

বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যা বর্তমান সংস্কৃত, বাংলা ও গ্রীষ্ম শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; গ্রীষ্ম ও আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিধান ; সমুদ্রতত্ত্ব এবং
আর্য্য ও অসার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সন্দর্ভভিত্তিক শাস্ত্রিক ব্যক্তি-
গণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ভাষ্য, ব্যাকরণ, অলংকার, ছন্দোবিদ্যা, ভাষ্য,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোচ্যার্থী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাশ্রমণী ও বাসনা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কবিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নামা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক ব্রহ্মবিধান ।

তৃতীয় খণ্ড ।

ক—কার্য্য ।

(১৪ নং তেলিপাড়া লেন, বিশ্বকোষ কার্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও
প্রকাশিত ।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইন্ডিন এস,
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ।

১২৯৯ সাল ।

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the
the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the
the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the
the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the
the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the
the twenty-first is the fact that the
the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the
the twenty-fourth is the fact that the
the twenty-fifth is the fact that the
the twenty-sixth is the fact that the
the twenty-seventh is the fact that the
the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the
the thirtieth is the fact that the
the thirty-first is the fact that the
the thirty-second is the fact that the
the thirty-third is the fact that the
the thirty-fourth is the fact that the
the thirty-fifth is the fact that the
the thirty-sixth is the fact that the
the thirty-seventh is the fact that the
the thirty-eighth is the fact that the
the thirty-ninth is the fact that the
the fortieth is the fact that the
the forty-first is the fact that the
the forty-second is the fact that the
the forty-third is the fact that the
the forty-fourth is the fact that the
the forty-fifth is the fact that the
the forty-sixth is the fact that the
the forty-seventh is the fact that the
the forty-eighth is the fact that the
the forty-ninth is the fact that the
the fiftieth is the fact that the
the fifty-first is the fact that the
the fifty-second is the fact that the
the fifty-third is the fact that the
the fifty-fourth is the fact that the
the fifty-fifth is the fact that the
the fifty-sixth is the fact that the
the fifty-seventh is the fact that the
the fifty-eighth is the fact that the
the fifty-ninth is the fact that the
the sixtieth is the fact that the
the sixty-first is the fact that the
the sixty-second is the fact that the
the sixty-third is the fact that the
the sixty-fourth is the fact that the
the sixty-fifth is the fact that the
the sixty-sixth is the fact that the
the sixty-seventh is the fact that the
the sixty-eighth is the fact that the
the sixty-ninth is the fact that the
the seventieth is the fact that the
the seventy-first is the fact that the
the seventy-second is the fact that the
the seventy-third is the fact that the
the seventy-fourth is the fact that the
the seventy-fifth is the fact that the
the seventy-sixth is the fact that the
the seventy-seventh is the fact that the
the seventy-eighth is the fact that the
the seventy-ninth is the fact that the
the eightieth is the fact that the
the eighty-first is the fact that the
the eighty-second is the fact that the
the eighty-third is the fact that the
the eighty-fourth is the fact that the
the eighty-fifth is the fact that the
the eighty-sixth is the fact that the
the eighty-seventh is the fact that the
the eighty-eighth is the fact that the
the eighty-ninth is the fact that the
the ninetieth is the fact that the
the ninety-first is the fact that the
the ninety-second is the fact that the
the ninety-third is the fact that the
the ninety-fourth is the fact that the
the ninety-fifth is the fact that the
the ninety-sixth is the fact that the
the ninety-seventh is the fact that the
the ninety-eighth is the fact that the
the ninety-ninth is the fact that the
the hundredth is the fact that the

বিশ্বকোষ

ক

ক ১ বাজ্ঞনবর্ণের প্রথম অক্ষর, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ইহার বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা রুদ্র, মাত্রা সরস্বতী, অক্ষরাকার রেখা কুণ্ডলী ও মধ্যস্থ শূন্যস্থান সদাশিব। (বর্ণোচ্চারতত্ত্ব)। তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত ককারের নাম—ক্রোধী, জীশ, মহাকালী, কামদেবপ্রকাশক, কপালী, ভেজস, শাস্তি, বাজুদেব, জয়ানল, চক্রী, প্রজাপতি, সৃষ্টি, দক্ষিণত্বক, বিশালশক্তি, অনন্ত, পার্শ্বিণ, বিষ্ণু, ভাগিনী, পরমাত্মক, ঋগীন্দ্র, মুখী, ব্রহ্মা, সখাদ্য, অজ্ঞঃ, শিব, জল, মাহেশ্বরী, তুলা, পুষ্পা, মঙ্গল, চরণ, কন, নিত্যী, কামেশ্বরী, মুখ্য, কামরূপ, গজেন্দ্রক, ত্রীপুর, রমণ ও রজকুম্ভা।

কামদেহু-তত্ত্বে ককারতত্ত্ব এইরূপ লিখিত আছে,— “ককারের বামরেখা অবাপুল ও অলঙ্কবর্ণ, দক্ষিণরেখা পরজন্তু তুলা, অধোরেখা মরকতপ্রভ, মাত্রা শম্বকুলদৃশ ও সাক্ষ্য সরস্বতী, অক্ষরাকৃতি কুণ্ডলী কোটিবিজ্ঞানভার প্রাণ আকারবিশিষ্ট; এবং মধ্যদেশের শূন্যস্থান সদাশিব কোটি-চক্রে সমবর্ণ। শূন্যগর্ভে কৈবল্যপ্রদায়িনী কালী অবস্থান করেন। ককার হইতেই সমগ্র কাম, কৈবল্য, অর্থ ও ধর্ম উৎপন্ন হয়। ককারই সর্ববর্ণের মূল প্রকৃতি, কামদা, কাম-রূপিনী, অব্যয়া, কামনীরা প্রকৃতি স্কন্দরী ও সন্দেবগণের মাতা। ককারের উর্ধ্বকোণে কামা নারী ব্রহ্মশক্তি, বাম-কোণে জোতা নারী বিষ্ণুশক্তি ও দক্ষিণকোণে বিন্দুনারী সংহারশক্তি রৌদ্রশক্তি। ককারই দেবগণমধ্যে ব্রহ্মা ইচ্ছা শক্তিমান, বিষ্ণু জ্ঞানশক্তিমান ও রুদ্র ক্রিয়াশক্তিমান। আত্মবিদ্যা, মঙ্গল ও মন্ত্র সর্বদা ককারে অবস্থিত আছে। পঞ্চদেবভাসর ককার ত্রিপুরাদেবীর আগমনস্থল, জৈবর সেই ককারই ত্রিকোণে অবস্থান করেন। জবা, অলঙ্ক ও লিঙ্গরূপ রক্তবর্ণী, চকুদুর্ভা, ত্রিভোজা, কনক-কোরকাকৃতি

তনয়বিশিষ্টা; বস্র, ককণ, কেদুর্ন, অকল, ইত্যদয়ঃ পুণ্যহারানিশোভিতা কামিনীকে ধ্যান করিয়া দশকর ককার জপ করিলে, তাহার ইষ্টসিদ্ধি হয়।”

২ যাকুর অধুবদ্বিশেষ। ক অধুবদ্ব ধাকিলে, সেই যাকুর চুরাদিগণের বৃত্তিতে হইবে। (কচু-রাসিঃ ১-কবিশ্রুঃ)। চুরাদিগণের যাকুর উত্তর দ্বাৰ্ধে গিচ্ হইয়া থাকে।

৩ পাণিনি ব্যাকরণশেখক প্রাক্তরবিশেষ। কক্, কন্, কপ্ প্রকৃতি প্রাক্তরের ও ক অবশিষ্ট থাকে।

ক (ক্লী) কারতি শব্দ করেতি-আবো যন্ম সত্যতি শেবঃ, কৈ-ড, (অষ্টেভ্যোহপি সৃভতে। পা ৩।২।১০১।) ১ মন্তক। ২ (কারতি শব্দ্যতে প্রোভোবেগেন) জল। ৩ সুখ। ৪ (কচ্যতে সংঘাত্তে, কচ-ড) কেশ, চুল।

কু (পুং) কচতি নীপাতে বেন জ্যোতিষা, কচ-ড। ১ জন্ম। ২ বিষ্ণু। ৩ প্রজাপতি। ৪ নক। ৫ কন্দর্প। ৬ অগ্নি। ৭ বায়ু। ৮ যম। ৯ সূর্য্য। ১০ আত্মা। ১১ স্রষ্টা। ১২ গ্রহি। ১৩ মনু। ১৪ মম। ১৫ শরীর। ১৬ কাল। ১৭ ধর্ম। ১৮ শক। ১৯ প্রকাশ। ২০ পক্ষী। ২১ রজ। ২২ পরলোক। ২৩ কিরণ। ২৪ (জি) সর্বমাস শব্দ, কে কি প্রকৃতি আর্যে প্রযুক্ত হয়।

কুই (দেশজ) ১ মন্তবিশেষ, ইহার লংকৃত নাম কবরী, কবিকাগুজ, জকচমুগী। (Cojus Coboju) জন্তাভ মন্ত অগেকা এই মন্ত জলশূন্য হানে অধিককণ বাচিয়া থাকে, কাটার পরও কিছুকণ ইহাদিগকে মকাচকা করিতে দেখা যায়। কই মাহ তালপাহে উঠিতে পারে বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, বহুজঃ ইহারা কর্ণদেশর কাটার অবলম্বন রাখিয়া উচ্চস্থানে উঠিতে গম্ব, সমকৃষিতেও ঐরূপ ভাবে বহুহর চলিয়া বাইতে দেখা গিয়াছে। বশোর জেলার এই মন্ত বহল পরিমাণে পাওয়া যায়, এই সকল কই জন্তাভ দেশের কই অপেক্ষা বৃহদাকার ও সুবাহ। বৈদ্যক-

মতে ইহার গুণ,—বধূর, মিষ্ট, বলকারী, বায়ু ও ককনাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তকর। বৈদ্যগণ অনেক স্থলে কই, মাগুর, শিথি প্রভৃতি রক্তের বৃথ পথ্যপ্রদান করিয়া থাকেন। ২ কোথায়? এই প্রশ্নের স্থলে কই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৩ সাবেগে কোন বিষয়ের অঙ্গসন্ধানকালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কইলা (দেশজ) গোবৎস, বাছুর।

কই (দেশজ) কই মাছ। [কই দেখ।]

কউত্তর (দেশজ, কপোত শব্দের অপভ্রংশ) পায়রা।

কএক (দেশজ) ১ কতকগুলি, কতিপয়। ২ কিঞ্চিৎ।

কএখা (দেশজ) কপিথ, কয়েম বেল।

কএদ্ (আরব্য) আটকান, অবরোধ, বন্ধ।

কএদখানা (পারস্য) কারাগার, যেখানে অপরাধীদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

কএদী (আরব্য কএদ্ শব্দজ) বন্দী। বিচারালয়ে যাহারা অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়া কারাগারে রুদ্ধ হইয়া থাকে।

কঁয়া (জি) কং লুপ্তমত্যতি, কন্-বন্ (কংশংভ্যাং বত্বুতি) ভূতবসঃ। পা ৫।২।১৩৮।। জুহী।

কঁয়া (জি) কং লুপ্তমত্যতি, কন্-বন্ (কংশংভ্যাং বত্বুতি) ভূতবসঃ। পা ৫।২।১৩৮।। লুখশালী।

কঁবুল (পারস্য শব্দজ) নীলকণ্ঠাক বর্ষলক্ষ্মীলীল গ্রহযোগ্য বিশেষ।

কংস (পুং, স্ত্রী) মন্যাদির পানপাত্র।

কংসহরীতকী (স্ত্রী) শোধরোগীধিকারোক্ত বৈদ্যক ঔষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—বেলছাল, শোনা-ছাল, গামারছাল, পাকলছাল, গণিরারিছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃষতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমূহের একত্র ২২ সের, ৩৪৩ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই সময়ে ১০০টা হরীতকী ডিলভাবে গুট্টলী করিয়া তাহাতে সিদ্ধ করিতে দিবে; ১০ সের অবশিষ্ট থাকিতে এই কাথ হাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন শুদ্ধ ২২ সের গুলিরা পুনরায় হাঁকিয়া লইতে হইবে এবং ১০০টা হরীতকী সহ মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে জিকটু, দাকচিনি, ভেজপত্র, এলাইচ ও ববকার প্রত্যেক ৭ তোলা প্রক্ষেপ দিবে; শীতল হইলে ২ সের মধু মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ এই হরীতকী ১ট ও ১০ তোলা পরিমিত লেহ সেবন করিলে শোধ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। (চক্রবর্ত্ত)

কংস (স্ত্রী, পুং) কাম্যতে কামরতিবা অনেক পাত্তম, কন্-স (বৃত্তবদিসিককিকবিভ্যঃ সঃ। উণ ৩।৩২।) ১ মন্যাদি পান করিবার পাত্র; ইহার পর্যায় পানভাঙ্গল, কংস ও

কাংস্ত। ২ ধাতুস্ত্রয। ৩ বর্ণ-মোপ্যাদি নির্মিত পান-পাত্র। ৪ পরিমাণবিশেষ, আঢ়ক; বৈদ্যকমতে আট সেরকে আঢ়ক বা কংস বলে। ৫ কাঁসা। সাত ভাগ ভাত ও দুই ভাগ বন্ধ এই উত্তর ধাতুর মিশ্রণে কাঁসা প্রস্তুত হয়; ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কাংস্ত, কংসাধি ও ভাতার্কি। চীন ও ভারতবর্ষে কাঁসার বাসন ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে খাগড়ার কাঁসার বাসনই প্রসিদ্ধ, এখানকার উত্তম কাঁসার বাসন দেখিতে ঠিক রূপার মত। কাঁসার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮.৪০২। কাঁসা পরীক্ষা করিলে, এই কয়েক ধাতু বাহির হয়।—

তাম্রা	...	৪০.৪ ভাগ।
দস্তা	...	২৫.৪ ভাগ।
রূপদস্তা	...	৩১.৬ ভাগ।
লৌহ	...	২.৬ ভাগ।

বিলাতের লোকেরা ইহাকে এক প্রকার জর্মনরোপা (German Silver) বলিয়া থাকেন। ৬ গোলাকার বন্ধ-পাত্রবিশেষ। ৭ (পুং) (কংস্তে শান্তি শব্দ জন্ম কং-স) অস্ত্রবিশেষ, ইনি মথুরারাজ উগ্রসেনের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। হরিবংশে কংসের উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে,—

“কোন সময়ে ঋতুরাতা উগ্রসেনপত্নী সুবাসুন নামক পুরুষ দর্শনে গির্যাহিলেন, তখন সৌতপতি ক্রমিল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কামবশে অধীর হইয়া উঠিল এবং কৌশলে পরিচয় জানিয়া, উগ্রসেনের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত রমণ করিল। উগ্রসেনপত্নীর পতি অপেক্ষা তাহার গৌরব-ধিক্য দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং ভীতভাবে তাহাকে ‘কন্তু স্বং’ বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ক্রমিল পরিচয় প্রদান করিবাণ্ড, তিনি বারবার তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ক্রমিল বলিল,—অনেকানেক মানবপত্নী ব্যভিচার দ্বারাই দেবসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, সুতরাং ব্যভিচার জন্ত তোমারও কোন দোষ হইতে পারে না। তুমি আমার ‘কন্তু স্বং’ বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে; এজন্য তোমার ‘কংস’ নামক শত্রুবজরী পুত্র উৎপন্ন হইবে।” (হরিবংশ ৮৫ অঃ।) দ্বারাচার কংস বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, দ্বীর পিতাকে কারাকন্ড করিয়া বধ রাজ্য হইরাছিল। বহুবংশীর বহুদেবের সহিত তাহার ভগিনী দেবকীর বিবাহ কালে, ‘দেবকীর অষ্টম গর্ভকাল পূজহন্তে তাহার প্রাণনাশ হইবে, এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া কংস ভগিনী ও ভগিনীপত্যকে কারাকন্ড করিয়া রাখিয়াছিল এবং একে একে তাঁহাদিগের হৃদয় পুত্র বিনষ্ট করিয়াছিল।

বৈব-কোশলে বহুবেব জটনপূত্র কককে বুঝাবনে নন্দবোবের
নিকট রাখিরা আলিরাহিলেন, পরে সেই শ্রীকঙ্কের হস্তেই
কংস নিহত হইরাছিল। [কক দেখ।]

কংস ১ নদীবিশেষ। মঙ্গলচণ্ডী প্রণেতা মাধবাচার্য
লিখিরাছেন, এই নদী কলিকতেশে; ইহার তটে দেবীর মঠ
নির্মািত হইরাছিল। বখা—

“আনিরাত বিখস্কর, মঠ গড়াও নবর,

কলিকে করিবে তোমা পূজা।

কংস নদীর তটে, গঠে হুদর মঠে,

অহুবল দিহু হুদমান হ”

এই নদী বর্তমান উড়িষ্যা-প্রদেশের বালেশ্বর জেলায়
কংসবীস নদী বলিরা বোহ হয়। [কংসবীস দেখ।]

২ ভৈরবকঙ্কের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (ব্রহ্মখণ্ড ৪৪। ২৩৯।)

কংসক (কী) কংস-সংজ্ঞায় কন্। হীরা কংসবিশেষ। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—পুশ্কাবীস ও নরনোবধ। [কালীস
দেখ।] (বিভিন্ন পুশ্কাবীস কংসক নরনোবধ।
হেম ৪। ১২৩।)

কংসকর, প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত বরুণকুণ্ডের নিকটস্থ
একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। (কালিকাপুরাণ ৭৯ অঃ)।

কংসকার (পুং) কংস তমরপাত্র করোতি, কংস-কৃ-অণ্।
(কর্মণ্য। পা ৩। ২। ১) জাতিবিশেষ, কীসারি। বৃহদ্রথ-
পুরাণের মতে ব্রাহ্মণ ঔরসে বৈশ্রাগর্ভে কীসারির উৎপত্তি;
কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে,—বিষকর্মী পুত্রাগর্ভে
মালাকার, কর্মকার, শখকার, সুবিলক, কুঙ্ককার ও
কংসকার এই ছয়জন শিল্পকর উৎপাদন করেন। উপনস্
বলেন,—কজিরাগর্ভে বৈশ্রের ঔরসে শুকবার ও কংসকারের
উৎপত্তি। সুতরাং এইজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ
গোলযোগ। তবে এই তিন মতেই এই জাতি সফর বলিরা
প্রতিপন্ন হইতেছে। বাহা হটক, এই জাতি সংপূত্র বলিরা
প্রসিদ্ধ; ব্রাহ্মণগণও ইহাদিগের স্ট্রীজলাদি গ্রহণ করিরা
থাকেন।

কংসকুন্ (পুং) কংস কুটবান্, কংস-কু-কিপ্। শ্রীকক।
তিনি কংসের কেশাকর্ষণ করিরা বিনাশ করিরাহিলেন।

কংসজিৎ (পুং) কংস জিতবান্, কংস-জি-কিপ্। শ্রীকক।

কংসবণিক (পুং) কংসত বণিক, ৬তৎ। ১ কীসার ক্র-
বিক্রয়কারী। ২ কীসারি।

কংসবতী (কী) কংসের ভগিনী, বহুব্রোহের কনিষ্ঠ পত্নী।

কংসবীস, উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার প্রবাহিত একটি নদী।
দেবীরেরা ইহাকে কীসবীস নদী কহে। এই নদী বীরপাড়া

হইতে বিধারা হইয়া ক্রমাগত দক্ষিণপূর্বে আসিরা সাগরে
মিলিত হইরাছে, উহার মোহনার দায়ভনপুর।

কংসহান্ (পুং) কংস হস্তবান্, কংস-হ-কিপ্। ১ শ্রীকক।
২ বিষ্ণু।

কংসা (কী) কংসভগিনী, উগ্রসেনের কস্তা ও বৈবভাগের পত্নী।

কংসারি (কী) কংসবৎ আকারমুচ্ছতি, কংস-কৃ-অণ্। অবি,
কীসার ন্যায় গুরুবর্ণ অবি।

কংসারোতি (পুং) কংসত অরোতি; শক্রঃ, ৬তৎ। ১ কংস-
শক্র, শ্রীকক। ২ বিষ্ণু। (কংসারতিরথোককঃ। অমর।)

কংসারি (পুং) কংসত অরি; শক্রঃ, ৬তৎ। শ্রীকক।

কংসাস্থি (কী) কংসরস্থি, উপরি। ১ ধাতুবিশেষ,
কীসা। ২ কংসার।

কংসিক (কি) কংসেন আত্মকমানেন আত্মতম্, কংস-
টিন্ (কংসাটিন্। পা ৫। ১। ২৫।) এক আত্মক বা
আট সের পরিমাণে যে বস্ত্র আহরণ করা হইরাছে।

কংসোস্তুবা (কী) কংসাং ধাতুবিশেষাৎ উদ্ভবতি, কংস-
উৎ-ভৃ-অচ-টাপ্। স্তম্ভজি স্তম্ভিকাবিশেষ, সৌরাষ্ট্রস্তম্ভিকা।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—আত্মকী, ভুবরী, কাকী, মুদাক্ষরা,
সৌরাষ্ট্রী, পার্শ্বকী, কালিকা, পপটী ও নভী। বৈদ্যোক্ত
অনেক ঔষধেই ইহার ব্যবহার উপদেশ আছে, কিন্তু এখন
এই স্তম্ভিকার নিত্যত অভাব হওয়ার, পরিভাষার উপদেশাহ-
সারে ইহার পরিবর্তে পঞ্চপটী ব্যবহার হইরা থাকে।

কক (ধাতু) কৃৎ আত্ম সক্র সেট্। গমন করা। (ককি
ব্রজনে। কবিঃ।)

কক (ধাতু) কৃৎ আত্ম অক্র সেট্। ১ গর্ভ। ২
চপল হওয়া। ৩ ইচ্ছা হওয়া। (কক্ ক্রিগাক্ষিপণ্যে।
কবিঃ।)

ককৎসু (পুং) কৃৎবাংশীর রাজবিশেষ।

ককল্ল (পুং) ককো গর্ভাদিকং ভবত্যাখ্যৎ, কক-জলচ্। বর্ণ।
(ককল্লঃ কনকে পুনি। শব্দার্থিকঃ।)

ককর (পুং) কক-অরচ্। পক্ষীবিশেষ।

ককরঘাট (পুং) কং বিবং করহাটে অন্ত, পৃথোদরাবিদ্যাৎ
হস্ত যঃ। মূলবিষয়কবিশেষ, যে সকল কৃকের মূলভাগ
(শিকড়) বিবাক।

ককরাউল, ঝারভাঙ্গার একটি গ্রাম। ঝারভাঙ্গা নগরের
প্রায় ছয় কোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে অতি উত্তম কাপড়
বোনা হয়, এই কাপড় নেপালীরা বড় ভালবাসে। এখানে
প্রবাহ আছে যে, এই গ্রামে কপিলমুনি বাস করিতেন।
প্রতিবর্ষে ঝারভাঙ্গা এখানে বেলা হয়।

ককরাণি, যম্মদুর্গ জেলার দাতিগঞ্জ মহকিমের অন্তর্গত একটি নগর। এখানে হিন্দু ও মুসলমানের বাস। সিপাইবিদ্রোহের সময় এখানকার মুসলমানেরা উত্তেজিত হইরাছিল। ১৮৫৮ খৃঃ, এপ্রেল মাসে জেনারেল পেনি বিদ্রোহীদের গুলি করিবার জন্য এখানে আগমন করেন, কিন্তু বিদ্রোহীর হাতে তাঁরকে পরলোক গমন করিতে হইল, তাহার সৈন্যসামন্তগণ বিদ্রোহীদের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ককরাণি নগরে হিন্দু দেবমন্দির ও মুসলমানের মসজিদ আছে। বিদ্রোহের পূর্বে এখানে ভাল ভাল বাড়ীর ছিল, কিন্তু এই সময়ে বিদ্রোহীরা পোড়াইয়া ছারবার করিয়া কেনে; এখন মাটির ঘরই অধিক। এখানে সরাই, ডাকঘর ও পুলিশ আছে।

ককর্দ (পুং) হিংসা। (“ককর্দয়ে যুবভো যুক্ত আসাং।” শব্দ ১. ১১২। ৩। ককর্দবেশ জ্ঞাং হিংসার। ভাষ্য।)

ককর্দহি (ককরদৃশ ?)—একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে ময়বাস হইতে সিংহপুর বাইবার পথ হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ দূরে, বরগিয়া নামার পশ্চিমে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ে অসংখ্য শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখনও ১২টি মন্দির নষ্ট হয় নাই, প্রত্যেক মন্দিরে ৫।৬ ফিট উচ্চ এক একটি শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরগুলি দেখিলে বোধ হয়, উহা ৮।৯ শত বর্ষের পুরাতন।

ককাইর (ককাইর) নাগপুরের একটি নগর। অক্ষ° ২০° ১৫' উঃ, দ্রা° ১৮° ৩০' পূঃ; মহানদীর দক্ষিণ তট এবং দুর্গ পরিবেষ্টিত অত্যন্ত শৈলমালার ব্যবধানে অবস্থিত। পূর্বে এই নগর মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে ছিল, তখন এখানকার রাজাকে প্রত্যেক্ষ ৫০০ সৈন্য যোগাইতে হইত। ১৮০৯ খৃঃ, রাজার বেদখল হইল, কিন্তু অপালাহেবের পলায়নকালে তখনকার রাজা কতকগুলি বিদ্রোহীর সহিত যোগ দিয়া এই স্থান পুনরায় অধিকার করেন। এখন এখানকার রাজাকে প্রতিবর্ষে ৫০০ টাকা কর দিতে হয়।

ককাটিকা (স্ত্রী) ১ বাড়ি, ককাটিকা। ২ শলাটের অঙ্কি।

ককানি (দেশজ) ১ অতিরিক্ত রৌদ্রকালে দম্ব বন্ধ হওয়ার সময় হওয়া। ২ কাভরভা প্রকাশ।

ককানি (দেশজ) ১ অতিরিক্ত রৌদ্রকালে একটানা পাক বিশেষ। ২ কাভরভা।

ককুজল (পুং, স্ত্রী) কং অঙ্গং কুজরতি বসিতে, ককুজ-অঙ্গ, (পুণ্ডরিকবিধাৎ নম্ব হুবচ।) চাতকশাবী।

ককুৎ (পুং, স্ত্রী) কং অঙ্গং কুজরতি প্রাপতি শৃংখলিত-শেষ, ক-কু-গিচ-কিপ-কুগাপনঃ বৃখচ, (পুণ্ডরিকবিধাৎ।)

১ বৃষের পৃষ্ঠদেশস্থ অবরবিশেষ, খুট। ২ প্রব। ৩ প্রেষ্ঠ। ৪ হস্তচাক্ষুরাদি রাজচিহ্ন। ৫ পর্ত্তপৃষ্ঠ।

ককুৎসল (স্ত্রী-দেশিক) ককুৎ নামক স্থলঃ অবরবিশেষঃ, (পুণ্ডরিকবিধাৎ সাধু।) ককুৎ নামক বৃখাধর, খুট।

ককুৎসু (পুং) ককুদি তিষ্ঠতীতি, ককুৎ-অঙ্গ। পুণ্ড-বংশীর পুরজর নামক রাজবিশেষ। ইহার পিতার নাম শশা। পুরজরের রাজ্যকালকালে অর্ধে দেবগণ দৈত্য ককুৎসু পরাজিত হইয়া বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিষ্ণু তাঁহাদের পুরজরের সাহায্য লইতে উদ্যোগ দেন; তদনুসারে দেবগণ তাঁহার সিকট আসিরা প্রার্থনা করিলেন, তিনিও তাহাতে সন্মত হইয়া, স্বরূপী ইন্দের ককুৎসুকে আরোহণ কর্ত্ত্বক হুজ্বাভা করিলেন। তাহার সেই যুদ্ধে সমগ্র দৈত্যগণ পরাজিত হওয়ার, দেবগণ স্ত্রীত হইয়া, তাঁহাকে ‘ককুৎসু’ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। (তাগবত ৯। ৬। ১১।)

ককুদ (স্ত্রী) [ককুৎ দেখ।]

ককুদ (পুং, স্ত্রী) কং অঙ্গং কোতি স্থচরতীতি, ক-কু-কিপ-তুচ্চ। ১ বৃষের খুট। ২ প্রধান। ৩ রাজচিহ্ন। ৪ পর্ত্তাপ্রভাগ।

ককুদাক (স্ত্রী) ককুদঃ রাজচিহ্নঃ অঙ্কোতি, ককুদ-অঙ্গ-অঙ্গ। রাজচিহ্নধারক।

ককুদাবর্ত্ত (পুং) ককুদি আবর্ত্তঃ, ককুদা। বৃষের ককুদ স্থলস্থ রোমাবর্ত্তবিশেষ।

ককুদ্যৎ (পুং) ককুদস্ত্যত, ককুদ-মতৃপ। ১ বৃষ। ২ পর্ত্ত। ৩ প্রবর্ত্তক নামক বৈদ্যোক্ত ক্রোধবিশেষ। ৪ উদ্বী, ডেউ।

ককুদ্যতী (স্ত্রী) ককুদিব অতিশয়তো বাৎসনিষ্ঠোহস্ত্যাত্ম, ককুদ-মতৃপ-ভীপ। মিতবদেশ।

ককুদ্যিম্ (পুং) ককুদস্ত্যতি, ককুদ-মিনি। ১ বৃষ। ২ পর্ত্ত। ৩ রৈবত্তরাজা, ইহার পিতার নাম রেব; বলদেব ইহার ভ্রাতা।

ককুদ্যস্ত্যতী (স্ত্রী) ককুদ্যিম্ রৈবত্তস্ত্যত, ৬-তৎ। রেবতী, ককুদ্যস্ত্যত বলদেবের ভাৰ্যা।

ককুদ্যর (স্ত্রী) ককুদ শরীরতঃ কুং অবরবিশেষঃ কৃপাতি, ককুদ-বচ-কুদ। মিতবহলের উত্তর পার্শ্ব পর্ত্তপৃষ্ঠ।

ককুপ্ [ভ] (স্ত্রী) কং বাতঃ কু-কিপ্ (পুণ্ডরিকবিধাৎ) ১ দিক্। ২ রাগিণীবিশেষ। ৩ শোভা। ৪ চন্দ্রকমলা। ৫ শাস্ত্র। ৬ প্রবেণী।

ককুত্ (স্ত্রী) কং অঙ্গং কুত্বাতি বিতরণতীতি, ক-কু-কিপ (পুণ্ডরিকবিধাৎ) ১ রাগিণীবিশেষ, ইহার অঙ্গর নাম ‘কুত্’। রাগিণী রাধাকান্তদেবের পঞ্চকল্পকমে সঙ্গীত-

দানোদানোক ককুতের বৈদ্যক ব্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা
অমূল্য। কারণ কানোবী রাগিনীর ব্যান ককুতার বর্ণিত
হইয়াছে। দানোদান সিদ্ধান্তপ্রণীত সঙ্গীতমৰ্শণে লিখিত আছে,

“সুশোভিতাকী রত্নমণ্ডিতাকী চন্দ্রাননা চন্দ্রকান্দবুজা।

কটাকিনী ভাং পরমা বিচিত্রা দানেন বুজা ককুতা মনোজা।”

ককুতার অঙ্গ সুন্দর ও বর্জিত, রতিরসে মণ্ডিত, মুখ
চন্দ্রের মত, চন্দ্রকমালা পরিশোভিত, দেখিতে পরম রমণীয়া,
মনোহরা, দামলীলা ও কটাকবুজা।

“ধৈবতাংশগ্রহভাঙ্গা সম্পূর্ণা ককুতা মতা।

তৃতীয়মূর্ছনোৎপন্ন শৃঙ্গাররসমণ্ডিতা।”

সম্পূর্ণা ককুতা রাগিনী ধৈবতের অংশ ও তৃতীয় মূর্ছনা
হইতে উৎপন্ন, ইহা শৃঙ্গাররসে গেল। যথা—ধ নি সি রি
গ ম প ধ।

২ দিক্। ৩ দক্ষকম্পাবিশেষ, ধর্মের পত্নী। [অজ্ঞাত
অর্থ ককুপ্ শব্দে দেখ।]

ককুভ (পুং) কক্ ভায়াঃ কুঃ স্থানং ভাতি অস্মাৎ, ক-কু-ভা-ক।
কং ভাতং ক্ষুভ্রাতি বিস্তারতীতি বা, ক-কু-ভ-ক, (পুণোদরাদি-
ভাৎ।) ১ অর্জুন নামক বৃক্ষবিশেষ। বৈদ্যকমতে
ইহার গুণ “শীতল ; তম, ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেহ,
মেদঃ, ব্রণ ও স্রোতোগনাশক।” [অর্জুন দেখ।] ২ বীণার প্রান্ত
দেশস্থ বক্র কাঠ, ইহার অপর সংস্কৃত নাম প্রসেবক। বীণার
উপরিদেশে যে বস্ দেওয়া হয়। ৪ বীণার অলারু অর্থাৎ
বস্। ৫ রাগবিশেষ। ৬ শিব। ৭ পক্ষীবিশেষ। ৮ তীর্থ-
বিশেষ, এখানে কশ্যপাদি বাস করেন। (লিঙ্গ পুং ৪২/৬০)

ককুভা (স্ত্রী) ১ দিক্। ২ রাগিনীবিশেষ। [ককুত দেখ।]

ককুভাদনী (স্ত্রী) নলী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [নলী দেখ।]

ককুভাদিচূর্ণ (স্ত্রী) ছত্রোগাধিকারোক্ত বৈদ্যক ঔষধ-
বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—অর্জুনছাল, বচ,
রান্না, বেড়োলা, গোরক্ষ, চাকুলে, হরীতকী, শটী, কুড়,
পিপুল ও শুঁট প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্রিত করিয়া
৥০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উপযুক্ত পরিমাণ গব্যমূত্রের সহিত
সেবন করিলে ছত্রোগ প্রশমিত হয়।

ককুভাতী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোবিশেষ। (“একম্বিন্ পক্ষকে
ছন্দঃ শব্দমতী বটকে ককুভাতীতি।” কাত্যায়ন।)

ককুহ (ত্রি) কক্ স্বর্য্যত কুং স্থানং দ্বিহীতে অতিক্রামতীৰ,
ক-কু-হা-ক। ১ অভিযন্ত উন্নত। ২ মহৎ।

ককেরুক (পুং) একপ্রকার কীট। এই কীট পাকস্থলীতে
জন্মে।

ককোর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Nauclea parvifolia.)

এই গাছ দ্বিবার্ষিক কায়েন, কুম্বারুনে কলহ, পত্রায়ে কমল
বা কমর, মহারাষ্ট্রে কমর, তামিল ভাষায় শীর কনব বা বোট
কহিবি, ভেলগুভে বট করবী এবং বাল্গালায় কেহ কেহ
চেকার বলে। এই গাছ ৩০ ফিট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহা
ভারতের গজাব ও শুমসরে, বোম্বাই প্রদেশে, কানাড়া ও
সত্তার বনজঙ্গলে, নল্লমলয়ে, দিল্লীর পশ্চিমে সীপ্পা নামক
স্থানে, শিবালিক গিরিমালা হইতে বিপাশা নদীর তট পর্য্যন্ত
নানান্থানে, সিংহল ও কিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জন্মে।

ইহার কাঠ কড়ি বরগা প্রভৃতি কার্য্যে লাগে। ভারতের
পশ্চিম উপকূলে ইহার তক্তার ঘরের মেজিয়া হয়। এই কাঠ
অতি কঠিন, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ইহার এক বনকুট ওজনে প্রায়
বিশ সের। ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত এই কাঠ নষ্ট হয় না।

ককোরী, বদাউন জেলার একটি গ্রাম। বদাউন নগর হইতে
ছয় ক্রোশ দূরে গঙ্গানদীর তটে অবস্থিত। এখানে প্রতি
বর্ষে কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় মহোৎসব হয়, সেই সময়ে
কাপপুর, দিল্লী, করখাবাদ এবং রোহিলখণ্ডের নানা স্থান
হইতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। যাত্রীরা এখান-
কার পুণ্যসলিলা গঙ্গায় তর্পণ ও অবগাহনাদি কার্য্য সমাধা
করিয়া ব্যবসায় মন দেয়। সেই সময়ে এখানে হাট বসে।
ভারতবর্ষের নানান্থান হইতে জিনিসপত্র আসিয়া থাকে।
গৃহস্থের আবশ্যক মত সকল দ্রব্যই সে সময়ে পাওয়া যায়।

কক (ধাতু) ভা° পর° অক° সেট্°। হাত করা। (ককহাসে।
কবি°ক্র°।)

ককট (পুং, স্ত্রী) কক-অটন্। যুগবিশেষ, অৰ্থমেধ যজ্ঞে এই
যুগের আবশ্যক হইত। (মহীধর)

ককুল (পুং) কক-উলচ্। বকুল বৃক্ষ।

ককোল (পুং) ককতে প্রকাশতে, কক-কিপ্ ; কোলতি
সংস্তারতি, কুল-জলাদিষাৎ প ; কক্চাসৌ কোলচেতি,
কক্ধা°। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কোলক,
কোষকল, কুতকল, কটুকল, বেবা, কুলমরিচ, ককোলক,
মাধবোচিত, কাল, কটুকল ও মরিচ। বৈদ্যাকোক্ত ইহার
গুণ—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তিক্ত, জ্বা, কটিকারক ; হৃথের
চূর্ণক, স্রোতোগ, কক ও বায়ুজ্ঞ রোগ এবং দেহরোগনাশক।
(ভাবপ্র°।)

ককোলক (স্ত্রী) ককোলজ ইন্দ্র বা বার্ধে ককোলকন্।

১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, [ককোল দেখ।] ২ শাস্ত্রীদ্বীপের অস্ত-
র্গত সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত। (বিষ্ণু পুং ২।৪ অঃ।)

কক্খ (ধাতু) ভা° পর° অক° সেট্°। হাত করা। (কক্খ
হাসে। কবি°ক্র°।)

কক্খট (পুং) ১ কঠিন। ২ (কক্খতীতি, কক্খ-অটন্) (ত্রি) হাতযুক্ত।

কক্খটপত্র (পুং) কক্খটানি প্রকাশিতানি পত্রাণি যন্ত, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ, (Corchorus olitorius.) বাহা হইতে পাট উৎপন্ন হয়। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পট্ট, বাজশল, শাপি ও চিম।

কক্খটী (স্ত্রী) কক্খতি প্রকাশয়তি বর্ষণেন বর্ণান্, কক্খ-অটন্-ডীপ্। খড়ী। ইহার সংস্কৃতপর্যায়—খটিকা, বর্ণলেখা, কঠিনী, খটী। [খড়ি দেখ]

কক্ (পুং) কষতীতি, কষ-স, (বৃত্তবদিনিহনিকমি কষিত্যঃ সঃ। উগ্ ৩। ৬২। বৃত্তবদহন কম ও কষ ধাতুর উত্তর স প্রত্যয় হয়।) ১ বাহুমূল, বগল। ২ তৃণ। ৩ লতা। ৪ শুকতৃণ। ৫ কচ্ছ। ৬ শুকবন। ৭ পাপ। ৮ বন। ৯ রুদ্র। ১০ ভিত্তি। ১১ পার্শ্ব। ১২ প্রকোষ্ঠ, গৃহ। ১৩ কক্ষারোগ, কঁকবিড়ালি রোগবিশেষ। [কক্ষ দেখ]। ১৪ কাছা। ১৫ অঞ্চল, আঁচল। ১৬ গ্রহগণের ভ্রমণ পথ। ১৭ প্রাতিযোগিতা, বিরোধ। ১৮ নৌকার অবয়ববিশেষ। ১৯ কোমরবন্ধ। ২০ রাজাস্ত্রঃ-পুর। ২১ মহিষ। ২২ বহেড়া। ২৩ জন্তুগণের শব্দ। ২৪ সাদৃশ্য, তুল্যতা। ২৫ সেকরার পরিমাণবিশেষ, এক রতি। ২৬ ভারতাক্ত আতিবিশেষ। [কচ্ছ দেখ]।

কক্ক (পুং) রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে দগ্ধ সর্পবিশেষ।

কক্কতু (পুং) কক্ক ইব তত্ত্বতে, কক্ক-তন্-ডু। বৃক্ষবিশেষ।

কক্কধর (স্ত্রী) কক্ষাং ধারয়তি, কক্ষা-ধৃ-অচ্। (পুৰোদরাদিষাং হ্রস্বঃ।) ব্রহ্মতোক্ত বক্ষঃ ও কক্কদেশের মধ্য মর্ধ্যস্থানবিশেষ; এই নর্ধ বিদ্ধ হইলে পক্ষঘাত হইয়া থাকে।

কক্কপ (পুং) কক্কে জলপ্রায়দেশে পিবতি, কক্ক-পা-ক। কচ্ছপ, কাছিম।

কক্করূহা (স্ত্রী) কক্কে জলপ্রায়ে রোহতি, কক্ক-রূহ-ক। নাগরমুখা; ইহা জলপ্রায় দেশেই অধিকাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কক্কশায় (পুং) কক্কে শুকতৃণে শেতে, কক্ক-শী-ণ। কুকুর।

কক্কশায়িনী (স্ত্রী) কক্ক-শী-গিনি-ডীপ্। কুকুরী, মাদৌ কুকুর।

কক্কশায়ু (পুং) কক্কে শেতে, কক্ক-শী-উণ্। কুকুর।

কক্কসেন (পুং) ১ রাজবিশেষ, পরীক্ষিতের পুত্র ও আবিষ্কৃতের পোত্র। ২ ঋষিবিশেষ, ইহার পুত্রের নাম অভিপ্রভারী।

* কক্কা (স্ত্রী) কক্ক-টাপ্। ১ হস্তী বাধিবার রজ্জু। ২ চক্রহার। ৩ প্রকোষ্ঠ, হুঠারী। ৪ দেওয়াল। ৫ সাম্য। ৬ রথের অঙ্গবিশেষ। ৭ কাছা। ৮ বিরোধ। ৯ মধ্যদেশ। ১০ রাজার অস্ত্রঃপুর। ১১ আঁচল।

১২ রোগবিশেষ। ব্রহ্মত বলেন,—বাহুপার্শ্বে ও বগলে বেদনামুক্ত যে কক্কবর্ণ ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে কক্কা বলে, ইহা পিত্তজ রোগ। এই রোগ পিত্ত জন্ত বিসর্পের ভায়ে চিকিৎসার উপদেশ থাকার, ইহাতে পদ্মমুগালসংলগ্ন কর্দম, গুলক ও ঝিহুক পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা গিরিমাটা ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। বটের মূল, মুখা, কলার মূল, পদ্মমুগালের গ্রাহি পেষণ করিয়া শতযোত ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। (চক্রদত্ত।)

কক্কাপট (পুং) কক্ষাকারঃ পটঃ বজ্রম্। কোপিন।

কক্কাবান্ [৭] (পুং) কক্ষা সাম্যমভ্যভ্যতি, কক্ষা-মতুপ, মত্ৰ বঃ। মুনিবিশেষ।

কক্ষাবেক্ষক (পুং) কক্ষার্য অবক্ষকঃ, ৬-তৎ। ১ অস্ত্রঃপুর-পালক, কক্ষী। ২ উদ্যানপালক। ৩ নাট্যকারক। ৪ কবি। ৫ লম্পট। ৬ ধারনক্ষক।

কক্ষিন্ (ত্রি) কক্ষং পাপমন্ত্যন্ত, কক্ষ-ইনি। পাপী।

কক্ষীকৃত (ত্রি) কক্ষ-কৃ-ক্ত-ক্ত। আয়ত্তীকৃত, অধীন।

কক্ষীবান্ (পুং) ঋষিবিশেষ, ইহার পিতার নাম দীর্ঘতম।

কক্ষৈয়ু (পুং) রোদ্রাশ্চের পুত্র। দশ অঙ্গরাগর্ভে রোদ্রাশ্চের দশটি পুত্র জন্মে তন্মধ্যে স্ত্রীতাটী গর্ভজাত পুত্রের নাম কক্ষৈয়ু।

কক্ষোথা (স্ত্রী) কক্ষাৎ কচ্ছভূমিতঃ উত্তিষ্ঠতি, কক্ষ-উৎ-স্থ-ক-টাপ্। ভদ্রমুখা, নাগরমুখা।

কক্ষ্য (স্ত্রী) কক্ষায়ৈ সাম্যায় ভবন্, কক্ষা-যৎ। ১ নিক্তির বাটী। (ত্রি) ২ কক্ষপূর্ণকারক। ৩ (কক্ষে ভবন্) কক্ষাৎ-পন্ন। ৪ (পুং) রুদ্র। ৫ উত্তরীয় বস্ত্র। ৬ প্রকোষ্ঠ। ৭ সাদৃশ্য। ৮ রাজাস্ত্রঃপুর। ৯ পার্শ্বভাগ।

কক্ষ্যা (স্ত্রী) কক্ষে ভবা, কক্ষ-যৎ-টাপ্। ১ কাছদড়ী, কাছি। ২ হস্তী বাধিবার চর্মরজ্জু। ইহার সংস্কৃতপর্যায়,—চূষা, বরজা, বৃষা, দৃষ্যা, দৃষ্যা ও কক্ষা। ৩ প্রকোষ্ঠ। ৪ মহল। ৫ চক্রহার। ৬ সাদৃশ্য। ৭ উদ্যোগ। ৮ বৃহতী। ৯ উত্তরীয় কাপড়। ১০ চক্রহার বাধিবার দড়ি। ১১ গুজা। ১২ অঙ্গুলি। ১৩ কোমরবন্ধ।

কক্ষ্যাবান্ (পুং) কক্ষ্যা অন্ত্যন্ত, কক্ষ্যা-মতুপ, মত্ৰ বঃ। হস্তী।

কক্ষ্যাবেক্ষক (পুং) [কক্ষাবেক্ষক দেখ]।

কথন (দেশজ) কোন সময়ের।

কথনও (দেশজ) কোন সময়ের।

কথ্যা (স্ত্রী) কথ-যৎ-টাপ্। [কক্ষা দেখ]।

কক্ক (পুং) কক্কতে উৎগচ্ছতি, কক্ক-অচ্-হুম্চ। ১ পক্ষী-বিশেষ; সাধারণতঃ ইহাকে কঁক বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সৌহপুচ্ছ, সনৎশবদন, খর, রণালঙ্করণ, ক্রুর,

আমিষপ্রিয়, অরিষ্ট, কালপুট, কিংশাক, সৌহপুঠক, দীর্ঘপাদ, ও দীর্ঘপাৎ । ২ বম । ৩ ছন্দবেণী ব্রাহ্মণ । ৪ যুধিষ্ঠির, অজ্ঞাত বানকালে তিনি 'কক্ক' নামে বিরটরাজের সনত্ত হইরা-
ছিলেন । ৫ কংসাসুরের ভ্রাতা । ৬ ক্ষত্রিয় । ৭ শাস্ত্রলি
খোপান্তর্গত পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত । ৮ চূত নামক রাজা । ৯ অশ্বমেধের
কনিষ্ঠ । ১০ জনপদবিশেষ । (মার্ক ৫৮ । ৮) মহাভারতে
লিখিত আছে, রাজস্বয়ম্বজ্ঞকালে এখানকার লোকেরা
রাজা যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞ উপহার লইয়া গিয়াছিল ; এই জনপদ
নেপালে অথবা তিব্বতের পূর্বাংশে বলিয়া অনুমিত হয় ।
১১ উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জমিদারী ।

কক্ক (জী) কংসের ভগিনী, বহুদেবের ভ্রাতৃবধু ।

কক্কট (পুং) কং দেহং কটতি আবুগোতি, ক-কট-অচ, কক্
অটন্ বা (শকাধিত্যো হটন্ । উণ্ ৪ । ১৮ ।) কবচ, বর্ম্ম ।

(কক্কটঃ পুংসি সরাহে তদ্বৎ কক্কটকো হপি চ । শকাধি ।)

কক্কটক (পুং) কক্কট-স্বার্থে কন্ । কবচ ।

কক্কটেরী (জী) হরিদ্রা, হলুদ । (কক্কটেরী হরিদ্রায়াং ।
শকাধি ।)

কক্কণ (ক্রী) কং ইতি কণতি, কং-কণ-অচ । ১ হস্তাভরণ-
বিশেষ, ইহার সংস্কৃতপর্যায়,—করভূষণ ও কোশুক । ২ হস্ত-
হস্ত্র । ৩ ভূষণমাত্র । ৪ শেখর । ৫ (কমিত্যব্যয়ং জলং, তন্ত
কণা) (পুং) জলকণা ।

কক্কণী (জী) ককি গতো-যঞ, কক্কে গমনে অগতি শকা-
য়তে, কক্ক-অণ-অচ-ভীষ । কং ইতি কণতি, কং-কণ পচাদ্যচ-
ভীষ ইতি বা । ক্ষুদ্র ঘণ্টা, ঘুঙ্গুর ।

কক্কণীকা (জী) পুনঃ পুনঃ কণতি, কণ-যঙ (লুক্)-ঈকন্,
ধাতোঃ কক্কণাদেশচ (চক্ণঃ কক্কণ চ । উণ্ ৪ । ১৮ ।)
ক্ষুদ্রঘণ্টা, ঘুঙ্গুর ।

কক্কত (ক্রী) কক্কতে শিরোরমণ প্রাপ্নোতি, ককি-অতচ ।
১ কাঁকুই, চিকুণী । ২ (পুং) বৃক্ষ । ৩ অন্নবিষ প্রাণী-
বিশেষ ।

কক্কতদেহী (পুং, জী) প্রাণীবিশেষ, ইংরাজিভাষায় ইহার
নাম সেডিপ (Oydippe) । ইহার আকৃতি স্নেহপিণ্ডের জায়,
তাহাতে চিকুণীর জায় দাঁড় আছে ।

কক্কতিকা (জী) কক্কত-ভীষ-স্বার্থে কন্, হ্রস্বচ । ১ চিকুণী ;
ইহার সংস্কৃতপর্যায়,—প্রসাধনী, কক্কতী, কক্কত, প্রসাধন,
কেশমার্জন, ফলী, ফলিকা ও ফলি । রাজবল্লভের মতে
ইহার গুণ,—কেশস্থ ধূলী, জঙ্ঘ, মলা ও শিরোরোগ নাশক,
কান্তিকারক, কেশবৃদ্ধি ও কেশের প্রশন্নভাকারক ।

কক্কতী (জী) কক্কত-ভীষ । চিকুণী ।

কক্কত্রোটি (পুং) কক্কবৎ ত্রোটিরতি, কক্ক-ত্রট-গিচ-অচ্ ।
কক্কবৎ পকিবিশেষবাং আত্মানং জাতীতি বা, কক্ক-জা অটন্,
(পুৰোদরাদিষাৎ) । মৎস্তবিশেষ ; ইহার সাধারণ নাম
কাঁকিলা, সংস্কৃতপর্যায় জলবৃদ্ধ ।

কক্কত্রোটি (পুং) কক্কত ত্রোটিরিব ত্রোটিচকুর্ভূত, মধ্য-
পদলোং । মৎস্তবিশেষ ; সংস্কৃতপর্যায় জলহৃদি, সাধারণ,
নাম কাঁকিলা ।

কক্কপক্ষ (ক্রী) কক্কত পক্ষং ৬-ভৎ । কক্কপক্ষীর পালক ।

কক্কপত্র (পুং) কক্কত পকিবিশেষত পত্রমিব পত্রং যন্ত । ১
বাণ । ২ কক্কপক্ষীর পক্ষ ।

কক্কপত্রী [ন্] (পুং) কক্কত পত্রমত্যাতি, কক্ক-পত্র-ইনি ।
বাণ ।

কক্কপর্ব্বা [ন্] (পুং) কক্কবৎ পর্ব্ব-অন্ত । সর্পবিশেষ ।

কক্কপুরী (জী) কং শ্বখং কায়তি হৃচয়তি, ক-কৈ-ক ।
কক্কাপুরী, কক্ষ্যাম্ । কাশীপুরী ।

কক্কমালা (জী) কক্কং করচাপায়াং মলতে ধারয়তি, কক্ক-মল-
অচ-টাপ্ । করতালী ।

কক্কমুখ (পুং) কক্কত মুখমিব মুখং যন্ত । ১ সন্দেশ, সাঁড়াশি ।

২ অস্থিপ্রবিষ্ট শল্যউদ্ধারের অজ্ঞ যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়,
তন্মধ্যস্থ যন্ত্রবিশেষ । এই যন্ত্রের অগ্রভাগ কক্কপক্ষীর মুখের
জায়, ইহা ময়ুরাকৃতি কীলকদ্বারা আবদ্ধ । মুস্ত্রেতে অজ্ঞাশ্র
যন্ত্র অপেক্ষা এই যন্ত্রের ঔৎকর্ষ বর্ণিত আছে,—“কক্কমুখ যন্ত্র
সহজেই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শল্যাগ্রহণপূর্ব্বক বহির্গত
হয় এবং সর্ব্বস্থানেই উপযোগী হয় বলিয়া সকল যন্ত্র অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ ।” ৩ বাণবিশেষ ।

(“ব্যাসসিংহমুখান্ বাণান্ কাককক্কমুখানপি ।”

রামাং ৬ । ৭৯ অঃ ।)

কক্কর (জি) কং শ্বখং কিরতি ক্লিপতি, ক-কৃ-অচ । ১ কুৎসিত ।

২ (ক্রী) কং জলং কীর্যতে অত্র, ক-কৃ-আধারে অপ্ ।
তক্র, ঘোল । ৩ কাঁকর । (Nodular limestone) ভারতবর্ষে
এই সকল স্থানে কাঁকর পাওয়া যায়—আলীগড়, আলিহা-
বাদ, অমৃতসর, ধারং (কাং), চম্পারণ, চাঁদনী, গিরোয়া,
গুজরাট, হারদরাবাদ, হরীক, খাঁদেশ, কৈম্বাজুর, ঢাকা,
খোলপুর, এতাবা, জয়পুর, জালন্ধর, জোনপুর, ঝালাবার,
খেরি, মুখিয়ানা, মুন্সের, মুলতান, মূর্শিদাবাদ, মধুরা, মজার-
পুর, মহিষুর, নরসিংপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অধোধ্যা,
প্রতাপগড়, পাটনা, পেশাবর, পঞ্জাব, পুর্নিরা, শাহারনপুর,
সারণ, শাহাবাদ, শাহজহানপুর, শিয়ালকোট, সিংহভূম,
নীতাপুর, সুলতানপুর, তিনবনী, উৎরোলা, বর্ধা, বালিয়া,

বাঁশী, বাঁহুড়া, বতি, বিজনী, বিকানীর, বদাউন, বুলন্দ-সইর। ৪ কর্কন।

কঙ্করোল (পুং) কঙ্ক ইব লোলশকলঃ, লত্ৱ রঃ। ১ নিকোচক বৃক্ষ। ২ কীকরোল। [কীকরোল দেখ।]

কঙ্কলোভ্য (ক্লীং) কঙ্ক ইব লোভ্যতে আলোভ্যতে, কঙ্ক-লোভ-ণ্যৎ। কঙ্কলোভ্য, চিকোড়মূল। রাজবল্লভের মতে ইহার শুণ—ওরু, অজীর্ণকারী ও শীতল।

কঙ্কশত্রু (পুং) কঙ্কত শত্রুঃ। পুন্নিপর্গী, চাকুলে; ইহার কঙ্কনাশক শক্তি আছে। [পুন্নিপর্গী দেখ।]

কঙ্কবাজ (পুং) কঙ্কত বাজ ইব বাজঃ পক্ষোহস্ত, মধ্যপদলো। ১ কঙ্কপজ নামক বাণবিশেষ। ২ কঙ্কপক্ষীর পক্ষ।

কঙ্কবাজিত (পুং) কঙ্কত বাজো জাতো হস্ত, কঙ্কবাজ-ইতচ্ (তদন্ত সংজ্ঞাতং তারকাদিত্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণ।

কঙ্কশত্রু (পুং) কঙ্কত শত্রুঃ, ৬তৎ। পুন্নিপর্গী, চাকুলে। প্রেরোগাঙ্গসারে এই উদ্ভিদ্ধারা কঙ্কপক্ষী বিনষ্ট হয়। থাকে।

কঙ্কশায় (পুং) কঙ্কইব শেতে, কঙ্ক-শী-ণ। কুতুর।

কঙ্কা (ক্লী) ১ উগ্রসেনের কন্যা, কংসভগ্নী। ২ উৎপলগন্ধিকা।

কঙ্কাল (পুং) কং শিরঃ কালয়তি ক্ষিপতি, ক-কল-পিচ্-অচ্। শরীরাহি। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, কয়ল ও অস্থিপঞ্জর। কঙ্কাল বা অস্থিপঞ্জর দেহের সার। স্বক মাংস বিনষ্ট হইলেও অস্থি নষ্ট হয় না। তাই মহর্ষি গুপ্তত বলিয়াছেন—

“অভ্যন্তরং গঠৈঃ সারৈঃ যথা তিষ্ঠতি কুরুহাঃ।

অস্থিসারৈঃ শুধা দেহা প্রিয়ন্তে দেহিনাং প্রবন্ ॥

তন্মাক্তিরবিনষ্টেয়ু স্বভূমাংসেয়ু শরীরিণাম্।

অস্থীসি ন বিনষ্টস্তি সারাগেভ্যানি দেহিনাম্ ॥

মাংসান্যত্র নিবন্ধানি শিরান্তিঃ স্নায়ুভিঃ শুধা।

অস্থীন্যালবনং কৃচ্চা ন শীর্ষান্তে পতন্তি বা ॥”

বৃক্ষ বেরূপ অভ্যন্তরস্থ সার আশ্রয় করিয়া অবস্থিত করে, সেইরূপ অস্থিসার আশ্রয় করিয়া মানব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। শরীরের স্বক ও মাংস প্রভৃতি নষ্ট হইলেও অস্থির বিদ্যমান হয় না। অস্থি সমস্ত দেহের সার। তাহাতে শির ও স্নায়ুর দ্বারা মাংস বদ্ধ থাকে, অস্থি অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়া মাংস শীর্ণ বা পতিত হয় না। (গুপ্তত শরীর-স্থান)। চরকের মতে,—

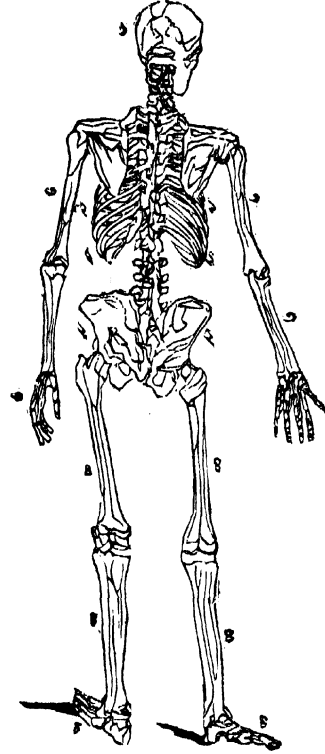
“স্বভূমাংসাদি রহিতঃ স্বহানস্থিতঃ শরীরাহিচরঃ কঙ্কাল-সংজ্ঞো ভবতি। স চ কঙ্কালঃ বড়ো ভবতি যথা শাখান্তস্তো মধ্যং পক্ষমং বর্তং শির ইতি ॥”

স্বক ও মাংসাদি রহিত স্বহানে অবস্থিত দেহের অস্থি

সমুদয়কে কঙ্কাল কহে। কঙ্কাল হয় অল্পে বিভক্ত—চারি পাখা, পক্ষম মধ্যাঙ্গ ও বর্ত মস্তক। উর্দ্ধশাখাধরকে বাহ ও অধঃশাখাধরকে সন্ধি বলে।

ইরোপীয় শরীরতত্ত্ববিদেরাও কঙ্কালকে প্রধানতঃ তিন অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন যথা,—উত্তমাত্র বা মস্তক (Head) মধ্যাঙ্গ বা স্বক (Trunk) এবং শাখা (Extremities)।

কঙ্কাল।



১ চিহ্নিত অঙ্গ মস্তক; ২ মধ্য, ৩ উর্দ্ধ ও ৪ অধঃশাখা।

মহর্ষি গুপ্ততের মতে অস্থি পাঁচ প্রকার—“কপাল, কচক, তরুণ, বলয় ও নলকাস্থি। জাহ্নু, নিভষ, অঙ্গ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মস্তক এই সকল স্থানের অস্থিখণ্ডকে কপাল; দস্তের অস্থিখণ্ডকে কচক, নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষুকোষস্থিত অস্থিকে তরুণ; হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর এবং বক্ষ এই সকল স্থানের অস্থিকে বলয় এবং অবশিষ্ট সকল অস্থিকে নলকাস্থি বলে। (১)

(১) “কপালকচকতরুণবলয়নলকসংজ্ঞায়া। তেভ্যং জাহ্নুভিঃশঙ্খ-গণ্ডতালুপাখিঃ কপালানি, হস্তবাহু কচকানি, শ্রাবকর্ণগ্রীবা-কোষে তরুণানি। পাণিপার্শ্বপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোদরঃ বলয়ানি, শেবাণি নলকসংজ্ঞায়া।” (হুগল)

মহর্ষি মুক্ত লিখিয়াছেন, “বেদজেরা বলেন যে অস্থির সংখ্যা ৩০৬ খানি। কিন্তু শল্যস্তরের মতে ৩০০। যথা—

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া	...	১৫
পদতল ও গুল্ফে	...	১০
গোড়ালিতে	...	১
জ্ঞান্ডাতে	...	২
জাহুতে	...	১
উরুদেশে	...	১
এইরূপ অপর পাদে	...	৩০
হুই চাতে ৩০টি করিয়া	...	৬০
কটিদেশে	...	১
মলবারে	...	১
যোনিদেশে	...	১
চুই নিতম্বে	...	২
চুই পার্শ্বে ৩৬টি করিয়া	...	৭২
পৃষ্ঠে	...	৩০
বক্ষে	...	৮
রক্তাকার অক্ষক নামক	...	২
গ্রীবাদেশে	...	৯
কণ্ঠদেশে	...	৪
চুই তলুতে	...	২
দন্তে	...	৩২
নালিকাতে	...	৩
তালুতে	...	৩
গণ্ড, কর্ণ ও রগ প্রত্যেকে ২টি করিয়া	...	৬
মস্তকে	...	৬

সর্বশুদ্ধ ৩০০ খানি

চরকের মতে অস্থিসংখ্যা ৩৬০। উল্লেখ অর্থাৎ দন্তমূলে ৩২, দন্ত ৩২, নখ ২০, শলালা ২০, অঙ্গুলির অস্থি ৬০, পার্শ্বিতে ২, কুর্চনিয় ২, হস্তের মণিকা ৪, পদের গুল্ফে ৪, অস্থির অস্থি ৪, জ্ঞান্ডা ৪, জাহুতে ২, কহুইয়ে ২, উরুতে ২, বাহুতে ২, কণ্ঠের নীচে ২, তালুতে ২, নিতম্বে ২, যোনি বা লিঙ্গে ১, ত্রিকদেশে ১, গুল্ফদেশে ১, পৃষ্ঠে ৩৫, গ্রীবার ১৫, জ্ঞান্ডতে ২, হৃদয় ১, হৃদয়লব্ধন ২, ললাটে ২, চক্ষুতে ২, গণ্ডযের ২, নালিকার ৩, উত্তরপার্শ্বে পঞ্জরাস্থি ২৪ খানি করিয়া ৪৮, পঞ্জরাস্থির গোলাকার হালিকা ২৪, ললাটে ২, মস্তকে ৪ ও বক্ষদেশে ১৭। (এইরূপে শরীরের অস্থিসংখ্য ৩৬০।)

হুনোপীর চিকিৎসকদিগের মতে, মস্তককালে সর্বশুদ্ধ ২২৩ খানি অস্থি আছে। যথা—করোটিতে ৮, বৃকবগুলে ১৪,

কর্ণাভ্যন্তরে ৮, কশেরুতে ২৩, বক্ষে ২৬, বস্তিনে ১১, উরু-শাখা বা বাহুতে ৬৮, অধোশাখা বা পৃষ্ঠিতে ৬৪ খানি।

কশেরু মেরুদণ্ডবন্দন, ইহাতে ২৪ খানি অস্থি আছে। উপরে ৭ খানি, তাহার নাম গ্রীবাশ্বেদক (Cervical vertebrae), মধ্যে ১২ খানি, তাহার নাম পৃষ্ঠশ্বেদক (Dorsal vertebrae), অধোভাগে ৫ খানি তাহার নাম কটিকশ্বেদক (Lumbar vertebrae)। কশেরু বা মেরুদণ্ডের তলভাগে ত্রিকোণ (Sacrum) উপরে থাকে। যদিও ত্রিকোণ বস্ত্যস্থিরই অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে এই অস্থি মেরুদণ্ডেরই সম্বন্ধিত অস্থি বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই অস্থিখানি দেখিতে ত্রিকোণাকার এই জন্ত ইহার নাম ত্রিক (Sacrum), ইহা ৫৬ খানি ক্ষুদ্র কশেরুকার গঠিত, তাহার নাম ত্রিকশ্বেদক (Sacral vertebrae) কহে। মেরুদণ্ডের সর্বনিম্নভাগে অধোকশ্বেদক (Coccyx), ইহা পঞ্চাশির লাজুলে অভ্যন্তর-অস্থিরূপে থাকে। মানবের পক্ষে সেরূপ নহে। মানবজাতির অধোকশ্বেদক অস্থি ক্ষুদ্র, সরাস্রতন এবং চারি পাঁচ খানির অধিক নহে। বস্ত্যস্থির উত্তরপার্শ্বে ও সম্মুখে শ্রোণীকলকাস্থি (Os Innominata) এই অস্থি আবার তিনভাগে বিভক্ত, কট্যাস্থি (Ilium), বক্ষপাণ্ডা (Ischium) এবং উপহাস্থি (Pubis)।

মেরুদণ্ডের প্রধান অংশ বক্ষস্থল (Chest or Thorax) ইহার পশ্চাৎভাগে পৃষ্ঠকশ্বেদক, সম্মুখভাগে ব্রুকাস্থি, উত্তর-পার্শ্বে ১২ খানি করিয়া পৃষ্ঠকা ও তাহাদের উপস্থি আছে। পৃষ্ঠকাগুলি মেরুদণ্ডের সহিত এক একখানি পৃথক পৃথক রহিয়াছে। কেবল উপরের উত্তরপার্শ্বে ৭ খানি ব্রুকা-স্থির সহিত এক একটি স্বতন্ত্রভাবে মিলিত আছে। এই সাতখানি স্বাভাবিক পৃষ্ঠকা এবং নীচের উত্তরপার্শ্বে ৫ খানিকে কৃত্রিম পৃষ্ঠকা বলা যায়।

বরোবৃদ্ধিগের ব্রুকাস্থি ১ খানি, যুবকদিগের ২ খণ্ডে এবং শিশুদিগের আরও কতগুলি অংশে গঠিত দেখা যায়। যৌবন কালে যখন ব্রুকাস্থি দুইখণ্ড থাকে তাহার উপরের খণ্ডকে মুটি (Manubrium) কহে। বরোবৃদ্ধির সময়ে ব্রুকাস্থি এক হইয়া যায়, ইহার অধোভাগ হইতে উপরিভাগ সরু হইতে ক্রমশঃ মোটা দেখায়, মধ্যে এক একটি কড়া থাকে, তাহার নাম অগ্রকড়া (Ensiform or xiphoid cartilage) মস্তকপালের করোটিতে ১ খানি ললাটস্থি (Frontal bone), ২ খানি পার্শ্বকাল্লাস্থি (Parietal bone), ১ খানি পশ্চাৎ কপালস্থি (Occipital bone) ১ খানি কীলকাস্থি (Sphen-

oid), ২ খানি শঙ্খাঙ্কি (Temporal bone) এবং ১ খানি শৌথিরাঙ্কি (Ethmoid) আছে। মূখমণ্ডলে ২ খানি নাসাঙ্কি (Nasal bone), ২ খানি মাজাঙ্কি (Superior maxillary), ২ খানি তাবাঙ্কি (Palate), ২ খানি গণ্ডাঙ্কি (Malar), ২ খানি অশ্রুজননাঙ্কি (Lachrymal), ২ খানি অধোবেটনাঙ্কি (Inferior Turbinated), ১ খানি ফালাঙ্কি (Vomar) এবং হুয়াঙ্কি (Inferior Maxillary) আছে। [কপাল ও মূখ দেখ।]

কঙ্কালের উর্দ্ধশাখার অংসফলকাঙ্কি (Scapula), জঙ্কি (Clavicle), চক্রদণ্ডাঙ্কি (Radius), প্রকোষ্ঠাঙ্কি (Ulna) মণিবন্ধ (Carpus), করত বা হস্ততল (Metacarpus) ও অঙ্গুল্যাঙ্কিসকল আছে। ইহার মধ্যে অংসফলকাঙ্কি ও জঙ্কি প্রাণীকলকাঙ্কির মতন। হস্তে মণিবন্ধ, করত ও অঙ্গুল্যাঙ্কি আছে। ইহার মধ্যে মণিবন্ধে সর্বতন্ত্র ৮ খানি অঙ্কি দুই থাকে আছে। প্রথম থাকে ৪ খানি, তাহাদের নাম নাবাঙ্কি (Scaphoid), অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কি (Semi lunar), কোণাঙ্কি (Cuneiform), বর্জুলাঙ্কি (Pisiform)। দ্বিতীয় থাকেও ৪ খানি, তাহাদের নাম সমবিপাৰ্শ্বাঙ্কি (Trapezium), চতুর্কোণাঙ্কি (Trapezoid), হুলাঙ্কি (Osmagnum), ও বড়িশাঙ্কি (Unciform)।

অঙ্গুলির অঙ্কিসকলকে অঙ্গুল্যাঙ্কি (Phalanges) কহে, প্রত্যেক অঙ্গুলিতে দুইখানি এবং অপর অঙ্গুলিতে ৩ খানি করিয়া অঙ্কি থাকে। প্রত্যেকটি অপর পক্ষ এবং করতলের অঙ্কি হইতে পৃথক এইজন্ত প্রত্যেকটি স্বাধীনভাবে বিস্তারিত হইতে পারে।

অধোশাখার উর্দ্ধাঙ্কি (Femur), জঙ্কফলকাঙ্কি (Patella), জঙ্কাঙ্কি (Tibia), নলকাঙ্কি (Fibula), গুলফ (Tarsus), প্রপদ (Metatarsus) ও পদতল (Toes) আছে।

অঙ্গের অঙ্কি মধ্যে উর্দ্ধাঙ্কি সর্ববৃহৎ। ইহার শিরোভাগ প্রাণীকলকাঙ্কি হইতে পৃথক হইয়া আছে। জঙ্কাঙ্কি পদের সমুখ ও অন্তর্ভাগে থাকে; ইহার শিরোভাগ অন্তর্ভাগ হইতে বড়, ইহার উপরটা দেখিতে বাদামী উপরের দুইটি বাদামী জমির উপর উর্দ্ধাঙ্কির গাঁট (Condyles) অবস্থিত। নলকাঙ্কি জঙ্কাঙ্কির ঠিক পার্শ্বে এবং পদের বহির্ভাগে স্থাপিত। ইহা দেখিতে লম্বা, ক্লীণ, অধিকাংশই তিনপার্শ্ববৃত্ত এবং শেষ দিকে বর্জিত। জঙ্কফলকাঙ্কি (Patella or Knee-pan) দেখিতে প্রায় ত্রিকোণাকার, ইহার অধোভাগ নিভাঙ্ক স্ক, অগ্রভাগ অঙ্গ হ্রাঙ্ক এবং দেখিতে তন্তবৎ, পশ্চাৎভাগ বেশ কোমল, মধ্যে এক আলি দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। গুলফ সাতখানি অঙ্কিতে নির্মিত, যথা—গুলফাঙ্কি (Astra-

galus), ২ পাঙ্কাঙ্কি (Os calcis), নাবাঙ্কি (Navicular), ৪ ঘনাঙ্কি (Ouboid), ৫ অভ্যন্তরকোণাঙ্কি (Internal Cuneiform), ৬ মধ্যকোণাঙ্কি (Middle cuneiform) ৭ বাহ্যকোণাঙ্কি (External cuneiform)।

প্রপদ ও পদাঙ্গুলির অঙ্কিসকলের গঠনপ্রণালী প্রায় করত ও অঙ্গুলির অঙ্কি মত। পদাঙ্গুলির অঙ্কিগুলি লম্বা, বড় ক্লশ এবং করতুলির অঙ্কিসকল অপেক্ষা বেশ বেশ থাকে। পায়ের দুইটা বড়। আঙ্গুল ছাড়া অপরগুলি ছোট।

এতদ্ভিন্ন শরীরে আরও অতি কোমল উপাঙ্কি বা তরুণাঙ্কি আছে। শরীরের দৃঢ় ও সবল অঙ্গ সকল অঙ্কি দ্বারা নির্মিত। মণিবন্ধ ও গুলফ প্রভৃতি স্থানে অঙ্কি বা স্ক্য়াঙ্কি সকল আছে। সমস্ত অঙ্কি অন্তর্ভাগে ও বহির্ভাগে কলা অর্থাৎ ঝিল্লি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। কিন্তু ইহাদের সন্ধিস্থান ঝিল্লি দ্বারা আবৃত নয়, সন্ধিস্থান পাতলা উপাঙ্কি দ্বারা আবৃত দেখা যায়। অস্থির গর্ভ পীতবর্ণ মেহবিশেষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। তাহাকে সঙ্কা বলে। অস্থিসমূহের গায়ে কোথাও গর্ভবৎ খাত, কোনখানে উচ্চতা দেখা যায়।

দেহের অস্থিময় গর্ভ (Acetabulum) সকল কপালাঙ্কি দ্বারা নির্মিত।

কঙ্কালকেতু (পুং) দানববিশেষ।

কঙ্কাল-ভৈরব-তন্ত্র (স্ত্রী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কঙ্কালমালী [ন] (পুং) কঙ্কালানাং মালা অর্থাৎ, কঙ্কাল-মালা-ইনি (ত্রীহানিভ্যচ। পা ৫। ২। ১১৬।) মহাদেব।

কঙ্কালমালিনী (স্ত্রী) কঙ্কালমালিন্-স্ত্রীপ। কালী।

কঙ্কালয় (পুং) কঙ্কালং যতি, কঙ্কাল-বা-ক। দেহ, শরীর।

কঙ্কালী (স্ত্রী) কঙ্কাল-স্ত্রীপ। মহাকালীমূর্তি। কমদা রাজ্যের অন্তর্গত বোরিয়া গ্রাম হইতে ৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি অতি প্রাচীন দুর্গ আছে, দুর্গের অবস্থা অতি শোচনীয়, ইহার চারি দিক ভূমিসাৎ হইয়াছে, যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে। এই দুর্গে কঙ্কালীদেবীর প্রস্তর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর ১৮ হাত, হাতে নরকপাল ধনুর্কাপাদি অস্ত্রশস্ত্র বিরাজ করিতেছে, তাঁহার নিকটে ত্রিশূলধারী শিব-মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকটেই গণেশ মূর্তি। এই দুর্গ ও কঙ্কালীদেবীর মূর্তি বহু প্রাচীন, প্রায় ৮০ শত বর্ষের হইবে।

দুর্গ হইতে মগরধ্বজ (চেদি.সং. ৭০০), গোপালদেব (চেদি.সং. ৮০০), এবং বশরাজ (চেদি.সং. ১১১০) প্রভৃতি কয়েক জনের শিলাস্থাপন পাওয়া গিয়াছে।

কঙ্ক (পুং) কঙ্কতে উচ্চতঃ প্রাপ্তোতি, কঙ্ক-উন্। ১ উগ্রসেনের

পুত্র, কংসাহরের স্রোতা। জুনাসা, জগোথ; কঙ্গ, শঙ্ক, হুহ, রাষ্ট্রপাল, সৃষ্টি ও তুষ্টিমান, এই আটটি কংসের স্রোতা ছিল।
২ ধাতুবিশেষ।

কঙ্গুঠ (কী) কঙ্কো: সনীপে তিষ্ঠতি, কঙ্ক-হা-ক-বদ্যক। পার্শ্বতীর স্তম্ভিকাবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপরিচয়—কালকুঠ, বিরজ, রজদারক, রেচক, পুলক, শোধক ও কালপালক। ভাবপ্রকাশের মতে হিমালয়শিখরে এই স্তম্ভিকা উৎপন্ন হয়, ইহা নালিক ও রেণুক নামে বিবিধ, নালিক রোপাবর্ণ ও রেণুক স্বর্ণবর্ণ; উভয়ের মধ্যে রেণুকই অধিক গুণশালী, উভয়ের গুণ—গুরু, দৃঢ়, বিরেচক, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বর্ণ-কারক; ক্রিমি, শোথ, উদরাধান, শুষ্ক, আনাহ ও কফনাশক।
কঙ্গু (পুং) ককি-উবন। আভ্যন্তর দেহ, শরীরের অভ্যন্তর প্রদেশ।

কঙ্কের (পুং) কঙ্কতে সোলাং প্রাপ্তোতি ভক্ষণায়তি শেব; ককি-এর। কাকবিশেষ, বারবলিভুক।

কঙ্কেলি (পুং) কং স্রুৎ তদর্থং কেলিগ্রজ, বহুতী। অশোকবৃক্ষ। (কঙ্কেলি: পুংস্ত্রলোককে। শঙ্কাকি।)

কঙ্কেল (পুং) ককি-এর। বাস্তুক শাক, বেতো শাক।

কঙ্কেলি (পুং) কঙ্ক-বাহুলকাং এলি, (পুষোদরাদিবাং সাধু।) অশোক বৃক্ষ। অমর এই শব্দ জীলিঙ্গ ধরিয়েছেন। (“জিরাং বৃশোককে কঙ্কেলিঃ।” অমর)

কঙ্কোল (পুং) ১ নাগরাজবিশেষ। ২ ‘গণপত্যাধারন’ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

কঙ্ক (কী) কং স্রুৎ ধলতি অনেন, কং-খল-বাহুলকাং ড।
১ পাপভোগ।

কঙ্গিয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Roscoeia pentandra.)

কঙ্গু (জী) কং স্রুৎ অঙ্গরতি, কং-অগি-পিচ-কু। ধাতু বিশেষ। কালিনী। ইহার সংস্কৃত পরিচয়—প্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গ, ও কঙ্গু। ভাবপ্রকাশের মতে এই ধাতু চারি প্রকার—কঙ্ক, রক্ত, শ্বেত ও পীত; পীত কঙ্গুই সর্বাঙ্গেক্ষে প্রেষ্ঠ। কঙ্গুর গুণ—ভয়গন্ধানকারক, বাতবর্ধক, বৃংহণ, গুরু, স্নায়ুস্নেহ-নাশক এবং অশ্বদিগের বিশেষ উপকারক।

কঙ্গুকা (জী) কঙ্গু-বার্ধে কন্-টাপ। ধান্যবিশেষ। [কঙ্গু দেখ।]

কঙ্গুজিয়া (দেশজ) কঙ্গুর ন্যায় এক প্রকার তৃণ।

কঙ্গুনী (জী) কঙ্গুনীরতে কঙ্গুনেন জারতে কঙ্গু-নী-বাহুলকাং ড-ভী। তৃণধান্যবিশেষ। পশ্চিমে মালকা-গনী বলে। ইহার সংস্কৃত পরিচয়—জ্যোতিষভী, কটভী, বকি, রুচি, চিগক, জ্যোতিকী, পারাবন্তপতী, পণ্যলতা, পীততুল্লা, হুহুমারী, হুহুমনী। রাজবল্লভের মতে ইহার

গুণ,—ধাতুশোধক, শিথলস্নেহনাশক, রক্ত, বায়ুবর্ধক, পুষ্টি-কারক, গুরু ও ভয়গন্ধানকারী।

কঙ্গুনীপত্রা (জী) কঙ্গুন্যা: পত্রমিব পত্রমত্যা: মধ্যপদ-লো। পণ্যাকা মায়ক তৃণবিশেষ।

কঙ্গুল (পুং) কঙ্গু লাতি গৃহাতি অমেন, কঙ্গু-লা-ক। হস্ত, হাত।

কঙ্গু (জী) কালিনী ধান। [কঙ্গু দেখ।]

কঙ্গুর (পুং) কঙ্গু লাতি অমেন, কঙ্গু-লা-ক, লত রঃ। হস্ত।

কচ (পুং) কচতে শোভতে শিরসি, কচ-পচাঘাচ্। ১ কেশ, চুল। ২ শুক ত্রণ। ৩ মেঘ। ৪ (ভাবে ব) বন্ধ। ৫ শোভা। ৬ বৃহস্পতি পুত্র। মহাভারতে ইহার চরিত্র এইরূপ বর্ণিত আছে—

দেবাহুরের বৃদ্ধকালে দেবনিহত অহুরগণকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনীবিদ্যাবলে পুনর্জীবিত করিতেন। দেবগুরু বৃহস্পতির ঐ বিদ্যা না থাকায় দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া গুরুপুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট ঐ বিদ্যা শিক্ষার জন্য অহুরোধ করিলেন। কচও দেবকার্য্য সাধনের জন্য শুক্রাচার্য্যের শিষ্য গ্রহণ করিয়া নিরতিশয় তত্বসংকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রুরমতি অহুরগণ কচের অতিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে ক্রমে হইবার বিনাশ করিল। শুক্র-কন্যা দেবযানী দেহবশতঃ পিতাকে অহুরোধ করিয়া হইবারই তাঁহাকে জীবিত করিলেন। তৃতীয়বার দৈত্যেরা কচের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া মধ্য সহ শুক্রাচার্য্যকে ভোজন করাইল; তখন দেবযানীও তাঁহার জীবনের জন্য পিতাকে অত্যন্ত অহুরোধ আরম্ভ করিলেন। শুক্রাচার্য্য এবারেও কচের অহুরোধে তাঁহাকে জীবিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, কচ কোথায় আছে? জিজ্ঞাসা করিলেন; কচ উদর মধ্য হইতে তাঁহার বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন শুক্রাচার্য্য নিরুপায় হইয়া কন্যাকে বলিলেন, কচকে বাঁচাইতে হইলে আমার প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা উদর হইতে সে কিরূপে বহির্গত হইবে? দেব-যানী বলিলেন,—উভয়ের বিচ্ছেদই আমার তুল্য কষ্টদায়ক, অতএব উভয়েরই বাহাতে জীবন রক্ষা হয়, তজ্জন বিধান করুন। তখন শুক্রাচার্য্য কচকে বলিলেন, কচ! তুমি দেব-যানীর স্নেহলাভ করিয়াই সিদ্ধ হইয়াছ, তোমার সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রদান করিতেছি, তুমি নির্গত হইয়া আমার জীবিত করিও। এইরূপে কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিয়া শুক্রাচার্য্য হইতে নির্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবিত করিলেন। অনন্তর দেবযানী তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি সখ্যবোধে তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। দেবযানী তাহাতে ব্যথিত হইয়া ‘তোমার বিদ্যা নিকল হইবে’ বলিয়া অভিশাপ দিলেন;

কচও কুছ হইয়া 'ভুমি কজিরপত্রী হইবে' বলিয়া দেবানীকে প্রতিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন, ভুমি অন্যায় প্রতিশাপ দিয়াছ, এজন্য আমার বিদ্যা নিষ্ফল হইলেও, আমি বাহাকে বিদ্যাদান করিব, তাহার বিদ্যা জুসিছ হইবে। এই বলিয়া তিনি দেবপুরী প্রস্থান করিলেন।" (ভারত স্তবক ৩৬ অঃ।)

কচকি (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। (Cyprinus monodactylus.)
কচগ্রহ (পুং) কচান্নাং গ্রহো গ্রহঃ বজ্র, বহুব্রীঃ। কেশা-
কর্ষণযুক্ত বৃক্ষ।

কচক্কন (পুং) কচং মেঘং কনতি উৎপাদয়তি, ধাতুনামনে-
কার্থাৎ, কচ-কন্-অচ্ (প্ৰবোধনাদির্থাৎ সাধুঃ।) সমুদ্র।

কচক্কন (স্ত্রী) কচস্ত জননবস্ত্র অঙ্গনম্, শক্কাদির্থাৎ সন্ধিঃ।
করবহিত বিক্রম স্থান, নিষ্কর হাটতলা। ইহার সংস্কৃতপর্যায়,
নির্ঘট্ট ও পণ্যাজির।

কচক্কল (পুং) কচ্যাতে কচ্যাতে বেলয়া, কচ-বাহুলকাৎ অজ-
লচ্। কচস্ত মেঘস্ত অজং লাতি গৃহীতি বা-লা-ক। সমুদ্র।

কচটা (দেশজ) মদিত।

কচটান (দেশজ) মর্দন করা, চটকান।

কচড়া (দেশজ) দীর্ঘস্থল রজ্জু, কাছি।

কচনার (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Bauhinia variegata
and Purpurea)

কচপ (স্ত্রী) কচতে শোভতে, কচ-কপন্ (উষি-কুট-নলি
কচি খলিত্যঃ কপন্। উণ্ ৩। ১৪২। উষ, কুট, দল, কচ,
খল, এই সকল ধাতুর উত্তর কপন্ প্রত্যয় হয়।) ১ তৃণ।
২ শাকপত্র। (কচপং শাকপত্রম্। উজ্জলদত্তঃ।)

কচপক্ষ (পুং) কচান্নাং কেশান্নাং পক্ষসমূহঃ ৬তং। কেশ-
সমূহ।

কচপাশ (পুং) কচান্নাং কেশান্নাং পাশঃ সমূহঃ, ৬তং।
কেশসমূহ।

কচমালা (পুং) কচং কচবৎ কান্তিং মলতে ধারয়তি, কচ-মল-
অণ্। ধূম। কেহ কেহ 'খতমান' ও বলিয়া থাকেন।

কচরিপুফলা (স্ত্রী) কচস্ত রিপুঃ কলমস্তাঃ, বহুব্রীঃ।
শমীরক।

কচরকচর (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ কোন কথা বিরক্ত-
ভাবে বারবার উচ্চারণ করিলেও তাহাকে কচরকচর
করা করে।

কচহস্ত (পুং) কচান্নাং হস্তঃ সমূহঃ, ৬তং। কেশসমূহ।

কচা (স্ত্রী) কচ্যাতে কচ্যাতে স্খলনাদিতিরিতিশেষঃ। কচ-
অচ্-টাপ্। ১ হস্তিনী। ২ শোভা। ৩ সজ্জিত। ৪ বস্ত্র।
৫ বস্ত্র। ৬ তৃণবিশেষ।

কচাকচি (অব্য) কচেহু কচেহু গৃহীত্বা প্রবৃত্তং বৃদ্ধং, কচী-
হারে-ইচ্, পূর্বদীর্ঘচ্। ১ পরস্পর কেশাকর্ষণপূর্বক বৃদ্ধ।
২ বিবাদ। চলিত ভাষার কচাকচি কহে।

কচাকু (জি) কচ ইব অকতি বক্রং গচ্ছতি, কচ-অক-উন্।
১ হুঃশীল। ২ হুরাধৰ্য। ৩ (পুং) সর্প।

(কচাকুস্ত হুরাধৰ্যে হুঃশীলে না বিলেশয়ে। মেদিনী।)

কচাঞ (স্ত্রী) কচান্নামগ্রঃ, ৬তং। ১ কেশের অগ্রভাগ।
২ কেশাঞ্জের ন্যায় পরিমাণবিশেষ, এই পরিমাণ জসরেপুর
অষ্টমভাগ।

কচাচিত্তি (জি) কচৈঃ আল্লায়িত কেঠৈরাচিতো ব্যাপ্তঃ,
৩তং। অসংস্কৃত কেশের দ্বারা ব্যাপ্ত। ("কচাচিত্তো বিদ-
গিবাগজৌগজৌ" কিরাতার্জুনীয়।)

কচাটুর (পুং) কচবৎ মেঘইব অটতি শূন্যো ভ্রমতি, কচ-অট-
উরচ্। পক্ষিবিশেষ। ইহার সাধারণ নাম 'ডাক', সংস্কৃত-
পর্যায়, শিতিকঠ, দাতুহ, কাকমদন্ত।

কচান (দেশজ) অকুরিত হওয়া, গজান।

কচামোদ (স্ত্রী) কচং আমোদয়তি স্তগন্ধিকরোতি, কচ আ-
মদ-গিচ্-অচ্। বালা নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [বালাদেখ।]

কচাল (দেশজ) ১ বিবাদ, মোখিক কলহ। ২ বুখা বাক্যব্যয়।

কচি (দেশজ) ১ কোমল। ২ নূতন উৎপন্ন।

কচিরি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহা কচুজাতীয়। পুষ্করিণীর
ধারে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। (Arum fornicatum.)



কচিরি।

এই গাছ বঙ্গ দেশ ও চট্টগ্রামে জন্মে। ইহার বৃক্ষ প্রকাশিত,
পত্রগুলি তলদেশের প্রায় সমান্তরালে বৃত্তসংযুক্ত, পত্রাংশের

চাষিদের কোপবিশিষ্ট ও ভয়ঙ্কর; ইহা কচু ফুলের ন্যায় জিজ্ঞাসী, ফুলের ডাঁটা উর্দ্ধভাগে ক্রমশঃ মোটা হয়; ফুলের বহিরাবরণ ফুলের ডাঁটার মত সমান, ইহার মধ্যে দুই তিনটি বীজ জন্মে।

কচু (দেশজ) কলবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপরিচয় কটী, বিতণ্ডা। রাজবল্লভ মতে ইহার গুণ—ভেদক, গুরু, কটু, আম, বায়ু ও পিত্তকারক এবং পিচ্ছিল। স্বতিশাস্ত্র মতে, হৃদগোৎসবের নবপত্রিকা মধ্যে কচু পরিগণিত।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে কচু অনেক রকম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মান (মানক) কচু, বাঁশপোর বা বাঁশপোল, শোলা কচু, টেঁকি-বাঁশপোল, নারিকেলীকচু, মুখীকচু, চৌমুখীকচু ও গুড়িকচুই (বাহার শাক খার) প্রধান।

মানকচু—ইহা দোয়াঁস ও ফাস মাটিতে অতি উত্তম জন্মে, খিয়ার মাটিতে বাড়েনা, পলি মাটিতেও হয়, তবে বড় সুবিধামত হয় না। কচুর ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না, সুতরাং বীজের চারা হয় না। পুরাতন গাছ উঠাইয়া ফেলিলে মাটিতে যে সকল শিকড় থাকে, তাহা হইতেই চারা জন্মে। গাছ না তুলিলেও চারা হয়, কিন্তু অল্প হয়। এই চারা তুলিয়া লাগাইতে হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই চারা বাহির হয়। পুরাতন মানের মুখ চারি কি ছয় ইঞ্চি পরিমাণে কাটিয়া লইয়া লাগাইতে পারা যায়। গৃহস্থের বাগীতে এইরূপে দুই চারিটা গাছ করিয়া থাকে। মুখকাটা-চারার মান খুব বড় হয়।

বাহার মানের চাষ করিতে চাহে, তাহাঙ্গিরের পক্ষে শিকড়ের চারা লাগানই সুকৃত-সঙ্গত। বৈশাখে ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই চারা লাগান কর্তব্য, ইহাই মানকচু রোপণের প্রকৃত সময়। অল্প সময়ের রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সময় চারা পাওয়া যায় না, মুখ কাটিয়া লাগাইতে হয়। মাঘ-মাসের পূর্বে কিন্তু মুখ কাটিয়া লাগাইলে চারা ভাল হয় না, শীতের প্রবলতা কমিলেই লাগাইতে পারা যায়। মানকচুর ক্ষেত্র গভীর করিয়া বর্ষণ করিতে হয়, কারণ বত নীচে পর্য্যন্ত মাটি আলগা থাকিবে, কচু সহজে তত বড় হইবে। ইহাতে লাজল দিবার আবশ্যক হয় না, তবে চাবারা কার্গ্যের সুবিধার জন্য লাজল দিয়াই চাষের ক্ষেত্র কোদালি দ্বারা কোদলাইয়া দিলেই ভাল হয়। থনা বলিয়াছেন—“কোদালে মান, তিলে হাল।” লাজল দিয়া চবিরি বা কোদলাইয়া দিয়া, মাটি গুঁড়াইয়া চূর্ণবৎ করিয়া দিতে হয়, বাস ঘুসা বাহিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর মই দিয়া লম্বল করিয়া লইতে হয়। পরে হুইল্ট কি দেফাত অস্ত্র এক এক প্রেণী চারা

লাগাইবে। এতদ্যক চারাদির মধ্যে দুইহুট কি দেফাত বীক রাখা আবশ্যক।

চারি যেমনই হউক না কেন (অতি ক্ষুদ্র হইলেও) লাগাইতে পারা যায়। ক্ষেত্র নিরত পরিষ্কার ও গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে আলগা করিয়া দেওয়া কর্তব্য। মানকচুতে হাইয়ের সারই প্রযুক্ত। হাইয়ের সারে মান বাড়িবে। আজকাল অনেক ফলে পাখুরিয়া করিয়া চলিত হইয়াছে। ইহার হাই সারের জন্য ব্যবহার করিতে নাই, কারণ ইহার তেজে গাছের উপকার না হইয়া অপকার হয়। কাঠ, তৃণ, লতা, পাতা, আবর্জনা, গোমর পোড়াইয়া হাই করা কর্তব্য। পোড়া মাটিও সার দেওয়া যাইতে পারে। কাঁচা গোমর বা অন্য সার দিলে মান বড় হয় বটে, কিন্তু মুখ ধরে, সুতরাং সে সার দেওয়ার কোন ফল হয় না। থনা বলেন—“কচুধনে যদি ছড়াস্ হাই, থনা বলে তার সংখ্যা নাই।” “ওলে কুটী মানে ছাই, এইরূপে কৃষি করগে ছাই।” নদীর ধারে কচু পুতিলে কচু খুব লম্বা হয়—এইজন্য পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী বা নালায় ধারে গৃহস্থেরা কচু পুতিয়া থাকে। থনা বলেন—“নদীর ধারে পুতিলে কচু, কচু হয় তিন হাত নীচু।” গৃহস্থেরা নীচ বাগীতে দুই চারিটা কচু পুতিতে ইচ্ছা করিলে, একহাত গভীর ও এক হাত বেড় গর্ত করিয়া ছাই ও গুঁড়া মাটিতে গর্তটা ভরিয়া একটা চারা কি পুরাতন মানের মোথা লাগাইয়া দিবে। এইরূপে যে কয়টা ইচ্ছা সেই কয়টা গাছ করিতে পারা যায়।

মানকচু দুইবৎসর পরে তুলিতে পারা যায়, চারি পাঁচ বৎসর পরে উঠাইলে, বেশ বড় কচু পাওয়া যায়। বশোহরে এক প্রকার মানকচু জন্মে, তাহা প্রায় এক হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহা বড় সুস্বাদু হয়, আর মোটে মুখ ধরে না। উক্ত জেলার ইহার আবাদ খুব বেশী হয়। রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বহুস্থানে মানকচুর বিস্তার আবাদ আছে। এই দুই জেলার যত্ন করিলে ছয় সাত হাত দীর্ঘ ও তরুণত্বত্ব ফুল মানকচু জন্মে। মাটি বেশী রসাল ও ছারাবিশিষ্ট হইলে, সেখানে মানকচু লাগাইতে নাই, কারণ সেখানকার মানে নিশ্চয় মুখ ধরে। অন্যান্য জেলার কচু খুব অল্প জন্মে, কারণ ইহার স্বভাব আবাদ নাই।

বশোহরের মানকচুই কেবল একবৎসরে পরিপুষ্ট হয় ও উঠাইয়া লইতে পারা যায়।

মানকচুর গুণ—অস্বাদ, শীতল, গুরু, দোষহর, কীটকচু। ইহা ঔষধেও ব্যবহৃত হয়।

মানকচুর অনেকগুলি ব্রহ্মজাত অতি সুস্বাদু হয়। বশো-

হয়ের মানকচু খাতি অপরস্থানের মানকচু কুটির। সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, তৎপরে ডালনা, কালিয়া, অন্ন, চাকড়ি প্রভৃতি ব্যঞ্জন হইয়া থাকে। বশোহরে “কচুর মুড়কী” ও “কচুর মোহনভোগ” নামে দুই প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সুখাদ্য।

“কচুর মুড়কী”—প্রথমতঃ কচুগুলি ভুসি ভুসি করিয়া (ছানার মুড়কীর ছানা যেরূপ আকারে কাটিয়া লইতে হয়, সেইরূপে কাটিয়া লইয়া) সিদ্ধ করিয়া লয়। তৎপরে ঘূতে অভ্যন্ত ভাজিয়া লইতে হয়। তৎপরে চিনি বা শুভ্রের রস পাক করিয়া, খইয়ের মুড়কীর রসপাকের ন্যায় বীচ মারিয়া লইয়া তাহা কচুর টুকরাগুলি ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। রস যখন কচুর গায়ে শুকাইয়া আসিতে থাকে তখন এলাটীর শুঁড়া, ইচ্ছামসারের কপূর, গোলাপজল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য মিশাইয়া দিতে হয়।

“কচুর মোহনভোগ”—কচুগুলি বেশ সিদ্ধ করিয়া চটকাইয়া রাখ। পরে আলো ঘৃত চড়াইয়া লবঙ্গ ও এলাচি দিয়া জৈবং ভাজিয়া লও। পরে তাহাতে চিনির রস বা চিনির জল ঢালিয়া দিয়া সিদ্ধ করিতে থাক। জল বা রস মরিয়া আসিলে কচু কড়ার গায়ে না লাগিয়া যায়, এজন্য জৈবং দুধ দেওয়া প্রয়োজন। পরে নামাইয়া সুগন্ধি দ্রব্যাদি দিয়া লও।

এই দুই মিষ্টানের অন্য কচু বাছিয়া লইতে হইবে, কারণ যে কচুতে মুখ ধরে, তাহাতে ঘৃত সহিবে না।

বাশপোল ও শোলাকচু—ইহা দোমরাঁস ও পলি মাটিতে ভাল হয়। ইহার ক্ষেত্রে পূর্ক হইতে সার দিয়া রাখা আবশ্যক। বর্ষায় যে জমীতে এক কি দেড়ফুট জল থাকে সেই জমীতে ইহা রোপণ করিতে হয়, উচ্চভূমিতে হয় না।

ইহাও মানকচুর মত মুখ কাটিয়া লাগাইলে উত্তম হয়। শিকড়ের চারার আবাদ করা যাইতে পারে। ইহার চারা প্রাণ ভাত্র মাসেই হইয়া থাকে। মানকচুর ন্যায় ইহার ক্ষুদ্র চারা রোপণ করিলে মরিয়া বাওরার সম্ভব, স্ততরাং হইমাস বিলম্ব করিয়া অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে চারা পুতিতে হয়, মাঘমাস পর্য্যন্তও রোপণ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্র গভীর করিয়া বর্ষণ করিতে হয়। মানকচুর ন্যায় ইহারও পাট করিতে হয়, বেশীর ভাগ কেবল ইহার ক্ষেত্রে জল আটকাইয়া রাখা প্রয়োজন, এইজন্য উচ্চ করিয়া আলি বাছিয়া দেওয়া আবশ্যক।

ক্ষেত্রে আবাদের সুবিধা না হইলে বাটীর নিকটে নিরস্থানে অর্থাৎ বেধানে জল আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে, এরূপস্থানে ঐরূপ নিয়মে চারা লাগাইলে, গৃহস্থের প্রয়োজন-

মত কল হইতে পারে। ইহা মানকচুর মত বেশীদিন রাখিতে হয় না, জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত খাবার যোগ্য হইয়া থাকে। প্রয়োজনমত বাছিয়া বড় বড়গুলি উঠাইতে হয়। প্রতিবৎসর ইহার আবাদ করিতে হয়। উত্তম তরকারি, মুখ ধরেনা।

ঢেঁকিবাশপোর কচু—ইহা সাধারণতঃ বাশপোর অপেক্ষা বড় হয় বলিয়া ঢেঁকিবাশপোল বলে। ইহার আবাদ বাশপোলের তুল্য। রক্তপুরে ইহা অধিক জন্মে।

নারিকেলীকচু—ইহাও একপ্রকার শোলাকচু। ইহার আবাদপ্রণালীও ঐরূপ। ইহাতে জৈবং নারিকেলের গন্ধ আছে।

বশোহর, রক্তপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় ইহার অধিক আবাদ হয়। অন্যত্র অতি অল্পমাত্র আবাদ হইয়া থাকে।

মুখীকচু—ইহাকে কলিকাতা অঞ্চলে কচুরমুখী, আর কোথাও কোথাও বয়েকচু, বয়ে, বৈকচু বলে।

ইহার নিমিত্ত হালকা পলি ও দোমরাঁস মৃত্তিকাই প্রশস্ত। কঠিন ও বেলে মাটিতে ইহা ভাল হয় না। গোলাআলুর মত একটি গাছের নীচে ইহা অনেক উৎপন্ন হয়।

আলু তুলিবার মত ইহাও ছোট বড় বাছিয়া ভুলিতে হয়। মাঝারি কচুগুলি বীজের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। এইগুলিতে অল্পর বাহির হইলে, উঠাইয়া ক্ষেত্রে লাগাইয়া দিতে হয়; অথবা যে কচু তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা হইতে বাছিয়া পরিপুষ্টগুলি অল্পর বাহির হইবার পূর্বেই ক্ষেত্রে বসান যাইতে পারে। ফাল্গুন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ইহা রোপণ করা কর্তব্য।

ক্ষেত্রে উত্তমরূপ চাষ দেওয়া আবশ্যক। জমীতে সার দেওয়া উচিত। ছাই ও গোমর দুই দেওয়া যাইতে পারে, তবে ছাইই ভাল। মই দিয়া ক্ষেত্রে সমতল করিয়া যে কয়টা সারি করিতে হইবে, সেই কয় স্থানে এক একবার লাঙ্গল টানিয়া সাত আট ইঞ্চি গভীর জোল করিবে। প্রত্যেক জোল পরস্পর দেড় ফুট অন্তর হইবে। প্রত্যেক জোলে পাঁচ ছয় ইঞ্চি অন্তর এক একটি বীজকচু রোপণ করিয়া গোড়ার মৃত্তিকা চাপা দিয়া রাখিতে হয়। চারা যত বাড়িবে ততই গোড়ার মাটি চাপা দিবে। মূল প্রবল হইবার পর গোলা আলুর মত গোড়ার নিকড়ে মাটি চাপা দিয়া, সেইরূপে কাকী বাছিয়া দিবে। ক্ষেত্রে বাহাতে জল জমিতে না পায়, তাহাতে লক্ষ রাখিতে হইবে।

ইহার ফলে উত্তম শাক হয়। আশ্বিন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই কচু উঠান যায়। বসি তাৎক্ষণিক কল হইবে,

ভাড়া হইলে ইহার এক একটা পাছে পাঁচ হর সের হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই কসলে বিত্ত উপকার পায়। তত্ত্ব লোকে বড় ব্যবহার করেন না।

চৌম্বীকচু—ইহাকে চৌম্বী কচুও বলে। দোরগাঁস মুক্তিকাত্তেই ইহা অধিক হয়, বিয়ার মুক্তিকাত্তেও হয়। গারো পর্বতে ইহার আবাদ অধিক হয়, অন্য স্থানে অতি সামান্য পাওয়া যায়।

ইহার পাছের গারে অনেক চোখ ও মুখী হয়। সেই চোখ কাটিয়া ও মুখী ভাঙ্গিয়া লইয়া পুতিতে হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পুতিলেই ভাল হয়। অন্য সকল সময়েরই রোপণ করা যাইতে পারে।

ইহার চারা বসান হইতে ক্ষেত্রের পাট সবই মানকচুর ন্যায়। আট দশ মাস পরে থাইবার যোগ্য হয়। যত অধিক দিন রাখিবে, ততই আবাদ বৃদ্ধি ও বড় হয়। দুই বৎসরকাল রাখা যাইতে পারে, তৎপরে শক্ত হইয়া যায়। সকল প্রকার কচু অপেক্ষা এই কচুই সুস্বাদু। ইহার তরকারী সিদ্ধ, ভাজা ও বড়া বেশ হয়। ইহাতে একপ্রকার পায়সও হয়। সকলেরই ইহার বীজ আনাইয়া আবাদ করা কর্তব্য।

গুড়ি কচু—ইহার শাকই লোকে থাইয়া থাকে। গুড়ি কচুর মধ্যে “অমৃতমান” নামে এক শ্রেণীই অতি সুন্দর। ইহাতে মোটে মুখ ধরে না এবং থাইতে বড় স্বাদু। ইহার পাতা পর্যন্ত থাইতে পারা যায়। সাধারণ কচুর শাক কৃষ্ণ-বর্ণ হয়, কিন্তু ইহাতে সবুজের ভাগ অধিক, আর পাতা খুব বড় বড় হয়, উঁটার ও পাতার তলার খড়ির গুড়ার মত একপ্রকার পদার্থ লাগিয়া থাকে। ইহার নির্জীবনের প্রমাণ একটি প্রবাদে জানা যায়—“মিঠে কথা অমৃতমান, তুলে খেলে জুড়ার প্রাণ।”

বাজালা দেশের সকল স্থানেই পুরণীর ধারে গুড়ি কচু আগনি জ্বায়। যতপূর্বক ইহার আবাদ করিতে হয় না।

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বাজালীদের “অরজন পূর্ণ” হইয়া থাকে। এই দিন সকলেই পূর্ব দিনের পাক করা অন্নব্যক্তাদির দ্বারা মনসাধনবীর পূজা দিয়া থাকে। কচুশাকের ঘণ্ট এই দিনের প্রধান অবশ্যকর্তব্য ব্যঞ্জন। এই দিন কলিকাতার ২টা কচুর ডাটা এক পরসার বিক্রীত হয়। কুবজশ্রেণীর ইহা একপ্রকার নিত্য বাস্য। কচু শাকের ঘণ্টে হিং, নারিঙেল কোরা, বড়ি ভাজা প্রভৃতি দিয়া রাখিলে অতি সুন্দর উপাদের তরকারী হইয়া থাকে।

কচুরী (দেশজ) শিষ্টকবিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম পুরিকা। ভাবপ্রকাশের মতে, দাবকলাইএর সহিত লবণ, জালা ও

হিং মিশ্রিত করিয়া মরমার মধ্যে ভাড়া পূরণ করিয়া পরে ভাহার শিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৈল বা ঘৃত দ্বারা ভাঙ্গিয়া লইলে ভাহাকে কচুরী বা পুরিকা বলে। তৈলপক কচুরির গুণ—স্থব্রেরটক, মধুরস, গুরু, মিষ্ট, বলকারক, রক্তপিত্ত-জনক, পাকে উষ্ণ, বায়ুনাশক ও চক্ষুর ভেজোনাশক। ঘৃতপক কচুরী চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক ও তৈলপকের ন্যায় অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

কচ্চট (স্রী) কু কুংসিতং চটতি, কু-চট-অচ, বাহুলকাৎ কোঃ কদানদেশঃ। ১ কুংসিত। ২ জলপিশলী।

কচেল (স্রী) কচ্যাতে বধ্যতে অনেন, কচ-এলচ্, লেখ্য-পত্র বাধিব্যার স্ত্রাদি।

কচ্চকচ্ (দেশজ) ১ অব্যক্তশব্দ। ২ অনর্থক বাক্য।*

কচ্চকটী (দেশজ) ১ মৌখিক কলহ। ২ অসম্বন্ধ বাক্য উচ্চারণ।

কচ্চর (জি) কু কুংসিতং চরতি, কু-চর-অচ, কোঃ কদানদেশঃ। ১ মলিন। ২ কুংসিত। ৩ (স্রী) (কেন জলেন চর্যাতে ব্যব-হরতে, পুৰোদরাদিভ্যাং) তক্র, ঘোল। (কচ্চরং কুংসিতে বাচালিঙ্গং তক্রৈ নপুংসকম্। মেদিনী) ৪ হৃৎ।

কচ্চিৎ (অব্য) কামাতে, ক-শ্চিৎ; চীরতে নিশ্চীরতে, চি-কিপ্ (পুৰোদরাদিভ্যাং মস্যা দত্তম্)। কচ্চ চিচ্চ ঘরোঃ সমাহার ইতি বা। ১ প্রসন্ন। ২ হর্ব। ৩ মজল। ৪ স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ।

কিচ্চদধায় (পুং) মহাতারতের অন্তর্গত অধ্যায়বিশেষ, ইহাতে ভল্লীক্রমে নারদ রাজনীতির উপদেশ দিয়াছেন। (ভারত স* ৫ অঃ।)

কচ্ছ (পুং) কেন জলেন ছণোতি দীপ্যতে ছান্যতে বা, ক-ছদ্-ড কং জলং ছাতি পরিহীনতি বা, ক-ছো-ক। (আতো হুহপসর্গে কঃ। পা ৩। ১। ৩।) ১ জলের নিকটবর্তী স্থান, কাছাড়। ২ নদী বা সরোবরের প্রান্তভাগ। ৩ নদী পর্বতাদির সীমাপস্থান। ৪ নৌকার অবরবিশেষ। ৫ পরিধান বস্ত্রের অঞ্চল, (কাছা)। ৬ বৃক্ষবিশেষ, জুঁগাছ। ৭ জলময় দেশ বা স্থান। ৮ প্রাচীন রাজধানীবিশেষ। ৯ (স্রী) বিবিধ পোকা, বিল্লি। ১০ মুখ সম্পূট। ১১ আকাণাচ্ছাদন। ১২ কুর্মেয় খোলা। ১৩ (স্রী) বারাহী।

কচ্ছ, ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সমুদ্রতীরবর্তী একটি প্রদেশ। অক্ষ° ২২°৪৬' হইতে ২৪° উ মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৬০° ২২' হইতে ৭১°৩' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণপূর্বসীমা বঙ্গ, দক্ষিণে কচ্ছ উপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, এবং উত্তরপশ্চিমে কোরি বা লকপৎ নদী।

রণ বা জলা উবরভূমিতে বড়িয়ার বীপ, পচ্ছম ও বরী নামক ভূভাগ।

কচ্ছের এই কয়েকটি প্রধান বিভাগ—১ পাবর; ২ গর্দা পথক, ৩ অবড়াসা, ৪ কুণ্ড পরগণা; ৫ কাঠি বা কাঠী; ৬ মীরাণি এবং ৭ বাগড়।

পাবর বিভাগেই পূর্বে কাঠিজাতির রাজধানী ছিল। এই স্থান দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইল এবং প্রস্থে ২০ মাইল, রণের দক্ষিণধারে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণসীমার চার্লড গিরিমালা। পাবরের প্রধাননগর জুল, এই নগর ১৬০৫ সন্থতে খজার কর্তৃক স্থাপিত হয়।

জামঅবড়ার নামানুসারে অবড়াসা বিভাগের নাম হইয়াছে, এই বিভাগ চার্লড গিরিমালা ও আরবসাগরের মধ্যে অবস্থিত।

মীরাণি বিভাগ পাবরের পূর্বে, মীরাণাজাতি হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে।

এখন যাহাকে সাধারণে কচ্ছ উপসাগর বলিয়া থাকেন, তাহারই নাম কাঠি ছিল, পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি উক্ত উপসাগরের নাম করিয়াছেন। (Ptolemy's Geog. Bk. vii. Ch. 1)

পেরিপ্লাস্ বারকে নামে এই উপসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনার জানা যায়, ইহার মধ্যে বরকে নামে একটি বীপ ছিল। কেহ কেহ এখনকার ওখমগুলকে পেরিপ্লাস বর্ণিত বারকে বীপ বলিয়া মনে করেন। আমাদের বিবেচনার বারকে ষারকা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মাগধী ভাষায় ষারকা স্থানে বারববাএ বা বরববাএ শব্দ প্রযুক্ত হয়। এখনও জৈনবণিকেরা কোথাও কোথাও মাগধী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব বোধ হইতেছে, পেরিপ্লাস্ কোন বণিকের নিকট হইতে সন্ধান পাইরা বারকে নামে ষারকার উল্লেখ করিয়াছেন।

টলেমি বর্ণিত উক্ত কাঠি বা কাঠি উপসাগরের নাম হইতেই কচ্ছ প্রদেশের কাঠিবিভাগের নাম হইয়াছে।

ইতিহাস—কচ্ছপ্রদেশের প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় না। মহাভারতে এই জনপদের নামমাত্র উক্ত হইয়াছে। (ভারত ভীম ২। ৫৬, জৈনহরিবংশ ১২। ৬৮)।

জনপ্রবাদ এইরূপ যে, পূর্বে কচ্ছপ্রদেশের ভেজ নামক প্রাচীন নগর সুরাষ্ট্ররাজ্যের রাজধানী ছিল, ভেজকর্ণ নামে একজন রাজা ঐ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। (Asiatic Researches, Vol. IX. 281.)। উইলসন সাহেবের মতে ট্রাবো বর্ণিত সিগর্ভিন্ (ঈপর্ভ) নামক জনপদের বর্তমান

নাম কচ্ছ। (Ariana Antiqua, 212.) ১৪৫ খৃঃ পূঃ অব্দে, মিনাক্ষর এই স্থান জয় করিয়াছিলেন।

৩৪০ খৃঃ অব্দে, চীম পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ন্স আগমন করেন, তিনি এখানে অনেকগুলি দশাবতারের মন্দির দেখিয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন, “এই জনপদ মালবরাজ্যের অন্তর্গত, এখানে অনেক ধনবান্ লোকের বাস।”

পূর্বকালে কচ্ছদেশে কাঠি ও আহীর জাতির প্রাধান্য ছিল। সে সময়ে কাঠিরা পাবরগড়ে চুর্ভেদ্য চূর্ণ নির্মাণ করিয়াছিল। কচ্ছের দক্ষিণভাগ পর্যন্ত তাহাদের অধিকার ছিল। প্রব্রতশ্ববিদেরা ইহাদিগকে শক বা জিং জাতির শাখা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শম্মারা প্রবল হইরা উঠিলে কাঠিদিগের প্রতাপ থরু হয়। তৎপরে খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাম অবড় কর্তৃক কাঠিরা এককালে কচ্ছপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

ভারীখুস্ সিন্দ নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে—

“ধাকীকের মৃত্যুর পর দেশের সকল মাজগণ্য সম্রাট ব্যক্তিগণ অমরের পুত্র এবং পুত্রের পৌত্র দুদাকে সিংহাসন প্রদানে এক মত হইলেন। অভিষেকের কার্য সম্পন্ন হইল। একদিন সিংহার নামক একজন জমিদার বার্ষিক কর দিতে আসিলেন। দুদার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। সিংহার দুদাকে ভয় দেখাইয়া জানাইলেন যে কচ্ছপ্রদেশের শম্মাজাতি তাঁঁ আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। এখন তাঁহার প্রস্তত হওয়া উচিত। সংবাদ পাইবামাত্র দুদা সসৈন্তে কচ্ছপ্রদেশে আসিলেন, এখানকার সকলে তাঁহার বজ্রতা স্বীকার করিল। তৎপরে শম্মা জাতীর শাখা নামক এক ব্যক্তি রাজদূত হইয়া এবং কচ্ছের ঘোটকাদি উপহার লইয়া দুদার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দুদা ধন রত্ন ও খিলাত ষারা রাজদূতের সম্মান রাখিলেন।” এই ঘটনা ষাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল।

শম্মা বা জাউজা (ঝাউজা) রাজগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও বাদবগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বংশাবলী পাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণপুত্র নরকাজুরের পুত্র বাণাহর ও তাঁহার বংশধরেরা শোণিতপুর ও মিসরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে জাম নরপৎ নামক একজন রাজকুমার তিনটি তাইকে সঙ্গে লইয়া মিসর (ইজিপ্ট) হইতে পলাইয়া আসেন। তিনি উম্মার নামক বন্দরে পোতারোহণ করিয়াছিলেন; সুরাষ্ট্রের ওশন্ নামক গিরিতে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

অগণ্য (অবগতি) হুলনান হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গজগণ বহুদিন হুয়াট্টে ছিলেন, এখনও হুয়াট্টের চূড়াসমা-বংশীরেরা গজগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

নরগণ একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি কিরোর-শাহকে বিনাশ করিয়া খাখাং (কাখে) অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র শম্মা। ইনিই শম্মাদিগের আদিপুরুষ; তিনি স্বেচ্ছা ভাতিয়া কুলুবা নারী একজন হুল্লরীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে জেহ বা তেজকরের জন্ম। তেজ-কর প্রমারমণীকে বিবাহ করেন। এই রমণী হইতে আম-নেত নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। আমনেত একজন বীরপুরুষ, একজন রাষ্ট্রেরকতা তাঁহার পত্নী। সেই পত্নীর গর্ভে জাম নোতিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। নোতিয়ারের পুত্রের নাম জাম উদরবদ্। উদরবদের প্রপৌত্র জাম অবড়া, ইনি কক্সের অবড়াগা বিভাগের স্থাপয়িত। ইহার পুত্র জাম লাখিয়ার, তিনি সিদ্ধপ্রদেশে নগরসমাই নামক স্থানে রাজত্ব করেন। লাখিয়ার একজন শোধী-রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার অঙ্গগম্বী করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র লাখা ঘুরারা (খোড়ার)। লাখার পুত্র উনড়। উনড়ের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মোড় ও মনাই। শম্মাভাতির উক্ত ক-জনেই সিদ্ধপ্রদেশে এক একজন নামক ছিলেন। উনড় পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহা তাঁহার দুই ভায়ের প্রাণে সহিল না। উভয়ে মিলিয়া উনড়কে বিনাশ করিলেন। কিন্তু দেশের সকলেই তাহাদের উপর বিরক্ত হইল, কাজেই মোড় ও মনাই উভয়ে কক্সপ্রদেশে পলাইয়া আসিলেন। এই সময়ে কক্সপ্রদেশে দুই ভায়ের কুটুম্ব বাগম্ চাবড়া রাজত্ব করিতেছিলেন। উভয়ে বাগম চাবড়াকে ও বমাগলে পাঠাইয়া এবং সাত প্রকার বাবেলাজাতিকে স্ববশে আনিয়া কক্সপ্রদেশ অধিকার করিলেন। পাঁচ পুরুষ রাজত্বের পর এই বংশের লোপ হয়।

উক্ত পাঁচজন রাজার মধ্যে ষষ্ঠ লাখা ফুলানির নামই কক্সপ্রদেশে প্রসিদ্ধ। তিনি খৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কাঠিয়াবাড়ের আদকোট নামক স্থানে লাখা ফুলানির পালিয়া আছে।

১৩৭৬ সনতে লাখা ফুলানি খেড়কোটে রাজত্ব করিতেন। তিনি কাঠিভাতিকে পরাস্ত করিয়া কাঠিয়াবাড়ের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। কেহ বলেন আদকোটে লাখা ফুলানির বৃহা হয়; আবার কেহ বলেন তাঁহার জামাতা তাঁহাকে বিনাশ করেন। ১৪০১ সনতে ফুলানির ভ্রাতৃপুত্র পুবরা গহানি রাজা হন। অরদিন রাজত্বের পর বক্সের হাতে

তাঁহার বৃহা হয়। তিনি রাজী নারী আপন বিধবা পত্নীকে রাখিয়া যান। রাজী লাখা জামকে কক্সপ্রদেশে ডাকাইয়া আনেন। লাখা জাম বৃজির পুত্র এবং জাম জাড়ার পোষ্য-পুত্র। ১৪০৬ সনতে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। তৎ-পরে সাতের পুত্র জাড়া রাজা হইলেন, তাঁহা হইতে জাড়েজা-বংশের উৎপত্তি। প্রায় ১৪২১ সনতে লাখার পুত্র রত রায়ধন রাজা হন। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র গজন কক্সের শক্তিমানবৃত্ত বারা নামক ভূখণ্ড শাসন করিতেন।

১৫২৫ খৃঃ, ভীমজীর পুত্র জাম হামীরজী শাশনভার গ্রহণ করেন। ১৫৩৭ খৃঃ, তিনি জাম রাবল হালা কর্তৃক নিহত হন। রাবল হালাকেও দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। তিনি কাঠিয়াবাড়ে আসিয়া নবানগর পত্তন করিলেন।

ইতিপূর্বে হামীরজীর পুত্র খজার জন্মভূমি ছাড়িয়া আক্সদাবাদে পলাইয়াছিলেন। এখানে মজুদ শাহের সাহায্যে ১৫৪৮ খৃঃ, (১৬০৫ সনতে) তিনি পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন। ভূজনগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। পরে পাঁচজন রাজার রাজত্বের পর মহারাও প্রীপ্রাগ্‌মলজী রাজা হইলেন। তিনি রাজ্যলোভে আপন ভ্রাতা রেবজীকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন। প্রাগ্‌মলের ভ্রাতা নাগলজী কোতারী, কোটরি, নজর, গোত্রা প্রভৃতি নগর সংস্থাপন করেন। অবড়াসার জাড়েজাভাতির হলানীরা এই নাগলজীর বংশধর। জাড়েজাবংশীরেরা নানা শাখার বিভক্ত। অনেকেই হুলনানান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পুরুষাচক্রমে যে উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা কেহ পরিভ্রাণ্য করেন নাই। [জাড়েজা রাজবংশাবলী পর পৃষ্ঠায় দেখ]

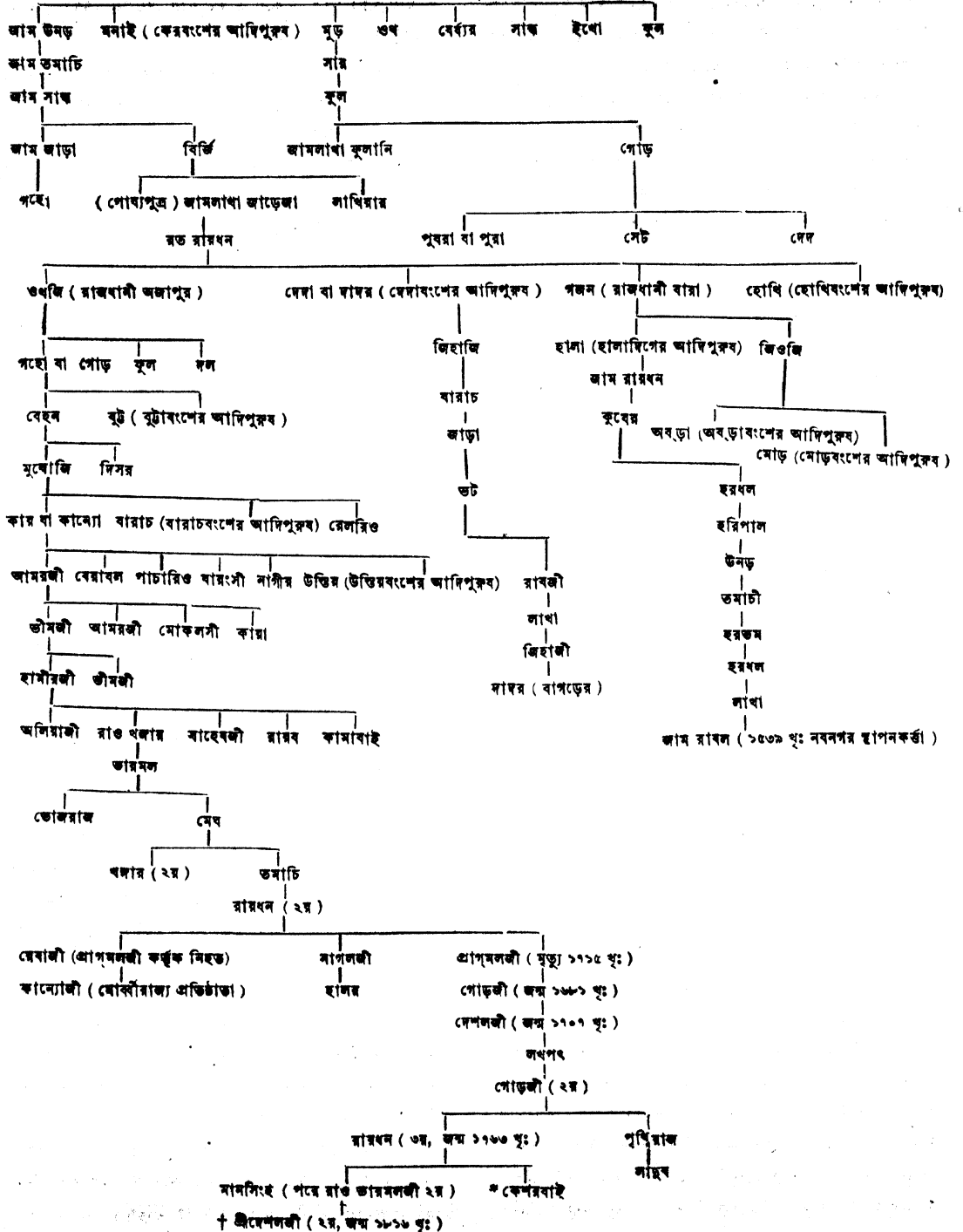
কক্সপ্রদেশে কাঠি, আহীর জাতি ও জাড়েজাবংশ ছাড়া এই কয় প্রকার জাতি বাস করে। কোলি, মীরগা, চাবড়া; বাবেলা রাজপুত, তংসালী, লোহাণা বা লবাণা, সংহার, ভাটিয়া, বারড়, তখীরা, ছুগর, দল, খালা, খাণ্ডাগরা, মায়ড়া, কনড়ে, পশারা, পেহা, মোকলসী, মোকা, রেলডীরা, বরংসী ও বেরার রাজপুত।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ঔদীচ, সারস্বত, পোখণী, নাগর, সাচোরা, ভ্রীমানী, গির্গারা, মোড় ও রাজগুরু ব্রাহ্মণ। মিজ্রী, কন্দোই, মোনি, হুয়াটিয়া, মূচ ও বাইড়া নামক বৈকব-সম্প্রদায়। কাক্‌লা, মাক্‌লা ও কুৎসল এই তিন প্রকার চারণ।

কক্সে অনেক ব্রাহ্মণ ও রাজপুত হুলনান হইরাছে, তাহার নামাঙ্কণিতে বিভক্ত। বর্ণা—মেহবণ, বোহোরা,

কচ্ছের জাড়েজা রাজবংশাবলী।

লাখা গোড়ারা।



* কুলপত্রে নবাবের সহিত ইহার বিবাহ হয়।

† জাড়েজা বংশাবলীতে এই রাজার নাম শেষ পাওয়া যায়।

আগরীয়া, আগা, ভাণ্ডারী, ভটি, বারাক, বদারিয়া, ভটায়, পাড়িয়ার, জুল, রাজক, রায়মা সেডাত, বেহন, হালিপুজা, নারকপুজা, নোড়, হিলোরা ও হিঙ্গোরজা।

এখন কচ্ছপদেশ ইংরাজদিগের অধিকারে।

ভূতত্ত্ব—কচ্ছপদেশ গিরি ও শৈলময়, কেবল দক্ষিণভাগে সাগরপ্রান্তে উর্বরা ভূখণ্ড পড়িয়া আছে। এখানকার গিরিমালা এক একটী স্বতন্ত্র, কোনটি পূর্বাভিমুখে, কোনটি পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। রণের ধারে কতকগুলি দুর্গম গিরিমালা আছে। এই সকল পাহাড়ে বেলেপাথর, করলার স্তর, স্লেটের মাটি, স্বেট ও চূণ পাওয়া যায়।

কচ্ছের দক্ষিণভাগেও পাহাড় আছে, এই পাহাড় আরেরগিরির উপাদানে গঠিত।

কচ্ছপ্রদেশ নদীমাতৃক নয়, এখানে নদীর পরিবর্তে নালা আছে, বর্ষাকালে চারিদিক জলময় হইলে ঐ নালা দিরা জল বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে।

(কচ্ছ প্রদেশের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য—Elliot's History of India, Vol. I, VI; Indian Antiquary, Vol. V. p. 167-172; Journal A. S. Bengal, I. 296; Trans. Roy. A. S. II. 569; Travel's in Western India, p. 353, 421; Burnes's Narrative of a visit to the Court of Sind, p. 236; Postans's Cutch, p. 135; Trans. Bombay, Lit. Soc. II. p. 239; Bombay Government Selection, No. XIII, XV; Archaeological Survey of Western India, II; Report on the Architectural and Archaeological Remains in the province of Katch by D. P. Khakhar &c.)

কচ্ছ (ত্রি) কেন জলেন ভূগতি দীপ্যতে, বা ছদ্-ড। জল-প্রান্ত। ("নদী কচ্ছোত্তবং কান্তমুক্তি তং ধ্বজসরিভম্") ভারত সম্ভব ৭০ অঃ।)

কচ্ছক (পুং) কচ্ছ-সংজ্ঞায়াং কন্। তুর্যক, তুঁদ।

কচ্ছটিকা। (স্ত্রী) কচ্ছং কচ্ছহলং অটতি প্রাপ্নোতি, কচ্ছ-অট্-অচ্ সংজ্ঞায়াং কন্, অতইৎক। কচ্ছ, কাছা। ইহার সংস্কৃতপরিচয়, কচ্ছ, ককা, কচ্ছা, কচ্ছোটিকা ও কচ্ছাটিকা।

কচ্ছনাগ, নাগাজাতিবিশেষ। ইহার আশামের নাগাপর্তুতে বাস করে। [নাগ দেখ।]

কচ্ছপ (পুং) কচ্ছ অনূপদেশে আশ্বানং পাতি রক্ষতি, কচ্ছং আশ্বানো যুধসম্পটং পাতিতি বা; কচ্ছ-পা-ড। ১ কাছিম। সংস্কৃত পরিচয়—কুর্ষ, কমঠ, পূড়াক, ধরদীধর, কচ্ছোট, বকলাবাস, কঠিনপৃষ্ঠক, পঞ্চপুণ্ড, ক্রোড়াক, পঞ্চনখ, গুহ, পীবর ও জলজন্ম। বৈদিক নাম অকুপার। নিকটকার্যকর লিখিয়াছেন, "কচ্ছোপাধ্যাকুপার উচ্যতে হুপারো ন কুপম্ভূতিতি। কচ্ছপঃ কচ্ছং পাতি কচ্ছেন পাতিতি বা কচ্ছেন পিবতিতি বা। কচ্ছঃ বচ্ছঃ ধচ্ছনঃ।

অনন্যীভরো নদীকচ্ছ এতদ্বাদেব কহুংকং ভেন হাদ্যতে।" (নিরুক্ত ৪।১৮)

ইংরাজীতে হুলকচ্ছপকে টর্টইন্ (Tortoise) এবং সমুদ্র-কচ্ছপকে টার্টল্ (Turtle) কহে। ইহার যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক নাম চিলোনিয়া (Chelonia)।

পৃথিবীর নানাদেশে নানাপ্রকার কচ্ছপ দেখা যায়। আরিষ্টটল্ গ্রীকভাষায় তিনপ্রকার কচ্ছপের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—হুলকচ্ছপ, জলকচ্ছপ এবং সমুদ্রকচ্ছপ। যুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা কচ্ছপজাতিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—হুলকচ্ছপ (Testudo), জলা কচ্ছপ (Emys), কঠিন আবরণযুক্ত কচ্ছপ (Chelydros), সমুদ্রকচ্ছপ (Chelonia) এবং কোমল কচ্ছপ (Trionyx)।

ফরাসী প্রাণীতত্ত্ববিদ হুমেরি এই কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—চারসিয়ান বা হুলকচ্ছপ (Chersites), ইলোদিরান্ বা বিলকচ্ছপ (Elodites), পোটামিরান্ বা নদীকচ্ছপ (Potamites), থালসিয়ান্ বা সমুদ্রকচ্ছপ (Thalassites)।

সকল কচ্ছপের মূণ্ড সর্পাদি সরীসৃপের মত, একখানি অস্থিতে নির্মিত, কিন্তু কয়েটি সকল জাতির সমান নয়।

হুলকচ্ছপের মস্তক অগাধকার এবং অগ্রভাগ বিবম; দুইটি চক্ষুর ব্যবধান কিছু বেশী, নাসিকার দ্বিভূজ বড়, পশ্চাৎভাগে চাপা। অক্ষকোটর গোলাকার ও বৃহৎ। পার্শ্বকপালাহি পশ্চাৎ কশেকর মধ্যে ফুঁকিয়া আছে এবং উত্তর পার্শ্বে দুইখানি বৃহৎ শাখা আছে। ঐ দুই মধ্যে মস্তকের বড় খরটির গর্ত।

কচ্ছপের উত্তরভাগে নাসাহি থাকে না। সজীব অবস্থায় নাসিকাছিদ্রে স্রব্দ স্রব্দ পাতের শব্দ অহিসকল দেখিতে পাওয়া যায়। নাসিকার অস্থিময় ছিদ্র একদিকে দীর্ঘ। ইহা কলাহি, মাটাহি, হরহি এবং দুই ললাটাহি দ্বারা গঠিত।

জলাকচ্ছপের মস্তক চেপ্টা, ইহাদের সমুদ্র ললাট বিভূত হইলেও অক্ষকোটর পর্যন্ত পৌছে না।

কোমল কচ্ছপের মূণ্ড সমুদ্রদিকে বরা এবং পশ্চাৎদিকে ফুঁকিয়া থাকে। ইহাদের পার্শ্বকপালের স্রব্দাহি ললাটের পশ্চাৎভাগ, শাখাহি এবং গাড়াহি পরস্পর সংলগ্ন। ইহাদের মূণ্ড অপর কচ্ছপ অপেক্ষা ছোট, অক্ষকোটর অনেকটা লম্বা, এবং নাসিকার ছিদ্র অতি ক্ষুদ্র।

কচ্ছপের নীচের কল তুল্যের কলের দ্বারা। কোন কোন প্রাণীতত্ত্ববিদের মতে ঠিক পানীর কলের মত। ইহাদের অহিসকল পানীর অস্থির দ্বারা আবদ্ধ।

জলার কচ্ছপ মানবের বিশেষ কার্যে আসে না। বঙ্গদেশের কেবল নীচ লোকেরা এই কচ্ছপ খায়। কিন্তু সমুদ্রকচ্ছপ মানবজাতির অনেক ব্যবহারে লাগে। কেহ ইহা খায়, আবার কেহ ইহার অস্থিতে কাঁচকড়া প্রস্তুত করে।

হলকচ্ছপেরাও জল বড় ভালবাসে, তাহারা এককালে অধিক জল পান করে এবং কাঁদার গড়াগড়ি দেয়। সাগর-বেষ্টিত দ্বীপসমূহে হলকচ্ছপ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বহুসংখ্যক একত্র দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়। যেখানে প্রবেশণ আছে এমনতর স্থানই কচ্ছপের প্রিয়। তাহারা নানা স্থানে গর্ত করিয়া রাখে, পথিকেরা পথে না জল পাইলে সেই গর্ত ধরিয়া জলের সন্ধান করিতে পারে।

আমরা মহাভারতে গজকচ্ছপের বৃদ্ধ পড়িয়া বিস্মৃত হইয়া থাকি, কিন্তু এখনকার চাখাম দ্বীপের কচ্ছপের বিবরণ শুনিতে সেই ঘটনা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ডাক্তার সাহেব চাখাম দ্বীপে অতি বৃহদাকার কচ্ছপ দেখিয়াছিলেন। আকিপেলোগো দ্বীপপুঞ্জে এক একটি অতি বৃহৎ কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ এক একটি কচ্ছপের কেবলমাত্র মাংস ওজনে প্রায় ২৪০ মণ (২০০ পাউণ্ড) একটা কচ্ছপ সাত আট জন লোকে তুলিতে পারে কিনা সন্দেহ। এই জাতীয় কচ্ছপের জী অপেক্ষা পুরুষেরাই বড়। জী অপেক্ষা পুরুষের লাজুল ও বড় হয়। এই কচ্ছপেরা যখন জলশূন্য স্থানে থাকে, অথবা জল পান করিতে পায় না, তৎকালে গাছের পাতার রস খাইয়া থাকে।

যে সকল হলকচ্ছপ উচ্চস্থানে অথবা ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করে, তাহারা তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট গাছের পাতা খায়। চাখাম দ্বীপবাসীরা বলে যে এখনকার হলকচ্ছপেরা ৩।৪ দিন পর্যন্ত জলের ধারে থাকে, তৎপরে নিরুজ্জ্বলিত ক্রিয়াকলাপে আসে। কোন কোন স্থানে হলকচ্ছপেরা বৃষ্টির জল ভিন্ন অপর সময়ে জল খাইতে পায় না। তবু তাহারা জীবিত থাকে। পথে পিপাসা হইলে উচ্চ দ্বীপবাসীরা কচ্ছপ মারিয়া তাহার খলি হইতে জল লইয়া পান করে, জী জল অতি পরিষ্কার, খাইতে কিছু কষ্ট। সেখানকার হলকচ্ছপ প্রত্যহ দুই ক্রোশ হাঁটিতে পারে। শরৎকালে কচ্ছপের মিলনের সময়, এই সময়ে জীপুরুষ একত্র হয়, পুরুষ জুখাবেশে মত্ত হইয়া প্রাণ তরিয়া চিংকার করিতে থাকে, সেই কর্কশধ্বনি ২০০ হাত দূর হইতে শুনা যায়। তখন দ্বীপবাসীরা গুলিতে পারেন, এইবার কচ্ছপের ডিম প্রসবের সময় হইয়াছে। যেখানে বালি পায়, কচ্ছপী সেইখানে ডিম পাড়ে, পরে ডিমের উপর বালি ঢালা দেয়। পাখাদের উপর যেখানে সেখানে

গর্ত মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। এই ডিম দেখিতে সাদা, এক একটি ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হয়। একস্থানে ৭।৮টি ডিম থাকে। ইহার বধির, এইজন্য কেহ পশ্চাৎদিক দিয়া ধরিতে আসিলে জানিতে পারে না। এই কচ্ছপ প্রায় শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকে।

বিলকচ্ছপ—অপর কচ্ছপজাতি হইতে বিলকচ্ছপের স্বভাব স্বতন্ত্র। হলকচ্ছপের মত ইহার আঙুল চলে না, ইহার জলে ও স্থলে অতি দীর্ঘ বাতায়ত করিতে পারে। ইহার কেবল শ্বাসসবজীতে সন্তুষ্ট নয়, সুবিধা পাইলে জীবজন্তু মৎস্তাদি ধরিয়া উদরপোষণ করে। ইহাদের ডিম প্রায়ই গোলাকার, শব্দকারির মত চূর্ণাৎপাদক আবরণে আচ্ছাদিত, বর্ণ সাদা। মাটিতে গর্ত করিয়া তন্মধ্যে ডিম পাড়ে, সচরাচর বিলের ধারেই গর্ত করিয়া থাকে এবং যাহাতে শত্রুকর্তৃক ডিম নষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্ক হয়। বিলকচ্ছপ নানা প্রকার। এশিয়ায় ১৬, আমেরিকায় ১৯, যুরোপে ২, এবং আফ্রিকায় ১ প্রকার বিলকচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়।

নদীকচ্ছপ—এই জাতীয় কচ্ছপ সর্বদাই জলে বাস করে, সময়ে সময়ে ডাকার উঠে। ইহার অধিক বড় হয়, বড় হইলে এক একটা ওজনে পঁয়ত্টিশ সাড়ে পঁয়ত্টিশ সের পর্যন্ত দেখা যায়। ইহাদের খোলা পরিমাণে ১০২ ইঞ্চি। জলমধ্যে এবং জলের উপরে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। দেহের নিম্নভাগ দেখিতে অন্ন শ্বেতবর্ণ, গোলাপী অথবা নীলের মত। কিন্তু উপরিভাগ নানাবিধ, সচরাচর পিঙ্গল বা পাংশুবর্ণ, তাহার উপর ছোট ছোট ফিটুকী দেখা যায়। রাত্রি আসিলে ইহার আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করে, এই সময়ে নদী-তটে, নদীর নিকটে পতিত বৃক্ষশাখার অথবা নদীর উপর ডাসমান কোন কাঠের উপর উঠিয়া বিশ্রাম করে, মানবের স্বর অথবা অপর কোন প্রকার শব্দ শুনিতে তৎক্ষণাৎ নদী-গর্ভে ডুব মারে। এই কচ্ছপ বড় মৎস্তপ্রিয়, ইহার ছোট ছোট কুমীরের ছানা পাইলে তাহাকেও ধরিয়া উদরপাণ করে। শীকার অথবা আশ্রয়লাভ করিবার সময় ইহার তীরবৎ মস্তক ও গ্রীবা সঞ্চালন করে। কাহাকে কামড়াইয়া ধরিলে দীর্ঘ ছাড়ে না, দষ্টহান হিঁড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়। এই নিমিত্ত সকলেই এই জাতীয় কচ্ছপদিগকে ভয় করিয়া থাকে। এদেশের লোকেরা বলিয়া থাকে যে একবার কচ্ছপ কামড়াইয়া ধরিলে মেঘ না ডাকিলে ছাড়ে না। এইজাতীয় জীর সংখ্যাই অধিক, পুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। জীলোকে একবারে ৫০।৬০টি ডিম পাড়ে। জীলোকের বয়সাত্ত্বসারে ডিমের কমবেশী হয়।

সমুদ্রকচ্ছপ—সমুদ্রজলে সত্তরপ জন্ত এইজাতীর কচ্ছপের মৎস্তের ভায় ডানা আছে, এরূপ অপর কোন জাতীর কচ্ছপের নাই। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও সত্তরপোপযোগী। ডিম পাড়িবার সময় ভিন্ন ইহার প্রায় তটে উঠে না। কেহ কেহ বলেন, ইহার রাত্ৰিকালে নির্জন প্রান্তরে চরিত্তা বেড়ায়।

সামুদ্রিক কচ্ছপেরা কখন কখন তাহাদের প্রিয় পাতালতা খাইবার জন্ত উপকূলে উঠিয়া অনেকদূর পর্যন্ত গমন করে। ইহার সমুদ্রের জলে নিশান্দভাবে ভাসিতে থাকে, দেখিলেই মৃত বলিয়া বোধ হয়। সত্তরপে ইহার বিশেষ গুণ; সামুদ্রিক উদ্ভিদগণই ইহাদের প্রধান খাদ্য, তবে যে যে সামুদ্রিক কচ্ছপের গাভ্র হইতে কস্তরিকার ভায় গন্ধ বাহির হয়, তাহার ঝিগুকাদি ধরিতা খায়।

ডিম পাড়িবার সময় এই জাতীর জীগণ রাত্ৰিকালে পুরুষকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র ছাড়িয়া অনেক দূরে কোন দীপমধ্যে বালুকাময় স্থানে উপস্থিত হয়। বালির মধ্যে দুই ফিট একটি গর্ত করে, সেই গর্তে এককালে ১০০টি ডিম পাড়ে। এইরূপ দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে আরও দুইবার ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিমের আয়তন ছোট ছোট গোলাকার, স্বর্ষ্যের উত্তাপে ১৫ হইতে ২০ দিনের মধ্যে ফুটিয়া থাকে। ডিম ফুটিলে প্রথমে সেই কচ্ছপশিশুর পৃষ্ঠাবরণ হয় না। তখন খেতবর্ণ দেখায়। এই সময়ে ইহাদের দারুণ বিপদ। স্থলে পক্ষী, আবার জলে গিয়া পড়িবার সময় কুম্ভীর ও সামুদ্রিক মৎস্তগণ ইহাদিগকে ধরিতা খায়। অতি অল্প সংখ্যক মাত্র জীবিত থাকে। যে কয়টি বাঁচে, তাহার সমুদ্র গর্তে বদ্ধিত হইয়া কালক্রমে বৃহদাকার প্রাপ্ত হয়। তখন এক একটি ওজনে ২০ মণ পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই জাতীয় কচ্ছপ মানবজাতির অনেক উপকারে আসে। নানা স্থানের লোকেরা ইহার মাংস খায়; বিশেষতঃ যেখানে কচ্ছপের খুব বড় খোলা পাওয়া যায়, সেখানকার লোকেরা ঐ খোলার নোকা, কুটার-আচ্ছাদন, গবাদির জাব দিবার পাত্র এবং অপর কয়েক প্রকার ব্যবহারের জিনিস নির্মাণ করে।

এই জাতি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; উহা আবার ৯১০ প্রকার। এই কচ্ছপ জাতির খোলা বা পৃষ্ঠাবরণ হইতে উৎকৃষ্ট কাচকড়া তৈয়ারী হয়। [কাচকড়া দেখ।]

ভগবান্ মহুর মতে কচ্ছপ ভক্ষ্য-পক্ষ্যবাস্তবগত।

“সাবিধং শল্যকং গোদা খণ্ডাকুর্ধনশাণ্ডখা।

ভক্ষ্যান্ পক্ষ্যবাহরহুট্টাশৈবকতো দন্তঃ” সমু ৫।১৮।

বরাহমিহির কচ্ছপজাতির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

“কটিকরজতবর্ণো নীলরাজীবচিহ্নঃ

কলসলম্বনমৃষ্টিশাকবংশচ কুর্খঃ।

অরুণলম্ববর্ণা সর্ষপাকারচিহ্নঃ

সকলনৃপমহন্তঃ সন্ধিরহঃ করোতি ॥

অঙ্গনভূমভ্রামবর্ণা বিন্দুবিচিত্রোহিবাকশরীরঃ।

সর্পশিরা বা মূলগলো যঃ সোহপি নৃপাণাং রাষ্ট্রবিবৃদ্ধৌ ॥

বৈদূর্ঘ্যষিট্টমূলকঠজিকোণো

গুচ্ছিত্রশাকবংশচ শতঃ।

ক্রীড়াবাণ্যাং ভোয়পূর্ণে মণো বা

কার্য্যঃ কুর্খো মঙ্গলার্থং নরৈস্তৈঃ ॥”

(বৃহৎসংহিতা ৬৩ অঃ)

যে কচ্ছপের বর্ণ কটিক ও রজতের ভায়, দেহের উপর নীলপদ্মের মত চিত্রিত, বাহার মৃষ্টি কলশের ভায়, পৃষ্ঠ মনোহর। অথবা যে কচ্ছপের দেহ অরুণবর্ণ ও সরিষার ভায় চিত্রিত, এরূপ কচ্ছপ বাটীতে রাখিলে রাজার মহা-প্রকাশ করে।

যে কচ্ছপের শরীর অঙ্গন ও ভূমের ভায় ভ্রামবর্ণ, সর্ষাপে বিন্দু বিন্দু চিত্রবিচিত্র অথবা বাহার মাথা সাপের মত বা গলা স্থূল, এরূপ কচ্ছপ রাজাদিগের রাষ্ট্র বৃদ্ধি করে।

যে কচ্ছপ বৈদূর্ঘ্যবর্ণ, স্থূলকঠ, জিকোণ, গুচ্ছিত্র ও মনোহর পৃষ্ঠদণ্ডবিশিষ্ট, তাহা ক্রীড়াবাণী প্রভৃতি অথবা জলপূর্ণ কলসে মঙ্গলার্থ রাখিলে রাজাদিগের কল্যাণ হয়।

বৈদ্যক মতে কচ্ছপ মাংসের গুণ,—বায়ুনাশক, শুক্র-বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, বলবর্দ্ধক, মেধা ও স্মৃতিকারক, স্রোতঃসংশোধক, শোথদোষনাশক। ইহার চর্ম পিত্তনাশক, পদ কক্ষহারক ও ডিম শুক্রবর্দ্ধক ও মধুর।

২ অবতার বিশেষ, [কুর্খ দেখ।] ৩ নন্দীযুক্ত। ৪ কুবেরের নিধি বিশেষ। ৫ মল্লদিগের যুদ্ধকৌশল বিশেষ। ৬ বিখ্যামিত্রের পুত্র; হরিবংশে বিখ্যামিত্রের এই কয়েকটি পুত্রের নামোল্লেখ আছে,—দেবরাজ, দেবপ্রভা, কতি, হিরণ্যাক, রেণুমান্, সাকতি, গালব, যুগল, বিশ্রুত, মধুচ্ছলা, প্রভৃতি, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ ও পুরিত। ৭ সর্পবিশেষ।

কচ্ছপিকা (জী) কচ্ছপ-স্বার্থে কন-অতইস্ব-টাপ-চ। ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। প্রামেহরোগ হইতে উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্মত মতে ইহার লক্ষণ,—দাহযুক্ত ও কচ্ছপাকৃতি, কফ ও বায়ু এই রোগের উৎপাদক। তাৎপ্রকাশ মতে ইহার চিকিৎসা,—এই রোগে প্রথমতঃ বেদজিরা করিয়া, হরিদ্রা, কুড়, শর্করা, হরিতাল ও দারুহরিদ্রা সেবন করিয়া প্রলেপ দিবে। পাকিলে ত্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কচ্ছপী (জী) কচ্ছপ-জীব (জাতেরজীববিশয়ানুশাখাং।

পা ৪।১।৬৩।) ১ কচ্ছপজী। ২ পিড়কা বিশেষ। [কচ্ছপিকা দেখ।] ৩ বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম 'কাছুরা সেতার'। ইহার খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় চেপ্টা বলিয়াই ইহার নাম কচ্ছপী বা কুর্দী বীণ। স্মিথ সাহেবের মতে লায়ার, টেস্টিডো ও কচ্ছপী এই তিনই এক-জাতীয় যন্ত্র। এখনকার যুরোপীয় গীটার যন্ত্রের সহিত ও কচ্ছপীর অনেক সোসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যুরোপীয় গীটার যন্ত্রের আকৃতি পর্যালোচনা করিলে কচ্ছপী হইতেই গীটারের সৃষ্টি বলিয়া সহজেই স্বীকার করা যায়। জর্জণ জাতীয়েরা গীটারকে 'জিটার' নামে ব্যবহার করেন, উহা কচ্ছপীর অবয়বভেদে মাত্র। [সেতার দেখ।] সরস্বতীর বীণ।

কচ্ছুরহা (জী) কচ্ছুরোহতি, কচ্ছ-কহ-ক- (ইণপঞ্চম) জীকির: কঃ। পা ৩।১।১৩৫।) টাপ্। দূর্দী। (কচ্ছুরহা জী দূর্দীয়াস্। শব্দাকি।)

কচ্ছা (জী) কচং পশ্চাৎপ্রদেশং ছায়ারতি, কচ-ছদ্-গিচ্-ড- টাপ্। ১ পরিধের বস্ত্রের অঞ্চল। ২ কাছা। ৩ বিকি-পোকা। ৪ বারাহী।

কচ্ছাল, বঙ্গদেশের অন্তর্গত বরদদেশের মধ্যবর্তী একটি প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মবংশ ১৯।৫৫)

কচ্ছাটিকা (জী) কচ্ছএব-বাহলকাং অটন-স্বার্থে কন্- টাপ্। কচ্ছ, কাছা।

কচ্ছু (জী) কষতি দেহং, কষ-উ-ছাত্তাদেশশ্চ (কষেচ্ছচ। উণ ১।৮৬। পূর্বোদরাদিষাৎ হ্রস্বঃ।) কৃজ্জুষ্ঠান্তর্গত রোগ-বিশেষ; খোষ বা পাঁচড়া। মাধবনিধানোক্ত ইহার লক্ষণ,—কণ্ঠ, দাঁহ ও আবহুত স্নান স্নান বহুসংখ্যক হেপিডকা হয়, তাহাকে পামা কহে; হস্তবহু ও পাছায় তীব্রদাহযুক্ত যে পামা উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম কচ্ছু।

ইহার চিকিৎসা—১। সোমরাজী, কালকান্দুলা, চাকুন্দা, হরিদ্রা ও গণিয়ারি প্রত্যেক সমভাগ দধির মাত ও কাঁজির সহিত পেবণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ২। বাসকের কচিপাতা ও হরিদ্রা গোমুখে পেবণ করিয়া প্রলেপ দিলে তিন দিবসেই কচ্ছুরোগ বিনষ্ট হয়। ৩। হরিদ্রা পেবণ করিয়া দুই পল গোমুখের সহিত পান করিবে। ৪। হরীতকী গোমুখে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ৫। আকন্দ পত্রের রস ও হরিদ্রা কন্দ সহ সর্বপতৈল পাক করিয়া মর্দন করিবে। ৬। চতুর্গুণ দূর্দার রসে তৈল পাক করিয়া সেবন করিবে। (চক্রবর্ত্ত)।

কচ্ছুরী (জী) কচ্ছুর হতি কচ্ছ-বন্টক্ (অমহুবা কৃৎকে চ। পা ৩।২।৫৩।) জীপ্। ১ পটৌল। ২ বণিক্ জ্ঞাতিবিশেষ।

কচ্ছুর (জি) কচ্ছুরজাতি, কচ্ছ-র হ্রস্বচ (কচ্ছু। হ্রস্বক।

পা ৫।২।১০৭ কাশিকা ৩।) ইতি র। ১ কচ্ছুরোগযুক্ত। ২ পরজীগামী। ৩ পামর।

কচ্ছুরা (জী) কচ্ছুর কণ্ঠং রাতি দদাতি কচ্ছুরা-ক (আতশোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬।) টাপ্। ১ শূক-শিখী। ২ দুরালভা। ৩ শঠী। ৪ যবাস। ৫ গ্রাহিণী, ক্ষীকই বৃক্ষ। ৬ বেস্তা জী।

কচ্ছুরাক্স তৈল (জী) ভাবপ্রকাশোক্ত কচ্ছুরোগ-নাশক তৈলবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—সর্বপতৈল ৮ সের, ককার্থ মনঃশিলা, হরিভাল, হীরাক্ষ, গন্ধক, গৈন্ধব, স্বর্ণক্ষীরী, পাষাণভেদী, শুষ্কী, কুড়, পিপ্পলী, বিব-লাঙ্গলা, করবীর, চক্রমর্দ, বিড়ল, চিতা, দন্তী ও নিমপাতা, প্রত্যেক এক তোলা। আকন্দের আঠা ও সিজের আঠা, প্রত্যেক এক পল। গোমুত্র ১৬ বোল সের। মুছ অগ্নি-উত্তাপে পাক করিয়া গাড়ে মর্দন করিলে, দুঃসাধ্য কচ্ছুর-পামা, কচ্ছুর ও অন্যান্য চর্মরোগ এবং রক্তদোষ নষ্ট হয়।

কচ্ছুরমতী (জী) কচ্ছুর সাধনত্বেন অন্ত্যাত্ম্য, কচ্ছুর-মতুপ-জীপ্। ১ শূকশিখী, আলকুশী। ২ কচ্ছুরোগযুক্তা জী।

(কচ্ছুরমতী শূকশিখ্যাং কচ্ছুরযুক্তে তু বাচ্যবৎ। শব্দাকি।)

কচ্ছুর (জী) কষতি হিনতি দেহম্, কষ-উ, ছাত্তাদেশশ্চ (কষেচ্ছচ। উণ ১।৮৬।) রোগবিশেষ। [কচ্ছুর দেখ।]

কচ্ছুরাটিকা (জী) কচ্ছুরঅটন-বাহলকাং কন্-অত ইৎ- টাপ্। (পূর্বোদরাদিষাৎ) ওকারাদেশঃ। কচ্ছুর, কাছা।

(কচ্ছুরা কচ্ছুরাটিকা কক্ষা পরিধানাপাঞ্চলে। হেম ৩।৩৩৯।)

কচ্ছুর (জী) কেন শিরসা চ্ছুর্যতে লিপ্যতে, ক-চ্ছুর-ঘঞ। শটী।

কচ্ছুরান (দেশজ) ১ খোঁতকরা। ২ বারবার এক কথা বলা।

কচ্ছুরা (দেশজ) খোঁতবস্ত্র।

কচ্ছুরী (জী) কচ্ছুর-জীপ্। কচ্ছুর নামক কন্দবিশেষ।

কচ্ছুর (জী) কে জলে জারতে, ক-জন্-ড। কমল, পদ্ম।

কজ্জি (পুং) মহাভারতোক্ত ভারতের প্রাচীন জনপদবিশেষ।

(ভীষ্মপর্ব)। সিংহলীদিগের ধর্মগ্রন্থে এই স্থান "কজ্জব্বলে নিরুদমে" নামে উক্ত হইয়াছে। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ং "কি-চ-হো-খি-লো" (কজুবীর বা কজিব্বর) নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন— "এই জনপদ প্রায় ২০০০ লি (দেড় শত কোশ) এখনকার তুসি সমভল, উর্ধ্বার, বখারীতি করিত হয় এবং এখানে বখেট শত জম্মে। আবহাওয়া—গরম; অধিবাসীরা সরল, তাহার বিদ্যা ও বিধানের আদর করিয়া থাকে। এখানে ৬৭টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম এবং দশটি (হিন্দু) দেবমন্দির আছে,

অনেকে দেবতাদর্শনে আসিয়া থাকে। কয়েক শত বর্ষ হইল, এখানকার রাজার মৃত্যু হয়,—তৎপরে নিকটস্থ রাজ্যের অধীনে শাসিত হইত। নগর সকল উচ্ছন্ন হইয়াছে, অধিবাসীরা অনেকে আশে পাশে গ্রামমধ্যে ছড়াইয়া আছে। এই জনপদের দক্ষিণ প্রান্তে অনেক বন্য হস্তী বাস করে। উত্তর সীমান্তে গন্ধার নিকটে একটি অত্যুচ্চ বৃহৎ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত মন্দির আছে, ইহা অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যে বিভূষিত। ইহার চারিদিকে সিদ্ধগণ, দেবগণ ও বুদ্ধগণের মূর্তি খোদিত আছে।”

চম্পা হইতে ৯২ মাইল দূরে এখনও কজেরি নামে একটি গ্রাম রহিয়াছে, অনেকে এই অঞ্চলে কজিভের অবস্থান সম্বন্ধে মত দিয়া থাকেন।

কজ্জল (কী) কুংসিতং জলং অম্বাৎ, কুংসিতং চক্ষুঃ-দুৰ্বিতং জলং দূরীভূতং ভবত্যম্বাৎ, বহুব্রী, কোঃ কদাদেশঃ। অঞ্জন, কাজল। ইহার অপর সংস্কৃত নাম লোচক। আয়ুর্বেদ মতে নেত্ররোগে উপকারপ্রদ কতিপয় কজ্জল ব্যবহৃত হয়, তাহা এইরূপ—১। ত্রিকলার জল, ভীমরাজের রস, স্কৃত, বিবকক, ছাগমূত্র, মধু, এই সমুদয়ে প্রত্যহ এক খণ্ড উত্তপ্ত সীসা নিষিক্ত করিবে; এইরূপ ৭ বার করিয়া পরে ঐ সীসাঘরা শলাকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতে অঞ্জনের সহিত প্রয়োগ করিলে বিবিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

২। ত্রিকলার জল, ভীমরাজের রস, স্কৃত, বিবকক, ছাগমূত্র, মধু, এই সমুদয়ে প্রত্যহ এক খণ্ড উত্তপ্ত সীসা নিষিক্ত করিবে; এইরূপ ৭ বার করিয়া পরে ঐ সীসাঘরা শলাকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতে অঞ্জনের সহিত প্রয়োগ করিলে বিবিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

৩। ডুমুর কাষ্ঠের পাড়ে তেঁতুল পত্রের রস রাখিয়া তাহাতে কুঁচের মূল ও সৈন্ধব লবণ মর্দন করিবে, পরে ঐ চূর্ণের সহিত সূক্ষ্মচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে কাঁচ, অর্ণ ও অর্জুন প্রভৃতি নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

৪। মঞ্জিষ্ঠা, বটুমধু ও সৈন্ধব লবণ একত্রে চূর্ণ করিয়া, চক্ক অঞ্জন দিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

৫। বেণামূলের কাথে সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া পুনর্বার পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে নামাইয়া স্কৃত ও মধু সংযুক্ত করিবে, ইহার অঞ্জে সর্পপ্রকার তিমির রোগ নষ্ট হয়।

[অঞ্জন দেখ।] ২ কক্কবর্ণ, কাল। ৩ (পুং) (কুং-সিতমপি জব্যভাতং লতাভাদিকং জালয়তি জীবয়তি, বর্ধ-পেন ইতি শেবঃ কু-জল-পিচ-অচ-হ্রবাঃ, কদাদেশশ্চ।) মেঘ। (কজ্জলন্ত পুমান্ মেঘেবজ্জনেপি চ। শব্দাকি।) ৪ কাক্কপের অন্তর্গত পর্কটবিশেষ। (কাকিকা পুং)

কজ্জলধ্বজ (পুং) কজ্জলং ধ্বজ ইব বত, বহুব্রী। প্রাণীপ-শিখা। (প্রাণীপঃ কজ্জলধ্বজঃ। হেম ৩। ৬৮৬।)

কজ্জলরোচক (পুং কী) কজ্জলং রোচয়তি, কজ্জল-কচ-পিচ-অচ-স্বার্থে কন্। দীপাধার, দেয়কো, পিলহুজ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কৌমুদীবৃক্ষ, দীপবৃক্ষ, শিখাতক, দীপধ্বজ ও জ্যোৎস্নাবৃক্ষ। (কজ্জলরোচকোহব্রী দীপ-বৃক্ষকে। শব্দাকি।)

কজ্জল (কী) মৎস্তবিশেষ, (cyprinus atratus) ইহার সংস্কৃত পর্যায়, কজ্জলী ও অনন্তা।

কজ্জলিত (ত্রি) কজ্জলং জাতমন্ত, কজ্জল-ইতচ্ (তদন্ত সংজাতং তারকামিত্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) বাহা কাশল করা হইয়াছে।

কজ্জলী (কী) কজ্জলনিবারতি, কজ্জল-কিপ্-(নাম ধাতু) সচ-ভী-চ। মিশ্রিত পায়দ ও গন্ধক। সাধারণতঃ কজ্জলীসম্বন্ধিমাণ পায়দ ও গন্ধক একত্রে খেলে মর্দন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, পায়দ গন্ধকে মিশ্রিত হইলেই কাল হইয়া উঠে, পরে স্ফটিক হইলেই ব্যবহারযোগ্য কজ্জলী প্রস্তুত হয়। ঔষধবিশেষে বিভাগ গন্ধক, মারিও কজ্জলী প্রস্তুতের উপদেশ আছে।

কজ্জলীতীর্থ (কী) কাজল। [কজ্জল দেখ।]

কক্কট (কী) কক্কতে দীপ্যতে, কচি-অট্। জলজ শাক-বিশেষ, কাঁচড়া। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—জলকু, লাদলী, শারদী, তোরশিঙ্গলী, ধুলাদলী ও জলতুল্লী। তাব-প্রকাশ মতে ইহার গুণ—স্নেহকারক, ধারক, নীতল, পিত্ত ও রক্তনাশক, লঘু, তিক্ত ও বায়ুনাশক।

কক্কটাদি (কী) অতীসার রোগাধিকারের বৈদ্যোক্ত পাতনবিশেষ। কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, আমপত্র, পানিকল পত্র, বালা, মুখা ও তুঁট, প্রত্যেক ২ তোলা ১/১০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১/১০ অর্দ্ধপোরা থাকিতে ছাকিয়া সেবন করিলে অতিবেগবান অতীসারও রুদ্ধ হয়। (চক্রবর্ত্ত।)

কক্কটাবলেহ (পুং) বৈদ্যোক্ত অতীসারাদি রোগাধিকারের ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—কাঁচড়ামূল ১/১ সের, তালমূলী ১/১ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, ঐ কাথে চিনি ১/১ সের দিয়া পাক করিবে; চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে, তাহাতে বরাকাতা, ধাইহুল, আক-নাদি, বেলতুঁট, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, জাতিহট, ববকার, সচল-লবণ, রসাজন ও ঘোচরস ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে নীতল হইলে মধু ১/১০ এক

কজিকা (জী) কজতে জুঁই তিখা উৎপাদ্যে, কলি-বু-টা-ই-বক। জাকগবটবুক, বামনহাটা।

কজিয়া। মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার উত্তর প্রান্তস্থিত একটি প্রাচীন নগর। পূর্বে এই স্থান বুদ্ধেনাগিগের অধিকারে ছিল। তৎকালে এখানকার শাসনকর্তার করপীড়নে প্রমাণে মাত্রে বিপদগ্রস্ত হইরাছিল। এখন এই স্থানের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে।

এখানকার প্রথম বুদ্ধেনা শাসনকর্তা দেবীসিংহ, তাঁহার পুত্র শাহজী নগরের নিকটে পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, এই দুর্গ চতুর্কোণাকার, চারি পার্শ্বে ৪৫ গজবাসী এখন তরুণার পড়িয়া আছে।

১৭২৬ খৃঃ, ফরাসিদের নবাব-হসন-উল্লা খাঁ শাহজীর বংশধর বিক্রমাদিত্যকে কজিয়া হইতে আকৃষ্ট হইয়া বেন। বিক্রমাদিত্য পিপ্রাসি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই গ্রামে তাঁহার বংশধর অনুসিংহ ১৮৭০ খৃঃ পর্যন্ত নিজের পক্ষ-গ্রামের আশে জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন।

১৭৫৮ খৃঃ, পেশোয়ার প্রভাণে হসনউল্লা বিতাড়িত হইলেন। পেশোয়া আগন জির কর্মচারী ধৃতরাও জিহককে এই নগর অর্পণ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ, বঙ্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী রামচন্দ্র বরাল পেশোয়াকে কজিয়া ও মলহার-গড় ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্তে ইতালি লইলেন। এই বর্ষে ব্রীটিশ গবর্ণমেন্ট এই নগর সিঁহিরাকে প্রদান করেন। সাতার সাগর বিজয়ের সময়ে এখানকার বুদ্ধেনাগি অনুভব-সিংহকে আগমাদিগের প্রভুত শাসনকর্তা বলিয়া বোঝা করিয়াছিল। কিন্তু অনুভবসিংহ আর কিস মতোই অপমানিত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বুদ্ধেনাগি নগর লুটপাট করিতে লাগিল। এই সময়ে লার হিউগ্‌ রোম সটেনসো বুদ্ধেনাগিগের বিরুদ্ধে আগ্রসর হন। ইংরাজ সেনাপতির আগমনলগ্নে পাইয়া বুদ্ধেনাগিগ হতভম্ব হইল।

১৮৬০ খৃঃ, এই নগর ব্রীটিশ গবর্ণমেন্টের অধীন সাগর জেলার সামিল হইল।

অক্ষা ২৪°২০'৩০" উঃ, এবং ৭৮°১৫' পূর্ব জ্যোতিষ অস্থিত।

কট (পুং) কটতি মনসরি বহতি, কট-অচ্। ১ হস্তীর গণ্ডহন।

(“বদন্তিনঃ কটকটাহতং নিবৃত্তকঃ” শিকশা।)

২ কটিনেশ। ৩ কটিনেশের পার্শ্বস্থান। ৪ বাঁহর। ৫ বরহা। ৬ ভূগবিশেষের দ্বারা নির্মিত নদী, এই নদীর দ্বারা অরুই বেষ্টন করা হয়, ইহার সাধারণ নাম ‘বড়’। ৭ ভূগাতি নির্মিত পথবা। ৮ ভূগাতি নির্মিত আসন। ৯ তল। ১০ অতিপথ।

৮ শর। ৯ সমর। ১০ ভূগ। ১১ শব। ১২ লবরথ। ১৩ ভববি-বিশেষ। ১৪ ক্ষণ। ১৫ বাকসবিশেষ। ১৬ (জি) কটরতি প্রকাশরতি জিহাং, কট-বিচ্-অচ্। জিহাকারক। ১৭ পাণা খেলিবার উপকরণবিশেষ।

(“ত্রৈভুক্তসম্বন্ধঃ পাবনগভনাঙ্ক শোভিতশরীরঃ।

নবিতমর্ষিতবার্গা কটেন যিনিগাতিভো যামি।” মুদ্রক’।)

কটক (পুং, জী) কটতে নির্গম্যতে অস্মাৎ নিখরিন্যাদিত্য, কট-বুন্ (কটাদিত্যঃ যজ্ঞোয়াং বুন্। উৎ ৫। ৩৫) ১ পর্কতের মধ্যদেশ; ইহার সমুদ্রতলপার্থ, নিতম্ব ও মেথলা। ২ বলর। ৩ চক্র। ৪ হস্তিনতের ভূম। ৫ সৈকবলবণ। ৬ রাজধানী। ৭ সৈন্ত। ৮ নগরী। ৯ শিবির, যেখানে সৈন্তগণ সন্নিবেশিত হয়। ১০ সাহু, পর্কতের সমতল ভূমি।

কটক। উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্য জেলা। অক্ষা° ২০°১’৫০” ও ২১°১০’১০” উঃ মধ্যে এবং জ্যোি ৮৫°৩৫’৪৫” ও ৮৭° ৩’৩০” পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিগরিমাণ ৫৮৫৮ বর্গমাইল।

সীমা—কটকজেলার উত্তরসীমা বৈতরণীনদী এবং ধানমানদীর বোহানা; দক্ষিণে পূরী জেলা; পূর্বে বঙ্গোপ-সাগর এবং পশ্চিমে উড়িষ্যার অর্ধবাহীম করদরাজ্যসমূহ।

এই জেলা ৩ প্রধান ভূতলে বিভক্ত। ১—সমুদ্রের ধারে জলা ও জল ও হইতে ৩০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার জল ভূতল অনেকটা সমুদ্রবনের জলদারির ভার, কিন্তু গলাতলের বনশোভা যেমন দক্ষিণের নরনপ্রীতিকর এখানে তাহার অভাব আছে।

২—শতভ্রামল খাতভূমি, এই ভূতলের একদিকে সমুদ্রকট এবং অপরদিকে শিরিমালা, ইহা প্রায় ২০ ক্রোশ বিস্তৃত। এই ভূমিতে অপর্যাপ্ত ধাত উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেজের মধ্যে মধ্যে তাল, তমাল, আম্র, বর্জর প্রভৃতি গাছও বিস্তর জন্মে।

৩—পার্বত্য ভূতাল; ইহা কটকজেলার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। পশ্চিমপ্রান্তে অনেকগুলি হোট হোট পাহাড়। এই ভূতাল হইতে শালতলা, লাকা, পদ, তদ্রকীট, মোটাক, লগ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এখানকার পাহাড়গুলি হোট হোট; সর্বোচ্চ শিখর ২৫০০ ফিটের বেশী নয় বটে কিন্তু প্রায় সকলগুলি হিম্মদিগের অভি পবিত্র দেবস্থান বলিয়া অভিপ্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

কটকের পাহাড়ের মধ্যে এই কয়টি প্রধান—

আসিরা পাহাড় (আলমদীর)—এই পাহাড় অনেকটা ভারগা হুড়িয়া আছে, ইহার প্রাচীন নাম চতুর্শীঠ। পূর্বে

এখানে নানান স্থান হইতে হিন্দুগণ তীর্থ করিতে আসিতেন। ইহার চারিটি বড় শূক, তন্মধ্যে একটি বিরাট নদীর দিকে, তাহার বর্তমান নাম আলমগীর, এই শূকর উপর একটি উচ্চ মসজিদ আছে। ১৭১২-২০ খৃঃ অব্দে, উড়িষ্যার শাসন-কর্তা জুজা উদ্দীন এই মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মসজিদ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যানও প্রচলিত আছে—

“একদিন মুহম্মদ ব্যোমপথে বাইতেছিলেন, সঙ্গে তাঁহার মলবলও ছিল। নেমাজের সময়ে সকলে নম্ভতিগিরি শূক্রে নামিলেন। গিরিশূক্রে চলিতে লাগিল, তাঁহাদিগকে ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। তখন মুহম্মদ নম্ভতিগিরিকে অভিলাপ করিয়া এখন যেখানে মসজিদ আছে, সেইখানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। যেখানে মুহম্মদ নেমাজ করিয়াছিলেন, এখনও তথায় তাঁহার পদচিহ্ন একখানি প্রস্তরের উপর রহিয়াছে। পূর্বে এখানে জল পাওয়া বাইত না, মুহম্মদ আপন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিমাত্র স্বচ্ছসলিল প্রসবণ উৎপন্ন হইল। মুসলমান যাত্রীগণ পদচিহ্ন ও সেই প্রসবণ এখনও দেখিতে গিয়া থাকেন। জুজাউদ্দীন কটকে আসিবার কালে ইরাকপুরে শিবির স্থাপন করেন। এই স্থান হইতে তিনি গিরিশূক্রে আসিয়া নেমাজের ধ্বনি শুনিতে পান। তাহার অমুচরবর্গ নেমাজ শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিল, সকলেই গিরিশূক্রে আসিয়া বাইতে চাহিল। কিন্তু জুজা নিষেধ করিয়া বলিলেন, যদি আমরা উপস্থিত হুজ্জত জয়লাভ করিতে পারি, তবে ফিরিবার সময়ে সকলে ঐ গিরিশূক্রে গিয়া নেমাজ করিব। জুজাউদ্দীনের জয় হইল, তিনি সৈন্তকে শূক্রে আসিয়া নেমাজ করিলেন। এইখানে তিনি মুহম্মদ মসজিদ নির্মাণ করাইয়া দেন।”

হিন্দুরা এই শূক্রে মণ্ডপ বলিয়া থাকেন। শূক্রে নীচেই মণ্ডপগ্রাম, অতিপ্রাচীনকালে এখানে হিন্দুরা মণ্ডবস্ত করিতেন।

উদয়গিরি—আসিয়া গিরিমালার ৪টি শূক্রে মধ্যে উদয়গিরিও একটি। আসিয়া গিরিমালার পূর্বভাগে অবস্থিত। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। শূক্রে উচ্চভাগ হইতে পানদেশ পর্যন্ত পরিদর্শন করিলে অসংখ্য দেবমূর্তি নয়নগোচর হয়। বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে এখানে যে অনেক সন্মারাম ও বৌদ্ধচৈত্য ছিল, এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

উদয়গিরির পাদদেশে এক প্রকাণ্ড পদ্মপাণি হুজ্জত মূর্তি আছে, এখানে আসিলে দর্শক অগ্রে এই মূর্তি দেখিতে পান। মূর্তি উচ্চ প্রায় ২ ফিট, একখানি পাথর খুদিয়া এই মূর্তি

গড়া হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক জললে আচ্ছন্ন আর কতকংশ ভূগর্ভে প্রোথিত। পদ্মপাণির বাম হস্তে পদ্ম; নাসিকা, বাহ ও বক্ষঃস্থলে অলঙ্কার শোভা পাইতেছে; ডানহাত ও নাসিকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পদ্মপাণির মূর্তি ছাড়াইয়া অনতিদূরে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, ইহারই নিকটে পাহাড়ের উপর একটি কুপ কাটা হইয়াছে, কুপ বিস্তারে ২৩ ফিট, জল ভুলিবার স্থান হইতে জল পর্যন্ত ২৮ ফিট, চারিদিকে পাথরের বেড়া, উহা দৈর্ঘ্যে সাড়ে ৯৪ ফিট, প্রস্থে ৩৮ ফিট ১১ ইঞ্চি। প্রবেশপথে দুইটা বড় বড় খাম আছে, এখন খামের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

শূক্রে ৫০ ফিট উপরে জল মধ্যে একটি চৈত্য পড়িয়া আছে, বৌদ্ধরাষ্ট্রদিগের সময়ে এখানে বৌদ্ধভক্তিগণের সমাবেশ হইত। বৌদ্ধদিগের অবসান হইলে হিন্দুগণ এখানে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করেন। দেবদেবী মুসলমানেরা অনেক মূর্তির মস্তক ও বাহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এখানকার হিন্দুরা ঐ সকল মূর্তির পূজা করিয়া থাকে। এই জল মধ্যে একটি বৃহৎ তোরণের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, এই তোরণের সম্মুখে এক বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি ধ্যাননিমগ্নিত নেত্র বসিয়া আছেন। তোরণের গঠন অতি চমৎকার, তিনখানি সুবৃহৎ প্রস্তরে গঠিত। মনোযোগপূর্বক দেখিলে প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তোরণের সোঁদা পাথরখানি পাঁচ স্তবকে বিভক্ত, স্তবকগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন দুই এক দিন হইল এই তোরণটি নির্মিত হইয়াছে, স্তবকের ভিতরে যেন সহস্র নীলপদ্ম ফুটিয়া আছে, পাহাড় কাটিয়া কত যত্নের সহিত ঐ পদ্মগুলি খোদাই করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দ্বিতীয় স্তবকে কতকগুলি সপ্তম নরনারীমূর্তি। মধ্য স্তবকে কুসুমমালা বিকুচিত। চতুর্থ স্তবকে হাত ধরাধরি করিয়া পুরুষনরীমূর্তি দণ্ডায়মান, সকলেই ফুলমালা দিয়া আবদ্ধ। শেষ স্তবক দেখিলে নয়ন মন জুড়ায়, কি মুন্দর কুসুমচিহ্ন। আচ্ছা এই নির্জন বন মধ্যে কে সাধ করিয়া পাথরে ফুলের মালা গাঁথিল, ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

তোরণ ছাড়াইয়া ১১ হাত গমন করিলে, একখানি ক্ষুদ্র গৃহ দেখা যায়। গৃহখানির চারি দিক কাঁটা গাছে ঢাকা। গৃহমধ্যে এক প্রকাণ্ড ধ্যানীবুদ্ধ মূর্তি রহিয়াছে। এই মূর্তি ৫ ফিট উচ্চ। দেবদেবী যবনেরা ইহার দক্ষিণ হস্ত ও নাসিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

অচল বসন্ত—আসিয়া গিরির আর একটি শূক্রে এই শূক্রে নীচে দক্ষিণের নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে,

পূর্বে এই নগরে এখানকার হিন্দুস্বাক্ষরগণের আবাস ছিল। এখনও তোরণ, প্রস্তরের উন্নতপ্রাঙ্গণ ও অশ্বচক্রাটীরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

বড়দেহী—আসিরাগিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহার পাদদেশে এখানকার দুর্গাধিপতির আবাস ছিল, মুসলমান ও মারাঠা-দিগের সময় এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। প্রথমে যখন বৃটীশ গবর্ণমেন্ট এখানকার জমির বন্দোবস্ত করিতে যান, এখানকার রাজা অব্যাহত হইয়া বৃটিশের অধীনতা অস্বীকার করেন, তখন হইতে এই স্থান মোগলবন্দীর সামিল হইল। এখন সেই প্রাচীন রাজার পরিবারবর্গ নিত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, সেই রাজারই এক পুরাতন দাস গড়নায়ক এক খণ্ড ভূমিদান করিয়াছেন, তাহাতেই রাজপরিবারের কায়-রেক্ষে জীবিকানির্ভর হয়।

নল্টিগিরি—এই গিরিও আসিরা গিরির অংশ, কেবল মধ্যে বিরূপানদীর ধারা দুইটা স্বতন্ত্র হইয়াছে। মটকনগর পরগণার উত্তরপশ্চিম কোণে ইহার অবস্থিতি। এখানে চন্দনগাছ ভিন্ন অপর গাছ গাছড়া বড় একটা জন্মে না। গিরির নিম্ন শৃঙ্গে অতি প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, পূর্বকালে উহাই বৌদ্ধমন্দিররূপে সুশোভিত ছিল। মণ্ডপ এককালে নষ্ট হইয়াছে, ৭৮ ফিট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ সকল এবং তাহারই নিকট দেবদেবীর মূর্তি রহিয়াছে। এই ধ্বংস-বশেষের কাছে মুসলমানদিগের একটি ভগ্ন গোরস্থান লক্ষিত হয়। বোধ হয় বৌদ্ধমন্দির ভাঙ্গিয়া ঐ গোরস্থান নির্মিত হইয়া থাকিবে। মন্দিরের মণ্ডপ না থাকিলেও এখনও ধর পড়িয়া আছে, উহার চারিদিকে প্রাচীর, মধ্যে অনেকগুলি অলঙ্কৃত বুদ্ধমূর্তি। এখানকার লোকে ঐ সকল মূর্তিকে অনন্ত পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন।

নল্টিগিরির উচ্চতর শৃঙ্গ উচ্চে সহস্র ফিট। এই শৃঙ্গের উপর প্রস্তর নির্মিত একটি বৃহৎ মন্দির ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র পড়িয়া আছে। ইহারই ৫০০ ফিট নিম্নে হাতিখাল নামে একটি গুহা আছে, গুহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, এই-খানে ছয়টি বুদ্ধমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই নিকট প্রাচীন কুটিল অক্ষরে খোদিত বৌদ্ধধর্মপ্রচারক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। অদূরে দুইটি সিংহোপরি শতদলআসনা সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি বিরাজ করিতেছেন।

অমরাবতী—এই পাহাড়কে এক্ষণে সকলে চট্টা পাহাড় বলে। পাহাড়ের পূর্বপাদদেশে প্রাচীন-দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গটা পাথর দিয়া বেষ্টিত দুর্ভেদ্য করা হইয়াছে, তাহা সাতিশর প্রাঙ্গণবন্দী। এই দুর্গদুর্গের

অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল, মধ্যে গবর্ণমেন্টের পূর্ববিভাগের লোকেরা এই দুর্গের পাথর খুঁদিয়া দইরা রাজ্যের লাগাইরাছে। এই ভগ্ন দুর্গের এক দিকে ২টি স্থলজিত ইন্দ্রাণীর প্রস্তর মূর্তি আছে। এই পাহাড়ের উপর অর্ধ মাইল জুড়িয়া নীলপুকুর নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে।

মহাবিনায়ক—বাঙ্গালীবাণ্টা গিরিমালার একটি শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গ অতি পূর্বকাল হইতে শৈবদিগের একটি পূণ্যপ্রদ তীর্থস্থান, যদিও এখন বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হওয়ার পূর্ব সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু শৈবযাজ্ঞীগণ দলে দলে এখানে আসিয়া থাকেন। এই শৃঙ্গের মধ্যে একস্থান দেখিতে হস্তী শুশ্রূষাকার, উহাকে লোকে মহাবিনায়ক বা গণেশমূর্তি বলিয়া থাকেন। উহার উপর বিনায়কের মন্দির আছে। পাহাড়ের দক্ষিণমুখ শিব এবং বামমুখ গৌরী বলিয়া পূজিত হয়। এখান হইতে ৩০ ফিট উচ্চে একটি জলপ্রপাত আছে, তাহার জলেই দেবার্জনা হয়। প্রপাতের নিকট শিবের অষ্টলিঙ্গ আছে।

নদী—কটক জেলা তিন প্রধান নদীতে বিভক্ত, উত্তরে কলুনাশিনী বৈতরণী, মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণী এবং দক্ষিণে মহানদী। বৈতরণী নদী মহাতারতের সময় হইতে পুণ্যসলিলা গঙ্গার ভায় পূজনীয়া। পঞ্চপাণ্ডব এই নদীতে আসিরা তর্পণ ও অবগাহন করিয়াছিলেন। বৈতরণী প্রবাহিত ভূমিখণ্ডকে পূর্বকালে যজ্ঞীর দেশ বলিত। [উৎকল, কলিঙ্গ, বৈতরণী দেখ।] এই তিন নদীর স্রোণে কটক জেলা পশ্চাশালিনী। নদীগুলি উচ্চস্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হয়, অথবা অপর নদী গ্রহণ করে নাই, নদীগুলি সমতল ভূমির উপর প্রবাহিত, এবং শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া কটক জেলাকে সুজলা সুকলা করিয়া রাখিয়াছে। কটক জেলার জম্বু, বাকুন্ড প্রভৃতি কয়েকটি খালও আছে।

নগর—কটক জেলার এই কয়েকটি নগর—১ কটক, ২ যাজপুর, ৩ কেশ্রাপাড়া, ৪ গগংসিংহপুর।

১ কটক—যেখানে মহানদী বিধারা হইয়া বীপাকার হইয়াছে, সেইখানে মহানদী ও কাটজুড়ি নদীর মুখে কটক নগর অবস্থিত। অক্ষা ২০°২৯'৪" উঃ, দ্রাঘি ৮৫° ৫৪'২৯" পূঃ।

কটক নগর আজকালের সহর নয়। মাদলাপাড়ীর মতে এই নগর প্রায় নয় শত বর্ষ পূর্বে কেশরীবাণীর কোন নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারও অনেক পূর্বে আর এক কটক সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভবভূষণ বৃট্টের পঞ্চম পতাবীতে রাজ্য করেন, অতএব ঐ সময়ে সেই কটক বিদ্যমান

হিল। (Indian Antiquary, Vol. V. 60.) কটকনগরের দেওয়ান পূর্বে চৌধার নামে একটি গ্রাম আছে, ইহাকে সাধারণে কটকচৌধার বলিয়া থাকে। একসময়ে এই স্থানে উৎকলরাজ্যের রাজধানী ছিল। উৎকলের পতনের মতে এই নগর সর্বপ্রথম কালে রাজা জনমেজয় কর্তৃক স্থাপিত হইরাছিল। বোধ হয় এই কটকচৌধারই তবণ্ডেশ্বর অধিপতির ন্যূনতম কটক হইবে। যদিও কটকচৌধারের আর পূর্ববর্তী নাই, কিন্তু কোন সময়ে যে অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা এই স্থান পরিদর্শন করিলেই জানা যায়। এই প্রাচীন নগরের পার্শ্বে কপালেশ্বর নামে একটি দুর্গ আছে, উৎকল-রাজ চোরগঙ্গার সময়ে এই দুর্গ মধ্যে একটি সুবিশিষ্ট জলাশয় খনন করা হইরাছিল, এখনও এখানকার লোকে এই জলাশয়কে চোরগঙ্গার পুকুর বলিয়া থাকে।

বর্তমান কটকনগরেও বড়বাটী নামে একটি দুর্গ আছে। খৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজা অনন্তদেব এই দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭৫০ খৃঃ, আক্ষদশাহের শাসনকালে এই দুর্গের উত্তরপশ্চিম প্রান্তরসংযুক্ত ও পূর্ব তোরণ নির্মিত হয়। দুর্গটি দুই দক্ষা পাথরের প্রাচীরে ঘেরা, চারিদিকে গড়খাই কাটা, দুর্গের মধ্যে একটা উচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভ আছে, তাহারই উপর জয়পতাকা উড়িত। আইন অববাকীর মতে এই দুর্গ মধ্যে রাজা মুকুন্দদেবের মরতলা বাটী ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এখন কটকনগরে দেওয়ানী আদালত ও কমিশনরের প্রধান কার্যালয় আছে।

২ বাজপুর—এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু-দিগের পূণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, এইখানে আমাদের পুরাণোক্ত বিরজাক্ষেত্র, এই নগরে দেখিবার জিনিস অনেক আছে। এখন এই নগর বাজপুর সবডিভিশনের প্রধান স্থান।

[বাজপুর ও বিরজা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ কেল্লাপাড়া—এই নগর মহাপ্রতাপী চিত্ররত্না নারী পাণ্ডার উত্তরে কিরকুরে অবস্থিত। মহারাষ্ট্রদিগের সময়ে এখানে একজন কোজদার ছিলেন, কুজদেবের রাজ্য তৎকালে নানাস্থানে লুটপাট আরম্ভ করিতেছিলেন, উক্ত রাজাকে শাসন করিবার জন্যে এখানে কোজদার অবস্থান করিতেন।

উত্তীর্ণ—কটক জেলার ধান বেশ জন্মে, এখানে বিরাটী, দোন্ডলী ও মাধুরী ধানই প্রধান। বহুদেবে যেমন আমল, এখানে সেইরূপ ‘পারল’ জন্মে। আমনের দ্যায় পারলও লাগাএকার। কুট, হোলা, মুগ, রীহি, অন্ধুর, প্রভৃতি ডাল,

সরিষা, ডালকা, হলুদ, বেণী, পানমৌরী, পিরাজ, রক্তন, তিসি, ধনা, পান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ঔষধবৃক্ষের মধ্যে—আমলা, অক্রান্তা, অর্জুন, অর্ক, আশুরাবট, অংশুগন্ধা, অশোক, আম, বেগ, ভুজরাজ, বামন-হাটি, বকুল, বজ্রমূল, ভালিয়া, বহেড়া, বেগুনীয়া, বেণা, বাগ, ভুতুরি, বারগোবা, বরকোলি, ভুঁই বাকী, বাকুচী, অনন্তমূল, চিরেতা, চিতামূল, লালচিতামূল, চাকুন্দা, দাড়িম, ধুতরা, দারুহরিদ্রা, দস্তী, দুধিরা লতা, গজপিপুল, ঘৃতকুমারী, গোলক, গাব, গোখুর, হস্তীকর্ণ, হাড়ভাঙ্গা, হিজলীবাদাম, হরিতকী, ইন্দ্রবব, ইন্দ্রবাকী, ইসপগুল, জাম, জৈত্রী, জার-কল, ককর্ণী, কীটাকুন্দ, কুচিলা, কালানান, কামরাঙ্গা, খেংপাপড়া, কাসন্দী, মুখা, মটমটরা, মানকচু, মহানিম, নিম, নাগেশ্বর, ওল, ফুটফুটরা, পটোল, নাগুতে, পলাশ, রক্তচন্দন, উঁতুল, ভালমূলী, সোমরাজ, সজিনা, সৌদাগ, শালপানী, সোণামুখ প্রভৃতি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

কটকজেলার হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নানা শ্রেণী লোকের বাস। ইংরাজরাজত্বের পূর্বে পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় আক্রমণে কটকজেলা নিত্যন্ত দরিদ্র ও হীনাবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আবার অবস্থা ক্রমশঃই ভাল হইতেছে, কিন্তু পূর্বে যেমন লোকে পরিশ্রমী ছিল, এখন আর তেমন নাই; কৃষকেরাও বিলাসী হইয়া পড়িতেছে। ক্রমশঃই এখানে বিলাতী জব্যের আদর বাড়িতেছে, দেশী জব্যাদির উপর প্রচণ্ড কমিয়া আসিতেছে।

[বালেশ্বর পুরী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কটকট (জি) কটপ্রকারঃ, প্রকারে বিবন্ম। ১ অত্যন্ত।

২ সর্কোৎকট। ৩ (পুং) মহাদেব। ৪ অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটকট (অব্য) কটকট-ডাচ্ (অব্যক্তাক্ষরগণ্য দ্ব্যজবর্ণার্থ-নিন্তো ডাচ্। পা ৫। ৪। ৫৭।) অজ্ঞকরণ শব্দবিশেষ।

(“বুদ্ভিভিন্ত মহাঘোষেরন্যোহন্যামতিজয়তুঃ।

ততঃ কটকটাপেক্ষা বভূব স্তমহাঘোষোঃ। ”

ভারত বন ১৫৭ অঃ।)

কটকীর (জি) কটং করোতি, কট-ক-অণ্। শিল্পকার জাতিবিশেষ, শূদ্রাগর্ভে গোপনে বৈত কৰ্ত্তব্য এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। সাধুর বড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহা-দিগের ব্যবসায়।

কটকী [নৃ] (পুং) কটকো হত্যাতি, কটক-ইনি। ১ পরিত।

২ (জি) কটকবৃত্ত।

কটকীর (জি) কটকার হিতঃ, কটক-ই। কলম্বি-প্রভৃতির উপকরণ, কর্ণাধি।

কটকোল (পুং) কটতি অৰতি, কট-অচ্; কটত কোলো
বনীভাবো যজ, বহত্ৰী। নিষ্ঠিবনপাজ, শিক্ৰানী।

(কটকোল: পুংসি পতদ্গ্ৰেহে। শকাঙ্কি।)

কটখাদক (জি) কটং ভূগাদিকং সৰ্বমেব খাদতি, কট-খাদ-
ধূল্। ১ সৰ্বভক্ষক। ২ (কটং শবং খাদতি) শবখাদক।

৩ (পুং) কাচকলশ। ৪ কাক। ৫ শৃগাল।

কটঘোষ (পুং) কট প্রধানো ঘোষঃ, মধ্যপদলো। ১ গোৱাল-
পাফা। ২ পূৰ্বদেশীয় গ্রামবিশেষ।

কটকট (পুং) কটং শবং কটতি জালরা আবুগোতি, কট-কট
বাহলকাং খচ্। ১ অগ্নি।

(“কটকটর ভাবার নমঃ পঞ্চপলায় চ।” অগ্নি পুং।)

২ স্বৰ্ণ। ৩ চিতাবৃক্ষ। ৪ গণেশ। ৫ রুদ্র।

কটকটেরী (স্ত্রী) কটকটং বহিঃ স্বৰ্ণভূত্যাং বা কাকিং কৈরয়তি
জাপরতি, কটকট-কৈ-অণ-স্ত্রীপ্। ১ হরিত্ৰা। ২ দারুহরিত্ৰা।

কটচুরি (পুং) জাতি ও গোত্রবিশেষ। নাগরখণ্ডে কট-
চুরী নামে উক্ত হইয়াছে। (নাগর ২৭০। ৪)

পূৰ্বকালে কটচুরি নামে এক প্রবল জাতি ভারতের
নানাহানে রাজত্ব করিতেন, শিলালিপিতে এই জাতি কল-
চুরি নামে অভিহিত হইয়াছে। [কলচুরি দেখ।]

কটদান (স্ত্রী) কটো দেহবৰ্ত্তনং দীৰ্ঘতেহত্ৰ কট-দা-লুট্।
ত্ৰীকৃষ্ণের পাৰ্শ্বপরিবৰ্ত্তন উপলক্ষে উৎসববিশেষ। এই উৎসব
ভাদ্রমাসের শুক্ল একাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের মধ্যপাদযোগে
সন্ধ্যাকালে কর্তব্য। দেশভেদে নাম ‘করোটা দেওরা।’

কটন (স্ত্রী) কটেন ভূগাদিনা অন্যতে সম্পদ্যতে, কট-অন-
অচ্। গৃহাচ্ছাদন, চাল।

কটনগর (স্ত্রী) পূৰ্বদেশীয় নগরবিশেষ।

কটপঙ্খলা (স্ত্রী) প্রাগ্দেশীয় গ্রামবিশেষ।

কটপূতন (পুং) কটন্ত শবন্ত পূ তাং তনোতি কটপূ-তন-অচ্।
প্রোতবিশেষ। ক্ষত্রিয় সধৰ্ম্মত্যাগী হইলে এই প্রোতত্ব প্রাপ্ত
হইরা শব ভক্ষণ করে।

“অমেধ্য কুণশাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ।” মনু ১২। ৭১।

কটপ্ৰ (পুং) কটে গ্রামানে প্রবতে বিচরতি, কট-প্র-ক্ৰিপ্
দীৰ্ঘশ্চ। (কিঞ্চিৎ প্রচ্ছি প্রচ্ছিক্ত প্রজ্ঞাং দীৰ্ঘো হস্প্রসারণক।
উণ্ ২। ৫৭।) ১ মহাদেব। ২ রাজস। ৩ বিদ্যাধর।
৪ পাশাকীড়ক।

(কটপ্ৰ: পুংসি রাজসে। বিদ্যাধরে মহাদেবে
তথা ভাদ্রকদেবতে। মেদিনী।)

কট। ৬ বহুদ্রপী। (কটপ্ৰ: কাষরঙ্গী কটিন্চ।
উজ্জলদত্ত।)

কটপ্রোধ (পুং, স্ত্রী) কটন্ত কট্যা: প্রোধঃ মাংসপিণ্ড, ৬৩৭।
কটিদেশস্থ মাংসপিণ্ড, নিভব।

(কটপ্রোধঃ কিচি পুমান্। শকাঙ্কি।)

কটভজ (পুং) কটানাং শতানাং হতেন ভজঃ। ১ হাত দিয়া
শত ছেঁড়া। ২ (কটন্ত সৈন্তসংঘত ভজো যশাং) রাজবিনাশ।

(কটভজন্ত শতানাং হতুচ্ছেদে নৃপাতারে। মেদিনী।)

কটভী (স্ত্রী) কটবদ্যতি, কট-ভা-ভ-ভীষ্। ১ জ্যোতিষভী-
লতা, নরাকটী। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—কটু ও
তিক্ত রস, সারক, কক ও বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণ, বমন-
কারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বুদ্ধিবলক ও দৃতিশক্তিপ্রদ।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কটভী, জ্যোতিষ, কটুভী, পারাবত-
পত্নী, পণালতা ও কুকুম্বনী। ২ অপরাজিতা। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—নাভিক, শোভী, পাটলী, কিণ্বহী, মধুমেধু,
কুন্ত্রামা, কৈতুর্ধ্য ও শ্রামলা। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার
গুণ—কটু, উষ্ণ; বায়ু, কক ও অজীর্ণরোগনাশক। কটভী
ষেত ও নীলভেদে বিবিধ, উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট। ইহার
ফলেরও ঐ সকল গুণ, তবে কল ককওজ্বকারী। [অপরা-
জিতা দেখ।] ৩ কাটাশিরীষ নামক বৃক্ষবিশেষ।

কটমালিনী (স্ত্রী) কটানাং কিম্বাদোষধীনাং মালা সাধন-
ধেন অস্তা: অস্তি, কটমালা-ইনি-স্ত্রীপ্। মদিরা; কিম্বাদি
ঔষধসমূহের দ্বারা ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কটম্ব (পুং) কটতি, কট-অচ্। (ককদিকভিঃ কটিভ্যোহচ্।
উণ্ ৪। ৮২।) ১ বাদ্যবিশেষ। ২ (কট্যতে আত্মিরতে
শক্ররনেন) বাণ। (কটম্বন্ত বাদ্যভিঃ বাণে। শকাঙ্কি।)

কটম্বর (স্ত্রী) কটং গুণাতিশয়ং বৃণোতি ধারয়তি, কট-
বৃ-অচ্-টাপ্। কটুকী। [কটুকী দেখ।]

কটন্তর (পুং) কটং গুণাতিশয়ং বিভর্তি, কট-ভৃ-অচ্, হুম্চ
(সংজ্ঞায়াং ভূত্ব বিভিধারি সহিতপিদমঃ। পা ৩। ২। ৪৬।)
১ শোণাবৃক্ষ। ২ কটভীবৃক্ষ।

কটন্তরা (স্ত্রী) কটন্তর-টাপ্। ১ রাজবালা। ২ প্রসারিণী,
গন্ধতাতুলে। ৩ কটুকী। ৪ হস্তিনী। ৫ কলম্বিক।
৬ গোলা। ৭ পুনর্বা। ৮ মূৰ্খা।

(কটন্তরা প্রসারিণ্যাং গোলায়াং গজঘোষতি।

কলম্বিকারো রোহিণ্যাং বর্ষাভূম্বর্যোরপি।

হেম অনে ৪। ২৪৬-৭)

কটরকটর (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটরমটর (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ছোলাভাজা
প্রভৃতি চর্কণকালে যে শব্দ হয়, তাহা এই নামে অভিহিত
হইয়া থাকে।

কটভ্রগ (পুং) কটঃ উৎকটঃ ব্রগো বৃক্ষকণ্ডুস্ত, বহব্রী।
ভীমসেন। [ভীমসেন দেখ।]

(কটভ্রগঃ পুমান্ ভীমে। শকাঙ্কি।)

কটশর্করা (স্ত্রী) কটঃ নলঃ শর্করেষ মিটরসযাৎ যত্নাঃ,
বহব্রী। গাড়েয়ীলতা, নাটাকরঞ্জা।

(কটশর্করাত্ত নাটাকরঞ্জকে জিয়াম্। শকাঙ্কি।)

কটা (স্ত্রী) কটকী। ২ (দেশজ) কক্ষ গোরবর্ণ, কটাসে।

কটাকু (পুং) কটতি কৃচ্ছ্রেণ জীবিকাং নির্জাহয়তি, কট-কাকু
(কটিকবিভ্যাং কাকুঃ। উণ্ ৩।৭৭।) পক্ষী।

কটাক (পুং) কটৌ অতিশয়িতৌ অক্ষিণী যজ্ঞ, কট-অক্ষি-
বচ্ (বহব্রীহৌ লক্ষ্যাক্ষোঃ স্বাভাৎ বচ্। পা ৫।৪।১১৩।)
কটং গন্তুং অক্ষতি ব্যাপ্রোতি, কট-অক্ষ-অচ্ বা। ১ অপাঙ্গ
দর্শন, আড়চোখে দেখা। ২ অপরের দোষদর্শন।

(“ইত্যলং উপজীব্যানাং মাত্তানং ব্যাখ্যানেন
কটাকনিক্ষেপেণ।” সাহিত্যদং।)

কটামি (পুং) কটেন তৃণাদিবেষ্টেনেন জাতোহমিঃ ৩-তৎ।
তৃণাদি বেষ্টেনের দ্বারা যে আমি উৎপন্ন করা হয়।

“উভাবপিতৃ তাবাব ব্রাক্ষ্যা গুপ্তা সহ।

বিপ্লুতৌ শূদ্রবন্ধুয়ো দন্ধুয়ো বা কটামিনা।”

মহু ৮।২৭৭।

কটাতঙ্ক (পুং) শিব।

কটাৎ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটায়ন (স্ত্রী) কটন্ত আসনবিশেষন্ত অয়নঃ উৎপত্তিস্থানং,
৬-তৎ। বেণামূল। (কটায়নন্ত বীরণে। শকাঙ্কি।)

কটার (পুং) কটং কল্পর্পমদং অক্ষতি, কট-ঋ-অণ্। ১ কামী।
২ লম্পট।

কটাল (ত্রি) কটোহস্তান্তি কট-লচ্-আত্ম (সিদ্ধাদিত্যম্।
পা ৫।২।২৭।) মন্ড গণ্ডযুক্ত।

কটাস (কটাক)। পঞ্জাবপ্রদেশের বিত্তস্তানদীতীরবর্তী একটি
ভীর্থস্থান। এইখানে সাতঘরামন্দির আছে। এই ভীর্থ
দর্শন করিতে বিস্তর লোক আগমন করিয়া থাকে। এই স্থানে
চীন পরিভ্রাজক হিউএন সিয়ং বর্ণিত ‘পুণ্যপ্রদর্শন’ ছিল।

কটাহ (পুং) কটং উত্তাপাদিকং আহতি নিবারয়তি, কট-
আ-হন্-ড। ১ কাছিমের খোলা। ২ ছৌপবিশেষ। ৩ পাক-
পাত্রবিশেষ, কড়া। ৪ ভাজনাখোলা। ৫ কটং শব্দে আহতি।
অন্নশুকযুক্ত মহিবিশাক। ৬ নরকবিশেষ। ৭ কর্কর।
৮ কুপ। ৯ দুর্ঘা। ১০ মাধার খুলি। ১১ কাছাড়।

কটাহক (স্ত্রী) কটাহ-বার্ধে কন্। কড়া।

কটি (পুং, স্ত্রী) কট্যাতে বজ্রাঘিনা হুত্রিরতেহসৌ, কট-ইন্।

শরীরের মধ্যদেশ, কোমর, কাঁকাল। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—
কট, শ্রোণিকলক, শ্রোণী, ককুম্বতী, শ্রোণিকল, কটী, শ্রোণি,
কলত্র, কটীর, কাঞ্চীপদ ও করত।

হুস্তত মতে কটিদেশে পাঁচখানি অস্থি আছে, তন্মধ্যে
গুহা, থোনি ও নিতম্বদেশে ৪ খানি এবং ত্রিক স্থানে ১ খানি,
অস্থিসংঘাতক ১, অস্থিসন্ধি ৩, এই সন্ধির নাম তুরসেবনী।
মায়ু ৬০, পেশী উভয় নিতম্বে ৫টি করিয়া ১০টি, কটিদেশস্থ
মর্ষ অস্থিমর্ষ ইহার নাম কটীক, তরুণ অস্থি পৃষ্ঠবংশ অর্থাৎ
মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে জনতি নিয়ে কুকুম্বর নামক দুইটি
মর্ষ আছে, তাহা হইতে কোনরূপে শোণিতপ্রাব হইলে স্পর্শ-
জ্ঞানশূন্য ও নিম্ন শরীরের চেষ্টা (গমনাগমন উত্থান প্রভৃতি)
বিনষ্ট হইয়া যায়। নিতম্বের উপরিভাগে পার্শ্বান্তরে প্রতিবন্ধ
নিতম্ব নামক মর্ষদ্বয়, তাহা হইতে শোণিত ক্ষয় হইলে অধঃ-
কারের শুষ্কতা ও দৌর্বল্য ঘটয়া মৃত্যু পর্যন্ত হইয়া থাকে।
কটিদেশের অভ্যন্তরস্থ মাংস ও রক্তবিশিষ্ট আশয়ের নাম
মূত্রাশয় বা বন্তি; অশ্বরীরোগ বাতীত অন্য কারণে তাহার
উভয় দিক্ বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ মৃত্যু হয়। এক পার্শ্বভেদ
করিলে মূত্রপ্রাবী ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাও কষ্টসাধ্য। কটি-
দেশে শিরা সংখ্যা ৮ বিটপস্থলে অর্থাৎ কুঁচিক ও কেশের
মধ্যস্থলে দুই দুইটি করিয়া ৪টি ও কটিকতরণে ৪টি। (হুস্তত
শারীর ৫।৬ অঃ।)

কটিকা (স্ত্রী) প্রশস্তা কটিরস্তাঃ, কটি-কন্-টাপ্। যে স্ত্রীর
কটিদেশ অতি সুলভ।

কটিকুপ (স্ত্রী) কটিদেশস্থং কুপম্, মধ্যপদলোঃ। নিতম্বস্থ
গর্ভঘর, ককুম্বর।

কটিতট (স্ত্রী) কটিরেষ তটং স্থানম্। কটিদেশ।

কটিত্র (স্ত্রী) কটিং ত্রায়তে, কট-ট্র-ক। ১ পরিদেয় বস্ত্র।
২ চন্দ্রহার। ৩ কটিবর্ষ। ৪ চক্রাঙ্গ। ৫ কোমরবন্ধ।

(“মুণালগোরং শিতিবাসং ক্ষুরং।

কিরীটেকেশ্বরকটিত্রকঙ্কণম্।” ভাগ ৬।১৬।৩০।)

কটিদেশ (স্ত্রী) কটিনামকং দেশং অবয়বম্, মধ্যপদলোঃ।
কোমর, কাঁকাল।

কটিন্ (ত্রি) কটোহস্তান্ত, কট-ইনি (বৃহৎকঠজিল ইত্যাদি।
পা ৪।২।৮০।) কটিযুক্ত। [কটি দেখ।]

কটিপ্রোধ (পুং) কট্যাঃ প্রোধঃ মাংসপিণ্ডঃ, ৬তৎ। কটি-
দেশস্থ মাংসপিণ্ড, নিতম্ব। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ক্ষিদ্,
পুলক, কটীপ্রোধ, কটি, প্রোধ ও পুণ।

কটিভূষণ (স্ত্রী) কটেভূষণম্, ৬তৎ। কটিদেশের অলঙ্কার,
চন্দ্রহার।

কটিমালিকা (ত্রী) কটৌ মালেন, কটিমাল-কন্ ইষম্।
চন্দ্রহার।

কটিরোহক (পুং) কটিং হস্তিপশ্চাত্তাগং রোহতি, কটি রূহ-
ধূল। হস্তির পশ্চাত্তাগ দিয়া যে হস্তিতে আরোহণ করে।

কটিম্ন (পুং) কটতি লভার্যং উৎপদ্যতে, কট-বাহুলকাৎ ল।
কারবেল, করেলা।

কটিম্নক (পুং) কটিম্ন-বার্ধে কন্। করেলা।

কটিবন্ধ (পুং) কটিবন্ধাতে যেন, কট-বন্ধ-অচ্। কোমবন্ধ,
যাহা দ্বারা কটিদেশ বন্ধন করিয়া রাখা যায়।

কটিশীর্ষক (পুং) কটিঃ শীর্ষমিব, কটিশীর্ষগংজ্জার্যং কন্।
কটিদেশ। (স্ত্রাং কটিশীর্ষকঃ ক্ষিচি। শকাঙ্কি।)

কটিশূল (পুং) কটিঃ শূলঃ শূলরোগঃ, কর্ণধা°। কটিদেশস্থ
শূলরোগ, কক্ষ ও বায়ুজন্য কটিদেশে শূল উৎপন্ন হয়।
গরুড় পুরাণের মতে—ইহার ঔষধ, একভাগ কুড় ও দুইভাগ
হরীতকী উজ্জলনের সহিত সেবন করিলে কটিশূল নিবারণ
হয়। [শূল দেখ।]

কটিশূলা (ত্রী) কট্যাঃ শূলা, ৬-তৎ। কটিদেশে ধার-
ণের উপযুক্ত ক্ষুদ্র শূল।

কটিসূত্র (ত্রী) কট্যাং ধার্য্যং সূত্রম্, মধ্যপদলো°। ১ চন্দ্রহার।
২ ঘৃনসি। স্থিতিশাস্ত্রের মতে কেবল কার্পাস সূত্র ধারণ
নিষিদ্ধ।

কটী [ন] (ত্রি) কটঃ গণ্ডস্থলং প্রাশস্ত্যোনাভাতীতি কটঅন্ত্যর্থে
ইনি (বৃজন্ কঠজিলসেনি ইত্যাদি। পা ৪।২।৮০) হতী।

কটী (ত্রী) কটি-ঊষ্ (যিসৌরাদিত্যস্ত। পা ৪।১।৪১।
১ পিপ্লমী। ২ প্রোণিশেষ।

কটীতল (পুং) কট্যাং তলমাস্পদমস্ত। অস্ত্র কটি দেশধারণ-
প্রসিদ্ধে; কটীতল ইতিথ্যাত্তিঃ। বক্রখড়্গা, তলবার।

কটীর (পুং) কট্যাতে আত্রিগতেহসৌ, কট্যাতেগম্যতেহনেন ইতি
কর্ণনি করণে বা কট ইরন্ (কৃশ্পৃকটিপটি শোটিভ্যইরন্।
উণ ৪।৩০) ১ কন্দর। ২ জঘনদেশ। ৩ নিতম্ব। ৪
কটি। (ত্রী) কট্যাতে আত্রিগতে ইনং বাসসা ইতি কর্ণনি
কট-ইরন্। কটি।

কটীরক (পুং) কটীর-বার্ধে সংজ্জার্যং বা, কন্। ১ জঘন।
২ কন্দর, গিরিগম্বর। (পুং, ত্রী) কটি।

কটু (ত্রী) কটতি সদাচারমাব্রণোত্তীতি। কট-উণ্। ১
অসৎকার্য। ২ ভূষণ।

কটু (পুং) কটতি ভীকৃতরা রননাং মুখং বা আব্রণতি বধা
কটতি বর্ষতি চক্ষুঃখনাসিকাদিত্যো জনং ব্রাবণতীতি। কটু-
উণ্ (অপচ (১৮) উনানিস্বজেকার্যৎ) কটিবটিত্যাৎ চ। ঝাল।

বাতটমতে কটুরসের লক্ষণ—জিহ্বা চিচ্ চিচ্ করিয়া
অত্যন্ত উদ্বেজিত হইয়া উঠে, মুখ হইতে লালারাব হয়,
এবং গণ্ডঘর ও মুখমধ্যে অতিশয় নাহ করে। চরকের মতে
ইহার গুণ—মুখশোধক, অগ্নির উদ্বীপক, তৃক্ক বস্তুর পরি-
শোধক, নাসিকা ও চক্ষুঃস্রাবকারক, ইজিরসকল প্রোহন-
জনক; অলসক, শোথ, উদর্জ, অতিবান্ধ মেহ, খেদ, ক্লেশ ও
মলনাশক; অন্নের ক্ষতিকারক; কণ্ডু, ত্রণ ও ক্রিমিবিনাশক,
ঘনীভূত রক্ত ভিন্নকারক। ইহাতে স্রোতঃসকল আবৃত এবং
স্রোতার উপশম করে।

কটুরস অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে, তৃক্কহানি,
মানি, অবসাদ, ক্লশতা, মূর্ছা, প্রাপ্তি, কঠোর, শারীরিক
ভাগ, বলকীর্ণ, তৃকা, এবং বায়ু ও অগ্নির বাহ্যতা অস্ত্র ভ্রম,
মদ, বেদনা, কাম্প, স্ত্রীবেধবৎ পীড়া, ভেদ ও বাহ্যপার্শ্বে
অস্ত্রাভ্য বায়ুজন্ম বিকার উপস্থিত হয়। ২ টাণাগাছ। ৩
চীনেকপূর। ৪ পটোল। ৫ কটীলতা। (ত্রী) ৬ কটুকী।
৭ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৮ রাইগর্ষণ। (ত্রি) ৯ তিক্ত। ১০ কষার।
১১ বিরস। ১২ পরজীকাতর। ১৩ অশ্রির। ১৪ ভীক।
১৫ উক। ১৬ সুরভি। ১৭ হর্গন্ধ। ১৮ কুংসিত। ১৯
কটুরসবিশিষ্ট। ২০ (ত্রী) অকার্য।

কটুক (ত্রী) কটুনাং কটুরসানাং জয়ং, কটু-সংজ্জার্যং কন্। ১
ত্রিকটু; শুট, পিপুল ও মরিচ। ২ (কটু-বার্ধে কন্) (ত্রি)
অশ্রির। (“হৃদ্যোদনশ্চ কর্ণশ্চ কটুকান্যভ্যভাতাম্।”

ভারত অমৃত ৭৭।১৬।)

(পুং) ৩ কটুরস। ৪ পটোল। ৫ জগন্ধি তৃণ। ৬
কুটজবৃক্ষ। ৭ আকন্দবৃক্ষ। ৮ রাজসর্ষপ। ৯ নাট।

কটুকত্রয় (ত্রী) কটুকানাং কটুরসানাং জয়ম্, ৬-তৎ।
ত্রিকটু; শুট, পিপুল ও মরিচ।

কটুকহ (ত্রী) কটুকস্ত ভাবঃ, কটুক-ব (ভক্ত ভাববৃত্তলো।
পা ৫।১।১১৯।) কটুতা।

কটুকন্দ (পুং) কটুঃ কন্দোমূলমস্ত। ১ সজিনাগাছ। ২ আম।
৩ লতুন। (কটুকন্দঃ পুনান্ শিঞৌ শৃঙ্গবের রসোনরোঃ।

মেদিনী।)

কটুকফল (ত্রী) কটুকং ফলমস্ত, বহুব্রী। ককোল।

কটুকভক্ষী [ন] (পুং) গোত্রপ্রবরবিশেষ।

কটুকরঞ্জ (পুং) নাট। করঞ্জ।

কটুকরোহিণী (ত্রী) কটুকা সতী রোহতি, কটুক-রহ-গিনি।
কটুকী।

কটুকবস্ত্রী (ত্রী) কটুকাচানৌ বস্ত্রীচেতি, কর্ণধা। কটুকী।

কটুকা (ত্রী) কটু-সংজ্জার্যং কন্-টাণ্। ১ কটুকী, ইহার

সংস্কৃত পর্যায়—অন্ননী, তিক্তা, রোহিণী, তিক্তরোহিণী, চক্রাকী, মৎস্তপিত্তা, বহুলা, শকুলাধনী, সাদনী, শতপর্ণা, বিজালা, মলভেমিনী, অশোকরোহিণী, কৃষ্ণা, কৃষ্ণভেমী, মহোদধী, কটী, অন্ননী, কাণ্ডকহা, কটু, কটুরোহিণী, কটুকরোহিণী, কেশরকটুকা, অরিষ্ঠা, পামরী, কটুঘরা, কটুঘরা ও অশোকা। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—অতি কটু, তিক্ত, শীতল, পিত্ত, রক্ত, দাহ, কফ, অকচি, শ্বাস ও জ্বরনাশক। ২ ভাণ্ডলী। ৩ কুলিক বৃক্ষ। ৪ রাইসরিষা। ৫ তিতলাউ।

কটুকাদ্যলৌহ (ক্ৰী) শোথাদিকারের বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধ কটকী, ত্রিকটু, দম্বীমূল, বিড়ল, ত্রিকলা, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহের সহিত মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

কটুকীগ্রাম। চম্পারথোর অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মণ্ড ৪২।৮২)

কটুকাটব্য (ক্ৰী) কটুচ তৎ কাটব্যক্ষেতি, কৰ্ম্মধা। ১ অত্যন্ত কর্কশ বাক্য। ২ গালাগালি।

কটুকালাবু (পুং) কটুকশাসৌ অলাবুক্ষেতি, কৰ্ম্মধা। তিক্ত অলাবু, তিতলাউ।

কটুকী (ক্ৰী) কটু-বার্ধে কন-ভীষ্। কটকী।

কটুকীট (পুং) কটুকীক্ৰঃ দংশনেন হঃপ্রদঃ কীটঃ, কৰ্ম্মধা। মশক, মশা। (কটুকীটম মশকে। শব্দাক্রি।)

কটুকীটক (পুং) কটুকীট-বার্ধে কন। মশক।

কটুকণ (পুং) কটুঃ কর্কশঃ কণঃ শকো বস্ত্র, বহুব্রী। টিষ্টিত পক্ষী।

(টিষ্টিতকটুকণ উপাদ শব্দশাস্ত্রঃ। ছেম ৪।৩৯৬।)

কটুগ্রন্থি (ক্ৰী) কটুতীব্রো গ্রন্থিমূলমজ, বহুব্রী। ১ পিপলী মূল। ২ গুটী।

কটুজ্ঞতা (ক্ৰী) কটুদ্বিত্তং করোতি, কটু-ক-ড লুম্ (পূবো-দরাদিষাৎ)। তত্ত ভাবঃ, কটুজ-তল্-টাপ্। নিত্যকর্ম ও আচারে নিষ্ঠুরতা।

(নিত্যকর্ম সমাচারে নিষ্ঠুরত্ব কটুজ্ঞতা। হারা।)

কটুচাকুর্জাতক (ক্ৰী) চকুর্জাতক-বার্ধে লণ্। কটু চ তৎ চাকুর্জাতকক্ষেতি, কৰ্ম্মধা। এলাইচ, দাকচিদি, জেজ-পত্র ও মরিচ এই চারিটি বস্ত্তবোধক।

কটুজ্ঞান (পুং) কটুজ্ঞানঃ পদমজ, বহুব্রী। উপর বৃক্ষ। (কটুজ্ঞান উপরে। শব্দাক্রি।)

কটুতা (ক্ৰী) কটু-তল্-টাপ্। ১ উজ্জতা। ২ স্বীকৃতা। ৩ অগ্রয়তা। ৪ কর্কশতা।

কটুভিজ্ঞক (পুং) কটুশাসৌ তিক্তক্ষেতি, কটুভিজ্ঞ অসার্ষে-কন। ১ শোণগাহ। ২ চিত্রাভা।

কটুভিজ্ঞ (ক্ৰী) বিপাকে কটুঃ যাদে তিক্তা। তিতলাউ।

কটুভিত্তিকা (ক্ৰী) কটুভিজ্ঞ-বার্ধে কন-টাপ্, অত ইষম্। তিতলাউ।

কটুভূগুকা (ক্ৰী) কটুভিজ্ঞ-বার্ধে কন-টাপ্, অত ইষম্। তিতলাউ।

কটুভূগু (ক্ৰী) কটু ভীষ্মং ভূগুনতাঃ, কটুভূগু-বার্ধে কন, অত ইষম্। লভাবিশেষ, তিক্তবিশিষ্ট। কটুতরাই। ইহার সংস্কৃত পর্যায় তিক্তভূগু, তিক্তাধা, কটুকা।

রাজনির্ধকের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত; কফ বমন বিষ অরোচক রক্ত ও পিত্তনাশক, শ্রোতঃশোধক এবং বিরেচক।

কটুভূম্বী (ক্ৰী) কটুশাসৌ ভূম্বীচেতি, কৰ্ম্মধা। তিক্ত অলাবু, তিতলাউ। ইহার সংস্কৃতপর্যায়,—ইন্ধাকু, কটুকালাবু, নৃপায়ক, কটুভিত্তিকা, কটুকলা, ভূম্বিনী, কটুভূম্বিনী, বৃহৎ-কলা, রাজপুত্রী, তিক্তবীজা ও ভূম্বিকা।

রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, বমনকারক, শ্বাস, বায়ু, কাস, শোথ, ব্রণ, শূলবিষ, পাণ্ডু, ক্রমি ও কফনাশক, শোধক এবং লঘুপাকী। [অলাবু দেখ।]

কটুতৈল (ক্ৰী) কটুতীক্ষ্ণং তৈলং কৰ্ম্মধা। সরিষার তৈল। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—অগ্নিগ্নীপক, কটুরস ও পাকে কটু, লঘু, শরীরের ক্রপাতারক, লেখন, উষ্ণস্পর্শ ও উষ্ণ-বীৰ্য, তীক্ষ্ণ, রক্তপিত্তহৃষিতকর; কফ, মেদ, বায়ু, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শিথ্র (ধবল) কোষ্ঠ ও মুঠব্রণ নাশক। রাইসরিষা বা শ্বেতসরিষার তৈলও এইরূপ গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ তাহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উপশম হয়।

সর্বপতৈলের দ্বারাও আয়ুর্বেদ মতে অনেক রোগনাশক তৈল প্রস্তুত হয়, সেই সকল তৈল প্রস্তুতের পূর্বে তৈলে মূর্ছাপাক দিতে হয়।

* কটুতৈলের মূর্ছাপাক এইরূপ—দুধ কড়ার করিয়া তৈল বৃহ বৃহ আল দিতে হয়, কেন্দ্রস্থ হইলে উজ্জ্বল বা চুলী হইতে নামাইয়া মজিষ্ঠা, আমলা, হরিজা, মুখা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বর, কক্করীয়া, নালুকা ও কহড়া ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক বস্তুই শিলে পেষণ করিয়া জলে গুলিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিতে হয়। ৮ চারিসের তৈলের উপযুক্ত

অব্য পরিবাণ,—মস্তিষ্ক। ২ পল, অন্যান্য অব্য প্রত্যেক ২ তোলা, জল ৬ সের।

কটুজ্বর (ক্ৰী) কটুনঃ কটুরসানঃ জ্বরঃ ৬তৎ। ত্রিকটু; শুট, পিপুল ও মরিচ। বাতটে লিখিত আছে,—ত্রিকটু হুলতা, অগ্নিমান্য, খাস, কাস, শ্লীপদ ও পীনস রোগ নষ্ট করে।

কটুদলা (ক্ৰী) কটুদলং পত্রং যত্নঃ, বহত্রী। কর্কটী, কাঁকড়।

কটুনিম্পাব (পুং) কটুশাসৌ নিম্পাবশ্চেতি, কর্ণধা। নবী-
ভীরে উৎপন্ন নিম্পাব ধান্যবিশেষ।

কটুপত্র (পুং) কটুঃ ভীত্রং পত্রং যত্নঃ, বহত্রী। পপটি,
কেংপাপড়া।

কটুপত্রিকা (ক্ৰী) কটুপত্রং যত্নঃ, কটুপত্র-কণ্-টাণ্-অ-
ইষ্ম্। কটেকারীষ্ম্। [কটেকারী দেখ।]

কটুপাক (জি) কটুঃ পাকোহত্। ১ যে সকল অব্য পাক
কালে কটু হয়। ২ যে সকল অব্য পরিপাক হইলে কটু হয়,
তেজ, বায়ু ও আকাশ গুণবহুলঅব্য কটুপাক হইয়া থাকে।
কটুপাক অব্য বায়ুবদ্ধক। (ভাবপ্রকাশ।)

কটুপাকী [ন] (জি) কটুঃ পাকোহত্যত্ কটুপাক-ইনি।
কটুপাকযুক্ত অব্য।

কটুকল (পুং) কটুকলমত্, বহত্রী। পটোল। [পটোল দেখ।]

কটুকলা (ক্ৰী) কটুকলমত্নঃ, বহত্রী। জীবনৌষ্ম্।

কটুভঙ্গ (পুং) কটুঃ একৈকদেশে ভঙ্গশ্চ যত্নঃ। শুষ্ঠী।

কটুভদ্র (ক্ৰী) কটু অতি ভদ্রং হিতজনকম্। ১ শুষ্ঠী।
২ আর্জক, আদা।

কটুভাবী [ন] (জি) কটুঃ কর্ণং ভাবতে কটু-ভাব-গিনি।
যে কটুব্যাক্য বলে।

কটুমঞ্জরিকা (ক্ৰী) কটুভীক্সা মঞ্জরী অতি অত্নঃ, কটুমঞ্জরী-
অচ্-ভীষ্-সংজ্ঞায় কন্, পূর্নহ্রস্বক। অপামার্গ, অপাং।
[অপামার্গ দেখ।]

কটুমোদ (ক্ৰী) কটুরেব মোদঃ পক্ষোহত্, বহত্রী। অরাদি
নাশক অগ্নিকি অব্যবিশেষ।

কটুস্তরা (ক্ৰী) কটুষ্ বিকর্ষিত্তি, কটু-ভৃ-খ্-ম্-টাণ্। ১
কটকী। ২ গন্ধতাহুল।

কটুর (ক্ৰী) কটুতি বর্ষতি বহনেন গুণাতরং রূপাতরং বা,
কট-উরন্। তজ্জ, ঘোষ। [তজ্জ দেখ।]

কটুরব (পুং) কটুঃ কর্ণশৌ রবো ধ্বনির্যত্নঃ, বহত্রী। তেজ,
বাত্।

কটুরোহিণী (ক্ৰী) কটুশাসৌ রোহিণী চেতি কর্ণধা।
কটুঃ নভীরোহতি কটু-কহ-গিনি-ভীপ্ বা। কটকী।

কটুলিঙ্গ। গৌড়ভাতির শাখাবিশেষ। ইহাদের আভার
ব্যবহার হিন্দুর ভায়।

কটুবর্ণ (পুং) কটুরসবিশিষ্ট অব্যাসমূহ। সূক্ষ্মে এই সকল
অব্য কটুবর্ণের মধ্যে লিখিত আছে, যথা—পিপুল, পিপুলমূল,
চই, চিতা, আদা, মরিচ, গজপিপলী, করেণুকা, এলা,
যবানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, মহানিষকল, হিঙ্গ,
বায়নহাটি, মধুরস, আতইচ, বচ, বিভ্রক, কটকী; জ্বরসা,
শ্বেতজ্বরসা, কণিজবক, অর্জক প্রভৃতি তুলসী সকল, গন্ধকুণ,
জগন্ধক, হুম্ব, কালমার, কাসমর্দ, কবক, খরপুশ, কটকল,
জ্বরসী, নিসিন্দা, কুলাহক, ইন্দুরকানী, পুরাতন আমলকী,
কাকমাটী, বিবমুটি, সজিনা, মধুপিপা নামক অজবিধ
সজিনা, মূলা, লণ্ডন, মোরি, কুড়, দেবদাড়, বগুজকল,
গুগুণ্ডল, মুখা, লাকলকী, শুকনাশা, পীসু প্রভৃতি অব্যাসকল।
ধূনা প্রভৃতি কতিপয় অব্যও এই গণের অন্তর্ভুক্ত।

কটুবর্তীকী (ক্ৰী) কটুশাসৌ বর্তীকী চেতি, কর্ণধা।
শ্বেত কটেকারী।

কটুবিপাক (জি) কটুঃ কটুরসো বিপাকে যত্নঃ, বহত্রী।
কটুপাক অব্য।

কটুবীজা (ক্ৰী) কটুবীজং ফলং যত্নঃ, বহত্রী। পিঙ্গলী,
পিপুল।

কটুশৃঙ্গাল (ক্ৰী) কটুনঃ শৃঙ্গার প্রাধান্ভায় অলতি পর্য্য-
প্নোতি, কটু-শৃঙ্গ-অল্-অচ্। গৌরঅবর্ণ শাকবিশেষ।

কটুস্নেহ (পুং) কটুভীক্সঃ স্নেহো যত্নঃ, বহত্রী। ১ সর্ষপ।
২ শ্বেতসর্ষপ, রাইসরিবা। ৩ (কর্ণধা) কটুটেল, সরিষার
তৈল।

কটুকট (ক্ৰী) কটুষ্ উৎকটম্, ৭তৎ। আদা।

কটুকটক (ক্ৰী) কটুকট-সংজ্ঞায় কন্। শুট।

কটোনক (ক্ৰী) কটায় প্রোভার দেয়মূলকং। প্রোভের
উদ্দেশে যে ভরণ করা হয়।

কটোর (ক্ৰী) কট্যতে বুধ্যতে নিবিচ্যতে বা তক্ষ্যত্রং যজ,
কট-ওলচ্, লত্ রত্ম্। পাত্রবিশেষ, বাটী, কটোরা।

কটোরক (ক্ৰী) কটোর-বার্ধে কন্। বাটী।

কটোরা (ক্ৰী) কটোর-টাণ্। বাটী। যুক্তিকানির্দিষ্ট বাটীর ভায়
কুজপাত্রকেই বালালার 'কটোরা' বা 'কটুরা' বলা হয়। কিন্তু
হিন্দুহানীগণ বাটী মাজকেই কটোরা বা কটুরী বলিয়া থাকে।

কটোল (পুং) কটুতি আবুণোতি সদাচারং অভয়ং বা,
কট-উলচ্ (কপিগড়িগড়িকটপট্য ওলচ্। উণ্ ১। ৬৭।)
১ কটুরস। ২ (জি) কটুরসযুক্ত অব্য। ৩ কটোল।

(কটোলঃ কটুঃ কটোনশাভাঃ। উজ্জলত্।)

কটোলবীণা (ত্রী) কটোলস্ত চণ্ডালস্ত বীণাব্যবিশেষঃ, ৬তম্। চণ্ডালদিগের বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম কেন্দুড়া।

(কটোলবীণা কেন্দুড়াহ্ময়বস্ত্রকে। শব্দাঙ্কি।)

কটুকট (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ যাতনাবিশেষ।

কটুকটানি (দেশজ) যাতনাবিশেষ।

কটুকটে (দেশজ) ১ শুক, নীরস। ২ যে সকল বালকবালিকা বয়সের অল্পবয়স্ক কথা বলে। ৩ যে সকল লজ্জ ‘কটুকট’ শব্দ করে, যেমন কটুকটে ব্যাঙ প্রভৃতি। ৪ ঢালাক। ৫ ৬জগন্নাথ-দেবের প্রসাদবিশেষ।

কটুকিনা (দেশজ) ১ কঠিনতা। ২ একবৎসরের লজ্জা লম্বী ইজারা দেওয়া নাম।

কটুকিনাদার (পারস্য) যে ব্যক্তি একবৎসরের জন্য লম্বী ইজারা লয়।

কটুকেনা (দেশজ) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কঠিন নিয়মে পালন করা। “তুলিয়া সে মাটি, দিবে ছড়াঝিটি, রাধিকার এটি কটুকেনা।” রাস্তা।

কটুকী (দেশজ) কটুকীশব্দের অপভ্রংশ, ঔষধবিশেষ।

কটুকল (পুং) কটতি কটুতরা অন্যরসং আব্রুপোতি, কটুকিপ্। কটুকলং বস্ত্র, বহত্রী। বৃক্ষবিশেষ, কায়কল। ইহার সংস্কৃতপরিচয়,—শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, কুন্তী, কৈটর্য্য, সোমবক, সোমবৃক্ষ, রোহিণী, কৃষ্ণগর্ভ, প্রচেতসী, ভদ্রাবতী, মহাকুন্তী, রামসেনক, কুম্ভা, উগ্রগন্ধ, ভদ্রা, রজনক, লঘুকাম্বর্য্য, শ্রীপর্ণী, কাকল, পরুষকুম্ভী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাশ, কঠরোগ ও অরুচি নাশক।

কটুকলা (ত্রী) কটুকল মস্তাঃ, বহত্রী। ১ গান্ধারী গাছ। ২ বৃহতী। ৩ কাকমাটি। ৪ দেবদালী। ৫ বার্তাকী। ৬ মুগের্শ্বর।

কটুকলাদি [বৃহৎ] (পুং) বৈদ্যকোক্ত পাচনবিশেষ। কটুকল, মুখা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেপাপড়া, কাকড়াশুনি, ইজবব, ধনে, শঠী, ভল্লরাজ, পিপুল, কটুকী, হরীতকী, বালা, চিরাতা, বামনহাটী, হিজ্জ, বেড়েলা, শোনা-ছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গণিরারিছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী, গোজুর ও পিপুলমূল, সমুদায় ২ তোলা, ৩২ তোলা জলের সহিত জাল দিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে হাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ আদার রস ও হিজ্জ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সারিপাতিক জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শ্বস্রতল, গলরোগ, কণ্ঠমূলের শোথ, হৃৎগত

রোগ, মুখরোগ, বাতশ্লেষ্মিক জ্বর, কাশ, শিরোরোগ, মস্তকের ভার ও বাতশ্লেষ্মা জন্য বধিরতা নষ্ট হয়।

কটুক (পুং) কটু অল্পমস্ত, বহত্রী। ১ শোনাগাছ। ২ (কটু উগ্রং বীৰ্য্যব্যাঞ্জকং অল্পং কলেবরমস্ত) দিলীপ নামক সূর্য্য-বংশীয় রাজবিশেষ।

(কটুকস্ত দিলীপকে। সূর্য্যবংশরাজভেদে শ্রোতাকে। শব্দাঙ্কি।) [খট্টাক দেখ।]

কটুর (ত্রী) কটতি বর্ষতি রসান্তরং, কটু-বরচ্ (হিষর হৃষর ধীবর পীবর মীবর চীবর ভীবর নীবর গহ্বর কটুরসংবহরাঃ। উপ্. ৩। ১।) ১ দধির সারবিশিষ্ট ষোল। ২ ব্যঞ্জন। (কটুরং ব্যঞ্জনম্। উজ্জল।)

কটুরতৈল (ত্রী) বৈদ্যকোক্ত অরোগের তৈলবিশেষ। ইহা বর ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ।

বর কটুর তৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কটুর ৪৪ সের ও সচললবণ, শুট, কুড়, মূর্জামূল, লাঙ্গা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা সমুদারে /১ সের, কঙ্কের সহিত পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে শীত ও দাহ বৃদ্ধ জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহৎ কটুর তৈল,—তিলতৈল /৪ সের, শুট /৪ সের, কাকি /৪ সের, দধিমাংস /৪ সের, তক্ত /৪ সের, গোড়ালেবুর রস /৪ সের। কঙ্কার্থ পিগলী, চিতামূল, বচ, বাসকছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুখা, পিপুলমূল, এলাইচ, আতাইচ, রেণুক, শুট, পিপুল, মরিচ, যমানী, ত্রাফা, কটকারী, চিরেতা, বেলছাল, রক্ত-চন্দন, বামনহাটী, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপাণী, মূর্জামূল, জীরা, সর্ষপ, হিজ্জ, কটুকী ও বিড়ক, সমুদারে /১ সের। যথারীতি পাক করিয়া মর্দন করিলে বিবিধ বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

কটুর (পুং) অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

(কটুরো না শস্ত্রভেদে। শব্দাঙ্কি।)

কটুরী (ত্রী) কটুতে কটুরস্তরা বাদ্যতে অমুভূযতে বা, কটু-উন্-ভীপ্। ১ কটুকী। ২ কটুরসমূহ।

কঠ (পুং) কঠেন প্রোক্তমবীভে, কঠশাখামভিজানান্তি বা, কঠ-গির্নে লুক্ (কঠচরকাম্লক্। পা ৪। ৩। ১০৭।) মুনিবিশেষ।

ইনি বেদের কঠশাখার প্রবর্তক। মহাভাষ্য মতে ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য। ইহার প্রবর্তিত শাখা ‘কঠক’ নামে প্রসিদ্ধ। এখন এই শাখার বেদসংহিতা লোপ হইয়া গিয়াছে। কঠক শাখাধারীগণও ‘কঠ’ নামে অভিহিত। ইহীদের সহিত সামের কলাপ ও কোথুমশাখীদের সংগ্রহ ছিল। সামারবেণ্ড কঠকালাপগণ একত্র উক্ত হইয়াছেন—

“পঞ্চকান্তিঃ সৰ্ব্বাভিগ্ৰহাঃ দশশতেন চ।

যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ ॥”

অথোধ্যা ৩২। ১৮।

হরদত্তের মতে, কঠশাখার ৪ বহুচাণি আছে।

“বহুচাণাব্যাপ্তি কঠশাখা।”

[সিদ্ধান্তকৌমুদী বৈদিক প্রক্রিয়া ৭। ৪। ৩৮ স্বত্র দেখ।]

- ১ মুনিবিশেষ। ২ কঠশাখাদারী। ৩ ঋক্বিশেষ। ৪ অর-
বিশেষ। ৫ ব্রাহ্মণ। ৬ দেবতা। ৭ উপনিষদ্বিশেষ।
[“ঐশকেন কঠপ্রমুখমাত্মক্যতিত্তিরি।” মুক্তিকোপনিষৎ]
৮ হুঃখ। ৯ কঠ।

কঠকোপনিষদ (জী) তর্কাদিপূর্ণ উপনিষদ্বিশেষ।

কঠমর্দ (পুং) কঠং কঠজীবনং মুদ্রাতি, কঠ-মৃদ-অণ্। শিব।

(কঠমর্দো মহাদেবে। শব্দাঙ্কি।)

কঠর (জি) কঠ-অরন্। কঠিন।

(কঠরঃ কঠিনে জিহু। শব্দাঙ্কি।)

কঠবল্লী (জী) অথর্ববেদান্তর্গত উপনিষদ্বিশেষ।

কঠশাখা (জী) কঠেন প্রোক্তা শাখা, মধ্যপদলো।

যজুর্বেদান্তর্গত কঠপ্রণীত শাখাবিশেষ।

কঠশাঠ (পুং) ঋগ্বিশেষ।

কঠপ্রোক্তীয় (পুং) কঠপ্রতিং বেত্তি অধীতে বা, কঠপ্রতি-
ব্যঞ্। ১ কঠপ্রতিজ্ঞ। ২ যে কঠপ্রতি অধ্যয়ন করে।

কঠাকু (পুং) পক্ষিবিশেষ, কাঠঠোকা।

কঠাহক (পুং) কঠং কঠিনং আহতি, কঠ-আ-হন্-ড, কঠাহঃ
তাদৃশং কং শিরো যন্ত। দাতুহ পক্ষী, ডাকপাখী।

কঠিকা (জী) কঠ-বাহুলকাৎ বুনু। খড়ী।

কঠিঞ্জর (পুং) কঠিং কঠিনং অরতি, কঠ-জ-পিচ্-থচ্-মুচ্।

কঠি-জ-অণ্ বা (পুর্বোদরাদিহাৎ)। তুলসীবৃক্ষ; ইহার সংস্কৃত-
পর্যায়—পর্ণাশ, কুঠেরক, লোণিকা, জাতুকা, পর্ণিকা, পত্নর
জীবক, স্নবর্জনা, কুরবক, কুতলিকা, কুরণ্টিকা, তুলসী,
সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গোৱী,
ভুতরী ও দেবহুদ্ভি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—কটু
ও তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, দাহকারী, পিত্তকারক, অমিদীপক,
এবং কুষ্ঠ, মূত্রকৃদ্ধ, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল, কফ ও বায়ুনাশক।
ওষধ ও ঝড়ভেদে তুলসী দুই প্রকার, উভয়ই তুল্য গুণবিশিষ্ট।

[তুলসী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কঠিন (জি) কঠ-ইনচ্ (বহুলমতজ্ঞাপি। উণ্ ২। ৪৯।)

১ দৃঢ়, শক্ত। ইহার সংস্কৃতপর্যায়,—কঠর, কক্খট, ক্রুর,
কঠোর, নিষ্ঠুর, দৃঢ়, অঠর, মূর্তিমৎ, মূর্ত, কক্খট, কঠোল,
অঠ, কঠর, কঠর ও কঠামিত। ২ নিষ্ঠুর। ৩ দুর্বোধ,

যে সকল বিষয় সহজে বুঝা যায় না। ৪ ভীক। ৫ দুঃসহ, বাহা
সহজে সহ করা যায় না।

(“নিভান্তকঠিনাং কক্খং মম ন বেদ সা মানসীন্।”

বিক্রমোর্কশী।)

৫ ভক্ত। ৬ (ক্লীং) পাতবিশেষ, স্থালী, হাড়ী।

(কঠিনমপিনিষ্ঠুরে ভ্যাং শুক্লেংপি জিহু নপুংসকং সংহাণ্যাম্।

মেদিনী।)

কঠিনচিত্ত (জি) কঠিনং চিত্তং যন্ত, বহুব্রী। নির্দর।

কঠিনতা (জী) কঠিনত্ব ভাবঃ, কঠিন-তল্-টাণ্। ১ দৃঢ়তা।

২ নিষ্ঠুরতা। ৩ ভীকতা। ৪ দুঃসহতা। ৫ দুর্বোধতা।

৬ ভয়ানকতা।

কঠিনপৃষ্ঠ (পুং) কঠিনং পৃষ্ঠমন্ত, বহুব্রী। কক্খপ, কাহিম।

কঠিনপৃষ্ঠক (পুং) কঠিন-পৃষ্ঠ-বার্ধে সংজ্ঞারাবা কন্। কক্খপ।

কঠিনা (জী) কঠিন-টাণ্। ১ শর্করা। ২ মিছরি, শুড়ের
সার, শুড়ের নিয়মেপে যে শক্ত দানা দানা জমিয়া থাকে।

(কঠিনী তু খটিকা ভ্যাং কঠিনা গুড়শর্করী।

হেমং অনেং ৩। ৩৬২)

কঠিনিকা (জী) কঠিন-ভীর্ বার্ধে কন্-টাণ্-ব্রহ্মচ। ১ কঠিনী,
খড়ী। ২ স্থালী, হাড়ী।

(কঠিনিকা চ কঠিনী স্থাণ্যাক খটিকাহু চ। শব্দাঙ্কি।)

কঠিনীভূত (জি) অকঠিনং কঠিনং ভূতম্, হি। যে সকল
দ্রব্য বস্ত শক্ত হইয়া যায়।

কঠিনী (জী) কঠিন-ভীর্ (বিদ্যগোৱাদিত্যচ। পা ৪। ১।
৪১।) খটিকা, খড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—পাকতলা,
অমিলা ধাতু, কক্খট, খটী, খড়ী, বর্ণলেখিকা, ধাতুপল ও
কঠিনিকা।

(“গুণিগণগণনারঞ্জে ন পতিতি কঠিনী সজ্জমাদ্ যন্ত।

তেনাষা যদি স্ততিনী বদ বক্ষ্যা কীল্লী ভবতি ॥” হিতোপদেশ।)

[খড়ী দেখ।]

কঠিনাদিপেয়া (জী) বৈদ্যকোক্ত পেয়বিশেষ। ফুলখড়ী ৮

তোলা, মিছরি ৪ তোলা, গদ ৪ তোলা, মোরী ২ তোলা,
দাক্তিচিনি ২ তোলা, একত্র জেবং কুটরা কোন মৃৎপাত্রে ১
সের জলের সহিত রাখে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রোক্তে হাঁকিয়া
কিছুকণ স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে, উপরের অংশ নির্মল
হইবে। সেই স্বচ্ছ অলপানে গ্রহণী, আশাশর ও রক্তপিত্তের
উপশম হয়। পুরোক্ত দ্রব্যসমূহের সহিত লবঙ্গ ২ তোলা ও
ধনে ২ তোলা মিশ্রিত করিলে অরুপিত্তের; এবং ঐ সমস্ত
দ্রব্যের সহিত কেবল বেগুনট ২ তোলা যোগ করিলে
রক্তপিত্তের উপকার হইয়া থাকে।

কঠিন (পুং) কঠতি ভোজনে দুঃখ উপবেগ বা জনরতি, কঠ বাহুল্যং ইম। কারবেল, করেলা।

কঠিনক (পুং) কঠিন-স্বার্থে কন্। ১ করেলা। ২ পুনর্বা। ৩ জুলগী।

(কঠিন: পুংসি চ কঠিনক: ভাং কারবেলকে। শব্দাকি।)

কঠী (স্ত্রী) কঠ-ভীষ। ১ কঠশাখাধারী পত্নী। ২ ব্রাহ্মণী।

কঠের (পুং) কঠতি কৃষ্ণেণ জীবতি, কঠ-এরক্ (পতিকঠি-কুটিগডিঙডিমশিত্য এরক্। উণ। ১। ৫৯।)

কঠে যে জীবিকা নির্বাহ করে, দরিদ্র।

কঠেরণি (পুং) ঋষিবেশে।

কঠেরু (পুং) কঠ-এক্। চামরের বাতাস। (কঠেকমহরৌ পুংসি। শব্দাকি।)

কঠোর (ত্রি) কঠতি পার্থক্য মাচরতি, কঠ-ওরন্ (কঠিকিত্যা-মোরন্। উণ। ১। ৬৫।) ১ কঠিন। ২ পূর্ণ। (কঠোর: কঠিন: পূর্ণশ্চ। উজ্জলদত্ত।)

(“কঠোরতারূপিলাঞ্ছনছবি:।” মাঘ ১। ২০।)

৩ জরঠ। ৪ কঠিন নিয়ম। ৫ দারুণ। ৬ হৃদবোদ্ধা। ৭

নিষ্ঠুর। ৮ ক্রুরকর্ম। ১০ ভয়ানককর্ম।

কঠোরগিরি। শৈলবেশে। অরুণাচল ও ত্রিচনপত্রীর মধ্য-বর্তী। এই শৈলের উপর শিবমন্দির আছে। এখানে নানা স্থান হইতে বাজীগণ দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন।

কঠোল (ত্রি) কঠ-ওলচ্। ১ কঠোর। ২ কঠিন।

কড় (ত্রি) কড়তি মাণ্ডতি, কড়-পটাদ্যহ্। ১ মূর্খ। ২ পাগল। ৩ ভ্রম্যন্তব্য। (দেশজ) ৪ শঙ্খনির্মিত জ্বীলোকের করতুবণ বিশেষ। (বিবাহকালে অনেক বালিকা শঙ্খ পরিতে অসমর্থ হয়, এজন্য তাহাদিগকে একএকগাছি শঙ্খের ‘কড়’ পরান হয়।) ৫ গালা নির্মিত বালা। ৬ মন্ত্র ধরিবার স্ত্রবিশেষ।

কড়ক (স্ত্রী) কড়তে অদ্যতে, কড়-অচ্-সংজ্ঞায় কন্। করকচ লবণ। ইহার সংস্কৃতপরিচয়—সামুদ্র, জিকুট, অকীব, বশির, সামুদ্রক, সাগরজ, ও উদধিশম্ভব। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর, বিপাক, দীর্ঘ তিক্ত ও মধুর রসযুক্ত, গুরু, অতিশয় উষ্ণ বা শীতল নহে, অম্লিপীক, তেদক, কার্যকর, অবিদাহী, কফকারক, বায়ুনাশক, তীক্ষ্ণ ও অরুণ।

কড়কচ (স্ত্রী) সামুদ্রলবণ। (কড়কং ভাং কড়কচ সামুদ্র-লবণে বরম্। শব্দাকি।) এই লবণ সাদা ও কাল হই প্রকার হইয়া থাকে, বীরভূম জেলায় সাদা করকচ ভিন্ন কাল পাওয়া যায় না। কাল করকচ অপেক্ষা সাদা করকচ কিছু শক্ত বলিয়া বোধ হয়। করকচ সৈন্ধবলবণের স্যায়

বিশুদ্ধ, এজন্য দ্রুতিশীঘ্রে বিধবাবিগের সৈন্ধব ও সামুদ্র উভয় লবণ ভোজনের বিধান আছে।

কড়কন (দেশজ) ১ কত্থান শুক হইয়া যাওয়া। ২ অক্লান্ত হওয়া গজর। ৩ ভয় দেখাইয়া শাসন।

কড়কড় (দেশজ) ১ শুক। ২ ঝরঝরে। ৩ মেঘের শব্দ।

কড়ঙ্গ (পুং) কড়ং মাদকতাপক্তিং গমরতি জনরতি কড়-গম-ড। ১ মদ্যবিশেষ। ২ দেশবিশেষ। (কড়ঙ্গো বা জুরা-তেদে দেশভেদেহপি কীর্তিত:। শব্দাকি।)

কড়ঙ্গর (পুং) কড়ং ভ্রম্যন্তব্য শব্দাদে: সকাশাং ত্রিয়তে কিপ্যতে কড়-গৃ-থচ্। কড়ং ভ্রম্যন্তব্য শব্দাদিকং গিরতি আশ্রয়: সকাশাং কড়-গৃ-অচ্ বা। ১ আগড়া। (বৃষ কড়ঙ্গর:। হেম ৪। ২৪৮।) ২ জুব। ৩ যুগ প্রভৃতির কলন্য গাছ বা খোবা।

কড়ঙ্গরীয় (ত্রি) কড়ঙ্গরং বৃষং অর্থতি কড়ঙ্গর-বন্। জুব বা আগড়া ভ্রম্যন্তব্য, গুরু প্রভৃতি পশু।

(“নীবারপাকাহি কড়ঙ্গরীয়ে রামুত্তে জানপদৈনকচিৎ।” রঘু ৬। ২।)

কড়ত্রে (স্ত্রী) গড়াতে সিচ্যতে জলাদিকম্, গড়-অজন্ গকারন্ত ককার: (গেড়েরাদেশ্চ কং। উণ। ৬। ১০৬। গড় ধাতুর উত্তর অজন্ প্রত্যয় হয়, এবং আদিত্বিত গকারের স্থানে ককার হয়।) পাত্রবিশেষ।

কড়ম্ব (পুং) কড়-অথচ্ (কৃকদিকডি কটিভ্যোহথচ্। উণ। ৪। ৮২। কৃ কন্ কড়্ কট ধাতুর উত্তর অথচ্ প্রত্যয় হয়।) ১ শাকের ডাটা। ইহার অপর নাম কলম্ব। ২ অগ্রভাগ। (কড়ম্বোহগ্রভাগ:। উজ্জলদত্ত।) ৩ কোণ। ৪ অকুর। ৫ হুড়ি। ৬ কদম্ব। ৭ বাণ। ৮ (দেশজ) বংশরকক শিত।

কড়ম্বক (পুং) কড়ম্ব-স্বার্থে-কন্। শাকের ডাটা।

(নাকড়ম্বকড়ম্বকৌ শাকনাত্যাম্। শব্দাকি।)

[কড়ম্ব দেখ।]

কড়ম্বী (স্ত্রী) কড়ম্বো জুরগা বিদ্যতে হস্তাং, কড়ম্ব-অচ্ (কড়ম্ব-আদিত্যো হচ্। পা। ৫। ২। ১২৭।)-ভীষ। কলম্বীশাক।

[কলম্বী দেখ।]

কড়রা (দেশজ) ১ কর্কশ, খড়খড়। ২ শক্ত। ৩ হৃৎ।

কড়বক (পুং) অপভ্রংশ নিবন্ধের অধার, বিরামস্থচক সর্গ। (অপভ্রংশ নিবন্ধো হসিন্ সর্গা: কড়বিকতিধা: সাহিত্যাদং।)

কড়া (দেশজ, কটাহশব্দের অপভ্রংশ) ১ লৌহ নির্মিত পাক-পাত্র, কটাহ। ২ বাঁটা, কোন বস্তুর বারবার ঘর্ষণ লাগিয়া যে দাগ হয়, বা সেই স্থান শক্ত হয়। ৩ খাত্ত নির্মিত বস্তুর ৪ কপর্দক, কড়ি। ৫ তীক্ষ্ণ, উগ্র। ৬ দেশবিশেষ।

কড়াই (দেশজ) ১ কটাই। ২ কনার।

কড়াকড়া (দেশজ) ১ শক শক। ২ অতিশয় উগ্র।

কড়াং (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কড়ার (পুং) গড় সেচনে আরনু, কড়াদেশচ (গড়ে: কড়ুচ। উল্ ৩। ১৩৫।) ১ পিজলবর্ণ। ২ দাঁস। ৩ দানমান-বিধি। (কড়ার: পিজলে দাঁসে দানমানবিধাবশি। শব্দাঙ্কি।)

৪ (ত্রি) পিজলবর্ণযুক্ত। (দেশজ) ৫ কালনিরূপণ।

৬ অঙ্গীকার। ৭ কতাদি স্থানের প্রলেপবিশেষ।

কড়ালিঙ্গী (পুং) উগানকসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসী শ্রেণীতে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন—ইহারা “কড়ালিঙ্গী” নামে পরিচিত। ইহারা সর্বদা উলঙ্গ থাকেন ও আপনাদিগের জিতেন্দ্রিয়তা রক্ষার জন্য সর্বদা লিঙ্গের উপর একটা সোহ কড়া দিয়া রাখেন। নানকপন্থীদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে।

কড়ি (দেশজ) ১ কপর্দক। ২ আড়া। ৩ গৃহাদির ছাদ রক্ষার্থে বৃহৎ বৃক্ষ কাঠ ব্যবহৃত হয়।

কড়িকা (স্ত্রী) কলিকা, কুঁড়ী।

কড়িকান (দেশজ) ওকান, শুক হওয়া।

কড়িকুর্ক (দেশজ) কুপণ।

কড়িভুল (পুং) কট্যাং তুলা তোলনঃ গ্রহণঃ বস্ত্র, (পুর্বো-দরাদিভাৎ উত্ত ডঃ।) খড়্গা, তরবারি। (কড়িভুলন্ত খড়্গাকে। শব্দাঙ্কি।)

কড়িয়াল (দেশজ) ধনী, অর্থবান্।

কড়িয়ালী (স্ত্রী) লাগাম, অশ্বের মুখরজ্জু।

কড়ুয়া (দেশজ) কটু, ঝাল।

কড়ুলী (স্ত্রী) অজবিশেষ, কুড়ুল।

কড়ে (দেশজ) ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র। ৩ অল্পলিম্পর্ষদ্বারা স্নর্গ-স্থিতি দেওয়া।

কড়েরাঁড় (দেশজ) বালবিধবা।

কড়্‌কড়্‌ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। যেমন কড়্‌কড়্‌ করিয়া আকাশ ডাকা।

কড়্‌কি (দেশজ) বৃকবিশেষ। (Rottboellia Perforata)

কড়্‌খা (দেশজ) ভতিপাঠকেরা যে সকল গান করিয়া রাজাদিগকে শুভ করে।

কড়্‌চা (পারস্য) যে খাতার প্রান্ত্যক ব্যক্তির উল্লু বাকী প্রভৃতির হিসাব পৃথক পৃথক কর্ণে লিখিত হয়।

কড়মড় (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ, কঠিন ভ্রবোর চর্যক শব্দ।

কণ (পুং) কণতি অতি সূক্ষ্মঃ গচ্ছতি, কণপতাকাচ্।

১ অতিসূক্ষ্ম। ২ সূক্ষ্ম অতিঅসূক্ষ্ম। ৩ চাউল প্রভৃতির ক্ষুদ্র অংশ।

(“কণান্ বাতকরেনকং পিণ্যাকং বা সত্বশি।” বহু ১২।৩২।)

কণগুণ্ডলু (পুং) কণশাস্ত্রী গুণ্ডলুচ্ছতি, কণ্ধবা। গুণ্ড-গুণ্ডবিশেষ, মহিষাখ্যা গুণ্ডগুণ্ড। ইহার সংস্কৃতপরিচয়—গজ-রাজ, বর্ণকর্ণ, জুবর্ণ, কনক, বংশপীত, জ্বরতি ও গুলফব। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, জ্বগতি; বায়ু, শূল, শুষ্ক, উদরাধান ও কফনাশক, এবং রসায়ন।

কণজীর (পুং) কণশাস্ত্রী জীরচ্ছতি, নিত্য কণ্ধবা। যেত-জীরক, সাদাজীর।

কণজীরক (স্ত্রী) কণং ক্ষুদ্র জীরকম্, কণজীর-বার্ধে কন্। ক্ষুদ্রজীর। ইহার সংস্কৃতপরিচয়—স্বাণগজি ও হুগজ। তাব-প্রকাশের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিশীপক, লঘু, ধারক, পিত্তবর্জক, মেধাজনক, গর্ভাশ্রয়শোধক, অন্ন-নাশক, পাচক, বলকারক, গুক্রবর্জক, রক্তিকারক, কফনাশক, চক্ষুর হিতজনক, এবং বায়ু, উদরাধান, শুষ্ক, বমি ও অতি-সারনাশক। [জীরক দেখ।]

কণপ (পুং) কণ-পা-ক। অস্ত্রবিশেষ, বর্ষবা।

(“অন্নঃ কণপচক্রাশ্চুৎপুদ্যতবাহবঃ।” ভারত আদি।)

[কণপ দেখ।]

কণ্‌ফট্‌, (কণ্‌ফট্‌) (হিন্দী, পুং) কণ্‌=কর্ণ, কট্‌ বা ছিত্র।

শৈব-উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণতঃ দুইটা শ্রেণী দেখা যায়,—সন্ন্যাসী ও যোগী। যোগীরা যোগাবলম্বন করিয়া সাধনার পথবিশেষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই যোগীশ্রেণী আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। “কণ্‌ফট্‌” এরূপ একটা শ্রেণীর নাম। ইহারা উভয়কর্মে ছিত্র করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাদিগকে “কণ্‌ফট্‌-যোগী” বলে। কেবল যে কণ্‌ফট্‌ যোগীদিগকেই কর্মে ছিত্র করিতে হয় তাহা নহে, সকল শ্রেণীর যোগীরাই কর্মে ছিত্র করিয়া থাকেন। অল্প শ্রেণী হইতে ইহাদের আরও একটু বিশেষ্য আছে,—কণ্‌ফটেরা ঐ ছিত্রবরে এক একটি কুণ্ডল ধারণ করেন। এই কুণ্ডলগুলি প্রান্তর, বেলোরার বা গুণ্ডারের শূদ্রে নির্মিত হয়। নীকার সময় এই কুণ্ডল প্রাথম ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলকে যোগীরা মুদ্রা বলেন, ইহার আরও একটি নাম দর্শন, এইজন্য কণ্‌ফট্‌ যোগীরা “দর্শন-যোগী” নামেও গণ্য হন। এই কুণ্ডল তির ইহারা ২১০ অঙ্গুলিপ্রমাণ একটি ব্রহ্মবর্ণ পদার্থ পশরের দ্বারা গাথিয়া পলার পরিধান করিয়া থাকেন। ঐ ব্রহ্মবর্ণ পদার্থটিকে “নার” ও পশরের দ্বারাটিকে “সেলি” বলিয়া থাকে। নার, সেলি ও বর্ণক-বিনীত যোগী দেখিলে সন্দেশেই

তাহাকে কণ্ঠ-বোণী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। এতদিন ইহারা গেরমা বস্ত্র পরিধান, জটাধারণ, তসলেপন ও বিহুতির ত্রিগুণ ধারণ করিয়া থাকেন।

ওক গোরকনাথ ইহাদের সন্তানপ্রদর্শক। ইহারা গোরকনাথকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। গোরকনাথই হঠযোগের প্রচারকর্তা। কণ্ঠ-বোণীরাও এইজন্য আধিগুরু প্রচারিত পথ অবলম্বন করিয়া বোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসীদের দ্বারা কণ্ঠ-বোণীরাও নামা ওক শীকার করিয়া থাকেন। এই সকল ওকরা আবার নিজের অতি-প্রাণ মত কেহ কেহ শিবকে মন্তক মুগুন করিতে, কেহ বা শিবকে কর্ণে মুক্তা ধারণ করিতে, কেহ বা শিবকে জ্যোৎস্নারূপে প্রদীপ্ত হইতে আদেশ দিয়া থাকেন। [জ্যোৎস্না-মার্গ দেখ]

ভারতবর্ষের পশ্চিমফলে এই প্রাচীর বোণী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই শিবপূজার কাল বাপন করেন, কোন না কোর শিবমন্দির ইহাদের আশ্রয়। কোথাও কোথাও বা ইহারা অনেক একত্রে থাকিয়া তিকা বার্তা জীবন নির্ভাষ করিয়া থাকেন, আর কেহ কেহ বা তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া জীবনাতিপাত করেন।

কণ্ঠ-বোণীগণের মধ্যে অধিকাংশ বোণীই উন্নত। কেহ কেহ বা বিষয়কার্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের উপাধি নাথ।

ওক গোরকনাথের নামানুসারে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে অনেকগুলি স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এইসকল স্থান কণ্ঠ-বোণীদের তীর্থভূমি। পেসবারে গোরকক্ষেত্র নামে একটি স্থান আছে। দারকার নিকটেও আর একটি “গোরকক্ষেত্র” নামক স্থান আছে। হরিদ্বারের নিকটে একটি স্থল আছে। এই “স্থল” ও দারকার “গোরকক্ষেত্র” কণ্ঠ-বোণীদের পতি প্রদেয় তীর্থ। মেগালয়ের পশ্চিমপাশ, বেবারের একলিঙ্গ প্রভৃতি বিখ্যাত শিবমন্দিরগুলি ইহাদের সন্তানপ্রদর্শক। কলিকাতার নিকটে রম্ভদ্বার “গোরক-বাঙ্গালী” নামক একটি স্থান আছে, যেখানে তিনটি বহু-মূর্তি এবং শিব, কালী ও হরদ্বার প্রভৃতি দেবতার মূর্তি আছে। এখানকার পূজকেরা মূর্তি তটিকে দস্তায়ে, গোরকনাথ ও মন্তেকনাথ বলিয়া পরিচয় দেন। জিবেশীর ৩৫ কোশ দক্ষিণে মহানাদ নামক গ্রামে জটেশ্বর নামক একই শিব-মন্দির আছে। এই মন্দিরও কণ্ঠ-বোণী সন্তানদের

অধিকৃত। জটেশ্বরের মন্দিরের নিকট বশিষ্ঠগঙ্গা নামে একটি ললাপার জাহে, বোণীরা ও তীর্থযাত্রীরা এই ললাপারকে প্রকৃত গঙ্গার ভার মান্য করিয়া থাকেন। এই মন্দিরে একটি বোণী বাস করেন, তাহার বিবরাদি বর্ণে, জমীদারীও আছে; ইহাকে লোক বোণীরাজ বলিয়া থাকে। এই বোণী-রাজবংশ বহুকাল হইতে প্রচলিত। ইহারা দারপরিগ্রহ করেন না, বোণীরাজের মুক্তা হইলে তাহার শিবগণের মধ্যে একজন মন্দির ও বিবরাদির উত্তরাধিকারী হন। জটেশ্বর শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে,— কোন সময়ে মহানাদ গ্রামে একটি দক্ষিণাবর্ত শম্ম পতিত ছিল, বায়ু লাগিয়া তাহা হইতে “মহানাদ” অর্থাৎ মহাশব্দ উদ্ভূত হয়। দেবতার সেই শব্দ চমকিত হইয়া সেইখানে উপনীত হইয়া জটেশ্বরের-লিঙ্গ ও বশিষ্ঠ গঙ্গা প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চের মহানাদ হইতে গ্রামের নামও মহানাদ হইয়াছে।

কণ্ঠ-বোণীদের মধ্যে চৌরশিখর সিদ্ধবোণীর নাম বিশেষ বিখ্যাত। হঠযোগপ্রদীপিকার হঠযোগের মাহাত্ম্য-বর্ণন স্থলে নিরলিখিত করেজনের নাম উল্লিখিত আছে। যথা—আদিনাথ, মন্তেকনাথ, দারদানন্দ, ভৈরব, চৌরদি, যৌন, গোরক, বিরূপাক্ষ, বিলেশ্বর, মল্লন ভৈরব, সিদ্ধবোধ, কহড়ী, কোরগুণ, হিরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চপটী, কর্ণে পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, মিরজন, কাপালি, বিলুনাথ, কাণ্ডী-শ্রমর, অক্ষর, প্রভুদেব, বোড়াচুলী, টিকিনী, ভরটী, নাগ-বোধ ও খণ্ডকাপালিক—ইহারা মহাসিদ্ধ।

উত্তরপশ্চিমের গোরকপুর ইহাদের প্রধান স্থান। পূর্বে এখানে ইহাদের একটি মন্দির ছিল, আজাদীন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই স্থানেই মসজিদ নির্মাণ করাইয়া দেন। কিছুকাল পরে ঐ মসজিদের নিকট আর একটি মন্দির নির্মিত হয়, কিন্তু তাহাও অরাজক ভাঙ্গিয়া দিয়া তথা মুসলমান-দিগের ভজনালয় নির্মাণ করেন। তাহার পর বৃন্দাবন নামে একজন বোণী আবার একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া উহার দক্ষিণে পশুপতিনাথ নামক শিবলিঙ্গ এবং হরদ্বারের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই মন্দির ৩ট এখনও আছে।

কণ্ঠ-বোণীরা বলেন—এখনও অনেকগুলি সিদ্ধবোণী পৃথিবীতে বর্তমান আছেন এবং আজও নামাছানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

নামছানের একলিঙ্গের গোবান্দীরাও এই কণ্ঠ-প্রাচীর অন্তর্গত। ইহারা দার-পরিগ্রহ করেন না বটে, কিন্তু বাখি-জাতি করিয়া থাকেন। ইহাদের অধীনস্থ মন্ত পত বোণী কলিকাতা হইতে দলবদ্ধ হইয়া মুক্তাধি করেন।

কণত (পুং) কণ ইব জাতি, কণ-তা-ক। অধিগ্রহণতি কীট-
বিশেষ। ইহা নলন করিলে বিশপ, শোণ, মূল, অর, বসি
ও শরীরের অবসরতা হয়। (ভাবপ্রকাশ)।

কণতক (পুং) কণান্ তকরতি, কণ-তক-অণ্। কণানবুনি।

কণতকক (পুং) কণান্ তকরতি, কণ-তক-কণ্। পক্ষি-
বিশেষ, ভারিট পক্ষী।

কণতুক [ক্] (পুং) কণান্ তুতে, কণ-তুক-কিপ্।
কণানবুনি।

কণলাভি (পুং) কণানাং লাভো বহ্নাৎ, বহ্নী। ১ পেষণ
করিবার বস্তুবিশেষ, জাঁতা। ২ (কণলাভ: সানুস্তেন অভ্যতি,
কণলাভ-অর্নভাদিবাৎ অহ্।) আবর্ত, জলের ঘূর্ণী।
(অধাবর্ত: কণলাভে। শকাঙ্কি।)

কণশ: [স্] (অব্য) কণ-বীপসার্ধে শস্। অগ্নে অগ্নে।

কণা (স্ত্রী) কণ-টাণ্। ১ জীরা। ২ কুস্তীরমক্ষিকা, কুমীরে
পোকা। ৩ পিপুল। (কণাজীরক কুস্তীরমক্ষিকা পিললীমূচ।
মেদিনী।) ৪ বেতজীরা। ৫ অন্ন।

(“কলীকলমহাং কণামাত্রমপকম্।” তিথ্যাহিতত্ব।)

কণাটিন (পুং) কণার অটতি, কণ-অট-ইনন্, দীর্ঘষক
(পূর্বোদরাধিবাৎ।) খজনপক্ষী। [খজন দেখ।]

কণাটীর (পুং) কণার অটতি, কণ-অট-ইরন্। খজনপক্ষী।

কণাটীরক (পুং) কণাটীর-স্বার্থে কন্। খজন পক্ষী।

(কণাটীন: কণাটীর: কণাটীরক ইত্যপি খজনে ভাৎ।

শকাঙ্কি।)

কণাদ (পুং) কণ: অতি তকরতি, কণ-অ-অণ্। ১ সুনি-
বিশেষ। ইনিই বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা; ইহার অস্ত্র নাম
উল্কা, কণতক, কণতুক ও কাণ্ডপ।

মহর্ষি কণাদ ‘বিশেষ’ নামে এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার
করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তৎকৃত দর্শনশাস্ত্রকে বৈশেষিক দর্শন
বলে।

‘কণাদের মতে ছয়টি ভাব পদার্থ আর একটি অভাব
পদার্থ, সমুদায়ে সাতটি।

ভাবপদার্থ এই ছয়টি—১ দ্রব্য, ২ গুণ, ৩ কর্ম, ৪ সামান্য,
৫ বিশেষ, ৬ সম্ভাব।

দ্রব্য প্রথম পদার্থ—ইহা নয় প্রকার। বধা—

“পৃথিব্যাপত্তে কোবা হুয়াক্ষাপং কালোদিগাঙ্গা মন ইতি দ্রব্যানি।”

বৈশেষ ২।১।৫।

কিতি, জল, ভেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও
মন এইগুলি দ্রব্য পদার্থ।

বাহ্যতে গন্ধ আছে, তাহার নাম কিতি। বহিঃ জলে

আবদা গন্ধ অহুতব করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতে সেই গন্ধ
জলের মত, পৃথিবী হইতে জলে এই গন্ধ সংক্রান্ত হইয়া
জলে গন্ধ অহুত হয়। বেগব নুতন কোন বস্তুপাত্রে জল
রাখিয়া কিছুকাল পরে সেই জল পান করিলে সেই জলে
নুতন পাত্রের গন্ধ অহুতব করিয়া থাকি। জুতরাং মুকিতে
হইবে যে আশ্রয়ের গন্ধই জলে অহুত হয়।

বাহ্যতে কেবলমাত্র তরুণ আছে কিবা বাতাবিক
দ্রব্য আছে, তাহাকে জল বলে। তরু গীত প্রকৃতি মানা-
বিশ্রুপ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় বলিয়া এবং বতাবিক দ্রব্য না
থাকিতে পৃথিবীকে জল বলা হইতে পারে না। বাহার
বাতাবিক উষ্ণতা আছে, তাহাকে ভেজ বলে। যে স্পর্শ
কোনরূপ পাক দ্বারা উৎপন্ন হইয়াই অথবা অহুত ও অস্বীতল,
সেই স্পর্শ বাহ্যতে আছে তাহাকে বায়ু বলে। বাহ্যতে শব্দ
উৎপন্ন হয়, তাহাকে আকাশ বলে। কেহ কেহ বলিয়া
থাকেন যে, বায়ুতেই শব্দ উৎপন্ন হয়, জুতরাং আকাশ
স্বীকার করার কোন মুক্তি নাই, এই সম্বন্ধে দ্বন্দ্বীকরণার্থ
সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বিখ্যাত ভ্রমপকামন লিখিয়াছেন—

“মতস্যুৎসবৎসু হুতশব্দজেনেণ ব্যারোকারণ গুণপূর্বক:

শব্দ উৎপাদ্যতাসিদ্ধিবাচ্যঃ অব্যবহৃত্যভ্যবহিষেণ
ব্যারোবিশেষগুণত্বাতাৎ।” সিদ্ধা, দু।

প্রথমতঃ বায়ুর অবস্থাবে হুত শব্দ উৎপন্ন হয়। পরে সেই
শব্দ হইতে হুত বায়ুতে হুত শব্দ উৎপন্ন হয়; এইরূপ বলা
হইতে পারে না যে বেহু আশ্রয়মাণ, বাহার নামের কারণ
নয়, তাহা বায়ুর বিশেষগুণ হইতে পারে না। আশ্রয় বিদ্য-
মান থাকিলেও যখন শব্দের বিনাশ অহুত হয়, তখন আশ্র-
য়নামকে শব্দনামের কারণ বলা কোন মতেই সম্ভব হইতে
পারে না। একমাত্র শব্দই আকাশ সিদ্ধির হেতু। এই সম্বন্ধে
লিখিত আছে—

“পরিষেবাইলেকমাকাশত।” ২ অ ১ আ ২৭ ২।

অন্ত অষ্টবিধ দ্রব্যে শব্দ থাকে অনন্তব বলিয়া শব্দই এক-
মাত্র আকাশের সিদ্ধ (অল্পপাকহেতু)

জ্যোত্ব ও কনিষ্ঠাদি জ্ঞানের কারণ যে পদার্থ তাহাকে
কাল বলে।

দ্রব্য ও নিকটস্থাদি জ্ঞানের কারণ পদার্থকে দিক্ বলে।

কতিজান প্রকৃতি বাহ্যতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে আত্মা
বলিয়া থাকে।

যে পদার্থ থাকতে আত্মা জ্ঞান ও জ্ঞান প্রকৃতি অহুতব
করি এবং বিজ্ঞাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহাকে মন বলে।

গুণ—গুণপদার্থ ২৪টি বধা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, লব্ধা,

পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিরোধ, পরস্ব, অপস্ব, বৃদ্ধি, হ্রাস, হ্রঃ, ইচ্ছা, বেধ, প্রবহ, শব্দ, শুদ্ধ, অশব্দ, জেহ, সংস্কার, পাণ ও ধর্ম। (বৈশে হু ১।১।৩)

কর্ম—পাঁচ প্রকার; উৎকোপণ, অবকোপণ, আকুকন, প্রসারণ, গমন। (বৈশে হু ১।১।৭।)

সামান্য—দুই প্রকার; সাধারণ ধর্ম বা আভিবেশ, যে পদার্থ থাকার পরমাণুগণের ভেদ সাধিত হয়, তাহাকে বিশেষ বলে। (বৈশে হু ১।২।৩।)

সমবার—নিত্য সঞ্চকে সমবার বলে। (বৈশে হু ৭। ২।২।) যেমন প্রবাহের সহিত তাহার পরমাণুর সঞ্চ, ঘটের সহিত মৃত্তিকার সঞ্চ ইত্যাদি।

অভাব—চারিপ্রকার; আগভাব, স্বসাতাব, অন্যান্য-ভাব, ও অনাত্যভাব। [অভাব দেখ।]

কণাদ বলেন, অন্ধকার কোন বস্তু পদার্থ নয়, ভেজের অভাবকেই অন্ধকার বলা যায়।

কণাদের মতে, প্রমাণ দুইপ্রকার প্রত্যক্ষ ও অনুমান, উপমান ও অনুমানের অন্তর্ভুক্ত।

মহর্ষি কণাদই সর্বপ্রথমে পরমাণুবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন, একমাত্র পরমাণু সংস্করণ নিত্য পদার্থ, তাহার আর কারণ নাই।

“সদকারণব্রিহত্যম্।” বৈশে হু ৪।১।১।

আমরা যে বাবতীর জড়পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, সমুদায় পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়।

তাহার মতে অদৃষ্ট কারণ বিশেষ দ্বারা পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হইয়া এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে।

কণাদ জড়পদার্থের মূলতত্ত্ব আপন সূত্রে মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহার কারণ কি? বৈশেষিক উপকারে স্পষ্টই লিখিত আছে—

“দৃষ্টে কারণে সত্যদৃষ্টকরনানবকাশাৎ।”

যে হেতু দৃষ্টকারণসঙ্গে অদৃষ্টকারণ করনার আবশ্যক নাই।

বাস্তবিক মহর্ষি কণাদ বাহ্য আপনার চতুর্দিকে দেখিতেন, তাহারই জানাছলিলেন প্রকৃত হইরাছিলেন।

যে পরমাণু, বা জড়তত্ত্ব কণাদ আপনসূত্রে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজকাল ভারতবর্ষে তাহার বিশেষ চর্চা বা আলোচনা থাকিলেও যুরোপীয় দার্শনিকেরা সমাদর করিয়া থাকেন। খ্রিস্টাব্দ ৪০০ পূর্বে গ্রীকদেশে ডেমক্ৰিটস্ পরমাণুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে এপিকিউরাস্ এই

মত বিশেষ প্রচার করেন, তাহার সিদ্ধান্ত গ্রিক কণাদের মত, তাহার মত লুক্রেসিয়া প্রকাশ করিয়া বান। লুক্রেসিয়া তৎকৃত কাব্যদর্শনে লিখিয়াছেন—

“Nunc age, quo motu genitalia materiai
Corpora res varias gignant, genitasque resolvant.
Et qua vi facere id conantur, quaeve sit ollis
Reddita mobilitas magnum per inane meandi
Expediam.” II. 61-64.

পরমাণু হইতে অগতের উৎপত্তি তাহা লুক্রেসিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক লুক্রেসিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে কণাদের মতের সঙ্গে অনেকটা একত্ব দেখা যায়।

এখন কথা এই, পরমাণুবাদ সর্বপ্রথমে কে প্রচার করিলেন, মহর্ষি কণাদ না থ্রেসের ডেমক্ৰিটস্?

কণাদ কোন সময়ের লোক, তাহা জানিবার উপায় নাই। আমাদের দেশীয় প্রবাদ ধরিলে তিনি ৫৬ হাজার বর্ষের লোক হইয়া পড়েন। তবে ভগবদ্গীতার বৈশেষিকের মত গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং গীতার রচনা হইবার পূর্বে মহর্ষি কণাদ বিদ্যমান ছিলেন। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ডেমক্ৰিটসের অনেক পূর্বে কণাদের জন্ম। অতএব বোধ হইতেছে মহর্ষি কণাদই সর্বপ্রথমে পরমাণুবাদ প্রচার করেন। ডেমক্ৰিটসের জীবনী পাঠে জানা যায় তিনি, সম্রাটসীসের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি সম্রাটসীর মুখে কণাদের মত জানিয়া আপন গ্রন্থে কতক বৈশেষিক মত লিখিয়া বান।

কণাদ যে অল্পরোপণ করিয়া বান, ভারতে তাহার স্ফুল ফলিল না। সুদূর যুরোপ খণ্ডে ডেলটন সাহেব তাহার পুন-কন্ডার করিলেন, এখন যুরোপে পরমাণুবাদ সর্ববাদিসম্মত। [পরমাণু শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

অনেকে বলিয়া থাকেন, কণাদ জৈবের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন না; কারণ কণাদ সূত্রের কোনখানে জৈবের নামোল্লেখ নাই। যখন অগতের কারণ নির্ধারণ করা দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন যদি জৈবকে বিস্কারণ বলিয়া

* “Thus the Great World's eternally renewed;
Thus endless atoms are with power endued,
Successive generations to supply;
Some creatures flourishing, while others die.
Like racers, each revolving age, we find,
Retires, and leaves the lamp of life behind.
If you suppose that seeds at rest convey,
Motion to bodies, wide from truth you stay
Through the Vast Void as these primordials rove,
By foreign force, or gravity they move.”

কণাদের বিধাৎ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি ভবিষ্যৎ স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতেন।

তবে কি কণাদ মান্তিক ছিলেন অথবা ঈশ্বরের অতিশয় সখ্যে তাঁহার সন্দেহ ছিল? না, তাহা হইতে পারে না। তিনি বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

“তদ্বচনাদায়ত্ব প্রামাণ্যম্।” বৈশে পৃঃ ১।২।৩।

যিনি আত্মকর্মে সম্পন্নকেই মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যিনি স্বর্গ ও অপস্বর্গপ্রদ ধর্মতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য আপন সূত্র প্রণয়ন করেন। * পরমতত্ত্ববিৎ মাধবাচার্য্য যে কণাদের কোন অংশে প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—

“বিশেষ্য পাকজ্যোৎপত্তৌ বিভাগেব বিভাগজে।

যন্ত ন অলিতং বুদ্ধিতং বৈ বৈশেষিকং বিদুঃ ॥”

সর্বদর্শনসংগ্রহ।

বিজ্যোৎপত্তি, পাক দ্বারা রূপাদির উৎপত্তি, ও বিভাগজ বিভাগের উৎপত্তিতে বাহার বুদ্ধি বিচলিত হয় না, তাহাকে বৈশেষিক জানিবে।—সেই কণাদগণি যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। শঙ্করমিশ্র কণাদসূত্রের (১।১।৩) ব্যাখ্যাকালে স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

“ভতিতাত্মকাস্তমপি প্রসিদ্ধিসিদ্ধতয়েচ্ছরং পরামৃশতি।”

তৎশব্দের অর্থ ঈশ্বর ইহা প্রসিদ্ধ, অতএব পূর্বে সূচনা না থাকিলেও এখানে উহা ঈশ্বরবাচক বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। ঈশ্বরশব্দের উল্লেখ না করিলেও, কণাদ গোপভাবে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। [ঈশ্বরশব্দ ২২২ পৃঃ দেখ।]

২ স্বর্গকার।

কণারক। উড়িয়ার অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। ইহার প্রকৃত নাম কোণার্ক বা কোণারক, কিন্তু অপভ্রংশ করিয়া কেহ কেহ কণারক উচ্চারণ করিয়া থাকেন। [কোণারক শব্দে বিবৃত বিবরণ দেখ।]

কণি (দেশজ) নখের কোণে যে একরূপ রোগ জন্মে, ইহার সংস্কৃত নাম চিগ্ন ও কুনখ। [কুনখ দেখ।]

কণিক (পুং) কণৈব, কণ-স্বার্থে কন্, অত ইতন্। ১ কণা। ২ শব্দ। ৩ আরতির নিয়মবিশেষ। ৪ গোপমূর্গ, ময়দা। ৫ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিবিশেষ।

“কণিকং মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং ধৃতরাষ্ট্রোহত্রবীৰ্য্যচঃ ॥”

ভারত সপ্তমঃ ১৪১ অঃ।

কণিকা (স্ত্রী) কণা: সন্তাতা:, কণ-ঠন (অতইনি ঠনৌ। পা

৫।২।১১৫।) ১ অত্যন্ত সুস্বাদু। ২ অমিষ, গণিকারিক। বৃক। ৩ কণা। ৪ তত্প্রবিশেষ। ৫ জলাদির স্ফাংশ।

(“বাসুধাণ্য বজ্রলকণিকা শীতলেনাসিলেন।” মেঘ।)

(কণিকাত্যক্ত হুয়েচ গণিকারীং লবেহি চ। শব্দার্থ।)

কণিত (স্ত্রী) কণ আর্জনাৎ-ভাব-জ। পীড়িতের বাতনা-সূচক শব্দ। (পীড়িতানাত্ত কণিতং হেম ৬।৪৪।)

কণিশ (স্ত্রী) কণো বিদ্যতেহত্, কণ-ইনি (কণিন্), কণিঃ শেষতে অসিন্, কণিন্-ঈ-ড। শতমঞ্জরী, খাভারিঈষ।

কণিষ্ঠ (ত্রি) কণ-ইঠন (অতিশয়নে তমবিঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫।) ১ অন্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ছোট। ২ অন্য অপেক্ষা হীন।

কণী (ত্রি) কণ-ঈকন্। অন্ন।

কণীক (স্ত্রী) কণ-ঈপ্। কণিকা।

কণীচি (পুং) কণ-ঈচি (যুক্তিনিভ্যামীচিঃ। উণ্ ৪।৭০।

মৃ ও কণ ধাতুর উত্তর ঈচি প্রত্যয় হয়।) ১ পরবী, ছোট ডাল। ২ নিনাদ, শব্দ। (কণীচিঃ পরবীপ্রোক্তা মিনাদে-হপি চ দৃশ্যতে। উচ্চলদত্ত।) (স্ত্রী) ৩ পুষ্পিতা লতা। ৪ গুল্ম, ফুঁচ। ৫ শকট, গাড়ী।

(কণীচিঃ পুষ্পিতা লতা গুল্মরোঃ শকটে জিহাম্। মেদিনী।)

কণীয়ঃ [স্] (ত্রি) কণ-ঈয়জন্ (দ্বিচনবিভজ্যোপপদেতর-বীয়জুনৌ। পা ৫।৩।৫৭।) কনিষ্ঠ।

কণীয়ান্ [স্] (পুং) কণ-ঈয়জন্। ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র। ৩ হীন।

কণুই (দেশজ) ককোণি শব্দের অপভ্রংশ। হস্তের মধ্যদেশের নক্ষিহল। [ককোণি দেখ।]

কণে (অব্য) কণ-এ। প্রকার ব্যাঘাত। (দেশজ) কক্সা শব্দের অপভ্রংশ। নববধু। এ দেশের বিবাহকালে কন্যাকে কণে বা কনে বলে।

কণের (পুং) কণ-এর। কর্ণিকার বৃক, সোনালু বৃক।

কণেরা (স্ত্রী) কণের-টাপ্। ১ বেড়া। ২ হস্তিনী।

কণেরু (স্ত্রী) কণ-এরু। ১ বেড়া। ২ হস্তিনী। ৩ কর্ণিকার বৃক, সোনালু।

(কণেরুঃ কর্ণিকারে চ কর্ণিবৈজ্যয়োঃ জিহাম্। মেদিনী।)

কণকণ (দেশজ) বাতনাবিশেষ, অত্যন্ত শীতল জলস্পর্শে বা হাড় প্রভৃতি স্থানে আঘাত লাগিলে বেদন যন্ত্রণা হয়।

কণকণে (দেশজ) বাহাতে কণকণ করে, অত্যন্ত ঠাণ্ডা, যেমন কণকণে জল ইত্যাদি।

কণ্ট (ত্রি) কট-অচ্। কণ্টক।

কণ্টক (পুং স্ত্রী) কট-ক্। ১ স্ত্রীর অগ্রভাগ। ২ ক্ষুদ্র শব্দ। ৩ দোমাক। ৪ যন্ত প্রভৃতির হাড়। ৫ বৃকের

* “বতোহুদ্যদরবিঃশ্রেরনসিদ্ধিঃ ন ধর্মঃ” বৈশে পৃঃ ১।২। বাহা হইতে অত্মদর ও বিঃশ্রেরন অর্থাৎ স্বর্গ ও অপস্বর্গ পাওয়া যায়, তাহারই নাম ধর্ম।

অবয়ববিশেষ, কাঁটা। ৬ নৈসর্গিক প্রভৃতির দোষোক্তি।
(কণ্টকো ন দ্বিরাং ক্ষুদ্রপত্রো মংত্রাদি কীকসে।

নৈসর্গিকাদি দোষোক্তো ভ্রাত্তোবাঞ্চক্ষমাঙ্গরোঃ। মেদিনী।

৭ কর্ণহান। ৮ দোষ। ৯ বিষ। ১০ বেণু। ১১ ক্ষতিকর।

১২ বিরক্তজনক। ১৩ কেষ্ট। (লগ্নাধুগ্নান কর্ণাণিকেষ্ট-
মুক্তঞ্চ কণ্টকম্।" জ্যোতিষ।) ১৪ কাঁটাল। [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকমেহী [ন] (ত্রি) কণ্টকপ্রধানো মেহোহস্যান্তি
কণ্টকমেহ-ইনি। ১ বাহার কণ্টকাত্ত শরীর (পুং) ২
সজার। ৩ মৎস্যবিশেষ।

কণ্টকক্রম (পুং) কণ্টকপ্রধানো ক্রমঃ, কণ্টকেন আচিভো
বা ক্রমঃ, মধ্যপদলো। ১ শাল্মলিবৃক্ষ। ২ কণ্টকবৃক্ষ বৃক্ষ,
বাগলা প্রভৃতি। ৩ কাঁটাল গাছ।

কণ্টকপক্ষক (ত্রি) কণ্টকং পক্ষে বস্ত ততঃ স্বার্থে কন্।
বাহার পক্ষে অর্থাৎ ডানার কাঁটা থাকে। কৈ মাছ প্রভৃতি।

কণ্টকপক্ষমূল (স্ত্রী) কয়দা, গোক্ষর, খাঁটা, শতমূলী ও
কেলেকড়া। বৈদ্যক মতে ইহার মূলপিত্ত, সর্ষপ্ৰকার মেহ,
তুক্রদোষ, তিন প্রকার শোথ ও স্নেহা নষ্ট করে।

কণ্টকপ্রসূতা (স্ত্রী) কণ্টকৈঃ প্রসূতা ব্যাধা, ততঃ। বৃত্ত-
কুমারী।

কণ্টকফল (পুং) কণ্টকৈরাচিতং ফলং বস্যা, মধ্যপদলো।
১ কাঁটাল গাছ। ২ গোক্ষর বৃক্ষ।

কণ্টকভূক [ক] (পুং) কণ্টকান্ ভুক্ত কণ্টক-ভূজ-
কিপ্। উষ্ট্র, উট, ইহার কাঁটাগাছ খাইতেই অধিক ভালবাসে।

কণ্টকবৃন্তাকী (স্ত্রী) কণ্টকৈরাচিতা বৃন্তাকী, মধ্যপদলো।
বাঁটাছ, বেগুন।

কণ্টকশৃঙ্গ (পুং) পর্লভবিশেষ, মহাভ্রমের উত্তরে অবস্থিত।
(লিঙ্গপুঃ ৪৯। ৫৫)

কণ্টকশ্রেণী (স্ত্রী) কণ্টকানাং শ্রেণী বস্যাং, বহুব্রী। কণ্টকারী।

কণ্টকস্থল (পুং) অগ্নিকোণস্থ দেশবিশেষ। (মার্ক)

কণ্টকাগার (পুং) কণ্টকা আগারো বস্ত, অথবা কণ্টকং
আগিরতি, কণ্টক-আ-গৃ-অচ্। সরটনামক জন্তু, গিরগিটি।

কণ্টকাঢ্য (পুং) কণ্টকৈরাঢ্যঃ, ততঃ। কুজকবৃক্ষ।

কণ্টকার (পুং) কণ্টকমুচ্ছতি, কণ্টক-ক্-অণ্। ১ সিমুলগাছ।
২ বইচগাছ।

কণ্টকারিকা (স্ত্রী) কণ্টকান্ ইয়ন্তি গচ্ছতি বা, কণ্টক-
ক-ধূল্-টাণ্, ইযক্। কণ্টকারী নামক বৃক্ষবিশেষ।

কণ্টকারী (স্ত্রী) কণ্টকার-ভীপ্। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Solanum Jacquinii) ইহার সংস্কৃতপরিচয়,—নিদিদ্ধিকা, স্পী,



কণ্টকারী বৃক্ষ।

ব্যাকী, বহুব্রী, প্রচোদনী, কুলী, ক্ষুদ্রা, হৃদ্যর্বা, রাষ্ট্রিকা,
অনাক্রান্তা, তপ্তাকী, নিংহী, ধাবনিকা, কণ্টকারিকা, কণ্ট-

কিনী, হৃদ্যধবিনী, নিদিদ্ধা, ধাবনী, ক্ষুদ্রকণ্টিকা, বৃহৎকণ্টা,
ক্ষুদ্রকলা, কণ্টানিকা ও চিত্রকলা।

এদেশে কণ্টকারী, পশ্চিমে কটেরী বা ভটকটেরী কহে।
খেত কণ্টকারীকে এদেশে ক্ষুদ্রা, পশ্চিমে কটীলা বা কটা-
শীলা, দক্ষিণে দৌরলিকাকল, তামিলে কন্দনবজ্রী এবং
তৈলগড়ে বহুদ কারা বা নোলবহুদ বলে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—সারক, তিক্ত ও কটুরস,
অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য, পাচক; কাস, খাস, জ্বর,
শ্লেষ্মা, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগনাশক।

কণ্টকারী ও বৃহতী উভয়ই এক পর্যায় শব্দে অভিহিত
হইয়া থাকে। হুশ্রভের মতে যে জাতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ভট্টাকী
নামে প্রসিদ্ধ, তাহাকেই বৃহতী বলে। বৃহতী—ধারক, হৃদয়-
প্রাণী, পাচক, কটুভিত্তকরস, উষ্ণবীৰ্য, এবং কফ, বায়ু, মূত্রের
বিরসতা, মল, অরুচি, কুষ্ঠ, জ্বর, খাস, শূল, কাস ও
অগ্নিমান্দ্যনাশক।

কণ্টকারী খেত ও নীল ভেদে বিবিধ; খেত কণ্টকারীর
নাম খেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষণা, ক্ষেত্রদূতিকা,
গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুশী ও প্রিয়করী, ইহার গুণও
ঐরূপ, বিশেষতঃ ইহা গর্ভপ্রদ। ইহাদের মূল, অতাবে সমস্ত
অংশ ব্যবহার্য। মাত্রা ১ মাষা।

এই গাছ ভারতবর্ষের নানাহানে জন্মে, শীতকালে মূল
ধরে। ফল দেখিতে রস্কাহর।

কণ্টকারীর ফলের গুণ—তিক্ত, রসে ও পাকে কষায়,
বীৰ্য্যনিঃসারক, ভেদক, ভীক, পিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক, হাল্কা;
কফ, বাত, কণ্ডু, কাশ, মেদ, ক্রিমি ও জ্বররোগনাশক।
মতান্তরে এই ফল ভীক, হাল্কা, কটু, দীপন, রুক্ষ, উষ্ণ এবং
খাস, কাস, জ্বর ও কফনাশক।

ক্ষুদ্রাকণ্টকারী ফলের গুণ—কটু, তিক্ত, রেচক,
পিত্তকর, মূত্রকারক; হিকা, হৃদ্বি, যক্ষ্মণ, খাস, কাস, কফ,
কণ্ডু, বাত, ক্রিমি ও জ্বরনাশক।

ডাক্তার উইলসনের মতে কণ্টকারী কটু ও বাতরেচক;
পদতলে প্রদাহ ও জলযুক্ত ফুসফুড়ি হইলে ইহা ব্যবহার
করা যায়।

দাঁতের গোড়ার ব্যথা হইলে কণ্টকারীর ধূম ও উত্তাপ
বিশেষ উপকারী।

ডাক্তার মোরহেড বলেন, ইহার বিশেষ গুণ কফ-
নিঃসারক।

কণ্টকারীস্বত (স্বী) বৈদ্যকোক্ত কাসরোগের ঔষধবিশেষ।
ইহা স্বল্প, অপর ও বৃহৎ ভেদে বিবিধ।

স্বল্প,—কণ্টকারী ৩০ পল, শুলক ৩০ পল, ৬০ সের জলের
সহিত কাথ করিবে, ১৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে হাঁকিয়া লইয়া

এই কাথের সহিত ৪ সের স্বত পাক করিবে। এই স্বত
পানে বাতাদিক্য ও কাসরোগ নষ্ট হয় এবং অগ্নির উদীপন
হইয়া থাকে।

অপর,—কণ্টকারীর কাথ ১০ সের, স্বত ৪ সের, ককাৰ্ধে
রাসা, বেড়েলা, জিকটু ও গোক্ষুর, সমুদায় মিলিয়া ১১ সের,
বথাবিধি পাক করিয়া সেবনে পক্ষবিধ কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ,—মূল, পত্র ও শাখাযুক্ত কণ্টকারীর কাথ ১০ সের,
স্বত ৪ সের, বেড়েলা, জিকটু, বিড়ঙ্গ, শটী, চিত্তা, সচল-
লবণ, যবক্ষার, বেলভট, আমলকী, কুড়, খেতপুনর্নবা, বৃহতী,
হরীতকী, যমানী, দাড়িম, ঝড়ি, জ্রাফা, রক্তপুনর্নবা, আতাইচ,
হুয়ালতা, আমরুল, কাঁকড়াশুলী, কুঁই আমলকী, বাহুনহাটী,
রাসা ও গোক্ষুর, সমুদায় মিলিয়া ১১ সের, এই সমস্তের কফ-
সহ পাক করিয়া সেবন করিলে সর্বাধিকার কাসরোগ ও
কফরোগ নিবারিত হয়।

ইহা তির স্বরভেদে রোগাধিকারে একরূপ কণ্টকারী স্বত
আছে, তাহা এইরূপ,—কণ্টকারী কণ্টকারীর রসের দ্বারা
(অতাবে আটগুণ জলদ্বারা) কাথ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট
থাকিতে, বেড়েলা, গোক্ষুর ও জিকটুর কফসহ স্বত পাক
করিয়া পান করিলে স্বরভেদ ও পক্ষবিধ কাস বিনষ্ট হয়। রোগীর
বলাবল দৃষ্টে ১০ অর্দ্ধতোলা হইতে দুইতের মাত্রা ব্যবস্থা করিবে।
অল্পপানও রোগীর অবস্থানুসারে, উষ্ণহৃৎ প্রভৃতি ব্যবহের।

কণ্টকারীস্বাদি (পুং) বৈদ্যকোক্ত জ্বরাদিকারের পাচন-
বিশেষ। কণ্টকারী, শুলক, বাহুনহাটী, ভট্ট, হুয়ালতা,
চিরাতা, রক্তচন্দন, মৃখা, পলতা ও কটকী, সমুদায়ে ২ তোলা,
অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে হাঁকিয়া লইয়া
পান করিলে পিত্ত, শ্লেষ্মা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাস,
হৃদয় ও পার্শ্বের বেদনা নিবারিত হয়।

কণ্টকাল (পুং) কণ্টক কণ্টকব্যাপ্তং ফলং কালয়তি
উৎপাদয়তি, কণ্ট-কল-নিচ-অণ্। কণ্টকৈঃ কণ্টকাধীর্ণ-
কলে রলতি শোভতে, কণ্টক-অল-অচ্ ইতি বা। ১ কাঁটাল
গাছ। ২ মাড়ার। (কণ্টকালন্ত পনসে মন্ডারে। শকাজি।)
কণ্টকালুক (পুং) কণ্টকৈ রলতি, কণ্টং কালয়তি বা,
কণ্টক-অল, কণ্ট-কল্ বা-উকঞ। যবাস বৃক্ষ।

কণ্টকাশন (পুং) কণ্টকং অস্নাতি, কণ্টক-অশ-ল্য। উষ্ট্র, উট।
কণ্টকাভীল (পুং) কণ্টকঃ অধীলোব বভ, বহবী। যন্ত-
বিশেষ; ইহার অপর নাম কুলিণ।

কণ্টকিত (জি) কণ্টকো রোমাকো জাতোহন্ত, কণ্টক-ইতচ্
(তদন্ত সংজাতং ভারতাদিত্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) ১
রোমাকিত। ২ কণ্টকযুক্ত।

কণ্ঠকিম্বী (জী) কণ্ঠকঃ সত্যতাঃ, কণ্ঠক-ইনি-ভীপ্। ১
বার্ভাকী, বেগুন। ২ শোণকিণি। ৩ মধু খজুরী।

কণ্ঠকিকল (পুং) কণ্ঠকি কণ্ঠকযুক্তঃ কলং যত, বহুব্রী।
১ কাঁটাল গাছ। ২ (কর্মধা) কাঁটাল।

(কণ্ঠকিকলঃ পুমান্ পনসে ত্রাৎ। শব্দাকি।) [কাঁটাল দেখ।]

কণ্ঠকিল (পুং) কণ্ঠকো হস্তাত্ত, কণ্ঠক-অস্ত্যর্থে ইলচ্।
বাশবিশেষ, বেউড় বাশ।

কণ্ঠকিলতা (জী) কণ্ঠকিনো চাসৌ লতাচেতি, কর্মধা।
শমার লতা।

কণ্ঠকী [ন্] (পুং) কণ্ঠকো হস্তাতি, কণ্ঠক-ইনি। ১ মৎস্ত।
২ খদিরবৃক্ষ। ৩ ময়নাগাছ। ৪ গোক্ষুরগাছ। ৫ বেউড় বাশ।
৬ কুলগাছ। ৭ কাঁটাল। ৮ (ত্রি) কাঁটায়ুক্ত।

কণ্ঠকী (জী) কণ্ঠক-অর্শ আদিষাৎ অচ-ভীষ্। বার্ভাকী
বিশেষ; কাঁটাবেগুন। রাজবলভের মতে ইহার গুণ—কটু,
তিক্ত, উষ্ণবীৰ্য, রক্ত ও পিত্তপ্রকোপকর, কণ্ঠ ও কঙ্ক-
নাশক এবং দোষজনক। [বেগুন দেখ।]

কণ্ঠকীক্রম (পুং) কণ্ঠকী চাসৌ ক্রমশ্চেতি, কর্মধা (পূর্বো-
দয়াদিষাৎ দীর্ঘঃ)। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ (কণ্ঠকী এব ক্রমঃ)
বার্ভাকীবৃক্ষ।

কণ্ঠকীকল (পুং) কণ্ঠকী কণ্ঠকাচিৎ ফলমন্ত বহুব্রী
(পূর্বোদয়াদিষাৎ) দীর্ঘঃ। কাঁটাল। [কাঁটাল দেখ।]

কণ্ঠকুরূপ (পুং) কণ্ঠঃ কণ্ঠকপ্রধানঃ কুরূপঃ মধ্যপদলো।
কিণি, ঝাটি। [কিণি দেখ।]

কণ্ঠতলু (জী) কণ্ঠা কণ্ঠকাষিতা তদ্ব্যবহাঃ, মধ্যপদলো। বৃহতী।

কণ্ঠদল (জী) কণ্ঠঃ কণ্ঠকাচিৎ দলং যন্তাঃ, মধ্যপদলো।
কেতকী ফল।

কণ্ঠপত্র (পুং) ১ বিককত বৃক্ষ, বইচগাছ। ২ শৃঙ্গাটক,
শিঙ্গার, পানিকল।

কণ্ঠপত্রক (পুং) কণ্ঠপত্র-স্বার্থে কন্। শৃঙ্গাটক, পানিকল।
(কণ্ঠপত্রকঃ শৃঙ্গাটকে। শব্দাকি।)

কণ্ঠপত্রফলা (জী) ক্রন্দগভীবৃক্ষ।

কণ্ঠপাদ (পুং) বিককত বৃক্ষ, বইচ।

কণ্ঠফল (পুং) কণ্ঠঃ কণ্ঠকাষিতং কলং, মধ্যপদলো। ১
ছোটগোক্ষুর। ২ কাঁটাল। ৩ ধূতরা। ৪ লতাকরক। ৫ ভেজ-
কল। ৬ এরঙফল। ৭ (বহুব্রী) ঐ সকল ফলের গাছ।

কণ্ঠফলা (জী) কণ্ঠঃ কণ্ঠকাচিৎ কলং যন্তাঃ। দেবদানীলতা।

কণ্ঠল (পুং) কণ্ঠঃ অস্তাত্ত, কণ্ঠ-অলচ্। কণ্ঠেন কণ্ঠকেন
অলতি পর্যাপ্নোতি, কণ্ঠ-অল্-অচ, ইতি বা। বাবলাগাছ;
ইহার সংস্কৃতপরিচয়—বাবল, বর্ণপুল ও গুলপুল।

কণ্ঠবল্লী (জী) কণ্ঠা কণ্ঠকাষিতা বল্লী, মধ্যপদলো।
গ্রীবল্লীবৃক্ষ।

কণ্ঠবৃক্ষ (পুং) কণ্ঠঃ কণ্ঠকবহলো বৃক্ষঃ, মধ্যপদলো।
ভেজঃকলবৃক্ষ।

কণ্ঠাকারী (পুং) বিককতবৃক্ষ, বইচ। (অবিককতে
কণ্ঠাকারী পুংসি। শব্দাকি।)

কণ্ঠাকল (পুং) কণ্ঠ-ভাবে অণ, কণ্ঠা কণ্ঠকোপলক্ষিতং
কলং যত। ১ কাঁটালগাছ। ২ (কর্মধা) কাঁটাল।

(কণ্ঠাকলন্ত পনসে পুমান্। শব্দাকি।)

কণ্ঠার্ভগলা (জী) নীলকিণি।

কণ্ঠালু (পুং) কণ্ঠায় কণ্ঠকায় অলতি পর্যাপ্নোতি, কণ্ঠ-
অল্-উণ্। ১ বাশবিশেষ। ২ বৃহতী। ৩ বার্ভাকী। ৪ বাবলা।

কণ্ঠাহ্বয় (জী) কণ্ঠঃ কণ্ঠকঃ আহ্বয়তে স্পর্ধতে, কণ্ঠ-আ-
হ্বে-ক। পদ্মের গের্ণো।

কণ্ঠী [ন্] (পুং) কণ্ঠঃ কণ্ঠকঃ অস্তাত্তি, কণ্ঠ-ইনি। ১
কলার। ২ অপমারগ। ৩ খদির। ৪ গোক্ষুর।

কণ্ঠ (পুং) কণ্ঠ-ঠ (কণ্ঠঃ। উণ্ ১। ১০৫।) ১ গলদেশ,
গ্রীবায় সন্মুখভাগ। সূক্ষ্মতের মতে এইখানে ৪ খানি তরুণাঙ্ঘ্রি
ও মণ্ডলা নামক ৩টি অঙ্গিগন্ধি আছে। কণ্ঠনাড়ীর উভয়-
পার্শ্বে ৪টি ধমনী, দুইটির নাম লীলা ও দুইটির নাম মস্তা;
কোনরূপে সেই ধমনী বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে মৃত্যুতা, অরবিকৃতি
ও রস গ্রহণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

২ অনেকস্থলে গ্রীবায় সমুদায় অংশও কণ্ঠ নামে অভিহিত
হইয়া থাকে। কণ্ঠব্যতীত গ্রীবায় অস্ত্রাজ্ঞ অংশে কণ্ঠরা ৪,
কুর্ক ১, অস্থি ২, অস্থিগন্ধি ৮, স্নায়ু ৩৬, পেশী ৪, গ্রীবায়
উভয়পার্শ্বে সিরি ৪, তাহাদিগের নাম মাতৃকা; সেই সকল
সিরি বিচ্ছিন্ন হইলে সদাঃ মৃত্যু ঘটয়া থাকে। (সূক্ষ্মত,
শারীর।) গৌতমভট্টের মতে কণ্ঠদেশে বিগুচ্ছ নামক ষোড়শ-
অঙ্গবৃক্ষ, ধূমবর্ণ, মহাপ্রভাবিশিষ্ট ষোড়শদল পদ্মের অবস্থান।

(“তদুর্দ্ধত বিগুচ্ছাখ্যং দলষোড়শপত্রজম্।

সরৈঃষোড়শভিযুক্তং ধূমবর্ণৈঃ মহাপ্রভম্।

বিগুচ্ছ পদ্মমাখ্যাতমাকাখ্য মহাদভূতম্।”)

৩ ধ্বনি, কণ্ঠের শব্দ। ৪ নিকট। ৫ মদনবৃক্ষ।

(কণ্ঠো গলে সন্নিধানেন ধ্বনৌ মদনপাদপে। (উজ্জলভট্ট।)

৬ হোমকুণ্ডের বাহিরে অজুগিপরিমিতস্থান।

(“খাতাখাছোহুজুঃ কণ্ঠঃ সর্গকুণ্ডেধরংবিধিঃ।” তিথ্যাদিতম্।)

৭ মুনি। ৮ কেন। (শব্দাকি।)

কণ্ঠক (পুং) কণ্ঠ-স্বার্থে কন্। কণ্ঠ। [কণ্ঠ দেখ।]

কণ্ঠকৃগিকা (জী) কণ্ঠইব কণ্ঠধনিরিব কৃগতি, কণ্ঠ-কৃ-
গিকৃ।

ধূলু-টাণ্, অত ইব্। বীণা, কৰ্ঠবয়ের জার ইহার বর অতি
স্থল্।

(বীণা পুনর্ব্যবহৃত বিপক্ষী কৰ্ঠক্লিক।। হেম ২। ২০১।)

কৰ্ঠগত (জি) কৰ্ঠে গতঃ, ৭৩৭। ১ কৰ্ঠহ্। ২ কৰ্ঠাগত।

কৰ্ঠতলাসিকা (জী) কৰ্ঠতলে অধাণাং কৰ্ঠদেশে আত্বে,

কৰ্ঠতল-আস-ধূলু-টাণ্-অত ইব্। অধের ঐবাবেষ্টক চণ-
রজ্ প্রভৃতি।

কৰ্ঠদয় (জি) কৰ্ঠঃ পরিমাণমত, কৰ্ঠ-দয়চ্ (প্রমাণেদয়সজ্
দয়প্রমাণতঃ। পা ৫। ২। ৩৭।) পল পরিমাণ।

কৰ্ঠধান (পুং) দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪। ২৬)

কৰ্ঠনাশী (জী) কৰ্ঠগতা নাড়ী, মধ্যপদলো° ভূত লক্ষ্ম। কৰ্ঠ-
দেশস্থিত স্থলধমনী, ভূত জব্য এই নাড়ীদ্বারা অধোগত হয়
এবং শব্দাদিও এই নাড়ীর দ্বারা নিঃসৃত হইয়া থাকে।

কৰ্ঠনীড়ক (পুং) কৰ্ঠে প্রাসাদবৃক্ষানীনাং শিরোভাগে নীড়ং
যত, কৰ্ঠনীড়-কপ্। চিলপক্ষী। (কৰ্ঠনীড়কে না চিলে।
শব্দাঙ্কি।)

কৰ্ঠনীলক (পুং) কৰ্ঠঃ ধারকত্ব কৰ্ঠানিকমূৰ্দ্ধদেহং নীলরতি
বশিখা কজ্জলেন নীলবর্ণঃ করোতি, কৰ্ঠ-নীল-শিচ্-ধূল্। ১
মসাল। ২ চিল্পাধী।

(কৰ্ঠনীলকঃ চিল্পপক্ষিণি চোদ্ধারাম্। শব্দাঙ্কি।)

কৰ্ঠপাশক (পুং) কৰ্ঠে পাশ ইব কারতি প্রকাশতে, কৰ্ঠ-পাশ-
কৈ-ক। ১ হস্তীর গলবেষ্টন দড়ী। ২ কৰ্ঠরজ্জ্ব। কৰ্ঠপাশকঃ।

(হস্তিনাং কৰ্ঠরজ্জ্বোচ্চ কৰ্ঠরজ্জ্বো নিগদ্যতে। শব্দাঙ্কি।)

কৰ্ঠবন্ধ (পুং) কৰ্ঠে বন্ধঃ, ৭৩৭। গলবন্ধন, গলার বঁস।

কৰ্ঠভূবা (জী) কৰ্ঠত ভূবা অলঙ্কারঃ, ৬৩৭। গলদেশের অল-
কার, ইহার সংস্কৃতপৰ্যায়ঃ—গ্রৈবের, ঐবৈ, রুচক ও নিফ।

কৰ্ঠমণি (পুং) কৰ্ঠে ধার্যো মণিঃ, মধ্যপদলো°। গলদেশে
ধারণোপযোগী মণি, ইহার সংস্কৃত নামান্তর কাকল।

কৰ্ঠমালা (জী) কৰ্ঠে ধার্যো মালা হারবিশেষঃ, মধ্যপদলো°।
জীলোকের কৰ্ঠভূষণবিশেষ।

কৰ্ঠরত্ন (জী) কৰ্ঠে ধার্যো রত্নম্, মধ্যপদলো°। কৰ্ঠদেশে
ধারণীয় রত্ন।

কৰ্ঠলতা (জী) কৰ্ঠে লতা ইব, উপমি°। অধের গলদেশস্থ
রজ্জ্ব প্রভৃতি।

কৰ্ঠরোগ (পুং) কৰ্ঠগতো রোগঃ, মধ্যপদলো°। কৰ্ঠনাশীর
অত্যন্তরজাত রোগসকল। মহর্ষি ব্রহ্মসূত্রের মতে কৰ্ঠনাশীতে
অষ্টাদশ প্রকার রোগ জন্মে; রোহিণী ৫ প্রকার, কৰ্ঠশালুক,
অধিজিহ্ব, বলয়, বলস, একস্থল, শতরী, শিলাব, গলবিক্রমি,
গলোব, স্বরয়, মাংসতান এবং বিদারী।

রোহিণী—দুর্মিত বায়ু, শিথ, কক ও রক্ত গলদেশস্থ মাংসকে
দুর্মিত করিয়া মাংসাত্মক উৎপাদন করে, তাহাকে কৰ্ঠরোগ
হয় ও শীঘ্র প্রাণ বিনাশ করে। ইহাকে রোহিণীরোগ বলে।
বায়ু অত রোহিণীরোগে জিহ্বার চতুর্দিকে অত্যন্ত বেদনাত্মক
কৰ্ঠরোধক মাংসাত্মক উৎপন্ন হয় এবং রোগী শুভ্র প্রভৃতি
বাতজনিত উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে। শিথ অত
রোহিণীরোগে অভিশর দাহ ও পাকস্থক মাংসাত্মক শীঘ্র বাহির
হয়। বিশেষতঃ রোগীর অত্যন্ত বেগবান্ হয় হইয়া থাকে।
ককরক্ত রোহিণীরোগে মাংসাত্মক রক্ত, হির ও বিলম্বে পাকে
এবং কৰ্ঠপ্রোত রক্ত হইয়া থাকে। শারিরাভিক রোহিণীরোগে
উক্ত তিন দোষের লক্ষণ দেখা যায় এবং মাংসাত্মক গঞ্জীর-
ভাবে পাকিয়া থাকে। এই রোগ চিকিৎসাশাখা নয়।
রক্তরক্ত রোহিণীরোগে জিহ্বামূল কোটক দ্বারা ব্যাধি হয়
এবং পিণ্ডের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভাবমিশ্র বলন—জৈবদৌষিক রোহিণীরোগে রোগীর
জীবন সদ্য নষ্ট হয়; ককজ রোহিণী তিন রাজির মধ্যে,
শৈবিক রোহিণী পাঁচ রাজির মধ্যে, এবং বাতজ রোহিণী
সাত রাজির মধ্যে রোগীর জীবন হরণ করিয়া থাকে।

শাখা রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, পুষ্ণাস, গণ্ডু-
ধারণ এবং নস্ত হিতকারক। বাতজ রোহিণীরোগে রক্ত-
মোক্ষণ করিয়া সৈন্ধব দ্বারা প্রতিলারণ করিবে এবং অন্ন গ্রহণ
দেহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ গণ্ডু ধারণ করিবে। পিত্তজ ও
রক্তজ রোহিণীতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া প্রিয়চূর্ণ, চিনি ও
মধু একত্র করিয়া ঘর্ষণ এবং ত্রাণা ও ফলসার কাথ দ্বারা
কবল করিবে। ককজ রোহিণীরোগে আগারধূম (কোল),
গুটী, পিঙ্গলী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা প্রতিলারণ করিবে।

কৰ্ঠশালুক—কুণ্ডিত কক দ্বারা কুলের আঁটির জার,
কাঠবৎ বা শুকবৎ বেদনাঞ্জনক খর ও হির গ্রাহি উৎপন্ন হইলে
তাহাকে কৰ্ঠশালুক কহে, এই রোগ শস্ত্রশাখা। এই রোগে
রক্তমোক্ষণ করিয়া তুতিকেরী রোগের জার চিকিৎসা
করিবে। সিদ্ধ বদার অন্ন পরিমাণে একবার ভোজন
করাইবে।

অধিজিহ্ব—রক্তমিশ্রিত কক কৰ্ঠক জিহ্বার উপর
জিহ্বাঙ্গের জার শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধিজিহ্ব
বলে। শোথ পাকিলে এই রোগ অশাখা হয়।

বলয়—রোগীর দ্বারা গলমালাতে আরত ও উন্নত শোথ
উৎপন্ন হইয়া কুত্ব জ্বরের পথ রোধ করিলে তাহাকে বলয়
রোগ বলে, এই রোগ অশাখা।

বলস—দোষী ও বায়ু কৰ্ঠক গলদেশে বেদনাত্মক শোথ

জন্মিলে এবং রোগীর মর্মান্বিত দারুণ বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে বলানরোগ কহে, এই রোগ অস্বাভাব্য।

একবৃন্দ—গলদেশে যে ফুলা গোল ও উন্নত হইয়া উঠে, দাঁহ ও কণ্ঠবিশিষ্ট এবং তার ও কোমল বোধ হয়, তাহার নাম একবৃন্দ। এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বিরচনাদি ষায়া শোধন করিবে।

বৃন্দ—রক্তপিত্ত জন্ম গোল ও অতিশয় উন্নত শোথ জন্মিয়া রোগীর অত্যন্ত অরু ও দাঁহ হইলে তাহাকে বৃন্দরোগ বলে, ইহাতে বেদনা হইলে বাতজ বলা যায়।

শতরী—গলনালীতে মোটা পলিতার মত, কঠিন, কণ্ঠ-রোধকারী, বাতজাদি ভেদে নানাপ্রকার বেদনায়ুক্ত অথচ মাংসাত্মকের দ্বারা অধিক ব্যাপ্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে নানাপ্রকার বাতনা উপস্থিত হইলে তাহাকে জিদোষ জন্ম শতরী রোগ কহে। এই রোগে রোগী আরই বাঁচে না।

শিলাধ—যে রোগে দূষিত কফ ও রক্ত হইতে গলার ভিতর আমলকীর আঁটির মত স্থির ও অন্ন বেদনায়ুক্ত গ্রন্থি জন্মে, ত্ত্বজ দ্রব্য সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে শিলাধ রোগ বলে, এই রোগ শুল্কসাধ্য। সূক্ষ্মতমতে ইহার নাম গিলায়ু রোগ।

গলবিজ্রমি—সমস্ত গলদেশ ফুলিয়া উঠিলে, এবং তাহাতে নানাপ্রকার বাতনা হইলে তাহাকে গলবিজ্রমি কহে। এই রোগ যদি মর্মান্বিত না হয় অথচ সূক্ষ্ম হয়, অল্পদ্বারা ছেদন করিবে।

গলোষ—কফ ও রক্ত জন্ম গলদেশ অত্যন্ত ফুলিয়া অন্ননালী বা জলপ্রবেশের পথ রোধ করিলে এবং তাহাতে বায়ুর গতি নষ্ট ও তীব্র অরু হইলে গলোষ রোগ বলে।

বরর—এই রোগে রোগী মুচ্ছিত হয়, সর্কদা খাস ত্যাগ করে, বরভঙ্গ ও কণ্ঠ শুক হয় (রোগী কিছু চিনিতে পারে না) এবং খাসের পথ আবৃত হয়।

মাংসভান—এই রোগে গলদেশের ফুলা ক্রমে বাড়িয়া কণ্ঠনালী প্রায় রোধ করে এবং ফুলা বিস্তৃত, অতি ক্লেশ-দায়ক ও লঘমান হয়। ইহাতে রোগী বাঁচে না।

বিদারী—এই রোগে পিত্তের একোপ জন্ম গলদেশে ও মুখে ভাঙ্গরণ দাঁহ ও বেদনায়ুক্ত ফুলা হয়, উহা হইতে দুর্গন্ধ-যুক্ত পচা মাংস ধসিয়া পড়ে, রোগী যে পার্শ্বে অধিক শয়ন করে, সেই পার্শ্বেই এই রোগ জন্মে।

সাধারণতঃ কণ্ঠরোগ মাত্রেই,—১। দারুণরক্তা, নিবহাল, শালবৃক, ইন্দ্রবব, এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিবে, অথবা হরীতকীর কষায় মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ২। কটকী,

আতাইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুখা ও ইন্দ্রবব, এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া গোমুত্রের সহিত পান করিবে। ৩। পিঙ্গলী, পিঙ্গলীমূল, টে, চিতা, শুট, সাজিমাটা, যবক্ষার এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে। ৪। মনঃ-শিলা, যবক্ষার, হরিভাল, সৈন্ধব ও দারুহরিদ্রা, এই সকলের চূর্ণ মধু ও স্তনের সহিত মুখে ধারণ করিলে, মুখরোগ ও গলরোগ বিনষ্ট হয়। ৫। যবক্ষার, গজপিঙ্গলী, আকনাদি, রসায়ন, দেবদারু, হরিদ্রা ও পিঙ্গলী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মধুর সহিত শুড়িকা করিবে, এই শুড়িকা মুখে ধারণ করিলে গলরোগ নিবারিত হয়। ৬। বেলমূলের ছাল, সোণা-মূলের ছাল, গাভারীর ছাল, পারুলের ছাল, গণিয়ারী, শাল-পাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দশমূলের কাথ জৈবদ্রব্য থাকিতে পান করিবে। (চক্রদত্ত।)

রূরোপীর চিকিৎসকদিগের মতে কণ্ঠরোগ নানাপ্রকার। তন্মধ্যে সামান্য কণ্ঠশোথ (Simple Sore throat), ক্ষতযুক্ত কণ্ঠশোথ (Ulcerated Sore throat), গলগ্রন্থিপ্রদাহ (Quinsy or Tonsillitis), সাংঘাতিক কণ্ঠশোথ (Malignant Sore throat), সারিপাতিক কণ্ঠরোগ (স্ফুচ্ছাদন) বা ডিপথিরিয়া (Diphtheria)

কণ্ঠশোথ হইলে কণ্ঠে প্রদাহ, গিলিতে কষ্টবোধ, খাস কেলিতে কষ্ট, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ও অরু হয়। প্রথমে বাধা না পাইলে ক্রমে বাড়িয়া উঠে, জিহ্বা ফোলে এবং ধারণ হইয়া থাকে। গলগ্রন্থি রক্তবর্ণ, গলদেশের পশ্চাতে ছোট ছোট পীতবর্ণ ফুলা হয়। তৃকা, নাড়ী প্রবল, কখন গাল ফুলিয়া রক্তবর্ণ হয়। চক্ষু জলে, রোগ বৃদ্ধি হইলে চিত্তবিভ্রম ঘটে। যতই রোগ বাড়ে, গলগ্রন্থিও তত ফুলিয়া উঠে, তাহাতে পূর জন্মে। স্ফোটক কাটিলে গেলে আরাম বোধ হয়। কখন কখন কাটিবার পর গ্রন্থিতে আবার পূর্ববৎ ফুলিয়া উঠে, সক্ষে সক্ষে তাহার চিকিৎসা করা চাই, নহিলে সাংঘাতিক হইয়া উঠে, এরূপস্থলে কঠিন অরু হয়।

সামান্য কণ্ঠশোথে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিশেষ উপকারী।

ভিজার পর ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য কণ্ঠশোথ হইলে ডাল্ফামরা। বায়ু পরিবর্তন দ্বারা হইলে গেলসেমিনম্। অরের সঙ্গে শীত বোধ হইলে একোনাইট। কণ্ঠবেদনা, কণ্ঠ-শুক, শিরশীড়া এবং মুখ লাল হইলে বেলেডোনা। কণ্ঠ স্নায়ু, গিলিতে কষ্ট ও কফ বাহির হইতে থাকিলে মাহুরিয়াস্।

ক্ষতযুক্ত কণ্ঠশোথে প্রথমে বেলেডোনা। ছোট, পাতবর্ণ

অথচ অনিউটারক দ্রুত হইলে এসিড নাইট্রিক। হৃদয় ও যাকুদোর্ল্য বটিলে ব্যাপ্তিসিরা, কার্বো-ডেজিটেব্লিস।

গলগ্রন্থিপ্রদাহ (Tonsillitis)—গলদেশে কোনস্থানে প্রদাহ হইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগও নানাপ্রকার। তন্তু-পারী শিশুসন্তানের এই রোগ বড় একটা হয় না। পাঁচ হইতে দশ বর্ষের সময় হইতে এই রোগ অধিক দেখা যায়। আবার পঞ্চাশ বর্ষের সময়ও এই রোগ জন্মে। এই রোগ সকল ঋতুতেই হয়, বিশেষ শীতকালে প্রবল হইয়া থাকে। শীতল বা হিম, আর্দ্র বা দূষিত বায়ুসেবন, শীত, পৈজিক দোষ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। বাহ্যিক দেখিতে ভাল, এরূপ লোককেই এই রোগ প্রায় আক্রমণ করে। গণমালা-রোগ আরাম হইবার পরও কখন কখন এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই রোগ জন্মিবার পূর্বে রোগী বেশ হুহু অব-স্থার থাকে, কখন কখন সামান্য পেটের গোলমাল হয়। এই রোগ হইলে শীতবোধ, কন্মন, চর্মে উত্তাপ, উত্তেজিত নাড়ী, তৃষ্ণা, শিরঃশীড়া অথবা স্খুধামান্য, অস্থিবোধ, প্রত্যাহে ব্যথা বা শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। চোক গিলিতে কষ্ট হয়, যেন গলদেশে কিছু চাপান হইয়াছে এরূপ বোধ হইয়া থাকে। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে সামান্য হইতে অতি দারুণ যন্ত্রণা, প্রদাহ ও গিলিবার ইচ্ছা হয়। চোক গিলিবার সময় কখন কখন এত কষ্ট হয় যে তখন আক্ষেপ পর্যন্ত ঘটয়া থাকে। কাসি, ছেপ বা কক ফেলিবার ইচ্ছা, কঠে দোবের স্কার, কঠে শ্বাসপ্রবাস, কঠ হইতে বড়বড় আওয়াজ, কখন কখন রোগ কঠিন হইলে এককালে স্বররোধ হয়। কোন কোন স্থলে গলার ফুলা অন্ত্যস্ত বাড়িয়া উঠে, নিশ্বাস ফেলিবার সময় বেদনাবোধ, কখন কখন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। এই রোগ অতি পীড়াদায়ক, সচরাচর সাত দিন হইতে চৌক দিন পর্যন্ত থাকে।

ফুলা কাটিয়া না দিলে কথা কহিবার সময়, বমি করিবার সময় অথবা কাসিবার সময় কাটিয়া যায়। ঘুমের সময়ও কাটিয়া থাকে, এ অবস্থার ফাটিলে রোগী অধিক কষ্ট ভোগ করে না, ঘুম ভাঙিলে রোগী অনেকটা শোয়াতি বোধ করে। ৫৭ দিনের মধ্যে ভাল হয়। শ্বাসবদ্ধ হইলে মৃত্যুর ভয়, নচেৎ নয়।

চিকিৎসা—রোগের প্রথম অবস্থার একটি পায়ে গরম জলে ধানিকটা কপূর ও আখ ছটাক ভিনিগার রাখিয়া হাঁ করিয়া তাহার উত্তাপ গ্রহণ করিবে। ঘুম লাগিয়া যদি কোন কারণে অধিক কাসি হয়, তবে শয়নকালে বৃহবিরেচক এবং প্রাতঃকালে ভেদক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, গরম জলে

লবণ ও রাইসরিবা নিশাইয়া তাহাতে হাত পা ডুবাইয়া রাখিবে। পূর্বে এই রোগ হইলে চিকিৎসকেরা ফুলা কাটিয়া দিতেন। আবার কেহ কলটিক দিয়া গোড়াইয়া দিতেন। তাহাতেও অনিষ্ট ভাবিয়া কেহ কেহ অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা রক্ত নিঃসারণ করিয়া থাকেন। হৃদয়, মস্তিষ্ক, অথবা অন্ত্র ব্যক্তির এই রোগ হইলে রোগী বড় দুর্বল হইয়া পড়ে, এরূপ অবস্থার রক্ত নিঃসারণ করিবে না। সহজ উপায়ে চিকিৎসা করিবে। ২ ড্রাম লুনার কলটিক ২ ঔন্স চৌমান জলে নিশাইয়া ফুলি দিয়া সাবধানে প্রলেপ দিবে। দিবসে ডিকল্লন অব সিন্‌কোনা, টিকর সিন্‌কোনা এবং এসে-টেট অব আমোনিয়া প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধটি কিরংকাল কঠে রাখিয়া তৎপরে গিলিতে দিবে। কেহ কেহ এই রোগে পদতল বিদ্ধ করিয়া রক্ত বাহির করিয়া থাকেন।

হোমিওপ্যাথিতে—এই রোগে বেলেডোনা, মার্জুরিয়াস, হেপার, আর্সেনিক, সাইলেন্সিয়া প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

দুধপোষা শিশুদিগের একপ্রকার কণ্ঠশোথ হয় তাহাকে ইংরাজীতে থ্রুস (Thrush) ও বাঙ্গালায় কোন কোন চিকিৎসক ছারু বলেন। এই রোগে মুখ মধ্যে একপ্রকার কোড়ক জন্মে। মুখে প্রথমে ছোট ছোট সাদা দাগ হয়, তাহা দেখিতে বাতির ফোটার মত। রোগীর অর বোধ, ভ্রূণা, উদরাধান, শূলব্যথা, অজীর্ণ রোগ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশু শুভ্রপান করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। চটচটে ও সবুজ ভেদ হয়। এই রোগে মধু দিবে। ২ ভাগ কার্বনেট অব সোডা ও ১ ভাগ গ্রে পাউডার নিশাইয়া দুই গ্রেন হইতে পাঁচ গ্রেন পর্যন্ত প্রত্যাহ তিনবার খাইতে দিবে। লাইম ওয়াটার, বিস্মথ, চক্ ইত্যাদিও উপকারক।

হোমিওপ্যাথিতে—নরম ফুলি দিয়া বোয়্যার বাহা প্রয়োগ করিবে। অধিক পরিমাণে কক নির্গত হইলে অথবা দ্রুত হইলে মার্জুরিয়াস, পরে সাপ্‌কার দিবসে ও রাতে খাওয়াইবে। অধিক দুধ তুলিলে বা অল্প হইলে পলস্যাটলা বা নক্স দিবে। রোগ কঠিন হইয়া উঠিলে ছর কিবা দ্বার ঘণ্টা অন্তর প্রথমে আর্সেনিকম, পরে এসিড নাইট্রিক প্রয়োগ করিবে।

সাম্প্রতিক কণ্ঠশোথ (বিদারী)—এই রোগ সচরাচর শরৎকালের প্রারম্ভে দেখা দেয়, ইহা বহুবাণী ও সংক্রামক। ইহার লক্ষণ—শীত, কন্মন, তাপ, দৌর্বল্য, স্বপ্নে বেদনা, বমন, ভেদ, চক্ জলন ও আলোবুদ্ধ, ওষ্ঠ দুই রক্তবর্ণ, নাড়ী হৃদয় ও গোলাবর্ণ, জিহ্বা খেতবর্ণ। গিলিতে অতি কষ্ট বোধ, কঠ লাল হইয়া কোলে। কঠের উপর নানা আকারে

নালি বা উৎপন্ন হয়। কখন কখন ঐ নালি উপরে নালিকা এবং নীচে নলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রথম হইতে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। রোগী মধ্যে মধ্যে এলোমেলো বকে, নিশ্বাসে খারাপ গন্ধ এবং রোগী দুর্গন্ধ অনুভব করে। গলিতাবস্থা উপস্থিত হইলে কম্পন, নাড়ী দুর্বল, মুখ বসিয়া পড়ে, কঠিন ভেদ, নাক ও মুখ দিয়া রক্তপাত—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ সাক্ষাতিক জানিবে।

চিকিৎসা—এই রোগের প্রথম হইতে অধিক অন্ন হইলে দুই বটী অন্তর একোনাইট। তৎপরে বেলেডোনা। মুখে বিশদ্রাব ও দুর্গন্ধ, গাঢ় ককযুক্ত, গলগ্রাহি নালিবৃত্ত হইলে, শীতবোধ, কম্পন, মধ্যে গা পরম এবং রাত্রিতে ঘাম হইলে দুই বটী অন্তর মাকুরিয়াস। রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলে রস। এ ছাড়া সালফার, সাইলিসিয়া, আর্সেনিক, এসিড নাইটিক প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

যক্ষ্মাদন (Diphtheria)—কণ্ঠের মধ্যে স্নায়িকঝিলির উপর প্রদাহজনিত কৃত্রিম ঝিলি (False membrane) জন্মে; এই কণ্ঠরোগকে ডাক্তারেরা ডিফথিরিয়া বলেন। (অপর নাম Cynanche Maligna বা Angina Maligna)। এই রোগ ১ বর্ষ হইতে ৮ বর্ষ বয়স পর্যন্ত শিশুদিগের প্রায় হইতে দেখা যায়। বাহ্য বায়ুর দোষে, এবং শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ জন্মে। কৃত্রিম ঝিলি গলগ্রাহি বা তালুতে প্রথমে উৎপন্ন হয়; কখন ডাদুমূলে, কখন খাসনলী (Larynx and Trachea) পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। খাসনলীতে এই রোগ জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য।

লক্ষণ—কণ্ঠের ভিতরে স্নায়িক ঝিলি ফুলা ও রক্তবর্ণ দেখায়। সহজ পীড়িতে অন্ন, গলায় অন্ন বেদনা, শ্রীবীর গ্রহি কিছু ফুলিয়া উঠে ও চোক গিলিতে কষ্ট হয়। স্বরভঙ্গ, নাসারন্ধ্রে শব্দ, অন্ন অন্ন খাস ও হইয়া থাকে। জ্বপিশু অসাড় হইলে সহজেই মৃত্যু ঘটতে পারে। কণ্ঠের স্থানবিশেষ আক্রমণকালে রোগের লক্ষণও বিভিন্ন হয়। যথা—১। নাসাযক্ষ্মাদন (Nasal Diphtheria), কোন কোন চিকিৎসকের মতে এই রোগ নাসা হইতে জন্মিয়া গলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু সচরাচর গলদেশ হইতেই নাসিকার দ্বারা হইয়া থাকে। এই রোগে খাসরোগের সম্ভাবনা, রোগী প্রায়ই বাঁচে না। ২। যাক্ষ্মাদনিক কাণ্ড (Diphtheric Croup)—এই রোগে বড়বড়ে কাণের লক্ষণ লক্ষিত হয়, ইহা সাংঘাতিক। ৩। বহিঃকক্ষ্মাদন (Cutaneous Diphtheria)—সচরাচর কণ্ঠ রোগ হইবার পর অকস্মৎ যে স্থানে কত থাকে বা ছড় হয়, উহাতে কৃত্রিম ঝিলি জন্মিতে দেখা যায়।

রোগ সহজ হইলে আট দিনের বেশী থাকে না। কঠিন হইলে ১ পক্ষ থাকে। খাসপ্রবাসের পথ বন্ধ হইলে দুই দিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা—২ ড্রাম কলিক ৬ ড্রাম চোরান জলে জ্ব করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুলি দিয়া গলায় ভিতর লাগাইবে। কেহ কেহ ট্রিং হাইড্রোক্লোরিক এসিড ১০ গুণ জলে মিশাইয়া প্রলেপ দিতে বলেন। শিশু কুলকুল করিতে জানিলে ১ ড্রাম টিক্স ফেরিমিউরিস ৪ ওঁল জলে মিশাইয়া ব্যবহার করা যায়। জ্বরের সময় ১ কোঁটা টিক্স একোনাইট ১ ওঁল জল দিয়া তাহার অর্দ্ধ ড্রাম ২ বটী অন্তর খাইতে দিবে।

হোমিওপ্যাথী—অধিক অন্ন, অবসন্নতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা ও শিরঃশীড়া থাকিলে একোনাইট, ১ বা অর্দ্ধ বটী অন্তর। কণ্ঠ ও গলগ্রাহি ঘোর লাল, ফুলার চারিদিকে বিজ-কুড়ি হইলে এবং গলা হইতে শ্বেদ নির্গত হইলে, গন্ধযুক্ত কক জন্মিলে মাকুরিয়াস, ১ বটী অন্তর। এ ছাড়া আর্সেনিক, হাইড্রোটিক্স প্রয়োগ করা যায়।

কণ্ঠগুণ্ডী (জী) তালুগত মুখরোগ বিশেষ;—দূষিত কফ ও রক্ত তালুগলে দীর্ঘাকৃতি অথচ বায়ুপূর্ণ ভিত্তির দ্বারা যে শোথ উৎপাদন করে, তাহার নাম কণ্ঠগুণ্ডী। এই রোগে পিপাসা, কাস ও খাস উপস্থিত হয়। কণ্ঠগুণ্ডী, গলগুণ্ডী ও তালুগুণ্ডী প্রভৃতি ইহার নামান্তর দৃষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ।)

চিকিৎসা—১। গলগুণ্ডীরোগে শোথ ছেদন করিয়া, ত্রিকটু, বচ, মধু ও গৈলব, অথবা কুড়, মরিচ, নৈঋতলবণ, পিপুল, আকনাদি ও গুগগুলু এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ২। উক্ত ঔষধ সকল স্তনসহ ঘর্ষণ করিবে এবং নাসিকার সমীপ-বর্তী স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। ৩। সিউলী গাছের মূল চর্ষণ করিলে গলগুণ্ডী রোগ বিনষ্ট হয়। ৪। আতইচ, আকনাদি, রাঙ্গা, কটকী ও নিমছাল এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া কবল করিলে গলগুণ্ডী নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কণ্ঠসজ্জন (জী) কণ্ঠে সজ্জন ৭৩২। কণ্ঠে লগ্ন হইয়া আলিঙ্গন।

কণ্ঠসূত্র (জী) কণ্ঠে সূত্রইব উপনিম্ন। ১। বাল্য। ২। আলিঙ্গন বিশেষ।

“বৎ কুরুতে বক্ষসি বস্ত্রতত্ত্ব স্তন্যভিঘাতঃ নিবিড়োপঘাতাৎ।

পরিশ্রমার্হাঃ সনকৈর্বিনধ্যাতবৎকণ্ঠসূত্রং প্রবক্ষ্যতি তত্ত্বজ্ঞাঃ।”

রতিশাস্ত্র।

কণ্ঠস্থ (জি) কণ্ঠে ভিত্তি, কণ্ঠে-হা-ক। মুখের, বাহ্য অত্যন্ত অজ্ঞান করা হইয়াছে।

কঠস্থানী। চন্দ্রবীণের অন্তর্গত একটি প্রাচীন মহাগ্রাম।
(ব্রহ্মখণ্ড ১৩।১৬) [চন্দ্রবীণ দেখ।]

কঠা (দেশজ) ১ কঠদেশ হাঁড়। ২ মৎস্তের কঠদেশ।

কঠাগত (জি) কঠে আগতঃ, ৭৩৭। বহির্গমনোদ্ভূত,
কঠে উপস্থিত।

“পঞ্চগ্রাণ কঠাগত হল তার আদি।

বিধাতা কাতর দেখি প্রভু ব্রহ্মরশি।”

হৃদ্যীভাম—গোবিন্দমঃ ৬১।

কঠামি (পুং) কঠে কঠাত্মক অগ্নিঃ পাচকার্ষিকত,
বহত্রী। পক্ষী, ইহাঁদের আহার গলাধঃকরণ হইলেই
পরিণাক হইয়া যায়।

কঠাভরণ (স্ত্রী) কঠে ধারণ্য আবরণম্, মধ্যপদলো।। গল-
দেশের অলঙ্কার।

কঠার। বর্গভূমির উত্তরস্থিত একটি মহাগ্রাম। ত্রিবিবাক্ত
ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—“হুর্গা হুর্গাহুয়ের মতক ছেদন করিয়া
পাদাভূত হারা তাহার কঠ এইখানে নিক্ষেপ করেন। হুর্গা-
হুয়ের কঠ এখানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম
কঠার হয়। কলিকালে এখানে ভূমিহার ও রাজপুত জাতিরা
বাস করিবে। রাজপুত জাতির সহিত যবনদিগের যুদ্ধ হইবে।
কঠারবাসীরা গ্রামে আগুন লাগাইয়া পলায়ন করিবে।”

(ব্রহ্মখণ্ড ৫৬।৩৯-৪১)

কঠাল (পুং) কঠি-আলচ্। ১ ওল। ২ যুদ্ধ। ৩ নৌকা। ৪
খন্ড। ৫ উটু। ৬ গুণ, দক্ষিণেশব। ৭ বৃক্ষবিশেষ।

কঠালা (স্ত্রী) কঠাল-টাপ্। ১ জালের দড়ী। ২ বায়ুনহাটী।
(শকাঙ্কি)। দ্রোণিবিশেষ। (কঠালা তু বমোদ্রোণীপ্রভেদে
না ক্রমেলকে। মেনিনী।)

কঠিকা (স্ত্রী) কঠো ভূব্যতরা অন্ত্যভাঃ, কঠ-ঠন্-টাপ্।
কঠাতরণবিশেষ, একনরী মালা। (হার্য যন্তিভেলা-
দেকাবল্যেকবটিকা, কঠিকাপি। হেম ৩।৩২৬।)

কঠী (স্ত্রী) কঠ-অম্বাধে ভীপ্। ১ গলদেশ। ২ অশ্বের
গলবেষ্টন করিবাস চন্দ্রদড়ী প্রভৃতি।

কঠীধারী (দেশজ) ১ মালাধারী। ২ হিন্দু। ৩ বৈষ্ণব।

কঠীরব (পুং) কঠাং রবো বস্ত, বহত্রী। ১ সিংহ। ২ মত-
হতী। ৩ পায়রা, কপোত।

কঠীরবী (স্ত্রী) কঠীরব-ভীব্। বাসকবৃক্ষ। [বাসক দেখ।]

কঠীল (পুং) [কঠাল দেখ।]

কঠেকাল (পুং) কঠে কালঃ বিধপানভো নীলিমা বস্ত
অনুকসমা। মহাদেব। (কঠেকালঃ শকরা নীলকঠঃ
ঐকঠোদ্রো বৃষ্টি ভীমভগো। হেম ২।১৯৯।)

কঠ্য (জি) কঠে কভঃ, কঠ-শরীরাবধবাবৎ বৎ (যতোহিনাবঃ।
পা ৬।১।২১৩।) ১ গলদেশজাত। ২ কঠ হইতে উদ্ভা-
রিত বর্ণ সকল। ৩। অকুহবিগর্জনীয়াসি কঠঃ। সিং কো।
অ আ অ ক খ গ ঘ ঙ হ এই করেকটি বর্ণকে কঠ্যবর্ণ কহে।
৩ কঠ্য কঠবরার হিতম্, বৎ। কঠবরের উপকারী।

(যবকোলকুলখানিঃ যুবঃ কঠ্যোহিনিলাপহঃ। হুপ্রভ।)

কঠ্যবর্ণ (পুং) কঠ্যন্ত্যসৌ বর্ণশ্চেতি কঠ্যবা। অ আ অ ক
খ গ ঘ ঙ হ এই করেকটি কঠ্যবর্ণ।

কণ্ডন (স্ত্রী) কড়ি ভাবে লুট্ ইদিবাৎ মূম্। ১ চাউল নির্মল
করা, কাড়া। ২ (কর্ণশি লুট্) চাউল হইতে যে অপরিষ্কার
গুঁড়া বাহির করা হয়, কুঁড়ো।

(“ক্রিমাং কুর্ধ্যাৎ ভিষক্ পশ্চাৎ শালীতপ্পলকণ্ডনৈঃ।” হুপ্রভ।)

কণ্ডনী (স্ত্রী) কণ্ডাতে ভূবাদিরপনীরতে অনরা, কড়ি-করণে
লুট্, ইদিবাৎ মূম্। উদ্বল, উখলি।

কণ্ডরা (স্ত্রী) কড়ি অরন্ ইদিবাৎ মূম্ টাণ্ চ। ১ মহানাড়ী।
২ মহাদায়ু। মহর্ষি হুপ্রভমতে—সর্বাঙ্গে ১৬টি কণ্ডরা
আছে; তন্মধ্যে হস্তে ৪, পদে ৪, গ্রীবাংশে ৪ ও পৃষ্ঠদেশে
৪। এই সকল কণ্ডরা হারা শরীর আকুল ও প্রসারণ
করিতে পারা যায়। হস্ত ও পদগত কণ্ডরার প্রেরোহ বা
প্রোত্তসীমা নথ, গ্রীবা ও হৃদয়বন্ধনীর অধোগত কণ্ডরাগণের
প্রেরোহ মেট্র, পৃষ্ঠনিবন্ধ কণ্ডরাগণের প্রেরোহ নিভব, মন্তক,
উরু, বক্ষ, অক্ষ ও ত্তনপিণ্ড। (ভাবপ্রকাশ।)

বাহুপৃষ্ঠ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যে সকল কণ্ডরা আছে,
তাহা বাতপীড়িত হইলে বাহুঘরের কার্য্য বিনষ্ট হয়, এই
রোগের নাম বিখাটী।

কণ্ডরীক (পুং) সপ্তজাতিস্বর মধ্যে বিপ্রবিশেষ। (হরিবংশ)

কণ্ডামি (পুং) পক্ষী।

কণ্ডানক (পুং) মহাদেবের অমুচর।

কণ্ডিকা (স্ত্রী) কড়ি-বুল্-টাপ্। বেদের একদেশ, অধ্যায়
প্রাপঠক প্রভৃতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বাক্যসমূহ।

কথু (পুং) ধূম্রবিশেষ, ইহাঁর পিতার নাম কত। বিষ্ণু-
পুরাণে লিখিত আছে—কোন সময়ে কতুদুমি গোমতী
তীরে উৎকট ভপতা আরম্ভ করেন, ইহা তাহাতে ভীত
হইয়া প্রয়োচ নারী অনুরাকে তাঁহার ভপোভয়ের লজ
পাঠাইয়া দেন। দুনিও তাহার রূপলাবণ্য এবং হাবভাব
দর্শনে বিমোহিত হইয়া ভপতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুকাল
তাহার সহিত একজুে অভিযাহিত করিলেন। বহুকাল পরে
একদিন সন্ধ্যাকালে কতু সন্ধ্যাবন্দনা করিতে ইচ্ছা করিলেন,
প্রয়োচা তাহার কথা শুনিয়া উপহাস করিয়া উঠিল।

ভাষাতে তাঁহার মোহ বিদূষিত হইল, তিনি পুনর্বার
পুরুষোত্তমে উর্দ্ধবাহ হইয়া তপতা দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন।
২ (জী) কণ্ঠহতি শরীর, কণ্ঠ-কু (মৃগবাদরশ্চ। উণ্
১। ৩৮।) একপ্রকার চুলকানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ।
[চুলকণা দেখ।]

কণ্ঠক (পুং) কণ্ঠ-কন্। ১ কণ্ঠক। ২ কণ্ঠ।

কণ্ঠর (পুং) কণ্ঠঃ রাস্তি দদাতি, কণ্ঠ-রা-ক- (আতোহুপ-
সর্গে। পা ৩। ২। ৩।) প্ৰবোধনাদিবাৎ হ্রস্বঃ। ১ করলা
লতা। ২ কুম্বর তৃণ।

কণ্ঠরা (জী) কণ্ঠর-টাণ্। ১ শুকশিখী, আলকুশী। ২ অত্যঙ্গণী।
কণ্ঠ (জী) কণ্ঠ-সম্পাদাদিবাৎ কিপ্, অলোপো যলোপশ্চ।
১ চুলকানি। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত-
পর্যায়,—ধৰ্ম্ম, কণ্ঠরা, কণ্ঠতি ও কণ্ঠন।

চিকিৎসা,—দুর্গা ও হরিত্রা একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ
দিলে কণ্ঠ, পামা, দক্ষ, শীতপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

গুণাফল (কুঁচ) ও ভূজরাজের রসের সহিত তৈল পাক
করিয়া, সেই তৈল অভ্যঙ্গে কণ্ঠ, দারুণ, কুষ্ঠ ও কাপাল রোগ
বিনষ্ট হয়। হরিত্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ এই রোগের বিশেষ
উপকারী। [হরিত্রাখণ্ড দেখ।]

কণ্ঠক (জী) কণ্ঠ-স্বার্থে কন্। কণ্ঠ।

কণ্ঠকরী (জী) কণ্ঠঃ করোতি, কণ্ঠ-ক-ট-ডীপ্। শুকশিখী,
আলকুশী।

কণ্ঠয় (পুং) কণ্ঠঃ হতি, কণ্ঠ-হ-ন-টক্। ১ আরথ, সৌদাম্।
২ খেত সর্পণ।

কণ্ঠয়বর্গ (পুং) কণ্ঠয়ানাং বর্গঃ সমূহঃ, ৬তং। চন্দন, বেণা-
মূল, সৌদাল, করঞ্জ, নিষ, কুটজ, সর্ষপ, মোল, দারুহরিত্রা ও
মুখা, এই দশটি কণ্ঠয়বর্গ। (চরক।)

কণ্ঠতি (জী) কণ্ঠ-ভাবে ক্তিন্, অলোপো যলোপশ্চ। কণ্ঠ-
রন, চুলকান।

(“হুভগ! স্বংকথারস্তে কর্ণে কণ্ঠতি লালসা।” সাহিত্যদ্যং।)

কণ্ঠমুকা (জী) কীটবিশেষ। এই কীট সংশন করিলে
রোগীর অঙ্গ পীতবর্ণ, বমন, অতিসার প্রভৃতি হইয়া প্রাণনাশ
ঘটিয়া থাকে।

কণ্ঠয়ন (জী) কণ্ঠ-ভাবে ল্যট্। ১ চুলকান। ২ চুলকণা।

(“যৈশ্চৈধুনাদি গৃহমেধি অথং হি তুচ্ছং

কণ্ঠয়নেন করোয়িষ হ্রস্বঃখন্।” ভাগবত ৭। ২। ৫৫।)

(বৈদিক) ৩ বৌদ্ধিজদিগের চুলকাইবার অস্ত্র ব্যব্যবিশেষ,
ককশূক; নামে কণ্ঠ উপস্থিত হইলে তাঁহার ঐ শূকের দ্বারা
চুলকাইয়া থাকেন। (কক।)

কণ্ঠয়নক (জী) কণ্ঠয়ন-স্বার্থে কন্। কণ্ঠয়ন।

কণ্ঠয়নী (জী) কণ্ঠয়ন-ভীষ। ককশূক।

কণ্ঠয়া (জী) কণ্ঠ-যক্ (কণ্ঠ্যদিত্যো যক্। পা। ৩। ৩।
১০২।) অ-টীপ্। কণ্ঠ। (কণ্ঠয়নক কণ্ঠরা কণ্ঠস্বার্থে।
শকাহি।)

কণ্ঠরা (জী) কণ্ঠঃ রাস্তি, কণ্ঠ-রা-ক-টাণ্। আলকুশী।
(কণ্ঠরারী শুকশিখ্যাম্। শকাহি।)

কণ্ঠল (পুং) কণ্ঠ-অন্ত্যর্থ লট্। ১ কণ্ঠকারক ওল প্রভৃতি।
(জি) ২ কণ্ঠযুক্ত।

কণ্ঠোল (পুং) কডি বাহুলকাৎ ওলট্। ১ মল বাঁশ প্রভৃতি
নির্মিত ধান্যাদির রাখিবার পাত্রবিশেষ, ডোল। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—পিট, পিটক ও পেটক। ২ উল্লী। ৩ গুজ-
রাটের থান জেলাস্থ একটি পাহাড়, এখানে অতি প্রাচীন দেব-
মন্দির আছে। কণ্ঠোল সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে—

“ধান কণ্ঠোলা মাগুবা নবসে বাব কুবা।

মাগা পেলা রাজীবা থান বাবরীয়া হুবা।”

কণ্ঠোলক (পুং) কণ্ঠোল-স্বার্থে কন্। কণ্ঠোল। (হেম ৪। ৮৩।)

কণ্ঠোলবীণা (জী) কণ্ঠোল ইব বীণা, কণ্ঠোলয়া বীণা বা।
চণ্ডালদিগের বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম কৈদড়া
সংস্কৃত পর্যায়—চাণ্ডালিকা, চণ্ডালবল্লকী, চণ্ডালিকা ও
কটোলবীণা।

কণ্ঠোলী (জী) কণ্ঠোলভবনাকারোহন্ত্যভ্যঃ, কণ্ঠোল-
অৰ্শ আদিবাৎ অচ্-ভীষ। কণ্ঠোলবীণা।

কণ্ঠোষ (পুং) কণ্ঠঃ ঔষঃ সমূহো যন্মাৎ। শুককীট, শূরা-
পোকা। এই পোকাশ্পর্শে প্রথমতঃ কণ্ঠ উৎপন্ন হইয়া, পরে
তাঁহা পাকিয়া উঠে। [শুককীট দেখ।]

কণ্ঠ (জী) কণ্ঠাতে অপোদ্যতে, কণ-বন্। ১ পান। ২
ভূতমোনিবিশেষ। ৩ মুনিবিশেষ, ইনি ঘোরপুত্র ও অভিরণ
গোত্রসম্বৃত। ঋকসংহিতার অষ্টম অষ্টক ইহার নামে প্রসিদ্ধ।
ইনি যজুর্বেদীয় কণ্ঠাখার প্রবর্তক।

বেদে আরও কয়েকজন কণ্ঠের নাম পাওয়া যায়; যথা—
কণ্ঠার্বদ, কণ্ঠশ্রিয়, কণ্ঠকান্তপ। ইহার সকলেই কণ্ঠবংশীয়।
মেনকা-পরিভাষ্য পুস্তকলা সম্ভবতঃ কণ্ঠকান্তপ কর্তৃক
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

মহাভারত টীকাকার নীলকণ্ঠ কণ্ঠ নামের এইরূপ অর্থ
করিতাহেন,—“কণ্ঠঃ স্তম্ভময়ঃ তদ্বদিত্যপ্রোভাবাৎ স্তম্ভঃ
সংসারজন্মা স্তম্ভময়ঃ নহি তদ্বজ্ঞানিনাং কচিৎ সংসারানন্তিকঃ
অবিদ্যাধর্ম্মাভাবাৎ।” কণ্ঠ অর্থাৎ তদ্বদিত্য প্রোভাবে স্তম্ভময়,
তদ্বজ্ঞানিবিশেষ অবিদ্যা অভাব প্রভৃতি সংসারে কোনরূপ

আসক্তি নাই, স্বভাব সংসার জন্য সুখময় মনেন।
৪ পুরুষাঙ্গীর রাজবিশেষ, ভগবতাবলে ইনিও মুনি হইরা-
ছিলেন। রাজবিশেষ, প্রতিরোধের পুত্র ও মেধাভিধির
শিতা। মভান্তরে অজমীতের পুত্র। ৫ ধর্মশাস্ত্রকার মুনি-
বিশেষ। (ত্রি) ৬ বধির।

৭ ভীষ্মবিশেষ, (ভারত ৩।৮২।৪৪।) (ত্রি) ৮ বিদ্যাক্রিয়া-
কুশল। ৯ মেধাবী। ১০ ভক্তিকারক। ১১ ভবনীর, বাহ্যকে
ভব করা হয়।

কণুরধস্তর (ক্লী) কধেন গীতং রথস্তরম্, মধ্যপদলো। সাম
গানবিশেষ।

কণুস্তূতা (স্ত্রী) কথত প্রতাপালিতা স্তূতা। শকুন্তলা।
একদা বিখ্যামিত্রের উগ্রতপস্তার ভীত হইরা দেবরাজ ইজ
তাহার তপোবিষ্মের জন্য যেনকা নারী অপসারকে পাঠা-
ইরা দেন। বিখ্যামিত্র তাহার রূপলাবণ্যাদি দর্শনে বিমো-
হিত হইয়া তদুপরে একটি কন্যা উৎপাদন করিলেন।
যেনকা সেই সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে বন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া
বনাশ্রমে চলিয়া যায়। দৈববশে কণুমুনি সেই কন্যাটিকে
দেখিতে পাইলেন এবং দরদ্রচিত্তে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন
করিয়া, তনয়র ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন।
[শকুন্তলা দেখ।]

কণাপ্রম (পুং) কথত আশ্রমঃ, ভতং। ১ কণুমুনির আশ্রম,
এই আশ্রম মালিনীনদীতীরে অবস্থিত; এই স্থান আদি
ধর্মারণ্য বলিয়া বিখ্যাত, এখানে প্রবেশ মাত্রেই সমস্ত পাপ
বিদূরিত হইরা থাকে। (ভারত)। ২ কোটার দক্ষিণে চবল
নদীর নিকট একটি কণাপ্রম আছে। এই আশ্রমের নিকট
মৌর্যবংশীয় শিবগণরাজের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

কণুমুতি (স্ত্রী) কধেন প্রগীতা স্তুতিঃ, মধ্যপদলো। তরু-
বজুর্কেন হইতে কণুমুনি লংগুহীত ধর্মশাস্ত্রবিশেষ।

কং (অব্য) ১ কৈবং, অন্ন। ২ কুংসিতা। ৩ কাথ।
(আরব্য) ৪ বধির।

কত (পুং) কং জলং শুভ্রং তনোতি, ক-তন্ ড। ১ নির্মলী
রক্ত। ২ মুনিবিশেষ, বিখ্যামিত্রের একভর পুত্র। ৩ (দেশজ)
কি পরিমাণ। ৪ অধিক পরিমাণ।

কতক (পুং) তক্ হালে বাহলকাৎ ব; কত জলত তকঃ
হাসঃ প্রকাশোৎসাহঃ। ১ রক্তবিশেষ, ইহার সংস্কৃত পর্যায়—
অমুগ্রাসাদ, কত, তিক্তকল, কচা, ছেদনীর, শুদ্ধকল, কতকল
ও তিক্তমরিচ। এই গাছ বহু নির্মলী, উত্তরপশ্চিমে
নির্মল বা নির্মলী, উৎকলে কতোক, তৈলঙ্গে কতকম্বু,
ইন্দুপুতে, অথবা চিন্ন; তামিল ভাষায় কতকম্বু বা

ভেজকোভে, দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে চিলবিজ এবং
সিংহলে ইজিবি বলে। (Strychnos potatorum)

অতি পূর্বকাল হইতে এই গাছ ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ।
আমাদের পূর্বজন ঋষিগণ ইহার কল দ্বারা জলসংশোধন
করিয়া লইতেন। [বৃহত বৃহদ্বান ৫৫ অঃ দেখ।] ভগ-
বান্ মহু সিধিরাছেন—

“কলং কতকবৃক্ষস্য বদ্যপ্যমুগ্রাসাদকম্।

ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি ॥” মহু ৬।৬৭।

কতকের কল জলে দিলেই জল পরিষ্কার হয়, কিন্তু
তাহার নাম গ্রহণ করিলেই জল বদ্ব হয় না।

এই গাছ ভারতের পার্শ্বভা প্রদেশে, বাংলাদেশ,
দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে কোন কোন স্থানে জন্মে। এক একটি
৩০ ফিট হইতে ৬০ ফিট পর্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠে তক্তা
হয়, তাহাতে গৃহস্থের আবাসিক মত বহুবিধ জিনিস প্রস্তুত
হইরা থাকে।

কতকের কল দেখিতে বাদামী, এক একটি আধ ইঞ্চি বড়,
পাকিলে কাল হয়। ইহার বহুল পরিভািত ধূসর বর্ণ, রেসমের
মত পরিষ্কার রৌএ আছে। ইহার খেতসার আশ্রয়নহীন।

রাজনিষ্ঠের মতে কতকের গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ,
চক্ষুহিতকর, কটিকর এবং কৃমিদোষ ও শূলদোষনাশক।
বীজের গুণ জলনির্মলকারী।

ভাবপ্রকাশ মতে, ফলের গুণ—জলপরিষ্কারক, মেত্রের
হিতকারী; বায়ু ও স্নেহনাশক, শীতল, মধুর, শুষ্ক ও কষায়।
চক্রদত্ত বলেন, চক্ষু হইতে জলপড়া নিবারণ এবং দৃষ্টিশক্তি
বৃদ্ধি করিতে হইলে নির্মলী মধু ও কপূরের সহিত বহিরা
প্রয়োগ করিবে।

মুসলমান চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ—শীতল ও
শুক, পেটের উপর ব্যবহার করিলে পেটব্যথা ভাল হয়,
ইহা চক্ষুর হিতকর এবং সর্পবিষহর। তালিক-ই-সরিকী
নামক পারস্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—মেহ ও মূত্রাশয়ের সম্বন্ধীয়
কোনপ্রকার পীড়ার নির্মলী বিশেষ উপকারী।

তামিল বৈদ্যদিগের মতে পক ফলের শুড়া বদনকারক।
কার্কাটিক সাহেব লিখিয়াছেন, নির্মলী মূত্রকৃচ্ছ-
রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

বুদ্ধবাজাফালে ঐকল সেদামিগের কাছে রাখা ভাল,
কারণ পথে কোনরূপ ময়লা জল পাইলে, তাহা নির্মলী
দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়। জল পরিষ্কার হয় বলিয়া
ইংরাজেরা ইহার নাম দিয়াছেন ক্লিয়ারিং নাট (Clearing
nut),

২ রামায়ণের একখানি প্রাচীন টীকা। রামায়ণ প্রকৃতি রামায়ণের টীকাকারগণ স্ব টীকার কতকের উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ণনের মতে, কতক সম্ভবতঃ খৃঃ চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু অপর টীকাকারদিগের উক্তি অনুসারে কতকটীকাকার ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক হওয়াই সম্ভব। কতকটীকাকার গ্রন্থের কালহস্তিকের অব্যবহৃত করিয়াছেন, ইহাতে অনেকটা অনুমান হয় যে তিনি দক্ষিণদেশবাসী।

৩ কুচিলা। (কতকঃ কুচিলা খ্যাতে নির্মাণাধ্যক্ষলক্ষ্মে।

শব্দাঙ্কি।) ৪ (দেশজ) কতিপয়, কিছুপরিমাণ।

কতচেতা (পুং) মুনিবিশেষের নাম।

কতদ্রোণ (পুং) সিদ্ধরাজ্যের অন্তর্গত নগরবিশেষ।

কতফল (পুং) কতং জলপ্রসাদকং ফলমস্য, বহুব্রী। ১ নির্মলীবৃক্ষ। ২ (কর্মধা) নির্মলীকল।

কতম (ত্রি) কিম্-ভতমচ্। বহুপদার্থের মধ্যে কোন একটি পদার্থ।

কতমাল (পুং) কস্য জলস্য তমায় শোষণায় অলতি পর্যাপ্নোতি, ক-তম-অল্-অচ্। অগ্নি; ইহার পাঠান্তর কচমাল ও খচমাল।

কতয় (ত্রি) কিম্-ভতয়চ্। দুইটি পদার্থের মধ্যে কোন একটি। (যদ্যনমজসিভদা কতরোবরন্তে। সৈবধ।)

কতি (ত্রি) কা সংখ্যা পরিমাণং এবাম্, কিম্-ভতি (কিমঃ সংখ্যাপরিমাণে ভতিচ। পা ৫।২।৪১।) ১ কি পরিমাণ, কত। ২ বিখ্যামিত্রের একতম পুত্র।

কতিচিৎ (অব্য) কতি-চিৎ। কতকগুলি, অনির্দিষ্ট পরিমাণ।

কতিধ (ত্রি) কতি-পূরণে ভট্, ধৃচ্চ (বট্-কতি-কতিপয়-চতুরাং ধৃচ্। পা ৫।২।৫১।) কতিপয়, কতসংখ্যার পূরণ।

কতিধা (অব্যয়) কতি-বিধার্থে ধা। কতপ্রকার, কতরূপ।

কতিপয় (ত্রি) কতি-অয়ক্-পৃচ্চ। কতকগুলি, কিছু।

কতিবিধ (ত্রি) কতিঃ বিধা প্রকারোহস্য, বহুব্রী। কত-প্রকার, কতরূপ।

কতিরা (লা)। হিমালয় ও পারস্যাদি দেশজাত সাদা বৃক্ষ-নির্বাণ। গাঁদের মত, জলে ডিজাইলে বৃদ্ধি হয়। ইহার গুণ—শীতল, বাতনাশক, মুত্রকৃচ্ছ ও বিবিধ মেহরোগনাশক।

কতিশঃ (অব্য) কতি-বীণার্থে শন্ (সংখ্যৈকবচনাক্ বীণারাম্। পা ৫।৪।৪৪) কত কত।

কতীমুখ (স্ত্রী) অগ্রহীরের নাম।

কতেক (দেশজ) কতিপয়, কয়েক।

কতেহার। মোহিলখণ্ডের পূর্বাংশের প্রাচীন নাম।

কৎকৎ (দেশজ) হুঃথে বা শোকে বুক খড় খড় করা।

কতৃণ (স্ত্রী) কু কুংসিতং তৃণং, কোঃ কদাশৈশ্বঃ (তৃণে চ জাতৌ। পা ৬।৩।১০৩।) ১ অগ্নিক তৃণবিশেষ, গন্ধতৃণ, বাহ্মাণ্য রামকপূর ও হিন্দীতে সৌধিয়া বা রোহিব কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—পোর, সৌন্দিক, ধ্যাম, দেবজঙ্ঘক, রোহিব, অগ্নিক, তৃণশীত, স্মশীতল, রোহিবতৃণ, কাতৃণ, ভূতি, ভূতিক, শ্রামক, ধ্যামক, পুতি, মুদগল ও দেবদঙ্ঘক। ভাব-প্রকাশের মতে ইহার গুণ—কটুপাক, তিক্ত ও কষায় রস, হ্রোণ, কঠরোগ, পিত্ত, রক্ত, শূল, কাস ও জরনাশক। রাজ-নির্ধেটের মতে কটু ও তিক্ত রস; ককদোষ, শল্ল ও শল্যাণোষ এবং বালকদিগের গ্রহদোষ নিবারক। ২ পুন্নিপনী, চাকুলে। (কতৃণং তৃণভিৎপুষ্যাঃ। মেদিনী।)

কতোয় (স্ত্রী) কু কুংসিতং তোয়ং যজ, বহুব্রী। মদ্য। (কতোয়মপিমদ্যকে। শব্দাঙ্কি।)

কত্রি (ত্রি) কুংসিতাশ্রয়ঃ, (জ্যোচ। পা ৬।৩।১০১। বার্তিক।) কুংসিত তিনটি পদার্থ।

কত্র্যাদি (পুং) পাণিনি উক্ত জাতাদি অর্থে চক্ৰে প্রত্যয়ের জন্য শব্দসমূহ। কত্রি, উত্তি, পুঙ্কল, মোদব, কুত্তী, কুত্তিন, নগরী, মাংসতী, বমতী, উথ্যা ও গ্রাম, এই কয়েকটি শব্দ কত্র্যাদিগণের অন্তর্ভূত।

কৎপয় (স্ত্রী) কৎ সুখকরং পরোহস্ত বহুব্রী। ১ সুখকর জলাশয়। ২ (কর্মধা) সুখকর জল।

কংলু খাঁ, (কুংলু খাঁ)—একজন লোহানি আকগান। কংলু খাঁর সময় বঙ্গে মোগলবিজ্রোহ ঘটে। এই সুযোগে (১৫৮০ খৃঃ) কংলু পাঠানসৈন্য সংগ্রহ করিয়া উড়িষ্যা আধিকার করেন। ক্রমে কংলু খাঁর তত্ত্বাবধানে চারিদিক হইতে পাঠান সৈন্যগণ আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কংলু তাঁহাদিগের সাহায্যে সলিমাবাদে লাভগীর শাসনকর্তা মির্জানজাৎকে পরাস্ত করিয়া মেদিনীপুর, বসন্তপুর এমন কি দামোদর নদীর দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত জয় করিলেন। এই সময় সম্রাট অকবর মির্জা আদীলকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কংলুর কাছে পরাস্ত হন। ১৫৮৩ খৃঃ মোগলসারীর নিকট দামোদর নদীর তীরে মোগলপাঠানে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সাদিক খাঁ ও শাহজুলী মহরম কংলুকে হারাইয়া দেন। ১৫৮৩ খৃঃ, অকবরের কর্মচারীর সঙ্গে কংলু খাঁর সন্ধি হয়, তদনুসারে কংলু উড়িষ্যা আগম দখলে রাখিতে পাইলেন। কিন্তু সম্রাট অকবর সেই সন্ধি অগ্রাহ করিলেন। কংলুকে শাসন করি-

যার জন্ত মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন। ধরপুরের নিকট যুদ্ধ বাধিল। কংলু সম্রাটের সৈন্যদলকে পরাজয় ও বিক্ষুব্ধ অধিকার করিলেন, এই সময়ে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিপদ হস্তে বন্দী হইলেন। কিছুদিন পরেই কংলুখান মৃত্যু হইল। কংলু প্রধান উজীর ইসা খাঁ মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া জগৎসিংহকে ছাড়িয়া দেন।

কংসবর (কী) কংস-বৃ-অপ্। স্বক্। (কীবে কংসবরঃ মতং স্বক্। শকাঙ্কি।)

কথং (অব্য) কেন প্রকারেণ, কিম্-ধ্ম (কিমশ্চ। পা ৫।৩।২৫।) ক্রিপে।

(“কথং যুত্যাঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদ্যাম্ প্রভো।” ম ৫।২।)

কথক (পং) কথয়তীতি, কথ-কর্তৃরি-ধূল্। ১ বক্তা। ২ যাহারা পৌরাণিক কথা কহিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ৩ নাটকের বর্ণনাকারী। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—একনট ও কথাপ্রাণ। ৪ গ্রন্থকর্তা বিশেষ।

(“বাহ্যাক্রমাদান্যনিয়মচ্যুতোহপি কথকৈকরূপাধিকরূপাভ্যাঃ।”

অনু চিন্তা।)

কথকতা (কী) কথক-তল-টাণ্। ১ বাক্যালাপ। ২ ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা।

কথকতা বলিলে এদেশে কথককর্তৃক পুরাণাদি ধর্ম-শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যানাদিবর্ণনা বুঝাইয়া থাকে।

কথকতা পাঠ (পারায়ণ) হইতে বিভিন্ন। [পাঠ ও পারায়ণ দেখ।] পাঠকার্য্য প্রাতঃকালে কর্তব্য। কিন্তু কথকতা বৈকালে হইয়া থাকে।

কথকতার সৃষ্টি হইবার কারণ কি?—এদেশের জন-সাধারণ প্রায়ই প্রাতঃকালে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, বিশেষতঃ সংস্কৃতভাষার পাঠ হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বোধগম্য হয় না; কিন্তু কথকতা তেমন নয়, ইহাতে আড়ম্বর চাই, বিলম্ব নহে, সঙ্গীতবিদ্যা জানা চাই, বিশেষতঃ লোকের সহজেই মনস্তৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। কথকতা দেশীয় সরল ভাষায় হইয়া থাকে, সুতরাং সহজেই সাধারণের ভাল লাগে। মিষ্ট কথায় সাধারণকে ধর্মোপদেশ দিবার পক্ষে ইহা এক সহজ উপায়। যে কোন শ্রেণীর লোক হউক না কেন, কথকতা সকলেরই প্রিয়। কথকের তেমন গুণ থাকিলে সাধারণে সহজেই আকৃষ্ট হয়। এখন বাঙ্গালার বহু কথকতা চলিত আছে, তাহা বেশীদিনের নয়, বড় জোর শতাধিক বর্ষ হইতে পারে।

এখন বঙ্গদেশে যে এরাণীতে কথকতা হইয়া থাকে, হই

ব্যক্তি ভাষার প্রবর্তক, সেই হইলেই নাম গদাধর ও রামধন শিরোমণি। গদাধর শিরোমণি বর্তমান জেলায় সোণামুখী গ্রামে বাস করিতেন, রাঢ় অঞ্চলের কথকেরা তাঁহার শিষ্য অথবা প্রশিষ্য, সকলেই প্রায় তাঁহার রচিত ‘সাঁট’ অনুসারে কথকতা করিয়া থাকেন।

রামধন গোবরডালা নিবাসী, তাঁহার অনেকগুলি খ্যাত-নামা শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরশি বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, ধরশির কণ্ঠ অতি মধুর, তিনি সঙ্গীত বিদ্যাও তেমন জানিতেন, কাজেই যিনি একবার তাঁহার কথকতা শুনিয়াছেন, তিনি আর ইহা নিয়ে তাঁহাকে তুলিতে পারেন নাই। ধরশির কতকগুলি শিষ্য এখনও জীবিত আছেন। কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী স্থানের কথকেরা রামধনের ‘সাঁট’ অবলম্বন করিয়া কথকতা করিয়া থাকেন।

কথকতার ‘সাঁট’কে চূর্ণী বলে। চূর্ণীতে মধ্যে মধ্যে কথকের আবৃত্ত্যকীর কতকগুলি সঙ্কেত থাকে, যথা—ভী-উ= ভীম উবাচ ইত্যাদি। চূর্ণীর মধ্যে যে সকল কথা থাকে, তাহাকে চূর্ণক বলে। চূর্ণী ছাড়া কথকে রাজিবর্ণনা, মধ্যাবর্ণনা, গ্রীষ্মবর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, দেশবর্ণনা, বেস্তা-বর্ণনা প্রভৃতি মুখস্থ রাখিতে হয়, বর্ণনার স্তম্ভ পুঁথিও থাকে। এই সকল বর্ণনার অনুপ্রাণের আড়ম্বরই অধিক। কথকতা-কালে আবৃত্ত্যক মত বর্ণনা প্ররোণ করিতে হয়।

কথকতা করিবার প্রারম্ভে বেদীতে শালগ্রামশিলা স্থাপন-পূর্ব্বক কথক বেদীতে উপবেশন করেন। প্রথমে মঙ্গলোচ্চারণপূর্ব্বক কথার সূচনা করেন। মঙ্গলোচ্চারণ সংস্কৃত-বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় এবং গীত সহযোগে হইয়া থাকে। তৎপরে কথক যে বিষয়ে কথকতা হইবে, তাহাই বলিতে থাকেন। যাহাতে সাধারণের মনঃসংযোগ হয়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখাই কথকের একান্ত কর্তব্য।

এদেশে মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত ইত্যাদির কথকতা হইয়া থাকে। যে গ্রন্থের কথা দেওয়া যায়, প্রতিদিন তাহা হইতে এক এক বিষয়ের কথা হইয়া থাকে, সেই এক এক বিষয়কে কেহ কেহ ‘পালা’ বলিয়া থাকেন; যেমন বামনভিক্ষা, দ্রবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র ইত্যাদি।

৫০।৬০ বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালার কথকতার বড় আদর ছিল। তৎকালে অনেক ভাল ভাল কথক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়কার প্রবীণলোকেরা কথকতার পক্ষপাতী ছিলেন। কি রাজা, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেই কথকতা শুনিতে ভালবাসিতেন। এখন আর কথকতার তেমন সমাদর নাই; হই এক জন ছাড়া সেসকল ভাল কথকও আর দেখা যায় না।

কথকথিক (জি) কথং কথমিতি পৃষ্টেযনাত্ত, কথং কথং বাহুলকাৎ ঠন্। প্রোঃ, যে প্রশ্ন করে।

কথকথিকা (জী) কথকথিকত ভাবঃ, কথকথিক-তল্-টপ্। প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা।

(প্রশ্নঃ পূজা হৃদয়োজনম্ কথকথিকতা। হেম ২। ১৭৭।)

কথকার (অব্য) কথং কৃ-ণমূল্। কল্পণে, কেমন করিয়া।

(“কথকারমনালয়া কীর্ষিণ্যামধিরোহতি। শিঙগালবধ।”)

কথক্কম্ (অব্য) কথং চন। ১ কোন অংশে। ২ কোনরূপে, কোন উপায়ে।

কথক্কিৎ (অব্য) কথং চিৎ। ১ কিঞ্চিৎ, কিছু। ২ কোনরূপে।

কথন (ক্ৰী) কথ-ভাবে লুট্। কথা, বাক্য।

কথনীন্ (জি) কথ-অনীন্ (তব্যত্যব্যানীরয়ঃ। প। ৩। ১। ৯৬।) বক্তব্য, বলিবার উপযুক্ত।

কথম্ (অব্য) কথিন্ প্রকারে, কিস্থং কৃ-কাদেশশ্চ (কিমশ্চ। প। ৫। ৩। ২৫।) ১ হর্ষ। ২ নিন্দা। ৩ কল্পণ। ৪ সঙ্কম। ৫ প্রশ্ন। ৬ সম্ভাবনা।

(কথম্ হর্ষে চ গর্হায়াং প্রকারার্থে চ সঙ্কমে।

প্রশ্নে সম্ভাবনার্থিক। মেদিনী।)

কথমপি (অব্য) কথক্ অপিচ, হ্ম। ১ কোন প্রকারে। ২ অতিযত্নে। ৩ অতিকটে। ৪ অতিগোঁরবে। ৫ দৃঢ়রূপে।

কথস্তাব (পুং) কথম্-ভূ-বঞ। ১ কিপ্রকার। ২ কিরূপ ভাবাপন্ন।

কথস্তূত (জি) কথম্-ভূ-ক্ত। ১ কিরূপ। ২ কিরূপে উৎপন্ন।

কথস্তিতব্য (জি) কথ-শিচ-তব্য। (তব্যত্যব্যানীরয়ঃ। প। ৩। ১। ৯৬।) বলিবারযোগ্য, বক্তব্য।

কথা (জী) কথ-অঙ- (চিতিপুজিকথিকুষ্টিচর্চিচ্চ। প। ৩। ৩। ১০৫।) টাপ্। ১ প্রবন্ধের বহুমিখা ও অল্প সত্যপূর্ণ কল্পনা। ২ নৈরাসিকগণ বিবিধ বস্ত্ত পূর্ণপক্ষ ও সিদ্ধান্ত-বিশিষ্ট বাক্যসম্বন্ধকে ‘কথা’ বলেন।

“তদ্বনির্ণয়বিজ্ঞানভিত্তমন্ত্রপযোগ্য-

ভাষাঙ্গগতবচনসম্বন্ধঃ কথা।” গৌতমবৃত্তি ১। ৪১।

পদার্থের বাথার্থ্যনিশ্চয় কিবা প্রতিপক্ষ পরাম্বয় প্রবোধক বাক্যকে কথা বলে। ভায়দর্শনের মতে কথা ত্রিবিধ—বাদ, জ্ঞন ও বিতণ্ডা। নৈরাসিকদিগের মতে, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে বাহ্যেদের কোন দোষ নাই, যিনি সাধারণ লোককর্তৃত্ব স্বীকৃত বিষয় স্বীকার করিতে কোন তর্ক কবেস না ও অকলহকারী, স্বীয় কথাতে সাধারণের বিশ্বাসোৎপাদন জন্ত বুদ্ধি প্রভৃতি বলিতে ও বস্ত্তর বাথার্থ্য নির্ণয়ে, সর্ব্ব কি বিপক্ষ

পরাম্বয় কামনাশালী ব্যক্তিই এই কথাতে একমাত্র অধি-কারী। যথা—

“কথামিকারিণস্ত তদ্বনির্ণয়বিজ্ঞানভিত্তমন্ত্রাভিলাষিণঃ সর্ক-জনসিদ্ধান্তবাপলাপিনঃ শ্রবনানিগটবঃ অকলহকারিণঃ কথোপরিকব্যাপারসমর্থঃ।” গৌতমবৃত্তি ১। ৪১।

সর্কদর্শনসংগ্রহের মতে বাদি-প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতি-পক্ষ পরিগ্রহকে ‘কথা’ বলে। যথা—

“বাদিপ্রতিবাদিনাং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ কথা।”

সর্কদর্শনং—অক্ষপাং দং।

৩ বার্তা। ৪ বাক্য। ৫ বিবরণ।

কথাক্রম (পুং) কথারাঃ ক্রমঃ প্রশঙ্গঃ, ৬তৎ। কথাপ্রসঙ্গ।

কথাদি (পুং) পাণিনি-উক্ত ঠক্ প্রত্যয়ের জন্ত শব্দগণ-বিশেষ;—কথা, বিকথা, বিশ্বকথা, সঙ্কথা, বিতণ্ডা, কুটবিদ্য, জ্ঞানবাদ, জ্ঞানবাদ, জ্ঞানবাদ, বুদ্ধিসংগ্রহ, জ্ঞান, গণ ও আত্ম-বর্ধন, এই কয়েকটি কথাদিগণের অন্তর্ভূত।

কথানক (ক্ৰীঃ) কথয়তি অজ, কথ-বাহুলকাৎ আনক্। ১ গল্প। ২ কথাবিশেষ। বেতালপক্ষবিশিষ্ট প্রভৃতি কথা গ্রন্থকে কথানক কহে।

কথান্তর (ক্ৰী) কথারা অন্তরং অবকাশঃ। ১ কথাবসর। ২ অজকথা। ৩ কলহ।

কথানীঠ (জী) কথারাঃ নীঠমিব, উপমি। কথাপ্রস্তাব নুচক প্রস্তাবনা।

কথাপ্রবন্ধ (পুং) কথারাঃ প্রবন্ধঃ ৬তৎ। গল্পের পুত্বক।

কথাপ্রসঙ্গ (পুং) কথারাঃ প্রশঙ্গঃ, ৬তৎ। ১ নানাবিধ কথোপকথন। ২ (জি) (কথারাং প্রশঙ্গে যন্ত, বহুব্রী) অবিশ্রান্ত গল্পকারক। ৩ বিবর্ধন্য। ৪ বাতুল। (কথাপ্রসঙ্গে বাতুলে বিবর্ধন্যে চ বাচ্যবৎ। মেদিনী।)

৬ বার্তা। ৭ গোষ্ঠীবচন, দুই চারিজন একত্রিত হইয়া

কথায় কথায় যে সকল গল্প করে।

(“মিথঃ কথাপ্রসঙ্গেন বিবাদং কিল চক্রভূঃ।” কথাং স* সাং।)

কথাপ্রাণ (জি) কথরা প্রাণিতি জীবতি, কথা-প্র-অণ-অচ্। কথারাং প্রাণাঃ জীবনোপায়া যন্ত ইতি বা। ১ কথক। ২ নাটকরচয়িতা।

কথান্তাস (পুং) ভায়মতে বাদী ও প্রতিবাদী কর্তৃক উপাশিত অসৎ তর্কমূলক বাক্য।

কথাবার্তা (জী) কথা চ বার্তা চ হ্ম। বিবিধ কথা।

কথাময় (জি) কথা-ময়ট্। কথাপূর্ণ।

কথামুখ (ক্ৰী) কথারা আমুখম্, ৬তৎ। কথাগ্রহের প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ।

কথায়োপ (পুং) কথারাঃ যোগঃ, ৬৩৭। কথ্য প্রসঙ্গ।

("পটুং সত্যবাদিত্বং কথ্যবোগেন বুধ্যতে।" হিতোপ।)

কথারন্ত (পুং) কথারাঃ আরন্তঃ, ৬৩৭। কথার আরন্ত।

কথালোপ (পুং) কথারাঃ আলোপঃ, ৬৩৭। কথোপকথন।

কথ্যশেষ (জি) কথ্য মাত্রঃ শেষো বস্ত, বহুব্রী। ১ মৃত ;
মৃত্যুর পর সে ব্যক্তির কথ্যমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। ২ (পুং)

কথার শেষ, কথ্যসমাপ্তি।

কথ্যসরিৎসাপন্ন (পুং) সংস্কৃত কথ্যগ্রন্থবিশেষ; সোমদেব
ভট্ট নামক জনৈক কবি কাম্বীরাদিগণিত খ্রীঃপূঃদেবের মহাবীর
চিত্তবিনোদের লজ্জা পৈশাচী ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায়
অনুবাদ করেন। ইহাতে কৌশাধীরাজ বংশস্রাজের পুত্র
ও নরবাহন হস্তের চরিত্র বর্ণিত আছে।

[গুণাঢ্য, সোমদেব ও কেমেন্দ্র দেখ।]

কথি (দেশজ) কোথার, কোন্ স্থানে।

কথিক (জি) কথ-ঠন্। কথক, পুরাণবক্তা।

কথিত (জি) কথ-ক্ত। ১ উক্ত, বাহা বলা হইয়াছে। ২ বর্ণিত,
বাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩ উচ্চারিত। ৪ ব্যাখ্যাত।
৫ প্রতিপাদিত। ৬ (পুং) পরমেস্বর, বিষ্ণু। ৭ (ভাবে ক্ত)
(ক্রী) কথন।

কথিতপদতা (ক্রী) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত দোষবিশেষ, একার্থ-
বাচক দুইটি শব্দ এক স্থানে সন্নিবেশিত হইলে, তাহাকেই
কথিতপদতা কহে, ইহার নামান্তর পুনরুক্তি।

("রতিলীলাশ্রমঃ ভিত্তে সলীলমলিনোবহন।" সাহিত্যদাম্।)

এখানে লীলা শব্দ পুনরুক্তি, যেহেতু রতিলীলা বস্তুতেই
অর্থের প্রকাশ হইত, অথচ অনর্থক লীলা শব্দ সন্নিবেশিত
হইয়াছে।

আবার অনেকস্থলে এই দোষ শুণের ভাষা কার্য্য করিয়া
থাকে; সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে,—

"কথিতঞ্চ পদং পুনঃ।

বিহিত্তাহুবাদ্যে বিবাদে বিশ্বয়ে কুধি ॥

দৈভেহং লাটাহুপ্রাসে হুহুকাপ্যারং প্রসাদনে।

অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যে হর্ষে হবধারণে ॥"

বিহিত্তাহুবাদ, বিবাদ, বিশ্বয়, ক্রোধ, দীনতা, লাটাহুপ্রাস,
হুহুকাপ্য, প্রসাদন, অর্থান্তরবাচ্য, হর্ষ ও অবধারণে
কথিতপদতা দোষ না হইয়া শুণ হইবে।

(সাহিত্যদাম্ ৭ম পরিঃ।)

কথীকৃত (জি) অকথা কথা সম্পদ্যমানা ক্রিয়তে, কথ্য-কৃ-
কৃত। কথ্যমাত্রে অবশিষ্ট কৃত, মৃত।

("অবগম্য কথীকৃতং বপুঃ।" কুমার। ৪। ১০।)

কথোদগ্ন (জি) কথারাঃ উদগ্নঃ প্রকাশো বস্ত, বহুব্রী। ১ কথা
হইতে উৎপন্ন। ২ (পুং) (কথারাঃ উদগ্নঃ) কথার উত্থাপন।

কথোদঘাত (পুং) নাটকের প্রস্তাবনাবিশেষ।

"হৃদধারন্ত বাক্যবা সবার্ণার্থমন্ত বা।

ভবেৎ পাত্তপ্রবেশকেন্তং কথোদঘাতঃ স উচ্যতে ॥"

সাহিত্যদাম্ ৬ষ্ঠপরিঃ।

প্রথম অভিনেতা হৃদধারের বাক্য বা বাক্যের অর্থবিশেষ
অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিলে, তাহাকে কথোদঘাত কহে।

রসাবলীতে হৃদধারের বাক্য অবলম্বন করিয়া এবং বৈদ্য-
সংহারে হৃদধারের বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া পাত্তের প্রবেশ
আছে।

কথোপকথন (ক্রী) কথারাঃ উপকথনং, ৭৩৭। কথার
উপর কথা, বিবিধ কথা, দুই চারি জন একত্রিত হইয়া কোন
বিষয়ের পরামর্শ বা আন্দোলন।

কথ্য (জি) কথ-য। ১ বলিবার উপযুক্ত বিষয়। ২ বলিবার
যোগ্য পাত্র। ("ভরতন্ত সন্নীপে তেনাহং কথ্যঃ কথঞ্চন।"

রাধা ২। ২৭ অঃ।)

কথ্যমান (জি) কথ-কর্ম্মনি-শানচ্। বাহা বলা হইতেছে।

কদ্ (দেশজ) কপিথ, কদবেল। [কদবেল দেখ।]

কদ্ (পুং) কং জনং নদাতি, ক-দা-ক। ১ মেঘ। ২ (জি)
জনদাতা। ৩ লুপ্তধারক।

কদক (পুং) কদঃ মেঘ ইব কারতি প্রকাশতে, কদ-কৈ-ক।
চন্দ্রাতপ, চাঁদোর।

(অথোন্নোচো বিভানং কদকো হপি চ। হেম।)

কদকর (ক্রী) কু কুংসিতং অক্ষরম্, কোঃ কদানেশঃ। ১

কুংসিত অক্ষর। ২ (বহুব্রী) (জি) বাহার হস্তাকর কুংসিত।

কদগ্নি (পুং) কুংসিতো অগ্নিঃ, কোঃ কদানেশঃ। ১ মন্দাগ্নি।
২ (জি) মন্দাগ্নিযুক্ত।

কদধ্বা [ন্] (পুং) কুংসিতো হুধ্বা, কোঃ কদানেশঃ।

নিম্বিত পথ। সংস্কৃতপদার্থ্য—ব্যধ্ব, দুয়ধ্ব, বিপথ ও কাপথ।

কদন (ক্রী) কদ্যতে হুঃপং প্রাপ্যতে হেনন, কদ-পিচ্-সূট্।
ঘটাদিহাৎ নবুজিঃ। ১ পাপ। ২ মর্দ। ৩ বুদ্ধ। ৪ মারণ,
বিনাশ।

কদম্ব (ক্রী) কুংসিতং অরং, কোঃ কদানেশঃ। কুংসিত আহার।

("হবির্বিদ্যা হরির্বাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।

কদমৈঃ পুণ্ডরীকাকঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ ॥" উভট।)"

কদম্বনাদ। মাজ্জাজের মালাবার জেলার মধ্যে প্রাচীন নাদ
রাজ্যগুলির মধ্যে ইহাও একটি নাদরাজ্য। ইহার অবস্থান
১১°৩৬' হইতে ১১°৪৮' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৫°৩৬' হইতে

১৫৫২' পূর্ণ জাতিয়ার। এই রাজ্য সমুদ্রোপকূল হইতে পশ্চিমব্যাটের পশ্চিমপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ইহার সমুদ্রতীরবর্তী স্থান অত্যন্ত উর্বরা। পূর্বদিকে পার্শ্বাত্যপ্রদেশে বন বথেষ্ট। এই বনে এলাইচ গাছ বথেষ্ট আছে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য একজন নারক সর্দারের দ্বারা স্থাপিত হয়। এই ব্যক্তি কোলাজী রাজ্যের রাজা তেজালকুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। টিপু সুলতান শেষে এই বংশকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দেন, অবশেষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ প্রাচীন বংশধরকে রাজ্যে স্থাপিত করেন।

ইহার রাজধানী কতিপুরম্ (কীতিপুর ?)।

কদমভোজী [ক্রি] কুৎসিতঃ অন্নং ভুক্ত্বৈ, কোঃ কদাদেশঃ কদম-ভূজ-গিনি। যে কদম অর্থাৎ অমৃত ভোজন করে।

কদপা। মাজার প্রদেশের একটি জেলা। এই জেলার উত্তরে কর্ণাল জেলা, পূর্বে নেম্বর, দক্ষিণে উত্তর অরুন্ধ ও কোলার জেলা এবং পশ্চিমে বেয়ারি জেলা। ভূমিপ্রমাণ ৮৭৪৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১১,২১,০০৮। জমির বাজনা ১৬১৭৪৩ টাক।

এই জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ পার্শ্বতীর, দক্ষিণপশ্চিম ও পশ্চিমভাগ সমভূমি। দক্ষিণপূর্বভাগে হিন্দুদিগের পুণ্য-শৈল ত্রিপতী। পাল্কাওয়া ও শেবাচল নামে দুইটি পাহাড় এই জেলাকে বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে—একভাগ নিম্ন আর একভাগ উচ্চভূমি। উক্ত পাহাড় দুইটি পেন্নার (পিগাকিনী) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাল্কাওয়ার অর্থ 'হৃদ-শৈল', বোধ হয় এখানে স্তম্ভের গোচারণক্ষেত্র থাকায় ঐ নাম হইয়া থাকিবে।

এই জেলার পেন্নার নদীই প্রধান, এই নদীর দুইটি শাখা কুঠৈও ও সগলৈর। এ ছাড়া পাপরী, বৈটের, ও চিঅ-বতী নামে আরও কয়েকটি নদী আছে।

এখানে বনজঙ্গলও অনেক, ঐ সকল জঙ্গল হইতে ভাল ভাল কাঠও পাওয়া যায়।

খনিজ পদার্থ—এখানে লৌহ, তামা, চূণাপাথর, প্লেট, ও বেলোপাথর উৎপন্ন হয়। কদপানগরের ৩৪ ক্রোশ উত্তরে পিগাকিনী নদীর ধারে চেণ্ডুরের নিকট হইতে হীরা পাওয়া গিয়াছে।

উদ্ভিদ—হোলা, কদু, কৌড়া, ধান, গম, তামাক, লঙ্কা, মরিচ, নানাপ্রকার তৈলবীজ, ইক্ষু, নীল, জাকরাণ, কাপাস এবং পাট প্রভৃতি নানাপ্রকার অন্ন জন্মে।

ইতিহাস—পূর্বকালে এই জেলা চোলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনবিষয়ক নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

এখানে বহুদিন হিন্দুরাজত্ব ছিল। এখানকার পাহাড়ের উপর অনেকগুলি দুর্ভেদ্য গিরি দুর্গ থাকায় মুসলমানেরা সহজে অধিকার করিতে পারে নাই, শেষে অনেক কষ্টে জয় করিল। ১৫৬৫ খৃঃ, তালিকোটের দুর্গটিনার পর, কর্ণাটিক জয় করিয়া মুসলমানেরা কদপার মধ্য দিয়া দ্বারাত করিতে থাকে। এই সময়ে গোলকুণ্ডের অধীনস্থ প্রধান প্রধান মুসলমান সামন্তগণ নানাহান আপনারা ভাগযোগ করিয়া লইতে লাগিলেন। উাহাদের মধ্যে একজন গুরুমকুণ্ড নবাব কদপা অধিকার করিলেন। এই নবাব খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি আপনার নামে যুদ্ধাদি প্রচলন করিয়াছিলেন।

চিরদিন কিছু সমান যায় না। এখানকার মুসলমান-দিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল; মহারাষ্ট্রবীরগণ ১৬৪২ খৃঃ, এই স্থান জয় করিয়া লইলেন। মহাবীর শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে এখানকার দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া-ছিলেন। কিছুদিন পরে মুসলমানেরা আবার দখল করিল। নবীখাঁ নামক একজন পাঠান কদপার স্বাধীন নবাব হইলেন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তিনজন নবাব প্রবল প্রভাবে রাজ্য শাসন করেন। শেষ নবাবের সহিত (১৭০২ খৃঃ) মহারাষ্ট্র-দিগের সঙ্গে বিবাদ ঘটিল। এই সময় হইতে এখানকার নবাবের ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল। ১৭৫০ খৃঃ, কদপার নবাব কর্ণাটিক যুদ্ধকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। পরবর্ষে তিনি নিজাম মুজফর জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তাহাতেই লুক-য়েদীপন্নী নামক গিরিপথে নিজাম প্রাণ হারাইলেন। ১৭৫৭ খৃঃ, মহারাষ্ট্রেরা কদপানগর জয় করিলেন, কিন্তু এই সময়ে নিজামের সৈন্যদল কদপাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার, মহারাষ্ট্রগণ কিছু করিতে পারিলেন না।

মহিষুরে হায়দার আলী প্রবল হইয়া উঠিলেন, ১৭৬৯ খৃঃ, তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, কদপাজয়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে কদপা জয় করা বড় সহজ কথা নয়। কাজেই তিনি ষষ্ঠভাবে নিজামের সহিত সন্ধি করিলেন,—উভয়ে মিলিয়া করমণ্ডল উপকূল জয় করিবেন, জয়লব্ধ জনপদাদির মধ্যে তিনি কদপা লইবেন এইরূপ চুক্তি হইল। অনেকবার যুদ্ধ চলিল। ১৭৮২ খৃঃ, হায়দার আলীর মৃত্যু হইলে, কদপার শেষ নবাবের একজন বংশধর সিংহাসনের দাবী করিলেন,

কডকগুলি ইংরাজসৈন্য তাঁহার সাহায্য করিতে বীভূত হইল, কিন্তু উত্তর দলে দেখা হইবামাত্র মুসলমানেরা সেই ইংরাজসৈন্যগিকে অন্যায়রূপে বিনাশ করিল। ইহার পর কদম্বার কিছু দিন কোন গোলযোগ ঘটে নাই। ১৭২০ খৃঃ, নিজাম এই স্থান উদ্ধার করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন।

১৭২২ খৃঃ, সন্ধিপত্রাদ্বারা টিপু সুলতান নিজামকে সমস্ত কদম্বা জেলা ছাড়িয়া দেন। নিজাম আবার রেমণ্ড সাহেবকে জারগিরি দেন। তৎপরে কয়েক বর্ষ ধরিতা পলিগারেরা কদম্বার হুগ্ধ অধিকার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। ১৭২৯ খৃঃ, নিজাম আপনাদের দের টাকা পরিশোধের জন্য ইংরাজগিকে কদম্বা প্রদান করেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দ হইতে কদম্বা ইংরাজদিগের হইল। এই সময়ে কদম্বার পার্শ্ববর্তী স্থান পলিগারদিগের অধিকারে ছিল। পলিগারেরা মধ্যে মধ্যে বড় উৎপাত করিত। দস্তাবেজ দ্বারা তাহাদের এক প্রকার জীবিকা নির্বাহ হইত। প্রথমে ইংরাজেরা তাহাদিগকে শাসন করিতে পারেন নাই, ক্রমে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করার পলিগারেরা একে একে বশতা স্বীকার করে। তাহাদের বংশধরেরা এখনও কদম্বার নানা স্থানে জমি জমা ভোগ করিতেছে। ১৮৩২ খৃঃ, কোন মসজিদ লইয়া এখানকার পাঠানদের সহিত ইংরাজদের গোলযোগ ঘটে, তাহাতে এখানকার সমস্ত মুসলমান বিদ্রোহী হইয়া তখনকার সব-কালেক্টার ম্যাকডোনাল্ডকে বিনাশ করিল। এই ঘটনার চারি বর্ষ পরে এখানকার একজন পলিগার গবর্ণমেন্ট নিকট হইতে তাহার মনোমত বৃত্তি না পাওয়ায় প্রায় দুই হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কয়েকবার যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা কেহ হত, কেহ আহত, কেহ বা পলায়ন করিল। তদবধি কদম্বার শান্তি স্থাপিত হইল।

এখানে হিন্দু ও মুসলমান জাতির বাস। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক; ব্রাহ্মণেরা সকলেই প্রায় শৈব, ক্ষত্রিয়েরা প্রায় বৈষ্ণব। এতদ্ব্যতীত যদনী, বেলকল, চেঙ্গুর ও গুগলা প্রভৃতি কয়েক প্রকার জাতি বাস করে।

কদম্বা জেলার প্রধান নগর—কদম্বা, বদতোল, প্রোদতুর, জম্বলমহু, কদিরি, দমনপল্লী, পুলিবেন্দল, রায়চোটী, বেলপলী, বরলপদ।

২ কদম্বানগর। এই নগর অক্ষা ১৪°২৮'৪২" উঃ, দ্রাঘি ৭৮° ৫১' ৪৭" পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

কদম্বা শব্দ সংস্কৃত কদম্বা শব্দের অপভ্রংশ। কেহ বলেন,

গদগ হইতে কদম্বা হইয়াছে। তৈলিঙ্গ গদগ শব্দের অর্থ 'গার', জিপতী বাইবার পথ বলিয়াই গদগ (কদম্বা) নাম হইয়াছে।

বিজয়নগরের রাজ্যদিগের সময়ে কদম্বার বেশ সুখ-সমৃদ্ধি ছিল। সেই সময়ের প্রাচীন নগর এখন আর নাই, তাহারই পার্শ্ব বর্তমান কদম্বা নগর স্থাপিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুর্পার নবাব এই স্থানে স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করেন।

কদম্বাত্য (কু) কুংসিতং অপত্যম্, কোঃ কদামেশঃ। ১ কুপুত্র। ২ (বহুব্রী) বাহার পুত্র অতিশয় মন্দ।

কদম্ব। মহীসুর রাজ্যের ভূমুহুর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। ইহার পরিমাণ ৪৯৮ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ১০১ বর্গমাইল আবাদ হয়। ইহার লোকসংখ্যা (১৮৮১) ৬৮,১৫৮। এই তালুকের প্রধান নদী শিমশা, উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত। কদম্ব ও গন্ধি নামক দুইস্থলে এই নদীর গর্ভে দুইটি হ্রদ আছে। এ জেলার সদরখানা গন্ধি। এখানে একটি মাজিষ্ট্রেটী আদালত ও ৯টা থানা আছে।

এই জেলার দবিঘাটার নিকট পূর্বতে কাচবৎ একপ্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, ইংরাজীতে ইহাকে (Horn-blende) বলে। এই ধাতু কাচশলাকার ভায়, লম্বা ও সূক্ষ্ম। ইহা ৩ প্রকার, বাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই হরুগ্রেণ্ড, বাহা সবুজবর্ণ তাহাকে অ্যাক্টিনোলাইট (Actinolite), আর বাহা সাদা তাহাকে ট্রিমোলাইট (Tremolite) বলে। এই পদার্থে ম্যাগনেসিয়া, চূর্ণ ও সোডের অংশ আছে।

এই জেলার কদম্বগ্রামে প্রত্নতত্ত্ব ব্রাহ্মণদিগের একটি উপনিবেশ আছে। ইহা অনেক দিনের প্রাচীন গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে একটি বৃহৎ সরোবর আছে, শিমশা নদীতে বাঁধ দেওয়ায় এই সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র লঙ্কায়ের পর প্রত্যাবর্তনকালে এই বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছিলেন।

কদম্বাত্যাস (পুং) কুংসিতোহিত্যাসঃ কদম্বা। মন্দ অত্যাস, কু অত্যাস।

কদম্ব (দেশজ) ১ কদম্বক। ২ কদম্বকল। ৩ মহিমা। ৪ ঘোড়ার গতিবিশেষ।

কদম্বা (দেশজ) মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, বজ্র, বিশেষতঃ রাড় অকলে ইহা প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

কদম্বীলতা (দেশজ) লতাবিশেষ।

কদম্ব (পুং) কদম্ব অথচ (ককমিকডিকটিভোহুচ। উপ ৪।৮২। ক, কদ, কড ও কট ধাতুর উত্তর অথচ প্রত্যয় হয়।)

১ বৃক্ষবিশেষ, কদম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—নীপ, প্রিয়ক, হলিপ্রিয়, কাদম্ব, বটগদেঠ, প্রাবুবেণা, হরিপ্রিয়, বৃক্ষপুষ্প, সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদম্বা, নীধুপুষ্প, মহাচা ও কর্ণপুরুক। কদম্বকে বাদ্রালার ও হিন্দীতে কদম, কর্ণাটা ভাষায় কদবেছ, তামিলে বেল্ল কদম্ব, তৈলঙ্গে কোদম্ব, কদম্বা, কদম্বীমাহ বা কদম্ব চেন্তু কহে।

এই সুল্লর গাছ ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও সিংহলদেশে আছে। এক একটা গাছ ৭০।৮০ ফিট বড় হয়। ইহার কাঠে নৌকা ও নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত হয়। কদম্বফল শ্রীকৃষ্ণের বড় প্রিয়, এই লজ্জা সুল্লন উপলক্ষে কদমফুল ব্যবহৃত হয়। অপর দেবতার পূজার এই ফুল দেওয়া যায়। কদম্ব গাছ হইতে মদ্য বাহির হয়, এই লজ্জা মদ্যের একটি নাম কাদম্বরী।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, “বলরামকে গোপগোপীগণের সহিত বেড়াইতে দেখিয়া বরুণ বারুণীকে (মদিরাকে) বলিলেন, হে মদিরে! তুমি বাহার অভিল্যাবের পাত্র, সেই অনন্তদেবের উপভোগ্য গমন কর। বরুণের কথা শুনিয়া বারুণী বৃন্দাবনোৎপন্ন কদম্বগাছের কোটরে আগমন করিলেন। বলরাম বেড়াইতে বেড়াইতে উক্ত মদিরাগন্ধ পাইলেন। তাঁহার পূর্নাসুরাগ উদয় হইল। তিনি কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিগলিত মদ্য দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তখন গোপগোপীগণ গান করিতে লাগিল; তিনি তাহাদের সহিত একত্র মদিরা পান করিলেন।”

কাদম্বরী মদ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে আবার এইরূপ লিখিত আছে—“একদিন বলরাম একাকী শৈলশিখরে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রফুল্ল কদম্বতরুর ছায়ায় উপবেশন করিলেন, অকস্মাৎ মদগন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল। বায়ুবশে মদগন্ধ তাঁহার নাসাবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া মাত্র রাত্রিতে মদ্যপান করিলে প্রভাতে যেমন মুখশোষ উপস্থিত হয়, সেইরূপ মদ-পিপাসা বলবতী হইলে তিনি কদম্ব বৃক্ষ দেখিতে লাগিলেন। বর্ষার বৃষ্টির জল সেই প্রফুল্ল কদম্ব কোটরে পড়িয়া মদ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। বলরাম নিত্য তৃষ্ণাকুল হইয়া সেই মদবারি পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন। সেই বারিপানে মত্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার শরীর বিচলিত হইল, তাঁহার শারীরীয় মুখশী দ্বয় চকলোচনে ঘুরিতে লাগিল। সেই অমৃতবৎ দেবানন্দবিধারিনী বারুণী কদম্বকোটরে উৎপন্ন হইল বলিয়া তাহার নাম কাদম্বরী হইল।

(কদম্বকোটরে জাকা নামা কাদম্বরীতি সা।

হরিবংশ ১৬ অঃ)

ভাবপ্রকাশের মতে কদম্বের গুণ—মধুর, কষায় ও লবণ-

য়স, শীতল, গুরু, বিরেচক, বিউজকারী, কক্ষ; কক্ষ, গুত ও বায়ুবর্জক।

নীপ, মহাকদম্ব, ধারাকদম্ব, ধূলিকদম্ব, কদম্বক প্রভৃতি কদম্বের বিবিধ ভেদ আছে। ২ সর্ষপ। ৩ দেবতাড়ক তৃণ। ৪ (ক্লীং) সমূহ।

(কদম্বং নিকুরেছ ভারীপসর্ষয়োঃ পুমান্। মেদিনী।)

৫ মধু। (মাক্ষিকক কদম্বং ত্রাৎ। হেম। ৪।২।) ৬ (কং উপস্থেজ্জিয়ং মমমতি) জিহেজ্জিয়। ৭ (কদং কদমং বিনাশং বাতিগচ্ছতি প্রলয়ে ইতি শেষঃ) জগৎ।

(“সএবসোমো নিত্যং রাজতে মূলে বিশ্বকদম্বস্ত পরমো বৈ পুরুষ আত্মা।” ঋতি।)

কদম্ব (কাদম্ব) দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন পরাক্রান্ত জাতি। এক সময়ে এই জাতি দক্ষিণভারতে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তৎকালে তাপীনীর দক্ষিণ হইতে গোপরাষ্ট্র (গোয়া) পর্যন্ত কাদম্বরাজ্যগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্পলিপি পাঠ করিলে এই জাতি সম্বন্ধে অনেকটা জানা যায় কিন্তু এই জাতি দক্ষিণ ভারতের আদিমনিবাসী কি না? ইহার অনার্য্য অথবা আর্য্য, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল? তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। কোন কোন জাতিতত্ত্ববিদের মতে, ইহার দাক্ষিণাত্যের আদিমনিবাসী, বর্তমান কুড়ু জাতির নামের সহিত এই জাতিরও অনেকটা সংশ্লিষ্ট আছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, কুড়ু স্বতন্ত্র অনার্য্য জাতি, এই জাতির সহিত যে পরাক্রান্ত কদম্বগণের কোনরূপ সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন ও প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তবে কাদম্বগণ যে উত্তরভারতের প্রাচীন আর্য্যগণের শাখা তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এই জাতি যে কোন সময়ে সত্যতাবে আর্য্যদিগের সহিত সমান আসন অধিকার করিয়াছিল, তাহা ঠিক।

কদম্ব জাতির পূর্বপুরুষগণ সকলেই শৈব ছিলেন, অথচ তাহার অপর দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। এই জন্য এই জাতিকে পুরাণকার অমর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কদম্বপুরাণের ভাষ্যেও একজন কদম্বরাজকে অমর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই অমররাজের বিবরণ এইরূপ—কদম্বরাজ অতিশয় শিবভক্ত ছিল, তাহার নিকট এক শিবলিঙ্গ ছিল, সেই শিবলিঙ্গের জন্য দেবতারও তাহার কিছু করিতে পারিতেন না, সময়ে সময়ে তাহাকে তর করিতে হইত। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে দুনিরূপ ধরিয়া কদম্বের কাছে

বাইতে আদেশ করিলেন। সেই মত ইজ্ঞা বুনিল্লগ ধরিয়া কদম্বের কাছে আসিলেন, এদিকে কৃষ্ণ কুমারী রমণীস্বরূপ ধারণ করিয়া গাহিতে গাহিতে কদম্বাহরকে দেখা দিলেন। বিজনে রমণীমূর্তি দেখিয়া কদম্ব বিমুগ্ধ হইল। সে বুনিল্লগী ইজ্ঞের নিকট শিবলিঙ্গ রাখিয়া তাহার মনোমোহিনীর দিকে ধাবিত হইল। তখন ইজ্ঞ কদম্বকে সহায়হীন দেখিয়া বজ্রনিক্ষেপ দ্বারা তাড়াকে সংহার করিলেন। কদম্ব চিরদিনের মত ভূমিশারী হইল, কিন্তু তাঁহার পবিত্র আত্মা শিবময় হইল।*

কদম্বকে অম্বর বলিয়া বর্ণনা করিবার কারণ কি? বোধ হয়, পূর্বে এই জাতি তাপীনদীতীরে অসভ্য অবস্থায় বাস করিত, সেই সময়ে ইহারা অপর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিত, (অম্বরপ্রকৃতির পরিচয় দিত।) তাই পুরাণকর্তা এই জাতিকে অম্বর পদবীতে সম্বোধন করিয়াছেন।

কদম্বজাতি সর্বপ্রথমে কোন সময়ে দক্ষিণদেশে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। দক্ষিণদেশের প্রবাদ ও কণ্ঠাটী প্রচাঙ্গসারে কদম্বদিগের প্রথম রাজা জিনেন্দ্রকদম্ব। দক্ষিণদেশীয় ঐতিহাসিকদিগের মতে তিনি ১৬৮ খৃঃ অব্দের লোক হইবেন।

ময়ূরবর্মচরিত্র প্রভৃতি কয়েকখানি দক্ষিণদেশীয় সংস্কৃত গ্রন্থে কদম্বরাজ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

ত্রিপুরাহরের নিম্নকালে মহাদেবের ললাট হইতে এক বিন্দু ঘর্ষ কদম্বকোটরে পতিত হয়, সেই বিন্দু হইতে এক জিনেন্দ্র পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কদম্বকোটরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নাম জিনেন্দ্র বা জিনোচন কদম্ব, তিনি কদম্ববংশের আদিপুরুষ। ইনি বানবাসী * (অপর নাম জয়ন্তীপুর) নামক জনপদে আপন রাজধানী স্থাপন করেন।† ইহার পুত্র মধুকেশ্বর, তৎপুত্র মল্লিনাথ, পুত্র চন্দ্রবর্ম। চন্দ্রবর্মার দুই পুত্র, একজনের নাম চন্দ্রবর্ম। (২য়) অপরের নাম পুরন্দর। চন্দ্রবর্ম। (২য়)র দুই পত্নী, এক পত্নীকে তিনি বনভীপুরের এক দেবালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে ময়ূরবর্মার জন্ম হয়। চন্দ্রবর্মার বনবাসেই মৃত্যু হইয়াছিল। পুরন্দর নিঃসন্তান হওয়ার ময়ূরবর্ম। বানবাসীর রাজা হইলেন। ইনিই সর্বপ্রথমে ভারতের উত্তর দিক হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণেরা বানবাসীতে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। ময়ূরবর্মার পুত্র জিনেন্দ্রকদম্ব (২য়)

চতালরাজের হস্ত হইতে গোবর্গতীর্থ উদ্ধার করিয়া তথায় ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করেন, ইহার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা হৈব ও ভূমুবে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

শিলালিপি রিসরণাঙ্গসারে ময়ূরবর্মাই বানবাসীর প্রথম রাজা, শিব ও পৃথিবী হইতে তাহার জন্ম। শিলালিপি অঙ্গসারে বানবাসীর কদম্ব রাজাদিগের বংশকারিকা এইরূপ—

ময়ূরবর্ম। (১ম)

কৃষ্ণবর্ম।

দাদবর্ম। (১ম)

বিন্দুবর্ম।

বৃন্দবর্ম।

লভ্যবর্ম।

বিজয়বর্ম।

জয়বর্ম।

দাদবর্ম। (২য়)

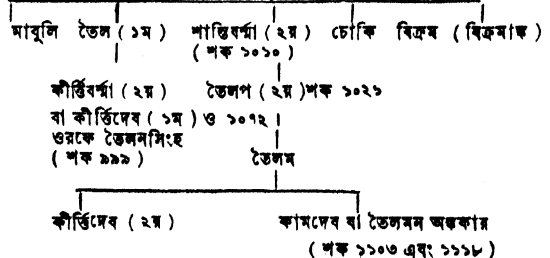
শান্তিবর্ম। (১ম)

কীর্তিবর্ম। (১ম)

আদিভ্যাবর্ম।

চট্ট, চট্টর বা চট্টগ

জয়বর্ম। (২য়) বা জয়সিংহ



এ ছাড়া শিলালিপিতে আরও কয়েকজন কদম্বরাজের নাম পাওয়া গিয়াছে—

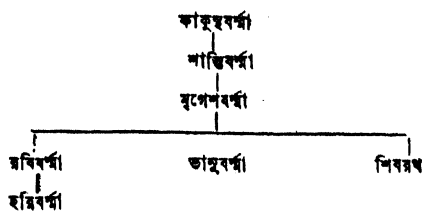
কুণ্ডমরল বা সত্যশ্রয় (শক ৯৪১),—ময়ূরবর্ম। ২য় (শক ৯৫৬ ও ৯৬৬),—চামন্দরায় (শক ৯৬৭ ও ৯৭০),—হরিকেশরী (শক ৯৭৭),—ময়ূরবর্ম। ৩য় (শক ১০৫০।)

শিলালিপিতে আরও কতিপয় মহামন্ত্লেখর কদম্বের উল্লেখ আছে। মহামন্ত্লেখরদিগের ক্ষমতা রাজগণ অপেক্ষা হীন, তাঁহারা এখনকার ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সর্দারদিগের স্তায় ক্ষমতাপালী ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ পের্ণটি নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিত, হুদুমান-চিহ্নিত পতাকা উড়িত। তাঁহারা সিংহচিহ্নিত ঘোহর ব্যবহার করিতেন।

* বানবাসী-জনপদ-পুরাণে বনবাসক বা বানবাসক নামে অভিহিত।

† তাহার মতে মহাদেব ও পার্বতী হইতে জিনেন্দ্রকদম্বের জন্ম।

বর্তমান বেলাগান্দ নামক জেলায়ও কয়েকজন কদম্ব রাজবংশের, তাঁহাদের রাজধানী পলাশিকা (বর্তমান হলুসি) ছিল। এখানকার কদম্বরাজগণের মধ্যে কাকুহ-বর্ম্ম ও মুগেশবর্ম্মাই প্রধান। তাঁহারা অদ্বিতীয় গোত্রীয়। কাকুহ সম্ভবতঃ ৩৬০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। শিলালিপিতে কাকুহ বর্ম্মার এই কয়েক জন বংশধরের নাম পাওয়া যায়—



চালুক্যারা প্রবল হইলে কদম্ববংশের অধঃপতন হয়, চালুক্যরাজ কীর্তিবর্ম্মার শিলালিপিতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

বানবাসী বা জয়ন্তীপুরের কদম্ব রাজবংশের অধঃপতন হইলেও গোপকপুরে (গোয়াতে) আর একবংশ অনেক দিন ধরিতা রাজবংশ করিয়াছিলেন। এখানকার কদম্বরাজ বর্ধ-দেবের ৪৩৪৮ কল্যাব্দের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, ইহার অপর নাম শিবচিহ্ন। ইহার সময়ে গোপকপুরীতে গোপেশ্বরের মন্দির ছিল। (Dynasties of the Kanarese Districts p. 89।)

প্রাচীন কদম্বরাজদিগের সহিত ভারতের অপর্যাপ্ত রাজ্যদিগের সহিতও সম্বন্ধ ছিল। জয়কেশী নামে একজন কদম্বরাজকুমার ছিলেন, তিনি বিক্রমাদিত্য আহবমল্লের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং আহবমল্লের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। জয়কেশীর কন্যা মৈনলদেবীর সহিত অনহিলবাড়ের রাজা কর্ণের বিবাহ হয়, তাঁহার গর্ভে বিখ্যাত জয়সিংহ সিংহরাজের জন্ম হয়। [কুমারপাল চরিত ১১। ৬৬, Forbes Rasmala I. p. 107., Bombay Branch of the Royal Asiat. Soc. IX. 321 দেখ।]

কদম্বক (ক্ৰী) কদম্ব-সংজ্ঞায় কন্। ১ সমুহ। (“কদম্বকং বাতমজং মুগাণাম্।” ভট্টি) ২ দেবতাড় বৃক্ষ। (পুং) (কদম্ব ইব কারতি প্রকাশতে) ৩ হরিজ্ঞা। ৪ সর্বপ। ৫ দারহরিজ্ঞা।

কদম্বকোরক শ্রায় (পুং) কদম্বপুষ্পের চতুর্দিকস্থ কেশর-সমূহ বেদন এক কালে উৎপন্ন হয়; সেইরূপ একটিনাশ শব্দের সহিত এককালে বহু বহু শব্দের উৎপত্তি হইল; ইহাকেই কদম্বকোরক ভায় কহে।

কদম্বগোলক শ্রায় (পুং) কদম্ব গোলাকার, তাহার গাজের চতুর্দিকস্থ কেশরসমূহও সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এমনতরু বৃহৎ সকল অবস্থাতেই তাহার এক গোল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কোন বস্তু বা বিষয়ের এক ভাব থাকিলে, তদ্বার ‘কদম্বগোলক ভায়’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কদম্বদ (পুং) কদম্ব-দোষার্থক। সর্বপ।

কদম্বপুষ্পা (স্ত্রী) কদম্বভেদে পুষ্প মস্তাতি, কদম্বপুষ্প-অর্থ আদিবাৎ অচ-টাপ্। সুত্তিতিকা বৃক্ষ, সুত্তিরী।

কদম্বপুষ্পী (স্ত্রী) কদম্বপুষ্পনিব পুষ্পমস্তাঃ কদম্বপুষ্প-টাপ্। সুত্তিরী।

কদম্ববাদী [ন] (পুং) কদম্ব ইতি বানঃ সংজ্ঞা অন্ত্যত, কদম্ব-বাদ-গিনি। নীপজাতীর কদম্ববিশেষ।

(“কদম্ববাদিনো নীপান্ দৃষ্ট্বা কটিকিতৈরিব।

সমস্ততো ভ্রাজমানং কদম্বকদম্বকৈঃ” কাশীখণ্ড।)

কদম্বী (স্ত্রী) কদম্ব-ভীষ্। দেবদালী লতা। [দেবদালী দেখ] কদম্ব (আরব্য) মর্যাদা, সম্মান।

কদম্ব (ক্ৰী) কং জলং দৃণাতি দারয়তি নাশয়তি ইত্যর্থঃ, ক-দৃ-অচ্। ১ পায়সবিশেষ, ছেঁড়া পায়স। ২ (পুং) শ্বেতখদির, কাঁটা-বাবলা। ইহার সংস্কৃতপরিচয়,—সোমবক, ব্রহ্মশল্য, খদিরো-পম, শ্বেতগার, খদির ও সোমবকল। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ,—বিশদ, বর্ণের হিতকর এবং মুথরোগ, কফ ও রক্তদোষনিবারক। ৩ করাৎ। ৪ অক্লুশ। ৫ ক্লুরোগ-বিশেষ। স্তম্ভতোক্ত ইহার লক্ষণ,—কক্ষর ও কণ্টক প্রভৃতির দ্বারা পদতল ক্ষত হইলে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ, মেদঃ ও রক্তকে দ্রুতি করিয়া বেদনা ও আব্রযুক্ত কুলের আঁটির ভায় যে রোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম কদম্ব।

চিকিৎসা—অস্ত্রদ্বারা কদম্ব উৎপাটিত করিয়া তণ্ডুল বা অগ্নিদ্বারা সেই স্থান দধি করিয়া ফেলিবে।

কদম্ব (পুং) কুংসিতোর্থঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুংসিত অর্থ। ২ পদার্থ। ৩ কুংসিত অর্থকারী।

কদম্বন (ক্ৰী) কু-অর্থ দ্যুট্। ১ কুংসিত অর্থকর।

কদম্বনা (স্ত্রী) কদম্বন-টাপ্। বিভবনা।

কদম্বিত (জি) কু-অর্থ-পিচ-ক্ত। ১ দ্রুতি। ২ বিভবিত। ৩ দ্রুতি।

কদম্বীকৃত (জি) অকদম্বং কদম্বং করোতি, কদম্ব-চি-কৃ-ক্ত। ১ মন্দীকৃত। ২ বিকলীকৃত।

কদম্ব্য (জি) কুংসিতো হব্যঃ দ্বারী, কুগতীতি সমাসঃ। ১ ক্লুত। ২ ক্লপণ। বৃত্তিশাঙ্কের মতে, যে লোভীবাঙ্কি আত্মা ধর্ম্মকার্য্য জীপ্ত প্রভৃতিকে কষ্ট দিয়া অর্থদান করে,

তাহাকে কদলী বলে। (‘কুপণ্ড মিতম্ভঃ। কীনাশত্বলঃ
কুত—কদলীমুখঃ। কিল্পাচলো। হেম ৩। ৩২।)

কদলীভাব (পুং) কদলীভাবঃ, ৬তং। ১ কুংলিত ভাব।
২ অঙ্গীল ভাব।

কদল (পুং) কদ-বুবাধিবাৎ কলচ্। ১ কলাগাছ। ২
চাকুলে লতা। ৩ ডিহিকা, ডিমি। ৪ শিমুলগাছ।

কদলক (পুং) কদল-বার্ধ-কন্। কলাগাছ।

কদলী (স্ত্রী) কদল-টাপ্। ১ চাকুলে। ২ কজলীগাছ। ৩
ডিহিকা। ৪ শিমুলগাছ।

(কদলী ভিষিকারাক শাস্ত্রী ভূতহে হপিচ। মেদিনী।)

কদলী [ন] (পুং) কদলো হত্যন্তি, কদল-ইনি। কলাগাছ।

কদলী (স্ত্রী) কদল-গোরাদিবাৎ ভীষ্ (বিদগোরাদিতাম্।
পা ৪। ১। ৪১।) ১ ওষধি বিশেষ, কলা।

উৎকৃষ্টবদ্ধ এদেশের একপ্রকার মিষ্ট ফল। বাঙ্গালা
দেশে ইহাকে চলিত কথায় ‘কলা’ বলে। ইহার সংস্কৃত
নাম কদলী। সংস্কৃতে ইহার আরও কতকগুলি নাম
আছে—বারগবুসা, রস্তা, মোচা, অম্বতমংকলা, কদল, কাঠল,
বারগবুসা, বারবুসা, লুফলা, লুকুমার, লুকংকলা, শুক্কলা,
হস্তিবিধানী, শুক্কদন্তিকা, নিঃসারা, রাজেঠা, বালকপ্রিয়া,
উরুভুজা, ভাঙ্গুফলা, বনলক্ষী, কদলক, মোচক, রোচক,
লোচক, বারগবুজা, চর্ম্মবতী। এই সকল নামের সার্থকতা
আছে, যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

ভারতবর্ষই কদলীর আদি বাসস্থান, এজন্য এদেশে ইহা
নানাবিধ কর্ণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার তুল্য আবঙ্গকীর
কল আর দ্বিতীয় নাই। ইহা জন্মেও অনেক। বৎসরের
সকল কালেই ইহার ফল জন্মে, তবে গ্রীষ্মকালেই অধিক
উৎপন্ন হয় আর ঐ সময়ের ফল অধিকতর কোমল,
মধুর এবং স্বাদু হয়।

কদলীর উদ্ভিদ তত্ত্ব—ইহার গাছকে উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা
কোমলকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন। বাহার কাণ্ডে
অর্ধাৎ গুঁড়িতে কাঠভাগ অল্প থাকে তাহাকেই কোমল
কাণ্ড বলে। বাস্তবিক কদলী বৃক্ষের কোনরূপ কাণ্ড নাই।
বাহা কাণ্ড বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক পাতার
শেষ ভাগ অর্ধাৎ কাণ্ডকোষ, বাহাকে বাঙ্গালার কলার খোলা,
বাঙ্গানা বা বাকুলা বলে তাহার সমষ্টিমাত্র। কলাগাছের পিণ্ড-
মূল (এঁটে) (roots, stalks) আছে, এই পিণ্ডমূল হইতেই
একেবারে পাতা বাহির হয়। পিণ্ডমূলের ঠিক মধ্যস্থল হইতে
একটি সরল গোলাকার খেতবর্ণ মজ্জা (Pith) উঠে, ইহারই
চতুর্দিকে তরে তরে কাণ্ডকোষগুলি ঢাকা পড়িয়া কাণ্ডের

ভার আকার ধারণ করে, এই জন্ত ইহাকে কোমল কাণ্ড
বলে। কালে ঐ মজ্জা পুশ্পদণ্ডে পরিণত হয়। যখন নূতন
পাতা বাহির হয়, তখন ইহা একেবারেই মূল হইতে জন্মে
এবং মজ্জার পার্শ্ব দিয়া শুভাইয়া সরু শুভাকারে উঠিতে
থাকে, শেষে পত্রকক দিয়া বাহিরে পড়িয়া পাতা ছাড়িতে
থাকে। ইহার পত্রাংশ অভ্যন্ত বিদ্রুত হইয়া থাকে।
এক একটা পাতা ৬।৮ ফুট দীর্ঘ ও ২ ফুট বিদ্রুত হয়।
ইহার পাতার “মধ্যপত্রিকা” হইতে পাতার ধার পর্যন্ত লম্বা
ভাবে সমদূরে সরল শিরা আছে। এই সকল শিরার মধ্যে
অখণ্ড পাতার মত জঙ্কলের ভাৱ স্থল শিরাবিন্যাস নাই,
সুতরাং একই প্রবলবাতাস লাগিলেই ইহা চিরিয়া যায়।
কলাগাছের পত্রভাগ, বৃন্তভাগ, কাণ্ডকোষ সমস্তই অংশ-
বিশিষ্ট। কলাগাছের মজ্জা বাহাকে বাঙ্গালার খোড় বলে,
তাহা অতি কোমল। ইহা কেবল কতকগুলি পাকান
পাকান রসাদার শিরার সমষ্টিমাত্র। মজ্জা হইতে বুদ্ধিপ্রাপ্ত
হইয়া পুশ্পদণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে। ইহার পুশ্পকে
বাঙ্গালার মোচা বলে। মোচা হইবার পূর্বে ইহার স্বক্বেশ
হইতে একখানি “অসিকলক” নির্গত হয়। বাঙ্গালার তাহাকে
পাতমোচা বলে। পাতমোচার অভ্যন্তরেই মোচা থাকে।
মোচা পুষ্ট হইলে এই পাতমোচা তলার দিকে কাটিয়া যায়,
আর মোচা নিম্নস্থে ফুলিয়া পড়ে। নারিকেল, তাল,
শুপারি, খজুর প্রভৃতি গাছেরও পাতমোচা হয়। পাত-
মোচাকে চলিত বাঙ্গালায় “বেল্দো” বলে।

মোচা কলাগাছের স্বক্বে হইতে উর্দ্ধমুখী হইয়া নির্গত হয়,
শেষে কতকটা বড় হইলে নিম্নমুখী হইয়া পড়ে। ইহা
দেখিতে কোণাকার, লম্বে প্রায় ১ ফুট ও মধ্যস্থলের বেড়
প্রায় ৬ ইঞ্চি হয়। একটি মোচার অনেকগুলি বিভাগ
থাকে, প্রতি বিভাগে দুই সার পুশ্পসূকুল এক একখানি
বেগুনে চর্ম্মবৎ পৌল্লিক পত্রাবর্ত্তে আবৃত থাকে। প্রত্যেক
সারে ৯টি বা ১০টি পুশ্প থাকে। প্রত্যেক পুশ্পেই ফল
হয়। এই পুশ্পগুলির মধ্যে পুংপুশ্পগুলি (Male-flowers)
নিম্নের শ্রেণীতে, স্ত্রীপুশ্প বা উতলিল পুশ্পগুলি (Female
or Herma-phrodite flowers) উপরের শ্রেণীতে থাকে।
প্রত্যেক ভাগের ফুলগুলি যেমন যেমন বাড়িতে থাকে,
অননি তাহাদের আবরক পৌল্লিক পত্রাবর্ত্তখানি খসিয়া
বাইতে থাকে। গোড়ার দিক হইতে পুশ্পগুলি কলে
পরিণত হইতে থাকে। বাঙ্গালার এই পৌল্লিক পত্রাবর্ত্ত-
গুলিকে চলিত কথায় মোচার খোলা বলে, প্রত্যেক
মোচার ৯ হইতে ১০ থাক কল ধরে। এক এক থাকে

বাঙ্গালার “ছড়া” বলে। মোচার বতগুলি ফুল থাকে, সব গুলিতে ফল হইতে পারে না। সব ছড়া লইয়া ফলশুলককে বাঙ্গালার কাঁদি বলে। একটি গাছে একবার যাত্র একটি কাঁদি ধরে। কাঁদি কাটিয়া লইলেই কিছু দিন পরে গাছ পড়িয়া মরিয়া যায়। গাছ অতি পুরাতন হইলে বা কাঁদি ফেলিয়া মরিয়া গেলে, তাহার গিওমূল হইতে ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত চারা নির্গত হয়। বাঙ্গালার এই চারাকে তেউড় বলে।

কলা অনেক প্রকার আছে। সকল কলার বীজ হয় না। বন্য কলার এবং চট্টগ্রাম প্রদেশের এক জাতীয় কাঁচকলার (Musa sapientum) বীজ হয়, এই বীজে গাছ হয়। অল্প কোন কোন জাতীয় কলার বীজ জন্মে বটে কিন্তু সে বীজে চারা হয় না। পার্শ্বত্যা প্রদেশে কলাগাছ অতি অল্প হয়। এ সকল স্থানে কলাগাছ বাড়িতে পারে না, কারণ অন্যান্য বৃক্ষের প্রতিযোগিতায় কলাগাছ পার্শ্বত্যা প্রদেশের কঠিন মাটি হইতে রস টানিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য ইহার তেউড় হয় না। তেউড় হয় না বলিয়াই, পার্শ্বত্যা কলার বীজ হইয়া থাকে। বীজ ও আবার এত বেশী হয় যে, কালে শত কিছুমাত্র থাকে না। বীজ-গুলির উপর পাতলা সরের মত একটু কোমল চট্টটে শত থাকে। পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা! পক্ষীর এই শতটুকু খাইবার জন্য বহুদূর হইতে আসিয়া পক্ষফল লইয়া যায়, এবং সেই সকল স্থানে এই উপায়ে বীজ নীত হইয়া কলার গাছ জন্মে।

অন্যান্য স্থলে কলার আবাদ হয়। আবাদী কলার বীজ হইতে পার না এবং উত্তরোত্তর ফলের উন্নতি হয়, গাছে তেউড় জন্মে, তেউড়ের ও উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া থাকে। আবারের শুণে ভাল ভাল কলার এগুন আর মোটেই বীজ জন্মে না। ইহাদের বীজোৎপাদিনী শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু কোন কোন স্থানের অলবায়ু প্রভাবে আবাদ করিলেও সহজে ইহাদের এ শক্তি রহিত হয় না। ছ একবারের ফলে হয় ত বীজ হইতে পারে না, কিন্তু তৃতীয় আবারেই বীজ হইয়া থাকে। সব্বীপের অলবায়ু এইরূপ বটে। বাঙ্গালার কাঁঠালী কলা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজিও তাহার বীজোৎপাদিনী শক্তি একবারে নষ্ট হয় নাই। অতি অল্প দিনই ইহাতে বীজ জন্মে, এজন্য বাঙ্গালার কাঁঠালিকলার বাড় বেশী পুরাতন হইতে দিতে নাই, তেউড়গুলি লইয়া অন্য স্থানে লাগাইয়া কলার উন্নতি বর্তমান রাখা কর্তব্য।

আবাদের শুণে ও জমীর শুণে কাঁঠালিকলার উন্নতি হয় মাত্র কিন্তু কিছুমাত্র শক্তি নষ্ট হয় না। চীন দেশে এক প্রকার কলাগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি ক্ষুদ্রাকার এবং তাহার ফলও হয় না।

কলাগাছ অতি নীচ নীচ বাড়়ে। ভাল জমীতে আবাদ করিলে এই বৃদ্ধি সহজেই চক্ষুগোচর করা যায়। কলার কচি পাতা বাঙ্গালার ইহাকে মাজ অথবা মধ্যপত্র বলে। যখন পাক ফুলিয়া বিকৃত হইতে থাকে তখন তাহার ষোঁটা (বৃত্ত) হইতে পত্রাগ্র পর্য্যন্ত একটা হতা মরিয়া বস্তুধানেক অপেক্ষা করিলেই দেখা বাইবে যে সেই সময়ের মধ্যে মাপের হতা ছাড়াইয়া আর ১ ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়াছে।

এবল বাতাসে কলাগাছের বড় অনিষ্ট করে, বিশেষতঃ ফল হইলে অতি অল্প বাতাসেই তাড়িয়া পড়ে। বাঙ্গালী দেশে বাতাসের তেঁকটা করিয়া এই সময়ে গাছ রক্ষা করিয়া থাকে। বাঙ্গালী দেশে কলার জুরে নামে একপ্রকার পোকা লাগে, এই পোকাতেও অনিষ্ট করে, জুরে লাগিলে গাছ শুইয়া পড়ে।

কোথার কোথার কদলী পাওয়া যায় এবং তাহার শ্রেণী বিভাগ—ভারতবর্ষ কলার আদি জন্মস্থান। এখানে ও পাশ্চাত্য প্রদেশ অপেক্ষা পূর্বপ্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যেই বেশী জন্মে। পূর্বে বাঙ্গালার এবং দাক্ষিণাত্যে মালাবর উপকূলে ইহার বহুল আবাদ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার রামরঙা, অরুণাম, মালভোগ, অপরিমর্ডা, মর্ডামান, চম্পক, চিনিচাপা, কানাইবাণী, ঘিমে, কালীবট, কাঁঠালী প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলা সর্বাধিক উৎকৃষ্ট। ইহার মধ্যে প্রথম চারি প্রকার এক শ্রেণীর, তাহার পরের চারিপ্রকারও এক শ্রেণীর আর শেষ তিন প্রকারও এক শ্রেণীর কলা। মর্ডামান শ্রেণীকে চাটম কলাও বলে; কোথাও কোথাও মর্ডামানও বলে। এই সকল কলার আদৌ বীজ হয় না। কাঁঠালিকলার অন্যান্য কলার বীজ হয় না, কেবল শুধু কাঁঠালী বলিয়া বাহা বিখ্যাত তাহাই বহুদিন এক কৃষিতে থাকিলে বীজবিশিষ্ট হইয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন মদনী, মদনা, তুলনী, মছরা রক্তবীর, গোড়ারক্তবীর প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলার কোন কোন জাতিতে অল্প বীজ হয় আবার কোন শ্রেণীতে মোটেই হয় না। বাঙ্গালার ‘বীচাকলা’ (বীজ-বহুল) নানাবিধ। ইহার এক একটি কলার যথেষ্ট বীজ হয়, কিন্তু মিষ্টতা খুব বেশী হয়। যশোহরে ‘ব’য়েকলা’ নামে এক প্রকার বীচাকলা হয়, ইহার সব্বতঃ অতি সুন্দর হইয়া থাকে। কম্বিকাভুক্ত মিকটবর্জী স্থানে ‘জোগুরকলা’

নামক একপ্রকার বীচাকলা হয়, ইহার কল খাইতে পারা যায় না, কিন্তু মোটা বড় সুস্বাদু হয়। মোচার জন্যই ইহার আবাদ করা হয়। "সয়া" নামক আর এক প্রকার বীচাকলা আছে, তাহার রসে নানারূপ চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। কাঁচকলা, কাঁচাকলা, আনাজি কলা প্রভৃতি কলা 'কাঁচকলা' জাতীয়। এই শ্রেণীতে নানা আকারের কলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পাকিলে সুমিষ্ট হয় বটে, কিন্তু ভরকারীতেই ইহা বথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। কাঁচকলার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম (Musa Paradisica) কাঁঠালিকলার কাঁচাকলাও খায়, ইহাকে 'ঠোটেকলা' বলে। 'ঠোটেকলা' আবার কাঁঠালিকলার শ্রেণীর ফলকেও বলে; ইহা কাঁঠালিজাতীয় একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীও বটে। সংস্কৃতের কদলীর নানা ভেদ আছে;—

"মাদিকামর্ত্যাসুতচম্পকাদয়া

ভেদাঃ কদল্যাঃ বহবোহপি সন্তি।"

এই সংস্কৃত "মর্ত্য" কলাই বাঙ্গালার মর্ত্যমান বা চাটম, আর "চম্পকই" চাপাকলা নামে বিখ্যাত। কাঁঠালিজাতীয় "কানাইবাণীকলা" প্রায় ১ ফুটের উপর লম্বা হয়। আর "কালীবউকলা" বেশ মোটা হয়। "বিরে" কাঁঠালী হইতে স্নাতের জায় সুগন্ধ নির্গত হয় এবং উচ্চ হৃদে ফেলিয়া দিলে মাখনবৎ গলিয়া ভাসিয়া উঠে।

কাঁঠালিকলা পাকিলে বর্ণ লবঙ্গ পীত হইয়া উঠে, চাটম-কলা পাকিলে বর্ণ পীতভাষ হয়, কিন্তু গায়ে ফোটা ফোটা দাগ হয়, চাপাকলা পাকিলে ঘোর পীতবর্ণ হয়। কাঁঠালী পরিপুষ্ট হইলে কতকটা চোপলা, লবঙ্গ বক্র; চাটমকলা সুগোল, সরল এবং চাপা সুগোল, অথচ স্বরাস্ত্রিত হইয়া থাকে। এদেশে একপ্রকার রক্তবর্ণকলা আছে তাহাকে "সিঁহুরেকলা" বা "চীনে কলা" বলে। মর্ত্যমানকলা ও কাঁঠালিকলার উক্তিক্ত শাস্ত্রোক্ত নাম Musa sapientum।

বাঙ্গালার কাঁঠালিজাতীয় কলার শত কিছু কড়া হয়, "মর্ত্যমান" জাতীয়ের শত খুব সাদা ও মাখনবৎ কোমল এবং "চম্পক" জাতীয়ের শত লবঙ্গ অল্পরসযুক্ত সুগন্ধ ও ফলের মধ্যে পীতভাষ বর্ণ হয়। কাঁঠালির ফলের খোসা পুরু, চাপার খোসা পাতলা হয়। বাঙ্গালীরা মর্ত্যমান কলাই বেশী আদর করে। এদেশের রূপ-প্রবাসীরা "চাপাকলা"র আদর করে। কাঁঠালির ও কাঁচকলার ব্যবহারই অধিক।

দাক্ষিণাত্যের দিল্লীওল প্রদেশের পর্বতে যে সকল কলা উৎপন্ন হয় ও বর্তমানে সাধারণতঃ যে সকল কলা দেখা যায়, তাহার ইংরাজী নাম Musa superba। বেঙ্গল প্রদেশের

কলা সুগন্ধবিশিষ্ট ও বরোচ প্রদেশের কলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

নেপালে একপ্রকার কলা আছে, ইহার নাম "নেপালী-কলা" Musa Nepalensis।

এ দেশে এক প্রকার বৃহদাকৃতি কলা আছে, তাহাকে "কাবুলে কলা" বলে।

মাসাজে বড় রকম কলা পাওয়া যায় তন্মধ্যে "রসবলি" সর্বাপেক্ষা উত্তম। "পতি" জাতীয় কলার শত বেশ কড়া, পাকিতে বড় বিলম্ব হয়, কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কলাই ভাল বাসে বলিয়া আগ দিয়া পাকাইরা বিক্রয় করে। "পাহা" জাতীয় কলা খুব লম্বা হয়, কিন্তু পুষ্ট হইলেই বাকিয়া যায়, ইহার বর্ণ সবুজ, পাকিলেও বর্ণ পরিবর্তিত হয় না। "পেবেলি" জাতীয় কলা সুমিষ্ট কিন্তু বর্ণ পাভঁটে। "সেবেলি" জাতীয় কলা খুব বড় হয়, ইহার বর্ণ লোহিত, দেখিতে বেশ। এতদ্বির বহু, বেদলা, বমেই, পে, সেম্বা, বেয়েপারিয়ান, শিরিমোথে প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর কলা পাওয়া যায়।

মর্ত্যমান কলা চট্টগ্রাম ও ভেনাসরির প্রদেশে বহুল পরিমাণে আছে, এই উত্তর প্রদেশের দক্ষিণে মার্ত্যমান উপসাগর। অনেক বলেন যে এই উপসাগর দিয়া এই কলা প্রথমে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম মর্ত্যমান হইয়াছে। আমাদের মতে তাহা নহে, মর্ত্য নামক কদলীই এই মর্ত্যমান কলা।

বাংলায় নয়প্রকার কলা আছে—বলরই, মুখলি, তাণ্ডি, রজেলি, লোখতি, নোনকেলি, বেসকেলি, করজেলি, ও নর-সিজি। ইহার মধ্যে তাণ্ডি রক্তবর্ণ কদলী।

ব্রহ্মদেশে পীত ও স্বর্ণবর্ণের নানাপ্রকার কদলী দেখিতে পাওয়া যায়।

সিদ্ধাপুর, মলয় এবং ভারতসাগরীর দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৮০ প্রকার ভোজনোপযোগী কলা আছে, ইহার মধ্যে অনেকগুলির আকারই বৃহৎ এবং সুগন্ধবিশিষ্ট। ইহার মধ্যে "পিত্তাং টিহাণা" রক্তবর্ণ কলা, ইহাকে সে দেশের লোকেরা তামাটে কলা, বা কীকড়া কলা বলে। "পিত্তাং মুলুং বেবেক" এই জাতীয় কলার তলার কতকটা খোঁলা বক্রভাবে হাঁসের ঠোঁটের মত হয়। "পিত্তাং রাজা"—ইহাকে রাজাকলা বলে। "পিত্তাং সুজ" ইহাকে "রুধে কলা" বলে। আর একপ্রকার কলা আছে, তাহাকে সোপাকলা বলে। সোপাক তিনপ্রকারই অতি সুন্দর, সুমিষ্ট, সুগন্ধবিশিষ্ট।

বব্বীনে "পিত্তাং টোক" নামে একপ্রকার কলা আছে,

তাহা দীর্ঘে প্রায় দুই ফুট হয়। বাঙ্গালার বোধ হয় এই প্রেক্ষণিকেই কানাই-বাণী বলে।

বব্বীপে আরও একপ্রকার কলা হয়, তাহার এক গাছে একট ফল ধরে। অভ্যন্তর গাছের ন্যায় এই ফল মোটা সমেত কাণ্ডের বাহিরে নির্গত হয় না। ইহা কাণ্ডের ভিতরে থাকিতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠে, তখন কাণ্ড কাটিয়া যায়। ইহা এত বড় হয় যে, একটা ফলে ৪ জন লোকের ক্ষুধা সন্তুষ্টি নিবৃত্ত হইতে পারে। এই সকল বিখ্যাত কলা ব্যতীত বব্বীপে কাঁঠালি বা মর্ত্যমান প্রেণীর যে সকল কলা জন্মে তাহাতে বীজ হয়। এই প্রেণীর কলাকে সে দেশে “পিত্তাং বুট্ট” বলে।

ফিলিপাইন দ্বীপের পার্শ্বত্যা প্রদেশে এক প্রকার কলা হয়, তাহা এত বৃহৎ যে একটা কলা একটা মানুষের উপবৃত্ত বোঝাই হইতে পারে।

মলয়দ্বীপের সাধারণ কলার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম *Musa glauca*। মরিশস দ্বীপে গোলাপী বর্ণের একপ্রকার কলা পাওয়া যায়, তাহার নাম *Musa rosacea* অর্থাৎ গোলাপী কলা।

আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কাঁঠালি ও মর্ত্যমান জাতীয় কলারই আবাদ হয়।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার বেগুণে বর্ণের কলা হয়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর। সে দেশের বড়মানুষেরা এই কলারই সমধিক আদর করে। এই জাতীয় কলাকে ইংরাজেরা *Fig banana* বলে। এই জাতীয় আর এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার কলা আছে, তাহাকেও নিরপ্রেণীর লোকে বিশেষ আদর করিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে *Fig Sucrier* বা *Lady finger* বলে, এই জাতীয় নাম *Musa orientum* ও পূর্বোক্ত *Fig banana* নাম *Musa musculata*।

আমেরিকার ফ্লোরিডাদেশে “ওরকো” নামক কলা অতি উত্তম, ইহা সে দেশের সকল স্থানেই পাওয়া যায়। যদি ইহা গাছপাকা হয়, তাহা হইলে তাহার সন্নিবেশ এমন কি মানুষ পণ্ড পক্ষী পর্যন্ত পাগল হইয়া উঠে।

চীনদেশে একপ্রকার কদলী জন্মে, তাহা ধর্ম্মাকার হয়, ইহাকে ইংরাজেরা *Dwarf plantain* অর্থাৎ বামনকলা বলে। ইহা দুই জাতীয় আছে, এক জাতীয়ের নাম *Musa Occinea* আর এক প্রকারের নাম *Musa nana*। চীনের আর একপ্রকার কলার নাম *Musa Cavendishi*। তথায় ধর্ম্মাকার আরও একপ্রকার কলা জন্মে।

আবিসিনিয়া প্রদেশে একপ্রকার কলা জন্মে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর, ইহার নাম *Musa ensate*।

এতদ্বির অন্যান্য স্থানেও কলা পাওয়া যায়। প্রধানতঃ উক্তপ্রধান স্থানেই কলা জন্মে। এশিয়ার পূর্বে চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমে তুরস্কের অন্তর্গত ইউফ্রেতিস নদীর তীর পর্যন্ত সমস্ত দেশেই কলা পাওয়া যায়। অন্যান্য অংশে যে সকল ভূভাগ পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত, সেই সকল স্থানেই কলা পাওয়া যায়। ভারতে হিমালয় পর্বতের শীতল প্রদেশে কলা জন্মে। ইহার পাদদেশে ৩০° উত্তর অক্ষান্তর পর্যন্ত কলা বেশ জন্মে, কিন্তু সুসৌরী, কুমায়ুন ও গাড়োয়াল প্রদেশেও কলা জন্মে বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল বীজ ব্যতীত শক্ত থাকে না বলিলেই হয়। সমুদ্র হইতে উর্দ্ধে ৭০০০ ফুট পর্যন্ত স্থানে কলা জন্মিতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার আজকাল কলার আবাদ যথেষ্ট হইতেছে। কারাকাস, গোয়েনা, ডেমেরেরা, জ্যামেকা, জিনিবাদ প্রভৃতি স্থানেও একেবারে অনেকটা জমিতে কলার আবাদ হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম প্রদেশের বনমধ্যে কলাগাছ এত অধিক জন্মে যে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে বনের মধ্যে হস্তী এবং গয়াল নামক মহিষ জাতীয় পশুগণ একপ্রকার কলাগাছ খাইয়া বাঁচিয়া যায়। পার্শ্বত্যা প্রদেশে সাধারণতঃ যে সকল কলা জন্মে, তাহাকে *Musa ornata* (পাহাড়ের কলা) ও বনমধ্যে সাধারণতঃ যে সকল কলা জন্মে তাহাকে *Musa superba* (বুনো-কলা) বলে। চট্টগ্রাম প্রদেশেও কলাগাছ ঘাসের মত অপরিখ্যাপ্ত জন্মায়। অন্যান্য স্থানে খালি মাঠ পড়িয়া থাকিলে যেমন দুর্গা মৃগা প্রভৃতি ঘাস জন্মায়, সেইরূপ চট্টগ্রামে খালিমাঠে পূর্বে ঘাসের সঙ্গে সঙ্গে কলাগাছও বাহির হইত। আবাদ করিতে হইলে, কত যে কলাগাছ মারিয়া ফেলিতে হইত তাহার আর সংখ্যা করা যাইত না। এখনও নূতন আবাদী জঙ্গল-মহলে এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

ইরোপে দক্ষিণ স্পেনে কলা হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে কাচঘর বা উকঘর ব্যতীত খোলা ক্ষেত্রে কলা হয় না। কিউবা দ্বীপে কোথাও কোথাও হয়।

ভিন্ন ভাব্য ভিন্ন নাম।—সংস্কৃত নামগুলি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অতি পূর্বকালে এদেশে ইহাকে মোচক অর্থাৎ মোচা বলিত। মোচক অর্থে বৃক্ক হইয়াছে বাহা—অর্থাৎ প্রথমতঃ বৃক্কগত হইতে ইহার ফল বাহির হয় তাহা একটি আবরণী মধ্যে থাকে, সেই আবরণী কাটিয়া ফল নির্গত হয়। প্রত্যেক ফলটি আবার শুষ্কগায়ে আর একটি

আবরণে আবৃত থাকে। সেই আবরণ মুক্ত হইলে ফল হয়, এই জন্ত ফলকে “মোচা” বলে। মোচা যে ইহার প্রাচীন নাম তাহা আমরা শিবপূজার মত্রে দেখিতে পাই।

“এতৎ মোচাকলং নমঃ শিবায় নমঃ।”

কেহই এহলে কদলী বা রক্তা কি জন্ত কোন নাম ব্যবহার করেন না। কদলী ও কদল অর্থে যাহা জলেই পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। কলাগাছ কিছু জলপ্রধান অর্থাৎ জলভেস্কা গাছ, ইহা সরস ভূমিতেই ভাল উৎপন্ন হয়। অংগ-সংকলা অর্থাৎ বাহার অংগ বা ভক্ত আছে। কলাগাছের ভক্ত বিশেষ বিখ্যাত। বারগবুসা ও বারগবলতা অর্থে হস্তীপ্রিয়। সঙ্কৎকলা অর্থে বৎসরে একটি গাছে একবারমাত্র ফল ধরে। তাহুফলা অর্থে সূর্য্যোদ্যাপপ্রিয়। বনলক্ষ্মী অর্থে যে ফলে বনের শোভা বৃদ্ধি হয় এবং বনেও ধনাগম বা প্রাণ-ধারণ হয়, হস্তিবিষাণী অর্থে যাহা হস্তিবিষাণ বা হস্তিদন্তের দ্বারা স্পর্শগোল, দীর্ঘ অথচ জীবৎ বজ্র। চর্ম্মবতী অর্থে চর্ম্মের দ্বারা আবরণযুক্ত। অন্যান্য নামের অর্থ নামটি পড়িলেই বুঝা যাইবে।

কলাকে আরবী ভাষায় “মোজ” বলে। ইহা সংস্কৃত মোচা শব্দ হইতে উৎপন্ন। লাতিন ভাষায় মিউসা বা মুজা বলে, ইহা আরবী মোজ হইতে উৎপন্ন। ইংরাজীতে ব্যানানা ও প্ল্যাণ্টেন বলে। ইংরাজী ব্যানানা শব্দ গ্রীক অরিয়ানা (Ariana) শব্দ হইতে উৎপন্ন। গ্রীক অরিয়ানার অপর পর্যায় ঔরানা (Ourana) ছিল। গ্রীক অরিয়ানা সম্ভবতঃ তৈলঙ্গী ভাষার অরিত্তি শব্দ হইতে উৎপন্ন।

অনেকে গ্রীক ঔরানা শব্দ সংস্কৃত বারগবুসা শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গ্রীক ভাষায় ভারতবর্ষীয় যে সকল ওষধির উল্লেখ আছে, তাহার দেশীয় নাম অধিকাংশ দক্ষিণদেশীয় ভাষা হইতে সংগৃহীত [ধান্য প্রভৃতি শব্দ দেখে।]

‘প্ল্যাণ্টেন’ শব্দ গ্রীক গ্রহকার থিওফ্রাস্টাস বা প্লিনির লিখিত পল নামক বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন। পলবৃক্ষের ও তাহার ফলের বর্ণনা ঠিক কদলী বৃক্ষের এবং কদলীর ন্যায় বটে এবং হিন্দু ঋষিগণের বায়্য বলিয়া উল্লিখিত। এই পল যে সংস্কৃত ফল শব্দ হইতে বা তামিল ‘বল’ শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহা নিশ্চয়। বাঙ্গালার ইহার নাম কলা, হিন্দীতে কেলা, মহারাত্রীর ভাষায় কেলি, তামিল বল বা বেলা, তৈলঙ্গী অরিত্তি, সিংহলীতে কহিকাং, ব্রহ্মদেশে মেরিয়ান বাজ-হেট, বালিবিপে বিবু, জাপানী গড়ং, মদগাজাবর পিতাং।

কদলীর ব্যবহার।—এদেশে কাঁচকলা, মোচা ও খোড়

ভরকারীতে ব্যবহৃত হয়। পাকাকলা ভুই খাওয়া হয়। হিন্দুর চক্ষে কলা বড় পবিত্র জিনিস, পূজা, জাদু, বিবাহ প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই কলা ব্যবহৃত হয়। হবিষ্যানে অন্য ভরকারী খাইতে নাই, কিন্তু কাঁচকলা সিদ্ধ খাওয়া যায়। পাতার ভারতবর্ষের সকল স্থলে ভোজন পাঞ্জের কার্য্য করে। অধিক সংখ্যক লোক খাওয়ারিতে হইলেই কলাপাতা ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোককে বাহাদিগের জল অশুভ তাহাদিগকে খাওয়ারিতে হইলে কলাপাতার খাইতে দেয়। মাজাজে, কাণাডার ও মালাবর প্রদেশে কলার জন্য বত হটক না হটক পাতার জন্যই কলার আবাদ করে, সেখানে সকল শ্রেণীর লোকেই কদলী পত্রে আহার করিয়া থাকে। গ্রাম্য পাঠশালে ভালপাতে লেখা হইলে ছাত্রেরা কলাপাতে লেখা অভ্যাস করিতে থাকে। কলাপাতে হাত পাকিলে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করে। ইহার কচিপাতা (“মাজপাতা”) বেলেস্তারার ঘাসের উপর ঢাকা দিলে আলা নিবারণ হয়। মাজপাতা কাটিয়া তাহার সোজা পিটে মাখন মাখাইয়া ঘাসের উপর দিয়া ৪।৫ দিন বাঁধিয়া রাখিলে বেলেস্তারার বা ভাল হয়। পশ্চিম ভারতে “বিড়ি” চুইত শুকনা কলাপাতার জড়াইয়া প্রস্তুত করে। সেদেশে কোন জব্যাদি মুড়িবার জন্য শুকনা কলাপাতা ব্যবহার করে। বাঙ্গালার মালীরা ফুল ও ফুলের মালা মুড়িবার জন্ত কলাপাতা ব্যবহার করে। চক্ষুরোগে কচি কলাপাতার আবরণ বড় উপকারক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার কলাপাতা দিয়া ঘর ছাইয়া থাকে। বাঙ্গালার গরীবেরা কলাপাতা পুড়াইয়া সেই ছাই দিয়া কাণড় কাটিয়া থাকে। বহুমূত্ররোগে কবিরাজ মহাশয়েরা কদল্যাতি বৃতে ইহার শিকড়ের রস ব্যবহার করেন। এই বৃত্ত বায়ু ও পিত্তদোষনাশক। কোলাপুর জেলার এই গাছের রস দিয়া রক্তপড়া নিবারণ করে। আমেিকাতেও এইরূপে ব্যবহৃত হয়। (তথ্যর গাছের গায়ে একটা খোঁচা মারিয়া রস বাহির করিয়া থাকে।) যব্বীপে এক শ্রেণীর কলাগাছের পাতার উন্টাদিকে মোমের দ্বারা একপ্রকার আটাবৎ পদার্থ জন্মে, লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া বাতি প্রস্তুত করে। কলাগাছেও অনেক কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। যেখানে হঠাৎ বজা প্রবেশ করে, সেখানে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া পাশাপাশি করিয়া গাধিরা দিয়া তেলা প্রস্তুত করে। ইহাকে কলার মাকাল বলে। আফ্রিকার অমভ্যেয়া এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যের লোকেরা কলাগাছে লক্ষ্য করিয়া জীৱ ও ভরকারী শিকার করে। বাঙ্গালার বঙ্গপূজার, বিবাহে এবং

অধিবাসাদি মাসল্যকর্মে ১ ছড়া অথও কলা আবশ্যক হইয়া থাকে। মুসলমানেরাও পীরের সিনি দিবার সময় কলা ব্যবহার করে। বাসন্তী ও হুর্গাপুকার সময় নবগজিকার কলার তেউড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নবগজিকাকে সাধারণ লোকে কলাবউ বলে। হিন্দুরা শুভ কর্মে কলার তেউড় মঙ্গলচিহ্নরূপে ব্যবহার করে। উৎসবের সময়, পূজা ও বিবাহাদির সময় হিন্দুরা ঘারে ও পথে কলাগাছ দিয়া থাকে। হিন্দুদের বিবাহাদি সংস্কারে ‘কলাতলা’ করে। এক স্থানে একখানি আসন রাখিয়া তাহার চতুর্কোণে চারিটা কলার তেউড় স্থাপন করে, এইখানে সংস্কারার্থ ব্যক্তির নানাকার্য্য, ক্ষৌরকর্ম, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বরণ ইত্যাদি হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ের পতিরতা কামিনীরা কলাগাছকে ধন ও আত্মপ্রদ বোধে পূজা করিয়া থাকে। প্রাচ্যে ইহার কাণ্ডকে বা খোলা বড়ই আবশ্যক হয়। ইহা দ্বারা প্রাকীর নৈবেদ্য, জল ও কল প্রদানের জন্য একপ্রকার ডোকা নির্মিত হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালার সন্তান-বতী রমণীরা কলার খোলার নোকা প্রস্তুত করিয়া গাঁদা-ফুল দিয়া সাজাইয়া তন্মধ্যে প্রদীপ জালিয়া পুত্র দ্বারা নদী বা পুকুরে জলে ভাসাইয়া দেয়। ইহা ভগবতী ভবানীর উদ্দেশে সন্তানের মঙ্গলকামনার ইহার নাম সোদো বা তুলসী ব্রত।

কলাগাছের আগাগোড়া সমস্তই গবাদির খাদ্য। হুর্জিকের সময় এই গাছ আগাগোড়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গরুকে খাওয়ায়। খোড় কাটিয়া লইলে তাহার বাসনাওলা গরুকে দেওয়া হয়। ইহা গরুর পক্ষে বিশেষ উপকারক। জ্যামেকাবীপে গম জন্মে, জুতরাং কদলীই সেখানকার অধিবাসী নিরশ্রমীর পক্ষে একমাত্র সুলভ খাদ্য। আমেরিকার আদিমনিবাসিরাও ইহা প্রধান খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করে। বোম্বাই প্রদেশে আম, কাঁটাল ফলের চারা লাগাইয়া তাহার পার্শ্বে এক একটি কলাগাছ রোপণ করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা মধ্যভারতের ধরতর রৌদ্রের আতপ হইতে চারা গাছটি রক্ষা পায়, শেষে যখন ৬৮ বৎসর বাদে ভাল গাছের চারাটি নিজে রৌদ্র সহ্য করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট হয়, তখন কলাগাছ কাটিয়া কেলে। এখানে শুপারির ক্ষেত্রেও কলাগাছ রোপণ করিয়া থাকে, কারণ কলাগাছের ছায়ার শুপারির শিকড় শীতল থাকে। এখানে একপ্রকার কলা শুকাইয়া রাখিয়া থাকে। রাজেলি নামক কলা পাকিলে একটা বাক্সের মধ্যে ছড়াছড়া করিয়া সাজাইয়া খড় চাপা দিয়া ৭৮ দিন রাখিয়া দেয়, তৎপরে খোলা ছাড়াইয়া সমুদ্রের তীরে বাটার

উপর শুকাইতে দেয়। সারাদিন রৌদ্রে শুকাইয়া লম্বাবেলা উঠাইয়া আনিয়া স্নাত মাখাইয়া সারারাত্রি মাছর ও কলাপাত চাপা দিয়া রাখিয়া দেয়। এইরূপে সাত দিন পর্য্যন্ত সকলে রৌদ্রে দেয় ও লম্বাবেলা ফুলিয়া আনিয়া স্নাত মাখাইয়া ঢাকিয়া রাখে। ৬৮ দিনে কলা বেশ শুখাইয়া যায়। ইহা খাইতে মন্দ নয়। শুক্কলা বড় বলকারক ও শৈত্যনিবারক; ইহা গাল ফুলার পক্ষে উপকারী। সমুদ্রযাত্রার ইহা বেশ ব্যবহার্য্য। ঘরে খাইবার জন্য বোম্বাইবাসীরা পাকাকলা খোলা ছাড়াইয়া বাঁশের চেরাড়ি দিয়া পাতলা পাতলা করিয়া চিরিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখে। ইহা হইতে একপ্রকার মোরকা প্রস্তুত করে, তাহা খাইতে অতি সুন্দর। বেসকেলি কলা শুকাইয়া পরে শুঁড়াইয়া বোম্বাইবাসীরা একপ্রকার পালো তৈয়ার করে, উহা শিশু, রোগী ও সদ্যপ্রসূতা কামিনীর পক্ষে অতি উপকারক এবং বলকারক খাদ্য। মরিসসহরে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও ঐরূপ পালো করে। মেক্সিকোদেশেও কলা শুকাইয়া রাখে। নিগ্রোর পাকাকলা সিদ্ধি বা মণ্ড উপাদের বোধে খাইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার, আফ্রিকার ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে ইহার চূর্ণ প্রস্তুত করে। দক্ষিণ আমেরিকার এই চূর্ণ হইতে আবার বিছুট তৈয়ারি হয়। ব্রিটিশ গিনিতে কাচাকলা প্রধান খাদ্য বলিয়া গণ্য এবং ইক্ষুর পর ইহার চাব বেশী হয়। ইহার গাছের রসে ক্ষার বা লবণবৎ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার তাড়ির মত একপ্রকার মদ্য পাকা কলা হইতে প্রস্তুত করে। শুক্কা কলা হইতেও একপ্রকার মদ্য হয়, তাহা তীব্র নহে। এইখানে পাকা ফলের শস্ত পাতার জড়াইয়া শুকাইয়া ছোট ছোট পাটালির ন্যায় করিয়া রাখিয়া দেয়। প্রয়োজন মত ইহার একটু ভাঙ্গিয়া লইয়া জলে গুলিয়া সরবত করিয়া খায়। এই সরবত বড় শীতল ও শ্রমপহারক। ভারতবর্ষে ইহার খোলা হইতে চামড়ার কাল রং প্রস্তুত হয়।

কলার গুণ—পাকাকলার গুণ অনেক। ইহা বলকারক, শীতল, পিত্তপ্রনাশক, গুরুপাক, অধীরোগে অপথ্য, সদ্য শুক্রাদিবর্দ্ধক, তৃষ্ণা ও শ্রমহারক, লাভণ্যবর্দ্ধক, কক্ষকর, আমকর, হৃর্জয় এবং ইহা খাইতে ঈষৎ কবায়সংযুক্ত, মধুরস-বিশিষ্ট। দধি, হুড় ও খোলের সহিত কদলী খাইলে অতিশয় হৃৎপাচ হয়। চাপাকলার কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে,— ইহা বাতপিত্ত নষ্ট করে, এবং অতি শীতল।

ঘোটা—কক, ক্রি, কুর্ট, গীহা, বাতপিত্ত, রক্তপিত্ত ও অরুণাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বাতপিত্ত, উদরদোষনিবারক।

খোঁচে বলবুদ্ধি করে এবং বাতপিত্ত নষ্ট করে। চাপাকলার বহুমুখ রোগের উপকার হয়। মুসলমান হাকিমেরাও পিত্ত-বাত, রক্ত এবং জন্মোগনাশক বলিয়া কলার গুণ ব্যাখ্যা করেন। ডাক্তার স্পে-কেনার বলেন যে ইহা শুক্রবৃদ্ধিকর ও মস্তিষ্কদোষনাশক। কিন্তু হৃৎপাণ্ড। হাকিমেরা কদলী ভোজন-জনিত দোষের জন্য মধু, আদা ও গাঁদ খাইতে বলেন। ইহার কচিপাতার আবরণী চক্ষুরোগের পক্ষে উপকারী। ইহার শিকড়ের রসে বহুমুখরোগের কদলান্য স্রুত প্রস্তুত হয়।

কলার সূতা—কলাগাছে ফল, খোঁড়, মোচা, পাতমোচা ভিন্ন আরও একটি ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। ইহার বাসনা, ছাল ও পাতা হইতে তত্ত্ব প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাকে কলাগাছের সূতা বলা বাইতে পারে। পাশ্চাত্য-গণের অধ্যবসায়ে এই তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার তাঁহার ইহার জন্য বিশেষ বাহাহুরি লইয়া থাকেন এবং অনেক দিয়াও থাকেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের লোকেরাও যে এ বিষয় অবগত ছিল এবং কোন কোন কর্ণে ব্যবহার করিত তাহা নিশ্চয়, এ কথা একমাত্র ইহার সংস্কৃত নাম অংশুমৎ-কলা হইতে ও মালাকরণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রমাণ করা যায়। মালায়া এখনও কলার ছোটায় ও বাসনার সূত্র খণ্ডে মালা গাঁথে, ফুলের পাত বাঁধে, লতাগাছের মাচা বাঁধে, এবং আবস্তক মত দুই তিনটা ‘ছোট্ট’ একত্রে পাকাইয়া কাগজ শুকাইবার দড়ি, সুড়ি বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি করিয়া থাকে।

কলাগাছের সূতার কাগজ, দড়ি, কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বিদেশীয় বণিক্গণের দ্বারা ইহা নিরদিষ্ট উপায়ে প্রস্তুত হয়। কলাগাছের সূতা তৈয়ারির দুইটি উপায় আছে, (১) গাছ জলে পচাইয়া, (২) কলে গিষিয়া। প্রথম উপায়ে সূতা বাহির করিতে হইলে গাছ কাটিয়া কিছু দিন ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হয়, শেষোক্ত উপায়ে হইলে গাছ কাটিয়াই উহাকে কলের জাঁতার বা ডলনার দিয়া গিষিতে হয়। পেছাই হইলে ও পচিয়া গেলে সেই গাছগুলি লইয়া সোডা ও কলিচূর্ণের জলে সিদ্ধ করিয়া সূতা-গুলি কঠিন করিয়া লইতে হয়। এই সিদ্ধ করিবার সময় সূতার গা হইতে অন্যান্য অংশ গুলিয়া যায়। ১টা ৬৫ মণ বরলায়ে একদিনে ২১ মণ সূতা হইতে পারে। সূতা পরিষ্কৃত করিবার জন্য ৫ বার সিদ্ধ করিতে হয়। ২১ মণ সূতা সিদ্ধ করিবার জন্য ১ মণ সোডা ও ১ মণ কলিচূর্ণ লাগে। সিদ্ধ করিবার সময় রকম রকম সূতা বাছাই করিয়া কেলিতে হয়। কিকে রঙের সূতা হইলে ৬ বর্গা খুইলেই পরিষ্কার

হয়, কিন্তু ঘোর রং হইলে ১৮ বর্গা রকম পরিষ্কার হয় না। বরলার হইতে সিদ্ধ সূতা বস্ত্রের সাহায্যে জলের ছোঁকে ধোত হইতে থাকে। ইহার পর সূতাগুলি ছারার শুকাইতে হয়।

গাছের বাসনা, ডাল, পাতা ও সকল অংশ হইতেই সূতা পাওয়া যায়। শুঁড়ি অপেক্ষা ডালের সূতা পরিমাণে অধিক হয়, আর তাহাই অধিক মূল্যবান। পাতার সূতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় বটে, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় বলিয়া কাগজ তৈরি আর কিছু হয় না। ১৮৬৪ সালে ডাক্তার ক্রে ইহা হইতে একপ্রকার চিঠির কাগজ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। উহা অতি ক্ষুদ্র হইয়াছিল। ১৮৫১ সালে ডাক্তার হার্টার মহাপ্রদর্শনী মাদ্রাজ হইতে কলার সূতার প্রস্তুত দড়ি, কাছি, কাগজ ও সূতার নানারূপ নমুনা দিয়াছিলেন। এই নমুনায় একপ্রকার কাগজ ছিল, তাহা রূপার পাতের ন্যায় পাতলা অথচ মন্থ, আর একপ্রকার কাগজ ছিল তাহা পার্চমেন্টের ন্যায় কড়া, ইহা জলে ভিজিলে নষ্ট হয় না। নমুনায় সূতাও নানা বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছিল। দড়ি ও কাছির কতকাংশ আলকাতরা দেওয়া হইয়াছিল। ডাঃ লেটউডি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন যে কলাগাছের সূতার কাগজ অতি উৎকৃষ্ট হয়। অন্য কোন সূতা না মিশাইয়া কেবল কলার সূতায় পাতলা মজবুত কাগজ হইতে পারে। কল চলিবার সময় ইহাতে শুটুলি বা গাঁট পড়ে না, ইচ্ছামত আকার ও বর্ণের কাগজ হইতে পারে। তাল করিলে ইহার কাগজ কাটিয়া যায় না। ইহার কাগজের সকল স্থানে সমান হয়। বাণীর কলেও ইহা পরীক্ষা করা হইয়াছিল, বাজালার ও আন্মানান বীণের কলাগাছের সূতা ব্যবহৃত হয়—কলও সন্তোষকর হইয়াছিল। প্রতি গাছে ১/২ সের সূতা হইতে পারে।

দড়ি কি কাছি করিতে হইলেও দেশী কলাগাছের সূতা শুষ্কক্ষে ব্যবহার করা বাইতে পারে কিন্তু ফিলিপাইন বীণের Musa Textilis নামক একজাতীয় কলাগাছের সূতাই এ সবক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাকে ইংরাজীতে “ম্যানিলা মণ” (Manilla hemp) বলে। ইহার কল খার না। বাজালা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের স্থানে স্থানে আজকাল এই জাতীয় কদলী জন্মিতেছে। বোম্বায়ে ইহার খোঁড় খার। ইহার বীজে ও চারা হয় বটে কিন্তু ছেউড় লাগাইলেই তাল হয়। ইহা পার্শ্বভাষ্যক্রিতে ও বেথানে অন্যান্য গাছপালা পচা পড়িয়া থাকে এরূপ স্থলে খুব বাড়ি। এই প্রকার কল হইতে দিলে সূতা তাল হয় না। ইহার বাসনাগুলি ৩ ইঞ্চি

চওড়া করিয়া চিরিয়া, পিষিয়া যোজ্রে শুকাইয়া হুতা বাহির করিয়া লইতে হয়। এই জাতীয় হুতার যন্ত্র বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার হুতা শণ অপেক্ষা ২½ গুণ ভারবহ।

ঢাকায় একপ্রকার কলার হুতার কাপড় প্রস্তুত হয়। ঢাকাই তাঁতিরা সময়ে সময়ে এই কাপড়ে নানা কারুকার্য করিয়া আপনাদের গুণপনা দেখায়, অন্য লোকে তাহা দেখিয়া মোহিত হইয়া যায়। ১৮৮৫ সালের কলিকাতা প্রদর্শনীতে ঢাকাই তাঁতিরা কেবল কলার হুতার একখানি রুমাল হুনিয়া তাহার উপর সাজাজরির কাজ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। কলিকাতার যাত্রাবরে এই রুমালখানি আজিও আছে। ইহা দেখিতে ঠিক তসরের ম্যার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা খসখসে। ইহার ৩০ ইঞ্চি লম্বা চওড়া কাপড়ের দাম ৫০ টাকা।

কদলীর চাষের বিবরণ—বালালাস ইহার চাষে বিশেষ পরিপাটি নাই, কেহ বড় যত্নও লয় না। যেমন অমীতে যেমন ভাবে ইচ্ছা লাগাইয়া দাও, ফল হইবে; কিন্তু যত করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এখানে যদি কেহ ইহার চাষে বিশেষ যত্ন করেন, তাখাপি ইহার আবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে, সেগুলি পালন করিলে বাস্তবিকই সফল পাওয়া যায়।

মাটি—কঠিন, নীরস ও কেবল বালুকাময় স্থান ব্যতীত অন্য সকল প্রকার মাটিতে ইহা হইতে পারে। সীয়াতা মাটিতে, পুষ্করীর তেলা মাটিতে ইহা খুব ভাল হয়।

সারের কথা—কলার বোদমাটি (পুষ্করী কাটাইলে বা ঝালাইলে মাটির নিয়ন্ত্রণ হইতে যে কালমাটি বাহির হয়, তাহা বহুদিনের বৃক্ষাদি পচা ব্যতীত আর কিছু নহে, তাহা-কেই চাষারা বোদমাটি বলে) ও ছাইয়ের সার দিতে হয়।

রোপণের সময়—বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বালালাস কলাগাছ পোঁতা যায়। কিন্তু খনা বলেন—

১। “কি কর খণ্ডর মিছে খেটে,

ফাণ্ডনে পোত এঁটে কেটে,

বেধে বাবে ঝাড়ু কি ঝাড়ু,

কলা বইতে ভাদবে ঝাড়।

২। যদি পোঁত ফাণ্ডনে কলা,

কলা হবে মাস ফসলা।

৩। ডাক দিয়ে বলে বনা,

আবাড় শাবনে কলা পুঁতনা,

সবি ঝেটে খাবিনে, কলাভলার খাবিনে,

লেগে বাবে জুঁয়ে, কলা পড়বে শুয়ে।

৪। সিংহ মীন বর্জ, কলা খাবে আর্জ।

৫। ভাদরে ক’রে কলা রোপণ,

সবংশে মরিল রাবণ।

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে ফাণ্ডন মাসে কলার এঁটে কাটিয়া লাগাইতে বলা হইয়াছে আর তাহা হইলে কলা খুব শীঘ্র ফলিবে এবং কাঁদি ও ছড়া বড় হইবে। ৩য় নিয়মে আবাড় শ্রাবণে কলা রোপণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কারণ ইহাতে জুঁয়ে ধরিবার সম্ভাবনা। জুঁয়ে লাগিলে কলাগাছ শুইয়া পড়িবে। ৪র্থ নিয়মে চৈত্র ও আশ্বিন মাস বাদ কলা লাগাইতে বিধি দেওয়া হইয়াছে। ৫ম নিয়মে ভাদ্রমাসও পরিত্যক্ত হইয়াছে। আরও একটা খনার বচন পাওয়া যায়, তাহাতে কিন্তু আবাড় শ্রাবণে কলা লাগাইতে বিধি দেওয়া আছে। তাহা এই—

“ডাক দে বলে রাবণ,

কলা পুঁতগে আবাড় শ্রাবণ।”

রোপণের নিয়ম—কলাবাগান করিতে হইলে প্রথমে ক্ষেত্রে ৮ হাত অন্তর এক একটি শ্রেণী করিবার জন্য অনূন এক হাত মাটি তুলিবে এবং কোদাল দিয়া চাপ ভাঙ্গিয়া পগার ভরিয়া ক্ষেত্র সমতল করিয়া দিবে। তেউড় লাগাইতে হইলে, প্রত্যেক তেউড়ের সহিত একটা করিয়া প্রাচীন বৃক্ষ বা এঁটের কিয়দংশ থাকা আবশ্যক। আর এঁটে লাগাইতে হইলে এঁটেগুলি উর্দ্ধাধোভাবে ৪ বা ৮খণ্ড করিয়া ক্ষেত্রময় রোপণ করিবে। প্রত্যেক চারা বা এঁটের টুকরা ৮ হাত অন্তর লাগাইবে। তেউড়ের গাছ দীর্ঘ হয় আর এঁটের চারায় গাছ খাট হয় বটে কিন্তু ফল অধিক বড় ও সুস্বাদু হয়। বাগান করিবার সুবিধা না হইলে, যে কোন স্থানে সারি দিয়া লাগাইলেও হয় আর সারি দিবার সুবিধা না থাকিলে যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমনই লাগাইলে হয়, তবে সার দেওয়া আবশ্যক। রোপণের সময় কোদালান মাটির সঙ্গে কিঞ্চিৎ বোদমাটি মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। তৎপরে মধ্যে মধ্যে চারার গোড়ায় ছাই দিলেই চলিবে। এ সম্বন্ধে খনার কয়েকটি নিয়ম আছে—

১। সাত হাতে, তিন বিঘাতে, কলা লাগাবে মারে পুতে।

২। নলেকান্তর গজেক বাই, কলা করে খেও তাই।

৩। সাত হাত অন্তর সাত হাত বাই,

কলা পুঁতে খাও চাবা তাই।

১ম নিয়মে সাত হাত অন্তর, বেড় হাত গভীর করিয়া তেউড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গাছ সমেত, ২য় নিয়মে ৮ হাত অন্তর ২ হাত গভীর করিয়া এবং ৩য় নিয়মে সাত হাত অন্তর

ও পোনে দুই হাত গভীর করিয়া পগার কাটিয়া চারা লাগাইবে।

কলার আর—কলার আর সব্বন্ধে খনার দুইটি উপদেশ আছে, তাহা অতি সুন্দর এবং স্বার্থ—

- ১। কলা পুঁতে কেটনা পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই তাত।
- ২। তিন শ বাট ঝাড় কলা করে,
খাক্গে গৃহস্থ যবে শুয়ে।

কলাগাছের পাতা কাটিলেই গাছ বলহীন হইয়া পড়ে, সুতরাং মোচা হইতে বিলম্ব হয়। নতুবা যথাসময়ে ফল হইলে লাভ হওয়ার সম্ভব। ৩৬০ ঝাড় কলা লাগাইলে ৮ মাস বাদে প্রায় সকলগুলি ফলিবে, সুতরাং একেবারে ৩৬০ ঝাড় কাঁদিতে অতি অল্প হইলেও ১৫০ টাকা আর হইবে। পল্লীগ্রামে মাসে যদি ১২ টাকা খরচ করা যায় ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। আর ২ বিঘা জমীতে ৩৬০ ঝাড় কলা স্বচ্ছন্দে হইতে পারে।

কলাগাছ একবার লাগাইলে এক জমীতে প্রায় ৫ বৎসর পর্যন্ত বেশ ফলে, কিন্তু তৎপরে অন্য ভূমিতে লাগান আবশ্যক।

বোম্বাই প্রদেশে সরস মাটিতে কলার চাষ করে। বোম্বাইবাসীরা ঝাড়ের মধ্যে কখন একটি কখন দুইটি তেউড় রাখিয়া বাকি সবগুলি কাটিয়া ফেলে। এদেশে ফলের বীজ রোপণ করিয়া চারার ছায়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক বীজের পার্শ্বে এক একটি কলাগাছ রোপণ করে, পরে চারা বড় হইলে ৭৮ বৎসর বাদে যখন ঐ কলাগাছই আবার উহাকে রস সঞ্চারে বাধা দেয়, তখন কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। সুপারির ক্ষেতেও ঐরূপে গাছের গোড়ার ছায়া রাখিবার জন্য কলাগাছ দিয়া থাকে। এখানে ইহার চাষে বড় যত্ন করিয়া থাকে। ইক্ষু ও পাণের চাষের পরই সেই জমীতে ইহার চাষ করে। প্রথমতঃ পাণ কাটিয়া লইলে, ইক্ষু বুনে। ইক্ষু কাটিয়া লইলে জমীটা কিছুদিন ফেলিয়া রাখে, তৎপরে বৃষ্টির পর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে (দাক্ষিণাত্যে এই সময় জল হয়) লাঙ্গল ও মই দিয়া ৮ ইঞ্চি করিয়া ডুবাইয়া চারা পুঁতিয়া দেয়। চারা বসাইবার সময় খোল, পচামাছ, গোবর ইত্যাদি সার মিশাইয়া দেয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কলা বুঝিয়া চারা রোপণ করিতে হয়। এক একর পরিমিত জমীতে বসায়ই কলার চারা ১০০০ আর তবড়ি কলার ৫০০ চারা মাত্র লাগাইয়া থাকে। অন্যান্য জাতীয় প্রত্যেক গাছের মধ্যে ৭ ফুট কাঁক দেয়। তাহার চারা পুঁতিবার

সময় হইতে ৪ মাস সার দেয়, প্রথম ৩ মাসে খোল ও ৪র্থ মাসে পচামাছের সার। প্রত্যেকবার সার দিয়া তাহার উপর পাতলা মাটি চাপা দেয়। মাছের সারে বড় পোকা হয় বলিয়া এই সার দিবার পর ৮১০ দিন জল দেয় না। জল না পাইয়া রোজে পোকাগুলি মরিয়া যায়। চারা আগা-ইবার পর ইহার সপ্তাহে দুবার জল দেয়, তৎপরে বৃষ্টিদিন বৃষ্টি না হয়, ততদিন সপ্তাহে ১ বার করিয়া জল দেয়।

মাক্কাজে দুই প্রকার চাষ হয়। উচ্চ জমীতে ‘পাকা বলই’ আর নিম্ন জমীতে ‘খুক বলই’। এখানে কলাকেজে রাক্ষা আলু ইত্যাদি বণন করে। এখানে লাঙ্গল দেয় না, কোদলাইয়া কলার জমী তৈয়ার করে। ৫ বৎসর পরে কলাগাছ মারিয়া কোদলাইয়া অন্য ফসল দেয়।

ব্রহ্মদেশবাসীরা ইহার চাষে কোন যত্ন লয় না, কিন্তু প্রত্যেকের বাড়ীতে কলাগাছ আছে। যত্ন না করিলেও এখানে স্বচ্ছন্দে অপব্যাপ্ত উত্তম ফসল হয়।

পূর্বভারতীয় বীপে ইহার চাষে বড় যত্ন করে। প্রতি ৩ বৎসরে ইহার ক্ষেত্র পরিবর্তন করিয়া নূতন তেউড় লাগায়। পুরাতন এঁটে সাররূপে ব্যবহার করে। এখানে এত যত্ন না করিলে ফলে বীজ জন্মে। ফিজি বীপেও পুরাতন এঁটের সার দেয় বটে, কিন্তু তাহার এ সার ভাল বলে না, ইহাতে জমী টুকু হইয়া উঠে।

পশ্চিম ভারতীয় বীপে পুরাতন গাছ কুচি কুচি করিয়া পুড়াইয়া ফেলে, পরে তেউড় কাটিয়া সেই ছাইয়ের মধ্যে ২ হাত অন্তর গাঁতি দিয়া গর্ত করিয়া লাগাইয়া দেয় আর কোন চেষ্টা করে না।

Musa textilis (যাহার সূতা ভাল হয়) ৬ ফুট হইতে ৯ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। শেষে এই কাঁকেও চারা বাহির হয়। ২ বৎসরেই সূতা হইতে পারে, কিন্তু ৪ বৎসর হইলে সূতা কিছু পাকা হয়। ইহার ফল হইতে দিতে নাই, তাহা হইলে সূতা ধারণ হয়। এই ফল হওয়া বন্ধ করিবার জন্য দুইটি পাতামাত্র রাখিয়া আর সব কাটিয়া ফেলিতে হয়।

কদলী সব্বন্ধে প্রবাদ—বাক্সালীর মধ্যে কলা সব্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে। ১টা প্রবাদ—কলাগাছে বজ্রাঘাত হইলে, বজ্র আর উগিয়া স্বর্গে বাইতে পারে না। চোরেরা এই বজ্র লইয়া গোপনে রাজ্যকালে জানালা দিয়া কামার বাড়ী দিয়া আসে। কামারেরা তাহাতে সিঁধকাটা গড়াইয়া জানালার রাখিয়া দেয়, চোর রাখে আসিয়া গোপনে লইয়া যায়। ইহা হইতেই প্রবাদ হইয়াছে,—“চোরে কামারে দেখা নাই।”

২য় প্রবাদ—বজীদেবী কলা বড় ভালবাসেন, যথা—“বজী, কলা খাবার গোজী।”

৩য় বৃক্ষের প্রিয়দাস, যথা—“কলা পড়ে টুপটাপ, বড় খায় গুণগাপ।”

“তালিক সরিক” নামক পারসী চিকিৎসাগ্রন্থে লিখিত আছে, ইহাতে কপূর হয়, কিন্তু আইন-আকবরী তাহা স্বীকার করেন না।

ইংরাজদের মধ্যেও এতদ্বন্দ্বকে প্রবাদ আছে যে ইহাই বাইবেলোক্ত নিষিদ্ধফল। লডল্ফ বলেন যে, বাইবেলোক্ত “ডুডোইম” (Dudoim) ফলই কদলী। কেহ কেহ বা ইহাকে নিষিদ্ধ ফল না বলিয়া স্বর্গোদ্যানে মানবের প্রথম প্রধান খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। ফলে বাহ্যই হউক, ইহার সহিত স্বর্গোদ্যানের সংশ্রব আছে বলিয়াই, বোধ হয়, ইহার নাম *Paradisioia* (*Paradise*—স্বর্গ) হইয়াছে।

কলাগাছে কারিগরি।—(১) লতাকলা—একটি কলাগাছ একস্থানে পুঁতিবে। এই গাছটির গোড়ার যতদিন তেউড় বাহির না হয় ততদিন কিছু করিতে হইবে না, কিন্তু তেউড় বাড়িতে দিবে না, হইলেই মারিয়া ফেলিবে। পরে মূল গাছটির গোড়ায় ১ হাত বাদ দিয়া সমস্তটা কাটিয়া ফেলিবে। প্রত্যহ ঐ গাছটিতে এক কদলী করিয়া জল দিবে। ইহাতে পুনরায় গাছ বাহির হইবে। ১ হাত বাড়িলে আবার পূর্ন-কর্ত্তিত স্থানেই কাটিয়া দিবে ও প্রত্যহ জল দিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ কাটিতে কাটিতে যখন মোচা বাহির হইবে, তখন আর না কাটিয়া, গোড়ার গাছটা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে। এরিকে খোড় ও মোচা বাড়িতে থাকিবে; কিন্তু আশে পাশে অবলম্বন না পাইয়া, উর্দ্ধে উচ্চ হইতে না পারিয়া জমির উপর হেলিয়া পড়িয়া, লতাইয়া বাড়িতে থাকিবে। ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

চৌ-মোচা—চারি জাতীয় কলার চারিটি তেউড় এঁটে সমেত কাটিয়া আনিয়া গাছগুলি কাটিয়া ফেলিবে এবং প্রত্যেক এঁটে হইতে এমন ভাবে ৮০ আনা বাদ দিবে যে, ঐ চারিটি একত্র করিলে যেন একটি পূর্ণ এঁটে হয়। তৎপরে ঐ চারিটি একত্র করিয়া পাট দিয়া উত্তমরূপে জড়াইয়া উপরে গোবর লেপিয়া দিবে। যেখানে ইহা পুঁতিতে হইবে, সেইখানে একহাত গভীর একটি গর্ত্ত করিয়া, তাহার অর্দ্ধাংশ পটা খড়ে পূর্ণ করিয়া, তাহার উপর ঐ এঁটেটি বসাইয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে। কিছুদিন পরে চারা বাহির হইবে। যতদিন পর্যন্ত মোচা বাহির না হয়, ততদিন ইহার আর কোন পাট নাই, কেবল গাছ না মরিয়া যার, এইরূপ

করিতে হইবে। পরে যখন দেখিবে যে মোচা হইবার উপক্রম হইয়াছে অর্থাৎ “পাতমোচা” পড়িবে, তখন গাছের অগ্রভাগ শক্ত রজু দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। তৎপরে গাছটিতে এককালে চারিদিক দিয়া ৪ জাতীয়া ৪টি মোচা বাহির হইবে। মোচার তার রাখিতে পারে এমন করিয়া মোচার ডালগুলির নীচে তেকাটা বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

কলাফুল—একটি মর্ত্ত্যমান বা চাঁপাকলার ছোট তেউড় একটি তলার বড় ছিদ্র করা টবে এমন করিয়া পুঁতিবে যে, তাহার তলার শিকড়ের নীচে বেন খুব অল্প অর্থাৎ ৮-১০ অঙ্গুলি মাটি থাকে। যতদিন চারাটি বেশ সতেজ না হয়, ততদিন অল্প অল্প জল দিবে। পরে যখন দেখিবে যে, বেশ সতেজ হইয়াছে, তখন ১ হাত উচ্চ একটি বাঁশের মাচার উপর তুলিয়া রাখিবে এবং জল দেওয়া বন্ধ করিবে। পরে সমস্ত পাতা ডাঁটাসমেত কাটিয়া ফেলিবে। পাতা আবার হইবে, আবার কাটিয়া দিবে। ওদিকে টবের ছিদ্র দিয়া শিকড় ফুলিয়া পড়িবে। প্রত্যহ এই শিকড়গুলিতে জলের ছিটা দিবে। পরে যখন পাতমোচা বাহির হইবে, তখন তাহার অগ্রভাগ কাটিয়া দিবে। ইহাতে যে মোচা হইবে তাহা কলাগাছটির মাথার উপর ছত্রাকারে ফুটিয়া ফুলের মত দেখাইবে। করিয়া উঠিতে পারিলে ইহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়।

সখের বাগানে এইরূপ ছই চারিটি ‘সকের বস্ত’ থাকিলে বড় ভাল হয়।

কদ্বেল, (কথ্বেল, বা কয়েদবেল) (দেশজ) একপ্রকার বেল, ইহা কমলানুব জাতীয়। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কপিথ, দমিথ, গ্রাহী, মম্বথ, দমিফল, পুন্সফল, দন্তশঠ, কগিথ, মাল্লব, মঙ্গল্য, নীলমঞ্জিকা, গ্রাহিফল, চিরপাকী, গ্রহিকল, কুচফল, কপীঠ, গন্ধফল, দন্তফল, করভবন্ত, কাঠিত্রফল, করঞ্জফল।

এই গাছ হিন্দীতে কয়েৎ, কথ্ব বা ভুঁইকোএৎ, মহারাষ্ট্রিতে কোএৎ, দক্ষিণে কবিৎ, মলয়ে বেলঙ্গ, তামিলে বেলমরম্, বিলম্ব বা বিলঙ্গ, তৈলঙ্গে বেলগা কেতু, কপিথম্ব বা পুলি, সিংহলে দেবল, ব্রহ্মে ক্ষন, শ্রীমে মা-কএৎ; পর্দ-গীজেরা ‘বলঙ’; ইংরাজীতে উড আপেল (Wood apple) এবং ইহার বৈজ্ঞানিক নাম *Feronia Elephantum*.

ইহা ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। বোম্বায়ে ইহার আবাদ হয়। এক একটি গাছ অতিশয় বড় হয়। ইহার কাঠ খুব মজবুত, স্থায়ী ও দেখিতে সাদা। বিশাখপট্টনে এই কাঠ গৃহনির্মাণকার্যে লাগে।

গুণ—চরকের মতে ইহার কণ—মধুর, কষায়, হৃগ্ধ, কঠিগ্রন্থ, সংগ্রাহী, বাতল ও বিবকর্ষায়। পকফল—গ্রাহী, শুষ্ক, দোষনাশক।

রাজনির্ণয়ের মতে কাঁচাকলের গুণ—অন্ন, উষ্ণ, কফ-নাশক, গ্রাহী, বায়ুবর্জক, কঠরোগ ও জিহ্বাদির জড়তাকারক, ত্রিদোষবর্জক, বিবহর, যোচক। পকফলের গুণ—ত্রিদোষ-নাশক, মধুরান্নরস, শুষ্ক; শ্বাস, বমি, শ্রম ও ক্রমহর; গ্রাহী, কঠিগ্রন্থ, সর্গদা সেব্য এবং হিকারোগে বিশেষ উপকারী।

ভাবমিশ্রের মতে—কাঁচা কদবেলের গুণ—ধারক, কষায়-রস, লঘু ও লেখন গুণযুক্ত। পাকিলে শুষ্ক, অন্ন কষায়রস, কঠশোধক, হৃস্পাচ্য এবং পিপাসা, হিকা, বায়ু ও পিত্তনাশক।

এ দেশের কবিরাজদিগের মতে পাকা ফল—ভারী; পিপাসা, উদরাময়, শ্বাস, শ্রম, বমি, ক্রম, আমরস, অভিলার, হিকা, বাত, পিত্ত ও কফনাশক; কষায়, অন্ন, বাহ, কঠশোধক, গ্রাহী, হৃজ্জর, কঠিকর, কতাদি রোগে হিতকর।

কদবেলের পাতার সংস্কৃত নাম—কপিথপত্রী, ফনিজ, কুলিজা, জীবপত্রিকা।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে পাতার গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফ, মেহ ও বিবহর।

হাকিমী মতে ফলের গুণ—শীতল, শুষ্ক, তেজস্কর, তীক্ষ্ণ, বলকারক, কফ-নিঃসারক, কঠশোথে হিতকর, দস্তমূল-দৃঢ়-কারক। ইহার সবত ক্ষুধাবর্জক ও নানাপ্রকার ব্যাধি-নাশক গুণবিশিষ্ট। ইহার পাতা অতিশয় তীব্র। বিষাক্ত কীটপতঙ্গাদি কামড়াইলে পত্রের কোমলাংশ বা শাঁস দষ্ট স্থানে লাগাইয়া দিলে উপকার হয়, শাঁস না পাওয়া গেলে ইহার ত্বক্ শুদ্ধা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কদবেলের গাছ হইতে উৎকৃষ্ট গঁদ পাওয়া যায়। বোম্বাই অঞ্চলের বাজারে তাহাই বিক্রীত হইয়া থাকে। দক্ষিণ অঞ্চলে সকলই এই গঁদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তামিলে কবিরাজেরা অল্পে ফিক্ ধরিলে ইহার গঁদ প্রয়োগ করেন।

ইহাকে পশ্চিমাঞ্চলে ঘাটীগঁদ, তামিলে বজমপিসিন্ কহে।

কদাচার (পুং) কুংসিতঃ আচারঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুংসিত আচার, মন্দ ব্যবহার। ২ (ত্রি) কুংসিত আচারো বস্ত, বহত্রী। কদাচারী।

কদাচারী [ন্] (ত্রি) কুংসিত আচারোহস্তাতি, কদাচার-ইনি। মন্দ ব্যবহারকারী।

কদাচারিণী (স্ত্রী) কদাচারিন্-ভীষ্ণব্যক। যে জীর ব্যবহার অতি মন্দ।

কদাচিৎ (অব্য) কদা অনিচ্ছামিতে চিৎ। কোনকালে, কোন সময়ে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাকু, কহিচিৎ।

(“ন পাদৌ ধাবরেন্ কাংস্তে কদাচিৎপি ভাবনে।” মনু ৪।৬৫।) কদানি। বোম্বাইয়ের অন্তর্গত রেবাকান্দার মধ্যে একটি দেশীয় রাজ্য। ইহার উত্তরে চতুরপুর ও মিবান রাজ্য, দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্বে শুভ রাজ্য, পশ্চিমে ও দক্ষিণপশ্চিমে মুণাবর এবং রেবাকান্দা রাজ্য। ইহার অবস্থান ২৩° ১৬' ৪০" হইতে ২৩° ৩০' ৩০" উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৩° ৪০' হইতে ৭৩° ৫৪' পূর্ব দৈর্ঘ্য। ইহার পরিমাপকল ১৩০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ১২৬৮৯।

এই প্রদেশ বহুর; পর্বত ও বনে পরিব্যাপ্ত। রাজ্যের দক্ষিণভাগে মহীনদী প্রবাহিত। এ অংশের ভূমি উর্বর। উত্তরাংশে নদীর উপকূলে একটু অপ্রশস্ত ভূভাগ ব্যতীত আর সমস্ত ভাগই অহরুর ও পর্বতময়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিহু দেবজী (লিম্ দেবজী) কর্তৃক এই রাজ্য স্থাপিত হয়। তিনিই পাঁচমহলের অন্তর্গত ঝলোদ নগরের স্থাপনকর্তা জালমসিংহের বংশোদ্ভূত এবং একজন জালমসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

কদানরাজ্য এখন ভারত গভর্ণমেন্টকে কর দিয়া থাকে।

রাজধানী কদাননগর মহীনদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত।

কদাপি (অব্য) কদা-অপি। কখনও।

কদামাত্র (পুং) কদাচিৎ মতঃ। ঋষিবিশেষ।

কদিস্ত্রিয় (স্ত্রী) কুংসিতমিস্ত্রিয়ঃ, কন্দ্বা। কুংসিত ইস্ত্রিয়।

কছু (পারস্ত) লাউ।

কছুট্ট (পুং) কুংসিত উট্টঃ, কোঃ কদাদেশঃ (কোঃ কন্তং-পুরুষে হতি। পা ৬।৩।১০১।) মন্দ উট্ট।

কছুষ (স্ত্রী) কুংসিত উক্ষম্, ঈষদার্থে কোঃ কদাদেশঃ (কবক্ষোক্ষে। পা ৬।৩।১০৭। চকারাৎ কং।) ১ ঈষৎ উক্ষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কোক্ষ, কবোক্ষ ও মলোক্ষ। ২ (ত্রি) ঈষৎ উক্ষবিশিষ্ট।

(“কদল্যাঃ শরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কছুকঃ কর্ণপূরণঃ।” বৃহত।)

কদুর। মহিষুররাজ্যের একটি জেলা। মহিষুরের নগর-বিভাগের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ। অক্ষা ১৩° ১২' ও ১৩° ৫৮' উঃ, দ্রাঘি ৭৫° ৮' হইতে ৭৬° ২৫' পূঃ। এই জেলার উত্তরে শিমোগ জেলা, দক্ষিণে হসর জেলা, পূর্বে চিতলহুর্গ এবং পশ্চিমে পশ্চিমঘাট। ভূমিপরিমাণ ২৯৮৪ বর্গমাইল।

এই জেলার পশ্চিম প্রান্তে কুহুরে-বুথ (উচ্চতার ৬২১৫ ফুট) ও মেরুতিগুদ (৫৪৫১ ফুট) গিরি, মধ্যভাগে মাথা-বুদন গিরিমালা (৬২১৪ ফুট) ও কলহজিগিরি (৬১৫৫ ফুট)

এ ছাড়া অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এখানকার মলনাদ নামক স্থান পাহাড় ও উপত্যকার সমাচ্ছন্ন। জেলার পূর্বভাগে ময়দান।

প্রধান নদী—তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক দুই নদী মিলিত হইয়া তুঙ্গভদ্রা নামে কক্সানদীতে মিশ্রিত হইয়াছে, জেলার দক্ষিণাংশে হেমবতী এবং পূর্বাংশে বেদবতী নদী।

বাবাবুদন গিরিপ্রদেশই এখানকার অত্যাংকট উর্বরা ভূমি। এখানে কাকির চাষ হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, বাবাবুদন নামে একজন কাকির গন্ধা হইতে কাকিগাছ আনিয়া এখানে রোপণ করেন।

কদুরের বনজঙ্গলে মূল্যবান চন্দন, শিণ্ডু প্রভৃতি ভাল কাঠ উৎপন্ন হয়। ১৪ প্রকার ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, সুপারী প্রভৃতি জন্মে। তবে কাকির চাষেরই আদর অধিক, কারণ ইহাতে আয় বেশী। এই জেলার ৭৮ বর্গমাইল রাজজঙ্গল। জঙ্গলে হস্তী, বজ্রমহিষ, ব্যাজ, তরুঙ্গ, শিবা নামে একপ্রকার তরুঙ্গ, বজ্রশৃঙ্গ, হরিণ, খরগোশ ও সজাঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার নদী ও জলাশয় মৎস্তে পরিপূর্ণ। এখানে কঞ্চল, তৈল, খদির, আতর ও লোহের ব্যবসা হইয়া থাকে।

এই জেলা পূর্বে বনরাজীতে সমাচ্ছন্ন ছিল, এখানে জনপ্রবাদ আছে, এই স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। এখানকার তুঙ্গনদীতটস্থ শুল্কেরিকে অনেকেই ঋষ্যশৃঙ্গগিরির অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। এইখানে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গে আনিবার অস্ত্র ব্যারবিলাসিনীদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। এই স্থান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্যের লীলাক্ষেত্র, এইখানে দাক্ষিণাত্যের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মদিগের 'জগৎগুরু' অবস্থান করেন।

এখানকার রত্নপুরী ও শঙ্করারপতন নামক স্থানে প্রাচীন নগরাদির চিহ্ন পড়িয়া আছে, তাহা পরিদর্শন করিলে এখানকার পূর্বসমৃদ্ধির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সেই দুই স্থান বঙ্গাল রাজাদিগের পূর্বে রাজধানীরূপে বিরাজ করিত, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের কত মহাপুরুষ সেখানে গিয়া বাস করিতেন। বঙ্গাল রাজাদিগের অভ্যুদয়ে সেই প্রাচীন সমৃদ্ধি একবারে লোপ হয় নাই। বিজয়নগরের যবনেরা প্রবল হইয়া উঠিলে, প্রাচীন নগরের পূর্ব সমৃদ্ধি লোপ হইল। তাহাদের অভ্যুত্থানে বঙ্গালরাজবংশের এককালে অধঃপতন হইল। কদুর ও নিকটস্থ জনপদ-সকল মূলমানেরা অধিকার করিল। কিছুদিন পরে বেদনুরের পলিগার কদুর জেলার অধিকাংশই আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অল্প করিয়া বেশী দিন তাহার ভোগ হইল না, ১৬৯৪ খৃঃ মহিষরের হিন্দুরাজা তাহাকে আবার পরাস্ত করিলেন।

১৭৬৩ খৃঃ, হারিদারজালী সমস্ত কদুরা জেলা অধিকার করেন। ১৭৯৯ খৃঃ, টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর, তৎকালীন গবর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি এখানকার মিত্তরাজকে এই জেলা প্রত্যাৰ্পণ করেন। কিছুদিন হিন্দুরাজগণ মুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিলেন। মধ্যে একজন বুঝি ব্রাহ্মণের অপমান করেন, তাহাতে এখানকার লিঙ্গায়ৎ ও কৃষিদম্প্রদার ক্ষেপিয়া উঠে। তাহারা সকলেই ঘোষণা করে যে ব্রাহ্মণের অপমান করিতে পারে, এরূপ হিন্দুরাজা রাজ্যের উপযুক্ত নহে। ১৮২১ খৃঃ লিঙ্গায়তেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তরিকেরির প্রাচীন পলিগার বংশের এক ব্যক্তি সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। রাজ-দ্রোহীরা অনেক স্থান আক্রমণ করিল। হিন্দুরাজা দেখিলেন যে তাঁহার সিংহাসন রাখা দায়। তখন ইংরাজসৈন্যের আবশ্যক হইল। ইংরাজেরা আসিয়া বিদ্রোহ থামাইলেন। তখন ইংরাজ গবর্নমেন্ট বুঝিলেন এখানকার হিন্দুরাজ কোন কাজের নয়, সেই অবধি কদুর রাজ্য গবর্নমেন্টের খাস হইল।

১৮৬৩ খৃঃ, চিকমগলুর নামে স্থানে এই জেলার সদর থানা হইল।

জেলায় সর্বমুদ্র ১৭৩ থানি নগর ও গ্রাম। ইহার এই কয়েকটি প্রধান নগর—চিকমগলুর, তরিকেরি, কদুর, আদিমপুর, অয়নকেরি, বিকর, হরিহরপুর, হীরেমগলুর কলস। এখানকার আবহাওয়া সকল জায়গায় সমান নয়, জলনাদে প্রতিবর্ষে একপ্রকার ভয়ানক জঙ্গল রোগ দেখা দেয়, তাহার প্রকোপ হইতে কেহই পরিজ্ঞান পায় না। অপর স্থান মন্দ নয়। কদুর জেলার প্রাচীন নগর কদুর, ইহা একখানি গুণগ্রাম মধ্যে পরিগণিত।

দশম শতাব্দীতে এখানে জৈনেরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রাচীন শিলালিপি ও ভগ্নস্তম্ভ দৃষ্টে জানা যায়। পূর্বে এখানে সদরথানা ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, এখান হইতে চিকমগলুরে উঠিয়া যায়। লক ১৩°৩০' উঃ, দ্রাঘি ৭৬°২৫' পূঃ। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ২১৯৩।

কদুহি (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিবেশে।

কদ্রুথ (পুং) কুংসিতঃ রথঃ, কোঃ কদাদেশঃ (রথবনয়োচ্চ। পা ৬। ৩। ১০২।) কুংসিত রথ।

কক্স (পুং) কদ-ক। ১ (পিজলবর্ণ) ২ (ত্রি) পিজলবর্ণ-বিশিষ্ট। ৩ (ত্রি) নাগমাতা, ইনি দক্ষের কন্যা এবং কক্সপের পত্নী।

(কক্সত্রিষু স্বর্ণপিণ্ডে নাগানাং মাতরি জিহাম্। মেদিনী।)

কক্রপ (ত্রি) কক্রপাত্ত, কক্র-ন (লোমাদিপাষাণিপিত্তা-
দিত্যঃ শনৈঃ। পা ৫।২।১০০।) পিঙ্গলবর্ণবৃক্ষ।

কক্রপুঞ্জ (পুং) কক্রোঃ পুঞ্জঃ, ৬৩৭। নাগ, সর্প। ইহার
সংস্কৃতপার্থ্যায়, কাক্রবেয়, কক্কান্দ ও কক্রমৃত।

কক্রমৃত (পুং) কক্রোঃ মৃতঃ, ৬৩৭। সর্প।

কক্র (ত্রি) কক্র-উৎ (কক্রকমণ্ডবোচ্ছ্বসি। পা ৪।১।৭১।)
সর্পমাতা।

কক্রাঙ্ক (ত্রি) কক্রিকৃতি, ক্রি-অঙ্-ক্-কিপ্-অদ্যাদেশঃ ক্রিমঃ
কচ্। ১ অনিশ্চিত দেশে যে গমন করিতেছে। ২ অনিশ্চিত
দেশে গমন।

কক্রৎ (ত্রি) ক অত্যন্ত, ক-মতৃপ্-মত বঃ। কশকযুক্ত ময়াদি।

কক্রভী (ত্রি) কক্র-ভীপ্। কশকযুক্ত ময়প্রকৃতি।

কক্রন (ত্রি) ক্রুৎসিতং বদতি, ক্রু-ব-পচাম্যচ-কোঃ কদাদেশশ্চ
(রথবনশ্যেচ। পা ৬।৩।১০২।) ১ ক্রুৎসিত বক্তা, যে মন্দ
বলে। গর্হাবানী ও দুর্ভাক্। ২ কর্কশভাবী। ৩ হুঃপ্রব-
শকযুক্ত। ৪ অতি ক্রুৎসিত।

কক্রয় (ত্রি) কং জলবিব আচরতি, ক-কিপ্-শত্-কতা ত্রিযতে
কত-ত্রি-অপ্। ১ দধিমেহযুক্ত তক্রবিশেষ, কটুর। ২ অতি
ক্রুৎসিত।

(আশংসুরাশংসিতরি কক্রয়তিক্রুৎসিতঃ। হেম ৩।১৪।)

কক্রপ্রিয় (ত্রি) ক্রদ্ধং শ্রীণাতি, শ্রী-ক (পুর্বোদরাদিঘাৎ।)
কক্রপ্রিয়।

কক্রপ্রী (ত্রি) (বৈদিক) ক্রদ্ধং শ্রীণাতি, শ্রী-কিপ্ (পুর্বোদরাদি-
ঘাৎ।) কক্রপ্রিয়।

কনক (স্ত্রী) কনতি নীপাতে, কন-বৃন্। ১ স্বর্ণ। [স্বর্ণদেখ]
(পুং) ২ পলাশ। ৩ নাগকেশর। ৪ ধূতুর, ধূতুরা।
৫ কাঞ্চনাল বৃক্ষ। ৬ কালীয় বৃক্ষ। ৭ চাঁপাফুলের গাছ।
৮ কালকান্দুলা। ৯ কণ্ডগুণ্ডলু। ১০ লাক্ষাগাছ।
১১ মহাদেব। ("উপকারঃ প্রিয়ঃ সর্গঃ কনকঃ কাঞ্চনচ্ছবি।"
ভারত ১২।১৭।৯২।) ১২ বছরব্যাপী দুর্দমরাজের পুত্র।
(হরি ৩৩।৬।) ১৩ একজন চোলরাজ।

কনককুশল। একজন জৈন গ্রন্থকার। বিজয়সেনহরির
শিষ্য। ইনি জ্ঞানপঞ্চমীমাহাত্ম্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কনককেশরী। উৎকলের একজন রাজা। অগাব্যকেশরীর
পুত্র। ইনি ৫৯৯-৬১৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

কনককর (পুং) কনকত্ব জাবার্থঃ কারঃ, মধ্যপদলো।
সোহাগ। [সোহাগা দেখ।]

কনকচাঁপা (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Pterospermum
acerifolium) এই গাছ ভারতবর্ষের নানাহানে জন্মে।

গাছ খুব বড় হয়। ফাঠে ফুলের ও মজবুত তক্তা প্রস্তুত হয়।
ইহার ফুল সুগন্ধবিশিষ্ট।

কনকচূর (দেশজ) ধান্যবিশেষ। ইহার আকৃতি ধর্ম, কিন্তু
মুখ খুব লম্বা। অন্যান্য জাতের ধান অপেক্ষা এই ধান বিলম্বে
পাকে। বেশি উর্বরা ও নির জমী না হইলে ইহার চাষ
করা হয় না। কনকচূরের খই হইতে বৃদ্ধি হয়।

কনকবিজ্রা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Polygonum elegans)
কনকতৈল (স্ত্রী) বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। ইহার
প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—কটুতৈল ৮ সের; কনকধূতুরা,
আকলফুল, বেড়োলা, দুর্কা, বাসকছাল, জরভীপত্র, নিসিন্দাপত্র,
ডহরকরঞ্জবীজ, বামনহাটি, আকৌড়ছাল, পুনর্নবা, কুলের
পাতা, সিদ্ধি, বেলছাল, বৃহতী, চিতামূল, সিজের মূল, গপি-
রারিমূল, এরণ্ডমূল, তেউড়িমূল, তাঁটি, রামবেগুন ও
সৌদালপত্র, প্রত্যেক ২ পল, ৬৫ সের জলে পাক করিয়া ১৬
সের অবশিষ্ট থাকিলে, এই কাথ ও উক্ত দ্রব্য সকল মিলিয়া
১০ সের এই কন্ধের সহিত যথাবিধি পাক করিলে। এই
তৈল ব্যবহারে চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ নিবারিত
হয়।

কনকদণ্ডক (স্ত্রী) কনকত্ব দণ্ডো বজ্র, বহুব্রী। রাজদ্বজ।

কনকধূতুরা (দেশজ) ধূতুরাবিশেষ। (Datura fastuosa)
ইহার ফুল স্বর্ণবর্ণ ও ছই থাকে। সচরাচর নীলবর্ণ ছই থাকে
পুষ্পকেই কনকধূতুরা বলিয়া থাকে। [ইহার গুণাদি ধূতুর
শব্দে দেখ।]

কনকধ্বজ (পুং) ধূতুরাত্তের পুত্রবিশেষ।

কনকপল (পুং) কনকত্ব পলং মানবিশেষঃ। ১ সোণা ওজনের
পরিমাণ বিশেষ; ১৬ মাষার সোণা ওজনের ১ পল হইয়া
থাকে, ইহার অপর সংস্কৃত নাম কুরুবিত্ত। ২ (কনকবিব
পলং মাংসমত) মংস্তবিশেষ।

কনকপত্র (স্ত্রী) কনকনির্মিতং পত্রম্, পত্রাকারং ভূষণমিত্যর্থঃ।
১ কাণের অলঙ্কার বিশেষ, কাণপাত বা কাণ।

কনকপিঙ্গল (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। (হরিবংশ ১।৫০৬।)

কনকপুর। কপিলবস্ত্রের এক যোজন দূরে অবস্থিত একটি
গ্রাম। এখানে কনকমুনি নামক বৃদ্ধ জগদ্ব্রহ্মণ করিয়াছিলেন।
কনকপুরী (স্ত্রী) কনকনির্মিতা পুরী, মধ্যপদলো। ১
স্বর্ণপুরী। ২ লম্বা।

কনকপ্রভা (স্ত্রী) কনকত্ব প্রভেব প্রভা বত্যাঃ, মধ্যপদলো।
মহাজ্যোতিষতী লতা।

কনকপ্রভাবতী (স্ত্রী) অতিসাররোগের বৈদ্যকোক্ত
ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ—ধূতুরাবীজ,

মরিচ, গোরাশেলতা, পিপুল, সোহাগার খই, বিব ও গন্ধক সমভাগ সিদ্ধির রসে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটা করিবে। এই ঔষধ অতীসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্যনাশক। ইহা ব্যবহারকালে দধি, অন্ন, শীতল জল, তিত্তিরপক্ষীর মাংস প্রভৃতি পথ্য সেবন করিবে।

কনকপ্রসবা (ত্ৰী) কনকবৎ প্রসবঃ পুষ্পঃ যন্তাঃ, বহত্ৰী। স্বর্ণকেশবী।

কনকময় (ত্ৰি) কনকস্ত বিকারঃ, কনক-ময়ট্। স্বর্ণনির্মিত।

কনকমুনি (পুং) বুদ্ধবিশেষ।

কনকমুগ (পুং) কনকবর্ণে মুগঃ, মধ্যপদলো। স্বর্ণবর্ণ মুগ। সীতাহরণের সময় মারীচ নামক রাক্ষস মায়াবলে স্বর্ণবর্ণ মুগরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিয়াছিল।

কনকরম্ভা (ত্ৰী) কনকবর্ণকলিকা রম্ভা, মধ্যপদলো। স্বর্ণবর্ণকদলী।

কনকরস (পুং) কনকবর্ণে রসঃ উপরসঃ। ১ হরিতাল। ২ গলিত সোণ।

কনকলোম্বব (পুং) কনতি নীপ্যতে ইতি কনা, কলা নীপ্তা কলা অবয়বঃ, তয়া উদ্ভবতি, কনকলা-উদ্-ভূ-অচ্। ধূন।

কনকবতী (ত্ৰী) কনকমন্ত্যাতাঃ, কনক-মন্তূ-মন্ত বঃ-ত্ৰী। ১ স্বর্ণভূষিত ত্ৰী। ২ কনকবর্ণরাজের রাজধানী।

কনকবর্ণ (পুং) কনকস্ত বর্ণইব বর্ণে যন্ত, বহত্ৰী। ১ সোণার স্তায় বর্ণবিশিষ্ট। ২ রাজবিশেষ। নেপালের বৌদ্ধেরা ইহাকে শাক্যসিংহের পূর্ব অবতার বলিয়া স্বীকার করেন।

কনকবাহিনী (ত্ৰী) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত নদীবিশেষ। (রাজতরঙ্গিনী ১।১৫০)

কনকবিগ্রহ (পুং) বিশালপুরীর একজন রাজা।

কনকশক্তি (পুং) কনকবর্ণা শক্তিরূপবিশেষো যন্ত, বহত্ৰী। কার্তিকেয়।

কনকশিল (পুং) পর্কতবিশেষ। (কিক্কিয়া ৪০ অঃ)

কনকসুন্দর (পুং) অতীসারাদিরোগের বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগের খই, বিব ও ধুতরার বীজ সমস্ত ত্র্যয় সমভাগ একত্রে সিদ্ধির রসে মর্দন করিয়া বটের মত বটা করিবে। এই ঔষধ অতীসার ও গ্রহণীরোগনিবারক। ইহা ব্যবহার কালে দধি, অন্ন, ঘোল প্রভৃতি পথ্য ভোজন করা উচিত।

কনকসূত্র (ত্ৰী) কনকনির্মিতঃ সূত্রম্, মধ্যপদলো। সোণার তার।

কনকসেন। প্রাচীনরাজবিশেষ। বিহারের রাণাহুলের

প্রতিষ্ঠাতা। রাণাহুলের কুলতালিকাগ্রন্থে লিখিত আছে, কনকসেন তারন্তবর্ষের কোন উত্তর প্রদেশ (সম্ভবত, লাহোর) হইতে যাত্রা করিয়া সৌরাষ্ট্র প্রারম্ভে আসিয়া উপনিবেশ করেন। তখন প্রমারবংশীর কোন রাজা তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন, কনকসেন বলপূর্বক তহার রাজ্য অধিকার করিয়া ১৪৪ খৃঃ অব্দে বীরনগর স্থাপন করিলেন। তাঁহার বংশীয় রাজগণই বিজয়নগর বলভীপুর প্রভৃতি কয়েকটি এশি়া নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কনকান্দ (ত্ৰী) কনকময়ঃ অলদম্, মধ্যপদলো। স্বর্ণ নির্মিত কেশু, অনন্ত।

কনকান্দী [ন] (পুং) কনকান্দমত্যাতি, কনকান্দ-ইনি। বিষ্ণু। (মহাবারাহো গোবিন্দঃ শ্রবণঃ কনকান্দী। বিষ্ণু স।)

কনকাচল (পুং) কনকময়ো অচলঃ, মধ্যপদলো। ১ স্তূম্বক পর্বত। ২ ধান্যাদি দানদান মধ্যে দানবিশেষ, ইহার তিন প্রকার পরিমাণ আছে তন্মধ্যে সহস্রপল স্বর্ণদানকে উত্তম কনকাচল দান কহে, এইরূপ পাঁচশত পলে মধ্যম ও আড়াই শত পলে অধম দান হয়। ঋষিক্রিগকে এইরূপ কনকাচল দান করিলে, সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। (স্থতি।)

কনকাজ্জলি (ত্ৰী) কনকপূর্ণা অঞ্জলিঃ মধ্যলো। মাস্তুলিক দানবিশেষ।

কনকাজ্জলী (ত্ৰী) কনকাজ্জলি-ভীপ্। মাস্তুলিক দানবিশেষ। কোন দেবর্চনার পর প্রতিমাবিসর্জন কালে সধবা গৃহ-কর্ত্তী স্বয়ং বেশভূষা করিয়া অস্ত্রাশ্র সধবা ত্রীদিগের সহিত প্রতিমা বরণপূর্বক তথায় স্বীয় অঞ্চল পাতিয়া থাকেন, সেই সময়ে গৃহস্বামীকে প্রতিমার পশ্চাৎ হইতে সেই অঞ্চলে সুদ্রাযুক্ত তণ্ডুলপূর্ণপাত্র নিক্ষেপ করিলে, কত্ৰী অঞ্চলে জড়াইয়া মন্তকে ধারণপূর্বক গৃহে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে তাঁহাকে জলধারা দিয়া লইয়া বাইতে হয়। ইহারই নাম কনকাজ্জলী। বিবাহ যাত্রাকালেও এইরূপ কনকাজ্জলী দানের প্রথা আছে।

কনকান্দি (পুং) কনকময়ো হজ্জিঃ মধ্যলো। স্তূম্বক পর্বত।

কনকাধ্যক্ষ (পুং) কনকস্ত রক্ষণে অধ্যক্ষঃ, মধ্যলো। স্বর্ণ-রক্ষক; ইহার সংস্কৃত নামান্তর ভৌরিক। (ভৌরিকঃ কনকাধ্যক্ষঃ। হেম ৩। ৩৮৭।)

কনকায়ু (পুং) যন্তরাত্রেয় পুত্রবিশেষ।

কনকারক (পুং) কনকমিব সর্বতো ঋচ্ছতি ব্যাঘোতি, দীত্যোতিশেষঃ কনক-ঋ-অনু-স্বার্থে কন্। রক্তকাকন বৃক্ষ।

[কোবিদার দেখ।]

কনকারাঙ্গা (দেশজ) বৃকবিশেষ (Amaranthus Gangetious.)

কনকালুকা (স্ত্রী) কনকনির্মিত আলু; সলিলাদ্যধারণাত্মক বিশেষ; কনকালু-সংজ্ঞার কন-টাপ। স্বর্ণনির্মিতজলপাত্র-বিশেষ, ভূদার। ২ সোণার গাড়, বারী।

(কনকালুকা হু ভূদারে সৌবর্ণকরুণী হু চ। শব্দার্থ।)

কনকাবতীমাধব (পুং) কনকাবতী মাধবক অধিকৃত কতোপ্রয: অণু, তত্ত্ব লুক্। গ্রন্থবিশেষ, ইহাতে কনকাবতী ও মাধবের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

কনকাল (স্ত্রী) কনকত আলু নাম বস্ত্র, বহত্রী। ১ নাগ-কেশর ফুল। ২ ধূতুরা। (কনকালত্বধূতুরে নাগকেশরকে পূমান্। শব্দার্থ।)

কনকালয় (পুং) কনক আলুরো বস্ত্র, বহত্রী। ১ ধূতুরা। ২ নাগকেশর। ৩ বুদ্ধদেবের নামবিশেষ।

কনকেশ্বর (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ।

কনকক (পুং) বেদোক্ত একপ্রকার বিঘ।

কনখল (পুং) গঙ্গাবার বা হরিদ্বারের সমীপস্থ তীর্থবিশেষ, ইহাতে স্নান করিলে সর্গপাপ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ হয়। (ভারত অমু ২৫ অঃ।)

কুর্খ ও লিঙ্গপুরাণের মতে কনখলে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল। (কুর্খ ২। ৩৪ অঃ, লিঙ্গ পু ১০০। ৮)। এখন ইহা একটি নগর, শাহারগপুর জেলার অন্তর্গত। অক্ষা ২২° ৫৫' ৪৫" উঃ, দ্রাঘি ৭৮° ১১' পূঃ। হরিদ্বার হইতে অর্ধকোশ দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ভূমিগরিমাণ ৬৩ একর। নগরের দক্ষিণ ভাগে দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের নিকট সতী প্রাণত্যাগ করিলে, শিব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন।

কনখলের বাড়ীঘরগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর, অনেকের প্রাচীরের গায়ে পৌরাণিক চিত্র বিচিত্র। এখানকার গঙ্গার কূলে মনোহর উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে, গঙ্গা হইতে তাহার দৃশ্য অতি সুন্দর।

এখানে ৫৮০৮ জন লোকের বাস, তন্মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, তাঁহারা হরিদ্বারের মন্দিরের পুরোহিত অথবা পাণ্ডা, হরিদ্বারে সুবিধা না থাকায় এখানে বাড়ীঘর করিয়া বাস করিয়া থাকেন। ইহারা জাবলপুরের ব্রাহ্মণের সহিত পুত্রকন্যার আদান প্রদান করেন। অপর কোন স্থানের ব্রাহ্মণকে প্রায় কন্যা দান করেন না।

হরিদ্বারের বাড়ীঘর প্রায় অনেক কনখল দর্শনে আসিয়া থাকেন। [হরিদ্বার দেখ।]

কনখলা। গঙ্গানদীর শাখাবিশেষ। এই নদী খা প্রবাহিত। (কানিকা পুঃ ৮৯। ৫০)

কনটী (স্ত্রী) রক্তবর্ণ শ্বেতকোষবিশেষ।

কনডাকা (দেশজ) বৃকবিশেষ।

কনন (ত্রি) কন-বুহ্। কাণ। (কাণঃ কনন একবুহ্। শব্দার্থ।)

কনল (ত্রি) কন-অলহ্। প্রীত।

কনবক (পুং) বীরপুত্রবিশেষ।

কনা (স্ত্রী) কনিম্বাধ ধাতু-অহ্। ১ কনিষ্ঠা। (বৈদিক) ২ কস্তা।

কনাৎ (আরব্য শব্দ) তাঁবুর চারিদিকে যে পর্দা দেওয়া যায়।

কনিক্রন্দ (ত্রি) ক্রন্দ যঙলুক্ অচ্ চূষাভাবঃ নিগাগমশ্চ। অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, যে অতিরিক্ত রোদন করে। (ওরবহুঃ ৩। ৪৮)

কনিগিরি [কন্যাগিরি দেখ।]

কনিয়ার (দেশজ) বৃকবিশেষ; কর্ণিকার। (Pterospermum macerifolium.)

কনিক। গাছারের একজন প্রাচীন বৌদ্ধরাজ। জালন্ধর তাঁহার জন্মস্থান। অর্ধৎ সুদর্শন তাঁহার শিকাগুণ। তিনি আপন ভুলবলপ্রভাবে ভারতের নানাস্থান জয় করিয়াছিলেন। মগিকাল, কান্দীর, মথুরা, ভাবলপুর, বেদে প্রভৃতি নানাস্থানের শিলালিপিতে কনিকরাজের নাম পাওয়া গিয়াছে। রাজতরঙ্গিনীর মতে ইনি তুর্ক জাতীর বৌদ্ধ ছিলেন, বহুদিন কান্দীরে রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে কান্দীরে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি আপন নামে (কনিকপুর) নগর স্থাপন করেন।

পালি বৌদ্ধগ্রন্থে ইনি 'চন্দন কনিক' নামে উক্ত হইয়াছেন।

কনিক একজন গোড়া বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম উদ্ধার করিবার জন্য তিনি কান্দীরে আসিয়া নানাস্থান হইতে অর্ধৎ ও ভ্রমণগণকে আহ্বান করেন। তাঁহার অনুশাসন-পত্র চারিদিকে প্রেরিত হয়। নানা দিক্দেশ হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ আসিয়া কনিকের সভায় উপস্থিত হন।

প্রথমে কনিক রাজগৃহে আসিয়া মহাসভার অধিবেশন করিতে চান। কিন্তু আর্থপাণ্ডিক প্রভৃতি অর্ধভেদী তাঁহার প্রভাবে অসম্মত হইয়া বলেন, "রাজগৃহে এখন মহাসভার অধিবেশন হইতে পারে না। সেখানে এখন বিভিন্ন মতাবলম্বী বিধর্মীর বাস, অতএব গিরিমেখলাবেষ্টিত বন্ধরাজরক্ষিত, সিদ্ধার্থসেবিত এই কান্দীররাজ্যেই মহাসভা হউক।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকলে কনিকরাজের সভায়-

বর্তী হইল। বেখানে হুজ, বিনয় ও অভিধর্মের বিভাবাহুয় করিবার জন্ত তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, কনিষ্ঠ তথায় এক সজ্জারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বহুমিত্র আসিয়া কনিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার অনাধারণ ক্রমতা সন্দর্শনে সকলে তাঁহাকেই সত্তাপতি মনোনীত করিলেন। বহুমিত্র বিভাবাহুয় প্রকাশ করেন, কনিষ্ঠরাজ তাহা লোহিত তাত্রকলকে খোদিত করিয়া প্রস্তরের আধারে রাখিয়া দেন। বেখানে সেই ধর্মগ্রন্থ রক্ষিত হয়, কনিষ্ঠ তথায় এক স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

অত্যাগত বৌদ্ধদিগের বিশ্রামের জন্য তিনি চীনপতি নামক স্থানে তিনটি বৃহৎ সজ্জারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গাঙ্কাররাষ্ট্র্যে এক অতি বৃহৎ দেউল, ৬ ও কয়েকটি সজ্জারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। কাহিয়ান প্রভৃতি চীনের প্রাচীন পরিভ্রাজকগণ উক্ত দেউল ও সজ্জারাম দেখিয়া গিয়াছিলেন।

কনিষ্ঠের মৃত্যু হইলে কৃত্যগণ কান্দীর অধিকার করে।

কনিষ্ঠ কোন্ সময়ের লোক ছিলেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এসম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। চীনপরিভ্রাজক জুয়ুনের মতে বুদ্ধনির্কীর্ণের ৩০০ বর্ষ পরে কনিষ্ঠ বিদ্যমান ছিলেন। হিউএন সিয়াং বলেন নির্কীর্ণের ৪০০ বর্ষ পরে কনিষ্ঠ গাঙ্কার রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু পঞ্জাবের রাবলগিণ্ডি জেলার অন্তর্গত মানিক্যাল নামক একটি গ্রামে কনিষ্ঠের রোমকমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ঐ মুদ্রা ৩৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দের। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদগণের মতে,—কনিষ্ঠ যুইচি (Yuei-chi) রাজা। শিলালিপিতে ‘কনিষ্ঠ কুয়াং’ বা গুবাংবংশীয় কনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

মৌল্যমুলের মতে কনিষ্ঠ শকরাজা, ইহার সময়ে শকাক প্রচলিত হয়।

কনিষ্ঠপুর। বৌদ্ধরাজ কনিষ্ঠপ্রতিষ্ঠিত কান্দীরের একটি নগর। (রাজতরঙ্গিনী ১। ১৬৮)

ইহার বর্তমান নাম কামপুর, ত্রীনগর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণে পীরগঞ্চাল গিরিপথের উপর অবস্থিত। এখন ইহা একটি সামান্ত গ্রাম মধ্যে পরিগণিত। এখানে একখানি সরাই আছে।

কনিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন বুবা অল্পো বা, যুবন্ অল্পো বা—ইটন্-কনাদেশন্ট (যুবান্নরোঃ কনজত্তরজাম্। পা ৫।৩৬৪।)

* কানিংহামের মতে বর্তমান পেশাবরের ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ঐ প্রাচীন দেউলের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

১ অতিযুবা। ২ অল্প। ৩ ছোট। ৪ পশ্চাত্য জাত। ৫ বয়সে ছোট। ৬ ছোট সহোদর। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—যবীমান, অল্পল, অবয়ল, যবজ্জল, কনীয়ান, কন্তল ও ববিষ্ঠ। ৭ মহাদেশব। (“পবিত্রা জিক্কুয়ত্তঃ কনিষ্ঠঃ কুপ্পিহলঃ।” ভারত ১৩। ১৭। ১৩১।)

কনিষ্ঠক (ক্ৰী) কনিষ্ঠমিব কারন্তি প্রকাশতে, কনিষ্ঠ-কৈ-ক। শূনত্ব।

কনিষ্ঠপদ (ক্ৰী) বীজগণিতোক্ত জ্যেষ্ঠাপেক্ষা কম সংখ্যা-যুক্ত পদ বর্গমূল।

কনিষ্ঠা (ক্ৰী) কনিষ্ঠ-টাপ্। ১ দুর্বল অল্পলি, কড়ে আঙ্গুল। ২ নারিকারিশেষ, ইহার লক্ষণ—যে পরিণীতা নারিকা স্বামীর অন্তর্মেহ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কনিষ্ঠা কহে।

ভারতচন্দ্র বলেন—কনিষ্ঠা তিন প্রকার, ১ ধীরা কনিষ্ঠা, ২ অধীরা কনিষ্ঠা, ৩ ধীরাধীরা কনিষ্ঠা।

১। ধীরা কনিষ্ঠা এইরূপ—

“প্রীর দেখি স্থির মান করিবারে সমাধান
বজ্র করে অগমান ক্রোধে ক্রোধে হরিব।

কিসে মোর পায়া দোষ কেন কর এত রোষ
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব॥

কেহ বুঝি কহিয়াছে গিয়াছিল কারো কাছে
অজ্ঞে বুঝি চিহ্ন আছে তবে কিসে তরিব।

আরস্তিয়া ছিলা ক্রোধ না করিলা উপরোধ
এত দূরে শোধ বোধ কত সেধে মরিব॥”

২। অধীরা কনিষ্ঠা—

“বিনা দোষে দেও গালি মাথে কলঙ্কের ডালি
মুখে যেন চূর্ণকালি কিসে মুখ চাহিব।

হয়্যাছি তোমার প্রভু কত দোষ পাই তবু
গালি নাহি দেই কত কত গালি খাইব॥

বিনয়ে না মানি রোধ যদি নাহি ছাড় ক্রোধ
এতদূরে শোধ বোধ দেশ ছাড়্যা বাইব।

তোমার যেমন মর্দ্ব তোমার তেমন কর্দ
জশাদ থাকিও ধর্ম কার্যকালে পাইব॥”

৩। ধীরাধীরা কনিষ্ঠা—

“এক বাক্যে দেখি রোষ আর বাক্যে বুঝি তোষ
না বুঝিছ শূণ দোষ বড় দায় পড়িল।

কি করিলে ভাল হবে বল তাই করি তবে
নহে ঘর লয়া রবে আমার কি রহিল॥

পদ্মিনী জয়রামা জয়রে খেদায়া হিয়া
তাহারি বিদরে হিয়া বুঝি তাই কলিল।

রত্নর সময় নটক আমার যে হয় হটক

ক্রোধানি তোমার হটক বা হবার হইল ॥”

ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী।

৩ ছোট সহোদর। ৪ অন্নবরজ। ৫ কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী।

৬ গায়ত্রীছন্দঃ।

কনিষ্ঠিকা (স্ত্রী) কনিষ্ঠাএব, কনিষ্ঠ বার্থে কন্-টাপ্-অত ইৎ। কড়ে আত্ম।

কনী (স্ত্রী) কন-অ-গৌরাদিবাৎ স্ত্রী। কন্যা।

(কন্যা কনী কুমারী চ। হেম ৩। ১৭৫।)

কনীচি (স্ত্রী) কন-বাহলকাৎ ইচি দীর্ঘক (পুৰোদরাদিবাৎ) ১ শুভ্রা, কুঁচ। ২ শকট, গাড়ী। ৩ পুষ্পক লতা।

অনেক স্থলে মূর্ত্য ৭ যুক্ত ‘কনীচি’ শব্দেরও ব্যবহার আছে।

কনীন (ত্রি) কন্-ঈন্। কমনীয়, মনোহর।

(“সদ্যোহজীবো বৃষভঃ কনীনঃ।” ঋক্. ১০। কনীনঃ কমনীয়ঃ। সায়ণ।)

কনীনক (স্ত্রী) চক্ষুর কনীনিকা, তার।

কনীনকা (স্ত্রী) ১ কণা। ২ কমনীয় শাপভঙ্গিকা।

কনীনিকা (স্ত্রী) কনীন-সংজ্ঞারঃ কন্-টাপ্-অত ইৎ। ১ চক্ষুর তার। ২ কনিষ্ঠাঙ্গুলি। ৩ কনিষ্ঠা ভগিনী।

(কনীনিকা তারকে হস্তঃ ভ্রাতৃ কনিষ্ঠাঙ্গুলাবপি। মেদিনী।)

কনীনী (স্ত্রী) কন্-ঈন্-স্ত্রী। কনিষ্ঠাঙ্গুলি।

কনীয়স (স্ত্রী) কনঃ সূর্য্যঃ, তজ্জেনঃ কনীয়স্, তদ্রূপত্বেন সীয়েতে অবসীয়েতে কনীর-সো-ঋ-কর্ষে ক। তাস্র। (তাস্মৈর অধিষ্ঠাতৃদেবতা সূর্য্য।)

(তাস্মৈ স্নেহসুখং শুভং রক্তং বাঠিসুচয়সম্।

স্নেহশাবরভেদাধাৎ মর্কটাত্মং কনীয়সম্ ॥ হেম ৪। ১০৫৬।)

কনীয়ান্ [স্] (ত্রি) অয়মনরো রতিশয়েন বৃষা অন্নো বা, বৃষন্ অন্ন-বা-ঈয়স্, কনাদেশঃ (বৃষাঃ কনজতরতাম্। পা ৫। ৩। ৬৪।) ১ অন্নজ, কনিষ্ঠ সহোদর। ২ অতিযুবা। ৩ অতি অন্ন। ৪ বয়সে ছোট।

(“মাতুঃ পিতৃঃ কনীয়াসং ন নমোৎ বয়সাহধিকঃ।

প্রণমোজ্ঞ গুরোঃ পত্নীং জ্যেষ্ঠাভাৰ্য্যং বিমাতরম্ ॥” শ্বত্ৰি।)

৫ ছোট। ৬ পশ্চাৎ উৎপন্ন।

কমুই (দেশজ) ককোনি, হাতের মধ্যস্থলস্থ সন্ধি।

কমুজ (দেশজ) কাকজুজের অপভ্রংশ।

কনের (পুং) কন্-এর। কর্ণিকার বৃক্ষ।

(কনেরস্ত কর্ণিকারে কর্ণিবৈজ্ঞান্যোঃ স্ত্রিয়াম্। শকাঙ্কি।)

কনেরা (স্ত্রী) কন্-এর-টাপ্। ১ হস্তিনী। ২ বেড়া।

কনোজ (ককাজুজ শব্দের অপভ্রংশ) জনপদবিশেষ। উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলের ককথাবান্ জেলার একটি তহশীল, দক্ষিণধারে অবস্থিত। ইহার কৃষিপ্রতিমাণ ২০৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ১,১৪,৯১২। গবর্ণমেণ্টের খাজনা আদায় ২০৬৩৭০ টাকা।

এই তহশীল দুই প্রকার ভূমিতে বিভক্ত—একভাগ বাজড় বা উচ্চভূমি আর এক ভাগ ‘কচোহ’ বা নিম্নভূমি। এখানকার অধিকাংশই উচ্চভূমি, উহা আবার কালীনদী দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বাবেল রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও কারহেরাই এই তহশীলের লস্বাধিকারী।

এখানে ছোলা, ধব, গম, অহিফেন, ইন্দু, জোরার, বজরা, নীল, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

এই তহশীলে একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত আছে। এখানকার নিরাপক-সরাই ও জালালাবাদ নামক স্থানে দুইটি পুলিশের থানা আছে।

প্রধাননগর—কনোজ, হিন্দুস্থানীরা ‘কনোজ’ বলিয়া থাকে। ইহা কালীনদীর পশ্চিমকূলে গঙ্গা ও কালীনদীর সঙ্গমস্থান হইতে ২১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২’ ৩০’’ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫৮’ পূঃ। পূর্বে এই নগরের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত, এখন প্রায় দুইক্রোশ সরিয়া গিয়াছে।

পুরাতত্ত্ব।—কনোজ আজকালের নয়, ত্রেতাযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার প্রাচীন নাম ককজুজ, কাকজুজ, মহোদয়, ককাজুজ, গাধিপুয়, কোশ, কুশস্থল।

(ককজুজ মহোদয়ঃ ককাজুজঃ গাধিপুয়ঃ।

কোশঃ কুশস্থলঃ তৎ ॥ হেম ৪। ৩৯।)

রামায়ণে লিখিত আছে, কুশের পুত্র কুশনাভ এই পুর স্থাপন করেন *। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানকে কোশ বা কুশস্থল বলা হইত।

কুশনাভের পুত্র গাধি এইস্থানে রাজত্ব করেন, তদনুসারে ইহার অপর নাম গাধিপুয় হইয়াছে। ককাজুজ নামের উৎপত্তি লক্ষ্যে হিন্দুবোকে একটু মতভেদ আছে†। রামায়ণে লিখিত আছে—

“স্বতীচী অঙ্গরার গর্ভে রাজর্ষি কুশনাভের একপুত্র ককাজুজ জন্মে। সেই পুত্র ককাজুজ যৌবনকাল আসিলে তাঁহারি এক-

* কুশনাভত বর্ধায়া পুরং চক্রে মহোদয়ম্।”

রামায়ণ আদি ৩২। ৬।

† “ববাহুনা চ তাঃ ককাজুজ ককাজুজঃ পুরা।

কাব্যমুখ্যমিতি ব্যাভঃ ভতঃ প্রকৃতি তৎপুয়ম্।” *

গৌড়ীর রামায়ণ বালক। ৩। Ed Gorrosio.

বেখানে বার্কর্ক (সেই পুত্র) কন্যা হুজ হইয়াছিল। সেই স্থানের নাম কন্যাকুজ।

দিন উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের স্নানলিত বাহ্য ও নৃত্যগীতে উদ্যান হাসিতে লাগিল। আহা! যে রূপের তুলনা পৃথিবীতে নাই, সেই রূপের ছটা নবযৌবনের ঘটা, মেঘের কোলে তারার মত বিজন উপবনে আজ শোভা পাইতে লাগিল। বায়ু সেই অল্পম অপাখিব রূপমাধুরী দেখিতে পাইলেন। সেই সর্কাত্মা তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, ‘দেখ! আমি তোমাদিগকে অভিলাষ করিতেছি, তোমরা মাহুভাব পরিভ্যাগ করিয়া আমার ভাৰ্যা হও, তোমরা দীর্ঘায়ু লাভ করিবে, তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। মাহুভাব যৌবন নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তোমরা অক্ষয় যৌবন লাভ করিবে।’

বায়ুর কথায় সেই শতকল্পা তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিলেন—‘হে দেব! আমরা তোমার প্রভাব অবগত আছি, তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ কর, এই ত তোমার জারি!—তবে কেন তুমি আমাদের অপমান করিতে আসিয়াছ? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের কন্যা, তোমার জারিকুরি এখন শেষ করিতে পারি। হুর্কুকে, পিতাই আমাদের প্রভু ও পরম দেবতা, তিনি বাহার সহিত আমাদের বিবাহ দিবেন, তিনিই আমাদের ভর্তা। আমাদের যেন এমন না হয় যে কামবশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বয়ম্বরা হই।’

বায়ু তাঁহাদের কথায় ফ্রু হইলেন, তাঁহাদের শরীরে ঢুকিয়া সমস্ত অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন তাঁহার বায়ু কর্তৃক ভগ্না হইয়া কুশনাভের কাছে আসিলেন। রাজা কুশনাভ সেই পরমহুন্দরী কন্যাদিগকে ভগ্না ও দীনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এক ব্যাপার! কে ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া তোমাদের কুজা করিয়াছে?’

তখন শতকল্পা পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, ‘হে রাজন্! বায়ু ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আমাদের ধর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আমরাও তাহাকে ‘আমাদের পিতা আছেন, স্ততরাং আমরা স্বাধীন নহি। যদি পিতা আমাদের প্রদান করেন, তবে আমরা তোমারই হইব।’ এই কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু বায়ু আমাদের কথা অগ্রাহ করিয়া সকলকেই ভগ্ন করিয়াছে।’

কুশনাভ তাঁহাদিগকে কহিলেন ‘হে পুত্রীগণ! তোমরা সকলে যে আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ, এবং বায়ুর হুনিবার্য্য রৌষবেগ সহ করিয়াছ, ইহাতে তোমাদের স্তম্ভং কার্য্য করা হইয়াছে।’ কুশনাভ এইরূপে কন্যাদিগকে বিদায় দিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত কন্যাদান বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মহর্ষি চুশীর পুত্র ব্রহ্মদত্ত কাম্পিলায়নগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকেই শতকল্পা সম্প্রদান করিলেন। ব্রহ্মদত্ত সেই কন্যাদিগের পানিস্পর্শ করিবারাত্র তখনই তাঁহার কুজহীনা, বিগতজরা ও পরমশোভাসম্পন্ন হইলেন।” (রামায়ণ আদি ৩২ ও ৩৩ সর্গ।)

উক্ত ঘটনা হইতে মহোদয়পুরীর নাম কন্যাকুজ হইল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনশরিভ্রাজক হিউয়েন্ সিয়াং এখানে আগমন করেন। তিনি কন্যাকুজের নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া যান—

“কন্যাকুজের প্রাচীন রাজধানী কুহুমপুরে ব্রহ্মদত্ত নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার ১০০ পুত্র ও ১০০ কন্যা জন্মে। কন্যাগণ পরমাহুন্দরী, তাহাদের রূপের সীমা ছিল না। তৎকালে গঙ্গাতীরে একজন ঋষি যোগমগ্ন হইয়া বাস করিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার শরীরে ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। তাঁহার তপোবল নিরীক্ষণ করিয়া সকলে তাঁহাকে মহাবৃক্ষ ঋষি বলিত। একদিন ধ্যানাবস্থানে তিনি কন্দমূল্যাদি অেষষণে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে গঙ্গার উপকূলে দিব্যরূপধারিণী শত রাজকুমারীকে দেখিতে পাইলেন। রাজকন্যাগণের অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে ঋষির মন টলিল, ছার সংসার সুখের ইচ্ছায় তাঁহার মন কলুষিত হইল, ঋষি বিলম্ব না করিয়া কুহুমপুরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রাজা ঋষির আগমনবার্তা শুনিয়া স্বয়ং আসিয়া যথানিয়মে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিনম্রনম্রবচনে তাঁহাকে কহিলেন—মহর্ষে! আপনার কুশল ত, আপনার ত কোন বিষ ঘটে নাই? ঋষি উত্তর করিলেন, রাজন্! আমি বিজন অরণ্যে বহুদিন স্তম্ভে ছিলাম, ধ্যান ভঙ্গ হইলে বেড়াইতে বেড়াইতে অলোকরূপসম্পন্ন আপনার কন্যাগণকে নিরীক্ষণ করিলাম, সেই অবধি আমার হৃদয়ে কামেচ্ছা বলবতী হইয়াছে। রাজন্! আপনি একটি কন্যা আমারে সম্প্রদান করুন, এই মাত্র আমার অহুরোধ। রাজা এই সকল শুনিয়া ঋষিকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আপনার আশ্রমে গিয়া এক্ষণে বিশ্রাম করুন, স্তত সময়ে আপনাকে সংবাদ দিব, এই আমার প্রার্থনা। ঋষি আপন আশ্রমে কিরিয়া আসিলেন।

এ দিকে রাজা ব্রহ্মদত্ত একে একে সকল কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইলেন, কিন্তু কেহ ঋষিকে বিবাহ করিতে চাহিল না।

রাজা ঋষির ভয়ে অত্যন্ত ভীত ও মনে মনে অন্ত্যত

দুঃখিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা কস্তা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, বাবা! আপনার সহস্র পুত্র, এবং সহস্র সহস্র লোক আপনার আজীবন। তবে কেন আপনি দুঃখিত হইতেছেন? রাজা কহিলেন, ‘মহারাজ ঋষি রূপা করিয়া তোমাদের এক জনকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা সকলেই সুখ ফিরাইয়া আছ, মহর্ষির আদেশ পালন করিতে কেহই সম্মত নও। সেই ঋষি অশেষকমতাসালী, তিনি মনে করিলে ভাল মন্দ সবই করিতে পারেন। এখন যদি তাঁহার আদেশ লজ্জিত হয়, তাহা হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার রাজ্য ধ্বংস করিবেন, আমার এবং আমার পূর্বপুরুষগণের নামে কলঙ্ক রটিবে। এই সকল যতই ভাবিতেছি ততই আমি সমধিক ব্যাকুল হইতেছি।’ বালিকা কন্যা উত্তর করিল, রাজন্! আপনার দুঃখ দূর করুন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি ঋষির প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

কনিষ্ঠা কন্যার হুমিষ্ট কথায় রাজা অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন এবং বিবাহের দ্রব্যসম্ভার লইয়া রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে কন্যাসহ ঋষির আশ্রমে আসিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনার সেবা শুক্রবা করিবার জন্য আমার কন্যাকে আনিয়াছি। ঋষি সেই কন্যাকে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! দেখিতেছি এই বৃদ্ধকে স্তম্ভা করিয়া এক অপোগণ্ড শিশুকে আমার সম্ভ্রাদান করিতে আসিয়াছে। রাজা বিনীত ভাবে কহিলেন, মহর্ষে! আমি আমার সকল কন্যাকেই কহিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইল না, কেবল আমার এই কনিষ্ঠা কন্যা আপনার সেবা করিতে অভিলাষী হইয়াছে। তখন ঋষি অত্যন্ত রোষপরবণ হইয়া এই বলিয়া অভিলাপ করিলেন, যেন সেই ৯৯ জন কন্যা এই মুহূর্ত্তে কুজ হয়, সেই বিকৃতাকৃতিগকে এ জগতে কেহ যেন আর বিবাহ না করে।

রাজা কস্তাদিগের নিকট অতি সত্বরে দূত পাঠাইলেন, দূত আসিয়া দেখিল রাজকস্তাগণ বিকৃতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে এই নগরের অপর নাম কস্তাকুজ হইল।’ (সি-বু-কি ৫।)

পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান কনোগিজ (Kanogiza) ও ওলিনিপাক্স (Oalinipaxa) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন যেমন এই জনপদ কুস্তাকার, পূর্বে তেমন ছিল না, পূর্বকালে কান্তকূজ একটি বিস্তীর্ণ

রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইত। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজ্যের আয়তন ৪০০০ মি (প্রায় ৩ শত কোশ) ছিল। ইহার রাজধানীও প্রায় আড়াই কোশ ব্যাপিয়া ছিল।

যে রাজধানী এক সময়ে সমৃদ্ধিতে ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, বাহার গঠন প্রাণীয়া সমকক্ষ ছিল না; আজ সেই প্রাচীন নগরের চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, হিন্দুরাজের পৌরব রবি অন্তর্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কনোজের পূর্বকীর্তিসকল লোপ হইয়াছে, বিধর্মী যবনেরা তাহার চিহ্নমাত্র রাখিতে কষ্টবোধ করিয়াছিল। এখানকার লোকের বিশ্বাস, পূর্বে কনোজনগর উত্তর হাজি হর্মায়নের মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে রাজবাটের নিকট মিরান-কি-সরাই, পূর্বে ছোট গঙ্গা এবং পশ্চিমে কপত্য ও মকরন্দনগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রাচীন নগরের প্রান্তে বর্তমান নগর স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানকে এখন ‘কিন্না’ অর্থাৎ দুর্গ কহে। কিন্নার মধ্যে চারিদিকে বাড়ী ঘর। তাহার উত্তর প্রান্তে রাজা হর্মায়নের মঠ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে রাজা অজয়পালের মন্দির, দক্ষিণ-পূর্বে ক্ষেমকলির বৃক্স, উত্তরপশ্চিম প্রান্তে শুক্ক নালা, উত্তরপূর্বে ছোট গঙ্গা এবং দক্ষিণে খাত ছিল, কিন্তু এখন তাহা বুজিয়া গিয়া বাতারাভের রাস্তারূপে পরিণত হইয়াছে। চতুঃসীমা নিরীক্ষণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে কনোজনগর যথার্থই ক্ষুদ্র এবং ইহার অবস্থান দুর্বল।

প্রবাদ আছে যে, প্রাচীননগরে ৮৪ মহালা ছিল, তাহার ২৫টি কেবল বর্তমান নগরে আছে। এখানকার রত্নমহল, বালাপীর, মধুচুম-জাহাগীর ও মকরন্দনগর হইতে প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কনোজের দেড়কোশ দক্ষিণপূর্বে ছোট গঙ্গার উপর রাজগিরি নামে একটি ইষ্টকময় প্রাচীন তৃপ পড়িয়া আছে। এই তৃপ চীনপরিব্রাজক বর্ণিত অশোকরাজনির্মিত বৌদ্ধতৃপ বলিয়া মনে হয়।

যে সময়ে প্রাচীন কনোজের পার্শ্ব দিরা গঙ্গা নদী প্রবাহিত হইত, তৎকালে এখানে অনেক দেবমন্দির ও বৌদ্ধদিগের চৈত্য ও সত্যারাম ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন-সিয়াং খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন, “নগরের দক্ষিণাংশে ও গঙ্গার ধারে ৩টি সত্যারাম, তন্মধ্যে মণিমাণিক্য বিভূষিত বৃহস্পতি আছে। বহুদূর হইতে বাত্রীগণ এখানে পূজা করিতে আসেন। সত্যারামের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে ১০০ ফুট উচ্চের দুইটি বিহার আছে। সত্যারামের অনতি-

দূরে দক্ষিণপূর্বে ২০০ ফুট একটি বৃহৎ বিহার, তন্মধ্যে তাত্রনির্মিত ৩০ ফুট উচ্চ বুদ্ধমূর্তি আছে। বিহারের চতুঃপার্শ্বের প্রাচীরে খোদিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তরনির্মিত বিহারের নিকটে হর্যামন্দির, তাহারই অনতিদূরে দক্ষিণে মহেশ্বরের মন্দির আছে। সেই দুইটি মন্দির নীলপ্রস্তরে নির্মিত, এবং বিবিধ কারুকার্যে সুশোভিত।^১ কিন্তু এখন সে সকল কোথায়?

ইতিহাস।—কান্তকূজের প্রথম রাজা কুশনাভ, তৎপরে তৎপুত্র গাধি, পরে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র রাজা হন। (রামায়ণ আদি ৩৩, ৩৪, ৩৫ সর্গ) বিশ্বামিত্র সংসারাত্মম ত্যাগ করিয়া মহর্ষি হইলে কুশবংশের কোন ব্যক্তি এখানে রাজত্ব করেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই। বহুবর্ষ পরে শুণ্ডরাজগণ এখানে রাজত্ব করেন, তাহার। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, শিলালিপি পাঠে তাহার কতক কতক বিবরণ জানিতে পারা যায়।

চীনপরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রভাকরবর্দ্ধন, তৎপরে তৎপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) রাজত্ব করেন। ইহারা বৈশ্বজাতীয়। রাজ্যবর্দ্ধন কর্ণসুবর্ণের রাজ্য শপাঙ্ক কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। হর্ষবর্দ্ধন প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র, তিনি ৩০৭ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন অঙ্গ প্রচলিত করেন। এই হর্ষই রত্নাবলী ও নাগানন্দপ্রণেতা ক্রীহর্ষ। ইহার সময়ে কনোজরাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে তৎসাময়িক বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাহার রাজসভায় অবস্থান করিতেন।

৬৫০ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। [ক্রীহর্ষ দেখ।] হর্ষবর্দ্ধনের পর কে রাজত্ব করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না।

শিলালিপিতে দেবশক্তি নামে কনোজরাজ্যের নাম পাওয়া যায়। এই রাজ্যের বংশ বহুদিন ধরিতা কনোজে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশ কোন সময় হইতে কোন সময় পর্যন্ত রাজত্ব করেন, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, এ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। [Jour. Beng. As. Soc. Vol. XXXII. p. 91 ff, XXXIII. 223 ff; Archæol. Surv. Ind. Vol. IX. p. 84; Ind. Ant. Vol. XV. 109-10 দেখ।]

একশ্রেণী অনেক অল্পসংখ্যক পুরাতত্ত্ববিদেরা দেবশক্তিরাজ্যের বংশাবলী এইরূপ স্থির করিয়াছেন—

দেবশক্তি (৭০০ খৃঃ অব্দঃ)
(ভূমিকাকে বিবাহ করেন)

বৎসরাজ (৭৬০ খৃঃ অব্দঃ)
(ইহার পত্নীর নাম হৃদরী)

মাগভট (৮০০ খৃঃ অব্দঃ)
(পত্নীর নাম টসটা)

রামভট (৮৩০ খৃঃ অব্দঃ)
(পত্নীর নাম অঙ্গা)

ভোজ ১ম (৮৬০ খৃঃ অব্দঃ)
(পত্নীর নাম চন্দ্রভট্টারিকা)

মহেন্দ্রপাল (৯০০ খৃঃ অব্দঃ) *

মহেন্দ্রপালপত্নী দেহনাগা

তৎপত্নী শটাদেবী

ভোজ ২য় (৯২৫ খৃঃ)

বিনায়ক পাল (৯৫০-৭৫ খৃঃ) +

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে কলচুরি ও পালবংশীয় রাজগণ মিলিত হইয়া দক্ষিণ ও পূর্বাংশ হইতে কনোজরাজ্য আক্রমণ করেন; তখন কলচুরি ও পালবংশই প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের আক্রমণে দেবশক্তিবংশীয় নৃপতিগণের অধঃপতন হইল। সেই সময়ে কলচুরিরাজ (চৌদ্ররাজ) কনোজ এবং পালবংশ কাশীরাজ্য অধিকার করিলেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অজয়পাল ও জয়পাল নামে দুইজন রাজা কনোজে রাজত্ব করেন। অজয়পালের সময়ে এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির নির্মিত হয়। এখনও একটি উৎকৃষ্ট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহা রাজা অজয়পালের মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। জয়পালের রাজত্বকালে ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মাসুদ গিজনী কনোজ আক্রমণ করেন। এই সময়ে বিধর্মীর আক্রমণে কনোজের পূর্বভূমি বিলুপ্ত হয়। অল্প দিন পরেই জয়পাল কালিঞ্জরের চান্কেলরাজ কর্তৃক নিহত হন। শিলালিপি অনুসারে এই সময়ে কলচুরিরাজগণের হস্তে কনোজের আধিপত্য ছিল। মহীপালরাজের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রদেব কলচুরিরাজ কর্ণের নিকট হইতে এই কনোজরাজ্য বহুতার পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দ্রদেবই কনোজের রাঠোররাজবংশের প্রথম রাজা হিন্দুধর্মের উপর চন্দ্রদেবের বড়ই ভক্তিব্রজা ছিল। বিহার ও কাশীর পালবংশীয় রাজগণ সকলেই চন্দ্রদেবের আত্মীয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ইনি তাহাদের সংশ্লিষ্ট এককালে পরিত্যাগ করেন। এমন কি তাহার পুত্রমহাজমিক 'পাল' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া 'চন্দ্র' উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইহার সময়ে কনোজের নানাহানে দেবালয় স্থাপিত হয়। ইহার পিতা মহীপালের মৃত্যু হইলে,

* মৃত্যুতে ৭৬০-৬৫ অব্দঃ

+ মৃত্যুতে ৭২৫-২৫ অব্দঃ

ইনি আপন অংশে অবোধাধ্যাত্ম্য প্রাপ্ত হইরাছিলেন। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ লিখিয়াছেন, এই চন্দ্রদেবের রাজত্বকালে গৌড়াদিগণ আদিশূর কান্ডকুজ হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কারহু আনাইরাছিলেন। কিন্তু আমাদের কুলাচার্যাদিগের গ্রন্থমতে, আদিশূরের সময়ে রাজা বীরসিংহ কান্ডকুজে রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই বীরসিংহ এই চন্দ্রদেবের নামান্তর কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারিলাম না, কারণ কোন শিলালিপিতে বীরসিংহের নাম পাইলাম না। তবে যদি এই চন্দ্রদেবই বীরসিংহ হন, তাহা হইলে আমাদের দেশের প্রবাদ অমুসারে তিনি ১৫৪ শাকে অর্থাৎ ১০৩২ খৃঃ অব্দে কনোজে রাজত্ব করিতেন। নানাদ্বানের শিলালিপি অমুসারে চন্দ্রদেবের রাজ্যকাল উক্ত সময়ের ২০ বৎসর পরে হইয়া পড়ে। সুতরাং চন্দ্রদেব ও বীরসিংহ এক ব্যক্তি কি না তৎপক্ষে সম্ভব থাকিয়া যাইতেছে। চন্দ্রদেবের পর তৎকালীয় চারিজন রাঠোররাজ কনোজে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যথা—

- (১) চন্দ্রদেব *
- (২) যদনপাল (১১৫৪ সখৎ)
- (৩) বিজয়চন্দ্র (১১৬১ সখৎ)
- (৪) গোবিন্দচন্দ্র (১১৮৫ সখৎ)
- (৫) জয়চন্দ্র (জয়চন্দ্র) (১২২৫ সখৎ)

বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়চন্দ্রই কনোজের শেষ হিন্দুরাজ। মুসলমান ইতিহাসে ইনিই জয়চাঁদ নামে অভিহিত। তৎকালে দিল্লীর পৃথিবীরাজ তিম্ব শৌর্যাবীর্য্যো এবং আধিপত্যে ভারতের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। দোষের মধ্যে তিনি কিছু দীর্ঘাপরবশ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন, সেই দোষেই পৃথিবীরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। সেই বিবাদ আরও গুরুতর করিবার জন্ত পৃথিবীরাজকে উপেক্ষা করিয়া রাজস্বয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ভারতের হিন্দু নরপতিগণ শুনিলেন, যজ্ঞসভায় জয়চন্দ্রের আদরের কণ্ঠা পরমশ্রদ্ধারী সংযুক্তার স্বয়ম্বর হইবে। তখন মিবারের সময়সিংহ এবং দিল্লীর পৃথিবীরাজ ব্যতীত প্রায় সকল হিন্দুরাজাই সেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইলেন। জয়চন্দ্র পৃথিবীরাজের স্তব্ধ মূর্ত্তি দ্বারদেশে স্থাপনপূর্ব্বক যজ্ঞসমাদা করিলেন।

এইবার সংযুক্তার স্বয়ম্বর। কনোজনগরী আজ অপূর্ব্ব শোভার স্রোতিভিত্তি হইল! নানাদেশীয় হিন্দুরাজগণের এমন সম্মিলন, বহুদিন কেহ দেখে নাই। সেই দেবোপম রাজস্তব্ধ ভাবিতেছেন না জানি বিধি কাহার অদৃষ্টে সংযুক্তার

লিখিয়াছেন। আজ সকলে মহাবীর্ণ বর্ণিবার্ণিকারসমূহে বিভূষিত হইয়া সংযুক্তার মন হরণ করিবার আশার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত। কিন্তু সংযুক্তার মন অপরিবর্ত্তে পড়িয়া আছে, তাঁহার মন আর তাঁহার অধীন নয়, এখন তাহা পৃথিবীরাজের, পৃথিবীরাজকে পাইবার জন্য পাপল!

এদিকে দিল্লীর পৃথিবীরাজ শুনিলেন, সংযুক্তা তাঁহাকে বড় ভালবাসে, সংযুক্তার স্বয়ম্বর! মহাবীর পৃথিবীরাজ কালবিলম্ব না করিয়া গুপ্তভাবে কনোজনগরে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া শুনিলেন আজ সংযুক্তার স্বয়ম্বর! সংযুক্তা বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সখিগণের সঙ্গে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন, আসিয়া চারিদিক্ একবার চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার পৃথিবীরাজকে দেখিতে পাইলেন না। তখন জয়চন্দ্র তাঁহার মনোমত জনকে বরমালা অর্পণ করিতে বলিলেন। এখন সংযুক্তা কি করে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দ্বারিকপে দণ্ডায়মান পৃথিবীরাজের স্তব্ধ-মূর্ত্তির গলদেশে মালা প্রদান করিলেন। সভায় সকলে চমৎকৃত হইল। জয়চন্দ্রের শিরে যেন বজ্রপাত হইল! তখন কনোজরাজ ক্রোধে উদ্ভীষ্ট হইয়া সংযুক্তার নির্কাসনের আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু একি হইল! পরমহুর্ন্তে মহাবীর পৃথিবীরাজ সঠেন্তে স্বয়ং সভায় উপস্থিত। ঘোর ঘনরবে রণভেরী বাজিয়া উঠিল, রাঠোরচৌহানে দারুণ সময় উপস্থিত হইল! অসম্মা বীরের মস্তক বিধগুণ্ডিত হইল। মহাবীর পৃথিবীরাজ সভাস্থল হইতে সংযুক্তাকে লইয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া অরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

একে জয়চন্দ্র পূর্ব্ব হইতে পৃথিবীরাজের নামে জলিতেন, আজ সংযুক্তার স্বয়ম্বরে তাঁহার মনে যেন দাবানল জলিয়া উঠিল। পৃথিবীরাজকে দমন করিবার জন্ত তিনি যবনরাজ মুহম্মদ ঘোরীকে আহ্বান করিলেন। ইতিপূর্বে যবনরাজ পৃথিবীরাজের নিকট পরাস্ত হইয়া ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, এখন জয়চন্দ্রের সাহায্য পাইবেন শুনিয়া স্বদলে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করিলেন। জয়চন্দ্রের দোষে হিন্দুদের কপাল পুড়িল, তাঁহার সাহায্যবলে মুহম্মদঘোরী পৃথিবীরাজকে পরাস্ত করিলেন। সেই সঙ্গে হিন্দুস্বাধীনতাও চিরদিনের মত লোপ হইল, সেই দিন হইতে সোণার ভারত যবনকবলিত হইল!—জয়চন্দ্রের মনস্কামনা পূর্ণ হইল, কিন্তু তিনিও যবনহস্তে অব্যাহতি পাইলেন না। ১১৯৪ খৃঃ অব্দে, জয়চন্দ্র যবনসেনাপতি কুতুব উদ্দীনকে হস্তে পরাজিত হইলেন, মুসলমানেরা কনোজরাজ্য অধিকার করিল।

কনোজরাজ্য যবনাধিকৃত হইবার ১৮ বর্ষ পরে জয়চন্দ্রের

* চন্দ্রদেব এতদ্ভিন্ন রাজগণের বিস্তৃত জীবনী তত্তৎপক্ষে দ্রষ্টব্য।

ক্যেঠপুজ শিবজী দ্বারকাযাত্রাঙ্কলে মাড়োবারে আগমন করেন। এইখানে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া মক্কাহলীর নানাস্থান অধিকার করেন। তাঁহার বাহুবলে মক্কাহলীতে রাতেররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার বংশধরগণ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া মাড়োবারের নানাস্থানে বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই বংশেই বোধপুর প্রতিষ্ঠাতা রাও যোধ জয়প্রহর করেন। [শিবজী, মাড়োবার, রাতেররাজ্য প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কনৌজনগরে শেরশাহের সহিত হুমায়ূনের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হুমায়ূন পরাজিত হইয়া ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করেন।

উৎপন্ন শব্দ—কনৌজের গোলাপ, আতর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

এখানে নানাপ্রকার বস্ত্র ও কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কনৌজিয়া (হিন্দী, কাজকুজ শব্দের অপভ্রংশ) পঞ্চগোড় ব্রাহ্মণের মধ্যে এক শ্রেণী। পুরাণে ইহার কাজকুজ নামে খ্যাত।

“সারস্বতাঃ কাজকুজা গোড়মৈথিলিকৌৎকলাঃ।

পঞ্চগোড়া ইতি খ্যাতা বিদ্যাত্তোত্তরবাসিনঃ ॥”

স্বল্পপুরণ।

কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের পাঁচ শাখায় বিভক্ত—১ কনৌজিয়া, ২ সর্করিয়া, ৩ জিঝোতিয়া, ৪ সনাঢ়া, ৫ বজের কনৌজীয়।

১। কনৌজিয়াশাখা উত্তরপশ্চিমে শাহজহানপুর ও পিলিভীত, উত্তরে কানপুর ও কতেপুরের কিয়দংশ, পশ্চিমে বান্দা জেলা, দক্ষিণে হামীরপুর, এবং দক্ষিণপশ্চিমে এতাবার কিয়দংশে বসবাস করে। ইহাদের কুলকারিকামতে ইহার বটকুল বা ছয় গোত্রে বিভক্ত, কিন্তু ইহাদের মতে সাত্বে ছয়কুল।

গোত্র	উপাধি
গৌতম	অবহি
শাণ্ডিল্য	মিশ্র
	দীক্ষিত
	সুকুল
ভারদ্বাজ	ত্রিবেদী
	পাঁড়ে
	পাঠক
উপমহা	দুবে
	ত্রিবেদী
কান্তপ	তেওয়ারী
কাতীপ	বাজপাই
গর্গ	চৌবে

২। সর্করিয়া শাখা কনৌজ হইতে গিয়া অযোধ্যায় বাস করে। এখন অযোধ্যায় বরাইচে, নেপালের প্রান্তে, কাশী ও প্রয়াগপ্রদেশে, দক্ষিণে বুদ্ধলগড়রাজ্যে ইহার বাস করে। তন্মধ্যে গোরক্ষপুরে কিছু অধিক, সেখানে সর্করিয়াগণ ১৯ বৎসর বিভক্ত।

অনেকে বলিয়া থাকেন সর্করিয়া সরস্বপারিয়া শব্দের অপভ্রংশ। প্রবাদ এইরূপ—রাম রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যায় কিরিয়া আসিয়া কান্যকুব্জ হইতে এই ব্রাহ্মণশ্রেণীকে আহ্বান করেন, তাঁহার সরস্ব পরপারে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সরস্বপারিয়া নাম হয়। ইহাদের মধ্যে তিন গোত্র ও তিন উপাধি আছে—

গোত্র	উপাধি
গর্গ	পাঁড়ে। (ইতিয়া)
গৌতম	দুবে (কঙ্কজীয়া)
শাণ্ডিল্য	পাঁড়ে (ত্রিফলা)
”	তেওয়ারী (পিণ্ডী)
ভারদ্বাজ	দুবে (বৃহজ্জাম)
বৎস	মিশ্র (পৈয়াদী)
”	দুবে (সমদারী)
কান্তপ	মিশ্র (রাঢ়ী)
”	পাঁড়ে (মালী)
কৌশিক	মিশ্র (ধর্মপুরা)
চন্দ্রায়ন	পাঁড়ে (চপালা)
সাবর্ণ্য	পাঁড়ে (ইতারী)
পরশর	পাঁড়ে

এ ছাড়া পুলহা, ভৃগু, অজি, অজিরা প্রভৃতি কয়েক গোত্রীয় আছেন।

উপরোক্ত গোত্রের মধ্যে গর্গ, গৌতম ও শাণ্ডিল্য গোত্রীয়রাই কুলীন বলিয়া খ্যাত।

৩। জিঝোতিয়াশাখা বুদ্ধলগড় হইতে অধিক বাস করে। উত্তরে ও পশ্চিমে ইহার কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের সহিত এবং পূর্বে সর্করিয়া ব্রাহ্মণের সহিত সম্মিলিত। রূপরম্বের চৌবে, দরিয়ার দুবে, হামীরপুর ও করিমার মিশ্রেরাই এই শাখার শ্রেষ্ঠবংশ।

গোত্র	উপাধি
উপমহা	পাঠক। (রোয়া)
”	বাজপাই। (বিনবারী)
কান্তপ	পতেরিয়া। (সারপুর)
”	পতেরিয়া। (বজবা)

গৌতম	চৌবে । (রূপনোরাল)
"	গজেলি । (বরাই)
শান্তিল্য	মিশ্র । (হামীরপুর)
"	অজেরিয়া । (কোটকে)
মোনস	মিশ্র । (করিয়া)
ভারখাজ	তেওয়ারী । (ঐজিক)
"	দুবে । (উঠাসনি)
বৎস	তেওয়ারী । (পঠরৈলি)
একাবিশিষ্ট	নারক । (পিপ্রি)

৪। সনাচ্য বা সনাচিয়া—রোহিলখণ্ডের মধ্যপ্রদেশ হইতে হুয়াবের উত্তর ও মধ্যভাগ, পিলিভীত হইতে গোরা-লিয়ার, রামপুরের উত্তরপশ্চিমাংশ, রিবা, জাহানাবাদ, নবাবগঞ্জ, বরেলি হইতে রামগঞ্জ, সলিমপুর, মীরাবাদ, তৎপরে গজার নিরতট হইতে কাজকুল পর্যন্ত, কালিনদীর কূল হইতে আলিপুরপটী, ভোইগাঁ, সোজ, এতাবা, বীবামো, এবং দক্ষিণে যমুনা হইতে চম্বলনদীর সঙ্গমস্থান পর্যন্ত এই শাখার বসবাস আছে।

গোত্র			উপাধি
বশিষ্ঠ	ব্যাস
"	গোখামী
"	মিশ্র
"	পরামর
"	কতারি
"	দেবলিয়া
"	দুবে
"	খেমর্যা
"	উপাখ্যার
ভারখাজ	বৈদ্য
"	চৌবে
"	দীক্ষিত
"	জিপাঠী
"	চতুর্থর
কান্তপ	মিশ্র
সাবর্য	তেওয়ারী
উপমহা	দুবে
গৌতম	উপাখ্যার
শান্তিল্য	পাঁড়ে

এ ছাড়া কৌশিক, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বনজর, কোশল, শিকীরা, বেরা প্রভৃতি গোত্র এবং পাঠক, বামী, সমাখ্যার,

মনস, বিধারি, চৈনপুরী, ভোটিয়া, বরীয়া, ওকা, মোদোরা, সঙ্ঘা, উদেলিরা, চটোখ্যা প্রভৃতি উপাধি আছে।

৫। বজের কনোজ ব্রাহ্মণেরা ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত ১ বারেন্দ্র, ২ রাঢ়ী, ৩ পাশ্চাত্য, ৪ দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

শেষ দুইটিকে অনেকে কনোজব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য করেন না।

প্রথম দুই শ্রেণী কনোজ হইতে আদিশূরের সময়ে বজ্রবেশে আসিয়া উপনিবেশ করেন। এই শ্রেণীর আদিপুরুষ তট্ট-নারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্ড ও ত্রীর্ঘ, উক্ত ৫ জনের বংশধরেরা বজ্রালসেনের সময়ে ১৫৬ বরে বিভক্ত হইরাছিল। তন্মধ্যে ১৫০ বর বরেন্দ্রভূমে এবং ৬ বর রাঢ়ে বাস করেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৮ বর শ্রেষ্ঠ বা কুলীন। যথা—১ মৈত্র, ২ ভূমি বা কালি, ৩ রুদ্রবাসিনী, ৪ সঙ্গমিনি বা সাজাল, ৫ লাহিড়ী, ৬ ভাহাড়ি, ৭ সাধু বা পাণ্ডী, ৮ ভদ্র।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৮ বর শূদ্রশ্রোত্রীয় এবং ৮৪ বর কষ্টশ্রোত্রীয়।

রাঢ়ের ব্রাহ্মণ মধ্যে ছয় বর কুলীন। যথা—১ মূখী বা মুখোপাধ্যায়; ২ গাজুলি, ৩ কাজিলাল, ৪ ঘোষাল, ৫ বন্দোষী বা বন্দোপাধ্যায়; ৬ চাটতি বা চট্টোপাধ্যায়।

এ ছাড়া ৫০ বর শ্রোত্রীয়। [ব্রাহ্মণ, কুলীন, বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কনুকনু (দেশজ) বাতনাবিশেষ, কোনস্থানে আঘাত লাগিলে বা বরফাদি দ্রব্য স্পর্শে যেরূপ ঘর্ষণ হয়।

কনুকনে (দেশজ) অভিশপ্ত শীতল দ্রব্য।

কন্তু (ত্রি) কং হুং অস্তাতি, কং-ত (কংস্তুয়াবতমুত্ৰিতু-তয়সঃ। পা ৫। ২। ১৩৮।) হুখী।

কন্তি (ত্রি) কং হুং অস্তাতি, কং-তি (কংস্তুয়াবতমুত্ৰিতু-তয়সঃ। পা ৫। ২। ১৩৮।) হুখশালী।

কন্তু (পুং) কামরতে, কম-কু (কমিমনিজনিগাতা-বিভ্যন্ত। উণ ১। ৭০। কম, মন, জন, গৈ, বা ও হি ধাতুর

উত্তর কু প্রত্যয় হয়।) ১ কামদেব। ২ চিত্ত, মন। (কন্তু কন্দর্পচিত্তয়োঃ। উজ্জলদত্ত।) ৩ (ত্রি) (কং হুং অস্তাতি) হুখী। ৪ কুল, গোলা।

কঙ্ক (পুং) গরিবিশেষ।

কঙ্করী (ত্রি) কং-অরন্থ-কুং (পূর্বোদরানিধাং,) জীৎ। বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপরিচয়—কঙ্করী, কঙ্কা, মৃদুর্বা, তীক্ষ্ণকটকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্রুরগন্ধা, ও হুস্তবেশা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, এবং কক, বায়ু, শোথ, রক্ত, গ্রহি ও অরনাশক।

কন্দা (স্ত্রী) কন্দ-বাহুলকাৎ ধনু-টাপ্। ১ কাঁথা; কতকগুলি ছিন্ন কাপড় একত্রে সেলাই করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। দরিদ্র ভিক্ষুকগণ ইহা দ্বারা শীত নিবারণ করে। নেড়ানেড়ী দলহ ভিক্ষুরাই ইহার অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। ২ মাটির ক্ষুদ্র প্রাচীর, কাঁথি।

(কন্দা যুগ্মযতিভোক্তাৎ কথা প্রাবরণান্তরে। মেদিনী।)

৩ উপনিষদের রাজ্যের নগরবিশেষ।

কন্দাধারী [ন] (ত্রি) কন্দা-ধ-গিনি। ভিক্ষুক।

কন্দারী (স্ত্রী) কন্দ-অন্ন-ধৃক্ (পুষোদরাদিহাৎ,) ডীর্ঘ। বৃক্ষবিশেষ। [কন্দারী দেখ।]

কন্দ (পুং স্ত্রী) কন্দয়তি জিহ্বায়া বৈরুৎ জনয়তি, কদি-গিচ্-অচ্। ১ ওল। [ওল দেখ।] ২ আলু মূলো মূলমাত্র। ৩ গাঁজর। ৪ (পুং) কং জলং দদাতি, ক-দা-ক। মেঘ।

৫ যোনিরোগবিশেষ। পীড়ারোগ (Prolapsus Uteri) ইহার নিদান ও লক্ষণ—দীর্ঘনিদ্রা, অতিরিক্তক্রোধ, ব্যায়াম, অতিমৈথুন ও নখদস্তাদি দ্বারা ক্ষত হওয়া প্রভৃতি কারণে, বায়ু শিত্ত ও কফ কুশিত হইয়া যোনিদেশে পুয়রক্তবর্ণ মান্দার ফলের স্থায় যে রোগোৎপাদন করে, তাহার নাম কন্দ। বাতিক, পৈতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভেদে এই রোগ চারিপ্রকার। বাতিককন্দ রক্ত ও ক্ষুণ্ণিত অর্থাৎ কাটা কাটা। পৈতিক কন্দ অধিক রক্তবর্ণ এবং ইহাতে দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক কন্দ তিলপুষ্পভূল্য ও কণ্ডুষক। সান্নিপাতিক ব্যতীত অল্প তিনপ্রকার কন্দ চিকিৎসার আরোগ্য হইয়া থাকে। চিকিৎসা—গেরিমাটা, আমের বীজ, বিড়ল, হরিদ্রা, রসাজন ও কটুফল এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত যোনিতে পূরণ করিলে এবং ত্রিফলার কাথের সহিত এই সকল চূর্ণ ও মধু মিলিত করিয়া প্রক্ষেপণ করিলে কন্দরোগ নিবারিত হয়। ইন্দুরের মাংস ও তৈল একত্র রোয় পক করিয়া ঐ তৈল যোনিতে মর্দন করিলে এবং ইন্দুরের মাংস ও সৈন্ধব দ্বারা যোনিতে স্বেদ প্রদান করিলে যোজর্শ, অর্থাৎ কন্দ আরোগ্য হয়। (চক্রলত।) ৬ (দেশজ) মিছরির কুঁদো।

কন্দক (পুং) কন্দ-স্বার্থেকন্। ১ কন্দ। ২ বিতান, চাদোরা।

কন্দগুড়ী (স্ত্রী) কন্দোত্তবা গুড়ী, মধ্যলো। গুড়ী-বিশেষ; ইহার সংস্কৃতপরিচয়,—কন্দোত্তবা, কন্দামৃত, বহু ছিরা, বহুগ্রহা, পিত্তাসু ও কন্দোরোগিলী।

কন্দজ (ত্রি) কন্দাৎ জায়তে, কন্দ-জন্-ক। কন্দোৎপন্ন মূল হইতে উৎপন্ন।

কন্দট (স্ত্রী) কদি-অটন্। খেতোৎপন্ন, সাদা ছাঁদিত মূল। (কন্দটং শুক্রোৎপলেন ত্রাৎ। শব্দার্থিক)

কন্দকলা (স্ত্রী) কন্দাৎ কন্দমারভ্য কলং বস্তাঃ বহতী। ছোট কন্দা, উচ্ছে।

কন্দবহুলা (স্ত্রী) কন্দাদারভ্য কন্দেন, কন্দেবু বা বহুলা, ৫মী, ওমী, বা ৭মী তৎপুরুষ। ত্রিগণিকা বৃক্ষ।

[ত্রিগণিকা দেখ।]

কন্দমূল (স্ত্রী) কন্দ এব মূল মত্ত, বহতী। মূলক, মূলো।

[মূলো দেখ।]

কন্দর (পুং) কং গজশিরঃ দীর্ঘাতে হনেন, কং-দৃ-করণে অপ্। ১ অক্ষুণ্ণ। ২ (কেন জনেন দীর্ঘাতে অলৌ, কন্দশি অপ্।) শুহা। ইহার সংস্কৃতপরিচয়,—দরী, কন্দরা, কন্দরী, দর ও শুহা।

“অপর ভুধর করিল কত।

চমর মন্দর কন্দরযুত।” (শিবায়ন)

৩ (স্ত্রী) আর্দ্রক, আদা। ৪ অক্ষুর। ৫ ওল। ৬ গাঁজর।

৭ ছইটি পর্বতের মধ্যস্থিত পথ।

কন্দরবান্ [ত] (পুং) কন্দরো হস্ত্যস্ত, কন্দর-মতৃপ্-মত্ত বঃ। পর্বত।

কন্দরা (স্ত্রী) কন্দর-টাপ্। শুহা।

কন্দরাকর (পুং) কন্দরস্ত্র আকরঃ, ৬তৎ পর্বত।

(অথগিরৌ পুংসি ত্রাৎ কন্দরাকরঃ। শব্দার্থিক।)

কন্দরাল (পুং) কন্দরার অক্ষুরায় অলতি, কন্দর-অল্-অচ্। ১ গর্দভাও বৃক্ষ। ২ পাকুড়গাছ। ৩ আখোট গাছ।

কন্দরালক (পুং) কন্দরাল-স্বার্থেকন্। প্রক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ।

কন্দরী (স্ত্রী) কন্দর-ডীর্ঘ। শুহা।

কন্দরোদ্ভবা (স্ত্রী) কন্দরে উদ্ভবতি, কন্দর-উৎ-ভৃ-অচ্-টাপ্। ১ ছোট পাষণভেদী বৃক্ষ। ২ (ত্রি) কন্দরোৎপন্ন বৃক্ষাদি। ৩ গুড়ী-বিশেষ।

কন্দরোহিণী (স্ত্রী) কন্দাৎ রোহতি, কন্দ-রহ-গিনি। গুড়ী-বিশেষ।

কন্দর্প (পুং) কং কুংসিতো দর্পো যন্মাৎ, বহতী। ১ কামদেব। কথিত আছে,—জন্মমাত্রই ‘কাঁছাকে মত্ততার দ্বারা দর্পযুক্ত করিব’ এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা কন্দর্প নাম প্রদান করেন।

(“কং দর্পর্যমীতি মদাজ্জাতমাত্রো জগাদ চ।

ভেন কন্দর্পনামানং তং চকার চতুর্ভুজঃ।” কথাস।)

২ সঙ্গীতের প্রবিশেষ।

(“ত্রয়োবিংশতি বর্ণাভিষ্ম প্রবঃ কন্দর্পগঞ্জকঃ।

বীরে বা করণে বা ভাৎ খণ্ডভালে বিধীয়তে।” সঙ্গীত দা।)

কন্দর্পকূপ (পুং) কন্দর্পস্ত কূপ ইব, উপনিং। যোনি।
(কন্দর্পকূপো ভগে। শব্দাঙ্কি।)

কন্দর্পকেতু (পুং) রাজবিশেষ।

কন্দর্পকেলি (পুং) কন্দর্পেণ কেলিঃ, ওতৎ। ১ কামবশতঃ
কেলিবিশেষ, মৈথুনাঙ্গি। ২ (কন্দর্পকেলি মথিকৃত্য কৃতো
গ্রহঃ, অণ্, তন্ত লুক্) গ্রহসনবিশেষ।

কন্দর্পজীব (পুং) কন্দর্পঃ জীবয়তি বর্জয়তি, কন্দর্প-জীব-
পিচ্-অচ্। ১ কামবুদ্ধিকারক জ্বা। ২ কাঁঠাল।

কন্দর্পজ্বর (পুং) কন্দর্পবিকারজো জ্বরঃ মধ্যলোং। কাম-
বিকার জ্বর জ্বর। [কামজ্বর দেখ।]

কন্দর্পদ্বন্দ্ব (পুং) কন্দর্পস্ত দ্বন্দ্বঃ বর্ণিতঃ যত্র। মহাদেব।
শিবপুরাণে লিখিত আছে—“দক্ষযজ্ঞে সতী দেহভাগ করার
পর মহাদেব যোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন; এদিকে সতীও
হিমালয়ে জঙ্গগ্রহণ করিয়া মহাদেবের পরিচর্যা কার্যে
নিযুক্ত হন। এই সময়ে ভাড়কাজের অত্যাচারে দেবগণ
নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একমাত্র শিবভক্তো-
জাত কার্তিকের ব্যতীত তাহার দমন হইবার উপায় না
থাকায়, দেবগণ মহাদেবের যোগভক্ত জন্ত রতি ও বসন্ত
সহ কন্দর্পকে প্রেরণ করেন। কন্দর্প দেবজ্ঞা অমুসারে
মহাদেবের শরীরে ফুলবাণ নিক্ষেপ করিবারাত্র, তাঁহার ললাট
হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়া
ফেলিল।”

কন্দর্পনারায়ণ। চন্দ্রবীপের একজন প্রবল বাঙ্গালী রাজা।
বারুড়রায় মধ্যে একজন। ইহার পিতামহ পরমানন্দ বহু রায়
দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের কায়স্থসমাজের সমাজপতি ছিলেন,
তিনি আপনাকে কান্তকূজ সমাগত কায়স্থপ্রবর দশরথ বহুর
বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। আইনই অকবরীতেও
তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৫৮৬ খৃঃ, কন্দর্পনারায়ণ বাকলা
চন্দ্রবীপে রাজত্ব করিতেন, তিনি একজন মহাবীর ছিলেন,
বিশেষতঃ কামান ছুঁড়িতে ভালবাসিতেন, তাঁহার গুণের
পরিচয় তৎকালীন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরাও বর্ণনা করিয়া
গিয়াছেন। (Hacklyt's Voyages, Vol. II. p. 257.)

কন্দর্পনারায়ণের পিতুল-নির্মিত কামান এখনও চন্দ্রবীপে
আছে, সেই কামানের উপর তাঁহার এবং সেই কামান-
নির্মিতার নাম খোদিত রহিয়াছে। সেই পিতলের কামান
দৈর্ঘ্যে ৭৫ ফুট, চূড়ির গোড়ার বেড় ২৫ ফুট, গোলা বাহির
হইবার মুখ ১২৫ ইঞ্চি। (Jour. As. Soc. Bengal Vol.
XLIII. p. 207.)

কন্দর্পবন্দন (পুং) কন্দর্পঃ বন্ধাতি, কন্দর্প-বন্ধ-জ্য। মহাদেব।

কন্দর্পমূবল (পুং) কন্দর্পস্ত মূবল ইব, উপনিং। উপস্থ
(কন্দর্পমূবলো লিকে। শব্দাঙ্কি।)

কন্দর্পরস। বৈদ্যোক্ত ঔষধবিশেষ। পারদ, গন্ধক, প্রবাল,
গিরিমাটী, বৈক্রান্ত, রোপ্য, শয্য ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ,
বটের সুরির কাথ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ
বটিকা করিবে। ত্রিকলা, কাবাবচিনি বা দাবলগাছালের
কাথের সঙ্গে সেবন করিলে ইহাতে ঔপসর্গিক মেহরোগ লঘু
নাশ হয়।

কন্দর্পশৃঙ্খল (পুং) কন্দর্পায় শৃঙ্খলঃ। রতিবদ্ধবিশেষ।
“নারীপদবয়ঃ স্তম্ভ কান্তভোরহঃ পরি।

কটিকেন্দ্র দোলদোলাত্তবন্ধঃ কন্দর্পশৃঙ্খলঃ ॥” (রতিমঞ্জরী।)

কন্দর্পসার তৈল (স্ত্রী) কুষ্ঠাধিকারের বৈদ্যোক্ত তৈল-
বিশেষ। কটুতৈল ৮ সের। কাথার্থ ছাতিমছাল, কালিয়া-
কড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, তিত্পলতা, জয়ন্তীপত্র,
তিতলাউ, গোরক্ষচাকুলে, হরিদ্রা, প্রত্যেক ১০ দশ পল,
পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমুত্র ১৬ সের,
সৌদালের পত্র, ভুজবাজপত্র, জয়ন্তীপত্র, ধূতরাপত্র, হরিদ্রা,
সিদ্ধিপত্র, চিতা, খেজুরপত্র, গোমর ও আকন্দপত্র, সিদ্ধপত্র
প্রত্যেক রস ৮ সের।

কদার্ঘ মাকাল, বচ, ব্রাকী, তিতলাউ, চিতামূল, শুভ-
কুমারী, কুচলা, পলতা, হরিদ্রা, মুগা, পিপ্পলমূল, সৌদালের
আটা, আকন্দ আটা, কালকাজলমূল, কৈশোরমূল, আচমূল,
মঞ্জিষ্ঠা (অভাবে ঘোড়ানিম), তিত্পলতা, রাশালশস্য মূল,
বিছুটিপত্র, করঞ্জমূল, হাপরমালি, মুগরামূল, ছাতিমছাল,
শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমছাল, গুলঞ্চ,
হাকুচবীজ, সোমরাজবীজ, চাকুন্দাবীজ, ধনিয়া, ভীমরাজ,
যষ্টিমধু, বন গুল, কটকী, শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল,
পদ্মকাঠ, গাঠিওলা, অঙ্কুর, কুড়, কপূর, কটুকল, জটমাংসী,
মুরমাংসী, এলাইচ, বাকসছাল, বেগারমূল প্রত্যেক দুই
তোলা। ইহাতে কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ চর্মরোগ ভাল হয়।

কন্দর্পসিদ্ধান্ত। পদ্মব্যাকরণের টীকাকার।

কন্দল (ত্রি) কন্দি-অলচ্। ১ কলধনি। ২ উপরাগ। ৩ গণ্ড-
দেশ। ৪ কপাল। ৫ নবান্নর। ৬ অগবান। ৭ কদলীবিশেষ,
ভূমিকদলী। (পুং) ৮ বর্ণ। ৯ বাগ্‌বৃদ্ধ, ঝগড়া। ১০ লম্বু।
কন্দলতা (স্ত্রী) কন্দ প্রধানা লতা, মধ্যলোং। মালকন্দ।
কন্দলিত (ত্রি) কন্দলো হস্ত সংজাতঃ, কন্দল-ইতচ্
(ভদ্র সংজাতঃ তারকানিত্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।)
কন্দলযুক্ত।

কন্দলী [ন্] (ত্রি) কন্দলো হস্তাত, কন্দল-ইনি। কন্দলযুক্ত।

কন্দলী (স্ত্রী) কন্দল-ভীষ্। ১ মৃগবিশেষ। ২ পক্ষীবিশেষ।

৩ গুণবিশেষ। (“আবিভূতপ্রথমমুকুলা কন্দলীচাত্তকচ্ছম্।”

মেঘদূত।)

৪ কন্দলী। ৫ পতাকা। ৬ পদ্মবীজ। ৭ ওর্কুসুনির কন্দা-বিশেষ; ইনি হুর্সানার শাপে ভস্মীভূত হইয়া কন্দলী বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কন্দলীকুসুম (স্ত্রী) কন্দল্যা ইব কুসুমং যন্ত। ১ শিলীকু। ২ ভূমিকন্দলীর ফুল।

কন্দবর্জিন (পুং) কন্দেন বর্জিতে, কন্দ-বৃধ-ল্য। শূরগ, ওল।

[ওল দেখ।]

কন্দবল্লী (স্ত্রী) কন্দাকাংরা বল্লী, মধ্যলো°। বক্ষ্যাকর্কোটকী।

কন্দশাক (স্ত্রী) কন্দপ্রধানং শাকং। আলু, ওল, মূলো, গাজর, মান, কচু, ভূমিকুয়াণ্ড, কন্দলীকন্দ, হস্তিকর্ণা, কেমুক, কেমুর, শালুক প্রভৃতি কন্দ আয়ুর্সেদে কন্দশাক বলিয়া কথিত। [প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেকের গুণাদি দেখ।]

(“সর্সেবাং কন্দশাকানাং শূরগঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।” ভাব° প্র।)

কন্দশূরগ (পুং) কন্দ এব শূরগঃ। ওল। [ওল দেখ।]

কন্দসংজ্ঞত (স্ত্রী) কন্দঃ সংজ্ঞা যন্ত। ঘোনিরোগবিশেষ।

(কন্দসংজ্ঞত বোতর্শসি মতং বৃধৈঃ। শব্দারি।)

[কন্দ দেখ।]

কন্দসার (স্ত্রী) কন্দানাং সারো যন্ত, বহুব্রী। ১ চন্দনবন।

২ (কন্দঃ সারো হন্ত) ওল প্রভৃতি কন্দসমূহ।

কন্দাত্য (পুং) কন্দেন আত্যাঃ। ভূমি-কুয়াণ্ড।

কন্দামৃত (স্ত্রী) কন্দ প্রধানা অমৃত, মধ্যলো°। গুড়চী-বিশেষ।

কন্দালু (পুং) কন্দময় আলুঃ, মধ্যলো°। ১ কানালু। ২ ভূমি-কুয়াণ্ড। ৩ ত্রিপিপ্টি।

কন্দারা। কণাটব্রাজ্ঞের শ্রেণীবিশেষ। [কণাটব্রাজ্ঞ দেখ।]

কন্দারী (স্ত্রী) কন্দ-ইরচ্-ভীষ্। লজ্জালু বৃক্ষ।

[লজ্জালু দেখ।]

কন্দী [ন্] (পুং) কন্দো হন্তাত্ত, কন্দ-ইনি। শূরগ, ওল।

কন্দী (স্ত্রী) কন্দো হন্তাত্তি, কন্দ-অচ্। মাংসকন্দী।

কন্দু (পুং, স্ত্রী) কন্দ-উ-সলোপচ্ (কন্দোঃসলোপচ্। উণ° ১।

১৫।) ১ বেদনপাত্র, তাণ্ডরা। ইহার অপর সংস্কৃত নাম

বেদনী। ২ লৌহ নির্মিত পাকপাত্র। ৩ ভর্জনপাত্র, ভাজনাখোলা প্রভৃতি।

কন্দুক (পুং) কং যুৎ দদাতি, দা-ডু-সংজ্ঞারং কন্।

১ গেণুক, খেলিবার গোলা। ২ ভাঁটা। ৩ জরোদশাকর

* সংস্কৃত হন্দোবিশেষ

কন্দুকপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষের নাম।

কন্দুকেশ (পুং) রাজবিশেষ।

কন্দুকেশ্বর (পুং) কাশীধামের শিবলিঙ্গবিশেষ। কাশীখণ্ডে ইহার উৎপত্তি কথা এইরূপ লিখিত আছে,—কোন সময়ে পার্শ্বতী কোতুকবশে কন্দুকজীড়া করিতেছিলেন, জীড়া-প্রসে তাঁহার কেশপাশ শিথিল ও নরনরময় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তরীক্ষ হইতে দৈত্যদেব তাঁহার এইরূপ ভাবাদি দেখিয়া, তাঁহাকে হয়গ করিবার জন্ত শাখরীমায়া অবলম্বনপূর্বক অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিল। দেবগণ দৈত্যদেবের বিনাশ সাধন জন্ত ভগবতীকে জৈজিত করিলেন। ভগবতীও জৈজিতমাত্র হস্তহিত কন্দুক নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। পরে ঐ কন্দুক ভূমিতে পতিত হইয়া লিঙ্গরূপে পরিণত হইল। (কাশীখণ্ড।)

কন্দুপক (স্ত্রী) কন্দো পকম্। কড়া, তাণ্ডরা প্রভৃতি পাত্রে ঘৃত ও তৈলের দ্বারা অথবা কাটখোলায় যে সকল দ্রব্য পাক করা হয়; ভাজা দ্রব্য।

(“কন্দুপকানি তৈলেন পায়সং দধি শক্তবঃ।

দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূরগেহকৃতাত্মপি॥” কুর্মপুরণ।)

কন্দুশালা (স্ত্রী) কন্দুপাকার্থঃ শালা, মধ্যলো°। যে গৃহে দ্রব্যাদি ভাজা হয়।

(“গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেদ্ব্যুদয়ঃ।

অমীমান্তানি শৌচানি ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥” স্মৃতি।)

কন্দুক (পুং) কন্দুক। [কন্দুক দেখ।]

কন্দুরোদয়। একজন প্রসিদ্ধ চোল রাজা, ইহার বংশে কজ-দেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

কন্দোটি (পুং) কদি-ওটন্। ১ যেতোৎপল। (পুং, স্ত্রী)

২ নীলোৎপল। (কন্দোটিস্ত ওরুনীলোৎপলয়োঃ শব্দারি।)

কন্দোত (পুং) কন্দে মূলে উতঃ, কন্দ-বেজ্-ক্ত। কুসুম, হেলাফুল।

কন্দোদভবা (স্ত্রী) কন্দাশ্রুতবোহভাঃ, বহুব্রী। গুড়চীবিশেষ।

কন্দৌ (দেশজ, কন্দাশব্দজ) বৃক্ষবিশেষ, জঙ্গলি পিয়ারাজ। (Scilla Indica)

কন্ধু (পুং) কং অলং দধাতি ধারয়তি কং-ধা-ক। ১ মেঘ। ২ মুণাবিশেষ।

কন্ধুজাতি। উড়িয়াবাগী অসভ্য জাতিবিশেষ। ইংরাজ-গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে নানাবিধ আখ্যা দিয়াছেন, কেহ ধন্দ, কেহ খোন্দ, কেহ খণ্ড, কেহ খোণ্ড, কেহ বা কন্দ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের শ্রেণীপরিচায়ক নাম কি, তাহা নিশ্চয় করণ একই বিচার-সাপেক্ষ।

উড়িয়ার ইহাদিগকে “কঙ্ক” বলে; “কঙ্ক” শব্দের অর্থ পাহাড়িয়া। অনেকে মনে করেন, তামিল ভাষার “কন্স” শব্দে পর্ততকে বুঝায়, হুতরাং সেই “কন্স” শব্দ হইতে “কঙ্ক” শব্দের উৎপত্তি। আবার কেহ বা বলেন, তামিল ভাষার “কঙ্ক” শব্দের অর্থ তীর; এই জাতি যুগ্মাদিতে তীর-ধরু ক ব্যবহার করে বলিয়া অনেকে ইহাদিগকে “কঙ্ক” হইতে “কঙ্ক” আখ্যা দেন। কেহ বলেন যে, দশপল্লা, বোদ ও গুমসর প্রদেশের মধ্যে একটি স্থানকে কিলারামপুরের কঙ্কেরা “কঙ্ক” বলে। এই কঙ্কনামক স্থানের নাম হইতেই ইহাদের “কঙ্ক” নাম হইয়াছে।

কিলারামপুরের প্রাচীন নামও “কঙ্কদণ্ডপং”। যিনি যাহাই বলুন, কঙ্কেরা নিজে আপনাদিগকে কঙ্ক বলিয়া পরিচয় দেয় না। ইহারা বলে, আমরা “কুী” জাতি। স্বজাতির মধ্যে একজনকে জাতি ধরিয়া পরিচয় দিতে গেলে, ইহারা “কিল্লা” বা “কুইল্লা” বলে। ডালটন বা হাণ্টারের পথায়-সরণ করিয়া ইহাদিগকে “কঙ্ক” বলা উচিত হয় না, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রাদির প্রমাণ দেখিয়া স্থির করা যায় যে, বাস্তবিকই ইহাদের নাম কঙ্ক। পুরাণাদিতে কেশকঙ্কর * নামে একটি অসভ্যজাতির পরিচয় পাওয়া যায়; বোধহয় প্রাচীন উড়িয়ারা এই কেশকঙ্কর শব্দ হইতেই “কঙ্ক” শব্দটি মাত্র রাখিয়াছে। পুরাণাদির প্রমাণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল;—

“ব্রহ্মোত্তরা প্রাবিজয়া মল্লকেশকঙ্করাঃ।”

উড়িয়ার পার্বত্যপ্রদেশ ইহাদের প্রধান বাসস্থান। এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যার দক্ষিণাংশে মহানদীর উত্তরতীরে প্রায় ৩৪০০ বর্গমাইল ভূমিতে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে চিলকা হ্রদ ও পশ্চিমে বোরার প্রদেশ পর্যন্ত ভূখণ্ডে সম্ভলপুরের খান্দোরা বা কালাহণ্ডি প্রদেশে, এবং বাস্তার জেলায়ও ইহাদের বসবাস আছে।

ইহাদের দেশের মধ্যে যে, কেবল কঙ্কজাতির লোকেরাই বাস করে তাহা নহে; শবর, কোল, ডোম, বা ডোমনা, পান বা পানওয়া ও অন্যান্য অসভ্য জাতিও আছে। ইহারা কঙ্কের চক্ষে নিতান্ত ঘৃণ্য এবং তাহাদের অপেক্ষা নীচশ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য। এই সকল জাতির সহিত কঙ্কেরা বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখে না, ইহারা অতি সামান্য হস্ত-শিল্পের উপর জীবনধারণ করে ও নিজ প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে কঙ্কের নিকট শস্তাদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

কঙ্কেরা আজকাল হিন্দুজাতির নিরশ্রেণীতে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে ইহারা কোথার ছিল, এ সম্বন্ধে অল্পসন্ধান

করিলে, ইহাদের মধ্যে একদল বলে যে, তাহারা পূর্বে মধ্য-ভারতে বাস করিত, ক্রমশঃ ভাঙিত হইয়া পূর্বদিকে উড়িষ্যা পর্যন্ত সরিয়া আসিয়াছে; আর একদল বলে যে, তাহারা পূর্বে উড়িষ্যার দক্ষিণাংশেই বাস করিত, ক্রমশঃ ভাঙিত হইয়া পশ্চিমে বোরার প্রদেশ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দুইটি মত্বা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, যখন উড়িষ্যার ও মধ্যভারতে আৰ্য্যজাতির প্রভুত বিস্তৃত হয়, তখন এই জাতি ভাঙিত হইয়া মধ্যপ্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। বাহা হউক প্রায় ৪ পুরুষ অতীত হইল বোদপ্রদেশকেই ইহারা আপনাদের প্রধান বাসস্থান বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছে। বোদপ্রদেশ এক্ষণে একজন হিন্দুরাজার অধীন, এই রাজ্য মহানদীর উত্তরতীরে প্রায় ৩৫ মাইল বিস্তৃত। এখানকার রাজা মহানদীতে কুং আদায় করিয়া থাকেন। এই প্রদেশের নিকটবর্তী পার্বত্য-প্রদেশে কঙ্কেরা বাস করে। ইহাদের গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্তত-শিখরে বা ঘন-ঘন পরস্পর পৃথক্। গ্রামগুলি পৃথক্ বলিয়া প্রত্যেকের শাসনকার্য্য বেশ শৃঙ্খলা মত হইয়া থাকে। অন্যান্য অসভ্যজাতির ভায় ইহারাও দুই চারিখানি গ্রাম লইয়া এক একটি বিভাগ নির্দিষ্ট করিয়া, তাহার একজন নায়ক ঠিক করিয়া থাকে। ইহারা বলে, এইরূপ নিয়মে তাহারা এককালে সমস্ত বোদরাজ্য শাসন করিত।

৬০ বৎসর পূর্বে ইংরাজেরা কঙ্কজাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই, কেবল মাত্র জানা ছিল যে, সমুদ্রোপকূলের বোদ ও গুমসর নামক হিন্দুরাজ্য দুইটির পশ্চিমে এই অসভ্য জাতির বাস। গোদাবরী ও মহানদী এই দুই নদীর মধ্যবর্তী প্রায় ৩০০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০ হইতে ১০০ মাইল প্রস্থ ভূভাগে শবর ও কঙ্কেরা বাস করিয়া থাকে; এ দেশ বন ও পর্ততময় বলিয়া দুর্গম। বিদেশীয় পক্ষে এ দেশ কেবল মাস করেকের জন্য বাসোপযোগী। ১৮৩৫ সালে গুমসর-রাজ বাকি-রাজত্বের দ্বারে বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হইলে এই কঙ্ক জাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনার ইংরাজেরা কঙ্কদিগের সহিত পরিচিত হন এবং লোকজন রাখিয়া ইহাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্মকর্ম, ও দেশাদির বিবরণ অবগত হন।

কঙ্কজাতির আবাসভূমির মধ্যস্থ মালভূমিতে যে সকল কঙ্কেরা বাস করে, তাহারা অবিকারিত একস্থলে থাকে না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশের নানাস্থানে বেড়াইয়া থাকে। ইহারা গবর্ণমেন্টকে কিছুমাত্র কর দেয় না বা তাহাদের কোন কর-চারীর সহিত কোনরূপ সংগ্রহ রাখে না। অনেকস্থলে কিন্তু

ইহাদের মধ্যে অর্দ্ধ-কর্তা-প্রধান শাসনপ্রণালী ও অর্দ্ধ-সামন্ত-প্রধান শাসনপ্রণালী-মিশ্রিত একপ্রকার শাসনপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কঙ্করা আপনাদের জাতীয় ভাবের প্রতি একান্ত অমুরাগী।

হিন্দুরাজগণকর্তৃক দূরীভূত হইয়া কঙ্করা ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাহারা সর্কাপেঙ্কা দ্বর্কল, তাহারা হিন্দুরাজের অধীনে অতি নীচশ্রেণীর লোক হইয়া বাস করিতেছে। ইহাদের নিজের জমী নাই, অপরের নিকট রোক-হিসাবে মজুরী করিয়া, বনজঙ্গল কাটিয়া, বা কাঠ কাটিয়া জীবন ধারণ করে। আর এক শ্রেণীর কঙ্ক হিন্দুদের নিকট যুদ্ধকালে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিবে বলিয়া জায়গীর ভোগ করে। ইহারা উড়িষ্যার মুসলমানআক্রমণের সময় স্ব স্ব রাজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিত। আর একদল কঙ্ক পরাজিত হইয়াও স্বাধীনভাবে মিত্র-সামন্তের মত বাস করে। ইহারাও যুদ্ধকালে স্ব স্ব মিত্র-রাজাকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু তত্ত্বজন্য কোনরূপ জায়গীর বা বেতন গ্রহণ করে না। ১ম শ্রেণীর কঙ্করা ভেটিয়া কঙ্ক নামে খ্যাত; ইহারা পূর্বঘাট পর্বতের নিম্নে বনভূমিতে বাস করে। ২য় শ্রেণীর কঙ্করা “বেনিয়া” কঙ্ক নামে খ্যাত, ইহারা পর্বতের উপরে থাকে; আর ৩য় শ্রেণীর কঙ্কর কোন স্বতন্ত্র নাম নাই। এতদ্ভিন্ন ইহাদের বাসস্থান ভেদে ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। বাহারা পর্বতের উপরে বাস করে, তাহারা “নালিয়া কোইলা” নামে খ্যাত, বাহারা সমতল ভূমিতে থাকে, তাহারা “সাসিকোইলা” নামে অভিহিত এবং বাহারা মহানদী নদীর দক্ষিণে বাস করে তাহারা শুদ্ধ “কোইলা” নামে খ্যাত। তৈলঙ্গীরা কঙ্কজাতীকে “কছুলু” বা কছুহুলু বলে—ইহার অর্থ গাহাড়িয়া লোক।

কঙ্কর শাসনপ্রণালী।—কঙ্করা এক্ষণে ইংরাজের অধীন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের শাসনাধীন নহে। বর্ধার্ততঃ শাসন-প্রণালী কঙ্করা আপনাদের হস্তে রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বেশ একটি শৃঙ্খলা আছে। ইহাদের মধ্যে বংশগত জাতিবিভাগ আছে। প্রত্যেক বংশের মধ্যে আবার শাখাভেদ আছে। প্রত্যেক শাখার আবার এক একটি গৃহস্থ ধরিয়া এক একটি ভাগ করিত হয়। কতকগুলি গৃহস্থ লইয়া একটি গ্রাম হয়। প্রত্যেক গ্রামে প্রায় এক বংশের লোকই থাকে। এই বংশের প্রত্যেক শাখার আবার একজন অধ্যক্ষ আছে, এই অধ্যক্ষগণের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ-বংশনস্কৃত সেই ব্যক্তিকে প্রাচ্যে “মণ্ডল” বলিয়া গণিত হয়। এই

এই মণ্ডলকে বোদরাজ্যে “বোড়”; চিরাংকেনেডে প্রদেশে “মাজী” ও গুমসর রাজ্যে “মুলিকো” বলে। কতকগুলি গ্রাম ধরিয়া আবার এক একজন “নারক” থাকে। এইরূপ কতক-গুলি নারকের উপর এক একজন সর্দার থাকে ও কয়েকজন সর্দারের উপর একজন রাজার ন্যায় লোক থাকে, ইহাকে “বিশাই” বলে।

ইহাদের সমাজবন্ধন।—প্রত্যেক গৃহস্থের মধ্যে যিনি প্রাচীন বা জ্যেষ্ঠ তিনিই কর্তা। পুত্রপৌত্রাদি সকলেই তাঁহার অধীন। সকলেই একান্তবর্ধি থাকে, পিতামহী বা মাতা সকলের জন্য অন্নপাক করে। এই সকল পুত্র-পৌত্রাদি পিতা বা পিতামহের জীবদ্দশায় বাহা কিছু উপার্জন করে, তাহাতে পিতা বা পিতামহেরই অধিকার জন্মে। কতকগুলি এইরূপ একবংশোদ্ভূত গৃহস্থ লইয়া এক একটি শাখা হয়। এই গৃহস্থগণের কর্তাদের মধ্য হইতে একজন এক একটা শাখার অধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হন। এইরূপ কতকগুলি অধ্যক্ষের মধ্য হইতেই এক একজন মণ্ডল নির্বাচিত হন ও কতকগুলি মণ্ডলের মধ্যে এক একজন নারক নিযুক্ত হন, কতকগুলি নারকের উপর একজন সর্দার নির্বাচিত হন, আর এইরূপ কয়েকজন সর্দারের উপরেই বিশাই নির্বাচিত হন। এই সকল পদগুলি বংশা-ক্রমিক ধারাবাহিকরূপে নির্দিষ্ট থাকে বটে, কিন্তু যদি কেহ তত্ত্বগণদের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাদ দেওয়া হয়। বংশের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠপুত্র তিনিই সামান্যতঃ ঐ সকল পদের অধিকারী, কিন্তু যদি তাঁহার উপযুক্ত গুণ না থাকে, তবে তাঁহার খুড়া বা ভ্রাতৃপুত্র সেই পদ পাইয়া থাকেন। এইরূপ নির্বাচনের সময়ে সকলের মতামতই যে লইতে হয় তাহা নহে, কার্য-গতিকে সকলেই আপনা হইতে অকর্মণ্য লোককে এই জন্য উপেক্ষা করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির অধীন হইয়া চলিতে থাকে।

ইহাদিগের সমাজবন্ধন এত স্নন্দর ও দৃঢ় যে অধিকাংশ সভ্যজাতিতে সে দৃঢ়তা দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে যেমন গুণের আদর আছে, সন্মান আছে, তেমন কিন্তু সভ্যতা-ভিমাত্রী অনেকানেক জাতিতে নাই। কঙ্কজাতির পুরুষের প্রধান ব্যক্তিরাই তাহাদের স্ব স্ব অধীনস্থ লোকদিগের বংশের কর্তা, মাজিষ্ট্রেট ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন। বংশের প্রথা ও নির্বাচন প্রথাও উদ্ভেদ একত্র মিলিত হইয়া এই সকল প্রধান পদবীর লোকগুলিকে ধার্মিক করিয়া তুলে। ইহারা এই সকল প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যে সকল ক্ষুদ্র কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহার

জন্য কেহ কোনরূপ বেতন বা কোনরূপ বিশেষ সুবিধা পান না, পাইবার মধ্যে কেবল বিচারকের, পুরোহিতের, শাসকের ও পিতৃজেনোচিত সম্মানটুকু পাইরা থাকেন। প্রত্যেক গৃহস্থের সংসারে যিনি কর্তা তিনিই প্রধান, বাকি সকলে সমপদবীর লোক বলিয়া পরিগণিত হইরা থাকে। নায়ক বা সর্দার-গণেরও ঐরূপ। ইহাদের সম্মানহুচক আড়ম্বর কিছুই থাকে না, অন্যান্য লোকের ন্যায় ইহারাও সামান্যভাবে কাল-যাপন করে, ইহাদের নিজের স্বতন্ত্র বাসস্থান বা দুর্গ নাই, বলোবস্ত করা সৈন্য নাই, পৈতৃকজমী ব্যতীত স্বতন্ত্র বিঘরাদি নাই, আর সেইটুকুর চাষে নিজের এবং নিজ পুত্রপৌত্রাদির পরিশ্রমে যাঁহা উৎপন্ন হয়, তথ্যাত আয় কোনরূপ আরও নাই। ইহাদের কেহ সাহায্য করে না বা কোনরূপ খাজানা দেয় না। কোন উৎসব বা ক্রিয়াকাণ্ডের সময়েই ইহারা পদোচ্চিৎ সম্মানাদি লাভ করে, আর সেই টুকুতেই ইহারা পরম পরিভূষ্ট হইরা থাকে। প্রতিগ্রামে “ডিগালু” নামে একজন লোক নির্ধারিত হয়। সর্দারগণের সমক্ষে ইহারাই স্ব স্ব গ্রামের বা জাতির অভাব বা অভিযোগ উপস্থিত করে। ইহারাই গ্রামের লোকের মুখ-পাত্র।

এক একটা জাতির সর্দার এবং বিশাইরা, একান্ত আব-শ্যক না পড়িলে, কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। কোন কার্যে ইহারা নিজের মনোমত কার্য্য করিতে পারে না। নিজ অধীনস্থ নায়কগণের ও মণ্ডলগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্যাবধারণ করিতে হয়। এই সকল সর্দার বা বিশাইকে নিজ অধীনস্থ জাতির সহিত অপরাপর জাতির সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়; যুদ্ধাদিবিষয়েও কর্তব্য স্থির করিয়া দিতে হয়; কোন হিন্দু রাজাকে সাহায্য করা সম্বন্ধেও মীমাংসা করিতে হয়; নিজ জাতির মধ্যে সকল বিষয়ের রীতি, নীতি ও আচারব্যবহারের শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়; কেহ কোন দুর্কর্ম করিলে, তাহার বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিতে হয়; পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাধিলে, তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে হয়।

এই সকল বিচার বা মীমাংসাকার্য্য নির্বাহের জন্য তাহার অধীনস্থ সমস্ত অধ্যক্ষ এবং নায়কগণকে একত্রিত করিয়া সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকে। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া এই সকল পরামর্শদাতার সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া থাকে। যিনি জাতির সর্দার, তিনিই তাঁহার নিজ সংসারের সামান্য কর্তৃত্ব, নিজ গ্রামের মণ্ডলের কার্য্য ও নিজ শাখার অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন।

গ্রামের মণ্ডলই হউন, শাখার অধ্যক্ষই হউন বা জাতির

সর্দারই হউন, সকলেই নিজ নিজ অধীনস্থ লোকের মধ্যে গৃহধর্ম ও বাহ্যধর্ম রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইরা থাকেন। কল্পগণের বিশ্বাস যে, যে সকল জাতির সহিত প্রকান্তরূপে কোনরূপ সন্ধি নির্ধারিত নাই, তাহাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ চলিতে পারে। এমন কি, একজন বিশাই বা বৌড়োর অধীনস্থ ভিন্ন জাতির মধ্যেও যদি সন্ধি না থাকে, তাহা হইলে, ভিন্ন ভিন্ন সর্দারেরা পরস্পরে যুদ্ধ করিতে পারে; হুতরাং দেখিতে গেলে, ইহাদের মধ্যে যদি পরস্পর প্রকান্ত সন্ধি না থাকে, তবে সকলেই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইরা সমস্ত বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারে, কিন্তু সর্দারগণের বা অধ্যক্ষগণের নিজ নিজ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্বদা এরূপ হইতে পার না।

শান্তিরক্ষার জন্য কল্পদিগের যে সকল নিয়মবিধি আছে, তাহা অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায় নহে। কেহ খুন হইলে, অন্য জাতিতে যেমন হত-ব্যক্তির আত্মীয়েরা খুনের পরিবর্তে খুন লইতে বাধ্য হয়, ইহাদের মধ্যে সে প্রথা ততটা দৃঢ় নয়। খুন হইলে, ইহারা অর্থ লইয়াও বিবাদ মিটাইরা থাকে। সাংঘাতিক আঘাতাদি করিলে, ইহারা অপরাধীর বিষয় হইতে আহতকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ দিয়া থাকে এবং সে যতদিন আরোগ্যলাভ না করে, ততদিন অপরাধীর ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে ব্যতিচার দোষে কোনরূপ ক্ষতিপূরণের প্রথা নাই। জী ব্যতিচারিণী হইলে এবং স্বামী তাহা ধরিতে পারিলে তাহার উপপতিকে হত্যা করিতে বাধ্য। ব্যতিচারিণী জী স্বামীগৃহে স্থান পায় না, অবস্থা প্রকাশ হইরা পড়িলে, তৎক্ষণাৎ তাহার পিতৃগৃহে প্রেরিত হয়। বিষয়াদিগত অপরাধে অপরাধীর নিকট হইতে দ্রুত বা নষ্টবস্তুর উদ্ধার করিয়া দিলেই সব গোল মিটরা যায়। অপস্কৃতবস্ত্র অপ-হারকের নিকট হইতে লইরা অধিকারীকে দিলে, অপরাধীর উপর আর তাহার কোন দাবি থাকে না। ইহাতে চৌর্য্যের প্রভ্রয় হয় বটে, কিন্তু প্রথম অপরাধেই এরূপ উপেক্ষা দেখা গিয়া থাকে। দ্বিতীয়বার এইরূপ অপরাধ ঘটিলে, ইহারা আর তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অত্যাচারী বা সামান্ত চোর বলিয়া ধরে না, তাহাকে সমস্ত সমাজের প্রতি অত্যাচারী বলিয়া বিবেচনা করে এবং তাহাকে স্বজাতি হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে, কল্পজাতির মধ্যে বিষয়গত অপরাধ দুই প্রকার,—(১) কৃষিজাত সামগ্রী অপহরণ ও (২) অন্যান্যপূর্বক পরে ক্রয় অধিকার। শতাপহরণ করিলে অপরাধীকে শত কিরাইরা দিতে হয়, আর

যে সকল স্থলে কিরীয়া দিবার উপায় না থাকে, সে সকল স্থলে অপরাধীর পত্ৰপূর্ণ-ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্তকে দেওয়া হয়। বতদিন তাহার ক্ষতিপূর্ণ না হয়, ততদিন সে সেই ক্ষেত্রের উৎপন্ন কসল ভোগ করিতে থাকে। অপরাধীর ক্ষেত্র অধিকার করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত কল্পেরা যে, তাহাদিগকে সপরিবারে অনাহারে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দেয়, তাহা দেয় না। বাহাতে তাহার সপরিবারে অন্নকষ্ট উপস্থিত না হয়, এরূপ ভাবে বার্ষিক কসল ভাগ করিয়া লয়। কোন কোন স্থলে অন্ডায়-রূপে ক্ষেত্র অধিকার করিয়া রাখিলে, তাহার কোনরূপ ক্ষতি হয় না, কেবল তাহার নিকট হইতে ক্ষেত্র কাড়িয়া লইয়া বখাৰ্ণ অধিকারীকে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকারের প্রাচীনত্ব দেখিয়া জমীর স্বত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। খাজানা দিয়া পরের জমী ভোগ করিবার প্রথা ইহাদের মধ্যে নাই। প্রত্যেক গৃহস্থেরই নিজের জমী আছে, সে জমীর জন্ত কেহ স্বতন্ত্র জমীদার নাই। যে জাতি যে জমী অধিক দিন চাষ করিতেছে, সে জমীতে তাহাদের স্বত্ব স্থির থাকে। এই জমীতে সেই এক জাতিভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে, যে যতটা জমী লইয়া যত অধিক দিন চাষ করিয়া থাকে, সে ততটায় অধিকারী বলিয়া নির্ণীত হয়।

ইহাদের কৃষিপ্রণালী অনেকটা ভ্রমশীল অসত্যজাতির ন্যায়। ইহারা যখন দেখে যে, কোন স্থানের জমীতে আর বড় উর্বরশক্তি নাই, তখন সেই জমী পরিত্যাগ করে এবং প্রতি চৌদ্দ বৎসরে তাহারা স্ব স্ব গ্রাম পর্য্যন্ত পরিবর্তন করিয়া থাকে। এইরূপে কল্পপ্রদেশে পতিত জমীর পরিমাণ বড়ই বাড়িয়া যায়। কোন স্থানে যদি লোক-সংখ্যা বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে তাহারা পার্শ্ববর্তী পতিত জমী আগনাদিগের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া ভোগদখল করিতে থাকে। জমী বা গ্রাম একবার পরিত্যাগ করিলে, আর তাহাতে পূর্বাধিকারীর স্বত্ব থাকে না, বাহারা নূতন অধিকার করে তাহাদেরই মধ্যে আবার অধিকারের প্রাচীনত্ব ধরিয়া স্বত্ব নিরূপিত হয়। এক জাতির অধিকৃত প্রদেশের মধ্যে যে সকল পতিত জমী থাকে, তাহাতে অপর জাতি আসিয়া অধিকার করিতে পায় না; যে জাতির অধিকৃত প্রদেশে জমী আছে, তাহাদেরই মধ্যে প্রয়োজনানুসারে ঐ সকল পতিত জমী বিভক্ত হইয়া থাকে। জমীর স্বত্ব যেমন সহজেই উৎপন্ন হয়, তেমনি বিক্রয় প্রথাও আবার সতি সুরল। যে জমী বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, সে হয় অধ্যক্ষকে না হয় স্বজাতির সর্দারকে নিজ জাতিগ্রাম জানায়। এইরূপ জানাইবার উদ্দেশ্য—তাঁহার অন্নমতি গ্রহণার্থ নহে;

সে জমী জমী বিক্রয় করিতেছে, ইহাই সাধারণে প্রচার করা আবশ্যক বলিয়া জানাইয়া থাকে। এইরূপ জানাইয়া সে খরিদারকে লইয়া, যে জমী বিক্রয় করিবে, সেই জমীতে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেইখানে গ্রামের ঠাণ্ড জন গৃহস্থ কৃষককে ডাকিয়া ক্ষেত্র হইতে এক মুঠা মাটি উঠাইয়া খরিদারের হস্তে প্রদান করে, খরিদারও এই সময় মূল্য প্রদান করিয়া থাকে। মূল্য লইয়া বিক্রয়কর্তা গ্রাম্য-দেবতাতে সাক্ষী মানিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলে যে, “এই জমীতে চিরকালের মত আমি স্বত্বচ্যুত হইলাম।”

জমী লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ গ্রামের মণ্ডলেরা মিটাইয়া দিয়া থাকে। ইহারা উত্তরপক্ষের আরজী-জবাব শুনিয়া, সাক্ষীর সাক্ষ্য লইয়া বিচার করিয়া থাকে। সহজে মীমাংসা না হইলে ইহারা কতকগুলি পরীক্ষা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা ব্যাক্তচৰ্ম্মস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া থাকে, এইরূপে শপথ করিলে, মিথ্যাবাদীর ব্যাক্তমুখে মৃত্যু নিশ্চিত ঘটয়া থাকে। যদি কখন কোন কল্প ব্যাক্তমুখে নিহত হয়, কল্পেরা অমনই তাহাকে মিথ্যাবাদী জুয়াচোর স্থির করিয়া, তাহার পরিণাম দেখিয়া সম্ভাব্য প্রকাশ করে ও তাহার পরিবারবর্গকে জাতিচ্যুত করিয়া থাকে। গ্রাম্য পুরোহিত (ডোমনা) কিন্তু দয়া করিয়া ইহাদিগের বধাসক্লষ কাড়িয়া লইয়া, আবার জাতিতে উঠাইয়া লইতে পারেন। কখন কখন গিরগিটির চৰ্ম্ম স্পর্শ করিয়াও শপথ করিয়া থাকে, এ শপথে মিথ্যা বলিলে, মিথ্যাবাদীর গায়ে কুঠের ভ্রাম একপ্রকার চৰ্ম্মরোগ জন্মে। এতদ্বির কল্পেরা বিশ্বাস করে যে, যদি বিচারক পৃথিবী দেবীর উদ্দেশ্যে মেঘ বলি দিয়া তাহার রক্তে ধাক্কা ভিজাইয়া বিচারকালে ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে সেই স্থলেই যে বখাৰ্ণ অপরাধী সে ঘুরিয়া পড়িয়া মরিয়া যার, অথবা যদি বিবাদী-ভূমির মাটি লইয়া বিচারকেরা স্বহস্তে কর্দমের তাল প্রস্তুত করেন, তাহা হইলেও সেই ফল হয়। এই দুইটি ব্যবহারের প্রতি কল্পদিগের এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহার আরোজন দেখিলেই, যে বখাৰ্ণ অপরাধী সে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে।

ইহাদের উত্তরাধিকারিত্বের নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি স্বয়ং কৃষিকার্য বা জমী রক্ষা করিতে না পারে, সে পৈতৃক জমীর অধিকার পায় না। কাহার মৃত্যু হইলে পুরুষেরাই বিষয়-ধিকারী হইয়া থাকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রই বেশী অংশ ভাগ পাইয়া থাকে; কোন কোন জাতিতে সকলে সমান ভাগেই লইয়া থাকে। পুত্র সন্তান না থাকিলে মৃতব্যক্তির ভ্রাতারা বিষয়ধিকারী হইয়া থাকে। কন্ডার গহনাদি, অস্থাবর সম্পত্তি ও বাটার আসবাব সমান অংশে বিভাগ করিয়া

লইয়া থাকে। যদি কাহারও মৃত্যুকালে তাহার কল্পা
অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে বহুদিন না তাহার বিবাহ হয়,
ততদিন সে শিত্তগৃহেই থাকে এবং খাইতে পরিতে পার ও
বিবাহের সময় বিবাহের খরচ পাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে সন্মম রক্ষার্থ বৈশী 'আদব কারদা' নাই।
। নিরশ্রমের লোক উচ্চশ্রেণীকে দেখিলেই যে কোনরূপ সন্মান
প্রদর্শন করিবে, তাহার বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে
পথে চলিবার সময় অশ্রমের মধ্যে বয়োবৃদ্ধকে দেখিলে শুদ্ধ
বলে—“আমি চলিরাছি”—বয়োজ্যেষ্ঠ প্রভৃত্যন্বয়ে বলে “বাও।”
প্রণাম করিবার সময় ইহারা উর্জ্বাহার ভার দক্ষিণ হস্ত
উঠাইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ইহারা হিন্দুগণের রীতিনীতিও
অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্বপুরুষের প্রতি ইহারা বিশেষ
সন্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ইহাদের তুল্য কষ্ট-সহিষ্ণু জাতি আর নাই। ছুড়িকে বা
গৃহবিবাদে যদিও ইহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, তবুও কোন
সাধারণ বিপদ উপস্থিত হইলে প্রত্যেকেই নবোৎসাহে
তাহার বিপক্ষে একত্র হইয়া দাঁড়ায়। যখন ইংরাজদিগের
সহিত ইহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন প্রত্যেক সর্দারেরা বৈরুপ
অপূর্ব সাহসের পরিচয় দিয়াছিল ও বৈরুপ দৃঢ়তার সহিত
অশেষ কষ্ট সহিয়া জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল,
তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এই তিন কর্ম্মে কল্পদিগের যথেষ্ট
উৎসবাদি হইয়া থাকে। আসন্ন-প্রসবা কামিনীরা গ্রামের
দেবতার নিকট পূজাদি দিয়া থাকে। যদি কাহারও প্রসব
হইতে বিলম্ব হইতে থাকে বা ক্লেশ হইতে থাকে, তাহা
হইলে পুরোহিত আসিয়া যেখানে ছইটা ঝরণার জল এক
হইয়াছে, সেইখানে তাহাকে লইয়া গিয়া জলের ছিটা দিতে
থাকে এবং জনন-দেবতার (বজী দেবী ?) পূজা দেয়।

নামকরণের জন্য ইহাদের বড়ই উৎসেগ দেখা যায়।
কঙ্কেরা যে সে নাম রাখে না। পুরোহিত একটা পায়ে জল
রাখিয়া শিশুর বংশের আদিপুরুষ হইতে প্রত্যেকের নাম
করিয়া এক একটা ধাত্ব সেই জলে ফেলিতে থাকে। সব
ধাত্বগুলিই ডুবিয়া যাইতে থাকে; কেবল বাহার নামের
ধাত্ব ফেলিবামাত্র ভাসিয়া উঠে, শিশুর সেই নামই রাখা হয়।
ইহারা বিশ্বাস করে যে, সেই ব্যক্তিই আবার আসিয়া জন্মগ্রহণ
করিয়াছে। সপ্তম দিনে নবশিশুর কল্যাণার্থ গ্রামের সমস্ত
লোককে এবং পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া
থাকে। এই ভোজে কঙ্কেরা অতিরিক্ত মহরামদ্য পান
করিয়া থাকে।

বিবাহ বিষয়ে ইহারা বড় সতর্ক হইয়া সজ্ঞানি করে।
বংশের গৌরব ও বীর্ঘবক্তা রক্ষা করিবার জন্য ইহারা
কখন অশ্রমীতে বা আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে বিবাহ করে না।
যে ছই জাতিতে চির-বিবাহ আছে, তাহাদের মধ্যেও বিবাহ
সম্বন্ধ স্থির হয়। হয়ত উত্তর জাতিতে কাল ভরানক যুদ্ধ
হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্য বিবাহ সভার উত্তর জাতি একত্র
মিলিত হইয়া মহা আনন্দে বহু ভাবে পানামোদ করিতেছে,
রাজ প্রভাত হইলে আবার বিশপ উৎসাহে পরস্পর যুদ্ধে
মাতিবে! এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয়। ১০ বা ১২ বৎসর
বয়সে ইহারা পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকে, পুত্র অপেক্ষা বধুর
বয়স অধিক হয়। ১০ বৎসরের বালকের সহিত অভাব পক্ষে
১৪ বৎসরের কস্তার বিবাহ হওয়া চাই। ইহা অপেক্ষা
অল্পবয়স্ক বিবাহ হয় না, কিন্তু ১৫১৬ বৎসরের বৈশী বয়স
কোন কল্পা অবিবাহিতা থাকে না। বরপক্ষ ও কস্তাপক্ষ
হইতে সম্বন্ধ স্থির করিবার দিন, বরকর্ত্তা নিজ আত্মীয় কুটুম্ব
লইয়া কস্তাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হয়। ইহারা কস্তার
মূল্য স্বরূপ চাউল, মদ্য ও ১০১২টা গরু বা ভেড়া লইয়া
আসে। কস্তাপক্ষের পুরোহিত নিজ যজমানের বাটীর ঘরে
দাঁড়াইয়া ইহাদিগকে অভ্যর্থনা করে। তৎপরে পুরোহিত
বরকর্ত্তার প্রদত্ত মদ্য পান করিয়া, বিবাহ-দেবতাকে (প্রজা-
পতি ?) মদ্যাদি উৎসর্গ করিয়া দিয়া থাকে। পরে ইহারা উভয়
বৈবাহিকে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ স্থির
করে। তৎপরে রাজ্য সকলে কস্তাকর্ত্তার গৃহেই আহাৰাদি
করে। সারা রাজ্য নৃত্য, গীত, বাদ্য ও মদ্য চলিতে থাকে।
শেষ রাজ্যে পুরোহিত বরকস্তার হস্তে হরিদ্রাক্ত হতা বীধিয়া
দেয় এবং যে ঘরে খান হইতে চাউল প্রস্তুত করে (চেকী-
ঘর ?) সেই ঘরে উভয়কে দাঁড় করাইয়া উভয়ের মুখে
হরিদ্রাক্ত জল ছিটাইয়া দিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইবামাত্র
বরের খুড়া ও কস্তার খুড়া বরকন্যাকে ফেলে লইয়া মহা-
সমারোহে নৃত্যগীতাদি করিতে করিতে বরের বাড়ীর দিকে
যাইতে থাকে। কন্যাপক্ষীরেও সঙ্গে সঙ্গে যায়। পথিমধ্যে
বরের খুড়া ও কন্যার খুড়া নিজ নিজ ভার পরিবর্ত্তন করিয়া
লইয়া বরের বাটী পলায়ন করে, এদিকে কস্তাপক্ষীরেও
কস্তাকে না দেখিয়া বরপক্ষীরে নিকট কস্তা দেখাইবার জন্য
দাঁড়া দাঁড়া করিতে থাকে। সমস্ত আমোদ উৎসব বন্ধ
হইয়া যায়। উভয়দলে পৃথক হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ
দণ্ডারমান হয়। যুদ্ধও হয়, হতাহতও হইয়া থাকে, তবে
কিরংক্ষণ পরে পুরোহিতগণের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটরা
যায়। কস্তাপক্ষীরেও কিরিয়া আসে। যদি বরকন্যাকে

পরিমধ্যে কোন নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে পুরোহিত
ঘরের বাড়ী গিয়া বরকনার গায়ে রক্ষাবন্ধন শাস্তিপাঠ করিয়া
জলদেবতার উপদ্রব হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া আসে।

পুত্রের বিবাহ দিবস পূর্ব যতদিন পুত্র জীসহবাসের
উপযুক্ত না হয়, ততদিন বরকর্তারা পুত্রবধূকে স্বগৃহে সমস্ত
কাজকর্মের ভার দিয়া দাসীর ন্যায় খাটাইয়া লন, পরে পুত্র
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পুত্র ও পুত্রবধু সংসারের মধ্যে পূর্ণকর্মতা
পাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে জীলোকেরা বিশেষ একটু সম্মান পাইয়া
থাকে। যতদিন স্বামী ছোট থাকে, ততদিন ইহারা স্বামীর
উপর বেশ প্রভুত্ব করে। বিবাহকালে বরকর্তা যে সকল
দ্রব্য বধুর মূল্যস্বরূপ কন্যাকর্তাকে দিয়া থাকেন, সেইগুলি
যখন হউক কিরাইয়া দিলেই, ইহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন
হইয়া যায়, জী পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া যায়।
যদি জী গর্ভবতীও থাকে, তাহা হইলেও কোন আপত্তি হয়
না। এইরূপ একবার বিবাহ-বন্ধন কাটিয়া গেলে, সে জীতে
স্বামীর আর কোন স্বত্ব থাকেনা, কিন্তু সে জীও আর দ্বিতীয়-
বার বিবাহ করিতে পায় না। স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ
করে। ব্যভিচার দোষ ঘটিলেই প্রায় এইরূপে বিবাহ-বন্ধন
কাটিয়া দেওয়া হয়, নতুবা অন্য কোন কারণে হয় না। এক
পক্ষীসঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষী গ্রহণ করিতে কেহ পারে না।

বেশা রাধিবার প্রথা ইহাদের মধ্যে নিম্নার্হ নহে। যাঁহার
জী আছে, সে বেশা রাধিতে পায় না, তবে জীর অমুমতি
লইয়া পারে। এরূপ স্থলে বেশাপুত্রেরাও ঔরস-পিতার
বিষয়ের সমান ভাগ পাইয়া থাকে। বেশা রাধিবার প্রথা
নিষিদ্ধ না হইলেও ইহাদের মধ্যে বেশার সংখ্যা বড় বেশী
নহে বা ব্যভিচার ও বলাৎকারের কথাও শুনিতে পাওয়া
যায় না। এ দোষ কচিং কখন দুটা একটা দেখিতে পাওয়া
যায়।

পতি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জীরা বড় ভক্তির সহিত সেবা
করিয়া থাকে। খাইবার সময় জী স্বামীর নিকট বসিয়া
খাওয়ায়, গৃহকর্ম সমস্তই নিজ হাতে করিয়া থাকে। যখন
ক্ষেত্রের কর্মে স্বামীকে একান্ত অবসর হইয়া পড়িতে দেখে,
তখন চক্ষুপোষ্য সন্তানকে উপেক্ষা করিয়া স্বামীর সহিত
ক্ষেত্রে গিয়া সাহায্য করিতে থাকে। এ সময় ইহারা কোমরে
কাঁপড় দিয়া সন্তানকে বাধিয়া লইয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন যে, অবিবাহিতাবস্থাতে যদি কোন
রমণী পুত্রবতী হয়, তাহা হইলেও তাহার বিবাহ হইয়া থাকে
এবং সে নিষিদ্ধ হয় না; তবে এরূপ কঙ্কাকে বিবাহ করিতে

কেহ সহজে স্বীকৃত হয় না। কঙ্কজাতিরা যখন ইচ্ছা করে,
তখনই স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে কিরিয়া আসিতে
পারে, আর আসিলেই তাহার পিতাকে বিবাহকালীন প্রাপ্ত
দ্রব্যাদি কিরাইয়া দিতে হয় বলিয়া, কঙ্কেরা কঙ্কাসন্তানকে
বড়ই ঘৃণা করে। ইহারাও জীলোককে বিশ্বাস করে না,
বলে যে, যে নিতান্ত শিশু সেও কুঠারের আঘাত খাইলেও
কখন গোপনীয় কথা প্রকাশ করে না, কিন্তু জীলোক
সহস্র বুদ্ধিমতী হইলেও সামান্য প্রলোভনে পড়িয়াই অতি
গোপনীয় কথাও প্রকাশ করিয়া ফেলে।

কঙ্কজাতির মধ্যে কোন সামান্য লোকের মৃত্যু হইলে,
ইহারা যতদূর পারে দেহটা পুড়াইয়া ফেলে এবং দশম দিবসে
গ্রামের সকলকে ভোজ দিয়া থাকে। সর্দার বা মণ্ডল প্রভৃতি
লোকের মৃত্যু হইলে, ইহারা ঢাক ঢোল বাজাইয়া মৃতের
অধীনস্থ সমস্ত গ্রামে তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে এবং
অজ্ঞাত গ্রামের মণ্ডল এবং জাতির সর্দারদিগকে আহ্বান
করিয়া সকলে মিলিয়া শব অশানে লইয়া যায়। খুব উচ্চ করিয়া
চিতা সাজাইয়া তাহার মধ্যস্থলে ধ্বজা ও জাতিগত নিশান
রোপণ করিয়া শব তুলিয়া দেয়। তৎপরে মৃতের পুত্র শবের
দিকে পশ্চাৎ করিয়া চিতায় অগ্নি প্রদান করে। এই সময়
মৃতের যাবতীয় বস্ত্রাদি, তৈজস ও শস্ত্রাদি আনয়ন করিয়া,
একটা চাউলের থলির উপর সাজাইয়া চিতার নিকট রাখিয়া
দেয়। তৎপরে যতক্ষণ নিশানটি পর্য্যন্ত ভস্মীভূত না হয়, তত-
ক্ষণ মৃতের আত্মীয়েরা চিতার চতুর্দিকে নৃত্য করিতে থাকে।
তৎপরে মৃতের অধীনস্থ প্রধানেরা মৃতের সেই সকল সম্পত্তি
আপনাদের মধ্যে মাজের চিহ্ন বলিয়া ভাগ করিয়া লয় এবং
৯ দিন পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে আসিয়া মৃতের বংশের সহিত
মিলিয়া চিতাভস্মের চতুর্দিকে নাচিতে ও শোকসঙ্গীত গান
করিতে থাকে।

দশম দিনে মৃতের অধীনস্থ সমগ্রজাতি ও গ্রামের
প্রধানেরা একত্রিত হয় এবং আপনাদের মধ্যে আর একজন
সর্দার বা প্রধান মনোনীত করে। মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রায়
মনোনীত হইয়া থাকে।

কঙ্কজাতির দুইটি প্রধান গুণ আছে—বিশুদ্ধতা ও সাহস।
আতিথেয়তা এই জাতির মধ্যে এতদূর প্রবল যে, তাহা
অজ্ঞান করিয়া সহজে বুঝা যায় না। ইহারা বলে—ধন মান
জন দিয়াও অতিথিসেবা করিবে। সন্তান অপেক্ষাও অতিথি
বন্ধের বস্ত। অতিথির বিপদ ঘটিলে নিজে প্রাণ দিয়াও তাহা
দূর করিবে। কোন গ্রামে যদি কোন বিদেশী পথিক
উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গ্রামের প্রত্যেক বাতীর কর্তারা

তাহাকে ভোজন করাইবার জন্ত আহ্বান করিয়া থাকে। বাহার বরে অতিথি আসে, তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। অতিথির বতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকিতে পার। কেহ অতিথিকে “বাও” বলিতে পারে না। যুদ্ধ হইতে পলাইয়া আসিয়া যদি কেহ আশ্রয় চায় বা অত্যন্ত অপরাধে প্রাণদণ্ডের অপরাধীও যদি আসিয়া আশ্রয় চায়, তাহা হইলেও ইহার আশ্রয় দিয়া থাকে। কাহারও পিতাকে কি কোন আত্মীয়কে বা সন্তানকে হত্যা করিয়া যদি হত্যাকারী আসিয়া বাহার আত্মীয় বা বাহার পিতা, বা বাহার সন্তানকে হত্যা করিয়াছে, তাহারই নিকট আশ্রয় চায়, সেও নিরাপদে আশ্রয় পাইয়া থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে হুটলোকেরা এইরূপে নিজ দুর্কার্যের ফল হইতে পরিজ্ঞান পাইতে চেষ্টা করে বলিয়া, তাহার নিয়ম করিয়া লইয়াছে যে, যদি কোন হত্যাকারী আসিয়া এইরূপে আশ্রয় লয়, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ তাহাকে আশ্রয় দিয়া নিজে সপরিবারে বাটা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু তাহাকে কোনরূপ খাদ্যাদি প্রেরণ করে না। আততায়ী বতকণ বাড়ীর মধ্যে থাকে, ততক্ষণ কেহ কিছু বলে না, কিন্তু অনাহারে পীড়িত হইয়া বাটার বাহির হইলেই সেই গৃহস্থ তাহাকে বিনাশ করিয়া প্রতিশোধ লয়। হুটকস্থলে ইহা নিয়ম হইয়া গেলেও, কতেরা এ প্রণালীকে এত ঘৃণা করে যে, এ নিয়মামুসারে কার্য্য কচিৎ কখন হই একটা ঘটতে দেখা যায়। যদি কেহ পুত্রশোকও উন্নত হইয়া এই নিয়মামুসারে কার্য্য করে, তাহা হইলেও সে স্বজাতি মধ্যে ঘৃণিত হইয়া থাকে। এই আভিণেয়তা লইয়া সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বক যুদ্ধ বাধিত। একবার এই যুদ্ধে এক জাতির সহিত আর এক জাতির যুদ্ধ বাধে। যে দল হারিয়া যায়, তাহার সকলেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইল। সে গ্রামের অধিবাসীরা অতিথিদিগকে একবৎসর আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিল। যে জাতি জয়লাভ করিয়াছিল, তাহার আসিয়া শত্রুকে আশ্রয় দিয়াছে বলিয়া এই জাতির সহিত যুদ্ধ করিল। ইহার তবুও আশ্রিতকে ত্যাগ করিল না। অবশেষে এক বৎসর গেলে, জেতুজাতি শত্রুপক্ষের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়া দিল। স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বিজিত জাতি জেতুজাতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল। অমনি আর কি শত্রুতা থাকিতে পারে? দেবতাবপূর্ণহৃদয় কল্পজাতি সমস্ত শত্রুতা তুলিয়া গিয়া বিজিতের জমাজমী বাহা কিছু অধিকার করিয়াছিল, সমস্তই কিরাইয়া দিল এবং চাববাস করিবার জন্ত আপনাদের শত হইতে বীজ

প্রদান করিল। এ মহাহৃদয় জাতির পন্থেগুর বোণ্য কোন সভ্য কি সভ্যতম জাতিও হইতে পারেন কি?

ইহার বিখ্যাততার জন্তই আজ স্বাধীনতা হারাইয়াছে। ১৮৩৫ সালে যখন গুমসররাজ ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহচরণ করিয়া ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন যে বংশ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদেরই হস্তে নিজ জীপুত্র কন্যা সমর্পণ করিয়া যত্নমুখে পতিত হন। ইংরাজ গুমসর-রাজের পুত্রকন্যা পাইবার জন্ত কল্পজাতির অহসরণ করিলে, প্রথমতঃ তাহার বৃত্তিতে না পারিয়া ইংরাজকে দেশে প্রবেশ করিতে দেয়। পরে যখন ইংরাজসেনার অভিপ্রায় বুঝিল, তখন আশ্রিতের রক্ষার জন্য আপনাদের বিপদ তুচ্ছ করিয়া, গুমসররাজের পরিবারবর্গকে লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিল; সময়ে সময়ে যুদ্ধে অসংখ্য মরিতে লাগিল, তথাপি আশ্রিতকে শত্রুহস্তে দিয়া “অবিবাসী” বলিয়া গণ্য হইতে পারিল না। শেষে ইহাদের প্রান্তবাসী কোন কুলাকার হিন্দু-সদ্বীরের বিশ্বাসঘাতকতার ইংরাজ হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। হিন্দু সদ্বীর ইংরাজের শিক্ষার শিক্ষিত হইয়া সভ্য হইয়াছিলেন কিনা, সেই জন্ত অসত্য কল্পের শরণাগত-পালন ধর্ম্মটি ভাল লাগিল না। তিনি রাজতত্ত্ব দেখাইয়া “সভ্য” বলিয়া পরিচয় দিলেন।

কৃষিকার্য্য এবং যুদ্ধই ইহাদের মধ্যে সম্মানের কার্য্য। বাহার কৃষিকার্য্য বা যুদ্ধাদি করে না, তাহাদিগকে ইহার ঘৃণা করিয়া থাকে। প্রত্যেকের নিজের চাববাসের জন্য এক একটু জমী আছে, সেই জমী লইয়াই ইহার সাম্রাজ্য-মুখ উপভোগ করিয়া থাকে। সেই জমীটুকু রক্ষা করিয়া কাটাতে পারিলে, ইহার যতটা সন্তোষ লাভ করে ততটা সন্তোষ বোধ হয়, একজন বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সম্রাটও পান কি না সন্দেহ। প্রত্যেক কল্পগ্রামে কতকগুলি নীচশ্রেণীর লোক থাকে, তাহার অপরের দাসত্ব করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

এতদ্বির প্রত্যেক কল্পগ্রামে কতকগুলি বংশাধিকারিক জাতি (পান বা পানওরা), কর্ম্মকার (লোহার), কুস্তকার (কুস্তার) গোরালা (গোয়ার) ও শৌভিক (শুভি) থাকে। ইহার গ্রামের মধ্যে স্থান পায় না, গ্রামের প্রান্তদেশে অথবা গ্রামের একধারে এক এক স্থানে এক একটা পরী বাধিয়া বাস করিতে থাকে। ইহাদের আর কতেরা খায় না বা নিত্যন্ত দুঃখবহান না পড়িলে ইহাদের ব্যবসার পর্য্যন্ত অবলম্বন করে না। এই সকল নিম্নশ্রেণীর জাতি মধ্যে পানওয়ারা বেশী কাজে লাগে। ইহার গ্রামের

পক্ষীরূপ বলিবার সময় বা যুদ্ধের সময় দূতের কার্য্য করে, উৎসবাদিতে বাগবাজনা সরবরাহ করিয়া থাকে, গ্রামের লোকের জন্য বস্ত্র বরন করে এবং আশ্রয় অনেক কার্য্য করে। পূর্বে যখন ইহাদের মধ্যে নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এই পানওয়া জাতির মধ্যে এক এক বংশ বংশাঙ্কুরে নগ্রামের জন্ত বলির পাত্র সংগ্রহ করিত। ইহারা আপনাদের জন্য জমী রাখিতে পার না বা উচ্চ জাতির অবলম্বনীয় অপর কোন কার্য্যও করিতে পার না। এই জন্য উচ্চ শ্রেণীর কঙ্করাও ইহাদিগকে একটু দয়ার সহিত ব্যবহার করে। কোন উৎসবাদি উপস্থিত হইলে সকলেই ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং ইহারা হঠাৎ কোন একটা দোষের কার্য্য করিয়া ফেলিলে, কেহ তাহার প্রতিশোধলীতে চায় না। ইহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যে, ইহারা কঙ্কজাতি হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক। আজও ইহাদের উভয় জাতিতে কোনরূপেই বর্ণশুদ্ধ-দোষ ঘটে নাই বলিয়া সেই স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট বুঝা যায়। অনেকে অস্বীকার করেন যে, ইহারা এই সকল প্রদেশের আদিম অধিবাসী। কঙ্করা পূর্কালে ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া নিজেরা দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছে, আর ইহারা সেই পর্য্যন্ত দাসের ন্যায় তাহাদিগের অধীনে কাল কাটাইয়া আসিতেছে। এই সকল নীচশ্রেণীর মধ্যে কঙ্কভাষা ও উড়িয়া ভাষা উভয়ই চলিত। কারণ, ইহারা উভয় জাতির সহিতই সম্ভাব রাখিয়া উভয়জাতিরই বশীভূত হইয়া আছে।

কঙ্করা বালককাল হইতেই চাষাবাস শিক্ষা করে আর বাল-মুগ্ধ ভেলা করিবার সময়ে যুদ্ধাদি শিখিয়া থাকে। ফসল বুনিবার সময় আর কাটিবার সময় ইহারা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া খিচুড়ির ভায় একপ্রকার আহার প্রস্তুত করিয়া খাইয়া মাঠে চলিয়া যায়; এই খিচুড়িতে দাইল, চাউল এবং ছাগল বা শূকরের মাংস থাকে। ক্ষেত্রের নীহার শুকাইতে না শুকাইতে ইহারা গিয়া লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করে এবং অবিশ্রামে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিতে থাকে। যখন বন জঙ্গল কাটিয়া নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তখন বিপ্রহরে কতকটা বিশ্রাম লয় আর সেই অবকাশে আহার করে। অল্প সময়ে ইহারা তিনটা পর্য্যন্ত খাটিয়া, নিকটবর্তী কোন নদীতে স্নান করিয়া বাটা ফিরিয়া আসিয়া আহার করে। এই সময়ে ইহাদের একটা ঝোল হইয়া থাকে, তাহাতে দোকান রস দেয়।

গ্রামপত্তনের জন্ত জমী নির্ণয়ে ইহারা বড়ই যত্ন লয়। প্রায়ই পাহাড়ের কোলে বা বহু বৃক্ষলতাকীর্ণ স্থানে উচ্চ

ভূমিতে গ্রাম বসাইয়া থাকে। এতি গ্রামে দুইসারি গৃহ নির্মাণ করে। মধ্যস্থলে গ্রাম্য পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়। এই পথের দুইদিকেই কাঠে নির্মিত দৃঢ় কপাট দিয়া বন্ধ করা থাকে। গ্রাম সকল গ্রামের মধ্যস্থলেই প্রধানের আবাসবাটা নির্মিত হয়। গ্রামপত্তনের সময় ইহারা গ্রামের মধ্যস্থলে একটি কাপিসবৃক্ষ রোপণ করিয়া গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবতার নামে উৎসর্গ করে। এই বৃক্ষের নিম্নেই প্রধানের আবাসবাটা বাঁধা হয়। বৃক্ষটি ইহাদের নিকট দেবতুল্য পূজিত হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পূর্কোক্ত পথের মুখ দুইটির নিকট বাস করে।

ত্রিশবৎসর পূর্বে কঙ্কজাতীর কোন লোক মুদ্রা-ব্যবহার জানিত না। ব্যবসায় বাণিজ্যও ইহাদের মধ্যে বড় কিছু ছিল না। মুদ্রাব্যবহারের সর্বপ্রথম পছা কড়ির ব্যবহারও ইহারা জানিত না। ইহাদের ক্রয়বিক্রয়ের কার্য্য বিনিময়ে সম্পন্ন হইত। মেঘ বা গরু দিয়াই অধিক পরিমাণ মূল্যের আদান প্রদান হইত। অজ্ঞাত স্থলে চাউল, দাইল ইত্যাদির বিনিময়ে মূল্যাদি লওয়া দেওয়া হইত; এরূপ বিনিময়ের হিসাবাদি বড়ই জটিল।

যুদ্ধে ইহাদের সাহস অপরিসীম। যুদ্ধস্থলে ইহারা স্ব স্ব সর্দারের নিকট যেরূপ বাধ্য হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

কঙ্করা উচ্চতায় হিন্দুদিগের মত। ইহাদের শৃগঠিত শরীর, দৃঢ় মাংসপেশী, দ্রুতপাদক্ষেপ, বিস্তৃত ললাট, পূর্ণায়ত ওষ্ঠাধর দেখিলে ইহাদিগকে বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের কথাও বেশ মিষ্ট ও সরস, সুতরাং ইহাদের সঙ্গে মিশিলে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। যুদ্ধে ইহারা বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠে। ইহাদের যুদ্ধের বা উৎসবের বেশভূষা একই প্রকার। লম্বা চুলগুলি জড়াইয়া মাথার দক্ষিণ পার্শ্বে খোঁপার মত বুটি বাঁধে এবং তাহার উপর পক্ষীর পালকের মুকুট পরিধান করে। যুদ্ধের পূর্বে সর্দারেরা কয়েকজন জ্ঞতগামী পানওয়ার হস্তে তীর দিয়া এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে সংবাদ দিবার জন্ত পাঠাইয়া দেয়। দূতের হস্তে তীর দেখিলে ইহারা যুদ্ধের সংবাদ বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে উভয়দলে জয়লাভাশায় পৃথীদেবতার নিকট এক একটি নরবলি মানসিক করে। এতদতির ইহাদের যুদ্ধেরও একটিও দেবতা আছে, তাহার নিকটেও মানসিক করে যে, “যুদ্ধে জয় হইলে তৎক্ষণাৎ এই যুদ্ধস্থলেই তোমার নামে ছাগল আর পক্ষী বলি দিব।” ইহারা উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ

করিয়া বতকণ কোন এক দল সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত না হয়, ততকণ বুদ্ধ ভাগ করে না। দিনের পর দিন ইহার নূতন করিয়া বুদ্ধ আরম্ভ করে, শেষ না হইলে পরদিনের অপেক্ষা করিয়া বহা উৎকর্ষের রাজি বাপন করে। প্রথম দিন বুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যদি শেষ না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়দিন বুদ্ধারস্তের পূর্বে ইহার বুদ্ধকেজে একখানি রক্তমাখা কাপড় পাতিয়া

দিয়া উভয়দলের বোদ্ধাগণকে উত্তেজিত করে। ছইদলের পশ্চাতে উভয় পক্ষীর বুদ্ধেরা এবং জীকজারী অস্ত্র শস্ত্র ও খাদ্যাদি লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। বুদ্ধকালে অন্ত্রাদি ভগ্ন বা অনাটন হইলে, কি বোদ্ধাগণের তুফাদি পাইলে, ইহার উৎকর্ষণে তাহা বোণাইয়া দেয়। যে ব্যক্তি বুদ্ধে প্রথমে হত হয়, উভয় পক্ষীর বীরেরাই আগ্রহ সহকারে আপন আপন বুদ্ধকূঠার তাহার রক্তে ডুবাইয়া লয়, আর যে ব্যক্তি তাহাকে বধ করে, সে হতযোদ্ধার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া লইয়া অতিশীঘ্র স্বদলের পশ্চাতে আসিয়া পুরোহিতের নিকট প্রদান করে। পুরোহিতেরা এই হস্তকে যুদ্ধ-দেবতার অতি প্রিয়বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। শুদ্ধ প্রথম হত যোদ্ধার হস্তই নহে, যখন যে কেহ পড়িলে, তখন তাহারই দক্ষিণ হস্ত হস্তা কর্তৃক স্বদলের পুরোহিতকে প্রদত্ত হইবে। এইরূপে যতদিন বুদ্ধ চলে, তাহার প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে প্রত্যেকদলের পশ্চাতে হতবীরের দক্ষিণ হস্তের রাশী হইয়া উঠে। ইহাদের যুদ্ধান্তের মধ্যে একপ্রকার বক্রাগ্র তরবারী, তীরধনু, দোহাতিয়া-কূঠার আর পাথর ছুঁড়িবার গুরুল-ধনুক ব্যবহৃত হয়। কক্কাের কোনরূপ ঢাল লইয়া বুদ্ধ করাকে ঘৃণা করে। কূঠারের বাঁটে ইহার ঢালের কার্য্য নির্বাহ করে। ধনু হইতে তীর নিক্ষেপ হইলে যদি সেই তীর ভূমিস্পর্শ করিয়া আবার উর্দ্ধমুখে উঠিয়া দৃষ্টি-রেখার নিম্ন দিয়া লক্ষ্য বেষ করে, তাহা হইলে সেইরূপ লক্ষ্য ভেদকেই ইহার শ্রেষ্ঠ-শিক্ষা বলিয়া প্রশংসা করে। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কখন কোন কক্কবীর নিজ কৌশল বা বলের প্রশংসা করে না বা শুনে না। সকলেই যুদ্ধদেবতার রূপায় জয় হইয়াছে, ইহাই দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

সভ্যজাতির লোভজনক এতগুলি সঙ্গুণ কক্কদিগের আছে বটে, কিন্তু তাহাদের পানদোষ বড়ই প্রবল। মহারাজুলের মদ তাহাদের প্রতি উৎসবে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মদ ভিন্ন গ্রামের কোন উৎসব, ব্যক্তিগত কোন সংস্কার সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস আছে। ইহাদের জীলোকেরা মদ ব্যবহার করে না, কেবল কোন কোন উৎসবে অমরোদ্রবশতঃ জিহ্বাধারা স্পর্শ করিয়া

দেয় মাত্র। জীলোকে মদ্যপান করিলে সমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যখন মহারাজুল ফুটিতে থাকে, তখন কক্কদিগের বড়ই হর্ষা হয়, নূতন ধনু নূতন মদ খাইয়া বাটে, মাঠে, পথে, দলে দলে পুরুষেরা অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, আর জীলোকেরা গৃহসংসারের কার্য্য সারিয়া ইহাদের শুশ্রূষা করিতে থাকে।

দোষগুণ লইয়া কক্কদিগের চরিত্র ঘোটের উপর এইরূপ দাঁড়াইতেছে;—একদিকে ইহাদের ঐকান্তিকী স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সর্দারগণের বাধ্যতা, অটল-প্রতিজ্ঞা, সাহস, আভি-ধেয়তা, অকৃত্রিম বদ্ধতা এবং পরিশ্রমশীলতা, অপরদিকে এক-মাত্র পানদোষ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতা দেখিলে বুদ্ধ হইতে হয়। ই একটি ক্ষুদ্র বিভাগ ব্যতীত আর কোথাও চৌর্য্য বা দস্যুতা বলিয়া একটা অপরাধ নাই, আর কচিং কখনও কাহারও নামে ব্যক্তিচারের অভিযোগ ব্যতীত সমস্ত কক্কজাতির মধ্যে আর কোনরূপ পাপ আছে কিনা সন্দেহ।

কক্কদিগের ধর্ম ও দেবতা।—কক্কদিগের ধর্মকর্ম যাহা কিছু আছে, তাহার মধ্যে বলিই প্রধান। ইহাদের দেবতার সংখ্যাও অনেক এবং জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পাতালে সকল স্থানেই ইহাদের দেবতা আছে। সকল দেবতারই নিকট জীব-বলি হইয়া থাকে। এই সকল দেবতাদের মধ্যে ৩টা শ্রেণী আছে। প্রথমশ্রেণীর দেবতা ১৪টি—(১) বেরা পেহু—পৃথী-দেবতা, (২) লোহা পেহু—দোহদেবতা বা যুদ্ধদেবতা, (৩) নান্জু পেহু—গ্রামাধিপতিতা, (৪) বেরেলা পেহু—সূর্য্য এবং দান্জু পেহু—চন্দ্র, (৫) সান্দে পেহু—সীমা-দেবতা, (৬) জুগা পেহু—বসন্তরোগের দেবতা (শীতলা?), (৭) সোর পেহু—পর্কত-দেবতা, (৮) জোরি পেহু—নদী-দেবতা, (৯) গাস্কা পেহু—বন-দেবতা, (১০) বুগা পেহু—পুঙ্করগী-দেবতা, (১১) জুগু বা সিদ্দুরো পেহু—নির্ঝর-দেবতা, (১২) পিন্জু পেহু—বৃষ্টি-দেবতা, (১৩) পিলানু পেহু—শীকার-দেবতা ও (১৪) গারী পেহু—জন্মদেবতা। এই সকল দেবতাই কক্কগণের ভাগ্যনিধাতা। ইহার মধ্যেও আবার বেরা পেহু, লোহা পেহু ও নান্জু পেহু সর্বাধিক প্রধান। ইহাদের পরই সূর্য্য, চন্দ্র, এবং সীমা, নদী, বন, পুঙ্করগী, নির্ঝর ও বৃষ্টিদেবতা গণনীয়। তৎপরে শীকার-দেবতা, বসন্ত রোগের দেবতা এবং জন্ম-দেবতা পূজিত হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা ১১টি—(১) পিতাবল্লী—আদিপিতৃদেব, (২) বাক্সি পেহু, (৩) বাহ্মন পেহু, (জ্ঞানপ ?) (৪) বাহ্মদী পেহু, (৫) ভুজরি পেহু, (৬) সিঙ্গা পেহু,

(৭) দমোদিংহীরাণী, (৮) পত্নীধর, (৯) শিঞ্জাই, (১০) কঙ্কালী ও (১১) বলিন্দা সিলেন্দা। ইহার মধ্যে “পিতাবল্লী” একপ্রকার প্রতিমা করিয়া রাখা। হিন্দুর যেমন বিষ্ণু, শট বা অশ্বখ বৃক্ষের নিম্নে একবৃক্ষ প্রান্তরে সিদ্ধুর চন্দ্রনাথি মাথাইরা শিব, বটী, ধর্ম প্রভৃতির প্রতিমা কল্পনা করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহারও বনমধ্যে একটা বৃহৎবৃক্ষের নিম্নে একখানা প্রান্তরে হরিদ্রা মাথাইরা রাখিয়া আদিপিতৃদেবের প্রতিমা-কল্পনা করিয়া থাকে। বনবাসী লোকেরা বলে যে, যে স্থানে এই প্রতিমা স্থাপিত হয়, সেইখানে পূর্বে উক্ত দেবতা সময়ে সময়ে আবির্ভূত ও ভূমধ্যে অন্তর্হিত হইতেন। বান্দরী পেশুরও প্রতিমা আছে, কিন্তু তাহা যে কিসে প্রস্তুত; তাহা কেহ আজিও নির্ণয় করিতে পারে নাই—ইহা কাঠ, প্রস্তর বা লোহাদি কোন ধাতুই নহে। ভূকরি পেশুর পূজা বৎসরে একবার মাত্র হইয়া থাকে। প্রত্যেক বংশের লোকে বৎসরে একবার একত্রিত হইয়া, একটা উচ্চ পর্বতে উঠিয়া, এই দেবতার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করে যে, “পিতৃপুরুষেরা যে ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তোমার প্রসাদে সেইরূপ কাটাইয়া যাইতে পারি, আর আমরা যেমন কাটাইয়া যাইব, সেইরূপে যেন আমাদের সন্তানেরও কাটাইতে পারে।” সিদ্ধা পেশু—সংহার দেবতা, ব্যাঙ্গই ইহার মূর্তি এবং পৃথিবী মধ্যে এই দেবতাই লোহরূপে অবস্থিত করে। কঙ্করা যুদ্ধে লোহ অস্ত্র ব্যবহার করে, ব্যাঙ্গের মুখেও অনেক বিনষ্ট হয় বলিয়া, বোধ হয়, এই ছুইটাকে সংহার-দেবতার মূর্তি বলিয়া স্থির করিয়াছে। এই দেবতারও প্রতিমূর্তি আছে। কঙ্কদিগের বিশ্বাস যে, যে বৃক্ষের নিম্নে এই দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার অতি অল্পদিন পরেই মরিয়া যায়, এবং যে পুরোহিত এই দেবতার পূজার জন্য নিয়মিতরূপে পূজক নিযুক্ত হন, তিনি কর্ণে নিযুক্ত হওয়ার পর আর বাঁচিবায় আশা করিতে পারেন না। এইজন্য কেহই ৪ বৎসর ইহার পূজার অঙ্গের হয় না। এই দেবতার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অনেক কঙ্ক হিন্দুদের কালীদেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছে। কঙ্কের জাতীয়-দেবতার জাতীয়-পুরোহিতের হস্তে পূজিত হইয়া থাকে এবং কালীপূজার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। কঙ্কগণের জাতীয় দেবতার অধিকাংশই পৃথিবীতে বা পাশ্চাত্যে বাস করে বলিয়া কঙ্কপুরোহিতেরা সময়ে সময়ে কুথিতে “কাটা” দেবিলেই বহুমানদিগকে ভাঙ্কিয়া দেখাইয়া বলে যে, এ কাটার ভিত্তর দিয়া দেব-

তার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। একমাত্র বেয়া পেনু বা পৃথিবী-পূজার দিনই সমগ্র কঙ্কজাতি একত্রিত হইয়া থাকে এবং ইহার পূজার বলি দিতেই হইবে। কঙ্কজাতির মধ্যে ইনিই প্রধান দেবতা, স্বভাবের উৎপাদিনী শক্তি, সর্বজনকালীন, ও সমস্ত ভুবনের স্রষ্টা। ইহার এক স্ত্রী আছে, তাহার নাম তারা দেবী। বেয়া পেনু নিরীহ দেবতা, কখন কাহারও কোনরূপ অপকার করেন না, কিন্তু তারাদেবী ঠিক তাহার বিপরীত। কঙ্করা বলে এই তারাদেবীর জন্যই মনুষ্য সমাজে বাবতীর দোষ বা পাপ প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাদের মতে সৃষ্টির আরম্ভ এইরূপ;—কোন সময়ে বেয়া পেনু দেখিলেন যে তাঁহার পত্নী আর তাঁহাতে সেরূপ ভক্তিমতী নাই, সুতরাং তিনিও তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া স্থির করিলেন যে, পৃথিবীকে উত্তীর্ণালিনী করিয়া তাহাতে জীব সৃষ্টি করিবেন। এই জীবেরা তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা ও আহ্বারদাতা বলিয়া ভক্তি করিবে, তাহা হইলে তিনি পত্নীর নিকট যে ভক্তিটুকু পাইতেছেন না, তাহাও তাঁহার পাওয়া হইবে। ইহার পরেই পৃথিবীতে প্রথমে উদ্ভিদ হইল, তৎপরে জীবকুলও হইল। মনুষ্যজাতি নিম্পাপ ও নির্মল হইল, কাঙ্কেই ইহাদের সহিত বেয়া পেনুর দেখা সাক্ষাৎ ও কথোপকথন অবধি চলিত, আহ্বারের জন্য পরিশ্রম করিতে হইত না, পৃথিবী বিনা চেষ্টায় বিনা কৃষিকার্যে আপনা হইতেই অপর্যাপ্ত শস্ত উৎপন্ন করিতেন এবং সর্বত্র নিরাপদ ও শান্তি ছিল। ইহার সে কালে উগ্ৰজ থাকিত, কিন্তু নিজের উলঙ্গাবস্থা বৃদ্ধিত না। শেষে তারা দেবী ইহাদের স্নেহে হিংসাপরায়ণ হইয়া, ইহাদের মনে পাপের সঞ্চার করাইয়া দিলেন। যাহারা এই সময়েই তারা-দেবীর প্রলোভন হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারিয়াছিল, তাহারা একপ্রকার দ্বিতীয়শ্রেণীর দেবতা বলিয়া গণ্য হইল এবং যাহারা পাপাসক্ত হইয়া পড়িল, তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিবার ভার পাইল। মানব পাপাশ্রিত হইয়া বড়ই বিষম অবস্থায় পড়িল। পৃথিবী আপনা হইতে প্রচুর শস্ত উৎপন্ন করা বন্ধ করিলেন। পূর্বে মানুষের মুখ্য ছিল না। তাহারা আকাশে পক্ষীর মত উড়িতে ও জলের উপর দিয়া হাঁটিতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আর সে কমতা রহিল না, সকলেই মুখ্যর বশীভূত হইয়া পড়িল। এই সমস্ত ঘটনা ঘটিলে তারাদেবী ও বেয়া পেনুর মধ্যে বিবাদ ঘটিল। সে বিবাদের বলে, মনুষ্যের মধ্যেও দুই-দেবতার দুইদল উপাসক হইল। বেয়া পেনুর উপাসকেরা

বলে যে, বেরা পেছ তারাদেবীকে একটি শাপ দেন যে, “তোমার স্বজাতিবেরা (জীলোকেরা) অতি কষ্টে সন্তান ধারণ ও প্রসব করিবে।” তারা-উপাসকেরা বলে যে, “নারাবিনী তারাকে পরাভ করিতে পারেন, এমন কমতা বেরা পেছর নাই। তারাদেবীকে উপাসনার ভূঁই করিতে পারিলে সন্তানের হর্ভাগ্য দূর হয়, স্তত্রাং ইনিই সর্কাগ্রে পূজা।”

বেরা পেছ ও তারাদেবীর এ বিবাদ বড় বেশী দিন রহিল না; মিলন হইলে ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হইল। ইহারও ছয়জন দেবতা বলিয়া গণ্য—(১) গিঙ্কু পেছ—বৃষ্টি বা জল-দেবতা, ইহার কপার কেজে বৃষ্টি হইয়া থাকে, বুরতি পেছ—বসন্ত-ঋতু-দেবতা, ইহার কপার বৃক্ষে নৃতন পত্র ও রস স্কার হয়; পিত্তি পেছ—লাভ ও বুদ্ধি-দেবতা; কলহ বা শিলায় পেছ—সীকার-দেবতা; লোহা পেছ—দৌহ বা বৃক্ষ-দেবতা এবং স্ত্রুদি বা সান্দ্রে পেছ—সীমা-দেবতা। ডিঙ্গা পেছ নামে বেরা পেছর আর একটি পুত্র আছেন, তিনি হিন্দুদের যমের ন্যায় মৃত ব্যক্তির পাপপুণ্যের বিচার করেন।

এতদ্ভাতিত আর এক শ্রেণীর দেবতা আছে, তাঁহার। মায়ামুক্ত আদিমহুবা। তাঁহার। গৃহ, বন, নদী, পর্বত, ওহা ও উদ্যানাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে পূজা পাইয়া থাকেন।

বেরা ও তারাদেবীর বাসস্থান বর্ণ। ডিঙ্গা সমুদ্র পারের একটি পর্বতের উপরে থাকেন—ইহাদের মতে এই পর্বত হইতে সূর্যোদয় হয়। মরিলে জীবকে এই সমুদ্র বৈতরণীর পার হইয়া যাইতে হয়। ইহার। এই পর্বতকে গুপস্বলী বা লক্ষপর্বত বলে। অন্যান্য দেবতার। পৃথিবীতে বাস করেন, কিন্তু মানুষে কাহাকেও দেখিতে পার না,—পশু পক্ষীরা দেখিতে পার। উৎসর্গের ত্র্যবাণি খাইয়াই ইহাদের দেবতাদের চলে, তবে কখন কখন নিজের। আহার।ষেণে পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন। কুবকের কেজে যদি রাঁড়া শিল বা কুল হয়, তাহা হইলেই ইহার। সিন্ধাত করিয়া লয় যে, কোন দেবতা আসিয়া তাহার শত লইয়া গিয়াছেন।

ইহার। প্রতি পূজার বলি দিয়া থাকে। যে পূজার বলির আবশ্যক হয় না, ব্যবহার বশতঃ সে সকল পূজাতেও শূকরহত্যা করে। শূকর ইহাদের নিকট বলি বলিয়া গণ্য নয়; প্রত্যেক পূজোপকরণের অঙ্গ মাত্র।

ইহার। সর্কাপেকা উৎকৃষ্ট বলি পৃথী-দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া থাকে। পৃথী-দেবতার ছইপ্রকারে পূজা হইয়া থাকে। সমগ্র জাতি একত্র হইয়া একপ্রকারে পূজা করে,

আবার প্রত্যেক গৃহস্থও নিজ নিজ ঘরের ভক্ত পূজা দিয়া থাকে। মরবলি ব্যতীত অল্প বলিও ইহাকে দেওয়া হইয়া থাকে। আবারের সময় ও কলস কাটবার সময়ই বলি দিবার নিয়ম, এই সময়ে সামান্য বলিই যথেষ্ট হয়।

পূর্বে কেবল যদি মারীতর বা কৃত্তিক উপহিত হইত অথবা সমগ্রজাতির প্রতিিনিব্বরণ প্রধানের সংসারে কোন-রূপ অকল্যাৎ বিঘ্ন বিপদ ঘটত, তাহা হইলেই মরবলি দেওয়া হইত। সাধারণ লোকেও নিজ নিজ সাংসারিক বিঘ্ন দুর্ঘটনার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও মরবলি দিত। যখন কাহা-কেও ব্যাধি খাইত তখন তাহার পরিবারবর্গের বিখাল হইত যে পৃথীদেবতার একটি মরবলি প্রেরণ হইয়াছে। যদি তৎকালং বলিপাত্র সংগৃহীত না হইত, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ একটি ছাগলের কাপ কাটিয়া সেই রক্ত ভূমিতে ছড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিত যে এক বৎসরের মধ্যে একটি মরবলি দিবে। কেহ কেহবা নিজ পুত্রের কাপ কাটিয়া সেই রক্ত দিয়া ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিত। যদি এক বৎসরে বলিপাত্র সংগৃহীত না হইত, তবে গৃহস্থ নিজের একটি পুত্র দিয়া দেবদান শোধ করিত।

এই সমস্ত দেবতার পূজা সময়ে সময়ে বা নির্দিষ্টকালে হইয়া থাকে। যে সকল ত্র্যবা দেবতাদিগকে উৎসর্গ করা হয়, তাহার প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে।

ইহার। আত্মার অভিয বীকার করে, কিন্তু আত্মাকে গতি ভাগ করিয়া নয়, আত্মার প্রথমাংশ নিজকৃত ক্রকর্মেয় জন্ত সুখভোগ করে, দ্বিতীয়াংশ দুঃখভোগ করে, তৃতীয়াংশ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্থীংশ মুক্ত্যুপে পতিত হয়।

ইহাদের প্রতি গ্রামে পুরোহিত আছে। কেবল বেরা-পেছ বা তারাদেবীর পূজাকালেই পুরোহিতের আবশ্যক হয়। গৃহস্থের কোন কর্ম বা অভ্যাস দেবপূজার প্রতি গৃহস্থের গৃহকর্তাই পুরোহিতের কর্ম নির্দ্ধা করেন। পূর্বে এরূপ ছিল না;—কোন কোন বংশবিশেষ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কোন কোন দেবতাবিশেষের পূজক ছিল, কিন্তু আজ কাল কেবল বেরা পেছ ও তারাদেবীর পূজা ব্যতীত পুরোহিত নামে স্বতন্ত্র লোক নাই। তারা ও বেরার পূজকেরা বৃদ্ধ করিতে পার না, সাধারণ লোকের সহিত একজে বা বাহার তাহার প্রভত ষাণ্যাদিও ভোজন করিতে পার না। এই পুরোহিত যে কেহ হইতে পারে, কিন্তু পুরোহিত হইবার পূর্বে তাহাকে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হয় যে, যখন দেবতাই তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া নিজ পুরোহিত-পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। পুরোহিতগণের কোনরূপ বৃত্তি নাই, কেবল

দক্ষিণার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, তবে তাহারাই শান্তি স্বতন্ত্রন করাইয়া, যদি কেহ পারিতোষিক বা পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু দেয় তবে তাহাও লইতে পারে। হিন্দুপুরোহিতেরা ইহাদের মধ্যে ওকার কার্য্য করে, উপদেবতার আবির্ভাবে তাহারাই আসিয়া ঝড়-ঝুক করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক দৈবজ্ঞের কার্য্যও করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর উড়িয়ারাই এই দৈবজ্ঞ হয়, কিন্তু কর্কশপট ও মুম্বকা নামক স্থানে কল্পদৈবজ্ঞও দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িয়া দৈবজ্ঞেরা (আনি বা দেশোরা) পত্রি ব্যবহার করে; কিন্তু কল্পদৈবজ্ঞেরা শরীরগত লক্ষণালক্ষণ দেখিয়াই মানবের ওভাঙত নির্দেশ করে। উড়িয়া দৈবজ্ঞেরা কোণী প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকে।

পূর্বকালে পৃথীদেবতা ও যুদ্ধদেবতার নিকট নরবলি হইত। বেরা পেছুর উপাসকেরা বেরা পেছকেই পৃথীদেবতা বলে, আর তারাদেবীর উপাসকেরা “তারাকেই” পৃথীদেবতা বলে। ফলে, পৃথিবীর উদ্দেশে নরবলি দিবার সময় উত্তর দলেই একজ হইত বটে, কিন্তু বেরা উপাসকেরা মনে মনে নরবলি দেওয়ার প্রথাও বড়ই ঘৃণা করিত। তারা উপাসকেরা বলে যে, পূর্বে পৃথিবী বড় কঠিন ও আবাদের অমুশযুক্ত ছিল, কোথাও উর্বরতা ছিল না। তারা নিজ ভক্তগণের ছদ্মশা দেখিয়া একটা ক্ষেত্রের উপর নিজ রক্ত ছড়াইয়া দেন, তাহাতেই পৃথিবীর উর্বরতা জন্মে এবং সেই সময় হইতেই তাহার উদ্দেশে ফসল আবাদের সময় ও কাটিবার সময় নরবলি দেওয়া চলিত হয়। কেহ কেহ বলে যে, পৃথিবীর কঠিনতা ও অমুশরতা দেখিয়া সকলে পৃথীদেবতার নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তিনি তাহাদের হৃদয়ে হৃদয়িত হইয়া বলিয়া দিলেন যে, “প্রত্যেক ক্ষেত্রে মনুষ্য রক্ত ছিটাইয়া দাও।” সকলে কিরিয়া আসিয়া একটি বালক বলি দিয়া সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিল। দেবতা পুনরায় আদেশ দিলেন যে এই প্রথা তাহার চিরকাল অবলম্বন করিবে। তখন হইতেই নরবলি চলিত হয়।

নরবলির নাম মেরিয়া উৎসব। মেরিয়া উড়িয়াভাষার কথা, অর্থ—বলিপাত্র। কল্পভাষায় বলিপাত্রের নাম টোকি বা কেকি। পান বা পানওয়া জাতীর লোকেরাই এই বলির পাত্র সংগ্রহ করিত, অর্থ দিয়াই ক্রয় করা নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু অধিকস্থলে চুরী করিয়াই আনিত। কখন কখন বা বলিপাত্র না পাইলে, আনিরা ভনিয়াও ইহার মিল সন্ধানকে পর্য্যন্ত প্রদান করিত।

বলির জন্ত যে কোন জাতীর শ্রী ও পুরুষ উভয়েই নির্বাচিত হইতে পারিত, কিন্তু অন্নবরফা বালকবালিকারাই বলির জন্য সংগ্রহীত হইত। পানেরা নানাহান হইতে বলিপাত্র সংগ্রহ করিত, সময়ে সময়ে একখানে কতকগুলি ধরিয়া আনিরা সঞ্চয় করিয়া রাখিত। বতদিন তাহারাই থাকিত, ততদিন গ্রামের সকলেই তাহাদের উপর লাবণ্য ব্যবহার করিত, আপনারা সর্বদা বেরূপ আহালাদি করিত, তাহা অপেক্ষা ভাল ভাল দ্রব্য খাইতে দিত। বালকবালিকারা স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বেড়াইতে পারিত; কিন্তু অন্নবরফা যুবক যুবতীরা বাটির বাহিরে বাইতে পারিত না। সময়ে সময়ে ইহারাই বলির নিমিত্ত আনীত যুবক যুবতীকে একজ রাখিয়া সহবাস করিতে দিত। এই গর্ভে যে সন্তান জন্মিত, তাহারও ভবিষ্যতে বলির জন্ত ব্যবহৃত হইত।

বলির ১০/১২ দিন পূর্বে ইহার নির্বাচিত বলিপাত্রের মন্তক মুণ্ডন করাইয়া দিত এবং সমস্ত গ্রামবাসী একজ হইয়া স্নান করিয়া বলিপাত্রকে লইয়া পুরোহিতের পবিত্র আশ্রমে গমন করিত। পুরোহিত এই সময়ে দেবতাকে জানাইয়া রাখিতেন যে, বলি প্রস্তুত হইতেছে। পুরোহিতের আশ্রমে তৎপরে ৩ দিন উৎসব হইত। অবাধে নৃত্য, গীত, মদ্যপান, এবং আহালাদি চলিত। এই উৎসবের পর বলি দিবার ঠিক পূর্বদিন বলিপাত্রকে তাহার পূর্বরাজি হইতে উপবাসী রাখিত এবং প্রাতঃকালে বেশ পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইয়া নববস্ত্র পরাইয়া দিত। তৎপরে নৃত্য করিতে করিতে সকলে মিলিয়া পুরোহিতের সঙ্গে তাহাকে বলিহানে লইয়া যাইত। কোন পুরাতন বনের কিয়দংশ এই উদ্দেশে সুরক্ষিত করিয়া রাখিত, কেহ কখন ইহার বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া কুঠারাঘাতে কলঙ্কিত করিত না; লোকের বিশ্বাস ছিল এখানে উপদেবতা বাস করে। এই বলিহানের ঠিক মধ্যস্থলে একটা খোঁটা পুঁতিত এবং খোঁটার দুইপাশে সেই দেশের পাঙ্কিশার নামক কাঁটাগাছ লাগাইয়া দিত। পুরোহিত তৎপরে খোঁটার গায়ে বালককে বসাইয়া বেশ করিয়া রাখিয়া রাখিয়া হালুদ তৈল মাখাইয়া দিত। কল্পদিগের বিশ্বাস ছিল, এই তৈল-হরিজা বা সেই দিনকার বলির পবিত্র অঙ্গপুষ্ট কিছু না কিছু দ্রব্য অতি পবিত্র, অতরাং উপস্থিত প্রত্যেক লোক উহার কিছু না কিছু লইবার জন্ত মহা আগ্রহ প্রকাশ করিয়া হড়াহড়ি করিত। সে নিম্নও বলি লাগায়াজ এইরূপ বাধা থাকিত; অন্ত্যস্ত উপস্থিত লোকেরা আবার আহালাদিও নৃত্য-গীত করিতে প্রবৃত্ত হইত। পরদিন বেলা দুইপ্রহর পর্য্যন্ত এই আয়োজন চলিত। পরে সকলে শান্ত হইয়া কে বল

গান করিতে করিতে বলি দিবস জন্ত প্রস্তুত হইত। বলিকে বাধিয়া হস্তা করি নাই বলিয়া তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া দিত বা অহিকেন সেবন করাইয়া নিশার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। পরে পুরোহিত দেবতার নিকট শস্তের, পুস্তকভার, পবাদি পালিতপণ্ডপক্ষীর বহুলপ্রার্থনা এবং সর্গবায়াদির সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্তও তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত প্রার্থনা করিত। দর্শকেরাও এই সময়ে সকলে স্ব স্ব অতীত সিদ্ধির জন্ত প্রার্থনা করিত। পরে পুরোহিত সাধারণের মধ্যে এই বলি দিবস ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়া ইহার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিত। তৎপরে পুরোহিত ও বলিপাত্রের তর্কবিতর্ক চলিত। পুরোহিত বলিকে বলিত, একজনের প্রশ্ন লইলে যদি এতগুলি লোকের উপকার হয়, সমস্ত দেশের উপকার হয়, আর যখন এই জন্তই তাহাকে ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে তখন সে আর কি বলিয়া অল্পযোগ করিবে। বলি বলে,—আমাকে ভুলাইয়া আনা হইয়াছে, আমার দাসত্ব করিতে হইবে বলিয়া আনা হইয়াছে। আমি নিজে আত্মবিক্রয় করি নাই, অপরে আমাকে বিক্রয় করিল কিরূপে—ইত্যাদি। শেষে পুরোহিত কোনরূপে তাহাকে বুঝাইয়া দিত। ইহার পরই পুরোহিত গ্রামের ছুই এক জন প্রাধানের সহিত একটা গাছের কাঁচা ডাল কাটিয়া মধ্যভাগ পর্যন্ত চিরিয়া ফেলিত এবং সেই চেরা-কাঁচকে বলির গলা পরাইয়া দিয়া যে দিকে ছুইটা মাথা ফাঁক হইয়া থাকে, সেই দিকে দড়ি বাধিয়া, পুরোহিত ও প্রাধানেরা মিলিয়া কসিয়া বাধিত পরে পুরোহিত স্বয়ং কুঠার দিয়া গলা কাটিয়া ফেলিত। এইরূপ গলা কাটিবার পূর্বেই সকলে মিলিয়া বলিকে বলিত যে, দেবতার প্রীত্যর্থ আমরা তোমাকে অর্ঘ্য দিয়া কিনিয়া আনিয়াছি, অতএব তোমাকে মারিলে সে পাপ যেন আমাদের হয় না। তৎপরে দর্শকেরা মস্তক ও উদর ব্যতীত শরীরের প্রত্যেক অংশের মাংস হাড় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অবশিষ্টাংশ পরদিম পুড়াইয়া ফেলিত। চিত্তার উপর একটা সেব বলি দেওয়া হইত, চিত্তার ছাই লইয়া সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিত এবং সেই ছাই গুলিয়া ময়ূরী ও গৃহাদির মেঝের লেপিয়া দিত; ইহার পর বলির পিতাকে বা সংগ্রহকারকে একটা বাঁড় উপহার দিয়া, অল্প একটা বাঁড় মারিয়া সকলে মিলিয়া মহা আনন্দে একত্র আহারাদি করিত। এই ভোজের পর উৎসব শেষ হইত। এক বৎসর পরে, পর বৎসরের সেইদিন তারা দেবীর উদ্দেশে একটা শূকর বলি দেওয়া হইত।

কোন কোন জেলায় বলিকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিত। প্রবাদ ছিল যে, বলির চক্ষে বত জল পড়িবে পৃথিবীতে

হুড়ুটি তত বেশী হইবে। চিরাকেনেতি নামক স্থানে বলিকে টানিয়া লইয়া অর্ঘ্যবস্ত কছেরা গ্রীৎকার করিতে করিতে হাড় হইতে মাংস লইয়া শস্তের সহিত মিলাইয়া রাখিত, ইহাতে নাকি আর শস্তে পোকা লাগিত না। মাজিবেশে (বোধ ও পাটনার মধ্যে) বলির দিন কছেরা হাতে বাত্মনির্মিত ভাঙ্গি ভাঙ্গি বলর পরিমা (এ বালা এই সময় কিনিতে পাওয়া বাইত) সেই বলর দিয়া বলির মাখান সবলে প্রত্যেকে আঘাত করিত। ইহাতেও যদি তাহার মুত্বা না হইত, তাহা হইলে বংশধও দিয়া বলির ঝাণরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিত। তৎপরে প্রত্যেকে এক একটুকরা মাংস লইয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রের ধারে নদীতীরে খোঁটার খুলাইয়া রাখিয়া দিত এবং অবশিষ্টাংশ মাটিতে পুঁতির ফেলিত। ইহারা প্রতিবৎসর আবার বলিপাত্রের প্রাক্ক করিত।

সাধারণতঃ কল্পজাতির নিয়ম ছিল যে বলির মাংস লইয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে পুঁতির রাখিলে ক্ষেত্রের দোষ নষ্ট হইত। তারা-উপাসকেরা যদি সংবাদ পাইত যে কোন গ্রামে মেরিয়া উৎসব হইবে, অমনি ৫০।৬০ কোশ দূর হইতে ডাক বসাইয়া বলির মাংসখণ্ড স্বগ্রামে লইয়া আনিত। যে দিন বলি হয়, সেইদিনই মাংস লইয়া স্বগ্রামে পৌঁছিতে পারিলে বিশেষ উপকার বোধ করিত।

অমপুরনামক স্থানে পূর্বে মাণিকসোরা নামক যুদ্ধ দেবতার নিকটেও নরবলি হইত। ৬ ফুট উচ্চ শক্ত কাঠের খোঁটা পুঁতির তাহার নিকট আগ্রশস্ত করিয়া একটা নালা কাটিয়া রাখিত। ইহাতে বলির মস্তক মুণ্ডিত হইত না, লম্বা লম্বা চুলগুলি খোঁটার গায়ে এমন করিয়া বাধিয়া দিত, যে মুণ্ড কাটিবামাত্র নিয়মুখে যেন সেই নালার মধ্যে পড়িয়া যায়। পরে বলির দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া পুরোহিত বুকজয়ের জন্ত, অত্যাচারী রাজা ও রাজ-কর্মচারীগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রার্থনা করিত। একটি করিয়া প্রার্থনা শেষ হইত আর এক একবার মাড়ে অস্ত্রাঘাত করিত, এক আঘাতে কাটিয়া ফেলিত না। এই আঘাতেও বলিকে মারিয়া ফেলিত না। শেষে সকলে তাহার কাণের কাছে গিয়া বলিত, “আজ তোমার কি ভাগ্য যে, মাণিকসোরা দেবতা আমাদের সমুখে তোমাকে খাইয়া ফেলিবেন। আমরা তোমার প্রাক্ক ভাল করিয়া করিব।” যদি বলি ছট্‌কট করিত, তাহা হইলে বলিত—অপরাধ লইও না, আমরা এইজন্যই তোমাকে কিনিয়া আনিয়াছি।” ইহার পর মাথা কাটিয়া লইয়া শরীরটা

পুঁতিয়া কেলিত। সুওটা এক বোটার স্কাইয়া রাখিত। শুমনর, বোদ, চিরােকেনডি, জরপুর, পাটনা ও কালা-হাটী প্রদেশে এইরূপ বলি হইত।

কক্সেরা বলাতীয়া জী সহজে পার না, অধিক স্ক্যু দিয়া ক্রয় করিতে হয় বলিয়া ইহার কক্সা সন্তানকে অতি যত্ন করে। পূর্বে কক্সহলের মধ্যপ্রদেশের কক্সেরা কক্সা-হত্যা করিত এবং অজ্ঞাত স্থান হইতে পত্নী সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিত। ইহার বলিত যে, কক্সা-সন্তান হত্যা করিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। পুত্রসন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও বিদেশীর জী বিবাহ করার জাতীর বল বীর্ঘ্যের হানি হয় না। সুম্কা, কর্ণপট, রায়পুর প্রভৃতি স্থানে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কক্সা জমিলে দৈবজ্ঞেরা আসিয়া তাহার ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া দিত। শুভ না হইলে কন্যাটিকে লইয়া পুঁতিয়া কেলিয়া তরুণি একটা পক্ষী বলি দিত।

১৮৩৬ সালে শুমনররাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজেরা ইহাদের রাজ্যে প্রবেশ করেন। লেকটেনাণ্ট ম্যাককার্সন কোশলে ইহাদের নরবলি ও কন্যাহত্যার প্রথা উঠাইয়া দেন। প্রথমে বোদ প্রদেশের রাজার উপর এই ভার দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে থাকে, শেষে সর্দারেরা নিজ নিজ গ্রামের সক্তি বলিগুলিকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিয়া বলে যে, আমরা এ প্রথা ত্যাগ করিব না, তবে নূতন সম্রাটকে এইগুলি সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া উপহার দিলাম। ইংরাজেরা একজাতির নিকট এইরূপ ফল পাইয়া অপর জাতির সহিতও ঐরূপ সম্বন্ধ বন্ধোবদ্ধ করিলেন। অবশেষে তাহার সন্তের নিয়ম কাটা-ইয়া ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বলপ্রকাশ করিয়া ঐ নিষ্ঠুর প্রথাগুলি রহিত করিয়া দিলেন। ম্যাককার্সন প্রথমতঃ তাহাদিগকে বদ্ধভাবে হস্তগত করিয়া কোশলে তাহাদের জাতিগত বিবাদ মিটাইয়া দিয়া বুকাইয়া দিলেন যে, ইংরাজেরা নিজের লাভের জন্য কিছু করিতেছেন না, কেবল কিলে তাহাদের উপকার হইবে, তাহাই খুঁজিতেছেন। সর্দার ও প্রবানেরা ইহাতে তাহার অনেকটা বশীভূত হইয়া পড়িল, কাজেই তিনিও জুখিয়া পাইয়া তাহাদিগকে কোনরূপে দোষী না করিয়া কেবল কাহারো বলিপাঙ্গ সংগ্রহ ও বিক্রয় করিত, তাহাদিগের উপর কঠিন শাস্তি দিবার বন্ধো-বদ্ধ করেন। ইহা হইতেই ঐ নিষ্ঠুর প্রথার মূলে বা পড়িল।

ম্যাককার্সনই ইহাদের মধ্যে জাতিগত বিবাদ মিটাইয়া

পরস্পর সন্তোষ স্থাপন করিয়া দেন। তিনি অর্থ ব্যবহার, রাস্তা প্রভৃতি ও অল্পে অল্পে বিক্রয়প্রথা প্রবর্তিত করেন।

একণে কক্সেরা ইংরাজের অধীনে বাস করিতেছে। ইহার কাছাকেও কোনরূপ কর দেয় না। ইংরাজ পক্ষ হইতে একজন তহসীলদার একজন পুলিশসৈন্য লইয়া কেবল শাস্তিরক্ষা করিয়া থাকেন মাত্র। প্রত্যেক বিভাগে ইহাদের পুরুতনরাজবংশই রাজ্য করিয়া থাকেন, এই সকল রাজারা সকল প্রকার বিচারাদিও করিয়া থাকেন। ইহার এ প্রদেশের করদরাজগণের সুপারিন্টেন্ডের অধীন। এই রাজারা কিছু কিছু কর দেন বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য। ১৯টি রাজ্য হইতে কেবল ৮৫ হাজার টাকা আদায় হয় মাত্র।

কক্সহল। উড়িষ্যা ১৯টি করদরাজ্য মধ্যে বোদরাজ্যের দক্ষিণবিভাগের নাম কক্সহল। এইস্থানেই কক্সজাতির সংখ্যা অধিক। কক্সহল ব্যতীত, বোদরাজ্যের অন্ত অংশে ও দশ-পন্নী, নয়াগড় প্রভৃতি রাজ্যে কক্সজাতি বাস করে। ইহার বড় সরল, শীকার করিতে ভালবাসে। যাহারা ইহাদের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে, তাহাদের সহিত ইহাদের বেশ বনে। ইহাদের সামাজিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ইহার বড় চট্টা বায়।

কক্সহলে কক্সব্যতীত ডোম্‌না নামে আর একশ্রেণীর পার্শ্বতা জাতি বাস করে। সাধারণতঃ ইহারাই কক্সগণের পুরোহিতের কার্য করিয়া থাকে। কোন কক্স ব্যাঙ্গ কর্তৃক বিনষ্ট হইলে, তাহার পরিবারেরা জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। ডোম্‌না পুরোহিতেরা মনে করিলে, তাহাদের সমস্ত বিষয়াদি লইয়া আবার জাতিতে তুলিয়া লইতে পারে।

কক্সহল কেবল বহুর মালভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতে আকীর্ণ। এখানে গ্রামের সংখ্যা অতি অল্প এবং প্রতি গ্রামের মধ্যে পর্বতমালা বা ঘন বন ব্যবধান থাকে। এই প্রদেশের সমস্ত ভূভাগে কক্সজাতির একাধিপত্য। ইহার বলে যে, এক সময়ে সমস্ত বোদরাজ্য ও ইহার চতুঃপার্শ্বের অন্যান্য রাজ্যাদিও ইহাদের অধীন ছিল, কাগক্রমে অপরে সে সমস্ত জয় করিয়া লইয়াছে। বিজেতাদিগের নিকট ইহার কখন অধীনতা স্বীকার করে নাই, অজ্ঞেই অন্যায় করিয়া তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিয়াছে মাত্র, সুতরাং সমস্ত ভূভাগের উপর বহুদিন অতীত হইলেও তাহার সন্তপ্ন হইতে পারে না। কক্সের বলে যে সমস্ত পুরের অন্তর্গত সবলে-ইয়া নামক জনপদই তাহাদের আদি বাসস্থান ছিল, ক্রমশঃ তাহার বিতাড়িত হইয়া এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

কঙ্করহন কোনকালে বোদরাজের বক্তব্যীকার করে নাই। ১৮৩৬ সালে ইংরাজরাজ ইহাদের মধ্যে নরবলি প্রথা নিবারণ করিবার জন্য বোদরাজকে বাধ্য করেন। বোদরাজ নিজেকে সন্মত করতাকার্য্য না হইয়া এই প্রদেশ ইংরাজ-রাজকে ছাড়িয়া দেন। ইংরাজ এ দেশ হতে লইয়া কেবল ঐ নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইয়া দিয়া শাস্তিরক্ষা করিয়া আসিতেছেন রাজ। এ দেশের লোকেরা ইংরাজকে কোন-রূপ কর দেয় না বা ইংরাজও কোন রকম কর লয়েন না। একজন তহসীলদার নিযুক্ত আছেন, তিনি একদল পুলিশ সৈন্য লইয়া শাস্তিরক্ষা ও বাহাতে কোনরূপ রক্তপাত না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। বোদরাজ এ প্রদেশের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না।

এ প্রদেশের প্রধান উপর—হরিজা। এখানকার হরিজার তুল্য ভাল হরিজা কোথাও জন্মে না। ব্যবসায়ীরা ভাল হরিজা পাইবার জন্য দেশের অতি অভ্যন্তরে এমন কি পর্ব্বতের উপরে পর্য্যন্ত গিয়া থাকে।

এখানে এখনও কঙ্করদিগের প্রাচীন রীতিনীতি চলিত আছে। এখনও যে জাতি বড়টা জমী চাষ করিতে পারে, তাহার অধীনে ততটা জমী থাকে এবং কোন জমীতে যে গৃহস্থ সর্কাপেক্ষা অধিক দিন ভোগ দখল ও চাষবাস করিতেছে, সে জমী তাহারাই বংশাধিকারিক ভোগ দখলে থাকে। প্রত্যেক জমীখণ্ড যে যে বংশের বা গৃহস্থের অধীনে থাকে, তাহারই তাহাতে একাধিপত্য জন্মে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে কোন রাজা বা জমীদার নাই যে, সে এই সকল জমীর উপর কোনরূপ কর আদায় করে। প্রত্যেক গৃহস্থই স্ব স্ব জমীর জমীদার, ইহার অন্য কাহাকেও কোনরূপ কর দিতে হয় না। প্রত্যেক গ্রামের বা পল্লীর যে সর্দার বা প্রধান আছে, তাহাদের সহিত জমীর কোন সংশ্লিষ্ট নাই। তাহারা কেবল অপর সাধারণের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র স্বরূপ পঞ্চায়তে উপস্থিত থাকে।

এ দেশে কঙ্করা একস্থানে করেক ঘর গৃহস্থে মিলিত হইয়া ঘর বাঁধিয়া বাস করে। এইরূপে একটা পল্লী হয়, করেকটা পল্লী লইয়া গ্রাম হয়। প্রত্যেক গ্রামবাসীর জমী বা চাষবাসের ক্ষেত্রাদি গ্রামের চতুর্দিকে থাকে। এই সময়ের উপর একজন প্রধান থাকে।

কঙ্করা (পুং) কং জগৎ পিরো বা ধারমতি কং-ধ-অচ্।

১ যেষা। ২ ধারিণ শাক, নটেশাক। ৩ গ্রীবা।

কঙ্করা (স্ত্রী) কং পিরো ধরতি, কং-ধ-অচ্ টাপ।
গ্রীবা।

কঙ্কি (স্ত্রী) কং পিরঃ জলবা প্রিয়তে বজ্র, কং-ধ-কি।
১ গ্রীবা। (পুং) ২ সমুদ্র।

কঙ্ক (স্ত্রী) কঙ্কতে প্রাপ্যতে হৃৎস্বদেশ, কন-ক। ১ গাণ।
২ মুচ্ছা।

কনুচি (কং-চু-চি)। ভগবান্ মহা দেবন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্তক, মহাত্মা কনুচি সেইরূপ চীনদেশের কি ধর্ম্ম, কি রাজ্য, কি নীতি, কি আচারব্যবহার, সকল বিষয়েরই নিয়ম-বিধির প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাদাতা। মহাপ্রবর্তিত ধর্ম্মশাস্ত্র শত শত বৎসরের প্রাচীন হইলেও হিন্দুর আজও যেমন শিরোধার্য্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছে, সেইরূপ মহাত্মা কনুচির ধর্ম্মশাস্ত্র আজিও অক্ষয়, অব্যয়, অচলভাবে সমান-বলে চীনদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। কালের প্রভাবে হিন্দুর রীতি নীতি স্থানবিশেষে মানবশাস্ত্র হইতে বর্তমান সময়ে কতকটা তির্য্যক ধারণ করিয়াছে, কিন্তু মহাত্মা কনুচির শাস্ত্র এমনই সর্ব্বকালোপযোগী ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অবলম্বনোপযোগী যে, আজ প্রায় তিন হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, তবুও তাহার একটুও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহার প্রদত্ত শিক্ষার এমনই অক্ষয় ফল ফলিয়াছিল যে আজিও চীনের ন্যায় বৃহৎশাস্ত্রালয়ের কোন সামান্য অধিবাসীও সে শিক্ষা ভুলিয়া অস্ত্র মত অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহারই শিক্ষাশ্রমে চীনবাসীরা প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া জগতের মধ্যে সর্কাপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতাবিদ্যমানী উন্নতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, “উচ্চ আশার অহুসরণ করিয়া তৎসিদ্ধির চেষ্টাতেই মানুষ উন্নত হইয়া থাকে” কিন্তু চীনবাসীকে দেখিলে তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয়, কারণ মহাত্মা কনুচির শিক্ষাবলে “উচ্চ-আশা” কাহাকে বলে, আজিও ইহার তাহা জানেনা, অথচ তিন হাজার বৎসর পূর্বে তাহার উক্ত মহাত্মার নিকট যে উপদেশ পাইয়াছিল, তাহারই অহুসরণ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে আজ ধার্ম্মিক, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শাস্তিপ্রিয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

মহাত্মা কনুচি ঈশ্বরপ্রদে উদারমীন হওয়া অপেক্ষা মানবজীবনের মনোহারিতা ও চমৎকারিতা সম্পাদন করাকেই মানবের কর্তব্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন—ঈশ্বর, যিনি অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, অব্যয়-সংগোচর, তাঁহাকে পাইবার জন্য বৈরাগী হইয়া পিতৃমাতা আত্মীয় স্বজন পুত্রকন্যা পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ অনন্য-সাহসিক ও অতিমাত্রাবিক্রিয়াকলাপের অহুতান করা

অপেক্ষা ইহজীবনের বৈচিত্র্যতা ও মনোহারিতা সম্পাদন করাই মুক্তিসম্বন্ধ।” মহাত্মা কনুহুতি একজন যে কেবল লক্ষ্য-দেপক, দার্শনিক, বিবেক, নীতিকুশল ব্যক্তিমান ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার বর্ষাৰ্থ ব্যক্তিত্ব ও স্বাভাব্য ছিল। তাঁহার কার্য যে প্রাচীনকাল হইতে লোককে চমৎকৃত ও তত্ত্বমুগ্ধ করিয়াই পর্যাবসিত হইয়াছে, তাহা নহে—আজও তাঁহার কার্যের ফল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিকাংশ অধিবাসী-সম্বন্ধিত রাজ্যে অনুরূপ ভাবে ফলপ্রসূ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রবর্তিত রীতিনীতি আজিও চীনদেশে সম্রাট হইতে সামান্য ভিক্ষুক, কর্তৃক সমান সম্মানের সহিত প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার উপদেশের প্রভাব রাজ্যের সকল স্থানেই আজিও সমান প্রবলতার সহিত প্রচলিত রহিয়াছে।

যে সময়ে এই মহাত্মা চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে চীন সাম্রাজ্য এখনকার মত বিস্তৃত ছিল না; বর্তমান সাম্রাজ্যের এক-বর্ষাংশ মাত্র ছিল। রাজ্যের সর্বত্র সামন্তপ্রথা প্রচলিত ছিল। সমস্ত রাজ্যটি তখন ১৩টি প্রধান ও অন্ত্যস্ত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল। পূর্বকালে যুরোপাদি মহাদেশে যে প্রকার সামন্তপ্রথা ছিল, প্রাচীনকালের চীন দেশে ঠিক সে প্রকার ছিল না। তিনটি বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইত। প্রথমতঃ সম্রাটবংশের বহুদিনাবধি পরিবর্তন না হওয়ার তাঁহার উদ্যম, অধ্যবসায় ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার অধীনস্থ সামন্তরাজগণের মধ্যে শাস্তিরক্ষা করিতে পারিতেন না। এইরূপে ক্রমাগত পঞ্চশতাব্দী অতীত হইয়াছিল। সামন্ত-রাজগণ ও তাঁহাদের অধীনস্থ সর্দারগণ বা ভিন্ন ভিন্ন বংশের মধ্যে চিরবিবাদ বহুস্থল ছিল। সর্দার যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় দেশের মধ্যে, হুঃখ, কষ্ট, দুর্ভিক্ষ ও কু-শাসন সর্দার বিরাজ করিত। দ্বিতীয়তঃ, বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, জীলোকেরা নিত্যন্ত হেয়বৎ ব্যবহৃত হইত, তাহাদিগের উপরে নানারূপ নিষেধ বিধি ও বাধা প্রবর্তিত ছিল। ইহা লইয়া যে কত বড়মত, গৃহবিবাদ, রাজ্যে রাজ্যে, বংশে বংশে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিত, কত খুন হইত, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। তৃতীয়তঃ, ইহাদের মধ্যে স্থির ধর্ম বিশ্বাস ছিল না, ইহারা প্রাচীন যুরোপীয়দের মত ভাইনী, ভৃত্য, প্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিত না কিংবা কোনরূপ ধর্ম মত পরিবর্তন লইয়া দেশের মধ্যে বিপ্লব ঘটাইত না বটে, কিন্তু ইহারা পৃথিবীর অতীত আর কিছু আছে কি না তাহা বুঝিত না। কার্যতঃ তাহা বিশ্বাসও করিত না। তাহারা বর্গ নরকাদি কিছুই জানিত না, স্ত্রতরা তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোনরূপ কামনা বা যুগাও ছিল না।

যে সময় কনুহুতির জন্ম হয়, তখন চীনরাজ্যে চাউ বা হু-বংশ সম্রাটগণের অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে সময় হইতে চীন-দেশের ইতিহাস পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই রাজবংশই তৃতীয়। এ সময়ে ইহাদের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল এবং শাসনদণ্ড দৃঢ়ভাবেই ইহাদের হস্তে স্তম্ভ ছিল। ইহাদের সময় ৫ শ্রেণীর সামন্তসর্দার ছিল। ইহারা সকলেই সম্রাটকে কর ও সৈন্ত দ্বারা সাহায্য করিত।

যদি সম্রাট অধ্যবসায়সম্পন্ন, উৎসাহী ও ক্ষমতাবান না হন, তাহা হইলে রাজ্যে স্বতাব্যতাই বিশৃঙ্খলা ঘটয়া থাকে। এই সময় চীনেও সেই দশা ঘটয়াছিল। সাধারণতঃ শাসনকার্য্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে অগ্নে অগ্নে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইতেছিল।

কিন্তু এই মল সময়ও চীনদেশে সাহিত্যচর্চা ও শিল্পচর্চার বেশ উন্নতি পাইতেছিল। সম্রাটের সভা হইতে সামান্য সামন্তের সভাতেও গায়ক ও ঐতিহাসিক সর্দার উপস্থিত থাকিত। শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়াদির দ্বার পাঠাগারও যথেষ্ট ছিল।

খৃষ্টের ৫৫০ বা ৫৫১ বৎসর পূর্বে লু-রাজ্যে * মহাত্মা কনুহুতি জন্মগ্রহণ করেন। শীতকালে ইহার জন্ম হয়। ইহার বংশগত উপাধি বা নাম কং বা কনু। দেশের লোকে পরে ইহাকে কনুহুতি (কং-হুতি) অর্থাৎ দার্শনিক বা শিক্ষাদাতা কং বলিয়া ডাকিত।

ইহার পিতার নাম হেই, † তিনি তৎকালের একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন, ইতিহাসেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়, তাঁহার ভুল্য সাহসী ও বলবান পুরুষ অভি অন্নই ছিল। খৃঃ পূঃ ৫২২ অব্দে যখন তিনি পেই ইয়াং নগর অবরোধ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন বিপক্ষ পক্ষীর একদল লোক কোশলপূর্বক নগরের দ্বার যুদ্ধ করিয়া দিল। তাহাদের

* এই লু-রাজ্য বর্তমান শাং-প্রদেশের অন্তর্গত। এখানে কামান নামক নগরে কনুহুতি জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে যুরোপেও পণ্ডিত-এবং পিথাগোরাস খ্রীঃ দিখ্যাবুদ্ধি বিস্তার করিয়া প্রভুত বশোভা করিতেছিলেন।

কংহুতি বড় সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার জন্মকালে চীনদেশে চাউ বা হু নামক তৃতীয় রাজ-বংশ রাজত্ব করিতেছিল। এই বংশের পূর্বে “সান” নামক দ্বিতীয় রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছে। সেই রাজবংশের নগরবিধিত নবাই তির নামক রাজার বিখ্যাত স্থলীসম্পত্তি কনুহুতির জন্ম হয়।

† কেহ কেহ বলেন ইহার পিতার নাম দাংকোং হেই। ইনি জীবদ্দশায় লু-রাজ্যে কোন প্রধান কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইচ্ছা যে, অবরোধকারীরা নগরমধ্যে প্রবেশ করিবারাজ অবনিহার বন্ধ করিয়া দিবে। বটনাও তাহাই ঘটিল। সমস্ত সৈন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সৰ্ব্ব পক্ষান্তে যেইও প্রবেশ করিতেছিলেন, আর ঠিক সেই সময়ে বিপক্ষীরেরা কটকের ভীষণ হার ফেলিয়া দিল। যেই দেখিলেন মহা বিপদ। তখন তিনি নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিজ কুজবলে সেই বিরাট কপাট টানিয়া ধরিয়া রহিলেন এবং অগ্নিকারিগণকে নগর হইতে বারিহে বাইতে আদেশ দিলেন।

কনুচ্চির যাতার নাম ইটেল চিং-সাই, ইনি চীনদেশের তখনকার “ইয়েন” নামক এক প্রাচীন মহাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হেইর বয়ঃক্রম বখন ৭০ বৎসর তখন তিনি ইহাকে বিবাহ করেন, কাজেই লোকে ভাবিয়াছিল যে, ইহাদের আর সন্তানাদি হইবে না। অবশেষে বখন মহাত্মা কনুচ্চি জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন বুদ্ধ দম্পতির প্রতিবেশী-বর্গের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

কনুচ্চির জন্মকালের অনেকগুলি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। চীনগ্রন্থকারেরা এ সবকে স্ব স্ব গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অস্ত্রান্ত্র প্রবাদের মধ্যে নিরলিখিত বিষয়ট সকল গ্রন্থকারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—যে দিন কনুচ্চি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পূৰ্ণরাত্রি চিং-সাই একটি স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্নের উপদেশ মত তিনি একটি পৰ্ব্বত-শুভায় গিয়া উপনীত হন। এই শুভা মধ্যে তিনি দৈত্যগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। এইখানে দৈত্যেরা চিং-সাইকে তাহার পুত্রের মহিমা ও ভবিষ্যৎ বশঃ এবং সম্মানের কথা বলিয়া দেয় এবং অঙ্গরার হস্তে মহাত্মা কনুচ্চি জন্মগ্রহণ করেন।

ইহার বাল্যজীবনী সব্বক্ষে আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। তবে বাল্যকাল হইতেই ইহার দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি আস্থা ছিল। তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি পিতৃহীন হন, তখনও ইহার পিতামহ জীবিত ছিলেন। শেষে বতই বয়স হৃদে পাইতে লাগিল, ততই তাহার ইতিহাস পাঠে আত্মরক্তি বাড়িতে লাগিল।

এই অল্পবয়সেই তাহার মাহাত্ম্যের পূৰ্ণ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইত। বাল্যকালে ইহার বেশ-প্রচলিত ধর্ম বিধান ও আচার ব্যবহারের প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল। তাহার নিজের প্রাণে ভক্তি এতদূর প্রবল ছিল যে, অগ্রে ইষ্টদেবের পূজার্কনাপূৰ্ণক তাহাকে নিজ আবাস্য নিবেদন না করিয়া কোনমতেই ভোজন করিতেন না।

কনুচ্চির পিতামহ অতি ধার্মিক এবং পরম পণ্ডিত

ছিলেন, বাল্যকালে তাহারই নিকট ইহার শিক্ষা বিধান হইয়াছিল। পিতামহের প্রবৃত্ত শিক্ষাবলে কনুচ্চি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহার সদাশয়তার অনুকরণ করিতে বিশেষ যত্ন করিতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর কনুচ্চি ৩৭-কালীন চীন-পণ্ডিতাগ্রগণ্য “চেং-সি” নামক পণ্ডিতের শিষ্য হন। স্বীয় অপরিসের হৃদে ও মেধাবলে ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই কনুচ্চি অসাধারণ বিদ্বান হইয়া উঠেন। ১৫ বৎসর বয়সেই ইনি ইয়াও ও সান নামক সম্রাটের স্নতি নীতিগুণ্ড প্রাচীনগ্রন্থ ও শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

১৯ বৎসর বয়সে ইনি শানরাভ্যের এক কুমারীকে বিবাহ করেন, কিন্তু জীব সন্ততি অধিক দিন একত্র বাস করেন নাই। একটি পুত্র সন্তান হইবামাত্র ইনি জীবন পরিত্যাগ করেন।

বিবাহের পর ইহার গুণরাশি প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে চীনদেশে সাধারণের জন্ত একটি শতভাণ্ডার ছিল। যে ব্যক্তি সৰ্ব্বাপেক্ষা ভাণ্ডারপূরণ হইত, তিনিই এই ভাণ্ডারের ভার পাইতেন। এই সময় কনুচ্চিকে এই পদ প্রদান করা হইল। কনুচ্চি পিতার মৃত্যুর পর তাহার বংশ-গত কোলীন্যমর্যাদা ব্যতীত আর কোন পৈতৃক ধনে অধিকারী হইতে পারে নাই, কাজেই অন্নচেষ্টার ইহাকে এই কর্ম স্বীকার করিতে হয়। পর বৎসর ইহার পনো-রতি হয়,—ইনি সাধারণ জমী ও ক্ষেত্রের অধ্যাক্ষতা লাভ করেন। এই সময়ে ইহার পুত্রের জন্ম হয়। কনুচ্চি তখন দেশের মধ্যে এতদূর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে, তৎপকার প্রধান সামন্ত তাহার পুত্র ভূমিত হইয়াছে শুনিয়া একটি পুষ্করিনীর মৎস্ত উপহার পাঠাইয়া দেন। এই ঘটনা হইতেই কনুচ্চি পুত্রের নাম “লি” বা “পিয়া” (পুষ্করিনীর মৎস্ত) নাম রাখেন।

এই সময়ে চীনদেশের অবস্থা বড় শোচনীয়। ন্যায়পরতা বেশ হইতে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল, অত্যাচার ও অবিচার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মন্ত্রীরা রাজাকে বিনাশ করিয়া, পুত্র পিতাকে মারিয়া রাজ্য অধিকার করিতেছিল। কনুচ্চি এই সকল দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেন, অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বজাতির চরিত্র যেমন করিয়াই হউক সংশোধন করিয়া দিবে।

নিজ প্রতিজ্ঞা সকল করিবার জন্য কনুচ্চি উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিলেন জী একটি বিষয় অন্তরায়। এ সময়ে জী-পুত্রের দ্বাৰায় সংসারে অন্তরায়।

থাকিলে কোন কার্যই হইবে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া কনুহুচি জী-পুত্র এবং রাজকার্য পরিচাল্য করিয়া সাধারণকে শিক্ষাদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার মাতা জীবিত ছিলেন, কাজেই গৃহ পরিচাল্য করিয়া বাইতে পারিলেন না। বাড়ীতে থাকিয়াই ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এ সময়ে ইনি প্রাচীন শাস্ত্রই শিক্ষা দিতেন, বুঝিয়াছিলেন যে, বাহা কিছু প্রাচীন গ্রন্থমতঃ তাহার প্রতি লোকের দৃঢ় অহুতাগ জন্মাইতে পারিলে ও সেই সকল বিধি-নিষেধাদি প্রত্যেকের দ্বারা প্রতিপালন করাইতে পারিলে, লোকের চরিত্র বা মন ক্রমশঃ সংস্কারের দিকে ধাবিত হইবে। এই সময়ে ইনি কার্যভার পরিচাল্য করিয়াছিলেন, ছাত্রেরা যে বাহা বৎসামান্য বেতন প্রদান করিত, তাহাই অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন।

২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কনুহুচি শিক্ষকতা অবলম্বন করেন। এই বৎসরেই (খৃঃ পূঃ ৫২৮) ইহার মাতৃবিয়োগ হয়। এই ঘটনার ইহাকে সমস্ত কার্য হইতে বিরত হইতে হইল, কারণ তখন চীনদেশে প্রথা ছিল যে, পিতামাতার মধ্যে বাহারই হউক একজনের মৃত্যু হইলে সে অশোচকালের মধ্যে কোনরূপ কার্য করিতে পাইত না। কনুহুচি নিজে প্রাচীন রীতি নীতি পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য আপগণে চেষ্টা করিতেছিলেন, সুতরাং এক্ষণে নিজে সেই প্রাচীন নিয়মাদি পালন করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না।

এতদ্বির কনুহুচি আরও স্থির করিলেন যে নিকটবর্তী কোন পণ্ডিত জমীতে নীরবে যাত্বেহ সমাহিত না করিয়া, রীতিমত আরোজনে ও মহোৎসবে অস্তোষ্টিক্রিয়া সমাধা করিবেন। বন্দোবস্তও সেইরূপ হইল, দেশের সাধারণ লোকে দেখিয়া ভাবিল যে যখন প্রাচীন-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতবর কনুহুচি এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, তখন ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত কার্য এবং আমাদেরও অবলম্বনীয়। কনুহুচির গুরু উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশের লোকের প্রাণে ধারণাশক্তি এতদূর হ্রাস হইয়া গিয়াছে, যে কেবল উপদেশ দিলে তাহাদের দ্বারা কোন কাজ হইবার নহে, সেই জন্যই তিনি নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রাচীন শাস্ত্র নীতিগুলি প্রতিপালন করিতেন। এই ঘটনার পর একান্ত হীনাবস্থার লোক ব্যতীত সকলেই ব ব অবস্থায়ারে অস্তোষ্টিক্রিয়ার উৎসব করিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রথা আজিও চলিতেছে।

কনুহুচি অবশ্য আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। অস্তোষ্টিক্রিয়ার যে প্রথা প্রচলিত করেন, তদ্বধ্যে একটি সিরস্ব প্রতি

জ্বলয় করিয়া গিয়াছেন। মৃতব্যক্তির প্রতি ভক্তিপ্রদা দেখাইবার জন্য সমাধিস্থলেই হউক বা এতদূরদেশে নির্দিষ্ট নিজ বাড়ীর কোন গৃহেই হউক গৃহস্থকে মৃতব্যক্তির জন্য কতকগুলি ক্রিয়া এবং তাঁহার শ্রুগাদিকীৰ্ত্তন করিতে হয়। ইহা হইতে বর্তমানকালে চীনদেশে আগমন সাধারণের মধ্যে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে বার্ষিক উৎসব ও প্রত্যেকের বাড়ীতে “পিতৃপুত্রের গৃহ” নামে একটি গৃহ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

এইরূপে কনুহুচি যখন দেখিলেন যে, স্বীয় উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন ইনি কতকটা আশ্বাসে ও আশায় মুগ্ধ হইয়া কার্যাজগৎ হইতে অশোভের তিন বৎসরের জন্য অপস্থত হইয়া স্বগৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অশোচকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কনুহুচি নূ-রাজ্যে থাকিয়া ইতিহাস, সাধারণ সাহিত্য ও সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা করিতে লাগিলেন। বাহার শিখিতে আসিত, তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত উপদেশ দিতেন। কেহ অল্পবেতন দিলেও শিক্ষাদানকালে ইনি তাহার প্রতি পক্ষপাত করিতেন না, সকলকেই সমান যত্নে, একরূপই উপদেশ দিতেন। কনুহুচি স্বয়ং নিজের নির্মলতা ও শাস্ত্রপ্রিয়তা কার্যে প্রকাশ করিয়া লোকের মনোবেগ আকর্ষণ করিতেন। দেশের মধ্যে তখন সর্বাপেক্ষা শাস্ত্রবিৎ, সাধুভ্রম ও সংকল্পচারী পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলেই লোকে ইহার নিকট মীমাংসার জন্য আসিতে বাধ্য হইত এবং সেই জুযোগে ইনি যথারীতি উপদেশ দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিতেন। ইহার উপদেশের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া লোকে ইচ্ছার হউক বা অনিচ্ছায় হউক ক্রমশঃ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রনীতির উপর আস্থা ও প্রজ্ঞাবান হইতে লাগিল।

২৯ বৎসর বয়সে (খৃঃ পূঃ ৫২৩) কনুহুচি “সিয়াং” নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তার নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতে পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতে ইহার বিশেষ অহুতাগ ছিল এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া একাদিক্রমে ১৫ বৎসরকাল সাধনা করিয়া সঙ্গীতে আশাস্বরূপ সিদ্ধিলাভ করেন।

নূ-রাজ্যের একজন প্রধান মন্ত্রীর ছোক ও নান্-কচ-কংহি নামক দুই পুত্র কনুহুচির শিষ্য হন। ইহাদিগকে শিষ্যরূপে পাইয়া কনুহুচি দেশের মধ্যে মহা সন্মান ও প্রভুর পায় হইয়া পড়িলেন। লোকে পূর্বে ইহাকে যে চক্ষে দেখিত তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে ইহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এ সময়ে প্রত্যেক প্রদেশের অধিপতি নামে রাজ সম্রাটের অধীন ছিলেন, কিন্তু কার্যভ্যন্তরঃ সকলেই স্ব-স্ব প্রধান, তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যনিয়মও স্বতন্ত্র ছিল। এই সকল নিয়ম যে অবিকৃত ভাবে পালন করিয়া দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখিয়া চলিতে পারিতেন তাহা নহে; তাহারা সর্বদা স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, অবিম্ব্যকারী, প্রভাবক, যথেষ্টাচারী ও রুষ্টবুদ্ধি পারিষদবর্ণে পরিবৃত্ত হইয়া কেবল কুপ্রভুতির দাঁপ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কনুচি ভাবিলেন, যতদিন রাজগণের চরিত্র সংশোধিত না হইবে, ততদিনে প্রজার মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তন ঘটবে না; সুতরাং স্থির করিলেন যে কোন রাজদরবারে প্রবেশ করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ দেখিবেন। কিংবদন্ত মধ্যযুগীয় তাহার উদ্দেশ্য সকল হইল। ইনি চাউরাল্যের সামন্তরাজের দরবারে স্থান পাইলেন। এখানে ইনি রাজনীতিকুশল বলিয়া পরিচিত হন নাই। এই সামন্তবংশের প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ও রীতিনীতি কিরূপ ছিল, তাহাই জানিবার জন্য বৎসরবিধি সে দেশে বাস করেন। তৎপরে স্বদেশে কিরিয়া আসিয়া পুনরায় অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে ইহার যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ছাত্রও প্রায় ৩৮০০ জুটিয়া ছিল।

এই সময়ে লু-রাজ ইহার গুণে মোহিত হইয়া ইহাকে রাজ্যের বিচারকপদে নিযুক্ত করেন। সকল সময়েই যে কনুচি বিচারকপদে বসিতেন তাহা নহে। যখন বৃত্তিভেন যে, এই পদে বসিয়া দেশের কিছু না কিছু সুবিধা করিতে পারিবেন, তখনই তিনি কার্যভার লইতেন এবং যতদিন অতীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত না ঘটত, ততদিন পদ পরিত্যাগ করিতেন না।

এইরূপে নানাবিধ চেষ্টা করিয়াও সম্যক ফল লাভ করিতে পারিলেন না। লু-রাজ্যে কি, সু ও মং নামক তিন বংশের লোকেরা রাজ্য মধ্যে প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। ইহারা রাজার সহিত সন্তাব রাখিয়া চলিতেন না, শেষে সকলে একত্র হইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পরাজিত লু-রাজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া “সি” রাজ্যে পলায়ন করেন। কনুচিও তাঁহার অনুগমন করেন।

কনুচির “সি”-রাজ্যগমনের বিতীরা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন যে সানু সম্রাটের পদাবলী কেবল তখন সি-রাজ্যের গায়কেরাই জানিত; এই পদাবলী শিখিবার জন্য বহুদিবসাবধি চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজধানী প্রবেশকালে কনুচি এই পদাবলীর একটি গান হঠাৎ শুনিয়া এতদূর

মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে-পানের উদ্দেশ্যমত তিন মাস কাল বাসস্পর্শ করেন নাই। ইহার স্মরণ সবেই কনুচি বলিতেন যে, “সকীতের স্বর এতদূর সুমিষ্ট ও সর্বাঙ্গ জন্ম হইতে পারে, তাহা আমার ধারণা ছিল না।”

সি-রাজ্যে বাইবার সময় তাই পূর্বতের উপর একটি ঘটনা ঘটে। এইস্থলে তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কত সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া ইনি খীর ছাত্রগণকে সহগণেশ প্রদান করিতেন। কনুচির যতগুলি ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। সি-রাজ্যে বাইবার সময়ও তাহারা গুরু সহজে গিয়াছিল।

সকলে তাই পূর্বত অতিক্রম করিবার সময় একটি সমাধি স্থানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, একটি ত্রীলোক সেইখানে বসিয়া রোদন ও বিলাপ করিতেছে। কনুচি স্বপ্নে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ত্রীলোক বলিল—“এইখানে আমার খণ্ডর ব্যায়মুখে প্রাণ হারাইয়াছেন, এইখানেই আমার স্বামী স্বপনের আহ্বান হইয়াছেন, শেষে আমার একমাত্র সন্তানও এইখানে ব্যায়মুখে কষ্টে নিহত হইয়াছে।” কনুচি কহিলেন, “তবে এ ভয়ঙ্কর স্থলে তুমি বসিয়া আছ কেন মা?” ত্রীলোক উত্তর করিল, “এস্থানও বরং ভাল তবু যে রাজ্যের রাজা অত্যাচারী প্রজাপীড়ক সে রাজ্যে কিরূপে বাস করিব?”—কনুচি শুনিলেন, শিবাগণকে ডাকিয়া বলিলেন—“বৎসগণ! শুনিলে ত, অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজা ব্যায়মুখে অপেক্ষাও অধিক ভয়ের বস্তু।”

কনুচি রাজ্যে আসিয়া পৌছিয়াছেন শুনিয়া সি-রাজ্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। কনুচি রাজসভায় উপস্থিত হইলে সি-রাজ্য তাঁহার সহিত কথোপকথনে অত্যন্ত শ্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে “লিন্‌কিউ” নামক সহরটি সমস্ত আর সহ তাঁহাকে বৃত্তিবরণ দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু পণ্ডিতবর কনুচি বলিলেন, “যিহা লোকে উপদেশ দিলে যতকণ সেই উপদেশ মত কার্য্য করা না হয়, ততকণ তাঁহারা কোনরূপ দান গ্রহণ করিতে পারেন না। আমি রাজ্যকে উপদেশ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তিনি এখনও তদনুসারে কার্য্য করেন নাই বা তাহার উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারেন নাই।” ইহার পর রাজার সহিত রাজনীতি লইয়া কথোপকথন হইলে কনুচি বলিলেন, “যে দেশে রাজা-রাজার কর্তব্য, নদী নদীর কর্তব্য, পিতা পিতৃকর্তব্য

এবং সন্ধান সন্ধানের কর্তব্য বুঝিয়া কার্য করিতে পারে, সেই দেশেই বর্ধাণ স্থাপন আছে বলা যায়।” রাজা ইহাতে উত্তর দিলেন—“হইতে পারে এ দেশে রাজা রাজা নহে, মন্ত্রী মন্ত্রী নহে আর সন্ধানও সন্ধান নহে, কিন্তু প্রজার নিকট কর পাইয়া থাকি, আমি তাহা উপভোগ করিব না কেন?”

কনুচি শেবে দেখিলেন সি-রাজ্যে থাকা আর উচিত হইতেছে না। রাজা বুঝিয়াছিলেন যে, লোকটাকে অর্থদান করিয়া বন্দীকৃত করিয়া রাখিবেন, কিন্তু কনুচি সে খাতুর লোক ছিলেন না; তিনি কিছুতেই কোনরূপ দান লইতে স্বীকৃত হন নাই। রাজা নানাবিধ উপায়ে অর্থ-বৃদ্ধি ও ভূমিবৃদ্ধি দিতে চাহিলেন, কিন্তু কনুচি সেই এক কথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন যে, “বতকণ রাজা আমার উপদেশ মত না চলিবেন, ততক্ষণ আমি তাঁহার কিছু লইব না।” সি-রাজ বা তাঁহার প্রজাবর্গ তখন এতদূর বিলাসোন্মত্ত যে, কনুচির উপদেশ অহুসারে চলা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কোনরূপেই উত্তর পক্ষে মনোনিয়ন হইল না দেখিয়া কনুচি বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। লু-রাজ্য তখনও অশান্তিপূর্ণ এবং শাসনভার রাজ্যের প্রধান রাজপুরুষগণের হস্তে পড়িয়া আছে।

দেশে আসিয়া কনুচি ১৫ বৎসরকাল কার্য জগৎ হইতে অবসর লইয়া কেবল শাস্ত্রচর্চায়, দেশের ইতিহাস প্রণয়নে ও সঙ্গীতগুণক রচনার কালযাপন করেন।

ইহার পর লু-রাজ্যে (খৃঃ পূঃ ৫০৫) শান্তি স্থাপিত হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তির এই সময় ইহাকে দেশের দোষ সংশোধন করিবার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন। কনুচি বাহা চাহিতে ছিলেন, তাহাই পাইলেন। রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল নিয়মাদি স্থির করা ছিল এবং দেশের লোকের চরিত্র সংশোধনের যে সকল উপায় স্থির করিয়াছিলেন, তদুত্তরই কার্যে পরিণত করিবার এই সুযোগ দেখিয়া মহা আক্লানিত হইলেন। এ সময়ে তিনি এমন সুনিরম্যে কার্য আরম্ভ করিলেন যে, মাস করেকের মধ্যেই কি রাজা, কি প্রজা, কি মহৎ, কি ইতর, সকলেরই আচার ব্যবহার ও চরিত্রের এত সংশোধন ঘটিল যে রাজ্যের এক নূতন জী, নূতন ভাব হইয়া উঠিল। যে প্রাণালীতে লু-রাজ্যে কার্য চলিতে লাগিল, তাহাতে অধিবাসীরা এতদূর সন্তুষ্ট হইয়া পড়িল যে, তাহারা নিজ নিজ গ্রামে কনুচির জরগান লিখিয়া স্থবরের অপূর্ণ কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিল।

লু-রাজ্যের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া পার্শ্ববর্তী জুপা-

লেরা হিংসার জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে, কনুচির প্রযুক্তি নিরবতালি অনায়াসে প্রচলিত করিয়া স্ব স্ব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিতেন, কিন্তু কার্যতঃ তাহা ঘটিল না। লু-রাজ্যের পার্শ্ববর্তী সি-রাজ লু-রাজ্যের সৌভাগ্য দেখিয়া বলিলেন যে, “যদি আর কিছুদিন কনুচি লু-রাজ্যে মন্ত্রী থাকেন, তাহা হইলে সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে লু-ই সর্বপ্রধান হইয়া পড়াইবে এবং সর্বপ্রায়ে পার্শ্ববর্তী আমার রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিবে। এই বেলা লু-রাজকে রাজ্য ছাড়িয়া শান্তি অলংঘনের চেষ্টা দেখিলে ভাল হয়।” সি-রাজের মন্ত্রী অতি কুট-বুদ্ধির লোক ছিলেন, তিনি রাজাকে জানাইলেন যে যদি কোন গতিকে লু-রাজের সহিত কনুচির বিবাদ বাধাইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাদের আর এ আশঙ্কা থাকে না। সি-রাজ সন্মত হইলে, মন্ত্রী ৮০টা রপ-লাবণ্যসম্পন্ন পূর্ণযৌবনা চিত্তাকর্ষিনী মনোহর নৃত্য-গীতাদি নিপুণা মধুর-ভাবিনী কোকিলকণী কামিনী এবং ১২০ অত্যুৎকৃষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া লু-রাজকে উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতবর কনুচি এ উপঢৌকনের পরিণাম কি হইবে, তাহা অহুসারন করিয়া রাজাকে উপ-ঢৌকন প্রত্যাখ্যান করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু লু-রাজের হ্রদৃষ্টবশতঃ মতিভ্রম ঘটিল। তিনি কনুচির পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া যুবতীগণকে অন্তঃপুরে স্থান দিলেন। ফল হইল এই যে লু-রাজ সেই যুবতীগণের মোহজালে জড়াইয়া পড়িলেন। রাজকার্য্য দিন দিন উৎসর যাইতে লাগিল, রাজপুরুষেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল, বিলাসিনীগণের প্রীত্যর্থ রাজা নীত্য নূতন মহোৎসবের অহুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। এইরূপে রাজ্য শ্রীহীন ও রাজা বিলাসীর অগ্র-গণ্য হইয়া পড়িলেন। কনুচি তাহার মতি গতি কিরা-ইবার অজ্ঞ যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্ত আশাসই বৃথা হইল। কিছুদিন পরে রমণী-জুহকে রাজা এতদূর হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন যে কনুচি উপদেশ দিতে গেলে তাহার ক্রোধোজ্জেক হইত। অবশেষে এতদূর হইয়া পড়িল যে, রাজা কনুচিকে স্তম্ভপথের কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে, নতুবা আমরণ কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

এতদিনে কনুচি স্থির করিলেন যে, লু-রাজ্যে থাকিলে তাঁহার বা রাজার কোন পক্ষেরই আর তত্ত্ব নাই, কাজেই সে বেশ ত্যাগ করিতে সন্থ করিলেন। একদিন রাজ্যের মঙ্গলার্থ দেবোদ্যানে মলি হইবার পর রাজা সেই মলির মাংস রাজ্যের ক্ষিত্র ক্ষিত্র প্রদেশে পাঠাইতে দেখিয়া প্রকাশ

করার কনুজি এই দুই ধরির পন্থাও করিয়া চলিয়া গেলেন। এ সময়ে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হস্ত রাজার ও মন্ত্রিপণের মতি মতি কিরিলে তিনি পুনরায় আহুত হইবেন, কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটিল না। কনুজি ৫৩ বৎসর বয়সে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে কনুজির বৈরাগ্য ধারণা ছিল, তাহা অতীত মনোহর। তিনি বলিতেন, যিনি রাজা তিনি রাজা, যিনি মন্ত্রী-তিনি মন্ত্রী, পিতা—পিতা, পুত্র—পুত্র হইলেই রাজ্য বড় হুখের হয়। সমাজ সম্বন্ধেও তাঁহার মত অতি উচ্চ ছিল। তিনি বলিতেন সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই ঈশ্বরভিগ্নেত। পাঁচটি সম্বন্ধ লইয়াই সমাজ হইয়া থাকে;—রাজা-প্রজা, পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র, ভ্রাতৃ-কনিষ্ঠ ও বন্ধু, ইহার রাজ্যপ্রভৃতি প্রথম চারিজনকে কর্তৃক এবং প্রজাপ্রভৃতি শেষ চারিজনকে বস্ততা থাকে। ভ্রাতৃপন্থতা ও দয়ার উপর কর্তৃক স্থাপিত এবং ভ্রাতৃপন্থতা ও ঐকান্তিকী প্রজা ভক্তির দ্বারা বস্ততা স্থাপিত হইলে সমাজ সুখস্বচ্ছন্দ থাকে। বহুভাবে উভয়ের মধ্যে পরস্পরের উন্নতির চেষ্টা করিলেই সমাজে কোন গোলমাল বাধিতে পারে না। লোকে মোহে পড়িয়া এই সকল সম্বন্ধের অপব্যবহার করে বলিয়াই সমাজে এত বিশৃঙ্খলা ঘটে, কিন্তু মাতৃব্রতের সত্যাবলম্বনের পূর্বা স্বভাবতঃ বড় অধিক, সুতরাং সংপথাবলম্বনের সুবিধা পাইলে তাহারাই ইচ্ছা করিয়া কথন মোহভুক্ত হয় না। কনুজি বলিতেন যে, যেমন বায়ুতরে দীর্ঘ দীর্ঘ বাস বীকিয়া পড়ে, সেইরূপ জানী ব্যক্তির নিকটে সাধারণ লোকে অবনমিত হইয়া থাকে। রাজ্যে যদি আদর্শ রাজা থাকে, প্রজারাও তাহা হইলে আদর্শ প্রজা হইয়া উঠিতে পারে। আমি এইরূপ আদর্শরাজা গড়িয়া লইতে পারি, রাজার বিরূপ গুণ থাকি আবশ্যক, তাহা আমি বলিয়া দিতে পারি। প্রাচীনকালে আদিবংশ স্থাপিতারা ত্রাণিবংশের আদিপুরুষ বিজয়ম ভাঙ্গি ও যিনি প্রথমে চীনদেশে বংশোদ্ভূতকি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, সেই পণ্ডিতবর 'ইয়ার' ক্রমণে কার্য করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া দিতে পারি। এই সকল আদর্শলোকের অনুকরণে ও আমার উপদেশ অনুসারে যদি কোন রাজা চলিতে পারেন। তাহা হইলে তিনিই দেশের মধ্যে প্রধান রাজা ও সুখী প্রজা লইয়া মহাত্ম্যে কালব্যাপন করিতে পারেন। যদি কোন রাজা এক বৎসর আমার উপদেশ মত কার্য করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার রাজ্যেই ক্রিয়াই দিতে পারি, আর যদি কেহ তিন বৎসর আমার বশে থাকেন, তাহা হইলে আমি যে-সকল হুখের কথা বলিলাম, তাহা তিনি উপভোগ করিতে পারেন।"

বাহা হউক, কনুজি ৫৩ বৎসর বয়সে সু-স্বাস্থ্য হইতে বহির্গত হইয়া সি, জি, টু প্রভৃতি রাজ্যে বীর মত প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আশা ছিল যে, কোন না কোন রাজাকে হস্তগত করিয়া বীর অতীত সিদ্ধ করিয়া লইবেন, কিন্তু কোথাও সে আশা পূর্ণ হইবার সুযোগ দেখিলেন না। কনুজির কি ধর্মবীতি, কি রাজনীতি, কিসাণী লোকের পক্ষে অবলম্বন করা এত হুসাখা হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহ সে সকল নিয়মে চলা দূরে থাক, তাঁহার নামে ভীত ও সমুচিত হইয়া পড়িত। রাজ্যের রাজপুরুষেরা ভাবিত যে, এখনই হস্ত কনুজি আসিয়া তাহাদের কার্যের প্রতিবাদ করিয়া, তাহাদের এতকালের প্রতিপত্তি ও আমোদপ্রমোদে ব্যাঘাত ঘটাইবেন। রাজা ভাবিতেন যে, এখনই আসিয়া তাঁহার শাসনকার্যের, বা প্রজাপালনের দোষ ধরিয়া ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিবেন। সাধারণ লোকে ভাবিত যে, এতকাল আমরা যেসকল হুখে স্বচ্ছন্দে আছি, তাহাই নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই বুরি এ ব্যক্তি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপে সকল স্থলেই রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্যন্ত আপাততঃ মুগ্ধ হইয়া কনুজির উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। অনেক স্থলেই লোকেরা তাঁহার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরোচ্ছার কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

কনুজি যে একেবারেই বৃথা ঘুরিতেছিলেন তাহা নহে, দুই চারিজন করিয়া প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে তাঁহার শিষ্য হইতেছিল। কনুজি সাধারণ লোকের নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষার জন্য ইয়াও, সান, ইউ, চিং ও তেংতাং প্রভৃতি চৈনিক মনোবীপগের নীতি ও নৃপতি সকল প্রচার করিতেন বলিয়া জানীলোকে তাঁহাকে ঐ সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া আদর করিতেন।

ক্রমশঃ কনুজির শিষ্যসংখ্যা প্রায় ৩০০০ হাজার হইয়া উঠিল। তাহার সকলেই ভ্রমণকালে গুরুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিত। কনুজি শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার সুবিধার্থ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছিলেন। বাহারী সকল বিষয়ে পারদর্শী এবং বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া যথেষ্ট নির্মলতা লাভ করিয়াছিল এবং বিত্তময় ধর্মপথাবলম্বী হইয়া ঐকান্তিক-চিত্তে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান হইয়াছিল, তাহারাই প্রথম শ্রেণীর শিষ্য মধ্যে গণ্য হইত; বাহারী বাবুপুত্র, শাস্ত্রাত্মান, ও সুতর্কে পারদর্শী হইয়াছিল, তাহারি দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইত; তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রসমূহকে তিনি কেবল রাজনীতি অতি বিশদরূপে শিক্ষা দিয়া সামান্যপণের শিক্ষকতা-

কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিতেন এবং চতুর্থ শ্রেণীর শিষ্যেরা লোক শিক্ষার্থ সাধারণের বোধোপযোগী সরল ভাষার নীতি ও ধর্মশাস্ত্র রচনা করিত এবং প্রাণে প্রাণে, নগরে নগরে, রাজ্যে রাজ্যে, প্রায় ৫০০ শত শিষ্য প্রধান প্রধান পথে নিযুক্ত হইরাছিলেন। এই চারি শ্রেণীর শিষ্য মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যেনিয়েন, মেকেকন, জেন্‌পিমিউ এবং শুকং ; দ্বিতীয় শ্রেণীর চেঙ্গো ও চুং ; তৃতীয় শ্রেণীর ইয়েনেন ও কিলু এবং চতুর্থ শ্রেণীর সিহেন ও সিহিয়া—এই দশজন শিষ্য সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইরাছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিজিলু ও টিজিকল বড় অহুসঙ্কিৎসাপন্নবশ এবং তাত্ত্বিক ছিলেন, ইহারা সর্বদাই গুরু সহিত সামান্ত সামান্ত বিষয় লইয়া তর্ক করিয়া সন্দেহ মিটাইয়া লইতেন। প্রথম শ্রেণীর বেনিয়েন গুরু বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। কনুচি তাঁহাকে পুত্রের ভায় ভাল-বাসিতেন। ৩১ বৎসর বয়সে বেনিয়েন অকালে প্রাণত্যাগ করায় কনুচি শোকহঃখবিজরী জ্ঞানীপুরুষ হইয়াও প্রিয় শিষ্যের মায়ার একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক-দিবস অল্প সকলকে ডাকিয়া বলেন, “দেখ, ইতিপূর্বে নানাবিধ দুর্গতি ভুগিয়াছি, অনেক হঃসহ যন্ত্রণাও সহ করিয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ মনস্তাপ ইতিপূর্বে কখনও পাই নাই।” বেনিয়েনের মৃত্যুর পর ইয়েনহই নামক শিষ্য কনুচির সেই স্নেহের স্থল অধিকার করেন। কনুচি বেনিয়েনকে যেমন ভালবাসিতেন, ইয়েনহইর গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে ঠিক সেইরূপ স্নেহ করিতে আরম্ভ করেন।

ভ্রমণকালে কনুচির জীবনে কয়েকটা ঘটনা ঘটে। এ সময়ে তাঁহাকে বৃহৎ শিষ্যদল লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত ; আশ্রয়ভাব প্রায় সর্বদা ঘটিত, মধ্যে মধ্যে তিনদিন পর্যন্ত অন্নভাব ঘটিত, কাজেই তাঁহাকে সর্বদা দীন হীনের ভায় কাল কাটাইতে হইত। একবার স্বদলে বিষম অজ্ঞাবে পড়িয়া মহাক্লেশ পাইতেছিলেন। টিজিলু নামক একজন প্রধান শিষ্য এই কঠে অভিভূত হইয়া পড়িয়া একদিন কনুচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যিনি মহাশয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, তাঁহাকেও কি অজ্ঞাবে পড়িতে হয় ? কনুচি উত্তর দিলেন—পড়িলেও সে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের মতই কার্য করে। সাধারণে সে সকল স্থলে অভিভূত হইয়া আত্মহার্য হইয়া পড়ে।

কনুচি নিজ কৃত নিরমাদিকে অজ্ঞাত ও ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং সময়ে সময়ে শিষ্যদের মধ্যে সে কথা প্রচার করিতেন। অনেকে সে কথা বিশ্বাস করিত না। একদিন কথা প্রসঙ্গে টিজিকল

নামক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিরমাদি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু কখনও কোন রাজ্যের লোকে কোনমতে অবলম্বন করিতে পারিবে না, স্তূতরাং সে গুলিকে ঈশ্বর পরিবর্তিত করিয়া লোকের অবলম্বনোপযোগী করিয়া দিলে ভাল হয়।

কনুচি বলিলেন—“কৃতক বস্তু ও পরিশ্রম করিয়া হৃদয়-রূপে আবাদ করিতে পারে, উত্তম ফসলের লব্ধ দায়ী হইতে পারে না। শিল্পকরেরা হৃদয় কাককার্য করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু সেইগুলি ব্যতীত বাজারে যে আর কোন বস্তু বিক্রীত হইবে না, তাহাতে কৃত-নিশ্চয় হইতে পারে না। সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানীতির ব্যবস্থা দিতে পারেন, কিন্তু লোকে গ্রহণ করিতে পারিবে কি না তজ্জন্ত দায়ী হইতে পারেন না।”

উইরাজ্যে প্রবেশকালে ‘পু’নামক স্থানে কতকগুলি লোক তাঁহাকে আক্রমণ করে। শিষ্যেরা সকলে মিলিয়াও তাহাদিগকে বাধা দিতে না পারায় তাহারা কনুচিকে ধরিয়া ফেলে। কনুচি তাহাদের বশীভূত হইয়া শপথ করিতে বাধ্য হন যে, আর তিনি উইরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবেন না ; কিন্তু মুক্তি পাইয়াই সেই দিকে যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। যিনি বিশ্বস্ততা ও সততাকে নীতির প্রথম পথ বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাকেই এই-রূপে সত্যভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া শিষ্যেরা চমকিত হইয়া উঠিল। টিজিকল জিজ্ঞাসা করিলেন, “শপথ পরিত্যাগ করা কি উচিত ?” কনুচি বলিলেন, “এ শপথ অপরে বলপূর্বক করাইয়াছে মাত্র, প্রাণে এ শপথ নাই।”

সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর কোনকার্যে লাগেন না। তাঁহারা চতুর্দিকে পাপের খেলা দেখিয়া শিহরিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান। তাহারা লোককেও এইরূপ করিতে উপদেশ দিতেন। এখন তাহারা কনুচিকে স্রোতের বিকল্পে যুদ্ধে প্রযুক্ত দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেন এবং জ্ঞানশূন্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন। এক সময়ে কনুচি ভ্রমণ করিতে করিতে স্বদলে তৃকান্ত হইয়া জলাশয় অববনগ করিতেছিলেন,—দূরে দেখিলেন, একটি সন্ন্যাসী ক্ষেত্রে নিজ কার্য করিতেছেন। টিজিলুকে তাঁহার নিকট জলের সংবাদ জানিতে পাঠাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী টিজিলুকে দেখিয়া কনুচির শিষ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, “বিশৃঙ্খলা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এক দ্বন্দ্ব হইতে আর একরাজ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে। কেহই ইহা নিবারণ করিতে পারিবে না। নিজের পরামর্শ তুলিল না

বলিয়া যে ব্যক্তি এক রাজার নিকট হইতে অপর রাজার ঘারে বুরিরা বেড়াইতেছে, তাহার অঙ্গসংগ করিয়া তোমরা কি কল পাইতেছ? তাহা অশেফা বাহারি সংসারের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খপে পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার নথরতা বুঝিয়া তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সেবা কর, কল পাইবে।” সরাসী এই কথা বলিয়া নিজ কর্ণে প্রবৃত্ত হইল, জলের কোন সংবাদ দিল না। টিজিলু কিরিয়া আসিয়া কনুফুচিকে সমস্ত কথা বলিলেন। কনুফুচি উত্তর দিলেন, “কথা বর্ণার্থ বটে, কিন্তু পৃথিবী হইতে সরিয়া দাঁড়াইব কিরূপে? মহ্যসমাজ ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিব কিরূপে? সঙ্গী না হইলে মানুষ থাকিতে পারে না। বনের পশু পক্ষীর সহিত মানুষের কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং তাহাদিগকে লইয়া কিরূপে থাকিব? যদি সঙ্গী লইয়াই মানুষকে থাকিতে হয়, তবে চূর্ণশাগ্রস্ত মানুষের নিকটে থাকাই উচিত। দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা আছে বলিয়াই আমার কার্য আছে। যখন সমস্ত দেশে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, নীতি প্রচলিত হইবে, তখন আর আমার এক রাজার দ্বার ছাড়িয়া অস্ত্রের দ্বারে বাইতে হইবে না, আমার বিশেষ কোন কার্যও থাকিবে না, তখনই আমি বর্ণার্থ বিষয়বিরাগী পৃথিবী-পরিত্যাগী নির্লিপ্ত বৈরাগী বলিয়া গণ্য হইব।”

সীন-রাজ্যে বাইবার সময়ে কোয়াননগরে কনুফুচি সদলে বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে এই সহরে ইয়াং নামে একজন ডাকাইতের বড় উপজব হইয়াছিল। লোকে তাহার উৎপাতে বড়ই উত্তাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হুঃখের বিষয় ইয়াং ও কনুফুচি উভয়ের শরীরগত এত সাদৃশ্য ছিল যে লোকে তাঁহাকেই ইয়াং বলিয়া ভুলিয়া তিনি যে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই বাড়ীর চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলিল। শিবাবুদ্ধ মহাভীত হইয়া পড়িল, কিন্তু কনুফুচি নির্ভীকচিত্তে বলিলেন, “আমা সঘন্ডে সত্য কখনই লুপ্ত থাকিবে না। পরমেশ্বর যদি এত শীঘ্রই এই সংকর্যে বাধা দিতেন, তাহা হইলে আজ আমাকে এ অবস্থার পড়িতে হইত না। তাঁহার ইচ্ছার সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবেই, কোয়ানের লোকেরা আমার কিছুই করিতে পারিবে না।” এই বলিয়া তিনি বীণার সুর চড়াইয়া নিজ রচিত প্রাচীন সম্রাটগণের মহিমান্বিত পদাবলী গান করিতে লাগিলেন। যে সকল লোক বাড়ী ঘিরিয়া কেলিয়াছিল, তাহারা বুঝিতে পারিয়া ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

১৩ বৎসর পরে ঘটনাক্রমে কনুফুচিকে খদেপে কিরিতে হইল। এ সময়ে সূর্য্যোজ্যে কি-কং নামে এক ব্যক্তি রাজার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ মত রাজা সকল কার্যই করিতেন। ঘটনাক্রমে ইয়েনইউ নামে কনুফুচির এক শিষ্য কি-কংএর অধীনে সৈন্ত-বিভাগে কর্মলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইয়েনইউ সি-রাজ্য বিপক্ষে যুদ্ধ বাড়া করিয়া অতি প্রকোপে ভর লাভ করেন। কি-কং তাঁহার যুদ্ধপ্রণালী দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নুতন প্রকার যুদ্ধরীতি দেখিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ ধরণে যুদ্ধপ্রণালী তিনি কোথায় শিখিয়াছেন? ইয়েনইউ বলেন, কনুফুচিই ইহার শিক্ষাদাতা। কি-কং কনুফুচির নাম শুনিয়া তিনি কিরূপ লোক, তাহা জানিতে চাহিলে ইয়েনইউ বলিলেন যে, “যদি আপনি তাঁহাকে আপনার কোন কর্মে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আপনার যশে চতুর্দিক ভরিয়া যাইবে; আপনার সৈন্তসামন্ত অকুতোভয়ে দেবদানব সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে; তাহাদের নিকট জয় করিবার মত কিছুই থাকিবে না বা তাহাদের অজানিতও কিছু থাকিবে না। আর যদি আপনি নিজে তাঁহার উপদেশ মত কার্য করেন, তাহা হইলে দেশের শত শত পণ্ডিতের পরামর্শও কেহ আপনার কিছু করিতে পারিবে না।”

এই সকল কথা শুনিয়া কি-কং ভবিষ্যৎ প্রফলের আশায় কনুফুচিকে নিযুক্ত করাই স্থির করিলেন। ইয়েনইউ শুনিয়া বলিলেন যে, “যদি তাঁহাকে নিযুক্ত করাই মত হয়, তাহা হইলে, একটা কথা স্মরণ রাখিবেন যে, আপনাদের উভয়ের পরামর্শের মধ্যে যেন কোন নীচমনা লোক স্থান না পায়।” ইহার পরই কি-কং কনুফুচিকে আনিবার জন্ত দূত পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ে কনুফুচি উই রাজ্যে ছিলেন। সেখানে তিনি কংওয়ান নামে উইরাজ্যের একজন সেনাপতির ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উইরাজ্য পরিত্যাগের পথ দেখিতেছিলেন। কংওয়ান কনুফুচির সর্গশাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া সর্বদা তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কেবল একমাত্র যুদ্ধশাস্ত্রের কথা লইয়াই আলোচনা করিতেন, কিন্তু কনুফুচি নিজে যুদ্ধশাস্ত্রে উপদেশ দিতে ভালবাসিতেন না বলিয়া মহা বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। শেষে স্থির করিলেন যে, এ রাজ্য ত্যাগ না করিলে আর এ দায় হইতে মুক্তি নাই। কনুফুচির মনের অবস্থা বহন এইরূপ, ঠিক সেই সময়ে কি-কংওর দূত আসিয়া পৌছিল, কনুফুচি বিকৃতি না করিয়া তাহাদের

প্রত্যয় প্রাচ্য করিলেন এবং বিলুপ্তও বিলুপ্ত না করিয়া শিশিবে স্বদেশে করিলেন।

কনুহুচি রাজসভার উপনীত হইলে, রাজা গই (গৈয়ং) শাসনকার্য্য সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কনুহুচি তাহার বর্থাবধ উত্তর দিতে দিতে স্পষ্টই আভাস দিলেন যে, যদি তাঁহাকে কোন কর্ণে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে, রাজার বখেট মঙ্গল হইবে। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, যে উপযুক্ত সংসদী নির্বাচন করিতে পারিলেই রাজ্য সুশাসিত হইবে। কি-কং ঐ কথা জিজ্ঞাসা করার কনুহুচি বলিলেন, “প্রশস্তমনা লোককে নিযুক্ত ও নীচমনাকে দূর করিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে যে অন্নদিনের মধ্যে নীচমনার মনও প্রশস্ত হইয়া পড়াইবে।” কি-কং এরূপ কথার বুলিলেন না যে কিরূপে কি করিতে হইবে, তাহার উপর আবার এই সময়ে লু-রাজ্যে ডাকাতির প্রাচুর্য্য হইয়াছিল, কি-কং কিরূপে এ ডাকাতি নিবারণ করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, কাজেই কনুহুচি আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন যে, “যদি তুমি নিজে লোভী না হও, তোমার প্রজাকে পুরস্কার দিয়া প্রলোভিত করিলেও তাহার চুরি কি ডাকাতি করিতে অগ্রসর হইবে না।” এই উত্তরে কনুহুচি স্বয়ং গইরাজ্যের উপরেও একটু কটাক্ষ করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে, আজ দুই বৎসরের মধ্যে রাজা কি-কঙের এমন বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কি-কং যাহা করিতেন, তাহাতে আর বিকল্প করিতেন না। যাহা হউক শেষে লু-রাজ্যের সভায় তাঁহার থাকা ঘটিল না, কারণ এরূপ লোকবিশেষের বশীভূত প্রভুর নিকট কনুহুচির জায় লোকের থাকা একান্ত অসাধ্য।

এবারেও লু-রাজ্যের নিকট মনোভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ার কনুহুচি রাজকার্য্যের আশা কতকটা দমন করিয়া অবসর লইয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। এই অবসরকালে তিনি স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস হু কিং গ্রন্থের চীকা ও ভূমিকা লিখিলেন। শুদ্ধ ইতিহাস নহে এই সময়ে তিনি অনেকগুলি বিষয়ে হস্ত দিয়াছিলেন।

আজকাল কনুহুচির বড়গুলি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার প্রথম শ্রেণীর আদি পুস্তক সর্বাগোচর। হিন্দুদের নিকট বেদ যেমন পূজ্য, চীনবাসীর নিকট এই আদিপুস্তক সেইরূপ পূজ্য। আদি পুস্তকে পাঁচখানি গ্রন্থ আছে—ই কিং, হু কিং, সি কিং, লি কিং ও চু কিং। “ই কিং” পুস্তকখানি চীনদেশের আদ্য পর্ব্ববর্তনের

বিষয় লিখিত। পুস্তকখানির মূল কনুহুচির রচিত নহে, তিনি ইহার চীকা ও ভাষ্যকার। কিম্বদন্তী আছে যে, চীনরাজ্যস্থাপনিতা কোবি ইহার প্রণেতা। ইহার প্রসঙ্গগুলি গ্রন্থলিখার রচিত, ভারী অতিকঠিন, সাধারণে ইহার অর্থ করিতে পারে না। ভাষ্য না হইলে যেমন কেহ বেদ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ কনুহুচির ভাষ্য না দেখিলে কেহ “ই কিং” বুঝিতে পারে না, ইহার ভাষ্যের ভূমিকার স্বয়ং কনুহুচিই বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি তাঁহার জীবনের পরিমাণ আর কিছুকাল বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে, তিনি আর ৫০ বৎসর “ই কিং” পড়িবার জন্ত ব্যয় করিতেন এবং তাহার পর যদি চীকা বা ভাষ্য রচিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাতে বিশেষ কোন বৃহৎ ভ্রম থাকিতে পারিত না। এই পুস্তকখানি চীন-গ্রন্থের মধ্যে সর্বাগোচর। প্রাচীন ও পবিত্র। খৃষ্টপূর্ব্ব ষাটশ শতাব্দীতে ভে-ভাং নরপতি একবার ইহার অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারেন নাই। কনুহুচির পূর্বে আর কেহই ইহার ভাব গ্রহণ করিতেই পারিত না। আজকাল সাধারণতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের নিকট বেদ যেমন চর্কোধ্য, কনুহুচির পূর্বে চীনদিগের নিকটে ই কিং সেইরূপ ছিল। কনুহুচি ইহার বড় আদর করিতেন।

আদিপুস্তকের দ্বিতীয় গ্রন্থ “হু কিং”, ইহা একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি চীনদিগের সর্বোৎকৃষ্ট প্রাচীন ইতিহাস। ইহাতে চীনরাজ্য স্থাপনাবধি কনুহুচির সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস বর্ণিত আছে। হিন্দুর পুরাণশাস্ত্রের মত ইহাতে ধর্ম্মনীতির উপদেশও আছে। কনুহুচি প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আদিপুস্তকের তৃতীয় গ্রন্থ “সি কিং” কনুহুচির রচিত নীতি-গুরু কাব্য এবং সঙ্গীতে পূর্ণ, এতদ্ভিন্ন ইহাতে প্রাচীন কবিতা, কাব্য ও সঙ্গীতসংগ্রহও আছে। চীনেরা এই সকল গীত ও কবিতা বড়ই করিয়া থাকে। ইহাতে সঙ্গীতের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্ত কনুহুচি কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। চীনেরা ইহার গীতাদি উৎসবদিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। চীনদিগের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার এই পুস্তক পাঠে বখেট জানা যায়।

কনুহুচির “লি কিং” নামক চতুর্থ গ্রন্থ সর্বাগোচর বৃহৎ। পূর্কোক্ত ও খানিকে একত্র করিলেও এ খানির তুলনা হয় না। এইখানি চীনদিগের দ্ব্যুত ও ব্যবহৃত গ্রন্থ। ইহাতে ধর্ম্মকর্ম্মের রীতিনীতি বিধি ব্যবহৃত বর্ণিত আছে। ইহার মূল্যে কনুহুচির রচিত কি না তাহা নির্ণয় করা যায় না।

চুইট নামক পঞ্চ গ্রন্থখানিতে কনুচির জন্মস্থান নু-
রাজ্যের ইতিহাস প্রদত্ত হইরাছে। চু-শব্দে বসন্তকাল
এবং চুইট শব্দে শরৎকাল বুঝায়। কনুচি এই পুস্তকখানি
বসন্তকালে আরম্ভ করিয়া শরৎকালে শেষ করিয়াছিলেন
বলিয়া ইহার নাম চুইট রাখেন। এইখানি তাঁহার
বুজাবস্থার রচনা। ইহাতে ইনরাজ্যের সময় হইতে গইরাজ্যের
রাজত্বকালের (চতুর্দশ বৎসর পর্যন্ত) ইতিহাস প্রদত্ত
হইরাছে। এইখানি কনুচির নিজের রচিত গ্রন্থ, ইহার
একটি শব্দও অপরের নহে। কনুচি এই জন্তই এইখানি
শেষ করিয়া শিষ্যগণের হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন যে,
যদি আমার রচনার জন্ত কোন যশ হয়, তাহা হইলে
তাহা এই চুইট হইতে হইবে, আর যদি অপরাধ হয়
তাহা হইলে তাহাও ইহা হইতে হইবে। এই পুস্তকখানিতে
কনুচি ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া কোন উপদেশ
দেন নাই। অলৌকিক শক্তির মহিমা বলিয়া তিনি কোন
বিষয়ের মীমাংসা করেন, প্রত্যেক প্রশ্নের মীমাংসায় তিনি
কার্য্য কারণ দেখাইয়া গিয়াছেন। কেবল মুত্ব কি?
এইরূপ কোন এক প্রশ্নের উত্তরে একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন
যে, “আমরা যখন জীবন কি—তাহাই জানি না, তখন মুত্ব
যে কি তাহা কিরূপে জানিব?”

খৃষ্টপূর্ব ৪৪১ অব্দে কনুচির একমাত্র পুত্র লী পরলোক
গমন করেন। কনুচির জীবনী মধ্যে এই ব্যক্তির বিশেষ
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল পুত্রকে উপদেশ
দিবার জন্ত কনুচি কিরূপ প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহার
তাহাই দেখাইবার জন্ত একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ আছে।
একবার কোন শিষ্য লীকে জিজ্ঞাসা করে যে, “আমরা যে
সকল উপদেশ পাইয়া থাকি, তদ্ব্যতীত তুমি তোমার পিতার
নিকট আর কোন বিষয় শিখিয়া থাক কি না?” লী উত্তর
দিলেন, “না, একদিন তিনি উঠানে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমি
নিকট দিয়া তাড়াতাড়ি বাইতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি গীতিপুস্তক পড়িয়াছ?”
আমি ‘না’ বলিলে, তিনি বলিলেন, যে “যদি তুমি গীতিপুস্তক
না পড়, তাহা হইলে তুমি কথোপকথনের উপযুক্ত পাত্র
হইতে পারিবে না।” আরও একদিন জিজ্ঞাসা করেন তুমি
আচার ব্যবহারের বিষয়ে গ্রন্থখানি পড়িয়াছ?” আমি আবার
‘না’ বলার বলিলেন, “যদি তুমি এ গ্রন্থখানি না পড়, তাহা
হইলে তোমার চরিত্র কোনকালে স্থির হইবে না।”

শিষ্য ওমিরা বলিলেন, “আমরাও উপদেশ চুইট পাই-
রাছি, কিন্তু আরও একটি বেশী উপদেশ পাইরাছি যে বিজ্ঞ

মহোয়ারা আপনাদিগের পুত্রের শিক্ষাদির জন্ত কোনরূপ বিশেষ
ব্যবস্থা করেন না।”

পুত্রের মৃত্যুর পরবৎসর ইয়েরনহিউ নামক কনুচির
সর্বাঙ্গিক প্রিয়ছাত্রের মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পাইয়া মাত্র
কনুচি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, “আঃ! ঈশ্বর যুঁচি
আমাকে নষ্ট করিলেন।” ইহার এক বৎসর পরে কি-কং
লীকারে গিয়া এক প্রকার এক পুত্রবিশিষ্ট অকৃত জীব ধরিয়া
আনেন। ইহা কি প্রাণী তাহা কেহই বলিতে না পারায়,
কনুচিকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়াই বলিলেন যে,
ইহা “কি-লিন” নামক প্রাণী। প্রবাদ এইরূপ যে, এই
প্রাণী কনুচির জন্মের পূর্বে নি-পর্গতে তাঁহার মাতাকে
স্বপ্নে দেখা দেয় এবং তিনিও স্বপ্নে তাহার পুত্র একটি
কিতা বাধিয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে
মৃত প্রাণীর পুত্র কিতা বাধা ছিল। দ্বিতীয়বার এই
পণ্ডকে দেখিয়া সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিল।
কনুচি বিজ্ঞতম হইয়াও বর্তমান ঘটনার মুগ্ধ হইয়া
চীৎকার করিয়া সেই পণ্ডর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,
‘তুই কাহার জন্ত আসিয়াছিস’, তৎপরে চক্ষু জলে আশ্রুত
হইল, তিনি বলিয়া কেলিলেন—“আমার উপদেশ চলিল
বটে, কিন্তু আমি অপরিচিত রহিয়া গেলাম।”

জি-কং বলিলেন—“আপনি অপরিচিত রহিলেন, এ
কিরূপ কথা?”

কনুচি বলিলেন—“আমি সে জন্ত ঈশ্বরকে দোষ দিতেছি
না, মাহুব আমার শিক্ষা অগ্রাহ্য করিতেছে অথচ সকলতা
লাভ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইরাছে বলিয়া তাহাদেরও দোষ
দিতেছি না, ঈশ্বর আমাকে জানেন। কোন মহাত্মার
নাম কখনও লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু আমার নিয়মাদির উপযুক্ত
প্রচার হইতেছে না, সুতরাং বুদ্ধিতেও পারিতেছি না যে,
তবিষাতে লোকে আমার কি চক্ষে দেখিবে?”

একদিন প্রাতঃকালে শুনা গেল যে, মহাত্মা কনুচি
উঠিয়া পঞ্চাদিকে কোমরের উপরে হাত দিয়া বীর বাটীর
দ্বারে বেড়াইতেছেন, হাতে তাঁহার হাড়ি আছে, তাহা
মাটিতে বসুড়াইয়া বাইতেছে। কনুচি বেড়াইতেছেন,
আর বলিতেছেন,

“উচ্চ গিরিচূড়া, হয়ে বার ডাঁড়া,

তেজে পড়ে বিটপী বিলাস।

বন-ভূপ মত্ত

তুকাইবে বত

মহাজানী মানবের মল্লধ

কিরংকণ পরে কনুচি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া

ঘরের সম্মুখে বসিলেন। জি-কং এই সময় গুরু নিকট আসিতেছিলেন, তিনি তাঁহার কথাগুলি শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন যে, “যদি উচ্চ গিরিচূড়া যথার্থই গুঁড়া হইয়া যায়, তবে আমি কাহাকে দেখিরা থাকিব, যদি বিশাল বিটপীই ভাঙ্গিয়া পড়ে অথবা মহাজানীলোকে বনের ভূপের মত শুকাইয়া যায়, তবে আমি কাহার ভরসা করিব।” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জি-কং গুরু নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কনুচি দেখিয়া বলিলেন—“জি, আজ তুমি এত বিলম্ব করিলে কেন? এতদিন পরে একটি স্নান করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সে আমার তাহার শিক্ষক করিবে। আমার অন্তিমসময় উপস্থিত।” এই কথাই বলিল, তিনি খাটে গিয়া শয়ন করিলেন এবং সাতদিন পরে তাঁহার জীবলীলা শেষ হইল।

কনুচির শিষ্যবৃন্দ মহা সমারোহে তাঁহাকে সমাহিত করিল। অনেকে তাঁহার সমাধির নিকট কঁড়ে বাধিয়া ৩৮ বৎসর বাস করিয়াছিল, পিতৃতুল্য গুরুদেবের মৃত্যুতে শিষ্যেরা বাস্তবিকই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কনুচির সর্বাঙ্গেক্ষা প্রিয়তম তিনজন শিষ্যের মধ্যে তখন একমাত্র জি-কং জীবিত ছিলেন, তিনি কোনমতে শোক সধরণ করিতে না পারিয়া আরও তিন বৎসরকাল সেই সমাধি স্থানেই ছিলেন। কনুচির মৃত্যু হইলে দেশের লোকে তাঁহার অভাব বুঝিতে পারিল, কাজেই সমগ্রদেশের লোকেই ইহার জন্য শোক-সন্তপ্ত হইয়া পড়িল।

কিউ-কো নগরের বহির্ভাগে কং-বংশের সমাধিস্থান ছিল। এই স্থানেই একটি স্বতন্ত্র বিস্তৃত ক্ষেত্রে কনুচির সমাধি হইয়াছিল। এইস্থানে পরে এক বৃহৎ ও উচ্চ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে, স্তম্ভের সম্মুখে মর্ম্মর প্রস্তর নির্মিত কনুচির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সমস্ত স্থান বিস্তারিত ক্রমবিকাশ পরিণত করা হইয়াছে এবং প্রবেশ দ্বার হইতে স্তম্ভ পর্যন্ত সাইপ্রেস বৃক্ষের সারি দিয়া শোভিত করা হইয়াছে। প্রবেশদ্বার অতি শুল্কর কারুকার্যশোভিত।

মর্ম্মর মূর্ত্তির নিয়ে “জাং” নামক রাজবংশ প্রদত্ত কনুচির মহাজানীগণাগ্রগণ্য, প্রাচীন শিক্ষক এবং সর্ববিদ্যা-নিপুণ ও সর্বজন সম্রাট নামক উপাধিগুলি খোদিত হইয়াছে।

কনুচির সমাধিস্তম্ভের উত্তর পার্শ্বে আর দুইটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে তাহার একটি তাঁহার পুত্রের ও অপরটি পৌত্রের সমাধিস্তম্ভ। পৌত্রের সমাধিস্তম্ভের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বাটা আছে, ওনা যায় যে, ঠিক ঐ স্থানে জি-কং কুটার

নির্ম্মাণ করিয়া একাক্রমে গুরু শোকে পাগল হইয়া ৬ বৎসর-কাল বাস করিয়াছিলেন।



কনুচির মর্ম্মর মূর্ত্তি।

কনুচির সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহা দেখিয়া ইহার আকৃতি স্পষ্ট বুঝা যায়। কনুচি দীর্ঘজীবন, বলিষ্ঠ, স্নগঠিত পুরুষ ছিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তাভ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং মস্তক বৃহৎ ছিল। ইহার শরীরে ৪২টি বিশেষ চিহ্ন ছিল।

কনুচি নিজ প্রভু রাজার নিকট যেভাবে ব্যবহার করিতেন, তাহাতে তাঁহার আত্ম-নির্ভরতা প্রকাশ পাইত বটে, কিন্তু রাজার সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেন। যখন-তিনি রাজসভায় প্রবেশ করিতেন কি শূন্য সিংহাসনের নিকট দিয়া বাইতেন, তখন তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া পড়িত, পা ভাঙ্গিয়া আসিত এবং কঠোর এত মুহূর্ত্ত হইয়া বাইত যে, বোধ হইত যেন কথা কহিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতেছে। যখন ঘটনাক্রমে তাঁহাকে রাজচিহ্নাদি বহন করিতে হইত, তখন তাঁহার শরীর এতদূর অবশ হইয়া পড়িত যে তিনি ঐ সকলের ভার কোনমতেই সহ করিতে পারিতেন না। যদি কোন পীড়ার সময় রাজা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনি সেই অস্থায়ী শরীরেও তাঁহার পদোচ্চিৎ বেষণুবা ও কোমরবন্ধ পরিয়া পূর্ব্ব মুখে শুইয়া থাকিতেন। যখন কোন রাজ-অতিথিকে সাহসে আহ্বান করিবার জন্য রাজা তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইতেন, তখন তাঁহার ভাব পরিবর্তিত হইত। তিনি উৎসাহিত হইয়া রাজার অভ্যন্তর কর্তৃদ্বারা-

গণের সহিত অগ্রসর হইতেন এবং যখন অতিথিকে আক্ৰান্ত করিবার জন্ত তাঁহাকে পাঠান হইত, তখন তিনিই সর্বপ্রায়ে ঘরের নিকট অগ্রসর হইয়া কিপ্রগতিতে খীর অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রদর্শন করাইতেন। যখন দেশীয় ছুঁড়িকাদি নিবারণার্থ দেশে বার্ষিক উৎসব হইত, তখন কনুচি স্বয়ং উৎসবের মূলউদ্দেশ্য বুঝিয়া উৎসাহ দিতেন এবং পদোচ্চিৎ বজ্রাদি পরিধান করিয়া খীর বাটীর পূর্বদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতেন; উৎসবে মাতিয়া যে সকল লোক তাঁহার নিকট আসিত, তাহাদিগকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। পানাহারাদি কার্যে কনুচি বড় সাবধান হইয়া চলিতেন। কখন বাহ্যভঙ্গুর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার খাদ্যাদি বড় পরিকার করিয়া প্রস্তুত করিতে হইত এবং প্রত্যেক প্রকার ব্যঞ্জন নির্দিষ্ট পাত্রে পরিবেশন করিতে হইত। তিনি বড় বেশী খাইতে পারিতেন না; খাইতে বসিয়া গল্প করিতেন না এবং যাহা কিছু খাইতেন তাহা মন্দ হইলেও কিয়দংশ দেবতার নামে উৎসর্গ না করিয়া কখন খাইতেন না। ময়ূপানের জন্ত তাঁহার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল না, যখন ইচ্ছা হইত তখনই খাইতেন, কিন্তু কখন অধিকমাত্রায় খাইয়া প্রমত্ত হইতেন না। কনুচি বড় দয়ালু ছিলেন, সকলকেই কিছু কিছু দান করিতেন। যখন শুনিতেন যে লোক অভাবে কাহারও সংকার হইতেছে না অমনি নিজে ছুটিয়া যাইতেন। কাহারও অসুস্থতা বাটিলে নিজে সাধ্যমত তাহাকে সাহায্য করিতে ক্রটি করিতেন না।

কনুচি যখন গাড়ীতে যাইতেন, তখন কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে অবনত হইয়া নমস্কার করিতেন। কখন তিনি কাহাকেও অজুলিনির্দেশে দেখাইয়া দিতেন না। তাঁহার নিকট সকলেই সমান আদর পাইত। তিনি বলিতেন শ্রেষ্ঠ ও নীচ লোকের মধ্যে বায়ু ও তুণের সখ্য; বায়ু বহিলে তুণ বাঁকিয়া পড়িবেই। নীচলোককে সদয় ব্যবহার করিলে সে নিশ্চয়ই বশীভূত থাকিবে।

এইরূপ কনুচির কার্যাবলী দেখিলেও বোধ হয়। যে তিনি শুদ্ধ উপদেশে নহে, স্বয়ং আদর্শ কার্যাদি করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়াছেন।

কনুচি সঙ্গীত-বিদ্যায় রীতিমত পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত ভিন্ন তাঁহার মতে কাহারও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। তিনি বলিতেন যে, “সঙ্গীত ভিন্ন আর কিছুতে মনকে জাগরিত করিতে পারে না। নীতি অবলম্বনে চরিত্র গঠিত হয় বটে, কিন্তু সঙ্গীত ভিন্ন সে গঠনে পূর্ণতা হয় না।

সঙ্গীতের কথা উঠিলে, কনুচি একপ্রকার পাগল হইয়া পড়িতেন, কেহ সাবাস্ত্র বিকৃত কথা বলিলে, কনুচি অমনি কোমর বাঁধিয়া তাহার সহিত তর্ক করিতে বলিতেন।

কনুচি নীতি শিক্ষাব্যাপ্তা ছিলেন। তিনি বাহা কিছু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেবল দর্শন-বিজ্ঞান সম্বন্ধ ব্যবহার নীতি, সমাজ নীতি ও রাজনীতিগত উপদেশ ভিন্ন ধর্ম কর্ম সম্বন্ধীয় কথা মত ও বিশ্বাস লইয়া বিশেষ কোন কথা নাই। কনুচি সাধারণের জন্ত একখানি ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই শাস্ত্রখানির নাম লি-কি বা লি-কিং। মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু কর্তব্য, বাহা কিছু করিতে হয় বা বাহা কিছু করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহার প্রত্যেকটি ধরিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পিতামাতার প্রতি-ব্যবহার, উচ্চ নীচের ব্যবহার ও সামাজ্য জীবনে চরিত্রের শোভা বর্ধন-বিষয়ে যে সকল উপদেশ ও নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি জ্ঞানর এবং অতি সহজে অবলম্বনীয়। পিতার নিকট পুত্রের বাধ্যতা লইয়াই কনুচি সমস্ত বিব-য়ের মূল স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে, একটি পরিবার একটি জাতির ক্ষুদ্র আদর্শ। পরিবারের মধ্যে পিতা যেমন পুত্রগণের উপর প্রভু করিয়া থাকেন ও পুত্রেরা যেরূপ পিতার বাধ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত জাতি রাজার নিকট সম্ভাব্য ব্যবহার করিবে ও রাজাও সমগ্র প্রজার উপর পিতার ভাষা ব্যবহার করিবেন। এই মূল ভিত্তির উপর কনুচি সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আজিও চীনে কোনরূপ বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটতেছে না।

কাহারও কাহারও মতে, কনুচি ঈশ্বরের সত্তা মানিতেন না, কিন্তু তাঁহার দর্শনশাস্ত্র সযত্নে যে সকল গ্রন্থ আছে তাহাতে লিখিয়া গিয়াছেন, যে, বাস্তবিক শূন্য হইতে কোন বস্তুর উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। নিশ্চয়ই কোন এক প্রকার মূল পদার্থ অনাদি অনন্তকাল হইতে আছে। কারণ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মূল তত্ত্ব বস্তুর সহিত সমভাবে আছে, সুতরাং কারণও অনাদি অনন্তকাল আছে, এই কারণ অনন্ত, অক্ষর, অসীম, সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র বিস্তারিত। নীল আকাশই শক্তির কেন্দ্রস্থান অর্থাৎ এইস্থান হইতেই প্রধানতঃ কারণের কার্য্যরাজ্য হয়। এইস্থান হইতে সমস্ত জগতে কারণের শক্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এই জন্ত মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ মধ্যে যে ছুইদিন দিব্যরাজ্য সমান হয়, সেই ছুইদিন এই আকাশের

উদ্দেশ্যে পূজাদি প্রদান করা রাজাদিগের উচিত, কারণ এই দুই সময়ের একটিতে লভ্য বপন করিতে হয় ও অপরটিতে প্রচুর কলস পাওয়া যায়।

তাঁহার মতে মহা-দেহ দুই বিষয়ে রচিত—একটি হৃদয়, অদৃশ্য ও উর্দ্ধগামী; দ্বিতীয়টি স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নিম্নগামী। যখন এই দুইটি মূল বিষয় পৃথক্ হইয়া যায়, তখন হৃদয়দেহ আকাশে প্রস্থান করে এবং স্থূলদেহ পৃথিবীতে মিলাইয়া যায়। তাঁহার দর্শনে “মৃত্যু” নামক কোন কথা নাই। স্থূলদেহ পৃথিবীতে মিশিয়া অগতির অংশ মধ্যে গণ্য হইয়া যায়; কিন্তু হৃদয়দেহ চিরবর্তমান থাকে এবং মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে যে বাটিতে যে সংসারে বাস করিত, সেইখানে আসিয়া থাকে। এই সকল হৃদয় দেহভূত স্বীয় বংশধরগণের নিকট পূজা পাইলে তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। এই কারণেই চীনদিগের পিতৃমন্দিরে উৎসবাদি করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহারা এই সকল উৎসবের প্রতি এতদূর ভক্তি ও যত্ন প্রকাশ করে যে দেখিলে অগ্নির আশ্রয়স্থিত হইয়া পড়ে। ইহাদের বিশ্বাস যে যদি ইহারা একরূপ না করে, তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়দেহ পিতৃমন্দিরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা পাইবে না অথবা বংশধরগণের নিকট কোনরূপ ভক্তি বা যত্ন পাইবে না।

কনফুচি বা তাঁহার শিষ্যেরা ঈশ্বরের কোনরূপ আকৃতি স্বীকার করিতেন না কিবা তাঁহার কোন প্রতিমা বা অবতারত্ব করনা করিতেন না। সাধারণতঃ কনফুচি লোককে শিক্ষা দিতেন যে “তোমরা অপরের নিকট যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করিয়া থাক, অপরের সহিত ব্যবহার করিবার সময় তোমরা সেইরূপ করিও।” তিনি অদৃষ্টবাদ স্বীকার করিতেন।

তিনি নিজ শিষ্যগণের সহিত কথোপকথন কালে যে সকল মহামূল্য মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, সেইগুলি লইয়া পরে “দর্শনশাস্ত্রের কথোপকথন” নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই মন্তব্যগুলি অতি সুন্দর ও মহামূল্য বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—ইহা হইতে কনফুচির ভূয়োদর্শন ও সর্ববিষয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।—

১। যিনি কিছুতে অশান্তি বোধ করেন না, তাঁহাকে যদি কেহ গ্রাহ্যও না করে, তাহা হইলে কি তিনি পূর্ণ ধার্মিক নন?

২। রাজা বসি কথার বড় সত্য থাকে না।

৩। বিশ্বাস ও দৃঢ়তাকেই জীবনে প্রথম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিবে।

৪। রাজ্যে আশ্রয় জানে না বলিয়া আমি হুঃখিত

নহি, আমার হুঃখ এই যে, আমিই মাহুকে জানিতে পারিলাম না।

৫। চিন্তাশূন্য বিদ্যার পরিভ্রম বৃথা নষ্ট হয় মাত্র। বিদ্যাশূন্য চিন্তাও সর্বনাশকর।

৬। জান কি, তাহা আমি তোমার শিখাইব কি? যখন তুমি কোন বিষয় জান, তখন যদি স্বীকার করিয়া লই যে তুমি তাহা জান এবং যদি তুমি কোন বিষয় না জান, আর যদি তোমাকে সেইরূপ অবস্থাতেই থাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই জান বলে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি-বিশেষকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলে, নিজের অজ্ঞতা বুঝিতে পারিলে এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমের যথার্থ বুঝিতে পারিলে, জ্ঞানের যথার্থরূপ বুঝিতে পারা যায়।

৭। যখন আমরা গুণবান্ লোক দেখিতে পাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে সমতা দর্শন করা আমাদের উচিত এবং যখন বিপরীত স্বভাবের লোক দেখিতে পাই, তখন আমরা অন্তর্দৃষ্টিতে আপনি আপনার পরীক্ষা কর্তব্য।

৮। লোকের সহিত প্রথম ব্যবহারে তাহাদের কথা শুনিতে হয় এবং তাহাদের আচরণের প্রশংসা করিতে হয়, তাহার পর তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাদের আচরণে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

৯। জি-কং বলিলেন, “আমি যেসকল ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি, সেইরূপ ব্যবহার করিতেও ইচ্ছা করি।” কনফুচি বলিলেন, “কিন্তু তোমার ততদূর অগ্রগতির হইবার দৃঢ়তা কোথায়?”

১০। জ্ঞানী লোকেরা কথার বড় খাটো, কিন্তু ব্যবহারে বড় হয়।

১১। ভগবান্ তোমার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন—এইরূপ স্থির করিয়া আরাধনা কর।

১২। আরাধনার সময়ে যদি আমার মন তাহাতে না বসে, তবে আরাধনা না করাই উচিত।

১৩। অমের জন্য মোটা চাউল, পানের জন্য সামান্য জল এবং শরনের জন্য নিজের হস্তকে বাগিস করিয়াও সুখে কাটাইতে পারা যায়, কিন্তু ধর্ম হারাইয়া ধন ও মান পাইলে আমার নিকট শরতের কাঁকা কাঁকা মেঘের ন্যায় বোধ হয়।

১৪। জ্ঞানীরা বাহা কিছু খুঁজেন তাহা আপনার মধ্যে আর অবোধেরা বাহা কিছু খুঁজে তাহা পরের মধ্যে।

১৫। বাহা শিখিয়াছে তাহা নিজে কার্যে পরিণত কর এবং প্রতিদিন কিছু কিছু নূতন নূতন শিখিতে থাক, তবে লোকের শিক্ষাদাতা হইতে পারিবে এবং লোকে তোমার কথা শুনিবে।

১৬। বাহার স্বপ্নে খিঁচান ও দৃঢ়তা নাই, সে আমার চক্রে চক্ৰহীন শকটের মত, সে জীবনপথে চলিবে কিরণে ?

১৭। তিন প্রকারে তিন জন একত্র থাকিলে শিক্ষার সুবিধা হয়। শিক্ষার্থী সত্যজ্ঞি অমুকরণ করিতে পারে এবং অসত্যজ্ঞিকে দেখিয়া নিজ দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারে।

১৮। মানুষকে বলপূর্ব্বক সংস্কারে প্রবৃত্তি করিতে পারা যায়, কিন্তু বলপূর্ব্বক তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে না।

১৯। স্বভাবে মানুষ এক, কিন্তু ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে।

২০। যে জৈশ্বের নিকট অপরাধী, সে কাহার নিকট শরণ লইবে।

২১। রাজা ধার্মিক হইলে ন্যায় ও যুক্তির সহিত কার্য্য করিবে ও সাহসের সহিত কথা কহিবে, কিন্তু রাজা অধার্মিক হইলে ন্যায় ও যুক্তির সহিত কার্য্য করিবে না, কিন্তু সাবধানে কথা কহিবে।

২২। জানীরা নিজ কার্য্যে পাছে কথা অপেক্ষা হীন হইয়া পড়েন, এই ভয়ে লজ্জিত হইয়া থাকেন।

কনুচির সহস্র দোষ ও সহস্র ভ্রম স্বীকার করিয়া লইলেও তিনি যে একজন আদর্শ লোক ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোনরূপ ঐশ্বরীক ক্ষমতার দোহাই না দিয়াও চীনেরা যে আজও ইহার উপদেশ পালন করিয়া আসিতেছে, ইহা কম বিশ্বাসের কথা নহে। চীনেরা ইহার প্রতি এই ৬৭৬৮ পুরুষ অতীত হইতে চলিল—এই নীর্ণকালেও যেরূপ সমভাবে সম্মান দেখাইয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, ইহার প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। মান্দারিংগণ, দেশের বিজ্ঞগণ এবং স্বয়ং সম্রাটও ইহার প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। ইহার মন্দিরে ধূপ ধূনা, চন্দনকাষ্ঠ ও গুগ্গলু পোড়ান হয়, সমুখে পরিষ্কার পাথ্রে কল, ফুল, মধ্য ইত্যাদি রাখিয়া দেওয়া হয়। এই পাথ্রে ‘হে কনুচি! হে আমাদের সম্মানার্থে শিক্ষক! তুমি এইখানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও, আমাদের এই ভক্তির পূজা গ্রহণ কর।’ এই কয়টি কথা খোদিত থাকে।

কনুচি মানবের ভূত ভবিষ্যৎ পরকাল বা সৃষ্টিকর্ত্ত, মনস্বত্ব, বস্তুত্ব ইত্যাদি বিষয় লইয়া কোন দিন নীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি বর্ত্তমানের সেবক ছিলেন, ইহজীবনের উন্নতি অবনতি লইয়াই উপদেশাদি দিয়া

গিয়াছেন। ইহার উপদেশ বসেই চীনবাসীরা আজও বর্ত্তমানের উপাসনা করিয়া, ইহজীবনের উন্নতিকালে গা ঢালিয়া মহারথে সেই সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত কাটা-ইরা দিতেছে।

কনুকা (জী) কনু-কনু-পূর্ব্ববৃত্ত। কুমারী। বৃত্তিশায়ে দশমবর্ষবয়স্ক। কুমারীকে কনুকা কহে।

(“অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রৌহিণী।

দশমে কনুকা প্রোক্তা অত উর্দ্ধং রত্নম্বলা ॥” মত্।)

২ পরকীর নারিকা বিশেষ; পিত্রাদির অধীন থাকার ইহাদিগকে পরকীয়া কহে, ইহাদের সমুদায় চোঁটাদিই শুণ্ড।

৩ কন্যা। ৪ বৃত্তকুমারী।

কনুকাভ্যাত (পুং) কন্যাকার্য্য অনুচারাং ভ্যাতঃ। ১ অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভভ্যাত।

(“কানীনঃ কন্যাকাভ্যাতো মাতামহভ্যাতো মতঃ।” যাজ্ঞবল্ক্য।)

২ কর্ণ; কুস্তীর অবিবাহিতাবস্থায় ইহার জন্ম হইয়াছিল।

৩ ব্যাসদেব। [ব্যাস দেখ।]

কনুকাপতি (পুং) কনুকার্য্য পতিঃ, ৬তং। ভ্রাতৃত্ব।

কনুকুজ (স্ত্রী) কন্যা: কুজা যজ্ঞ। ১ কন্যাকুজ দেশ।

২ কুনাগড়ের অন্তর্গত একটি তীর্থ। প্রতাপরুদ্রের কোন কোন পুথিতে কর্ণকুজ নামে উক্ত হইয়াছে। [কর্ণকুজ দেখ।]

কনুনা (স্ত্রী) কন্যামাচটে, কন্যা-গিচ্-ভাবে ঘৃহ। কন্যার নাম।

কনুল (স্ত্রী) কন্যা কমনীয়তাং লাতি গৃহাতি, কন্যা-লা-ক-টাপ্। কন্যা।

কনুস (পুং) কনুসেন সীয়েতে অবসীয়েতে, কন্যা-সী-যঞার্থে ক। ১ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

(“রামস্ত কনুসো ভ্রাতা সুমিত্রা যেন সুপ্রজাঃ।” রামা ৫।৩৩।১৮)

২ (স্ত্রী) অধম। ৩ অঙ্গুলিপরিমাণ।

কনুসা (স্ত্রী) কন্যাস-টাপ্। কনিষ্ঠা ভগিনী।

কনুসী (স্ত্রী) কন্যাস-ভীষ। কনিষ্ঠা ভগিনী।

৫ “অভিজিৎ স্পর্ধমানাতু রৌহিণ্যাঃ কন্যাসী বস।”

ভারত বন ২৩৯ অঃ ১।)

কনু (স্ত্রী) কন-বক্- (অস্বাদ্যরস। উৎ ৪।১১১।) টাপ্।

১ দশমবর্ষীয়া কুমারী। ২ অবিবাহিতা স্ত্রী; ভারতেও কন্যা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছে,—“সকলকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া অবিবাহিতা স্ত্রীর নাম কনু।” তবে নব কন্যার প্রাধান্য কথিত হইয়াছে। বধা—

“নটী কাপালিকী যোজা রত্নকী নাপিতাদনা।

ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যা ৫ ভগ্না গোপালকন্যা।

মালাকারত কন্যা ৫ নবকন্যা প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ৪*

শুণ্যধনতন্ত্র ১ম পট্টল।

নট, কাপালিকী, বেড়া, ধোবানী, নাপিতিনী, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোয়ালিনী ও মালী-কন্যাই নবকন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্ত্রের মতে ইহারা ই কলাচনা। ৩ জী মাজ।

৪ স্বতকুমারী। ৫ বড় এলাইচ। ৬ ভূমিকুমারী। ৭ বন্ধাকোটকী। ৮ মহোবধি বিশেষ। শূদ্রত বলেন, ইহার ময়ূর পক্ষের ন্যায় মনোজ্ঞ ব্যাঘ্রটি পাতা, স্বর্ণবর্ণ কীর অর্থাৎ আটা, এবং কল হইতে ইহার উৎপত্তি। ৯ মেঘাদি ষাণ্ঠ রাশির অন্তর্গত ষষ্ঠ রাশি। এই রাশি উত্তরকন্থনী নক্ষত্রের শেষ তিন পাদ, হস্তা নক্ষত্রের সম্পূর্ণ পাদ ও চিত্রার প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ, এই সময়ে অবস্থিত করে। ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা জল মধ্যে নৌকারূপা এবং শত্রু ও অগ্নিধারিণী। ইহার অপর নাম পাথের। মতান্তরে ইহাকে শীর্ষোদয়া, দিনবলা, পিঙ্গলবর্ণা, দক্ষিণদিক্‌স্বামিনী, বায়ুপ্রকৃতি, শীতলপ্রভাবা, শুক্লভূমিচারিণী, বৈশ্রবর্ণা, কৃষ্ণা, স্রগন্ধী, খট্‌জ্জ্বা, অন্নসন্তানা ও অন্নপূঃস্রজা কহে। এই রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে, বেদশাস্ত্রে প্রজ্ঞাবান্, যথাস্থানে ক্রোধ করিয়াও তজ্জন্ম অমৃতপাকারী এবং পত্নীর প্রতি সর্বদা বিরস হইয়া থাকে। কন্যা লগ্নে জন্ম হইলে নানা শাস্ত্রে বিশারদ, সর্বত্র স্তম্ভ, সৌভাগ্যশালী ও সুরত-প্রিয় হয়।

১০ সূতা, হুহিতা। বিবাহ ব্যতীত কন্যার অন্য সংস্কারকালে বৃদ্ধি প্রাক্কর নিবেশ আছে। ইহাদের নামকরণ, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ কার্য্য বিনা মন্ত্রে নিষ্পাদন করিবে। নিষ্ক্রাম্য সংস্কার একেবারেই নিষিদ্ধ।

১১ তীর্থ বিশেষ; এই তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ হয়।

(“ততো গচ্ছন্ত ধর্মজ! কন্যাতির্থমমুত্তমম্।

কন্যাতির্থে নরঃ স্রাজ্য গোসহস্রফলং লভেৎ ॥”

ভারত ৩।৮৩।১০৪।)

১২ চতুরক্ষরী ছন্দোবিশেষ; এই ছন্দে গ (একটি গুরুবর্ণ) ও ম (তিনটি গুরুবর্ণ) অর্থাৎ চারিটিই গুরুবর্ণ থাকে। (“মৌচেৎ কন্যা।” বৃহস্পতিস্মৃতি।)

কন্যাকা (জী) কন্যাব, কন্যা-বার্ধ-কন, অমৃতপুংকবাং ন ব্রহ্মঃ। ১ কন্যা। ২ কুমারী।

কন্যাকাল (পুং) কন্যার: কালঃ, ৬৩৭। অবিবাহিতা থাকিবার নিয়মকাল; দশম বৎসর পর্য্যন্ত।

কন্যাকুজ (পুং) কন্যা: কুজা যজ, বহত্রী। কন্যাকুজ বেশ।

কন্যাকুপ (পুং) তীর্থবিশেষ। (ভারত অহ ২৫ অঃ।)

কন্যাগর্ভ (পুং) কন্যার গর্ভঃ, ৬৩৭। অবিবাহিতা জীর গর্ভ।

কন্যাগিরি। মাদ্রাজপ্রদেশের নেমুর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক, সাধারণে কনিগিরি বলে। ইহার পরিমাণকল ৭২৬ বর্গ মাইল। অক্ষা ১৫°১' হইতে ১৫°৩২' উঃ, এবং দ্রাঘি ৭৯°২' হইতে ৭৯°৪৪' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এইস্থানে দুইটি ফৌজদারী আদালত ও থানা আছে।

ইহার প্রধাননগর—কন্যাগিরি (কনিগিরি) অক্ষা° ১৫°১৩' উঃ, দ্রাঘি ৭৯°৩২' পূঃ।

খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে গজপতি বংশীয় ককেত রুদ্রহর পুত্র কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। খৃঃ বোড়িশ শতাব্দে রুদ্ররায় এই নগর আক্রমণ করেন। পূর্বে এখানে ভাল ভাল ঘরবাড়ী ছিল, হায়দারআলী সেই সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলেন। লোকসংখ্যা ২৮৬৯, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু।

কন্যাগ্রহণ (ক্ৰী) কন্যার গ্রহণঃ, ৬৩৭। বিবাহ।

কন্যাটি (পুং) কন্যা অতি অত্র, কন্যা-অট-আধারে ঘঞ্। বাসগৃহ। (অথ বাসসম্মান কন্যাটঃ। শব্দকি।)

কন্যাতির্থ (ক্ৰী) তীর্থবিশেষ।

কন্যাত্ত (ক্ৰী) কন্যার ভাবঃ, কন্যা-ত্ব (তস্যাত্তবত্বতো।

পা ৫।১।১১১।) কন্যার ভাব।

কন্যাদান (ক্ৰী) কন্যার দানং বরায় সম্প্রদানম্। পাত্র হস্তে কন্যা সম্প্রদান, কন্যার বিবাহ দেওয়া। অগ্নিপুরাণে কন্যা দানের ফলাফল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;— যে ব্যক্তি কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে উপযুক্ত বরকে অলঙ্কৃত কন্যা প্রদান করে, তাহার শত বজ্রফল লাভ হয়। পিতৃপিতামহলোক কন্যাদান কথা শ্রবণ করিলে, সর্বপাপবিশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মবিবাহের দ্বারা কন্যা প্রদান করিলে, ব্রাহ্মদি দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। দিব্য বিবাহের দ্বারা কন্যা সম্প্রদানে স্বর্গলোকের দ্বার ভেদ করিয়া স্বর্গে গমন করে।

গান্ধর্ববিবাহে কন্যাদানে গন্ধর্বলোক লাভ করিয়া দেবতার ন্যায় চিরদিন জীড়া করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুদ্ধ সহ কন্যা সম্প্রদান করে, সে অনন্তকাল কিয়র ও গন্ধর্বগণ সহ জীড়া করিতে পারে।

ব্রাহ্মবিবাহে কন্যাদান করিয়া তাহার গৃহে ভোজন নিষিদ্ধ; কেহ মোহবশতঃ ভোজন করিলে তাহাকে নরকে বাইতে হয়। তবে দৌহিত্যের উৎপত্তি হইলে সেখানে

তোষন করিতে কোনই নিবেদন নাই। বক্ষ্য কন্যায় যুয়ে
তিরদিনই তোষন নিষিদ্ধ।

কন্যাদূষণ (ক্ৰী) কন্যার। দূষণম্, ৬৩৭। অবিবাহিতা
স্ত্রীর ব্যতিচার।

কন্যাধন (ক্ৰী) কন্ডাকালে লক্ষ্য ধনম্, মধ্যলোপ।
অবিবাহিতাবহার স্ত্রীধন। অধিকারিণীর যুত্বতে তাহার
সহোদরগণ এই ধনের অধিকারী হইয়া থাকে।

কন্যাস্তম্ভপূর (ক্ৰী) কন্যার। স্তম্ভপূরম্, ৬৩৭। কন্ডার
বাসস্থল, স্তম্ভপূর মধ্যে যে অংশে রাজকুমারী বাস করে।
("কন্যাস্তম্ভপূরবোধনায় যদধিকারাম দোষানুগম্।" নৈষধ ৪।)

কন্যাপতি (পুং) কন্ডার। পতিঃ, ৬৩৭। জামাতা।
(কন্যাপতিস্ত হুহিতুঃ স্বামিনি যুতঃ। শব্দাক্ষি।)

কন্যাপাল (পুং) কন্ডাপ্রধানঃ পালঃ, মধ্যলোপ। ১ যুজ
জাতিবিশেষ, পাল নামক বশিক্ জাতি। [পাল দেখ।]
২ কন্ডার পতি, জামাতা। ৩ (ত্রি) কন্ডার প্রতিপালক।

কন্যাপুত্র (পুং) কন্ডার। পুত্রঃ, ৬৩৭। কন্ডার পুত্র, দৌহিত্র।

কন্যাপুর (ক্ৰী) কন্ডার। পুরম্, ৬৩৭। কন্ডার বাড়ী।

কন্যাপ্রদান (ক্ৰী) কন্ডার। প্রদানং বরায় সস্ত্রানামম্।
কন্ডাদান।

কন্যাভর্তা (পুং) কন্ডাভিঃ প্রাধনীয়া ভর্তা, মধ্যলোপ।
১ কাঙ্কিকের, কাঙ্কিকের অতিশয় রূপবান্ বলিয়া কন্ডামাজেই
তাঁহার ন্যায় পতিকামনা করে। (৬৩৭) ২ জামাতা।

কন্যাভাব (পুং) কন্ডাভাবঃ, ৬৩৭। কন্যাহ, কন্ডাবস্থা।

কন্যাময় (ত্রি) কন্ডা-ময়ট। ১ কন্যাস্বরূপ। ২ প্রচুর
কন্যাবিশিষ্ট স্তম্ভপূর।

কন্যারত্ন (ক্ৰী) কন্যারত্নমিব, উপমি। শ্রেষ্ঠকন্যা, অসাধারণ
রূপবতী বা গুণবতী কন্যা।

কন্যারাম (পুং) বৃদ্ধবিশেষ। (কন্ডারামো বৃদ্ধভেদে।
শব্দাক্ষি।)

কন্যারানি (পুং) কন্ডাধাঃ রানিঃ, কর্ণধা। রানিবিশেষ।
[কন্যা দেখ।]

কন্যারানীয় (ত্রি) কন্যারানৈরিয়ম্, কন্যারানি-হ।
কন্যারানি সম্বন্ধীয়।

কন্যাবেদী [ন] (পুং) কন্যায় হুহিতরঃ আবিষ্কতি, কন্যা-
আ-বিদ্-মি। জামাতা। ("কন্যায় কন্যাবেদিনিশ্চ
পশুন্ মুখান্ স্ততানপি।" বাজ।)

কন্যাস্তম্ভ (ক্ৰী) কন্যার। স্তম্ভম্, ৬৩৭। কন্যার মূলা,
বিবাহকালে বরের নিকট যে টাকা লওয়া হয়।

কন্ডাঞ্জম (ক্ৰী) ভীৰ্ণবিশেষ। এই ভীৰ্ণে সংযত হইয়া

ব্রহ্মচর্য্য নির্ভার জিহবার উপভোগ করিলে, শত কন্যালাভ ও
অস্ত্রিবে স্বর্ণপ্রাপ্তি হয়।

(“ভক্তঃ কন্যাজ্ঞমং গচ্ছন্ত নিরন্তো ব্রহ্মচর্য্যবান্।

জিহ্বাজ্যোপবিতো রাজন্ নিরন্তো নিরন্তাশমঃ।

নন্তেৎ কন্যাপশং বিব্যাং স্বর্ণলোকক্ গচ্ছতি।”

ভারত বন ৮০ অঃ।)

কন্যাসম্প্রদান (ক্ৰী) কন্যার। সম্প্রদানম্, ৬৩৭। কন্যাদান।
[কন্যাদান দেখ।]

কন্যাসংবেদ্য (ক্ৰী) ভীৰ্ণবিশেষ, এই ভীৰ্ণে নিরন্ত নিরন্তাশম
হইয়া থাকিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় এবং এই স্থানে
কন্যার্থ অগুণরমিত ব্রব্যও দান করিলে তাহা অক্ষয় থাকে।

(“কন্যাসংবেদ্য মাসাদ্য নিরন্তো নিরন্তাশমঃ।

মনোঃ প্রজাপতে লোকানাপ্রাপ্তি পুরুষবতঃ।

কন্যার্থং বৎ প্রবচ্ছন্তি দানমগণি ভারত।

তদক্ষয়মিতি প্রাহ্ ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।” ভারত)

কন্যাস্বয়ম্বর (ক্ৰী) কন্যার। স্বয়ং স্ত্রিয়তে যজ, কন্যা-স্বয়ং-
বৃ-খ। কন্ডাকর্তৃক স্বয়ং পতিগ্রহণ।

কন্যাহ্রদ (পুং) ভীৰ্ণবিশেষ, এই ভীৰ্ণে বাস করিলে দেব-
লোকে গমন করিতে পারে।

(“ব্রত কন্যাহ্রদে বাসো দেবলোকং স গচ্ছতি।”

ভারত অম্ব ২৫ অঃ।)

কন্যাহরণ (ক্ৰী) কন্যার। হরণম্, ৬৩৭। কন্যার অভিভাবক-
দিগের অজ্ঞাতগারে অথবা তাহারদিগের নিকট বল প্রকাশ
করিয়া কন্যাগ্রহণ।

কন্যিকা (স্ত্রী) কন্যা এব, কন্যা পার্শ্বে কন্ টাপ্ অত
ইষন্। কন্যা।

কন্যুয় (ক্ৰী) কন ইন্, কন্যা কান্তা ওষতি ইব। কনি-
উষ-ক। হস্তপুচ্ছ, হাতের পোছা।

কপ (পুং) কানি জলানি পাত্তি, ক-পা-ক। ১ বরগ
দেব। ২ অম্লবিশেষ। (ভারত অম্ব ১৫৭ অঃ।)

৩ (ত্রি) জলপারী।

কপট (পুং, ক্ৰী) কপ-অটন্; কং সত্যং ব্রহ্মাণমপি
পটতি আচ্ছাদয়তি, ক-পট অচ্ বা। ১ মিথ্যা ব্যবহার,
কপটতা। ইহার সংস্কৃতপৰ্য্যায়,—ব্যাঘ, দস্ত, উপধি, ছদ্ম,
কৈতব, কুট, কন্ড, হল, মিথ, কৈরব, ব্যাপদেশ, লক্ষ,
মিড, মার, শঠতা, পাঠ্য, কুসৃত্তি ও নিহতি।

২ দহপুত্র, দামবিশেষ।

কপটচারী [ন] (ত্রি) কপট-চর-মি। প্রবঞ্চক, যে কপট
ব্যবহার করে।

কপটতা (ক্রী) কপটত-ভাবঃ, কপট তল-টাপ্ (তল ভাব
হতলো। পা ৫। ১। ১১১) কপটের ভাব, কপট্য।

কপটতাপস (পুং) কপটেন তাপসঃ। হলপূরক যে
তপস্বী হয়, কপটনরাসী।

কপটধারী [ন্] (ত্রি) কপটং ধারয়তি, কপট-ধৃ-গিনি। কপটযুক্ত।

কপট-পটু (ত্রি) কপটে পটুঃ, ৭তৎ। ১ প্রতা-
রণা করিতে নিপুণ। ২ ইন্দ্রজালকারী।

কপটবচন (ক্রী) কপটপূর্ণং বচনম্। প্রত্যয়ণাবাক্য,
যে বাক্যের দ্বারা বঞ্চনা করা হয়।

কপটবেশ (ত্রি) কপটো বেশো যন্ত, বহুত্ৰী। ১ ছদ্ম-
বেশী। ২ (পুং) (কর্মধা) ছদ্মবেশ।

কপটবেশী [ন্] (ত্রি) কপটবেশোহস্ত্যন্তি, কপটবেশ-
ইনি। ছদ্মবেশী।

কপটিক (ত্রি) কপটঃ বিদ্যতে হন্ত, কপট-মথর্থে ঠন্।
কপটবিশিষ্ট।

কপটিনী (ক্রী) কপটো হস্ত্যন্তি, কপট-ইনি-গৌরাদি-
ঘ্যৎভীঃ। চীড়ানামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

কপটী [ন্] (ত্রি) কপটো হস্ত্যন্তি, কপট-ইনি। প্রত্যয়ক,
বঞ্চক

কপটী (ক্রী) কপ-অটন্-ভীঃ। পরিমাণবিশেষ; এক
আঁকাড়।

কপটেশ্বর। কাম্বীরহ জনপদবিশেষ। এইখানে পাপস্বদন
নাগের বাস ছিল। ইহাই রাজতরঙ্গিনীবির্ণিত পাপস্বদন-
ভীর্ষ। (রাজতরঙ্গিনী ৩১। ৩২।) এই স্থান কোটহার
পরগণার অন্তর্গত ইসলামাবাদের নিকট।

কপটেশ্বরী (ক্রী) কমিব শুভঃ পটঃ বসনং ততুল্যং ফলং
দেহে, কপট-ঈশ-করপ্-ভীঃ। খেত কটকারী। [কটকারী
দেখ।]

কপন (পুং) কপ-ন্। ১ কম্পন। ২ ঘৃণাদি কীট।

কপর্দ (পুং) পর্দা পুরণে-ভাবে কিপ্-বলোপঃ (রাংলোপঃ।
পা ৬। ৪। ২১।) ইতি। পর পূর্তি, কপ্ত গলাজলন্ত পরা
পুরণেন দাপয়তি শুভ্যন্তি; ক-পর্দ-দৈপ-ক (আভোহ্রস্প
সর্গে। পা ৩। ২। ৩) ১ শিবজী। ২ কড়ি।

(কপর্দঃ খণ্ডপরশো র্তাভূটে বরাটকে। মেদিনী)

কপর্দক (পুং) কপর্দ-কন্। ১ বরাটক, কড়ি। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—বরাট, কপর্দ, বরাটিকা, চরাচর, চর, বর্গা,
বালকৌড়ক।

বাঙ্গালার কড়ি বা কোড়ি, হিন্দী ও গুজরাটীতে কোড়ি,
তামিলে 'কপরি', তৈলঙ্গে 'গবর', সিন্ধীতে 'পিকো', মলয়ে

'বেরা', পার্শ্বে 'খরমোহর', আরব্যে 'বুদা', ইংরাজীতে
'কোরি', (Cowrie), কন্নড়ীয়া 'কোরিস্' বা 'বোসেন্স'
(Coria, Cauria, or Bouges), ওলন্দাজেরা 'করিস্' বা
'ক্যান্ডেনহুজেন্স' (Kanria, Slangenhoofdjes), রোমকেরা
'কোরি' বা 'পোরশেলান্ড' (Cori, Porcellano), জার্মানদের
'করিস্' (Kanria), স্পেনীয়রা 'সিক্বে' বা 'বুসিওন্স'
(Siqueyes, Bucios), পর্তুগীজেরা 'বুসিওন্স' বা 'জিম্বোস',
(Zimbos,) দিনেমার, জুইস্ ও কুরেরা 'কোরিস্'
(Kauris) কহে।

কড়ি সামুদ্রিক জীব। পৃথিবীর নানাস্থানে নানাপ্রকার
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলেই একজাতীয়। এই
জাতিকে ইংরাজীতে সাইপ্রাইডি (Cypridae) বলে।

ইহার একসঙ্গী অর্থাৎ আপনাপনি সঙ্গমদ্বারা সন্তানোৎ-
পাদন করে, ইহাদের জীপুরুষ বলিয়া বিস্তরতা নাই।
এই জাতির মাথা স্বতন্ত্র ভাবে বাহিরে থাকে, তৎসঙ্গে দুই
পার্শ্বে দুইটি কোণাকার রেখাযুক্তস্থান উঠাই ইহাদের স্পর্শ
ও ভ্রাণেজিরের কাজ করে, তাহারই বাহিরে দুই পার্শ্বে দুইটি
অতি ক্ষুদ্র চক্ষু আছে।

এই জীবের তিন অবস্থা। প্রথম বা বাল্যাবস্থায়
বহিরাবরণ স্বচ্ছ, পিঙ্গলবর্ণ ও অতিসূক্ষ্ম দেখায়, আবরণে
তিনটি করিয়া ত্রাভ্রিমা রেখা টানা থাকে। দ্বিতীয় বা
যৌবনাবস্থায় কড়ি অনেকটা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত
হয়, এই সময়ে কড়ির বহিরেষ্ঠ পুরু হইয়া আসে, কিন্তু
তখনও বহিরাবরণ তেমন কঠিন হয় না। তৃতীয় বা পূর্ণা-
বস্থায় কড়ির বহিরাবরণ অত্যন্ত কঠিন হয়, আবরণের গায়ে
কিটুকি কিটুকি বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রেণী অনুসারে
বর্ণও পরিম্ফুট হয়।

রাজনির্ঘণ্টের মতে, কড়ি ৫ প্রকার। ১—যে কড়ি
দেখিতে সোণার মত, তাহার নাম সিংহী। ২—ধূস্রবর্ণী কড়ির
নাম ব্যাভ্রী। ৩—যে কড়ির উপরিভাগে পীত ও নিম্নভাগে
শ্বেতবর্ণ তাহার নাম মৃগী। ৪—কেবল শ্বেত কড়ির নাম
হংসী। ৫—যে কড়ি বেশী বড় নয় তাহার নাম বিম্বা।

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদগণের মতে কড়ি জাতি তিন
প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম, যে শ্রেণীর বহিরাবরণ অতি
সূক্ষ্ম, মেরুদণ্ড (Columella) অত্যন্ত বিস্তৃত তাহাকে সাই-
প্রিয়া (Cypraea) বলে। এই শ্রেণীতে অনেক প্রকার
কড়ি আছে। তন্মধ্যে ১ গোলাকড়ি (Cypraea Mappa)
২ ছোটো কড়ি (C. Talpa) ৩ বেচি কড়ি (C. Cioercula), ৪
খুদে কড়ি (C. Childreni) প্রভৃতি সাইপ্রিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত।

গোলকড়ি ভারতমহাসাগরে পাওয়া যায়, এই কড়ি কোনটা গোলাপী, কোনটা কাল ও কোনটা বা নেবু রঙের মত হয়। মরিসসহরে একপ্রকার মৃগের দ্বারা বর্ণবিশিষ্ট কড়ি দেখা যায়, তাহা দেখিতে অতিসুন্দর। ছুঁচোকড়ির গঠন দেখিতে অনেকটা ছুঁচার মত, মধ্যের দাঁতগুলি কটা অথবা কাল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কড়িকে আরিসিয়া (Aricia) বলে। এদেশে যে কড়ি বাজারে ও দোকানে জব্বাদির মূল্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম সাইপ্রিয়া মোনেটা (Cypraea moneta)। এই কড়ি অতি পূর্বকাল হইতে এদেশে সামান্য মুদ্রার পরিবর্তে চলিত হইয়া আসিতেছে। এদেশে এখন কড়ি গণ্ডা কড়িতে এক পরমা গণনা করে। এখনকার অপেক্ষা পূর্বে কড়ির বেশী আদর ও অধিক মূল্য ছিল।

ভাস্করাচার্য লিখিয়াছেন—

“বরাটকানাং দশকষয়ং যং

সা কাকিণী তান্ধ পঞ্চতন্ত্রঃ।

তে ষোড়শ জন্ম ইহাবগম্যো

ঐম্যন্তথা ষোড়শতিন্ধ নিঃ ॥” লীলাবতী।

২০ কড়িতে ১ কাকিণী, ৪ কাকিণীতে ১ পণ, ১৬ পণে ১ জন্ম, ১৬ জন্মে ১ নিধ।

রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের মতেও ৮০ কড়িতে ১ পণ। যথা—

“অশীতিভিক্সরাটকৈঃ পণ ইতাভিধীয়তে।

তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং ভ্রাজ্জতং সপ্তভিন্ত তে ॥”

পূর্বে এবং এখনও দক্ষিণার কড়ি দেওয়া যায়, শুদ্ধিতবে লিখিত আছে—

“হতমশ্রোত্রিয়ং দানং হতো যজ্ঞদক্ষিণঃ।

তন্ম্যং পণং কাকিণীং বা কলং পুন্সমথাপি বা।

ঐদন্যাং দক্ষিণাং যজ্ঞে তথা ন সফলো ভবেৎ ॥”

পূর্বে আফ্রিকারও কড়ি মুদ্রারূপে প্রচলিত ছিল।

এখন কড়ি ক্রমশঃই লুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে এক টাকার ২৪০০ কড়ির অধিক পাওয়া যাইত না, কিন্তু এখন এক টাকার প্রায় ৬০০০ কড়ি পাওয়া যায়।

৩য় শ্রেণীর কড়ির নাম নেরিয়া (Naria) এই শ্রেণীর কড়ির শিরদাঁড়া সরু, দাঁতগুলি তীক্ষ্ণ, বহিরাবরণ অতি চিকণ হয়। এই শ্রেণীতে নানা আকারের কড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, ভ্রাম্যণ্যে ডিমের মত একপ্রকার কড়িই অধিক বড় হয়। সুকার ন্যার ছোট ছোট কড়িও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

চীনদেশে ও আফ্রিকাটিকসাগরে লম্বা লম্বা কড়ি পাওয়া যায়, এখানকার লোকে দেখিলে তাহা কড়ি বলিয়া কিছুতে চিনিতে পারে না। এই কড়ি দেখিতে সাপুড়েদিগের বংশীর ন্যায়।

বৈদ্যক মতে—ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ এবং কর্ণপুল, ত্রণ, শুশ্র, প্ল ও মেত্রদোষনাশক। (রাজনির্ঘণ্ট)

২ মহাদেবের জটা।

(কপর্দিকো বরাটে চ জটাজুটে শিবত চ। শকাঙ্কি।)

কপর্দিকা (জী) কপর্দিক-টাণ্-অত ইষম্। কড়ি।

(“মিত্রাণ্যমিত্রতাং যান্তি যন্ত নম্রাঃ কপর্দিকাঃ।” পঞ্চতন্ত্র।)

কপর্দিগিরি। পঞ্জাবের সুসক্লে জেলার অন্তর্গত একটি স্থান। ইহার বর্তমান নাম শাহবাজগড়ি। এখানে বৌদ্ধরাজ অশোকের অমুশাসন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

কপর্দিনী (জী) কপর্দিন্-জীপ্। জটাবারিণী।

(“মৃগালব্যালবলয়া বেণীবদ্ধকপর্দিনী।

হরামুকারণী পাতু লীলয়া পার্শ্বভী জগৎ ॥” সাহিত্য দ।)

কপর্দিস্বামী [ন্] (পুং) আগন্তব্যীয় গুণবৃদ্ধের ভাষ্যকার।

কপর্দী [ন্] (পুং) কপর্দো জটাজুটোহত্যাত, কপর্দ-ইমি।

১ শিব। ২ (জি) জটায়ুত।

কপর্দীশ (পুং) কালীহ শিবলিঙ্গবিশেষ।

(“কালেশ্বরকপর্দীশো চরণাবতিনির্ঘলো।” কালী ৩৩ অঃ।)

কপাল (ক্লী) [বৈদিক] ১ অর্দ্ধাংশ। ২ বর্ধমানের একটি গ্রাম। (ভং ব্রহ্মণ্ড ৭। ৩২।)

কপাট (জি) কং বাহুং মন্তকং বা পাটয়তি, ক-পট-নিচ-অণ্। ঘরের আবরণকারী কাঠখণ্ডবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—অরর, কবাট, কপাটী, কবাটী, অররী, অররি, দারকণ্টক, অসার।

বিষকর্মপ্রকাশনামক বাস্তশাস্ত্রে লিখিত আছে—

“যদ্যরোতি কপাটং বৈ তত্র বংশকরো ভবেৎ।” ৭ম অঃ।

যাহার গৃহের কপাটে ধ্যান্ ধ্যান্ শব্দ হয়, তাহার বংশকর হইয়া থাকে।

কপাটস্থ (পুং) কপাটং হস্তি কপাট-হন্-টক্ (শক্ভো) হস্তি কপাটরোঃ। পা ৩। ২। ৫৪। চোর, ডাকত। (কপাটস্থ-চোরঃ। কালিকা।)

কপাটসন্ধি (পুং) কপাটং সন্ধীয়তে অত্র, কপাট-সন্ধ্য-কি। উত্তর কপাটে বা কপাটে চৌকাটে মিলিত স্থান।

কপাটসন্ধিক (পুং) স্তম্ভতোক্ত কর্ণযোগবিশেষ। [কর্ণ-যোগ দেখ।]

কপাটিকা (জী) কপাট বাধে কন্টাণ্-অত ইষম্। কপাট।

কপাটোদঘাটন (ক্লী) কপাট উদঘাটন, ৬তম। কপাট খোলা।

কপাল (পুং, ক্লী) কং মন্তকং পালয়তি, ক-পালি-অণ্; কপি-কালন্ বা (ভমিবিশিবিভিমুণিকুলিকর্পিগলিপকিত্যঃ কালন্। উণ্ ১। ১১৭।) ১ মন্তকের অস্থি, মাথার খুলি। [কডাল দেখ।] ২ ললাটদেশ। ৩ অদৃষ্ট। ৪ কর্ণ, খাপরা, খোলা। ৫ বে দুইভাগ যুক্তিকা দ্বারা ঘটা নিশ্চিত হয়। ৬ ভিক্রিপাত্র। ৭ যুক্তিকাপাত্র। ৮ কুষ্ঠরোগবিশেষ। এই কুষ্ঠ কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ, কপাল-তুল্য, রক্ত, কর্ণশ, তন্ন ও তৌদ অর্থাৎ হৃদীবেধের দ্বারা বেদনাবিশিষ্ট। ৯ পুরোডাশ, যজ্ঞীয় যুত। ১০ সমুহ। ১১ অঙ্গাদির অবয়ব। (“কুষ্ঠটীওকপালানি স্তমনোমুহুলানি চ।” হুত্রত।)

কপালতীর্থ। তীর্থবিশেষ। এইখানে বেদনাশন নামক জৈনমূর্তি আছে। (প্রতাসখণ্ড § ১৩০। ২। ৪।)

কপালনালিকা (ক্লী) কপালস্ত স্ত্র্যসংঘত নালিকা, ৬তম। তর্কু, টেকো।

কপালপানি (ত্রি) কপালে পানিযুক্ত, বহুব্রী। যে ললাট দেশে হাত দিয়া আছে।

কপালভৃৎ (পুং) কপালং ভিক্রিপাত্রং ব্রহ্মকপালং বা বিভর্তি, কপাল-ভৃ-কিপ্-ভুক্ত চ। শিব। (কপালভৃৎ পুমান্ শব্দৌ। শকাঙ্কি)

কপালমালী [ন্] (পুং) কপালানাং মালা বিন্যতে হস্ত কপাল-মালা-ইনি। শিব।

কপালমোচন (ক্লী) কপাল-মুচ-ল্যট্। ১ কালীস্থ তীর্থ-বিশেষ। (কালীখণ্ড ৩১ অঃ।) কাহারও মতে, রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে কোন রাক্ষসের মন্তক ছেদন করিলে, সেই মন্তককপাল মহোদর নামক ঋষির উরুদেশে বিদ্ধ হয়, পরে তিনি অজ্ঞাত মুনিগণের উপদেশানুসারে ঔশনসতীর্থে স্নান করিলে তথায় ঐ কপাল পতিত হয়, তৎকালে সেই স্থানের নাম কপালমোচন। ২ অখালার পূর্বস্থিত একটি পুণ্যতীর্থ। এখানকার তীর্থজলে স্নান করিলে অশেষপুণ্য লাভ হয়। এখানে প্রাচীন গুপ্তরাজগণের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

কপালশিরা [ন্] (পুং) কপালং শিরসি যত, বহুব্রী। মহাদেব।

কপাললঙ্ঘি (পুং) কপালস্থঃ লঙ্ঘিঃ, লঙ্ঘ্যলোং। মন্তকাস্থিতে যে লঙ্ঘন মিলনস্থান আছে।

কপালশ্বেটি (পুং) কপালস্ত শ্বেটিঃ, ৬তম। ১ মাথা খোঁড়া। ২ রাক্ষসবিশেষ।

কপালাধিকরণ (ক্লী) বীমাংশান্ননোক্ত অধিকরণবিশেষ। বীমাংশাহ্নের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে এই বিবরণিত হইয়াছে। দর্শণোপমাগপ্রকরণীয় প্রতিভে লিখিত আছে—

“কপালেমু পুরোডাশং প্রপতি।”

দর্শ ও পৌরোদাশ যাগের অসীদ্ধত পুরোডাশ কপালে পাক করিবে এবং সেই প্রকরণে অন্তপ্রতিভে উক্ত আছে—

“পুরোডাশকপালেন তুষারুপবপতি।”

পুরোডাশকপালদ্বারা তুষ পরিভ্যাগ করিবে।

এই দুই প্রতিভারা সংশয় হইতেছে যে পুরোডাশ পাক ও তুষ পরিভ্যাগ, এই উভয়ই কপালের প্রয়োজক কি কেবল পুরোডাশ পাক? এই সংশয় দ্বারা উভয়ই কপালের প্রয়োজক, যেহেতু একের প্রয়োজকত্ব নিশ্চায়ক কোনও বিশেষ হেতু দৃষ্ট হয় না। এই পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে—

“অর্থাভিধানকর্ম্য চ ভবিষ্যতাসংযোগস্ত তন্নিমিত্তকাত-দর্ঘোহি বিধীয়তে”। বীমাংশা নং: ৪। ১। ২৬।

“অর্থাভিধানং প্রয়োজনসম্বন্ধমভিধানং যত্র যথা পুরোডাশ-কপালং ইতি, পুরোডাশার্থং কপালং পুরোডাশকপালং। কথমেতদবগম্যতে? পুরোডাশস্তাবৎ তস্মিন্ কালে নাস্তি। যেন বর্তমানঃ সম্বন্ধঃ কপালেন জ্ঞাৎ, তেনৈব হেতুনা ন ভূতঃ, স এব কপালস্ত পুরোডাশেন ভবিষ্যতা সম্বন্ধঃ, ভবিষ্যতা সম্বন্ধস্ত তন্নিমিত্তক ভবতি। তন্মাত্রং পুরোডাশেন প্রযুক্তং যৎ-কপালং তেন তুষা উপবপ্তব্যঃ—ইতি এবঞ্চ সতি চরৌ পুরোডাশাভাবে যদা তুষারুপবপ্তং কপালমুপাদীয়তে নতং পুরোডাশকপালং জ্ঞাৎ, ন চৈব, ন তেন তুষা উপবপ্তব্য ভবন্তি। তন্মাত্রং ন তুষোপবাগঃ কপালানাং প্রয়োজকঃ প্রয়োজকত্ব প্রাপনং ইতি—” শবরভাষ্য।

“পুরোডাশকপালেন তুষারুপবপতি” এই প্রতি বাক্যে, যে পুরোডাশকপালের অভিধান হইয়াছে, তাহা প্রয়োজনবিশিষ্ট পুরোডাশই প্রয়োজন, যে সময়ে তুষ পরিভ্যাগ করা হয়, সেই সময়ে পুরোডাশ উৎপন্ন হয় না এবং তৎপূর্বেও হয় নাই, কিন্তু পরে হইবে, অতএব ভাবি পুরোডাশের সহিত কপালের সম্বন্ধ এই প্রতি দ্বারা বুঝিতে হইবে ভবিষ্যৎবস্তুর সম্বন্ধ, সেই বস্তুর নিমিত্তই থাকে (পুরোডাশরূপ ভবিষ্যৎ বস্তুর সম্বন্ধ বর্তমান কপালে আছে)। পুরোডাশের জন্ত অলীক কপাল, ইহাই পুরোডাশকপাল শব্দের অর্থ। হুতরাং শব্দ দ্বারা ই বুঝাইরা-

তেছে যে পুরোডাশই কপালের প্রবোজক, ভূষপরিভাগ কপালের প্রবোজক নহে। শীমাংশাদর্শনের মতে যে কার্যের জন্ত বাহ্যকে উপাদান করা যায়, সেই কার্যকে তাহার প্রবোজক বলা হইয়া থাকে। এই স্থলে পুরোডাশপাকের জন্ত কপালের উপাদান হইয়াছে বলিয়া কপালের প্রবোজক পুরোডাশ হইবে। যদি পুরোডাশই কপালের প্রবোজক এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে পুরোডাশাধ আদিত কপালদ্বারা ভূষপরিভাগ করিবে, যে যোগে পুরোডাশ হয় না, সেই যোগে যদি ভূষ পরিভাগের জন্ত কপালের উপাদান করা হয়, তবে তাহা পুরোডাশ-কপাল হইবে না, যেহেতু এই যোগে পুরোডাশ নাই বলিয়া পুরোডাশের জন্ত কপাল আনীত হয় নাই, কেবল ভূষ পরিভাগের জন্ত কপাল আনীত হইয়াছে। অতএব পুরোডাশের জন্ত যদি কপাল আনীত না হয়, তাহা হইলে ঐ কপালদ্বারা যোগান্ত ভূষ পরিভাগ করিবে না ইহাই এই অধিকরণের সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল।

কপালি (পুং) কং ব্রহ্ম শিরঃ পালয়তি, ক-পাল-ইন্। মহাদেব।

কপালিকা (স্ত্রী) কপাল-কন্-টাপ্ অত ইৎম্। ১ খাপরা, থোলা। ২ ঘটাদির উত্তর স্তূতিকথণ্ড। ৩ দন্তরোগবিশেষ।
সুশ্রুতোক্ত এই রোগের লক্ষণ—

“দলন্তি দন্তবন্ধানি যদা শরীরয়া সহ।

জয়ো কপালিকা সৈব দশনানাং বিনাশিনী॥”

শরীর নামক দন্তরোগের পর শরীরালকল দন্ত হইতে খসিয়া পড়িবার কালে দন্তের বন্ধও দলিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এই রোগের নাম দন্তশরীর। [চিকিৎসাদি দন্ত-রোগে দেখ।]

কপালিনী (স্ত্রী) কপালিন্-টীপ্। দুর্গা।

(কর্ণমোটা মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী। হেম ২।১২০।)

কপালী [ন্] (পুং) কপালোৎস্রাণ্ডি, কপাল-ইনি। ১ মহাদেব। ২ জাতিবিশেষ, এই জাতি তীব্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ-কন্যাগর্ভে উৎপন্ন। (পরামরপদ্ধতি।) ৩ (ত্রি) কপাল-বিশিষ্ট। ৪ ভাগ্যবান্। ৫ যোগিবিশেষ।

(“কপালী বিন্দুনাথক কাকচণ্ডীস্বরাস্বরঃ।” হঠযোগসীপিকা।)

৬ উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ। [কপালিক দেখ।]

কপালেশ্বর (পুং) ১ শিব। ২ উড়িয়ায় একটি প্রাচীন গ্রাম, মহানদীর উত্তরকূলে কটকের কিছু দূরে অবস্থিত। এখানে ‘কপালেশ্বর’ নামে পুরাতন দুর্গ আছে।

কপি (পুং) কপি-ই-নলোপশ্চ (কুটিকম্পোর্নলোপশ্চ। উৎ ৪।

১৪০। কুটি ও কপি ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় হয়, এবং তাহার কিং ভাব ও ধাতুর ন লোপ হয়।) ১ বানর। ২ শিলারস। ৩ মধুসূদন। ৪ আমলকী। ৫ করজবিশেষ। ৬ রক্তচন্দন। ৭ বরাহ। ৮ পিঙ্গলবর্ণ। (ত্রি) ৯ পিঙ্গলবর্ণযুক্ত।

(দেশজ, সম্ভবতঃ ক’বেজ শব্দের অপভ্রংশ) একপ্রকার গাছ। (Brassica Oleracea) এই গাছ যুরোপ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। বাঙ্গালার এখন তিনপ্রকার কপির চাষ হয়, ফুলকপি (Cauliflower), বাধাকপি (Wild Cabbage) ও ওলকপি (Brassica campestris)। যুরোপের নানাদানে এই সকল কপি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় আরও ৫৬ প্রকার কপি আছে। বাঙ্গালার লোকেরা পুরোক্ত তিন প্রকার কপিই খাইয়া থাকে। উদ্ভিদবেত্তা-গণের মতে শালগ্রাম গাছের প্রভৃতি এই কপিজাতী। [শালগ্রাম, গাছের দেখ।]

কপিকচ্ছু (স্ত্রী) কপীনামপি কচ্ছু বৃত্তাঃ, বহত্ৰী। বৃক্ষ-বিশেষ, আলকুশী। [আলকুশী দেখ।]

কপিকচ্ছুফলোপমা (স্ত্রী) কপিকচ্ছুফলত উপমা বত্ৰ, বহত্ৰী। জড়ফালতা।

কপিকচ্ছুরা (স্ত্রী) কপিভ্যোহপি কচ্ছু কণ্ঠং রাতি দদাতি, কপি-কচ্ছু-রা-ক। আলকুশী।

কপিকন্দুক (স্ত্রী) কপি-কদি-উক, অতোলোপঃ, কন্ত শিরসঃ পিকন্দুকং অস্থি বা। মস্তকের অস্থি, মাথার খুলি। (কপিকন্দুকং শিরোহস্থি। শকাব্দি।)

কপিকা (স্ত্রী) কপির্বরাহ ইব কারতি প্রকাশতে কৃকষাৎ, কপি-কৈ-ক-টাপ্। নীলসিন্ধবার বৃক্ষ, নীলনিম্বা গাছ। [নিম্বা দেখ।]

কপিকেতন (পুং) কপির্হৃদয়ান্ কেতনে বত্ৰ, বহত্ৰী। ১ অর্জুন। “বাত্তপূর্বমিদং বাক্যমত্রবীৎ কপিকেতনঃ।”

ভারত আখ্য ৮২ অ.।) ২ (কর্ণধা) কপিচিহ্নিত ধ্বজ।

কপিকোলি (পুং) কপীনঃ প্রিরঃ কোলিঃ, মধ্যং লো। কুলবিশেষ, শেয়াকুল।

কপিচূড়া (স্ত্রী) কপীনঃ চূড়াইব, উপমি। আমড়া গাছ। [আমড়া দেখ।]

কপিচূত (পুং) কপীনঃ চূত ইব, (ভেদ্যমভিপ্রায়ঃ)। আমড়া।

কপিজ (পুং) কপিতো জারতে, কপি-জন্-ড। ১ শিলারস। ২ (ত্রি) বানর-জাত।

কপিজজিকা (স্ত্রী) কপেঃ বানরত জজ্বা ইব জজ্বা বত্ৰাঃ, সংজারঃ কন্। তৈলসিন্ধুলিকা, তৈলাপোকা, আমছলা।

কপিঞ্জল (পুং) কপিবিব ভবতে বেগেন গচ্ছতি, কং শ্রুতি-
জ্ঞানঃ পিজরতি বা (প্ৰবোধদাশিষ্যঃ)। ১ চাঁতকপকী;
সুজ্ঞত মতে ইহার মাংস গুণ; শীতল, লঘু, রক্তপিণ্ডনাশক,
এবং জৈবিক রোগ ও মন্দবায়ুতে উপকারী। ২ তিস্তিরি
পকী। (অথ তিস্তিরোক্তাং কপিঞ্জলঃ পুমান্ মতঃ। শব্দাকী।)
ইহার মাংস গুণ;—সর্গদোষনাশক, বারক, বর্ণের প্রসন্নতা-
কারক, এবং হিকা খাঁস ও বায়ুরোগনাশক। গৌর
তিস্তিরি অস্ত্রাভ তিস্তিরি অপেক্ষা অধিক। গুণশালী।
(সুজ্ঞত)। ৩ তেজল নামক পক্ষিবিশেষ। ৪ ঋষিকুমার
বিশেষ; বাণভট্ট রচিত কামবরী উপাখ্যানে ইনি খেত-
কেতু ঋষির পুত্র ও পুণ্ডরীকের বহু বলিরা বর্ণিত আছেন।

কপিঞ্জলতায় (পুং) যে ভাৱ দ্বারা বহুকে জিহ্বা সংখ্যার
পর্যাবসিত করা যায়, তাহাকে কপিঞ্জল ভাৱ বলে।

বেদে একটি ঋতি আছে,—

“বসন্তায় কপিঞ্জলানাভতেত” অর্থাৎ “বসন্ত-বাগের
নিমিত্ত বহুকপিঞ্জলের হমন করিবে।” এইঋতিদ্বারা কতগুলি
কপিঞ্জল-হমনের বিধি দেওয়া হইতেছে, তাহা প্রথম
দৃষ্টিতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। কারণ, জিহ্বা হইতে পরাঙ্ঘ
পর্যন্ত সকল সংখ্যাতেই বহু বুঝায়। “প্রথমোপস্থিত-
পরিভাষায়ে প্রমাণাতাবাং”—ভৈমিনীরা এই শ্রুতাহুসারে
এখানে এই “বহু” বৈদিক তাৎপর্য “জিহ্বা” বৃত্তিতে
হইবে; তাহা না বুঝিলে বেদে অপ্রমাণাণ্যাপত্তি ঘটে;
কারণ, “জিহ্বা” হইতে “পর্যাঙ্ঘ” পর্যন্ত সকল সংখ্যাতেই
বহন “বহু” আছে, তখন “বহু কপিঞ্জল” কতগুলিতে
হইবে তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া লোকে নিশ্চয়ই
বেদে প্রযুক্তি-শূন্য হইয়া পড়িবে। মীমাংসাকার এই
বিরোধের হ্রাসরমীমাংসা করিয়াছেন।

“প্রথমোপস্থিতেতত্ত্বাৎ”। মীমাংসা হুঃ।

জিহ্বের উৎপত্তি হইলে জিহ্বা সহিত একত্ব জ্ঞান দ্বারা
চতুর্ভুজের উৎপত্তি হয়, স্তম্ভমাং চতুর্ভু প্রযুক্তি সংখ্যা অন্তিমবার
পূর্বে নিয়মতঃ জিহ্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় বলিয়া
জিহ্বা সংখ্যাতেই বৈদ্যবোধ্য বহু পর্যাঙ্ঘলর অর্থাৎ বেদে যে যে
স্থলে বহুয়ের বোধ হইবে, সেই সকল স্থলে প্রথমোপস্থিত
বেদে জিহ্বা গ্রহণ করা দাইতে পারিবে। বাহ্যিকের মতে
জিহ্বাবিশিষ্ট একত্বজ্ঞান চতুর্ভুজের কারণ নয়, তাহাদের মতেও
জিহ্বাতেই বহুয়ের পর্যাবসার স্বীকার করিতে হইবে।

এই মতে একত্বজ্ঞান বিদ্যক জ্ঞান জিহ্বের কারণ এবং একত্ব
চতুর্ভুজ বিদ্যক জ্ঞান চতুর্ভুজের কারণ এইরূপ স্বীকার করা
হয়, স্তম্ভমাং বহুকে জিহ্বের অন্তর্গত বসিলে ভবকারণ

একত্ব জ্ঞানের দাব্য হইবে। যদি চতুর্ভুজি সংখ্যাতেও
বহু পর্যাঙ্ঘসিত হয় তাহা হইলে একত্ব চতুর্ভুজ জ্ঞানচতুর্ভুজের
কারণ হওনতে গৌরব হয়, একত্ব চতুর্ভুজ জ্ঞান অপেক্ষা
একত্বজ্ঞান জ্ঞানে লঘুত্ব থাকিতে তজ্জন্ত জিহ্বাই কেনবোধ্য
বহুয়ের পর্যাবসার হইবে, তাহা হইলে বহু জ্ঞান করা
সুসমাধা হইবে না। যদি বহু জ্ঞান হয়, তাহা হইলে বহু-
কপিঞ্জলহমনে প্রযুক্তির আর অজ্ঞান-নিবন্ধন বাধা
হইবে না, স্তম্ভমাং বেদের অপ্রমাণাণ্যাপত্তি হইতে
পারে না।

কপিতৈল (ক্ৰী) শিলায়।

(“সিদ্ধাকল্প তুর্যঃ স্যাৎ যতো যবনদেশগঃ।

কপিতৈলক সংখ্যাভং তখাচ কপিনামকঃ।” ভাবপ্রঃ।)

কপিখ (পুং) কপিভিষ্ঠতি কপিপ্রয়ত্বাৎ বজ্র, কপি-হা-ক
(প্ৰবোধদাশিষ্যঃ) সলোপঃ। ১ কব্বেল। [কব্বেল দেখ।]

২ কুশবীপেশ্বর রাজা জ্যোতিষ্মতের পুত্র; (বিষ্ণু ২য় অঃ।
৪ অঃ।)

কপিখাত্তক (ক্ৰী) কপিখস্য ঋষিব স্বক্ যস্য, যধ্যলোং।
এলবালুক, [এলবালুক দেখ।]

কপিখপূর্ণী (ক্ৰী) কপিখস্য পূর্ণিব পূর্ণং পত্রং যস্যঃ,
বহব্রী। বৃক্ষবিশেষ ইহার সাধারণ নাম ‘কপিখানী’।
সংস্কৃত পর্যায়—বিরাজা, সুরঙ্গা ও চিত্রপত্রিকা।

কপিখাষ্টক (ক্ৰী) বৈদ্যাকোক্ত অতীসাররোগের ঔষধ-
বিশেষ;—জোয়ান, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজ-
পাত, নাগেশ্বর, শুট, মরিচ, চিতা, বালা, কৃষ্ণজীরা,
ধনিয়া ও সচলবর্ণ, ইহাদের প্রত্যেকে এক একভাগ;
তিস্তিড়ী, ধাইফুল, পিপুল, বেলশুট ও দাড়িম, ইহাদের
প্রত্যেকে ৩ ভাগ, চিনি ৬ ভাগ, কব্বেল ৮ ভাগ, এই সকল
একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী,
কন্দরোগ, গুল্ম, গলরোগ, কাশ, খাঁস, অরুচি ও হিকা
রোগ নিবারিত হয়।

কপিখাস্ত (পুং) কপিখবৎ গোলাকারং আস্যৎ যুগং যস্য,
বহব্রী। ১ বানরবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—গোলা-
জুল, দধিশ্রোণ ও মগাটন। ২ যুগবিশেষ।

কপিখিনী (ক্ৰী) কপিখো হত্য্য দেশে, কপিখ-ইন্ (পুরু-
রাহিবেশে। পা ৫। ২। ১০৫।) ভীষ্ম। ১ কপিখবৃত্ত দেশ।
২ কপিখপর্ণী।

কপিখিল (জি) কপিখ-কাশাদিষ্যৎ ইল (বৃহৎ কঠজিল-
সেনিরচক্য য কক্কিক্য্যক ঠকোহরীহক্কাখ্য-
হুহকবশেতি। পা ৪। ২। ৮০।) কপিখবৃত্ত দেশাধি।

কপিলজ্ঞ (পুং) কপি ইহমান্ রথো বস্য, বহতী। অর্জুন।
(ভারত বন ১৫১ অঃ।)

কপিনামক (পুং) কপিনামন—স্বার্থে কন্। শিলারস।
("কপিতৈলক লংঘ্যাত্ত ভণ্যত কপিনামকঃ।" ভাব প্র।)

কপিনাশ [ম্] (পুং) কপেনার্মেব নাম বস্যাঃ বহতী।
শিলারস।

কপিপিল্লালী (স্ত্রী) কপিবর্ণা রক্তা শিল্পলীল, উপরি। ১
রক্ত অপামার্গ। ২ দুর্ধাবর্ভবক।

কপিপ্রভা (স্ত্রী) কপিষণি প্রভো নিগুণপ্রসারো বস্যাঃ
বহতী। ১ আলকুশী। ২ অপামার্গ। (কপিপ্রভা জিহ্বাং মতা
অপামার্গে। শকাহি।)

কপিপ্রভু (পুং) কপীনাং হুমুদাদীনাং প্রভু নিমজ্ঞ, ভতং।
১ রামচন্দ্র। ২ বালি। ৩ সুগ্রীব।

কপিপ্রিয় (পুং) কপীনাং প্রিয়ঃ, ভতং। ১ আমড়া। ২ কন্দেল।

কপিভক্ষ (ত্রি) কপীনাং ভক্ষঃ, ভতং। ১ বানরদিগের
ভক্ষ্য বস্ত্র। ২ (পুং) কদলী, ইহা বানরের অতি প্রিয় খাদ্য।

কপিরক (পুং) কপিল-স্বার্থে কন্-লস্য-রত্ম (সংজ্ঞাহ্মসো
বাকপিলকাদীনাম্। পা ৮। ২। ২৮, বার্তিক ৩।) কপিল
বর্ণ, পিজলবর্ণ।

কপিরথ (পুং) কপি ইহমান্ রথ ইব বাহনো বস্য, বহতী।
১ রামচন্দ্র। ২ (কপি: রথে বস্য) অর্জুন।

কপিরোমফলা (স্ত্রী) কপীনাং রোম ইব রোমফলে
বস্যাঃ, মধ্যলোম*। আলকুশী; ইহার ফলে বানরের
লোমের ন্যায় পিজলবর্ণ শূক দ্বারা আবৃত।

কপিল (পুং) কন্-ইলচ্-পাদেশশ্চ (কমে: পশ্চ। উণ্ ১।৫৬)
কন্-ধাতুর উত্তর ইলচ্-প্রত্যয় হয়, এবং অন্তে অর্থাৎ মএ-
স্থানে প আদেশ হয়।) ১ পিজলবর্ণ। ২ অগ্নি। ৩ কুসুর।
৪ শিলারস। ৫ মহাদেব। ৬ বিষ্ণু। ৭ নর্পবিশেষ। ৮ দানব-
বিশেষ। ৯ বক্ষণবৃক্ষ। ১০ (ত্রি) পিজলবর্ণবৃক্ষ। ১১ (পুং) সুনি-
বিশেষ। ইহার পিতার নাম কদম ও মাতার নাম দেবহতি,
ইনিই সাধ্যাদর্শন-প্রণেতা।

সাধ্যাচার্য্য কপিল একজন অতি প্রাচীন ঋষি ছিলেন,
যেদের উপনিষদাগে তাঁহার নাম পাওয়া যায়*। তিনি
সিদ্ধবিগ্ণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই ভগবান্ গীতার
কলিমাছেন—

"গুরুর্জাণাং চিত্তরথঃ সিদ্ধীনাং কপিলো মুনিঃ।"

গীতা ১০। ২৬।

* "কপি প্রভুঃ কপিলঃ বহুদ্রো জ্ঞানবিতর্জি।" বেতালবত ৫। ২।
এক কথায় ঋষিকে তিনি সর্বপ্রথমে জানকীর পোষক করেন।

আমি গুরুর্জগণের মধ্যে চিত্তরথ, সিদ্ধগণের মধ্যে
কপিল মুনি।

ভাগবতে লিখিত আছে—"কপিল ভগবানের গুরু
অবতার, মহাবৈদ্যী কর্কষের ঔরসে দেবহতির গর্ভে
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে আকাশে বর্ষাশীল
যেব হইতে নামাবিধ বাহ্য বাহির উঠিল, গুরুর্জগণ হুতা
করিতে লাগিল, এবং অসুরাগণ আনন্দে ঈড় জরজর
করিল, আকাশ হইতে পক্ষীপন পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল,
দিক্, জল ও সর্বপ্রাণীর মন প্রায় হইয়া উঠিল। স্বয়ং
ব্রহ্মা কর্দ্দমাশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি কর্দ্দমকে জানা-
ইয়া কহিলেন, হে মুনে! তোমার এই বালকটি নাক্যং
জৈবর, ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাধ্যাচার্য্য কর্দ্দক
পুত্রিত হইয়া লোকে 'কপিল' নাম প্রাপ্ত হইবেন। ইনি
জ্ঞানসাধন সাধ্যাশাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্ত এই অবতার
গ্রহণ করিয়াছেন।

কপিল আপন পিতা কর্দ্দম ও মাতা দেবহতিকে
জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন। দেবহতি জীলোক হইলেও
পুত্রের নিকট তৎস্বকথা শুনিয়া জ্ঞান ও জীবন্তি
লাভ করেন।"

ভাগবতে দেবহতিকে উপদেশস্থলে কপিল কর্দ্দক
সাধ্যমত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই মত কপিল মত হইতে
অনেকটা বিভিন্ন। ভাগবতোক্ত কপিল মত এইরূপ—

যে সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশাত্মক, বাহ্যবাহ্য দ্বারা লক্ষণ্যাদি
বিষয় অর্জুত হয়, সমুদ্ভূতি ভগবানের প্রতি তাহাদিগের
যে স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাকেই নিকার ভাগবতী ভক্তি বলে,
গুরুস্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইন্দ্রিয়-
গণের ঐ বৃত্তি আপনা হইতে হয় না, বেরবিহিত কর্ণে
প্রবৃত্তি জন্মিলে পর হয়। ঐ প্রকার ভক্তি হইলে ক্রমে
মুক্তিও হইয়া পড়ে। জৈবর বাহার আশ্রয় প্রিয়, পুত্রবৎ
মেহের পাত্র, সখার ভার বিখাগভাজন, গুরুর ভার উপদেষ্টা,
বন্ধুর ভার হিতকারী, ইষ্টদেবের ভার পূজ্য অর্থাৎ বাহার
সর্বতোভাবে ভগবানের ভজনা করে, তাহাদের কাল-কিছুই
করিতে পারে না।

প্রতিলোমবুদ্ধিবিধিষ্ট যে আত্মা, তিনিই পুরুষ; সেই
পুরুষ অনাদি ও নিঃশব্দ এবং প্রকৃতি হইতে জিন্ন। পুরুষ
কেবল সাক্ষীস্বরূপ। ভক্তি আপনি প্রকাশ পান, এই বিশ্ব
তাহার সহিত সমন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সেই
পুরুষের নিকট বিষ্ণুর শক্তিঙ্গণা অরুচকত্ববরী প্রকৃতি
সীল্যবশতঃ উপসভা হইলে তিনি অবতাক্রমে তাহাকে

ঐহিক ক্রিয়া থাকেন। ঐ প্রকৃতি আপনীর গুণদ্বারা আপনীর সমানরূপ বিচিত্র প্রকা সৃষ্টি করিতে থাকেন। নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান, তাহার নাম প্রকৃতি। ঐ প্রধান ত্রিগুণ, অতএব তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ অকার্য, স্তব্ধতা মহত্ত্বও নহে, কার্য ও জীবনধারণ নিত্য অর্থাৎ জীবের প্রকৃতিও নয়। উক্ত প্রধানের কার্যাবরূপ চতুर्वিংশতিগণ আছে, যথা—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দ তন্মাত্র এই পঞ্চ তন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, শব্দ, বাস্প, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয়। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চারি অন্তরীন্দ্রিয়। যদিও অন্তঃকরণই অন্তরীন্দ্রিয়, কিন্তু বৃত্তিতেই উক্ত চারিপ্রকার প্রভেদ হইয়া থাকে। এই চতুर्वিংশতিতত্ত্বই সগুণ ব্রহ্মের সরিবেশ স্থান। এতদ্ভিন্ন কাল পঞ্চবিংশতত্ব।

নিকাম ধর্ম, নির্মল মনঃ, ভক্তিবোধ, তত্ত্বদর্শিজ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপোযুক্ত বোধ, এবং দূততর আত্মসমাধি এই সকল দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে আলাপিকাঠের স্থায় আলিয়া শেষে তিরোহিত হইতে পারে। পুরুষের প্রকৃতি এইরূপে একবার গেলে আর তাহা চাপিয়া উঠে না। তখন পুরুষ বোধ করেন, ইহার ভোগ ভুক্ত হইয়াছে। পুরুষ অস্বপ্নাত্মারে অধ্যাত্মরত হইয়া যখন তাহার আর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বিষয়েও বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিমান হইয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে, তখন কৈবল্য ধামে দেহাতিরিক্ত সদাশ্রয় স্বরূপ পরমানন্দ লাভ করেন। তখন লিপশরীর নাশ হওয়ার আনন্দলাভ করিয়া পুনর্বার আর তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হয় না, আত্মজ্ঞানবলে মিথ্যা জ্ঞান সকলও বিনষ্ট হইয়া যায়।”

পূর্বে বলা হইয়াছে—ভাগবতোক্ত কপিলমতের সহিত সাংখ্যসূত্রের মত অনেকটা স্তব্ধ। এখন দেখা যাউক, তিনি সাংখ্যসূত্রে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন—

বস্তুরাজ্যেই সৎ অর্থাৎ কোন বস্তুরই উৎপত্তি কিম্বা বিনাশ নাই। বস্তুর আবির্ভাব হইলেই আমরা তাহা উপলব্ধি করি এবং তিরোভাব হইলে আর উপলব্ধি হয় না। আবির্ভাবের পূর্বেও বস্তুর সত্তা স্বীকার করিতে হয়। তাহা না করিলে একমাত্র উপাদান হইতে সকলকার্য উৎপন্ন অসংকার্যবাদিমতে উপাদান বৃত্তিকার সহিত ঘটের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল না, সেইরূপ পটের সহিতও উক্ত বৃত্তিকার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ না থাকিলেও যেমন বৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, সেইমত পটও বৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে।

যদি উৎপত্তির পূর্বেও কার্যকে সৎ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বৃত্তিকা হইতে পটোৎপত্তির আশঙ্কি হইতে পারে না, যেহেতু বৃত্তিকার সহিত পটের কোন সম্বন্ধ নাই, বাহার সহিত বাহার কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ নাই, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না। ঘটের সহিত উৎপত্তির পূর্বেও বৃত্তিকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া ঘটের বৃত্তিকা হইতে উৎপত্তি হয়। যদি উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ হয়, তাহা হইলে বৃত্তিকারূপ সংস্কারণের সহিত অসৎ ঘটরূপ কার্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না। স্তব্ধতা অসংকার্যবাদিমতে ঘটসংসর্গশূন্য বৃত্তিকা হইতে যেমন ঘটের উৎপত্তি হয় সেই মত অসম্বন্ধবৃত্তিকা হইতে পটের উৎপত্তি হইতে বাধা কি? অথবা বৃত্তিকার সহিত সংসর্গ নাই বলিয়া যেমন বৃত্তিকা হইতে পট উৎপন্ন হয় না, সেই মত বৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া বৃত্তিকা হইতে ঘটেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। উক্ত বৃত্তিব্যয়ই সংকার্যবাদ স্থাপনের প্রধানতম যুক্তি।

উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্তা স্বীকার করিলে উৎপত্তির পূর্বে কার্যের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ মহর্ষি কপিলের মতে কার্যাত্মাই উৎপত্তির পূর্বে কারণে অব্যক্তাবস্থায় ডিম্বস্থিত সর্পের মত অবস্থান করে, ডিম্ব হইতে বাহির হইবার পূর্বে যেমন সর্পকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেই কারণ হইতে অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে কার্যকেও প্রত্যক্ষ করা যায় না।

কপিল পদার্থের সংখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তৎকৃত দর্শনসূত্রের নাম সাংখ্যসূত্র। [সাংখ্য দেখ।] সেই পঁচিশটি পদার্থ এই—প্রকৃতি (১), মহত্ত্ব (২), অহঙ্কার (৩), মন (৪) শব্দতন্মাত্র (৫), স্পর্শতন্মাত্র (৬), রূপতন্মাত্র (৭), রসতন্মাত্র (৮), গন্ধতন্মাত্র (৯), চক্ষুঃ (১০), কর্ণ (১১), নাসিকা (১২), জিহ্বা (১৩), ঘ্র্ণ (১৪), বাস্প (১৫), পানি (১৬), পাদ (১৭), পায়ু (১৮), উপস্থ (১৯), আকাশ (২০), বায়ু (২১), তেজঃ (২২), জল (২৩), ক্রিতি (২৪), আত্মা (২৫)। যে সময়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কোন কার্যকারিতা থাকে না, সেই সময় উপলব্ধিত উক্ত ত্রিগুণকে প্রকৃতি বলে, এই প্রকৃতির প্রথম কার্য বুদ্ধিতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্বকেই মহত্ত্ব বলে। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে শব্দ প্রকৃতি তন্মাত্র ও চক্ষু প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের (শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে তেজঃ, রস হইতে জল, গন্ধ হইতে ক্রিতির) উৎপত্তি হইয়াছে। আত্মা নিত্য অপ্রকাশ ও নির্বিকার, স্থখ

হুঃপ্রভৃতি কিছুই তাহাকে স্পর্শ করে না। যখন অন্তঃ-
করণের বুদ্ধিতত্ত্বের সূত্র ও হুঃপ্রকার বৃত্তি হয়, সেই সময়ে
অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভিন্ন জ্ঞান হয় বলিয়া অন্তঃ-
করণের সূত্র ও হুঃপ্রাদি আত্মাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন কোন
বুদ্ধে মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইলে মনুষ্যের হস্ত সন্তকাদি জ্ঞান
বুদ্ধিতে হইরা থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণের সহিত আত্মার
অভিন্ন জ্ঞান হইলে অন্তঃকরণের সূত্র সূত্র ও হুঃপ্রাদি আত্মাতে
অন্তর্ভুক্ত হইরা থাকে।

কপিল তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও
শব্দ। ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার করণকে প্রত্যক্ষ
প্রমাণ বলে। ঘটাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ হইলে
অন্তঃকরণে বিষয়াকার পরিণাম উৎপন্ন হয়, সেই পরিণাম
অত্যন্ত নির্মল, তাহাতে স্বপ্রকাশ আত্মা প্রতিবিম্বিত হয়,
তখনই বিষয় সকলকে অনুভব করিয়া থাকে। ব্যাপ্তি
জ্ঞান জন্য জ্ঞানকে অনুমিত বলে, অনুমিতের করণই অনু-
মান প্রমাণ। যে হেতু সাধ্যের অব্যতিচারী, (সাধ্যশূন্য স্থান
থাকে না), সেই হেতুতে সাধ্যের যে সামান্যাদিকরণ্য
(সাধ্যাদিকরণে সেই হেতুর যে অস্তিত্ব) তাহাকে ব্যাপ্তি
বলে। যাহাকে সাধন করিতে হইবে, তাহাকে সাধ্য বলে,
যেমন ‘পর্তুতো বহিমান্ ধূমঃ’ এখানে পর্তুতে বহিকে সাধন
করিতে হইবে বলিয়া বহিই সাধ্য। যাহা দ্বারা সাধ্যের
সাধন করা হয়, তাহাকে হেতু বলে, যেমন ধূম, ধূম দেখিয়াই
পর্তুতে বহির সাধন করা হইরা থাকে। বহিশূন্য স্থানে ধূম
থাকে না, কিন্তু বহির অধিকরণে ধূমের অস্তিত্ব আছে,
অতএব ধূমে বহির ব্যাপ্তি থাকিতে কোনও বিরোধ নাই।
শব্দদ্বারা যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের করণকে শব্দপ্রমাণ
বলে। কপিল বৈদান্তিকের মত এক জীববাদী নহেন।
তিনি বলেন, সকলের এক জীবাত্মা স্বীকার করিলে রাসের
সূত্র হইলে ভ্রামও সেই সূত্রাদি অনুভব করিতে পারে।
নৈসারিকাদির মত সাধ্যা পণ্ডিতগণ আত্মাতে হুঃপ্র ও সূত্র
স্বীকার করে না, বিষয়েই তাহারা সূত্র ও হুঃপ্র স্বীকার
করেন, যদি বিষয়ে সূত্র ও হুঃপ্র না থাকিত, তাহা হইলে
অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তিমাাত্র সূত্র ও অনভিলষিত বিষয়
দ্বারা হুঃপ্র হইত না। অভিলষিত বিষয়ে সন্তুপ্তির উত্তর
হইলেই সূত্র হয় এবং রসোক্তগণের উত্তর হইলেই হুঃপ্র হয়।

কপিল সাধ্যাসূত্রে বৈদ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিরা-
ছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।
সাধ্যাসূত্রবশত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে
জগতের কর্তা বলিতে হইবে, তাহা হইলে বিদ্যন স্বীকারী

ঈশ্বর মনুষ্যের মত পক্ষপাতী হইরা পড়েন। একজনকে সুখী
ও অপরকে দুঃখী করা কোন মতেই ঈশ্বরের উচিত হইতে
পারে না, যে হেতু ঈশ্বর সকলের নিকটেই সমান। যেমন
অরহান্তমণির নোহ আকর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি চেতন-সম্বন্ধ না
থাকিলেও হইরা থাকে, সেই মত চেতনাময় ঈশ্বরের সম্বন্ধ
না থাকিলেও অচেতন প্রকৃতির সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্তি হইতে
পারে। কপিল বলেন যে, অন্তঃকরণ যখন প্রকৃতিতে লীন
হইবে, তখনই পুরুষের বৃত্তি হয়। যতকাল পর্য্যন্ত অন্তঃ-
করণ থাকিবে, ততকাল পুরুষের বৃত্তি হইবে না।

ইহারই কোপানন্দে সগরবংশ লংশ হইরাছিল; কেহ
কেহ বলেন সগরবংশনাশক কপিল স্বতন্ত্র। ১২ বিতমপুত্র।
১৩ বহুদেবপুত্র। ১৪ কুশবীপের পর্কতবিশেষ। (ভাগবত
৫।২০।১৫)

কপিল। ব্রাহ্মণসম্প্রদায়বিশেষ। ইহার আপনাদিগকে
কপিলবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। হুয়াট, বয়োচ ও
জয়সরে কপিলব্রাহ্মণেরা বাস করেন।

কপিলক (জি) কপ-ইরন-স্বার্থে করস্য লঃ। ১ কম্পাঙ্কিত।
২ (পুং) (কপিল-স্বার্থে কন) পিঙ্গলবর্ণ।

কপিলক্ষেত্র। নর্মণা ও মহীনাগরের মধ্যবর্তী উপকূল।
কলপুরাণোক্ত রেবাখণ্ড মতে ইহা অতি পুণ্যস্থল। [কপিলা-
সম্মম দেখ।]

কপিলগঙ্গিকা (জী) কপিলগঙ্গা; কামরূপস্থ নদীবিশেষ।
(কালিকাং ৭৯।১৪৯) ইহার বর্তমান নাম কপিলী।

কপিলদেব (পুং) সৃষ্টিশাস্ত্রবিশেষের প্রণেতা।

কপিলদ্ব্যুতি (পুং) কপিল। রক্তা পিঙ্গলবর্ণা বা দ্ব্যুতির্ভাষ্য,
বহুব্রী। সূর্য্য।

কপিলদ্বীপ। পবিত্র তীর্থবিশেষ। এখানে ভগবানের
অনন্তমূর্ত্তি বিরাজ করেন। (নারসিংহপুং ৬৫।৭)
[কপিলক্ষেত্র দেখ।]

কপিলব্রাহ্মণ (জী) কপিল। কপিলবর্ণা ব্রাহ্মণ, কর্ম্মধা।
ব্রাহ্মণবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুখীক, গোতনী,
কপিলকলা, অমৃতরসা, দীর্ঘকলা, মধুবলী, মধুকলা, মধুলী,
হরিভা, হারহার, স্ককলা, সুখী, হিমোত্তরা, পথিকা, হেম-
বতী, শতবীৰ্যা ও কাশ্মরী। ব্রাহ্মনির্ঘণ্টের মতে ইহার
গুণ,—মধুর, মীতল, স্নায়ু, মস্ততা স্তম্ভ হর্ষপ্রদ এবং দাও,
মুহুরী, অর, বাস, তৃষ্ণা ও জ্বালা (বহনবেগ) নিহারক।

কপিলক্রম (পুং) কপিলঃ কপিলবর্ণো ক্রমঃ, মধ্যলো।
কাশীনাশক স্তম্ভদ্বিকর্ত্তিবিশেষ।

কপিলধারা (জী) কপিলান্য দ্বারা সূত্রধারা ইব কপিল ধারা

বন্যাঃ, কপিলানং হৃদযাঃ। সত্বতা নির্মলা বার্য বন্যাঃ
ইতি বা, আকারস্য হৃদযঃ (ভ্যাগোঃ সংজ্ঞা হৃদ্যো বহুত্বম্ ।
পা ৩।৩।৩০।) ১ গলা। ২ তীর্থবিশেষ। (কাশী ৬২ অঃ।)
৩ (৬৩৭) কপিল গাভীর হৃদযাঃ।

কপিলকলা (জী) কপিলং কল বন্যাঃ, বহত্রী। জালা।
কপিলমত (কী) কপিলস্য মনের্মতম্, ৬৩৭। কপিলমুনির
মত, সাংখ্যদর্শনের মত।

কপিলমুনি (পুং) ধূলনা জেলাহ একটি গ্রাম। কপোতাক
(কবদক) নদীর তটে অবস্থিত। পূর্বকালে কপিলনামক এক
জন সাধু এইখানে কপিলেশ্বরী নামে এক দেবীমূর্তি স্থাপন
করেন, তাহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম কপিলমুনি
হইয়াছে। চৈত্রমাসের বাসুন্তর্য্য দিন কপিলেশ্বরী দেবীর
মহোৎসব হয়, সেই সময় এখানে মেলা হইয়া থাকে, সেই
দিন এখানকার কপোতাক্ষনদীতে স্নান ও দেবীদর্শন
করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়, তত্পলক্ষে নানাস্থান হইতে
তীর্থযাত্রীগণ আগমন করেন। এখানে জাকর আলী নামক
একজন মুসলমান পীরের মন্দির মসজিদ আছে।

অক্ষা° ২২° ৪১' উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ২১' পূঃ।

কপিললিঙ্গ। মেঘনা নদীর পূর্বধারে প্রায় দুইহাজার
হাত দূরে, নবপালের নিকট অবস্থিত লিঙ্গবিশেষ।
(ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৯। ৪২।)

কপিলবস্ত্র (কী) প্রাচীন নগরবিশেষ।

শাক্যরাজগণের রাজধানী এবং শাক্যসিংহের জন্মস্থান।
বৌদ্ধগ্রন্থগোষ্ঠে জানা যায়, বুদ্ধদেবের সময়ে এখানে বিস্তারিত
লোকের বাস ছিল, জন্মের রাজপ্রাসাদ, মনোহর উদ্যান,
অসংখ্য সুরম্য হস্ত্যাবলী নগরের স্থানে স্থানে শোভাবর্ধন
করিত, তৎকালে কপিলবস্ত্রে নানাদেশীয় লোকের বসবাস
ছিল। [শাক্য দেখ।]

প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাং হিয়ান্ ও হিউএন ত্সিং
কপিলবস্ত্র দর্শনে আগমন করেন। উঁহার ক্রমান্বয়ে ‘কিঅ
বো-লো-বে’ ও ‘কি-শি-লো-ক-স্লে-তি’ নামে এইস্থানের
উল্লেখ করিয়াছেন।

হিউএন্ ত্সিংতের বর্ণনায় জানা যায় যে, কপিলবস্ত্র
একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, ইহার পরিমাণকল প্রায় ৬০০ মাইল
(৪০০০ লি)। উত্তর পরিব্রাজকের সময়ে কপিলবস্ত্র অবস্থা
মিতান্ত্র শোচনীয় হইয়াছিল। পূর্বে যে যে স্থান লক্ষ্য-
শালী ছিল, তাহার আদিয়া যেখেন সেই স্থান জনমানব-
মুক্ত মরুপ্রায় পড়িয়া আছে। এমন কি তৎকালে শাক্য-
রাজধানী কপিলবস্ত্রনগরের পূর্বস্থি এককালে বিলুপ্ত

হইয়াছিল। নগরের প্রাচীন ইষ্টকনির্মিত প্রাসাদ সকল
ভগ্ন অথবা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই নিকট হীন-
বান-মতাবলবীরিগের একটি সম্মারাম ছিল, এ ছাড়া হিন্দু-
দিগের দুইটি দেবমন্দির ছিল। প্রাসাদের মধ্যস্থলে
ভুদ্ধোদয়নরাজের প্রস্তরমূর্তি, তাহারই অনতিদূরে বুদ্ধজয়নী
মারাদেবীর অস্তঃপুর ছিল। এ ছাড়া নগরের আশে পাশে
অনেকগুলি স্তূপও দৃষ্ট হইত।

বর্তমান কৈলাবাদ হইতে বর্ষা ও গণ্ডকী নদী মধ্য-
বর্তী স্থান এবং এই দুইনদীর সঙ্গমস্থান পর্য্যন্ত চীনপরিব্রাজক
বর্ণিত কপিলবস্ত্ররাজ্য বলিয়া অজ্ঞানিত হয়। কৈলাবাদ
হইতে ২৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত বজ্রজেলার অন্তর্গত
মনজুরনগর পরগণার সামীল ভূইলা নামক স্থানই প্রাচীন
কপিলবস্ত্র নগর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন সকলে
তাহাকে ‘ভূইলা তাল’ বলে। [কপিলবস্ত্র বিস্তৃত বিবরণ
Cunningham's Arch. Survey of India, Vol. xii. p.
83-172. দেখ।]

কপিলশিংশপা (জী) কপিল পিজলবর্ণা শিংশপা, কর্ণবা।
শিংশপা বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্যায়,—কপিল, পীতা,
সারিণী, কপিলাকী, ভঙ্গগড়া ও কুশিংশপা। রাজনির্ঘণ্টের
মতে ইহার গুণ,—তিক্ত, শীতবীর্য এবং আমবাত, পিত্ত,
জ্বর, বমন ও হিকানাসক। [শিংশপা দেখ।]

কপিলসংহিতা (জী) উপপুরাণবিশেষ। ইহাতে উৎকল-
দেশের তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

কপিলস্মৃতি (জী) কপিলপ্রণীতা স্মৃতিঃ, মধ্যলোং।
সাংখ্যশাস্ত্র। বেদার্থাভূতব ও মুনিপ্রণীত বলিয়া সাংখ্য
শাস্ত্রের স্মৃতি স্বীকার করা হয়।

(“কপিল স্মৃতেরনবকাশদোষমাশঙ্ক্য মানবাধিস্মৃত্যন্তরা-
নবকাশদোষাৎ সাংখ্যমতং প্রত্যাব্যাতম্।”

‘স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গইত্যাদি সাংখ্য।’ সাংখ্য হৃ-তাম্য।

কপিল (জী) কপিলো বর্ণোহস্যাত্তি, কপিল-অর্ধআবিহাৎ
অট্টাপ্। ১ পুণ্ডরীকনামক দিগগজের পত্নী। ২ ভঙ্গগড়া-
শিংশপাবৃক্ষ। ৩ রেণুকানামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

(রেণুকা রাজপুত্রী ৮ নন্দিনী কপিল বিজা।

ভঙ্গগড়া পাণ্ডুপ্রত্নী স্ত্রী কৌতী হরেণুকা ॥ রাজবল্লভ।)
৪ অর্ধবর্ণা গাভীবিশেষ। ৫ দক্ষকর্ত্তা। ৬ গৃহকর্ত্তা। ৭ কাম-
দেহু। ৮ শিংশপা। ৯ রাজনীতি। ১০ কামরূপস্থ নদীবিশেষ।
(কালিকাপুং ৮১ অঃ।)

১১ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটি নদী, এই নদীর সহিত
নর্মদানদী মিলিত হইয়াছে।

“আপনা কপিল নাম বুঠা ব্রহ্মবিদ্যেবৈতঃ ।

নর্যনামকম তত্ত্ব ক্রতাবর্ধঃ প্রকীর্তিতঃ ॥” রেবাখণ্ড ২৬ অঃ ।

কপিল ও নর্যনামকম নদীর সমন্বয়নকে ক্রতাবর্ধ বলে ।

[কপিলাবর্ধ দেখ ।] রেবাখণ্ডমতে এইখানে মান করিয়া

মহেশ্বরের পূজা করিলে অক্ষয়বর্ষ লাভ হয় । ১২ তীর্থবিশেষ ।

১৩ ভ্রামলতা । ১৪ বিশালদেশের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ ।

(ভৃং প্রস্থখণ্ড ৪৯ । ১২)

১৫ (জি) কপিলবর্ধবৃত্ত ।

কপিলাকী (জী) কপিলং কপিলবর্ধং অক্ষি ইব পুষ্পং যস্যাঃ ।

১ যুগেক্ষার । ২ কপিলশিংশপা ।

কপিলার্চ্য (পুং) কপিলঃ কপিলনামা আচার্য্যঃ,

কর্মধা । ১ কপিল ঋষি । ২ বিষ্ণু ।

(“মহর্ষিঃ কপিলার্চ্যঃ কৃতজ্ঞো মেদিনীপতিঃ ।” বিষ্ণুসং ।)

কপিলাজ্জন (পুং) কপিলং অজ্ঞনং যজ্ঞ, বহতী । শিব, মহাদেব ।

কপিলাতীর্থ (ক্রী) তীর্থবিশেষ ; এইতীর্থে ব্রহ্মচারী হইয়া

মান এবং পিতৃলোক ও দেবতার অর্চনা করিলে, সহস্র

কপিল গাভীদানের ফললাভ হয় । (ভারত । ৩ । ৮৩ । ৪৫)

কপিলাদান (ক্রী) কপিলার দানং ওতং । কপিলাগাভী

দান । মৎস্যপুরাণোক্ত কপিলাদানের মন্ত্র ;—

“কপিলে । সর্ষভূতানাং পূজনীয়া হসি রোহিণী ।

তীর্থদেবমরী যস্যাং অতঃ শাস্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥”

বটী, চামর, কিঙ্কিনী, দিব্যবস্ত্র ও হেমদর্পণ-

ভূষিতা, পয়স্বিনী, স্তম্বীলা, তরুণী ও বৎসবৃত্তা

কপিল প্রদান করা উচিত । এই দানে স্বর্গলাভ

হইয়া থাকে ।

কপিলাপুর । দক্ষিণাংশের নগরবিশেষ । (রেবাখণ্ড

১৭ । ৬) সম্ভবতঃ নর্যনামকীতীরে অবস্থিত ।

কপিলাবট (পুং) কপিলার কৃতো বটো গর্ভঃ । তীর্থবিশেষ ।

(ভারত বন ৮৪ । ২৮ ।)

কপিলাবর্ত্ত । বরোচজেলার অন্তর্গত নর্যনাম ও কপিল নদীর

সমন্বয়ন । কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডমতে ইহার নাম ক্রতাবর্ধ ।

কপিলান্দ্র (পুং) কপিলঃ কপিলবর্ণা অথবা যস্য বহতী । ১

ইন্দ্র । ২ রাজবিশেষ । ৩ খৃষ্টাব্দীয় কুললরাস্বের পুত্র ।

(কপিলান্দ্রঃ পুংসি শব্দে । শকাব্দিক ।)

কপিলানন্দম । কপিল ও নর্যনামকম নদীর সমন্বয়ন । এইখানে

মান করিলে অনেক পুণ্যলাভ হয় । ইহার নিকট অনেক

পবিত্র তীর্থ আছে । (রেবাখণ্ড ১৩ অঃ ।) বর্তমান বরোচ

জেলার অন্তর্গত ।

কপিলান্দ্র (পুং) তীর্থবিশেষ । (ভারত বন ৮৪ অঃ)

কপিলিকা (ক্রী) কপিলানন্দজারী কন্দীপ্ অন্তরীক্ । শত

গদীবিশেষ, কান-কোটারিবিশেষ ।

(“শতগদ্যাক্ত পক্ষা ক্রকো চিত্রা কপিলিকা পীতিকা

রক্তা বেতা অগ্নিপ্রভা ইত্যাক্টে ॥” জুজ্ঞত)

কপিলী । আসামের অন্তর্গত অরুণীগিরি হইতে নির্গত নদী-

বিশেষ । ইহার প্রাচীন নাম কপিল বা কপিলদক্ষিকা ।

কপিলীকৃত (জি) অকপিলং কপিলং কৃতম্, কপিল-অকৃত

তৎভাবে চি-কৃত-ক । বাহা কপিল ছিল না তাহাকে কপিল

করা হইয়াছে ।

কপিলেশ্বরদেব । উৎকলের একজন রাজা । বাংলাকালে

তিনি একজন ব্রাহ্মণের গরু চরাইতেন, তৎপরে উৎকল-

রাজ নেত্রবাহুদেবের নিকট আসিয়া চাহুরী করেন । কার্য্য-

দক্ষতা শুধে তিনি নেত্রবাহুদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া

উঠেন । বাহুদেবের মৃত্যু হইলে তিনি আপন সাহস-

বলে উৎকলের রাজসিংহাসন লাভ করেন । তাহার রাজব-

কাল ২৭ বর্ষ (১৪৫২-১৪৭৯ খৃঃ অঃ) ।

কপিলেশ (ক্রী) কপিলেন প্রতিষ্ঠাপিতং ঈশং লিঙ্গম্, মধ্যলোং ।

কানীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ ।

(“কপিলেশং মহালিঙ্গং কপিলেন প্রতিষ্ঠিতম্ ।

মুচ্যতে কপরেহপ্যস্য দর্শনাৎ কিমু মানবাঃ ॥” কানীখণ্ড ।)

কপিলেশ্বর । একটি প্রাচীন নগর । মাজারপ্রদেশের

গোদাবরী জেলার রামচন্দ্রপুর তালুকের অন্তর্গত । অক্ষা-

১৬° ৪৬' উঃ, দ্রাঘি ৮১° ৫৭' ২০" পূঃ । (১৮৮১ সালে) লোক-

সংখ্যা ৫০৫৭ ।

কপিলোমফলা (ক্রী) কপীনাং লোম ইব লোমাবৃত্তং ফলাং

যস্যাঃ, বহতী । আলকুণী ।

কপিলোমা (ক্রী) কপীনাং লোমইব লোমমঞ্জরী যস্যাঃ,

বহতী । রেণুকানামক গজজব্য । [রেণুকা দেখ ।]

কপিলোহ (ক্রী) কপিবৎ পিজলং লোহং । পিত্তল ধাতু-

বিশেষ । [পিত্তল দেখ ।]

(—অধারকূটঃ কপিলোহং জুবর্ণকম্ ।

দ্রিগী রীগী চ রীতিশ্চ পীতলোহং স্নোলোহকম্ ॥

(হেম ৪ । ১১৪ ।)

কপিলিকা (ক্রী) কপিবর্ণা বল্লিকা, (প্ৰবোধরাসিখ্যাং) ব

লোপঃ । গজপিল্লী । [গজপিল্লী দেখ ।]

কপিবক্ত (পুং) কপেদীনরয়া বক্তৃষি বক্তৃং বয়া, বহতী ।

দেবর্ষি নারদ । মহাভারতে ভারতের দ্বানরবৃত্ত সম্বন্ধে

এইরূপ লিখিত আছে ;—কোম সময়ে দেবর্ষি নারদ ও

তাঁহার ভাগিনের পক্ষত ঋষি মহাবালোকে আসিয়া মহাপ্রাণ

সহ একত্র বাস করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাহার পর উভয়ে উভরকে গুহাভ্যন্তর বাবতীর মনোভাব প্রকাশ করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, স্বপ্নময় রাজার রাজ্য মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার জন্য খীর কতাকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; কিছুদিন পরে নারদ সেই কতারা প্রতি নিভাত আসক্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ এই মনোভাব ভাগিনের পক্ষতের নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না। পরন্তু নারদের আকার ইন্দিতে দ্বারা তাঁহার মনোভাব অবগত হইলেন, এবং নারদ যে গোপন করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছেন এষম্ অভি-
শর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন,—“এই রাজ-
কতা তোমার ভাৰ্য্যা হইবে এবং তুমি বানরমুখ ধারণ করিয়া এই মর্ত্যভূমে বিচরণ করিবে।” (ভারত শাস্তি ৩০ অঃ।) ২ (কী) (কপেবক্রম্) বানরের মুখ।

কপিবল্লী (কী) কপিগিরি কপি লোম ইব বস্ত্রী, মধ্যলোঃ। গজপিঙ্গলী।

কপিময়না। একপ্রকার ময়না গাছ। (Vangueria spinosa.) [ময়না দেখ।]

কপিশ (পুং) কপিঃ বর্ণবিশেষঃ কপিলনাম বা অন্ত্যস্ত, কপি-শ (লোমাদিপামাদিপিছাদিত্যঃ) শনেলচঃ। পা ৫। ২। ১০০। ১ শ্রাবণ, এইবর্ণ কৃষ্ণ ও পীত এই উভয় বর্ণে মিলিত হইয়া উৎপন্ন হয়। ২ (ত্রি) কপিশ বর্ণযুক্ত। (পুং) ৩ মেটে রজঃ ৪ শিব।

(“কপিলঃ কপিশঃ গুহ্য আয়ুষ্চৈব পরো হপনঃ।”

(ভারত জহ্ন। ১৭। ১৭।)

৫ শিলারস।

(কপিশস্ত্রিযু জ্ঞাবে জী মাধব্যঃ সিল্লকে পুমান্। বেদিনী।)

৬ (কী) মধ্যবিশেষ।

(“প্রাণা ন পশ্চৎ কপিশং পিপাসতঃ।” মাধ।)

৭ জনপদবিশেষ। [কপিশী দেখ।]

কপিশা (কী) কপিশ-চাপ্। ১ মধ্যবিশেষ। ২ মাধবী-
লতা। ৩ নদীবিশেষ। রত্ন রাজ্য এই নদী গায় হইয়া উৎ-
কলে দিয়াছিলেন। (রত্নবংশ)। ইহার বর্তমান নাম কশাই,
উহা মেসিলাপুয়ের দক্ষিণাংশে প্রাবাহিত হইয়া স্বযোগলাগরে
মিলিত হইয়াছে।

কপিশাজ্ঞন (পুং) কপিশঃ অজ্ঞনঃ কপিশযুক্তঃ বা অজ্ঞনঃ
বস্ত্র, বহস্ত্রী। শিব।

কপিশাপুত্র (পুং) কপিশারাঃ, মদোজ্ঞারাঃ শিশুচ্যাঃ
পুত্রা, ৬৩৭। শিশু।

কপিশারন (পুং) ১ দেবতা। ২ মধ্যবিশেষ। কপিশবংশোদ্ভব
জ্ঞানবান্ভব মধ্য। [কপিশী দেখ।]

কপিশী (কী) কপিশ-বর্ণধাতিবাৎ জীব্। ১ মাধবীলতা।
২ মধ্যবিশেষ।

কপিশীকা (কী) কপিশ-বর্ণার্থে বাহুলকাৎ কৈক্ টাপৃচ।
মধ্যবিশেষ।

কপিশীর্ষ (কী) কপীনাম্ প্রিয়ং শীর্ষং প্রাকারাদীনাম্
অগ্রপ্রদেশঃ, মধ্যলোঃ। প্রাচীরাদির অগ্রভাগ। (প্রাকা-
রাগ্রং কপিশীর্ষং। হেব ৪। ৪৭।)

কপিশীর্ষক (কী) কপীনাম্ শীর্ষবর্ণং কাশতি প্রকাশতে,
কপিশীর্ষ-কৈ-ক। ১ হিহুল। ২ প্রাচীরের অগ্রভাগ।

কপিষ্ঠল (পুং) ঋষিবিশেষ। [কপিষ্ঠল দেখ।]

কপিস্কন্ধ (পুং) কপীনাম্ স্বন্ধ ইব স্কন্ধো বস্ত্র, মধ্যলোঃ।
দানববিশেষ। (হরিবংশ)

কপূরখলা। পঞ্জাব-গবর্ণমেটের অধীন এক দেশীয় কয়দ
রাজ্য। অক্ষা ৩১° ৯' হইতে ৩১° ৯' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি
৭৫° ৩' ১৫" হইতে ৭৫° ৩৮' ৩০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমি-
পরিমাণ ৬২০ বর্গমাইল। (১৮৮১ সালের) লোকসংখ্যা
২৫২৬৭।

পূর্বকালে কপূরখলারাজ্য অনেকটা বিস্তৃত ছিল,
পূর্বে জালন্ধর ও পশ্চিমে শতদ্রু নদী ছাড়াইয়া আরও
অনেকটা লইয়া এই রাজ্যের সীমা নির্ধারিত হইত।

কপূরখলার আহলুওয়ালিয়া-বংশীয় পূর্বতন সর্দারগণ আপন
অসি বলে সমস্ত শতদ্রুব প্রদেশ শাসন করিতেন। পূর্বে
আহলনামক গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া এই বংশীয়েরা
আহলুওয়ালিয়া নামে অভিহিত হইতেন। সখাও সিং এই
বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

১৭৮০ খৃঃ অঃ, রামগড়িয়া বংশীয় সর্দার বংশসিংহ
শতদ্রুব প্রদেশ অনেকটা আপনি অধিকার করেন এবং
অনেকটা মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট হইতে ১৮০৮
খৃঃ অব্দে প্রাপ্ত হন।

১৮০৯ খৃঃ কপূরখলার সর্দারের সঙ্গে ইংরাজসিগের
এক সন্ধি হয়, তাহাতে সর্দার শতদ্রুবপ্রদেশে যে সকল
ইংরাজসৈন্য আদিবে তাহাদের রসম ও বাসস্থান বোণাইতে
বন্ধিত হন এবং যুদ্ধকালে ইংরাজসিগকে সাহায্য করিতে
প্রতিজ্ঞিত হন। কিন্তু অসিবাণের যুদ্ধের সময় সর্দার কত-
সিংহের পুত্র নেহালসিংহ ইংরাজসিগকে সাহায্য না করিয়া
ইংরাজসৈন্যের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন, তাহাতে তাঁহারই
পরাজয় হইল। ইংরাজবাহাদুর তাহার রাজ্য হস্তগত করিলেন।

১৮৪৫ খৃঃ, ইংরাজেরা জালন্ধর প্রদেশ অধিকার করিলে স্বর্গি সৌর্যব নামক স্থান পূর্বতন সর্দারকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দেওয়ানী ও কোজদারী ব্যাপার কোম্পানী বাহারর আপন হাতে রাখিলেন। ১৮৪৯ খৃঃ অঃ, সর্দার সৌর্য সিংহ রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ খৃঃ অঃ, তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রণধীর সিংহ রাজা হন। ১৮৫৭ খৃঃ, বিদ্রোহের সময়ে রণধীর ইংরাজদিগকে বখা-শক্তি সৈন্ত দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহারই সফলতার ইংরাজেরা জালন্ধর প্রদেশ হাতে রাখিতে পারিয়াছিলেন। তৎপরবর্ষে তিনি সসৈন্তে অযোধ্যা প্রদেশে আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে শাসন করেন, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট তাঁহার বীরত্ব ও রাজভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত বন্দী, বিখৌলী, ও আকোনা নামক স্থান চিরকালের জন্য জারী করিলেন। এখানে কপূর-খলারাজ সমস্ত তালুকদারের প্রধান হইয়া 'রাজা-ই-রাজাগণ' উপাধি ভোগ করিয়া থাকেন। ১৮৭০ খৃঃ রণধীর বিলাত যাত্রাকালে আদেশবন্দরে প্রাণত্যাগ করেন, তৎপুত্র খরকসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ, খরকের পুত্র জগৎজিসিংহ কপূরখলার রাজা হন। সম্ভ্রান্ত তৎপুত্র রাজা হইয়াছেন।

কপূরখলার রাজা নিজ রাজ্য হইতে ১০,০০,০০০ টাকা এবং অযোধ্যা প্রদেশ হইতে ৮,০০,০০০ টাকা কর আদায় করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে ১,০১,০০০ টাকা এবং রণধীর সিংহের জাতপুত্রের বংশধরগণকে ৩০,০০০ টাকা দিতে হয়।

ইহার প্রধাননগর কপূরখলা।

কপিশূল (ক্ৰী) কপীনাং স্থলং, আবাসঃ, ৬তং। ১ বানর-বিশের নিবাসস্থান। ২ পঞ্জাবের প্রাচীন জনপদবিশেষ।

[কপিশূল দেখ]

কপিশ্বর (ত্রি) কপীনাং স্বর ইব শ্রো যত, বহুব্রী। বানরের ভাব স্বরবিশিষ্ট ব্যক্তি।

কপীকচ্ছু (ক্ৰী) কপিকচ্ছু-সংজ্ঞায়াং বা দীর্ঘঃ। আলকুশী।

কপীজ্য (পুং) কপিভি বানরৈ রিষ্যতে পূজ্যতে, কপি-বজ্-ক্যাপ্। ১ রামচন্দ্র। ২ কীরিকাবৃক। ৩ (কপিবৃ ইজ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ।) সুগ্রীব। ৪ হনুমান্।

কপীত (পুং) কপিভিরিতঃ প্রাপ্তঃ প্রিরথেনেতি শেবঃ। যেত-বৃক।

কপীতন (পুং) কপীনাং তং লক্ষ্যং তনোতি, কপি-কৈ-তন্-পঠ্যক্যচ্। ১ আমড়া গাছ। ২ গর্দভাঙ্কুর, পাতিভাট। ৩ শিরীষ। ৪ অশ্বখ। ৫ সুপারি গাছ। ৬ বেল গাছ।

কপীন (বিশেষ) কৌশীন শব্দের লপভঙ্গ। [কৌশীন দেখ]
কপীন্দ্র (পুং) কপিভিঃ ইব, কপিবৃ ইজ্যঃ শ্রেষ্ঠো বা। ১ হনুমান্। ২ বালি। ৩ সুগ্রীব। ৪ বিষ্ণু।

(“শরীরভূতকৃত্তোক্তা কপীন্দ্রো ভূমিদক্ষিণঃ।”

ভারত ১৩। ১৪৪। ৬৬।)

কপীবহু (ক্ৰী) কপিবহু-ইকো বহেৎপীলোঃ। পা ৩। ৩। ১২১।) দীর্ঘঃ। সরোবরবিশেষ।

কপীবান্ [৭] (পুং) বশিষ্ঠ ঋষির পুত্রবিশেষ।

কপীবান (পুং) বশিষ্ঠ-ভূমির পুত্রবিশেষ। (হরিবংশঃ)

কপীক (পুং) কপীনাং ইষ্টঃ প্রিরঃ, ৬তং। ১ রাজাদনী বৃক। ২ কপিথ, কপ্বেল।

কপুচ্ছল (ক্ৰী) কত শিরসঃ পুচ্ছমিব লাভি, ক-পুচ্ছ-লা-ক। ১ কেশচূড়া। ২ ক্রকের অগ্রস্থান।

(“ইষমেব কপুচ্ছলময়ং নতঃ স্বাহার্কঃ।” শতব্রাহ্ম ২০। ১১০।)

কপুষ্ঠিকা (ক্ৰী) কত শিরসঃ পুষ্ঠী কারতি, ক-পুষ্ঠি-ট-ক-টা-প্। কত শিরসঃ পুষ্ঠী পোষণার হিতং, ক-পুষ্ঠি-কন্-টা-প্ বা। কেশচূড়ার সংকার কার্য।

(“অথাত তৃতীয়ে বর্ষে চূড়াকরণং কপুষ্ঠিকা।” গোতিল।)

কপুয় (ত্রি) কুংসিতং পুয়তে, কু-পুয়-অচ্ (পূর্বোদগারিষ্যৎ) উ লোপঃ। কুংসিত।

(“অথ য ইহ কপুয়চরণা অভ্যাশোহ তে কপুয়যোনি-মাশ্রয়ন্ত।” ছান্দোগ্য উপঃ।)

কপুথ (ত্রি) কুংসিতং প্রথরতি, কু-প্রথি-কিপ্ বৈদিকভাবে নিপাতনে সিদ্ধঃ। কুংসিত প্রকাশক।

কপোত (পুং) কো বায়ু, পোতঃ নোরিবাত্ত। কব-ওতচ্

(কবেরোতচ্ পশ্চ। উৎ ১। ৬৩) ইতি বক্ত পশ্চ। পাররা

ও ঘুবুর সাধারণ নাম কপোত। সংস্কৃতে পাররার নাম

“পারাবত বা গৃহকপোত” এবং ঘুবুর নাম “বনকপোত।”

লাটিন ভাষার কপোতের প্রতিলিপ্য Columbidae. হিন্দীতে

পাররাকে সাধারণতঃ “কমুতন্” বলে।

পারাবতের পর্যায়—গৃহকপোত, পারাগত, পারাবত,

কলরব, ছোয়া ও গৃহকুট।

ঘুবুর পর্যায়—বনকপোত, চিত্রকর্কট, কোকদেব, বহন,

বৃন্দ, ভীষণ, ধূম্রলোচন, অগ্নিহার ও গৃহনাশন।

[ইহার বিশেষ বিবরণ “বু” দেখ।]

পৃথিবীর সর্বত্রই পারাবত দেখিতে পাওয়া যায়, অস্ট্রেলিয়া

ও ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী প্রদেশসমূহে ইহাদের

সংখ্যাই অধিক। আমেরিকার পাররা বর্ণেট আছে রঙে, কিন্তু

বিভিন্ন প্রকারের পাররা বড় দেখা যায় না। ভারতবর্ষে ও

বলর উপরীপে সংখ্যাও যেমন অধিক, বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীও তেমনই অধিক; যুরোপ ও উত্তর এশিয়ার ইহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অল্প।

বগভবভোজী এ পর্য্যন্ত প্রায় তিন শতেরও উপর কপোত-শ্রেণী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই দেখিতে অতি সুন্দর। অনেকগুলির গাত্র ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত বলিয়া দেখিতে বড়ই মনোহর। ইহাদের প্রায় সকল শ্রেণীর অঙ্গসৌষ্ঠব বেশ সুগঠিত ও সুদৃষ্ট। পায়রার অধিকাংশ শ্রেণীই মানুষের খাদ্যের উপযোগী এবং অনেক স্থলে খাদ্যরূপে প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পায়রার মধ্যে দাম্পত্য প্রেম অতি সুন্দর। ইহারা একবার যে ছুইটীতে জোড় মিলিয়া যায়, জীবনমধ্যে আর বিযুক্ত হয় না। ইহাদের এই অবিচ্ছিন্ন প্রেমের কথা সকল দেশের কাব্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার কবি মাইকেলও বলিয়া গিয়াছেন—

“ছিহু মোরা জুলোচনে! গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী যথা, উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।”

পায়রাতেরা ক্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই বাসা বাঁধা, ডিমের তা দেওয়া ও শাবকের আহাৰ-দানকার্য্যে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। ইহারা কাটিতে কাটিতে বিনাইয়া বাসা বাঁধিতে পারে না। গাছের উপর, পাহাড়ের গহবরে, ঠেটকালয়ের কার্ণিসের নীচে বা দেওয়ালের গায়ে গর্তে কাটিকুটি সাজাইয়া আলগা করিয়া বাসা বাঁধে। ইহাদের একবারে দুইটি ষেতবর্ণ ডিম হইয়া থাকে, কোন কোন শ্রেণীর একটী মাত্র ডিম হয়, কিন্তু কাহারও দুইটির বেশী হয় না। প্রতিমাসেই ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিম ফুটিতে ১৫ দিন সময় লাগে। এই ১৫ দিন তা দিতে হয়। কপোতী ডিম পাড়িয়া প্রথম ৩ দিন একাক্রমে দিবারাত্র সমানে ডিমের উপর তা দিয়া বলিয়া থাকে, কেবল এক একবার থাইতে উঠিয়া আসে। প্রথম তিন দিন বেশীকণ কপোতকে তা দিতে দেয় না বা কণমাত্রও ডিম খালি রাখিয়া উঠিয়া আসে না। কপোতী যখন থাইতে বাইবার জন্য ইচ্ছা করে, তখন কপোত গিয়া ডিমের তা দিতে বসে। কপোত নিকটে না থাকিলে কপোতী একান্ত ক্ষুধা পাইলেও ডিম অনাবৃত রাখিয়া উঠিয়া আসে না। কপোত নিকটে নাই অথচ কপোতীর ক্ষুধা পাইয়াছে, কিন্তু ডিম অনাবৃত রাখিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সেই সময় কপোতী কপোতকে ডাকিবার জন্য এক প্রকার গর্জন শব্দ করিতে থাকে। কপোত দূরে থাকিলেও এই

শব্দ শুনিবারাত্র তৎক্ষণাৎ বাসার আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম তিন-দিন কাটিয়া গেলে কপোতী ডিম ছাড়িয়া উঠিয়া আসে। দিনের বেলায় অধিককণ কপোত তা দেয় এবং রাতে কপোতী তা দিয়া থাকে। ১৫ দিন বাবে ডিম ফুটিয়া শাবক বহির্গত হয়। এই শাবক চন্দ্রাঙ্গানিষ্ঠ মাংসপিণ্ড যাক হইয়া থাকে। ইহার গায়ে পালকের চিহ্নবাহ থাকে না এবং চক্ষু দুটিও মুদ্রিত থাকে। ডিম ফুটিলে কপোতী আবার ৩ দিন তা দিতে বসে। প্রথম ৩ দিনের ভ্রম এ ৩ দিনও সে আহাৰ নিজ্জাত্যাগ করিয়া থাকে। কপোত কপোতী উভয়েই শাবককে খাওয়াইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহারা যাহা খায়, তাহাই আপনাদের উদরস্থ খাদ্যাধারে রাখিয়া দৃষ্টবৎ তরল পদার্থে পরিণত করিয়া শাবকের গালে ঢালিয়া দেয়। কিছু দিন গেলে মণ্ডবৎ করিয়া গালে ঢালিয়া দেয়, শেষে অর্দ্ধ গলিত পদার্থ ঢালিয়া দিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ বয়ো-বৃদ্ধির সহিত খাদ্যভ্রব্যের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া ক্রমশঃ কঠিন জব্য থাইতে শিখায়।

ডিম ফুটিবার প্রায় ৫৩ দিন পরে পালকের রেখাদেশা দেয় এবং একমাস মধ্যে সর্বাপেক্ষা পালকে ঢাকিয়া যায়। সর্বাপেক্ষা ঢাকিয়া গেলেও শাবক খুঁটিয়া থাইতে শিখে না, তবে এই সময়ে তাহার পিতামাতার সহিত উড়িয়া ভ্রমিতে নামিতে ও বাসার উঠিতে শিখে, এ সময়েও তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। শাবক দেড় মাসের বা দুই মাসের হইলে নিজে খুঁটিয়া থাইতে পারে। ডিম ফুটিবার পর পায়রার শাবককে “পিল” বলে। পিল উড়িতে আরম্ভ করিলে “পাট্টা” বলে। পায়রার ডানার শেষভাগে ৩৪টি বড় পালক থাকে, এই পালকগুলিকে “বীরপর” বলে। প্রথম বীরপর হইতে ডানার উড়িবার উপযুক্ত ১০টি পালক অন্বে। মানুষের যেমন ৭ বৎসর বয়সে কচি দাঁত পড়িয়া গিয়া আবার উঠে, সেইরূপ পায়রারও পাট্টা-বেলায় ডানার পালক পড়িয়া গিয়া পুনরায় উঠিয়া থাকে। সর্বাপেক্ষে ডানার তিতরের উড়িবার পর প্রথম হইতে ষসিতে আরম্ভ হয়। একটি ষসিয়া বতদিন সেটি আবার না অন্বে, ততদিন দ্বিতীয়টি ষসে না। এইরূপে বতদিন পর্য্যন্ত ৫ম পর না ষসে ততদিন পায়রার শাবককে “পাট্টা” বলা হয়। তৎপরে ইহাদের বয়স পরিণত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ শেষ বীর পালকটি পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। এইরূপ ১০ম পালক পরিবর্তনকে “বশক-লাক” করা বলে।

এহাবাক পায়রার বতদিন “বশক লাক” না করে, ততদিন তাহাকে পাট্টা বলা যায়।

পায়রা বল শতাব্দি খাইরা জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কোনরূপ কীটাদি আহার করে না; কিন্তু এক এক প্রেণীর পায়রার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুঁড়ি খাইরা থাকে। বাজালা দেশের পায়রার বন্ধ বন্ধ, বকো কৌ প্রভৃতি শব্দের ভাষা শব্দ করে। ইহার। ব ব প্রেণীর কপোতী মনোনীত করিয়া থাকে বটে, কিন্তু গৃহপালিত কপোতের। মাছবের বন্ধিত হইরা ভিন্ন প্রেণীর কপোতীর সহিতও মিলিত হইরা থাকে। পায়রার মধ্যে জীজাতি পায়রাই যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, একটা কপোতীর জন্ত দুইটা কপোত বিষম বুদ্ধে মতিরা গিয়াছে, আর কপোতী নতুন কপোতের দিকে ঝুঁকিতেছে। আবার অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, কোন দুই মপতীর মধ্যে প্রত্যেকের জীপুরুবে বগড়া হইলে উভয়ে আপোষে বন্দোবস্ত করিয়া পরস্পর জী পরিবর্তন করিয়া লয়। ইহার। সন্ধ্যাকালে অতি শীঘ্র শীঘ্র বাসায় প্রবেশ করে, কিন্তু অন্যান্য পক্ষীর জায় প্রান্তঃকালেই বাসা পরিত্যাগ করে না। ইহার। স্ব্যাকরণ কিছু অধিক ভালবাসে। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। ইহাদের দুই পক্ষ অতি সবল এবং লঘু; এই জন্য ইহার। অতি দ্রুত উড়িতে পারে।

সাধারণতঃ পায়রা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের ঠোঁট বড় বেশী লম্বা হয় না, প্রায়ই ১ ইঞ্চিরও কম হইয়া থাকে। ঠোঁট দুইখানি সরল এবং একটু টেপ। ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বাঁকা, কাহারও বা বেশ বাঁকিয়া গিয়া থাকে। উপরকার ঠোঁটের উপর গোড়ার ঈষৎ মাংস গজাইয়া থাকে, এই মাংস অতি কোমল ও সুমান। কোন কোন প্রেণীর ইহা ঢেউ-খেলান হইয়া থাকে। এই মাংসের উপরেই ঠিক কপালের নীচে নাকের হেঁদ। দুইটি সরল ভাবে থাকে। ইহাদের কপাল হইতে মস্তকের উপরিভাগ গোল হইয়া পশ্চাৎদিকে গড়াইয়া গিয়াছে। ইহাদের মুখ-বিবর নিত্য ক্ষুদ্র কি অতি বৃহৎ নহে। চক্ষু দুইটি ঠোঁটের বিস্তার পশ্চাতে মস্তকের দুই পার্শ্বে সমান্তরপাতে অবস্থিত। ডানা বেশ দীর্ঘ। কোন কোন প্রেণীর ডানা শুটাইয়া রাখিলে শেষ প্রান্ত সুন্দর হইয়া থাকে, কাহারও বা ঈষৎ গোলাকার হইয়া যায়। পুচ্ছের পালকগুলিও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। পুচ্ছ প্রায় ১২টি বা ১৪টি পালক থাকে, এই পালকগুলি অত্যন্ত স্থানের পালক হইতে বর্ণেও দীর্ঘ। কোন কোন প্রেণীর পুচ্ছে ১৯টি আর কোন কোন প্রেণীর ১০টি মাত্র পালক থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের হাঁটুর উপরি ভাগ পর্যন্ত পা পালকচাকা থাকে।

অনুলিঙ্গি-মাজিবির্ধ, পশ্চাতের অনুলি মস্তকের অনুলির ভাষা সমান্তরপাতে অবস্থিত। নখর বড়োপকর্ষী পক্ষীগণের ভাষা বন্ধ। অনুলিগুলিও অত্যন্ত বড়োপকর্ষী পক্ষীগণের ভাষা প্রেণিল। কোন কোন প্রেণীর সমস্ত পায়ে (অনুলির গাইটগুলি পর্যন্ত) পালক গজাইরা থাকে।

বাজালার লোকে আমোদের নিমিত্ত পায়রা পুখিরা থাকে, এজন্য এখানে পায়রার ব্যবসা আছে। শুদ্ধ বাজালার কেন, পুখিবীর সকল স্থলেই পায়রা মস্তবোয় আশ্রয়ে পালিত হইয়া থাকে।

বাজালার কপোত-পালকের। ও কপোত-ব্যবসায়ীরা শাকুনশাস্ত্র হিসাবে ইহাদের প্রেণী বিভাগ করে না; আকার, কার্য ও গুণাদি দেখিয়া প্রেণী বিভাগ করে। এইরূপে এখানে ইহাদের প্রধানতঃ দুইটি জাতি আছে, গোলা ও গ্রহবাজ। এই দুই জাতীর আবার পরিবার বিভাগ অনেক প্রকার। প্রত্যেক পরিবারে আবার কতকগুলি প্রেণীভেদ আছে। গোলা জাতীর কপোতের মধ্যে নজা, লজা, সিরাক, বোগদান, মুক্ষি, গুলিখাল, পরপাও, সিন্ডাক, কড়িগাল, আউল, ইহাযু, আক্খা, গলাকুলো, কাবরা, মুগিয়া, লোটন, জেকোবিন ও সাধারণ গোলা প্রভৃতি পরিবারই প্রধান।

বঙ্গদেশের গৃহস্থের বাটতে প্রায় এক জাতীর গোলা আপনি অযাচিত হইয়া বাস করে, ইহাদিগকে ‘কেলে গোলা’ বলে। এই জাতীর গোলা মানা বর্ণের দেখা যায়। ইহাদের মূল্য অতি অল্প।

গ্রহবাজ জাতীর কপোতের মধ্যে কাক্জী, কটুকী, সবুজ, নীলা, কাল, আবলুক, লাল, প্লেন, খন্তেন, উলা, তুরা, গাণ্ডার, নাচরা, কাসরা, কাচকড়া, মহাহুম, তাহুম, দোবাজ এই কর পরিবার প্রধান।

গোলা ও গ্রহবাজ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। গোলায় ঠোঁট অপেক্ষা গ্রহবাজের ঠোঁট ষাটো হয়। গোলায় চক্ষুতে সর্করা শাউ ভাব থাকে, কিন্তু গ্রহবাজের চক্ষুতে সর্করাই চটুলতা বর্তমান।

গ্রহবাজ জাতীর পায়রার পায়ে পালক জন্মিলে তাহাকে ‘কাপড়া’ বলে আর মাখার কুঁট হইলে ‘চটরাগ’ বলে, আর যে প্রেণীর মাখার কুঁট ও পায়ে পালক উভয়ই জন্মে, তাহাকে ‘হাপড়া চটরাগ’ বলে।

পুর্বে বাজালার পায়রার অসংখ্য ভেদ ছিল, কিন্তু এখনকার প্রেণীর নাম মরিয়া প্রাচীন নামগুলি নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কবিকল্প বুদ্ধনারায়ণ দ্বীপ কাব্যে ইহাদের নামের তালিকা দিয়াছেন। প্রাচীন কালেও

এদেশে পায়রা পুঁথির প্রথা ছিল, কবিকল্পের কবিতাই
তাহার প্রথম পাঠ্য বস্তু। তাহার কবিতার ২য় শ্রেণীর
নায়ক ধনপতি নতের মধ্যে পায়রা ছিল। বালাকালে
ধনপতি বালাকালের সঙ্গে এই পায়রা উড়াইয়া নগরনয়
খেলা করিয়া বেড়াইতেন। এই পায়রা উড়ান হইতেই
তাহার কবিতার প্রধান ঘটনা ধনপতি-খুলনামিলন সংঘটিত
হয়। নিম্নে এই বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

“লগ্নে শিশুগণ, বেশের নন্দন,
পায়রা উড়াতে যায়।
সঙ্গে শিশু বত, লগ্নে পারাবত,
শ্রীকবিকল্প গায় ॥”

* * * * *
“পায়রা উড়াইতে যায় সাধু ধনপতি।
যত নগরিয়া ভাই করিয়া সংহতি ॥
* * * * *
মুরারি, দৈত্যারি, গোবিন্দ, ভবানন্দ।
পায়রা উড়াতে হৈল সবার আনন্দ ॥
যত নগরিয়া বেগে সদাগর সাথ।
যতনে লইল সব নিজ পারাবত ॥”

“লগ্নে নিজ পারাবত চলে ধনপতি দত্ত
উড়াইতে নগরিয়া সাথে।

করি শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
কিহরে পিঞ্জর লয় মাথে ॥
খতি-মারি, পাত-শালিকা, খেতা, নেতা, নয়ান জুখা,
করট, তামট, জলক্ষণ।
সোল-মুখ, রাজ-গোলা, শিখরিয়া, ঘন-বোলা,
গাঙলী, জ্বলী জ্বলন ॥
কেবল্যা, বাতাভা, হাঁসা, নেটে, খাটু, বুড়া, ডাঁসা,
জগ-সিন্দুরিয়া বন-জরা।

নীল-কুমুদ-কুখা, ঘিরিনি, দীঘল-মুখা,
মন-জুখা, রাক্ষা, দেউলিয়া ॥
সিংহা, বাঘা, রঞ্জিতা, কররা, কপাল-চিতা,
সিঙ্গ, মাট্যা, পাঙসা, পাখরা।

মাণিক, দোশলি, বুড়া, আভালা, পরনা, জুড়া,
পালট, বিলট, রতি-তোরা ॥

পাকশি, পাখরি, টাকি, হাঁসী, ডাঁসী, বড়ি রাকি,
লাবারকে লইয়া পায়রা।

করিয়া চড়িকা ধান শ্রীকবিকল্প গান
রথুনাথ মুপতি কেশরী ॥

* * * * *
লখা সঙ্গে ধনপতি আনন্দে পুঁথি দতি
পায়রা উড়ায় নগরগরে।

ছাড়িয়া পাটের দোলা একে একে করে খেলা
পায়রা রাখিয়া বাস করে ॥

* * * * *
নগরিয়া শিশু মিলি দেয় ঘন কহতালি
খেতারে উড়ায় ধনপতি।

তার পাছে ভাই যত উড়াইল পারাবত
বামহাতে রাখি পারাবতী ॥

* * * * *
ইছানি নগর মুখে, খেতা যায় অন্তরীকে
উত্তমুখে ধায় সদাগর।

* * * * *
পায়রা ধরিয়া করে খেতা বলি উচ্চৈশ্বরে
উত্তমুখে ধায় ধনপতি।

* * * * *
সাত পাঁচ লখি মেলি খুলনা খেলেন ধূলি
পারাবত পড়িল অকলে।

পায়রা আঁচলে ঢাকি, চৌরিকে বেড়িয়া লখি
যায় রামা আপন ভবনে।

সদাগর যান পাছে, পারাবত তারে যাচে
শ্রীকবিকল্প রস ভণে ॥”

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে লোকালোকে পায়রা কিরূপ
ভালবাসিত, কিরূপে তাহা লইয়া আমোদ করিত, তাহা
সমস্তই বুঝা যায়।

কবিকল্প যে সকল নাম দিয়াছেন তাহা হইতে আমরা
“রাজ-গোলা” (গোল লাঠীর কোন এক শ্রেণী) আর
পালট (পালটীয়া বাজী করে? গ্রহবাজ) এবং “বিলটি”
(লুটিয়া বেড়ার?—(লোটন) নামক এই তিনটি শ্রেণী
বুঝিতে পারি।

এদেশে বালকেরা পায়রা উড়াইয়া খেলা করিয়া থাকে।
পায়রা উড়াইবার জ্ঞান এদেশে “বোয়াম” বাঁধিতে হয়।
গৃহের সর্বাপেক্ষা উচ্চ প্রাচীরের গায়ে একটা দীর্ঘ বাঁশ
আঁটিয়া দিয়া তাহার বাঁশের একট চতুর্ভুজ হস্তির (ছোট
ছোট বাখারির মাচা) বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহার নাম
বোয়াম। পায়রা ছাড়িয়া দিলে, ইহার উপর দিয়া বলিয়া
থাকে। তৎপরে বালকেরা একটা দৃং দ্বিপের খোঁচা
দিয়া বাঁককে বাঁক উড়াইয়া দেয়।

এদেশে পায়রার থাকিবার বরকে খোপ বলে। খোপ কাঠের ও বাশের হয়। ইংরাজীতে Dove-cot যে প্রাণীর খোপ, তাহাকে এদেশে “পায়রার খুপরি ঘর” বলে।

এদেশের পায়রার বসন্ত বা ঝটি, তুকে, শর্দি ও ফুলো রোগ বেশী হয়। ঝটি হইলে জলে ভিজিতে দিতে নাই এবং তারপিন তৈলের প্রলেপ দিতে হয়। ফুলো হইলে রোজে রাখিতে ও এক কোরা রসুন খাওয়াইয়া দিতে হয়। শর্দিতেও ঐ ঔষধ। তুকে হইলে সরিষার তৈলের পলিতা গোড়াইয়া সেই ভস্ম খাওয়াইয়া দিতে হয়। হোমিওপ্যাথির মতের কোন কোন ঔষধ ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী; ইহা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা আকাশে উঠিবার সময় কি আকাশ হইতে নামিবার সময় উলটিয়া পাটাইয়া ডিগ্বাজি খাইতে থাকে। ইহা ইহাদের জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ কার্য। এই কার্যকে বাজি বলে। যে পায়রা বেশী পরিমাণে বাজি করিয়া থাকে, তাহাকে ‘বাজেন্দার’ বলে। গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা একবার উড়িলে এক দমে অতি উচ্চে উঠিয়া যায়, একজ্ঞ অনেক সময় শুনে (শীকুর) পক্ষী ঘরা আক্রান্ত হয়,—এইরূপে বিনষ্ট হওয়ারকে ‘ঠোটে লাগা’ বলে। গ্রহবাজ বাজি করিবার সময় যে ভাবে ঘুরিয়া পড়ে, তাহাকে ‘প্যাচ’ বলে। কোন কোন পায়রা একবারে দুই দিকে দুইটি প্যাচ দিয়া ঘুরিতে পারে। দুই প্যাচের অধিক কোন পায়রাই ঘুরিতে পারে না। যে গ্রহবাজ একবারে এক দমে এক বাঁশতোর উচ্চে ঘুরে ছায় উঠিয়া যায়, তাহাকে ‘সড়োকদার’ বলে। গ্রহবাজের পাট্টা প্রথমে সম্পূর্ণরূপে বাজি করিতে পারে না, অর্ধেকটা ঘুরিয়া আবার সিধা হইয়া উড়িতে থাকে। এইরূপ অর্ধেক বাজিকে ‘কৌদ’ বলে। যে সকল গ্রহবাজ অতি অল্পদূর উঠিয়াই বাজি করিতে থাকে, তাহাদের ‘গরম’ হইয়াছে বুঝিতে হয়। গরমে পড়িলে ইহারা অধিক দূর উড়িতে পারে না।

কি গোলা, কি গ্রহবাজ সকল প্রকার পায়রাই রোজ ভালবাসে এবং তাহাদের পক্ষে রোজ উপকারীও বটে, বিশেষতঃ গ্রহবাজের উপযুক্ত রোজ উপভোগ করিতে না পাইলেই গরমে পড়ে। আতপহীন স্থান ইহাদের বিষম অনিষ্টকর। গ্রহবাজ গরমে পড়িলে, তাহাদের পুচ্ছের পালকগুলি ছিঁড়িয়া দিতে হয় বা কাঁচি দিয়া ‘লেতু’ করিয়া (লেজ ছাঁটিয়া) দিলে উপকার হয়। গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা দীর্ঘে অধিক বড় হয় না; সাধারণতঃ ১ ফুট হইতে ১৫ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। গ্রহবাজকে ইংরাজীতে Tumbler-pigeon বলে।

গোলাজাতীয় পায়রা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারবর্গের আকৃতিগত বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, মিলে সেই লবন্ত লিখিত হইল—

জেকোবিন—এই পরিবারের শ্রেণীগত বিশেষ লক্ষণ মন্তকের পশ্চাদেশ হইতে চকুর পার্শ্ব দিরা ডানার উপরিভাগ পর্যন্ত দুই থাক উচ্চ পালক থাকে। ইহার এক থাক চকুর দিকে ও অপর থাক পিঠের দিকে থাকিয়া পড়ে, মধ্যস্থলে সঁথির ছায় হয়। ইহাদের বর্ণ সাধারণতঃ লাল, কাল, সাদা ও অরদ বর্ণের হয়। ইহাদের পৃষ্ঠ, পুচ্ছ, বক্ষঃস্থল ও মন্তকের বর্ণ প্রায় সাদা থাকে। ডানার বর্ণই কেবল ভিন্ন হইয়া থাকে। বাহাদের চিলে বর্ণ হয়, তাহাদের রং বালালা ইষ্টকের রঙের সহিত ঈষৎ পীতমিশ্রিত করিলে যেমন হয়, সেইরূপ। আর বাহাদের বর্ণ কাল তাহারা যেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণে ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত। ডানা দুইখানির উপরেই এই বর্ণ থাকে এবং গলদেশের পূর্বেও দুই থাক পালকের ডগাগুলি ঐ ঐ বর্ণের হয়। সমস্ত শালা ও ঈষৎ বেগুনির আভাযুক্ত ধূসরবর্ণের কচিং কখন দেখা যায়। ইহাদের ঠোঁট কিছু ক্ষুদ্র, চকুর শির চতুষ্পার্শ্ব কাল হইয়া থাকে। ডানার শেষ বড় পালক ৩টি হয়। ইহারা বড় ভীক। ইংরাজীতে এই শ্রেণীকে Jacobine and Jack বলে।

লকা—এই পায়রা ক্ষুদ্র শ্রেণীর। দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অপরাজিতা ও রেশমী। লকার বিশেষ চিহ্ন এই যে, ইহাদের পুচ্ছের পালকগুলি ময়ূরের পেকমের ছায় সর্দঙ্গ ছত্রাকার হইয়া থাকে। ইহাদিগকে ‘ফুল লকা’ও বলে। সাধারণতঃ বাহাদের পেকম পূর্ণছত্রাকার হয় না, তাহাকে ‘হাকলকা’ বলে। ফুললকার বর্ণ সমস্ত খেত হইয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ অধিক উজ্জ্বল শালা রেশমের ন্যায় হইলে রেশমী-লকা কহে। সমস্ত কাল ফুললকাও আছে, কিন্তু তাহা দেখিতে তত মনোহর নহে। ‘হাকলকা’ শালা, কাল, ও অপরাজিতা বর্ণের হইয়া থাকে। যে লকা দেখিতে নানা বর্ণের ও সুন্দর, তাহাকে ‘নক্সা’ বলা যায়। ফুললকার পুরুষ জাতি ভূমিতে চরিবার সময় অতি সুন্দর দেখায়। ইহার বখন বসিয়া থাকে বা চলিতে থাকে, তখন ইহারা সমস্ত গলদেশটা ঈষৎ বাঁকাইয়া এমন সুন্দর ভাবে কাঁপাইতে থাকে যে, দেখিলে মন আনন্দে ভরিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে দু এক শ্রেণীর মাথায় বোটন হয় না। কিন্তু সকলেরই পায়ে পর হয়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Fan-tail pigeons বলে।

সিরাছু—কাল, লাল, অরদ, পাঁচ ধূসর ও কান্দীরী প্রভৃতি

নানাবর্ণের হয়। এই পরিবারের বিশেষ চিহ্ন এই যে, ইহাদের ঠোঁটের গোড়া হইতে চক্ষুর পশ্চাৎ দিয়া, ঝাড়, পিঠ, ডানা হইয়া পুচ্ছের গোড়া পর্য্যন্ত একমাত্র বর্ণ থাকে এবং নিম্ন ঠোঁটের নিম্ন হইতে গলা, বক্ষ, ডানার নিম্নভাগ, উদর এবং পুচ্ছের পালকগুলি শাদা হইয়া থাকে। ইহাদের জঘনদেশ হইতে অঙ্গুলির গ্রন্থিগুলি পর্য্যন্ত বরোবুদ্ধির সহিত পালকে ঢাকিয়া যায়। এই জাতীয় পায়রা খুব বড় হইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু অতি গম্ভীর, ভীমকায় ও বলশালী হইয়া থাকে। লাল সিরাজুর বর্ণ ঠিক রক্তবর্ণ নহে, চিলে বর্ণের উপর দীর্ঘ কৃষ্ণাভ পীতবর্ণের ভাগই অধিক। কাল সিরাজুর বর্ণ ঘোর নীলবর্ণযুক্ত কৃষ্ণ। সবুজ মিশ্রিত চিকণ। ধূসর বর্ণের সিরাজু দেখিতে বেশ এবং কাল সিরাজু হইতে নম্রপ্রকৃতি। কাশ্মীরী সিরাজুর বর্ণ ধূসর বটে, কিন্তু তাহার পালকের উপর, বক্ষে, পুঠে, ডানায় ও ঝাড়ে শাদা ও বেগুনি-মিশ্রিত বিন্দু বিন্দু দাগ আছে। একবর্ণী সিরাজুর বক্ষে ও উদরে ভিন্ন বর্ণের একটি ছোট পালক থাকিলে গুলদার বলে। গুলদার সিরাজু দেখিতে অতি সুন্দর।

মুন্সি—প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, কাল ও আগরায়। দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের বিশেষ চিহ্ন এই যে, ঠোঁটের উপর হইতে চক্ষুর উপর দিয়া ঝুঁটির কোল পর্য্যন্ত সমস্ত মস্তক ধবধবে শাদা হয় এবং দুইটি ডানার এবং বাকি সমস্ত দেহের অঙ্গ বর্ণ হয়। ইহারা অতি ক্ষুদ্র জাতীয় পায়রা হইয়া থাকে এবং যত ক্ষুদ্র হয় ততই সুদৃশ্য হয়। ইহারাও লক্ষ্যের জ্ঞান ঘাড় কাঁপাইয়া থাকে (কসে) এবং ঘাড় কাঁপাইবার সময় ইহাদিকে লক্ষ্য অপেক্ষাও দেখিতে সুন্দর ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন দেখায়। মুন্সির কাল শ্রেণীর উজ্জ্বল-তাই অধিক। ইহাদেরও গলদেশ নানাবর্ণ মিশ্রিত চিকণ হইয়া থাকে। কাল ছাড়া অন্য বর্ণের হইলে কাহারও মতে তাহাকেই ‘আগরায় মুন্সি’ বলে। ধূসর ও চিলে মুন্সির বর্ণ চক্কুজ্বলকর। ইহাদের পায়ের পর হইতে দেখা যায় না, সকলেরই মাথার ঝুঁট থাকে। ইহাদের মাথার শাদা রং যদি চক্ষুর নিম্নে বা গলদেশে বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে তাহাকে দাগী মুন্সি বলে। দাগী মুন্সির দর অন্ন, আদর অন্ন, দেখিতেও দীর্ঘ বিলম্ব। বিলাতে মুন্সির মাথা ও ডানার তিনটি বড় পালক ও পুচ্ছের রং কাল হয় এবং ঝুঁট কিছু লম্বা হইয়া মাথার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে, গাজবর্ণ শাদা হয়। সেখানে মুন্সি তিন প্রকার, এই তিন শ্রেণীর মাথার রং বর্ণক্রমে কাল, পীত ও লাল হয় এবং

মাথার যে রং থাকে ডানা ও পুচ্ছে বড় পালকগুলিতে সেই রং হয়। ইহাদিগকে সে দেশে Nun pigeons বলে।

কড়িয়াল—ইহাদের চক্ষু ছোট কড়ির মত বড় হয়, চক্ষুর চতুর্দিকে ও নাকের গোড়ার ঠোঁটের উপর দীর্ঘ রক্তাভ কোমল মাংসের বড় বড় ফুল হইয়া থাকে।

পরপাঁও (পর্ণপ)—ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মাথার ঝুঁট হয়, পায়ের পর হয়। পায়ের গোড়ালির কাছে পরগুলি খুব বড় বড় হয়। ইহারা দেখিতে তত সুদৃশ্য নয়। সিরাজুর জ্ঞান এই শ্রেণীও খুব বৃহৎ ও ভীমকায় হয়, কিন্তু তাহাদের মত মাধুর্য্যপূর্ণ গম্ভীর ভাবের পরিবর্তে ইহাদের একটু ভীমদর্শনত্ব থাকে। ইহাদের ঠোঁট কোন কোন শ্রেণীর দীর্ঘ কৃষ্ণাভ হয়। ইহাদের মধ্যে চিলে (লাল) পরপাঁও-য়ের সংখ্যাই অধিক, তদ্ব্যতীত শাদা কাল পরপাঁও আছে। ইহাদের পুরুষগুলি যখন কোটরে বসিয়া থাকে, তখন গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে। এই শব্দ করিবার সময় ইহাদের গলদেশের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যাধার থলি ফুলিয়া উঠিতে থাকে; এই থলিকে ইংরাজীতে Crop বলে ও এই শ্রেণীর পায়রাকে ইংরাজীতে Cropper বলে। ইহাদের পায়ের পর দেখিয়া কেহ কেহ Flag-thighed Pigeonsও বলে।

গলাফুলা—দুই প্রকার কাল ও শাদা। ইহারা অতি বৃহৎ হইয়া থাকে; ইহাদের ঠোঁটের নিম্ন হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটা থলির জ্ঞান ফুলিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Pouter pigeons বলে।

লোটন—ক্ষুদ্রজাতীয় দ্বৈতবর্ণের একপ্রকার গোলা-পায়রা। ইহারা মাটিতে লুটিতে পারে, এই জন্য এই শ্রেণীকেই লোটন বলে। লোটন পায়রাকে লুটাইতে হইলে পায়রাটিকে দক্ষিণ হস্ত দিয়া এরূপ ভাবে ধরিতে হয় যেন বুদ্ধাঙ্কুরের দ্বারা তাহার একটি ডানা এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা অপর ডানা চাপা পড়ে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা গলার দুইপার্শ্ব দিয়া বক্ষঃস্থলের দুইপার্শ্বে ঠেকে। পরে দক্ষিণে ও বামে এরূপে নাড়িবে যে ঘাড়টা যেন একবার ডাহিনে ও বামে ঠক্ ঠক্ করিয়া নড়িতে থাকে। এইরূপ মিনিট খানেক নাড়িয়া মাটিতে ছাড়িয়া দিলে সে ডিগ্বাঙ্গি দিতে থাকে। ৪।৫টা বাজি করার পর ধরিয়া সিঁধা করিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা কঠিন মাটিতে লাগিয়া মাথা কাটিয়া বাওয়া সম্ভব। ইহার ইংরাজী স্বতন্ত্র নাম নাই, কিন্তু Tumbler বলা বাইতে পারে। শীঘ্র শীঘ্র লুটিতে পারিলে “থ’ড়কে” ও একদমে বেগীবার লুটিতে পারিলে “বেদম-লোটন” বলে।

আউল—এই শ্রেণীর অনেক ভেদ আছে। ইহাদের

টোট খুব ছোট, ইহাদের গলদেশের পালকগুলি বকের উপর উন্নতভিত্তি হইয়া থাকে না, ছই পার্শ্বদেশে বাকিয়া মাঝখানে চুলের বিহীন ভায় হইয়া থাকে। ইহা সমস্ত গলদেশ ভরিয়া হয় না, বকের উর্দ্ধদেশে অর্ধ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে ঐরূপ হয়। এই জাতীয় পায়রা সুগঠিত ও দৃঢ়কার। ইহাদের মাথার খুঁট হইলে, সেই শ্রেণীকে “টরপেট” বলে।

আঁখা—ইহাদের বর্ণ ক্রকের আধিক্যযুক্ত ধূসর। ইহাদের চক্ষু রক্তকণ্ঠের ভায় রক্তবর্ণ। টোটে ছোট ও কাল। ইহাদের গলদেশ ময়ূরের ভায় চিকণ। টোটে ফুল নাই। চক্ষু আবরণী ক্রকবর্ণ।

ইহায়া—পাটুকিলা বর্ণ। ইহাদের বর্ণের জীবৎ তারতম্যাদ্বারাে নানারূপ আছে। ইহাদের শব্দ অনেকটা ঘূঘুর ভায় কতকটা “ইহায়া, ইহায়া”র মত। বাহাদের শব্দ সুস্পষ্ট ও বর্ণ কিছু তরল, সেই শ্রেণীই উৎকৃষ্ট।

সিন্তাক—ইহাদের মস্তক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত ক্রকের আধিক্যযুক্ত ধূসর, পৃষ্ঠ ও বক্রে শাদা ও কাল দাগ থাকে। চক্ষু ও চক্ষুর আবরণী ক্রকবর্ণ।

কাব্রা—সিন্তাকুর ভায় সমস্ত লক্ষণ, কেবল পৃষ্ঠ ও বক্ষস্থল পাটল ও শাদা দাগযুক্ত।

মুগিয়া—ইহাদের বর্ণ লাল ও জরদ-মিশ্রিত। ইহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ এবং টোটের পার্শ্বে ফুল হয়।

খাল—দেখিতে খর্রাকার, টোটে ছোট। এই পরিবারের মস্তক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত ও পুচ্ছ এক বর্ণের হয়, মধ্যস্থল শাদা থাকে। বাহাদিগের মধ্যস্থলে গুল জন্মায় তাহাদিগকে গুলিখাল বলে। ইহারা কাল, লাল ও জরদ বর্ণের হয়।

নিশোরা—দেখিতে কাল ও লম্বাকার। ইহাদের পুচ্ছ কিছু লম্বা ও অধিক পালকযুক্ত, টোটে গ্রহবালের ভায় ক্ষুদ্র। পূর্বেকার নবাবেরা এই পায়রা বড় ভালবাসিতেন। ইহারা খুব উড়িতে পারে।

বোগদান—দেখিতে কাল। ইহাদের টোটে প্রায় দেড় ইঞ্চি বড় এবং টোটের অগ্রভাগ বক্র হয়, চক্ষু বড় বড়, পার্শ্বে ফুল থাকে। ইহারা এক হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। কেহ কেহ বলেন, এই পায়রা তুর্ককের বোগদাননগর হইতে এদেশে আনীত হইরাছে।

ঘুঘু পায়রা—কাহারও মতে ইহারা ইহায়া জাতীয়। কথিত আছে—ঘুঘু ও পায়রার সম্মে এই জাতীয়ের উৎপত্তি। ইহারা দেখিতে শাদা ও খর্রাকার। কোন কোনটি ঘুঘুর ন্যায় হয়। ইহারা ঘুঘুর ন্যায় শব্দ করিতে পারে।

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রাবিগের মধ্যে নিরনিধিত কয়েকটি পরিবারই প্রধান। যথা—

আবলুক—দেখিতে শাদা। এই পরিবারের চক্ষুর পার্শ্বে সরিষার মত একটি ক্ষুদ্র চিক্র হয়, অথবা ডানার উপর দাগ থাকে। সরিষার মত কাল চিক্রবিধিট আবলুকের অধিক চিক্রযুক্ত শাবক হইলে, উহারাই উৎকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া গণ্য হয়।

উদা—দেখিতে পীতাদিক্য রক্তবর্ণ, ডানার উপর রেখা এবং চক্ষুর মধ্যে দুইটি গোলাকার দাগ থাকে।

কাগজী—দেখিতে শাদা, ইহাদের চক্ষে রক্তিন দাগ থাকিলে, তাহাকে ‘মতিচূর’ বলে।

কটুকী—দেখিতে কাল, সর্বাঙ্গে কাল গুলের ন্যায় দাগযুক্ত। চক্ষু দুইটিতেও দাগ হয়।

কাচকড়া—দেখিতে ধূম বর্ণ, চক্ষে দাগ থাকে।

কান্দ্রা—দেখিতে গাঢ় ধূসর, চক্ষে লম্বা দাগ থাকে।

থতেন—দেখিতে জীবৎ শিল্প, চক্ষু গোলাকার দাগযুক্ত। এই জাতীয় জীর সংখ্যা অতি অল্প।

গাণ্ডার—দেখিতে থতেনের ন্যায় কিন্তু অধিক গাঢ়।

জাগ বা নাচরা—দেখিতে গাঢ় ক্রকবর্ণ।

এই পরিবারের দোবাজ-ডানার মধ্যে অনেকগুলি পালক শাদা হয়, বাহাদের ডানায় কেবল একটিমাত্র পালক শাদা থাকে, তাহাদিগকে ‘একবাজ’ বলে।

নীলা—দেখিতে তরল ধূসর বর্ণ। টোটে শাদা।

পেন—ইহারা সিয়া, চিনি ও সাধারণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সিয়া পেনের পুচ্ছ কাল অথবা লাল, গলায় কতকগুলি ছিটকাটা এবং চক্ষুতে গোলাকার দাগ থাকে। চিনি পেনের গলায় লাল ছিটকাটা, চক্ষু রক্তিন ও দুটি গোল দাগ থাকে। উক্ত দুই জাতীয় দেখিতে বড় সুন্দর। সাধারণ পেনের অঙ্গে, গলদেশে এবং পুচ্ছে দাগ থাকে।

ভূরা—এই পরিবারের গলদেশে, পৃষ্ঠে ও পুচ্ছে শাদা ও কাল ছিটকাটা থাকে। কাহারও কেবল অঙ্গে এবং চক্ষুতে দাগ থাকে।

মহাজম—দেখিতে কাল। এই পরিবারের পুচ্ছের সমস্ত না হউক কতকগুলি পালক শাদা হয়। বাহাদের পুচ্ছে একটি মাত্র শাদা পালক থাকে, তাহাকে ‘তাহুজম’ বলে।

সবুজ—দেখিতে গাঢ় ধূসর বর্ণ, ডানার দুইটি করিয়া রেখা থাকে। এই পরিবারের বাকি, ঘোরা ও উড়ন লইয়া উৎকৃষ্ট ও নিকটের ভারতম্য আছে।

ইংরাজ-খগতস্ববেত্তাদিগের মতে পায়রা ও ঘুঘুর সাধা-

রণ নাম Columbidae। ইহারা প্রধানতঃ শত খাইরা জীবন ধারণ করে। ইহারা ভূমিতে চরিত্ব খাইতে অধিক ভাল বাসে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের বর্ণই নীলবর্ণের প্রকার ভেদ। পারস্যের বর্ণ ও স্বতাবাহুসারে ৩টা শ্রেণী নির্বাচিত হইয়া থাকে; ১ম Lopholæminæ অর্থাৎ ডবল ষোটন পায়রা (Crested-pigeons), ২য় Palumbinae অর্থাৎ বস্ত পায়রা (Wood-pigeons), ৩য় Columbinæ অর্থাৎ পাহাড়ে পায়রা (Rock-pigeons)।

প্রথম শ্রেণীতে এখন অষ্ট্রেলিয়ায় একটি মাত্র জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাথায় ময়ূরের চূড়ার মত ডবল খুঁট হয়। ইংরাজী খগতবে এই জাতিকে Lopholæmus antarcticus (অর্থাৎ দক্ষিণ মহাসাগরীয় ডবল খুঁটপায়রা) বলে। ২য় শ্রেণী, অর্থাৎ বস্ত পায়রার মধ্যে এক প্রকার বেগুণির আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণের পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি মধ্যভারতের পূর্বাংশ হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আসাম, আরকান ও রামরিহীপেও ইহাদের সংখ্যা যথেষ্ট। হিমালয়ের মধ্যপ্রদেশে এই শ্রেণীর একপ্রকার বুটাদার পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি দেখিতে অতি মনোহর। স্বারজিলিংএর নিকট এক প্রকার এই জাতীয় পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে নেপালীরা “নাম্ পুংফো” বলে। নীলগিরি পর্বতে এই জাতীয় এক শ্রেণীর পায়রা আছে, তাহাকে তদেবাসীরা রাজ-কপোত বলে। ইহারা দৈর্ঘ্যে পুচ্ছের পালক সমেত প্রায় ২৫ ইঞ্চি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মধ্যে বাঙ্গালার বুনো-গোলা ও গ্রহবাক পায়রাকে ফেলা যায়। ৩য় শ্রেণী, নীলবর্ণের পার্শ্বত পায়রা কুমায়ুন প্রদেশের উত্তরে, উত্তর এসিয়া ও জাপান হইতে সমস্ত যুরোপখণ্ডে পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ ঠিক নীল নহে, নীলের অধিক্যযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাস্মীর অঞ্চলে হিমালয়ে এক প্রকার খেত-চক্ষু কপোত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা-দিগকে দেখিতে বেশ সুন্দর।

ইংরাজী খগতবে এই সকল ও অন্যান্য জাতি বা পরিবার ভেদে যে সকল লক্ষণালক্ষণ লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ সেই সেই জাতীয় পক্ষী না দেখিলে কেবল কবির বর্ণনা পড়িয়া তাহার সাহায্যে একটা আকৃতি কল্পনা করিয়া লেখা হুক্তিসিদ্ধ নহে। সেই জন্য ইংরাজী খগতবাহুসারে সমস্ত জাতির লক্ষণালক্ষণ লিখিত হইল না।

পায়রা বড় স্ত্রী প্রাণী। অতি সামান্য অজুখে, সামান্য

বিপদে ইহাদের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। বাঙ্গালার পায়রাকে লক্ষীর বরণপাত্র বলিয়া আদর করিয়া থাকে। এদেশে অনেকের বিশ্বাস আছে, যে পায়রা পুষিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়, দরিদ্রতা দূর হয়, সংসারে লক্ষীর দৃষ্টি পড়ে; এজন্য অনেকে পায়রা পুষিয়া থাকে এবং বস্ত পায়রা আসিয়া বাটীতে আশ্রয় লইলে তাহাদিগকে তাড়ায় না। কলিকাতার বাঙ্গালী মহাজন ও হিন্দুস্থানী মহাজনেরা স্ব স্ব ব্যবসায়-স্থানে সব্বদে পায়রা প্রতিপালন করে। ইহাদের এই বিশ্বাস ও পায়রার সুখপ্রিয়তা দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে “সুখের পায়রা।” এই নিমিত্তই সুখের পায়রা বলিলে চিরসুখী-বিলাসী লোককে বুঝায়, আবার সম্পদের বহুকেও বুঝায়।

মহুবোয় অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে রাজ-কপোতের এক অসাধারণ গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা শিক্ষিত হইলে দূরদেশ হইতে লিপি আনিতে পারে। ইহাদিগের পক্ষ অত্যন্ত সবল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর কপোতের মধ্যে যাহার পক্ষ বড়টা সবল সে তত অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, কিন্তু দেখিতে অতি সূন্দর। ইহারা বাঙ্গালার কড়িয়াল শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের দ্বারা লিপি প্রেরণ আর এখন বড় শুনা যায় না। পূর্বে তুরুক রাজ্যে এই প্রকার অত্যন্ত প্রচলন ছিল; এখনও সেখানে হু এক স্থলে ধনীদিগের মধ্যে হু একটি লিপিবাহী কপোত আছে। ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে বোগদাদের সম্রাট মুহম্মদ মুহম্মদ এই প্রকার প্রচলন করেন। পরে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদনগর মঙ্গোলীয়দিগের হস্তগত হইলে এই প্রথা রহিত হইয়া যায়। ফ্রান্সো-প্রসিয়া যুদ্ধেও এই কপোত দেখা দিয়াছিল। বেশী দিনের কথা নয়, কলিকাতার বড় আদালতে এইরূপ একটি পক্ষবাহী কপোত আসিয়াছিল। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Carrier pigeons বলে।

লিপিবাহী কপোতকে শিখাইতে বহু বয়স, আয়াস ও সময় লাগে। শাবক পরিণত হইলে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ লইয়া একত্র রাখিয়া পোষ মানাইতে হয় এবং উভয়ের মধ্যে যাহাতে যথেষ্ট প্রণয় জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। তাহার পর যে স্থান হইতে তাহাদিগকে পত্রাদি আনিতে হইবে, সেই স্থলে খোলা খাঁচার করিয়া পাঠাইয়া দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে যদি কোনটাকে আর একটার নিকট হইতে পৃথক করিয়া আনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপরটাও তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া থাকে। অতি পাঁতলা অথচ কড়া-কাগজে পত্র লিখিয়া ইহার একটার ডানার পালকে একটি আলু-পিন দিয়া গাঁথিয়া দিতে হয়; আলুপিনের সূক্ষ্মপ্রভাগ সর্দী-

য়ের বাহিরের দিকে রাখিতে হয়। পরে ইহাকে উড়াইয়া দিলে যে বাতীতে ইহার বোড়ার পায়রাটি থাকিবে, সেই বাতীতে উড়িয়া আসে। ইহাদের বাসস্থানের অতি অভ্যস্ত মমতা জন্মে বলিয়া একটি মাত্র পায়রা পুষ্টিগোপ্য কার্য চলিতে পারে। এরূপ হইলে শিক্ষিত পায়রাকে কোন লোকের হাতে দিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ পাইবার আবশ্যক, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হয়। তিনি পূর্বোক্তরূপে লিপি বাধিয়া দিলে পায়রা প্রাণপণে উড়িয়া প্রতিপালকের গৃহে ফিরিয়া আসে। ইহাদিগকে শিখাইতে হইলে, প্রথমতঃ ইহাদিগকে বাড়ী চিনাইবার জ্ঞান এবং বহুদূর হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার জ্ঞান প্রত্যহ ইহাদিগকে লইয়া দুইবার তিনবার বাতী হইতে এক পোয়া পথ দূরে গিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। একপোয়া পথ অভ্যস্ত হইলে অর্ধকোশ, ক্রমে এক, দুই, তিন, ক্রমে পাঁচ কোশ, পরে গ্রামান্তর, অবশেষে দেশান্তরে লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতে হয়। ইহারা অতি শীঘ্রই শিখে। শেষে এতদূর দক্ষতা লাভ করে যে সমুদ্র পার হইয়াও যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহারা শিক্ষিত হইলে, এক ঘণ্টায় ২০ কোশ উড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। অধিক দূরদেশ হইতে যদি এই কপোতের দ্বারা পত্র পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে উড়াইবার পূর্বে ৮ ঘণ্টাকাল অনাহারে একটা অন্ধকার গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। শেষে ছাড়িয়া দিলে একেবারে অতি উর্দ্ধদেশ দিয়া উড়িতে উড়িতে ক্ষুধার আগ্রাস প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। শুনা যায়, সমুদ্র পার হইতে গিয়া অনেকগুলি কপোত জলে পড়িয়া মারা গিয়াছে। কুয়াসা হইলে বা ঝড় বৃষ্টিতে ইহারা সহজে ও স্বল্পায়াসে উড়িতে পারে না, সুতরাং ঐ কালে ইহাদের উড়াইলে, কি পশ্চিমধ্যে এরূপ সময় ঘটিলে ইহাদের অভ্যস্ত বিপদ ঘটে।

এ প্রথা যে কেবল তুর্ককেই ছিল, তাহা নহে, পরে যুরোপের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। পূর্বে মিশর, পালেস্তাইন, তুর্ক, আরব ও পারস্য হইতে যুদ্ধ সময়ে জয়-পরাজয়, সৈন্য আনয়ন, খাদ্য অনাটন প্রভৃতির সংবাদ এই কপোত দ্বারা অতি সহজে সম্পন্ন হইত। ইংলণ্ডের বিলাসী ধনী-সন্তানরাও সেকালে ইহাদের দ্বারা প্রাণিনি ও বহু বাক্যের নিকট সংবাদাদি প্রেরণ করিতেন।

রামায়ণ মহাভারতাদির সময়েও আমাদের দেশে পক্ষীর মুখে সংবাদ প্রেরণপ্রথা প্রচলিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মহাভারতে একটি গল্প আছে।—গৃহে ঋতুমতী ও কামাতুরা পত্নী রাখিয়া চেন্দিশোষিপতি মহারাজ উপনিচর

শিউ-মিদেশে যুগ্মরায় গমন করেন। সেখানে বৃক্ষজায়ার প্রান্তিদূর করিবার সময়ে পত্নীকে স্মরণ করিবার জন্য তাঁহার রোতখলন হয়। মহারাজ উষ্ম হইয়া সেই রোতঃ পাতার ঠোঙার করিয়া একটি শ্রেনপক্ষীকে দিয়া পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দেন। শ্রেন সেই ঠোঙা মুখে করিয়া চেন্দিশোষানী অভিযুখে যাইতে যাইতে অপর একটা শ্রেনের সহিত বিবাদ করিয়া তাহা ফেলিয়া দেয়। ইহাতে মংস্যের উদরে ব্যালজননী মংস্তগন্ধার জন্ম হয়। এই উপাখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, শ্রেনপক্ষীও শিক্ষিত হইলে লিপিবহনের কার্য করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন নলদময়ন্তীতে “হংসদূতের” কথা পাওয়া যায়। দময়ন্তীর গোপিত হংস আসিয়া নলকে তাঁহার রূপের কথা জানাইয়া যায়। ইত্যাদি উপাখ্যান এতদিন কবির কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু যখন কপোতের এই স্বভাবের কথা জানা গিয়াছে, তখন আর সেই পৌরাণিক উপাখ্যান একেবারে অমূলক বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

দেখা যায় যে, প্রায় সকল দেশেই কপোত পবিত্র পক্ষী বলিয়া বিখ্যাত। আমরা ইহাদিগকে লক্ষীর বরপাত্র বলি, আবার মঙ্গলনগরে কপোতেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ ও কপোতেশী নামে ভবানী মূর্তি আছে। প্রাচীন আসিরিয়া দেশের রাজারা ইহাদিগকে পরম ভক্তি করিতেন। আরবদেশী বৃহৎকাব নীল পারাবত “নোয়ার যুবু” বলিয়া মহা সম্মান পাইয়া থাকে। মুসলমান ধর্মগ্রন্থে ইহারা “স্বর্গের দূত” বলিয়া অতিহিত হইয়াছে। মুসলমানেরা বলে যে, যখন মুহম্মদের কিছু আনিবার প্রয়োজন হইত, তখন স্বর্গ হইতে কপোত আসিয়া কাণে কাণে বলিয়া দিয়া যাইত। মস্তার কাবা মসজিদে পায়রা অতি যত্নের সহিত পালিত হয় এবং “কাবার যুবু” বলিয়া কোন মুসলমান কখন ইহাদিগকে খায় না। সেকালে ইংরাজ খৃষ্টানেরাও ইহাদিগকে “Holy-bird” (পবিত্র পক্ষী) বলিয়া আদর করিত।

আমাদের পুরাণেও আছে যে শিবরাজার দানশীলতা পরীক্ষার্থে অগ্নি কপোতরূপে ও ইন্দ্র শ্রেনরূপে ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কপোত শ্রেন ভয়ে ভীত হইয়া শিবির কোড়ে পতিত হইল এবং আশ্রয় চাহিল। শিবি শরণাগতকে রক্ষা করিয়া শ্রেনকে ভুই করিবার জ্ঞান স্বদেহের সমস্ত মাংস, শেষে নিজদেহ দান করিয়া মহা বশোলাত করিলেন। এই হইতে কপোতের নাম অগ্নিমূর্তি হয়।

আমাদের আয়ুর্বেদশাস্ত্রে কপোত মাংসের গুণাগুণ লিখিত আছে।

মহর্ষি চরকের মতে,—পায়রার মাংস কষার, মধুর, শীতল

এবং রক্তপিত্তনাশক। হারীতের মতে—বৃহৎ, বলকর, বাতপিত্তনাশক, তৃপ্তিকর, শুক্রবর্ধক, রক্তিকর এবং মানবের হিতকর। ভাবমিশ্র বলেন ইহার গুণ—শুষ্ক, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক, সংগ্রাহী, নীতল, স্বকের হিতকর এবং বীৰ্য্যবর্ধক। ছন্দ্রত ও বাতের মতে কালপাররা (কাপকপোত) শুষ্ক, লবণযুক্ত, ঝাহ ও সর্পদোষকর। [যুগ্ম শব্দ দেখ।]

কপোতক (ক্লী) কপোত ইব কপোতবর্ণবৎ কায়তি প্রকাশতে। কপোত-কৈ-ক। সৌবীরাজম।

কপোতকীয় (জি) কপোতো হস্তাত্ত, কপোত-হ-কৃচ্চ (নড়ানীনং কৃচ্চ। পা ৪।২।১১।) কপোতযুক্ত।

কপোতচরণা (জী) কপোতস্ত চরণচরণবৎ আকারো হস্তাত্তাঃ, কপোত-চরণ-অর্শ আদিহাৎ অচ-টাপ্ চ। ১ নলীনামক গন্ধদ্রব্য। ২ কীরিকা। ৩ (৬তৎ) কপোতের পা।

কপোতপাক (পুং) কপোতস্ত পাকঃ ভিষঃ, ৬তৎ। কপোতশিত, পায়রা বা ঘুঘুর-ছানা।

কপোতপাদ (জি) কপোতস্ত পাদাবিব পাদৌ যস্য, হস্তাদিহাৎ নাস্ত্যালোপঃ। (পাদস্যালোপোঃ হস্তাদিহাৎ। পা ৫।৪।১০৮।) কপোতের হাত পদযুক্ত।

কপোতপালিকা (জী) কপোতান্ পালয়তি, কপোত-পাল-গিচ্-খুল্ স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইষম্। ১ বিটক, পায়রার খোপ বা বাসা। ২ শুষ্ঠাদির উপরে যে সকল সজীব স্থানে পায়রা প্রভৃতি বাসা করে। ৩ চিড়িয়াখানা।

কপোতপালী (জী) কপোতান্ পালয়তি, কপোতপাল-গিচ্-অণ্-ডীপ্ চ। কপোতপালিকা।

(“চিক্রংসয়া কৃত্রিমপত্রিপঙক্তেঃ

কপোতপালীষু নিকেতনানাম্” মাঘ।)

কপোতরোমস (পুং) প্রবরমুনি বিশেষ।

কপোতরোমা [ন] (পুং) ১ রাজা উশীনরের পুত্র। কপোত-রূপী অগ্নির বয়ে ইহার জন্ম। (ভারত বন ১৯৬ অঃ।) ২ যদুবংশীয় কুকুর নৃপতির পৌত্র। (হরিবংশ ৩৮ অঃ)

কপোতলুক্কীয় (ক্লী) কপোতং লুক্ককঞ্চ অধিকৃত্য কৃতো গ্রহঃ, কপোতলুক্ক-হ। মহাভারতের অন্তর্গত আখ্যায়িকা-বিশেষ, ইহাতে কপোত ও লুক্ককের গল্পহলে গৃহস্থের প্রাণ দিয়াও অতিথি সংকার কর্তব্য, এইরূপ উপদেশ আছে।

কপোতবন্ধা (জী) কপোতো বন্ধতে প্রত্যাঘাতে হনয়া, কপোত-বন্চ্ করণে ষঞ্-কৃৎ টাপ্ চ। ব্রাহ্মী। [ব্রাহ্মী দেখ।]

(“কপোতবন্ধা মূলং হি শিবদগ্নয়নাদিভিঃ” ছন্দ্রত।)

কপোতবর্ণী (জী) কপোতস্য বর্ণ ইব বর্ণো যন্তাঃ, গৌরা-নীহাৎ ভীব্। ছোট এলাইচ।

কপোতবল্লী (জী) কপোতবর্ণী বলী মধ্যলোপঃ। ব্রাহ্মী।

(“ব্রাহ্মী কপোতবল্লী চ সোমবল্লী সরস্বতী।” ভাবপ্র।)

কপোতবাণা (জী) কপোতপ্রাণ ইব বাণ তন্মৎ আকারো যস্য। নলিকা নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ।

কপোতবৃত্তি (জি) কপোতানাং বেগো বৃত্তিরিব বৃত্তির্ভজ, বহত্রী। ১ সঙ্করহীন, যে রোজ আনিয়া রোজ খায়। ২ (৬তৎ) (জী) সঙ্করশূন্য কীরিকা।

কপোতবেগা (জী) কপোতানাং বেগে গতিরিব বেগে ক্রতবৃত্তির্ভগ্যাঃ, মধ্যলোপঃ। ব্রাহ্মীশাক।

কপোতসার (ক্লী) কপোতবর্ণ ইব সারঃ কৃষ্ণবর্ণো যন্ত, বহত্রী। অঙ্গনবিশেষ, শ্রোতোঙ্গন।

কপোতহস্ত (ক্লী) উপাসনাকালে হাতবোঁড় করা।

কপোতাক্র নদী। বালারার একটা নদী। চলিত কথায় ইহাকে “কপদক” নদী বলে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরের নিকট মাথাভাঙ্গা নদী হইতে বহির্গত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থল হইতে কিছুদূর পূর্বাভিমুখে বহিয়া গিয়া নদীয়া ও যশোহরের মধ্যে দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে। এই স্থানে এই নদীই নদীয়া ও ২৪ পরগণা এবং যশোহর জেলার সীমা নির্দেশক। ২৪ পরগণার মধ্যে আশান্তনি হইতে ৫ মাইল পূর্বে ইহা “মরিছাপ গাং”এর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গাঙের ভিতর দিয়া কলিকাতা হইতে নৌকাদি যাতায়াত করে। যেখানে কপোতাক্র উক্ত গাঙের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার ২ মাইল দক্ষিণে এই নদী হইতে পূর্বমুখে যশোহর জেলার ‘চাঁদখালী খাল’ নির্গত হইয়াছে। এই খাল দিয়া খুলনা, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে মাল আমদানী রপ্তানি হইয়া থাকে। চাঁদখালী খালের মুখ হইতে ২২° ১৩' ৩০" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯° ২০' পূর্ব দ্রাঘিমায় ইহার সহিত খোলপেটুয়া নদী মিলিত হইয়াছে। এই সংযুক্ত নদী দুইটিকে সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ কোথাও পালাসি, বাড়, পাঙ্গা, নামগাদ ও সমুদ্র বলে। সাগরের নিকটবর্তী স্থানে ইহার নাম মালঞ্চ। কপোতাক্র অবশেষে এই মালঞ্চ নামেই বঙ্গোপসাগরে প্রবিশ্ট হইয়াছে।

যশোহর জেলার মধ্যে এই নদীর তীরে সাগরদাঁড়ী নামে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম আছে। এই গ্রামে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বালারার প্রসিদ্ধ কবি মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনাদি কাব্য-প্রণেতা ৮ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়।

কপোতাজি (জী) কপোতস্ত অজিদ্ভিরিব, উপমি। ১ নলীনামক গন্ধদ্রব্য। ২ (পুং) (৬তৎ) পায়রা বা ঘুঘুর পা।

কপোতাজ্ঞান (কৌ) কপোতবর্ণঃ অজ্ঞানঃ, মধ্যলো।
ক্লোভোজ্ঞান।

কপোতাত্ত (পুং) কপোতত্ব জাতাইব আতাত্ত, মধ্যলো।
১ কপোতবর্ণ।

(কপোতত্ব কপোতাত্তঃ পীতত্ব সিতরজনঃ। শব্দাকি।)

২ দ্বিবিশেষঃ; ইহা মংশন করিলে, দষ্টহানে গ্রহি,
পিড়কা ও শোধ উৎপন্ন হয়, তাহাতে বায়ু, পিত্ত, কক ও
রক্ত এই চতুর্বিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। (হৃৎকত)

কপোতারি (পুং) কপোতানাং অরিমারকঃ, ৬তৎ।
স্ত্রেন পক্ষী, বাজপাখী।

কপোতিকা (কৌ) কপোত-বার্ধে কন্ টাপ্ অতইষম্।
কপোতী, পায়রী, মাদী পায়রা বা বুয়ু।

কপোতী (কৌ) কপোত-ভীষ্। ১ কপোতজাতির কৌ।
২ বজ্রীয় যুগবিশেষ।

কপোতেশ্বর (পুং) মহাদেব। কোন সময়ে কুশস্থলীতে
বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মহাদেব কপোতের ন্যায় ক্লশ হইয়া
যাওয়ার, তাহার এই নাম হইয়াছে। অগ্নিপুত্রের মতে, কোন
সময়ে হরপার্বতী কপোত কপোতীর রূপধারণ করিয়া বিহার
করিয়াছিলেন, তাহা হইতে শিবের এই নামের উৎপত্তি।

কপোতেশ্বরী (কৌ) কপোতেশ্বর-ভীষ্। পার্বতী, দুর্গা।
কপোল (পুং) কপি-ওলচ্- (কপিগড়িগড়িকটিপটিভ্য
ওলচ্। উণ ১। ৬৩।) নলোপঃ। গণ্ডস্থল, গাল।

কপোলকল্পনা (কৌ) অমূলক কল্পনা, গানগম।
কপোলকল্পিত (ত্রি) যে সকল অমূলক বিষয় কল্পনা করা হয়।
কপোলকাষ (পুং) কষাতে অনেক ইতি কাষঃ, কপোলানাং
কাষঃ কষণস্থানম্। হস্তিগণ যেখানে গওদেশ ঘর্ষণ করে,
বৃক্ষাদির বন্ধস্থান।

(“লীনাংলিঃ সুরকরিণাং কপোলকাষঃ।” ভারবি।)

কপোলফলক (পুং) কপোলঃ ফলকইব। বিস্তৃত কপোল।
কপোলভিত্তি (কৌ) কপোলা ভিত্তরইব, উপমি। বিস্তৃত
কপোল।

কপোলী (কৌ) জাহ্নব অপ্রভাগ।
কপুচান (দেশজ) পক্ষিদের বুলি ধরবার উপক্রম করা।
কপ্যাধ্য (কৌ) কপিপ্যাধ্য যন্ত, বহুব্রী। বানর।
কপ্যাস (কৌ) আন্ততে অনেক ইতি আসঃ, কপীনাং আসঃ,
৬তৎ। কপিগণের পৃষ্ঠের প্রান্তভাগ।

কক (পুং) কেন জলেন ফলতি, ক-কল-ভ (অন্যেবপি
দৃষ্টতে। পা ৩। ২। ১০১।) শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, স্লেয়া।

“ক” শব্দের অর্থ দেহ এবং “কল” ধাতুর অর্থ গতি;

সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, ইহা প্রাণি-
গণের দেহে সর্বত্র গতি (চলাচল) করে বলিয়া, উহাকে
কক বলা যায়। ইহা শরীরস্থ সৌম্য (জলীয়, মিষ্টিওণ-
বিশিষ্ট) ধাতু। প্রচলিত বক্তব্যের ইহাকে কক ও স্লেয়া
বলা যায়। ক্লেনন, সজ্জাত, সৌম্যধাতু, স্লেয়া, ঘন ও বলী,
এই কয়েকটি শব্দ কক শব্দের পর্যায়। এই কক দেহকে
ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া উহাকে “ধাতু”, সমস্ত দেহকে
দ্রবিত করে বলিয়া উহাকে “দৌষ” এবং ক্লেনাদি দ্বারা
সর্বশরীরকে মলিন করে বলিয়া উহাকে “মল” বলা যায়।
এই কক নামভেদে, স্থানভেদে ও কার্যভেদে পাঁচ ভাগে
বিভক্ত। যথা—

“ককৈভেতানি নামানি ক্লেননশ্চাবলঘনঃ।

রসনঃ স্বেহনশ্চাপি স্লেয়গঃ স্থানভেদতঃ ॥”

হৃৎকত, হৃৎস্থান ॥

১ ক্লেনন, ২ অবলঘন, ৩ রসন, ৪ স্বেহন এবং ৫ স্লেয়গ,
এই কয়েকটি স্লেয়গ নাম।

“আমাশয়ে হৃৎ হৃদয়ে কর্ণে শিরসি সন্ধি।

স্থানেষু মজ্জাংগাং স্লেয়া তিষ্ঠত্যুজ্জমাং ॥”

হৃৎবোধ ॥

১ আমাশয়, ২ হৃদয়, ৩ কর্ণ, ৪ মস্তক ও ৫ সন্ধিস্থান,
শরীরের এই ৫টি স্থান ককের প্রধান আশ্রয়স্থল। ক্লেনন নামক
স্লেয়া আমাশয়ে, অবলঘন নামক স্লেয়া হৃদয়ে, রসন নামক
স্লেয়া কর্ণে, স্বেহন নামক স্লেয়া মস্তকে এবং স্লেয়গ নামক
স্লেয়া সন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। ইহা সর্বশরীর-
ব্যাপী হইলেও যখন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তখন কেবলমাত্র
পূর্বেকৃত আমাশয়াদি পঞ্চস্থানেই অবস্থিত করে। উল্লিখিত
ক্লেননাদি পঞ্চবিধ স্লেয়ার কার্যও পৃথক্ পৃথক্, তাহাও
এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে;—

“ক্লেননঃ ক্লেননভ্যন্নমাশ্রয়ন্ত্যাপিরাণ্যপি।

অহুগ্ধরাতি চ স্লেয়স্থানাত্মাদককর্ণণা ॥

রসযুক্তাশ্রয়ীৰ্য্যেণ হৃদয়স্থানলঘনম্।

ত্রিকস্কারগণকাপি বিদধাত্যবলঘনঃ।

রসনাবস্থিতেষু রসনো রসবোধনাৎ ॥

স্বেহনঃ স্বেহনানেন সমভেদ্যি তর্পণঃ।

স্লেয়গঃ সর্বগজীনাং বং স্লেবং বিদধাত্যসৌ ॥”

হৃৎকত, হৃৎস্থান ॥

১ম—ক্লেনন নামক স্লেয়া আগুন শক্তি দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যকে
ক্লিন করে, সুতরাং তাহার পিত্তাকৃতি আহারীয় বস্তু সকল
ভিন্ন হইয়া (গলিয়া) পড়ে। তৎপরে ঐ ভিন্ন অর

সকল হৃদয় প্রভৃতি অজ্ঞাত স্থান সমূহে গমনপূর্বক হৃদয়াবলম্বন, ত্রিক (মেরুদেশের নিম্ন ও উপরিস্থ সন্ধিস্থান অর্থাৎ শুষ্কের সন্নিকট শেবাহি ও ঝাড়), সন্ধারণ, রসগ্রহণ, ইন্দ্রিয়সমূহকে শৈত্য গুণে সন্তুষ্টিকরণ এবং সন্ধিসংলগ্নবণ প্রভৃতি উদক কর্মধারা তত্তৎস্থানের আত্মকৃত্য করিয়া থাকে। ২য়—বন্ধঃস্থলস্থিত অবলম্বন নামক প্লেয়া রসগ্রহণে যৌর শক্তি দ্বারা হৃদয় অবলম্বন এবং ত্রিক-দেশকে ধারণ করিয়া রাখে। ৩য়—রসন নামক রসনাং কফ আহারীয় বস্তু সমূহের রসজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। ৪র্থ—স্নেহন নামক প্লেয়া স্নেহপদার্থ প্রদানপূর্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন করে। ৫ম—প্লেয়ায় নামক কফ সন্ধিসমূহের সংলগ্ন (মিলন) বিধান করিয়া থাকে। বাতটের মতে—

“কফধাত্বাক্ত শেবাণাং যৎকরোত্যবলম্বনম্।

অতোহবলম্বকঃ প্লেয়া যদ্বাশায়সংশ্রিতঃ।

ক্লেদকঃ সোহমসম্ভাতক্লেদনাৎ রসবোধনাৎ।

বোধকো রসনাংহারী শিরঃসংস্হোহকিতপর্ণাৎ।

তর্পকঃ সন্ধিসংলগ্নোচ্ছ্রয়কঃ সন্ধিস্থিতিঃ ॥”

বাতট, স্ত্রুতস্থান।

অবলম্বক, ক্লেদক, প্লেয়ায়ক, বোধক এবং তর্পক, এই ৫টি নাম দ্বারা কফ ৫ ভাগে বিভক্ত হয়। অবলম্বক প্লেয়া পূর্বোক্ত অবলম্বন কক্ষোক্ত ক্রিয়াশীল ও স্থানগত, ক্লেদক প্লেয়া ক্লেদন প্লেয়ার জায় কার্যকারী ও স্থানগত, প্লেয়ায়ক কফ পূর্বোক্ত প্লেয়ায় কফের মত কার্যকারী ও স্থানগত, বোধক প্লেয়া পূর্বোক্ত রসন নামক কফের সদৃশ ক্রিয়াবিশিষ্ট ও স্থানগত এবং তর্পক প্লেয়া স্ত্রুততোক্ত স্নেহন নামক প্লেয়ার সদৃশ ক্রিয়াকারী ও স্থানান্তরী।

“প্লেয়া স্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীত এবচ।

মধুরম্ববিদগ্ধঃ তাদ্ বিদগ্ধো লবণঃ স্ত্রুতঃ ॥”

স্ত্রুত, স্ত্রুতস্থান।

ইহা স্বেতবর্ণ, গুরু (ভারী), স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, মধুর রসাত্মক এবং বিকৃত হইলে লবণ রসবিশিষ্ট।

কফ প্রকোপের কারণ ও কাল—গুরুপাকী জব্য, মধুর রসবিশিষ্ট জব্য, অত্যন্ত স্নিগ্ধ জব্য, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, জব (ভরল) বস্ত্র; দধি, পিষ্টক ও স্তন্যসংযুক্ত জব্য এই সকল বস্ত্র ভোজন করিলে এবং দিবানিজ্রা, বালাকাল, শীতকাল, বসন্তকাল, ঋত্বির প্রথমকাল, দিব্যর আদি সময় (প্রভাত) এবং ভোজন করিবামাত্র, এই সকল সময়ে কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে; কফ প্রকুপিত হইলে ভিমিত্তভাব, মধুররস, শীততা, শোণ্য, প্রোসেক, বলপ্রাচুর্য, স্থিতি, লবণাক্ততা, কণ্ড,

আলস্ত, চিরকারিতা, কঠিনতা, শোথ, অকটি, স্নিগ্ধতা, তন্ম্রা, তৃপ্তি, উপদেহ, কাস ও গুরুতা; এই বিংশতি প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফজ-রোগে এইগুলি উপকারী। যথা—কফ জব্য, কাস জব্য, কাস জব্য, তিক্ত জব্য এবং কটুজব্য সেবন, ব্যায়াম, নিজীবন (কাশিয়া থুতু নিক্ষেপ করণ), ধূমপান, উষ্ণ শিরোবিরেচক জব্য (নস্যাদি) ব্যবহার, বমনকারক জব্য প্রয়োগ, স্নেহ (গরম জলাভিষেক ফ্যানেলাদি উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা সেক প্রদান), উপবাস, মৈথুন, পথপর্যটন, যুদ্ধ, জাগরণ, জলক্রীড়া এবং পদাদি দ্বারা আঘাত প্রয়োগ, এই প্রকার আহার বিহার ও ঔষধাদি দ্বারা প্রকুপিত কফ প্রশমিত হইয়া থাকে। উক্ত কফ জব্যাদিকে কফ সংমনন বর্ণ বলা যায়।

জলক্রীড়া (সস্তরণ), শীতল এবং ক্রিয়া দ্বারা কি প্রকারে কফ প্রশমিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে এই বলা যায় যে, জলক্রীড়া জনিত শীতলতা দ্বারা শারীরিক উত্তাপ অবরুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং যেমন চতুর্দিকে কর্মম লেপন করিয়া দিলে পাকায়ি প্রথর হওয়ায় সস্তর পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ শারীরিক অগ্নি অত্যন্ত প্রথর হইয়া কফকে শোষণ করে। কফ বদ্ধিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, নাসিকাদি হইতে কফস্রাব, আলস্ত, দেহের গুরুতা ও স্বেতবর্ণতা, অজ্ঞাদি শীতল ও শিথিল হয় এবং শ্বাস, কাস ও নিজ্রাদিক্য হইয়া থাকে। কফ ক্ষীণ হইলে শ্রান্তিবোধ, হৃদয়াদি প্লেয়াশয় সমূহের শূন্যতা (কফশূন্যতা), জব্যে অগ্নতা এবং শারীরিক সন্ধি-সমূহ শিথিল হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির শরীরে কফ অধিক পরিমাণে অবস্থিত করে, তাহারা কফের গুণ ক্রিয়াদি-বিশিষ্ট হইয়া কফাত্মক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাকে কফ-প্রকৃতিক বলা যায়। গভীর বুদ্ধি, কেশ জামবর্ণ ও স্নিগ্ধ, ক্ষমশীলতা, বীৰ্যবস্তা, স্থলকার, সমধিক বলবত্তা এবং নিজ্রা-বহ্য স্বপ্নযোগে জলাশয় দর্শন, এই সকল প্লেয়া প্রকৃতির লক্ষণ বলিয়া জানিবে। এই প্লেয়া প্রকৃতি বিকৃত হইলে স্নেহ, বদ্ধ (বদ্ধতা), স্থিরতা, গোরব, বৃষের ন্যায় বল, ক্ষমা, ধৃতি এবং অলোভ, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। (স্বথবোধ।)

লক্ষণ। স্ত্রুতের মতে—কেশ নীলবর্ণ, সোভাগ্যবান্, মেঘ ও মৃদঙ্গের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট, নিজ্রাবহ্য স্বপ্নযোগ; প্রকৃত পদ্য কুমুদাদি বিবিধ পুষ্প, সস্তরণশীল হংস চক্রবাকাদি জলক্রীড়ক পক্ষী ও সবুজ মনোহর সরোবরাদি জলাশয় দর্শন, রক্তান্তনেত্র, সুবিত্ত গাভ্র, সমাবরব, স্নিগ্ধমেহ, সন্ধ্যগযুক্ত ক্লেশসহিত এবং গুরুকে মান্যকারী এই সকল কফ প্রকৃতির লক্ষণ।

মামবর্ণের শরীরে ছই প্রকার কফ অবস্থান করে, সাম-

কফ ও নিরাম কফ। যে কফ আম (অপক)-রস-মিশ্রিত থাকে, তাহাকে সাম কফ বলে। আর যে কফ অপক রস-বিহীন তাহাকে নিরাম কফ বলিয়া জানিবে। নিরাম কফ অবিকৃত ও নির্দোষ, উহা দ্বারা কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা নাই। সাম কফ বিকৃত ও দূষিত; ইহা দ্বারা নানাবিধ অহিত উৎপন্ন হয় বলিয়াই উহার লক্ষণ সকল কথিত হইল। যথা—

“আলস্ততজ্ঞাহনরাবিশুদ্ধিদোষাপ্রবৃত্ত্যাবিলম্বতাত্তিঃ।

শুক্রদরস্বাক্টিশুশ্রুতাভিরামাধিতং ব্যাধিমুদাহরন্তি।”

ভাবপ্রকাশ, মধ্যখণ্ড-জরাদিকার।

আলস্ত, তজ্ঞা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা (বন্ধঃস্থলে কফ কর্তৃক বাধাবোধ), দোষের অপ্রবৃত্তি (প্রাব হয় না), মূত্রের আবিলতা (মোলাটে), উদরে ভারবোধ, অরুচি ও নিদ্রালুতা, এই সকল সাম কফের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

প্রথমেই কফ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দেশক ব্যুৎপত্তি দ্বারা উহা সর্ষশরীরে চলাচল করে এরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং তৎপরে কফ বথন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তখন উহা হৃদয়, কণ্ঠ, আমাশয়, মস্তক ও বিকৃত হইলে সন্ধিহুল, এই ঐতি স্থানে অবস্থিতি করে এবং বিকৃত হইলে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া সর্ষশরীরের নানাস্থানে যাইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই কফ দেহের সর্ষতঃ প্রসরণশীল হইলেও বায়ুর সাহায্য ব্যতীত হৃদয়াদি স্বস্থান হইতে অন্যত্র আদৌ যাইতে পারে না। যথা—“পিত্তং পঙ্কু কফঃ পঙ্কুঃ পঙ্কবো মলধাতবঃ। বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ।” শাঙ্খধর, ষষ্ঠ অধ্যায়। অর্থাৎ পিত্ত, কফ, বিষ্ঠামূত্রাদি মল এবং রস রক্তাদি ধাতু সমস্তই পঙ্কবৎ অচল, স্বয়ং শরীরাত্তরে কদাচ গতি-বিধি করিতে পারে না, বায়ু কর্তৃক যে স্থানে নীত হয়, তথায় মেঘ বর্ষের ন্যায় স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ কফ বিকৃত কুপিত বা বর্ধিত হইলে, উহা বায়ু কর্তৃক শরীরের নানাস্থানে নীত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন কফ বন্ধঃস্থ ফুসফুসে নীত হইলে শ্বাস ও কাসরোগ, মস্তকে নীত হইলে শিরঃপীড়া, নাসিকায় আসিলে প্রতিশ্রাব রোগ উৎপাদন করে ইত্যাদি।

পথা—বমন, উপবাস, নেত্রাঞ্জন, মৈথুন, শরীরমার্জন, উষ্ণজলদির স্বেদ, চিহ্না, আগরণ, পরিশ্রম, অত্যধিক পথপৰ্যটন, ভৃক্ষার বেগধারণ, গণ্ডুধারণ, প্রতিসারণ (দন্ত জিহ্বা যুগ্মে ঘর্ষণ দ্রব্য প্ররোগ) শিরোবিরেচক নস্ত, হস্তী অশ্বাদি বানারোহণ, ধূমপান, শরীরচ্ছাদন, বৃক্ষ, মনোহঃ

উৎপাদন, কৃষ্ণদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, পুরাতন ও বটিক ধান্য, বরবটী, ভূগু ধান্য, ছোলা, মুগ, কুলখ, কলাই, বব, ক্ষার, সর্ষগৈল, গরমজল, ধ্বংসেজ মাংস, রাইসরিবা, বেড়াগ্র, পটোল, কলা, উচ্ছে, বেগুন, বজ্রভূদ্র, কীক-রোল, মোচা, রহুন, ডাও, ওলনা, নিম্ব, কচিনুদা, কটকী, ভেউরী, মধু, তাবুল, পুরাতনমদ্য, ত্রিকটু, ত্রিকলা, গোমুত্র, খই, কুঠে তণ্ডুলকতান, জৈবদ্রব্য গৃহ, কীসা, শৌহ, মুক্তা, কপূররসযুক্ত, তিক্তকর দ্রব্য ও কষার দ্রব্য, এই সকল আচরণ, পান ও আহারাদিতে কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অপথা—স্নেহ প্ররোগ, তৈলাভ্যাস, উপবেশন, দিবা নিদ্রা, স্নান, নূতনজল, নূতন তণ্ডুল, মাষকলাই, মংগ, মাংস, গুড়াদি মিষ্টদ্রব্য, ছানা, দধি প্রভৃতি দৃঢ়বিকৃত দ্রব্য, পেয়া, কামরাজা, পুঁইশাক, কাঁঠাল, ধান, খেজুর, দুগ্ধ, অমুলেপন, নারিকেল, মিঠান, মধুর দ্রব্য, অন্নদ্রব্য, গুফ (ভারী) দ্রব্য ও হিম, এই সকল আচরণ, আহার, বিহারাদি কফের অপথা অর্থাৎ এই সকল দ্বারা কফ-রোগীর অনিষ্ট উৎপন্ন এবং কুপিত ও বর্ধিত হইয়া থাকে।

কফকর (জি) কফং করোতি, কফ-ক-অচ্। কফক্কারক দ্রব্য। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে,—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাধানী, মেদা, মহামেদা, ছিন্নরহা, কাকরাশুঙ্গী, তুগাক্ষরী, পদ্মক, প্রপোওরীক; ঋজি, বৃদ্ধি, মুহুরিকা, জীবন্তী ও মধুক; এই কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য সকল কফকর। [অস্ত্রাজ দ্রব্য কফ শব্দে দেখ।]

কফকুর্চ্চিকা (জী) কফং কুর্চ্চতি বিকৃতং করোতি, কফ-কুর্চ্চ-বৃ-লু-টাপ-অত ইৎফ। লালা, থুতু।

(স্বণীক) শ্রম্বিনী লালাত্যসবঃ কফকুর্চ্চিকা। হেম ৩২৯৩।)

কফকেতু (পুং) ঔষধ বিশেষ।

কফক্ষয় (পুং) কফানাং ক্ষয়ঃ, ৬৩৭। শরীরস্থ স্বাভাবিক কফের নাশ। [কফক্ষয়ের লক্ষণ কফে দেখ।]

কফশু (জি) কফং তদ্বিকারঞ্চ হন্তি, কফ-হ-ন্-টক্। কফনাশক বা কফজনিত পীড়ানাশক দ্রব্য।

সুশ্রুতোক্ত আরখাদি, বরুণাদি, সানসারাদি, লোহাদি, অর্কাদি, ছুরাদি, পিঙ্গল্যাদি, এলাদি, বৃহত্তাদি, পটো-লাদি, উবকাদি ও মৃতাদি গণোক্ত দ্রব্যসকল এবং ত্রিকটু, ত্রিকলা, পঞ্চমূল, দশমূল প্রভৃতি দ্রব্য সকল কফনাশক। [অস্ত্রাজ কফ শব্দে দেখ।]

কফস্ত্রী (জী) কফয়-স্ত্রীপ্। হবুবা বিশেষ, আউচ বৃক্ষ বিশেষ। কফজ (জি) কফাজ্যতে, কফ-জ-ন্-ড। স্নেয়া হইতে উৎপন্ন।

কফজ্বর (পুং) কফ নিমিত্তো জ্বরঃ, মধ্যলোঃ । জ্বররোগ বিশেষ ।
[অর দেখ ।]

কফণি (পুং, স্ত্রী) কেন স্বধেন কণতি অনারাসেন সঙ্ঘোচ-
বিকোচনকঃ প্রাপ্তোতি ইত্যর্থঃ, ক-কণ্-ইন্ । কেন অনারাসেন
ক্ষুরতি, ক-ক্ষুর-ইন্ (পুৰোদারাদিহাং সাধুঃ ।)
কফোণি, কহুই । (কফোণিস্ত ভূজা মধ্যং কফণিঃ কুর্পরশ্চ সঃ ।
হেম ৩।২৫৪।)

কফদ (ত্রি) কফং দদাতি, কফ-দা-ড । শ্লেষকারক ।

কফনাশন (ত্রি) কফং নাশয়তি, কফ-নাশ-ণিচ্-লুট্ । শ্লেষ-
নাশক ।

কফপ্রায় (ত্রি) কফঃ প্রায়ঃ বাহুল্যেন যত্র, বহত্বী । কফ-
বহল, অতিরিক্ত শ্লেষসংযুক্ত ।

কফল (ত্রি) কফঃ সাধ্যত্বেন অন্ত্যস্ত, কফ-লচ্ । কফজনক ;
শ্লেষকারক ।

কফবর্দ্ধক (ত্রি) কফং বর্দ্ধয়তি, কফ-বৃধ-গিচ্-বুল্ । বাহার
দ্বারা শ্লেষার বৃদ্ধি হয় ।

কফবর্দ্ধন (পুং) কফং কফজনিতং বিকারদ্বা বর্দ্ধয়তি, কফ-
বৃধ-গিচ্-লু। ১ পিণ্ডীভগর বৃক্ষ । ২ (ত্রি) কফবৃদ্ধি-
কারক দ্রব্যাদি ।

কফবিরোধি [ন্] (স্ত্রী) কফং বিশেষণে কণক্তি কফ-বি-
রোধ-ণিনি । ১ মরিচ । ২ (ত্রি) শ্লেষনাশক ।

কফসম্ভব (ত্রি) কফাৎ সম্ভবঃ উপপত্তির্ব্যস্ত, ৫তৎ ।
কফজাত ।

কফহর (ত্রি) কফং হরতি নাশয়তি, কফ-হ-অচ্ । কফনাশক ।

কফহ্রৎ (স্ত্রী) কফং হরতি, কফ-হ-কিপ্ । শ্লেষনাশক ।

কফাত্মক (ত্রি) কফ আত্মা যন্ত, কফাত্মন-কন্ । ১ কফময় ।
২ কফরূপী ।

কফাস্তক (পুং) কফস্ত অন্তকো নাশকঃ । বাবলাগাছ ।

কফারি (পুং) কফস্ত অরিঃ শময়তি । শুভী, শুট ।

কফিনী (স্ত্রী) কফিন্-স্ত্রীপ্ । ১ হস্তিনী । ২ শ্লেষপ্রধান স্ত্রী ।

কফী (ত্রি) কফোহস্ত্যস্ত, কফ-ইনি (দ্বন্দ্বোপাতাপগর্হাৎ
প্রাপিস্থাদিনি । পা ৫।২।১২৮।) ১ শ্লেষযুক্ত । ২ (পুং)
হস্তী ।

কফেলু (ত্রি) কফং লাতি আদত্তে, কফ-লা-ক্ নিপাতনাৎ
এতন্ (অনুদ্বন্দ্বজঙ্ঘ কঙ্ কফেলু কর্কজ্জুদিঘিয্ । উণ্ ১।
১৫।) ১ কফযুক্ত । ২ (পুং) শ্লেষাত্মক বৃক্ষ ।

(কফেলুঃ শ্লেষাত্মকতরো পুংসি । উজ্জলদত্ত ।)

কফোণি (পুং, স্ত্রী) কেন স্বধেন কণতি ক্ষুরতি বা, ক-কণ-
ক্ষুর বা-ইন্ (পুৰোদারাদিহাং সাধুঃ ।) কুর্পর । কহুই ।

কফোড় (পুং) কফোণি-বেদে কফোড়োদেশঃ পুৰোদার-
দিহাৎ । কফোণি, কহুই ।

কবন্ধ (স্ত্রী) কন্ত প্রাণবারোঃ বন্ধ আশ্রয়ঃ, ৩তৎ । ১ জল ।

(পুং) ২ কং জলং বদ্যতি, ক-বন্ধ-অণ্ । উদর, পেট । ৩
বাহ । ৪ ধুমকেতু । ৫ রাক্ষস বিশেষ । রানারগে এই রাক্ষসের
বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে ;—“দহু নামক কোন এক
দানব উগ্রতপস্তার দ্বারা ত্রক্ষকে তুষ্ট করিয়া তাহার নিকট
দীর্ঘ জীবন বরণাত করিয়াছিল । বরণপ্রাপ্তে নিতান্ত গর্জিত
হইয়া কোন সময়ে ইজের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত
হইল, ইজ বজ্রধাতের দ্বারা তাহার হস্ত ও মস্তক শরীরের
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন ; কিন্তু ত্রক্ষবরে তাহার
তাহাতেও প্রাণবিরোগ হইল না । এইরূপ বিকৃত শরীরে দিন
দিন ক্লিষ্ট হইয়া দহু বারবার ইজের নিকট অমুগ্রহ প্রার্থনা
করিতে লাগিল । ক্রমে ইজও তাহার প্রতি সদয় হইয়া
তাহাকে যোজন পরিমিত ছই হস্ত ও বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে
এক বদন বসাইয়া দিলেন । দহু সেই মূর্তিতে বনে বনে
ভ্রমণ ও দীর্ঘ বাহ দ্বারা বস্ত্র ভ্রষ্ট আহার করিয়া অবস্থান
করিতে লাগিল ।

তৎপরে একদা পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন জন্ত রামচন্দ্র
লক্ষ্মণ ও সীতাসহ সেই বনে উপস্থিত হইলে, ঐ রাক্ষস দীর্ঘ
বাহ দ্বারা তাহাদিগকে ধারণ করিল, রাম বীৰ্য্যভরে লঘু হস্তে
স্বীয় ধ্বজা দ্বারা তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন । রামহস্তে মৃত্যু
হওয়ার কবন্ধ দিব্যমূর্তি ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিল ।”

মহাভারতের মতে এই রাক্ষস পূর্বে বিশ্বাবহু নামক গন্ধর্ব্ব
ছিল, পরে কোন ত্রাক্ষণ অভিশাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয় ।

৬ (পুং স্ত্রী) (কেন প্রাণবায়ুনা পুনর্বধাতে, সমধাতে)
মস্তকহীন জীবিত এবং ক্রিয়াযুক্ত কলেবর । ৭ আতর্ক
বিশেষ । ৮ মূনিবিশেষ ।

কবন্ধবধ (পুং) কবন্ধস্ত বধঃ বধোপাধানং যত্র । পদ্ম-
পুরাণের অধ্যায়বিশেষ, এই অধ্যায়ে কবন্ধ রাক্ষসের বধ
বিষয় আত্মপুর্নিক বর্ণিত আছে ।

কবন্ধী [ন্] (পুং) ঋণিবিশেষ ।

(“অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ ।” প্রমোপ)

২ (ত্রি) কং জলং অস্ত্যতি, ক-বন্ধ-ইনি । জলযুক্ত ।
কবরী । জাতিবিশেষ । মাত্রাজ প্রদেশে এই জাতির
বসবাস । ইহারা প্রায় ১৮ শাখায় বিভক্ত । তন্মধ্যে বদিগি
ও ভোক্তিয়ার নামক শাখাই প্রধান ।

পূর্বে কবরীরা চাষবাসের জন্ত জমি রাখিত, সেই জমি
অপর নিকটে জাতি দ্বারা আবাদ করাইয়া তাহার আর

জীবিকানির্ভাহ করিত। এখন ইহাদের মধ্যে সেই পূর্ন-প্রথা থাকিলেও অনেকে নিজে চাষ বাস করে, কেহ কেহ ধাড়ি মালি, ও কেহ বা সামান্ত বাণিজ্য ব্যবসাও করিয়া থাকে।

তোত্তিরার শাখা কোন কোন স্থানে তোত্তিরান্ বা কষলতার নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা পরিশ্রমী ও বড় উৎসাহী। কৃষিকার্য্য হইতে অনেক উচ্চ কার্য্য পর্য্যন্ত ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মাস্ত্রাজনগরে তোত্তিরারেরা অনেক ভাল ভাল কার্য্য করিয়া থাকে।

তোত্তিরারেরা ৯ শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রত্যেক শ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র। প্রায় পাঁচ শতবর্ষ পূর্বে কতকগুলি তোত্তিরার মহুরাজেলায় আসিয়া উপনিবেশ করে।

ইহারা সকলই বিষ্ণু-উপাসক, বিষ্ণুর লীলাখেলা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকে। কেহ বিষ্ণুর নিন্দা করিলে ইহাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। নিন্দাকারীকে যথোচিত শাস্তিবিধান করিতে কেহ পশ্চাৎপদ হয় না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইন্দ্রজাল জানে, সেই জন্ত সাধারণে ইহাদিগকে ভয় ভক্তি করে। শুনা যায়, ইহারা ইন্দ্রজালবলে সাপে কামড়ান ভাল করিতে পারে। ইহাদের পুরুষেরা মাথায় পাগড়ী বাঁধে। জীলোকেরা নানাবিধ অলঙ্কার পরে, তাহাদের বন্ধ অনেকটা অনাহৃত থাকে, তাহাতে লজ্জা বোধ করে না।

তোত্তিরারদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু প্রায়ই সকলে একবার বিবাহ করে, একপত্নীর মৃত্যু হইলে তবে অপর পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহে অথবা ধর্ম্মকর্মে ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না, কোড়াজিনায়কন্ নামে ইহাদের এক এক চাই থাকে, তাহারাই বিবাহাদি সম্পন্ন করে এবং এই জাতির জন্মকোষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া দেয়।

কবরী-জাতিরা প্রধানতঃ তৈলঙ্গ, প্রায় সকলেই এই এই ভাষায় কথা কয়। তবে বাহারা স্বদেশ ছাড়িয়া অল্পস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

কবীর। কবীরপন্থী নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তিনি কাহার পুত্র অথবা কোন্ জাতীয় তৎসম্বন্ধে কিছু গোলযোগ আছে। তাঁহার জাতি, বুল ও জন্ম বিষয়ে নানা বিবরণ পাওয়া যায়। মুসলমানেরা বলেন, তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন। কিন্তু ভক্তমালা লিখিত আছে—

“রামানন্দশিষ্য কোন ব্রাহ্মণের এক বালবিধবা কন্তা ছিল। একদিন সেই ব্রাহ্মণ কন্তাকে সঙ্গে লইয়া গুরুদর্শনে

গমন করেন। রামানন্দ সেই ব্রাহ্মণ-কন্তার ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ‘তুমি পুত্রবতী হও’ বলিয়া সহসা আশীর্বাদ করিলেন। আশীর্বাদ বুঝা হইল না, বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্তার এক পুত্র জন্মিল, তাহার নামই কবীর। পুত্র তুমিই হইবামাত্র অভাগিনী জননী লোকাপবান ভয়ে গুপ্তভাবে সেই শিশুকে স্থানান্তরে পরিত্যাগ করিয়া আসিল। একজন জোলা ও তাহার স্ত্রী দৈবাৎ ঐ শিশুকে পাইয়া নিজ পুত্রের দ্বারা লালন পালন করিয়াছিল।”

কবীরপন্থীরা ভক্তমালের প্রথম অংশ আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কবীর একদিন কাশীর নিকট ‘লহর তলাও’ নামক সরোবরে গয়পত্রের উপর তাসিতে-ছিলেন, সেইখান দিয়া হুরি নামে একজন জোলা বীর পত্নী নিম্নার সঙ্গে বিবাহনিমন্ত্রণে যায়। নিম্না ঐ শিশুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে নিজ স্বামীর নিকট আনয়ন করে। শিশু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আমার কাশীতে লইয়া চল। হুরি সেই সদ্যোজাত শিশুর মুখে কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কোন উপদেষ্টা মানবদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছে তাহারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে ফেলিয়া পলাইতে লাগিল। শিশু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ গিয়া হুরি দেখিল, শিশু তাহার সম্মুখে উপস্থিত! তখন হুরি ভয়ে অড়ীভূত হইল। শিশু তাহার ভয় নিবারণ করিয়া কহিল, তোমরা আমার প্রতিপালন কর, কোন ভয় নাই, এইরূপে সেই শিশুরূপী কবীর জোলা কর্তৃক লালিত পালিত হইলেন।

কবীরের জীবনের প্রথমার্ধ যেমন কৌতুকবাহ, অবশিষ্ট অংশও তদনুরূপ।

ভক্তিমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

“পূর্বকালে বেদান্তভ্যাসনিরত একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি জী-পুত্রের জন্ত শিরকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ভাহ করিতেন। একদিন তিনি স্ত্রী আনিবার জন্ত ভক্তবাগের ভবনে গমন করেন। তথা হইতে নিজগৃহে ফিরিয়া আসিয়া অরোগে আক্রান্ত হন। দৈবযোগে সেই অরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি ভক্তবাগকে স্মরণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভক্তবাগের ঘরে তাঁহার জন্ম হইল।

ভক্তবাগের ঘরে জন্ম লইয়া সেই ব্রাহ্মণ প্রথমে বজ্রাদি নির্মাণ করিতে শিখিলেন, কিন্তু পূর্বসংস্কারবশতঃ তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানও জন্মিল। তিনি সর্বদাই বলিতেন, এ সংসার অসার, এ জীবন পদপত্রে জলের মত। এই কানীধামে কে আমার গুরু হইবে? কে আমাকে এ সংসারসাগর

হইতে পরিত্রাণ করিবে? কর্ণধার না পাইলে এই দেহতরী
কিরূপে চলিবে?

একদিন তিনি কতকগুলি সাধুর নিকট উপস্থিত
হইয়া আপনার মনোভাব জানাইলেন। সাধু বৈষ্ণবগণ
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে তুই? কি চাস?'
তিনি বলিলেন, "আমি জাতিতে ভক্তব্রাহ্মণ, রামানন্দের
শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি।" বৈষ্ণবগণ উপহাস করিয়া
কহিলেন, 'তুই স্নেহ! তোর গুরু কে হইবে?'

তখন ভক্তব্রাহ্মণী কবীর ভগ্নমনোরথ গৃহে ফিরিয়া
আসিলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি পুন-
রায় সাধুগণের নিকট আসিয়া মনের দুঃখ জানাইলেন।
কিন্তু এবারও তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তিনি
অস্থির চিত্তে বারাণসীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন;
বীহাকে দেখেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি
বলিতে পার, গুরু রামানন্দ কোথায়?' এইরূপে বহুদিন
গত হইল। একদিবস একজন বৈষ্ণব তাঁহাকে দয়া করিয়া
বলিল, 'গুরু রামানন্দ অমুক স্থানে বাস করেন, রাজিশেষ
হইলে বহির্দ্বার খুলিয়া প্রত্যহ গজান্বানে বাহির হন।
তুই রাজি থাকিতে তাঁহার বহির্দ্বারের সম্মুখে গিয়া শুইয়া
থাকিস, যখন দ্বার খুলিয়া তিনি বাহিরে আসিবেন তাঁহার
পদ তোর অঙ্গে লাগিবে, তখন তিনি যে নাম উচ্চারণ
করিবেন, তাহাই তুই গুরু মন্ত্র ভাবিয়া গ্রহণ করিবি। এ
ছাড়া রামানন্দের শিষ্য হইবার কোন উপায় নাই।'

কবীর বৈষ্ণবের কথায় আকৃষ্ট হইলেন। শুভদিনে
রাজিশেষে রামানন্দের দ্বারে আসিয়া শুইয়া রহিলেন।
রাজিশেষ হইলে রামানন্দ প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া কুশ তিল
লইয়া স্নানার্থে ঘেমন বাহির হইবেন অমনি কবীরের অঙ্গে
তাঁহার পদস্পর্শ হইল; কবীরও মহাসমাদরে গুরুপদ ভাবিয়া
চুষন করিলেন। রামানন্দ একজন স্নেহের গায়ে পা লাগিল
দেখিয়া 'রাম! রাম! কে তুই?' এই কথা উচ্চারণ করিলেন।
এইরূপে কবীরের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি রামানন্দকে
গুরু সন্মোদন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন *।

সেই অবধি কবীর 'রাম' নাম সার করিলেন, তিনি
তব স্তুতি কিছুই করিতেন না, কেবল রামনামই মুক্তির
সোপান ভাবিতেন। তদবধি তিলকমালা ধারণ করিয়া
অপরায়ণ বৈষ্ণবের ভায় কানীধায়ে বাস করিতে লাগিলেন।

* রেখতার মতে কবীর রামানন্দের লীলা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।
কথা—

“প্রথম হি রূপ জোলাহা কীহা। চারিঘরন মোহি কাহে ন গীহা।
রামানন্দ গুরু লীকা দেহ। গুরুপূজা কহু হব সো দেহ।”

কবীরের আচার ব্যবহার দেখিয়া বৈষ্ণবেরা ক্রুদ্ধ হইল।
একদিন তাহার কবীরকে ডাকিয়া বলিল, 'রে স্নেহাধম!
তুই কি সাহসে তিলকমালা ধারণ করিতেছিস? কে তোরে
এ ছবুঁকি দিয়াছে।'

কবীর শান্তশিষ্টভাবে উত্তর করিলেন, 'সত্যই বলি-
তেছি, গুরু রামানন্দ আমাকে রামমন্ত্র দিয়াছেন, তাই
আমি এমন হইয়াছি।'

সকলে আসিয়া রামানন্দকে কবীরের কথা বলিল।
রামানন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।
তিনি গুরুর নিকট আসিয়া কৃতান্তলিপুটে বীরভাবে কহি-
লেন, 'হে নাথ! আপনি কি ভুলিয়া গেলেন? সে দিন
রাজিশেষে আমি আপনার দ্বারে শয়ন করিয়াছিলাম,
আপনি আমার অঙ্গে পদ দিয়া রাম নাম উচ্চারণ করিয়া-
ছিলেন, সেইদিন আমি রামমন্ত্র লাভ করিয়াছি, সেইদিন
হইতে নিয়তই রাম নাম জপ করিয়া থাকি। প্রভো! ইহাতে
যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।'

রামানন্দ কবীরের পরিচয় পাইলেন, ক্রোধ পরিত্যাগ
করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। সেই-
দিন হইতে সকলে কবীরকে একজন ভক্ত বলিয়া জানিলেন।

কবীর যে কেবল একজন ভক্ত ছিলেন, তাহা নয়;
তাঁহার হৃদয় দরিদ্রের দুঃখে গলিয়া যাইত। একদিন তিনি
একখানি বস্ত্র লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, পথে এক-
জন বৃদ্ধের সহিত দেখা হইল। তখন শীতকাল, দরিদ্র
বৃদ্ধ শীতার্ভ হইয়া তাঁহার নিকট বস্ত্রখানি চাহিল, কবীর
দরিদ্রের দুর্দশা দেখিয়া অগ্নানবদনে বস্ত্রখানি তাহাকে
প্রদান করিলেন। দান করিলেন বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে
সংসারের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। আহা! আজ যে
তাঁহার গৃহে অন্ন নাই, তাঁহার মাতা যে পথপানে চাহিয়া
বসিয়া আছেন। কবীর রিক্তহস্তে কেমন করিয়া ঘরে
ফিরিবেন! তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আজ দরিদ্রকে
এই বস্ত্রখানি দিয়া আমার যে সুখ লাভ হইল, বস্ত্রখানি
বেচিয়া অর্থ লইয়া এমন সুখ ত পাইতাম না! আমার
যাহা অসুটে আছে, তাহাই হইবে। কবীর গৃহে ফিরিলেন,
আসিয়া শুনিলেন তাঁহার মাতা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া
তাঁহার অপেক্ষা বসিয়া আছেন। কবীর মাতাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, 'মা! আজ আমাদের সংসার চলি কিরূপে,
আমাদের ত আজ কিছু সংস্থান ছিল না।'

মাতা উত্তর করিলেন, 'সে কি কবীর! তুমিই যে
লোক দিয়া আমার কাছে অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছ।'

কবীর আশ্চর্য্য হইলেন, আবেগে গদগদভাবে মাতাকে কহিলেন, 'মাগো! তুমিই ধর্ম্ম! সাক্ষাৎ ভক্তবৎসল ভগবান আসিয়া তোমার অর্ঘ্য দিয়া গিরাঁছেন। মা! দীন দুঃখীকে ধন বিতরণ কর। ধনে আমাদের প্রয়োজন কি মা?'

তাহার মাতা দীন দরিদ্রকে ধন বিতরণ করিলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, কবীর বড় দাতা; যে বাস, সেই পায়, লাহাকেও বুঝা করিতে হয় না।

কবীরের বদান্যতা শুনিয়া একদিন চারিদিক হইতে বিশ্বর লোক আসিয়া তাহার বাটীতে অতিথি হইল। কবীর দেখিলেন, বড়ই বিরাট! তিনি দরিদ্র, নির্ধন, গৃহে অন্নের সংস্থান নাই, কিন্তু এত লোকের মনস্তৃষ্টি করিবেন। তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল, তিনি গৃহান্তরে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান কবীররূপ ধরিয়া অতিথিদিগকে ধনরত্নে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। কবীর গৃহে আসিয়া এই অপূর্ণ ঘটনা অবগত হইলেন। তখন কবীর আর কি স্থির থাকিতে পারেন? প্রাণ ভরিয়া কেবল ইষ্টদেবকে ডাকিতে লাগিলেন।

একদিন কবীর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এক অঞ্জলি জল লইয়া পূর্ব্বমুখে নিক্ষেপ করেন। রাজা তাহাকে পাগল ভাবিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তৎকালে কবীর নির্ভয়ে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্! হাসিবার কোন কারণ নাই। জগন্নাথপুরীতে একজন পুজক ব্রাহ্মণের পায়ে গরম ভাত পড়িয়া গিয়াছে, আমি তাহারই পায়ে শীতল জল অর্পণ করিলাম।'

কবীরের কথায় রাজার বড় কোতূহল জন্মিল, তিনি জগন্নাথপুরীতে চর পাঠাইলেন। চর ফিরিয়া আসিয়া কবীরের কথা সপ্রমাণ করিল। তখন রাজা স্থির করিলেন যে কবীর নিশ্চয়ই একজন সিদ্ধপুরুষ। কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কবীর রাজাকে আপন ক্ষুদ্রকূটরে পাইয়া অতিশয় আশ্চর্য্যিত হইলেন, ঘোড়হস্তে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার শুভাগমনে এ দাস কৃতার্থ হইল। কিন্তুকে আদেশ করুন, কি করিতে হইবে?' রাজা কবীরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'হে বৈষ্ণব! তুমি আমার দোষ গ্রহণ করও না, আমি না জানিয়া তোমাকে উপহাস করিয়াছি। বল, কি করিলে তুমি সুখী হও! ধন রত্ন বাহা চাহ, এখন দিতে প্রস্তুত আছি।'

কবীর সহাত্মমুখে উত্তর করিলেন 'রাজন্! ধনরত্নে প্রয়োজন কি? জীবন মরণ উভয়ই সমান। আমি মূর্থ!

এ হার জীবিকানির্ভারের জন্য সামান্য ধনের ইচ্ছা করি না। বাহারা দীন দরিদ্র, দুখাতুর, অর্থের জন্য লালারিত, আপনার ইচ্ছামত তাহাদিগকে ধন দান করুন, আপনার মহাপুণ্য হইবে।'

রাজা কষ্টচিন্তে নিজ প্রাণদে ফিরিলেন এবং সেইদিন হইতে রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিলেন, 'কবীর আমার অতি প্রিয়'।

কিছুদিন পরে কবীর তীর্থযাত্রার বহির্গত হইলেন। মথুরা দর্শন করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। তখন দিল্লীতে যবনরাজ সিকন্দর গোড়ী রাজত্ব করিতেছিলেন। ছটলোকে গিয়া যবনরাজকে জানাইল যে, কবীর নামে একজন দার্শনিক জোলা আসিয়া অনেককে বঞ্চনা করিতেছে। একরূপ লোককে রাজার শাস্তি দেওয়া উচিত।

সিকন্দর কবীরকে ধরিবার জন্য আদেশ করিলেন। যথাসময়ে রাজপুরুষেরা কবীরকে গিয়া ধরিল। কবীর তাহাদের মুখে শুনিলেন তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। যবন-রাজের সমীপে আনীত হইলে পারিষদবর্গ তাহাকে নমস্কার করিতে বলিল। কিন্তু কবীর তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'কাহাকে আবার প্রণাম করিব? এ সংসারে কে বধ্য নয়?'

তখন যবনরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যমুনার অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। রাজপুরুষেরা তৎকণাৎ কবীরকে যমুনার জলে ফেলিয়া দিল। কালিন্দীর কালজলে কবীরের দেহ অদৃশ্য হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সকলে দেখিতে পাইল, কবীর যমুনার পরপারে সহাত্মমুখে বেড়াইতেছেন। ছটলোকেই স্নেহ-রাজকে জানাইয়া বলিল যে কবীর ঐশ্বর্য্যালব্ধ, সামান্য ইন্দ্রজালবিদ্যা-প্রভাবে নিশ্চয়ই সে রক্ষা পাইয়াছে। এবার তাহাকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হউক।'

দিল্লীর ছটের কথায় ভুলিলেন, রাজপুরুষদিগকে ডাকাইয়া মহানলে কবীরকে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অলপ অনলে কবীরের একগাছি বেশমাত্র নষ্ট হইল না।

কবীরের এই অমোঘ ঘটনা দেখিয়াও দিল্লীর চৈতন্য হইল না, তিনি ক্রোধে উন্নত ও ক্রুদ্ধনের কথায় বশীভূত হইয়া হতৌপদন্তে কবীরের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু ভগবান বাহার প্রতি সদয়, নত হতী তাহার কি করিতে পারে? আজ মৃত্যু হতীও কবীরের সিংহরূপ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল।

স্বপ্নেরা কবীরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এবার সিন্ধুরেরও মন টলিল। তিনি কবীরকে আস্থান করিয়া সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, ‘সাধু! আমার দোষ কমা করিও। তুমি মহাজন, আজ আমি জানিতে পারিয়াছি।’

কবীর বধনরাশের নিকট বিদায় লইয়া কাশীবাসী আগমন করিলেন। এখানে তিনি সংসারের অনিচ্ছাতা বুঝিয়া আত্মজ্ঞানলাভে যত্নবান্ হইলেন।

এই কাশীতেও তাঁহার চারিদিকে বিপক্ষ ঘুরিত। একদিন কোন ছটলোক কবীরের নাম করিয়া কাশীবাসী সমস্ত সাধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। ঘটনাক্রমে সেইদিন কবীর স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কুটীরে কেবল কয়েকজন শিষ্য ছিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া কাশীর সহস্র সহস্র সাধু কবীরের বাসায় উপনীত হইলেন। সহস্রাধিক অতিথিকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া শিষ্যগণের প্রাণ শুকাইল। সকলেই ভাবিতেছিল, এতলোককে কিরূপে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিব। পরক্ষণেই ভক্তবৎসল ভগবান্ কবীরের রূপে ভক্ষ্য ভোজ্য লইয়া সর্বসমক্ষে দেখা দিলেন এবং স্বহস্তে সাধু-দিগকে ভোজন করাইয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। আজ সাধুগণ যে কি পরিতৃপ্ত হইল, তাহা প্রকাশ করা যায় না। কবীর গৃহে কিরিয়া আসিয়া মহাসমারোহ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়গণ হইলেন। একজন শিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বৎস! এ ব্যাপার কি? কি অজ্ঞ এত লোকের সমাগম হইয়াছে?’

শিষ্য আশ্চর্য হইয়া বলিল, ‘একি কথা বলিতেছেন? আপনি সহস্রাধিক লোক ভোজন করাইলেন, তাঁহারাই আসিয়া মহোৎসব করিতেছে।’

কবীর বুঝিতে পারিলেন, এ সকলি হরির লীলা! তিনি মনোভাব গোপন করিয়া শিষ্যকে কহিলেন, ‘বৎস! আমি ক্ষুধার অভিশয় কাতর হইরাছি, আমাকে সাধুগণের প্রসাদ আসিয়া দাও।’

যাহারা কবীরের নিরন্তর অনিষ্ট চেষ্টা করিত, ক্রমে সেই দ্রুতবেগের কবীরের মহত্বগুণে বশীভূত হইতে লাগিল। তাহার কবীরের নিকট নিজ নিজ দোষ স্বীকার করিয়া কতই কমা চাহিত। তখন সাধু কবীর সকলকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমানন্দে রাম নাম উচ্চারণ করিতেন।

কাশীবাসী মাঝেই কবীরের গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। এমন কি একদিন একজন স্নগবতী বেস্তা কবীরের নিকট আসিয়া বলিল ‘মহান্ন! আমি দ্রুতগীতাবি নানা-প্রকার উপভোগ দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করি।’

রূপসৌন্দর্য্যশালিনী দ্রুতগীতমিথুনা নর্তকীকে দেখিয়া কবীর সহান্তে কহিলেন, ‘আমি সুখভোগ জানি না; নাচ গান জানি না; আমি স্ত্রীও নই, পুরুষও নই; আমার কাছে তোমার মনকামনা কিরূপে পূর্ণ হইবে?’

নর্তকী অতি কাঙ্ক্ষতিমিনতিভাবে তাঁহাকে বলিল, ‘আমি বড় আশার আসিয়াছি। হতাশ হইয়া কি কিরিতে হইবে?’

কবীর বীরভাবে বলিলেন, ‘দেখ! আমার গৃহে স্বয়ং ভক্তবৎসল হরি বিরাজ করেন, তিনি অতিরাগী, মহাভোগী, তাঁহার কাছে দ্রুত গীত করিয়া তোমার ভোগশিপালা নিবারণ করিতে পার।’

নর্তকী মহা আনন্দিত হইল, তাহার কি সৌভাগ্য যে স্বয়ং ভগবান্কে দ্রুত গীত দ্বারা পরিতোষ করিবে। সেইদিন হইতে সেই বেস্তা কবীরের গৃহে থাকিয়া প্রত্যহ দ্রুত গীত করিত।

কিছুদিন গত হইল। বেস্তা মনে মনে কবীরকে ভাল-বাসিতে লাগিল। একদিন গভীর রজনী সকলেই নিদ্রিত; কিন্তু সেই বেস্তার চক্ষে ঘুম আসিল না, কবীরের সন্তোগ লালসায় তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই আত্মসংযম করিতে সমর্থ হইল না, যে ঘরে কবীর নিদ্রা বাইতেছিলেন, মনের আবেগে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গভীর অমারজনীতে তথায় কবীরের পরিবর্তে জ্যোতির্ময় হরিসূর্তি তাহার নয়নগোচর হইল।

তখন তাহার কামপিপাসা কোথায় অন্তর্হিত হইল! হৃদয়ে প্রেমাক্ষ বিগলিত হইতে লাগিল। আজ তাহার পক্ষে লংসার অসার বোধ হইল। বেস্তা সেই অমানিশার একাকী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করিল।

কবীর প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিলেন, বেস্তা ঘরে নাই; তাহার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকলই পড়িয়া আছে। তিনি ভাবিলেন এতদিনে বুঝি বেস্তার সন্ধ্যা হইল।

তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘আমার বাইবার সময় হইয়াছে। বৎসগণ! তোমরা কাশীবাসী সকলকে সংবাদ দাও। মণিকর্ণিকার বাটে যেন আমার সহিত সকলে সাক্ষাৎ করে।’

শিষ্যরা চারিদিকে শুক আজ্ঞা ঘোষণা করিল। দলে দলে লোক আসিয়া পুণ্যলঙ্গিলারভাটে সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই কবীরের কথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। কবীর বধন দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়জন সকলেই উপস্থিত

হইয়াছে; তিনি মিষ্টকথার সকলকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন,
'আজ আমি পরপারে গমন করিব। আমার ইচ্ছাধর্মের
লীলা ফুরাইয়াছে। তাই! আমি অন্ত্যজ স্নেহ বরে জন্মিয়া
কর্মদ্বন্দ্বৈক্য হইয়াছি। এই মিথ্যা অপমিত্র দেহ রাখিয়া
কল কি? বহুগণ! মগররাজ্যে আমার মোক্ষ হইবে।'

কবীরের কথা শুনিয়া সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল।
তিনি মধুর কথার বেহের অমিত্যক্তা হুতাইরা সর্গসাধারণকে
সামান্য করিলেন।

অনন্তর তিনি সকলকে সঙ্গে করিয়া মনিকর্ণিকার পর-
পারে আনিলেন। এইখানে আসিয়া তাঁহার নিজাকর্ষণ
হইল। তিনি ভূমিতে শয়ন করিলেন, শিষ্যেরা তাঁহার
শরীরে বজ্রাচ্ছাদন করিয়া দিল। তৎপরে প্রায় দুই ঘণ্টা
অন্তীত হইল, তিনি উঠিলেন না। তাহাতে সকলেরই
মন অস্থির হইয়া উঠিল। শিষ্যেরাও কেহ সাহস করিয়া
তাঁহার অঙ্গের আবরণ খানি তুলিতে পারিল না। দুই
ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া সাধারণের মনে বিজাতীয় ভাব উদয়
হইল, সকলেই বারবার কবীরকে জাগাইতে বলিল। তখন
অগত্যা শিষ্যগণ গুরুর আবরণবস্ত্র তুলিয়া ধরিল। কিন্তু
বস্ত্রের মধ্যে আর কবীরের দর্শন পাইল না। সকলে
দেখিল কেবল বস্ত্রখানি, শূন্য ধরাসন পড়িয়া আছে। এইরূপে
ভক্ত কবীর পরমপদ লাভ করিলেন।*

(ভক্তিমাহাত্ম্য ১৮০-১৮৫। ১ পৃঃ)

বস্তুতঃ কবীর যে একজন মহৎ লোক ছিলেন, তাহা কে
অস্বীকার করিবে? তিনি যে জাতিই হউন, তাঁহার নিকট
হিন্দুমুসলমান সকলেই সমান। তিনি অকুতোভয়ে শাস্ত্র
ও কোরাণের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিতেন
হিন্দুদিগের রাম এবং মুসলমানের করীম স্বতন্ত্র নয়, অমু-
সলমান কর হৃদয়ে দেখিতে পাইবে; এই বিশ্ব বাঁহার সংসার,
আলি ও রামের সন্তানেরা বাঁহার সন্তান, তিনিই আমার

* ভক্তিমাহাত্ম্যের যে পুঁথি পাইয়াছি, তাহাতে 'মগধ' পাঠ আছে,
কিন্তু 'মগধ' হওয়াই বুদ্ধিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া এই পাঠ গ্রহণ করিলাম।
এবাদ আছে, কবীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহ লইয়া হিন্দুমুসল-
মানে বিবাদ হইতেছিল, সেই সময়ে কবীর খসং উপস্থিত হইয়া 'আমার
শবদেহের আবরণ খানি তুলিয়া দেখ' এই কথা বলিয়া অতর্কিত করেন।
আবরণ তুলিয়া সকলে দেখিল, সেখানে শব নাই, কেবল কতকগুলি কুল
ছড়ান রহিয়াছে। কবীর রাজা বীরসিংহ সেই কুলের অর্থেই আনিয়া দাহ
করিলেন এবং সেই কুলের ছাই এখানকার কবীর-চৌর নামক স্থানে সমাহিত
করিলেন। পাঠানরাও বিজলিলা। অপর অর্ধ লইয়া পোরবন্দরের নিকট
কবীরের মৃত্যুস্থানি মগরনামক গ্রামে স্থাপন করিয়া তাঁহার উপর
মন্দির সমাধি তত্ত নির্মাণ করাইলেন।

উক্ত 'কবীরচৌর' ও 'মগরের সমাধিক্ষেত্র' কবীরপন্থীদের প্রধান
ঐর্ষ্যস্থান রহিয়া গণ্য।

পীর। তিনি জগৎ পূজারি স্বীকার করিতেন না। জগৎ
পূজারি পদক্ষেপ বলিতেন—

"মন্কা ফেরৎ জলম্ গরো গরো ন মন্কা কেহ।

কদ্দকা মন্কা ছোঁক কদ্ মন্কা মন্কা কেহ?"

জগৎমালায় ৩টি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কীবন গেল, কিন্তু
মদের ঘোর কাটিল না; তাই বলি হাতের ৩টি ছেড়ে
মনের ৩টি ঘুরাও।

তিনি জাতিভেদও স্বীকার করিতেন না, তাঁহার মচনে
পাওয়া যায়—

"সব্লে হিলিরে সব্লে হিলিরে সব্কা লিখিরে নীউ।

হাঁকী হাঁকী সব্লে কিলিরে বসে আপন গাঁউ।"

সকলের সঙ্গী হইবে, সকলের বহিত মিলিবে, সকলের
নাম গ্রহণ করিবে। হাঁকী হাঁকী সকলকেই বলিবে, কিন্তু
আপন জায়গায় থাকিবে।

তিনি সংসারকাণ্ড দেখিয়া হুংহুং করিয়া বলিতেন—

"বাম্‌হন টাম্‌ মুরখ্‌ ভরে হুজ পড়ে গীতা।

ঠগ্‌ ঠগ্‌ বন্‌ আছা খাবে হুংহুং পারে পণ্ডিতা ॥

সাকাকো মারে লাঠা কুটা জগৎ পিতায়।

গোরস গলি গলি করে মুরা বৈঠ বিকায় ॥

সতীকো না মেলে খোতি গন্তান্‌ পহুরে খাসা।

কহে কবীরা দেখে তাই ছনিয়াকা তামাসা ॥"

কবীরের জাতিকুল লইয়া যেমন গোল, কবীরপন্থীরা
তাঁহার সময় লইয়াও সেইরূপ গোল করিয়া থাকেন। তাঁহার
বলেন, ১২০৫ সন্থতে কবীর টক্সার-শাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং
১৫০৫ সন্থতে মগরনগরে তাঁহার মোক্ষ হয়। তাহা হইলে
কবীরের প্রায় ৩ শতবর্ষ পরমায়ু হইরা পড়ে, ইহা নিতান্ত
অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। বাহা হউক তিনি যে সিকন্দর
লোডার সমসাময়িক, তাহা আমরা ভক্তিমাহাত্ম্য ও কয়েক-
খানি মুসলমান ইতিহাসপাঠে জানিতে পারি। সিকন্দর
১৫৪৪ সন্থতে রাজ্য প্রাপ্ত হন; অতএব এই সময়ে যে কবীর
বিদ্যমান ছিলেন, তাহাই সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করা যায়।

শিখদিগের ধর্মগুরু নানকও কবীরের মত আপন ধর্মগ্রন্থে
উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, এতদতির সংসারী, সাধ, জিনারারপী
ও শূন্যবাদিগের পুস্তকেও কবীরের মচন পাওয়া যায়।

† "জাতি পাতি মুল কাপরা বেহ শোভা দিল রায়।

কহে কবীর শুনহো রামানন্দ বেউ রাহে স্বকমায়।

জাতি হদারী বানী কুল করুতা উর রাহি।

কুটন হমারে সত হারি কোই মুরখ সবকত রাহি ॥"

যেখা।

ইহাতে বোধ হইতেছে, উক্ত সম্প্রদায়প্রবর্তকগণও কবীরের মত লইয়া সেই সঙ্গে স্ব স্ব মত প্রচার করেন।
[অস্তিত্ব কথা কবীরপন্থী শব্দে দেখ।]

কবীরপন্থী। সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা মহাত্মা কবীর-প্রবর্তিত ধর্মমত অবলম্বন করিয়া চলেন। [কবীর দেখ।]

কবীরপন্থীরা সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি অধিক ভক্তি দেখান। রামানন্দী ও অপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের বেশ সদ্ভাব এবং আচার ব্যবহার অনেকটা তাহাদের মত, তাই অনেকে কবীরপন্থীদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে। ইহারা অপরূপ বৈষ্ণবের জায় ভিলকসেবা করেন, নাসিকার উপর চক্ষুনের অথবা গোণীচক্ষুনের রেখা অঙ্কিত করেন, কণ্ঠে তুলসীমালা, আবার হাতে তুলসীর অপমালা ও ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কবীরপন্থীরা জানেন, এ সকলই বৃথা আড়ম্বর মাত্র, বাস্তবিক ইহারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কোন দেবদেবীর উপাসনা অথবা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অমুঠানকে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না।

কবীরপন্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই দল, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। গৃহস্থেরা স্ব স্ব জাতিগত ও বর্ণগত আচার ব্যবহার অবলম্বন করেন; কেহ আবার নিজ ধর্ম ছাড়াইয়া হিন্দুজাতির উপাস্ত দেবদেবীরও পূজা করিয়া থাকেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা কেবল একমনে নয়নের অগোচর কবীরদেবেরই ভজনা করেন, তাঁহাদের গুরুর নিকট মন্ত্র লইতে হয় না। তাঁহারা কেবল বিভোল হইয়া প্রাণ ভরিয়া ধর্মগান করাকেই উপাসনা মনে করেন। ইহার যেনমন ইচ্ছা, তিনি তেমন। বেশভূষা করেন, কেহ আবার উলঙ্গপ্রায় হইয়াও পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। ইহাদের মহেশ্বরা মাথার টুপী পরেন। উক্ত দুইদল প্রধানতঃ ১২ শাখার বিভক্ত। এই ১২ শাখা প্রবর্তক-দিগের নাম—

১। স্রুতগোপাল দাস। সুখনিধানপ্রণেতা। ইহার শিষ্যগণ শিষ্যগুরুসম্মান্য ঋষিকার আখড়া, বারানসীর কবীর-চৌর, মগয়ের সমাধি এবং জগন্নাথের আখড়ার উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

২। ভগোদাস। বীজকরচরিতা। ইহার অমুগামী শিষ্যপ্রশিষ্যগণ ধনোতি নামক স্থানে বাস করেন।

৩। নারায়ণ দাস }
৪। চুরামণ দাস }
ধর্মদাস নামক বণিকের পুত্র। ইহার গৃহস্থ ছিলেন, তাই সকলে ‘বংশগুরু’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এখন চুরামণের বংশ সমাজভ্রষ্ট এবং নারায়ণের বংশ লোপ হইয়াছে।

৫। জীবনদাস। ইনি সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। [সৎনামী দেখ।]

৬। জগোদাস। কটকে ইহার গদি আছে।

৭। কমাল। প্রবাদ আছে ইনি কবীরের পুত্র; কিন্তু তৎপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। ইনি বোম্বাই-বাসী। ইহার মতাবলম্বীরা বোম্বাইবাসী।

৮। টাকশালী। ইনি বরদাবাসী।

৯। জ্ঞানী। সহস্রাব্দের নিকট মক্কা গ্রামে ইহার বাস ছিল।

১০। সাহেবদাস; কটকনিবাসী। মূলপন্থী নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। [মূলপন্থী দেখ।]

১১। নিত্যানন্দ

১২। কমলানন্দ

উভয়ে দাক্ষিণাত্যবাসী।

এ ছাড়া দান-কবীরী, মাজুল-কবীরী, হংস-কবীরী প্রভৃতি আরও কতকগুলি শাখা আছে।

ইহার পূর্বোক্ত স্থানসমূহের মধ্যে বারানসীর কবীরচৌর নামক স্থানকেই সর্বপ্রধান তীর্থস্থান বলিয়া মনে করেন।

কবীরপন্থীদিগের প্রকৃত ধর্মমত সহজে জানা যায় না, তবে যে হিন্দুধর্ম হইতেই এই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা কবীরপন্থী-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেকটা স্বীকার করা যায়। কবীরপন্থীরা একমাত্র কবীরের মত ব্যতীত অপরূপ সকল মত দৃষ্টিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে কবীরপ্রবর্তিত ধর্মছাড়া আর সকল ধর্মই ভ্রমপূর্ণ।

ইহাদের মতে, ঈশ্বর এক, তিনি সাকার ও সঙ্গুণ তাঁহার পাক্ভৌতিক শরীর ও জিহ্বা-বিশিষ্ট অস্ত্রকরণ আছে। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বদোষবিবর্জিত, স্বেচ্ছাহুসারে সর্বপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু আর আর সকল বিষয়ে মনুষ্যের সহিত পার্থক্য নাই। কবীর-পন্থীরা বলেন এই সম্প্রদায়ের সাধুরা ঈশ্বরের অনুরূপ, তাঁহারা পরলোকে তাঁহার সমান হইয়া তাঁহার সহিত একত্র পরমহুখে বাস করেন। ঈশ্বরের আদি নাই, অন্ত নাই; তিনি নিত্যস্বরূপ। যেমন গাছের ডালপালা প্রথমে বীজের অন্তর্গত থাকে, সেইরূপ সকল বস্তু ব্যক্ত হইবার পূর্বে অব্যক্তভাবে ঈশ্বর শরীরের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে।

কবীরপন্থীরা আরও বলেন—পরমপুরুষ পরমেশ্বর প্রায় ৭২ বৃণ পর্য্যন্ত একাকী থাকিয়া বিশ্ব-সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা অবশেষে এক জী বৃত্তি ধারণ করিল। ঐ জীর নাম মায়। এই মায়াই আদ্যা-শক্তি বা প্রকৃতি। পরমেশ্বর এই মায়ার সহিত সন্তোষ

করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হয়। তৎপরে পরমপুরুষ অন্তর্হিত হন। ক্রমে মায়া আপন পুত্রগণের নিকটবর্তিনী হইতে লাগিলেন। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তৎকালে মায়া কহিলেন, “আমি নিরাকার, নয়নের অগোচর এবং আদি মহাপুরুষের সহচরিনী। এখন তোমাদের সহচর্যায় আসিয়াছি।” তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সহসা তাঁহার কথা স্বীকার করিলেন না। বিশেষতঃ বিষ্ণু ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি মায়াকে কঠিন প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। তখন মায়া আপন পুত্রগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য হুর্গা মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন। সেই ভয়ঙ্করী হুর্গামূর্তি দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অত্যন্ত ভীত ও আত্মবিস্তৃত হইয়া মায়ার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার তিন কন্যা জন্মে, সরস্বতী লক্ষ্মী ও উমা। তিনি ব্রহ্মাদির সঙ্গে তিন কন্যার বিবাহ দিয়া জালামুখী প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন এবং ঐ ছয় জনের উপর বিশ্বসৃষ্টি, নানাবিধ ভ্রমাত্মক জ্ঞান ও অমূলক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচার করিবার ভারার্পণ করেন। ব্রহ্মাদি সকলেই মায়ার অধীন, সেই জন্য তাহাদের পূজাদি করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। কেবল কবীরের স্বরূপজ্ঞান লাভ করাই সর্ব্বধর্ম্মের মূল অভিপ্রায়, কিন্তু তথাপি ঐ সকল দেবতা ও উপাসকেরা কেহই সে দ্রুত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই।

সকল জীবের জীবাত্মা সমান, পাপমুক্ত হইলে আপন মনোমতরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। জীবাত্মা যতদিন না মুক্ত হন, ততদিন নানা যোনি পরিভ্রমণ করেন। যখন উদ্ধাপাত হয়, তখন তিনি কোন গ্রন্থরীরে প্রবেশ করেন। স্বর্গ ও নরক উভয়ই মায়ার কার্য্য, বাস্তবিক স্বর্গ ও নরক বলিয়া কিছু নাই। পৃথিবীর সুখই স্বর্গ, পৃথিবীর দুঃখই নরক।

কবীরপন্থীরা বলেন, সংসারভাগ্যই সংসারামর্শ, কারণ সংসারে থাকিলে আশা, ভয়, লোভ প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয় না, সুতরাং শান্তিলাভেরও নানা বিঘ্ন ঘটে। গুরুভক্তিই প্রধান ধর্ম্ম। শিষ্য দোষ করিলে গুরু তাঁহাকে ভৎসনা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি দণ্ড দিতে পারেন না।

[কবীর দেখ।]

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ও মধ্যভারতে অনেক কবীরপন্থী বাস করে, ইহাদের মতে কেহ বিষয়ী, কেহ বা ধর্ম্মব্রতাবলম্বী। ইহারা বড় সত্যপ্রিয়, উপজবশূন্য এবং নেহাত ভাল মানুষ। ইহাদের উদাসীনদের অগরাপার সম্মানীদের মত দ্রুত স্বভাব নহেন এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ান না।

কাশীধামে কবীরচৌর নামক স্থানে অনেক কবীর-পন্থী

আসিয়া বাস করে। পূর্বে কাশীরাজ বলবন্তসিংহ তথাকার কবীরপন্থীদের আহাতিদিগের অস্তিত্ব নিরূপিত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপুত্র চৈতন্যসিংহ কবীরপন্থীর সংখ্যা নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে কাশীর নিকট এক মেলা করেন, তাহাতে প্রায় ৩৫,০০০ কবীরপন্থী-সম্মানীদের সমাগম হইয়াছিল।

কবুলি (জী) জন্মের দেহের পঞ্চাৎ ভাগ।

কবুতর (হিন্দী) কপোত শব্দের অপভ্রংশ, পাখি। [কপোত দেখ।]

কবুল (আরব্য) স্বীকার।

কবে (দেশজ) ১ কোন্ দিনে। ২ কোন্ সময়ে। ৩ কখন।

কজ্জা (আরব্য কব্জ শব্দজ) যে যন্ত্রের দ্বারা চৌকাটের সহিত কপাটযুক্ত করিয়া রাখা হয়। লৌহ পিত্তল প্রভৃতি ধাতু দ্বারা ইহা নির্মিত হয়।

কজ্জি (আরব্য কব্জ শব্দজ) হাতের চোটোর মূলসন্ধি, যে সন্ধিহানে হাতের চোটো আরম্ভ হইয়াছে। মণিবন্ধ।

কবলদুর্গ। মহিম্বর-রাজ্যের মালবর্গী তালুকের অন্তর্গত। শিংশা ও অরুণভীর নদীর মধ্যবর্তী একটা কপোতাকার গিরি। অক্ষা ১২°৩০' উঃ, দ্রাঘি ৭৭°২২' পূঃ। পূর্বে এখানকার হিন্দু ও মুসলমান রাজারা দোষী ব্যক্তিকে এই গিরির উপর লইয়া বন্দী করিয়া রাখিতেন, এখানকার অসহ্যকার বাঘ-গুণে অপরাধীর শীঘ্রই জীবন নিঃশেষ হইত।

কডু (দেশজ) কখন, কোন সময়ে।

কমু (দেশজ) ১ অল্প। ২ তুল্য।

কম (অব্যয়) ১ জল। ২ মস্তক। ৩ হৃৎ। ৪ মঙ্গল। ৫ পাদপূরণার্থ নিরর্থক শব্দ।

কমক (ত্রি) কম-পিণ্ড-ভাবে অচ্-স্বার্থে অক্। ১ কামুক। ২ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিবেশব।

কমঠ (পুং) কম-অঠ (কমেতঠঃ)। উৎ ১। ১০২। ১ কচ্ছপ। [কচ্ছপ দেখ।] ২ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। ৩ বংশ। ৪ দৈত্যবেশব। ৫ শল্যকী। ৬ কাষোজরাজবেশব। (ভারত ২। ৪। ২২।) ৭ (ক্লী) ভাণ্ডবেশব, মুনিগণের জলপাত্র-বেশব।

কমঠী (জী) কমঠ-ভীষ্ম। ১ ছোট কাছিমজাতি। ২ কচ্ছপী। ৩ শল্যকী।

কমণ্ডলু (পুং, ক্লী) কচ্ছপজাত প্রাণপাতকী মণ্ডঃ সারঃ, তং লাতি গৃহ্মতি, ক-মণ্ড-লা-ডু (ডুপ্রকরণে মিতদ্ব্যদিত্য উপ-সংখ্যানম্। পা ৩। ২। ১৮০। বার্তিক) ১ সম্মানীদের মূর্তিকা, কাঠ বা লাউএর বস প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত পাত্রবেশব। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, কুণ্ডীপ, কয়ক। ২ (পুং) অশ্বখবৃক্ষ।

(কমণ্ডলু: ত্রাংকরকে নজী না প্রকপাদপে। মেদিনী।)

৩ (জী) গর্ভভাও বৃক্ষ, গাঁধিভাট।

কমণ্ডলুতরু (পুং) কমণ্ডলুতরাকারন্তরঃ, মধ্যলো। ১ অর্থ বৃক্ষ। ২ গর্ভভাও, গাঁধিভাট।

কমন (ত্রি) কম-গিঙ-ভাবে যুচ্। ১ কমনীয়। ২ কামুক। (পুং) ৩ কন্দর্প। ৪ অশোক বৃক্ষ। ৫ ব্রহ্ম।

কমনচ্ছদ (পুং) কমনঃ কমনীয়ঃ ছদঃ পক্ষে যন্ত, বহজী। কঙ্কপক্ষী। (কঙ্কন্ত কমনচ্ছদঃ। হেম ৪। ৩৯৯।)

কমনীয় (ত্রি) কামাতে যৎ, কম-কর্মণি অনীয়। ১ কামনার যোগ্য। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—চাক, হারি, কচির, মনোহর, বস্ত্র, কান্ত, অভিরাম, বজুর, বাস, রচ্য, সুসম, শোভন, মঞ্জু, মঞ্জুল, মনোরম, সাধু, রম্য, মনোজ্ঞ, পেশল, হৃদ্য, সুন্দর, কাম্য, ক্রম, সৌম্য, মধুর ও প্রিয়।

কমনীয়তা (জী) কমনীয়ন্ত ভাবঃ, কমনীয়-তল্-টাপ্ (তন্ত ভাবন্তলো। পা ৫। ১। ১১৯।) সৌন্দর্য্য, কান্তি।

কমন্ধ (ক্লী) ১ কম শিরঃ অন্ধঃ শূন্যং যন্ত। কবন্ধ। ২ কমঃ দীপ্তিং জীবনং বা দধতি ইতি বা কম-ধা-ড (পুণোদরাদি-ভাং)। জল।

কমর (ত্রি) কম-অর-টিং (অর্ন্তিকমিঅমিচমিদেবিবসিভ্য-শিৎ। উণ্ ৩। ১৩২। ঋ, কম, ভ্রম, চম, দেব ও নিজন্ত বস ধাতুর উত্তর অর প্রত্যয় ও টিৎ হয়।) কামুক। (কমরঃ কামুকঃ। উজ্জলদত্ত।)

কমরাণ। সুলতান বাবরের পুত্র, হুমায়ূনের ভ্রাতা। প্রথমে ইনি কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্তা ছিলেন; বাবরের অস্তিত্ব ইচ্ছা অনুসারে হুমায়ূন কমরাণকে আফগানিস্তান ও পঞ্জাবপ্রদেশের রাজ্যভার প্রদান করেন। যৎকালে হুমায়ূন শেরশাহের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন, কমরাণ শেরশাহকে পঞ্জাব ছাড়িয়া দিয়া কাবুলে চলিয়া আসেন। সেই অবধি হুমায়ূনের সহিত ইহার বিবাদের সূত্রপাত হইল। [হুমায়ূন দেখ।]

হুমায়ূন পারস্তরাজের সাহায্যে কমরাণকে পরাস্ত করেন।

কমরাণ কান্দাহার এবং পরে কাবুল হারাইয়া সিন্ধুপ্রদেশে পলায়ন করেন। ১৫৫১ খৃঃ অব্দে, সৈয়দসংগ্রহ করিয়া আপনার হস্তরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু এবারও তাড়িত হইলেন। এই সময়ে তিনি অসম্ভব আফগানদিগের আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষার্থ কাবুল ও পঞ্জাবের পার্শ্বপ্রদেশে ঘুরিতে লাগিলেন। ১৫৫২ খৃঃ, পার্শ্ববর্তী গধর জাতিরা হুমায়ূনের নিকট তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। হুমায়ূনের আদেশে কমরাণের দুই চক্ষু উৎপাটিত হইল। ১৫৫৬ খৃঃ,

তিনি হুমায়ূনের অহুমতি লইয়া মকায় যাত্রা করেন, ওখার মৃত্যু হয়। (কাহারও মতে পথেই মৃত্যু হইয়াছিল।)

কমরুদ্দীন খাঁ, (মীর মুহম্মদ ফাজিল)। ইনি উজীর বাংমাছকোলা মুহম্মদ আমীন খাঁর পুত্র। ইনি দিল্লীসম্রাট মুহম্মদশাহের সময়ে পিতৃপদ লাভ করেন এবং 'বাংমাছকোলা নবাব কমরুদ্দীন খাঁ বাহাদুর নসর জঙ্গ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি আকবর শাহ আবদালীর বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৭৪৮ খৃঃ, ১১ই মার্চ, সহিন্দার যুদ্ধের সময়ে ইনি আপনার শিবিরে নেমাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শত্রু-নিক্ষিপ্ত গোলা দ্বারা ইহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

কমল (ক্লী) কম-গিঙ-ভাবে বুবাদিভ্যাং কলচ্। কং জলঃ অলতি অলঙ্করোতি, কম-অল্-অচ্-বা। ১ পদ্ম। [উৎপল ও পদ্ম দেখ।] ২ জল। ৩ তাম্র। ৪ ক্লেম। ৫ ওষধ। ৬ সারসপক্ষী। ৭ (পুং) মৃগবিশেষ। ৮ পাটলবর্ণ। ৯ (ত্রি) পাটলবর্ণযুক্ত। (পুং) ১০ আকাশ। ১১ চাতকপক্ষীবিশেষ। ২ প্রবক অর্থাৎ তালবিশেষ।

(“উক্তো মলয়তালেন লঘুमध्ये ক্ষুরেদ্বৈকঃ।

সপ্তদশাক্ষৈরযুক্তঃ কমলোহয়ং ভয়ানকঃ।”

সঙ্গীতদামোদর।)

কমলক (ক্লী) কমল-স্বার্থে কন্। কমল।

কমলকীট (পুং) কমলবর্ণঃ কীটঃ। কীটবিশেষ।

কমলকীরক (পুং) কমলবর্ণঃ কীর ইব কায়তি। কমল-কীর-কৈ-ক। কীটবিশেষ।

কমলকোরক (পুং) কমলন্ত কোরকঃ, ভতৎ। পদ্মের কুঁড়ি, অফুটন্ত পদ্ম।

কমলকোষ (পুং) কমলন্ত কোষঃ, ভতৎ। কমলকোরক, পদ্মের কুঁড়ি।

কমলখণ্ড (ক্লী) কমল-খণ্ড (কমলাদিভ্যঃ খণ্ডঃ। পা ৪। ২। ৫১। বার্তিক।) পদ্মসমূহ।

কমলগর্ভাভ (ত্রি) কমলগর্ভন্ত আভাইব আভা যস্য, মধ্যলো। পদ্মের মধ্যস্থলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট।

কমলচ্ছদ (পুং) কমলঃ কমলবর্ণঃ ছদঃ পক্ষে যন্ত, বহজী। ১ কঙ্কপক্ষী। ২ (ভতৎ) পদ্মের পাপড়ি।

কমলজ (পুং) কমলাৎ বিকোর্নাতিকমলাৎ জায়তে, কমল-জন-ড। ব্রহ্ম।

কমলদেবী (জী) কাম্বররাজ। ললিতাদিত্যের জী এবং রাজা কুবলয়াপীড়ের মাতা। (রাজতরঙ্গিণী ৪। ৩৭২।)

কমলপত্রাক্ষ (ত্রি) কমলপত্রবৎ অক্ষির্ভক্ত। পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট।

কমলপুর। ১ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত ঝালাবারের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ডাউনগর-গৌদল রেলওয়ের লিমুর ষ্টেশন হইতে ১৭ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

২ ঝালাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা ২৫° ৪২' উঃ, ও দ্রাঘি ৮১° ২৫' পূঃ। গ্রামের কাছে কমল নামক একজন মুসলমান সাধুর এবং তাহার পুত্র ও শিষ্যাদির গোরস্থান আছে।

কমলভব (পুং) কমলাৎ ভবতীতি, কমল-ভূ-অণ্। ১ কমলজ, ব্রহ্মা। ২ একজন ভৈরবগ্রন্থকার; ইনি কণ্ঠাভাষায় শাস্তিনাথ পুরাণ রচনা করেন।

কমলভিদা (ত্রি) কমলানাং ভিদা পাটনং, ভতৎ। পদ্ম-প্রসুটিত হওয়া।

কমলযোনি (পুং) কমলং বিষ্ণুনাভিকমলং যোনিরূপতি-স্থানং যন্ত, বহত্ৰী। ১ ব্রহ্মা। ২ (ত্ৰী) (ভতৎ) পদ্মের উৎপত্তিস্থান।

কমলবতী (ত্ৰী) [কমলদেবী দেখ।]

কমলবীজ (ক্ৰী) পদ্মবীজ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—বাহু, কষায় ও তিক্তরস, শীতল, গুরু, বিষ্টভি, শুক্রবর্ধক, রুক্ষ, বলকারক, সংগ্রাহক, গর্ভসংস্থাপক, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, রক্ত ও দাহনাশক।

কমলবদন (ত্রি) কমলমিব বদনং যন্ত, বহত্ৰী। পদ্মের স্থায় যাহার মুখকান্তি।

কমলবর্দ্ধন (পুং) একজন কম্পনরাজ। তিনি কাশ্মীর-রাজের একজন প্রবল শত্রু ছিলেন। বালক শূরবর্মা কাশ্মীরের রাজা হইলে তিনি সুযোগ বুঝিয়া কাশ্মীররাজ্য আক্রমণ করেন। একাজ ও তত্ত্বীগণ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে; তাঁহার ভয়ে কাশ্মীররাজ সিংহাসনের আশা বিসর্জন দিয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করেন। কমলবর্দ্ধনের বড় আশা ছিল যে, তিনিই কাশ্মীরের রাজা হইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কোন মতে তাঁহাকে রাজা হইতে দিলেন না। তৎপরিবর্তে ব্রাহ্মণেরা যশস্করনামক একজন সামান্য লোককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কমলবর্দ্ধন ৮১৬ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

কমলবহু। এখানকার প্রাচীন লোকের মুখে 'কিরিজি কমলবোস', 'তমু মঘ', 'জাদ্‌রেল কালুঘোষ' প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম শুনা যায়। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে কি প্রকার লোক ছিলেন, তাঁহাদের নামের সহিত বিজাতীয় উপাধি সংযুক্ত হইবার কারণ কি? তাহা অনেকেই অবগত নন।

উপস্থিত প্রবন্ধে কেবল 'কিরিজি কমলবোসের' কথাই লিখিব। [তমু মঘ, কালুঘোষ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কমলবহুর আসল নাম রামকমল বহু। তাঁহার গুরু-জনেরা কেবল 'কমল' বলিয়াই ডাকিত, তাহা হইতেই তিনি সাধারণের নিকট 'কমলবোস' বলিয়া পরিচিত হন।

১৭৬৭ খৃঃ অঃ, রামকমল গোবরডাকার নিকটবর্তী গোইপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাণিকচন্দ্র বহু চন্দ্রনগরে ফরাসীদের অধীনে তহসীলদারী করিতেন। তৎকালে গোইপুরে করাল কালরূপী বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়, অধিবাসীরা প্রাণের ভয়ে স্থানান্তরে পলাইতে থাকে। এই সময়ে মাণিকচন্দ্র জী ও চারি পুত্রকে চন্দ্রনগরে লইয়া আসেন। সেই পর্যন্ত আর তিনি জন্মভূমে ফিরিলেন না। এখানে রামকমল গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় যৎসামান্য বাঙ্গালা ও পারসী ভাষা শিখা করেন।

রামকমল পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁহার পিতার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, কাজেই তাঁহাকে অল্পবয়সে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তিনি ২০ বর্ষ বয়স্ককালে পশুগীজদিগের সিপ-সরকারী কার্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে জাহাজের কাপ্তেনদিগের সঙ্গে সংশ্রব থাকায়, অল্প-দিন মধ্যে সামান্য চলিত পশুগীজ ভাষা শিখিয়াছিলেন। এই প্রথম কার্যে তিনি কিছুই উন্নতি করিতে পারেন নাই, বরং কর্তৃপক্ষদিগের নিকট কিছু টাকা দায়ী হন, সেই টাকার জন্য কিছুদিন তাহাকে কারাভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে গোপীমোহন ঠাকুরের যত্নে ও সাহায্যে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

রামকমল জেল হইতে আসিয়া নিজের টাকায় ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। এইবার তাঁহার ভাগ্য ফিরিল। এই সময়ে ডি' জুজা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বণিকেরা তাঁহার সহিত কারবার করিতে লাগিলেন।

পশুগীজবিশিদিগের সহিত কারবার করিয়া রামকমল বেশ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তিনি এক প্রকার ছিট কাপড় (চন্দ্রনগরে তাঁতি ঘারা বুনাইয়া) আমেরিকায় রপ্তানি করিতেন। ইহাতে তিনি বিলক্ষণ লাভ করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, প্রত্যেক জাহাজে তাঁহার ৫০,০০০ টাকা লাভ হইত। এইরূপে তিনি ১০ বার লাভ করিয়াছিলেন। পশুগীজদিগের (কিরিজি) সংশ্রবে থাকিয়া বড়লোক হইলেন, সেইজন্য তখনকার লোকেরা তাঁহাকে 'কিরিজি কমলবোস' বলিত। বাস্তবিক তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তৎকালে দোল-

দুর্গোৎসবাদি সকল পুজাই মহা সমারোহে সম্পন্ন করিতেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর তাঁহার বিলক্ষণ ভক্তি প্রদা ছিল। তখনকার টোলে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অনেক জমিজমার দান করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহার বাটী হইতে কখন অতিথি ফিরিত না; দীনদুঃখীকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

রামকমল অল্পদিন মধ্যেই মাঙ্গ গণ্য ও সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু অধিকদিন সেই উপার্জনের খন ভোগ করিতে পারিলেন না। ৪৩ বর্ষ বয়সে ৫টি পুত্র, কলিকাতা ও চন্দ্রনগরে ভূমিসম্পত্তি এবং কতক নগদ টাকা রাখিয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন।

মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, তাঁহার সেই ভবনেই সর্বপ্রথম ভেভিদ্‌ হোয়ার কর্তৃক হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়, এই বাড়ীতেই রামমোহন রায় প্রথমে আপনাদেবদেব প্রচার করেন। এই বাড়ীতে বসিয়া ডক সাহেব বাঙ্গালার চারিদিকে মিসনারি পাঠাইবার জন্ত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

বর্তমান আদিত্রাক্ষসমাজের নিকট দুই তিনটি বাড়ীর পর কমলবহুর সেই প্রসিদ্ধ বাড়ীখানি রহিয়াছে। তাঁহার বংশধরগণের নিকট হইতে মল্লিকেরা এই বাড়ী খরিদ করিয়াছেন। এখনও অনেক বৃদ্ধ তাহাকে ‘ফিরিঙ্গি কমল বোসের’ বাড়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কমলবহুর বংশধরেরা এখন চন্দ্রনগরে বাস করিতেছেন। এখন আর তাঁহার তেমন সম্পত্তিশালী নন; তাঁহার পুত্রগণের অপরিমিত ব্যয়দোষেই সেই বিপুল সম্পত্তি প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।

কমলমণ্ড (পুং) কমলানাম বণ্ড: সমূহঃ, ৩তং। পদ্মসমূহ, অনেক পদ্ম।

কমলসম্ভব (পুং) কমলাৎ সম্ভব উৎপত্তিযুক্ত, বহুব্রী। ব্রহ্ম। **কমলা (স্ত্রী)** কমল-টাপ্। ১ লক্ষ্মী। ২ সুন্দরী স্ত্রী। ৩ নুবিশেষ। [কমলানুব্ দেখ।] ৪ গজা।

(“কমলা কমলতিকা কালী কলুষবৈরিনী।” কাশী ২৯১৪৪।) ৫ নর্তকীবিশেষ। ৬ কাম্বীরহ পুরীবিশেষ। (রাজত ৪৪৮৩।) ৭ ছন্দোবিশেষ। দুইটি নগণ ও একটি সগণ অর্থাৎ ৮টি লঘুবর্ণের পর একটি গুরুবর্ণ যুক্ত যে ছন্দ: তাহার নাম ‘কমলা’।

“বিগুণ নগুণ সহিত: সগণ ইহ হি-বিহিতঃ।

কণিগতি মতি বিগলা ক্টিগিণ্ড ভবতি কমলা।”

(বৃহদ্রাক্ষর।)

৮ নামরূপে প্রবাহিত একটি নদী, এই নদীর তীর অধিক উর্বরা। [ভং ব্রহ্মণ্ড ১৬। ৫৪।]

২ উত্তর বেহারপ্রদেশে প্রবাহিত নদীবিশেষ। এই নদী নেপাল রাজ্যে হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ অংশকে বড়ী কমলা বলে। ইহাই ব্রহ্মণ্ডে তৈর-ভুক্তের অন্তর্গত পুণ্যসলিলা কমলা নদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার তীরে শিলানাথ গ্রাম, তথায় শিলানাথ নামে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। (ভং ব্রহ্মণ্ড ৪৯। ১৬৬) ১০ বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। (ঐ ৩৯ অঃ) **কমলাকর (পুং)** কমলানাম আকরঃ, উৎপত্তিস্থানম্ ৩তং। ১ যে সকল সরোবর তড়াগ প্রভৃতিতে অধিক পদ্ম জন্মে। ২ পদ্মসমূহ। ৩ কমলাকরভট্ট নির্মিত স্থতিগ্রন্থবিশেষ।

৪ গোদাবরী তিরোবর্তী দেবগিরি-নিবাসী নৃসিংহের পুত্র, ইনি সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক ও জাতকতিলক নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

কমলাকরভট্ট। বিখ্যাত স্থতিগ্রন্থকার। ইনি রামকৃষ্ণ-ভট্টের পুত্র, নারায়ণ ভট্টের পৌত্র এবং দিনকর ভট্টের সহোদর। এই মহাত্মা অনেকগুলি স্থতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ইহার সময়ে ইনি একজন প্রধান ঋষি ছিলেন।

কমলাকরের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিই প্রধান। ১ তত্ত্ব-কমলাকর, ২ পূর্ত্তকমলাকর, ৩ তীর্থকমলাকর, ৪ সংস্কার প্রয়োগ বা সংস্কারপদ্ধতি, ৫ কার্ত্তব্যার্থ্যজ্ঞান দীপদানপ্রয়োগ, ৬ শাস্তিরত্ন, ৭ শূদ্রধর্মতত্ত্ব, ৮ মহত্ব চণ্ড্যাদি বিধি, ৯ নির্ণয়-সিদ্ধ, ১০ বিবাদতত্ত্ব। ইহার গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ইনি ১৫৩৪ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। নবদ্বীপামিষপতি মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের সমকালে বঙ্গে যে সকল দিগ্গজ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ইনিও একজন। “ত্রিকান্ত কমলাকান্ত বলরামচন্দ্র শঙ্করঃ”, প্রভৃতি শ্লোকে ইহার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু অজ্ঞ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে, ত্রিকান্ত, কমলাকান্ত, বলরাম ও শঙ্কর এই চারিজন পণ্ডিত একত্র একপক্ষ হইয়া বিচারে বসিলে স্বয়ং সরস্বতীও নিজে অপরপক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়ী হইতে পারিতেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাকে স্বীয় সভায় রাখিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে কমলাকান্ত বিরক্ত হইয়া, রাজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় গ্রামে আসিয়া বাস করেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত “পূঁড়া” গ্রামে ইহার বাস ছিল। তৎকালে “পূঁড়া” পণ্ডিত-মণ্ডলীর বাসস্থান ছিল বলিয়া “ছোট নবদ্বীপ নামে বিখ্যাত

হইয়াছিল। আজিও এখানে কমলাকান্তের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। বর্তমান বংশধর কমলাকান্তের প্রপৌত্র।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। একজন এসিষ্ট সাক্ষ এবং বর্দ্ধমানের সভাপণ্ডিত। ইনি ১২১৬ সালে অধিকা কালনা হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া তৎকালীন বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত হন।

কমলাকান্ত একজন সাধিক, অভিমানশূন্য ও পরম দেবীভক্ত ছিলেন, তাঁহার ইষ্ট নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তেজশ্চন্দ্র তাঁহাকে আপন গুরুপদে বরণ করেন এবং তাঁহার বাসের জন্ত বর্দ্ধমানের নিকট কোটালহাট গ্রামে সুন্দর বসতবাটা নির্মাণ করাইয়া দেন। এই বাটীতে তিনি মহা সমারোহে শ্রীশ্রীশ্রামাপূজা সম্পন্ন করিতেন। উক্ত পূজার দিন তাঁহার শত্রু মিত্র সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ এবং তাঁহার ভক্তিগাথা শ্রবণ করিতেন।

যে রূপ পদাবলীতে রামপ্রসাদ দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া ছিলেন, যে পদাবলী এখনও সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দেয়; কমলাকান্ত সেইরূপ পদাবলী গান করিয়া এক সময়ে বর্দ্ধমানবাসীদিগকে মাতাইয়া গিয়াছেন। কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, যে কোন লোক হউক, যখন তাঁহাকে অনুরোধ করিত, তিনি যে কোন সুর ও তালে একটি শ্রামাবিষয়ক পদ রচনা করিয়া নিজে গাহিয়া তাহাকে পরিতুষ্ট করিতেন।

তিনি নির্ভীক ও সরলচিত্ত ছিলেন। শুনা যায়, একদিন রাত্রিকালে 'ওড়গায়ের ডাঙ্গা' নামক মাঠ দিয়া যাইতে-ছিলেন, হঠাৎ কতকগুলি দম্ভা ভীমরবে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি দেখিলেন, এইবার বৃষ্টি তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তখন নির্ভয়ে পরমানন্দে রামপ্রসাদী সুরে এই বলিয়া শ্রামা মাকে ডাকিলেন,—

“আর কিছু নাই শ্রামা তোমার, কেবল ছুটি চরণ রাক্ষ।

তুনি তাও নিরাচ্ছেন ত্রিপুরারি, অতেব হ'লেম সাহস ভাঙ্গা ॥

জাতি বন্ধু হুত দারা, সূতের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই, ঘর বাড়ী ওড়গায়ের ডাঙ্গা।

নিজ গুণে ঘনি রাখ, করুণা-নয়নে দ্যাখো,

নইলে জপ করি যে তোমায় পাওরা, সে সব কথা ভুতের সাঙ্গা।

কমলাকান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা,

আমার অপের মালা সুলি কাঁথা, অপের ঘরে রইল ঠাঙ্গা ॥”

দম্ভাগণ মোহিত হইল। তাহারা বৈরভাব বিসর্জন দিয়া কমলাকান্তের পদানত হইয়া কক্ষা প্রার্থনা করিল। কমলাকান্ত তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বর্দ্ধমানে কিরিয়া আসিলেন।

তিনি বিবেকস্রোতে ভাসিতেন, সংসারের কিছুমাত্র মমতা করিতেন না। শুনা যায়, যখন তাঁহার স্ত্রীকে দাহ করিবার জন্ত চিতা প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন কমলাকান্ত মৃত্যু করিতে করিতে গাহিলেন—

“কালি! সব ঘুচালি দেটা।

শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখি কিনা রাখি সেটা ॥

তোমার কৃপায় হয় তার সৃষ্টি ছাড়া নপের ছটা।

তার কটিতে কৌপিনি বেড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা ॥

আশান পেলে সূত্রে ভাস তুচ্ছ বাস মণি কেটা।

আপনি যেমন ঠাকুর তেমন ঘুল না তার সিন্ধি খোটা ॥

হুংখে রাখ সূত্রে রাখ করবো কি আর দিয়ে খোটা।

আমি দাগ দিয়ে প'রেছি আর পু'ছতে কি পারি সাধের কোটা ॥

জগত জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।

এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার ইহার মর্ঘ জান্বে কেটা ॥”

কুমার প্রতাপচাঁদও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

শুনা যায়, তাঁহার মৃত্যুকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র স্বয়ং তাঁহার ভবনে উপস্থিত হন এবং গুরুদেবকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্ত অনেক অমূল্য বিনয় করেন। তাহাতে কমলাকান্ত একটা পদাবলী গাহিয়া তাঁহাকে উত্তর দিলেন—

“কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।

আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি শরণ লব ॥”

অনন্তর কমলাকান্ত ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন।

প্রবাদ এইরূপ, সাধকের তৃণশয্যা ভেদ করিয়া ভোগবতীর স্রোতোবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল।

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। আজকাল ইংরেজেরা প্রাচ্য-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া খোদিত লিপি, প্রাচীন হস্তাক্ষর প্রভৃতি পাঠ করিয়া যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার মূল এই পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসিয়াটিক সোসাইটীর পণ্ডিত ছিলেন। বংকালে পণ্ডিত কমলাকান্ত এই সমাজের পণ্ডিত ছিলেন, তখন প্রধান পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রাচীন শিলা-লিপি, তাম্রফলক, হস্তাক্ষর প্রভৃতির মর্ধ্যোদ্ধার করাই পণ্ডিত কমলাকান্তের কার্য্য ছিল।

দিল্লী ও আলাহাবাদে দুইটি লৌহস্তম্ভে প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষায় কোন বিষয় অঙ্কিত ছিল। ইহার অমূল্য লিপি পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সার উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক ও হোরেন্স হেমেন উইলসন প্রভৃতি সংস্কৃতবিৎ সাহেবেরা ইহার অর্থ করিতে বা কোন্ জাতীয় অক্ষরে

অঙ্কিত, তাহার বিন্দু বিসর্গও স্থির করিতে পারেন নাই। শেষে কমলাকান্ত এই লিপির মর্শ্বোদ্ধার করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। কমলাকান্ত প্রথমতঃ লিপিগুলির অক্ষর নির্ণয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে ইহার সহিত ষাটলি, সাঁচি ও গিরিনর প্রভৃতি স্থানের খোদিত লিপির সমতা দেখিয়া বঙ্গাক্ষর ও দেবনাগরাক্ষরের সহিত মিলাইয়া একে একে অক্ষরগুলি স্থির করিতে লাগিলেন। সর্বাঙ্গের "দ" ও "ন" স্থির হয়। "দ" ও "ন" স্থির হইবার পর কার্য্য অনেকটা সহজ হইয়া গেল, তৎপরে া ি ইত্যাদি স্থির করিয়া ফেলিলেন। ক্রমশঃ অজ্ঞাত বর্ণ ও পরে শব্দ স্থির করিয়া লইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে লিপি দুইখানি প্রাচীন পালিভাষায় খোদিত। বর্তমানকালে এই প্রাচীন পালিবর্ণমালা উদ্ধাবনের মূল এই বন্দী পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।

ইহার পর কমলাকান্ত উক্ত দুইখানি লিপির অর্থোদ্ধার ও টীকা করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সেই অর্থ ও টীকা সাধারণে প্রচারিত হইলে, বিজ্ঞানসমাজে মহাশঙ্কল পড়িয়া গেল। ভারতেতিহাসের তমসাক্ষর অধ্যায়গুলির একটি নূতনালোক প্রভাসিত হইল, কিন্তু যাহার দ্বারা এত কাণ্ড ঘটিল, তিনি তাহার ফল পাইলেন না। ফল পাইলেন, সম্পাদক প্রিন্সেপ সাহেব। আমেরিকা ও যুরোপ হইতে বিদ্যাতুরাগীরা প্রিন্সেপ সাহেবকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রিন্সেপ সাহেব নিতান্ত অকৃতজ্ঞ লোক ছিলেন না, তিনি তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে কমলাকান্তকেই ইহার মর্শ্বোদ্ধেদক ও টীকাকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

যেরদীতে প্রাপ্ত একখানি কুটিল লিপির সমালোচনা কালে কমলাকান্ত যুক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, এরূপ স্থলর ভাব ও ভাষা তিনি অল্প কোন লিপিতে এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। এই লিপিখানির বর্ণমালা হইতেই যে বঙ্গলিপির বর্ণমালায় উৎপত্তি হইয়াছে বা সাদৃশ্য আছে, এ কথা কমলাকান্তই প্রথমে প্রকাশ করিয়া যান।

কমলাকান্ত আর একটি বিশেষ কার্য্য করিয়া পুরাতত্ত্ব আলোচনার সমধিক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। পূর্বেক দিল্লী ও আলাহাবাদলিপিতে অক্ষরের দ্বারা সংখ্যা-বাচক প্রতীপাদিত ছিল। কোন্ অক্ষর কোন্ সংখ্যার বোধক, তাহা নানা সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিয়া নির্ণয় করিয়া যান। এ স্থলে তাহার দুই একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

“স্বনয়ুগাক্তিচতুরকো বিসর্গশ্চ।”

৪ (চারি)—এই অক্ষটী জীলোকের স্বনয়ুগাক্তি এবং

বিসর্গের ছায়। কান্তজ ব্যাকরণে তিনি এই স্থল পাইয়া স্থির করেন যে, বিসর্গ (ঃ) বর্ণটি (৪) চারি এই লক্ষ্যবোধক বর্ণ। এইরূপে পিজলকৃত প্রাকৃত ব্যাকরণের স্থল ৬ (ছয়) সংখ্যাবোধক বর্ণ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

ইহার পরে ও পূর্বে প্রিন্সেপ সাহেব এইরূপে কমল পণ্ডিতের সাহায্যে নানাবিধে বিশেষ কৃতকার্য হইয়া-ছিলেন। প্রিন্সেপ নিজে বিশেষরূপে সংস্কৃত ভাষার অভিজ্ঞ ছিলেন না; পণ্ডিত কমলাকান্তই তাঁহার চক্ষু হইলেন। কমলাকান্ত যশোলিপ্সু ছিলেন না, তাহা বিশেষ বুঝা যায়। কারণ, যদি তাঁহার বিন্দুমাত্র যশোলিপ্সা থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটা যদি তাঁহার নিজ নামে প্রচার করিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ছায় তাঁহার নাম পৃথিবীর সকল স্থানে বিবোধিত হইত।

হৃৎথের বিষয়, এই পণ্ডিতবরের চরিত্রবিষয়ে বা কোথায় তাঁহার জন্ম স্থান, কোথায় তিনি থাকিতেন, কে তাঁহার পিতা মাতা ছিল, তাহার কণামাত্রও সন্ধান পাওয়া গেল না। কমলাকান্ত (জি) কমলমিব অক্ষি যত্ন, বহুব্রী। পদ্মের ছায় স্তম্ভর চক্ষুবিশিষ্ট।

কমলাদেবী। ১ কাদম্বরাজ শিবচিহ্নবীরপ্রমাদিদেবের পাটরাণী। দাক্ষিণাত্যের শিলালিপি পাঠে জানা যায়— তাঁহার পতি গোপকপুরীতে (বর্তমান গোয়ানগরে) রাজত্ব করিতেন। তিনি পতির প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। দেব-দ্বিজকে বড় তত্ত্বি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার দানশীলতা ও পরোপকারিতা শুণে তিনি শ্রেষ্ঠ রমণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাহ্মণদিগকে অনেক-গুলি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহারই অমুরোধে ৪২৭৫ কল্যাক্ষে (১১৭৪ খৃঃ) কাদম্বরাজ ব্রাহ্মণগণকে দেগধে গ্রাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কমলাদেবী উমার পূজা করিতেন।

ইতিহাসে আর এক কমলাদেবীর নাম পাওয়া যায়; নিয়ে তাঁহার বিবরণ লিখিত হইল—

২ ইনি গুজরাটরাজ করণ রায়ের পরমাস্ত্রমুরী পত্নী, যখন খিলজীবংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীন (১২৯৭ খৃষ্টাব্দে) গুজরাট জয় করেন, তখন বন্দীগণের সহিত কমলাদেবীও দিল্লীতে নীত হন। কিছুদিন পরে আলাউদ্দীনের কৌশলে ও প্রেরোচনায় কমলাদেবী সম্রাটের সহিত বিবাহিত হন। ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে এই কমলাদেবীর গর্ভজাতা গুজরাটের রাজকন্যা দেবলদেবীও দিল্লীতে বন্দিনী হইয়া আসেন। আলাউদ্দীনের পুত্র শাহজাদা বিজির ঐ দেবলদেবীর রূপে

বুড় হইয়া পড়েন। অবশেষে ইহাদের উভয়েরও বিবাহ হইয়া যায়। মোবারিক সা সন্ডাই হইয়া খীর ভ্রাতাকে গোয়ালিরের নিকট বন্দী করিয়া নিহত করেন এবং ভ্রাতৃবধূ দেবলদেবীকে নিজ পত্নীষে বরণ করেন। খিজির খীর সহিত দেবলদেবীর প্রণয়কথা লইয়া তদানীন্তন রাজ-কবি আমীর খশরু “ইসকিয়া” নামে একখানি সুন্দর পারসী কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা এই কমলা দেবীকে “কওলা দেবী” নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

কমলানেবু (দেশজ) বনামধ্যাত ফল। ইহার গাছকে সংস্কৃত ভাষায় কমলা, নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, স্বগঙ্গ, তক্ষুগঙ্গ, সুরঙ্গ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র, সুখপ্রিয় কহে। (ভাবপ্র; রাজনিং)

বঙ্গের কোন কোন স্থানে নারঙ্গী, নারেঙ্গা, কমলা, মোগলাই, কাকি, খাটজামির; হিন্দীতে অমৃতফল, কমলানেবু, সুহর, নারিকী, সজতর, নারেঙ্গ; নেপালী ‘সুস্তল’, শুজরাটা ‘নারঙ্গী’, পঞ্জাবী ‘সস্তর’, ‘নারঙ্গি’, ‘নারঙ্গ’; বোম্বাই ‘নারঙ্গী শজ’, ‘নারিঙ্গশাল’; মহারাষ্ট্রী ‘সকু লিখু’ ‘নারিঙ্গশাল’, ‘নারিঙ্গ’; তৈলঙ্গী ‘গঞ্জনিম্ব’, ‘কিতলি’, ‘কিচিলিপনু’, ‘নারিঙ্গপনু’; তামিল ‘কিচিলি’, ‘কেচু’, ‘কল্লুজী পন্নম’; কর্ণাটে ‘কিতলে পন্নু’, ‘কিত্তবৈগ্নে’; মলয় ‘মাহুর-নারঙ্গা’ ‘কোলাজি নরকম’; মহিসুরে ‘ফেরক’, ‘সিমও-মনিম’; সিংহলী ‘নারঙ্গকা’; ‘দোদন’; আরবী ‘নারঙ্গ’; পারসী ‘নারঙ্গ’, রুয ‘নারঙ্গস’; স্পেনীয় ‘নারঙ্গ’, পর্তুগীজ ‘লরঞ্জিরা’ (Laranjeira de fructo dulce); জার্মণ ‘ওরঙ্গেন বোম’ (Orangen baum) ইতালী ‘অরন্সিও’ (arancio) লাতিন ‘অরঙ্গিয়া’ (arangia) এবং বর্তমান লাতিন বৈজ্ঞানিক নাম Citrus aurantium.

ইংরাজীতে ‘অরেঙ্গ’ বলে। এই শব্দও আরবী ‘নারঙ্গ’ শব্দের অপভ্রংশ। আরবী ‘নারঙ্গ’ সংস্কৃত ‘নারঙ্গ’ শব্দেরই রূপান্তর মাত্র।

সংস্কৃত নারঙ্গকে এদেশে ‘কমলানেবু’ বলে কেন? তাহা লইয়াও গোলযোগ। কেহ বলেন, আসামে কমলানামে এক নদী আছে, তাহার নিকট এই নেবু বিস্তর জন্মে বলিয়া ইহার নাম কমলানেবু হয়। আবার কেহ বলেন, ত্রিপুরার রাজধানী কুশিলা হইতে এই নেবু পূর্বে আনীত হইত, সেইজন্ত কুমিলানেবুর স্থানে কমলানেবু নাম হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই দুইটি কথাই ঠিক নয়। কারণ পূর্বে হইতে তৈলঙ্গদেশে এই নেবুকে “কমলা-

পনু” বলিত। কমলা নামটিও অন্ততঃ ২।৩ শতবর্ষের প্রাচীন হইবে। ককানন্দ তত্ত্বদ্বারে ‘কমলা’ নেবুও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

“রজাকলং তিষ্ঠিতীকং কমলাং নাগরঙ্গকম্।

ফলাভ্যন্তানি ভোজ্যানি এভোহিভ্যানি বিবর্জয়েৎ ॥”

এদেশে নারেঙ্গা বলিলে ‘কমলানেবু’র স্থায় আকার-বিশিষ্ট আর একপ্রকার অন্নরস প্রধান নেবুকে বুঝাইয়া থাকে। এইজন্তই বোধ হয় অনেকে বলিয়া থাকেন, “প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রে কমলানেবুর কোন উল্লেখ নাই। পূর্বে এদেশে ‘কমলানেবু’ ছিল না। বৈদ্যক শাস্ত্রে ‘নারঙ্গ’ শব্দের উল্লেখ থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে কমলানেবু স্থায় আকার বিশিষ্ট নারঙ্গনেবুই এদেশে ছিল।”

উদ্ভিদতত্ত্ব ডি কণ্ডোল লিখিয়াছেন, “ছইহাজার বর্ষ পূর্বে ভারতবর্ষে কমলানেবু ছিল না, তাহা হইলে সংস্কৃত শাস্ত্রে অবশ্যই ইহার উল্লেখ থাকিত এবং তাহা হইলে প্রাচীন গ্রীকজাতিও এই উপাদের ফলের অবশ্যই বর্ণনা করিত। কমলানেবু চীন হইতে ভারতে আনীত হইয়াছে।”

আবার ডাক্তার বোনেভিয়া বলেন, ‘কমলানেবু ভারত-বর্ষেই জন্মাইত। ইহার প্রাচীন সংস্কৃত নাম সুস্তর।’

যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় উক্ত উভয় মতই যুক্তিসঙ্গত নয়।

কমলানেবু বহুদিন হইতে হিমালয় প্রদেশের স্থানে স্থানে, নেপাল, সিকিম, ত্রিহট্টের উত্তরে খালিয়া গিরির দক্ষিণ প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, নাগপুরে এবং দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে জন্মাইতেছে। এতদ্বারা বোধ হইতেছে কমলা-নেবু ভারতবর্ষের ফল, চীন অথবা অপর কোন দেশ হইতে এখানে আনীত হয় নাই। ইহার প্রাচীন নাম ‘সুস্তর’ নয়, কারণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ নাই। ভাব-প্রকাশ পাঠে জানা যায় কমলানেবুর প্রাচীন সংস্কৃত নাম নারঙ্গ।

কমলানেবু প্রধানতঃ চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়,—১ সুস্তর বা মোগলাই কমলা; ২ কেওন্লা বা নারিকী; ৩ লাল কমলা ও ৪ মান্দারিণ।

১। মোগলাই কমলার ছাল অতি পরিষ্কার, দেখিতে নীতাত কমলারঙের মত, খক্ব বড় আলুগা। নাগপুর দিল্লী, আলবার, গুর্গাঁও, লাহোর, মুলতান, পুণা, মাদ্রাজ, কুর্গ, ত্রিহট্ট, ভোটান, নেপাল এবং সিংহলে এই জাতীয় কমলার আবাদ হয়। অগ্রহারণ বা পৌষমাসে ইহার ফল পরিপক হয়।

২। কেওন্লা (কমলা)—কোন স্থানে নারিকী নামে প্রসিদ্ধ। এই জাতীয় কমলা মোগলাই কমলা অপেক্ষা

অধিক পরিমাণে জন্মে। আবাদ করিলে ভারতের সর্বত্র এই কমলা জন্মিতে পারে। এই কমলা পৌষ মাঘমাসে কলিকাতার বাজারে বিক্রীত হয়।

৩। লাল কমলাকে উদ্ভিদবেত্তারা মাল্টা নেবু (Malta Orange) বলে। এখন হিমালয় ও ছারজিলিঙ্গে যে সবুজ রঙ্গের বুনো কমলা জন্মাইতেছে, তাহা এই জাতীয় কমলার অবনতি মাত্র। ব্রহ্মদেশে ঠিক এই জাতীয় এক প্রকার কমলা দেখিতে পাওয়া যায়। পুণার বাজারে ‘মুসেবি’ নামে একজাতীয় ছোট লালকমলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আবিষ্কার হইতে এ দেশে আনীত হয়।

শুভ্রাণবালায় এক প্রকার কমলা জন্মে, তাহা খাইতে অতি সুস্বাদু। এই নেবু ইংরাজের অতি প্রিয়, তাহারাই ইহাকেই সর্কোংকুষ্ট কমলানেবু মনে করিয়া সমাদর করেন।

৪। মান্দারিণ—দেখিতে ক্ষুদ্রাকার, বর্ণ প্রায় লাল কমলার মত। খাইতে সুস্বাদু, সকল প্রকার কমলা অপেক্ষা ইহার পাতীয় ও ফলে সদৃশ অধিক। ইহা চীন হইতে খাসিয়া গিরি পর্যন্ত পার্শ্বীয় ভূখণ্ডে উৎপন্ন হয়।

একস্তম্ভ পৃথিবীর নানাদেশে জলবায়ু ও অবস্থাতেই নানা আকারের কমলানেবু দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে যুরোপেও কমলা জন্মাইত না। প্রথমে পর্তুগীজেরাই ভারতবর্ষ হইতে যুরোপে লইয়া যায়।

গুণ—পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভাবমিশ্রের মতে কমলানেবুর সংস্কৃত নাম নারঙ্গ। তিনি লিখিয়াছেন—

“নারঙ্গে মধুরাস্ত্রঃ শ্রাদ্ধীপনঃ বাতনাশনম্।

অপরশ্বসমভাষ্যঃ হৃক্ষরঃ বাতহঃ সরম্।”

ভাবপ্রকাশ পূর্বকথ্য ১ম ভাগ।

নারঙ্গের (এখন কমলানেবু) গুণ মধুরাস্ত্র, অগ্নিপ্রদীপক ও বাতনাশক। অপর এক প্রকার নারঙ্গ আছে (যাহাকে আমরা নারঙ্গানেবু বলি) তাহা অত্যন্ত অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য, দৃশ্যাকা, বায়ুনাশক ও সারক।

রাজনির্ঘণ্টের মতে—ইহা মধুর অন্ন, শুষ্ক, রোচন, এবং বাত, আম, ক্রমি, শূল ও শ্রমনাশক; বল্য এবং রুচ্য।

হাকিমীমতে কমলানেবুর খোসা ও ফুল উষ্ণ ও শুষ্ক; ইহার শীষ শীতল; ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশি বা জরভাব হইলে এই ফল খাইতে দেওয়া যায়। ইহার রস পিত্তনাশক এবং পিত্তাতিসারনিবারক। ক্রমি অথবা বমন নিবারণের জন্য ইহার বড়ি ব্যবহার করা যায়। কমলানেবু মিশ্রিত জলও অতিশয় বলকর। ইহার খোসা ও ফুল হইতে তৈল হয়, তাহা মালিসের ঔষধরূপে ব্যবহার করা যায়।

ডাক্তার ঐঙ্গলি বলেন, “হিন্দু চিকিৎসকদিগের মতে ইহা রক্তশোধক, জরে পিপাসানিবারক, পীনসরোগহর এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক। গ্রীষ্মের সময় ভাল পাকা কমলানেবুর সরবত ইংরাজদিগের পক্ষে বড় উপাদেয়। ইহার খোসা বাতনাশক, অজীর্ণরোগের পক্ষে হিতকর।”

ভারতবর্ষীয় ফার্মাকোপিয়ার মতে, ইহা বলকর ও অগ্নিবর্দ্ধক। অজীর্ণরোগে অথবা সাধারণ হৃক্ষলতার পক্ষে ইহা বড় উপকারী। ইহার পাতা চোয়াইয়া যে জল পাওয়া যায়, তাহার আধছটাক স্বায়বীয় এবং মূচ্ছারোগে প্রয়োগ করিলে আক্ষেপ নিবারণ করে।”

এদেশে মুখে ত্রণ হইলে কেহ কেহ কমলানেবুর শুষ্ক খোসা ঘষিয়া লাগায়, আর ঐ খোসা জল দিয়া বাটিয়া চর্মরোগে ব্যবহার করিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্রই কমলানেবু সুস্বাদু ফল বলিয়া সমাদৃত হয়। ইহার গাছ বহুদিন পর্যন্ত জীবিত থাকে। শুনা যায় এক একটি গাছ ৫। ৬ শতবর্ষ হইল এখনও জীবিত আছে। ঐ গাছ এক একটি ৫০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হয় এবং শুঁড়ি ১২ ফিট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। একটি গাছে ৫০০ হইতে ৬০০০ ফল হয়।

কমলানেবুর পাতা জল দিয়া চোয়াইয়া লইলে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। তাহার গন্ধ অতি তীব্র অথচ তৃপ্তিকর। তাহাকে ইংরাজেরা ‘নিরোলি অয়েল’ বলিয়া থাকেন। এই তৈলে আতর প্রস্তুত হয়। বিলাতে লেবোটার, সাবান প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে ঐ তৈল মিশ্রিত করে।

ইহার ফুল হইতে যে তৈলবৎ নির্ঘাস নির্গত হয়, তাহার আতর অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক কমলানেবুর তৈল পরীক্ষা করিয়া ইহা হইতে কর্পূর বাহির করিয়াছেন, তাহার নাম ‘নিরোলি ক্যাম্ফার’।

কমলাপতি (পুং) কমলায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ। বিষ্ণু।

কমলালয় (স্ত্রী) তাজোরের অন্তর্গত জিবলুর নগরস্থ একটি পবিত্র তীর্থ। এখানে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে।

কমলালয়া (স্ত্রী) কমলং আলয়া যত্নাঃ। লক্ষ্মী।

কমলাসুখ (পুং) কমলায়াঃ সুখা-টচ্ (রাজাহঃসখিত্যট্। পা ৫।৪।৮১।) বিষ্ণু।

কমলাসন (পুং) কমলং আসনং যত্ন, বহুব্রী। ১ ব্রহ্মা।

(“জ্ঞানানি পূর্বা কমলাসনেন।” কুমার।)

২ (স্ত্রী) কমলায়া লক্ষ্ম্যা আসনং ক্ষেপণং দানমিত্যর্থঃ।

লক্ষ্মীর দান। ৩ আসনবিশেষ, পদ্মাসন।

কমলাসনস্ (পুং) কমল: বিকোনাতিকমলঃ শুক্রপে
আসনে তিষ্ঠতি, কমল-আসন-স্থ-ক। ব্রহ্ম।

কমলাহট্ট (পুং) রাণী কমলাখিতী স্থাপিত কাম্বীরস্থ হাট।
(রাজতরঙ্গিণী ৪।২০৮।)

কমলিনী (স্ত্রী) কমলানি সন্তি অত্র, কমল-ইনি (পুং-
দিত্যে দেশে। পা ৫।২।১৩৫।) ১ পদ্মিনী, পদ্মের গাছ
বা শুভ্র। ২ পদ্মাকর, যে সকল সরোবরে অধিক পদ্ম
জন্মে। ৩ গঙ্গা।

(“কুম্বতী কমলিনী কাশ্মি: কলিতদায়িনী।” কাশী ২৯৩০।)
কমলেক্ষণ (ত্রি) কমলমিব ঈক্ষণঃ যন্ত, বহত্বী। পদ্মচক্ষু:
পদ্মের স্থায় ঘাহার চক্ষু অতি স্নন্দর।

কমলেশ্বর (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। (কৃষ্ণপু ৩৪।৭) কোন
কোন পুণিতে কমলেশ্বর স্থানে ‘কালেকেশ্বর’ পাঠ দৃষ্ট হয়।

কমলোত্তর (স্ত্রী) কমলমিব উত্তরঃ শ্রেষ্ঠম্। কমলাহুত্তরঃ
উত্তমমিব বা। কুম্ভস্থ ফুল।

(লটুয়াঃ মহারজনঃ কুম্ভস্থঃ কমলোত্তরম্। হেম ৪।২২৫।)
কমা (স্ত্রী) কম-গিঙ-ভাবে অ-টাপ্। ১ শোভা ২ (দেশজ)
অন্ন হওয়া।

কমাতাপুর। কোচবিহারের একটি প্রাচীন বিখ্যাত নগর।
রাজা নীলধ্বজ কর্তৃক স্থাপিত। পূর্বে ইহার খুব সমৃদ্ধি ছিল।
হোসেন শাহের আক্রমণের পর হইতে বর্তমান দশা হইয়াছে।

কমান্ (পারস্ত) ১ বক্র ধনুক।

কমানি (দেশজ) অন্ন করা।

কমাল খাঁ। গথর। সুলতান সারঙ্গের পুত্র; গথররাজ্য-
প্রতিষ্ঠাতা মালিক খাঁর বংশীয়। গথররাজ্য ভাট ও
সিদ্ধপ্রদেশের মধ্যবর্তী গিরিমালার মধ্যে, এইখানে কমাল
খাঁর পিতা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতা মালিক কলান
শেরশাহের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করেন। অবশেষে তিনি
সপুত্র গোরালির দ্বর্গে বন্দী হন। এইখানে মালিক নিহত
হইলেন। শেরশাহের পুত্র সলিমশাহের রূপায় কমাল খাঁ
মুক্তিলাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃব্য সুলতান
আদম গথররাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। কমাল
দেখিলেন পিতৃব্যের হস্ত হইতে উদ্ধারের আর আশা নাই,
তখন নিরুপায় হইয়া অকবর বাদশাহের সভায় উপস্থিত হই-
লেন। অকবর তাঁহাকে আপন কর্ণে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে
তিনি কার্যদক্ষতা গুণে গব্বাহাজারী পদ অধিকার করিলেন।
এইবার তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের সুযোগ হইল। তিনি
অকবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তখন অকবর
সুলতান আদমকে শাসন করিবার লজ্জা বহুসংখ্যক সৈন্য

পঠাইলেন। আদম পরাজিত ও বন্দী হইয়া কমাল খাঁর
নিকট আনীত হইলেন। অকবরের অগ্রগ্রেহে কমাল খাঁ
পিতৃরাজ্যে অতিবিকৃত হইলেন। আদম বন্দীভাবে জীবন
অতিবাহিত করিলেন। ১৫৬২ খৃঃ অঃ কমাল খাঁর মৃত্যু হয়।
কমালগঞ্জ। ফরকাবাদ (ফরখাবাদ) জেলার অন্তর্গত ফরখাবাদ
তহসীলের অধীন একটি গ্রাম, গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত।
লোকসংখ্যা ২৮৯৮। এই গ্রামে গুরুদাসইগঞ্জ বাইবার পথে
ছই ধারে দোকান। মঙ্গল ও শুক্রবারে হাট বসে। বজ্র ও
শস্ত্রের ব্যবসা হয়। এখানে পুলিশ ও বড় ডাকঘর আছে।
পুলিসের লজ্জা এখানকার লোকদিগকে কর দিতে হয়।

কমালপুর। মধ্যপ্রদেশের ভূপাল রাজ্যের অধীনস্থ একটি
ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সামন্ত ঠাকুর মদনসিংহ
সিদ্ধিরার নিকট হইতে প্রতিবর্ষে ৪৬০০ টাকা পাইয়া
থাকেন এবং সুজাবলপুরের অন্তর্গত একটি গ্রামের উপসব্ব
ভোগ করিয়া থাকেন।

কমানুদ্দীন্ খুজন্দী (সেখ)। একজন বিখ্যাত পারস্ত কবি।
হাফেজের সমসাময়িক। কেবল কমাল খুজন্দী নামে পরিচিত।
পারস্তে খুজন্দনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৯০ খৃঃ অঃ, তাবেজ
নগরে ইহার মৃত্যু হয়, তথায় ইহার সমাধিস্থান আছে।
ইহার গজল মুসলমানসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে।

কমাসিন (বা দর্শন্য)। বাল্মা জেলার একটি তহসীল,
যমুনার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৮১,২৩৮। ইহার
সদরথানা কমাসিন গ্রাম, উহা বাল্মানগর হইতে ১৯ কোশ
দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২০০০, তন্মধ্যে ঠাকুরদিগের
সংখ্যাই অধিক।

কমিতা [তু] (পুং) কম-গিঙ-ভাবে তুহ। কামুক।

(কমিতা কামুকে পুংসি। শব্দাঙ্কি।)

কমিত্রী (স্ত্রী) কমিত্-ত্ৰীভ্। কামুকী।

কমী (পারস্ত) অন্ন, কম।

কমে (দেশজ) অন্ন হয়, কম হয়।

কমেবার। গোদাবরীতটস্থ কৃষকজাতি বিশেষ।

কমোনা। উত্তরপশ্চিমে মুল্লাসহর জেলার একটি গ্রাম। কালী-
নদীর দক্ষিণতটের নিকট অবস্থিত। এখানকার দ্বর্গ প্রসিদ্ধ।
কমুনে (দেশজ) কোনদিকে।

কম্প (পুং) কপি-ভাবে যঞ্ ইদিশ্বাৎ যুম্। ১ কাঁপা, গাঁত্র
চলিত হওয়া। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বেপথু, বেপন, বেপ,
ও কম্পন। ২ বায়ুস্পর্শে পত্রাদি চালিত হওয়া।

কম্পান্স (পুং) কম্পবৃদ্ধি অরঃ, মধ্যলো। যে অরে
কম্প হয়, বায়ুজন্ত অর। [অর দেখ।]

কম্পন (ত্রি) কপি-বৃচ্-ইতিবাৎ যুৎ। ১ কম্পবৃত্ত, কাঁপুনে। সংস্কৃত পৰ্যায়—চলন, কম্প, চল, লোল, চলচল, চঞ্চল, তরল, পারিল্লব, পরিপ্লব, চপল ও চটুল। ২ কম্পকারক। ৩ (স্ত্রী) (কপি-ভাবে লুট) কম্প। (কম্পনং ন বয়োঃ কম্পো মেদিনী।) (পুং) ৪ (কম্পরতি বেপথুভুক্তং কয়োতি, কপি-গিচ্-বৃচ্, লুর্বা।) গীত ঋজু। ৫ রাজবিশেষ। (“কাষোজরাজঃ কমঠঃ কম্পনন্ত মহাবলঃ।

সততঃ কম্পরামাস যবনানেক এব যঃ।” ভারত ২।৪।১২।)

৬ অস্ত্রবিশেষ। ৭ সন্নিপাত জন্তু অরবিশেষ। ভাবমিশ্র ককোষণ সন্নিপাত জরকেই কম্পজর বলিগ্রাহ্যে—

“জড়তা গদগদা বাণী রাজৌ নিজ্রা ভবত্যাপি।

প্রান্তকে নয়নে চৈব মুখমধুর্যামেষ চ।

ককোষণস্ত লিঙ্গানি সন্নিপাতস্ত লক্ষ্যেৎ।

মুনিভিঃ সন্নিপাতোহয়মুক্তঃ কম্পনসংজ্ঞকঃ।”

ককোষণ-সন্নিপাতে শরীরে জড়তা, গদগদবাক্য, রাজ্যে অধিক নিজ্রা, চক্ষুর গুল ও মুখে মিষ্টরস বোধ হয়। মুনি-গণ ইহাকেই কম্পজর বলেন।

৮ কাশ্মীরের নিকটবর্তী নগরবিশেষ।

কম্পনা (স্ত্রী) কম্পন-টাপ্। ১ নদীবিশেষ। ২ সেনা, সৈন্য।

কম্পনীয় (ত্রি) কম্পন-টক্। কম্পনের যোগ্য।

কম্পমান (ত্রি) কপি-শানচ্-ইতিবাৎ যুৎ। কম্পবৃত্ত, যে কাঁপিতেছে।

কম্পলক্ষ্মা [ন্] (পুং) কম্পঃ চলনং লক্ষ লক্ষণং যন্ত, বহুব্রী। বায়ু, বাতাস। (কম্পলক্ষ্মা পূম্ভান্ বায়ৌ। শকাঙ্কি।)

কম্পবায়ু (পুং) কম্পঃ কম্পকরঃ বায়ুঃ। বাতরোগবিশেষ।

কম্পকারক বায়ুরোগবিশেষ। [বাতব্যাদি দেখ।]

কম্পা (স্ত্রী) কপি-ভাবে অ-টাপ্। কম্পন, লক্ষালিত হওরা।

কম্পাক (পুং) কম্পরা চলনেন কারতি প্রকাশতে, কম্প-কৈ-ক। বায়ু।

(কম্পাক নিত্যগতিপদ্ধত্বপ্রভঞ্জনঃ। হেম ৩।১৭২।)

কম্পিত (স্ত্রী) কপি-ভাবে ক্ত। ১ কম্পন। ২ (কর্তৃরি ক্ত) (ত্রি) কম্পবৃত্ত। (কম্পিতং কম্পনে দ্ব্যন্তং কম্পবৃত্তে চ। শকাঙ্কি।)

কম্পিল (পুং) কম্প-ইলচ্। ১ রোচনী, কমলাভক্তী। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়—কম্পিল, কম্পিল্য, কম্পীল, কম্পিলক, রক্তাক, রেটী, রেচনক, রজক, লোহিতাক ও রক্তচূর্ণক। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মিষেচক, কটু, উষ্ণ, লঘু এবং ত্রণ, কক, কাস ও তক্ত জ্বিনিদ্রাশক। জ্বরভেদের মতে ইহার তৈলগুণ—তিক্ত, কটু ও ককরস, অধোগত ঘোব-

নাশক, হৃষ্ট জ্বশোধক, এবং জ্বিনি, কক, কটু ও বাহুনাশক। ২ করকাবাদের কাইমগজ তহনীলের অন্তর্গত একটি প্রধান গ্রাম। মহাত্মারতে কম্পিল্য নামে প্রসিদ্ধ। [কম্পিল্য দেখ।]

কম্পিল (পুং) কম্প-ইল। কমলাভক্তী।

কম্পিল্লক (পুং) কম্পিল-বার্ধে কন্। কমলাভক্তী।

কম্পী [ন্] (ত্রি) কম্পো অত্যতি, কম্প-ইনি। ১ কম্প-বৃত্ত। ২ (কম্প-গিচ্-গিনি) যে কাঁপায়।

(“গীতী শ্রীশ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।

অনর্থজো হরকণ্ঠস্ত যত্নেতে পাঠকাধমাঃ।” শিকা ৩২।)

কম্প্য (ত্রি) কপি-গিচ্-কর্মণি যৎ। চালনীয়, কাঁপাইবার উপযুক্ত।

কম্প্র (ত্রি) কম্প-র (নমিকম্পি শ্রাস্তসকমহিংসরীপো রঃ। পা ৩।২।১৬৭।) কম্পাষিত। (“বিধায় কম্প্রানি মুখানি কম্প্রতি।” নৈবধ ১।১৪২) জ্বিয়াং টাপ্। শাখা।

কম্বথৎ (পারস্ত) হুঃখী, অম্বথী, হৃদশাগ্রস্ত।

কম্বথতী (পারস্ত) হৃদশা, হুঃসময়।

কম্বন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তামিল কবি। বেল্লুরের বৈরৈই নেন্নুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভজ্যতা বল্ললনামক শুল্লবংশীয়। বার বর্ষ বয়স হইতে বাম্বীক-রামায়ণ তামিল ভাষার অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সম্পূর্ণ করেন। চোলাধিপ করিকাল চোল তাঁহার কবিত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন। রাজেন্দ্র চোল কখনকে আপন রাজসভায় আহ্বান করিয়া রাজকবি উপাধি প্রদান করেন। তিনি ৮০৭ শকে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকৃত তামিল রামায়ণ, ‘কম্বনপাদল,’ ‘কাঞ্চিবরম্ পিল্ল তামল,’ ‘চোল কুবল’ (করিকাল চোলের ইতিহাস), এবং ‘কম্বন অগরাধি’ নামক তামিল অভিধান দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। তিনি মহরানগরে ৬০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। (Wilson's Mackenzie Collection.)

কাহারও মতে, ইহার নাম কবর, ভজোরের অন্তর্গত কব-নাড়ুনামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপন রামায়ণের তামিল অনুবাদ রাজেন্দ্র চোলের সমর আরভ করিয়া কুলোত্তম চোলের রাজ্যকালে সমাপ্ত করেন।

(Caldwell's Dravidian Grammar, p. 134.)

কম্বন্। মাজাজের কর্ণুলজেলার অন্তর্গত একটি নগর।

কম্বর (পুং) কব-অরন্। ১ বিবিধবর্ণ, চিত্রবর্ণ। ২ (ত্রি) নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট।

কম্বর। সিদ্ধপ্রদেশের একটি তালুক। অক্ষা° ২৭° ২৮' হইতে ২৭° ৫২' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ৩৩' ৪৫" হইতে ৬৮° ১০' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিগণনা ১৭৭ বর্গমাইল। এখানে প্রায় লক্ষলোকের বাস। এখানকার অপর নাম শাহবৎপুর। শিকারপুর জেলা হইতে এখানে তালুক উত্তরি আসিয়াছে। ইহার প্রধাননগর কম্বর। অক্ষা° ৭৩° ৩৫' উঃ, এবং দ্রাঘি° ৬৮° ২' ৪৫" পূঃ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গলীরা এই নগর লুণ্ঠন করি, তাহার পরবর্ষে অগ্নিপ্রয়োগে এই নগর এককালে ধ্বংস হইয়া যায়।

কম্বল (পুং) কব-বৃকাদিভ্যাং কলচ্। ১ মেঘাদির লোম-নির্মিত আসনবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রক্তক, বেশক, রোনবোনি, রেগুকা ও প্রাবার। এদেশে অনেকই কম্বল ব্যবহার করেন। পূর্বে কম্বল কবচের কাজ করিত। কেহ কেহ বলেন কম্বলের তুল্যভরা করিয়া গায়ে দিলে বনুকের তুলি পর্যন্ত শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। ২ সর্প-বিশেষ। ৩ গুরু প্রভৃতির গল কম্বল। ৪ উত্তরীয়। ৫ শূণ-বিশেষ। ৬ নাগধ্বজ, তন্মধ্যে একটি পাতালে ও অপরটি বরুণ-দেবের সভাস্থলে বাস করে। ৭ কুমি-বিশেষ। ৮ তীর্থবিশেষ। (‘প্রয়াগং স্মরণার্থিতানং কম্বলাশ্বতরো তথা।

তীর্থং ভোগবতী চৈব যেনিরেবা প্রজাপতেঃ॥’ ভারত বন৮৫অঃ)

৯ (স্ত্রী) জল।

(কম্বলো নাগরাজে ভ্রাতৃ সান্না প্রাবরয়োরপি।

কপাবপুস্তরাসঙ্গে সলিলে তু নপুংসকম্। মেদিনী।)

কম্বলক (পুং) কম্বল-স্বার্থে কন্। কম্বল। [কম্বল দেখ।]

কম্বলকারক (পুং) কম্বলং করোতি, কম্বল-ক-কুল্। কম্বল-নির্মাণাতা, বাহারি কম্বল প্রস্তুত করে।

কম্বলধারক (পুং) কম্বল-ধ-ধূল্। কম্বলধারী, বাহারি গায়ে কম্বল আছে।

কম্বলবর্হিব (পুং) অন্ধকরণের পূত্রবিশেষ। (ভাগবত ৯।২৪।১১।)

কম্বলবান্ [৭] (ত্রি) কম্বলোহত্যতি, কম্বল-মতুপ-মত্ বঃ।

১ কম্বলবিশিষ্ট, বাহারি কম্বল আছে। ২ প্রস্তুত গলকম্বল-বিশিষ্ট (বৃষ)।

কম্বলহার (পুং) কম্বলং হরতি, কম্বল-হ-অণ্। ১ কম্বলহারক, যে কম্বল অপহরণ করে। ২ অবিবিশেষ।

কম্বলার্ধ (স্ত্রী) কম্বলরূপং ধনম্, কম্বল-ধ-ধৃজিঃ (প্রবৎসন্তর-কম্বলধনসর্গধনানামুণে। পা ৬।১।৮৯। বার্তিক ৬।)

কম্বলরূপ ধন।

কম্বলিকা (স্ত্রী) কম্বল-ক-স্বার্থে কন্-কৃৎ-টাপ্ চ। ১ কৃষ্ণ-কম্বল। ২ কম্বলমূগের স্ত্রী।

কম্বলিবাছক (স্ত্রী) কম্বলঃ সান্না অন্ত্যত, কম্বল-ইনি, কম্বলিভিবৃ-টবকৃহত্যে, কম্বলিন্ বহ-কম্বলিণ্যৎ-স্বার্থে সংজ্ঞারঃ বা কন্। গোলকট, গরুর গাড়ী। সংস্কৃত পর্যায়,—গম্ভী ও গাম্ভী।

(অনন্ত শকটো ২খ ভাণ্ড গম্ভী কম্বলিবাছকম্। হেম ৩।৪১৭।)

কম্বলী [ন] (পুং) কম্বলঃ গলকম্বলঃ প্রোক্তোহন্ত্যত, কম্বল-ইনি। বৃষ।

কম্বলীয়া (ত্রি) কম্বলার হিতম্, কম্বল-হ। কম্বলের উপাধান, মেঘলোমমুক্ত।

কম্বল্যা (স্ত্রী) কম্বল-বৎ (কম্বলাজ সংজ্ঞারাম্। পা ৫।১।৩।) শতপল পরিমিত উর্ণা (কম্বলমূর্ণাপলশতম্। কাশিকা।)

কম্বলারী [ন] (পুং) শম্ভটিল।

কম্বি (স্ত্রী) কন্ বাহুলকাৎ বিন্। ১ দক্ষী, হাতা। ২ বাঁশের গাব্ (কম্বিরংশে চ বংশত খণ্ডাকারামপি জিহ্বাম্। মেদিনী।)

কম্বু (পুং) কন্-উণ্ বৃচ্। ১ শম্ভ। (পুং) ২ বলর, বালী। ৩ শামুক। ৪ হস্তী। ৫ চিত্রবর্ণ। ৬ গ্রীবাংশে। ৭ নলক হাড়।

কম্বুক (পুং) কম্বু-স্বার্থে কন্। কম্বু।

কম্বুকণ্ঠী (স্ত্রী) কম্বুরিব কণ্ঠোহত্যঃ কণ্ঠ-কণ্ঠী। যে স্ত্রীর কণ্ঠদেশে শম্ভের ছায় তিনটি দাগ আছে।

কম্বুকা (স্ত্রী) অধগন্ধা বৃক। [অধগন্ধা দেখ।]

কম্বুকাষ্ঠী (স্ত্রী) কম্বু চিত্রবর্ণং কাষ্ঠং যতঃ, বহস্ত্রী। অধগন্ধা।

কম্বুগ্রীব (ত্রি) কম্বুরিব রেখাজয়যুক্তা গ্রীবা বত্। বাহারি গলদেশে শম্ভের ছায় তিনটি রেখাবিশিষ্ট।

(‘কম্বুগ্রীবঃ পুদ্রাক্ষো ভর্তা যুক্তো ভবেন্নয়ম’।

ভারত ১।১৫০।১৮।)

কম্বুগ্রীবা (স্ত্রী) কম্বুরিব রেখাজয়যুক্তা গ্রীবা, উপনি। শম্ভের ছায় রেখাজয়যুক্ত গ্রীবা।

কম্বুপুঞ্জী (স্ত্রী) কম্বুৎ স্তম্ভং পুঞ্জং যতঃ, বহস্ত্রী। শম্ভ-পুঞ্জীবক। [শম্ভপুঞ্জী দেখ।]

কম্বুমালিনী (স্ত্রী) কম্বুত্বা পুন্নাগাং মালী সমূহঃ অন্ত্যতঃ। শম্ভপুঞ্জী।

কম্বু (ত্রি) কম্ব-কৃ, নিপাতন্য সাধুঃ (অন্যদৃশ্ কম্বু-কম্বু-কম্বলকর্ককৃ দিবিবৃ। উপ ১।৯৫। এই সকল শব্দ কৃ প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে নিহ্ন হয়।) ২ চোর। (কম্বুঃ পরজ্ঞাপনহারী। উচ্ছলদত্ত।) ২ (স্ত্রী) (কম্বু-উচ্চ) কম্বু। [কম্বু দেখ।]

কম্বুক (পুং) কম্বু-স্বার্থে কন্। কম্বু।

কম্বো। জাতিবিশেষ। এখন এই জাতি পরাব ও বিজনোরে বাস করে। পূর্বে ইহারি লিঙ্গনস হাফিয়া কাম্বলের

উত্তর প্রদেশে বাস করিত। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইহারাই ‘কক্খোজ’ নামে উক্ত হইরাছে এবং ইহাদের পূর্ববাসস্থানকে পূর্বকালে ‘কক্খোজ’ বলিত। তৎকালে সকলেই হিন্দু ক্রান্তির ছিলেন। মুহম্মদ গিলনী এইজাতির অনেককেই মুসলমান করেন। মোগলেরা এই জাতিকে বড় ভূষণ করিত পারসীভাষায় চলিত আছে—

“আউজ্জ কক্খো হুএম্ অকগী সেওয়ম্ বদ্ভাত কাম্বীরী।”
[কক্খোজ দেখ।]

কক্খোজ (পুং) কক-ওজ। ১ শব্দবিশেষ। ২ হস্তবিশেষ। ৩ দেশবিশেষ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে—

“পাক্ষালদেশমারতয় স্নেহাদক্ষিণপূর্বতঃ।

কক্খোজদেশো দেবেশি। বাজিরাপিপরায়ণঃ॥”

পাক্ষালদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া স্নেহ দেশ হইতে দক্ষিণপূর্ব পর্য্যন্ত কক্খোজদেশ। এখানে বিস্তর ঘোটক উৎপন্ন হয়।

শক্তিসঙ্গমের মত ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। রঘুবংশে লিখিত আছে, মহারাজ রঘু পারসীক, সিন্ধুনদতীরবাসী এবং হৃণদিগকে জয় করিয়া কক্খোজদেশীয় রাজগণকে পরাজয় করেন। কক্খোজেরা তাঁহার নিকট অবনত হইয়া উৎকৃষ্ট অশ্ব ও রাশীকৃত সুবর্ণ উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। তৎপরে রঘু অশ্ব সাহায্যে গৌরীশঙ্কর পর্বতে আরোহণ করিলেন। * (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ)

রঘুবংশের উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোধ হইতেছে, কক্খোজদেশ সিন্ধুনদীর উত্তরভাগ এবং গৌরীশঙ্কর পর্বতের নিকট ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণে গৌরীশ্রী এবং মহাত্মারতে সুবাস্ত নদীর সহিত গৌরীনদীর উল্লেখ দেখা যায়। এই সুবাস্ত ও

* “মিনীতাক্ষপ্রমাত্ত সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ।
তত্র হৃণাশ্বরোধানাং তথুৎ ব্যক্তবিক্রমঃ।
কক্খোজাঃ সমরে সৌচুঃ তত্র বীর্যমবীৰ্যরাঃ।
গজালাদপরিষ্কিষ্টৈরকোটিঃ সর্ঘদামতাঃ।
তথাঃ সপশুভ্রিষ্ঠাঃ স্তম্ভাঃ ত্রিবিধাঃ রায়রাঃ।
উপমাঃ বিবিধাঃ শব্দোৎসেহাঃ কোশলেশ্বরম্।
ওতো গৌরীশঙ্করঃ শৈলমাক্ষরোহাশ্বাদধঃ।” রঘু ৪ সর্গ।

+ মরিশাখ ‘গৌরীশঙ্কর’ শব্দের অর্থ হিমাশ্রয় জিহ্মিরাছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গৌরীশঙ্কর এখানে একটি স্বতন্ত্র পর্বতকে বুঝাইতেছে। পাক্ষাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি ‘গৌরীয়া’ (Goryaia) নামে এক জমিদারের উল্লেখ করিয়াছেন (Ptolemy, Bk. VII. Ch. I.)। এই জমিদারের নধ্য বিরা বোরনদী প্রবাহিত। এই নদী বর্তমান কাবুল নদীতে পতিত হইরাছে। উহা কক্খোজিতা ও মহাত্মারতে গৌরীনদী নামে উল্লিখিত হইরাছে। ইহার চারিদিকে পর্বতমালায় বেষ্টিত। কালিদাস এই পর্বতমালাকেই গৌরীশঙ্করনামে উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই পর্বত হইতেই গৌরীনদী উৎপন্ন হইরাছে। উক্ত পার্শ্ববর্তী প্রদেশই টলেমি কর্তৃক ‘গৌরীয়া’ নামে উক্ত হইরাছে।

গৌরী নদী বর্তমান পঞ্জাবের উত্তরস্থ আং প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত।

অতএব রঘুবংশের মত ধরিলে বর্তমান সিন্ধু ও লগুই নদীর উত্তরাংশে পূর্বকালে কক্খোজনামক জনপদ ছিল। পূর্বকালে কক্খোজবাসীরা সংস্কৃত কথা কহিত। (মহাভারত ২।২)। [কক্খো দেখ।] ৪ (জি) কক্খোজদেশবাসী।

কক্খোজ। (কক্খোজিয়া) জনপদবিশেষ। উত্তর সীমান্ত লেবানদেশ, পূর্বে কোচীন-চীন, দক্ষিণে ভায়োণসাগর ও চীনসাগর এবং পশ্চিমে ভায়দেশ। অক্ষা° ৮°৪৭’ হইতে ১৫° উঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পূর্বকালে যখন কক্খোজ স্বাধীন ছিল, সেই সময়ে এই রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরাজগণ এই দূরদেশে রাজত্ব করিতেন; তাঁহাদের কীর্তিকলাপ, ধর্মীয়রাজ্য, দেবদ্বিজভক্তি, অসাধারণ শৌর্য বীর্যমহিমা, বহু শতবর্ষ গত হইরাছে, তথাপি এখনও কক্খোজের নগরে, কাননে ও পর্বত-গহবরে শিলাকলক এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবমন্দিরাদির ভয়াবশেষ দেখা যায়। কক্খোজের প্রাচীন হিন্দুরাজকাহিনী এতদিন খনিগর্ভে মগ্নির ভায়ে লুক্কায়িত ছিল, এতদিন পরে ফরাসীপণ্ডিতগণের গভীর গবেষণা-প্রভাবে সাধারণ সমক্ষে উন্মুক্ত হইরাছে। হিন্দুগণের ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। দীন দরিদ্র ধর্মভীরু হিন্দু জাতিতে পারিবেশ, কক্খোজের প্রাচীন হিন্দু রাজগণ সুদূরবর্তী কক্খোজরাজ্যে যে কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়; বাহা আমরা বিধর্মী কবলিত ভারতবর্ষে খুঁজিয়া পাই না, সামান্য কক্খোজের ভিতর তাহাই দেখিতে পাইব।

পুরাতত্ত্ব।—বর্তমান কক্খোজের বহু, বকু, লোলি, প্রে, ক্রিৎস্জেলার অন্তর্গত চমুনম, বটজেলার কুম, চিসৌব নামক পর্বতে, বত্তবজ্জেল (একদে ভায়রাজ্যভাগ), ক্রিমনক, কেমিচর, এবং অক-চম্নিক নামক স্থান হইতে প্রাচীন কণাটী অক্ষরে অনেক সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল শিলালিপি পাঠে জানা যায় পূর্বকালে কক্খোজ রাজ্য পশ্চিমে ভায়দেশ হইতে পূর্বে আনামের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার প্রাচীন অধিবাসীদিগকে ‘কক্খুজ’ বা ‘কক্খোজ’ বলিত। এই কক্খোজজাতি বর্তমান কক্খোজরাজ্যের আদিম অধিবাসী নয়। ইহাদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে—

“তকশিলা হইতে অদভিভূয়ে রোমবিষয়ে এক ধর্মনিষ্ঠ বিচক্ষণ ব্রহ্মপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র সুব্রাহ্ম

‘অ ধা’ পঠিত করের অর্থাৎ রাজ্য হইতে নির্বাসিত হন। সেই রাজকুমার নানানান অতিক্রম করিয়া এই কবোজরাজ্যে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।”

যদি এই প্রবাদ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, সেই রাজকুমার পজাব ও কাশ্মীরের উত্তর কবোজ নামক প্রাচীন জনপদ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই দেশের এখনকার কাবোজদিগের সহিত কাশ্মীরী ও কবোজদিগের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ এখানকার প্রাচীন দেবমন্দিরাদির নির্মাণ-প্রণালীও কাশ্মীরের মন্দিরাদির ভাৱ। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই কবোজরাজ্যের নাম হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধদের উত্তরে অবস্থিত ‘কবোজ’ হইতে হইরাছে।

সেই রাজকুমার কোন্ সময়ে এ দেশে আগমন করেন, তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশ্মীর-রাজ তুলসিনের রাজত্বকালে (৩১৯ খৃঃ অঃ) ভারতের পশ্চিমপ্রদেশে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ সেই সময়ে এই দেশে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইরাছিল। কিন্তু ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিলাম না।

এখানকার সংস্কৃত শিলালিপিতে ‘কিরাত’ জাতির নাম পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহারা এই দেশের আদিম নিবাসী। মৎস্ত, কৃষ্ণ, বামন, গরুড়, ব্রহ্মাও প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থসারেও ভারতবর্ষের পূর্বসীমান্তবাসীর নাম কিরাত।

কবোজ ও আনাম্ (অরম্)-দেশ ব্রহ্মাওপুরাণোক্ত অজবীপ হওয়ার সম্ভব। এই স্বীকারে বিবরণে উক্ত হইরাছে—

“অজবীপং নিবোধধ্বং নানা সম্বসমানুলম্।

নানারোহণগাকীর্ণং তদ্বীপং বহুবিশ্রমম্ ॥

হেমবিজয়মস্পৃগং রত্নানামাকরং ক্ষিতৌ।

নদীশৈলবনশিচরং সরিতং লবণাস্তনা ॥

তত্র চন্দ্রগিরির্গমনৈক নির্ভরকন্দরঃ।

তত্রসাগরদীচাত নানাসমুদ্রসামুদ্রা ॥

স মধ্যে নাগদেশত নৈকদেশো মহাগিরিঃ।

কোটিভ্যাং নাগনিগরং প্রাপ্তে নদনদীপতেঃ ॥”

ব্রহ্মাও ৫৪ অঃ।

ইয়োপীর ঐতিহাসেরা বলেন যে, ৭৫৬ খৃঃ চীনপতি মিং-হোয়াংতি টকিনে ‘অরম্’ নামে এক সামরিক জেলা সংস্থাপন করেন, তাহার নাম হইতে সমস্ত অরম্ বা আনাম দেশের নাম হইরাছে। কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণের ‘অরম্’ শব্দ ‘অজম্’ শব্দের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অজরাজ্যের

রাজধানীর নাম বেবন চম্পা, সেইরূপ এই অরম্দেশের রাজধানীর নামও চম্পা। এইরূপ পূর্বকালে (শিলালিপি অল্পসংখ্যায়) এই অরম্ দেশ চম্পারাজ্য বলিয়াও অভিহিত হইত। বর্তমান কবোজের যে স্থান হইতে সর্বপ্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইরাছে, তাহার নাম ‘অজ-চন্দ্রনিক’, ইহাও ‘অজচন্দ্রনিক’ বা ‘অজচম্পা’ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়। এই কয়েকটি প্রমাণের দ্বারা উক্ত স্থানকে এক স্বতন্ত্র অরম্দেশ বা অজবীপ বলিয়া স্বীকার করা হইতে পারে। কবোজ এবং অরম্দের যথার্থ পৰ্য্যন্তই সম্ভবতঃ ব্রহ্মাওপুরাণোক্ত ‘চন্দ্রগিরি’ বলিয়া মনে হয়।

[চম্পা শব্দে অজাত কথা দেখ।]

ইতিহাস।—কবোজের হিন্দুরাজগণের প্রাচীন ইতিহাস অল্পকার্য্যকর। এখনও সমস্ত শিলালিপি অথবা এখানকার প্রাচীন পুস্তকাদি সংগৃহীত হয় নাই, যদ্বারা সেই যৌর অজকার হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই।

অধুনাতন কবোজ হইতে যে সর্বপ্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সময় ৫২৬ শক। কিন্তু তাহাতে কোন রাজার নাম নাই। শিলালিপি হইতে যে সকল রাজার নাম বাহির হইরাছে, তন্মধ্যে ‘তববর্ষা’ নৃপতিই সর্বপ্রথম। তববর্ষের পর শিলালিপি অল্পসংখ্যায় যে যে হিন্দুরাজের নাম পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা প্রস্তুত হইল—

রাজার নাম।	সময়।
তববর্ষা	৫৪৮ শক।
মহেন্দ্রবর্ষা } ঈশানবর্ষা }
জয়বর্ষা	৫৮৬-৫৮৯ শক (?)
ভববর্ষা	৫৮৯ শক।
পৃথিবীজবর্ষা	(?)
ইন্দ্রবর্ষা (পৃথিবীজ বর্ষার পুত্র)	৭২৯ শক।
বশোবর্ষা (ইন্দ্রবর্ষার পুত্র)	৮১১ শক।
হর্ষবর্ষা (বশোবর্ষার ছোটপুত্র)	
ঈশানবর্ষা ২য়, (বশোবর্ষার ২য় পুত্র)	৮৩২ শক।
জয়বর্ষা (ইন্দ্রবর্ষার ২য় পুত্র, বশোবর্ষার ভ্রাতা)	৮৫০ শক।
হর্ষবর্ষা ২য়, (জয়বর্ষার কনিষ্ঠ ভ্রাতা)	৮৬৪ "
রাজেন্দ্রবর্ষা (হর্ষবর্ষার ছোট ভ্রাতা)	৮৬৬ "
জয়বর্ষা (রাজেন্দ্রবর্ষার পুত্র)	৮৯০ "
উদয়াদিত্য বর্ষা ১ম	৯২৩ "
জয়বীরবর্ষা	৯২৪ "

স্বর্গাবস্থা	১৩৯-১৪০ শক।
উদয়াদিত্যাবস্থা	২৪,	...	১৪১ শক।
হর্ষাবস্থা	৩৪, (উদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)		
উদয়করবস্থা	১৮৮ "
জয়বস্থা
ধরদীপকবস্থা	১০৩১ "
স্বর্গাবস্থা	১০৩৪ "
জয়বস্থা	(পরম বিজুলোক)		১১০৮ "

উপরোক্ত রাজগণের মধ্যে পৃথিবীজের পুত্র ইন্দ্রাবস্থা বহু নামক স্থানে ৮০০ শকে পৃথিবীজেশ্বর নামে এক বৃহৎ শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার স্মৃতির পর তৎপুত্র যশোবস্থাও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতার অমুখ্যত্বী হইরাছিলেন। যশোবস্থার ভ্রাতা জয়বস্থার সময় হইতে এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ করে। ইতিপূর্বে এখানে বৌদ্ধ ছিল না। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু এ সময়ে এখানকার কোন হিন্দুরাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন নাই। জয়বস্থা পরম বিজুলোক সম্ভবতঃ ১১০০ শকে এখানকার প্রসিদ্ধ অক্ষরবটের দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই জয়বস্থার পর শিলালিপিতে আর কোন হিন্দুরাজের নাম এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অমুসন্ধান চলিতেছে, ফল কতদূর হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

চীন ইতিহাসপাঠে জানা যায়, খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে কবোজরাজ চীনরাজের নিকট রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ খৃষ্টের ষাটশ শতাব্দী হইতে কবোজরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইয়া উঠে, কারণ সেই সময় হইতে আর হিন্দুরাজগণের নাম শুনা যায় না। যাহা হউক কবোজের বৌদ্ধইতিহাসও গাঢ় তিমিরচ্ছন্ন। বোধ হয়, ভ্রামের বৌদ্ধরাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলে, কবোজ ভ্রামের অধীন হইরাছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে করাসীরা বাগিচ্যের অভি-প্রায়ে কবোজে প্রবেশ করেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে আনাম-রাজ দিরা-লং করাসীপতি বোধশ সুইয়ের সহিত সন্ধি-স্থাপন করেন। তদনুসারে করাসীরা বুদ্ধকালে আনাম-রাজকে সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের সাহায্যে দিরা-লং তৎকালে টকিং ও কবোজ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে, আনামরাজের মৃত্যু হয়। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে, তাঁহার পৌত্র ডিএন্-ক্টি রাজা হইয়া কয়েকজন করাসী ও স্পেনিস্ খৃষ্টান-ধর্ম-প্রচারকের প্রাণ বধ করিবার আদেশ দেন, তাহাতে সমস্ত করাসী ও স্পেনিস্গণ খেপিয়া উঠেন।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে, ক্যাপ্টেন রিগল-ডি-গিনোলি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র নিষ্পত্তি করিবার জন্ত সৈন্যে প্রেরিত হইলেন। আনামরাজ ক্যাপ্টেনের আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। তখন করাসী সেনাপতি বুদ্ধ বোধবা করিলেন। অনেকবার বুদ্ধ বাটল, কিন্তু তথাপি আনামরাজ করাসীদিগের নিকট অবনত হন নাই। আনামের গোলযোগ শুনিয়া ১৮৫২ খৃঃ অব্দে, কবোজের খৃষ্টানেরা একত্র হইয়া বিদ্রোহী হইল। নৌ-সেনাপতি গিনোলি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত সৈগন নদী দিরা কবোজে প্রবেশ করেন। এবার করাসীরা প্রাণপণে বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুত্র পুত্র আক্রমণে কবোজ-রাজ বিচলিত হইলেন। ১৮৬২ খৃঃ ২৬এ মে, আনামরাজ সন্ধি করিবার জন্ত কবোজের রাজধানী সৈগননগরে দূত প্রেরণ করেন। ১৫ই জুন তারিখে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়। করাসীরা তাঁহাদের বুদ্ধব্যয়াদি এবং পূর্বসন্ধিপত্রানুসারে তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ আদায় করিয়া লইলেন। এ সময়ে খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারকের অবাধে ধর্মপ্রচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে কবোজ আনাম ও ভ্রামের অধীনে করদরাজ্য-ভুক্ত ছিল; একজন রাজপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত। করাসীরা কবোজরাজ্যে আসিয়া এখানকার মিকং নদী-তীরবর্তী প্রদেশের উর্বরতা ও শতশালিতা দেখিয়া বিমোহিত হইলেন, তাঁহারা এই স্থান হস্তগত করিবার ইচ্ছা করিলেন। অন্ততম নৌ-সেনানায়ক প্রাণ্ডওয়ার তদ্রূপ রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হইলেন। রাজপ্রতিনিধি করাসীদের মনোভাব জানিতে পারিয়া আনামরাজের মতামত জানিবার জন্ত সময় প্রার্থনা করেন। কিন্তু করাসী-দূত তাঁহার কথা শুনিলেন না। সে সময়ে কবোজ-রাজপ্রতিনিধির তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি করাসী বিপক্ষে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সন্ধি করিতে হইল। এই সন্ধি অনুসারে উত্তরপক্ষে বাগিচ্য চালাইবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কবোজে করাসীদের যে সকল মালের মাজুল লাগিত তাহা রহিত হইল, এবং কবোজের উৎপন্ন জব্যাদির যে মাজুল নির্দ্ধারিত ছিল, তাহাও উঠিয়া গেল। করাসীরা কবোজের নানাহানে এক একজন প্রতিনিধি (রেসিডেন্ট) রাখিবার আদেশ পাইলেন এবং উলঙ্ নামক নগরে আপনাদিগের আবাসিক মত বাড়ী, কারখানা ও গুদাম প্রভৃতি নির্মাণ করিবার জন্ত ভূমি পাইলেন। কবোজরাজ করাসীদের অমুমতি ব্যতীত অপর কোন বৈদেশিক প্রতিনিধি উলঙ্ নগরে রাখিতে পারিবেন না, তাহাও সেই সন্ধিপত্রে স্থিরীকৃত হইল।

একদিন কম্বোজপতি একজন সানাত্ত রাজপ্রতিনিধি মাত্র ছিলেন, এখন করাসীদিগের সাহায্যে রাজ উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পূর্বের মত ভ্রামরাজকে কর দিতে লাগিলেন।

১৮৬৫ খৃঃ অব্দে, মিকং ও বৈকোনবীর মধ্যবর্তী জলা-ভূমিতে দেশীরেরা দলবদ্ধ হইয়া রাজবিজ্রোহী হয়, তাহার করাসীদিগের উপর অত্যাচার এবং তাহাদের বাণিজ্য জ্বায়াদি লুণ্ঠপাট করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে কম্বোজের একজন সানাত্ত বিজ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া কম্বোজরাজ নরোদনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তৎকালে করাসীরা কম্বোজরাজের সহিত যোগ দিয়া বিজ্রোহী দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সহজে কেহ বৃত্ততা স্বীকার করিল না। এই যুদ্ধে দুই তিনজন করাসী সেনাপতি রণশারী হইরাছিলেন।

১৮৬৬ খৃঃ, ১৬ই আগষ্ট, বিজ্রোহী-সানাত্ত নিজ দলবল লইয়া প্রবলবেগে রাজধানী আক্রমণ করেন। এই সময়ে রাজপরিবারেরা দারুণ বিপদে পড়িলেন। করাসীদিগের প্রায় দুইশত রণতরী উদঙ নগরে থাকিয়া শত্রুদিগকে যথাসাধ্য বাধা দিতে থাকে। ১৭ই ডিসেম্বর আসিল, এই দিবস কম্বোজ-ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর দিন। এই দিনে রাজবিজ্রোহী কম্বোজবাসীরা আপনাদের জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য অকুতোভয়ে প্রাণপণে করাসী ও কম্বোজরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত সহস্র কাঞ্চাল জন্মভূমির নাম লইয়া রণশয্যায় শয়ন করিল। এই যুদ্ধে করাসী ও কম্বোজের অনেক প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়া-ছিলেন। বাহা হউক বহু বস্ত্র, অনেক কষ্ট এবং বিস্তর সৈন্তক্ষয়ের পর বিজ্রোহীর করাল কবল হইতে কম্বোজ-রাজধানী উদঙ নগর রক্ষিত হইল।

এবার কম্বোজরাজ করাসীদিগের সাহায্যে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কম্বোজরাজ নরোদন নিজ নামে রাজধানী স্থাপন করিলেন। করাসীরা মিকং নদী-কূলে উপনিবেশ স্থাপন করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নগর।—এখন কম্বোজের প্রধান নগর সৈগন, ও পিঙ্গে (বন্দর)।

হিন্দুকীৰ্ত্তি।—প্রথমেই সিধিরাছি, কম্বোজরাজ্যে প্রাচীন হিন্দুস্বাক্ষরণ বে কীৰ্ত্তিতত্ত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বহুবর্ষ অতীত হইল বটে, কিন্তু এখনও তাহার কীৰ্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। কম্বোজের বন জঙ্গলে, মানবের অগম্যস্থানে, সেই অসাধারণ কীৰ্ত্তিরাশি পরিলক্ষিত হয়। উৎসাহী করাসী

প্রমত্তবহির্গমনের বস্ত্রে সেই পুরাকীর্ত্তিসমূহ অগ্ন্যবশ্যে প্রকা-শিত হইতেছে। বস্তু ন্যেহ করিতে পারিরাছি, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম—

কম্বোজের সানাহানে বে সকল পুরাকীর্ত্তি অবিকৃত হইয়াছে, তাহা স্থান ভেদে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম অঞ্চলের বট, ২য় বকু ও দোলি, এবং ৩য় কম্বোজের দক্ষিণ ও মধ্যমাংশ।

১ম, অঞ্চলের বট।—ভ্রামবাসীরা ইহাকে ‘নধনু বট’ অর্থাৎ নগর-মন্দির বলিয়া থাকে। এই মহামন্দির অঞ্চোরনগর হইতে প্রায় দুইকোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার মত বৃহৎ মন্দির অতি অল্পই দেখা যায়, মন্দিরের আরতন প্রায় অর্ধ কোশ হইবে। ইহার পরিবেষ্টক প্রাচীর ১০৮০ × ১১০০ ফুট এবং চারিদিকে ২০০ ফুট বিস্তৃত খাত দ্বারা পরিবেষ্টিত। খাতের উপর দিয়া মন্দিরে বাইবার জন্য অদৃঢ় স্তম্ভ সমুদায় পরিশোভিত সেতু আছে। সেতুর পর পঞ্চতল গোপুর, তাহার মধ্য দিয়া মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে বাইতে হয়।

নৈঋত কোণ দিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলে ডান ধারে অপূর্ণ দৃষ্ট নয়নগোচর হয়। এখানে ভীমের শরশয্যা দেখিতে পাইবে। মধ্যস্থলে কুরুপিতামহ তীর্থ শরশয্যায় শায়িত, তাহার দুইপার্শ্বে মুকুট ও কিরীট শোভিত কুরু ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দণ্ডায়মান। গজ ও রথ তেজঃপুল মহা-রথীগণ অবস্থান করিতেছেন। পিতামহ ভীমের অনতিদূরে গজের উপর রাজ্য হর্ষোদন রানবদনে অপেক্ষা করিতেছেন। শত শত বর্ষ গত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল মূর্ত্তির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; এই প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি সকল দূর হইতে দেখিলে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়।

মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমোত্তরভাগে রামায়ণের দৃষ্ট। রাক্ষসবানরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। বিকট মূর্ত্তিধারী রাক্ষসবীরগণ রথে চড়িয়া বাণ বর্ষণ করিতেছে; মধ্যস্থলে রাম হনুমানের উপর বসিয়া রাবণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহার দুই পার্শ্বে লক্ষ্মণ ও বিতীবন দণ্ডায়মান। সিংহ-বোজিত রথে রাবণ রামের শরণীড়নে জর্জরিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

উত্তর পশ্চিমভাগে দেবাহরের সমর-দৃষ্ট। বিবিধ মূর্ত্তি-ধারী মুকুটশোভিত দেবগণ অববোজিত রথে আরোহণ করিয়া বাণ ত্যাগ করিতেছেন। বিকট মূর্ত্তিধারী অস্ত্রধারণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। এখানকার মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্রদেবের জ্যোতির্গন মূর্ত্তি অতি সুন্দর। দেবগণ য য বাহনে আরুঢ়।

উত্তরপূর্বমঞ্চ।—এখানেও দেবাহুরের মূর্তি। চতুর্দশানন, গঙ্গানন, বড়ানন, গরুড়োপরি পদ্মচক্রগদাগদধারী বিষ্ণু অঙ্গুর ধারণ করিতেছেন। বহুমুখ ও বহু হস্তবিশিষ্ট দেবগণ অশ্ব, গজ, সিংহ বা গজার আরাহণ করিয়া ভীর ধনুক হস্তে যুদ্ধে ব্যাপ্ত। যুদ্ধস্থলের অঙ্গুরে জটাজুটবিলম্বিত ত্রিশূলধারী মহাদেব মূর্তি, সিংহাধি বোদীগণ পুষ্পকরে তাঁহার অর্চনা করিতেছেন।

উত্তরভাগের কিছু পূর্বে আবার একটি মঞ্চ।—এখানকার শিল্পনৈপুণ্য ও স্থাপত্যকার্য্যাদি এখনও শেষ হয় নাই, সকলই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এখানেও পৌরাণিক দৃষ্ট। বিষ্ণু গরুড়োপরি আরাহণ করিয়া একজন গজারোহী অঙ্গুরকে বিনাশ করিতেছেন। আরও অনেক দেবাহুর মূর্তি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।

পূর্বদক্ষিণ ভাগে সমুদ্রমহন দৃষ্ট। কি শিল্পকার্য্যে, কি চিত্র কার্য্যে, কি স্থাপত্যবিদ্যার সর্ববিধে এই একটি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সমুদ্রমহনের এমন জীবন্ত দৃশ্য বোধ হয় আর কোথায়ও নাই। মধ্যস্থলে কুর্ণের উপর মন্মরাতল স্থাপিত, তত্ত্বপরি বিষ্ণু; মন্মর বাহুকীর্ণা। বেষ্টিত, নাগরাজের মুখের দিকে প্রায় ১০০ শত বিকটাকার দৈত্য মূর্তি, এবং পুচ্ছভাগে ১০০ দেবমূর্তি। দৈত্যগণকে দেখিতে থর্ক, বলিষ্ঠ, শিরজ্ঞাপ ও কবচাবৃত, সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল ও লম্বা দাড়ী আছে। দেবগণের মাথার মুকুট, কণ্ঠে হার, হস্তে বলয়, হুই থাক অঙ্গ ও বস্ত্রস্বয় শোভিত। এই ছই শত মূর্তি ঠিক একভাবে দণ্ডায়মান।

যেখানে সমুদ্রমহন হইতেছে, তাহার উপরিভাগের দৃশ্য অতি চমৎকার। যেন শত শত অর্পবিদ্যারী ও অঙ্গরাজ্য আকাশপথে নৃত্য করিতেছে। তাহার অধোভাগে সাগরের দৃশ্য। নানাপ্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তু সংজ্ঞাদি এই কল্পিত সমুদ্রে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। স্বচ্ছ সলিলে কেমন ধীরে ধীরে স্রোত বহিতেছে!

তাহার পর দক্ষিণপূর্বভাগে আর একটি মঞ্চ। এখানে বমালয়ের দৃষ্ট। পাণের নিগ্রহ, পুণ্যের পুরস্কার; স্বর্গ ও নরকের স্বখ ও দুঃখের দৃষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে নরকযন্ত্রণার ৩৬টি মূর্তি খোদিত হইয়াছে। প্রত্যেক মূর্তির নিম্নে খোদিত-লিপিতে যে প্রকার পাপ করিলে যেন্নর নরকভোগ হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত মঞ্চ হাড়াইরা পশ্চিমে কিছুদূর গমন করিলে আর একটি সুদৃষ্ট মঞ্চ নরনগরের হয়। এখানে কবোজের রাজগণ ও রাজপরিবারগণের মূর্তি খোদিত আছে। এখান-

কার কান্দকার্যের পারিপাট্য বেশিলে চমৎকৃত হইতে হয়; এমন জীবজন্তু দৃষ্ট কবোজের আর কোথাও নাই। কিনা নন্দে! কোথাও পীষোদ্রুত পরোদ্রা হুতাকহাসিনী রাজ-মহিলাগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া মহাপারায় বসিয়া সমারোহ মধ্য বিরা বাইতেছেন, উপরে চিত্রবিচিত্র চত্রোতপ বোহুগমান; আবার তাহারাই পশ্চাতে দ্বিধারূপ-ধারিনী মনোমোহিনী রাজকন্তাগণ মরচালিত রথে আরাহণ করিয়া আছেন, যেন কোথায় বাইতেছেন। তাঁহাদের নন্দে লখীগণ পুষ্পচরন করিয়া উপহার দিতেছে, দাসদাসীগণ নিকটবর্তী কলশালী বুক হইতে ফল লইয়া ছোট ছোট বালকবালিকাকে বিতরণ করিতেছে। রাজকন্তাগণের পার্শ্ব-সহচরীগণ কেহ চামর ব্যজন করিতেছে, কেহ মাথার ছাতি ধরিয়াছে, কেহ সুস্বাহ ফল লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহারই অঙ্গুরে নির্জন উপবন-দৃষ্ট। গিরিমালা মধ্যে তরুরাজী,—তরুতলে মুগশিত খেলা করিতেছে; তরুশাখার নানাবিধ পক্ষী বসিয়া আছে।

মঞ্চের উপরিভাগে সশস্ত্র কবচাবৃত রাজপুরুষ, নর্তক এবং ধাতুকীগণ দণ্ডায়মান। ইহাদের বেশভূষাও রাজসভার উপযোগী। সমুখে রাজসভা। কুণ্ডলধারী জটাজুটবিলম্বিত ব্রাহ্মণগণ গভীরভাবে সমাধীন, রাজা ও রাজকুমারগণ পদোচ্চিৎ বেশভূষা করিয়া বখাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট, অস্ত্রধারী বোদ্ধাগণ রাজসভা উজ্জল করিয়া বসিয়া আছেন। প্রাচীন হিন্দুরাজসভা যেন্নর ভাবে হইত, এই দৃষ্ট দেখিলে তাহার কতকটা ধারণা হইতে পারে। পরমবিহ্বলোক জয়বর্ধা অঙ্কোর বটের উক্ত মহাকীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

অঙ্কোর বট নামক মন্দির হইতে দক্ষিণপূর্বে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে আরও তিনটি পবিত্র স্থান আছে, তাহাদের নাম বকং, বকু ও লোলি।

বকঙের মন্দির অতি প্রাচীন, দেখিতে ত্রিকোণাকার, হরতলে বিভক্ত, প্রত্যেক তলে নির্গম আছে, উপর উপর স্থাপিত হইয়া শ্বেবে ৩৪ হাত উচ্চ ত্রিভুজ মন্দিররূপ ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেকের মধ্যস্থলে সিঁড়ি, তাহাতে সিংহমূর্তি খোদিত ছিল, এখন প্রায় আর নাই। নির্গমের প্রত্যেক কোণে গজমূর্তি। মন্দিরের চতুর্দিকে ৮টি ইষ্টকনির্মিত ছোট মন্দির আছে। এখানকার লোকেরা বলে, এই অবধি প্রধান মন্দিরের নীমা। ৮টি মন্দিরের ভোরণ-প্রাচীরে সংকৃত ভাষায় ৮।১০ ছয় লিপি খোদিত আছে, এতদ্বারা মন্দিরনির্মাতার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কবোজরাজ ইন্দ্রবর্ধা হরগৌরী পূজার জন্ত এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

বহু নামক স্থানে শালাশালি ছবিটি শিবমন্দির আছে, প্রত্যেক মন্দিরের প্রবেশ বাঁহুরে প্রাচীরে বকুণ্ডের মন্দিরের ছবি সংকৃত ভাষায় লিপি খোদিত আছে। বকুণ্ডের মন্দিরে কেবল সংকৃত ভাষায় শিলালিপি বাহির হইয়াছে, কিন্তু বকুর মন্দিরে সংকৃত এবং কবোজে প্রচলিত খন্দের ভাষায় শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি অনুসারে পরমেশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বর নামে এই দেবমন্দিরগুলি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। বকুতে তিনটা শক্তিমন্দিরও আছে। মন্দিরের কারুকার্য অতি পরিপাটি, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

বকু হইতে প্রায় পোয়াখানেক পথ উত্তরে গমন করিলে লোলিনামক স্থান পাওয়া যায়। এখানে চারিটি ইষ্টক নির্মিত দেবমন্দির আছে। স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর সকল পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলেই বোধ হইবে যে সেখানে কোন বৃহৎ দেবালয় ছিল, এখন মক্ষিকা ও ভিত্তির সামান্য ধ্বংসাবশেষ

মাত্র পড়িয়া আছে। প্রত্যেক মন্দিরের চারুগণে অল্পাংশ লিপি খোদিত রহিয়াছে, ভগ্নাংশে জানা যায়, কবোজ-রাজ বশোবর্ষ ৮১৫ শকে শিব ও ভবানীর সেবার্ঘ উক্ত মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন। তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে দেবসেবার বিশেষ মনোযোগ করিতে পুণ্য পুণ্য আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

উপরে যে মন্দিরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম, এই সকল ছাড়া আরও অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে বেওন-নগরের ব্রহ্মমন্দিরগুলিই সর্বপ্রধান। শিবশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-গণের মতে অঙ্কোর-বটের মন্দির অপেক্ষা কবোজের ব্রহ্মমন্দিরগুলি সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। কি শিবনৈপুণ্যে, কি কারুকার্যে, কি স্থাপত্যকর্মে, ব্রহ্মমন্দির নির্মাতাগণ স্ব প্রাধান্য দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ বাহা আমরা সমস্ত ভারতে খুঁজিয়া পাই না, সেই চতুর্ভুজ ব্রহ্মার মন্দির কবোজে



ব্রহ্মমন্দির।

দেখিলাম। এই ব্রহ্মার মন্দির দেখিলে আমাদের কত কথাই মনে আসে! আমাদের আরাধ্য বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ-গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্রহ্মার উপাসনা দেখিতে পাই, এই ব্রহ্মাই আরাধ্যজ্ঞাতির সর্বপ্রথম উপাত্ত দেবতা। উপনিষদে নিরা-

কার পরমব্রহ্ম বলিয়া সন্মোদিত হইয়াছেন, পুরাণে ইনিই চতুর্ভুজ ব্রহ্মা। পুরাণে আমরা অনেক ব্রহ্মভীরের নামও পাঠ করিয়াছি, কিন্তু ভারতবর্ষের কোন স্থানে যে ব্রহ্মার মন্দির আছে, তাহা দেখি নাই অথবা শুনি নাই।

কথোজের হিন্দুগণ তবে কোথা হইতে এই ব্রহ্মমন্দিরের কথ পাইলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও কঠিন। লভ্যবতঃ যখন ভারতের উত্তরস্থ কথোজদেশবাসী কথোজগণ ব্রহ্মমূর্তি পরিত্যাগ করিয়া এই প্রান্তর প্রদেশে আগমন করেন, বোধ হয় তৎকালে সেই আদি কথোজদেশে ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরও নির্মিত হইত। কত শত বর্ষ গত হইয়াছে, বিধর্মীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাহার চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হইয়াছে। জানি না, ভবিষ্যৎকালে কি নিহিত আছে। হয় ত হিমালয়ের দুর্গম ভূবারবেষ্টিত গহ্বর মধ্য হইতে এই ব্রহ্মমন্দির অথবা ইহার গুপ্তত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, মধ্য এশিয়ার ব্রহ্মমন্দির ছিল, প্রাচীন কথোজেরা এখানে আসিয়া তদনুসারে ব্রহ্মালয় নির্মাণ করেন। এ কতদূর সত্য? ভগবানই জানেন।

এখানকার ব্রহ্মমন্দিরগুলির একটু বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক মন্দিরের চূড়ার অঙ্গার চতুর্মুখ শোভা পাইতেছে। এক একটু বৃহৎ ব্রহ্মমন্দির অধোরবটের সমকক্ষ হইতে পারে। অতি ক্ষুদ্র যেটি তাহারও আরতন ও গঠনপ্রণালী নিতান্ত সামান্য নয়। পূর্বপৃষ্ঠে একটু ক্ষুদ্র ব্রহ্মমন্দিরের চিত্র দেওয়া গেল। মন্দিরের অভ্যন্তর যে প্রাণালীতে এবং যেরূপ কৌশলে নির্মিত, তাহা চিত্র করিয়া দেখান যায় না। মূল কথা, শিল্পীগণ প্রাণ ভরিয়া নিজ নিজ কন্মতার পরিচয় দিয়াছেন।

যেখানে বড় মন্দির আছে, তাহারই নিকট আরও কয়েকটি ছোট ছোট ব্রহ্মমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

বেণননগরের পূর্বে অর্ধকোশ দূরে 'পতন্ ভা কুম্' নামক এক প্রথমশ্রেণীর উচ্চ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সংস্কৃত নাম ব্রহ্মপতন অর্থাৎ যে নগরে ব্রহ্মমূর্তি বিরাজ করিতেছে। এই মন্দির চতুস্তম্ভ, প্রতি দিক্ প্রায় ৪০০ ফুট বিস্তৃত। পূর্বে ইহার বহির্দুর্গ যেমন নরনগ্নীভিকর ছিল, এখন তাহার কণামাত্র নাই বলিলেও অত্যাতি হয় না। এখন মন্দিরের চারিদিকে বন জঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে, মন্দির ভেদ করিয়া ময়ীকহগণ মস্তক উত্তোলন করিতেছে। স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার বহু জীব জন্তুর বাসস্থান হইয়াছে। যেখানে পূর্বে শস্যবটীকানিতে প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, এখন তথায় দিবাভাগেও শিবীর উচ্চরব শ্রুত হয়। যিবি নিরীক! হিন্দুর হিন্দু লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই শোচনীয় অবস্থা ঘটয়াছে। কেবল মন্দির নয়, কথোজের ক্রোমি আরও পর্বত হইতে অনেক ব্রহ্মমূর্তিও পাওয়া

প্রাপ্ত। কাশ্মীরে শিবলিঙ্গ যেমন হড়হড়ি, এই পর্বতেও ভ্রূপ অসম্ভ্য ব্রহ্মমূর্তি বিরাজ করিতেছেন।

কথোজরাজগণও ব্রহ্মার প্রতি স্নাতিকর তত্ত্ব প্রভা দেখাইতেন। এখানকার প্রাচীনলোকের মুখে গল্প শুনা যায় যে, একজন রাজা কোন নাগরাজের কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহাতে নাগরাজের উৎপাতে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, সেবে নগরদ্বারে এক ব্রহ্মমূর্তি স্থাপন করিলেন, তাহাতে তাহার সকল ভয় দূর হইল। নাগরাজ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। সেই ব্রহ্মমূর্তি অদ্যাপি নগরদ্বারে রহিয়াছে। একজন চীনপরিব্রাজক ১২৯৫ খৃঃ অব্দে এখানে আগমন করেন, তিনি ঐ মূর্তি দেখিয়া পকানন বুদ্ধদেবের মূর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহারই ভ্রম বলিতে হইবে, অথবা চীনপরিব্রাজক বৌদ্ধগণের রীত্যনুসারে যেখানে বাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

বাহা হউক, বৌদ্ধদিগের দেখিবার জিনিসও কথোজের নানাহানে পড়িয়া আছে, কোথাও বৃহৎ পাষাণে খোদিত ধ্যানীবুদ্ধমূর্তি, কোথাও প্রত্যেকবুদ্ধ, কোথাও বা বুদ্ধনির্কারণের আধ্যাত্মিক দৃষ্ট রহিয়াছে। এখনও অম্লসন্ধান চলিতেছে, কথোজের পুরাতত্ত্ব জানিবার অল্প ফরাসীপণ্ডিতগণ বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও কত কি নূতন কথা জানিতে পারিব।

আব হাওয়া।—কথোজের জল বায়ু বঙ্গদেশের জ্ঞার। এখানে জ্যৈষ্ঠমাস হইতে ভাদ্রমাস পর্যন্ত বর্ষা হয়, এই সময়ে উত্তরপূর্ব বায়ু বহিতে থাকে। দক্ষিণপশ্চিম বাতাস হইলে ভূমি শুষ্ক হয়। এখানে তাপমান বস্তুর ১০৩° তিন ডিগ্রির অধিক কখন উত্তাপ হয় না এবং যখন অধিক শীত হইতে থাকে, তখন ৫৭° ডিগ্রি পর্যন্ত নামিয়া আসে। দেশীয় এবং যুরোপীয় উভয়ের পক্ষেই এই স্থান অতি মনো-রম ও স্বাস্থ্যকর। কথোজদেশ সমতল, নদীতটস্থ স্থান অতিশয় উর্বরা ও কলশালী।

উৎপন্নপ্রসব।—ধান, পান, জুপারি, চন্দনকাঠ, ও রেবন্-চিনি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। লোহ, রৌপ্য, ও হস্তদস্ত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। খৃষ্টের নবম শতাব্দীতে দুইজন আরব্য ভ্রমণকারী কথোজে আগমন করেন, তাহারা লিখিয়াছেন "জগতের সর্বোচ্চতম মস্জিদ এই কথোজে পাওয়া যায়, এখানে প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানি হয়।"

জীবজন্তু।—হস্তী, মহিষ, সুগ ও গোমেঘাধি বন জঙ্গলে দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষা।—কম্বোজ ভূমির ও আদামী ভাষা প্রচলিত।
এখানকার কাবোজেরা এখানকার ভূমির ভাষা কথ্য কর;
এই ভাষাই এখানকার আদিভাষা বলিয়া বিবেচিত।

(কম্বোজ দেশের বিস্তৃত বিষয় জানিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি
পঠি করা আবশ্যিক—

Henri Mouhot's Travels in Indo-China, Cambodia, and Laos.

Die Völker der Oestlichen Asien von Dr. A. Bastian.—

J. Garnier's Voyage d' Exploration en Indo-Chine.—

Abel Remusat's Nouveaux Melanges Asiatiques.—Croizier's

L'Art Khmer; Légendes Indo-Chinoises relatives aux
monuments de pierre de l'ancien Cambodge.—Aymerier's

Notice sur le Cambodge, Géographie du Cambodge.—

Journal Asiatique 1882-83-84; Journal of the Indo-Chino

Society of Paris 1877-78; Journal of the Anthropological

Society of Bombay, Vol. I. p. 505-532.)

কম্বোজারী [ন্] (পুং) শব্দচিহ্ন।

কম্ব (জি) কং জলং জুং বা অস্তাতি, কম্-ত (কংসংভ্যাং-
বভৃতিভূতয়ঃ। পা ৫।২।১০৮।) ১ জলযুক্ত। ২ জুখী।

কম্বারী (জী) কং জলং বিতর্জি ধারয়তি, কম্-ত-অণ্-ভীপ্,
ভীষ্ বা। গাভারী বৃক্ষ। [গাভারীদেখ]

কম্ব (কী) কং জলং ততুল্যং শৈত্যং বিতর্জি, কম্-ত-ভূ।
উশীর, বেণামূল।

কম্ব (জি) কাময়তি, কম্-র (নমিকপ্পিন্ময়সকমহিংস-
দাপো রঃ। পা ৩।২।১৬৭।) ১ কামুক। ২ কাম্যতে
অনো। কমনীয়, মনোহর। (কাম্যং কত্রং কমনীয়ং
সৌম্যক মধুরং প্রিয়ম্। হেম ৬।৮১।)

কম্বা (জী) কম্-ট্রাপ্। ১ কমনীয়, মনোহর। ২ কামুকী।
৩ গজ। (“কমনীয়জলা কম্বা কম্পি জুকপদিগা।” কাশী
২৯।৪৪।)

কম্ব (জি) কিম্ পুণ্যোদরাদিভ্যাং বেদে কয়াদেশঃ। ১ কি।
কো বায়ু ইব যাতি গচ্ছতি অথবা কং জলমিব যাতি।
ক-বা-ড। ২ বয়ঃ, বয়ঃক্রম। (পুং) ৩ দৈত্যবিশেষ, অপর
নাম কাশার। বালিখিল্যের নিকট ইনি বেদের একখানি
সাহিত্য শিক্ষা করেন। (ভাগবত)

করলা। (হিন্দী) বৃক্ষাদির দ্ব্যবশিষ্ট বৃক্ষবর্ণ কঠিন পদার্থকে
এদেশে সাধারণতঃ “করলা” বলে। আপাততঃ করলা দুই-
প্রকার দেখা যায়, অবিদগ্ধ কাঠাদির করলা আর ভূগর্ভোত্তলিত
খনিজ করলা। খনিজ করলাকে সংস্কৃত ভাষার “মুদকার”
বলে, এবং কাঠের করলা “অকার” নামেই প্রচলিত। খনিজ
করলাও ভূগর্ভস্থ আভ্যন্তর ভাগে দ্ব্যবশিষ্ট রাসায়নিক

ক্রিয়াউৎপন্ন বৃক্ষাদিরই অবশিষ্টাংশ বটে। ভীষণরী হইতেও
করলা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প।

“করলা” এই পদার্থের বাক্যলা নাম নহে, করলা হিন্দী
নাম। যথা “করলা কি করলা ছুটে বব আর করে পরবেশ।”
ইহার সংস্কৃত নাম অকার “অকারঃ শব্দ ধৌত্তমঃ মলিনবৎ
ন বুদ্ধতি।” এই “অকার” শব্দের অপভ্রংশ “আকার” ইহার
বাক্যলা নাম। এখন করলা নামই চলিত হইয়া গিয়াছে।
ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা—

হিন্দী—কোরলা, করলা।

বাক্যলা—আকার, আভ্রা, করলা।

মাক্শিকাত্য—কোলসা।

তামিল—করি বা সিমাই করি।

ভেলগু—বোগুণ্ড বা সিম বোগুণ্ড।

মলয়—করি।

কর্ণাটা—ইদাম্।

শুজরটা—কোরলো বা কোলসো।

গৈংহলী—অদ্রু।

আরবী—কাম।

পারসীক—জুবাল্।

ব্রহ্ম—মিছএ বা মৌদুয়ে।

করলার প্রাকৃতিক গঠনপ্রণালীর নিয়মানুসারে পদার্থ-
তত্ত্ববেত্তারা করলার করটা শ্রেণী নির্ধারণ করিয়াছেন।
খনিজতত্ত্বজ্ঞেরা সাধারণতঃ ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত
করেন, তন্মধ্যে একভাগ শিলাজতুবিশিষ্ট, অপর ভাগে
উহা নাই। শিলাজতুহীন করলাকেই “পাথুরে করলা”
বলে। পাথুরে করলা বড় শক্ত হয়। ইহা আলাদিন্রপে
ব্যবহৃত হয়। এই করলা পৃথিবীর সমস্ত ভূমি হয় না।
আমেরিকার এই জাতীয় করলার দোয়াত, বাক্স প্রভৃতি
ব্যবহার্য্য বস্তুও প্রস্তুত হয়। শিলাজতুবিশিষ্ট করলার নানাবিধ
শ্রেণী ও প্রত্যেক শ্রেণীর স্বতন্ত্র নাম আছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন
শ্রেণীতে শিলাজতুর পরিমাণের বিভিন্নতা আছে। পাথুরে
করলা অপেক্ষা এই করলা অনেক কোমল। ইহার
আপেক্ষিক গুরুত্ব পাথুরেকরলা অপেক্ষা অল্প। পাথুরেকরলার
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৩ হইতে ১.৭৫ পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু
শিলাজতুবিশিষ্ট করলার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫ অপেক্ষা
প্রায় বেশী হয় না।

পিচ করলা—এই জাতীয় করলার বর্ণ লবৎ ধূসর বৃক্ষ-
বর্ণের মধ্যবলের ভাৱ। ইহা অস্বাদ্য নিকৃষ্ট হইলে পটু
পটু করিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু

তাহার পরেও যদি উত্তাপ পায়, তাহা হইলে আবার সব গলিয়া ডেলা হইয়া জলিতে থাকে। জলিবার সময় এই করলার অম্লিশিখা দ্বয় পীতবর্ণ দেখায়। পিচকরলা জলিবার সময় যখনই উটাইয়া না দিলে ইহার আশ্রয় নিবিয়া যায়। কারণ ইহা গলিতে গলিতে জমিয়া যায় এবং আশ্রয় “মেড়ো” পড়িতে থাকে। ইংলণ্ডের অন্তর্গত নিউকাসল নামকস্থানের খনিতে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

গুট্টকে করলা (Cherry coal)—ইহা দেখিতে ঠিক পিচ করলার মত। পিচকরলার মত ইহাও অম্লিশিখা করিবামাত্র ফাটিয়া ছড়াইয়া যায়। পিচকরলার মত এ করলা গলিতে গলিতে জমাট বাঁধিয়া যায় না। গুট্টকে করলা বড় ভঙ্গপ্রবণ, একজ্ঞ খনি হইতে তুলিবার সময় যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ইহা পুড়িবার সময় পরিষ্কার পীতবর্ণের শিখা উঠিতে থাকে। ইংলণ্ডের গ্ল্যানগো নামক স্থানের খনিতে এই করলাই অধিক।

বাতি করলা—ইহার ঔজ্জ্বল্য নাই। ইহার গঠন বেশ দৃঢ় এবং মৃণ্ম। অম্লি লাগিলে ইহা এবড়ো খেবড়ো হইয়া ফাটিয়া চটিয়া যায়। বাতি করলা অতি শীঘ্র জলিয়া যায় এবং ইহা হইতে পীতবর্ণের অম্লিশিখা উঠিতে থাকে। ইহা অগ্নিতে গলে না, পাথুরে করলার ভায় পুড়িতে থাকে। ইহা হইতে এক প্রকার বাতি প্রস্তুত হয়। ইহাতেও দোয়াত, নন্দদান প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কাঠকরলা—যে করলা হইতে কাঠের অংশ এখনও সম্পূর্ণরূপে করলার পরিণত হয় নাই, তাহাকে “কাঠকরলা” বলে। ইহার বর্ণ দ্বয় পাটুকিলা কৃষ্ণবর্ণ। ইহা পুড়িবার সময় অতিশয় গন্ধ নির্গত হয়। অপরীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহার গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করিলে ইহার অপরিবর্তিত কাঠাংশ সকল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উপকূলভাগে এই করলা পাওয়া যায়। ইহাতে জলীয়মাংশ অধিক থাকে; এমন কি ইহাতে মত অজারসার থাকে, জলীয়মাংশ প্রায় ততটা থাকে। প্রাচীনতম করলাস্তর অপেক্ষা এরূপ করলাস্তরগুলি আধুনিক বলিয়া অনুমিত হয়।

মসীকরলা—ইহাও একপ্রকার শিলাজতুবিশিষ্ট করলা। ইহা বৃক্ষশাখার ভায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া ভূস্তর মধ্যে জন্মে। ইহা কোমল এবং ভঙ্গপ্রবণ, এবড়ো খেবড়ো ভাবে চিড় পাওয়া যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব জল অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহার বর্ণ ঠিক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রত্নমলের মত। ইহার রত্ননের ভায় এক প্রকার ঔজ্জ্বল্য আছে। দক্ষিণ ভারতে ইহা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে বাহা উৎকৃষ্ট, তাহা

হইতে কাঁচকড়ার গহনার মত এক প্রকার করলা প্রস্তুত হয়। যখনগুলি আলানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা যখন পুড়িতে থাকে, তখন সবুজবর্ণের শিখা উঠিতে থাকে, যেটেক্টলের কড়াগন্ধ বাহির হয়। ইহাতে শতকরা ৩৭ ভাগ দাহ ও বায়বীয় পদার্থ আছে।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই করলার খনি আছে। এই সকল খনিতে যে সকল করলা পাওয়া যায়, তাহা যুরোপের করলার ভায় ভূস্তর-সংগঠনের অঙ্গার যুগের বস্তু নহে। দাক্ষিণাত্যে যে করলা পাওয়া যায়, তাহাকে গোণ্ড-বন করলা (Gondwana system) বলিয়া থাকে। ভূস্তর সংগঠনের দ্বিতীয় যুগে যে সকল অঙ্গারস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের গঠনপ্রকরণ যেমন এই গোণ্ডবন করলাও সেইরূপ। দাক্ষিণাত্যের বহির্ভাগে যে সমস্ত করলার খনি আছে, তাহার গঠনভঙ্গিমা ভূস্তর-সংগঠনের তৃতীয় যুগের ভায়।

গোণ্ডবন করলা উত্তর পূর্বাঞ্চলে ও মধ্যভারতে পাওয়া যায়। ভূস্তর-গঠনের তৃতীয় যুগোৎপন্ন করলা সৈন্ধবীয় ও গান্ধ্য প্রদেশের বহির্ভাগে সকল স্থানে উৎপন্ন হয়। এই দুই প্রকার করলার মধ্যেও আবার ভাল মন্দ প্রভেদ আছে। উভয়বিধ করলার মধ্যে বাহা এ পর্য্যন্ত সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সর্বোৎকৃষ্ট যুরোপীয় করলার ভায়। গোণ্ডবন করলার ভয়ভাগ কিছু বেশী, কোন স্থানের করলায় আবার জলীয় ভাগও বেশী থাকে। তৃতীয় যুগের করলার ভয়ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং দাহ্যপদার্থের অংশ বেশী থাকে। গোণ্ডবন করলা অপেক্ষা ইহা লঘু। গোণ্ডবন করলায় মধ্যে বাঙ্গালা দেশজাত করলা ও তৃতীয় যুগের করলার মধ্যে আসামের করলাই প্রধান গণ্য। এই দুই দেশের করলায় কি পরিমাণ দাহ্য পদার্থ, জলীয়মাংশ ও ভয় আছে, তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইল—

বাঙ্গালার করলা			আসামের করলা	
সাধারণ		উৎকৃষ্ট	সাধারণ	উৎকৃষ্ট
ভয় ...	১৬.১৭	৪.৪০	৩.৯	৭.৪
জলীয়মাংশ ...	৪.৮০	১.৬	৫.০	...
দাহ্যপদার্থ (জলশূন্য) ২৫.৮৩	২৮.১২	২৮.১২	৩৪.৬	৩৩.৫
অজারসার ...	৫০.২০	৬৬.৫২	৫৬.৫	৬৬.১

বাঙ্গালার যে সকল স্থানে করলার খনি আছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল ;—

রাণীগঞ্জক্ষেত্র—ভারতবর্ষের যেখানে বহু করলা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই ক্ষেত্রই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রয়োজনীয়। কলিকাতার অতি নিকটে এবং

ভাট্টের প্রধান রেলপথের উপর অবস্থিত বালিয়া ইয়ার ব্যবসার অতি বিস্তৃত। পশ্চিম বালিয়ার পার্শ্বভাগেই এই ক্ষেত্র, কলিকাতা হইতে ১২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৫০০ শত বর্গমাইল জমি হইতে করলা উৎপাদিত হয়, কিন্তু অল্পমান হয় যে ইহার বিস্তৃত স্থানে করলার বিনি আছে, কারণ বড়ই খনি বিস্তৃত হইতেছে, ততই পূর্বদিকে বনির গভীরতা ও করলার আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। এই ক্ষেত্র হইতে বহিঃ নষ্ট হইবে তাহা (অর্থাৎ কড়তি পদ্ধতি) বায় দিরা প্রায় ১৪০০০০০ টন করলা পাওয়া যায় বলিয়া অনুমান হইয়াছে। এই ক্ষেত্রের করলার শিরাগুলির (Seams) মধ্যে কোন কোনটি প্রায় ৭০। ৮০ ফুট মোটা। করলার শিরা বেশী মোটা হইলে তাহাতে ভাল করলা পাওয়া যায় না।

বড়িয়া বা খেড়িয়া—রাণীগঞ্জের করলাক্ষেত্র হইতে পশ্চিমে ৮ ক্রৌঞ্চ দূরে, দামোদর নদীর নিকটে অবস্থিত। এই ক্ষেত্র সমস্তই মানকুম জেলার অধীন। প্রায় ৫০০ মাইল বিস্তৃত। ইহার শিরার যে করলা পাওয়া যায়, তাহা রাণীগঞ্জের করলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক ইহাতে আলানি অংশ অধিক আছে। এই ক্ষেত্রের শিরাগুলি সকল স্থানে সমান মোটা নহে। এই ক্ষেত্র হইতে ৪৬৫০০০০০ টন করলা উঠে।

বোকারোক্ষেত্র—বড়িয়া ক্ষেত্রের পশ্চিমে ২ মাইল দূরে দামোদর নদীর নিকটে এই ক্ষেত্র অবস্থিত। ক্ষেত্রটি ২২০ মাইল বিস্তৃত। এখানকার করলা মধ্যবিধ। শিরাগুলি খুব দীর্ঘ। একটি শিরা ৮০ ফুট মোটা। এখানে প্রায় ১৫০০০০০০০ টন করলা পাওয়া যাইতে পারে।

রামগড়ক্ষেত্র—বোকারো ক্ষেত্রের দক্ষিণে এই ক্ষেত্র অবস্থিত। ইহার করলা বড় ভাল নহে। এখানে শিরা অনেক আছে, কিন্তু সেগুলি বড় বেশী দূর বিস্তৃত নহে। পশ্চিম সীমার হাজারীবাগ হইতে রীতি পর্যন্ত এক রাস্তা আছে। অনেক অনুমান করেন যে, এই দিকে আপনা হইতেই জমির উপরিভাগে করলা বাহির হইয়া পড়ে, বেশীর লোকেরা এই করলা সংগ্রহ করিয়া রীতিতে বেচিতে লইয়া যায়। রামগড়ক্ষেত্র ৪০ বর্গমাইল বিস্তৃত এবং এখানে প্রায় ৫০০০০০০০ টন করলা উঠিতে পারে।

উত্তরকরণপুরক্ষেত্র—রামগড়ের পশ্চিমে। দামোদরের উৎপত্তিস্থানের নিকটে এই ক্ষেত্র অবস্থিত। প্রায় ৩৭৫ মাইল বিস্তৃত। করলাও প্রায় ৮৭৫০০০০০০ টন উঠিতে পারে।

দক্ষিণকরণপুর—উত্তর করণপুর ক্ষেত্রের দক্ষিণে প্রায় ৭২

বর্গমাইল বিস্তৃত। এখানে করলা প্রায় ৭৫০০০০০ টন পাঠে। এই বনির করলা বড় উত্তীর্ণজনক।

চৌপক্ষেত্র—এই ক্ষেত্র কেবল ৮ বর্গমাইল বিস্তৃত। হাজারীবাগ মানকুম উপর বিস্তৃত।

ইটকুরীক্ষেত্র—হাজারীবাগের ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত। এখানে কয়েকটি নামক করলার শিরা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অগরনক্ষেত্র—লোহারডাঙ্গা জেলার কোরেল নদীর ধারে অবস্থিত। কোরেলনদী শোণমের একটি উপনদী। ক্ষেত্র প্রায় ৯৭ বর্গমাইল বিস্তৃত। করলাও ২০০০০০০ টন উঠিতে পারে। এখানেও মাটিতে আপনা হইতে যে করলা পাওয়া যায়, তাহা বড় ভাল নহে।

ইতারক্ষেত্র—অগরনক্ষেত্রের পশ্চিমে ৭৮ বর্গমাইল বিস্তৃত। করলা ভাল।

ডালটনগঞ্জক্ষেত্র—কোয়াল নদীতীরে ২০০ বর্গমাইল বিস্তৃত। শিরা অধিক নাই; এক একটি ৬ ফুট মোটা। করলা খুব ভাল। এখানে অনুমান ১১৬০০০০ টন করলা উঠিতে পারে।

করহারবারিক্ষেত্র—কলিকাতা হইতে ২০০ মাইল পশ্চিমে হাজারীবাগ জেলার এই ক্ষেত্র অবস্থিত। এ ক্ষেত্র ৮ বর্গমাইল বিস্তৃত। এখানকার করলা খুব উত্তম। এই ক্ষেত্রে ৩ টি প্রধান শিরা আছে। শিরাগুলি গড়ে গড়জাই প্রায় ১৬ ফুট করিয়া মোটা। এখানে প্রায় ১৩৬০০০০০ টন করলা উঠিতে পারে। ইন্ডিয়ান কার্বা চালাইবার জন্য রাণীগঞ্জ অপেক্ষা এখানকার করলাই ভাল।

দেওঘরক্ষেত্র—এখানে জয়ন্তী, সাহাজোরী, ও কুন্ডিং কড়েরা নামক তিনটি ক্ষেত্র পরস্পর অতি নিকটে অবস্থিত। এখানে নীনা প্রকার করলা উঠিয়া থাকে। জয়ন্তীর করলা অতি উৎকৃষ্ট। সাহাজোরির করলা ভাল নহে।

রাজমহলপার্কক্ষেত্র—রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমাংশে এই ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত, কিন্তু এক্ষণে প্রায় ৭০ বর্গমাইলের কিছু অধিক স্থানে কার্বা আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে পর্বতের শিখর অবধান পড়ার সমস্ত ক্ষেত্র এখন হুড়া, চাপারভিটা, পাচগড়া, নোহতুড়ি ও ব্রাহ্মী এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখানকার করলা ভাল নহে, প্রায়ই পাথরের মত। কোবড়াগেই শিরাগুলি বড় বিস্তৃত নহে; পূর্বদিকে খনি করলার শিরা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এখানকার করলা কুঠারির মত অতি সুবিধা হয়, কারণ নিকটেই গঙ্গানদী।

উড়িয়ার ব্রাহ্মী নদীর ধারে প্রায় ১০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত করলার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও এখানে কার্য আরম্ভ হয় নাই। এখানকার করলা ভাল নহে। ক্ষেত্রটির নাম ভালটির।

আসামে যে করলি ক্ষেত্র আছে, তন্মধ্যে ডকলা পাহাড়ের ক্ষেত্রে গোণ্ডবন করলা পাওয়া যায়, কিন্তু এখানকার করলার তরং ৬ ফুটের অধিক মোটা নহে, কাজেই এ ক্ষেত্রে কোন কার্য হয় না।

বলিয়া ও অরুণীপাহাড়ের ক্ষেত্র—এখানে তৃতীয় গঠনের তৃতীয় যুগের তরুর ভাঙ্গ এবং প্রাগীযুগের তরুর ভাঙ্গ করলার তরং পাওয়া যায়। মেরো-বে-লির্কা নামক স্থানে যে করলা পাওয়া যায়, তাহাতে পাইরীটাজ নামক গন্ধক-প্রধান ধাতুর ভাগ অধিক বলিয়া আলানি কার্যে ব্যবহৃত হয় না, তবে সিলিং টেশনে ব্যবহৃত হয় মাত্র। এইস্থান ও ল্যাংগ্রিন নামক স্থানের করলার তরং তৃতীয়যুগের এবং চেরাপুঞ্জির করলা প্রাগীযুগের। অরুণীপর্বতের আম-উর, লা-কা-ডোং, নরপুর, শা-টিং-বা ও সেরমাং নামক স্থানের করলার অকার্যকারিতার ভাগ বণ্ঠিত আছে। এখানে একমাত্র লা-কা-ডোং ক্ষেত্রেই ১৫০০০০০ টন করলা উত্তিতে পারে।

গারোপর্বতক্ষেত্র—দরঙ্গগিরি ক্ষেত্রে প্রায় ৭ ফুট মোটা করলার শিরা আছে, কিন্তু ইংরাজেরা সেখানে বাইতে পান না বলিয়া করলা উঠান হয় না।

উত্তরআসাম—মাকুম নামক ক্ষেত্রে অনেকগুলি বড় বড় করলার শিরা আছে, তন্মধ্যে একটি প্রায় ১০০ ফুট মোটা, আর একটি ৭৫ ফুট, এখানকার করলা অতি উৎকৃষ্ট। এখানে প্রায় ১৮০০০০০ টন করলা আছে। জরপুর নামক ক্ষেত্রের করলা তত ভাল নহে। দুই চারিটা শিরার ভাল করলাও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রায় ১০০০০০০ টন করলা আছে। নাজীর নামক ক্ষেত্রে কতকগুলি শিরা আছে, তাহার অধিকাংশই ৩০ ফুট বা তাহা অপেক্ষাও মোটা। এখানেও জরপুর ক্ষেত্রের মত করলা উত্তিবে। জাজি ও ডিনাই নামে আরও দুইটি ক্ষেত্র এখানে আছে।

ব্রহ্মদেশের মধ্যে ও ভারতের পূর্বাংশে নিম্নলিখিত স্থানে করলা পাওয়া যায়—

আসামের প্রদেশের অন্তর্গত বরদ্বারীপে ও খনিও পেনি-কিরং ধীপে ১টি খনি আছে। রামরীপে যে খনি আছে, তাহার একটি শিরা প্রায় ৬ ফুট মোটা। চেন্নাবাহুমেও করলার খনি আছে। পেন্ড প্রদেশে বৈয়টবোয়ার খনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু কিছুকাল পরে এখানকার

কার্য বন্ধ হইয়া যায়। এতদতির ভেনাসরিম ও উত্তরব্রহ্মের নানান স্থানে করলার খনি আছে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে স্তোতাপানি, ইরিয়া ও মোরন নামক ক্ষেত্র তিনটিই শোণনবনের নিকটে। এখানে শিরার যে করলা পাওয়া যায়, তাহাতে বেশ কার্য চলে। সিকরাউলি নামক স্থানের কোটাক্ষেত্রের কার্য সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে। সোহাগপুর ক্ষেত্রের শিরাতুলি আকৃতভাবে সন্নিবেশিত, সুতরাং এখান হইতে করলা উঠাইবার বড় সুবিধা। এতদতির কোহিলা, উমরিয়া, কোরন, ঝিল-মিলি, বিশ্রামপুর, লক্ষণপুর প্রভৃতিস্থানে করলার ক্ষেত্র আছে। ইহার মধ্যে উমরিয়ার ক্ষেত্র সর্বাপেক্ষা বড়।

মধ্যভারতে মহানদীর নিকট রায়গড়, হিজির, উদয়পুর ও কোর্কা ক্ষেত্র। ইহার মধ্যে কোর্কা ক্ষেত্রের করলা বেশ ভাল ও শিরা মোটা। নর্মদানদী ও সাতপুর পর্বতের মধ্যে মহাপানিক্ষেত্র বেশ বড়। এই ক্ষেত্রের করলা নদী প্রোট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের কার্যে চলে। এতদতির তাওয়ার উপত্যকার শাহপুর বা বিটুলক্ষেত্র, পেন্ট উপত্যকা, এবং বর্ধ-গোদাবরী উপত্যকার বন্দরক্ষেত্রে বেশ করলা পাওয়া যায়।

নিজামরাজ্যে বর্কা বা চণ্ডক্ষেত্র—বেশ বড় খনি। এখানে বরোরা, ধুওল, বুন, বুন ও পাপুরে মধ্যে এবং বটী ও পাউনির মধ্যে করলা পাওয়া যায়।

বোম্বাই বিভাগে—কচ্ছ, সিদ্ধ, বোদান গিরিবন্দে' মাহ-নামক স্থানে, হরগাই গিরিপথের উপর শাহরিগ, লুনি পাঠানরাজ্যে চমারলং, ওয়ালীরা রাজ্যে কানিগরম, লবণপর্বত, কালাবা প্রভৃতি স্থানে করলার খনি আছে। পঞ্জাবে লবণ পর্বতের মধ্যে অব, জুজেলবর, চামিল, ফুট, শোভা খাঁ, দেবল, হরপুর (মীলবন), কেকুলি, দাঙং, পিড়, ভগবানবর প্রভৃতি স্থানে করলা পাওয়া যায়। পিড়-খনির করলাই এদেশে আলানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ভগবান-বরের করলার পাইরীটাজনামক গন্ধকপ্রধান ধাতুর ভাগ বেশী এবং বড় কাটা এতদতির ইহা আলানি কার্যে ব্যবহৃত হয় না।

হিমালয় পর্বতে পকনদীর তীরবর্তী ডাঙলি, লক্ষনাবাদ পর্বতের উত্তরপশ্চিম ভাগে প্রাগীযুগের করলার তরং দেখিতে পাওয়া যায়। শিবালিক পর্বতে করলার তরং পর্বার ও অপরিশুদ্ধ করলা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কার্য হয় না। সিকিমে ডালিকোট নামক স্থানে গোণ্ডবনের তরং জুজ করলা পাওয়া যায়। এখানে একপ্রকার করলার ওতা

পাওয়া যায়, তাহা শেখনিদের কৃষ্ণসীসক-বৎ পদার্থের ভাৱ হইরাহে।

মাস্ত্রাজে বেদাধিদোশ, মাস্ত্রাজের, লিঙ্গা, সিদ্ধারনী, কামার, টাপুর, অস্তর পাঁচ, বসী ও পাওনি প্রভৃতি স্থানে করলা উঠে।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সর্বাধিক করলা করলা তুলিয়ার কার্যের সূত্রপাত হয়। তখনকার বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের হিটলি ও সামার নামক দুইব্যক্তি ইহার একচেটিয়া ব্যবহার করিতেন। ইহার প্রথমেই রাণীগঞ্জে কার্যারম্ভ করেন, কিন্তু প্রথম প্রথম কতিপয় হওয়ার কার্যবদ্ধ করিয়া দেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যবদ্ধ থাকে। তৎপরে কোকানামে একব্যক্তি কার্য করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনিও বিশেষ কোন সুবিধা করিতে না পারায়, ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্য বদ্ধ দেন। আলেকজান্ডার এণ্ড কোং নামে একদল বণিক ঐ বৎসরই আবার কার্য করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহারের হতে ৫০ টি খনির কার্য চলিতে থাকে। ২৭ টি এজিন ও ১৬০০ লোক এই সময় কার্য করিতে থাকে। এ সময় ১০ ফুট পর্যন্ত গভীর করিয়া খনন করা হইরাছিল। দামোদরনদীর তল পর্যন্ত এই খনি বিস্তৃত, বিস্তারও তখন প্রায় ৩ মাইল ছিল। ১৮৪০ সালে এখান হইতে ১৫ লক্ষ মণ করলা উত্তোলিত হইরাছিল। তাহার পর ক্রমশঃই পরিমাণ বাড়িতে লাগিল, শেষে ১৮৬০ সালে প্রায় চতুর্গুণ হইয়া উঠিল।

করলার ব্যবহার।—ভারতের করলা প্রায়ই অধিকাংশ রেলওয়ের কার্যে ব্যবহৃত হয়। রাণীগঞ্জের বা বাঙ্গালা দেশভিত্ত করলাই কলিকাতার কলকারখানার ও জাহাজ-নিতে ব্যবহৃত হয়, এখানকার ছোট ছোট করলাই ইটের পাঁজার লাগে, আর সর্বাধিক ক্ষুদ্র করলা গৃহস্থের আলানি কার্যে ব্যবহৃত হয়।

করলা উত্তোলন।—বাঙ্গালার করহারবারি কেন্দ্র বদিও সর্বাধিক ক্ষুদ্র, কিন্তু এখানে উত্তোলনপ্রথা সর্বাধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার অভ্যন্তর কেন্দ্রে এই স্থানের অল্পকরণেই কার্য চলিয়া থাকে। করলার খনিতে প্রাতে ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কার্য চলে। আবহাওয়া বন্ধ রাতি পর্যন্ত বেশী খাটাইয়া লওয়াও হয়। সপ্তাহের মধ্যে ৪ দিন বেশ পুরানমে কার্য চলিতে থাকে। খননকার্যে নিরপ্রেমীর হিন্দু ও মুসলমান এবং সাঁওতাল কোল প্রভৃতি জাতি নিযুক্ত হয়। প্রতি রবিবারে

ইহাদিনকে বেতন দেওয়া হয়। বাঙ্গালার “বাটরী” নামক জাতি এই খননকার্যে বিশেষ দক্ষ। ইহারাই এখানে অধ্যাকতা করিয়া থাকে এবং খননকার্য শিক্ষা দেয়।

খনির মধ্য হইতে জলনিষ্কাশন করিবার জন্ত এঞ্জিনের সাহায্যে জল হেঁচিয়ার (Pomp-Machine) কল বসান আছে এবং বাহু চলাচলের জন্ত ধূমনের ভাৱ সূত্রপত তত্ত নিশ্চিত হইয়া থাকে, অনেক খনিতে আবার ইহা নাই। অন্ধকারবশতঃ লোকে মশাল আলিয়া কার্য করে। যে খনিতে তৈল বা গন্ধকের পরিমাণ অধিক, সেখানে এই মশালের আশ্রয় হইতে সময়ে সময়ে মহাবিপদ ঘটে।

খনকেরা খনির নিকটেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুটার বাধিয়া বাস করে। প্রত্যেক হুটারে একখানি ক্ষুদ্র বাসগৃহ, একটি শস্ত ও একটি গোশালা থাকে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে খনিতে কার্য হইতে থাকে, তখন ইহার সাইদানে কার্য করে, কিন্তু বর্ষার ৩ মাস (জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর) ইহার আপনার চাব বাস করে। অনেকে আবার সংবৎসর কেবল খনিতেই কার্য করিয়া থাকে। ইহার সাইদানে সপ্তাহের দুই পাঁইয়া থাকে।

করলার ব্যবসায়—করলার আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। যে সকল জাহাজ এ দেশ হইতে যায়, তাহাতে খরচের জন্ত বাহা বিক্রীত হয় তাহাই ভারতের করলার রপ্তানি বলিয়া গণ্য, আর যে সকল দেশে সহজে করলা পাওয়া যায় না, সেই সকল দেশে (ভারতের) অভ্যন্তর হইতে করলা আনিয়া কার্য নির্বাহ করে, ইহাই আমদানী বলিয়া গণ্য হয়। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের জন্ত বাঙ্গালা বা নিজামের রাজ্য হইতে করলা আমদানী করিতে হয়।

কোককরলা—সচরাচর গৃহস্থ বাড়ীতে যে করলা ব্যবহৃত হয়, তাহা খনিজ করলা নহে। তাহা কলে গোড়াইয়া, উহা হইতে তৈলাদি বাহির করিয়া গহীরা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে “কোক” বলে। খনিজ করলাকে সাম্য ভিত্তঃ “কাঁচা করলা” বলিয়া থাকে। কোক এদেশেও হয়, আবার অভ্যন্তর দেশ হইতেও ভারতে আমদানী হয়। এখানে যে কোক হয়, তাহা দুই প্রকার, কঠিন ও কোমল। কঠিন কোক লোহার কারখানা ও ছোট খাট এঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়; কোমল কোক পুড়িবার সময় ধূম হয় এবং রক্তমাংস-কার্যে ব্যবহৃত হয়।

অনেক বিতরণ ডাক্তারে বলিয়া থাকেন যে কলিকাতা ও তরিকটবর্তী স্থানে যে অধিকাংশ লোকে অরুণোপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রধান কারণ এই করলার

আলে বকরি করিয়া থাকে। কথটা এমনত অসম্ভব যদিও
প্রত্যক্ষবাহিনীসকলের অসামান্য আকর্ষণ করিতে পারে
নাই, কিন্তু নিত্যত অসম্ভব যদিও বোধ হয় নাই।

করুয়া (জী) কো বাহু ইব খাতি গচ্ছতি কিংবা কং অগমিব
খাতি। ক-বা-ত করু, তজ ভিত্তি হা-ক (আতো হুশসর্গে
ক। পা ৩। ২। ৩) টীপ চ। অসামান্য টীপ। পা ৪। ১। ৪।
বহু। কাকোণী।

করাদি (দেশজ) ১ করাবাস। ২ করাবিহীন ভায় আট-
কাইরা রাখা।

করাদু (জী) অজ্ঞানের কর্তা। হিরণ্যকশিপু জী। প্রজ্ঞানীর
মাতা। দানবগতি হিরণ্যকশিপু করাদুর গর্ভে সংগ্রহি, অমু-
দ্রাণ, প্রজ্ঞান ও ব্রাহ্ম এই চারিগুণ জন্মে। (ভারত ৬। ১৮। ৯)

করার (হিন্দী) বনভিত্তির, চিকোরগাখী। [চিকোর দেশ।]

করাল (আরব্য) খাতিরি পরিমাপক ব্যক্তি; বাহ্যিক ক্রোড়া ও
বিক্রেতা কর্তৃক অধমোদিত হইয়া বিক্রয় বস্ত্র মাগিয়া দেশ।

করালী (দেশজ) করালের কার্য।

করী (দেশজ) কই বাছ।

করেক (দেশজ) কএক, কতিপয়।

করেন্দ (আরব্য) কএদ, আটক।

কর (পুং) কীর্তিতে বিক্রিয়াতে অসৌ জনেন বা কর্ণপি বা
করণে অপ্। ১ হস্ত। ২ হাতির শুড়। ৩ ক্রিয়ণ। ৪ করকা,
বধৌপল। ৫ প্রত্যয়। ৬ বিষয়। ৭ কষ্ট। ৮ উপপদ পূর্বে
থাকিলে কারক, জনক ইত্যাদি বুঝায়। বধা অর্থকর ইত্যাদি।
৯ শুক। ১০ রা-ক (আতোহুশসর্গে। পা ৩। ২। ৩)। রাজস্ব
অর্থাৎ মূগতির আশ্রয় অংশ। সাধারণতঃ ইহাকে ষাঁড়ীনা বলিয়া
থাকে। ইহার সংস্কৃতপরিমাণ মাগধের, ধলি, কীর ও প্রত্যয়।
[করো বধৌপলে রক্ষৌ পালৌ প্রত্যয়িতত্ত্বৈঃ। বেদিনী।]

“ক্রমবিক্রম মধ্যমঃ ভক্তকঃ সপরিবারম্।

যোগ্যকেনক সংশ্রেক্য বশিষ্ঠো দাপয়েৎ করাদিঃ।

বধী কলেন হুজ্যত রাজা কঠী চ কর্ণগাম্।

ভবাবেক্ষ্য নুপো রাষ্ট্রে করয়েৎ সততং করাদিঃ।”

মূগতি ক্রমবিক্রম প্রভৃতির লাতীলাভ দেখিয়া কর সংগ্রহ
করিবেন। করকর্তা ও রাজা উভয়েই বাহাতে কলতাপি হইতে
পারেন, সেইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজার করনির্ধারণ কর্তব্য।

“পঞ্চাশতাব্দে আদ্যে রাজা পঞ্চবিংশতিবর্ষে।

বাতানানটমো তাগঃ বঠো বাদন এব বা।”

রাজা পঞ্চ ও স্ববর্গদিগের পঞ্চাশতাব্দে, একতাল এবং
হুম্বি উৎকর্ষ ও অহংকর্ষ বিবেচনা করিয়া বঠের বর্ষ,
অটন বা বাদনত্বগণের একতাল গ্রহণ করিবেন।

“আদ্যদীত্যং বর্ষভাগঃ জ্ঞানমমমুগতিবান্।

গন্ধোবধিরসানাক পুশমুলকল্য চ।

লজ্জাককল্পানাক চম্পকঃ বৈদগল্য চ।

মুগ্ধানাক ভাতানাক সর্ল্যানমদর চ।”

বৃক, প্রভর, মধু, হুত, গন্ধজবা, রস, পুশ, মূল, কল,
পজ, শাক, তুল, চর্ম, পিটক, সুবর্ণজি ও প্রভরপাজ
প্রভৃতির বঠাংশে রাজার আশ্রয়।

“ক্রিয়মাণো হপ্যাদিত ন রাজা প্রোজিরাম করম্।

ন চ দুবাত গঙ্গীর্দেহে জিরো বিধৌ বসন্ত” (মহু ৭ অঃ)

রাজা নিত্যত বনবাস হইলেও প্রোজিরের ধন গ্রহণ
করা উচিত নহে; কিন্তু প্রোজির ব্যবসারী হইলে উহাকে
রাজকর প্রদান করিতে হইবে।

এই প্রকা ক্রম করিতে কত মূল্য লাগিয়াছে, ইহা বিক্রয়
করিলে কত লাভ থাকিবেক, এই প্রকা রক্ষা করিতে বশি-
ষ্ঠের কিরূপ ব্যয় হইয়াছে, এবং চৌরগণি হইতে নিরাপদে
রক্ষা করিতেই বা তাহার কিরূপ ব্যয় হইয়াছে। ইদানীং
বিক্রয় করিলেই বা কত লাভ থাকিতে পারে এই সমুদয়
বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠের বিক্রয় প্রব্যের মূল্য নির্ধারণ
করিতে হইবে।

মূগতি কেবল নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে যে ব্যয় বা
পরিশ্রমাদি হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া একদেশপরীকরণে
নির্ধারণ করিবেন না। কিন্তু ক্রয়ক, বশিষ্ঠ প্রভৃতির সমস্ত
কার্য পর্যালোচনা করিয়া নির্ধারিত করিতে হইবে।
জলোকা, বৎস ও ভ্রমরগণ বেক্রম জন্মে জন্মে রক্ত, ক্ষীর
ও মধু ভক্ষণ করিয়া থাকে, তুগতিও সেইরূপ বশিষ্ঠাদির
বাহাতে মূলধনের উচ্ছেদ না হই, এইরূপে অন্ন অন্ন করিয়া
কর গ্রহণ করিবেন।

রাজ কর্তৃক সর্বস্বাধারী প্রোজিরের যদি অসামান্যে
অবলম্ব হইতে হয়, তাহা হইলে সেই মহীপতির রাষ্ট্র ও অধিরাজ্য
দুখার অবলম্ব হয়। অতএব রাজা শত্রু ও জানাঘটনানে
প্রভূত হইয়া বাহাতে ধর্ম বিকৃত না হয়, প্রোজিরগণ
চৌরাদির ভয় হইতে নিরুদ্বেগে থাকিতে পারেন, তাহা
অবলম্ব করিবেন। রাজকর্তৃক অসম্মিত প্রোজির যে বর্ষাধীন
করেন, তদ্বারা মূগতির আশ্রয়, ধন ও রাষ্ট্রের সুখি হইয়া
থাকে। (মহু)

১১ বর্ষের দক্ষিণরাষ্ট্রী কারকের উপাধি বিশেষ। ইহার
৮ ঘরের মধ্যে পরিগণিত।

করক (রী পুং) কিমতি বিক্রিণি জনকঃ করোতি
কলমজ বা। কু বা কু-কু (ককাদিত্যঃ) সজ্জায় কু।

উৎ ৫। ৩৫)। ১ করক, কমণ্ডলু। ২ (করোতি বাধানি
মোহাভাং ক্রপোতিঃ) ইতি ক-বুন্। দাড়িম্বক। ৩
করকরক। ৪ পলাশক। ৫ করীর, বংশাহর। ৬ বহুলক।
৭ কর এব স্বার্থে-ক। রাজব। ৮ দাড়িম্বক। ৯ করক,
মেঘোপল, শিলা। ১০ কোবিন্দার, রক্তকাকন। ১১
নারিকেল মালা।

করকঙ্কণায় (পুং) কর শব্দ প্ররোগ করিলে যেরূপ কঙ্কণাদি
অলঙ্কারযুক্ত ও কর বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ দৃষ্টান্তযুক্ত ভায়।
করকচ (পুং) ১ সামুদ্রিক লবণবিশেষ [কঙ্কচ দেখ।]
২ জ্যোতিষোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ। শনিবারে বজী, শুক্র সপ্তমী,
বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, বুধে নবমী, মঙ্গলবারে দশমী, সোমবারে
একাদশী এবং রবিবারে দ্বাদশী তিথিকে করকচ কহে।

“শনিভার্গবজীবজকুজসোমার্কবাসরে।

বঠ্যাদিত্যঃ সপ্ত ক্রমাৎ করকচাঃ স্মৃতাঃ ॥”

করকচি (দেশজ) কোমল, অপূঠ।

করকচ্ছপিকা (স্ত্রী) কচ্ছপদাকৃতিরিত অস্ত্রা মুদ্রাঃ
ঠন্। কর্ণমুদ্রা [মুদ্রা দেখ।] তান্ত্রিকগণ অর্চনাকালে মন্ত্র
কূর্বাদি অনেক প্রকার মুদ্রা প্ররোগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে
কূর্ণ অর্থাৎ কচ্ছপাকার যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহারই
নাম করকচ্ছপিকা বা কর্ণমুদ্রা।

করকঞ্জ (স্ত্রী) করগম্ব। “চুড়ি কনক করকঞ্জে” বিদ্যাপতি।

করকটিয়া (দেশজ) ১ নীরস। ২ পক্ষিবিশেষ, করটু।

করকটক (পুং, স্ত্রী) করে কটক-ইব। নথ।

করকপত্রিকা (স্ত্রী) করকঃ কমণ্ডলুরূপা পত্রিকা। কমণ্ডলু।

করকপুর। উত্তরপশ্চিম প্রদেশস্থ নগরবিশেষ। পাটলিপুত্র
নগর হইতে ৮০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে মুন্সেরের সন্নিকটে অবস্থিত।

করকমল (স্ত্রী) করঃ কমলমিব, উপমি। পদ্মের ভায় হুল্লর
হত।

করকলস (পুং) করঃ কলস ইব, উপমি। জলাদি গ্রহণ জন্ত
যেরূপে উত্তরকর মিলিত করা হয়।

করকলিত (জি) করেন কলিতঃ ধৃতঃ। হস্ত দ্বারা ধৃত।

করকা (স্ত্রী) ক্রপোতি অপচয়ং করোতি ফলাদিকং, কিরতি
ক্ষিপতি জন্ম বা। ক্রু-বুন্-টাপ্ ক্রিপকাদিষাৎ নেঘঃ।
মেঘভব জল বা শিলা। শিল। ইহার সংস্কৃতপরি্যায়—বর্ষো-
পল, মেঘোপল, বীজোদক, ঘনকক, মেঘান্ধি, বার্চর, কর,
করক, রাধরত্ন ও ধারাহর।

করকাজল (স্ত্রী) করকারা জন্ম ৬৩৭। বৈদ্যকমতে
ইহার লক্ষণ ও গুণ,—দ্রব্য বায়ু ও তেজঃ সংযোগে সংহত
হইয়া আকাশ হইতে পান্য ধণ্ডের ন্যায় বে লগীর পদার্থ

পতিত হয়, ভরিস্থত্ব জনক করকাজল বা শিলজল কহে।
ইহা রসক, মির্ষল, শুষ্ক, হিরা গুণযুক্ত, অতিশয় শীতল,
পিত্তনাশক এবং কক ও বায়ুবর্জক। (ভাবপ্রকাশ)

করকাজ (স্ত্রী) করকারা আরতে, জন-ত (অন্যোষণি
দৃষ্টতে। পা ৩। ২। ১০১)। করকাজত জল।

করকিশলয় (পুং, স্ত্রী) করঃ কিশলয়মিব। করগম্ব, পদ্মবের
ন্যায় হুল্লর হত।

করকাক (জি) করকা মেঘভবশিলাবৎ অলি বত। মধ্যলোণ।
বাহার চক্ষুঃ করকার ন্যায় শুভ্রবর্ণ।

করকান্তাঃ [স্] (পুং) করকাবৎ অন্তো বিদ্যতে বজ্র বহুত্রী।
নারিকেল বৃক।

করকামু (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।

করকাসার (পুং) করকারা আসারঃ ৬৩৭। শিলাবৃষ্টি।

করকি (দেশজ) তৃণবিশেষ।

করকিটেঙ্গরা (দেশজ) মন্ত্রবিশেষ। এক প্রকার টেলরা।

করকুটাল (স্ত্রী) করঃ কুটালবৎ। বৃহলিতাঙ্গুলি হত।

করকোষ (পুং) করাত্যাং নির্মিতঃ কোষঃ; মধ্যলোণ।
জলাদি গ্রহণের জন্ত উত্তর হস্ত যেরূপ মিলিত করা হয়।

করকোল। চট্টলহ একটি গ্রাম। (ভা ব্রহ্মণ্ড ১৫। ১৬)

করকোষ্ঠী (স্ত্রী) করস্থিতা কোষ্ঠী। করস্থিতা রেখা। হস্ত-
রেখা দ্বারা কোষ্ঠির ভায় শুভাশুভ অংগত হইতে পারা যায়,
এই জন্ত উহাকে করকোষ্ঠী কহে।

করগবীজ (মৈথিলী করগ—করক, বীজ আধার) নারিকেলের
খোল বা কমণ্ডলু।

“দশন মকুতা জিনি কন, করগবীজ জিনি
কম্বুকর্ষ আকারে।” বিদ্যাপতি।

করগ্রহ (পুং) করো গৃহতে যত্র আধারে অপ্। ১ বিবাহ।
(৬৩৭) ২ হস্তধারণ। ৩ প্রভার নিকট হইতে প্রাপ্য রাজব গ্রহণ।

করগ্রহণ (স্ত্রী) করত গ্রহণং যত্র, বহুত্রী। [করগ্রহ দেখ।]

করগ্রহরত্ন (পুং) করগ্রহস্ত আরত্ব প্রকৃতিপুঞ্জতো যত্র।
বার্ষিককর গ্রহণারম্ভের দিন, পূর্ণ্যাহ, পূর্ণ্যা। অশ্লেষা,
আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ,
মঘা, ভরণী ও কৃত্তিকা তির অস্ত নক্ষত্রে; মিথুন, সিংহ,
কর্কট, তুলা, বৃশ্চিক, মৃত্ত ও মীনলয়ে এবং রবি, সোম,
বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে করগ্রহরত্ন কর্তব্য।

“ভীকোগ্রবকীভরতেন্দু লগে

শীর্ষোদয়ে ভাহুদিনে শুভাহে।

কুর্যাদহুত্বানি সমীহিতানি

করগ্রহরত্নমপি প্রোভাভাঃ” ॥

করঞ্জের এই নামের জনস্বাক্ষর দেবজামিনের কর্জনা করিয়া কৃতনবাজ প্রস্তুত করেন এবং এই উপলক্ষে যত সাধারণ্যে প্রকাশ ও আশ্রয় বহু প্রকৃতিকে জ্ঞান করাইয়া থাকেন।

করঞ্জা (পুং) করং গৃহাতি বঃ গ্রহ-প (কিতাব গ্রহঃ পাতা)। ১৪৩) ১ রাজা। ২ রাজ্য আদায়কারী, ক্ষেত্র। ৩ সাধারণতঃ হস্ত গ্রহণকারী।

করঞ্জাহক (পুং) করং গৃহাতি গ্রহ-পু (পুং জ্যোতিঃ)। পা ৩। ১। ১০৩) ১ পতি। ২ রাজ্য আদায়কারী। ৩ হস্তগ্রহণকারী।

করঞ্জাম (পুং) গোপবন প্রদেশস্থ নগরবিশেষ। এই নগর গোপজাতির রাজধানী। উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত রত্নপুর হইতে ৬৪ ক্রোশ উত্তরদিকে অবস্থিত।

করঞ্জাহী [ন] (পুং) করং গৃহাতি, গ্রহ-পু (শিখি-পু)। পা ৩। ১। ১৪৪) [করঞ্জাহ দেখ।]

করজবর্ণ (পুং) করাত্যাং ঘ্রাভ্যে হনৌ। ঘ্র-কর্মণি হ্রাট্। ১ দধিমহন দণ্ড। ইহার সংস্কৃতপরিচয়,—বৈশাখ, দধিচারণ, ওজাট। ২ (ক্ৰী) হস্তবর্ণ।

করজবর্জী [ন] (পুং) করাত্যাং করনো বা ঘ্রবণং বিদ্যতে যন্ত বজ বা করজবর্জী-ইমি। বহনদণ্ড।

করজ (পুং) কত মন্তকত রজ-ইব। ১ মাথার খুলী। ২ (কীর্যতে জলময়। কৃ-অণ্। করঃ জলহীনঃ অকো গর্ভো যন্ত শক্কাবিসাদলোগঃ) নারিকেলাহি, নারিকেলের খোল। ৩ কমণ্ডলু। (করজঃ কমণ্ডলৌ। মেঘিনী।) ৪ শরীরস্থি। ৫ পাত্রবিশেষ, কোটা। (‘‘তাম্বুলকরজ-বাহিনী’’ কানবরী।) ৬ ডিকাগাজ। ৭ ইকুবিশেষ। ৮ মন্তক।

করজপাবন (ক্ৰী) ভাগিনদীর উত্তরস্থ ভীষ্মবিশেষ। (তাগীখণ্ড ১১। ১)

করজশালি (পুং) করজ ইতি নামা শোভতে, করজ-শাল-ইন্। ইকুবিশেষ।

করজ (দেশজ) করজ শব্দের অপভ্রংশ। জলপাত্রবিশেষ। সাধারণতঃ বৈষ্ণবরাই ‘‘করজ’’ বলিয়া থাকে।

‘‘কমণ্ডলু ভূবীকল, করজ পিবারে জল, হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ।’’ জয়দাসবল।

করজগ (ক্ৰী) বিপনি, বাট।

করজা (দেশজ) করজ।

করজুলি। রাজ্যের তেলপণ্ড জেলার অন্তর্গত মধুরাজক তালুকের মধ্যে একটি নদী। রাজ্য হইতে ২৪ ক্রোশ দূরে দক্ষিণ ট্রান্সবেরের দিকে অবস্থিত। ‘‘অক্ষা ১২° ৩২’

উঃ, দ্রাঘি ৭২° ৫৬ ৪০’’ পূঃ। এখানকার জলবায়ু তেমন ভাল নয়। ১৭২৫ হইতে ১৮২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এখানে তালুকের থানা ছিল। এখানকার হর্গ বিখ্যাত। এই হর্গ আরভনে ১৫০০ গজ এবং চারিদিকে শতকোটির ঘাসা পরিবেষ্টিত। হর্গের প্রকার এখন ভয় হইয়াছে, উহার পাথর লইয়া এখানকার পুর্জকার্য চলিতেছে। ইংরাজ ও করাসীদিগের যুদ্ধের সময় এই হর্গ বুদ্ধকারীদের আড্ডা হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃঃ, হর্গটি ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল। ১৭৫৭ খৃঃ অঃ, করাসীরা দখল করিয়া লয়। পর বর্ষে ইংরাজেরা এই হর্গ পুনরায় পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেক বৈতন্যকর হইল বটে, কিন্তু কিছুতেই উদ্ধার করিতে পারিলেন না। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে কর্ণেল কুট এই হর্গ আক্রমণ করেন। সেই পর্যন্ত ইংরাজদিগের অধিকারে আছে।

করচা (আরব্য) ব্যবসারিগণের হিসাব রাখিবার খাতাবিশেষ। করচিসাল। (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Bridelia lanceifolia) এই গাছ বঙ্গদেশে জন্মে, খুব বড় হয়।

করচিয়ার (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। অর্জুনগাছ (Pentaptera Arjuna)

করচ্ছদ (পুং) কর ইব আরণকারী হনো বস্ত্র। শাখোট বৃক্ষ, সেওড়াগাছ। [শাখোট দেখ।]

করচ্ছদা (ক্ৰী) করকিরণবৎ প্রোহিতবর্ণং ছদং পুং অস্তাঃ। সিন্দূর পুষ্পবৃক্ষ।

করজ (ক্ৰী) করে আরভে, জন-ড। ১ বাজিনব নামক গজ-জব্য। ২ (পুং) কং যুৎ জলং বা রজরতি, কর্মণি অণ্। করজবৃক্ষ। (করজকঃ ত্রাৎ করজঃ পত্রমুচী ফলাপম। শব-রদ্বাবলী) ৩ নথ। ‘‘ন মুরোঠক মুরীয়ার জিল্যাত করজকৃগম’’ মনু ৪। ৭০। ৪ হস্তজাত জব্যমাত্র।

করজগি। ধারবারের একটি বিভাগ। ভূমিগরিমাণ ৪৪২ বর্গ মাইল। এখানে চোরগি হাজার লোকের বাস। এই বিভাগের মধ্যে দিয়া পূর্ক হইতে খন্ডিনে বরদনদী প্রবাহিত।

করজাখ্য (পুং, ক্ৰী) করজত নথভেব আখ্যা বস্ত্র। নথীনাথ গজজব্য।

করজোতি (পুং) করং জোড়রতি, অড় বজ-ইন্। হাড়-জোড়া গাছ।

করজ (পুং) কং যুৎ শিরোমুৎ বা রজরতি ক-রজ-পিচ্-অণ্। বনাম্বাজাত বৃক্ষবিশেষ। করজগি।

বৈষ্ণবগাছ বটে করজ-চারি প্রকার থকা—

১ ভবরক্ষমণ্ডা। ইহার সংস্কৃত পরিচয়—মন্তকাল, পুতিক,

চিরবিব, পুতিপর্ণ, বহুকল, সোঁটন, চিরবিব, করজ, করজক, চিরবিব, উদকীর্ষ।

২ নাটাকরম্ভা। ইহার সংস্কৃতপরিচয়—প্রকীর্ষা, পুতি-
করজ, পুতিক, কলিকারক, পুতিকরজ, সপ্তক, জ্বলা,
প্রজবীপুল, প্রকীর্ণ, কলিমাগক, কলহমানক, কৈড়বা,
কলিমাগ ও পুতিকরজ।

৩ কাঁটাকরম্ভা বা পাঁচিরা করম্ভা। ইহার সংস্কৃত নাম—
বড়গ্রাহা, মহাকরজ, বিহারী, হৃতিহারিণী, রাসিণী, কাকরী,
জ্বলা, বদহতিনী, হৃতিকরজক, কাকতাপ্তী, অমুমতী।

৪ করম্ভা। ইহার সংস্কৃতপরিচয়—করমর্দিক, কৃষ্ণপাককল,
অবিদ, অবেশ, কৃষ্ণপাক, পাককল, কৃষ্ণকল, পাককৃষ্ণকল,
কৃষ্ণকলপাক, পাককৃষ্ণ, কলকৃষ্ণ, পাককলকৃষ্ণ, অমালর,
বলালক, করাহুক, বোল, কল, আবিদ, করমর্দী, বনেমুত্রা,
করাজ, করমর্দ, পাণিহর্দ।

১। ডহরকরম্ভা হিন্দীতে করজ বা কিরমাগ, মহা-
রাজিতে করজ, পঞ্জাবে অক্টেন, তামিলে পুঙ্গু, তৈলঙ্গে
করুগ, বা কগ্গেরা, সিংহলে যোগলকরম্ভা, কর্ণাটে কোঙ্গর,
ক্লেঞ্চ-বেন বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম *Pongamia*
glabra। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই জন্মে। ইহার গাছ
৪০।৫০ ফুট বড় হয়।

বৈদ্যক মতের ডহরকরম্ভার গুণ—কটু, উষ্ণবীৰ্য, চক্ষুর
হিতকারক, কফনাশক, কুষ্ঠ, অর্শ ও ক্রিমিরোগে উপকারক;
বায়ুশান্তিকর ও ভেদক।

বৈদ্যক মতে ডহরকরম্ভার তৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য, রক্ত-
পিত্তজনক, ক্রিমিনাশক, কিছু পিত্তবর্জক। চক্ষুরোগ, বাত-
ব্যাধি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্ষত ও চর্মরোগে মাঝে বিশেষ উপকারক
এবং বিষটিকা রোগনাশক। ইহা বাহ ও অভ্যন্তরে প্রয়োগ
করা যায়। মাত্রা ৫ কৌটী।

রুদ্রোপীর চিকিৎসকদিগের মতে ইহার পাতা বাটরা
ক্ষত রোগে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাক্তার
ঐন্সলি বলেন, ইহার শিকড়ের রস ক্ষতস্থানপরিষ্কারক এবং
নালীদ্বার মুখরোধক। ডাক্তার গিবসনের মতে ইহার তৈল
সর্বপ্রকার চর্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

তৈল করিবার জন্য ডহরকরম্ভার বীজ অপ্রায়ণ মাসে
সংগ্রহ করিয়া ধানি দিয়া মাড়িতে হয়। ১ মণ বীজে প্রায়
লাড়ে ছয় সের তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল ৫০ ডিগ্রি
উষ্ণতায় একটি বাধিতে পারে। দক্ষিণদেশে এই তৈল
আমদিলা থাকে।

২। নাটাকরম্ভাকে হিন্দীতে নাটকরজ ও কহালাটে

নাগরপোতা, দক্ষিণে পজ, তামিলে কলিচিরম্ বা পজ
চেতু, সিহীতে কিরমং। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম
Guilandina Bonduc.

এই গাছ ভারতবর্ষে, পূর্বউপবীপে ও আফ্রিকার
অন্যে, গাছে কাঁটা এবং ফল হরিৎবর্ণ হয়।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণবীৰ্য, বিকরোপ
ও বাতশ্লেশনাশক এবং কুষ্ঠ, চর্মরোগ ও ক্ষতরোগে উপ-
কারক। ইহার ফলে শীত জর ভাল হয়।

ইহার বীজকে ইংরাজেরা বন্ডুকনাট (*Bonduc nat*)
বলেন, ইহা দেখিতে খেতবর্ণ, অতিশয় কঠিন এবং বাইতে
অত্যন্ত তিক্ত। পরীক্ষা করিলে ইহার বীজ হইতে তৈল,
শাঁস, শর্করা ও নির্বাণ পাওয়া যায়। এ দেশে বেনের দোকানে
এই বীজ বিক্রীত হয়। সবিদ্যায় অয়ে ইহা প্রয়োগ করিলে
সদা সদা উপকার দর্শে।

৩। কাঁটা করম্ভাকে হিন্দীতে কাটকরজ বলে। বৈদ্যক-
মতে ইহার গুণ তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য, কটু, বিবহর; কণ্ডু ও গুণ
নিবারক। ইহার মূলের স্বক ব্যবহার্য। মাত্রা ১ মাষা।

৪। করম্ভাকে হিন্দীতে করোলা, বোঝাই অকলে
করিলা, তামিলে কল্কা, তৈলঙ্গে পেদ কলিবি বা ওকা
চেতু, উড়িয়ায় গোথো, বড়ী কদম্বী ও ইংরাজেরা *Carissa*
বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম *Carissa* *Carandas*.

এই কণ্টকাত্ত গুল্ম ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই জন্মে।
ইহার সাদা সাদা ফল হয়। ফল পাকিলে মীলবর্ণ দেখায়।
এ দেশের লোকেরা করম্ভা ফল খাইরা থাকে।

করম্ভা হই প্রকার একজাতীয়ের ফল কিছু বড়, অপ-
জাতীয়ের ফল কিছু ছোট হয়। বাহার ছোট ফল হয়,
ভাহাকে সংস্কৃত ভাষায় করমর্দিকা বলে।

বৈদ্যকমতে উভয়প্রকার করম্ভা ফল অপকাবেহার অর,
শূল, রোচক, উষ্ণ, রক্তপিত্ত ও ককযুদ্ধজনক এবং তৃকা-
নাশক। পাকফলের গুণ মধুর, রচিকর, লঘু, বায়ু ও পিত্তনাশক।

কাহারও মতে উক্ত চারিপ্রকার করম্ভা হাড়া মাড়ুড়া
করম্ভা (সংস্কৃত নাম মর্কটী) ও বিবকরম্ভা (অনারবজরী)
নামে আরও দুই প্রকার করম্ভা আছে। বৈদ্যকগ্রন্থে
উভয়ের গুণাগুণ লিখিত হয় নাই। ২ বেদোক্ত অজুরবিশেষ,
ইজ্র ইহাকে দ্বিগুণ করেন। (ঋক ১।৪৫।৮)

করঞ্জ বা উরণ। বোঝাই প্রদেশের বান জেলার অন্তর্গত একটি
দীপ, বোঝাই বন্দরের দক্ষিণপূর্বে এবং কর্ণাট কলর হইতে
ও ক্রোশ হুন্ডে অবস্থিত। হিন্দুস্থানিগের সময়ে এখানে
অনেক বেববদির দ্বিগুণিত হয়, প্রাচীন দক্ষিণা দ্বিগুণিত

এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের সময়ে এই পূর্বভাগের
দীপে অনেক বৌদ্ধচৈত্যা ও প্রত্নরম্মির নির্মিত হইয়াছিল।

খুঁটের দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানে শিহারা নামক সম্রাটের
রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের সময়ে এখানে অনেক নগর
স্থাপিত ও উদ্যানাদি নির্মিত হইয়াছিল। খুঁটের পঞ্চদশ
শতাব্দীর শেষভাগে পণ্ডুগীজেরা এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন
করে। তাহার ১৫৩০ হইতে ১৭৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই
দীপ নিজ অধিকারে রাখিয়াছিল। পণ্ডুগীজগির্জা ও
আশ্রমদ্বয় এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে বর্গীরা
এই স্থান আক্রমণ করে। তৎপরে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ
পণ্ডুগীজদিগকে তাড়াইয়া এই দীপ অধিকার করে। ১৭৭৪
খৃঃ হইতে করঞ্জদীপ ইংরাজঅধিকারভুক্ত হইয়াছে।

এই দীপের পূর্বভাগ দিয়া (উপর হইতে পনবেল পর্য্যন্ত)
প্রায় সাড়ে সাতকোশবাণী ধাতুবন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে।
এখানকার প্রধান বন্দর মোরা, করঞ্জা ও শিবা। বোম্বাই
হইতে হইলে মোরা বন্দরে ইটিয়ারে চড়িতে হয়। ইহার
নিকট শূকরদীপ নামে আর একটি ক্ষুদ্র দীপ আছে।

এখানে লবণ, মোহরা, মদ ও খেজুরসের স্রা প্রাপ্ত হয়।
প্রতিবর্ষে প্রায় ৪৬,০০০ টাকার লবণ ও ১৬,৬০,০০০
টাকার মদ জন্মে।

এই দীপ হংসকারণ্ডবের অতি প্রিয়স্থান। বোম্বাই
হইতে পক্ষীশীকারীরা এখানে আমোদ করিতে আসেন।
করঞ্জবন্দরের বর্তমান নাম উরণ।

করঞ্জনগর। ১ বেরারের অনরাবতীজেলার অন্তর্গত একটি
প্রাচীন নগর। অক্ষা ২০°২৯' উঃ, দ্রাঘি ৭৭°৩২' পূঃ।
লোকসংখ্যা প্রায় ১১ হাজার।

করঞ্জ নামক একজন ঋষির নাম হইতে এই স্থানের নাম
হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ, করঞ্জ ঋষি কঠোর রোগে আক্রান্ত
হইয়া মহানারায়ণ আরাধনা করেন, দেবী তাঁহার উপর
সন্তুষ্ট হইয়া এখানে সরোবর করিয়া দেন। করঞ্জ সেই
সরোবরে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন। সেই অবধি এই
স্থান পুণ্যার্থী বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। লিঙ্গ-
পুরাণে এই করঞ্জতীর্থের নাম পাওরা বার, হেথার নীল-
লোহিত মহাদেব আছেন। (লিঙ্গপুরাণ ৫০।৫) এখনও
অনেক প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে, তাহার নির্মাণপ্রণালী
অশংকনীয়। এখানে বাণিজ্য ব্যবসা জন্য অনেক বাণিজ্য বাস
করেন।

২ মধ্য প্রদেশের বর্ধাজেলার একটি নগর। ইহার
চারিদিকে গিরিমালা, বর্ধানগর হইতে ১০ কোশ দূরে

অবস্থিত। প্রায় ২৭৫ বর্ষ পূর্বে নবাব মুহাম্মদ বী নিরাজ
কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এই পার্শ্বতীর ভূভাগে
ইক্ষু ও অহিকেন উৎপন্ন হয়।

করঞ্জক (পুং) করঞ্জ-বার্ধ কন্। করঞ্জক।

করঞ্জকল (পুং) করঞ্জকলবৎ অন্নং বত। কপিথ বৃক।

করঞ্জকলক (পুং) করঞ্জকল বার্ধে কন্ (ইবে প্রতিকৃতো।
পা ৫।৩।৯৬) কপিথ বৃক, কপবেল।

করট (পুং) কং কুংসিতং বা রটতি রবং কয়োতি ক-রট-অচ্
(পটাদিত্যো লুপিতচঃ। ৩।১।১৩৪) ১ কাক। (“বহুব্রি-
গত্বাভীয়ে শরটঃ করটঃ”) ২ (কিরতি বিকিপতি মদমিতি
বা) ২ হস্তিগণ্ড। (“কথং হি ভিন্নকরটং পদ্মিনং বনগোচরম্।
উপহায় মহানাগং করণ্ডঃ শূকরং স্পৃশেৎ”। ভারত) ৩ কুশুভ
বৃক, কুশুম ফুলগাছ। ৪ দ্ব্যুপজীবনধারী। ৫ একাদশাহ-
শ্রাঙ্ক। ৬ হৃদ্রুৎ, হৃদ্রম্য নাতিক। ৭ বায়ভেদ। (করটো
গজগণ্ডে স্যৎ কুশুভে নিন্দ্যাজীবিনে। একাদশাহাদিশ্রাঙ্কে
হৃদ্রুৎচৈপি বাসসে। করটো বায়ভেদে। মেদিনী।)

করটক (পুং) করট বার্ধে কন্। চৌরশাস্ত্র প্রবর্তক কর্ণীর পুত্র।
(কর্ণীগতঃ করটকঃ চৌরশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ।) [করট দেখ।]
করটা (স্ত্রী) করট-টাপ্। হ্রঃখে দোহ্য গাতী। যে পাতী
দোহন করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়।

করটী [ন] (পুং) করটো বিদ্যতেহত, প্রাপ্তে ইন্। হস্তী।
(দস্তাবলং করটিকুঞ্জরকুণ্ডপীলবঃ। হেম।)

করটু (পুং) ক-অটু। পক্ষিবিশেষ, করকটিয়া।

(কর্করেটুঃ করেটুঃ ভাণ করেটুঃ কর্কাটুঃ। হেম।)

করণ (ক্ৰী) ক্রিয়তে অনেন ক-লুট্। ব্যাকরণোক্ত কারক-
বিশেষ। ক্রিয়া নিষ্পত্তির কারণসমূহের মধ্যে কারণান্তরের
ব্যবধান অভাবে যে বস্তুকে ক্রিয়ানিষ্পত্তির কারণ বলিয়া
কথিত হইয়া থাকে, তাহাকেই করণকারক বলে। যেমন
“দাজেণ ধাতুং লুনাতি” “দা দ্বারা ধাতুছেদ করিতেছে”
ইত্যাদি ছেদন কার্যের নিষ্পত্তিকারক হইলেও দাজ সংযোগের
প্রাধান্য হেতুক কার্য সম্পন্ন হওয়ার দাজেরই করণকারকত্ব
হইল।

“ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তির্ধ্বাংপারাদনন্তরম্।

বিবক্ষ্যতে যদা বজ্র তৎকরণ মুদাহৃতম্।” হরিকারিকা।

২ চক্ষুদাদি ইন্দ্রিয়। ৩ দেহ। ৪ ক্রিয়া, কার্য। ৫ স্থান।

৬ হেতু। ৭ হস্তলেপ। ৮ নৃত্যের প্রকার। ৯ গীতবিশেষ।

১০ ক্রিয়াভেদ। ১১ সংবেদন। ১২ বব, কালব, কোলব,

ঠেতিল, গর, বণিজ, বিটি, শকুনি, চক্ষুশব্দ, কিস্কম, নাপ এই

একাদশটি করণ জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত। এই সকল করণের

বধাক্রমে অধিষ্ঠাতৃদেবতার নাম—ইন্দ্র, কমলজ, মিত্র, অর্যমা, ভূ, প্রী, বস, কলি, বৃষ, কণী ও মারুত। এক একটি তিথিতে দুই দুইটি করণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বধাদি ৭টি করণ শুরু প্রতিপদের শেবার্দ্ধ হইতে কৃষ্ণচতুর্দশীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত এবং অবশিষ্ট ৪টি কৃষ্ণচতুর্দশীর শেবার্দ্ধ হইতে শুরুপ্রতিপদের প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত হইয়া থাকে। (পৃঃ ১৩ বিহু।

১৪ জাতিবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে বৈষ্ণব ঐশ্বর্যে শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহার লিপিকারের কার্য করে। (ব্রহ্মবৈঃ ব্রহ্ম ১০ অঃ, ও কৃষ্ণজন্মে ৮৫ অঃ)। ভারতবর্ষের নানাহানে করণজাতি বাস করে। ইহাদের আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণদিগের মত, কেবল যজ্ঞস্থলে ধারণ করিতে পারে না। অনেক স্থানে ইহার করণকায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে কর্ণলু নামে অভিহিত।

ভগবান্ মনুর মতে করণেরা ত্রাতৃকজিহ্ব। বধা—

“ব্রহ্মো মনশ্চ রাজজ্ঞাৎ ত্রাত্যামিচ্ছিবিরেব চ।

নটশ্চ করণশ্চৈব খসজবিড় এব চ ॥” মনু ১০।২১।

১৫ অসভ্য অবস্থার পতিত বলশালী জাতিবিশেষ। আসামের পূর্বাংশে পার্বত্যের প্রদেশে, ব্রহ্ম ও ভূমদেশে এই জাতি বাস করে।

সকল স্থানের করণজাতি দেখিতে এক প্রকার নহে। দেশভেদে ইহাদের আকারের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে দেখিতে বলশালী, সাহসী এবং ভীমকায়। ইহাদের জী-পুরুষেরা মুখে উল্লিখিত কাটে, দূর হইতে দেখিলে ভয়ঙ্কর দেখায়। এই জাতি অসভ্য বটে, কিন্তু অতি সরল, সত্যবাদী এবং নিরীহ। যুদ্ধবিগ্রহে ভালবাসে না, সকলেই শান্তিপ্রিয়। কিন্তু কেহ ইহাদের অনিষ্ট করিলে, অথবা ইহাদের নিকট দোষী হইলে, তখন এই জাতির বীর্যবহিঃ জলিয়া উঠে। ৫৭ জন ব্রহ্মবাদী বলবীর্যে ১ জন করণের সমকক্ষ। বল থাকিলেও করণেরা যুদ্ধকার্যে ত্রুতী হয় না। তাই বলিয়া এই জাতি অলস নয়। যেখানে বাস করে, ইহাদের অপরিণীম পরিশ্রমে ও বজ্রে সেই স্থান প্রচুর লস্য্যালিনি হইয়া উঠে। তবে এককালে ইহাদিগকে নির্দোষ বলি যায় না, কারণ ইহার বড় নেশাখোর। মদের অস্ত্র লালসিত, মদ পাইলে ইহার অর্ধেক ও ভুল্জ জান করে।

করণেরা লিখিতে পড়িতে জানে না, ইহাদের ধর্মশাস্ত্রও কিছুই নাই। মূর্খতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইহার উত্তর দেয় যে, এক সময়ে ঈশ্বর মহিষচর্মে তাঁহার আদেশ ও ধর্মশাস্ত্র লিখিয়া মানব জাতিকে ডাকিয়া পাঠান। মানব জাতির মধ্যে সকলেই ঈশ্বরের আদেশ ও ধর্মশাস্ত্র গ্রহণ

করিবার জন্য গমন করিল, কিন্তু সময় বা হওয়ার তেমন এই করণজাতি বাইতে পারিল না। জ্ঞতরা তিরকানই তাহার ধর্মশাস্ত্রহীন হইয়া রহিল।

(স্রী) ১৬ বোণিদের আনন প্রকৃতি। ১৭ কৃতাদি।

১৮ লেখাপজ সাক্ষিবিষয়াদি।

করণক (জি) দিয়া, ঘারা। পূর্ববর্তি কোনপদের সহিত বছরীহি সমাস না হইলে ইহার প্রয়োগ হয় না।

করণজ্ঞাণ (স্রী) করণেঃ হস্তাদিভিঃ জ্ঞাতে বৎ করণে স্মৃষ্টি। মন্তক। (বরাহঃ করণজ্ঞাণ শির্ষং মন্তকমিত্যপি। হেম।)

করণবাচক (পুং) ৬-তৎ, করণং বাচয়তি বচনুসৃ। করণবোধক। করণ জন্ত জনকত্ববিশিষ্ট।

করণবাস। বুলন্দসহর জেলার মধ্যে একটি সহর। এই সহর অমুপসহর হইতে ১২ মাইল এবং বুলন্দসহর হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণপূর্বে অমুপসহর তহসীলের মধ্যে গন্ধার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সমস্তই হিন্দু। জমীদারেরা বৈশ (বৈষ্ণব)-জাতীর রাজপুত। দশহরার দিন এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে, এ জেলার এক বড় মেলা আর কখন হয় না। এই সহরে একটি অতি প্রাচীন শীতলামন্দির আছে। প্রতি সোমবারে এই মন্দিরে জীলোকেরা উপস্থিত হইয়া পূজাদি দিয়া থাকে।

করণা (স্রী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, একপ্রকার বৃহৎ জাতীয় সহজ যন্ত্র, ভারতবর্ষ ও পার্শ্বতে ব্যবহৃত হয়। ধনি কর্ণভেলী এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট। ইহার নামান্তর কর্ণ।

করণাধিপ (পুং) করণানাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ জীৱ। ২ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা। কর্ণের দিক্, ষষ্ঠের বায়ু, মেজের অর্ক, বসনার প্রচেতা, মাসিকার অধিনীক্কারবধ, বাক্যের বহি, পালির ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, পানুর মিত্র, উপন্থের প্রজাপতি, মনের চক্ৰ, বুদ্ধির চতুর্মুখ, অহঙ্কারের কজ ও মনের অচ্যুত। ৩ বধাদি করণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা; বধা—ইন্দ্র, কমলজ, মিত্র, অর্যমা, ভূ, প্রী, বস, কলি, বৃষ, কণী ও মারুত।

করণী (স্রী) ক্রিরতে ক্রিরাবিশেষোহয় ক করণে স্মৃষ্টি ভীৎ। গণিতশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিরাবিশেষ। অতি নৃকরণে বোরশির মূল বাহির করিতে পারা যায় না। (Surda.)

করণীয় (জি) ক্রিরতে বৎ যজ বা কর্ণপি আধারে চ, ক-অনী-রয (কৃত্যস্মৃটো বহুলন্। পা ৩।৩।১১০।) কার্য, বাহা করা উচিত। ২ বেধানে করা উচিত।

করণীভূতা (স্রী) বে কভাকৈ পোবাগুজীর্ণে গ্রহণ করা যায়।

করণশু (পুং) ক্রিরতে ক-অন্তন্ কর্ণবি (অন্তন্ কৃত্যত্বঃ।

উৎ ১। ১২৮) ১ বধূকোষ, মোচাক। ২ অসি। ৩ কার-
ত্ব পক্ষী। ৪ দলাচক, গিরিমাটি। (করতো বধূকোষা-
কারণে বধূ দলাচকে। মেদিনী।) ৫ বংশাদি রচিত পুশ-
পাঞ্জবিশেষ, গাজি। ৬ কোটা। (“দীপতাজনভ্রমরকরক-
প্রভৃত্যনেকোপকরণবৃত্তঃ” দশকুমার।) ৭ কালখণ্ড, বকুৎ।
৮ পৈবালবিশেষ।

করগু (জী) করগু-টাণ্ (অজান্যতটাপ্। পা ৪। ১। ৪)
পুশভাণ্ড, গাজি।

করগুক (পুং) করগুঃ বিদ্যতে যন্ত, করগু-ইকন্। যে
সকল জীবের করগুবৎ চর্মের হলী আছে।

করগুী [ন] (পুং) করগুবৎ আকারোহিত অস্ত, ইন্।
মন্তবিশেষ।

করন্তল (পুং) করন্ত তলঃ ৬তৎ। ১ হস্ততল, হাতের
তেলো। করন্তলমিব। ২ হস্ত।

করন্তাল (স্ত্রী) করন্তায়াঃ দীর্ঘমানন্তালো যত্র বহতী।
১ ভল্লক, বায়্যবিশেষ, এই বস্ত্র কাঁসাধাতুতে প্রস্তুত হয়।
খেলের বাজানার ইহা দ্বারা তাল দেওয়া হয়। ২ হাততালী।

করন্তালক (স্ত্রী) করন্তাল স্বার্থে কন্। [করন্তল দেখ।]

করন্তালধ্বনি (পুং) করন্তালজ ধ্বনিঃ ৬তৎ। করন্তালের বায়্য।

করন্তালী (জী) করন্তাল গোয়াদিবাৎ জীহ্। ১ বায়্যবিশেষ,
করন্তাল, করকি। ২ করন্তলধ্বনের অভিধাত্বে উৎপাদিত শব্দ।

করতোয়া (জী) করন্তায়াঃ চ্যুতঃ হরণার্জতীপরিগরকালীন
হরকরন্তায়াঃ ক্ষরিতং তোয়ং জলং বিদ্যতে যত্র। অর্শাদি-
বাদহ্। অন্যথাযাত নদীবিশেষ। কথিত আছে, গৌরী-
বিবাহসময়ে শিবের পাণিবিম্বিকণ্ড জল হইতে এই নদীর
উৎপত্তি হয়। এই নদী অতিশয় পবিত্র। এমন কি, বর্ষাকালে
সকল নদীর জলই অগুচি হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, কিন্তু
এই নদীর জল কোন সময়েই অগুচি প্রাপ্ত হয় না। এই
নদী তীর্থস্থলীর মধ্যে গণনীয়। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া
জিরাঙ্গ উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

(ভায়ত ৩। ৮৫। ৩।)

পূর্বকালে এই নদী বঙ্গ ও কামরূপের মধ্যে সীমা-
নির্দেশক ছিল। [কামরূপ দেখ।] এই নদীর গতি এক্ষণে
সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে এই নদী বঙ্গপুত্রের
পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত। এখন জলপাইগুড়ি জেলার
উত্তরপশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুর জল হইতে উৎপন্ন হইয়া, বরাবর
দক্ষিণে আসিয়া বঙ্গপুত্রের মধ্য দিয়া বঙড়া জেলার দক্ষিণে
হলহলিয়া নদীর গহিত মিলিত হইয়াছে। এইস্থান হইতে
এই গতি লইয়া ডাঙ্গি পোলাবোগ, নানা শাখা চারিদিক্

হইয়া কে কোথায় চলিয়াছে, তাহা নির্ণয় করাই কঠিন,
বিশেষতঃ গত কয়েক শতবর্ষ ধরিত্রী জিহ্বোতা নদী এই
অঞ্চলে যেভাবে নির্দিষ্ট গতি অভিক্রম করিয়া চলিয়াছে,
তাহাতে প্রাচীন করতোয়া নদীর পূর্বগতি নির্ণয় করা
কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

উক্ত স্থান হইতে করতোয়া নদী ফুলকর নামে অজাই
(আজেরী) নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। অনেক এই
ফুলকরকেই প্রাচীন করতোয়ানদী বলিয়া উল্লেখ করেন।
আবার কাহারও মতে মহানদী ও তিত্তা (জিহ্বোতা) নদীর
মধ্যবর্তী ‘করতো’ নামক নদীই প্রাচীন করতোয়ার উৎসগতি,
এবং বঙড়ার দক্ষিণে সর্বমঙ্গলা ও যুবনেশ্বরী নামে যে দুই
নদী প্রবাহিত হইতেছে, ইহার মধ্যে যুবনেশ্বরী নদীই
প্রাচীন করতোয়ার মধ্যগতি।

এক্ষণে করতোয়ানদী নিত্যন্ত ক্ষয়কার ধারণ করিলেও
পৌরাণিক সময়ে মহাপ্রোতবতীরূপে প্রবাহিত হইত।

করুদ (জি) করং দদাতি কর-দা-ড। ১ রাজস্বপ্রদানকারী।
২ পরিগ্রাহার্থে হস্ত প্রদানকারী।

করদারী [ন] (জি) করং দদাতি কর-দা-বিনি (“নন্দিগ্রহি-
পটাদিত্যো লুপ্তিঃ। পা ৩। ১। ১৩৪) করপ্রদানকারী।

করদীকৃত (জি) অকরং করং ক্রিয়তে যেন চি। বাহাকে
করদান করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

করক্রম (পুং) ক্রিয়তি বিক্রিপতি সমস্তাং শাখাঃ, কৃ-অচ,
করচ্চাসৌ ক্রমশ্চ নিত্যসমাস। কারকর বৃক।

করক্খি (পুং) করং বেটি, কর-ক্খি-কিপ্। ১ গোত্রভেদ।
২ বেদশাখাভেদ।

করক্কম (পুং) করং ধমতি অসিঃসংযোগং করোতি কর-ক্কা-খশ্
(উৎপত্তের অদপাঞ্জনাশ্চ। পা ৩। ২। ৩৭) সুম্। ইক্কাকু-
বংশীয় খনীনেজ নামক রাজার পুত্র, প্রকৃত নাম সুবর্কঃ।

সত্যযুগে মহুর বংশে খনীনেজ নামক রাজা জয়গ্রহণ
করেন। তিনি অতিশয় উদ্ধতপ্রকৃতির লোক ছিলেন।
তৎকর্তৃক খীয় সহোদরগণ এমন কি প্রজাবর্গও নিরন্তর
উৎপীড়িত হইত। এই অনিবার্য ঔদ্ধত্যপ্রকৃতিবশতঃ
তিনি প্রজাসমূহের প্রকৃতিরঙ্গন করিয়া খীয় পূর্বপুরুষোচিত
বশঃলাভ করিতে সক্ষম হইলেন নাই। পরিশেষে দিগ্বিদারী
নৃপতি হইলেও তিনি প্রজাগণ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যে
বিতাড়িত হইয়াছিলেন। প্রজাগণ তৎপুত্র সুবর্কাকে রাজ্য
প্রদান করিল।

সুবর্ক পিতাকে বিককক্রিয়ারত বেতু রাজ্যচ্যুত ও
নির্কাসিত হইতে দেখিয়া, সতত সংযতচিত্তে প্রজাগণের

হিতসাধনে নিরত হইরাছিলেন। এলাপগও তাঁহাকে
অনিষ্ট, সভ্যত্ব, ভক্তি, শব্দমাদি উপভূষিত, মনসী ও
বার্ষিক দেবীরা একান্ত অকৃতজ্ঞ হইরাছিল। কালবশে
সদা ধর্মনিরত সুবর্তী অর্থহীন হওয়ার সামন্তগণ তাঁহাকে
উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সেই বর্ষাক্ষা নৃপতি কোব ও বাহনাদি বিহীন হইয়া
সামন্তগণের ভরে নিজ অল্পরক্ত ভৃত্য গহীরা অতি সাবধানে
সুপরিরক্ষা করিয়াছিলেন। বলহীন হইলেও নিরতধর্ম-
পরায়ণ বলিয়া উৎপীড়ক সামন্তগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে
সক্ষম হন নাই। অবশেষে যখন রাজা সামন্তগণ কর্তৃক
নিদারুণরূপে পীড়িত হইলেন, তখন তিনি নিজ কর অনলে
বিক্রান্ত করিলে অগ্নি হইতে তাঁহার ভীমপরাক্রম সৈন্তসকল
উৎপন্ন হইল। তখন বলীমান নৃপতি অকৃতরূপে আবিভূত
সেই সৈন্তপরিবৃত্ত হইয়া স্বীয় সীমার অন্তর্বর্তী নৃপতিগণকে
স্বপ্নে আনিলেন। তিনি স্বীয় কর অগ্নিতে দগ্ধ করার
ভদ্রবধি “করক্কম” নামে বিখ্যাত হইলেন। (অখমেধ পর্ব)
করক্কয় (ত্রি) করঃ ধরতি লেঢ়ি, কর-ধে-খন্-মুন্। হস্তলেহক।
করক্কাস (পুং) করে করাধরবে ক্রাসঃ ৭ভৎ। তত্রোক্ত ক্রাস-
বিশেষ। তত্রোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অকৃত প্রভৃতি অজুলি-
সমূহের তল ও পৃষ্ঠদেশে যে ক্রাস করা হয়।

“অঙ্গক্রাসঃ করক্রাসো বীজক্রাসতথৈব চ” বটুকণ্ডব।

করপক্ষ (পুং) করৌ পক্ষং যন্ত বহুব্রী। বাহুদ্বয়।
করপক্ষজ (ক্লী) করঃ পক্ষজমিব। পক্ষহস্ত।
করপণ্য (ক্লী) করার্থং রাজস্বার্থং পণ্যম্, মধ্যলোপঃ। রাজস্ব
প্রদানের জন্য যে কোন বিক্রয় বস্ত্র প্রদত্ত হয়।
করপত্র (ক্লী) করমবলম্ব্য পততি, কর-পত-ট্রি-ন। দারী-
শস্ববলভত্বদিসিচাদি। পা ৩।২।১৮২) ট্রি। ১ ক্রকচ, করাত ;
অকৃত কথিত বিংশতি শব্দের প্রকারভেদ। ২ জলক্রীড়া।
করপত্রবান্ [৭] (পুং) করপত্রবৎপত্রং যন্ত তৎ অন্তান্তি ;
করপত্র-মতুপমত বঃ। (তদন্তান্তান্তিরিতি মতুপ। পা ৫।
২।৯৪। সংজ্ঞায়াম্। ৮। ২। ১১) তালবৃক্ষ।
করপত্রিকা (ক্লী) করৌ পত্রং বানমিব যন্তাঃ কর-পত্র-কপ্-
টাণ্-অত ইষম্। জলক্রীড়া।
করপূর্ণ (পুং) করবৎ পূর্ণং যন্ত। ১ তিষ্ঠাতকবৃক্ষ। ২ রক্ত
এরঙ। [এরঙ দেখ]
করপল্লব (পুং) করত পল্লবৎ। ১ অজুলি। ২ (করঃ পল্লব
ইব) ৪ হস্ত।
করপাত্র (ক্লী) করঃ পাত্রবৎ যন্ত। ১ জলক্রীড়া। ২ কর-এব
পাত্রম্। হস্তরূপ পাত্র।

করপাল (পুং) করং পালয়তি কর-পাল-অণ্। (করপাল্য।
পা ৩।২।১১) বক্ষণ।

করপালিকা (ক্লী) করং পালয়তি কর-পাল-বুল্ (বুল্-কৃটো
পা ৩।১।১৩৩) অজান্যতটীপ্। ৪।১।১৪) টাপ্। ১ কৃত্ত
হস্তবট, হাড়ি। ২ ছোঁরা। ৩ মুল্লর।

করপালী (পুং) করং পালয়তি কর-পাল-গিনি-ক্লীর্ (গনি-
প্রহিণচাদিত্যো ল্যপিতভঃ। পা ৩।১।১৩৪) ১ কৃত্ত হস্তবট,
হাড়ি। ২ ছোঁরা। ৩ মুল্লর।

করপীড়ন (ক্লী) করত বধূকরত পীড়নং বরণে বজ্র বহুব্রী। বিবাহ।
করপুট (পুং) করয়োঃ পুটঃ ৬ভৎ। বন্ধাকলি, করবোড়।
করপ্রাদ (ত্রি) করং প্রদদতি কর-প্র-দা-অণ্। (আতশোপ-
সর্গে। পা ৩।৩।১০৬) করদাতা।

করক্ষু (বৌদ্ধশব্দ) কোন বিশেষ উচ্চ সংখ্যা।

করবালিকা (ক্লী) করং বলতে পালয়তি, কর-বল-বুল্-টাণ্
অত ইষম্। করপালিকা।

করভ (পুং) ক্রিয়তি বিক্রিপতি ইত্যন্ততঃ কৃ বিক্রেপে
(কৃশশলিকলিগদিত্যো ২ভচ্। উপ্ ৩।১২২) কৃ-অতচ্।
করে ভাতি শোভতে ; কর-ভা-ক (আতোহরূপসর্গে ক।
পা ৩।২।১৩) ১ মণিবদ্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত হস্তের
বহির্দেশ। ২ উল্লিখিত। ৩ উল্লি। (করতো মণিবন্ধাদি কনিষ্ঠা-
তোল্লিত্বংস্মতে। মেদিনী।) ৪ হস্তিশাবক। ৫ নখীনামক গজ
দ্রব্য। ৬ কটি। ৭ অখতর, খচর।

করবাল (পুং) করত বালঃ স্তত ইব। ১ নখ। করং আশ্রিত্য
বলতে হিনতি বল-অণ্। তরবারি। ইহার সংস্কৃতপরিায়—
অসি, খড়্গা, তীক্ষ্ণবর্ষ, ছুরাসদ, বিশসম, গ্রীণ্ড, বিজয়,
ধর্মপাল বা ধর্মমাল, নিজিংগ, চক্রহাস, কোকেশক, মণ্ডপাণ্ড,
করপাল, তরবার, রিটী। গঠনের আকার অনুসারে ইহার
আরও কতকগুলি নাম আছে।

অতিপূর্বকালে সেই বৈদিক সময় হইতে ভারতবর্ষীয়
আর্যগণ করবাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

বৈশম্পায়নোক্ত ধর্মশ্রুত, বীরচিন্তামণি, দৌহার্ণব, বৃদ্ধি-
কলতরু, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে করবাল
বা খড়্গের বিবরণ যথেষ্ট বর্ণিত হইরাছে।

বীরচিন্তামণি মতে খড়্গা নির্মাণ করিতে হইলে দুই
প্রকার লৌহ উপযুক্ত—নিরঙ্গ ও সাজ।

শাধধরপদ্ধতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রথান সাজ লৌহ
দশ প্রকার। বধা—১ মোহিণী, ২ মধুরৈশ্বর্য, ৩ মধুরজ্জ্বল,
৪ সুবর্ণবজ্র, ৫ মৌলবজ্র, ৬ স্বর্ণক, ৭ প্রহিবজ্র, ৮ শৈবাল-
মালান, ৯ নীলপিণ্ড, ১০ তিস্তিরাজ।

৩৮। বাহার অর্থাৎ কাকের ডাক আকার, অথচ অত্যন্ত কঠিন, এই প্রকার লোহ অন্ন নীলবর্ণের হইলে তাহাকে রোহিণী বলা যায়। রোহিণী দ্বারা গুহ্য হইলে অত্যন্ত বৈদ্যনা হয়।

২। দেখিতে মন্থরকণ্ঠ মত, এমন লোহকে মন্থরকণ্ঠ বলা যায়।

৩। বাহার উপরটা দেখিতে নাগকেশরকুলের ন্যায় আভ্যন্তর, তাহার নাম মন্থরবজ্রক।

৪। বাহার শরীরে সোণার মত চিহ্ন আছে, তাহারই নাম সুবর্ণবজ্র। এই লোহ অধিক মূল্যবান।

৫। বাহার হই পাশ্বে আভ্যন্তর, মধ্যে স্বর্ণরেখাবিশিষ্ট এবং আবৃত করিলে সংঘাত স্থান ধূমবর্ণ হয়, তাহার নাম মৌবলবজ্র।

৬। বাহারকে ভাঙিলে তাহার উপরিভাগে পদ্মের ডাঁটার মত স্তম্ভ ছিদ্র দেখা যায়, তাহার নাম স্বর্ণক, ইহার অপর নাম কঙ্কালবজ্রক।

৭। বাহার সর্বত্র গাঠিত আছে, তাহাকে গ্রাহিবজ্র বলা যায়। এই লোহ মূল্যবান ও হুল্লভ।

৮। বাহার অল্প অবিচ্ছিন্ন আস থাকে ও আভা দুর্দ্বা-বালের মত হয়, তাহার নাম শৈবালমালাস।

৯। বাহার অল্প দেখিতে অনেকটা নীলবর্ণের মত, তাহার নাম নীলপিণ্ড।

১০। বাহার অল্প ভিত্তির পাখীর মত, তাহার নাম তিস্তিরাক। এই লোহ মহামূল্য ও হুল্লভ। ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট অস্ত্র নির্মিত হয়।

পৌহার্ণবমতে নিরঙ্গলোহ তিনপ্রকার;—রোহিণী, পাণ্ড্য ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে এখন কাস্তিকতা বলে।

প্রাচীন গ্রন্থে ১৫ প্রকার লক্ষণাক্রান্ত তরবারির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

১ কালধড়। ২ নকুল। ৩ কুলবজ্র। ৪ মহাধকা।

৫ কেতকীবজ্র। ৬ কুটীরক। ৭ কঙ্কালগাজ। ৮ কালগিরি।

৯ ধবলগিরি। ১০ কান্তিলোহ। ১১ নমনবজ্র। ১২ বামনাক।

১৩ মহিষ। ১৪ অঙ্গপজ। ১৫ গজবজ্র।

১। যে তরবারির লম্বি কাণ, সোণার মত আভা এবং অন্ন বজ্রচিহ্নযুক্ত তাহার নাম কালধড়ক বা ভাটনীবজ্র।

২। বাহার উপর উর্দ্ধগামী কশিলের আভা দেখা যায়, তাহাই নকুল। ইহার স্পর্শে সর্পাসিত ও বিনষ্ট হয়।

৩। বাহার শরীরে অঙ্গকার ছোট ছোট কুণ্ডলী দেখা যায়, তাহার নাম কুলবজ্র।

৪। বাহার অত্যন্ত অতি কঠিন, ভূমি চিহ্নবীন, মধ্যে ও পার্শ্বস্থল কিছু অত্যন্ত ধারাল, তাহার নাম মহাধকা।

৫। যে তরবারির ভূমিতে কেতকীবজ্রের মত চিহ্ন থাকে, তাহার নাম কেতকীবজ্র।

৬। বাহার অল্প স্তম্ভ রক্ত পঙ্কাকার অথচ কৃষ্ণবর্ণ, সেই অঙ্গির নাম কুটীরক। ইহা দ্বারা গুহ্য হইলে শোণ হয়।

৭। বাহার দ্বারা দাঁড়া, মধ্যে কাকুলের মত, সর্বত্র কাল দাগ, তাহার নাম কঙ্কালগাজ।

৮। বাহার অল্প সোণার বিন্দু, অথচ কালদাগ থাকে, তাহার নাম কালগিরি।

৯। পাণ্ড্যালোহ নির্মিত যে অঙ্গির ভূমি ও অঙ্গ রূপার মত দাঁড়া, তাহাকে ধবলগিরি বলা যায়।

১০। কান্তিলোহনির্মিত যে অঙ্গির অল্প রূপার চিহ্ন, বর্ণ অন্ন নীল, তাহাকে নিরঙ্গ বা কান্তিলোহ বলে। এই অঙ্গি হুল্লভ ও অতি মূল্যবান।

১১। যে তীক্ষ্ণধার অঙ্গির অল্প দোনা অথবা কুঁদ গাছের পাতার মত চিহ্ন থাকে, তাহা নমনবজ্র।

১২। যে খড়্গ অতি কঠিন, কোনরূপ চিহ্নরহিত এবং ছেদনকালে ছেদ্য বস্তুতে খেঁড়ে যায় না। তাহার নাম বামনাক।

১৩। বাহার নীলমেঘের ন্যায় আভা এবং অল্প এরও বীজের ন্যায় চিহ্ন দেখা যায়, তাহার নাম মহিষ।

১৪। যে খড়্গ মাঝিলে তাহাতে বর্ণপ্নের ন্যায় প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহার নাম অঙ্গপজ।

১৫। বাহার অল্প অতি মন্থর, ঘন ও স্তম্ভরেখাবিশিষ্ট, ধার অতি তীক্ষ্ণ, রক্তস্পর্শমাত্র বাহা শরীরে প্রবেশ করে, যে অঙ্গির যৌত অল্প পান করিলে আবিধাধি সূর হয়, তাহার নাম গজবজ্র।

দেশভেদে করবালের গুণাগুণ বৃত্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন ধর্ম্মের মতে—খটী, খট্টের, স্ববিক, বক, পূর্ণারক, বিনেহ, অঙ্গ, বধ্যমগ্রাম, বেলী, সহগ্রাম, জীন ও কালক্রমে যে লোহ উৎপন্ন হয়, তাহাই বর্ণানুসারে গুণাগুণ প্রাপ্ত।

খটী ও খট্টের দেশজাত করবাল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। স্ববিক দেশের তরবারি গুরুভার, অঙ্গারদেশেই ইহা দ্বারা শরীর ছিন্ন হয়। বকদেশীয় অঙ্গি অতি তীক্ষ্ণ, ছেদ ও তেজ কল্পিতে পটু। পূর্ণারকদেশীয় তরবারি অতিশয় কঠিন। বিনেহের তরবারি অসহ্য তেজস্বী ও প্রভাবশালী। বধ্যমগ্রামের করবাল লম্বু ও অতি তীক্ষ্ণ। বেলীদেশের অঙ্গি হালকা, তীক্ষ্ণ কিন্তু সারহীন। সহগ্রামের খড়্গ অতি তীক্ষ্ণ

৩ তারি হালকা । সীমাবদ্ধী বর্ণা তীক্ষ্ণ ও বেশ নির্মল । কাশজরের নিকট হইতে যে বর্ণা জন্মে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও স্থলকণযুক্ত ।

বহুবর্ণের মতে খড়্গের পরীক্ষা ৮ প্রকারে করিতে হয়, সেইজন্য ইহাকে অষ্টক কহে । যথা—১ অঙ্গ । ২ রূপ । ৩ জাতি । ৪ নেত্র । ৫ অরিষ্ট । ৬ ভূমি । ৭ ধ্বনি । ৮ পরিমাণ ।

১। খড়্গ প্রস্তুত হইলে তাহার শরীরে যে নানা প্রকার চিহ্ন বা দাগ হয়, সেই চিহ্নই অঙ্গ । অঙ্গ প্রায় ১০০ প্রকার হইতে পারে ।

২। খড়্গা যে রঙে দৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার রূপ । নীলরূপ, কৃষ্ণরূপ, শিল্পরূপ, হস্তরূপ প্রধানতঃ এই চারি প্রকার রূপ, এ ছাড়া মিশ্ররূপও হইয়া থাকে ।

৩। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি প্রকার খড়্গের জাতি, এ ছাড়া জাতিসঙ্করও হয় । যে খড়্গা সর্বাধিক বিঘ্নে প্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য তাহাই ব্রাহ্মণ জাতি । ইহা দ্বারা অল্প কত হইলেও সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা ও শোথ জন্মে । মূর্ছা, পিপাসা, দাহ ও জ্বর হইয়া শীঘ্রই প্রাণ বহির্গত হয় । হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই তিন জন্ম কুটুরা উক্ত খড়্গের উপর ১ দিন রাখিয়া দিলেও কবায় রসে মলিন হয় না, বরং অধিক পরিষ্কার হইয়া থাকে । হিমালয় ও কুশবীপে কখন কখন এই খড়্গা পাওয়া যায় ।

যে খড়্গা ধূমবর্ণ, তীক্ষ্ণধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত ও আবাতসহ তাহাই ক্ষত্রিয় । এই খড়্গা সংস্কার না করিলেও বহুদিন পরিষ্কার থাকে, ইহা শাণবস্ত্রে ধরিলে বহু অগ্নিকণা বাহির হয় । ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে তৃকা, দাহ, মলমূত্ররোধ, জ্বর, মূর্ছা ও কখন মৃত্যু ঘটে, বাহা দেখিতে নীল ও কৃষ্ণ, সংস্কার করিলে খুব উজ্জ্বল হয়, শাণ না দিলে তীক্ষ্ণ হয় না, একরূপ খড়্গা বৈশ্য জাতি ।

বাহা দেখিতে মেঘের মত, ধার মোটা, ধ্বনি মৃদু, শাণ দিলেও তীক্ষ্ণ হয় না, তাহাই শূদ্রজাতি ।

যে খড়্গা বহুজাতির লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হয়, তাহা জাতিসঙ্কর বলিয়া গণ্য ।

৪। তির তির চিক্কের নাম নেত্র । খড়্গবেত্তাগণের মতে নেত্রচিক্ক জিশের অধিক হয় না । যথা—চক্র, পদ্ম, গলা, শঙ্খ, ডমক, ধ্বজ, অশ্বপ, ছত্র, পতাকা, বীণা, বস্ত্র, শিব, স্বজ, অর্ধচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাগ্রনেত্র, সিংহ, সিংহাসন, গজ, হংস, মূরু, পুষ্কিকা, জিহ্বা, নগ, খড়্গা, চাবর, শিখা, কুম্বালা ও সর্পাকার চিহ্ন ।

৫। যে খড়্গের চিক্ক অমললবনক, সেই চিক্কের নাম

অরিষ্ট । খড়্গের অরিষ্ট ৩০ প্রকার । যথা—হিঙ্গ, মেধা, ভিন্ন, কাকপদ, ভেকশির, বিড়ালচক্ৰ, ইন্দুর, শর্করা, নীলা, মশক, ভ্রমরপদ, মৃচী, বিলু, কপোতক, নীচে নীচে জিবিম্ব, বর্ষর, লকল, শূকর, কুশপদ, জাল, কয়াল, ককপদ, খর্জুর, শূক, গোপুচ্ছ, খন্ডা, লালল ও বক্ষিণ ইত্যাকার চিক্কসকল অরিষ্ট । অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত খড়্গ যে ধারণ করে, তাহার নামা বিপদ ঘটে ।

৬। খড়্গের ভূমি দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রথম ক্ষেত্র বা কারা, দ্বিতীয় জন্মস্থান । খড়্গের ভাল মন্দ জানিতে হইলে তাহার জন্মস্থানের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত ।

খড়্গের ভূমি অর্থাৎ জন্মস্থান বিবিধ, দিব্য ও ভৌম । স্বর্ণে যে সকল খড়্গা বা লৌহ জন্মে তাহা দিব্য । আর বাহা ভারতবর্ষে জন্মে, তাহা ভৌম । বৃত্তিকরতক নামক নন্দিত গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে দেবদাস্যের যুদ্ধে প্রথমতঃ খড়্গের জন্ম হয় । তদনন্তর খড়্গাসকল কোন কোন পুত্র স্থানে রক্ষিত আছে । তাহার মধ্যে বেঙলি স্থলধার, অতি লঘু, নির্মল, স্নানরসে, অরিষ্টহীন, চূর্নকো, উত্তম ধ্বনিযুক্ত, বিনাসংস্কারেও নির্মল থাকে এবং তাকিলে আর বোড়া দেওয়া যায় না, তাহাই দিব্য খড়্গ । ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ ও অস্ত্রপাক জন্মে । (সম্ভবতঃ উদ্ভাসিত লৌহোৎপন্ন খড়্গাকেও দিব্য বলা বাইতে পারে ।)

ভৌম খড়্গের লক্ষণ জানিতে হইলে প্রথমে লৌহতত্ত্ব জানা উচিত । [লৌহ দেখে ।] ইহা দুই প্রকার—অমৃত ও বিষকন্মা । এক প্রাচীন কিংবদন্তি আছে যে, পুরাকালে দেবদাস্যের বিবাহ পান করেন, সেই পীত বিব বিলু বিলু ক্রমে নানা দেশে নিপতিত হইরাছিল । সেই সেই বিব-বিলু হইতে কালায়স বা ইস্পাত জন্মে, ইহাই বিষকন্মা । দেবগণ সমুদ্রমন্ধান্বিত অমৃত পান করেন, সেই পীত অমৃতের বিলু যে যে স্থানে পড়িয়াছিল সেই সেই স্থানে শুদ্ধ লৌহ উৎপন্ন হয়, শুদ্ধ লৌহের নাম অমৃতকন্মা । শুদ্ধ লৌহ বারাগনী, মগধ, সিংহল, নেপাল, অজমেশ, সুরাষ্ট্র, প্রভৃতি পুণ্যভূমে উৎপন্ন হয় । ওড়, কলিক, তত্ত্ব, পাণ্ড্য, অয়্যাত্ত ও বঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ শুদ্ধ লৌহ আছে । এই সকল লৌহের অসিই উৎকৃষ্ট ।

৭। ধ্বনি অর্থাৎ শব্দ শুনিয়া খড়্গের ভাল মন্দ জানা যায় । খড়্গের ধ্বনি প্রথমতঃ দুই প্রকার যোর ও তারি । হংস, কাক, চক্র ও মেঘধ্বনি এই চারি প্রকার ধ্বনিই যোর । যোরধ্বনিযুক্ত খড়্গ উত্তম বলিয়া গণ্য । কাক,

বীণা, ধর ও প্রেতর উচিত জানি, এই চারি প্রকার কনিই ভায়। তারধনিবৃত্ত খড়া ভাল নহে।

৮। খড়গের মান উত্তম ও অধম ভেদে বিবিধ। বাহা বিশাল ও হালকা তাহা উত্তম, বাহা খাট ও ভারি তাহা অধম। উহা আবার তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম ও অধম। নাগার্জ্জনের মতে, যে খড়গ যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির চতুর্থ ভাগ বিবৃত্তি ও ওজন হইলে তাহাই উত্তম। যে খড়গ যত মুষ্টি দীর্ঘ, তাহার অর্দ্ধ অঙ্গুলির তিন ভাগের এক ভাগ বিবৃত্তি ও তাহার অর্দ্ধ পল ওজন হইলে মধ্যম পরিমাণ। যত মুষ্টি দীর্ঘ, অঙ্গুলির ৪ ভাগের এক ভাগ বিবৃত্তি এবং তাহার অর্দ্ধ বা অধিক পল ওজন, তাহাই অধম।

পূর্বকালে রাজগণ অতি যত্নের সহিত অসিচালনা শিক্ষা করিতেন। বৈশম্পায়নোক্ত ধর্ম্মসূত্রে ৩২ প্রকার অসিচালন-ক্রিয়ার নাম পাওয়া যায়। যথা—ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আশ্রুত, বিপ্লুত, স্তব্ধ, সংযাত্ত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ, প্রগ্রহ, পদাবকর্ষণ, সন্ধান, যন্তুকভ্রামণ, ভূজভ্রামণ, পাশ, পাদ, বিবদ্ধ, ভূমি, উত্তমণ, গতি, প্রভ্যাগতি, আক্ষেপ, পাতন, ঔখানক, মুতি, লঘুতা, সোষ্টব, শোভা, হৈর্যা, দৃঢ়মুষ্টিতা, তির্যাক্ প্রচার, উর্দ্ধপ্রচার।

করভক (পুং) অহুকম্পিতঃ করভঃ করভকঃ করভ-কন্ (অহুকম্পায়াং। পা ৫।৩।৭৬) ১ প্রিয়তম হস্তিশাবক বা উষ্ট্রশাবক। ২ (স্বার্থে-কন্) করভ।

করভকাণ্ডিক (স্ত্রী) করভস্য প্রায়ঃ কাণ্ডঃ যন্তাঃ, বহুব্রী, করভকাণ্ড-কণ্, টাপ্ ইৎ। উষ্ট্রকাণ্ডী বৃক।

করভজ্ঞক (জি) করং ভনজি কর-ভনজ-বুল্ (বুল্ ভূচৌ। পা ৩।১।১৩০) করভজকারী। (পুং) প্রাচীন জনপদবিশেষ। (মহাভা' ভীম ২। ৬৯।)

করভজ্জিকা (স্ত্রী) করভজ্জক-টাপ্ (অজাভ্যতটাপ্। পা ৪।১।৪) ইৎ। ১ করভজ্জকারিণী। ২ করমর্দবিশেষ। [করমর্দ দেখ।]

করভজ্জন (জি) করং ভনজি ভনজ-লুট্। করভজকারী।

করভপ্রিয়া (স্ত্রী) করভস্য উষ্ট্রত করিশাবকত বা প্রিয়া, ৬৩৯। ১ কুজহরালতা। ২ উষ্ট্র বা করিশাবকাদির স্ত্রী।

করভবল্লভ (পুং) করভত বল্লভঃ ৬৩৯। ১ উষ্ট্রপ্রিয় পৌলুহক। ২ কপিখরুক।

করভালনী (স্ত্রী) করভেন উষ্ট্রেন অদ্যতে, করভ-অদ-কর্ম্মি-লুট্-ডীপ্। কুজ হরালতা।

করভী [ব্] (পুং) করভঃ হস্তস্য অবরবভেদবদ্ অকারোহতি ভভে বভ অথবা করোহতি ইব ভতি কর-ভা-ভ করভঃ ভভভতি বস্য বহুব্রী। হতী।

করভী (স্ত্রী) করভস্য স্ত্রী করভ-ডীপ্ (আভেরস্ত্রীবিধবাধমো-পধাৎ। পা ৪।১।৬০) স্ত্রীকরভ, হতী ও উষ্ট্রাদির স্ত্রী।

করভীয় (জি) করভ-টঞ। হতী বা উষ্ট্রগর্ভকারী।

করভীর (পুং) করভিনং করিণং কৈরয়তি প্রেরয়তি মুক্‌ইবৃন্দঃ, করভ-কৈর-অণ্। সিংহ।

করভু (স্ত্রী) করায় ভবতি কর-ভূ-ক্টিপ্। নথ।

করভুষণ (স্ত্রী) করো ভূষাতে অনেন কর-ভূষ-লুট্। ১ বস্ত্রণ। ২ হত্যালকার মাত্র।

করভোরু (স্ত্রী) করভবৎ উর্কয্যাঃ উঙ্। প্রাপ্ত উর্কবিশিষ্টা স্ত্রী।

করম (দেশজ) ১ “কর্ম্ম” শব্দ স্থানে পদ্যে এইরূপ আদেশ হয়। ২ (স্বাভিক) ভাগ্য, কর্ম্মফল।

করমঙ্গল। বারমহলের মধ্যস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখন বন ভঙ্গলময়, কিন্তু ইহার অনুরে পর্ব্বতোপরি প্রাচীন হিন্দুমন্দির ও রাজগৃহাদি রহিয়াছে। রায়কোট হইতে ২১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।

করমুচা (দেশজ) করমর্দ। [করম দেখ।]

করমট্ট (পুং) করং হস্তিগুণং অট্টি অতিক্রাময়তি কর-অট্টি-থ মুন্। ১ গুবাক বৃক, সুপারিগাছ। ২ পানিরা আমলা গাছ।

করমগুল। ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব উপকূল। এই নামের উৎপত্তি লইয়া কিছু গোলযোগ আছে। কেহ বলেন পুলি-কটের নিকটস্থ প্রাচীন ‘করমগুল’ গ্রাম হইতে করমগুল নাম হইয়াছে। পূর্বে এখানে পর্তুগীজদিগের জাহাজ লাগিত, নাবিক ও আড়তদারদিগের বাস ছিল। আবার কাহারও মতে, তামিল ‘চোরমগুল’ হইতে ইংরাজেরা অপভ্রংশ করিয়া করমগুল নাম দিয়াছে। শেবোক্ত মতই অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। তামিল ‘চোরমগুল’ শব্দের সংস্কৃত নাম চোলমগুল। প্রাচীন চোলরাজগণের সময় হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। [চোল দেখ।] পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান সোরটৈ (Sôrtai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (Ptolemy, Geog. Bk. VII. Ch. 1.)

করমরী [ন্] (পুং) ক্রিয়তি বিক্রিপতি মত্তাৰ্হান্ অজ ক্-অধিকরণে অণ্ করঃ কারাগারঃ তজ্জ ময়ঃ যুজ্যবৎ ক্লেপে অগ্ন্য বাহুলকাৎ ইনি অথবা কবে ভ্রিয়তে কর-মৃ-ইনি। বন্দী, করোণী।

করমর্দ (পুং) করং যুদ্যাতি, কর-যুদ-অণ্। করমর্দক বৃক, পানি আমলা। ভাবপ্রকাশের মতে কাঁচা করমর্দের গুণ—অম, শুষ্ক, তৃকানাশক, উষ্ণ, দৃঢ়িকর এবং পিত্ত, রক্ত ও কক-

দুষ্টিকারক। পক করমর্দ, মধুর, কঠিনজনক, লঘু, পিত্ত ও বায়ুনাশক। [করম দেখ।]

করমর্দক (পুং) করং মুদ্রাতি কর-মুদ-লু (লু কৃটো। পা ৩। ১। ১০০) বা করমর্দ এব স্বার্থে-কন্। ১ বৃক্ষবিশেষ, পাণি আমলা। ২ করোনা, করম্ভা।

করমর্দা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। এই নদী নর্মদা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার সম্মুখান পুণ্ড্রার্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তথায় করমর্দেখর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বল্প-পুরাণীয় রেবাক্ষেত্র মতে, করমর্দালগ্নমে দান করিয়া করমর্দেখর দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

করমর্দা [ন] (পুং) করং মুদ্রাতি মুদ-গিনি। পাণি আমলা।

করমর্দা (স্ত্রী) করং মুদ্রাতি মুদ-অগ-স্ত্রীপু। করমর্দকবৃক্ষ।

করমশোণি। বারভঙ্গের অন্তর্গত একটি গ্রাম। বারভঙ্গ-রাজমন্ত্রী করমশোনি এই গ্রাম স্থাপন করেন। (ভা ত্রয়োদশ ৪৪। ১৬০-৬১)

করমা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

করমাল (পুং) করং করিণ্ডঃ তদাকৃতিবৎ মালা সমূহো বস্যা। ১ ধুম। ২ মেঘ। (অন্তঃসুঃ করমালশ্চ স্তরী কীমূত-বাহপি। হেম ৪। ১৭০।)

করমালা (স্ত্রী) করং করাজুলিপর্কমালা ইব জপসংখ্যা-হেতুত্বাৎ। করপর্করূপ মালা। করমালার অপ করিতে হইলে অনামিকার তৃতীয়, মূলপর্ক, কনিষ্ঠার মূল, তৃতীয় ও শেবপর্ক অনামিকা ও মধ্যমার শেব, এবং তর্জনির শেব ও তৃতীয় মূল, এই অষ্ট পর্কে যথাক্রমে জপ করিতে হয়। অনামিকার মধ্য হইতে কনিষ্ঠাদি ক্রমে তর্জনির মূলপর্ক পর্যন্ত ক্রমশঃ ডানদিকে ১০ বার গমন করিয়া অপ করাকে করমালা কহে।

“আরক্ত্যানামিকামধ্যং দক্ষিণাবর্তযোগতঃ।

তর্জনী মূলপর্যন্তং করমালা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥”

করমুক্ত (স্ত্রী) করেণ গৃহীত্বা অরতিং প্রতি মুচ্যতে, কর-মুচ-ক্। (নিষ্ঠা। পা ৩। ২। ১০২) ১ অজ্ঞতেদ, বড়শী। ২ করাৎ মুক্তঃ ৩তৎ (ত্রি) হত্যাভ্যুত। ৩ নিভর।

করমেতিবাই। অসাধারণ ভক্তিমতী কোন ব্রাহ্মণকণ্ঠা। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের খাজল গ্রামে ইহার জন্ম, পিতার নাম পরশুরাম পণ্ডিত, তিনি ঐ দেশস্থ রাজার পুরোহিত ছিলেন। রাজা ও রাজপুরোহিত উভয়েই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্মশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য সে সময়ে বৈষ্ণবগণ জীমিগকেও বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। করমেতিবাই শৈশব-কালেই বিদ্যাবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বৈষ্ণবধর্মেও অধিকতর ভক্তি জন্মিয়াছিল।

পণ্ডিত পরশুরাম বখাকালে তাঁহাকে সংপাঞ্জে সম্মান করিলেন। করমেতিবাইয়ের বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। থাকিলেও পিতার অনুরোধে তিনি বিবাহ করিলেন। কিন্তু স্বামীকে অবৈষ্ণব ও অত্যন্ত বিবরী দেখিয়া, তিনি স্বামী সহবাস বা গৃহস্থানী করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলেন। তাঁহার সকল কার্যই সাধারণের বিষয়কর হইয়াছিল,—সর্ববাই তিনি নির্জনস্থানে থাকিয়া ইষ্টদেবের পানপত্র তিত্তা করি-তেন এবং পাগলিনীর ভায় কখন হাসিতেন, কখন কাঁদি-তেন, কখন বা ‘হা নাথ’ বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেন।

কিছুকাল পরে পুনর্বার তাঁহাকে স্বামীগৃহে লইয়া বাইবার জন্য বিশেষ বস্ত্র হইতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রহরসের আশাব পাইয়া সংসারে তাঁহার বিবরণ যুগা জন্মিয়াছিল, সুতরাং তিনি স্বামীগৃহে বাওরা নিতান্ত অনিষ্টকর জানিয়া সর্বদাই রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে কাহাকে কিছু না বলিয়া গোপনে ব্রহ্মাবন বাওরা স্থির করিলেন। রাজ্যকালে করমেতিবাই নিজের গৃহ হইতে বাহিরে আসি-লেন, বাটীর সকল দ্বারই বন্ধ থাকায় বাহিরে আসিবার কোন পথ পাইলেন না, অবশেষে মনের আবেগে উপরতলা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। করমেতিবাই বড় বাটীর বাহির হইতেন না, কোথায় ব্রহ্মাবন, কোনদিকে পথ, কিছুই জানেন না, তথাপি তিনি কান্দালিনীর ভায় একাকিনী উর্দ্ধ্বাশে ব্রহ্মাবন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে পরশুরাম পণ্ডিত গৃহে কজ্জাক না দেখিয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং রাজার নিকটে গিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য দিয়া চারিদিকে করমেতির অন্বেষণের জন্য লোক পাঠাইলেন।

করমেতিবাই একটি বৃহৎ প্রান্তর দিয়া বাইতে বাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ঘুরে তাঁহার অন্বেষণের জন্য লোক আসিতেছে। দেখিয়া নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ধূধু প্রান্তর, কোথাও লুকাইবার উপযুক্ত স্থান বুঝিয়া পাইলেন না, সমুখে কেবল একটি উষ্ট্রের মূত্রেদেহ পড়িয়া আছে, যুগল কুকুরে তাহার মাংসাদি প্রায় তক্ষণ করিয়াছে। ভীষণ দুর্গন্ধ, নিকটে বাওরাই প্রসাধ্য। ভক্তিমতী করমেতি সেই উষ্ট্রদেহের উদর মধ্যে লুকাইলেন। উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। অন্বেষণকারিগণ তাহার অন্য দিক দিয়া চলিয়া গেল। আবার কে কখন আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে তিনি ভিনবিন পর্যন্ত সেই উষ্ট্রের দেহ মধ্যেই অনাহারে কেবল কুচ্ছিতা করিয়া অতিবাহন করিলেন। তিন দিন

পরে তথা হইতে নির্গত হইয়া নদীতে স্নান করিয়া শরীর নির্মল করিলেন। এইরূপে তিনি পশ্চিমধ্যে বহুক্ষেপ সহ করিয়া বৃন্দাবনে পৌছিলেন। পবিত্র বৃন্দাবন দর্শনে তাঁহার বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইল, মন প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে বন মধ্যে কুকদর্শন অভিলাষে ধ্যানযোগে উপবিষ্ট হইলেন।

এদিকে পরশুরাম পণ্ডিত কস্তার বিরহে নিতান্ত শোকাক্ত হইয়া, দেশদেশান্তরে অন্বেষণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি বহু বন বহু স্থান অন্বেষণ করিয়াও কস্তার কোন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে একদিন একটি বিশাল বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে নিবিড় বনমধ্যে করমেতিকে উপবিষ্ট দেখিয়া অতি ব্যস্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সন্নিগদ্য সহ কস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এখন আর তাঁহার সে কস্তা নাই, সংসারের মলিনতা এখন তাঁহার দেহ হইতে বিনষ্ট হইয়া গিরাজে, সুখশ্রীর কেমন এক পরিবর্তন হইয়াছে, সমুদ্রার শরীরেই তপঃপ্রভা প্রকাশ পাইতেছে এবং কেমন এক আশ্চর্য্য জ্যোতিতে তাঁহার মুখমণ্ডল পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিলেন, তিনি বাহুজানশূন্য হইয়া ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষুঃস্বয়ং হইতে দীপ্তরশ্মি ধারায় প্রোক্ষিত বহিতেছে। কস্তার এই অবস্থা দেখিয়া পরশুরামের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তিনি আর করমেতিকে কস্তাভাবে দেখিতে সাহস পাইলেন না। অবশেষে নিতান্ত আকুল হইয়া তাঁহাকে সঠিক প্রাণপাত করিলেন।

বহুকাল পরে করমেতিবাই চক্ষু উন্মীলন করিলেন, সম্মুখেই পিতাকে উপস্থিত দেখিয়া নীরবে প্রশ্ন করিয়া নীরবেই বলিয়া রহিলেন, কেন পরম্পর অপরিচিত। পণ্ডিত পরশুরাম তাঁহাকে অনেক বিনয় করিয়া ফিরিতে বলিলেন, এবং গৃহে বলিয়াই কুকচিহ্ন করিতে অজরোধ করিলেন কিন্তু করমেতি তাহাতে কোনরূপেই স্বীকৃত না হইয়া, পিতাকে তাঁহার আশা ত্যাগ করিতে অজরোধ করিলেন, এবং সর্বদা কুকপদপাথনে উপদেশ দিলেন। কুকপদচিহ্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার কালে করমেতি প্রেমভরে মুগ্ধিত হইয়া পড়িলেন এবং পুনর্বার আপনা হইতেই কেন চেতনালাভ করিলেন।

পরশুরাম পণ্ডিত কস্তার এইরূপ অপারূপ ভক্তিতে চমৎকৃত হইলেন। বারবার অজরোধেও কস্তাকে ফিরাইতে

না পারিয়া একাকীই রোজন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাপিত হইলেন এবং রাজার নিকট সমুদ্রার কীর্তন করিলেন। রাজা বিশেষ ভগবৎ প্রেমিক ছিলেন, তিনি করমেতিকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথায় করমেতির নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্রেও তাঁহাকে একটি কুটীর নির্মাণ করিয়া দিলেন। এখনও ঐ কুটীরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে।

করমোদা (জী) নদীবিশেষ। (বিষ্ণু, মার্ক, ব্রহ্মাণ্ডপু) করম্ব (জি) ক্রিয়তে কৃ-অবচ্ (কুকদিকড়িকটিভ্যোহচ্। উপঃ। ৮২) মিশ্রিত। ২। ভাবে অবচ্। মিশ্রণ, মিশান। (করম্বঃ কবরো মিশ্রঃ সম্পৃক্তঃ ষচিত্তঃ সমাঃ। হেম ৩। ১০৫।)

করম্বক (জি) করম্ব-স্বার্থে কন্। করম্ব।

করম্বিত (জি) করম্বঃ মিশ্রণং জাতোহচ্, করম্ব-ইতচ্। ১ মিশ্রিত। ২ ষচিত্ত। (“মধুকরনিকর করম্বিত কোকিল-কুজিত কুঞ্জ কুটীরে।” গীতগোবিন্দ)

করম্ব (পুং) কেন জলেন রভাতে একত্রীক্রিয়তে ধাতুনামনেকার্থবাৎ; ক-রভ-ঘঞ (অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞারাম্। পা ৩। ৩। ১৯। রভেরশব্ লিটোঃ। পা ৭। ১। ৬৩। হৃম্) ১ দধিমিশ্রিত ছাত্ত। ২ উদমহ। ৩ ভাষা ব্যবহৃত। ৪ মিশ্রগন্ধ। ৫ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। ৬ শতাবরী, শট বা শতমূলী।

করম্বক (স্ত্রী) করম্ব-স্বার্থে কন্। দধি মিশ্রিত ছাত্ত। ইহার অপর সংস্কৃত নাম কর্কসার। (“নিভৈরজলিভিঃ প্রাদাৎ বিজন্মভ্যঃ করম্বকন্।” রাজতরঙ্গিনী ৫। ১৬।)

করম্বা (স্ত্রী) কেন জলেন বায়ুনা রভ্যতে সিচ্যতে বিকী-র্যতে বা, ক-রভ-ঘঞ (অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞারাম্। পা ৩। ৩। ১৯) টাৎ। ১ শতাবরী। ২ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৩ কলিঙ্গ দেশীয়া স্বনামখ্যাতা রমণী, পুরুষাঙ্গীর অক্রোধন নৃপতি ইহার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার গর্ভে দেবাত্মির জন্ম হয়। (ভারত আদি ৯৫। ২২)

করম্বি (পুং) বহুবঙ্গীর রাজবিশেষ। ইহার পিতার নাম শকুনি এবং পুত্রের নাম দেববর্ত। (ভাগবত ৮। ২৪। ৫)

করম্বোড় (দেশজ) উত্তরহস্ত একজ করা, বিনীতভাব, যোড়হস্ত। (“করম্বোড়ে কহেন রাজন।” গোবিন্দমঙ্গল।)

করম্ব (আরব্য) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

করম্বা (আরব্য) কর্কশ, খড়্গ-যুগ্ম।

করম্বক (জি) করে কারাগারে হতেন বা কঙ্ক। ১ কারাগারে আবদ্ধ। ২ হস্ত দ্বারা আবদ্ধ।

করম্বহ (পুং) করম্বঃ রোহিত উৎপদ্যতে। কর-ক-ক (ইতপদ্য। পা ৩। ১। ১০৪) ১ নব। ২ অকুলি। ৩ কৃষ্ণাণা

করবী (কী) করত বাদি। ১ করবীপং। ২ (করেন
বদ্বিষত) করভাসী।

করুল (দেশজ) পাকবিশেষ। (Buco Carula.)

করুল (দেশজ) কারবের, উচ্ছে। [উচ্ছে দেখ।]

করবার (পুং) করং বৃণোতি, বারয়তি আক্রমণকারিত্যো বা
কর-বৃ-অন্। (কর্ণগণ্য। পা ৩।২।১) ১ কৃপাণ, খড়্গ।
২, কাপাড়া প্রদেশের একটি নগর। গোরা হইতে
২২ কোশ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪° ৫০' উঃ,
দ্রাঘি° ৭৪° ১১' পূঃ।

১৬৬৩ খৃঃ অব্দে এখানে ইংরাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
আপনাদিগের কুঠী স্থাপন করেন। টিপু সুলতানের সময়ে
সে সকল নষ্ট হইয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা অধি-
কাংশই কোকন ভাষা ব্যবহার করেন, তবে বহুদিন বিজয়পুর
রাজ্যের অধীন থাকার মহারাষ্ট্রভাষারও প্রচলিত আছে।

করবারক (পুং) করং বারয়তি আচ্ছাদয়তি। কর-বৃ-লু
(লু ভূটো। পা ৩।১।১৩৩) ১ হস্তাবরণকারী। ২ দেয়
রাজ্য বন্ধকারী।

করবিন্দুস্বামী। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রের একজন ভাষ্যকার।

করবী (কী) কস্ত বারোঃ রবে বিদ্যাতে হ্রঃ গৌরাদিবাং
ভীষ্। ১ হিন্দুপত্র, ইন্দুরীক্ষ। করেন বীরতে ক্ষিপ্যতে কর-বী-
ক্ষিপ্ (অভ্যেত্যোহপি দৃষ্টতে। পা ৩।২।১৭৮) ২ কবরী,
চুলের ধোঁপা। ৩ বনামধ্যাত প্রসিদ্ধ পুষ্প। [করবীর দেখ।]

করবীক (কী) কবরী স্বার্থে কন্। কবরী। [করবীর দেখ।]

করবীর (পুং) করং বীরয়তি, বীর বিক্রান্তৌ অণ্। (কর্ণগণ্য।
পা ৩।২।১) ১ কৃপাণ, খড়্গ। ২ দেশভেদ। ৩ শ্মশান।
৪ ব্রহ্মবর্ত। ৫ দৃশ্যবতী নদীতীরস্থ চন্দ্রশেখরনামক রাজপুরী।

৬ রাজপুরী বিশেষ। চেন্নদেশের নিকটবর্তী এবং গোমন্ত-
পর্বত হইতে ৩ দিবসের পথে অবস্থিত। কংসবধ প্রবণে
কুরু জরাসন্ধ রাম ও কৃষ্ণের বিনাশ কামিনার মথুরাপুরী
অবরোধ করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ রাম ও কৃষ্ণের পরাক্রমে
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, বুদ্ধ চৌধুরের
অভিপ্রায়ানুসারে রাম ও কৃষ্ণ চেন্নি হইতে অনতিদূরবর্তী
করবীরপুর অভিযুগে সন্নিভে বাজা করিলেন। রামকৃষ্ণের
আগমনবার্তা শুনিয়া উক্ত করবীরপতি শৃগাল তাঁহাদের
পতিরোধ লভ উপস্থিত হইলেন, কিন্তু যোদ্ধার বুদ্ধ শৃগাল
হত হইলেন। (হরিবংশ ৯৯।১০১ অঃ।) মহাকব্যরতের
যদর হইতে একটি তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

করবীরপুর নবাবপ্রতিপত্তি দ্বিতীয় আছে,—

*বোজনে দশ হে পুত্র কারাট্টো দেশহুঃ ২৪

ভগ্নাধ্য পক্ ক্রোশক কাষ্ঠাভিযাধিকং কুবি।

কেত্রং বৈ করবীরাখ্যং কেত্রং লক্ষ্মীবিদিশ্রিতম্। ২৫

ভং কেত্রং হি মহৎ পুণ্যং দর্শনং পাপনাশনম্।

তৎকেত্রে ধরঃ সর্গে ভ্রাকর্ণা বৈদ্যপরিণীঃ। ২৬

ভেবাং দর্শনমাত্রেণ সর্গপাপকরো ভবেৎ।

তৎকেত্রং কেবলং পীঠং মহালক্ষ্মীচ্যুতভূতঃ। ২৭

উত্তরাঙ্কে ২ অঃ।

হে পুত্র। দর্শনোজন বিদ্যুত হৃদয় কারাট্টদেশ, তাহারই
মধ্যে কানী প্রভৃতির অধিক পুণ্যস্থান লক্ষ্মীবিদিশ্রিত
করবীরকেত্র। সেই কেত্র দর্শন করিলে মহাপুণ্য লাভ
হয় এবং পাপক্ষয় হয়; বেদপারগ ভ্রাকর্ণ ও ঐবিগণ সেই
কেত্রে বাস করেন, তাঁহাদিগের দর্শনমাত্রে সকল পাপ
বিদূরিত হয়। সেই কেত্রই কেবল মহালক্ষ্মীর পীঠ
বলিয়া কথিত।

কারাট্টদেশের বর্তমান নাম করাট। এতএব করবীর
এই করাটের অন্তর্গত। [করাট দেখ।]

২ পুষ্পরূপ বিশেষ। ইহার সংস্কৃতপরিচয়,—প্রতিহাস,
শতপ্রাস, চণ্ডাত, হরমারক, প্রতীহাস, অম্বয়, হমারি, অম্ব-
মারক, শীতকুন্ত, তুরঙ্গারি, অম্বা, বীর, হরমার, হরম,
শতকুল, অম্বরোধক, বীরক, কুল, শকুল, খেতপুলক,
অম্বাতক, নখরাস্ব, অম্বনাশন, হলকুহুদ, দিবাপুল, হরিপ্রিয়,
গৌরীপুল ও সিদ্ধপুল।

করবীর হই প্রকার খেতকরবী ও রক্তকরবী। খেত
করবীর পরিচয়—খেতপুল, শতকুল, অম্বমার। লাল করবীর
পরিচয়—রক্তপুল, চণ্ডাত, লণ্ডক।

হিন্দীভাষার ও দাক্ষিণাত্যে কণের, তামিলে আদারি,
তৈলঙ্গে ঘেরেক, আরব্য ও পারসীতে দিক্কা, ইংরাজীতে
Oleander কহে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Nerium
Odorum.

উত্তর প্রকার করবীরলতাই ভারতবর্ষের নানান্থানে
জন্মে। কোন গাছে কেবল লাল অথবা কেবল লাল, আবার
কোন কোন গাছে খেতরক্ত মিশ্রিত মূল জন্মে, শেবোক্ত
করবীরকে অনেকে পদ্মকরবী বলিয়া থাকে। বৈদ্যকশাস্ত্র-
মতে উত্তর প্রকার করবীর গুণ—তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণ
বীৰ্য। ব্রণ, চক্কুরোগ, কুষ্ঠ, কত, ক্রিমি ও কক্কু প্রভৃতি
রোগে ইহার মূল ব্যবহার করা যায়। ইহার মূল বিবাক,
আত্যাতিিক প্রয়োগে বিষবৎ কার্য করে। (চক্রপাণ্ড,
তাবপ্রকাশ, পাঁচধর)। হাকিমীগ্রন্থে ইহা মৃদু-উষ্ণ বিধর ও
ধন্বনহর নামে অভিহিত; ইহা প্রদাহ ও কটিক দ্বিধারক।

ইহা বাহু প্রয়োগ করিতে হয়, আত্যন্তরিক প্রয়োগে কি বহুবা
কি জীবজন্তু সকলেরই দৃষ্ট্য হয়।

বীর মুহম্মদ হোসেন নামক মুলগম্বান হাকিম বলেন,
ইহার মূল অপর সকলস্থলে বিবরণ হইলেও, সর্পে কামড়াইলে
ইহা বিবনিবারক হইয়া থাকে। পোকা মাকড় মারিতে
হইলে ইহার মূল প্রয়োগ করা যায়।

জীলোকেরা অনেক সময়ে ঐ মূল খাইয়া আত্মহত্যা
করে। একজন মজিনদেশে জীলোকে জীলোকে বিবান উপস্থিত
হইলে 'কণের' কাছে বাও, এইরূপ বলিয়া গালাগালি দেয়।

ডাক্তার ডাইমক বলেন, করবীরূলে জীৱ জন্মিয়া আছে।
ইহার ০০০১৬ গ্রেণ মাত্র একটা তেজকে খাওয়াইয়া দেখা
গিয়াছে যে, ১৪ মিনিট পরে জন্মগতি নিশ্চয় হয়। সেই সঙ্গে
জন্মগতি ও বর্ষরোধ হইয়া যায়।

করবীরূল হিন্দুদেবতার অতি প্রিয় দ্রব্য। ইহার পাতা
ও বকল শুকাইয়া বাটুরা প্রয়োগ করিলে সর্পপ্রকার চর্ম-
রোগে উপকার সর্পে।

করবীরক (পুং) করবীরবৎ কারিত্তি প্রকাশিতে কৈ-ক
(আত্মোহুপসর্গে ক। পা ৩। ২। ৩।) বা করং বীরয়তি
বীরবিক্রান্তো বুল (বুল ভূচো। পা ৩। ১। ৩৩) ১ অর্জুনবৃক্ষ।
২ অর্ধে কনু। করবীর। ৩ বজা। ৪ করবীর মূলরূপ বিব।
করবীরকন্দসংজ্ঞা (পুং) করবীর কন্দ ইতি সংজ্ঞা বজ।
তৈলকন্দ।

করবীরতৈল [করবীরাদ্য দেখ।]

করবীরপূর (স্ত্রী) [করবীর দেখ।]

করবীরভূজা (স্ত্রী) করবীরভূজঃ শাখা ইব ভূজঃ শাখা যভাঃ
বহতী। আচকীবৃক্ষ, অরহর।

করবীরভূষা (স্ত্রী) করবীরভূষেব ভূষা অভাঃ। আচকী,
অরহর।

করবীরাদ্যতৈল (স্ত্রী) করবীরং আদ্যং প্রধানং যজ বহতী।
কুষ্ঠরোগাধিকারের বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। খেতকরবীর
মূলের মল, গোমুত্র, চিতা ও বিড়ল এই সকল দ্রব্যের সহিত
যথাবিধি তৈল পাক করিয়া কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে।

খেতকরবীর মূল ও বিব (মিঠা) সমভাগে কড়
করিয়া গোমুত্রের সহিত তৈল পাক করিবে। ইহা সেবনে
চর্মদল, শিথ, পামা, বিস্ফোট ও কিটিন প্রভৃতি রোগ
বিনষ্ট হয়। ইহার নাম খেতকরবীরাদ্যতৈল।

করবীরী (স্ত্রী) ক্রিয়তি বিক্ৰিপতি দানবরাক্ষসাদীন কৃ-অহ
(মজিগ্রহিণ্যভিহিতো ২৫। পা ১। ১৩৪) করঃ বীরঃ
পুত্রোহত্য। ১ অরিকি। কং অং রাতি দ্যতি ক-ক-ক

(আত্মোহুপসর্গে। পা। ৩। ২। ৩) করঃ করবীরকঃ
বীরঃ পুত্রো বভাঃ। ২ পুত্রবতী। ৩ শ্রেষ্ঠগবী। (করবীর্য-
মিতি শ্রেষ্ঠগবী পুত্রবতীবৃ ৬। বেলিনী।)

করবীর্য (পুং) করবীরপুত্রঃ ভবঃ, করবীর বৎ। ১ খরতরির
প্রতি আকর্ষণের প্রসঙ্গ। অবিবিশেষ। ২ (করত বীর্যং)
বাহুবল।

করশাখা (স্ত্রী) করত শাখা ইব। অজুলি। ইহার সংকত
পর্বার, — অগ্রু, অধা, কিপ, ত্রিণ, পর্বার, রপনা,
ধীতি, অধর্বা, বিপ, কক্ষা, অবনি, হরিং, অসার, জামি,
সনাতি, যোক্ত, যোজন, ধুর, শাখা, অভীত, দীপতি ও
গততি। (বেদনিষক্টু ২ অঃ।)

করশীকর (পুং) করং করিত্তাৎ নিহতঃ শীকরঃ, করস্য
শীকরো বা। হস্তির তত্তনিকিণ্ড জলকণ। ইহার অপর
সংকত নাম বমধু।

"উদাত্তময়িং শময়াৎকৃত্ব গর্জা বিবিধাঃ করশীকরেন।" রত্ন।
করশুক্লি (স্ত্রী) করত শুক্লিঃ (৬৩৭) 'কড়' এই মন্ত্র
উচ্চারণ করিয়া গুরুপুষা দ্বারা হস্তশোধন। ("আদ্যাব্যাদিক-
ভাগঃ করতুক্তিততঃ পরম্" তন্ত্রসার।) পুন্ড্রাদি কার্যে অঘ্যা-
দিভাসের পরেই করশুক্লি করিতে হয়।

করশুক (পুং) করত করে বা শূকঃ অস্মাঃ অগ্যাগ্র
ইব বা। নথ।

করশোধ (পুং) করগতঃ শোধঃ মধ্যলো। হস্তের শোধ
(মুলন)। [শোধ দেখ।]

করস্ (স্ত্রী) ক্রিয়তে বৎ ক-অহনু। কর্ণ। ("প্রতে পূর্নানি
করণানি বিপ্রা বিপ্রা আহ বিহবে করংসি" ঋক্ ৪। ১৯ ২০।)

করসাদ (পুং) সদনং সাদঃ সদ-ভাবে দাৎ করত সাদঃ
অবসন্নতা। হস্ত অবশ হওয়া।

করসূত্র (স্ত্রী) করে স্থিতং সূত্রং ৭৩৭। ১ হস্তের সূত্র
সূত্র। ২ বিবাহকালীন মঙ্গলার্থ হস্তে ধৃত সূত্র।

করহালী [ন] (পুং) করঃ হালীব অস্ত। মহাদেব। যেরূপ
হালিতে (হাঁড়ি) পাক করিয়া থাকে, মহাদেবও সেইরূপ
মহাকালরূপে প্রলয়কালে হস্তরূপ হালীতে সমুদায় জ্বতের
পাক করিয়া থাকেন।

"তলভাগঃ করহালী উর্জসংহননো মহান।"

ভারত অহু ১৭ অঃ।

করস্ন (পুং) করং করঃ কৃ-অপু করং-প্রতি কয়োতি বাতৃ-
নামনেকার্থবাৎ জা-ক (আত্মোহুপসর্গে ক। পা ৩। ২। ৩)
কর্মকর বাহ। ("যেবৎপ্রা করবা দবিবে বপুঃ" ঋক্ ৩।
১৮। ৪।) বাহ। (বেদনিষক্টু ২। ১৮)

করবান (পুং) করত বানঃ ৩৩৭। হস্তাবনি।

করহকা (ক্ৰী) সপ্তাকরা হস্তাবিশেষ।

করহাটি (পুং) করণ বিকিরণেন হাটিতে দীপ্যতে হট-গিচ্-অণ্। (কর্ণগাণ্। পা ৩। ২।) ১ পদ্যাবির মূল। ২ করং হাটহতি হট-গিচ্-অণ্ করহণি। মদনবৃক্ষ। ৩ দেশবিশেষ।

করহাটক (পুং) করহাট ইব স্বার্থে কন্ অথবা করং হট-রতি কর-হট-গিচ্-বুল্ (বুল্ তুটৌ। পা ৩। ১। ১৩৩) ১ মদন বৃক্ষ। ("করহাটকাঙ্কনককুভেত্যানি" মুদ্রতঃ)।

২ করত হাটকং (ক্ৰী) স্বর্ণের হস্তালঙ্কার। ৩ জনপদবিশেষ। (সভাপর্ক)। ইহার বর্তমান নাম করাঢ়। [করাঢ় দেখ।]

করাঘাত (পুং) করণ আঘাতঃ ৩৩৭। হস্তাঘাত, কিল, চাপড়, বুসি প্রভৃতি।

করাঙ্গণ (ক্ৰী) করত আসনঃ ৩৩৭। রাজস্ব আদায়ের স্থান।

করাঙ্গুলি (পুং) করত অঙ্গুলি ৩৩৭। হস্তাঙ্গুলি, হাতের আঙ্গুল।

করা (দেশজ) ১ কড়া, শক্ত। ২ ক্রোধী। ৩ ক্রিপণ।

করাগার (পুং) করত আগারঃ। রাজস্ব আদায়ের গৃহ।

করাচি। ভারতের সর্বপশ্চিম প্রদেশস্থ সিন্ধুদেশের একটি জেলার নাম করাচি। এই জেলার উত্তরে শিকারপুর জেলা, পূর্বে হায়দরাবাদ জেলা ও সিন্ধুনদ, পশ্চিমে সাগর ও বেলুচিস্থান, দক্ষিণে কোরিনদী এবং সাগর। করাচিজেলা ও বেলুচিস্থানের মধ্যে হাবনদী বহুদূর পর্যন্ত ভারতবর্ষ এবং বেলুচিস্থানের মধ্যে সীমান্তরূপে প্রবাহিত। উত্তরদক্ষিণে এই জেলার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল এবং পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃতি প্রায় ১১০ মাইল, পরিমাণকল ১৪১১৫ বর্গমাইল। এই জেলার সদরধানার নাম করাচি। সিন্ধুনদের মোহানা হইতে বেলুচিস্থানের পূর্বসীমা পর্যন্ত এই জেলার ভূমিভাগ সকল স্থলে সমান উচ্চ নহে। জেলার পশ্চিমাংশে কোহিস্থান নামক উপবিভাগের মধ্যে কতকটা পার্শ্বত্যাগ্রদেশ আছে। বেলুচিস্থানের পূর্বাংশস্থিত হালা পর্বত হইতে কতকগুলি পর্বতশিখর বহির্গত হইরাছে। এই সকল পার্শ্বত্যাগ্রদেশের মধ্যে মধ্যে উর্বর উপত্যকা আছে। ভূমিভাগ সাধারণতঃ দক্ষিণপূর্বমুখে নাবাল। উপকূলভাগে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগরশাখা প্রবেশ করিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে নদীতীরে বাবলা-বন বধেই। সিন্ধুনদই এখানকার প্রধান নদী। কিন্তু হাবনদী হইতেই এ জেলার অধিকাংশ স্থলে জল পাইয়া থাকে। এ জেলার সিন্ধুনদ প্রায় ১২৫ মাইল বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণাংশেই সিন্ধু বহু শাখার বিস্তৃত হইয়া সাগরে পতিয়াছে। এই সকল শাখা বড়ই গতি-

পরিবর্তনশীল, বর্তমান উল্লিখিত শাখাবির আরম্ভে নীতা এবং বাবিরার নামক শাখা হইতে বেশ বিস্তৃত ছিল, এমন কি উহাদের মধ্যে বহুক্ষেত্র জাহাজাবি বাতারাভ করিতে পারিত, কিন্তু ১৮৩৭ সাল হইতে বাবিরার নদীর জল তির পথ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আর পুরাতন নীতা ক্রমশঃ ভরিয়া গিয়াছে। বাগনা নামক একটি শাখার তীরে করাচি জেলার প্রাচীন বন্দর "শাহবন্দর" অবস্থিত ছিল। বহুদিন পর্যন্ত এই বন্দর কলকরা রাজবংশের নৌবন্দর ছিল। তৎপরে এখানে বৃহজ্জাহাজাদিও থাকিত, কিন্তু এখন এখানে হইতে নদী প্রায় ১০ মাইল সরিয়া গিয়াছে। এখন "হজারমো" নামক শাখাই সিন্ধুর প্রধান সুখ বলিয়া গণ্য হইরাছে। ১৮৪৫ সালেও এই শাখাটি অতি ক্ষুদ্র ছিল, শাল্ভি তির ক্ষুদ্রনৌকা অতিক্রমে গভীরায় করিত। এই জেলার মধ্যে সেওয়ারন উপবিভাগে "মহর" নামে একটি বৃহৎ হ্রদ আছে। এত বড় হ্রদ সিন্ধুদেশের মধ্যে আর নাই। করাচিনগরের ৭৮ মাইল উত্তরে পার্শ্বত্যাগ্রদেশে "শির-মাংঘো" নামক স্থানে কতকগুলি উচ্চ প্রবেশ আছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা নাকি অতি মূল্যবান। ভ্রমণকারীরা প্রায়ই এই স্থানের শোভা দেখিবার জন্ত আসিয়া থাকে। এই স্থানের নিকটই একটি "জলা" আছে। এই জলার অসংখ্য ক্ষুদ্রী বাস করে। আরণ্য জন্তর মধ্যে চিতাবাঘ, হায়না, নেকড়েবাঘ, শৃগাল, উকামুখী, তলুক, হরিণ ও বন্যমেঘ প্রধান। পক্ষীর মধ্যে শকুনির সংখ্যা বধেই। কোহিস্থানে নানা জাতীর সরীসৃপ দেখা যায়।

করাচি জেলার মূলমান অধিবাসীর সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরে হিন্দু ও তৎপরে অন্যান্য জাতি। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও লোহানার সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য জাতির মধ্যে জৈন, পারসী, রিহনী ও বৌদ্ধ আছে। এই হ্রদ পশ্চিমে ১৬ জন ব্রাহ্মণ আছে। এই জেলা করাচি, সেওয়ারন, জিবক ও শাহবন্দর নামে ৪টি উপবিভাগে বিভক্ত।

এই জেলার করাচি, কোটরি, সেওয়ারন, বুবক, রুহ, ঠাঠা, কেতি বন্দর, মণ্ডল ও মীরপুর বড়োমো নামক করেকটি নগর প্রধান। করাচির বন্দর ৩টা—করাচি, কেতি ও শিরগঙ (শ্রীণ্ড)।

এখানকার লোকে বলে যে ঠাঠা নগর হইতে খ্রীস্বেসম্রাট আলেকজান্ডারের সেনাপতি নিরাকসু পারত সাগরোদ্দেশে গমন করেন। সেওয়ারন নগরে এক স্মৃতি প্রাচীন হর্ষের তদা-বশেব আছে; অনেক বলে, এ হর্ষটীও আলেকজান্ডারের নির্মিত। করাচির জেলার স্মৃতি অসংখ্যই আছে। হইয়া

থাকে। কুটি, কুণ ও নির্ভরর জলের উপরেই এখানকার কুবি চিলিয়া থাকে। মালিরকেজে জেলার, বাজিরা, বন ও ইকু জঙ্গে। জিবক ও শাহবন্দরের নিকটবর্তীখানে চাউল, গম, ইন্দু, ভুট্টা, তুলা ও তামাক জন্মে। কোহিহানের পার্শ্বভাষ্যে ফোমনরূপ শস্যাদি জন্মে না। এখানকার দোকেরা আরই কৃষাহারী সত্ত্বাৎসেই জীবন ধারণ করে। এই জেলার ভিনবায় থল হয়, যে থল জোঠে আদ্যাতসানে উপ ও কার্তিক অগ্রহায়ণে পরিপক হয় তাহাকে "কারিক" থল বলে, যে থল কার্তিক অগ্রহায়ণে উপ এবং বৈশাখ জোঠে পরিপক হয় তাহাকে "রবি" থল, কাকদ চৈজে উপ ও আদ্যাত শ্রাবণে পরিপক হয়, তাহাকে "আধাওয়া" থল বলে। করাচিজেলার প্রধান পণ্যস্রব্য—তুলা, গম ও পডলোম।

শাহবন্দরের নিকট ঈগণ্ড খাঁজিতে বখেট লবণ জন্মে। ফাণ্টেন বার্ড ১৮৪৭ সালে এখানকার লবণস্তর পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে এই লবণ লইয়া ক্রমাগত ৪০০ শত বৎসরকাল সমস্ত পৃথিবীর লবণের খরচ কুলাইতে পারা যায়। এখানে লবণস্তরের পরিমাণ বিগুন-বলিয়া কেহই এই লবণ উড়াইয়া ব্যবহার করিতে পারে না। সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার ব্যবসাও আছে। বুহানা নামে মুসলমান জাতি এই ব্যবসা করিয়া থাকে। ঠাঠানগরী জুদ্দিনামক শীতবস্ত্রের জন্ম এবং বুবকনগর কার্পেটের জন্ম বিখ্যাত।

করাচিজেলার অধিকাংশ নগর সিদ্ধুর ইতিহাসের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট। [বিশেষ বিবরণ "সিদ্ধু" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

করাচিগহরে সিদ্ধুপ্রদেশের সেনাবাস স্থাপিত আছে। এই নগরের ঠিক দক্ষিণে করাচি উপসাগর। এই উপসাগরের এক পার্শ্বে মানোরা অন্তরীপ। মানোরা অন্তরীপ ও ক্লিক-টন নামক বাহানিবাসের মধ্যে করাচি উপসাগরের বিস্তার আর ৩৫ মাইল কিন্তু প্রবেশের মুখে "সিদ্ধু পাছাড়" নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্শ্বভাষ্যে এবং "কিরামারি" নামক দীপে প্রায় বন্ধ। মানোরা অন্তরীপে একটি আলোকস্তম্ভ আছে। এই আলোকস্তম্ভের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপও আছে।

করাচি নামের কারণ—১৭২৫ খৃষ্টাব্দে বেখানে হাব নরী সাগরে মিলিতেছে, সেখানে বড়কন্যায় একটি নগর ছিল। বড়কে তখন ব্যবসার বাণিজ্য বেশ বিস্তৃত ছিল। ক্রমশঃ কালে বড়কন্যায় প্রবেশের পথ বাণিতে বন্ধ হইয়া গেলে, আরও একটু দক্ষিণে, বেখানে এখন বর্তমান করাচি নগর বর্তমান, সেইখানে "কলাচিকুন" নামে এক ক্ষুদ্র নগর ছিল। এই স্থান হইতে করাচির চারিদিকে ব্যবসার বাণিজ্যের আধারাদি রঙাদি বাড়িতে থাকে। ক্রমশঃ

এখানে দ্বীপ নির্মিত হয় ও সফটনগর হইতে ভোপ জারিয়া ঐ দ্বীপ অরক্ষিত করা হয়। সেবে "শাহবন্দরের" ব্যবসার একেবারে মরিয়া গেলে এই স্থান সমুদ্রচাপা হইয়া উঠে। উক্ত "কলাচি" নাম হইতেই "করাচি" নাম হইয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

করাচি (জি) করার বিবেচনার অর্থে অট-অট। চাপড়।

করাচিয়া (দেশজ) পকিবিশেষ।

করাচী (দেশজ) করাচী, লেখক।

করাচ (দেশজ) করণ্ড শব্দের অপভ্রংশ। কাঠ চিরিয়ার অল্পবিশেষ।

করাচী (দেশজ) করাচ ব্যবসায়ী, বাহারী করাচের দ্বারা কাঠ চিরে।

করাচগ্রাম। কাশীজেলার গ্রামবিশেষ (ত' ব্রহ্মণ্ড ৪৪:৫০।)

করাচ। ১ বোম্বাই প্রদেশের সাতারাজেলার অন্তর্গত একটি বিভাগ। ইহার ভূমি পরিমাণ ৩৯৫ বর্গমাইল। মহাত্ম্যতে এই স্থান 'করাচটক' নামে সম্রাট নগরীর সহিত উক্ত হইয়াছে। কথা—

"নগরীং সম্রাটক পাঞ্চ করহাটকম্।

দুইতের বশে চক্রে করকৈনানদাপন্নঃ" তারত সভা ৩৯:৭০

দাক্ষিণাত্যের বনবাসী প্রভৃতি কোন কোন স্থানের প্রাচীন শিলাকলকেও করাচের প্রাচীন নাম করহাটক দৃষ্ট হয়।

কলপুরাণের মহাজিহণ্ডে এই ভূভাগ 'কারাট্ট' নামে উক্ত হইয়াছে। মহাজিহণ্ডমতে কারাট্ট কোয়না সন্দের দক্ষিণে এবং বেদবতী নদীর উত্তর পর্য্যন্ত সর্বগুণ্ড ১০ যোজন বিস্তৃত।

"বেদবত্যাশ্রোতরে কু কোয়নাসন্দেরদক্ষিণে।

কারাট্ট নাম দেশস্ত দৃষ্টদেশঃ প্রাকীর্ষিতঃ" উত্তরার্কে ২:৩।

এখানে লক্ষ্যিক হিন্দুর বাস, তন্মধ্যে করাচ ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। [করাচব্রাহ্মণ দেখ।]

২ করাচ বিভাগের প্রধান নগর। তুলা ও কোয়নানদীর সন্মুখস্থানে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৩৭' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°১০' ৩০" পূঃ। এখানকার লোকসংখ্যা ১০৭৭৮। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই নরহাকার। এখানে লবঙ্গের আদালত, ডাকঘর, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

করাচব্রাহ্মণ (কারাট্টব্রাহ্মণ) মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণ জাতিবিশেষ।

আপনাদিগের অল্পভূমির নামানুসারে ইন্দোনিগের নামও করাচ হইয়াছে। কলপুরাণের মহাজিহণ্ডে ইহাঙ্গা অতি বিলিণ্ড ও দৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কথা—

"কারাট্টো নাম দেশস্ত দৃষ্টদেশঃ প্রাকীর্ষিতঃ" ২

মর্মে লোকান্ত করিয়া হৃদয়ঃ পাণকর্ণিণঃ ।
 তদেবজাত বিপ্রাভ কার্যতঃ ইতি ন্যাতঃ ॥ ৪
 পাণকর্ণরতা নষ্টা ব্যক্তিচারনমুখ্যঃ ।
 ধরত হৃদ্যোগেন রেতঃ কিণ্ডঃ বিভাবক ॥ ৫
 তেন তেবাং সমুৎপত্তিজাতা বৈ পাণকর্ণিণাঃ ।
 তদেবে বাত্‌কান্দেবী মহাহটা কুলশিখী ॥ ৬
 ততঃ পুত্রা বদ্যাক চ ব্রাহ্মণো দীরভে বসিঃ ।
 তে পংক্তিগোত্রজা নষ্টা ব্রহ্মহত্যায় করোতি চ ॥ ৭
 ন কৃত্য বেন সা হত্যা কুলং ভস্য করং ব্রজেৎ ।
 এবং পুরা তন্ন দেব্যা বরো দত্তো বিজান কিল ॥ ৮
 তেবাং সংসর্গমাত্রেণ সচৈলং মানমাতরেৎ ।
 তেবাং দেশান্তরে বাহুর্ন গ্রাহো বোজনব্রহ্ম ॥ ৯
 কেবলং বিবদ্যাপ্রোতি পাতকং হ্যতিব্রহ্মসম ॥ ১০

সহ্যাদ্রিখণ্ড ২।২। অঃ ।

ইহারা সকলেই শাক্ত। শুনা যায়, পূর্বে ইহাদের মধ্যে এক প্রাণ ছিল যে, প্রতিবর্ষে দেবী শক্তির সমকে একটি করিয়া ব্রাহ্মণশিশু বলি দিতে হইত। ১৮১৮ খৃঃ অব্দের পর হইতে এই প্রাণ এককালে উঠিয়া গিয়াছে। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা অপর মহারাষ্ট্রদিগের ভায়। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রকবি যোঁরোপহ এই করাটশ্রেণী-ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে তিন গোত্র ও অনেক ঘর দৃষ্ট হয়। যথা—

গোত্র	ঘর
কাত্তপগোত্র	১২
অজিগোত্র	১৫
ভরবাগগোত্র	১৭
জমদগ্নিগোত্র	১৫
বশিষ্ঠগোত্র	৮০
কৌশিকগোত্র	৪৭
নৈকবগোত্র	২৪
গৌতমগোত্র	১৫
গার্গ্যগোত্র	১৬
মুলগলগোত্র	৮
বিশ্বামিত্রগোত্র	১
বান্ধবগোত্র	১
কৌণ্ডিন্যগোত্র	১
উপমহাগোত্র	১
আজিরগোত্র	১
লোহিতাকগোত্র	১
বৈপ্যগোত্র	৬
শাক্তিগোত্র	৬
কুলগোত্র	০
বাংগগোত্র	২

ভারিগোত্র ...
 পাণিগোত্র ...
 [মহারাষ্ট্র দেখ।]

করামর্দ (পুং) করং আ লরাক্‌ স্‌মুদ্রাতি কর-আ-সু-অণ্‌
 (কর্ণপাণ্‌। পা ৩।২।১) করমর্দক, করমর্দা গাঁহ।
 করাস্মুক (পুং) কীৰ্যতে বিকিপ্যতে কৃ-কর্ণিণি অণ্‌। করং
 অসু বস্যাৎ কপ্‌। কৃকপাককলসুক, করমচ।
 করাস্মুক (পুং) কীৰ্যতে ইতি করং কীৰ্যমানং অস্মং বস্যাৎ
 অস-কপ্‌। করমর্দকসুক।
 করাস্মিকা (স্ত্রী) করাবিব আচরতি উভয়নকালে করমর্দক-
 মানস্যাৎ। কর-ক্যভ্‌ (উপমানাদাচারে। পা ৩।১।১০)
 ততো ধূল্‌ (ধূল্‌ তুটো। ৩।১।১২০) টাপ্‌। ১ বলাকাপকী,
 সুত্র বক। ২ কুটপূরী।

করার (আরব্য) অলীকার, প্রতিশ্রুতি।

করারবীর। কাশীর বায়ুক্ষেপে চারিযোজন দূরে অবস্থিত
 যশনপুরের নিকটস্থ একটি গ্রাম। এখানে প্রাচীন দুর্গ ও
 পীরহান আছে। (ভা. ব্রহ্মখণ্ড ৫০।২৭৩)

করারি (দেশজ) ১ যে ব্যক্তি করার করিয়াছে। ২ যথিবরে
 করার আছে। ৩ উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা কালী,
 চামুণ্ডা প্রভৃতি দেবীর ভরবরী মূর্তির উপাসক; ভারতের
 নানাহানে কোন কোন লোক শলাকাদি দ্বারা আগুন মাংস
 বিদ্ধ করিয়া তিকা করিয়া বেড়ায়, অনেকে তাহাদিগকেই
 করারি বলেন।

করারোট (পুং) করে আরোটতে ভাতি, কর-আ-কট-অচ্‌
 (নন্দগ্রহিণচান্দিভ্যো লুপিতচঃ। পা ৩।১।১৩৪) অঙ্গুরীক।

করাল (স্ত্রী) করায় চক্ষুরোগাদিবিষেক্ষণায় অলতি শল্যোতি
 কর-অল-অচ্‌। ১ কৃককৃঠেরক, কালকুলসী। ২ যুতাসিদ্ধি
 বেশবার, চপ্‌। (পুং) করং আলাতি গৃহাতি অথবা করায়
 ভয়প্রদর্শনার অলতি পর্যাপ্রোতি কর-আ-লা-ক। ৩ সর্জরসমুজ
 তৈল, গর্জনতৈল। ৪ তুদ, উভ। ৫ (ত্রি) দধর, উরভদ্র,
 দেভো। ৬ (ত্রি) ভয়ানক (‘সদা বৃহদা বৃহকঃ করালচ
 মহামনাঃ।’ ভারত ১। ১২৩। ৫৪।) ৭ দক্ষরোগভেদ।
 কুপিত বাহু দণ্ডে আশ্রিত করিয়া ক্রমে ক্রমে দণ্ড সকল
 বিকৃত ও ভয়ানক ভাবে উন্নত করিয়া তোলে, ইহাকে
 করাল রোগ বলে, ইহা অসাধ্য। (দাধবনিদান।)

৮ কত্বর বৃগ। ৯ দৈত্যবিশেষ। ১০ গজর্জবিশেষ।
 ১১ রংত্রবিশেষ।

করালক (পুং) করাল এবা যথৈ-কন্‌ করালবৎ কাব্যতি বা।
 ১ কৃককৃঠগী। ২ করালশব্দবাচক।

করালকেশর (পুং) করালঃ কেশরো বভ। সিহ।

করালজিহুতা (স্ত্রী) করালানি জীপি পুটানি বভাঃ। লকা-
বাত, জিকাভিকা (রাজনি)

করাললংঘ্য (স্ত্রী) করালঃ লংঘ্যঃ বভাঃ। ১ কাণী। ২ ভদ্র-
নকদন্তবিশিষ্টা স্ত্রী।

করালভৈরব (স্ত্রী) ভৈরবিশেষ।

করাললোচন (জি) করালে লোচনে বভ। ভদ্রানক চক্ষুবিশিষ্ট।

করালবদনা (স্ত্রী) করালং বদনং বভাঃ। ১ কাণী। ২ ভদ্র-
ভরমুখী স্ত্রী।

করালম্ব (জি) করং আলম্বতে পরার্থঃ গৃহাতি লম্ব-অচ্।
করগ্রহণকারী।

করালম্বন (জি) করণে করত বা আলম্বনং। ১ হস্ত ধারী
গ্রহণ। ২ হস্তগ্রহণ।

করাল্লা (স্ত্রী) করাল-টীপ্। শাখিবা, অনন্তমূল।

করালানিন (জি) করালং আননং বভাঃ। ভদ্রকর মুখবিশিষ্ট।

করালিক (পুং) করালং করসদৃশাখানাং আলিঃ জেপি
ব্রত, করাল-কপ্। ইষম্। বৃক্ষ। (নন্দ্যাবর্তকরালিকো
ভদ্রবংশগী পুলাক্যাব্রিগঃ। হেম ৪। ১০০।)

করালিত (জি) করাল-ইতচ্। ভরমুক্ত।

করালী (স্ত্রী) করাল-ভীব্। জাতেরজীবিসাদরোপধাং।
পা ৪। ১। ৬৩) অগ্নির সপ্ত জিহ্বার অন্তর্গত জিহ্বাবিশেষ।

"কাণী করালী চ মনোজবা চ

মুলোহিতা বা চ মুখবর্ণা।

ক্ষুণ্ণিলিনী বিষমগী চ দেবী

লোহারমানা ইতি সপ্ত জিহ্বা।" মুক্তকোপনিষৎ।

করাল্ফাট (পুং) করণে আফাটে: শব্দো যজ। ১ বক্ষ-
হলে একহস্ত সসুচিতভাবে রাখিয়া অন্য হস্ত ধারী ভাঙন,
তাল চোকা। ২ করত আফাটে:। করাবাত।

করিক (দেখ) উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ। যেমন আমি করি।

করিক (পুং) করো বিক্ষেপো হতি অত কন্। বিটুখনির।

করিকণবল্লী (স্ত্রী) করিকণঃ গজপিপ্লগ্যবরব-ইব বলী। চই।

করিকণাবল্লী (স্ত্রী) করিকণারাইব বলী। চবিকারুক, চই।

করিকর (পুং) করিগঃ করঃ ৬৩৭। হতিগুণ্ড।

করিকা (স্ত্রী) করো বিলেনমমতি অভাঃ অর্শাদিবাচ-
ইষক। নথরেকা।

করিকাল (কারিকোল)। কর্ণাটিকের একটি নগর। ট্রাঙ্কুই-
বার হইতে ৪ কোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা ১০° ৫৫'
উঃ, দ্রাঘি ৭০° ৫৩' পূঃ।

এই নগরটি অতি প্রাচীন। ১৭৪০ খৃঃ হইতে ১৭৬৩ খৃঃ অব

ব্যাণী কর্ণাটিক নগরের সময় এই নগর বৃদ্ধ করা হইয়াছিল।

এখানে ইংরাজদের সঙ্গে করাবীদের যুদ্ধ হয়। এখানে

করিকাল নদী ও কাবেরী নদীর একটি স্রব সাধা আছে।

করিকালের চারিদিকে অপর্যাপ্ত শস্ত উৎপন্ন হয়।

এখান হইতে লবণ রপ্তানি হইয়া থাকে।

করিকালিচোল। একজন বিখ্যাত সোণরান, পরাঙ্ক

চোলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পাভ্যারাজ বীরপাভ্যাকে বৃদ্ধ

পরাস্ত করেন। ইনি কারোবীর জলপ্রাচীর হইতে ভ্রমের

জেলার রক্ষা করিবার জন্য আনিকাট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

ইনি ৯০০ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

করিকুন্ত (স্ত্রী) করিগঃ কুন্তঃ ৬৩৭। ১ হতিকুন্ত, হতির

মতকহ কুন্তাকৃতি হান। ২ গন্ধদূর্ণ।

করিকুন্ত (পুং) করী নাগকেশরভৃৎ কুন্তঃ। নাগকেশর চূর্ণ।

করিগর্জিত (স্ত্রী) করিগঃ গর্জিতং গর্জনং ভাবে ক। ব্যুহিত,
হতির গর্জন।

করিজ (পুং) করিণো জায়তে করি-জন-ড (পক্ষমাম-

জাতো। পা। ৩। ২। ১৮) ১ হতিশিত। ২ (স্ত্রী) গজমুক্তা।

করিণী (স্ত্রী) করিন্ দ্বিরাং ভীপ্। ১ হতিনী। ২ দেবতা-
বিশেষ।

করিদারক (পুং) করিগঃ দারয়তি করি-দৃ-বৃল্ (বৃল্ তুচো)

পা ৩। ১। ১৩০) সিংহ।

করিনাসিকা (স্ত্রী) করিগঃ নাসিকা। ১ হতির নাক। ২

করিগঃ নাসিকা ইব আকৃতিব্রতাঃ। বহুবিশেষ।

করিপ (পুং) করিগঃ পাতি রক্ষতি করি-পা-ড (অস্ত্রোপি
দৃষ্টতে। পা ৩। ২। ১০১) হতিপালক, মাহত।

করিপত্রে (স্ত্রী) করিগঃ কর্ণং পত্রমত্। তালীশগজ।

করিপথ (পুং) করিগঃ পথঃ ৬৩৭। ১ হতির গমন-

যোগ্য পথ। (সংজ্ঞারং কন্।) ২ দেবপথ। ৩ দেশবিশেষ।

করিপিপ্ললী (স্ত্রী) করিসংজ্ঞাপিপ্ললী মধ্যলোঃ। গজপিপ্ললী।

করিপোত (পুং) করিগঃ পোতঃ ৬৩৭। হতিশিত।

করিবন্ধ (পুং) করিগঃ বরাতি যজ, বন্ধ আধারে বন্ধ (অক-
র্তরি চ কারকে সংজ্ঞারং। পা ৩। ৩। ১২)। ১ হতিবন্ধন
বন্ধ, আলান। ইহার অভ্যন্তর প্রারক্তি। ২ ভাবে বন্ধ
(ভাবে। পা ৩। ৩। ১৮)। গজবন্ধন।

করিবর (পুং) করিগঃ বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রেষ্ঠহতী।

("টোটেতে করিয়া সে করুণ করিবর।" গোবিন্দমঙ্গল।)

করিত্ত (স্ত্রী) করীব ভাতি ভা-ক (আভোবহুপনর্গে।
পা ৩। ২। ৩) ১ কুজবিশেষ।

করিষ (বাসনিক) করুণামর, কীষর।

করুন। একজন পাঠ্যকল্যাণ। ইনি দুইটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিব্বত নদীতে নিধিরা নিধিয়ারাক্য সুট-পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে নিধিরা কর্তৃক বন্দী হন। নিধিরা অনেক টাকা লইয়া ইহাকে মুক্তি দেন। মুক্তি পাইয়া করিম আরও প্রবল হইয়া উঠিলেন। দেশের লোকজন তাঁহার নাম ভুলিলেই তরু পাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে জাবার তাঁহাকে ইন্দোরে বন্দী করা হইল। করিম কিছুদিন পরে মুক্তি লাভ করিয়া ইংরাজবিক্রমে অস্ত্রধারণ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ, কর্ণেল আদম তাঁহার বিপক্ষে সৈন্যচালনা করেন। এই সময়ে করিম বাবরের ক্ষণিক্ত রায়ের আশ্রয় লইতে পারেন, কিন্তু অবশেষে বাধ্য হইয়া উক্ত বর্ষে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ জন মালকোমেসের নিকট বন্দ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি আপন জীবিকা-নির্বাহের জন্য গোরক্ষপুর প্রাপ্ত হইলেন।

করিন্দ। রাজনহেজ্রাজেলার অন্তর্গত সমুদ্রতটস্থ একটি নগর। রাজনহেজ্রা নগর হইতে ১৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। মানাহান হইতে করিন্দে জাহাজ আসিয়া লাগে। এখানে বাণিজ্য ব্যবসায়ও আছে। পূর্বে এই নগর বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন আর তেমন নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র হইতে বাণ আসিয়া করিন্দনগরকে ভাসাইয়া দেয়, তাহাতে বিস্তর লোক মারা পড়ে এবং পূর্ব সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। ইহার পার্শ্বস্থ নগরকে করিন্দ উপনামের বলে।

করিন্দ শব্দ কলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। [কলিঙ্গ দেখ।]

করিন্দাচল (পুং) মচশাঠ্যনদীরে, মচ ভাবে বহুঃ। করিণং হস্তং মাচং শাঠ্যং লাভি বিস্তারয়তি করি-মাচ-লা-ক (স্রতো) হস্তপসর্গে। ৩। ২। ৩) সিংহ।

করিন্দুখ (পুং) করিণো মুখমিব মুখং বহুঃ। ১ গণেশ। ব্রহ্মঠেকবর্তে গণেশখণ্ডে বর্ণিত আছে;—পার্কটীসনান গণেশ জন্মিলে সকল দেবতাই সেই স্থানর মূর্তি দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভগবতী ক্রমে সকল দেবতাকেই আসিয়া কিরিয়া বাইতে দেখিলেন, কিন্তু সেই দেবমণ্ডলীর মধ্যে শনিকে না দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার সেই প্রাণের স্থানর নন্দন দেখিবার জন্য আসিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। শনির দৃষ্টিন্যায় সমুদয় তরু হইয়া উড়িয়া যায়, এই ভয়ে শনি গণপতিকে দেখিতে আসেন নাই। বাহা হউক অবশেষে ভগবতীর আদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শনি আসিয়া ভগবতীকে জানাইলেন যে তিনি বাহা দেখেন, তাহাই রিনাশ পায়। বারংবার এইরূপ বলিলেও ভগবতী তাঁহাকে গণেশ দেখাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শনি অন্তর্গত

নিরুপায় হইয়া গর্ভখণ্ডে বেবিবার জন্য আপন মুখবস্ত্রের এক প্রান্ত ধুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি প্রথমে গণপতির মস্তকে পড়িয়াছিল, তাহাতে মস্তক ভগ্ন হইয়া উড়িয়া যায়। মস্তক বিনষ্ট দেখিয়া শনি পুনরায় বস্ত্র বন্ধন করিলেন। পার্কটীও প্রিয়পুত্রের মস্তকহীন দেখিয়া শোকে আতঙ্ক হইয়া পড়িলেন। তখন দৈববাণী হইল “উত্তর দিগরে যে হস্তী নিখিলিত আছে, তাঁহার মুখ গণেশের মস্তক হইবে।” কেননগণ অস্থলজ্ঞানে ব্যথিত হইয়া দেখিলেন, দেবরাজের হস্তী ঐভাবে নিখিলিত, তখন সকলে অগত্যা সেই হস্তিমুখ করিয়া গণেশের দেহে যোগ করিয়া দিলেন। এইরূপে গণপতির করিমুখ হইয়াছিল। ২ করিণঃ মুখং। হস্তির মুখ।

করিন্দাটি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Tringa Ochropus) করিন্দ (পুং, স্ত্রী) করিতি বিকিপতি কৃ-ইন্স সংজ্ঞায়। ১ বংশোদ্ভূত, বাঁশের কৌড়া। ২ (পুং) বট। ৩ কৃকবিশেষ। করিন্দত (স্ত্রীং) করিণো মতমিবরতন্, মধ্যলো। ১ কান-শাছোক্ত এক প্রকার রত্ন।

“ভূগতস্তনভূভাতমতকামুরতাং স্বরমণোমুখীং ত্রিরম্।

জামতি স্বকরভট্টমেহনে বরতকরিত্তং তদুচ্যতে।”

২ (৬তং) হস্তির রমণ।

করিন্দা, করিন্দী (স্ত্রী) হস্তিবস্ত্রের মূল।

করিন্দ (জি) করিণং বাতি হিনতি করি-বা-ক (আতোহহ-পসর্গে। পা ৩। ২। ৩) সিংহ।

করিন্দ (দেশজ) গুণবিশেষ। (Dalbergia reniformis.) করিন্দাবক (পুং) করিণং শাবকঃ। হস্তিনিত। পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত হস্তিনিত। সংস্কৃত পর্যায়—কলত, করত, করিপোত, করিল, বিত ও দিত।

করিন্দুগু (স্ত্রী) করিণঃ ততং। হস্তির তত্।

করিন্দ (জি) অতিশয়েন কর্তা ইষ্টম্। কর্তৃত্বম্। (“পুত্র লভিত্য আভূতি করিষ্ঠঃ” ঞ্ ৭। ৯৭। ৭।)

করিন্দু (পুং) কৃ-ইক্চুৎ। করণশীল।

করিন্দুত (পুং) করিণঃ স্তৃতং, ৬তং। হস্তিনাবক।

করিন্দুন্দরিকা (স্ত্রী) করীষ হস্তরী, করি-দুন্দরী সংজ্ঞায় কনু টাপ্ হ্রস্বত। ১ নাগবট। ২ কাপড় তত করিণ্ডার বস্ত্রবিশেষ। (হারাবলী)

করিন্দুদ্র (স্ত্রী) করিণং স্তৃতং করিন্দুদ্রত্। ১ গজস্নহ। ২ করিণঃ ততং, ৬তং। গজের তত। ৩ করিন্দুদ্রিব ততং বহু। হস্তির ততের ভার বাহার তত।

করী [ন্] (পুং) করঃ ততঃ অতি অত কর-ইন্সি। ১ হস্তী। ২ অটলমধ্য। ৩ অঙ্গবোধক।

করীতি (পুং) ১ ব্যক্তিবিশেষের নাম। ২ জনপদবিশেষ। (ভারত ভীম।)

করীন্দ্র (পুং) করিণাঃ ইন্দ্রঃ ৩৩৭। ১ করিশ্রেষ্ঠ, উত্তম হাতি। ২ ঐরাবত হতী।

করীর (পুং, স্ত্রীঃ) করিতি বিকিণতি আবরণান্ কৃ-ঈরন্, (কৃপূকটিপটিশোটিত্য ঈরন্। উপ্ ৪। ৩৪) ১ বংশাঙ্কুর, বাণের কোড়া। বাতটের মতে ইহার গুণ—দ্রোণনাশক, কবার, দাহজনক, বাতজনক, আত্মনিজনক, মধুর ও কফজনক। ২ ঘট। ৩ অঙ্কুরমাত্র। (“হিমাংসু বংশস্ত করীরমেব মাং নিশম্য কিম্বাসি কলেগ্রহিগ্রহা” নৈষধ।) ৪ (পুং) মল্লভূমিভাত উষ্ট্রপ্রিয় কণ্টকবৃক্ষবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম করীল। সংস্কৃত পর্যায়—ক্রকর, গ্রিহিল, ক্রকচ, নিশাজিকা, করির, গৃঢ়গজ, করক, ভীক্ষকটক। (Capparis aphylla.) ইহাকে বাছালা ও হিন্দীতে উট কটের, আরবে ও বোম্বাই অঞ্চলে কবর, সিরীষ ভাবার কবার, তুরুকে কবরিষ, পারস্তে কবর ও কুরক বলে। এই গাছ ভারতবর্ষে সচরাচর জন্মে। ইহার ফল ব্যবহৃত হয়। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, শ্বেদজনক, উষ্ণ ও ভেদক। অর্প, কক, বায়ু, আম, বিষজ শোধ ও ত্রণনাশক। ইহার ত্বক্ ব্যবহার্য। মাত্রা ২ মাষা।

মথজন-উল-আদ্বিয়া নামক হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয়। ইহা কণ্ডু, কটু, পরিষ্কারক, পক্ষা-যাত ও সকল প্রকার বাতরোগে উপকারক। ইহার টাটকা পাতার রস কাণের ভিতর প্রয়োগ করিলে পোকা মরিয়া যায়।

ঐক্ষলি সাহেবের মতে দ্বিত্ত ত্রণের ইহা এক মহৌষধ।

করীরক (স্ত্রী) করীরএব স্বার্থে কন্। বংশাঙ্কুর।

করীরকুণ (স্ত্রী) করীরস্ত পাকঃ করীর-কুণ্ (ভক্ত পাকমূলে পিছাদিকর্ণাদিত্যঃ কুণ্জাহচে। পা ৪। ২। ২৪) করীরশাক।

করীরপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ।

করীরী (স্ত্রী) করীর-টাপ্। চিরিকা, কিঁকিপোকা। ২ হস্তিদন্তমূল।

করীরিকা (স্ত্রী) করীরমিব আকৃতির্ভূতাঃ করীর-ঈন্-টাপ্ চ। ১ হস্তিদন্তমূল। ২ ঝিলী, কিঁকিপোকা।

করীরী (স্ত্রী) করিতি কৃ-ঈরন্ [করীর দেখ।] গৌরাদিত্যঃ ভীষ্ (বিৎ গৌরাদিত্যক্। পা ৪। ১। ৪১) চিরিকা, ঝিলী। ২ হস্তিদন্তমূল। (করীরী চিরিকায়াক দন্তমূলে চ দত্তিনাম্। বেহিনী।)

করীষ (পুং, স্ত্রীঃ) কীৰ্ষাতে বিকিণ্যতে কৃ-ঈবন্ (কৃত্ত-ভারীষন্। উপ্ ৪। ২৬) ১ শুক গোময়, ঘুঁটে। ২ শস্তর পুরীষমাত্র। (ভক্ত শুকে কৃ গোগ্রহিঃ করীষহগণে অপি। হেম)

করীষক (পুং) করীষ এব স্বার্থে কন্। [করীষ দেখ।] দেশবিশেষ। (ভারত ভীম ১। ৪৫)

করীষগন্ধি (স্ত্রী) করীষত্ গন্ধইব গন্ধো যত। শুক গোময়ের জার গন্ধযুক্ত।

করীষজ্জবা (স্ত্রী) করীষঃ কবতি হিনতি করীষ-কব-খদ্-মুশ্চ (সর্গকৃলাজকরীষেবু কবঃ। পা ৩। ২। ৪২) বায়ু।

করীষাশ্বি (পুং) করীষস্থিতোশ্বিঃ। শুকগোমরবহি, ঘুঁটের আশ্বন।

করীষী [ন] (পুং) করীষঃ বিভাভ্যে যজ করীষ-ইনি। করীষবৃক্ষ দেশ।

করীষিণী (স্ত্রী) করীষিন্ জিরাং ভীপ্। ১ গোবরাখিষ্টাঙ্গী লক্ষ্মীদেবী।

(“গন্ধবারাং ছয়াধর্বাং নিত্যপুষ্ঠাং করীষিণীম্।” শ্রীমুক্।)

করুই (দেশজ) গোলা, ভাণ্ডার, জবাগার।

করুণ (পুং) করোতি মনঃ আত্মকূল্যার কৃ-উনন্, (কৃদ-দ-রিভ্য উনন্। উপ্ ৩। ৫০) ১ বৃক্ষবিশেষ, করুণানুবব গাছ। (Citrus decumana.) রাজবল্লভের মতে ইহার কণের গুণ—কক, বায়ু, আম ও মেদোনাশক, পিত্তপ্রাকোপক।

২ শৃঙ্গারাদি অষ্ট রসের অন্তর্গত তৃতীয় রস। সাহিত্য-

দর্পণে করুণরসের লক্ষণাদি এইরূপে কথিত হইয়াছে;—

বজ্রবান্ধবদির বিয়োগ হইতে করুণ রসের উৎপত্তি। করুণ

রসের কপোত্ত বর্ণ, ইহার অখিষ্টাঙ্গী দেবতা যম। করুণ

রসের স্থায়িতাব শোক, আলম্বন ভাব শোচ্য জন, (বাহার

বিয়োগ হইয়াছে), এবং তাহার দাহাদি অবস্থাই উদ্দীপন

ভাব। দৈবনিন্দা, ভুতলে পতন, ক্রন্দন, বিবর্ণতা, উর্দ্ধ্বাস,

নির্জাতত্ব প্রাণীপের জার নির্জীববৎ নিখাস বন্ধ করিয়া থাকে।

ও প্রলাপ ইহার অজ্ঞতা। বৈরাগ্য, জড়তা ও চিন্তা প্রভৃতি

ইহার ব্যাভিচার ভাব। বজ্রবিয়োগে দৈবনিন্দা। যথা—

বিগিনে ক জটানিবন্ধনঃ

তব চেদং ক মনোহরং বপুঃ।

অনয়ো ঘটনা বিধেঃ ক্ষুৎ

নহু খণ্ডেন শিরীষকর্তনঃ॥ রাঘববিলাস।

সঙ্গীত শাস্ত্রে এই সকল রাগরাগিণী করুণরসে গের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—তৈরব, তৈরবী, রামকেলি, খট, গান্ধার, যোগিনী, বিভাষ, কুরুভ, দেবকিরি, আশাহিরা, বেলাবলী, সিদ্ধতা, সিদ্ধ, মূলতানী, পুরবী, তোড়ী, গৌরী, কেমারী, ইমন, কল্যাণ, অরুণবতী, হাবির, ভূগলী, কাণ্ডাড়া, খাখা, বিকিট, বেহাগ, বাগেত্রী, হুরট, লক্ষরাজরণ, বোহিনী, নানকোষ, বালাসী, বরাদ, বলিত।

৩ পরহঃখ দুঃ-করিত্ব ইচ্ছা, ইচ্ছা। ৪ করুণা-বিষয়, দীন। ("অহরোমিতীষ করুণের গজিনাং বিরতেন" বাক।)

৫ দয়াযুক্ত। ৬ যুক্তভেদ। ৭ পরবেশের। ৮ ঐগিহিগের অন্তরজনক পরিভ্রাণক। ৯ ভীষবিশেষ। (কালিকাপুরাণ) করুণধ্বনি (পুং) করুণহৃৎকঃ ধ্বনিঃ। ১ হৃৎখে বা শোকে মানবযুগ হইতে বেরুণ শব্দ নির্গত হয়। ২ যে শব্দ শুনিলে জীবের প্রতি দয়া জন্মে।

করুণময়ী (স্ত্রী) করুণা করুণযোগ্যা ময়ী। নবমল্লিকা। এই মূল অতি সুকুমার, স্পর্শনেই মলিন ও হীনপ্রভ হইয়া থাকে, এইজন্যই ইহাকে করুণময়ী বলে।

করুণবিপ্রলভ (পুং) করুণযুক্তো বিপ্রলভঃ। শূদ্রার রসের ভেদবিশেষ। নারক নারিকার মধ্যে একজন পরলোক গমন করিলে পুনর্স্মার মিলন আশায় জীবিত ব্যক্তি যে কোন প্রকারে কষ্টে সৃষ্টে জীবন ধারণ করে, তাহার নাম করুণবিপ্রলভ। বেরুণ কাদবরীর পুণ্ডরীক ও মহাশেতা-বৃত্তান্তে পুনর্স্মার পুণ্ডরীকের লাভ বা জন্মান্তরে লাভবিষয়ে করুণরসই বর্তমান। কিন্তু দৈববাণী শ্রবণান্তর পুণ্ডরীকের সহিত মিলন আশাই শূদ্রাররসের উজ্জেক।

করুণবেদিত্ত (স্ত্রী) করুণং দয়াং বেত্তি জানাতি বিদ-মিনি ততঃ ভাবেৎ। দয়াবানের ধর্ম।

করুণবেদী [ন] (জি) করুণং দয়াং বেত্তি পরহঃখং অনু-ভবতি বিদ-মিনি। দয়াবান্।

করুণা (স্ত্রী) করেতি চিত্তং পরহঃখহরণায় কু-উনন্ (কুব-দারিত্যো উনন্। উপ্ ৩। ৫০) টাপ্ চ। ১ অপরের হৃৎখ-বিনাশের ইচ্ছা। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাকণ্য, যুগা, কুপা, দয়া, অহুকম্পা, অহুকোশ, শূক। ২ গদ্যার নামবিশেষ।

(‘কুটরা করুণা কান্তা কুর্খযানা কলাবতী’ কানীধঃ ২৯।৪০)

৩ পুণ্ড্রামূনির কনিষ্ঠা কস্তা।

করুণাকর (জি) করুণায় আকরঃ, ৬৩৭। অত্যন্ত দয়ালু।

করুণাক্তক (জি) করুণঃ করুণরসঃ আত্মা যত্ বহত্রী, করুণাত্মন্ কন্। করুণ রসবিশিষ্ট কাব্যাদি।

করুণাক্সা [ন] (পুং) করুণো দয়াত্রী আত্মা যত্ বহত্রী। দয়াবান্।

করুণানিদান (জি) করুণা নিদায়তে নিশ্চিন্ত্য দায়তে যেন, করুণা-নি-দা-লাউ। দয়ালু, দয়ার আধার।

করুণানিধি (জি) করুণা নিধায়তেহজ্জ, করুণা-নি-ধা-কি (কর্ষণ্যধিকরণে চ। পা ৩। ৩। ২০।) করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণাবিত্ত (জি) করুণায় অবিত্তঃ, ৩৩৭। করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণাময় (জি) করুণা প্রাকুরোণ অত্যন্ত, করুণা-ময়ীক দয়াবান্। ("অতর শরণদাতা কুনি করুণাময়।

কেবল করুণাময় পজিতের বহুঃ" গোবিন্দমঙ্গল।)

করুণায়ুক্ত (জি) করুণায় যুক্ত ৫৩৭। দয়াবান্।

করুণারক্ত (জি) করুণঃ করুণরস আরভ্যো বজ্জ, বহত্রী। ১ করুণরসে আরক্ত করিয়া লিখিত গ্রন্থাদি। ২ (৬৩৭ পুং) করুণরসের আরক্ত।

করুণার্জি (পুং) করুণায় আর্জিঃ, ৩৩৭। অত্যন্ত দয়ালু, দয়াবানের স্বরূপ হৃৎখী দেখিলে গলিয়া যায়।

করুণার্জিচিত্ত (পুং) করুণায় আর্জিঃ চিত্তং যত্ বহত্রী। দয়ালুহৃদয়।

করুণালাগর (পুং) করুণায়াং সাগর-ইব, উপমি। দয়ার সমুদ্রস্বরূপ, অতিশয় দয়ালু।

করুণী [ন] (পুং) করুণা অত্যন্ত, করুণা-ইনি (সুখাদি-ভ্যন্ত। পা ৫। ২। ১০১।) করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণী (স্ত্রী) কু-উনন্-ভীপ্। পুণ্ড্রকবিশেষ; কোড়ন দেশে ইহাকে ককরধিকুলি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—দ্রীমপুলী, রক্তপুলী, চারিণী, রাজপ্রিয়া, রাজপুলী, সুল্লা ও ব্রহ্মচারিণী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ এবং কক, বায়ু, আত্মান (পেটকাঁপা), বিববমন ও উর্দ্ধ্বাসনাশক।

করুণ্যাম (পুং) কুর্বৎসবংশীয় কুর্বৎসবাকার পুত্রবিশেষ। (হরি ৩২ অঃ)

করুন্ময় (পুং) কুর্বৎসবংশীয় কুর্বৎসব পুত্রবিশেষ। (হরি ৩২ অঃ)

করুন্ম (পুং) অথর্কবেদোক্ত পিশাচবিশেষ।

(“যে শালাঃ পরিনৃত্যন্তি সারং গর্দভনাদিমঃ।

কুংলা যে চ কুলিলাঃ ককুভাঃ ককমাঃ শ্রিমাঃ।

তানোবধে! স্বং গন্ধেন বিশ্বীমান্ বিনাশয়”।

অথর্ক ৮। ৬। ১০।)

করুল (দেশজ) কুরর পক্ষী। [কুরর দেখ।]

করুল (স্ত্রী) কু-উ। ১ কর্ভন, কাটা। ২ কুত, বাহা কাটা হইয়াছে।

করুল (পুং) কু উবন্। দেশবিশেষ, দত্তবজ্জ এই দেশে অধিপতি ছিলেন। (ভারত সভা ৪৭ঃ)। বর্তমান শাহাবাদ জেলা।

করুলক (পুং) ১ বৈবস্বত ময়র পুত্র। ২ কল্লল, পক্ষক।

করুলজ (পুং) করুলদেশে আরতে, করুল-জন্মভূ। দত্তবজ্জ।

(“ভাবিহাথ পুনর্জাতৌ শিশুপালকরুলজৌ” ভারত আদি)

করুলধিপতি (পুং) করুলবস্ত তদানবনপদত অধিপতিঃ, ৬৩৭। ১ করুলদেশের রাজা। ২ দত্তবজ্জ।

করেট (পুং) করেট করাদুলিহু অতি উৎপাত্তে, অসুখ সমানঃ; করেট-অট-অট্। নব।

করেটব্যু (জী) করে অটং অটনং ব্যয়তি, অলুকসমাসঃ ; করে-অট-ব্যু-ভটাপ্ । ধনচ্চ নামক পক্ষিবিশেষ ।

করেটু (পুং) কে জলে বায়োর বা রেটতি, ক-রেট-কু । পক্ষি বিশেষ, করকটরা । ইহার সংস্কৃতপরিচয়—কর্করেটু, করটু, কর্করাটুক । (কর্করেটুঃ করেটুঃ ত্যাং করটুঃ কর্করাটুকঃ । হেম)

করেণু (পুং) কৃ-এণু । কৃদভ্যামেণুঃ । উণ্ ২ । ১ । ১ হস্তী, মদা হাতি । ২ (জী) হস্তিনী । (করেণুর্গজহস্তিত্রোঃ । অমর ।) বৈদ্যাকমতে হস্তিনীর হৃদ্য কিঞ্চিৎ কষায়যুক্ত, মধুররস, বুয্য, শুক, স্নিগ্ধ, হৈম্যাকর, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বলকারক । ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ ।

করেণুকা (জী) করেণু-স্বার্থে কন্-টাপ্ । হস্তিনী ।

করেণুপাল (পুং) করেণুং পালয়তি রক্ষতি, করেণু-পাল-গিচ্-অচ্ । হস্তিনীপালক ।

করেণুভূ (পুং) করেণৌ করেণুবিষয়ে ভবতি হস্তিশাস্ত্রপ্রবর্তনায় প্রভবতি ইত্যর্থঃ, করেণু-ভূ-ক্লিप् । ১ পালকাপ্যনামক হস্তিশাস্ত্র প্রবর্তক মুনি । ২ হস্তিনী হইতে উৎপন্ন ।

করেণুমতী (জী) নকুলের পত্নী, ইহার গর্ভে নকুলের নিরমিত্র-নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । (ভারত আদি ৯৫ অঃ ।)

করেণুস্তুত (পুং) মধ্যলোঃ । ১ মুনিবিশেষ । ২ হস্তিশাবক ।

করেণু (জী) কৃ-এণু । ১ হস্তিনী । ২ (পুং) হস্তী (অমরটীকা) ।

করেনর (পুং) ভূরক্ষনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ ।

করেন্দুক (পুং) করেণ রশ্মিনা ইন্দুরিব কায়তি শোভতে, কর-ইন্দু-কৈ-ক । ভূতৃণ, গন্ধতৃণ । [গন্ধতৃণ দেখ ।]

করেবর (পুং) কীর্ষ্যতে ক্রিপ্যতে পাষাণঃ কপিভিরিতি বাবৎ করন্তস্মিন্ ত্রিযতে উৎপদ্যতে, অলুক সমাসঃ ; করে-বৃ-অচ্ । শিলারস ।

করোট (জী) কে মস্তকে রোটতে দীপ্যতে, ক-রট্-অচ্ । মাথার খুলি, শিরোস্থি । (Cranium)

করোটক (পুং) সর্পবিশেষ ।

করোটি (জী) ক-রট্-ইন্ । শিরোস্থি । মাথার খুলি । (Cranium) [কঙ্কাল দেখ ।]

করোটি (জী) করোট-গৌরাদিত্যাং ভীষ্ । মাথার খুলি ।

করোৎকর (পুং) করণাং উৎকরঃ সমূহঃ । কর সমূহ ।

করৌলি । ভরতপুর ও করৌলি এজেন্সির রাজনৈতিক তত্ত্বাবধানে রাজপুতনার অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য । অক্ষা° ২৬° ৩' হইতে ২৬° ৪৯' উঃ পর্য্যন্ত এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫' হইতে ৭৭° ২৬' পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ।

করৌলিরাজ্যের উত্তর ও উত্তরপূর্বসীমা ভরতপুর ও খোলপুর, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে জয়পুর, এবং দক্ষিণপূর্বে

চম্বল নদী প্রবাহিত হইয়া করৌলিকে গোয়ালিন্দার রাজ্য হইতে পৃথক করিয়াছে । ভূমিগরিমাণ ১২০৮ বাইল । লোক-সংখ্যা ১৪৮৬৭০ ।

এই রাজ্য উচ্চ, নিম্ন ও পর্বতময় । উত্তরদিকে গিরিমালা সীমাপ্রাচীররূপে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে । এখানকার গিরিশৃঙ্গ উচ্চতায় ১৪০০ ফুটের অধিক নয় ।

এখানে চম্বল নদীই প্রধান, এই নদী হইতে পাঁচটি শাখা বাহির হইয়া গন্ধনদ নামে করৌলিতে প্রবাহিত হইতেছে । গন্ধনদ উত্তরমুখী হইয়া বাণগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে । করৌলি নগরের দক্ষিণপশ্চিম দিয়া কালিঙ্গর ও জিরোতা নামে দুই ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে, এই দুই নদীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে অতি সামান্য জল থাকে । এখানকার পাহাড়ের উপর যেসকল ইদারা আছে, তাহার জল উষ্ণপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর ।

এখানকার পাহাড়ে প্রধানতঃ দুই প্রকার পাথর আছে, এক বিদ্যাপাথর, অপর কাচপাথর (মণিপ্রস্তর), যেখানে কাচপাথর, তাহারই চারিদিকে অধিক পরিমাণে বিদ্যাপাথর দেখিতে পাওয়া যায় । এখানকার চূণাপাথর নীলাভ, কপিল অথবা হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট । উৎকৃষ্ট বেলে পাথরও পাওয়া যায় । তাজমহলের প্রায় অনেকাংশ এই বেলেপাথর লইয়া নিৰ্ম্মিত । এখানকার 'ভাঁড়ের' নামক চূণাপাথর অনেক স্থানে চূণের জন্ত পোড়ান হইয়া থাকে । এখানকার অধিকাংশ গ্রামই প্রস্তর নিৰ্ম্মিত । করৌলির উত্তরপূর্বে পর্বতোপরি লৌহখনি বাহির হইয়াছে ।

জীবজন্তু ।—চম্বলনদীর নিকট বনজঙ্গলে বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, শাম্বর, নীলগাই দেখিতে পাওয়া যায় । সহরের নিকট শশক, উবিড়াল, ভারুইপক্ষী, কুকুট, কাদাখোঁচা এবং জলাশয়াদিতে বক, হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয় ; মৎস্তাদিও প্রচুর জন্মে । করৌলির পশ্চিমাংশে বিস্তর সর্প, কুম্ভীর প্রভৃতি সরীসৃপ বাস করে ।

উদ্ভিজ্জ ।—করৌলির উচ্চ গিরিমালার বড় একটা গাছ নাই । চম্বলনদীর উর্দ্ধভাগে ধাইকুল, পলাশ, খদির, কার্পাস, শাল, গর্জন ও নিম গাছ জন্মে ।

এখানকার কৃষিতে যব, গম, ছোলা, তামাক, ধাত্ত, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু ও শগ উৎপন্ন হয় ।

এখানে জলাশয় ও ইদারা হইতে এবং চম্বলনদীর বাণ আসিলে সেই জল লইয়া কৃষিকার্য্য চলে ।

বাণিজ্য ।—এখানে টুংকরা কাপড়, লবণ, ইক্ষু, তুলা, মহিষ ও ষাঁড় আমদানী হয় এবং ধাত্ত, কার্পাস ও ছাগ রপ্তানি হয় ।

জলবায়ু ।—এখানকার আবহাওয়া বড় মন্দ নয় । জর,

অতিশয় ও বাত রোগ হইতে দেখা যায়, অপর ছোঁয়াচে রোগ বড় এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ইতিহাস। মুক্জীর কারিক। অমুসারে করোলির প্রথম রাজা ধর্মপাল। নিম্নে ঐ কারিকা দেওয়া গেল—

মুক্জীর কারিক। বয়ানভাটের তালিকা। সময়।

ধর্মপাল		
নিংহপাল		
জগপাল		
নরপালদেব		
সংগ্রামপাল		
কুণ্ডপাল		
হুচপাল		
পুচপাল		
বিরামপাল		
জ্যোষ্ঠপাল		
বিজয়পাল	বিজয়পাল	১০৩০ খৃঃ অব্দ।
তহনপাল	তহনপাল	১০৬০ "
ধর্মপাল	কিত্তিপাল	১০৯০ "
কুমার (কুন্বর) পাল	ধর্মপাল	১১২০ "
অজয়পাল	কুন্বরপাল	১১৫০ "
হরিপাল	অজয়পাল	১১৮০ "
সোহপাল	হরিপাল	১১৯৬ "
অনঙ্গপাল	সোহনপাল	১২২০ "
পৃথ্বীপাল		১২৪২ "
রাজাপাল		১২৬৪ "
ত্রিলোকপাল		১২৮৬ "
বিপলপাল		১৩০৮ "
আসলপাল		১৩৩০ "
যুগলপাল		১৩৫২ "
অর্জুনপাল (১ম)		১৩৭৪ "
বিক্রমজিৎপাল		১৩৯৬ "
অভয়চাঁদপাল		১৪১৮ "
পৃথ্বীরাজপাল		১৪৪০ "
চন্দ্রসেনপাল		১৪৬২ "
ভারতীচাঁদ		১৪৮৪ "
গোপালদাস		১৫০৬ "
ঘারকাদাস		১৫২৮ "
মুকুন্দদাস		১৫৫০ "
যুগপাল		১৫৮২ "
তুলসীপাল		১৬০৪ "
ধর্মপাল (২য়)		১৬২৬ "
রত্নপাল		১৬৪৮ "
আর্তিপাল		১৬৭০ "
অজয়পাল (২য়)		১৬৯২ "
রাতিপাল		১৭০৪ "
হজাধরপাল		১৭২৬ "
কুন্বরপাল (২য়)		১৭৪৮ "
শ্রীশোপাল		১৭৭০ "
মাণিকপাল		১৭৯২ "
অমলাপাল		১৮১৪ "
হরিপাল (২য়)		১৮৩৬ "
মধুপাল		১৮৫৬ "
অর্জুনপাল		১৮৭৮ "

করোলিরাজ অর্জুনপাল কুকের বংশধর এবং বহুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পূর্বে এই বংশ বৃন্দাবনের নিকট ব্রজধামে বাস করিতেন। এককালে বয়ানে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। ১০৫০ খৃঃ অব্দে, মুসলমানেরা এই স্থান অধিকার করেন। তখন হইতে তাঁহারা করোলিতে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৪৫৪ খৃঃ অব্দে মালবপতি মাল্লু দ খিলজী করোলি আক্রমণ করেন। অকবর বাদশাহ মালব-জয়ের পর এই রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়েন। মোগলগোরবরবি অন্তর্মিত হইলে মহারাজেরা এই স্থান অধিকার করিয়া, ২৫০০০ টাকা বার্ষিককর নির্দিষ্ট করেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে পেশোবা করোলির উপ-সদ্ব ইংরাজদিগকে ভোগ করিতে দেন। ইংরাজেরাও এখানকার রাজার সহিত এই বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, ইংরাজরাজের বিপদ আপদের সময়ে করোলিরাজ সৈন্য-সংগ্রহ দ্বারা ইংরাজদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এই সময় হইতে করোলিরাজ্য ইংরাজরাজের আশ্রিত হইল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে মহারাজ নরসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় করোলিরাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেন্টের খাস হইবার কথা হয়। কিন্তু অনেক জল্পনার পর রাজার আত্মীয় মদনপালকে করোলিরাজ্যের সিংহাসন প্রদান করা হইল। মদন ৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়ে কোটার বিদ্রোহীদের বিপক্ষে সৈন্য পাঠাইয়া ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, এই কারণে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাকে 'জি, সি, এস, আই' উপাধি এবং ১৫ স্থানে ১৭ তোপের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ১৮৬৯ খৃঃ, মদনপালের মৃত্যু হইলে দুইজনের পর ১৮৭২ খৃঃ, অর্জুনপাল রাজা হইলেন।

করোলিরাজ্যের মাহুল হইতেই অনেকটা কর আদায় হয়। (১৮৮১ সালের) বার্ষিক কর আদায় ৪৮০৮১০০, তন্মধ্যে খরচ ৪২৯৫৮০০। এখানে রীতিমত পুলিশ নাই। রাজার সৈন্যগণই সেই কার্য করিয়া থাকে। করোলি-রাজের ১৬০ জন অশ্বারোহী, ১৭৭০ জনপদাতি, ৩২ জন গোলন্দাজ এবং ৪০টি কামান আছে। সৈন্যগণ নিম্নলিখিত ১২ জায়গার ১২টি দুর্গে অবস্থান করে।

যথা—করোলিনগর, উঠগড়, মন্ডেল, নারোলি, সপোড়া, দৌলংপুর, থালি, জঘুরা, নিলা, থুলা, উন্দ ও খোদাই।

করোলিরাজের স্বতন্ত্র টাকশাল আছে; তাহাতে রৌপ্য-মুদ্রা প্রস্তুত হয়।

২ করোলিরাজ্যের প্রধাননগর করোলি। মধুরা হইতে ৩৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩০' উত্তর, দ্রাঘি° ৭৭°৪' পূঃ।

করেটবা (জী) করে অটং অটনং ব্যয়তি, অলুকসমাসঃ ; করে-অট-ব্যো-ড-টাপ্। ধনচ্ছামাক পক্ষিবেশ্য।

করেটু (পুং) কে জলে বায়ৌ বা রেটতি, ক-রেট-কু। পক্ষি বিশেষ, করকটরা। ইহার সংস্কৃতপরিচয়—করকরেটু, করটু, কর্করাটুক। (করকরেটু: করেটু: ত্র্যং করটু: কর্করাটুক:। হেম)

করেণু (পুং) কু-এণু (কুহভ্যামেণুঃ। উণ ২। ১।) ১ হস্তী, মদা হাতি। ২ (জী) হস্তিনী। (করেণুর্গজহস্তিত্রোঃ। অমর।) বৈদ্যকমতে হস্তিনীর দুধ কিঞ্চিৎ কষায়গুণ, মধুররস, বৃষ্য, গুরু, শ্লিষ্ণ, হৈর্ঘ্যাকর, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বলকারক। ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ।

করেণুকা (জী) করেণু-স্বার্থে কন্-টাপ্। হস্তিনী।

করেণুপাল (পুং) করেণুং পালয়তি রক্ষতি, করেণু-পাল-গিচ্-অচ্। হস্তিনীপালক।

করেণুজ (পুং) করেণৌ করেণুবিষয়ে ভবতি হস্তিশাজ্ঞপ্রবর্ত-নায় প্রভবতি ইত্যর্থঃ, করেণু-জ-ক্টিপ্। ১ পালকপাল্যনামক হস্তিশাজ্ঞ প্রবর্তক মুনি। ২ হস্তিনী হইতে উৎপন্ন।

করেণুমতী (জী) নকুলের পত্নী, ইহার গর্ভে নকুলের নিরমিত্র-নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভারত আদি ৯৫ অঃ।)

করেণুস্তুত (পুং) মধ্যলোঃ। ১ মুনিবিশেষ। ২ হস্তিশাবক।

করেণু (জী) কু-এণু। ১ হস্তিনী। ২ (পুং) হস্তী (অমরটিকা।)

করেনর (পুং) তুরক্ষনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

করেন্দুক (পুং) করেণ রশ্মিনা ইন্দ্রিব কায়তি শোভতে, কর-ইন্-কৈ-ক। ভূত্বগ, গন্ধত্বগ। [গন্ধত্বগ দেখ।]

করেবর (পুং) কীৰ্য্যতে ক্টিপ্যতে পাষণঃ কপিভিরিতি যাবৎ করন্তামিন্ ত্রিযতে উৎপদ্যতে, অলুক সমাসঃ ; করে-বৃ-অচ্। শিলারস।

করোট (জী) কে মস্তকে রোটতে দীপ্যতে, ক-রুট-অচ্। মাথার খুলি, শিরোস্থি। (Cranium)

করোটিক (পুং) সর্পবিশেষ।

করোটি (জী) ক-রুট-ইন্। শিরোস্থি। মাথার খুলি। (Cranium) [কঙ্কাল দেখ।]

করোটি (জী) করোট-গৌরাদিহাং ভীষ্। মাথার খুলি।

করোৎকর (পুং) করাগাং উৎকরঃ সমূহঃ। কর সমূহ।

করোলি। ভরতপুর ও করোলি এজেন্সির রাজনৈতিক তত্ত্বাবধানে রাজপুতনার অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য।

অক্ষা° ২৬° ৩' হইতে ২৬° ৪৯' উঃ পর্য্যন্ত এবং দ্রাঘি° ৭৬°

৩৫' হইতে ৭৭° ২৬' পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

করোলিরাজ্যের উত্তর ও উত্তরপূর্বীয়া ভরতপুর ও ধোলাপুর, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে জয়পুর, এবং দক্ষিণপূর্বে

চবল নদী প্রবাহিত হইয়া করোলিকে গোরালিয়ার রাজ্য হইতে পৃথক্ করিয়াছে। ভূমিপরিমাপ ১২০৮ মাইল। লোক-সংখ্যা ১৪৮৬৭০।

এই রাজ্য উচ্চ, নিম্ন ও পর্বতময়। উত্তরদিকে গিরিমালা সীমাপ্রাচীররূপে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। এখানকার গিরিশৃঙ্গ উচ্চতার ১৪০০ ফুটের অধিক নয়।

এখানে চবল নদীই প্রধান, এই নদী হইতে পাঁচটি শাখা বাহির হইয়া গন্ধনদ নামে করোলিতে প্রবাহিত হইতেছে। গন্ধনদ উত্তরমুখী হইয়া বাণগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। করোলি নগরের দক্ষিণপশ্চিম দিয়া কালিজর ও জিরোতা নামে দুই ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে, এই দুই নদীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে অতি সামান্য জল থাকে। এখানকার পাহাড়ের উপর যে সকল ইদারা আছে, তাহার জল উষ্ণপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর।

এখানকার পাহাড়ে প্রধানতঃ দুই প্রকার পাথর আছে, এক বিক্র্যাপাথর, অপর কাচাপাথর (মণিপ্রস্তর), যেখানে কাচাপাথর, তাহারই চারিদিকে অধিক পরিমাণে বিক্র্যাপাথর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার চূর্ণাপাথর নীলাভ, কপিল অথবা হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট। উৎকৃষ্ট বেলে পাথরও পাওয়া যায়। তাজমহলের প্রায় অনেকাংশ এই বেলেপাথর লইয়া নির্মিত। এখানকার 'ভাঁড়ের' নামক চূর্ণাপাথর অনেক স্থানে চূর্ণের জন্ম গোড়ান হইয়া থাকে। এখানকার অধিকাংশ গ্রামই প্রস্তর নির্মিত। করোলির উত্তরপূর্বে পর্বতোপরি লৌহখনি বাহির হইয়াছে।

জীবজন্তু।—চবলনদীর নিকট বনজঙ্গলে বাঘ, ভূমুক, হরিণ, শাম্বর, নীলগাই দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের নিকট শশক, উরিড়াল, ডাকইপক্ষী, কুক্কট, কাদাখোঁচা এবং জলাশয়াদিতে বক, হংস, কারওব প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয়; মংগ্রাদিও প্রচুর জন্মে। করোলির পশ্চিমাংশে বিস্তর সর্প, কুন্ডীর প্রভৃতি সরীসৃপ বাস করে।

উদ্ভিজ্জ।—করোলির উচ্চ গিরিমালার বড় একটা গাছ নাই। চবলনদীর উচ্চতাগে ধাইফুল, পলাশ, খদির, কাপাঁস, শাল, গর্জন ও নিম গাছ জন্মে।

এখানকার কৃষিতে যব, গম, ছোলা, তামাক, ধাত, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু ও শণ উৎপন্ন হয়।

এখানে জলাশয় ও ইদারা হইতে এবং চবলনদীর বাণ আসিলে সেই জল লইয়া কৃষিকার্য্য চলে।

বাণিজ্য।—এখানে টুकरা কাপড়, লবণ, ইক্ষু, তুলা, মহিষ ও বাঁড় আমদানী হয় এবং ধাত, কাপাঁস ও ছাগ রপ্তানি হয়।

জলবায়ু।—এখানকার আবহাওয়া বড় মন্দ নয়। অর,

অতিসার ও বাত রোগ হইতে দেখা যায়, অপর হোঁসাতে রোগ বড় এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ইতিহাস। মুক্জীর কারিকা। অমুসারে করোলির প্রথম রাজা ধর্মপাল। নিম্নে ঐ কারিকা দেওয়া গেল—

মুক্জীর কারিকা। বয়ানভাটের তালিকা। সময়।

ধর্মপাল		
নিংহপাল		
জগপাল		
নরপালদেব		
সংগ্রামপাল		
কুঠপাল		
হুচপাল		
পুচপাল		
বিরামপাল		
জোঠপাল		
বিজয়পাল	বিজয়পাল	১০৬০ খৃঃ অঃ।
তহনপাল	তহনপাল	১০৬০ "
ধর্মপাল	ক্ষিতিপাল	১০৯০ "
কুমার (কুন্বর) পাল	ধর্মপাল	১১২০ "
অজয়পাল	কুন্বরপাল	১১৫০ "
হরিপাল	অজয়পাল	১১৮০ "
সোহপাল	হরিপাল	১১৯৬ "
অনন্ডপাল	সোহনপাল	১২২০ "
পুখিপাল		১২৪২ "
রাজাপাল		১২৬৪ "
ত্রিলোকপাল		১২৮৬ "
বিপলপাল		১৩০৮ "
আসলপাল		১৩৩০ "
যুগলপাল		১৩৫২ "
অর্জুনপাল (১য়)		১৩৭৪ "
বিক্রমজিৎপাল		১৩৯৬ "
অভয়চাঁদপাল		১৪১৮ "
পুখিরাজপাল		১৪৪০ "
চন্দ্রসেনপাল		১৪৬২ "
ভারতীচাঁদ		১৪৮৪ "
গোপালদাস		১৫০৬ "
ঘারকাদাস		১৫২৮ "
মুকুন্দদাস		১৫৫০ "
যুগপাল		১৫৮২ "
তুলসীপাল		১৫৯৪ "
ধর্মপাল (২য়)		১৬১৬ "
রত্নপাল		১৬৩৮ "
আস্তিপাল		১৬৬০ "
অজয়পাল (২য়)		১৬৮২ "
রাতিপাল		১৭০৪ "
স্বজাধরপাল		১৭২৬ "
কুন্বরপাল (২য়)		১৭৪৮ "
জিগোপাল		১৭৭০ "
মাণিকপাল		১৭৯২ "
অমলাপাল		১৮১৪ "
হরিপাল (২য়)		১৮৩৬ "
মধুপাল		১৮৫৬ "
অর্জুনপাল		১৮৭৮ "

করোলিরাজ অর্জুনপাল কৃষ্ণের বংশধর এবং বহুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পূর্বে এই বংশ বৃন্দাবনের নিকট ব্রজধামে বাস করিতেন। এককালে ষয়ানে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। ১০৫০ খৃঃ অঃ, মুসলমানেরা এই স্থান অধিকার করেন। তখন হইতে তাঁহারা করোলিতে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৪৫৪ খৃঃ অন্ধে মালবগতি মাক্দু খিলজী করোলি আক্রমণ করেন। অন্ধের বাদশাহ মালব-জয়ের পর এই রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়েন। মোগলগোরবরবি অন্তর্মিত হইলে মহারাষ্ট্রেরা এই স্থান অধিকার করিয়া, ২৫০০০ টাকা বার্ষিককর নির্দিষ্ট করেন। ১৮১৭ খৃঃ অন্ধ পেশোবা করোলির উপ-সম্ব ইংরাজদিগকে ভোগ করিতে দেন। ইংরাজেরাও এখানকার রাজার সহিত এই বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, ইংরাজরাজের বিপদ আপদের সময়ে করোলিরাজ সৈন্ত-সংগ্রহ দ্বারা ইংরাজদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এই সময় হইতে করোলিরাজ্য ইংরাজরাজের আশ্রিত হইল।

১৮৫২ খৃঃ অন্ধে মহারাজ নরসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় করোলিরাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের খাস হইবার কথা হয়। কিন্তু অনেক জন্মানর পর রাজার আশ্রী মদনপালকে করোলিরাজ্যের সিংহাসন প্রদান করা হইল। মদন ৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়ে কোটার বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষে সৈন্ত পাঠাইয়া ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, এই কারণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে 'জি, সি, এস, আই' উপাধি এবং ১৫ হানে ১৭ তোপের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ১৮৬৯ খৃঃ, মদনপালের মৃত্যু হইলে দুইজনের পর ১৮৭৯ খৃঃ, অর্জুনপাল রাজা হইলেন।

করোলিরাজ্যের মাফুল হইতেই অনেকটা কর আদায় হয়। (১৮৮১ সালের) বার্ষিক কর আদায় ৪৮৩৮১০, তন্মধ্যে খরচ ৪২৯৫৮০, এখানে রীতিমত পুলিশ নাই। রাজার সৈন্তগণই সেই কার্য করিয়া থাকে। করোলি-রাজের ১৬০ জন অশ্বরোহী, ১৭৭০ জনপদাতি, ৩২ জন গোলন্দাজ এবং ৪০টি কামান আছে। সৈন্তগণ নিম্নলিখিত ১২ জায়গার ১২টি ঘর্ষে অবস্থান করে।

যথা—করোলিনগর, উঠগড়, মজেল, নারোলি, সপোজা, দৌলংপুর, থালি, জম্বা, নিলা, খুদা, উল ও খোদাই।

করোলিরাজের স্বতন্ত্র টাকশাল আছে; তাহাতে রোপ-মুদ্রা খোদিত হয়।

২ করোলিরাজ্যের প্রধাননগর করোলি। মধুবা হইতে ৩৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩০' উত্তর, দ্রাঘি° ৭৭°৪' পূঃ।

কাহারও মতে অর্জুনদেব প্রতিষ্ঠিত কল্যাণজীর মন্দির হইতেই এই নগরের নাম হইয়াছে। ১৩৪৮ খৃঃ অব্দে অর্জুন এই নগরটি স্থাপন করেন। এককালে এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও পার্শ্বতীর মেনাজাতির উৎপাতে ইহার সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল। ১৫০৬ খৃঃ, রাজা গোপালদাসের শাসনকালে এই নগর পূর্নশ্রী লাভ করে। এই সময়ে এখানে জুরম্য হর্ষ্যসকল নির্মিত হইয়াছিল। নগরটি প্রায় ১ ক্রোশ, ইহার চারিদিকে বেলেপাথরের প্রাচীর; নগরে প্রবেশ করিবার ৬ সিংহদ্বার এবং ১১টি গুপ্তদ্বার এবং নগরের মধ্যে গোপালদাসের সমরকার এক সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ আছে। প্রাসাদের চারিদিকে অত্যুচ্চ প্রাচীরপরিবেষ্টিত, দুইটি জুজ্বর সিংহদ্বার, প্রাসাদের মধ্যে রাজমহল ও দেওয়ানি-আম নামক গৃহ দেখিবার জিনিষ বটে, এই দুই গৃহের চিত্র বিচিত্র, কারুকার্য ও শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে নির্মাণ-কারীদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। এখানে শিকারগঞ্জ, শিকারমহল ও আমমহল নামে তিনটি মনোরম উদ্যান আছে। লোকসংখ্যা ২৫,৬০৭।

কক (পুং) করোতি কৃ-ক (কৃদধারার্জকলিভাঃ কঃ। উণ্. ৩। ৪০) ১ খেত অখ। ২ কুলীর, কাকড়া। ৩ দর্পণ। ৪ ঘট। ৫ ককট রাশি। ৬ অগ্নি। ৭ তিল। ৮ সৌন্দর্য। ৯ কণ্টক। ১০ বৃক্ষবিশেষ, কাকড়াশূক। ১১ গুল্লবর্ণ। ১২ উত্তম, শ্রেষ্ঠ।

১৩ রাষ্ট্রকূটাধিপতি গোবিন্দরাজের পুত্র। খোদিত শিলা-লিপি অনুসারে ইনিই কক ১ম। ইহার দুই পুত্র ইন্দ্ররাজ ও কৃষ্ণরাজ, ইহার মৃত্যু হইলে রাষ্ট্রকূটরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার রাজ্যকাল ৬৮৫ খৃঃ অঃ।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় ২য় কক গুজরাটরাজ ৩য় ইজের পুত্র, তাহার অপর নাম সুবর্ণবর্ষ। তিনি গুজরাটে রাজত্ব করিতেন। তিনি ২য় ক্রবরাজের পিতা। বরদা ও অপর স্থানের অনুশাসনপত্রে তাহার সময় ৭৩৪ ও ৭৪২ শক নির্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত উভয় রাষ্ট্রকূটরাজই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। এই বংশে আর একজন ককের (৩য়) নাম পাওয়া যায়, তাহার অপর নাম অমোঘবর্ষ বা বল্লভনরেন্দ্র। তাহার পিতা (৪র্থ) কৃষ্ণরাজ। সময় ৯৭২-৩ খৃঃ অঃ।

কক উপাধ্যায়। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ও পারদগৃহসূত্রের ভাষ্যকার। সায়ণচার্যের পূর্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। সায়ণ আপন বেদভাষ্যে ককের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ককখণ্ড (পুং) ককঃ খণ্ড; ভূমিভাগো যত্র বহুত্রী। দেশবিশেষ।

(ভারত বনপর্ক ২৫৩। ৭২)

ককটর্ভিটি (স্ত্রী) ককবর্ণা শুক্লা, চিহ্নিতি, মধ্যলো।। সাদাহুতি।

ককট (পুং) কক-অট্। ১ বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্যায়—কক, ক্ষুদ্রধাত্রী, ক্ষুদ্রামলক ও ককফল। ইহার ফলের আকৃতি ছোট আমলকীর মত। ২ জলজন্তুবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্যায়,—ককটক, কুলীর, কুলীরক, সদংশক, পঞ্চবাস ও তির্থ্যাক্গামী। বাদ্যলায় কাকড়া বা ক্যাকড়া, দক্ষিণে দরজা-কা-কেকড়া, তামিলে কদলনান্দু, তৈলঙ্গে নক্কৈয়া বা সমুদ্রপু, মলয়ে কপিতিং, পারস্তে পাঞ্জপারা, আরবে থিরচিং, লাতিন ক্যান্সার (Cancer), ইংরাজিতে ক্র্যাব্ (Crab) বলে।

যুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা ককটজাতিকে দৃঢ়াবরণী বিশিষ্ট-দশপাদী জীবশ্রেণী (Crustaceans of the order Decapoda) মধ্যে ধরিয়াছেন।

ইহাদের পাঁচজোড়া বক্ষস্থলনিঃসৃত প্রত্যঙ্গ আছে, বোধ হয়, এই জন্তই পারস্তভাষায় ইহাদিগকে পাঞ্জপারা অর্থাৎ পঞ্চপদবিশিষ্ট বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। বক্ষ প্রদেশের প্রত্যেক পার্শ্বকানকোরা বেষ্টিত আছে।

ককটজাতি পৃথিবীর নানাস্থানে বাস করে। ইহার নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়,—বাহারা সমুদ্রে বাস করে, তাহারা স্বভাবতঃ অনেক বড় হয়। বাহার নদীতে থাকে, তাহারা সামুদ্রিক ককট অপেক্ষা ক্ষুদ্র, আবার বাহার জলাশয়ে বাস করে, তাহারা আরও ছোট হয়।

সকল প্রকার ককটের পৃষ্ঠাবরণ (খোলা) দেখিতে সমান নয়, দেশভেদে ও জল বায়ুর অবস্থানভেদে নানাস্থানে নানাবিধ আকারের ককট দৃষ্ট হয়। ইহার অণ্ডজ জীব। প্রথমাবস্থায় মাতৃবক্ষে অতি ক্ষুদ্র ডিম্বাকারে বাস করে, সময় হইলে ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ইহাদিগকে কোন প্রকার পোকা বলিয়া ভ্রম জন্মে; ডিম্ব হইতে নির্গত হইয়াই জলে ভাসিতে থাকে। এ সময়ে ইহাদের বিপদ অনেক, জলচর জীবগণ আপনাদের আহার ভাবিয়া সদ্যোজাত ককট ধরিয়া ভক্ষণ করে। বতই বড় হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে রূপেরও পরিবর্তন ঘটে। প্রথম হইতে পাঁচরকম রূপপরিবর্তনের পর প্রকৃত ককটরূপ প্রাপ্ত হয়।

ককটেরা সমুদ্রের অতল সলিলে, ফলের ধারে, অথবা সলিলনিকটস্থ পাহাড়ের গর্ভে বাস করে। বঙ্গদেশের বাদায় যেখানে সমুদ্র অথবা নদীর জল সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে, একরূপ স্থলে গর্ত করিয়াও ছোট বড় সকল প্রকার ককট বাস করিতে দেখা গিয়াছে। দুই এক জাতি ভিন্ন সকল প্রকার ককট পদদ্বারা সাঁতার কাটিতে পারে না, বরং স্থলে বেড়াইতে পারে।

ককটের মত ঝগড়াটে এবং ধান্যগ্রহণ করিতে তৎপর

জলচরজীব আর নাই। অধিক কর্কট একত্র হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, যে বলবান্ তাহারই জয় এবং যে অতি ক্ষীণ, তাহার প্রাণসংশয় হয়। ইহার শীতকালে গভীর জলে বাস করে, আবার গ্রীষ্ম আসিলে তটের নিকট থাকে। পৃথিবীর নানা প্রকার কর্কট মানবজাতির খাদ্যোপযোগী।

রাজনির্যন্তের মতে ইহার গুণ—মলমূত্রপরিষ্কারক, ভয়-সন্ধানকারী অর্থাৎ ভয়স্থান জোড়া দিতে সমর্থ এবং বায়ুপিত্তনাশক। কৃষ্ণকর্কট অর্থাৎ কাল কাঁকড়ার গুণ—বলকারক, জৈব উষ্ণ ও বায়ুনাশক।

৩ পক্ষিবেশ্য, করকটে। ৪ পদ্মমূল। ৫ তুসীলাউ। ৬ মেঘাদি ষাটশ রাশির চতুর্থ রাশি; এই রাশি পুনর্কল্প নক্ষত্রের শেষপাদের সহিত পুষ্যা ও অশ্লেষানক্ষত্রে হইয়া থাকে। (এই নক্ষত্রের চারিদিকে ৫টি উপগ্রহ আছে।) ইহার দেবতা কুলীরাব্রতি, তাহার পৃষ্ঠদেশ উন্নত; তিনি শ্বেতবর্ণ, কফপ্রকৃতি, স্নিগ্ধ, জলচর, বিপ্রবর্ণ, উত্তর-দিকপাল, বহু স্রোমজ ও বহু সন্তানশালী। কর্কটরাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে কপটচিত্ত, মুঢ়ভাষী, মন্ত্ৰণাকুশল, অপ্রবাসী ও অশ্লীল হইয়া থাকে। জন্মকালীন চন্দ্র এই রাশিগত থাকিলে মানব নৃত্যগীতাদি বহুকলাভিজ্ঞ, নিখিলবৃত্তি, কৃশ, জুগলপ্রিয়, জলকেলিপ্রিয়, ধনবান্, বুদ্ধিমান্ এবং দাতা হইয়া থাকে। কর্কটলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে ভোগী, সর্বজনপ্রিয়, মিষ্টান্নপানভোজী ও আত্মীয়দিগের প্রিয় হইয়া থাকে। ৭ সর্পবেশ্য। ৮ কলশ। ৯ কীলক, গোঁজ। ১০ কণ্টক। ১১ রোগাবিশেষ। (Cancer) অর্কদ্রুত রোগ, ইহা অসাধ্য।

কর্কটক (পুং) কর্কট-এব-স্বার্থে-কন্। ১ কাঁকড়া। ২ বস্ত্রভেদ।

কর্কটক্রান্তি (স্ত্রী) নিরক্ষরেখা হইতে ১০৮ ক্রোশ উত্তরস্থিত অক্ষরেখা। (Tropic of Cancer.)

কর্কটশৃঙ্গিকা (স্ত্রী) কর্কটত্বাং শৃঙ্গমত্যাঃ, কর্কটশৃঙ্গ-স্বার্থে কন্-টাপ্-ইত্বং। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটশৃঙ্গী (স্ত্রী) কর্কটশৃঙ্গ শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমগ্রভাগো যন্তঃ, বহুব্রী। গাছবিশেষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী। ইহার সংস্কৃতপর্যায়,—কর্কটাত্মা, মহাঘোষা, শৃঙ্গী, কুলীরশৃঙ্গী, চক্রাঙ্গী, কুলঙ্গী, কাসনাসিনী, ঘোষা, বনমূর্জা, চক্রা, শিখরী, কর্কটাজা, কর্কটী, বিধানিকা, কোলীরা, চন্দ্রাম্পদা, বলাঙ্গা। ভাব-প্রকাশের মতে ইহার গুণ,—কষায় ও তিক্তরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য; এবং কফ, বায়ু, ক্ষয়, জ্বর, উর্জ্বাযু, তৃষ্ণা, কাস, হিকা, অরুচি ও বমিনাশক।

কর্কটাক্ষ (পুং) কর্কট-ইব অক্ষি গ্রহিভেদোহত্ব, বহুব্রী। কাঁকড়, কর্কটী।

কর্কটাত্মা (স্ত্রী) কর্কটত্বাৎ আত্মা এব আত্মা যন্তাঃ, বহুব্রী। কাঁকড়াশৃঙ্গীবৃক্ষ।

কর্কটাক্ষা (স্ত্রী) কর্কটশৃঙ্গ অক্ষ শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমগ্রভাগাঃ কর্কটাক্ষ-টাপ্। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটাস্থি (স্ত্রী) কর্কটশৃঙ্গ অস্থি, ৬ত্বং। কাঁকড়ার খোলা।

কর্কটাহ্ন (পুং) কর্কটমাহ্নয়তে স্পর্ধতে কণ্টকময়ত্বাৎ, কর্কট-আ-হ্নে-ক। বেলগাছ।

কর্কটাহ্না (স্ত্রী) কর্কটাহ্ন-টাপ্। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটি (স্ত্রী) করং কটতি প্রাপোতি, কর-কট্-ইন্-(সর্গ-ধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭) শকজাদিবৎ অলোপঃ। কাঁকড়।

কর্কটিকা (স্ত্রী) কর্কটী-স্বার্থে কন্-টাপ্-ইত্বশ্চ। কাঁকড়।

(“তো চ ব্রুতি ভলং কৃষা কর্কটিকাক্ষেত্রেষু প্রবিষ্টা তৎফল-ভক্ষণং স্নেহয়া কৃষা।” পঞ্চতন্ত্র।)

কর্কটিকেশ (স্ত্রী) কামরূপহ একটি গ্রাম। শ্রাঙ্কের পর এই গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

“উদ্যতক্ণ গয়াং গন্ত্যঃ শ্রাঙ্কং কৃষা বিধানতঃ।

বিধায় কর্কটিকেশং গ্রামস্তান্ত প্রদক্ষিণম্।” যোগিনীতন্ত্র।

কর্কটিনী (স্ত্রী) কর্কটবৎ আকারো হস্তাত্মাঃ, কর্কট-ইন্-ভীপ্। দারুহরিদ্রা।

কর্কটী (স্ত্রী) করং কণ্টকং অটতি গচ্ছতি, কর্ক-অট্-ইন্-শকজাদিভাদলোপঃ-ভীষ্। করং কটতি, বা কর-কট্-ইন্-ভীষ্। ১ শাখালীকল, শিমুলফল। ২ সর্পবেশ্য। ৩ দেব-দালীলতা। ৪ কাঁকড়াশৃঙ্গী। ৫ একাঁক। ৬ ঘোটিকাবৃক্ষ। ৭ ফললতাবিশেষ, কাঁকড়। (Cucumis Utilissimus)

ইহার সংস্কৃতপর্যায়—কটুদলী, ছর্দাপনিকা, পীনসা, মুত্রফলা, ত্রপুষা, হস্তিপর্ণী, লোমশকাণ্ডা, মুত্রলা, বহুকন্দা, কর্কটাক্ষ, শাস্ত্রহু, চির্ভটী, বালুকী, একাঁক, ত্রপুষী।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রূক্ষ, মলরোধক, গুরু, কটিকর ও পিত্তনাশক। পাকা কাঁকড় তৃষ্ণা, অমি ও পিত্তকারক। ইহার পাকপ্রণালী—পরিপুষ্ট কাঁকড়ের ছাল বীজ বাদ দিয়া গোলাকার খণ্ড খণ্ড করিবে, পরে তণ্ডুলে ভাজিয়া লইয়া ঘৃত, চুর্ন ও শর্করার সহিত পাক করিবে, পাকশেষে এলাচীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সুবাসিত করিয়া লইবে। এতদ্বিত্ত ইহার তরকারী পাক করিয়া খাইবারও রীতি আছে। তিক্ত কাঁকড় রক্তপিত্ত-নাশক ও কফদোষকারক। পাকাকাঁকড় মূত্ররোধবিনাশক।

কর্কটু (পুং) কর্কট-কু, মুগয়াদিভ্যাং। করেটুপক্ষী, করকটে।

কর্কদ। চটলহু গ্রামবিশেষ। (ভঃ ব্রহ্মখণ্ড ১৫। ২২)

কর্কছু (পুং জী) কর্কঃ কর্কেতং দধাতি, কর্ক-ধা-কু-হ্মচ ।

১ কোলিবৃক্ষ, শৃগালফল, শেরাকুল, ।

ভাবপ্রকাশের মতে শেরাকুলের গুণ—অন্ন, কষায় ও ক্লেবং মধুররস, মিষ্ট, তিক্ত, গুরু ও বাতপিত্তনাশক । শুক কুল ভেদক, অগ্নিকারক, লঘু, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও রক্তনাশক । কোন কোন স্থলে কর্কছু শব্দ ক্রৌবিল্লিও দেখিতে পাওয়া যায় । ২ কুলফল ।

কর্কছুকুণ (পুং) কর্কছুগাং পাকঃ, কর্কছু-কুণপ্ (তন্ত্র পাকমূলে পীতাদি কর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচৌ । পা ৪। ২। ২৪।)

১ কর্কছুর পকাবস্থা । ২ পাকা কর্কছু ।

কর্কছুমতী (জী) কর্কছুমন্ত্যত্র ভূমৌ ইতিশেষঃ, কর্কছু-মতুপ্ ভীষ্ । কর্কছুযুক্ত ভূমি ।

কর্কছু (পুং জী) কর্কঃ কর্কেতং দধাতি, কর্ক-ধা-কু- ততো নিপাতনাং সিদ্ধঃ (অন্দ্ৰদৃশ্চক্ৰকৃৎকফেলুকর্কছুদিধিষু । উণ্ ১। ১৫।) কর্কছুবৃক্ষ । [কর্কছু দেখ ।]

কর্কফল (জী) কর্কশ্চ কর্কেতশ্চ ফলম্, উত্তং । ১ কর্কেতফল । ২ (কর্কবং ফলং যন্ত) বৃক্ষবিশেষ, ক্ষুদ্র আমলকী ।

কর্কর (ত্রি) কর্ক-অরন্ । ১ কঠিন । ২ কর্কশ ।

কর্কর (জী) কর্ক-রা-ক । ১ ছোট ছোট পাথরকুচি, যাহা গোড়াইয়া চূর্ণ প্রস্তুত করে ; ইহার অপর সংস্কৃত নাম চূর্ণ-খণ্ড । ২ কাকর । (পুং) ৩ দর্পণ । ৪ সর্পবিশেষ । (ভারত ১। ৩৫। ১৬।) ৫ মূলগার ।

কর্করাক্ষ (ত্রি) কর্করং কর্কশং অক্ষি যন্ত, বহব্রী । কর্কশচক্ষু ।

কর্করাক্ষ (পুং) কর্করতুল্যং অঙ্গং যন্ত বহব্রী । কালকণ্ঠ নামক পক্ষিবিশেষ, খঞ্জনপক্ষী ।

কর্করাটু (পুং) কর্কঃ হাসং রটতি প্রকাশয়তি, কর্ক-রট-কু-কুণ্ বা । কটাক্ষ ।

কর্করাটুক (পুং) কর্কং কর্কশং রটতি রোতি, কর্ক-রট-উকঞ-স্বার্থে কন্ । করকটে পাখী ।

কর্করাক্ষক (পুং) কর্করঃ কঠোর অঙ্গঃ, কর্কধা ; স্বার্থে কন্ । অঙ্করূপ ।

কর্করাল (পুং) কর্করঃ সন্ অলতি পর্যাপ্রোতি, কর্কর অল্-অচ্ । চূর্ণকুম্ভল, অলক ।

(অলকস্ত কর্করালঃ খঅরশূর্নকুম্ভলঃ । হেম ৩। ৫৬৯)

কর্করী (জী) কর্কঃ হাসবৎ নির্মলঃ সলিলং রাতি, কর্ক-রা-ক গোরাদিভ্যঃ ভীষ্ । ক্ষুদ্রজলাধার, গাড়ু, ঝারী । ইহার সংস্কৃত-পর্যায়,—আলু, গলপ্তিকা, আলু ও আকু ।

কর্করীকা (জী) কর্করী-স্বার্থে কন্ হ্রস্বো ন । কর্করী ।

কর্করেট (জী) কর্কং কর্কেতি শব্দং রেটেতে যত্র, কর্ক-রেট

বঞ্ । গলার হাত, গলা টিপিয়া ধরা । ইহার সংস্কৃতপর্যায়,—অর্জুচক্র ও অঙ্গুলিতোরণ ।

কর্করেটু (পুং) কর্কং কর্কেতি শব্দং রেটেতে ভাবতে রোতি বা, যুগয়াদিভ্যঃ সাধুঃ । করেটুপক্ষী, করকটে ।

কর্কশ (পুং) কর্কোহস্ত্যন্ত, কর্ক-শ (লোমাদিপামাদিপিক্ষা-দিভ্যঃ শনেলচঃ । পা ৫। ২। ১০০) ১ কাশ্মিরবৃক্ষ, কমলা-গুড়া বা গুড়ারোচনী । ২ কাসমর্দ, কালকাসিন্দা । ৩ ইক্ষু । ৪ খড়্গা । ৫ (ত্রি) কঠিনস্পর্শ । ৬ জুর । ৭ নির্দিয় । ৮ হুর্যোধ । ৯ কুণপ । ১০ থরস্পর্শ, থরথরে । ১১ সাহসী । ১২ কঠোর । ১৩ অভ্যস্ত । ("তন্ত্র কর্কশবিহারমন্তবম্ ।" রঘু ।) ১৪ কুণপ ।

কর্কশচ্ছদ (পুং) কর্কশঃ ছদঃ পত্রমন্ত, বহব্রী । ১ পটোল । ২ শাখোটবৃক্ষ, শেওড়াগাছ ।

কর্কশচ্ছদা (জী) কর্কশঃ অমহং ছদো যন্তাঃ কর্কশচ্ছদ-টাপ্ । ১ কোশাতকী, বিজে । ২ দগ্ধাবৃক্ষ ।

কর্কশত্ব (জী) কর্কশত্ব ভাবঃ কর্কশ-ত্ব (তন্ত্রভাবতলো । পা ৫। ১। ১১৯।) কর্কশতা, কর্কশের ধর্ম । [কর্কশ দেখ ।]

কর্কশদল (পুং) কর্কশং দলং পত্রমন্ত, বহব্রী । ১ পটোল । ২ শেওড়াগাছ ।

কর্কশদলা (জী) কর্কশং দলং যন্তাঃ, কর্কশদল-টাপ্ । ১ কোশাতকী, বিজে । ২ দগ্ধাবৃক্ষ ।

কর্কশবাক্য (জী) কর্কশঞ্চতং বাক্যঞ্চোতি, কর্কধা । ১ নিষ্ঠুর বচন । ২ নীরসবাক্য ।

কর্কশা (জী) কর্কশ-টাপ্ । ১ ব্যভিচারিণী জী । ২ বৃশ্চিকালী, বিছাতিলতা ।

কর্কশিক (জী) কর্কশ-কন্-টাপ্-অত ইহং । বনফুল ।

কর্কসার (জী) কর্কঃ কর্কশঃ সারো যত্র, বহব্রী । করস্কক, দধি মিশ্রিতছাতু ।

কর্করু (পুং) কর্কং হাসবৎ শোভাঃ ঋচ্ছতি প্রাপ্রোতি, কর্ক-ধা-উণ্ । কুয়াণ্ড, কুগড়া । ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, গুরু, মলমুক্তকারক ও রক্তপিত্তনাশক । পক কর্করু তিক্ত, অগ্নিকারক, ক্ষারযুক্ত এবং কফ ও বায়ুনাশক ।

কর্করুক (পুং) কর্কঃ হাসং হিতকারিভ্যঃ ঋচ্ছতি অনরতি, কর্ক-ধা-উকঞ । কালিবৃক্ষ, খেঁড়ো ।

মুত্রপ্তের মতে ইহার ফল গুণ—গুরু, বিষ্টভী, শীতল,

স্নাত্ত, কফকারক, মলমুক্তপরিষ্কারক, ক্ষারযুক্ত ও মধুররস ।

কর্কি (পুং) কর্ক-ইন্ । ১ কর্কটরাশি । ২ আরম্ভাবাদের পূর্বনাম ।

কর্কী (জী) কর্ক অচ্-ভীষ্ । কাকুড় ।

কর্কীপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ ।

কর্কেতন (জী, পুং) কর্কে হস্তাদৌ তনোতি, কর্কে-তন্-অচ্

অলুক্সমাস। রত্নবিশেষ। এই রত্নকে হিন্দীতে ও পারস্যে জমরদ, হিব্রু 'টারশিস্,' গ্রীক 'বেরলস্,' লাতিন 'স্মারগডাস্' (Smaragdus), পোগণ্ড 'জমরগদ্,' রুথ 'ইম্মরদ,' ওলন্দাজ 'স্মরগদ্' বা 'এস্মরদ,' দিনেমার ও জুইস্ 'সমরদ,' রোমক 'স্মরল্দো,' পর্তুগীজ 'এস্মরল্দ,' বাইবেলে বেরিল, ফরাসীভাষায় বেরিল (Beril) এবং ইংরাজিতে বেরিল বা ক্রিসোবেরিল্ (Beryl বা Chrysoberyl) কহে।

গরুড়পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে,—“বায়ু ছষ্টটিতে দৈত্যগতির নথ সকল গ্রহণ করিয়া চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিলে কর্কেতন নামক পূজ্যতম রত্ন পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইল। সিন্ধু, বিষ্ণু, সর্ষপ সমবর্ণ, ঈষৎপীত, ওজনে ভারি, বিচিত্র এবং ত্রাসত্রগাদি দোষবর্জিত কর্কেতন অতিউৎকৃষ্ট। রক্তের মত লাল, চন্দ্রের স্থায় পাণ্ডুর, মধুর স্থায় ঈষৎ পীত, তামার মত অল্প লাল, পীত, অগ্নির স্থায় উজ্জল, নীল এবং সাদা কর্কেতন পাণনাশক। সংস্কারকের দোষে তেমন জ্যোতির্গম্য হয় না। এই মণি সোণায় মুড়িয়া গলে বা হাতে পরিলে অতি সুন্দর দেখায়, তাহাতে আয়, বংশ ও মুখ বৃদ্ধি হয় এবং রোগ ও কলিদোষ দূর করে। যে নির্দোষ কর্কেতন ধারণ করে, সে সর্ষপ পূজিত, বহু ধনশালী, বহুবান্ধব, দীপ্তিমান ও নিত্যতৃপ্ত হয়। এই মণি যত উজ্জল ও যত ভারি হয়, ইহার মূল্যও তত অধিক।” (গরুড় পূঃ ৭৫ অঃ)।

এই মণি ভারতবর্ষে, সিংহলে, উত্তর আমেরিকায়, মিসরে, রুখে ইউরাল পর্বতস্থ তজোবাজনদীগর্ভে, ব্রেজিলে, মোর-ভিয়ায় এবং পেশুতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণভারতে কৈম্বাতুর হইতে ২০ ক্রোশ দীর্ঘানকোণে কর্কেতনের খনি আছে এবং নানাহানে মরকত, ইন্দ্র-নীল প্রভৃতির সহিত দৃষ্ট হয়।

ইহা সবুজ, নীল, হরিৎ প্রভৃতি নানাবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট কর্কেতন দেখিতে অল্প সবুজ বা দুর্লভ-বাসের বর্ণের মত। ইহার উজ্জল্যও অধিক। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৬ হইতে ৩.৮ পর্য্যন্ত। ইহা অতিশয় কঠিন, প্রায় ৮.৫। ইহা দ্বারা ক্ষতিক বিদ্ধ করা যায়। আবার কর্কেতন চিরিতে বা বিদ্ধ করিতে হইলে ইন্দ্রনীল ও মাণিক্য আবশ্যক। ইহা ঘষিলে বৈদ্যাতিক জ্যোতিঃ নির্গত হয়, তাহা কর্কেতনের গুণাঙ্গসারে কয়েক ঘণ্টা থাকিতে পারে।

কর্কেতনের মধ্যে যাহা অর্দ্ধযচ্ছ, তাহা ‘বিম্বী কি আঁথ’ (বিড়ালাকী) নামে বিক্রীত হয়।

অতি উজ্জল স্বচ্ছ কর্কেতনের মূল্য অধিক, এক একট ১০০০ টাকা হইতে ৩০০০ পর্য্যন্ত।

কর্কোট (পুং) কর্ক-ওট। নাগরাজবিশেষ।

(“অনন্তো বাহুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মো হপি তদ্রকঃ।

কর্কোটঃ কুলিকঃ শব্দ ইত্যাহৌ নাগনারকাঃ ॥” ত্রিকাণ্ড শেঃ।)

কর্কোটক (পুং) কর্কঃ কর্কটকময়বাৎ কর্কোরঃ অটতি প্রাপ্নোতি, কর্ক-অট-অচ্, (পূর্বোদরাদিভ্যং) ওকারাদেশঃ, তৎ কায়তি প্রকাশতে, কর্কোট-কন্। ১ বেলগাছ।

২ করুপুত্র নাগরাজবিশেষ। (কর্কোটকঃ শ্রাদ্ধালুপকাত্বেয়-প্রভেদয়োঃ। মেদিনী।) ৩ ইক্ষু। ৪ কাঁকরোল। [কাঁকরোল দেখ।] ৫ মহাভারত ও পুরাণোক্ত জনপদবিশেষ। (মার্কণ্ডেয় পুঃ ৫৮। ৮, মহাভাঃ ভোগ, বৃহৎসংহিতা ১৪। ১২)। ইহার বর্তমান নাম কারা; জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত।

কর্কোটকী (স্ত্রী) কর্কোটক-গৌরাদিভ্যং ভীষ্। ১ পীত-ঘোষা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কটুফলা, মহাজালিনি, ধামার্গব ও রাজকোষাতকী। [ধামার্গব দেখ।] ২ কাঁকড়।

কর্কোটব্যাপী (স্ত্রী) কর্কোটনামনাগেন কৃত্য বাপী, মধ্যলোঃ। কালীস্থ তীর্থবিশেষ। (“কর্কোটব্যাপ্যা দীর্ঘানে মরীচে: কুণ্ডমুত্তমম্।” কালীখণ্ড।)

কর্কোটিকা(স্ত্রী) কর্কোট-স্বার্থে কন্-টাপ্-অত-ইত্। কাঁকরোল। কর্কটিকা (স্ত্রী) কং স্নত্থং যথা তথা চর্যতে উপযজ্যতে, ক-চর-কন্, পূর্বোদরাদিভ্যং সাধুঃ। পিষ্টকবিশেষ, কচুরী। [কচুরী দেখ।]

কর্চরী (স্ত্রী) কং জলং চর্যতে অত্র, ক-চর-ভীষ্ (পূর্বোদরাদিভ্যং সাধুঃ।) জলশূণ্ড শুক ফলখণ্ড; হিন্দুস্থানীরা ইহাকে কচুরী কহে। ইহাতে কীর ও অল্পসংযুক্ত করিয়া স্নত-গক করিতে হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—রুচি ও বলকারক, উষ্ণ, পিত্তকর, কফজনক ও ভেদক।

কর্চুর (স্ত্রী) কর্ক-উর (পূর্বোদরাদিভ্যং সাধুঃ।) ১ কর্কুর, বিবিধবর্ণ। ২ স্বর্ণ। ৩ বৃক্ষবিশেষ, কচুর। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মুখপরিষ্কারক এবং কফ, কাশ ও গলগণ্ডনাশক। চরকে তৃক্ষুণ্ণ কর্কুরের এইরূপ গুণ লিখিত আছে,—রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নগন্ধি, কফ ও বায়ুনাশক, এবং শ্বাস, হিকা ও অশোবোরোগে হিতকর। [আষহলুদ দেখ।]

কর্চুরক (পুং) কর্কুর স্বর্ণমিব কায়তি প্রকাশতে, কর্কুর-কৈ-ক। ১ কাঁচা হলুদ। ২ (স্বার্থে কন্) কর্কুর।

কর্জ (আরব্য) ধণ, দেনা।

কর্জদার (পারস্য) দেনাদার, অধমণ।

কর্জপত্র (আরব্য কর্জ + সংস্কৃত পত্র) কর্জ লইবার সময় উত্তমণকে যেরূপ লিখিয়া দিতে হয়।

কর্জশোধ (আরব্য কর্জ + সংস্কৃত শোধ) শ্লগণ পরিশোধ।

কর্জী (দেশজ) অধমর্গ, যে শ্লগণ করে।

কর্ণ (পুং) কর্ণ্যতে ক্রিপ্যতে বায়ুনা শব্দো যত্র, কৃ-ন-নিচ (কৃ-জ-মি-ক্র-প-অ-নি-শি-প-ভো) নিং ১: উণ্ ৩। ১০।) কর্ণ্যতে আকর্ণ্যতে অনেন কর্ণ-করণে অপ্ বা। ১ শ্রবণেন্দ্রিয়, কাণ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শব্দগ্রহ, শোত্র, শ্রুতি, শ্রবণ, শ্রব, শ্রোত্র ও বচোগ্রহ। কর্ণের বাহ্যভ্যন্তর সমুদায় অবয়বেই ‘কর্ণ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কর্ণগহ্বরের আকাশস্থানেই কর্ণেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং সেই আকাশের নামই ‘শ্রবণেন্দ্রিয়’ এই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দিক্, শব্দ ইহার বিষয়।

অপনকার শারীরবিদ পণ্ডিতগণের মতে মনুষ্য এবং যাবতীয় স্তম্ভপায়ী জীবের কর্ণ তিনভাগে বিভক্ত—১ বহিঃকর্ণ, ২ ঢক্কা (Tympanum) ও ৩ কর্ণভ্যন্তরস্থ বিবর বা গোলকধাঁদা (Labyrinth)। বহিঃকর্ণের আবার দুই অংশ কর্ণশুল্লী (Auricle) এবং কর্ণপ্রণালী বা কর্ণ-বহির্দ্বার (Auditory canal or external meatus)।

কর্ণশুল্লী উপাঙ্গিক সংগঠনদ্বারা উচ্চ ও নিম্নগামী। ইহার গভীর ও প্রশস্ত মধ্যস্থান, যাহাতে গোলছিদ্রগুলি নামিয়া গিয়াছে, তাহার নাম কর্ণস্থালী (Concha) এবং নিম্নতম দোলায়মান অংশকে কর্ণপালি বা কাণের পাতা (Lobe) বলা যায়। এদেশে কর্ণবেধের সময় এই কাণের পাতায় ছিদ্র করিতে হয়। বহিঃকর্ণে একখানি উপাঙ্গ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি ছিদ্র এবং সেই ছিদ্রগুলি সূত্রাকার ঝিল্লিসমূহে পূর্ণ থাকে। কর্ণশুল্লীর একভাগ হইতে অপরভাগে কয়েকটি পেশী চলিয়া গিয়াছে। এই পেশী সর্বশুদ্ধ ৩টী। উহারা পার্শ্বস্থ শিরষক্ (Scalp) হইতে কর্ণে বিস্তৃত হইয়াছে, মনুষ্য মধ্যে এই পেশী তেমন আবশ্যকীয় নয়, কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবের পক্ষে এগুলি না থাকিলেই নয়।

কর্ণপ্রণালী অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত। উহা কর্ণস্থালী হইতে অভ্যন্তরে গিয়াছে, ইহার উভয় পার্শ্ব অপেক্ষা মধ্যভাগ অধিক সরু। এইজন্ত কর্ণের অভ্যন্তরে কোন কিছু প্রবেশ করিলে বাহির করিতে কষ্ট হয়। অধোভাগ উপরভাগ অপেক্ষা বৃহৎ হওয়ায় কর্ণপ্রণালীর শেষ হইতে মধ্যকর্ণের ঝিল্লী তির্ধাক্ভাবে অবস্থিত। কর্ণপ্রণালী অস্থিগর্ভ ও উপাঙ্গিবৃত্ত। যেভাগ অস্থিগর্ভ, তাহার মধ্যে ঝিল্লিপরিলেপিত স্নায়ু অস্থিভ্রূণ থাকে। কোন কোন প্রাণীর স্বতন্ত্রভাবে কেবল অস্থির ছায় থাকে।

কর্ণরন্ধ্রের বহির্ভাগে মুখাভিমুখী স্থানকে কর্ণগজক (Tragus) বলে। কর্ণরন্ধ্রে খোলযুক্ত গ্রন্থি থাকে, ঐ গ্রন্থি থাকায় কীট ও ময়লাদি প্রবেশ করিতে পারে না।

কর্ণের বহির্দ্বারের ও কর্ণবিবরের মধ্যবর্তী গহ্বরকে মধ্য-কর্ণ বা ঢক্কা (Tympanum) বলা যায়। এই স্থান বায়ুপূর্ণ। ঐ বায়ু গলকোষ হইতে ইউষ্টেকিয়ান্ নলী দিয়া ঢক্কাতে আসিষ্ট হয়। ঢক্কাঝিল্লীর ও কর্ণবিবরের সহিত সচল অস্থিশ্রেণী সংযুক্ত আছে।

ঢক্কার গহ্বর দেখিতে অসমান এবং সাধি সারি স্তম্ভ লোমবৎ উপস্থিত। এই উপস্থিত গলকোষ হইতে নির্গত হইয়া ইউষ্টেকিয়ান্ নলী দিয়া কর্ণমণ্ডলে আসিয়া পৌছিয়াছে।

ঢক্কার ক্ষুদ্রাস্থি তিনখানি এবং তাহাদের আকারানুসারে নাম মুদগরাস্থি (Malleus), নিহানী-অস্থি (Incus) এবং রেকাবাহি (Stapes)।

ঢক্কার ঝিল্লী উক্ত গহ্বরের বহিঃপ্রাচীররূপে সংগঠিত। উহা দেখিতে ডিম্বাকৃতি। এই ঝিল্লীর উপর ও অধোদিকের মাঝামাঝি ক্ষুদ্রাস্থিশ্রেণীর প্রথমটি মুদগরের হাতলের আকারে সংলিপ্ত আছে, সেই অস্থির নাম মুদগরাস্থি।

ঢক্কাগহ্বরে কর্ণভ্যন্তরের সহিত সংশ্লষ থাকিবার জন্ত দুইটি গবাক্ষ আছে, ঐ গবাক্ষ কোমল ঝিল্লী দ্বারা আবদ্ধ থাকে। উহার একটিকে ডিম্বাকার গবাক্ষ (Fenestra ovalis) এবং অপরটিকে গোলগবাক্ষ (Fenestra rotunda) বলা যায়। প্রথমটি কর্ণবিবরের প্রবেশদ্বারের প্রদর্শকরূপে রহিয়াছে এবং আপন ঝিল্লীর দ্বারা ক্ষুদ্রাস্থিশ্রেণীর অন্তরাস্থির (অপর নাম রেকার-অস্থি) সহিত দৃঢ়রূপে সংযুক্ত আছে। দ্বিতীয় গবাক্ষটি কর্ণবিবরের শব্দকাকার গহ্বরের (Cochlea) দিকে অবস্থিত।

ঢক্কার মুদগরাস্থির সহিত একাধিক পেশী লিপ্ত আছে। এই পেশীর একটি ক্যরোটির কীলকাস্থির কেশরকমজাবৎ স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, (ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Laxator tympani) আর একটি শল্যাস্থির প্রস্তরবৎ কঠিন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Tensor tympani) শেষোক্ত পেশী মুদগরাস্থির হাতলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শারীরতত্ত্ববিদের মধ্যে অনেকেই প্রথম পেশীর অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, উহাকে পেশী না বলিয়া বরং বন্ধনী বলা যাইতে পারে।

নিহানী-অস্থি বলিলে কামারদিগের নিহানীর ত্রায় আকারবিশিষ্ট বুঝায়, কিন্তু সেরূপ নয়। এই অস্থিখানি দেখিতে পেয়গদত্তের ত্রায়, ইহার যে অংশ ক্ষুদ্র তাহা পশ্চাদিকে যাইয়া ঢক্কাগহ্বরের পশ্চাভাগে চুচুকাকার কোষের *

উপর খুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং যে অংশ কিছু বড়, তাহা অধোগামী হইয়া শেষে রেকাবাহির মাথার উপর চেপ্টা অথচ গোলাকার ধারণ করিয়াছে।

রেকাবাহি দেখিতে অস্বাভাবিক পদ রাখিবার রেকাবের ভায়। ইহার মস্তক, ঐরা, দুইশাখা ও ভূমি আছে। এই অস্থির কোণাকার উচ্চাংশ হইতে এক স্বল্প পেশী (Stapedius) উৎপন্ন হইয়া ডিম্বাকার গবাক্ষের পশ্চাত্তাগে রেকাবাহির ঐরাবদেশে সন্নিবেশিত হইয়াছে; ঐরাবদেশ পশ্চাত্তাগে টানিলে, উহা কর্ণবিবরের দ্বারকে সঙ্কুচিত করে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ইউটেকিয়ান্ননলী দিয়া ঢকা-গহ্বর বাহির হইয়াছে। ইউটেকিয়ান্ননামক একজন শারীরবিৎ এই নলীট প্রথমে আবিষ্কার করেন, তাহারই নামানুসারে এই নলীর নাম হইয়াছে। এটি প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। ইহার অন্নভাগ অস্থিময় এবং অধিকাংশ উপস্থিময়। এই নলীর মধ্য দিয়া বায়ু বহিয়া ঢকার উপরে ও মধ্য সঞ্চালিত হয় এবং এই পথ দিয়া ঢকাগহ্বরস্থ সঞ্চিত স্নেহাদিও নির্গত হয়।

কর্ণভ্যন্তরস্থ বিবরই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূল অংশ, এখানে কর্ণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর স্পন্দজনক স্ত্র সঞ্চালিত হইয়া আছে। উহা তিন অংশে বিভক্ত, বিবরদ্বার (Vestibule), অর্দ্ধগোলাকার নলীসমূহ (Semi-circular canals) এবং শব্দকাকার গহ্বর (Cochlea)। ঐ তিনটি গর্তাকারে গোলকর্ধাদার মত ঘোরপাক খাইয়া শব্দাহির প্রস্তরবৎ অতি কঠিনাংশে অবস্থিত আছে। ঢকার গোলগবাক্ষ ও ডিম্বাকার গবাক্ষ দ্বারা ইহাদের বাহির সঞ্চক এবং ভিতরে সঞ্চক কর্ণভ্যন্তরস্থ শ্রোত্র-নলীর সহিত। এই নলীই করোটির গহ্বর হইতে কর্ণবিবর অবধি শ্রোত্রসঞ্চকীয় স্নায়ু (Auditory nerve)-কে বহন করিতেছে।

উপরোক্ত গর্তগুলির চারি পার্শ্বে অস্থিময় গোলকর্ধাদা (Osseous labyrinth) আছে এবং উহাদের মধ্যে আবার ঝিল্লীর গোলকর্ধাদা (Membranous labyrinth) আছে।

বিবরদ্বারটি কর্ণভ্যন্তরের মধ্যগহ্বররূপে অবস্থিত, এত-খান হইতে অর্দ্ধগোলাকার নলীসমূহ এবং শব্দকাকার গহ্বর বাহির হইয়াছে। এই দ্বারটি উচ্চতায় ১ ইঞ্চির পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই দ্বারের বহির্গাত্রে ৪টি ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া অর্দ্ধগোলাকার নলীসঞ্চাল বাহির হইয়াছে। পশ্চাদিকে শব্দকাকার গহ্বর। বহির্গাত্রে ডিম্বাকার গবাক্ষ আছে এবং ভিতর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া শ্রোত্রসঞ্চকীয় স্নায়ুর স্পন্দজনক স্ত্র সঞ্চালিত ভিতরে প্রবেশ করে।

উক্ত অর্দ্ধগোলাকার নলী ৩টি, তাহাদের উত্তরপার্শ্বে ছোট বড় এক একটি দ্বার থাকে।

শব্দকাকার গহ্বর দেখিতে শব্দকের ভায়। উহা কর্ণবিবরের অগ্রবর্তী। ইহাতে দেড় ইঞ্চি লম্বা অস্থিময় নলী আছে।

অস্থিময় কোমল বিবরদ্বারের ও অর্দ্ধগোলাকার নলীর মধ্যে যে কোমল অংশ তাহাই ঝিল্লীর গোলকর্ধাদা (Membranous Labyrinth)। অস্থিময় গোলকর্ধাদা দেখিতে ঝিল্লীর গোলকর্ধাদার মত, তবে উভয়ের আয়তনে ছোট বড় আছে। উভয় গোলকর্ধাদার মধ্যে পেরিলিম্প (Perilymph) নামক একপ্রকার তরল পদার্থ থাকে। ঝিল্লীগোলকর্ধাদায় এণ্ডোলিম্প (Endolymph) নামে একপ্রকার তরল পদার্থ আছে এবং ইহার কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ বিবরদ্বারের স্নায়ুর প্রান্তভাগে, কি মানুষ কি নিরুপ্ত পশুর মধ্যে একপ্রকার চূণের মত পদার্থ দেখা যায়। মানব, শুভ্রপারী জন্তু, পক্ষী এবং সরীসৃপদিগের মধ্যে চূণমিশ্রিত মিহি গুঁড়ার মত থাকে, উহাকে কাণের গুঁড়া (Otoconia) বলা যায়।

বিবরদ্বারংশে দুইটি থলি, একটি উপরে সেটি কিছু বড় ও দেখিতে ডিম্বাকার। (ইংরাজীতে ইহাকে Utriculus or common sinus বলে।) অপরটি দেখিতে প্রথমটি অপেক্ষা কিছু ছোট ও গোলাকার, এটি নিম্নে থাকে, ইহাকে কোবালু (Sacculus) বলে।

সুশ্রুতের মতে প্রত্যেক কর্ণে ১টি করিয়া ২টি সন্ধি, তাহার নাম শৃঙ্গটিক। অস্থি দুইখানি, তাহার নাম তরুণ। পেশী ২টি। শিরা ১০। ধমনী ৬, তন্মধ্যে বায়ুবাহিনী ২, শব্দবাহিনী ২, শব্দকারিণী ২। চরকের মতে কর্ণ একটি আন্তরীক্ষ পদার্থ *।

কর্ণের অবয়বগুলি একে একে লিখিত হইল। এখন দেখা যাউক, কিরূপে আমরা কর্ণে শ্রুতিতে পাই; কর্ণের বস্তুগুলি কিরূপে কার্য্য করে।

যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কাহারও মতে, শব্দ কর্ণগোচর হইবার পূর্বে প্রথমে বায়ুকণ্টক কর্ণশঙ্কুলীতে নীত হয়, তৎক্ষণাতঃ বায়ুপ্রভাবে তাহার তরল পদার্থের আণবিক কম্পন উপস্থিত হয়। শব্দ বায়ুতে সঞ্চালিত হইবামাত্র বায়ু দ্বারা ঢকার ঝিল্লীরও উৎকম্পন হইতে

* “বহিঃস্থবস্তুতে মহান্তি চাপ্ণি চ স্রোতাংসি তদান্তরীক্ষঃ শব্দঃ শ্রোত্রকঃ।” চরক শারীরস্থান ৭ অঃ।

শরীরে যে সমুদায় ছিদ্র এবং বড় ও ক্ষুদ্র স্রোত সমুদায় আছে, সেই সমুদায় এবং শব্দ ও কর্ণ আন্তরীক্ষ পদার্থ।

থাকে। বায়ুতে শব্দ যতবার ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, তকার ঝিল্লীও ততবার উৎকম্পিত হইতে থাকে। সেই মতে যুদ্ধসঙ্গীত ছলিয়া নিহানী-অস্থি এবং ডিঙ্কার গবাক্ষের ঝিল্লীকে জাগাইয়া দেয়। তৎক্ষণাৎ তকার পেশী দিয়া ঢকা-ঝিল্লীর বিতান ছলিতে থাকে। ঢকাগছরে বায়ু দুই ভাবে কার্য্য সম্পাদন করে। প্রথমতঃ গবাক্ষের ঝিল্লীসমূহের বহির্ভাগে রীতিমত ঢাপ রাখে, তাহাতে ঐ ঝিল্লীগুলির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ ঢকাগছরে বায়ু প্রবেশ করার ক্ষুদ্রাঙ্গুলার গতি হইতে থাকে। শব্দবিজ্ঞানানুসারে বায়ুসংস্পর্শে ঐ ক্ষুদ্রাঙ্গুলী হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়।

কর্ণাভ্যন্তরস্থ বিবর বা গোলকধাঁদায় তিন প্রকারে শব্দ যায়। প্রথমতঃ অস্থি শ্রেণী দিয়া, দ্বিতীয়তঃ ঢকাগছরের বায়ু দিয়া এবং তৃতীয়তঃ মস্তকেয় অস্থি মধ্য দিয়া।

কর্ণের অভ্যন্তরস্থ বিবরদ্বারকেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূলযন্ত্র বলা যায়। পশ্চাদির কর্ণের অপরাংশ না থাকিলেও এই অংশ থাকিবেই থাকিবে। বৃহৎকায় জন্তুদিগের কর্ণের মধ্য-ভাগে এই বিবরদ্বার থাকে। এখানে কাণের গুঁড়ো থাকায় শব্দের বিশেষ সুবিধা হয়। কাছে আসিবামাত্র থন্ থন্ শব্দ হয়, সেই শব্দ বিবরদ্বারের ঝিল্লী, অর্দ্ধ গোলাকার নলীর প্রসারিত অংশ (Ampullae) এবং তাহাদের স্নায়ুতে লক্ষ্যকৃত হয়।

অর্দ্ধগোলাকার নলীরসমূহের দীর্ঘতা, বিস্তার ও উচ্চতা আছে। তদ্বারা শব্দের গতি জানা যায়। শব্দ খামিয়া গেলেও শব্দের ভাব এককালে কর্ণ হইতে যায় না। [কাণ দেখ।]

২ যুগিষ্ঠিরের অগ্রজ; ভোজরাজহুঁহিতা কুন্তী অবিবাহিতা-বহ্নয় পিতৃগৃহে অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, একদা হর্কীশা খবি তাঁহার আতিথ্যপ্রার্থী হইলে তিনি অতি যত্নের সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, মুনী তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীকে মন্ত্র প্রদান করিলেন, ঐ মন্ত্রের দ্বারা যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিলেই তিনি আসিয়া সহবাস করিবেন। কুন্তী আশ্চর্য্য প্রভাবশালী এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া কোতুলবশে সেই মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। সূর্য্য তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সন্তোষ করিলেন, সন্তোষমাজেই কবচ-কুণ্ডলধারী সূর্য্যসম ভেজস্বী এক নবকুমার উৎপন্ন হইল।

কুন্তী লোকলজ্জা ভয়ে তাঁহাকে অশ্বনদীর জলে ডালাইয়া আসিলেন। কুমার কর্ণ স্রোতে ডালিয়া যাইতেছে, সেই সময়ে অধিরথ নামক একজন স্তরের দর্শনপথে পতিত

হইলেন। অধিরথ অপূত্রক ছিলেন, তিনি এমন জ্বলন্ত শিশু পাইয়া নদী হইতে তুলিয়া লইলেন এবং পরমানন্দে নিজ পত্নী রাধার সহিত পুত্র নির্কিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ণের কবচকুণ্ডলগুণ বহু (ধন) দেখিয়া তাঁহার 'বহুবেন' নাম রাখিলেন।

কর্ণ প্রথমে দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন। ধৃষ্টদেব-শিক্ষার সময় হইতে অর্জুনের প্রতি তাঁহার ভ্রমী হয়ে। একদিন রত্নভূমে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষা করেন, তাহাতে অর্জুন অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করার দ্রোণাচার্য্য তাঁহার বিস্তার প্রশংসা করেন। কর্ণের দ্রোণে তাহা সহ্য নহে। রত্নস্থলে সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়া অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "অর্জুন। তুমি যাঁহা দেখাইলে, আমিও সকলকে দেখাইতে পারি, তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিও না।" এই বলিয়া সর্বসমক্ষে অর্জুনের মত অলৌকিকী ধৃষ্টদেবের পরিচয় দিলেন। তখন দ্রুপদাধন কর্ণের কার্য্য-প্রণালী দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিলেন এবং তাঁহার মান বাড়াইবার জন্ত তাঁহাকে অপরাজয় প্রদান করিলেন।

কর্ণ প্রায় সর্বদাই দ্রুপদাধনের কাছে থাকিতেন। তাঁহাকে পাইয়া দ্রুপদাধনের পাণ্ডবভয় অনেকটা দূর হইল।

একদিন কর্ণ দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন, "গুরো! আমাকে অঙ্গগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মজ্ঞ দান করুন। আপনায় নিকট আশাহুরূপ প্রায় সকল অস্ত্রই প্রাপ্ত হইয়াছি, বাকি কেবল ব্রাহ্মজ্ঞ। ইহা দান করিয়া আমার মনোহামনা পূর্ণ করুন।" দ্রোণ জানিতেন যে, কর্ণ বড় অর্জুনদেবী। সেই নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, "যে নিত্য শুদ্ধব্রতাচারী ব্রাহ্মণ অথবা যে তপঃস্বাধ্যায়নিরত ক্ষত্রিয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মজ্ঞের উপযুক্ত। সেইজন্যই তুমি ব্রাহ্মজ্ঞ পাইতে পার না।"

তখন কর্ণ ব্রাহ্মজ্ঞ লাভ করিবার জন্ত মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করিলেন, এখানে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া পরশুরামের নিকট নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার অতিপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি সমুদ্রতীরে আসিয়া শরক্লীড়া করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহার শর-প্রহারে কোন ব্রাহ্মণের হোমধেয় পঞ্চক প্রাপ্ত হয়। কর্ণ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া অনেক অশ্রু নয় বিনয় করিলেন এবং তিনি না জানিয়া দোষ করিয়াছেন, তজ্জন্ত ক্ষমা চাহিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, "তুমি যাহার জন্ত এত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, যাহাকে পরাজয় করিবার জন্ত সর্বদাই চেষ্টা করিতেছ; তাহারই হস্তে তোমার

মৃত্যু হইবে।” কর্ণ ক্ষুব্ধ মনে আজ্ঞা দিয়া আসিলেন। কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তিনি পরশুরামের নিকট হইতে ব্রাহ্মাঙ্গ লাভ করিলেন।

একদিন পরশুরাম তাঁহার উত্তর উপর মাথা রাখিয়া নিজা ঘান। সেই সময়ে অলঙ্কারাভূষিত অষ্টপাদ কীট আসিয়া কর্ণের উরুদেশের একদিক ভেদ করিয়া অপরপারে বাহির হয়। কর্ণ গুরুতর নিদ্রাভঙ্গ হইবে ভাবিয়া সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ করিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই দারুণ দংশনে উরু বিদীর্ণ হইয়া রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। গাত্রে রক্ত লাগিবামাত্র পরশুরাম জাগরিত হইলেন, তিনি চক্ষু উদ্বীলন করিবামাত্র কীট মরিয়া গেল। তখন তিনি কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! তুমি এ অসহ্য কীট দংশন কিরূপে সহ করিলে? ব্রাহ্মণশরীরে কখনই এরূপ সহ হয় না। অতএব শীঘ্র সত্য করিয়া বল, তুমি কে।”

কর্ণ অবনত হইয়া বিনীতভাবে উত্তর করিলেন “গুরো! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি মিথ্যাবাদী হইয়া আপনাদের নিকট বড়ই অপরাধ করিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ নই, সামান্য সূতপুত্র। সূতকন্তা রাধা আমার মা, আমার নাম কর্ণ।” তখন পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “দেখ কর্ণ! তুমি ব্রাহ্মাঙ্গ পাইবার জন্য আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছ, এই জন্য যুদ্ধকালে ঐ অস্ত্র তোমার মনে পড়িবে না। এখন শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।”

কর্ণ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে দুর্যোধনের সহিত কলিঙ্গ-রাজ্যে গমন করেন। এখানে কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদকন্তার স্বয়ম্বর। স্বয়ম্বর সভায় দুর্যোধন কুরুবীরগণের সাহায্যে রাজকন্তাকে হরণ করিলেন। তৎকালে কর্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জরাসন্ধ তাহার বীরত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মালিনী-নগরী প্রদান করেন। এইবার কর্ণের বিবাহ হইল, তাঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী।

তিনি পাণ্ডবগণকে মারিবার জন্য সর্বদাই দুর্যোধনকে কুপারামর্শ দিতেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ভীষ্ম কর্ণের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া যখন তখন তাঁহার নিন্দা করিতেন। তাহা কর্ণের পক্ষে অসহ্য বোধ হইত। তিনি ষোড়ষাত্মার দুর্যোধনের পর একদিন দুর্যোধনকে বলেন, “মিঞা! আমার একটা কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। ভীষ্ম সর্বদাই আমাদের নিন্দা এবং পাণ্ডবগণের সূচ্যাত্তি করেন। বিশেষতঃ তোমার সমক্ষে সর্বদাই আমার অবজ্ঞা করেন। এখন আমার অহুমতি কর, আমি একাই সমস্ত পৃথিবী জয় করি।”

দুর্যোধনের অহুমতি লইয়া কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি ক্রপদ, ভগদত্ত, এবং বদ্র, কলিঙ্গ, মণ্ডিক, মিথিলা, মগধ, কর্ণধত্ত, অবনীপুর, অহিচ্ছত্র, বৎস, কেরলী, মুত্তিকা-বতী, মোহন, ত্রিপুর, কোশল, কাম্বী, চেদি, অবন্তি, স্নেহ, ভদ্রক, রোহিতক, আগ্রহ, মালব, শশক ও আটবিক প্রভৃতি নানাদেশীয় রাজগণ এবং অপরপার সভ্য ও অসভ্য জাতিকে জয় করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। দুর্যোধনের সপক্ষীয়েরা কর্ণকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে দুর্যোধন বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই সময়ে কর্ণ তাঁহাকে বলেন, “অদ্য হইতে যে বাহা চাহিবে, আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিব। এই আমার প্রতিজ্ঞা। যতদিন না আমি অর্জুনের প্রাণবধ করিতে পারিব, ততদিন এই ব্রত পালন করিব।”

ইতিপূর্বে বুধকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। একদিন ঐকৃষ্ণ কর্ণ কেমন দাতা পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কহিলেন, তোমার পুত্র বুধকেতুর মাংস খাইতে ইচ্ছা করি। কর্ণ তাহাই করিলেন। তাঁহার স্ত্রী বুধকেতুর মাংস রন্ধন করিয়া কৃষ্ণকে খাইতে দিলেন। কৃষ্ণ কর্ণের আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা প্রভাবে বুধকেতুর পুনরায় প্রাণদান করিলেন। এই অলৌকিক দানের জন্য কর্ণ ‘দাতাকর্ণ’ নামে বিখ্যাত হন।

একদিন তিনি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সূর্য্য আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ‘কর্ণ! ইন্দ্র পাণ্ডবগণের হিতসাধনে ব্রাহ্মণবেশে তোমার নিকট কবচ ও কুণ্ডল চাহিতে যাইবেন, অতএব সাবধান! তাঁহাকে উহা দিও না।’ কিন্তু কর্ণ উত্তর করেন যে, প্রাণ গেলেও তিনি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। তখন সূর্য্য তাঁহাকে কুণ্ডলকবচের পরিবর্তে ইন্দ্রের শক্তিঅস্ত্র গ্রহণ করিতে অহুরোধ করিলেন। প্রভাত হইল। ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া কর্ণের নিকট কুণ্ডলধর্য প্রার্থনা করিলেন। কর্ণ বলিলেন, ‘দেবরাজ! আপনাকে আমি চিনিরাছি, আমি কবচ ও কুণ্ডল দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমিও আপনার শক্রমর্দ্দিনী শক্তি প্রার্থনা করি।’ ইন্দ্র তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। শেষে যাইবার সময়ে বলিলেন, ‘কর্ণ! এই শক্তি দ্বারা আমি শত শত শত্রু বিনাশ করিতাম, কিন্তু তোমার হস্তনিক্ষিপ্ত হইলে একটি শত্রু বিনাশ করিয়া আমার নিকট গমন করিবে।’

এ দিকে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস ফুরাইয়া আসিল।

তাহারা পাকালরাজের পুরোহিতকে সন্ধির জ্ঞাত হুতরাষ্ট্রের নিকট পাঠাইলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের কুণল সংবাদ লইয়া কহিলেন, 'পাণ্ডবেরা পরম ধার্মিক, তাই যুদ্ধে আত্মীয় কুটুম্বের বিনাশ না করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। বাস্তবিক অর্জুনের জ্ঞায় বোদ্ধা আর নাই। কোরবপক্ষে এমন কোন বীর নাই যে, তাহার সম্মুখীন হইতে পারে।' এই কয়টা কথা কর্ণের অসহ্য হইল, তিনি ভীষ্মের অনেক নিন্দা করিলেন। শেষে কর্ণও শকুনির পরামর্শে সন্ধি রহিত হইল।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে প্রথমে ভীষ্ম কোরবসেনাপতি হইলেন। তৎকালে তিনি আপন সেনাগণের সুবন্দোবস্ত করিয়া দূর্য্যোধনকে বলেন, 'দেখ দূর্য্যোধন! কর্ণ নীচ জাতি এবং ক্ষুদ্র প্রকৃতি, পরশুরামের নিকট অভিসপ্ত, আপন কবচ ও কুণ্ডলভ্রষ্ট হইয়াছে। এরূপ সামান্য ব্যক্তিকে অর্দ্ধরথী বিবেচনা করাই উচিত।' এই কথা শুনিয়া কর্ণের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সেইদিন প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যতদিন ভীষ্ম জীবিত থাকিবে, ততদিন কখনই আমি যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না।' এই বলিয়া রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিলেন।

দশদিন যুদ্ধের পর কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায়া শায়িত হইলেন। কর্ণ একদিন রাত্রিকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, 'আপনি সর্গদাই বাহার নিন্দা করিতেন, আমি সেই কর্ণ।' ভীষ্ম চক্ষু মেলিয়া রক্ষিদিগকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, পরে সম্মুখে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'কর্ণ! আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শুনিয়াছি, তুমি কুন্তীর পুত্র। তুমি পাণ্ডবগণের ষেষ করিবে বলিয়াই আমি তোমাকে কটু কথা বলিতাম। বাস্তবিক তোমার জ্ঞান দাতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠাপর আর দ্বিতীয় নাই। তোমার প্রতি আমার যে পূর্নভাব ছিল, তাহা দূর হইয়াছে। এখন যদি তুমি আমার কথা শোন, তবে আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার আপন সহোদর পাণ্ডবগণের সহায়তা কর।' ভীষ্ম

ভীষ্ম কর্ণ উত্তর করিলেন, 'যখন আপনি বলিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি কুন্তীর পুত্র। পিতামহ! এতদিন বাহার ঐশ্বর্য্য আমি প্রতিপালিত হইয়াছি, বাহাকে একবার আখ্যাস প্রদান করিয়াছি, কেমন করিয়া সেই প্রিয়বন্ধু দূর্য্যোধনের প্রতিকূলচরণ করি; বরং প্রাণ যায়, তাহাও শ্রেয়, তবু প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।' ভীষ্ম কহিলেন, 'তবে স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর। কখন কুটুম্ব করিও না।' ভীষ্মের পর জ্ঞোষাচার্য্য কোরবপক্ষে সেনাপতি হইলেন। কর্ণ তাহার অধীনে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে

তিনি বালক অভিমমু্যকে কুটুম্বকে বিনাশ করিবার পরামর্শ দেন এবং এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

কর্ণের বড় আশা ছিল, যে একাদ্রী শক্তি দ্বারা অর্জুনকে বধ করিবেন, কিন্তু তাহার মনের আশা মনেই রহিল। যখন ভীমদমন ঘটোৎকচ কুরুসৈন্যদলনে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ণের সম্মুখীন হন, তখন তিনি আত্মরক্ষা করিবার জ্ঞাত সেই একাদ্রী শক্তি নিক্ষেপ করিয়া ঘটোৎকচকে নিপাত করিলেন। দ্রোণ নিহত হইলে কর্ণ কুরুসৈন্যের সেনাপতি হইলেন। তাহার সারথি হইলেন শল্য। যথাসময়ে মহাবীর কর্ণ সৈন্যে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার যুদ্ধনীতি ও বীরত্ব দর্শনে কোরব পক্ষে আনন্দধ্বনি এবং পাণ্ডবপক্ষে হাহাকারধ্বনি উঠিল। কিন্তু কর্ণের সারথি শল্য তাহার প্রতি বিমুখ। কর্ণ 'অর্জুনকে বিনাশ করিব' বলিয়া যতই আশঙ্কান করেন, শল্য তাহার প্রতিবাদ করিয়া অর্জুনের প্রশংসা এবং তাহার নিন্দা করিতে থাকেন। যাহা হউক, তিনি নিজ বাহুবলে ৭৭ প্রভঙ্গক, ২৫ পাঞ্চাল, ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূর-সেন প্রভৃতি মহাবীর এবং চেনি ও অপরায় স্থানের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করেন। এমন কি অর্জুন ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে পরাস্ত করেন। তিনি কুন্তীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে অর্জুন ব্যতীত অপর কোন পাণ্ডবের প্রাণবধ করিবেন না, তাই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ পরাস্ত হইলেও প্রাণ হারান নাই।

শেষে অর্জুনের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে অর্জুনহস্তে তিনি অন্তিমশয্যা শয়ন করেন। (মহাভারত)

তাঁহার প্রথম নাম বল্লভেন, পালকপিতা স্তত তাঁহার এই নাম রাখিয়াছিলেন। পরে পৃথক পৃথক কার্য্যানুসারে কর্ণ, বৈকর্জন, অর্কনন্দন, অঙ্গরাজ, অঙ্গেশ্বর, চাম্পোশ, চম্পাধিপ, অঙ্গাধিপ ও ঘটোৎকচাস্তক প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতিপালক পিতা ও পালিকা মাতার পরিচয়ানুসারে লোকে তাঁহাকে স্ততপুত্র রাধেয়, রাধাপুত্র, প্রভৃতি বলিয়াও সম্বোধন করিত। ৩ হুতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত আদি। ১১৭। ৩।) ৪ নোকার দাঁড়। ৫ সুবর্ণাল বৃক্ষ। ৬ চারি হাত বাহ ও তিনহাত কোটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। ৭ কুটিল। ৮ (কর্ণঃ প্রাশস্তোয় অন্ত্যস্ত, কর্ণ-অচ্ অর্শাদিহাৎ) দীর্ঘকর্ণ, লঘুকর্ণ। (কৃষ্ণ যজুঃ ২। ৪। ৪০।)

কর্ণ। মেবারের একজন রাণা। ইনি রাজপুত বীরকেশরী প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠপৌত্র। পিতৃনিদেশে এবং বিধব্রী কবল

হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্ত অনেকবার মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এ সময়ে মেবারের নিত্যন্ত হীন অবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া মেবারের রাজকোষ শূন্য, মেবারের প্রধান প্রধান বীরগণ রণশয্যা চিরনিদ্রিত। এরূপ অবস্থায় রাজপুতবীর আর কতদিন মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পারেন? এমন কি রাজকোষ শূন্য হওয়ার, কর্ণ জয়টনগর লুণ্ঠন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৬১৩ খৃঃ অব্দে মহাবীর কর্ণ জাহাঙ্গীর পুত্র খুস্ম (শাহজাহান)-হস্তে পরাজিত হইলেন। এতদিন পরে আজ মেবারের রাণা অমরমোগলসম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধি হইলে কর্ণ খুস্মের সহিত আজমীরে আসিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাদশাহ যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া কর্ণকে আপন দক্ষিণপার্শ্বে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। এই সময়ে প্রতিদিন বাদশাহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন এবং বহুল্য খেলাত ও বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রী প্রদান করিয়া সর্বদাই তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিতেন। জাহাঙ্গীর আপন জীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন—

“মাতৃভূমির প্রাকৃতিক অবস্থানস্বারে কর্ণ স্নেহসেব্য দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করিতে জানিতেন না। তিনি অতিশয় লাজুক, অতি অল্পভাষী এবং আমাদের সহিত অল্পই মিশিতে চাহিতেন। আমাদের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্ত প্রতিদিন সামান্যবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতাম। আমি একদিন তাঁহাকে জুরজিহানের নিকট লইয়া যাইলাম। মহিষী তাঁহাকে হস্তী, অশ্ব, তরবারি প্রভৃতি নানাপ্রকার খেলাত পারিতোষিক প্রদান করিলেন।”

বাস্তবিক জাহাঙ্গীর কর্ণের সহিত বিজ্ঞতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন না, বাহাতে তিনি আপন সম্রাট কিছুনা লাভবান না করেন, তৎপক্ষে জাহাঙ্গীর সর্বদাই চেষ্টা করিলেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে মেবারের শেষ স্বাধীন রাজা মহারাণা অমর-সিংহ জ্যোত্স্ন কর্ণকে সিংহাসন প্রদান করেন।

কর্ণ রাণা হইলে মেবারে শাস্তির রাজত্ব হইল। মোগল আক্রমণে মেবারের যে যে অংশ ভগ্ন ও নষ্ট হইয়াছিল, তিনি তাহার পুনঃসংস্কার করিলেন। আপন রাজধানীর চতুঃপার্শ্ব প্রাকারগুলি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পেশোয়ার জলরোধক বাধাট পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। তিনি ১৬২৮ খৃঃ অব্দে (১৬৮৪ সম্বতে) প্রিয়পুত্র জগৎসিংহের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

কর্ণওয়ালিস্। লর্ড কর্ণওয়ালিস, যিনি ভারতের গভর্ণর-

জেনারেল ছিলেন, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শ ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। ইহার নাম চার্লস কর্ণওয়ালিস। ইনিই কর্ণওয়ালিস্ প্রদেশের দ্বিতীয় আরল্ ও প্রথম মার্কুইন্স। পিতা বর্ডমানে ইনি লর্ড ক্রস নামে পরিচিত ছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার পিতার মৃত্যু হইলে, ইনি পিতৃপদের অধিকারী হইয়া ইংলণ্ডের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। শাসনকার্যে ইহার সর্বতোমুখী ক্ষমতা ও স্বাধীন মত প্রদান করিবার শক্তি ছিল। এই সময়ে আমেরিকাবাসীরা স্বাধীনতার জন্ত যে যুদ্ধ করে, তাহাতে লর্ড কর্ণওয়ালিস অতি উৎসাহ ও বিশেষ দক্ষতার সহিত নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, কামডেন, পয়েন্ট কমফর্ট (স্বপ্ন অন্তরীপ) প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে জয়লাভ করেন; কিন্তু ইয়র্ক নদীতীরে ইয়র্ক নগরের যুদ্ধে ফরাসী ও আমেরিকাবাসী দ্বারা একবারে আক্রান্ত হওয়ায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রুহস্তে সমলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন (১৭৮১ খৃঃ)। ইহার পরাজয়েই ইংরাজদিগের হার হইল। ইংরাজেরা ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিয়া ইহাদের উদ্ধার সাধন করেন। রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই পরাজয়ের জন্ত বিশেষ তিরস্কৃত হন নাই।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিরূচিত হইলেন এবং ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় উপনীত হন। ইনি শাস্তসভাব, গভীরবুদ্ধি, স্মৃতিচারণ, ক্ষম, লোকপ্রিয়, মহানুভব ও লোকহিতৈষী ছিলেন। যে সময়ে তিনি ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তৎকালে ভারতে যুদ্ধবিগ্রহাদি কিছু ছিল না; কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালের দুর্নীতিতে দেশ ছাইয়া পড়িয়াছিল। অত্যাচার অবিচারে আপামর সাধারণে পর্য্যদস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং অনেকানেক দেশীয় রাজা বিধ্বস্ত হইয়াছিল; সূতরাং এরূপ অবস্থায় লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আসিয়া স্বীয় স্বভাব-গুণে নানা ভিত্তিকর কার্যের অর্থচর্চা করিয়া ভারতীয় প্রজাগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এ সময়ে বড় বড় ইংরাজ কর্মচারীরা ও সৈনিকেরা এদেশীয় লোকের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন, দেশীয় রাজগণের নিকট উপঢৌকন লইতেন। সৈনিকেরা নানাবিধ উপায়ে পুরস্কার গ্রহণ করিত, শাস্তিরক্ষার জন্ত কতকগুলি সৈন্য বুঝা নিযুক্ত করা হইত। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই সকল কুপ্রথা নিবারণ করেন। ইনি কি দৈনিক কি অল্পবিধ কর্মচারী সকলের জন্যই মাহিনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

অযোধ্যার উজীরের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি অন্যায ও অসঙ্গত নিয়ম আছে দেখিয়া, লর্ড কর্ণ-

ওয়ালিস্ পুনর্বার সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, সীমান্ত প্রদেশের সৈন্তের খরচের জন্য উজীরকে প্রতি বৎসর ৭৪ লক্ষের পরিবর্তে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। এতদ্বিধি অন্য যে সকল বাবতে তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় হইত, সে সমস্ত বন্ধ করিয়া দেন। উজীর তাঁহার নিজ রাজ্যে স্বাধীন ভাবে শাসনকার্য্য করিতে ক্ষমতা পাইলেন।

ইতিপূর্বে হায়দরাবাদরাজ্যে নিজামের সহিত এই চুক্তি হইয়াছিল যে, গণ্টুর সরকার ইংরাজের অধীনস্থ হইবে। কিন্তু অদ্যাপি তাহাতে অধিকার না দেওয়ায়, ১৭৮৮ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কাপ্তেন কনওয়েকে দূতস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু নিজাম তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ শেষে যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নিজাম তখন শাস্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং টিপু সুলতানের গ্রাস হইতে নিজের কতকগুলি রাজ্য উদ্ধার করিয়া লইবার জন্য ইংরাজের সাহায্য চাহিলেন। তৎপরে নিজাম টিপুকেও ভয় দেখাইবার জন্য একখানি কোরাণ পাঠাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, প্রভুতবিক্রম ইংরাজের সহিত বিবাদে আবশ্যক নাই, যখন আমরা উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী, তখন আমাদের পরস্পরের বিবাদ মিটাইবার জন্য অপরের মধ্যস্থতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। টিপু উত্তরে বলিলেন যে, যদি নিজামকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে তিনি নিজামের অমুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। নিজাম তাহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং উভয়ের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। মহলৌপস্তনের সন্ধির নিয়মামুসারে ইংরাজ নিজামের পক্ষে টিপুর সহিত যুদ্ধে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। টিপুর সহিত বিবাদের আরও একটি কারণ ছিল। মাদ্রাগোর সন্ধিপত্রা-মুসারে ত্রিবাঙ্কড় ইংরাজের রক্ষিত রাজ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। এই ত্রিবাঙ্কড়ের রাজা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে করজানোর ও আরকোট নামক দুইটি নগর ক্রয় করেন। টিপু এই ক্রয় অস্বীকার করিয়া কোচিনরাজ্যের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক নগর দুইটি অধিকার করিবার জন্ত ত্রিবাঙ্কড় আক্রমণ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ত্রিবাঙ্কড়ের সাহায্যার্থ বন্ধপরিকর হইলেন।

যুদ্ধ বাধিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জেনারেল আবার একটি উপকূলস্থ কাননের প্রদেশ অধিকার করিলেন। প্রথম মহিষ্মরযুদ্ধ ইহাতেই শেষ হয়। দ্বিতীয়বারে (১৭৯১ খৃঃ) লর্ড কর্ণওয়ালিস্ নিজে সেনাপতি হইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। এ যুদ্ধে টিপুর হার হয়। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ধান্য অভাবে সম্পূর্ণ জয়লাভ না করিয়া সটেন্ডে ফিরিতে বাধ্য হন। শেষে

মার্কটাদিগের সাহায্যে আবার যুদ্ধ বাধে। এবার টিপু সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

মহিষ্মরে কৃতকার্য্য হইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ শাসনবিধি সংস্থারে মনোযোগী হইলেন। এসময়ে কর আদায়ের বন্দোবস্ত বড় বিশৃঙ্খল ছিল। অকবর জরীপ করিয়া যে জমীর বেরূপ কর ধার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন একাল পর্য্যন্ত সেই করই চলিয়া আসিতেছিল। বাহারা কর আদায় করিত, তাহারা বংশানুক্রমে সেই কার্য্য করিয়া নানাপ্রকার অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই সকল বিষয়ের অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তালুকদারদিগের সহিত একটি বন্দোবস্তের নিয়ম করিলেন। এই নিয়মটি দশসালা বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। অবশেষে এই নিয়মে জমীদারগণের অমুবিধা দেখিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ জমীদারদিগকে চিরদিনের জন্ত ভূস্বামিত্ব দিয়া ইংরাজ গভর্নমেন্টের সহিত একটা করের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে খ্যাত, ১৭৯৩ সালের ২২এ মার্চ তারিখে এই বন্দোবস্ত হয়।

পূর্বে যিনি বিচারক, তিনিই তহসীলদার বা কালেক্টর ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই দুই কার্য্যে দুইটি স্বতন্ত্র লোকের ব্যবস্থা করেন। জেলার জেলার দেওয়ানী আদালত ইহারই সৃষ্টি। এই সকল আদালতের আপীল শুনিবার জন্ত চারিটি আপীল আদালত স্থাপিত করেন এবং এই আপীল আদালতের বিচারগুলির মীমাংসা করিবার ভার কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের উপর অর্পিত হয়। এই সময়ে নিজামত আদালতের নিয়মাদি অনেক পরিবর্তিত হয়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ স্বদেশ যাত্রা করেন। সার জন সোর (যিনি দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথা স্থির করেন) ইহার পর ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করেন।

দেশে গিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহাসম্মানলাভ করেন এবং মার্কুইস উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি আরলওয়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। সেখানেও শাস্তভাবে বিদ্রোহাদি দমনপূর্ব্বক লোক-প্রিয় হইয়াছিলেন। ১৮০১ সালে ক্রায়ে রাজপুত হইয়া গমন করেন এবং ইহারই মধ্যস্থতায় এসিজ সন্ধি স্থাপিত হয়।

১৮০৫ খৃঃ অব্দে, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আবার ভারতের প্রতি-নিধি হইয়া আসেন। এখানে আগষ্ট মাসে পৌছিয়াই একদল সৈন্তের অধিনায়ক হইয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গমন করেন এবং অক্টোবর মাসে গাজীপুরে পৌছিয়া পীড়িত হন ও ৬ই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। গাজীপুরে এখনও ইহার কবর আছে।

কর্ণক (পুং) কর্ণগতি বিভিন্ন জাতিতে, কর্ণ-পুং। ১ বৃক্ষাদির শাখাপত্রাদি। ২ বৃক্ষাদির রোগবিশেষ। ৩ (ত্রি) শিকক। ৪ কর্ণধার।

কর্ণকণ্ডু (পুং) কর্ণজ কর্ণজাতো বা কণ্ডুঃ। কর্ণরোগ-বিশেষ। কক ও বায়ু কর্ণ আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। ককনাশক বিধিসমূহই এই রোগের প্রধান ঔষধ।

কর্ণকীটা (স্ত্রী) কর্ণগতঃ কর্ণজ ভেদকঃ কীটঃ মধ্যলো-কর্ণকীট-টাণ্। কাণকোটারি।

(কর্ণজলোকাত্ত কর্ণকীটা শতপদী চ সা। হেম ৪। ২৭৮)

কর্ণকীটা (স্ত্রী) কর্ণে স্থিতা কর্ণজ ভেদিকা কীটা কীটবিশেষঃ, মধ্যলো-কৃদ্রার্থে ভীষ্। কাণকোটারি, কেবলই। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কর্ণজলোকা, শতপদী, চিত্রাজী, পৃথিকা ও কর্ণহ্রুতি।

কর্ণকুজ (স্ত্রী) নগরবিশেষ, কক্কুজ। বর্তমান গুজরাট প্রদেশস্থ জুনাগড়ের পৌরাণিক নাম। [কক্কুজ দেখ।]

কর্ণকুহর (স্ত্রী) কর্ণগতঃ কুহরঃ, মধ্যলো-। কাণের ছিদ্র।

কর্ণকূপকণ্ডসেক (পুং) জীষবিশেষ, শামুকাদি। ইহারাজল মধ্যে কাণকুয়া দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে। (Branchifera.)

কর্ণকুমি (পুং) কর্ণগতঃ সন্ কর্ণভেদকঃ কুমিঃ, মধ্যলো-। কাণকোটারি।

কর্ণক্লেড় (পুং) কর্ণজ কর্ণজাতো বা ক্লেড়ঃ। কর্ণরোগ-বিশেষ। এই রোগে কর্ণ মধ্যে বেগুন্ন শব্দের জ্ঞায় শব্দ হয়। থাকে ; ইহা ত্রিদোষজ। কর্ণমধ্যে সর্বপ তৈল পূরণ করিলে এই রোগ বিনষ্ট হয়। থাকে।

কর্ণখরিক (পুং) বৈশজাতি। [বৈশ দেখ।]

কর্ণগ (পুং) কর্ণে গচ্ছতি, কর্ণ-গম-ড। ১ শব্দ। ২ (ত্রি) কর্ণ-স্থিত। ৩ আকর্ণ।

কর্ণগড়। বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভাগলপুরের নিকটস্থ একটি পার্বত্যভূমি। অক্ষা° ২৫° ১৪' ৪৫" উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ৫৮' ৩০" পূঃ।

দেশাবলী ও ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে এই স্থান কর্ণধূর্ণনামে উক্ত হইয়াছে।

দেশাবলী পাঠে জানা যায়—পূর্বে এখানে ব্রাহ্মণভূমির রাজধানী ছিল। ১৬৭৮ (সম্রতে) এখানে সভাসিংহ রাজত্ব করিতেন। তিনি রাজ্য কীর্তিচক্রে কর্তৃক বিনষ্ট হন। সভাসিংহের পর হেমন্তসিংহ এখানে রাজত্ব করেন। এই কর্ণগড়ের অর্ধকোশ পূর্বে শিলাবতী নদী প্রবাহিত। ইহার ১। কোশ পশ্চিমে বিশালাকী নামী মহামারীর মন্দির আছে। (বিক্রমসাগরোক্ত দেশাবলীবিবৃতি)।

পূর্বে এখানে পাহাড়িরাগিরের বড় উৎপাত হইত। সেইজন্য ১৭৮০ খৃঃ অঃ, ভাগলপুর জেলার তহসীলদার ক্রেড-ল্যাণ্ড সাহেব এখানে একদল দেলীয় সৈন্ত স্থাপন করেন।

এখানকার শিবমন্দির বিখ্যাত। সর্বশুদ্ধ চারিটি শৈব-মঠ আছে। তন্মধ্যে একটিতে এক বৃহদাকার শিবলিঙ্গ আছে। সেই শিবমন্দির প্রায় ৫। ৬ শত বর্ষের প্রাচীন। এখানকার অধিবাসীরা সকলে শৈব না হইলেও কাস্তিকসংক্রান্তির দিবসে সকলে শিবের পূজা দিয়া থাকেন।

প্রবাদ এইরূপ এই স্থানে কুন্তীপুত্র কর্ণ রাজত্ব করিতেন। তিনি এখানে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে এই স্থানের কর্ণধূর্ণ বা কর্ণগড় নাম হইয়াছে। প্রাচীন ইষ্টক-নির্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ নানাস্থানে পড়িয়া আছে।

কর্ণগুথ (স্ত্রী) কর্ণজ কর্ণজাতং বা গুথম্। কর্ণমল, কাণের ঠেঁল।

কর্ণগুথক (পুং) কর্ণ-গুথ-সংজ্ঞায়াং কন্। কর্ণরোগবিশেষ। কর্ণকুহরে প্রায় পিত্তগত্যাগে গুল হইলে কর্ণগুথক নামক রোগ বা অধিক ঠেঁল উৎপন্ন হয়। (হৃশ্ণতঃ) তৈল ও ঘেদ প্রয়োগের দ্বারা কতকটা দ্রব করিয়া শলাকা দ্বারা বাহির করিয়া ফেলিবে। (চক্রপাণি)।

কর্ণগৃহীত (ত্রি) কর্ণেণ গৃহীতঃ ৩তৎ। ১ ক্রত। ২ কর্ণকর্ষক ধৃত।

কর্ণগোচর (ত্রি) কর্ণজ গোচরঃ বিষয়ীভূতঃ, ৩তৎ। কর্ণের বিষয়ীভূত, যাহা শোনা হইয়াছে।

কর্ণগ্রাম। ১ ভাগীরথীতীরবর্তী বঙ্গের একটি গ্রাম। (ভং ব্রহ্মখণ্ড ৭। ৩৪) ২ মেঘনাদবীর পূর্বকুলস্থিত একটি বৃহদগ্রাম। (ঐ ১৫। ৪।)

কর্ণগ্রাহ (পুং) কর্ণমরিৎ গ্রাহতি, কর্ণ-গ্রহ-অণ্। কর্ণধার, মান্নি।

কর্ণছিদ্র (স্ত্রী) কর্ণজ ছিদ্রঃ, ৩তৎ। কর্ণদ্ব, কাণের ছিদ্র।

কর্ণজলুকা (স্ত্রী) কর্ণজ কর্ণে বা জলুকা ইব, উপমি°। কর্ণ-কীটা, কাণকোটারি।

কর্ণজলোকা (স্ত্রী) কর্ণে জলোকৈব। কাণকোটারি।

কর্ণজলোকাঃ [স্] (স্ত্রী) কর্ণে জলোকা ইব, উপমি°। কাণকোটারি।

কর্ণজাহ (স্ত্রী) কর্ণজ মূলম্, ৩তৎ। কর্ণ-জাহচ্ (তত্ত পাঠ-মূলে পীষাদি কর্ণাদিভাঃ কৃণজাহটৌ। পা ৫। ২। ২৪।) কর্ণমূল। কর্ণজিৎ (পুং) কর্ণং জিতবান্, কর্ণ-জি-কিপ্। অর্জুন। (বৃহদ্রটৌ শুড়াকেশঃ হুত্রেঃ কপিধ্বজঃ। বীড়হুঃ কর্ণ-জিৎ। হেম ৩। ৩৭৩।)

কর্ণভাল (পুং) কর্ণে ভাঃ ভাডনা, ৭তৎ। কর্ণভাডনা।

কর্ণতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। (বৃহদ্রটৌ।)

কর্ণদর্পণ (পুং) কর্ণে দর্পণ ইব, উপনিঃ। ভাটক নামক কর্ণভূষণ বিশেষ; কাণতড়কা।

কর্ণদুন্দুভি (স্ত্রী) কর্ণে কর্ণাভ্যন্তরে দুন্দুভিরিব ততুল্য কনিজনকথাং। কর্ণকীটী, কাণকোটোরি।

কর্ণদেব (পুং) চৌলুক্যরাজবিশেষ। ইনি অনহিলবাড়ের রাজা ভীমদেবের পুত্র। রাজ্যকাল ১১২০—১১৫০ সন্থৎ। ইহার পুত্রের নাম জয়সিংহ সিদ্ধরাজ। এই বংশে আর একজন কর্ণদেবের নাম পাওয়া যায়। তিনি সারঙ্গদেবের পুত্র, ১০৫৩ হইতে ১০৬০ সন্থৎ পর্য্যন্ত শুঙ্গরাজ্যে অনহিলবাড়ের রাজত্ব করেন।

কর্ণধার (পুং) কর্ণং অরিজং ধারয়তি কর্ণ-ধৃ-অণ্, প্যস্তাৎ অচ্। ১। নাবিক, মাঝি। ২ (ত্রি) দ্বুঃখাদির নিবারক।

(“অকর্ণধারা পৃথিবী শূন্তেব প্রতিভাতিকৈ।

গতে দশরথে স্বর্ণং রামে চানন্যমাপ্রিতে ॥”

রামায়ণ ২। ৮৮। ১৭।)

কর্ণধারিণী (স্ত্রী) কর্ণং অন্তর্জীবগণেকরা বিপুলং ধরতি, কর্ণ-ধৃ-গিনি ভীষ্। হস্তিনী।

কর্ণনাদ (পুং) অমূলপিহিতকর্ণে নাদঃ; ধ্বনিতোদঃ। কর্ণ-রোগবিশেষ; এইরোগে বায়ু শব্দবাহী শিরাসমূহে প্রবেশ করিয়া কর্ণমধ্যে নানাশ্রকার শব্দ উৎপাদন করে।

সর্বপতৈলের দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে অথবা অপমার্গ গোড়াইয়া সেই কারজল এবং অগম্যার্গের ককের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাদ আরোগ্য হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণনাসা (স্ত্রী) কাণ ও নাক।

কর্ণন্দু (স্ত্রী) কাণের মাকড়ি।

কর্ণপত্রক (পুং) কর্ণে পত্রমিব কাস্ততি শোভতে, কর্ণ-পত্র-কৈ-ক। কর্ণপালী, কাণের পাতা।

কর্ণপথ (পুং) কর্ণ এব পথঃ-অচ্। কাণের হিত্র, ইহাই শব্দ প্রবেশের পথ।

কর্ণপরম্পরা (স্ত্রী) কর্ণানাং পরম্পরা, ৩তৎ। কাণাকাশি, একজনের কাণ হইতে অন্তের কাণে, আবার তাহার কাণ হইতে অপরের কাণে এইরূপে ক্রমশঃ বিস্তৃতি।

কর্ণপরাক্রম (পুং) অপজঃশবোগ্য বিবিধ ছন্দোযুক্ত কাব্য-বিশেষ।

কর্ণপর্ব্ব (স্ত্রী) মহাভারতের অষ্টমপর্ব্ব; কর্ণের সেনাপতিত্ব গ্রহণের পর যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, এই পর্ব্বের তাহাই বর্ণিত আছে।

কর্ণপাক (পুং) কর্ণরোগবিশেষ; কর্ণমধ্যে ক্ষত, অভিস্রাব,

কোড়া বা বাতাদি ভিন্ন দোষ জুপিত হইলে কর্ণ হইতে রক্ত বা পীত বর্ণ প্রাব নির্গত হয় এবং কর্ণ মধ্য অন্তিমের উষ্ণ ও দাহযুক্ত হইয়া থাকে; ইহাকেই কর্ণপাক রোগ কহিয়া থাকে। (ছত্রতঃ) মালতী গুজের রস অথবা গোমুত্র বধুর সহিত কর্ণে পূরণ করিলে কাণপাক রোগ বিনষ্ট হয়। হরিতাল ও গোমুত্র একত্র করিয়া অথবা জাম ও আমের নুতনগাতা, কদ্বেশ ও কাপাসের বীজ সমভাগে গাইরা হেঁচিয়া রস বাহির করিবে, ঐ রসের কর্ণপূরণ করিলে কাণ পাকা নিবারণ হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণপালি (স্ত্রী) কর্ণং পালয়তি শোভয়তি কর্ণপাল-ইন্। কাণের পাতা। (Lobe)

কর্ণপালী (স্ত্রী) কর্ণং পালয়তি শোভয়তি, কর্ণ-পাল-অণ্-ভীষ্। ১ কাণের পাতা। ২ কাণবালা নামক কর্ণভূষণ।

কর্ণপাল (দেশজ) কাণের গহনাবিশেষ।

কর্ণশিলাচী (স্ত্রী) কর্ণং স্বরূপং শিনষ্টি, কর্ণ-শিশ্-কিপ্, কর্ণপিটু আচয়তি নাশয়তি স্বরূপদর্শনেন, কর্ণপিটু-আ-চি-শিচ্-অচ্-ভীষ্। দেবীবিশেষ। এই দেবীর ধ্যান,—

“কৃষ্ণাং রক্তবিলোচনাং ত্রিনয়নাং ধ্বংসক লম্বোদরীং,

বন্ধু কারুণজিহ্বিকাং বরবরাভীষুক্করামুদুখীম্।

ধূম্রার্জির্জটীলাং কপালবিলসৎ পাণিধয়াং চকলাং,

সর্বজ্ঞাং শব্দং কৃত্যধিবসতীং পৈশাচিকীং তাং হুমঃ ॥”

কৃষ্ণবর্ণী, রক্তচক্ষু, ত্রিনয়না, ধ্বংসকৃতি, লম্বোদরী, বাঁধুলি ফুলের ছায়া রক্তজিহ্বা, বর ও অভয়দানে দুই কর ব্যাপ্ত, উর্দ্ধমুখী, ধূম্রবর্ণজটীশালিনী, অপর হস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড; চকলা, শব্দদয়বাসিনী ও সর্বজ্ঞা পৈশাচিকীকে নমস্কার করি।

নিশাকালে বা অর্দ্ধরাত্রে ঐ ধ্যানে চিন্তা করিয়া পূজা করিবে এবং দক্ষমন্তের বলি প্রদান করিবে। বলিদানের মন্ত্র,—“ও কর্ণশিলাচি নমস্কারবলিঃ গৃহ গৃহ মম সিদ্ধিং কুরু কুরু বাহা।”

জল প্রোক্ষণের মন্ত্র,—

“রক্তচক্ষুনবন্ধু জবাগুপ্তাদিকং বৎ।

অমৃতং কুরু দেবেশি বাহা।”

পূজার দিন প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জপ করিয়া মধ্যাহ্নে নিরামিষ একবার মাত্র ভোজন করিবে। প্রাতঃকালে যত সংখ্যক জপ করা হয়, সেই সংখ্যক রাজিকালেও জপ করিতে হইবে। তাৎপলাদি ভিন্ন রাজে অস্ত্র কিছু ভোজন করিবে না। অপের দশমাস্ত তর্পণ করিবে। “ও কর্ণশিলাচী তর্পয়ামি হ্রীং বাহা” এইরূপে একলাল পুরস্করণ করিয়া দশাংশ হোম করিবে। অতাবে দশভাগ তর্পণ করিয়া বর প্রার্থনা করিবে।

যজ্ঞের উপর চন্দ্রের দ্বারা মূলবীজ লিখিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়।

আকাশ হইতে ছদ্মাদির দ্বারা শব্দ শুনিতে পাইলে এবং

দীর্ঘ অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলে কার্যসিদ্ধি হইবে বুঝিতে হয়।

কর্ণপুট (কৌ) কর্ণত পুটং, ৬তং। কাণের ছিদ্র।

কর্ণপুত্র (কৌ) কর্ণত পুত্রং, ৬তং। কর্ণের রাজধানী, চম্পানগরী।

কর্ণপুত্রী (কৌ) কর্ণত পুত্রী, ৬তং। চম্পানগরী।

কর্ণপুষ্প (পুং) কর্ণবৎ কর্ণাকারং পুষ্পং যন্ত, কর্ণভূষণযোগ্যং পুষ্পং বা যন্ত, বহুব্রী। মোরট লতা।

কর্ণপুন্ন (কৌ) কর্ণত পুং পুন্নং, ৬তং। কর্ণরাজের পুরী, ইহার সংস্কৃত পর্যায়—চম্পা, মালিনী ও লোমপাদপুঃ।

কর্ণপুন্ন (পুং) কর্ণং পুন্নয়তি অলঙ্কারোতি, কর্ণ-পুন্-অণ্। ১ শিরীষগাছ। ২ নীলপদ্ম। ৩ অশোকবৃক্ষ। ৪ কর্ণভূষণ।

(কর্ণপুন্নঃ শিরীষে স্ত্রীমৌলোৎপলাবতঃসরোঃ। মেদিনী।

কর্ণপূরক (পুং) কর্ণং পূরয়তি ভূষয়তি, কর্ণ-পূ-বৃ-ল্। কর্ণপূর স্বার্থে কন্ বা। ১ শিরীষগাছ। ২ নীলপদ্ম। ৩ অশোকগাছ। ৪ কদম্বগাছ। ৫ কাণের গহনা।

কর্ণপূরণ (কৌ) কর্ণত পূরণং, ৬তং। তৈলাদির দ্বারা কাণের ছিদ্র পূর্ণ করা।

কর্ণপ্রদান (পুং) কর্ণে অঙ্গুলিপিত্তকর্ণে প্রদানঃ শব্দ-বিশেষঃ ৭তং। কর্ণনাদ নামক কর্ণরোগবিশেষ।

কর্ণপ্রতিনাহ (পুং) কর্ণে জাতঃ প্রতিনাহঃ রোগবিশেষঃ মধ্যলোম। কর্ণরোগবিশেষ। কাণের খোল জব হইয়া জাগমুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে কর্ণপ্রতিনাহ নামক রোগ উৎপন্ন হয়, এই রোগে মস্তকের অর্দ্ধভাগে বেদনা হইয়া থাকে। (মাধবকর)। কর্ণপ্রতিনাহ রোগে স্নেহ ও শ্বেদ প্রয়োগ করিয়া নস্তাদি গ্রহণ করিতে হয়। (চক্রদত্ত)।

কর্ণপ্রতীনাহ (পুং) কর্ণপ্রতিনাহ রোগ।

কর্ণপ্রায়গ (পুং) গড়বাল জেলাস্থ একটি গ্রাম, পিণ্ডার ও অলকানন্দা নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০° ১৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১৪' ৪০" পূঃ। অতি পূর্বকাল হইতে একটি তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার গঙ্গাসঙ্গমে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। হিমালয়ে বাইবার সময়ে যাত্রীরা এই তীর্থ দর্শন করিয়া যান।

এখানে হিমাচলনন্দিনী শিবসোহাগিনী উমার মন্দির আছে। এখানকার পাণ্ডার বালেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই দেবীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্বে এখানে পিণ্ডার উত্তীর্ণ হইবার কারণ দড়ির ঝোলা ছিল, এখন লৌহের সেতু প্রস্তুত হইয়াছে।

এখানকার একটি মন্দিরে কর্ণের প্রতিমূর্তি আছে। কাহ্নরও মতে, সেই কর্ণের নাম হইতে কর্ণপ্রায়গ নাম হইয়াছে।

কর্ণপ্রায়গ সমুদ্র হইতে ২৫৬০ কিট্ উচ্চ।

কর্ণপ্রাস্ত (পুং) কর্ণত প্রাস্তঃ সীমানদেশঃ, ৬তং। কর্ণের শেষ সীমা।

কর্ণপ্রাবরণ। জনপদ ও সেই জনপদবাসী জাতিবিশেষ।

মহাভারতে এই জনপদ দক্ষিণদেশীর কালমুখ, কোলগিরি, নিবাদ প্রভৃতির সহিত উক্ত হইয়াছে। (সভাপর্ক ৩০ অঃ)।

দেশাবলীর মতে এই জনপদ মালবদেশের পশ্চিমে।

মৎস্তপুরাণে অপর এক কর্ণপ্রাবরণের নাম পাওয়া যায়।

এই জনপদ দিরা পাবনী নদী প্রবাহিত। (মৎস্ত পুং ১২১।৫৮)।

এই স্থান হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়।

এই জনপদটিও অধিবাসীবাচক। পাশ্চাত্য মেগেস্থিনি

ঐহার ভারতপুস্তকে কর্ণপ্রাবরণদিগকে এনোটোকটৈট (Enôtokoitai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

কর্ণফুলী। চট্টগ্রামের একটি নদী। অক্ষা° ২২° ৫৫' উঃ, এবং দ্রাঘি° ৯২° ৪৪' পূর্বে, জয়াজি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণমুখে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর দক্ষিণকূলে চট্টগ্রামনগর ও বন্দর অবস্থিত। এই নদীর প্রধান শাখা ৪টি কাশালং, চিংড়ী, কপতাই ও রজিয়াঙ্ক।

এই নদীর উৎপত্তিস্থানে নীলকণ্ঠ নামক লিঙ্গ আছে।

ব্রহ্মধণ্ডের মতে এই নদীতে স্নান করিলে পুণ্য হয়। (ভ° ব্রহ্মধণ্ড ১৪।৬।)

কর্ণপ্রায় (পুং) দেশবিশেষ। বৃহৎসংহিতার এই দেশ নৈঋত দিকে বলিয়া কথিত আছে। (বৃহৎসংহিতা ১৪।১৮।)

কর্ণফল (পুং) কর্ণঃ ফলমিব যন্ত, বহুব্রী। মৎস্তবিশেষ, কাগলিমাছ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—অজীর্ণ ও শ্লেষ্মাকারক।

কর্ণভূষণ (কৌ) কর্ণং ভূষয়তি, কর্ণ-ভূষ-ল্য। কাণের গহনা।

কর্ণভূষা (কৌ) কর্ণং ভূষয়তি, কর্ণ-ভূষ-অচ-টাপ্। কাণের অলঙ্কার।

কর্ণমূল (কৌ) কর্ণত মূলং, ৬তং। কর্ণজাত ময়লা, ইহার অপর সংস্কৃত নাম কর্ণগুণ।

কর্ণমুকুর (পুং) কর্ণে মুকুরঃ দর্পণ ইব, উপনিঃ। তাড়ক নামক কাণের অলঙ্কার।

কর্ণমদগুর (পুং) মৎস্তবিশেষ। কাগলিমাছ। (Silarus unitus)

কর্ণমূল (কৌ) কর্ণত মূলং, ৬তং। কাণের মূলদেশ।

কর্ণমূলীয় (কৌ) কর্ণত মূল-কর্ণ। কর্ণমূল সম্বন্ধীয়।

কর্ণমোচী (ত্রি) কর্ণং কর্ণোপলক্ষিতং রোগবিশেষঃ মোচিরতি নাশয়তি, কর্ণ-মুট-ইন্-ভীপ্। চানুগুণী দেবী।

(চানুগুণী চরিত্কা চর্যমুণ্ডা মাজ্জার কর্ণিকা।

কর্ণমোচী মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী ॥ হেম ২। ১২০)

কর্ণযোনি (ত্রি) কর্ণঃ যোনিঃ স্থানমন্ত, বহুব্রী। ১ কর্ণ-গ্রাহ বিষয়, শুনিবার বিষয়। ২ কর্ণ হইতে উৎপন্ন।

কর্ণরন্ধ্র (পুং) কর্ণস্ত রন্ধ্রঃ ৬তং। কাণের ছিদ্র।

কর্ণরাজ। শুভরাত্রের অনহিলবাড়ের একজন রাজা। ভীম-রাজের পুত্র। (১০৭৩ খৃঃ অঃ) ভীম স্বর্গারোহণ করিলে কর্ণ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার শাসননীতিগুণে রাজ্যের সামন্ত ও পার্শ্ববর্তী রাজগণ তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন। তিনি কদম্বরাজ অয়কেশীর কন্যা ময়গল্লদেবী (মৈনলদেবীর) রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। প্রথমে তাঁহার পুত্রাদি না হওয়ার লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান করেন। পরে লক্ষ্মীর বরে মৈনলদেবীর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। (১০৯৩ খৃঃ) বৃদ্ধাবস্থায় তিনি আপন পুত্র জয়সিংহকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। (হেমচাট্যাকৃত বৈআচর্যায়।)

কর্ণরোগ (পুং) কর্ণস্ত কর্ণে জাতো বা রোগঃ। যে সকল রোগ কর্ণে উৎপন্ন হয়। কর্ণরোগ ২৮ প্রকার। তাহাদিগের নাম—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্ঘা (কালা), কর্ণক্ষুদ্র, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডু, কর্ণগূথ, কর্ণপ্রতীনাহ, জন্তকর্ণ, কর্ণপাক, পুতিকর্ণ, ৪ প্রকার অর্শঃ, ৭ প্রকার অর্কুদ, ৪ প্রকার শোথ ও ২ প্রকার বিজ্রিহ। [কাণ শব্দে কাণচটা, কাণফোলা, কালা প্রভৃতি রোগের বিবরণ দেখ।]

কর্ণরোগপ্রতিষেধ (পুং) কর্ণরোগাণাং প্রতিষেধঃ শমনো-পায়ো যত্র, বহুব্রী। ১ সূক্ষ্মতসংহিতার অধ্যায়বিশেষ। ২ (৬তং) কর্ণরোগ চিকিৎসা।

কর্ণল (ত্রি) কর্ণঃ কর্ণশক্তিরন্ত্যত্র, কর্ণ-লচ্ (সিদ্ধাদিত্যশ্চ। পা ৫। ২৯৭।) প্রশস্ত প্রবণশক্তি বিশিষ্ট।

কর্ণলতা (ত্রি) কর্ণস্ত লতা-ইব, উপমি। কর্ণপালী, কাণের পাতা।

কর্ণলতিকা (ত্রি) কর্ণস্ত লতা-ইব। কর্ণলতা-স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইৎ। কাণের পাতা। (পালিস্ত কর্ণলতিকা। হেম ৩। ৪৭৪)

কর্ণবংশ (পুং) কর্ণঃ কর্ণাকৃতিবৎ বংশো যত্র, বহুব্রী। মঞ্চ, মঁচা।

কর্ণবৎ (ত্রি) কর্ণঃ প্রাশস্তোহন অত্যন্তি, কর্ণ-মতুপ্-মন্ত বঃ। ১ দীর্ঘ কর্ণবিশিষ্ট। ২ কর্ণযুক্ত।

কর্ণবর্জিত (পুং) কর্ণেন অবশেষজিহ্বা বর্জিতঃ হীনঃ। ১ সর্প;

ইহাদের পৃথক কর্ণেজিহ্বা নাই। ২ (ত্রি) বধির, বাহার প্রবণশক্তি নাই।

কর্ণবিট্ [ব্] (ত্রি) কর্ণস্ত কর্ণে জাতো বা বিট্। কাণের খৈল। (“বসা শুক্রমশ্চ মজ্জা মূত্রবিড়্ভ্রাণকর্ণবিট্।

শ্লেষ্মাশ্চুবিট্কা শ্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥” মজ্জ।)

কর্ণবিবর (স্ত্রী) কর্ণস্ত বিবরং, ৬তং। কাণের ছিদ্র। কর্ণভ্যন্তরস্থ কর্ণবিবরের ইংরাজি নাম Vestibule.

কর্ণবেধ (পুং) কর্ণয়োঃ কর্ণস্ত বা বেধঃ, ৬তং। সংস্কারবিশেষ; ইহাতে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কাণে ছিদ্র করিতে হয়। জন্মমাসাবধি ৬, ৭, ৮, ১২ ও ১৬ মাসে; বৃধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোমবারে; ষিঠীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী তিথিতে, মধ্যাহ্নকালে; ক্ষত্রিয়ের স্বর্ণ-শলাকা দ্বারা, ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যের রৌপ্যশলাকা দ্বারা এবং শূত্রের গোহশলাকা দ্বারা কর্ণবেধ করিতে হয়। জন্মমাসে, চৈত্র ও পৌষমাসে, যুগ্মবৎসরে, হরির শয়নকালে, দূষিত স্রবো, কৃষ্ণপক্ষে, জন্মনক্ষত্রে দিবসের পূর্ভাগে ও রাত্রিকালে কর্ণবেধ করিবে না। (মদনরত্ন)। স্রব্যের উত্তরায়ণ সময় কর্ণবেধের প্রশস্তকাল, দক্ষিণায়নে কর্ণবেধ করিবে না। (গর্গ)। এক পিতার দুইটি পুত্রের কর্ণবেধ সংস্কার না হইতে যদি পুনর্বার পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে উপস্থিত দুই পুত্র মধ্যে যাহার শুদ্ধ বর্ষ হইবে, তাহারই কর্ণবেধ করান কর্তব্য; এ সময়ে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিচারের আবশ্যক করে না; নতুবা ঐক্য তিন পুত্র হইলে তাহাকে ‘কর্ণবটুক’ কহে, ইহা অতীব দোষজনক। (মলমাসতত্ত্বে মাণ্ডব্য)। ব্রাহ্মণের কর্ণছিদ্র অজুষ্ঠের যব প্রমাণ প্রশস্ত হওয়ার বিধি। নির্ণয়সিদ্ধিতে লিখিত আছে,— “অজুষ্ঠমাত্র স্রবিরো কর্ণো ন ভবতো যদি। তস্মৈ শ্রাদ্ধং ন দাতব্যং দন্তক্ষেদাজ্জরং ভবেৎ ॥”

যাহার কর্ণে অজুষ্ঠ যব প্রমাণ ছিদ্র নাই, তিনি শ্রাদ্ধে অনধিকারী; শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অস্বরগণের ভোজ্য হইয়া থাকে। হেমোজি দেবলবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

“কর্ণরন্ধ্রং রবেচ্ছায়া ন বিশেষঃ প্রজন্মনঃ।

৩২ দৃষ্টা বিলয়ং যান্তি পুণ্যোবাশ্চ পুরাতনাঃ ॥”

যে ব্রাহ্মণের কর্ণরন্ধ্র দিয়া স্রব্যকিরণ প্রবেশ না করে, তাহাকে দেখিলে প্রাচীন পুণ্যশীল ব্যক্তিগণও নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। [কর্ণব্যবধি দেখ।]

কর্ণবেধনিকা (স্ত্রী) বিধ্যতে হনয়া, কর্ণ-বিধ-করণে লুট্-স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইৎ। কর্ণবেধনের অস্ত্র, কাণ ফুড়িবার সূচ।

কর্ণবেধনী (স্ত্রী) বিধ্যতে হনয়া, কর্ণ-বিধ-করণে লুট্-ভীপ্। কর্ণবেধের সূচী।

কর্ণবেষ্ট (পুং) কর্ণো বেষ্টয়তি, কর্ণ-বেষ্ট-অচ্। ১ কুণ্ডল।
২ ঝাপরয়ুগের রাজবিশেষ। (ভারত-আদি ৬৭ অঃ)

কর্ণবেষ্টক (স্ত্রী) কর্ণো বেষ্টয়তি, কর্ণ-বেষ্ট-কুল। কুণ্ডল।
(তাড়নস্ত তাড়নস্ত কুণ্ডলং কর্ণবেষ্টকঃ। হেম ৩। ৩০০।)

কর্ণবেষ্টকীয় (ত্রি) কর্ণবেষ্টক-চঞ। কর্ণবেষ্টকসম্বন্ধীয়।

কর্ণবেষ্টন (স্ত্রী) কর্ণো বেষ্টতেহনেন, কর্ণ-বেষ্ট-লুট্। কুণ্ডল।

কর্ণব্যবস্থি (পুং) কর্ণব্যস্ত কর্ণবেষ্ট্য বিধিঃ, ৬তৎ। ১ কর্ণ-
বেষ্টের নিয়ম। [কর্ণবেষ্ট দেখ।] ২ বালকের রক্ষাক্ষণের অস্ত্র

সুশ্রুতোক্ত কর্ণবেষ্টের নিয়ম। সুশ্রুতে লিখিত আছে,—
বালকের ষষ্ঠ বা সপ্তমমাসে প্রশস্ত তিথি করণ মুহূর্ত্ত ও নক্ষত্র-
যুক্ত দিবসে মঙ্গলকার্য্য ও স্বস্তিবাচন করিয়া ধাত্রীর কোলে
বালককে উপবেশন করাইবে এবং পুতুল প্রভৃতি বিবিধ
খেলনা দ্বারা তাহাকে সান্তনা করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে
ভিষক বাম হস্তের দ্বারা কাণ টানিয়া ধরিয়া স্বর্ঘ্যাকিরণে
দৈবরূক্ত ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে সূক্ষ্মসূচী দ্বারা সোজা
ভাবে বিদ্ধ করিবেন। পুত্রের দক্ষিণ কর্ণ ও কন্যার বাম
কর্ণ বেধ করিতে হয়। বেধের পর তাহাতে তুলার বর্ত্তি
করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবেন এবং তাহাতে অপক তৈল
সেবন করিবেন। অধিক রক্তস্রাব হইলে, বা বেদনা অধিক
হইলে অন্য স্থানে বেধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথাস্থানে
যথারীতি বিদ্ধ হইলে কোনরূপ উপদ্রবের আশঙ্কা থাকে না,
অজ্ঞভিষক কোন শিরা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলে বিবিধ উপদ্রব
উপস্থিত হইয়া থাকে। কালিকা শিরা বিদ্ধ হইলে অর, দাহ,
শোথ ও বেদনা; মর্শ্বশিরা শিরায় বেদনা, অর ও গ্রহিঃ;
লোহিতিকা শিরায় মন্যাস্তম্ভ, অপতানক, শিরোগ্রহ ও কর্ণ-
শূল উৎপন্ন হয়।

কষ্টকর জিজ্ঞা, প্রশস্ত সূচী দ্বারা বেধ, গাঢ়তরবর্ত্তি প্রবেশ,
দোষের প্রাকোপ অথবা বিদ্ধ হইয়া বেদনা ও শোথ উৎপন্ন
হইলে, বস্ত্রিধু, এরুণ্ড মূল, মজ্জিষ্ঠা, যব ও তিল বাটিয়া মধু
ও ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, এই প্রলেপের
দ্বারা কর্ণ স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে পুনর্বার পূর্কোক্ত নিয়মে
বিদ্ধ করিতে হইবে। ছিদ্র প্রশস্ত করিবার জন্য তিন দিন
অন্তর ক্রমশঃ স্থলবর্ত্তি প্রবেশ করাইয়া তৈলের সেক দিতে
হইবে। (সুশ্রুত)।

কর্ণশঙ্কলী (স্ত্রী) কর্ণয়োঃ কর্ণশ্চ বা শঙ্কলী ইব, উপনিঃ।
কর্ণবেষ্টন, কর্ণগোলক। বহিঃকর্ণ (Auricle or External ear)

(কর্ণঃ শ্রোত্রঃ শ্রবণক বেষ্টনঃ কর্ণশঙ্কলী। হেম ৩। ২৩৮।)

কর্ণশিরীষ (পুং) কর্ণগতঃ শিরীষঃ মধ্যলোঃ। যে শিরীষমূল
কাণে অলঙ্কাররূপে দেওয়া যায়।

কর্ণশূল (পুং) কর্ণস্য শূলঃ শূলবৎ যন্ত্রণাপ্রদো রোগঃ।
কর্ণরোগবিশেষ। কর্ণমধ্যে দ্রবিত কক শিষ্ঠ ও রক্ত কর্ণক
পথ রুদ্ধ হইয়া বায়ু চারিদিকে বিচরণ করে, তাহাতে অত্যন্ত
বেদনা উপস্থিত হয়; এই পীড়ার নাম কর্ণশূল, ইহা
কষ্টসাধ্য।

কদবেল, ছোলদনেবু ও আদা ইহাদের রস ঈষৎ উষ্ণ
করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে; অথবা শুঠ, মধু, সৈন্ধব ও তৈল
একত্র কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে, কিম্বা রহুন,
আদা, শজিনা ও রক্তশজিনার মূল এবং কদলীর রস
উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে, অথবা কেবল সমুদ্রফেন চূর্ণ
করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। গোমূত্র, ছাগ-
মূত্র, মেঘমূত্র, মহিষমূত্র, অশ্বমূত্র, হস্তিমূত্র, উষ্ট্রমূত্র অথবা
গদ্বিষ্ঠমূত্র উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে কিম্বা আকন্দপত্রের
পুট মধ্যে সিজের পাতা ঝলসাইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে
তাহার রস দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে অথবা পাকা আকন্দের
পাতায় ঘৃত মাখিয়া, অগ্নি বা রৌদ্রে তপ্ত করিয়া নিঙুড়াইলে
যে রস বাহির হইবে, এই রসের দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল
ভাল হয়। (চক্রদত্ত)।

কর্ণশূলী [ন] (পুং) কর্ণশূলোহস্তান্তি, কর্ণশূল-ইনি (অত-
ইনিঠনৌ। পা ৫। ২। ১১৫।) কর্ণশূলবিশিষ্ট, বাহার কর্ণশূল-
রোগ হইয়াছে।

কর্ণশোভন (ত্রি) কর্ণং শোভয়তি, কর্ণ-শোভ-গিচ্-লুট্।
কর্ণভূষণ, কাণের গহনা।

কর্ণশ্রব (ত্রি) শ্রবতে শ্র-অণ্ শ্রবঃ শব্দঃ, কর্ণেন শ্রবঃ শ্রবণ-
যোগাঃ শব্দো যত্র, বহুব্রী। শুনিবার যোগ্য শব্দবিশিষ্ট বায়ু
প্রভৃতি। (কর্ণশ্রবেহনিলে রাজৌ দিবাপাণ্ডুসমূহনে।" মধু)

কর্ণসংস্রাব (পুং) কর্ণস্ত কর্ণয়োঃ সংস্রাবঃ পূরণশোণিতাদেঃ
নিঃস্রাবণং যত্র রোগে, বহুব্রী। কর্ণরোগবিশেষ। মস্তকে
কোনরূপ আঘাত পাইলে, জলে নিমগ্ন হইলে, অথবা আত্যা-
ন্তরিক কোন বিদ্রুপি পাকিলে, বায়ু কর্ণদ্বার দিয়া পূরস্রাব
করায়, ইহাকেই কর্ণস্রাব রোগ কহে। (মাধবনিদান।)

জাম, শিমুল, বেড়োলা, বকুল ও কুল এই সকল গাছের
ছালের চূর্ণ ও কদবেলেররস একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর
সহিত কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব ভাল হয়। অথবা হাতির
বিষ্ঠা পুটপাকে সিদ্ধ করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে, এই
রসে তৈল ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে
কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত)।

কর্ণভূষণ। ভারতবর্ষের এক প্রাচীন জনপদ। প্রসিদ্ধ চীন-
পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং (খৃস্ট) 'কিএ-লো-ন-ম-ক-ল-ন'

আমি যে জনপদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য প্রাকৃতিকবিদেরা তাহারই 'কর্ণভূবর্ণ' এই সংস্কৃত নাম দিয়াছেন।

চীনপরিভ্রাজক লিখিয়াছেন, "এই জনপদ নৈর্ঘ্যগ্রন্থে প্রায় ১৪০০ কি ১৫০০ লি (প্রায় ১২৫ ক্রোশের অধিক) হইবে। ইহার রাজধানী প্রায় ২০ লি (দেড় ক্রোশ)। এখানে বিস্তর লোকের বাস, সকলেই শাক্ত, শিষ্ট ও সম্প্রতি-শালী। জমি ন্যায্য ও উর্বরা, জমিতে নিয়মিত কৃষিকার্য হয়, নানাবিধ মহার্য ও উপাদেয় কুহুমভূষণ এই জনপদ অলঙ্কৃত। এখানকার জলবায়ু মনোরম, অধিবাসীরা বিদ্যোৎসাহী। (সেই সময়ে) এখানে দশটি সজ্জারাম এবং তাহাতে প্রায় ২০০০ ব্যক্তি বাস করেন। সকলেই সম্মতীয় হীনযান-মতাবলম্বী। এতদ্ভিন্ন পঞ্চাশটি দেবমন্দির আছে। নগরের পার্শ্বেই রক্তবিটি (লো-ভো-বেই-চি) নামে একটি সজ্জারাম আছে, ইহার দরদালান সুবিস্তৃত এবং প্রাকারগুলি অতি উচ্চ। এখানে পূর্বে কোন বৌদ্ধ ছিলেন না।...রাজার আদেশে একজন শ্রমণ আগমন করেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথায় মুগ্ধ হইয়া রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই এখানে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ সমাদর হইল। উক্ত সজ্জারামের অনতিদূরে অশোকরাজ একটি স্তূপ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন।"

এই কর্ণভূবর্ণ জনপদ কোথায় ছিল, তাহার বর্তমান স্থান লইয়াই গোলযোগ। কাহারও মতে, মুর্শিদাবাদ হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে 'কুন্সোস্ন কা-গড়' নামে যে একটি প্রাচীন নগর আছে, সম্ভবতঃ সে প্রাচীন নগরই কর্ণভূবর্ণ হইবে।

(J. As. Soc. Bengal, Vol. XXII. 281ff. J. R. As. (N. S.) Vol. VI. 248, Ind. Ant. Vol. VII. 197.)

আবার কেহ ভাগলপুরের নিকটস্থ কর্ণগড়কে কর্ণভূবর্ণ বলিয়া মনে করেন। (Beal's Record, Vol. II. 20in.) বস্তুতঃ কর্ণভূবর্ণের প্রকৃত স্থান এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে চীনপরিভ্রাজকের বর্ণনার জানা যায়, এই জনপদ ভাঙ্গলিগু হইতে ৭০০ লি (প্রায় ৫০ ক্রোশের অধিক) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

কর্ণসূ (জী) কর্ণ-সু-কিপ্। কর্ণের জননী, কুন্তী।

কর্ণসূচী (জী) কর্ণবেদনার্থঃ সূচী, মধ্যলো।। যে সূচীর দ্বারা কর্ণবেদ করা হয়।

কর্ণক্ষেপাট (জী) কর্ণত ক্ষেপেব ক্ষেপাট। বিদ্যারণ্য বস্তাঃ। লতাবিশেষ, কাণকাটা। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ঋতিক্ষেপাট, ত্রিপুটা, কৃষ্ণতণ্ডুলা, চিত্রপর্ণী, কোপলতা, চিত্রিকা ও অর্দ্ধ-

শীতল, সর্বপ্রকার বিষরোগ, গ্রহদোষ, কৃত্তাবি দৌর ও পীড়ানাশক।

কর্ণস্রাব (পুং) কর্ণস্ত কর্ণস্রাবো স্রাবঃ পুরাদিনিঃসরণঃ, ৬তৎ। কর্ণরোগবিশেষ। [কর্ণস্রাব দেখ।]

কর্ণস্রোতঃ [স্] (স্ত্রী) কর্ণস্ত স্রোত ইব, উপনিম্ন। কর্ণবিষয়, কাণের ছিদ্র।

কর্ণস্রোতোভব (পুং) কর্ণস্রোতসো বিকৃকর্ণবিবরণঃ ভবতি, কর্ণস্রোতস্-ভ-অচ্। ১ মধু নামক অম্লর। ২ কৈটভ নামক অম্লর। [কৈটভ দেখ।] (ভারত অম্ ৬৬ অঃ।)

কর্ণহীন (জি) ৩তৎ। ১ বধির, কালা। ২ সর্প, সাপের কাণ নাই।

কর্ণাকর্ণি (পুং) কর্ণে কর্ণে গৃহীত্বা প্রবৃত্তঃ কথনম্, ব্যতি-হারে ইচ্-পূর্বস্ত দীর্ঘশ্চ। কাণাকাণি, পরস্পর কাণের নিকট কথা বলা।

("কর্ণাকর্ণি হি কপয়ঃ কথয়ন্তি চ তৎকথাম্।" রামা ৬।২১।৩০।)

কর্ণাঞ্জলি (পুং) কর্ণেঃ অঞ্জলিরিব, উপনিম্ন। কর্ণরূপ অঞ্জলি, কাণের ছিদ্র; অঞ্জলির দ্রব্য গ্রহণের ভায় ইহার শব্দ গ্রহণে যোগ্যতা আছে, এই জন্যই ইহাকে অঞ্জলির সহিত উপমিত করা হইয়াছে।

কর্ণাট। দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন জনপদ। শক্তিসঙ্গম তত্ত্বের মতে—

"রামনাথ সমারভ্য ত্রিরঙ্গান্তঃ কিলেশ্বরী।

কর্ণাটদেশো দেবেশি। সাম্রাজ্যভোগদায়কঃ।"

রামনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিরঙ্গের সীমা অবধি সাম্রাজ্যভোগদায়ক কর্ণাটদেশ।

রামনাথের বর্তমান নান রামনাথ, উহা ভারতের দক্ষিণে সমুদ্রের নিকট অবস্থিত। ত্রিরঙ্গ ত্রিশিরাপন্নীর নিকট কাবেরী ও কোলঙ্গু নদী মধ্যে অবস্থিত। তাহা হইলে, শক্তিসঙ্গমের মতে, ভারতের সর্বদক্ষিণ অংশ রামেশ্বরের নিকট হইতে কাবেরী নদী পর্যন্ত কর্ণাটদেশ হইতেছে।

কিন্তু উক্তমত ভুল বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারত মার্কণ্ডেয়পুরণ ও বৃহৎসংহিতায় কর্ণাট অবস্থি, দশপুত্র, মহারাষ্ট্র ও চিত্রকূটের সহিত উক্ত হইয়াছে। যথা—

"অবন্তয়ো দাশপুরা শুভেখা কণিনো জনাঃ।

মহারাষ্ট্রাঃ স কর্ণাটা গোনদাশ্চিৎকটকাঃ।"

মার্কণ্ডেয় পুঃ ৪৮ অঃ।

"কর্ণাট মহাটমিচিৎকটঃ।" ইত্যাদি। বৃহৎসংহিতা ১৪।১৩। শক্তিসঙ্গম তত্ত্বেরও একস্থানে লিখিত আছে—

"মার্কণ্ডেয়ীর্ষ্য রাজেন্দ্র! কোলাপুরনিবাসিনী।

এখানেও মহারাষ্ট্রের নিকট কর্ণাটখামির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

এতদ্বির কর্ণাটরাজগণের প্রোদিত শিলালিপি পাঠে জানা যায়, তাঁহারা বর্তমান মহিম্বরের উত্তরাংশ হইতে বিজয়পুর পর্য্যন্ত সমুদ্রার তূতাবে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ঐ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড মহাভারত, মার্কণ্ডেয় ও বরাহমিহিরের কর্ণাট বলিয়া মনে হয়। এখন অনেকে কাণাড়া ও কর্ণাটক প্রদেশের নাম শুনিয়া উহাকেই কর্ণাট বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাঁহাদেরও ভ্রম বলিতে হইবে।

এখন যাহাকে কর্ণাটক বলে, সেই স্থানে কোন প্রাচীন কর্ণাটরাজ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন নাই। মুসলমানেরা আসিবার সময় হইতে মহিম্বরের দক্ষিণ অংশ কর্ণাটক নামে অভিহিত হয়। [কর্ণাটক দেখ।] খ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষিণ কর্ণাটের নাম পাওয়া যায়। ঐ স্থান কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক নামক জনপদের সহিত উক্ত হইয়াছে। (ভাগবত ৫। ৬। ৮)

বর্তমান কর্ণাটকের কানেরী কুলস্থ স্থান উক্ত দক্ষিণকর্ণাট হইলেও হইতে পারে।

এখন যাহাকে কল্লড় বা কাণাড়া বলে, তাহা কর্ণাট শব্দেরই অপভ্রংশ। কিন্তু ঐ প্রদেশও প্রাচীন কর্ণাট রাজ্যের অন্তর্ভূত নয়, মহিম্বরের দক্ষিণাংশে মুসলমানেরা আসিয়া যেমন কর্ণাটক নাম দিয়াছে, ইংরাজেরাও সেইরূপ গোয়ার দক্ষিণস্থিত সমুদ্রকূলবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম কাণাড়া রাখিয়াছেন। প্রাচীনকালে সমুদ্রকূলবর্তী ঐ বিস্তীর্ণ ভূভাগ মহাজিথেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কর্ণাটপ্রদেশে চালুকা, চের, গঙ্গ, পল্লব ও কলচুরিবংশ রাজত্ব করিতেন। [চালুকা প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দ দেখ।] খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে কর্ণাটের দক্ষিণাংশ চোল রাজাদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে উত্তর অংশে কলচুরী রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

বল্লালদেব মহিম্বরস্থ তোরুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তিনি এবং তাঁহার বংশধরেরা বিজয়নগরের কলচুরীরাজের করদ ছিলেন। কলচুরীরা অধঃপতনে বল্লালবংশের আত্মদায় হইল।

১৩৩৬ খৃঃ অব্দে, বল্লালবংশ প্রবল হইয়া তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণস্থিত কর্ণাটপ্রদেশ অধিকার করেন। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, তৎপরে তাঁহারা মুসলমানদিগের বাহুবলে পরাজিত হইয়া প্রথমে পেলাকোতা, তৎপরে চম্মসিহিতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে

কেবল একটা শাখা অনাভিহিত ছিলেন। এই সময় হইতে কর্ণাটক নাম প্রচারিত হয়। প্রাচীন কর্ণাট হইতে কর্ণাটকে বর্তমান বুঝাইবার জন্য ‘কর্ণাটপর্য্যনঘাট’ অর্থাৎ কর্ণাটের নিম্নভূমি এবং তাহার উত্তরে অবস্থিত পার্শ্ববর্তী ভূমিকে ‘কর্ণাট বালাঘাট’ বলা হইত।

মুসলমানেরা বিজয়নগরের হিন্দুরাজাদিগকে তাড়াইয়া কর্ণাট ছইভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন, একভাগ কর্ণাটক হায়দরাবাদ বা গোলকুণ্ড, অপর কর্ণাটক বিজাপুর, উত্তর বিভাগ আবার পর্য্যনঘাট ও বালাঘাট এই দুই উপবিভাগে বিভক্ত।

ব্যুৎপত্তি।—এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ণ-অট-অচ্ শব্দাদি এইরূপে কর্ণাটশব্দের ব্যুৎপত্তি সাধেন। কিন্তু শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, জাবিড়ী কর্ণাহ (কর্ণ কৃষ্ণ + নাহ স্থান) অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রদেশ বা কৃষ্ণকাপাসোৎপাদক ক্ষেত্র হইতে এই কর্ণাট নাম হইয়াছে।

যাহাই হউক, কর্ণাট নামটিও যে বহুপ্রাচীন, তাহা মহাভারত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা পাঠে জানা গিয়াছে।

কর্ণাট শব্দ স্থান-বাচক হইলেও বহুদিন হইতে স্বতন্ত্র জাতি ও ভাষাবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [কর্ণাটক দেখ।]

২ জাবিড়ব্রাহ্মণ মধ্যে শ্রেণীবিশেষ। ভারতের উত্তরাঞ্চলে পঞ্চগোড় বলিলে যেমন কান্যকূজ, সারস্বত, গোড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে বুঝায়, সেইরূপ জাবিড় বলিলে মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, জাবিড়, কর্ণাট ও গুজর এই পঞ্চশ্রেণীর দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া থাকে।

জাবিড় ব্রাহ্মণের ৪র্থ শ্রেণী কর্ণাট। তাঁহারা অপর জাবিড় ব্রাহ্মণের নিকট আভিজাত্যে ও মর্যাদায় নিষ্কণ্ট। অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে কল্যাদান করেন না। কিন্তু অন্ন গ্রহণ করিতে কাহারও বাধা নাই। অপর স্থানের ব্রাহ্মণেরা যেমন সর্বত্র পূজিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন, কর্ণাটব্রাহ্মণদিগের ভাগ্যে তেমন সম্মান, তেমন আদর অত্যর্থনা ঘটে না।

কাণাড়া ও কর্ণাটক প্রদেশে এই শ্রেণীর বসবাস। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই প্রায় লিঙ্গায়ৎ। তাহারা এই ব্রাহ্মণদিগের সম্মান করা দূরে থাকুক; বরং সময়ে সময়ে নিন্দা করিয়া থাকে। তবে যদি কোন কর্ণাটব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্যে কাহারও বাটীতে অতিথি হন, তবে আদর অভ্যর্থনার পরিলীমা থাকে না। কায়মনোচিত্তে ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া তাঁহাকে বঞ্চে সম্ভট করেন।

ঊহারা এদেশের ব্রাহ্মণদিগের ভায় বজমান দ্বারা দক্ষিণোক্ত না হওয়ার, কাজেই জীবিকানির্বাহের জন্য স্ব জাতীয় কর্তৃত্ব করিয়া ও নানাপ্রকার কার্য করিয়া থাকেন। এমন কি অনেকে গেষ্টের দ্বারে কৃষিকর্ম করিয়া থাকেন। কর্ণাট ব্রাহ্মণেরা ঋতু অবস্থা বজুর্বেদী। ঊহারা প্রধানতঃ সপ্তশাখার বিতক্ত—১ হৈম, ২ কাত, ৩ শ্রীবেঙ্গুরী, ৪ বর্গীনার, ৫ কন্দাব, ৬ কর্ণাটক, ৭ মহীভূরকর্ণাটক, ৮ শ্রীনাথ (ঈনাথ)। বাসস্থানের নামানুসারে কর্ণাট ব্রাহ্মণদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়।—

গোত্র।	উপাধি।	কুল।
কস্তুর	... আর-কর্ণাটক	... মহীভূর।
গোতম	... কর্ণক	... বরদলুহ।
ভরদ্বাজ	... মুর্কিনাক	... শ্রীবেঙ্গুরী।
বশিষ্ঠ	... বরদলুহ	... শ্রীভদ্রপত্তন।
বিখামিত্র	... কর্ণক	... দেবদাহালী।
শাণ্ডিল্য	... মুর্কিনাক	... হোমকরণগোলক।
গর্গ	... নবীনকর্ণাটক	... মগদী।
অজিত	... পেরীচরণ	... মুলবাগলু।
বৎস	... দেবদ	... মালোহ।
ভরদ্বাজ	... হলকর্ণেজ	... হর্যাপুরম্।
উপমহা	... প্রাচীনকর্ণাটক	... শ্রীমহাজনগরম্।
কান্ত	... পেরীচরণ	... কুরক।
শাণ্ডিল্য	... প্রাচীনকর্ণাটক	... হাগলবারী।
গোতম	... মুর্কিনাক	... চিত্রদুর্গ।
ভরদ্বাজ	... মুর্কিনাক	... শিওমগী।

এ হাড়া কুটী, নজনগুরু প্রভৃতি আরও কয়েক বয় আছে।

তাহাদের বিশেষ বিবরণ কিছু জানা যায় নাই।

কর্ণাটব্রাহ্মণেরা উত্তর ও দক্ষিণ কাণাড়া, ভুলু, মালা-বয়, কোচিন ও মহীভূরে বাস করেন। তাহাদের সংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক হইবে।

কর্ণাট ব্রাহ্মণের দেহের গঠন জুহী, দেখিতে অনেকটা উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের ভায়।

কর্ণাটক। দাক্ষিণাত্যের জাতিভাষা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত;—তেলগু (তৈলগ), তামিল (ত্রাবিড়ী) ও কর্ণাটক (কর্ণাটী)। তেলগুভাষা উত্তর মাজাজে, তামিল-ভাষা দক্ষিণ মাজাজে ও কর্ণাটীভাষা মাজাজের পশ্চিমাংশ হইতে পশ্চিমোপকূল পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশে প্রচলিত। এই তিনটি ভাষাই দাক্ষিণাত্যের প্রধান ভাষা। উদ্যোগে কাণাড়া, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, মহীভূর, দিঙ্গামরাজ্যের পশ্চিমাংশ ও দ্বিবেই

কর্ণাট ভাষার প্রচলন অধিক। মীলগিরিতে বড়গনামে যে এক জাতি বাস করে, তাহারাও নাকি প্রাচীন কর্ণাটীভাষা ব্যবহার করে। প্রাচীন কর্ণাটীকে এখন হলকর্ণ হলে। মহারাষ্ট্র ও মহীভূরের যে সকল প্রাচীন খোদিত শিলালিপ্য পাওয়া গিয়াছে, উদ্যোগে কতকগুলি প্রাচীন কর্ণাট লিপ্য আছে।

মাজাজ বা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধিলিয়ান ও অন্যান্য বর্ণমোহন কর্ণাটীকে এই সকল দেশীয়ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ইহাদিগের জন্য শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করি-বার সময়ে কর্ণাটী ভাষা লক্ষ্যে অনেক বিদ্য সংগৃহীত ও লিখিত হইয়াছে। এই সংগ্রহের সময় দেখা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কেশবপণ্ডিত নামক একব্যক্তি “গণ-বজ্রদর্পণ” নামক একখানি খাত্মস্বাক্ষর পুস্তক সংগ্রহ করেন। সেইখানিই এই ভাষার মূলব্যাকরণ।

কর্ণাটী-ভাষা সংস্কৃতাদি ভাষার ভায় বামদিক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে লিখিত হইয়া থাকে। এই ভাষার শব্দ বা পদ লিখিতে হইলে, সেই সেই শব্দ লিখিতে যে যে বর্ণের বা যুক্তাকরের প্রয়োজন তাহাই পাশাপাশি লিখিয়া যাইতে হয়। দুইটি শব্দ বা পদের মধ্যে আবশ্যক মত কোন ছেদ বা ফাঁক দিবার ব্যবস্থা নাই, বাক্য বা বাক্যাংশের পরও কোনরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। কর্ণাট বর্ণমালায় সর্লক্ষ ৫৬টি অক্ষর আছে, ইহার মধ্যে ১৬টি স্বরবর্ণ, ২টি অর্ধস্বর ও ৩৮টি ব্যঞ্জনবর্ণ। এই ৫৬টি বর্ণের মধ্যে ৩৭টি বিশুদ্ধ কর্ণাটমিশ্রিতবর্ণ, বাকি ১৯টি সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণমৌখিকার্থে গড়িয়া লওয়া হইয়াছে। সংস্কৃতাদি ভাষার ভায় কর্ণাটী ভাষাতেও যুক্তাকরের আকার ভিন্নরূপ এবং যুক্তাক্ষরও যথেষ্ট।

কর্ণাটী ভাষার সহস্র শব্দ ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত—১ম মূল কর্ণাটী শব্দ, ২য় কর্ণাটী প্রত্যয়াদিযুক্ত সংস্কৃত শব্দ, ৩য় সংস্কৃত পরিবর্তিত শব্দ, ৪র্থ অপভ্রংশ ও অপভাষার শব্দ এবং ৫ম অন্যান্য ভাষার শব্দ। কর্ণাটী-ভাষার বিশেষ্য শব্দগুলিও ৪ ভাগে বিভক্ত, যথা,—বস্তুবাচক বিশেষ্য, বিশিষ্ট বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও যৌগিক বিশেষ্য। কর্ণাটী ভাষার দেবগণ ও মানব পুংলিঙ্গ, দেবী ও মানবী স্ত্রীলিঙ্গ এবং সমস্ত পদগন্ধী কীট পতঙ্গাদি এবং অচেতন ও উদ্ভিদ পদার্থ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য। এ ভাষার দুইভাষা বচন আছে—একমচন ও বহুবচন। সর্লক্ষ শব্দ ৮ ভাগে বিভক্ত যথা,—ব্যক্তিবাচক, পুংলিঙ্গবাচক, অনিচ্ছাবাচক, লক্ষ্যবাচক, স্থান-বাচক, সময়পরিমাণবাচক ও প্রসূতক। কর্ণাটী-ভাষার

ক্রিয়া সাক্ষরক ও বিকল্পক। ইহাদের কাল আট প্রকার।
 দ্বিতীয় পুরুষের অকৃতকালের ধাতুর রূপ বাহা তাহাই ধাতুর
 মূল রূপ।

কর্ণাটী ভ্রমবার উপলব্ধি অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ, সমুচ্চ-
 রাসি অব্যয় ও বিশ্রয়সি অব্যয়ও আছে। এতদ্বির ভ্রমবার
 যে সকল বিশেষণ আছে, তাহা এক্ষেপে বিবিন্ন প্রকাশ
 করিবার উপায় নাই। কর্ণাটী ভাবান্তেও পুত্রবোণে দণ্ডবোণে-
 ক্তর সংযোগ হৃত হয়।

(কর্ণাটীভাষা সম্বন্ধে যদি বিশেষ বিবরণ জানিতে হয়
 তবে Dr. Mc Kerrell's Grammar of the Carnataku
 language এবং Caldwell's Dravidian Grammar
 দেখা আবশ্যিক)

২। নেপালের একটি রাজবংশ। পার্শ্ববর্তী বংশাবলী
 পাঠে জানা যায় নেপালের কর্ণাটক রাজগণ নেপালী-সম্বৎ
 ১৯ হইতে ২২৮ (অর্থাৎ ৮৯০ খৃঃ হইতে ১১০৯ খৃঃ) অবধি
 ২১৯ বর্ষ রাজত্ব করেন। এই কয়জন নেপালীরা কর্ণাটক-
 গণের নাম পাওয়া যায়—

নাম।	রাজ্যকাল।
১। নান্দদেব ...	৫০ বর্ষ।
২। নন্দদেব (ঐ পুত্র) ...	৪১ "
৩। নরসিংহদেব (পুত্রের পুত্র) ...	৩১ "
৪। নন্দদেব (নরসিংহের পুত্র) ...	৩৯ "
৫। রামসিংহদেব (নন্দীর পুত্র) ...	৫৮ "
৬। হরিদেব।	

কর্ণাটীশিখর (কৌ) মহারণ্য মধ্যস্থ চিজকুটাদি পর্বতের
 চূড়াদেশ।

কর্ণাটিক। কুমারী অন্তরীপ হইতে উত্তর সরকার পর্য্যন্ত,
 পূর্বদাট ও করমণ্ডল উপকূল অর্থাৎ সমস্ত তামিল প্রদেশ
 যুরোপীয়কর্তৃক প্রথমকমে কর্ণাটিক নামে অভিহিত করিয়া
 থাকে। কর্ণাটিক বলিতে গেলে কর্ণাটসম্বন্ধীয় বুঝায়।
 কিন্তু উক্ত বিশেষ্য ভূখণ্ডে প্রাচীন কর্ণাটরাজ্যের অন্তর্গত
 ছিল না। [কর্ণাট দেখ।] বরং ইহার উত্তরাংশে জিচনগরী
 ও কাবেরীনদীর উপকূলস্থ ভূমিখণ্ড এক সময়ে দক্ষিণকর্ণাট
 নামে কথিত হইত। এখন ইংরাজেরা বাহাকে কর্ণাটিক
 বলিয়া থাকেন, বর্তমান আর্কট (অরুকাহু), মহারা ও
 তঞ্জোররাজ্য তাহার অন্তর্গত।

পলাশীযুদ্ধের সময় এই কর্ণাটিকে ইংরাজদের সহিত
 করেববার হুকুম হয়। সেই হুকুমলিতেই দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ-
 প্রভুত্বের ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হয়। নিম্নে সেই হুকুমলির বিবরণ
 প্রদত্ত হইল।—

যে সময় ক্লাইব কলিকাতার ইংরাজগণের বিপদ কনিসা
 অ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে সহিত মাজাজ ভ্যাগ করিয়া
 বাদালাভিনুখে চলিয়া আসেন, সেই সময়ে (১৭৫৭ খৃঃ)
 কাপ্তেন কালিয়ড মারক মাজাজের জনৈক
 ইংরাজ সেনানী মহারাজার বাকি রাজত্ব আধারের লজ
 আক্রমণ করেন। কাপ্তেন কালিয়ড জিচনগরীর শাসনকর্তা
 ছিলেন। কালিয়ড মহারা-জের আশার জিচনগরী পরি-
 ত্যাগ করিবামাত্র ইংরাজের তদানীন্তন শত্রু করাসীরা
 জিচনগরী আক্রমণ করিবার লজ একদল সৈন্ত পাঠাইয়া
 দিল। করাসীসৈন্ত জিচনগরীতে পৌছিয়া ইংরাজদ্রুগ অধিকার
 করিয়া দিল। কাপ্তেন কালিয়ড এই সংবাদ পাইবামাত্র
 ভাড়াভাড়ি জিচনগরীর দিকে ক্ষিরিসেন, মহারাজ হুকুম হার
 হইল। বাহা হুকুম, কালিয়ড জিচনগরীতে পৌছিয়াই
 করাসী সৈন্তকে উৎসাদিত করিয়া ফেলিলেন। করাসী
 সৈন্তাধ্যক্ষ পরাজিত হইয়া ইংরাজ হস্তে জিচনগরী সমর্পণ
 করিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে বন্দীবার নামক স্থানের শাসনকর্তা
 ইংরাজকে রাজত্ব দিতে অস্বীকার করার কর্ণেল অ্যালডারক্রন
 তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং নগরবরোধ করিয়া বসিয়া
 থাকেন, কিন্তু করাসীরা বন্দীবারের শাসনকর্তার পক্ষ
 হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার কাপ্তেন অ্যাল-
 ডারক্রন অবরোধ উঠাইয়া লইয়া চলিয়া আসেন। ইহার
 পরই মহারাজীয়েরা আসিয়া তত্ত্ব্য নবাবের নিকট বাকি
 চৌধ রাজত্ব ৪ লক্ষ টাকা চাহিয়া বসে, কিন্তু নবাবের
 তখন অত টাকা দিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি নানারূপ
 অত্যাচার বিনয় করিতে লাগিলেন। শেষে মহারাজীয়েরা
 ৪৫ লক্ষ টাকায় সমস্ত মেনা শোধ করিয়া লইতে সম্মত
 হয়। এ সময় পাঠান নবাবেরা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার
 এবং মহারাজীয়েদের যুগ্মি রাওয়ের অধীনতা বড় স্বীকার
 করিতেন না, সুতরাং ইংরাজদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে,
 তিনি মার্হাটাদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সাহায্য করিতে
 প্রস্তুত আছেন। ইংরাজেরা এসময় এরূপস্থিত সন্ধিহাপন
 করিতে পারিলেন না, কারণ মার্হাটারা তখন তাঁহাদের
 উপর সদয় ব্যবহার করিতেছিল। এইরূপে একমাস
 কাটিয়া গেলে পরমাণে (জুন ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে) কাপ্তেন
 কালিয়ড আবার মহারা আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। হুকুম
 ইংরাজ পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইল এবং প্রথম আক্রমণে ইহার
 কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না; কিন্তু কালিয়ড এত
 ক্ষতি সহ্য করিয়াও হুকুম ক্ষান্ত হইলেন না। ৮ই আগষ্ট
 তারিখে কালিয়ড নগর প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন এবং

শাসনকর্তার নিকট হইতে ১,৭০,০০০ টাকা বাকি রাজস্ব আদায় করিলেন। ইহার পরও ইংরাজেরা মহারাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনপক্ষেই অর পরাজয় হির হইল না।

এই সময়ে আবার যুরোপে ইংরাজ ফরাসীতে যুদ্ধ বাধে। ফরাসীরা কাউন্ট ডি লালী নামক একজন বিখ্যাত সৈনিককে ভারতের ফরাসীসেনার নায়ক স্ব দিয়া একদল নৌ-সেনা সহ এখানে প্রেরণ করিলেন। লালীর নিজের এক সহস্র আইরিশ সৈন্ত ছিল। তিনি আসিবার সময় তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ১৭৫৮ সালের এপ্রেলমাসে ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন। লালী পৌঁছিয়াই ইংরাজ অধিকৃত সেন্ট ডেভিড দুর্গ আক্রমণ করিলেন। অ্যাডমিরাল ডিভেলের অধীনস্থ ইংরাজসেনাগণ তাহাকে বাধা দিল বটে কিন্তু ফল হইল না। লালী দুর্গ অধিকার করিয়া মাস্তাজ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাহার আবশ্যকমত অর্থ না থাকায় সে সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। অর্থ-সংগ্রহের জন্ত লালী এই সময় তঞ্জোরের রাজার প্রদত্ত ৫৬ লক্ষ টাকার তমস্ক আদায় করিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। তঞ্জোরের রাজা ইংরাজের মন্ত্রণায় তুলিয়া টাকা দিতে বৃথা বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইত্যবশ্যে ইংরাজের নৌ-সেনা আসিয়া পড়িল, কাজেই লালী বাধ্য হইয়া সেন্ট ডেভিড দুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। লালী কিবেলুরের একটি প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করেন এবং তাহার পূজক সেবাইত ব্রাহ্মণগণকে তোপে উড়াইয়া দেন। এই সময় ফরাসীসেনানী বৃসি নিজামরাজ্যে মহা সমাদরে বাস করিতেছিলেন। লালী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বৃসি লালীর নিকট আসিবামাত্র উত্তর সরকারের ফরাসী অধিকারে গোলমাল বাধিয়া গেল। বিজিগাপত্তনের রাজা আনন্দরাজ ফরাসী-অধিকার আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে ফরাসীর আক্রমণ হইতে কিরূপে রাজ্য রক্ষা করিবেন তাহা বিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। শেষে অস্ত্র উপার না পাইয়া বাঙ্গালার ক্লাইবের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব আবশ্যক মত সন্ধিপত্র স্থির করিয়া উত্তর সরকার হইতে ফরাসী তাড়াইবার উদ্দেশ্যে কর্ণেল ফোর্ডের অধীনে ২ হাজার সিপাহী ৫০০ শত গোরা সৈন্ত ও ৬টা কামান দিয়া রাজমহেন্দ্রী অভিমুখে পাঠাইলেন। পথি মধ্যে ফরাসী সেনানী কনফুঁ ঐ পরিমাণ সৈন্ত লইয়া তাহাকে পরাজিত ও তাহার সমস্ত কামান দখল করিয়া ফেলিলেন,

কিন্তু কোর্ড তাহাতে ক্ষুণ্ণিত না হইয়া কনফুঁ প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া দেখিলেন, সেখানে কেহই নাই; সুতরাং সপক্ষে মহলীপত্তনের দিকে অগ্রসর হইলেন। মধ্যে কয়েকস্থলে আনন্দরাজ বাধা দিতে চেষ্টা পাইরাছিলেন বটে, কিন্তু শেষে (৬ মার্চ ১৭৫৮ খৃঃ) ফোর্ড স্বল্পে মহলীপত্তনে পৌঁছিলেন। কনফুঁ এবার নিজামের সাহায্য চাহিলেন। নিজাম সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এদিকে ফোর্ডের গোরা সৈন্ত বাকি মাহিনা ও মহলীপত্তনের লুণ্ঠের অংশ পায় নাই বলিয়া বিজ্রোহী হইয়া উঠিল, কিন্তু শেষে যখন শুনিল যে নিজাম সৈন্ত কেবলমাত্র ১০ দশ কোশ দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহারা নিরস্ত হইল। কোর্ড মহলীপত্তন দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। নিজাম এই সময় ফরাসী সৈন্তের আগমন প্রতীক্ষার বসিয়া রহিলেন। ফরাসী রণতরী কুলে আসিয়া কিন্তু সৈন্ত নামাইল না শুনিয়া নিজাম ঝিকিয়া বসিলেন এবং স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংরাজদের সঙ্গে মিশিলেন। সন্ধি হইল, ইংরাজেরা বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা আয়ের উপযুক্ত ভূ-সম্পত্তিসহ চিরকালের জন্ত মহলীপত্তন সহর পাইবেন আর কৃষ্ণানদীর উত্তরে ফরাসীদের কোন কুঠি ভবিষ্যতে হইবে না বা থাকিবে না এবং সুবাদার নিজকার্য্যে কখন ফরাসী রাখিতে পারিবেন না, সন্ধিপত্রে এই কয়েকটা চুক্তি হইল।

যে সময় লালী সেন্ট ডেভিডের অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া আসেন, সেই সময় অ্যাডমিরাল পোকোক ইংরাজ পক্ষে ও কাউন্ট ডি আসি ফরাসীপক্ষে কর্মমণ্ডল উপকূলে স্ব স্ব নৌসেনা লইয়া উপস্থিত। পোকোক নিজ হইতে হুইবার আসিকে আক্রমণ করেন, আসি ভীত হইয়া পুঁদি-চেরী পলায়ন করিলেন এবং সেখানে লালীর নিকট তাড়া খাইয়া মরিচসহরে পলাইয়া গেলেন। লালী ইহাতে হীনবল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু এই সময় কর্ণাটকের নবাব চাঁদ-সাহেবের মুক্তা হওয়ার তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজাসাহেবকে ফরাসীরা কর্ণাটকের নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাকে গদিতে বসাইবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল, লালী তাহাতেই বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মুহম্মদ আলী আর্কটের শাসনকর্তা ছিলেন, তাহাকে হস্তগত করিবার জন্ত লালী প্রতারণাপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন ১০,০০০ টাকার তিনি আর্কট গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। মুহম্মদ আলী তাহাতেই রাজী হইলেন। লালী ছন্দে নগর প্রবেশ করিয়া দখল করিলেন; আর্কট লওয়ার পর তিনি চিঙ্গলিগুট দুর্গ অধিকার করিতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরা-

জেরা মাজাজের এত নিকটে করাসীরাজ্য হইতে বিবেচন
কেন? তাহারা চিকলিগুট হুর্গে সৈন্তাদি পাঠাইয়া যুদ্ধকিত
করিলেন। লালী মাজাজ অধিকার করেন, এরূপ অর্থ
সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, তবুও সাহস করিয়া ২৪ হাজার
টাকা মাত্র অবলম্বন করিয়া ডিসেম্বর মাসে মাজাজ অবরোধ
করিতে বাধ্য করিলেন। মাজাজও এ আক্রমণ সহ্য করি-
বার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সৈন্যসংখ্যা আবশ্যক মত বেশী
ছিল না বলিয়া ৯ সপ্তাহকাল করাসীসৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ
হইয়া রহিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৯ তারিখে মাজাজ বায়
বায় হইল, এমন সময় ইংরাজদের নৌ-সেনা আসিয়া পৌঁছিল।
এদিকে করাসীদের খাদ্যের অভাব হওয়ায় তাহাদের
আর্কটের দিকে ফিরিতে হইল।

ইংরাজেরা সমুদ্রপথে খাদ্য ও সৈন্যের সাহায্য পাইতে
লাগিলেন, কিন্তু করাসীরা পুঁচিচেরী হইতে কোন সাহায্য
না পাইয়া একেবারে উদ্যমহীন হইয়া পড়িল। ১০ই সেপ্টেম্বর,
করাসী নৌ-সেনার কতকাংশ ত্রিনকমলীর নিকটে উপস্থিত
হইবামাত্র ইংরাজসেনানী পোকক তাহা ছত্রভঙ্গ করিয়া
দিলেন। ইহার পর আর একদল করাসী নৌ-সেনা
কাউন্ট আসির অধীনে ৪,০০,০০০ টাকার জহরতাদি ও
সৈন্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষে অবতীর্ণ
হইতে আদেশ না পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে
বন্দীবাস ইংরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইল। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে,
কুট ইংরাজপক্ষ হইতে বন্দীবাস আক্রমণ করিয়া অধিকার
করিলেন। করাসীরা এতখান হইতেই পরাজিত হইতে
লাগিল। বন্দীবাসের যুদ্ধে বৃসি বন্দী হইলেন। কুট তৎ-
পরে আর্কট আক্রমণ করিলেন এবং জন করিয়া অন্যান্য
স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন। করাসীরা কিছুতে
কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। মার্চ মাসের মধ্যে উৎকলে
কালিকট ও পুঁচিচেরী ব্যতীত করাসীদের আর কোন
অধিকার রহিল না। লালী অর্থ বা সৈন্য সাহায্য না পাইয়া
মহা ব্যস্তিভাষ্য হইয়া পড়িলেন, শেষে মহিষুরের হারদর
আলীর সাহায্য চাহিলেন। হারদর আলী স্বীকৃত হইলেন,
স্বয়ং সৈন্য লইয়া আসিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন কারণ বশতঃ
শীঘ্র অরাজ্যে সৈন্যে ফিরিয়া গেলেন, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে
করাসীদের কোন উপকার হইল না। এই সময়ে কেজর
মনসন করাসীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন, কিন্তু
লালী হঠাৎ ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ-শিবির আক্রমণ
করিল। মনসনকে ওস্তররূপে আঁইত করেন, শেষে কুটের
হুর্গে সম্পূর্ণ পরাজিত হন। তৎপরে কুট পুঁচিচেরী অবরোধ

করিল। বসিলেন। ক্রমে দুর্গবধে খাদ্যের অভাব হইল। দুই-
দিনের মত খাদ্য অবশিষ্ট থাকিতে লালী হুর্গ ছাড়িয়া দিয়া
মাজাজে রাজা-সাহেবের নিকট আশ্রয় লইলেন।

এইরূপে করাসী প্রাচুর্য্যে ভারতে লুপ্ত হইল। কর্ণাটকের
মধ্যে এই সময়ে কেবল তিয়াগর ও গিজিনাথক স্থান দুটি
মাত্র রহিল। কিছুদিন পরে ইহাও ইংরাজহস্তগত হয়।

কর্ণাটিকা (জী) কর্ণাটী স্বার্থে কন্ টাপ্ হুয়ঃ ১। রাগিণী-
বিশেষ ২। হংসপদীনতা ৩। কর্ণাটদেশীয় জী।

কর্ণাটী (জী) কর্ণাট-জীপ্। রাগিণীবিশেষ, এই রাগিণী মালব
রাগের পত্নী ২। হংসপদীনতা ৩। কর্ণাটদেশের জী।
৪। অমুপ্রাসবিশেষ; ক বর্ণের অমুপ্রাসকে কর্ণাটী কহে।
৫। কর্ণাটের ভাষা।

কর্ণাটী (কী) কর্ণঃ তির্ঘ্যাপ্রোকারবান্ ইব অট্। তির্ঘ্যাক
যানের ছায় পাষণাদি বিস্তার করিয়া যে গৃহ প্রস্তুত হয়,
ঐরূপ গৃহবিশেষ।

(বিভিহুস্তে মনিস্তান্ কর্ণাটী শিখরাণি চ।)

ভারত বন-২৬৫ অঃ।)

কর্ণাটদেশ (পুং) কর্ণালঙ্কার বিশেষ, এখন অনেক কাণ
ইয়ারিং বলে।

কর্ণামুজ (পুং) কর্ণত্ব অমুজঃ, কর্ণ-অমু-জন্-ড। যুধিষ্ঠির।
কর্ণান্দু (জী) কর্ণত্ব আন্দুরিব। ১। কর্ণপালী, কাণতড়্কা।
২। উৎকৃষ্টিকা, কাণকড়া। (উৎকৃষ্টিকাত্ত কর্ণান্দু বালিকা
কর্ণপৃষ্ঠগা। হেম ৩। ৩২০।)

কর্ণান্দু (জী) কর্ণান্দু-উঙ। কর্ণপালী।

কর্ণাভরণ (কী) কর্ণত্ব কর্ণে ধাৰ্য্যং বা আভরণম্। কাণের
অলঙ্কার।

কর্ণাভরণক (পুং) কর্ণাভরণমিব পুঁপেঃ কাণতি প্রকাশতে,
কর্ণাভরণ কৈ-ক। আরম্ভ, সোন্দান গাছ। [আরম্ভ দেখে।]

কর্ণারা (জী) কর্ণঃ অর্ধাভে বিধ্যতে (ধাতুনামনেকার্থব্যং)
অনরা, কর্ণ-ক্-ব-জ-টাপ্। কর্ণবেধনী, বাহা দ্বারা কর্ণবেধ
করা হয়।

কর্ণারি (পুং) কর্ণত্ব আরিঃ, ৬তৎ ১। অর্জুন। ২। নদী সর্প-
বৃক্ষ, আর্জুন গাছ।

কর্ণার্ণণ (কী) কর্ণত্ব কর্ণয়োর্বা অর্ণণং প্রতিযোগ্য বিষয়ে।
কাণ দেওয়া, মনোযোগের সহিত শোনা।

কর্ণালঙ্কার (পুং) কর্ণ অলঙ্কারীতে যেন, কর্ণ-অলং-কৃ-ব-জ-
কাণের গহনা, কর্ণভূষণ।

কর্ণালক্ষিণা (জী) কর্ণায়োরলঙ্কিণা অলঙ্কারণং ৬তৎ।
কাণ শোভিত করা।

কর্ণালঙ্কৃতি (জী) কর্ণরোলঙ্কৃতিরলক্ষণ ৬৩৭। ১ কর্ণের
প্ৰহনা। ২ কর্ণ শোভিত করা।

কর্ণান্ধকাল (পুং) কর্ণরোরাণ্ডালঃ আন্ধালনং। হৃদিসিগের
কর্ণ সঞ্চালন, কাণস্বা।

কর্ণি (পুং) কর্ণ-ইন্। ১ শরবিশেষ, ইহার কলা কর্ণকৃতি।
২ ভাবে ইন্। ভেদ করা।

কর্ণিকা (জী) কর্ণ-ইকন্- কর্ণলগাটাৎ কনলকারে। পা
৪।৩।৬৫। টাপ্। ১ কর্ণভূষণবিশেষ, কাণতড়কা।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভালপত্র, তাড়ক ও দস্তপত্র। ২ হৃদিসি-
গের গুহের অগ্রভাগস্থিত অঙ্গুলির দ্বার প্রব্যবিশেষ।
৩ পদ্মবীজকোষ, পদ্মের ঢাকী। ৪ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলি।
৫ বোটা। ৬ লেখনী, কলম। ৭ অগ্নিমহাবৃক। ৮ অঙ্গশুকী
বৃক। ৯ অঙ্গরোবিশেষ, ("মেনকা সহজ্ঞা চ কর্ণিকা
পুঞ্জিকস্থলা।" ভারত আদি। ১২৩।৬১।) ১০ সেবতী,
গোলাপফুল; ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শতপত্রী, তদগী, কর্ণিকা,
চাক্ৰকেশরী, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লক্ষপুশ্পা ও অতিমঞ্জলা।
ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—আহ্লাদকর, শীতল,
সংগ্রাহী, গুরুবর্জক, লঘু, ত্রিদোষ ও রক্তনাশক, বর্ণকর,
ভিক্ত, কটু ও পরিপাককারক। ১১ ঘোনিরোগবিশেষ;
প্রাণবের পূর্বে কোঁৎ দিব্যর অঙ্গগবৃত্ত সময়ে কোঁৎ দিলে,
গর্ভের দ্বারা বায়ু প্রতিক্রিয়া হয়। প্রেম ও রক্ত সহ মিশ্রিত
হয়, তাহা হইতেই এই রোগ উৎপন্ন হয়। (চরক।)

এই রোগে সর্সগ্রকার ককনাশক ঔষধ ব্যবহৃত।
কুড়, গিণ্ডুল, আকন্দ্রের কোমল শাখা অর্থাৎ অগ্রভাগ ও
সৈন্ধব লবণ ছাগমূত্রে পেণণ করিয়া বর্ষিত অমৃত জলিবে;
ঐ বর্ষিত ঘোনিতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে কর্ণিকা রোগ
নিবারিত হয়। (চরকদত্ত।)

কর্ণিকাচল (পুং) কর্ণিকারঃ স্থিতঃ অচলঃ। স্তম্ভেরূপকর্ত।
("বস্ত্র নাত্যামবহিতঃ সর্সতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেধ
ধীপারামসমুদ্রাঃ কর্ণিকাভূতঃ কুবলকমলত।" ভাগবত
৫।১৬।৭।)

কর্ণিকাজি (পুং) কর্ণিকারঃ স্থিতঃ অচলঃ। স্তম্ভেরূপকর্ত।

কর্ণিকাপর্বত (পুং) কর্ণিকারঃ স্থিতঃ পর্বতঃ। স্তম্ভেরূপকর্ত।

কর্ণিকার (পুং) কর্ণিঃ ভেদনং করোতি, কর্ণি-কৃ-অণ্। ১
বৃকবিশেষ, কর্ণিকার। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ক্রনোৎপল,
পরিব্যধ ও ব্রুকোৎপল। ২ কর্ণিকার পুষ্প; ("বর্ণ প্রকর্ষে
সতি কর্ণিকারম্।" কুমারসং।) ৩ আরবধবিশেষ, ছোট
সোলাল। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রাজকর, প্রজ্জ্ব, ক্রত-
নালক, জ্বল, চক্র, পরিব্যধ, ব্যাধিরিগু, পিত্তবীজক ও

লম্বারবধ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—সারক, ভিক্ত,
কটু, উষ্ণ, এবং কক, শূল, উদর, ক্রমি, ঘেহ, রণ ও
ওজনাশক।

কর্ণিকারপ্রিয় (পুং) শিব।

কর্ণিকী [ন্] (পুং) কর্ণিকা ও ভাণ্ডারজিঃ অস্ত্রাতি, কর্ণিকা-
ইনি। হস্তী।

কর্ণিনী (জী) ঘোনিরোগবিশেষ, কর্ণিকা। [কর্ণিকা দেখ।]

কর্ণিল (জি) কর্ণ প্রাশস্তোত্র অস্ত্রাতি, কর্ণ-ইলচ্ (কুমারিভ্য
ইলচ্। পা ৫।২।১১৭।) দীর্ঘকর্ণ, লম্বাকর্ণবিশিষ্ট।

কর্ণিশর (পুং) শরবিশেষ।

কর্ণী (ন) (পুং) কর্ণো পক্ষো অন্ত্যস্ত কর্ণ-ইনি (কুমারিভ্য
ইলচ্। পা ৫।২।১১৭। চকারাদিনিষ্ঠনো ইতি
কাশিকা।) ১ সপ্তবর্ষপর্বত মধ্যে পর্বতবিশেষ। (হিমবান্
হেমকটচ্চ নিষাধো মেরুশ্রেণ। চৈত্রঃ কর্ণীচ শৃঙ্গীচ সৈশ্বেতে
বর্ষপর্বতাঃ। হারাবলী।)

২ বাণবিশেষ। ("করোতি কর্ণিনো যন্ত যন্ত ষড়্গাদি কুরয়।
প্রযাতি তে বিশসনে নরকে ভূশ দারুণে।" বিষ্ণু ২।৬।১৬।
কর্ণিনো বাণবিশেষান্। জীঘর)

কর্ণী (জী) কর্ণ-ভীপ্। ১ বাণবিশেষ। ২ মূলদেবের মাতা।

কর্ণীমান্ [ৎ] (পুং) কর্ণী বাণবিশেষাকারঃ কলেহস্ত্যস্ত,
কর্ণিন্-মতৃপ্, সংজ্ঞারঃ দীর্ঘঃ। আরবধ, সোলাল।

কর্ণীরথ (পুং) কর্ণঃ সামিগ্যাৎ স্বঃ অস্ত্রাতি বাহনেষন,
কর্ণ-ইনি; কর্ণী চাসৌ রথশ্চেতি, কর্ণধা, দীর্ঘশ্চ (অন্ত্যমশি
দৃষ্টতে। পা ৬।৩।১৩৭।) ১ বেশিবার ছোট রথ। ২
অন্ত্যমশি বহন করিতে পারে তৎপরিমিত রথ। ৩ জী বহনের
জন্ত উপরে কাণড় ঢাকা বানবিশেষ, ডুলি; ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—প্রবহন, হরন, প্রহরণ ও ডরন।

কর্ণীহৃত (পুং) কর্ণ্যাঃ হৃতঃ ৬৩৭। মূলদেব, চৌরশাস্ত্রকার।

("কর্ণীহৃতো মূলদেবো মূলভজঃ কলাধুরঃ। হারাবলী।)

কর্ণুল। মাজ্জার অন্তর্গত একটা জেলা। ইহার উত্তরে
ভূমত্যা ও কুমারদী এবং কুকা জেলা; দক্ষিণে কদপা ও
বেলারি জেলা, পূর্বে কুকা ও নেঙ্গুর জেলা এবং পশ্চিমে
বেলারি জেলা। সদর থানা কর্ণুল।

কর্ণুল জেলার নরমলর ও ঘেরমলর নামে দুই পর্বতশ্রেণী
ঠিক মধ্যস্থল দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। নরমলর এ জেলার
মধ্যে উত্তর দক্ষিণে ৭০ মাইল। ইহার বিস্তার স্থানে স্থানে
প্রায় ২৫ মাইল। ঐ পাহাড়ের বিরমকুণ্ড (৩১৪৫ ফুট)
ও ওলা ব্রহ্মকর (৩০৫৫ ফুট) ও কর্ণীহৃতকুণ্ড (৩০৮৫ ফুট)-
নামক প্রধান শিখর এই জেলার অবস্থিত। এই পর্বতের

উপর পাঁচটি মালভূমি আছে, তন্মধ্যে শুওলা-ভ্রম্বের শিখরের মালভূমিই প্রধান, উচ্চ প্রায় ২৭০০ ফুট। এ স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে। বেরমলগশ্রেণী বড় উচ্চ নহে, ইহার শিখরদেশ প্রায় সমতল, ইহার সর্বোপেক্ষ উচ্চতা ২০০০ ফুট মাত্র। এই দুটি পর্বতশ্রেণীতে সমস্ত জেলা ৩টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। পূর্বাংশের নাম কন্ত উপত্যকা; এ অংশ পর্বতময়। পর্বতগাত্রে অনেকগুলি ধান আছে। হিম্মুরাজগণের সময়ে এই সকল সরোবরের মধ্যে কন্ত সরোবর অতি মনোহর ছিল। শুওলাকান্না নদীতে বাঁধ দিয়া এই সরোবর নির্মিত। কন্ত উপত্যকা হইতে নন্দিক নামক পর্বতের মণ্ডলগিরিবন্ধ দিয়া মধ্যাংশে পড়িতে হয়। এই মধ্যাংশ অতি বিস্তৃত।

এখানে ভবনাশী নদী—উত্তরে ও কুম্ভকর নদী দক্ষিণ-ভাগে প্রবাহিত। এই অংশের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া মাস্ত্রাজের জলপ্রবাহ খাল খনিত হইয়াছে।

পশ্চিম অংশে উত্তরদক্ষিণে হিজ্রি নদী প্রবাহিত। ইহা ভূতভ্রমায় পতিত হইয়াছে। যেখানে ভবনাশী নদী কুম্ভকর পতিত হইতেছে, সেই স্থলে সঙ্গমেশ্বর নামক তীর্থ অবস্থিত। এই সঙ্গমেশ্বর তীর্থের নিকটে একটি “বুর্জিল” আছে, তাহাও পবিত্র “চক্রতীর্থ” নামে খ্যাত।

এই স্থানে নরমলর পর্বতে “চিফু” নামক অসভ্য জাতির বাস। ইহারা “গুদেম” নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বাস করে। এক একটি গুদেমে নানা জাতীয় চিফু থাকে। ইহারা বীর অধিকৃত পর্বতজাত দ্রব্য প্রভিষাদী-দের দিয়া অপর দ্রব্যাদি লয়। কন্যা বিবাহের যৌতুক স্বরূপও কিছু কিছু দেয়। ইহারা চাষ করিতে ভালবাসে না। নিম্নভূমির লোকেরা ইহাদিগকে ক্ষেত্ররক্ষণ কার্যে নিযুক্ত করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে “ষাট তালিরাড়ি” বা রাত্তার চৌকীদার নিযুক্ত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে জঙ্গল রক্ষা করে বলিয়া ইনাম (নিফর) অসী ভোগ করে। ইহাদের ভাষা ভৈলকের অপভ্রংশ।

কর্ণুলের এই তিনটি স্থান প্রধান, ১ কন্তম্, ২ কর্ণুল, ৩ নন্দিয়াল।

পূর্বে এই জেলা বরঙ্গুলের তৈলঙ্গরাজের অধীন ছিল। বরঙ্গুল রাজবংশের অধঃপতন হইলে কর্ণুলের রাজা দীপ্বর নামের পুত্র নরসিংহ রায়কে বিজয়নগরের রাজা গ্রহণ করেন। এই সময়ে কর্ণুলে একটি হর্গ নির্মিত হয় এবং এই স্থান রামরাজাকে জারগীর দেওয়া হয়। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বিজয়নগর তালিকটের যুদ্ধে বিজয়পুরের সুলতানের

নিকট পরাস্ত হইলে কর্ণুল বিজয়পুর রাজ্যের সানীল হয়। বিজয়পুরের মুসলমানরাজ আবদুল বহাব নামক একজন হাবসীকে এই কর্ণুলজেলা জারগীর দেন। জারগীরদার এখানকার প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরগুলি তাদিরা তথায় মসজিদ নির্মাণ করেন।

১৬৫১ খৃঃ, আরজলিব কর্ণুল জয় করিয়া বিভিন্ন খাঁ নামক একজন পাঠান সেনানীকে তাঁহার যুদ্ধকার্যে সন্তুষ্ট হইয়া এই স্থান প্রদান করেন। বিভিন্ন খাঁ আপন পুত্র দায়ুদের হস্তে নিহত হন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র ইব্রাহিম খাঁ ও আলিক খাঁ ছয় বৎসর ধরিয়া এই স্থানে রাজত্ব করেন।

আলিকের পৌত্র হিম্মত খাঁ বাহাদুর হায়দরাবাদের নিজাম নাজির জঙ্গের সহিত কদপা ও সুবগীর নবাবের বিরুদ্ধে কর্ণাটক অভিযুগে যাত্রা করেন। নাজিরজঙ্গ নবাব-দিগের হস্তে গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তাঁহার জাতপুত্র দক্ষিণের সুবাদার হইলেন। কিন্তু তিনিও পাঠান নবাব-দিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে না পারায় হিম্মত বাহাদুর তাঁহাকে বধ করেন, পরে তিনিও একজন সৈনিকের ক্রোধে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। সলাবৎ জঙ্গ দক্ষিণের সুবাদার হইলে হিম্মত খাঁর জাতা সুনাবর খাঁ রীতিমত টাকা দিয়া পুনরায় কর্ণুল জেলা জারগীর পাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে হায়দরআলী কর্ণুল আক্রমণ করেন এবং ২ লক্ষ গড়-বল টাকা লুট করিয়া লইলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই জেলা কদপা ও বেলারির সহিত ব্রীটশ শাসনাধীন হইল। এখানকার জারগীরদার প্রতিবর্ষে ১ লক্ষ পড়-বল টাকা কর দিয়া আসিতেছেন।

কর্ণুলজেলার ভূ-পরিমাপ ৭৭৮ বর্গমাইল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের গণনায় এখানকার লোকসংখ্যা ৭০২০০৫।

কর্ণেচুরচুরা (জী) কর্ণে চুরচুরা মন্ত্রণাকথনং নিপাতনাং সিদ্ধং (পাঠ্যে সমিতাদয়শ্চ। পা ২। ১। ৪৮।) কাণেকাণে মন্ত্রণা বা পরামর্শ করা।

কর্ণেজপঃ (জি) কর্ণে জপতি, অগ্রকাশং যথাতথা অহুচিৎ প্রবোধয়তি; কর্ণে লগিষা পরাপকারং বদতি বা; অলুচ্ সমাসঃ। ১ গোপনে উচিত বিষয়ে পরামর্শদাতা। ২ পরের অনিষ্টবিষয়ক মন্ত্রণাতা; ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—হুচক, শিত্তন, হর্জন ও থল। এই সকল নাম মধ্যে কর্ণেজপ ও হুচক পরের অপকারবাদী; শিত্তন, হর্জন ও থল পরস্পরে ভেদকারক।

কর্ণেটিরিটরা (জী) নিপাতনাং সিদ্ধং (পাঠ্যে সমিতাদয়শ্চ। পা ২। ১। ৪৮।) কাণেকাণে মন্ত্রণা বা পরামর্শ করা।

কর্ণোৎপল (পুং) কর্ণোঃ কর্ণে বা ইন্দ্রিয, উপনিঃ। কর্ণাপু,
অক্ষিপ্ণকর্ণ কর্ণের গহনাবিশেষ।

কর্ণোৎপল (স্ত্রী) কর্ণহিতমুৎপলঃ বধ্যলোঃ। ১ কাটিল যে
পল্ল ধারণ করা হয়। ২ (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

কর্ণোর্ণকর্ণিকা (স্ত্রী) কর্ণদ্বিপকর্ণো হস্ত্যন্ত, কর্ণোপকর্ণ-ত্ন
টাগ্ন-অন্ত ইত্য়ম্। কাণ্যকর্ণি। (“প্রাণেব কর্ণোপকর্ণিকয়া
প্রতাপবাদ স্মৃতিত দ্বয়ঃ।” পঞ্চতন্ত্র।)

কর্ণোর্ণ (পুং) কর্ণে উপাধিকং লোম বন্ত, বহুব্রী। বৃণবিশেষ।
“(কর্ণোর্ণৈকপদধাতো নিবৃত্তে বৃকনান্তিভিঃ।” ভাগ ৪।৬।২০।)

কর্ণ্য (ত্রি) কর্ণে ভবঃ, কর্ণ-যৎ (শরীরাবয়বাক্ষ)। পা ৪।৩।৫৪।

১ কর্ণ হইতে উৎপন্ন মলাদি। ২ (কর্ণ্যি বৎ) ভেদের যোগ্য।

কর্ত্ত (পুং) কর্ত্ত-ভাবে অণ্। ১ ভেদ।

(“সম্যক্ত নিরম্য যতরো বমকর্ত্তহেতি।

অহঃ পরাভিব নিগানধনিজমিভঃ।” ভাগ ২।৭।৪৮।

‘কর্ত্তোভেদঃ ভিন্নরাসো হকর্ত্তঃ।’ ত্রিধর। ২ (কর্ত্তয়তি
ভিনতি, কর্ত্ত-অণ্। (ত্রি) ভেদক, ভেদকারী।

কর্ত্তন (স্ত্রী) কর্ত্ত-ভাবে লুট্। ১ ছেদন, কাটা। ২ খুঁটা কাটা,
খুঁটা তৈয়ার করা। (কর্ত্তনং ন বয়োহ্লেদে নারীগাং খুঁজ
নির্শিভে।) যেদিনী) ৩ শিথিল করা। ৪ (করণে লুট্)
কাটিবার অস্ত্র। ৫ (কর্ত্তরী ল্য) ছেদকারক।

কর্ত্তনী (স্ত্রী) কর্ত্তন-ভোগ্য। কাটিবার অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

কর্ত্তরি (স্ত্রী) কর্ত্ত-ইন্। কাটিবার অস্ত্র, কাটারি বা কাটারি
[কর্ত্তরী দেখ।]

(“কুরকর্ত্তরি সংদশৈ স্তত্ রোমানি নির্হিরেৎ।” অশ্বত্।)

কর্ত্তরিক (স্ত্রী) কর্ত্তরী-স্বার্থকন্টাগ-ব্রহ্মশ্চ। কাটিবার
অস্ত্রবিশেষ, কর্ত্তরী।

কর্ত্তরী (স্ত্রী) কর্ত্ততি, কর্ত্ত-অর-ভীষ্; যবা কর্ত্তং রাসি, কর্ত্ত
রা-ক (আতোহমুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩।) ১ কর্ত্তপাণী।

২ কাতি, সোণার-পাত কাটিবার অস্ত্র। ৩ কাঁচি, চুল প্রভৃতি
কাটিবার অস্ত্র। ৪ কাটারি। ৫ যোগবিশেষ, জ্যোতিষশাস্ত্রে
লিখিত আছে,—“কুরমধ্যগতশ্চজ্ঞে। লয়ঃ বা কুরমধ্যগঃ।

কর্ত্তরী নাম যোগোহয়ং কস্তানিধনকারকঃ।”

চক্ষ অথবা লয় কুররাসির অর্থাৎ প্রথম তৃতীর গুরু
সপ্তম নবম ও একাদশ রাশির মধ্যগত হইলে কর্ত্তরী নামক
যোগ হয়। এই যোগ কস্তার নিধনকারী।

কর্ত্তরীয় (পুং) বৃকবিশেষ; এই বৃকের বকল, লায় ও
নির্ধাস বিষয়।

(“অন্নপাচক কর্ত্তরীসৌরীয়করবাটকরস্তনন্দন-

বরাটকানিগন্ত বৃক্শারনির্ধাসবিধাণি।” অশ্বত কর্ত্ত ২ অঃ।)

কর্ত্তব্ (দেশজ) গীতাদিতে সুরের, নানা প্রকার কোশল
দেখানকে কর্ত্তব্ বলে, ইহার সংস্কৃত নাম কর্ত্তব্য এবং
হিন্দি নাম ‘কর্ত্তব্’। কর্ত্তব্ করিবার সময় রাগভ্রষ্টকর
কোন সুর (বিবাদী সুর) ব্যবহৃত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক
হওয়া উচিত।

কর্ত্তব্য (ত্রি) কর্ত্তং যোগ্যঃ, ক-যোগ্যদ্ব্যর্থতঃ। ১ করিবার
উপযুক্ত (“হীনসেবান কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যো মহাপ্রভুঃ।” হিতোপঃ)
২ (স্ত্রী) কার্য। ৩ ছেদ্য, কাটিবার উপযুক্ত।

কর্ত্তব্যতা (স্ত্রী) কর্ত্তব্যন্ত ভাবঃ, কর্ত্তব্য-তন্ (তন্ত ভাব
স্বভলো। পা ৫।১।১১৯)-টপ্। বিধেরতা।

কর্ত্তা (পুং) করোতি স্বভতি সম্পাদয়তি বা, কৃত্-তুচ্ (বুল-তুটো।
পা ৩।১।১৩৩।) ১ ব্রহ্মা। ২ কর্মসম্পাদক; এই
কর্ত্তা পাঁচ প্রকার,—হেতু কর্ত্তা, প্রয়োজক কর্ত্তা, অনুমন্তা
কর্ত্তা ও গৃহীতা কর্ত্তা।

ন্যায় মতে, ক্রিয়াকৃতি বাহাতে সমবায় সমক্ষে থাকে,
তাহাকে কর্ত্তা বলে। বেদান্তপরিশ্রাব্য মতে, যিনি উপাদান
বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান চিকীর্ষা এবং কৃতিমান্ তিনিই কর্ত্তা।
যথা—ঘটের প্রতি কুস্তকার। ভামতী মতে, ইতরকারক
দ্বারা প্রেরিত না হইয়া যিনি সকল কারকের প্রয়োজক
(প্রেরক) তিনিই কর্ত্তা।

কর্ত্তা শুণাধুন্যে ত্রিবিধ হইয়া থাকে—সাত্ত্বিক, রাজস
ও তামস। মুক্তসদ, নিরহঙ্কারী, ধৈর্যশালী, উৎসাহী
এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার পুরুষ সাত্ত্বিক কর্ত্তা।
রাগী, কর্ম্মকলাকাজী, লুভ, হিংস্র, অন্তি, এবং হর্ষশোকাদি-
বৃত্ত পুরুষ রাজস কর্ত্তা। আত্মজ্ঞান লাভে নিশ্চেষ্ট, শঠ,
প্রতারণ, অলস, বিষভোজী, দীর্ঘস্থলী ও শুকপ্রকৃতি পুরুষ
তামস কর্ত্তা। ৩ প্রভু। ৪ অধ্যক্ষ। ৫ মহাদেব।

(“ক্রোধহা ক্রোধকং কর্ত্তা বিশ্ববাহুমহীধরঃ।”

ভারত ১০।১৪৯।৪৭।)

কর্ত্তাভজা—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। এই
সম্প্রদায়ী লোকনিগের ব্যাখ্যামুসারে একেশ্বরবাদী লোকে-
রাই প্রকৃত কর্ত্তাভজা, অর্থাৎ ‘কর্ত্তা’ ঈশ্বর, তাহাকে ভজনা
করে যে সেই ‘কর্ত্তাভজা’। এই সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ প্রথম
মত-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকের নাম আউলিয়া চাঁদ। মত-
প্রতিষ্ঠাতা আদিপুরুষের এই নামটি বোধ হয়, এতৎ
সম্প্রদায়ী লোকেরা তাহার উপাধি স্বরূপ রাখিয়া থাকিবেন,
এটি তাহার প্রকৃত নাম নহে।* আউলিয়া চাঁদের আবির্ভাব

* আরবী ভাষার ‘আউল’ শব্দে ‘আদি’ বুঝায় এবং ‘আউলিয়া’
শব্দে হাদিসে ‘সিদ্ধপুরুষ’কেও বুঝাইয়া থাকে।

ভিরোভাব ও ধর্মপ্রচার বিষয়ে উক্ত সম্প্রদায়ী-লোক-দিগের মধ্যে বিভিন্ন শাখাবলম্বীর নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপ আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। রামাহুজ, কবীর, দাহ ও নানকাদি ধর্মগুরুদিগের যেমন লিখিত গ্রন্থ ও পদ্ধতি আছে, এ সম্প্রদায়ীদিগের তজ্ঞা কিছুই নাই; তবে ইহাদিগের মধ্যে যে পুরুষপরম্পরাগত জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, তাহা অবলম্বনপূর্বক উক্ত ধর্মপ্রচারকের অনেক পরে কোন কোন লেখক এবং উপাসক-সম্প্রদায়-সংগ্রাহক ইংরেজী ও বাঙ্গালাভাষায় যথাক্রমে উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সে সমস্ত লেখা যে কতদূর সমূলক ও প্রামাণিক তাহা সংশয়-শূন্য হইয়া বলা কঠিন। ঐ সমস্ত আখ্যানের মধ্যে যে কোন্টি সত্য ও কোন্টি মিথ্যা তাহাও স্থির করা সম্ভব নহে।

এই আউলিয়াচাঁদ যে স্বয়ং জৈবরের অবতার একথা তৎ-সম্প্রদায়ী সকল লোকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহার বলেন যে, শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব অন্তলীলার শেষ-ভাগে ক্ষীর-চোরা গোপীনাথের * মন্দিরে অপ্রকট হইয়া † অলঙ্ক্যে সন্ন্যাসীর বেশে আনোরপুর পরগণার “ঘোলা চুবলী” নামক স্থানে আসিয়া কিছুদিন প্রজ্ঞাভাবে কালাপান করেন। অনন্তর তথা হইতে উলাগ্রামে মহাদেব বাকুইয়ের বরজে বালকবেশে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না, তিনি ঐ অজ্ঞাতকুললীল বালকটিকে পাইয়া বহুদিন পুত্রনির্কিংশেবে প্রতিপালন করেন। কথিত আছে, আউলেচাঁদ ১২ বৎসরকাল ঐ মহাদেব বাকুইয়ের ঘরে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে ছলক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এক গন্ধবগিকের গৃহে কিছুদিন থাকেন, পরে একজন ভূ-স্বামীর ভবনে ১১ বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। অনন্তর বাঙ্গালার পূর্বাংশে কোন কোন স্থানে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়স্কের সময় বেজড়া নামক একখানি

* বাঙ্গালার স্থানে স্থানে একটি জনশ্রুতি আছে যে, একদিন গোপীনাথ-বিগ্রহের শ্রীমন্দিরে সমাগত অতিথির মধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী নামক একটি বালক উক্ত বিগ্রহের বৈকালিক জলপানের ক্ষীর খাইবার জন্য অভিলষী হন, তজ্জবৎসল গোপীনাথ ভোগের খাল হইতে এক কটোরা ক্ষীর চুরী করিয়া ষড়ার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখেন; পরে সেবাইতগণকে প্রত্যাদেশ করেন যে মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য এইরূপে ক্ষীর চুরী করিয়া রাখিরাছি, তাহাকে ডাকিয়া বাও। সেবাইতেরা প্রত্যাদেশ পাইয়া ঘোষণা করিলেন, “কে আছে ভক্তমধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী।

তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করেছেন চুরী।”

† চৈতন্য সম্প্রদায়ীদিগের মতেও এইরূপ একটি প্রবাদ আছে,—

“কি করিব কোথায় বাব বচন না সরে।

গোরাটাবে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।”

গ্রামে অতিবাহিত করেন। এই স্থলেই ক্রমে পঞ্চাশিভিত্ত ২২ জন শিষ্য তাঁহার অহুচর হন;—১ নরন, ২ লক্ষীকান্ত, ৩ হট্ট বোষ, ৪ বেচু বোষ, ৫ রামশরণ পাল, ৬ নিত্যানন্দ দাস, ৭ খেলারাম উদাসীন, ৮ কৃষ্ণদাস, ৯ হরি বোষ, ১০ কানাই বোষ, ১১ শঙ্কর, ১২ নিতাই বোষ, ১৩ আনন্দলাল গোসাই, ১৪ মনোহর দাস, ১৫ বিষ্ণু দাস, ১৬ কিষ্ক, ১৭ গোবিন্দ, ১৮ শ্রীম কঁাসারি, ১৯ ভীমরায় রজপুত, ২০ পাঁচু কইদাস, ২১ নিধিরাম বোষ ও ২২ শিগুরাম। এই বাইশ জন শিষ্য সম্বন্ধে কর্তৃত্বজ্ঞাদিগের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য বচন প্রচলিত আছে; যথা,—“আউলে চাঁদ দোয়া গরু, সঙ্গে বাইশ ফকীর বাছুর তার।” এই বিষয়ে একটি অপূর্ব গীতও শুনিতে পাওয়া যায়;—

“এ ভাবের মাধু্য কোথা হৈতে এলো।

এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বলো ॥

এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একটি মন,

বাহ তুলি কল্ল প্রেমে ঢলাঢল ॥

এ যে হারা দেওয়ার, মরা বাঁচার, এর ছকুমে গলা শুকালো ॥” *

কথিত আছে, আউলেচাঁদ চাকদহের নিকট পরারী নামক স্থানে বহুকাল বাস করেন এবং ১৬৯১ শকে বোয়ালে নামক গ্রামে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎকালে তাঁহার বাইশজন শিষ্যের মধ্যে রামশরণ ও হট্টবোষাদি আটজন প্রধান শিষ্য সেই স্থানেই তাঁহার কহ্মার সমাজ দিয়া দেহটিকে লইয়া পরারী গ্রামে গমন করেন এবং সেই-স্থানে তাহা সমাহিত করেন।

যদিও আউলেপ্রভুর ২২ জন শিষ্য থাকার কথা কর্তৃত্বজ্ঞাদিগের পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এক্ষণে এক রামশরণ পালের বংশ ও প্রচারিত মত ভিন্ন অন্য কাহারও বংশের বা পিতামাতার নাম ধাম ও পরিচয় কি, তাহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন কথা জানিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না।

এই রামশরণ পাল সদোপাখ্যাতীয় একজন গৃহস্থ। চাকদহের নিকট জগদীশপুর গ্রামে ইহার বাস ছিল। ইহার

* কর্তৃত্বজ্ঞাদিগের মধ্যে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, ১৬৬৪ শকে বঙ্গদেশে বর্গীর হাঙ্গামের সময় আউলেচাঁদকে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বেগার ধরিলেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকট চন্দ্রহাটীর বাটে ধীর কমণ্ডু মধ্যে গজাকে পুরিয়া লইয়া খড়ম পায়ে দিয়া জলশূন্য পথিল গজাণ্ড পার হইয়া চলিয়া বান। আউলে কর্তার কমণ্ডুগৃহিত সেই গজাঙ্গল আজিও বোম্বাড়াইর পালদিগের বাড়ীতে আছে। সেই জল দ্বারা লোকের সকল কামনা পূর্ণ ও সকল দার হইতে মজিলাত হর বলিয়া কর্তৃত্বজ্ঞারা বিশ্বাস করে।

পিতার মার নন্দ ঘোষ। গৃহস্থের নিয়মামুসারে ইহার পিতা প্রথমতঃ চাকদহের নিকটই অগপুয় গ্রামের শিবঘোষের কন্যা গৌরীর সহিত ইহার বিবাহ দেন; এবং সেই গৌরীর গর্ভে রামশরণের ত্রৈলোক্যমোহিনী ও অগস্ত্যিণী নামে দুইটা কন্যা হয়। কিছুদিন পরে রামশরণের এই দুই কন্যা ও পত্নী মৃত্যুরূপে পড়িলে, তিনি স্বীয় অজ্ঞান অগপুয়-পুরের নিকট গোবিন্দপুর-গ্রামবাসী গোবিন্দ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যার নাম সরস্বতী। এই সরস্বতীই দেহান্তের পর “সতী মা” নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। সরস্বতীর গর্ভে রামশরণের “রামজলাল” নামে এক পুত্র এবং “অন্নদা” ও “ভবানী” নামে দুই কন্যা হয়। সরস্বতীকে বিবাহ করিবার অতি অল্প দিন পরেই রামশরণ বিষয় কার্যের প্রাধান্য নদীরা জেলার অন্তর্গত মুরতিপুর গ্রামে আসিয়া নিজ কুইথ কাটুদিগের বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকেন। তথাকার অমীদার বেনাপুরের খাঁ রাজদিগের বংশোদ্ভব রায় রায়ান দেওয়ান পদলোচন রায় বাহাদুরের বাড়ীতে অতিথিসেবার একটি চাকরী প্রাপ্ত হন। এই কর্মে স্বীয় প্রভুর সন্তোষ ও বিশ্বাসজনক কার্য করায় “বিশ্বাস” উপাধি লাভ করেন। অনন্তর তাঁহার প্রভু তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে উচ্চ পদপাশর একটি মহালে নাএব নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কথিত আছে যে, এই স্থানেই আউলেকাদের সহিত রামশরণের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয়। রাম পূর্ব হইতেই অতিথিতত্ত্ব, সাহিত্যিক ও পরমার্থপ্রিয় লোক ছিলেন। এই স্থলে গমনের অল্পদিন পরেই তাঁহার আতিথেয়তার বশ সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং সর্বদাই নানা প্রকার অতিথি অভ্যাগতের সমাগম হইতে লাগিল।

একদা রামশরণের কাছারী বাড়ীতে একজন মহাপুরুষের সমাগম হইল। যথাসময়ে মহাপুরুষ স্নানে গেলেন। এমন সময়ে তৈলমর্দন করিতে করিতে রামশরণ পূর্বসংকীর্ণ শূল-বেদনার মুহূর্ত্তে হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষ স্নানান্তে তথায় উপস্থিত হইয়া রামশরণের মুহূর্ত্ত ও হৃদয় দেখিয়া পরিচারক-বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আত্মোপাশ্রয় সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া আপনায় কমণ্ডলু হইতে বৎসিকিৎ জল লইয়া রামের চক্রে প্রক্ষেপ ও মূখে দিব্যমাজ রান চৈতন্তপ্রাপ্ত ও বস্ত্রাশ্রিত হইয়া উঠিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাধুর প্রতি রামের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তি হইয়া উঠিল। এদিকে মহাপুরুষ স্নানান্তে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া যে ধ্যানস্থ হইয়াছেন, সে ধ্যানের আর ভঙ্গ নাই, সমস্ত দিব্য অবলম্বন হইল, তথাপি কোন সাড়া শব্দ নাই, রামশরণের

স্নানান্তের নাই, সন্ধ্যার পর গৃহের বহির্ভাগে রাম একটি শীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া বসিয়া ও আগনি একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাজি দুইগ্রহর অতীত, বাসার সমস্ত লোক নিদ্রিত, কেবল রাম একাকী জাগ্রত, এমন সময় মহাপুরুষ ঘরের দ্বার মুক্ত করিয়া কমণ্ডলু হস্তে তথা হইতে চলিলেন। রামও তাঁহার পশ্চাৎ দৃষ্টি হইলেন। কিরদূর গমন করিয়া মহাপুরুষ এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, রামশরণও অল্পগমন করিলেন। রামের গমনের শব্দে মহাপুরুষ পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন। তখন রামও অমনি তাঁহার পদানন্ত হইয়া পড়িলেন ও কহিলেন যে ‘ঠাকুর আমাকে কৃপা করিয়া সতী করুন, আমি সেবার নিযুক্ত থাকিব।’ ঠাকুর কহিলেন, “আমি উদাসীন সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী, বিশেষতঃ তুমি দারপরিগ্রহ করিয়াছ, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। এক্ষণে তোমার সময় হয় নাই। তুমি যথাসময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর এবং আমি যে উপদেশাদি দিই তাহা পালন, যজ্ঞ ও যাজ্ঞপুর্ষক আপনায় ও অন্তের মঙ্গল বর্দ্ধন করা।” এই বলিয়া তিনি রামকে আপন কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিলেন। প্রবাদ আছে যে উপরের লিখিত পালদিগের ঘরে যে গজাঙ্গল আছে সে এই জল। শুনা যায়, তদবধি রামশরণ বিষয়কার্য পরিচর্যা করিয়া মুরতিপুর গ্রামের সন্ধ্যাপপল্লীতে আসিয়া নির্ভর করিলেন এবং ক্রমে স্বীয় মত বিস্তার করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার সম্প্রদায় যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ওদিকে তদমুসারে তাঁহার দিন দিন ধনাগম বৃদ্ধি হইয়া সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। মতাবলম্বী লোকেরা বলেন যে, তখন আউলিয়া চাঁদ বাফকীর ঠাকুর রামের এই ভবনে আসিয়া অনেক দিন ছিলেন। তিনি অতি দীর্ঘকায় ও অজাহ্ন লম্বিত বাহ ছিলেন। ফলমূল ও লতাপাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। কর্তৃত্বজাদিগের মধ্যে তাঁহার অনেক অলৌকিকী শক্তির কথা প্রচলিত আছে। অন্ধের নয়ন, খঞ্জের চরণ, কুষ্ঠাদি উৎকট রোগের আরোগ্য সাধন, অপুঞ্জের পুঞ্জ, দরিদ্রের ধন, মৃতের জীবন-দান ইত্যাদি অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য দেখাইয়া তিনি স্বীয় মতাবলম্বী লোকদিগকে বিমোহিত করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বহুতর ব্যক্তিকে আপন মতে আনিয়া ছিলেন। প্রবাদ যে তাঁহার প্রসাদে তথায় রামশরণও এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন ও এই সামান্ত সন্ধ্যাপপল্লী মুরতিপুর গ্রামের ঘোষপাড়া অল্প দিনের মধ্যে বহুবিখ্যাত হইয়া উঠিল। এই স্থানেই তাঁহার পুত্র রামজলালের জন্ম হয়। রামশরণের

পর রামচন্দ্রলালও কর্তৃত্বজ্ঞা মতেই ভারী উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি স্বতাবতঃ বড় বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন এবং নীতিমত পারদ্র তাবা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সকল প্রকার লোকের বোধশক্তি সামান্য সামান্য ভাষায় ন্যূনাধিক সাত আট শত গীত রচনা করেন, ঐ সমস্ত গীতের নাম "ভাবের গীত"। কিন্তু তাহার মধ্যে সকল গানের ভাব বোধ হয় কোন মতাবলম্বী কর্তৃত্বজ্ঞাও বুঝিতে কি বুঝাইতে পারেন না। তাহার মধ্যে কোন গীত প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রাভিপ্রায়, কোন কোন গীত মুসলমানদিগের সুকী সম্প্রদায়সিদ্ধ এবং অনেক গীত রচয়িতার নিজের অভিজ্ঞতা। যদিও ঐ সমস্ত গীত বহুবর্ণপুর্নক একত্র সংগৃহীত হইয়া বহুকালের পর এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি পাঠকগণের অবগতির জন্য এ স্থলে আমরা দুই চারিটি গীতের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম—

১। আদি অবধি জলে কিরি।

জীব তরায় যে থাকি কেউ থাকে না বাকি,
একাকী পেতে ভগ্নতরি।

এই গীতের স্থানান্তরে 'কল্পপত্রী' অদিতি দিতি দুই সতীনে, পতিসহ... করে দেবানুরাগণে, সেই কল্পপত্রীর উৎপত্তি বিধির যোগেতে, তিনটি বিধির উৎপত্তি সেই ঋণের নিধি নিরঞ্জন হতে, এই নয় পুরুষের মধ্যে যারা আছে হয়েছে স্বর্গের অধিকারী।

আমি পরিচয় দিলে সকলে বলে কথার কথা—

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল হৃদ যত প্রকৃতি সবাই আমার মাতা * * *

২। ডাক্টি পার হব বলে ও ছেলে মুখ তুলে তাকাও।

পুরাতন তরি পেতে, কেয়ালখান করেছ ডান হাতে,
এই নদ নদীতে পার করিতে লোকটা পেছে কত চাও।

তোমার আচ্ছা মাল্য থালা পরসা বাহের বাছ দেখে,
ঠাউরে ঠাউরে স্নান করি দিবো তোমাকে,
আমি স্নান করি স্নান। দেবী স্নান তরি ভিজিয়ে দাও।

তাইরে অশ্রুস্ত বস্ত্র শাও যেখানে,

ভেবেছে জনকত লোক তারা চলে যাবে সেখানে;

তার অবধি, ভবজলধি আদ্য নদীপার,

ধবর পেয়ে এলে খেয়ে সেই জলধির ধার,

জলের খেরা দেখে বল্লে ডেকে তরিতে কে খিরে চাও।

ডাক্টি পার হব বলে ও ছেলে মুখ তুলে তাকাও।

৩। ভাবের ভাবের তার চরণ।

ও যার নাম করিলে হয় সকল জালা নিবারণ।

তুমি বারেক ভবে দেখো,

মহা না পাও বুঝে বুঝে কান্ত হয়ে থেকো,

সেই দীন দীনগণ জনার মনোরঞ্জন।

যে জন ইন্দুরসের পেয়েছে সন্ধান,

অপ্রভাগ হইতে ক্রমে করে রসপান,

তেমনি ক্ষীণ হতে হতে, হৃৎ পাবে অতিশয় নানা-নো মতে
ও ভাই! এই দীন দীন জনগণার মনোরঞ্জন।

৪। এই জন্মে মন করে বুৎ বুৎ।

তিনি গড়েন যত ধর তার বাড়ি বাড়ি বেগুড়ে যত।

আমি সোদাতে বাই ঘরানির বাড়ি,

শুনতে পাই তার হাত কামাই নাই একবাড়ি,

তাইরে, সে ধর উড়য়ে নে যায় পঙ্কজতল।

এই সমস্ত গীত প্রাচীন কবিগুণালিঙ্গের সুরে গীত হয় এবং তাহার স্রায় ইহার চিত্তেন, মহড়া, কলি, পরকলি ও পর-চিত্তেন ফুকে প্রভৃতি সমস্ত শাখা প্রশাখা আছে। প্রকৃত বাহুল্যের অশঙ্কার ভাবং বিস্তৃতরূপে না দিয়া নমুনা স্বরূপ আমরা এই দুই চারিটি গীতের এক এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বর্তমান কর্তৃত্বজ্ঞা মতাবলম্বীরা রামচন্দ্রলালের রচিত এই গীতগুলিকে 'শাস্ত্র' বলিয়া মান্য করে এবং ইহার মধ্যে যাহার যে গীত ইচ্ছা সে সেই গীতের আলাপ ও আলোচনা করিয়া থাকে। প্রতি শুক্রবার প্রাতে ও সন্ধ্যার পর উক্ত মতাবলম্বীদিগের বৈঠক হইবার নিয়ম আছে এবং তদনুসারে অনেক স্থানে বৈঠক হইয়াও থাকে, ঐ বৈঠকে এই ভাবের গীত সঙ্গীত হইয়া থাকে। রামচন্দ্রলালের সময় অনেক ধনী মানী ও জ্ঞানী লোক উক্ত মতাবলম্বী হইলেন। শুনা যায় কু-কৈলাসের রাজা ৮ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর কোন উৎকট রোগ শাস্তির উদ্দেশে বোম্বাড়া পর্য্যন্ত গমন করিয়া ফল প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত মতাবলম্বী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র পোজাদিবাংপারম্পরার নামের প্রথমে 'সত্য' শব্দ যুক্ত থাকিবার এই মাত্র কারণ। আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি কালীধামে 'গুরুধাম' এই নামে পূণক্ একটি স্থান প্রস্তুত করিয়া রামচন্দ্রলালকে তথায় লইয়া গিয়া ঐ গুরুধামে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একলক্ষ টাকা দক্ষিণা দিতে চাহিয়াছিলেন। তথাপি চন্দ্রলাল স্বীয় গদি ছাড়িয়া তথায় গমন করেন নাই। রামচন্দ্রলাল ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বাঙ্গালা ১২৩৮ কি ৩৯ সালের চৈত্রমাসের কৃষ্ণা অমাবস্যা তিথি বারুগীর দিবস ইহলোক হইতে অবসর করেন।

রামচন্দ্রলালের চারি পক্ষের জ্যৈষ্ঠ গর্ভে পাঁচটি পুত্রসন্তান হয়। ১ রাধানোহন, ২ মধুর, ৩ জুব্বিহারী, ৪ কেশরচন্দ্র,

৫ ইশ্রচ্ছ। হুলাল বর্তমানেই প্রথমতঃ দ্বিতীয়ের প্রাপ্তি হয়। যদিও তাঁহার পরলোক গমনের পর তিন পুত্র বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মাতা কর্তা রামশরণের দ্বী বর্তমান থাকার কোন পুত্রই গদির মালিক না হইয়া স্বয়ং সরস্বতী 'কর্তা মা' ও 'সতী মা' নামে গদিসী হইলেন এবং তাঁহারই কর্তৃত্ব চলিতে লাগিল। যদিও তিনি দ্রীলোক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আমলে উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছিল। তিনি অতি প্রাচীনাবস্থা পর্যন্ত কর্তৃত্ব করিয়া, বাঙ্গালা ১২৪৭ কি ৪৮ সালের আশ্বিন মাসে দেবীপক্ষে প্রতিপদের দিন ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর তাঁহার চতুর্থ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল গদির মালিক হইয়া বহুদিন কর্তৃত্ব করেন। তাঁহার প্রথম কর্তৃত্ব সময়ে সম্প্রদায়ের অবস্থা পূর্ববৎই ছিল। অনন্তর কতকগুলি অসৎ লোকের কুসংসর্গে তাঁহার অসৎ প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া তদনুরূপ কার্যের ঘটনায় বোম্বপাড়ার ঘর একেবারে ছারখার হইয়া গেল, এক্ষণে আর সে শ্রী নাই, সে শোষ্টব নাই, সে সাধিক ভাব নাই, সে হরিসংস্কীর্ণন নাই, গুরুব্রাহ্মের মজলিসও নাই, সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের চিত্তরঞ্জন ও মনোমোহনের জন্য কেবল নির্জীব সমাজঘর, ঠাকুর ঘর ও মাড়িমতলা পড়িয়া আছে। আর গোড়ের খালের আড়ংদারদিগের ভায় যাত্রীদিগের পুটলী কাড়াকাড়ি চলিতেছে এবং খানগজীদিগের ভায় দুই পক্ষের মহাশয়গণ লোক সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বকীয় কর্মফল ভোগের জন্য হতমান ও হতশ্রী হইয়া কলিকাতার বড় বেলে কারাবাস পর্যন্ত করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে সম্প্রদায় মধ্যে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধের হইতে হয় নাই এবং অর্থাগমের হানি হয় নাই। সেই জেলখানাতে শত শত লোক গিয়া নানা জাতীয় খাদ্যাদি উপহার দিয়াছে এবং অর্থাকুল্য করিয়াছে। ধন্য ধর্মের কুহক! ধন্য বিশ্বাস! ধন্য ভক্তি! যে কিছুতেই চলিবার কি হেলিবার ছলিবার ও টলিবার নহে। ঠাকুরের বত দুর্দশা ততই মহিমা, ততই লীলার প্রকাশ না হইবে কেন? যখন ক্রাইস্টের জুগপাত, কৃষ্ণের ব্যাধহস্তে মৃত্যু ও দেবরাজের সম্ভ্রান্ত লীলা ও মহিমা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তখন ঈশ্বরচন্দ্রেরই বা অপরাধ কি? ঈশ্বরের জীবদ্দশাতেই তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র রসিকলাল ও সত্যচরণ পালের এক পৃথক্ গদি হয়, এক্ষণে ঐ গদি ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু ঘটনার পর হইতে তাঁহার পৌত্র হরিনাথ পালের আর এক গদি এই দুই গদি প্রচলিত আছে।

রামশরণের পুত্র রামহুলাল যে ভাবেই গীতগুলি রচনা করিয়া যান, ভক্তির কর্তৃত্বজ্ঞা সম্প্রদায়ের আর কোন শিখিত গ্রন্থাদি থাকি প্রকাশ নাই এবং আউলিয়াটার রামশরণকে যে কি মূলমন্ত্র ও উপদেশ প্রদান করেন, তাহাও সংশয়মুক্ত হইয়া জানা যায় না। এক্ষণে উক্ত সম্প্রদায়ী লোকে বা যে কতকগুলি বাঙ্গালাভাষা রচিত বচন পাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেগুলি যে মত-প্রবর্তকের মুখ-বিগলিত হইয়া তদবধি পুরুষপরম্পরারূপে চলিয়া আসিতেছে, কি ক্রমে উক্ত সম্প্রদায়-সিদ্ধ মহাপুরুষেরা ইহাও আবশ্যক মত সময়ে সময়ে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা স্থির করা বড় কঠিন। এক্ষণে তাঁহাদিগের দলে পরমার্থ-সাধনের ও আচারানুষ্ঠানের যদিও নানাপ্রকার বিভিন্নতা জন্মিয়াছে, কিন্তু বীজমন্ত্র ও মূলতত্ত্ব বিষয়ে কোন অসৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। যথা বীজমন্ত্রের মূল মন্ত্র "গুরু সত্য।" কোন ব্যক্তি উক্ত সম্প্রদায়ভূক্ত হইতে চাহিলে প্রথমতঃ সে ঐ মূলমন্ত্র পায়। যখন উহাতে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অধিকতর ধারণা শক্তি হয়, তখন সে "কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার তুমি আমার, তোমার হুখে চলি কিরি, তিলার্ক তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু" (এই মন্ত্রের প্রকারান্তর শুনা যায়। যথা, "কর্তা আউলে মহাপ্রভু তোমার হুখে চলি বলি, যা বলাও তাই বলি, যা খাও-রাও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্ক নহি, গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা") তিনবার এই বোল আনা মন্ত্র পাইয়া থাকে। ইহাদিগের মতে পরজীগমন, পরজ্ঞব্যহরণ ও পরহত্যা সাধন এই তিনটি কায়কর্ম ও ঐ ত্রিবিধ কায়কর্মের ইচ্ছা রূপ মনঃ কর্ম ও মিথ্যা কথন, কটু কথন, বৃথা ভাব ও প্রলাপভাব এই চারি প্রকার বাক্ কর্ম, এই দশবিধ কর্ম নিবেদ। ইহা আউলিয়াটারদের উপদেশ ও আজ্ঞা বলিয়া খ্যাত। ইহাতে বোধ হয় কর্তৃত্বজ্ঞাসম্প্রদায়-প্রবর্তকের উদ্দেশ্য অতি উৎকৃষ্টই ছিল। এই বিষয়ে আর একটি মন্ত্রও আছে, যথা "মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তৃত্বজ্ঞা।" ইহাদিগের মতের মন্ত্রদাতা গুরুর নাম মহাশয়, আর শিষ্যের নাম বরাতি *। কোন মহাশয় যখন কোন বরাতিকে উপদেশ দেন, তখন তাহাকে মূলমন্ত্রের সঙ্গে উক্ত প্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ী লোক পরস্পর যখন কথাবার্তা করিয়া থাকেন, তখন তাহাতে অন্তের দস্তম্ভুট করা বড় কঠিন। ভার মধ্যে অনেকগুলি

* বরাতি অর্থাৎ যে দ্বার বরাতে পড়ে সে তার বরাতি মাত্র নচেৎ মূল গুরু সেই কর্তা।

ভেঁড়টারের মত লোকভিত্তিক শব্দ আছে। তত্ত্বাবধানিগের যেমন চৌকি বলিলে মাকুকে বুঝায়, তেমনি ইহাদিগেরও তোমার বলিলে আমার বুঝায়। যথা, ভোঁয়ার ঘেটকের দোব হইরাছে অর্থাৎ আমার চকের দোব হইরাছে। ইহার। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করাকে 'হাটা' বলেন। যথা, তুমি কি কালি তথায় হাঁটিবে অর্থাৎ গমন করিবে। ইহার। আপন আপন বাড়িকে বাসা বলেন, তাহার মর্ম্ম ঘোষপাড়া সমস্ত লোকেরই বাড়ি, আর তাহাদিগের নিজ নিজ বাসস্থান কেবল বাসা মাত্র। উক্ত সম্প্রদায়ী লোকের নাম ভগবজ্ঞান, তত্ত্বির আর সকল লোকই ঐহিক লোক, কর্তৃত্বজ্ঞারা মৃত্যুকে দেহ রাখা বলে অর্থাৎ জীবাত্মা অমর, তিনি দেহ এখানে রাখিয়া অস্ত্র দেহ ধারণ করেন, ইহাদিগের ধর্ম্মাহুয়ারী সিদ্ধপুরুষের নাম পাত্রসাব্যস্ত। ইহাদিগের জাতিবিচার ও অন্নবিচার নাই, সকল বর্ণের লোকই, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত এ ধর্ম্মগ্রহণ করিবার অধিকারী এবং যে বর্ণের লোকেই হউক, একবার মূলমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক এ ধর্ম্মভুক্ত হইলে ইহার। তাহার সহিত অন্নগান গ্রহণ করিয়া থাকে। মাছুবে মাছুবের সেবা ও পূজা, তত্ত্বির অপর কোন দেব দেবীর আরাধনা বা উপাসনা ইহাদের মতে আবশ্যিক নহে। যদিও পরজীগমন কি গমনের ইচ্ছা পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের সম্পূর্ণ মত বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ; কিন্তু এক্ষণে নরসেবা ও নারীসেবাই এই ধর্ম্মের সর্ব্বনাশের মূল হইয়া উঠিয়াছে। কর্তৃত্বজ্ঞা দলের মধ্যে হিসাব করিলে তিনভাগের অধিক জীলোক ও এক ভাগের নূন পুরুষ। প্রাচীন মহাত্মাদিগের মহাবাক্যের বিপরীত এই সমস্ত নরনারী সর্ব্বদা একত্র সহবাস করায় কর্তৃত্বজ্ঞা ধর্ম্ম দিন দিন হ্রাসাপন্ন হইয়া আসিতেছে।

কর্তৃত্বজ্ঞারা গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে আর আর বস্তু প্রকার ধর্ম্ম আছে, সমস্তই অজ্ঞান, কেবল ইহাই সত্য ধর্ম্ম; ইহার জ্ঞানসাধন দ্বারা মানব আপন আপন ইষ্টদেবকে প্রত্যাক করিতে পারেন। এই প্রত্যাক করণক্রিয়া সকলের সাধ্য নহে, কেহ কেহ নিজ সাধন বলে ইহার অধিকারী হইতে পারেন। এতৎ সংক্রান্ত অনেক কৌতুকাবহ উপাখ্যান আছে, প্রস্তাব বাহুল্যের আশঙ্কায় তদ্বর্ণনে কাস্ত হইতে হইল।

বাহা হউক ত্রিবিধ কারণে এক্ষণে ত্রিবিধ লোকনিগকে ঘোষপাড়া বাইতে হয় এবং তথাকার মতস্থ হইতে দেখা যায়। ১ম, বর্কর ও জীজাতিদিগকে একটা ধর্ম্মরূপ কুহকে বুদ্ধ করিয়া অর্থশোষণ ও ইঞ্জিরচরিতার্থ করণ। ২য়, উৎকট রোগ বা অপর কোন লক্ষ্য হইতে পরিত্রাণ। ৩য়, কর্তৃত্বজ্ঞা

ধর্ম্ম কি ইহা জানিবার কারণ। এই তিন প্রকারের লোকের মধ্যে প্রথম প্রকারের লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দ্বিতীয় প্রকার লোক তাহার কম, আর তৃতীয় প্রকারের লোক অতি বিরল। ঘোষপাড়ার গদির কর্তার এই কয়েক প্রকার আয়ের পথ। ১ খাজনা, ২ ভোগ, ৩ মানসিক। * ঘোষপাড়ার পালবাহুদের বাটিতে এক্ষণে এই কয়েকটি দৈবস্থান আছে, যথা সতীমার সমাজ, দাড়িমতলা, ঠাকুর ঘর; এবং শ্রীমতের স্থান এই স্থানে রামশরণের পুত্র রাম চুলালের খড়ম আছে। পশ্চাৎস্থিত কয়েকটি পক্ষীহে ঘোষপাড়ার ভগ্নতাবলস্বাদিগের সমাগম হইয়া থাকে। ১ম, কান্তগী পূর্ণিমা। এই সময়ে সেখানে একদিনে দোল ও রাসবাজা হইয়া থাকে। সেই দোলঘাটার দোলচৌকী ও রাসাসনে যদিও প্রাক্ত্তে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির বার হইয়া থাকে, কিন্তু শুণ্ডভাবে তাহার পশ্চাতে একটি বালিশের আকারে নিয়ের লিখিত কতকগুলি যন্ত্রকিত পরমপদার্থের অধিষ্ঠান হয়। এই দোলরাস পূর্ব্বই সকলের প্রধান। এই সময়ে ঘোষপাড়ায় সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয় এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর দোকানি পসারি গিন্না নানা জব্যের ক্রয় বিক্রয় করে।

এই উপলক্ষে পালবাহুদিগের বস্তু টাকা আর হয়, বৎসরের মধ্যে কোন পক্ষে তুচ্ছ হয় না।

দ্বিতীয় বৈশাখ মাসে যে পূর্ণিমা হয়, তাহাতে ঘোষপাড়ার রথবাজা হইয়া থাকে। উক্ত রথের উপরও ঐ বালিশ উঠিয়া থাকে। এ সময় বড় অধিক লোকের সমাগম ও ধুমধাম হয় না।

তৃতীয় আষাঢ় মাসের রথবাজার পর চতুর্থী তিথিতে রামশরণ পালের মহোৎসব। ইহাতে গোড় বৈষ্ণবদিগের প্রচলিত রীতামুসারে অধিবাস, মহোৎসব ও পূর্ণমহোৎসব, তিন দিন এই তিন প্রকার মহোৎসব হইয়া থাকে। ইহাতেও বহুতর লোকের সমাগম হয় এবং পালদিগেরও তদনুসার অর্থাগম হইয়া থাকে।

* উক্ত ধর্ম্মবাহীর। বলেন যে, প্রত্যেক লোকের শরীর সেই কর্তার; অতএব তাহাতে যে তুমি বাস কর, তাহারি খাজনা কি কর তোমার অবশ্য দেয়। সতী মা কি ঠাকুর ঘরে যে ভক্তিপূর্ব্বক কিছু ভোগ দেয় তাহার নাম ভোগ, আর কেবল দ্বার উদ্ধারের জন্ত যে বাহা মানিয়া বাস তাহাকে মানসিক বলে।

† শুনা যায় এই সমাজঘরে রামশরণের স্ত্রী সরস্বতীর দেহাবশেষ সমাহিত আছে, এজন্য ইহার নাম সমাজঘর।

‡ দাড়িমতলায় পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র দোতলাঘরের মধ্যে রামশরণের খড়ম, আউলিয়া টানের আশা বাড়ি ও কুছা এবং একটি কোটার মধ্যে রামচুলাল পালের অস্থি ইত্যাদি-কতকগুলি পবিত্র পদার্থ আছে। প্রতি-দিনই তাহার অর্জনা হয়। পূর্ব্বের দ্বাচ ঘরের সমুখে সন্ধ্যার সময় হরি সঙ্গীত হইত, এই ঘরের নাম ঠাকুরঘর।

চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যেও নব। ইহাতে লোকের যত সমাগম হয় না, কেবল পূর্বোক্ত প্রকার মহোৎসবের কার্য হইয়া থাকে।

পঞ্চম কোলাগর লক্ষীপূজা। এই দিনে অনেক যাত্রী ঘোষপাড়া ধামে আসিয়া থাকে এবং পালবাবুদিগেরও কিছু অর্থ লাভ হয়। যদিও কর্তৃত্বাভা মতাবলম্বীদিগের পূর্বোক্ত প্রকার কতকগুলি বিশেষ আচারানুষ্ঠান বিদ্যমান আছে, কিন্তু বাহ্যে হিন্দুধর্মের বিপরীত কোন ব্যবহারই দৃষ্ট হয় না। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা যেমন যত্নপূর্বক আপন আপন বর্ণাচার ও কুলচার রক্ষা করিয়া থাকেন, কর্তৃত্বাভা সন্তানদিগকেও বাহিরে তদ্রূপ করিতে দেখা যায়। যে ব্যক্তির যে বর্ণে উৎপত্তি তিনি সেই বর্ণের সকল ব্যবহারই রক্ষা করিয়া থাকেন। এমন কি ঘোষপাড়ার পালবাবুদিগেরই অজ্ঞাত সন্দোপের স্ত্রীর গুরু ও পুরোহিত থাকা দৃষ্ট হয় এবং যথানিয়মে তাঁহার আসিয়া আবশ্যিক মত, গুরুপুরোহিতের কার্য্য করিয়া যান। পালদিগের বাটীতে আর আর সন্দোপের ন্যায় লক্ষী ও যক্ষীপূজাদি সকল প্রকার পূজা হইয়া থাকে এবং স্বজাতি ও স্ববর্ণের সহিত যথাবিধি বিবাহাদি কার্য্য হয়, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য সাধন জন্য তাঁহার কহিয়া থাকেন যে ব্যবহার ও পরমার্থ দুই সত্য, উভয়কে সমানরূপে পালন ও পূজা করিতে হইবে। ইহার পোষকে ইহাদিগের একটি বচনও আছে যথা “লোকের মধ্যে লোকাচার, সঙ্গুকের মধ্যে একাকার”। পালদিগের বাটীতে কোন উৎকট রোগের কথা দূরে থাকুক, সামান্য সর্দি ধ্রুয়া হইলেও তখন ডাক্তার বৈদ্যের প্রয়োজন হয়। বাহা হউক ধন্য মাহুঘের মন, ধন্য লোকের ভক্তি ও ধন্য ধর্মের কৃষ্ণক।

কর্তৃত্ব (ত্রি) কর্তৃ-ক-ইচ্। বাহা কাটা হইয়াছে।

কর্তৃকাম (ত্রি) কর্তৃং কামঃ অভিলাষো বস্ত, বহব্রী। করিতে ইচ্ছুক, বাহার করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

কর্তৃকা (স্ত্রী) কৃত্ততি ছিনতি, কৃৎ-কৃৎ-স্বার্থে কন্-টাপ্। কৃৎ খণ্ডা, ছোট খাঁড়া। কাটারি।

(“হস্তযুক্তাং ত্রিনেত্রীক কপালকর্তৃকাকরাম্।”

ভট্টশালী শ্রীমাধ্যান।)

কর্তৃকৃত্ত (স্ত্রী) কর্তৃ-কৃত্তাঃ, কর্তৃ-কৃ (ভট্টশালী বহুব্রীতলৌ। পা ৫।১।১১১) কর্তার ধর্ম।

(“ন কর্তৃকং ন কর্মণি লোকস্ত স্মৃতি প্রভূঃ।” গীতা ৫।১৩।)

কর্তৃপুর (স্ত্রী) নগরবিশেষ। ভারতের উত্তরপূর্বাংশে অবস্থিত। সমুদ্রগুপ্ত এই স্থান জয় করেন।

কর্তৃবাচ্য (ত্রি) কর্তা বাচ্যো যত, বহব্রী। যেখানে ক্রিয়া

পদের দ্বারা কর্তৃ লক্ষিত হয়। এই বাচ্যে কর্তার প্রথম ও কর্ত্রের দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্তৃস্থ (ত্রি) কর্তার চতুর্নাম্পাদনযোগ্যে তিষ্ঠতি, কর্তৃ-স্থ। কর্তৃস্থানীয়, কর্তার প্রতিনিধি।

কর্ত্তী (স্ত্রী) করোতি যা, কৃ-কৃচ্ জীপ্। ১ কার্য্য-সম্পাদনকারিণী। ২ প্রভুপত্নী।

কর্ত্ত্ব (স্ত্রী) কৃ-কৃন্ (কৃত্যার্থে তটৈকেন্ কৈকৃৎনঃ। পা ৩। ৪।১৪।) কৃত। (কৃৎং হবিঃ। কাশিকা।)

কর্দ (পুং) কর্দ-অচ্। কর্দম, কাঁদা।

কর্দঙ্গ। পঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলার মধ্যবর্তী একটি গ্রাম, ভাগ-নদীর বামকূলে অবস্থিত। এখান লাহল উপবিভাগের অন্তর্গত। এখানে ভাল ভাল বাড়ী আছে।

কর্দট (পুং) কর্দং কর্দমং অটতি কারণতেন প্রাপ্নোতি কর্দ-অট্-অচ্ (শক্কাদিশ্বাদলোপঃ।) ১ পক্ষ, পাঁক। ২ কর-হাট, পদ্যকল। ৩ (ত্রি) পঙ্কার, পাঁকে গমনকারী।

(কর্দটঃ করহাটে ত্রাৎ পক্ষপঙ্কারয়োরপি। মেদিনী।)

কর্দন (স্ত্রী) কর্দতে, কর্দ-ভাবে লুট্। উদরশব্দ, পেটের ডাক।

(পর্দনং গুদজ্ঞে শব্দে কর্দনং কৃশিসম্ভবে। হেম ৬।৩৯)

কর্দম (স্ত্রী) কর্দ-অম (কলিকর্দোয়মঃ। উণ ৪।৮৪।)

১ কাঁদা। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নিবহর, জহাল, পঙ্ক ও শাদ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—শীতল, রূক্ষ এবং বিষ

রোগ, বেদনা, দাহ ও শোথনাশক। ২ স্বায়ত্ত্ব মনস্তত্ত্বের

প্রজ্ঞাপতি বিশেষ, কীর্ত্তমানের পুত্র, ইহার পুত্রের নাম অনঙ্গ

(ভারত শাস্তি)। ব্রহ্মার ছায়া হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া

ছিল। ইনি সরস্বতী-তীরে বিন্দুসরতীরে দশহাজার বৎসর

তপস্তা করেন, স্বায়ত্ত্ব মনস্তত্ত্ব দেবহুতি ইহার পত্নী, পুত্রের

নাম কপিলদেব এবং কলাদি নরটি ইহার কন্যা। [কপিল

ও কলা দেখ।] ৩ পাপ। (কর্দমঃ পক্ষপাপয়োঃ। উজ্জল।)

৪ ছায়া। (“বেদেষু কর্দমঃ শক্কায়াং বর্ত্ততে ক্ষুটম্।”

ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্ম° ২২ অঃ) ৫ নাগবিশেষ।

(“কর্দমশ্চ মহানাগো নাগশ্চ বহুমূলকঃ।” ভারত ১।৩৫।১৬।)

৬ (কর্দম-অর্শ আদিবাৎ মন্বর্থে অচ্, ত্রি) কর্দমযুক্ত স্থান।

৭ বিদ্যাপাশ্বের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ৮ কাশীপ্রদেশের

মধ্যবর্তী একটি গ্রাম। এখানে কর্দমেশ নামক শিবলিঙ্গ

আছে। (ড° ব্রহ্মধণ্ড ৫৪।৪৮-৫২।)

কর্দমক (পুং) কর্দমে কারতি প্রকাশতে, কর্দম-কৈ-ক।

ধাত্তবিশেষ। [ধাত্ত দেখ।]

কর্দমরাজ (পুং) কাশীরের রাজবিশেষ, ইহার পিতার নাম

কৈকটগুপ্ত। (রাজতরঙ্গিণী ৬।২০০, ৩২৫, ৩৪২)

কর্দমাটক (পুং) কর্দমো মলাদিঃ অটোতে নিক্ষিপ্যতে বজ্র, কর্দমস্ত মলাদেঃ অটো নিক্ষেপোহজ ইতি বা। বিঠাদি কেলিবার হান।

কর্দমিত (ত্রি) কর্দম-ইতচ্ (ভদ্রস্ত সংজ্ঞাতং তারকাদিত্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) কর্দমরূপে পরিণত, কাদা হইয়া যাওয়া।

কর্দমিনী (স্ত্রী) কর্দমানাং দেশ, কর্দম-ইনি (পুংকরাতিভ্যো দেশে। পা ৫।২।১৩৫।)-স্ত্রীপ্। প্রচুর কর্দমযুক্ত দেশ।

কর্দমিল (স্ত্রী) কর্দম-ইল (বৃহৎকঠজিলসেনিরচঞ্যায় ফক্কিঞ্যাককঠকো হরীহণাদিত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) জনপদবিশেষ। ("এতৎ কর্দমিলং নাম ভরতভাতিবেচনম্।" ভারত বন।)

কর্দমী (স্ত্রী) মুদগর বৃক্ষ, কামরাদা।

কর্পট (পুং) কীর্ষ্যতে ক্ষিপ্যতে কৃ-বিহ্, কর্ টাসৌ পটশ্চেতি। ১ জীর্ণবস্ত্র, হেঁড়া কাপড়, নেকড়া। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—লঙ্কক ও নক্তক। ২ পর্কতবিশেষ,—ইহা নাভিমণ্ডলের পূর্বদিকে ও ভ্রমুকটের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে শমন অবস্থান করেন। (কালিকাপুঃ ৮১ অঃ।) ২ মলিন বস্ত্র। ৩ বস্ত্রখণ্ড। ৪ কষায় রক্তবস্ত্র।

কর্পটধারী [ন্] (ত্রি) কর্পটং ধরতি, কর্পট-ধৃ-ণিনি। মলিন জীর্ণবস্ত্রখণ্ডধারী, ভিক্ষুক।

কর্পটিক (ত্রি) কর্পটো হস্তান্ত, কর্পট-ঠন্ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) কর্পটধারী।

কর্পটী [ন্] (ত্রি) কর্পটো হস্তান্ত, কর্পট-ইনি (অত ইনি-ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) কর্পটধারী।

কর্পটিনী (স্ত্রী) কর্পটিন-স্ত্রী। কর্পটধারিণী।

কর্পণ (পুং) কৃপ-লুট্। পোহশব্দবিশেষ। ("চাপচক্রকণকর্পণ-প্রাশপট্টিশমুঘলতোমরাপি প্রহরণজালমুপযুজানঃ।" দশকুমার।)

কর্পর (পুং) কৃপ বাহুলকাৎ অরন্, লঘাভাবঃ। ১ কপাল, মাধার খুলি। ২ শব্দবিশেষ। ৩ কটাছ। ৪ ধোলা। ৫ উড়ু-বর বৃক্ষ। ৬ কাছিমের পিঠের খোলা।

কর্পরংশ (পুং) কর্পরস্ত অংশঃ, ৬তৎ। খাপরার অংশ, খোলাকুচি।

কর্পরাল (পুং) কর্পর ইব অলতি পর্যাপ্নোতি, কর্পর অল্-অচ্। ১ কন্দরাল। ২ পর্কতভাত গীলুবিশেষ, আখরোট্।

কর্পরালী [ন্] (পুং) কর্পরে অপ্রাতি, কর্পর-অশ-ণিনি। বটুকতৈরব।

("মশামবাসী মাংসালী কর্পরালী মধ্যাক্ষরং।" বটুকতৈরব।)

কর্পরিকা (স্ত্রী) কর্পরী স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রবঃ। কর্পরী, দারু হরিজার কাথের তুতে।

কর্পরিকাতুথ (স্ত্রী) কর্পরিকৈব তুথম্। দারুহরিজার কাথের তুতে।

কর্পরী (স্ত্রী) কৃপ বাহুলকাৎ অরন্, লঘাভাবঃ, স্ত্রীপ্। দারু-হরিজার কাথের তুতে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—দার্কিকা ও তুথালন।

কর্পাস (পুং, স্ত্রী) কৃ-পাস, (কৃঞঃ পাসঃ। উণ ৫।৪৫) কার্পাস, কাপাসগাছ। [কার্পাস দেখ।] (কর্পাসঃ শতভেদঃ ভ্রাত্। উজ্জল।)

কর্পাসফল (স্ত্রী) কর্পাসস্ত ফলং, ৬তৎ। কাপাসের বীজ, মাকাটি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ, শুষ্কবর্দ্ধক, বৃষ্য, শিথল, গুরু ও কফকারক।

কর্পাসী (স্ত্রী) কর্পাসজাতিত্বাৎ গোরাদিত্বাৎ বা স্ত্রীপ্। কাপাসগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কার্পাসী, তুতিকেরী ও সমুজ্জাভা। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—লঘু, জিহৎ উষ্ণবীৰ্য, মধুররস ও বায়ুনাশক। কার্পাসের পত্র বায়ুনাশক, রক্ত ও মূত্রবর্দ্ধক, এবং কর্ণশীড়ক, কর্ণনাশ ও পুণ্ড্রাবের শাস্তিকারক। [কার্পাস দেখ।]

কপূর (পুং, স্ত্রী) কৃপ উর (খর্জিপিঞ্জাদিত্য উরোলচৌ। উণ ৪।৯০।) জুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ; পারসীভাষায় ইহাকে কাকুর, হিন্দিভাষায় কপূর, দক্ষিণে কাপূর, তামিল করপূরম্, সিংহলী কপূর ও ইংরেজী ভাষায় ক্যাম্ফর (Camphor) কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ঘনসার, চন্দ্রসংজ্ঞ, সিতাগ্র, হিমবালুকা, সিতাভ, ঘনসারক, সিতকর, শীত, শশাক, শীলা, শীতাংশু, হিমবালুক, হিমকর, শীতপ্রভ, শান্তব, শুভ্রাংশু, ক্ষটিকাত্র, কারমিহিকা, তারাত্র, চন্দ্রার্জক, চন্দ্র, লোকতুবার, গোর, কুমুদ, হহু, হিমালয়, চন্দ্রভষ্ম, বেথক ও রেণুসারক। কপূরের জরোদশ প্রকার ভেদ আছে,—পোতাস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্করবাস সংজ্ঞ, পাণ্ডু, পিঙ্গ, অম্বসার, হিমবালুক, জুতিকা, তুবার, হিম, শীতল ও পত্রিকাথ্য। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—শীতল, বৃষ্য, চকুর হিতকর, লেখন, লঘু, জুগন্ধি, মধুর ও তিক্তরস এবং কক্ষ, পিত্ত, বিষদোষ, দাহ, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা, মেদঃ ও দুর্গন্ধনাশক। চীনে কপূর,—কফনাশক, তিক্তরস এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বমিনিবারক।

কপূর উদ্ভিদভাত জমাট, গুরুবৃত্ত ও চকল উষ্মা গুণ-বিশিষ্ট (বাহা উবিরি যার) খেত পদার্থ বিশেষ। রসায়নশাস্ত্র-জ্ঞের বলেন, উদ্ভিদের উষ্মা গুণযুক্ত তৈলের বিতীর্ণ অবস্থা বা বিতীর্ণ গঠন কপূর। নানা প্রকার উদ্ভিদ হইতেই কপূর পাওয়া যায়।

কপূরের ইতিহাস।—কতকাল হইতে কপূর মানব-জাতির ব্যবহারে আসিতেছে? কোন সময় হইতে মানব ইহার গুণাগুণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সেই সময় লইয়া বিবন গোল। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রাচীন গ্রহে কপূরের উল্লেখ পাওয়া যায়। হজ্রমোভের কিনা-রাজবংশীয় ইম্ফ-ই-ই-কস্ নামে একজন রাজপুত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব্য কবিতা লিখিয়া যান, তাহাতে কপূরের উল্লেখ আছে।

কিন্তু আমরা বলি, তাহার বহু পূর্বে হইতে ভারতবর্ষেররা কপূরের সন্ধান পাইয়াছেন। শ্রুত, চরক, বাভট, হারীত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্বেদ প্রণয়কগণ কপূরের নাম ও কেহ কেহ গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইশাক ইবন্ আমন্ নামক একজন আরব্য চিকিৎসক এবং ইবন্ খুদ্দবা নামক একজন আরব্য ভৌগোলিক খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিয়া যান, “মলয় প্রায়োদীপ হইতে কপূর রপ্তানি হয়।” খৃষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কপোলো লিখেন, “ফন্থর নামক স্থানেই সর্বোৎকৃষ্ট কপূর উৎপন্ন হয়।” ফন্থর বা পন্থর জমাজা দ্বীপের মধ্যে; এখন সেখানকার কপূর ‘বরস’ নামে খ্যাত। পূর্বে যুরোপে কপূর কি কেহ তাহা জানিত না। চীনদেশ হইতে প্রথমে যুরোপে কপূর যায়। ১৫৬৩ খৃঃ অব্দ হইতে, যুরোপীয়েররা ছই প্রকার কপূরের সন্ধান পাইয়াছেন।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের লোকেরা প্রধানত দুইপ্রকারে কপূর ভাগ করিতেন, এক পক কপূর, অপর অপক কপূর।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত বলেন, পক কপূর চীনদেশীয় (Cinnamomum Camphora) একপ্রকার গাছের কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়, রৌদ্রের তাপে পক হয়। অপক কপূর বোর্নিও দ্বীপের এক প্রকার বৃক্ষের (Dryobalanops aromatica) বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়, এই কপূরই সর্বোৎকৃষ্ট। বোম্বাই অঞ্চলে হিন্দুস্থানীরা ইহাকে ‘ভীমসেনী কপূর’ বলে।

দাক্ষিণাত্যে চারি প্রকার কপূর প্রচলিত আছে,— ১ কাঙ্কুরি কৈহুরি, (কৈহুরি কপূর), ২ জুরাটি কাঙ্কুর, ৩ চীনীকাঙ্কুর (চীনের কপূর) এবং ৪ বটাই-কাঙ্কুর।

যুরোপীয় ডাক্তারেরা স্থান ভেদে ও গুণভেদে কপূরকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—

১ম—ফর্মোজা বা চীনে-কপূর এবং জাপানী কপূর। ফর্মোজা দ্বীপ এবং মধ্য চীনদেশে ‘ক্যাম্ফার লরেন’ (Cinnamomum Camphora) নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে। এদেশে বহিরবৃক্ষ হইতে যে অণুগীতে খয়ের পাওয়া

যায়, সেইরূপে উক্ত গাছের কাষ্ঠের কুটার নির্বাণ হইতে হইতে বহু কাষ্ঠের মত কপূর বাহির হয়। তাহার সার গ্রহণ করিতে হয়। এই গাছের কপূরমাত্রে চীনে কপূর নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বে বিলাতে ও ভারতে এই কপূরের খুব কাটতি ছিল। চীন সম্রাটের উৎপাতে এখন আর চীনে কপূর বড় একটা বিলাতে বাইতে পারে না।

জাপানে এই গাছ বেশ অনেক, সমুদ্রের সীতল বাতাস ইহার বড় উপকারী। এখানকার সংজ্ঞা ও বন্দোবাসক জেলায় কপূরের কাঁচবার আছে।

২য়—ভীমসেনী কপূর। ইহার প্রকৃত নাম ‘বরস’। জমাজা দ্বীপের বরস নামক নগরে শাল গাছের মত দেখিতে এক প্রকার গাছ (Dryobalanops aromatica) আছে। এই গাছের কাণ্ডে কাঠের মত এক প্রকার পর্যাবসিত সন্ধিত থাকে। যেমন বহিরবৃক্ষে খয়ের এবং চন্দনবৃক্ষে অঙ্কুর পাওয়া যায়, ইহাও সেইরূপ কাণ্ডের অভ্যন্তরে এবং বৃক্ষের স্থান মধ্যস্থ কাটা চির মধ্যে জমাট বাঁধিয়া থাকে।

কপূরের কাচবৎ অংশ কাণ্ডের ভিতরই পাওয়া যায়, কোন কোন স্থলে শুঁড়ি, গাঁট বা যে ডাল দিয়া আর একটি ডাল বাহির হইয়াছে, এমন স্থানে অথবা গাছের বড় বড় তক্তার গর্ত বা কাটা মধ্যে থাকে।

ঐ গাছ যত বড় হয়, কপূর তত অধিক হয়। কিন্তু এখানকার লোকের জালায় দীর্ঘজীবী হইতে পার না। অধিবাসীরা কপূরের লোতে কত শত ছোট গাছ কাটিয়া ফেলে। কিন্তু ৭৮ বর্ষের গাছ না হইলে তেমন কপূর হইতে দেখা যায় না।

ঐ গাছ ওলন্দাজ অধিকৃত জমাজা দ্বীপের উত্তরপশ্চিম উপকূলে আয়ার বারী হইতে বরস ও সিকেল নামক নগর পর্যন্ত সমুদায় স্থানে, বোর্নিও দ্বীপের উত্তরপাশে এবং লেবুয়ান্ দ্বীপে আছে।

৩য়—নাগাই কপূর। ইন্দোনেসিয়া ইহাকে Blumea Camphor বলেন। চীনদেশের কান্টন নগরে এই কপূর প্রস্তুত হয়। ইহার গাছ খুব বড় হয়। এই জাতীয় গাছ হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে, খাসিয়া গিরি, চট্টগ্রাম, পেগু, ব্রহ্ম এবং চীনের দক্ষিণপূর্বাংশে আছে। তবে ব্রহ্মদেশেই কিছু অধিক। ব্রহ্মের কপূর গাছ সম্বন্ধে একজন লোক বলিয়াছেন, যদি এই সকল গাছ হইতে কপূর লওয়া যায়, তবে তাহা দারাই পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ সমুদায় হইতে পারে।

ডাক্তার জাইমক্ বোম্বাইঅঞ্চলে এই জাতীয় একপ্রকার কপূরোৎপাদক বৃক্ষ পাইয়াছেন। বোম্বাই অঞ্চলের লোকেরা কতু তাড়াইবার জন্য এই গাছ ব্যবহার করে।

৪র্থ—নানা জাতীয় বৃক্ষ হইতে এক প্রকার কপূর প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা সুগন্ধি দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। এই কপূর ভামাকের পাতা চৌরাইয়া, কিছা (Thymus) তৈলের সার আংশিক পরিমাণে চৌরাইয়া অথবা পাচুলী গাছ হইতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত গাছ হইতে যে কপূর বাহির হয়, তাহাকে অনেক স্থানে 'পাচুলি কপূর' বলে। নারেলানেনবু হইতে একপ্রকার কপূর পাওয়া যায়, তাহার ইংরাজি নাম 'নিরোলি ক্যাম্ফার' (Neroli Camphor.)

বাঙ্গালদেশে এক প্রকার গাছ (Nimnophila gratio-
lodes) আছে, তাহা হইতে কপূর পাওয়া যায়।

গত কয়েক বর্ষ ধরিয়া ভারতবর্ষে বেশ কপূরের আম-
দানী রপ্তানী চলিতেছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

খ্রষ্টাব্দ	আমদানী		রপ্তানী	
	ভীমসেনী	অজ্ঞপ্রকার	ভীমসেনী	অজ্ঞপ্রকার
১৮৭৯-৮০ ...	২০,২০৯	৫,৩৪,০০১	২,৩১৬	২৩,১৭৪
১৮৮০-৮১ ...	২২,২২৪	৫,৫৩,৭৩২	১৪০	২৩,৫৫৯
১৮৮১-৮২ ...	৩৮,৫৭৪	৫,৫২,৫৩৫	১,৬৪০	২১,১৩৮
১৮৮২-৮৩ ...	৪৩,৬১৮	৮,৬৮,৭২৪	৫২২	২৫,২৩১
১৮৮৩-৮৪ ...	৩৮,৫৭৯	৬,২৭,২৭৮	৭২০	২৮,৭৩০
১৮৮৪-৮৫ ...	৩৫,৫০১	৬,৮৩,৩৩৩	২৭০	১৩,৪৩২
১৮৮৫-৮৬ ...	২৫,২৪৪	৬,৫৩,৫৪৫	০	১৬,৭৭৯

দেশীয় কবিরাজের মতে কপূর কামোদ্দীপক, কিন্তু
মুলমানদিগের মতে কামশক্তিসংসারক। হিন্দুমুলমান
উভয়ের মতে চক্ষের প্রদাহ অবস্থায় চক্ষুর পাতায় কপূর
দিলে বিশেষ ফল দর্শে।

ইপানী রোগ অধিক বাড়িয়া উঠিলে ৪ গ্রেণ কপূর
ঐ মাত্রা হিঙ্গের সহিত বড়ি করিয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর
খাইতে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়, এই সময়ে বৃকে
তাপ্তি তৈল মালিস করা উচিত।

পুরাতন বাতরোগে ৫ গ্রেণ কপূর ১ গ্রেণ আফিমের
সহিত শুইবার সময়ে খাইতে দিলে, খানিকটা ঘাম হইয়া
ব্যথার লাঘব হয়।

কপূর ও হিঙ্গ একত্র খাওয়াইলে হৃৎরোগ নিবারিত হয়।

বালককালে ছেলের কাশি হইলে একখানি শুক্কাড়ায়
কপূর মাখাইয়া তাড়াইয়া রাজিকালে বন্ধের উপর দিয়া
রাখিলে রোগের অনেকটা লাভ হয়।

বৃদ্ধদোষ ও শুষ্ককম প্রভৃতি রোগে রাজিকালে শুইবার
সময়ে ৪ গ্রেণ কপূরের লগ্নে অর্ধ গ্রেণ আফিম খাইতে

দিলে রোগের প্রতিকার হয়। যেহাতি রোগে লিকোজাস
ঘটিলে উক্ত ঔষধের সহিত আফিম বাড়াইয়া দিলে এবং
লিঙ্গের উপর কপূরের লিনিমেন্ট অড়াইয়া রাখিলে আত
ফলপ্রসূ হয়।

জীলোকের জরায়ুতে ঐরূপ নানারোগে প্রদাহ উপ-
স্থিত হইলে রোগের অবস্থানসারে ৫।৬ গ্রেণ মাত্রায়
কপূরের এক একটি বড়ি করিয়া দিনে ২।৩ বার খাইতে
দিলে সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঐরূপ
স্থলে রোগীর অস্ত্র খালি রাখিতে হইবে।

প্রসবকালে বৈঠনী আরম্ভ হইলে ৫ গ্রেণ কপূর ও ৫
গ্রেণ ক্যালোমেল মধুতে মাখিয়া দুইটি বড়ি করিয়া এক
একটি খাইতে দিলে উপকার দর্শে। ঘণ্টা খানিক পরে
রোগীকে জোলাপ দিবে।

পীনসরোগে কপূরের বাষ্প বড় উপকারী। স্নায়ুশূল
রোগে ৩।৪ গ্রেণ কপূর অর্ধগ্রেণ বেলেডোনার সার সহিত
প্রয়োগ করিলে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়।

ওলাউঠা রোগে অনেকস্থলে কপূর উপকারী, আবার
অনেকস্থলে অমুককারী হইয়া থাকে।

গর্ভবতী অধিক মাত্রায় কপূর খাইলে গর্ভপ্রাণ হয়।

বস্ত্রাদির উপর কপূর ছড়াইয়া রাখিলে পোকা লাগিতে
পারে না।

২ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ, ইনি গঙ্গামলের পিতা এবং
কল্যাণমলের পিতৃব্য।

কপূরক (পুং) কপূর ইব কায়তি প্রকাশতে, কপূর কৈ-ক।

১ কর্করক। ২ কর্করক।

কপূরখণ্ড (পুং) কপূরস্ত খণ্ডঃ, ৬তং। কপূরের টুকরা।
কপূরগৌর (ত্রি) কপূরবৎ গৌরঃ শুভ্রঃ। কপূরের জায় শুভ্রবর্ণ।
কপূরগৌরী। রাগিণীবিশেষ; জ্যোতিঃ, খাষাবতী, জয়তন্ত্রী,
টঙ্ক ও বরাটী যোগে উৎপন্ন।

কপূরতিলক (পুং) কপূর ইব শুভ্রঃ তিলকং ললাটিচিহ্নং যত,
বহতী। হস্তিবিশেষ।

কপূরতিলকা (স্ত্রী) পার্শ্বতীর একজন সখী, বিজয়া।

কপূরতৈল (স্ত্রী) কপূরস্ত তৈলমিব মেহঃ। কপূরমেহ,
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—হিমতৈল, অধাণ্ডতৈল। রাজ-
নির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—কটু, উষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক,
দন্তের দৃঢ়তাকারক ও পিত্তবর্জক।

কপূরনালিকা (স্ত্রী) পক্ষ্মবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম,
কপূরনারী বা নেওয়ারা। স্ত্রুত সংযুক্ত ময়দা দ্বারা লঙ্ঘাক্তি
ঠোকা করিয়া তাহার মধ্যে লবঙ্গ, সরিচ, কপূর ও চিনি পুরিয়া

বুধ বন্ধ করিতে হইবে, তাহার পর স্তুতে ভাঙিয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হইল। ইহার গুণ,—শরীরবর্দ্ধক, বলকারক, অমিষ্ট, গুরু, পিত্ত ও বায়ুনাশক, কঠিনজনক এবং দীপ্তাশি মানবদিগের অত্যন্ত উপকারী। (ভাবপ্রঃ ২২।)

কপূরমণি (পুং) কপূর বর্ণো মণিঃ। পাবাণবিশেষ। ইহা বাতাদি দোষনাশক।

কপূররস (পুং) কপূর ইব কুণ্ডো রসঃ পারদঃ, মধ্যলো। গাকবিশেষের দ্বারা কপূরের জ্বাঘ্নিত পারদ, রসকপূর। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গাকপ্রণালী এইরূপ,—

“রস-কপূর প্রস্তুত করিবার পূর্বে সামান্তরূপে পারদ শোধন করিয়া লইতে হইবে; পরে ঐ পারদের সম পরিমিত গেরিমাটী, ইটের গুঁড়া, ফটিকরি, সৈন্ধব, উইমাটী, কায় লবণ ও হাঁড়ির গুঁড় করিবার মাটির চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর মর্দন করিবে। তাহার পর ঐ সমস্ত চূর্ণের সহিত পারদ একটি হাঁড়িতে রাখিয়া তাহার উপর আর একটি হাঁড়ি দিয়া মাটি ও নেকড়া দ্বারা সজ্জিহান লেপিয়া দিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে তিনবার লেপ দিয়া শুষ্ক হইলে ঐ হাঁড়ি অগ্নিতে জাল দিতে হইবে, অনবরত ৪ দিন জাল দিয়া, আরও একদিন আন্ধারের উপর রাখিতে হইবে। পাঁচদিনের পর অতি সাবধানতার সহিত উপরের হাঁড়িটি খুলিয়া লইবে। তাহাতে যে কপূরের জ্বাঘ্ন পারদ লাগিয়া থাকিবে, তাহারই নাম কপূররস বা রসকপূর। এই রসকপূর অল্পপান বিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে, ফিরঙ্গরোগ ও তজ্জন্ত উপদ্রব সকল নিবারিত হয়, এবং অগ্নির দীপ্তি, শারীরিক পুষ্টি ও বিপুল বলবীৰ্য লাভ করিয়া শত রমণী সম্বোগে সামর্থ্য কামিয়া থাকে।

কপূররস (ক্লী) সরোবরবিশেষ।

কপূরস্তব (পুং) কপূরাদি শব্দবৃতিঃ স্তবঃ মধ্যলো। শ্রামা-স্তববিশেষ; এই স্তবের প্রথমে কপূর শব্দ আছে বলিয়া ইহাকে কপূরস্তব কহিয়া থাকে।

কপূরা (ক্লী) রূপ-উর-টাপ্। হরিত্রাবিশেষ, আমাদা।

কপূরী [ন] (ক্লী) কপূরো হস্ত্যন্ত, কপূর-ইনি। কপূরযুক্ত।

কপূরিল (ক্লী) কপূরো হস্ত্যন্তি, কপূর কাশাদিভ্যাং ইল (বৃহৎ কঠজিলেভ্যাদি। পা ৪।২।৮০) কপূর যুক্ত।

কৰ্মর (পুং) কৰ্ম্যভ্যে ক্রিপ্যতে, কৃ-বিচ্; কল্যতে কল-কলন্ত রঃ; কৰ্ম্যমানঃ ফলঃ প্রতিবিধো যজ্ঞ, বহত্ৰী। দর্পণ, আয়না।

কৰ্মদ্বার (পুং) কৰ্ম্মরিব কৰ্ম্মঃ সন্ বা স্নেহাগং মলং বা দ্বারমতি, কৰ্ম্ম-দৃ-শিচ-অচ্। ১ কোবিন্দারবৃক্ষ। ২ শ্বেতকাঞ্চন। ৩ নীলকিষ্ঠী।

(“শব্দত কোবিন্দারত কৰ্মদ্বারত শাখলোঃ।

পুশং গ্রাহি প্রশস্তত রক্তপিত্তে বিশেষতঃ। চরক সূত্র ২৭ অঃ।)

কৰ্মদ্বারক (পুং) কৰ্ম্মদ্বারবৎ কামতি, কৰ্ম্মদ্বার কৈ-ক;

যথা কৰ্ম্মরিব স্নেহাগং দ্বারমতি, কৰ্ম্ম-দৃ-শিচ-অচ্। স্নেহাত্মক।

কৰ্মদ্বার (ক্লী) কৰ্ম্মতি গৰ্ভতি অগ্ন্যাং অনেন বা, কৰ্ম্ম দর্পে

উরচ্ (মহাভারতম্। উৎ ১।৪২) ১ স্বর্ণ। ২ ধৃত্যবৃক্ষ।

৩ জল। ৪ (পুং) (কৰ্ম্মতি হিনতি জীবন, কৰ্ম্ম-উরচ্)

রাক্ষস। ৫ পাশ।

(কৰ্ম্ম রং সলিলে হেরি কৰ্ম্ম রঃ পাপরক্ষসোঃ। মেদিনী)

৬ (কৰ্ম্মতি নানাবর্ণতাং গচ্ছতি) নানাবর্ণ; ইহার সংস্কৃত

পর্যায়,—চিত্র, কিশোরী, কাম্বা, শবল ও এত। ৭ (ক্লী)

নানাবর্ণবিশিষ্ট, চিত্রিত। ৮ শঠী। ৯ নদীজাত নিশাধ দ্বাভ।

কৰ্মদ্বারফল (পুং) কৰ্ম্মরঃ চিত্রবর্ণং ফলং যজ্ঞ, বহত্ৰী।

সাক্ষক ও বৃক্ষ।

কৰ্মদ্বার (ক্লী) কৰ্ম্মর-টাপ্। ১ কৃষ্ণতুলসী, পাকল। ২ বাবুই

তুলসী।

কৰ্মদ্বারিত (ক্লী) কৰ্ম্মরো হস্ত জাতঃ, কৰ্ম্মর-ইতচ্। চিত্রিত,

নানাবর্ণবিশিষ্ট।

কৰ্মদ্বারী (ক্লী) কৰ্ম্মর গোরাদিভ্যাং ভীব্ (বিদগোরাদিভ্যাশ্চ।

পা ৪।১।৪১) হর্ণী।

কৰ্মদ্বার (ক্লী) কৰ্ম্মতি গৰ্ভঃ প্রাপ্নোতি যদ্যাং, কৰ্ম্ম-উর

(খজিপিঞ্জাদিভ্য উরোলটো। উৎ ৪।৯০)। ১ স্বর্ণ। ২ হরি-

তাল। ৩ (পুং) শঠী। ৪ রাক্ষস। ৫ দ্রাবিড়ক, কাঁচা হলুদ।

৬ নানাবর্ণ।

কৰ্মদ্বারক (পুং) কৰ্ম্মর স্বার্থে কন্। ১ হরিত্রাভবৃক্ষ, কাঁচা হলুদ।

২ কালহরিত্রা। ৩ কপূরহরিত্রা, আমাদা। ৪ কাকবসন্ত,

কাজিকতা হরিত্রা বা হরিত্রাভকচোরা; ইহার সংস্কৃত

পর্যায়,—দ্রাবিড়ক, কাকক, বেধমুখ্যক, কাল্যক।

কৰ্মদ্বারিত (ক্লী) কৰ্ম্মরো হস্ত সংজাতঃ, কৰ্ম্মর ইতচ্।

চিত্রিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট।

কৰ্ম্ম [ন] (পুং, ক্লী) কৃ কৰ্ম্মণি মণিন্ অর্জুনাং। বাহা করা

যায়, তাহাকে কৰ্ম্ম বলে। বৈয়াকরণ পণ্ডিতেরা বলিয়া

থাকেন যে—“তৎক্রিয়ানাশ্রয়ে সতি তৎক্রিয়াজন্ত ফল-

শালিভঃ কৰ্ম্মং” ইতি কৰ্ম্মলক্ষণ।

যে ক্রিয়ার আশ্রয় না হয়ইহাও সেই ক্রিয়াজন্ত ফলবিশিষ্ট

হয়, সেই সেই ক্রিয়ার কৰ্ম্ম। যথা “ওদনং পাতি”। এইখানে

কৰ্ত্তৃসমবেত পাকক্রিয়ার অনাশ্রয় ওদন পাক জন্ত বিক্লিতি-

রূপ ফলবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া উক্ত ওদনই কৰ্ম্ম লক্ষণের

লক্ষ্য হইল। উক্ত কৰ্ম্ম তিন প্রকার—নির্কর্তব্য, বিকার্য ও

প্রাপ্য। যে বস্তু অবিন্যাসমান থাকিয়া উৎপত্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে নির্বর্ত্য বলে যেমন “কটং করোতি” এখানে কট পূর্বে অবিন্যাসমান ছিল, পরে উৎপত্তি দ্বারা আত্মলাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং কট-কে নির্বর্ত্য কর্ম বলা যায়।

যে বস্তু পূর্বে সং হইয়া পরে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বিকার্য বলে, যেমন “ওদনং পচতি” এখানে ওদন পূর্বে সং হইয়া পরে কেবলমাত্র অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ওদনই বিকার্য কর্মের উদাহরণ হইল। এই বিকার্য কর্ম বিবিধ, প্রকৃতিনাশসম্বৃত ও গুণান্তরোৎপত্তি দ্বারা নামান্তরবিশিষ্ট। “কাঠং ভঙ্গ্য করোতি” এইস্থলে কাঠ বিনষ্ট হইয়া ভস্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতিনাশসম্বৃত কর্মের উদাহরণ হইল। “সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি” এইস্থলে সুবর্ণ হইতে গুণান্তরবিশিষ্ট কুণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং গুণান্তরোৎপত্তি দ্বারা সুবর্ণই নামান্তর দ্বারা অভিহিত হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় উদাহরণ সঙ্গত হইল। নির্বর্ত্য ও বিকার্য ভিন্ন কর্মকে প্রাপ্য বলে, যেমন “আদিত্যঃ পশ্চতি।”

সীমান্সকেরা কর্ম দুই প্রকার বলিয়া থাকেন, অর্থ কর্ম ও গুণ কর্ম। যে কর্ম দ্বারা আত্মাতে কোনরূপ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহাকে অর্থ কর্ম বলে, যেমন অগ্নিহোত্র যাগ। এই যজ্ঞ করিলে যাজ্ঞিকের আত্মাতে স্বর্গজনক অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং সেই অদৃষ্ট দ্বারা পরে যজ্ঞকর্তা স্বর্গ লাভ করে। যে কর্ম দ্বারা বস্তু সংস্কৃত হয়, তাহাকে গুণ কর্ম বলে। যথা, “ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি” এখানে প্রোক্ষণ দ্বারা ব্রীহীকে সংস্কৃত করা হইয়াছে বলিয়া প্রোক্ষণকে গুণকর্ম বলা যায়।

অর্থকর্ম নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার, যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাকে নিত্য কর্ম বলে। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ না করিলে ব্রাহ্মণের পাপ হয় বলিয়া অগ্নিহোত্রাদি ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম। যে কর্ম কোন নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে; গোবধাদি পাপক্ষম্যার্থ প্রারম্ভিত গোবধাদি নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয় বলিয়া উহা নৈমিত্তিক কর্ম মধ্যে পরিগণিত। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম না করিলে পাপ হয়, কিন্তু করিলে কোন ফল হয় না, এই মত কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকে। বাস্তবিক তাহা অমূলক, যেহেতু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় এই মত স্বত্বির বচনে লেখা আছে,— “নিত্য নৈমিত্তিকৈরেব কুর্মাণো হরিতুম্ভয়ং।”

সীমান্সো পরিভাব।

যে কর্ম কোন ফল কাম্যনাপূর্বক করা যায়, তাহাকে কাম্য বলে। যেমন “কারৌরী যাগ” ইহা বৃষ্টি কাম্যনাশীল পূর্বক কর্তৃক অমুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে কাম্য বলা যায়। কাম্য কর্ম তিন প্রকার, ঐহিক ফলক, আত্মিক ফলক ও ঐহিকাত্মিক ফলক। যে কর্ম দ্বারা ইহলোকে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐহিক ফলক বলে, কারৌরী যাগ দ্বারা ইহলোকে বৃষ্টিরূপ ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা ঐহিক ফলক। যে কর্ম পরকালে ফলের উৎপাদক হয়, তাহাকে আত্মিক ফলক বলে, অগ্নিহোত্রাদি যাগ ইহকালে কাহার স্বর্গ প্রদান করে না, কিন্তু পরকালেই স্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে, সুতরাং অগ্নিহোত্র যাগই আত্মিক ফলক। যে কর্ম ইহকাল ও পরকালে ফলপ্রদ তাহাকে ঐহিকাত্মিক ফলক বলে।

বোধায়নাচার্য্য জ্ঞানসহকারে এই কর্মকে মুক্তির কারণ বলেন, কিন্তু অধৈতবানী শঙ্করাচার্য্য ইহা স্বীকার করেন না। শঙ্কর বলেন যে, যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এই জ্ঞান চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়, তখন সেই জ্ঞানী পুরুষ কর্ম ও তৎসাধনভূত মিথ্যা মনে করে এবং পরমব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে নিজের অস্তিত্বও স্বীকার করে না, সুতরাং কর্মকর্তা ও সাধনের মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত সেই জ্ঞানসময়ে কর্ম থাকার সম্ভাবনা নাই বলিয়া জ্ঞান সহকারে কর্ম মুক্তির কারণ হইতে পারে না, কেবলমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ। ফলাকাজ্ঞা পরিত্যাগপূর্বক কর্ম করিলে চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া অধিতীয় ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, পরে বিমুক্ত চিত্তে সেই কুটস্থ ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইলে মুক্তিলাভ হয়।

জৈন মতে কর্ম দুই প্রকার—ঘাতি কর্ম ও অঘাতি কর্ম। যে কর্ম মুক্তির বিরুদ্ধ তাহার নাম ঘাতি কর্ম। এই ঘাতি কর্ম চারিপ্রকার, জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও আন্তর্য্য। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় না, এই জ্ঞানকে জ্ঞানাবরণীয় কর্ম বলে। আর্হত দর্শন অধ্যয়ন করিলে মুক্তি হয় না, এই জ্ঞানকে দর্শনাবরণীয় কর্ম বলে। পাশ্বে মুক্তির পরম্পর বিরুদ্ধ অনেক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কোনটী মুক্তির প্রকৃত কারণ এই বিশেষের অনবধারণকে মোহনীয় কর্ম বলে। মোক্ষপথে প্রবৃত্তির বিঘ্ন করাকে আন্তর্য্য বলে। অঘাতি কর্মও চারি প্রকার—বেদনীয়, নামিক, গোত্রিক ও আত্মিক। ঐশ্বর্যতত্ত্ব আমার জাতব্য এই অভিমানকে বেদনীয় কর্ম বলে। আমি অমূলক নামবিশিষ্ট এই অভিমানকে নামিক কর্ম বলে। আমি অমূলকবংশে জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছি এই অভিমানকে গোত্রিক কর্ম বলে। শরীর রক্ষার জন্য যে কর্ম করা যায়, তাহাকে আয়ুর্ক কর্ম বলে। উক্ত চারি প্রকার কর্ম মুক্তির কোনও বিঘ্নকারী হয় না, এইজন্য ইহাকে অব্যতি কর্ম বলা যায়।

নৈয়ারিকগণ ক্রিয়াকে কর্ম বলেন এবং তাহাকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করেন; যথা উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। যে ক্রিয়াধারা উপরে কোন বস্তু সংযুক্ত করা যায়, তাহাকে উৎক্ষেপণ বলে। যে ক্রিয়া ধারা অধোদেশে কোন বস্তুর সংযোগ হয়, তাহাকে অবক্ষেপণ বলে। যে ক্রিয়াধারা প্রস্ফুটিত বস্তু মুক্তিত হয়, তাহাকে আকুঞ্চন বলে। যে ক্রিয়া ধারা মুদিত বস্তু প্রস্ফুটিত হয়, তাহাকে প্রসারণ বলে। যে ক্রিয়াধারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া যায়, তাহাকে গমন বলে। এই গমন পাঁচ প্রকার; যথা ভ্রমণ, রেচন, শুশ্রূষা, উর্দ্ধগমন ও তির্ধ্যগ্গমন। এই সম্বন্ধে ভাষ্যপরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

“উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনমুপাধা।

প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মণ্যেতানি পঞ্চ চ ॥

ভ্রমণং রেচনং শুশ্রূষাং উর্দ্ধগমনমব চ।

তির্ধ্যগ্গমনমপ্যত্র গমনাদেব লভ্যতে ॥”

পূর্বে মীমাংসকেরা জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের প্রাধান্ত স্বীকার করিতেন, আবার বৈদান্তিকেরা বলিতেন, ‘কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞান না অম্বলে মুক্তি হয় না’।

উক্ত মতবৈষম্য দূর করিবার জন্য মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার অতি চমৎকার মহোৎকৃষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অতি দুজ্জের যে কর্মতত্ত্ব তাহা অতি মনোহর ও বিস্তারিতরূপে সুবোধগম্য করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

গীতার তৃতীয়ধ্যায় অবধি ষষ্ঠাধ্যায় পর্যন্ত ও অষ্টাদশাধ্যায়ে কর্মসম্বন্ধীয় অনেক কথা ও অস্তিত্বাধ্যায়ে তৎসংক্রান্ত কোন না কোন মহৎ প্রসঙ্গ বিবৃত আছে, কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়টি কেবল কর্মস্বাক্ষর, এইজন্য সেই অধ্যায়ের নাম কর্মবোধোপদেশ। শ্রীকৃষ্ণের মতে শারীরিক ব্যাপারের নাম কর্ম, তদভাবকে অকর্ম বলে। পুনশ্চ শাস্ত্র বিধেয় বাহ্য তাহা কর্ম ও তদ্বিধি অকর্ম। আবার কর্মসাধন সম্বন্ধেও অকর্ম বোধ এবং অকর্ম সম্বন্ধেও কর্ম বটিতে পারে। কর্মের বিভাগ নানা প্রকার, তন্মধ্যে বৈষয়িক বিবিধ স্থখাভিলাষ, তৃপ্তি বা স্বর্গাদি পুণ্যফল প্রাপ্তি জন্য কামনা করিয়া যে কর্ম করা হয়, তাহার নাম কাম্য কর্ম; তৎকামনাপূত্র হইয়া অহংজ্ঞান পরিত্যাগপূর্বক সর্বব্যাপক ঈশ্বরের কেবলমাত্র সত্ত্বা জ্ঞানে তদঙ্গতিতে তত্ত্বকিতে তৎপ্রীত্যর্থ্যে যে কর্ম, তাহাই নিষ্কাম

কর্ম, আর চিত্তত্বকির জন্য যে নিয়মিত কর্ম, তাহা নিত্য কর্ম। শরীর ব্যক্তি মন প্রভৃতির প্রবর্তক পঞ্চবিধ কারণ শরীর, কর্তা (অর্থাৎ চিত্ত ও অহংকার), চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়াদি প্রাণাদির বিবিধ বাহুর ব্যাপার এবং চক্ষু কর্ণাদির আহুকূল্যকারী সূর্য্য বায়ু ইত্যাদি। ঈশ্বরের সত্ত্বাতেই দুজ্জেরা মায়ার সত্ত্বা, মারা হইতেই উদ্ভব সম্বন্ধ তমঃ ত্রিবিধ জ্ঞান, পৃথিব্যাদিতে কোন সম্বন্ধ নাই বাহ্য এই ত্রিগুণযুক্ত; সুতরাং সকলই এই জ্ঞানের প্রাহুর্ভাব্যেতে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করে এবং তজ্জন্মই কর্মের সাম্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ বিভাগ হইয়াছে। বিশেষ কর্মের যে বিশেষ বিশেষ ফল ও পাপপুণ্যাদি তাহার নিরস্তা ঈশ্বর নহেন; প্রাকৃতিক অলঙ্ঘনীয় নিয়মে তাহা ঘটয়া থাকে। অহংভাব অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমানশূন্য আত্মীয়ের প্রতি মেহ, শত্রুর প্রতি ঘেববর্জিত ও ফলাকাজ্ঞা-রহিত হইয়া যে নিত্য কর্ম করা হয়, তাহা সাম্বিক। ফলাকাজ্ঞার ও অহংকার-যুক্ত হইয়া অতিশয় আয়াসে যে কর্ম করা হয়, তাহা রাজসিক এবং ভবিষ্যৎ নিজ শুভাশায় বিস্তারিত করিয়া পরহিংসারত হইয়া নিজ সামর্থ্য পর্যালোচনা না করিয়া যে কর্ম করা হয়, তাহা তামসিক। জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৃতি, শ্রদ্ধা এবং কর্তা ইহাদেরও সম্বাহুরূপ ত্রিবিধ লক্ষণ দর্শিত হইয়াছে, যজ্ঞ তপঃ, দান এবং আহার ইহারও ঐ প্রকার ত্রিবিধ ভেদ, কর্মের রূপ ভেদ এই সকলের উপর নির্ভর করে।

শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের প্রশংসা করিয়া জ্ঞানের মহোৎকর্ষতা দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী আত্মতত্ত্বজ্ঞ আত্মার প্রসাদে আত্মক্রিয়াতেই আত্মায় সন্তুষ্ট, “তৎকৃত্যন্তদাত্মানন্তরিত্তাং পরায়ণঃ”, সে ব্যক্তির নিজের পক্ষে কর্মের কোন প্রয়োজন নাই, করিলেও কোন ইষ্ট নাই, না করিলেও কোন প্রত্যয়ায় (পাপ) নাই। কিন্তু এতদুচ্চ অমুখ্যায়িক কর্মকাণ্ডের অকর্তব্যতা আশঙ্কা দূরীকরণার্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সর্বদা স্মর্তব্য মহত্বপদেশ দিয়াছেন এবং এককালীন সাংখ্য, যোগ ও পূর্ব-মীমাংসার ক্রিয়াকলাপসম্বন্ধীয় আপাততঃ বিরোধি মতের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। কর্ম বন্ধনস্বরূপ অর্থাৎ মুক্তিলাভের বাধকস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্য সাংখ্য-মনোবিগণ কর্ম দোষাবহ বলিয়া তত্ত্বাগ বিধান করিয়াছেন; তবে মীমাংসকেরা বলেন যে যজ্ঞদান ও তপস্বী কখনই পরিত্যাগ কর্তব্য নহে, উভয় মত ধরিলে মহাবিরোধ ঘটয়া উঠে কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহাতে কোন বিরোধ নাই। কারণ দেহধারী মাঝেই অশেষরূপে কর্মত্যাগের ক্ষমতাই নাই, ‘নহি দেহভূতাত্মক্য

ত্যাগ কর্তব্যগণের বৃত্তি।' কেহ কখন কর্মত্যাগ করিয়া অণকাল মাত্র থাকিতে পারেন না, তাঁহার ইচ্ছার বিরোধেও প্রকৃতির গুণ তাহাকে কর্মরত করার দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন এই যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম এবং গমন, আলোচন, শ্রম, নিশ্বাস, মলমূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ ও নেত্র উন্মীলন ও নিমীলন যে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম, তাহা ইন্দ্রিয়দিগের স্বতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য, ইচ্ছা দ্বারা অনিবার্য। তবে যাহারা অভ্যাগ বলে কর্মেন্দ্রিয় (বাক পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ)-সকলকে সংযম করিয়াও তাহাদের মন লালসায় পরিপূর্ণ থাকে, তাহারা কপটীচারা। ত্যাগও সম্ভারূপ ত্রিধা ভেদাশ্রয়ক। আসক্তি ও কর্মফল পরিত্যাগপূর্বক কেবল কর্তব্য বোধে যে কার্য্যাত্মক তাহা সাধিক ত্যাগ। এরূপ ত্যাগী সত্বগুণসম্পন্ন মেধাবী ও সংশয়বিরহিত, তিনি দুঃখাবহ বিষয়ে ঘেব ও সুখাবহ বিষয়ে অমুরাগ প্রদর্শন করেন না। ফলতঃ তাহারাই কর্মফলত্যাগী বলিয়া বাচ্য। দুঃখাবহ বিষয় কায়ক্লেশ ভয়ে ত্যজ্য হইলে তাহাকে রাজসিক ত্যাগ বলে এবং নিত্যকর্ম মোহবশতঃ ত্যজ্য হইলে তাহা তামসিক ত্যাগ হয়। এক্ষণে উভয় মতের সামঞ্জস্যে শ্রীকৃষ্ণ এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, পণ্ডিতেরা কাম্য কর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন। যজ্ঞ, দান, তপস্তা, কদাচ ত্যাগ করা কর্তব্য নহে; এই কয়েকটি কার্য্য বিবেকী-দিগের চিত্ত শুদ্ধির কারণ। এই কথাটিই নিশ্চয় যে, আসক্তি ও কর্মফল পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কার্য্য অমুষ্ঠান করাই শ্রেয়, কর্মত্যাগ কখনই কর্তব্য নহে। জ্ঞানযোগ যদিও শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানকিত্তিস্থাপিত ভক্তি-উদ্ভাবিত শাস্তি জ্ঞান-অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তথাচ বিধের কর্মস্বরূপ ভিন্ন যখন জ্ঞানলাভের ব্যাঘাত হয়, তখন তৎতৎকর্ম বর্জন অপেক্ষা সাধন অবশ্য কর্তব্য। জ্ঞানোপদেশে মানসবৃত্তির প্রকৃত চালনা দ্বারা ও অভ্যাগ বলে ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক যে ব্যক্তি কর্ম্যাত্মক করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। আসক্তি ত্যাগপূর্বক ঈশ্বর-উদ্দেশ্যে যে কর্ম্য করা না হয় তাহাই বন্ধন। ঈশ্বর উদ্দেশ্যে কর্ম্যই প্রকৃত যজ্ঞ নাম-ধেয়, নানা কামনা সিদ্ধি করিবার জন্য যে কর্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করা হয়, তাহাতে মন কেবল সেই কর্ম সিদ্ধির উপর নিবেসিত থাকে, ঈশ্বর-বিমুখ হয়। তথাচ যখন নানা মহত্বা নানা প্রকৃতিহ, তখন যেমন বালককে লাড্ডুলোভ দেখাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করান হয়, সেইরূপ তৎকর্মফল আশায় ক্রিয়াকলাপাদি করা ধর্মসোপানের একটি নিম্ন পৈঠা মাত্র, এবং "সহ যজ্ঞা প্রযাত্ত্যাদি" প্রোকে কৃষ্ণ সে ভাব ব্যক্ত

করিয়াছেন, আর এই সতর্কতা দর্শাইয়াছেন যে, যেরূপ অগ্নি প্রথম উদ্দীপন সময়ে ধূমচ্ছর হয়, সেইরূপ সকল কর্মেরই প্রারম্ভে দোষ দর্শন হইলেও তাহা পরিত্যাগ না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক তাহা অভ্যাগ করা কর্তব্য। শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার যদিও কোন ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন নাই, তথাচ যখন তৎকর্ম-সিদ্ধিকাজী প্রয়োজন এবং যখন ইতর পুরুষ শ্রেষ্ঠের কার্য্যাত্মক হই, তখন সিদ্ধপুরুষ জন-হিতার্থ তৎকর্ম করিতে পারেন; সিদ্ধির সর্বোচ্চ সোপানের পৈঠার উত্তীর্ণ হই অর্থাৎ ঈশ্বরভক্বে ঈশ্বরভক্তিতে নিবিষ্ট হইবার জন্য কর্মফলত্যাগী হইয়া নিকাম কর্মসাধন আবশ্যক এবং এরূপ কর্মে প্রবৃত্তার্থ নিম্নশ্রেণীর লোকের পক্ষে সকাম কর্মও বিধেয়। কিন্তু নিম্ন দুই শ্রেণীর লোকের সততই আচার্য্য উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা প্রয়োজন। কর্মের যে মোক্ষ উদ্দেশ্যে ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরভক্তির জন্ম চিত্তশুদ্ধি তাহা বিমুক্ত হইয়া কেবল কর্মপরায়ণ হইয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করা বৃথা।

ঈশ্বরের সর্ব কর্ম সমর্পণ করা অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্তা, দান ও বিবিধ যত কিছু সংকার্য্য মানব করিয়া থাকে, তাহাতে তাঁহাকেই স্মরণ, তাঁহারই মহিমা কীর্তন, তাঁহারই বিতৃতিদর্শন করা হয়; কখন বা তাঁহারই বিষ্ণুরূপ, কখন বা সোম্য মূর্তি ধ্যান করিলে এমনই অনির্লসনীয় ভাব মনে উপস্থিত হয়, যে তাহাতে অহংভাব বিমুক্ত সোহং জ্ঞান উপস্থিত হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। এই পরাসিদ্ধি সাধকের প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ, এজন্ম কেবলমাত্র ঈশ্বরপরায়ণ হইলে যে ব্যবসায়িকা বুদ্ধি লাভ করিতে হয়, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলেও ক্ষতি নাই, এ এমনই ধর্ম যে ইহার যতদূর সাধন হয় ততদূরই কল্যাণকর। বৈদিক অকিঞ্চিকর স্মৃতি লাভও হইল না, সিদ্ধি লাভও হইল না বলিয়া দুঃখের বিষয় কিছুই নহে, যে হেতু যখন এরূপ কর্ম সমর্পণ দ্বারা ঈশ্বরমগ্ন হইলে পবিত্র স্মৃতির ইয়ত্তা নাই, অনির্লসনীয় স্মৃতি লাভ হয়, তজ্জন্ম ইহজন্মে যোগব্রত অর্থাৎ উক্ত প্রকার চরম সিদ্ধির অলাভ হইলে, ইহজন্মের কিয়ৎ পরিমাণে তৎকার্য্য বলে পরজন্মে তৎকর্ম সাধনে অধিক সমর্থবান হওয়া যায়। তাই কাহারও অনেক জন্মভরে সিদ্ধিলাভ, কাহারও পূর্বাঙ্কিত কর্ম বলে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। দ্রব্য যজ্ঞাদি যত প্রকার যজ্ঞ কর্ম, তদপেক্ষা ঈশ্বর পরায়ণতা স্বরূপ জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ এবং সেই যজ্ঞের যে প্রধান ফল ঐশিক ভাব প্রাপ্ত হওয়া, তদ্যাব মধ্যে সর্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি এবং সৌহার্দ্য পরিগণিত। সুতরাং যিনি সর্বভূত

হিতে রক্ত, বাহার শত্রুমিত্রে সমান ঐতি ও দয়া, এবং যিনি
ঈশ্বর ইষ্টানিষ্টে তুলিরা সর্ব কর্মেই সমর্পণ করেন, তিনিই
পরম যোগী।

কর্মকর (জি) কর্ম করোতি মূল্যন কর্মন, ক-ট- (কর্মণি
ভূতো। পা ৩।২।২২)। ১ বেতন লইয়া কার্যকারক,
চাকর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়। ভূতক, ভূতিভূক, বৈতনিক,
বেতনোপজীবী, ভরণ্যভূক ও কর্মণ্যভূক। ২ কর্মকারক,
যে কর্ম করে।

(“শিষ্যাস্তেবাসিভূতকাস্তুভূতবিকর্মকুৎ।

এতে কর্মকরা জ্ঞেয়াঃ” মিতাকরা।)

৩ (পুং) (কর্মহিংসাং করোতি, ক-হেত্বাদৌ ট) যম।

(কর্মকরো ভূত্যে বেতনোপজীবিনঃ ত্রিষু। কীনাশে পুংসি।

মেদিনী।)

কর্মকরী (জী) কর্মন-ক-ট-ভীপ্। ১ দাসী। ২ মূর্খালতা।
৩ বিধিকা লতা, তেলাকুচার লতা।

কর্মকর্তা (পুং) কর্মণঃ কর্তা সম্পাদকঃ, ৬তৎ ৮ ১ কার্য-
কারক। ২ (কর্তব্যে কর্তা) ব্যাকরণোক্ত বাচ্যবিশেষ;
ইহাতে কর্মের কর্তৃত্ব বিবক্ষা দ্বারা কর্ম কর্তৃত্বতা প্রাপ্ত হয়।
“ক্রিয়মাণস্ত যৎকর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।

স্বকরৈঃ বৈশ্বপৈঃ কর্তুঃ কর্মকর্তেতি তদ্বিশ্বঃ॥”

কর্তা যে কর্ম করিতেছেন, তাহা যদি নিজের গুণে
আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়, তাহাকেই কর্মকর্তা কহে।
এই বাচ্যে কর্মবাচ্যের জ্ঞান যত্, আত্মনেপন, চিণ্, চি্ণ্যৎ ও
ইট হয়, এবং কর্মে প্রথমা হইয়া থাকে।

কর্মকাণ্ড (ক্লী) কর্মণাং কর্তব্যতাপ্রতিপাদকঃ কাণ্ডম্,
মধ্যলোম্। কর্মের কর্তব্যতাপ্রতিপাদক বেদাংশ। [কর্ম দেখ।]

কর্মকার (জি) কর্ম করোতি ভূতিং বিনা ইতি শেষঃ। ১
বেতন ব্যতিরেকে বাহারা কর্ম করে, বেগার। ২ কামার
নামক জাতিবিশেষ। [কামার দেখ।]

(“হরিগাঙ্কি! কটাক্ষেণ আত্মানমবলোকয়।

নহি খেড়া বিজানান্তি কর্মকারং স্বকারণম্” উত্তট।)

কর্মকারক (জি) কর্মকরোতি, কর্ম-ক-বুল-(বুলভূটো।
পা ৩।১।১৩৩)। কার্যকারক।

কর্মকারী [ন] (পুং) কর্ম করোতি, কর্ম-ক-ণিনি। কর্ম-
কারক। (“তাম্ বিদিত্বা সূচরিতৈ গুচৈতৎ কর্মকারিভিঃ”
মহু ৯।২৬১।)

কর্মকীলক (পুং) কর্মণা কীলকইব বজ্রকালনাদিনা গৃহ-
স্থানাং মাননক্ষাপটিকীলকস্বরূপঃ। রজক, খোবা।

কর্মকুশল (জি) কর্মণি কুশলঃ, ৭তৎ। কর্মে নিপুণ।

কর্মকুৎ (জি) কর্ম করোতি, কর্মন-ক-কিপ্। কর্মকারক।

(“কর্মাপি বিবিধং জ্ঞেয়মগুতং গুতমেব চ।

অগুতং দাসকর্মোক্তং গুতং কর্মকৃত্যং স্বতম্” মিতাকরা।)

কর্মকুম (জি) কর্মণি কুমঃ সমর্থঃ, ৭তৎ। কর্ম করিতে সমর্থ।

(“আত্ম কর্মকমং দেহং ক্ষাভোদ্যর্থ ইবাশ্রিতঃ।” ৪মু।)

কর্মক্ষেত্র (ক্লী) কর্মণাং ক্রিয়াস্থানানাং ক্ষেত্রম্, ৬তৎ।
ভারতবর্ষ, এই স্থানে কর্ম করিয়া কর্মকলাভূদ্যারে অজ্ঞাত
বর্ষে জন্ম হইয়া থাকে। ভাগবতে লিখিত আছে,—

“অজাপি ভারতমেব বর্ষং কর্মক্ষেত্রম্। অজ্ঞাতঐবর্ষানি
স্বর্গিণাং পুণ্যশেষোপভোগস্থানানি ভৌমস্বর্গপদানি ব্যপদি-
শন্তি” ভাগবত ৫:২৭।১।) কথিত বর্ষমুহ মধ্যে ভারতবর্ষই
কর্মক্ষেত্র, অন্যান্য ঐবর্ষে স্বর্গবাসিদিগের অবশিষ্ট পুণ্য
ভোগের স্থান, এজ্ঞাত ঐ সকল বর্ষকে ভৌমস্বর্গ বলিয়া থাকে।

কর্মগ্রাস্তি (পুং) কর্মণাং গ্রাস্তিবন্ধনমদ্বাৎ, বছরী। অজ্ঞান
জন্য বাসনাস্রপ দোষ, এই বাসনাই সকল প্রবৃত্তি ও কর্ম-
বন্ধনের হেতু।

কর্মচণ্ডাল (পুং) কর্মণা চণ্ডালইব। ১ অস্বয়ক, হিংস্রক।
২ পিশুন, খল। ৩ কৃত্রিম। ৪ অত্যন্ত ক্রোধী।

(“অস্বয়কঃ পিশুনশ্চ কৃত্রিমো দীর্ঘরোবকঃ।

চত্বারঃ কর্মচণ্ডালা জঘন্তচাপি পঞ্চমঃ” বসিষ্ঠ।)

৫ রাহু। (“উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহৌ ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।

কর্মচণ্ডাল। যোগোৎসব মম পাণকরং কুৎ”

গ্রহপমুক্তিমান মন্ত্র।)

কর্মচন্দ্র (পুং) ১ মালবদেশের একজন রাজা। ২ মগধের
একজন রাজা।

কর্মচারী [ন] (জি) কর্মণি চরতি, কর্ম-চর-ণিনি। বেতন
লইয়া বাহারা কার্য করে।

কর্মচিৎ (জি) কর্ম-চি-ভূতে কিপ্। ১ কৃতকর্ম, যে কর্ম
করা হইয়াছে। ২ কর্মের দ্বারা চীরমান অর্থাৎ বাহা সঞ্চিত
হইতেছে।

(“কর্মময়ান্ কর্মচিত্তে কর্মণৈবাবীরজে।

কর্মণা চীরজে।” শতপথ ব্রা ১০।৫।৩।৯।)

কর্মচিত্ত (জি) কর্মণা চিত্তঃ, কর্ম-চি-ক্ত। কর্মনিষ্পাদ্য,
কর্মের দ্বারা বাহা সম্পাদন করিতে হয়।

(“তদ্যথৈহ কর্মচিত্তোলোকঃ কীরতে এবমমুজ পুণ্যচিত্তঃ।”
বেদপরিঃ শ্রুতি।)

কর্মচেষ্ঠা (জী) কর্মণি চেষ্ঠা, ৭তৎ। ক্রিয়াস্থানানের চেষ্ঠা।

(“আত্মজন্যা ভবেদিক্ষা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ।

কৃতিজন্যা ভবেকেষ্ঠা চেষ্ঠাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ” মহু)

কর্মচোদনা (জী) কর্মণি কর্মাবোধনে চোদনা বিধি।

১ কর্মবিষয়ে প্রেরণকারক বিধি। ২ (কর্মচোদ্যতে প্রবর্ততেহনরা, অ-টাপ্) কর্মে প্রবৃত্তির হেতু।

(“জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।” গীতা।)

৩ কর্মবিধি (“চোদনা চোপদেশশ্চ বিশিষ্টৈকার্থ বাচিনঃ। ইত্যনেন উক্ত লক্ষণং ত্রিগুণাত্মকঃ জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্মবিধিঃ প্রবর্ততে।” ত্রীধরবামী।)

কর্মজ্ঞ (পুং) কর্মণঃ কর্মজনাদৃষ্টাভ্যাস্যতে, কর্মজন্-ড। ১ কর্মকল জন্য রোগাদি; এই রোগ শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত হইয়া ঔষধপ্রয়োগেও উপশম প্রাপ্ত হইয়া না, কেবল কর্ম-করেই ইহার শাস্তি হইয়া থাকে। ২ জন্মপরিগ্রহ, কারিক, বাচিক ও মানসিক কর্মবিশেষের ফলে যোনিবিশেষে জন্ম হইয়া থাকে। ৩ পাপপুণ্যাদি। ৪ ক্রিয়া জন্য সংযোগ বিভাগাদি। ৫ বেগনামক সংস্কার।।

(“মূর্ত্তমান্নৈতু বেগঃ ত্র্যং কর্মজ্ঞো বেগজঃ কচিৎ। ভাষাপরি”)

৬ বটগাছ। ৭ (কর্মণো জাতঃ বিষভোগবাসনাবশাং ক্রমশো মলিনায়মান বৃত্তিভিজাত ইত্যর্থঃ) কলিযুগ। ৮

(ত্রি) ক্রিয়াজাত।

(“তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্মজং দোষমাশ্রয়ঃ।” মনু ১২।১০)

কর্মজ্ঞগুণ (পুং) কর্মণো জায়তে যো গুণঃ, কর্মধা°। ক্রিয়া-জন্য গুণ, সংযোগ, বিভাগ ও বেগ।

(“সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ বেগশ্চৈততে তু কর্মজাঃ। ভাষাপরি”।)

কর্মজিৎ (পুং) ১ জরাসন্ধবংশীয় মগধের নৃপবিশেষ। ২ উড়িষ্যার একজন রাজা। তিনি ৭৮ খৃঃ হইতে ১৪৩ খৃঃ অব্দ অবধি, ৬৫ বর্ষ রাজত্ব করেন।

কর্মজ্ঞ (ত্রি) কর্ম জানাতি কর্মন্ জ্ঞা-ক। কর্মবোধক, যাহার হিতাহিত ও সময় বুঝিয়া কর্মবিশেষ করিবার জ্ঞান আছে।

কর্মজ্ঞ (ত্রি) কর্মণি ঘটতে কর্মন্ অঠচ্ (কর্মণি ঘটোহঠচ্। পা ৫।২।৩৫।) কর্মকুশল, কর্মে সুনিপুণ, যে যন্ত্রের সহিত শূশ্রুণায় নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করিতে পারে। ইহার অপর নাম কর্মপুর।

(“জ্ঞাতাশয়ন্তত্ব ততোব্যতানীৎ।

স কর্মঠঃ কর্ম স্ততাল্লবজি”। ভট্টি ১।১১।)

কর্মণিবাচ্য (পুং) ব্যাকরণোক্ত বাচ্যবিশেষ। এই বাচ্যে কর্মে প্রথম ও কর্তার দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং কর্মপদের বচন ও পুরুষ নির্দিষ্ট হয়।

কর্মণ্য (ত্রি) কর্মণি সাধুঃ কর্মন্-ঘৎ। ১ কর্মযোগ্য, কেজো। ২ যাহা কর্মবিশেষে আবশ্যক।

কর্মণ্যাতা (জী) কর্মণ্যত্ব ভাবঃ, কর্মণ্য-ভল্-টাপ্ (তত্ত্বভাব-স্তভলো। পা ৫।১।১১৯) ১ নিপুণতা। ২ কাজে লাগা।

কর্মণ্যভূক্ (ত্রি) কর্মণং বেতনং ভূক্তে, কর্মণ্য-ভূজ-কিপ্। বেতনোপভোজী, চাকর।

কর্মণ্য (জী) কর্মণা সম্পদ্যতে, তত্র সাধু কর্মন্-ঘৎ-টাপ্। ১ বেতন। ২ মূল্য।

কর্মণ্যগ (পুং) কর্মণঃ ভ্যাগঃ, ভতৎ। কর্ম পরিত্যাগ করা, চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া।

কর্মদক্ষ (ত্রি) কর্মণি দক্ষঃ ৭তৎ। কর্মে পটু।

কর্মদুষ্ট (ত্রি) কর্মণা দুষ্টঃ, ৩তৎ। ১ কর্মবিশেষের দ্বারা গতিত। ২ পাপী।

কর্মদেব (পুং) কর্মণা দেবঃ প্রাপ্ত দেবভাবঃ। দেববিশেষ; অষ্টবহু, একাদশ রুদ্র, বাদশ সূর্য্য, এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই তেত্রিশটি কর্মদেব। অগ্নিহোতাদি বৈদিক কর্মক্ষেত্রে ইহার দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ইন্দ্র প্রভু এবং ইহাদিগের আচার্য্য বৃহস্পতি।

কর্মদেবী। দেবারের রাজা সমরসিংহের পত্নী। ইহার পুত্রের নাম রাহপ। [সমরসিংহ দেখ।]

কর্মদেবতা (জী) কর্মণা দেবতা। কর্মদেব।

(“জ্যোতিষ্টোমাদিনা স্বর্গং প্রাপ্তঃ স্র্যঃ কর্মদেবতাঃ।” শব্ধতি।)

কর্মদোষ (পুং) কর্মের দোষঃ, কর্মহেতুদোষো বা। ১ দুষ্ট কর্ম, পাপজনক হিংসাদি কর্ম। ২ কর্ম জন্য পাপাদি। ৩ কর্মবিষয়ক দোষ। ৪ সমস্ত কর্মের মূল কারণস্বরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্য বাসনারূপ দোষ।

কর্মধারয় (পুং) ব্যাকরণোক্ত সমানাসিকরণ পদঘটিত সমাসবিশেষ।

(“সমানাসিকরণস্তৎ পুরুষঃ কর্মধারয়ঃ।” পাণিনি।)

কর্মধ্বংশ (পুং) কর্মণো ধ্বংসঃ, ভতৎ। কর্ম নষ্ট, কর্মক্ষতি।

কর্মণাশা (জী) কর্ম নাশরতি, কর্মন্-নশ-গিচ্-অণ্-টাপ্। নদীবিশেষ। বঙ্গপ্রদেশের শাহাবাদ জেলার কাইয়ুর পাহাড় হইতে, অক্ষা° ২৪° ৩৪' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ৪১' ৬০" পূঃ মধ্যে নির্গত হইয়াছে। এই নদী উত্তর পশ্চিমমুখে গিয়া দরিহার গ্রামের নিকট শাহাবাদ ও মির্জাপুর দুইদিকে দুই জেলা রাধিয়া বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। এই নদী চৌসা গ্রামের নিকট গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার দুইটি শাখা ধর্মাবতী ও দুর্গাবতী।

পাহাড়ের উপরে যেখানে যেখানে কর্মণাশা বহিতেছে, সেখানকার নদীগর্ভ পাথরিয়া হইলেও যেখানে জমি পাইয়াছে সেখানকার গর্ত্ত কর্দময় ও অতি গভীর। মাঘ কান্ডনে এই

নদী শুধাইয়া যায়, কিন্তু বৰ্ষাকালে ইহাৰ ভোড় দেখে কে, তখন অল্পকালে সহজে নামিতে অনেককই সাহস করে না। সেই সময়ে মালবোকাই করা বড় বড় নৌকা অনায়াসে ইহাৰ বকে ভাসিরা যায়। মিৰ্জাপুর জেলার ছানপাথর নামক স্থানে এই নদী ১০০ ফুট উচ্চ হইতে নামিতেছে, অধিক বৃষ্টির সময়ে সেই জলপ্রপাতটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। অনেক বলিয়া থাকেন, এই নদী স্পর্শ করিলে মহাপাপ হয়, রাধণের প্রসাবে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। [বৈদ্যনাথ দেখ।] কাহারও মতে, সূৰ্য্যবংশীয় ত্রিংশু রাজা ব্রহ্মহত্যার পাপ করেন। তিনি আপনায় পাপমোচনের অস্ত্র পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্যভোয়া নদীর জল আনয়ন করেন এবং সেই জলে ছান করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এখন যে কৰ্মনাশা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সেই ত্রিংশুরাজার পাত্ৰ-ধোত অপবিত্র জল। আবার কাহারও মতে, উত্তর পশ্চিমা-কলে, প্রাচীন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণ এই নদী পার হইয়া কীকট অথবা বন্দেপে আসিতেন না, তাই সেই সময় হইতে অপবিত্র রহিয়াছে। যাহা হউক, এই নদীকূলে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা এই নদী অপবিত্র মনে করে না, এই নদীর জলে তাহাদের সাংসদ্বাৰ্য্য কার্য্য চলিতেছে। বরং ভবিষ্য ব্রহ্মধৰ্মে লিখিত আছে যে, এই নদীতে, বিশেষ গঙ্গা ও কৰ্মনাশাসকমে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। যথা—

“ভাগীরথ্য সমং তজ্জ কৰ্মনাশা নদী বিজাঃ।

সংগতিং পুণ্যাদাং প্রাপ্তা লোকতারগহেতবে ॥”

ভং ব্রহ্মধৰ্ম ৫৮।৪০।

উক্ত ব্রহ্মধৰ্মের মতে, এই নদীর কূলেই তাজ্জকারাকগীর বন ছিল।

কৰ্মনিষ্ঠ (ত্রি) কৰ্মনি নিষ্ঠা যন্ত, বহুব্রী। বাগাদি কৰ্মাসক্ত।

(“জ্ঞাননিষ্ঠা বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাত্তথাপরে।

তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কৰ্মনিষ্ঠাত্তথাপরে।” মহু।)

কৰ্মনিষ্ঠা (ত্রি) কৰ্মনি নিষ্ঠা আসক্তি, ৭৩৭। কৰ্মে আসক্তি।

কৰ্মন্দ (পুং) তিক্ৰুহ্রকার ঋষি বিশেষঃ।

কৰ্মন্দী [ন্] (পুং) কৰ্মন্দেন তিক্ৰুহ্রকারকেন ঋষি-বিশেষেন প্রোক্তঃ তিক্ৰুহ্রমধীতে, কৰ্মন্দ-ইনি (কৰ্মন্দ কৃশাশ্বাদিনিঃ। পা ৪।৩।১১১।) তিক্ৰু, সন্ন্যাসী।

কৰ্ম্মত্বাস (পুং) কৰ্ম্মাণাং বিহিতকৰ্ম্মাণাং বিধিনা জ্ঞাসঃ ভ্যাগঃ। ১ কৰ্ম্মভ্যাগ, সন্ন্যাস। ২ কৰ্ম্মফল ভ্যাগ।

কৰ্ম্মপঞ্চম (মল্লীত) ললিতা, হিন্দোল, বসন্ত ও দেবকার যোগে উৎপন্ন রাগিণী বিশেষঃ।

কৰ্ম্মপঙ্ক (পুং) কৰ্ম্মাণাং পঙ্কঃ, কৰ্ম্মন-পখিন্-অহ। কৰ্ম্মের

পঙ্কতি। এই কৰ্ম্ম পঙ্কতি মনপ্রকার, মহাত্মারূপে সেই মন কৰ্ম্মপঙ্কতি পরিত্যাগ করিবার উপদেশ আছে,—

“কায়েন ত্রিবিধং কৰ্ম্ম বাচ্য চাৰ্ণি চতুর্বিধম্।

মনসা ত্রিবিধকৈব মনকৰ্ম্মগণাংভ্যাং ॥

প্রাণাতিপাত্ত্বৈ তৈমাক পরদারমাণিব।

ত্রীণি পাণ্ডুনি কায়েন সৰ্ব্বতঃ পরিবৰ্জয়েৎ ॥

অসংপ্রাণং পাকবাং গৈশ্চত্ৰমুতং তথা।

চত্বারি বাচ্য রাজেন্দ্ৰ ন জন্মেরাহুচিন্তয়েৎ ॥

অনতিথ্যা পরমেশ্ব সৰ্বসংযমু সৌদাম্।

কৰ্ম্মণাং কলমতীতি ত্রিবিধং মনসা চয়েৎ ॥”

ত্রিবিধ কায়িক, চতুর্বিধ বাচিক ও ত্রিবিধ মানসিক এই মন কৰ্ম্মপথ পরিত্যাগ করিবে। প্রাণনাশ, চৌর্য ও পরদার গমন এই তিন প্রকার কায়িক কৰ্ম্ম সৰ্ব্বতোভাবে ভ্যাগ করিবে। অসংবাক্য, কৰ্ম্মপাক্য, নিষ্ঠুরবাক্য ও মিথ্যাবাক্য এই চারি প্রকার বাক্য বলিবে না। পর-সম্পত্তিতে নিস্পৃহ হইয়া সৰ্ব্বজীবে সৌদাম্য স্থাপন করিয়া এবং কৰ্ম্মের ফল আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া আচরণ করিবে।

(ভারত অঙ্ক ১৩ অঃ।)

কৰ্ম্মপঙ্কতি (ত্রি) কৰ্ম্মাণাং পঙ্কতি, ৬৩৭। কৰ্ম্মের প্রণালী, কৰ্ম্ম করিবার নিয়ম।

কৰ্ম্মপাক (পুং) কৰ্ম্মণঃ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মমূলকস্য পাকঃ পরিণাম, ৬৩৭।

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের সুখদুঃখাদিরূপ পরিণাম। [কৰ্ম্মবিপাক দেখ।]

কৰ্ম্মপ্রদীপ (পুং) কৰ্ম্ম প্রদর্শিত্বঃ প্রদীপ ইব। কাভ্যায়ন প্রণীত গ্রন্থবিশেষঃ।

কৰ্ম্মপ্রবচনী (পুং) কৰ্ম্ম প্রোক্তবান, কৰ্ম্মন-প্রবচ-অনীয়ঃ। পাণিনি ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষঃ; (কৰ্ম্ম প্রবচনীয়াঃ। পা ১।৪।৮০)।

কৰ্ম্মপ্রবাদ (পুং) জৈন ধৰ্ম্মশাস্ত্রাভ্যন্তরিত চতুর্দশ পুর্কের মধ্যে অষ্টম পুর্ক। [জৈন দেখ।]

কৰ্ম্মফল (ক্লী) কৰ্ম্মণঃ ক্রীতকৃত্তত্ত্বভূতভরণপত্র ফলং পরিণামঃ।

১ ভূতাত্ত্ব কৰ্ম্মের সুখদুঃখ ভোগরূপ পরিণাম। ২ কামরাজ ফল।

কৰ্ম্মবন্ধ (ক্লী, পুং) কৰ্ম্মণা বন্ধঃ শরীরলব্ধঃ, ৩৩২। ১ কৰ্ম্ম জন্ত অদৃষ্টবশে পরজন্মরূপ বন্ধন। ২ (ত্রি) কৰ্ম্মবন্ধ বন্ধ-সাধনং যন্ত, বহুব্রী। কৰ্ম্মরূপ বন্ধনের কারণবৃত্ত। (“লোকো হয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ।” গীতা।)

কৰ্ম্মবন্ধন (ক্লী) কৰ্ম্মণা বন্ধনং, কৰ্ম্ম এব বন্ধনম্। ১ কৰ্ম্ম জন্ত জন্মগ্রহণ। ২ কৰ্ম্মরূপ বন্ধন।

কৰ্ম্মভূ (ক্লী) কৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্মনি উচিতা বা ভূঃ, ৬ বা ৭৩৭।

১ চালের উপযুক্ত ভূমি, কষ্টভূমি; ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
কর্মাস্ত। ২ ভারতবর্ষ।

(“তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বীপে মহামুনে।

যতো হি কর্মভূম্যে অতোহস্তা ভোগভূময়ঃ ॥”)

কর্মভূমি (জী) কর্মণঃ পুণ্যজনকযজ্ঞাদিরূপক্রিয়ায়া ভূমিঃ,
৬তং। ১ আখ্যাবর্ত্ত।

(ভরতাত্মৈশ্বর্যতানি বিদেহাশ্চ কুরুন্ বিনা।

বর্ষাণি কর্মভূম্যাঃ স্তাঃ শেষাণি ফলভূময়ঃ ॥ হেম ৪। ১২।)

২ ভারতবর্ষ।

(“উত্তরং যৎ সমুদ্রস্ত হিমাশ্চৈশ্চ ব দক্ষিণম্।

বর্ষং তদভারতং নাম ভারতী যত্র সত্যতি ॥

নবযোজনসাহস্রো বিস্তারো হস্ত মহামুনে।

কর্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্ ॥”

বিষ্ণুপুং ৩। ১। ২।)

কর্মভোগ (পুং) কর্মণঃ কর্মজন্তু স্তৃষ্ণুঃখাদিভোগঃ, ৬তং।

কর্মফলাহুসারে স্তৃষ্ণুঃখাদির ভোগ।

কর্মমজ্জী [ন্] (পুং) কর্ম মজ্জয়তি, কর্মন্-মজ্জ শিচ্-গিনি।

কর্ম সম্বন্ধে মজ্জগাঢ়তা।

কর্মমীমাংসা (জী) কর্মণি মীমাংসা। কর্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়-
কারক বিচার শাস্ত্রবিশেষ। জৈমিনিহৃত্য।

কর্মমূল (ক্লী) কর্মণো মূলমিব মূলমন্ত, মধ্যলোং বহুব্রী।
যবা কর্মণে যজ্ঞাদি ক্রিয়াজন্তু সংকর্মার্থং মূলং যন্ত। কুশ
নামক তৃণবিশেষ।

কর্মযুগ (ক্লী) কৃণাতি হিনস্তি অজ্ঞোহন্তং যত্র, কৃ-মনিন্; কর্ম
হিংসাপ্রধানং যুগম্ কর্মধা। কলিযুগ।

কর্মযোগ (পুং) কর্মস্ব যোগন্তুকৌশলম্, ৭তং। চিত্ত শুদ্ধি-
জনক বৈদিক কর্ম। [কর্ম দেখ।]

(“অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্ত সাধকঃ।

কর্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্তচিৎসেব দৃশ্যতে ॥” মলমাস তত্ব।)

কর্মযোগী [ন্] (পুং) কর্মযোগো হস্তান্তি, কর্ম-যোগ-ইনি।
কর্মযোগে রত; যাহারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি অভিলাষে যজ্ঞ ধ্যানাদি
বৈদিক কর্ম করেন।

কর্মযোনি (জী) কর্মণো যোনিঃ আদিকারণম্, ৬তং।
কর্মের মূল কারণ।

কর্মর (পুং) কর্ম হিংসাং রাস্তি, কর্মন্-রী-ক। কামরালা।

কর্মরক (পুং) কর্মর স্বার্থে কন্। কামরালা।

কর্মরত্ন (পুং, ক্লী) কর্মণে হিংসার রজ্যতে, রোগাদিজনক-
হাদিত্তি ভাবঃ, কর্মন্-রজ্জ-বঞ্। ফলবৃক্ষবিশেষ, কামরালা।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শিরাল, বৃন্দন, সজাকর, কর্মার,

কর্মরক, শীতফল, কর্মর, সূক্ষ্মরক, মূলসর, ধরাফল ও কর্মরক।
হিন্দীতে কামরক বা কামরল, বোম্বাইঅঞ্চলে কর্মরল, তামিল
ভমর্ত্তম-খরম, তৈলঙ্গে কোরমল বা ভমর্ত্তচেত্তু, মললে বিং
বিং মণিস, ত্রক্ষে জুজ বা, পর্জু গীজ করখোল। ইংরেজী বৈজ্ঞা-
নিক নাম Averrhoa Carambola. রাজনির্যটকের মতে ইহার
গুণ,—অন্ন, উষ্ণ, বায়ুনাশক, পিত্তকারক, তীক্ষ্ণ, কটুপাকী
ও অন্নপিত্তকারক। ইহার পক্ষফল মধুর ও অন্নরস, এবং
বল, পুষ্টি ও ক্ষতিকারক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা শীতল,
মলবদ্ধকারক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

কামরালা ছই প্রকার, মিঠা ও টক্। তন্মধ্যে পাকা টক্
কামরালাই অনেকে পছন্দ করেন, খাইতেও বেশ সুখরোচক।

কামরালা গাছ ১৪ ফুট হইতে ৩৬ ফুট পর্যন্ত বড় হইতে
দেখা যায়। যুরোপীয়দিগের মতে, কামরালা প্রথমে ভারত
মহাসাগরীয় মালাক্কাধীপে জন্মাইত, তথা হইতে সিংহলে
এবং সিংহল হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। কিন্তু আমাদের
বিবেচনায় তাহা নয়, বহু প্রাচীনকাল হইতে ইহার গাছ
ভারতবর্ষে জন্মাইতেছে, রামায়ণ হইতে তাহার প্রমাণ
পাওয়া যায়। এক্ষণে ভারতের প্রায় সর্বত্রই কামরালা
জন্মাইতেছে।

কর্মরাষ্ট্র। দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন উপবিভাগ। (Ind.
Ant. VII. 189)

কর্মরী (জী) কর্ম ভৈষজ্যোপযোগক্রিয়াং রাস্তি দদাতি,
কর্ম রা-ক গৌরাদিভাং ডীষ্ (বিদ্যগৌরাদিভ্যচ। পা ৪। ১। ৪১।)
বংশলোচনা। [বংশলোচন দেখ।]

কর্মর্ষ (পুং) অথর্ববেদী একজন প্রাচীন ঋষি।

কর্মর্ষচন (ক্লী) কর্মর্ষাক্য। বৌদ্ধমতানুযায়ী ক্রিয়াকান্ত।

কর্মর্ষজ (পুং) কর্ম শ্রোতাদ্যহুষ্ঠানং বজ্জমিব যত, বহুব্রী। শূদ্র।

কর্মর্ষৎ (ত্রি) কর্ম অস্তান্তি, কর্ম মতুপ্, মন্ত বঃ। কর্মবিশিষ্ট।

কর্মর্ষশ (ত্রি) কর্মণো বশঃ ৬তং। ১ কর্মের অধীন।
২ কর্মের অহরোধ।

কর্মর্ষশিতা (জী) কর্মর্ষশিনো ভাবঃ, কর্মর্ষশিন্-তল্ (তন্ত
ভাবত্বতলো। পা ৫। ১। ১১১।) কর্মর্ষশিনের ধর্ম।

কর্মর্ষশী [ন্] (পুং) কর্মণো বশঃ বশ্ততা অস্তান্তি, কর্মর্ষশ-
ইনি। কর্মাধীন।

কর্মর্ষশ্রুতা (জী) কর্মণো বশ্ততা, অধীনতা, ৬তং। কর্মের
অধীনতা।

কর্মর্ষাটী (জী) কর্মণাং শাস্ত্রোক্ত তিথি নিমিত্তীভূতক্রিয়াণাং
চক্রকলাক্রিয়াণাং বাটীব। তিথি।

(তিথিঃ পুনঃ কর্মর্ষাটী প্রতিপৎ পক্ষতিঃ নমে। হেম ২। ৬১।)

কর্মবিধি (পূঃ) কর্মণো বিধিনিয়মঃ, ৬তং। কর্মের নিয়ম।

কর্মবিপাক (পূঃ) কর্মণঃ ধর্মার্থমূলকত্ববিপাকঃ পরিণামঃ, ৬তং। শুভাশুভ কর্মের ফল সুক্তি, স্বর্গ, পরজন্মে ঐশ্বর্যাদি জন্মের উপকরণ লাভ করিয়া সুখভোগ প্রভৃতি শুভকর্মের ফল এবং রোগ ও নরকাদি অশুভ কর্মের ফলভোগ।

আমাদের শাস্ত্র মতে, অধর্মের নানাবিধ অঙ্গসারে প্রথমে তরুণ নরক ভোগ করিয়া পাণ্যোনি বিশেষে উৎপত্তি হয়। তরুণ পাণ্যে তরুণ যোনিতে উৎপত্তি হয় তৎসম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ লিখিত আছে,—পতিত ব্যক্তির দান গ্রহণ করিলে নরকান্তে পাপী ক্রমি, উপাধ্যায়কে প্রতারণা করিলে কুকুর, গুরুপত্নী বা গুরুজ্যেষ্ঠ লোভ করিলে গর্ভত, মাতা প্রভৃতি অশু শুভজনকে আক্রমণ করিলে শারিকা, মাতাপিতাকে বসুণী দিলে কচ্ছপ, প্রভুদত্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া অশু ভ্রব্য আহার করিলে বানর, গচ্ছিত ধন অপহরণ করিলে ক্রমি, কাহারও গুণের প্রতি দোষারোপ করিলে রাক্ষস, বিশ্বাসঘাতকতা করিলে মন্ত্র, যব ধাতু প্রভৃতি শত অপহরণে ইন্দ্র, পরজীঘামনে ব্যাব্রুক প্রভৃতি, ভ্রাতৃভায়াহরণে কোকিল, গুরু প্রভৃতির পত্নীহরণে শূকর, যজ্ঞ দান বিবাহ প্রভৃতির বিঘ্ন করিলে ক্রমি; দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া ভোজন করিলে বায়স, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিলে ক্রৌঞ্চ, শত্রু হইয়া ব্রাহ্মণী গমন করিলে ক্রমি, ব্রাহ্মণগর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে কাঠনাশক কাঁট, কৃতঘ্নতা করিলে ক্রমিকীট পতঙ্গ বা বৃশ্চিক, শত্রুহীন ব্যক্তিকে হনন করিলে ধর, স্ত্রী ও শিশুবধ করিলে ক্রমি, কাহারও ভোজ্যবস্তু চুরি করিলে মক্ষিকা, অন্নহরণ করিলে বিড়াল, তিলহরণে মুষিক, স্নাতহরণে নকুল, মদগুরুমন্ত্রহরণে কাক, মধুহরণে উাশ, পিষ্টকহরণে পিপীলিকা, জলহরণ করিলে বায়স, কাঁসা হরণ করিলে হারীত বা কপোত, স্বর্গভাণ্ড হরণে ক্রমি, বজ্রাদি হরণে ক্রৌঞ্চ, অগ্নিহরণে বক, বর্গক ও শাক পত্রাদিহরণে ময়ূর, রক্তবস্ত্র হরণে চকোশ, স্ত্রীশব্দবস্ত্র হরণ করিলে ছুঁচা, বাঁশ হরণ করিলে শশক, ময়ূরের পুচ্ছ হরণ করিলে বণ্ড, কাঠহরণ করিলে কাঠকীট, ফুল চুরি করিলে দরিদ্র, বাব হরণ করিলে পঙ্ক, শাকহরণে হারীত, জলহরণে চাতক এবং গৃহহরণ করিলে রোরবাদি দাক্ষণ নরক ভোগ করিয়া ভূপ শুভ লভা বৃক্ষাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গো স্ত্রবর্ণাদি হরণেও এইরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যা হরণ করিলে বহু নরকভোগের পর মুক হইয়া এবং ইচ্ছান শূন্য অরিতে আহুতি প্রদান করিলে মল্লারি হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

(গুরুত্বপূঃ ২২৯ অঃ।)

পাপকার্য বিশেষের দ্বারা সেই জন্মে বা পরজন্মে রোগ বিশেষও ভোগ করিতে হয়। শাতাতপ ঋষি যে পাপে যেরূপ রোগের বিধান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। পাপ জন্ম যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পর পরজন্মেও ঐ রোগযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মহাপাতক জন্য রোগ ৭ জন্ম, উপপাতক জন্য রোগ ৫ জন্ম, এবং পাপ জন্য রোগ ৩ জন্ম হইয়া থাকে। মহাপাতক, উপপাতক ও পাতকের প্রায়শ্চিত্তেরও নানাবিধ আছে। মহাপাতকের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত, উপপাতকে অর্দ্ধ এবং পাতকে যষ্ঠাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এতদ্বির অতিপাতকে দানাদি সাধারণ বিধানের দ্বারা মুক্ত হইতে পারা যায়।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
হাগহত্যা অবহত্যা যেবহত্যা উট্টহত্যা কাকহত্যা ধরহত্যা হস্তিহত্যা	অধিকার বক্রমুখ পাত্তরোগ বিকৃত স্বর কর্ণহীনতা কর্কশ লোম সর্বকার্যে অসিদ্ধি	বিচিত্রযুক্ত ছাগদান। শত পল চন্দন দান। ব্রাহ্মণকে একপল কস্তুরীদান। কপূরক ফলদান। কুম্ভবর্ণী গাভী দান। ৩ মোহর পরিমিত বর্ণ প্রকৃতি দান। মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গণেশ মূর্তি প্রতিষ্ঠা, অথবা কুলশাখা ও পিষ্টকের দ্বারা গণসমূহের শাস্তি-বিধান ও একলক্ষ গণেশ মন্ত্র জপ।
তরুহত্যা গোহত্যা	কেকরাকি (ট্যারা) কুষ্ঠ	গুণ্যময়ী খেদুদান। পঞ্চ পলব সংযুক্ত, পঞ্চ বর্ণবিশিষ্ট রক্তচন্দন লিঙ্গ, রক্তপুষ্প ও রক্তবস্ত্র আচ্ছাদিত একটি রক্তকুন্ত দক্ষিণদিকে স্থাপিত করিয়া তাহাতে তিলচূর্ণ পূর্ণ তাম্রপাত্র রাখিয়া তাহার ১০৮ বাহা পরিমিত স্বর্ণবর্ণের বস্তুমূর্তি স্থাপন করিয়া পুরুষমুখ মস্তুর দ্বারা পূজা করিবে, এবং তাহার নিকট 'আমার পাপ শাস্তি করুন' বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তৎপরে দামবেদী ব্রাহ্মণ সেই কলসে দাম পারায়ণ করিবেন। অনন্তর দশ ভাগ স্বর্ণ দ্বারা পাত্ৰ মাল্যের অভি-সেচন করিবে। পরিশেষে "যমোহপি মহিষাক্রোধে দণ্ডপাণির্ভয়ানকঃ। দক্ষিণাশা পতির্দেবো মম পাপং ব্যপোহতু।" এই মন্ত্রের দ্বারা ধর্মমূর্তি বিসর্জন দিয়া ভক্তিসহকারে আচার্যকে নিবেদন করিবে।
মহিবহত্যা মাক্ষরহত্যা	কৃকণ্ড হস্ততল পীতবর্ণ	১০৮ বাহা পরিমিত বর্ণ প্রকৃতি দান। ১০৮ বাহা পরিমিত বর্ণে পারাবত প্রস্তুত করিয়া দান।
বকহত্যা শুকশারিকাহত্যা	দীর্ঘনাশিকা খলিত বাক্য	কুম্ভবর্ণী গাভী দান। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত কোম শাস্ত্রগ্রন্থ দান।
শূকর হত্যা	দন্তর	দক্ষিণার সহিত বৃত্ত-মুত দান।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত	পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
শৃগালহত্যা। হরিণহত্যা। শিঙীহত্যা।	পদশূলভা বঙ্গ চেতনানান	একপল পরিমিত বর্ণ-অর্থ দান। একপল পরিমিত বর্ণ-অর্থ দান। ৩০টি প্রাজাপত্য করিয়া, ১ পল পরিমিত বর্ণে নৌকা প্রস্তুত করিয়া এবং ত্রাজাপত্যে রৌপ্যময় কুণ্ড স্থাপন করিয়া ১০৮ মাথা পরিমিত বর্ণে বিষ্ণু বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে পট-বস্ত্র পরিধান করাইয়া যথাবিধি পূজা করিতে হইবে। পরে ঐ সমস্ত ত্রয়া ত্রাক্ষণকে দান করিবে। পিতৃহত্যার ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত। চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া "সরযতি জগন্নাথঃ শলব্রহ্মাদি দেবতে। দুর্দ্ধর্ম বরণং পাপাং পাহি মাং পরমেশ্বরী।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পল পরিমিত বর্ণ সহ ত্রাক্ষণকে পুত্ৰকদান করিবে।	পর্ভপাত দাবায়িগতা চুটবচন ভালধাকিতে মল অন্নদান মুর্ভতা পরিন্দা অনোর ভোজসে বিরদান অন্যকে দুঃখদান অন্যকে উপহাস মুগংসতা প্রতিমা ভঙ্গ মদ্যপান পথনাশ রজবলাপ্পট অন্ন- ভোজন বিষদান সভায় পক্ষপাতিতা হুয়াপান দেবালয়ে ও জলে মলমূত্র ত্যাগ অগম্যাগমন অধোনি গমন অপক অন্নগ্রহণ ইন্দ্রবিহার হরণ উর্গা কথনাদি মেঘলোমজাত ত্রয়া হরণ ঔষধ হরণ	বকুং, মীরা ও জলোদর রক্তান্তিসার ধতিত মন্দ্যদি অপম্মার ধনী অজীর্ণ শূল কাণা হাসকাস অগ্রতিষ্ঠ রক্তপিত্ত পানরোগ কৃমি ছদ্মি রোগ পক্ষাঘাত শ্যাবদন্ত ঔষধরোগ ক্রবমণ্ডল শুভদন্ত হীনদীপ্তি লোমশ দুর্ধাবর্ভ	তিনপল পরিমিত বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রযুক্ত জল ও ধেনুদান। জলপান ও বটফল রোপণ করিবে। দুর্দ্ধপূর্ণ ঘটবর ও দুইপল রৌপ্য ত্রাক্ষণকে দান। তিনটি প্রাজাপত্য করিয়া ১০০ শত ত্রাক্ষণ ভোজন করাইবে। ব্রহ্মকূর্মসরী ধেনুদান। কাঞ্চনসহ ধেনুদান। যথাবিধি লক্ষ হোম কর্তব্য। অন্নদান ও রক্তের জপ করিবে। বর্ণসহ গাভী দান। সহস্রপল পরিমিত ঘৃত দান। তিন বৎসর পর্যন্ত প্রতিদিন অথথেষ্ট সেচন করিয়া বিষরাজের পুত্রা স্থাপন। বর্ণসহ একটি ঘৃত বা অর্দ্ধ ঘটি মধুদান। অধদান। ত্রিরাত্র পোমাত্র ও বাব ভোজন। ১০টি দুর্দ্ধবতী গাভী দান করিবে। সত্যবতী ত্রাক্ষণকে ৩ নিধ (৩২৪ মাথা) পরিমিত বর্ণদান করিবে। প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া ৭ তোলা পরিমিত শর্করাদান, মহারক্তের জপ, তাহার দশাংশ তিলের দ্বারা হোম ও বরণমন্ত্রের দ্বারা অভিষেক। একমাসকাল দেবতাপূজা, একটি প্রাজাপত্য ও দুইটি গাভী দান করিবে। কাপাল-ভার ও কাংসপোহ সংস্কৃত সর্বৎসা তিলঘটি পরিমিত বর্ণধেনুদান; দানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। "হরজী বৈষ্ণবী মাতা মম পাণং ব্যপোহতু।" দুইমাসকাল প্রতিদিন সর্বৎসা সংখ্যক দান। দুই নিধ (২১৬ মাথা) বর্ণে অশ্বিনীজুয়ার নির্মাণ করিয়া দান করিবে। ঔড় ও ধেনু দান। ১০৮ মাথা পরিমিত বর্ণে অগ্নি মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে, পরে ঐ মূর্ত্তি ও কণল দান। একমাসকাল দুর্ধাবর্ভ ও কাঞ্চন দান করিবে।
মাতৃহত্যা প্রাতৃহত্যা	অন্ধ মক				
ম্রীহত্যা	অভীসার	১০টি অথথ বৃক্ষ রোপণ, শর্করা ও ধেনুদান এবং শত ত্রাক্ষণ ভোজন। ত্রাক্ষণের বিবাহ দান, হরিবংশ শ্রবণ, মহারক্তের জপ, অযুতসংখ্যক দুর্দ্ধা আহুতি দিয়া দক্ষিণাসহ ১০৮ মাথা পরিমিত ১১ খণ্ড বর্ণ, অথবা ১১ পল বর্ণ একাদশটি ত্রাক্ষণকে দান করিবে। অন্যান্য ত্রাক্ষণকে যথাশক্তি দক্ষিণ দান কর্তব্য। অবশেষে আচার্য্য বরণদৈবতমন্ত্রের দ্বারা দম্পতিকে দান করাইবেন, যজ্ঞমান আচার্য্যকে বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি প্রদান করিবেন। গো, ভূমি, বর্ণ, মিষ্টান্ন, জল, বস্ত্র, ঘৃতধেনু ও তিলধেনু দান।			
বালকহত্যা	মৃতবৎস	চারিদিকে পঞ্চপল ও পঞ্চবর্ণ সংযুক্ত কলস স্থাপিত করিয়া মধ্য কলসের উপর রৌপ্যনির্মিত অষ্টপল পদ্ম রাখিয়া তাহার উপর ১০ তোলা বর্ণনির্মিত দশহস্ত চতুর্দ্বন্দ্ব দেব স্থাপন করিবে। দ্বাদশদিন পর্যন্ত ত্রাক্ষারী ত্রাক্ষণ ঐ কলসহ দেবের পূজা, দেবপাঠ, হোম প্রভৃতি—প্রত্যহ সম্পাদন করিবে। পরে ঐ সন্ধ্যা ত্রয়া আচার্য্যকে দান করিতে হইবে। ৪টি প্রাজাপত্য করিয়া সপ্ত দান্য উৎসর্গ। ১টি প্রাজাপত্য করিয়া দক্ষিণার সহিত একটি ধেনুদান। শত প্রাজাপত্য করিয়া ত্রাক্ষণকে ভূমি ও দক্ষিণাধান এবং ভারত শ্রবণ। ভীমপঞ্চকের উপবাস। ত্রিরাত্র উপবাস।			
রাজহত্যা	ক্ষয়রোগ				
ক্রমহত্যা	পাতুর্ভ				
বৈভহত্যা	রক্তার্ক				
শূত্রহত্যা	দণ্ডাপতানক				
বংশনাশ	কুষ্ঠ ও নির্দোষ				
অত্যাক ভোজন অশ্মতপ্পট অন্ন ভোজ	উদরে কৃমি ঐ				

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত	পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
কলমূল হরণ	দুঃস্থ হত	যথাশক্তি দেবালয় ও উদ্যান নির্মাণ করিবে।	কলহরণ	অজুলিগ্রহণ	ব্রাহ্মণকে অমৃত সংখ্যক নানাবিধ কলদান।
কাংস্ত হরণ	পুণ্ডরীক	ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাকে শতপল কাংস্ত দান করিবে।	ভ্রাতৃভায়া গমন	গুপ্ত ও ফুট	কন্যাগর্ভবনের প্রায়শ্চিত্তের আর্হেক, এবং যুতযুক্ত তিল দ্বারা দশাংশ হোম কর্তব্য।
গুরুপত্নীগমন	মুত্রকৃচ্ছ	নীলমালাযুক্ত ও নীল বস্ত্র আচ্ছাদিত ঘট পশ্চিমদিকে স্থাপন করিয়া তাহার উপর তাত্রপাত্রে দ্ব্যয়নিক স্বর্ণ নির্মিত বরণ মূর্তি পুরুষমূর্ত্তের দ্বারা পূজা করিবে। সামবেদী ব্রাহ্মণ সেই সময়ে সামবেদ পাঠ করিবে। পরিশেষে ২০ নিফ পরিমিত স্বর্ণ পুস্তলিকা 'নিপ্পাপোহং' বলিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে, এবং ঐ বরণ মূর্ত্তি আচার্য্যকে প্রদান করিবে। বরণ মূর্ত্তি দানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়,— “যাদসামধিপো দেবো বিশেষামধিপো বরঃ। সংসারনো কর্ণধারো বরণঃ পাবনো হুত্ব মে।”	মহাহরণ	নেত্ররোগ	উপবাস করিয়া মধু ও ধেনুদান করিবে।
চণালীগমন	হীনমুক্তা	মাতৃগামীর ভায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। একমাস রজের জপ ও যথাশক্তি স্বর্ণ দান করিবে।	মাতুলানীগমন	কুজতা	কুক্ষমণ চর্মদান।
তপস্বিনী প্রসঙ্গ	প্রমেহ	মধু, ধেনু ও স্বর্ণসহ শতজোপ পরিমিত তিল দান।	মাতৃহরণ	লিঙ্গহীন	উত্তরদিকে কুকমালাযুক্ত কুজ বস্ত্রা- বৃত্ত রাখিয়া, তাহার উপর কাংস্তপাত্রে দ্ব্যয়নিক পরিমিত স্বর্ণ নির্মিত নর- বাহন কুবেস মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুরুষ মূর্ত্তের দ্বারা বজ্র করিবে। অধ্বর্ক বেদবিদ ব্রাহ্মণ সেই সময়ে অধ্বর্ক বেদোক্ত কার্য্য করিবে। পরিশেষে বিশেষতঃ নিফ পরিমিত স্বর্ণের পুস্তলি ব্রাহ্মণকে “নিপ্পাপোহং” বলিয়া দান করিবে, এবং ঐ কুবেস মূর্ত্তি আচার্য্যকে দান করিবে। কুবেসমূর্ত্তি দানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়,— “নিধীনামধিপো দেবঃ শঙ্করস্ত প্রিয়ঃ সখা। সৌম্যশাধিপতিঃ শ্রীমান্ মম পাপং বাপোহতু।”
তপস্বিনী সঙ্গম	অশ্মরী	দক্ষিণসহ উত্তম প্রবালবরণ দান করিবে।	মাতৃদশাগমন	সর্বাঙ্গ ভ্রণ	দানদান ও অগম্যাপমনের প্রায়- শ্চিত্ত করিবে।
তাঁবুল হরণ	শ্বেতোষ্ঠতা	প্রাজাপত্য ব্রত ও শত পল পরি- মিত তাঁবুল দান।	যুতভায়াগমন	যুতভায়া	একটি ব্রাহ্মণের বিবাহ দিবে।
তাত্রহরণ	উদুৎসব কুষ্ঠ	উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণকে দুই ঘণ্টা তৈলদান করিবে।	রক্তবস্ত্র ও প্রবাল- হরণ	বাতরক্ত	মণি ও বস্ত্রসহ মহিবীদান।
তৈলহরণ	কণ্ডু প্রভৃতি	উপবাস করিয়া যথাবিধি যুত ও ধেনু দান করিবে।	দৌহরণ	চিজিতাজ	একদিন উপবাস করিয়া শতপল দৌহ দান করিবে।
ত্রপু (নীসা) হরণ	নেত্ররোগ	ব্রাহ্মণকে দধি ও ধেনু দান।	বস্ত্রহরণ	কুষ্ঠ	নিফপরিমিত স্বর্ণনির্মিত প্রাজাপতি ও ১ জোড়া বস্ত্র দান।
দধিহরণ	মস্ততা	ব্রাহ্মণকে দুইপল কুছুমদান।	বিদ্যাপুস্তকহরণ	মুক	ব্রাহ্মণকে দক্ষিণসহ ভায় ইতি- হাস প্রভৃতি দান।
কাষ্ঠহরণ	হস্তশ্বেদ	দুইটি প্রাজাপত্য করিবে।	ব্রাহ্মণের রক্তহরণ	অনপত্যতা	মহাকরজপাদি, দশাংশ পলাশ কাষ্ঠের দ্বারা হোম, ও যুতবৎসার প্রায়শ্চিত্তোক্ত প্রায়শ্চিত্ত।
দীক্ষিতা স্ত্রীসঙ্গম	দুষ্টিরক্ত জন্তু নেত্র- রোগ	ব্রাহ্মণকে যথাবিধি দুক্ষধেনু দান করিবে।	ব্রাহ্মণের স্বর্ণহরণ	কুলদ্ব	তিনটি চান্দ্রায়ণ করিয়া শত মোহর দান।
দুক্ষহরণ	বহুমুত্র	তন্মধ্যে জ্বরে রক্তের জপ, মহা- জ্বরে মহাকরজের, রৌজ জ্বরে অতি- রৌজের, এবং বৈকুণ্ঠ জ্বরে মহাকরজ ও অতিরৌজের জপ করিবে।	শাকহরণ	নীললোচন	ব্রাহ্মণকে দুইটি মহানীল মণিদান।
দেবতাহরণ	বিবিধ জ্বর	যথাশক্তি জল বস্ত্র ও স্বর্ণদান।	শুক্রিহরণ	পীতুক্ষেপ	উপবাস করিয়া শতপল শুক্রিহরণ করিবে।
দানাবিধ অব্যবহার	গ্রহণী	লক্ষণার গায়ত্রীজপ ও তিল দ্বারা তাহার দশাংশ জপ করিবে।	হৃৎকি ভ্রব্য	অঙ্গদোঁগক	জপ পদ্মের দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে।
পক্ষাঘহরণ	জিহ্বারোগ	যেহুদান।	স্বগোত্র গ্রীগমন	ভগল	মহিবীদান।
পটস্থহরণ	লোমশুভতা	দুইখানি তিলপাত্রে দান।	স্বভাতি গ্রীগমন	হৃদয় ভ্রণ	দুইটি প্রাজাপত্য করিবে।
পণ্ডকোনি গমন	মুত্রাঘাত	যথাশক্তি ছাপ দান।	বকজাগমন	রক্তকুষ্ঠ	পূর্কীককে পীতমালা ও পীতবস্ত্র আচ্ছাদিত কলস রাখিয়া তাহার উপর স্বর্ণপাত্রে ৬ নিফ পরিমিত স্বর্ণ নির্মিত বাসব মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া
পিতৃঘনা গমন	দক্ষিণভাগে ভ্রণ	কত্যাগমনের প্রায়শ্চিত্তের আর্হেক পরিমিত প্রায়শ্চিত্ত, এবং যুতযুক্ত তিলদ্বারা দশাংশ হোম করিবে।			

পাপ	যত্ন	প্রারচিত্ত
অন্যায়ের অধ্যয়ন অম্পদী করুণিত কুমারী গমন বস্ত্রহেমন ও নিকৃন্তন বজ্রনিপা বা দেবনিপা গুরহত্যা	বজ্রাঘাতে অম্পদী করুণিত কুমারী গমন বস্ত্রহেমন ও নিকৃন্তন বজ্রনিপা বা দেবনিপা গুরহত্যা	পুণ্যবস্ত্রের দ্বারা বজ্র করিবে এই নামের এক বস্ত্র: নাম ও বেদাম্বারের আচরণ করিবে। পূজাকে 'নিপা-পো- হই' বলিয়া ব্রাহ্মণকে শত বর্ষ নির্দিষ্ট পুতলী দান করিবে, এবং বাসব মূর্তি আচার্য্যকে প্রদান করিবে ই মূর্তি প্রদানের মন্ত্র,—“দেবানি- মণিগো দেবো বজ্রী বিকুনিক্তন:। শতবজ্র: সহস্রাক: পাপং মম নিকৃন্তু।” বিধা দান। বেদপারায়ণ। বধাশক্তি ধর্মদান। ক্লেত্রমুক্ত ভূমিদান। পরকন্ডার বিবাহ দান। ব্রাহ্মণকে পৌষ্যদান। দক্ষিণাসহ মহিষ দান। নিক পরিমিত বর্ণনির্মিত পাত্রে বিক্রয় অধিষ্ঠানমুক্ত এবং তুলসীপত্র বিত্ত্বিত শযাদান। বাটীতে সত্তা করিবে। কুমারের বিবাহ দান। সংস্কা দুইবতী গাভীদান। ১০টি কঙ্কুত্রাচরণ। ব্রাহ্মাদি হস্তের দ্বারা প্রারচিত্ত। চারি নিক পরিমিত বর্ণনির্মিত হস্তদান। যেহুদান। ব্রাহ্মাদি হস্তের দ্বারা প্রারচিত্ত। ছই নিক বর্ণন হরিদান। বোড়ন প্রাজাপত্য কর্তব্য। বৃষদান। যথাশক্তি পান্থক দান। বর্ণময় পুরুষদান। বর্ণসহ বর্ণময় বৃক্ষ দান। সংযত ভাবে লক্ষনংখ্যক গায়ত্রী জপ। নাগ বলিদান ও বর্ণদান। বজ্রসহ বৃষদান। পান্থগ্রহ দান। উপকরণসহ অম্বদার। তিন নিক পরিমিত বর্ণময় বরণ দান। যথোচিত ব্রহ্ম নাম জপ। দুইবতী গাভী দান। তিন নিক পরিমিত বর্ণ দান।
দক্ষিণাহরণ	দাবারি বা বৃক্ষাঘাতে	
বিত্রোহ	বিবাহসংস্কার- হীনাবস্ত্রের মৃত্যু	
ব্রাহ্মণনিপা	প্রস্তরাঘাতে	
ব্রাহ্মণের বস্ত্রহরণ	অনপতাবস্ত্রের মৃত্যু	
গচ্ছিত ধনহরণ	কুকুরাঘাতে	
রাজহত্যা	গজাঘাতে	
পণ্ডিত্য	চৌরহস্তে	
জালাদি দ্বারা পণ্ড	বনমধ্যে শূকরা- ঘাতে	
পক্ষী ধারণ	অগুচি অবস্থায় মৃত্যু	
অহংকার	পতিত হইয়া মৃত্যু	
মনাবিক্রম	শত্রুহস্তে	
মিত্রভেদ	অগ্নিদগ্ধ	
বজ্রহানি	রাজহস্তে	
রাজকুমারহত্যা	বৃক্ষাঘাতে	
রাজহস্তিহত্যা	অতীসাররোগে	
দৌহরণ	সর্পাঘাতে	
বিষদান	মূলাঘাতে	
শিবনিপা	বনমরোগ বা অম্পদী	
পান্থহরণ	গাড়ীর আঘাতে	
খল	জলমগ্ন	
সেতুভেদ	শাকিনী প্রভৃতির আবেশে	
দর্পের সহিত কার্য	উদ্বলনে	
হিংসা	অবাধাতে	

পাপ	যত্ন	প্রারচিত্ত
হিংসা	বানরাঘাতে বিহুতিকারোগে কঠকবলে কেশরোগে	বর্ণনির্মিত বানর দান। ১০০ ব্রাহ্মণ ভোজন। তিল বেহু দান। ৮ কঙ্কুত্র আচরণ করিবে।

অগতির সাধারণ প্রারচিত্ত,—

কল ও সপ্তদামোয় উপর পঞ্চপদব ও সর্বোবধিসংযুক্ত
কুকুবজ্র আচ্ছাদিত অক্ষাণদুল (আমা) কলস স্থাপন করিয়া,
তাহার উপর মিকপরিমিত বর্ণনির্মিত মহিষাচ্ছ, চতুর্ভুজ,
দণ্ডহস্ত ও বর্ণকুণ্ডলধারী প্রেতরূপী পুরুষ অধিষ্ঠিত করিয়া পূজা
করিবে। প্রাত্যহ পুরুষহস্ত এবং দুইয়ের দ্বারা তর্পণ করিবে
আর কলসে বড়ল কল্পনাম জপ করিবে। বসন্তের দ্বারা
যমপূজা প্রভৃতি, আত্মবিভক্তির জন্য গায়ত্রী জপ এবং গ্রহ-
শান্তিপূর্বক দশাংশ তিলহোম করিয়া অজ্ঞাতগোত্র ব্রাহ্মণকে
তিলোদক প্রদান করিবে।

“ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধুসর্পিঃসমর্পিতম্।

দদামি তস্মৈ প্রেতায যঃ পীড়ায় কুরুতে মম ॥”

এই মন্ত্রের দ্বারা মধু ও শর্করা-মিশ্রিত কুকু তিলপিণ্ড
প্রেতরূপকে দান করিয়া, বজ্রমান প্রেতের উদ্দেশে তিলপাত্র
সংযুক্ত দ্বাদশটি কুকুকলস, এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে একটি কলস
প্রদান করিবে। বরাহধারী আচার্য্য বরণদৈবত মন্ত্র
উচ্চারণ করিয়া কলসে জল লইয়া নম্পতিকে অভিষিক্ত
করিবে। বজ্রমান তাঁহাকে দক্ষিণা দিবে ও নারায়ণবলি
করিবে। [নারায়ণবলি দেখ।]

এইরূপ প্রারচিত্তের দ্বারা প্রেত প্রেতন্ত্র মুক্ত হইয়া
পবিত্র ও তৃপ্ত হইয়া থাকে এবং পূত্রপৌত্রদিগকে আরোগ্য-
সম্পদ প্রদান করে।

প্রারচিত্ত গ্রহণের অহুষ্ঠান,—

৪, ৫, ৮, বা ১০ সংখ্যক ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইয়া,
তাঁহাদিগের আজ্ঞামুসারে প্রারচিত্তের উপক্রম করিতে হয়,
তৎপরে বিষ্ণুর পূজা এবং কামদা অহুসারে সন্ধ্যা করিয়া,
ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি খেদ, বস্ত্র, অলঙ্কার ও দক্ষিণা প্রদান
করিয়া সাঠীকে প্রণামপূর্বক প্রারচিত্ত প্রার্থনা করিবে।
তাঁহাদের অহুমতি হইলে যথাবিধি প্রারচিত্ত সমাপন
করিয়া, ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবে, পরিপেবে ব্রাহ্মণ
ভোজন করাইয়া বজ্রগণসহ স্বয়ং ভোজন করিবে।

দানের সাধারণ বিধি,—

কেবলমাত্র গোদানের বিধান থাকিলে, জলীলা সংস্কা

দুঃখবতী গাভী, যুবদানে গুরু বস্ত্র ও কাঁকনসহ যুব, ভূমি-
দানে দশ নিবর্তন পরিমিত ভূমি, স্বর্ণদানে শতনিক অথবা
পঞ্চাশৎ নিক স্বর্ণ, অর্থদানে উপকরণসহ স্থলীল অর্থ, মহিষ
দানে স্বর্ণযুক্ত মহিষী, গজ মহাদানে স্ববর্ণকল সহিত
গজ, দেবতার অর্চনে লক্ষ মন্ত্রের দ্বারা পুষ্পদান, ব্রাহ্মণ
ভোজনে সহস্র ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্নদান, রত্নরূপে লক্ষসংখ্যক
পুষ্পের দ্বারা শিবপূজা করিয়া একাদশ মন্ত্রের নাম জপ, যত
গুণগুলসহ তদুপাংশ হোম ও বরুণমন্ত্রের দ্বারা অভিষেক,
ধান্যদানে ৬০ ধারী অর্ধাৎ ৭৬৮ মণ ধান্য, এবং বস্ত্রদানে
কপূর মিশ্রিত পটু বস্ত্রের দান করিতে হয়।

বিবিধ পুরাণের মতেও নিম্নোক্ত রোগ নিম্নোক্ত
পাণাভুসারে উৎপন্ন হয়। বধা—

১ ক্রীবতা,—নিরপরাধিনী পতিব্রতা যুবতী জীকে পরি-
ভ্যাগ করিলে, কাহারও অণুশোষ ছেদন করিয়া দিলে,
অথবা গুডুনাভা জীর সহবাস না করিলে নপুংসক হইয়া
জন্মগ্রহণ করে।

২ অন্নবরসই সন্তান নষ্ট হওয়া,—তৃষ্ণার্ত জীবের অন্ন
পানে বাধা প্রদান করিলে, তাহার পুত্র কন্যা অতি অন্ন
আহু হইয়া থাকে।

৩ দরিদ্রতা,—যে ব্যক্তি প্রভূত ধনবান হইয়াও ধর্মনিষ্ঠক
হয় এবং দেবতা, অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে কিছুমাত্র দান
না করে, মৃত্যুর পর সে বিবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া
অতিদরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং জীর্ণ বস্ত্র পরিধান
করিয়া নিরতিশয় ক্লেশে জীবনযাপন করিয়া থাকে।

৪ বিরোগ,—ছুটে, ছরাচার, ছটবুদ্ধি ও মেহভেদকারী
ব্যক্তি পরজন্মে বিরোগ যন্ত্রণা অহুভব করে।

৫ নেত্ররোগ,—গৃহস্থের দীপহরণ করিলে অথবা সতী
পরনারীর প্রতি সিকাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বা পরের
সন্তোষ দর্শন করিলে, কাণা বা অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৬ কুজতা,—দেবতাপ্রতিমা, ব্রাহ্মণ, গুরু, শ্রেষ্ঠব্যক্তি,
ব্রহ্মচারী ও গুপস্বী দেখিয়া অভিমান না করিলে, মৃত্যুর পর
অশান বৃক্ষ হইয়া বহুকাল অতিবাহন করিয়া কুজরূপে জন্ম হয়।

৭ খঞ্জ ও ছিন্নপাদতা,—জুতা ও খড়ম চুরি করিলে বহুবিধ
নরক যন্ত্রণার পর খঞ্জ বা ছিন্নপাদ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৮ ছিন্নহস্ততা ও ছিন্নপাদতা,—পিতা, মাতা, গুরু বা
বৃদ্ধকে ভাঙনা করিলে বিবিধ ঘন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ছিন্ন-
হস্ত বা ছিন্নপাদ হইয়া উৎপন্ন হয়।

৯ ছিন্ননাসিকতা,—শ্রুতি স্মৃতি কথার বিষ উৎপাদন
করিলে বা দেবনিন্দা করিলে মৃত্যুর পর নৈঋত ও পশ্চিম-

দিকস্থিত পিঙ্গলা নামক নগরে শিশাচগণের সহিত বহুকাল
বাস করিয়া, ছিন্ননাসিক হইয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করে।

১০ ছিন্নকর্ণতা,—কাহারও মিথ্যা অপবাদ দ্বারা তাহাকে
সম্বাদিত করিলে, ছিন্নকর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

১১ হস্তপদহীনতা,—উত্তর সৈন্তের দারুণ সংগ্রামস্থলে
যীর প্রভুকে পরিভ্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, মৃত্যুর পর
হুঃসহ নরকভোগ করিয়া হস্তপদহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

১২ পক্ষরোগ,—নিজে সশস্ত্র হইয়া নিরস্ত্র শত্রু বিনাশ
করিলে, বহু জন্ম পণ্ডবোনি প্রাপ্তির পর মনুষ্যজন্ম পাইয়া
এইরোগে পীড়িত হয়।

১৩ বৈধব্য,—যে স্ত্রী যৌবনগর্ভে যীর অহুগত পতিকে
বিরূপ বলিয়া দিবসে নিন্দা করে, রাত্রিতে তাহার শয্যা
স্পর্শ করে না এবং পতি আজায় নিতান্ত কষ্ট হয়; পর-
জন্মে তাহার বৈধব্যযন্ত্রণা ঘটে।

১৪ বক্ষ্যতা,—পিপাসার্ত বৎসকে অন্নপান করিতে বাধা
দিলে, দক্ষিণাশূন্য ব্রত আচরণ করিলে, মিষ্টফলাদি দেব-
তাকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিলে এবং কাহাকেও
মৈথুনে উদ্যোগী দেখিয়া তাহার বিষ উৎপাদন করিলে
বক্ষ্যতা ঘটয়া থাকে।

১৫ গর্ভস্রাব,—যে স্ত্রী হিংসাবশে সপত্নী বা অস্ত্র নারীর
সন্তান ছুটে ঔষধ বা ছুটে মন্ত্রাদির দ্বারা বিনষ্ট করে, নরকান্তে
সে মনুষ্যবোনি প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞ কোন পুণ্যকলে ঐশ্বর্য-
শালিনী হইলেও গর্ভস্রাব পীড়ার পীড়িত হইয়া থাকে।

১৬ মৃতভার্য্যতা,—কোষ্ঠভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে
কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে মৃতভার্য্য হয়। সপ্তমী তিথিতে তৈল
স্পর্শ করিলেও কোষ্ঠা স্ত্রী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

১৭ বহুপুত্রতা ও অপুত্রতা,—গাভীমুখ হইতে ভোজ্য বস্ত্র
আকর্ষণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে মৃত্যুর পর তিন মনুষ্য
কাল নির্জ্ঞান মরুভূমিতে বাস করিয়া পরজন্মে বহুপুত্রক বা
অপুত্রক হইয়া থাকে।

১৮ দৌর্ভাগ্য,—তৃতীয়া তিথিতে তৈল স্পর্শ করিলে
দৌর্ভাগ্য জন্মে।

১৯ সাপস্রা,—যে স্ত্রী মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের দ্বারা বিবাদ
করে এবং পরস্পর ঘেহবৈষম্য ঘটাইয়া দেয়, পরজন্মে
তাহাকে সপত্নী জন্ম হুঃখভোগ করিতে হয়।

২০ জাত্যন্তর,—অপবিজ্ঞ অন্নযতি প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগকে
দান করিলে জাত্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

২১ মুকতা,—কোন স্ত্রীগাভীকানারীকে উপহাস করিলে
পরজন্মে মুকতা ঘটয়া থাকে।

২২ গদগদবাক্য,—জিহ্বা পরবশ হইয়া যে ব্যক্তি বিবাদ করে, অথবা মূর্খভাজন গুরুনিদা করে, মৃত্যুর পর বহুবিধ যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে সে গদগদ ভাবী হইয়া থাকে।

২৩ মুখরোগ,—পিতৃনিদা, গুরুনিদা ও দেবনিদাকারী মিথ্যাবাদী, এবং অত্যন্ত কক ব্যক্তিগণ নরকান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া মুখরোগাক্রান্ত হয়।

২৪ কর্ণরোগ,—অসম্বদ্ধ প্রলাপ বা পাপবাক্য প্রবণ করিলে পরজন্মে কর্ণরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

২৫ দুর্গন্ধগাত্রতা,—অগন্ধি দ্রব্য হরণ করিলে, মূত্র বিষ্ঠা-যুক্ত নরকভোগ করিয়া পরজন্মে দুর্গন্ধগাত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২৬ দারিদ্র্য ও বিরূপতা,—দানকার্যে ব্যাঘাত করিলে, পরজন্মে দরিদ্র ও বিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২৭ স্থিরপাদপালিতা,—লবণ চুরি করিলে মৃত্যুর পর ক্ষারাকি নামক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পর জন্মে হস্তপদে শ্বেদযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২৮ দাহজর,—অগ্নিধারা গৃহ, গ্রাম, ক্ষেত্র প্রভৃতি দগ্ধ করিলে, প্রাণান্তে রৌরব নরকভোগ করিয়া পরজন্মে দাহ-জরে কষ্ট পাইতে হয়।

২৯ অগ্নিমান্দ্য,—ব্রাহ্মণের পাককালে বিদ্র উৎপাদন করিলে, কাম্বব নামক নরক ভোগ করিয়া, পরজন্মে অগ্নি-মান্দ্য রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩০ অজীর্ণ,—পাক করিয়া পাকায়ি জল দিয়া নির্কীর্ণ করিলে অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৩১ অতীশার,—যজ্ঞায়ি দূষিত করিলে, দানলোপ করিলে, কিছা চুরি করিয়া পরের ছাগ বিনষ্ট করিলে, নর-কান্তে তিনবৎসর মন্ত্যযোনি হইয়া পরে মহাব্যজ্ঞে অতী-শার রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩২ গ্রহণী,—যে ব্যক্তি ধনলোভে দান ভোজন হব্য-কব্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র অর্থ সঞ্চয় করে, যে ব্যক্তি গো ও ভূমি অপহরণ করে, যে নিষ্ঠুর, যে ব্যক্তি সরলা সচ্চরিত্রা যুবতী ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগ করে, সে নরকান্তে গ্রহণী রোগগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পশু দ্রব্য ধন প্রভৃতি অতি কষ্টে প্রাপ্ত হয়।

৩৩ পাণ্ডু,—পরভাৰ্য্যায় বা নীচ জাতীয়া জীতে সজত হইলে, বহুকাল পর্য্যন্ত বহুবিধ যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া মাহু-জন্মে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইয়া কীর্ণচেতাঃ হইতে হয়।

৩৪ কামলা,—অন্নাদি চুরি করিলে, জীবনান্তে ত্রিবিধ নরকভোগ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কাক কক প্রভৃতি

ভাৰ্য্যাকবোনি প্রাপ্তির পর মহাব্যজ্ঞে কামলারোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩৫ কাস,—কাস পাঁচপ্রকার, কর্মভেদানুসারে ইহার উৎপত্তির ভেদ হইয়া থাকে। ১ অতি কঠোর মিথ্যাবাক্যের দ্বারা কাহাকেও পীড়িত করিলে পিত্তপ্রবল কাসরোগে পীড়িত হয়। ২ ব্রাহ্মণের স্থান বিনষ্ট করিলে বাতজন্ম কাস উৎপন্ন হয়। ৩ জলাশয় ধ্বংস করিলে শ্লেষ্মজন্ম কাস হইয়া থাকে। ৪ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে বিভিন্ন জ্ঞান করিলে সন্নি-পাত জন্ম কাস হয়। ৫ যজ্ঞ ব্যতিরেকে পশুহত্যা করিয়া ভোজন করিলে, সর্কদোষজন্ম কাসরোগে পীড়িত হইতে হয়।

৩৬ শ্বাসকাস,—শ্বাসকাসও মহা, উর্দ্ধ, হ্রি, তমক ও ক্ষুদ্র ভেদে পাঁচ প্রকার, কর্মবিশেষে ঐ পাঁচ প্রকার উৎপন্ন হয়। ১ যজ্ঞব্যতীত শ্বাসরোধপূর্বক পশু হত্যা করিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করিলে মহাশ্বাস হয়। ২ পুরাণকথা সময়ে অন্য কথা উত্থাপন করিলে উর্দ্ধশ্বাস হয়। ৩ নিষিদ্ধ দান গ্রহণ করিলে হ্রিঃশ্বাস হয়। ৪ শাস্ত্রার্থে বৃথা দোষারোপ করিলে তমক শ্বাস হয়। ৫ এবং পাককালে বিদ্র উৎপাদন করিলে ক্ষুদ্র শ্বাসরোগে পীড়িত হইতে হয়।

৩৭ যক্ষ্মা,—বিগ্রহত্যা, ন্যাসহরণ, বৃত্তিচ্ছেদ, প্রজাপীড়ন ও গুরুবিক্রোহ করিলে, জীবনান্তে বিবিধ হুঃসহ যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত কুমিযোনি হইয়া থাকিতে হয়; পরে মহাব্য জন্ম পাইলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৩৮ রক্তপিত্ত,—নিত্যত হব্যবহার, পরজব্যে অভিলাষ, পরভাৰ্য্যা কামনা এবং পিতৃব্যবধু গমন করিলে রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৩৯ শুষ্ক,—একাকী মিষ্ট বস্ত ভোজন করিলে এবং নীচ জাতীয়া জী গমন করিলে, জীবনান্তে কুমি পূর্ণপূর্ণ কাকোল নামক নরক ভোগ করিয়া ৪ বৎসর পিপীলিকা যোনিতে উৎপত্তি হয়, পরে মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া শুষ্করোগে পীড়িত হইতে হয়।

৪০ শূল,—নিরপরাধে কাহাকেও শূল্যাত করিলে, অথবা কাহারও প্রতি শূলসম কষ্টদায়ক বাক্য প্রয়োগ করিলে, এবং দম্পতির মেহভেদ করিলে, ৪ মনুষ্য যম-যন্ত্রণা ভোগের পর পক্ষিযোনিতে উৎপন্ন হইয়া বিরোগ যন্ত্রণা পাইতে হয়। পরে মহাব্যজ্ঞে শূলরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪১ অর্শঃ,—শাস্ত্রী ঋতুভ্রাতা জীয়ে সহবাস না করিলে, আত্মহত্যা, ক্রণহত্যা, বা গোহত্যা করিলে, ৩৫১০০০০০০ বৎ-সর নরকে থাকিয়া মহাব্যজ্ঞ হইলে অর্শোরোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৪২ ভগ্নরূপ,—আচার্য্য-ভাষ্যায় গমন করিলে, অথবা গ্রী-
বালক ও বৃদ্ধের ধন হরণ করিলে নরকান্তে পুনর্বার জন্ম-
গ্রহণ করিয়া ভগ্নরূপরোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৪৩ হৃদি,—গুরু মুখ হইতে কোন বস্তু আকর্ষণ করিয়া
ফেলিয়া দিলে, পরজন্মে বায়ুজন্য হৃদিরোগ হয়। পিতৃ-
লোককে তুষ্ট না করিয়া বরং জলপান করিলে, পিতৃজন্য
হৃদিরোগ উৎপন্ন হয়।

৪৪ হিকা,—কোন ঘোঁরি তপত্তা নষ্ট করিলে হিকা
রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৪৫ অরোচক,—শিতা, মাতা ও অতিথি প্রভৃতিকে অন্ন
না দিয়া বরং জোজন করিলে, পরজন্মে হীন জাতিতে
উৎপন্ন হইয়া অরোচক রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪৬ অরতজ,—গান সমাপ্তি না হইতে গায়ককে বাধা
দিলে জন্মান্তরে অরতজ রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৪৭ অতিতৃষ্ণা,—তৃষিত গৌ-সমূহের জলপানকালে ব্যাঘাত
করিলে অথবা জল হরণ করিলে অসংখ্যকাল মকতুমিতে কীট-
যোনি থাকিয়া, মনুষ্যজন্মে তৃষ্ণা ব্যাধিযুক্ত হইয়া থাকে।

৪৮ বিস্ফোট,—চণ্ডালের জলাশয়ে ঘান ও সেই জল পান
করিলে, নরকান্তে বিস্ফোট রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪৯ ভ্রম ও মুছাঁ,—যে কুটিলব্যক্তি সভাস্থলে লোক-
দিগকে ভ্রান্তিতে ফেলিয়া অন্য প্রকার বলে, তাহাকে
নরকান্তে ভ্রম বা মুছাঁ রোগাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ
করিতে হয়।

৫০ হ্রোণ,—শোভ বা ঘেববশতঃ কাহারও পীড়ন
করিলে, অথবা কাহাকেও মর্যাদাসিক বেদনা প্রদান করিলে
পরজন্মে হ্রোণরোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৫১ আমবাত,—বস্ত্র করিয়া তাহার দক্ষিণা না দিলে
অথবা ব্রাহ্মণকে কোন বস্তু উৎসর্গ করিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে
দান না করিলে, কিংবা অধর্মান্বিত উপার্জিত ধন সংগ্রহ
করিলে, জন্মান্তরে আমবাত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৫২ লক্ষীক বাতব্যধি,—সুরাপান করিয়া হঠাৎ গ্রীসহবাস
ইচ্ছা করিলে, অথবা পরজীৱ বস্ত্রহরণ করিলে, নরকান্তে
তীর্থক্বেদনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যজন্মে সর্লক্ষগত বাতরোগে
আক্রান্ত হইতে হয়।

৫৩ তৃন্দরোগ,—ব্রাহ্মণের বট হরণ করিলে অথবা বজ্র-
কালে সত্তর করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দি না দিলে, যেরূপশিত
হইয়া তৃন্দা অর্থাৎ হোল্যরোগ উৎপন্ন হয়।

৫৪ অন্নপিত্ত,—লোভপরবশ হইয়া নিম্নিক্ত ত্রক জোজন
করিলে, জীবনান্তে কাক, কুকুর ও গৃধযোনি প্রাপ্ত হইয়া

পরজন্মে মনুষ্যজন্মে ধারণ করে এবং অন্নপিত্ত রোগে আক্রান্ত
হইয়া থাকে।

৫৫ শোথোদর,—লোভ, মোহ বা ঘেববশত অধর্মান্বিত
করিলে, নরকান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া শোথোদরী হইয়া থাকে।

৫৬ জলোদর,—বিষ্ণু ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে তিরস্কৃত
করিলে জন্মান্তরে জলোদর রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৫৭ শোথ,—বিনা অপরাধে কশা বেজ বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা
কাহাকেও তাড়িত করিলে, জন্মান্তরে শোথরোগে আক্রান্ত
হইতে হয়।

৫৮ মূত্রকৃচ্ছ,—বিধবাগমন বা মদ্যপান করিলে নরকান্তে
জন্মগ্রহণ করিয়া মূত্রকৃচ্ছ রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৫৯ মূত্রাবাত,—দম্পতির মৈথুনকালে বিষ উৎপাদন
করিলে জন্মান্তরে মূত্রাবাত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬০ অশ্মরী,—অশ্রীতি বা ক্রোধবশত গুরুমাতা জীতে
উপগত না হইলে মৃত্যুর পর পুয়শোণিতপূর্ণ নরক ভোগ
করিয়া পরজন্মে অশ্মরীরোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৬১ মেহ,—বিশ্রুতি প্রকার, কর্ম্মমুখ্যারে প্রকার ভেদে
উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ শূকরযোনি মৈথুন করিলে উদক-
মেহ হয়। ২ মাতৃগমনে মধুমেহ। ৩ রজস্বীগমনে ক্ষার-
মেহ। ৪ সতীত্ব হরণে সান্নমেহ। ৫ রোগিণীগমনে মাজিষ্ঠ
মেহ। ৬ মিত্রজীগমনে জক্রমেহ। ৭ চতুষ্পদগমনে
সিকতামেহ। ৮ স্বর্ণহরণে কীরমেহ। ৯ সুরাপানে সিভ-
মেহ। ১০ ঋতুমতী গমনে কালমেহ। ১১ রজস্বলা গমনে
রক্তমেহ। ১২ নীচজাতীয়া জীগমনে মজ্জমেহ। ১৩ বিধবা-
সঙ্গমে ইক্ষুমেহ। ১৪ ব্রাহ্মণীগমনে হস্তিমেহ। ১৫ অক্ষত-
যোনি গমনে হারিদ্ৰমেহ। মাতা, ভগিনী, কন্ডা, স্বশ্র, অক্ষতযোনি, ভ্রাতৃজায়া, মাতুলানী, গুরুপত্নী, রাজপত্নী,
মিত্রপত্নী প্রভৃতি অজ্ঞান্য কুটুম্বিনী গমনে জীবনান্তে জলন্ত
লৌহখণ্ড তক্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ বময়গ্রণ ভোগ করিয়া
পাঁচবৎসর শূকরযোনি, দশ বৎসর কুকুরযোনি, তিনমাস
পিপীলিকায়োনি ও এক বৎসর বৃশ্চিকযোনিতে উৎপন্ন
হইয়া পরে গোজন্ম গ্রহণ করে, সর্বশেষে মনুষ্য জন্মলাভ
করিয়া সর্বপ্রকার মেহরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬২ পুংসনাশ,—ধর্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া অন্য জী গমন
করিলে পুংস বিনষ্ট হয়।

৬৩ মুকবুজি,—মুকের সহিত মিজতা করিয়া সর্বদা
বনে বনে ব্যাধের ন্যায় ভ্রমণাদি হনন করিয়া বেড়াইলে মন-
বাত্তে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া মুকবুজি রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬৪ উন্মাদ,—ব্রাহ্মণ, বৈক্য, পিতৃমাতা ও ব্রাহ্মণ

প্রভৃতি সন্ধানার্থে অক্ষিপণের অর্জন না করিলে, অথবা তাঁহাবিধের নিন্দা করিলে, কিবা ব্রাহ্মণ শুক প্রভৃতির প্রতি বভাচরণ করিলে ও তাঁহাবিধকে দ্বিভ্রমকারী কোন দ্রব্য প্রদান করিলে, অস্মান্তরে উদ্ধার রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬৫ অপস্মার,—কোপবৃদ্ধি হইলে, উপকারীর নিকট অকৃতজ্ঞ হইলে, অধম মানবের সহিত ব্রাহ্মণের ঔষধ-রোধ করিলে, অথবা রজ্জ্বাঘাত গোমুখ বদ্ধ করিলে, নর-কাণ্ডে ব্যাল, বায় ও শূকরযোনি ভোগ করিয়া, মনুষ্য জন্মে অপস্মার রোগে পীড়িত হইতে হয়।

৬৬ অস্থিশূলানি,—ছাগী, তিলধেনু, লোহবর্ষ, তিষা-জিন, গজ, উভয়মূকী, ঘেহু, সালুক, মধু, তৈল, লবণ ও মহাদান গ্রহণ করিলে, কিবা কামবশে অধর্ম্মাচরণপূর্বক মৈথুন করিলে, অথবা পরস্পর ও গাভী প্রভৃতিতে রেতঃ-পাত করিলে, এবং ব্রহ্মব বা রাজার দ্রব্য অপহরণ, আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিলে, হস্তী, বাঘ, সিংহ, নখী বা দল্যহস্তে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর বহুকাল ক্লেশজনক যোনি জন্ম করিয়া, মনুষ্যজন্মে অস্থি-শূলানি রোগে পীড়িত হইতে হয়।

৬৭ মূত্রকমি,—বিনাময়ে অগ্নিতে স্নাত নিক্ষেপ করিলে, নরকাণ্ডে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া মূত্রকমি পীড়িত হইতে হয়।

৬৮ বিজ্রমি,—কল অপহরণ করিলে, নরকাণ্ডে বানর-জন্ম, পরে মনুষ্যজন্মে বিজ্রমি রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

৬৯ অপচী ও বাতগ্রস্থি,—বিশালকুক্ক, পর্শকৈ, নদী-তীরে, বন্যকোণ্ডে, গোষ্ঠস্থলে, গো-গৃহে বা দেবালয়ে মূত্র-ত্যাগ ও নিজীবনাদি নিক্ষেপ করিলে, বহুবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে অপচী ও গ্রিহি রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

৭০ শিরোরোগ—ভীষণহানে বিহিতকার্যাদি না করিলে এবং শুক ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে দেখিয়া প্রণাম না করিলে, নরকাণ্ডে দশবৎসর ভঙ্গুকযোনি, তিনবৎসর মেমযোনি ভোগ করিয়া মনুষ্যজন্মে শিরোরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৭১ নেত্রহীনতা,—পরস্পর প্রতি কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অথবা গরু বা ব্রাহ্মণের চক্ষুতে আঘাত করিলে, প্রাণান্তে বিবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অস্মান্তরে নেত্র-হীন হইতে হয়।

৭২ রাজ্যহতা,—কামবৃত্তিতে পরস্পর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, নদী জী অবলোকন করিলে, কিবা গো-হিংসা ও বিপ্র-হিংসা দর্শন করিলে, রাজ্যহতা, দৃষ্টিকীর্ণতা, দ্বিহাঙ্কতা ও অর্জুদৃষ্টি-রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

৭৩ দৃষ্টিকীর্ণতা,—উদয়, অস্ত ও মধ্য সময়ে সূর্য্যের প্রতি

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, অথবা অশ্বটি অবহার সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, গাভী ও দিক্ দৃষ্টি করিলে পরজন্মে দৃষ্টিকীর্ণতা রোগ জন্মিয়া থাকে।

৭৪ বিবমাক্ষিতা ও বিজ্ঞমাক্ষিতা,—পুত্রের প্রতি জার ডাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, পরজন্মে বিজ্ঞমাক্ষিতা হয়। পুরুষ পরস্পর প্রতি, এবং স্ত্রী পরপুরুষের প্রতি কুটিল দৃষ্টি-ক্ষেপ করিলে পরজন্মে বিবমাক্ষিতা হইতে হয়।

৭৫ গলগণ্ড ও গণ্ডমালা,—শুকপত্নীর কণ্ঠ দর্শন করিলে, নরকাণ্ডে গলগণ্ড বা গণ্ডমালা রোগাক্রান্ত হইয়া অস্মান্তরে করিতে হয়।

৭৬ নাসারোগ,—কামাবিহিতিতে ব্রাহ্ম্যকর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক জুগন্ধি কুম্মাদি ব্রাহ্মণ দেবতা প্রভৃতিতে দাম না করিয়া স্বয়ং আত্মাণ করিলে পরজন্মে নাসারোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৭৭ দৃষ্টিহীনতা,—অপর বালকের অন্ত্র দৃষ্টবাছা করিলে ও যে স্ত্রী তাহা না দেয়, প্রাণান্তে তাহাকে ৪ বৎসর সর্পিণী ও ৪ বৎসর কচ্ছপী হইয়া পরিশেষে মনুষ্যজন্মে দৃষ্টিহীন হইতে হয়।

৭৮ স্তনবিক্ষেপ,—অশ্রু পুরুষকে যে স্ত্রী বীর স্তন দর্শন করায়, নরকাণ্ডে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাকে স্তনবিক্ষেপ রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৭৯ বেস্তাশ্ব,—স্বামীর মৃত্যুর পর যে স্ত্রী পরপুরুষকে অভি-লাষ করে, প্রাণান্তে তাহাকে তপ্তলৌহময় পুরুষ-আলি-দন প্রভৃতি যন্ত্রযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে বেস্তা হইতে হয়।

৮০ বাধির্বা,—ধর্ম্মচিন্তা পরাশ্রুত হইয়া, পিতামাতা, ব্রাহ্মণ ও ভীষণ প্রভৃতির নিন্দা করিলে পরজন্মে বাধির্বারোগগ্রস্ত অর্থাৎ শ্রাণশক্তিহীন (কাল) হইতে হয়।

৮১ শ্লেষরোগ,—নিত্যক্রিয়া বহির্ভূত হইয়া ভোজন করিলে প্রাণান্তে শুক কাঠোপজীবী ও বায়স জন্ম গ্রহণ করিয়া পরজন্মে শ্লেষরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৮২ হস্তশূল,—সন্ধ্যাদিবিহীন ব্রাহ্মণ জীবনান্তে এক বৎ-সর কাল কক ও পারাবত যোনি ভোগ করিয়া মনুষ্য জন্ম হইলে হস্তশূলরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

৮৩ যোনিরোগ,—যে স্ত্রী রমণকালে পতির সন্তোষ বিধান না করে, অথবা অস্ত্রের ভোজ্যবস্ত্র অপহরণ করে, তাহাকে ১৪ বৎসর উষ্ট্রযোনি ভোগ করিয়া মনুষ্যজন্মে যোনিরোগ গ্রস্ত হইতে হয়।

৮৪ প্রদর,—সুদীর্ঘ পতিকে ভোজন না করাইয়া যে স্ত্রী অগ্রে ভোজন করে, কিবা বুধা পতহত্যা করে, অথবা ভোজ্যবস্ত্র অপহরণ করে; প্রাণান্তে তাহাকে সন্ধ্যাপানোক্ত

নয়কভোগ করিয়া দশবৎসর বারসবানি ও শুকবানি ভোগের পর মহাব্যতনে প্রায়রোগে যন্ত্রণা পাইতে হয়।

কর্মবিশেষ (পুং) কর্মণো বিশেষঃ অন্যত্মাৎ পার্থক্যম্, ৬৩৭। সাধারণ কার্য্য হইতে বিভিন্ন কার্য্য।

কর্মবীজ (ক্লী) কর্মণো বীজং মূলকারণং, ৬৩৭। কর্মের মূলকারণ।

কর্মব্যতিহার (পুং) কর্মণা ব্যতিহারঃ, ৩৩৭। পরস্পর একজাতীয় কার্য্য করা।

কর্মশালা (ক্লী) কর্মণঃ শিলাদেঃ শালা, ৬৩৭। শিলাদি কার্য্যের গৃহ।

কর্মশালী (ক্লী) নদীবিশেষ, এই নদী চট্টগ্রামের নিকট প্রবাহিত।

কর্মশীল (ত্রি) কর্মশীলং কর্মকরণরূপবতাবো যন্ত, বহুব্রী। কর্ম শীলয়তি বা। কর্ম করাই বাহার স্বভাব, যে কর্ম-কলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা না করিয়া স্বভাব বশতই কার্য্য করিয়া থাকে। কার্য্যকারক।

কর্মশুচি (ত্রি) কর্মস্থ শুচিঃ, ৭৩৭। পবিত্রকর্ম, বাহার কর্মমাত্রই নির্দোষ।

কর্মশুদ্ধ (ত্রি) কর্মস্থ শুদ্ধঃ, ৭৩৭। পবিত্রকর্ম।

কর্মশূর (ত্রি) কর্মণি শূরঃ দক্ষঃ। কার্য্যদক্ষ।

কর্মশৌচ (ক্লী) কর্মস্থ শৌচং দোষহীনতা। কর্মবিষয়ে নির্দোষতা।

কর্মশ্রেষ্ঠ (পুং) ১ পুলহের পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৪।১।৩১।) ২ (ত্রিঃ) কর্মণা শ্রেষ্ঠঃ। কার্য্যবিশেষের দ্বারা শ্রেষ্ঠ।

কর্মস্থ (ক্লী) কর্ম শুভকর্ম ত্রুতি নাশয়তি, কর্ম-সো-ক, নিপাতনাৎ যচ্চম্। কর্মস্থ, পাণ।

কর্মস (পুং) পুলহের পুত্র কর্মশ্রেষ্ঠের নামান্তর।

কর্মসংগ্রহ (পুং) কর্মণঃ সংগ্রহঃ, ৬৩৭। কাজের যোগাড় করা।

কর্মসঙ্গ (পুং) কর্মণি সঙ্গ আসক্তিঃ, কর্মন্-সঙ্গ-যঞ্। কর্মে আসক্তি, কর্মে লিপ্ত।

কর্মসচিব (পুং) কর্মস্থ সচিবঃ সহায়ঃ। কার্য্যে সাহায্যকারী।

কর্মসন্ধ্যাস (পুং) কর্মণঃ সন্ধ্যাতঃ কলতো বা সংজ্ঞাসন্ধ্যাগঃ, ৬৩৭। ১ কর্মত্যাগ। ২ কর্মকলত্যাগ।

কর্মসন্ধ্যাসিক (পুং) কর্মণাং সন্ধ্যাসোহন্ত্যত, কর্মন্-সংন্যাস-ঠন্। প্রত্যক্ষাযুক্ত ভিক্ষুক।

কর্মসন্ধ্যাসী [ন] (পুং) কর্মসংন্যাসো হন্ত্যত, কর্মন্-সংন্যাস-ইনি। ১ যথাবিধানে কর্মত্যাগী ভিক্ষুক। ২ কর্মকলত্যাগী।

কর্মসম্বন্ধি (ক্লী) কর্মণঃ সম্বন্ধি পরিসম্বন্ধিঃ। ১ কর্মের শেষ। ২ মুক্তি।

কর্মসম্বন্ধ (ত্রি) কর্মণঃ সম্বন্ধ উৎপত্তিবন্ত, বহুব্রী। ১ কর্ম-

জাত, কর্ম হইতে উৎপন্ন। ২ (পুং) কর্মের উৎপত্তি।

কর্মসাকী [ন] (পুং) কর্মণাং সাকী প্রত্যাককারী, ৬৩৭।

১ স্বর্ঘ্য। ২ চন্দ্র। ৩ বম। ৪ কাল। ৫ পৃথিবী। ৬ জল।

৭ তেজঃ। ৮ বায়ু। ৯ আকাশ।

(স্বর্ঘ্যঃ সোমো বমঃ কালো মহাত্তানি পঞ্চ চ।

এতে শুভাশুভস্যেহ কর্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥"

বৈদিকক্রিয়া পদ্ধতি।)

কর্মসাধক (ত্রি) কর্ম সাধয়তি নিম্পাদয়তি, কর্মন্-সাধ-ধূল্। (ধূলুত্চো। পা ৩।১।১৩৩।) কার্য্যনিম্পাদক।

কর্মসাধন (ক্লী) কর্মণঃ সাধনং সম্পাদনম্, ৬৩৭। কার্য্যের সিদ্ধি।

কর্মসিদ্ধি (ক্লী) কর্মণঃ সিদ্ধিঃ, ৬৩৭। কর্মজন্ত ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলপ্রাপ্তি।

কর্মসূত্র (ক্লী) কর্ম এব সূত্রম্। কর্মরূপ সূত্র।

কর্মস্থ (ত্রি) কর্মণি তিষ্ঠতি, কর্মন্-স্থ-ক। কর্মে নিযুক্ত।

কর্মস্থান (ক্লী) কর্মণঃ স্থানম্, ৬৩৭। ১ কর্মক্ষেত্র, কার্য্য-স্থান। ২ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত লগ্ন অবধি দশম স্থান।

কর্ম্ম। ১ একজন পতিপুত্রহীনা ভক্তিমতী ব্রাহ্মণ কস্তা। ইনি আপন ভক্তিগুণে জগদ্বৈদ্যদেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন।

[ভক্তিমাহাত্ম্য গ্রন্থে কর্ম্মসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

২ আলাহাবাদ জেলার কহানী তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর, প্রয়াগধাম হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। (১৮৮১ সালের গণনাঙ্কনামারে) লোকসংখ্যা ৩২০৪। এখানে মঙ্গল ও শুক্রবারে হাট বসে, হাটে পশাদি, শস্ত, তুলা, ধাতুর বাসন প্রভৃতি বিক্রয় হয়। এখানে পুলিশ আছে।

কর্ম্মাক্ষম (ত্রি) কর্মস্থ অক্ষমঃ অসমর্থঃ, ৭৩৭। কার্য্য করিতে অসমর্থ।

কর্ম্মাঙ্গ (ক্লী) কর্মণো অঙ্গম্, ৬৩৭। বিহিত বজ্রাদি কর্মের অঙ্গ।

কর্ম্মাজীব (পুং) কর্মণা আজীবঃ জীবনম্। শিলাদি কার্য্যের দ্বারা জীবনযাপন।

কর্ম্মাত্মা [ন] (পুং) কর্মণা আত্মা আত্মতাবো যন্ত, বহুব্রী।

১ প্রাপ্তি। ("তস্মিন্ স্বপতি তু স্বহৃদে কর্ম্মাত্মানঃ শরীরিণঃ।" মধু)

২ (কর্ম্মণি আত্মা মনো যন্ত) কর্ম্মাসক্তচিত্ত, বাহার অন্তঃকরণ নিয়ত কর্ম্মে আসক্ত থাকে।

কর্ম্মাদি (পুং) কর্মণঃ আদিঃ, ৬৩৭। কার্য্যের আরম্ভকাল।

কর্ম্মাধিকারী [ন] (পুং) কর্ম্মণি অধিকারোহন্ত্যত, কর্ম্মন্-অধিকার-ইনি। কর্ম্মে বাহার অধিকার আছে।

[অধিকারী দেখ।]

কর্ম্মাধ্যক্ষ (পুং) কর্ম্মস্থ অধ্যক্ষ: ৭৩৭। কার্যের অধ্যক্ষ, কার্যকারকের কার্য যিনি পরিদর্শন করেন।

কর্ম্মামুদ্রক (পুং) কর্ম্মণ: অমুদ্রক: সংযোগ: লেশো বা; ৬৩৭। ১ কর্ম্মের সংযোগ। ২ কর্ম্মের লেশমাত্র।

কর্ম্মামুরূপ (পুং) কর্ম্মণ: অমুরূপ: ৬৩৭। ১ কর্ম্মসদৃশ। ২ কর্ম্মের উপযোগী।

কর্ম্মামুষ্ঠান (ক্লী) কর্ম্মণ: অমুষ্ঠানম্, ৬৩৭। কর্ম্মের অমুষ্ঠান, কার্যের আরম্ভ।

কর্ম্মামুসার (পুং) কর্ম্ম অমুসরতি, কর্ম্মন্-অম্-স্-বঞ। কর্ম্মসদৃশ।

কর্ম্মাস্ত্র (পুং) কর্ম্মণ: জীবকৃতপ্রকৃতদ্রুতক্রিয়ায়া: অস্ত্রো যজ; যথা কর্ম্মণ: কৃষিকার্য্যস্ত তৎকলস্ত ধাতাদিসংগ্রহরূপ-ক্রিয়ায়া: অস্ত্রো যজ; বহুব্রী। ১ কর্ম্মহান। ২ কষ্টভূমি।

(“অহস্তহস্তবেদেতকর্ম্মাস্ত্রান্।” মমু ৮। ৪১৯।)

কর্ম্মাস্ত্রর (ক্লী) কর্ম্মণ: অস্ত্রং, তদাস্ত্রং ইত্যর্থ: ৬৩৭। কার্য্যাস্ত্রর, এক কাজ হইতে অস্ত্র কাজ।

কর্ম্মাস্ত্রিক (পুং) কর্ম্ম অস্ত্রিকে সমীপে বস্ত, বহুব্রী। কর্ম্মকারক।

কর্ম্মার (পুং) কর্ম্ম লোহনির্ম্মাণাদি কার্য্যং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কর্ম্মন্-ঋ-অণ্। ১ কর্ম্মকার, কামার। [কামার দেখ।]

(“কর্ম্মারস্ত্র নিবাস্ত্র রজাবতারকস্ত চ।” মমু ৪। ২১৫।)

২ বাশ। ৩ কামরাজ। ৪ কাটিবাড়ের ঝালবার বিভাগের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূমি পরিমাণ ৩ মাইল মাত্র। এখানে একজন সামন্ত থাকেন, তিনি বর্ষে ৫১০০ টাকা খাজনা আদায় করেন, তন্মধ্যে ১৪০০ টাকা বুটীণ গবর্ণ-মেণ্টকে এবং ৩৭০০ আনা জুনাগড়ের নবাবকে করস্বরূপ প্রদান করেন।

কর্ম্মারক (পুং) কর্ম্মার-বার্ধে কন্। ১ কর্ম্মার। (ত্রি) ২ কর্ম্মপ্রাপ্ত।

কর্ম্মালা। বোম্বাই প্রদেশের অধীন শোলাপুর জেলার একটি উপবিভাগ। ভূমি পরিমাণ ৭৬ বর্গমাইল। অক্ষা° ১৭°৫৭' হইতে ১৮°০২' উঃ পর্য্যন্ত এবং দ্রাঘি° ৬৪° ৫২' হইতে ৭৫° ৩১' পূঃ পর্য্যন্ত।

এই উপবিভাগে ১২২ খানি গ্রাম এবং ৯৩০০ ঘর আছে, ইহার পশ্চিমে ভোমানদী এবং পূর্বে সিনানদী প্রবাহিত হইতেছে। এই ভূভাগের অধিকাংশ ভাগ উর্ব্বর ও দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, অপরূপ দেখিতে লাগ ও কয়রময়।

এখানে একটি দেওয়ানী, দুইটি ফৌজদারী আদালত, এবং তিনটি পুলিশের থানা আছে। বার্ষিক কর আদায়

(১৮৮১ সনে) ১৩০০৪০ টাকা। এখানে নানাপ্রকার শস্ত, কলাই, পাট, সরিষা ও অপরূপ কল উৎপন্ন হয়।

২ কর্ম্মালা উপবিভাগের প্রধাননগরের নাম কর্ম্মালা। অক্ষা° ১৮°২৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°১৪' ৩৩" পূঃ।

শোলাপুর নগর হইতে ৩৪ কোশ উত্তরপশ্চিমে এবং এ অঞ্চলের রেলওয়ের জেউর নামক স্টেশন হইতে সাড়ে পাঁচকোশ উত্তরে অবস্থিত। ভূমি পরিমাণ ১৮৮ একর। (১৮৮১ সনের) লোকসংখ্যা ৫০৭১।

পূর্বে এখানে নিম্বালকর মণ্ডলেশ্বরদিগের বেশ আধিপত্য ছিল, তাঁহাদের বোলবোলারের সময়ে এখানে একটি সুল্লর গড় নির্ম্মিত হয়; পিতা আরম্ভ করিয়া বান, পরে পুত্র তাহা সমাধা করেন। এখন সেই গড়বাটিতে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যালয় হইয়াছে। এক সময়ে খুব বাণিজ্য ব্যবসা চলিত। পুনা, আম্রাবাদ, শোলাপুর, বার্ষি প্রভৃতি নানাহানের জিনিষপত্র আমদানি রপ্তানি হইত। এখন আর তেমন নাই। তবে এখনও প্রতি শুক্রবারে এক বৃহৎ হাট বসে, তাহাতে নামাদেশীয় বস্ত্র, গবাদি পশু, নানাপ্রকার শস্ত ও তৈল বিক্রয় হয়। এখানে ৬০ খানি তাঁতের কাজ চলিতেছে। বিদ্যালয়, ঔষধালয়, ডাকঘর ও পাঠাগার আছে।

কর্ম্মার্হি (পুং) কর্ম্ম অর্হতি, কর্ম্মন্-অর্হ-অণ্। ১ পুরুষ। ২ (ত্রি) কর্ম্মের উপবৃত্ত।

কর্ম্মাবিধায়ক (ত্রি) কর্ম্মণ: অবিধায়ক:, ৬৩৭। যে কার্য্যের বিধান করে না।

কর্ম্মাশয় (পুং) আশেরতে পুরুষা অশিন্, আ-শী-অচ্। কর্ম্মাশয়াশয়:, ৬৩৭। কর্ম্মরূপ কর্ম্মাধর্ম্মরূপ গুণবিশেষ।

কর্ম্মিক (ত্রি) কর্ম্ম অন্ত্যস্ত, কর্ম্ম-ঈক্। কর্ম্মবিশিষ্ট।

কর্ম্মিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন কর্ম্মা, কর্ম্মিন্-ইষ্টন্ (অতিশয়েন তমবিষ্টনৌ। পা ৫। ৩। ৫৫।) ইনে লুক্। অতিশয় কার্য্যকারক।

কর্ম্মিষ্ঠতা (ত্রী) কর্ম্মিষ্ঠত্বাৎ, কর্ম্মিষ্ঠ-তল্। (তত্ত্ব ভাব-বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) টাপ্। অতিশয় কার্য্যকারিতা, কার্য্য সম্পাদনে বিশেষ তৎপরতা।

কর্ম্মী [ন্] (পুং) কর্ম্ম অন্ত্যতি, কর্ম্ম-ইনি (ত্রীহানিত্যন্ত। পা ৫। ২। ১১৬।) ১ কর্ম্মবিশিষ্ট। ২ কল আকাজক করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্যকারক।

কর্ম্মীর (পুং) কর্ম্ম-ঈরন্। কর্ম্মীরবর্ণ, চিহ্নিত।

কর্ম্মীরক (পুং) সেওকাগাহ। (Trophis aspera.)

কর্ম্মেস্ত্রিয় (ক্লী) কর্ম্মণাং সম্পাদনার কর্ম্মাৰ্হ বা ইস্ত্রিয়ং মধ্যলো। বাক্যাদি কর্ম্মসম্পাদক পাঁচ ইস্ত্রিয়। বাক্, হস্ত, পদ, শুষ্ক ও উপস্থ, এই পাঁচটি কর্ম্মেস্ত্রিয়; যথাক্রমে ইহা-

দিগের কার্য,—উভারণ, আবাদাদি, গমনাদি, উৎসর্গ ও আনন্দ। ইহাদিগের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলি, ইজ, উপেন্দ্র, নিজ ও ব্রহ্মা। [ইতিরূপে।]

কর্কটোদ্ভূত (জি) কর্ণি উদ্ভূতঃ, ৭৩৭। কর্ণে উল্লোহ-বিশিষ্ট।

কর্কটনগর। মাজারের উত্তর অক্ষর জেলার মধ্যবর্তী একটি বৃহৎ জনিদারী। ভূমিপ্রমাণ ৬৮০ কর্ঘমাইল। অক্ষা° ১৩°৪' হইতে ১৩° ৩৬' ৩০" উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১৭' হইতে ৭৯° ৫৩' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৭৪৮০।

এই ভূভাগের উত্তরে চন্দ্রগিরি, পূর্বে কালহস্তী ও চেলগণ্ড, দক্ষিণে বালারূপেট, এবং পশ্চিমে চিত্তুর। এই স্থানকে অনেকে ব্রহ্মরাজের দেশ বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রথম কর্ণাটক রাজের সময়ে এখানে ব্রহ্মরাজনামে একজন পলিগার রাজত্ব করিতেন। এখানকার পেশকাশ বা স্থায়ীকর ১৮০৪৯০ টাকা।

এখানকার জমি উর্করা, চাষবাসও বেশ চলে, নীল প্রচুর উৎপন্ন হয়। এখানকার নগরীপাহাড়ে গাছ কাটিয়া বড় বড় তক্ত পাওয়া যায়।

এই ভূভাগের এখাননগরের নামও কর্কাইত নগর। এই নগরটি পূর্বে ৮ ফুট উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল, কেবল দক্ষিণে ও পশ্চিমদিকে ছোট বৃহৎ ভোরণকার ছিল। এখন আর নাই, ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানে রেল-ওয়ে ষ্টেশন আছে। লোকসংখ্যা ৫৮৭৪।

কর্ক (পুং) ক্রিতি বিক্রিতি চিত্তং বিষয়েনু, কৃ-ব (কৃগৃ-দৃভ্যো বঃ। উণ ১। ১৫৫।) ১ কাম (কর্কঃ কামঃ। উজ্জল-দত্ত।) ২ (কৃণতি-হিনতি, কৃ-ব) ইন্দুর।

কর্কট (পুং, স্ত্রী) কর্ক-অটন্। ১ চইশত প্রাণের মধ্যবর্তী অক্ষরস্থান। ২ শতপ্রাণের লোক যে স্থানে ক্রমবিক্রমাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ৩ চারিদিকে সমপ্রায়। ৪ চারিদিকে সমান গৃহস্থান বিশেষ। ৫ বজ্রের দক্ষিণাংশস্থ প্রাচীন জনপদ বিশেষ, মার্কণ্ডেয়পুরাণে 'কর্কটাসন' নামে উক্ত হইয়াছে। ("ভাষ্যলিঙ্গং চ রাজ্যং কর্কটাদিগতিং তথা।

সুখানামধিপতিকৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।"

ভারত ২। ৩০। ২২।)

৬ (স্ত্রী) নগরমাত্র।

কর্কটক (পুং, স্ত্রী) কর্কট-বাক্যে কন্। ১ কর্কট। ২ পাঙ্কজের চাতু।

কর্কটী (স্ত্রী) কর্কট-ভীষ। নদীবিশেষ। (সম্মারণ)।

কর্কট (স্ত্রী) কুবরচ। ১ কর্ণ। কৃ বিশেষণ-ব্রহ্মঃ (কৃগৃগৃভূতিভ্যঃ ব্রহ্ম। উণ ২। ১২৩।) ২ ব্যাক্ত। ৩ রাজন। ৪ পাপ। ৫ ঐক্যবিশেষ।

(কর্করঃ কথিতো ব্যাঘ্রে শিবানামপি কর্করী।

কর্কর্যুয়ারাং না বক্ষঃপাপনো ভেদজাতরেঃ। যেমিনী।)

কর্করী (স্ত্রী) কর্কর-ভীষ। ১ উমা, পার্বতী। ২ ব্যাক্তী। ৩ হিঙ্গুপত্রী। ৪ রাজকী।

কর্কদার (পুং) কর্ক-উণ, কর্কঃ দারমতি, কর্ক-দৃ-অণ্। কোবিন্দারগাছ।

কর্কর (পুং) কর্কতি হিনতি, কর্ক-উরচ (মৎপ্রদাদৃশচ। উণ ১। ৪২।) ১ শ্বেতবর্ণ। ২ রাজন। (কর্করঃ শ্বেতরক্তনোঃ। উজ্জলদত্ত।) ৩ চিত্রবর্ণ। ৪ শত্রী।

কর্কর (পুং) কর্ক-উর (খর্জিপিঞ্জাদিত্য উরোলটো। উণ ৪। ৯০।) ১ রাজন। ২ শত্রী।

কর্কক। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ভারতের দক্ষিণপশ্চিমস্থিত জনপদ-বিশেষ। (বৈঃ হরিবংশ ১১। ৭৪)

কর্কক (পুং) [বৈ] রাজন। শিশিট। প্রেত।

কর্কন (স্ত্রী) কৃশ-লুট্। কৃশ করণ।

কর্কিত (জি) কৃশ-গিচ্-ক্ত। কৃশীকৃত, বাহ্যকে ক্রীণ করা হইয়াছে।

কর্কট (পুং) কৃশ-বৎ। কর্কটগাছ; হিন্দিভাষায় ইহাকে 'কচুর' কহে।

কর্ক (পুং স্ত্রী) কৃশ-গঢ়াচ্, কর্ণি করণে বা বঞ। ষোল মাষা পরিমাণ, ৮০ রতি; ইহার সংস্কৃত পর্যায় অক্ষ। বৈদ্যক পরিমাণে ইহাকে দুই তোলা কহে; তাহার সংস্কৃত পর্যায়,—স্বর্ণ, অক্ষ, বিভ্রালপদক, পিচু, পানিভল, উড়ুয়, তিন্দুক ও কবড়গ্রহ। ২ (পুং) আকর্ষণ। ৩ বিলম্বন, টাচিয়া ফেলা। ৪ বিতীতক, বহেড়াগাছ।

কর্কক (জি) কর্কতি ভূমিং, কৃশ-বুল্ (বুল্ ভূটো। পা ৫। ১। ১১২।) ১ কৃষিকারী, কৃষাণ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কেকজা-ভীষ, কৃষিক, কৃষীকল ও কর্কক। ২ আকর্ষণকারী। ৩ যে টাচিয়া ফেলে।

কর্ষণ (স্ত্রী) কৃশ-ভাবে লুট্। ১ কৃষিকার্য, লাঙ্গল প্রভৃতির দ্বারা ভূমিখনন, সাধারণ কথায় ইহাকে 'চাষ' কহে। ২ আকর্ষণ, টান। ৩ শোষণ। ৪ শীড়ন।

("শরীরকর্ষণং প্রাণাঃ কীরতে প্রাণিনাং বধা।

তথা রাজানপি প্রাণাঃ কীরতে রাজ্যকর্ষণং।"

মহা ৭। ১১৭।)

কর্কণি (স্ত্রী) কৃশ-অনি। অগভী।

কর্ষণী (জী) কর্ণ গৌরাদিবাং-ভীব্। ক্ষীরিণীবৃক্ষ।
কর্ষণীয় (ত্রি) কর্ণ-ছ। ১ কর্ণের যোগ্য। ২ বাহ্য কর্ণ
করিতে হইবে।

কর্ষণল (পুং) কর্ণ: কর্ণমাত্রঃ কলং যত, বহুত্রী। বিভীতক,
বহেড়াগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বিভীতক, অক্ষ, কর্ণ-
কল, কলিঙ্গম, ভূতবাস ও কলিঙ্গগালয়। [বহেড়া দেখ।]

কর্ষণল। (স্ত্রী) কর্ণকল-টাপ্। আমলকীগাছ। [আমলকী দেখ।]

কর্ষাপণ (পুং) কর্ণেণ আপণ্যতে ক্রীয়তে, কর্ণ-আ-পণ-অচ্।
কর্ষপরিমিত মূল্যের দ্বারা বাহ্য ক্রয় করা হয়।

কর্ষার্দ্ধ (স্ত্রী) কর্ণস্ত অর্দ্ধম্, ৬তৎ। এক তোলা পরিমাণ।

কর্ষিণী (জী) কৃষ-গিনি-ভীপ্। ১ ক্ষীরিণীবৃক্ষ। ২ অশ্বের
লাগাম; ইহার সংস্কৃত পর্যায়—খলীন, কবীয় ও কবিকা।
৩ (ত্রি) মনোহারী।

(“আগকাস্তমধুগন্ধকর্ষিণী:

পানভূমি রচনা: প্রিয়সখ: ॥” রঘু ১৯। ১১।)

কর্ষিত (ত্রি) কৃষ-গিচ্-ক্ত। ১ আকর্ষিত। ২ যে ভূমিতে চাঁস
দেওয়া হইয়াছে। ৩ বাহ্য কৃষ করা হইয়াছে।

কর্ষী [ন্] (ত্রি) কৃষ-গিনি। আকর্ষক।

কর্ষু (পুং) কৃষ-উ (কৃষিচমিতনিধিনিসর্জিধর্জিভা উঃ। উণ্-
১। ৮২।) ১ কৃষি। ২ জীবিকা। ৩ করীষাণি, ঘুঁটের
আঙুন। (স্ত্রী) ৪ কৃষিম ক্ষুদ্র জলাশয়। ৫ নদীমাত্র। ৬ ইষ্টাখাত।

(“চতুরঙ্গপৃথীত্তাবদন্তরাত্তথাঃখাতা বিতস্তারতান্ত্রিঃ
কর্ষু: কৃষ্যাং” শ্রাক্তবিরেকদ্ব্যত বিষ্ণুসূত্র।)

(কর্ষু: পুমান্ করীষাণৌ দ্বিগ্যং কুলোষ্টাখাতয়ো:। মেদিনী)

কর্হি (অব্য) কিম্-র্হি (অন্যতনে হিঁলতত্তরতাম্। পা ৫।
৩। ২১।) কাদেশঃ। কোন্ সময়ে, কবে।

কর্হিচিৎ (অব্য) কর্হি চ চিচ্চ, ইচ্ছ। মুদ্বোধ যতে কর্হিচিৎ
(কিমঃ ক্ত্যস্তাকিচ্চনৌ। মূ তদ্ধিত)। কোন কালে ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—জাহু ও কদাচিৎ।

(“বতীর্থবুদ্ধি: সলিলেন কর্হিচিৎ

জনেদভিজ্ঞেযু স এব গোথর: ॥” ভাগবত ১০। ৮৪। ১৩।)

কল (স্ত্রী) কড়তি মাদ্যতি অনেন, কড়-ঘঞ (হলশ্চ। পা
৩। ৩। ১২১।) ডলয়ের কড়ম্। ১ শুক্র। ২ শেরাকুল বৃক্ষ।

(পুং) ৩ মধুরাক্টধনি। ৪ সালগাছ। ৫ (ত্রি) কলয়তি
মাদ্যং জনয়তি তঠরাধিম্। অজীর্ণ।

(কলং শুক্রে ত্রিষজীর্ণে চাব্যকমধুরধনৌ। মেদিনী।)

(দেশজ) ৬ নূতন গজান।

কলক (পুং) কলতে, কল-ধূল্-স্বার্থে কন্। শকুল মৎস্ত।

(শকুলে ত্র্যং কলকো হথ গড়ক: শকুলার্জক:। হেম ৪। ৪১৮)

কলকঠ (পুং) কলগ্রধান: কঠো বস্ত। ১ কলধ্বনিকারী।
২ হংস। ৩ পারিষা। ৪ কোকিল। ৫ কল-গ্রধান: কঠ:।
কলধ্বনি। (কলকঠ: কলধ্বানে হংসে পারাবতে শিকে।
মেদিনী।)

কলকল (পুং) কলাদপি কলঃ, কলশঙ্কে-ঘঞ; কল: প্রকারঃ,
প্রকারার্থে বিষয়া। ১ কোলাহল। ২ সাল-নির্ঘাস, ধুনা।
(কলকল উক্ত: কোলাহলে তথা সালনির্ঘাসে। মেদিনী।)

কলকলবান্ [ৎ] (ত্রি) কলকলো হস্তান্তি, কল-কল-মজুপ্,
মজু বঃ। কলকলবিশিষ্ট।

কলকীট (পুং) কল-প্রধান: কীট:, মধ্যলো। সঙ্গীতের
গ্রামবিশেষ।

কলকুজিকা (স্ত্রী) কলং কুজয়তি উচ্চারয়তি, কল-কুজ-ধূল্
টাপ্ অত ইষ্ম। মধুরধ্বনিকারিণী।

কলকুট (পুং) কজিয়জাতিবিশেষ এবং তাহার দ্বাধানে
বাস করে সেই জনপদ।

কলকুনিকা (স্ত্রী) কামুকী।

কলগী (আরব্য শব্দ) উকীষ, কীরীট।

(“মালিক কলগীতোরা চকুমকে হীরা।” অন্নদামঙ্গল)

কলঘোষ (পুং) কলো মধুরো ঘোষো ধ্বনির্ঘত, বহুত্রী।
কোকিল।

কলঙ্ক (পুং) কলয়তি, কল-কিপ্; কল্ চাসৌ অঙ্কশ্চতি,
কর্ম্মাণ। ১ চিহ্ন। ২ অপবাদ।

“তেজলু গুরুকুল সঙ্গ।

পূরল হকুল কলঙ্ক ॥” বিদ্যাপতি।

৩ লোহের মলা। (কলঙ্কোহঙ্ক ইপবাদে চ কালায়স মলে
ইপিচ। মেদিনী।)

কলঙ্ককর (ত্রি) কলঙ্ক: করোতি জনয়তি, কলঙ্ক-ক-ট।
কলঙ্কজনক, বাহ্য হইতে অপবাদ উৎপন্ন হয়।

কলঙ্কম্ (পুং) করণে কষতি হিনস্তি, কল-কষ-খচ্-মুচ্ চ। সিংহ।

কলঙ্কম্। (স্ত্রী) কলঙ্কম্-টাপ্। করতালি।

কলঙ্কহুৎ (পুং) কলঙ্ক: হরতি নাশয়তি, কলঙ্ক-হ-কিপ্। শিব।

কলঙ্কিত (ত্রি) কলঙ্কো হস্ত জাত: কলঙ্ক ইতচ্। কলঙ্কী,
বাহ্য কলঙ্ক আছে।

কলঙ্কী [ন্] (ত্রি) কলঙ্কো হস্তান্ত, কলঙ্ক-ইনি। ১ কলঙ্কযুক্ত,
কলঙ্কিত। (“কলঙ্কী জায়তে বিধে তির্গগ্ধোনিষ্ঠ নিধকে।”
তিথাদিত্য।)

২ চিহ্নযুক্ত। ৩ লোহমলবিশিষ্ট। ৪ (পুং) চক্র।

কলঙ্কুর (পুং) কং জলং লভয়তি গময়তি, ভ্রাময়তি ইত্যর্থঃ; ১
ক-লকি-পিচ্-উরচ্। আবর্ত, জলের বুদ্বি।

কলচুরি। ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন রাজবংশ। চেনি, দাহলমণ্ডল ও কর্ণাটে একসময়ে এই রাজবংশীয়গণ প্রবল প্রভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [কর্ণাট ও চেনি দেখ।] ভারতের নানাহান হইতে কলচুরিরাজগণের খোদিত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শিলালিপি ও তাম্রাঙ্কনশিলা কলচুরী ও কলচুরী নাম পাওয়া যায়। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, শিলাকলকে ‘কলংচুরি’ ও ‘কলচুর্য’ এই সংস্কৃত নামেও এই বংশীয় রাজগণ অভিহিত হইয়াছেন।

৬শস্বরাঙ্গগণ পূর্বে প্রতাপ হারাইয়া হীনবল ও চীনা-বহু হইয়া পড়িলে কলচুরিরাজগণ কালঞ্জর জয় করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০০ খৃষ্টাব্দে নন্দ্যদীতটস্থ দাহলমণ্ডল জয় করিয়া, তাঁহারা পূর্বে ছত্রিশ গড় এবং দক্ষিণে কর্ণাটরাজ্য ক্রমাগত অধিকার করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে কলচুরিবংশীয়গণ গোদাবরী তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া অনেকে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহাদের কেহ বা করদ রাজা, কেহ বা সামন্ত, কেহ বা মণ্ডলেশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু চেনির (বর্তমান বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডের) রাজগণ রাজচক্রবর্তী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; পার্শ্ববর্তী ও অপরপূর রাজাদিগকে তাঁহারা আপনাদিগের বশে আনিয়াছিলেন।

কল্যাণের চালুক্যরাজগণ প্রবল হইলে দক্ষিণাপথে কলচুরি রাজগণের পূর্ক্বেভজঃ হ্রাস হইয়া আইসে। খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে (খৃঃ অঃ ৫৬৭-৬১০) চালুক্যরাজ মঙ্গলীশ কোন কোন কলচুরি রাজাকে পরাস্ত করিয়া করদ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক দাহল ও কর্ণাটের উত্তরাংশে এই বংশীয় রাজগণ খৃষ্টের ষাটশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নির্বিকারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [দাহলমণ্ডল ও কর্ণাট দেখ।]

এই বংশ প্রায় নয়শত বর্ষকাল উত্তরে ত্রৈপুর বা চেনি, পশ্চিমে ভিলসা (বিদিশা), পূর্বে ছত্রিশগড় এবং দক্ষিণে গোদাবরীতট পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড উপভোগ করেন।

তাঁহারা সকলেই শৈব ও শক্তির সেবক ছিলেন। চেনির কলচুরিরাজ কর্ণদেবের অমুশাসনে সুবর্ণ বৃষভধ্বজ ও চতুর্ভুজ পরিশোভিত। হস্তিপরিবৃত্তা কমলেকামিনী মূর্তি অঙ্কিত আছে, তৎপুত্র গাজেন্দ্রদেবের স্বর্ণমুদ্রায়ও চতুর্ভুজা পার্শ্বতী মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা দেশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ‘করচুলি’ নামক রাজপুত্র জাতির নামোল্লেখ দেখিতে পাই—

“চোহানন্দ দীক্ষিতশ্চ রেকোবারন্ততঃপরম্।

করচুলিঃ পরিহারো চান্বেলাখ্যা নৃপোত্তমঃ।

বাঘেলো বয়সো ভূপু, কছুরা রজপুত্রকঃ।

রাঠোরো রণপুরশ্চ রাণাধ্য রণহর্জয়ঃ।

বিশেষঃ প্রবলো যুদ্ধে ষাটশ পরিকীর্তিতাঃ।”

দেশাবলী-রণন্তত্ত্ব বিবরণ

এই করচুলি রাজপুত্র এক সময়ে বাঘেলখণ্ডে (প্রাচীন চেনিরাজ্যে) বাস করিত।

সেবা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অনেকগুলি সম্রাট রাজপুত্র বাস করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ‘করচুলি ঠাকুর’ বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন, ‘আমরা হৈহয় বংশীয়, সহস্রাঙ্কনের বংশধর। আমাদের পূর্ক্বেপুত্রবরা রায়পুর-রতনপুর হইতে আসিয়া এ অঞ্চলে বাস করিয়াছেন।’

এই করচুলি বা করচুলি রাজপুত্র জাতিই সম্ভবতঃ প্রাচীন শিলালিপি বর্ণিত কলচুরি বা কালচুরি। প্রত্নতত্ত্ববিদ ফিট্‌ সেই কলচুরি বংশীয়দিগকে আর্জুনায়ন বলিয়া স্বীকার করেন। (Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 10 দেখ) কিন্তু এখানে আমরা ফিট্‌ সাহেবের মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কার্ত্তবীর্ষ্যারজুনের বংশধরগণ হৈহয় নামে পরিচিত, আর্জুনায়ন বলিয়া কোন পুরাণ বা প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত হয় নাই। কোন কোন পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও পাণিনির অশ্বাদিগণে আর্জুনায়ন শব্দ জনপদ ও সেই জনপদবাসী লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে। বরাহমিহির এই জনপদ ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত অপরপূর জনপদের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মত গ্রাহ্য করিলে এই জনপদ পাণিনি-গণোক্ত অশ্ব (অশ্বক) জনপদের নিকটে হয়। [আর্ঘ্যাবর্ত শব্দ ১৮৩ পৃঃ ও আর্ঘ্যাবর্তের মানচিত্রে অশ্বক ও আর্জুনায়ন দেখ।] বর্তমান জলালাবাদ যাইবার সময় ঐ স্থানকে অনেকে ‘অজুন’ বলিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে ঐ প্রদেশ ও তজ্জনপদবাসীরাই আর্জুনায়ন বলিয়া অভিহিত হইত। কলচুরিবংশ সমুদ্রগুপ্তের অমুশাসনসম্বন্ধ-বর্ণিত আর্জুনায়ন নয়।

পূর্ক্বেকালে এই কলচুরিরাজগণ এক স্বতন্ত্র সখ্য ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের অমুশাসন ও খোদিত শিলাকলকে এই সখ্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই সখ্যের প্রথম আরম্ভকাল নির্ণয় করা মুকঠিন। প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিহামের মতে, কলচুরি রাজকর্তৃক কালঞ্জর অধিকারের সময় হইতে কলচুরি বা চেনি সখ্য আরম্ভ

হইরাছে। তাঁহার মতে ২৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার আরম্ভ। অধ্যাপক কিলহোর্ণের মতে ২৪৮-৪৯ খৃঃ এই সম্বন্ধের আরম্ভ কাল।

(Cunningham's Indian Eras, p. 60; Archaeological Survey of India, Vol. IX, p. 9; Academy, December 1897, p. 394; R. Sewall's Sketch of the Dynasties of Southern India, p. 42 ff.)

কলঞ্জ (পুং) কং লঞ্জয়তি, ক-লজি-অণ্। ১ বিধাত্ত অস্ত্র-মৃত্যুয়। ২ বিধাত্ত অস্ত্রহত পক্ষী। ৩ তান্ত্রিকট, তামাক। বিষ্ণুসিদ্ধান্ত সারাবলী নামক গ্রন্থে তামাকের ধূমসেবনে এইরূপ গুণ লিখিত আছে,—

“কলঞ্জসংবেঠনধূমপানং

তাদন্তশুদ্ধিমুখরোগহানিঃ।

ককমময়জরহানি কৃত

গান্ধার্কবিদ্যা প্রবেগকসেব্যম্॥”

কলঞ্জ-সংবেঠন আধুনিক চুরুট বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, ইহার ধূমসেবনে দন্তশুদ্ধি, মুখরোগ, কফ ও আমজর উপশমিত হয়। সঙ্গীতবিদেরা এই ধূম সেবনে স্বরের উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন। [তামাক দেখ।]

৪ পরিমাণবিশেষ, ১০ পল; ইহার অপর নাম ধরণ।

(“কলঞ্জং ধরণং প্রোহ মণিমানবিশারদাঃ।”)

৫ (স্ত্রী) বিধাত্ত অস্ত্রহত যুগপক্ষীর মাংস।

কলঞ্জাদিকরণ (স্ত্রী) “ন কলঞ্জং ভক্রেৎ” ইত্যাদি বাক্য অবলম্বন করিয়া পঞ্চাবয়ব জ্ঞানবিশেষ।

কলট (স্ত্রী) কং জলং লটতি আব্রোতি, ক-লট-অচ্। ‘তৃণাদি নির্গত গৃহাচ্ছাদন, ঢাল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কুটল।

কলতা (স্ত্রী) কলস্ত ভাবঃ, কল-তল্-টাপ্ (তন্ত্রভাবস্তলো। পা ৫।১।১১১।) অব্যক্ত মধুরতা।

কলতুলিকা (স্ত্রী) কং মুখং বিষয়দেহন লাতি গৃহাতি কলং কামং তুলয়তি পুরয়তি; কল-তুল-গুল্-টাপ্-অত ইত্য়ম্। ১ ইচ্ছাবতী। ২ কামুকী, ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বাঞ্ছিনী ও লজ্জিকা।

কলত্র (স্ত্রী) গড় লেচনে-অত্রন্-গকারস্ত ককারঃ, (গড়াদেশচ কঃ। উণ্ ৩।১০৬) ডব্র লঃ। ১ স্ত্রী। ২ নিতম্ব। ৩ দুর্গস্থান। (কলত্রং শ্রোণিভাৰ্ঘ্যায়ং দুর্গস্থানে চ ভূভূজাম্। হেম° অনে ৩।৫০১।)

কলত্রবান্ [৭] (পুং) কলত্রমস্ত্যতি, কলত্র-মত্প, মত্ৰ বঃ। সঙ্গীক।

(“কলত্রবস্তমাস্তানমবরোধে মহতাপি।” রঘু।)

কলত্রী [ন] (পুং) কলত্রমস্ত্যতি, কলত্র-ইনি। সঙ্গীক, স্ত্রীযুক্ত।

কলধূত (স্ত্রী) কলেন অবয়বেন ধূতং তচ্ছম্, ৬তৎ। ১ রৌপ্য। ২ কলেন অব্যক্তমধুরধ্বনি। ধূতম্ মনোরমম্। (জি) অব্যক্ত মধুর শব্দযুক্ত।

কলধৌত (স্ত্রী) কলেন অবয়বেন ধৌতং তচ্ছম্। ১ স্বর্ণ, সোণ। “তন্তুকলধৌত জিনি হৈল অঙ্গশোভা।” কবিকঙ্কণ।

২ রৌপ্য।

(“অধিরাজি যত্র নিপতন্নভোলিহাং

কলধৌতধৌতশিলবেখানাং রুচৌ।” মাঘ।)

(কলধৌতঃ সুবর্ণে জ্ঞাং রজতে চ নপুংসকম্। মেদিনী।)

৩ কলধ্বনি।

কলধ্বনি (পুং) কলঃ অক্ষুটমধুরঃ ধ্বনির্ভক্ত, বহত্রী। ১ পায়রা। ২ কোকিল। ৩ ময়ূব। ৪ অব্যক্ত মধুর শব্দ।

(“অঙ্গরোগগণসঙ্গীতকলধ্বনিনির্নাদিতে।” মহানির্বাণ°।)

কলন্ (স্ত্রী) কল্যাতে লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বা, কল-লূট্। ১ চিহ্ন। ২ দোষ। ৩ কল্যাতে গুরুশোণিতাভ্যাং অজ্ঞোহস্তং মিশ্র্যতে। গর্ভে মিশ্রিত গুরুশোণিতের প্রথম বিকার; ইহার সংস্কৃত নামান্তর কলল। [কলল দেখ।]

(“কলনং ত্বেকরাজ্যেণ পঞ্চরাজ্যেণ বৃন্দবৃন্দম্।

দশাহেন তু কর্কসুঃ পেত্ৰণ্ডং বা ততঃপরম্॥”

ভাগবত ৩।৩১।২।)

৪ গ্রহণ। ৫ গ্রাস। (“কলনাং সর্গভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ষিতঃ।”) ৬ জ্ঞান। (“লোকানামন্তকং কালঃ কালো-হন্তঃ কলনাম্বকঃ।” স্বর্ঘ্যসি°।

‘কলনাম্বকঃ জ্ঞানবিষয়স্বরূপঃ জ্ঞাতুং শকাইত্যর্থঃ।’ রজনীনাথ।

৭ (পুং) কং জলং লাতি, ক-লা-ক; কলঃ সন্ নমতি, কল-নম্-ড। বেতস, বেতগাছ।

কলনা (স্ত্রী) কল-ভাবে যুচ্-টাপ্। ১ বশীভূততা।

(“করারং যৎক্ষেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা।” আনন্দলহরী।)

২ জল্পনা। ৩ অবমোচন। (“পিচ্ছাবচুড়া কলনামিবোরঃ।” মাঘ।)

কলনাদ (পুং, স্ত্রী) কলো নাদোহস্ত, বহত্রী। ১ রাজহংস।

২ (জি) কলধ্বনিযুক্ত। ৩ (পুং, কর্ণধা) কলধ্বনি।

কলস্তক (পুং) পক্ষিবিশেষ।

কলন্দক (পুং) গোত্রপ্রবর সুনিবিশেষ।

কলন্দন (পুং) কলং শাস্ত্রবিহিতং বাক্যং শিষ্টাচারং বা দৃশ্যতি, কল-দৃ-খচ্-মুস্চ। বর্ণসম্বন্ধ জ্ঞাতবিশেষ। লেট জাতির ওরসে ও তীবর কস্তার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। (ব্রহ্মবৈবর্ত°।)

কলন্দিকা (স্ত্রী) কলং কামং সর্গভূতীঃ দদাতি, কল-দা-

ক-সংজ্ঞায় কন্-টাপ্-অত ইত্ম্। পুরোদরাদিবাং ব্রু চ।
সর্গবিদ্যা। (কলমিকা সর্গবিদ্যা। হেম ২। ১৭২।)
কলমু (জী) কলারঃ মায়া অক্ষুরিব, শক্কাদিদ্ব্যলোপঃ।
বোলীশাক।

কলপ (দেশজ) চুল রঙ্গ করিবার অস্ত্র একপ্রকার ত্র্য
পদার্থবিশেষ।

কলভ (পুং) কলেন করণে শুণেন ইত্যর্থঃ ভাতি, কল-ভা-ক
যৰ। কল-অভচ্ (ভদ্রশূলিকলিগুণ্ডিত্যোভচ্। উণ ৩। ১২২)
১ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক হাতির ছানা। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—করিষাবক, ব্যাল ও হুদিস্ত। ২ হস্তিমাত্র।

(“মুদা রমন্তে কলভা বিকশরৈঃ।” মাঘ।)

৩ ধূতরাগাছ। ৪ উল্লুশাবক।

কলভবল্লভ (পুং) কলভত হস্তিাবল্লভ বল্লভঃ প্রিয়ঃ,
৬তৎ। পীলুবৃক্ষ।

কলভী (জী) কং জলং আশ্রয়তয়া লভতে, ক-লভ-অচ্-
গোরাদিবাং ভীষ্। চক্ষুবৃক্ষ।

কলভৈরব (পুং) কলং ভৈরবচ্, কর্মধা°। ভয়ঙ্কর অব্যক্ত শব্দ।
(“ইহমুহুর্দিতৈঃ কলভৈরবঃ।” মাঘ।)

কলম (পুং) কলয়তি অক্ষরং জনয়তি, কল-গিচ্-অম্ (কলি-
কর্দোরমঃ। উণ ৪। ৮৪।) ১ লেখনী। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—লেখনী, বর্ণভূমী ও অক্ষরভূমিকা। ২ শালিধাত্ত-
বিশেষ; রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—কষায়রস, চক্ষুর
হিতকারক, এবং রক্তদোষ ও ত্রিদোষনাশক। ৩ চোর।

(কলমঃ পুংসি লেখন্যঃ শালো গট্ঠরেহপি চ। মেদিনী।)

৪ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; ইহার আকার লিখিবার কলমের
জায়, সেইজন্ত ইহার নাম ‘কলম’। এই যন্ত্র এইরূপ নামেই
অনেকদেশে প্রচলিত আছে। ইহাই সংস্কৃতে কলম, পারস্ত,
আফগানিস্তান, তুর্কি, তাতার প্রভৃতি দেশেও কলম, এবং
গ্রীসে কলামস্ (Calamus), সেইজন্ত বোধ হয় ইহা ভারতবর্ষীয়
যন্ত্র। ইহার একমুখ কলমের জায় কর্তিত এবং অপর মুখ
অজ্ঞাত বংশীর জায় অনাবদ্ধ থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত
অল্প এবং তার রন্ধু সংখ্যা অজ্ঞাত বংশীর জায় সাতটি।
ইহা সরলভাবে বাজাইতে হয়। বৈদিকে বাজার, সেইখানে
দেশী সানাইয়ের মত একটি ক্ষুদ্র নল বসান থাকে এবং
বাজাইবার পূর্বে ঐ নল দিয়া ভিজাইয়া লইতে হয়।

কলমকর্তনী। কলম কাটিবার ছুরী।

কলমকাঠি। কলম করিবার কাঠি।

কলমজারি (পারস্ত) ১ কাজে ব্যস্ত। ২ আশ্রয়।

কলমতরাস্ (পারস্ত) কলমকাটিবার ছুরী।

কলমা (আরব্য) ১ কথা ২। মুললমানদিগের ভজন।

কলমী (দেশজ) কলমীশাক; ইহার সংস্কৃত নাম কলম্বী।
[কলম্বী দেখ।]

কলমীশাক (দেশজ) জলজাত শাকবিশেষ। [কলম্বী দেখ।]

কলমেরমোচ্ (দেশজ) কলমের অগ্রভাগ (Nib.)

কলমোভম (পুং) কলমেভাঃ কলমেযু বা উভয়ঃ। গন্ধশালি,
হুগন্ধি ধাতু।

কলম্ব (পুং) কল্যতে ক্লিপ্যতে শত্রুঃ প্রতি, কল-অঘচ্।
১ শর, বাণ। ২ শাকনাশিকা, শাকের নল বা ডাঁটা।
৩ কদম্ব। (কলম্বো নালিকাশাকে পুষৎকে নৌপগাদপে।

হেম° অনে ৩। ৪৪৭।)

কলম্ব। সিংহলের একটি জনাকীর্ণ নগর। ৪৯৬ খৃঃ অব্দের
পূর্বে সিংহলীদিগের প্রাচীন পুস্তকে এই স্থান ‘কুগম্’ বা
সমুদ্রতট বলিয়া খ্যাত ছিল। ১৫০৫ খৃঃ, পর্তুগীজেরা
এখানে প্রথম পদার্পণ করে। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজ
অধিকৃত হয়।

এই নগরে মন্দির উপাগারের নিকট কতকগুলি হিন্দু-
মন্দির আছে।

কলম্বক (পুং) কলম্ব-সংজ্ঞায় কন্। ধারী কদম্ব।

কলম্বকুজক (জী) তীর্থবিশেষ। (বৃহদ্রীলতন্ত্র)

কলম্বিকা (জী) কলম্ব-টাপ্-অত ইত্ম্। ১ কলমীশাক।

(“কলম্বিকা গুরুবৃষা কষায়ন্তন্যবৃদ্ধিদা।” চক্রদ°।)

২ (কলম্বীৰ কায়তে প্রকাশতে, কলম্বীকৈ-ক-টাপ্-
ইত্ম্, পুরোদরাদিবাং ব্রুঃ।) গ্রীষ্মর পশ্চাচ্ছিকস্ব নাড়ী,
ইহার অপর সংস্কৃত নাম মজ্জা।

কলম্বী (জী) কে জলে লম্বতে, লবি অংসনে-অচ্-ভীষ্।
জলজ লতাবিশেষ, কলমীশাক। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
কড়ম্বী, কলম্বু ও কলম্বিকা। (Convolvulus repens.)

রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—মধুর ও কষায়রস, গুরু;
শুভ্রহৃৎ, শুক্র ও স্নেহকারক।

কলম্বু (জী) কে জলে লম্বতে, ক-লম্ব-উণ্। কলমীশাক।

কলম্বুট (জী) কে জলে লম্বতে ভাসতে, ক-লম্ব-উটন্।
১ হৈমলবীন, সন্দো রুদ্রজাত বৃক্ষ। ২ নবনীত, মাখন।

কলম্বু (জী) কে জলে লম্বতে, লম্ব-বাহলকাং উট্। কলমী।

কলরব (পুং) কলঃ মধুরাক্ষুটৌ রবঃ ধ্বনি বঁস্ত, বহরী। ১
কপোত, পাররা। (°শীর্ণপ্রাসারোপরি দ্বিগীযুরিব কলরবঃ
কণতি।°) আখ্যাসংগৃহীত ৫৯৩।)

২ কোকিল। ৩ (কর্মধা°) কলধ্বনি। ৪ গোলমাল।

কলরোল (পুং) কলধ্বনি। অক্ষুট মধুর শব্দ।

“আই আই আরের উটিল কলরোল।

জামাই মাইলো তেঁলো বলি হৈল গণগোল ॥” শিবায়ন।

কলল (পুং, স্ত্রী) কল্যতে বেঠেতে হনেন, কল-বুঝাভিঃ। কলচ্। ১ জরায়ু, গর্ভবেটন চর্মা। ২ শুক্রশোণিতের প্রথম বিকার; গর্ভের প্রথমমাসে কলল উৎপন্ন হয়। গর্ভস্থতা জী যবে মৈথুন আচরণ করিলে তাহার গর্ভ হইয়া থাকে, সেই গর্ভ অস্থি প্রভৃতি পৈত্রিক গুণশূদ্ধ হওয়ার ‘কলল’ মাত্র প্রসূত হইয়া থাকে। (জুস্ততঃ)

(গর্ভস্ত গরভো জুগো দোহলক্ষণঃ সঃ।

গর্ভাশয়ো জরায়ুযে কললোযে পুনঃ সমঃ ॥ হেম ৩।২৪৪।)

কললজ (পুং) কললমিব জায়তে, কলল-জন-ড। ১ রাল, ধূনা। ২ গর্ভ।

কললজোক্তব (পুং) উক্তবতি অশ্রাৎ, উক্তবঃ, কললজত উক্তবঃ, ৬তৎ। সালগাছ।

কলবল (দেশজ) ১ বিবিধ অক্ষুট শব্দ। ২ অস্বচ্ছ বাক্য।

কলবিক (পুং) কলঃ মধুরাক্ষুটং বহতে রোতি, কল-বকি-অচ্-প্ৰোধদরাদিভ্যং অত ইহম্। ১ চটক, চড়াইপাখী। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কলবিক, কুল্লিক ও কালকণ্টক। ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার গুণ,—শীতল, মিষ্ট, স্বাদু, শুষ্ক ও কফকারক এবং সন্নিপাতনাশক। গৃহচটক অধিকতর শুক্র-কারক। ২ কলিক বৃক্ষ। ৩ কলক। ৪ খেতচামর। ৫ ছটার পুঞ্জ বিখরুপের মন্তক বিশেষ। ভাগবতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—

“কোন সময়ে ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া জুরাচার্য্য বৃহস্পতির অবমাননাকরায়, বৃহস্পতি অস্বহিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অম্বরগণ দেবতাদিগকে নিতান্ত পীড়িত করিয়া ভুলিল, ব্রহ্মা অনন্তোপায় দেখিয়া ঐষ্ট পুত্র বিখরুপকে পৌর-হিত্যে নিযুক্ত করিয়া অম্বর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। দেবগণও তদনুসারে তাঁহাকে পুরোহিত করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিখরুপ মাতামহ বংশের প্রতি স্বাভাবিক ঘ্নেহবশতঃ গোপনে অম্বরদিগকে বজ্রভাগ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইন্দ্র তাহা অবগত হইয়া ক্রোধে বিখরুপের মন্তকসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিখরুপের ৩টি মন্তক ছিল, নাম—কপিজল, কলবিক ও তিভিরি। যে মুখের দ্বারা তিনি জুরাশান করিতেন, সেই মুখের নাম কলবিক।” (ভাগবত ৬।৯ অঃ।)

৬ তীর্থবিশেষ।

কলশ (জি) কলং মধুরাযুক্তশব্দং শবতি, জলপূরণসময়ে প্রাচোত্তি, কল-শ গতো-ড। জলাধারবিশেষ, কলশী।

ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বট, কুট, মিশ, কলস, কলদি, কলনী, কলশি, কলশী, কুন্ত ও করীর। তত্ত্বসারোক্ত কলাবতী বীকা প্রকরণে কলশের পরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে,—“পঞ্চাশ অঙ্গুল বেড়, বোড়শ অঙ্গুল উচ্চ এবং আট অঙ্গুলি মূখ। ৩৬ অঙ্গুলি বিস্তার ও উচ্চতাবিশিষ্টকে কুন্ত বলে। বোড়শ বা দ্বাদশ অঙ্গুলির কম করা উচিত নহে।”

কলশদিবু (স্ত্রী) কলশত দীর্ঘরশ্ম, কলশ-দৃ-ভাবে কিণ্। যান্ত্রিক কলশ-বিহারণ।

কলশপোতক (পুং) সর্পবিশেষ।

(“আর্য্যকশোভাক্ষেপনঃ কলশপোতকঃ।”

ভারত আদি ৩৫ অঃ।)

কলশি (স্ত্রী) কলং পরীরমালিঙ্গং ভ্রতি নাশয়তি, কল-শো-ইন্। ১ পুষ্টিপণী, চাকুলে। ২ (কল-শু-ডি) বট, জলাধার-বিশেষ। (“কলশিমুদধিগুবরী বজ্রবা লোড়রতি।” মাঘ।)

কলশী (স্ত্রী) কলশি ভীপ্। ১ জলপাত্রবিশেষ। ২ চাকুলে। ৩ তীর্থবিশেষ।

কলশিকণ্ঠ (জি) কলশাঃ কণ্ঠেইব কণ্ঠঃ অস্ত, বহত্বী। ১ কলশীর কণ্ঠের স্থায় কণ্ঠযুক্ত। ২ ঔষিধবিশেষ।

কলশীমুখ (পুং) বায়বজ্রবিশেষ। ইহার মুখ কলশীর মুখের স্থায়।

কলশীমুত (পুং) কলশাঃ মুত ইব, কলশীতঃ উৎপন্নত্বাৎ। অগস্ত্যমুনি। [অগস্ত্য দেখে।]

কলশোদর (পুং) কলশ ইব উদরমত, বহত্বী। ১ দানব-বিশেষ। (হরিবংশ ২৪০ অঃ) ২ কলশের স্থায় বাহার উদর।

কলস (জি) কেন জলেন লগতি শোভতে, ক-লস-অচ্। ১ কলশ, কলশী। ২ (পুং) ত্রোণ পরিমাণ, ৪ আঢ়ক ৮৮সের।

(“চতুর্ভিরাঢ়কৈর্ভ্রোণঃ কলসোনষণোক্ষণঃ।” শালধর।)

৩ (পুং, কেন জলেন লগতি, ক-লস-অচ্।) কুন্ত। কলিকাপুরাণে লিখিত আছে “অমৃত সংগ্রহের জন্য যে সময়ে দেব-জুরে সাগরমন্ধান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিখরুপী দেব-গণের কলাসমূহের দ্বারা পৃথক্ নরটি বট প্রসূত করিয়া-ছিলেন; এই জন্তই ইহার নাম কলস হইয়াছে।” নির্ঝণ তন্ত্রেও লিখিত আছে—

“কলাং কলাং গৃহীষ্য তু দেবানাং বিশ্বকর্মণা।

নির্ঝিতোহয়ং স বৈ যদ্বাং কলসন্তেন কথ্যতে ॥”

৪ গর্ভজাত নাগবিশেষ। (মহাভারত) ৫ কাশ্মীরের এক-জন রাজা, ইহার অপর নাম রণামিত্য। ইনি তুজের পুত্র।

৬ই জীবন ৯৬৫ শকে, তুজ ইহাকে রাজা করেন। রাজা হইয়া তাঁহার পিতার উপর কেমন বিব নজর পড়িল, পিতার

উপর অভিযাত্রা করিতে বাকি রাখিলেন না। তাঁহার মজি-
গণের এ সব অভিযাত্রা সহ হইল না। শেষে তাঁহার প্রধান-
মন্ত্রী হলধর তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসন প্রদান করিলেন।
তখন কলস নামমাত্র রাজা হইয়া পিতার অধীনে চলিতে
লাগিলেন। বত ডগ লম্পট তাঁহার সহচর হইল। তাহাদের
সহবাসে ক্রমে ইহার চরিত্র এত নীচ হইয়া পড়িল যে
আপন কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আপন ভগিনী ও
তনয়ার সতীত্ব নষ্ট করেন। বৃদ্ধ রাজা তাঁহার আচরণে
নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমস্ত ধনসম্বল বিতরণ করিয়া রাজ্য
ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এই সময়ে এই দুই পিতৃহত্যা
করিবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। পরে নিজ মাতার কান্ডর
বাক্যে এই দুর্ভাগিনী পরিভ্রমণ করিলেন। বৃদ্ধ পিতা
মনের দুঃখে আত্মঘাতী হইলেন। কলসও কিছুদিন রাজত্ব
করিয়া লীলাবেলা শেষ করিলেন। তাঁহার পর উৎকর্ষ
কাম্বীরের রাজা হন। (রাজতরঙ্গিণী ৭ম ভাগ)

কলসক্ষেত্র। কর্ণাটকের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

[বুদ্ধপুরাণীয় কলসক্ষেত্রমাহাত্ম্য দেখ।]

কলসি (পুং) কেন জলেন লসতি, ক-লস্-ইন্। ১ চাকুলে।
২ পর্গরী। ৩ জলপাত্র বিশেষ।

কলসী (স্ত্রী) কলস-ভীপ্। ১ কলস। ২ চাকুলে। ("কলসী
বৃহতী জ্ঞানী" স্মৃতিতঃ)

কলসীক (স্ত্রী) কলসী-স্বার্থে কন্। কলস।

("অবলম্বিত কর্ণশঙ্কলী কলসীকঃ রচয়ন্তবোচত।")

নৈষধ ২। ৮।)

কলসীকৃত (পুং) কলসাত্মক জাতঃ স্মৃতঃ, মধ্যলো। অগত্যমুনি।

কলসোদধি (পুং) কলস ইব উদধিঃ, মূল্যধারকঃ। সমুদ্র।

কলসোদরী (স্ত্রী) কলস ইব উদরঃ যন্তাঃ, বহুব্রী। কলশের
ন্যায় উদরবিশিষ্টা স্ত্রী।

কলসনাড় (দেশজ) একপ্রকার চৌচ বাস।

কলস্বর (পুং) কলশচাপৌ স্বরশ্চেতি, কর্ণধা। কলরব, অব্যক্ত
মধুর শব্দ।

"চাঁদমুখে চুঘন করিয়া তার পর।

চকে জল দিয়া কঁদে করি কলস্বর।" শিবায়ন।

কলহ (পুং, স্ত্রী) কলং কামং হন্তি অজ, কল-হন্ অধিকরণে ড।

১ বিবাদ, ঝগড়া। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বৃদ্ধ, আয়োজন,
জন্য, প্রধন, প্রবিদারণ, যুদ্ধ, আক্রমণ, সংখ্যা, সযৌক,
সাম্প্রদায়িক, সমর, অনীক, রণ, বিগ্রহ, সস্ত্রহার, অভিসম্পাত,
কলি, সংক্ষেপ, সংযুগ, অভিযাত্রা, সমাধাত, সংগ্রাম,
অভ্যাগম, আহব, সমুদ্রার, সংবৎ, সমিতি, আজি, সমিৎ,

যুদ্ধ, সযৌক, সাম্প্রদায়িক, সংক্ষেপ ও যুৎ। ২ (পুং) পথ
ও খড়্গকোষ, তরবারের খাপ। ৩ ভগ্ন, প্রভারণ।

(কলহং যুদ্ধি বাটে না খড়্গকোষে চ ভগ্নেনে। মেদিনী)।

কলহংস (পুং) কলেন মধুরাক্ষুটজনিয়া বিশিষ্টো হংসঃ
মধ্যলো। ১ বাগিহাঁস; ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কান্দব, কল-
নাভ ও ময়ালক। ২ রাজহংস।

("কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ।")

প্রতীরিরে শ্রোত্রমুখৈর্ধিনিদৈঃ ॥ ভট্টি)

৩ রাজশ্রেষ্ঠ। ৪ পরমায়া। ৫ ব্রহ্ম। ৬ ব্রাহ্মণ। ৭ রাগিণী
বিশেষ। মধু, শব্দরবিজয় ও আত্মীয়যোগে উৎপন্ন। ৮ ছন্দো-
বিশেষ; ইহা অভিজগতীর অন্তর্ভুক্ত এবং ত্রয়োদশ
অক্ষরবিশিষ্ট। এই ছন্দের ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম,
১০ম ও ১১শ অক্ষর লঘু, এবং ৩য়, ৫ম, ৯ম, ১২শ, ১৩শ
অক্ষর গুরু।

"সঙ্গসাঃ সর্গো চ কথিতঃ কলহংসঃ।"

উদাহরণ যথা,—

"যমুনাবিহারকৃত্তকে কলহংসো

ব্রজকামিনী কমলিনী কৃত্তকেলিঃ।

জনচিত্তহারিকলকর্ণনিদানঃ

ভ্রমং তনোতু তব নন্দনজঃ ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)।

কেহ কেহ ইহাকে 'সিংহনাভ'ও কহিয়া থাকেন।

কলহকার (জি) কলহং করোতি, কলহ-কৃ-অণ্। কলহকারক।

("হন্তং কলহকারো হসৌ শব্দকারঃ পপাত যম্। ভট্টি)।

কলহকারক (জি) কলহং করোতি, কলহ-কৃ-ণুল্ (ণুল্
তুচৌ। পা ৩। ১। ১৩৩।) বিবাদকারী।

কলহকারী [ন] (জি) কলহ-কৃ-ণিনি। বিবাদকারক।

কলহনাশন (পুং) কলহং নাশয়তি, কলহ-নশ-ণিচ-লু।

১ পুতিকরজ। ২ যে ঝগড়া থামায়।

কলহপ্রিয় (পুং) কলহঃ প্রিয়ো যন্ত, বহুব্রী। ১ নারদ। ২

(জি) বিবাদপ্রিয়, ঝগড়াটে।

("হৃদ্বাঃ কপিলাঃ কৃষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ।")

রামায়ণ ৫। ১৬। ২৭।)

কলহপ্রিয়া (স্ত্রী) কলহন্ত কলহে বা প্রিয়া, ৬ বা ৭তম।
শারিকা পাখী।

কলহর। মধ্যপ্রদেশবাসী বনিকজাতিবিশেষ। ইহার অধি-
কংশই দোকানদার। এ অঞ্চলে এই জাতির সংখ্যা অনেক।
এক বেগলপ্রদেশেই ৩ লক্ষের অধিক। এই জাতি প্রধানতঃ
তিন শাখার বিভক্ত, সিহোরা কলহর, পরদেশী কলহর ও জৈন
কলহর। সিহোরা কলহর পূর্বে বৃন্দাবনভেদে বাস করিত,

সেখান হইতে এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করে। পূর্বে তাহার
‘ওমরাই বেনিয়া’ বলিয়া পরিচয় দিত।

পরদেশী কলহেরাই এখারকার আদি কলহর। তাহার
বলে, যে ভারতের উত্তর অঞ্চল হইতে সে দেশে গিয়াছে।
জৈন কলহেরার সমাজচ্যুত ও ধর্মভ্রষ্ট বলিয়া অপর কলহর
অপেক্ষা নিরশ্রমী বলিয়া অভিহিত।

কলহাস্তরিতা (স্ত্রী) কলহাৎ অস্তরিতা পশ্চাৎ পরিতাপ-
মাপ্তা ইতি শেষঃ। নায়িকাবিশেষ; সাহিত্যদর্পণে ইহার
লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

“চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোদধপাত্তা য।

পশ্চাত্তাপমবাপ্তোতি কলহাস্তরিতা তু সা ॥”

যে স্ত্রী প্রথমে অহুরোধকারী নায়ককে ক্রোধভরে পরি-
তাগ করিয়া পরে অহুতাপ করে, তাহাকে কলহাস্তরিতা
কহে। উদাহরণ যথা—

“নো চাটুশ্রবণঃ কৃতঃ ন চ দৃশ্যহারো হস্তিকে বীক্ষিতঃ
কান্তস্ত প্রিয়হেতবে নিজসখীবাচোহপি দ্রুতীকৃতঃ।

পাদান্তে বিনিপত্য তৎক্ষণমসৌ গচ্ছয়্যা মুচুয়া

পাণ্ডিত্যমবরুধ্য হস্ত সহসা কণ্ঠে কথং নার্পিতঃ ॥”

প্রাণনাথের চাটুবাচ্যে আমি কর্ণপাত করি নাই, সমীপস্থ
হারও একবার চাহিয়া দেখি নাই এবং প্রিয়সখিগণ কান্ত
সম্বন্ধে যে সকল প্রিয়বাচ্য বলিয়াছিল, তাহাতেও আস্থা না
দেখাইয়া অবজ্ঞা করিয়াছি; পরিশেষে কান্ত যখন আমার
পায়ে পড়িয়া চলিয়া বাইতেছিলেন, আমি সেই সময়ে কেন
তাহার কর্ণদেশে বাহু দ্বারা বেটন করিয়া হার পরাইয়া দিই
নাই? (সাহিত্যদর্পণ ৩। ৮৬।) ভ্রান্তি, সন্তাপ, সন্দোহ, বিশ্বাস,
অর ও প্রাণপাদি কলহাস্তরিতার ক্রিয়া। (রসমঞ্জরী।)

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

“কলহে খেদার পতি পশ্চাত্তাপিতা।

কবিগণ বলে ভারে কলহাস্তরিতা ॥

ক্রোধে হরে হস্তজ্ঞান, কৈয় তার অপমান,

এখন আকুল প্রাণ দেখিতে না পাইয়া।

মুটিছে বিবিধ ফুল, ডাকে ডুল অলিফুল,

সামালিব এই ফুল কার পানে চাহিয়া ॥

কাতর হইয়া অতি, বিস্তর করিয়া নতি,

চরণে ধরিল পতি না চাহিলু করিয়া।

করিমু যেমন কর্ম, কলিল তাহার ধর্ম,

মরুক এমত মর্ম হুখে বাই মরিয়া ॥”

কলহাপহৃত (ত্রি) কলহেন অপহৃতঃ। বিবাহ করিয়া
বাহ্য অপহৃত হয়।

কলহী [ন্] (ত্রি) কলহইমি। কলহযুক্ত, যগড়াটে।

(“অথবেহ্নাঃ কলহিনঃ পিতৃনা উপবাসিনঃ।” শব্দার্থ ৭। ৩। ১।)

কলহু। গণিতোক্ত উর্দ্ধসংখ্যা বিশেষ।

কল্য (স্ত্রী) কলয়তি বৃদ্ধিতো ধনং সঙ্কিনোতি, কল-অচ-
টাপ্। ১ মূলধন বৃদ্ধি, হ্রদ। ২ শিলাদি। ৩ অংশ। ৪ ত্রিশ-
কাঠা পরিমিত সময়। ৫ উত্তর ধাতুর মিশ্রণহীনস্থ অবকাশ
বিশেষ, ইহার দ্বারা ইরসরজাদি ধাতু পৃথক্ ভাবে থাকিতে
পারে। ৬ জীদিগের রজঃ। ৭ নৌকা। ৮ কণ্ট। ৯ রাশির
ত্রিশ অংশকে ভাগ এবং ভাগের বষ্টি ভাগকে কল্য কহে।

“বিকলানাম কল্য বর্ষা তৎ বর্ষা ভাগ উচ্যতে।

তত্ত্বংশতা ত্বেত্ৰাশির্ভগণো দ্বাদশৈবতঃ ॥” সূর্য্যসিদ্ধান্ত।)

১০ চন্দ্রের বোড়শভাগ, তাহাদিগের নাম—অমৃত, মানদা,
পুষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, বাস্তি,
জ্যোৎস্না, স্রী, প্রীতিরঙ্গনা, পূর্ণা, পূর্ণামৃত ও স্বরঙ্গা। চন্দ্রের
এই সকল কল্য অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ক্রমে ক্রমে পান করেন
বলিয়া, দিন দিন চন্দ্রের হ্রাস হইয়া অমাবস্তা হইয়া থাকে।
অগ্নি প্রথম কল্য, সূর্য্য দ্বিতীয়, বিষ্ণুদেবা তৃতীয়, বরুণ
চতুর্থ, বসুট্টকার পঞ্চম, ইন্দ্র ষষ্ঠ, দেববিগণ সপ্তম, একপাং
অজ অষ্টম, যম নবম, বায়ু দশম, উমা একাদশ, পিতৃলোক
দ্বাদশ, কুবের ত্রয়োদশ, পশুপতি চতুর্দশ ও প্রজাপতি পঞ্চদশ
কল্য পান করার পর, বোড়শ কল্য জলমধ্যে প্রবেশ করে,
জল হইতে ওষধি শরীরে প্রবিষ্ট হয়। গাতীসকল জল ও
ওষধি-প্রবিষ্ট ঐ কল্য পান করিলে তাহা অমৃতস্বরূপ ক্ষীর
হইয়া নিঃসৃত হয়, ঐ ক্ষীরজাত স্মৃত মন্ত্রপুত্র করিয়া অগ্নিতে
আহুতি প্রদান করিলে, চন্দ্র পুনর্বার দিনে দিনে আপ্যায়িত
হইতে থাকেন।

১২ সূর্য্যের দ্বাদশভাগ; তাহাদের নাম,—তপিনী,
তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জালিনী, রুচি, সূর্য্য, ভোগদা, বিখা,
বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা।

১২ অগ্নিমণ্ডলের দশভাগ, তাহাদের নাম,—ধূম্রা, অর্জি,
উম্মা, জলিনী, জালিনী, বিস্কুলিঙ্গিনী, হুত্ৰী, সূর্য্যপা, কপলা
ও হব্যকব্যবহা।

১৩ চতুঃবষ্টি (৬৪) কল্য, শিবতন্ত্রে সেই সকল কল্য
নাম নির্দেশ আছে। যথা—গীতবাদ্য; নৃত্য, নাট্য; চিত্র;
তুষণ; নির্মাণ; তত্ত্ব ও কুহুমাদি দ্বারা পূজার উপহার
সজ্জা; পুষ্পশয্যা; দস্ত বসন ও অঙ্গরাজ; মণিভূমিকা কর্ম;
শয্যারচনা; উদকবাদ্য; উদকঘাত; চিত্রাবোগ; মালা-
গ্রহন; চূড়ানির্মাণ; বেশভূষা করণ; কর্ণপত্র তদ্র; গন্ধলেপন;
ভূষণবোজনা; ইন্দ্রজাল; কোমারবোগ; হস্তলাঘব; বিবিধ

শাপাশূণ্যাদি ভক্ষ্য প্রস্তুত করণ; পানকরসরাগাসিরাহি; বোজন; সূচীবাণকর্ষ; সূত্রকীড়া; প্রাহেলিকা; প্রতিমালা; দূর্ঘটক যোগ; পুস্তক পাঠ; নাটিকা ও আখ্যায়িকা দর্শন; কাব্যসমস্যাপূরণ; পট্টিকারেত্নবাণবিকর; তর্ককর্ষ; তক্ষণ; বাস্তবিদ্যা; রোগ্যরসাদি পরীক্ষা; ধাতুবাদ; মণিরাগজ্ঞান; আকরজ্ঞান; বৃক্ষাধুর্বেদ যোগ; মেঘকুকুট ও লাবক-বুদ্ধবিধি; শুকশায়িকা প্রোলাপন; উৎসাদন; কেশমার্জন কোশল; অক্ষরমুদ্রিকা কথন; স্নেহিত কবিকর; দেশভাবা জ্ঞান; পুষ্পশকটিকা নিমিত্তজ্ঞান; বস্ত্রমাতৃকা; ধারণমাতৃকা; সম্পাট্য; মানসীকাব্যক্রিয়া; ক্রিয়াবিকর; চলিতক যোগ; অভিধানকোষছন্দোজ্ঞান; বস্ত্রগোপন; দ্যুতবিশেষ; আকর্ষণকীড়া; বালক ক্রীড়নক; বৈদ্যারিকী বিদ্যা জ্ঞান; বৈজয়িকী বিদ্যা জ্ঞান ও বৈতালিকী বিদ্যা জ্ঞান। কোন কোন গ্রন্থে সূচীবাণ কর্ষ ও সূত্রকীড়া একপদ করিয়া বীণাডমরু-ক-বালা একটি অধিক সন্নিবেশ এবং বৈতালিকী স্থানে বৈদ্যারিকী পাঠ দৃষ্ট হয়। ১৪ জিহ্বা।

(“কলাং পরাধুখীং কৃষা জিগধে পরিযোজয়েৎ।

হটযোগদীপিকা।

১৫ শিব। ১৬ লেশ। ১৭ অন্ন সময়। ১৮ বিত্ত্তি। ১৯ সামর্থ্য। ২০ সংখ্যা। ২১ শৌর্যাদি গুণ। ২২ কলন। ২৩ বিভীষণের জ্যোষ্ঠা কন্যা, ইনি মরীচির পত্নী ছিলেন। ২৪ জীব দেহস্থ ষোড়শকলা; তাহাদিগের নাম,—প্রাণ, শ্রদ্ধা, বোম, বায়ু, জল, পৃথিবী, ইঞ্জির, মন, অন্ন, বীর্ষ্য, তপঃ, মজ্জ, কর্ণ, লোক ও নাম। ২৫ একটি মাত্রাযুক্ত লঘুবর্ণ।

(“বড় বিব্রমেহট্টো সময়ে কলান্তান্ত সময়েহ্যনোনিরন্তরাঃ।

নসমাজপরাশ্রিতা কলা বৈতালীয়োহন্তে রণে) গুরুঃ ॥”

বৃত্তরত্নাকর।

২৭ ঠাট, ঢালাকি। ২৮ কদলী। [কদলীশক্কে কলার সমস্ত জাতব্য বিবরণ লিখিত হইয়াছে, কেবল কলার মান্দাসের কথা লিখিত হয় নাই। এখানে তাহার কিছু পরিচয় দিব।]

পূর্বে এদেশে কলার মান্দাস অর্থাৎ কলাগাছে তেলা প্রস্তুত করিয়া জলপথে যাত্রারাত চলিত। কলার মান্দাস করিতে হইলে প্রথমে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া তাহার বেলদো পর পর লাজাইয়া বাশের গজাল দিয়া আটিয়া দিতে হয়, আটিয়া দিলে দেখিতে তেলার মত হইবে। এই তেলা জলে ভাসাইয়া দিলে শীঘ্র ডুবিয়া যায় না।

মনসার ভাসান নামক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে কলার মান্দাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বাসরবারে সাপের কাঁধে বেহলার পতি মরিয়া যায়। সতী বেহলা পতি নখিলরকে

কোলে লইয়া কলার মান্দাসে চড়িয়া ভাসিয়া চলিলেন। শেষে তাঁহার গুণে পতি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। [নখিলর ও বেহলা দেখ।]

কবি কেতকানাস ও কেমানন্দ উক্ত উপাখ্যানটি রচনা করেন। এই মান্দাসে জলভ্রমণ উপলক্ষে বেহলা নানাস্থান দিয়া ভাসিয়া বান, সেই সকল স্থানের নাম প্রাচীন তৎসাহ-সন্ধিৎসুদিগের আবৃত্তক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

“নানারূপ বন করি, বাশের গজাল মারি,

সাজাইল কলার মান্দাস।

কলার মান্দাস ভাসে পান্ডের জলে।

বেহলা ভাসিয়া যায় কাঁড় লৈয়া কোলে।

মনসা কুপার যায় মনের নিঃসঙ্গে।

চাপাতলা এড়াইয়া গেল কুত্তরবন্দে।

ত্রিদিন বেহলা ভাসে দুবরাজপুর।

নবখণ্ড এড়াইয়া গেল বহুদূর।

প্রাণহীন খারী তার কোলে নখিলর।

ভাসিয়া ভাসিয়া পাইল ঝাঁক দামোদর।

ওখাটি গোবিন্দপুর বর্ধমান ভাসে।

আলো গঙ্গাপুরে বেহলা উত্তরিল আসে।

বিবহরি বিনোদিনী মারা কৈল তার।

গঙ্গাপুরে বেহলার মান্দাস এলার।

বাশের গজাল যত তাহা গেল ছেড়ে।

বান বান হৈরা ভাসে যত কলা বড়ে।

বেহলা করেন স্তব মনসার তরে।

মান্দাস লাগিল ঘোড়া ঈশ্বরীর ঘরে।

আলো গঙ্গাপুরে বান করিয়া পন্ডাৎ।

দেপুর্বে মান্দাস ভাসে রজনী প্রভাত।

অবিরত নেত্রজল নিবারিতে নারী।

নোরাদার ঘাটে ভাসে বেহলা হুন্দরী।

মুখরী বিবহরি কেউয়ার কমলা।

তিন দিন তাঁর পূজা করিল বেহলা।

কেউয়ার করিয়া পূজা জগাতি কমলা।

ভাসিয়া আশমপুরে হুন্দরী বেহলা।

গোদাঘাটা পন্ডাৎ করিয়া সীমন্তিনী।

জলেতে ভাসিয়া যায় দিবস রজনী।

ভাসিয়া কুজুরঘাটা বেহলা হুন্দরী।

সেই ঘাটে দান সাধে ঘাটের জগাতি।

অবিরত মনে কত গণিল হতাপ।

বোয়ালিয়া ঘরে ভাসে কলার মান্দাস।

বোয়াল হাড়িয়া গেল মান্দাসের পাশ।

হাসনঘাটেতে বখা হাসনের ঘাট।

প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেলডাঙ্গার।

কলার মান্দাস চাপি আইল তখার।

বৈদ্যপুর ভাসিয়া পাইল শিড়তলী।

গহরপুর ভাসিয়া গঙ্গার জলে দিলি।

তিন দিনে ত্রিবেণী ত্রিধারা বখা বহে।

তখার বেহলা আইল কেমানন্দ কহে ॥”

কলাই (দেশজ) কলার শব্দের অপভ্রংশ হইলেও ইহার অর্থ-ভেদ বটিকাছে। সংস্কৃত ভাষার ঘটকে কলার কহে, বাঙ্গালার কলাই শব্দ মায় অর্থাৎ মায় কলাই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কলাই (আরব্য শব্দ) পাখাদি টিন অথবা অপর কোন খাতু দিয়া মোড়া।

কলাইকর। কলাইয়ের কার্য যে করে।

কলাকন্দ (দেশজ) কীরের অর্ধাৎ বরকীর মিষ্টান-বিশেষ।

কলাকর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Unona longiflora) অশোকের মত দেখিতে একপ্রকার সুন্দর গাছ। বাঙ্গালার কোল কোন স্থানে দেখদারী, তামিলে অশোকেশ্বরম বা খেবথর বলে। দক্ষিণ দেশে এখানকার মত অশোক গাছ বড় একটা জন্মানা, সেখানকার লোকেরা ইহাকেই অশোক বলিয়া মনে করে। এই সুন্দর গাছ ভারতবর্ষ ও বব্বীপে জন্মে। মাল্যাজ প্রদেশেই কিছু অধিক।

কলাকুশল (ত্রি) কলায় গীতাদিচতুষ্টিকলাবিষয়ে কুশল: নিপুণ: ৭৩২। গীতাদি চৌষট্ঠিকলায় সুনিপুণ।

কলাকুল (কৌ) কলায় মাত্রায়া আকুল্যতি, কল-আকুলি নামধাতো:—অচ্। বিব, হলহল।

কলাকেলি (পুং) কলাভি: কেলি: বিলাসো যত, বহত্ৰী। কলায় কেলিযত্ বা। কন্দর্প।

কলাক্ষেত্র। কামরূপস্থ একটি প্রাচীন ভীর্ণস্থান। (যোগিনীতন্ত্র)

কলাঙ্গর (পুং) ১ সারসপাখী। ২ চৌরশাস্ত্রপ্রবর্তক কর্ণাহত। ৩ কংসাসুর।

কলাচিকা (স্ত্রী) কলায় অচতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি বা, কলা-অচ-অণ্ স্বার্থে কন্-টাপ-অত ইতন্। প্রকোষ্ঠ, কণ্ডের পর হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত হস্তভাগের নাম প্রকোষ্ঠ।

(অধস্তন) মণিবন্ধান্ত্র প্রকোষ্ঠ: কলাচিকা। (হেম ৩২৫৪।)

কলাচী (স্ত্রী) কলায় অচতি, কলা-অচ-অণ্-ভীষ্। কলাচিকা।

কলাচীন (পুং, স্ত্রী) কর্কাটনামক পক্ষিবিশেষ।

কলাজাজী (স্ত্রী) কলায় জায়তে, কলা-জন্-ড-টাপ্, কলাজা-সত্যী আজায়তে, কলাজ-আ-জন্-ড-ভীষ্। কলোজা নামক বৃক্ষ-বিশেষ; পাশ্চাত্যভাষায় ইহাকে 'মঙ্গেরলা' কহে।

কলাদ (পুং) কলায় গৃহস্থদত্তবর্ণাদীনাং অংশঃ আদতে গৃহাতি, কলা-আ-দা-ক। স্বর্ণকার, সেকরা।

কলাদক (পুং) কলায় গৃহস্থদত্তবর্ণাদীনাং অংশঃ অতি গোপয়তি, কলা-অদ-ধূল্ (ধূল্ ততো। পা ৩।১। ১৩৩।) স্বর্ণকার।

কলাঙ্গি। বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণ বিভাগের একটি জেলা। এখন বিজাপুর জেলা নামে চলিত হইতেছে।

এই জেলার উত্তরাংশে ভীমানী বিজাপুরের পার্শ্ব দিয়া উন্নীত হইয়াছে, তদ্বারা শোলাপুর জেলা এবং অকালকোট

রাজ্য বিজাপুর হইতে পৃথক হইয়াছে। দক্ষিণে মালপ্রাভা নদী, পূর্বে ও দক্ষিণপূর্বে নিজামরাজ্য, পশ্চিমে মুখোল রাজ্য, লামখণ্ডী ও জাঠ। অক্ষা° ১৫° ৫০' হইতে ১৭° ২৭' উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩১' হইতে ৭৬° ৩১' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণকল ৫৭৫৭ বর্গমাইল।

এই স্থান প্রাচীন দণ্ডকারণের অন্তর্গত। এখানকার নির্জন অরণ্যমধ্যে ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অনেক জিনিস দেখিবার আছে। নিবিড় বন্যরাজী মধ্যেও অপূর্ণ প্রস্তররচিত পৌরাণিক দৃষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে, কে সেই সকলের নির্মাতা তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এই জেলার অন্তর্গত ঐন্দলী, বাদামি, বাগলকোট, ধুলখেন্দ, গলগলি, হিপগী এবং মহাকুট নামক স্থানই প্রধান, ঐ সকল স্থানকে এ অঞ্চলের লোকেরা পুণ্যভীর্থ বলিয়া মনে করেন। দেব, ঋষি ও সিদ্ধগণের লীলা প্রসঙ্গে ঐ সকল স্থানের মাহাত্ম্য স্মৃতিত হইয়াছে। [বাদামি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বন কাটিয়া কবে এখানে বসতি হইল, তাহা ঠিক করা কঠিন। তবে অতি পূর্বকালে এখানে নগর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে টেলমৌ এখানকার বাদামি, কলকেরি ও ইন্দ্র নামক নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদামি নামক স্থানটি অতি প্রাচীন, পল্লবরাজগণ এখানে হর্ডেন্ড্য দুর্গ নির্মাণ করিয়া নিরাপদে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্যরাজ পুলিকেশী (১ম) পল্লবদিগকে তাড়াইয়া বাদামি অধিকার করেন। পুলিকেশীর পর চালুক্যরাজগণ ৭৬০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে রাষ্ট্রকূট রাজগণ এই স্থান আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটবংশের অধঃপতন হইলে কলচুরি ও হয়শাল-বল্লালবংশের রাজ্যকাল আরম্ভ হয়। তাহার ৯৭৩ হইতে ১১২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া যান। অনন্তর দেবগিরির যাদব রাজগণ অধিকার করিয়া লইলেন। তৎকালে দেবগিরি (বর্তমান দৌলতাবাদ) নগরে যাদবরাজগণের রাজধানী ছিল। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন দেবগিরি আক্রমণ করেন। তখন যাদববংশীর রামচন্দ্র দেবগিরির রাজা। তিনি মুসলমানের আক্রমণে এককালে নিঃস্ব হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন। খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৃক্ষ আদিল শাহ দক্ষিণাংশে এক প্রাচীন রাজ্য স্থাপন করেন, বিজাপুরে তাহার রাজধানী হইল। [বিজাপুর দেখ।]

পূর্বে এখানে অনেক বৌদ্ধত্ব ছিল, চীনপরিব্রাজক

হিউএন্সিয়াং আসিয়া সেই সকল দর্শন করিয়া যান, তখন এই রাজ্য ৬০০০ লি (প্রায় সাড়ে চারিশত ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল।

এই জেলায় ভীমা, কুকা, ধোন, ঘাটপ্রভা এবং মাল-প্রভা নামে নদী প্রবাহিত, এ ছাড়া আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র প্রোতপত্তী আছে। ধোননদীর জল বেজায় নোনতা, কিন্তু অপর নদীর জল সুখমিষ্ট।

এখানে লৌহ, স্ট্রো, কালপাথর, চূণ-পাথর, লাল বেলে পাথর প্রভৃতি খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হয়।

এখানে জোয়ার, বাজরা, গম এবং কার্পাস বেশ জন্মে। এরও, তিসি, তিল ও কুম্ম প্রচুর উৎপন্ন হয়। বসন্তাগমে স্বর্ণাকার কুম্মফুল ফুটিয়া উঠে, তখন এখানকার শোভা দেখে কে?

এখানকার বন জঙ্গলে বাঘ, শূকর, হরিণ, নেকড়েবাঘ ও শিয়াল দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানকার আবহাওয়া নেহাত মন্দ নয়। তবে যথাকালে বৃষ্টি না হওয়ায় সময়ে সময়ে ভাল শস্য জন্মে না, তাহাতে হুভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। দক্ষিণাপথে ১৩৯৬-১৪০৬ খৃষ্টাব্দে, এই বহুবর্ষব্যাপী দারুণ হুভিক্ষ হয়, সেই সময়ে এই জেলা এক-কালে উৎসন্ন হইয়াছিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দেও আর একবার ভয়ঙ্কর হুভিক্ষ হয়। এই সময়ে ১/২ সের জোয়ার ও বাজ-রার দাম ১ টাকা হইয়াছিল। এইরূপে ১৮১৮-১৯, ১৮২৪-২৫, ১৮৩৩, ১৮৫৪, ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালে বৃষ্টির অভাবে হুভিক্ষের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। এই সময়ে টাকার সাড়ে চারি সেরের অধিক জোয়ার কি বাজরা পাওয়া যাইত না। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের হুভিক্ষই প্রধান। সে সময়ের কথা মনে করিলে বুক কাটিয়া যায়। কতশত নরনারী অরাভাবে ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সেই হুভিক্ষকে এ অঞ্চলের লোকেরা কঙ্কালরূপী মহামারী বলিয়া থাকে। বাস্তবিক সেই অকালমৃত অসংখ্য নর-নারীর কঙ্কাল ভূগর্ভে খননকালে এখনও পাওয়া যায়।

এই জেলায় ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কোলি, কুণরী, বেরদ, মালকের, কোটি, কুস্তকার, লোহকার, স্বর্ণকার, চর্মকার, সূত্রধার, তৈলকার, ভাণ্ডারী, দর্জি, ধানভ, ধোপা, হজাম, জন্ম, লিঙ্গায়ত, পঞ্চমশালি, রকী ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। লোকসংখ্যা ৬০৮৪৯৩।

কলাধর (পুং) কলা: ধরতি, কলা-ধ-অচ। ১ চত্ব। ২ চত্ব: বটিকলাভিজ ব্যক্তি। ৩ পি।

কলাধিক (পুং) কুকুট।

কলানি (দেশজ) যোগকরা, গটান।

কলানক (পুং) একজন শিবের অম্বচর।

কলানাথ (পুং) গন্ধর্ব্ববিশেষ, ইনি সোমেশ্বরের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কলানিধি (পুং) কলা: নিধীয়ন্তেহ্মিন্, কলা-নি-ধা-কি। ১ চত্ব। ২ চৌষট্ঠিকলাভিজ ব্যক্তি।

কলাসুনাঙ্গী [ন] (পুং) কলা অহুনদতি, কলা-অহু-নদ-গিনি। ১ শব্দ করিতে করিতে গমনকারী। ২ ভ্রমর। ৩ কলবিজ। ৪ চটক, চড়ুই। ৫ কপিজল। ৬ চাতক।

(কলাসুনাঙ্গী রোলবে কলবিজ কপিজলে। মেদিনী।)

কলাস্তুর (ক্লী) অস্তা কলা অংশ:, সূপ্-সুপেতি সমাস:। ১ লাভবুদ্ধি, জ্ঞান। (বুদ্ধি: কলাস্তুরমূণং ভূদ্বার: পর্য্যদক্ষনম্। হেম ৩। ৫৪৫।) ২ চন্দ্রের অস্তকলা।

(“পুণ্যোষ লাভ্যাময়ান্ বিশেষান্

জ্যোৎস্নাস্তরাণীব কলাস্তরানি ॥” কুমার। ১। ২৫।)

কলাস্তাস (পুং) কলানাং স্তাস:, ৬তৎ। তত্ত্বোক্ত স্তাস-বিশেষ। তত্ত্বগারে লিখিত আছে,—শিষ্যশরীরে কলাস্তাস করিবে; পাদতল হইতে জাহ পর্য্যন্ত ‘ও’ নিরুত্তো নমঃ’, জাহ হইতে নাভি পর্য্যন্ত ‘ও’ প্রতিষ্ঠায়ে নমঃ’ নাভি হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ‘ও’ বিদ্যায়ৈ নমঃ’, কণ্ঠ হইতে ললাটদেশ পর্য্যন্ত ‘ও’ শাস্ত্রায়ৈ নমঃ’, ললাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ‘ও’ শাস্ত্রতীতায়ৈ নমঃ’, এই মন্ত্র ধারা স্তাস করিয়া, পুনর্ব্বার ঐ সকল মন্ত্র ধারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পাদতল পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

কলাপ (পুং) কলাং মাত্রাং আপ্রোতি, কলা-আপ্-অপ্- (কর্ম্মণ্যপ্। পা ৩। ২। ১।) কলা আপ্রোতে অনেন, কলা-আপ-ব-এ বা (হলচ। পা ৩। ৩। ১২১।) ১ সমূহ। ২ ময়ূর-পুচ্ছ। ৩ মেখলা, চন্দ্রহার। ৪ অলঙ্কার।

(“কণ্ঠস্ত তস্তা: স্তনবন্ধুরস্ত

মুক্তাকলাপস্ত চ নিস্তলস্ত ॥” কুমার।)

৫ তুণ। ৬ চন্দ্র। ৭ চত্বর। ৮ ব্যাকরণবিশেষ। কলাপ-ব্যাকরণের অপর নাম কুমার ও কান্তর।

কলাপচন্দ্র নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই ব্যাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

“রাজা শালিবাহন কোন মহিষীর সঙ্গে জলক্রীড়া করিতে-ছিলেন। জলসিকনে সেই রাণী রতিরসে আত্ম-হার্য হইয়া রাজাকে বলিলেন,—“মোদকং দেহি দেব!” অর্থাৎ হে দেব! আমাকে উদক (জল) দিও না। দুর্ভাবশতঃ রাজা সেই স্বরঘটিত পদ বুদ্ধিতে না পারিয়া রাণীকে একট

মৌসিক (মোয়া) প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই বুদ্ধিমত্তী রাণী 'আমার পতি রাজা হইলেও মূর্থ' এই বলিয়া নিন্দা করিলেন। শালিবাহন ভাৰ্য্যার সমুদয় কথা শুক শৰ্ৰবৰ্ণ্যার কাছে জানাইলেন। তখন শৰ্ৰবৰ্ণ্যা তাঁহার শিকার জন্ত কাতন্ত্র রচনা করিলেন।*

কাতন্ত্র বা কলাপ রচনা সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তি আছে— 'শৰ্ৰবৰ্ণ্য শালিবাহনকে ব্যাংগল করিতে প্রতিক্রমিত হইয়া কুমারের আরাধনা করেন। তখন ভগবান্ কান্তিকেশ্ব তাঁহার আরাধনার প্রীত হইয়া নিজ ব্যাকরণ-জ্ঞান আবির্ভাবের নিমিত্ত 'সিন্ধো বর্ণসমারায়ঃ' এই পদ্যপাদরূপে স্তম্ভ শৰ্ৰবৰ্ণ্যাকে প্রদান করেন। শৰ্ৰবৰ্ণ্য তাহাই অবলম্বন করিয়া কলাপ প্রণয়ন করেন। কুমার হইতে ব্যাকরণের প্রথম স্তম্ভ প্রাপ্ত হওয়ার, ইহার একটি নাম 'কুমার ব্যাকরণ'।

আর একটি কিম্বদন্তি আছে, তাহা এই— 'যখন শৰ্ৰবৰ্ণ্য শালিবাহনের নিকট প্রতিক্রিয়া করিয়া কুমারের আরাধনা করেন, তখন কুমার যে ময়ূরটিতে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হন, শৰ্ৰবৰ্ণ্য দেখিলেন, সেই ময়ূরের কলাপদেশে 'সিন্ধো বর্ণসমারায়ঃ' এই স্তম্ভটি লেখা রহিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র তাঁহার মনে পূর্ণ ব্যাকরণ-জ্ঞান উদ্ভিত হইল।

তিনি সেই স্তম্ভটি প্রথমে রাখিয়া স্তম্ভ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। ময়ূরের কলাপে ইহার প্রথম স্তম্ভ লিখিত থাকায় এই ব্যাকরণের কলাপ নাম হয়।

কলাপের টীকাকারগণের মতে শৰ্ৰবৰ্ণ্য ঈষৎ তল্পে অৰ্থাৎ অল্পস্তম্ভে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, এই জন্ত ইহার নাম হইল কাতন্ত্র*।

বঙ্গদেশে কলাপ নামই প্রচলিত। পূৰ্ণবঙ্গের পণ্ডিতমাজ্জি প্রায় কলাপব্যবসারী। বৈরাচরণগণ পাণিনির পরই ইহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। বাস্তবিক কেবল এই ব্যাকরণ খানি আন্যোপাস্ত মনোযোগপূৰ্ণক পড়িয়া পণ্ডিতপদবাচ্য হওয়া যায়।

* (১) "কাতন্ত্রতেতি তত্রি কুটুম্বধায়ে চুদাদিবিপত্তঃ। তত্র্যন্তে ব্যাংগায়ন্তে শব্দা অনেনেতি স্বরবৃদ্ধিস্বীহাম্ [কলাঃ ৪। ৫। ৪০] ইতি করণেন্দ্ৰ প্রত্যয়ঃ। স চানেকাৰ্ণাভাতুমাং ব্যাংগানেন্দ্ৰপি বৰ্ততে। তেন তত্রমিহ স্তম্ভচ্যুতে। ঈষত্তম্ভ কাতন্ত্রম্। কুশলন্ত তন্ত্রশব্দে পরে। কা ঈষদৰ্থে হক ইতি ঈষদৰ্থে কাদেশঃ" ত্রিলোচনকৃত কাতন্ত্রপঞ্জিকা। (২) "ঈষত্তম্ভ কাতন্ত্রম্। ঈষদন্তোৎসার্যবাচকঃ। কবিরায় ও কাতন্ত্রচঞ্জিকা।

শৰ্ৰবৰ্ণ্য কলাপের সন্ধি, চতুর্ভূত এবং অখ্যাত এই অংশ-ত্রয়ের স্তম্ভ রচনা করেন। তিনি কৃত্ত্বস্তম্ভ প্রণয়ন করেন নাই। কাত্যায়ন কৃত্ত্বস্তম্ভের প্রণেতা।

হর্গসিংহ কলাপের বৃত্তি রচনা করেন। তাঁহার বৃত্তি না হইলে বোধ হয় কলাপব্যাকরণ সম্পূর্ণ ও সাধারণের সুবোধগম্য হইত না। বাস্তবিক হর্গসিংহ নিজবৃত্তিতে বেরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। [হর্গসিংহ দেখ]

এতদ্ব্যতীত কলাপের অনেকগুলি টীকা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে শ্রীপতিরচিত কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা, ত্রিলোচনকৃত পঞ্জিকা, কবিরাজকৃত কলাপবৃত্তিটীকা, হরিরামকৃত ব্যাখ্যাধার, রঘুনাথশিরোমণির ব্যাখ্যা; কাতন্ত্রচঞ্জিকা ও লঘুবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকখানিই প্রসিদ্ধ।

৯ গ্রামবিশেষ; (ভাগবত ৯। ১২। ৬)। ১০ অস্ত্রবিশেষ; (ভারত ৪। ৫। ২৮।) ১১ বাণ। ১২ ধনু। ১৩ ব্যাপার।

"দবদহনজালা কলাপায়তে।" সাহিত্যদর্পণঃ ১০ প।)

কলাপক (পুং) কলাপ-সংজ্ঞারং কন্। ১ হস্তীর গলবন্ধ। ২ (স্বার্থে কন্) কলাপ। ৩ (স্ত্রী) যমিন্ কালে ময়ূরঃ কলাপিনো ভবন্তি, স কলাপী, তন্মিন্ কালে দেয়ঃ ঋণম্, কলাপিন্-বুন (কলাপাখ্যববুদুনাহুন। পা ৪। ৩। ৪৮।) ঋণবিশেষ। ৪ কবিতাবিশেষ, চারিটি কবিতা একত্র যুক্ত হইলে তাহাকে কলাপক কহে।

"ছন্দোবন্ধগদ্য পদ্যং তেনৈকেন চ মুক্তকং।

ছাত্ত্যজ যুগ্মকং সন্দানিতকং ত্রিভিরিবাতে।

কলাপকং চতুর্ভিঃ পঞ্চভিঃ কুলকং মতম্।"

(সাহিত্য দং ৬। ৫৫৮।)

সন্দানিতকের নামান্তর বিশেষক; গ্রহান্তরে "ত্রিভিঃ স্তোকেবিশেষকম্।" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

কলাপগ্রাম (পুং) কলাপনামকো গ্রামঃ মধ্যলো। গ্রাম-বিশেষ, হিমালয়ের উত্তরে এই গ্রাম বলিয়া মহাভারতে কথিত আছে। ("হিমবন্তমতিক্রম্য কলাপগ্রামমাবিধৎ।" ২ যশোরস্থ গ্রামবিশেষ। (ত' ব্রহ্মণঃ ১১। ২১)

কলাপচন্দ্র (পুং) ২৪ নল সূতার গহনা।

কলাপতত্ত্বার্গব (পুং) কলাপব্যাকরণের মতানুসারী গ্রন্থ-বিশেষ।

কলাপদ্বীপ (পুং) কলাপঃ তন্মামকো গ্রামঃ দ্বীপ ইব, উপনি কলাপগ্রাম।

কলাপশিরা [ন] (পুং) মূনিবিশেষ।

কলাপানুসারী [ন] (পুং) কলাপব্যাকরণের মতানুসারী।

কলাপিনী (স্ত্রী) কলাপচন্দ্র: জ্যোতিষ, কলাপ-ইনি-ভীপ।
১ রাজি। ২ নাগরমুখা।

কলাপী [ন] (পুং) কলাপোহিত্যজ, কলাপ-ইনি। ১ অরুখ
গাছ। ২ মধুর। ৩ কোকিল। ৪ তৃণবাণাদিধারী। ৫ কলাপ-
ব্যাকরণধারী। ৬ বৈশম্পায়নের ছাত্রবিশেষ।

কলাপূর (পুং স্ত্রী) বাণ্যবস্ত্রবিশেষ।

কলাপূর্ণ (পুং) কলাতি: পূর্ণ: ৩৩৭। ১ চন্দ্র। ২ চৌষটি
কলার অভিজ্ঞ। ৩ অংশমাত্রের পরিপূর্ণ।

(“সদা ভবানু কালগনন্ত গুণৈরশ্বান বিকথতে।

ন চাক্ষু: কলাপূর্ণো মম দুর্যোধনস্ত বা।”

ভারত ৪। ৩৭। ১৩।)

কলাভূৎ (পুং) কলাং বিভক্তি, কলা-ভূ-কিপ্তৃগাগমস্ত।
১ চন্দ্র। ২ (ত্রি) গীতাদিকলাভিজ্ঞ।

কলামক (পুং) কলাম-কনি, পুষোদরাদিষাং সাধু:। কলাম
ধাতু। [কলাম দেখ।]

(শালয়: কলামায়া: হ্রা: কলামস্ত কলামক:। হেম ৪। ২৪৫।)

কলামোচা (দেশজ) ধাতুবিশেষ। (Andropogon laxum)
কলাম্বিকা (স্ত্রী) কলা অর্থ: বিকায়তে প্রযুক্ত্যতে অতাম্।
কলা-বিকৈ-ক টাপ্; পুষোদরাদিষাং মুম্। ১ শ্রগদান,
ধার দেওয়া।

কলায় (পুং) কলাং অয়তে, কলা-অয়-অণ্ (কর্ণগ্যণ্। পা ৩।
২। ১।) মটর; ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সতীলক, হরপু,
খণ্ডিক, ত্রিগুট, অতিবর্জল, সুগুণক, শমন, নীলক, কণ্টী,
সতীল, হরপুংক, সতীন ও সতীনক। ভাবপ্রকাশের মতে
ইহার গুণ,—মধুর রস, পাকে মধুর, কক ও বায়ুঘর্জক।

ইহার শাকের গুণ,—ঈষৎ কষায়কৃত্ত মধুর রস, কক,
ভেদক ও বায়ুপ্রকোপক। (রাজনির্ঘণ্ট)।

(“বিকসৎকলায়কুস্থাসিতজ্যতে:।” মাধ।)

কলায়থঞ্জ (পুং) বাতব্যাদিবিশেষ; ভাবপ্রকাশোক ইহার
লক্ষণ,—

“কম্পাতে গমনারম্ভে ধঞ্জরিষ চ লক্ষ্যতে।

কলায়থঞ্জ: তং বিদ্যাভুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্॥”

প্রথম পদক্ষেপের সময় সমস্ত শরীর কম্পিত হইয়া
খঞ্জের দ্বারা গমন করিলে, তাহাকে ‘কলায়থঞ্জ’ কহে।

খঞ্জ ও পঙ্গুরোগের দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিবে। সেহ
কিঙ্গ ইহাতে বিশেষ কর্তব্য।

কলায়ন (পুং) কলানাং হৃত্যগীতাদীনাং অরনং প্রোত্তির্বজ,
বহতী। মর্জক।

কলায়া (স্ত্রী) কলায়-টাপ্। গণ্ডহরী। [গণ্ডহরী দেখ।]

কলালাপ (পুং) কলাং মধুরাক্টং আলগতি, কলা-আলপ-
অণ্ (কর্ণগ্যণ্। পা ৩। ২। ১।) ১ জ্বর। ২ (কর্ণধা)
মধুর আলাপ। ৩ (ত্রি) মধুর আলাপকারী।

কলাবট (দেশজ) নবপত্রিকা। দুর্গাপূজার প্রথম দিন
পূর্নাহ্নে এই নবপত্রিকা বজ্রাঘাতের দ্বারা ভূষিত করিয়া গৃহ
প্রবেশপূর্বক অর্চনা করা হয়। ইহাতে কদলী প্রভৃতি ৯টি
পত্র থাকে। প্রত্যেক পত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বতন্ত্র।
কদলীর অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, হরিজার দুর্গা, খাভের লক্ষী,
কচুর কালিকা, মানকচুর চামুণ্ডা, জয়ন্তীর কার্তিকী, দাড়ি-
মের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা ও বিহের শিবা।
পূজাকালে প্রত্যেক দেবীর স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়। এই
নবপত্রিকা মধুর দ্বারা বজ্রাঘাতিত থাকে বলিয়া সাধারণে
ইহাকে ‘কলাবট’ বলিয়া থাকে। অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ
ইহাকে গণেশের পত্নী বলিয়া জানে; কিন্তু তাহা নিতান্ত
ভ্রান্তিমূলক।

কলাবৎ (দেশজ) কালোরাং, সজীভশাভজ্ঞ।

কলাবতী (স্ত্রী) কলা: সজীভাদয়: সন্তি অতাম্, বহতী;
কলা-মতৃপ্-মস্ত বঃ-ভীপ। ১ তুফল নামক গন্ধর্বের বীণা।

(নারদস্ত তু মহতী গণনাং প্রভাবতী।

বিষাবসোস্ত বৃহতী তু বুরোস্ত কলাবতী॥ হেম ২। ২০৩।)

২ ঋষিল রাজার পত্নী। ৩ রক্ষিকার মাতা। ৪ অপ্সরো-
বিশেষ। ৫ গজা। (“কুটুহা করুণা কাতা কুর্ধ্যানো কলাবতী।”

কাশী ২২। ৪৭।)

৬ দীক্ষাবিশেষ। তন্ত্রমতে ইহার নিয়ম এইরূপ লিখিত
আছে,—শিষ্য উপবাস করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক
প্রথমে স্বস্তিবাচন সহ সঙ্কল্প করিবে, ওক আচমন করিয়া
প্রথমে দ্বারদেশে সামান্ত অর্ঘ্যদানপূর্বক দ্বার পূজা করি-
বেন। তৎপরে দক্ষিণপদ অঙ্গেরপূর্বক দ্বারের বাম পাখা
স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণপদ সঙ্কোচপূর্বক মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ
করিয়া, নৈঋত দিকে বামপদ ও ব্রহ্মার পূজা করিবেন
এবং দেয় স্তম্ভ দ্বারা ও দিবাষ্ট্র অবলোকন দ্বারা দিবা
নির, অস্তমস্ত ও জল দ্বারা অন্তরীক্ষস্থ বিদ্র ও বায়ুশক্তির
আধাত দ্বারা ভৌম কিং উৎসারণ পূর্বক তত্বাদি ত্রয় অস্ত্র
মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিবেন। তৎ-
পরে আসনগুহি, বৃত্তিক কর্ণ, বিদ্রোৎসারণ, পঞ্চগব্য
প্রভৃতির দ্বারা মণ্ডপশোধন করিয়া, দক্ষিণে পূজাদ্রব্য,
বামে স্থবাসিত জলপূর্ণ কুম্ভ, পৃষ্ঠদেশে হস্ত প্রক্ষালনের জন্য
একটি পাত্র রাখিতে হইবে। সন্ধ্যাদিকে স্তম্ভের প্রাচীর
আলিয়া পুটাজল পূর্বক, বামদিকে ওক পঞ্চমস্তক ও পরাগর

দক্ষিণে গণেশ ও মধ্যে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে। অত্র মন্ত্র ও পদ্ম পুষ্পের দ্বারা করম্বর সংশোধন করিয়া, উর্দ্ধ উর্দ্ধ দিকে তিনটি তালি, ও কুড়িবারা দশদিক্ বন্ধন করিয়া, এবং বহি, বীজ ও জলদ্বারা দ্বারা-বহি প্রাকার চিত্তা করিয়া কৃত্তিক করিতে হইবে। তৎপরে মাতৃকামন্ত্র, প্রাণায়াম, পীঠভঙ্গ, ঋষ্যাদিভঙ্গ ও মন্ত্রভঙ্গ; তাহার পর মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ধ্যান, মানসপূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন; তৎপরে অর্ঘ্যপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্শীপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, সেই জলদ্বারা আত্মা ও পূজোপকরণ মূলমন্ত্র সহ তিনবার দিক্তি করিয়া, পীঠমন্ত্রের দ্বারা শরীরে ঋষ্যাদির পূজা করিতে হইবে। তৎপরে জ্বপমন্ত্রের পূর্বাদি কেশরে পীঠশক্তির পূজা করিয়া মধ্যে পীঠপূজা করিবে। জ্বপের মূল দেবতার পূজা নৈবেদ্য ব্যতীত কেবল গন্ধাদি দ্বারা করিতে হইবে। তাহার পর মন্তক, জনর, মৃগাদার ও পদ প্রভৃতি সর্বত্র মূলমন্ত্র দ্বারা পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, বখাশক্তি মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমাপন করিবে।

এই সমস্ত কার্য প্রোক্শীপাত্রে জলদ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। তৎপরে প্রোক্শীপাত্র জল পরিবর্তন করিয়া, বহিঃ পূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমে শারদোক্ত সর্বতোভক্ত মণ্ডলাদির অন্ততম মণ্ডল বিধান করিয়া, তাহাতে ঘট স্থাপন করিবে। মণ্ডলপূজার পর, কর্ণিকা ধাতুপূর্ণ করিয়া, তাহার উপর ততুল বিভাস, তাহার উপর কুশ বিভাসপূর্বক আতপততুল সংযুক্ত কুশান বিভাস করিবে। তৎপরে মণ্ডলে পীঠোক্ত দেবতার পূজা এবং প্রাক্শিপ্যের দ্বারা বহির দশকলা বিভাস করিয়া পূজা করিতে হইবে। তৎপরে ঋষ্যাদিচিত্ত কৃত্ত অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা প্রকালিত চন্দন অঙ্কুর ও কপূর দ্বারা ধূপিত এবং ত্রিগুণ হুত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া কুস্তের পূজা করিবে, ও তাহাতে বিষ্টর, আতপততুল ও নবরস প্রক্ষেপ করিয়া, প্রণব উচ্চারণপূর্বক কৃত্ত ও পীঠের একত্ব চিত্তা করিয়া পীঠস্থাপন করিতে হইবে। ঐ কুস্তের চারিদিকে বেরিয়া সূর্য্যের দ্বাদশকলা স্থাপনপূর্বক পূজা করিবে।

তৎপরে আত্মভেদে মাতৃকামন্ত্র প্রতিলোমভাবে জপ করিয়া, দেবতা বুদ্ধিতে বটাদিবৃক্ষের কবর দ্বারা, কিম্বা পলাশ বকলের কবর দ্বারা, ভীৰ্জলের দ্বারা অথবা স্থাপিত জলের দ্বারা, কৃত্ত পূর্ণ করিবে। চক্রে অমৃতাদি বোড়শ কলা প্রাক্শিপ্যের দ্বারা জলে চিত্তা এবং মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া এবং একটি শব্দ বটাদিবৃক্ষের কবর প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ ও অষ্ট গজদ্বার দ্বারা বিলোড়িত করিয়া, তাহাতে সকল কলার আদ্যহসপূর্বক পূজা করিবে।

প্রথমেই অধির দশকলা পূজা করিতে হইবে; মূলমন্ত্রের প্রতিলোমভাবে জপ ও মনে মনে মন্ত্রদেবতার ধ্যান করিয়া তাহাদিগের ঐশ প্রতীতিপূর্বক প্রত্যেকের পূজা করিতে হয়। তৎপরে সূর্য্যের ত্রিশতাবি দ্বাদশকলা ও চক্রে অমৃতাদি বোড়শকলার আবাহনাদি করিয়া প্রত্যেকের পূজা করিবে। পরিশেষে গন্ধাশকলার পূজা করিতে হয়। হুট্টাদি ক ও চব্বিগ দশকলা, জয়াদি ট ও তব্বিগ দশকলা, তীক্ষাদি প ও বব্বিগ দশকলা, পীতাদি যব্বিগ দশকলা ও নিম্বাদি অবব্বিগ বোড়শকলার পূজা করিবে; সমর্থ হইলে প্রত্যেককে আবাহন করিয়া পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করা উচিত। তৎপরে কলাময় ঐ শব্দ কথ কৃত্তে নিক্ষেপ করিবে। ঐ কৃত্তমুখ অথবা, পনস ও অস্ত্র গব্ব ইজবরী বেষ্টিত করিয়া কল্লব্বকৃদ্ধিতে তাহা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, এবং কল্লব্বকল বুদ্ধিতে ঐ মুখের উপর কল, আতপ ও চসক স্থাপন করিবে। তাহার পর নির্ঘল পট্টবস্ত্রের দ্বারা কৃত্তবেটন করিয়া এবং মূলমন্ত্রের দ্বারা কৃত্তে মুক্তি কলন করিয়া, যথোক্তরূপ দেবতার ধ্যানপূর্বক তাহার আবাহনাদি সহকারে পূজা করিতে হইবে। দেবতার অঙ্গে অলভঙ্গ, মেঘমুদ্রা ও পরমীকরণমুদ্রা প্রদর্শন, ঐশপ্রতীতি এবং বোড়শোপচারে পূজা সমাপন হইলে ১০০৮ বা ১০৮ জপ করিবে।

অতঃপর মন্ত্রের দশসংখ্যার সমাপন করিয়া গুরু শিষ্যের নেত্রময় মন্ত্র ও বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিবেন এবং পুষ্প দ্বারা তাহার অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া স্বয়ং মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবতার শ্রীতির জন্ত কলসে ঐ পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করাইবেন। তৎপরে মেত্রবন্ধন খুলিয়া শিষ্যকে কুশানসে উপবেশন করাইয়া, স্বকৃত পূজাক্রমামুসারে তৃত্তকাদি বিধান করিয়া শিষ্যদেহে সেই সেই মন্ত্রোক্ত ভাস করিবেন। কৃত্তহ দেবতাকে গন্ধোপচারে পূনরী পূজা করিয়া, অলঙ্কৃত শিষ্যকে অস্ত্র আসনে উপবেশন করাইবেন, এবং ঐ কৃত্তমুখ কল্লব্বকল গব্ব পল্লব সকল শিষ্যের মস্তকে রাখিয়া, মনে মনে মাতৃকা জপপূর্বক বশিষ্ঠসংহিতোক্ত অভিব্যেক মন্ত্র দ্বারা ঐ কৃত্তহ জল শিষ্যশরীরে সেচন করিবেন। শিষ্য অবশিষ্ট জলের দ্বারা আচমন করিয়া বস্ত্রের পরিবর্তনপূর্বক গুরু সমীপে উপবেশন করিবে। তৎপরে গুরু শিষ্যসংক্রান্ত ও আত্মদেবতাকে এক চিত্তা করিয়া গন্ধাদি দ্বারা তাহার পূজা করিবেন।

তৎপরে মন্ত্রের দ্বারা শিষ্যের শিষ্যবন্ধন করিয়া শিষ্য-শরীরে কলাভঙ্গ করিবেন এবং শিষ্যমস্তকে হস্ত দিয়া

১০৮ বার জপ করিয়া ‘অমুক মন্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি’ বলিয়া শিষ্যহস্তে জলদান করিবেন। শিষ্যও ‘মদম’ বলিয়া জলগ্রহণ করিবে। তখন গুরু শ্রব্যাতি যুক্ত মন্ত্র বিজ্ঞাত্তির দক্ষিণকর্ণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার, জ্বালোক ও শূদ্র হইলে বামকর্ণে তিনবার ও দক্ষিণকর্ণে একবার শ্রবণ করাইবেন। মন্ত্রগ্রহণের পর শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া থাকিবে, গুরু তাহাকে মন্ত্র দ্বারা উখিত করিবেন। উখিত হইয়া শিষ্য ঐ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে এবং কুশ তিল ও জল গ্রহণ করিয়া গুরুকে স্বর্ণখণ্ড দক্ষিণা ও দীক্ষাগ্রহণের সমস্ত সামগ্রী প্রদান করিবে। অন্যান্য ব্রাহ্মণকেও যথাশক্তি দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতে হইবে। গুরুকেও মন্ত্রদানের পর স্বীয় শক্তি রক্ষার জন্য ১০০৮ বা ১০৮ মন্ত্র জপ করিতে হয়। পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়া শিষ্যও ভোজন করিবে। যেহেতু দীক্ষাদিবসে গুরু-শিষ্য উভয়েরই উপবাস নিষিদ্ধ।

কলাবাদতন্ত্র (ক্ৰী) তন্ত্রবিশেষ।

কলাবান্ [৭] (পুং) কলাঃ সন্ত্যজ, কলা-মতৃপু মন্ত বঃ।
১ সঙ্গীতবিদ্যাবিদ, কালোয়াং। ২ চন্দ্র। ৩ (ত্রি) কলা-বিশিষ্ট।

কলাবিক (পুং) কলং আবিষ্কারতি বিশেষণ রোতি, কল-আ-বি-ক-ক। কুকুট, মোরগ।

কলাবিকল (পুং) কলয়া কামাবেশেন বিকলশঙ্কলঃ, ৩তৎ।
চটক, চড়ুইপাখী। [চটক দেখ।]

কলাবিত্তন্ত্র (ক্ৰী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কলাসারতন্ত্র (ক্ৰী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কলাহক (পুং) কলং আহতি, কল-আ-হ-ক-ড-সংজ্ঞায়াং কন্।
কাহলনামক বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

কলি (পুং) কলতে কলেরাশ্রয়েন বর্ততে, কল-ইন্ (সর্গ-ধাতুভ্য ইন্। উণ ৪। ৪১৭) ১ বহেড়া গাছ; নলরাজের নির্ঘাতন জন কলি কোন সময়ে বহেড়া গাছ অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম ‘কলি’ হইয়াছে। (বামন ২৭ অঃ।) (কলিরক্ষা বিতীতকঃ। হেম ৪। ২১১।)
২ (কলতে স্পর্ধিতে) শূর, বীর। ৩ (কলতে স্পর্ধমানা ভাবতে) বিবাদ। ৪ যুদ্ধ। ৫ (কলরতি পাপেন জড়রতি) যুগবিশেষ, চতুর্থযুগ। (কলিঃ ক্রী কলিকারং না শরাজিকলহে যুগে। মেদিনী।)

কলিপুরাণে কলিযুগের উৎপত্তিকথা এইরূপ লিখিত আছে,—

“প্রলয়াস্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মা পৃষ্ঠদেশ হইতে পাপমর

মলিন বোর অধঃপন্ন সৃষ্টি করিলেন; অধঃপন্ন তাঁহার মার্জার-লোচনা মিথ্যানারী পত্নীর গর্ভে ‘দন্ত’ নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন, দন্ত ‘মারা’ নারী বীর ভগিনী গর্ভে ‘লোভ’ নামক পুত্র ও ‘নিকৃতি’ নারী কন্যা উৎপাদন করিলেন; এই ব্রাতা ভগিনী হইতে ক্রোধের জন্ম হইল, ক্রোধের ঔরসে তাহার ভগিনী গর্ভে কলি জন্মগ্রহণ করিল, তাহার রূপ তৈলসংযুক্ত অঙ্গনের ন্যায়, মুখ করাল, জিহবা লোল, উদর কাকের ন্যায় এবং সর্বাঙ্গে পুতিগন্ধ। এইরূপ ভরানক সৃষ্টিতে বামহস্ত দ্বারা উপস্থ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিল। জন্মাবধিই কলি ক্রী, মদ্য, দূত, স্তবর্ণ প্রভৃতিতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কলির ঔরসে ভগিনী হুরুজির গর্ভে ‘ভয়’ নামক পুত্র ও ‘মৃত্যু’ নারী কন্যার উৎপত্তি হয়। (কলি ১ অঃ।)

কলিযুগের লক্ষণ—“যে সময়ে সর্বদাই মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিবাদন, শোক, মোহ, দীনতা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহার নাম কলিকাল।

এই সময়ে মানবগণ কামী ও কটুভাবী, জনপদ সকল দম্ব্যপীড়িত, বেদ সকল পায়ওদ্বিত, রাজগণ প্রজাপীড়ক, ব্রাহ্মণগণ শিশু ও উদরপরায়ণ, ব্রাহ্মণবালকগণ ব্রতশূন্য ও অগুচি, ভিক্ষুকগণ পরিবারপোষক, তপস্বিগণ গ্রামবাসী, ন্যাসিগণ অর্থলোলুপ, এবং মহুয্যামাত্রই ক্ষুদ্রকায়, অধিক-ভোজনশীল ও চৌর্য্য মারা প্রভৃতিতে সমধিক সাহসী হইবে।

এইকালে ভূত্যাগণ প্রভুত্যাগ, ও তপস্বিগণ ব্রতত্যাগ করিবে; শূদ্রগণ তপোবেশোপজীবী হইয়া প্রেতিগ্রহ লইবে, মহুয্যামাত্রই উষিধ, অনলকার ও পিশাচতুলা হইয়া, অন্যত অবস্থার ভোজন করিয়াও অগ্নি দেবতা অতিথি প্রভৃতির পূজা করিবে। গিণ্ডোদকক্রিয়া লোপ হইবে। সকলেই জীৱত ও শূদ্রসম হইয়া উঠিবে। ক্রীগণ অন্নভাগ্যা, অধিক সন্তানবতী ও সংপতির অবজ্ঞাকারিণী হইবে। কেহই আর বিষ্ণুপূজা করিবে না, তবে কলিকালে এই এক ভাল হইবে যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করিলেই মানব মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।” (গুরুপু ২২৭ অঃ।)

উল্লাসতন্ত্রেও কলিযুগের লক্ষণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—“যে সময়ে বৈদিকী দীক্ষা, পোয়ালিকী দীক্ষা ও গাপপুণ্যের বেদসম্বৎ পরীক্ষা লুপ্ত হইবে, স্থানে স্থানে গন্ধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবেন, রাজগণ স্নেহজাতীর ও ধনলোলুপ হইবে, ক্রীগণ অতিশয় দুর্দান্ত, কর্কশ, কলহরত ও পতি-নিম্নক হইবে, মানবগণ ক্রী-পরাজিত, কামকিকর ও গুরু মিত্রাদির অনিষ্টকারক হইবে, পৃথিবী অন্নশতা, মেঘগণ

অন্নবর্ষী ও বৃক্ষসকল ব্রহ্মকল হইবে; ব্রাতা, আত্মীয়, অমাত্য প্রভৃতি সামাজ্যমাত্র ধনের জন্ত পরস্পর কলহ করিবে এবং মদ্যমাংসাদি পানভোজন, নিন্দা এবং দণ্ডশূন্য হইবে, তখনই কলি প্রবল হইরাছে জানিবে।”

মাসীপূর্ণিমার শুক্লাবারে কলিযুগের উৎপত্তি হইরাছিল। ইহার আয়ুঃকাল চারিদশ বক্রিশ হাজার (৪০২০০০) বৎসর। আখ্যাত্তমতে ১৫৭৭৯১৭৪০ দিবস।

ক্রীমন্তাবতে বর্ণিত আছে—“কলিতে মানবগণের ৫০ বর্ষ মাত্র পরমায়ু হইবে। কলি দোষে দেহিদিগের দেহ ক্ষীণ হইলে, ত্রাণপ্রমাচারী লোকদিগের বেদবিহিত ধর্মপথ নষ্ট হইলে, ধার্মিক পাবপ্রায় হইল, রাজগণ লজ্জাপ্রায় হইলে, মহাব্যাগণ চৌর্য, মিথ্যা, বৃথা হিংসা ইত্যাদি নানা বৃত্তি-সম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ শূদ্রপ্রায় হইলে, গো সকল ছাগ প্রায় হইলে, আশ্রম সকল গৃহপ্রায় হইলে, বন্ধু সকল যৌন-প্রায় হইলে, ওষধির গুণ সকল হ্রাস হইলে, পর্কতসকল নিম্নপ্রায় হইলে, মেঘ সকল বিচ্ছিন্নপ্রায় হইলে, গৃহ সকল শূন্যপ্রায় ধর্মরহিত হইলে, লোকসকল দুঃসহ চেষ্টিত হইলে ধর্ম পরিভ্রাণের নিমিত্ত সঙ্কল্পে ভগবান্ কলি অবতীর্ণ হইবেন। তোমার (পরীক্ষিতের) জন্ম অবধি মহানন্দের রাজ্যভিষেক কাল পর্য্যন্ত ১১৫০ বর্ষ অতিবাহিত হইবে। গপ্ত নক্ষত্রায়ক সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে উদয় সময়ে যে দুইটি নক্ষত্ররূপ ঋষিকে আকাশমণ্ডলে প্রথম উদিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্বৎয়ের মধ্যে সমদোষাবহিত যে অশ্বিন্যাদি এক একটি নক্ষত্রকে রাত্রিকালে দেখা যায়, তাহার এক একটির সহিত যুক্ত হইয়া ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মহাব্যপরিমাণের এক এক শত বৎসর অবস্থিত করেন, সেই সকল ঋষিরা অধুনা তোমার (পরীক্ষিতের) সময়ে মর্যাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মর্যানক্ষত্রে বিচরণ করিবেন, তখন কলি প্রবৃত্তি ১২০০ বৎসর অতীত হওয়ার পরে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইবে। যখন ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মর্যাহইতে পূর্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন, তখন অবধি অর্থাৎ নন্দ্যভিষেক অবধি এই কলি অতিশয় বৃদ্ধপ্রাপ্ত হইবে। যে দিন কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, সেই দিন অবধিই কলিযুগ প্রাপ্তিপর হইরাছে। দিব্য পরিমাণ সহস্র বৎসরের পর চতুর্থ কলি অতীত হইলে, পুনর্বার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে।”

(ভাগবত ১২শ স্কন্ধ, ২য় অঃ, ১০-২৯ শ্লোকঃ)

বর্তমান ১৮১৩ শকাব্দ পর্য্যন্ত কলিযুগের ৪৯৯২ বৎসর অতীত হইতেছে।

এই যুগে ধর্ম একপাদ, অধর্ম তিনপাদ। মহাশয়ের আয়ুঃ

পরিমাণ ১০৮ বৎসর, দেহপ্রমাণ স্ব স্ব হাতের ৩০ হাত। অবতার ঐক্লব এবং যুগশেষে দশম অবতার কলি উৎপন্ন হইয়া পাপিগণের বিনাশসাধন করিবেন। ব্রাহ্মণ নিরক্ষি, অরগত প্রাণ এবং ভোজন পাত্রের অনিয়ম হইবে।

কলিযুগের বিশেষ ধর্ম দান। মহাসংহিতা প্রভৃতিতে লিখিত আছে—

“তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানযুগাতে।

ধাপরে যজ্ঞমেবাহর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥”

সত্যযুগে তপস্তা, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, ধাপরে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানমাত্র বিশেষ ধর্ম। (মহা সং।)

“তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানযুগাতে।

ধাপরে যজ্ঞমেবাহঃ কলৌ দানং দয়া দমঃ ॥”

সত্যযুগে তপস্তা, ত্রেতায়াং জ্ঞান, ধাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দান, দয়া ও দম বিশেষ ধর্ম। (মহাভারত।)

“ত্রয়োধর্মঃ কৃতযুগে জ্ঞানং ত্রেতাযুগে দৃঢ়ং।

ধাপরে চাধরঃ প্রোক্তঃ কলৌ দানং দয়া দমঃ ॥”

সত্যযুগে বৈদিক ধর্ম, ত্রেতায়াং জ্ঞান, ধাপরে যজ্ঞ এবং কলিতে দান, দয়া ও দম বিশেষ ধর্ম। (বৃহস্পতি।)

এইরূপ লিঙ্গপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতেও একবাক্যে দানের কথা অল্পমোহিত আছে।

কলিযুগের সংহিতা নিশ্চয় সঙ্কটে পরাশর লিখিয়াছেন,—

“কৃতে তু মানবো ধর্মত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।

ধাপরে শম্মলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥”

সত্যযুগে মহাসংহিতা, ত্রেতায়াং গৌতম, ধাপরে শম্ম ও লিখিত এবং কলিযুগে পারাশর সংহিতা ধর্মশাস্ত্র।

কলিদোষশাস্তির জন্ত লিঙ্গপুরাণ, বৃহদ্রায়দীর, মহাভারত, ও শিবপুরাণে শিবপূজার উপদেশ আছে। স্বল্পপুরাণে শিবই একমাত্র কলিযুগের দেবতা বলিয়া উল্লেখ আছে,—

“ব্রহ্মা কৃতযুগে দেবঃ ত্রেতায়াং ভগবান্ রবিঃ।

ধাপরে ভগবান্ বিষ্ণুঃ কলৌ দেবো মহেশ্বরঃ ॥”

সত্যযুগে ব্রহ্মা, ত্রেতায়াং সূর্য্য, ধাপরে বিষ্ণু ও কলিতে মহেশ্বর দেবতা।

অস্ত্রাভ্যন্ত্রে কালিকা ও গোপাল কলির জাগ্রত দেবতা বলিয়া উল্লেখ আছে,—

“কলৌ জাগর্তি গোপালঃ কলৌ জাগর্তি কালিকা ॥”

কাশীবাস, গঙ্গানান প্রভৃতিও কলিকালে মুক্তির উপায় বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে।

“নাভ্যং পশ্চামি জন্তুনাং যুগ্মাং বারাগণীং পুরীম্।

সর্বপাপপ্রশমনং প্রাপ্তিস্তং কলৌ যুগে ॥

যে বিপ্রাশ্রয় পুরী প্রাপ্য ন মুক্তি কথ্যন ।

বিজিত্য কলিমান্ দোষান্ বাতি তৎ পরমং পরম্ ॥”

কলিযুগে বারানসীপুরী ব্যতীত জীবগণের সৰ্বপাপনাশক প্রারম্ভিত আর নাই। যে ব্রাহ্মণ ঐ পুরী প্রাপ্ত হইয়া কখন তাহা পরিত্যাগ না করেন, তিনি কলিক পাপ বিনাশ করিয়া পরম পদ লাভ করিতে পারেন। (কল্প পু।)

গঙ্গাস্নান সম্বন্ধে তথ্যপুস্তানে লিখিত আছে,—

“কৃত্তে সৰ্বানি তীর্থানি ত্রেতারায় পুঙ্করং পরম্ ।

ধাপিরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গজৈব কেবলম্ ॥”

সত্যযুগে সমুদ্র তীর্থ, ত্রেতার্য পুঙ্কর, ধাপিরে কুরুক্ষেত্র এবং কলিযুগে গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ। মহাভারতে আছে,—

“গীতা গঙ্গা তথা ভিক্ষুঃ কপিলার্শ্বসেবনম্ ।

বাসরং পদ্মনাভস্ত সপ্তমং ন কলৌ যুগে ॥”

গীতা, গঙ্গা, ভিক্ষুক, কপিলা, অশ্বখবৃক্ষ ও হরিবাসর সেবা ব্যতীত কলিযুগে আর সপ্তম ধর্ম্মকর্ম্ম নাই।

হরিনাম কীর্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—

“যেহনিনশং অগঙ্ঘ্যতুর্বারুদেবস্ত কীর্তনং ।

কুরুন্তি তান্ নরব্যাদ্ধ ন কলির্বাধতে নরান্ ॥

চক্রাযুধস্ত নামানি সদা সর্জজ কীর্তয়েৎ ।

নাশোচং কীর্তনে তস্ত স পবিত্রকরো যতঃ ॥

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাহুতমল্লৌকনাম যৎ ।

সংকীর্তিতমযং পুংসো মহেদেধো বথানলঃ ॥”

বাহারা দিবানিশি অগংগষ্টা বাহুদেবের কীর্তন করেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকে কলি কোনরূপ বাধা দিতে পারে না। সর্গদা সকলস্থানেই চক্রপাণির নাম করিবে, তাহাতে অশোচ বিবেচনার আবশ্যক নাই, যেহেতু নামকীর্তনেই পবিত্রকায়ক। অজানবশতঃ হউক বা অজানবশতঃই হউক হরিনাম কীর্তন করিলেই পুরুষের পাপসকল অগ্নি কর্তৃক কাঠরাশির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়।

কল্পপুস্তানে আছে,—

“গোবিন্দনামা যঃ কচ্চিরমো ভবতি ভূতলে ।

কীর্তনাদেব তত্ৰাপি পাপং বাতি সহস্রাধ ॥”

গোবিন্দনাম যুক্ত কোন বানবের নাম করিলেও সহস্র পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

মহানির্করণ তন্ত্রের মতে,—

“মেঘাংমেঘাবিচারাপাং স শুদ্ধিঃ শ্রোতকর্ম্মণা ।

ন সংহিতাভ্যঃ স্মৃতিভির্নিকিঞ্চিন্দুগাভ্যেৎ ॥ ৩

বিদ্যা হ্যগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ঃ ৩

স্মৃতিস্মৃতিপুস্তকাদি মর্মেবোক্তং পুরা শিবে ।

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ বক্তেং জ্বাঃ ৪” ৮। ২৪উদাস। পবিত্রাপবিত্র বিচারহীন ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বেদোক্ত কর্ম্ম ধারা শুদ্ধি হইবে না; পুরাণ, সাহিত্য ও স্মৃতি দ্বারাও মনুষ্যের ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না। কলিকালে আগমোক্ত পথ ব্যতিরেকে গতি নাই।

“পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোহপি দুর্লভঃ ।

বীরসাদনকর্ম্মণি প্রত্যক্ষানি কলৌ যুগে ৪ ১৯

কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ নিকিঞ্চ জায়তে ।” ৪র্থ উদাস। কলিযুগে পশুভাব নাই, দিব্যভাবও দুর্লভ। কলিযুগে বীর-সাদনই প্রত্যক্ষকলমারক। হে দেবি! কলিযুগে কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধি হইতে পারে না।

মহানির্করণ তন্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, বাহারা জিতে-জিহ্ন হইয়া কুলাচারের অহুতান করিবেন, বাহারা দরাসীল হইবেন, বাহারা গুরুগুরুষার তৎপর, পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান্, স্বপত্নীতে অহরন্ত, সত্যব্রত, সত্যনিষ্ঠ ও সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া ‘কুলসাদনে’ সত্য এইরূপ বিশ্বাস করিবেন, বাহারা হিংসা, মাৎসর্য, দম্ব ও ঘেবশূন্য হইবেন এবং বাহারা কুলাচার অহুসারে দান, দান, তপস্তা, তীর্থদর্শন, ব্রত ও তর্পণ, গর্ভাধান, পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি আচরণ করিবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না। কলির দোষসমূহের মধ্যে একটি প্রধান গুণ আছে যে, সত্যপ্রতিজ্ঞ কৌলিক-গণের সকলমাত্রাই প্রেম লাভ হয়।

কলির ভায়ক ব্রহ্মনাম,—

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

বৃহন্নারদীয়ে নিরোক্ত কার্যসকল কলিতে নিষিদ্ধ—সমুদ্রযাত্রা, কমলসুধারণ, অসবর্ণ কঙ্কাকিবাহ, দেবরের দ্বারা পুজোৎ-পাদন, মধুপর্কে পশুঘণ, শ্রাদ্ধে ঘাংসদান, বানপ্রস্থাজ্ঞা, দত্ত-কম্যা অক্ষতা হইলেও তাহার পুস্কীর দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যা, মরমেধ, অশমেধ, মহাপ্রস্থান গমন, গোমেধ বজ্র, ব্রাহ্মণ আভ্যন্তরী হইলেও তাহার হিংসা করা, ক্ষয়গ্রহণ, অগ্নিহোজ হবীভেদেও লেহ লীলা গ্রহণ, বৃত্ত ও স্বাধ্যায়সাপেক্ষ অশোচ, সঙ্কোচ, মরণাভিক প্রারম্ভিতবিধান, সংসর্গদোষ-সংকটচূরি প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্তিসাধক, দম্বক ও ঔরস ব্যতীত অন্য পুত্র গ্রহণ, শুক-জী পরিত্যাগ, পদোদ্যোপে আশ্রয়ত্যাগ, উদ্ভি-ষ্টের বর্জন, দান গোপাল প্রভৃতির অস্বত্যাগ, গৃহস্থের স্ত্রীভ্রমের স্ত্রীভ্রম, শুকজীতে পিষ্যের শুকসংকট, দিব্যভি-

দিগের আপদমুহুর্তি, অশান্তনিকতা, ভ্রান্তধর্মের প্রবাস, মুখাধি-
বমন, বলাৎকারাদি-বোঝ-হুটে-জী-গ্রহণ, সর্বজাতিতে বহির
ভিকাগ্রহণ, ভ্রান্তধর্মের জন্য শূদ্রাদির পাক, পক্ষান্তের উচ্চ-
স্থান হইতে পতিত হইয়া অথবা অধিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ
প্রভৃতি কার্য সকল কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্ণয়সিদ্ধ,
হোমোজি, আদিত্যপূরণ ও পৃথীচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রহে
লিখিত আছে।

যুধিষ্ঠির, হরিশ্চন্দ্র, মুনিশ্চন্দ্র, তেজঃশেখর বিক্রমাদিত্য,
বিক্রমসেন, লাউসেন, বজ্রালসেন, দেবপাল, ভূপাল, মহীপাল,
এই কয়েকজন কলিযুগের প্রধান রাজা এবং যুধিষ্ঠির,
বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়, নাগার্জুন ও বলি এই
ছয়জন রাজচক্রবর্তী শঙ্করকর। [শক দেখ।]

৬ দেবগন্ধর্ববিশেষ, কস্তুর ওরসে দক্ষকন্যার গর্ভে ইহার
জন্ম। (মহাভারত ১। ৬৫। ৪৪।)

৭ একজন অতি প্রাচীন ঋষি। ইহার নাম ঋকসংহিতায়
দৃষ্ট হয়।

৮ সঙ্গীতের অন্তর। ৯ শিব। ১০ বৈষ্ণবদিগের তিলকের
ভেদবিশেষ, ইহার আকৃতি ফুলের কুঁড়ির ন্যায় আগাগোড়া
সুন্দর ও মধ্যস্থল; ইহা অতি সুন্দর ও সুন্দর হইলে 'রসকলি'
বলিয়া থাকে। ১১ (জী) কলিকা, ফুলের কুঁড়ি।

কলিক (পুং) কলো মন্দগম্ভীরো ধ্বনিরন্ত্যন্ত, কল-মন্দার্থে
ঠন্। ক্রৌঞ্চ পক্ষী।

কলিকা (জী) কলিরেব, কলি-স্বার্থে কন্-টীপ্। ১ ফুলের
কুঁড়ি। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কোরক, কলি, কলী।

(“মুম্বাহমাতরজসাং কলিকামকালে।

ব্যর্থং কদর্থমসি কিং নবমালিকারঃ।” সাহিত্য দং।)

২ বীণার মূলদেশ। ৩ রচনাবিশেষ; তালনিয়ন্ত পদসমূহের
নাম কলা, কলাযুক্ত বলিয়া ইহার নাম কলিকা। কলিকা
ছয় প্রকার,—চণ্ডবৃত্ত, দ্বিগাদিগণবৃত্ত, ত্রিভঙ্গীবৃত্ত, মধ্য, মিশ্র
ও কেবল। চণ্ডবৃত্তে দশপ্রকার সংযুক্ত বর্ণ থাকে। মধুর,
স্পিষ্ট, বিস্পিষ্ট, শিথিল ও হ্রাদি-সংযুক্ত হইয়া বর্ণ সকল হ্রস্ব
দীর্ঘভেদে ভিন্ন হয়। হ্রস্ব ও মধুর সংযোগ বধা,—শঙ্কর,
অজুশ ও কঙ্কর। স্পিষ্টসংযোগ দর্প, কর্পর ও সর্প। বিস্পিষ্ট
সংযোগ বধা,—ভল্ল, কল্যাণ ও চিল্লি। শিথিল সংযোগ,—
পশু, কস্তুর ও বস্ত্র। হ্রাদি সংযোগ মহ ওহ, সহ ও প্রসহ।

• “যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ ধর্মাবিনাথৌ বিজয়ভিনন্দনঃ।

ইবেহু নাগার্জুনমেঘিনীপতির্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শঙ্করকরঃ কলৌ”

জ্যোতির্বিদ্যাকরঃ।

কেহ কেহ গর্হাদি শব্দকেই হ্রাদি সংযুক্ত বলিয়া থাকেন।
দীর্ঘসংযোগ বধা,—ভল্ল, অজ, কাপীশ, বালা, বৈভ ও বাহক।
চণ্ডবৃত্তে কলার নিয়ম,—বাদশ হইতে চৌবটি, ইহার নানা-
ধিক করা হয় না। চণ্ডবৃত্ত হইতে প্রকার মধ্য ও বিশিষ্ট।
তন্মধ্যে মধ্য বিশিষ্ট প্রকার,—বর্জিত, বীরভদ্র, সমগ্র, অচ্যুত,
উৎপল, তুরঙ্গ, ত্রিগুণরতি, মাতঙ্গলেখিত ও তিলক; এই
নয় প্রকার ব্যতীত অন্যভেদের নামাদি প্রায়ই দেখিতে
পাওয়া যায় না। বিশিষ্ট পাঁচ প্রকার,—পদ্ম, কুল, চম্পক,
বজ্রল ও বকুল। তন্মধ্যে পদ্ম ছয় প্রকার,—পঙ্কেতক, সিত-
কজ, পাণ্ডুপল, ইন্দীবর, অরুণাভোজ ও কল্লার। বকুল
দুই প্রকার,—ভাস্কর ও মঙ্গল। এইরূপে চণ্ডবৃত্ত বিশিষ্ট প্রকার
হইয়া থাকে। দ্বিগাদিগণবৃত্ত পাঁচপ্রকার,—কোরক, ওহ,
সংফুল, কুমুম ও গন্ধ। ত্রিভঙ্গীবৃত্ত, দণ্ডক ও বিদগ্ধভেদে দুই
প্রকার—মিশ্রকালিকা গদ্যাসম্পৃক্তা ও সপ্তবিভক্তিকা ভেদে
দুই প্রকার, কেবলও দুই প্রকার—অক্ষরময়ী ও সর্বলয়ী।

৪ ছন্দোবিশেষ;—

“প্রথমমপরচরণসমুখং শ্রয়তি স যদি লক্ষ্য।

ইতরদিতরগদিত মগি যদি চ তূর্য্যং

চরণংগলকমবিকৃতমপরমিত কলিকা সা।”

(বৃত্তরত্নাকর ৪ অঃ।)

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ একরূপ লক্ষ্যাক্রান্ত হইলে,
এবং তৃতীয় চতুর্থ চরণ অবিকৃত থাকিলে তাহাকে কলিকা
কহে।

৫ কলা, চন্দ্রের জ্যোতির অংশ।

(“তন্যন্তে কলিকা যন্মাত্তদ্বাত্তাতিথয়ঃ সূতাঃ।”

সিদ্ধান্তশিরোমণি।)

কলিকা (দেশজ) কল্কে, তামাক খাওয়ার উপকরণবিশেষ,
ইহাতেই তামাক সাজিতে হয়। মাটি, পাথর ও বিবিধ
ধাতু প্রভৃতি দ্বারা ইহা প্রস্তুত। উৎপত্তির স্থানে ও আকার
ভেদানুসারে ইহারও নানা প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া
যায়; যেমন,—বলাগড়ে, কাঁটালে, ধূতরাফুল ধুতি,
ইত্যাদি।

কলিকাতা—সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী, বঙ্গদেশের
সর্ব-প্রধান নগরী; বৃটিশ-শাসনের কেন্দ্রস্থল, বৃটিশ-রাজ-
প্রতিনিধির বসতিস্থান, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান বন্দর।
এই নগরীতে এত অধিক জরমা, স্থান, সুশোভিত অট্টা-
লিকা আছে যে, তজ্জন্ত ইহার আর একটি স্বতন্ত্র নামের
সৃষ্টি হইয়াছে; লোকে ইহাকে ঐ অর্থ “দোদমনরী মহানগরী”
বলিয়া থাকে।

এই নগরী গঙ্গানদীর দক্ষিণবাহিনী শাখা ভাগীরথীর বামতীরে অবস্থিত। ইংরেজেরা ভাগীরথীর দক্ষিণাংশকে “হুগলী” নদী বলেন, সুতরাং ইংরাজ-ভৌগোলিকের মতে ইহা হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরে পথার মুখে জাহাজের গমন-পথ নির্দেশ করিবার জন্ত যে সকল ‘ব’ আছে, তাহা হইতে কলিকাতার দক্ষিণাংশস্থিত নদী-তীরবর্তী কোর্ট উইলিয়ম নামক ইংরাজ-জর্জের অন্তর্গত নগর-নিরূপক গোলাক-তন্ত্র পর্য্যন্ত মাপিয়া আসিলে জানা যায় যে, সাগরতীর হইতে কলিকাতা টিক ৮৮’২ ভৌগোলিক মাইল বা ৪৩ ক্রোশ উত্তরে ২২° ৩৪’ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮° ২৫’ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

কলিকাতার ভূতত্ত্ব—ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ হির করিয়াছেন যে অতিপূর্বে অর্থাৎ ইতিহাসাতীতকালে বর্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগ, যাহাকে ইংরাজ ভৌগোলিকেরা গাঙ্গের “ব” দ্বীপ বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন, তাহার অস্তিত্ব মাত্র ছিল না; বর্তমান রাজমহল, মুরসিাবাদ ও মালদহের মধ্যে কোন একস্থলে সমুদ্রতীর ছিল। হিমালয় হইতে যে সকল নদী তখন ঐ স্থানে আসিয়া সাগরে পড়িত, তাহাদেরই স্রোতবাহিত মৃত্তিকারশিতে গাঙ্গের “ব” দ্বীপের জন্মশঃ জন্ম হইরাছে, সুতরাং কলিকাতা নগরীর জন্মঐ সময়েই হয়। কলিকাতার ভূমি সামান্যতঃ নিম্ন ও সমতল, দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে ঢালু।

কলিকাতার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্ত এক সময়ে দুইটি পরীক্ষা হইরাছিল, একটি কোর্ট উইলিয়ম (কেল্লাতে) কূপখনন ও শিয়ালদহে পুষ্করীখনন। ১৮৩৫ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূতত্ত্ববিদ্যারের জন্ত কেল্লাতে একটি কূপ ৪৮১ ফুট গভীর করিয়া খনন করা হয়। ১৫৯ ফুট নিম্নে একপ্রকার পীতবর্ণ শিরাযুক্ত আঁটাল মাটি এবং ১৯৬ ফুট নিম্নে লোহমিশ্রিত মৃত্তিকা পাওয়া যায়; ৩৪০ এবং ৩৫০ ফুট নিম্নে প্রস্তরে পরিণত অস্থি পাওয়া যায়, পরীক্ষকেরা ইহাকে কচ্ছপের অস্থি বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন; ৩৭০ ফুট নিম্নে আরও কতকগুলি ঐরূপ অস্থি পাওয়া যায়। এইখানে ৩৮০ ফুট নিম্নে যে স্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, এই স্তরে এক সময়ে একটি বৃহৎ জল ছিল, এখন তাহা ভূগর্ভে শোষিত হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এই স্তরটি

দেখিয়া পরীক্ষকেরা নিশ্চয় করেন যে, বর্তমান স্তরখনির কূপটি তুল্য এই স্তরটিও এক সময়ে কূপটি ছিল, কালক্রমে সেই কূপটি ৩৭০ ফুট বলিয়া গিয়াছে।

ঐ কূপে ৩৯২ ফুট নিম্নে বালুকা মধ্যে গিরিনদীগর্ভ-জলত কূপ কূপ উৎকৃষ্ট মুরদার, কতকগুলি জীর্ণকাঁচ খণ্ড, ৪০০ ফুট নিম্ন হইতে একখণ্ড চূপপাথর এবং ৪০০ হইতে ৪৮১ ফুট মধ্যে সমুদ্রোপকূলজাত ত্র্য্য ও দুই নিকতায় আদি পার্শ্ববর্ষাধ, স্ফটিক, কেল্‌স্পার, অত্র, স্টেট ও চূপপাথর-মিশ্রিত উপলব্ধ পাওয়া যায়। বিহ বটীর আর নিম্নে যেই দূর খনন করা হয় নাই, সুতরাং হির হইল না যে, কতদূর পর্য্যন্ত এই অসমতাব্যাপার স্তর আছে, কোন কোন পরীক্ষক অনুমানে হির করেন যে, নিম্নে আরও ৮০ ফুট ঐরূপ আছে। উপরি উক্ত স্তরবলীর বর্ণনা হইতে হির হয় যে, পূর্বে ইহার নিকটে উচ্চ পাহাড় ছিল, তাহাই বলিয়া গিয়া বর্তমান সমতল ভূমির উৎপত্তি হইরাছে।

শিয়ালদহের টেননের সীমার মধ্যে যে বৃহৎ পুষ্করীটি খনন করা হইরাছিল, তাহা হইতে ব্র্যানকোর্ড সাহেব কলিকাতার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করেন। পুষ্করীটি তৎকালের ভূমির স্বাভাবিক সমতল হইলে ৩০ ফুট গভীর করিয়া খনন করা হয়। তখনকার ভূমির পৃষ্ঠ-দেশ, নিকটস্থ ঝালের মরা-জোয়ারের সীমাসমতল হইতে ১৫৫ নিম্ন এবং গ্রীষ্মকালীন ভাগীরথীর অভ্যন্তর-জোয়ারের সীমাসমতল হইতে ১৭ ফুট উচ্চ ছিল ব্রাদ। পুষ্করী পুড়িবার সময় দেখা যায়, প্রথম ৩ ফুট ভূমি উত্তীর্ণ মৃত্তিকাপূর্ণ, তাহার পরের স্তর অসমতল এবং খান্দেরের মৃত্তিকার স্তর মৃত্তিকাপূর্ণ, এই স্তরের সকল স্থলেই একরূপ নহে, কোথাও স্বল্পভার-সহিষ্ণু বালুকা ও লবণাক্ত কর্দম, কোথাও বা পরিষ্কার চিত্তক মৃত্তিকা। এ সকলেও উত্তীর্ণাবশেষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা এত পুরাতন যে, তাহারের আভি-উৎপত্তি অবগত হইবার উপায় হয় নাই। ইহার নীচে কূপটি হইতে আঁটাল মাটি পাওয়া যায়, এই আঁটাল মাটি ২০ ফুট নীচে। সুতরাং পূর্বাভ্য উত্তীর্ণজাত মৃত্তিকার স্তর ৩ ফুট বাদ দিলে মধ্য স্তরটির বেধ ১৭ ফুট হয়। ইহার নিম্নে উত্তীর্ণজাত অপরিণত কদলার স্তর (ভক্ষ হইলে ইহা অস্তিত্ব নষ্ট হয় না।) এই স্থলে কতকগুলি মুরদী গাছের ভণ্ডি দণ্ডারমান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভণ্ডির শিকড় বাঁকিয়া না গিয়া টিক যোজা হইয়া নিম্নস্তরে প্রেথিত হইরাছে বলিয়া অনুমান হয় যে, এক সময়ে এই স্তরটি কূপটি ছিল, কালক্রমে বলিয়া গিয়াছে। এই স্তরটি পুষ্করীর সর্বাংশে দেখা যায়। অনেকে অনুমান

* Geology of India, by Blandford, and Medlicott, এবং Blandford's Physical Geography.

† Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IX. p. 686 and Vol. XXXII. p. 154.

করেন যে, এই তরটি সমস্ত কলিকাতা, তরিকটবর্তী সমস্ত বা নদীতীরবর্তী স্থানগুলিতে বর্তমান, তবে সকল স্থানে এই তরের অবস্থান সমতরীয় নহে। সারা ভীটার সমস্ত গার্ডেন রোডের (কোম্পানীর বাগানের) নিচে এবং অপর পারে নদী-গর্ভে এই তর অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শিরালবহে এই তর ভূপৃষ্ঠে হইতে ৩০০৩ ফুট নিম্ন এবং কোম্পানীর বাগানের নীচে ৩৬ ফুট নিম্ন, কিন্তু কেল্লাতে ৫১ ফুট নিম্ন।

পূর্বে যে গাছের শুভ্রি কথা বলা গিয়াছে, তাহার মূলভূমি স্থান করিয়া বহু একটি ৪ ফুট গভীর কূপ খনন করিয়া দেখা যায়, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল বৃক্ষাবশেষ পূর্বোক্ত খালের সারা ভীটার সীমাসমতল হইতে ১৫১ ফুট নিম্নে এবং ভাগীরথীর ঐ স্থান হইতে ১৩ ফুট নিম্নে অস্তিত্বাছিল। মাতলা, ক্যানিং-ট্যুউন প্রভৃতি স্থলেও ঐ তরটি পাওয়া যায় এবং তাহাদিগের সহিত তুলনায় ও অনুসরণের অনুসারী বৃক্ষ-সংস্থানের ভূমির সহিত তুলনা করিয়া বুঝা যায়, শিরালবহের যে তর ঐ সকল বৃক্ষাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে ঐ সকল বৃক্ষ অস্তিত্বের পরে ১৮ বা ২০ ফুট বসিয়া গিয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেল্লার ভিতরে যেখানে ঐ তর বৃক্ষাবশেষ দেখা গিয়াছিল, সেই স্থানই যদি ঐ বৃক্ষগণের মৌলিক অবস্থান-স্থল হয়, তবে সেখানেও যে তরটি ৪৬।৪৮ ফুট বসিয়া গিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই ছই স্থানের ভূপৃষ্ঠ সমসাময়িক কি না, তাহার বিশ্বাসজনক কোন প্রমাণ নাই।

উপরোক্ত কারণসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে গালের 'ব' দ্বীপটি গড় ১৮ হইতে ২০ ফুট পর্যন্ত বসিয়া গিয়াছে। যেহেতু নিম্নে যে সকল স্থানে অনুসারীগাছ পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকল গাছ এককালে ভূপৃষ্ঠে অস্তিত্বাছিল, তাহা বসে সন্দেহ নাই।

ভূতত্ত্ববিদ ব্রান্‌ফোর্ড সাহেব যে সকল স্থানের খনন পরিদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয় স্থানে ৮ হইতে ১০ ফুট মধ্যেই ঐরূপ বৃক্ষাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। উপরিস্থ তরসমূহ সাধারণতঃ উদ্ভিদাবশেষ এবং নদীজলসঞ্চিত লব্ধকাবিত্তে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল স্থানে যে এক সময়ে ভূপৃষ্ঠ ছিল, তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে যে কেবল তরটি কালসহকারে বসিয়া গিয়াছে তাহাই স্পষ্ট বুঝা যায় এমন নহে। উহা এক শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল যে, নদী-স্রোতবাহিত বৃত্তিকা (পলি) দ্বারাও তত ক্রম তরটি হওয়া অসম্ভব।

নদীর গতি-পরিবর্তন—কলিকাতার দক্ষিণে, "টালির

নালা" বা "আদিগড়া" নামে একটি খাল আছে। এই খাল-টার পূর্বে এ অবস্থা ছিল না। ইহা নিম্নতর নদী ছিল, প্রাচীনকালে ইহাই ভাগীরথীর প্রধান স্রোত ছিল। কালক্রমে ইহা একটি সামান্য "স্রোত" নামে পর্য্যবসিত হয় ও অবশেষে "টালি" নামক এক সাহেব ইহার পট্টোদ্ধার করিয়া "টালির নালা" এই নামে প্রচারিত করেন। ভাগীরথীর স্রোত দুগড়ির নিকট দক্ষিণবাহিনী হইয়া বরাবর কলিকাতাকে বায়ে রাখিয়া দিঘিরপুয়ের নিকট পূর্ববাহিনী হয়। সেখান হইতে বর্তমান টালির নালায় খাল বাহিয়া চট্রিক্রোশ দক্ষিণে গড়িয়াগ্রাম পর্যন্ত পূর্বমুখে বহিয়া অগ্নিকোণে বাঁকিয়া হাতিরাগড় পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। এখনও হাতিরাগড় পর্যন্ত সেই আদি গঙ্গার গর্ভ স্পষ্ট লক্ষিত হয়।*

* দিঘিরপুয়ের নিম্নে যে প্রকার মূলস্রোত প্রবাহিত ছিল, তাহা কবিকল্পের চক্রিকা বা হইতেও বুঝা যায়। শ্রীমন্তের ডিঙ্গা গঙ্গা বাহিয়া কোরগর, কোতরঙ্গ এড়াইয়া কুচিনান হইয়া কলিকাতার উত্তর চিংপুরে উপস্থিত হইল, তৎপরে কলিকাতা ও তাহার সমুখে অপর সালিখা অতিক্রম করিয়া বেতেডু, বনভগ্রাম হইয়া ডাহিনে হিল্লীর পথ পরিভ্রমণ করিয়া বালিখাটা (বেলেখাটা?) উপস্থিত হইল, তৎপরেই শ্রীমন্তের ডিঙ্গা কালীখাটে পহছিল।

"বরার চলে তরি তিলেক না রহে।

ডাহিনে সাহেব বামে বড়দহ রহে।

কোরগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।

সর্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পার।

ছাগ মহিব মেবে পুজিয়া পার্শ্বী।

কুচিনান এড়াইল সাধু শ্রীমন্তি।

দ্বার চলি তরি তিলেক না রহে।

চিংপুর সালিখা এড়াইয়া যায়।

বেতেডুতে উত্তরিল বেগিয়ার বাল।

কলিকাতা এড়াইল অবসান বেলা।

বেতাই চতিকা পুজা কৈল সাবধানে।

বনভ গ্রামখানা সাধু এড়াইল বামে।

ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিল্লীর পথ।

রাজহুস কিদিয়া লইল পারাবত।

বালিখাটা এড়াইল বাগিয়ার বাল।

কালীখাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা।"

রেনেল সাহেব আভ্যন্তরিক জলপথের গতি দেখাইবার জন্য তাহার "হিন্দুস্থানের মানচিত্র" নামক গ্রন্থে যে একখানি নদী-প্রবাহ-প্রদর্শক মানচিত্র দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে কলিকাতার দক্ষিণপূর্বে বেলেখাটার নিম্নে একটি নদীধারা ছিল, কবিকল্পের বর্ণনার "বালিখাটা" যদি এই বেলেখাটা হয়, তাহা হইলে ঐ নদীধারাই যে ভাগীরথীর আদিম্রোত তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না, কারণ এই নদীধারার উপরেই শ্রীমন্ত কালীখাটে পাইয়াছিলেন।

কলিকাতার জলবায়ু—উষ্ণ-কটিবহ্নের বা গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রায় সীমার নিকট এবং কর্কটক্রান্তির ১ অক্ষাংশ মধ্যে স্থাপিত হইলেও কলিকাতার জলবায়ু প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের সারিধাবশতঃ কলিকাতাবাসিগণকে ভারতের অপরাপর স্থানের লোকের ভায় কোন ঋতুর আভিলাষ অনুভব করিতে হয় না; আর সেই জন্য এখানে বড়ঋতুর মধ্যে তিনটিমাত্র ঋতুর প্রভেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। কাস্তনমাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাসের আদ্যাবস্থা পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম, তৎপরে ভাদ্র-পর্য্যন্ত বর্ষা, তৎপরে কার্তিকের শেষ হইতে শীত ঋতুর আবির্ভাব হয়। অগ্রহায়ণের শেষ হইতে মাঘের পূর্ব পর্য্যন্ত শীতের প্রাবল্য এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে গ্রীষ্ম ও রৌদ্রের তীক্ষ্ণতা হয়। কলিকাতার বৎসরের মধ্যে গড়ে উষ্ণতার পরিমাণ বৃদ্ধি ৭৯°৪'; গ্রীষ্মের সময় গড়ে ৮৪°৫' বর্ষার গড়ে ৮৩°৩' ও শীতে গড়ে ৭৫°৫' উষ্ণতার পরিমাণ দেখা যায়। গত ত্রিশ-বৎসরের মধ্যে ১৮৬৭ ও ১৮৭৩ সালের মে মাসে সর্বাপেক্ষা অধিক গরম পড়িয়াছিল, ছারতে তখন উষ্ণতা হইয়াছিল ১০৬°। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতা ও তরিকটবর্তী স্থানে ঝড় হইয়া থাকে। ঝড়ের সময় প্রায় উত্তর-পশ্চিমকোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে। অপরাহ্নেই প্রায় ঝড় হয়। কলিকাতার ঝড়ে প্রায় বজ্রগতন ও বিদ্যুৎস্করণ অধিক হয়। কলিকাতার সাধারণ বায়ুর আর্দ্রতা কিছু অধিক। অধাপক ব্লানকোর্ডের মতে, এখানকার বায়ুতে এক-সহস্রাংশে গড়

অনেক অনুমান করেন যে পূর্বে চাঁদপাল ঘাটের নিকট হইতে যে ঝাল (যাহাকে ডিম্বাভার ঝাল বলিত) ধর্মতলার উত্তর দিয়া বরাবর পূর্বমুখে বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ক্রিক-রো নামক স্থানের ভিতর দিয়া বেলেঘাটার নিকট বড় ঝালে মিলিত হইয়াছিল, সে ঝালে পূর্বে বড় বড় নৌকা বাতায়ত করিত; ঐমন্তের ডিম্বা এই ঝাল দিয়াই বড় ঝাল হইয়া আদিগঙ্গার উপর দিয়া কালীঘাটে গহিছিয়াছিল, আর এ ঝালের দৈর্ঘ্য চাঁদপাল ঘাট হইতে বেলেঘাটা পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে বেলেঘাটার নিম্নে যে নদীধারা আছে তাহাকে সামান্য ঝাল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাহার দৈর্ঘ্য অনেক দূর।

তৎপরে ঐমন্ত কালীঘাটের দক্ষিণে নানা স্থান অতিক্রম করিয়া শেষে;—

“ভাধিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।

ছত্রভোগ এড়াইল অবসান বেলা।

ত্রিপুরা পুজিয়া সাধু চলিল সখর।

অমলিক গিয়া উত্তরিল সখাগর।

সকলোমাধব পূজা করিল সখর।

তাহার সেলান সাধু পায় হাত্যাঘর।”

এই “হাত্যাঘর”ই এখনকার হাতিয়াগড়। কবিকল্পণের বর্ণনা যে সুলক, তাহা এখন হাতিয়াগড়ের নিকট আদিগঙ্গার গর্ভস্থিত করিলে অবশ্যই বীকার করিতে হয়।

১৯২ ভাগ জলীর বাষ্প বা হ্রস্ব জলকণা থাকে। কলিকাতার বৎসরে গড়ে ৬৬°০৪ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। তদ্ব্যতিরিক্ত ১৮৭১ সালে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হইয়াছিল, উহার পরিমাণ ৯২°৩১ ইঞ্চি। প্রাবণমাসের শেষে অধিক বৃষ্টি হয়, অর্থাৎ গড়ে ৪১°১৮ ইঞ্চি এবং পৌষমাসের শেষে সর্বাপেক্ষা কম হয়, অর্থাৎ গড়ে ০°২৪ ইঞ্চি মাত্র। কলিকাতার বায়ুর ভায় গড়ে সমুদ্রতল হইতে ১৮ ফুট ও বায়ুমান বস্ত্রে জ্বল বা জ্বলাই মাসে ২৯°৭২ ইঞ্চি উঠে অল্পত হয়। ডিসেম্বর মাসে আরও উঠে অর্থাৎ ৩০°০৪ ইঞ্চি উঠে বুঝা যায়। কলিকাতার অবস্থান স্থল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এখানে ঘূর্ণীবাতাস ও তৎসঙ্গে প্রবল ঝড় প্রায় সর্বদাই ঘটিতে পারে এবং ঘটেও। একগুণ ভীষণ ঝড় এখানে ১২১০ বৎসরের মধ্যে প্রায়ই ঘটয়া থাকে। চল্লিশসালের বজ্রা ও আধিনে ঝড় এবং কার্তিকে ঝড় (১২৭১ এবং ১২৭২ সাল) ইহার নিদর্শন। এই সকল ঝড়ে কলিকাতার নীচে ভাগী-রখী গর্ভে জাহাঙ্গিরির যথেষ্ট ক্ষতি হয় বলিয়া আজকাল কলিকাতা বন্দরে “ঝটিকা-সঙ্কেত” (Storm Signal) স্থাপিত আছে। কলিকাতার ঝড়ের লক্ষণ বুঝিতে পারিলেই নাবিকদিগেকে সাবধান করিবার জন্য ঐ সকল সঙ্কেত প্রদর্শন করা হয়। কলিকাতার মৌসুম বায়ু বহিতে আরম্ভ হইলে অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখমাসে নৈঋতদিক হইতে এবং ঐ বায়ু বন্ধ হইবার সময় অর্থাৎ ভাদ্র আধিনমাসে উত্তরপশ্চিমকোণ হইতে ঝটিকা উত্থিত হয়।

কলিকাতার প্রকৃতত্ব—এখন যে কলিকাতা লক্ষ লক্ষ মানবের বাসভূমি ‘মৌদমরী মহানগরী’ বলিয়া পরিচিত, সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে এই কলিকাতার চিত্রমাত্র ছিল না। সাগরের অতলস্পর্শী সলিলগর্ভে এই স্থান নিহিত ছিল। কেবল এই স্থান কেন, সমস্ত গাঙ্গেয় ‘ব’ দ্বীপের চিত্রমাত্র ছিল না। ভূতত্ত্ববিদেরা বহু অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, অতি পূর্বকালে বর্তমান রাজমহলের নিম্ন দিয়া বঙ্গোপসাগরের ধর স্রোত প্রবাহিত হইত। বহুদিন পরে ক্রমশঃ চড়া পড়িয়া বর্তমান আকার ধারণ করে; কিন্তু গাঙ্গেয় ‘ব’ দ্বীপটি বহুদিন অজময় ছিল। কলিকাতা ঐ গাঙ্গেয় ‘ব’ দ্বীপেরই অন্তর্গত, পলি জমিয়া যখন কলিকাতার ভূপৃষ্ঠ দেখা দিল, তখন ইহা হ্রদবনের অন্তর্গত ছিল। এদিক জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির বর্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশকে ‘সমভট’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নামটি

* বরাহমিহিরের পূর্বে আর কোন পুরাণ, উপপুরাণ অথবা গ্রন্থে পুত্রে সমভটের উল্লেখ নাই। [সমভট বৈদ্য]

যারাও যোগ্য হইতেছে যে পূর্বে এখানে সমুদ্র ছিল অথবা সেই ভূভাগে সমুদ্রের স্রোত আসিত। কিন্তু বরাহমিহিরের কিছু পূর্বে হইতেই সেখানে সমুদ্রস্রোত আর না আসায়, সেই সমুদ্রতটস্থ স্থান 'সমভট' নামে প্রচলিত হয়। ক্রমে এখানে লোকের বসতি হইয়া খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে সমভট একটি কুজরাট্যে পরিণত হয়। (বরাহমিহিরকৃত - বৃহৎসংহিতা ১৪। ৬, এবং চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং এর ভ্রমণবৃত্তান্ত দেখ)। তৎকালে কলিকাতা সমভটের দক্ষিণে বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ জঙ্গলবন মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই প্রাচীন বনজঙ্গলময় স্থান ইতিমধ্যে আর একবার ভূগর্ভে বসিয়া গিয়াছিল, ক্রমশঃ পলি পড়িয়া আবার ভূভাগে পরিণত হয়।

কর্তদিন হইল, কলিকাতা বর্তমান ভূভাগে পরিণত হইয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তৎপরে সর্ব প্রথম কোন্ সময়ে এই স্থান মানবজাতির বাসযোগ্য হয়, তাহাও জানিবার উপায় নাই। জঙ্গলবনের জায় এখানেও পূর্বে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর আবাস ছিল। তৎপরে অসভ্য বস্ত্র জাতিরা আসিয়া নদীতীরে স্থানে স্থানে বাস করিতে থাকে। তাহারা সম্ভবতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত কীকট, নিষাদ, শবর অথবা কোল জাতি। তাহাদের বসবাসে ক্রমে এই জঙ্গলময় স্থান কুজরাটে পরিণত হয়। তৎপরে অসভ্য ধীরজাতি আসিয়া এখানে বাস করে। তাহারা নিকটস্থ নদী হইতে মাছ ধরিয়া তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহাও কতদিনের কথা, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

কলিকাতার প্রাচীনত্ব।—কলিকাতা কর্তদিন হইল নগর হইয়াছে, তাহা ঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। কাহারও কাহারও মতে এই স্থান খুব প্রাচীন। পণ্ডিত পদ্মনাভ ঘোষাল এইরূপ বলেন যে—“বহুপ্রাচীন কাল হইতে কলিকাতা নগর পরিচিত। পুরাকালে হিন্দুগণ এই স্থানকে কালীক্ষেত্র বলিতেন। তৎকালে ইহা বেহলা (আধুনিক বেহালা) হইতে দক্ষিণের পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই কালীক্ষেত্রের সীমার মধ্যে কোন স্থানে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া সতীসেহের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল বলিয়া এই স্থানে একটা দেবী-মূর্তি ও একটি তৈরবমূর্তির আবির্ভাব হয়, সেই দেবীর নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছিল কালীক্ষেত্র। কলিকাতা শব্দ কালীক্ষেত্রের অণুভাষ ছাড়া আর কিছু নহে।” (১)

পদ্মনাভ আরও বলেন,—“বঙ্গালদেশের সমস্ত কলিকাতার অথবা বিশেষ মক ছিল না, তৎপরে জঙ্গলবনের উৎপত্তির সময় হইতে ইহার দৃশ্যরূপ স্বেচ্ছাপাত হয়।” (২)

(১) Indian Antiquary, 1873. (২) পৌত্তীয় ভাষ্যকর দেখ।

উপরোক্ত বিবরণগুলিকে কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা দুকঠিন। আমরা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন প্রমাণ খুঁজিয়া পাইলাম না।

বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীন হইলে ইহা কুজ কুজ প্রদেশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাসনকারী দ্বারা শাসিত হইত। সপ্তগ্রাম এই সকল প্রদেশের একটি। কলিকাতা প্রাকৃতিক স্থানসমূহ সম্ভবতঃ এই প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অকবরের প্রধান সচিব সুবিখ্যাত আবুল-ফজল প্রণীত আইন-ই-অকবরী নামক গ্রন্থে কলিকাতা নামের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পূর্বে আর অল্প কোন ইতিহাসে অথবা প্রামাণিক পুস্তকে কলিকাতার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই আইন-ই-অকবরী গ্রন্থে অকবর শাহের রাজত্বসচিব-তোদরমল্লকৃত রাজত্ব-তালিকার বঙ্গদেশ যে কয়েকটি বিভাগ বা সরকারে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কলিকাতা সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) সরকার-ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, মহল কলিকাতা (কলকাতা), বারবাকপুর ও বকুয়া এই মহলত্রয় হইতে একত্র বাৎসরিক ২৩,৪০৫ টাকা রাজস্বরূপ সাম্রাজ্যিক কোবে সরবরাহ হইত।

আইন-ই-অকবরী রচিত হইবার পরে এবং বঙ্গদেশের সহিত যুরোপীয়দিগের সংস্রব হইবার পূর্বে আর কোন মুসলমান ইতিহাস-লেখকদিগের বিরচিত ঐতিহাসিক পুস্তকে “কলিকাতা” নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকৃত চণ্ডীতে আমরা কলিকাতার উল্লেখ দেখিতে পাই (?) কথিত আছে যে ১৪৬৬ শকে বা ৩৪৬ বৎসর পূর্বে অথবা সম্রাট অকবর শাহের সিংহাসনারূঢ় হইবার বার বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। এই পুস্তক মধ্যে বণিক ধনপতি এবং তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সওদাগরের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ মধ্যে কলিকাতার (?) নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব অকবরেরও অনেক পূর্বে কলিকাতা বর্তমান ছিল। কিন্তু এই সময়ে কলিকাতা নাম সম্বন্ধে কিছু গোল আছে। আইন অকবরীতে কলকাতা মহলে কোন্ কোন্ গ্রাম ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই সময়কার সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা কলিকাতা-মহলকে কিলকিলা নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মগধাধিপ বৈজয়ন্তরাজের সভাপণ্ডিত কবিরাম দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক পুস্তকে “কিলকিলা”র বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। [কবিরাম শলে তাঁহার জীবনী ও সময় দেখ।] তাঁহার মতেও

কলিকাতার মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম ছিল, নিয়ে কতিবরণ
উদ্ধৃত করিলামঃ—

* পশ্চিমে সরষতী ও পূর্বে বহুনা নদী, ইহার মধ্যেঃ ২১
বোজন-পরিমিত কিলকিলা ভূমিঃ ইহা দুই ভাগে বিভক্ত।
দানগলী নদীর পশ্চিমে গঙ্গার নিকটে শ্রীক্ষেত্রীদেবী বিরাজ
করিতেছেন। এখানে উপবাস করিলে কুটাসি হারুণ রোগ-
সমূহ (দেবীর ক্রোধ) আরোগ্য হয়। মাহেশ ও শ্রীকালী

* পশ্চিমে সরষতী নদী পূর্বে কালিকাতা নদী।

একবিংশতিবোজনৈক মিতো কিলকিলাভিঃঃ ১৩৩

কিলকিলাভূমি মধ্যে মো বোশী নৃপশেখর।

দানগলী নদীর পশ্চিমে পশ্চিমপার্শ্বে বিরাজতেঃ ১৩৪

বজ্র শ্রীক্ষেত্রী দেবী গঙ্গারাজকৈবল্যম্।

কুটাসিভক্তনরোদায়াং বিদ্যমানোপবাসতঃঃ ১৩৫

মাহেশব্রহ্মদাহাধ্যগ্রামস্নেহস্বরে মহান্।

দীর্ঘগঙ্গা সমীপে চ রাজা হি কুলপালকঃঃ ১৩৬

কেচিৎকতি ভূপাল বার্তীভূমিন্দীতটে।

অনুপালক দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃঃ ১৩৭

অনেককলীযুগাঃ তথা লাক্ষ্মীভূতরাঃ।

তথা কনকবৃক্ষাণাং বহিলাং তত্র জায়তেঃ ১৩৮

শ্রীমদালাভব্রহ্মসহ সতীদেব্যাঃ শরীরতঃ।

বাসভূম্যাকুলিপাতো জাতো ভাগীরথীতটেঃ ১৩৯

কালীদেব্যাঃ প্রসাদেন কিলকিলাদেশবাসিনঃ।

ত্রিবিধৈঃ পুরিতাঃ নিত্যং ভাবিতাচিত্রকালতঃঃ ১৪০

অদ্বৈতক গায়ত্রি সর্বশতত বর্জনাং।

প্রায়শো বর্ণভেদানাং বাসো হি সর্বদা ভূমিঃঃ ১৪১

সংভাব্য ভূমিঃ লোকা হি ধনানাং সম্বতো নৃপ।

ভাগীরথ্যাকোত্তরপার্শ্বে বিদ্যোজনগ্রামগতঃঃ ১৪২

কিলকিলাদায়নলকত বহবর্ষেণ বর্ততে।

বধা কথঞ্চিৎপাণ্ডিত্যঃ করুণীয়া হি সাধুতিঃঃ ১৪৩

সমুদ্রমন্ডলভুক্তে কুর্ধপুর্বে চ সন্মরঃ।

ভারভূতাহিবেবক বৈভ্যানাং মোহনায় চঃ ১৪৪

কুর্ধনিবাসো জায়তে মন্মথবারণপ্রমাং।

ভেম কলোলবহলং জায়তে বদধিধূপঃঃ ১৪৫

ভদ্রবধিঃ কিলকিলাদেশো শ্রীমতে দেশবাসিন্তিঃ।

কিলকিলাসম্পত্তির্ভসতি নিত্যরেনৈব বজ্র চঃ ১৪৬

কমলাহুশরনং তত্র কিলকিলা বিজ্ঞতা ভূমি।

কতীদেব্যাঃ বরেণৈব ভীমভূজবলপুত্রকঃঃ ১৪৭

কুলপালো কেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিমে ভূটে।

কুলপালত মো পুত্রো হরিপালোহিহিপালকোঃঃ ১৪৮

লোভঃ সিদ্ধপশ্চিমে বদ্যামবসতিঃ কৃতঃ।

হরিপালো মহাগ্রামো হটবাসিনসমিতঃঃ ১৪৯

হরিপালো হি তত্রৈব ভদ্রবায়ত বোধিতুঃ।

রাজা বহুব্র বিপ্রো সাধাপিসংজ্ঞকেষু চঃ ১৫০

(খড়বহ) গ্রামের মধ্যে দীর্ঘগঙ্গার (বৃদ্ধিগঙ্গা) নিকট
কুলপাল নামক রাজা বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন,
গঙ্গানদীর তটে অনুপদেশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বার্তীভূমি (?)
আছে। এখানে কদলী, পুরিগা, সুপারি প্রভৃতি গাছ জন্মে।
শ্রীমদালাভব্রহ্মসহ মতে, এখানে ভাগীরথীর তীরে সতীদেবীর
শরীর ছইতে সম্বহতের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। কালীদেবীর
প্রসাদে কিলকিলাবাসীরা ধনধান্যবান্ হইবে। সকল প্রকার

অহিপালো মাহেশে চ রাজ্যং তাজ্য। চ পশ্চিমে।

ত্রিবেণীসরিধানে চ চক্রবীজত সন্নিধৌ।

উমুরবীপমধ্যে চ বসতিঃ কৃতবান্ নৃপ। ১৫১

অহিপালস্য ত্রয় পুত্রাঃ বেৎযোবিত্ত্বজ জন্মিঃ।

কৃতকল্মা বিতাড়ক কেশিকল্মা মহাবলঃঃ ১৫২

পশ্চিমে বোলবাতে চ সপ্তগ্রামস্ত মধ্যতঃ।

নৃপো ভূঁড়া বেৎযাতিং...পপালহঃ ১৫৩

কৃতকল্মস্য তনয়ো বিরলিসংজ্ঞকো বলিঃ।

সুপকিগ্রামমধ্যে চ চকার বসতিঃ সূদাঃ ১৫৪

বিতাড়ো বাণময়ী চ পূর্বাগারে স্থিতঃ স চ।

জগদলে মহাগ্রামে বস্যা বংশোহপি বর্ততেঃ ১৫৫

প্রতাপবিভাতৃপুঙ্গব্য পোদরভূমিপদ্য চ।

গঙ্গাংসহস্রো রাজন্ ইন্দ্রানীঃ বর্ততে নৃপ। ১৫৬

কেশিকল্মা মহাগ্রামে চান্দোল...ভিৎথেরকে।

কারহান্ বহলান্ নীচা রাজ্যক চকারহঃ ১৫৭

তস্য বংশেণ চোৎপন্ন্য ব্রাহ্মীসরিংতটে নৃপ।

তেষাং কারহজাতীনাং মিত্রানীমিত্রি শাসনম্ঃ ১৫৮

শিবপুরং সমারভ্য বাসুকো হি বিজ্ঞান্দঃ।

শ্রীরামকিপুং দিবাং ভদ্রেবরস্য সন্নিধৌঃ ১৫৯

বংশবাতী প্রভৃত্যো হৃগলীমাণ্য বর্ততে।

বলাপি ভট্টনী-নিভাঃ বহতে বাসুকান্তরেঃ ১৬০

হানোহরসংগতঃ চ গঙ্গাং সিলতি সাধরন্।

গলশামিমহাগ্রামো বজ্র রাজা চ ধীবরঃঃ ১৬১

গঙ্গাবহনরোর্মধ্যে পাটলগ্রামবাসিনাম্।

কারহানাং শাসনক বর্ততে অধুনা নৃপ। ১৬২

গোবিন্দাদিপুং সর্বং তথাহি ভট্টগমিকম্।

কালীদেব্যাঃ সমীপে চ শূপালদাহাদিকং নৃপঃ ১৬৩

সারপমিঃ মহাগ্রামঃ...তেষাং শাসনম্।

গ্রামাণাং ত্রিসহস্রক কিলকিলায়ক বর্ততেঃ ১৬৪

কিলকিলামহাতন্ত্রে পটলে প্রথমেহপি চ।

বিদ্রুপং পুন্নিবৃত্ত কিলকিলাবিরম্য চঃ ১৬৫

তত্রঃ কিলকিলাদেশে নবদীপজনাগরে।

তত্র বিজ্ঞানে সারঃ কলোভাবী শরীহৃতঃঃ ১৬৬

তত্রঃ কিলকিলাদেশে গঙ্গাদগ্রামমধ্যতঃ।

হাড়াপিন্ডভিত্তবেহে দিত্যানন্দো ভবিষ্যতিঃ ১৬৭

বিবিধরথকালশে কিলকিলাবিরম্য।

সত্যনি এখানে জন্মে বলিয়া, অনেককে ইহাকে স্বদেশ বলিয়া থাকেন। এখানে সকল বর্ণের লোক মিশ্রিত বাস করে।..... কিলকিলা অমর শব্দ; সাধুগণ ইহার নামাঙ্ককার অর্থ করিয়া থাকেন। এখানকার দেশবাসীদের মধ্যে, সমুদ্র বহনকালে কুর্খ পৃষ্ঠস্থিত মন্দর-পর্বতের ও অনন্তের ভায়ে অভিভূত হইয়া বৈভ্যপনের মোহনের জন্ত নিখাস ভাগ করেন, সেই নিখাসের কজোল বতদূর গিয়াছিল, ততদূর কিলকিলা দেশ। সতীদেবীর বরে মহাবলবান কুলপাল ও দেশপাল ভাগীরথীর পন্ডিতভীরে প্রসিদ্ধ হইয়া ছিলেন। কুলপালের দুই পুত্র, হরিপাল ও অহিপাল। জ্যেষ্ঠ হরিপাল সিংহের পশ্চিমে নিজ নামে হট্টবাসীভূত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণ, তাঁতিগোষ্ঠি ও সাল্লাইদিগের রাজা হইলেন। অহিপাল মাহেশ ছাড়িয়া জিবেশীর নিকট চক্রবীপ (চাকদ) ও ডুমুরদীপ (ডুমুরদ) মধ্যে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। অহিপালের তিন পুত্র, কৃতধ্বজ, বিভাণ্ড ও মহাবল কেশধ্বজ। (তিনি) কিলকিলার পশ্চিমে বোঁলনান্তরে সপ্তগ্রাম মধ্যে রাজা হইয়া 'বেঘ'(৭) জাতিকে পালন করিতে লাগিলেন। কৃতধ্বজের পুত্র মহাবল বিরলি জুগন্ধি নামক গ্রামে বস-বাস করেন। বিভাণ্ড পূর্বপারে বাণরাজার মন্ত্রী হইয়া-ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা লগধলে বাস করিতেছেন। সম্ভ্রতি বংশেরাজ প্রতাপাদিত্য ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বস্থান সমূহের রাজা হইয়াছেন। রাজা কেশধ্বজ চান্দোল নামক স্থানে নানা স্থান হইতে কারহ আনাইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখন ব্রাহ্মীনদীর তীরে সেই কেশধ্বজের বংশোদ্ভব কারহগণ রাজত্ব করিতেছেন। শিবপুর ও বালুকা (বালি) গ্রামের মধ্যে এবং তন্ত্রের নিকট শ্রীমদপুরাদি গ্রামে ব্রাহ্মণজাতির বাস। হগলীর নিকট বংশবাটী (বংশবেড়িয়া) প্রভৃতি গ্রাম, এখানে খলাশিনদী দামোদর হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। খলশানি গ্রামে দীঘর রাজার রাজত্ব। এক্ষণে গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যে পাটলগ্রাম—কারহ অধিবাসীদের অধীন। গোবিন্দপুরাদি গ্রাম, তটপল্লি, কালী-দেবীর নিকটস্থ শৃগালদাহ (শিরালদা) এবং সারপল্লি ও কারহ-দিগের শাসনে আছে। সর্বমুদ্র ৩০০০ গ্রাম কিলকিলার অন্তর্গত। বিশ্বসারতন্ত্রে প্রথম পটলে কিলকিলাস্থ শিবলিঙ্গের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। ঐ তন্ত্রমতে কিলকিলাদেশে নব-দীপ নগরে ব্রাহ্মণবংশে শতীভূত (চৈতন্যদেব) এবং ঋতুদ গ্রামে হাফাই পণ্ডিতের বরে নিত্যানন্দ জন্ম গ্রহণ করিবেন।

বাহা হউক স্বকবরের সময়ের পরে যে সময়ে ইংরাজ-গণ কলিকাতার পর্যায়ণ করেন, সে সময়ে কলিকাতার

অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। কিলকিলাবংশাবলী-চরিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মদীরার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কলিকাতা তাঁহার জমিদারীভূক্ত ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাজালার সুবাদার নবাব আলীবর্দী খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। উক্ত রাজার নিকট তাঁহার পিতৃপিতামহের সম-য়ের দের রাজত্বের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা নবাবের পণ্ডনা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঐ টাকা রেহাই পাইবার জন্য নবাবের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। একদা নবাব জলপথে নৌকারোহণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। ভাগীরথী-তীরস্থ অস্ত্রাস্ত্রগ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে নবাবের তরঙ্গী কলিকাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময়ে এখানে একখানি অতি সামান্য গলী ছিল। পূর্ব ও দক্ষিণাংশ এককালে জলাভূমি, বাদা ও বনে আচ্ছন্ন ছিল, কেবল ইহার উত্তরাংশে গঙ্গার ধারে কতকগুলি লোকের বসতি ছিল মাত্র। তৎকালে মুরশিদাবাদ ও কলিকাতার মধ্যে ভাগীরথীর পূর্বতটে কোন গ্রাম বা নগরের নিকট এমন বন ছিল না; এই কারণে মুরচুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার জমী-দারীর ছরবস্থা নবাবের ছরমজম করিয়া দিবার অতিপ্রায়ে ঐ প্রদেশ দেখাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। নবাব আলীবর্দী রাজার একান্ত অমরোহ এড়াইতে না পারিয়া জমীদারীর অবস্থা নিজ চক্ষে দেখিবার জন্য বহির্গত হইলেন। লোকালয় অতিক্রম করিয়া বত দূর বাইতে লাগিলেন, ততদূর কেবল অরণ্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এই সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষাগত নবাবের সঙ্গীগণ 'এখানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তর ভয় আছে' প্রভৃতি নানা প্রকার ভয়ের কথা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন। রাজাও সময় বুঝিয়া সজলনয়নে ও কাতর বচনে নিবেদন করিলেন, 'ধর্ম্মাবতার! যদি সৌভাগ্যক্রমে কৃপা করিয়া বিশেষ কষ্ট স্বীকারপূর্বক এতদূর আসিয়াছেন, তবে আর কিছু দূর চলুন, তাহা হইলে সেবকের জমীদারীর যে কিরূপ অবস্থা তাহা জানিতে আর কিছু বাকী থাকিবে না।' নবাব উত্তর করিলেন, 'কৃষ্ণচন্দ্র! আর অধিক দূর যাইবার আবশ্যক নাই, বখেট হইয়াছে, অন্য হইতে তোমাকে তোমার পিতৃ-পিতামহের খণদার হইতে মুক্ত করা গেল।' (৬) ইহা হইতেই তৎকালে কলিকাতার কিরূপ ছরবস্থা ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

(৬) কাঙ্ক্ষিকচন্দ্র রায় এণ্ডিও কিলকিলা-বংশাবলী চরিত ১০০ হইতে ১০১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখ।

কলিকাতার ইংরাজগণ, তৎকালীন ভূতত্ত্ব ও আনুমানিক ইতিহাস।—বাংলা-প্রদেশে ইংরাজদিগের প্রথম কুঠি স্থাপিত হয় বালেশ্বরের নিকট পিপ্পলিতে, তৎপরে কিছুদিন নানা গোলমালে পড়িয়া ইংরাজেরা বাংলায় আপনাদের বাণিজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন নাই। সূর্য্যটের ইংরাজকুঠির অধীনস্থ “হোপওয়েল” নামক জাহাজের শত্রুচিকিৎসক মিঃ গেব্রিয়েল বাউটন সম্রাট শাহজাহানের একটা কস্তার হারারোগ্য অগ্নিদগ্ধকৃত আরোগ্য করায় তিনি ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে পুরস্কারস্বরূপ একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সনন্দে ইংরাজদিগকে দিল্লীসাম্রাজ্যের সর্বত্র বিনা শুষ্ক বাণিজ্য করিতে এবং বঙ্গদেশে তাঁহাদিগের ইচ্ছামত সকলস্থলে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। এই সনন্দের বলে ইংরাজেরা নবাব সায়ের্ত্তা খাঁর সময়ে হুগলিতে কুঠি করিয়া হুগলী, পাটনা, বালেশ্বর, কাশিম-বাগার, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে বিপুল উৎসাহে বহু বিস্তৃত বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে কিন্তু বাংলায় ইহাদের প্রতি কুঠিতে একজন এনসাইন ও বিশজন রক্ষী সৈন্য ব্যতীত আর কোনরূপ সামরিক বল ছিল না। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে ইংরাজ বণিকেরা বাংলায় বাণিজ্য সম্বন্ধে বেশ প্রবল হইয়া উঠিলেন। বাংলার নবাব ইহাতে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া বলে ছলে ইংরাজ বণিকদলকে শাসনে রাখিবার জন্ত নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে ইংরাজেরা নবাবের অত্যাচারে একান্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। নবাব সম্রাটের সনন্দ উপেক্ষা করিয়া নানাহারে ইংরাজদিগের নিকট শুদ্ধ আদার করিতে লাগিলেন। ইংরাজ বণিকদিগের প্রশ্ন ওষ্ঠাগত হইয়া পড়িল; তাহারা কোর্ট অব্ ডিরেক্টরদিগকে জানাইলেন। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা ইংলণ্ডের অল্পমতি লইয়া তাঁহাদের বাণিজ্যতরীগুলিকে দুইটি বহরে (Fleet) ভাগ করিয়া একটি সূর্য্যটে ও অপরটি গঙ্গার মোহানায় প্রেরণ করিলেন। যেটি গঙ্গার মোহানায় আসিল, তাহাতে ৬০০ শত সূর্য্যপীণ শিক্ত সৈন্য ছিল।

কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা কোম্পানীর গোমস্তা জব চার্লসকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, বাংলায় যত ইংরাজ আছে, সকলে একত্র হইয়া একত্র ভাবে প্রস্তুত থাকিবে যে, বালেশ্বরে জাহাজের বহর পহুঁছিলেই তাহারা সকলেই যেন জাহাজে উঠিতে পারে। জাহাজের বহরের অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ ছিল যে, তিনি বালেশ্বরে ইংরাজগণকে উঠাইয়া লইয়া চট্টগ্রাম নগর আক্রমণ ও তথায় আত্মরক্ষণোপযোগী দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া ইংরাজদিগকে স্থাপন করিবেন।

জাহাজের বহর আসিয়া পহুঁছিলে কিছু বিলম্ব হইল। খুঁটাকের অষ্টোবর মাসে বহর আসিয়া নদীর মুখে পহুঁছিল। জব চার্লস তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাইয়া বহরের অধ্যক্ষকে সদলে হুগলীর নিরে আসিতে লিখিলেন এবং নিজ হুগলীর কুঠির অধীনে একটি পর্তুগীজ পদাতি-দল প্রস্তুত করিয়া লইলেন। নবাব সায়ের্ত্তা খাঁ এ সংবাদে ভীত হইয়া জব চার্লসের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

নবাব সন্ধির প্রস্তাব করিলেন বটে, কিন্তু পাছে যুদ্ধ বাধে, এই আশঙ্কায় তিনিও সুবাদালির চতুর্দিক্ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সৈন্য-দল কোলদারের অধীনে থাকিবার জন্ত হুগলীতে প্রেরিত হইল। ইতিমধ্যে যখন একটা মীমাংসা হইবার কথাবার্তা চলিতেছিল, সেই সময়ে একদিন (১৬৮৬, ২৮এ অষ্টোবর) হুগলীর বাংলার ইংরাজগণের কয়েকজন সৈনিকের সহিত নবাবের কয়েক জন সৈনিকের বিবাদ হয়। এই সূত্রে ৩ জন ইংরাজ মারা পড়ে; সুতরাং একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধে। কয়েকঘণ্টা যুদ্ধের পর নবাবসৈন্য বিশৃঙ্খলতা বশতঃ ইংরাজসৈন্যের নিকট পরাস্ত হইল। বাংলাদেশে ইংরাজনবাবে ইহাই সর্বপ্রথম যুদ্ধ। ইংরাজেরা জরী হইয়া হুগলীনগর আক্রমণ করিলেন। জাহাজের বহরের অধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল নিকলসন জাহাজ হইতে নগরের উপরে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হুগলীর প্রায় ৫০০ শত গৃহ বিনষ্ট হইল। ইংরাজেরা নগর লুণ্ঠন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে জব চার্লস দৃঢ়রূপে নিবারণ করিয়া রাখিলেন। (এই নিবারণ করার জন্ত তিনি শেষে ডিরেক্টরদিগের নিকট তিরস্কৃত হন; কারণ, তাহারা বলেন যে, যদি ইংরাজসৈন্য নগর লুণ্ঠন করিতে পাইত, তাহা হইলে নবাবসৈন্য ও দেশীয় লোকেরা ইংরাজের প্রভাব বৃদ্ধিতে পারিত। *)

ইংরাজসৈন্য জরী হইল, কিন্তু যুদ্ধ ছাড়িল। ফৌজদার ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি হইল যে, যে পর্য্যন্ত সম্রাটের নিকট হইতে নতন করমাণ না আসে, ততদিন ইংরাজেরা পূর্বে সনন্দানুসারে বাণিজ্য করিতে পাইবেন ও নবাব তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের জন্ত ৪৬ লক্ষ টাকা দিবেন। সন্ধি করিয়া মুসলমানেরা ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। নবাব ঢাকা, মালদহ, পাটনা ও কাশিমবাগারের কুঠিগুলি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া, সেই

* Vide (a) Stewart's History of Bengal, (b) Broom's History of the Rise and Progress of the Bengal Army and (c) Cook's Monthly Mail and Indian Advertiser Vol. I or VIII.

সকল স্থানের অধ্যক্ষগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তৎপরে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নবাব সৈয়দসংগ্রহ করিয়া হুগলীতে প্রেরণ করিলেন।

ইংরাজগণ এই সৈয়দসংগ্রহ দেখিয়া পরামর্শ করিলেন যে, হুগলীতে থাকিয়া এইরূপ নিত্য উৎপীড়িত ও অতি-গ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা এ স্থান হইতে প্রধান কুঠী উঠাইয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত। স্থান অস্থগমন হইতে লাগিল। শেষে হুগলীর করেক ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার পূর্ণপারে হুতা-ছুটি নামক স্থানই স্থির হইল। এই স্থানটি অনেক কারণে ইংরাজের পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হইল; কারণ, এই সময়ে গঙ্গার পশ্চিমতীরে চন্দননগরে ফরাসীরা ও চুঁচড়ায় ওলন্দাজেরা কুঠীস্থাপন করিয়া সমুদ্রের নৈকট্যবশতঃ আপনাদিগের বাণিজ্যব্যবসায় যেরূপ বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিল; তাহাতে ইংরাজেরাও বুঝিয়াছিলেন যে, গঙ্গার দক্ষিণাংশে কোন একস্থলে বাণিজ্যের প্রধান কুঠী স্থাপিত করিয়া সমুদ্র গমনাগমনের সুবিধা করিতে পারিলে, তাঁহাদেরও বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইবে। হুগলী যদিও তৎকালে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল বটে, তথাপি সাগর হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া বিদেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধাকর ছিল না। পূর্বোক্ত নবাবী অত্যাচার ও বাণিজ্যতরীর গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা ব্যতীত মহারাজ্জিদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্তও ইংরাজেরা একেবারে গঙ্গার পশ্চিমকূল ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। (১)

হুতাছুটি স্থানটি ইংরাজের নিকট অনেক পূর্ষ হইতে পরিচিত ছিল। বঙ্গোপসাগর হইতে হুগলী যাতায়াতের সময় গঙ্গার উভয়কূলের সকল স্থানই ইংরাজেরা বিশেষরূপে জানিয়া শুনিয়া রাখিয়াছিলেন। হুগলী পরিত্যাগের পরামর্শ স্থির হইলে, স্থানাস্থগমনের সময়ে তাহারা দেখিলেন যে, যদি হুতাছুটিতে প্রধান কুঠী করা যায়, তাহা হইলে অনেকগুলি সুবিধা হয় :—

প্রথমতঃ—হুগলীর ফৌজদারের সহিত সর্কসী সংঘর্ষ থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ—ভাগীরথীর গর্ভ দিন দিন যেরূপ মুক্তিকাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আর কিয়দিন পরে হুগলীর নিয়ে জাহাজ লইয়া যাওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। হুতাছুটিতে সে আশঙ্কা একেবারে থাকিবে না। তৃতীয়তঃ—ফরাসী জাতির সহিত ইংরাজের শত্রুতা যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধয় হইতেছে, তাহাতে চন্দননগর হইয়া বড় বড়

বাণিজ্যতরী হুগলী লইয়া যাওয়া বিধম ভয়ের কথা। হুতাছুটি চুঁচড়া ও চন্দননগরের দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া সে ভয়ের সম্ভাবনা নাই। চতুর্থতঃ—সমুদ্র নিকট হইবে। পঞ্চমতঃ—হুতাছুটি গঙ্গার পূর্ণ পারে অবস্থিত বলিয়া মহারাজ্জিদিগের উপদ্রবের ভয় থাকিবে না। ষষ্ঠতঃ—একেবারে জাহাজেই গণ্য জব্যাদি উঠান ও নামান হইবে। সপ্তমতঃ—যে সকল বৃহদাকার জাহাজ গঙ্গার আসিতে পারিবে না, তাহা বঙ্গোপসাগরে নজর করিয়া রাখিলেও সান্নিধ্যবশতঃ কোন অসুবিধা হইবে না। অষ্টমতঃ—গঙ্গানদী পূর্ববঙ্গের অস্ত্রাজ্য নদীর জায় বজা প্রবলা নহে। নবমতঃ—হুতাছুটির নিকটবর্তী স্থানে অনেকগুলি বহু জনাকীর্ণ গ্রাম আছে; সুতরাং ব্যবসায় ও বসবাসের সুবিধা হইবে। দশমতঃ—হুতাছুটিতে এ সময়ে তত্ত্বাবয়জাতির অধিক বাস ছিল। ইহারা বজ্রবরন ও হুত্র-প্রস্তুতকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সুতরাং ইহাঙ্গিকে কুঠীর অধীনে রাখিয়া বজ্রের ব্যবসায় চালাইতে পারিলেও বিশেষ লাভবান হওয়া যাইবে।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ ডিসেম্বর তারিখে জব চার্ণক হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বাণিজ্যব্যবসা ও ইংরাজের যাবতীয় কর্মচারী লইয়া হুতাছুটিতে পঁহুছিলেন। যেখানে জব চার্ণক প্রথম অবতরণ করেন সেই ঘাটকে তখন “হুতাছুটি ঘাট” বলিত (১)। হুতাছুটিতে এ সময়ে একটি ভুলা, হুতা ও বজ্রের চাঁট হইত, এই চাঁটের সম্মুখেই এই ঘাটটি ছিল। কোম্পানীর অমুদ্রিত কাগজপত্রের সহিত যে মানচিত্র আছে, তাহাতে যে স্থানে হুতাছুটি ঘাটের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এখনকার আইরীটোলা ঘাটের উত্তর-পূর্বে চাপাতলা এবং রথতলাঘাটের নিকটস্থ কোন একস্থান হইতে পারে; তবে সে ঘাটের বর্ধাৎ অবস্থান এখন অনেকটা পূর্বাংশে নগরগর্ভে পড়িয়া গিয়াছে।

যে হাট ও ঘাটের কথা বলা হইল, ইহা বর্তমান বড় বাজারের শেঠ ও বসাকদিগের যন্ত্রে নির্মিত হয় বলিয়া

(১) Vide Map attached to the Selections from Unpublished Records of Government.

* বসাকেরা বলিয়া থাকেন যে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে বাজার প্রাধান্য বাণিজ্যক্ষেত্র সমগ্রায়ের নীচে সরষতী নদীর—(বাহা এক্ষণে আশুল, মহিষাড়া ও রাজপুত্রের নির দিয়া আসিয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে ইহা এক্ষণে সরষতী খালী নামে খ্যাত। ত্রিবেণীর নিয়ে এই সরষতীর গোড়ারদিকের কতকাংশ আছে। তৎপরে আদিগঙ্গার ন্যায় ইহারও দুর্দশা হইয়াছে। আদি গঙ্গার স্থানে স্থানে বুঝিয়া গিয়া যেমন “বোবের গঙ্গা” “বোসের গঙ্গা” নামে পুঙ্করূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ, মাকড়স, জমাই প্রভৃতি গ্রামের নীচে সরষতী-নদীর পুরাতন গর্ভ-বিনষ্ট পুঙ্করূপ ও চিহ্নাধি দেখা যায়।)—স্রোত কমিয়া গেলে হুগলী-সহর

(১) Vide “Some Observation and Remarks on a late Publication entitled Travels in Europe, Asia and Africa”—by J. Price.

প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। সে সময় হুতাশুটি ও তদ্বন্ধিণ-বর্তী কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক দুইখানি গ্রামে ইহা-দের বসবাস ছিল।

জব চার্ণক দলবল লইয়া হুতাশুটিতে* পহুছিয়া ঘাটের কিক্কিদ্ধিণে একটি বৃহৎ নিষবৃক্ষের তলে কুঠীরাদি নির্মাণ করিয়া বাস করেন। এই নিষবৃক্ষের তলা হইতেই বর্তমান “নিমতলা” নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে। সেদিন (১৮৮৩) নিমতলার আনন্দময়ীর মন্দিরের নিকট অগ্নিদাহে যে প্রাচীন নিষবৃক্ষটি পুড়িয়া গিয়াছে, সেটি চার্ণকের সময়ের বৃক্ষ নহে; কারণ সে সময়ে ঐ স্থানের ভূমির উৎপত্তি হয় নাই, উহা তখন গঙ্গাগর্ভে ছিল।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জব চার্ণক সংবাদ পাইলেন যে, নবাব সায়েস্তা খাঁর সেনাপতি আবদুল সমদ খাঁ বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হুগলীতে

বাঙ্গালার সর্বাঙ্গিক প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠে, সেই সময়ে শেঠ-দিগের একজন ও বসাকদিগের ৪ জন আদিপুরুষ হুতাশুটির দক্ষিণে গোবিন্দপুরগ্রামে আসিয়া বাস করেন। বসাকেরা বলেন যে, যুরোপীয়-গণের সহিত বাণিজ্য করিবার লোভেই তাঁহারা এখানে আসেন, কিন্তু তাহা যুক্তিসিদ্ধ অনুমান বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, তাহা হইলে তাঁহারা তৎকালের বাণিজ্যক্ষেত্র হুগলী বা তন্নিকটবর্তী স্থানে না থাকিয়া এতদূরে আসিয়া বাস করিবেন কেন? আর বর্তমান শেঠ বংশধরেরা ইহাদের আদিপুরুষ মুন্সুরাম শেঠ হইতে ১৭শ পুরুষ এবং কালিদাস বসাকের বংশধরেরা ১৬শ পুরুষ এবং অন্য তিনজন বসাকের বংশধরেরা ১৫শ পুরুষ অধস্তন। এই বংশাবলী আলোচনা করিলে জানা যায় যে সময়ে ইহাদের আদিপুরুষেরা (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে) এখানে আসেন, তখন সপ্তগ্রামের তেমন হীনাবস্থা হয় নাই, তখনও সপ্ত-গ্রামে বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। তবে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, স্বদেশে কোন বিশিষ্ট কারণে উৎপীড়িত বা বিরক্ত হইয়া আত্মীয় বান্ধবের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্যই বোধ হয়, তাঁহারা এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ তৎকালে কলিকাতা যে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। অতএব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যপ্রাণী এখানে আসাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

* হুতাশুটির নাম যুরোপীয়গণ কতদিন হইতে অবগত হইয়াছেন, তাহা ঠিক করিবার কোন কাগজপত্র নাই, কেবল ভালেটিন নামক ওলন্দাজ সাহেবের সঙ্কলিত ১৬২৬ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে হুতাশুটি স্থলে “চিটানুটি” (Chittanutte) লিখিত আছে, আর কর্ণেল ইউল “ইতিয়া-হাউসের” পুরাতন কাগজপত্র পর্যবেক্ষণের সময়ে কয়েকখানি অতি পুরাতন চিঠিপত্র পান। তাহার মধ্যে একখানি হুতাশুটি হইতে ১৬৮৬ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে লিখিত হয় এবং তাঁহার পুস্তক হইতে জানা যায় যে, ইংরাজেরাও ১৬৮৬ সালের পূর্বে এই স্থানটি জানিতেন, কারণ, ইউল সাহেব বলেন যে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের “ইংলিস পাইলট ও প্রাচীন সমুদ্র যাত্রীর মানচিত্রে” হুতাশুটির উল্লেখ আছে।

উপস্থিত হইয়াছেন, দেশ হইতে ইংরাজ উচ্ছেদ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই সংবাদ পাইয়াই চার্ণক বুঝিলেন যে আর এখন হুতাশুটিতে থাকাও যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, বাঙ্গালার নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবার মত তাঁহার সৈন্যবল নাই, আর এরূপ অরক্ষিত স্থানও সেসকল বৃহৎ যুদ্ধের উপযোগী নহে। এই স্থির করিয়া তিনি আবার সদলে হুতাশুটি ত্যাগ করিয়া গঙ্গানদীর মোহানায় হিজলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার গঙ্গার পশ্চিমকূলে হুতাশুটির ৫ ক্রোশ দক্ষিণে “টানা” নামক স্থানের দুর্গ অধিকার করিলেন। পরে যতই দক্ষিণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই নদীতীরস্থ মুসলমানদিগের অধিকৃত স্থানের লবণের এবং শস্তের গোলা লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। নদীগর্ভে মুসলমানদিগের যে সকল নৌকা দেখিতে পাইলেন, তাহাও হস্তগত করিয়া আপনাদের জাহাজগুলির মধ্যে কতকগুলিকে বালেষ্বরে পাঠাইয়া দিলেন এবং দেশীয় বণিক-গণের ৪০ খানি তরগী পোড়াইয়া দিলেন।

এ সময়ে হিজলী একটি দ্বীপের মত ছিল, পশ্চিমদিকে একটি ক্ষুদ্র খাঁড়ি ছিল, স্তরং হিজলী আসিতে হইলে নৌকা ব্যতীত আর কোন উপায়ই ছিল না। সে সময়ে এখানে লোকের বাস ছিল না বলিলেই চলে, চারিদিকে বড় বড় বন আর তাহাতে ব্যাঘ্রের বাস ছিল। প্রকৃতপক্ষে নবাবের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্তই ইংরাজেরা এই স্থানটি মনোনীত করেন।

জব চার্ণক হিজলীতে সদলে অবতীর্ণ হইয়া বন কাটা-ইয়া চতুর্দিকে কামানাদি স্থাপন করিলেন এবং গঙ্গার উপর সমস্ত জাহাজাদি রাখিয়া মোহানা আটকাইয়া বসিয়া রহিলেন; কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। হিজলীতে এক বিন্দুও পানোপযোগী পরিষ্কার জল পাওয়া যাইত না, তাহার উপর দক্ষিণে লোণাবাস্তাসে সমস্ত ইংরাজসৈন্য পীড়িত হইল এবং জলাভাবে অধিকাংশ মুহাম্মদে পড়িল; বাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা পীড়ায় এরূপ কাতর হইয়া পড়িল যে, তাহাদের জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইল। শুভাদৃষ্টক্ৰমে নবাব সায়েস্তা খাঁ এই সময়ে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। চার্ণক ক্রটিমনে সন্ধি করিলেন। সন্ধিতে ইংরাজেরা সকল স্থানের কুঠীগুলি ফিরিয়া পাইলেন, সমুদ্র হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে “উল্বেড়িয়াতে” ডক ও গোলা করিবার অনুমতি পাইলেন, ইহাদের বাণিজ্য বিনাশকে চলিতে লাগিল, কেবল মুসলমানদিগের যে নৌকাগুলি ইহারা হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহাই ফিরাইয়া দিলেন।

নবাবের হঠাৎ একরূপ সন্ধি করিবার কারণ ছিল। অ্যাডমিরাল নিকলসন যিনি হুগলীতে বহর লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি ইংলণ্ড হইতে চট্টগ্রাম ও সমস্ত মুসলমান নৌকা অধিকার করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। নবাব এই সংবাদ শুনিয়া এত শীঘ্র সন্ধি করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে জব চার্ণক উলুবেড়িয়ার ডক নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পীড়িত সৈন্য ও ইংরাজগণকে হুতাহুতিতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার আসিয়া কুঠীর বাস করিতে লাগিল। এমন সময়ে মালাবারে ইংরাজ ও মোগল-সেনার যুদ্ধ বাধে, হুতরাং সারেন্তা খাঁর মনে আবার ইংরাজ-পীড়নের কথা জাগিল। তিনি হুতাহুতি ত্যাগ করিয়া ইংরাজ-দিগকে হুগলীতে আসিতে আদেশ পাঠাইলেন এবং তাঁহা-দিগের সহিত গোলাশালে তাঁহার রাজ্যের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া যথেষ্ট টাকা চাহিলেন এবং নিজ সৈন্যদিগকে ইংরাজের যথা সর্ব্বশ্রু লুণ্ঠনের আদেশ দিলেন। চার্ণকের তখন একরূপ অবস্থায় যে তিনি টাকা দিতে বা যুদ্ধ করিতে পারেন না এবং বুঝিলেন যে হুগলীতে কিরিয়া বাওয়া কোনক্রমে সম্ভব নহে। কাজেই তাঁহার আদেশ মত দুইজন ইংরাজ কুঠীয়াল নবাবকে কথায় ভুলাইয়া এই অত্যাচার নিবারণের জন্য চাকায় উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা নিকলসনের অকৃতকার্য্যভায় ক্রুদ্ধ হইয়া কাপ্তেন হিদকে ৬৪টি কামান ও ১৬০ জন ইংরাজসৈন্য সহ বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। হিদের উপর আদেশ রহিল যে, তিনি হয় উপযুক্ত নিয়মে যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্য বজায় রাখিবেন, নতুবা বাঙ্গালার সমস্ত ইংরাজসৈন্য ও কুঠীয়াল-গণকে মাস্ত্রাজে গর্হছাইয়া দিয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবেন।

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হিদ আসিয়া হুতাহুতি পছন্দিলেন। এ সময়ে চার্ণক পূর্ব্বোক্ত দুইজন কুঠীয়ালকে নবাবের নিকট চাকায় পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি নবাব কতকটা কথা গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হুতাহুতিবাসের ও তথায় জমী খরিদ করিয়া আবাসাদি নির্মাণের অমুমতি আনিতে হইবে। এই অবস্থায় হিদ হুতাহুতিতে উপস্থিত হইয়া নবাবের ব্যবহারের কথা শুনিলেন এবং নিজে উদ্ধত স্বভাবের লোক বলিয়া তৎক্ষণাৎ চার্ণকের অনভিমতেও যুদ্ধ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং কোম্পানীর সমস্ত কুঠী-রাল ও লোকজনকে লইয়া বালেশ্বরভিমুখে গমন করিলেন। বালেশ্বরের শাসনকর্ত্তা নবাবের হইয়া সন্ধি করিতে চাহিলেন,

কিন্তু হিদ শুনিলেন না। তখন সেই শাসনকর্ত্তা বালেশ্বরের ইংরাজ কুঠীর দুইজন কুঠীয়ালকে জামীন স্বরূপে বন্দী করিলেন। এই সময়ে চাকায় নবাবের নিকট পূর্ব্বপ্রেরিত দুই জন ও অল্প দুই কুঠীয়াল দুইজন ইংরাজ কুঠীয়াল এবং বালেশ্বরের এই বন্দীদ্বয় বাতীত আর সকলেই হিদের জাহাজে ছিলেন। হিদ উক্ত ৬ জনের প্রাণের আশঙ্কা সত্ত্বেও সৈন্যসামন্ত লইয়া বালেশ্বর আক্রমণ করিলেন। যে দিন বালেশ্বর আক্রমণ করা হইল, সেইদিনই চাকার দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, নবাবসৈন্য ইংরাজের অধীনে আরাকান অধিকার করিবে। হিদ চট্টগ্রাম দখলে সম্ভাবনা দেখিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর তিনি বালেশ্বর ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চট্টগ্রাম সুরক্ষিত দেখিয়া আরাকানরাজকে হস্তগত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজার উত্তর দিতে বিলম্ব দেখিয়া স্মরণ চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়া পূর্ব্বোক্ত ৬ জনকে বাঙ্গালায় ফেলিয়া অন্য সকলকে মাস্ত্রাজে রাখিয়া আসিবার জন্য ১৩ ফেব্রুয়ারী যাত্রা করিলেন।

এ দিকে অরঙ্গজেব এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া দেশ হইতে ইংরাজ তাড়াইয়া দিতে আদেশ দিলেন। নানা অত্যাচার ঘটিল। এদিকে সারেন্তা খাঁ বুদ্ধবয়সে আগরায় গিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। আলীমর্দন খাঁর পুত্র ইব্রাহিম খাঁ নবাব হইলেন। ইব্রাহিম বড় দয়ালু। তিনি নবাব হইয়াই বন্দী ইংরাজ ৬ জনকে ছাড়িয়া দিলেন ও সম্রাটের আদেশ আনাইয়া ইংরাজগণকে বঙ্গদেশে আসিবার জন্য চার্ণককে পত্র লিখিলেন।

ইংরাজগণ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯এ আগষ্ট তারিখে হুতাহুতিতে আসিয়া স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে থাকেন। সাম্রাজিক কোষে বাৎসরিক ৩০০০ মুদ্রা সরবরাহ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালার নানস্থানে কুঠী-স্থাপন ও ব্যবসা বাণিজ্য করিবার জন্ত, ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে (আল হিজরি ১০০২) জব চার্ণক নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট হইতে সম্রাট প্রদত্ত ‘হুম্বুল হুকুম’ প্রাপ্ত হন। ইংরাজগণ হুতাহুতিতে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অমুমতি পাইলেন বটে, কিন্তু উক্ত স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিবার আজ্ঞা পাইলেন না। (১) এই ঘটনার পর ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের জাহুয়ারী মাসের ১০ই দিবসে চার্ণকের মৃত্যু হয়। কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, চার্ণকের জীবন কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাম্রাজ্য হইতে পৃথক থাকিরা ব্যবসায়

কার্য্য করিবে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর পুনরায় কোর্ট সেক্রেটারীর (সাক্ষ্যের) অধীনস্থ হইবে। (২)

চার্জের মৃত্যুর পর বাঙ্গালা পুনর্বার সাক্ষ্যের অধীন হইল এবং ইলিস সাহেব চার্জের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কমিসারী-জেনারল ও সুপারভাইজার তাঁহাকে পৌণ্ড-বরকে কার্য্যে সন্তুষ্ট করিতে না পারায় তাঁহার পক্ষে ঢাকা-স্থিত কুঠীর অধ্যক্ষ আয়ার সাহেব নিযুক্ত হইলেন।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের আজ্ঞামুতাবে হুতাছুটি বাঙ্গালার প্রধান এজেন্টের বাসস্থান রূপে নির্দিষ্ট হয়। এই বৎসর হুতাছুটিতে ২০০০ মুদ্রা শুদ্ধ হিসাবে আদায় হইরাছিল।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে একটি ঘটনায় যুরোপীয় বণিকদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। শেঁতাঙ্গিহ নামক জনৈক বর্দ্ধমানের তালুকদার উক্ত স্থানের রাজাকে নিহত করিবার হিম্মত নামক উড়িষ্যার পাঠান সর্দারের সাহায্যে বাঙ্গালার সুবাদারের বিপক্ষে বিজোহানল প্রজ্জলিত করেন। এই রাজপ্রোহ দমন করিবার জন্য বশোরের কোজনার নূর উল্লাহ উপর ভার দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত কোজনার ভীকৃতাবশতঃ হগলীর কেল্লা হইতে পলায়ন করেন। এই সুবিধা পাইয়া বিজোহীগ হগলীনগর দখল করিল। শেঁতাঙ্গিহ বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবারও অনেকটা সুবিধা করিয়াছিলেন। বাহা হউক, এই সুযোগে পাইয়া ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী প্রভৃতি যুরোপীয় বণিকগণ আপনাদিগের উপনিবেশ শক্ত হইতে রক্ষণোপযোগী করিবার জন্য নবাবের নিকট হইতে অহুমতি পাইলেন। ফলে এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজগণ দুর্গ নির্মাণে প্রথম উদ্যোগী হইলেন। তৎকালীন ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়মের নামামুতাবে “ফোর্ট উইলিয়ম” নামক দুর্গ নির্মিত হইল। (৩)

উপরোক্ত ঘটনায় সম্রাট অরঙ্গজেব বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পোত্র আজিম উদ্দৌলাকে বাঙ্গালার সুবাদার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ মুদ্রা ও বিবিধ মূল্যবান উপচৌকনাদি প্রদানে প্রীতি সম্পাদন করিয়া, আজিম উদ্দৌলার নিকট হইতে হুতাছুটি, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করিলেন।

এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করিবার বিশেষ কারণ ঘটিল। এ সময়ে ইংরাজগণ দিন দিন হুতাছুটিতেই আপনাদিগের বাণিজ্যস্থান করিবার অভিপ্রায়ে আয়োজন করিয়া আসিতে-ছিলেন, অথচ তৎপূর্ব্বাবধি জমী পাইতেছিলেন না। জমীদারের খাজনা দিয়া তাঁহার উপর এরূপ বহুবিষ্মত কারবার করা সুবিধাজনক নহে, অথচ নবাবের হুকুম না পাইলেও জমী ধরিদ করা হয় না, সুতরাং তাঁহার অর্থলোপ আজিম উদ্দৌলার নিকট অর্থে বশীভূত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আজিম বর্দ্ধমানে ছিলেন। ওলন্দাজেরা ইংরাজের ভার বিনাশকে বাণিজ্য করিবার আশায় তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিল। ইংরাজেরা তাহারই প্রতিবাদ এবং জমীক্রয় ও কতিপূর্ণগণির বন্দোবস্ত করিবার জন্য মিঃ ওয়ালস্ নামক একজন বিচক্ষণ কর্মচারীকে পাঠাইলেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের জাম্বারীমাসে ওয়ালস্ আজিমের শিবিরে উপস্থিত হইয়া জুলাই মাসের মধ্যে নানাবিধ অর্থাদি দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিলেন। আদেশপত্রখানি তৎক্ষণাৎ হুতাছুটিতে প্রেরিত হইল, কিন্তু তখনকার হুতাছুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমীদারেরা অহুমতিপত্রে দেওয়ানের সহি নাই বলিয়া বিক্রয়ে অসম্মত হইলেন। অবশেষে ১৭০০ সালের জাম্বারীমাসে দেওয়ানের সহি করাইয়া অহুমতিপত্র উপস্থিত করিলে জমীদারেরা ওজর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

বিভাগিসাহেব বলেন যে ঐ ক্রীতস্থানের বিস্তৃতি নদীর ধারে (ভাগীরথীর) লম্বায় তিন মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল

হইখানি গ্রাম গঙ্গাতীরে ছিল। আইন-ই অকবরী গ্রন্থে যেখানে সরকার সাতগাঁর মধ্যে “কলিকাতা” নামক মহলের উল্লেখ আছে, সেখানে হুতাছুটি বা গোবিন্দপুরের নাম নাই, কিন্তু কলিকাতার সহিত ঐক বন্ধনীতে বারাকপুর ও বকরা নামক আর দুইটি মহলের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ দুইটিই হুতাছুটি বা গোবিন্দপুরের পরিবর্তিত নাম কিনা তাহা নিরূপিত হই নাই। পূর্বে যে ওলন্দাজ ভ্যালেন্টাইন সাহেবের মানচিত্রের কথা বলি হইয়াছে, তাহাতে গোবিন্দপুরের স্থলে পোরবপুর লিখিত হইয়াছে। আইন-ই অকবরী ভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মণ্ডে গোবিন্দপুরের নাম দৃষ্ট হয় এবং সে গোবিন্দপুরে, এই ভাগীরথীতীরস্থ গোবিন্দপুর তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাহাতে আছে যে—

“ভারিগুপ্রদেশ চ বর্গভীমা বিরাজত।

গোবিন্দপুরস্থানে চ কালী হরধনীতে।”

এতদ্ব্যতীত পূর্বে কর্ণেল ইউলার কথিত (১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে) দ্রুতিত “ইলিস পাইলট ও প্রাচীন সমুদ্রযাত্রীর মানচিত্র” নামক পুস্তকে হুতাছুটির পার্শ্বে গোবিন্দপুরের নাম পাওয়া যায়।

(২) Vide Bruce's Annals of the East India Coy, Vol. III, p. 143-4.

(৩) Vide Historical and Topographical Sketch of Calcutta, by James Rainey.

* হুতাছুটির দক্ষিণে কলিকাতা ও তাহার দক্ষিণে গোবিন্দপুর নামক

হইবে। (১) কিন্তু বোর্ট সাহেব বলেন যে, ঐ সমস্ত স্থান দৈর্ঘ্যে গ্রহে দেড় মাইল হইবে। (২) এই ভূমির দক্ষণে যে বাৎসরিক ১,১৯৫ মুদ্রা বাজারের নবাবকে প্রদান করিতে হইবে, তাহা আলিম উদ্-সান্ন নিজের প্রাপ্যের মধ্যে রাখিলেন। (৩) বাহা হউক, এই ক্রয়-সম্বন্ধীয় নবাব প্রদত্ত সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া নৃত্যাহুটি প্রধান বণিক-প্রতিনিধি এই সংবাদ লওন নগরে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্কে জানাইলেন। তাঁহার প্রত্যুত্তরে কলিকাতাকে প্রেসিডেন্সী পদে উন্নত করিয়া, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পাঠাইলেন যে, প্রেসিডেন্ট মাসে ২০০ টাকা মাহিনা এবং ১০০ টাকা ভাতা পাইবেন। তাঁহার অধীনে একটা সভা থাকিবে, ঐ সভায় চারিজন সভ্য হইবে। পরামর্শাদি দানে ইহার প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করিবেন। ইচ্ছাদিগের মধ্যে প্রথম হইবেন হিসাবী (Accountant), দ্বিতীয় বাণিজ্য জব্যাদির গুদাম-রক্ষক (Warehouse-keeper), তৃতীয় সামুদ্রিক কোষাধ্যক্ষ (Marine-purser) এবং চতুর্থ রাজস্ব-গ্রাহক (Receiver of Revenues)।

আয়ার সাহেব বিলাত যাত্রা করিলে বিয়ার্ডসাহেব কুঠীর প্রধান বণিকপদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালা একটি বিভিন্ন প্রেসিডেন্সী বলিয়া পরিগণিত হইল, তখন জনবিয়ার্ড সাহেবই প্রথম প্রেসিডেন্টপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সার চার্লস আয়ার বিলাত হইতে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়া আসিলে বিয়ার্ডসাহেবকে দ্বিতীয় বা হিসাবীপদ গ্রহণ করিতে হয়, তখন হাল্‌সি তৃতীয় বা বাণিজ্য জব্যাদির গুদাম-রক্ষক, হোয়াইট সামুদ্রিক কোষাধ্যক্ষ এবং রাফ্‌ সেল্ডন্ পঞ্চম বা রাজস্ব-গ্রাহক নিযুক্ত হন। (কিন্তু আয়ার সাহেব আসিয়া কার্য গ্রহণ না করাতে বিয়ার্ড সাহেবই কার্য করেন।) (৪)

ইতিপূর্বে যে সকল চিঠি পত্রাদি লওনে কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স অথবা অন্ত্র লেখা হয়, ঐ সকল পত্রাদির উপরে “নৃত্যাহুটি” বলিয়া লিখিত আছে। (৫) কিন্তু এখন হইতে কলিকাতা “প্রেসিডেন্সী কলিকাতা” এবং তদনন্তর “প্রেসি-

ডেন্সী অব কোর্ট উইলিয়ম” বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে। শেখোক্ত নামে অব্যাপিত চলিতেছে; কিন্তু ঠিক কোন্ সময় হইতে যে, নৃত্যাহুটি, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর এই তিনটি সম্মিলিত গ্রাম কেবল “কলিকাতা” নামে অভিহিত হইতে থাকে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কাহারও কাহারও মতে “কলিকাতা” এই যে নামটি ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় হইতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঐ মত ভ্রমাত্মক, যেহেতু ১৭০২ খৃষ্টাব্দে দুইটি বিসম্বাদী ইংরাজ বণিক সমিতির (অর্থাৎ ইংলিস্ কোম্পানী ও ইস্ট ইন্ডিয়া-কোম্পানী) সম্মিলিত হইবার যে দলিল লেখা হয়, তাহাতে নৃত্যাহুটি বলিয়াই লিখিত হইয়াছে। (কলিকাতা নহে)। বাহা হউক উপরোক্ত তিনটি গ্রাম এইরূপে সন্নিবেশিত ছিল :— টালি নালা (তৎকালে গোবিন্দপুর বাড়ি বা আদিগঙ্গা) হইতে আরম্ভ করিয়া এখনকার কেরা পর্যন্ত স্থানকে গোবিন্দপুর কহিত। এই গ্রাম কতকগুলি মেটেবরের সমষ্টিমাত্র এবং মধ্যে বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল।

উত্তরে চিংপুরের খাল (মহারাজপুত্র), পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে বর্তমান টাঁকশাল, বড়বাজার এবং পূর্বে কর্ণ-ওয়ার্লিসের কতকাংশ ও সারকিউলার রোডের খানিকটা পশ্চিমাংশ নৃত্যাহুটি নামে প্রসিদ্ধ ছিল*। গোবিন্দপুর ও নৃত্যাহুটির মধ্যবর্তী স্থান কলিকাতা।

এই কলিকাতা পশ্চিমে ভাগীরথীর তীর হইতে পূর্বে কোন্ স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। বড়বাজার, পাথুরিয়া গির্জা, গোষ্ঠে আগিশ, কাষ্টম হাউস প্রভৃতি স্থান ডিহি কলিকাতার মধ্যে ছিল। ফলে এই তিনটি গ্রাম এবং আর কয়েকটি সামান্য সামান্য পল্লী মিলিত হইয়া এই “সৌধময়ী মহানগরী” (City of Palaces) হইয়াছে।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে জন বিয়ার্ড সাহেব “সম্মিলিত পূর্বভারত বণিক-সমিতি”র (United Company of Merchants Trading in the East India) বন্ধীর সভার সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং কোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সির এলাকার কার্যসমূহ নির্বাহ করিবার জন্ত তাঁহার অধীনে আট জন কমিসনার নিযুক্ত হইলেন; এই বিসম্বাদী বণিক সমিতির সম্মিলনে উক্ত কোম্পানিদের কর্মচারীদের মধ্যে বিবাদ মিটিল না।

ইংলণ্ডের নিকট হইতে সমাট অরঙ্গজেবের নিকটে সার উইলিয়ম নরিসের দৌত্যকার্য্য নিফল হইলে, সম্রাট

* নৃত্যাহুটির প্রাচীন চিঠির জানা যায় যে, বাগ্‌বাজার, যোগলভূমি, নিমুলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি বস্ত্রগ্রাম ও নৃত্যাহুটির সীমান বহির্ভূত ছিল।

(১) Vide Report on the Census of the Town of Calcutta taken on the 6th April 1876, by Beverly, O. S.

(২) Vide Bolt's Consideration on Indian Affairs 2. ed. 1772. p. 60.

(৩) Vide Orme, Vol. II. p. 17.

(৪) History of the Rise and Progress of the Bengal Army, by Arthur Broome, I. 31.

(৫) Historical Notices concerning Calcutta in the days of Job Charnok (in Indian and Colonial Magazine).

ভাঁহার রাজ্য মধ্যে সমস্ত যুরোপীয়গণকে বন্দী করিবার আজ্ঞা প্রচার করেন। পাটনা এবং রাজমহলস্থ ইংরাজ-উপনিবেশ লুণ্ঠিত হয়, এবং কলিকাতা লুণ্ঠন করিবার জন্ত হুগলীর ফৌজদার ইংরাজদিগকে প্রদর্শন করেন; কিন্তু বিয়ার্ড সাহেব কলিকাতাকে উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিয়া ফৌজদারের ভয়-প্রদর্শন উপেক্ষা করিলেন। ফৌজদারও তাত্‌কালিক অবস্থা বুঝিয়া আর বিশেষ গোলমাল বাধাইলেন না।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট বিয়ার্ড সাহেবের মৃত্যু হইল। ভাঁহার পদে উত্তর কোম্পানীর হিসাব পরিষ্কার করিবার জন্ত হেজেন্স ও সেলডন সাহেব নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে অনেকগুলি ভোপ আনাইয়া যুরোপীয় সৈন্তের সংখ্যা ১৩০ জন করিয়া উইলিয়ম হুর্গ সুরক্ষিত করা হইল। কলিকাতার অবস্থা এইরূপে দিন দিন উন্নত হওয়ার নির্বিশেষে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার জন্ত চতুর্দিক হইতে লোক আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে এই মহানগরী কলিকাতার প্রথমাবয়ব সংগঠিত হয়।

যদিও অরঙ্গজেবের সনন্দ দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছিল যে, বাৎসরিক ৩০০০ মুদ্রা প্রদান করিলে ইংরাজগণ সর্ব-প্রকার শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইবেন, তথাচ নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ অজ্ঞাত ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে শুল্ক গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দেন। তখনকার কলিকাতার গবর্ণর হেজেন্স সাহেব ইংরাজদিগের প্রতি এই-রূপ অবস্থা ব্যবহারের প্রতিবিধানের আশায় দূত পাঠাইবার জন্ত ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের নিকট হইতে অমুমতি লইলেন। সেই দোত্যাচার্য্যে জন সন্ধ্যান ও ষ্টেফেনসন নামক দুই জন অভিজ্ঞ কুঠিয়ার এবং তাহাদের সঙ্গে খোজা সরহঙ্গ দোস্তাবী ও উইলিয়ম হামিলটন নামক একজন ডাক্তার নিযুক্ত হইলেন। দূতগণ ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ৮ই জুলাই তারিখে বহুমূল্য বিবিধ সুরোপজাত দ্রব্যাদির উপটোকন সহ দিল্লীনগরে উপনীত হন। (১)

এই সময়ে সম্রাট ফিরোজশাহের সহিত রাজা অজিত-সিংহ নামক রাজপুত্রাজের কস্তার বিবাহ; কিন্তু সম্রাটের একরূপ পীড়া হইল যে, রাজকীয় চিকিৎসকগণ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও ঐ রোগের শান্তি করিতে পারিলেন না। ফলে ঐ বিবাহও স্থগিত হয়। অবশেষে ঐ দৌরাণের অধ-

রোধে সম্রাট সমাগত ইংরাজ দূতদলভুক্ত ডাক্তার হামিলটন সাহেবকে ভাঁহার চিকিৎসা করিতে অমুমতি দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে হামিলটন সাহেব বিলক্ষণ বিজ্ঞতার সহিত অতি অল্পকাল মধ্যে সম্রাটের রোগ আরোগ্য করিলেন। এই ঘটনার হামিলটন সাহেব সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন। রোগ হইতে শান্তিলাভ করিবার পর রাজকীয় বদান্ততার যতদূর পরিচয় দিতে হয়, তাহা ব্যতীত সম্রাট প্রীতিজ্ঞা করেন যে, হামিলটন সাহেব আর যাহা যাচঞা করিবেন তাহাও তিনি সাধ্যমত দান করিবেন। হামিলটন সাহেবও বাউটনের মত নিজের স্বার্থ ও লাভেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া, যাহাতে দোত্যাচার্য্যে সমাগত ইংরাজগণের মনোরথ পূর্ণ হয়, তাহাই প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট হামিলটন সাহেবের এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে দর্শনে চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইলেন, প্রীতিজ্ঞা করিলেন যে, বিবাহকার্য্য অসম্পন্ন হইলেই ভাঁহার প্রাধিকার বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন এবং যাহাতে নিজের সাম্রাজ্যের মর্যাদার উপগৃহ ও যতদূর সাধ্য দেয়, তাহা তিনি ইংরাজদিগকে দান করিতে ক্রটি করিবেন না। রোগশান্তির পরেই বিবাহ সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের অগ্রের ইংরাজগণ ভাঁহাদিগের আবেদন-পত্র সম্রাট সমীপে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, কিছুদিন বিলম্বে এবং বিলক্ষণ উৎকোচের সাহায্যে অবশেষে ইংরাজদূতগণের উদ্দেশ্য সফল হইল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে (আল-হিজরা ১১২৯) বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যাতে বাণিজ্য করিবার জন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্রাট ফিরোজ-শাহের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তদ্বারা কোম্পানীর পূর্বপ্রাপ্ত অধিকার বলবৎ হইল। ইংরাজগণ বাণিজ্য দ্রব্যাদির নোকা অমুমদান হইতে অব্যাহতি ও মুশিদাবাদের টাকশালে তিনদিন কোম্পানীর টাকা মুদ্রিত করিবার অমুমতি পাইলেন এবং হুতাশ্রুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জন্ত যে ১১৯৫৮০ বাৎসরিক দিতে হইত, উহা ব্যতীত আরও ৮২২১০ মুদ্রা বৎসর বৎসর সাম্রাজ্যিক কোষে সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া উক্তগ্রামজন্মের সন্নিকটে দক্ষিণে ভাগীরথীর উত্তরপারে পাঁচ ক্রোশের মধ্যে ৩৮টি পলিগ্রাম ক্রয় করিবার আদেশ পাইলেন। (১)

সম্রাটের নিকট হইতে এইরূপ সনন্দ লইয়া আসার, নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ইংরাজ বাণিকদিগের উপর অত্যন্ত

কৃত হইয়াছিলেন। সেই গ্রামগুলি ক্রয় করিবার পক্ষে যদিও তিনি সম্মতের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া প্রকাশ্যে কোন প্রকার শক্ত্যচারণ করিতে সাহস করেন নাই, তথাচ গুপ্ত ভাবে ঐ গ্রামগুলির জমিদারদিগকে ভয় দেখাইতে ছাড়েন নাই। তিনি গুপ্তভাবে জমিদারদিগকে জানাইলেন যে, বতাই অধিক মূল্য দিতে স্বীকার হউক না কেন, যদ্যপি কোন জমিদার তাহার ভূমি বা গ্রাম ইংরাজদিগকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার (নবাবের) কোপ হইতে কাহারও রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না। তিনিও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদ্যপি এই সকল স্থান ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, তাহা হইলে ভাগীরথী সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্বাধীন হইবে এবং তাহারাইচ্ছামত নদীর উভয়পার্শ্বে বুরুজাদি নির্মাণ করিয়া আপনাদিগের বল আরও বাড়াইতে পারিবে। (১)

যাহা হউক, বোল্টন্স সাহেব বলেন যে, সম্রাট ঐ ৩৮টি গ্রাম ইংরাজদিগকে দান করেন নাই, উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। জমিদারগণ ঐ গ্রাম সকল বিক্রয় করিতে সম্মত হয়েন নাই বটে, কিন্তু ইংরাজগণ অবশেষে অনেকের নিকট হইতে প্রতারণা অথবা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২)

ক্যাপ্টেন হারিসন্টন ১৭১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে আগমন করেন। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন;—নদীর ধারে দক্ষিণে গোবিন্দপুরে একটি এবং উত্তরে বরাহনগরের নিকটে আর একটি কোম্পানির উপনিবেশের সীমা চিহ্ন ছিল। এই দুইটি চিহ্নের ব্যবধান তিন ফোশ হইবে এবং ভূমির দিকে সীমা ছিল ধাপার বিল বা লোণা বিল পর্য্যন্ত, ফলে এই সময়ে কলিকাতার সীমা ঠিক যে কি ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভারত পণ্ডিতের পরিচালনাধীনে মহারাষ্ট্রগণ (বর্গী) উড়িয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জেলা মেদিনীপুর ও বর্ধমান হইয়া রাজমহল পর্য্যন্ত নগর ও পল্লী সমস্ত লুটপাট করিতে থাকে। তাহারই পর বর্গীরা কলিকাতার সন্নিহিতে ভাগীরথীর অপার পায়ে—(যথায় অধুনা কোম্পানির বাগানের তত্ত্বাবধায়ক বাস করেন)—তানা কেল্লা হস্তগত করিয়া হুগলীনগর লুণ্ঠন করে। ঐ সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমপাশের অধিবাসীগণ কলিকাতার আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ

করে। মহারাষ্ট্রদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরাজগণ পূর্ব্বপাশে থাকিয়াও কলিকাতার চতুর্দিকে একটি গভীর গড় খাই করিবার জন্য নবাব আলীবর্দী খাঁর নিকট অসুমতি গ্রহণ করেন। হুতাছুটির উত্তর অংশ হইতে গোবিন্দপুরের দক্ষিণ অংশ পর্য্যন্ত ঐ নালাটি খনন করিবার কথা হয়। ছয় মাস মধ্যে দেড় ফোশ (তিন মাইল) খনন করা হইল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, আলীবর্দীর অধ্যবসারে মহারাষ্ট্রগণ ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে কলিকাতা হইতে ৩০ ফোশের মধ্যে আর আসিল না, তখন ঐ খাতের খনন কার্য্য বন্ধ হইল। এই খাল “মহারাষ্ট্রখাত” (Maharatta Ditch) নামে অভিহিত। শ্রামবাজারের নিকট দশদমা বাইবার রাস্তায় আজও ঐ খাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।* অগ্নি সাহেবের মতে কলিকাতার অধিবাসীদিগের অসুরোধে এবং তাহাদিগেরই বায়ে ঐ খালটি খনন করা হয়। (১)

হলওয়েল সাহেব বলেন যে, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দেও গিমুলিয়া, মলদ্বা, মির্জাপুর এবং হোগলকুড়িয়া সমস্ত মিলিয়া ৩০৫০ বিঘাভূমি এই চারি স্থান কোম্পানি উপনিবেশের সীমার মধ্যে ছিল না; ঐ স্থানগুলিও কোম্পানি ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাদিগের স্বত্বাধিকারীদিগকে কোন প্রকারে সম্মত করিতে পারেন নাই। (২) ঐ স্থান করটি কলিকাতার সীমার বাহিরে ছিল বটে, কিন্তু বেনেপুকুর, পাগলডাঙ্গা, ট্যাংরা এবং ধলদ্বা এই চারি স্থান সমস্ত মিলিয়া ২২৮ বিঘা ভূমি হইবে—তখন কলিকাতার অংশরূপে পরিগণিত ছিল। দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৫৪ সালে হলওয়েল সাহেব কোম্পানীর জন্ত রসিক মল্লিক এবং নওয়াগীস্ মল্লিকের নিকট হইতে ২২৮১১ মুদ্রা মূল্যে গিমুলিয়া ক্রয় করেন। (৩)

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই সময়ে তাঁহার আদেশে অল্পকালের জন্য কলিকাতা “আলিনগর” নামে অভিহিত হয়। তৎপরে অন্ধকূপহৃত্যা এবং উহার পরবৎসরে জাহাঙ্গীরীনাগে ক্লাইব এবং ওয়াটসন কর্তৃক কলিকাতা গ্রহণের পর উন্মির্দান,

* সম্ভ্রুতি ইহা বুঝাইয়া মিউনিসিপালিটি হইতে রাত্রে প্রস্তুত হইতেছে।

(১) Orme's History of India, Vol. II. p. 15.

Broome's Rise and Progress of the Bengal Army, Vol. I p. 41.

(২) Holwell's Indian Tracts, 2nd. ed. 1764. p. 140.

(৩) Selections from the Unpublished Records of the Government. p. 53.

(১) Broome's Rise and Progress of the Bengal Army Vol. I. p. 36.

(২) Bol's Consideration on Indian Affairs 1772, App. p. I, note.

অন্ধকূপ, ক্লাইব শব্দ দেখ।] ১৮৫৭ সালের ২ই ফেব্রুয়ারিতে সিরাজউদ্দৌলার সহিত সন্ধি হয়। এই সন্ধি দ্বারা এই স্থির হয় যে, যে সকল গ্রাম সনন্দ দ্বারা কোম্পানি পাইয়া ছিলেন, সুবাদার তাহা আজও তাঁহাদিগকে দখল দেন নাই; এক্ষণে ঐ সকল গ্রামে কোম্পানীকে অধিকার দেওয়া হইবে এবং কোম্পানীকে ঐ সকল স্থান বিক্রয় করিতে জমীদারদিগকে কোনরূপ বাধা দেওয়া হইবে না।

পলাশীর যুদ্ধের পর বখশ নবাব মীরজাফর নুতন সুবাদারপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন একটি সন্ধি দ্বারা ইংরাজ বণিক-সমিতি কলিকাতার মৌরসী জমা প্রাপ্ত হন। (১) [পলাশী ও মীরজাফর দেখ।]

এই সন্ধি দ্বারা কলিকাতার মধ্যস্থিত ভূমি ছাড়া মীরজাফর কোম্পানীকে কলিকাতার সীমার বাহিরে একটি ১১০০ হস্ত পরিমিত জমী দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পি পর্যন্ত সমস্ত ভূমি কোম্পানীর জমীদারী-ভুক্ত করিয়া দেন, এবং আজ্ঞা দেন যে ঐ অংশের সমস্ত কর্ণ-চারী কোম্পানীর অধীনস্থ হইবে ও অন্ত্যস্ত জমীদারের দ্বারা কোম্পানীও রাজস্ব প্রদান করিবেন। (২)

পর বৎসর ১৭৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফর্দ সওয়াল দ্বারা কোম্পানী তালুক বা জায়গীর স্বরূপ কলিকাতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ইংরাজ বণিক-সমিতি তাঁহাদের কুঠী রক্ষা করিবেন এবং বন্দর সকল সাবধানে রাখিবেন বলিয়া নবাব মীরজাফর ৮৮৩৬ টাকা রাজস্ব রেহাই দিয়া উক্ত কোম্পানীকে কলিকাতা, পাইকান, মানপুর এবং আমীরাবাদ পরগণা চতুষ্টয়ের মধ্যস্থিত ২০২টি মৌজা, দুইটি বাজার এবং আব-ওয়াব কৌজদারী প্রদান করেন। মৌজা কয়েকটি এই— ১ গোবিন্দপুর, ২ মির্জাপুর, ৩ চৌরঙ্গী, ৪ ধলন্দ, ৫ জেলে কোলন্দ, ৬ বেলেডেঙ্গা, ৭ আনহাটি, ৮ শিয়ালদহ, ৯ বাহির বির্জি, ১০ কিসপুরপাড়া, ১১ বাহির শ্রীরামপুর, ১২ সূতাছুটি ১৩ হোগলকুঁড়িয়া, ১৪ সিমলা, ১৫ মাখন্দ, ১৬ আভিলী, ১৭ ডিহি কলিকাতা, ১৮ দক্ষিণ পাইকপাড়া, ১৯ বির্জি, ২০ শ্রীরামপুর, ২১ গুণেশপুর, মলকা খালদার মধ্যবর্তী। বাজারদ্বয়—১ সূতাছুটি-বাজার ও ২ গোবিন্দপুর-বাজার।

উপরোক্ত গ্রামগুলির মধ্যে কয়েকটি মহারাত্রি খাতের এবং কতকগুলি উক্ত খাতের সীমা হইতে ১২০০ হস্তের মধ্যে ছিল। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত সময়েও

লোকে সাধারণ কথাবার্তার মহারাত্রি খাতই কলিকাতার সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট করিত। বাহাই হউক, যে সময়ে কোম্পানী ২৪ পরগণা গ্রহণ করেন, সেই সময়ে মহারাত্রি খাতের বাহিরে যে সকল স্থান কলিকাতার সীমাত্ত ছিল, ঐ সকল স্থান এবং আরও কতক ভূমি লইয়া কলিকাতা ও ২৪ পরগণা হইতে বিভিন্ন রাখিয়া ডিহি পঞ্চান গ্রাম নামে অভিহিত হয়। অধুনা যে সকল স্থান কলিকাতার সহরতলী বলিয়া পরিচিত, উক্ত স্থানগুলিই পূর্বে ডিহি পঞ্চানগ্রাম নামে অভিহিত হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২১ আইনে পঞ্চানগ্রামের সীমার মধ্যে সমস্ত ভূমিই সহরতলী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সময় হইতে উহার অতি সামান্য অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল। (১) ঠিক কোন সময়ে যে, কলিকাতা এবং পঞ্চান গ্রামের মধ্যে সীমা নির্ধারিত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত উঠার উক্ত সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১০ই দিবসে গবর্নর জেনারেল ব্যবস্থাপক সভা হইতে একটি আইন (২) বিধিবদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত রূপ বোধগোপ্য দ্বারা কলিকাতার সীমা নির্ধারিত করেন। সংক্ষেপে তাহার মর্ম উদ্ধৃত হইল।—

উত্তরসীমা—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাগবাজারের খালের মুখ হইতে পুরাতন পাউডার মিলবাজার হইয়া দমদমা বাইবার পোলের (শ্রামবাজার গোল) পাদদেশ পর্যন্ত।

পূর্ব সীমা—মহারাত্রি খাতের পশ্চিমধার অথবা তৎপার্শ্বস্থ রাস্তার পূর্বধার হইয়া হাল্‌সিবাগানের উত্তরকোণ হইতে ঐ খাতের দক্ষিণধার দিয়া পূর্বমুখে, তথা হইতে খাতের উত্তর ধার দিয়া পশ্চিমমুখে, উক্তস্থান হইতে খাতের পশ্চিম ও বৈঠকখানা রাস্তার পূর্বধার দিয়া দক্ষিণদিকে মহারাত্রি খাতের শেষ সীমা হইয়া রাজা রামলোচনের বাজারের কোণ অথবা নারায়ণ চাটুর্জীর রাস্তার ঠিক বিপরীত দিকে যেখানে হইতে বেলেঘাটার রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তৎপরে মির্জাপুর ভেদ করিয়া বৈঠকখানা রাস্তার পূর্বধার হইয়া এবং পূর্বগীজদিগের সমাধিভূমিকে পূর্বদিকে রাখিয়া যেখানে প্রাচীন সুবিখ্যাত বৈঠকখানা বৃক্ষ ছিল,—অর্থাৎ বহুবাজার রোড ও বৈঠকখানা বাজারের বিপরীত দিকে রাস্তার দুই পার্শ্বে, বৈঠকখানা রাস্তার পূর্বধার দিয়া গোপীবাবুর বাজারের এবং তথা হইতে সমান চলিয়া গিয়া যেখানে উক্ত রাস্তা পশ্চিম

(১) Bolt's Indian Affairs p. 81.

(২) Rise, Progress and State of the English Government in Bengal, by Harry Verelst 1772. App. p. 154.

(১) Census Report of Calcutta of 1876 by Mr. Beverly.

(২) 159th section Cap. 52. of the Act passed in the 33 year of his Majesty's reign.

দিকে বাকিয়াছে, তথায় ডিহি জীরাঙ্গপুর পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে রাখিয়া খানিক দূর গিয়া পূর্ব সীমা শেষ হইয়াছে। তখনকার কলিকাতার সহরতলীর প্রোটেক্টেড সমাধিভূমি, চৌরঙ্গী এবং ডিহি বিজি এই সীমার অন্তর্ভূত হয়।

দক্ষিণ সীমা—উক্ত স্থান হইতে ডানদিকে বাকিয়া ডিহি বিজির অন্তর্গত বেনেপুকুর বা এঁড়িয়াপুকুর সীমারেখার মধ্যে রাখিয়া পশ্চিমমুখে,—যেখানে চৌরঙ্গীর বড় রাস্তার বিপরীত দিকে রসপাগলা রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে, তথা হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশ এবং সাধারণ হাঁসপাতালের মধ্যে সাধারণ রাস্তার দক্ষিণদিকে খানিক দূর গিয়া পুনরায় পশ্চিমমুখে সাধারণ হাঁসপাতাল, পাগলাগারদ, ডিহি ভবানীপুরস্থিত হাঁসপাতালের সমাধিভূমি বাদ দিয়া আলীপুরের পুলের পাদদেশ পর্যন্ত; এখান হইতে আলীপুর পুলের দক্ষিণ হইয়া টালির নালা (আদিগঙ্গা)র উক্ত জল-রেখা চিহ্ন, এখান হইতে ক্রমান্বয়ে চলিয়া গিয়া খিদিরপুরের পুল হইয়া উয়েটনের ডক বাদ দিয়া আদিগঙ্গার মুখে (যেখানে হুগলী নদীর সহিত আদিগঙ্গা মিলিয়াছে); উক্ত স্থান হইতে ঠিক সমান ভাবে গিয়া নদীর অপর বা পশ্চিম পারের মেজার কিডের বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে (অগচ উক্ত বাগান ও শিবপুর বাদ দিয়া) দক্ষিণসীমা শেষ হইয়াছে।

পশ্চিমসীমা—শেষোক্ত স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নিম্ন জল রেখা চিহ্ন হইয়া ক্রমে রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া এবং শালিখার ঘাট বাদ দিয়া চিংপুর পুলের নিকট (নদীর পশ্চিমতীরে) পূর্বোক্ত আফাপুরের কর্ণেল রবার্টসনের বাগানের উত্তর কোণে বাইয়া পশ্চিম সীমা শেষ হইয়াছে।

পূর্ব কথিত বিধি (Act 56) অনুসারে যদিও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই সীমা পরিবর্তিত করিবার জন্ত সক্ষম ছিলেন, কিন্তু সেই পর্যন্ত কলিকাতার সীমা আর বদলায় নাই। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ঠিক কোন সময়ে যে, কলিকাতা এবং পঞ্চাঙ্গ্রামের উভয়ের সীমা স্থিরীকৃত হয়, তাহা ঠিক জানা যায় না এবং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হওয়াতে এই সীমা সন্দেহে কিঞ্চিৎ গোলাবোগ উপস্থিত হয়; যেহেতু উহাতে পূর্ব সীমা সন্দেহে লিখিত আছে যে, যে অবধি মহারাত্রি খাত দেখিতে পাওয়া যায় সেই অবধি উক্ত খাতের ভিতরের দিক পর্যন্ত কলিকাতার সীমা বর্ধিত হইয়াছে। (১) কিন্তু এই খাত সম্পূর্ণ খনন করা হয় নাই এবং

মেছুয়াবাজার রাস্তার দক্ষিণে ইহার চিহ্ন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ স্থানের পর হইতে আলীপুর পুল পর্যন্ত সারকিউলার রোড (তৎকালে ইহাকে বৈঠকখানা রোড কহিত) এবং তথা হইতে আদিগঙ্গার দক্ষিণ পর্যন্ত সীমা ধরা হইয়াছে। ১৭৯৪ সালে পূর্বদক্ষিণ সীমা কি ছিল তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। ১৭৫৭ সালের যে কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্র আছে, উহা হয় মাণে ভুল অথবা কলিকাতার সীমা ঐ সময়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। উক্ত মানচিত্রে এস্প্রানডের জমীর পরিমাণ প্রকৃত মাপের ঠিক অর্দ্ধেক ধরা হইয়াছে। আবার ১৮৩৮ সালের “কিবার হিম্পট্যাল কমিটি”র সমীপে সাক্ষ্যপ্রদানে ডাক্তার নিকলসন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ৩০ বৎসর পূর্বে সাধারণ এবং সামরিক হাঁসপাতাল হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে একটি তত্ত্ব প্রোথিত ছিল, উহাতে খোদিত ছিল যে, এই স্থানে কোর্ট উইলিয়মের এস্প্রানড শেষ হইতেছে।” (১) কলে কলিকাতার সীমা যে ঠিক কোন সময়ে কি ছিল তাহা সমস্ত ঠিক নির্ণয় করা অতীব অকঠিন।

কলিকাতার অন্তর্গত প্রাচীন ও আধুনিক স্থানাদির ইতিহাস।—কলিকাতার মধ্যে যে সমস্ত স্থানের নাম পাওয়া যায়, তাহার কতকগুলি হইতে এই স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণাদি পাওয়া যায়।

কলিকাতার কতকগুলি প্রধান রাস্তার নাম কয়েকজন রাজপুরুষের নামানুসারে হইয়াছে, যথা,—ভাল্টিটার্ট রো নামক রাস্তাটি কলিকাতার প্রাচীন গবর্ণর ভাল্টিটার্ট সাহেবের নামে নামকরণ হইয়াছে। “ক্রাইব ক্রীট” নামক রাস্তা লর্ড ক্রাইবের নামানুসারে হইয়াছে। এই রাস্তার উপরে এক্ষণে যে বাটীতে “অরিএন্টাল ব্যাঙ্ক” আছে, অনেকে বলেন, সেই বাটীতেই লর্ড ক্রাইব বাস করিতেন, কেহ কেহ বা বলেন যে, যে বাটীতে গ্রোহাম কোম্পানীর আপিস আছে, সেই বাটীই লর্ড ক্রাইবের বাটী ছিল। এই দুই বাটীই অতি প্রাচীন, তবে উভয়ের মধ্যেই এক্ষণে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে, “কর্ণওয়ালিস্ ক্রীট ও ক্যার” লর্ড কর্ণওয়ালিসের নামে অভিহিত হইয়াছে। কর্ণওয়ালিস ক্রীট নামক রাস্তার উত্তর দিকের শেষভাগ হইতে বাগবাজারের খাল পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, ইহাই কলিকাতার উত্তর সীমা। খালের নিকট যেখানে রাস্তাটি মিলিয়াছে, সেইখানেই

(১) Selections from the Calcutta Gazette, Vol. II. by W. S. Seton Karr, C. S. p. 129.

(২) Census Report of Calcutta, 1876, by H. Beverley Esqr, C. S. p. 34.

কলিকাতার নীমাত্তরপূর্বকোণ। এই খালের উপর একটি পুল আছে। এই পুল পার হইয়া “টালা” নামক স্থানে যাওয়া যায়। প্রাচীন টালা (Mr. Talloh) নামক নিলাম-ওয়ারা সাহেবের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। টালার পুল হইতে নানিয়া দক্ষিণমুখে কিরদূর আসিলে তাহিনে বাগবাজার স্ট্রীট; এই রাস্তা বরাবর পশ্চিমমুখে গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়াছে। বাগবাজারের মধ্যে উত্তরপূর্বাংশে এখন যেখানে নিকারী-পাড়া (মন্ত বা নাবিক ব্যবসায়ী বাঙ্গালী মুসলমানকে নিকারী বলে) সেইখানে অতি প্রাচীনকালে ইংরাজের “বান্দখানা” ছিল। এখনও এই বান্দখানার বৃহৎ দীঘী “বান্দখানার পুকুর” নামে ভগ্নাবস্থার বর্তমান আছে। বাগবাজার অতি প্রাচীন স্থান, গবর্ণমেন্টের ১৭৪৯ সালের কাগজে এই স্থানের উল্লেখ আছে। বাগবাজার স্ট্রীটের বিপরীত খালের দিকে পূর্বমুখে একটি রাস্তা গিয়াছে। ঐ রাস্তা দিয়া দমদমা, বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট যেখানে আরম্ভ, সেইস্থান হইতেই উহার পূর্ব দিয়া সাকুলার রোড দক্ষিণমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই সাকুলার রোড অতি প্রাচীন রাস্তা, এই রাস্তাই কলিকাতার উত্তর হইতে পূর্ব পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইবার রাস্তা ছিল। কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের উত্তরদিকের মাথার নিকট “শ্রামবাজার” ও “শ্রামপুকুর” নামক দুইটি পল্লীও বহু প্রাচীন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেন্টের কাগজপত্রে “শ্রামবাজার” নামক পল্লীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পল্লীতে অতি বৃহৎ একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা ছিল, ইহার নাম ছিল “শ্রামপুকুর”, সম্ভ্রুতি এই পুকুর দূষিত হইয়া যাওয়ার গতবৎসরে বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রামবাজারের পূর্বে সাকুলার রোডের মুখের নিকট পূর্ব পার্শ্বে “মোহনবাগান” নামক পল্লী, এই স্থানে রাজা রাধাকান্তের পিতা ৬ গোপী-মোহন দেবের একটি সুবৃহৎ সুন্দর উদ্যান ছিল, তাহা হইতেই এই স্থানের নাম হইয়াছে। মোহন-বাগানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া “মহারাত্রি খাত” ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নবাবের অজমতি লইয়া ইংরাজেরা বর্গীর হাকীমা নিবারণের উদ্দেশে এই খাত খনন করেন। খাতটি মোহনবাগানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া বরাবর দক্ষিণমুখে জানবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও সম্ভবতঃ এইখানে ডিলাভাকার খালের সহিত মিলিত হইয়াছিল; এই খাতের ভগ্নাবশেষ এখনও শ্রামবাজারের পুলে যাইবার রাস্তার দেখা যায়। মোহন-বাগানের দক্ষিণে হাল্‌সির বাগান নামক পল্লী। এইখানে

ক্রৌঞ্চপতি উমিচাঁদের বাগানবাটী ছিল। ঢাকার রাজা রাজ-বল্লভের পুত্র কুমার কৃষ্ণদাস নবাব-ভরে ভীত হইয়া পলাইয়া আসিয়া এই বাগান বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তৎপরে হাল্‌সি সাহেবের লম্বাভূমারে এই স্থানের আরূপ নামকরণ হয়। হাল্‌সির বাগানের পশ্চিমে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের পূর্বে “হাতি-বাগান” পল্লী। “হাতিবাগান” পল্লীতে এক্ষণে কলিকাতার অনেকগুলি “ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত” চতুষ্পাঠী করিয়া বাস করিতেছেন, কিন্তু পূর্বকালে এখানে নবাবের হস্তী থাকিত। এই হাতিবাগান হইতে দক্ষিণে এক্ষণে যে স্থানকে মাণিক-তলা বলে, তাহার উত্তরাংশ পর্যন্ত অঙ্গলে আবৃত ছিল। ১০। ৭৫ বৎসর পূর্বেও এই সকল স্থানে সন্ধ্যার পর লোকে চোর ডাকাত ও খুনের ভয়ে বাতায়ত করিত না। হাতি-বাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিমে “হোগলকুড়িয়া” পল্লী। গত শতাব্দীতে হোগলা বনে আবৃত ছিল। মহারাত্রি খাত খনন কালে ইহা পরিষ্কৃত হয়। এ স্থানটি এইনামেই বহু-কালাবধি বিখ্যাত। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের কাগজপত্রে হলওয়েল সাহেব এই স্থানকে হোগলকুড়িয়া নানে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্বে এই স্থানে মুসলমানেরা “গোর” দিত। বৃদ্ধ লোকেরা বলেন যে, পূর্বে এখানে ইষ্টকালয় নির্মাণ-সময় ভিত্তি খননকালে অনেকগুলি কবর ও মন্মথ্য দেহাবশেষ বাহির হইয়াছিল। হোগল-কুড়িয়ার উত্তর পূর্বকোণে “সিকদার বাগান” নামক পল্লী। এ স্থানে পূর্বে “সিকদার” উপাধিধারী ব্যক্তিগণের বৃহৎ বাগান ছিল। হোগল-কুড়িয়ার পশ্চিমে “দজিপাড়া” নামক পল্লী; এখানে এখনও বখেঁট মুসলমান দরিজর বাস আছে। এই স্থানের রাস্তা-ঘাটের নাম “লাল ওস্তাগরের গলি,” “গুনু ওস্তাগরের গলি” “হোসেন পাড়া” ইত্যাদি। প্রাচীনকালে এই মুসলমান পাড়ার (দজিপাড়ার) নিকটে দুই ঘর হিন্দু বাস করিত, তাহাদের মধ্যে একজন “মুদির দোকান” চালাইত, আর একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন; দজিপাড়ায় সেই দুই হিন্দুর নামে দুইটি রাস্তা বর্তমান আছে,—জীদাম (ছিদাম) মুদির গলি, আর জৈখর ঠাকুরের গলি। দজিপাড়ার উত্তরে “বালাখানা” নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। এই স্থানের নাম “বালাখানা” কেন হইয়াছে তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। “বালাখানা” অর্থে দীর্ঘ-গৃহশ্রেণী, ইংরাজীতে ইহাকে “বার্যাক” বলা যায়। বালাখানায় মুসলমানদিগের সৈন্ত প্রহরী ইত্যাদি থাকিত (যেমন “কোজদারী বালাখানা” অর্থাৎ যেখানে কোজদারের “বালাখানা” ছিল।) সম্ভবতঃ পূর্বে এ অঞ্চলেও একটি ক্ষুদ্র “বালাখানা” ছিল,

তাহাতে সৈন্যাদি থাকিত। বালাখানার দক্ষিণে ও পূর্বে পশ্চিমে বিস্তৃত একটি রাস্তাকে এখন গ্রেট্রীট বলে; গ্রেট্রীট পূর্বে সাকুলার রোডে মিলিয়াছে; ইহাকে দেশীয়েরা “বালাখানার রাস্তা” বলে। বাঙ্গালার ছোটলাট আর উইলিয়ম গ্রেস নামানুসারে ইহাকে এক্ষণে গ্রেট্রীট বলা যায়। যেখানে গ্রেট্রীট সাকুলার রোডে মিলিয়াছে, সেই স্থানের নাম নন্দনবাগান। নন্দনবাগান পূর্বকালে উমিচাঁদের বাগান বাটার (হালসির বাগানের) অন্তর্গত ছিল। সনাত্ন ১৮৫৬ সালে কলিকাতা অবরোধ করিবার সময় এই নন্দনবাগানেই ছাউনি করিয়াছিলেন এবং রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে পাইবার জন্য নন্দনবাগান ও হালসির বাগান ভাঙ্গিয়া উমিচাঁদের বাটা লুট করেন। তৎপরে নন্দন উপাধিধারী কোন ব্যক্তি এখানে বাগান করার ইহার নাম নন্দনবাগান হইয়াছে। হোগলকুড়িয়ার নিজ পূর্বদক্ষিণে গোয়াবাগান নামক ক্ষুদ্র পল্লী। গোয়াবাগান শব্দের অর্থ গুপারি বাগান। বোধ হয় পূর্বে এ অঞ্চলে কাহারও গুপারির বাগান ছিল বা তৎপূর্বে এ অঞ্চলে যে জঙ্গল ছিল, তন্মধ্যে যথেষ্ট গুপারি বৃক্ষ ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে। এক্ষণে এখানে গাভীর হাট আছে। অনেকে বলেন গো-হাট (বাগান) হইতে “গো-বাগান” (গোয়াবাগান নহে) নাম হইয়াছে। এখানকার গো-হাট অতি প্রাচীন। গোয়াবাগানের দক্ষিণে “সিমুলিয়া” নামক বৃহৎপল্লী। সিমুলিয়া যখন বনের মধ্যে ছিল, তখন এস্থলে যথেষ্ট সিমূল তুলার বৃক্ষ ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম হইয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে সক্ষার পর লোকের ঘাটয়াত বন্ধ হইত। ১৭৪৯ সালের কাগজপত্রে এইস্থান এই নামেই উক্ত হইয়াছে।

কলিকাতায় কতকগুলি স্থান এইরূপ বৃক্ষের নামে পরিচিত। যথা—কলাবাগান,—এটি আছে একটি বাগবাঙ্গারের খালের নিকট, অপরটি বর্তমান চোরবাগানের ভিতর। চোরবাগানের কলাবাগানে বসাকদিগের কলার চাষ ছিল। এই বাগানের মধ্যে একটি বৃহৎ দীঘী ছিল, ইহা “বসাক দীঘী” বা “কলবাগানের দীঘী” নামে পরিচিত। সম্প্রতি এই দীঘীকে ছোট করিয়া ও তাহার চতুর্দিকে বৃক্ষাদি দ্বারা সাজাইয়া মিউনিসিপালিটি কর্তৃক “মার্কার্স স্কয়ার” নাম দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নারিকেলডাঙ্গা, নেব-বাগান, মেঘতলা, হরিতকীবাগান, বকুলবাগান, পেয়ারা-বাগান, নিমতলা, বাঁশতলা, ভালতলা, আমড়াতলা, চাঁপা-তলা ইত্যাদি। এই সকল স্থানে পূর্বে ঐ সকল বৃক্ষের লক্ষ্যে অধিকই থাক বা তাহাদের বৃহৎকার অথবা প্রাচীনত্ব

হইতেই হউক স্থানগুলির নামকরণ হইয়াছে। “বাঁশ-বটতলা” নামক স্থানে পূর্বে একটি পুকুরী ও একতর বোড়া দুটি বটগাছ ছিল। এখানে বাঁশালা ভাবার প্রাচীন রহণগুলি অতি চুর্দণার সহিত মুজিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। আর কতকগুলি নাম ব্যক্তিগত নাম বা উপাধি হইতে হইয়াছে, যেমন—রামবাগান, রায়বাগান, মাধের বাগান, রাজার ফুলবাগান (এখানে শোভাবাজার রাজ-বংশের ফুলবাগান ছিল।) ইত্যাদি। এই সকল স্থানে বোধ হয় উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণের বাস বা বাগান ছিল। স্মৃতির বাগান নামক পল্লীতে পূর্বে একটি বৃহৎ উদ্যান ছিল, সেখানে বহু আড়-স্বরে সেকালে স্মৃতি থেলা হইত। বাজুবাগান নামক পল্লীতে বাজুদের আধিপত্য বড় বেশী ছিল কিনা তাহা কে বলিবে? পূর্বে যেমন “জামপুকুর” পল্লীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ কয়েকটি স্থানের নাম আছে, যথা নিয়োগীপুকুর, বেণেপুকুর প্রভৃতি। এই সকল স্থানে উক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ পুকুরী ছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল বেণেপুকুরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। “ফড়িয়া-পুকুর” নামকস্থানে বোধ হয় পূর্বে নানান স্থানের ফলবিক্রেতা আসিয়া শাকভরকারী বিক্রয়াদি করিত এবং নিকটে একটি বৃহৎ পুকুরী ছিল। বামাপুকুর নামক স্থানের পুকুরী আজও বর্তমান। শুনা যায়, এখনও ইহার তলদেশ হইতে যথেষ্ট বামা ইট বাহির হয়। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে কাগজপত্রে উল্লেখ আছে যে, সে সময়ে এই অঞ্চলের পুকুরীগুলি অতি দূষিত জলপূর্ণ ছিল; বোধ হয়, জলের সেই দোষ নিবারণের জন্য বামাপুকুরের অধিকারীরা পূর্বকালে পুকুরী মধ্যে যথেষ্ট বামা ফেলাইয়া থাকিবেন।

কতকগুলি স্থানের নাম তত্তত্ব অধিবাসিগণের জাতি, নাম বা ব্যবসায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যথা—* কুমারটুলী,

* কুমারটুলীতে কোম্পানীর সময়কার মহরকোতোয়াল বমশালী সরকারের স্থাপিত “শ্যামসুন্দর” ও “শিব ঠাকুরের” মন্দির অতি বিখ্যাত। শ্যামসুন্দরের মন্দিরের বহির্ভাগ দেখিতে তাদৃশ মনোরম নহে, কিন্তু ইহার গায়ে ইষ্টক কাটরা নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তি খোদিত হওয়াতে কারু-কার্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পার্শ্ব দিয়া এক্ষণে রাস্তা হওয়ায় ইহার নাটমন্দিরাদি ভগ্ন ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ উত্তর পশ্চিমকালের হিন্দুদিগের রাজ্যকালে নির্মিত মন্দির-দ্বিরস্তার দেখিবার যোগ্য শিল্পকার্য্য ও খোদিত মূর্তিতে পূর্ণ। এই মন্দির বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। এখানে একটি বৈষ্ণব উৎসব হইয়া থাকে, তাহাতে নানা রাজী আসিয়া থাকে। তবে বমশালী সরকারের বংশলোপ হওয়ার পর এবং বিধবাদি দৌহিত্র বংশে অবস্থিত

এখানে কুস্তকারগণের অধিক বাস ও ব্যবসায় আছে। জেলে-টোলা ও জেলেপাড়া—পূর্বকালে মৎস্যজীবী ধীবরেরা বাস করিত। শাখারীটোলা—এখানে শব্দবিক্রয়গণের বাস ও ব্যবসায় ছিল।

কাঁদারীপাড়া—কাংসা বণিকগণের বাস এখনও যথেষ্ট আছে। এইরূপ ধোপাপাড়া, চাষাধোপাপাড়া, কামার-পাড়া, আহিরীটোলা, হুঁড়ীপাড়া, ডোমপাড়া, পটুয়াটোলা, হাড়িপাড়া, মুচিপাড়া, নিকারীপাড়া ইত্যাদি।—এই সকল স্থানের কোথাও এখনও উক্ত জাতীয় লোক বাস করে, কোথাও বা কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল “ধোপাপাড়ার” উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানপাড়া ও উড়িয়াপাড়ার মুসলমান ও উড়িয়ারা বাস করে এবং দর্জিপাড়ায় মুসলমান দর্জিগণের অধিক বাস আছে। এই তিন স্থান আধুনিক। খালাসীটোলার এখনও আহাজের মাঝিমালা বাস করে। “কসাইটোলা” একটি প্রাচীন পলি, এখন ইহার এবং তলিকটবর্তী স্থানের নাম বেন্টিক্‌ স্ট্রীট। পূর্বে কলিকাতার ইংরাজগণের প্রয়োজনীয় মাংসাদি এই স্থানে বিক্রীত হইত। বেন্টিক্‌ স্ট্রীট অতি পূর্বে হইতেই বর্তমান ছিল, এই রাস্তা দিরাই সেকালে বাজীরা কালীঘাটে বাইত।

পূর্বে লবণের ব্যবসায়ের জন্য “মলঙ্গা”, চুণের ব্যবসায়ের জন্য “চুণাগলি”, হাড়ের কারবারের (চিকরী, কোটা, খেলি-বার পাশা) জন্য “হাড়কাটা” ও ছাতার ব্যবসায় হইতে “ছাতাওয়ালাগলি”র নামকরণ হইয়াছে। এইরূপে দরমা-হাটা, দয়ে (দধি)-হাটা, মুরগীহাটা, মেছোবাজার, গরগ-খুঁটি-হাটা, সুলরিয়া (সিদ্ধুরিয়া?)-পটা, সোণাপটা, তুলাপটা, আকিনের চৌরাস্তা ইত্যাদি। পগেরাপটাতে এক্ষণে বজ্রের বিপুল ব্যবসায় এবং খোজরাপটাতে এক্ষণে বেণে মসলা, ডাক্তারি ঔষধ, ছাতা ইত্যাদির ব্যবসায় আছে। কিন্তু পূর্বে কিসের ব্যবসা হইতে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে, তাহা জানা

হওয়ার ইহার আর পূর্বকার মত সম্ভ্রুতি নাই। এখন “মহদীপ পণ্ডিত-মণ্ডলী” হইতে যে নৃতন পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে বৈকব-দিগের পক্ষাঘ্নে মৃত্যো এই জামদগ্ন্য মন্দিরের উৎসবই “শৌর গোপীনাথ কুণ্ডের মহোৎসব” নামে উল্লিখিত আছে। এই ঠাকুরবাটী ৩৫ নং বনমালী সরকারের স্ট্রীটে অবস্থিত। বনমালী সরকারের বাড়ী সেকালে কলিকাতার অটালিকামালার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল।

এইখানেই কলিকাতার প্রাচীন কালেক্টর বা নায়ের জমীদার গোবিন্দরাম সিন্ধের বাড়ী। এখানে এখনও তাঁহার বংশধরগণ বাস করেন। সেকালে এই “গোবিন্দরাম সিন্ধের হাড়ি ও বনমালী সরকারের বাড়ী” এসিদ্ধ ছিল।

বার না। “সানকীতাল” পন্নীর নাম কি বুঝে হইল বলি বার না, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এখানে সানকীর মত ক্ষণভঙ্গুর মুৎপাঞ্জের ব্যবসায় ছিল।

কতকগুলি স্থানের নাম মুসলমানগণের নামানুসারে হইয়াছে;—যেমন, “মির্জাপুর” বোধ হয় কোন মির্জার নামানুসারে হইয়াছে। মেহদী বাগান—এখানে আগা মেহদী নামক মুসলমানের বাগান ছিল; কেহ বলেন তৎপূর্বে এখানে মেহদীগাছের বন ছিল। মাণিকতলা—পীর মাণিকের নামানুসারে হইয়াছে। সোণাগাছি—সোণাগাছি নামে একজন মুসলমান জমীদার এই অঞ্চলে ছিল। “ইমান বক্স খানাদারের লেন” নামে একটি রাস্তা আছে। এই ইমান বক্স কোন্ সময়ে কোথাকার খানাদার ছিলেন, ইহা জানা যায় নাই।

কতকগুলি স্থানের নাম তদ্রূপ প্রাচীন বিখ্যাত বস্ত হইতে নামকরণ হইয়াছে। ষণা,—ঘোড়াসাঁকো, এইখানে পূর্বে দুইটি সাঁকো পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গা-নদী চিংপুর রাস্তার যতটা পূর্বে গরিয়া গিয়াছে, পূর্বে ততটা দূরে ছিল না। এখন দরমাহাটার রাস্তার উপর টাকশালের নিকট যেখানে ৮ জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে, পূর্বে সেই মন্দিরের নিম্নে ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। সেই সময়ে ঘোড়াসাঁকো পন্নীতে বোধ হয় গ্রামের জল-নির্গমনের জন্য বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী ছিল। সেই প্রণালীর বিস্তৃতি সম্ভবতঃ কিছু বেশী ছিল, আর সেইজন্য পারাপারের সুবিধার্থ চিংপুর রাস্তার মুখে দুইটি ঘোড়া সাঁকো ছিল। এই সাঁকো দুইটি হইতেই এ স্থানের নাম হইয়া থাকিবে। যখন কলিকাতার প্রথম ড্রেণ হয়, তখন চিংপুর রাস্তার নিম্নে এই সাঁকোর পোস্তার অবশিষ্টাংশ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু ঠিক কোথায় বাহির হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। ঘোড়াবাগান—এরূপ পাশাপাশি দুইটি বাগানছিল। পাথুরিয়াঘাটা—অনেকে মনে করেন প্রথমকুমার ঠাকুরের পাথর বাধান ঘাট হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। যখন সমস্ত ট্রাণ্ড রোড গঙ্গার গর্ভে ছিল, তখন পূর্বোক্ত ঘোড়াবাগানের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে পাথর বাধান একটি ঘাট ছিল, লোক তাহাকে “পাথুরিয়া ঘাট” বলিত। সেই ঘাট হইতেই এ স্থানের নামকরণ হইয়াছে। বড়বাজার,—প্রাচীন “কলিকাতা” নামক গ্রামের হাট বা বাজার এইখানে হইত, নিকটবর্তী কয়েকখানি গ্রামের মধ্যে এত বড় হাট বা বাজার আর ছিল না বলিয়া সে কালেও এ স্থানকে “বড়বাজার” বলিত। এখনও সহরে এত বড় বৃহৎবাজার আর নাই;

সামান্য মাছ তরকারী হইতে হীরামতি জহরৎ বখন বত টাকার আবশ্রুক, তাহা এই বড়বাজারে পাওয়া যায়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এ স্থান এই নামেই অভিহিত হইত। শোভা বা সভাবাজার—অনেকে বলেন যে, রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে তাঁহার বাটীতে যে কারুগরের সমবেত মহতী সভা হইয়াছিল, তাহারই প্রসিদ্ধি হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। কেহ বলেন যে, সেই সভার আহৃত ব্যক্তিগণের দৈর্ঘ্যমিহন ব্যাপার নির্বাহার্থ নবকৃষ্ণকে একটি বাজারের মত ভাণ্ডার স্থাপন করিতে ও তাঁহাদের বাসের জন্য গৃহাদি নির্মাণ করা হইতে হইয়াছিল, যে স্থানে এই সকল হইয়াছিল, লোকে সেই স্থানকে “সভার বাজার” বলিত; ক্রমে তাহা হইতে “সভা-বাজার” নামের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু ইহার কোনটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ যে সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধ হয়, তাহার বহু পূর্বে হইতেই এই স্থান এই নামেই বিখ্যাত ছিল; ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের কোম্পানীর কাগজপত্রে, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল সাহেবের লিপিতে ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব এবং মুন্সী (তখন রাজা হন নাই) নবকৃষ্ণের নামের সহিত এ স্থানের এই নামেই পরিচয় আছে। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, কলিকাতার প্রাচীন বসাকবংশের শোভারাম বসাক এখানে একটি বাজার করিয়া তাহার নাম “শোভারাম বাজার” রাখেন—তাহা হইতে ইহার নাম “শোভাবাজার” হইয়াছে। কিন্তু তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না বা তাহার সাপক্ষে কোন কাগজপত্রও পাওয়া যায় না, কারণ প্রাচীন কালে বা মধ্যকালে কলিকাতার যে সকল ব্যক্তিগত নামে বাজার স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নামের অর্দ্ধাংশ লোপ বা নামের পর বাবু শব্দ লোপ দেখা যায় না। যেমন, মাধব বাবুর বাজার, লালা বাবুর বাজার, জগু বাবুর বাজার ইত্যাদি; সুতরাং যদি শোভারাম বসাকের নামে এ স্থানের নামকরণ হইত, তাহা হইলে “শোভারাম বাবুর বাজার” এইরূপ নামকরণ হইত। কোন বিখ্যাত প্রাচীন বিজ্ঞ লোক রাজা রাধাকান্ত দেবের মুখে শুনিয়াছেন যে, পূর্বে ঐ বাজারের ‘সুবা বাজার’ অর্থাৎ সুবাদারের বাজার এই নাম ছিল; তাহারই অপভ্রংশ করিয়া বঙ্গবাসীরা ‘সুতা’ বা ‘সভাবাজার’ বলিয়া থাকে। পূর্বে এই বাজার তখনকার (কাঁচা) চিংপুর রাস্তার উপর বসিত। শোভাবাজারের দক্ষিণ এবং দর্জিপাড়া ও বালাধানার উত্তরস্থানকে এখন “রাজার পাড়া” বলে, কিন্তু পূর্বে এই স্থানকে “হুজুমান-বাগান” বলিত। সেকালে নাকি এই অঞ্চলে বানরের বিশেষ উপদ্রব ছিল।

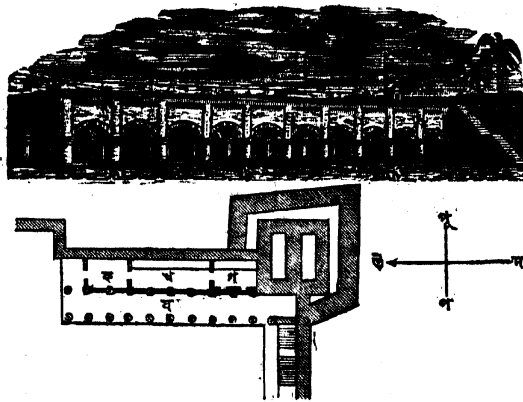
এখনও মদনমার নিকট একস্থলে যথেষ্ট বানর আছে দেখা যায়। চোরবাগান—পূর্বে এখানে চোর ডাকাতির বিশেষ উপদ্রব ছিল বলিয়া লোকে এই অঞ্চলের এইরূপ নাম দিয়াছিল। এখন দেখানে ছাত্তু বাবুর মাঠে বাজার হইয়াছে, তাহার উত্তরাংশে দর্জিপাড়ার রাস্তা পর্য্যন্ত ছাত্তু বাবুর বাটীর উত্তরাংশকে পূর্বে “মালীর বাগান” বলিত। জোরপতি রাম-চুলালের বাগানের মালীরা এই অঞ্চলে থাকিত বলিয়া এই নাম হইয়াছিল। মালীর বাগান ছাড়াইয়া পূর্বে “হেদো” বা “হেছা” নামক স্থান। “হেদো” হ্রদ শব্দের অপভ্রংশ, ১০৮০ বর্ষ পূর্বে, এখানে বনজঙ্গলে পরিণত জব্বা জলা বা ‘দহ’ ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম “হেদো” হইয়াছে। পূর্বে এখানেও চোর ও দ্রুত লোকের বড় উপদ্রব ছিল। পূর্বকার সেই বন কাটা হইয়া এবং ‘জলা’ পরিষ্কার করিয়া বর্তমান ‘হেছা পুকুর’ হইয়াছে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজারের নিকট অনেকগুলি নীচ জাতীয়া বেষ্ট্রার বাস ছিল, এ সময়ে এখানে মাঝিমালাগণের গতিবিধি ছিল। এখনও নিকটবর্তী “সিদ্ধেশ্বরীতলায়” ঐরূপ বেষ্ট্রাগণের যথেষ্ট বাস আছে। এই সিদ্ধেশ্বরীতলায় “সিদ্ধেশ্বরী” নামক কালীর মন্দির ও নবরত্ন নামক শিবমন্দির আছে। এতদুভয় মন্দির কুমারতুলীর মিত্রবংশের আদিপুরুষ সেকালের কলিকাতার নায়েব জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শুনা যায়, সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে গোবিন্দরামের সময়ে এত বলি দেওয়া হইত যে, রক্তশ্রোত চিংপুর রাস্তার নর্দমা ভরিয়া গলায় গিয়া পড়িত। সিদ্ধেশ্বরীতলার উত্তরে মদনমোহনতলা। এখানে বিষ্ণুপুর-রাজবাটীর বিগ্রহ মদনমোহন নামক শ্রীকৃষ্ণমূর্তির মন্দির ও রাসমঞ্চ আছে। এখানে রাসযাত্রার সময়ে এবং প্রাচুর্ষিতীর পূর্ব দিন অন্নকুট-যাত্রার সময়ে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহ ঋণগ্রস্ত হইয়া কলিকাতার বাগবাজার-নিবাসী তখনকার জনৈক লবণব্যবসারী কায়স্থবণিক গোবুলচাঁদ মিত্রের নিকট লক্ষ টাকা ধার করেন এবং প্রতিভূরূপ মদনমোহন বিগ্রহ রাখিয়া যান। পরে যখন আবার উদ্ধার করিতে আসেন, তখন গোবুলের সেবার তুট হইয়া মদনমোহন তাহাকে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন ও স্বপ্নে রাজাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। হাটখোলা—শোভাবাজারের পশ্চিমাংশে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত স্থানের নাম “হাটখোলা”। এইখানেই বর্তমান চাপাতলা ও রথতলা-বাটের মধ্যে প্রাচীন “হুতাশুটি বাট” ছিল আর সেই বাটের উপরেই “হুতাশুটি হাট” ছিল। সেই হাট হইতে

এই স্থানের নাম হইয়াছে। এখন এখানে অনেকগুলি মহাজনের আড়ত আছে।

ডাল্‌হাউসি কয়ার ও ষ্ট্রীট নামক রাস্তা ও স্থান, লর্ড ডাল্‌হাউসির নামে অভিহিত হইয়াছে। “ডাল্‌হাউসি কয়ার” এতদেশীয়ের নিকট “লালদীঘী” নামে পরিচিত। লালদীঘী অতি প্রাচীন স্থান, গত শতাব্দীতে ইহাকে ইংরাজের “কেল্লার বাগান” (Green in the Fort) বলিতেন।* আজকাল সাহেবেরা ইহাকে “ট্যাক্স কয়ার” বলিয়া থাকেন। কলিকাতায় যখন জলের কল হয় নাই, তখন কলিকাতার দক্ষিণাংশে এই লালদীঘীর জলই পানীররূপে ব্যবহৃত হইত। যখন বর্তমান পোষ্ট-আপিসের নিকট কলিকাতার “পুরাণ কেল্লা” ছিল, তখন এই পুকুরিণী ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানই ইংরাজদিগের সায়াংকালীন ভ্রমণ ও আমোদপ্রমোদের স্থল ছিল। ইহার তীরে একটি কমলানুব্রুজ ছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সেই কুঞ্জে বসিয়া প্রাচীনকালের ইংরাজগণ সুখে কথোপকথন করিতেন। এই দীঘীর নাম “লালদীঘী” ও ইহার নিকটস্থ রাস্তার নাম “লালবাজার” কেন হইল, তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্বে এই স্থানের স্তম্ভিকার বর্ণ রক্তবর্ণ ছিল, আবার কেহ বলেন যে, পূর্বে ইহার নিকটেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃহৎ বৃহৎ লাল রঙের বাড়ী ছিল, তাহা হইতে এরূপ নাম হইয়াছে। টাভেলিয়ার্সের লিখিত বিবরণে দেখা যায় যে, “পূর্বে এখানে

প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার স্থল “অন্ধকূপ” বর্তমান ছিল। পূর্বে এই স্থানে অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি ৫০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। মিঃ হল-ওয়েল যিনি অন্ধকূপ-কারার বন্দী ছিলেন, যিনি জগদীশ্বরের রূপায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২০ জুন রায়ে সেই দমকবল



(ক) প্রহরীসভা। (খ) বারিক। (গ) প্রাচীন অন্ধকূপের বহির্ভূত।

সের আদেশে ডাঙ্গিরা ফেলা হইয়াছে। যেখানে এই স্তম্ভ ছিল, এখন সেখানে ছোটলাট ইডেনের স্তম্ভ আছে। এই

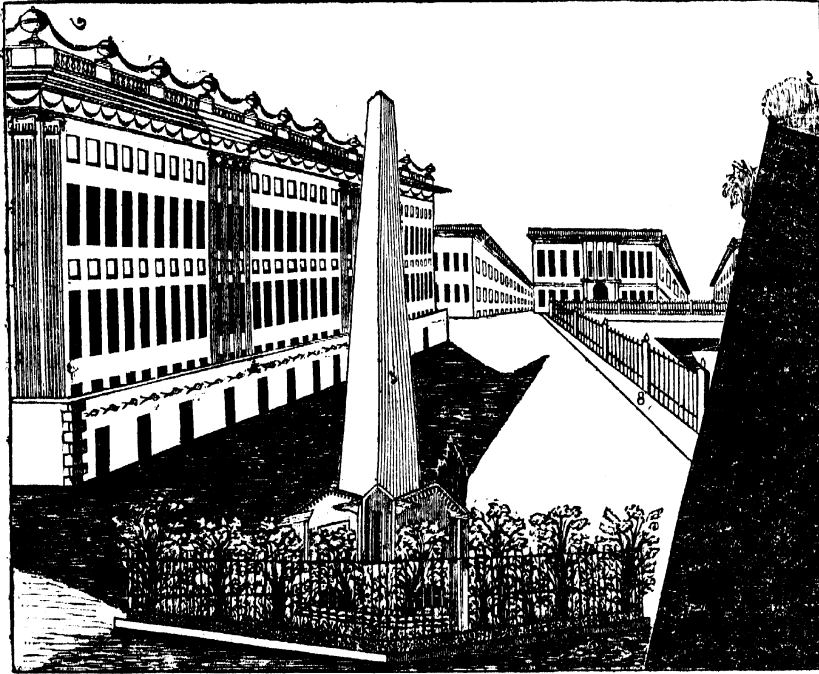
দীঘী ছিল না। কলিকাতার দক্ষিণাংশে স্মিট জলের অভাব হওয়ার এতদঞ্চলের অধিবাসীগণের প্ররোচনায় গভর্ণমেন্টের আদেশে “পুরাণ কেল্লা”র সমুখের বাগানের মেছোপুকুর বাড়াইয়া দীঘী করা হয় ও সাধারণ বাহাতে এই দীঘীতে স্নানাদি করিয়া জল নষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্ত চতুর্দিকে লৌহ বেড়া দেওয়া হয়।” এক্ষণে লালদীঘীর পরিসর বড়টা আছে, পূর্বে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী ছিল। যখন ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল ছিলেন, তখন ইহার তীর বাধান ও খননকার্য শেষ হয়। লালদীঘীর উত্তরপূর্ব কোণে হইতে “লালবাজার” নামে যে রাস্তা অপর চিংপুর রোডে মিলিয়াছে ও তৎপরে পূর্বমুখে “বহুবাজার ষ্ট্রীট” নামে বরাবর শিয়ালদহ গিয়া মিশিয়াছে, এই রাস্তাটি বহু প্রাচীন; ইহার নাম তখন ছিল “টবঠকথানার রাস্তা।” “লালবাজার” রাস্তা যেখানে “অপর চিংপুর রোডে” মিশিয়াছে, তাহারই উত্তরপূর্বকোণে এখন পুলিশ আপিস। যে বাটীতে পুলিশ আপিস আছে, ঐ বাটী জন্ পামার নামক ইংরাজ বণিকের বাটী ছিল। সেই পুরাতন বাটী গতবৎসর (১৮৯১) ডাঙ্গিরা আগুন পুনর্গঠিত হইয়াছে। পামার সাহেবের পিতা ওয়ারেন হেস্টিংসের সেক্রেটারী ছিলেন। ইহার ছাত্র দয়ালু ইংরাজ আর ছিল না। এখন যাহার নাম “হরিণবাড়ী”, তাহাই সেকালের কলিকাতার “জেল” ছিল। লালদীঘীর উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রাচীন কলিকাতার

হইতে পরিজ্ঞাপ পাইয়াছিলেন; তিনিই নিজ-বায়ে সে রায়ে, সে ঘরে বাহারা মরিয়াছিলেন, তাহাদের স্মরণার্থ ঐ স্তম্ভটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অন্ধকূপে মৃত প্রত্যেক ব্যক্তির নাম স্তম্ভগাত্রে খোদিত ছিল। এই স্তম্ভটি অনেকদিন দণ্ডায়মান ছিল, শেষে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিং-লালদীঘীর নিকটে যেখানে বর্তমান “কাষ্টম হাউস” ও “পোষ্ট আপিস” আছে, পূর্বে সেইখানি প্রাচীন কোর্ট উইলিয়ম

* তখন ইহাতে লালদীঘীর ছাত্র বড় পুকুরিণী ছিল না। বাগানের মধ্যস্থলে একটি ছোট পুকুরিণী ছিল, তাহাতে ইংরাজেরা আমোদের জন্য মাচ ছাড়িয়া রাখিতেন। এই সময়ে এই বাগানে ২৫ একরেরও বেশী বন্যী ছিল।

নামক চূর্ণ ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চূর্ণের বাটী বর্তমান ছিল, শেষে ঐ বৎসরেই তাহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া কেলিরা “কাউন্স-হাউস” নির্মিত হয় ও অবশিষ্টাংশ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গিয়া কেলিরা “পোষ্ট অফিস” নির্মিত হইয়াছে। প্রাচীন চূর্ণের একপার্শ্বের প্রাচীর বর্তমান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল, পরে গত আগষ্টমাসে নূতন “কালেক্টরেট বিল্ডিং” নির্মাণের সময়ে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। এই নূতন বাটীর ভিত্তি-খননের সময়ে পোষ্ট অফিসের বর্তমান উত্তর-পূর্ব ফটক, বাহার মস্তকের উপর ভিত্তরদিকে

“অন্ধকূপ” স্থিতি প্রস্তরখানি গাঁথা আছে, তাহারই উত্তরে ৫৬ ফুট মাটির নিম্নে একটি ঘর বাহির হইয়াছিল। গৃহটিতে একটি জানালা ছিল এবং তাহার ছাদ, দেওয়াল, খিলান কোথাও ভাঙে নাই। গৃহটির বহির্ভাগের প্রাচীরে ও গৃহের অভ্যন্তরে বালির অমাত্র পর্যন্ত নষ্ট হয় নাই। সকলেই স্থির করিয়াছেন যে, ইহা প্রাচীন চূর্ণের অভ্যন্তরস্থ একটি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল, শুদামরূপে বা ভূতাদির অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। পুরাতন চূর্ণ গঙ্গাতীরের দিকে, এখন যেখানে পোর্ট কমিসনরগণের অফিস আছে, সেই পর্যন্ত ও এখন



(১) ১৭৯০ খৃঃ অঃ অন্ধকূপ স্থিতিস্থল। (২) পুরাণ কোমা। (৩) কোম্পানী কর্মচারীর নিবাস। (৪) লালদীঘী।

যেখানে রেলওয়ে অফিস আছে, তাহার উত্তরস্থ রাস্তার উত্তরে ও কিয়দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কারণ, ঐ সকল স্থানে যখন আধুনিক গৃহাদি নির্মিত হয়, তখন ভিত্তি-খননের সময়ে ভূমধ্য হইতে বড় বড় প্রাচীরের অংশ পাওয়া গিয়াছিল।

লালদীঘীর উত্তরে “রাইটার্স বিল্ডিং”। এই সৌখ্যমালা অতি প্রাচীন, তবে পূর্বকালে ইহার সম্মুখভাগ একরূপ ক্ষুদ্র ছিল না। এই বাটীর উত্তরদিকে বর্তমান “লার্নার্স” নামক রাস্তার উত্তর ও পূর্বে যে সকল গৃহাদি নির্মিত হইয়াছে, তাহাও সে কালে ছিল না। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মিঃ বার-

ওয়েল কলিকাতার গবর্নর ছিলেন, তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের কর্ম হইতে অবসর লইয়া প্রস্থান করেন। যখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, তখন এই বৃহৎ সৌখ্যমালা তাঁহার সম্পত্তি ছিল। অবশেষে, যখন কোম্পানীর কর্মচারী যুবক সিভিলিয়ানগণের সংখ্যা বেশী হইল, তখন এই সৌখ্যমালা গবর্নমেন্ট বারওয়েল-পরিবারের নিকট হইতে ভাড়া লইয়া ঐ সকল কর্মচারীকে থাকিতে দেন। তখন হইতে ইহার নাম “রাইটার্স বিল্ডিং” হয়। অবশেষে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইহার সম্মুখভাগ পরিবর্তিত এবং আরও বর্ধিত হয়। “রাইটার্স বিল্ডিং”এর উত্তরপার্শ্ব দিয়া “কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট”

নামক বর্তমান রাস্তা আছে। এই রাস্তার উত্তরপূর্ব কোণে যে বাড়ীতে এখন “এক্সচেঞ্জ” আছে, পূর্বে সেই বাড়ীতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোর্ট উইলিয়ম কলেজ” স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাস্তার অপর পার্শ্বে যে দীর্ঘ লোমসীলা আছে, তাহাই পূর্বে “হয়করা” নামক সংবাদ পত্রের কার্যালয় ছিল। তখন “কোর্ট উইলিয়ম কলেজ” বাড়ি ও “হয়করা” আফিস, এতদ্ব্যতীত ছােদের উপর দিয়া একটি কাঠের সঁকো দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন ছিল। “রাইটাস বিলডিং”এর পশ্চিমে প্রাচীন “সেন্টজন গির্জা” ছিল। এই গির্জাই কলিকাতার সর্ব প্রথম গির্জা। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্মিত হয়, ইহার চূড়া সর্ষাপেক্ষা উচ্চ ও সুদৃশ্য ছিল। সে কালের গবর্নরগণ কোম্পানীর অধীনস্থ কলিকাতাবাসী ইংরাজকর্মচারীগণে পরিবৃত্ত হইয়া প্রতি রবিবারে এইখানে উপাসনা করিতে আসিতেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পে এই গির্জার চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদৌলা যখন কলিকাতা অবরোধ করেন তখন তাঁহার আদেশে এই গির্জা ধ্বংস করা হয়।

যে রাস্তা রাধাবাঙ্গারের রাস্তার সম্মুখ দিয়া লালবাঙ্গারের রাস্তা হইতে বহির্গত হইয়াছে, উহাকে “মিসন্ রো” বলে। পূর্বে ইহাকে “দি রোপ ওয়াক্” বলিত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা অবরোধের সময়ে এই পথের উপর মহাবুদ্ধ হইয়াছিল। এই রাস্তার উপর একটি গির্জা আছে। এই গির্জার নাম “ওল্ড চর্চ বা ওল্ড মিসন্ চর্চ”। ইহার বাঙ্গালা নাম “লাল-গির্জা”, ১৭৬৭ সালে মিঃ কিরনাওয়ার নামক এক ব্যক্তি ইহা স্থাপন করেন। তিনি ইহার “বেথ-টফিলা” নাম দিয়াছিলেন। কিরনাওয়ার সাহেব সুইডেন-দেশীয় লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইহা একটি ক্ষুদ্র গির্জা ছিল। তখন ইহার গায়ে এক প্রকার পাথুরে লাল রং দেওয়া ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম “লাল গির্জা” হইয়াছিল; কেহ বলেন, লালদীঘীর নিকটে অবস্থিত বলিয়াই ইহার নাম “লাল গির্জা” হইয়াছে। অবশেষে বটট নামে একজন দিনেমার বর্তমান গির্জাতত্ত্ব ও গৃহাদি নির্মাণ করেন। এই বাড়ি নির্মাণের সময়ে কিরনাওয়ারের ‘বেথ-টফিলা’ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়।

লালদীঘীর নিজ দক্ষিণে একটি প্রস্তরনির্মিত বাড়ী আছে, ইহার নাম “ডালহৌসি ইন্সটিটিউট”। এই প্রস্তর গৃহটি বড় বড় বিখ্যাতলোকের প্রস্তরমূর্তি রাখিবার জন্য নির্মিত হয়। এখানে লর্ড ডালহৌসি, সিপাহীযুদ্ধে বিখ্যাত বীর হাডলক, নীল, আউটরায়, নিকলসন্ প্রভৃতি কয়েক

জনের প্রস্তর মূর্তি এবং একটি রজ-(থিয়েটার)-মঞ্চ আছে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহার সমুখভাগ নির্মিত হয়।

“ডালহৌসি ইন্সটিটিউটের” দক্ষিণ রাস্তার অপর পার্শ্বে “টেলিগ্রাফ আফিস।” ১৮৭৩ সালে ইহা নির্মিত হয়। ইহার উত্তর-পূর্বকোণে একটি ১২০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ আছে। লালদীঘীর দক্ষিণ-পূর্বকোণে “কয়েলি আফিস”। এখানে নোট ভান্ডাই হয়। এই বাড়িটি পূর্বে “আগ্রা ও মার্চা-ম্যান ব্যাল্লের” জন্য নির্মিত হয়, কিন্তু বাড়ীটির নির্মাণ শেষ হইবার পরে উক্ত ব্যাক ‘কেন’ হয়। গবর্নমেন্ট ক্রয় করিয়া “কয়েলি আফিস” করেন।

কয়েলি আফিসের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণের চৌমাথা হইতে যে রাস্তা টেলিগ্রাফ আফিসের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার নাম “ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট”। এই রাস্তাটি বরাবর গবর্নমেন্ট হাউসের উত্তর ফটকের সম্মুখ দিয়া ময়দানে আসিয়া মিলিয়াছে। এই রাস্তার উপর যত টাকার ব্যবসা বাণিজ্য হইয়া থাকে, এত টাকার ব্যবসা পৃথিবীর আর কোথাও একস্থানে এক রাস্তার উপরে হয় না। এইখানেই ইংরাজ-তুহুরী হামিল্টনের দোকান। এই অঞ্চলে একটি বাড়িওয়াল। গির্জা আছে, উহা সেকালে ছিল না। উহার নাম “সেন্ট অ্যাণ্ড্রু চর্চ”, এদেশীয়েরা উহাকে “লাটগাহেবের গির্জা” বলে। লর্ড ময়রা ইহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন বলিয়া ইহার দেশীয় নাম ঐরূপ হইয়াছে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ এ জুন ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়; ঐ দিন ইংরাজী পর্বে “সেন্ট অ্যাণ্ড্রু ডে” এবং তাহা হইতেই ইহার নাম “সেন্ট অ্যাণ্ড্রু চর্চ” রাখা হয়। ইহার ঘড়ীটি ১৮৩৫ সালে প্রদত্ত হয়। ডাক্তার ব্রাইন্স নামক একব্যক্তি এই গির্জার স্থাপয়িতা; ইহা স্কটল্যান্ডের পাদরীগণের অধিকারভুক্ত। কলিকাতার মধ্যে এই গির্জার চূড়া অনেকা-নেক গির্জা অপেক্ষা উচ্চ। কলিকাতার প্রথম বিশপ্ মিডলটনের সহিত ডাঃ ব্রাইন্সের ইংলণ্ডীয় ও স্কটল্যান্ডীয় গির্জার উচ্চতা লইয়া তর্ক হয়। সেই তর্কের বশে ব্রাইন্স ইহার চূড়া সর্ষাপেক্ষা উচ্চ করেন। বিশপ্ মিডলটন তখন নুতন “সেন্টজন চর্চ” (পাথুরিয়া গির্জার) থাকিতেন, ব্রাইন্স সেন্টজন চর্চের চূড়া অপেক্ষা সেন্ট অ্যাণ্ড্রু চর্চের চূড়া উচ্চ করিয়া তত্ক্ষণাৎ একটি বায়ুগতি-নির্দেশক যোজগ পক্ষী স্থাপন করেন। ইংরাজ গবর্নমেন্ট ইংলণ্ডীয় চর্চের সজ্জ রক্ষার্থ ও বিশপ্ মিডলটনের মাজ রক্ষা করিবার জন্য নিয়ম করেন যে, পূর্ত বিভাগ হইতে সেন্ট অ্যাণ্ড্রু চর্চের সমস্ত অংশ যেরামত হইবে, কেবল ঐ পক্ষীর কিছু দোষ হইলে

তাহা পূর্ববিভাগ হইতে মেরামত হইবে না; আজিও এই নিয়ম চলিতেছে। এই সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ চর্চ যে স্থলে নির্মিত, পূর্বে সেইখানে “ওল্ড কোর্ট হাউস” বা সাবেক টাউনহল ছিল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ বুসিয়ার নামক একজন বণিক এই টাউনহল প্রস্তুত করান। ঐ বণিকই অবশেষে বোম্বাইয়ের গবর্নর হন। ১৭৩৪ সালে মিঃ বুসিয়ার ঐ টাউনহলটি গবর্নমেন্টকে দান করেন। গবর্নমেন্টের সহিত তাঁহার কথা পাকে যে, গবর্নমেন্ট বার্ষিক ৪০০০ টাকা সাহায্য করিয়া একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করিবেন। এই টাকায় বর্তমান “ফ্রি স্কুল” স্থাপিত হয়। এই প্রাচীন টাউনহলের ছাদের উপর ছইটি সভাগৃহ ছিল। সেখানে তদানীন্তন ইংরাজগণের ভোজ, নৃত্য, সভা ও বক্তৃতাাদি হইত। সাবেক টাউনহলের নিকট বর্তমান “লারঙ্গ রোড” নামক রাস্তার উত্তর-পূর্বকোণে সেকালের ইংরাজগণের “থিয়েটার গৃহ” ছিল। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে অবরোধের সময়ে সিরাজের সৈন্যদল এই “থিয়েটার গৃহ” অধিকার করিয়া এইখান হইতে প্রাচীন কেল্লার উপর তোপ মারিতে আরম্ভ করে।

পাথুরিয়া গির্জা—গবর্নমেন্ট হাউসের উত্তর পশ্চিম-কোণে “চর্চ লেনের” উপর যে ঘড়িওয়ালা গির্জা আছে, তাহাকে বাঙ্গালীরা “পাথুরিয়া গির্জা” বলে। ইহার নাম “সেন্ট জন চর্চ”। পুরাতন “সেন্ট জন চর্চ” সিরাজ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ইহা পুনর্নির্মিত হয়। ইহার ভিত্তিপ্রস্তর বড়লাট স্থাপন করেন। রাজা নবকুমার এই গির্জার লজ্জা ভবিষ্যৎ জমী বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রাচীন কবর স্থান ছিল। চর্চ লেনের দিকে এখনও কয়েকটি সমাধিস্তম্ভ বর্তমান। এই স্থানেই কলিকাতার স্থাপয়িতা জব চার্ণক, ইংরাজের বাঙ্গালা জয়ের প্রধান সহায় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ও যে ডাক্তার সম্রাট কিরোকসিয়ারকে আরোগ্য করিয়া বাঙ্গালায় ইংরাজ বাণিজ্যের স্বরূপাত করেন সেই ডাক্তার হার্মিন্টনের কবর আছে। কথিত আছে, গোড়নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট হিন্দুপ্রাসাদের ভগ্ন প্রস্তর দ্বারা ইহার গুপ্তটি নির্মিত হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীরা ইহাকে “পাথুরে গির্জা” বলে। চর্চ লেনের পশ্চিম পার্শ্বে টিক গির্জার সম্মুখে যে বাড়ীতে এখন “ষ্ট্যাম্প অ্যাণ্ড ষ্টেশনারী আপিস” আছে, সেই বাড়ীতেই পুরাতন কলিকাতার “চাঁক-শাল” ছিল। ১৭৯১ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে টাকা তৈয়ারী হইত। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম টাকা তৈয়ারী হয়।

গবর্নমেন্ট হাউস—১৭৯৩-৯৩ খৃষ্টাব্দে আপজন সাহেব যে

মানচিত্র করেন, তাহাতে দেখা যায়, বর্তমান লাট সাহেবের বাড়ীর স্থানেই পুরাতন লাট সাহেবের বাড়ী ও “কাউন্সিল হাউস” ছিল। তাহার পূর্বে এখন যেখানে “ট্রেজারি বিল্ডিং” আছে, সেইখানে ছিল। বর্তমান গবর্নমেন্ট হাউস লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। হেষ্টিংস দ্বীটে যে বাড়ীতে এখন বরণ কোং’র আপিস, সেই বাড়ীতে মিসেস হেষ্টিংস (ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্ত্রী) থাকিতেন। হাইকোর্টের পূর্বদিকে “ওল্ড পোষ্ট অফিস দ্বীট”। ইহাকে “উকীল পাড়ার রাস্তা” বলে। এইস্থানে যেখানে “এজরা বিল্ডিং” আছে, সেইখানে পূর্বতন ডাকঘর ছিল।

টাউনহল—যেখানে বর্তমান টাউনহল আছে, পূর্বে সেখানে জষ্টিস হাইডের বাড়ী ছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ৭ লক্ষ টাকায় বর্তমান “টাউনহল” নির্মিত হয়। টাকা চান্দার উঠে।

হাইকোর্ট—১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের আদেশে আলীপুরে বর্তমান গৈনিক হাসপাতাল নামক বাড়ীতে সদর দেওয়ানী বা আপীল আদালত এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় “সদর নিজামত আদালত” মিলিত হইয়া সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়। “ওল্ড কোর্ট হাউস” নামক স্থলে যে প্রাচীন “কোর্ট হাউস” বা “টাউনহল” ছিল, এখন যেখানে সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ চর্চ আছে, তাহাতেই এই আদালত বসিত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট তৈয়ারী হইয়া গেলে, এই বাড়ীতে সুপ্রীম কোর্ট উঠিয়া আসে ও পুরাতন কোর্ট হাউস ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বর্তমান হাইকোর্টের স্থানে পুরাতন সুপ্রীম কোর্টের বাড়ী ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট ভাঙ্গিয়া বর্তমান হাইকোর্ট নির্মিত হয়।

ছোট আদালত—চর্চ লেন হইতে উত্তরমুখে হেয়ার দ্বীটে বাহির হইয়া পড়িলেই রাস্তার উত্তরপার্শ্বে ছোট আদালত। ১৮৭২ সালে ইহা নির্মিত হয়।

পোষ্ট আপিস—পুরাতন কেল্লার কতকাংশ জমীর উপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

বান হাউস—কাষ্টম হাউসের নিকটেই “বান হাউস”; ইহার প্রকৃত নাম বণ্ডেড ওয়ার হাউস (Bonded ware-house). এই বাড়ীটি গুদাম মাত্র। কলিকাতা বন্দরে যে সকল মাল আসিয়া নামে বা এখান হইতে যাহা রপ্তানী হয়, তাহাই এই গুদামে থাকে। এই গুদামগুলিতে কিন্তু কাঠের সম্পর্ক নাই; কড়ি বরণা প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ বাড়ীটি খুব মজবুত।

রেলওয়ে আপিস—কাষ্টম হাউসের উত্তরে এই মনোহর বাড়ী অবস্থিত। এই ধরণের বাড়ী কলিকাতায় আর বিত্তীয় নাই। ইহার কার্গিলাদি প্রস্তর-নির্মিত। জানালা

দরজা কপাট ব্যতীত বাটীতে কাঠের সম্পর্কও নাই। ইহাতে দরজা, ও জানালার চৌকোট পাথরের প্রাচীর কাটিয়া করা হইয়াছে। এই বাটী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছে। ইহার উত্তরপূর্বকোণে ফুটপাথরের উপর এক জায়গা মেঝেমো করা আছে। এই স্থানে প্রাচীন কেল্লার উত্তরপূর্বকোণের বুদ্ধজ ছিল। রেলওয়ে আপিসের ভিত্তি খননের সময়ে এই বুদ্ধজ ও তাহার সংলগ্ন উত্তর দিকের আবরক প্রাচীর এবং উত্তরপশ্চিমের বুদ্ধজ ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমদিকের আবরক প্রাচীরের কিয়দংশ বাহির হইয়াছিল। এই সকল প্রাচীরের বহির্দেশে কোনরূপ বাতির বা চূণের কাজ ছিল না, ইষ্টকের লাল রং দেখা যাইত। অনেক মনে করেন—এই রক্তবর্ণের দুর্গপ্রাকারের সম্মিহিত বলিয়াই পূর্বোক্ত “কেল্লার বাগানের” মেছোপুকুরের নাম “লালদীঘী” হইয়াছে। কেহবা বলেন যে অশ্বি এবং হলওয়েল সাহেবের লিখিত প্রাচীন কেল্লার স্তম্ভের দোকানের নিকটস্থ দুর্গের জল-নির্গমের খিলানের মুখের পুকুরই লালদীঘী, পূর্বে এই পুকুরি দিয়া গঙ্গার জল ঘুরাইয়া আনিয়া দুর্গ পরিখা পূর্ণ করা হইত।”

মেটকাফ হল—ছোট আদালতের দক্ষিণপশ্চিমকোণে গঙ্গা-তীরে হেয়ার স্ট্রীটের দক্ষিণপার্শ্বে “মেটকাফ হল।” ১৮৪০ খৃঃ বাঙ্গালা মুদ্রাধস্তের স্বাধীনতা প্রদান উপলক্ষে লর্ড মেটকাফের নামে এই পুস্তকালয় স্থাপিত হয়।

টাকশাল—ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের নিকট এই সুন্দর বাটী প্রায় ৫৬ বিঘা জমীর উপর নির্মিত। ইহার মধ্যস্থলের বৃহৎ বাটীটি গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের গিনর্স দেবীর মন্দিরের অবিকল প্রতিকৃতি, তাহার দৈর্ঘ্য-বিস্তার ইহার ঠিক বিপুল। ১৮২৪-৩০ খৃষ্টাব্দে এই বাটী নির্মিত হয়। এখানে যে কল আছে, তাহাতে আবশ্যক হইলে ১ দিনে একেবারে ১০ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারে। ১৮৬৬ সালে একবার হঠাৎ প্রয়োজন হওয়ায় একদিনে ১৮ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল। যেখানে এখন টাকশাল অবস্থিত, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য কালে ভাগীরথীর বেলাভূমি ছিল।

ডাল্‌হৌসি স্কয়ারের ভায় লর্ড ওয়েলেসলির নামে স্কয়ার, প্রেস ও স্ট্রীটের নাম আছে। বহুবাজার-জলের কলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া যে রাস্তা বরাবর দক্ষিণ-মুখে “তেকোণা পুকুরের” নিকট পার্ক স্ট্রীটে মিলিয়াছে, তাহার নামই “ওয়েলেসলি স্ট্রীট” এই রাস্তার মধ্যস্থলে “ফ্রি-চর্চ” নামে একটি গির্জা আছে; ইহার দেশীয় নাম “মাজা-

সার গির্জা”। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ডক্ সাহেব অজ্ঞাতলোকের সহিত মিলিয়া এই গির্জা স্থাপন করেন। এই ফ্রি-চর্চের উত্তরে “কলিকাতা মাজানি কলেজ,” এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ওয়ারেন হেস্টিংস্। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে আরবী ও পারস্য ভাষার সাহিত্য, বিজ্ঞান ও মুসলমান আইন শিক্ষা দিবার জন্ত তিনি এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইহার বর্তমান বাটী নির্মিত হয়। ইহার সম্মুখে একটি পুকুরি আছে। ইহার দেশীয় নাম “মাজানি গোলপুকুর”। তেঁকোণা পুকুর ছাড়াইয়া আরও কিছু দক্ষিণে গেলে আর একটি পুকুরি আছে তাহার দেশীয় নাম “বায়ুন (ত্রাঙ্গণ) বস্তি (বসতি) দীঘী”।

ডিউক অব ওয়েলিংটনের নামেও একটি স্ট্রীট ও স্কয়ার আছে। ওয়েলেসলি স্ট্রীটের উত্তরে বহুবাজারে জলের কলের আপিস, এই জলের কলের মুক্তিকামধ্যস্থ পুকুরি দক্ষিণপার্শ্বে চৌমাথার নামই “ওয়েলিংটন স্কয়ার”। ওয়েলেসলি রাস্তার উত্তরমুখ হইতে বহুবাজার চৌরাস্তার দক্ষিণ পর্যন্ত যে রাস্তা তাহার নামই ওয়েলিংটন স্ট্রীট, এই রাস্তার উত্তরাংশে পূর্বদিকে “হিদারাম বাড়ুয়ার গলী” নামে একটি রাস্তা আছে। কলিকাতার প্রথম পত্তনের সময়ে সেই রাস্তা নির্মিত হয়।

বহুবাজার—বহুবাজার স্ট্রীট নামে একটি বৃহৎ রাস্তা বহুবাজার চৌরাস্তা হইতে পূর্বে শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্যন্ত ও পশ্চিমে অপার চিৎপুর রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তাটিই প্রাচীন বৈঠকখানার রাস্তা। বহুবাজার পল্লীটিও বহু প্রাচীন। বহুবাজার স্ট্রীটের পূর্বাংশে একটি স্থানের নাম “নেড়া গির্জা”। এই স্থানে পূর্বে একটি গির্জা ছিল। এখন যে বৃহৎ বাজার, যাহাকে “নেড়া গির্জার বাজার” বা “ভুলুপালের বাজার” বলে, পূর্বে সেইখানে গির্জাটি ছিল। এই স্থানে উক্ত “ভুলুপালের” ঠাকুর বাটী “কুঞ্জবাটী” নামক দেবালয়ে একটা মেলা হয়। সেই মেলায় প্রায় সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়। নববীপাদি দূর স্থান হইতেও বৈষ্ণবগণ এখানে আসিয়া থাকেন।

এই বহুবাজারে জল যোগাইবার কল আছে। এখানকার প্রধান কার্যালয় হইতেই চৌত্তের মধ্য দিয়া কলিকাতার সর্বত্র জল যোগান হইয়া থাকে।

বহুবাজার ছাড়াইয়া উত্তরে পটলডাঙ্গা ও কলেজ স্ট্রীট। এখানে কয়েকটি বিশ্ব বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত কলেজ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, হিন্দু কলেজ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, এবং ডাক্তারি শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ উঠিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে
লিপ্সিত হয়।

কলেজ ষ্ট্রীটের উত্তরে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ও ঠন্থনিয়া।
এই ঠন্থনিয়া কর্ণওয়ালিস্ ও চৌরবাগানের মোড়ে একটি
প্রাচীন কালী ও শিবমন্দির আছে। শঙ্কর ঘোষ নামক এক
ব্যক্তি ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ এইরূপ, একদিন
রজনীযোগে কালীদেবী শঙ্কর ঘোষকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ
করেন, ‘শঙ্কর! তোর বাটার পার্শ্বে আমার মন্দির নির্মাণ
করিয়া দে, তোর মঙ্গল হইবে।’ শঙ্কর ঘোষ দেবীর
আদেশে ঐ মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেবীকে এবং তাঁহার
পার্শ্বের মন্দিরে শিল্পিত স্থাপনা করিলেন। এখনও শিব-
মন্দিরের পাষাণের উপর খোদিত আছে—

“শঙ্করের হৃদয় মাঝে কালী বিরাজে।”

কলিকাতার এ অঞ্চল সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লেখা
আছে, কিন্তু প্রস্তাব বাহ্যিক ভয়ে এখানেই উপসংহার
করিতে হইল। এখন কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চল লইয়া দুই
এক কথা বলিব।

আদিগঙ্গা যেখানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই
মুখের উপর একটি সেতু আছে; মার্কুইন্স অব্ হেষ্টিংসের
শাসনকালে সাধারণ চাঁদার নির্মিত হয়। হেষ্টিংসের সময়ে
সেতুটি প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম “হেষ্টিংস্ ব্রিজ”
রাখা হয়। বিদ্যুৎপূর হইতে উক্ত সেতু পার হইয়া কুলি-
বাজারে পড়িতে হয়। এখানে গবর্ণমেন্টের কমিসেরিয়ট
স্তম্ভাম সকল আছে। এই স্থানে প্রথম ব্রাহ্মণরক্তে ইংরাজ-
শাসন কলুষিত হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এই আগষ্ট শনিবার দিবসে
মুর্শিদাবাদের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।
[নন্দকুমার দেখ।]

বর্তমান আলীপুরের সেতু হইতে কিছু দূরে দুইটি বুক
ছিল, তাহারই তলে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এবং সার ফিলিপ্
ফ্যানসিসের বন্দ যুদ্ধ হয়।

এখন আলীপুরে যে সৈনিকদিগের হাঁসপাতাল আছে,
তাহাতে পূর্বে সদর দেওয়ানী বা আপীল আদালত বসিত,
ঐ আদালত বর্তমান বড় আদালতের সহিত মিলিত হইলে
এই বাটতে সৈনিক হাঁসপাতাল (Military Hospital)
হইল। এই বাটার পূর্বদিকে নগরান্তিমুখে পাগলাগারদ ও
সাধারণ চিকিৎসালয় (General Hospital), শেষোক্ত বাটা
পূর্বে একজন ধনী বাগান ছিল, তৎপরে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে
গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিয়া সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

চৌরঙ্গী—উক্ত চিকিৎসালয় হইতে কিছু পূর্বদিকে

আসিলে চৌরঙ্গী নামক রাস্তা। এই রাস্তা চিংপুর হইতে
কালীঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বে যাজীগণ চিংপুরে চিত্রেশ্বরী
দর্শন করিয়া এই রাস্তা দিয়া কালীঘাটে বাইত। এই
রাস্তার পশ্চিমে গড়ের মাঠ এবং পূর্বে সম্রাট ইংরাজদিগের
বসতি স্থান। পূর্বকালে এইস্থান ও ময়দান নিবিড় বন
জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানেও বহু বরাহ ব্যাঘ্র
প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু বাস করিত, সেই বন মধ্যে দুর্দান্ত
ডাকাতদিগের আড্ডা ছিল। অস্ত্রশস্ত্র না লইয়া কেহই এ
পথে চলিতে পারিত না। কেহ কেহ বলেন, তৎকালে এখানে
গোরক্ষনাথের শিষ্য চৌরঙ্গী নামধারী হঠযোগীরা বাস
করিতেন, তাহা হইতে এইস্থান “চৌরঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ
হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, “প্রাচীন গোবিন্দপুরের
পূর্বাংশে জঙ্গল-গিরি নামক একজন চৌরঙ্গী যোগী কালী-
দেবীর কোন পবিত্র চিহ্নের সেবা করিতেন। ঐ চিহ্নই
দেবীর কনিষ্ঠাঙ্গুলি। অবশেষে গোবিন্দপুরে বর্তমান কেল্লা
নির্মাণ করিবার সময়ে এই পবিত্র চিহ্ন বর্তমান কালীঘাট
নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত দেবীপূজক চৌরঙ্গী
হইতে বর্তমান চৌরঙ্গী নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে।”
শেষোক্ত মতটি যুক্তিসিদ্ধ ও প্রামাণিক বলিয়া বোধ
হয় না। চৌরঙ্গী যোগীদিগের অনেক পূর্বে কালীঘাট
প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া
যায়। [কালীঘাট দেখ।] বিশেষতঃ জঙ্গলগিরির নাম
হইতে চৌরঙ্গীর উৎপত্তি এবং এখানে তাঁহার নিবাস সম্বন্ধে
কোন প্রমাণ অথবা জনপ্রবাদ প্রচলিত নাই। সুতরাং
জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী হইতে চৌরঙ্গীনামের উৎপত্তি অযৌ-
ক্তিক বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত। আরও চৌরঙ্গী
যোগীগণ এই অঞ্চলে কোন সময়ে বাস করিয়াছেন কি না,
তদ্বিষয়েই সন্দেহ আছে। [চৌরঙ্গী দেখ।]

চৌরঙ্গী এই স্থানীয় নামটি অধিকদিনের প্রাচীন বলিয়া
বোধ হয় না, ১৭৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরজাফরের পুত্র
মীরণের নামাঙ্কিত সনন্দপত্রসহ সংলগ্ন ‘ফরদি সনন্দ’
চৌরঙ্গী একটি মৌজা বলিয়া সর্বপ্রথম বর্ণিত হইয়াছে।
তৎকালে এই স্থান কতকটা পরগণা কলিকাতার অন্তর্গত
এবং কিয়দংশ পরগণা পাইকানের অন্তর্গত ছিল। ১৭৫৭
খৃষ্টাব্দে এখানকার বনজঙ্গল পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়।
এখন চৌরঙ্গীতে বে সকল সৌধমালা দেখা যায়, উহা
সমস্তই আধুনিক। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ২৪খানি মাজ
বাটা ছিল, তৎসাময়িক আপুজন সাহেবের মানচিত্র দেখিলেই

* এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি জেল।

জানা যায়। তৎকালে এখানে (বর্তমান মিডল্টন রো নামক গলিই ‘লোরেটে হাউস’ নামক বাড়িতে) সার ইলা-ইজা ইম্পি বাস করিতেন। তাঁহার বাড়ির নিকট পুষ্করী বা ঝিল ছিল, ঐ ঝিল বুজাইবার সময়ে, এখানে সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগের দারুণ স্তরপাত হইয়াছিল, তৎকাল বর্তমান ‘মিডল্টন রো’ নামক রাস্তা কিছুদিন ‘কলেরা ষ্ট্রীট’ বা ওলাউঠার রাস্তা বলিয়া খ্যাত ছিল। এই সমস্ত স্থান ইম্পির উদ্যান মধ্যে ছিল।

পার্ক ষ্ট্রীট—(দেখিয়েরা বাগানতলা বলিয়া থাকে)। এই রাস্তা হইয়া ইম্পির বাগানে যাইতে হইত বলিয়া পার্ক ষ্ট্রীট নাম রাখা হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এই পথ সমাধি-ভূমির রাস্তা (Burial Ground Road.) নামে অভিহিত ছিল। কারণ, সেই সময়ে এই পথ দিয়া শবদেহ লইয়া গোর দিতে যাইত। তৎকালে এখানে কেহ বড় একটা বাস করিতে চাহিত না। তখনকার সাহেবেরাও এখানে ভূতের ভয় করিত।

এই রাস্তার নিকটে উড ষ্ট্রীট ও থিয়েটার রোড, এই দুই রাস্তার সম্মুখে পূর্বে চক্ষু চিকিৎসালয় ছিল, তাহাতে কর্ণেল ট্রয়ার্ট সাহেব বাস করিতেন, তাঁহার পৌত্তলিকধর্মে বিশেষ আস্থা ছিল, তৎকালে সকলে তাঁহাকে ‘হিন্দু ট্রয়ার্ট’ বলিত।

সেন্টপলের গির্জা—চৌরঙ্গীর দক্ষিণপ্রান্তে ময়দানের উপর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। দেখিয়েরা ইহাকে ‘বর্জিতলার গির্জা’ বলিয়া থাকে। এই গির্জার সম্মুখে রাস্তার পূর্বপ্রান্তে লর্ড বিসপের বাড়ি আছে।

এসিয়াটিক সোসাইটি—এই প্রত্নতত্ত্ববিদের সভা গড়ের মাঠ হইতে পার্ক ষ্ট্রীটে প্রবেশ-পথের উপর অবস্থিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই বাড়ি নির্মিত হয়।

এসিয়াটিক সোসাইটির দুইটি বাড়ি পরেই চৌরঙ্গী রাস্তার উপর প্রসিদ্ধ মিউজিয়াম বা যাদুঘর; এই বাড়ি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

ধর্মতলা—চৌরঙ্গীর উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে এই রাস্তাকে এভিনিউ (Avenue) বলিত। তখন এই রাস্তা দিয়া লোনাবিল ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে বাওয়া যাইত। পূর্বে এখানে গাছের তলায় মহা সমারোহে ধর্মঠাকুরের পূজা হইত। এই পূজা নীচ লোকেরাই করিত। সেই ধর্মঠাকুরের নাম হইতে ‘ধর্মতলা’ নাম হইয়াছে। আবার কাহারও মতে, এখন যেখানে কুক সাহেবের আড়-গড়া, সেইখানে একটি বড় মসজিদ ছিল, তাহা হইতে এই

ধর্মতলা নাম হইয়াছে। ধর্মতলার বাজার ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহাকে পূর্বে সেকগীররের বাজার বলিত। ধর্মতলা রাস্তার কোণে মুসলমানদিগের একটি বৃহৎ মসজিদ আছে, এই মসজিদের কারুকার্য অতি চমৎকার। ইহা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের পুত্র শাহাজাদা গোলাম মুহ-ম্মদের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মতলা বাজারের দক্ষিণে মিউনিসিপাল আপিসের পাশেই ‘মিউনিসিপাল মার্কেট’ বা হুগুসাহেবের বাজার। এমম জুন্সর বাজার আর কোথাও দেখা যায় না।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি—কলিকাতা নামটি কি করিয়া হইল, এ সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দুই একটি কথা আমরা উল্লেখ করিব।

১। প্রবাদ আছে, যখন সর্বপ্রথম একজন ইংরাজ এখানে আসিয়া আর কাহাকেও না দেখিয়া একজন চাষীকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করেন, সে ইংরাজী কথা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, সাহেব বুঝি তাহার ধানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই ভাবিয়া সে উত্তর করিল, ‘কাল কাটা’ অর্থাৎ গতকাল এই ধান কাটিয়াছি। সাহেব মনে করিল, এই স্থানের নাম তবে বুঝি ‘ক্যালকাটা’।

২। লং সাহেব বলেন, কলিকাতার নাম সম্ভবত মহা-রাষ্ট্র-খাত অর্থাৎ খাল কাটা হইতে হইয়া থাকিবে।

৩। কোন কোন বিচক্ষণ ইংরাজের মতে কলিচূর্ণ হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি।

৪। কাহারও মতে কালীঘাট হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে।

উপরে যে কয়টি কথা লিখিলাম, আমাদের বিবেচনায় কোনটি যুক্তিসঙ্গত অথবা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

প্রথমতঃ ইংরাজ আগমন এবং মহারাষ্ট্র-খাত খননের পূর্বে কলিকাতা নাম ছিল। তাহা আমরা আবুল-ফজলের আইন-ই-অকবরীগ্রন্থে দেখিতে পাই। স্তরাং কাল-কাটা প্রবাদ ও খাল কাটা হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইতে পারে না।

কলিচূর্ণ হইতে কলিকাতার নাম হওয়া নিতান্ত উচ্চ মস্তিষ্কের কথা, এক্রপ প্রলাপ বাক্যে কর্ণপাত করা যাইতে পারে না।

কালীঘাট হইতেও কলিকাতা নাম হয় নাই। কারণ ভারতের নানাস্থানের প্রাচীন ও আধুনিক জনপদ নগরাদির নাম মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় ;

যে কালী স্থানে 'কলি' এবং ঘাট বা ঘাটা স্থানে 'কাতা' এরূপ নামের অপভ্রংশ বা নাম পরিবর্তন কখন ঘটে নাই, বিশেষতঃ কালীঘাটস্থানে কলিকাতা হওয়া শব্দশাস্ত্রের নিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। এমন কি ভারতের যে কোন স্থানের নামের আদিতে কালী আছে, তাহা ভারতবাসীর নিকট কেন, অদূরবর্তী বনগণ দ্বারাও বিভিন্ননামে উচ্চারিত হয় নাই। সুতরাং কালীঘাট নাম হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত এককালে পরিত্যাগ করাই উচিত। [কালীঘাট দেখ।]

কলিকাতাকে দেশীয়েরা 'কোল্‌কাতা' এবং উত্তর পশ্চিমের লোকেরা 'কল্কত্তা' বা 'কলকাত্তা' নামে উচ্চারণ করেন এবং বঙ্গবাসীরা লিখিবার সময় 'কলিকাতা' লেখেন বটে, কিন্তু উচ্চারণ করেন 'কোলিকাতা'। আমাদের কোন বিখ্যাত বঙ্ক 'কোল্‌কা হাতা' বা 'কোলি কা হাতা' হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি স্বীকার করেন। তিনি অস্বীকার করেন, প্রাচীনকালে কোল অথবা কোলি-জাতি এখানকার নদীতীরে বাস করিত, সম্ভবতঃ তাহাদের বাস থাকায় এখানকার কোল্‌কাতা বা কোলিকাতা নাম হইয়াছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও দ্রাবিড়ভাষায় 'কোল' শব্দের একটি অর্থ শূকর দৃষ্ট হয়। যখন কলিকাতা বনজঙ্গলে পরিণত ছিল, তৎকালে বর্তমান হুন্দরবনের স্থায় এখানেও যে বিস্তৃত শূকরের বাস ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অস্বীকার করা যায় সেই সময় হইতে এখানকার নাম 'কোল্‌কাতা' হইয়াছে। অকুবরের সময়ে (বোধ হয় তাহারও পূর্বে হইতে) কলিকাতামহলের প্রান্তবর্তী নীচ জাতিরা ঐ শূকর ধরিয়া বাস করিত। বরাহনগর* এ ব্যবসার প্রধানস্থল। ওলন্দাজ ও ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস পাঠে এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা হউক শূকর অথবা কোলজাতির নাম হইতেই যে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ বলিতে পারা যায় না। তবে কলিকাতা নাম কিসে হইল? তাহাই এখন বিবেচ্য।

* বরাহনগর নামট আধুনিক নহে। প্রাচীন ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের পুস্তকে এবং অকুবর বাহাদুরের সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীগ্রন্থে বরাহনগরের উল্লেখ আছে। কবি মাধবাচার্য্যের বচন উদ্ধৃত করিলাম।—

"কিরাইতন বাহি যায় সাধু ধনপতি।

বরাহনগরে ডিন্দা হইল উপনীতি।

চিত্রপুর ঘাট সাধু বাহে সাবধানে।

তাহার মেলনে ডিন্দা গেল কুচিরানে।"

যদিও এখনকার বঙ্গবাসীগণ কলিকাতা এবং পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা 'কল্কত্তা' বলিয়া থাকেন, কিন্তু অকুবরের সময়ে এবং ইংরাজ আগমনের পূর্বে এই স্থানকে প্রকৃতই কলিকাতা অথবা কলকত্তা বলিত কি না, তৎপক্ষেই এখন ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বে লিখিয়াছি বটে; আইন-ই-অকুবরীতে 'মহাল্ কল্কত্তা' এবং কবিকঙ্কণের মুদ্রিত চণ্ডীগ্রন্থে 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন আবার বিষম গোলযোগ দেখিতেছি। প্রথমতঃ এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে আইন-ই-অকুবরী নামক যে পারস্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ পুস্তকে সরকার সাতগাঁও-এর মধ্যে যেখানে 'মহাল্ কল্কত্তার' উল্লেখ আছে, তাহারই নিম্নে 'কল্‌তা,' 'কল্‌না,' 'তল্‌পা' এইরূপ পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রিত পুস্তকে থাকিলেও কবিকঙ্কণ রচিত চণ্ডীমঙ্গলের যে কয়েকখানি প্রাচীন পুথি দেখিলাম, তন্মধ্যেও 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ নাই। এতদ্ভাতিত অকুবরের সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীগ্রন্থে ধনপতি ও শ্রীমন্তের সমুদ্র যাত্রা বর্ণনাকালে বরাহনগর, চিত্রপুর, কালীঘাট প্রভৃতি পার্শ্বস্থ স্থানের উল্লেখ থাকিলেও ঐ গ্রন্থে কলিকাতা নামের কোন উল্লেখ নাই। এমন কি, এ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র অস্বীকার্য্য দ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ১৬ই আগষ্ট ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কল্কত্তা (Calcutta) নামের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে কল্কত্তা বা 'কলিকাতা' এই নামটি বর্তমান ছিল কিনা, তৎপক্ষেই ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কারণ, ওলন্দাজ ভ্যালেন্টাইনের মানচিত্রে প্রাচীন কলিকাতা গ্রামের উভয় পার্শ্ব চিট্টাহুটি (বা স্তাহুটি) ও গোবর্ধনপুর (বা গোবিন্দপুর) উক্ত দুইটি স্থানের উল্লেখ থাকিলেও কলিকাতার নাম পাওয়া যায় না। তাহাতে কলিকাতার নামোল্লেখ নাই বটে, কিন্তু একস্থানে ভ্যালেন্টাইন কল্কলা (Calcula) নামক একটি গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণেল ইউল সাহেব এই স্থানটি 'খোল খালি' বলিয়া অস্বীকার করেন। কোম্পানীর সময়কার একখানি অতি প্রাচীন সমুদ্রযাত্রীর মানচিত্রে 'কল্কলা' স্থানে কলকত্তা (Calcutta) লিখিত দেখা যায়। আবার টমাস্ কিচেন নামক একজন ভৌগোলিক কলকত্তা (Calcutta) স্থানে কল্কলা (Calcula) নাম ব্যবহার করিয়াছেন। যদিও ইউল্ কল্কলার নাম 'খোল খালি' বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু আনুমানিক প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক সময়ে এই কলি-

কাতাকে কেহ কেহ 'কল্‌কলা' নামক স্থান বলিয়াও মনে করিতেন। বাস্তবিক ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যখন কোন কাগজপত্রে স্পষ্টতঃ কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না, এবং ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ওলন্দাজ মানচিত্রে যখন স্থানটি ও গোবিন্দপুরের উল্লেখ থাকিলেও কলিকাতার নাম পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু একস্থলে 'কল্‌কলা' নাম পাওয়া যাইতেছে। তখন অনুমান করা যায়, এই কলিকাতার একটি প্রাচীন নাম 'কল্‌কলা' ছিল।

রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার শেষাবস্থায় বৃন্দাবনধামে একখানি বাঙ্গালা পদাবলি রচনা করেন, তিনি আপন মুদ্রিত পদাবলির মুখপত্রে 'কলিকাতা' স্থানে 'কিলকিলা' নাম লিখিয়াছেন। এতদ্বারা বোধ হইতেছে যে, রাজা রাধাকান্ত কলিকাতার যে অপর একটি প্রাচীন নাম 'কিলকিলা' ছিল, তাহা অবশ্যই জানিতেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক কবিরাম তৎকৃত দিগ্বিজয়প্রকাশে 'কিলকিলা' ভূমির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্বে যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এই কিলকিলা ভূমিই যে আইন-ই-অকবরীর 'মহাল্‌ কল্‌কতা',* তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কিলকিলার অপভ্রংশে ওলন্দাজ ভৌগোলিক কর্তৃক 'কল্‌কলা' শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব নহে। ঐ কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশে একস্থানে কিলকিলা যে ভাবে বর্ণিত আছে, তাহাকে কিলকিলা ভূমির অন্তর্গত কিলকিলানামক গ্রাম বলিয়াও অনুমিত হয়। যথা—

"কিলকিলা দক্ষিণাংশে যোজনত্রয় ব্যতায়।

সহস্রধারা গঙ্গাহি জাতা চ হস্তিকোটিকে ॥"

কিলকিলাবিবরণে ১৬৭ শ্লোঃ।

উক্ত কিলকিলা প্রাচীন কলিকাতা গ্রাম বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ এই কিলকিলা কলিকাতার অতি প্রাচীন নাম। এই কিলকিলা শব্দের অপভ্রংশে আইন-ই-অকবরী প্রভৃতিগ্রন্থে কল্‌কতা, কল্‌তা, কল্‌না, কল্‌কলা, কল্‌কতা, কলিকাতা প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আরব্য ও পারস্তভাষাবিদ মৌলবীগণও স্বীকার করেন যে, পারস্তভাষায় 'কল্‌কতা' শব্দ লিখিয়া তাহাতে যদি 'হুজা' না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ শব্দ কল্‌তা, কল্‌না, তল্‌না এইরূপ বিভিন্ন নামে উচ্চারিত হইতে পারে। বোধ হয়, তাই পারস্তভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন আইন-ই-অকবরীগ্রন্থে পাঠান্তর লক্ষিত হইতেছে।

* এখানকার সহর কলিকাতা নয়। কারণ অকবরের অনেক পরে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম উপনিবেশ সময়ে কলিকাতা একটি সামান্ত গ্রামরূপে অভিহিত হইত।

পুস্তকঃ কিলকিলা শব্দ ভাষান্তরে লিখিত হইয়া 'কল্‌কলা', 'কল্‌কতা', 'কল্‌কতা' ও পরিণেবে কলিকাতা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অশঙ্ক্য বলিয়া বোধ হয় না।

গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি।—কলিকাতার ভূতপূর্ব কালেক্টর ষ্টার্ণডেল সাহেবের মতে, গোবিন্দরাম মিত্রের নামানুসারে গোবিন্দপুর হইয়াছে। আবার বড় বাজারের শেঠ বসাকেরা বলিয়া থাকেন, পূর্বে এই স্থানে তাঁহাদের ইষ্টদেব গোবিন্দজীর মন্দির ছিল, তাহা হইতে এই স্থানের নাম গোবিন্দপুর হইয়াছে। এই দুইটি মতই বিশেষ মুক্তি-সম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। প্রথমতঃ গোবিন্দরাম মিত্রের অনেক পূর্ব হইতে গোবিন্দপুর নাম পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ যদি গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুর নাম হইত, তাহা হইলে যে সকল প্রাচীনগ্রন্থে গোবিন্দপুরের উল্লেখ আছে, তাহাতে গোবিন্দজীর নামও থাকা সম্ভবপর। বাহা হউক, কবিরাম বিরচিত দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক গ্রন্থে, গোবিন্দপুরের নামকরণ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ বিবরণ পাইয়াছি, নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"ইদানিং নৃপশার্দ্দূল চরভূমৌ কথা শৃণু।

কালীদেব্যাঃ সরিধৌ চ গঙ্গায়াং প্রাচ্যকৈ তটে ॥ ১০৫২

গোবিন্দনতো রাজা চ কলিবেদাক্সসহস্রগে।

সিদ্ধপদ্মমতৌর্থাত্রাকরণার্থং সমাগতঃ ॥ ১০৫৩

গোবিন্দদত্তভূপালং তীর্থং প্রভাগ্যতং শুভম্।

কালীদেবী স্বপ্নচ্ছলে নৌকাস্তম্বনুবাচ হ ॥ ১০৫৪

অকর্ষণীপুত্রীং রাজনুং আগচ্ছ হি মমাস্ততঃ।

বান্দর-রসা-পৃথিব্যাঞ্চ ছেদয়িত্বা তৃণাদিকম্ ॥ ১০৫৫

পুরং.....মহতীং মৎসকশতঃ।

প্রাপ্যাসি শূণ্ণ ভূপাল তে কল্যাণং ন চৈদপি ॥ ১০৫৬

কালীদেব্যা বচো জ্ঞাত্বা গঙ্গায়াশ্চ তটাস্তরে।

বসতিং ভূয়সীং তত্র চকার হি মুদাশ্রিতঃ ॥ ১০৫৭

পারোজগ্রামাৎ সর্বাণি জবিণানি মহীপতিঃ।

আনয়িত্বা চ বসতিং কৃতবান্‌ সুরসরিতটে ॥ ১০৫৮

লাজুগৌ দ্বিস্রব্ধমুতঃ দেব্যাঃ পূঠ চ বর্জিত।

যদাদেশেন তন্মূলে..... ॥ ১০৫৯

প্রাপ্তা তেনৈব ভূপেন মৃতিকাত্যস্তরে নিশি।

কাঞ্চনকর্ষপুরিতাশ্চালভ্যা দেবাসুতৈরমপি ॥ ১০৬০

ভূরাদি জবিণান্তেব প্রাপ্য গোবিন্দভূপতিঃ।

চতুঃষষ্টিসংখ্যাকৈশ্চ বলিভিঃ পূজনং কৃতম্ ॥ ১০৬১

গোত্রবৃদ্ধ্যা বিস্তবৃদ্ধ্যা তেজোবৃদ্ধ্যা হি ভূমিপ।

বভূব গোবিন্দনতো বার্ষিকপ্রবরো মহান্ ॥ ১০৬২

ভাগীরথীপূর্বতটে পুরীবর্ধনহেতবে।

বাস্তব্যাগং বিজান নীধা চকার বাসহেতবে॥” ১০৬৩

“হে সুপতিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চরকুমির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। গঙ্গার পূর্বপারে কালীদেবীর সন্নিকটে চারি সহস্র কল্যাক গোবিন্দনন্দ নামক একজন রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রাউদ্দেশ্যে আগমন করেন। বধন তিনি তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আইসেন, সেই সময়ে কালীদেবী নৌকামধ্যেই তাঁহাকে এইরূপ স্বপ্নাদেশ করেন; ‘রাজন্! ভূমি আমার আজ্ঞায় অকর্ষণপূরীতে * আগমন কর। আমার নিকটবর্তী বাদররশা (?) ভূমিতে তৃণশুল্কাদি পরিকার করিয়া একটি মহাগ্রাম সংস্থাপন কর। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।’ রাজা দেবীর আদেশ অবগত হইয়া পারীক্ষাগ্রাম (?) হইতে নানাবিধ ধনরত্ন আনয়ন করিয়া সুরধুনীতটে বসতি করিলেন। গোবিন্দনন্দ স্বপ্নকালে দেবীর পৃষ্ঠদেশে যে একখানি স্বরূপ যুক্ত লাল দেখিয়াছিলেন, পরে দেবীর আদেশে ঐ লাল দ্বারা তথাকার ভূমি খনন করিয়া প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ অর্থ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়া গোবিন্দনন্দ চতুঃষষ্টি বলি দ্বারা দেবীর পূজা করেন। ধন ধাত্র, বংশ ও বলের বৃদ্ধিশ্রয়ক তিনি কালক্রমে ঐ স্থানের বর্ধিত লোক হইয়াছিলেন। এইরূপ অতিথিত ঐশ্বর্যাভাভে তিনি পুরীর শ্রীবৃদ্ধি এবং ঐ স্থানে বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বাস্তুযাগ করাইয়াছিলেন।”

কবিরামের উক্ত বর্ণনা দ্বারা জানা বাইতেছে যে, রাজা গোবিন্দনন্দের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম ‘গোবিন্দপুর’ হইয়া থাকিবে।

স্বতাহুটি সম্বন্ধে হই একটি কথা।—ইতিপূর্বে স্বতাহুটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এখানে ইংরাজ আগমনের পূর্বে হইতে তত্ত্বাবধায়ক স্বতাহুটি (বা লুটি) প্রস্তুত করিয়া (বর্তমান হাটখোলা নিকট) তখনকার স্বতাহুটির হাটে বিক্রয় করিত, ঐ হাটকে স্বতাহুটির হাট বলিত। এই হাটের সম্মুখে একটি ঘাট ছিল, তাহাই স্বতাহুটির ঘাট। এইখানে ইংরাজবণিকেরা নামিয়া তত্ত্বাবধায়কদের নিকট হইতে স্বতা (বা স্বতাহুটি) ক্রয় করিত। সেই হাটের পার্শ্বে একটি বিস্তীর্ণ বাজার বসিত। বোধ হয় যুরোপীয় বণিকেরা ‘স্বতাহুটি-হাটের’ নামানুসারে ইহার নিকটবর্তী সমুদায় স্থানের স্বতাহুটি নাম প্রদান করেন। কারণ ইংরাজ অথবা অপরূপ যুরোপীয়গণের আগমনের পূর্বেকার কোন

* অকর্ষণপূরী—যে ভূমি কর্ণিত হয় নাই।

দেশীয় চিঠির ‘স্বতাহুটি’ নাম পাওয়া যায় না। ইংরাজ-দিগের অধিকার-কাল হইতে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দখলে ছিল, তৎপরে ঐ বৎসরে ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নওয়াপাড়া মৌজার পরিবর্তে মহারাজ নবকৃষ্ণকে স্বতাহুটি প্রদান করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নবকৃষ্ণকে যে সনদ পত্র দেন, তাহাতে এই কয়েকটি স্থানের উল্লেখ আছে—

১ মহল স্বতাহুটি (২০১৭ বিঘা)। ২ হাট স্বতাহুটি। ৩ বাজার স্বতাহুটি। ৪ সুবাবাজার। ৫ চার্লসবাজার। ৬ বাগবাজার (১০০ বিঘা)। ৭ হোগলকুঁড়িয়া (২৯৭) বিঘা। ঐ কয়টি স্থানের জম্ম নবকৃষ্ণকে প্রতি বর্ষে ১২৩৭৮/১০ মাল খাজনা দিতে হইত। * এখনও শোভাবাজারের রাজবাঙ্গীরগণ ঐ সকল স্থানের তালুকদারী-সম্বন্ধ ভোগ করিতেছেন।

বিদ্যালয়।—কলিকাতার ৪টি গবর্ণমেন্টের কলেজ, ৫টি মিশনারী কলেজ এবং দেশীয়লোকের যত্নে স্থাপিত ৩টি কলেজ আছে। ডাক্তারি শিক্ষার জম্ম মেডিকেল কলেজ ও ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল, শিল্পশিক্ষার জম্ম আর্টস্কুল বা শিল্প বিদ্যালয় (Government School of Art) এ ছাড়া ২৯১টি অপর বিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে ১৪৯টি বিদ্যালয় বালকদিগের জম্ম এবং ১৪২টি বালিকাদিগের জম্ম। উহার ভিতর আবার বালকদিগের জম্ম ৮২টি ইংরাজী, এবং ৭২টি বাঙ্গালা বিদ্যালয়, বালিকাদিগের জম্ম ১২০টি বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষকতা শিক্ষা দিবার জম্ম ৩টি নর্মাল বিদ্যালয় আছে।

হাসপাতাল।—কলিকাতার মধ্যে ৬টি হাসপাতাল আছে—মেডিকেলকলেজ হাসপাতাল, মেও হাসপাতাল, ক্যাম্পবেল হাসপাতাল, স্থানীয় পুলিশ হাসপাতাল এবং স্ত্রীলোকদিগের জম্ম ইডেন হাসপাতাল।

ধর্মসমাজ—কলিকাতায় নানাজাতির বাস থাকায় অনেকগুলি ধর্মসমাজ আছে। তন্মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ধর্মসমাজগুলি ইতিপূর্বে মধ্যে মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এই কলিকাতার মধ্যে ৫৬টি হরিসভা এবং ৩টি ব্রাহ্মসমাজ আছে।

* কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও স্বতাহুটি ইহাদিগের প্রাচীন ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক অনেক কথা জানিবার যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বনের বিশেষ চেষ্টা কর্তব্য। সদরঘোডে, কলিকাতা বা ২৪ পঃ কালেক্টারীতে, মাস্ত্রাজের পুরাতন সেরেস্তার, বিলাতের ইতিহাস হাউস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে যে অনেক পুরাতন কাগজ আছে, তাহা অধ্যয়ন করিলে অনেক ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত হইতে পারে।

জল।—অপর স্থানের জায় এখানে পুষ্করিণীর জল কাহাকেও খাইতে হয় না। মিউনিসিপালিটির যন্ত্রে এখানে কলের জল সর্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। এই জল পলতা নামক স্থান হইতে আনীত হয় এবং কলের কলের আশিসে শোধিত হইয়া নলদ্বারা কলিকাতার চারিদিকে সঞ্চালিত হয়। এখন আর কলিকাতার সকল বাড়িতেই অন্ততঃ একটি করিয়া কলের কল আছে এবং সাধারণের সুবিধা জন্ত প্রতিরাত্তর মোড়ে একটি করিয়া বড় কলের কল ও মধ্যে মধ্যে স্নানাগার নির্মিত হইয়াছে।

এখানকার অনেক হিন্দুবিধবারা কলের জল অপবিত্র ভাবিয়া পান করেন না, তাঁহারা ভাগীরথীর জল আনিয়া ব্যবহার করেন।

গ্যাস।—সন্ধ্যার পরই কলিকাতার বড় রাস্তা হইতে সামান্য গলিখুঁজি সর্বত্রই গ্যাসালোকে আলোকিত হয়, একজু দিনের মত রাত্রিকালে পথে চলিতে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় না।

ড্রেন।—কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার সকল রাস্তার পার্শ্বেই নর্দমা দেখা যাইত, কিন্তু এখন আর নাই। আর সকল রাস্তার মুক্তিকার ভিতর দিয়া ড্রেন গিয়াছে, সকল বাড়ির এবং সকল রাস্তার ময়লা এই ড্রেনের ভিতর দিয়া ধাবারবিলে গিয়া পড়ে, একজু কলিকাতাবাসীকে আর নর্দমার ময়লার দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয় না।

পুলিস।—কলিকাতার পুলিস কমিসনরের অধীন। কমিসনরের একজন সহকারী আছেন। তাঁহাদের নীচে ৪ জন সুপারিণ্টেন্ডেন্ট, ২১৯ জন যুরোপীয় কর্মচারী, ১২২৭ জন কনষ্টেবল এবং ৬ জন অখারোহী কনষ্টেবল। এ ছাড়া বিস্তর পাহারাওয়াল আছে। প্রতিবর্ষে পুলিসের খরচ ৪২০৮৯০।

উপরোক্ত জল, গ্যাস, ড্রেন ও পুলিসের জন্য (গবর্ণ-মেন্টের ব্যতীত) কলিকাতাবাসিগণ মিউনিসিপালিটিকে স্বতন্ত্র কর দিতে বাধ্য।

কলিকাতা বন্দর।—ভাগীরথীর ধারে ৫ ফ্রোশ বিস্তৃত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে পোর্ট কমিসনরগণের তত্ত্বাবধানে আছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীর উপর কলিকাতা হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত এক সেতু আরম্ভ হয় এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই সেতু সম্পূর্ণ নির্মিত হয়। উক্ত সেতু প্রস্তুত করিতে ২২০০০০০ খরচ হয়, সেই সময় হইতে উক্ত পোর্ট কমিসনরগণ এই সেতুর তত্ত্বাবধান করায় তাঁহারা 'ব্রিজ কমিসনর' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। পোর্ট কমিসনরগণের প্রধান কার্য্য ভাগীরথীর তীরে জাহাজ, নৌকা এবং তাহার মাল রাখিবার

জন্ত জেটী ও গুদাম প্রভৃতি রাখা, নদীর উপর আলো রাখা, বাহাতে জাহাজ নৌকাদিতে কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্ক থাকে। [মাতলা, পোর্টক্যানিং দেখ।]

বাণিজ্য।—কলিকাতায় যেমন নানাদেশীয় লোকের বাস, সেইরূপ নানাদেশের সহিত ইহার বাণিজ্য। এখানে প্রতিবর্ষে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। [বাণিজ্য শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

লোকসংখ্যা।—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির এলাকাধীন স্থানের লোকসংখ্যা মোট ২৬,৮১৫,৫৯। তন্মধ্যে সাবেক মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ স্থানে পুরুষ ২,৮৭,০৩৪, স্ত্রীলোক ১,৪৯,৩৫২। বর্দ্ধিত স্থানে পুরুষ ১,২৮,০৯৭, স্ত্রীলোক ৮৫,০০১। কলসায় পুরুষ ৭১১৯, স্ত্রী ৩৪৯। বন্দরে পুরুষ ২৬,৫১৫, স্ত্রী ৭৩। খালে পুরুষ ২,০৭২; স্ত্রী ৩০।

গত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে, কলিকাতা নগর, বন্দর ও সহরতলীর লোকসংখ্যা ৪২৮৬৯২; তন্মধ্যে শতকরা ৬২ জন হিন্দু, ৩২ জন মুসলমান এবং ৪ জন খৃষ্টান। এবং মোট ব্রাহ্ম ৪৮৮, বৌদ্ধ ১৭০৫, জৈন ১৪৩, দিহনী ৯৮৬, পার্শী ১৪২, শিখ ২৮৪ এবং অপরজাতি মোট ৭২৭।

হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ৫২,২৪১; কায়স্থ ৫২,৩৫১; কৈবর্ত ৩৪,২৬২; চামার ২১৫০১; সুবর্ণবর্ষিক ও স্বর্ণকার ১৭,৫৩৫; তন্তুবায ১৬৪৫৮; বৈষ্ণব ১৫,৭৬৫; বাগ্দি ১৩,৪৩৩; গোয়াল ১২,২৭৪; সন্ধ্যাপ ১১,৫৪৩; কাহার ১১,০৪১; তেলি ১০,৭৬৯, মেস্তর ১০,৬৩৬।

রাজা নবজ্ঞেশ্বর সমরে কেবল স্ত্রীহুটিতে ২৯৯৫ ঘর লোকের বাস ছিল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ৩৪৮ ঘর, কায়স্থ ৪৭২ ঘর, তাঁতি ২৪৬ ঘর, মুসলমান ২১৬ ঘর, তেলি ৮৫ ঘর, কলু ৪৬ ঘর, চাষাধোবা ৭৬ ঘর, এ ছাড়া অপরাজাতি বাস করিত বটে, কিন্তু তাঁহার সংখ্যা অতি অল্প।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপালিটির শাসনবিবরণী অনুসারে কলিকাতায় ২৫,৯৪৯ পাকা এবং ৪৭,২৭৭ কাঁচা বাড়ী আছে। **কলিকাপূর্ব্ব (স্ট্রী) কলিকার** অংশে জন্ত অপরূর্ণ। চরমা পূর্ব্বের জনক অপরূর্ণ। যেমন, দর্শ ও গোণ্ডাস যোগের অঙ্গ আয়েয়াদিয়াগ জন্ত অপরূর্ণ। ("অঙ্গ প্রাধান্যভর বহুকর্ম্মসাধ্য সর্গাদি ফলজনকপূর্ব্বোৎপত্তৌ তত্ত্বং প্রত্যেক কর্ম্মজন্তম-দৃষ্টম্॥" স্বতী)

কলিকার (পুং) কলিং কলং করোতি, কলি-কৃ-অণ্। ১ ধূম্যট পক্ষী, ফিলে। ২ পীত মন্তক পক্ষী। ৩ (কলিং স্বকণ্টকৈরনিষ্টং করোতি) পুতিকরজ।

(কলিকারজ ধূম্যটে করজে পীতমন্তকে। মেদিনী।)

কলিকারক (পুং) কলিং স্বকণ্টকৈরনিষ্টঃ করোতি, কলি-
ক-নিচ্-ব্। ১ পুতিকরজ, কাঁটাকরজ। ২ (কলিং কলহং
কারয়তি) নারদ ঋষি। (নারদস্ব দেবব্রজা পিণ্ডনঃ কলি-
কারকঃ। হেম ৩। ৫৩।) ৩ (জি) কলহকারক।

কলিকারী (ক্লী) কলিং গৰ্ভপাতাদ্যানিষ্টঃ করোতি, কলি-
ক-অণ-ডীর্ঘ। বিষলাকলিয়া। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
লাঙ্গলী, হলিনী, গৰ্ভপাতনী, দীপ্তা, বিশলা, অগ্নিমুখী,
নক্তা, ইন্দ্রপুংলিকা, বিদ্যাজ্জালা, অগ্নিজিহ্বা, ত্রণজং, পুষ্প-
মোরভা, স্বর্ণপুষ্পা ও বহিষিধা। রাজনির্ব্যষ্টের মতে ইহার
শুণ্ণ,—কটু, উষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক, গৰ্ভস্থ শল্য অর্থাৎ মৃত
গৰ্ভ নিষ্কাশক এবং সারক।

কলিকাল (পুং) কলিরেব কালঃ। কলিযুগ [কলি দেখ]
কলিঙ্গ (ক্লী) কলি-গম-ড, নিপাতনান্ সাধুঃ। ১ ইন্দ্রবব।
(পুং) ২ পুতিকরজ। ৩ (কে মন্তকে লিঙ্গ চিহ্নমন্ত) ধূমাট,
ফিঙ্গোপাখী। ৪ কুটজগাছ। ৫ শিরীষগাছ। ৬ অশ্বখগাছ।
৭ জল পদার্থ। ৮ একজন অতি প্রাচীন রাজা। দীর্ঘতমার
ওরসে বলিগরী হৃদেষ্কার গর্ভে ইহার জন্ম। ৯ ভারতবর্ষের
এক প্রাচীন জনপদ। এই জনপদ কোথায় ?

মহাভারতে লিখিত আছে* “রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর-
সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া পঞ্চ শত নদী মধ্যে স্নান করিলেন।

* “স সাগরঃ সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে বৃপ।

নদীশতানাম্ পকানাম্ মধ্যে চক্রে সমাগমম্।

ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বহুধাধিপঃ।

ব্রাহ্মভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত।

লোমশ উবাচ।

এতে কলিঙ্গাঃ কোণ্ডের যত্র বৈতরণী নদী।

যত্রাহযজত ধর্মোহপি দেবাহরণমেতা বৈ।

ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজিয়ঃ গিরিশোভিতম্।

উত্তরঃ তীরমেতচ্চি সত্যং দিগদেবিতম্।

সমানং দেবযানেন পথ্য স্বর্গমুপেয়ম্।

অত্র বৈ ঋষয়োহস্তে চ পুরা কৃতুভিরীজিরে।

অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র ! পশুবাদন্তবান্ মথৈ।

পশুবাদায় রাজেন্দ্র ! ভাগোহয়মিতি চাত্রবীং।

হুতে পশৌ তদা ধোবাত্তমূর্চরতর্ধত।

মা পরমমতিজোহা মা ধর্মান্ সকলান্ বশীঃ।

ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগভিঃ কৃত্তমন্তবন্।

ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানসাক্ষিরে তথা।

ততঃ স পশুসংযজ্য দেবযানেন জগিবান্।

তত্রাহুযশো কৃত্ত তরিবোধ যুধিষ্ঠির !

অবাত্বাসঃ সর্কোভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।

দেবাঃ সঙ্গজামাহর্ভয়াক্রমন্ত শাশ্বতম্।

তৎপরে ব্রাহ্মগণ সহ সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ-দেশে উত্তীর্ণ
হইলেন। তখন লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! এই সমস্ত
প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া থাকে। এই স্থানে শ্রোত-
সত্য বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে ; এই স্থানে ভগবান্ ধর্ম
দেবগণের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক বজ্রাহুষ্ঠান করিয়াছিলেন।
এই স্থানে ভগবান্ কৃত্ত যজ্ঞকালে পশু গ্রহণপূর্বক ইহা
‘আমারই অংশ’ বলিয়া নির্দেশ করিলে দেবগণ কৃত্তকে
কহিলেন, হে ভগবন্ ! পরম গ্রহণ করা নিতান্ত অজ্ঞান,
আপনি ধর্মসাধন যজ্ঞভাগ সমস্ত আত্মসাৎ করবেন না।
এই বলিয়া সকলে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। যাগ
ঘারী তাঁহার সম্মান-বর্দ্ধন করিলে কৃত্ত পশু পরিত্যাগ করিয়া
দেবযানে আরোহণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এ
বিষয়ে এক কিংবদন্তি আছে যে, দেবগণ কৃত্তভয়ে ভীত হইয়া
সর্কোৎকৃষ্ট রসপূর্ণ একভাগ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন।
হে যুধিষ্ঠির ! এই গাথা কৌতুহলপূর্বক এই স্থানে স্নান
করিলে স্বর্গগত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অনন্তর পাণ্ডবেরা
দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে নামিয়া পিতৃগণের তর্পণ করি-
লেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির কৃত্তস্বস্ত্যয়ন হইয়া সাগরের নিকট
উপস্থিত হইলেন এবং লোমশের আদেশ প্রতিপালনপূর্বক
মহেঞ্জ-পর্বতে নিশাচাপন করিলেন।”

রঘুংশে কলিঙ্গাস লিখিয়াছেন,—

“স তীর্থী কপিশাং সৈতৈর্বক্বিরদসেতুভিঃ।

উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥”

রঘু, হস্তী ঘারা সেতু প্রস্তুত করিয়া, কপিশা নদী উত্তীর্ণ
হইলেন এবং উৎকল-দেশবাসী রাজাদিগের সাহায্যে পথ
অবগত হইয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শক্তি-সঙ্গম তত্ত্বের মতে,—

“জগন্নাথং পূর্বভাগাৎ কৃষ্ণাতীরাস্তগং শিবে।

কলিঙ্গ-দেশঃ সংপ্রোক্তো বাসমার্গপরায়ণঃ ॥

কলিঙ্গ-দেশমারত্য পঞ্চাষ্ট্রযোজনং শিবে।

দক্ষিণত্যাং মহেশানি ! কালিঙ্গঃ পরিকীর্তিতঃ ॥”

জগন্নাথের পূর্বভাগ হইতে কৃষ্ণানদীর তীর পর্যন্ত
কলিঙ্গদেশ, এই স্থানের লোকেরা বাসচারমতাবলম্বী।
আবার কলিঙ্গ-দেশ হইতে দক্ষিণে ৫৮ যোজন পর্যন্ত কালিঙ্গ
নামে কথিত হইয়া থাকে।

ততো বৈতরণীং সর্কৈ পাণ্ডবো দ্রৌপদী তথা।

অবতীর্ণ্য মহাভাগতর্পয়াক্ষিরে পিতৃন ১...

ততঃ কৃত্তস্বস্ত্যয়নো মহারাজা যুধিষ্ঠিরঃ সাগরভাগচ্ছৎ।

কৃষা চ তৎ শাসনমন্ত সর্কং মহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাৎ ॥”

মহাভারত, বনপর্ব, ১১৪ অঃ।

কবিরামকৃত দ্বিখণ্ডগ্রন্থাকাশে লিখিত আছে—

“ঔদ্ভূদেশাহুত্তরে চ কলিঙ্গো বিক্রান্তো ভূবি ।

तद्भाष्यं त्रैलोक्ये सर्वलोकेषु विश्रुतम् ॥ १८१ ॥

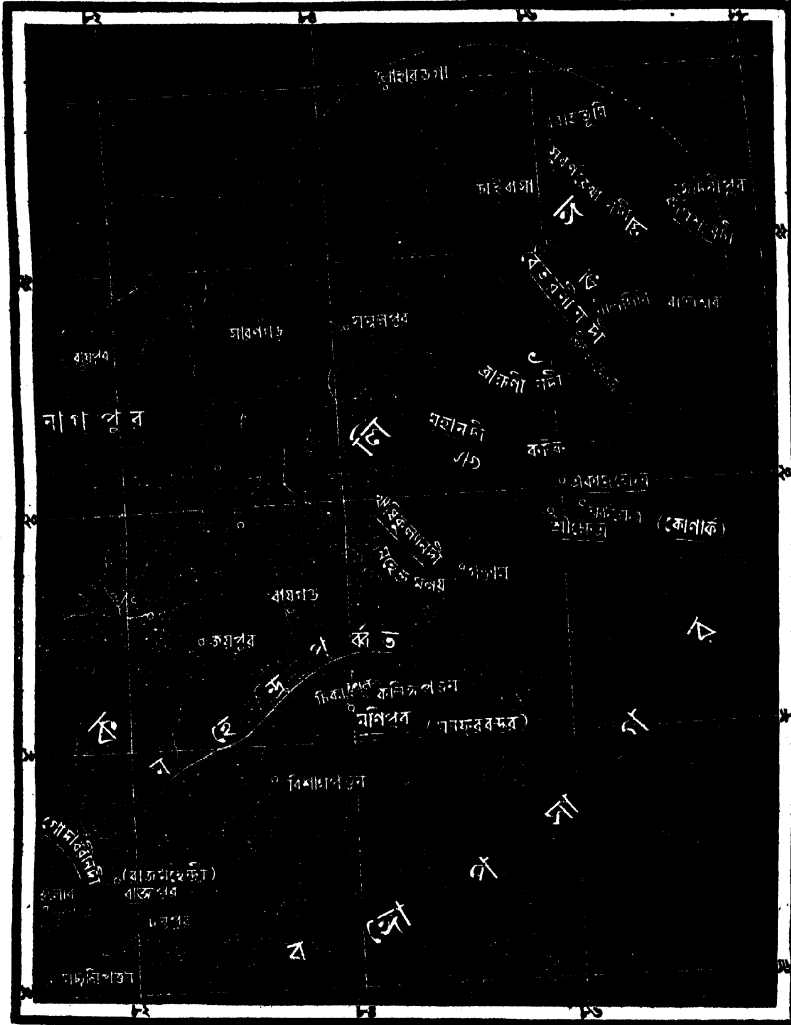
ঔড়দেশের উত্তরে প্রসিদ্ধ কলিঙ্গদেশ, সেই স্থানে লোক-
প্রসিদ্ধ ভীমকেশের রাজত্ব।

এইত গেল আমাদের দেশীয় প্রাচীন যত । এখন দেখা
 বাউক, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণ কলিঙ্গ-সম্বন্ধে

ফি বলিরাছেন। প্রিন্স তিনটি কলিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, ১ কলিঙ্গী, ২ যোদোগলিঙ্গম্, ৩ মকোকলিঙ্গী। ইহার মধ্যে কলিঙ্গী, মণ্ডি ও মল্লির নিম্ন ভাগে এবং যোদোগলিঙ্গম্ পর্বতের নিকটে। (Pliny, *Hist. Nat.* VI. 21)

এখানে সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদিও
মন্দিরা কে ? এবং মালেকাস্ পক্ষতই বা কোথায় ?

মণ্ডি জাতি এখন মুখ্য নামে বিখ্যাত ;—এই জাতি



ଥାଟୀନ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସାନଚିତ୍ର ।

এখনও ছোটনাগপুরের দক্ষিণ-অংশে বাস করে। (Campbell's Ethnology of India, pp.150-1) এই জাতির অনতিদূরে উড়িষ্যার পার্বত্যপ্রদেশে কঙ্ক নামক অসভ্য জাতির বাস। (Imperial Gazetteer of India, Vol. VII.

p. 506 দেখ।) এই অসত্য জাতিই প্রিন্স-বর্ধিত মল্লি বলিয়া সহজে স্বীকার করা যায়। কঙ্ক জাতিরাও আপনাদিগকে মল্লা বা মাল বলিয়া কখন কখন পরিচয় দেয়।

মাল্যবান্ পর্বত আমাদের পুরাণোক্ত 'মাল্যবান্'।

প্রিন্সি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, এই মালেনাস্ পর্বতে মোনেন্দে ও শরীরী জাতি বাস করে। অতি পূর্বকাল হইতে উড়িষ্যার পার্শ্বতীর প্রদেশে শবর জাতির বাস ছিল, তাহার তুরি তুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বল্পপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে, নীলাচলের নিকটেই শবরাগার ছিল, সেইখানে শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুমূর্তি বিরাজ করিতেন। যথা—

“নীলাচলং লিখন্তঃ খং পশ্চতাং পাপনাশনম্।

অত্যন্তুতং নিবসতি সাক্ষাতমুভূতো হরেঃ ॥

উপত্যকারামাক্রুতঃ সমস্তান্গারিণী বিজঃ।...

দদর্শ শবরাগারৈবেষ্টিতং পরিতো বিজাঃ।

ক্ষেত্রস্ত দীপহানং যৎ খ্যাতং শবরদীপকম্ ॥

দদর্শ বিষ্ণুভক্তাংস্তান্ শঙ্খ-চক্র-গদাধরান্।...

ততো বিশ্বাবস্তুর্নাম শবরঃ পলিতাজকঃ ॥” ইত্যাদি।

অতএব প্রিন্সি-বর্ণিত ‘শরীরী’ জাতি পুরাণকথিত শবর ভিন্ন আর কিছুই নয়। এক্ষণে উড়িষ্যার অন্তর্গত পাল-লহরী রাজ্যের মধ্যবর্তী একটি উচ্চ গিরিশৃঙ্গকে মালয় বা ‘মাল্যাগিরি’ বলে। সম্ভবতঃ পূর্বকালে এই রাজ্যের সমস্ত গিরিমালাকেই ‘মাল্যাগিরি’ বলিত। এই গিরিমালাই ‘মালেনাস্’ নামে প্রিন্সি কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে পুরাণোক্ত ‘মাল্যাবান্’ পর্বত বলিয়া স্বীকার করিলে কোন দোষ পড়ে না। যাহা হউক, বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, প্রিন্সি উড়িষ্যার পশ্চিমাংশকে কলিঙ্গ বলিয়া অহুমান করিয়াছিলেন।

২য়, মোদোগলিঙ্গম্। আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল ইহাকে ‘মধ্যকলিঙ্গ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সেন্ট মার্টিন এই স্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“মহুতে মদ নামক এক প্রকার অসভ্য জাতির নাম পাওয়া যায়, ইহার আন্ধ্র জাতির সহিত একত্র বর্ণিত হইয়াছে। * প্রিন্সি এই জাতিকে গঙ্গার এক বৃহদ্বীপবাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গলিঙ্গ সম্ভবতঃ কলিঙ্গ শব্দের রূপান্তর মাত্র। গঙ্গার ‘ব’বীপে ঐ জাতির বাস থাকায় উহাকে মদগলিঙ্গ বলিত।”

আমাদের মতে, উক্ত উভয় মতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমরা তেলুগু-ভাষায় মোদোগলিঙ্গ শব্দ দেখিতে পাই। তৈলঙ্গীদিগের উচ্চারণ অহুসারে এই শব্দ “মুহুগলিঙ্গ” হইয়া থাকে। তেলুগুভাষায় মুহু শব্দের অর্থ তিন। সুতরাং ‘মোদোগলিঙ্গ’ বা ‘মুহুগলিঙ্গ’র সংস্কৃত নাম ত্রিকলিঙ্গ বলিয়া

গ্রহণ করিলেই যুক্তিসঙ্গত হয়। (Caldwell's Dravidian Grammar, Intro. p. 82. দেখ।)

ত্রিকলিঙ্গ * নামক জনপদের নাম দক্ষিণদেশের ৫ম, ৯ম, ও ১০ম শতাব্দীর শিলালিপি ও তাম্রশাসনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জনপদ পূর্বকালে কলিঙ্গ রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল। টলেমি ত্রিগলিটিন বা ত্রিলিঙ্গন নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। (Ptolemy's Geog. Bk. vii. ch. 23) দক্ষিণাংশের তামিল শিলালিপিতে ইহা ‘তৈলিঙ্গ’ নামে কলিঙ্গদেশের সহিত উক্ত হইয়াছে। (Archæological Survey of Southern India, Vol. IV. p. 61.) স্বল্পপুরাণের কুমারিকা খণ্ডে ‘তিলঙ্গ’ নামক জনপদের উল্লেখ আছে। যথা,—

“নরেন্দ্রনামদেশে চ লক্ষমেকঞ্চ পাদকম্।

তিলঙ্গদেশে চ তথা লক্ষঃ প্রোক্তঃ সপাদকঃ ॥”

কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অঃ।

পশ্চিমসঙ্গমতন্ত্রে ইহাই ‘তৈলঙ্গ’ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

“ত্রিশৈলন্ত সমারভ্য চোলেশান্ মধ্যভাগতঃ।

তৈলঙ্গদেশো দেবেশি! ধ্যানাধ্যয়নভংগরঃ ॥”

ত্রিশৈল হইতে আরম্ভ করিয়া চোলরাজ্যের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ দেশ। হে দেবেশি! এই স্থানের লোকেরা ধ্যান ও বেদাধ্যয়ন-ভংগর।

ত্রিকলিঙ্গ বা তৈলঙ্গের বর্তমান নাম তৈলিঙ্গ বা তেলিঙ্গন। এই জনপদ মাজাজের উত্তর পলিষ্ট নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে গঙ্গায় পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিগতি, বেলারি, কর্ণুল, বিদর ও চন্দা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানে তৈলঙ্গ বা তেলুগুভাষী হিন্দুজাতির বাস।

৩য়, মক্কোকলিঙ্গী। ইহা সংস্কৃত মণিকলিঙ্গের রূপান্তর। প্রাচীন হিন্দুগণ বর্তমান আরাকান প্রদেশকে মণিবীপ এবং তাহার অধিবাসীদিগকে মণি বলিয়া জানিতেন। কেহ কেহ এই মণিবীপবাসীকেই প্রিন্সি-কথিত মক্কোকলিঙ্গী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন সিয়ং কলিঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন “কোঙ্গ-উ-তো” হইতে একশত কোশের অধিক (১৪০০ বা ১৫০০ লি)

* মনুসংহিতায় ইহার বৈদেহিক জাতিসমূহের মদ ও আন্ধ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। (মনু ১০। ৩১) মদ নয়।

* কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, ত্রিকলিঙ্গ বলিলে তিনটি কলিঙ্গ বুঝায়। যথা কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ ও উৎকলিঙ্গ। উৎকলিঙ্গ হইতেই অপভ্রংশে উৎকল নাম হইয়াছে। (Indian Antiquary. V. 59.) এই মত সঙ্গত নয়। কারণ মহাভারত হরিবংশাদিতে উৎকল নাম দৃষ্ট হয়; প্রাচীন কোন গ্রন্থে উৎকলিঙ্গ নাম নাই।

গমনের পর আমরা কলিঙ্গ (কি-লিঙ্গ-কিঙ্গ) দেশে আসিলাম।" (Si-yu-ki, Bk x.) এখন দেখা যাউক 'কোঙ্গ-উ-তো' দেশ কোথায়? কানিংহাম সাহেবের মতে, ইহারই বর্তমান নাম গঞ্জাম। (Cunningham's Ancient Geography of India, p. 513)। কিন্তু ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বিখ্যাত চীনভাষাবিদ শুয়ান্সিলা জুলে 'কোঙ্গ-উ-তো' শব্দের সংস্কৃত নাম 'কোন্‌যোধ' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (১) কিন্তু আমাদের বিবেচনায়,—'কোন্‌যোধ' না হইয়া 'কঙ্কযোধ' হওয়াই অধিক সম্ভব। প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান কটক প্রদেশে কঙ্ক ও যোধ নামে দুই পাশাপাশি ক্ষুদ্র অঞ্চল প্রবল রাজ্য ছিল। এই দুই রাজ্যের মধ্যে যোধ রাজ্য সমধিক প্রাচীন। কটকের প্রাচীন রাজধানী চৌদ্বারের নিকট হইতে একখানি অতি প্রাচীন তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহার খোদিত অক্ষশাশন পাঠে জানা যায় যে, ঐ ক্ষুদ্র জেলা ত্রিকলিঙ্গ-রাজ ভবগুপ্তের শাসনাধীন ছিল। (২) ভবগুপ্তের পুত্রের নাম শিবগুপ্ত, তিনি উৎকল-রাজ যযাতিবংশীর সমসাময়িক, অক্ষশাশন-পত্রাঙ্ক-সারে তাঁহার রাজত্ব-কাল ৪৭৪—৫২৬ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ত্রিকলিঙ্গরাজ ভবগুপ্ত চীনপরিব্রাজকের অনেক পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার সময়ে যোধ জেলার অবস্থা অবশ্যই ভাল ছিল। বোধ হয়, তাঁহার অনেক পরে অর্থাৎ হিউএন্‌ সিয়ঙের সময়ে যোধ কঙ্ক-রাজের অধিকারভুক্ত হইয়া কঙ্ক-যোধ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কঙ্করাজ সামান্য ভূখণ্ডের অধিপতি হইলেও তাঁহার প্রতাপ নিতান্ত কম ছিল না। কঙ্করাজ্য বড়ই উর্বরা, এখানে প্রচুর পরিমাণে ধাতু জন্মিয়া থাকে। কঙ্করাজ কলিকাতা ও কটকনগরে বিস্তর চাউল রপ্তানী করিয়া থাকেন। (৩) হিউএন্‌ সিয়ঙের মতে কঙ্কযোধ হইতে ১০০ কোশ গমন করিলে কলিঙ্গদেশ পাওয়া যায়। তাহা হইলে গঞ্জাম প্রদেশই কলিঙ্গ-দেশ হইতেছে। কানিংহামের মত ধরিলে গঞ্জাম রাজ্য প্রায় ছাড়াইয়া যাইতে হয়। বাহা ইউক, চীনপরিব্রাজক গঞ্জাম প্রদেশ হইতে যে, কলিঙ্গ আরম্ভ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই মত স্বীকার করিয়া লইলে মহাকবি কালিদাসের বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়। চীন-পরিব্রাজকের মতে, কলিঙ্গদেশের ভূপরিমাণ প্রায় ৩৫৭ কোশ (৫০০০ লি) অক্ষবরের রাজত্বকালে কলিঙ্গ দণ্ডপৎ নামে একটি সরকার ছিল, উহা উড়িষ্যার অন্তর্গত। তখন

এই স্থান ২৭টি মহলে বিভক্ত ছিল। (আইন-ই-অকবরী।) এইত গেল সাব্যেক কথা, এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কি বলেন, তাহাই জানা আবশ্যক।

কোলকটক সাহেবের মতে, গোদাবরী নদীর তটস্থ প্রদেশ কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত। (১)

কানিংহাম বলেন "হিউএন্‌ সিয়ঙের সময়ে কলিঙ্গরাজ্য গঞ্জামের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৪০০ হইতে ১৫০০ লি অর্থাৎ ২৩০ হইতে ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তৎকালে ইহার ভূমি-পরিমাণ প্রায় ৮৩০ মাইল ছিল। যদিও ইহার চতুঃসীমা উক্ত হয় নাই, কিন্তু এই রাজ্য পশ্চিমে অন্ধ্র ও দক্ষিণে ধনাকোট রাজ্যের সহিত সন্মিলিত ছিল। ইহার প্রান্তসীমা দক্ষিণ-পশ্চিমে গোদাবরী এবং উত্তর-পশ্চিমে ইন্দ্রাবতী নদীর শাখা গুণ্ডলিয়া নদী ছাড়াইয়া যায় নাই। এই বিস্তীর্ণ ভূমি-খণ্ড মহেন্দ্র পর্বতের দ্বারা সমাকীর্ণ।" ইত্যাদি।

শিলা-লিপিবৎ হগট্টসের মতে, কলিঙ্গ গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যে। (২)

আমাদের মতে, মহাভারত ও হরিবংশের সময়ে কলিঙ্গ-রাজ্য বর্তমান বৈতরণী নদীর তট প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৩) এখনকার যেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও সরকার তৎকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উৎকলরাজ প্রবল হইয়া উঠিলে উৎকল কলিঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র হইল। [উৎকল শব্দ দেখ।] তদবধি কেবল গঞ্জাম ও সরকার কলিঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট রহিল। খৃষ্টের দশম ও একাদশ শতাব্দীতে চালুক্য-রাজগণের প্রবল প্রতাপে কলিঙ্গ-রাজ্য উত্তরে উৎকল ও দক্ষিণে চোলমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে তৈলঙ্গ পর্য্যন্ত এই কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের আক্রমণকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের ভূমি-পরিমাণ অনেকটা কমিয়া আসে। সেই সময়ে উৎকল ও তৈলঙ্গ (তৈলিঙ্গন) স্বতন্ত্র হইল। মহেন্দ্রপর্বতের উপরিস্থিত সামান্য ভূভাগকে লোকে কলিঙ্গ বলিত। প্রকৃত কথা, তৎকালে কলিঙ্গ নামের লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখনকার বর্তমান মানচিত্রেও কলিঙ্গরাজ্যের উল্লেখ নাই,

(১) Colebrooke's Essays, Vol. II. 179.

(২) E. Hultzsch's South Indian Inscriptions. p. 63.

(৩) হরিবংশে 'অঙ্গাঙ্গ কলিঙ্গাঙ্গালিগুকাঃ' (২২৮ অঃ ৫৫ শ্লোক),

এই স্থলে ভাষ্যলিপ্ত (বর্তমান ভদ্রলুক) সহ কলিঙ্গ উক্ত হওয়ার ২টি সত্রিকটক জনপদ বলিয়া সহজে অনুমান করা যায়। টলেমির মতেও গঙ্গাপ্রদেশের দিকটো কলিঙ্গ রাজ্য (Indian Antiquary, Vol. XIII. p. 363 দেখ।)

(১) Julien's 'Hiouen Thsang', III. 91.

(২) Indian Antiquary, Vol. v. 67.

(৩) Sterling's Orissa, p. 8.

কেবল সমুদ্র-তটস্থ কলিঙ্গ-পত্তন ও গোদাবরীর মোহান-স্থিত কলিঙ্গ নগর যেন সেই কলিঙ্গ রাজ্যের চিহ্নমাত্র মরণ করিয়া দিতেছে।

মহাভারতাদিতে কলিঙ্গ-রাজ্যের দুইটি প্রধান নগরের উল্লেখ আছে,—মণিপুর ও রাজপুর। বৌদ্ধশাস্ত্রে কলিঙ্গের এই দুইটি প্রাচীন নগরের নাম পাওয়া যায়,—দন্তপুর ও কুন্ড-বতী। জৈনদিগের হরিবংশ নামক গ্রন্থে কাঞ্চন-নগর নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে। প্রাচীন শিলাপিতে কলিঙ্গ-নগর, পিষ্টপুর, বেকীপুর প্রভৃতি আরও কয়েকটি প্রাচীন নগরের উল্লেখ দেখা যায়।

কলিঙ্গ জনপদ কোন্ সময়ে সংস্থাপিত হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মহাভারতের মতে, দীর্ঘতমা-পুত্র কলিঙ্গ স্বীয় নামে জনপদ স্থাপন করেন।

“অদ্বো বক্ষঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ স্কন্ধশ্চ তে স্তুতাঃ।

ভেবাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ সনামপ্রথিতা ভূবি ॥

কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গস্ত চ স স্তুতঃ।”

মহাভারত আদি ১০৪।৪৯

মহাভারতের মত ধরিলে কলিঙ্গরাজ্যের স্থাপনকাল বৈদিক সময়ে যাইয়া পড়ে। [দীর্ঘতমা দেখ।]

বাস্তবিক এই জনপদ অতি প্রাচীন, বৈদিকগ্রন্থে না থাকুক, রামায়ণাদি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। (রামায়ণ কিঙ্কিধ্যা ৪১ অঃ) *

পূর্বকালে এখানকার ক্ষত্রিয়েরা বিলক্ষণ ক্ষমতামাণী ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কলিঙ্গরাজ মহাবীর ঋতায়ু দুর্যোধনের সেনাপতি হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। ভীষ্মের হস্তে তিনি এবং তৎপুত্র শক্রদেব ও কেতুমান্ নিহত হন। (ভীষ্মপর্ব)। দ্রাঘাবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, যুদ্ধের নিকট হইলে তৎকালীন কলিঙ্গরাজ বুদ্ধদেবের দস্ত আনিয়া আপন রাজ্যে স্থাপন করেন এবং যেখানে ঐ দস্ত রাখিয়াছিলেন, পরে সেই নগরের নাম দন্তপুর হইল। [দন্তপুর দেখ।]

কলিঙ্গক (পুং) কলিঙ্গ-সংজ্ঞার কন্। কলিঙ্গ-ইব কার্যতঃ কলিঙ্গকৈ-ক, ইতি বা। ইন্দ্রব।

(“কলিঙ্গকাঃ পটোলস্ত পাঠা কটুকরোহিণী।” চক্রদত্ত।)

কলিঙ্গডী (স্ত্রী) দুর্গা।

কলিঙ্গা (স্ত্রী) কার স্থখায় লিঙ্গমতাঃ, বহুব্রী; ক-লিঙ্গ-টাপ।

* রামায়ণে অপর এক কলিঙ্গনগরের নাম পাওয়া যায়। উহা মোহনী ও অবোধ্যার মধ্যবর্তী কোন স্থানে ছিল। (রামায়ণ অবোধ্যা-কাণ্ড ৭১ অঃ দেখ)

১ নারী। ২ ভেউড়ি। ৩ ভোলরাজের পত্নী, দ্বয়ভের মাতা। (স্মৃতিংহপুঃ ২৮।১৮)

কলিঙ্গাদ্যাণ্ডিক (স্ত্রী) অরাস্তিসাররোগের ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—ইন্দ্রব, বেলগুট, আমের আঁটির শাঁস, কন্বেল, রসাকন, লাক্ষা, হলুদ, দাকহরিজা, বালা, কটফল, শোনা, লোধ, মোচরস, নবী, ধাইফুল ও বটের কুঁড়ী; এই সকল দ্রব্য সমানভায়ে লইয়া চেনুনি জলদ্বারা (আটগুণ জলে চাউল ধুইয়া) পেষণ করিতে হয়, চিকণ হইলে ২ তোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়াতে শুক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে অরাস্তিসার, শূল, অভিসার ও রক্তদোষ নিবারিত হয়।

কলিঙ্গিকা। অপর নাম কলিঙ্গগদা। কামরূপের একটি নদী। (কালিকাপুঃ) ইহার বর্তমান নাম কলং।

কলিচূর্ণ (দেশজ) ঋক, শামুক প্রভৃতি পোড়াইয়া যে চূর্ণ প্রস্তুত হয়। [চূর্ণ দেখ।]

কলিজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল, কন্ডে।

কলিজ (পুং) কং বায়ুঃ লজ্জতি তিরস্করোতি, রোধনেন ইতি শেষঃ ক-লজি-জন্ (কর্মণ্যন্। পা ৩।২।১।) নিপাতনাৎ সাধুঃ। কট, বেড়া, দরমা। ইহার অপর সংস্কৃত নাম ‘কলিজা।’

কলিঞ্জ (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (Alprinia Galanga.)

কলিত (ত্রি) কল-ক্ত। ১ বিদিত। ২ প্রাপ্ত। ৩ ভেদিত। ৪ গণিত। ৫ উপাঞ্জিত। ৬ অহুগত। ৭ আশ্রিত। ৮ বিচারিত। ৯ বদ্ধ। ১০ উক্ত। ১১ গৃহীত। ১২ ধৃত।

(“করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপালিঃ।” ভৈরবধ্যান।)

১০ (স্ত্রী, ভাবে ক্ত।) জ্ঞান।

কলিঙ্গম (পুং) কলিঙ্গা আশ্রিতো জন্মঃ, মধ্যলোঃ। বিভী-তক, বহেড়াগাছ। [বিভীতক দেখ।]

কলিনাথ (পুং) কলেঃ কলিরেব বা নাথঃ। ১ কলিযুগের প্রভু, কলি। ২ যুনিবিশেষ, ইনি একখানি গন্ধর্ববেদ প্রণয়ন করেন।

কলিন্দ (পুং) কলিং মদ্যতি দ্যতি বা, কলি-দা দো বা-খচ্ মুম্। ১ বহেড়াগাছ। ২ সূর্য্য। ৩ পর্ব্বতবিশেষ, এই পর্ব্বত হইতে যমুনানদী নির্গত হইয়াছে। (রামায়ণ কিঙ্কিধ্যা ৪০ অঃ)

কলিন্দকন্যা (স্ত্রী) কলিন্দস্ত পর্ব্বতবিশেষস্ত কন্যা ইব। যমুনানদী। (“কলিন্দকন্যা মথুরাং গতাশি গন্ধোদিসংসক্তজলেব ভাতি।” রঘু।)

কলিন্দনন্দিনী (স্ত্রী) কলিন্দং নন্দয়তি, কলিন্দ-নন্দ-পিনি-ভীপ্। যমুনানদী।

কলিন্দশৈলজা (স্ত্রী) কলিন্দশৈলাৎ জারতে, কলিন্দ-শৈল-জন্-ড-টাপ্। যমুনানদী।

কলিম্বিকা (জী) কলিঃ দ্যতি নামস্রতি, কলি-দ্যো-খচ-মুম্বার্থে কন-টাপ্ অন্ত ইবম্। সর্গবিদ্যা। (কলিম্বিকা সর্গ-বিদ্যা।) হেম ২। ১৭২)

কলিপ্রিয় (পুং) কলিঃ কলহঃ প্রিয়ো যত্র, বহুব্রী। ১ নারদমুনি। ("কলিপ্রিয়ত প্রিয়শিব্যবর্গঃ।" রত্ন।) ২ বানর। ৩ ছুটে প্রকৃতি। ৪ বহেড়াগাছ।

কলিমারক (পুং) কলিনা স্বদেহস্থ কণ্টকেন মারয়তি, কলি-মৃচিচ-বুল। পুতিকাঙ্গ।

কলিমালাক (পুং) কলীনাং কণ্টকানাং মালা যত্র, কলি-মালা-ক। পুতিকাঙ্গ।

কলিমালা (পুং) কলীনাং মালাঃ যত্র, বহুব্রী। পুতিকাঙ্গ।

কলিযুগ (ক্লী) কলিরেব যুগম্। চতুর্থযুগ। [কলি দেখ।]

কলিযুগাদ্যা (জী) কলিযুগস্ত আদ্যা আদ্যতিথিঃ, ৬৩৭। মাবী পূর্ণিমা; এই তিথি হইতে কলিযুগের আরম্ভ।

কলিল (জি) কল্যাতে মিশ্রাতে, কলি-ইলচ্ (সলিকলানিরহি ভড়িতভীত্যানি। উণ্ ১। ৫৫।) ১ মিশ্র। ২ গহন।

(কলিলং মিশ্রং গহনঞ্চ। উজ্জলদত্ত।)

("যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যাপ্তিরিযাতি।" গীতা ২। ৫২।)

কলিবল্লভ। চালুক্যরাজ ঋবের নামান্তর।

কলিবিক্রম। দক্ষিণাপথের একজন প্রাচীন চালুক্যরাজ। ইহার অপর নাম জিভুবনমল বা বিক্রমাদিত্য (৪র্থ)। ইনি আহবমল্লের পুত্র। ইহার রাজত্বকাল সম্বৎ ৯৯৭—১০৪৮।

কলিবিষুবর্দ্ধন। পূর্ব চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্য নরেন্দ্র যুগরাজের পুত্র। ইনি দেড়বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কলিবৃক্ষ (পুং) কলেশ্বরপ্ররূপো বৃক্ষঃ, মধ্যালো। বহেড়াগাছ।

কলিসংশ্রয় (পুং) কলেঃ সংশ্রয়ঃ আবেশঃ, ৬৩৭। ১ শরীরে কলি প্রবিষ্ট হওয়া। ২ কলির আকৃতি।

কলিহারী (জী) কলিঃ হরতি, কলি হ-অণ্-ভীষ্। বিষলানলিরা। ("কলিহারী সনাক্তশোকার্শোত্রগশূলজিৎ।" ভাবপ্র।)

কলৌ (জী) কলি-ভীপ্। কলিকা, ফুলের কুড়ী।

কলীজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল।

কলু (দেশজ) নিয়ন্ত্রণী বর্ণগন্ধর জাতিবিশেষ। ইহার তৈলাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। তারতবর্ষের সর্বত্রই এই শ্রেণীর হিন্দু আছে। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা ইহাদিগকে "কলু" বলে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাদিগকে "তৈলী" বলে। বাঙ্গালার "তৈলী" নামে আর এক জাতি আছে, তাহারাও তৈলাদি বিক্রয় করে বটে, কিন্তু তাহারা "কলু" অপেক্ষা উচ্চশ্রেণী-ভুক্ত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বা বিহারে এ পার্থক্য নাই। সংস্কৃতভাষায় কলুকে তৈলকার বা তৈলিক বলে।

বাঙ্গালার যে সকল কলু আছে, তাহাদের মধ্যে ৬ শ্রেণীর কলুই প্রধান। কোলকাতা (কলিকাতা?), আনরপুরী, পশ্চিমে, পিসনেং বা পিসলে, দেশ বা দেশলা ও সপ্তগ্রামী; এতদ্ভিন্ন দোরাশ (বাদশ), রাঢ়ী, সেনভূমী, কুতুবপুরী প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের স্বভাবভিত্তে পূর্বে ৬ শ্রেণীর কলু অপেক্ষা আর সস্তম পাইয়া থাকে। এই সকল শ্রেণীকে "সমাজ" বলে। উক্ত সমাজের মধ্যে আবার পর্যায়ক্রমে কোলকাতা, আনরপুরী, পশ্চিমে, দেশলা ও সপ্তগ্রামীরা অল্পবিস্তর সস্তম পাইয়া থাকে। "কোলকাতা" সমাজের কলুর সংখ্যা অতি অল্প। "আনরপুরী" সংখ্যাই অধিক। পূর্বে এই ছয় সমাজের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইত না, এখনও হয় না, তবে পূর্বে কোন কোন উচ্চ সমাজের লোক নিম্ন-সমাজ হইতে কড়া গ্রহণ করিত বটে, কিন্তু কখনও নিম্নসমাজে কড়া সম্প্রদান করিত না; আজকাল সে প্রথাও রহিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার কলুদিগের মধ্যে কাঞ্চন গোত্রই অধিকাংশ।

কলুরা অনাচরণীয়, অর্থাৎ ইহাদের স্পৃষ্ট জল কোন উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুর ব্যবহার্য্য নহে। ইহাদের নীক্ষাদান ও পোরা-হিত্য করিবার জন্য একশ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের সহিত মিশিতে পারেন না, কারণ, তাহারা পতিত অর্থাৎ তাহারা কলুদিগের নিকট নিবিদ্ধ দান গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কলুর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও রাঢ়ীয় ও বৈদিক দুই শ্রেণীই আছে। বৈদিক কলুর ব্রাহ্মণের উপাধি চক্রবর্তী ও ভট্টাচার্য্য এবং রাঢ়ীয় কলুর ব্রাহ্মণের মধ্যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও চক্রবর্তী উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তিই অধিক। ইহাদের এতদিন কলুর পোরাহিত্যাদিই একমাত্র জীবিকা ছিল, সম্প্রতি কোন কোন স্থলে কেহ কেহ ইং-রাজের অধীনে চাকুরী স্বীকার করিয়াছেন।

বাঙ্গালার কলুর মধ্যে কোলকাতা ও আনরপুরী সমাজের কলুর উপাধি সাধুবা (সাদবা) ও মণ্ডল। অজ্ঞাত শ্রেণীতে মণ্ডল, পরামণিক, বারিক, দত্ত প্রভৃতি উপাধি আছে।

কলুজাতির ইতিবৃত্ত—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুন্তকারের ঔরসে ও কোটকজাতীয়া জীর গর্ভে তৈলকার নামক জাতির উৎপত্তি, আর জাতি-মালার মতে কুপজাতীর পুরুষের ঔরসে বৈজ্ঞার গর্ভে তৈলকারের উৎপত্তি হইয়াছে।

তৈলকার শব্দের আর কয়টি প্রাতিশব্দ—ধূসর, চাক্রিক, তৈলিক, তৈলী। আরম্ভের সময় পোতা ঋবের বংশে বেণ নামে এক রাজা হন। বেণ দুর্লভ প্রযুক্ত স্বরাজ্যে (ভারত

বা নাতিবর্ষে) বিবাহ বিষয়ে জাতিগত বাধা উঠাইয়া দেন। সুতরাং তখনকার চতুর্দশের মধ্যে অহলোম ও প্রতিলোম মিলন যথেষ্ট চলিয়া গেল। এই সকল বর্ণবিপর্যয়ে যে সকল সম্ভাবন উৎপত্তি হইল, তাহারাই বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া নানাজাতির প্রতিষ্ঠা হইল। বেণ রাজার এইরূপ চর্যাবহার দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উচ্চদেশ মছন করিয়া এক পুরুষ উৎপাদন করিলেন। এই পুরুষ পৃথুনামে খ্যাত হইয়া রাজা হইলেন। পৃথু রাজা হইয়া সমস্ত বর্ণসকলের মধ্যে কার্যবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিলেন। এই সময়ে বাহাদিগের প্রতি তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার ভার দেওয়া হয় তাহারাই তৈলকার বা কলু নামে স্বত্ত্ব জাতি হইল। পৃথু নিয়ম করিয়া দেন যে, যে শ্রেণীর প্রতি যে কার্যের বা ব্যবসার ভার অর্পিত হইল, সে যদি সে ব্যবসা ত্যাগ বা অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে, তবে সে অপশ্রেণী হইতে স্রষ্ট ও রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবে।

কলুরা “ধানিগাছ” নামক কাঠের যন্ত্রে যন্ত্রে সাংঘ্যো তিল, তিসি, সর্ষপ, গোস্ত, বাদাম, এরুণ্ড প্রভৃতি তৈলকর বীজ ও নারিকেলের শস্ত পেষণ করিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া তাহারই ব্যবসার করে। বাকালার “তেলী” নামক যে জাতি তৈল প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে “গাছুরা বা ঘনা তেলী” বলে। কলুর ধানিগাছ ও ঘনাতেলীর ধানিগাছ বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র। ঘনাতেলীর গাছ অপেক্ষা কলুর গাছ অধিক সুবিধাজনক ও কার্যোপযোগী।

“কলু” বর্তমান অবস্থা—ইহাদের বর্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইংরাজেরা এক্ষণে পেণবস্ত্র আবিষ্কার করিয়া ইহাদের জীবিকায় হস্তাকর হইয়া উঠিয়াছেন। ইংরাজ-বিহ্বত কলে বেক্স শীত্র ও যত অধিক তৈল হইতে পারে, কলুর ধানিগাছে তাহা হওয়া একান্ত চূঃসাধ্য। সুতরাং কলুর ধানিতে তৈলপেষণ এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। কাজেই আজকাল ইহাদের জীবিকা-নির্মাণ বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে ইহারা তৈল ব্যবসারে বিশেষ লাভবান হইত, প্রতিগ্রামে অভাববঞ্চে এক ঘর কলুরও বাস আবশ্যক হইত, এবং তাহার জীবিকা ও সর্ষপাদি উৎপাদনের জন্য একখণ্ড ভূমির চাহ হইত, কিন্তু এক্ষণে আর তাহার আবশ্যক হয় না। ইংরাজের যন্ত্রের সাহায্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা অধিক কলুর ব্যবসার চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজের আর দেরূপ দৃঢ়তা নাই, কাজেই এই সকল কলুব্যবসারী ব্রাহ্মণাদি জাতির কোন শাসন নাই; রাজা বিবেচীর, তিনি ইহাতে অনিষ্টকারিতা দেখিতে পান

না। সুতরাং দিন দিন কলুজাতির অন্নোভাব বাড়িয়া উঠিতেছে।

কলু (দেশজ) ২ আসামের গারো পাহাড়ই একটি নদী। এই নদী জুরা নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে।

কলুক (পুং) বাদ্য যন্ত্রবিশেষ, এক প্রকার মন্দির।

কলুনী (দেশজ) কলুজাতির জী।

কলুষ (স্ত্রী) কং যৎ লুঘতি হিনতি, ক-লুষ জণ। কল-উবচ বা (পুনর্হিকলিত্য উবচ। উণ ৪। ৭৫) ১ পাপ। ২ মলিনতা।

(“বিগতকলুষমন্তঃ শালিগকা ধরিজী।” ঋতু সং।)

(পুং) কস্ত জনস্ত লুঘঃ হিংসক আবিলাকারকঃ, ক-লুষ ক।

৩ মহিষ। (জি) ৪ বদ্ধ। ৫ নিম্নিত। ৬ কষায়িত। ৭ ছঃখিত।

৮ ক্ষুদ্র। ৯ শাপী। ১০ অসমর্থ।

(“ভাবাববোধকলুষা দরিতেষ রাভৌ।” রঘু ৫। ৬৪।)

কলুষিত (জি) কলুষমন্ত সজাতং, কলুষ-ইতচ্ (তদন্ত সজাতং তারকাদিত্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) ১ পাপযুক্ত। ২ দূষিত। ৩ মলিন। ৪ কষায়িত। ৫ বদ্ধ। ৬ ছঃখিত। ৭ ক্ষুদ্র। ৮ অসমর্থ।

কলুষী [ন] (জি) কলুষমভ্যভি, কলুষ-ইনি। ১ শাপী। ২ মলিন।

কলুতর (পুং) দেশবিশেষ।

কলেজা (দেশজ) বন্ধঃহল।

কলেবর (স্ত্রী) কলে শুক্রে বরং শ্রেষ্ঠঃ, দেহোৎপত্তিহেতুক-ত্বাৎ পবিভ্রম্, সপ্তম্যা অলুক্। শরীর।

(কলেবরঃ শরীরোহস্মিন্নজীবে কুণপং শবঃ। হেম ৩। ২২৮।)

কলেরা (ইংরেজি Cholera) ওলাউঠা। [ওলাউঠা দেখ।]

কলোয়ান (কলবার)—হিন্দুস্থানী ও বিহারী বেণিয়াজাতি হইতে উৎপন্ন এক অতি নীচজাতির লোক। ইহারা সরাপের ব্যবসার করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, খদির-প্রস্তুতকারী “খয়েরওয়ার” নামক বস্ত্রজাতির নাম হইতে ইহাদের এই জাতীয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে, আর কেহ কেহ বলেন যে, “কলওয়ারা” শব্দ হইতে “কলওয়ার” নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু কোনটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

এই জাতি প্রধানতঃ ৬ শ্রেণীতে বিভক্ত;—বনোদিয়া, বিয়াপুত বা ভোজপুরী, দেশওয়ার, জৈসওয়ার, অযোধ্যাবাসী খালসা ও খরিদাহা। ইহা ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান আছে, তাহার “মাকি বা কলাল” নামে পরিচিত। বনোদিয়ারা এই মুসলমানগণ-সবকে বলে যে, উহারা

সায়বেরেলি হইতে প্রায় শতবৎসর পূর্বে এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে “সাগাই” (সাগা ?) বলে। বিয়াহুতেরা বলে যে, পূর্বে তাহাদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না, তবে আজকাল চলিয়া গিয়াছে। ইহারা স্বজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, যে আদি-পুরুষ হইতে সমুদয় কলওয়ার জাতির উৎপত্তি, সেই আদি-পুরুষের দুইটি পত্নী ছিল, একটি “বিয়াহি” (বিবাহিত), আর একটি “সাগাই” এই “বিয়াহি”-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা “বিয়াহুত” নামে পরিচিত, আর “সাগাই”-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরাই অজ্ঞাত নামে পরিচিত। বিয়াহুতেরা মদের ব্যবসা, মদ্যপান, নিজ হস্তে গোদোহন বা বলীর্দেহের “অণ্ডচ্ছেদন” করে না। ইহারা কেবল “ভাড়ির” ব্যবসা করে। খরিদাদা শ্রেণীর বলে যে, গাজীপুর জেলার একটি গ্রামের নাম হইতে তাহাদের শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। খরিদাদারা বিয়াহুত-গণের জায় নিজহস্তে গোদোহন ও বণ্ডের অণ্ডচ্ছেদন করে না, তবে মদ্যপানে বা মদ্যের ব্যবসারে তাহাদের আগতি নাই। অজ্ঞাত কলওয়ারেরা জৈসওয়ার শ্রেণীকে আরজ বংশ বলিয়া থাকে। কোন এক কলওয়ারের “জৈসিয়া” নামে এক উপপত্নী ছিল; তাহার গর্ভজাত সন্তান হইতে জৈসওয়ারগণের উৎপত্তি; কিন্তু তাহারা আপনারা বলে যে, পূর্বে তাহারা “জৈসপুর” নামক এক গ্রামে ছিল, সেই গ্রামের নাম হইতে তাহাদের শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। এইরূপ পূর্বোক্ত কয়েকটি নিষিদ্ধ বিষয়ের তারতম্য লইয়া অজ্ঞাত শ্রেণীগুলির বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। বিয়াহুত ও খরিদাদা শ্রেণীর লোকেরা স্ববংশে নিজ মাতামহগোষ্ঠিতে, পিতৃমাতামহ-গোষ্ঠিতে বা পিতামহের মাতামহ-গোষ্ঠিতে বিবাহ করে না। জৈসওয়ার শ্রেণীরও এইরূপ স্ববংশে, নিজ মাতামহ-গোষ্ঠিতে ও নিজ প্রমাতামহীর পিতৃবংশে বিবাহ করে না।

বিবাহ—বিয়াহুত ও খরিদাদা শ্রেণীর কলওয়ারেরা ৫ম হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত ও জৈসওয়ারেরা ৫ হইতে ১০ম বৎসর বয়সে কস্তার বিবাহ দেয় ও বনোদিয়ারা ৭ হইতে ১৪ বৎসরে দেয়; কিন্তু সকলেই কন্যা অপেক্ষা বরের বয়স কয়েক বৎসর বেশী হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করে। পুরুষের বিবাহ সকল শ্রেণীতেই ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানী বেনিরাদিগের যে প্রণালীতে বিবাহ হইয়া থাকে, ইহাদেরও সেইরূপ হয়। “সিন্দূরদান” কার্য হইয়া গেছেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয়।

ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্বে “সরদেখি,” “বরদেখি” ও “পানবাটি” নামক তিনটি কুলাচার আছে। কেবল বনোদিয়া-গণের মধ্যে ঐ তিন প্রথা নাই। বরের পিতাকে সর্বাধা রক্ষার্থ ইহারা কিছু নগদ অর্থ দেয়, তাহাকে “তিলক” বলে, কোন শ্রেণীতেই ২১ টাকার অধিক তিলক দিবার রীতি নাই। ইহারা একটি হইতে ৪টি পর্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। প্রথমা পত্নী বন্ধ্যা হইলেই একরূপ পরিত্যক্ত গ্রহণ ঘটে। সকল শ্রেণীতেই বিধবা-বিবাহ চলে। পত্নী ব্যতিচারিণী হইলে ইহারা সে পত্নীকে পরিত্যাপ করে। চম্পারণ জেলার পরিত্যক্তা ব্যতিচারিণীকেও কলওয়ারেরা “সাগাই” প্রণালীতে পত্নীরূপে গ্রহণ করে, একরূপও দেখা যায়।

ধর্ম—এই জাতীয় সকল শ্রেণীর লোকেই বৈষ্ণব, তবে অজ্ঞাত গ্রাম্যদেবতার পূজা করিয়া থাকে। “শোখা” নামক দেবতাকে শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষের দুইটি সোমবার বিয়াহুত ও খরিদাদা শ্রেণীর লোকেরা চাউল ও দুগ্ধ উৎসর্গ করে, ঐ সময়ে বৃধ ও বৃহস্পতিবারে “কালী” ও “বন্দী” নামক দেবতাকে ছাগল ও মিঠাম উৎসর্গ করে এবং মঙ্গলবারে “গোরইয়া” দেবতাকে শুভপারী শূকরশাবক ও মদ্য উৎসর্গ করে। ঐ সময়ে শনিবারে জৈসওয়ারেরা পিষ্টক ও মিঠাম “পাঁচপীর” দেবতাকে এবং ভাদ্র কৃষ্ণা একাদশী ও মাঘী শুক্লা একাদশী ও জ্যৈষ্ঠদশীতে বনোদিয়ারা “অক্ষদেব”কে উৎসর্গ করিয়া থাকে। এই সকল নিবেদিত প্রণালী দ্রব্য ইহারা আপনারা ভোজন করে। কেবল উৎসর্গিত শুভপারী শূকরশাবকগুলি খায় না, মৃত্যুকামধ্যে পুঁতিয়া ফেলে আর পাঁচপীরের প্রসাদ মুসলমানগণকেও বিতরণ করিয়া দেয়।

ইহাদের পূজাদি ও পৌরহিত্যাদি করিবার জন্ত এক শ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ আছে। কেবল বনোদিয়ার পুরোহিতেরা অজ্ঞাত কনোজীয়া ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান পাইয়া থাকে। ইহারা শবদাহ করে। জ্যৈষ্ঠদশদিনে আদ্যজ্ঞাহ হয়। বনোদিয়ারা ৫ম বর্ষের নূন মৃত সন্তানের শব পুঁতিয়া ফেলে।

জীবিকা ও অবস্থা—সর্যাপ প্রান্তরের ব্যবসারই ইহাদের মূল জীবিকা। বনোদিয়া, দেশবর ও খালসা ভিন্ন অজ্ঞাত শ্রেণীর কলবরেরা অজ্ঞাত ব্যবসা ও তেজারতি কারবারও করিয়া থাকে; অধিকাংশই কৃষিকার্য্য করে। যে সকল কলবরেরা তেজারতি কারবার করে, তাহারা ইহাদের মধ্যে সম্মান পায়। ছোটনাগপুরের ডকতশ্রেণীর কলবরেরা ঐ ব্যবসারে সমধিক সম্ভ্রান্ত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা নাই, সামান্য মজুরেরা বৈষ্ণব আহাৰ্য্যজ্ঞান নির্বাহ করে, ইহারাও সেইরূপ করে।

ইহার অনাচরণীয়, অর্থাৎ ইহাদের স্পষ্ট অল জ্ঞানাদির অব্যবহার্য। ইহাদের অধিকাংশ এখন চাম্বাস করিয়া খায়, কারণ ইহাদের জাতিগত ব্যবসার গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গ্রহীত হওয়ার কৃষি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। “তেলী” বা কলু অপেক্ষা ইহার জাতিপর্যায়ের উচ্চ শ্রেণী মধ্যে গণ্য বটে।

সর্কাপেক্ষা চম্পারণ ও মজঃকরপুর জেলায় এই জাতির বাস অধিক। নদীয়ায় ১ ঘর মাত্র আছে।

কক্ক (পুং) কল-ক (কলাধারার্জিকলিভাঃ কঃ। উণ ৩। ৪০।)

১ শিলাপিষ্ট জব্য।

“জব্যমাত্রঃ শিলাপিষ্টঃ শুক্কঃ বা জলমিশ্রিতঃ।

তদেব স্মৃতিঃ পুট্রৈঃ কক্ক ইত্যভিযীতঃ ॥”

শুক্ক হউক বা জলমিশ্রিত হউক শিলাপিষ্ট জব্যমাত্রকেই কক্ক বলা যায়। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—পিষ্ট, বিনীয়, আবাপ ও প্রক্ষেপ। একপ্রহরের অতিরিক্ত কাল থাকিলে কক্ক জব্যের বীৰ্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ২ ঘৃততৈলাদির শেষ। ৩ দন্ত। ৪ বহেড়াগাছ। ৫ বিঠা। ৬ কিট। ৭ পাণ। ৮ জব্যমাত্রের চূর্ণ। ৯ কাণ্ডের মলা। ১০ তুফক নামক গন্ধ-জব্য। ১১ প্রতারণ। ১২ (জি) কলয়িত পাণঃ আচরণতি, কল-ক। পাণায়া, পাণাশয়।

(কক্কোহস্তী ঘৃততৈলাদিশেষে দন্তে বিভীতকে।

বিটিকিটোশচ পাণে চ জিহ্বা পাণাশয়ে পুনঃ ॥ মেদিনী।)

কক্কুন (ক্ৰী) কক্ক শাঠ্যং করোতি, কক্ক-গিচ্-ভাবে লুট্।

১ শঠতাচরণ। ২ বিবাদ।

কক্কফল (পুং) কক্কত বিভীতকত ফলমিব ফলং যত, মধ্যলো।

দাড়িমগাছ। [দাড়িম দেখ।]

কক্কল (পুং) ব্যক্তিশেষঃ।

কক্কলানি (দেশজ) ১ বৃথাব্যাক্যে গোলযোগ করা। ২ জল-স্রোতের শব্দ।

কক্কালিন্দা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কক্কি (পুং) কক্ক পাণং হার্যতয়া অস্তি অস্ত ইন্। ভগবান্ নারায়ণের দশাবতারের মধ্যে দশম বা শেষাবতারের নাম “কক্কি”। যখন ভূমণ্ডলে কলির চতুর্থ-পাদ বা পূর্বাধিকার হইবে অর্থাৎ কলির শেষে যখন সমুদয় মানব একবর্ণ হইয়া যাইবে এবং বিষ্ণুর নাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে, তখন ভগবান্ এই নামে অবতীর্ণ হইয়া, কলিকে নিপীড়িত করিয়া, তাহাকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দিবেল এবং রেঙ্কুল ধ্বংস করিয়া সঙ্কর্ষের প্রতিষ্ঠা ও পুনর্কায় লভ্যরূপে আধিপত্য প্রদান করিবেন।

(মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণু, গজ, নারসিংহ ইত্যাদি।)

লভ্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ পরস্পর পৃথিবীতে অধিকার পাইয়া থাকে। এই চারিটি যুগের সমষ্টি কালকে “বিব্যুগ” বলে। এইরূপ ৭১টি দিব্যযুগে এক একটি মন্বন্তর হয়। বর্তমান সময়ে ৭ম মন্ব বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। বৈবস্বতের অধিকারের ৭১টি দিব্য-যুগের মধ্যে অষ্টারিংশটি দিব্যযুগের বর্তমান কলিযুগ চলিতেছে। ইতিপূর্বে স্বায়ম্ভুব, আরোচিব, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ নামক ছয়টি মন্বন্তর হইয়া গিয়াছে। এই প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১টি করিয়া ৪২৬টি দিব্যযুগ অতীত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দিব্যযুগে একটি করিয়া কলিযুগ অতীত হইয়াছে; আর বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তর ২৭টি দিব্য-যুগ ও তৎসঙ্গে ২৭টি কলিযুগও গিয়াছে। বর্তমান খ্রীঃ বরাহ কল্মে মোট ৪৫০টি কলিযুগ অতীত হইয়াছে। যদি প্রত্যেক কলির শেষাবস্থার নারায়ণ কক্কিমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ৪৫০ বার তাঁহার কলিলীলা হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমান কলিযুগের শেষেও একবার হইবে। প্রত্যেক মন্বন্তরে নারায়ণের অবতারাদি সমান হয় কি না তাহা কোন পুরাণ হইতেই স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং পূর্বে পূর্বে মন্বন্তরে বা কলিযুগে কক্কি অবতার হইয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করা যায় না।

যাহা হউক, ভগবানের কলিলীলা লব্ধে কক্কিপূরণকার যাহা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, “কলির শেষ পাদ উপস্থিত হইলে, স্বাধ্যায়, স্বধা, স্বাহা, বসট্ ও ওঙ্কার অন্তর্হিত হইল, সুতরাং দেবগণের আহ্বারাদিও বন্ধ হইয়া গেল। তখন তাঁহার সমবেত হইয়া দীন। কীর্ণা মলিনা ধরণীকে অগ্রে করিয়া একান্ত হতাশ মনে ব্রহ্ম-লোকে গিয়া উপনীত হইলেন। দেবগণ বিষন্নমনে ব্রহ্ম-লোকে উপনীত হইয়া সনক সনন্দ সনাতনাদি ও সিদ্ধগণ কর্তৃক তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া অবস্থান করিলেন। পিতা-মহ তাঁহাদিগকে সাবধে উপবেশন করিতে বলিয়া কুলল জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগণ তখন কলির দোষ বৈকুণ্ঠে ধর্ম্মনাশ হইয়াছে, সেই সমস্ত যথাযথ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণের নিকট অবস্থা অবগত হইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, ‘চল, বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া তোমাদের অস্বীকৃত সিদ্ধ করিব।’ এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জ্ঞাবহিতে ভূষ্ট করিয়া দেবগণের প্রার্থনা জানাইলেন। নারায়ণ কিম্বদন্তে কলি-বিবরণ জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, ‘বিতো! আমি তোমার

অভিপ্রায়ানুসারে শব্দলগ্ন্যমে বিক্ষুব্ধতার ঔরসে স্মৃতিগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিব। আমার কোষ্ঠ আর তিনটি ভ্রাতা হইবেন। আমি সেই ভ্রাতৃত্বের সহিত মিলিত হইয়া কলিকতা করিব। আমার প্রিয়তমা লক্ষ্মী ও পদ্মা নাম ধারণ করিয়া সিংহলদেশে বৃহত্তথপত্নী কোমুদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। দেবগণ! তোমরাও ভূমণ্ডলে স্ব স্ব অংশে অবতরণ কর। আমি তোমাদের সহায়ে দেবাপি ও মরু নামক রাজবশকে পৃথিবীরাষ্ট্র্যে অধিষ্ঠিত করিয়া তথায় সত্যযুগ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিব।' বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

দেবগণকে বিদায় দিয়া ভগবান্ শব্দলগ্ন্যমে বিক্ষুব্ধতার ঔরসে স্মৃতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পূর্বে কবি, প্রাজ্ঞ ও সূক্ষ্মক নামে বিক্ষুব্ধতার তিনটি পুত্র হইয়াছিল। যথাকালে বৈশাখমাসের শুক্লা দ্বাদশীদিনে ভগবান্ ভূমিষ্ঠ হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কৃষ্ণাবতারের স্তায় এখানেও চতুর্ভূজ হইলেন। কথিত আছে, মহাযজ্ঞী ইহার ধাত্ত্বী হইয়াছিলেন, ভগবতী অধিকা নাভিচ্ছেদন করিয়াছিলেন, ভাগীরথী গর্ভক্রেদ পরিকার ও সাবিত্রী দেবী গাজমার্জ্জুন করিয়াছিলেন, পৃথিবীদেবী স্তম্ভ দিয়াছিলেন, ষোড়শমাতৃকা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। স্বর্গে ব্রহ্মা ভগবান্কে এইরূপে চতুর্ভূজ মূর্তিতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া পবনকে স্মৃতিকাগৃহে প্রেরণ করিলেন। পবন আসিয়া ভগবানের কর্ণে কর্ণে বলিলেন 'প্রভো! আপনার চতুর্ভূজমূর্তির দর্শন লাভ দেবতাদিগেরও দ্রুপ্ত; স্মৃতরাং এ মূর্তি সংবরণ করিয়া মনুষ্য মূর্তি ধারণ করাই যুক্তিসঙ্গত।' ভগবান্ পবন-মুখে ব্রহ্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ ত্রিভূজ মানব-গুণ হইলেন। বিক্ষুব্ধা হঠাৎ পুত্রের রূপান্তর দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিক্ষুব্ধতার মোহিত ইয়া পূর্বদৃষ্ট রূপকে ভ্রম বলিয়া দিচ্ছাস্ত করিলেন।

ভগবানের জন্মগ্রহণাবধি শব্দলগ্ন্যমের পাপ তাপ অন্ত-হীত হইল। অধিবাসিবর্গ মঙ্গলাহুতানে রত হইল। পুত্রকে ভ্রমশ: প্রাপ্তবয়: দেখিয়া বিক্ষুব্ধা বেদবিদ ব্রাহ্মণদিগকে আনাহীরা নামকরণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। য দিন নামকরণ হইবে, সেই দিন পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, মন্থখামা ও ব্যাসদেব ত্রিভূজরূপ ধারণ করিয়া শিশুরূপী রিক্রে দেখিতে আসিলেন। বিক্ষুব্ধা এই অদৃষ্টপূর্ব সুখ্যসম ভক্ষণী অতিথিচতুষ্টয়কে দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার উপবিষ্ট হইয়া পিতৃকোড়হালককে দেখিয়াই বুঝিলেন, ভগবান্ কলিকক বিনাশের

অস্ত্র এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তাঁহার বালকের 'কব্জি' নাম নির্দেশ করিলেন এবং উপস্থিত থাকিয়া জাতকর্ম ও নামকরণাদি সংস্কার করাইয়া প্রসন্নমনে বিদায় হইলেন। ইহার পর গর্গ, ভর্গ, বিশাল প্রভৃতি নামে দেবভারা কব্জির জাতিক্রমে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে বিশাখযুগ নামে নরপতি তৎপ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণাদিকে প্রতিপালন করিতেন। ক্রিয়ংকাল পরে কব্জির উপনয়নযোগ্য বয়স হইল, বিক্ষুব্ধা একদিবস কব্জিকে বলিলেন, 'বৎস, আমি তোমার যজ্ঞসূত্র-রূপ প্রধান সংস্কার সম্পন্ন করিব, পরে তুমি চতুর্ভূজ অধ্যয়ন করিবে।' কব্জি এই কথা শুনিয়া কোতূহলাক্রান্ত হইয়া বেদ কি, সাবিত্রী কি, যজ্ঞসূত্র কি, ব্রাহ্মণ কি, দশবিধ সংস্কার কি, বিষ্ণুপূজা কি, প্রভৃতি জানিয়া লইলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যে ব্রাহ্মণ সংপথের পথিক হইয়া হরির স্রীতি-লাভ, জিলোকের অতীষ্টসাধন ও নিধিল ভুবনের উদ্ধার করেন, এরূপ ব্রাহ্মণ কোথায় থাকেন।' বিক্ষুব্ধা এই প্রশ্নের উত্তরে কলির অত্যাচারের কথা বিবৃত করিলেন। পিতার মুখে কলির সংবাদ শুনিয়া ভগবান্ কব্জি যেন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; তাঁহার মনে কলিনিগ্রহের অভিলাষ জন্মিল। পরে যথানিয়মে উপনয়ন শেষ হইলে, তিনি গুরুকূলে বাস করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

তখন পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে বাস করিতেন। তিনি কব্জিকে আসিতে দেখিয়া ননিজ আশ্রমে আনিয়া, স্বীয় পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'বৎস, আমি তোমার অধ্যাপনা করিব, ভূগুণ্ডে জন্মদগির ঔরসে আমার জন্ম, বেদবেদাঙ্গ তত্ত্ব ও ধর্মকিঁদ্যার আমি পারদর্শী, আমি সমুদ্র পৃথিবী নিঃকল্লিয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়াছি, এক্ষণে তপশ্চরণের অস্ত্র এই মহেন্দ্রপর্বতে বাস করিতেছি, তুমি আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার কর এবং অভিলষিত শাস্ত্র অভ্যাস কর।' কব্জি পরশুরামের কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার নিকট থাকিয়া চতুঃষষ্টিকলা সাক্ষবেদ ও ধর্মকিঁদ্যার শিক্ষা করিয়া যথাকালে দক্ষিণা দিতে চাহিলেন। পরশুরাম দক্ষিণার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণকুমার, ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট কলিনিগ্রহের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কলিনিগ্রহের নিমিত্ত অবতারণা করিয়াছেন, তুমি সেই পূর্ণব্রহ্মরূপী হরি, তুমি আমার নিকট বিদ্যা শিখিয়াছ, পরে শিবের নিকট অস্ত্র ও সর্বজ্ঞ শুকপত্নী এবং

সিংহলদেশের রাজকন্যা পদ্মাবতী লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে তোমার হস্তে ধর্মহীন নৃপতিগণের বিনাশ, কলির নিগ্রহ ও স্বধর্মের সংস্থাপন হইবে, তুমি অবশেষে মরু ও দেবাপিকে পৃথিবীরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া গোলোকে প্রতিগমন করিবে, তোমার এই সাধুকর্মের অমুষ্ঠানে আমার পরম শ্রীতি হইবে, তাহাই আমার দক্ষিণা।’ ককি শুকদেবের কথা শুনিয়া বিবোধকেবর নামক শিবমন্দিরে গিয়া মহাদেবের পূজা ও স্তব করিলেন। শুবে তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেব পার্শ্বতীর সহিত আবির্ভূত হইলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন, ‘তুমি যে স্তব রচনা করিয়া পাঠ করিলে, সেই স্তব যে পাঠ করিবে তাহার ইছলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই ক্রতগামী বহুরূপী গুরুভের অংশসমুহ অথ ও এই সর্বজ্ঞ শুক তোমাকে বিতেছি, গ্রহণ কর; আজ হইতে মানবগণ তোমাকে সর্ববিধ শাস্ত্রে স্নানপুণ, বেদপারদর্শী ও সর্বভূতবিজয়ী বলিয়া জানিবে, এই মহাপ্রভাশালী রত্নখচিত মুষ্টিশালী করাল করবাণ গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা পৃথিবীর গুরুভার হরণ করিও।’ এই বলিয়া মহাদেব অস্তিত্ব হইলেন; ককিও হরণপার্বতীকে প্রণাম করিয়া শিবদত্ত বস্ত্রগুলি লইয়া অম্বারোহণে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বিক্ষুণ্ণা পুত্র-



ককি অবতার।

মুখে সমস্ত অবগত হইয়া যেখানে সেখানে সেই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন, ক্রমে সেই কথা রাজা বিশাখ-
যুগের কর্ণগোচর হইল। বিশাখযুগে শুনিয়া বুঝিতে পারি-
লেন যে, বর্ধা-ই বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছেন, কারণ যে

অবধি ককির জন্ম হইয়াছে, সেই অবধি তাঁহার রাজধানী
মাহিমতী নামক নগরীতে যাগ, দান ও তপস্তা ব্রতের
অমুষ্ঠান হইতেছে, ব্রাহ্মণ-ককির বৈশ্বাদি তাহাদের দুরাচার
ভ্যাগ করিয়াছে। বিশাখযুগ এই সকল দেখিয়া নিজেও
ধর্মপথ অবলম্বন করিলেন ও বিপুল ধনদে প্রজাপালন
করিতে লাগিলেন। ককি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া ধন
ও ধর্মরূপ গ্রহণকরত মাহিমতীপুরের উদ্দেশে অম্বা-
রোহণে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃস্বয় ও গর্গ
ভগাদি জ্ঞাতিগণও অমুগমন করিলেন। বিশাখযুগ কলির
আগমন শুনিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি পুরোহরে পৌছিয়া
দেখিলেন, দেবতা-পরিবৃত উচ্চৈশ্বর্যবাহী ইন্দের ভ্রাতৃ
স্বজনপরিবৃত ককি দণ্ডায়মান। বিশাখযুগ তাঁহাকে দেখিয়াই
অবগত হইয়া প্রণাম করিলেন, ককিও প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার
দিকে চাহিলেন, ভগবানের রূপাঙ্গটি পাইয়া সেই দিন
হইতেই বিশাখযুগ পুণ্যাত্মা বৈষ্ণব হইলেন।

ককি রাজার সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং সং-
ক্ষেপে আশ্রমধর্মের নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ‘আমার
অংশগণ কলির পাপে ভ্রষ্টাচার হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার
আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তুমি রাজস্বয় ও অশ্বমেধ
যজ্ঞ করিয়া আমার উপাসনা কর, আমিই পরম লোক,
আমিই সনাতন ধর্ম, কাল স্বভাব সংস্কার আমারই অমু-
গামী। আমি চন্দ্রবংশীয় দেবাপি ও সূর্য্যবংশীয় মরুকে
ধর্মরাজ্যে সংস্থাপিত ও সত্যযুগ প্রবর্তিত করিয়া গোলোকে
প্রস্থান করিব।’ বিশাখযুগ ককির বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে
বৈষ্ণব ধর্মের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ককি কলি-কলুষ-বিনাশের জন্ত বিশাখযুগের সত্যমধ্যে
প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাটমুষ্টি, ব্রহ্মা,
মায়ী, দেবদানব-মানব-হাবরজজমাদির সৃষ্টি, বেদমাহাত্ম্য,
ব্রাহ্মণমহিমা প্রভৃতি কথা ও আপনার অবতারের আবশ্যকতা
ব্যক্ত করিলেন। বিশাখযুগ এই সকল কথা শুনিয়া
সন্ধ্যাকালে স্থানান্তরে বাইলে, শিবদত্ত শুক ইত্যন্তঃ বিচরণ
করিয়া ককির নিকট উপস্থিত হইল। ককি শুককে
জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘শুক, তুমি কোন্ দেশে কি আহার
করিয়া আসিলে বল, তোমার মঙ্গলত’ শুক কহিল, ‘দেব,
সাগরের মধ্যে সিংহল নামে দ্বীপ আছে, সেখানকার
নৃপতির নাগ বৃহদ্রথ, কোমলী নামী মহিষীর গর্ভে তাঁহার
এক কন্যা হইয়াছে, তাঁহার নাম পদ্মাবতী, পদ্মাবতী
জিলোকে স্থলভা, তাঁহার চরিত্র অতীব রমণীয়, রূপে সন্মত ও
পাগল হয়, পদ্মাবতী হরণপার্বতীর উপাসনা করিয়া বর

লাভ করিয়াছেন যে, কোন মনুষ্য-রাজপুত্র পদ্মাবতীর উপ-
যুক্ত নহেন, এই জগতে মানব বা দেব অস্তর নাগ
গন্ধর্ব প্রভৃতি যে কেহ পদ্মাকে কামভাবে নিরীক্ষণ বা
অভিলাষ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ স্বীয় পুরুষজন্মের বরসাহুরূপ
জীৱ প্রাপ্ত হইবে, একমাত্র নারায়ণই তাঁহার স্বামী। পদ্মা
মহাদেবের নিকট এই বর লাভ করিয়া পরম ক্রোড়ে হইয়া
এতদিন নারায়ণের অপেক্ষা করিতেছিলেন, সন্ততি তাঁহার
পিতা স্বরস্বরের আয়োজন করিয়াছেন, নৃপতির উদ্দেশ্য
স্বরস্বর সভামধ্যে ত্রীকক যেমন ককিণীকে গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন, সেইরূপ নারায়ণ এই সভামধ্যে পদ্মাকেও গ্রহণ
করিবেন। এদিকে স্বরস্বর-সভায় যে সকল নৃপতি আসিয়া-
ছিলেন, তাঁহারা পদ্মাকে কামভাবে দৃষ্ট করিবামাত্র স্ব স্ব
বরসাহুরূপ বিপুলনিতম্বা স্তনযুগ্মশালিনী স্তম্ভ্যমা রমণীর
শরীর প্রাপ্ত হইলেন। বাঁহার মনে যেমন রমণীর রূপ
প্রতিভাসিত ছিল, তিনি সেইরূপ রূপ প্রাপ্ত হইলেন, এমন
কি, তাঁহারা হস্তবিলাসব্যসনে নিপুণতাও লাভ করিলেন।
নৃপতিগণ জীৱ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নমনে পদ্মার সহচরী
হইলেন। আমি বিবাহ দেখিব বলিয়া নিকটস্থ একটি
বৃক্ষে বসিয়াছিলাম, এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত হুম্বিত
হইলাম। পদ্মাও বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমি পদ্মার
বিলাপ শুনিয়াছি, তিনি শ্রীহরির চিন্তায় একান্ত কাতরা;
আমি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া পদ্মাবতীকে সেই
অবস্থার পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে
আসিয়াছি।

ককি শুক্রমুখে পদ্মাবতী লক্ষীর এতাদৃশ অবস্থা শুনিয়া
তাঁহাকে আশ্বাস বিদ্যার জন্ত শুক্রকে যথোযুক্ত উপদেশ দিয়া
পুনরায় সিংহলে প্রেরণ করিলেন। শুক্র সিংহলে উপস্থিত হইল
এবং পদ্মাবতীকে কতকটা আশ্বাসিত করিয়া তাঁহার মুখে
শিবোক্ত বিষ্ণুপূজার পদ্ধতি, ভগবানের দেহের বর্ণনা ও শ্রীচরণ
হইতে কেশ পর্যন্ত প্রতি অঙ্গের ধ্যান শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে
সমুদ্রের অপর পারে শম্ভলগ্রামে বিষ্ণু ককিরূপে অবতীর্ণ হইয়া-
ছেন, এই সংবাদ প্রদান করিল। পদ্মা শুক্রমুখে ককির সংবাদ
পাইয়া তাঁহাকে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিলেন এবং তাঁহাকে
ককিদেবকে আনয়নের জন্ত নিযুক্ত করিলেন ও বলিয়া
দিলেন, “শুক্র, বাহা বলিবার হয় বলিও, তোমার অবিদিত
কিছুই নাই; আমি আর কি বলিব, যদি ককি আপনাকে
মহুযাজ্ঞমে ত্রীক-প্রাপ্তির আশঙ্কার সিংহলে পদার্পণ না
করেন, তথাপি তাঁহার শ্রীচরণে আমার প্রণাম জানাইয়া
বলিবে, ‘আমায় অদৃষ্ট-দোষে শিবের বর অভিলাষে

পরিণত হইয়াছে।’ শুক্র পদ্মাবতীর নিকট বিদ্যার গ্রহণ
করিয়া ককির নিকট প্রত্যাগমন করিল। ককি শুক্রের
নিকট পদ্মার কথা শুনিয়া শিবদত্ত অর্থে আরোহণপূর্বক
শুক্রকে সঙ্গে লইয়া ভদ্রায়চিত্রে বসিতপদে সিংহলে যাত্রা
করিলেন। যথাকালে রাজধানী কাকমতীনগরে উপস্থিত
হইলেন। নগরের প্রান্তভাগে মনোহর সরোবর দৃষ্ট করিয়া
শুক্রকে বলিলেন, “শুক্র, এই স্থানে স্নান করিতে হইবে।”
শুক্র ককির উদ্দেশ্য বুঝিয়া পদ্মাবতী সন্নিধানে পন্ন করিল।
ককি সরোবরতীরে সোপানোপরি অবস্থান করিলেন।
এদিকে শুক্র গিয়া পদ্মাবতীকে ককির আগমন সংবাদ জানা-
ইল। পদ্মাবতী শুনিয়া সরোবর-তীরের ছলে সহচরী সঙ্গে
লইয়া ককিদর্শনে চলিলেন। পদ্মাবতী আসিতেছেন
শুনিয়া, গৃহে বিশ্রুতিতে যে সকল পুরুষ ছিল, তাহারা ভয়ে
চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; তাহাদিগের কামিনীগণ
পাছে পতির জীৱ্য প্রাপ্তি হয়, এই ভয়ে পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান
করিতে লাগিল। পদ্মাবতী সহচরীগণের সহিত সরোবর-
সোপানে নামিলেন, ভগবান্ ককি তখন কদম্বভরুর মূল-
দেশে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। পদ্মাবতী যথাকালে স্নান
সমাপন করিয়া সেই তরুমূলে উপস্থিত হইলেন এবং ককির
রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইয়া শুক্রকে বলিলেন,
“শুক্র, এই মহাপুরুষের নিদ্রা ভঙ্গ করিও না, কি জানি যদি
নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমাকে দেখিয়া ইনি জীৱ্য প্রাপ্ত হন,
তাহা হইলে আমার কি হইবে। হায়! মহাদেবের বর
আমার পক্ষে শাপ হইল।” ককি মনে মনে পদ্মার অভিপ্রায়
বুঝিতে পারিয়া জাগরিত হইলেন এবং পদ্মাবতীকে মধুর
প্রেমসম্ভাষণে আদর করিলেন। পদ্মাবতী ককিদেবের মধুর
বচন শ্রবণ করিয়া এবং স্বীয় পুরুষত্ব অক্ষত রহিয়াছে দেখিয়া
সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং লজ্জানন্দমুখে প্রেম-
গন্ধদম্বরে ভগবান্ ককিকে স্তবে তুষ্ট করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন
করিলেন। পদ্মাবতী নিজ গৃহে আসিয়া পিতার নিকট
ভগবান্ ককিদেবের আগমনবার্তা জানাইলেন। রাজা
বৃহদ্রথ, নগরে শ্রীহরির পদার্পণ হইয়াছে শুনিয়া, নানাবিধ
নৃত্য, গীত, বাদ্যাদির আয়োজন করিয়া পাক্ষিমিত্র পরিজন
ও ব্রাহ্মণাদি সহ ককিদেবকে আনয়ন করিতে যাত্রা
করিলেন। পুরোহিতগণ পূজার উপকরণ লইয়া অঙ্গুরণ
করিলেন। রাজা সরোবরতীরে ককিকে দেখিয়া স্তব
পূজাদি দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন ও অবশেষে পুরী মধ্যে
আনয়ন করিয়া পদ্মাবতীকে সস্ত্রদান করিলেন। যে
রাজগণ জীৱ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্তব করিয়া ককির

প্রসন্নতা লাভ করিলেন ও তাঁহার আদেশমত রোমানদীর জলে অগ্নিহীন করিয়া স্ব স্ব পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইলেন। পরে সকলে দশ অবতারের নামোচ্চারণ ও ভগবান্ ককির স্তব করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। পুরুষোত্তম ককি এই সময়ে তাহাদিগকে বর্ণাশ্রমধর্মের উপদেশ, বৈদিক অমুশাসনাদি, শ্রুতিমার্গের ও নিরুতিমার্গের পণিকোচিত কার্যের উপদেশ দিলেন। নৃপতিগণ এই সকল কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেব, কে কি কারণে জী ও পুরুষভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন, অথ, হুং ও জরা কোথা হইতে, কাহার আদেশে, কি উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়াছে? এ পর্যন্ত এ সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হয় নাই ও এতদ্বিধ আর বাহা কিছু আমরা জানি না, আপনি অমুগ্রহ করিয়া আমাদেরকে বলুন।' ককিদেব এই প্রশ্ন শুনিয়া অগন্ত্যনামক মুনিকে স্মরণ করিলেন। মুনিস্বর স্মরণমাত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন। ককি তখন রাজাদিগের প্রশ্ন শুনাইয়া সহজর দিতে কহিলেন। মুনিস্বর অগন্ত্য স্বীয় পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া রাজাদিগের সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। রাজগণ তাহার পর স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নৃপগণ স্মরণো প্রত্যাগমন করিলে, ভগবান্ ককিও স্মরণো প্রত্যাগমন করিতে সংকল্প করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের অভিশ্রয় অবগত হইয়া বিশ্বকর্মা দিয়া শস্ত্রসমগ্র ভগবানের জন্ত স্রষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ গৃহ নির্মাণ করাইলেন। ককি ও পদ্মাবতী যথাকালে নানাবিধবোতুক লইয়া শস্ত্র গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা সকলে উপনীত হইলে ককি ও পদ্মাবতী জনক জননীর চরণে প্রণাম করিয়া বহুজন সমভিষাহারে নগরে আগমন করিয়া বিশ্বকর্মানির্দিত ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ককির ভ্রাতা কবি স্ব-পত্নী কামকলার গর্ভে বৃহৎকর্তী ও বৃহদ্বাহ; প্রাজ স্ব-পত্নী সন্নতির গর্ভে যজ্ঞ ও বিজ্ঞ; এবং সূর্য্যক মালিনীর গর্ভে শান ও বেগবান্ নামে পুত্রোৎপাদন করিলেন।

কিছুদিন অতীত হইলে, বিজ্ঞানশা অধ্যয়ন করিতে অভিশ্রয় প্রকাশ করিলেন। ককি পিতার ইচ্ছা অবগত হইয়া ধনরত্ন সংগ্রহার্থ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন।

ককি স্বজনে পরিবৃত্ত হইয়া সটেন্দ্রে প্রথমতঃ কীকটদেশে উপস্থিত হইলেন। কীকটদেশে তখন সব একাকার হইয়া গিয়াছে, কেহ আর ধন, জী বা স্রাদ্দিগ্ৰহণে আপনায় ও অশরের মধ্যে কোন ভেদ দেখিত না। কীকটে

তখন জিন নামক রাজা ছিলেন। তিনি ককিকে আসিতে অনুরোধ করিয়া অকোহিণী সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

প্রথম যুদ্ধে জিনরাজের বৌদ্ধসেনা বিধ্বস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। পরে ককি ও জিনের যুদ্ধবৃত্ত বাধিল। ককি শরাঘাতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। জিনরাজ অচেতন ককিদেহ উঠাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিশ্বস্তর দেহ উঠাইতে পারিল না। ইতিমধ্যে বিশাখযুগ নিকটস্থ হইয়া জিনকে গদাঘাতে স্তম্ভিত করিয়া ককিদেহ লইয়া স্ব-রণে আরোহণ করিলেন। রণে উঠিয়াই ককির চেতনা হইল। চেতনা পাইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আবার জিনের সন্মুখে উপনীত হইয়া তাহাকে যন্ত্রণা পরিত্যক্ত করিয়া কটদেশ ভগ্ন করত বিনাশ করিলেন। জিনের ভ্রাতা শুক্লোদন গদাহস্তে ভ্রাতৃঘাতীর প্রতিশোধ দিতে আসিল, কিন্তু ককির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবির নিকট বাধা পাইয়া তাঁহারই সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শুক্লোদনে কবিতে গদাযুদ্ধ হইল, কিন্তু শুক্লোদন কিছুতেই কবিকে মারিত্ত করিতে না পারিয়া মায়াদেবীকে স্মরণ করিল। মায়াদেবী সিংহধ্বজ রথে নৈঋত পুরোভাগে থাকিলে বিশকর্পকের নৈঋত হীন হইয়া পড়িল। মায়ী আসিলেন, ককিসৈন্য অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। বৌদ্ধসেনা জয়ধ্বনি করিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু ককি কারণ বুদ্ধিতে পারিয়া নিজে মায়ার সন্মুখীন হইলেন। মায়ী বিফলক সন্মুখে দেখিয়া তাঁহার শরীরে মিশিয়া গেলেন। মায়াকে অন্তর্হিত দেখিয়া বৌদ্ধসৈন্য হীনবল হইয়া পড়িল। যাত্রা হটক, শেষে আবার যুদ্ধ বাধিল। ক্রমে শুক্লোদন, কাকাক, কপোতরোমা প্রভৃতি বৌদ্ধনায়কগণ পতিত হইতে লাগিল। শেষে অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বৌদ্ধবীরগণেরা যুদ্ধে আগমন করিল। ভগবান্ ককি তখন তাহাদিগকে অবলাজনমুগ্ধ অকৃত্রিম বুঝাইয়া দিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। রমণীগণ সে কথা না শুনিয়া পতিশোকে অস্ত্রত্যাগ করিল, কিন্তু অস্ত্রগণ শত্রুর প্রতি না গিয়া মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, 'যে ভগবানের শক্তির আশ্রয়ে আমরা শত্রুকুল ধ্বংস করি, ইনি সেই ভগবান্ হরি। ভগবান্ যখন প্রক্লান্তের জন্ত সুসংহৃদিত পরিগ্রহ করিয়াছিলেন তখনও আমরা হরির গাত্রে আঘাত করিতে পারি নাই, আর এখনও পারিব না।'

বৌদ্ধকামিনীরা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইল ও অবশেষে ককির শরণ লইল। ককিদেব তখন তাহাদিগকে ভক্তি-যোগের উপদেশ দিলেন। তাহারাও ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করিল।

কঙ্কিদেব তৎপরে কীকট হইতে চক্রতীর্থে আসিয়া সন্মিলে শাস্ত্রবিহিত বিধানাঙ্গারে ঘানাদি করিলেন। একদিন তথায় বালিখিল্য নামক কতকগুলি মুনি বিষম বদনে আসিয়া জানাইলেন যে, কুস্তকর্ণের নিকুস্তনামে এক পুত্র ছিল, তাহার কুখোদরী নামে এক কস্তা আছে। কালকল্পনামক রাক্ষসের সহিত এই কুখোদরীর বিবাহ হইয়া বিকল্পনামে এক সন্তান হইয়াছে। আপাততঃ কুখোদরী হিমালয় পর্বতে মন্তক রাখিয়া নিষধ পর্বতে পদব্রজ বিভ্রান্ত করিয়া শয়ন করিয়া আছে। হিমালয়ের এক উপত্যকায় বসিয়া বিকল্প স্তম্ভপান করিতেছে, সেই রাক্ষসীর নিখাস পবনে প্রভিহত ও বিবশ হইয়া আমরা আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমাদেরকে চিরকালই রাক্ষসভীতি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এবারেও করুন।

কঙ্কি মুনিগণের কথা শুনিয়া হিমালয়ের উপত্যকায় গিয়া দেখিলেন, এক দুগ্ধময়ী নদী অতি ধরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, উহা কুখোদরীর একটি স্তনের দুগ্ধধারা; বিকল্প একটি স্তন পান করিতেছে বলিয়া অপর স্তনের দুগ্ধধারা গড়াইয়া নদী হইয়া বহিতেছে। সম্ভবতঃ পরে সে যখন স্তন পরিবর্তন করিবে, তখন এই নদী শুকাইয়া যাইবে, অপরদিক দিয়া অপর স্তনে দুগ্ধ বহিতে থাকিবে। কঙ্কি এই কথা শুনিয়া কুখোদরীর ভীষণকারের কথা চিন্তা করিতে করিতে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিকটে গিয়া দেখেন, রাক্ষসীর কর্ণগহ্বরে পর্বতগহ্বর ভ্রমে সিংহগণ আশ্রয় লইয়াছে, লোমকূপে হস্তগণ পুষ্পোজাদি লইয়া স্নেহে আছে। কঙ্কি রাক্ষসীকে দেখিয়া শরত্যাগ করিলেন। রাক্ষসী শরবিক্ত হইয়া গভীর গর্জন করিল। শব্দে কঙ্কিসেনা মুক্তিত হইয়া পড়িল। পরে রাক্ষসী ঋষি গ্রহণ করিবামাত্র হস্তাশ্রয়পদাতি সহিত কঙ্কি রাক্ষসীর নাসাপথে প্রবেষ্ট হইবার উপক্রম হইল। রাক্ষসী নিকটে পাইয়া সমস্তই গ্রাস করিল।

ভগবান্ কঙ্কি সৈন্যে রাক্ষসীর উদরে প্রবেষ্ট হইবামাত্র অগ্ন্যং সংসার ভীত হইয়া উঠিল। কঙ্কিদেব তখন রাক্ষসীর উদরে বাণাশ্রি আলিয়া করণাল হস্তে উদর বিদারণ করিয়া বহির্গত হইলেন। সৈন্যগণ যোনিরন্ধ, কর্ণ, নাসারন্ধ প্রভৃতি যে যেখান দিয়া পারিল বাহির হইয়া পড়িল। কুখোদরী পক্ষপাৎ। বিকল্প জননীর মৃত্যু দেখিয়া নিরাশ্রয় হস্তে কঙ্কিসেনা বিস্ত্রাবিত করিতে লাগিল। কঙ্কি পক্ষবীর্য ভীষণ রাক্ষস শিশুকে ব্রহ্ম-অস্ত্রে বশাণে প্রেরণ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃ অসংখ্য মুনি ঋষি গঙ্গাস্নান পাঠ

করিতে করিতে কঙ্কিদর্শনে আসিলেন। এই সকল ঋষি-সত্তমগণের মধ্যে অত্রি, অদ্রিরা, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পরাশর, নারদ, হর্ষীদা, দেবল, কথ, অশ্বখামা, পরশুরাম, কপাচার্য, জিত, বেদগ্রমিতি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ছিলেন। ইহাদের সহিত মরু ও দেবাপি নামক দুই রাজর্ষি আসিয়াছিলেন। কঙ্কি তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, মরু আপনাকে সূর্য্যবংশোদ্ভূত অগ্নিবর্ণের গোত্র ও শাস্ত্রের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইনি কলাপগ্রামে তপস্তা করিতেছিলেন, ব্যাসদেবের মুখে কঙ্কি অবতারের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত এখানে আসিয়াছেন। মরু আপনাকে চক্রবংশীয় প্রতীপকের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইনি শাস্ত্রটুকু রাজ্যদান করিয়া কলাপগ্রামে তপস্তা করিতেছিলেন, ব্যাসমুখে কল্কিসংবাদ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন।

ইহাদের পরিচয় শুনিয়া ভগবান্ কঙ্কির পূর্বকথা শ্রবণ হইল। উভয়কে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, 'মরু, প্রজাপীড়ক, প্রাণিহিংসক স্নেহগণকে সংহার করিয়া তোমাকে অযোধ্যার সিংহাসনে এবং পুরুষদিগের উচ্ছেদসাধন করিয়া দেবাপিকে হস্তিনারাজ্যে বসাইব। তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে কৃত-বিদ্যা, এক্ষণে যোদ্ধৃবশে রণারোহণে আমার অঙ্গগমন কর। মরু! তুমি বিশাখবৃষের স্তন্যরীকচিরাকী কস্তাকে পত্নীতে গ্রহণ কর এবং দেবাপি! তুমিও রুচিরাম নৃপতির কন্যা শান্তাকে বিবাহ কর।' কঙ্কি এই কথা বলিবামাত্র আকাশ হইতে দুইখানি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রণ অবতরণ করিল। সকলে বিস্মিত হইল। কঙ্কি কহিলেন, 'তোমরা উভয়ে লোকপালনার্থ সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বম ও কুবেরের অংশে ধরাধামে অবতীর্ণ হইরাছ। তোমাদের জন্ত ইন্দ্রাদেশে বিশ্বকর্মা এই রথ নির্মাণ করিয়াছেন। তোমরা ইহাতে আরোহণ করিয়া আমার অঙ্গবর্তী হও।' কঙ্কির এই কথার পর পুষ্প-বৃষ্টি হইল।

এই সময়ে সনকসদৃশ এক তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারী উপনীত হইলেন। কঙ্কি পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'কমলাপতে! আমি আপনার আদেশবহ সত্যযুগ। আপনার আবির্ভাব ও প্রভাব প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত এখানে আসিয়াছি।' সত্যযুগ এই বলিয়া কঙ্কির স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিয়া সত্যযুগ কঙ্কির অঙ্গুগামী হইলেন। মহর্ষিরা ঋষি স্থানে প্রস্থান করিলেন।

কঙ্কি তৎপরে বিশালরাজ্যে বৃদ্ধযাত্রা করিলেন। বিশাখ-

বৃষ, দেবাপি ও মরু তাঁহার অঙ্গুগামী হইলেন। ধর্ম্ম স্বয়ং এই সময়ে যুদ্ধ ভ্রাক্ষণের বেশে ককির নিকট স্বীয় পরিজন সহ উপস্থিত হইলেন। ককি পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন। কীকটে বৌদ্ধ বিদলিত হইয়াছে শুনিয়া ধর্ম্ম আত্মাদিত হইয়া সিদ্ধান্ত্রমে স্বপরিজনবর্গকে রাখিয়া ককির অঙ্গুগমন করিলেন।

এবার কল্কি খশ, কাঞ্চোজ, শবর, বর্কর প্রভৃতিকে দমন করিবার অভিলাষে কলির পুরী অভিযুগে যাত্রা করিলেন।

কলির পুরী এরূপ ভীষণ যে, দেখিমামাত্র সকলের মনে ভয় সঞ্চার হয়। সর্বদাই ভূত, সারমেয়, কাক উলূক ও শৃগালগণে সমাচ্ছন্ন। গোমারদেশের পুতিগন্ধে সর্বত্র পরিপূর্ণ। সেখানে কামিনীগণ দ্বাত, বিবাদ প্রভৃতি বাসনে অহরন্ত। রমণীগণই সেখানে সংসারে কর্জী, অস্ত্র প্রভৃতি নাই।

কলি ককিদেবকে যুদ্ধোদ্যত শুনিয়া স্বীয় পরিজনে পরিবৃত্ত হইয়া পেচকাক্ষরথে আরোহণ করিয়া বিশসন নগরের বহির্ভাগে আসিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিল। ককি সৈন্যে উপনীত হইয়া ধর্ম্মের সহিত কলির, ঋতের সহিত যন্তের, প্রাসাদের সহিত লোভের, অভয়ের সহিত ক্রোধের, সুখের সহিত ভয়ের, হর্ষের সহিত নিরয়ের, যোগের সহিত আদির, ক্ষেমের সহিত ব্যাধির, প্রজ্ঞের সহিত মানির, স্মৃতির সহিত জরার ও অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দীগণের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ক্রমে বিষয় যুদ্ধ বাধিল। আকাশে দেবতার দৈবদেহে আসিলেন। মরুরাজা খশ ও কাঞ্চোজদিগের সহিত, দেবাপি চীন ও বর্করদিগের সহিত এবং বিশাখযুগ পুন্ড্র ও চণ্ডালগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কলির কোক ও বিকোক নামক দুই দানব সেনাপতি ছিল। ইহারা ব্রহ্মস্বরের পোত্র ও শকুনির পুত্র। ইহাদের দেখিতে উভয়েই একরূপ। ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া ইহারা দেবতার ও অজ্ঞের হইয়া উঠিয়াছিল। গলাহস্তে এই দুই বীর রণে নামিলে স্বয়ং মৃত্যুও ভীত হইয়া পলায়ন করিতেন। ককিদেব স্বয়ং এই দুই বীরের প্রতিদ্বন্দী হইলেন। যুদ্ধে অজ্ঞের স্বনাম্না বীরগণের স্পর্ধাবাকা প্রভৃতিতে পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। অবশেষে কলির অঙ্গুরবর্গ একে একে পরাজিত হইয়া নানা দিশে পলায়ন করিল। কলি স্বয়ং পরাজিত হইয়া জীবাশ্মিক স্ববনে প্রবিষ্ট হইল, তাহার পেচকাক্ষ রথ চূর্ণিত হইয়া গেল। খশ চণ্ডালাদি ধর্ম্মভ্রষ্ট আতিরাও মরু দেবাপি ও বিশাখযুগের হস্তে নিশ্চেষ্ট হইল।

কোক ও বিকোকের সহিত ককিদেব যেন পুনরায় যু-

কৈটভের যুদ্ধের জায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ককি ইহাদের অস্ত্রাঘাতে নিতান্ত পীড়িত হুঙ্ক হইয়া একবারে বিকোকের শিরশ্ছেদ করিলেন, কিন্তু কোক ভ্রাতার মৃতদেহের প্রতি চাহিমামাত্র সে জীবিত হইয়া আবার উভয়ে ককির প্রতি ধাবিত হইল। এইরূপে কতবার উভয়ের শিরশ্ছেদ করিলেন, কিন্তু একে অজ্ঞের মতদেহ দৃষ্টি করিমামাত্র জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে ককি স্বীয় অশ্বকে তাহাদের প্রতি নিযুক্ত করিলেন। কামগামী অশ্বের গুরপ্রহারে দানবদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছিত হইতে লাগিল, তথাপি মরিল না দেখিয়া ককি চিন্তাযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা এই সময়ে রণস্থলে আসিয়া ককিকে বলিলেন, 'বিভো! ইহারা অস্ত্রশস্ত্রে বধ্য নহে! ইহাদিগকে আমি বরদান করিয়াছিলাম, যে একে অজ্ঞের মৃতদেহ দেখিতে পাইলে মৃতব্যক্তি পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং বাহাতে ইহারা এক সময়ে বিনষ্ট হয়, তাহা করুন।' ককি তখন রহস্ত বুদ্ধিতে পারিয়া গলা পরিভাগ করিয়া উভয়ের মস্তকে এককালে বজ্রমুষ্টিতে প্রহার করিলেন। উভয়ে বিদীর্ণ মস্তক হইয়া পঞ্চস্থ পাইল, আর কেত কাহারও মৃতদেহ দেখিতে পাইল না, সুতরাং আর জীবিত হইল না। দেবতার ও পৃথিবীস্থ সকলে ইহাদের বিনাশে পরম প্রীত হইলেন। সিদ্ধাচরণাদি তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কলিপুর বিজিত হইল।

ককি তৎপরে ভল্লাটনগরে শয্যাবর্ণদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিতে লাগিলেন। ভল্লাটনগরে শশিধ্বজ রাজা অতি ক্রমপরায়ণ এবং যোগীর অগ্রগণ্য। তগবান্ ককি যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া, তিনিও প্রীতি ও ভক্তিসহকারে সৈন্য সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত রহিলেন। তাঁহার বিষুপরায়ণ সূশান্ত্র স্বামীকে জগৎপতির সহিত যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, নাথ! তগবানের কোমল শরীরে আপনি অস্ত্রক্ষেপণ করিবেন, কিরূপে? শশিধ্বজ উত্তর দিলেন, প্রিয়ে! রণস্থলে গুরুশিষ্যে, উপাত্ত উপাসকে স্বচ্ছন্দে প্রহার করিতে পারে; আর যদি যুদ্ধে জীবিত থাকি, তাহা হইলে রাজা আজি, তাহাত থাকিবই অথচ ককিজয়ী হইয়া বশবী হইব, অথবা যদি যুদ্ধে মরি তাহা হইলে স্বর্গে নিঃসন্দেহে যাইব; সুতরাং আমি কোন দিকেই ক্রটি দেখিতেছি না। এতদ্বির তিনি ঈশ্বর, আমি সেবকাধম, তিনি আমার নিকট ধেরূপে সেবা চাহিবেন, আমার তাহা করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, সুতরাং প্রভু বধন আমার নিকট যুদ্ধ চাহিতে আসিতেছেন, তখন আমি তাহাই করিতে বাধ্য। রাণী শুনিয়া বলিলেন—হরিসেবকেরা কখনই কামনাশিষ্ট নহেন,

সুতরাং আপনি যে স্বর্ণ কামনা বা যশ কামনায় যুদ্ধ করিবেন, ইহা অসম্ভব, আর আপনি যখন নিকার, তখন তিনিও অদাতা, সুতরাং আমার বোধ হয় আপনাদের উভয়ের যুদ্ধোদ্যমই মোহের খেলোমাত্র। এইরূপ আরও কথোপকথনের পর শশিধ্বজ হরিনাম স্মরণ ও হরিধ্যান করিয়া হরির সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। শয্যাকর্ণগণ উদ্যাতজ হইয়া তাঁহার সহিত চলিল। রাজকুমার স্বর্ধ্যকেতুও পরম বৈষ্ণব ও অস্ত্রবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধ বাধিল। বিশাখ-যুগের সহিত শশিধ্বজ, মরুর সহিত স্বর্ধ্যকেতু ও দেবাপির সহিত বৃহৎকেতু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কব্জিসৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। স্বর্ধ্যকেতুর যুদ্ধে মরু মূর্ছিত হইবামাত্র সারথি তাহাকে লইয়া পলায়ন করিল। বৃহৎকেতু দেবাপির যুদ্ধে পরাজিত হইলেন ও তাঁহার ক্রোড়ে নিম্বেষিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু স্বর্ধ্যকেতু সাহায্যার্থ আসিয়া মুঠাঘাতে দেবাপির চৈতন্য হরণ করিয়া তাঁহার ভুজবন্ধন হইতে ভ্রাতাকে মুক্ত করিলেন। শশিধ্বজ বিশাখযুগকে পরাস্ত করিয়া কব্জির সম্মুখীন হইলেন।

শশিধ্বজ কব্জিকে বলিলেন, ‘গুণ্ডরীকাক! আইস, তুমি আমার হৃদয়ে প্রহার কর, নতুবা আমার ভয়ে আমার অন্ধকার হৃদয়ে লুপ্ত। আর যদি আমার শত্রু বিবেচনা করিয়া থাক, তবে নিষিদ্ধাদে প্রহার কর, আমি অনায়াসে শিব অথবা বিষ্ণুসোকে চলিয়া যাই।’

কব্জি এই কথায় মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বাহ্যে তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়ে মহাযুদ্ধ বাধিল। উভয়ে দিব্যাস্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন। শেষে কব্জির মুঠাঘাতে শশিধ্বজ মূর্ত্তের জন্ত অচেতন হইয়া পড়িলেন; পরমূর্ত্তে তিনিও কব্জিকে মুঠাঘাত করিলেন। কব্জি সেই আঘাতে ছিন্নমূল কদলীর স্তায় অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। ধর্ম ও সত্যযুগ পতিত কব্জিকে উঠাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিকটস্থ হইবামাত্র রাজা শশিধ্বজ তাঁহাদের উভয়কে উভয় কক্ষে ও কব্জিকে বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া স্বপুরীতে চলিয়া আসিলেন। গৃহে পৌঁছিয়া রাজা দেখিলেন, ‘রাণী সখিগণে পরিবৃত্তা হইয়া হরিগুণগান করিতেছেন। রাজা ভার্য্যাকে বলিলেন, ‘প্রিয়ে! এই ভগবান কব্জি মূর্ছাজলে আমার বক্ষস্থলে উঠিয়া তোমার ভক্তি দেখিতে আসিয়াছেন। আর আমার উভয় কক্ষে ধর্ম ও সত্যযুগ। তুমি ইহাদের যথোচিত আর্চনা করা।’ সুশাস্তা সকলকে প্রণাম করিয়া হরিপ্রসঙ্গে বিভোরা হইয়া নৃত্য ও স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া কব্জি সুপ্তোষিতের

স্তার উঠিয়া জীবৎ লজ্জিতমুখে সুশাস্তার পরিচয় লিজ্ঞাসা করিলেন। সুশাস্তা দাসী বলিয়া পরিচয় দিলেন। ধর্ম ও সত্যযুগ তাঁহার হরিভক্তির প্রণংসা করিলেন। কব্জি প্রীত হইয়া বলিলেন, ‘তোমরাই যথার্থ আমার জয় করিরাছ।’ শেষে কব্জি শশিধ্বজের কস্তা রমার পাণিগ্রহণ করিলেন। অবশেষে কব্জির সহচর রাজগণ শশিধ্বজকে তাঁহার অপূর্ব ভক্তির কথা লিজ্ঞাসা করিতে তিনি পরিচয় দিয়া যেরূপে হরিভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করেন।

তৎপরে কথাপ্রসঙ্গে শশিধ্বজ ভক্তিতত্ত্ব, বাসনাভিত্ত ব্যাখ্যা করিলেন এবং শেষে দ্বিবিদ ও জ্ঞানবানের জ্ঞান মরণ প্রার্থনা করিলেন। রাজগণ ঐ বানরদ্বয়ের বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন, শশিধ্বজ তাহাও শুনাইলেন এবং আরও বলিলেন যে, তিনিই ক্রমাবতারে সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন। তৎপরে কব্জি স্বস্তর শশিধ্বজকে সাশ্বনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপরে তিনি সটৈস্জে কাকনীপুরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরী গিরি চূর্ণে বেষ্টিত ও সর্পজাল কর্তৃক রক্ষিত। কব্জি বিবিধ বাণ ধারি বিষান্ত্র নিবারণ ও পুরী প্রবেশ করিলেন। পুরী মধ্যে স্থলর প্রাসাদ হরিচন্দনবৃক্ষে বেষ্টিত ও মণিকাকনে অলঙ্কৃত, কিন্তু মনুষ্যের সম্পর্ক নাই, কেবল নাগকস্তাগণ চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কব্জি এই পুরী প্রবেশে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল, ‘আপনি একা প্রবেশ করুন; পুরীমধ্যে এক বিষকন্যা আছে, তাহার দৃষ্টিতে আপনি ভিন্ন আর সকলেই মরিবে।’ তখন কব্জি কেবল শুককে লইয়া অস্বারোহণে খড়াহস্তে পুরী প্রবেশ করিয়া বিষকস্তাকে দেখিতে পাইলেন। বিষকস্তা নারায়ণকে দেখিয়া বলিলেন, ‘আমার তুল্য হতভাগিনী বিষনেত্রী কামিনী আর নাই; আপনি কে?’ কব্জি লিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি বিষনেত্রী হইলে কেন?’ বিষকস্তা বলিল, ‘আমি গন্ধর্ষরাজ চিত্রগ্রীবের ভার্য্যা, সুলোচনা। একদিন আমি পতির সহিত গন্ধমাদন কুঞ্জবনে রম্যলাপ করিতেছিলাম, এমন সময় নদ্য মূনির কদর্যা কলেবর দেখিয়া উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলাম। মূনি ক্রুদ্ধ হইয়া বিষনেত্রী হইতে অভিসম্পাত করিলেন। এক্ষণে আপনার দর্শনে আমার শাপান্ত হইল, আমি স্বামীসকাশে চলিলাম।’

বিষকস্তা স্বর্ণে গমন করিলে, কব্জি ঐ পুরীর অধীশ্বর অমর্ষকে ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে মরুকে অযোধ্যারাজ্যে, স্বর্ধ্যকেতুকে মথুরায়, দেবাপিকে বঙ্গপ্রবত, অরিস্থল, বৃকস্থল, কামন্দক ও হস্তিনারাজ্যে অভিষিক্ত

করিলেন এবং কবি প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে শৌণ্ড, পৌণ্ডাদি ও জাতিবর্গকে কীকটাদি রাজ্য প্রদান করিলেন, বিশাখ-
গুপ্তকে কোক ও কলাপরাজ্য প্রদান করিলেন। অবশেষে
সকলে শান্তলে কিরিয়া আসিলেন। পৃথিবীতে ধর্ম ও
সত্যযুগের অধিকার প্রবর্তিত হইল।

কিছুদিন অতীত হইলে, বিষ্ণুশাপ্তপুত্রকে যজ্ঞ করিতে
অমরোধ করিলেন; ককিও পিতার আদেশে রাজস্ব,
বাঞ্ছের ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। রূপ, রাম, বশিষ্ঠ,
বাস, ধোম্য, অকুতন্ত্রণ, অশ্বখামা, মধুচ্ছন্দা ও মন্দপাল
প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই সকল যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। ককি
যজ্ঞান্তে গন্ধার্যমূনার সঙ্গমস্থলে ব্রাহ্মণগণকে মধুমাংসাদি
ভোজন করাইলেন; পরে সকলে শান্তলে কিরিয়া আসিলেন।

কিরদ্বিবস পরে পরশুরাম ককিভবনে উপস্থিত হইলেন।
এই সময় কলির পদ্মাবতীগর্ভে অর ও বিজয় নামে দুই
পুত্র হইয়াছিল। রমার পুত্র হয় নাই। তিনি পরশুরামকে
দেখিয়া তাঁহাকে অস্তিলাব জানাইলেন। পরশুরাম রমা-
ছারা ককিগীত্রিত করাইলেন। ব্রতের ফলে রমার মেঘমাল
ও বলাহক নামে দুই পুত্র হইল। এইরূপে ককি পত্নীপুত্র
লইয়া মহাহুধে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদ্বিবস
ব্রহ্মাদি দেবতা আসিয়া তাঁহাকে স্বর্গে গমন করিতে অমরোধ
করিলেন। তখন তিনি পুত্র ও প্রজাবর্গকে ডাকিয়া
জানাইলেন। তাহারা সকলে শোকার্ত হইয়া পড়িল।

ককি রাজস্ব পরিত্যাগ করিয়া পত্নীস্বয় সমভিব্যাহারে
হিমালয়প্রদেশে গন্ধাতীরে উপস্থিত হইয়া আপনাকে
আপনি স্মরণ করিলেন। অমনি চতুর্ভুজ মূর্তিতে পরিবর্তিত
হইয়া গোলোকে চলিয়া গেলেন। পদ্মা ও রমা অনলে
দেহ বিসর্জন করিয়া পতিলোকপ্রাপ্ত হইলেন। পৃথি-
বীতে সত্য ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিল। দেবাপিও মরুরাজ্য
শাসন করিতে লাগিলেন।" (ককিপু্রাণ)।

[ককিপু্রাণ শব্দ দেখ।]

ভাগবতে ককি ভগবানের ত্রয়োনিংশ অবতার বলিয়া
কথিত হইয়াছেন। (ভাগবত ১। ৩ অধ্যায়, ২৪। ২৫ শ্লোক)

জৈনদিগের মধ্যে ককি অবতারের কথা শুনা যায়।
তঁাহারা বলেন যে, মহাবীরের নির্জাগ্রপ্রাপ্তির পর প্রাতি
সহস্র বৎসরে ককি অবতার হইয়া জৈনধর্মের বিস্তারিত
স্থাপন করেন। বর্ণা :—

"বুদ্ধিঃ গতে মহাবীর প্রতীবর্ষহস্তকম্।

একৈকো জায়তে ককির্জৈনধর্মবিদ্যোদকঃ ॥

(জৈন' হরিবংশ ৩। ৬০। ২। ৬২)

ককিপু্রাণ—একখানি অতিরিক্ত উপপুরাণ। এখানি অষ্টা-
দশ উপপুরাণের অন্তর্গত নহে। ইহাতে ৩টি অংশ আছে।
প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে সাতটি সাতটি করিয়া চৌদ্দটি
অধ্যায় এবং তৃতীয়াংশে একবিংশতিটি অধ্যায় আছে।
সর্বমুদ্র এই ৩৫টি অধ্যায়ে ক্রমাবধি শুক-মার্কণ্ডেয়-সংবাদ,
অধর্মের বংশকীর্তন, কলি-বিবরণ, পৃথিবী ও দেবতাদিগের
ব্রহ্মলোকগমন, ব্রহ্মবাক্যস্বরূপে শতলক্ষ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশাপ্তপুত্র
হুমতিগর্ভে বিষ্ণুর ও তদংশুত চারিটি ষোড়শ সহোদরের
জন্মবিবরণ, ককি-বিষ্ণুশাপ্ত-সংবাদ, ককির উপনয়ন, পরশু-
রামের সহিত ককির সাক্ষাৎ, তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন,
অস্ত্রশস্ত্র-শিক্ষা, ককির শিবসেবার্চনা, হরগীর্ষী সাক্ষাৎ
ককির শিবস্তুতপাঠ, শিবের নিকট অশ্ব, খড়্গ, শুক, অস্ত্রাদি
এবং বরলাভ, শান্তলে প্রত্যাগমন, জাতিদিগের নিকট
বরকীর্তন, নরপতি বিশাখগুপ্তের সত্য ককির সংক্ষেপে
বর্ণাশ্রমধর্মকথন, শুকের আগমন, শুক-ককি-সংবাদ,
সিংহল বর্ণন, পদ্মাচরিত, শিবের নিকট পদ্মার বরপ্রাপ্তি,
পদ্মার স্বয়ম্বরের আয়োজন, স্বয়ম্বর সভায় আগত রাজগণের
ব্রীড়াবপ্রাপ্তি, পদ্মার বিবাদ, শুককে ককির দূতরূপে
প্রেরণ, শুক-পদ্মা-সংবাদ, পদ্মার বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুর পাদাদি
কেশান্ত পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা ও ধ্যান, শুককে
অলঙ্কার দান, শুক-প্রত্যাগমন, পদ্মার উদ্দেশ্যে ককি ও
শুকের সিংহল যাত্রা, পদ্মার সরোবরে নানজলে অভিগম,
পদ্মার জলক্রীড়া, ককিপদ্মাযমিন, বৃহদ্রথসংবর্জন, ককি-
পদ্মা বিবাহ, ব্রীড়াপ্রাপ্ত রাজগণের ককি দর্শনে পুংখ
প্রাপ্তি ও ককির স্তুত, ককির বর্ণাশ্রম ধর্মের উপদেশ, রাজ-
গণের প্রশ্ন, অনন্তমূনির আগমন, অনন্তের পূর্ববৃত্তান্ত কথন,
শিবস্তুত, পিতৃমৃত্যুর পর অনন্তের মারাদর্শন ও বৈরাগ্যাবল-
ম্বন, অনন্তমোক্ষ, রাজগণের প্রত্যাগমন, ককি-পদ্মার শান্তলে
প্রত্যাগমন, বিশ্বকর্ম-বিধান, ভ্রাতৃগণের বংশবৃদ্ধি, বিষ্ণু-
শপার যজ্ঞকামনা, ককির স্বজনসহ দিগ্বিজয়ে গমন, জিনরাজ
বধ, বৌদ্ধনিগ্রহ, মায়ার অন্তর্ধান, বৌদ্ধরমণীগণের যুদ্ধযাত্রা,
অস্ত্রদেবতাদিগের আবির্ভাব, জ্ঞানযোগকথন, মুনিগণের
আগমন, কুণ্ডোদরী বৃত্তান্ত, সপুত্র কুণ্ডোদরীবধ, হরিষ্মার
গমন, মুনিগণ-সাক্ষাৎ, মরু ও দেবাপি মিলন, উভয়ের পরি-
চয়স্থলে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ কীর্তন, মধুর রামচরিত
শ্রবণ, মরু ও দেবাপির সহিত ককির যুদ্ধযাত্রা, ধর্ম ও সত্য
যুগ মিলন, কোক বিকোক-বিনাশ, ভরাতগমন, শব্দ্যাক-
দিগের সহিত যুদ্ধ, কুশাভ্যাসনীপে শশিধর্মের বিজুতকি
কীর্তন, রণস্থলে শশিধর্ম কর্তৃক ককি, ধর্ম ও সত্যযুগের

পরাজয় এবং তাঁহাদিগকে লইয়া শশিধ্বজের পুরীপ্রবেশ, অশাস্তার স্তব, কঙ্কির সহিত রমার বিবাহ, শশিধ্বজের গৃহ-জন্মের বিবরণ, বিবিদ ও জাঘবানের বিবরণ, ভ্রমভ্রমকোপা-খ্যান, শশিধ্বজের মুক্তি, বিবকভা-মোচন, রাজাদিগের রাজ্যদান, পুত্রাদির অভিষেক, মায়াক্তব, শত্ৰুগণে যজ্ঞাদি অহুষ্ঠান, নারদ হইতে বিষ্ণুদেবতার মুক্তিলাভ, ধর্ম ও সত্য-যুগাধিকার, কঙ্কিগীত, কঙ্কির বিহার, পুত্রপোত্রাদি মুক্তি, ব্রহ্মকঙ্কিসংবাদ, বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠগমন, পদ্মা ও রমার অনল প্রবেশ, কথাস্থেব, শুকদেবের প্রস্থান, মুনিগণোক্ত গঙ্গাস্তব সংক্ষেপে পুরাণ বিবরণ ও পুরাণের ফলশ্রুতি বিবৃত হইয়াছে।

কঙ্কিপুরাণের রচয়িতা, উৎপত্তি ও শ্লোক সংখ্যা—
এখানি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া বিবৃত হইলেও তাঁহার রচিত বলিয়া বিশ্বাস হয় না; কারণ বেদব্যাস প্রণীত যে সকল মহাপুরাণ ও উপপুরাণ নামক অজ্ঞাত গ্রন্থে দেখা যায় তাহার মধ্যে ইহার নাম নাই। এতদ্বির ইহার মধ্যেই তৃতীয়াংশের একবিংশ অধ্যায়ের শেষে এক স্থলে আছে, “সকল পুরাণাভিজ্ঞ লোমহর্ষণনন্দন সূত বেদ-ব্যাসের শিষ্য ছিলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।”— যদি এখানি বেদব্যাস-রচিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার লেখনী হইতে অন্তিমের প্রক্তি প্রণামজ্ঞাপক শ্লোক লিখিত হইত না।

এই কঙ্কিপুরাণ মধ্যেই ইহার রচয়িতা যে বেদব্যাস তাহাও আবার পাওয়া যায়। প্রথম অংশে প্রথম অধ্যায়ে উগ্রশ্রবা শৌনকাদি ঋষির প্রামাণ্যসারে যখন কঙ্কিপুরাণ-ব্যাক্যার উপক্রম করিলেন, তখন পুরাণোৎপত্তি নিরূপণ করিবার সময়ে বলিলেন, “পুরাকালে নারদ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা এই উপাখ্যান তাঁহাকে বলেন। নারদ ব্যাসদেবের নিকট ব্যাক্য্য করেন। বেদব্যাস স্বপুত্র ব্রহ্মরাতকে (শুকদেবকে ?) সেই বিবরণ বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মরাত অভিমত্মপুত্র বিষ্ণুরাতের (পরীক্ষিতের ?) সভায় এই কথা কীর্তন করেন, কিন্তু কথা শেষ হইতে না হইতে বিষ্ণুরাত স্বর্গগমন করিলেন। মার্কণ্ডেয়াদি মহর্ষিগণ শুকদেবকে অনুরোধ করিয়া কথার শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন। আমি সেই সময়ে শুকদেবের মুখে বাহা শুনিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিব। ইহাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক আছে।”—কিন্তু তৃতীয়াংশের শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থের উপসংহার কালে, উগ্রশ্রবার মুখেই ভিন্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, “যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর পানী তাহার্য্য এই পুরাণের প্রভাবে অজীভ লাভ করিতে পারে। এই কঙ্কিপুরাণে ছয়সহস্র একশত শ্লোক

সকল শাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। প্রলয়াবসানে ঐহিকির মুখ হইতে এই কঙ্কিপুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পুরাণে চতুর্বর্ণ লাভ হয়। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রাহ্মণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, পরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, এই পরম বিশ্বকর ভগবান্ কঙ্কির প্রভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।” শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে এই পুরাণের দুই স্থলে দুইরূপ সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে; পুরোক্ত উক্ত অংশের তাহা দুই হইবে।

কঙ্কিপুরাণের বর্ণিত বিষয়—পুরাণোপপুরাণ বর্ণিত বিষয় সকলের বাহুল্য বর্ণনা কঙ্কি পুরাণে নাই। ইহার লেখক সে সম্বন্ধে যে সকল কথা যে পরিমাণে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলেই বোধ হয় যে, সে সকল অংশ কেবল পুরাণের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র। রঘুবংশ, নৈষধ, কুমার প্রভৃতি মহাকাব্যে যেমন কোন এক ব্যক্তি বিশেষের বা বিষয় বিশেষের বর্ণনা থাকে, ইহাতেও সেইরূপ একমাত্র কঙ্কিরই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে শূদ্রার, শাস্তি ও বীররসের বেশ ক্ষুদ্র আছে, অজ্ঞাত রসও অবিষ্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং পুরাণাদির ভ্রাস ইহাতে পুনরুক্তি দোষ বা অনর্থক অব্যয় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। এই সকল কারণে ইহাকে একখানি স্কন্দর মহাকাব্য বলিলে বেশ যুক্তিসঙ্গত হয়। ইহার রচনাপ্রণালী ও পুরাণের ন্যায় রসহীন নহে এবং তাদৃশ প্রাচীন ধরণের ভাষাতেও লিখিত নহে।

কঙ্কি পুরাণের ঐতিহাসিকতা ও কালনির্ণয়—কঙ্কিপুরাণে কলিযুগের শেষপাদের বর্ণনা আছে এবং কথিত হইয়াছে যে যখন কলিপ্রভাবে সমস্ত পৃথিবী একবর্ণা হইয়া যাইবে, তখন ভগবান কঙ্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিকে দূর করিয়া সত্যযুগ প্রবর্তিত করিবেন; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে মনোযোগপূর্বক বিচার করিয়া দেখিলে কঙ্কির সময়ে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কলির শেষপাদের ঘটনা না হইয়া বরং প্রথমপাদের ঘটনা বলিয়া অনুমিত হয়। কঙ্কির সহিত মায়াবাদী বৌদ্ধগণের প্রথম যুদ্ধ বাধে। এই অংশ নিষিদ্ধ-চিত্তে পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, যখন ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মে ভাসিতেছিল, তখন ভারতের যে অবস্থা ছিল, ইহা সেই অবস্থার বর্ণনা। কঙ্কিশব্দে জৈন হরিবংশের যে শ্লোক উক্ত হইল, তাহা হইতেও ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অনুমান হয়, যে সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রবলতা দীর্ঘ করিয়া আসিয়া অন্তরে অন্ত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান হইতেছিল, কঙ্কিপুরাণকার ঠিক সেই সময়ের লোক। তখন তাঁহার চক্ষে ভারতের যে হর্দিশার ছবি ভাসিতেছিল তিনি তাহাকেই কলির

শেখ পাঁদেৰ অৰহা বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এইখান হইতেই কক্কি পুৰাণ রচনার অসুমান কৰিয়া লওয়াইতে পারে।

তৎপরে কক্কিপুৰাণে যে সকল স্থানের নাম কথিত হইয়াছে, (মাহিষতী, শম্ভল, কীকট, সিংহল, গোপ্ত, শৌণ্ড, সুরাট্ৰি, পুলিন, মগধ, মধ্যকর্ণাট, অঙ্গ, ওড়, কলিঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গ, কঙ্ক, কলাপক, দারকা, মথুরা, বারণাস, অরিহল, বৃক্শল, কামন্দক, হস্তিনাপুরী, চোল, বর্নর, কর্ণ, ভল্লাট, কাকিনপুরী প্রভৃতি) তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন পৌরাণিক নাম। ইহার কতকগুলি, সেই সেই নামে পুরোক্ত অসুমিত সময়ে (অর্থাৎ ভারতে বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের প্রথমাবস্থায়) বিদ্যমান থাকা সম্ভব।

তাহার পর মরু ও দেবাপির পরিচয়স্থলে, কক্কিপুৰাণকার যে বংশাবলী দিয়াছেন, তাহাতে মরু রামচন্দ্রের অধস্তন একবিংশ পুরুষ এবং দেবাপি পাণ্ডবগণের উর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ শাস্ত্রহর প্রাতা বলিয়া কথিত আছে। যদি অন্যান্য পুৰাণের কথা বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, যুদ্ধিরাণি কলির প্রারম্ভ ৬৫০ বৎসরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, স্ত্রুতাং তাহার উর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ কখনই তাহার বহুপরবর্তী কলির শেষপাদেৰ লোক হইতে পারেন না। এতন্ত্ৰি মরু ও দেবাপির যে বংশাবলী দেওয়া আছে, তাহা হইতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, মরু ও দেবাপির মধ্যেও সাত পুরুষের পার্থক্য আছে। তাহার পর আরও এক কথা, এই স্থলে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কক্কি অবতারের পর সত্যযুগের প্রারম্ভ। যদি কক্কিদেব দেবাপি ও মরুকে পৃথিবীরাজ্যে স্থাপিত করিয়া সত্যযুগের সংক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে, দেবাপি ও মরুকে সত্যযুগের প্রথম রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু অন্য কোন পুৰাণেই সে কথা বলে না। [কক্কি দেখ।]

কক্কিপুৰাণের ঘটনা ভবিষ্যৎ ঘটনা কি না—ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া যদি পুৰাণের কথা বলিয়া এতদ্বিধি বিষয়গুলি যথার্থভাবে ভক্তির সহিত বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার বর্ণিত ব্যাপারগুলি ভবিষ্যতে ঘটবার কথা, কিন্তু এই পুৰাণখানির বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা বোধ হয় না। ইহাতে বাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত অতীতকালের ঘটনা-বোধক।

উগ্রশ্রবণ ঋষিপ্রশ্নের পর বলিলেন—“ওকদেবের অসুমিত-ক্রমে আমি সেই পুণ্যপ্রসঙ্গে যে সকল ভবিষ্যৎ ঘটনা সন্নিহাছিলাম, এই স্থলে সেই স্তম্ভকর ভাগবতধর্ম কীৰ্ত্তন করিতেছি।” ভবিষ্যৎ কালের বোধক উগ্রশ্রবণ বুধে একটি রাজ্য কথা ব্যতীত আর কোথায় বিদ্যুদ্ভাও কিছু নাই।

ইহা ভবিষ্যৎকালের ঘটনা বলিয়া কথিত হইলেও বাস্তবিক ইহা ভবিষ্যৎকালের ঘটনা নহে; কিন্তু মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, নারসিংহ পুৰাণ প্রভৃতিতে কক্কিঅবতারের কথা বাহা লিখিত আছে, তাহাতে সমস্তই ভবিষ্যৎ কালবোধক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, স্ত্রুতাং বুঝা যাইতেছে যে, কক্কি অবতার উত্তরকালে হইবেন, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

বাহা হউক কক্কিপুৰাণখানিতে সংক্ষেপে অনেক গভীর ভাবময়ী সংকথার আলোচনা আছে, পাঠে আনন্দ আছে। এই সকল কারণে কক্কিপুৰাণকে “অমৃতভাগবত” বলিয়া থাকে।

কক্কিপ্রাচুর্ভাব (পুং) কক্কি: দশমাবতারস্ত প্রাচুর্ভাব: উৎপত্তি:। কক্কি অবতারের উৎপত্তি।

কক্কিরাজ। একজন প্রাচীন রাজা, গুপ্তরাজবংশের পর ইনি ইন্দ্রপুরে ৪১ বর্ষ রাজত্ব করেন। (জৈনঃ হরিবংশ) ইহার ভ্রাতা রাজা অজিতজয়। (জৈনঃ উত্তরপুরাণ)।

কক্কী [ন্] (পুং) কক্কি: পাণ্ডব নাশ্ততয়া অন্ত্যস্ত, কক্কি-ইনি। কক্কি অবতার।

(“মৎস্তঃ কুর্শ্মৌ বরাহশ্চ নরসিংহোহংখং বামনঃ।

রামো রামশ্চ রামশ্চ বৃদ্ধ: কক্কী চ তে দশ।” পুৰাণ।)

কল্তানি (দেশজ) ১ নিংড়ান রস। ২ আঁব জলের ন্যায় পচা জিনিষের রস।

কল্প (পুং) কল্লাতে বিধীরতে অসৌ, কৃপ-কর্শপি বঞ। ১ বিধি। (“এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্যকব্যয়োঃ।” মমু ৩।১৪৭।) ২ (কল্পতি সৃষ্টিঃ নাশং বা অত্র, কৃপ-গিচ্-অপ্।) প্রলয়; স্বদক্ষিণুক্ত চতুর্দশ মমু দ্বারা এক প্রলয় কাল নির্ণীত হয়। “সসঙ্করস্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দশ।

কৃতপ্রমাণঃ কল্লাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশ স্মৃতঃ।” (স্বর্ঘ্যাসি।)

৩ (কল্পতে স্বক্রিয়ায়ৈ সমর্থো ভবতি অত্র, কৃপ-বঞ) ব্রহ্মার একদিন, দেবতার দুই সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন হয়; এই-রূপ ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস হইয়া থাকে। তাহার সংস্কৃত নাম—ঋতবাহার, নীললোহিত, বামদেব, গাণ্ডার, রোরব, প্রাপ, বৃহৎকল্প, কম্প, সত্য, দীপান, ধান, সার-স্বত, উদান, গরুড়, কোর্শ (ইহাই ব্রহ্মার পৌর্ণমাসী), নারসিংহ, সমাপি, আয়েয়, বিষ্ণুজ, সৌর, সোম, ভাবন, স্তম্ভমাণী, বৈকুণ্ঠ, আর্জিষ, বসীকল্প, বৈরাজ, গৌরী-কল্প, মাহেশ্বর ও পিতৃকল্প (ইহাই ব্রহ্মার অমাবস্তা) এইরূপ বারমাসে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, এবং এইরূপ সাত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু কাল। উহার পঞ্চাশ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

একপে একপঞ্চাশবর্ষীয় খেতবাহার কল্প চলিতেছে, চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদে প্রথম কল্প আরম্ভ হইয়াছে।

“চৈত্রে মাসি জগৎ ব্রহ্মা সসর্জ প্রথমমহানি।

গুরুপক্ষে সমগ্রস্ত তদা সূর্য্যোদয়ে সতি।

প্রবর্তমানাস তদা কালস্ত গণনামপি ॥”

চৈত্রমাসের গুরুপক্ষীয় প্রথমদিনে সূর্য্যোদয় হইলে ব্রহ্মা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং সেই সময় হইতেই কালের গণনা প্রবর্তিত হইয়া ছিল। (ব্রাহ্মপুরাণ)

১০। প্রাণাদি স্থল কালের নাম মূর্ত্তকাল এবং ক্রিয়াদি পরমাণু সূক্ষ্ম কালের নাম অমূর্ত্তকাল। সূক্ষ্ম শরীয়ে নিখাস প্রাণসের যে পরিমিত কাল, তাহাকে প্রাণ কহে; অর্থাৎ দশটি শুক্ল অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে কাল লাগে তাহাকে প্রাণ কহে। উহা ইংলণ্ডীয় ৪ সেকেন্ড পরিমিত সময়। ঐরূপ ৬ প্রাণে ১ বিনাড়ী বা পল এবং ৬০ বিনাড়ীতে ১ নাড়ী বা ১ দণ্ড হয়। ৬০ দণ্ডে ১ নাক্ষত্র অহোরাত্র এবং ৩০ নাক্ষত্র অহোরাত্রের ১ নাক্ষত্র মাস হয়। এক সূর্য্যোদয় হইতে অষ্ট সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে কাল তাহার নাম সাবন অহোরাত্র এবং ঐরূপ ৩০ সাবন অহোরাত্র পরিমিত কালই সাবন মাস। এক তিথি হইতে অপর তিথি পর্য্যন্ত যে কাল তাহার নাম চাত্র অহোরাত্র। ঐরূপ ৩০ চাত্র অহোরাত্রের এক চাত্র মাস হয়। সূর্য্যের এক রাশি সংক্রমণ হইতে অপর রাশি সংক্রমণ পর্য্যন্ত কালের নাম সৌর মাস। ঐরূপ দ্বাদশমাসে এক বৎসর হয়। সৌর এক বৎসরে দেবভাগের এক অহোরাত্র হয়। যে সময়ে দেবভাগের দিন ঐ সময়ে অম্বরগণের রাত্রি, এবং যে সময়ে দেবভাগের রাত্রি ঐ সময়ে অম্বরগণের দিন হয়। ঐরূপ ৩৬০ অহোরাত্রের দেবভাগের ও অম্বরগণের এক এক বৎসর হইয়া থাকে। দেবভাগের ১২,০০০ বৎসরে এক মহাযুগ বা চারিযুগ হয়। ঐ চারিযুগে ৪,৩২০,০০০ সৌর বৎসর হয়। সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রাতিযুগের আদি সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ অর্থাৎ প্রাতি যুগের অন্ত্যাসন্ধির সহিত চারি যুগ হয় এবং ধর্ম্মপাদের ব্যবস্থা অনুসারে অর্থাৎ সত্যযুগে চারিপাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিাদ, দ্বাপর যুগে দ্বিপাদ ও কলিযুগে একপাদ, এই অনুসারে চারি যুগের পরিমাণ স্থির হয়। মহাযুগ পরিমিত বৎসরকে দশভাগ করিলে যে ভাগফল লক্ষ হয়, তাহাকে চারিগুণ করিলে যাহা হয়, তাহাই সত্যযুগের পরিমাণ। ঐরূপ তিন গুণে ত্রেতাযুগের বিংশগুণে দ্বাপর যুগের ও এক গুণে কলিযুগের পরিমাণ জানিতে হইবে। প্রাতি যুগের আদি ও অন্ত্য বর্ত্তাংশই সেই সেই যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ।

একসপ্ততি মহাযুগে এক মহন্তর হয়। সত্যযুগ পরিমাণে ঐ মহন্তরের সন্ধি জানিতে হইবে। ঐরূপ এক এক মহন্তরের পর এক একবার জলপ্রাণন হইয়া থাকে। এক এক কল্পে সন্ধির সহিত চতুর্দশ মহন্তর থাকে; অর্থাৎ সন্ধির সহিত চতুর্দশ মহন্তরেই এক কল্প হয়। এক সত্যযুগের পরিমাণে ঐরূপ কল্পের আদিতে ঐ পঞ্চদশ সন্ধি স্বীকৃত হইয়া থাকে।

	দেবমান।	সৌরমান।
আদি সন্ধি	৪,৮০০	১৭,২৮,০০০
একসপ্ততি মহাযুগ	৮৫২,০০০	৩০,৬৭২০,০০০
এক সন্ধি	৪,৮০০	১,৭২৮,০০০
এক মহন্তর	৮৫৮,৮০০	৩০৮,৪৪৮,০০০
চতুর্দশ মহন্তর	১১,৯৯২,২০০	৪,৩১৮,২৭২,০০০
কল্প	১২,০০০,০০০	৪,৩২০,০০০,০০০

সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়। প্রাতি কল্পের অবসানে সর্কভূতের বিনাশ অর্থাৎ প্রলয় হয়। এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন হয়, এবং তাঁহার রাত্রির পরিমাণও দিবসের তুল্য। পূর্ককথিত অহোরাত্র সংখ্যার একশত বৎসরকাল ব্রহ্মার আয়ুঃ। একাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুঃ অর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশবর্ষ অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান কল্পের আরম্ভ ব্রহ্মার আয়ুঃ অবশিষ্ট পঞ্চাশবর্ষের প্রথম দিবস জানিতে হইবে। বর্ত্তমান কল্পেরও হয় ময় ও তাহার সপ্ত সন্ধি অতীত হইয়াছে। একপে বৈবস্বত নামক সপ্তম ময়ুর কাল চলিতেছে। ঐ বর্ত্তমান ময়ুরও সপ্তবিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে। এই অষ্টাবিংশতি যুগেরও আবার সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর বিগত হইয়াছে, কলিযুগ চলিতেছে।

(সূর্য্যাসিকান্ত মধ্যাধিকার ১১—২৩)

৪ বিকল্প। ৫ ভায়। ৬ কল্পরুক। ৭ শাক্তবিশেষ, এইশাক্তে বেদমুদ্রের অন্তর্গত বাগক্রিয়াদির উপদেশ আছে। ৮ ব্যাকরণের প্রত্যয়বিশেষ, জৈবদূন অর্থে এট প্রত্যয় হইয়া থাকে। (“তে পরম্পরাম্যন্ত্য দেবকল্পা মহর্ষয়ঃ।” ভারত ১।১২৬।) ৯ সংকল্প, প্রতিজ্ঞা। ১০ পক্ষ। ১১ অভিপ্রায়। ১২ বেদ বিধিবিশেষ।

কল্পক (পুং) কল্পয়তি কৌরকর্ম্মাদিনা বেশং রচয়তি, কল্প-গিচ-ধূল্। ১ নাপিত। ২ কর্জুর। ৩ (কল্পয়তি গম্যপদ্যাদিকমুদ্রাব্য রচয়তি) গ্রন্থকর্ম্ম। ৪ (ত্রি) রচক। ৫ আরোপক।

কল্পকার (পুং) কল্পং কল্পয়ন্ত্যং কল্পোতি, কল্প-ক-অণ্ (কর্ম্ম-ণ্যন্। পা ৩।২।১।) ১ কল্পস্থজকারক আখ্যানাদি।

২ (কল্পং বেষণং করোতি) নাপিত। ৩ (জি) বেষণকারক।
৪ ছেদক।

কল্পকারক (পুং) কল্পং করোতি, কল্প কৃ-বৃ-ল্ (বৃ-ল্ তৃতো।
পা ৩। ১। ১৩৩।) ১ কল্পহৃত্ত্বকারক। ২ নাপিত। ৩ (জি)
বেষণকারক। ৪ ছেদক।

কল্পকেদার (পুং) কালীশিব প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থবিশেষ।

কল্পক্ষয় (পুং) কল্পত্ব স্ফটঃ কয়ো বয়, বহভ্রী। প্রলয়।

৬ “কল্পক্ষয়ে পুনস্তে তু অবিশন্তি পরং পদম্।” বিষ্ণুপুরাণ।)

কল্পগা (স্ত্রী) গঙ্গা নদী।

কল্পতরু (পুং) কল্পশাস্ত্রোক্তশ্চেতি, কর্ণধা। কল্পতরু:
রাহোঃ শিরঃ ইত্যাদিবৎ ৬তৎ। ১ দেবলোকের বৃক্ষবিশেষ।
এই বৃক্ষের নিকট যে কোন পদার্থ প্রার্থনা করিলেই পাওয়া
যায়। (“নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।” ভাগবত ১। ১। ৩।)

২ স্থতিশাস্ত্রবিশেষ। ৩ শারীরকহৃত্ত্বভাষ্যের ভামতী টীকার
একখানি ব্যাখ্যার নাম।

কল্পদ্রু (পুং) কল্পশাস্ত্রোক্তশ্চেতি, কর্ণধা। কল্পতরু।

কল্পদ্রুম (পুং) কল্পশাস্ত্রোক্তশ্চেতি, কর্ণধা। কল্পতরু।

কল্পন (স্ত্রী) রূপ-ভাবে লুট্। ১ ছেদন। ২ রচনা। ৩ বিধান।
৪ আরোপ। ৫ অপেক্ষিত বিষয়ের উদ্ভাবন।

কল্পনা (স্ত্রী) রূপ-শিচ্-ভাবে যুচ্-টাপ্। ১ হস্তিসজ্জা।
২ নারকের আরোহণ সজ্জা হস্তিসজ্জা। ৩ অমুমান। ৪ রচনা।
৫ অর্থপত্তিরূপ প্রমাণবিশেষ। ৬ নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন।

কল্পনাকাল (জি) কল্পনায়াঃ কাল ইব কালো যত, বহভ্রী।
সকলের ভায় আশু বিনাশী অস্থির পদার্থ।

কল্পনাথ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Justicia paniculata.)

কল্পনাশক্তি (স্ত্রী) কল্পনায়াঃ নবোদ্ভাবনস্ত শক্তিঃ ৬তৎ।
নূতন বিষয় উদ্ভাবনের শক্তি।

কল্পনী (স্ত্রী) কল্পয়তি, কেশাদীনু ছিনতি অনয়া, রূপ ছেদনে
লুট্-টাপ্। কর্ত্তনী, কাঁচি। (রূপাণী কর্ত্তরী কল্পন্যপি।
হেম ৩। ৫৭৫।)

কল্পনীয় (জি) কল্পনায়াঃ হিতম্, কল্পন-ঠক্। ১ কল্পনার
উপযোগী। ২ ছেদ্য। ৩ বিধানের উপযুক্ত। ৪ আরোপণের
উপযোগী।

কল্পপাদপ (পুং) কল্পয়তি সর্বকামঃ সম্পাদয়তি কল্পঃ,
কল্পশাস্ত্রোক্তশ্চেতি, কর্ণধা। কল্পবৃক্ষ।

(“মুখান চক্রেহরিতকল্পপাদপঃ।” নৈষধ। ১। ১৫।)

কল্পপাদপদান (স্ত্রী) কল্পপাদপস্ত স্তবর্ণনির্মিত পাদপা-
কৃত্তেদানম্। মহাদানবিশেষ। বজ্রালসেন-বিরচিত দান-
লাগর নামক গ্রন্থে এই দানের বিধান এইরূপ বর্ণিত

আছে,—“বজ্রমান কল্পপাদপ-দান করিতে ইচ্ছা করিলে,
তুলাপুরুষ দানের ন্যায় পূণ্য দিন দেখিয়া পূণ্যাহ বচন,
লোকেশের আবাহন, এবং ঋষিক্, মণ্ডপ, স্তম্ভার, ভূষণ ও
আচ্ছাদন একত্র করিবে। শক্তি অনুসারে তিন পল
হইতে সহস্র পল পর্য্যন্ত স্বর্ণের অর্দ্ধাংশ দ্বারা নানা কলবৃত্ত
ও নানা বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি যুক্ত পাঁচটি শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ
প্রস্তুত করিয়া, ১ প্রহ শুক্লের উপর ২ খানি শুক্লবস্ত্র আচ্ছাদন
করিবে, এবং তাহার তলদেশে স্রদ্ধা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্যমূর্ত্তি
স্থাপন করিবে। অপর অর্দ্ধাংশ স্বর্ণ দ্বারা আর চারিটি
বৃক্ষ ও চারিটি মূর্ত্তি করিতে হইবে। তন্মধ্যে সন্তান বৃক্ষের
তলদেশে রতি ও কন্দর্পের মূর্ত্তি রাখিয়া শুক্ল বসাইয়া ঐ বৃক্ষ
১ প্রহ পূর্ব্বদিকে, স্বতের উপর লক্ষ্মীসহ মন্দার বৃক্ষ দক্ষিণ-
দিকে, জীরকের উপর সাবিত্রীসহ পার্ণভদ্র বৃক্ষ পশ্চিমদিকে,
এবং তিলের উপর সুরভিসহ হরিচন্দন বৃক্ষ উত্তরদিকে
রাখিয়া প্রত্যেক বৃক্ষ ২ খানি করিয়া শুক্লবস্ত্র দ্বারা
আচ্ছাদন করিবে। প্রত্যেক বৃক্ষের পার্শ্বে ২টি করিয়া
৮টি পূর্ণকলস, তাহার উপর ইন্দ্রদণ্ড ও ফলাদি রাখিয়া
কৌষেয় বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। পূর্ণ কলসের পার্শ্ব-
দেশে পাহুকা, উপানহ, ছত্র, চামর, আসন, ভাজন ও দীপ
রাখিয়া দিবে। পরে মন্ত্রবিশেষ দ্বারা তিন বার প্রদক্ষিণ
করিতে করিতে দুই তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, শাজ্জোক্ত
মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কল্পপাদপ দান করিবে।

দানান্তে এত দান করিলাম বলিয়া বিস্তৃত হইবে না,
এবং কোনরূপ শর্ত্তা ব্যবহার করিবে না।

এই মহাদান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়,
এবং সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হওয়ায় প্রাণান্তে শতকল্প স্বর্গবাস করিয়া
রাজ্যধিরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আবার নারায়ণ-বলযুক্ত,
নারায়ণ-পরায়ণ ও নারায়ণ-কথাসক্ত হওয়ায় তাহার নারায়ণ-
লোক লাভ হয়।

এই কল্পপাদপ দান কথা পাঠ করিলে, শ্রবণ করিলে বা
স্মরণ করিলেও পাপবিমুক্ত হইয়া মম্বন্তরকালে, ইন্দ্রলোকে
বাস করিতে সমর্থ হয়।”

কল্পপাল (পুং) কল্পং সুরাবিধানকল্পং পালয়তি, কল্প-পাল-
গিচ্-অণ্। শৌণ্ডিক, শুড়ি। (কল্পপালঃ সুরাজীবী শৌণ্ডিকো
মণ্ডহারকঃ। হেম ৩। ৫৬৫।)

কল্পমহীকুহ (পুং) কল্পশাস্ত্রোক্তশ্চেতি, কর্ণধা। কল্পবৃক্ষ।
কল্পলতাদান (স্ত্রী) কল্পলতায়াঃ বথাবিধ-স্তবর্ণ-নির্মিতায়া
লতায়া দানং, ৬তৎ। মহাদানবিশেষ।

দান-লাগরে ইহার দান বিধি এইরূপ লিখিত আছে,—

শক্তি অল্পসংখ্যক পল হইতে সহস্র পল পর্যন্ত পরিমিত
অর্ণের কল কুল গ্রহ ও পক্ষীশোভিত, স্থানে স্থানে বিদ্যাদর,
কিন্নর, মিথুন ও সিদ্ধমূর্তি, এবং বিষ্ণুহস্তলয় মুক্তাহারিণিষ্ট
দশটি লতা নির্মাণ করিয়া, নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা
আচ্ছাদন করিবে। লতার নিম্নদেশে স্থাপনের জন্য ত্রাক্ষ্যাদি
দশটি প্রতিমা করিতে হইবে। লতা রোপণের জন্য লবণ,
শুভ্র, হরিদ্রা, তম্বুল, যুত, ক্ষীর, শর্করা, তিল ও নবনীত
এবং লতাপার্শ্বে স্থিতির জন্য দশটি খেদ্র, দশটি কুম্ভ ও
দশ বোড়া বস্ত্র সংগ্রহ করিবে। ব্রতের পূর্বদিনে হবিষ্য
ভোজন, নিবেদন, সঙ্কল্প বাক্য প্রভৃতি করিতে হইবে।
পরদিন শুক, পুরোহিত, বজ্রমান ও আপক সকলে উপবাসী
থাকিবেন। পুরোহিত প্রধান বেনীতে লিখিত চক্রের উপর
পূর্বদি ৮ দিকে ৮টি ও লতামণ্ডপ মধ্যে ২টি লতা রাখিয়া
তাহার নিম্নদেশে লবণ দিয়া হংসারুড়া ব্রাহ্মী ও অনন্তশক্তি
মূর্তি স্থাপন করিবেন, অপর আটদিগের ৮টি লতার নীচে
যথাক্রমে পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া শুভ্রের উপর
স্বর্ণাসনে কুলিশাযুধস্তা মাহেশ্বরী, হরিদ্রার উপর ক্রবহস্তা
ছাগারুড়া আর্যেয়ী, তম্বুলের উপর গদাপাণি মহিষারুড়া বাম্য,
যুতের উপর ঋতুপাণি, নরারুড়া নৈঋতী, ক্ষীরের উপর নাগ-
পাশ হস্তে সর্পহা বারুণী, শর্করার উপর যুগাসনা পতাকিনী,
তিলের উপর সৌম্য এবং নবনীতের উপর শূলহস্তে বৃষা-
সনে মাহেশ্বরী মূর্তি স্থাপন করিবে। প্রত্যেক মূর্তিই মুকুট
যুক্ত, ক্রোড়দেশে পুস্ত্রবিশিষ্ট ও প্রসন্ন হওয়া আবশ্যক।
লতার পার্শ্বে দশখেদ্র, দশ পূর্ণকুম্ভ ও দশ বোড়া বস্ত্র স্থাপন
করিবে। তৎপরে মঙ্গল গীত, বাদ্য, বন্দীগণের জুতিপাঠ
প্রভৃতি হইতে থাকিবে, এই সময়ে কুণ্ডের নিকটস্থ ৪ কুম্ভ
জল দ্বারা বজ্রমানকে স্নান করাইবে। স্নানান্তে বজ্রমান
গুরুবস্ত্র অলঙ্কার ও মালাদি ধারণ করিয়া, লতাসমূহ তিনবার
প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মন্ত্রপাঠপূর্বক তিন বার পুষ্পাঞ্জলি
দিবে। তৎপরে যথাবিধানে কল্পলতা দান করিয়া দক্ষিণা-
দান, দরিদ্র অনাথ প্রভৃতির সঙ্কোষ সাধন ও ব্রাহ্মণ
ভোজনাদি কার্য সম্পাদন করিবে।

কল্পবর্ষ (পুং) উগ্রসেনভ্রাতা দেবকের পুত্র।

(ভাগবত ৯।২৪।২৫।)

কল্পবল্লী (স্ত্রী) কল্পলতা।

কল্পবায়ু (পুং) প্রলয়কালে যে বায়ু প্রবাহিত হয়।

কল্পসূত্র (স্ত্রী) কল্পত বৈদিককর্ম্মসূত্রানন্ত প্রতীপাদকং
সূত্রম্। ১ বৈদিক কর্ম্মবিধায়ক গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থ আশ্ব-
লায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি প্রণীত।

(“জ্যোতিষশাস্ত্রে সংখ্যাভঃ কল্পসূত্রেন ব্রাহ্মণৈঃ।

চতুষ্ঠোমমহন্তস্ত প্রথমং পরিকল্পিতম্ ॥” রামা ১।১৩৪০।)

২ জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থবিশেষ। ভজবাহ এই গ্রন্থ প্রচার করেন।

কল্পাতীত (পুং) কল্পঃ কল্পকালঃ অতীতো বস্ত্র, কল্পঃ স্রুতিঃ
অতীতঃ অতিক্রান্তো যেন বা বহুব্রী। কল্পকাল অপেক্ষাও
অধিক দিন বাহারা বাচিয়া থাকে, অথবা বাহারা স্রুতি নহেন
অর্থাৎ নিত্য, দেবতাবিশেষ।

(কল্পাতীতা নব প্রবেশকঃ পঞ্চমহন্তরাঃ।

নিকায়ভেদাদেবঃ স্থার্বোবাঃ কিল চতুর্ধিধাঃ ॥ হেম ২।৮।)

কল্পাদি (পুং) কল্পত স্রুতিঃ আদিঃ প্রথমঃ কালঃ, ৩তৎ।
স্রুতির পূর্ব সময়।

কল্পানুপদ (পুং) নামবেদান্তর্গত গ্রন্থবিশেষ।

কল্পান্ত (পুং) কল্পত অন্তো বস্ত্র, বহুব্রী। ১ প্রলয়। ২ ব্রহ্মার
দিনান্ত।

(“উপবাসয়তাত্শিচব জলে কল্পান্তবাসিনঃ।” রামা ৩।১০৪।)

কল্পান্তর (স্ত্রী) কল্পান্তরং, ৫ তৎ। অপর কল্প।

কল্পান্তস্থায়ী [ন] (জি) কল্পান্তপর্য্যন্তঃ তিষ্ঠতি, কল্পান্ত-
স্থায়িনি। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বাহা বর্তমান থাকে।

কল্পিক (জি) উপযুক্ত, যোগ্য।

কল্পিত (পুং) কল্পাতে সজ্জীকৃত্যতে অসৌ, কৃপ-গিচ্-কর্ম্মণি-জ-
১ সজ্জিত হস্তী। ২ (জি) রচিত।

(“ব্রহ্মাদিতৃপপর্য্যন্তঃ মায়রা কল্পিতং জগৎ।” মহানির্ঝাণ।)

৩ উদ্ভাবিত। ৪ সম্পাদিত। ৫ সজ্জিত। ৬ দত্ত। ৭ আরো-

পিত। ৮ অবধারিত। ৯ কৃত্রিমবিষয় সত্যের ভ্রান্ত স্থিরীকৃত।

কল্পিতার্থ্য (জি) কল্পিতং দত্তং অর্থ্যং যস্মৈ। বাহ্যকে অর্থ্য
দেওয়া হইয়াছে।

কল্পী [ন] (জি) কল্পয়তি, কৃপ-গিচ্-শিনি। ১ রচনাকারক।
২ আরোপক। ৩ বেশকারক। ৪ (পুং) জাপিত।

কল্প্য (জি) কৃপ-গিচ্-যৎ। ১ রচনীয়। ২ আরোগ্য। ৩ অনু-
ষ্ঠেয়। ৪ বিধেয়।

কল্বল (দেশজ) ১ অম্পট শব্দ। ২ অম্পট কথা।

কল্বলানি (দেশজ) ১ অম্পট শব্দকরা। ২ অম্পট ভাবে
কথা বলা।

কল্বলি (দেশজ) কল্বল করা।

কল্ম [ন] (স্ত্রী) বল্লমোরৈক্যাৎ। কর্ম্ম।

কল্মাল (পুং) কলয়তি অপগময়তি মলং, পুর্বোদরাদিভ্যাং
সাধুঃ। তেজঃ।

কল্মলীক (স্ত্রী) কলয়তি অপগময়তি মলং পুর্বোদরাদিভ্যাং
সাধুঃ। তেজঃ।

কল্যাণীকী [ম] (পুং) কল্যাণীকমভ্যতি, কল্যাণীক-ইনি। কত্র।
কল্যাণ (স্ত্রী) কল্যাণতকর্ণ ভতি নাশয়তি, পৃথিব্যাদিবাং
লাধুঃ। ১ পাপ। ২ হস্তিপুচ্ছ। ৩ মলিনতা। ৪ (পুং) নরক-
বিশেষ। ৫ (স্ত্রী) মলিন। ৬ (পুং) মাদবিশেষ; জঘনক্রে
বঙ্গলবার বা শনিবার হইলে তাহাকে কল্যাণ মাস কহে।

“জঘন্যক্রে যদি স্তাভাং বারৌ ভৌমশনৈশ্চরৌ।

স মাসঃ কল্যাণো নাম মনোহঃ প্রদায়কঃ।” নীপিকা।

কল্যাণ (পুং) কলয়তি, কল-কিপ্; মাষয়তি স্বভাঙ্গা অভি-
ভবতি অন্তর্বর্ণান্, মাষ-গিচ্-অচ্; কল্-চাসৌ-মাষশ্চেতি
কৰ্মধা। ১ চিত্রবর্ণ। ২ (স্ত্রী) চিত্রবর্ণবিশিষ্ট, চিত্রিত। ৩ কৃষ্ণ
পাণ্ডুরবর্ণ। ৪ কৃষ্ণবর্ণ। ৫ (কলং শুভকৰ্ম মাষয়তি হিমন্তি,
কল্-বৃ-গিচ্-অচ্) রাক্ষস। ৬ গন্ধশালি। ৭ সর্পবিশেষ।
৮ অগ্নিবিশেষ। ৯ (স্ত্রী) কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত।

কল্যাণকণ্ঠ (পুং) কল্যাণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কণ্ঠো যন্ত, বহুব্রী। শিব,
নীলকণ্ঠ।

কল্যাণগ্রীব (স্ত্রী) কল্যাণা কৃষ্ণবর্ণা গ্রীবা যন্ত, বহুব্রী। ১ বাহার
গ্রীবাদেশ কৃষ্ণবর্ণ। ২ (পুং) কল্যাণা গ্রীবা সামীপ্যাং
কণ্ঠো যন্ত। মহাদেব।

কল্যাণতলা (স্ত্রী) কল্যাণতলারঃ কল্যাণ-তল্ (তন্তু ভাবহৃতলো)।
পা ৫। ১। ১১২। ১ চিত্রবর্ণতা। ২ কৃষ্ণপাণ্ডুরবর্ণতা। ৩
কৃষ্ণবর্ণতা। (“রাক্ষসং ভাবমাগমঃ পাদে কল্যাণতাং গতঃ।”
ভাগবত ৯। ৯। ২৫।)

কল্যাণপাদ (পুং) কল্যাণো কৃষ্ণবর্ণো পাদৌ যন্ত, বহুব্রী।
গৌদাসরাজ; ইনি নলসখা ঋতুপর্ণরাজের বংশীয়। কোন
সময়ে গৌদাস মৃগয়া করিতে গিয়া এক রাক্ষস বিনাশ
করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রাতা সেই ক্রোধে বৈরনির্যাতনের
উপায় অনুসন্ধানের আশায় রাজার গৃহে পাচকবেশে বাস
করিতে লাগিল। একদিন রাজ-শুদ্ধ বশিষ্ঠ রাজগৃহে
ভোজন করিতে উপস্থিত হইলে, ঐ রাক্ষস তাঁহাকে নরমাংস
ভোজন করিতে দিয়াছিল। বশিষ্ঠ সেই মাংস দেখিয়া রাজার
হৃদয়বহার বিবেচনায় তাঁহাকে ‘রাক্ষস হইবে’ বলিয়া অভি-
শাপ দিলেন। বিনা অপরাধে অভিশাপ দেখিয়া রাজাও
শুদ্ধকে প্রতিশাপ দিবার জন্য জল গ্রহণ করিলেন; এই
সময়ে রাজমহিষী মনয়ন্তী ক্রতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া
রাজাকে এই অকারণ্য হইতে নিবারণ করিলেন। রাজা
সেই জল নিজের পায়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার
পাদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার নাম
কল্যাণপাদ হইল।

(ভাগবত ৯। ৯ অঃ)

কল্যাণজিহ্ব (পুং) কল্যাণো কৃষ্ণবর্ণো জিহ্বা যন্ত, কল্যা-
ণজিহ্ব-কন্। কল্যাণপাদ।

কল্যাণী (স্ত্রী) কল্যাণ-স্ত্রী। ১ চিত্রবর্ণা স্ত্রী। ২ কৃষ্ণবর্ণা
স্ত্রী। ৩ কৃষ্ণবর্ণা যবন। (“কল্যাণীতীরলংহৃত গভঃ শিব্যতাং
ভৃগোঃ।” ভারত সত্য ৭৬ অঃ) ৪ রাক্ষসী।

কল্যাণবর।—মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটি
নগর। নাগপুর নগর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।
কুণবীজাতীয় একব্যক্তি এখানকার জমীদার, তিনি নগ-
রের মধ্যে একটি প্রাচীন দুর্গে বাস করেন। সেই দুর্গটি
দিল্লী হইতে একজন হিন্দু বন্দনবহার আসিয়া নির্মাণ
করেন। এখানে খাজ, তৈল ও দেশীকাপড়ের ব্যবসা আছে।
এখানকার জমীতে আফিম, ইন্দু ও তামাক জন্মে। লোক
সংখ্যা ৫০১৮।

কল্যা (স্ত্রী) কল্যাতে আগম্যতে, কল-কৰ্ম্মণি-ৎ। ১ প্রাতঃ-
কাল। ২ (কলয়তি মিষ্টভাং সম্পাদয়তি কল্-যক্) মধু।
৩ (স্ত্রী) সজ্জ, প্রস্তুত। ৪ নীরোগ। ৫ বধির ও বোবা।
৬ দক্ষ। ৭ কল্যাণবাক্য। ৮ উপায় বাক্য। (মেদিনী)

কল্যাণজিহ্ব (স্ত্রী) কল্যা প্রাতঃ জিহ্বাভোজনম্, ৭তৎ।
১ প্রাতঃকালে ভোজন। ২ প্রাতঃকালের ভোজ্য।

কল্যাণ (স্ত্রী) কল্যন্ত নীরোগন্ত ভাবঃ, কল্যা-ব (তন্তু ভাবহৃ-
তলো)। পা ৫। ১। ১১২। আরোগ্য, নীরোগতা।

কল্যাণাল (পুং) কল্যাণ মধু মধ্যং পালয়তি, কল্যা-পাল-অণ্।
শুড়ি।

কল্যাণালক (পুং) কল্যাণ পালয়তি, কল্যা-পাল-কুল্। শুড়ি।
কল্যাণবর্ত্ত (পুং) কল্যা প্রাতঃ বর্ত্ততে জীব্যতে অনেন, কল্যা-
বৃত-গিচ্-অণ্। প্রাতর্ভোজন। (কল্যাণবর্ত্তঃ প্রাতরাশঃ।
হেম ৩। ৮২।)

কল্যা (স্ত্রী) কলয়তি মাদয়তি, কল্-গিচ্-যক্ টাপ্। ১ মধ্য।
২ কল্যাণবাক্য। ৩ হরীতকী।

কল্যাণ (স্ত্রী) কল্যা প্রাতঃ অগ্যতে শকাতে, কল্যা-অণ্ যক্
(অকর্ত্তরি চ। পা ৩। ৩। ১১২।) ১ মঙ্গল; ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—ঋ, শ্রেয়স্, শিব, ভদ্র, শুভ, ভাবুক, ভবিক, ভব্য,
কুশল, ক্ষেম ও শান্ত। ২ (স্ত্রী) কল্যাণযুক্ত। ৪ অক্ষয়বর্ণ।
(কল্যাণমকরে স্বর্ণে মঙ্গলেশশি নপুংসকম্। মেদিনী।)
৫ রাগবিশেষ। এই রাগে গ, নি, সা, ধ, প, ম, প এই কয়েকটি
স্বর আছে। রাগি ১০ দণ্ডের সময় ইহা গান করিতে হয়।
ইহার ঠাটে রাজধানী কল্যাণ, বিহারী, ঐরাবত ও কোকিল
কল্যাণ প্রভৃতি গাইতে হয়। কল্যাণের পুত্রগণের নাম,—
হিমাণ, বলত, বীর, জলাল, কলিঙ্গ, পুলিন্দ ও শুকলাগর।

(পূঃ) রাজবিশেষ, ইনি 'ভট্ট ত্রিকল্যাণ' নামে খ্যাত ছিলেন। ৭ শতাব্দীর নামক পুস্তকপ্রণেতা।

কল্যাণ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থান নামক জেলার একটি উপবিভাগ। ইহার পরিমাণকল ২৭৮ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের উত্তরে উলহাস ও ভাংনা নদী, পূর্বে শাহপুর ও মুর্সাদ, দক্ষিণে কর্জু ও পুনবেল এবং পশ্চিমে পার্শ্বিক পর্তমালা। এখানে প্রধান উৎপন্ন জবোর মধ্যে ধান, কলাই, শর্ষপাদি ও অন্যান্য শস্য ও পাট জন্মে। এখানকার লোকসংখ্যা ৭৭,৯৮৮।

এই স্থান আর জিকোণাকার। পশ্চিমাংশে প্রশস্ত সমতল ভূমি এবং পূর্বে ও দক্ষিণে পর্তমালায় অংশ সমূহে দেশটি পরিব্যাপ্ত। কল্যাণে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্বাঙ্গিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে, ইহা বড়ই অসহ্যকর। শীতকালে এখানে জরের কিছু প্রাদুর্ভাব হয়, কিন্তু তাহা হইলেও এই সময় বেশ স্বাস্থ্যকর হয়। এখানে একটি দেওয়ানী আদালত, দুইটি ফৌজদারী আদালত ও একটি থানা আছে। 'কল্যাণনগর' এই প্রদেশের প্রধান নগর। কল্যাণ সহরে বন্দর আছে। এইখানে চাউল ছাঁটাইবার ব্যবসা অতি প্রবল। কল্যাণে যখন মুসলমান অধিকার ছিল, তখন এই সহরটিতে ১১টি মসজিদ ও ৪টি নগরদ্বার নির্মিত ও ইহার চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করা হয়। নগরটি ১৯°১৪' উঃ অক্ষরেখায় এবং ৭৩° ১০' পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কল্যাণ অতি প্রাচীন স্থান। নানা স্থানের অতি প্রাচীন এমন কি খৃষ্টীয় প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর খোদিত লিপিতেও কল্যাণ প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। পেরিপ্লাসের মতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কল্যাণ নামে একটি প্রধান রাজ্য ছিল, কস্মস্ ইণ্ডিকোপ্লেটসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের ৫টি প্রধান বাণিজ্য প্রধান নগরীর মধ্যে কল্যাণ একতম, এখানে বস্ত্র পিত্তল প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মুসলমানেরা কল্যাণনগরকে একটি জেলার সদর থানা করিয়া ইহার নাম পরিবর্তিত করিয়া ইসলামাবাদ রাখেন। পর্তুগীজেরা ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অধিকার করে। ইহারাই এস্থান অধিকার করিয়া স্থানটি রক্ষা করিবার কোন বন্দোবস্ত করে নাই। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে তাহারাই ইহার উপকণ্ঠ লুণ্ঠন করিয়া যথেষ্ট ধন রত্ন লইয়া যায়। তাহার পরই এ প্রদেশ আফগানদের রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজ প্রবল হইলে, কল্যাণ ভজাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শিবজীর সেনাপতি আবাজী সোমদেব কল্যাণ

আক্রমণ ও ইহার শাসনকর্তাকে বন্দী করেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা শিবজীর হস্ত হইতে এ প্রদেশ আর একবার উদ্ধার করে, কিন্তু ১৬৯২ পুনরায় অধিকারচ্যুত হয়। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবজী ইংরাজদিগকে এখানে একটি কুঠি স্থাপন করিতে আদেশ দেন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মার্কিটারা ইংরাজদিগকে সাহায্যকরা বন্ধ করিলে ইংরাজেরা এ প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন। তদবধি এই স্থান ইংরাজ গবর্ণ-মেন্টের অধীনে আছে।

কল্যাণের প্রাচীন ইতিহাস—ইহার প্রাচীন ইতিহাস এ পর্যন্ত বাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ কর্ণাটিকের খোদিত লিপি হইতে। কর্ণেণ মেকেজি সাহেব সংস্কৃত পুস্তকাবলীর যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে "নকরাজ বমরাজ বংশাবলী" নামে একখানি পুথির ইতিহাস মধ্যে লিখিয়াছেন যে ইহাতে ত্রিপত্তী পর্তের নিকট-বর্ত্তী নারায়ণ বা নারায়ণবরম নামক স্থানের জমীদার-গণের বা প্রাচীন কর্কটীনগরের মকরাজবংশীয় রাজগণের বংশবিবরণ কীর্ণিত হইয়াছে। তোলমান চক্রবর্ত্তীর বংশীয় ধনঞ্জয় চোল নামক জনৈক চোলরাজপুত্র হইতে এই বংশের উৎপত্তি। ধনঞ্জয়ের বংশে নারায়ণরাজ নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। এই নারায়ণরাজই নারায়ণবরম বা কল্যাণ-পত্তন নগরী স্থাপন করেন। কল্যাণপত্তন প্রাচীন কল্যাণ বা আধুনিক নারায়ণবরম নদীর উপর অবস্থিত।

কর্ণাটিক খোদিত লিপি হইতে বতদূর জানা যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, যখন চালুক্যরাজগণ গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর অন্তর্গত ভূভাগে অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন; তখন কোঙ্কণ, কল্যাণ, বনবাসী প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এই সময় কল্যাণ এতদূর সমৃদ্ধিশালী ও বিখ্যাত হইয়া পড়ে যে, তদানীন্তন চালুক্যরাজগণ আপনাদিগকে খোদিত লিপি প্রভৃতিতে "কল্যাণ বা কল্যাণপুরের চালুক্য-রাজ" বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। কোঙ্কণ প্রদেশের চিত্ররাজ মহামণ্ডলেশ্বর নামক জনৈক নৃপতির (৯৪৬ শক) প্রদত্ত ছাড় সন্ধে মতামত দিবার সময় অধ্যাপক ল্যাসেন বলিয়াছেন যে, "এতজ্ঞপ্লিখিত শিলাহার জাতি কাবুলস্থানের উত্তরস্থ কাফির জাতীয় "শিলায়" ব্যতীত অজ্ঞ জাতি নহে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যেও শিলায় নামে এক জাতি ছিল, ইহারাই প্রথমে মাজ্জকেনের রাষ্ট্রকূটগণের ও তৎপরে কল্যাণের চালুক্যগণের অধীনস্থ হয় এবং এই শিবলারগণের অধীনেই তখন সমগ্র কোঙ্কণ প্রদেশ, বেলগাম ও সেতারার মধ্যবর্ত্তী

স্থান সমুদয় ছিল। শিলায়গণের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল প্রদেশও কল্যাণের অধীনস্থ হয়।

দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজগণের মধ্যে কলিবিক্রম বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লদেবের একখানি মহিমাঙ্ক কাব্য আছে। বিহ্লগ নামক জনৈক কবি তাহার প্রণেতা ও কাব্যখানির নাম “বিক্রমাদিত্য”। এই কাব্যের মতে এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল শক ৯৮৭—১০৪৮, এবং ইহার পিতা আহবমল্ল ২য় কল্যাণনগরীর স্থাপয়িতা; কিন্তু ইহার পূর্বেও যে কল্যাণ-প্রদেশ ছিল, তাহার স্বতন্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায়। (Ind. Ant. Vol. I. p. 209) কল্যাণ প্রদেশ পুরোক্ত বিক্রমাদিত্যের অতি প্রিয় স্থান ছিল। নানা স্থানের যুদ্ধ জয় করিয়া বিক্রমাদিত্য এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন।

কল্যাণউপাধ্যায়। বালভট্টনামক সংস্কৃত-গ্রন্থ-প্রণেতা, ইনি মহীধরের পুত্র, রামদাসের পৌত্র, অতিচ্ছত্র নগর ইহার জন্মস্থান। ইনি ৬৪৪ শকে শ্রাবণ পূর্ণিমা রবিবারে আপন বালভট্ট পরিসমাপ্ত করেন।

কল্যাণক (ক্লী) কল্যাণ-স্বার্থে কন্। ১ কল্যাণ। ২ (ত্রি) কল্যাণযুক্ত।

কল্যাণকগুড় (পুং) গ্রহীরোগের বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—আমলকীর স্বরস ১২ সের, ইক্ষু-গুড় ৬০ সের, একত্র পাক করিবে; পাক প্রায় সমাপ্ত হইলে পিপুলমূল, জীরা, চৈ, মরিচ, পিপুল, শুঁট, গজ-পিপ্পলী, হুযা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, শৈকব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, আকনাদি, চিতা ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, তেউড়ী চূর্ণ ১ সের ও তৈল ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। ২ তোলা পরিমিত এই অবলেহ ৮ তোলা এলাইচ তেজগন্ধের চূর্ণসহ সেবন করিলে গ্রহী, ঝাঁদ, কাস, স্বরভেদ, শোণ, মন্দ্যামি, পুরুষহানি ও বক্ষ্যাদোষ নিবারিত হয়। ইহা তেউড়ী তৈলে ভাজিয়া গুড়া করিয়া দিতে হয়। (চক্রবর্ত্ত)।

কল্যাণকম্বুত (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধ-সংস্কৃত দ্রব্যবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুখা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমবৃক্ষ, উৎপল, প্রিয়ঙ্গু, এলাইচ, এলবালুক, রক্তচন্দন, দেবদারু, বেণামূল, কুড়, হরিদ্রা, শালপাণী, চাকুলে, অনন্ত-মূল, জামা, রেণুকা, জিহ্বা, দাড়ী, বচ, ভালীপ কেশর ও মালতীমূল এই সকলের কঙ্ক বাঁরা বিশুদ্ধ দ্রবের সহিত বণাবিধি দ্রুত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, বিষমজ্বর, ঝাঁদ, জ্বর, উন্মাদ, বিষরোগ, অলক্ষ্যগ্রহ ও রক্তাদোষ, অগ্নি-

মান্দ্য, অপস্মার, শুক্রহীনতা, বক্ষ্যাদোষ, চক্ষুরোগ ও শুক্র-মার্গের দোষসমূহ নিবারিত হইয়া আয়ুর্ভক্তি হয়। (শ্রুত) কল্যাণকর (ত্রি) কল্যাণ করোতি, কল্যাণ-কুট (ক্লী) হেতুতাল্লীলায়লোমোয়। পা৩.২।২০।) মঙ্গলকর, শুভজনক। কল্যাণকলবণ (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধ-সংস্কৃত লবণবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—গজীর, পলাশ, কুটজ, বিব, আকন্দ, শিজ, অপামার্গ, পাটল, পারিতজ্ঞ, পিপুল, কঙ্ক-গন্ধা, কদম্ব, নির্দহনী, চিতা, তগরপাহুকা, পুতিকী, বৃহতী, কণ্টকারী, ভেলা, ইঙ্গুরী, বৈষ্ণবভী, কদলী, পুনর্গবা, বালা, তিলক, ইজ্জবাকলী, খেতমোক্ষক ও অশোক; এই সকল গাছের লতাপাতা মূল সমস্তই লবণমিশ্রিত করিয়া গোড়াইতে হইবে, তাহার পর দ্রাব প্রস্তুতের বিধান মত ইহা স্রাব করিয়া দ্রাব প্রস্তুত করিবে। হিজ্জাদিগণোক্ত বা পিপ্পলাদিগণোক্ত দ্রব্য সকল ইহাতে প্রক্ষেপ দিতে হইবে। ইহা সেবনে বায়ুরোগ, শুষ্ক, প্রীহা, অভিব্যঙ্গ, অজীর্ণ, অর্শঃ, অরোচক ও কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

কল্যাণকামোদ (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ, ইমন্ ও কামোদ এই উভয়রাগ মিশ্রিত হইলে, তাহাকে ‘কল্যাণকামোদ’ কহে। কল্যাণকুৎ (ত্রি) কল্যাণ-কু-কিপ্। ১ কল্যাণকারক, যে কল্যাণ করে। ২ শাস্ত্রবিহিত কার্যকারক।

কল্যাণকোট। সিজুগদেশের ঠাঠা নগরের পার্শ্বস্থ একটি প্রাচীন গিরিভূগ, বর্তমান নাম তোবলকাবাদ।

কল্যাণচন্দ্র (পুং) একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

কল্যাণদেবী (স্ত্রী) কাম্বীরাজ জয়ালীড়ের জী। (রাজতরং) কল্যাণধর্ম্মী [ন] (ত্রি) কল্যাণো মঙ্গলময়ো ধর্ম্মোহিত্যতি, কল্যাণ-ধর্ম্ম-ইনি। মঙ্গলকর ধর্ম্মবিশিষ্ট।

কল্যাণনট (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ; কল্যাণ ও নট এই উভয় রাগ মিশ্রিত হইলে, তাহাকে ‘কল্যাণনট’ কহে।

কল্যাণপুর। ১ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ফতেপুর জেলার অন্তর্গত একটি তহসীল, গঙ্গাযমুনানদীর মধ্যে। ২১৬ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। পরিমাণ ২৭৯ বর্গমাইল। ১১১৮২ জন লোকের বাস। ২ কাম্বীরের একটি প্রাচীন নগর, (৬৬৭ শকে) কল্যাণদেবী এই নগর স্থাপন করেন। (রাজ-তরঙ্গিনী ৪।৪৮২) ৩ দাক্ষিণাত্যের কল্যাণপ্রদেশের প্রাচীন রাজধানী। চালুক্যরাজগণের শিলালিপিতে এই স্থান প্রসিদ্ধ। [কল্যাণ দেখ।]

কল্যাণমল।—অযোধ্যা প্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। ইহার প্রাচীন নাম রথোলিয়া। প্রবাদ এইরূপ, রামচন্দ্র রাবণনিধন করিয়া লক্ষা হইতে কিরিয়া

আসিবার সময়ে এখানে রথ হইতে অবতরণ করেন এবং রথ-বধ-অনিভ পাপকালনের জন্ত এখানকার 'হাতিয়া হরণ' নামক পবিত্রকূণ্ডে স্নান করেন।

পাঁচশতবর্ষ পূর্বে এই স্থান ঠাঠেরাদিগের অধিকারে ছিল, তৎপরে বৈষ্ণবর রাজপুতকুলোদ্ভব রাজকুমার ঠাঠেরাদিগকে তাড়াইয়া ৯৪ খানি গ্রামের উপর রাজত্ব করেন। তিনি 'রথোলিমা' নগরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নাগমল নামক ঠাঠের একজন নায়েব প্রভুত্বা করিয়া (কাহারও মতে বলপ্রয়োগপূর্বক) এই স্থান অধিকার করেন। এখনও নাগমল-বংশীয় শকরবার রাজপুতগণ ৬৩ খানি গ্রাম উপভোগ করিতেছেন।

এই পরগণার পরিমাণ ৬৩ বর্গমাইল, ভূমধ্যে ৪১ বর্গমাইলে চাষ হয়। এখানকার জমী তেমন উৎকৃষ্ট নয়। লোকসংখ্যা ২৮৫৭২। এখানকার 'হাতিয়াহরণ' নামক কূণ্ডের পার্শ্বে প্রতিবর্ষে ভাদ্রমাসে একটি মেলা হয়, তাহাতে নানাধিক গনরহাচার লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

এই পরগণার মধ্যে কল্যাণ নামক গ্রামটিই প্রধান।

কল্যাণমল্ল (পুং) ১ অনঙ্গরঙ্গ-নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ গজ-মলের পুত্র, ইনি মেঘদূতের মালভীনাট্যী টীকা রচনা করেন।

কল্যাণমিত্র (ক্লী) কল্যাণস্ত ধর্মস্ত মিত্রং ইব। মহর্ষি সূতপার পুত্র, ইহার নাম স্মরণে নষ্টজব্য পাওয়া যায়, এবং বজ্রভয় নিবারিত হয়। (ত্রুট্যৈববর্ত পুং)

কল্যাণযোগ (পুং) কল্যাণকরো যোগঃ, মধ্যলো* কর্মধা। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত যাত্রার যোগবিশেষ। বৃহস্পতি কেজ্রে স্থলে অর্থাৎ লক্ষ্মীস্থানের ১,৪,৭,১০ম স্থলে; এবং সূর্য্য জিকোণে অর্থাৎ ৫ম ও ৯ম স্থানে অথবা ১০ বা ১১ম স্থলে থাকিলে 'কল্যাণযোগ' হয়। এই যোগে যাত্রা করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে।

কল্যাণরাজচরিত্র (ক্লী) কল্যাণরাজের জীবনচরিত, ইহা মদন নামক কোন লেখকের লিখিত।

কল্যাণবচন (ক্লী) কল্যাণঃ মঙ্গলময়ঃ বচনঃ, কর্মধা। মঙ্গলবাক্য।

কল্যাণবর্ণী [ন] (পুং) ১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ; ইনি সারাবলী নামক একখানি জ্যোতিষ রচনা করেন। ২ কাম্বীরাজ বৃহস্পতির একজন মাতুল; বৃহস্পতির শৈশবাবস্থায় ইনি কিছু দিন ক্ষাত্রগণের সহিত রাজকাৰ্য্য চালাইয়া ছিলেন। ইনি কল্যাণবর্ষীকেশব নামে এক বিষ্ণুর্জি প্রভিষ্ঠা করেন। (রাশিতত্ত্বঃ ৪। ৬৭৬)।

কল্যাণবাচন (ক্লী) কল্যাণস্ত বাচনং উচ্চারণম্, ৬তৎ। শাস্ত্রবিহিত কর্মণ্যমূহের প্রথমেই ব্রাহ্মণ দ্বারা যে মন্ত্রবিশেষ উচ্চারণ করান হয়। যজমান 'ও' স্বঃ কর্তব্যোহস্মিন্ কর্মণি কল্যাণং ভবন্ত্যোহধিক্রবন্ত' এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। ব্রাহ্মণ 'ও' কল্যাণম্' এই মন্ত্র ৩ বার পাঠ করিলে,

'ও' পৃথিব্যামুদ্ভূতানস্ত যৎকল্যাণং পুরাকৃতম্।

ঋষিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ভৈস্তৎ কল্যাণং সদাস্ত নঃ ॥'

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ দ্বারা কার্য্যারম্ভে কল্যাণবাচন করিতে হয়। **কল্যাণবাদী** [ন] (ত্রি) কল্যাণঃ বদতি, কল্যাণ-বদ-গিনি। কল্যাণবক্তা, যে কল্যাণ বলে।

কল্যাণবিনোদ (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ, কল্যাণনটের নামান্তর। [কল্যাণনট দেখ]

কল্যাণবীজ (পুং) কল্যাণং বীজং যন্ত, বহুব্রী। ১ মন্ত্র। [মন্ত্র দেখ] ২ (৬তৎ) মঙ্গলের কারণ।

কল্যাণসিংহ। বিকানীরের একজন রাজা। রাজা জেৎ-সিংহের পুত্র, ১৬০০ সন্বতে ইনি রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনি ২৭ বর্ষ রাজত্ব করেন।

কল্যাণাচার (পুং) কল্যাণকরঃ আচারঃ, মধ্যলো*। মঙ্গল-কর আচরণ।

কল্যাণাচারী [ন] (ত্রি) কল্যাণাচারং অন্ত্যত, কল্যাণা-চার-ইনি। মঙ্গলময় আচরণযুক্ত।

কল্যাণাভিজ্ঞান (ক্লী) কল্যাণকরং অভিজ্ঞানং, কর্মধা। মঙ্গলকর জ্ঞান।

কল্যাণালয় (ত্রি) কল্যাণস্ত আলয়ঃ, ৬তৎ। ১ মঙ্গলের আশ্রয়, বাহার নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করা যায়। ২ (পুং) পরমেশ্বর।

কল্যাণাম্পাদ (ত্রি) কল্যাণস্ত আম্পাদঃ, ৬তৎ। ১ মঙ্গলের পাত্র। ২ (পুং) জগদীশ্বর।

কল্যাণিকা (ক্লী) কল্যাণ-সংজ্ঞারং কন্-টাপ, অত ইচ্ছম্। ১ মনঃশিলা। [মনঃশিলা দেখ]।

কল্যাণিনী (ক্লী) কল্যাণং অন্ত্যাত্মাঃ, কল্যাণ-ইনি-ভীপ্। ১ বলা। [বলা দেখ]। ২ কল্যাণবিশিষ্টা ক্লী।

কল্যাণী [ন] (ত্রি) কল্যাণমন্ত্যতি, কল্যাণ-ইনি। কল্যাণযুক্ত।

কল্যাণী (ক্লী) কল্যাণ-ভীপ্। ১ মাংসপী*। ২ গাজী।

(“উপস্থিতেরং কল্যাণী নামি কীর্তিত এব যৎ” রঘু ১৮৭।)

কল্যাণীয় (ত্রি) কল্যাণ-টক্। কল্যাণের যোগ্য পাত্র, কল্যাণবিশিষ্ট।

কল্যাণ্যাদি (পুং) পানিনি ব্যাকরণোক্ত গণবিশেষ, কল্যাণী,

মুভগা, হুভগা, বহুকী, অমুহুটি, অমুহুটি, অমুহুতি, বনীবনী, জোষ্ঠা, কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও পরজী; এই কয়েকটি শব্দ কল্যাণাদিগণের অন্তর্ভুক্ত; ঢুক প্রত্যয়ান্ত এই সকল শব্দের নিয়োগে ইনঙ্ আদেশ হয়। (কল্যাণাদিনা-মিনঙ্চ। পা ৪। ১। ১২৬।)

কল্যাণপাল (পুং) কল্যাণ মদ্যাং পালয়তি, কল্যা-পাল-গিচ্-অণ্। শৌণ্ডিক, তুড়ি।

কলুষ (ক্লী) [বৈদিক] কলুষি (?)

কল্প (ত্রি) কল্পতে শব্দং ন গৃহাতি, কল্প-অচ্। বধির, কালা।

কল্পট (পুং) স্পন্দস্বরূপ ও স্পন্দহ্রস্ববিবরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

কাশ্মীর ইহার জন্মস্থান। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাকে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক হইবেন, ঐ সময়ে কাশ্মীরে কল্পট নামে একজন শৈব রাজা ছিলেন, সম্ভবতঃ স্পন্দস্বরূপকার ঐ রাজার নামেই আগুন গ্রন্থ চালাইয়া থাকিবেন। স্পন্দহ্রস্বের বার্তিককার ভাস্করভট্টের মতে বহুগুণ কল্পটের নিকট শিবহ্রস্ব ব্যক্ত করেন। পরে কল্পট স্পন্দহ্রস্বের কারিকাদ্বয় জনসমাজে প্রচার করেন। তিনি স্পন্দহ্রস্বের একখানি লঘুসুতিও রচনা করেন। [শৈব দর্শন দেখ।]

কল্পত্ব (ক্লী) কল্পস্ত ভাবঃ, কল্প-ত্ব (তত্ত্ব ভাবত্বলো। পা ৫। ১। ১৯।) ৩ স্বরভেদ। (স্বরভেদস্ত কল্পত্বং। হেম ২। ২২০।) ২ বধিরতা।

কল্পন। দক্ষিণাপথের অসভ্য কৃষ্ণবর্ণ জাতিবিশেষ। তামিল তৈলঙ্গী প্রভৃতি ভাষা অনুসারে ‘কল্পন’ শব্দের একটি অর্থ চোর বা ডাকাত। পূর্বে ইহার চৌর্য্য বা ডাকাতী করিত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে।

মহুরারাজ্যে এই জাতির বাস। এক সময়ে ইহারাজ্যমীয়ার বঙ্গালদিগের নিকট হইতে কোন কোন স্থান লইয়া স্বাধীনভাবে বাস করিত।

ইংরাজ আগমনের পূর্বে এই জাতি মহুরা এবং নিকটস্থ রাজ্যে বড়ই উৎপাত করিত। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মহুরা ইংরাজ অধিকৃত হইলে, ইহাদের সেই প্রভাব দৌরাত্ম্য অনেক কমিয়া আসে, তবে সেই উদ্ধত স্বভাব, অতুল সাহস এবং শরীরের ভেজ এখনও কমে নাই।

কল্পন জাতির বিবাহপদ্ধতি বড় চমৎকার, একটা রমণী জনারাসে দুইটি হইতে দশটি পর্য্যন্ত পতি গ্রহণ করিতে পারে, তবে এক এক জোড়া লইতে হইবে, বিজোড় হইলে চলিবে না। ইহাদের সন্তানেরা আপনাদিগকে ছর, আট

বা দশজনের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয় না;—এইরূপে পরিচয় দিয়া থাকে, ‘আট ও দুইজনের, ছর ও দুইজন অথবা চার ও দুইজনের পুত্র।’ অনেকগুলি পিতা হওয়ার বড় একটা গোলযোগ নাই, তাহার ভাবে সন্তান সকলেরই, স্ত্রীর সন্তান সকলেই প্রতিপালন করিতে বাধ্য।

ইহার পুত্রদিগকে শৈশবকাল হইতে চৌর্য্যবৃত্তি শিক্ষা দেয়। যে এই কার্য্যে যেমন পরিপক হয়, সে স্বজাতির নিকট সেইরূপ আদর ও সম্মান লাভ করে। ইহার শিবের পূজা করে। কেহ মরিলে আবশ্যক হইলে গোড়াইরা কেলে অথবা গোর দেয়।

কল্পা, কল্পি (দেশজ) ১ হুট। ২ শঠ। ৩ অব্যর্থ।

কল্পি (অব্য) কল্য, আগামী দিন।

কল্পিনাথ (পুং) একজন সন্ন্যাস-শাস্ত্র-রচয়িতা।

কল্পোল (পুং) কল্প-বাহুল্যক্য ওলচ্। ১ মহাতরঙ্গ, বড় ডেউ; ইহার অপর সংস্কৃত নাম উল্লোল। ২ হর্ষ। ৩ (ত্রি) শত্রু। (কল্পোলঃ পুংসি হর্ষে ত্রাহুল্লোলবৈরিণোরপি। মেদিনী)

কল্পোলিত (ত্রি) কল্পোলোহস্ত সংজাতঃ, কল্পোল-ইভচ্ (তদন্ত সংজাতং তারকাদিত্য ইভচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) তরঙ্গযুক্ত।

কল্পোলিনী (ক্লী) কল্পোলোহস্তাত্মাঃ, কল্পোল-ইনি-ভীপ্। নদী।

কল্পোলিনীবল্লভ (পুং) কল্পোলিনীনাং নদীনাং বল্লভ ইব। সমুদ্র।

কল্হণ (দেশজ) মস্ত শরীরের অবয়ব বিশেষ, কান্ধা ও মুখ কোণের মধ্যস্থান।

কল্হণ (কল্হণ) (পুং) রাজতরঙ্গিনী নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ইতিহাস রচয়িতা। ইনি কাশ্মীরের প্রধান রাজমন্ত্রী চম্পক-প্রভুর পুত্র। রাজতরঙ্গিনী পাঠে জানা যায়, কল্হণ ৪২২৪ সপ্তর্ষি বা লৌকিকাব্দে এবং ১০৭০ শকে (১১৪৮ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন*।

কল্হণের রাজতরঙ্গিনী ভারতবাসী হিন্দুদিগের বড় আদরের ধন, ভারতের পুরাতত্ত্ববিদগণের অমূল্য বস্তু। পূর্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল, ভারতবাসী আপনাদের প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়ন করাকে আবশ্যিকতা জ্ঞান করিতেন না। কল্হণ এই অপবাদ দূর করিয়াছেন; তিনি মহারাজ ধৃতিষ্ঠিরের সমকালীন গোনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমসাময়িক সিংহদেবের রাজ্যকাল অবধি কাশ্মীরের ইতিহাস

* “লৌকিকাব্দে চতুর্বিংশ শতকালন্ত সাম্রাজ্যম্।

সপ্তত্যাতিথিকং বাস্তবং সহস্রপরিবৎসরঃ।” রাজতরঙ্গিনী ১। ৫২।

লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজতরঙ্গিণী পাঠ করিলে কাশ্মীরের প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণের বংশাবলী, সংক্ষিপ্ত জীবনী, রাজ্যকাল এবং কাশ্মীরের ও তরিকটস্থ জনপদ সমূহের অবস্থা জানা যাইতে পারে। [কাল শব্দে কল্হণগৃহীত এক সকলের সমালোচন দেখ।] রাজতরঙ্গিণীর রচনা-প্রণালীও বেশ কবিত্ব ও শব্দলালিতাপূর্ণ।

কলহোরা। সিদ্ধ প্রদেশীয় বেলুচী মুসলমানজাতি। ইহার আপনাদিগকে অব্বাসের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়।

কবক (ক্লী) কবতে আচ্ছাদয়তি বিস্তারয়তি বা, কব-অচ-সংজ্ঞায় কন্। ১ ছত্রাক, বেড়ুছাতা। মনুসংহিতায় ইহা অখাদ্য বলিয়া লিখিত আছে,—

(“লগুনঃ গৃহ্ননকৈব পলাতুং কবকানি চ।” মনু।)

২ (পুং) কবল, গ্রাস।

(গ্রাসোপ্তদেয়কঃ পিণ্ডো গড়োলঃ কবকোপ্তদেয়ঃ। হেম ৩।৮২)

কবচ (পুং, ক্লী) কু-অচ্ (ঋতজ্জিহবজ্ঞাপ্তিমদাত্যাদিকৃ ইত্যাদি। উণ্। ৪।২।) অথবা কং দেহং বক্ষতি বিপক্ষা-জ্ঞানি বক্ষয়িত্বা রক্ষতি, ক-বক্ষ অচ্; কং বাতং বক্ষতি বা। ১ সন্মাহ, বর্ষ (কবচং বর্ষ। উজ্জলবৃত্ত।) ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—তম্র, বর্ষ, দংশন, উরুহর, কষ্টটক, জগর, দংশন, জাগর, অজগর, কটক, যোগ, সন্মাহ ও কঙ্ক।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ এই কয়েক ধাতু দ্বারা বর্ষ প্রস্তুত হয়। তদ্বিন্ন কাষ্ঠ, চর্ম ও বহুল দ্বারাও বর্ষ প্রস্তুত হইত, ইহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর জ্ঞানিনির্মিত বর্ষ অধিক গুণযুক্ত। বৈদিক কালে স্বর্ণনির্মিত কবচের প্রচলন ছিল, ঋকসংহিতাপাঠে জানা যায়। শরীরের আবরক, লবু, দৃঢ় ও দুর্বল, এই কয়েকটি কবচ সাধারণ। ছিদ্রযুক্ত অতিশয় ভার বা পাতলা এবং সহজভেদ্য বর্ষ নিকৃষ্ট। শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ এই কয়েক প্রকার বর্ষে রক্ষা করিবার নিয়ম। ২ শরীররক্ষার জন্য দেবতার মন্ত্রবিশেষ; প্রথমে মন্ত্রবিশেষের উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করিয়া ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, পরে ভূজপাত্রে মন্ত্র লিখিয়া স্বর্ণরৌপ্য বা তাম্রের দ্বারা তাহা আবৃত করিয়া কণ্ঠ বা দক্ষিণ বাহু প্রভৃতি স্থানে ধারণ করিতে হয়। ৩ গর্দভাণ্ড বৃক্ষ। ৪ ঢাক-বাদ্য, নাগবাদ্য।

(কবচো গর্দভাণ্ডে সন্মাহে পটহে হপিচ। মেদিনী।)

কবচপত্র (ক্লী) কবচলেখনসাধনং পত্রমিব পত্রং বহুলাং যত্ন, বহুত্রী। ভূজপত্র।

কবচপাশ (পুং) [বৈ] কবচ বা বর্ষবন্ধ, বস্ত্রাদি বর্ষ বাঁধা যায়। (ঋকসংহিতা)।

কবচহর (পুং) কবচং হরতি যেন বয়স, কবচ ছ-অচ্। (বয়সি চ। পা ৩।২।১০।) কবচহরণের উদ্যম করিবার উপযুক্ত বয়স্কবালক। (কবচহরঃ কুমারঃ। কাশিকা।)

কবচিত (ত্রি) কবচং সংজ্ঞাতমন্ত, কবচ-ইতচ্ (তদন্ত সংজ্ঞাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬) কবচযুক্ত।

কবচী [নৃ] (ত্রি) কবচং অন্ত্যন্ত, কবচ-ইনি। ১ বর্ষযুক্ত। ২ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (মহাভারত ১:১১৭।১২।) ৩ শিব, মহাদেব।

কবচী (স্ত্রী) কোতি শব্দায়তে, কু-অটন্-ভীষ্। কবাটী।

কবড় (পুং) কেন জলেন বলতে চলতি, ক-বল-অচ্, লড়কো-রৈক্যম্। ১ গ্রাস। ২ মুখের ভিতর জলাদি দিয়া নাড়া চাড়া করিয়া ফেলিয়া দেওয়া, কবল করা।

কবতী (স্ত্রী) ক শব্দঃ অন্ত্যন্ত, ক-মতুপ-মন্ত বঃ-ভীপ্। “কয়া নশ্চিৎ” ইত্যাদি ঋক্বিশেষ।

কবত্ব (ত্রি) [বৈ] ১ স্বার্থপর। ২ মন্দকর্ম। (সায়ণ) “পুশ্চতি ন দেবাসঃ কবত্ববে।” ঋকসংহিতা ৭।৩২২।

কবন (ক্লী) কোতি শব্দায়তে, কু-লুট্। জল।

কবন্তক (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। (পা ২।৪।৬৯)

কবপথ (পুং) কুপথ-কোঃ কবাদেশঃ। (পথি চ ছন্দসি। পা ৬:৩।১০৮।) মন্দপথ।

কবয়ী (স্ত্রী) কাং জলাং বয়তে গচ্ছতি, ক-বয়-ইন্-ভীষ্। মন্ত্রবিশেষ, কইমাছ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম ক্রকচপৃষ্ঠী।

[কই দেখ।]

কবর (ত্রি) কে মন্তকে বরং শোভমানত্বাৎ শ্রেষ্ঠঃ। কেশ-পাশ। ২ সংপৃক্ত। ৩ খচিত। ৫ (পুং) কু-অরন্ (কোর-রন্। উণ্। ৪।১৫৪।) পাঠক (উজ্জলদত্ত।) (পুং, ক্লী) ৬ লবণ। ৭ অন্ন। (কবরং লবণান্নয়োঃ। মেদিনী।) ৮ চিত্রবর্গ।

(“দৃষ্টেবিনির্জিতকলাপতরামধস্তাৎ।

ব্যাকীর্ণ মাল্যকবরং কবরীং তরুণ্যাঃ॥” মাঘ ৫।১৯।)

(আরব্য শব্দজ) গোর, সমাদি।

কবরকী (স্ত্রী) কবরং কেশপাশং ক্রিরাতি বিক্রিপতি যজ, কবর-কৃ-ড-ভীষ্। কাঁরাগরিবন্ধা, কয়েদী।

কবরপুচ্ছী (স্ত্রী) কবরং চিত্রবর্গঃ পুচ্ছঃ অন্ত্যঃ, ৬তৎ। ১ ময়ূরী। ২ বিচিত্র পুচ্ছবিশিষ্ট।

কবরা (স্ত্রী) কবর-টাপ্। ১ ধরপুষ্প, বাবুই। ২ বিচিত্রবর্ণা।

কবরী (স্ত্রী) কং শিরঃ বৃণোতি আচ্ছাদয়তি, ক-বৃ-অচ্-ভীপ্। অথবা কু-অরন্ (কোররন্ উণ্। ৪।১৫৪।) ভীষ্। ১ কেশ-বিভাগ, চুলের খোঁপা। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কেশবেশ,

১ কবর ও কেশগর্ভক। ২ বর্ষরা; বাবুই। ৩ কারবী, হিঙ্গের পাতি।

কবরীভার (পুং) কবরীয়া: ভার আধিক্যম্, ৬তং। ফুল কবরী।

কবরীভার (পুং) কবরীয়া: ভার আধিক্যম্, ৬তং। ১ ফুল কবরী। ২ কবরীর ভারত্ব।

কবরীভূত (ত্রি) কবরীঃ বিভক্তি, কবরী-ভূ-কিপ্। কবরী-ধারী, যাহার কবরী আছে।

কবগ (পুং) ককারাদি এটি বর্ণ,—ক খ গ ঘ ঙ, এই পাঁচটি কবর্গ; ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ।

কবর্গীয় (ত্রি) ক বর্গাৎ ভবঃ, কবর্গ হ। কবর্গ হইতে উৎপন্ন।

কবর্দ্ধা। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। অক্ষা ২১° ৫১'—২২° ২৯' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮১° ৩'—৮১° ৪০' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ৮৮৭ বর্গ মাইল। ৩৮৯ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোকসংখ্যা ৮৬৩৬২।

এই রাজ্যের পশ্চিমাংশ চিল্পি গিরিশ্রেণী, রাজ্যমধ্যে এই স্থান উৎকৃষ্ট। এখানে জুলা, ধাতু, গমাদি বেশ জন্মে। এখানকার জঙ্গলে লাফা, মউয়াজুল ও নানাপ্রকার গঁদ পাওয়া যায়।

এই রাজ্যের প্রধাননগর কবর্দ্ধা, উহা ২২° ১' উঃ অক্ষ এবং ৮১° ১৫' পূঃ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এখানে কার্পাস ও লাফার ব্যবসাই প্রধান। কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের প্রধান মলপতি এই স্থানে বাস করে।

কবল (পুং) কেন জলেন বলতে চলতি, ক-বল-অচ্। ১ গ্রীষ্ম।

(“ব্যস্তজন্ কবলান্নাগা গাবো বংসান্ন ন পায়ন্ন।”

রামা ২।৪।১০।)

২ মৎস্তবিশেষ, বেলে মাছ।

কবলগ্রস্থ (পুং) কবলস্ত গ্রস্থঃ, ৬তং। ১ কবলযোগ্য পরিমাণবিশেষ। ২ নগরবিশেষ।

কবলিকা (স্ত্রী) ব্রণের উপর প্রলেপ দিয়া তাহার উপর বাধিবার উপযুক্ত পত্রাদি।

(“ততঃ কঙ্কেনাচ্ছাদ্য নাতিন্ধিমাং নাতিরুলাং

কবলিকাং দধা বজ্রপট্টেন বন্ধোয়াৎ।” সুশ্রুত সুত্র ৫ অঃ।)

কবলিত (ত্রি) কবলং করোতি, কবল-ণিচ-কর্মণি ক্ত।

১ ভুক্ত। ২ গ্রস্ত, যাহা গ্রাস করা হইয়াছে। ৩ অধিকৃত।

৪ ব্যাপ্ত।

কবলীকৃত (ত্রি) অকবলং কবলং কৃতম্, কবল-ক্-কৃত-কবলিত।

কব্ধ (ত্রি) কু-অবচ্। সচ্ছিন্ন কপাটাди। (পুং) প্রাচীন

খণিবিশেষ। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

কবস (পুং) কু-অন্ (অতঃস্ত্রিযন্যঃ প্রাপিন্দ্যত্যঙ্কিকৃৎ কৃশিত্য ইত্যাদি। উণ ৪.২।) ১ সংনাহ, বর্ষ। ২ কণ্টক জাতি। (কবসঃ সংনাহঃ কণ্টকজাতিশ্চ। উজ্জলদত্ত।)

কবাগ্নি (পুং) কু-অগ্নো অগ্নিঃ কোঃ কবাদেশঃ। অগ্ন অগ্নি।

কবাট (ত্রি) কু-শব্দে—ভাবে অণ্, কবং শব্দং অটতি, কব-

অট্-অচ্। কং বাতঃ বটতি বারগতি বা, ক-বট-অণ্। কপাট।

(“মোক্ষদারকবাটপাটনকরী কালীপুরাধীশ্বরী।” অন্নদাস্তব।)

কবাটক (ত্রি) কবাট-স্বার্থে কন্। কপাট।

কবাটস্ত্র (ত্রি) কবাটং হস্তি শক্ত্যা, কবাট-হন-ঢক্ (শক্তৌ

হস্তিকবাটয়োঃ। পা ৩.২.৪৪।) চোরবিশেষ, ডাকাৎ; বাহার।

কপাট ভাঙ্গিয়া চুরি করে।

কবাটবক্র (স্ত্রী) কবাটং বক্রং যন্মাৎ, ৫তং। কপাটবন্ধে

বা কবাটবন্ধে নামক বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—

“বক্রাগ্র, কপোতবক্র ও অশ্রুজিং।

কবাটী (স্ত্রী) কবাট-অন্নার্থে ডীপ্। ছোট কপাট।

কবার (স্ত্রী) কং জলং আশ্রয়স্থেন বৃণোতি, ক-বৃ অণ্। পদ্ম।

কবারি (ত্রি) কুংসিতোহরঃ কোঃ কবাদেশঃ। কুংসিত শত্রু।

কবাস্থ (ত্রি) কুংসিতস্ত সখা, কু-সখা-টচ্। কোঃ কবা-

দেশশ্চ (পুষ্যদাদিভ্যাৎ।) কুংসিত সহায়বিশিষ্ট।

কবি (পুং) কবতে শ্লোকান্ গ্রন্থতে বর্ণয়তি বা, কব-ইন্। ১

কবিতা গান প্রভৃতি রচয়িতা। ২ বাগ্মীকি। ৩ শুক্র।

৪ পণ্ডিত। ৫ (স্ত্রী) কু অচ্-ই (অচ্ ইঃ। উণ ৪।১৪৮।)

খলীন, লাগান।

(——— কবিধাত্মিকশুক্রয়োঃ।

সূরৌ কাব্যকরে পুংসি স্ত্রাং খলীনে ভু যোষিতি। মেদিনী।)

৬ ভৃগুর পুত্র ও শুক্রাচার্যের পিতা ঋষিবিশেষ। ৭ সূর্য।

৮ কব্ধদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ৯ ক্রান্তদর্শী। ১০ মেধাবী।

১১ চান্দ্রমহু ও বৈরাগ্য প্রজ্ঞাপতিক্তার গর্ভজাত পুত্রবিশেষ।

(“কচ্ছার্যঃ ভরতশ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যস্য প্রজ্ঞাপতেঃ।

উক্লঃ পুরুঃ শতভ্রায়ন্তপ্তবী সত্যাবাক্ কবিঃ।” হরি ২ অঃ।)

১২ স্তোতা, স্তবকর্তা। ১৩ ব্রহ্মা।

কবি—বঙ্গদেশ-প্রসিদ্ধ এক প্রকার গানবিশেষ। যদিও কবি

শব্দের প্রকৃত অর্থ কবিতা-রচয়িতা ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি

কবিতা রচনা করে, ‘কবি’ বলিলে সেই ব্যক্তিকেই বুঝায়;

কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বহুদিন হইতে উক্ত গানবিশেষ এত

প্রসিদ্ধরূপে কবি শব্দে বুঝাইয়া আসিতেছে যে ঐ গীতের

ব্যবসায়িদিগকে সচরাচর লোকে ‘কবিওয়াল’ বলিয়া

থাকে এবং উহার রচয়িতাকে কবির 'বীধনদার' বলে। এইদেশের মধ্যে এই কবিগানের ও কবিওয়ালাদিগের যে কতদিন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সংশয়শূন্য হইয়া স্থির করা বড় কঠিন। বোধ হয় কালিদাসমন যাত্রার অনেক পরে ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, এবং ঐ যাত্রাই ইহার নিদান ও উৎপত্তিস্থান। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রসঙ্গটি কালিদাসমন যাত্রার অঙ্গবিশেষের নাম সুমুর। যাত্রার বালকগণ একত্র হইয়া, একতানে ঐ সুমুর গাহিয়া থাকে এবং সুমুরের ভাবেই রসজ্ঞ ও মতবিশ্বাসী ভাবেকরা, মান, মাধুর্য কি কলঙ্কভঞ্জন কোন্ পালার যাত্রা হইবে, তাহা বুঝিতে পারেন। পাঠকদিগের অবগতির জন্য পরমানন্দ অধিকারীর দলের একটি সুমুর এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

“ও যার অঙ্গ বাঁকা বচন বাঁকা বাঁকা যুগল আঁখি।

জন্ম নিময় পাষণ ও তার শৌন গো বিধুমুখী।

ও মন চুরি করে, বাঁশির স্বরে, ও তা জানে গো জগৎজনে,
তার সঙ্গে রাই প্রেম কর সে কি প্রেমের মরম জানে।”

এই সুমুর গানের পর যাত্রার প্রকৃত পালা আরম্ভ হয়।

ইহার সুর ও তাল মান অতি মধুর। এই সুমুরের অনুকরণ করিয়া পশ্চিমাংশ বর্জমান ও বীরভূম জেলাতে পৃথক সুমুরের দলের সৃষ্টি হয়। তাহাতে খেলের বদলে মাদল বাজে, এবং জ্রী পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়া কৃষ্ণলীলা-ঘটিত সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড় লহরাদি গান করিয়া থাকে। কবির গানের মত ইহাতে উত্তর প্রত্যুত্তরও আছে। যথা,—

“নন্দধোব বলে, ও কুড়হলে,

আজি কানাই বলাই সঙ্গে লয়ে যাব মধুমণ্ডলে।”

উত্তর—“কৈদে যশোমতী কর, নন্দ মহাশয়,

কানাই বলাই কেন নিয়ে যাবে বল কংশালয় ?”

এইরূপ গীতের সহিত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গানের সুর-সারের অনেক সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। যথা—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা হরঠাকুরের ওস্তাদ রঘুর গীত,—

“বদি চলি গোপাল রে তুই মথুরায়,

আয় আয় একবার করি কোলে।

ও তুই কংশযজ্ঞে যাবি, আমারে কীর্ধাবি রে,

একবার ডাকরে ডাক জন্মের মতন মা বলে।”

কবির আসরে প্রথমতঃ ভবানী-বিষয়, পরে সখী-সংবাদ, তার পর বিরহ এবং সর্বশেষে লহর ও খেউড় গাইবার নিয়ম। তর্পী ও ভাষাদি শক্তির স্তোত্র এবং লীলাদি বর্ণনা-সম্পর্কীয় ভক্তিমূলক কি বীররসের গানের নাম ভবানী বিষয়;

অথবা ‘ঠাকুরণ বিষয়।’ কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ব্রজাঙ্গনা ও সখীদিগের উক্তি গীতকে সখীসংবাদ বলিয়া থাকে এবং পতিবিরোগবিধুরা বিরহিণী কামিনীদিগের বিরহ-বস্ত্রপা-প্রকাশক গীতগুলি বিরহ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই বিরহে কখন কখন পুরুষের উক্তিও শুনিতে পাওয়া যায়। শ্লেষ, ব্যঙ্গ, কাব্য ও পরিহাসাদি ভাবের গানের নাম লহর এবং আদিরস-ঘটিত গীতের নাম খেউড়। ভক্তভাবের খেউড় প্রায় আকার-ইচ্ছিতে ও ভাব-ভঞ্জিতে খুব প্রচ্ছন্নভাবে রচিত ও গীত হয়। ইহার নাম সাদা খেউড়। আর কখন কখন কোন কোন খেউড় এত অঙ্গীল শব্দে ও বীভৎসরসে রচিত হইয়া থাকে যে, তাহা শুনিতে কর্ণে হস্তার্পণ করিতে হয়। দুই ব্যক্তি একত্র হইয়া শুনা দূরে থাকুক, নির্জনে আপনা আপনি মনে করিতেও ঘৃণা ও লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু মানবচরিত্র কি অজুত ও কালের কি কুটিলগতি! কিছু দিন পূর্বে এই বঙ্গদেশে মহা-মহা বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, অধ্যাপক ও রাজা রাজওয়াড়ারা, পিতা-পুত্রে একত্র বসিয়া অতিশয় যত্নপূর্বক এই খেউড় শ্রবণ করিতেন। কবির জৈষরচন্যে শুণ্ড প্রভৃতির হাপ-আখড়াইয়ের গীতের মধ্যেও উক্তপ্রকার অঙ্গীল শব্দপূর্ণ আদিরসের বিস্তর খেউড় দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। নবমীপাৰিগতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঘরে শারদীয়া পূজার সময় নবমী-কীৰ্ত্তন উপলক্ষে নবমীপূজার দিন মহিষ বলিদানের পর কাদা-খেউড়ের সময় স্বয়ং মহারাজ, যুবরাজ ও আর আর রাজকুমারদিগকে নিজে নিজে এক-একটি সকার-বকারের খেউড় রচনা করিয়া গাইতে হইত এবং কখন কখন পরস্পর ছড়া কাটা-কাটি ও উত্তর-প্রত্যুত্তর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন,—

“কি হ’ল ওলো ঠাকুরঝি” ইত্যাদি খেউড়টি রাজকুমার শিবচন্দ্রের রচিত বলিয়া প্রবাদ আছে। উক্তবংশে অদ্যাপি এই রীতি প্রচলিত আছে কি না, বলা যায় না; বোধ হয় না থাকাই সম্ভব।

কবির দুই দল থাকে, একদল গান গাহিয়া থাকিলে, অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করে। গীতের সেই উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া সভাসদেরা কাহার জয় বা কাহার পরাজয় হইল, তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। প্রতি কবির দলেই একজন বা দুইজন করিয়া গীত-রচক বা বীধনদার থাকেন। এখন কবির গান আর তেমন শুনা যায় না। লোকের পূর্ববৎ অহরাগ না থাকায় ‘কবি’ লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন কবির অনুকরণে লেখক ‘হাপ-আখড়াই’ গান মধ্যে মধ্যে শুনা যায়।

বাঙ্গালা সনের একাদশ শতাব্দীর পূর্বে প্রকৃত কবি-
গান ও কবিগোলা বিদ্যমান থাকার কোন কথা শুনিতে
পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ হুগুঁঠাকুরের ওতাদ রঘুর পূর্বে
আর কেহ প্রকৃত কবিগোলা বলিয়া ছিল না। কেহ কেহ
বলেন, 'মতে' ও নন্দ কবিগোলায় দল রঘুর পূর্ববর্তী।
যাহা হউক, ইহার পূর্বে বোধ হয় বহুলোক একত্র হইয়া,
বৈঠক করিয়া কবির ছায় কোন একরকম গান করিতেন,
যেহেতু উত্তরকালবর্তী কবিকে অনেক প্রাচীন লোক
'দাঁড়া কবি' বলিতেন। যথা,—“এদের বাড়ী দাঁড়া কবি
হইতেছে।” “এটা দাঁড়াকবির রুর” ইত্যাদি। যাহা
হউক, একমতে রঘু হইতেই দাঁড়াকবি বা প্রকৃত কবির
সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। রঘুর দলের অনেক গীতের সুরসার
তদুত্তর কালবর্তী কবিগোলাদিগের ছায়। যথা, সখীসংবাদ,—
“তোরা বলিস্ত আমি তোদের সঙ্গে যাই,
বুলে আর আমার মনেতে কাজ নাই।

কুলপঙ্কজ কত ডুবে রব।

ও কলঙ্ক গলার হার, শঙ্কা কি আমার, ডকা মেরে চ'লে যাব।”

রঘু যে কি জাতি ছিলেন, এবং কোথায় তাঁহার বাস ছিল,
তাঁহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় না, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখ
হইতে এই বিষয়ে ভিন্ন রূপ কথা শুনা যায়। কেহ এই
রঘুকে রঘুনাম দাস চর্যাকার বলিয়া নির্দেশ করেন, কেহ
বা ভদ্র শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ বলেন, কলিকাতার
নিকটবর্তী শালিখাতে রঘুর বাস ছিল, আবার কেহ বলেন,
শুষ্টিপাড়া রঘুর জন্মস্থান। রঘুর পরে, কি তৎসমকালে
'রামুন্সিংহ', যাহাকে 'রামু নরসিং' বলিয়া থাকে, এবং
লালুনন্দলাল ও গোপলা শুই এইনামে কয়েক ব্যক্তির দল
থাকার কথা কাহারও কাহারও নিকট শুনিতে পাওয়া যায়।
কিন্তু তাঁহারা যে কি প্রমাণ অঙ্গুদারে ঐ কথা বলিয়া
থাকেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন
লোকপরম্পরায় রামু নরসিংএর ও লালুনন্দলালের কথা শুনা
যায় বটে; তাহাদের মধ্যে রামুন্সিংহেরই যে ছই একটি
গান শুনা যায়, তাহাই ভারপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। যথা,—

(মহড়া)— “সখি এ সকল প্রেম প্রেম নয়।

ইহাতে মলিয়ে নাহি হুখের উদয়।

হুদয়ভঙ্গ, লোকপঙ্গ, কলঙ্কভাজন হ'তে হয়।

(চিঠেন)—এমনে পীরিতি করি, বা'তে তরি ছবিকে,

এহিক আর পার্থিকে,

ঈরনন্দন, চ'বতঙ্গ, সখা রাবি মন ভাষি পার।

(অন্তরা)—অমির তাজে, পরলে মজে, উপজে কি হুখ,

কলঙ্কবোধ, অপতে মরণ হ'তে অধিক,

(পরচিঠেন)—হুদয়-মন্দির মাখে, রসরাজে বসায়,
যেখিব আখি মুদিয়ে,
বিকারে সে পড়ে, বাঁধিব হুদয়ে, কলঙ্কবিচ্ছেদে নাহি ভয়।

(অন্তরা)—মনেরে ক'রে চাতক পাখী রাখিব বিশেষে,

জলং দেখি জলং দেখি ডাকিব প্রেমের প্রমোদে,

(চিঠেন)—কলঙ্কজ্ঞান সে নীরব হইতে,

জাকবী হ'লেন বাহাতে,

সেই কুপা জলে, মন ডুবায়, কাঁলেয়ে করিব পরাজয়।

(অন্তরা)—কমলজ জন, সেখিত ধন, অরুণ চরণে,

মনের ভিমির বিনাশে পাইলে করিবে।

(চিঠেন)—হুখে আছে শতদল, সে কমল ফুটিবে,

প্রেম দীঘ্ব যটিবে,

মনো মধুভ্রত, হ'বে যেন রত, সেই নামায়িত হুখা খায়।

(শেষ অন্তরা অথবা কলি) —

অমির আর গরল, দুই রাবিরে সাক্ষাতে,

নয়ন দিরাছেন বিধাতা দেখিয়ে ভথিতে;

ভালিয়ে এ হবারল, কেন বিধ ভথিবে?

কলঙ্ক-কুপে ডুবিবে,

থাকিতে নয়ন, অজ যেই জন, পেয়ে প্রেমধন সে হারায়।”

এই কবির রচিত বিবহ যথা,—

(মহড়া)—“কহ সখি কিছু প্রেমের কথা।

ঘুচাও আমার মনের ব্যথা।

করিলে প্রণব, হয় দিব্যজ্ঞান, হেন প্রেমধন উপজে কোথা।

আমি এসেছি বিরাগে, মনেরি রাগে, গীতিরি প্রাণে মুড়াব মাথা।

(চিঠেন)—আমি রসিকের স্থানে, পেরেছি সন্ধান,

জুসি নাকি জান প্রেম-বারতা।

কাপটা তাজিয়ে, কহ বিবিরে, ইহার লাগিরে এসিছি হেথা।

(অন্তরা)—হায় কোন প্রেমলাগি, অশ্লাঘ বৈরাগী,

মহাদেব যোগি, কেমন প্রেম?

কি প্রেম কারণে, ভগীরথজনে, ভাগীরথী আনে ভারতভূমে।

(পরচিঠেন)—কোন্ প্রেমে হরি, বধে রজনীরী,

গেল মধুপুরী, ক'রে অনাথা।

কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে, কৃষ্ণপদেলে মাধবীলতা।”

রামু নৃসিংহের একগু গীত আর বড় দৃষ্ট হয় না। তবে

তাঁহার অধিকাংশ গানই একটু সাত্বিক ও ভক্তি ভাবের।

করাসভাগার নিকটবর্তী গোদলপাড়ার রামুন্সিংহের
জন্মস্থান বলিয়া খ্যাতি আছে। ইনি কায়স্থকুলোদ্ভব ভদ্র-
সন্তান, বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর পর ষোলশ শতাব্দীতে
প্রাক্তভূত হয়েন এবং ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ইহলোক
পরিত্যাগ করেন। কবিগোলা লালুনন্দলালও এই সময়ের
লোক। কিন্তু ইহার দলের অধিক গান প্রচারিত নাই।
তাঁহার একটি পাঠকগণের অবগতির লজ্জা এখানে উদ্ধৃত
হইল। যথা,—

(মহড়া)—“হ’ল এ স্থল লাভ পীরিতে।

চিরদিন গেল কাঁদিতে।

(চিতেন)—হ’রেছে না হ’বে কলক আমার গিরেছে না বাবে কুল,

ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর

শেষে এই হ’ল কাণ্ডারী পালাল, তরঙ্গী লাগিল ভাসিতে।

(অন্তরা)—খন প্রাণ মন যৌবন বিরে শরণ লইলাম যান্,

তবু তার মন পাওয়া সখি আমার হ’ল ভার,

না পুরিল সাধ, উদয় বিচ্ছেদ, মিছে পরিবাদ জগতে।” ইত্যাদি

ইহার পরই হরুঠাকুরের সময়। অহুমান বাঙ্গালা ১১৪৫

কি ৪৬ সালে কলিকাতা সিমুলিয়ারে হরু (হরেকৃষ্ণ) ঠাকুর

য়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কালীচন্দ্র দীর্ঘাকী।

হরু প্রাথমতঃ সখের দল করেন, তৎপরে অনেক বিলম্বে

পেশাদারী দল করিয়াছিলেন। তিনি পেশাদারী কবিওয়ালা

হইলেও কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই তিন স্থানের

রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি

জন্মকবি এবং ইহার কবিতাশক্তি স্বভাবসিদ্ধ। সর্বাঙ্গপেক্ষা

রাজা নবকৃষ্ণই হরুকে বড় সমাদর করিতেন ও ভালবাসি-

তেন। ইহাতে তাঁহার সভাশক্তিতে অধ্যাপকেরা মনে মনে

একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাদিগের এই ভাব

বুঝিতে পারিয়া, যে সময়ে তাঁহার প্রাতঃস্নানের পর রাজাকে

আশীর্বাদ করিয়া যান, একদিন সেই সময়ে রাজা তাঁহা-

দিগকে বলিলেন,—যে “গতরাত্রে পূর্ণচন্দ্র দর্শনে আমার

মনোমধ্যে একটি ভাবের উদয় হইয়াছে, অচুগ্রহৃদয়

আপনারা সেই ভাবের একটি পুরাণপ্রসঙ্গটি কবিতা

পূরণ করিয়া দিলে, মনে বড় আনন্দ হয়।” অধ্যাপকেরা

কহিলেন, “তার আশ্চর্য্য কি? কি ভাব, আজ্ঞা করুন।”

রাজা কহিলেন,—“বড়িশে বিধেছে যেন চাঁদ।” অধ্যাপকেরা

একে একে সকলেই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই ভাবের

উদ্যোগ ও ক্ষুরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা

লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—“মহারাজ! ভাবটা বড় কূট;

একটু চিন্তা করিয়া কল্য কবিতা প্রস্তুত করিয়া দিব।”

এই কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ একজন চোপদারকে

কহিলেন,—“যাও, হরুঠাকুর যে ভাবে থাকেন, সেইভাবেই

তাঁহাকে আসিতে বল।” আজ্ঞানুযায়ী চোপদার গিয়া হরুকে

রাজা নবকৃষ্ণের আদেশ জানাইল। হরু তখন তৈল

মাখিতে ছিলেন, শুনিবামাত্র গামছা দোছোটে রাজসভায়

আসিলেন। রাজা হাসিতে হাসিতে হরুকে ঐ ভাবটি বলিয়া

একটি পুরাণোক্ত গীত রচনা করিতে বলিলেন। কবিতা

দেবীর অহুগ্রহে, হরু তৎক্ষণাৎ একটি সেই ভাবের সখী-

সংবাদ প্রস্তুত করিয়া, মহারাজ ও সভাস্থ সকলকে শুনাইলে,

সকলেই ধস্তাধস্ত করিয়া, হরুকে সাধুবাদ দিলেন ও রাজাকে কহিলেন, “আপনি প্রকৃত রসজ্ঞ ও ভাবজ্ঞ বলিয়াই হরুর এত আদর করেন। আমরা হরুর ঐদৃশী শক্তি জানিতে ও বুঝিতে পারি-নাই।”

হরুঠাকুরের সখীসংবাদ বড় প্রশংসনীয়। সখীসংবাদ—

(মহড়া)—“তোমার ভাব দেখে করি অমুভাব ভাব বুঝি কুরাল।

দিন দিন, রসহীন হ’লে প্রাণ, ওরে প্রাণ,

তুমি আছ সেই তোমার প্রেম দুকাল।

একি ভাব, গেছে পূর্বের সে সব ভাব, অজাবে ভাব মিশাল।

তোমার লোকে কর, রসময়, মিথাময় সে রস পরের কাছে হয়,

যরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়,

তোমার আমার আছে আশ্রি, হয় শিরে সংক্রান্তি,

যেন শান্তিভক্তকে পাঠ এগোলো।

(চিতেন)—সেই তুমি সেই আমি সেই প্রাণ, নতন নয় পরিচয়,

তবে প্রাণ হ’লে রসের অহুগ্রহ বিরস বদন কেন হয়,

পেলেম বাসায়ে পরীক্ষে, (ওরে প্রাণ)

তোমার অবাচক ভিক্কে চক্রে রেখে চাওনা পোড়া চক্কে,

তোমার সদাই বদন বাঁকা, হয় যখন দেখা (প্রাণ)

সে সব শশিমুখের হাঁসি কমনে গেল।

(অন্তরা)—প্রাণ যেমনে ভুলা’লে এ মন, তোমার কোথা মন,

কেমন কেমন দেবতে পাই।

বলনা কোন্খানে মন হারাল রে প্রাণ না হয় আমিও

সেই পথে বাই।

(পরচিতেন)—নাই এখন তোমার সে হৃদয় হৃদয় হৃদয়,

কোথা হয়, যেন কে করে কি কর, ও প্রাণ এমনি অজ্ঞ মন,

তুমি রসিক নও তানয় প্রাণ, রাখ হান বিশেষে মান,

কোন্ রাজ্যে ধান, কোন্ রাজ্যে বাণ,

আমি হাজা প্রজা ব’লে, জলে প্রাণ জলে প্রাণ,

আমার হৃদের সময়ে তোমার রস শুকাল।

(কুঙ্কো)—প্রাণ বলবো বলবো করি, ভয়ে বলতে নারি

সদাই ভারি ভারি মূখ।

এমন হৃদের দেখা পাই না হে রসরাজ করি হাত রহাত কোঁড়ক।

(শেষচিতেন)—আমি জানি আমি হ’তে প্রাণ হৃদের স্থান তোমার নাই

(ওরে প্রাণ)

এখন কোথায় জুড়ো প্রাণ সেই কথা শুনতে চাই,

মনে এই বড় তিতিকে (ওরে প্রাণ)

আপনার রাগিতবন্ধে হৃৎকলদান কর বিপক্ষে,

হ’রে আশার উদ্যোগী সন্তোষী মন হ’ল।

গেমের ছায়া লেগে কারা কই জুড়াল।”

হরুঠাকুর রচিত বিরহ।

(মহড়া)—“ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার জীবন যৌবন।

এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন

সে চাহেনা আমি তার যোগাই মন।

(চিহ্ন) —বেথানেতে না রছিল মালী জমদার মাল,
সে কেমন অজান তারে পূর্ণে গ্রাণ,
সেধে কেঁদে হ'য়ে গেছে কলকতাকদ।

(অন্তরা) —একি প্রাণের রীতি সই গুনেছ এমন,
কেহ মখে থাকে কেহ হুখে আলাতন,

(চিহ্ন) —পরমে যখনে মনে বে বা'রে খেয়াল,
সে জন তাহার কিরে নাহি চার,
তথাপি না পারে তারে হ'তে বিসরণ।

(অন্তরা) —সখি পিরীতি পরম ধন জগতের সার,
হুজনে কুজনে হ'লে হয় হারবার,

(পরচিহ্ন) —সামান্য খেদের কথা একি প্রাণ সই
কারেই বা কই, প্রাণে মরে রই,
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাজন।

(কুঁকো) —বা'রে ভাবিবা আপন সই তার এ বোধ নাই,
এমন প্রেমের মুখে তারো মুখে ছাই,

(চিহ্ন) —হেন অরণ্যেরোদনে ফল আছে কি
এ হ'তে হথী একা যে থাকি,
ধ'রে বেঁধে করা কিনা প্রেম উপার্কন।

(অন্তরা) —যার বড়াব লম্পট সই তার কি এ বোধ,
আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ,

(চিহ্ন) —অতিষ্ঠ উভয়েতে হওয়া এ কেমন,
এজন মিলন না দেখি কখন;
রথু বলে কোথা মিলে দুজনে হুজন।

বিরহবর্ণনার রামবল্লভের সমান কেহই নয়। তবে হরু
ঠাকুরের রচিত বিরহের মধ্যে দুই একটি গীতে বিলক্ষণ
জ্ঞাবের গাঢ়তা ও রচনার নিপুণতা দেখা যায়। বিশেষতঃ
আর আর যত কবি, সকলেই বসন্ত ঋতু অবলম্বনপূর্বক বিরহ
রচনা করিয়াছেন। কিন্তু হরু বর্ষা ঋতু আশ্রয় করিয়া, যে
একটি বিরহ রচনা করিয়াছিলেন, সেটি অতি মধুর ও তাহাতে
হরুঠাকুরের বেশ কবিত্ব শক্তির প্রকাশ পাইয়াছে। যথা,—

(চিহ্ন) —“হথীর ধার বহিছে এই ষোড়শরা রজনী।
এ সময়ে প্রাণসখিরে কোথায় গুণমণি।

যন পরজে ঘন শুনি;
ঐ ময়ূর ময়ূরী হরষিত হেরি চাতক চাতকিনী।

(অন্তরা) —এ কদম্ব কেতকী চম্পকজাতি সেউতি সেকালিকে,
জাগেতে আগেতে যোহি জম্মার প্রাণনাথ গৃহে না দেখে,
বিদ্রাঘ ধ্বংসাত দিবাজ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি।

প্রিয়মুখ মুখ দিয়ে শরী শুক থাকে দিবস রজনী।

হরুর শেখাবস্থার এবং তাহার দেহাবস্থানের পর নীলু,
রামপ্রসাদ, উদয়দাস, পরাণদাস, নিত্যানন্দদাস বৈরাগী,
জুবানীবেনে, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ, কান্দীনাথ
পাটনী ও তৎপুত্র নীলুহরি পাটনী, জোলাধরদাস, চিত্তাম্বরদাস,

বলরাম কপালী এবং আশুতুনি সাহেবের কবির দল হয়।

এই দলগুলির মধ্যে নীলু ও রামপ্রসাদের দলই সর্বাঙ্গ-
বর্তী। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দলগুলির আবির্ভাব
হওয়া বলিয়া বোধ হয়। তবে ইহার মধ্যে কোন্ দল
কখন অর্থাৎ কে আগে ও কে পশ্চাতে হয়, তাহা ঠিক
করা কঠিন। তবে পূর্বোক্ত দলগুলি যে সমকালবর্তী,—

তাহা ঐ সমস্তদলের মধ্যে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা
জানা যায়। ইহার কিছুদিন পরেই গোবিন্দ আরজখিণি,
উদয়দাস, নিতাইদাসের পুত্র, এবং তাহার পুত্র কৃষ্ণদাস
(পর্ষস্ত নিতাইদাসের দল রাখিয়াছিলেন) এবং পরাণ-সিং
সর্বশেষে প্রোদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত
দলখিণিতরাই যে স্বয়ং গীত-রচয়িতা ছিলেন, তাহার
কোন প্রামাণিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকের
দলে পৃথক বীধনদার থাকিত এবং অনেকেই নিজে
গান প্রস্তুত করিতেন। নীলুঠাকুর, মোহন সরকার, জুবানে
বেণে ও ঠাকুরদাস সিংহের দলে অনেক সময়ে বিখ্যাত কবি
রামবল্লভ গান দিতেন। তৎপরে তিনি নিজে দল করিয়া
আর কাহারও দলে গান দেন নাই। গৌরকনাথ ঠাকুর
বলিয়া একব্যক্তি সাহেবের দলে বীধনদার ছিলেন। নীলু
পাটনীর দলে সমস্ত গীত একজন ‘কুঁকুরমুখো গোরা’ নামক
বীধনদারের রচিত।

বীধনদারদিগের মধ্যে সকলে যে শিক্ষিত ও ভদ্রলোক
তাহা নহে। অনেকে অশিক্ষিত ও অভদ্র ছিলেন। ইহার
মধ্যে কাহার কাহার বর্ণজ্ঞান পর্যাপ্ত ছিলনা, কিন্তু এমনি
সরস ও ভাবপূর্ণ গীত রচনা করিতে পারিত যে তাহা শুনিয়া
শাস্ত্রজ ব্যক্তিকেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হইত। প্রবাদ আছে যে
পাটনীর দলের বীধনদার কুঁকুরমুখো গোরা কেবল মুখে
মুখে বড় বড় ওস্তাদিদের গীতের উত্তর দিত এবং ঐ
সমস্ত উত্তর গানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গগীত গুট ও শুদ্ধ ভাব সকল
সন্নিবেশিত থাকিত। একবার নিতাইদাস নীলুপাটনীকে
“দাঁড়বাওয়া পাটনী” বলিয়া প্রেব করিয়াছিলেন, তাহাতে
গোরা ঐ গীতের উত্তরে বাবাজিকে প্রেব করিয়া বলে—
“তোমর জাত খুঁজেরাত কাবার হলো ডুব দিয়ে পেলেমনা খাই।
নিজের আদ্যি কি ভেবে দেখের বৈরাগী নিতাই ॥

ছেড়ে শর ক্ষীর ননী,

সেই বশোদার নীলমণি,

যতো বৈকুণ্ঠী পার কব্বে বলে দণ্ড ধমে আছি ভাই।” ইত্যাদি।

কবিওয়ালাদিগের মধ্যে কবিত্ব শক্তি অল্পাধিক পর্যায়
বদ্ধ করিতে হইলে হরুর পর রামবল্লভ কথা উল্লেখ করা—

কর্তব্য বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু সময়ের পূর্ণকার ঘটনা ধরিলে নীলুঠাকুরের দলকেই হরুর আসন্ন নিকটবর্তী বলিয়া গণ্য করা উচিত। চুঃখের বিষয় এই যে নীলুব দলের অধিক গীত প্রকাশ নাই, যাহা কিছু আছে, তাহাও রামপ্রসাদ ঠাকুরের রচিত বলিয়া বিখ্যাত, একত্ব তত্তাবৎ রামপ্রসাদ ঠাকুর প্রসঙ্গে প্রকাশ করাই কর্তব্য। নীলুব পর রামপ্রসাদ ঠাকুর নীলুগাটনীর দল রাখেন। রামবহুব্রত একটি গীতে তাহার একথা প্রকাশ আছে, যথার্থানে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। নীলুঠাকুরের পর নিতাইদাসের দলই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দল বলিয়া খ্যাতি আছে। নিতাইদাসের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী। ফরাসডাকার ইং-রাজ্যধিকৃত চন্দননগর ইহার জন্মভূমি। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব এবং বালককাল হইতেই ইহার গাহনা বাজনায় বড় অজুরাগ। সৰ্ব্ব প্রথমে নীলুঠাকুরের কবির দলে গান করিতেন, তার পরে নিজে দল করেন। কিন্তু সকল গীত স্বয়ং রচনা করিতেন না, নবাইঠাকুর ও গৌর কবিরাজ নামে দুই ব্যক্তিও ইহার দলে বাঁধনদার ছিলেন। ইহার দলের গীত বিলক্ষণ সারগর্ভ ও সাহিত্যিকতা পূর্ণ। যথা,—

সখী-সংবাদ।

(মহড়া)—“কিরে কিরে চার কিরে বার ঐ ভামধন।

পিরায়ী ধানিক বই, বলবে কুক কই কই
তখন কোথা বাব কোথা পাব ভামের অবধন।
অভিমানের রয়েচেন মানিনী রতন,
মানের অধীন হয়ে কোন দিন
কি বটিবে মানে মান বাবে, এগ বাবে, মাধব বাবে;
না মরিব দেখিব তখন ;
পেরারী কেমন না হয়ে কালবরণ।

(চিতেন)—বা করে তা কক্ক রাই সই তাহে ক্ষতি নাই,
কেন্দে কুক যায় কিরে, চাইতে চাইতে রাধারে,
যখন বাই রাই রাই রাই মাধব বলে,
অমনি বরান ভাসে ভামের নয়নজলে ;
কণেক কুলের বাহিরে যায়, কণেক চাঁড়ার
চলিতে না চলে চরণ।

(অন্তরা)—রাধার একি মান সইগো, রাইকে মানা কর,
মানে সঙ্গে রাই, ভামের আর সে পিরীত নাই,
এখন মানের সঙ্গে পিরীত হল,
মানিনী কুক প্রতি, কোপে সঙ্গে হঠাৎ অধীরা অতি,
এবে হয়ে রাধা মানগ্রস্ত

“অমনি ভামের প্রতি হল খল হস্ত,—

(পরচিতেন)—কিহুজ্ঞেতে চলিতে সই বৃন্দের প্রতি কর ;
দাসবরীর মান ঘেরে হুসি হে বিষর।

রাধার যুগলচরণকমল করে ধরি,
অমনি বৃন্দার লুটিত বংশীধারী,
তখাচ মান নাহি গেল উখলিল দুর্ধরমান-সরোবর।

বিশেষতঃ উক্ত বৈরাগীর দল ত্রিপুরকবোক্তি আর
তেমন বড় একটা গুনিতে পাওয়া যায় না। যথা—
(মহড়া)—“পীরিতের কি ধার ধারো তুমি এগ,
এতো নবীনা দারারো কর্প নর, ইথে প্রবীণতা অতিশয়,
কখন রাধা, কখন প্রজা, কখন বা বোণী হ’তে হয়।
মথি আধি মনঃপ্রাণ, সধা সাধমান,
ধান লবসাধনের প্রায়।

(চিতেন)—আগে মাধার লইয়ে কলকের ডালি,
কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

মান অপমান সইরে ইথে নাহি থাকে লোকলাভ ভয়।
দীপে পতঙ্গ যেমন, হরলো পতন, দাহন করিতে নিজ কার।

(মহড়া)—এই খেদ হয়, তবু বল পুরুষ ভাল নয়।
যখন দক্ষবজ্রে সতী ভাজেছিলেন এগ,
তখন যুতদেহ গলার গৈথে রাপলেন যুত্ভঙ্গর।

(চিতেন)—কথার কথার ক’রে অভিমান, তিলে ক’রে বসে ভাল,
ও ধনী না জানি কেমন পুরুষের কপাল ;
যদি পুরুষ পাতকী হবে,
তবে পাণ্ডবেরা দারীর সঙ্গে বনে কেন বেড়াবে ;
দেখো তারা একা নয়, হরি দয়াময়,
মানে ধরেছিলেন রাধার পদধর।

(মহড়া)—আর দারীরে করিনে প্রত্যয়।
দারীর নাইকো কিছু ধর্মভয়।

(অন্তরা)—দারী মিতে যেমন, ভুলতে তেমন, দুই দিকে তৎপর।
মজিরে পরে চার না কিরে আপনি হয় অন্তর।

(চিতেন)—উত্তমেরে ত্যাক্য করে অধম যতন,
দারী বারি দুই জনারি নীচপথে গমন,
তার অমাণ বলি এগ, মলিনী-তপনে তাজিহে,
বনের পতঙ্গ সে জুড় তারে মধু-বিতরণ।”

নিতাইদাসের সমকালবর্তী আর একজন কবিওরাণা
ভবানে বেনে। ইহার প্রকৃত নাম ভবানী, জাতিতে গন্ধবপিক,
কলিকাতার নিকটবর্তী উপনগর বরাহনগর ইহার বাস-
স্থান। কেহ কেহ কহেন যে, অধিকাকালনার নিকট সাত-
গেছে ভবানের জন্মস্থান, বরাহনগরে তাহার দল থাকিত
বলিয়া লোক তাহাকে উহার বাসিন্দা মনে করিত।

ভবানে প্রথমতঃ রামবহুর নিকট হইতে গীত লইরা
প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভবানের দল এক সময়ে নাম-
লক হইয়াছিল। প্রায় নিতাইদাসের সঙ্গে ইহার লড়াই
হইত এবং তৎকালবর্তী লোক “নিতে ভবানের” লড়াইকে
“বাঘে মহিষের লড়াই” বলিতেন। ঐ দুইজনকে

প্রতিশ্রুতি হইরাছিল, যেখানে ভবানে সেখানে নিতে,
যেখানে নিতে সেইখানে ভবানে। পাঠকদিগের অবগতির
জন্ত নিতে ভবানের এক একটি গান নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

নিভাইদাসের রচিত বিরহ।

(মহড়া) — “কোকিল রে কিছু দয়া ধর্ম বাই তোমার শরীরে,
হয়ে মনের অহুচর, রাখার জ্বালাবে নিরন্তর,
তবে ক্রীড়ার ভাগী করিয়া তোমারে;
বেধে ব্রজমথরে।
সেই কুকপ্রেমে যজ্ঞ ত্রিগুণে মাঝে কালকলী হল নাথ,
আবার সে কাল হ'লো আবার বাস;
আবার কাল তমালডালে ঐ কাল কোকিল,
বসন্তকাল জ্বালায় আবারে।

(চিহ্ন) — নিরোধ করিলে তোমার না শুন কথা,
দেখি তোমার রীত একি বিপরীত,
দেহ বারে বারে অন্তরে ব্যথা; —
যদি তোমার রব শুনে মরিরে পরাণে,
তবে তোর গতি হবে কি,
বিহব তুই কাননের পাখী;
তুমি না চেন আশ্রয় হান্বেছ পঞ্চর,
দুঃখিনী কমলিনীর হৃদপিণ্ডের।

(অন্তরা) — ওরে কোকিলে রাখরে কমলিনীর মিনতি,
কুকপ্রেমের অনল জ্বলে আবার তার দিতেছরে আহতি; —
রাখার হ'য়ে মধুপুরে যেতে ত পারেনা এই শ্রীমতীর হ'ল কি দুর্গতি।
মনের খেদে প্রাণে ঝাঁটিনে, যদি আজ হে কুব্জবনে শ্রীকৃষ্ণবিন্দে,
প্রাণেতে মরি, তবু অন্তে পাব শ্রীহরি;
ওরে তোমার কি কঠিন প্রাণ, জ্বালালে রাখার প্রাণ,
একাকী পেরে কুব্জকূটরে।”

ভবানেবেনের দলের রচিত বিরহ।

(মহড়া) — “একবার কুব্জবনে কুক বলে ডাকরে কোকিলে।
মধুর কুব্জবনে শুনে তাপিত প্রাণ জুড়াবে গোপীগণে;
নীরব হয়ে বসে কেন রইলি তমাল ডালে।
জুড়াবে গোবিন্দবাসী গোপী সকলে,
ওনাও মধুমধা মধুর, ওরে পিকবর, রাখার কর্ণকূহরে।
হুমধুর হয়ে কুক কুক কুক বল,
আনি দুঃসহ বিরহ ও নামে বিরূপ হয়,
কুকপ্রেমের জ্বালা বাবে কুব্জবনে নিলে।

(চিহ্ন) — বসন্ত সময় ব্রজে হ'লনা বসন্তের অভ্যুদয়,
মৃতী কুকবিচ্ছেদে মনের খেদে কোকিলেরে কর,
সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীম বৃন্দাবনে নাই;
হুঃখের কি দিব সখের কুকপূর্ণপদ, অজ ঢেলে আছে রাই,
জুড়ার কমলিনীর জীবন ব্যাধার ব্যাধী এমন কে,
ওরে পক হও সাপক দুখিনী বলে।

(অন্তরা) — আমরা দুখিনী গোপী বিরহিনী কুকবিরহে
বেধে বিহব বিনে ব্রিতর অবশে অহু মরে;
কুক হয়েছে রাখার কলহর, শোন্সে ওরে পিকবর,
যে পার জীবন এখন ওরে কুব্জবন শুভালেণ”

নিভাইদাস যেমন গাহিয়ে তেমনি বাজিরে ছিলেন। তাঁহার
সম ঢুলী তৎকালে কেহই ছিল কি না সন্দেহ। সহর করান-
ডাঙ্গা নিবাসী শ্রীধারামবাইতির পুত্র দেশবিখ্যাত মোহন
ঢুলীই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গ করিত; কিন্তু যখন গাহিতে
গাহিতে তিনি বড় উত্তর হইতেন, তখন মোহনের কন্ধ
হইতে ঢোল লইয়া নিজে বাজাইতেন এবং তাঁহার আড়ি
পরম ও তিহাইয়ের চোট শুনিয়া মোহন বারবার তাঁহার
পায়ের ধলা লইত।

কবিওয়ালা মোহন সরকার ও ঠাকুরদাস সিংহের নিজের
কোন গীত প্রসিদ্ধ নাই, এজন্য তাহাঙ্গিণের কথা পৃথকরূপে
আর কিছু বলা হইল না। ইহারা দুইজনেই রামবহুর
সাহায্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। অতএব রাম-
বহুর পরিচয়েই ইহাঙ্গিণের পরিচয় হইবে। এই সময়েই
কবি রামবহুর নাম জাহির হইয়া উঠে এবং তিনি পৃথক
দল করেন।

৮ রামবহুর প্রকৃত নাম রামচন্দ্র বসু, কলিকাতার নিকট
ভাগীরথীর পরপারস্থ শালিখাগ্রামে অতি ভক্তকুলীন কার্যের
ঘরে ইহার জন্ম এবং ইনি জন্ম কবি। অতি বালাবস্থায় যখন
সহর কলিকাতায় ঘোড়াসাঁকো-নিবাসী ৮ বারাগসী ঘোষের
বাটীতে রামচন্দ্র তাঁহার গিশামহাশয়ের নিকট লেখাপড়া
শিক্ষা করিতেন, তখন হইতে কলাপাতে তিনি গীত রচনা
করিয়া ফেলিয়া দিতেন, কবিওয়ালা ভবানেবেনে সর্বপ্রায়ে
তাঁহার এইরূপ অসাধারণ রচনাশক্তি জানিতে পারিয়া
গোপনে তাঁহার নিকট হইতে গান লইতে আরম্ভ করে।
তিনি কিছুদূর পর্যন্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া কিছুদিন
কেরানীগিরি চাকরী করেন, কিন্তু কবিতা-রচনা বিষয়ে
তাঁহার এমন অনুরাগ ছিল যে, সে চাকরী তাঁহার ভাল
লাগিল না। তিনি কেবল কবিতা-রচনাতেই জীবন দীক্ষিত
করিলেন। প্রথমতঃ তিনি কাহারো নিকট হইতে কিছুই
গ্রহণ করিতেন না, তারপর প্রয়োজন সাধনের জন্ত অগত্যা
তাঁহাকে কিছু কিছু স্বর্ধ গ্রহণ করিতে হইরাছিল। পূর্বতন
লেখকদিগের প্রামাণ্যস্বারা সর্বপ্রায়ে ভবানে-বেনের দলে
তাঁহার গান দেওয়া বলিয়া মনে করিতে হয়, তাঁর পর নীলু-
ঠাকুর, পরে মোহন সরকার, তখনন্তর ঠাকুরদাস সিংহ, অব-
শেষে তিনি নিজ নামে দল করিয়া এই বঙ্গদেশের মধ্যে

বধেই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার দেহাবসান হয়। তিনি ৪২ বিরাজিৎ বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা ১২৩৫ কি ৩৬ সালে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সহর মুন্সিবাধারের কান্দিমবাজারস্থ রাজা হরিনাথ কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে শায়িত। পূজার সময় গান করিতে গিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন এবং সেই পীড়িতেই তাঁহার আত্মা শেখ হয়। রামবল্লভ কবিশক্তি অসাধারণ ও অদ্বিতীয়।

রামবল্লভ রচিত সপ্তমী।

(মহড়া)—“তবে নাকি উমার তবু ক’রেছিলে (গিরিরাণ)।

ওহে গুন গুন তোমার মেরে কি বলে।

নারী প্রবেশিতে যেতে হৈ কৈলাসে বাই বলে।

এসে বলতে যেনকা তোমার হুংখের কথা উমা সব শুনেছে,
তোমার বেথতে পাখাশী আপনি ঈশানী আলুতে চেয়েছে,
তুমি গিয়েছিলে কই, উম্ম বলে ওই হে,
আমি আপনি এসেছি জন্মী বলে।

(চিত্তেন)—তারি হারা হ’রে নরনের তারি হারা হ’রে রই,

সখা কই উমা কই আমার প্রাণ উমা কই,

আমার সেই হারা তারি ত্রিগুণের সারা বিধি এনে দিলালে।

উমা চন্দ্রবন্দে ডাকছে সখনে মা মা বলে।

উমা যত হেসে কয়, ও তো হাসি মর হে,

যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে।

(অন্তরা)—ভাল হোক হোক ওহে গিরি চাই, আমি নারী তাই তুলি বচনে
তোমার কি মনে হয় না হে নাথ হেরিতে উমার চন্দ্রাননে।

(পরচিত্তেন)—আশা-বাক্যে আমার নাশ প্রাণ রহি বল কতদিন,

দিসের দিন তুমি কীণ, বহিরীস যেমন বীন;

বারে প্রাণ পাব দেখে, সখৎসরে তাকে, আনতে তো যেতে হয়,

যেন মাহীনা কত। তিন দিনের জন্তা এলো হে হিমালয়;

মুখে করি হাহাকার ছিলাম যেন শব হে,

গৌরী মৃতদেহে এসে প্রাণ দিলে।”

রামবল্লভ রচিত ১ সখীসংবাদ।

(মহড়া)—“ভাষ কাল মান ক’রে গেছে কেনন আছে সখি দেখে আর।

আমার ক’রে সে বঞ্চিত, পেল ক’র কুলে বঞ্চিত,

হরে খতিতে সখি হরিপ্রেমের দার।

হলে রাখার মন হলেহে তুমি জানবে মন দূরে থেকে,

চকে দেখে গো দেখ দেখি কর কি কর কথা ডেকে,

যদি কাতরে কথা কর, তবে মর অগ্রণর,

তানকে সেখো গো ধরে দুটি রাজা পায়।

(চিত্তেন)—নাথ করে করেছিলান দুর্জয় মান,

ভ্রমের তার হ’ল অপমান,

ভানকে সাধুলাম না, কিরে চাইলাম না,

কথা কইলাম না দেখে মান;

কুক সেই রাজের অমুরাগে রাগে বাগে, কো,

পড়ে আছে চন্দ্রাবলীক মথরাগে;

গেছে পূর্বের সে পূর্বরাগ

এখন কি অপূর্বরাগ

রাগে পাছে ভান রাখার আদর ভুলে বার।

(অন্তরা)—ওগো বার মানের মানে আমার মানে,

সে না মানে তবে কি করে এ মানে;

মথকের কত মান না হর তার পরিমাপ,

আমি মানিনী হরেছি বার মানে।

(পরচিত্তেন)—যে পকে যখন বাড়ে অভিমান,

সেই পকে রাখেতে হর সম্মান,

রাখেতে ভ্রমের মান, গেল গেল মান,

আমার কিসের মান অপমান;

এখন মানিতে প্রাণ জলে জলে জলে গো,

আমার সেই কাল জলবর, হল আজ বতন্তর,

রাধাচাতকী করে বেখে প্রাণ জুড়ায়।

(ফুকা)—

যখন ভাম সাধলে চরণ ধরে,

তখন তারে একবার চাইলেম না ফিরে,

হুঙ্কর বার ক’রে তার, তুমি প্রাণ বার,

না দেখে কাল জলধরে;

অন্তরে বাধা করি অমুরাগ,

নিকটে গেলে বাড়ে রাগ,

সখি প্রেমের রীত যে করে বঞ্চিত

ভাবি তারি রীত অমুরাগ,

কুক মর্করা বিরাগ করে,

তবু তারে গো প্রাণে রাখি প্রাণ জুড়াব মনে করি;

আমার মদরের ধন কালবংশীবদন

সে কোন্‌খানে জুলে আছে সীরাধা।.....

(শেষ অন্তরা)—সই এ ভাবের কি ভাব বল দেখি,

ধাকি থাকি কেন কুক বলে ডাকি,

মানে ভেবে বিরগ, দেখি সই কালরূপ,

যে দিকে কিরাই দুই আঁখি;

একবার ভাবিগো শ্যামকে তুলি তুলি

আবার যে তুলি একি দাক।

হ’ল শ্যামের মন সে কি.....ধন,

তবু আমার মন তারে চার।”

ঐ ২ সখীসংবাদ।

(মহড়া)—“ওগো মলিতে গো দেখে বান্দো রাই কেন এমন হ’লো।

(চিত্তেন)—বসেছিলেন কমলিনী একলা হুঙ্করে,

ঐকুপ্রসঙ্গকথা আমার আসিতে,

কুক কথা পেলে আর কি তোলে, রাই,

রয়ে, রয়ে, ঐ কথা তোলে,

কইতে কইতে কুক কথা, এলো খেলা বর্ণলতা,

‘কোথা কুক কুক বলে’—আছে কি হ’লো।”

বসিও শেখোক লখীসংবাদীর আগাগোড়া সমস্ত অংশ পাওয়া যায় না, কিন্তু বড়ই পুরাতন গল্প, তাহাতেই কবির বেশ গুণগণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। বিরহ-বর্ণনে রাম-বহুর কেহ এখন সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তাঁহার ছুইটি বিরহের কতকাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

(মহড়া)—“মনে রহিল সই মনের যেখনা।

এখানে বধন যায় গো সে তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না।

লরমে মরমের কথা কওরা গেল না।

যদি নারী হ'রে সাধিতাম তাকে,

নির্লঙ্কে রসগী বলে হাসিত লোকে,

সখি ধিক্ ধাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,

নারী-জনম যেন করে না।

(চিতেন)—এক আমার এ বোধকাল তাহে কাল বসন্ত এস,

এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল;

বধন আসি আসি সে আসি বলে,

সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়নজলে,

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চার ধরিতে,

লজ্জা বলে হি ছি ছুঁও না।

(অন্তরা)—তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সন্নি,

অনা'সে প্রবাসে গেল সে গুণমণি,

একি সখি হ'ল বিপরীত রেখে লজ্জার লক্ষ্য,

মদনে দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ।” ইত্যাদি

ঐ ২য় বিরহ।

(মহড়া)—“প্রাণ সইরে ঐ নারীধরা বসন্ত এলো।

(চিতেন)—শরত শিশিরে সইরে আমি হিলাম তো ভালো।

একি পর্কি সখি সর্বনেশে মদন এসে ক'রে আকুলো।

বধন কুহ কুহ কুহরে কোকিলে,

প্রাণ সই প্রাণনাথ ঠেক, ভাল আলা হ'ল বসন্তকালে,

যেমন সপ্তরথী মেলে, আমার বধিলে যেন অভিমুখের দশা হ'ল।

কোকিল বলে বিরহিনী বোধন সামালো।” ইত্যাদি।

লহর-রচনা বিষয়েও রামবহু অধিকারী। নীলুঠাকুরের মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ ঠাকুর যখন সেই দলের দলপতি হইলেন, তখন কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ী দুর্গোৎসবের সময়ে এক আসরে রামপ্রসাদ রামবহুকে স্নেহ করিয়া একটি লহরের ছড়ার গাহিয়া ছিলেন—

“নাই কো রামবোনের এখন সেকলে পৌরোষ।

এখন দল করে হ'য়েছেন রামবোণ রামকাবারের...কোব।”

তৎপরেই রামবহু ঐ গীতের এইরূপ উত্তর দিলেন,—

(মহড়া)—“ভেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটু।

যেমন চাকের পিঠে ঝাঁপ থাকে সাজবাকো একটু দিল।

(চিতেন)—যেমন রাতভিরাধীরে রামপ্রসাদ থাকে এক একজন,

হরিনাম সেনো মুখে পিলু থেকে চাল কুড়তে মন,

করে অকর্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্মা,

মন কাজের কাজি ঠাটর বাজী (ভাইরে)

ঠিক যেন খোবার বিশকর্মা;

যেমন বিদ্যাপ্ত বিদ্যাপ্তমণি সিদ্ধিরত্নবহীন।

(অন্তরা)—নীলমণি ম'লে নীলমণির দলে,

টুকলো শিংভাড়া এ'ড়ে বাহুরের পালে,

যেমন নবাব ম'লে নবাব হ'ল উজীরানী আড়াই দিন,

সরি হার কি হয়ৎ, ঠিক যেন বলরার মুরৎ,

খাড়া আছেন খাপ খুলে রাতদিন।

যেমন মেঘের কাছে পেগের বড়ই ঘরে করেন জাঁক,

ছুরিয়ার কর্ণেতে কুড়ে ভোজনে বেড়ে বচনে পুড়িয়ে করেন খাঁক,

তেমনি শ্রীহাদ, এই পেটকো মুকুটাদ,

ধ'রে কুকপ্রসাদ ... ভরেন রামপ্রসাদ, (?)

যেমন জন্মে কতু হাত পৌরে না দোলে লেখবার আত্মদ্বন্দ্ব।”

যখন হরুঠাকুর দল পরিত্যাগ করিয়া রাজা নবকৃষ্ণের সভাগত হইয়া কাণবাগন করিতেন, তখন তিনি একবার পক্ষপাত করিয়া রামবহুর দলের হার সাব্যস্ত করার রাম বহু পাল্টে গানে আদিয়া গাহিলেন,—

“ঠাকুর বাঁচবেন না বিস্তর দিন।

তার চক্রে ধরেছে পোকা স্বর্ণরেখা অতি কীণ।” ইত্যাদি।

এবার যে ইহাতে হরুঠাকুর বড় কষ্ট হইয়া রামবহুকে বাপান্ত করিয়া আগর হইতে উঠিয়া যান।

রামবহুর খেউড়ও এইরূপ উপহারহিত, কিন্তু সে সমস্ত গীত অস্পষ্ট শব্দপূর্ণ বলিয়া এতলে উদ্ধৃত হইল না; কিন্তু তাহার আগাগোড়া রসোদীপক ও কবিত্বপূর্ণ। রামবহুর রচিত বিরহের মধ্যে আর একটি বিশেষ গুণ লক্ষিত হয় যে, অধিকাংশ গীতই স্বকীর রসে বর্ণিত হইয়াছে।

কলিকাতার উপনগর ভবানীপুরে কতকগুলি ভক্তগুণ্ডান একত্র হইয়া নলদময়ন্তীর যাত্রার দল করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে সখের যাত্রার এই আরম্ভ। রামবহু এই দলের গীত ও সুর দেন। ইহাতেও উক্ত বহুর কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

রামবহুর সমকালবর্তী আর একজন কবিগুরুলার কথা বড় কৌতুকাবহ। তিনি আদৌ এদেশীয় লোক নহেন, তিনি প্রকৃত প্রত্যবে সাতসমুদ্র ভের নদী পারের লোক, তিনি একজন আহোলে বিলাতী পর্ভুগীষ লাহেব। তাঁহার নাম মিটার একটিনি এবং তাঁহার লেখানো রাম মিটার কেলি। এখানে তাঁহার আটটি ও কালুসাহেব

নামে বিখ্যাত ছিলেন। গরিটর নিকট করাণী অধিকার-
ভুক্ত স্থানে আট্টনির বাগানবাটী ছিল, এখনও তাহার
অঙ্গাবশেষ দৃষ্ট হয়। সাহেব বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙ্গালার
আসিরা কিছুদিন থাকিতে থাকিতে একজন ব্রাহ্মণকন্ডার
এগরে বন্ধ হইয়া সমস্ত বাণিজ্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক
ঐ গরিটর বাগানে বসবাস করিয়া থাকিতে লাগিলেন
এবং স্বীয় এগরিনী ব্রাহ্মণকন্ডার সর্ব্বপ্রকার সন্তোষ
সাধনে উৎসর্গ হইলেন। ব্রাহ্মণীয় সহিত দীর্ঘকাল সহবাসে
সাহেবের বাঙ্গালী কথাবার্ত্তার বিলক্ষণ অধিকার ও
আদর জন্মিল। বিশ্রাণা আপনার বিখ্যাসের অল্পরূপ
দোলদুর্গোৎসবাদি যে সমস্ত পূজার্ত্তনা করিতে থাকিলেন,
সাহেব তাহাতেও অহমোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত
পর্য্যাহে তৎকাল-প্রচলিত কবির গান শুনিয়া আট্টনি
সাহেবের বড় অহুরাগ জন্মিল, ক্রমে এতদূর হইয়া উঠিল যে,
আট্টনি সাহেব নিজে সখের এক কবির দল করিয়া বসি-
লেন, এইরূপে যখন সাহেবের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল,
তিনি একেবারে নির্ধন হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি সেই
সখের দলকে পেশাদারীদল করিয়া তদ্বারা আপনার জীবিকা-
নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, সাহেবের দল খুব নামলক্ষ ও
বিখ্যাত হইয়া উঠিল। গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি
সাহেবের দলের বীধনদার ছিলেন, কিন্তু সময়ে সময়ে সাহেব
নিজেও কোন কোন গীতের উত্তর দিতেন ও নৃতন ভাবের
গীত রচনা করিতেন। যখন ঠাকুরদাস সিংহের দলে রামবহু
বীধনদার, তখন এক আসরে সিংহ সাহেবকে বলেন,—

“কও হে আট্টনি আমি এইটী শুনতে চাই।

এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গারে কেন কুর্জি নাই ॥”

ইহাতে সাহেব নিজেই উত্তর দিলেন,—

“এই বাঙ্গালার বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।

হ’রে ঠাকুরো সিদীর বাপের জামাই কুর্জি টুপী ছেড়েছি ॥”

আর একবার রামবহু নিজদলে এক আসরে সাহেবের
সঙ্গে লড়াইতে বলেন,—

“সাহেব! মিথ্যে তুই কলপদে মাতা মুড়ালি।

ও তোর পাদ্রিসাহেব শুনতে গেলে গালে দেবে চূণকালি ॥”

তাহাতে সাহেব উত্তর করেন,

“খুটে আর কুকে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই।

শুধু নামের করে মাহুব করে এও কোথা শুনি নাই ॥

আমার খোদা যে হিঁদুর হরি সে,

ঐ দেখে তামি পাড়িরে রয়েছে,

আমার মানব-জন্ম সকল হবে যদি রাক্ষা চরণ পাই ॥”

একবার চুঁচড়ার কোন সজ্জাত লোকের বাড়ী দুর্গোৎস-
বের সময়ে সাহেবের দলের বীধনদার গোরক্ষনাথ বলেন,
“তুমি যদি সখসংসরের বেতন শোধ করিয়া না দাও, তবে
আমি তোমাকে নৃতন সপ্তমী দিব না।” ইহাতে সাহেব
রাগান্বিত হইয়া আর তাহার উপাসনা করিলেন না, নিজে
এই ঠাকুরগণ বিষয় প্রস্তুত করিয়া গাহিলেন,—

“আমি ভজন সাধন জানিনে না নিজে তো ফিরিঙ্গী।

যদি দয়া ক’রে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী ॥” • • •

আট্টনি সাহেবের সমকালবর্ত্তী গোবিন্দ আরজবিগি
প্রভৃতি আর কতকগুলি ওতানীদল বিদ্যমান থাকার কথা
শুনা যায়, কিন্তু তাহাদিগের কোন বিশেষ কবিত্ব কি গুণ-
পণার কথা প্রচার নাই।

হরুর অনেক পরে শান্তিপুত্রের নিকট বৈচিত্র্যমে সাতু-
রার নামে আর একজন কবি প্রচলিত হন। সাতুরার
ব্রাহ্মণ এবং ভক্তসম্মান, তিনি কখন নিজে কবির দল
করেন নাই এবং কোন পেশাদার কবিওরার দলে বীধন-
দারীও করেন নাই। সাতুরার বদিও জন্মকবি, কিন্তু তিনি
যাবজ্জীবন চাকরী করিতেন। তাহার পেশাবস্থায় তিনি
রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের তরফ বারাসতে মোক্তারি
করিতেন, সেই কর্ম করিতে করিতেই তাহার জীবনের শেষ
হয়। তাহার অঙ্গাবস্থায় শান্তিপুত্রের জমীদারেরা তাহার
কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে আদর ও যত্নপূর্ব্বক
আপনাদের নিকট রাখেন। এখানে তিনি শিবচন্দ্র বাবুর
সখের দলের গীত রচনা করিয়া দেন। সেই সময়ে তিনি
অনেক ভাল ভাল গীত বাধিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে একটি উদ্ধৃত
করা গেল—

(সহড়া)—“অপরূপ একি রূপ কুরূপ লিখে গো রাই।

লিখলে সব শ্যামের অবরব

গতি নাই যে চরণ বই, সে চরণ কৈ গো কৈ,

ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই।

(চিতেন)—কৃক বিচ্ছেদে খেদে কিশোরী কুরূপ করিয়া মনন,

নির্জনে শ্যামদনে দেখবার হ’ল আকিঞ্চন,

তুমে ত্রিভঙ্গের জীঅঙ্গ ক’রে লিখন,

মথুরার পাছে যার সেই ভরে লিখলেন না মৃগল চরণ,

এরূপ করিয়া দরশন, জিজ্ঞাসেন সখীগণ,

রাই রাই গো বল রত্নময়ী একি রত্ন দেখতে পাই।

(অন্তরা)—একি ভাব হৃদাঃশূন্যী তোর হৃদাই।

কও কি ভাবে এ ভাবের হ’ল উদয় কিশোরী,

শ্যাম শরীর লিখলে লিখলে না কেন নবদর,

আমরা যে চরণ ধরন, আরেহি বর্ষন, রাই রাই গো,

আজ কি সে রূপ লিখতে জেলাই রূপ পাই।

(কলি)—এই বিবর করি, লেখ গো কিশোরী, ঐহিরি ঐচরণ,

অকলে আর কপিলুবে আর রাই

অজহীন বাহুরী কর্তে নাই হরণন।

(পরতিভেন)—বে চরণ সাধন লভ সধাশিব বোধধর্ম করেন আশ্রয়,

ত্রিভঙ্গের সর্কাকের সারাংশার সেই পদবর,

যদি সেই চরণ লিপ্তে হলি বিস্মরণ,

হুঃসহ বিরহ কিশোরী কিসে করুবি নিবারণ,

বিচ্ছেদ বরণী-পারাবার, বা হ'তে হবে পার,

(রাই রাই গো)

বিশেষ জেনেও কি কপালক্রমে তুলে তাই।"

(পালটা মহড়া)—নিরব পদবর লিখি নাই এই আশকার।

(চিতেন)—ঐশ্বর্যি প্রতিমুষ্টি ঐগনহীন, লিখে ঐক্ষতী বেদে কর।

বলবো কি ও সধি বলতে বিদগে হরণ।

লিখে ঐকান্তে লিখি নাই সই ঐচরণ,

কি কারণ বিবরণ বলি শোন,

শোন বো তার চরণের কি আচরণ,

ল'য়ে গেল শ্যাম কংসালর,

আনলে না নন্দালর, সই সই গো

রইল ছরশর নিরুর হয়ে যথার।

(অন্তরা)—সই সময় যখন মল্ল হয়,

চিহ্নমুখে গেলে হার,

বিচিত্র কি চিহ্নশ্যাম বরি মথুরে বার।"

কবিওয়ারাদিগের এই কবির গীতরচনা ও পরম্পর উত্তর প্রত্যুত্তর ধারায় বঙ্গদেশের প্রাচীন ও তৎকালীন স্রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, অপর কোন গ্রন্থপাঠে তাহা প্রাপ্ত হইয়া সহজ নয়; কিন্তু হুঃখের বিষয় কালসহকারে উক্ত 'কবি'গীত দিন দিন লুপ্ত হইতেছে।

কবি—যবদীপের প্রাচীন ভাষা। যেমন ব্রহ্ম, শ্যাম, পেণ্ড প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন পালি-ভাষার প্রচলন না থাকিলেও, ভাষাকার প্রাচীন বৌদ্ধস্রীস্থানে খোদিত শিল্পলিপিতে পালি-ভাষা ব্যবহৃত হইরাছে। তেমনি এই কবিভাষা এক্ষণে যব, বালি প্রভৃতি দীপে ব্যবহৃত নহিঁ হইলেও পূর্বেকার খোদিত শিল্পলিপি ও প্রাচীন ধর্মপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। যবদীপে কবিশব্দের অর্থ রহস্ত বা আধ্যাত্মিক; বোধ হয়, প্রাচীনকালে এই ভাষার রহস্ত ও আধ্যাত্মিক রচিত হইত, তাই এই 'কবি' নাম হইয়া থাকিবে। অনেকে অল্পমান করেন, সংস্কৃত কাব্য শব্দ হইতে 'কবি' শব্দের উৎপত্তি।

কোন কোন শব্দশাস্ত্রবিদের মতে, এই ভাষা যবদীপের দেশীয় ভাষা নহে, কোল সময়ে ভিন্নদেশ হইতে এই ভাষা যবদীপে গিয়া প্রচলিত হইয়া থাকিবে। সত্য বটে ভারতের

দক্ষিণদেশের ভারতবর্ষের অনেক শব্দ এই কবি ভাষার দেখা যায়, কিন্তু বর্তমান যবদীপের বাবনী ভাষার সহিতই ইহার বিশেষ সৌসাদৃশ থাকার, ইহাকে ভিন্ন দেশীয় ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন বাঙ্গালাভাষার সহিত বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ পার্থক্য, প্রাচীন কবি ও বাবনী ভাষাও অনেকটা তদনুরূপ। প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যবহার্য্য-সারে যেমন অনেক অপ্রচলিত সাবক বাঙ্গালা শব্দ সহজে সাধারণে বুঝিতে পারেনা, সেইরূপ কবিভাষার অনেক শব্দ এখনকার যবদীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ভিন্ন জনসাধারণে বুঝিতে অক্ষম।

যবদীপের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে হইলে, এই কবিভাষা শিক্ষা করা উচিত। যবদীপে মুলমান আসিবার পূর্বে বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজাদিগের বিবরণ এই কবিভাষায় লিখিত প্রাচীন খোদিত শিল্পলিপিতে পাওয়া যায়। যব ও বালি দীপের ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এই কবিভাষায় অল্পবান্ধিত হই-রাছে। এই ভাষায় লিখিত 'ব্রাত্যুদ' বা ভারতবৃদ্ধ নামক গ্রন্থই প্রধান, এই গ্রন্থ দয়ানামক এদেশের রাজা জয়বরের আদেশে আশুসুন্দা নামক এক ব্যক্তি প্রণয়ন করেন। জয়বর কুরুসেনাপতি শল্যের কাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, তাহারই মনস্তষ্টির জন্য কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া ১১১৭ শকে "ব্রাত্যুদ" রচিত হয়। [যবদীপ দেখ।]

কবিক (কী) কবি-স্বার্থে কনু। ১ বলীন, লাগাম। (পুং) ২ কবি।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। বঙ্গদেশ বিখ্যাত চণ্ডী-মঙ্গল গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি। জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত সেলিমাবাদ থানার এলাকাধীন দামুড়া * নামক গ্রামে কবিকঙ্কণের জন্ম। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম স্বরূপ মিশ্র এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম কবিচন্দ্র।

এ দেশে মুকুন্দরাম 'কবিকঙ্কণ' নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছেন। কবিকঙ্কণ + রাজপ্রদত্ত উপাধিমান, তাঁহার প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম।

* দামুড়া গ্রাম বর্তমান জাহানাবাদ হইতে ৫ কোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

† কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থে আপনায় এই পরিচয় দিয়াছেন—

"ভদ্র তাই সভাজন, কবিরের বিবরণ, এই গীত হইল যেমতে।

উরিয়া মায়ের বেলে, কল্লির পিররদেশে, চণ্ডিকা বলিয়া আচরিতে।

সহর সেলিমাবাদ, তাহারে ছলসরাজ, বিবসে দিরাঙ্গী গোপিকা।

তাঁহার তাম্বুকে বলি, দামুড়ার কবি কুবি, নিবাস পুন্স হয় সার।

বে সময়ে ববনের উৎসীড়নে বন্ধবানীপণ উভাক্ত; বিরক্ত,
মানসময় রক্ষা করিতে অক্ষম, এমন কি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত
ঘটিল। সেই প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ যৌবন-তরঙ্গে সংসার
স্রোতে ভাসিতে ছিলেন। তিনি মুসলমানের অত্যাচারে
উৎসীড়িত হইয়া আপন অম্মহান ছাড়িয়া মনের দুঃখে জী-
পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া বিদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া-
ছিলেন, নানাহানে পথে ঘাটে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন,
তাহা বর্ণনাভীত! নানাহান অতিক্রম করিয়া অবশেষে
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূমি পরগণার মধ্যবর্তী
আঁড়ার নামক গ্রামে ব্রাহ্মণরাজ বাঁকুড়াদেবের নিকট উপ-

ধত্ত রাজা মানসিংহ, বিপ্লবদাত্তোজ্জ্বল, গৌড়বন-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের কালে, বিলাস পায় মামুদ সত্রিক।
উজীর হ'ল রায়জাদা, ব্যাপারীরা ভাবে সল, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
মাপে কোণে দিয়া মড়া, পোনের কঠোর কড়া, নাহি হানে প্রজার গোঁহারি।
সরকার হেল কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিনা উপকারে খার খতি।
পোকার হইল বন, টাকার আড়াই আনা কম, পাই লভা নয় দিন প্রতি।
ডিহবার আরোজখোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ, খান্য পোক কেহ নাহি কেনে।
এড় গোপীনাথ নলী, বিপাকে হইল বন্যী, হেতু কিছু নাহি পরিগ্রাহে।
কোতালিয়া বড়পাপ, সজ্জনের কাল সাপ, কড়ির কারণে বহু মারে।
আখালি পাখালি কড়ি, লেগা জোখা নাহি দড়ি, বত দিয়া খেবা নিতে পারে।
পেরাল সন্টার নাহে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার জড়িয়া দেয় খানা।
প্রজার ব্যালুচিহ্ন, বেচে খানা পোক নিত্য, টাকার ত্রব্য হয় দশ আনা।
সহায় শ্রীমন্তর্থা, চণ্ডীগড় যায় গাঁ, যুক্তিকরি গজীর (?) খাঁর সনে।
হামুনা ছাড়িয়া বাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, পথে দেখা হেল তার সনে।
তেলিগারে উপনীত, রূপার কৈল হিত, বহুকুৎ তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবার কৈল ভর, তিনবিবসের দিল ভিক্ষা।
বাহিল পোড়াইনটী, সর্পলা অরিয়া বিধি, তেউটার হৈমু উপনীত।
দ্বারকেশ্বর তরি, পাইনু বাতনগিরি, গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত।
নায়ায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদর, উপনীত গোখড়ানগরে।
তৈল বিনা করি ত্রান, উদক করিষু পান, শিশু কালো ওদনের তরে।
আশ্রয় পুখুরঝাড়া, নৈবেদ্য শালুকনাড়া, পূজা কৈমু রুদ্র প্রথমে।
কুখা ভয় পরিশ্রমে, নিরা গৈমু সেই ধামে, চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া, আজ্ঞা দিল রচিত সজীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বহিয়া বাই, আরড়া নগরে উপনীত।
আরড়া ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ বাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিকবী, সন্ধ্যাষু নৃপশপি, রাজা দিল দশ আড়াধান।
বীরমাধবের হৃত, বাঁকুড়াদেব গুণবৃত্ত, হৃত পাশে কৈল নিরোজিত।
ভীর হৃত রঘুনাথ, রূপে ভগ্নে অবদাত, ভক্ত করি করিল পূজিত।
সঙ্গে ভাই রামানন্দী, সে জানে স্বপ্নের স্বাক্ষি, অহুদিন করিত বজ্র।
নিত্য দেখে অহুস্বতি, রঘুনাথ নরপতি, গারেনের হিলেন ভূষণ।
ধনা রাজা রঘুনাথ, কুলে গীলে অবদাত, একাধিল, নৃতন মজল।
তাহার আদেশ পাই, কবিকঙ্কণ গান, মম ভাষা করিও কুলধর।

স্থিত হন। বাঁকুড়াদেব তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ
হইয়া তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিলেন এবং আপন পুত্র
রঘুনাথের শিক্ষকতার নিযুক্ত করিলেন। এই স্থানে কবিকঙ্কণ
পরমসুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এইখানেই তিনি
রাজা রঘুনাথের আদেশে বাঁকালান্দার সর্বপ্রধান কাব্য
চণ্ডীমঙ্গল প্রচার করেন।

কবিকঙ্কণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন, পুত্র দুই-
জনের নাম শিবরাম ও মহেশ, কন্যা দুইটির নাম চিত্রলেখা
ও বর্ণোদা।

কবিকঙ্কণের বংশধরেরা অন্যাপি দামুন্ডাগ্রামে * বাস
করিতেছেন, তাঁহার সকলেই সাবর্ণ্য প্রোজীর। তাঁহার
কবিকঙ্কণের হস্তগিহিত চণ্ডীমঙ্গলের পূজা করিয়া থাকেন।
সেই পুথিখানি কবিকঙ্কণের আরাধ্যদেবী মহিষমর্দিনীর
পার্শ্বে স্থাপিত আছে। এখন দামুন্ডাগ্রামে কবিকঙ্কণের
বংশধরদিগের বাটীতে যে মহিষমর্দিনী আছে, তাহার মূর্তি
অপরূপ, তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এবং গলে
বনমালা বিভূষিত। কবিকঙ্কণের বংশধরেরা বলেন, "কবি-
কঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন। বধন ভগবতী তাঁহাকে দেখা দেন,
তখন তিনি আপন কুলময় পরিবর্তন করিতে ইতস্ততঃ
করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবতী তাঁহাকে বলেন, 'ভূমি
আমাতেই তোমার ইষ্টদেবের মূর্তি দেখিতে পাইবে।' তাই
মহিষমর্দিনীর প্রতিমা এইরূপ।" প্রথমতঃ কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব
ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি চণ্ডীমঙ্গল
লিখিবার অনেক পূর্বে 'জগন্নাথ-মঙ্গল' নামক একখানি
উৎকলমাহাত্ম্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে অনেক স্থলে—

"বিজ মুকুল কহে বন্ধিয়া শ্রীহরি।"

এইরূপ ভিন্তা দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থখানি চণ্ডীমঙ্গলের মত
মূললিখিত ও কবিশক্তির পরিচায়ক নহে। ইহার রচনা প্রাণী
দৃষ্টে অসূচিত হয়, এই গ্রন্থখানি তিনি বালককালে রচনা
করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ
করেন নাই। বোধ হয়, ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথ তাঁহাকে
'কবিকঙ্কণ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতে
চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থ যেমন বঙ্গদেশের সর্বত্র পালাক্রমে গীত হইয়া
আসিতেছে, জগন্নাথমঙ্গল স্ক্রুত পুস্তক হইলেও বহুদিন
হইতে আজ পর্য্যন্ত উৎকলদেশের নানাহানে ইহার গান
শুনিতে পাওয়া যায়।

* দামুন্ডাগ্রামবাসী চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন আপনা-
দিগকে কবিকঙ্কণের প্রকৃত বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কবিকঙ্কণের সময়।—মুদ্রিত চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থের শেষে লিখিত আছে—

“শকৈ রস রস বেন শশাঙ্কগণিতা।

কতদিনে দিলা গীত হরেন্দ্র বণিতা।”

এই কবিতার উপর নির্ভর করিলে ১৪৬৬ শকে চণ্ডী-মঙ্গলের রচনা-কাল স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু চণ্ডী-মঙ্গলের প্রণয়মেই লিখিত হইয়াছে, মানসিংহ যখন গোড়, বজ ও উৎকলের রাজা, সেই সময়ই চণ্ডীগ্রন্থের উৎপত্তি-কাল। মানসিংহ ১৫১১ শকে এ দেশের স্ববাদারী পদ প্রাপ্ত হন, সুতরাং ১৪৬৬ শকে গ্রন্থখানি রচিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এমন কি উক্ত চণ্ডী-মঙ্গলের প্রাচীন পুথিতে সমাপ্তিকাল-নিরূপক কবিতাটি দৃষ্ট হয় না, ইত্যাদি কারণে ১৪৬৬ শক-নিরূপক কবিতা অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম কৃতবর্ষার নিকট হইতে কয়েক বিঘা জমীর সনন্দ পাইয়াছিলেন* কৃতবর্ষা জাহাঙ্গীর ষাটশাহের সময়ে ১৫২৮ শকে (১৬০৬ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার স্ববাদার হইয়াছিলেন, অতএব ১৫১১ শকের পর ও ১৫২৮ শকের পূর্বে কোন সময়ে কবিকঙ্কণ আপন গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমির রাজগণের মধ্যে কবিকঙ্কণের প্রতিপালক রঘুনাথ রায় ১৪২৫ শক হইতে ১৫২৫ শক পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন†। ঐ রাজত্বের সময়েই চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয়।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলে যেরূপ কবিত্ব, শব্দশালিতা, রচনা-পারিপাট্য এবং চরিত্র অঙ্কনে যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ভগবতীর পূজা প্রচারোদ্দেশ্যে কালকেতু ও শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান সন্নিবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন, এই উপাখ্যানে দেবীমাহাত্ম্য-বটিত যে সকল পুরাণ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও কবিকঙ্কণের সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ৩০০ বর্ষ

পূর্বেকার বঙ্গদেশের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতির প্রকৃত ছবি এই চণ্ডীগ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে, বঙ্গ-সমাজের এমন প্রকৃত চিত্র তৎকালীন অপর কোন পুস্তকে লিখিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

তিনি চণ্ডী লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ হইতে নানাবিধ উপাখ্যান, ভারতবর্ষস্থ নানাস্থানের নদ নদী নগর গ্রাম অরণ্য কতই বর্ণন করিয়াছেন! পশু পক্ষী ও নানাদর্শী বজ্রাভীর মানবের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব কি অন্ময়ই চিত্রিত করিয়াছেন। কালকেতু, ধনপতি, শ্রীমন্ত, ভাঁড়দত্ত, মুরারীশীল, লহনা, ফুলরা, খুলনা, চুর্লনা প্রভৃতি সমুদয় চরিত্রই পুণকভাবে চিত্রিত।

কবিকঙ্কণ প্রায় সকল স্থলেই বিশেষ নিপুণতার সহিত নায়ক নায়িকার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ছুই এক স্থলে অত্যাতিশয়ো ও অস্বাভাবিক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, খুলনা কখন পতি সহবাস করে নাই, ১২১৩ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই, এমনকালে বিদেশ-প্রভাগত পতির শয়নগৃহে যাইবার ব্যগ্রতা, যাইবার সময়ে সপত্নীর সহিত নিঃশব্দে মত বাধিতত্তা, নিম্নিত পতিকে মৃতবোধে বোদন আরম্ভ, নিজে বাচিয়া পতি সঙ্গে পাশাপাশি; এবং মহাধনীর পত্নী হইলেও গুণচট্ট পরিয়া ছাগল চরাইয়া বেড়ান, এরূপ স্থলে তাঁহার মাতাও কন্ডার একবার তত্ত্ব লইল না, এগুলি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। এ ছাড়া ১২ বর্ষ বয়সের শ্রীমন্ত সিংহলে গিয়া বিবাহের পর শানীশালজ প্রভৃতির সহিত যেরূপ হাত-পরিহাস করিয়াছেন, তাহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ় রসাদোষক, ভাবপূর্ণ ও স্নমধুর হইলেও আরোপাত্ত প্রাঞ্জল ও সূত্ববোধ নয়; ইহার স্থানে স্থানে অনেক হ্রস্ব সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে, এ ছাড়া এত অগভ্রাংশ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, যে তাহাদের অর্থ সহজে লক্ষ্যরূপ করিতে পারা যায় না। সুতরাং সেই সেই স্থানে রসভঙ্গ-দোষ ঘটে।

চণ্ডী গ্রন্থে যে ছুইটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটি স্থান কলিঙ্গদেশ এবং দ্বিতীয়টি বর্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকটবর্তী অজয়নদের তীরস্থ উজ্জয়িনীনগরী। কলিঙ্গদেশ কবিকঙ্কণের বাসস্থান হইতে বহুদূরবর্তী, বোধ-হয়, তিনি সেই দেশে কখন-গমন করেন নাই, তাই এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক হয় নাই। দ্বিতীয় স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ অনেকটা ঠিক। অধ্যাপি মঙ্গলকোটের নিকট ‘উজনী’ নামে একটি স্থান আছে, তাহাই কবিকঙ্কণের উজ্জয়িনী নগরী বলিয়া বোধ হয়, এখন উহা পতিত

* শিবরামের বংশধরের নিকট সনন্দ আছে।

† রঘুনাথ রায়ের বংশীয়েরা একশে মেদিনীপুরের সেনাপতি গ্রামে বাস করিতেছেন, তাহাদের সে গ্রাম প্রতাপ, সে পূর্ব বিঘর সম্পত্তি নাই; বর্ধমানরাজ সমস্ত ভাড়িয়া লইয়াছেন। সেনাপতি গ্রামের গবর্ণমেন্ট খাজনাবাদ বাহা উপবধ থাকে, তদ্বারা ই তাহাদের কথঞ্চিৎ জীবিকা-বিল্লাহ হইতেছে।

তুখণ্ড মাত্র, সেখানে লোকের বসবাস নাই। উহার নিকট 'ভ্রমর' নামক একটি ঝাল আছে, খালটি অজয়নদে মিশিয়াছে। ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর অজয় বাহিয়া সিংহল যাত্রাকালে নদের উত্তরকূলে হসনপুর, গাজড়া, বাকুলা, চরকি, অজার-পুর, নগাঁ, উকানপুর প্রভৃতি গ্রামের নামোল্লেখ আছে, এখনও তাহার অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে উক্ত সওদাগরঘরের নৌকা গজার পৌছিলে গজার উভয় কূলবর্তী যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যায়*, তাহার অনেক আজও প্রত্যক্ষ হইতেছে। তৎকালে হুন্দরবনের নিকটবর্তী অনেক স্থান পর্তুগীজদিগের অধিকারে ছিল, কবিকঙ্কণ ঐ সকল স্থান 'ফিরিকীর দেশ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"ফিরিকীর দেশ খান বাহে কর্ণধারে।

রাত্রিদিন বহু যায় হারাম্দের ডরে ॥"

কেহ কেহ অনুমান করেন, কালকেতু ও শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবিকঙ্কণের স্বকপোলকল্পিত; কিন্তু তাহা নয়। কবিকঙ্কণের বহুপূর্ব হইতে কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী ত্রিবেণী-নিবাসী কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল বা হুর্গা-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়†।

* কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের ৫৭ খানি প্রাচীন পুঁথি পাঠ মিলাইয়া দেখিলে প্রত্যেক পুঁথিতেই যেখানে কোন স্থানের নাম আছে, সেইস্থানের বিভিন্ন পাঠ লক্ষিত হয়, এমন কি দুইখানি প্রাচীন পুঁথির পাঠ একরূপ প্রায় দেখা যায় না।

† কবি মাধবাচার্য্য আকবর বাদশাহের সমসাময়িক, তিনি আপন হুর্গামাহাত্ম্য এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন;—

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পুঁথিবীর সার।

একাকর নামে রাজা অর্জুন অবতার।

অপার প্রতাপী রাজা বৃদ্ধ বৃহস্পতি ॥

কলিযুগে রামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি ॥

সেই পঞ্চগৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।

ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল।

সেই মহানদী-ভটবানী পরাশর।

যাগবজ্জ জগে তপে প্রেত বিজয়র।

মধ্যাহ্নায় মহোদধি দানে কল্লতঙ্গ।

আচারে বিচারে বৃদ্ধ সম সুরভর।

তাহার তমুজ আমি মাধব আচার্য্য।

ভক্তভাবে বিরচিত দেবীর মাহাত্ম্য।

আমার আসরে যত অশুদ্ধ গারে গন।

তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান।

ঋতি তাল ভঙ্গ দোষ না নিবা আমার।

তোমার চরণে মাগি এই পরিহার।

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিরোজিত।

যিহ মাধবে গার শারণ-চরিত ॥"

উপরোক্ত কবিতা পাঠে দেখা যাইতেছে, মাধবাচার্য্য ১০০১ শকে (১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) 'হুর্গামাহাত্ম্য' রচনা করেন। এই প্রমাণানুসারে তিনি কবিকঙ্কণের অন্ততঃ ১০ বৎসর পূর্বে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল বা হুর্গামাহাত্ম্য ধর্মপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের সমুদ্রযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিরও পূর্বে গান হইত। তবে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর মত রচনাপ্রণালী ভাবোদ্ভূত ও কবিত্বপূর্ণ না হওয়ার জন-সমাঝে তেমন আদৃত হয় নাই।

কবিকর্ণহার (পুং) কবিনাং কণ্ঠহারইব আদরণীয় ইত্যর্থ।

১ কবিদিগের উপাধি বিশেষ। ২ একখানি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ।

কবিকর্ণপুর। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার। কাকদপল্লী (কাঁচড়া-পাড়া) গ্রামে সেনবংশ নামে একটি প্রসিদ্ধ বংশ আছে। ঐ বংশে শিবানন্দ সেন নামে এক পরম বৈষ্ণবপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একবার রথের সময় শ্রীশ্রী মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য সপরিবারে নীলাচলে গমন করেন। রথের সময় প্রভুকে দর্শন করিতে যত গোড়ার যাত্রী গমন করিতেন, তাহাদিগের পাথের ব্যয়-নির্বাহ ও আবাস-স্থান নির্ধারণ করাই শিবানন্দের প্রধান কর্ম ছিল। শিবানন্দ যেবার সপরিবারে নীলাচলে গমন করেন, তাহার পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে যখন একবার তিনি একাকী নীলাচলে গিয়াছিলেন, এবারে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এবার তোমার একটি পুত্র হইবে, ঐ পুত্রের নাম পরমানন্দপুরী গোলাঞ্চি রাখিবে। ঐ সময়ে শিবানন্দের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, শিবানন্দ বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, তাহার একটি পুত্র হইয়াছে। শিবানন্দ প্রভুর আজ্ঞানুসারে পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখিলেন।

পুত্রটিকে দর্শন করিয়া অবধি শিবানন্দের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল যে, তিনি পুত্রটিকে লইয়া চৈতন্যপ্রভুর চরণে সমর্পণ করিবেন; কিন্তু ঐটি তাহার শেষ পুত্র, স্তবরাং তাহার পত্নী ঐ পুত্রটিকে সেই দূরদেশে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। অগত্যা শিবানন্দকে সপরিবারে নীলাচলে যাইতে হইল। শিবানন্দের পুত্র এই পরমানন্দ দাসই পরে কবিকর্ণপুর নামে বিখ্যাত হইলেন। কবিকর্ণপুর সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য-চরিত নামে একখানি মহাকাব্য, আনন্দ-বৃন্দাবন নামে একখানি চম্পুকাব্য এবং চৈতন্যচরিতামৃত নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুরের বিষয় যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এই;—

শিবানন্দ সেন পুত্রকে কোড়ে লইয়া শত শত ভক্তের সহিত যখন চৈতন্যপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভু ও ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্কল্পমার্থ কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। যখন উভয় দল মিলিত হইল, তখন শিবানন্দের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র

পিতৃমুখকৃত প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহ সহকারে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বাবা গৌরান্দ্র প্রভু কে আমাদের দেখাইয়া দিবা।” তাহাতে শিবানন্দ সেন উত্তর প্রদান করেন, তাহাই চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে;—

“বিদ্যাদামহাত্ম্যতিরতিশয়োৎকর্ষকজীরবেন্দ্র-

কীড়াগামী কনকপরিঘ্রাঘিমোদ্যামবাহঃ।

সিংহগ্রীবো নবদীনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাগাঃ

শ্রীগৌরান্দ্রঃ ক্ষুরতি পুরতো বন্দ্যাতাং বন্দ্যাতাং ভোঃ ॥”

বিদ্যাদামহাত্ম্য, উৎকর্ষিত যুগেন্দ্রগতি, অর্ণপরিঘসম দীর্ঘোদত বাহু, সিংহগ্রীব, অরুণ-কিরণকাস্তিবাগা, ঐ শ্রীগৌরানন্দেব সমুখে রহিয়াছেন; তোমরা প্রণাম কর, প্রণাম কর।

ঐ দিবস শ্রীগৌরান্দের চরণে শিবানন্দের পুত্রকে নিবেদন করা হইল না। কয়েক দিবস পরে প্রভু বখন দুই তিনটি ভক্ত সমতিবাহ্যারে শিবানন্দের বাগার নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন শিবানন্দ পত্নীর সহিত চৈতন্যের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিজ বাসাতে লইয়া আসিলেন। এক্রপ প্রবাদ আছে, চৈতন্য কখন ক্রীলোকের মুখ-দর্শন করিতেন না; কিন্তু বাহাদিগের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাব অথবা বাহাদি তাঁহার গুরুজন মধ্যে গণ্য, তাঁহাদিগের সহিত চৈতন্যদেবের এই ভাব ছিল না। শিবানন্দের পত্নীকে চৈতন্য নিজের কস্তার ভ্রাম দেখে করিতেন, সুতরাং শিবানন্দের কথায় কোন আপত্তি না করিয়া তিনি তাঁহাদিগের বাসাতেই গমন করিলেন। এইবার শিবানন্দ পুত্রকে লইয়া চৈতন্যপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন। প্রভু শিবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে বলিয়া স্নেহভাবে বালকের মস্তকে চরণ প্রদানে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে পরমানন্দ প্রভুর ইচ্ছানুসারেই হউক অথবা বাল্যভাববশতই হউক চরণগ্রহণার্থ মস্তক অবনত না করিয়া হাঁ করিলেন। তাহা দেখিয়া চৈতন্যদেব বালকের মুখে পায়ের বুড়া আঙ্গুল ঠেকাইলেন; বালকও দুই হস্তে পা ধরিয়া গভীর-হৃদয়ে ঐ অঙ্গুলি লেহন করিতে লাগিলেন। এই বিষয়টি আনন্দবৃন্দাবনের নিম্নলিখিত শ্লোকে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে;—

“বৎসাব্দ্য মুহঃ স্বয়া রসনয়া প্রাপ্য গংকাব্যাত্ম।

দেয়ং তক্তজনেন্ ভাবিষ্য-সুগ্ৰেই-প্রাপ্যমেতৎ স্বয়া ॥”

বৎস! তুমি স্বীয় রসনা দ্বারা এই অঙ্গুলি আশ্বাদন করিয়া সংকবিশ্ব প্রাপ্ত হইলে, এই দেবহর্ষভ কবিশ্ব তক্তজন মধ্যে প্রচার করিবে।

ঐ সময়েই প্রভু বলেন, “পরমানন্দ, তুমি উত্তম কবি হইবে। অদ্যাবধি তোমার নাম কবিকর্ণপুর হইল।” বস্তুতঃ কবিকর্ণপুর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একজন প্রধান কবি হইয়াছিলেন। [কাকনপলী দেখ।]

কবিকল্পদ্রুম (পং) বোপদেবপ্রণীত ধাতুসমূহের অর্থবোধক গ্রন্থবিশেষ।

কবিকল্পলতা (স্রী) কাব্যরচনা শিখিবার উপযোগী গ্রন্থবিশেষ। কবিকা (স্রী) কবি-স্বার্থেক-ন-টাপ। ১ লাগাম। ২ কচুক পুষ। ৩ কইয়াছ।

কবিক্রতু (ত্রি) [বৈ] ১ স্তুতি করিতে ইচ্ছু। ২ জ্ঞানবান।

কবিচন্দ্র (পং) ১ কর্ণপুরের পুত্র ও কবিবল্লভের পিতা; ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কবিচন্দ্রের নামে কাব্যচঞ্জিকা, ধাতু-চঞ্জিকা, রত্নাবলী, রামচন্দ্রচম্পু, শান্তিচঞ্জিকা, স্বরলহরী ও স্তবাবলীনামক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি একজনের হস্তলিখিত কিনা, তৎপক্ষে সন্দেহ আছে।

২ কবিকল্পের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনিও বাদালা কবিতা লিখিতেন। এক্ষণে তৎকৃত ‘দাতাকর্ণ’ কবিতা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ।

কবিচ্ছদ (ত্রি) কবিঃ শব্দঃ ছদ আবরণ বস্ত্রমিব বস্ত্র, বহস্ত্রী। পণ্ডিত।

কবিজ্যেষ্ঠ (পং) কবিষু জ্যেষ্ঠঃ, ৭৩৭। বাম্বীকিমুনি।

কবিজ্ঞক (পং) পক্ষীবিশেষ।

কবিতম (ত্রি) অয়মেবামতিশয়েন কবিঃ, কবি-তমপ্ (অতি-শায়নে তমবিষ্ঠনো। পা ৫।৩। ৫৫।) বহুকবির মধ্যে উৎকৃষ্ট কবি।

কবিতা (স্রী) কবের্তাবঃ, কবি-তন্ (তত্ত্বভাবস্বতলো। পা ৫।১। ১১৯।) টাপ। কাব্য, শ্লোক, পদ্য।

কবিতাবেদী [ন] (ত্রি) কবিতাং বেত্তি, কবিতা বিদ-গমি। কবিতাজ্ঞ, বাহার কবিতাবিশয়ে জ্ঞান আছে।

কবিত্ব (স্রী) কবের্তাবঃ, কবি-ত্ব (তত্ত্ব ভাবস্বতলো। পা ৫।১। ১১৯।) কবিতা-রচনার শক্তি।

কবিত্বন (স্রী) [বৈ] ১ স্তুতি। ২ জ্ঞান।

কবিপুত্র (পং) কবেঃ ভৃগুপুত্র পুত্রঃ, ৬৩৭। ১ শুক্রাচার্য্য ২ ভার্গবধাষি।

(“ভৃগোঃ পুত্রঃ কবিবিদ্বান্ শুক্রঃ কবিস্তুতোগ্রহঃ ॥”

মহাভারত আদি ৬৬ অঃ।)

কবিভূষণ (পং) কবীনাং ভূষণমিব। ১ উপাধিবিশেষ। ২ কবিচন্দ্রের পুত্র।

কবির (স্রী) কং স্তুতং অজতি, ক-অজ-ক-ওজহানে বি আদেশঃ। খলীদ, লাগাম।

(কবী খলীল কবিকা কবিরঃ মুখবরগম্ । হেম ৪।৩৬ ।)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—বাল্যলার বিখ্যাত “রাম-প্রসাদী পদাবলী” রচয়িতা। ইহার পদাবলী ব্যতীত “কালীকীর্তন” “শিব সকীর্তন”, “কৃষ্ণকীর্তন” ও “বিদ্যাহুন্দর” নামক কবিত্বাংশি কাব্য আছে। এই কবিত্বাংশি পুস্তকের মধ্যে বিদ্যাহুন্দরই সর্বাঙ্গোৎকৃষ্ট এবং প্রধান এবং কালীকীর্তন সর্বাঙ্গোৎকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহার পদাবলীই তাহার অতুল ও অক্ষয়কীর্তি। রামপ্রসাদের এই গানগুলির তুল্য ভক্তিতরঙ্গ গান অগতির আর কোনদেশের সাহিত্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার পদাবলীগুলি অতি সহজ কথা, অতি গূঢ়ভাবে পরিপূর্ণ। কালীকীর্তনখানি মহাকাব্যের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। ইহার অধিকাংশই গানময়। এই সকল গান কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট। শিবসকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাহুন্দরখানি প্রধান গ্রন্থ হইলেও বাঙ্গালীর নিকট তাদৃশ আদর পায় নাই; কারণ, রামপ্রসাদের ভারতচন্দ্র রায়ের অমর-মঞ্জলের অন্তর্গত বিদ্যাহুন্দর অতি মধুর বলিয়া এখানির হত্যাদর ঘটয়াছে, কিন্তু, তাই বলিয়াই যে কবিরঞ্জনের বিদ্যাহুন্দর মাধুর্য্যহীন, তাহা নহে, বরং কাব্যার্থে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাহুন্দর অপেক্ষা এখানি শ্রেষ্ঠতর। ভারতের কাব্যে যে রস আছে, তাহা সাধারণের নিকট অতি মধুর, অতি তৃপ্তিকর; আর কবিরঞ্জনের বিদ্যাহুন্দরেও সেই রস আছে, কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে ততটা তৃপ্তিকর নহে, তবে কবিরঞ্জনের বিদ্যাহুন্দরে এই রসের সঙ্গে আর একটি সামগ্রী আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের কাব্যে নাই। ভারতচন্দ্র তাহার নায়কনায়িকাকে কেবল রিপূর দাসদাসী করিয়া সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কবিরঞ্জন উভয়কে ভক্তির জীবন্ত প্রতিমা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এক কথায় ভারতচন্দ্র প্রসাদ-গুণপ্রধান আর কবিরঞ্জন ভক্তিরস-প্রধান। ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে, শব্দযোজনায় ভারতের কাব্য অতুল-নীর আর ভাবে, চরিত্রচিত্রণে ও বর্ণনার গভীরতার কবিরঞ্জন লক্ষণে শ্রেষ্ঠ। আর এক কথা,—কবিরঞ্জনের কাব্য ভারতের কবিত্বের পূর্ণে রচিত হয়। এখানে এ বিষয়ে আর অধিক আবশ্যক নাই। [“বিদ্যাহুন্দর” দেখ।]

জীবনী—প্রসিদ্ধ হালিসহরের অন্তর্গত বর্তমান “কুমার-হাটা” বা “কুমারহাট” গ্রামে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের যে স্থলে কবিরঞ্জনের বাস ছিল, সেখানে এখন গৃহাদি নাই, তবে সেখানে তিনি গুরুমতে পঞ্চমুখী আসন করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে সেই আসনের স্থান আজিও বর্তমান আছে। আজিও গ্রামের লোকে এই

স্থানটিকে পবিত্র বলিয়া মনস্তত্ত্ব ভাণ্ডারে অঙ্গবিজ্ঞ করে না। অনেক গায়ক ভিক্টর বাইবার সময় অগ্রে এই আসনের স্থানের মাটি ভক্ষণ ও মন্ডকে ধারণ করিয়া, এই স্থানে দাঁড়াইয়া হুচারিটা গান করিয়া পরে অস্ত্র গমন করে। সম্ভ্রুতি এই-খানে স্থানীয় যুবকগণের উৎসাহে রামপ্রসাদের উদ্দেশে প্রতিবৎসর একটি মেলা হইয়া থাকে।

কবিরঞ্জন কুমারহাটের যেখানে বাস করিতেন, নিজকাব্য বিদ্যাহুন্দরে তাহাকে “সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

“ধরাতলে বহু সে কুমারহাট গ্রাম।

তার মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম॥”

কবিরঞ্জনের যে সকল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোথাও কাল-নিরূপক কোন কথা নাই। কালীকীর্তনের একস্থলে আছে,—

“শ্রীরাজকিশোরদেবে শ্রীকবিরঞ্জন।

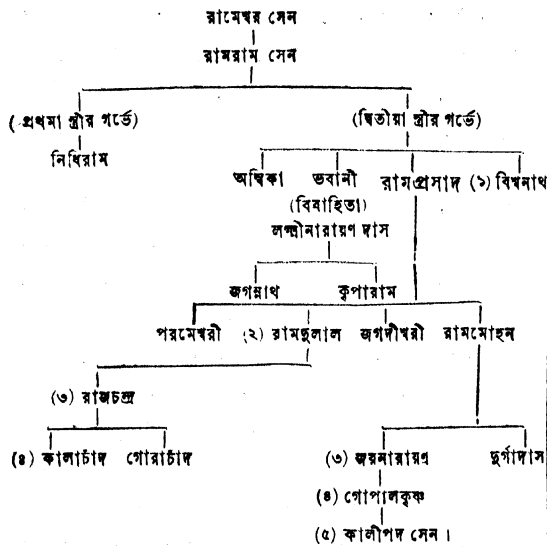
রচে গান মহা অক্ষের ঔষধ অঞ্জন॥”

এই “রাজকিশোর” কে? তাহারও অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন এই “রাজকিশোর” শব্দ যুবকরাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত, কিন্তু তাহাও কতটা যুক্তিযুক্ত তাহারও স্থির করবার কোন উপায় নাই।

অনেকে অনুমান করেন যে কবিরঞ্জন ১৬৪০—১৬৪৫ শকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ বলেন, তিনি ১৬৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। যদি ইহাই গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ১২২৭ সালে (ইং ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে) কবিরঞ্জন জন্মিয়াছিলেন, বলিতে হয়; আর ভারতচন্দ্রের জন্মকাল ১৬৩৪ শকে সূত্রায় উভয়ে সমকালবর্তী হইলেও ভারত রামপ্রসাদ অপেক্ষা আট বৎসরের বড় বলিতে হয়।

রামপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু প্রসাদী পদাবলীর মধ্যে কতকগুলি গানের শেষে “দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে” এইরূপ ভণিতা আছে; ইহা দেখিয়া অনেকে বলিতে চাহেন যে, রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথচ কোথাও কোন স্থলে ব্রাহ্মণের “সেন” উপাধি নাই; সুতরাং তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কেহ বলেন, রামপ্রসাদের সময়ের কিছু পূর্ব হইতে বাঙ্গালার বৈদ্যসমাজ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের ঔরস-জাত বলিয়া প্রমাণ করিয়া উপবীত গ্রহণ এবং অশৌচকাল কসাইয়া লয়েন; রামপ্রসাদ বোধ হয়, এই আন্দোলন স্রোতে পড়িয়া আপনাকে “দ্বিজ” নামে অভিহিত করিতেন, এরূপ অনুমান করা বাতুলতাব্যঞ্জ; কারণ, ভক্তিমাত্র রাম-প্রসাদ কখনই ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসম্মান দেখাইয়া হজ্জকে

স্মৃতিবার যত তরল-প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আরও তিনি কালী-কীৰ্ত্তনের অনেক স্থলে নিজ ব্রাহ্মণের জাতি-প্রতিপাদক “ভগ্নে রামপ্রসাদ দাস, মার এই এক ধ্যান,” “রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে ভাসে,” “দাস প্রসাদ বলে, সেই ব্রহ্মময়ী” ইত্যাদি বর্ণে ভণিতা আছে। কেহ কেহ বলেন, “বিজ” শব্দ পরবর্তী যোজনামাত্র। কেহ কেহ আবার বলেন, “বিজ রামপ্রসাদ” হয়ত একজন স্বতন্ত্র লোক ছিলেন, কালক্রমে তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি কবিরঞ্জনর গীতাবলীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। এই উভয় কথার মীমাংসা করা বড় সহজ; কারণ নিম্নে রামপ্রসাদ সেনের নিজের লিখিত পরিচয় ও তাঁহার বংশ-তালিকা দেওয়া হইল, ইহাতে তাঁহার অধস্তন এম পুরুষের নামও আছে, তাঁহার বংশীয়েরা আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।



এতদ্বির বিদ্যাহুঙ্করের শেষে যে, কবিরঞ্জন নিজ আত্মীয়গণের জন্ম মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, সেখানে তিনি লিখিয়াছেন যে,—

“জ্যোষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী ।
যার পাদপদ্ম আমি রাজিদিবা সেবি ॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥
ভাগিনের যুগ্ম জগন্নাথ কুপারাম ।
আম্বাতে একান্ত ভক্তি সর্বগুণধাম ॥
সর্বাঙ্গজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অধিকা ।
তার দ্বাখে দূর কর জননী কালিকা ॥

শুগনিধি কুপারাম বৈমাত্রেয় জ্ঞাতা ।
তারে কুপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা ॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামারী ।
সমাজক বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥
শ্রীকবিরঞ্জে মাতা কেহ কৃতাজলি ।
শ্রীরামজলালে মাতা দেহ পদধূলি ॥

এই উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় চরণে “ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস” এই নাম হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবিরঞ্জন ব্রাহ্মণ ছিলেন না; তবে গীতের ভণিতায় উল্লিখিত “বিজ রাম-প্রসাদ” একজন স্বতন্ত্রলোক ছিলেন—এ সন্দেহ এখানেও মিটিল না, সম্ভবতঃ এই বিজ রামপ্রসাদ কবিওয়ালা রাম-প্রসাদ ঠাকুর হইতে পারেন। কারণ, ইহারা প্রায় সম-সাময়িক। [কবি দেখ।] বিদ্যাহুঙ্করের শেষে রামপ্রসাদ নিজবংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল;—

“ধনহেতু মহাকুল পূর্বাঙ্গ গুণমূল
কীৰ্ত্তিবাস ভূল্য কীৰ্ত্তি কই ।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শাস্ত গুণানন্ত
প্রসন্ন কালিকা কুপাময়ী ॥
সেই বংশ সমুদ্ভূত ধীর সর্বগুণবৃত্ত
ছিলা কত কত মহাশয় ।
অনতির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয় ॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা ধীরে সদয়া অভয়া ।
প্রসাদ তনয় তাঁর কেহ পদে কালিকার
কুপাময়ী যমি কুক দয়া ॥”

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রামপ্রসাদ সেন যে বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন, তাহা বেশ ঐশ্বর্যশালী ছিল। তাঁহার জনৈক পূর্বপুরুষের নাম কীৰ্ত্তিবাস। এই কীৰ্ত্তিবাস হইতে নিজ পিতামহ রামেশ্বর পর্যন্ত মধ্যে কয়েক পুরুষের নাম তিনি প্রকাশ করিয়া যান নাই।

রামপ্রসাদ বাল্যকালেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দি-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, কাজেই তাঁহার স্বন্ধে সংসারের ভার পড়িল। রামপ্রসাদের পিতা বোধ হয়, এ সময়ে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়া ছিলেন, জাতীয় চিকিৎসাব্যবস্থায় কোনরূপে দিনপাত করিতেন; কারণ, পিতার মৃত্যুর পরই রামপ্রসাদকে সংসার-প্রতিপালনের জন্ত অল্পবয়সে কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টায় আসিতে হইয়াছিল। রামপ্রসাদের মধ্যমা ভগিনীপতি

লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বাটী কলিকাতার হিল, সেই স্ত্রী
তিনি কলিকাতার বাতারাভ করিতেন। তখন জমীদার বা
মহাজনের বাড়ী তির আর কোথার চাকরী মিলিত না,
কাজেই রামপ্রসাদ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কলিকাতার এক ধন-
বানের গৃহে একটি সামান্য মুহুরীগিরি পাইলেন। কিঞ্চদন্তী
এইরূপ যে, তখন তাঁহার বয়স ১৭। ১৮ বৎসরের অধিক
নহে। কোন্ ধনবানের গৃহে তিনি কর্মে নিযুক্ত হন, তাহা
নিশ্চিত জানা যায় না; কেহ বলেন, ভূটেকলাসের
দেওয়ান পোতুলচন্দ্র বোবালের নিকট আর কেহ বলেন যে,
নবরঙ্গকলাধিপতি দুর্গাচরণ মিজের নিকট তিনি চাকরী স্বীকার
করিয়াছিলেন। কিছুদিন চাকরী করিবার পর একদিন তাঁহার
উপরিভন কর্মচারী তাঁহার লিখিত খাতা বহিগুলি দেখিয়া
মহাজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্রোধের কারণ আর
কিছুই নহে, কেবল রামপ্রসাদ সেই সকল পাকা খাতার
হিসাবের পার্শ্বে প্রতিপৃষ্ঠায় যেখানে ফাঁক পাইয়াছেন, সেই-
খানেই গান লিখিয়া তরাইয়াছেন। উপরিভন কর্মচারী
একান্ত বিবরীলোক, কাজেই তিনি এ সকল গানের ভাব কি,
আর কি অবস্থাতেই বা লিখিত হইয়াছে, তাহা না বুঝিয়া
কেবল বুঝিলেন, রামপ্রসাদের হস্তে প্রভুর হিসাবের পাকা
খাতা মাটি হইয়াছে; হুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ প্রভুকে গিয়া
সেই খাতা দেখাইলেন। বাঙ্গালীর শুভাদৃষ্টক্রমে রাম-
প্রসাদের প্রভু খালি প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিলেন;—

“আমার দেও মা তবিলদারী।

আমি নিমক-হারাম নই শকরী ॥

পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি ॥

ভাঁড়ার জিন্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।

শিব আন্ততোষ স্বভাব-নাভা, তবু জিন্মা রাখ তারি ॥

অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে তারি।

আমি বিনা-মাইনার চাকর, কেবল চরণ ধুলার অধিকারী ॥

যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।

যদি আমায় বাপের ধারা ধর তবে ত মা পেতে পারি ॥

প্রসাদ বলে, এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।

ও পদের মত পদ পাইত সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥”

প্রভু গানটি দেখিলেন, দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন।

তাঁহার আর দাওয়ানজীর নাশিশ ভনা হইল না। তিনি
খাতাখানি লইয়া আদ্যোপাত পাঠ করিলেন। তাঁহার
আর কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। তিনি বুঝিলেন,
রামপ্রসাদ সামান্য লোক নহেন, রামপ্রসাদ তাঁহার তহবিল-
দার বা মুহুরী হইবার উপযুক্ত নহেন, তিনি মা কালীর

তহবিলদার হইবার আশার ভোর হইয়া পড়িয়াছেন;
মা কালীর পদরত্নভাণ্ডারের জিন্মা লইবার অস্ত্র বাহজ্ঞান
হারাইয়াছেন, নিজের সম্বা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত
প্রভুদাস সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া, প্রভুর হিসাবের পাকা খাতার
স্বচ্ছন্দ মনে, বিস্তার প্রাণে, প্রাণের উৎস ছুটাইয়া
নিজের তক্তিতরা প্রাণের কণাগুলি সুরে বাধিয়া লিখিয়া
রাখিয়াছেন।

যাহা হউক রামপ্রসাদের প্রভু গানগুলি পড়িয়া
দাওয়ানজীর আর কোন কথা শুনিলেন না, তৎক্ষণাৎ
রামপ্রসাদকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে নিজকর্ম হইতে
অবসর দিয়া সংসারচিন্তা হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন,
আর তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণের অস্ত্র মাসিক ত্রিশ
টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই ঘটনা হইতে অনুমান হয় যে, বালককাল
হইতেই রামপ্রসাদের মনে কাণীতক্তি আগরিত হইয়াছিল
এবং যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই তক্তি পূর্ণ-বিকসিত
হইয়া তাঁহাকে বাহজ্ঞানশূত্র করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি
তক্তিতরাপ্রাণে সময়ে সময়ে নিজের সম্বা পর্যন্ত ভুলিয়া
যাইতেন, কাজেই হিসাব লিখিতে বসিয়া পাকাখাতার কথা,
হিসাবের কথা, ভুলিয়া গিয়া মা কালীর সহিত যেন কথা
কহিতেন, প্রত্যুত্তরগুলি স্বভাবতই গানের আকারে নিজের
অজ্ঞাতসারে নিজেই সেই পাকাখাতার লিখিয়া ফেলিতেন।

যাহা হউক, রামপ্রসাদ গুণগ্রাহী ও তক্তিমান প্রভুর
কৃপার একবারে সংসারচিন্তা ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত
হইয়া বাটী চলিয়া গেলেন। বাটী গিয়া রামপ্রসাদ তত্তমতে
পঞ্চমুণ্ডী আসনাদি করিয়া সাধনা করিতে আরম্ভ করেন।
ইতিমধ্যে রামপ্রসাদের বিবাহ হয়। ঠিক কোন সময়ে তিনি
বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার
নিজ লিখিত গ্রন্থের কোথাও ভণিতার স্বীয় স্বত্তরকুলের
পরিচয় দেন নাই; কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থলে—

“ধস্তা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।

আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥

জন্মে জন্মে বিকায়ছি পাদপদ্মে তব।

কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব ॥”

এইরূপ ভণিতা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, রামপ্রসাদ যে
সময় বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তখনও তাঁহার সাধনার মনোমত
সিদ্ধিলাভ হয় নাই, কিন্তু তিনি যে কোন প্রকার সিদ্ধলাভ
করিয়াছিলেন, একথা ঐ বিদ্যাসুন্দরেই তিনি উল্লেখ করিয়া
গিয়াছেন—

“শ্রীমন্তে জাগ্রত বৈশেষণপুত্রী বধা।

নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা।

কিঞ্চিৎ ভিত্তিলে কল্যাপেকা ছিল কিবা।

কৌণ-পুণ্য দেখি বিজয়না কৈল শিবা॥”

রামপ্রসাদের পত্নীও অসামান্য রমণী ছিলেন। কালী স্তম্ভযোগে তাঁহাকে প্রত্যাশ্রয় করিতেন। রামপ্রসাদ এইজন্যই কালীর উপর অতিমান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—
“ধন্না দাসা স্বপ্নে তারা প্রত্যাশ্রয় তারে”—ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের সাধনা কিরূপ বলা যায় না; কিন্তু তাঁহার লেখা দেখিয়া বোধ হয় না যে, কোন প্রকার সাধনপ্রণালী তাঁহার জানা ছিল। তিনি স্নানের শব্দস্বন শ্রবণে বলিয়াছেন—

“জাত নহি বলে কেহ না করিবে হেলা।

বিষয় বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা।

স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।

ভক্তিতে সংক্ষেপে কিছু কিছু করে বাই॥”

ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি ভবমণ্ড সংসারে লিপ্ত বিষয় কর্মে মিশিয়া থাকিতেন বলিয়া, শব্দাদি সাধনার গুঢ় মর্ম্ম অবগত থাকিলেও সে সকল অবলম্বন করিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদের বিশ্বাস ছিল—

“গুরুমন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র, পরমায়ু ধর্ম্ম।

ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম॥”

সেইজন্য তিনি কোথাও তাঁহার উপদেষ্টার নামও প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু কালীকীর্তনের একস্থলে পাওয়া যায়,—

“কৃপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ
প্রাণদান দিয়া লৈতে চার।”

এ স্থান হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বোধ হয় প্রসাদের গুরুর নাম ‘কৃপানাথ’ ছিল।

“রামপ্রসাদের বাসস্থান ‘কুমারহট্ট’ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল। কুমারহট্ট গঙ্গাভীরে অবস্থিত বলিয়া এখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটি কাছারিবাড়ী ও প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন ও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। এই স্বত্বে রামপ্রসাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল; কারণ, কৃষ্ণচন্দ্রের জ্ঞান গুণজ্ঞ ও সজ্জনপ্রিয়ের নিকট রামপ্রসাদের জ্ঞান গুণী ব্যক্তি অধিকদিন অপরিসীম থাকিতে পারে না, তবে কি স্বত্বে তাঁহাদের প্রথম পরিচয় হয় তাহা জানা যায় না। অবশেষে যখন কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টের প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতেন, সেই সময় রামপ্রসাদকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত নানাবিধের

আলোচনা করিতেন। এ সময় কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত ভারত-চন্দ্রের পরিচয় হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের অসাধারণ কবিত্ব ও পারমার্থিক জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অহরহ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু রামপ্রসাদ সংসার-বিরাগী নিম্পৃহ মহাশক্তির উপাসক প্রেমিক লোক ছিলেন। তিনি এরূপে রাজপ্রসাদ ভোগ করাকে বড় ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। এসম্বন্ধে তাঁহার যে মত ছিল, তাহা আমরা বিদ্যাহনুকের একটি চরণে দেখিতে পাই,—“কিঞ্চিৎ যেই স্বধর্ম্ম খোঁয়ায় খোঁসামোদে।” এই মতের পরিপোষক তাঁহার দুইটা স্তীতও দেখিতে পাওয়া যায়;—

(১)

“আমি তাই অভিমান করি।

আমায় করেছ পো মা সংসারী॥

অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবান্নি।

ওমা তুমি কোন্সন করেছ, বলয়ে শির তিকারী॥

জান ধর্ম্ম প্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্ম তার উপরি।

ওমা বিনা দানে মধুরা-পারে বান্নি সেই ব্রহ্মেশ্বরী॥

নাতোরানি কাচ কাচো মা বলে ভঙ্গ ভূষণ পুরি॥

ওমা কোথায় লুকাবে বল তোমার কুবের ভাণ্ডারী॥

প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা এত কেন হলে ভারি।

যদি রাখ পদে থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি॥”

(২)

“আর ভুলালে ভুলব না গো।

আমি অভয়পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব ছলব না গো।

বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কুপে উলব না গো।

সুখ দুখে ভেবে সমান মনের আগুণ তুলব না গো॥

ধনলোভে মত্ত হয়ে ঘারে ঘারে বুলব না গো।

আশাবাস্যগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুলব না গো॥

দামা-পাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।

রামপ্রসাদ বলে দুখ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো॥”

বাস্তবিক কালীও তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যবে অসম্মত হইলেও রাজা জুড় হইলেন না, বরং সন্তুষ্ট হইয়া প্রসাদকে একশত বিঘা নিরুরভূমি দান করিলেন এবং “কবিরঞ্জন” উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে কেবল গান শুনিয়া আর ভাব দেখিয়া প্রসাদকে উপাধি দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি অবশ্যই তাঁহার রচিত কোমল কাব্যগ্রন্থ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এই কাব্য যে কি, তাহা জানা যায় না, তবে কবিরঞ্জনের বিদ্যাহনুকের

শেখোক্ত অষ্টমঙ্গলার তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়,—

(অষ্টমঙ্গলা)

“নমো বিশ্বভাবিনী দক্ষবজ্র-বিনাশিনী
অনমিলা পর্ত্তেশ-বরে । (১)

কার্ত্তিকের অম্বদেহু ভস্মরাশি মীনকেতু
তদবধি অনলপাখা ধরে ॥ (২)

হরন্ত মহিষাসুর তার দর্প কৈলা চূর
লীলার হইলা দশভূজা ।

মহিষমর্দিনী নাম সেতুবন্ধে প্রভু রাম
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা ॥ (৩)

শুভ নিভন্তের গর্গর সঙ্গুধ সমরে খরক..... (৪)
শক্তি লভে সুরথ সমাধি । (৫)

ব্রহ্মময়ী পরাংপরী অম্বজরাসুত্বেয়া
তব তবু না জানেন বিধি ॥

বিধি হরি জিলোচনে মহাকালী দরশনে
গতমাত্র প্রথমতঃ যাত্রা ।

শেষ অম্ব কৃপালেশ গত বাবতীর ক্লেপ
দিলা পদসরসিজছারা ॥ (৬)

নৃপতি বিক্রমাদিত্য তোমা পূজে নিত্য নিত্য
লভিল রমণী ভাহুমতী । (৭)

তুমি আদ্যাশক্তি শিবা মূঢ়মতি জানি কিবা
কৃপাময়ী অগতির গতি ॥

মালদার হারাবতী শাপে অম্ব বহুমতী
ব্রতকথা জগতে প্রচার । (৮)

কালক্রমে ত্যজি প্রাণ, পুনরপি পরিত্রাণ
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার ॥”

ইহার মধ্যে শেষ মঙ্গল লইয়াই ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচিত হয়, কিন্তু অপর সাতটি মঙ্গলের কথা বিদ্যাসুন্দরে কিছুই নাই; সুতরাং বোধ হয় যে কবিরঞ্জন এই ৮টি মঙ্গল লইয়া একখানি অম্বদেহু কাব্য লিখিয়াছিলেন, আর বিদ্যাসুন্দরের কথা লইয়াই তাহার শেষ মঙ্গল রচিত হয়; কিন্তু এখন সে কাব্যের পূর্বাংশ লোপ পাইয়াছে বলিয়াই কেহ কেহ অজুমান করেন।

রামপ্রসাদের সমকালে তাঁহার নিজপ্রাণে ‘আজু গোঁসাই’ নামে একব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম যে কি ছিল, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য; কেহ কেহ ‘অযোধ্যারাম গোঁসামী’ বলিয়া অজুমান করেন। ইহার সহিত রামপ্রসাদের জীবনে অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। গোঁসামী মহাশয় বৈষ্ণব আর সাধক রামপ্রসাদ না কালীর

‘আত্মরে ছেলে’, সুতরাং ইহাদের মধ্যে বিষম মতভেদ ছিল ও মধ্যে মধ্যে সলোভের উক্তি-প্রতুক্তি লইয়া বিবাদ বাধিত; কিন্তু কখন দুখামুখী যুগড়া বা তর্ক হইত কিনা জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া, উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়ারঙ্গ দেখিতেন; কিন্তু যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে শুণ্ণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আজু গোঁসাইয়ের মত একজন উপস্থিত কবির আদর হয় নাই কেন? কেহ কেহ সে অজ্ঞ বলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র নিজে কালীভক্ত ছিলেন বলিয়া, বৈষ্ণবদিগের উপর প্রজ্ঞাবান ছিলেন না অথবা আজু গোঁসাইয়ের কবিস্বশক্তি উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত ছিল না। এ মীমাংসা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ যাহার উপস্থিত কবিত্ব শুনিয়া আনন্দোদ্ভূত হইবার অজ্ঞ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইত, তাহার কবিত্বই যে উৎসাহ পাইবার অসুপযুক্ত ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, আর বৈষ্ণব বলিয়া যে তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদ-লাভ করেন নাই, তাহাও ঠিক নহে; কারণ, তাঁহার সত্য অনেকানেক পণ্ডিত থাকিতেন, তাহারা যে সকলই শাক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? বৈষ্ণবের প্রধান স্থান নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহাও বোধ হয় অসম্ভব।

আজু গোঁসাই গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার প্রাণে জগন্ময় শ্রীকৃষ্ণের রূপ বাতীত কালীর্গাশিব প্রভৃতি কিছুই স্থান পাইত না; কিন্তু রামপ্রসাদের প্রাণে একরূপ বৈতণ্ড্য ছিল না; তিনি গাহিতেন;—

(১)

“নটবরবেশে বৃন্দাবনে কালী হ’লে রাসবিহারী।

পৃথক প্রণব নানা লীলা তব,

কে বুঝে একথা বিষম ভারি ॥” ইত্যাদি।

(২)

“মন করনা বেবাদেবী।

যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।

আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তন্মাসি।

মহাকালী, কৃষ্ণ, শিব, সকল আমার এলোকেশী ॥” ইত্যাদি।

যাহা হউক আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের দু একটি গানের যে উত্তর দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা সংগৃহীত হইল।

“এই সংসার ধোঁকার টাটি।

ও তাই আনন্দবাজারে লুটি ॥

তবে কিত্তিজন বহি বাহু খুলে পাঁচে পদিপানী ॥

যেমন শরীর জলে স্রব্বের ছায়া অর্থাৎ বেতে অর্থাৎ বেটা ।
 গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলেন মাটা ॥
 ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি ।
 রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি ॥
 আগে ইচ্ছামুখে পান করিয়ে বিষের জালায় ছট্‌ফট ॥
 আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদিপুরুষের আদি মেয়েটা ।
 ওমা যা ইচ্ছা তাহাই কর মা, তুমি গো পাষণের বেটা ॥
 এই গান শুনিয়া আজুগোসাই উত্তর দিয়াছিলেন—
 “এই সংসার সুখের কুটি ।
 যার যেমন মন তেমনি ধন মনের কররে পরিপাটি ॥
 ওহে সেন অন্ন জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি ।
 ওরে শিবের ভাবনা কেন শ্রামাদয়ের চরণ দুটি ॥
 জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিলনা ক্রটি ।
 সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেতে পেতে দুধের বাটি ॥”
 রামপ্রসাদের গান—

“মুক্ত কর মা মায়াজালে ।” ইত্যাদি ।

আজুগোসাইয়ের উত্তর—

“বন্ধ কর মা খেপলা জালে ।

যাতে চুগপুটা এড়াবেনা, মজা মাংস খোলে খালে ॥”

রামপ্রসাদ কালীকীর্তনে ভগবতীর গোপবধূবশে বেণু
 বাজাইয়া একাত্মকাননে গো-চারণ বর্ণনা করিয়া কয়েকটি
 গীতপদ ও ভজন রচনা করিয়াছেন । আজুগোসাই সেই-
 গুলি শুনিয়া উত্তর দেন,

“না জানে পরমতত্ত্ব কীঠালের আমসজ

মেয়ে হয়ে খেয় কি চরণের ?

তা যদি হইত যশোদা যাইত

গোপালে কি বনে পাঠায়ের ?”

আজু গোসাইয়ের এইরূপ প্রতিবন্ধিতা দেখিয়া রাম-
 প্রসাদ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একবার বলিয়াছিলেন—

“কর্ণের বাট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট,

ম’লেও যায় না ।”

আজুগোসাই ঐ কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন—

“কর্ণ-ডোর অর্থাৎ চোর, আর মদের বোর

ম’লেও যায় না ।”

রামপ্রসাদ এই “মদের বোর” উল্লেখ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

“কালীনাথ সুধারস পান কর রাজদিনে ।” ইত্যাদি ।

রামপ্রসাদের বিদ্যাহুন্দরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামহুগাল
 ও কস্তাঘরের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কনিষ্ঠপুত্র রামমোহনের
 নাম পাওয়া যায় না, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যখন রামমোহন

জন্মিত হন, তাহার বহুপূর্বে বিদ্যাহুন্দর রচিত হইয়াছিল,
 আর যখন তাঁহার তিনটি সন্তানের পর বিদ্যাহুন্দর রচিত
 হইয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে কনিষ্ঠ পুত্রটি তাঁহার
 পরিণত বয়সের সন্তান । যখন এই কনিষ্ঠ পুত্রটি গর্ভে তখন
 আজুগোসাই সে সংবাদ শুনিয়া রামপ্রসাদকে বলেন—

“তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচারেছ পাকাখুটি ।”

এই কয়টা সামান্য ঘটনা ছাড়া রামপ্রসাদের জীবনে
 কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নিয়ে তাহার
 উল্লেখ করা যাইতেছে ।

একদিন রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন ও আপন
 মনে গান গাহিতেছিলেন । বেড়ার অপর পার্শ্বে বসিয়া
 তাঁহার কস্তা জগদীশ্বরী তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন ।
 কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশ্বরী হঠাৎ কোন কাৰ্য্যান্তরে উঠিয়া
 গেলেন, রামপ্রসাদ তাহা জানিতে পারিলেন না । তৎপরে
 জগদীশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, বেড়া অনেকদূর বাঁধা
 হইয়াছে ; কিন্তু একা রামপ্রসাদ কিরূপে এতটা বাঁধিলেন,
 তাহা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভিতর দিক্
 হইতে দড়ি কিরাইয়া দিল কে ? রামপ্রসাদ গাহিতে
 গাহিতে বলিলেন, “কেন মা তুমিই-ত দিতেছিলে ।”
 জগদীশ্বরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “না আমি উঠিয়া
 গিয়াছিলাম ।” তখন রামপ্রসাদ সকল শুনিয়া ব্যাপার
 বুঝিলেন ও ঈষৎ হাসিয়া গাহিলেন—

“মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া ।

ও মন ! তাব শক্তি পাবে মুক্তি বাঁধ দিয়ে তক্তিদড়া ॥

নয়ন থাকতে দেখলে না মন ! কেমন তোমার কপাল পোড়া ।

মা ভক্তে ছিলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥

মায়ে যত ভালবাসে বুঝা বাবে মৃত্যু-শেষে,

ক’রে তুচার দণ্ড কাঁদাকাটা শেষে দিবে গোবর ছড়া ।

ভাই বন্ধু দারা স্নাত কেবলমাত্র মাযার গোড়া ॥

ম’লে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী কড়ি দিবে আটকড়া ।

অন্ধেতে যত আভরণ সকল করিবে হরণ

দোছোট বস্ত্র গায়ে দিবে চারকোণা মাঝখানে হেঁড়া ॥

যেই ধ্যানে একমনে সেই পাবে কালিকা ভার ।

বের হ’রে দেখে কস্তারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥”

কিছুদিন হইতে রামপ্রসাদের মনে বারান্দা-দর্শনের
 অভিলাষ আছে, একদিন তিনি দান করিতে বাইবার সময়
 গাহিতে গাহিতে বাইতেছিলেন,—

“আদি কবে কান্দী-বাসী হব ।

সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবাসিব ॥

গজাজলে বিঘ্নললে বিধেখরমাথে পুন্নিব ।

ঐ বারানসীর জলে স্থলে স্থলে পরে মোক পাখি ॥

অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব ।

আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে নৃত্য ক'রে গাল বাজাব ॥

প্রসাদ বলে এ জনমে এমন দিন নাহি পাব ।

যদি সেই বেটা সে ইচ্ছা করে এখন সে দিন পেয়ে বাব ॥*

রামপ্রসাদ গান সবেমাত্র গাহিয়া থামিয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে একটি রমণী আসিয়া তাঁহাকে বলিল, “বাবা! তুমি বেশ গাও, আমাকে ছুটা গান শুনাও।” রামপ্রসাদ বলিলেন, “বাও মা! তুমি আমার বাড়ী গিয়ে বস, আমি ফিরে এসে তোমার গান শুনাব।” পরে রামপ্রসাদ ঘান করিয়া আসিয়া গৃহে কাছাকেও দেখিতে না পাইয়া নিজ অননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা! একটা জীলোক কি গান শুনিতে এসেছিল?” প্রসাদের মাতা বলিলেন, “হাঁ হাঁ একটা মেয়ে মাছুষ এসেছিল বটে, কিন্তু তোর বিলম্ব দেখে চণ্ডীমণ্ডপে কি লিখে রেখে গেছে।” রামপ্রসাদ চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বাহা দেখিলেন, তাহাতে বুঝিলেন, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা গান শুনিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কাশীতে গিয়া গান শুনাইয়া আসিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন*। রামপ্রসাদ অমনি আর্দ্রবস্ত্রে মাতাকে সঙ্গে লইয়া—“মন চলরে বারাণসী” গান গাহিতে গাহিতে বারাণসী চলিলেন। পথিমধ্যে রামপ্রসাদের বড়ই কষ্ট হয়, বোধ হয় পীড়িত হইয়া পড়েন, কাজেই পথ চলিতে অক্ষম হন এবং কাশী যাওয়া হইল না ভাবিয়া তাঁহার বড় দুঃখ হয়। তিনি অতি দুঃখে একদিন গাহিলেন,—

“মাগো, আমার কপাল দোষী।

আমি ঐহিক সুখে মত্ত হইয়ে যেতে নারিলাম বারাণসী ॥

ভারতভূমে জনমিয়া কি কর্ম করিলাম আসি।

আমি না ভাবিলাম অভয় পদ কোথায় পাব গঙ্গাকাশী ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মাগো, পাপ করেছি রাশি রাশি।

আমি বাবার পথে কাঁটা দিয়ে পথ হারানো আছি বসি ॥

পরের হয় পরগমন মনে তখন হাসি খুসি।

সাজাই এখন করে রোদিন প্রসাদ নয়ন-জলে ভাসি ॥”

তৎপরে তিনি সেই অবস্থাতে ত্রিবেণীর নিকট পৌঁছিলে, লেখানে রাক্ষে অন্নপূর্ণা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রত্যাদেশ করিলেন, “আর তোমার কাশী বহুবার আশ্রয় নাই,

এইখান হইতেই আমার গান শুনাও।” রামপ্রসাদ অমনি গাহিলেন—

১। “কাজ কি আমার কাশী ?

বার কৃত কাশী শুদ্ধরশি বিগলিত কেনী ॥

অগ্নিবীর কুণ্ডল পড়েছিল খসি,

সেই হ'তে গণিকর্ণি বলে তারে খোঁষি ॥

অসী বহুবার মধ্যে তীর্থ বারাণসী,

মায়ের করুণা বরুণাধারা অসীধারা আসি ॥

কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি,

ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী ॥

রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল তা না বসি,

ঐ যে গলাতে লেগেছে আমার কাশী নামের কাসি ॥”

২। “আর কাজ কি আমার কাশী।

মায়ের পদতলে পড়ে আছে গঙ্গা বারাণসী ॥

ছদ্মকমলে ধ্যানকালে আনন্দমাগরে ভাসি।

ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি ॥

কাশীনামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা,

ওরে অনলে দাহন যথা হয়রে তুলারশি।

গরায় ক'রে পিণ্ডদান, বলে পিতৃবধে পাবে জ্ঞান,

ওরে যে করে কালীর ধ্যান তার গয়া শুনে হাসি ॥

কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,

ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥

নির্ঝরনে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,

ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি ॥

কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,

ওরে চতুর্ভুজ করতলে ভাবিলে রে এলোকেশী ॥”

৩। “কাজকিরে মন যেয়ে কাশী।

কাশীর চরণ কৈবল্য রাশি ॥

সার্ব্বত্রিকোটি তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।

যদি সন্ধ্যা জ্ঞান শাশ্বতমান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী ॥

ছদ্মকমলে ভাব ব'লে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।

রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি ॥”

প্রবাদ আছে, কাশী রামপ্রসাদের হস্ত হইতে পুণালীরূপে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার রামপ্রসাদ গাবগাঁহ হইতে পদ্ম আহরণ করিয়া কাশীপূজা করিয়াছিলেন।

এতদ্বির আর দুইচারিটি ঘটনা রামপ্রসাদ সৰ্ব্বদে জানা যায়। তিনি কলিকাতার তগিনীপতির বাড়ীতে বধ্যে মধ্যে আসিতেন; এই সময়ে তাঁহার সহিত রাজা নবকৃষ্ণের পরিচয় হইয়াছিল। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে দোলের সময় এক-

* কেহ কেহ বলেন, অন্নপূর্ণা লিখিয়া রাখিয়া যান নাই, রামপ্রসাদ বাসী আসিবামাত্র দৈববাণী হয় “আমি আর বসিতে পারি না, তুই কাশী গিয়া আমাকে গান শুনাইয়া আয়।”

বার রামপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। রাজা মনস্কক তাঁহাকে দোলসম্বন্ধে একটি গান রচনা করিতে বলেন। রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ গাহিলেন,—

“হৃদকমলমঞ্চে দোলে করালকলনী (শ্রামা)।

মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী (ওমা) ॥

ইড়া শিঙ্গলানামা সুসুমা মনোরমা

তার মধ্যে বাধা শ্রামা ব্রহ্মসনাতনী (উমা) ॥

আবির কথির তায় কি শোভা হয়েছে হায়
কাম আদি মোহ বার হেরিলে অমনি (ওমা)।

যে দেখেছে মায়ের দোল সে পেয়েছে মায়ের কোল
শ্রীরামপ্রসাদের এই ঢোল মারা বাণী (ওমা) ॥”

আর একবার রথযাত্রা উপলক্ষে রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

“কালী কালী বল রসনারে।

ও মন ঘটক্রমণ মধ্যে, শ্রামা মা মোর বিরাজ করে ॥

তিনটে কাছি কাছাকাছি, বাঁধা আছে মূলধারে।

পাঁচ কমতার, সারথি ভায়, রথ চালায় দেশ দেশান্তরে ॥

জুড়ি ষোড়। দোড় কুচে দিনেতে দশকুশী মারে।

সে যে সময়-শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হ'লে পরে ॥

তীর্থে গমন, মিথ্যা-ভ্রমণ মন উচাটন করোনারে।

ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হ'মে অন্তঃপুরে ॥

পাঁচজনে পাঁচস্থানে গেলে ফেলে রাখবে প্রসাদে।

ও ঘন এই-ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাক্তে পার

“হৃ-অক্ষরেক ॥”

আর একবার চড়ক দেখিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

“ওরে মন চড়কী চড়ক ঘোর, এ ঘোর সংসারে।

মহা যোগেন্দ্র কোতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে ॥

মৃগল স্বয়ম্ভু শঙ্কু যুবতীর উরে।

মনরে ওরে করপকবিশ্বদলে পুজিছ তাঁহারে ॥

ঘরেতে যুবতীর বাক, বাজিছে গাঞ্জে ঢাক,

মনরে ওরে, বৃন্দাবলী খ্যাম্টা ঢালী বাজায় বারে ॥

কাম উচ্চ ভারার চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে,

মনরে ওরে, এমন যাতনা কয়েছ তুচ্ছ ধস্তরে তোমারে ॥

* প্রবাদ আছে বটে এই গানটির রথ-উপলক্ষে রামপ্রসাদ গাহিয়া-
ছিলেন, কিন্তু বোধহয় তাহা নহে, কারণ “তীর্থে গমন, মিথ্যাভ্রমণ”
ইত্যাদি চরণগুলি পড়িলে অনুমান হয় যে, কোন সময়ে তাঁহার জগন্নাথ-
ক্ষেত্রে গিয়া রথ দেখিবার সাধ হইয়াছিল বা সে সন্ধ্যাে কাহারও সহিত
কোন কথোপকথন হইয়াছিল, কারণ তাঁহার আরও একটি গানে আছে,
“ভবজরা পাপরোপ, লীলাচলে না না ভেসে, ওরে আরে কালী স্বর্নদানী,
দ্বিবেণীবাঁধে রেখে থাকিবে।”

দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাহের বাছ,
মনরে ওরে, মায়াভোর বড়শীগাথা দেহ বল বারে ॥

প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে লাগ,
মনরে ওরে, শিল্পে হুঁকে শিল্পে পাবি ডাক কেল মারে ॥”

আর একবার কুমারহট্ট নিবাসী অধ্যাপক বলরাম
তর্কভূষণ তাঁহাকে মাতাল বলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ সেই
কথা শুনিয়া গাহিয়াছিলেন,—

“ওরে সুরাপান করিনে আমি সুখ খাই জয়কালী বলে।

মন-মাতালে মাতাল করে, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥

গুরুদত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি মদলা দিবে মা,

আমার জ্ঞানগুড়ীতে চোয়ান ত্যাগি,

পান করে মোর মন-মাতালে।

মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, সোধন করি বলে তারা মা,

রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চকুর্কর্ণ মিলে ॥”

রামপ্রসাদের মৃত্যুসম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে,
তিনি পূর্বেই কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে জানিতে পারিয়া-
ছিলেন। তদনুসারে তিনি মৃত্যুর পূর্বরাত্রে কালীপূজা
করেন। পরদিন বিসর্জনের সময় পরিজনবর্গকে নিজ
আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়া, সকলের সঙ্গে গান গাহিতে
গাহিতে গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং গঙ্গাজলে নিজ শরীর
অর্দ্ধ মগ্ন করিয়া শেষ চারিটি গান করেন। তাঁহার শেষ
গানটি এই—

“তারা তোমার আর কি মনে আছে।

ওমা এখন যেমন রাখলি হৃদে তেমনি লুপ্ত কি পাছে ॥

আর যদি থাকিত ঠাই, তোমারে সাধিতাম নাই,

মাগো ওমা দিবে আশা, কাটিলে পাশা, তুলে দিবে গাছে।

প্রসাদ বলে মন মড় দক্ষিণায় জোর বড়,

মাগো ওমা, আমার দফা হ'ল রক্ষা দক্ষিণা হ'য়েছে ॥”

উক্ত গানটির শেষ ছত্র গাহিবামাত্র ব্রহ্মরুকু ভেদ করিয়া
রামপ্রসাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

রামপ্রসাদের মত।—কবিরঞ্জন গুটি অগুটি ছুখ হুখ
ধর্ম্মার্থের প্রভেদ স্বীকার করিতেন না, তিনি এক স্থানে
বলিয়াছেন,

“ধর্ম্মার্থ দুটো অলা তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থোবা।

ওরে জ্ঞানখণ্ডে বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা ॥”

তাঁহার মতে, অহঙ্কার বিনাশ না হইলে প্রকৃত জ্ঞান
জন্মে না।

“অহঙ্কার অবিন্যা তোর সে'টাকে তাড়ায় দিবি।”

তিনি প্রকৃত তাত্ত্বিক, মহাপ্রকৃতির উপাসক, আদ্যাশক্তির

প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তিনি ঘটে পটে, জলে স্থলে, সকল
দেবমূর্তিতেই মহাশক্তি কালীরূপ দেখিতে পাইতেন;—

তিনি এক স্থানে গাহিয়াছেন,

“ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনেও কি তা জাননা।”

কালী কৃষ্ণ ব্রহ্মা শিব তাঁহার অভেদজ্ঞান জন্মিয়াছিল।
তাঁহার মতে, ধাতু পাষণ অথবা মাটিমূর্তি পূজা করিয়া কাজ
কি, হৃদয়মন্দিরে সেই মহাশক্তির মনোময় প্রতিমার কল্পনা
করিয়া সাধক অর্চনা করিবেন। মহাশক্তির প্রতি অচলা
ভক্তি থাকিলেই মুক্তিলাভ হয়। তাঁহার মত পরিপোষক
কয়েকটি গীত উদ্ধৃত হইল;—

(১)

“মন তোর এত ভাবনা কেনে ?

একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে ॥

জীকজমকে কল্পে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে ;

তুই সুকিয়ে তাঁরে কন্নি পূজা জানবেনারে জগৎজনে ॥

ধাতুপাষণ মাটির মূর্তি কাজ করে তোর সে গঠনে।

তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসিও হৃদিপদ্মাসনে ॥

আলোচাল আর পাকালা কাজ করে তোর আরোজনে।

তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্ত কর আপন মনে ॥

ঝাড়লঠন বাতির আলো কাজ কি তোর দে রোসনায়ে ;

তুমি মনোময় মাণিক্যজেলে দেওনা অঙ্গুক নিশিদিনে ॥

মেঘ ছাগল মহিষাদি কাজ করে তোর বলিদানে।

তুমি জয়কালী জয়কালী বলি বলি দাও বড়রিপুগণে ॥

প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ করে তোর সে বাজনে।

তুমি জয়কালী বলি, দাও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥”

(২)

“মন কোরনা ঘেঁষাঘেঁষি।

যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী ॥

আমি বেদাগম পুরাণে কল্লম কত খোঁজ তল্লাসি ;

ঐ যে কালীকৃষ্ণ শিবরাম—সকল আমার এলোকেশী ॥

শিবরূপে ধর শিলা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,

ও মা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥

প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দাঁতোর হাসি।

আমার-ব্রহ্মময়ী সর্বদ্যেটে পদে গলা গয়াকালী ॥”

(৩)

“কে জানে গো কালী কেমন।

বড়দর্শনে না পারি দরশন ॥

মূলধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।

তার পদবনে হংসসনে হংসরূপে করে রসন ॥

আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন।

তার ঘটে পটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥

তারার উদর ব্রহ্মাও ভাণ্ড প্রকণ্ড তা জান কেমন।

কালীর মর্দ্ব কাল জেনেছেন অস্ত্র কেটা জানবে তেমন ॥

প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে সত্তরণে সিদ্ধুরণ।

আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুকে না ধনুবেশশী হ’য়ে বামন ॥”

কবিরহস্য (কী) কবীনাং রহস্যং যজ্ঞ, বহুত্রী। গ্রন্থবিশেষ ;

এই গ্রন্থে প্রত্যেক ধাতু যত প্রকার গণভুক্ত এবং তাহার

প্রত্যেকগণে যেরূপ নিম্পন্ন হয়, তাহাই কাব্যচ্ছলে লিখিত

আছে। ইহা পণ্ডিত হলায়ুধ প্রণীত। [হলায়ুধ দেখ।]

কবিরাজ (পুং) কবীনাং রাজা শ্রেষ্ঠঃ, কবি-রাজ-নৃ-ট্

(রাজাহঃ সখিভ্যট্। পা ৫।৪।৬১) ১ কবিশ্রেষ্ঠ। ২ কবি-

বিশেষ, ইনিই ‘রাঘবপাণ্ডবীর’ কাব্য প্রণয়ন করেন।

পাশ্চাত্য মতে, ইনি খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

৩ আয়ুর্কেন্দ্রীয় চিকিৎসক। এই চিকিৎসক সম্প্রদায়ের

মধ্যে পূর্বে অনেকেই প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, সেই অবধিই

বোধ হয় চিকিৎসক মাত্রই ‘কবিরাজ’ নাম প্রাপ্ত হইয়া

থাকিবেন। বঙ্গদেশে বৈদ্যমাত্রাই কবিরাজনামে পরিচিত।

কবিরাজগণের আরও কয়েকটি উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা—

কবিরঞ্জন, কবিচন্দ্র, কবিরত্ন, কবিভূষণ, কবিবল্লভ, কবীন্দ্র,

বৈদ্যানিধি ইত্যাদি।

এ দেশে কবিরাজের আর একটি নাম “নাড়ীটেপা”

ভাল ভাল কবিরাজগণ কেবলমাত্র নাড়ী টিপিয়া উৎকট

উৎকট রোগ নির্ণয় করিয়া থাকেন বলিয়া “নাড়ীটেপা”

নাম হইয়াছে। বাহারা আয়ুর্কেন্দ্রে বিশেষ পারদর্শী নয় অথচ

চিকিৎসা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে “হাতুড়িয়া” বলে।

পূর্বে এই বঙ্গদেশে কবিরাজের বিশেষ সমাদর ছিল।

তৎকালে বিক্রমপুর ও কাঁচড়াপাড়ার কবিরাজী শিখিবার

পাঠশালা ছিল, এ ছাড়া বড় বড় কবিরাজের বাটতেও আয়ু-

র্কেন্দ্র শিক্ষা করিবার জন্ত অনেক ছাত্র থাকিত। মধ্যে

হাকিমী ও ইংরাজী চিকিৎসার প্রচলনে কবিরাজগণের

আয়ুর্কেন্দ্রীয় চিকিৎসা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

একণে আবার কবিরাজী চিকিৎসার দিন দিন উন্নতি দেখা

যাইতেছে। [বৈদ্য, চিকিৎসা, আয়ুর্কেন্দ্র প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কবিরাজী (দেশজ) ১. বঙ্গদেশীয় বৈদ্যক চিকিৎসা। ২. (ত্রি)

কবিরাজসম্বন্ধীয়। (পুং) ৩ উপাসক-সম্প্রদায়বিশেষ, রূপ

কবিরাজ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। রূপের ওরূপ তাঁহাকে

শম্ভুধারিণী রমণীর হস্তে ভোজন করিতে নিষেধ করেন ; তাই

একদিন তিনি শম্ভুধারিণী গুরুপত্নীর হস্তে ভোজন করেন

লাই। শুধু এই কথা শুনিয়া তাঁহার তিন কণ্ঠিযালায় মধ্যে দুই কণ্ঠি ছিড়িয়া দেন। রূপ সেই এক কণ্ঠি লইয়া পলায়ন করেন। উৎকলদেশে অনেক বৈষ্ণব রূপ কবিরাজের মতাম্বর্তী হইয়া তাহার কবিরাজী নামে বিখ্যাত হয়। কবিরাজীরা অস্ত্র বৈষ্ণবের ঘরে বিবাহ অথবা অন্নগ্রহণ করে না, অথবা অস্ত্র কাহার পাক করা অন্ন ভোজন করে না, প্রায় সকলেই সদাচারী। কাহারও মতে, ইহাদেরই অপর নাম ‘স্পষ্টদায়ক’।

কবিরাম। ১ দ্বিধিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভূগোল-রচয়িতা। ইনি কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহার গ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। ইহার গ্রন্থে সমস্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রাচীন ভূবৃত্তান্ত ও প্রবাদ লিখিত হইয়াছে। ২ বেহারে ডোমজাতির চাইকে কবিরাম কহে।

কবিরামায়ণ (পুং) কবিনা কবিতয়া কবিসু কাব্যোয় বা রামঃ অয়নং আশ্রয়ো যন্ত, বহুব্রী। বাঙ্গালি মুনি।

কবিল (ত্রি) কু-কব-বা বর্ণনে-ইলচ্। ১ স্তোতা, স্তবকারক। ২ শব্দকারক।

কবিলাসিকা (স্ত্রী) কং স্মৃৎ বিলাসয়তি উদীপয়তি ক-বি-লস-গিচ্-বুল্ টাপ-অত ইহম্। বীণাবিশেষ।

কবিবর (ত্রি) কবিসু করঃ শ্রেষ্ঠঃ। কবিশ্রেষ্ঠ।

কবিবল্লভ (পুং) অপর নাম আদিত্যহরি। ইনি বিখ্যাত আচার্য্যের শিষ্য এবং কালাদর্শ বা কালনির্ণয় নামক স্মৃতিসংগ্রহ রচয়িতা।

কবিবেদী [ন্] (ত্রি) কবিং কবিত্বং বেত্তি কবি-বিদ্-গিনি। ১ কাব্যবেত্তা। ২ কবি।

কবিশস্ত্র (ত্রি) কবিসু শস্ত্রঃ খ্যাতঃ ৭তৎ। বিখ্যাত কবি।

কবিশেখর (পুং) সাধনমুক্তাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

কবী (স্ত্রী) কবি-ভীষ্। লাগাম।

(কবী থলীনং কবিকা কবিরং মুখবল্লবম্। হেম ৪।৩।৬।)

কবীন্দ্র আচার্য্য সরস্বতী, কবিচন্দ্রোদয় ও পদচক্রিকা নামী সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

কবীন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা, একাত্তরজিকা ও বিরজামাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি উৎকলরাজ অলাবু-কেশরীর সময়ে ঐ দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

কবীয় (স্ত্রী) কবি-স্বার্থে ছ। লাগাম।

কবীয়ং (ত্রি) কবিরিব আচরতি, কবিং স্তোতারং ইচ্ছতি বা; কবীয়-শব্দ। ১ কবিসদৃশ। ২ নিজের স্তব পাইবার ইচ্ছাবৃত্ত।

কবীয়ান্ [স্] (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন কবিঃ, কবি-ভীরহুন। (বিবচন-বিভজ্যোপপদে ভরবীরহুনৌ। পা ৫।৩।৫৭।) উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।

কবীরপছী (দেশজ) বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। [কবীর দেখ।]

কবুলাবেশী (আরব্য কবুল শব্দজ) কোন জমীর জমা নিরিখ মত গুণগুণা জমা অপেক্ষা বত অধিক দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়, তাহার নাম ‘কবুলাবেশী’।

কবুল (আরব্য) ১ স্বীকার।

কবেল (স্ত্রী) কং জলং বিলতি তৃণাতি, ক-বিল-অণ্। ১ পদ্ম। ২ শুনিফুল।

কবোক্ষ (স্ত্রী) কুংসিতং দ্বৈবং ইত্যর্থঃ উক্ষঃ, কর্ণধা কোঃ কবাদেশঃ (কবকোক্ষো। পা ৬।৩।১০৭।) ১ দ্বৈবং উক্ষ স্পর্শ। ২ (ত্রি) দ্বৈবং উক্ষ স্পর্শবৃত্ত।

(কোক্ষঃ কবোক্ষঃ কহুক্ষোমন্দোক্ষশ্চেষদ্বক্ষবৎ। হেম ৬।২২।)
“মৎপরং দুর্লভং মন্তানুমানবজ্জিতং ময়া।

পয়ঃ পূর্বেঃ সনিখ্যটৈঃ কবোক্ষমুপভূজাতে ॥” রঘু ১।৬৭।

কব্য (ত্রি) কবি-যৎ (বহুঅয়স্ ও ক-কবি-ক্ষেম-বর্জস্ নিক্ষে-বলউৎপন্নপূর্ব্বনবস্মরমর্জবর্জ ইত্যোতেভ্যশ্চান্ধি স্বার্থে যৎ। কাশিকা ৫।৪।৩০) [বৈ] স্তবকারী (সারণ)। (পুং) ২ বেদোক্ত পিতৃলোকবিশেষ।

(“মাতলী কটৈর্বমো অজিরোতিঃ।” ঋকসংহিতা ১০।১৪.৩)
(স্ত্রী) কৃত্যতে দীযতে পিতৃভ্যাঃ যৎ অমাদিকং, কু-অচ্-যৎ (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭। ৩ পিতৃলোকের উদ্দেশে যে অমাদি দেওয়া হয়।

কব্য পদার্থ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়, নতুনা তাহা নিফল হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,— একটিমাত্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কব্য ভোজন করাইলে পুঙ্কল ফল লাভ হয়, কিন্তু অমঙ্গল বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও তাহা হয় না; বিশেষতঃ অমঙ্গল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সে যতগুলি গ্রাস ভক্ষণ করে, পিতৃলোকদিগকে ততগুলি উত্তপ্ত লৌহ গোলা ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব প্রণামেই পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কব্য ভোজন করাইবে। বেদতত্ত্ববিদ ব্রাহ্মণমধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ ও কর্মনিষ্ঠভেদে চারি শ্রেণী আছে। হব্য ভোজনে চারি শ্রেণীরই বিধান থাকিলেও কব্য-ভোজনে একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিধান দেখা যায়।

“জ্ঞাননিষ্ঠা বিজ্ঞাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠান্তথা পরে।

তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্মনিষ্ঠান্তথা পরে।

জ্ঞাননিষ্ঠেযু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যনি বহুতঃ।

হব্যান কু বখাভারং সর্কেষেব চতুর্থপি ॥

ঐক্য প্রাক্কণের অভাব হইলে, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনের, শ্বশুর, গুরু, দোহিত্র, ভায়াতা, বজ্র, পুরোহিত বা বজ্রমানকে ভোজন করাইবে। (মহা ১ অঃ।)

মহুর মতে বেদজ্ঞ হইলেও এই সকল প্রাক্কণকে ভোজন করান নিষিদ্ধ। বখা—চিকিৎসক, দেবল, কস্তা-বিক্রেতা, দোকানদার, চৌর্যাদিগণে পতিত, ক্রীষ, নাস্তিক, জটা-ধারী, দুর্বল, প্রভারক, রাজার প্রেযা, কুনবী, ভাবদত্ত, গুরু প্রতিরোধী, অগ্নিত্যাগী, রাজবন্দী, পতপালক, ব্রহ্মবেদী, অভিনেতা, শূদ্রাণিপতি, বিধবার গর্ভজাত, কাণা, বেতন লইয়া বাহারা অধ্যাপনা করেন, শূদ্রশিষ্য, দুষ্টবাদী, মাতা পিতা ও গুরুকে অকারণ পরিত্যাগকারী, গৃহদাহক, বিধবাভা, কুণ্ডার-ভোজী, সোমবিক্রেতা, সমুদ্রযাত্রী, অবিবাহিত, অগ্রজ বর্ভ-মানে বিবাহকারী, আরজ, বন্দী, তৈলিক, কুটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী, মদ্যপ, পাগুরোগী, দাস্তিক, রসবিক্রেতা, ধমু ও শরনিষ্ঠাভা, দিঘিষ্পতি, মিত্রজ্যোহী, দ্যুতবৃত্তি, পুজা-চাৰ্য্য, অপস্মাররোগ, গণ্ডমালারোগী, খিত্তরোগী, খল, উদ্বৃত্ত, অন্ধ, বেদনিদ্রক, জ্যোতিষ, ব্যবসায়ী, পক্ষিপোষক, যুদ্ধশাস্ত্রের আচার্য্য, হুপতি, দূত, বৃক্ষারোপক, কুকুরের সহিত ক্রীড়াশীল, শ্বেদপক্ষীজীবী, কস্তাদূষক, হিংস্র, শূদ্রবৃত্তি, গণগাংকারী, আচারহীন, ক্রিয়াজীবী, স্ত্রীপদরোগী ও সঙ্কট-নিমিত্ত।

(পুং) চতুর্থ মন্তব্যের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

কব্যতা (স্ত্রী) [বৈ] ভূতি। জ্ঞান।

কব্যবাড় [কব্যবাল দেখ।]

কব্যবাল (পুং) কব্যং বল্যতে দীয়েতে অটম কব্যবাল-ঘঞ।

১ পিতৃগণবিশেষ।

(“কব্যবালো হনলঃ সোমো যমশ্চৈবাব্যমা ভথা।

অগ্নিষাত্তা বর্হিবনঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥”

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

২ অগ্নি। অগ্নিমুখেই পিতৃগণ উদ্দেশে দান করা হইয়া থাকে।

কব্যবাহু (পুং) কব্যং বহতি, কব্য-বহ-বি। অগ্নি, যে অগ্নিতে পিতৃগণের উদ্দেশে কব্য দেওয়া হয়।

কব্যবাহু (পুং) কব্যং বহতি প্রাপ্যতি পিতৃনিতি শেষঃ, কব্য-বহ-অণ্। অগ্নি।

কব্যবাহন (পুং) কব্যং বহতি কব্য-বহ-ঞাট্ (কব্যপুরীষ-পুরীষোয় ঞ্জাট্। পা ৩। ২। ৬৫।) ১ অগ্নি। (“অগ্নয়ে কব্যবাহনার ঞ্জাট্। ভরু বজ্রঃ। ২। ২২।”) যজুর্বেদের

মতে, অগ্নি তিন প্রকার, দেবগণের অগ্নি ‘হব্যবাহন’ পিতৃ-গণের ‘কব্যবাহন’ এবং অসুরগণের ‘সহরক্ষা’। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২। ৫। ৮। ৬)

কশ (পুং) কশতি শরায়তে তাড়রতি বা কশ-অচ্। অশ্ব প্রভৃতিকে তাড়না করিবার পদার্থবিশেষ, চাবুক; ইহা চর্ম, বস্ত্র ও বেত প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত হয়।

(“সরাসা তং কশেন অতাড়য়ৎ।” মহাভারত ৩। ১২৬।)

কশস্ (স্ত্রী) কশতি নীচং গচ্ছতি কশ-অহ্। জল। (নিঘণ্টু ১। ১২)

কশা (স্ত্রী) কশ-টাপ্। ১ চাবুক। (“অশ্বান কশয়া মোহাং তদা রাজসবয়ুনিম্।” ভারত ১। ১৭১। ১।) (চর্মভূতে কশায়শ্চৈব বস্ত্রাবক্ষেপণী কুশাঃ। হেম ৪। ৩৮।) ২ মাংস-রোহিণী। (ভাবপ্রা°) ৩ (দেশজ) টানা।

কশাই (দেশজ) গরু প্রভৃতি মারিয়া বাহারা বিক্রয় করে। কশাই, মেদিনীপুর জেলায় নদীবিশেষ, সাধুভাষায় কংশবতী এবং কালিদাসের রঘুবংশে কপিশানদী নামে পরিচিত।

কশাইফুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গের বাগিছাভিবেশ। ইহার কশাই নদীতে নৌকা চালায় ও মাছ ধরিয়া বেড়ায়। ১৪ প্রকার বাগীর মধ্যে ইহার আগুনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়।

কশাঘাত (পুং) কশেন কশয়া বা আঘাতঃ ৩তৎ। চাবুক মারা।

কশাত (দেশজ) তৃণবিশেষ, কেযো।

কশাত্রয় (স্ত্রী) কশানাং কশাঘাতানাং ত্রয়ম্ বহতী। ৩ প্রকার কশাঘাত; মুহু, মধ্য ও নিষ্ঠুর। অশ্বগণের সাধারণ দণ্ড-কালে মুহু আঘাত এবং উপবেশন, নিদ্রা, অলস, দুষ্টচেষ্টা, অশ্বিনী দেখিয়া ঔৎসুক্য, গর্জিত হেয়ারব, জাস, দুর্কথান, বিমার্গগমন, ভয়, শিক্ষাত্যাগ, চিত্তবিস্রম প্রভৃতি অপরাধে মধ্য ও নিষ্ঠুর আঘাত করিতে হয়। অপরাধ বিশেষে আঘাতের স্থানও পৃথক্। জন্তু ও ভীত হইলে গলদেশে শিক্ষাত্যাগ ও চিত্তবিস্রমে অধরে গর্জিত হেয়ারব ও অশ্বিনী দেখিয়া ঔৎসুক্যকালে বাহ ও দুর্কথানে উপবেশন ও নিদ্রার কটদেশে দুর্ব্যবহার ও বিমার্গ প্রস্থানে মুখে, অলস ও দুর্কথানে অধনে এবং কুর্ভ প্রভৃতি হইলে সর্কধানৈ ই কশাঘাত করিতে হয়।

কশার্হি (স্ত্রী) কশাং অর্হতি কশা-অর্হ-অণ্। ১ কশা মারি-বার উপযুক্ত। ইহার অপর সংস্কৃত নাম কস্ত।

[কশাত্র দেখ।]

কশিক (পুং) কশতি হিনস্তি-লর্শম্, কশ-বাহলকাৎ-ইক্। নহুল, বেজি।

কশিকপাদ (জি) কশিকত পাদাবিধি পাদৌ অত্র, বহুব্রী, হস্ত্যাবিধাৎ নাস্ত্যলোপঃ (পাদত্বে লোপাহস্ত্যাবিধ্যঃ। পা ৫।৪।১৩৮।) নকুলের ভায় পদবিশিষ্ট জড়।

কশিপু (পুং) কশতি দ্বঃখং কশতে বা, যুগযাদিষাৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ন। ২ আচ্ছাদন। ৩ অরাচ্ছাদন।

(কশিপূর্তজাচ্ছাদনরোরেকোজ্য পৃথক্করোঃ পুংলি। মেদিনী।) ৪ শ্যয়া। ("সত্যং কিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈঃ।" ভাগবত ২।২।৪)

৫ আশনবিশেষ।

কশিপূর্বর্হণ (ক্লী) [বৈ] উপাধান বজ্র। বালিসের খোল। কশীকা (ক্লী) কশ-বাহুলকাৎ কৈক্-টাপ্। প্রস্থতানকুলী। ("আগধিতা পরিগধিতা বা কশীকেব জলহে।" ঞক্ ১।১২৬।) 'কশীকা স্তবৎসা নকুলী' সারণ।)

কশু (পুং) রাজবিশেষ, ইহার পিতার নাম চেনি।

কশুর (দেশজ) ১ কুশাবতী নামের অপভ্রংশ। [কুশাবতী দেখ] ২ অন্ন। [কশুর দেখ]।

কশেরুক (পুং) যক্ষবিশেষ। (ভারত ২।১০ অঃ)

কশেরু (পুং, ক্লী) কে দেহে শীর্ণাতে ক-শু-উ-এরঙাদেশচ্ (কেশ্-এরঙাচ্চ। উণ্ ১।৯০।) ১ পৃষ্ঠাধি, পিঠের দাঁড়া, শিরদাঁড়া। ২ (ক্লী) কং জলং বাতং বা শৃগাতি। কেশুর। (Scirpus kysoor) ইহা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দুই প্রকার বড় কেশুরকে 'রাজকশেরু' ও খুয়ার ভায় ক্ষুদ্র কেশুরকে দেশ বিশেষে 'চিচ্চোড়' কহে। বিবিধ কেশুরের গুণ—মধুর, কষায়রস, শীতল, গুরু, মলগ্রাহী; পিত্ত, রক্তদাহ ও চক্ষুরোগ-নাশক এবং শুক্র, বায়ু, স্নেহা ও শুভ্রকারক।" (ভাবপ্র।) ৩ (পুং) ভারতবর্ষের একটি বিভাগ।

("ভারতভ্যন্ত বর্ষত নবভেদানি নাময়।

ইন্দ্রধীপঃ কশেরুশ্চ তাত্রবর্ণো গভতিমান্।

নাগবীপত্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বধ্বংসারূপঃ।" বিষ্ণুপুরাণ)

কশেরুক (ক্লী) কশেরু-স্বার্থে কন্। কেশুর।

কশেরুকা (ক্লী) কশেরুক-টাপ্। পৃষ্ঠাধি, পিঠের দাঁড়া।

কশেরুমান্ (পুং) ১ যবনরাজবিশেষ।

("ইন্দ্রদ্রোহিতঃ কোপাদ্ধবনশ্চ কশেরুমান্।" হরি ১৬ অঃ।)

২ ভারতবর্ষের ঋণবিশেষ।

কশেরুন্ (ক্লী) কশেরু।

কশেরু (ক্লী) ক-শু-উ-এরঙাডাদেশঃ (কেশ্-এরঙাচ্চ।

উণ্ ১।৯০।) ১ তৃণকলবিশেষ, কেশুর। (কশেরু তৃণকলে ক্লী।

উজ্জলভ।) [কশেরু দেখ] ২ বিখকশীর চতুর্দশী কজা।

নরকাজুর হস্তরূপে ইহাকে হরণ করিয়াছিল। (হরিঃ ১২১ অঃ।)

কশৌক (জি) কশ ভাঙনে-বাহুলকাৎ ওক। ১ হিংসক। ২ রাক্ষসাদি।

কশ্চন (অব্যয়) কিম্-চন ইতি মুদ্রবোধঃ। (পানিনি ইহাকে পৃথক পদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।) কোনও, অনির্দিষ্ট কোন একজন।

কশ্চিৎ (অব্যয়) কিম্-চিৎ ইতি মুদ্রবোধঃ। পানিনি স্তে ইহাও পৃথক পদ। কোনও, অনির্দিষ্ট কোন একজন।

("কশ্চিৎ কাস্তাবিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ

শাপেনাত্তং গমিত মহিমা বর্ষতোগোন তর্জুঃ।" মেঘদূত।)

কশ্মল (ক্লী) কণ-কল মুট্ (কুটিকশিকোতিভ্যঃ প্রত্যয়ত মুট্। উণ্ ১।১০৮) ১ মুছা। ২ মোহ। ৩ পাপ। ৪ (জি) মলিন।

(মলিনং কচ্চরং স্নানং কশ্মলকং মলীমসম্। হেম ৬।৭১)

৫ ছরচার। ৬ (জি) পানী।

কশ্মল (ক্লী) বেদে পূর্বোদারাদিষাৎ লভ শঃ। কশ্মল।

[কশ্মল দেখ।]

কশ্মীর (পুং) কশ-ঈরন্-মুডাগমচ্ (কেশ্-মুট্ চ। উণ্ ৪।৩২) কামীর জনপদ [কামীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কশ্মীরজ (ক্লী) কশ্মীরে জায়তে, কশ্মীর-জন্-ড। কুছুম-বিশেষ। [কুছুম দেখ।]

কশ্মীরজন্ম [ন] (ক্লী) কশ্মীরে জন্ম যত বহুব্রী। কুছুম-বিশেষ। [কুছুম দেখ।]

(কশ্মীরজন্ম সূর্যং বর্ণং লোহিতচন্দনম্। হেম ৩।৩৮।)

কশ্য (ক্লী) কশাং অর্হতি কশা-য (দণ্ডাদিত্যো যঃ। পা ৫।১।৬৬।) ১ অশ্বের মধ্যদেশ। (মধ্যং কশ্যং নিগলন্ত গলোদ্যেশঃ খুরাঃ শকাঃ। হেম ৪।৩১।) ২ (জি) কশা-ঘাতের যোগ্য। ৩ কশতি বাহুলকাৎ করণে যৎ। মদ্য।

কশ্যপ (পুং) কশ্যঃ সোমরসাদিজনিভঃ মদ্যং শিবতি কশ্য-পা-ক। ১ ঋষিবিশেষ, ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির ঔরসে ও কলার গর্ভে ইহার জন্ম। মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে, কশ্য অর্থাৎ সোমরস জনিত মদ্য হইতে ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহার নাম কশ্যপ হইয়াছে।

"ব্রহ্মগুণনয়ো যোহভূৎ মরীচিরিতি বিপ্রতঃ।

কশ্যপস্তত পুত্রোহভূৎ কশ্যপান্যং স কশ্যপঃ।"

মার্কণ্ডেয়পুঃ ১০৮। ৩।

শুরু যজুর্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যমতে, কশ্যপ হিরণ্যবর্ষ ব্রহ্ম হইতে জন্মে। "হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ বাবকা বাহু লাতাঃ কশ্যপো বাবিত্রঃ।" (তৈত্তিরীর সাহিত্য ৫।৬।১।১।)

কশ্যপ একজন ঔষধপণ্ডিত। নাম, বহুঃ ও অধর্কসংহিকার

মতে, ইনি ইঙ্গ চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের জনক। (সামস ১।১২।৪; শুক্ল যজু: ৩.৬২; অথর্ব ১৩.৩.১০।)

কাত্যায়নের বেদাঙ্কুরমণিকার মতে, কশ্যপ ঋকসংহিতার কয়েকটি স্কন্ধের ঋষি। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কশ্যপ ঋষি দক্ষের ১৭টি কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের গর্ভে ১৭টি জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল; যথা—১ অদিতিগর্ভে দেবগণ, ২ দিতিগর্ভে দৈত্যগণ, ৩ দম্বরগর্ভে দানব, ৪ কাষ্ঠা গর্ভে অশ্বাদি, ৫ অরিষ্টাগর্ভে গন্ধর্ব্বগণ, ৬ সুরমাগর্ভে রাক্ষস, ৭ ইলাগর্ভে বৃক্ষ, ৮ মুনিগর্ভে অস্পরোগণ, ৯ ক্রোধবশাংগর্ভে মর্গ, ১০ ভাস্করাগর্ভে শ্চেন গৃধ্র প্রভৃতি, ১১ সুরভিগর্ভে গো মহিষাদি, ১২ সরমাগর্ভে স্বাপদ, ১৩ তিমিগর্ভে জলজন্ত, ১৪ বিনতাগর্ভে গরুড় ও অরুণ; ১৫ কজ্রগর্ভে নাগ, ১৬ গন্তঙ্গীগর্ভে পতঙ্গ, ১৭ বামিনীগর্ভে শলভ।

(ভাগবত ৪।১।১২।)

কিন্তু মহাভারত এবং অন্ত্যান্ত পুরাণ প্রভৃতিতে কশ্যপের ত্রয়োদশ ভাগ্যার উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ত্রয়োদশটির নাম এই—১ অদিতি ২ দিতি ৩ দম্ব ৪ বিনতা ৫ খসা ৬ কজ্র ৭ মুনি ৮ ক্রোধা ৯ অরিষ্টা ১০ ইরা ১১ ভাস্করা ১২ ইলা এবং ১৩ প্রধা। (মার্কণ্ডেয় ১০৮ অঃ।)

• ২ (পশুতীতি পশু: সর্ষজ: পশু এন পশু: আদ্যন্তাক্ষর বিপর্যয়াৎ সিধ্যতি। যথা কশ্যং অজ্ঞানং অবিদ্যামিত্যর্থ: পিবতি নাশয়তি অথবা কশ্যং বিজ্ঞানঘনং পাতি রক্ষতি স্বাশ্বনীতি শেব:।) পরব্রহ্ম।

(“তদেব ব্রহ্ম বা আত্মা এতন্ত পাতা হর্ত্বা প্রজানাং গোষ্ঠা বাবহ কশ্যপো হ যোঃমজ্ঞান-ভোক্তা গান্ধর্ব্বি।” তাপনি শ্রুতি ২। ১১।) ৩ কচ্ছপ। ৪ (ত্রি) শ্রাবদন্ত (সুরাপ: শ্রাবদন্ত: ভা৩।) ৫ মৃগবিশেষ। ৬ মৎস্রবিশেষ।

কশ্যপনন্দন (পুং) কশ্যপন্ত নন্দন: পুত্র: ৬তৎ। ১ গরুড়। ২ দেবাসুরাদি।

কশ্যপপুত্র (স্ত্রী) কশ্যাপন্ত পুত্রম্ ৬তৎ। বর্ত্তমান কাম্বীর; কশ্যপ ঋষি ইহার কশ্যপপুত্র নামকরণ করিয়াছিলেন। এই জনপদই হীরদেয়াতপের ‘কম্পূরন’ এবং টলেমীর ‘কম্পীরা’। কশ্যপসংহিতা (স্ত্রী) কশ্যপন্ত সংহিতা, ৬তৎ। কশ্যপ গ্রন্থিত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

কশ্যপস্মৃতি (স্ত্রী) কশ্যপগ্রন্থিত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

কব (পুং) কবতি অত্র অনেন বা কব-অচ্; যথা-কব-ঘ-লিপান্তনাং সাধু:। (গোচর-সকলবহুজব্যাপণনিগমাচ্। পা ৩।৩।১১৯।) কষ্টিপাথর, বাহাতে স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা গরীকা করা হয়। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—শান ও নিকষ।

কব্জ (ত্রি) কব্যতে বিষ্মাভ্যতে, কব-কর্ম্মণি-স্মাই। ১ অঙ্গক। ৩ (পুং) কবতি অত্র। কষ্টিপাথর। ৪ (স্ত্রী) ভাবে স্মাই। বর্ষণ, কঙ্কুয়ন।

(“কব্জকম্পানিরন্ত মহাহিতি:

কণবিসম্মত মতলজবজ্রিভে:।” ভারবি ৫। ৪৭।

৫ চালন। ৬ (দেশজ) টানিয়া বাঁধা।

কবণী (দেশজ) ধমকানি, শাসন, কঙ্কুনি।

কব্যাষণ (পুং) কবচানৌ পাষাণশ্চেতি কর্ম্মণা। কষ্টিপাথর।

(“কব পাষাণনিতে নভন্তলে।” নৈষধ ২।)

কব্য (স্ত্রী) কব্যতে ভাড্যতে অনয়া কব বাহনকাৎ কবণে অপ-টাপ্। ১ কশা, চাবুক। (দেশজ) ২ টানিয়া বাঁধা। ৩ কব্যর রস। ৪ শরীর রক্ষ হওয়া। ৫ কৃপণ।

কব্যকু (পুং) কব-আকু। ১ পুর্ষা। ২ অমি।

কব্যনি (দেশজ) ১ ক্রন্দ। ২ নির্গত রস।

কব্যয় (পুং, স্ত্রী) কবতি কঠং, কব-আয়। ১ রসবিশেষ, কব্য। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—তুবর, কুবর ও তুবর। সুশ্রুতে কব্যয় রসের এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে; যথা—যে রস আশ্বাদন করিলে মুখ শুষ্ক, জিহ্বা শুষ্কিত, কঠদেশ বন্ধ, হৃদয় কষিত ও পীড়িত হয়, তাহাকে কব্যয় রস কহে। পৃথিবী বায়ুগুণ-বহুল হইলে এই রসের উৎপত্তি হয়। এই রসের গুণ মল-গ্রাহক, ত্রণরোগক, শুভ্রন, শোথন, লেখন, শোষক, পীড়াদায়ক, ক্রেশনাণক ও বায়ুবর্দ্ধক। ইহা অতিরিক্ত ব্যবহার করিলে পীড়া, মুখশোষ, উদরাগ্নান, বাক্যগ্রহ (কথা বলিতে আটকাইয়া যাওয়া), মজ্জান্তস্ত, গাত্রক্ষুরণ, গাত্র চিমিচিমি, শ্রোতোঅবরোধ, শ্রাবত, শুক্রনাশ, আকুশন, আক্ষেপণ প্রভৃতি বায়ুবিকার উপস্থিত হয়।

২ কাথ, পাচন, ইহার অপর সংস্কৃত নাম নিষূহ। ইহার পাঁচ প্রকার ভেদ আছে—সরস, বহু, কষিত, শীত, ও ফাট। [তত্ত্ব শব্দে দেখ।]

৩ নির্যাস। ৪ বিলেপন, অজলেপ।

(“কঠার্ণিতো লোপ্রকব্যয়রক্ষে

গোরোচনাক্ষেপনিতান্ত গোরে।” কুমার)

৫ অজরাগ। (পুং) ৬ শোনা গাছ। ৭ রাগ, আসক্তি।

৮ কলিযুগ। ৯ নির্বিকল্প সমাধির বিষয়বিশেষ। বাহু বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অথও বস্তু গ্রহণে উদ্যত হইলেও যে রাগাদি সংস্কার উদ্ভূত হইয়া তাহাকে তত্ত্ব করিয়া রাখে এবং অথও বস্তু গ্রহণ করিতে না দেয়, তাহাকেই ‘কব্যর’ কহে। ১০ ব বৃক্ষ। (ত্রি) ১১ কব্যরসবিশিষ্ট। ১২ সুরভি। (“প্রত্যবেদু কুটিকমলামোদনৈস্ত্রী কব্যর:।” বৈষ্ণবজ্ঞ।)

১৩ লোহিত, রক্তবর্ণ। ১৪ রক্তপীতমিশ্রিত বর্ণ। ১৫ অপটু।
১৬ সুশ্রাব্য। ১৭ রঞ্জিত। ১৮ আসক্ত, সংসারলিপ্ত। লোক-
প্রকাশ নামক জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে—

“কষঃ সংসারকান্তারময়ং তে যান্তি যে জনাঃ।

তে কষায়াঃ ক্রোধমানমায়া লোভঃ ইতি শ্রুতঃ ॥” ৩৪০৯।

কষায়কৃৎ (পুং) কষায়ঃ কষায়রাগং কৰোতি, কষায়-কৃ-কিপ্-
ভূগাগমঃ। ১ রক্তলোহিত। ২ (ত্রি) কষায় প্রস্তুতকারী।

কষায়তা (ত্রি) কষায়স্তাৎবাঃ, কষায়-তল্-টাপ্। কষায়ের ধর্ম।

কষায়পাক (পুং) দ্রব্যবিশেষের কাথ প্রস্তুত-প্রণালী। যে
লবণ কাথে জলের পরিমাণ লিখিত নাই, তথায় আর্দ্র দ্রব্য
হইলে ৮ গুণ ও শুষ্ক দ্রব্য হইলে ১৬ গুণ জলদ্বারা সিদ্ধ
করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিবেন। অথবা ১ ভূলা দ্রব্যে
দ্রোণ পরিমিত জল দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিতে হয়।

কষায়পাণ (স্ত্রী, পুং) কষায়ঃ পানং যন্ত, বহুব্রীঃ; পন্থঃ
(পানক্ষেপে)। পা ৮। ৪। ৯।) গান্ধার জাতি। (কষায়পাণা
গান্ধারঃ। কাশিকা।)

কষায়যাবনাল (পুং) কষায়ঃ রক্তবর্ণঃ যাবনালঃ, কৰ্মধা।
কষায়রসবিশিষ্ট যাবনাল ধাতু।

কষায়রস (পুং) রসবিশেষ। [কষায় দেখ।]

কষায়বর্ণ (পুং) কষায়রাগঃ কষায়রসযুক্তদ্রব্যরাগঃ বর্ণঃ সমুহঃ,
৬তং। জগ্ৰোধাদি, অশ্বষ্ঠাদি, শ্রিয়ঙ্গাদি, লোহাদি, ত্রিফলা,
শল্লকী, জাম, আম, বকুল, তিলক, ফলিনী, কতকশাক,
পাষাণভেদী, বনস্পতিকল, সাগসারাদি, কুরবক, কোবিদার,
জীবন্তী, চিল্লী, পালকী, স্ননিষর, নীবার ও মুগ প্রভৃতি দ্রব্য
সংক্ষেপতঃ কষায়বর্ণের অন্তর্ভূত। (সুশ্রুত।)

কষায়বাসিক (পুং) সুশ্রুতোক্ত কীটবিশেষ; এই জাতীয়
কীট সোম্য, সুতরাং শ্লেষপ্রকোপক; ইহাদের মল-
মূত্র বিষাক্ত।

কষায়া (স্ত্রী) কষ-আয়-টাপ্। ক্ষুদ্র দূরালভা লতা। (Small
sort of Hedysarum) ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—যাস, যবসা,
জুস্পা, ধম্বাস, কুনাশক, ছুরালভা, ছুরালস্তা, সমুদ্রাস্তা,
রোদিনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনস্তা, হরবিগ্রহা, ছুরতিগ্রহা।
ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত ও কষায়রস,
শারক, শীতল, লঘু এবং কফ, মেদ, মত্ততা, শ্রম, পিত্ত, রক্ত,
কুষ্ঠ, কাস, তৃক্ষা, বিসর্প, বাতরক্ত, বমি ও অরুনাশক।

[ছুরালভা দেখ।]

কষায়িত (ত্রি) কষায়ঃ রক্তপীতাদিবর্ণঃ সজাতোহস্ত কষায়-
ইতচ্। (তদন্ত সজাতং তারকাদিত্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।)
রক্তাদি বর্ণকৃত, যে বস্তুর রক্তাদি বর্ণ করা হইয়াছে।

(“অনুর্নৈব কষায়িত ভনী হুভবেন প্রিয়গাজভমনা।”

কুমার ৪। ৩৪।)

কষায়ী [ন্] (পুং) কষায়ো বিদ্যাতে হস্ত, কষায়-ইনি।

১ শালবৃক্ষ। ২ লকুচবৃক্ষ। ৩ ধক্ষুরবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ কষায়বিশিষ্ট।

কষায়ীকৃত (ত্রি) অকষায়ঃ কষায়ঃ কৃতঃ, কষায়-কৃ-কৃ-ক্ত।

যে কষায় বর্ণশুদ্ধ দ্রব্যে কষায়বর্ণ করা হইয়াছে।

কষায়ীভূত (ত্রি) অকষায়ঃ কষায়ো ভূতঃ, কষায়-ভূ-ভূ-ক্ত।

কষায়রূপে বা কষায় গুণযুক্ত করিয়া নির্মিত দ্রব্য।

কষি (ত্রি) কষতি হিনতি, কষ-ই (খনিকষাঙ্গদিবসি
ইত্যাদি। উণ ৪। ১২৯।) হিং-শ্রক।

(কষির্হিংশ্রঃ। উজ্জলদত্ত।)

কষিত (ত্রি) কষ-ক্ত। যাহা কষা অর্থাৎ পরীক্ষা করা হইয়াছে।

কষীকা (স্ত্রী) কষতি, কষ-ঈকন্ (কষি-দৃষিভ্যামীকন্। উণ
৪। ১৬।)-টাপ্। ১ পক্ষিজাতি। (কষীকা পক্ষিজাতিঃ।
উজ্জলদত্ত।) ২ (কষত্যানরা) শব্দ।

কষী (পারস্ত শব্দজ) দাঁড়ি, ছেদ।

কষীদা (পারস্ত শব্দজ) শক্ত করিয়া বাঁধা।

কষেরুকা (স্ত্রী) কষ-এরক্-উ-সংজ্ঞারঃ কন্-টাপ্। ১ পৃষ্ঠাঙ্কি,
পিঠের দাঁড়া। ২ কেশরুকা, কেশুর।

কক্ষ (পুং) কষ ইতি অব্যক্তশব্দযুক্তার্থ্য কষতি কষ-কষ-
অচ্। বিষধর কুমিবেশেষ।

(“যেবাযাসঃ কক্ষায়াঃ এজংকাঃ শিববিংহুকাঃ।

দৃষ্টশ্চ হস্ততাং কুমি কতাদৃষ্টশ্চ হস্ততাম্ ॥”

অথর্ববেদ ৫। ২৩। ৭।)

কষ্ট (ত্রি) কষাতে হসৌ, কষ কৰ্ম্মণি ক্ত নেটু (কৃচ্ছু গহ-
নয়োঃ কষঃ। পা ৭। ২। ২২।) ১ পীড়ায়ুক্ত। ২ গহন।
৩ পীড়াকারক। ৪ কষ্টসাধ্য। ৫ কুৎসিত। ৬ (স্ত্রী) কষ-
ভাবে ক্ত। পীড়ামাত্র; ইহার সংস্কৃত পর্যায়, পীড়া, বাধা,
ব্যথা, দুঃখ, অমানস্ত, প্রহতিজ, কৃচ্ছ, আভীল, আবাধা,
বেদনা, দুঃখ, আমানস্ত, কলাকল, অর্জি, অর্জি, পীড়ন, বাধন,
আমনস্ত, বিবাধন, বিচেষ্টন, বিধানক, পীড়িত, কাথ ও
অশর্ম। ৭ অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত দোষবিশেষ; অর্থ প্রতীতি
ব্যবহিত হইলে তাহাকে কষ্ট বা ক্লিষ্টতা-দোষ কহে।

“ক্লিষ্টত্বমর্থপ্রতীতেরব্যবহিতম্ ॥” সাহিত্য দ্বা ৭ অঃ।)

যথা “কীরোদজাবসতিজন্ম ভুবঃ প্রসঙ্গাঃ।” এখানে
‘জল প্রসঙ্গ’ এই অর্থে বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু সহজে
তাহা বুঝিবার উপায় নাই,—কীরোদজা লক্ষ্মী, তাঁহার বসতি
পন্ন, পন্নের জন্মস্থান জল। অতএব এখানে ক্লিষ্টত্ব বা
কষ্টদোষ ঘটিয়াছে।

সাহিত্যদর্পণে ইহাকে ক্রিষ্ট বসিলেও গ্রন্থান্তরে 'কট'
নামে অভিহিত আছে।

(“কটং তদর্থাংগমো হুয়ারন্তো ভবেদ্বদি।”)

কটকর (ত্রি) কটং করোতি, কট-কৃ-ট। ১ পীড়াজনক।
২ দুঃখজনক।

কটকল্পনা (স্ত্রী) কটেন কল্পনা, ৩তৎ। ১ বাহা ভাবিয়া
স্থির করিতে কট বোধ হয়। ২ বাহা সহজে কল্পনা করা
যায় না।

কটকল্পিত (ত্রি) কটেন কল্পিতং রচিতম্। বাহা কটে রচনা
করা হইয়াছে।

কটকার (পুং) কটং করোতি, কট-কৃ-অণ্। ১ সংসার।
২ (ত্রি) পীড়াকারক।

কটকারক (পুং) কটকার-স্বার্থে কন্। কট-কৃ-লু বা
যষা কটক কারকঃ ৩তৎ। ১ সংসার। (ত্রি) ২ দুঃখজনক।

কটজীবী [ন্] (ত্রি) কটেন জীবতি, কট-জীব-ইনি। ১ যে
কটে জীবিকা নির্বাহ করে। ২ যে অনেক ভোগ করিয়াও
বাঁচিয়া থাকে।

কটতপা [ন্] (পুং) কটং কটকরং তপো যন্ত, বহুব্রী।
অতি কটকর তপস্তাপারক।

কটদ (ত্রি) কটং দদাতি, কট-দা-ক। কটদায়ক, যে কট দেয়।

কটরিপু (পুং) কটঃ কটগাধ্যো রিপুঃ, কর্মধা। যে শত্রুকে
কটে পরাজয় করিতে হয়। মহাসংহিতায় ইহার এইরূপ লক্ষণ
উক্ত আছে,—

“প্রাজ্ঞঃ কুলীনঃ শুরধঃ দক্ষঃ দাতারমেবচ।

কৃতজ্ঞঃ ধৃতিমন্তঃ কটমাছরিরং বুধাঃ।”

বিদ্বান্, কুলীন, বীর, দক্ষ, দাতা, কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশালী
শত্রুকে গণ্ডিতগণ ‘কটরিপু’ কহেন।

কটলভ্য (ত্রি) কটেন লভ্যং, ৩তৎ। বাহা কটে পাওয়া যায়।

কটশ্রিত (ত্রি) কটং শ্রিতং আশ্রিতং যেন, বহুব্রী। ১ যে
কটে পাইতেছে। ২ কঠোর ব্রতকারক।

কটশ্রোত্রিয়। বঙ্গদেশীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের একটি
বিভাগ। [শ্রোত্রিয় দেখ।]

কটসহ (ত্রি) কটং সহতে কট-সহ-অচ্। কটসহিষ্ণু।

কটসাধ্য (ত্রি) কটেন সাধ্যম্, ৩তৎ। ১ বাহা কটে
আরোগ্য করিতে হয়। ২ বাহাকে কটে পরাজয় করিতে হয়।

কটস্থান (স্ত্রী) কটং কটকরং স্থানম্, কর্মধা। দুঃখজনক
স্থান।

কটহরণপর্বত, মল্লেরহ পর্বতের একটি প্রাচীন নাম।

কটহরণী, ১ কীকট দেশস্থ একটি নদী। (ভৃং ত্র্যম্বকং ২১। ৪৯)

২ অঙ্গদেশের দবীকর্ণের নিকট প্রতিষ্ঠিত এক প্রাচীন
দেবীমূর্তি। (দেশাবলী § ৪৪। ২। ৬)। বর্তমান মুল্লেরের
নিকট।

কটী (দেশজ) কষায় রসবিশিষ্ট।

কট্ট (স্ত্রী) কষ-ভাবে ক্টি। ১ কষা, পরীক্ষা করা। ২ (অধি-
করণে ক্টি) কষিবার পাথর।

কট্টপাথর (দেশজ) সোণা রূপা পরীক্ষা করিবার পাথর-
বিশেষ।

কট্টমুখে (দেশজ) অতি কটে। সংস্কৃত ভাষাতেও ‘কট
মুষ্টি’ শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি করিয়া অতি কটের স্থলে
‘কট্টমুষ্টি’ এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কস্ (দেশজ) ১ কাথ। ২ মুখের প্রান্তভাগ।

কস্ (পুং) কসতি বিকসতি স্বর্ণাদিরত্ন, কস-অচ্। কষ,
কটিপাথর।

কসন (পুং) কসতি হিনস্তি, কস-ল্য। কাসরোগ।

কসনা (স্ত্রী) কসতি হিনস্তি বিশেষ পীড়য়তি কষ-ল্যু-টাপ্।
লুতাবিশেষ, কৃষ্ণবর্ণ মাকড়সাবিশেষ। ইহার মুখ স্পর্শে
বিষরোগ হইয়া থাকে। [বিষরোগ দেখ।]

(“আলমুত্রবিধা কৃষ্ণা কসনা চাষ্টমী স্তুতা।” স্তোত্র।)

কসনি (দেশজ) ১ বাক্‌ডোর। মুখরজ্জু। (?)

“কুন্দলের ধুকড়ি টেঁকির গিঠে জিন।

কসনি কুসের দড়ি লুগামবিহীন।” রামেশ্বর শিবায়ন ১১৪।

২ কসিয়া বাধা।

কসনোৎপাটন (পুং) কসনং কাসরোগঃ উৎপাটয়তি,
কসন-উৎ-পাট-গিচ্-ল্যুট্। বাগক বৃক্ষ।

কসব্ (আরব্য) বাণিজ্য, ব্যবসা।

কসম্ (আরব্য) শপথ।

কসর্গীর (পুং) সর্গবিশেষ। (অথর্কসংহিতা ১০। ৪। ৫)

কসরবাণি, বেহার অঞ্চলের বেগিয়া জাতির একটি শাখা,
এই শাখা আবার ৯৬থাকে বিভক্ত; তন্মধ্যে ইহারাই প্রধান,
যথা—সগেলা, বগেলা, চনক্কাং-কথোতিয়া, আব্‌কহিলা,
চালানিয়া, চৌসোবার, মালহাটিয়া, লৌদ্ধকরাব্রি, সোনে-
চড়ু পেকেদাঁড়ি, সোনাল, তারদি ও তিরুসিয়া।

কসরবাণিয়া স্ব স্ব থাকে অথবা বাহার সহিত পাঁচ পুরুষে
সম্বন্ধ আছে, এরূপ লোকের সহিত বিবাহ কার্য করে না।
ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। পুরুষেরা বহু বিবাহ
করিতে পারে। বিধবা-বিবাহ ইহাদের মধ্যে দোষের নহে,
তবে বিধবা কোনক্রমে আপন দেহরকে বিবাহ করিতে
পারে না। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, বিহু

উপাসনা ব্যতীত, তাহার। 'বনী' ও 'সোখা-শস্ত্রনাথ নামক গ্রামাদেবতারও পূজা করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই দোকানদার, তবে অল্প লোকেই কৃষিকার্য্য করে। ইহার। তেলী অথবা মুসলমানকে কখন গণ্যাদি বিক্রয় করে না।

কসা (ক্রী) কসতি তাড়য়তি, কস-অচ্-টাণ্। ১ কসা, চাবুক। ২ (দেশজ) মুখের প্রান্তদেশ।

কসাই (আরব্যশব্দ) ১ পশুঘাতক। ২ (দেশজ) একটি নদী। মানভূমজেলার উত্তর পশ্চিমাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হইয়া হলদী নদীর সহিত মিশিয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশে ইহা 'কপিশা' নামে উক্ত হইয়াছে। কোন কোন প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে ইহার নাম কংশবতী দৃষ্ট হয়।

কসাগিলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Dolichos hexandras)

কসান্দু (ক্রী) পিতৃলোকদিগকে কব্যান্নদান সময়ে যে জল দান করা হয়।

কসায়ী (আরব্যশব্দ) কসাই, পশুঘাতক।

কসারস (পুং) পক্ষিবিশেষ।

(“হংসকাকময়ূরগোং কুকলাসকসারসাম্” মহাভারত ১৩।৬ অঃ)

কসাল (আরব্য) কষ্ট।

কসিপু (পুং) কশতি শান্তি ছংখম্, (নিপাতনাং সিদ্ধম্।) ১ কশিপু। ২ অন্ন।

কসুনি (দেশজ) ১ কসাকসি। ২ গৃহস্থ পরিবারকে শাসন বা পীড়াপীড়ি।

কসুর (আরব্য) ১ অভাব। ২ ক্রটি। ৩ অবশিষ্ট। ৪ অন্ন।

“পার্কণি পঞ্চকজাত, ওড়ালোন সনাভাত,
ধানকাটি কসির কসুরে।” কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

কক্ষানি (দেশজ) ক্রোধে দত্ত কড়মড়ি।

কস্কস্ (দেশজ) ১ অধিক উত্তপ্ত। ২ অধিক কাঁচা। ৩ অত্যন্ত ক্রোধ।

কসিয়া, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গোরখপুরজেলার দ্রৌণ-তহ-সীলের এলাকাধীন একটি গ্রাম, গোরখপুর হইতে ১৮৥ ক্রোশ পূর্বে।

কসিয়া গ্রাম—বৌদ্ধগ্রন্থে ‘কুনীনগর’ নামে পরিচিত। এইখানে শাক্যবুদ্ধের নির্মাণ হয়। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ রাজাদিগের সময় এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে দেশ বিদেশ হইতে বৌদ্ধযাত্রীগণ অতি পবিত্র তীর্থ ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে আসিত। খৃষ্টের ৫ম ও ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিভ্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউএনসিয়াং এই পবিত্রস্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন। হিউএনসিয়াং লিখিয়াছেন, ‘এই

নগরের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশদূরে, অজিতাবতী নদীর পরপারে শালবন ছিল, এই বনে বুদ্ধদেব নির্মাণলাভ করেন। তাহার অনর্থক অশোকরাজ অনেকগুলি স্তূপ ও একটি বিহার নির্মাণ করিয়া তাহাতে এক প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করেন।’

হিউএনসিয়াংয়ের সময়ে এখানকার পূর্ব সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল, তৎকালে এখানকার প্রাসাদ উপবন সকলই ধ্বংস হইয়াছিল। কেবল অশোকরাজ-নির্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ এবং বুদ্ধমূর্তি ভূষিত একটি বিহার সেই পূর্ব সমৃদ্ধির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছিল।

এখন এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অশ্বখমূলে উপ-বিষ্ট বুদ্ধমূর্তি, একটি ইষ্টক-নির্মিত প্রাচীন স্তূপ এবং রামভর-ভবানী নামক দেবীমন্দির আছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বৌদ্ধস্থতি ছিল, কালবশে গণ্ডকীনদীর জলস্রোতে সেই সমস্ত কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বর্তমান গ্রামে ডাকঘর, ঔষধালয়, পুণিসের খানা ও জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের থাকিবার কাছারী আছে।

কসিয়াড়ি, মেদিনীপুরজেলার তামলুক উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গ্রাম। অক্ষা° ২২° ৭’ ২৫’’ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ১৬’ ২০’’ পূঃ। এই গ্রামটি বাণিজ্যপ্রধান, এখানে তসরের কৃষি হয় এবং তসরের ব্যবসার জন্মই এই স্থান বিখ্যাত।

কসেরা, বেহার অঞ্চলের এক প্রকার বেণিয়াজাতি।

[কাসারি দেখ।]

কক্ষাদি (পুং) পাণিনি-বাকরণোক্ত বিসর্গস্থানে নিত্য স হইবার জন্ম গণবিশেষ।

“কক্ষ, কোতক্ষত, ভ্রাতৃপুত্র, শুনক্ষণ, সদ্যক্ষণ, সদ্যক্ষণ, সদ্যক্ষণ, কাংক্ষান, সর্পিক্ষণিকা, ধক্ষপাল, বহিষ্ণাল, যজ্ঞপাত্র, অয়ক্ষাত, তদক্ষাণ্ড, অয়ক্ষাণ্ড, মেদক্ষিণ্ড, ভাঙ্কর, অক্ষর ও আকৃতিগণ।” (পা ৮।৩।৪৮।)

কস্তুরী (ক্রী) [বৈ] কং শিরোহগ্রভাগং স্তভ্রাতি, ক-স্তনুভ-অণ ভীষ্। শকটের অপঃপতন নিবারণ জন্ম মেধিবিশেষ।

কস্তুর (ক্রী) রাং, রঙ্গধাতু। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পুত্র-পিচ্চট, মুবঙ্গ, বঙ্গ, রঙ্গ, জগুং, স্বর্ণজ, নাগজীবন, শুক্লপত্র, চক্র, তমর, নাগজ, আলোনক ও সিংহল। [রঙ্গ দেখ।]

কস্তুরিকা (ক্রী) কস্তুরী-স্বার্থে কন্-টাণ্ (প্ৰযোদয়াদিষাৎ সাধুঃ।) কস্তুরী।

কস্তুর (দেশজ) কস্তুরী।

কস্তুরী (দেশজ) কস্তুরী।

কস্তুরিকা (ক্রী) কস্তুরী-স্বার্থে কন্-টাণ্ (প্ৰযোদয়াদিষাৎ) ইষঃ। কস্তুরী।

কৃত্তিকামৃগ (পুং) একজাতীয় হরিণ। ইহাদের তল-
টের নিকট নাভিতে কৃত্তুরী সঞ্চিত থাকে এবং ইহাদের
শরীর হইতে কৃত্তুরীগন্ধ নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে কৃত্তু-
রিকা-মৃগ কহে। সংস্কৃত পর্যায়—কৃত্তুরীমৃগ, গন্ধবাহ,
গন্ধমৃগ। ভারতবর্ষে অতি পূর্বকাল হইতেই এই মৃগ পরি-
চিত ও সমাদৃত। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ৫ প্রকার মৃগের
নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে কৃত্তুরিকামৃগ ‘পার্শ্ববর্মণের’
অন্তর্গত। যথা—

“পৃথিব্যপ্ৰাণমৃগনাং তেজোহধিকান্ত পঞ্চক।

ভিদ্ধ্যন্তে নৈকভেদান্ত সমস্তা মৃগজাতয়ঃ ॥

যে গন্ধিনঃ ক্রীণশরীরকণ-

ন্তে পার্শ্বা গন্ধমৃগাঃ প্রদীষ্টাঃ।” যুক্তিকল্পতরু।

মৃগজাতি এক প্রকার নয়। পার্শ্ববর্মণ, জলমৃগ, বায়ুমৃগ,
গগনমৃগ ও তেজোমৃগ এই পাঁচ প্রকার ভেদ আছে। যে
সকল মৃগের শরীর ও কণ ক্রীণ, গন্ধবিশিষ্ট; তাহাদিগকে
পার্শ্ববর্মণ মৃগ বলা যায়। [মৃগ দেখ।] এই গন্ধমৃগেরই
অপর নাম কৃত্তুরিকামৃগ।

কৃত্তুরিকামৃগ রৌমহক চতুষ্পদ পশুর মধ্যে পরিগণিত।
সচরাচর যে সকল হরিণ দেখা যায়, ইহারা সেরূপ নয়।
হরিণের বড় বড় শিং থাকে, কিন্তু ইহাদের তাহা নাই,
তবে গতি হাব ভাব ঠিক হরিণের মত, এজন্য ইহাদিগকে
এক বিভিন্ন জাতীয় হরিণ বলা যায়। হরিণের জায়
ইহাদের চক্ষুর মূলে অন্ধিচ্ছিত্র নাই। এ ছাড়া ইহা-
দের উপর-মাড়ি হইতে গালের দুই পার্শ্বে দুইটি গজদন্ত
২।৩ অঙ্গুলি বাহির হইয়া থাকে। লোম স্পর্শ করিলে হংস-
পুচ্ছের পালকের মত কর্কশ বোধ হয়।

কৃত্তুরীর জন্মই কৃত্তুরিকামৃগের এত আদর। এই
জুগন্ধি দ্রব্য বছদিন হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত। [কৃত্তুরী দেখ]

“কৃত্তুরিকামৃগবিমর্দ জুগন্ধিরেতি” মাধ।

পূর্বে ভারতবর্ষের তিন জায়গায় তিন প্রকার কৃত্তুরিকামৃগ
পাওয়া যাইত, স্থানভেদে কৃত্তুরীরও তারতম্য ছিল।
কাশ্মীর-পণ্ডিত নরহরি-বিরচিত নিষট্টরাজনামক গ্রন্থে
লিখিত আছে—

“কপিলা পিজলা কৃষ্ণা কৃত্তুরী ত্রিবিধা মতা।

নেপালে হপি কাশ্মীরকে কামরূপে হপি জায়েত ॥

কামরূপোত্তবা শ্রেষ্ঠা নৈশালী মধ্যমা ভবেৎ।

কাশ্মীরদেশসম্ভবা কৃত্তুরী হৃদযা মৃতা ॥”

নেপাল কাশ্মীর ও কামরূপ এই তিনদেশে তিন প্রকার
কৃত্তুরী জন্মে। কামরূপের কৃত্তুরী সর্বোৎকৃষ্ট, দেখিতে

কৃষ্ণবর্ণ, নেপালের কৃত্তুরী মাঝারি, দেখিতে নীল এবং
কাশ্মীরের কৃত্তুরী অধম, দেখিতে কপিলবর্ণ।

উপরোক্ত প্রায়শ্চাৎ বোধ হইতেছে পূর্বকালে কাম-
রূপ, নেপাল ও কাশ্মীরে তিন প্রকারের কৃত্তুরীমৃগ বাস
করিত। এসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের মতে হিমালয়
প্রদেশই এই জাতীয় মৃগের প্রধান বাসস্থান;—

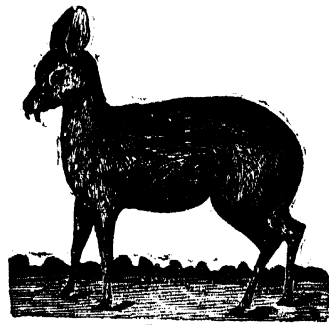
“মৃগনাভিঃ কৃত্তুরী তদগন্ধি কৃত্তুরীমৃগাধিষ্ঠানাদিত্যন্তঃ

তেন হিমাজ্জাবপি তদগন্ধস্ত সঞ্চারোহন্তীতি গম্যতে ॥”

কুমারসম্ভবে মল্লিনাথকৃত টীকা ১।৫৪।

এই মৃগজাতি সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া এবং হিমালয়-
প্রদেশে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হইতে ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থানে, টিব্বি
ও আনামদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সহ্যাদ্রি
গিরিতেও এই মৃগ দৃষ্ট হয়। সকল স্থানের কৃত্তুরিকামৃগ
অপেক্ষা তিব্বতদেশীয় কৃত্তুরীমৃগ অধিক আদরণীয়। ইহাকে
তিব্বতে ‘লা’, ‘লব’, কাশ্মীরে ‘রৌম’, কুনাবরে ‘বেনা’,
হিন্দুস্থানীরা ‘কৃত্তুর’ ও ‘কৃত্তুরী’, মহারাষ্ট্রে ‘পেশোরী’
ও পারস্তে ‘মুসক’ বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম
(Moschus Moschiferus)

কৃত্তুরীমৃগ ২০ ফুটের অধিক বড় হয় না, চর্ম কাল, মধ্যে
মধ্যে লাল ও জরদের ফুটকি; ঠোঁট পীত, লেজ ছোট
প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, দ্বী ও পুরুষের ২ বর্ষ পর্যন্ত লেজের উপরে
লোম ও নিয়ভাগে পশম থাকে; পুরুষ বড় হইলে লোম বা
পশম থাকে না। কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের নাভি হইতেই
কৃত্তুরী উৎপন্ন হয়।

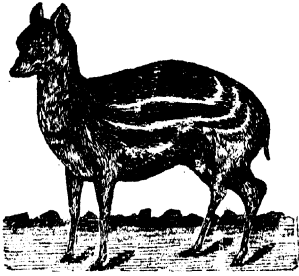


কৃত্তুরিকামৃগ।

ইহারা অতি ভীক, নিরীহ, লাজুক এবং নির্জ্ঞান-প্রিয়।
নিবিড় অরণ্য ও মানবের অগম্য উগতাকাপ্রদেশ ইহাদের
বিসরণ-ভূমি। শীকারীরা বহুক্ষেত্রে ইহাদের ধরিতে অথবা
আক্রমণ করিতে পারে। কোনক্রমে ধরিতে পারিলে
শীকারীরা ইহাদের নাভিচ্ছেদন করিয়া লয় এবং উহা অধিক
মূল্যে ব্যবসারীর নিকট বিক্রয় করে।

কস্তুরিকামুগের নাভি (Musk-bag) একটি ছোট পায়রার ডিমের মত, আকার বৃদ্ধকের জায়। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ট্যাভার্নিয়ার ১৬৭৩টি নাভি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কস্তুরিকামুগ পুরুত্বজাত সামান্য, তৃণ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের চারি পা অত্যন্ত ক্ষম, দূর হইতে তাহাতে জন্তুদিগের ভেদ দেখা যায় না। এজন্য একটি গল্প আছে যে, কস্তুরিকা মুগের হাঁটু নাই।

ভারত মহাদাগরীর বীণপুঞ্জ কস্তুরিকামুগের মত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র পশু আছে, কিন্তু তাহাদের নাভিতে কস্তুরী উৎপন্ন হয় না। স্বমাত্রা ও যববীণে এই ক্ষুদ্র অর্ধ হস্ত-পরিসিত হরিণকে কোথাও 'সেব্রোটন' কোথাও বা "নেপু" বলে। ইহার ইংরাজী প্রদত্ত নাম Tragulas Javanicus.



ইহা যববীণবানীগণের অতি প্রিয়; পুষিলে বেশ পোষ মানে।

কস্তুরী (জী) কসতি গন্ধো হস্তাঃ কস্-উর-তুট-ডীপ্ (পূর্বোদরাদিবাং সাধুঃ) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ [কস্তুরিকামুগ দেখ] ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মৃগনাভি, মৃগমদ, মৃগ, মৃগী, নাভি, মদ, বাতামোদ, যোজনগন্ধিকা, মদনী, গন্ধকেলিকা, বেধমুখ্যা, মার্জারী, স্তম্ভা, বহুগন্ধনা, সহস্রবেধী, শ্রামা, কামাঙ্গা, মৃগাঙ্গা, কুরঙ্গনাভি, ললিতা, শ্রামলা, মোদিনী, কস্তুরিকা, কস্তুরিকা, নাভী, লতা, যোজনগন্ধা, মার্গ, গন্ধবোধিকা, কালাঙ্গা, ধূসফারী, মিশ্রা ও গন্ধপিষাটিকা। কস্তুরীমুগের নাভি (একটি ক্ষুদ্র থলী আকারে) থাকে। তন্মধ্যে এই কস্তুরী উৎপন্ন হয়। এই জন্তু মচরাচর ইহাকে মৃগনাভি বলে। আরবী ও পারসি ভাষায় মুস্ক, বা মিস্ক, হিন্দী তামিল ও তেলগু ভাষায় কস্তুরী ও কস্তুর, যব ও মলয়ে দিদেশ, সিংহলে রুতা বা উরুলা, ব্রহ্মে দো, চীনে শি-হিয়ং, রুষে কবর্গ ও মস্কস্, ইতালীতে মুস্‌চিও, জার্মানে বিসম্, পর্তুগীজেরা অলম্বিকার, ওলন্দাজেরা মস্ক, দিনেমারেরা দিসমের, কমানীরা মস্ক, ইংরাজীতে মাস্ক কহে। মৃগনাভি

কিছু উগ্র; ইহার আবাদ কটু অথচ মুখে দিলে বেশ সন্দেহ বাহির হয়।

ভারতবর্ষে মৃগনাভির আদর বহু পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার তুরি তুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন বৈদ্যক মতে, কামরূপ, নেপাল ও কাশ্মীর এই তিনদেশে কস্তুরী উৎপন্ন হয়, ইহাদিগের মধ্যে কামরূপের কস্তুরী সর্বোৎকৃষ্ট ইহা রুষবর্ণ, নেপালের মধ্যম নীলবর্ণ, এবং কাশ্মীরের অধম কপিলবর্ণ। থরিকা, তিলকা, কুলখা, পিত্তা ও নায়িকা নামে ইহা পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত। (ভাবপ্রকাশ) রাজবল্লভের মতে, ইহার গুণ সুগন্ধি, তিক্ত, চক্ষুর হিতকারক এবং মুখরোগ, কিলান, কফ, দৌর্গন্ধা, বহ্যদোষ, অলক্ষী, মলা, রক্তপিত্ত ও ছদ্দিনাশক। এতদ্ভিন্ন ভাবপ্রকাশে কটু, ক্ষার, উষ্ণ, গুরুজনক, গুরু এবং শীত ও শোষণাশক এই কয়েকটি গুণ অধিক লিখিত আছে।

পূর্বে যুরোপের লোকেরা কস্তুরীর বিষয় জানিত না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা যুরোপে কস্তুরী লইয়া যায়। আরব ও পারসিকেরা কস্তুরীকে মুস্ক বলে, তাহা হইতে লাতিন মুস্কস্ (Muschas) ও ইংরাজী মাস্ক (Musk) শব্দের উৎপত্তি।

যুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ—

উত্তেজক ও আক্ষেপজনক। হাঁকানি কাশ(১০-১৫ গ্রেণ), কালী (১ গ্রেণ দিনে ৩।৪ বার), মৃগীরোগ, তাণ্ডবরোগ, ধমুঠেকার, জীলোকের প্রসবকালীন আক্ষেপ, হিষ্টেরিয়া, মোহকর ও তাদ্রিক অর, (Pneumonia) ক্ষুধাহীন প্রদাহ (২৫-৩০ গ্রেণ) ও নাতরোগে বিশেষ উপকারী। ছেল্লেনের তড়কাযোগে অধিক আক্ষেপ হইতে থাকিলে ১-৫ গ্রেণ কস্তুরী পিচ্কারী করিয়া প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাত্ ফল পাওয়া যায়।

একশ্রেণি তিন প্রকার মৃগনাভি প্রচলিত; তিব্বতদেশীয়, রুষদেশীয় ও চীনদেশীয়। ইহার মধ্যে তিব্বতদেশীয় সর্বোৎকৃষ্ট, চীনের মধ্যম, রুষের অধম। রুষদেশীয় মৃগ হইতে যে কস্তুরী পাওয়া যায়, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট না হওয়ায় ব্যবসাদারেরা রুষদেশীয় মৃগের নাভি হইতে কস্তুরী আনিয়া চীনদেশীয় মৃগের নাভিতে পুরিয়া রাখে, তাহাতে উহার গন্ধ অনেকটা পরিবর্তিত হয়।

মৃগনাভি অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, এক একটি নাভির মূল্য ১৫। ১৭ টাকা, তাই ব্যবসায়ীরা ইহাতে মাংসের কুচি ও রক্ত মিলাইয়া কৃত্রিম চন্দ্রলোমে ঢাকিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু মৃগনাভির পরীক্ষা অতি সহজে হয়। কৃত্রিম-মৃগ-

নাতি আশ্রমে কেলিলে তাহা হইতে হুর্গাক বাহির হয়। কিন্তু প্রকৃত কন্তুরীতে এমন ঘটে না। (দেশজ) বৃকবিশেষ। (Hibiscus Abelmoschus) আর একজাতীয় গাছ আছে তাহা দেখিতে ভেরাঙাগাছের মত (Amaryllis Zeylanica)

কন্তুরীকাণ্ডজ (পুং) মৃগনাভি।

কন্তুরীতিলক (স্ত্রী) কন্তুরীতিলকং ৬৩৭। কন্তুরীর কোটা। (“কন্তুরীতিলকং ললাটকলকে।” বিষ্ণুস্তব।

কন্তুরীমল্লিকা (স্ত্রী) কন্তুরী গন্ধযুক্তা মল্লিকা মধ্যলো। ১ মৃগবদমাগা। ২ লতাকন্তুরী। ইহাকে এদেশে কন্তুরী বলে, কন্তুরীগাছ হইপ্রকার একপ্রকার লতানিয়া অপর ভেরাঙাগাছের মত, উভয় গাছে কল ও ফুল হয়। ফুল এবং ফলের বীজে বেশ সদৃশ আছে। এদেশে মাথাঘগার মসলায় কন্তুরীবীজ দেওয়া হয়।

কন্তুরীমৃগ [কন্তুরিকামৃগ দেখ।]

কন্তুরীবল্লিকা (স্ত্রী) কন্তুরীগন্ধযুক্তা বল্লিকা মধ্যলো। লতাকন্তুরী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর ও তিক্তরস, শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, ভেদক এবং শ্লেষ্ম, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ ও মূত্ররোগনাশক।

কন্মল (স্ত্রী) কশ-কল-মুট (নিপাতনাং) শস্য সম্বন্ধ। ১ কন্মল। ২ মোহ।

কসুর (আরব্য) ব্যায়াম, কোশল।

কসুল (আরব্য) ব্যায়াম, কোশল।

কস্বা (আরব্য) ক্ষুদ্র নগর বা গ্রাম।

কস্বাটী (দেশজ) মৎস্তবিশেষ।

কস্বী (আরব্য) বেড়া।

কস্বীবাজ (আরব্য শব্দজ) লম্পট।

কস্বর (ত্রি) কস্-বরচ্। ১ গমনশীল, যে গমন করিতেছে। ২ হিংস্রক।

কহন (দেশজ) বলা।

কহয় (পুং) কহ স্বর্ধ্যত্ব হয়: অর্থ:। স্বর্ধ্যের অর্থ। স্বর্ধ্যের অর্থ গতি ইহাদের সকলেরই বর্ণ হরিৎ অর্থাৎ সবুজ।

কহরা (দেশজ)। মৎস্তবিশেষ, খয়েরা মাছ।

কহলক (দেশজ) এক জাতীয় ঘুঘু (Columba lineata.)

কহা (দেশজ) বলা।

কহাকহি (দেশজ) বলাবলি, পরস্পর কথা কহা।

কহাহ (পুং) কটাহ।

কহিক (পুং) কহোড়-ঠক (দ্বিতীয়াঘো লোপে লক্ষ্যকর দ্বিতীয়ঘে তদাদেশোপবচনম্। পা ৫। ৩। ৮০। বার্তিক ৮।) অনেন সাধু:। ঋবিবিশেষ।

কহু (দেশজ) কহুত গাছ। (Pentaptera glabra)

কহুবা (দেশজ) একপ্রকার অর্জুন গাছ, কহুত।

কহুয় (পুং) হে-ক্যপ্-হুয়: ক: স্বর্ধ্য: হুয়া বত বহুৱী। স্বর্ধ্যের আস্থানিকারক ঋবিবিশেষ।

কহুয়া (দেশজ) বাথী, যে অধিক ও ভালবলিতে পারে। যেমন কহিয়ে বলিয়ে লোক।

কহোড় (পুং) ঋবিবিশেষ, ইনি উদালকের শিষ্য ও অষ্টা-বক্রের পিতা।

কহুগ (পুং) কহুগ। রাজতরঙ্গিণী প্রণেতা। [কহুগ দেখ।]

কহুলা (স্ত্রী) কহু জলজ হার ইব কে জলে ফ্লাদতে বা ক-ফ্লাদপচাদচ্-(পুৰোদরাবিজ্ঞাং সাধু:)। খেত উৎপল, খেত শুদি, হেলা ফুল। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সৌগন্ধিক, কহুগ ও গন্ধক। (Nymphaea edulis) ইহাকে বঙ্গদেশে কোন কোন স্থানে ছোট শুদি কহে। ইহা ভারতবর্ষের নানা স্থানে জলা ও পুকুরিণীতে জন্মে। অপর পদ্মের মত ইহার মূলও বড় হয়। ইহার শাঁশ খাওয়া যায়। ইহার ফুল ছোট সাদা বা লাল রঙের হয়। রাজবল্লভের মতে, ইহার পুষ্প-গুণ—কষায় ও মধুর রস, শীতল এবং পিত্ত, কফ ও রক্ত-নাশক।

কহু (পুং) কে জলে হরতি শকার্যতে স্পর্ধিতে বা ক-হে-ক। বক। (বকে কহো বকোতবৎ। হেম ৪। ৩৮)

কা (অব্যয়) ১ কাকের শব্দ। ২ মন্দ। *। পথ ও অক্ষ শব্দ পরে থাকিলে কু শব্দের স্থানে কা আদেশ হয়। (কা পথ্যাকরো:। পা ৬। ৩। ১০৪।)

কাই (দেশজ) লেই, মণ্ড।

কাইট (দেশজ) ১ কিট, মলা। ২ তৈলাদির নীচে যে পদার্থ জমিয়া থাকে, ঐরূপ পদার্থের নাম কাইট বা কাট।

কাইবীচি (দেশজ) তেঁতুলের বীজ, এই বীজের শাঁসে কাই-বৎ আটা থাকে, বোধ হয় তাই কাইবীচি নাম হইয়াছে। [তেঁতুল দেখ।]

কাইম (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থলে ‘কেমা’, কোনখানে বা ‘খরিম’, তৈলঙ্গে ‘নীল বোলাকোদি’ এবং বঙ্গের কোন কোন স্থানে ‘কেম’ বলে। ইংরাজীতে (Porphyrio poliocephalus.)

এই পাখী দেখিতে গাঢ় নীল, পুচ্ছ চিকণ কৃষ্ণ, পুচ্ছের মূলের নিম্নভাগ যেত এবং উপরিভাগ অন্ন নীল। ঠোঁঠ লাল, উপরসীমা কিন্তু কতকটা কাল, হুই চুরালের উপর যেন রক্তের কোটা, পা দুটি ইটের মত লাল। এক একটি লম্বায় ১ হাত, ডানায় ১০ অঙ্গুলি।

এই পাখী ভারতবর্ষ ও সিংহলের খাল, বিল, জলা, অথবা নদীতে বেখানে অধিক থাকে। গাছ জন্মে এরূপ স্থানেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থান অথবা বিলের চারিপাশে কোপ থাকে, এরূপ স্থানই কাইম পাখীর প্রিয় ও আবাসযোগ্য। ইহাদের ডাক কুঁকড়ার মত। বীজ ও শাক সব্জী ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাদের ডিম কখন কখন কুঁকড়ার বাগার দিয়া কোটান হয়। আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডে এই জাতীয় একপ্রকার পাখী আছে। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জে একজাতীয় কাইম আছে, তাহার বুনো হাসের ডিম চুষিয়া খায়।

কাইল (দেশজ) কল্য, কালু।

কাউর (দেশজ) ত্রণবিশেষ, শিশুদিগের পদাদিস্থানে ইহা উৎপন্ন হয়; ইহার আকৃতি প্রায় পাচড়ার মত, চিকিৎসাও তদ্রূপ। [পান দেখ।]

কাএদা (আরব্য) ১ অধিকার। ২ বশ। ৩ অস্থূল। ৪ নৈপুণ্য। ৫ বন্দোবস্ত।

কাএম (আরব্য) স্থায়ী।

কাএমগঞ্জ, ১ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ফরুখাবাদ জেলার একটি তহসীল। গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। কাপ্পিল ও শম্ভাবাদ ইহার অন্তর্গত। তহসীলের কতকাংশ ভান্ডাড় ও কতকাংশ নাবাল; কতকাংশ বালুকাময় আবার কতকাংশ বেশ উর্বর। [কাপ্পিল ও শম্ভাবাদ দেখ।] এই তহসীলের ভূপরিমাণ ৩৭১ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ২৪০ বর্গমাইলে কৃষি হয়। জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু ও কার্পাসবেশ জন্মে। (১৮৮১ সালের সংখ্যাসূচীতে) এখানে ১৬৭১৫৬ লোকের বাস। তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। গবর্ণমেন্টের বার্ষিক খাজনা ২৫৪৬৪০। এখানে দাওয়ারী ও ফৌজদারী আদালত আছে।

২ কাএমগঞ্জ তহসীলের প্রধান কাছারী ও কাপ্পিল পরগণার প্রধান নগর কাএম-গঞ্জ। অক্ষা° ২৭° ৩০' ১০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২০' ৪৫"। বৃদ্ধগঙ্গানদীর অর্ধ-কোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

এই নগর ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের প্রথম নবাব মুহম্মদ নবী কর্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি আপন পুত্র কাএমের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ করেন। এইখানে পাঠানদিগের দুর্গ ছিল, এখনও অনেক পাঠান এই নগরের নিকটবর্তী জমি ভোগ করিতেছে।

কাএমগঞ্জ নগর আর, তামাক ও বিলাতী আমুর জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে নানাপ্রকার বস্ত্র ও ছুরি, জুতি প্রভৃতি লোহাস্রও প্রস্তুত হয়। লোকসংখ্যা ১০৪৪০।

কাএমগঞ্জ, ফরুখাবাদের নবাব মুহম্মদ নবী বঙ্গের পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের নবাবীপদ গ্রহণ করেন। ইহারই নামানুসারে কাএমগঞ্জ নগরের নামকরণ হয়।

মোহিলা-সুন্দার আলী মুহম্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে, নবাব কাএমজল আপন উজীরের প্ররোচনার মোহিলখানের মোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধবোধনা করেন, এই মহাযুদ্ধে তিনি পরাভূত ও নিহত হন (১০ই নবেম্বর ১৭৪৯ খৃঃ)। এই সময়ে সেই দুর্বৃত্ত উজীর কাএমজলের সকল ধন সম্পত্তি অধিকার করিল। নবাবের প্রধান কর্মচারীগণ বন্দী হইয়া প্রয়াগে আসিল। কেবল নবাবমাতা আপন ভরণপোষণের জন্য ফরুখাবাদ নগর ও কতকগুলি ক্ষুদ্র জেলা পাইলেন। উজীরই সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিল। উজীরের সহকারী রাজা নবাব রায় বিজিত স্থান-সমূহের শাসনকর্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নবাব রায়ের আধিপত্য বেশী দিন থাকিল না। কাএমজলের স্ত্রী আফসানা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, প্রাচুর্য্য উদ্ধার করিলেন।

কাএমী (আরব্য কাএম শব্দ) স্থায়ী।

কাওয়ারী (দেশজ) তালবিশেষ।

হিন্দুস্থানীরা 'কাবালী' কহে। কাবাল শ্রেণীর গায়কের প্রায় এই তাল ব্যবহার করেন, বোধ হয় তাই এরূপ নাম হইয়াছে। ইহা তেতালা (ত্রিতালী) ও জলদতেতালা (দ্রুতত্রিতালী) নামেও পরিচিত। জলদ তেতালা, চিমা তেতালা, মধ্যমান ও আড়াঠেকা, ইহার একজাতীয় কেবল আড় করিয়া বাজাইলে একই বোলে বাজান বাইতে পারে। মধ্যমানকে বিশুণ জলদ করিলে কাওয়ারী, মধ্যমান হইতে জলদ কাওয়ারী হইতে আড় হইলে জলদ-তেতালা, মধ্যমান আড় হইলে চিমা-তেতালা। আড়াঠেকার বোল মধ্যমানকে কিছু আড় বাজাইলেই হইতে পারে। কাওয়ারী চারিমাাত্রার তাল ও একটি ফাঁক। ঠেকা—

১।	ধা	ধিন্	ধিন্	তা,	তেৎ	ধাগে	জেকেটে	ধিন্,
	১০				১২			
		তা	ধিন্	তিন্	তা,	কৎ	তাগে	জেকেটে
	১০				১২			ধিন্::
২।	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা,	তা	ধিন্	ধিন্	তা,
	১০				১২			
		তা	তিন্	তিন্	তা,	না	ধিন্	ধিন্
	১০				১২			তা::
৩।	ধা	ধিন্	ধা,		না	ধিন্	ধা,	
	১০				১২			
		তি	তিন্	তা		না	ধিন্	ধা::

তৃতীয় প্রকার ঠেকা জলদ বাজাইবার কালে ও সেতার সম্বন্ধেই অধিক প্রচলিত।

কাওরাটোটা (দেশজ) ওষধিশেষ, কাকজন্ম।

কাওরা (দেশজ) বাঙ্গালার বাঙ্গালীভাষী অতি নীচ শ্রেণীর হিন্দু জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার 'কাওরা', পশ্চিম বাঙ্গালা, মধ্যবাঙ্গালা ও ছোটনাগপুরে "খৈরা", মানভূম ও বাঁকুড়ার 'খয়রা' ও সাঁওতাল পরগণায় 'কোরা' নামে প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে ইহারা দক্ষিণাত্যের ড্রাবিড় জাতির অন্তর্গত। ছোট নাগপুর পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালার ইহারা ভূমিধননাদি ও চাষবাগ করিয়া থাকে। মানভূম ও বাঁকুড়ার খয়রা-দিগকে মুণ্ডজাতীয় (খাণ্ডজাতীয়) বলিয়া অনেকে অহুমান করেন এবং ইহারাও স্বীকার করে যে, হয়ত বহুপূর্বে তাহাদের মধ্যে কোন না কোন প্রকার নিকট সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে নাই। সাঁওতাল পরগণার কাওরার বংশে যে, তাহারা নাগপুর হইতে এদেশে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে (পশ্চিম বাঙ্গালা ও ছোট নাগপুরে) কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে; যথা—খালো, মোলো, শিখরীয়া, বাদামিয়া, সোণা-রেখা, বেটীয়া ও গুড়ি বাবা। এই কয়শ্রেণীর আবার গোত্র-ভেদ আছে; যথা—আলু, বান্দা, ভূটুকু (শুক্র-শাবক), হাঁসদা (বহুহংস), কস্তাব (কচ্ছপ), সামা সাল (শালমাছ) বা সাউলা ও সাম্পু (রূষ)। ইহার মধ্যে বান্দা গোত্রীয় খৈরার আপনাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, তাহাদের আদিপুরুষ স্রীম জাতীয় সহিত বনমধ্যে শীকার করিতে যায়, কিন্তু দৈবক্রমে কোন শীকার না পাইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণ কাতর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। শেষে দেখিল বনের মধ্যে একটি পিঠুলি বা পিঠালী-গাছে শালপাতায় বাঁধা একটি পুইলী কুলিতেছে, তাহারা উহা নামাইয়া দেখিল যে উহাতে কতকটা কি মাংস বাঁধা রহিয়াছে। ক্ষুধার আতিশয়াবশতঃ তাহারা আর অহুসকান করিল না যে উহা কিসের মাংস; অননি পোড়াইয়া ভোজন করিল। অবশেষে তাহারা জানিতে পারিল যে উহা মনুষ্যের জায়ু (নবজাতশিশুর সহিত যে কুল পড়ে তাহাই)। তাহারা তদবধি পিঠালীগাছের কলকে তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধর-গণের পক্ষে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া যায়।

আলুগোত্রীয়েরা আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, তাহাদের আদিপুরুষ ফল-আলু গাছের তলার জন্তগ্রহণ করিয়া-ছিল বলিয়া তাহারা ঐ গাছের ফল এবং সাদৃশ্য নিবন্ধন আলুজাতীয় কোন কলও ভক্ষণ করে না। কালক্রমে পূর্বাঞ্চলে ইহাদের এই সকল গোত্রভেদ উদ্ভিদি গিরা সামান্যতঃ খালো, মোলো, শিখরীয়া ও বাদামিয়া এই চারিটি শ্রেণীতে পরিণত

হইয়াছে। খালো শ্রেণীর লোকেরা বলে যে তাহারা সিংহভূম জেলার পূর্বাংশ ধলভূম হইতে এদেশে আসিয়াছে। এইরূপে খালোরা মানভূম, শিখরীয়ারা দামোদর ও বরা-কর নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ ও তৎপূর্ববর্তী পরেশনাথ পাঁহাড়ের সমতলশিখরনামক শিখর হইতে এবং সোণা-রেখার জুবর্ণরেখা নদীর তীর হইতে এদেশে আসিয়াছে;

বাঙ্গালা-দেশের বাঙ্গালীর মধ্যে একশ্রেণীর নাম বেটীয়া বাঙ্গালী আছে দেখিয়া বোধ হয়, বেটীয়া কাওরা-গণ তাহাদেরই সমজাতীয়। বাঁকুড়ায় এই চারিশ্রেণীর লোক স্বশ্রেণীতেই বিবাহাদি করে; কিন্তু বাঁকুড়ার কিছু পূর্বে মোল ও শিখরীয়া শ্রেণীর পরস্পর আদান প্রদান করিয়া থাকে। মানভূম অঞ্চলে এক্রণ শ্রেণী-বিভাগ নাই। মধ্য-বাঙ্গালার কাওরার বলে যে, যখন বিখ্যামিত্র ঋষির বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ-করিবার জন্ত আসিয়াছিলেন, সেই সময় সেই দেবগবীর আপীনদেশ হইতে যে সকল স্নেচ্ছলৈঙ্গ নির্গত হইয়া বিখ্যামিত্রকে পরভূত করে, এই কাওরারাই সেই স্নেচ্ছলৈঙ্গের অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন যে সাঁওতাল পরগণার খয়রার পশ্চিম হইতে এদেশে আসিয়াছে এবং প্রথমে খদির প্রস্তুত করাই তাহাদের জাতিগত ব্যবসা ছিল, কিন্তু এক্রণ মীমাংসা সমীচীন নহে।

যে প্রদেশে ইহাদের গোত্রভেদ আজিও রক্ষিত হই-য়াছে, সেদেশে ইহারা কখনই পিতৃগোত্রে বিবাহ করে না; কিন্তু মাতৃগোত্রে মাতুল হইতে ৩ পুরুষ অতীত হইলে বিবাহ করতে পারে।

কাওরার দৃঢ়বিশ্বাসী হিন্দু। ইহাদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবভেদ আছে। ইহারা কালী, দুর্গা, মনসা, শিব, রাক্ষস প্রভৃতি দেবতার পূজা করে। মনসা ও ভাঙ্-দেবী ইহাদের নিকট অতি প্রিয় দেবতা; বাঙ্গালীদের মত ইহারাও মনসাদেবীর ভাস্কর্য্যের বাপান-উৎসবে যোগ দেয়। ভাস্কর্য্যের শেষদিন বাঙ্গালীদের মত ইহারাও ভাঙ্-দেবীর পূজা করে। ছোটনাগপুরের পাঁচটে রাজবাংশে অতি পূর্বকালে এক রাজার ভাস্কর্য্যে এক কস্তা ছিলেন। কস্তাটি অতি সুশীলা ও ধর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন। রাজাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। এই কস্তা চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া কেবল লোকের উপকার করিতেন। শেষে এই অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই রাজকন্যা ভাঙ্ই কাওরা ও বাঙ্গালীর উপাস্ত দেবী। মানভূম ও বাঁকুড়ায় বাঙ্গালী ভাস্ক-সংক্রান্তির দিন ভাঙ্দেবীর একটি প্রতিমূর্ত্তি লইয়া উৎসব করিতে করিতে নগরপথে বাহির হয়। কাওরারও ইহাতে

যোগ দেয়। উৎসবে আবালবৃদ্ধবিত্তা সকলেই মিলিত হয়, সকলেই নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে গমন করিতে থাকে। এতদ্বিধ ইহাদের গৃহে ডোমদের ধর্মঠাকুরের মত গ্রাম-দেবতা কুজ ও 'ভৈরবঠাকুরের' পূজা হয়। গ্রাম-দেবতা ও কুজদেবতার নিকট ইহারা ছাগল, হাঁস, পাখরা প্রভৃতি বলি দেয় ও নৈবেদ্যাদি দিয়া থাকে। "দেওঘরীরা ব্রাহ্মণেরা" এই সকল দেবতার পূজাদি করিয়া থাকে। যে-বরে ঐকুণ দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহাকে দেবতার নামানুসারে কুজস্থান, ভৈরবস্থান ইত্যাদি বলে। মানভূমের কাওরারা ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে না, ডোমদিগের মত ইহাদের মধ্যে একজন করিয়া পণ্ডিত থাকে; এই পণ্ডিতকে ইহারা 'লায়া' বা 'নায়' বলে। লায়াকে ইহারা নিকর জমীভোগ করিতে দেয়, ঐ জমীকে লায়ালী জমী বলে। আরও পূর্বাঞ্চলে "বর্ণ ব্রাহ্মণগণ" ইহাদের পৌরাহিত্য করিয়া থাকে। বর্ণব্রাহ্মণেরা বাঙ্গা ও বাউরী ব্রাহ্মণের জায় পতিত।

কাওরারা হিন্দুসমাজে সর্কাপেক্ষা নীচ শ্রেণীতে গণ্য। বাঙ্গা, বাউরী, বুনা প্রভৃতির সহিত ইহারা প্রায় এক জাতীয়। ছোটনাগপুরের কাওরা গোমাংস, শূকরমাংস, হাঁস, মোরগ, প্রভৃতি সকল প্রকার হিন্দুদের নিষিদ্ধ মাংসই খাইয়া থাকে, কেবল মেঠো-ইন্দুর, সাপ, টিক্‌টকী, গোলাপ ইত্যাদি ও মৃত পশুর মাংস খায় না। ছোটনাগপুরের পূর্বে যে সকল কাওরা থাকে, তাহারা গোমাংস স্পর্শও করে না। অনেকে পক্ষিমাংস বা মন্যাদিও ব্যবহার করে না। নিজ বাঙ্গালার কাওরা বড় হিন্দুর পান ভোজনাদির নিয়ম পালন করে বলিয়া তাহারা অজ্ঞাত কাওরা অপেক্ষা আগনাদিগকে উচ্চ জাতীয় বলিয়া বিবেচনা করে। কাওরা-রা বাঙ্গালীদের সহিত একজ ঘৃণত্বক ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করে, কিন্তু অন্ন বা জল গ্রহণ করে না। ইহারা নবশাখের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে।

ছোট নাগপুরের কাওরারা শবদাহ বা সমাধি ছই করে। সমাধি দিবার সময় ইহারা শবদাহক উত্তরদিকে রাখিয়া শবদাহ (মাটিতে উপড় করিয়া) মাটি ঢাপা দেয়। বাঁকুড়া ও আরও পূর্বাঞ্চলে শবদাহই করে; কেবল বাহারা ওলাউঠা, বসন্ত বা কোনরূপ সংক্রামক পীড়ার মরে, তাহাদিগকেই কবর দেওয়া হয়, ইহাদিগকেও উপড় করিয়া সমাহিত করে। তাহাদের বিশ্বাস যে, একুণ করিলে ঐ সকল রোগপ্রভ লোকের প্রেত আর পৃথিবীতে উঠিতে পারে না। ইহারা একাদশ দিবসে মৃতের উদ্দেশে প্রাচ

করে। প্রতিবৎসর কার্তিক ও চৈত্রমাসে ইহারা পিতৃ-লোকের উদ্দেশে চাউল, ঘৃত ও গুড় উৎসর্গ করে।

পশ্চিম বাঙ্গালার কাওরাদের মধ্যে বাস্যবিবাহ ও অধিকবরসে বিবাহ ছই প্রচলিত আছে; অধিক বরস কস্তার বিবাহের পূর্বে কিন্তু পুরুষ সহবাস করিতে পারি না। ঘটনাক্রমে একুণ হইলে উভয়ে সমাজে দণ্ডিত হয়। নিজ বাঙ্গালার ইহারা কেবল বালাকালে বিবাহ দেয়। বাঁকুড়ার ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্বে ব্যভিচার ঘটলে বড় বিষম দণ্ড হয়। ইহাদের বিবাহ-নিয়ম সমস্তই বাঙ্গালীদের মত [বাঙ্গালী দেখ।] ছই একস্থলে ইহাদের মধ্যে কেবল সিন্দুরদান-প্রথা ভিন্নরূপ। বাঁকুড়ার বর জাঁতিতে করিয়া সিঁদুর পরাইয়া দেয়। মানভূমে বর গোকর জোরাদের (জোরালের) এক প্রান্তে দাঁড়ায় এবং কস্তা এক আঁঠু খড়ের উপর দাঁড়ায়। বরকে কস্তার পশ্চাতে দাঁড়াইতে হয়, এবং কস্তা অগ্রে অগ্রে সাত পা অগ্রসর হয়, এই সময়ে বরকে কস্তার কপালে সিঁদুর মাখাইয়া দিতে হয়। নিজ বাঙ্গালার কাওরা-দিগের বিবাহপ্রথা হিন্দুদের মত। ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ আছে। অনেকেই ছই বিবাহ করে। মানভূম, সাঁওতাল-পরগণা, ও ছোট নাগপুরে কাওরাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। এই বিবাহকে ইহারা "লাকা" বলে। "সাল্লার" বিবাহ মুসলমানের "নিকাহ" মত অপরিজ্ঞ। ইহারা সাক্ষা করিবার সময় পাত্র পাত্রীর কপালে নিজহস্তে সিঁদুর দেয় না। পাত্র সিঁদুর স্পর্শ করিয়া দেয় ও উপস্থিত অজ্ঞাত বিধবারা প্রত্যেকে সেই সিঁদুর পাত্রীর সিঁদুর পরাইয়া দেয়। সাঁওতাল-পরগণা ও মানভূমে বিধবারা বাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কেবল মৃতস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পারে না; দেবরকে পারে, কিন্তু তাহাকেই যে বিবাহ করিতে হইবে, একুণ কোন নিয়ম নাই। বিধবারা যদি অজ্ঞ পতি না লইয়া দেবরকে পতিত্বে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহা অন্যান্য সাক্ষা অপেক্ষা কতকটা পবিজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হয়। বাঁকুড়ার ও তাহার পূর্বে কাওরারা বিধবার বিবাহ দেয় না। ছোটনাগপুরে স্বামীকর্তৃক পরি-ত্যাগ সধবা-স্ত্রীও সাক্ষা করিয়া থাকে। স্ত্রীর সতীত্বে সন্দেহ হইলেই স্বামী তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া নিজ সমাজের মণ্ডলদিগের নিকট স্ত্রী-পরিত্যাগের প্রার্থনা করে। মণ্ডলেরা প্রমাণে বিশ্বাস করিয়া দোষ সাব্যস্ত করিলে স্ত্রী গৃহবিকৃত হয়। সাঁওতাল-পরগণার স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ঐকুণে পতি অথবা পত্নী পরিত্যাগের প্রার্থনা করিতে পারে। কোন উচ্চ জাতীয় পুরুষ যদি পতিত হইয়া ইহাদের

জাতিভুক্ত হইতে চাহে, তাহা হইলে ইহারাও মণ্ডলদিগের অনুমতি লইয়া বাগ্গীদের মত তাহাকে স্বাভিভুক্ত করিয়া লয়। নূতন কাওরা হইতে হইলে প্রাৰ্থিকে একটি সামাজিক ভোজ দিতে হয়। ইহারা সামাজিক ও দেওয়ানী মীমাংসা আপনাপন পক্ষান্তরে উপর নির্ভর করে। উত্তরাধিকারী হইয়া গোলমাল হইলে দায়ভাগ ও মিডাকরার মতে কার্য্য হয়। বাঁকুড়ায় ও পূর্বাঞ্চলে কোথাও কোথাও জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক বিষয় হইতে “জ্যেষ্ঠাং” বলিয়া এক জ্যেষ্ঠ-ভাগ প্রাপ্ত হয়; মানভূমে সকলেই সমান ভাগ পায়। যদি কাহারও একাধিক পত্নীর ভিন্ন ভিন্ন গর্ভজাত সন্তান থাকে, তবে যে করজন স্ত্রী থাকে সমস্ত বিষয় সেই কয় ভাগে বিভক্ত হয়, পরে সেই এক এক ভাগ এক এক স্ত্রীর সন্তানেরা বিভীষিকার ভাগ করিয়া লয়।

হিন্দু-রাজত্বকালে কাওরারা পুষ্করিণী-খনন, পথ-প্রস্তুত, ও অন্যান্য ভূমিগত কার্য্য করিত, আজও তাহাই আপনাদিগের জাতিগত ব্যবসায় বলিয়া বিবেচনা করে। ইহারা “ভাজি” নামক একপ্রকার ত্রিকোণাকার জোড়া বুড়িতে করিয়া মাটি বহিয়া থাকে; এই ভাজি কাঁধে করিয়া বহন করে, কেহ কখন মাথায় লয় না। বেলদার নামক চাষীজাতি মাটি ফেলিবার সময় এই ভাজি কখন স্পর্শ করে না। নিজ বাজালার অনেক কাওরারা চাষের কাজ করিয়া থাকে। অনেক কাওরা বহুকালপূর্ব্ব হইতে ঘাটওয়ালীর কার্য্য করিতেছে। এই কার্য্যের জন্ত তাহারা ঘাটওয়ালীর জমী ভোগ করে।

কাংশি (পুং) কংসে ভবঃ কংস-বাহুলক্যং ইঞ, বেদে (পুৰোদরাদিভ্যং) সস্ত শব্দম্। কাঁসার পাত্র।

কাংস (ত্রি) কংসো দেশভেদো হভিজনো হস্ত, কংস-অণ্ (সিদ্ধতু কশিলাদিভ্যো হণঞো)। পা ৪।৩।২৩। কংসা-ধিত্তি ভোজদেহীয় মানবাদি।

কাংস (স্ত্রী) কংসায় পানপাত্রায় হিতম্ কংসীয়ঃ তস্ত বিকারঃ, কংসীয়-যঞ-ছলোপঃ (কংসীয় পরশব্যয়োর্যঞো লুচ্চ। পা ৪।৩।১৬৮।) কংসমেব ইতি স্বার্থে যঞ বা। তাস্ত ও রস মিশ্রিত ধাতু, কাঁসা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কংস, কংসাহি, তাস্ত্রাহি, সৌরাষ্ট্রিক, বোষ, কাংসীয়, বহি-লোহক, দীপ্তিলোহ, ঘোরঘূষা, দীপ্তিকাংস্ত, কাস্ত। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, রুক্ষ, কষায়, লঘু, অম্বীণীপক, পাচক, স্রোতঃ-সমূহের ও চক্ষুর হিত-কারক, রক্তিকারক এবং বায়ু ও কফরোগ-নাশক। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি গুণ রাজবল্লভ বলিয়াছেন—অন্নরস,

বিশদ, লেখন, সারক ও পিত্তনাশক। সুখবোধে কাংস্ত দেহের দৃঢ়তা ও আয়ুর্জিকারক বলিয়া উক্ত আছে। ইহার শোধন মারণ প্রভৃতি তাম্রের দ্বারা। অনেক আবার স্বস্ত্র পদ্ধতিতেও ভস্ম করিয়া থাকেন।

কাংস্তকার (পুং) কাংস্তং তৎপাত্রং কেরোতি, কাংস্ত-ক-অণ্। কংসকার, কাঁসারি। [কাঁসারি দেখ।]

কাংস্তজ (ত্রি) কাংস্তাজ্জায়তে, কাংসা-জন্-ড। কাঁসা ধাতু দ্বারা যাহা প্রস্তুত হয়।

কাংস্ততাল (পুং) কাংস্তেন নির্মিতঃ তালঃ, মধ্যলো। ১ করতাল। ২ মন্দির।

কাংস্তনীল (পুং) কাংস্তেন কৃতঃ নীলঃ, মধ্যলো। অঙ্গন বিশেষ, নীলতুখ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মূষাতুখ হেম, তার ও বিতুলক।

(মূষাতুখং কাংস্তনীলং হেমতারং বিতুলকম্। হেম ৪।১১৮) কোন কোনস্থলে ‘কাংস্তনীল’ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঁক (কঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ) পক্ষিবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঙ্ক, লোহপৃষ্ঠ, সন্দশবদন, খর, রণালকরণ, জুর, আমিষপ্রিয়, অরিষ্ট, কালপুঠ, লোহপূরক, কিংশার, দীর্ঘ-পদ, দীর্ঘপাদ। (অমর, হেম, নিঘণ্টুরাজ, শব্দরত্নাবলী)।

কাঁকপাখী এক প্রকার নহে; সাদা কাঁক ও কাল কাঁক ভেদে কএক প্রকার কাঁক দেখা যায়। সাদা কাঁককে হিন্দুস্থানীরা কবুদ, বেহারে থররা, সিদ্ধপ্রদেশে সেয়া, তৈলঙ্গে নারায়ণপতি, তামিলে নারায়ণ ও ইংরাজীতে Blue Heron কহে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Ardea cinerea.

ইহার মাথা সাদা, ঘাড় কাল, মাথার পশ্চাদ্ভিকের পালক কাল, পিঠ ও ডানা নীলাভ কটা, পক্ষের পালক কাল, পিঠের কাছাকাছি ডানার অগ্রভাগের পালকগুলি বেশ সুচিক্ণ অথচ কটার মত, লেজ নীলাভ ভস্মাকার, বুক ও সমস্ত নিম্ন অংশ সাদা। চক্ষু ঘোর হলুদিয়া, ঠোঁটের উপরভাগ কটা, পা ও পায়ের তলা কটা। এক একটা দুই হাতের উপর বড় হয়।

এই জাতি এসিয়া, যুরোপ ও আফ্রিকার নানাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বৃক্ষের উচ্চ চূড়ায় দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং নদী, ঝাল ও বিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে মৎস্ত ধরিয়া খায়।

কাশ্মীররাজ্যে এই পাখীর কিছু আদর বেশী। তনিতে পাওয়া যায়, কাশ্মীররাজ্যের উকীষে নাকি এই পাখীর পালক সুশোভিত হয়।

লাল কাঁককে ইংরাজীতে Purple Heron কহে,

ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম *Ardea purpurea*। লাল কাকের মাথা কাল তাহাতে সবুজের আভা, চুটি সাদা, গাল লাগের আভাযুক্ত কটা, বাড় ঘোর লাল তাহাতে শিলল ও কালরঙের আভা, পিঠ, পাখা ও পুচ্ছ রক্তাভযুক্ত ধূসর, পিঠের কাছাকাছি ডানা লম্বা ও দেখিতে ঘোর লাল, বুক, পেট ও খাঁরা কটাসে লাল, পেটের উপর কতকটা সাদাটিয়া। চোঁট ঘোর পীত, উপরভাগ কতকটা কটা। এক একটা হুই হাতের কিছু বড় হয়। আবার কোন কোনটি ছোটও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে জলপ্রধান স্থানে খাল, বিল, জলা ও শতক্ষেত্রে সাদা কাক দেখা যায়। যেখানে বক থাকে, সেখানে প্রায় লাল কাকের গভায়াত ঘটে না। ইহার বড় বড় খাগড়াগাছের উপর বাসা নির্মাণ করে। মৎস্ত, ভেঁক প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। ভারতবর্ষ, সিংহল, মলয়, ব্রহ্মদেশ এবং যুরোপে ও আফ্রিকাতেও লাল কাক দৃষ্ট হয়।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকশাস্ত্রকার সুশ্রুতের মতে কাক পাখীর মাংস সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণের সহিত সমান গুণ-বিশিষ্ট, রস বীৰ্য ও বিপাকে হিতকর এবং শোথরোগে ফলপ্রদ। (সুশ্রুত সুত্রস্থান ৪৬ অঃ)।

কাঁকই (দেশজ) কঙ্কাতিকা, চিকণী।

কাঁকজোল, এক ক্ষুদ্র বিভাগ, পূর্ণিমা, মালদহ ও ভাগলপুরের কতকাংশ। কনিংহামের মতে ইহার অপর নাম রাত।

কাঁকড়া (দেশজ) কর্কট, জলজন্তু বিশেষ। [কর্কট দেখ।]

কাঁকড়াকাঠ (দেশজ) কাঠবিশেষ।

কাঁকড়াবিছা (দেশজ) বৃশ্চিকবিশেষ। [বৃশ্চিক দেখ।]

কাঁকড়াশালি (দেশজ) ধাতুবিশেষ।

কাঁকড়াশূলী (দেশজ) [কর্কটশূলী দেখ।]

কাঁকড়ি (দেশজ) কঙ্কণ।

কাঁকনি (দেশজ) কঙ্কণ।

কাঁকতল্লী (দেশজ) কঙ্কদেশে লইয়া বাইবার উপযুক্ত বোচকা।

কাঁকনী (দেশজ) [কাঁকিলী দেখ।]

কাঁকোর (দেশজ) কঙ্কর, স্মৃষ্ণ স্মৃষ্ণ কঠিন পদার্থবিশেষ।

কাঁকরোল (দেশজ) ফলবিশেষ, কর্কোটক।

কাঁকলা (দেশজ) ১ কঙ্কোল নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ।
২ কাকোলা।

কাঁকলাস (দেশজ) কুকলাস, গিরগিটী।

কাঁকবিড়ালী (দেশজ) পীড়াবিশেষ, কঙ্কদেশে অর্থাৎ বগলে ফোড়া হইলে, তাহাকে 'কাঁকবিড়ালী' কহে।

কাঁকাল (দেশজ) কটদেশ, কোমর।

কাঁকালি (দেশজ) কটদেশ।

"আপনার গোরব রাখহ বনমাণী।

হের দেখ বাড়ি নারি ভাবিব কাঁকালি।" শ্রুতীভাষ্য।

কাঁকিনী (দেশজ) মহিষের জ্রী, মহিষী।

কাঁকিলা (দেশজ) মৎস্তবিশেষ (*Esoc Scolopax*)

কাঁকুয়া (গ্রাম্য) কানকুয়া।

কাঁকুই (দেশজ) কঙ্কাতিকা, চিকণী।

কাঁকুড় (দেশজ) কর্কটী। [কর্কটী দেখ।]

কাঁকুড়ী (দেশজ) কাঁকুড়।

কাঁখ (দেশজ) কাঁক, কঙ্ক।

"পুস্ত্রভাবে কোলে কাঁখে তুমি কর ভায়।" গোবিন্দমঙ্গল ১৬২।

কাঁখতালী (দেশজ) বগল, কঙ্ক।

কাঁচ (দেশজ) কাচ। [কাচ দেখ।]

কাঁচকড়া [কাচকড়া দেখ।]

কাঁচকলস (দেশজ) বোতল, গ্লাস প্রভৃতি।

কাঁচকলা (দেশজ) কাঁচা কলা, অপককদলী।

কাঁচগড়গড় (দেশজ) ঘাসবিশেষ।

কাঁচড়া (দেশজ) [কঙ্কট দেখ।]

কাঁচড়ানাম (দেশজ) কাঁচড়া।

কাঁচপাত্র (দেশজ) কাচনির্মিত পাত্র।

কাঁচপোকা (দেশজ) পতঙ্গবিশেষ, বোল্তাজাতীয় একরূপ পতঙ্গ, কুমীরপোকা। ইহাদিগের বর্ণ নীল। বোল্তার জায় ইহাদের দংশনেও আলা করে। ঘরের কপাট চৌকাট প্রভৃতি কাঠে ছিদ্র করিয়া, অথবা মৃত্তিকাদি দ্বারা গৃহের ভিত্তি প্রভৃতি স্থানে একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করিয়া বাস করে। তাহাদের বাসার মাটি জলে গুলিয়া ললাটাদি তিলকস্থানে ফোটা দিলে পালাজর আরোগ্য হয়। এই পোকা প্রায়ই তেলাপোকা (আরমুল) ধরিয়া নিজের বাসায় লইয়া যায়। প্রবাদ আছে কাঁচপোকা তেলাপোকা ধরিলে, তেলাপোকা নিতান্ত ভীত হইয়া কেবল কাঁচপোকায় চিন্তা করে, তাহাতে ক্রমে ক্রমে সেও কাঁচপোকায় জায় বর্ণাদি প্রাপ্ত হইয়া কাঁচপোকা হইয়া যায়।

কাঁচমণি (দেশজ) কাচ।

কাঁচলবণ (দেশজ) লবণবিশেষ।

কাঁচলি (দেশজ) জীলোকের শুনাচ্ছাদক বস্ত্রবিশেষ।

"কুচুগ হেমগিরি হর-মনোহর।

বিচিত্র কাঁচলি ভায় বিশ্ব-অগোচর।" ধর্মমঙ্গল ৭। ১০১।

কাঁচা (দেশজ) অপক।

কাঁচী (দেশজ) ১ কর্ভরী, চুল ও বস্ত্র প্রভৃতি কাটিবার
অস্ত্রবিশেষ। ২ অসম্পূর্ণ।

কাঁচীওজন (দেশজ) অসম্পূর্ণ ওজন; দেশ ও স্থান-ভেদে
কাঁচীসেয়ে ৫৮, ৬০, ৬৪, ৭২ তোলা প্রভৃতি নানা প্রকার
ওজন দেখা যায়।

কাঁচীসীম (দেশজ) বৃকবিশেষ (Dolichos lignosus.)
[সীম দেখ।]

কাঁচীসের (দেশজ) ৫৮, ৬০, ৬৪ ও ৭২ তোলা।

কাঁচুলী (দেশজ) কাঁচলি।

কাঁজি (দেশজ) কাজিক, আমানি।

কাঁজিয়াল (দেশজ) বৃকবিশেষ (Cascaria ovata.)

কাঁটা (দেশজ) ১ কণ্টক, বৃকহ স্থচীবৎ পদার্থবিশেষ।
২ মাছের হাড়। ৩ বাধা। ৪ শত্রু।

কাঁটাআলু (দেশজ) আলুবিশেষ (Dioscorea pentaphylla.)

কাঁটাকচু (দেশজ) কচুবিশেষ (Pothos laesia.)

কাঁটাকারী (দেশজ) কণ্টকারী।

কাঁটাকুড় (দেশজ) কণ্টকগুণ্ড, কণ্টকময় স্থান।

কাঁটাকুলিকা (দেশজ) কুলবিশেষ। (Ruellia longifolia.)

কাঁটাগুড়কামাই (দেশজ) বৃকবিশেষ। (Monetia
barlerioides.)

কাঁটাগোলাব (দেশজ) গোলাববিশেষ। (Rosa Chinensis.)
[গোলাব দেখ।]

কাঁটানটিয়া (দেশজ) কাঁটামুক্ত নটে নামক শাকবিশেষ
(Amaranthus Spinousus.) কাঁটানটের সংস্কৃত নাম মারিষ,
বাম্পক, মার্ষ। ইহা দুই প্রকার—সাদা কাঁটানটে ও লাল
কাঁটানটে।

বৈদ্যক মতে সাদাকাঁটা নটের গুণ—মধুর, শীতল,
বিষ্টভী, পিত্তনাশক, গুরু, বাতশ্লেষকারী, রক্তপিত্তনিবারক
ও অগ্নিবৈবমানাশক।

লাল কাঁটানটির গুণ—কারবিশিষ্ট, মধুর, সর, কক-
জনক, পাকে কটু, স্বর দোষকর, ইহা অধিক গুরু নহে।

বৈদ্যকমতে কাঁটানটের মূল—উষ্ণ, ককর, আর্ন্তবরোধক,
রক্তপিত্তনিবারক ও প্রদররোগে শান্তিদায়ক।

কাঁটাপালথ (দেশজ) কাঁটামুক্ত পাখা।

কাঁটাবউল (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। (Pristis pectinatus.)

কাঁটাবাটানা (দেশজ) বৃকবিশেষ। (Quercus acuminata.)

কাঁটাবাঁশ (দেশজ) বেড়বাঁশ, ইহার গায়ে কাঁটা আছে।
(Bambusa spinosa.)

কাঁটাবাবলা (দেশজ) বাবলাগাছ। (Mimosa Arabica.)

কাঁটাভোলা (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। (Perca Ontaa.)
[ভোলা দেখ।]

কাঁটাময় (দেশজ) কাঁটা-বিশিষ্ট।

কাঁটামান (দেশজ) বৃকবিশেষ। (Pothos heterophylla.)

কাঁটাল, কাঁঠাল (দেশজ) কণ্টকীকলশব্দের অপভ্রংশ।

১ কণ্টকী, পনসকল। ইহার সংস্কৃত নাম—পনস, কণ্টকীকল,
কণ্টকীফল, ফণাল, অতি বৃহৎফল, মহাসর্ষ, ফলিন, ফলবৃকক,
ফল, কণ্টকল, মূলকল, অপুশাকলদ, চূতফল, চম্পকোব,
চম্পালু, রসাল, সুদলফল, পনস, পনসতালিকা। উত্তর-
পশ্চিমে কাঁঠাল, বোম্বায়ে ‘ফনস’, ও তামিলে শিলা কহে।
(Jack-fruit, *Artocarpus integrifolia*.)

কাঁঠালগাছ এক একটি খুব বড় হয়। কাঁঠাল দুই
প্রকার—খাজা কাঁঠাল ও নেও বা গলা কাঁঠাল। খাজা
কাঁঠালের কোয়া প্রায় ৮।১০ অঙ্গুলি বড় হয়, নেওর
কোয়া তেমন বড় হয় না।

এই ফল কেবল গাছের উপর শাখায় জন্মে না, অনেক
সময় গাছের মূল মাটির মধ্যে হইতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই কাঁঠাল গাছ জন্মে। ইহার
গাছ পাথরিয়াজায়গায় অধিক বাড়িতে পারে না, কিন্তু
গুঁড়ি খুব মোটা হয়; বালুকাময় স্থানে খুব বাড়ি,
শাখা প্রশাখাও বেশ ছড়াইয়া পড়ে; যদি ইহার মূলে
অধিক জল সিক্ত হয়, অথবা পুষ্করিণীর ধারে যেখানে
ইহার মূল জল টানিতে পারে, এরূপ স্থানে কাঁঠালগাছে
প্রায় ফল ধরে না অথবা ছোট ছোট ফল ধরিলে তাহা বাড়িতে
না বাড়িতে শুকাইয়া যায়। এদেশে অগণক ফলকে ইচোড়
এবং পকফলকে কাঁঠাল বলে। ইচোড় ও কাঁঠাল বহু-
বাসীর অতি প্রিয়।

বৈদ্যক রাজবল্লভ মতে ইহার গুণ—অমধুর, বৃহৎ,
স্নিগ্ধ, শীতল, দুর্জর, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মা ও শুক্রজনক।
ইচোড়ের গুণ—কষায়, বাত, বাতল, রক্তপিত্তহারক।

নিষট্টরাজের মতে—বলবীৰ্য্যবর্দ্ধক, প্রমদাহনাশক,
রুচিকর, প্রাণী, হৃদয়, গুরু। বীজের গুণ—ঈষৎ কষায়,
মধুর, বাতল, গুরু, কটিকর। ইচোড়ের গুণ—নীরস ও
হৃদয়; মধ্যপকের গুণ—দীপন।

ভাবপ্রকাশের মতে ইচোড়ের গুণ—কিষ্টভী, বাতজনক,
কষায়, গুরু, দাহকর, মধুর, বলকারক, কফজনক ও
মেদোবর্দ্ধক। পকফল—শীতল, স্নিগ্ধ, বাত ও পিত্তনাশক,
তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, বাত, অতিশয় মাংসবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক,
বলকারক, শুক্রপ্রদ, রক্তপিত্ত, কফ ও ক্রবহাসক। ইহার রস

শুক্লজনক ও ত্রিবেণীশাক। বীজ—শুক্লজনক, মধুর, শুষ্ক, কোঠিরোধক ও মূত্রনিসারক। সন্ধ্যাপি ও শুষ্করোগীর পক্ষে কাঁঠাল অতি অনিষ্টকর। ২ কাঁটাবুলু।

কাঁটালকুসী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Percia nebulosa.)

কাঁটালকোষ (দেশজ) কাঁটালের কোষ বা কোরা।

কাঁটালপাড়া, চক্ৰিয়-পরগণার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। এখানে পূর্বে খুব সংস্কৃত চর্চা ছিল। নব্বইপগতি মহারাজ সতীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মদন-গোপালের রাসযাত্রার সময় এখানে বড় ধুমধাম হয়।

কাঁটালমাছ (দেশজ) কণ্টকবিশিষ্ট মৎস্য।

কাঁটাললবাটানা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Quercus armata.)

কাঁটালিকলা (দেশজ) কলাবিশেষ। হিন্দুদিগের পূজা ও মঙ্গলকর্মে এই কলা ব্যবহৃত হয়।

কাঁটাশিজুর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Quercus armata) পূর্ব-বঙ্গে ইহা বিস্তর জন্মে।

কাঁটাশিরীষ (দেশজ) শিরীষগাছ। (A species of Mimosa.)

কাঁটাশুনা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Panax digitata.)

কাঁটাসিজ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Quercus armata.)

কাঁটাসিজ (দেশজ) তেঁকাটা সিজ গাছ।

“বড়ি ভাঙ্গা বিস্তর বদরীর বীজ।

কলা মূল ভেজে দিল কাটা কাঁটাসিজ ॥” শিবারণ ১২।

কাঁটা (দেশজ) ১ লৌহ নির্মিত গোলাকার পদার্থ, ইহা জালে গাঁথা থাকে। ২ স্বর্ণনির্মিত গোলাকার পদার্থ, ইহা অলঙ্কার বিশেষে ব্যবহৃত হয়।

কাঁটাপলা (দেশজ) ছাতের অলঙ্কারবিশেষ, স্বর্ণের কাঁটা ও প্রবাল যথাক্রমে এক কাঁটার পর একটা প্রবাল এইরূপে গাঁথিয়া এই অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।

কাঁঠা (দেশজ) কাঁটা।

কাঁঠাবালা (দেশজ) কাঁটাপলার নামান্তর।

কাঁঠাবালাচন্দনা (দেশজ) চন্দনাপক্ষীবিশেষ (Psittacus eupatria, Latham.)

কাঁড় (দেশজ) তীর, শর।

কাঁড়ন (দেশজ) তুষ পরিষ্কার করা।

কাঁড়রা (দেশজ) মোটা, স্থূল।

কাঁড়রাবুলবুল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Turdus jocosus.)

[বুলবুল দেখ।]

কাঁড়া (দেশজ) পরিত্রুত, ছুষ্ট।

কাঁড়ি (দেশজ) ১ রাশি, চিবি। ২ তালের কাঠ।

কাঁড়িয়া (দেশজ) বৃহৎ ভাঙ।

কাঁত (দেশজ) অন্ন পরিসরবিশিষ্ট প্রাচীর।

কাঁহড়া (দেশজ) গৃহাদির তক্তাবিশেষ, তন্ন প্রাচীর।

কাঁধ (দেশজ) কাঁত।

কাঁধা (দেশজ, কছা শব্দের অপভ্রংশ) কছা, বাহা কতকগুলি জীর্ণ বস্ত্র একত্র শেলাই করিয়া প্রস্তুত হয়।

কাঁধী (দেশজ) নদীর উচ্চতট।

কাঁধড়া (দেশজ) কাঁহড়া। ভয়াবশেষ।

কাঁদড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, (Commelina nudiflora.)

ইহা সৈং সৈতে স্থানে অধিক উৎপন্ন হয়।

কাঁদ (স্বক্লবের অপভ্রংশ) বাহর মূলদেশ।

কাঁদন (দেশজ) রোদন, ক্রন্দন।

কাঁদনি (দেশজ) রোদন, ক্রন্দন।

কাঁদনী (দেশজ) যে বালিকা অধিক কাঁদে।

কাঁদনিকলা (দেশজ) রোদন, বিলাপ।

কাঁদলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Commelina nudiflora.)

কাঁদা (দেশজ) ১ রোদন করা। ২ প্রান্তদেশ। ৩ কূল, তীর।

কাঁদাকাটা (দেশজ) রোদন, বিলাপ।

কাঁদাকাঁদি (দেশজ) পরস্পর রোদন।

কাঁদাড়ি (দেশজ) হাঁচতলার নিয়ে প্রবাহিত পরঃনালা।

কাঁদালবাড়ি (দেশজ) কৃষকের স্বক্লান্তি যষ্টিন্দিব, ইহা দ্বারা কৃষকেরা গোরু ভাড়ার ও ধান মাড়িবার কালে ধান টানিয়া একত্র করিয়া দেয়।

কাঁদী (দেশজ) ভাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি ফল সকল যেরূপ একত্র গ্রথিত হইয়া থাকে, তাহাকে কাঁদী কহে।

কাঁধ (দেশজ) স্বক্ল, বাহর মূলদেশ।

কাঁধনাড়ি (দেশজ) স্বক্ল করিয়া লইবার উপযুক্ত দীর্ঘ যষ্টি।

কাঁধা (দেশজ) ১ প্রান্তদেশ। ২ স্বক্ল।

কাঁধাড়ি (দেশজ) ১ পাহাড়ের শিরোভাগ। ২ কাঁদাড়ি।

কাঁপন (দেশজ) কম্পন, পরাধর করিয়া শরীর চালিত হওয়া।

কাঁপনি (দেশজ) কম্পনরোগ, স্থায়ীভাবে বহুকাল কম্পিত হওয়া। [বেগথু দেখ।]

কাঁপা (দেশজ) কম্পিত হওয়া।

কাঁশা (দেশজ) কাংশু ধাতু।

কাঁসড় (দেশজ) কাংশু নির্মিত বাদ্য যন্ত্রবিশেষ; দেবতাদিগের আরাতি সময়ে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কাঁসর (দেশজ) কাঁসার বাদ্য যন্ত্রবিশেষ, কাঁসড়।

কাঁসা (দেশজ) কাংশু।

কাঁসারি (দেশজ, সংস্কৃত কাংসকার শব্দের অপভ্রংশ) কাংসজীবনির্মাণ ও বিক্রেতা হিন্দু বণিকজাতিবিশেষ। অপর নাম কংসকার, কংসবণিক, কাংসকার। বৌদ্ধাইরে 'কঁসর' বা 'কংসর' এবং উত্তর-পশ্চিম ও বেহার অঞ্চলে 'কসেরা', 'কংসেরা' ও 'ভামেরা' নামে আখ্যাত। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়।—

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্মবংশে লিখিত আছে,—

“কোন সময়ে বিশ্বকর্মা স্বর্গবেশে ঘূতাচীকে দেখিয়া কামদেবের পীড়িত হইলেন। সেই সময় ঘূতাচী কামদেবের নিকট গমন করিতেছিলেন, বিশ্বকর্মা তাঁহাকে আপনাদেবের অভিলাষ জানাইয়া কহিলেন, ‘হে সুলভ! আমি কামদেবের নিকট কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তোমাকে বিবিধ অলঙ্কার প্রদান করিব।’ ঘূতাচী কহিলেন, ‘দেখ, তুমি বলিতেছে ‘আমি কামদেবের নিকট কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি।’ এখন আমি সেই কামদেবের চিত্তরঞ্জন করিতে যাইতেছি। আমি অদ্য তোমার গুরু কামদেবের পত্নীস্থানীয়। এক্ষণ স্থলে আমাকে কামনা করিলে তোমার গুরুপত্নী-গমন-রূপ মহাপাতক হইবে। আমি কিছুতেই আজ তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না।’ বিশ্বকর্মা ঘূতাচীর কথায় অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, ‘তুই যেমন আমার মনোরথ পূর্ণ করিলি না, তেমনি আমার অমোঘ শাপপ্রভাবে মর্ত্যলোকে শূদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর।’ তখন ঘূতাচীও বিশ্বকর্মা এই বলিয়া শাপ দিলেন, ‘তুমিও আমার শাপে বর্গভ্রষ্ট হইয়া নরলোকে জন্ম গ্রহণ কর।’ অনন্তর ঘূতাচী নরলোকে শূদ্রার গর্ভে জন্ম লইয়া মদনগোপের পত্নী হইলেন, এদিকে বিশ্বকর্মাও ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে মদনগোপের স্ত্রীর সহিত ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্মা সহবাস করিলেন, তাহাতে ৯টি পুত্র জন্মে, সেই নয় পুত্রই মালাকার, কর্ণকার, কংসকার প্রভৃতি নয় প্রকার জাতি। তাহাদের মধ্যে মালাকার, কর্ণকার, শঙ্খকার, তন্তুকার, কুন্তকার ও কংসকার এই ছয় প্রকার জাতি শিল্পিগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত*।

বৃহৎসং-পুরাণের মতে—“ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যগর্ভে

অযষ্ঠ, গন্ধবণিক, শঙ্খকার ও কংসকারজাতির উৎপত্তি হইয়াছে”†।

ভার্গবরাম বিরচিত জাতিমালা মতে—

“গান্ধিক: শাঙ্খিকশৈব কাংসিকো মণিকারক:।

সুবর্ণবণিকশৈব গন্ধিকৈব বণিক জাত: ॥

শাঙ্খিক্যাং গান্ধিকাজ্জাত্যন্ত্রাং কাংসোপজীবিক: ॥”

বণিক অর্থাৎ বেণিয়াজাতি ৫ প্রকার, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক (শাখারি), কংসবণিক (কাঁসারি), মণিকার ও সুবর্ণবণিক। গন্ধবণিকের ঔরসে শঙ্খবণিক-কন্তার গর্ভে তান্ত্র ও কাংস-উপজীবী কংসবণিকজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ভার্গবরাম কংসবণিক হইতে বিলোমক্রমে অপর জাতি সংস্রবে যে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এইরূপ লিখিয়াছেন।—

“শাঙ্খিক্যাং কাংসিকজ্জায়াং মণিকারশ্চ জায়তে।

কাংস্যকারাচ্চ মণিক্যাং সুবর্ণকৌবিকোহভবৎ ॥

মণিপুত্র্যাং কাংসজ্জায়াং গোপালস্ত চ সম্ভব:।

গোপালাং কাংসপুত্র্যাং বৈ তৈলিত্তাশূলিকস্তত: ॥”

শঙ্খবণিকের ঔরসে কংসবণিককন্তার গর্ভে মণিকার; কংসবণিকের ঔরসে মণিকার-কন্তার গর্ভে সুবর্ণবণিক এবং গোপালার ঔরসে কংসবণিক-কন্তার গর্ভে তৈলী ও তাশূলীর জন্ম।

বঙ্গদেশের কোন কোন বয়সবৃদ্ধ কাঁসারির মুখে শুনা যায়, এই জাতির আদিপুরুষ বহু পূর্বকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়া বাস করেন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কাঁসারিরা আপনাদিগকে প্রকৃত বৈশ্যজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বাস্তবিক শিল্পী ও বণিকদিগের মধ্যে তাঁহাদিগের সম্মানই অধিক। তাঁহারা যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার উপাধিভেদে সাতটি শাখা আছে—১ পুর্কিয়া, ২ পুর্কয়ান (পশ্চিমীর), ৩ গোরখপুরী, ৪ তঙ্ক, ৫ তাকুরা, ৬ ভরীয়া, ৭ গোলার।

উক্ত শাখাগুলির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান অথবা আহার-ব্যবহার প্রচলিত নাই। মির্জাপুরে এই জাতির সংখ্যা কিছু অধিক, এখানে তাহারা কাঁসার বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দূরদেশান্তরে বিক্রয় করিতে পাঠায়।

বেহার অঞ্চলের কাঁসারিরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কাঁসারিদের মত পদমর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ঠেঠেরা প্রভৃতি অপর বেশিয়া অপেক্ষা কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ।

* “বিশ্বকর্মা চ শূদ্রায়াং বীৰ্য্যাদানং চকার স:।

ভতো বৃহুবু: পুত্রাশ্চ নবোত্তে শিল্পকারিণ:।

মালাকার-কর্ণকার-শঙ্খকার-কুণ্ডলকার:।

কুন্তকার: কংসকার: যভেতে শিল্পিণাং বরা:।” ব্রহ্মবং ১০।১৯-২০ শ্লোক।

* “বৈশ্যরাং ব্রাহ্মণাজাত: অযষ্ঠো গান্ধিকো বণিক:।

কংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাং সমভূবত্ ॥” বৃহৎসং-পুরাণ।

ভাহারা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিলে, ঠঠেরাগণ ভাহাতে পালিস অথবা খোদাই করে। [ঠঠেরা দেখ।]

বেহারের কাঁসারিদের অনেক গোত্র চলিত আছে; যথা—বনৌধিয়া, বসইয়া, চৌপর্ণা, চৌঘরা, হরিহর্ণ, লকর-মহোলিয়া, মছুয়া, মহোলিয়া, মোহরিয়া, সুথরিয়া, সুধর।

ইহারা স্বগোত্রে বিবাহ করিতে পারে না এবং বাণ্য-কালেই কস্তার বিবাহ দেয়। অনেক সময়ে কস্তার কিছু আশিক বয়সে বিবাহ হইতে দেখা যায়; এমন কি অনেক সময়ে খুতু হইবার পর কস্তা পতিমুখে দেখিতে পায়। বিবাহ-প্রথা অনেকটা বেহারের কারহদিগের মত। জী রুগ্না মৃতবৎসা, মৃতগর্ভা অথবা বক্ষা হইলে পুরুষ স্বতন্ত্র পত্নী বরণ করিতে পারেন। ইহাদের বিধবারা মনে করিলে ‘সাগাই’ প্রাপ্যমত বিবাহ করে। গভীর রাত্রে অন্ধকার গৃহে এই বিবাহ হয়, একপ বিবাহে কেবল বিধবারাই উপস্থিত থাকে, সখবারা অশবিজ্ঞ ভাবিয়া এই বিবাহ দেখে না। পুরুষ সিন্দুর দান করিয়া বিধবাকে আগুন গদ্বীতে গ্রহণ করে। একপ বিবাহে ভোজ্য নাই, আমোদ নাই, শাস্ত্রানুসারে কোন ধর্মকর্মও করিতে হয় না।

সমাজে ইহারা সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রচলিত, ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হস্তে জলগ্রহণ করিতে পারেন।

বঙ্গদেশীয় কাঁসারিদিগের মধ্যে পদবী, ঘর ও ভিন্ন ভিন্ন গোত্র প্রচলিত আছে।

পদবী—কুণ্ড, প্রামাণিক, দাস, দী, পাল, নন্দন, দে ইত্যাদি।

ঘর—সপ্তগ্রামী, মামদাবানী, মাওতা, মাইতি।

গোত্র—শাখাখি, শাঙিয়া, সপ্তবার্ধি, ঋষিকেশ, দধিধ্বি।

ইহারাও স্বগোত্রে বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহাদি কার্যে ইহাদিগকে বিবন দায়ে পড়িতে হয়; বিবাহের সময় সব ঘর নিমন্ত্রণ করা চাই, কাজেই ভোজের খুব বেশী আয়োজন করিতে হয়। এই জন্ত গরীব কাঁসারিরা এককালে ৮।৯ টী কস্তার বিবাহ দেয়।

বিবাহপ্রথা—বিবাহ হইবার পূর্বে কস্তা ও বরকর্ত্তা পরস্পরের গৃহে গিয়া পাত্রপাত্রী স্থির করেন; পরে ঘরে ঘরে পান ও কাটা সুপারি পাঠাইয়া ‘পানপত্র’ হয়; বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য স্থলবিশেষে পানপত্রের সঙ্গে ‘সায়-সন্দেশ’ হয়, একবার ‘সায়সন্দেশ’ হইলে সহজে বিবাহ ভঙ্গ করিবার যো নাই। কারহ-ব্রাহ্মণদিগের মত ইহাদিগকে কোন প্রকার লিখিত লগ্নপত্র করিতে হয় না। বিবাহের পূর্বে ‘ডেকে’ নামে কতকগুলি লোক পাড়ায় ও কুটুম্বাটীতে ‘অমুকের পুত্রের সহিত অমুকের কস্তার বিবাহ হইবে’ বলিয়া

সংবাদ দিয়া আসে এবং ভোজের সময় খাইয়া সকলকে ডাকিয়া আনে। গাজহরিজার দিন বরের মাতৃহানীর কোন জীলোক এক কাঁসীতে তৈল ও হরিদ্রা, অপর এক খালে মিঠার এবং কতকগুলি কুটুম্ব জীলোক সঙ্গে লইয়া কস্তার গাজহরিদ্রা দিতে যান। বিবাহের পূর্বে বরকর্ত্তাকে কস্তার গহনা পাঠাইয়া দিতে হয়, সেই সঙ্গে খাবার, পান ও সুপারি লইয়া বরণকীর জীলোকেরা খাইয়া কন্যাকে গহনা পরাইয়া আসেন। বর ও কন্যা পাকি করিয়া কুটুম্বগৃহে খাইয়া ও গিড়া আহ্বার করে এবং প্রত্যেক বাটী হইতে বর ধূতি ও কন্যা মাটি পাইয়া থাকে। তৎপরে কস্তাকর্ত্তা ‘মুনিভাঙ্গা’ সারিতে যান। এই সময় বরকে কুশের পৈতা ও আংটি পরান হইয়া থাকে। কস্তাকর্ত্তা বরকে বলেন, ‘তুমি সন্ন্যাস-আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমার কস্তাকে গ্রহণ কর।’ তখন বর ভাবী খণ্ডরের কথা মত যথোচিত উত্তর করেন। পরে লগ্ন অনুসারে রাতে বিবাহ হয়। বিবাহে সিতায় সিন্দুর দিবার নিয়ম নাই। বাসরঘরে বর বাইতে পায় না, অন্য ঘরে শুইয়া থাকে; অতি প্রভাতে উঠিয়া বর খণ্ডরভাবে নিজ গৃহে চলিয়া যায়। দিবসে বর একবার খণ্ডরালয়ে আসিয়া আহ্বার করিয়া যায়। পরে রাতে বরকে আনাইয়া ‘বরনারান’ হইয়া থাকে। চারি রাত্রি বরনারান হয়। বিবাহের আটদিন বরের নিমন্ত্রিত সপরিবার কন্যার বাটীতে ও কন্যার নিমন্ত্রিত সপরিবার বরের বাটীতে আহ্বারাদি করিয়া থাকে।

ইহারা বিবাহের চতুর্থ দিবসকে ‘চৌঠ’ বলিয়া থাকে, এই দিন যদি শুভবার হয় তবে যথাসাধ্য বর বিদায় করিতে হয়, নহিলে শুভ দিনে বিদায় হয়। বিদায়ের পর বর খণ্ডর-পক্ষীয় কুটুম্ববাটীতে নমস্কার করিতে যায় এবং সকলেরই নিকট হইতে কিছু কিছু যৌতুক পায়। এই দিবস বর-বসন্ত করিবার জন্য কন্যাকে খণ্ডরগৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

বসন্তের দিন বরকন্যা আট হাঁড়ীতে ভাত ও বাজান রাখিয়া এক একবার খোলা-ঢাকা করে, তাহাকে ‘অষ্টমঙ্গলা’ বলে। সেই দিবস কন্যাপক্ষ হইতে বরকে ও বরণক্ষ হইতে কন্যাকে একখানি লালপেড়ে কাপড় আলতায় ছোপাইয়া পরিতে দেয়। বর খণ্ডরগৃহে আসিয়া কন্যার কপালে সিন্দুর দিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া নিজ গৃহে কন্যাকে লইয়া যায়। সেইদিন রাতে বরকন্যা একত্র শয়ন করে। যদি কন্যা ছোট হয়, তবে বিছানার মাড়াইয়া চলিয়া যায়। সেই দিবস বরবসন্ত না হইলে কন্যা এক বৎসর পিতৃগৃহে বাস করে, তৎপরে শুভ দিনে খণ্ডরগৃহে বরবসন্ত করিতে আসে। বরবসন্ত না হইলে যদি ঐ একবর্ষ মধ্যে বরের মৃত্যু

হয়, তখনই হইলে সেই কন্যা স্বতঃস্ফূর্তে আর স্থান পায় না, আজীবন তাহাকে পিতৃগৃহে থাকিতে হয়।

বাল্যালার কাঁদারদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই।

ইহাদের পূজা শাস্তি সত্যমনাদি ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন হয়।

ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হাতে জল অর্পণ করিতে পারেন।

পূর্ব্ববঙ্গে অধিকাংশ কাঁসারিই শৈব; পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব এই কয়প্রকার কাঁসারিই দেখিতে পাওয়া যায়। ৩০এ ভাদ্র বিধবর্ষ। পূজা হইয়া থাকে, এই দিবস কোন কাঁসারি যজ্ঞাদি স্পর্শ করে না।

মাইতী কাঁসারিরা কাস্তিক মাসে অমাবস্তার পর প্রতিপদে তাঁহাদের কুলদেবতা কালীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

বোম্বাই-প্রদেশের কাঁসারিরা আপনাদিগকে কুর্জিবীর-বংশীয় সেনাপতি ফজিরের ঔরসোৎপন্ন ও ফজিয়াণীর গর্ভজাত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা তথাকার শূদ্রজাতি অপেক্ষা কুলেশীল ও মানে অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় মহাকাণীর উপাসক।

কাক (ক্রী) কু দ্বয়ং কং জন্মঃ, কোঃ কাদেশঃ। ১ জৈয়ং জল। ২ (কাকন্ত সমঃ) কাক সকল। ৩ সুরতবন্ধবিশেষ। [কাকপদ দেখ।] ৪ (গুং) কায়তে শব্দায়তে, কৈ-কন্ (ইপ্তীকোপাশল্যতিমর্জিত্যঃ কন্। উৎ ৩। ৪৩।) পক্ষি-বিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—করট, অরিষ্ট, বলিপুষ্ট, সক্রুৎপ্রজ, ধ্রাজ্জ, আশ্বঘোষ, পরভূৎ, বলিভূক্ত, বায়স, বাতজব, বল, দীর্ঘায়ু, সূচক, কৃষ্ণ, গ্রামীণ, গিগুন, কট-খাদক, দ্বিক, কাগ, কাণ, ধূলিজত্ব, নিমিত্তকৃৎ, কৌশিকারি, চিরায়ু, কুশল, খর, মহাশোল, চিরজীবী, চলাচল, করটক, নাগবীরক, গুটনৈখুন, লণ্টাক, শ্রাবক ও রতজর।

পৃথিবীর উত্তরাংশে সর্বত্রই প্রায় কাক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই কাক আছে। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার “কাক” “কাগু” “কাগা” “কাউয়া” “কেগো” প্রভৃতি নামে পরিচিত।

কাকের শ্রেণীবিভাগ নানাপ্রকার; তন্মধ্যে ভারতে ডোমকাক, দাঁড়কাক, পাতিকাক ও কড়িয়ালই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদেশিক শাস্ত্রন-শাস্ত্রবেত্তাগণের মতে কাক “করভিডি” (*Corvidae*) বিভাগের অন্তর্গত “করভিনি” (*Corvinæ*) শ্রেণীভুক্ত “করভাস” (*Corvus*) জাতীয়। “করভাস” জাতীয় পক্ষীর নাসারন্ধ্র টিক কপালের নীচে হয় না, উর্দ্ধ চক্ষুর প্রায় মধ্যস্থলে হয় এবং ১২১৪টি নাসা-লোমে (চক্ষুর পার্শ্বদ্বিগা চক্ষুর দিকে কতকগুলি তীক্ষ্ণ লোমের দ্বারা আকার-

বিশিষ্ট কোমল অথচ অল্প পালক হয় তদ্বারা) আবৃত, ইহাই এই জাতির বিশেষ চিহ্ন। এতদ্ভিন্ন চক্ষু দীর্ঘ, কঠিন, পুরু ও সরল; উর্দ্ধচক্ষুর উচ্চতা কিছু অধিক, ডানা ক্রমবৃদ্ধ, দীর্ঘ, প্রথম পর ছোট, কিন্তু ২য় পর ১ম অপেক্ষা বড়, ৩য় ও ৪র্থ পর সর্বাধিক বড় এবং ৫ম পর হইতে ক্রমশঃ ছোট। পুচ্ছ মধ্যবিধ; পুচ্ছের অগ্রভাগ কতকটা গোলাকার, পায়ের ডাঁটি দৃঢ়; ইহার গ্রন্থিগুলি সবল, পায়ের পাতা মধ্য-বিধ, কুজাঙ্গুলিই প্রায় সমান, নখ তীক্ষ্ণ ও খুব বক্র। ইহার শাখা প্রশাখার বসিতে পারে, আবার ভূমিতে ও চলিতে পারে।

১। পাতিকাক—বাঙ্গালার সাধারণত যে কাক দেখা যায়, তাহাকে বাঙ্গালীরা “কাগু” “কাউয়া” “কাগা” “কেগো” বলিয়া থাকে। পশ্চিম বাঙ্গালা ও উত্তরপ্রদেশে ইহাদিগকে “পাতি-কাউয়া” ও “দেশী কাউয়া” বলিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যেও এই কাক আছে; তৈলঙ্গীরা “মাকীকাকী”, তামিলেরা “নল্লকাক”, সিংহলীরা “করবীকাক” “কাকু” ও “প্রায়া” এবং মণিপুরীরা “নানকোয়াক” বলে। ইহাদের কপাল, মস্তক ও মুখমণ্ডল চিকণ-কৃষ্ণবর্ণ এবং বাড়, গলা, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও উদর পাংশু-বর্ণ; পুচ্ছ ও ডানা কৃষ্ণবর্ণ, গলদেশের পালক বিরল; কৃষ্ণ-বর্ণ পালকগুলিতে পিঙ্গল ও সবুজবর্ণের চিকণতা আছে। ইহার ১৫ হইতে ১৭১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়, পুচ্ছের পালক ৭ ইং, ডানা ১১ ইং, পায়ের ডাঁটি প্রায় ২ ইং। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মতে ইহার নাম “করভাস্ স্প্লেন্ডেন্স” (*C. Splendens*) অর্থাৎ “সাধারণ কাক;” ইংরাজেরা ইহাকে “ভারতীয় সাধারণ কাক” বলিয়া থাকেন। ইহাকে সংজ্ঞাচ্ছলে বাঙ্গালার “গ্রাম্যকাক” বলা যাইতে পারে। হিমালয়ের পাদমূল হইতে সিংহল পর্যন্ত সর্বত্রই এই কাক দেখা যায়। সিকিমে নাই। নেপাল ও কাশ্মীরে অল্প। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল-বায়ুর গুণে ইহাদের বর্ণব্যত্যয় হইয়া থাকে। সিদ্ধ, রাজ-পুতানা প্রভৃতি শুকপ্রদেশে ইহাদের ফিঁকা রঙের পালকগুলি প্রায় শাদা হইয়া থাকে, আর সিংহলদ্বীপে ও দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকূলে ঐ সকল পালক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

কাকের স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পর যে বিশেষ বন্ধুতা দেখা যায়, তাহা নহে। নগরে, গ্রামে ও বহুজনাকীর্ণ স্থানে ইহার অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করে। ঐ সকল স্থানের নিকটবর্তী কোন বৃহদ্বৃক্ষে ইহার প্রায় ১০০২০০ মিলিয়া রাজিবাগন করে। ইহার গর্ভিণী না হইলে কেহ বাসা বাঁধে না। ডিম পাড়িলে কেবল জীপুদ্বয় ছুইটাই বাগায় যায়। অল্প সকলে গাছে বসিয়াই রাজিবাগন করে। কাকেরা সন্ধ্যাকালে সূর্যাস্তের পরই কোন এক

বৃক্ষে বহুদূর এমন কি ১০২০ মাইল দূর হইতে আসিয়া দলবদ্ধ হইতে থাকে এবং রাত্রি ২৩ দণ্ড পর্য্যন্ত কে কোন ডালে বসিয়া ঘুমাইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য “কা কা” রবে দিক্ ভরিয়াদেয়। পরদিন প্রত্যুষেও আবার প্রায় ২ দণ্ড রাত্রি থাকিতে ঐরূপে ডাকিতে থাকে এবং ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায়, শেষে সূর্যোদয় হইলে আশ্রয় ভাগ করিয়া নানাদিকে উড়িয়া যায়। উড়িয়া যাইবার সময় ইহার ৩টি হইতে ৩০৪০টি পর্য্যন্ত একত্র এক একদিকে গমন করে। যাহারা বহুদূর আহারের চেষ্টায় যাইবে, তাহারাই সকাল সকাল যায়, আর যাহারা নিকটে চরিবে, তাহারাই গাছে বসিয়া অনেকক্ষণ পরস্পর আলাপ করিতে থাকে বা পালাকাদি সংঘত করিতে থাকে।

ইহার মনুষ্যের খাদ্যাবশেষ দ্বারাই প্রধানতঃ জীবিকা নির্বাহ করে। ইহার যে গ্রাম বা নগরের নিকট থাকে, তাহার কোন বাড়ীতে কখন খাদ্যাদি পাক হয়, কখন কে ভোজনাবশেষ বহির্দেশে নিক্ষেপ করে, তাহা বেশ জানে, এবং সময় বুঝিয়া ঠিক সেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়। সকলেই এ সকল জানে, কিন্তু সকলেই এক স্থানে উপস্থিত হয় না। কতকগুলি ঐরূপে লোকালয়ে ভ্রমণ করে, কতকগুলি নদীতীরে কাকড়া, ভেক, ক্ষুদ্র মৎস্য বা কীটাদি ধরিতে গমন করে, কতকগুলি মাঠে গিয়া গবাদির শরীরজাত কীটাদি, অথবা পক্ষ শস্যকণা খাইতে যায়, কতকগুলি কোণায় কোন মৃত অন্তর শরীর পড়িয়াছে তাহার অবশেষে গমন করে এবং কদলী, বট, আম ইত্যাদি বৃক্ষে ফল পাকিলেও তাহার উপর অনেকের দৃষ্টি পড়ে। বর্ষাকালে সন্ধ্যা বা সকালবেলা “বাদলাপোকা” উড়িলে ইহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না, ইহার দলে দলে আসিয়া সেই পোকা ধরিয়া খাইতে থাকে। গ্রীষ্মকালে ইহাদের অতি কষ্ট হয়। প্রতিদিন বেলা ৮।১০ ঘটিকা অতীত হইলেই ইহার ঐশ্রে কাতর হইয়া অট্টালিকার ছাদে বা বৃক্ষাদির ছায়ায় বসিয়া হাঁ করিয়া হাঁপাইতে থাকে, গৌর পড়িলে আবার ভ্রমণে বাহির হয়। প্রত্যহ চরিয়া আসিবার সময় ইহার পশ্চিমধ্যে দল গুণ করিতে করিতে আসিতে থাকে। ইহার চরিয়া ফিরিয়া আসিয়া একে একে গুচে, অট্টালিকার ছাদে বা ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিতে বসিয়া থাকে এবং যখন সেই স্থান দিয়া তাহাদের পরিচিত দল উড়িয়া বাসার দিকে যাইতে থাকে, তখন তাহারাও উড়িয়া গিয়া স্বদলে মিলিত হয়।

বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার ডিম পাড়ে। এক এক বড় বৃক্ষে বড় মোড় ৩টি কাক বাসা বাঁধে। কাটি-কুটা

দ্বিরাই ইহার বাসা বাঁধে, কিন্তু কলিকাতার মধ্যবর্তী কাকের বাসার টিনের টুকরা ও সোড়াওয়াটার-বোতলের তার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একেবারে ৪টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ঐযং সবুজবর্ণ ও তাহার গায়ে ধূসর বর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে। “কাগডিমী” রং দেখিতে বড় সুন্দর। কোকিলেরা নিজে বাসা বাঁধে না, তাহারাই এই কাকের বাসার ডিম পাড়িয়া রাখে, শেষে কোকিলশাবক ডাকিতে শিখিলে, কাকী ঠোঁকরাই বাসা হইতে তাড়িয়া দেয়। ঐখন্ডে এমনি মহিমা যে যতদিন কোকিলশাবক উড়িতে না পারে, ততদিন ডাকিতেও পারে না, সুতরাং কাকী বীর সন্তান-নির্কীর্ষে পালন করে। কাকেরা শাবককে অনেক দিন পরাস্ত আহার দিয়া থাকে।

কাক অতি দ্রুত উড়িতে পারে। ব্রাহ্মণচিল সময়ে সময়ে ইহাদের সুস্থিত আহার কাড়িয়া গাইবার জন্য তাড়া করে, তখন ইহার যেরূপ বেগে উড়িয়া পলাইতে থাকে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ইহার বড় চতুর ও বুদ্ধিমান। ইহাদের ধূর্ততা সঘন্যে যথেষ্ট গল্প প্রচলিত আছে। ইহারি এতদূর নির্ভীক যে, মানুষ ভোজন করিতেছে, নিকটে বিভ্রাল বসিয়া আছে, অথচ তাহা কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া আনালা দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্নপাত্র হইতেই অন্ন লইয়া উড়িয়া পলায়ন করে। ইহার লোকের সম্মুখ দিয়া লাফাইতে লাফাইতে ভূমির উপর চলিয়া যায়, বিন্দুমাত্র ভয় করে না। ইহাদের প্রতি কেহ যদি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলায়। ইহার বড়ই সন্দ্বিষ্টচিত্ত, সামান্য ভয়ের সন্তোষ থাকিলে সেদিকে বড় যায় না।

ইহার স্বজাতীয়ের মৃতদেহ দেখিলে বা বন্দকের শব্দ শুনিলে মহা কোলাহল করিয়া সেইস্থানে একত্র হয়। স্বজাতীয়ের কাহারও বিপদ ঘটিলে ইহার জড় হইয়া কোলাহলে সেই স্থান বিরক্তিকর করিয়া তুলে এবং যতক্ষণ তাহার কোন একটা শ্রেণ ফল দেখিতে না পায়, ততক্ষণ কেহ সে স্থান ত্যাগ করে না।

ইহার বড় পরিহাস-প্রিয়। দুই তিনটা কাক একত্র মিলিত হইয়া চিল, শকুনি বা অন্যান্য পক্ষীকে ঠোঁকরাইরা, তাহাদের লাজুল টানিয়া বিরক্ত করিয়া তুলে। তাহার বিরক্ত হইয়া উড়িয়া গেলে বা চীৎকার করিয়া উঠিলে, ইহার মহা আনন্দে “কা-কা” করিয়া উঠে। ঠিক ঐরূপে ইহার সিড়ালের মুখের আহারও কাড়িয়া লয়।

এই দ্রষ্ট কাক গরীবের বড় অনিষ্ট করে। ইহার সমস্ত

সময়ে তৃণ-চালে বা খোলার চালের খোলার মধ্যে খাদ্যাদি লুকাইয়া রাখে, শেষে আবশ্যকমত স্থান তিক করিতে না পারিয়া, চালের অধিকাংশ তৃণ টানিয়া ও খোলা উন্টাইয়া ফেলে।

ইহারা ফিঙ্গার সঙ্গ ভালবাসে না। ফিঙ্গা দেখিলেই কাক সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়, ফিঙ্গা ও পশ্চাতে পশ্চাতে উড়িতে থাকে। ইহাকেই ‘কাকের পিছনে ফিঙ্গা লাগা’ বলে।

হিন্দুর নবান্ন পর্বে এই কাকের বড় আদর দেখা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ “নবান্ন” লইয়া গৃহছাদে উঠিয়া কাকের আগমন প্রার্থনা করিতে থাকে, কিন্তু সে দিন ইহাদিগকে পাওয়া যায় হয়, কারণ প্রায় সর্বত্রই ইহারা জোজ্য পাইয়া তৃপ্ত থাকে। এই জন্য লোকে কথায় বলে যে, “নবান্নের কাক” অর্থাৎ ভূষাপ্য।

২। (ক) ডোমকাক—‘করভাস্’ জাতির মধ্যে ডোম-কাক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরাঞ্চলে ইহাদিগকে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধ, রাজপুতানা প্রভৃতি করেকস্থানে ইহারা গ্রীষ্মকালে থাকে না। শরতের প্রথমে ইহারা আসে ও বসন্তের পরেই আফগান-স্থান, কাশ্মীর প্রভৃতি শীতপ্রধান স্থানে চলিয়া যায়। হিমালয় পর্বতের ১৪০০০ ফুটের উর্কে ডোমকাক আছে; কিন্তু তন্নিম্নে পার্বত্য-প্রদেশে নাই। বাঙ্গালায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে যেরূপ ডোমকাক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের গাত্র গাঢ়নীলের আভাযুক্ত চিকণ কৃষ্ণবর্ণ; গলদেশের পালকগুলি দীর্ঘ ও বিরল; উপরের ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র, উর্দ্ধচক্ষুর উচ্চতা অধিক; ডানা দৈর্ঘ্য ১৫ ই:। দেহ দৈর্ঘ্য ২৫ হইতে ২৭ ই:। চক্ষুর উত্তরপার্শ্বে ঝাল, চক্ষু ও পদদ্বয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, উর্দ্ধচক্ষুর অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র। ইহাদিগকে হিন্দুস্থানীরা “হুদা” ও “ডোমকাগ্”, বাঙ্গালায় “ডোমকাগ্”, ইংরেজেরা “র্যাভেন,” স্বিডেরা “কর্ক্সি”, সুইডেন-বাসীরা “ক্রপ”, দিনেমারেরা “রওন”, জার্মানেরা “কোলক্রেড”, ফরাসীরা “করবোঁ”, ইতালীয়েরা “ক্রভো”, “ক্রবো” বা “ক্রভোগ্রোসো”, প্রাচীন রোমকেরা “করভাস্”, স্পেনীয়রা “এল্ কুইর্ভো”, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপবাসীরা “কঅকঅ-গিউ” এবং একুইমোর “তুলুআক” বলে। বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রে ইহার নাম করভাস্ কোরাক্স (Corvus Corax)।

হিমালয় ও যুরোপে যে ডোমকাক দেখা যায়, তাহারা বড় ভীত-স্বভাব, কখন লোকালয়ে আসিতে চাহে না, কিন্তু ভারতে অন্যান্যস্থানে যে সকল ডোমকাক আছে, তাহারা

পাতিকাকের ন্যায় নির্ভীক, ঘরে ঘুরারে ইচ্ছামত ব্যাভ্যাস্ত করে। ডোমকাকেরা কিন্তু বড় বন্দ-প্রিয়। ইহারা কলহ করিতে করিতে এতদূর উন্মত্ত হয় যে, উভয়ের মধ্যে একটা প্রায়ই মারা পড়ে। সিদ্ধপ্রদেশে প্রতি বৎসর শরৎকালে ইহারা যখন আসে, তখন প্রথম প্রথম ইহাদের অনেকগুলি মারা পড়ে দেখিয়া অনেকে অসুস্থমান করেন যে, ইহাদের স্বভাবমূলত বন্দপ্রিয়তাই এই মৃত্যুর কারণ। সিদ্ধপ্রদেশের ডোমকাকেরা জাগিত কণ্ঠস্বর ভিন্ন ঘণ্টাধ্বনির মত একপ্রকার শব্দ করিতে পারে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহারা কাটিকুটা দিয়া মাঠের মধ্যে বা বিরল জঙ্গলে বড় বড় বৃক্ষের মাথায় বাসা বাঁধে। ইহাদের ঠোঁট ডিম হয়। ইহারা প্রায় পোষ হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যেই ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখিতে সবুজের আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণ; ডিমের গাত্রে কৃষ্ণাধিক্য মেটে রঙ্গের, তরল বেগুনি রঙ্গের ও তরল সিন্দুরিয়া রঙ্গের দাগ থাকে।

(খ) ভোটদেশীয় ডোমকাক।—হিমালয়ের উর্দ্ধতমপ্রদেশে, কাশ্মীর ও কুমায়ুন রাজ্যে এবং তিব্বতদেশে একজাতীয় ডোমকাক আছে, তাহারা প্রায় দীর্ঘ ২৮ ই:; ডানা ১৯ ই: বড়, উর্দ্ধচক্ষুর গোড়ার উচ্চতা খুব বেশী, এবং তাহাদের পুচ্ছও দীর্ঘ হইয়া থাকে। অজ্ঞান্য অবয়ব সাধারণ ডোমকাকের মত। দুই চারিজন বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রবিৎ ইহাকে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণনা করেন ও “করভাস্ টিবেটেনাস্” (Corvus Tibetanus) অর্থাৎ ‘তিব্বতী ডোমকাক’ নামে অভিহিত করেন, কিন্তু সামান্য আকারের দীর্ঘতা ভিন্ন অন্য কোন বিশিষ্টতা নাই দেখিয়া অনেকেই ইহাকে সাধারণ শ্রেণী মধ্যে গণ্য করেন।

য়ুরোপীয় শাকুনতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ডোমকাক (র্যাভেন) মনুষ্যের কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর অনুকরণ করিতে পারে।

(গ) পাটলচূড়-ডোমকাক।—মধ্যপ্রদেশে আর একপ্রকার ডোমকাক দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের কপাল ও মস্তক পাটলাত পিঙ্গলবর্ণ ও কতকাংশে বেগুনি রঙ্গের চিকণতা আছে, পালকের মধ্যে উপরের স্তরের পালক চিকণ, কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্নস্তরের পালক পাটলাত পিঙ্গলবর্ণ; পিঙ্গলবর্ণের পালকগুলির প্রান্তভাগ রক্তাভ। চক্ষুপুট কাল, পদদ্বয় কাল। দৈর্ঘ্য ২২ ইঞ্চি। সিদ্ধপ্রদেশের যাকোবাবাদ ও লারখানার মরুভূমিতে ইহাদিগকে শীতকালে দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জাবের ডোমকাক (C. Corax) হইতে ইহাদের গাত্রবর্ণ ভিন্ন, আরও একটু পার্শ্বা আছে যে, ইহাদের গলদেশের

পালকগুলি ক্ষুদ্রাকার ও দেহ পরিমাণে ছোট। ইহাদিগের নাম “করভাস্ আম্ব্রিনাস্” (C. Umbrinus) অর্থাৎ ‘শাটলচূড়োমকাক’। ইহা ভারতের উত্তরপশ্চিমপ্রান্ত হইতে মিসরদেশ, এশিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ সকল দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। দাঁড়কাক—এইজাতীয় কাককে উত্তরভারতে “দাড়” বা “দাল কাউয়া” ও দক্ষিণে “ধেরি কাউয়া” বলে। যাহারা শীক্রে পক্ষী প্রতিপালন করিয়া তদ্বারা পক্ষী-শীকার করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই জাতীয় কাককে “কড়িয়াল কাক” বলে এবং ভৈলঙ্গীরা “কাকী”, ভামিলেরা “কাকী,” লেপ্‌চারী “উল্‌ক্-ফো,” ভুটানীরা “উল্‌ক্” এবং অনেক ভারতবাসী ইংরাজ ইহাদিগকেই “র্যাভেন” বলেন; কিন্তু বস্তুতঃ শাকুনতন্ত্রজ ইংরাজ পণ্ডিতেরা ইহাকে “ইণ্ডিয়ান কর্‌বী” (Indian Corby) বলিয়া থাকেন।

দাঁড়কাকের কয়েকটা শ্রেণী ভেদ আছে।—

(ক) ভারতীয় দাঁড়কাকগুলির আকার এইরূপ—সমস্ত শরীরের উপরিস্তরের পালকগুলি চিকণ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; নিম্নস্তরের পালক তত ঘোর বর্ণ নহে, পুচ্ছের পালক-সংস্থান জীবৎ গোলাকার, ডানা খুব দীর্ঘ, গ্রায় পুচ্ছের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, চক্ষুপুট সরল, উর্দ্ধচক্ষুর সম্মুখভাগ উচ্চ ও অগ্রভাগ বক্র, বাড় ও চক্ষুপার্শ্ববর্তের পালকে গ্রায় চিকণতা নাই এবং এই স্থানের পালক তুলার খুঁপির মত, তাহাতে পালকের ডাঁটি নাই। ইহাদের চোঁট, পা ও আঙ্গুল কৃষ্ণবর্ণ। এক একটি দৈর্ঘ্যে ১১ ইং, ডানা ১১ হইতে ১৪ ইং, পুচ্ছ ৭ ইং, পায়ের ডাঁটি ২ ইঞ্চির অধিক এবং চোঁট ২২ ইঞ্চি।

ইহাদিগকে ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে “করভাস্ ম্যাক্রো-হিঙ্কাস্” (C. macrorhynchus) বা “করভাস্ কালমিনেটাস্” (C. culminatus) বলে।—ইহারা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে বনে, জঙ্গলে, পর্বতে, লোকালয় প্রভৃতি সকল স্থানে বাস করে। পূর্ব-উপদ্বীপ ও ভারতীয় দ্বীপশ্রেণীতেও আছে। গ্রাম্যকাকের জায় ইহারা অগণ্য নহে, তবে অজ্ঞাত জাতীয় কাক অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা অধিক বটে। দক্ষিণাত্যে নীলগিরি পর্বতে ইহারা ই গ্রাম্যকাকের জায় অসংখ্য বাস করে। ইহারা লোকালয় অপেক্ষা বনে, জঙ্গলে অথবা পর্বতে থাকিতে ভালবাসে। ইহারা প্রধানতঃ মৃত জন্তর মাংসাদি আহার করে বলিয়া ইহাদিগকে ইংরাজেরা “কর্‌বী” বা “কেরিয়ন” অর্থাৎ ‘গলিত-মাংসভুক্’ বলেন। ইহারাও ডিম পাড়িবার সময় কোম জর্গম জঙ্গলের ভিত্তর একটি নিরুপজীব বৃক্ষে বাসা বাঁধে। বাসার শুষ্ক বাস, পাতা ও

লোম দিয়া কোমল ও উষ্ণ করে। একবারে ৩।৪টি ডিম হয়, ডিম ভরল সবুজবর্ণ ও গায়ে হৃদয়বর্ণের বিন্দু বিন্দু লাগ হয়। বৈশাখ হইতে প্রাষণ মাসের মধ্যে ডিম পাড়িবার সময়। ইহাদের বাসাতেও কোকিলে ডিম পাড়ে। ইহারা বড় অনিষ্টকারী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘোরগ, পারিয়ার ছানা ও চড়াই ধরিয়া লইয়া যায়, এমন কি ক্ষুদ্র ছাগ-শিশু পর্য্যন্ত ইহাদের চক্ষুপুটাবাতে মারা পড়ে। ইহারা অপর পক্ষীর বাসা বা ডিম নষ্ট করিতে দেখিলে ‘রাজকাক’ ইহাদিগকে ভাড়া করে। অনেক ইংরাজ ইহাদিগকে “জঙ্গলক্রো” (Jungle crow) অর্থাৎ বজ্রকাক বলিয়া থাকেন।

(খ) যুরোপীয় দাঁড়কাক বা “কেরিয়ন ক্রো” (Carriou crow) অর্থাৎ ‘গলিত মাংসভুক্ কাক’ দেখিতে ঠিক এদেশীয় দাঁড়কাকের জায়, কেবল গায়ে সর্ব্বত্রই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, গালের পালক নরম নহে। সর্ব্বশরীর চিকণ। পুচ্ছের পালক ৮ ইং, ডানা ১২ হইতে ১৪ ইং, এবং চোঁট গ্রায় ৩ ইং। ভারতবর্ষে ও কাশ্মীরে কেবল এই জাতীয় দাঁড়কাক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অজ্ঞা কোথাও নাই। এই জাতীয় পক্ষীর আদিম বাসস্থান সাইবিরিয়ার পূর্বাংশে ইনিসি নদী হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত। সেখান হইতে ইহারা দক্ষিণে কাশ্মীর ও পশ্চিমে ইংলও পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে বাস করে। ইহারা দল বাদিয়া বাস করে না। ইহাদিগকে ইংরাজী শাকুন শাস্ত্রে “করভাস্ কোরোন” (C. Corone) বলে।

(গ) কাশ্মীরে আর এক শ্রেণীর দাঁড়কাক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রমাণে দাঁড়কাক হইতে ক্ষুদ্র, গাত্র-বর্ণ অন্ধকারের মত কাল। ইহারা অতি দ্রুত উড়িতে পারে। চিলের সহিত ইহাদের বিষম বিবাহ। ইহারাও গলিত মাংস খাইয়া থাকে। কাশ্মীরে, সিমলা-প্রদেশে, ভূগসাই উপত্যকায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পার্শ্বাভ্যাস কাক নামে বিখ্যাত। ইংরাজী শাকুন শাস্ত্রমতে ইহাদিগকে দাঁড়কাক ও গ্রাম্যকাকের মধ্যবর্তী বলিয়া “করভাস্ ইন্টারমিডিয়াস্” (C. intermedius) বলে।

(ঘ) হৃদয়চক্ষু দাঁড়কাক—গাজবর্ণ বেগুনি মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ। মস্তক, বাড়, পৃষ্ঠ, উদর ও চক্ষের বর্ণ অপেক্ষাকৃত তুরল। কপাল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। দৈর্ঘ্যে ১৮ ইং, ডানা ১২ ইং, পুচ্ছ ৭ ইং, চক্ষুপুট লম্বে ২ ইং, মোটা পৌণে এক ইঞ্চি মাত্র। ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে ইহার নাম “করভাস্ টেনুইরোস্ট্রিস্” (C. tenuirostris)।

এতদ্ভিন্ন চীনদেশীয় “করভাস্ পেটোরালিস্” (C. pectoralis) ও বব্বীপের “করভাস্ এন্কা” (C. enca)

দাঁড়কাকজাতীর বটে। বনবীণের “করভাস্ একা” স্তম্ভে কাকের এক জাতীয়, কিন্তু ক্ষুদ্রাকার এবং চীনদেশীয় “পেক্টো-রালিস্” ভারতীয় দাঁড়কাক-জাতীয়।

৪। ব্রহ্মদেশীয় গ্রাম্যকাক—ইহাদের কপাল, মস্তক, চিবুক ও গলা চিকণ কৃষ্ণ। ষাড় ও চক্ষুপার্শ্ব তরল পিঙ্গলবর্ণ এবং কর্ণাবরক পালকগুলি ও নিয়মিত পালকগুলি পিঙ্গলাভ-মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ। ডানা, পুচ্ছ ও বাকি পালক চিকণ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের কৃষ্ণবর্ণ পালকগুলি হইতে বেগুনী ও সবুজবর্ণ-মিশ্রিত অর্থাৎ ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভা বাহির হয়। ইহাদের স্বভাবাদি ঐকি ভারতীয় গ্রাম্য-কাকের ন্যায়। সমস্ত ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণে মারভাই পর্যন্ত, পশ্চিমে আনাম হইতে মণিপুরের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত সমস্তদেশে এই কাকের বাস, অন্যত্র নাই। ইহাদের ব্রহ্মদেশীয় নাম “কীগান” এবং বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রমতে ইহাদিগকে “করভাস্ ইন্সোলেন্স” (C. insolens) বলে।

৫। ঝোটন কাক—ইহাদের মস্তকে কাকাতুরার ন্যায় ঝোটন আছে। ইহাদিগের মস্তক, ষাড়, গলা, বকের উর্দ্ধভাগ, ডানা, পুচ্ছ, এবং উরু চিকণ; অবশিষ্ট পালক গলায় বেলেমাটির ন্যায় ধূসরবর্ণ। উপরের পালকের কলম কৃষ্ণবর্ণ ও নীচের পালকের কলম পাটল। পা, ঠোঁট ও অঙ্গুলি কাল। দৈর্ঘ্য ১৯ ইং, পুচ্ছ ৭৫ ইং, ডানা ১২৫ ইং, পায়ের ডাঁটি ২ ইং ও ঠোঁট ২ ইং। ইহাদের ইংরাজী নাম হুডেড ক্রো (Hooded Crow) এবং ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রমতে নাম “করভাস্ কর্নিক্স” (C. Cornix)

ইহাদের ৩টা শ্রেণী আছে। এই ৩টা শ্রেণীর আকৃতিগত এত স্পষ্ট প্রভেদ যে দেখিলে স্পষ্টই চিনিয়া লইতে পারা যায়। বিস্তৃত ঝোটন কাক (True Corvus Cornix) পারস্তোপসাগরের উপকূল হইতে পশ্চিমে যুরোপ পর্যন্ত সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কৃষ্ণবর্ণের পালক ব্যতীত অন্য পালকগুলির বর্ণ পাংগল ধূসর। এই জাতীয় “করভাস্ কেপেলেনাস্” (C. Capellanus) পারস্তোপ-সাগরের তীরে ও মেসোপোটামিয়া প্রদেশে দেখা যায়। এই শ্রেণীর পালকের বর্ণ শাদা ও পালকের কলম কাল। আকার বর্ণাদির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শীতকালে ইহাদিগকে পড়াশের সর্দাপেক্ষা উত্তরপশ্চিমকোণে, হাজারা প্রদেশে ও পিলিচিট প্রান্তে দেখা যায়। গলিত-মাংসভূক্ত কাকের ন্যায় ইহাদের স্বভাবাদি; আবার ইহারা শতভূক্ত ও বটে এবং শত পাইবার আশায় ইহারা দলে দলে মাঠে ঘুরিয়া খণ্ডকাই; ভারতবর্ষে ইহারা বাসা বাঁধে না বা ডিম পাড়ে না।

সাইবিরিয়ার ইহারা গলিত মাংসভূক্ত শ্রেণীর সহিত সহবাসাদি করিয়া সম্ভান উৎপাদন করে। এই বর্ণগত কাক এদেশে দেখা যায় না।

৬। কাম্বোজ-প্রদেশে, পশ্চিম এশিয়ার এবং যুরোপে একপ্রকার দাঁড়কাক দেখা যায়; বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রমতে ইহারা তিন শ্রেণীভুক্ত। ইহাদিগের সমস্ত অবয়বের বর্ণ কাল; মস্তক, গলা, ষাড় ও নিম্নদেশের পালক নীলবর্ণের চিকণতা ও পাটলের আভাযুক্ত। ইহাদের পরিমাণ দাঁড়কাকেরই জায়, সামান্য ইতরবিশেষ আছে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে রক (Rook) ও ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে “কর-ভাস্ ফ্রুগাইলিগাস্” (C. Frugilegus) বলে। ইহাদের শাবক ৫ মাসের হইলে তাহাদের নাসা-লোম (Nasal bristles) পড়িয়া যায় ও তাহার দুইমাস পরেই তাহাদের মুখের সম্মুখভাগে অর্থাৎ ঠোঁটের মূলে কিছুমাত্র পালক থাকে না। এই কাক ভারতবর্ষে বাসা বা সম্ভানোৎপাদন করে না। ইহারা প্রধানতঃ শতভোজী, চরিবার জন্য দলে দলে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং খাল বিল ও জলাশয়ে কীটাদি ধরিয়া খায়।

৭। কাম্বোজে আরও এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার দাঁড়কাক দেখা যায়, ইহাদিগকে ক্ষুদ্রকৃষ্ণ দাঁড়কাক বলা যায়। ইহাদের মস্তক ও কপাল চিকণ ও কৃষ্ণাৰ্ণ, ষাড় গাঢ় ধূসরবর্ণ, মস্তকের পার্শ্ব ও গলা তরল ধূসর বর্ণ, অর্ধেক গলায় প্রায় খেতবর্ণের কাঁটি আছে। উপরের ত্বরে পালক ও পুচ্ছ সূচিকণ নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, পালকের কলম ধূসর, গলায় নিম্ন-ভাগ কৃষ্ণবর্ণ, অস্ত্রাঙ্গ পালক ও ঝোটের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। দীর্ঘতা ১৩ ইং, পুচ্ছ ৫৫ ইং, ডানা ৯ ইং, পায়ের ডাঁটি ১৫ ইং, ও ঠোঁট ১৫ ইং মাত্র। ইংরাজীতে ইহাদিগকে “জ্যাক ড” (Jackdaw) ও ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রমতে “করভাস্ মনিডিউলা” (C. monedula) বলে। ভারতের মধ্যে কাম্বোজ ও উত্তর-পূর্বাঙ্গে ইহাদিগকে দেখা যায়। শীতকালে আশালা প্রদেশে পক্ষতের নিকটেও ইহাদের দেখা যায়। ইহারা কাম্বোজে পুরাতন অট্টালিকা ও লুকাদিতে বাসা বাঁধিয়া বাস করে। ইহারা ৪ হইতে ৬টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে।

৮। খেতকাক—কাকের ন্যায় অবিকল আকারের একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহার সমস্ত পালক কাকাতুরার ন্যায় শাদা। পদব্রজ ও ঠোঁট এবং চক্ষু ও কাকাতুরার ন্যায়। ইহাদিগকে খেতকাক বলে।

কাক সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশে কয়েকটি প্রবাদ আছে—

(১) ইহারা এক ঢকে দেখিলে গরি না, কারণ মাক

সীতা একদিন বনে বেড়াইতেছিলেন। ইন্দ্রপুত্র সীতার রূপ দেখিয়া মোহিত হন এবং কাকরূপে সীতার বক্ষ বসন আকর্ষণ করেন। নখাঘাতে সীতার স্তনে রক্তপাত হয়। রাম দেখিয়া বাণ ত্যাগ করেন। বাণ কাকের চক্ষুতে লাগে। তদবধি কাকেরা একটি চক্ষুর দৃষ্টি হারাইয়াছে। (রঘুবংশ, ১২।২২-২৩) এ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

“দয়ার সাগর রাম না মারেন পাখী।

তাক্রবানে বিধিলেন তার এক আঁখি।”

(২) যদি কোন গৃহস্থের ছাদে বসিয়া একটা কাক আর একটা কাকের গাত্রকীট বাছিয়া দেয় ও মাথার পালক সংযত করিয়া দেয়, আর যদি কোন মধবা পুত্র-সন্তাবিতা বধু বা কন্যা তাহা দর্শন করে, তবে গৃহিণীরা স্থির করেন যে সেই মাসের ঋতুমানের পরই সে কামিনী গর্ভিনী হইবে।

(৩) কাকের পালক স্পর্শ করিলে পূর্কধর্ম বিনষ্ট হয়। অনেকে এই বিশ্বাসে কাকের পালক ছুঁইলে সবস্ত্র স্নান করিয়া থাকেন।

(৪) কাক ঝড় ব্যতীত মরে না। “কাক মরে ঝড়ে, বিড়াল বলে আমার শাপ কল্যাণ হাড়ে হাড়ে।” (এই শাপটা কি বা তাহার ইতিহাস আছে কিনা জানা যায় নাই।)

(৫) কাক যখন প্রভাত্রে উঠিয়া ডাকিতে থাকে ও ইতস্ততঃ উড়িতে থাকে অথচ আহার গ্রহণ করে নাই তখন শুভোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলে মঙ্গল হয়। ডাকের বচনে আছে—“উঠে পড়ে খায় না, তখন কেন যায় না।”

(৬) কাক নাগিত শিয়াল।

এই তিন চতুরাল ॥

(৭) পক্ষী জাতির মধ্যে কাক চণ্ডালজাতীয়। ইহারা শবদেহ পরিষ্কার করে। কেহ কেহ আবার ইহাকে ব্রাহ্মণ জাতীয়ও বলে।

(৮) কাকমাংস তিত্ত, কোন পশুপক্ষীর খাদ্য নহে। লোকে স্বার্থপরতার তুলনায় বলে, “কাক সকলের মাংস খায়, কিন্তু তার মাংস কেহ খাইতে পায় না।” [কাকচরিত্র দেখ।]

মদনপালের মতে ইহার মাংস গুণ—লঘু, অম্লদীপক, বৃংহণ, বলকারক, আয়ু ও চক্ষুর হিতকর এবং ক্ষত ও ক্ষয়রোগ-নাশক।

৫ এক কড়ার চতুর্থাংশ। ৬ বীপবিশেষ। ৭ তিলক-বিশেষ। ৮ শিরোহবক্ষালন। ৯ (জি) কুংসিতভাবে গমনকারী, ধৌড়া। ১০ অতি দৃষ্ট।

কাককল্প (জি) কাকপ্রিয়া কল্প: মধ্যলো। দান্তবিশেষ। চীনা। (চীনকল্প কাককল্প: হেম ৪।২৪৪।)

কাককলা (জী) কাককলা অবয়ব ইব অবয়বো যতঃ, মধ্যলো। কাককলা।

কাকদ্বী (জী) কাকঃ হস্তি, কাক-হনু-ট-ডীপ্। মহাকরজ।

কাকচরিত্র (জী) কাকস্ত চরিত্রং বর্ণিতং বয়ঃ, বহুবী। শাকুনশাস্ত্রের অংশবিশেষ; ইহাতে কাকের চেষ্টাদি ও শব্দ-বিশেষ দ্বারা কিরূপে লাভালাভ জানিতে পারা যায়, তাহারই উল্লেখ লিখিত আছে। বসন্তরাজ প্রণীত শাকুনশাস্ত্রে ইহার মত লিখিত হইয়াছে। তাহা এই—

“কাক পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজ; বর্ণ ও বয়স দ্বারা ঐরূপ ভেদ বুঝিয়া লইতে হয়। যে সকল কাক পরিমাণে বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও বৃহৎ মস্তকযুক্ত এবং বাহাদিগের স্বর গম্ভীর, তাহার বিপ্রজাতি। বাহাদের মিশ্রবর্ণ, পিঙ্গল অথবা নীলচক্ষু, তীক্ষ্ণরব এবং অতিশয় বল আছে, তাহার ক্ষত্রিয় জাতি। বাহাদের বর্ণ পাণ্ডু বা নীল, চক্ষু খেঁত বা নীল, শব্দ অন্ন ক্ষত, তাহার বৈশ্যজাতি। বাহাদের বর্ণ ভস্মের জায়, শরীর রূপ, শব্দ অধিকাংশ ককারযুক্ত, স্বভাব চঞ্চল, তাহার শূদ্রজাতি এবং বাহাদের মুখদেশ রূক্ষ, হৃদয় ও পাতলা, স্বল্পদেশ দীপ্তিবিশিষ্ট, শব্দ ও বুদ্ধিবৃত্তি স্থির, আশঙ্কা অল্প, তাহার অন্ত্যজ। জ্ঞোণনামক কৃষ্ণবর্ণ বিপ্র-কাক (দাঁড়কাক) শ্রেষ্ঠ, অভাবে বাহাদের কণ্ঠদেশ শ্রামবর্ণ, তাহাদিগের লক্ষণাদি দেখিবে। অদ্বৈত দর্শন বলিয়া খেত-কাক গ্রাহ্য নহে। বিপ্রকাকের নিকট প্রাণ করিলে, তাহার পরিষ্কার উত্তর দেয়। ক্ষত্রিয়কাক তাহা অপেক্ষা অল্প। বৈশ্যকাক অমিবাগন পাইলে এবং শূদ্রকাক পূজা পাইলে উত্তর দেয়। কিন্তু অন্ত্যজকাক সর্বদাই সমস্ত প্রাণের উত্তর দিয়া থাকে। এই পাঁচ প্রকার কাকের শব্দ দ্বারা যথাক্রমে তৎক্ষণাৎ, তিনদিন ও সপ্তাহ বা একপক্ষ অন্তরে ফল পাওয়া যায়।

“শাস্ত্র ও প্রদীপ্তভাবে শব্দ করিলে তাহা শুভপ্রদ, কিন্তু রোক্তবস্তুর শব্দ করিলে তাহা প্রশস্ত নহে। সর্বত্র মধুর শব্দই প্রশস্ত। প্রদীপ্তভাবে অথচ পক্ষবস্তুর শব্দ করিলে কার্য নিশ্চয় হইলেও পুনর্বার তাহা বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রদীপ্ত অথচ শাস্ত্রভাবে শব্দ করিলে, তাহা দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয়। শাস্ত্র ও প্রদীপ্তভাবে বাহিরে একবার শব্দ করিয়া ভিতরে প্রবেশিত হইয়াও যদি পুনর্বার সেইরূপ শব্দ করে, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় বিনষ্ট হইয়া কার্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমে দীপ্ত শব্দ করিয়া পরে শাস্ত্র শব্দ করিলে কার্য নষ্ট হইয়া দ্বিতীয়বারে সিদ্ধ হয়।

“স্বর্ঘ্যোদয়ের সময় পূর্বদিকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া

সমুখভাবে শব্দ করিলে শত্রুনাশ, চিহ্নিত কার্যের সিদ্ধি এবং জী ও রত্ন লাভ হয়। অগ্নিকোণে বসিয়া শব্দ করিলে, শত্রুনাশ, ভয়নাশ ও জীলাভ হয়। দক্ষিণদিকে পক্ষ্ম স্বরে শব্দ করিলে অতি দুঃখ, রোগ বা মৃত্যু; কিন্তু মধুরস্বরে শব্দ করিলে কার্যাসিদ্ধি ও জীলাভ হয়। নৈঋতদিকে সহসা শব্দ করিলে ক্ষুরকার্য সংঘটন, দূত্যাগমন ও কার্যের মধ্যমসিদ্ধি ঘটে। পশ্চিমদিকে শব্দ করিলে বৃষ্টি হয়; জী, বজ্র ও রাজ-পুরুষ আগমন করে এবং জীও সহিত কলহ হইয়া থাকে। বায়ুকোণে শব্দ করিলে বাহ্যিক বজ্র, অন্ন ও ধান লাভ হয়; কিন্তু পূর্বের বৃষ্টি বিনষ্ট হয় এবং অতিথির আগমন ও স্বদেশ হইতে নিজের বিদেশ গমন হইয়া থাকে। উত্তরদিকে শব্দ করিলে দুঃখ, সর্পভয়, দরিদ্রতা, ধননাশ ও প্রিয়ব্যক্তি লাভ হয়। ঈশানদিকে শব্দ করিলে জী ও অন্ত্যজাতি আগমন করে এবং রোগের কারণ উৎপত্তি, প্রিয় বজ্রলাভ ও গীড়ার আধিক্য থাকিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। ব্রহ্মপ্রদেশে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে মধুর স্বরে শব্দ করিলে, বাহ্যিক অর্থলাভ, প্রভুর অমুগ্রহ ও ধন লাভ হয়।

“প্রথম প্রহরের সময় পূর্বদিকে কাক ডাকিলে চিহ্নিত কার্যের সিদ্ধি, অতীত ব্যক্তির আগমন ও বিনষ্ট বিষয়ের লাভ হইয়া থাকে। অগ্নিকোণে ডাকিলে জীলাভ ও শত্রুনাশ হয়। দক্ষিণদিকে ডাকিলে জীলাভ, সুখলাভ ও প্রিয়সঙ্গ লাভ হয়। নৈঋতদিকে ডাকিলে প্রিয়পত্নী, মিষ্টান্ন ও চিহ্নিত বিষয়ের সিদ্ধি লাভ হয়। পশ্চিমে ডাকিলে পূজ্যজনের আগমন ও বৃষ্টি হয়। বায়ুকোণে ডাকিলে শুভ, রাজপ্রসাদ ও পথিক দর্শন হয়। উত্তরে ডাকিলে ভয়, চোর ও শোক-সংবাদ, অথবা মনোরম সংবাদ ও ধনলাভের সংবাদ আসিয়া থাকে। ঈশানকোণে ডাকিলে প্রিয়ব্যক্তির সহিত আলাপ, অগ্নিভয় ও বহুলোকের সঙ্গ হয়। ব্রহ্মদেশে ডাকিলে সুখ ও কামভোগ, সম্মান, সম্পদ, ধন ও সিদ্ধি লাভ হয়।

“দ্বিতীয় প্রহরে পূর্বদিকে কাকের শব্দ হইলে কোন পথিকের আগমন, চোরভয়, ব্যাকুলতা ও অতিশয় শঙ্কা; অগ্নিকোণে কলহ, প্রিয়ব্যক্তির আগমন-সংবাদ ও জীলাভ; দক্ষিণে বৃষ্টি, অতিশয় ভয় ও প্রিয়ব্যক্তির সমাগম; নৈঋতে প্রাণভয়, জী ও ভোজ্যলাভ এবং যাবতীয় রোগনাশ; পশ্চিমে জীলাভ, জীর আগমন, সম্পদবৃদ্ধি ও কুবর্ষণ; বায়ুকোণে ধ্বজ ও চোর সঙ্গ, দূতের আগমন এবং জী, মাংস ও অন্নলাভ; উত্তরে রম্য রব করিলে অগ্নি ও ইষ্ট ব্যক্তির আগমন এবং জয়লাভ; অরম্য রব করিলে চোরভয়; ঈশানে রুদ্ধ শব্দ করিলে চোরভয়, অগ্নিভয় ও বিরুদ্ধ বাক্য অরুদ্ধ হইলে

শত্রুর আগমন ও জয়লাভ; ব্রহ্মপ্রদেশে সুশব্দ করিলে রাজপ্রসাদ ও মিষ্টান্ন লাভ এবং কুশব্দ করিলে চোরভয় হইয়া থাকে।

“তৃতীয় প্রহরে পূর্বদিকে রুদ্ধ শব্দ করিলে সম্পদ বৃদ্ধি ও চোরভয় হয় এবং রম্য শব্দ করিলে রাজার আগমন, জয়লাভ ও কার্যাসিদ্ধি হয়। এইরূপ অগ্নিকোণে বিরুদ্ধ শব্দে অগ্নিভয়, কলহ, বিরুদ্ধ সংবাদ ও যাত্রার বিফলতা, বিপদ শব্দে জয়াদি সংবাদ; দক্ষিণ দিকে শীঘ্রই রোগোদ্ভব, আশু-ব্যক্তির আগমন ও ক্ষুদ্র কার্যের সিদ্ধি; নৈঋত দিকে মেঘাগম, মিষ্টান্নলাভ, শত্রুনাশ, শূঙ্গের আগমন, প্রভুর বিরুদ্ধ সংবাদ ও যাত্রার কার্যনাশ; পশ্চিমে নষ্টধন লাভ, দূরপথে গমন, সুহৃদ্ব্যক্তির আগমন, জীলাভ, অতীত জয়াদির সংবাদ ও যাত্রার কার্যাসিদ্ধি; বায়ুকোণে দুর্দিন বার্তা, অশক্ত বস্তুর লাভ, সন্তোষকর সংবাদ, উত্তম জীলাভ ও যাত্রা; উত্তর দিকে কার্যাসিদ্ধি, অর্থলাভ, ভোজ্যবৃদ্ধির জন্য শুভসংবাদ, গমন ও বৈশ্ব-সমাগম; ঈশানদিকে সুশব্দে ভোজ্য ও জয়লাভ, কুশব্দে হানি ও কলহ এবং ব্রহ্মদিকে শব্দ করিলে তিলতণ্ডুল ও তাহ্মল্যুক্ত ভোজ্য লাভ হইয়া থাকে।

“চতুর্থ প্রহরে পূর্বদিকে অর্থলাভ, রাজপুজা, ভয়, সম্পদ বৃদ্ধি ও রোগ; অগ্নিকোণে ভয়, রোগ, মৃত্যু ও শিষ্টাগম; দক্ষিণদিকে তন্দ্রা ও শত্রুভয়, শিষ্টজনের আগমন, রোগ ও মৃত্যু; নৈঋতে অতি বৃদ্ধি, অতীতসিদ্ধি ও পথে চোরের সহিত যুদ্ধ; পশ্চিমে ব্রাহ্মণের আগমন, অর্থলাভ, জী ও জয়লাভ, বৃষ্টি, যাত্রার সিদ্ধি এবং রাজপ্রসাদ; বায়ুকোণে প্রিয়জীর আগমন, সপ্তাহ মধ্যে প্রবাস এবং সত্তর প্রত্যাগমন; উত্তরে পথিকের আগমন, তাহ্মল্যলাভ, কুণ্ডল সংবাদ, বৈশ্ব হইতে ধনলাভ, অশ্বাদি আরোহণ এবং যাত্রা বিরুদ্ধ অন্য রোগীর মৃত্যু; ঈশানদিকে স্বর্ণের সংবাদ ও রোগনাশ এবং ব্রহ্মদিকে শব্দ করিলে মধ্যম বার্তা ও মধ্যমসিদ্ধি হয়।

“দিক্ ও প্রহরাদি অনুসারে যে সকল শুভাশুভ বিশিষ্ট ভাবে কথিত হইল, তন্মধ্যে দীপ্তশব্দ অশুভ ও শাস্ত্রশব্দ শুভকর বলিয়া জানিবে; অথচ দীপ্তদিকের রব শাস্ত্রদিকে প্রসারিত হইলে অধিক ফলপ্রদ; দীপ্তদিকে অবস্থিত হইয়া দীপ্তদিক্ দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে তাহা ছুট; দীপ্তদিকে থাকিয়া প্রদীপ্ত দিক্ দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে তাহাও ছুট; দীপ্তদিকে থাকিয়া প্রাশস্ত দিক্ সমুখ করিয়া শব্দ করিলে তুচ্ছ ও ছুট ফলপ্রদ; শাখায় বসিয়া শাস্ত্রদিক্ দেখিতে দেখিতে রুদ্ধ শব্দ করিলে অন্ন অনিষ্ট; শাস্ত্রদিকে থাকিয়া প্রদীপ্ত দিক্ দেখিতে দেখিতে শাস্ত্রস্বরে শব্দ করিলে অন্ন

অভীষ্টপ্রদ এবং শান্তিদৈব থাকিয়া দৌণ্ডিক দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে শীঘ্র অভীষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। এইরূপে অল্পব্যয় কাকসমূহের আকার, চেষ্ঠা ও রব বিভাগ করিয়া দিবারাজে চারি প্রহর অজুযায়ী শুভাশুভ নিরূপণ করিবেন।

“কাল ও স্থানবিশেষে কাকের বাসা নির্মাণ দেখিয়াও শুভাশুভ নিরূপিত হয়।

বৈশাখ মাসে নিরুপজব বৃক্ষে বাসা নির্মাণ করিলে দেশের অঙ্গল এবং কুৎসিত, শুষ্ক বা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে বাসা নির্মাণ করিলে দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। প্রশস্ত বৃক্ষের পূর্ব শাখায় বাসা করিলে বৃষ্টি, শকুনপ্রাসাদ, নীরোগ ও বিজয়; অগ্নিকোণের শাখায় বৃষ্টি, ভয়, কলহ বা পাপ, দুর্ভিক্ষ ও শত্রু দ্বারা দেশনাশ এবং পশ্চাদিগের পীড়া; দক্ষিণশাখায় অন্ন বৃষ্টিপাত, অন্ননাশ ও শত্রুরিরোধ; নৈঋত শাখায় বাসা করিলে বর্ষাকালে অন্নবৃষ্টি, মনুষ্যের রোগ, শত্রু ও চোরভয়, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ; পশ্চিমশাখায় বৃষ্টি, নীরোগ, মঙ্গল, সুভিক্ষ, সম্পদ ও আনন্দ; বায়ুকোণস্থ শাখায় অত্যন্ত বায়ু অর্থাৎ ঝটিকাদি, অন্নবৃষ্টি, মূষিকের উপদ্রব, শত্রুনাশ ও দুই পক্ষে মহাবিরোধ; উত্তর শাখায় বাসা করিলে বর্ষাকালে পরিমিত বৃষ্টি, মঙ্গল, সুভিক্ষ, সুখ, নীরোগ, সম্পদ বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি; ঈশানদিকস্থ শাখায় অন্নবৃষ্টি, শত্রুবৃদ্ধি, প্রজাদিগের উৎসর্গ, বান্ধবদিগের কলহ-প্রবৃত্তি এবং লোকসকল মর্যাদাশূন্য হইয়া থাকে। বৃক্ষের অগ্রভাগে বাসা করিলে অত্যন্ত বর্ষণ; মধ্যদেশে করিলে মধ্যমরূপে বৃষ্টি এবং নিম্নদেশে করিলে একেবারে অনাবৃষ্টি হয়। ভূমিতে কুলায় করিলে অবৃষ্টি ও রোগাদি ভয়ের বৃদ্ধি; শুষ্ক বৃক্ষে বাসা বাঁধিলে দাঙ্গা অর্থাৎ লাঠালাঠি ও অন্ননাশ; প্রাচীরের মধ্যে প্রভূত ভয়, নিম্নপ্রদেশে, তরু কোটরে, বন্ধীক রন্ধে ও লতায় বাসা করিলে পীড়া, অবৃষ্টি ও দেশ নিয়মশূন্য হয়।

“কাকের অণুপ্রসবায়ুসারে শুভাশুভ নির্ণয় করা যায়।—একটি অণুপ্রসব করিলে তাহাকে বান্ধন, দুইটি করিলে অগ্নি, তিনটি করিলে বায়ু ও চারিটি করিলে ঐন্দ্র বলিয়া থাকে। বান্ধন অণুপ্রসবে পৃথিবী শতপূর্ণা হয়, অগ্নি-অণুপ্রসবে মন্ববর্ষণ হয় ও রোগিত বীজের অজুর হয় না; বায়ু-অণুপ্রসবে শত্রু উৎপন্ন হইলেও তাহা শুষ্ক, শলভ প্রভৃতি কীটগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলে এবং ঐন্দ্র-অণুপ্রসব করিলে পৃথিবীতে মঙ্গল, সুভিক্ষ, সুখ ও কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

“কাকের শব্দ চেষ্ঠাদি অনুসারে রাজাকালীন শুভাশুভ নির্ণয়।—প্রবাসী রাজ্যকালে কাকদিগকে দধি ও অন্নযুক্ত পুঞ্জ প্রদান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক নমস্কার করিবে।—

মন্ত্র।—ভূজ্ঞে বলিং পক্ষিষু মন্ত্রপুতঃ

স্বং প্রাণিষু প্রাণিষি বর্ষণকন্ম।

শুভেন চ জীং তজসে নমোহস্ত

ভুত্যাং খগেজ্যায় সন্তুং প্রজায় ॥

নমস্কারের পর দ্বীয় কার্য্য স্মরণ করিয়া তাহার সিদ্ধি-কামনায় কাক দর্শন করিতে হইবে। কাক যদি সেই সময়ে বামদিকে মধুর শব্দ করিয়া দক্ষিণদিক দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে সর্বার্থসিদ্ধি ও প্রত্যাগমন হইয়া থাকে। সেই কাক যদি পুনর্বার বামদিক দিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যাগত হয়, তবে অভীষ্ট কার্য্যের সিদ্ধি, মঙ্গল ও শত্রু প্রত্যাগমন হয়। বামদিকে অল্পলোম অর্থাৎ উপর হইতে নীচে আসিবার সময় মধুর রব করিলে প্রয়োজন সিদ্ধি; বাম ও দক্ষিণ উভয়দিকে ঐরূপ শব্দ করিলে কার্য্যের সিদ্ধি অসিদ্ধি উভয়ই হইয়া থাকে, অর্থাৎ কার্য্যসমূহের মধ্যে কতক কার্য্যের সিদ্ধি এবং কতকগুলির অসিদ্ধি ঘটে। পৃষ্ঠদেশে মধুর শব্দ করিতে করিতে অল্পগমন করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। শব্দ করিতে করিতে অগ্রে যাইলে, উপস্থিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ করিলে, অথবা পদ দ্বারা মাথা চুলকাইলে অভীষ্টসিদ্ধি হয়। হাতী বাঁধিবার ধামে বসিয়া শব্দ করিলে হস্তীলাভ, হস্তীর উপরে রাজত্ব, অশ্বে বাহন ও ভূমি-লাভ, ধ্বজে বিজয়, কূপে নষ্ট বস্ত্র ও জয়লাভ, নদীতীরে কার্য্য-সিদ্ধি, পূর্ণ ঘটে ধনলাভ; প্রাসাদ, ধান্যরাশি, হর্য্যাপৃষ্ঠ, শত্রু-পূর্ণ ও তৃণপূর্ণ ভূমিতে বসিয়া শব্দ করিলে ধনলাভ এবং যুগ্ম-শব্দ করিলেও ধনলাভ হয়। পৃষ্ঠদেশে বা সম্মুখে গোময়ের উপরে বসিয়া অথবা বটাদি বৃক্ষে বসিয়া বিষ্টাপূর্ণ মুখে শব্দ করিলে অভিলষিত ভোজন পান লাভ হয় এবং অন্নাদি, বিষ্ঠা, ফল, মূল, পুষ্প বা মৎস্যপূর্ণ মুখ দেখিলেও মিষ্টান্নভোজন হয়। নারী-শিরস্থ পূর্ণঘটে বসিয়া শব্দ করিলে স্ত্রী ও ধনলাভ, শয্যার উপরে বসিয়া শব্দ করিলে সুজন সমাগম হইয়া থাকে। সম্মুখে গোপৃষ্ঠ, বৃক্ষ, দুর্গা বা গোময়ে চক্ষু ঘর্ষণ করিতেছে, অথবা অন্যকে আহ্বান দিতেছে, ঐরূপ অবস্থা দেখিতে পাইলে বিচিত্র ভোজ্য লাভ হয়। ধান্য, যব, দধি বা ঘৃত দেখিয়া শব্দ করিলে ধন লাভ, মুখে কাঁচা তৃণ লইয়া সম্মুখে দেখা দিলে লাভ; মনোরম অজুর, পত্র, পুষ্প, ফুল ও ছায়াযুক্ত বৃক্ষে শব্দ করিলে কার্য্যসিদ্ধি; বৃক্ষের শিখরদেশে প্রাসক্তভাবে শব্দ করিলে জীসল, খাজানি রাশিতে শব্দ করিলে অন্নলাভ, গো-পৃষ্ঠে গো ও জীলাভ, হস্তিশিষ্ঠ-পৃষ্ঠে মঙ্গল, গর্দভের পৃষ্ঠে শত্রুভয় ও বধ, শূকরপৃষ্ঠে বধ, ঘন পক্ষ্মযুক্ত শূকরপৃষ্ঠে ধন লাভ, কহিব

পৃষ্ঠে সদোজ্ঞর, মৃতশরীরে মূর্তা, শূন্যকলসে কার্যক্ষতি ও কাষ্ঠে কলহ হয়। দক্ষিণদিকে শব্দ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইলে, সন্মুখ দিয়া আসিলে, অথবা পশ্চাৎদিকে শব্দ করিতে করিতে বিপরীতভাবে গমন করিলে রক্তপাত হইয়া থাকে। বাম ও দক্ষিণ ক্রমে উভয়দিকে শব্দ করিলে অনর্থ, বামদিকে বিপরীতভাবে গমন করিলে বিষ, পশ্চাৎদিক হইতে শব্দ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলে রক্তপাত, লতাদি লইয়া প্রাদক্ষিণ করিলে সর্পভয়, গো-পুচ্ছ ও বন্দীক উপরে বসিয়া শব্দ করিলে সর্পদর্শন, অঙ্গার, চিতা ও অস্থির উপরে বসিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু, কর চর্ষণ করিয়া শব্দ করিলে হানি ও গীড়া, পৃষ্ঠদেশে নিষ্ঠুর শব্দ করিলে মৃত্যু, শূন্যমুখ প্রসারিত করিয়া থাকিলে অমঙ্গল, পরাধ্বু হইয়া থাকিলে রক্তপাত বা মৃত্যুভয়, চক্ষু বা অস্থি ভঙ্গ হইলে অস্থিভঙ্গ বা বন্ধন, পরস্পর যুদ্ধ করিলে বধ; পরাধ্বু হইয়া শুষ্ক বৃক্ষে থাকিলেও রোগ, তিস্তবৃক্ষে কলহ ও কার্য্য নাশ, কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে পক্ষবয় কাঁপাইয়া রক্ত শব্দ করিলে মৃত্যু, ভগ্নশাখার বধ, লতাবেষ্টিত থাকিলে বন্ধন, কণ্টকযুক্ত রম্যবৃক্ষে কলহ ও কার্য্যক্ষতি, আচ্ছন্নবৃক্ষে রক্তপাত; বিষ্ঠা, আবর্জনা, মৃত্তিকা, তৃণ, কাষ্ঠ, কূপ ও ভস্মাদিতে কার্য্যনাশ হইয়া থাকে। কাকমুখে লত, রজু, কেশ, শুক কাষ্ঠ, চন্দ্র, অস্থি, জীর্ণবস্ত্র, বন্ধন, অঙ্গার, রক্তোৎপল ও খোলা দেখিতে পাইলে পুণ্যক্ষয়, পাপ সমাগম, এবং পথে ও আলয়ে মহৎভয়, রোগোৎপত্তি, বন্ধন, বধ ও সর্ধনাপহরণ প্রভৃতি ঘটয়া থাকে। উর্দ্ধমুখ হইয়া চঞ্চল গন্ধে কর্ণশ শব্দ করিলে মৃত্যু, এক পা সঙ্কুচিত করিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দীপ্ত স্বরে শব্দ করিলে অথবা কাষ্ঠাদি কুটিত করিলে যুদ্ধাদিতে অনর্থ, চক্ষুদ্বারা পুচ্ছদেশ কণ্ডূয়ন করিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু, এক পায়ে উপবিষ্ট থাকিলে বন্ধন, যাত্রাকারীর মস্তকে বিষ্ঠা বা গোময় নিক্ষেপ করিলে বন্ধন, অস্থি-নিক্ষেপ করিলে মৃত্যু, উর্দ্ধদিকে শব্দ করিলে জ্বীদোষ; মহুয়া, হস্তী বা অশ্ব মস্তকে বসিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু এবং নদীতীরে বা বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণশ শব্দ করিলে ব্যাভ্রভয় ঘটে। পীড়িত বা হুশ্চেষ্ট কাক দর্শনে অমঙ্গল, মহুয়া বা অশ্বমস্তকে অথবা রথে দৃষ্ট হইলে সৈন্যবধ, সৈন্যের সন্মুখ দিয়া আসিলে পরাজয়, মাংস না থাকিলেও গৃধ্র ও কঙ্কসহ শিবির মধ্যে কাক প্রবেশ করিলে শত্রুগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সন্ধি; ছিন্নশ্বজে আরোহণ করিয়া সমুদ্র্যত শত্রুসৈন্যগণের দিকে চাহিয়া থাকিলে, অথবা বটাদি কীরীযুক্ত আরোহণ করিয়া শব্দ

করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে। এতদ্বির দিগমুখ্যারে ও প্রহারামুখ্যারে কাকশব্দের ব্রহ্মণ শুভাশুভ কথিত হইয়াছে, যাত্রাকালে তাহাও অমূল্যদান করিতে হয়।

“কাকের চোঁটা বিশেষ দ্বারা শুভাশুভ নিরূপিত হয়।— অকারণে বহুকাক একত্র মিলিত হইয়া শব্দ করিলে গ্রামে অগ্ননাশ হয়; চক্রাকৃতি হইয়া শব্দ করিলে গ্রামের রোধ এবং বাম ও দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করিলে গ্রামে ভয় উপস্থিত হয়; রাত্রিকালে শব্দ করিলে জনসমূহের বিনাশ হয়। চক্ষু ও চরণদ্বারা লোকদিগকে উদ্বেজিত করিলে শত্রুসমূহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দান করিয়া ধূলিতে লুপ্ত হইয়া শব্দ করিলে বৃষ্টি হয়। এইরূপ জলজন্তু ও স্থল-জন্তু বিপরীত ব্যবহার করিলে অর্থাৎ জলচর স্থলে আসিলে এবং স্থলচর জলে যাইলে বর্ষাকালে বৃষ্টি ও অল্প সময়ে ভয় ঘটয়া থাকে। মধ্যাহ্নকালে কাহারও গৃহের উপর কাক বসিয়া শব্দ করিলে, চোর তাহার ধনাদি অপহরণ করে, অথবা অল্প কোন প্রমাদ ঘটয়া থাকে। অদৃষ্টভাবে তৃণপূর্ণ-মুখে শব্দ করিলে অগ্নিভয়, অথবা বৃষানে থাকিলে কিম্বা প্রবাসে গমন করিলেও তিন দিবস মধ্যে বিবিধ দুঃখ ঘটে। ছায়ার বসিয়া শব্দ করিলে লাভ, ভূমিতে ভূমিলাভ, জলে বিষ, প্রস্তরে কার্য্যনাশ, (স্থানস্থিত বা প্রবাসী হইলেও তাহাকে অমৃত্যব করিতে হয়।) দ্বারদেশে ক্রধিরলিপ্ত হইয়া শব্দ করিলে শিশুনাশ, পাখা কাঁপাইতে কাঁপাইতে রক্ত শব্দ করিলে গৃহের অমঙ্গল, উর্দ্ধদিকে পাখা তুলিয়া কর্ণশ শব্দ করিলে প্রলয়, ক্রুদ্ধ হইয়া অপর কাকের উপর আরোহণ করিয়া শব্দ করিলে রোগ দ্বারা মৃত্যু, কাককর্তৃক দ্রব্য নষ্ট বা অপহৃত হইলে বিনাশ ও লাভ হইয়া থাকে। কাকের নিকট রোগবিনাশের প্রশ্ন করিলে,—স্বরব করিলে শীঘ্র রোগনাশ ও শাস্তপ্রদেপে কর্ণশ শব্দ করিলে বিলম্বে রোগনাশ হইয়া থাকে। প্রশ্ন করিলে যদি শাস্তদিক্ আশ্রয় করিয়া শাস্তস্বরে শব্দ করে, তাহা হইলে শুভ, তাহার বিপরীত হইলে অশুভ হয়। কুন্তে অথবা জালায় শব্দ করিলে গর্ভিণীর পুত্রোৎপত্তি হয়। কোন কণ্টকযুক্ত শাখা লইয়া উড়িয়া গেলে রাজার আগমন হইয়া থাকে। অন্নাদি, বিষ্ঠা ও মাংস প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণমুখ কাক অস্তীষ্ট কল বলিয়া দেয়; ঐরূপ কাক মস্ত্রাদিতে সিদ্ধি ও বাণিজ্যাদিতে লাভ প্রদ এবং বিবাহবিধিতে প্রশস্ত। কাক অশ্বাদি বাহনে অবস্থিত হইলে ইষ্টসিদ্ধি, ছত্রাদিতে অবস্থিত হইলে সেই সেই দ্রব্য লাভ, প্রাণীরে অবস্থিত হইলে বহু আগমন এবং মনোরমবৃক্ষে অবস্থান করিলে মনোজ-বিষয়ের লাভ হয়। গৃহের দিকে সন্মুখ হইয়া স্থলস্থলস্থানি

করিলে পথিকের আগমন হয় এবং ঐরূপ ধ্বনি সর্বকাৰ্য্যে
সুভজনক। কাকের মৈথুন দর্শন বা বেতকাক দর্শন পৃথিবীর
মহাজন্ম ও উৎপাতসূচক। ঐরূপ অদ্ভুত দর্শনে মানবদিগের
উদ্বেগ, বিবেচ, ভয়, প্রবাস, ধনক্ষয়, ব্যাধিভয়, প্রহার, বৃদ্ধি-
নাশ, আকুলতা ও প্রমাদ ঘটয়া থাকে। ঐ সকল দ্রুৎপ্রাণির
শাস্তিজন্য দর্শনযাত্রাই সত্য জ্ঞান, ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্রদান,
অন্নদান ও ভূমিশ্রম করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত হবিষ্যন্ন ভোজন
করিবে এবং ক্রীড়াভোগ ত্যাগ করিবে। ঐ সাতদিন অকাক-
ঘাতী-ব্রত আচরণ করিতে হইবে। তাহার পর প্রভাতে
জ্ঞান করিয়া শাস্তিবিধান করিবে এবং যথাশক্তি গুণী ব্রাহ্মণ-
দিগকে ধন দান করিবে। ঐরূপ অদ্ভুত দৃষ্টি যে দেশে ঘটে,
তথায় অশুষ্টি, তর্ভিক, ভয়, উপদর্গ, চোর, অগ্নি ও শত্রুভয়
এবং ধর্ম্মনাশ উপস্থিত হয়। রাজা তাহার শাস্তি জন্ত শাস্তিক
ও পৌষ্টিক কৰ্ম্ম করিয়া অন্ন, গো, ভূমি ও ধনদান করিবেন
এবং এক বৎসর যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন।

“স্বরবিশেষ দ্বারা বৈষ্ণব শুভাশুভ নির্ণীত হয়।—
'ককাক' শব্দ মঙ্গলজনক, 'কেকাক' শব্দ অভিলষিত ভোজন
ও যানলাভের কারণ এবং 'কুং কুং' শব্দে অর্থলাভ, 'কং কং'
শব্দে স্বর্ণলাভ, 'কেং কেং' শব্দে সুনন্দী ক্রীলাভ, 'কাং কাং'
শব্দে ভোগলাভ, 'কু কু' শব্দে পুত্রলাভ, 'কে কব' শব্দে
যাত্রাসিদ্ধি, 'ক্রোং কোং' শব্দে শুভ লাভ, 'কুং কুং' শব্দে প্রিয়-
গম্য হয়। 'ক্রাং ক্রুং' 'ক্রাং' ও 'ক্রাং ক্রাং' শব্দ
যুদ্ধজনক, 'ক্রাং ক্রাং' 'ক্রোং ক্রোং' 'ক্রুং ক্রুং' ও 'ক্রো
কু কু কু' শব্দ মৃত্যুবোধক। 'খং গং' শব্দ যাত্রাকারীর মৃত্যু-
জনক, 'ক্রী ক্রীং' শব্দ ইষ্টার্থ-বিনাশকারী, 'জং জং' শব্দ
অভিভয়জনক, 'কী কী' ও 'কো কো' শব্দ বারম্বার করিলে
তাঁহা বধজনক, 'কা' শব্দ সর্বদা বিফলকারক, 'ক' শব্দ
সিদ্ধলাভকারক, 'কা কা' শব্দ হানিকারক, 'কা কট' শব্দ
আহারদোষজনক, 'কু কু' শব্দ যুদ্ধজনক, 'কে কে' 'কা কুটি'
ও 'কিং টিকি' শব্দ পরদোষসূচক, 'কাং কাং কাং' শব্দ
মহৎ যুদ্ধসূচক, 'কাং' শব্দ বাহননাশক, 'কু কু কু' শব্দ
দুর্ভাগ্য। শ্রান্ত, দীন ও উৎসাহহীন কাক দীর্ঘ 'কা' শব্দ
করিলে তাঁহা কার্য্যনাশক, 'বক বক' শব্দে মাংসভোজন,
'কলি কলি' শব্দে রমনেন্দ্রিয় গ্রাহ দ্রব্যের নিবারণ ও রক্তস্বরে
খব্দ করিলে বিদেশী ব্যক্তির আগমন, 'শব শব' শব্দে মৃত্যু,
'কণ কণ' শব্দে কলহ, 'কুলু কুলু' শব্দে প্রিয় ব্যক্তির আগমন,
'কট কট' শব্দে অন্ন ও দধিভোজন ঘটয়া থাকে। এইরূপ
বহু বহু প্রদীপ্ত ও শাস্ত স্বরাহুসারে শুভাশুভ লক্ষিত হয়।

“কাকদিগকে বলি অর্থাৎ তাহাদের অতীষ্ট আহাতি

প্রদান করিলে, তাহারা নিতাই হিত বলিয়া থাকে, এমন
প্রাচীন মুনিগণ তাহাদিগকে বলিপ্রদানের বৈষ্ণব নিয়ম
বলিয়াছেন, তাহাই এখন বর্ণিত হইতেছে।

“দক্ষিণদিগ্ বাজীত অন্যান্যাদিকে বটাদি কীরীবৃক্ষ
আশ্রয় করিয়া যেখানে বহুকাক একত্র থাকিবে, নিম্নতলদ্বিগে
তথায় উপস্থিত হইয়া কাকদিগকে বলিপিণ্ডের জন্য নিম-
ন্ত্রণ করিতে হইবে; পরদিন প্রাতঃকালে ঐ বৃক্ষের নিম্নদেশ
পরিকার করিয়া গোময় লেপন করিবে। তাহার পর
ঐ স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য,
ইন্দ্র, অগ্নি, বৈবস্বত, রাক্ষস, বরুণ, বায়ু, কুবের ও শঙ্কর
পূজা করিয়া, অষ্টদিকে অষ্টলোকপালের পূজা করিবে;
পূজাকালে প্রণব ও নমঃ শব্দযুক্ত পৃথক পৃথক নাম নির্দেশ
করিতে হইবে। অর্ঘ্য, আসন, আলোপন, পুষ্প, ধূপ,
বৈবেদ্য, দীপ, আতপ চাউল ও দক্ষিণা, এই সকল দ্রব্য
পূজার উপকরণ। পূজান্তে তরু সন্নিবিষ্ট কাকদিগকে ময়-
পাঠপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া দক্ষিণিগুণ্ড বলি প্রদান
করিবে। ময় যথা—‘ইক্রায় যমায় বরুণায় ধনদায় ভূত-
বায়সায় বলিঃ গৃহ্মাহু মে স্বাহা।’

“ঐ সমস্ত কার্য্যান্তে তথা হইতে অপস্থত হইয়া নিম্নত
দেশে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া কাকের চেষ্টা বিশেষ দ্বারা
শুভাশুভ লক্ষ্য করিবে। পূর্ব্বদিগ্ হইতে খাইতে আরম্ভ
করিলে সুখ ও ধন বৃদ্ধি, অগ্নিদিগ্ হইতে আরম্ভ করিলে
অগ্নিভয়, দক্ষিণদিগ্ হইতে আরম্ভ করিলে অর্থনাশ, নৈঋতে
দিক্‌পালগণের কার্য্যাহানী, পশ্চিমে অতীষ্টসিদ্ধি, বায়ুদিকে
অন্ন বৃষ্টি, উত্তরে সুখ, আরোগ্য ও কার্য্যসিদ্ধি ও ঈশানদিকে
অতীষ্ট সিদ্ধি হয়। চতুর্দিকে বলি একেবারে বিলুপ্ত হইলে
কার্য্যে শুভাশুভ উভয়ই ঘটবার সম্ভাবনা এবং প্রমত্ত
বলি একেবারে ভোজন না করিলে ভয়ের আশঙ্কা।

“কীরীবৃক্ষ, উপবন, চতুঃপাণ, নদীতীর ও দেবালয় প্রভৃতি
স্থানে; ভূতদিন ও অষ্টমী তিথিতে, অর্দ্ধসিদ্ধ গোময় বা
ছোলা, দধি ও তণ্ডুলদির দ্বারা বলি প্রদান করিতে হয়।

“এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার পিণ্ডদানের ব্যবস্থা
আছে; তন্মধ্যে নারদাদি কথিত পিণ্ডদান দানের ব্যবস্থা
এইরূপ—“শুভদিনে চতুর্থ প্রহরের সময় পূর্ব্বকথিত স্থানে
পিণ্ডদান ভোজনের জন্য কাকদিগকে সময়ে নিমন্ত্রণ করিতে
হইবে। পরদিন প্রাতে ভূমিলেপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত ময়
দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বরুণ, লোকপালগণ ও কাকদিগের
যথাক্রমে দধোদান, আতপতণ্ডুল, পুষ্প, ধূপ প্রভৃতি
দ্বারা পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বদিগ দিগ্‌মুখ্যানে প্রথম

পিণ্ডে স্বর্ণ, দ্বিতীয় পিণ্ডে রৌপ্য, ও তৃতীয় পিণ্ডে লৌহ নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যে বলি প্রদানের উপযুক্ত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। তাহার পর নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা কাক-দিগকে আহ্বান করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—‘ওঁ হিবি টিমি বিটি কাকচাণ্ডালার বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে বিশ্বায় কাকচণ্ডা-লার বাহা।’

“কাক স্তব্ধযুক্ত পিণ্ড ভোজন করিলে কার্য্য উত্তম হয়, এইরূপ রৌপ্যযুক্ত পিণ্ডভোজনে মধ্যম ও লৌহযুক্ত পিণ্ড ভোজনে অধম বুঝাইয়া থাকে। বিবাদ, বাগিলা, বিবাহ, বৃষ্টি, মঙ্গল, ধন, কৃষি, ভোগ, রোগ, সংগ্রাম, সেবা, রাজ-কার্য্য ও দেশ সঙ্কটে শুভাত্তর দেখিতে হইলে এইরূপ বলি প্রদান করিতে হয়।”

“কাক পিণ্ড গ্রহণ করিয়া অস্থূল চেষ্টা করিলে, দক্ষিণ পক্ষ ও গ্রীবা উচ্চ করিয়া শব্দ করিতে করিতে মনোজ্ঞান বা মনোজ্ঞ বুদ্ধি আশ্রয় করিলে শুভ ও অশুভ সিদ্ধি হইয়া থাকে; ইহার বিপরীত চেষ্টায় বিপরীত ফল হয়। কাক যদি প্রধান পিণ্ড লইয়া শাস্ত্রদিকে গমন করে, তাহা হইলে ফল পূর্ণ, এবং ঐ পিণ্ড লইয়া প্রাদৌশদিকে গমন করিলে কার্য্যের ফল প্রথমে উত্তম হইলেও পরে তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয় পিণ্ড অপহরণ করিয়া শাস্ত্রদিকে গমন করিলে শুভ ও কার্য্য ফল বিলম্বে সিদ্ধ হয়। জঘন্য পিণ্ড লইয়া প্রাদৌশদিকে গমন করিলে কার্য্য ও নিতান্ত জঘন্য হইয়া থাকে।”

“পিণ্ডাষ্টক দানের ব্যবস্থা—শুভদিনে সায়াংকালে বলি-ভোজনের জন্ত কাকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, পরদিন প্রভাতে সমস্ত উপকরণসহ কোন নির্জন দেশস্থ তরতলে গিয়া, মৃত্তিকা, গোময় প্রভৃতি দ্বারা পরিষ্কৃত করিবে এবং গন্ধ-গব্য দ্বারা পরিষেক করিবে। তাহার পর ঐ স্থানে সৌম্য উপহার দ্বারা কুলদেবতার পূজা করিয়া, ঘৃত ও দধিমিশ্রিত আটটি অন্নপিণ্ড পূর্বাদিক্রমে আটদিকে ইন্দ্র, বহি, বম, নৈঋত, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কুবের, মহেশ্বর ও কাকদিগকে প্রদান করিবে। প্রত্যেকের নামোচ্চারণ করিয়া প্রণব ও নমঃ শব্দ-যুক্ত মন্ত্র এবং অর্ঘ্য, আগন, আলোপন, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, দ্বীপ, আতপ চাউল ও দক্ষিণাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ নমঃ খগপত্যয়ে গরুড়ায় ত্রৌণায় পক্ষিণ্যায় বাহা।

ত্রৌণাত্তকসমং পিণ্ডং গৃহাণ ক্షমশক্তিভঃ।

যথাশৃষ্টং নিমিত্তকং কথরস্বাধমে স্টুটম্॥”

পিণ্ডদানের পর তথা হইতে অপস্থত হইয়া নিষ্কৃত স্থানে

দাঁড়াইয়া কাকচেষ্টা লক্ষ্য করিবে। প্রথম পিণ্ড গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি; দ্বিতীয়ে উষেণ, শোক, বাজার বিফলতা, হানি বা কলহ; তৃতীয়ে রোগ, আপদ, ভয় ও মৃত্যু; চতুর্থে যুদ্ধ-জয়; পঞ্চমে সহজে অশুভ সিদ্ধি; ষষ্ঠে প্রবাস ও বিফলতা; সপ্তমে অসিদ্ধি এবং অষ্টমে সম্ভাব, শোক ও বাজার বিফলতা হইয়া থাকে। পিণ্ড একেবারে ভোজন না করিলে অথবা চক্ষুঃ দ্বারা নিক্ষেপ করিলে সর্ব্বকার্য্যে অমঙ্গল অথবা ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে।”

কাকচিঞ্চা (স্ত্রী) কাকবর্ণা চক্ষা প্রান্তভাগঃ ফলে যতাঃ (পুৰোদরাদিত্যং সাধুঃ।) কুঁচ, গুঞ্জা। [গুঞ্জা দেখ।]

কাকচিঞ্চি (স্ত্রী) কাকবর্ণা চক্ষা প্রান্তভাগঃ ফলে যতাঃ (পুৰোদরাদিত্যং সাধুঃ।) কুঁচ, গুঞ্জা।

কাকচিঞ্চিক (স্ত্রী) কুঁচ।

কাকচিঞ্চী (স্ত্রী) কাকচিঞ্চি-ভীপ্। গুঞ্জা।

কাকচ্ছদ (পুং) কাকস্ত ছদঃ পক্ষঃ ইবঃ ছদো যন্ত মধ্যলো। ১ খঞ্জনপাখী। ৩তং। ২ কাকের পাখা।

কাকচ্ছদি (পুং) কাকচ্ছদ-বাহনকং ইচ্। খঞ্জনপাখী।

কাকজঙ্ঘা (স্ত্রী) কাকস্ত জঙ্ঘবৎ জতবা আকৃতির্জঙ্ঘাঃ মধ্যলো।

১ কেওয়াঠেলা গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকাকী, কাকাকী, কাকনাসিকা, কুবীৰল, জাঙ্ঘজঙ্ঘা, কাকাক্ষা, স্থলোমশা, পারাবতগদী, দাদী ও নদীকাষ্ঠা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, ত্রণ, কক, বধিরতা, অজীর্ণ, জীর্ণর ও বিষম জরনাশক। লক্ষানাপের মতে ইহাতে জর, কণ্ডু, বিষমজর ও ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পুষ্যা নক্ষত্রে ইহার মূল তুলিার রক্ত স্ত্রী দ্বারা গলদেশে বা হস্তে বন্ধন করিলে একদিন অন্তর পালাজর আরোগ্য হয়।

কেহ কেহ এই গাছকে “মদী” বলিয়া থাকে। ইহাকে তৈলক্ষে সুরপদী বা ‘চিবিকি বেলমা’ ও ইংরাজী উদ্ভিজ্জাষ্মে Leen hirta বলে। কেউরা ঠেলা গাছ ও এ হাত বড় হয়। ইহার কাণ্ডসন্ধির মধ্যভাগ উন্নত দেখিতে কাকজঙ্ঘার মত, সেই স্থান হইতে পাতা গজায়। পাতা এক একটি দৈর্ঘ্যে আধ হাত, প্রস্থে ৪ অঙ্গুলি, অগ্রভাগ স্থম্ভ ও বহুশিরাযুক্ত লোমশ ও কিঞ্চিৎ খরস্পর্শ। ইহার ফল এক এক গোছ হয়, তাহার মটরবৎ বর্তুল উপর প্রদেশ কিঞ্চিৎ নিম্ন।

এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যশোরাক্ষলে নদকূলবর্তী জঙ্গলে বিস্তর জন্মে। ২ গুঞ্জা। ৩ মৃদগপর্ণী লতা। (রত্নমালা)

কাকজঙ্ঘু (স্ত্রী) কাকবর্ণা জঙ্ঘাঃ। তুমিজন, স্কন্দ জাম, বনজাম।

কাকজম্বু (জী) কং জলং অকতি আশ্রয়েন গৃহ্নতি, ক-অক-অণ্-টাপ্ ; কাকা চাসৌ অধুচেতি কৰ্মধা°। জলজাত জামবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাককলা, নাহেরী, কাক-বলতা, ভুগেঠা, কাকনীলা, খাজ্জম্বু ও ধনপ্রিয়া। বাঙ্গালার কাক জাম, বনজাম ও পানশিউলী ইহা। (Ardisia humilis) রাজনির্ঘণ্টমতে ইহার গুণ—কষায়, অন্ন, পাকৈ মধুর, শুষ্ক, হাৰ, শ্রম ও অভিসারনাশক, এবং বীৰ্য্যবর্দ্ধক ও রসদায়ক।

কাকজাত (পুং) কাকেন জাতঃ প্রতিপালনেন বদ্ধিত ইত্যর্থঃ। ১ কাকপুষ্ট, কোকিল। ২ (ত্রি) কাকজাত, কাক হইতে উৎপন্ন।

কাকণ (স্ত্রী) কু ঙৈৎ কণতি নিমীলতি, কু-কণ-অচ্-কোঃ কাদেশঃ। ১ গুঞ্জা, কুঁচ। ২ (কাকণমিব আকৃতিরস্তাতি কৃষ্ণরক্তচিহ্নিতত্বাৎ) কুষ্ঠবিশেষ।

“যৎ কাকণস্তকাবর্ণমপাকং তীব্রবেদনম্।

ত্রিদোষনিবং তৎকুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি॥” নিদান।

যে কুষ্ঠ কুঁচের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট, অশাক অর্থাৎ পাকেনা, এবং অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত, তাহার নাম ‘কাকণ’, এই কুষ্ঠ ত্রিদোষ জন্ত, স্ত্রত্যং ত্রিদোষের লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা অসাধ্য।

কাকণক (স্ত্রী) কাকণ-স্বার্থে কন্। কাকণকুষ্ঠ।

কাকণস্তিকা (স্ত্রী) কু ঙৈৎ কণস্তী নিমীলন্তী, কু-কাদেশঃ, কাকণস্তী-কন্-টাপ্। কুঁচ।

কাকণস্তী (স্ত্রী) কু ঙৈৎ কণস্তী নিমীলন্তী, কু-কণ-শত্-ভীপ্-কোঃ কাদেশঃ। কুঁচ।

(“কোষ্ঠং গম্বা ক্ষোভয়ন্ত তন্ত রক্তম্

তচ্চাধস্তাৎ কাকণস্তী প্রকাশম্॥” সূত্রতঃ।)

কাকণী (স্ত্রী) কাকণ-ভীষ্ (ষিদ্গোরাতিভাষ্য। পা ৪।১।৪১) ১ গুঞ্জা। ২ কুষ্ঠবিশেষ। [কাকণ দেখ।]

কাকতন্ত্রা (স্ত্রী) কাকন্ত তন্ত্রেব তন্ত্রা, মধ্যলো°। ১ কাকের তন্ত্রার স্থায় অতি সতর্ক ভাবে তন্ত্রা। ২ (ভত্৩) কাকের তন্ত্রা।

কাকতা (স্ত্রী) কাকন্ত ভাবঃ, কাক-তন্ (তন্ত ভাবত্বতলৌ) পা ৫।১।১১১।-টাপ্। ১ কাকের বর্ধ। ২ কাকের স্বভাব।

কাকতালীয় (স্ত্রী) কাকতালমধিকৃত্য উপদিষ্টং, কাক-তাল-হ (সমাসাক্ত দ্বিধরণ্যৎ। পা ৫।৩।১০৬) জায়-বিশেষ। গাছ হইতে তালের ঠিক পড়িবার সময় কোন কাক সেই তালের উপর বসিলে, লোকে যেমন তাহাকে ‘কাকে তাল ফেলিয়া দিল’ বলে; সেইরূপ কোন কাণ্ড আপনা আপনি সিদ্ধ হইবার সময় কেহ তাহাতে হাত দিলে

তাহারই কৃত বলিয়া পরিচিত হয়। ইহাকেই কাকতালীয় স্থায় কহে।

(“তদিন্নং কাকতালীয়ং বৈবরমাসাদিতং স্বরা।”

রামায়ণ ৩।৪৫।১৭।)

কাকতালুকী [ব্] (ত্রি) কাকবৎ তালুস্তাতি, কাক-তালুক-ইনি (বন্দোপতাপগর্হাৎ প্রাণিহাদিনিঃ। পা ৫।২।১২৮।) কাকের ন্যায় তালুবিশিষ্ট।

কাকতিক্তা (স্ত্রী) কাকমৎসবৎ তিক্তা, মধ্যলো°। ১ কাক-জজ্বা। ২ গুঞ্জা, কুঁচ।

কাকতিন্দুক (পুং) কং জলং অকতি, ক-অক-অণ্ ; কাকচ্চাসৌ তিন্দুকশ্চেতি, কৰ্মধা°। যথা কাকবর্ণতিন্দুকঃ, কাকপ্রিয়ো বা তিন্দুকঃ, মধ্যলো°। ইহাবিশেষ। দেশভেদে ইহাকে ‘মাকড়াকেন্দু’ ‘মাকড়ো গাব’ ও ‘কাকডেহু’ বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাকেন্দু, কুলক, কাক-পীলুক, কাকপীলু, কাকাণ্ড, কাকক্ষুর্জ, কাকাছ ও কাক-বীজক। (Diospyros tomentosa) রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার কাঁচা ফলের গুণ—কষায়, অন্ন, শুষ্ক ও বায়ুরোগ-নাশক। ইহার পক ফলের গুণ—মধুর, কিঞ্চিৎ কককারক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

কাকতুণ্ড (পুং) কাকতুণ্ড ইব বর্ণো হস্তাত্ত, কাকতুণ্ড-অচ্- (অর্শ আদিষাৎ)। কাল অগুরু। (কালগুরুঃ কাকতুণ্ডঃ। হেম ৩।৩০৫।)

কাকতুণ্ডফলা (স্ত্রী) কাকতুণ্ডমিব ফলমত্যাঃ, বহত্৩। কাক-নাসিকা, কেওয়া-ঠোঁটি।

কাকতুণ্ডিকা (স্ত্রী) কাকতুণ্ডস্তেব বর্ণঃ ফলাংশে বজাঃ, কাকতুণ্ড-ঐন্-টাপ্। গুঞ্জা।

কাকতুণ্ডী (স্ত্রী) কাকং ঙৈৎ কুঃৎ তুণ্ডতে নাসরতি, তুড়িও বধে-অণ্-ভীষ্ (ষিদ্গোরাতিভাষ্য। পা ৪।১।৪১।) ১ রাজপিত্তল। ২ (কাকতুণ্ডস্তেব আকৃতিত্বত্যাঃ) কেওয়া ঠোঁটি। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাকাদনী, কাকপীলু, কাক-শিখী, রক্তলা, খাজ্জাদনী, বজ্রপল্যা, ছপ্পোহা, বারসাদনী, খাজ্জনখী, বারসী, কাকদন্তিকা ও খাজ্জদত্তী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, জ্ব, রসায়ণ, বায়ুরোগ-নাশক, রক্তিকারক ও পলিতত্ত্বক।

কাকতুল্য (ত্রি) কাকন্ত তুল্যং, ভত্৩। কাকের মত।

কাকতেয় (কাকত্যা), দক্ষিণাংশের এক প্রাচীন হিন্দু-রাজবংশ। এই বংশীরেরা প্রথমে কল্যাণের চালুক্যরাজগণের অধীনস্থ ছিলেন। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদগণের মতে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে এই বংশের অভ্যুদয়কাল।

এই রাজবংশে যে যে রাজার নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাকতি-প্রলয় প্রথম। কেহ কেহ বলেন, প্রলয়রাজের পাট-রাণী কাকতিদেবীর পূজা করিতেন, প্রলয় পত্নীর অনুরাগী ও কাকতিদেবীর উপাসক হইয়া কাকতিপ্রলয় নাম গ্রহণ করেন। ঘটনাক্রমে একদিন সেই রাজা একটি শিবলিঙ্গ পান, সেই লিঙ্গ নাকি পরেশ-পাথরের। রাজা সেই পাথরের গুণে বিস্তর ধন লাভ করেন। সেই পাথর এমন ভারী ছিল যে, কেহই নড়াইতে পারিত না। কাজেই প্রলয়রাজকে অনন্য-কোণে পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে পাথর পাওয়া গিয়াছিল সেইখানে ৯৯০ শকে (১০৬৮ খৃষ্টাব্দে) নগর স্থাপন করিতে হইল। প্রথমে কাকতিপ্রলয় চালুক্যরাজগণের অধীনে করদ রাজা ছিলেন। চালুক্যরাজদিগের অধঃপতন-কালে ইনি স্বাধীন হইলেন। প্রলয়ের পুত্র জন্মিলে দৈবজ্ঞেরা বলেন যে, সেই পুত্র পিতৃঘাতী হইবে। দৈবজ্ঞের কথা শুনিয়া রাজা পুত্রকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। কোন ব্যক্তি তাহাকে পাইয়া পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপালন করিল। সেই পুত্র বয়োপ্রাপ্ত হইলে পরেশলিঙ্গের রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন। ঘটনাক্রমে একদিন রাজ্যে প্রলয়রাজ মন্দিরে দেবদর্শন করিতে গমন করেন। সঙ্গে লোক জন কেহই ছিল না। রাজকুমার রাজাকে গুপ্তভাবে আসিতে দেখিয়া মনে করিল, বুঝি কোন চোর আসিতেছে, তাহার আর বিশদ্ব্যস ছিল না। তরবারী ধারী রাজাকে গুরুতররূপে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতেই প্রলয়রাজ ধরাশায়ী হইলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, যে পুত্রের হস্তে হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাতৃক্রোধ হইতে লইয়া বনে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, এই সেই পুত্র, তাহারই এই কাজ। তিনি বুঝিলেন অদৃষ্টলিপি বুঝা হইবার নয়। পুত্রের কি দোষ? তাহার অদৃষ্টে ছিল, তাই পুত্র হস্তে মরিতে হইল। তিনি অন্তিমকালে পুত্রকে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই রাজ্য প্রদান করিলেন।

কাকতিপ্রলয়ের পুত্র রুদ্রদেব। তিনি পিতৃহত্যারূপ মহাপাতকের প্রারম্ভিক্তের জন্য সংস্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বাহুবলে কটক ও বলনাদের রাজা তাঁহার বশতা-স্বীকার করিয়াছিলেন। কিছুকাল রাজত্বের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব বিজ্রোহী হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। কিছুদিন পরে মহাদেব দেবগিরির রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া জীবন হারাইলেন। তাঁহার পর রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র গণপতিদেব রাজা হইলেন। তিনি দেবগিরির রামরাজাকে

যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পিতৃবোর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন। রামরাজ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহাকে আপনার কভারক প্রদান করিয়া তাঁহার আনুগত্য-স্বীকার করিলেন। গণপতিদেব পল্লিগারদিগের যত্নে বলনাদ, নেচুর প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করেন। তিনি বড় জৈনবিষয়ী ছিলেন। তাঁহার সময়ে অসংখ্য জৈনমন্দির বিনষ্ট হইয়া, সেই সেই স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি অনেক-গুলি নগর পত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আপন রাজধানীর চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া তাহার 'একশিলানগর' নাম রাখেন। তাঁহার রাজত্বকালে অনেক তৈলঙ্গ কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী গোপরাজ রমণের যত্নে নিয়োগী ব্রাহ্মণেরা সামান্য মুহুরী কার্যে নিযুক্ত হন। তৎকালীন বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এই নিয়মের ষোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমন্ত্রীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে জনসাধারণ সমর্থ হয় নাই।

গণপতিদেবের পুত্র হয় নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা উমাকদেবীর সহিত রাজমহেন্দ্রীর রাজকুমার চালুক্য-ভিলক বীরভজের বিবাহ হয়। গণপতির মৃত্যুকালে তাঁহার দৌহিত্রও জন্মে নাই। স্মৃতরাং তদীয় পত্নী রুদ্রমাদেবী তৎপদে অভিযুক্ত হইয়া ২৮ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে উমাকদেবীর পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব বয়োপ্রাপ্ত হইলে, তিনিই মাতামহ গণপতিদেবের সিংহাসন লাভ করিলেন। এই প্রতাপরুদ্রদেবই বরঙ্গলের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা। তিনি গোদাবরী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত প্রদেশে অপ্রতি-হতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ এইরূপ, তাঁহার প্রবলপ্রভাবে ভীত হইয়া কটকরাজ দিল্লীর বাদশাহের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করেন। মুসলমান ইতিহাসপাঠে জানা যায়, ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র মুসলমানদিগের নিকট পরাজিত হইয়া, দিল্লীর সুলতানের নিকট প্রেরিত হন। কিছুদিন পরে প্রতাপরুদ্র স্বাধীনতা লাভ করিয়া বরঙ্গলে প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু আর অধিক দিন তাঁহাকে ইহলোকে থাকিতে হইল না। তাঁহার মরণান্তে তৎপুত্র বীরভজ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময় যবনের আক্রমণে বরঙ্গল রাজধানী এককালে ভস্মীভূত হইল। বীরভজ বরঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া কোণ্ডবীড় নামক স্থানে একটি নূতন নগর স্থাপন করিলেন। বরঙ্গলের কাকত-রাজবংশের সেই অবধি রাজত্ব ফুরাইল।

[কোণ্ডবীড় দেখ।]

কাকদন্ত (পুং) কাকত দন্তঃ। কাকের দাঁত, ঘোড়ার ডিম, 'শশবিষাণ, কুর্নলোম' প্রভৃতির দ্বারা নিরর্থক ব্যক্তি।

কাকদন্তিক (পুং) প্রাচীন ক্ষত্রি় আতিবিশেষ।

কাকদন্তগবেষণ (পুং) কাকদন্ত দন্তাঃ সন্তি ন বা ইতি সংশয়ে
তত্র বর্ণভেদস্ত সংখ্যাবিশেষস্ত চ গবেষণমিব অনর্থকঃ অবজ্ঞো
যত্র। অকারণ অধেয়গ-বোধক জ্ঞায়বিশেষ।

কাকের দন্ত আছে কিনা এ সন্দেহ নিশ্চয় হওয়ার
পূর্বে তাহার বর্ণ ও সংখ্যা লইয়া গোলযোগ করা যেমন
অনর্থক; সেইরূপ অনর্থক বিতণ্ডাহলে এই জ্ঞায়ের উদাহরণ
দেওয়া হয়।

কাকক্রম (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (Dalbergia rimosa.)

কাকধ্বজ (পুং) কাকঃ ধ্বজং বাস্পঃ ধ্বজ ইব যত্র।
বাড়বাগি। [বাড়বাগি দেখ।]

কাকনস্তী (স্ত্রী) কু দ্রব্যং কনস্তী নিমীলস্তী, কোঃ কাদেশঃ।
কাকগস্তিকা, কুঁচ।

কাকনালা [ন] (পুং) কাকস্ত নাম নাম যত্র, মধ্যলোং।
বকফুলের গাছ। [কাকলী দেখ।]

কাকনাস (পুং) কাকস্ত নাসায়া বর্ণ ইব ফলে যত্র। বিক-
টক, বইচগাছ।

কাকনাসা (স্ত্রী) কাকস্ত নাসা-ইব ফলমত্যাঃ। কেওরা-
ঠোটা গাছ।

কাকনাসিকা (স্ত্রী) কাকনাসা-বার্ধে কন-টাপ্ অত ইত্ম।
১ কেওরাঠোটা। ২ রক্ত ত্রিবৃং।

কাকনিদ্রা (স্ত্রী) কাকস্ত নিদ্রা ইব নিদ্রা, মধ্যলোং। ১ কাকের
নিদ্রার জ্ঞায় অতি সতর্কতার সহিত নিদ্রা। ২ (৩৩৭)
কাকের নিদ্রা।

কাকনীলা (স্ত্রী) কাক ইব নীলা। জামবিশেষ।

কাকন্দক (ত্রি) কাকন্দোদেশে ভবঃ, কাকন্দো বৃক্ষঃ (রোগ-
ধেভোঃ প্রাচ্যাম্। পা ৪।২।১২৩) কাকন্দো দেশবাসী।

কাকন্দি (স্ত্রী) দেশবিশেষ।

কাকন্দী (স্ত্রী) কাকন্দি-ঙীপ্। দেশবিশেষ।

কাকন্দীয় (ত্রি) কাকন্দো-জ্। কাকন্দীদেশবাসী।

কাকপক্ষ (পুং) কাকস্ত পক্ষ ইব আকারো হস্তাত্ত, কাক-
পক্ষ-অচ্। ১ মস্তকের দুইপার্শ্বে কেশ কাটিয়া কেশ-রচনা-
বিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—শিখণ্ডক ও শিখণ্ডি।
পূর্বে বালকদিগের মস্তকে ঐরূপ কেশরচনা ব্যবহার ছিল।

(“কৌশিকেন স কিল ক্ষিতীথরে

রামমধুরবিবাতশান্তয়ে।

কাকপক্ষধরমেত্যাচিভ-

ভেজসা হি ন বয়ঃ সনীক্যতে”

রঘু ১১।১।)

২ কাণের দুইপার্শ্বে কেশরচনাবিশেষ, কাণপাট্টা বা
কাণজুলী।

কাকপক্ষযুক্ত (ত্রি) কাকপক্ষঃ কেশসংস্কারবিশেষেণ যুক্তঃ,
৩৩৭। ১ শিখণ্ডকযুক্ত। ২ কাণপাট্টাযুক্ত।

কাকপদ (পুং) কাকপদ ইব আকারো হস্তাত্ত, কাকপদ-
অচ্। ১ রতিবক্ষবিশেষ।

“পাদৌ যৌ স্বকৃৎসুহৌ ক্ষিপ্তৌ লিঙ্গং ভগে লঘু।

কাময়েৎ কামুকীঃ কামৌ বন্ধঃ কাকপদৌ মতঃ”

রতিমজরী।)

২ (কাকস্ত পদং পদপরিমাণম্, ক্রী) কাকপদের জ্ঞায়
পরিমাণ; স্মৃতিশাস্ত্রে এই পরিমাণে শিখা রাখিবার ব্যবস্থা
আছে। ৩ (কাকপদবৎ আকৃতিরস্তাত্ত, কাকপদ-অচ্)
পুস্তকের লিখিত বিষয় অপেক্ষা স্থানে স্থানে অধিক লিখিবার
আবশ্যক হইলে সেই স্থানে যে চিহ্ন দিয়া উপরে বা নীচে
লিখিত হয়, তাহাকে লেখকগণ কাকপদ বলেন। তাহার
আকার এইরূপ (Λ বা V)।

কাকপর্ণী (স্ত্রী) কাক ইব কৃষ্ণং পর্ণং যত্রঃ, কাকপর্ণ-ঙীষ্
(যদগৌরাদিত্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) মূলপর্ণী, মৃগাণী।
[মূলপর্ণী দেখ।]

কাকপীলু (পুং) কাকপ্রিয়ঃ পীলুঃ। ১ কাকভিলুক। ২ কাক-
তুণ্ডী। ৩ খেত কুঁচ।

কাকপীলুক (পুং) কাকপীলু-সংজ্ঞায়াঃ কন্। কাকভিলুক,
মাকড়াকেলু। (Diospyros tomentosa.)

কাকপুচ্ছ (পুং) কাকস্ত পুচ্ছ ইব পুচ্ছো যত্র, মধ্যলোং।
কোকিল।

কাকপুষ্ঠ (পুং) কাকেন পুষ্ঠঃ, ৩৩৭। কোকিল। কোকিলী
ডিম ফুটাইতে পারে না বলিয়া, তাহার কাকের বাসায়
আসিয়া কাকের ডিম ফেলিয়া দিয়া নিজে ডিম পাড়িয়া
যায়; কাক নিজের ডিম ডাবিয়া সেই কোকিলের ডিমে
তা দিয়া থাকে। ডিম ফোটার পরও শাবকের সম্পূর্ণ পালক
হওয়া পর্যন্ত তাহাকে কোকিল বলিয়া চিনিতে পারা
যায় না, সুতরাং কাকও ততদিন তাহাকে প্রতিপালন
করিতে থাকে। এইরূপে কাক কর্তৃক প্রতিপালিত হও-
য়ায় ইহাকে ‘কাকপুষ্ঠ’ কহে। [কোকিল দেখ।]

কাকপুষ্প (স্ত্রী) কাকবৎ কৃষ্ণং পুষ্পং যত্র, বছত্ৰী। গরুপর্ণ।
কাকপোয় (ত্রি) কাকপয়নতকৃৎসৈঃ পীয়েত, কাক-পা-যৎ
(কৃত্যয়দিকার্ষ্যৎসেনে। পা ২।১।৩৩।) পূর্ণ জলাশয়।

কাকফল (পুং) কাকপ্রিয়ং ফলমত্, মধ্যলোং। নিম্গাছ।
[নিম্গ দেখ।]

কাকফলা (জী) কাকপ্রিয় ফলমতঃ, মধ্যলো। কাকজ্ব, বনজাম।

কাকবন্ধা (জী) কাকী বন্ধা; পুষ্পভাঃ। একটিমাত্র পুষ্প প্রসব করিয়া যে জী বন্ধা প্রাপ্ত হয়। কাকও একবার মাত্র প্রসব করে বলিয়া ঐরূপ জীকে 'কাকবন্ধা' কহে।

কাকবলি (পুং) কাকভোয়া দেবো বলিরদ্বাদিকম্, মধ্যলো। কাককে অন্নাদি দ্বারা দেওয়া হয়। বলিপ্রদানের নিয়ম যথা—প্রথমে কাককে "ও" সমধারাবস্থিতনানাদিগুদৌষ্য-বায়াসেতানমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পাদ্যাদি দান করিয়া পূজা করিবে। পূজাশেষে—

"ও কাক স্বং যমদূতো হসি গৃহাণ বলিমুত্তমং।

যমলোকগতং প্রেত্য স্বমাপ্যসিভুর্হসি।"

এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনার পর—

"ও কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় মহাশ্বনে।

অত্রপিণ্ডং প্রেচ্ছামি কথ্যতাং ধর্ম্মরাজনি॥"

এই মন্ত্রদ্বারা পিণ্ডদান করিতে হইবে।

আহিকতক্ষে পিণ্ডদানের মন্ত্র অত্ররূপ। যথা—

"ঐন্দ্রবারুণবারব্যাঃ সৌম্যা বৈ নৈঋতাঋত্বা।

বায়সাঃ প্রতিগৃহস্ত ভূমৌ পিণ্ডং মর্যাপিতম্॥

ও কাকভোয়া নমঃ।"

এই মন্ত্র দ্বারা পিণ্ডদান করিয়া তাহাতে জল সিঞ্জন করিতে হয়।

কাকভণ্ডী (জী) কাকত ঈষজ্জগত মুখস্রাবরূপত ভাণ্ডী ক্ষুদ্রভাণ্ডমিব, উপনিং। মহাকরজ; ইহা মুখে দিলে মুখ হইতে জলস্রাব হইয়া থাকে।

কাকভীরা (পুং) কাকাং ভীকর্তয়নীলঃ, ৫৩৭। পেচক। [পেচক দেখ।]

কাকমদণ্ড (পুং) কাক ইব কক্ষো মদণ্ডর্জলচরণক্ষিবিশেষঃ। দাড়াহ, ডাছকপাখী।

(“স্বতঃ ক্বা তু ধুবুঁজিঃ কাকমদণ্ডঃ প্রজায়তে।"

ভারত ১৩। ১১১। ১২১।)

কাকমর্দ (পুং) কাকং মৃদনাতি, কাক-মৃদ অণ্। মহাকাল-লতা, মাকাল।

কাকমাটিকা (জী) কাকমাটী-স্বার্থে কন্-টাপ্ হ্রস্বঃ। কাকমাটী বৃক্ষ।

কাকমাটী (জী) কাকান্ মধুতে, মচি-অণ্ (পুষ্পাদিরাতিং নলোপঃ) ভীষ্। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ; শুড়কামাই। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বায়সী, দ্বাজকমাটী, বায়সাহা, সর্পতিকা,

বহুফলা, কটুফলা, রসায়নী, শুষ্কফলা, কাকমাতা, বাহু-পাকা, জুন্দরী, তিত্তিকা ও বহুতিকা।

বঙ্গদেশে স্থানবিশেষে 'কাস্তে' ও 'মধুনী', হিন্দীভাষায় 'কটেরা' বা 'মকোই', বোম্বাই অঞ্চলে 'কমুনি' বা 'ঘাটি' ও তামিলে 'মনভুক-কলি' বলে। (Solanum nigrum) এই গাছ দেখিতে ছোট লক্ষাগাছের মত, ফুলও তজ্রপ, ফল মটর বা ব্যাকুড়ের ছায় এককালে গোছা গোছা হয়, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

রাজনির্ঘণ্ট ও রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ, কটু, তিত্ত, উষ্ণ, বৃষ্য, রসায়ন, রোচক, তেজক এবং কক্ষ, শূল, অর্শঃ, শোথ, কুষ্ঠ ও কণ্ডুনাশক। ভাবপ্রকাশে আরও কয়েকটি অধিক গুণ দেখা যায়—জর, মেহ, নেত্ররোগ, হিকা, বমি ও হৃদ্রোগনাশক।

হকিমেরা ইহার ফলকে 'অনব্-উস্-খলিব' বলিয়া থাকেন।

যকৎ বৃদ্ধি হইলে দেড় পোয়া কাকমাটীর রসপ্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

ডাক্তার মুদিন সেরিকের মতে, শোথরোগে কাকমাটীর পত্রের কাথ অথবা তাহার রস ১ ড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার সেবন করান যাইতে পারে।

কাকমাতা (জী) কাকত মাতের পোষিকা, কাকত তৎফল-প্রিয়ত্বাৎ। কাকমাটী।

কাকমুখ (জি) কাকত মুখমিব মুখং যত, বহুজী। ১ কাকের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ২ (পুং) পুরাণোক্ত জাতিবিশেষ, ইহার সম্ভবতঃ মহানদীর উপকূলে বাস করিত।

কাকমুলা (জী) কাকেন ঈষজ্জলেন মৃদং গচ্ছতি, কাক-মৃদ-গম-ড-টাপ্। মুলাপর্ণী গাছ, মুগানী। [মুলাপর্ণী দেখ।]

কাকযব (পুং) কাকবৎ নিষ্ঠুরগোষবঃ। আগড়া, তপুল-শূন্য ধান্য। ("তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্কে তথা কাকযবা ইব।" মহাভারত।)

কাকর, ১ বোম্বাইপ্রদেশের শিকারপুর জেলার একটি তালুক। একটি নগর ও ১০২ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোক সংখ্যা ৪২ ৫০০। ১৮৮১-৮২ খৃঃ অঙ্গুসারে গবর্ণমেন্ট খাজনা ১৮৬২১০ টাকা। এখানে ১১ খানা ও ২টি ফৌজদারী আদালত আছে। জুমিরপরিমাণ ৫৯৮ বর্গমাইল। ২ কাকর তালুকের নগর। অক্ষা ২৬° ৫৮' উঃ, দ্রাঘি ৬৭° ৪৪' পূঃ।

কাকরালা (ককরালা) বৃন্দাউন জেলার দাতাগঞ্জ তহশীলের অন্তর্গত একটি নগর। বৃন্দাউন নগর হইতে ছয়ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে হিন্দুদেবমন্দির ও কতকগুলি মসজিদ

আছে। সিপাহীবিজ্ঞোহের সময় বিজ্ঞোহী কর্তৃক এই নগর
ভস্মীভূত হয়। ১৮৫৮ খৃঃ এপ্রেল মাসে ইংরাজ সেনানায়ক
জেনারেল গেনি বিজ্ঞোহী শাসন করিতে যান, কিন্তু তিনি
কতকগুলি মুসলমান গাঙ্গী কর্তৃক নিহত হন, অবশেষে
তাহার সৈন্যগণের যত্নে বিজ্ঞোহীগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত
হয়। লোকসংখ্যা ৫৮১০, তন্মধ্যে ৩৪৫৬ মুসলমান ও
২৩০৫ হিন্দু।

কাকরুত (কী) কাকত রুতম্, ৬তৎ। কাকের রব।
[শব্দবিশেষায়ুগারে শুভাশুভ কাকচরিত্রে দেখ।]

কাকরুহা (জী) কাক ইব রোহতি, মূলশুভতয়া বৃক্ষাদ্য-
বলধনেন জায়তে; কাক-রুহ-ক-টাণ্। যথা কাকপুত্রীযাৎ
রোহতি উৎপদ্যতে বৃক্ষোপরি ইত্যর্থঃ। বন্দা বৃক্ষ, পরগাছা।

কাকরুক (জি) কু কুংসিতং কেরোতি, কু-কু-উক; কোঃ
কাদেশঃ। ১ জীবশীভূত। ২ উল্লঙ্গ। ৩ ভীর্ণ। ৪ নিঃস্ব,
দরিদ্র। (পুং) ৫ দস্ত। ৬ কাকেন লুগতে ছিদ্যতে, কাক-
লু-কর্মণি ক্লিপ-লুগতঃ সংজ্ঞায়াং কন্। পেচক।

(কাকরুকো নগদন্তদ্বীজিতোলুকীভক্ষু নিঃস্বে। মেদিনী।)

কাকল (কী) ক্রীষৎ কলো যন্নাৎ, কোঃ কাদেশঃ। ১ কঠমণি।
২ গ্রীবাঃ উন্নতদেশ, টুংটি। ৩ (পুং) কা ইত্যেৎ কলো
যত, বহব্রী। দ্রোণকাক, দাঁড়কাক।

কাকলক (পুং) কাকল-কপ্। ২ কঠমণি, কঠের উন্নতদেশ।
(গলো নিগরণঃ কঠঃ কাকলকন্ত তন্মণিঃ। হেম ৩। ১৫২।)

২ ষষ্ঠিক ধাতু বিশেষ। (“ষষ্ঠিকমুদ্রকমুদ্রকপীচক-
প্রমোদককাকলকাসনপুষ্কমহাষষ্ঠিকচূর্ণকুরবককেদারক-
প্রভৃত্যষষ্ঠিকাঃ।” সূত্রত।)

কাকলাস (দেশজ) ককলাশ। (Lacerta scutata.)

কাকলি (জী) কল-ইন্ কলিঃ; কু ক্রীষৎ কলিঃ, কোঃ
কাদেশঃ। হ্রস্ব মধুরাক্ষুটধনি।

(“দেবী কাকলিগীততত্ত্বদীপা নিদমন্ত চ।”

কথাসরিৎসাগর।)

কাকলী (জী) কাকলি-ভীপ্। হ্রস্ব ও মধুর অক্ষুটধনি।

(কাকলী তু কলঃ হ্রস্ব একতনো লয়ায়ুগঃ। হেম ৬। ৪৬।)

(“ক্রীড়ৎ পোকিল কাকলী কলকটৈল্লদগীর্ণকর্ণজরাঃ।”

উত্তরচরিত ২ অঃ।)

২ যন্ত্রবিশেষ। ৩ রত্নবিশেষ।

কাকলীক (পুং, কী) অক্ষুট মধুরধনি।

কাকলীজাফা (জী) কাকলীব হ্রস্বা জাফা, মধ্যলো।

জাফাবিশেষ, কিস্মিন্। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—জঙ্ঘা, কালোত্তমা, লঘুজাফা, নিবীজা, সুবৃত্তা ও রমাধিকা। রাজ-

নির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মধুর, অন্ন, রসাল, কটিকারক,
শীতল, শ্বাস ও ব্রণাননাশক এবং জনসমূহের প্রিয়।

[কিস্মিন্ দেখ।]

কাকলীরব (পুং) কাকলী মধুরাক্ষুটো রবো যত, বহব্রী।

১ কোকিল। ২ (কর্মণা) হ্রস্ব ও মধুর অক্ষুটধনি।

কাকবর্ণ (পুং) সুনিকবংশীয় রাজবিশেষ। শিশুনাগের পুত্র।

(বিষ্ণুপুরাণ ৪। ২৪। ২)

কাকবর্ণা, নেপালের সোমবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি
মনাকের পুত্র।

কাকবল্লভা (জী) কাকত বল্লভা, প্রিয়া। কাকজঙ্ঘ, বনজাম।

কাকবল্লরী (জী) কাকপ্রিয়া বল্লরী, মধ্যলো। স্বর্ণবল্লী।

কাকশিখী (জী) কাকপ্রিয়া শিখী, মধ্যলো। কাকতুণ্ডী,
কেওয়াঠোটাগাছ। [কাকতুণ্ডী দেখ।]

কাকলীর্ষ (পুং) কাকঃ লীর্ষে অগ্রে যত, বহব্রী। বকফুল,
বকফুলের গাছ।

কাকজী (জী) কাকত জীব, নাম সাদৃশ্যে। বকফুলের গাছ।

কাকক্ষুর্জ (পুং) কাকঃ ক্ষুর্জতি অগ্নিন, কাক-ক্ষুর্জ-যজ্ঞঃ।
কাকভিন্মুক বৃক্ষ। [কাকভিন্মুক দেখ।]

কাকস্বর (পুং) কাকত স্বর ইব স্বরো যত, বহব্রী। ১ কাকের
স্বায় বাহার কঠস্বর। ২ (৬তৎ) কাকের রব।

কাকা (দেশজ) ১ পিতৃব্য, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ২ কাকের
শব্দ।

কাকা (জী) কাকবৎ আকারো হস্তাতঃ, কাক-অচ্-টাণ্।

১ কাকমাগালতা। ২ কাকালী গাছ। ৩ কাকজন্ম গাছ।

৪ রক্তিকালতা। ৫ মলপু গাছ। ৬ কাকমাচী গাছ।

(কাকাত্যং কাকনাগায়াং কাকালী কাকজন্ময়োঃ।

রক্তিকায়ঃ মলপুং কাকমাচ্যাক্ষা যোমিতি॥ মেদিনী।)

কাকাকি (কী) কাকত অক্ষি চক্ষুঃ, ৬তৎ। কাকের চক্ষু।

কাকাকিগোলক ত্রায় (পুং) কাকত অক্ষি গোলকমিব
ভ্রায়ঃ, উপমি। ত্রায়বিশেষ। কাকের একমাত্র চক্ষুই
যেমন উভয় অক্ষি গোলকের কার্য সম্পাদন করে; সেইরূপ
একবিষয়ের সহিত দুইটি বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলে তাহাকে
কাকাকিগোলক ত্রায় বলে।

কাকাক্সা (জী) কাকত অঙ্গং জজ্বেব আকারো যতঃ, বহব্রী।

কাক-অচ্-টাণ্। কাকজন্ম গাছ।

কাকাক্সী (জী) কাকত অঙ্গং জজ্বেব আকৃতির্যতঃ। কাক-
জন্ম গাছ।

কাকাক্সী (জী) কাকং তজ্জন্মাকারং অকৃতি প্রাপ্নোতি,
কাক-অচ্-অণ্-ভীপ্। কাকজন্ম গাছ।

কাকাণ্ড (পুং) কাক্যা অণু ইব ফলং যন্ত বহুব্রী। ১ মহা-
নিষ। ২ কাকতিস্কৃ।

(“কাকাণ্ডম্বরসগন্ধ্যাক্য।

পুনর্নবা বায়সী শিরীষকর্ষণে।

উদবুদ্ধবিষজগম্বতে

লোপোষধ নস্তপানানি ॥” চরক-চি-২৫ অঃ।)

৩ (৬৩৭) কাকের ডিম্।

কাকাণ্ডক (পুং) কাক্যাঃ অণুঃ, ৬৩৭; কাকী-অণু-পু-
স্তাবঃ-স্বার্থে কন্। কাকের ডিম্।

(“কেচিৎ হরিত্রা সংকাশাঃ কাকাণ্ডকনিভান্তথা।”

ভারত বন*।)

কাকাণ্ডা (স্ত্রী) কাকস্ত্র অণু ইব বীজমন্তাঃ, বহুব্রী।
কোলশিষী।

কাকাণ্ডাবৃশ্চিক, মেদিনীপুরের জাঙ্গলভূমির অন্তর্গত একটি
গ্রাম। এই গ্রামে কাকাণ্ডাবৃশ্চিক নামে এক জাগ্রত
দেবতা আছেন। (দেশাবলী।)

কাকাণ্ডী (স্ত্রী) কাকাণ্ড-ভীষ্। মহাজ্যোতিষতী-লতা।
[মহাজ্যোতিষতী দেখ।]

কাকাণ্ডোলা (স্ত্রী) কাকাণ্ডং ওরতি তৎসাদৃশ্যং বীজে
প্রাপ্তোতি, কাক-উর-অচুপ্-রস্ত্র লভ্। কোলশিষী।

কাকাতুরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। বর্তমান শাকুনত-
বিদগণের মতে কাকাতুরা তোতাপাখীজাতীয়। কেবল
এতদ্ভেদ এই, তোতা অপেক্ষা কাকাতুরা আকারে বড়,
মাথার বেশ ছড়ান পাখার মত কুঁট ও পুচ্ছ অনেকটা বড়
হয়। ইহাকে ইংরাজীতে Cockatoo ও ইংরাজী
শাকুনশাস্ত্রে এই পক্ষীবংশকে Cacatuina কহে।

অকৃত কাকাতুরার পালক শাদা, তবে কোন কোনটার
শাদা শালকের উপর অল্প লাল বা অপরবর্ণ-মিশ্রিত দেখা
যায়। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে অষ্ট্রেলিয়ারূপে দুই প্রকার
কাল-কাকাতুরা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে ইংরাজী
শাকুনশাস্ত্রে ‘ক্যালিটোরিঞ্চাস্’ (Calytorhynchus) ও
‘মাইক্রোগ্লোসাস্’ (Microglossus) কহে। তন্মধ্যে শেষোক্ত
কাল-কাকাতুরাই অনেকটা বড় হয়। নিউগিনিতে এই
বড় কাকাতুরা পাওয়া যায়। তাহাদের জিহ্বা কাঁটাল, তন্মাত্রা
অল্পেই খাদ্যগ্রহণাদি গৃহীত হয়।

সর্বাপেক্ষা ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অষ্ট্রেলিয়ার
কাকাতুরার সংখ্যা অধিক। ইহার ফল, মূল, বীজ ও বেদজ
কাঁটাদি আহার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। পুষ্টিতে বেশ
পোষ মানে, শিখাইলে তোতার মত বেশ কথা বলিতে পারে।

কাকাদনী (স্ত্রী) কাকৈরব্যাতে ভূজ্যতে হসৌ। কাক-অদ্-
কর্ণগি ল্যুট-ভীপ্। ১ কুঁচ। ২ খেত কুঁচ। ৩ কেলেকোড়া;
ইহার সংস্কৃত পর্যায়—হিংস্রা, গুধ্রনখী, তুণ্ডী, কালা,
অহিংস্রা, কটুকা, পানি, কাশাল ও কুলিক। যুক্রান্তে
সংক্ষেপতঃ ইহার স্লেখনাশকতা গুণ বর্ণিত আছে।

কাকায়ু (পুং) কাকস্ত্র আয়ুর্গদ্যং বহুব্রী। সর্ববলীলতা।

কাকার (ত্রি) কং জলং আকিরতি ক-আ-কৃ-অণ্। জলস্রাব-
কারক।

কাকারি (পুং) কাকঃ অরিষন্ত বহুব্রী। পেচক।

(যুকে নিশাটঃ কাকারিঃ কোশিকোলূকপেচকাঃ।

হেম ৪। ৩৯০।)

কাকাল (পুং) কা ইতি শব্দং কলতি রোতি ক-কল্-অণ্।
দাঁড়কাক।

কাকাবলি (স্ত্রী) কাকানাং আবলিঃ শ্রেণী, ৬৩৭। শ্রেণীবদ্ধ
বহুসংখ্যক কাক।

কাকিণা, রঙ্গপুরজেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম, ত্রিশোতা
নদীর বামকূলে অবস্থিত। এখানকার লোকেরা কেহ কেহ
কাঁকিনা ও কাকিনীয়া এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এ
অঞ্চলের বিভাজনকদিগের মতে ‘কাঁকিনা’ শব্দ কাহণ বা
কাহণীয়া শব্দের অপভ্রংশ। গ্রামটি বড় অধিক দিনের নয়।
তবে এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান জমিদারেরা এই গ্রামে বাস
করেন। এখানে হাটবাজার আছে; ইক্ষু, তামাক ও পাটের
বিস্তার রপ্তানি হইয়া থাকে।

কাকিণিকা (স্ত্রী) কাকিণী—স্বার্থে কন্-ভ্রহৃৎ। গণের
চতুর্থাংশ, পাঁচগুণাকড়ি।

কাকিণী (স্ত্রী) ককতে গণনাকালে চঞ্চলী ভবতি, কাক-
পিনি-ভীপ্ (পৃষোদরাদিভ্যং নস্ত্র গঃ।) ১ গণের চতুর্থাংশ,
পাঁচগুণাকড়ি। ২ মানদণ্ড, কাঠানল। ৩ কুঁচ। ৪ এককড়া।
৫ এক মাষার চতুর্থাংশ।

কাকিনী (স্ত্রী) কাকিণী।

(“ঈশ্বরী ভূরিনানেন যন্তভন্তে ফলং কিল।

দরিত্রস্তক কাকিক্সা প্রাপ্যদুয়াদিতিন স্রুতিঃ ॥” গুণতত্ত্ব*।)

কাকিল (পুং) কু ঈষৎ কিরতি, কৃ-কৃ-ক্, কোঃ কাদেশঃ,
রস্ত্র লভ্। কর্ণমণি, গলদেশের মধ্যস্থিত উন্নত অংশ।

কাকী (স্ত্রী) কাকস্ত্র স্ত্রী। ১ কাকের স্ত্রী। ২ বায়নীলতা।
৩ কাকোলা। ৪ কর্কশ স্বর। ৫ (দেশজ) খুড়ী, গিছুবোর
পত্নী।

কাকীয় (ত্রি) কাকস্ত্র ইদম্। কাক-টঙ্। কাকসম্বন্ধীয়,
কাকের।

কাকু (জী) কক-উণ্। ১ শোকভরাধি ধারা স্বরবিহার।
২ বিকল্প অর্থবোধক স্বরবিশেষ। অনকারশাভেও এইরূপ
লক্ষণ কথিত আছে—

("ভিন্নকর্তব্যনির্ধারৈঃ কাকুরিত্যভিধীতে।"

সাহিত্যদর্পণ ২২৩।)

৩ দৈজ্যক্তি। ৪ বদ্বহর। ৫ জিহ্বা। ৬ উল্লাপ।

কাকুড় (দেশজ) কাকুড়। [ককৌটি দেখ।]

কাকুৎস্থ (পুং) ককুৎস্থন্ত নৃপতেরপাত্যাম্ পুমান্। ককুৎস্থ-
অণ্ (শিবাসিভোগ্যণ্। পা ৪।১।১১২।) ১ রামচন্দ্র।
২ বার্থে-অণ্। ককুৎস্থ রাজা। [ককুৎস্থ দেখ।]

কাকুৎস্থবর্ষা, দক্ষিণাংশের পলাশিকা ও বনবাসীর প্রাচীন
কদম্ব রাজ্য। তাঁহার পুত্রের নাম শান্তিবর্ষা। [কদম্ব দেখ।]

কাকুদ (কৌ) কাকুৎ দদাতি কাকু-দা-ক। তালু।

(তালু কাকুদম্। হেম ৩।২৪৯।)

কাকুদ্র (ত্রি) উদগাতা। (ঐতর্য্যেত্র ব্রা ৭।১।১)

কাকুপুর, অযোধ্যার একটি প্রাচীন নগর। কাণপুর হইতে
১০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বৌদ্ধরাজগণের সময়
ইহাই অযোধ্যার প্রধান নগররূপে পরিচিত ছিল। কোন
কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, এই কাকুপুর ভোটদেশীয় বৌদ্ধ-
গ্রন্থে 'বাগুদ' নামে অভিহিত হইয়াছে। কাকুপুর ও বিঠুরের
মধ্যে পঞ্চক্রোশী উৎপলারণা নামক পবিত্র স্থান।

এখন কাকুপুরে 'জজপুর' নামক একটি গড়ের ভগ্নাবশেষ
পড়িয়া আছে, সেই গড় প্রায় ১০০ বর্ষ পূর্বে চান্দেলরাজ
জয়পালকর্তৃক নির্মিত হয়।

এখানে ক্ষীরখর-মহাদেব ও অম্বাশার নামে দুইটি
বৃহৎ মন্দির আছে। প্রতি বর্ষে দেবতার উৎসব উপলক্ষে
একটি মহামেলা হয়।

কাকুভ (ত্রি) ককুভ ইদম্, ককুভ-অঞ। ১ ককুভ ছন্দো
প্রথিত গাথাধি। ২ দিক্ সঞ্চকীয়। ৩ ককুভের পুত্র।

কাকুবাদ (কৌ) কাক। দৈজ্যারেনণ বাদম্, ৩৩৭। দীনস্বরে উক্তি।

"কাকুবাদ করিয়া বহিলা করণটে।"

দাস পাছে দোষ পার ছুর্গার নিকটে॥"

রামেশ্বর—শিবারণ ১৩৪।

কাকুক্তি (জী) কাক। দৈজ্যারেনণ উক্তি: ৩৩৭। দীনস্বরে কখন।

কাকুতি (দেশজ) কাকুতি কাকুতি দীনভাবে অহরোধ।

কাকুৎসু (পুং) কাকৎ দৈবজ্ঞঃ বত্র তাদৃশ ইক্ষুঃ। ১ ভূপ-
বিশেষ, নলধাগড়া। ২ কাণবিশেষ।

কাকেন্দু (পুং) কাকন্ত ইন্দুবিব, আক্লানকবাৎ, ৩৩৭।

কুলিকবৃন্দ, মাকড়াকেন্দুগাছ।

কাকেকৈ (পুং) কাকন্ত ইষ্ট: ৩৩৭। নিমগাহ। [নিম্ব দেখ।]

কাকোচিক (পুং) কু কৈবৎ কোচী নকোচী কু-কুচ-গিনি-
বার্ধকন্ কো: কাদেশ:। কাকোচী বা কাউচীমৎত।

কাকোচী (জী) কাকোচ-জী। কাউচীমৎত।

কাকোড়ুস্বর (পুং) কাকপ্রিয়া উড়ুস্বর: মধ্যলো। কাক-
ডুস্বর।

কাকোড়ুস্বরিকা (জী) কাকোড়ুস্বর-বার্ধক-কন্-টাণ্-অভ-
ইক্ষম্। কাকডুস্বর বা কোঠডুস্বর গাছ। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—ফল, মলপু, জবনেফলা, মলপু, কলকলা, পজাঙ্গী,
রাজিকা, ক্ষুদ্রোদ্রস্বরিকা, কলবাটিকা, কলনী, কাকোড়ুস্বর,
ফলবাটিকা, বহুকলা, কুঠরী, অজাঙ্গী, চিত্রভেবঙ্গা, গাজ্জ-
নারী। বাদলার স্থানবিশেষে ধোখসাডুস্বর বা ডুস্বরী, হিন্দীতে
খোপ্লা, পঞ্জাবঅঞ্চলে ধুয়া বা দেগর কহে। (Ficus
oppositifolia) এই গাছ ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রাচীরের
পায়ে অথবা জমির উপর জন্মে। রাজনির্ধেটের মতে
ইহার গুণ—কষায়রস, শীতল, ত্রণনাশক, গর্ভরক্ষাবিবরে
হিতকারক ও স্তন-দুগ্ধ-বর্দ্ধক। এতদ্ব্যতীত তাবপ্রকাশে
কফ, পিত্ত, শ্লিথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, পাণ্ডু ও কামলা-নাশক এই
কয়েকটি অধিক গুণ লিখিত আছে।

কাকোদর (পুং) কু কুংসিতং অকতি কু-অক্-অচ্-কো:
কাদেশ:; কাকৎ বক্রগমনকারি উদরং যত বা বহত্রী। সর্প।

(কাকোদরো বিষধর: কণ্ডূঃ পূনাফু:। হেম ৪।৩৬৯।)

কাকোদ্রস্বরিকা (জী) কাকপ্রিয়া উদ্রস্বরিকা মধ্যলো।
কাকডুস্বর। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ক্ষুদ্রোদ্রস্বরিকা, খরপজী,
রাজিকা, ক্ষুদ্রোদ্রস্বরিকা, কুঠরী, ফলবাটিকা, অজাঙ্গী,
ফলনী, মলপু, চিত্রভেবঙ্গা ও গাজ্জনারী।

[কাকোড্রস্বরিকা শব্দে গুণ দেখ।]

কাকোরী, অযোধ্যাপ্রদেশের লক্ষ্মৌজেলার অন্তর্গত কাকোরি
পরগণার একটি নগর। অক্ষা° ২৬° ৫১' ৫৫" উঃ, দ্রাঘি°
৮০° ৪৯' ৪৫" পূঃ। নগরটি অতি প্রাচীন, পূর্বে এখানে ভার-
জাতির বাস ছিল, এখন লক্ষৌ এর উকীলমোক্তারগণের প্রিয়
আবাস স্থান। এখানে অনেক মূল্যমান পীরের গোরস্থান
আছে। লোকসংখ্যা ৭৪৬২। এখানে সপ্তাহে দুইবার
হাট বসে।

কাকোল (পুং, কৌ) কু কুংসিতং তীব্রতরং বধা ভাতধা
কোলতি গীড়য়তি কু-কুল-বঞ, কো: কাদেশ। ১ ককবর্ণ
হাবর বিববিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—উগ্রভেলঃ,
ককচ্ছবি, মহাবিধ, গরল, ক্ষুভ, বৎসনাভ, প্রদীপন,
শোকিকের, ব্রহ্মপুত্র ও বিব। ২ (কৌ) কাকেন্দুভার্যতে

ভক্ষ্যতে অজ্ঞ, পুষ্যদরাদিভ্যাং সাধুঃ। নরকবিশেষঃ। ৩ (পুং)
 ঈড়কাক। ৪ সর্প। ৫ শূকরবিশেষ। ৬ কুলাল, কুলকার।
 ৭ কাকোলী নামক ঔষধবিশেষ।

কাকোলী (স্ত্রী) কাকোল-ভীষ (বিন্ গৌরাদিত্যশ্চ। পা
 ৪।১।৪১।) ঔষধবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মধুরা,
 কাকী, কালিকা, বারসোলী, ক্ষীরা, শ্রাজ্জিকা, বীরা, শুক্লা,
 ধীরা, মেহুরা, শ্রাজ্জিকালী, বাদুমাংসী, বরঃহা, জীবনী, শুক্ল-
 ক্ষীরা, পরশ্বিনী, পরশ্বা ও গীতগাকী। রাজনির্ঘণ্টের মতে
 ইহার গুণ—মধুরস, স্নীতল, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক এবং ক্ষয়রোগ,
 পিত্ত, বাতব্যাদি, রক্তদোষ, দাহ ও জরনাশক।

কাকোলুক (স্ত্রী) কাকশ উলূকশ নিভারিরোদিভ্যাং সমা-
 হার ষন্ডঃ। সমবেত কাক ও পেচক।

কাকোলুকিকা (স্ত্রী) কাকোলুক-বৃন্ (বৃন্দাবন্ বৈরমৈথুনি-
 কয়োঃ। পা। ৪।৩।১২৫।) টাপু। কাক ও পেচকের
 স্বাভাবিক শত্রুতা।

কাকোলুকীয় (পুং) কাকোলুকমধিকৃত্য কৃতো গ্রহঃ কাকো-
 লুক-হ। কাক ও পেচকের আখ্যান অবলম্বন করিয়া
 লিখিত পুস্তকবিশেষ।

কাকোলাদি (পুং) কাকোলী প্রভৃতি কতকগুলি বৈদ্যকোক্ত
 দ্রব্যের সংজ্ঞা।

“কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগপর্ণী,
 মাষপর্ণী, মেদা, মহামেদা, শুলক, কর্কটশৃঙ্গী, বংশলোচন, ক্ষীরী,
 পদ্মক, প্রপৌণ্ডরীক, ঋক্ষি, বৃক্ষি, মুখিকা, জীবন্তী ও মধুক
 এই কয়েকটি দ্রব্য কাকোলাদিগণের অন্তর্গত। ইহার
 রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক এবং প্লৈয়, শুক্র, আয়ুঃ ও শুক্রবর্দ্ধক।”
 (সুশ্রুত-সূত্র-৩৮ অঃ।)

কাকোঠক (পুং) কাকত ওষ্ঠ ইব কারতি প্রকাশতে কাক-
 ওষ্ঠকৈ-ক। কর্ণবন্ধের আকৃতিবিশেষ; মাংসশূভ সংক্ষিপ্ত অগ্র-
 দেশ এবং অন্ন রক্তবিশিষ্ট কর্ণপালিকে কাকোঠকপালি কহে।

(“নির্মাণসংক্ষিপ্তাগ্রাংশপণিতপালিঃ কাকোঠক পালি-
 রিতি।” সুশ্রুত সূত্র ১৬ অঃ।)

কাক (পুং) কুংসিতং অক্ষং বজ্র, কোঃ কাদেশঃ (কা পথ্য-
 কয়োঃ। পা ৬।৩।১০৪।) ১ কটাক।

(অপাঙ্গদর্পনঃ কাকঃ কটাকো হসিকি বিকুলিতম্। হেম ৩।২৪২।)

২ (কর্ষণ) কুংসিত চকু।

কাকসেনি (পুং) অভিপ্ৰতারণী নামান্তর।

কাকী (স্ত্রী) ককে কজে ভবঃ কক-অণ্ (তজ ভবঃ। পা ৪।
 ৩।৫০।) ভীপ্। ১ অড়হর। ২ সৌরাষ্ট্রযুক্তিকা।

(কাকী কুয়িকারিক সৌরাষ্ট্রযুক্তিকা জিহাম্। মেদিনী।)

কাকীব (পুং) কু লীষৎ কীবরতি কীব-গিচ্-অচ্ কোঃ
 কাদেশঃ। ১ সজিনাগাছ। ২ গৌতম ঋষির ঔলীনরী নারী
 শূদ্রাণীর গর্ভজাত পুত্রবিশেষ।

(“শূদ্রায়াং গৌতমো বল মহাত্মা সংশিতভ্রতঃ।

ঔলীনর্যামল্লনয়ং কাকীবাদ্যান্ হুতান্ মুনিঃ।” ভারত সভা।)

কাকীবক (পুং) কাকীএব-সার্থে কন্। সজিনাগাছ।

কাকীবত (পুং) কাকীবতো মূনেরপত্যম্ পুমান্ কাকীবৎ-অণ্।

১ কাকীবৎ ঋষির পুত্র। (জি) ২ কাকীবৎ ঋষি সম্বন্ধী।

কাকীবতী (স্ত্রী) কাকীবত-ভীপ্। ব্যাধিতাৎয়ের স্ত্রী, ইহার
 নাম ভদ্রা। (ভারঃ আদি ১২১ অঃ।)

কাকীবান্ [৭] (পুং) ১ শূদ্রাগর্ভজাত দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র
 বিশেষ। ২ চণ্ডকৌশিকের পিতা গৌতম। ৩ রাজবিশেষ।
 (ভারঃ আদি ১ অঃ।)

কাথড়া (দেশজ) ১ জলজন্তুবিশেষ। [কুলীর দেখ।] ২ গাছ-
 বিশেষ। (Curcuma zerumbet.)

কাগ (পুং) কা ইতি শব্দং গায়তি কা-গৈ-ক। কাক।

কাগজ (পারসীক শব্দ) “কাগজ” যে কি জিনিস, তাহা
 আর আজ কাল কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। পৃথিবীতে
 এমন দেশ অতি অল্পই আছে, যেখানে কাগজ নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। যথা,—

উত্তর-ভারত ও পারস্ত	...	কাগজ।
আরব	...	কর্তাস্।
তামিল	...	বরক।
দেয়ার্ক	...	পেপির।
ফ্রান্স ও জার্মানী	...	পেপিয়ার।
ইতালী ও প্রাচীন লাতিন	...	কার্টা বা চার্ট।
পর্্তুগীজ ও স্পেন	...	পেপেল।
সুবিয়া	...	মুন্সান্।
ইংলও	...	পেপার।

অপ্রাচীন তাত্ত্বিক সংস্কৃত গ্রন্থে ‘কাগদ’ নাম পাওয়া যায়।

এখন সকল দেশেই প্রধানতঃ লিখনকার্যে কাগজ
 ব্যবহৃত হয়। এই সকল কাগজও আজ কাল প্রধানতঃ
 নানাবিধ বাষ্পীয় যন্ত্র সাহায্যে রূপ, আমেরিকা ও এশি-
 য়ার প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু এখনও এশিয়ার দক্ষিণ ও
 পূর্বপ্রদেশসমূহে হাতে হাতে যথেষ্ট পরিমাণে কাগজ
 প্রস্তুত হয়। এই সকল কাগজ হুর্দ্বা ও বিশেষ বিশেষ
 কার্যে ব্যবহৃত হয়। ভারত, পূর্ব-উপদ্বীপ, চীন, জাপান,
 পারস্ত প্রভৃতি দেশেই ঐরূপ হাত-গড়া কাগজের বেশী
 আদর দেখা যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার, ভূটান, নেপাল, আন্ধ্রাবাদ, সুরাট, ধারবার কোলাপুর, আরকাবাদ ও দৌলতাবাদে ঐরূপ হাত-গড়া কাগজ যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। আরকাবাদের কাগজ সর্কাপেকা উৎকৃষ্ট; দেশীয় রাজস্ববর্গ এই কাগজের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই কাগজ সর্কাপেকা মসৃণ, চিক্ল ও অদৃশ্য হইয়া থাকে। ইহার পরই দৌলতাবাদের “বাহার খানি” ও “মাধাগরি” কাগজ সমধিক আদৃত হয়। এই দুই কাগজ প্রস্তুতের সময় ইহার মধ্যে স্বর্ণের সূক্ষ্মপাত মিশিয়া দেয়, তৎপরে কাগজ প্রস্তুত হইলে কাগজখানির সর্বত্র ঐ স্বর্ণের সূক্ষ্মাংশ-সকল ছড়াইয়া পড়ে, দেখিতে অতি চমৎকার শোভা হয়;— এই কাগজের নাম “আফশানি কাগজ”। দেশীয় রাজন্য-গণ এই আফশানি কাগজে রাজকীয় কার্যাদি করিয়া থাকেন। এই সকল হাত-গড়া কাগজে দলীল, সনন্দ, ছাড় প্রভৃতি লিখিত হইয়া থাকে।

যাহার উপর লেখা যায়, সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে পত্র বলে। বাঙ্গালা ভাষায় চলিত কথায় “পাতা” বা “পেতে” বলিলে যে অর্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে, সংস্কৃত পত্র শব্দের যথার্থ অর্থ তাহাই। কিম্বদন্তি অনুসারে, পত্র ও লিখন-প্রণালীর উৎপত্তি হইল তৎসময়ে একটি কোতুহলজনক অথচ সমূলক প্রমাণ রঘুনন্দনের জ্যোতিষতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়,—

“বাগ্মনিকৈ তু সংপ্রাপ্তৌ ভ্রাত্ত্বি-সংস্কারতে বতঃ।

ভ্রাত্ত্বাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রাঙ্কঢাক্ততঃ পুরা ॥”

অর্থাৎ ছয়মাস অতীত হইলে ভ্রম উপস্থিত হইল দেখিয়া বিধাতা কর্তৃক পূর্বকালে অক্ষর সৃষ্ট হইয়া পত্রাঙ্কঢ হইল। ছয় মাসের পর যে অধিকাংশ কথাই ভুল হইয়া যায়, তাহা একান্ত সত্য।

জগতের উন্নতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে প্রথমেই কাগজের উপর কালি কলম দিয়া লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই। কাগজ আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে কিসে লেখা হইত, কিসে কাগজ সৃষ্টি হইল, প্রথমে কোন দেশে কাগজ সৃষ্টি হয় ও কি কি জব্য হইতে কিরূপে এখন কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

১। কাগজ প্রস্তুত হইবার পূর্বে কি কি সামগ্রী লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত?

(ক) প্রস্তর ও কাঠ—সর্বান্য প্রস্তর ও কাঠই লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। অতি প্রাচীনকালে কাঠে ও প্রস্তরে

অক্ষরাদি খুদ্রিয়া রাখিতব্য বিষয় সকল লিখিত হইত। কালদীয়া-প্রদেশের প্রাচীন সমাধিস্তম্ভের এবং মিশরদেশের পিরামিডের গায়ে খোদিত অস্পষ্ট অক্ষরমালাই ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন।

(খ) ইটক—প্রাচীন কালদীয়ার উপর আপনাদিগের জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণাদির ফলাফল উৎকীর্ণ করিয়া রাখিত। এইরূপ লিপি-বিশিষ্ট ইটক এখন কোন কোন যুরোপীয় বাহুবরে সংরক্ষিত আছে।

(গ) সীসা—প্রাচীনকালে সীসার উপরে দলীলাদি খুদ্রিয়া রাখিবার প্রথা ছিল। কথিত আছে যে, হিসরিডের “গ্রহাবলী ও তাহার সময়” নামক পুস্তক একটি বৃহৎ সীসার টেবিলে খোদিত হইয়াছিল ও বহুদিন পর্যন্ত মেসি-সের মন্দিরে রক্ষিত ছিল। সীসার পাত হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া পাতলা করিয়া লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোমনগরে এইরূপ সীসার খোদিত একখানি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহার আকার ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩ ইঞ্চি প্রশস্ত। ইহাতে প্রাচীন মিসরীয় অস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত।

(ঘ) পিত্তলাদি—রোমনগরে সাধারণ প্রস্তাবাদির ফলাফল সেকালে পিত্তলে খোদিত হইত। প্রাচীন রোমীয় সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পিত্তলের বগলে বা তলবারের খাণ্ডে আপনাদিগের “ইচ্ছাপত্র” (Wills) লিখিয়া রাখিত। ১২ ঘরার আইন (Laws of 12 tables) পিত্তলে খোদিত হইয়াছিল। রোমীয় সম্রাট তেলেপীয়ানের রাজত্ব-কালে যখন অগ্নিদাহে রাজধানী পুড়িয়া যায়, তখন প্রায় ৩০০ হাজার পিত্তলের পাত নষ্ট হইয়া যায়; ঐ সকল পাতের কত প্রয়োজনীয় আইন ও দলীলাদি ভস্মীভূত হইয়া যায়। সিরীয়ার প্রাচীন মঠে ডাক্তার বুকানন ৬ খানি ধাতুকলক পাইয়াছিলেন। সে গুলি ধাতু-বিমিশ্রিত। ৬ খানি ধাতুকলকে প্রায় ১১ পৃষ্ঠা হইবে। ইহা পেরেকের মাথার দ্বারা বা ত্রিকোণাকার অক্ষরে লিখিত। কোচীনের রিহনীদিগের নিকটেও এইরূপ কয়েকখানি ধাতুকলক আছে।

(ঙ) কাঠ—সোলনের আইনগুলি কাঠের উপর খোদিত; এই কাঠের আইন পুস্তকের নাম অক্সোনস (Axones)। ঐ আইনের কতকগুলি আবার প্রস্তরের উপরেও খোদিত আছে; এই প্রস্তর-লিপির নাম গ্রীক-ভাষায় “কিরবিস” (Kyrbies)। হোমরের সময়ের পূর্বে তালিকা পুস্তকগুলিও (গ্রীসের) কাঠে খোদিত হইত। বক্স ও নেবু গাছের কাঠ এবং হাতীর ঠাঁতই এই সকল

কার্যে অধিক ব্যবহৃত হইত। তখন এই সকল পাতের উপর যোন মাথাইয়া খুঁটি (বর্গ, মৌণ্য, পিত্তল, লৌহ বা তামার স্ফুটন শলাকা) দিয়া আঁচড়াইয়া লিখিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল। এই সকল লিখিত কাঠকলক-গুলি একত্র বাঁধিয়া রাখিলে যে পুস্তক হইত, তাহাকে “কডেক্স” (Codex) অর্থাৎ পুঁথি বলিত। ইহার উপরে সময়ে সময়ে খড়ির গোলা দিয়াও লিখিত হইত। বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে সামান্ত সামান্ত মুদ্রির দোকানে এই প্রকারের বস্ত্র আজিও দেখা যায়। তাহারা ৩ খণ্ড ৬×৪ ইঞ্চি কাঠ একত্র দড়ি দিয়া গাঁথিয়া রাখে। দড়ির সহিত একটি পেরেক বাঁধা থাকে। খণ্ডগুলিতে মোনের সহিত ভূষা মাথাইয়া রাখে। কেনাবেচা করিতে করিতে যে সময়ে কোন ধারের হিসাব বা অন্য কোন হিসাব চুকিয়া রাখিবার আবশ্যক হয়, তাহাই ইহাতে পেরেক দিয়া লিখিয়া রাখে। হিন্দুস্থানীরা একখণ্ড ১ ফুট×১১ ফুট তক্তায় লিখিয়া থাকে। ইহারা আরই কবির কলমে খড়িগোলা দিয়া লিখে। পূর্বে এইরূপ কাঠকলকে চিঠি লিখিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাঁটের উপর মোহর করিয়া দিত। সলোমন-পুস্তকালয়ে এইরূপ ২ ফুট ৬৬ ইঞ্চি কাঠে লিখিত তক্তা আছে। চীনেরাও কাঠের তক্তা লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত।

(৮) পাতা—প্রাচীনকালে অধিকাংশ জাতিই বৃক্ষ-পত্রকে লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত। আফ্রিকার মিসরীয়েরা সর্বপ্রথমে তালপত্র ব্যবহার করিতে লিখে। সিরাকিউসের জলেরা জলপাইগাছের পাতায় নির্কাসনদণ্ডের আসামীগণের নাম লিখিতেন। ভারতে, সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে তালপত্র যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। ব্রহ্মদেশে কোন পুস্তক লুপ্ত করিয়া লিখিতে হইলে, হাতীর দাঁতের পাতের উপর লিখিত। হাতীর দাঁতের পাতগুলি প্রথমতঃ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহার উপর অর্ণবের বা মৌপোর হল করিয়া অক্ষর লিখিত। উড়িয়া ও সিংহলীরা “তালিপত” গাছের পাতা ব্যবহার করে; এই পাতা খুব চওড়া ও পুরু। ইহার উপরে অক্ষরগুলি স্পষ্ট করিবার জন্য খুঁটি দিয়া লিখিয়া কয়লার গুঁড়া মাথাইয়া মুছিয়া ফেলিত। এখনও সিংহলে তালিপত ও ভারতে তালপত্রের বহুল ব্যবহার আছে। ৮ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতবর্ষে যতগুলি প্রাচীন তালপত্রের পুঁথি দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১৮০ সখতের পুঁথি সর্বাধিক প্রাচীন।

(৯) বৃক্ষবৃক্ষ—এক সময়ে পৃথিবীর সর্বত্রই বৃক্ষ লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন কালদীর্ঘবয় বৃক্ষের

আভ্যন্তরীণ বৃক্ষকে লেবার (Lober) বলিত ও লেবারকে ব্যবহার করিত। এই লেবার হইতেই লেবার অর্থে এখন পুস্তক বুঝায়। ব্রহ্মদেশীয়েরা বাঁশের চেয়ারের উপর পবিজ পুস্তকাদি লিখিত। সুমাত্রাবীপের বৃট্টালাতি আঁজ ও একপ্রকার বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ ছালের উপর লিখিয়া থাকে। তাহারা এই ছাল লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া চারকোণা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দেয়। রজন বা টার্পিন তৈলের বৃক্ষ-জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের রসে ইক্ষুরস মিশাইয়া কালি প্রস্তুত করে। সাধারণতঃ ব্যবহারের জন্য ইহারা বাঁশের গাঁঠের গায়ে যে মোচার খোলার মত খোলা (অসিকলক) থাকে, তাহাতেও লিখিয়া থাকে। বড়লিয়ার লাইব্রেরীতে মেক্সিকোদেশীয় অস্পষ্ট সাংকেতিক অক্ষরে লিখিত এক-খানি পুস্তক আছে, তাহার অক্ষরসমূহও বৃক্ষের উপর চিত্রিত। ভারতের মালাবার উপকূলবাসীরা আজিও প্রাচীনতঃ বৃক্ষের উপরেই লেখা পড়া করে।

(১০) রেশমীবস্ত্র খণ্ড—প্রিন্স বলেন রেশমীবস্ত্রের উপর লিখনকার্য্য সেকালে অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই সকল রেশমীবস্ত্রের পুস্তকাদিতে ম্যাজিষ্ট্রেট-গণের নাম ও সাধারণের দলীলাদি লেখা হইত। মিসরের লোকেরাও এরূপ পুস্তকে রক্ষিতব্য বিষয় লিখিয়া রাখিত।

(১১) পত্চর্ম্ম—প্রাচীনকালে এক সময়ে কোথাও কোথাও লোকে পত্চর্ম্মের উপর লিখিত। প্রাচীন যোনজাতি পুস্তকে “ডেপ্টের” (Deptere) বা চর্ম্ম (t) বলিত। বিব্লস্ (Biblos) গাছ যখন হুপ্রায়া হইয়া উঠিল, তখন ছাগল ও ভেড়ার চামড়াই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। খৃঃ পূঃ ৭ শতাব্দীতে কন্ঠটিনোগলে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তাহাতে একজাতীয় সর্পের উদ-রের চর্ম্ম পুড়িয়া যায়। এই সকল সর্পচর্ম্মে গ্রীকদিগের মহাকাব্য “ইলিয়াড” ও “অডেসি” স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল।

(১২) পার্চমেন্ট ও বিলাম্—ছাগ ও মেঘচর্ম্মকে রীতি অনুসারে এরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে তাহার উপর “ছাপা” হইতে পারে; এইরূপ প্রস্তুত করা চামড়ার নাম পার্চমেন্ট। স্ক্রু ও উৎকৃষ্ট পার্চমেন্টের নাম বিলাম্। বিলাম্ সকল চামড়ার হয় না; অকালপ্রস্তুত বা হৃৎপারী গো-বৎসের চর্ম্মে মাত্র প্রস্তুত হয়। প্রাচীন-কালে রিহনীর ইহার উপর আইনাদি লিখিত। পারসীকরা ইহাতে স্বদেশ-প্রচলিত গল্প বা ইতিহাস লিখিত। দলীলাদি লিখিবার জন্য ইহা এখনও ব্যবহৃত হয়। ড্রুসডেনে মাই-

ত্রেরীতে হমাণকীর চর্মে লিখিত একখানি মেক্সিকো-পঞ্জিকা ও ভিয়েনা লাইব্রেরীতে একখানি পুস্তক আছে।

(ট) প্রস্তুত করা চামড়া (লোন তুলিয়া পিটরা পরিষ্কার করিয়া যে চর্ম নানাবিধ কার্য্যেব্যবহাৰী করা হইয়াছে)—একশ চর্মে আরবীরেরাই অধিকাংশ লিখিত।

এইরূপ চর্মে ৫৭ পাতার একখানি চিত্র-বিচিত্র অক্ষরে লিখিত পুস্তক দেখা গিয়াছে।

২। কাগজের সৃষ্টি—প্রথমদেই একেবারে অশুভমান্ পদার্থের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই। প্রথমে তৃণ ও বৃক্ষাদির অংশবিশেষ হইতে কাগজবৎ একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের মতে পেপিরাস্ (Papyrus Antiquorum বা বাইবেল মতে ইংরাজী “বুলরাস্” Bulrush) নামক তৃণের মূলদেশ হইতে প্রস্তুত কাগজই সর্ক্যাপেকা প্রাচীন। ইহা হইতে যে কাগজ প্রস্তুত হইত, তাহাকে “পেপিরাস পেপার” বা সংক্ষেপে “পেপিরি” বলিত। ভাস সাহেব রচিত Exodus নামক গ্রন্থে দেখা যায়, খৃষ্টের ১৪০০ বৎসর পূর্বেও পেপিরির বহুল প্রচলন ছিল এবং খৃষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পরেও এই পেপিরি ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই তৃণশরের ভাস জলা জমীতে হইয়া থাকে। মিসরদেশে, সিরীয়ার ও সিসিলীরূপে এই তৃণ জন্মে। সিরীয়ার ইহাকে বেবির (Babeer), গ্রীকেরা ইহাকে বিব্লস্ (Biblos) এবং উত্তরদেশে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা সাইপেরাস সিরিয়াকাস (Cyperus Syriacus) বলেন। ইহা প্রায় ৮ ফুট হইতে ১২ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার পাতা কিন্তু শরের পাতার মত নহে, আমাদের দেশীয় ঝাউ গাছের পাতার ধরণ যেরূপ, এই তৃণের অগ্রভাগেও সেই ধরণের ৮টা মাত্র পাতা হয়। ইহার সর্ক্যাদে পাতা থাকে না বা শরের ভায় গাঁট থাকে না। ওলের ডাঁটার মত গাছটি সরল হইয়া উঠে ও মাথার উপর ওলের পাতার মত ৮টি পাতা ছত্রাকারে বিস্তৃত হয়, আর সেই পাতার গা দিয়াই ঝাউপাতার মত নৃক্ষ নৃক্ষ পত্রাংশ সকল ছুলিয়া পড়ে। ইহার গাজের বর্ণ সবুজ, কিন্তু গোড়ার দিকের যে অংশ জল ও কর্দম মধ্যে থাকে, সেটুকু অপেক্ষাকৃত বেতবর্ণ। এই অংশের ছাল অতি পাতলা এবং মোটার খোলায় মত। ইহার ঐ অংশে ১১২০টি খোলায় জাঁক হইয়া থাকে। এইগুলি সাবধানে খুলিয়া লইয়া আড়ভাবে পরস্পর ধারে ধারে জুড়িয়া লইলেই সেকালের পেপিরি কাগজ প্রস্তুত হইত। ঐ ছাল জুড়িতে সেকালে

শিরীষ বা ভজ্জণ কোন আঠা ব্যবহৃত হইত না। পেপিরাস্ বাসের গোড়া মাছের বাহর মত মোটা হইয়া থাকে, সুতরাং যে গাছের গোড়া বত মোটা ঐ পেপিরি কাগজও ততটা চওড়া হইত। এই ছাল আবার বত ভিতরের হয়, ততই পাতলা হইয়া থাকে বলিয়া সেকালে নানাপ্রকার পুর ও পাতলা ‘পেপিরি’ প্রস্তুত হইত। যে পেপিরি সর্ক্যাপেকা নৃক্ষ হইত, তাহাকে গ্রীকেরা “হেরিটিকা” বলিত, কারণ এই শ্রেণীর পেপিরি কেবল মিসরীয় রাজকগণ ব্যবহার করিতেন, অপর সাধারণ বা বিদেশীয় বণিকেরা ক্রয় করিতে পাইত না। মিসরীয় রাজকেরা ইহার উপর ধর্ম-কথা লিখিয়া বিক্রয় করিতেন মাত্র। এ সময় মিসরীয়েরাই পেপিরি প্রস্তুত করিতে জানিত, সুতরাং গ্রীকেরা ঐ প্রথম শ্রেণীর “পেপিরি” প্রস্তুত করিয়া লইতেও পারিত না। রোমকেরাও ঐ লজ্জ “হেরিটিকা” পেপিরি পাইত না; কিন্তু শেষে তাহারা উহা ব্যবহার করিবার উপায় করিয়া লয়। রোমসম্রাট অগস্তাসের সময় রোমকেরা মিসর হইতে রাজকগণের লিখিত ‘হেরিটিকা’ ক্রয় করিয়া আনিত এবং এক প্রকার ঔষধ দিয়া ঐ সকল লেখা ধুইয়া ফেলিত। এই ঔষধটিও তাহারাই উদ্ভাবন করে। এইরূপে ধুইয়া ফেলিয়া রোমক বণিকেরা বিদেশীয় সম্রাটের নামানুসারে উহার “অগস্তাস্” কাগজ নাম দিয়াছিল। উক্ত শ্রেণীর ষ্টিক পরবর্তী পেপিরি কাগজকে রোমকেরা অগস্তাস্-পত্নীর নামানুসারে ‘লেভিয়ান’ বলিত। শেষে যখন তাহারা নিজে পেপিরি প্রস্তুত করিতে শিখিল, তখন ঐ দুইশ্রেণী ব্যতীত ‘অ্যান্টি-থিয়েট্রিকা’ ‘ফ্যানিয়ানা’ ‘এম্পোরটিকা’ ‘ক্লডিয়া’ প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পেপিরি প্রস্তুত করিত। প্রিন্সি ইতিহাস পড়িলে বুঝা যায় যে, তখন গ্রীস বা রোমে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পেপিরি প্রস্তুত করিতে মিসরদেশীয় নীলনদের জল একান্ত আবশ্যক, কারণ নীলনদের জলে স্বভাবতই এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ আছে, তদ্বারা পেপিরির ছাল-গুলি জুড়িবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত। পেপিরির ছাল-গুলিকে ছাঁটিয়া সমান করিয়া ধারে ধারে মিলাইয়া একটি টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়া নীলনদের জল ছিটাইয়া দিয়া, কিরংকণ পরে রোজে শুকাইয়া লইলেই পেপিরি প্রস্তুত হইত; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, পেপিরি-ছাল ভিজিলেই উহা হইতে এক প্রকার আঠা-রস বাহির হইয়া থাকে এবং শুকাইলে তাহাতেই ছালগুলি জুড়িয়া যায়।

তৎপরে কিরূপে কি উপায়ে অশুভমান্ পদার্থকে মণ্ড করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়, তাহা

জানিবার উপায় নাই, তবে অমূল্যবিশ্বাস-পর্যায় স্থায়ীগণ অমূল্য করেন, যেমন বোলতা, ভীষ্মক ও মৌমাছির ঠাক দেখিতে অনেকটা কাগজের স্তর এবং উহা বৃক্ষাদিজাত পদার্থ হইতেই প্রস্তুত। উক্ত পতঙ্গেরা ধ্বংসে বৃক্ষাংশ বিশেষকৈ তরলাকারে পরিণত করিয়া অণুপ্রমাণে মুখে করিয়া আনিয়া বৃহৎ বৃহৎ চাক এবং বিস্তৃত ডিম্বকোষ সকল প্রস্তুত করে, সেই উপায়ের অমূল্য করিয়াই বোধ হয় কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় খৃষ্টীয় ১৫ অব্দে চীনেই অমূল্য পদার্থ হইতে সর্ব প্রথমে কাগজ প্রস্তুত করে।

কৃষ্ণচিরসময় চীনেরা বাঁশের আভ্যন্তরীণ ছালের উপর তীক্ষ্ণমুখ লেখনী দিয়া আঁচড়াইয়া লিখিত। তৎপরে ইহারা সেই বাঁশেরই ছাল, তুলা, রেশম ও অজ্ঞাত গাছের ছাল হইতে মণ্ড করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিতে শিখে। হানবংশীয় হোটি নামক চীনমন্ত্রাটের রাজত্বকালে কতকগুলি বৃক্ষের ছাল, পুরাতন মাছ-ধরা জালের ছিন্নাংশ, শণ ও রেশম একত্র সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিত এবং এই মণ্ডেই কাগজ হইত। কাগজ প্রস্তুত করিতে ইহারা সেই প্রাচীনকালে যে সকল যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছিল, একালে তাহারই উন্নতি করিয়া তাহার সাহায্যে উত্তমোত্তম কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। এখন চীনে নানাবিধ কাগজ হইয়া থাকে। ইহাদের দেশীয় হো-সি নামক খড়ের কাগজ এত অধিক প্রস্তুত হয় যে, ইহারা তদ্বারাই শব্দাহ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় ঐতিহাসিকেরা কাগজের উৎপত্তি সম্বন্ধে চীনকেই প্রথম পদবী দিন আর যাহাকেই দিন, গ্রীক ইতিহাসে কিন্তু যথার্থ কথা জানা যায়। পঞ্জাববিজয়ী গ্রীক-মন্ত্রাট আলেকজান্ডারের সেনাপতি নিয়ারকাস লিখিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে তিনি ভারতবর্ষে উত্তম মসৃণ চিত্রণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী একপ্রকার 'তুলা-চাপড়ান' জিনিসের উপর বাণিজ্যাদির আদান প্রদানের হিসাব লিখনের বহুল প্রচলন দেখিয়াছিলেন। এই তুলা-চাপড়ান সম্ভবত তুলাত বা তুলট কিম্বা তুলট কাগজের অমূল্য হইবে। মাকিদনরাজ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন খৃষ্টজন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্বে, স্মরণ্য তাহার অনেক পূর্বে হইতেই যে ভারতে তুলটের জায় কোন প্রকার লিখিবার কাগজের প্রচলন ছিল, তাহা নিশ্চয়। অনেকে মনে করেন, বিলাতী কাগজে বা আধুনিক কালের কাগজে হরিতাল মাথাইলেই তুলট কাগজ প্রস্তুত হয়; কিন্তু তাহা নহে। পূর্বে মালদহ জেলায় এই তুলট

কাগজ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। দেশ বিদেশেও এই কাগজের বেশ আদর ছিল, একজ প্রতিবৎসর মালদহ হইতে নানা প্রকারের তুলটকাগজ দেশ বিদেশে রপ্তানি হইত। সে কালে ইংরাজেরাই চীনদেশীয় একশ্রেণীর কাগজকে "India-proof" নাম দিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই কাগজ পূর্বে চীন দেশে উৎপন্ন হইত না, সর্বপ্রথমে ভারত হইতে চীনে রপ্তানি হইয়া থাকিবে; কারণ তাহা হইলে গুরুপ নামকরণ কেন হইবে? এবং চীনের সহিত ভারতের যে অন্তর্জাণিজ্য পূর্বে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। ৪।৫ শত বৎসর পূর্বে মালদহে এই কাগজের ব্যবসার বেশ বিস্তৃত ছিল; এক শ্রেণীর লোকের ইহাই উপজীবিকা ছিল। এখনও অনেক প্রাচীন কর্মচারের ঘরে সাতিনের স্তর উজ্জ্বল ও মসৃণ এক প্রকার কাগজে বাদশাহী সনন্দ, ছাড় ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পুরাতন দেশী কাগজ গোড়ে প্রস্তুত হইত। আমরা তুলট কাগজে লিখিত ছয় সাতশত বর্ষের প্রাচীন পুথি দেখিয়াছি। ভারতবর্ষে মুসলমানেরাও কাগজের ব্যবসা করিত। মুসলমান তীর্থীরা যেমন 'জোলা', 'মুসলমান মন্তাজীবীরা' যেমন 'নিকারী' ইত্যাদি আখ্যা পাইয়াছে, সেইরূপ সেকালের কাগজ-ব্যবসারী মুসলমানেরা 'কাগজী' আখ্যা পাইয়াছিল। এখনও কাগজী-মুসলমানেরা ঢাকা অঞ্চলে 'কাগজ' প্রস্তুত করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে। কলিকাতার বিগত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে (১৮৮৩-৮৪) কয়েক প্রকার পাটের কাগজ, ঢাকা মুসলিমজের 'মেঘু কাগজী' প্রস্তুত এক প্রকার কাগজ, শাহাবাদ সাঙ্গেরাম হইতে ৪ প্রকার দেশী কাগজ, বহরমপুর-কর্ণহোলি (মুজ্জফরপুর) হইতে দুই প্রকার দেশী কাগজ, এবং ভুটান হইতে এক প্রকার বৃক্ষের ছালের কাগজ প্রদর্শিত হয়। ভুটিয়া কাগজে প্রায় পোকা লাগে না। এই কাগজই সুদৃশ্য ও মসৃণ বলিয়া বিখ্যাত।

পূর্বে পারস্যে কঠিন বৃক্ষ স্বক হইতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত। এই স্বকের নাম তুস বা তুজ। প্রাচীন পারস্যেরা এই তুজ চামড়ার সহিত মিশাইয়া কাগজ প্রস্তুত করিত। তাহারাই এই কাগজ বহুল ব্যবহার করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে পঞ্জাবাদি উত্তরভারতেও এই কাগজ আসিত।

মুসলমান ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদের কতকগুলি গ্রন্থ মেবের স্বাক্ষারিত পাতে লিখিত হইয়াছিল।

৩। বিলাতী কাগজের ইতিহাস—

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, চীনেরাই খৃষ্টীয় কালারম্ভের সময়ে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্ম শণ, রেশম ও স্থির

বস্ত্রাদি হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিবার উপার উদ্ভাবন করে। আরবেয়া ইহাদের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া ৭০৬ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দ সহরে প্রথম কারখানা স্থাপন করে। তাহাদিগের নিকট হইতে ঐ কাগজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে যুরোপে প্রচারিত হয়। এই সময়েই সর্বপ্রথম স্পেনদেশে তুলা হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা স্থাপিত হয়। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ভেলেন্সিয়া প্রদেশের প্রাচীন নগর ক্লেটিভা নগরের কারখানার কাগজ সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইয়া উঠে। এই কাগজ পূর্ব ও পশ্চিমে সকলদেশে রপ্তানি হইত। ক্রমে ভেলেন্সিয়া ও টেলেডো প্রদেশের খুটানেরা কাগজের কারখানাগুলির বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যুরোপের সর্বত্র তুলার কাগজ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতে থাকে। সেই সময়কার কাগজে লিখিত একখানি দলীল উত্তর সিরিয়া প্রদেশের গস নগরের মঠে রক্ষিত আছে। দলীলখানি রোমসম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আদেশপত্র। ইহাতে ১২৪২ খৃষ্টাব্দের তারিখ দেওয়া আছে। অবশেষে ১৪শ শতাব্দীতে শণ ও রেশম হইতে বেশী পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় এবং তুলার কাগজ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তখন তুলার কাগজ বড় বেশী দৃঢ় হইত না। সেকালে শূণ্যাদি হইতে যে কাগজ প্রস্তুত হইত, বর্তমান প্রাণালীর জায় তখন শণ ধৌত করিয়া শাদা করিয়া ফেলিত না, কেবল উহার আঠা ধুইয়া ফেলিত। এই সকল কাগজে শিরীষ মাখাইয়া দিলে আরও দৃঢ় হইত। সেই সকল কাগজ যাহা আছে, তাহা আজও বিলক্ষণ মজবুত ও সমান উজ্জ্বল আছে; দেখিলেই প্রশংসা করিতে হয়। ১৪শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনে শণ রেশমাদির কাগজের কারখানা যথেষ্ট হইয়াছিল। জর্মনিতে মুরেবর্গনগরে ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে আর ইংলণ্ডে ১২৫০ খৃষ্টাব্দে হার্টফোর্ডসায়রের টেভেনেজ নগরে সর্বপ্রথম কাগজের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কেটসায়রে মেডষ্টোননগরে পাতলা কাগজের একটি কারখানা হয়। ইহারই কিছু পূর্বে বন্ধোরাভাইল কাগজ ঢালিবার বুনন-করা ছাঁচ উদ্ভাবিত করেন। এই ছাঁচ ফরাণীরা ব্যবহার করিতে করিতে তাহার আরও উন্নতি করে এবং পরিণামে ঐ সকল ছাঁচে সেকালে "বেলম" (Vellum) কাগজ প্রস্তুত হইত। এই সময় হলণ্ড হইতে শণ রেশমাদি কুচাইয়া কুটিবার লজ কাঁচি ও টেকিকল আবিষ্কৃত হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে মুর্ণে ডিডো সকল প্রকার তত্ত্ব হইতেই কাগজ

প্রস্তুত করিবার উপার আবিষ্কার করেন। মুর্ণে ডিডো সেই উপায়টি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রবর্তিত করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রুডিনিয়ার কোম্পানি উহার একচেটিয়া কারবার করিতে আদেশ পান। অবশেষে ইহাদের এই একচেটিয়া কারবারে মহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা জুটিল। ইহাদের কাগজ প্রস্তুতের একচেটিয়া যত্নও প্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হইল; কাজেই ব্যবসায়ের আর প্রতিযোগিতা চলিল না, লোকলান পড়িল। ক্রমিয়ার রাজকোষে তখন ইহাদের লক্ষাধিক টাকা গাওনা। ৭৫ বৎসর বয়সে হেনরি ফ্রুডিনিয়ার নামক এক ব্যক্তি একমাত্র কল্যাকে সঙ্গে লইয়া ক্রমিয়ার টাকা আদায়ের চেষ্টার গেলেন। অজ্ঞাত সকলে বুটীশ গবর্ণমেন্টের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিলেন যে, তাহাদের উদ্ভাবিত ব্যবসায়ের এতদিন ইংলণ্ডের রাজকোষে প্রতিবৎসর প্রায় ৫ লক্ষ মুদ্রা আয় হইয়াছে, আর এখন সেই ব্যবসায় নষ্ট হইল; সুতরাং এ সময় ইংরাজ-রাজের কিছু দয়া করা উচিত। পালিয়ামেন্টে এ আবেদনের বিচার হইয়া স্থির হইল যে কেবল ৭০০০ পাউণ্ড দেওয়া বাইতে পারে। অজ্ঞাত কাগজ-ওয়ালারা ইহা দেখিয়া চাঁদা করিয়া আরও কতক টাকা তুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে যাহাদের নামে ব্যবসায়ের একচেটিয়া ছিল, তাহাদের শেষ বংশধর ৮৯ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইহার দুইটী-মাত্র কল্যা অনেক চেষ্টার পর রাজকোষ হইতে বৎসামাত্র মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

আজকাল চিঠির কাগজে ও ফুলফ্যাপ কাগজে ঘেরুপ জলের লাইনকাটা থাকে, পূর্বে সকল বিলাতী কাগজেই ঐরূপ জলীয় দাগের চিহ্ন থাকিত। এই সকল জলীয় দাগের চিহ্ন ব্যবসায়ী ভেদে বিভিন্ন হইত। হিসাব বা দলীলাদিতে জাল হইয়াছে কি না জানিবার জন্য ঐ সকল জলীয় চিহ্ন পরীক্ষা করা হইত। প্রাচীনকালে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জলীয় চিহ্নের মধ্যে ফ্যাণ্ডাল্ নগরে যে কাগজ হইত, তাহাতে একটি হাতের পাজা থাকিত, ঐ পাজার মধ্যমা অঙ্গুলির মাথা হইতে একটা তারকাবিশিষ্ট শলাকা বহির্গত হইত। এই কাগজে তখন সাধারণ চিঠি পত্রাদির কার্য চলিত। ভিনিসের একটা যাত্রাবরে ঐরূপ কাগজে লিখিত একখানি চিঠি আছে, ঐ চিঠিখানি ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ২০ জুলাই তারিখে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরি ফ্রান্সিস্কা ক্যাপেলোকে লিখিয়াছিলেন। এই পাজামার্কার কাগজকে "হাত কাগজ" (Hand-paper) বলে। আর এক প্রকার চিঠির কাগজে (Note-paper) সে কালে একটি মদের

রাসের চিহ্ন থাকিত; কিন্তু কিছুদিন পরে আবার তাহা বদলাইয়া চালের উপর রাজচিহ্ন (Royal arms) অঙ্কিত হইত। ডাকের কাগজে (Post-paper) সে কালের ডাকপরিবাহার শিলা ও চালের উপর রাজমুকুট চিহ্ন থাকিত। নকলের কাগজে (Copy paper) করাসী জাতীয় পুশ্চিহ্ন থাকিত। ডেমি কাগজে করাসীপুশ ও চালের মাথার রাজমুকুট থাকিত। রয়্যাল কাগজে বাঁকা বামহস্ত ও করাসী পুশ্চিহ্ন থাকিত। ক্যাপ (Cap) কাগজে অখারোহীর টুপি (Jockey-cap) ভায় কোন পদার্থ অঙ্কিত থাকিত। এই ক্যাপ কাগজে লেক্সপিয়রের পুস্তকাবলী সর্বপ্রথম ছাপা হয়। আর্কিমিডিসের মতে, ১৬৬১ সালে ফুলফ্যাপ কাগজ প্রথম প্রচারিত হয়। প্রথম চার্লস নিজ কোষশূন্য দেখিয়া কতকগুলি ব্যবসাদারকে একচেটিয়া ব্যবসার আদেশ দেন। কএকজন সেই সময়ের রাজ-কার্যে যে কাগজ লাগে তাহারই একচেটিয়া পায়। তাহারাই ফুলফ্যাপ কাগজের আকারে কাগজ প্রস্তুত করে। প্রথমে এই কাগজে রাজচিহ্ন দেওয়া হইত, কিন্তু ক্রমশঃরাজ্য-ধিকার করিলে রাজচিহ্নের পরিবর্তে “গাধারটুপি” (Foolscap) ও একটা ঘণ্টাচিহ্ন দেওয়া হয়। শেষে আবার যখন শাসনভার “রাম্প্‌ পার্লামেন্টের (Rump Parliament) হস্তে পড়ে, তখন ইহা উঠিয়া যায়, কিন্তু আজিও উহার নাম এবং পার্লামেন্টের জাবোদা খাড়াপত্রের নাম “ফুলফ্যাপ”ই আছে।

অনেক বিলাতী কাগজে প্রায় নীল রঙ্গ করে। একরূপ রঞ্জিত করিবার প্রণালী পূর্বে হঠাৎ ঘটিয়া গিয়াছিল। মিঃ বুটেনশ নামক একজন কাগজব্যবসায়ী ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে একদিন নিজের কারখানার সজীক বেড়াইয়া কার্যাদি পরিদর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাহার জীর হাত হইতে এক মোড়ক নীলবর্ণের গুঁড়া একটা কাগজের মধ্যে পড়িয়া যায়। রং মণ্ডের উপর পড়িবারান্ত তাহাতে মিশিয়া যায়। শেষে সেই মণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হইলে, তাহার বড়ই আদর হয়। বুটেনশের জীও নীলরঙের পাটি (Cake) বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করেন।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। এডিনবরা নগরে এজন্য একটা সভা হয়। সভার যে সকল নিয়মাদি স্থিরীকৃত হয়, তাহা আজিও বৃটিশ মিউজিয়মে আছে। সেকালে সর্কাসপেক্টা স্প্রু কাগজ স্পোন-দেবীর এক প্রকার ঘাস (Esparto Alfa, Lygeum Spar-keum) হইতে প্রস্তুত হইত।

এইরূপে বৃটীশ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বর্তমান উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বাধিকালের মধ্যে যুরোপীয় কাগজ প্রস্তুতের জন্য যে সকল বস্তু ব্যবহৃত হয় এবং প্রত্যেক বস্তু সর্বপ্রথম কোন কোন সালে কে ব্যবহার করেন? তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত হইল;—

ক্রম	সাল	প্রথম ব্যবহারকর্তা—
তুলা		
শগ,	১৬৮২	ব্লাডেন (Bladen)
রেশম		
পশম		
চামড়া	১৭২০	হপার (Hooper)
খড়	... ১৮০০	কুপ্‌স (Koops)
কাটাগাছ	... ১৮০১	
কাঠ	... ১৮০১	
বহুল	... ১৮০০	
গুড় তণ	... ১৮০০	জোন্স (Jones)
গুড়বিষ্ঠা	... ১৮০০	
সেহালা; শৈবাল	... ১৮২৪	নেসবিট (Nesbitt)
হপ গাছ	... ১৮২৫	দিল-গার্দে (De-la-Garde)
চুল, লোম	... ১৮৩৩	উইলিয়ামস (Williams)
স্বতকুমারী	... ১৮৩৬	বেরি (Birry)
কলাগাছের খোলা	এ	এ
কলাইয়ের ডাঁটা	... ১৮৩৬	ডি'হারকোর্ট (D'Harcourt)
ইক্ষুদণ্ড	... ১৮৩৬	বেরি (Berry)
বৃক্ষপত্র	... ১৮৩৬	বালম্যানো (Balmano)
বৃক্ষের শিকড়	... ১৮৩৬	
জনারের তুঁব ও ডাঁটা	... ১৮৩৬	ডি'হারকোর্ট (D'Harcourt)
মটরের ডাঁটা	... ১৮৩৬	এ
গুটাগাছ	... ১৮৪৬	হানক (Hanock)
পাট	... ১৮৪৬	ক্যালভার্ট (Calvert)
নারিকেল ছোঁবড়া	১৮৫২	নিউটন (Newton)
তুঁব	... ১৮৫২	উইলকিন্সন (Wilkinson)
করাভের গুঁড়া	... ১৮৫২	
তামাকের ডাঁটা	... ১৮৫২	আডকক (Adocock)
তুণবর্ণ	... ১৮৫৩	স্টিক (Stiff)
নারিকেল মালা	১৮৫৪	ড্রাপার (Diaper)
বাদামের খোলা	... ১৮৫৫	কুপল্যান্ড (Coupland)
জলজতুণ	... ১৮৫৫	আরচার (Archer)

এতদ্বিধা আরও নানাবিধ বস্তু হইতে প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু সকলগুলি হইতেই কাগজ করিতে যে ব্যবহার

উলিতে পারে, তাহা নহে এ বিষয়ে চীনবাসীরা সর্বাঙ্গিক অধিক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। চীনরাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে প্রত্যেক জেলায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগজ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, চীনেরা হো-সি নামক খড়ের কাগজে শব্দাচ করে। পি-সুজ নামক কাগজ তুঁতগাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়; এট কাগজ তাহারায় যারের লিণ্ট (Lint) বা পট্টর জন্ম বাবহার করে, ছেঁড়া কাগড়ের টুকরার ব্যবহারের স্থলেও তাহারাই এই কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিয়াংসিতে পিয়াউ-সিন্ নামে এক প্রকার কাগজ হয়, তাহা মোড়ক করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। হোয়াং-সিয়েন নামক কাগজ কেবল ঔষধাদি মুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিয়াং-সি প্রদেশে হোয়াং-পিয়ান্ নামক কাগজ হো-সি কাগজের ভায়ই শব্দাচ ব্যবহৃত হয়। তাং-সে ও চাং-সে নামক কাগজ হিসাবের খাতাপত্রাদি করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ম-গিয়েন ও লিয়েন-সি স্থানীয় অল্প পাতলা কাগজ, ইহাই লিখনমুদ্রণাদি করিবার জন্য ও চিত্রাদি বগাইবার জন্য এবং কৈ-লিয়েন-সি নামক হরিজ্ঞা-বর্ণের স্থল কাগজ ঔষধালয়ে চূর্ণ ঔষধাদি মুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ল্যামিয়েন নামক মোগটাল কাগজে পত্রাদি লিখিত হয়। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার রঞ্জিত কাগজ অত্যন্ত সুলভমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহার কতকগুলিতে ৭টি ও কতকগুলিতে ৮টি করিয়া দৃশ্যভাবে লাগরদের রেখা টানা থাকে।

এই সমুদায় কাগজই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত হয়। ফো-কিয়েন প্রদেশে কচি বাঁশ হইতে, চি-কিয়াং প্রদেশে খড় হইতে এবং কিয়াং-নান প্রদেশে ছিন্ন রেশম হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের কাগজ অত্যন্ত মহার্ঘ, আদরীয় এবং গুণ্ডা। কাগজে বাহাতে কালি চূপাইয়া না যায়, এরূপ করিবার জন্য ইহার এক প্রকার শিরীষবৎ পদার্থ প্রস্তুত করে। উহা দেখিতে ঠিক মোমের পটুগটির মত। মাছের কাঁটা বেশ করিয়া ধুইয়া উহার তৈলাংশ নষ্ট করিয়া পরিমাণ মত কটুকির সহিত একত্র মিশাইয়া রাখে; ক্রমে উভয় বস্তু গুলিয়া তরল হইয়া যায়, তৎপরে চিমটা দিয়া ধরিয়া এক একখানি কাগজ উহাতে ডুবাইয়া লইয়া রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া লয়। তাহারাই আর এক প্রকার কড়া কাগজ প্রস্তুত করে, তাহা অর্ধ ইঞ্চি মোটা হয়। এই কাগজে সহজে অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া বাইরে পড়ে না। ইহার "ভারত" নামে এক প্রকার

কাগজ (India-paper) প্রস্তুত করে, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম শিল্পের খোদিত অতি সূক্ষ্ম ছাপা হয়। চীনে নৌকার বা গৃহের ছাদ কুটা হইয়া গেলে, তৈলাক্ত কাগজ জ্বলিয়া দিয়া দাগবাকী করিয়া লয়। পূর্বে যে কড়া কড়া কাগজের কথা বলা হইল, তাহা হইতে ইহারাই জাহাজের বা নৌকার পাশে জালি দিয়া থাকে, এবং দোকান-দারেরা ইহা হইতে জিনিষ পত্রাদি বাধিবার স্তলি করিয়া লয়। চীনে প্রতিদিন কাগজ এক অধিক ব্যবহৃত হয় যে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না, ইহার তুল্য স্থলত বাণিজ্য জব্য আর নাই। চীনেরা খড়, গমের কুটা, তুলা, শূণ, কচি বাঁশ, রেশম ইত্যাদি যাহা কিছু পায় তাহা হইতেই কাগজ করিয়া থাকে। চীনের কাগজে যৌন দেওয়া হয়, তাই ঐ সকল কাগজ দেখিতে অত্যন্ত চিকুণ। কাগজে যৌন মাখাইবার পূর্বে একখানি পাথর দিয়া ঘষিতে হয়। চীনে বিদেশীয় কাগজ বেশী দিন টিকে না। দেশীয় কাগজ এমন নিয়মে প্রস্তুত করে, যে দৈবাৎ নষ্ট না হইলে তাহা নষ্ট হয় না। সুতরাং চীনে সাধারণতঃ যে কাগজে লেখাপড়া হইয়া থাকে, তাহা তাহাদের দেশী কাগজ। বিদেশীয় কাগজে শিরীষ দিলে চীনে তাহা বেশী দিন থাকে না।

চীনেরা অতি সহজে বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। কচি বাঁশগুলিকে প্রথমতঃ জলে বেশ করিয়া ভিজাইয়া রাখে, জলে থাকিয়া যখন বাঁশগুলির হাড় হাড়ে জল প্রবেশ করে, তখন বাঁশগুলি চিরিয়া চুপের জলে ভিজাইয়া রাখে। ইহাতে বাঁশ একবারে কানার মত নরম হইয়া পড়ে, শেষে উদ্বললে ফেলিয়া কুটিতে থাকুক। কুটিতে কুটিতে যখন সমস্ত বাঁশটা নষ্ট হইয়া পড়ে, তখন উদ্বল হইতে তুলিয়া লইয়া অগ্নিতে জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকে। এইরূপ সিদ্ধ করিয়া ফেলিয়া ছাঁচে ঢালিয়া আঙ্গুর নত পাতলা বা মোটা কাগজ করে। বাঁশের এই কাগজে লেখাপড়া বা মোড়ক করা ভিন্ন আরও কাজ হয়। টুটখোলার ইট প্রস্তুতের সময় ইটের মাটির ভাগাড়ের সহিত বাঁশের মোটা কাগজ কুটিয়া মিশাইয়া দিয়া থাকে। বাঁশের কাগজ খুব পাতলা ও সূক্ষ্ম হয়। চীনেরা ৫০ খুঁটাকে এই কাগজ প্রথম প্রস্তুত করে। কেহ কেহ বলেন, তাহার আরও পূর্বে চীনে বাঁশের কাগজ প্রচলিত ছিল। চীনের এক এক প্রদেশে এক একটি বস্তু হইতে প্রধানতঃ কাগজ হইয়া থাকে। কোথাও শূণ, কোথাও কচি বাঁশ, কোথাও তুঁতছাল, কোথাও খড়, কোথাও গমের খড় হইতে প্রধানতঃ বহু পরিমাণে কাগজ হয়। রেশমের খুটি হইতে

পার্সিয়েটের মত একপ্রকার কাগজ হয়, ইহাকে চীনেরা লো-
কয়েন-ডি বলে। ইহা অত্যন্ত মন্থ হয় এবং ইহাতে খোদাই
লেখা চলিতে পারে। এক প্রদেশে কো-চা বা 'চা' নামক
একপ্রকার গাছ হইতে যথেষ্ট কাগজ হয়। ইহার সেকালের
কাগজগুলিও আজ কাল প্রস্তুত করিয়া থাকে। চীনবাসীরা
চীন বা ব্রহ্মদেশীয় তুঁত (Bronssonetia papyrifera, paper-
mulberry) ছালের কাগজ প্রস্তুত করিতে প্রথমতঃ ডালগুলি
১ হাত লম্বা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফারজলে সিদ্ধ করিয়া
লয়। এইরূপ সিদ্ধ করিলে অভ্যন্তরীণ ছালের পরদাগুলি
আলগা হইয়া যায়। তৎপরে তুলিয়া লইয়া বতদূর পারে ঐ
সকল ছাল খুলিয়া লইয়া রোজে শুকাইতে দেয়। এই-
রূপে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ছাল জমা হয়, তখন সেইগুলি
৩।৪ দিন ধরিয়া জলে ভিজাইয়া নরম করিতে থাকে।
অবশিষ্টাংশ হইতে একবারে বহিঃস্থ ছালগুলি ফেলিয়া
দেয়। সর্বশেষ বহিরাবরক ছালখানি ফেলিয়া দিয়া বাহ্য
কিছু বাকী তাহা সিদ্ধ করে। যতক্ষণ এইগুলি সিদ্ধ
হইতে থাকে, ততক্ষণ উহা একটি ঘোটনা দিয়া উহুনের
উপর নাড়িতে থাকে। ইহাতে সমস্ত আঁশ মরিয়া যায়।
তৎপরে নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে মণ্ডাকারে পরি-
বর্তন করিয়া তুলে, পরে টেকিতে কুটিয়া ধুইয়া ভাতের
মাড় মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া কাগজ করে। বাঁশের কাগজ
অপেক্ষাও ইহাতে বহু আবশ্যক। তৎপরে তা সাজাই-
বার সময় প্রতি তার নিম্নে একটি করিয়া কাটি দিয়া
উপর্যুপরি সাজাইয়া দেয়। এইরূপে একদিন রাখিয়া দেয়,
শেষে প্রতি তা তুলিয়া লইয়া শুকাইতে দেয়। এই কাগজ
নরম ও বড় পাতলা হইয়া থাকে, এক পৃষ্ঠা ব্যতীত
হুই পৃষ্ঠায় লেখা যায় না। চীনেরা কখন কখন ইহার দুই
তা কাগজ একত্র উপর্যুপরি শিরীষ দিয়া আঁটিয়া ফেলে।
এরূপে আঁটিলে বুঝা যায় না যে, ইহা দুই তা কাগজ
কি এক তা কাগজ।

জাপানে ঐ কাগজ প্রস্তুত করিবার সময় ইহার ডাল-
গুলিকে ফারজলে সিদ্ধ না করিয়া ছাই জলে হাঁড়ী বা
পাত্রেয় মুখ বন্ধ করিয়া সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইয়া যখন
ডালগুলির উভয় প্রান্ত হইতে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি
পরিমাণে ছাল গনিয়া যায়, তখন নামাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা
করে, তৎপরে ছালগুলি ছাড়িয়া লইয়া ৩।৪ ঘণ্টাকাল
জলে ভিজাইয়া রাখে। এই সময় ইহার দুই দিয়া ক্রমবর্ণ
ছালখানি চাঁচিয়া ফেলে। তাহার পর মোটা ছাল ও পাতলা
ছাল বাছিয়া আলাদা করে। তাহার পর ছালগুলি

আবার সিদ্ধ করিতে থাকে ও একটি কাটি দিয়া খুঁটিতে
থাকে। এইরূপে মণ্ড প্রস্তুত হইলে ভাতের মাড় ও অন্যান্য
জরাদি মিশাইয়া মাজুরে ঢালিয়া কাগজ করে এবং তা
সাজাইবার সময় তা-মধ্যে খড় দিয়া উপর্যুপরি সাজাইয়া
চাপ দিয়া জল বাহির করিয়া ফেলে। তৎপরে রোজে
শুকাইয়া লইলে কাগজ হইল। এই কাগজের আঁশ বুঝিয়া
না টানিলে ছিঁড়িতে পারা যায় না অর্থাৎ কাগজের আঁশ-
গুলি যে ভাবে থাকে, তাহার আড়ভাবে টানিলে ছিঁড়ে
না। ইহা ভাঁজ করিয়া রাখিলে ভাঁজে ভাঁজে ফাটিয়া যায়
না এবং যুরোপীয় কাগজ অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী।
সর্বদা বাজারে যে চীনের হাতপাখা দেখিতে পাওয়া যায়,
সেই পাখা এই কাগজে প্রস্তুত হয়। এই কাগজে ঘরের
দেওয়াল হয়; প্রায় মোড়ক করিবার জন্যই বহুল ব্যবহৃত
হয়। সেখানে গকেট ক্রমালের পরিবর্তে এই কাগজ অনেক
ব্যবহার করেন। বাস্তবিকও এই কাগজ এরূপ স্থল,
কোমল ও মন্থ হয় যে দেখিলে কোন মতেই কাপড় ব্যতীত
অন্য কিছু বলিয়া চিনা যায় না, কারণ ইহা ভাঁজ করিয়া
রাখিলে ভাঁজের দাগ বসে না। জাপানীরা এই কাগজে
গালার কাজ করিয়া টুপি প্রস্তুত করে এবং গৃহমধ্যস্থ
ঠেলা বেড়ার কাচের পরিবর্তে এই কাগজও ব্যবহার করে।
ইহাতে তোয়ালে, টেবিলের আস্তরণ, গায়ের ফতুয়া জামা
প্রভৃতিও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জাপানে প্রধানতঃ মোরাস পেপিরিফেরা সাতাইভা (Morus
papyrifera sativa) বা প্রকৃত প্রস্তাবে যথার্থ 'কাগজের
গাছের ছাল' হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। জাপানীরা ইহাকে
"কাদ্জি" বলে; ইহাতে ভাতের মাড় ও "অরেনি" (Orani)
মূল মিশাইয়া সূক্ষ্ম ও দৃঢ় করে। আর এক প্রকার ঐ
জাতীয় বৃক্ষের ছাল হইতে কাগজ করে, এই প্রণীত গাছকে
জাপানীরা "কাদ্জ" বা "কাদ্জিরা" বলে, এই কাগজে বেশ
ছাপা হয়। ঐ "কাদ্জ" এত শক্ত যে উহা হইতে কাছি দড়ি
হইতে পারে। সিরিগা প্রদেশে সিরিগানগরে এক প্রকার
কাগজ প্রস্তুত হয়, ইহার সহিত রেশমের এত নিকট সাদৃশ্য
যে হাতে করিয়া ধরিয়াও ভ্রমে পড়িতে হয়। অনেকে
অনুমান করেন যে জাপানী "কাদ্জ" শব্দ হইতে ইরানি-রা
"কাগজ" শব্দ গ্রহণ করিয়াছে।

সমরকন্দে সর্দাপেক্ষা স্থল রেশমী কাগজ প্রস্তুত হয়।
চীনের কাগজ অপেক্ষাও ইহার অধিক আদর। সর্বপ্রথমে
চীনেরাই রেশম হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাদের
নিকট হইতে ভারতবর্ষ, ভারত হইতে পারস্য, পারস্য হইতে

আরব, আরব হইতে গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্ম হইতে প্রাচীন রোমক রাজ্যে রেশমী কাগজ প্রস্তুতপ্রণালী প্রচারিত হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে নেপালে শুদ্ধ বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। নেপালীরা বাঁশ কাটিয়া কাঠের উদ্দেশ্যে কুটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করে। তৎপরে জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লয়, নানা প্রক্রিয়ার পর রেশমের বস্ত্রের উপর ঢালিয়া শুকাইতে দেয়। তৎপরে ছড়ি পাথর দিয়া ঘষিয়া মসৃণ করে, এই কাগজ বড় কড়া হয়; আড়ভাবে ছেঁড়া যায় না। এই কাগজে “ফিল্টার” (Filter) করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধা, কারণ ইহা জলে ভিজিলে শীঘ্র এলাইয়া যায় না বা ভিজা কাগজ লইয়া অধিকক্ষণ নাড়াচাড়া করিলেও শীঘ্র নষ্ট হয় না। নেপালী কাগজ নামে আরও একপ্রকার কাগজ হয়। মহাদেব-কা-ফুল (Daphne canabina) নামক গাছের বকল হইতে প্রস্তুত হয়। ১৮৫১ সালের প্রদর্শনীতে এই বকল হইতে প্রস্তুত করা একখণ্ড সুবৃহৎ কাগজ প্রদর্শিত হয়, দর্শকেরা তাহা দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী জাপানের তুঁতছালের কাগজ প্রস্তুতের জায়, কেবল ইহা ছাই জলে সিদ্ধ করিবার সময় ডাল সিদ্ধ করে না, আভ্যন্তরীণ ছাল তুলিয়া লইয়া সিদ্ধ করে। এই কাগজে আবার সময়ে সময়ে কড়ি ঘষিয়া মসৃণ করে। এই কাগজ যদিও নেপালী-কাগজ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা নেপালে প্রস্তুত হয় না। ভোটিরাজ্যে ও হিমালয়প্রদেশেই ঐ বৃক্ষের যথেষ্ট বন আছে এবং সেইদেশেই প্রস্তুত হয়। ভুটিয়ারা ইহার কাঠ আলাইয়া থাকে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই কাঠের কতকগুলি ইটকাকার খণ্ড ইংলণ্ডে পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে ইহা হইতে হাতে যে কাগজ হয়, তৎসম্বন্ধে একজন মুদ্রাকর বলেন যে, ইহাতে এক্রণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছাপা উঠিতে পারে যে, কোন ইংরাজী কাগজে তেমন হইতে পারে না। ইহা চীনদেশীয় “ইওয়া পেপারের” তুল্য গুণবিশিষ্ট। নেপালে এই কাগজে লিখিত কতকগুলি গৃথ আছে, শুনা যায় সেগুলি বহু প্রাচীন। এই সকল গৃথ দেখিয়া অনেকে অশ্রুমান করেন যে চীনদেশ হইতে প্রায় ৭০০ শত বৎসর পূর্বে ভুটিয়ারা এই কাগজ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। “মহাদেব কা-ফুল” মুদ্রাকার কাঁটাগাছ মাঝ, দেখিতে অনেকটা বিলাতী লরেলের জায়। ইহা দুই বৎসরকাল বাঁচে, শীতকালে ইহার পাতা ঝরে না। ইহার ফল বিষাক্ত। এই গাছ নানান জাতীর আছে, সকল জাতীয় হইতেই কাগজ হয়। কতকগুলি গাছের ফুল ধ্বংসে শাদা, কতকগুলির

ফুল দ্বিবং মেটে ও বেগুনি মিশ্রিত শাদা বর্ণের হয়। হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, নেপালী কাগজে হরিভাল বা সর্বকো মিশ্রিত করে, কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ নেপালে ওরূপ বিষ কোহ বেচিতে পায় না, লুকাইয়া বেচিলেও বিশেষ দণ্ড পায়। মহাদেব-কা-ফুল জাতীয় গাছই দ্বিবং বিধাক্ত, কিন্তু কাগজ প্রস্তুত করিলে আর তাহাতে বিষ থাকে না, কারণ দেখা গিয়াছে যে এ কাগজেও পোকা লাগে। এই কাগজ শুকানস্থায় বড় কড়া, শুদ্ধ জব্যাদি মুড়িয়ার পক্ষে মন্দ নহে। কলিকাতার যাহ্নবরে এই কাগজের একখানি আছে, তাহা দীর্ঘ ৫০ ফুট ও প্রস্থ ২৫ ফুট।

ভুটানীরা তদ্রূপজাত “ডিয়া” নামক একপ্রকার গাছের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। ইহার গাছের ছাল-গুলিকে লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া কাঠের ছাইয়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুতের উপর রাখিয়া কাঠের মুলার দিয়া কুটিয়া পিটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করে, তৎপরে জাপানী-কাগজের প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহাতে সাতিন ও রেশম বুনা যাইতে পারে। চীনদেশে ইহা এক্রূপেই ব্যবহৃত হয়।

ব্রহ্মদেশে একপ্রকার লতা হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়, উহা পেটবোর্ডের মত কড়া ও পুরু হয়। এই কাগজের উপর কাল রং মাখাইয়া দেয় এবং স্টেট-পেন্সিলের মত একপ্রকার দ্বিবং হরিৎবর্ণ প্রস্তুতের পেন্সিল দিয়া লিখে।

ভ্রামদেশে একপ্রকার বকল হইতে ২ প্রকার কাগজ হয়। তদ্রূপে এই বৃক্ষকে “পিলক ফ্লাই” বলে। এই দুই প্রকার কাগজের এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ও একপ্রকার স্বেতবর্ণ হয়। ইহাও ভাল কাগজ নহে এবং প্রস্তুতও ভাল হয় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ভারতেও চাতোগড়া কাগজ হয়। এখানে পুরাতন গুণচট্ট, ছেঁড়া কাপড়, পুরাতন কাগজ ও অগুমান বস্তাদি হইতে কাগজ করে। প্রথমে ঐ সকল জব্য ভিজাইয়া চূণের গুঁড়া মিশাইয়া টেকিতে কুটিতে থাকে। তৎপরে মণ্ডটি ধুইয়া লইয়া চূণের জলে পচাইতে দেয় ও ৪।৫ দিন অন্তর চূণের জল বদলাইয়া দেয়। এইরূপে দুই তিনবার জল বদলাইয়া পচাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া শুকাইয়া লয়। কাগজ শুকাইয়া গেলে ভাতের নাড় দিয়া খুঁটিয়া শুকাইতে দেয়, পরে ২।৪ দিন চাপ দিয়া রাখে তৎপরে তেল-গাপর ঘষিয়া মসৃণ করে।

অষ্টাবংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুরোপে জুনা ও শণ হইতে প্রধানতঃ কাগজ প্রস্তুত হইত, ছেঁড়া কাপড়ের বা রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার ছিল না। এখন প্রধানতঃ উহাই ব্যবহার

হইয়া থাকে; কারণ ইহা অতি সহজে ও বহু খরচে মণ্ডে পরিষৃত হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একশে নানাবিধ হইতে যুরোপে ছিন্ন বস্ত্রাদি আমদানী হইয়া থাকে।

মাদাগাস্কারদ্বীপে “আবো” নামক বৃক্ষের বহুল হইতে একপ্রকার কাগজ হয়। এই কাগজও ভূটানের ডিয়া গাছের ছালের কাগজের মত প্রস্তুত হয়। ইহাতে ভারতের মাড় দিয়া থাকে; তাহাতে শীঘ্র কাগি চুপাইয়া যায় না।

তুলার কাগজের ইতিহাস।—যুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে যুরোপীয় প্রদেশে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে বা ১০ম শতাব্দীর প্রথমভাগে বম্বিকিনী (Bombycina) নামক তুলার কাগজ প্রথম প্রস্তুত হয়। আরবীয়েরা বলে, মুসলমানরা মানব ব্যক্তিই ইহা প্রথম প্রস্তুত করেন। কিন্তু আনাদের বিবেচনার তাহারও অনেক পূর্বে তুলট বা তুলার কাগজ ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহা মাকিনবীর সেকন্দরের সেনাপতি নিয়ার্কসের ‘তুলা-চাপড়ান’ হিসাব পত্রের উল্লেখে জানা যায়। আরবীয়েরা কাগজ প্রস্তুত প্রণালী পারসিক-বিগের নিকট শিক্ষা করে, তাহারাই সর্বপ্রথমে আফ্রিকার অল্পর্গত সেটা নগরে, তৎপরে স্পেনদেশে কজেতিভা, ভ্যালেন্সিয়া ও টলেডো নগরে তুলার কারখানা স্থাপন করেন।

যুরোপীয়েরা ষাটশ শতাব্দীতে পূর্ব-যুরোপে ও সিলি-দ্বীপে তুলার কাগজ প্রস্তুত করিতেন। কাগজের উৎপত্তি বস্তুর অভাবে তুলার কাগজ উদ্ভাবিত হয়। এই কাগজ প্রস্তুত হওয়াতে ক্রমশঃ পেপিরি কাগজ উদ্ভিষ্টা যায়। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী হইতে তুলার কাগজের বহুল ব্যবহার হয়। ইহা প্রথমে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে চীন ও ভারত, ক্রমশঃ পারস্য, আরব, গ্রীস, অষ্ট্রিয়া (ভিনিগিয়া), ও জর্জনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; তখন ইহার নাম ছিল গ্রীক পার্চমেন্ট। তৎকালে গ্রীকেরা ইহাকে “বম্বিকিন” বলিত; কারণ গ্রীক ভাষায় তুলার গাছকে “বম্বিক্স” বলে। প্রাচীন ল্যাটিনেরা “চার্টা বম্বিসিনা” (Charta Bombycina), মধ্যযুগের লেখকেরা “চার্টা গসিপেনা বা গজ্জিগিনা (Charta Gossypena or xjlina), স্পেনীয়রা “পারগামিনো ডি পানো” (Pergamino di panno) বলিত। ডানাস্কে যে কাগজ হইত, তাহা ভাল হইত বলিয়া তাহাকে “চার্টা ডানাস্কেনা” (Charta Damascena) ও অনেকে “চার্টা কটনিয়া” (Charta Cottonia) এবং শেষে “চার্টা সেরিকা” (Charta Serica) বলিত। কারণ চীনের সেরিকা প্রদেশ হইতেই প্রথমতঃ তুল্য আমদানী হইত। তৎপরে ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে।

তুলার কাগজের পর রেশম হইতে কাগজ হইতে আরম্ভ হয়। সিলিয়ার বর্ণনাপাঠে জানা যায় যে পূর্বে রেশমী বস্ত্রের একখণ্ড নানা উপায়ে প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহাতেই লিখিবার ব্যবহারও ছিল, ইহাকে “লিবি লিটাই” (Libi litie) বলিত এবং আজকাল যে ভাবে চিত্রকরেরা রেশমীবস্ত্রে ছবি আঁকিবার জন্য অমী করিয়া লয়, প্রায় সে কালেও সেই উপায়ে লিখিবার জন্য অমী করিত। ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে যুরোপ মধ্যে জর্জনিয়েরা রেশম হইতে কাগজ করেন। কেহ কেহ ইতালীয়বিগকে প্রথম নিষ্প্রীতা বলেন। যুরোপীয়েরা চীনবাসীদের নিকট ইহা শিক্ষা করে। কেহ কেহ বা বলেন, যে খৃষ্টীয় ষাটশ শতাব্দীতেও যুরোপে রেশমী কাগজ ছিল।

কাগজের কল ও ব্যবসায় ইত্যাদি।—এখন যুরোপের সর্বত্র এসিয়া ও আমেরিকার অনেকানেক স্থলে সাধারণতঃ বাম্পীরবস্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ কলে কাগজ প্রস্তুত হয়। এখন কুটা, পিসা, মণ্ড করা, দোত করা, ছাঁচে ঢালা, শুকান, চিঙ্কন করা, মাগ মত কাটা প্রভৃতি সমস্ত কার্যই কলে হইয়া থাকে। কি যুরোপ কি আমেরিকা, কি এসিয়া প্রায় সকল স্থানেই এখন বস্ত্রের ছিন্নাংশ হইতেই প্রধানতঃ কাগজ হইয়া থাকে। অনেক কাগজের কলওয়ালার মতে, তুল্যজাত দ্রব্যাদি (বস্ত্রাদি) হইতে যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহাই আধুনিক কলে সুন্দররূপে ব্যবহার করা বাইতে পারে, কিন্তু কাঁচা তুলা (অর্থাৎ মূতা বা বস্ত্রাদি ভিন্ন অথ অবস্থা হইতে যে মণ্ড হয়) তাহা এখনকার কলে সহজে ব্যবহার করিতে সুবিধা হয় না। কালে কালে নানা দোকান দ্বারা নানা বস্তু হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে; সহজে সুবিধায় সম্মান্যে অধিক পরিমাণে কাগজ পাইবার আশায় অনেকেই ঘাস, খড়, পাভা ইত্যাদি লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু আজিও কেহই তুলার বা রেশমের বস্ত্রাংশের দ্বারা আর কোন বস্তু হইতেই আশাহরূপ কল পাইতেছেন না, তবে ক্রমশঃ পরীক্ষার নিযুক্ত থাকিলে উত্তরকালে কি দাঁড়াইবে বলা যায় না; কারণ, পেপিরস বস্তু খুঁট জন্মের পরও প্রায় ১২ শত বৎসর চলিয়াছিল, আর তুলা রেশমের কাগজের বয়স কেবল ১২৫০ বৎসর হইল মাত্র। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে খড়ের কাগজ লন্ডনে প্রস্তুত হয়। ঐ সময়ে মাকুইং অফ গল্‌স্‌ফরি ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জকে একখানি পুস্তক উপহার দেন, উহা কেবল খড়ের কাগজে মুদ্রিত, আর যে সকল বস্তুতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার মধ্যে যতগুলি

বিবরণ ভৎকালে জানা গিয়াছিল, তাহারই ইতিহাস ঐ পুস্তকে বৃত্তি হইয়াছিল। খড়ের কাগজ আজকাল যুরোপের সর্বত্রই চলিত হইয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। একবার শিরসমিতিতে কতকগুলি ভারত-বর্ষীয় তৃণ পরীক্ষিত হয়, তাহাতে স্থির হয় যে সমস্ত তৃণ হইতেই কাগজ হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে খড়ই সর্বাপেক্ষা অধিক শুণ্ণবিশিষ্ট। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় একশানি পুস্তক লিখিত হয়, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ৬০ প্রকারের স্বতন্ত্র জলজাত কাগজ ছিল।

● আফ্রিকায় এস্পার্টো (Esparto) তৃণ ও অ্যাডান্সোনিয়া (Adansonia) বৃক্ষের বকল বাতীত “ডিস” (Diss-grass) বাস হইতেও কাগজ হইতে পারে, কিন্তু সহজপ্রাপ্য নহে। আলজিরিয়া প্রদেশে ক্ষুদ্রাকার একজাতীয় তাল পাওয়া যায়, তাহাতেও কাগজ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা যেমন চূর্ণপ্রাপ্য, তেমনি তৈলময় ভক্তবিশিষ্ট বলিয়া কাগজও ভাল হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় নদীর স্রোত বন্ধ করিয়া একপ্রকার জলজতৃণ জন্মে, উহা ইংরাজীতে “পামেটা” (Palmeta) নামে খ্যাত। এগুলি ৮।১০ ফুট হয়। ইহাতেও কাগজ হইতে পারে।

আজকাল কাপাসবীজের তুব্ব হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। অনেক বলেন, ইহার কাগজ খুব ভাল হয়। পূর্বে স্পেনদেশীয় এস্পার্টো তৃণসম্বন্ধে বাহা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে “মেরোকোয়া টেনাসেসিপায়া (Mrochoa Tencissama) ও “লিগেয়াম্ স্পার্টাম্ (Lygeum Spartum) জাতীয় বাসই ভাল, ঐ বাস ভূমধ্যসাগরের তীরেই বেশী জন্মে।

ভারতবর্ষীয় বাবলাগাছের আভ্যন্তরীণ বকল হইতেও অতি উৎকৃষ্ট কাগজ হইতে পারে।

ঐসিয়া রাজ্যে পেরো নামক তৃণ হইতে কাগজ হয়।

কাগজে বর্ণাদি সংযোগ।—পূর্বে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথমে যেরূপে রঞ্জিন্ কাগজ উদ্ভাবিত হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন কালাবধি সাধারণতঃ কাগজের বর্ণ শাদা হইয়া থাকে এবং ভদ্রপরি কালরঞ্জের কালিতে লিখন-রীতি চলিয়া আসিতেছে। কাগজের পূর্বে যখন চামড়ায় লেখা চলিত ছিল, তখন মেবাদির চর্ম পীতাদি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের হল-করা অক্ষরে লিখিত। রোমকরা হাতীর দাঁতের পাতে সবুজ রং করা মোম মাখাইত। অনেক স্থলে সিন্দূরে লিখিবার প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। গ্রীক রাজবংশে প্রায় সমস্ত লেখাপড়াই লালরঙে হইত। ভারতবর্ষে চন্দন, আলতা ও সিন্দূর

দিয়া মস্তাদি লিখিবার প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বাকালার ও তারতের লজ্জাত হলো বালকগণকে প্রথম লিখিতে শিখাইবার সময় “রানখড়ি” নামক একপ্রকার কোমল প্রস্তর খণ্ড দিয়া ভূমিতে বর্ণমালা লিখাইতে অভ্যাস করান হয়, তৎপরে ক্রমশঃ তালপাতা, কলাপাতা ও অর্বশেবে আজকাল কাগজে লিখান হইয়া থাকে। ইহা হইতেই ভারতের লেখ্য বস্তুর ক্রমাধিকার স্পষ্ট বুঝা যায়। এদেশে সেকালে যতপ্রকার লেখ্য ছিল, তন্মধ্যে তালপাতা, কলাপাতা, বটপাতা, তেরেটপাতা, ভূর্জপত্র, তুলাং বা তুলট কাগজ, প্রস্তর ও ধাতুকলকাহিই প্রধান। এখনও তালপাতার বহুল ব্যবহার আছে। হস্তে বা কণ্ঠে কবচ ধারণ করিবার জন্য স্তবকবচাদি লিখিতে হিন্দুরা আজিও ভূর্জপত্র ব্যবহার করে। কলাপাতা আজিও পল্লীগ্রন্থের পাঠশালে ব্যবহৃত হয়। এই কলাপাতার শীঘ্র শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ইহাতে কখন কোন রক্ষিতব্য বিষয় লিখিত হয় না। এ সম্বন্ধে বাকালার একটি প্রবাদ আছে—“লিখে দিলাম কলার পাতে, ভেলে বেড়োগে পথে পথে”—অর্থাৎ কলারপাতে লিখিয়া দিয়াছি মাত্র—উহাতে উহার কোনও উপকারে আসিবে না। তেরেটপাতায় লিখিত পুঁথি এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়; ইহা তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষপত্র। পাতাগুলি দেখিতে অবিকল তালপাতার দ্যায় তবে উহা অপেক্ষা পাতলা, চওড়া, নমনশীল অগচ্চ দীর্ঘকাল স্থায়ী। বটপাতার ব্যবহার আর নাই। ধাতুকল ও প্রস্তরকলক এখন কেবল মন্দিরাদিতে শিরলিপি খুদিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাত্ত্বিক উপাসকেরা তাম্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যাদিতে খোদিত দেবতার যন্ত্র সম্রাদি পূজা ও ধারণ করিয়া থাকে। তুলাং বা তুলট কাগজ যথেষ্ট চলিত আছে। পূর্বে নিয়ারকসের বর্ণনার বলা গিয়াছে যে তুলা পিটিয়া একপ্রকার “তুলা-চাপড়ান” হইত, তাহা হইতে হউক বা দেশীয় তুঁত বা চীন ও ব্রহ্মদেশীয় তুঁত হইতে কাগজ হইত বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম তুলট হইয়া থাকিবে। পূর্বে এই কাগজের উপর গঁদ, কাঁই-বিচি (ভেঁতুল-বীজ)-বাটা ও হরিতাল মাখাইয়া খুঁটিয়া রক্ত করিত, কেহ কেহ বা ভাতের মাড় দিত। ইহাতে কাগজে পোকা ধরিত না বা কালি চূপসাইত না। যে কাগজে ভাতের মাড় দেওয়া হইত, তাহাতে কোন সংকৃত পুস্তক লিখিত হইত না। হরি-তালাদি দিবার পর বড় কড়ি দিয়া বাহিয়া মসৃণ করা হইত।

মুসলমানদের আমলে ভারতে কয়েক প্রকার কাগজ

প্রস্তুত হইত; তন্মধ্যে (১) সাধারণ ব্যবহারের কাগজ, (২) আমীর ও মরহদিগের ব্যবহারের কাগজ এবং (৩) ঘোঁটা কাগজই প্রধান। ঘোঁটা কাগজ আবার ৩ রকম ছিল।

১ম, শাদা—কেবল কড়ি বা ছুড়ি বসিয়া মসৃণ করা।

২য়, জরফান—রূপালি ও সোণালি ছিটা দেওয়া অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের “আফগানি” কাগজের মত।

৩য়, টিক্‌লিদার—ছোট ছোট পাটালি আকারের রূপালি ও সোণালি পাত বসান। মর্যাদা অনুসারে ইহারই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার হইত।

এ সকল কাগজ আড়া লঘা হইত। এই সকল কাগজে বিষয়াদি লিখিত হইলে পর শুটাইয়া তাহার উপর ঐ প্রকারের আর একখণ্ড কাগজ জড়াইয়া রাখিত। এই কাগজ খণ্ডকে “কোমরবন্দ” বলিত। তৎপরে মলমলের বগুলির ভিতর পুরিয়া আর একটি মখমল, কিংবা বা ভাল জরির তাসের কাপড়ের বগুলিতে পুরিয়া জরির দড়ি দিয়া মুখ বাঁধিয়া রাখিয়া দিত।

কাগ্গীরে একপ্রকার পুরাতন দেশী কাগজ দেখা যায়, তাহা দেখিতে তেমন শাদা না হইলেও তাহার ভ্রায় সূচিকণ ও দৃঢ় কাগজ ভারতে অল্পই আছে। শুনা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই কাগ্গীরে ঐ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দ্বারা যে যে উদ্ভিজ্জ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে, নিয়ে তাহার নাম দেওয়া হইল;—

পোতাড়ি, বাবলা, মুর্গা, সূতকুমারী, আনারস, জুপারি, বাবুইয়াস, বাঁশ, বেড়বাঁশ, রক্তকাঞ্চন, বনরাজ, শিয়ালী, তুর্জপত্র, ভাবরয়াস, চীনেয়াস, বোল (হলদরবনে), শিমুল, ভাল, তুঁত, পলাশ, অড়হর, আকন্দ, গাঁজা, অক্ষোট, দেখুর, চিকি (বেরারপ্রদেশে), চোচড়ায়াস, নারিকেল, ঘিনালিতা, জাতিপাট, চালিতা, গোন্দী (হিন্দী), শণ, হরিজা, মহাদেব-কা-ফুল, কুটাল (হাজার প্রদেশে), কুটিলাল (পঞ্জাবে), খেত বড়ুয়া (হিন্দী), তলতাবাঁশ, কালাঞ্চি (পঞ্জাবে), কোদালিয়া, চিতি (শতজুনদীতীরে), জিৎসা (জাপানে), রুজাক, মুরা, জলী-ভেঁদী (উত্তর পশ্চিমে), মিঠা শিমুল, পালিতামাদার, জামরুল, ফতসিয়া (কর্মাভাষীপে), বট, কাগ্গীরী, যজ্ঞভূমুর, অখখ, বিলাতী আনারস (বা ব্রজবাকসী), গাস্তারী, কাপাস, ফলসা, হাম্পু (কুর্গ প্রদেশে), অজুন, হুর্দামখী, পল্লুরা-পাত, চৈঁড়স, হল-পদ্ম, জবা, মেস্তাপাত, আঁতমোড়া, কান্তিয়া, কিপ (সিদ্ধ-প্রদেশে), তিলী (সুমা), মালাচড়া, তোজুস (হিন্দী), তুঁক, কহলী, কেশিমলসা, খড়, শকর-আলু (হিন্দী), কেরা,

বিলাতী-কিকর, জুহার, খেজুর, শীতলপাতা, ইক্ষু, মূলা, শর, জুপ, পাহাড়ী-শিপুল, মূর্সী, মর্কো (বেলজিয়মে), সিদ্ধপ্রদেশের সরখব বাস, জরন্ত, কুরেত, বেড়েলা, সিংরা (চীনদেশে), মর্শি (উত্তর-পশ্চিমে), তেলহাই, গোলবার (দক্ষিণে), ষ্টিপা (Stipa) বাস, পুরুষশিপুল, গোব্দ, অস্ত-মূল, হোগলা, বন্ডকড়া, বিচুয়া, আলু, জ্বল (রক্তগিরিতে), তিলক, মুকা (উত্তর আমেরিকার), ও মকা প্রভৃতি।

কাগজী (পারস্ত) ১ কাগজনির্মাতা। ২ কাগজের আধার।

কাগজীনেবু (দেশজ) এক জাতীয় নেবু।

কাগদ (পারস্ত ‘কাগজ’ অথবা জাপানী ‘কাগু’ শব্দ হইতে উৎপন্ন।) কাগজ।

(“ভূর্জে বা বসনে রক্তে কোমে বা তালপত্রকে

কাগদে চাটগন্ধেন পঞ্চগন্ধেন বা পুনঃ।

ত্রিগন্ধেনাথৈবৈকেন বিলিখ্য ধারয়েন্নরঃ

পঞ্চ সপ্তজিলোকটৈ বী শোধিতং কবচং শুভম ॥”

মন্ত্রকল্পক্রম।)

কাগল, বোম্বাইপ্রদেশের কোলাপুররাজের অধীন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ১২২ বর্গমাইল। মোট খাজনা আদার ২১১৯৬০। তন্মধ্যে এখানকার সামন্তরাজ কোলাপুর-রাজকে প্রতিবর্ষে ২০০০ কর দিয়া থাকেন।

বর্তমান সামন্তরাজের পূর্বপুরুষ সখারাম রাও দিক্‌দার একজন কাম্বোজী ছিলেন। তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোলাপুর-রাজের নিকট ‘কাগল’ সনন্দ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র, মহারাত্রী-কুলোত্তব জয়সিংহ রাও ঘটগে সর্জরাও বজারং মাআব নামক বর্তমান সামন্তরাজকে, দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। বর্তমান সামন্তরাজ সম্মানার্থ ৯টি করিয়া তোপ পাইয়া থাকেন।

কাগল রাজ্যে দুধগঙ্গা ও বেদগঙ্গা নামী দুইটা নদী প্রবাহিত। ইহার প্রধান-নগরের নাম ‘কাগল’, উহা অক্ষা ১৬°৩৪’ উঃ এবং ৭৪°২০’ ৩০’’ পূঃ দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ৬৩৭১, অধিকাংশই হিন্দু।

কাগান, পঞ্জাবপ্রদেশের হাফারা জেলার অন্তর্গত একটি উপত্যকা; দক্ষিণাংশ ব্যতীত তিনদিকে কাগ্গীররাজ্য পরিবেষ্টিত। উপত্যকাটি পরিমাণে প্রায় ৮০০ বর্গমাইল। দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল, বিস্তারে ১৫ মাইল। ইহার শৃঙ্গগুলি প্রায় ১৭০০ ফুট উচ্চ।

কাগান-উপত্যকা হিমালয়ে অভ্যন্তরীণ হইয়াছে। এই অভ্যন্তর উপত্যকা ২২টি রোখ বা অরণ্য বিভক্ত। এই সকল বনে বড় বড় বাহাদুরী কাঠ পাওয়া যায়।

এখানকার লোকসংখ্যা অধিক নয়, স্থানে স্থানে কোথাও ২৪৪ বর লোকের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপত্যকার 'কাগান' নামে একটি গ্রাম আছে। উহা অক্ষা- ৩৪°৪৬'৪৫" উঃ এবং ৭৫°৩৪'১৫" পূঃ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

কাগারি (পুং) কাগর অগ্নিঃ, কাগঃ অগ্নির্ভূত বা। পেচক।

কাগ্নি (পুং) জ্বং অগ্নিঃ, কোঃ কাদেশঃ। অন্ন অগ্নি।

কাঙুর, কামরূপের একটি অপর প্রাচীন দেহু নাম।

"মাসিদ্ধ পীঠ এই কাঙুর ভূবন।" ধনরাম—শ্রীধর্মমঙ্গল।

[কামরূপ দেখ।]

কাক্সা (দেশজ) ১ কাকের ঠোঁঠ। ২ কাকালী। ৩ কাকজব্বাগাহ।

কাক্সাম্য (দেশজ) তৃণবিশেষ। (Cyperus jalmotha ?)

কাক্সায়ন (পুং) মুনিবিশেষ, ইনিও চরকসংহিতাপ্রণেতা অম্বিবেশ ঋষির সহিত ভরদ্বাজ পুনর্কল্প ঋষির নিকট আয়ুর্-র্ষেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চরকসংহিতা পাঠে জানা যায়, ইহারও প্রণীত পুণ্ড্র কোন সংহিতা ছিল। কিন্তু আজ কাল তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কাক্সালী (দেশজ) কটিদেশ।

কাজ্জা (স্ত্রী) কাক্সি-অটাপ্প। আকাজ্জা, ইচ্ছা।

("উল্লারগুজাবপি ভক্তকাজ্জা।" মুদ্রত।)

কাজ্জিকৃত (ত্রি) কাক্সি-কৃত। অভিলষিত।

কাজ্জিকীয় (ত্রি) কাক্সি-অনিয়ত (ব্যত্যব্যানীয়ঃ। পা ৩। ১ ২৬।) বাহনীর ইচ্ছার উপযুক্ত।

কাজ্জী [ন] (ত্রি) কাক্সতীতি, কাক্সি-নিগি। আকাজ্জা-কারী, অভিলাবী।

কাজ্জেকা (পুং) কক্ষপক্ষিবিশেষ।

কাজ্জনী (দেশজ) কজু নামক ধানবিশেষ। [কজু দেখ।]

কাজ্জয়ম্, মাজ্জা প্রদেশের কোইম্বাতুর জেলার ধারাপুর তালুকের অন্তর্গত একটি নগর।

ইহার প্রাচীন নাম কোজু, বোধ হয় পূর্বকালে দাক্ষিণাত্যের কোজুরাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। অক্ষা- ১১° ১' উঃ, দ্রাঘি ৭৭° ৩৬' পূঃ। লোকসংখ্যা ৫২৩৮।

কাজ্জা (স্ত্রী) কুংসিতং অঙ্গং যন্তাঃ, বহুস্ত্রী। কাজ-টাপ্। বচ নামক ঔষধবিশেষ।

কাজ্জাল (দেশজ) ১ দরিদ্র, গরীব। ২ যে কোন বিষয়ের অভাববিশিষ্ট।

কাজ্জালী (দেশজ) দরিদ্র।

কাক্সালীপনা (দেশজ) দরিদ্রের ভান, আপনাকে দরিদ্র বলিয়া পরিচিত করা।

কাজ্জুক (স্ত্রী) কজুশান। [কজু দেখ।]

কাক্সাড়া, ১ পঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের অধীন একটি জেলা। অক্ষা ৩১° ২০' হইতে ৩৩° উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫° ৫২' হইতে ৭৮° ৩৫' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। জুনিয়র ২০৬৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭৩৮৪৫।

ইহার প্রায় সর্বত্র অত্যুচ্চ গিরিমালায় পরিবেষ্টিত। এই সকল গিরি সমুদ্রসমন্তল হইতে উচ্চে এক একটি ২৩৭ ফুট হইতে ১৫২৫৬ ফুট পর্যন্ত দেখা যায়। তন্মধ্যে ধবলাধারগিরি কাক্সা জেলার উত্তর সীমারূপে ঘেরিয়া আছে, তাহার পরই 'বড় বজাহল' গিরিমালা, ইহার এক একটি শৃঙ্গ ১৭০০০ হইতে ২০০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ।

কাক্সাড়া গিরিমালায় পরিবেষ্টিত ও সমাকীর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্র আছে।

উত্তরসীমায় হিমালয়-পর্বত তিব্বতের বক্ষুজনপদ ও চীনসাম্রাজ্যসীমা হইতে এই জেলাকে পৃথক করিয়াছে, দক্ষিণ-পূর্বে বসহর, মন্দি, বিলাসপুর প্রভৃতি পার্শ্বতীর রাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে ছসিয়ারপুর জেলা এবং উত্তর-পশ্চিমে চাকিনদী, গুরুদাসপুর ও চাব্বারাজ্য হইতে এই জেলাকে পৃথক রাখিয়াছে। এই জেলা পাঁচটি তহসীলে বিভক্ত, তন্মধ্যে কুলু হইতে পীর-পঞ্চাল একটি অংশ, মধ্যস্থলে কাক্সাড়া তহসীল, তৎপরে হামীরপুর, ডেরা ও নুরপুর তহসীল দক্ষিণভাগে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত।

ধবলাধারগিরি বজাহল তালুককে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরাংশের নাম বড়বজাহল এবং দক্ষিণাংশের নাম ছোটবজাহল। বড়বজাহল তালুক ও কুলুর মধ্যস্থলে বড়-বজাহল গিরি, ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫ মাইল এবং উচ্চে ১৮০০০ ফুট হইবে। ইহার মধ্যে একটি সামান্য গ্রাম আছে, তথায় প্রায় ৪০০০ কুনেং জাতির বাস। কয়েকবর্ষ গত হইল, দারুণ ভূবারপাতে এখানকার বিস্তর ঘরঘার কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। এই গিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গ ভেদ করিয়া ইরাবতী নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

ছোটবজাহলের মাঝখানে একটি ১০০০০ ফুট উচ্চ গিরিশৃঙ্গ পড়িয়াছে, তাহাতে এই স্থান দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার নিম্নাংশে ১৯২০ খানি গ্রাম আছে, ঐ সকল গ্রামে কেবল কুনেং ও দাবীজাতির বাস। বজাহল তালুকের কিয়দংশের নাম বীরবজাহল, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোহর।

কাক্সাড়া জেলার মধ্যদিয়া তিনটি গিরিশ্রেণী সমভাসে চলিয়া গিয়াছে, এই তিন গিরিশ্রেণী হইতে বিপাশা, জৈতাগা, প্পিতি ও ইরাবতী নদী বহির্গত হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস—ভারত ও পুরাণাবিহিত কুলিন
ও কুল্ল নামক পার্শ্বতীয় জাতির নামোন্মেষ আছে, তাহারাই
এখানকার প্রাচীন অধিবাসী। সেই প্রাচীনকালে কাল্‌ডা
জেলা কতকটা পুরাণোক্ত কুল্লজনগরের এবং কতকটা
কুলিন জনপদের মধ্যে পরিগণিত ছিল। (এখন সেই কুল্ল ও
কুলিন জাতি কুল্ল ও কুমে২ নামে পরিচিত।)

[কুল্ল ও কুলিন দেখ।]

কুল্ল ও কুলিন জাতিকে পরাজয় করিয়া রাজপুতেরা এই
স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা এই পার্শ্বতীয় ভূভাগ বিভাগ
করিয়া বহুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহারা সকলেই আপনাদিগকে
কুরুপাণ্ডবগণের সমকালীন জালন্ধরের কতোচ রাজবংশীয়
বলিয়া পরিচয় দিতেন। মুসলমানদিগের আক্রমণে উভ্যক্ত
হইয়া কতোচ রাজকুমারগণ কাল্‌ডার গিরিধূর্গে আশ্রয়
গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের বিপুল রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে
বিভক্ত হইয়া পড়ে। তখনও এখানকার নগরকোটের
হিন্দু দেবমন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, এত ঐশ্বর্য্য পঞ্জাবের
আর কোন দেবমন্দিরে ছিল না। হিন্দুসমাজেই এখানকার
দেবমূর্তির বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ১০০৯ খৃঃ গজনী-
পতি মাস্কুদ এখানকার দেবতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের কথা
তুলিলেন, তাঁহার নোড ও বিবেষ প্রবল হইল। তিনি
পেশোবার ক্ষেত্রভিমুখে সটেন্জে উপস্থিত হইলেন। হিন্দু
রাজগণ তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করি-
লেন কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে গজনীর নিকট সকলেই পরাজয়
হইলেন। তখন মাস্কুদ কাল্‌ডা দুর্গ অধিকার করিয়া
মন্দিরের দেবমূর্তিগণ স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্য প্রভৃতি
বহুমূল্য ধন লুণ্ঠন করিলেন। প্রায় ৩৫ বর্ষ পরে
রাজপুতগণ কাল্‌ডাদুর্গ উদ্ধার করিয়া বহু সমারোহে পুনর্বার
দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কিছুদিন আর কোন গোলযোগ ঘটে নাই। তৎপরে
১৩৬০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ কিরোজ ভোগলক কাল্‌ডা জতি-
মুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন, এখানকার রাজা সহজেই তাঁহার
বস্ত্রাশীকার করায় তিনি আপনার রাজ্য পাইলেন বটে,
কিন্তু সেই পবিত্র দেবমূর্তি হারাইলেন। মুসলমানেরা সেই
দেবমূর্তি লুণ্ঠিয়া মন্দির পাঠাইয়া দিল।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে অকবর বাদশাহ কাল্‌ডা দুর্গ অধিকার
করেন। তদবধি এই পার্শ্বতীয় ভূভাগের রমণীয় বিভাগ
সকল দিল্লী সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইল, কেবল দুর্গম
মন্দির স্থান দেশীয় সর্দারগণের অধিকারে রহিল। এখান-
কার রাজপুতগণ হুইবার বিজোহ হইয়া কাল্‌ডা দুর্গ

উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, আইগীর হুইবার (১৬১৫ খৃঃ
ও ১৬২৮ খৃঃ) কতোচ রাজকুমারদিগকে শাসন করিবার
জন্য কাল্‌ডার পয়ন করেন। শেষবারে ২২ জন সর্দার
কর দিতে সম্মত হন।

আইগীর কাল্‌ডার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া
এখানে বাসের জন্য ঐশ্বর্য্যবন নির্মাণের আদেশ করেন।
এখনও এখানকার গর্গরীগ্রামে সেই ঐশ্বর্য্যবনের চিহ্ন
পড়িয়া আছে।

দিল্লীর মুসলমান বাদশাহেরা কাল্‌ডার সর্দারগণকে
উপেক্ষা করিতেন না, সকলকেই বিশেষ সম্মান দেখাইতেন
এবং পদ অনুসারে সকলকেই বিশেষ বিশেষ পদমর্যাদা প্রদান
করিতেন। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে নূরপুরের রাজা জগৎচাঁদ শাহজ-
হান বাদশাহ কর্তৃক ১৪০০০ সৈন্তের অধিনেতৃপদ প্রাপ্ত
হন। তিনি সেই সৈন্য সাহায্যে বালুণ ও বদকুশানের
উল্লেসগদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ছিলেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জগৎচাঁদের
পৌত্র মাক্কাতা কিছুদিনের জন্য সুদূরতী বামিয়ান ও
ঘোরবন্ধের শাসনকর্তাপদে নিযুক্ত হন। কুড়ি বর্ষ পরে
রাজা মাক্কাতা ২০০০ মনুষ্যবাহার পদ প্রাপ্ত হন।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কাল্‌ডারাজ বমলচাঁদ জালন্ধর এবং
ইরাবতী ও শতজুনদীর মধ্যবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তা হন।

দিল্লীর বাদশাহগণের পূর্ক পরাক্রম বিলুপ্ত হইলে, রাজ্য-
মধ্যে একপ্রকার অরাজকতা ঘটে, সেই সময়ে প্রায় ১৭৫২
খৃঃ এখানকার রাজপুত সর্দারগণ স্বাধীন হইয়া কাল্‌ডার
অধিকাংশ উপভোগ করিতে থাকেন, তৎকালে আকবরশাহ
দুরানি কেবল তত্ত্ব কাল্‌ডা দুর্গটি আয়ত্তে রাখিয়াছিলেন
মাত্র। ১৭৭৪ খৃঃ, জয়সিংহ নামক একজন শিখ-সর্দার
কৌশলক্রমে কাল্‌ডা দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু ১৭৮৫
তিনি ঐ দুর্গটি কাল্‌ডার রাজপুতরাজ সংসারচাঁদকে
ছাড়িয়া দিলেন। এতদিন পরে কাল্‌ডা দুর্গ পুনরায়
কতোচ রাজবংশের হস্তগত হইল। কতোচরাজ সংসার
চাঁদ পূর্ক পুরুষগণের জায় পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব
করিতে লাগিলেন। কাল্‌ডার পার্শ্বতীয় প্রদেশের নানা
স্থানের সর্দারগণ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন। এমন
কি সংসারচাঁদ যখন দিঘিঞ্জরে বহির্গত হইতেন, ঐ সকল
সর্দারগণ সটেন্জে তাঁহার অনুবর্তী হইতেন। প্রতি বর্ষে এক-
বার করিয়া প্রত্যেক সর্দারকে রাজদর্শনে আসিতে হইত।
সংসারচাঁদ ২০ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিলেন। তিনি
নামসম্মানে ও বশে সকল কতোচরাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন।

১৮০৫ খৃঃ কুঞ্জে সংসারচাঁদ বিলাসপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। বিলাসপুরের রাজা শতদ্রু ও বর্ষা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশের গোৰ্খা সর্দারগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গোৰ্খাগণ শতদ্রুনদী পার হইয়া মহলমোরি নামক স্থানে (১৬০৬ খৃঃ) কতোচ রাজপুত্রদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের বাহুবলপ্রভাবে রাজপুত্রগণ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। গোৰ্খা সর্দারগণ কাজ্‌ড়ারাজ্যে প্রবেশ করিয়া দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। রক্তস্রোতে কাজ্‌ড়া ভাসিতে লাগিল। নগর, গ্রাম, উপবন, সুন্দর রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি সকলই বিধ্বস্ত হইল। এখন কাজ্‌ড়ারাজ্য অশান—মকভূমি সমান! কতোচ রাজকুমারগণ প্রাণ লইয়া সুদূর গিরিগুহায় পথ ঘাটে আশ্রয় লইলেন। গোৰ্খাদিগের সেই লোমহর্ষণ কাণ্ড আজও কেহ ভুলিতে পারে নাই। কাজ্‌ড়ার প্রত্যেক নগরে প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেকের হৃদয়ে সেই ভীষণ ব্যাপার জাগরুক রহিয়াছে।

তিন বৎসর অত্যাচার সহিয়া রাজা সংসারচাঁদ মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ১৮০৯ খৃঃ, রণজিৎসিংহ গোৰ্খাদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ভীষণ সমর বাধিল। অনেক কষ্টে রণজিৎ জয়লাভ করিলেন। গোৰ্খাগণ শতদ্রুর পরপারে প্রস্থান করিল। প্রথমে রণজিৎ সংসারচাঁদকে সমস্ত কাজ্‌ড়ারাজ্য ছাড়িয়া দিলেন, প্রথমে কেবল কাজ্‌ড়া দুর্গ ও ৬৬ খানি ক্ষুদ্রগ্রাম সৈন্তব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য আপনায় থাকে রাখিলেন; পরে ক্রমশঃ পার্শ্ববর্তী সর্দারগণের অধীনস্থ স্থানসমূহ আপনায় অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংসারচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধচাঁদ রাজা হন, তিনি ৪ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। রণজিৎ আপন সস্ত্রী ধ্যানসিংহের পুত্রের সহিত অনিরুদ্ধের ভগিনীর বিবাহ দিতে চান। কতোচ রাজকুমার তাহাতে আপনাকে অপমানিত বোধ করেন। তিনি রণজিৎসিংহের আদেশ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া রাজ্যভাগ করিয়া হরিদ্বার যাত্রা করেন। এই সময় সমস্ত কাজ্‌ড়া শিখরাজের রাজ্যভুক্ত হইল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম শিখযুদ্ধের পর ইংরাজেরা কাজ্‌ড়ারাজ্য দখল করিলেন। ১৮৪৮ খৃঃ. মূলতান-বিদ্রোহের পর এখানকার পার্শ্ববর্তী সর্দারেরা বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অল্পেই মিটিয়া যায়। তৎপরে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এখানেও সামান্য বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল, এই সময় হয় জন বিদ্রোহী সর্দারের কঁাসী হয়। সেই অবধি কাজ্‌ড়ারাজ্যে আর কোন বিশেষ গোলযোগ ঘটে নাই।

কাজ্‌ড়াজেলার প্রধান নগর কাজ্‌ড়া, অক্ষা. ৩২°৫৪'১৩" উঃ এবং দ্রাঘি. ৭৬°১৭'৪৬" পূঃ। পূর্বে এই নগর নগরকোট নামে বিখ্যাত ছিল। ইহা বাণগঙ্গা ও বিশাখা নদীর লক্ষ্যে নিকট পর্বতের উপর অবস্থিত। এই নগরে একটি বহু প্রাচীন দুর্গ আছে। এখানে ভবানী ও ভবানীপতির অতিপ্রাচীন মন্দির রহিয়াছে। কাজ্‌ড়ার জড়োরা ও মিনার কাজ্‌ড়ার। লোকসংখ্যা ৫৩৮৭।

কাজ্‌ড়ার লোকেরা সাহসী, বলশালী, সরল ও স্বাধীনচেতা। অধিকাংশই রাজপুত্র।

এখানকার একদল চিকিৎসক কোশলে নাকবোড়া বা খাঁদানাক ভাল করিয়া দিতে পারে। অকবর শাহের বৃন্দে নামক একজন চিকিৎসক ছিলেন; তিনিই নাকবোড়া-চিকিৎসা প্রথম প্রচার করেন। অকবরশাহ তাঁহার চিকিৎসার সন্তুষ্টি হইয়া তাহাকে কাজ্‌ড়ার খানিকটা স্থান জায়গীর দেন।

এই জেলার স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, রত্নজিন, হীরক, মর্দর প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রস্তর উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিজ্জ ও পণ্যবস্তুর মধ্যে যব, গম, ছোলা, শণ, কাপাস, ইক্ষু, তামাক, চা, মধু, মোচাক, লবণ ও বাঁশমতী ধানই প্রধান।

কাচ (কী) কচাতে বধ্যতে অনেক, কচ-বগ্ৰ, ম কুসুম। ১ মোম। ২ গালা। ৩ কাচলবণ। (পুং) ৪ শিকা। ৫ মণি বিশেষ। ৬ নেত্ররোগবিশেষ—লিঙ্গনাশ ও নীলিকা, এই দুইটি ইহার নামান্তর। তিমির রোগের প্রথমাবস্থায় যখন কেবল মাত্র চক্ষু, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও উজ্জল রক্তাদি দেখিতে পায়, তাহাকেই কাচ বা লিঙ্গনাশরোগ কহে।

শঙ্খনাভি, বহেড়ার মজ্জা, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপুল, মরিচ, কুড় ও বচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র ছাগ দুধ দ্বারা পেষণ করিতে হইবে। পরে মটরের জায় বটিকা করিয়া শুক হইলে জল দিয়া ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিতে হইবে। এই অঞ্জন দ্বারা কাচ, তিমির, পটল, মাংসজ্বক, অর্কুদ ও রাজ্যাক্ত প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। ৭ সমুদ্র গুপ্তের নামান্তর।

৮ মৃত্তিকাবিশেষ। কাঁচ, ইহার অপর সংস্কৃত নাম ফার। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—কাররস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং অঞ্জন দ্বারা দৃষ্টির প্রসন্নতাকারক।

(ভাবপ্রকাশ ৪র্থ ভাগ।)

কাচ তলপ্রবণ বহুদ্রব্য। ইহা যুরোপের সর্বপ্রধান ব্যবহার্য্য দ্রব্য। আমাদের দেশে কঁাসা, পিত্তল, পাখরাদি যেরূপ নিন্দ্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য, যুরোপে

সেইরূপ কাচপাত্রের ব্যবহার; সুতরাং সেখানে এদেশ অপেক্ষা কাচ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এই শিল্পটির উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে। যুরোপে কাচ এত অধিক প্রস্তুত হয় যে, তাহাতে দেশের অভাব কুলাইয়া বিদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হয়। ভারতেও যুরোপ হইতে কাচ আসিয়া থাকে। কাচে বোতল, শিশি, কাচের চামর, পুঁতি, কৃত্রিম মুক্তা, নানাবিধ বাসন, কাড়, লঠন, কানন ও নানাবিধ খেলওয়ারি জুয়াখি, চুড়ী, বালা, ইয়ারিং প্রভৃতি অলঙ্কার ইত্যাদি প্রস্তুত হয় ও নানাদেশে রপ্তানি হয়। যুরোপীয় কাচের জুয়াখি এক ভারতেই প্রতি বৎসর প্রায় ৩৫০৬ লক্ষ টাকার আমদানী হয়, তন্মধ্যে পুঁতি ও মুক্তা প্রায় ১০ লক্ষ টাকার আসে।

বালুকান ও কার কাচের উপাদান। ভারতে এই দুই পদার্থের অভাব নাই। সাধারণ বালুকার মধ্যে বালুকান যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং কার নানাবিধ বস্তু হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। উৎকৃষ্ট কাচ প্রস্তুত করিতে হইলে বালুকানের পরিবর্তে চুনায় গোড়া আরকন্দ (Fire-clay) চূর্ণ ব্যবহার করা হইতে পারে, ভারতে তাহারও অভাব নাই। এতটা সুবিধাসত্ত্বেও ভারতে খাজ ও কাচের ব্যবহারের উন্নতি হইল না। এখানে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের কাচ হয়, তাহাতে এক চুড়ী ও কাচের আঁত দানাত ও জরাজ ফুকা শিশি ও কুপী ভিন্ন আর কিছু হয় না। এ দেশের কাচ-প্রস্তুতকারীরা অধিক পরিমাণে কার কাচের কাচে বসিয়া কাচ ভাল হয় না। সময়ে সময়ে কার এক অধিক দেয় যে, কাচখণ্ড জলদ্বারা স্পর্শ করিলে গলগলি পাওয়া যায়। তাহার পর যেকোন তুলে কাচ গালাই হয়, তাহাও ঠিক কাচোপযোগী নহে। যেকোন ধরনের তুলে এদেশে কাচ গালাই হয়, তাহাতে উপযুক্ত উত্তাপ জন্মে না বা যে পরিমাণ উত্তাপ জন্মে, তাহাও বরাবর সমান থাকে না; কারণ, এ দেশের তুলে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য জাঁতার বাতাস দেওয়া হয়, সুতরাং জাঁতার প্রতি হাইতে উত্তাপের বৃদ্ধি ও পদক্ষেপেই হ্রাস ঘটে। আরও এইরূপ বাতাস দেওয়ার গলিত কাচমণ্ডে কতক স্থল পাতলা, কতক স্থল পুরু ও অভ্যন্তরভাগে বায়ুবিন্দু পূর্ণ হইয়া পড়ে, পরিষ্কারও হয় না। দেশী কাচে বিপুল কারের পরিবর্তে সামান্য কাচ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কাচ ভাল হয় না; কারণ, ইহাতে অধিকাংশ কড়া অম্লারকার (Crude Carbonate of Soda), সামান্য পরিমাণ উদ্ভিজ্জকার (Potash), শতকরা ৬০-৭০ ভাগ চূর্ণ, ৩০-৪০ ভাগ জৈব শীতবর্ণ বালুকা, আঁত সামান্যভাগে কোয়ার্টজ, ফেল্‌স্পার ও

লৌহাদি আছে; কিন্তু যুরোপীয় উৎকৃষ্ট কাচের মোতালেক যে উপাদান ব্যবহৃত হয়, তাহাতে শতকরা ৫৮ ভাগ বালুকা, গন্ধককার (Sulphate of Soda) ২৯ ভাগ, চূর্ণ ১১ ভাগ ও উদ্ভিজ্জকার ১ ভাগ থাকে। গন্ধককার শতকরা ৪৫ ভাগ কার থাকে। আর কাচমণ্ডে শতকরা ২৯ ভাগের মধ্যে ১০ ভাগ মাত্র এই কার পড়ে; কিন্তু সামান্য হইতে যে অম্লারকার পাওয়া যায়, তাহাতে ৩০-৪০ ভাগ কার থাকে, সুতরাং ভারতীয় কাচে ও যুরোপীয় কাচে কার-পরিমাণ প্রায় ২০ ও ১০ ভাগ হইয়া পড়ে।

এদেশে কাচে রং করিবার জন্য লৌহ, তাম্র ও সফল-কার (Arsenic) ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে কাচপ্রস্তুতের ব্যবসায় আছে। সেখানে যে বালুকা হইতে কাচ হয়, তাহা স্বভাবত কাচবৎ চিকণ ও কারবিশিষ্ট। সে দেশে ইহাকে "রেহ" বলে। এই পদার্থ যে জমিতে থাকে তাহাতে চাষ হয় না। অনেক স্থলে ইহা বাতাসে আপনিই জমিয়া কাচবৎ হইয়া যায়। এই জমা পদার্থের বর্ণ বিশাভী শিশির জায় দৈবৎ নীলবর্ণ। ইহা হইতে আঁত জলদ্বারা খেঁচবরণে কাচ হয়।

চীনে ভারত অপেক্ষা কাচ প্রস্তুতের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

ভারতে অনাথীজাতর মধ্যে পুঁতির ব্যবহার যথেষ্ট। হিন্দুস্থানীরা বড় পুঁতিক কাঁচকা, মানকা, মিনা, তামলেরা মুন্ন, তৈলজারা পুসালু ও মলয়বাসীরা বুটর পাটা বলে।

কাচের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার নাম। আরব—খিরাজ। ফরাসী—ভিট্রে। ভের্ণে—হলকা, বালাগ—কাঁচ, কাচ। ইটালী—ভেট্রো। গার্সন—ভট্টাস। পারস্ত—শিশা। রুসীয়—টেকলো। স্পেনীয়—ভিট্রো। তামিল—কুন্ডাত। তৈলগী—আঙ্গামু।

রসায়ন-তত্ত্বমতে কাচে নিম্নলিখিত জবাদি থাকে;—বালুকান (Silica), উদ্ভিজ্জকার (Potash = Pearl-ash ও wood-ash), সোডা (Soda = Sulphate of soda, carbonate of soda), ব্যারাইট (Baryta), স্ট্রন্টায় (Strontia), চূর্ণ (Lime) ও কটিকিরি (Alumina)।

অস্থিজকার (Bone-ash) হইতে একপ্রকার কাচ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ইংরাজেরা (Bone Glass) বলে।

কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ২.৭০২।

জর্জনে প্রস্তুত শাশির (আনাগার) কাচের মধ্যে চিকণ বালুকা ১০০ ভাগ, উদ্ভিজ্জকার ৫০ ভাগ, বড়ি ২৫ ভাগ ও সোরা ২ ভাগ থাকে।

করাগীঘের (পরকোলাস দর্পণের) কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৪৮৮। ইহার বর্ণ জৈব নীলবর্ণ। ভিনিসীয় দর্পণের কাচ জৈব পীতবর্ণ।

বোহিমিয়ান কাচের বহুতা সূর্য্যাপেক্ষা বিখ্যাত। আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৩২৬।

বিলাতী "ক্রাউন" কাচ বোহিমিয়ান কাচের জায়। আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৪৮৭।

ফটিক কাচ (Crystal glass) আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৯ হইতে ৩.২৫৫ হয়। ইহাতে সীসকের অংশ থাকে। ইহার বিশেষ কোন বর্ণ নাই। ইহার ১০০ শত ভাগ বালুকা, ৩০।৪০ ভাগ উদ্ভিজ্জকার, ৬০।৭০ ভাগ মিনিয়াম, ৪ ভাগ সোহাগা, ৩ ভাগ সোরা, ১৫ ভাগ মণ্ডলকারাদি ইত্যাদি। লণ্ডন কৃষ্টাল স্যাস হইতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়।

ফ্লট্‌কাচ (Flint glass, হিন্দী—দোবাস) ইহা সূর্য্যাপেক্ষা পরিষ্কৃত জব্বাদি হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার ১০০ ভাগ বালুকা, ৫০ ভাগ উদ্ভিজ্জকার, ১০০ ভাগ মিনিয়াম ও অবশিষ্ট ফটিকের জায়।

চুমি-কাচ (Ruby glass) একপ্রকার অতি সুন্দর স্বর্ণপ্রভাময় কাচ। ইহা পরিমাণ করিয়া প্রস্তুত হয় এবং গলিত মণ্ডের সহিত স্বর্ণদ্রাবক মিশাইয়া দেয়। এই কাচ যখন প্রস্তুত হয় তখন কোন বর্ণ থাকে না, পরে কারোনাটপ ৯২৫ ডগ্রী উত্তপ্ত করিলে দিয়া চুমির জায় রক্তবর্ণ হয়।

মিন-কাচ (Ename glass) ইহাও একপ্রকার অতি সুন্দর চক্কর কাচ।

কাচোপা—সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে কাচকে মণিবিশেষ বলিয়া গণনা করা হয়—

"আকরে গদ্যাপাণ্ডা জন্ম কাচগণে: কৃত:।"

কাচ ও ফটিক একই জ্ঞা—

"কাচ-ফটিক-পাত্রেষু।"

ফটিক মণি সৰ্ব্বদে সংস্কৃত গ্রন্থে আছে—

"হিমালয়ে সংহলে চ নিদ্ধাতিবা-তটে তথা।

ফটিকং জায়তে চৈব নান্যাকণং সমপ্রভম্ ॥

হিমাচলো চক্করকাণ্ডে ফটিকং তৎপ্রভাবতঃ।

সূর্য্যাকান্তক তৈজসং চক্করকাণ্ডে তপাপরম্ ॥

সূর্য্যাস্তে স্পন্দমাজেণ বাক্তং সমতি বৎকণাৎ।

সূর্য্যাকান্ত: তদাখ্যাত: ফটিকং বহুবেদিস্তি: ॥

পূর্ণেন্দু করসংস্পাদমুতং অংগতি কণাৎ।

চক্করকাণ্ডে তদাখ্যাতং চক্করং তৎকলৌমুগে ॥"

হিমালয়ে, সংহলে ও নিদ্ধাতিবো ফটিকমণি আছে। হিমালয়ে চইপ্রকার আছে, তদ্বৎ একপ্রকার সূর্য্যাস্ত, ইহা সূর্য্যাকিরণস্পর্শে অগ্নি উদ্বীর্ণ করে। ইহার নাম সূর্য্যাকান্ত। অপর প্রকার চক্করসূর্য্য। ইহা চক্করস্পর্শে অমৃত উদ্বীর্ণ করে, কিন্তু কলিযুগে ইহা পাওয়া যায় না ইহার নাম চক্করকান্ত।

সূর্য্যাকান্তমণি এখনকার আত্মীকাচের সমতুল্যবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

কাচক (পুং) কাচ-স্বার্থে কন্। কাচ।

কাচকুপী (স্ত্রী) কাচনির্মিতা কুপী, মধ্যলো। কাচের বোতল। ("কাচকুপাং পিনি:কিপেৎ।")

সাব্যক্তত্ব অর্থপ্রকাশ। ১ম)

কাচঘটী (স্ত্রী) কাচনির্মিতা ঘটা অন্ন ঘটা, মধ্যলো।

কাচনির্মিত জলপাত্র, কাচের গ্লাস।

কাচডাদাম (দেশজ) জলজ লতাবিশেষ। (Jussieu repens.)

কাচন (স্ত্রী) কচ-স্বার্থে পিচ-ভাবে লুটি। ১ পত্র বা পত্রক বীধিবার উপকরণ। ২ ("কিসংকরাভিক্তনো" ইতি সূত্রবোধ সূত্রেণ কাচন।) কোনও অনির্দিষ্টা স্ত্রী। ৩ (দেশজ) কণে ধৌত করা। ৪ কৃত্রিম বেশ করা।

কাচনক (স্ত্রী) কাচাতে লেখা নিবন্ধান্তে অঙ্গের, কচ-পিচ-লুটি-স্বার্থে কন্। পত্র বা পত্রক বীধিবার উপকরণ।

কাচনকী (স্ত্রী) (পুং) কাচনক: সস্ত্যন্ত, কাচনক-ইনি। পত্র, চিঠি। ইহার সংস্কৃত পদ্যাদি—বর্জিত, বর্জিত, লেখ, বীচিক, চারক ও তালক।

কাচনার (স্ত্রী) কাচনক:। (Boehnia variegata.)

কাচভাজন (স্ত্রী) কাচনির্মিত ভাজন মধ্যলো। কাচের পাত্র। ইহার অপর সংস্কৃত নাম শিখরিন।

কাচমণি (পুং) কাচনং মণি: কাচ এব মণির্বা। ১ কাচের জায় অন্ন উজ্জ্বল মণি। ২ কাচ।

কাচমল (স্ত্রী) কাচত কারমুতকারা মলমিব, উপনিং। কাচলবণ।

কাচর (স্ত্রী) কু জৈব চরতি দীপ্তা দূরং গচ্ছতি, কু-চর-অ-কো: কাদেশ:। পীতবর্ণ।

কাচরূপ, পূর্নগঙ্গের একপ্রকার কারত জাতি। ইহার কারত জাতির একটা শাখা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই জাতির উৎপত্তি সৰ্ব্বদে একটি গল্প আছে—

"একজন ধনবান ও সম্ভ্রান্ত কারত্ব অপরাপর কারত্বের নিবেশ স্বত্তেও আপনায় বাটীতে কালীপূজা করেন। জাহাতে বৈকুণ্ঠ কারত্বগণ জাহার প্রতি বিরক্ত হন এবং লক্কে

মিলিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। এই সমাজচ্যুত কার্যের আত্মীয়বর্গ 'কাচক' নামে প্রসিদ্ধ হন।"

আবার কেহ বলেন, তাহা নয়, "কাচাকরা কাচ বা গালায় ব্যবসা করিতেন বলিয়া কার্যসমাজ হইতে বহির্গত হন। তাঁহারি নানা স্থানে কাচ বা গালায় বলয়াদি প্রস্তুত দ্বারা বিলক্ষণ ধন উপার্জন করিতেন বলিয়া, কাচক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।"

যাহা হউক, অপর কার্য হইতে হইতে কাচকরা অনেকাংশে নিকৃষ্ট, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহাদের পুরোহিত, ধোবা, নাপিত স্বতন্ত্র।

গোত্র—আলিমন্, কাশ্চপ, পরাশর।

পদবী—দে, দত্ত, দাস।

পূর্ববঙ্গে ও করিমপুর জেলায় মানারিপুরে অধিকাংশ কাচক বাস করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন আর গালায় ব্যবসা করে না।

কাচলবণ (স্ত্রী) কাচাৎ কারমুক্তিকাতঃ জাতং লবণম্ মধ্যলো°। লবণবিশেষ, কাল-লবণ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—নীল, কাচোদ্ভব, কাচ, নীলক, কাচসম্ভব, কাচসৌবর্জল, কৃষ্ণলবণ, পাকক, কাচোথ, হরগন্ধ, কাললবণ, কুরুবিল, কাচমল ও ক্রজিম। রাজনির্ণাণ্টের মতে ইহার গুণ—ঈষৎ কার, ক্রচিকারক, অগ্নিবর্জক, পিত্তবৃদ্ধি ও দাহকারক এবং কফ, বায়ু, শুণ্ম ও শূলনাশক।

কাচবকযন্ত্র (স্ত্রী) কাচনির্ণিতঃ বকযন্ত্রম্, মধ্যলো°। কাচ নির্মিত বস্ত্রবিশেষ। [বকযন্ত্র দেখ।]

কাচসম্ভব (স্ত্রী) সম্ভবতি অস্মাৎ ইতি সম্ভবঃ, কাচঃ সম্ভবঃ উৎপত্তিস্থানমন্ত, বহুব্রী। কাচলবণ।

কাচসৌবর্জল (স্ত্রী) কাচস্থানিকং সৌবর্জলং, মধ্যলো°। কাচলবণ।

কাচস্থালী (স্ত্রী) কাচস্ত কারস্ত স্থালী, উপমি। ১ পাকল গাছ। (Bignonia suaveolens) ইহার সংস্কৃত পর্যায়—পাটনি, পাটলা, অমোঘা, মধুদত্তী, ফলেদ্রহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাকী, কালস্থালী, কাচস্থালী, অস্তিত্তলতা ও তাত্রপুন্দী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—কষায় ও তিক্তরস, ঈষৎক্ষারী, এবং বায়ু, পিত্ত, মেদা, অরুচি, শ্বাস, শোথ, রক্ত, বমি, হিকা ও তৃক্ষণাশক। ইহার ফুল কষায়, মধুর রস, শীতবীৰ্য, ক্ষয়গ্রাহী, কঠশোধক এবং কফ, রক্তদোষ, পিত্ত ও অতীসার-নাশক। ফল হিকা ও রক্তপিত্তনাশক। (ভাবপ্র ১ম ভাগঃ।) [পাকল দেখ।] ২ (কাচনির্ণিতা স্থালী, মধ্যলো°) কাচের হাঁড়ী।

কাচা (দেশজ) ১ পিত্তা মাতার যুত্ব হইলে হিন্দুগণ যে

নূতন বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া অশৌচকাল অতি বাহিত করেন, তাহাকে কাচা কহে। ২ ধোত করা।

কাচাক (পুং) কাচ ইব অক্ষি যন্ত, বহুব্রী। বকবিশেষ। কাচান (দেশজ) ১ অপর দ্বারা ধোত করান। ২ ধোপার দ্বারা পরিষ্কার করান।

কাচিৎ (পুং) কচতে দীপ্যতে, কচ-বাহুলকাৎ ইন্; কাচিৎ কাচিৎ হস্তি গচ্ছতি, কাচি-হন্-ড হস্ত যঃ (পুৰোদারাদিক্) ১ স্বর্ণ। ২ ছেমড, ছিমড়া। ৩ ইন্দুর।

(কাচিৎঃ কাঞ্চনে হপিভ্যৎ ছেমডে মুষিকে হপিচ। মেদিনী।) কাচিৎ (অব্যয়) কোনও অনর্দিষ্টা জ্ঞী। পাণিনি মতে কাচিৎ দুইটি পৃথক্ পদ একত্রিত; কিন্তু মুখবোধের মতে কাপদের উত্তর চিৎ প্রত্যয় হইয়াছে। (কিমংক্যন্তাচ্চিনো। যু। ত।)

কাচিতি (ত্রি) কচ্যতে বধ্যতে অসৌ কচ-ণিচ-ক্ত। শিকার তোলা বস্ত্র।

কাচিম (পুং) কচ-ণিচ-ইমন্। দেবকুলোৎপন্ন বৃক্ষ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম ভঙ্গর।

কাচিলিঙ্গি (স্ত্রী), কাকচিকি।

কাচুয়া (কচুয়া) খুলনাজেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম, ভৈরব ও মধুমতীনদীর সঙ্গমস্থানে এবং বাঘেরহাট হইতে ৩ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। এখানে পুলিশের থানা এবং একটি বড় বাজার আছে। ১৭৮২ খৃঃ, হেক্সেল সাহেব ঐ বাজার স্থাপন করেন। গ্রামের মধ্য দিয়া একটি খাল গিয়াছে, তাহাতে গ্রাম থানি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মধ্যস্থানে যাতায়াতের জন্য সেতু আছে।

এখানে বিস্তর কচু জন্মে, বোধ হয় তাঁহা হইতে ইহার নাম কচুয়া বা কাচুয়া হইয়াছে।

কাচুক (পুং) কচ-বাহুলকাৎ উকঞ°। ১ কুকুট। ২ চক্রবাক। কাছ (দেশজ) ১ নিকট। ২ নদীতীর। (হিন্দী) ৩ পরিধের বস্ত্রবিশেষ। ইহা পরিধান করিলে উরুর উপর হইতে পাছ পর্যন্ত ঢাকিয়া যায়। ৪ উরুর উপরিভাগ।

কাছনি (হিন্দী) ১ কাছ। ২ কাছের মত উরুর উপর গুটাইয়া টানিয়া পরা।

"কটি খটি বাজে দৃঢ় করিয়া কাছনি।" ছঃখীভাম—গোবিন্দ°।

কাছা (দেশজ) পুরুষের পরিহিত বস্ত্রের যে ভাগ পশ্চাদ্গমিকে ঢাকিয়া রাখা হয়।

কাছাআলগা (দেশজ) অপাবধান, কোন কাছাই বাহার বস্ত্র নাই।

কাছাকাছি (দেশজ) নিকটে নিকটে।

কাছাড় (কাছার)। আসামের চিক কমিসনরের অধীন একটি জেলা। অক্ষা ২৪° ১২' হইতে ২৫° ৫০' উঃ এবং দ্রাঘি ৯২° ২৮' হইতে ৯৩° ২৯' পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

ভূপরিমাণ ৩৭৫০ বর্গমাইল।

এই জেলার উত্তরে কপিলি ও দিয়াং নদী, এই দুই নদী দ্বারা নওগঞ্জ জেলা হইতে কাছাড় পৃথক্ হইয়াছে; পূর্বে মণিপুর ও নাগা পাহাড়; দক্ষিণে লুসাই বা কুকি জাতি-পরিবেষ্টিত গিরিমালা, পশ্চিমে শ্রীহট্ট ও জয়ন্তী পাহাড়।

এই জেলা প্রধানতঃ বরাক উপত্যকার উত্তরাংশ অধিকার করিয়া আছে। ইহার তিন দিকে উচ্চ গিরিমালা; কেবল পশ্চিমে শ্রীহট্টের দিকে খোলা। এই সকল পাহাড়ে কোথায় নিবিড় বন জঙ্গল, কোথাও পর্বত ভেদ করিয়া স্রুজ প্রস্রবণ প্রবাহিত; উপত্যকার মধ্যভাগে পূর্বে হইতে পশ্চিমাভিমুখে কলনাদিনী স্রোতঃস্রোতী প্রবাহিত হইতেছে। বর্ষাকালে ইষ্টিমারে করিয়া এই স্রোতঃস্রোতী পার হইতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণে উভয় পার্শ্বে পাহাড়গুলি একটি হইতে আর একটি এইরূপ ভাবে বাহির হইয়া ঢেউ খেলাইয়া গিয়াছে।

এখন এই সকল ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর জঙ্গল কাটিয়া চা বাগান হইয়াছে। পাহাড়ের উপরিভাগে চা-করদিগের বিশ্রাম ভবন। এখানকার নিম্ন ভূমিতে ধাতুর চাব হইতেছে।

বারেল পাহাড় এই জেলাকে 'উত্তর কাছাড়' ও 'দক্ষিণ কাছাড়' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; এই গিরিমালা ২৫০০ ফুট হইতে ৬০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। বরাক উপত্যকার দক্ষিণে ভুবন, রেংতি পাহাড়, তিলাই এবং সরসপুর বা সিক্কেসর পাহাড়। এই পাহাড়গুলি দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গিয়াছে, উচ্চত্রে একটি একটি ৩০০০ ফুটের কম নয়। উপরিভাগের পাহাড়ে আদৌ অধিত্যকা নাই।

বরাক নদী—এই জেলার মধ্য দিয়া প্রথমে উত্তরে তৎপরে পশ্চিম মুখে চলিয়াছে, সকল সময়েই নৌকাযোগে এই নদী পার হওয়া যায়। কাছাড়ের মধ্যে বরাকনদীর এই কএকটি প্রধান শাখা আছে; যথা—উত্তরাংশে জিরি, জাতিঙ্গা, মহরা, বদরী ও ছিরি নদী এবং দক্ষিণাংশে ধলেশ্বরী, ঘাগুরা ও সোনাই। রেংতি ও তিলাই পাহাড়ের মধ্যে চাংলা নামে একটি হোড় বা জলা পড়িয়া আছে, বর্ষাকালে বরাক নদীর জল আসিয়া এখানে জমে, তাহাতে এই জলাটি ছয় ক্রোশ বিস্তৃত একটি হ্রস্বরূপে পরিণত হয়।

বরাক নদীর উত্তরাংশ স্থান শক্তপ্রধান, যে দিকে দেখ, দেখিতে পাইবে শক্তক্ষেত্র ধু ধু করিতেছে। এখানে শক্ত বেশ উৎপন্ন হয়; কিন্তু দক্ষিণভাগ বস্তা প্রধান।

এখানকার জমী বালি ও কর্দম মিশ্রিত। এখানকার মৃত্তিকা কোমল, চাষাবাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানকার পর্বতগর্ভে ক্ষটিক, ক্ষটিকের ন্যায় উজ্জল স্ট্রেটপাথর এবং উপলখণ্ডের চাপ পাওয়া যায়।

এখানে ধনি বা ভাল ধনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না। পূর্বে কাছাড়ে অধিকাংশ লবণই এখানকার লবণকূপ হইতে সংগৃহীত হইত। এখন বঙ্গদেশ হইতে ভাল লবণের আমদানী হওয়ার অনেককেই আর লবণকূপ হইতে লবণ সংগ্রহ করে না, তবে শুনা যায়, এখনও একটি লবণকূপ ব্যবহার হইয়া থাকে।

কাছাড়ের ধনভাণ্ডার কাছাড়ের বনজঙ্গলে নিবদ্ধ। ভাল ভাল জারুল ও নাগকেশর এখানে অপরিাপ্ত জন্মে, যতই কাট, কিছুতেই ফুরায় না। এখানকার বুনারা অবি-প্রান্ত কাঠ কাটিতেছে, তাহাদিগকে কাঠ কাটিয়া লইবার জন্য প্রত্যেককে ১ টাকা করিয়া কর দিতে হয়।

কাছাড় হইতে প্রতিবর্ষে নৌকা, হাল, যষ্টি ও চাপড়ান দ্বারা প্রভৃতি অনেক টাকার দ্রব্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এখানকার কাম্বীরীগাছ হইতে রবার উৎপন্ন হয়। গত ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ে প্রায় বাটহাজার টাকার রবার বিক্রয় হয়।

এখানকার অরণ্যে হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, মেংনা গো, ব্যাঘ্র, কৃষ্ণ শূকর, শাবর ও বড়শিকা হরিণ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার হাতিখেনা গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া। মেংনা গো কাছারীরা দেবতার বলি দিবার জন্য পুষিয়া থাকে। মহিষের দ্বারা কৃষিকার্য্য হয়।

ইতিহাস—এখন যেমন কাছাড় সামান্য একখণ্ড ভূভাগে পরিণত হইয়াছে, পূর্বকালে এমন ছিল না, পূর্বকালে রঙ্গপুর, আসাম, কাছাড় ও জিপুরা এই কয়টি লইয়া কাছাড়-রাজ্য ছিল।

ইহার প্রাচীন নাম "হেড্‌ঘরিষর"। একজন প্রবাদ আছে, যে হিড়িঘ রাক্ষসের সহোদরা ভীম-পত্নী হিড়িঘা কাছাড় রাজকুলের আদিমাতা। হিড়িঘার বংশধরেরা এই স্থানে রাজত্ব করেন বলিয়া এই জনপদ হেড্‌ঘ নামে পরিচিত হয়। ব্রহ্মধত্ত নামক একখানি তথ্য পুরাণীয় গ্রন্থে এই হেড্‌ঘ জনপদের প্রথম নামোল্লেখ পাওয়া যায়। বলা—

"বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঃ হেড্‌ঘ মণিপুরকম্।

লৌহিত্যত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যঃ জঙ্গলকম্।"

এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রণচণ্ডী। (৬।৬৪।)

“হেড়মদেশমধ্যে চরণচণ্ডী বিরাজতে।

বরবক্রা সরিৎপাশে হিড়িছা লোকভূজরা।।”

ভবিষ্যৎ ব্রহ্মখণ্ড ২২।৪১।

এখন যাহাকে আমরা কাছাড় বলি, তাহারই খানিকটা ‘কচ্ছাল’ গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [ভূ. ব্রহ্মখণ্ড ১৯।৫৫।]

দেশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে হেড়মরাজ্য উত্তরে কামরূপ ও ধর্মপুর, পূর্বে মণিপুরসীমা, দক্ষিণে ময়ূরা এবং পশ্চিমে শিয়ালকোট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেশাবলীমতে এই কয়টি নগর ও গ্রাম হেড়মরাজ্যের অন্তর্গত। যথা—

১ কাশপুর—হেড়মরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এই নগর ঘটোৎকচবংশীয় হেড়মরাজগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়।

২ ধর্মপুর—হেড়ম রাজধানী হইতে ১৮ যোজন উত্তরে পূর্বতের নিকট অবস্থিত। এখানে গার ও নাগাজাতির বাস। যেখানে নাগারা বাস করে, তাহাকে কেহ কেহ ‘খাইচারি নাগাগর’ বলে।

৩ শূগলকোট বা শিয়ালকোট—কাশপুর হইতে ৮ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত।

৪ তিলাজিমালা—শিয়ালকোট হইতে ৬ যোজন পূর্বে; এই গ্রামে পূর্বকাল হইতে অনেকগুলি মনোহর পুষ্করিণী আছে।

৫ ফুলাসাদি—শিয়ালকোট হইতে অর্দ্ধ যোজন পূর্বে অবস্থিত।

৬ জয়নগর—ফুলাসাদির পূর্বে।

৭ চাপঘাট—কাশার (বা কাছাড়ের) দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা হেড়মরাজ্যের সহিত প্রায়ই যুদ্ধ করিত।

এতদ্ভিন্ন বন্ধালী, লাহাটো, ছতশতী, বাওয়গঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরগনা ছিল। (দেশাবলী)

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, পূর্বকালে অর্জুনপুত্র বক্র-বাহনের বংশধর কাছাড়ে রাজত্ব করিতেন, এখানকার রাজ-বংশীয়েরা বক্রবাহনের বংশধর, কিন্তু এ প্রবাদটি ঠিক নয়। প্রাচীন পুস্তক ও সাধারণের প্রবাদ মতে হিড়িছানন্দন ঘটোৎকচের বংশধরেরা এখানে রাজত্ব করিতেন। দেশাবলীতে লিখিত আছে—“হেড়মদেশের প্রথম রাজা ঘটোৎকচ, তিনি কুকক্ষেত্রমুকে কর্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র বর্সরীক এখানকার রাজা হন। বর্সরীক কীককের চক্রাঘাতে নিহত হইলে, তৎপুত্র মেঘবর্ণ হেড়মের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার অনেক পুত্র গত

হইলে, সেই বংশের সুর দর্পনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাযোদ্ধা ও পরমধার্মিক ছিলেন, ৫০ বর্ষ রাজত্বের পর তাঁহার স্বর্ণপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার পুত্র শত্রুশাস্ত্র-বিশারদ রামচন্দ্র রাজা হইলেন। [দেশাবলী হেড়মদেশবর্ণন দেখ।]

কাছাড়ের ভূতপূর্ব ডেপুটি কমিশনার এড্গার সাহেব লিখিয়াছেন যে, “কাছাড় রাজবংশ বহুদিনের প্রাচীন নয়। কাছাড় রাজবংশ মধ্যে ঘটোৎকচ হইতে যে বংশাবলী প্রচলিত আছে, তাহাও অতিনব। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশাবলী প্রস্তুত হয়, স্মরণ্য তাহার উপর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে রণবীর নির্ভয়নারায়ণ কাছাড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা; তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার উত্তরপুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্র ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। হরিশ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর ৩৭ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র ভাতৃউত্তরাধিকারিণি স্বত্ব সিংহাসনে আরোহণ করেন।”

কিন্তু দেশাবলীর বর্ণনার বিশ্বাস করিলে এড্গারের কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এড্গার সাহেব কাছাড় রাজবংশের অপ্রাচীন বলিয়া স্থির করিলেও রাজমালা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রাচীন ইতিবৃত্ত গ্রন্থে প্রাচীন কাছাড় রাজগণের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। রাজমালা প্রায় সাড়ে চারশত বর্ষ পূর্বে লিখিত হয়। এই গ্রন্থে লিখিত আছে “ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দৌলজয়সিংহ হেড়মরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন। ত্রিলোচনের দ্বিতীয়পুত্র দক্ষিণ গৈতুকরাজ্যের উত্তরাধিকারী হন।”

কাছাড়ের ঐতিহাসিকেরা বলেন, এখন যেখানে নাগা জাতির বাস সেই নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত পার্বত্যপ্রদেশসমূহে পূর্বে কাছাড় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। আসামের দিমাপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এখনও দিমাপুরে প্রাচীন কাছাড়রাজগণের রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ ও বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখনও সেই কাছাড়ীদিগের বংশধরেরা কুকী ও নাগাদিগের সহিত উত্তর কাছাড়ে বাস করিতেছেন, তৎপরে কাছাড়ী রাজগণ দক্ষিণাভিমুখে বারেন পাহাড়ের মধ্যবর্তী মাইবোং নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানকার জঙ্গলমধ্যে প্রাচীন দেবমন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভের উপবন এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, ভদ্রুটে বোধ হয়, এখানে কাছাড়ী রাজারা অতি অল্পকাল বাস করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণের মতে, পূর্বকালে কাছাড়ী রাজগণ

বিভিন্ন-মতাবলম্বী পার্শ্বতীয় জাতি মধ্যে পরিগণিত হইতেন। তাঁহারাই মাইবোং নামক স্থানে আসিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে কাছাড়রাজ ত্রিপুরারাজকন্ডার পাণি-গ্রহণ করেন। তিনি বিবাহের মৌতুক স্বরূপ ত্রিপুরারাজের নিকট হইতে বরাক উপত্যকা প্রাপ্ত হন। অনেকে অমু-মান করেন যে, সেই সময় হইতে কাছাড়-রাজগণ ক্ষত্রিয় পরিচায়ক বর্মোপাধি ব্যবহার করিতেন। জয়ন্তীরাজগণের উপভ্রবে কাছাড়-রাজগণ মাইবোং ছাড়িয়া কাশপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন*। এই সময়ে বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত গড়েরিতর নামক স্থানে আর একটি ক্ষুদ্র রাজধানী ছিল, শেষোক্ত রাজধানী এককালে বিধ্বস্ত হইয়া এখন তৎপরিবর্তে চা-বাগান শোভা পাইতেছে।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কাছাড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে মণিপুররাজ মধুচন্দ্র ভ্রাতৃকর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাছাড়রাজ তাঁহাকে ৫০০ শত সৈন্য সাহায্যার্থ প্রদান করিলে, মধুচন্দ্র মণিপুরে পুনরায় যুদ্ধ বাজা করেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর মধুচন্দ্র নিহত হইলেন, তাঁহার ২য় সহোদর চৌরজিং পূর্ব হইতে মণিপুরে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, তিনি ৩য় সহোদর মারজিতের সহিত একত্র বন্দোবস্ত করেন যে, তিনি দুই বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া মারজিতের হস্তে শাসনভার-প্রদানপূর্বক চিরদিনের মত তীর্থবাণী হইলেন। তিন বৎসর পত্ন হইল, মারজিং চৌরজিতের নিকট মণিপুরের সর্পাশন চাহিলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রাণবধেত্র চক্রান্ত হইতেছে। তখন কালবিলম্ব না করিয়া গোপনে তিনি একমাত্র অঝোরোহণে করেকজন বিখ্যাত অমুচরের সহিত কাছাড় যাত্রা করিলেন। এখানে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রাতা কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু মারজিতের মনোহর অশ্ব দর্শনে কাছাড়রাজের লোভ হইল। এই লোভই কাছাড়-রাজ-বংশের সর্বনাশের কারণ। কাছাড়রাজ ইচ্ছাক্রমে মূল্য লইয়া অশ্ববিক্রয়ের জন্য মারজিংকে অমুরোধ করিলেন। কিন্তু মণিপুররাজকুমার প্রাণপ্রিয়তার অশ্রুটি কিছুতেই দিতে চাহিলেন না, গোবিন্দচন্দ্র সেই অশ্ব বলপূর্বক গ্রহণ করিলেন।

মারজিং আশ্রয়দাতা কর্তৃক মর্ষণীভূত হইয়া বনে বনে

ভ্রমণ করিতে করিতে আবার রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং ব্রহ্মরাজের নিকট যথেষ্ট সমাদর পাইলেন, ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে মণিপুররাজ্য উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই মারজিং ব্রহ্মরাজের সাহায্যে মণিপুর উদ্ধার করিলেন। তিনি পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অস্বাধিকারী এখনও পার্শ্ববর্তী রাজ্যসনে বিরাজ করিতেছেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কাছাড়বংশ করিতে চলিলেন। রাজধানী কাশ-পুর ভস্মীভূত হইল। আবাল বৃদ্ধের রোদনধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কাছাড় নরশোণিতে প্লাবিত হইল। গোবিন্দচন্দ্র আত্মরক্ষার্থ শ্রীহটে পলায়ন করিলেন। কাছাড় ধ্বংস করিয়া মারজিং "মেরাঙাখা" অর্থাৎ কাছাড়-বিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে ব্রহ্মরাজ মারজিংকে আবানগরে বাইবার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু মারজিং বলিয়া পাঠান যে যদি ব্রহ্মরাজ উভয়রাজ্যের মধ্যবর্তী কোন এক স্থান নির্দেশ করিয়া, যত্ন তথায় উপস্থিত হন, তবে মণিপুররাজ সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্রহ্মরাজ মারজিতের পক্ষে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া সটেন্ত্রে মণিপুর আক্রমণ করিলেন। মারজিং কাছাড়ে আসিয়া পলায়িত সহোদর চৌরজিং ও গভীরসিংহকে আহ্বান করিলেন। তিনি উভয় ভ্রাতাকে বিজিত কাছাড়রাজ্যের এক একটি অংশ দান করিলেন। তাঁহারও পরস্পর বিপদে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

গোবিন্দচন্দ্র রাজ্য হারাইয়া ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু সে সময়ে কোম্পানী বাহাদুর অমিতপরাক্রম মহারাই ও পিণ্ডারীগণের সহিত যুদ্ধে বাপৃত থাকায় তাঁহার কণায় কর্ণপাত করেন নাই। গোবিন্দচন্দ্র তখন নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। পররাজ্যলোলুপ খেতগজাধিপ কাছাড়-ভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মারজিং, চৌরজিং ও গভীর সিংহ তিনজনে মিলিয়া প্রাণপণে ব্রহ্মসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন। ব্রহ্মরাজের জয় হইল এবং কাছাড়রাজ্য ব্রহ্মরাজের হস্তগত হইল। তখন হতভাগ্য গোবিন্দচন্দ্র পুনরায় কোম্পানীবাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজসৈন্য-সাহায্যে পুনরায় কাছাড়ের ময়ূবাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইংরাজসৈন্য কাছাড় পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অল্পদিন পরেই কাছাড়ীসেনার অধিনায়ক জুলায়ান

* এড্‌গার, ক্যাপ্টেন কিসর ও হট্টার প্রভৃতি সাহেবের মতে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশপুর রাজধানী স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহারও অনেক পূর্বে যে এখানে য়েড়বরাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ১৬০০ অব্দে রচিত দেশাবলী গ্রন্থপাঠে জানা যায়।

সেনাপতি বিজোহী হইয়া উত্তরকাছাড় অধিকার করেন। তৎপরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় তাঁহার অধিকৃতরাজ্য ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হইল। তখনও জুলারাম উত্তর কাছাড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, ১৮৫৫ খৃঃ, তিনিও অপূত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে ইংরাজ-কোম্পানী তাঁহার অংশও অধিকার করিলেন।

পূর্বে কাছাড়ের বনজঙ্গলে স্বভাবতই চা-গাছ জন্মাইত। ১৮৫৫ খৃঃ, চা-করের প্রথম ইহার সন্ধান পায়। সেই পর্য্যন্ত কাছাড়ের নানাহানে চা-বাগান প্রস্তুত হইয়াছে। এই চা-বাগান লইয়া দুই একবার ইংরাজরাজকে নাগাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, নাগাপার্কতের অজামী-নাগারা কাছাড়ের উত্তরাংশে চা-বাগানে নামিয়া আসিয়া বিলকণ উৎপাত করে, এই উপ-ক্রমে একজন চা-কর সাহেব ও ১২ জন কর্মচারী নাগাদের হস্তে নিহত হন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট অজামী-নাগাদিগকে শাসন করিবার জন্ত ১৮৮০-৮১ খৃঃ স্বাধীন নাগরাজ্যে ইংরাজ-সৈন্য প্রেরণ করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, কাছাড়ে একজন ধর্মপ্রচারক দেখা দেন। তিনি চারিদিকে এই বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার দৈব ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা বলে, তিনি কাছাড়রাজ্য উদ্ধার করিবেন এবং কাছাড়ীরা আবার সকলেই স্বাধীন হইবে। দলে দলে অসভ্য কাছাড়ীরা আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। তাহার প্রথমতঃ গুপ্ত খানা তৎপরে মাইবোং নগরে ডিপুটি কমিসনর ও তথাকার প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে একটি সামান্য যুদ্ধ বাধে। ডিপুটি কমিসনর বিলকণরূপে আসির আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আক্রমণকারীদের মধ্যে ৯ জন নিহত হয় এবং অবশিষ্ট সকলে বন মধ্যে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লয়।

কাছাড়ে বণ্যকালে আউস, শালি ও আমনধানের চাষ হয়। এ ছাড়া সরিষা, তিসী, কলাই, ইক্ষু, লক্ষা ও নামানিধ শাকসব্জিরও চাষ হইয়া থাকে। এখানে মণিপুরী খেস ও কুফীরমণীদের প্রস্তুত একপ্রকার অতি উৎকৃষ্ট মসারি পাওয়া যায়।

শিলচর, সিদ্ধেশ্বর, ও হৈলাকাঁদি নামক স্থানে প্রতিবর্ষে ফুলির হাট হয়। চাকরেরা চা-বাগানের জন্ত সেই সকল ফুলী লইয়া যায়।

কাছাড়ের লোকসংখ্যা ৩১০৮৫৮, তন্মধ্যে সত্বে, গ্রামে ও

ময়দানে ২৮২৪২৫ এবং পার্কতের উপর ২৪৪৩৩ জন লোকের বাস। তন্মধ্যে কাছাড়ী, কুকী, লুগাই, নাগা ও মিকির জাতির সংখ্যাই অধিক। [কাছাড়ী, কুকী প্রভৃতি শব্দ দেখ।] কাছাড়ী (কাছারী)। কাছাড়ের পার্কতীয় জাতিবিশেষ। কাছাড়ের প্রধান প্রধান লোকের মতে কাছাড়ী, নাগা, আবার প্রভৃতি পার্কতীয় জাতি যেচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কাছাড়ীজাতি সাহনী, বলিষ্ঠ এবং গ্রামবাসী। তাহাদের মুখের আকার মোগলজাতির মত; চিবুক কেশশূন্য, এবং দেহ অতি অল্প লোমযুক্ত। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি শাখা আছে, যথা সরমীয়া, স্বর্গীয়া ও স্বর্গীয়-বুটিয়া। সরমীয়ারা কাছাড়ের ও আসামের উত্তরাংশে বাস করে, তাহারা হিন্দুধর্মাবলম্বী। স্বর্গীয়ারা পূর্বদ্বারে বাস করে, তাহাদের মধ্যে সকলেই আপনাদের পূর্ব রীতিনীতি অনুসারে চলে। স্বর্গীয়া বুটিয়ারা ভোটাঁনে বাস করে, তাহারা অধিকাংশই ভোটের লামার মতাবলম্বী।

কাছাড়ীরা রাক্ষসপ্রধার বিবাহ করে। তাহাদের প্রধান উপাত্ত দেবতার নাম 'বোখো', তাঁহার পত্নীর নাম 'মৈমোন'। তাহারা পরমবস্ত্র ভাবিয়া আকল্যাঙ্ক প্রজা করে। ওঝারা ইহাদের পুরোহিত এবং চিকিৎসক। তাহাদের প্রধান পুরোহিতের নাম দেওশী।

সমগ্র কাছাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৩০০০০০০০। আসামে একজাতি কাছাড়ীদের সঙ্গে বাস করে, তাহাদিগকে হোঝাই-কাছারী বলে।

কাছাড়িলা (দেশজ) অসাবধান।

কাছাড়রা (দেশজ) ১ অসুগত। ২ তোমামোদকারী। ৩ ভীক।

কাছার (দেশজ) জেলাবিশেষ। [কাছাড় দেখ।]

কাছারী (পারস্ত) ১ বিচারস্থল। ২ কার্যালয়। ৩ জমিদার-গণের কর্মচারীগণ যেখানে বসিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করে।

কাছি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকশ্রেণীভুক্ত জাতিবিশেষ। ইহারা বাজারে ফলমূলাদি বিক্রয় ও বাগানে মালীর কাজ করিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যে সকল কাছি জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ ৭টি শ্রেণী বিভাগ আছে;—কনোজিয়া, হুদিয়া, সিংগ্রৌ-রিয়া, জোনপুরীয়া, বাস্কনীয়া বা মগহিয়া, জেরেঠা ও কচ্ছবা। এই ৭ শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান বা পানভোজনাদি চলে না। কনোজিয়া শ্রেণীই এই ৭ শ্রেণীর

মধ্যে সর্কাপেক্ষা সম্মানার্থ ও কচ্ছবারা সর্কাপেক্ষা নিম্নপদবীতে গণ্য; কিন্তু কচ্ছবারা বলে যে তাহারাই সর্কাপেক্ষা সম্মানার্থ এবং কনোজিয়া সর্কাপেক্ষা নিম্ন পদবীতে গণ্য। এই কনোজিয়া-শ্রেণী কনোজ হইতে কাশী পর্য্যন্ত, হর্দিয়া-শ্রেণী পূর্ব-অযোধ্যার, সিংগ্রোয়া-শ্রেণী অযোধ্যার দক্ষিণপশ্চিমাংশে, জোনপুরীয়া-শ্রেণী অযোধ্যার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে, জোনপুরীয়া-শ্রেণী বনোদা জেলায়, বাজগীয়া ও জেরেঠা শ্রেণীষর বিহারে এবং কচ্ছবা শ্রেণী ব্রজ ও জয়পুরাদি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ৭ শ্রেণী ব্যতীত কাছিদীগের মধ্যে আরও তিনটি শ্রেণী অল্পসংখ্যক দেখা যায়—খাফলা, জুখসেন ও সচন। বিহারে ইহারাই অধিকাংশ আফিমের চাষ করত।

ললিতপুরের কাছিদীগের মধ্যে পূর্বোক্ত ৭টি বা ১০টি শ্রেণী নাই। ইহার কচ্ছবা, লোরিয়া, হর্দিয়া ও অম্বার এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত।

কাজীতে যে সকল কাছি আছে, তাহার বলে যে, তাহার কচ্ছবা (কচ্ছব) রাজপুতজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ও তাহাদিগের পূর্বপুরুষেরা নরবর প্রদেশ হইতে এতদঞ্চলে আসিয়াছিল।

কাছি জাতির শ্রেণী বিভাগের নামগুলি অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় ইহার আপনাদিগের বাসভূমি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, কনোজিয়া—কনোজ বা কাছকুজ, হর্দিয়া—হর্দিয়াগজ, সিংগ্রোয়া—সিংগ্রোর (এলাহাবাদ হইতে ২৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত, রামায়ণোক্ত নিষাদরাজ্য “শূরবের পুরী”), জোন-পুরীয়া—জোনপুর; বাজগীয়া বা মগহিয়া—মগধ, কচ্ছবা—কচ্ছব, জুখসেন—সন্ধিয়া (রামায়ণোক্ত “সান্ধ্যস্ত”—কালীনদীর তীরে মৈনপুরী ও ফরক্কাবাদের মধ্যে আজিও ইহার ভগ্নাবশেষ আছে)।

অনেকস্থলে ইহার কোরেরি মুরাও বা মোবাই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার কৃষিকর্মে অতি গঠু এবং অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে উত্তমোত্তম শস্তাদি ফল উৎপাদন করিতে পারে।

আগ্রাঞ্চলে কচ্ছব কাছির সংখ্যাই অধিক। কচ্ছব রাজপুত ঠাকুরদিগের ওরসে ক্রীতদাসীর গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। দাক্ষিণাত্যে এই জাতি বণেই আছে। ইহার কুণবী জাতির সদৃশ পদবীতে গণ্য। বোম্বাই প্রদেশে ইহার কলফুল ও তরকারী বিক্রয় করে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের ভ্রম ইহার বিক্রয় করেনা; দেবসেবার ভ্রম ইহার সাধারণ

করিয়া মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। দাক্ষিণাত্যে ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র ২টি শ্রেণীতে ভেদ আছে—কাছি বৃন্দলী ও কাছি নরবরী।

রাজপুতানার চোলপুর প্রদেশেই কাছিজাতি বণেই আছে।

কাছিম (দেশজ) জলজন্তু বিশেষ। [কচ্ছপ দেখ।]

কাছী (দেশজ) মোটা দড়ি, বাহাধারা নোকাদি দৃঢ়রূপে তীরে বাঁধিয়া রাখা হয়।

কাছে (দেশজ) নিকটে।

কাছলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বুদাউন জেলার বুদাউন তহ-নীলের অন্তর্গত নগরবিশেষ। গঙ্গার পশ্চিমতীরে বুদাউন সহরের ৯ কোশ দূরে অবস্থিত। বুদাউনের নিম্নে বেরেলী ও হাতরাশের মধ্যবর্তী রাজপথ গঙ্গাতীরে আসিয়া মিলিয়াছে। গ্রীষ্মকালে গঙ্গায় নৌসেতু বাঁধিয়া ঐ পথের কার্য চলিয়া থাকে। বেরেলী হইতে শস্তাঞ্চি এই পথে বুদাউনে আমদানী হয়, তৎপরে কাছলার নৌকা বোম্বাই হইয়া কাণপুর ও কতগড়ে রপ্তানি হয়। এখানে ধান, ডাকঘর, আফিমের গুদাম, সরাই, হাট ও তাঁবু কেলিবার মাঠ আছে। সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

কাজ (দেশজ, প্রাকৃত কচ্ছ শব্দের অপভ্রংশ) কার্য, কর্ম।

কাজর (হিন্দী) কাজল, অজল।

“কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর।

ভ্রমর ভুলল জহু বিমল কমলপর ॥” বিদ্যাপতি।

কাজর—মুসলমানজাতিবিশেষ। পারস্যের বর্তমান রাজবংশ এই জাতীয়। যে সময় মুকুতি বংশীর প্রথম সম্রাট শাহ ইম্মাইল শিয়া-মত পারস্যের রাজকীয় মতরূপে প্রচার করেন, তখন যে ৭টি তুর্কীজাতি তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিল, ইহার তাহাদের একতম। একসময়ে প্রাচীন হিব্রুনিয়া (বর্তমান মসন্দরান) রাজ্যে এই কাজরজাতি মহা প্রভিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের (হিজিরা ৯০৬) পূর্বে এই জাতির কথা শুনা যায় না। ঐ সময়ের একখানি হস্ত-লিখিত গ্রন্থে “পিরিকো কাজর” নামক এক ব্যক্তির নাম আছে, তৎপূর্বের কোন সাহিত্যেও “কাজর” জাতির উল্লেখ নাই। অস্ত্রাবাদ ও মসন্দরান প্রদেশে ইহার অধিক সংখ্যক বাস করে। রাজপুতের জ্ঞায় ইহার কেবল বুদ্ধব্যবসারী; এই জাতিসম্প্রদায় আগা মুহম্মদ খাঁ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম সম্রাট হন ও অস্ত্রাবাদের নিকট বাস করেন। (ইনি একজন সামান্য সৈনিকের পুত্র এবং এক সময়ে নাদিরশাহের সক্তা হইতে বিতাড়িত হন।) নাদিরের এক ভ্রাতৃপুত্র ইহাকে বাংলায় লে পাইয়া খোজা করিয়া দেন। ইনি লোভী ও পরাক্রমজ্ঞ

ছিলেন, ইহার পর ইহার আত্মপুত্র কতে আলী (১৭৯৯ খৃঃ) সম্রাট হন। ইহার সময়েরই কব পারস্তের যুদ্ধ ঘটে। কর্ণেল ম্যাকগ্রিগরের মতে—তিমুর বাদশাহ ৮০৩ হিজিরায় সিরিয়া হইতে কাজারদিগকে এদেশে আনয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে য়োকরিবাস ও আশোগাবাস নামে দুটি শ্রেণী ও প্রত্যেক শ্রেণী ৬টা করিয়া বংশভেদ আছে। জিয়াফোগলু নামক কাজার-জাতীয় একটি বংশ কব-আর্থেনিয়ার গাজীপ্রদেশে উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছে। আজদানলু বংশীয়েরা ১ম তমাম্প শাহের সময় মার্ক্স প্রদেশে উঠিয়া যায়, কিন্তু বোখারার খাঁ সাহেবের অধীনে উজ্বাক বংশীয়েরা তাহাদিগকে দূরীভূত এবং অবশিষ্ট অনেককে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কাজাল (কী) কুংসিতং জলম্, কোঃ কাদেশঃ। ১ কুংসিত জল। ২ (দেশজ) কজল, অজল।

কাজলকোঁরী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (*Tacca integrifolia*) কাজলনতা (দেশজ) কাজল প্রভৃত করিবার জন্য দৌহ-নির্মিত বস্ত্রবিশেষ। বাঙ্গালী কচ্ছাদিগকে বিবাহকালে কাজলনতা হাতে রাখিতে হয়।

কাজলবলি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (*Alpinia Banglium*, *Buch.*)

কাজলবাস (তুর্কী কাজল্ অর্থ লাল+বাস=বাহারী মাথায় লাল টুপী ব্যবহার করে।) শিয়াস্প্রাদারভুক্ত মুসলমান জাতিবিশেষ। পারস্তের তাসিজ, সিরাজ, মেসিদ ও কের্মান নগর এই জাতির জন্মভূমি। তথায় ইহারা অখপালন, ঘেঘপালন ও কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

কাজলবাসেরা বিলক্ষণ সাহসী, হুঁদাত্ত ও মহাযোদ্ধা।

ইহারা পারস্তবীর নাদিরশাহের বিপুলবাহিনী মধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। নাদিরশাহের খুন হইলে কাজলবাসেরা আজাদ-শাহের সহিত মিলিত হইয়া কাবুল অধিকার করে। এই সময়ে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০০০। আজাদশাহের মৃত্যুর পর ইহারা কাবুলের নিকটবর্তী চান্দোলগ্রামে বাস করিতে থাকে। ইহারা হুসিস্প্রাদারভুক্ত হুগানি সর্দারগণের ঘোর শত্রু, আফগান সর্দারেরা ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলেন।

একপক্ষে কাজলবাস-সৈন্য আবারের, আফগান সর্দারগণের এবং বুটীশ গণপরিষদের অধীনে কর্ম করিতেছে।

কাজলা (দেশজ) কুকবর্ণ, কালরঙের বস্ত্র।

কাজলালটোঁরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (*Lanius excubitor*)

কাজলি (দেশজ) ১ কালরঙের বস্ত্র। ২ মৎস্তবিশেষ। (*Malopterurus Koila*, *Buch.*)

কাজাক্, (কজাক্) মধ্য-এসিয়ার ভ্রমণকারী মুসলমান

জাতিবিশেষ। যুরোপে ইহারা কোসাক নামে পরিচিত। ইহারা মধ্য-এসিয়ার উত্তরবিভাগস্থ মঙ্গোলেশ্বের অন্তর্গত ভূভাগনমুহে প্রধানতঃ বাস করে। তুর্কিজাতির ভায় ইহাদের মধ্যে নানাবিধ শ্রেণী, শাখা ও বংশবিভাগ আছে। যুরোপে ইহারা বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্রদল এই তিনভাগে বিভক্ত। এরূপ বিভাগ কিন্তু মধ্য এসিয়ার নাই। ভ্রমণ-প্রিয়তা ও যুদ্ধ-প্রিয়তার জন্য অতি দূরবাসী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা একত্র হয়। এখানদীর ভীরে, আরাল হ্রদের ভীরে এবং বঙ্গাশ ও আলাতোঁ হ্রদের ভীরে ইহাদের অধিক সংখ্যক দেখা যায়, কিন্তু এতদূরবর্তী হইলেও সর্বদা সকল প্রদেশে ভ্রমণ করার জন্য ইহাদের ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য নাই।

ট্রান্সকাসিয়ানা প্রদেশে ইহারা তোকেল বা তিরমোকেল স্থলভান্ নামক একব্যক্তির অধীনে স্বাধীন জাতিরূপে প্রথম অভ্যুত্থান করে। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে (৯৪১ হিজিরায়) লক্ষণেশনদীর তীরে ইহারা বড়ই দুর্দান্ত হইয়া উঠে। স্থলভান্ তোকেল দক্ষাউনগরে কব সম্রাট কেডোবের নিকট অনেকবার দূত পাঠাইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধপ্রিয় জাতীর “বদ তলাই” (দৈবশক্তিসম্পন্ন প্রস্তরখণ্ড) নামক একপ্রকার প্রস্তরখণ্ডের রোগঘোচনের শক্তি, যুদ্ধে জয়বিধানের শক্তি, এবং ভূতবর্গের উপর ক্ষমতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে।

ইহারা ১৬শ শতাব্দীতে তাতারসেনা দলের মধ্যে সন্মুখ-ভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিত। রুশিয়া এই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহারা সেই সুবিধায় সেই সময় প্রায় সমস্ত রুশিয়ারাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে, এমন কি অষ্ট্রোকান পর্য্যন্ত অধিকার করে। শেষে প্রচণ্ডবীর ইভান (Ivan the terrible) ইহাদিগকে কবসীয়ার বহির্দেশে দূরীভূত করিয়া দেন। ইহারা পরাভূত হইয়া সময়কন্, বোখারা ও খিবা প্রদেশে পলাইয়া যায়। এখানেও ইহারা হুঁদমণীয় হইয়া উঠে, পরে অল্পদিন হইল এখানেও কব-অধিকার বিস্তৃত হওয়ায়, ইহারা কতকটা শান্ত হইয়া নামমাত্র রুশিয়ার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কাজান প্রদেশে এইজাতীয় লক্ষাধিক লোক বাস করে।

ইহাদের ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন মসজিদ, ভিন্ন কবরভূমি ও তাঁবু ফেলিবার স্থান আছে। ইহাদের মধ্যে অনেক ধনী বণিক আছেন। অনেক সম্ভানাই বিদ্বানও আছেন। রুশিয়ার কোন আইন ইহারা গ্রাহ্য করে না। তাহার ও আচার ব্যবহারে বুদ্ধভ্রান্তি হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। ইহাদের জীলোকের ও খিণ্ডর পানদ্রব্য রুশোপরিগণের ভায়, কেবল

পুৰ্যোক্তাপে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের মস্তক দীর্ঘ, পাগড়ী কোণাকার, চক্ষু বাদামের ন্যায় ও ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট, হস্ত উচ্চ, চেন্টা নাক, প্রশস্ত ললাট, ওষ্ঠ বৃহৎ ও গোঁপ অন্ন। ইহাদের মতে কাপুঁনবাজকগণের জীজাতিই জুল্লারী। ইহারা প্রায়কালে কন্নক নামক পাগড়ী ও গীতকালে জুম্বক নামক টুপি পরে। ইহারা সামুদ্রিক শাস্ত্র, কলিতজ্যোতিষ, ভূতাদি আত্মান প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে ও সেই সেই শাস্ত্রের বহুল আলোচনা করে।

১৮১২ হইতে ১৬ খৃষ্টাব্দে, ইহাদের মধ্যে হইতে কতকগুলি উপযুক্ত লোক লইয়া কবচসম্রাট ৮০টি সৈন্যদল প্রেরিত করিয়াছেন।

মুরোয়ীর কোসাকেরা দেখিতে সুপুরুষ, আতিথের ও লজ্জানারহী। বিবাহিত জীলোকেরা মস্তকে একটি রাজিকালোচিত রেশমী টুপি পরে ও তাহার গায়ে একখানি ক্রমাঙ্গ জড়ান থাকে।

কাজিয়া (আরব্য) কলহ, বিবাদ।

কাজী (আরব্য) মুসলমান-সমাজের বিচারপতি। যেখানে মুসলমানের রাজত্ব, সেইখানেই কাজী সমাজনীতি, ধর্ম-নীতি, কোজদারী ও লাওয়ারী বিধি অমুসারে বিচার করেন। বখন ভারতরাজ্য মুসলমানরাজের অধীন ছিল, তৎকালে এই কাজীরা বিচারকপদে অভিষিক্ত ছিলেন। এই বঙ্গদেশেই অনেক কাজী বিচার করিতেন; শুনা যায়, তাঁহাদের মধ্যে পক্ষপাত ও প্রজ্ঞাচারিতা কিছু প্রবল ছিল, সেই জন্য বোধ হয় এখনও অনেকে কোন প্রকারে অস্তায় বিচার হইলে ‘কাজীর বিচার হইল’ বলিয়া উপহাস করেন। এখন ইংরাজাধিকৃত ভারতসাম্রাজ্যের মধ্যে কাজীরা মুসলমান-দিগের বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহবন্ধন দৃঢ় করিয়া থাকেন। কিন্তু তুরুক, আরব ও পারস্তে ইহারা এখনও বিচারকের কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে দেশভেদে ইহাদের মর্যাদার কিছু তারতম্য আছে। তুরুকদেশে ইহাদের হস্তে বিচারের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিলেও, সেখানে কাজীরা মুক্তির অধীন। তুরুকদিগে হাকুম আল রসীদের সময় হইতে কাজীর হস্তে বিচারভার অর্পিত হয়, সর্বপ্রথম কাজীর নাম আবু হুসন্। সকল দেশ অপেক্ষা আরবরাজ্যে কাজীদিগের ক্ষমতা অধিক, যদি প্রজারা কোন কারণে দেশের অধিপতির নামে অভিযোগ করেন, তাহা হইলে প্রবল-পরাক্রান্ত মন্তটাদিগে ইমামকে ও কাজীর সমক্ষে উপস্থিত হইতে হয়। পারস্তদেশে প্রত্যেক নগরেই কাজী আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই শেখ উল ইসলামের অধীন। সর্বপ্রধান কাজীর নাম কাজীউল কাজন।

কাজী আক্সাদবিন্ মুহাম্মদ অলগফারি অল্-কাজবিন।

একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইনি হুসন্ ইজহন্-আরা নামক একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থে মুসলমান রাজ্যের স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া ৯৭২ হিজরী পর্যন্ত লেখা ঘটনাবলী লিখিত হইয়াছে। কাজী আক্সাদ পদব্রজে পারস্ত হইতে মক্কা দর্শনে গমন করেন, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সিন্ধুপ্রদেশে দৈবাল নামক গ্রামে ইহার মৃত্যু হয় (১৫৬৭ খৃঃ)।

আজীমআলীখাঁ। একজন মুসলমান চিকিৎসক ও ওমরাহ। ইনি আগ্রানগরে বসুনাভীরে (১৫৫১ খৃঃ) একজনর উদ্যান নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। সেই উদ্যানের আর পূর্বে সৌন্দর্য্য নাই, অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। বাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা অন্যান্য ‘হকীম-কা-বাঘ’ নামে প্রসিদ্ধ।

কাজীয়াৎ (পারস্ত) কাজীর কার্য্য, বিচার।

কাজ্লা (দেশজ) কোন ক্রমনিরূপণে একটি দ্রব্য রাখিয়া তাহা ঠেলিয়া উপরদিকে না তুলিয়া, যদি ঐ দ্রব্যটির নিরূপণ হইতে স্থানটিকে চালনা করা যায়, তাহা হইলেও দ্রব্যটি উপরদিকে উঠিতে থাকে, এই প্রক্রিয়ার নাম কাজ্লা।

কাঞ্চন (ক্ৰী) কাঞ্চতে দীপ্যতে, কচি-লু। ১ স্বর্ণ। ২ গন্ধ-কেশর। ৩ ধন। ৪ (ক্ৰী পুং) নাগকেশর ফুল। ৫ নীপ্তি। ৬ বন্ধন। ৭ (ত্রি) স্বর্ণ নির্মিত। (পুং) ৮ গুল্মবৃক্ষবিশেষ; এই গুল্ম খেত ও রক্ত ভেদে দুই প্রকার। রক্ত গুল্মের সংস্কৃত পর্যায়—রক্তগুল্ম, কোবিদার, যুগ্মপত্র ও কুঙল। খেত গুল্মের পর্যায়—কাঞ্চনাল, কর্জুদার ও পাকারি। [কাঞ্চনফুল শব্দে ওপাদি দেখ।] ৯ চম্পক। ১০ উচ্ছ্বর। ১১ ধূতুর। ১২ পুরুরবার বংশীর ভীমের গুল্মবিশেষ।

(‘ভীমন্ত বিজয়তাপ কাঞ্চনে হোজকন্ততঃ। ভাগ ২। ১৫। ৩।) ১৩ পঞ্চম বৃক্ষ। ১৪ নারায়ণের গুল্মবিশেষ। ১৫ ধনঞ্জয়-বিজয় নামক গ্রন্থ প্রণেতা।

কাঞ্চনক (ক্ৰী) কাঞ্চন-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ হরিতাল। ২ দ্বাভ-বিশেষ (জুজ্ঞা জুজ্ঞা ৪৬ অঃ)। ৩ (পুং) কাঞ্চনফুলের গাছ। কাঞ্চনকদলী (ক্ৰী) কাঞ্চনবর্ণা কদলী, মধ্যালো। ৪ চাপা কলা। কাঞ্চনকন্দর (পুং) কাঞ্চনস্ত কন্দরঃ, ভতং। স্বর্ণের খনি। কাঞ্চনকারিণী (ক্ৰী) কাঞ্চনঃ বহুমূলেন বন্ধনঃ করোতি, কাঞ্চন-ক-গিনি-ভীপ্। শতমূলী। [শতাবরী দেখ।] কাঞ্চনক্ষীরী (ক্ৰী) কাঞ্চনমিব কীরমত্যাঃ, বহবী। কীরিগীলভা।

কাঞ্চনগিরি (পুং) কাঞ্চনমগ্নোগিরিঃ, মধ্যালো। ১ জ্বলেক পর্বত। ২ দান কদ্রিবার উদ্ভেদে স্বর্ণনির্মিত কৃত্রিম পর্বত।

কাঞ্চনগৈরিক (ক্লী) কাঞ্চন গিরিতো জাতম্, কাঞ্চন-গিরি-চক্ৰ । স্নেহক পৰ্বতজাত গিরিসানি ।

কাঞ্চনচক্ৰ (ক্লী) গৌড়শাস্ত্রমতে পৃথিবীর মধ্যভাগ ।
(দিখাবানান ১২৮।৮)

কাঞ্চনচয় (পুং) কাঞ্চনচয়ঃ রাশিঃ, ৬তম্ । স্বর্ণের রাশি ।
কাঞ্চনজঙ্ঘা । পূৰ্ব্ব হিমালয়ের এক অতুল পৰ্বতশৃঙ্গ, গিমিম ও নেপালের প্রান্তসীমায় অবস্থিত । অক্ষা° ২৭° ৪২'৫", দ্রাঘি° ৮৮°১১'২৬" পূঃ । ধবলাগিরি ছাড়া এত-বড়শৃঙ্গ আর জগতে নাই, ২৮১৭৬ ফুট ইহার উচ্চতা । এই শৃঙ্গ গোখামীস্থান হইতে ৬৫ ক্রোশ পূৰ্বে থাকিয়া ইহার শৃঙ্গ দ্বারা যেন নেপালের পূৰ্ব সীমা রক্ষা করিতেছে । এই শৃঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন ভূযারায়ত থাকে । স্বৰ্ণোদয়কালে দূর হইতে ঠিক কাঞ্চনের ছায়া দেখায়, সেইজন্য বোধ হয়, এই শৃঙ্গ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'কাঞ্চনজিহ্বা', 'কাঞ্চনশৃঙ্গ', এবং কোন কোন সংস্কৃত পুস্তকে 'কাঞ্চনাদ্রি' নামে অভিহিত ।

কাঞ্চনপল্লী । বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণার উত্তর প্রান্তে কলিকাতা হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম । এখানে পূৰ্ববঙ্গরেলওয়ের একটি আড্ডা আছে । ইহার বৰ্ত্তমান নাম এবং প্রাচীন কিংবদন্তি দ্বারা অনেক অনুমান করেন যে, এক সময় ইহা বঙ্গবিখ্যাত কুমারহট্ট (হালিশহর) গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট পল্লী ছিল* । এই গ্রামের লোকব্যবহৃত নাম কাচরাপাড়া বা কাচনাপাড়া কি কাচরাপাড়া । পশ্চিমাংশ বৰ্দ্ধমানজেলা প্রভৃতি রাঢ় দেশীয় লোক ইহাকে কাতলাপাড়াও বলিয়া থাকে । উক্ত গ্রামের মধ্যে পুরুষপরম্পরায় একটি জনপ্রবাদ আছে, যে কাঞ্চনপল্লী নামটি ইহার গৌরবশূচক নাম । পূৰ্বকালে এইস্থানে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও বিচক্ষণ চিকিৎসকের বাস ছিল বলিয়া লোকে ইহাকে আদর করিয়া কাঞ্চনপল্লী বলিতেন, বস্তুতঃ এখানে কাচনা নামে এক প্রকার খাল হইত বলিয়া কাচনাপাড়া নাম হইয়াছিল । কেহ কেহ কহেন যে পূৰ্বে এখানে অনেক সুবর্ণবিক্রেতার বাস ছিল এবং স্বর্ণ রৌপ্যের ক্রয় বিক্রয় হইত বলিয়া, ইহাকে

* অনেক বিচক্ষণ ও পণ্ডিত লোক অনুমান করেন, যে পাড়া শব্দই কোন একখানি মূল গ্রামের অংশ বা খণ্ড পরিচায়ক, যেমন উত্তরপাড়া, একসময় পরিগ্রামের উত্তরদিকস্থ পল্লী ছিল, কিন্তু বালির খাল মধ্যস্থানে ব্যবধান হওয়ার ক্রমে পৃথক্ গ্রামরূপে পরিণত হইল । সেইরূপ কাচরাপাড়া ও হালিশহরের মধ্যস্থানে মল্লিক সাহেব খাল কাটায়া বেওয়ার কাচরাপাড়া স্বতন্ত্রগ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হয় ।

† রাঢ়দেশে দক্ষিণদিকার এক 'কাতলাপাড়া' বলে ।

সাধারণে কাঞ্চনপল্লী বলিত । এই শ্বেদোক্ত কথার প্রমাণ পক্ষে অদ্যাপি একটি নিদর্শন পাওয়া যায় । কলিকাতার বড়বাজারে অদ্যাপি যে সকল নিক্তি বিক্রয় হয়, তাহার প্রতিষ্ঠার জন্ম বিক্রেতারা তাহা কাচনাপাড়ার নিক্তি বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু বহুকাল হইতে উক্ত গ্রামে কোন প্রকার নিক্তি প্রস্তুত হইতে দেখা যায় না । যাহা হউক পূৰ্বকালে ঐ গ্রাম সুবর্ণাদি মূল্যবান ধাতু ক্রয়বিক্রয়ের স্থান থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় । যদিও বাগেরখাল নামক একটি কুজিমনদী ইহাকে মূলস্থান কুমারহট্ট হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু পূৰ্বকালে ইহা যে কুমারহট্টের সঙ্গে একত্র ও সংযুক্ত ছিল, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হইতে পারে না, কারণ বাগেরখাল নামক খাল কুমারহট্ট ও কাঞ্চনপল্লী সংস্থাপনের অনেকপর নির্ধারিত মল্লিক সাহেব, তাহার বাসস্থানের গড় স্বরূপ বাগিচা কার্যের সুবিধার জন্য ফুলিয়া গ্রামের নিম্নস্থ যমুনা হইতে তাগিরখী গর্ভাস্ত্র প্রায় দুই ক্রোশ বিস্তৃত একটি খাল কাটাইয়া দেন । উক্ত খাল এই উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ থাকা সত্ত্বেও কাঞ্চনপল্লী অদ্যাপি হাবিলসহর পরগণার অধীন ও কুমারহট্ট সমাজভুক্ত । ইহার বৰ্ত্তমান দক্ষিণসীমা মল্লিক সাহেবের কাটাখাল, পশ্চিমে ভাগীরথী খাত, উত্তরে যমুনা-তীরস্থ মুরতিপুর ও পূৰ্বসীমা সিন্দে ভবানীপুর । এই গ্রাম যে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থানে চরপত্তন হইয়া তাহার উপর সংস্থিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায় । এই বিষয়ের একটি চমৎকার আখ্যান আছে । একদা কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী একজন তীর্থযাত্রী কাশীধামে একজন দণ্ডাশ্রমী পুরুষকে দর্শন করিতে গিয়া পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে পরিচয় দিলেন, যে "আমার নিবাস ত্রিবেণীর পরপারস্থিত ভাগীরথীতীরবর্তী কাঞ্চনপল্লী ।" সিদ্ধপুরুষ কহিলেন, "কি, ত্রিবেণীর পরপার কাঞ্চনপল্লী? কোন্ ত্রিবেণী? ত্রিবেণীর পূৰ্বপারে তো ভৈরবনগর ।" তীর্থযাত্রী কহিলেন, "ভৈরবনগর আমার বাসস্থান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ পূৰ্বে ।" সাধু বলিলেন, "তবে কি তোমরা গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থানে চরের উপর বাস কর । আশ্চর্য্য ! ইহার মধ্য গঙ্গার চর হইয়া তাহাতে গ্রামের পত্তন হইয়াছে ! কালের কি কুটিল গতি !" যাহা হউক, অদ্যাপি উক্ত ভৈরবগ্রামে নগরবাটা ও জগাতিবাটা প্রভৃতি স্থান বিদ্যমান আছে এবং সেই সেই স্থান যে একসময় নগর-বিশেষ ও বাগিচাস্থান ছিল, তাহা সময়ে সময়ে এখানকার মুক্তিকার নিদ্র হইতে তৈজসাদি বহুবিধ জ্বালাত প্রাপ্ত হওয়ার অনেকে স্থির করিয়াছেন । যদিও এই কাঞ্চনপল্লী

গজায়মুনার মুকুবেলীর মধ্যস্থিত চরের উপর উৎপন্ন বলিয়া অনেক প্রমাণ ও নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা যে অনূন তিনশত বৎসরের পূর্বকালবর্তী, সে বিষয়েও অনেক সংশয়চ্ছেদী প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কাঞ্চনপল্লী ঐতিহ্যবাহী মহাপ্রভুর সমকালবর্তী সেন শিবানন্দের পাট। বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ পাটমালাগ্রন্থ ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে কাঞ্চনপল্লী নামটাই লিখিত আছে, তৎপূর্বে উহা অন্য নামেও আখ্যাত হইবার কথা শুনা যায় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদ্যজাতির একটি সমাজের নাম নরহট্ট অর্থাৎ নরহট্টগ্রামীয়। এই নরহট্টগ্রামই কাঞ্চনপল্লীর প্রাচীন নাম। এক্ষণে যে স্থলে কাঁচড়া-পাড়ার বড় চড়া, প্রাচীন লোকেরা বলেন যে পূর্বে ঐ স্থানেই নরহট্ট গ্রাম ছিল। কালে উহা গজার গর্তমাং হইয়া যায় এবং তথাকার লোকেরা ক্রমে তৎপূর্বদিকে সরিয়া আসাতে কাঁচড়াপাড়ার উৎপত্তি হয়। সেই প্রাচীন কাঁচড়া-পাড়াও ক্রমে গজায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, বহুতর কাংশ্রবণিক উহার পরপার বংশবাটী অর্থাৎ বাঁশবেড়ে গ্রামে উঠিয়া গিয়া বাস করে এবং তদবধি বাঁশবেড়ে গ্রাম কাঁসারিজাতির একটি প্রধান স্থান হইয়া উঠে। বিশেষতঃ সেন শিবানন্দ নিজ গুরু শ্রীনাথ আচার্যের নামে যে কৃষ্ণরায়বিগ্রহ প্রকাশ করেন; ঐ বিগ্রহ * প্রথমতঃ শ্রীনাথআচার্যের দৌহিত্রসন্তান শ্রীমহেশের † নিজ বাটীতে থাকিতেন। একদা বঙ্গপ্রভাকর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুলতাতপুত্র যশোরাঞ্জয় রায় (কচুরায়) কোন বিশেষ কারণে দিল্লী যাঁহবার সময় কাঁচড়াপাড়া হইয়া যান এবং যাত্রাকালে কৃষ্ণরায়বিগ্রহ দর্শন করিয়া এইরূপ মানসিক করেন যে, “যদি আমি দরবারে ক্ষতে হই, তাহা হইলে ঠাকুরের একটি শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিব।” দৈবযোগে যশোরাঞ্জয় রায় দরবারে কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমনকালে পুনর্বার কৃষ্ণরায়কে দর্শন করিয়া আইসেন; এবং তাঁহার শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির ও দোলমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন এবং নিত্যসেবা নিকাহের জন্য কৃষ্ণবাটী নামে একখানি নিকর তালুক প্রদান করেন; অদ্যাপি ঐ কৃষ্ণবাটী তালুক উক্ত বিগ্রহেরই সেবার্থ সেবায়াং অধিকারীদিগেরই

* “বক্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায়ঃ প্রাচুরাসীং বয়ং কলৌ।

অমুগ্রহায় বিজঃ কিঞ্চিৎ শ্রীঃ শ্রীনাথসংজকঃ।”

এই লোকটি উক্ত কৃষ্ণরায় বিগ্রহের পদ্যসনে খোদিত আছে।

† ঐ শ্রীমহেশই কাঁচড়াপাড়ার কৃষ্ণরায়বিগ্রহের বর্তমান অধিকারী-বংশের আদিপুরুষ বলিয়া অধিকারী মহাশয়েরা পরিচয় দেন এবং তিনি ভরবাঙ্গলোজীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া এক্ষণে ইহারও মুখোপাধায় উপাধিতে অভিহিত হন।

স্বাধিকারে আছে। তবে রাজার আমলে যেমন নিকর ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের দশশালা বন্দোবস্তের সময় বার্ষিক ২৮৮০/০ কর ধার্য হইয়াছে। ঈশানচন্দ্র অধিকারী মুখোপাধায় এক্ষণে এই বংশের প্রধান ও প্রাচীন। যশোরাঞ্জয়ের যে দেবালয় করিয়া দেন, সে দেবালয় ও তৎসম্বন্ধিত নগরের বাজার প্রভৃতি কাঁচড়াপাড়ার বহুতর প্রাচীন-কীর্তি কালে গজাগর্ভে জলমাং হইয়া সেই সেই স্থানে এক্ষণে পুনরায় নুতন চরের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দেবালয় ধ্বংস হইবার পর কলিকাতানিবাসী নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক * এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কৃষ্ণরায় জীউর দেবমন্দিরাদি প্রস্তুত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবাদ আছে, এই মহান কীর্তির উদ্যোগেই নিমাইয়ের পরলোক প্রাপ্তি হয় এবং তাঁহার ইচ্ছাপত্রানুসারে তাঁহার উত্তরাধিকারিরা সকলকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ফলতঃ কৃষ্ণরায় জীউর দেবালয়সদৃশ দেবালয় এ অঞ্চলের আর কোন স্থানে নাই। শকাব্দ ১৭০৭ শকে শ্রীমন্দির সম্পন্ন হয়। শ্রীমন্দিরটি দেখিলে বোধ হয়, যেন কেহ ইষ্টক ও চূর্ণাদি উপকরণ কোন বিশাল পাকঘরে দ্রবীভূত করিয়া মন্দিরটিকে ছাঁচে ঢালিয়াছে, এরূপ সূচ্যম সূচী ও সর্বস্বাস্থ্যের মন্দির দৃষ্টিগোচর হওয়া বঙ্গদেশে অতি বিরল। এই অস্থিত মন্দির যে কেবল ক্ষণজন্মা নিমাইচরণ ও গৌরচরণ এবং কাঞ্চনপল্লী গ্রামেরই কীর্তিস্বরূপ এমন নহে, ঐ দৃষ্টিচূর্ণিত দেবকীর্তি আমাদেরই হতভাগা বঙ্গদেশের ও শিল্পনৈপুণ্যের মহদমণ্ড: উচ্চৈশ্বরে ঘোষণা করিতেছে। আমাদের দেশের পুরাতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রকাশ ও আবিষ্কারের জন্য দূরদেশে গমন করিয়া, পূর্বতন মঠ, মন্দির ও অট্টালিকার শিল্পনৈপুণ্য পর্যবেক্ষণপূর্বক লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের পার্শ্বদেশে যে কত শত অসামান্য কীর্তিকলাপ অব্যক্ত ও অনেকের অবদিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা কিছুমাত্র অবগত নহেন! সেন শিবানন্দের পুত্র পুরীগোস্থানী, যিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া কবিকর্ণপুর উপাধি লাভ করেন, কাঞ্চনপল্লী তাঁহার জন্মভূমি ও লীলাস্থান। তিনি বৈদ্যজাতিদিগের নরহট্টসমাজভুক্ত ছিলেন। অদ্যাপি কাঞ্চন-পল্লী-নিবাসী বিখ্যাত কবিরাজ চণ্ডীচরণ রায়ের বংশোদ্ভব রায় বৈদ্যেরা কবিকর্ণপুরের সন্তান বলিয়া পরিচয়

* কিম্বদন্তী আছে, যুগসাগরের কুষ্টির সাহেব মিষ্টার জোসেফরট (যাঁহার ঐশ্বর্য ও বালাখানার তুল্য উৎকৃষ্ট আসাদ বঙ্গদেশের কৃষাপি ছিল না বলিয়া প্রবাদ আছে।) একদা বলেন, “বাক্সালা কা বিচু দে খোড়া রুপেরা হামারা হার, আউর খোড়া রুপেরা নিমু মলিককা হার।”

দেন*। কিন্তু কাঞ্চনপল্লীস্থ আর আর বৈদ্যেরা এই কথার প্রতিবাদ করিয়া কহেন যে, কবিকর্ণপুর স্বয়ং বিরক্ত বৈরাগী ছিলেন, তাঁহার কোন সম্ভানসম্বন্ধি থাকার কথা জানা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থাদিতেও কবিকর্ণপুরের দারপরিগ্রহ কি গার্হস্থ্যধর্মের কোন কথা উল্লিখিত দৃষ্ট হয় না। কবিকর্ণপুর চৈতন্যদেবের সমকালবর্তী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কবিকর্ণপুরের অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুরের প্রকৃত নাম পুরীগোসাই, ঐ পুরীগোসাই চৈতন্যদেবের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। কবিকর্ণপুর নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কাঞ্চনপল্লীতে তাঁহার আর বিশেষ কোন কীর্্তি নাই।

কাঞ্চনপল্লীর রথ অতি প্রসিদ্ধ এবং ঐ রথযাত্রা বড় সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইত; এখন সে পূর্ব সমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। কৃষ্ণরায় জীউর যে লোহের রথ এখন বর্তমান আছে, উহা কাঞ্চনপল্লীর নিকটবর্তী কাউটিয়া গ্রাম-নিবাসী নন্দীবাবুদিগের প্রদত্ত এবং এক্ষণে রথযাত্রায় বাহা ব্যয় হয়, তাহাও উক্ত বাবুদিগের দ্বারাই নির্বাহিত হইয়া থাকে। উক্ত বিগ্রহের পূর্বে যে রথ ছিল, তাহা ঐ কাউটিয়া গ্রামের বীরেশ্বর নন্দীর পুত্রের বিবাহের আতসবাজীর আশুনে দগ্ধ হইয়া যাওয়ায়, বীরেশ্বর অতি বৃহৎ একখানি রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া সমারোহপূর্বক তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি সেই রথই চলিতেছিল। সম্প্রতি নন্দীদিগের দত্ত রথও অক্ষয়্যে পুড়িয়া যাওয়ায় পুনর্বার ঐ বংশোদ্ভব কোন ব্যক্তি একখানি লোহের রথ করিয়া দিয়াছেন। পূর্বে কৃষ্ণরায় জীউর রথোৎসবে প্রতি বৎসরই নরহত্যা হইত, এইজন্য সেবারতেরা বহুদিন হইতে আসল বিগ্রহকে রথে না তুলিয়া তাহার অমুরূপ একটি মুগ্ধবিগ্রহ রথে তুলিয়া থাকেন। ঐ মুগ্ধবিগ্রহের কলেবর পরিসরনের প্রয়োজন হইলে তদীয় সেবারত অধিকারী মহাশয়াদিগের মধ্যে কেহ কেহ তৎকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কাঞ্চনপল্লীগ্রামকে যদিও এক্ষণে বৈদ্যপ্রধান স্থান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পূর্বকালে উক্ত স্থানে যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকের বাস ছিল, অদ্যাপি তাহার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে।

কাঁচড়াপাড়ার ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে রায় চক্রবর্তীরাই অতি প্রাচীন ও বনিয়াদি। চক্রবর্তী-মহাশয়েরা কালক্রমে

ধনগৌরবে চৌধুরী উপাধি লাভ করেন; তাঁহাদিগের বংশে অদ্যাপি পূর্ব সমৃদ্ধির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু রায়বংশ এককালেই ধ্বংসের দশায় পতিত হইয়াছে। ঐ বংশে এখন দুই একজন নির্বাণপ্রায় দীপবর্তিকার জ্ঞান রহিয়াছেন। যে নিমচাঁদ শিরোমণির নাম সর্বত্র বঙ্গবিখ্যাত হইয়াছিল, যিনি জায়শাজ্ঞে ঐতিহ্যের জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের তুল্য বলিয়া অনেকে অহুমান করিতেন, তাঁহারও জন্মভূমি এই কাঞ্চনপল্লী।

এখানে সময়ে সময়ে বিস্তর গ্রন্থকারের আত্মজীবন লিখিয়াছে। তন্মধ্যে ভূতপূর্ব প্রভাকর-সম্পাদক কবির দীধরচন্দ্র গুপ্ত ও অজ্ঞানতিমিরনাশক প্রণেতা বৈদ্যনাথ আচার্য্য এবং জ্ঞানার্ণব নামক গ্রন্থরচয়িতা প্রেমচাঁদ কবিরত্ন; অদ্বৈত রামায়ণের ও তুলসীদাসী রামায়ণের অনুবাদক ও বিবিধ বঙ্গ-সাহিত্যের রচনাকর্তা হরিমোহন সেন গুপ্ত প্রভৃতি সঙ্গম সাহিত্যপরায়ে লোকদিগের যশঃসৌরভ বঙ্গদেশের বহুস্থানই বিস্তৃত ও বিখ্যাত আছে। এখানকার কবিরাজী চিকিৎসা বহুদিন হইতেই বিখ্যাত। তন্মধ্যে কবিরাজ চণ্ডীচরণ রায়, রাজা কৃষ্ণদাস সেন ও কৃষ্ণ কণ্ঠভরণের নামই বড় প্রসিদ্ধ। চণ্ডীচরণ রায়ের একটি কুটীচাকৎসার যে প্রকার জনপ্রবাদ লোকপরিচরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা অতি অদ্ভুত। পূর্বকালে কোন সময় স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা আনন্দারোগে আক্রান্ত হইয়া চাকৎসার জন্য কাঞ্চনপল্লীতে চণ্ডীচরণের নিকট আগমন করেন। ভাগীরথীতীরে তাঁহার তাঁবুপড়ে ও চণ্ডীচরণ চাকৎসার প্রবৃত্ত হন। তিনি রোগের লক্ষণের সঙ্গে আয়ুর্বেদের ঐক্য কারয়া ঔষধ ব্যবস্থা কারবেন বলিয়া রাজাকে আশ্বাসিত করিয়া প্রতিদিন দুইবেলা তাঁহাকে দেখিতে যান। রাজাও এদিকে আপনার আপন্ন মৃত্যু অবধারিত করিয়া তদ্রূপে ধর্মকার্যে ব্রতী হইলেন এবং অপরাহ্নে পূর্ণাঘ্রবণ করিতে লাগিলেন। এক দিন গভীর নিশীথ সময়ে তাঁহার দুই রাণী, গ্রহরী এবং ভৃত্যবর্গ সকলেই নিদ্রাগত, এমন সময় হঠাৎ মেঘ গর্জন করিয়া বিশঙ্কণ এক পশলা ঝুটি হইয়া গেল এবং তাঁবুর পার্শ্বদেশের একস্থলে স্বপ্নমাত্র জল সঞ্চিত হইল। রোগের জন্য রাজার নিদ্রা নাই, দেখেন যে কিরূপে একটা কালসর্প ঐ তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ একটু বেড়াইয়া সেই সঞ্চিত জল পানানন্তর তাঁবুর বাহিরে চলিয়া গেল। রাজা ভাবিলেন যে, এই সময়! হরি এ অধমের প্রতি অহুকুল হইয়া ঐ সর্পকে প্রেরণ করিয়াছেন, আর তো এ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য হয় না। বোধ হয় আমার এ অসাধ্য

* কাঞ্চনপল্লী নিবাসী চণ্ডীচরণ রায়ের বংশোদ্ভব শশীভূষণ রায় তাঁহার মুদ্রিত ভগবদ্গীতা গ্রন্থের পরিশেষে আত্মপরিচয়স্থলে উক্ত চণ্ডীচরণকে কবিকর্ণপুরের গৌড় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

উৎকট রোগের কোন ঔষধ নাই, কবিরাজ লজ্জায় পড়িয়া আপন সম্রম রক্ষার জন্ত আমার কিছু বলিতে পারিতেছেন না, নচেৎ মাসাবধি গুত হইল, এ পর্য্যন্ত রোগের কোন ব্যবস্থা হইল না। আরোগ্যলাভ তো সুদূরপর্য্যন্ত! বাহা হউক, আজি এই কালসর্পের বিষদ্বিত জলপান দ্বারা জীবনের সঙ্গে যুদ্ধের শেষ করিব। রাজা মনে মনে এইটি স্থির করিয়া সেই কালসর্পের পানাবশেষ পানীয় পান করিলেন এবং আপনার অস্ত্রমকাল উপস্থিত জানিয়া অস্ত্র-কাণ্ডক অনন্তশক্তি ঈশ্বরের স্মরণ মননে চিন্তানিবেশ করিলেন। এই অবস্থায় রাজা যেমন শয়ন করিলেন, অমনি শ্রান্তি-হারিণী নিজাদেবী আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া লইলেন। রাজার স্বাস্থ্যকে রাণীদিগের নিজা ভঙ্গ হইয়া গেল; তাঁহারা প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে দাসদাসী সকলকে আহ্বান করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইয়া পড়িল। চণ্ডীচরণ কবিরাজ প্রাতঃস্নানে গমন করিয়া রাজাকে দেখিতে গেলেন এবং অমাত্য-ভৃত্য সকলের নিকট হইতে রাজ্যাব বর্তমান অবস্থার কথা অবগত হইয়া নাড়ীপরীক্ষা ও অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহিলেন, কোন ভয় নাই, আমার কোন ঔষধ লক্ষণ বোধ হইতেছে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজার আপনা হইতে নিজাভঙ্গ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা কেহ যেন উঁহাকে জাগাইও না। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, রাজার নিজাভঙ্গ হইল; তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং এই নিজা সেই কালকূট গরলের আচ্ছন্নতা ভিন্ন আর কিছুই নহে মনে করিয়া, কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিলেন না। বৈকালে নির্দিষ্ট সময়ে কবিরাজ আসিয়া নির্জনে রাজাকে কহিলেন, আমি এতদিন আপনাকে লজ্জা ও ভয়ে কিছু বলিতে পারি নাই; আপনার রোগের যে প্রকার ঔষধ ও অমুপান শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অতি দুর্ঘট ও দুর্লভ। যদি আপনার ইচ্ছা ও অমুমতি হয়, বলিতে পারি। রাজা শুনিতে ইচ্ছুক হওয়ায় কবিরাজ কহিলেন যে, একখানি প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, যদি অমানিশার নিশীথ সময় বৃষ্টি হইয়া সেই জল কোন খর্পূরে পতিত হয়, সেই জল ভিন্ন এ রোগের ঔষধের আর কোন অমুপান নাই। ইহা শুনিয়া রাজা কবিরাজকে গত রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন এবং সেই জলধার গর্তখনন করিয়া দেখিলেন যে, সেটি কোন শবের মাতার খুলি। ইহাতে রাজা ও কবিরাজ উভয়েরই বিশ্বাস উপস্থিত হইল এবং উভয়ের আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। রাজা কবিরাজের সম্মানস্বরূপ বিস্তর ধনরত্নাদি দান করিয়া সানন্দ-হৃদয়ে স্বদেশগমন

করিলেন। এই অপূর্ণ আখ্যানের কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু চণ্ডীচরণ রায় যে একজন অধিতীয় চিকিৎসক ছিলেন, তাহা অন্যাপি অনেকে ঘোষণা করেন। কাঁচড়াপাড়ার গ্রাম্য উৎসবস্বরূপ মহাকালী-রাজ-রাজেশ্বরী ও জগদ্ধাত্রী পূজা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং পূর্বে পূর্বে এই সকল উৎসবে বহু ব্যয়সাধ্য নৃত্যগীত, রাগরঙ্গ, দরিত্রভোজন এবং অধ্যাপকদিগকে শাল রত্নাদি মূল্যবান বস্তু ও রূপার তৈজসাদি বিতরণ হইত।

কাঁচড়াপাড়া এক সময় দৈহিক বলবিক্রম বিষয়েও বিখ্যাত ছিল। বেচারাম অধিকারী নামক এক ব্যক্তি একদা বাহুবলে তালগাছ তুলিয়া ফেলিয়া জীলোকদিগের স্নানের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন এবং একবার একদল নব্য সম্প্রদায়দিগের মধ্যে একজনকে কুন্তীয়ে ধরিলে সকলে ঐক্য হইয়া সেই কুন্তীরকে ডাঙ্গায় তুলিয়াছিলেন। কাঁচড়াপাড়ার হৃত্তিকাকে পূর্বে অনেকে বীরমাটি বলিত; কিন্তু এখন সেই বীরভূমি নীরব হইয়া গিয়াছে।

কাঞ্চনপুর (ক্কা) কলিকাতার নগরবিশেষ। (জৈন হরি-বংশ ২৪ ১১)

কাঞ্চনপুষ্প (ক্কা) কাঞ্চনাম্র পীতং পুষ্পং যন্ত, কাঞ্চন-পুষ্প-কপ্। আচল্য গাছ। [আচল্য দেখ।]

কাঞ্চনপুষ্ণী (ক্কা) কাঞ্চনাম্র পুষ্পং যন্তাঃ, ভীপ্। গণিয়ারী গাছ। [গণিকারিকা দেখ।]

কাঞ্চনপুষ্টি (দেশজ) একজাতীয় পুষ্টিমাছ, ইহার গাত্রবর্ণ অতি চক্কণ সোণার মত, তাই ইহাকে কাঞ্চনপুষ্টি কহে। (Barbus conchonis.)

কাঞ্চনপ্রভ (পুং) ১ ঐলবংশীয় রাজবিশেষ। ২ (ত্রি) কাঞ্চনপ্রভা ইব প্রভা যন্ত, বহুব্রী। স্বর্ণের স্থায় প্রভাবিশিষ্ট।

কাঞ্চনফুল (দেশজ) ফুলবিশেষ (Bauhinia variegata) ইহার গাছের সংস্কৃত নাম—কাণ্ডিদার, রক্তকাঞ্চন, চমরিক, কুন্দাল, যুগ্মপত্রক, কাঞ্চনার, কণ্ঠকারক, কান্তপুষ্প, করক, কান্তার, যমলচ্ছদ, কাঞ্চনাল, তাম্রপুষ্প, কুন্দার, বিদল, কাঞ্চনক, গুণ্ডারি, শোণপুষ্পক। হিন্দী কচনার বা সোণা, মহারাত্রী 'কাঞ্চন,' উড়িয়া 'বোরোখা,' তামিল 'সেগাছ মছরী,' ব্রহ্ম 'মহাল্লিগণি,' মলয় 'চোবন মুল্লুরী'।

কাণ্ডিদার ও কাঞ্চন একজাতীয় বৃক্ষ এবং সংস্কৃত ভাষায় এক পর্যায়বাচক হইলেও উভয়ে স্বল্পবিশেষ প্রভেদ আছে। বর্তমান ইংরাজী উদ্ভিদজ্ঞানশাস্ত্রেও উভয় গাছের নাম এক (Bauhinia variegata), ইংরাজীতে ইহাকে

Mountain-ebony কহে। এই গাছ বড় বাহারী, তেমনি ফুলগুলি সুন্দর ও নানাবর্ণের, বিশেষতঃ বেগুনিয়া ফুলের উপর মাঝে মাঝে রক্তের বিন্দুতে বড়ই সুন্দর দেখায়। বোম্বাই ও পঞ্জাবে, উড়িষ্যার শুস্কসররাঙ্গো, আজমীরে, বাল্লা ও বেহারে এবং ব্রহ্মদেশে এই ফুলের গাছ জন্মে। ইহার কাঠ বেশ মজবুত, এক একটা পাছ বড় হইলে ১০ ইঞ্চি চওড়া তক্তা পাওয়া যায়।

পঞ্জাবের লোকেরা ইহার ফুলের কুঁড়ি রন্ধন করিয়া খায়।

ভাবপ্রকাশ নামক বৈদ্যকগ্রন্থে উভয়গাছের এইরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে। যথা—কাঞ্চনাল শীতল, গ্রাহী, কষায়, শ্লেষ্মপিত্তনাশক এবং ক্রমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ ও গণ্ডমালা-রোগহারক। কোবিদারের গুণও ঐ প্রকার, বিশেষতঃ ইহার ফুল লঘু, রুক্ষ, সংগ্রাহী; পিত্তরক্ত, প্রদর, ক্ষয় ও কাসরোগনাশক।

কাঞ্চনবুড়া (দেশজ) ফুলগাছবিশেষ। পশ্চিমে স্থানবিশেষে মদননিবিন্দী কহে। (*Koempferia angustifolia*) ইহার ফল বড় হয়, রঙ শাদা, ধার বেগুনিয়া।

কাঞ্চনভূ (জী) কাঞ্চনময়ী ভূ, মধ্যলো।। স্বর্ণময় স্থান।

কাঞ্চনময় (জি) কাঞ্চনস্ত বিকারঃ, কাঞ্চন-ময়ট (ময়ট বৈভবো ভাষায়ামভক্ষাদিনয়োঃ। পা ৪।৩। ১৪৩।) স্বর্ণানাম্বিত।

কাঞ্চনমালা (জী) ১ অশোকরাজপুত্র কুণালের পত্নী। ২ স্বর্ণশ্রেণী। ৩ কাঞ্চনবৃক্ষের শ্রেণী।

কাঞ্চনবপ্র (পুং) কাঞ্চনময়ঃ বপ্রঃ, মধ্যলো।। ১ স্বর্ণনির্মিত প্রাচীর। ২ হুম্রক পর্বতের সাহুদেশ।

কাঞ্চনবর্ণা [ন] (পুং) প্রাচীন রাজ্যবিশেষ। [তিরণ্যবর্ণা দেখ।]

কাঞ্চনভীবী [ন] (পুং) স্বয়ম্বরাজের পুত্র। (ভারত শা ৩০।৩১ অঃ।)

কাঞ্চনসন্ধি (পুং) কাঞ্চনবৎ দ্বর্ভেদ্যঃ সন্ধিঃ, মধ্যলো।। উভয় বস্তুতে মিলিয়া সন্ধি, যে সন্ধি স্বর্ণের ভায় দ্বর্ভেদ্য অর্থাৎ সহজে ভঙ্গ হয় না।

কাঞ্চনা (জী) মহীরাবণের রাজধানী, ইহার অপরা নাম স্বর্ণভূমি।

কাঞ্চনাক্ষ (পুং) দানববিশেষ। (হরিব ২৪০ অঃ।)

কাঞ্চনাক্ষী (জী) সরস্বতী নদী।

কাঞ্চনাক্ষ (জি) কাঞ্চনবৎ সুন্দরঃ অক্ষঃ যজ্ঞ, বহুব্রী। ১ স্বর্ণের ভায় সুন্দর অক্ষবিশিষ্ট। ২ (জী) কাঞ্চনময়ঃ অক্ষঃ মধ্যলো।। স্বর্ণনির্মিত অবয়ব।

কাঞ্চনাভিধানসন্ধি (পুং) কাঞ্চনসন্ধি।

কাঞ্চনার (পুং) কাঞ্চনং তদ্বর্ণং ঋদ্ধতি পুটোঃ, কাঞ্চন-ঋ-অন্। কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনাল (পুং) কাঞ্চনং কাঞ্চনবর্ণং অলতি, কাঞ্চন-অল্-অন্। কাঞ্চনগাছ।

কাঞ্চনারক (পুং) কাঞ্চনার-স্বার্থে কন্। কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনাঙ্ঘ্রয় (পুং) কাঞ্চনং স্বর্ণং আঙ্ঘ্রয়ে স্পর্ধিতে স্বভাষা ইতিশেষঃ, কাঞ্চন-আ-হ্রে-ক। কাঞ্চন ইতি আঙ্ঘ্রয়ে নাম যন্ত বা। নাগকেশর গাছ।

কাঞ্চনী (জী) কচ্যতে দীপাতে জনরা, কাচি লুটীভীপ্।

১ হরিদ্রা। ২ স্বর্ণকীরী গাছ। ৩ গোরোচনা। (হিন্দী) ৪ নর্তকী, গায়িকা। ৫ গোবাম্বী সম্প্রদায়বিশেষ। তাঁহারা নৃত্যগীত দ্বারা জীবিকানির্ভাহ করেন। তাঁহাদের পরিধেয় গৈরিক বাস, আচার ব্যবহার সাধারণ গোঁসাইদিগের মত। আদ্যন্তক হইলে তাঁহারা বিবাহ করিতে পারেন। মৃত্যু হইলে তাঁহাদের শবের সমাধি অথবা নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

কাঞ্চনীয় (জী) কাঞ্চনায় হিতং, কাঞ্চন-ছ টাপ্। গোরোচনা।

কাঞ্চি (জী) কাচি-ইন্ (সর্ষধাতুত্যা ইন্। উণ্ ৪।১।৭।)

১ জীদিগের কটীভূষণ, চন্দ্রহার।

(“হৃতকাঞ্চিবল্লীবন্ধান্তরজঘনাদপরাভোগভূক্তাঃ।

উল্লসতি রোমরাঞ্জিঃ স্তনশোভোর্বরলরেখবঃ” আ° সং ৬৯৩।)

২ দাক্ষিণাত্যস্থিত আবুড়রাজ্যের রাজধানী। ইহাকে বর্তমান সাধারণে কঞ্জোভরম্ (Conjeveram) বলে।

[“অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি রবন্তিকা।

পুরী দ্বারাবতী চৈব শৈলুভা মোক্ষদায়িকা” কাঞ্চীপুর দেখ।]

কাঞ্চিক (জী) কাঞ্চি-সংজ্ঞায় কন্। কাঞ্চি।

(কাঞ্চিকং কাঞ্চিকং ধাত্মান্নানালে, ভূষোদকম্। হেম ৩৪৯।)

কাঞ্চী (জী) কাঞ্চিভীষ্। ১ চন্দ্রহার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মেথলা, মণ্ডকী, রসনা, সারসন, কাঞ্চি, রশনা, কক্ষা, কক্ষ্যা, সপ্তকা, সারশন, রসন ও বন্ধন। কেহ কেহ বলেন, এক পর্য্যায়ের মধ্যে এই সমস্ত নাম কথিত থাকিলেও বস্তুতঃ বিভিন্নতা আছে;—

“একযষ্টিভবেৎ কাঞ্চী মেথলা তষ্টযষ্টিকা।

রসনা ষোড়শস্তোত্রা কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ।।”

একগাছিমাত্র যষ্টিকে কাঞ্চী কহে, ইহাই বর্তমান সময়ে গোটা নামে ব্যবহৃত হয়। আটগাছি যষ্টিবিশিষ্ট কটীভূষণের নাম মেথলা, বোল গাছি যষ্টিবিশিষ্টের নাম রসনা, এবং পঞ্চবিংশতি যষ্টিবিশিষ্টের নাম কলাপ। ২ দাক্ষিণাত্যের আবুড়রাজ্যের রাজধানী। [কাঞ্চীপুর দেখ।] ৩ কুঁচ।

কাঞ্চীনগর (কী) কাঞ্চীপুর। [কাঞ্চীপুর দেখ।]

কাঞ্চীপদ (কী) কাঞ্চা: পদং স্থানম্, ৬৩৭। জবন, নিভম্।

(শ্রোণি: কলত্রং কটীরং কাঞ্চীপদং ককুদ্বতী। হেম ৩২৭১।)

কাঞ্চীপুর, মাদ্রাজপ্রদেশের চেন্নলপুত জেলার মধ্যবর্তী কাঞ্চীবরম্ তালুকের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগর। অক্ষা° ১২° ৪৯' ৪৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪৫' পূঃ। ভূ-পরিমাণ ৫৮৫৮ একর। লোকসংখ্যা ৩৭২৭৫, তন্মধ্যে ৩৫,৯৮৯ জন হিন্দু, হিন্দুদিগের মধ্যে শতকরা ১১ জন ব্রাহ্মণ ও ১৭ জন তাঁতি। এখানে আদালত, কারাগার, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় আছে।

পুরাতত্ত্ব।—কাঞ্চীপুর অতি প্রাচীন নগর। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। যথা—

“অসম্ভবং পল্লবান্ পুচ্ছাং প্রম্বাদু বিড়াঙ্কান্।

শকুন্তলান্ধ্রজং কাঞ্চীন শবরাংশৈশ্চ ব পার্থতঃ।”

মহাভারত আদিপর্ব ১৭৬। ৩৪।

অনেক মহাত্মার মতে, মহাভারতে কাঞ্চীনামের উল্লেখ থাকিলেও কেবল ঐ প্রমাণটির উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে মহাভারতের সমকালীন অতি প্রাচীন নগর বলা যায় না। তামিল ভাষায় লিখিত “কাঞ্চীপুর স্থলপুরাণে” লিখিত আছে, প্রসিদ্ধ চোলরাজ কুলোত্তম চোল এই নগর স্থাপন করেন। তৎপুত্র অদভী তোড়ীরের সময়ে ইহার বিশেষ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পুরাবিদ ফাওর্গান সাহেবও উক্ত মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, “পূর্বে এই স্থান জঙ্গলে পরিবৃত্ত ছিল, তখন এখানে অসভ্য কুরুব্রজাতি বাস করিত। খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে অদভী চক্রবর্তী এই নগর পত্তন করেন।” (Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture.)

উপরোক্ত উভয় মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বাস্তবিক এই কাঞ্চীপুর অতি প্রাচীন নগর। চোলরাজ্যের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্বে এই নগরে দক্ষিণাপথের প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিবর্গের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন শিল্পলিপি ও প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। এখন যেমন কাঞ্চীপুর একটি ক্ষুদ্র নগর, পূর্বকালে এমন ছিল না, তখন এই কাঞ্চীপুর একটি বিস্তীর্ণ জনপদে বিভক্ত ছিল। স্বল্পপুরাণে কুমারিকাথও লিখিত আছে—

“গ্রামাণ্যং নবলক্ষঞ্চ কাঞ্চীপুরে প্রকীর্তিতম্।” ৩৭ অঃ।

মহাভারতের সময় কাঞ্চীপুর সম্ভবতঃ কলিঙ্গের ক্ষত্রিয়-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তখনও এই স্থান দ্রাবিড়রাজ্যের

অন্তর্গত হয় নাই; মহাভারতে দ্রাবিড় ও কাঞ্চী উল্লেখ এই মাত্র অসুস্মিত হয়। তৎপরে দ্রাবিড় রাজ্যের এই স্থান অধিকার করেন।

পাণ্ডুরাজ্যের পরই কাঞ্চীপুর পল্লবরাজ্যের হস্তগত হয়। এক সময়ে পল্লবরাজ্যের দ্রাবিড় ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ জয় করিয়া এই কাঞ্চীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রবল হইয়া উঠিলেও, তৎকালীন কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজ্য হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন, খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর শিল্পলিপি তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। সেই সকল শিল্পলিপি পাঠে উপলব্ধি হয়, সে সময়ে ও তাহার পূর্বে এখানে জৈনধর্মও বিশেষ প্রবল ছিল। তৎকালীন পল্লবরাজ্য বেদান্ত ব্রাহ্মণগণকে যে সকল সনন্দ বা অশুশাসনদ্বারা গ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই সেই ব্রাহ্মণগণের অব্যবহিত পূর্বে জৈনদিগের অধিকার ছিল। বোধ হয়, হিন্দু-রাজ্যের জৈনগণকে উচ্ছেদ করিয়া সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণ-দিগকে স্থাপন করেন। (Indian Antiquary, VIII, 281.)

বৌদ্ধগণ অসুমান খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে কাঞ্চী হইতে আসিয়া কাঞ্চীপুরে বাস করেন। পাণ্ডুরাজ্যের সময়ে এখানে জৈনধর্ম প্রবল হইয়া উঠে, জৈনরাজ্যের এখানকার অধিকাংশ বৌদ্ধ অধিবাসীকে তাড়াইয়া দেন। (Wilson's Mackenzie Collection, p. 40. 41.)

শিল্পলিপি-অনুসারে সিংহবিষ্ণুই কাঞ্চীপুরের প্রথম পল্লব-রাজ, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন; অনেকে অনুমান করেন, তাঁহার সময়ে বিষ্ণুকাঞ্চীর বরদরাজধানীর আবির্ভাব হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে পুলিকেশী (২য়) একবার কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজ্যকে আক্রমণ করেন। ৫০৭ শকে খোদিত পুলিকেশীর শিল্পলিপিপাঠে জানা যায়, যে পল্লবরাজ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া কাঞ্চীপুরের প্রাকার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন *।

খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়ং কাঞ্চীপুরে (কি এন্-চি-পু-লো) আগমন করেন। সেই সময়ে কাঞ্চীপুর দ্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী, প্রায় ২৫ কোশ বিস্তৃত ছিল। সে সময়ে এখানে বৌদ্ধ, নিগ্রহু ও হিন্দু এই তিন দলই প্রবল। তৎকালে এখানে ১০০টি বৌদ্ধসভারাম ও ৮০টি দেবমন্দির ছিল। কাঞ্চীপুর ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান,

* “আক্রান্তরাজ্যের তথলরাজ্যস্থান কাঞ্চীপুরঃ।

প্রাকারান্তরিতমতাপমকরোদ্যঃ পল্লবান্ধ্রজঃ।”

৫০৭ শকে খোদিত এহোল-শিল্পলিপিঃ।

এইজন্য বৌদ্ধগণ এই স্থানকে পুণ্যভূমি বলিয়া মনে করিত। তাই নানাদেশ হইতে বৌদ্ধযাত্রী এখানে আসিত।

অনেকে অনুমান করেন যে, চীনপরিভ্রাজকের আগমন-কালে এখানে বৌদ্ধরাজ রাজত্ব করিতেন, কিন্তু তাহা নহে। খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীর শিল্পলিপিপাঠে জানা যায় যে, সে সময়েও এখানে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী পল্লবরাজগণের রাজত্ব ছিল।

পূর্বতন পল্লবরাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শিল্পলিপিতে কাঞ্চীপুরাধিপ নরসিংহ বর্ম্ম আপনাকে শৈব বা মহেশ্বরোপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে কাঞ্চীপুরে শৈবধর্ম্ম প্রবল হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চোলরাজ কুলোত্তম* কাঞ্চীপুর অধিকার করেন। তৎপুত্র অদভী চক্রবর্ত্তীর সময়ে কাঞ্চী-পুর ভৌত্তীয়মণ্ডলের রাজধানী হইয়াছিল।

খৃষ্টের দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে চালুক্য রাজ-গণ কাঞ্চীপুর অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। বিহ্লগ-কবি বিরচিত বিক্রমাক্ষরিত নামক সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে জানা যায়, চোলরাজ আহবমল্ল (১০৪০-৬৯) চোলরাজ-ধানী কাঞ্চী আক্রমণ করেন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও চোলরাজদিগকে স্ববশে আনিতে পারেন নাই। তাঁহার আদেশক্রমে তৎপুত্র বিক্রমাদিত্য চালুক্য কয়েকবার কাঞ্চী আক্রমণ করিয়াছিলেন। [বিহ্লগকৃত বিক্রমাক্ষরিত ৩। ৬১, ৬৬। ২২-২৮ দেখ।]

বোধ হয় সেই সময়ে কাঞ্চীর কোন কোন অংশ পল্লব-রাজগণেরও অধিকারে ছিল; কারণ শিল্পলিপি ও বিহ্লগের গ্রন্থপাঠে জানিতে পারা যায় যে বিক্রমাদিত্যপুত্র বিনয়াদিত্যকর্ত্তৃক কাঞ্চীর ত্রৈরাজ্যপল্লবের বিপুলবাহিনী আক্রান্ত ও পথ্যদস্ত হইয়াছিল।

১০৮৪ শকের একখানি শিল্পলিপিতে খোদিত আছে যে, ঐ সময়ে (খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীতে) কাকত্যরাজ রুদ্রদেব কাঞ্চীপুর শাসন করিতেন। (Ind. Antiquary XI. 19.)

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে উৎকলের কেশরীবংশীয় একজন রাজা কাঞ্চীপুর লুট করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৪৭৭ খৃঃ, বাজগীবংশীয় মুসলমানরাজ মুহম্মদ কাঞ্চীপুর জয় করিয়া আপন অধিকারভুক্ত করেন। সেই পর্য্যন্ত কিছু

দিন এই স্থান বাজগীবংশীয়দিগের শাসনাধীনে থাকে। তৎপরে বিজয়নগরের রাজা নরসিংহ রায় বাজগীদিগের হস্ত হইতে এই স্থান উদ্ধার করেন। তিনি বীর বসন্তরায়কে কাঞ্চীপুরের শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করেন। নরসিংহ রায়ের পুত্র রুদ্ৰদেব রায় ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভিষিক্ত হন। তিনি ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীপুরে আগমন করেন। তিনি কাঞ্চীপুরের বিখ্যাত শতস্তম্ভমণ্ডপ এবং কতকগুলি শিব-মন্দিরের সংস্থার করাইয়াছিলেন। ১৪৩৮ শকে খোদিত অনুশাসনপত্রপাঠে জানা যায় যে, তিনি এখানকার প্রসিদ্ধ বরদরাজস্বামীর মন্দিরের ব্যয়-কারণ ১১ শত টাকা আয়ের বিশরা, তিরুপা, কদাহ, উপহুগাল ও গোবিন্দবদি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করেন।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর যবন-কবলিত হইলে, কাঞ্চী-পুর গোলকুণ্ডার মুসলমানরাজের শাসনাধীন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ইহা অন্ধকূটর সামিল হয়। ১৭৫১ খৃঃ, লর্ড ক্লাইব ফরাসীদিগের হস্ত হইতে কাঞ্চীপুর অধিকার করেন, কিন্তু ঐ বর্ষেই রাজসাহেবকে ছাড়িয়া দিতে হয়। ১৭৫৭ খৃঃ, ফরাসীরা এই স্থান আক্রমণ করিয়া অগ্নি প্রদান করেন। পরবর্ষে ইংরাজসৈন্য এই নগর পরিত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে ফরাসীদিগের বিপক্ষে যাত্রা করেন, কিন্তু আবার ফিরিয়া ফরাসী অবরোধ হইতে এই নগর উদ্ধার করেন। কাঞ্চীপুরের অদূরে পল্লুর নামক স্থানে ইংরাজ ও মুসলমানে একটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে, হায়দার আলী জেনারেল বেলির সৈন্যবাহু ভেদ করিয়াছিলেন।

কাঞ্চীপুর একটি প্রাচীন মহাভীর্ষ। ভারতবর্ষের যে সাতটি পুণ্যানগরী দর্শন করিলে জীব অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, কাঞ্চীপুর তাহাদেরই মধ্যে একটি।

“অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।

পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈস্তা সিদ্ধিদায়িকা॥”

ভোড়লভয়ের মতে, এই তীর্থই বিশ্বরূপ মহাদেবের কটাদেশ(স্বরূপ)। যথা—

“নাভিমূলে মহেশানি অযোধ্যাপুরী সংস্থিত।

কাঞ্চীপীঠং কটাদেশে ত্রীহটং পৃষ্ঠদেশকে॥”

ভোড়লভ ৭ম উল্লাস।

কেবল তীর্থ নয়, কাঞ্চী মহাপীঠ স্থান। বৃহন্নীলভয়ের মতে এখানে কনককাঞ্চীদেবী বিরাজ করেন।

“কাঞ্চ্যাং কনককাঞ্চী ভাদবন্ত্যামতিপাবনী।”

বৃহন্নীলভয়ে ৫ম পটল।

* কাঞ্চীসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পুরাবিদেদের মতে খৃষ্টীয় ১১শ বা ১২শ শতাব্দী মধ্যে কুলোত্তমচোলের রাজত্বকাল; কিন্তু দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ বৃহন্নীল মহাভাষ্য নামক পুস্তকের মতে, কুলোত্তম খৃষ্টের নব শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন।

কাঞ্চীপুর সহর দুইভাগে বিভক্ত ; বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীতে শিবমন্দির ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। এই দুই স্থানে দর্শনীর বস্ত্র মধ্যে শিবকাঞ্চীস্থিত ‘একাম্রনাথ’ নামক মহাদেবের অনাদিলিঙ্গ, ভগবতী কামাক্ষীদেবীর মূর্তি, ভগবান্ শঙ্করাচার্যের প্রতিমা ও সমাধি-স্থল, কম্পানদীতীর্থ এবং বিষ্ণুকাঞ্চীস্থিত “শ্রীবরদরাজ স্বামী” নামক ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্তি, উলঙ্গমূর্তি, বেগবতীধারাতীর্থ, রবিতীর্থ, সোমতীর্থ, মঙ্গলতীর্থ, বুধতীর্থ, বৃহস্পতিতীর্থ, শুক্রতীর্থ ও শনিতীর্থ প্রভৃতি প্রধান। এ ছাড়া কাঞ্চীর নিকট কেদারেশ্বর ও বালুকারণ্য নামে দুইটি পুণ্য-স্থান আছে। [এই সকল তীর্থের বিবরণ শিবকাঞ্চীমাহাত্ম্য, কামাক্ষীবিলাস, কেদারেশ্বরমাহাত্ম্য, বালুকারণ্যমাহাত্ম্য প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

দক্ষিণদেশের স্মার্তদিগের মতে শিবকাঞ্চী বারাণসীভূত। এই স্থানের উৎপত্তিবিষয়ে স্থলপুরাণের একস্থলে কথিত আছে যে, মহাদেব পার্শ্বতীকে পুণ্যতীর্থের বিষয় বলিতে বলিতে বলেন যে, “বারাণসী, রামেশ্বর, ত্রীক্ষেত্র, ইত্যাদি পুণ্যক্ষেত্র হইতে কাঞ্চীপুর সর্বোৎকৃষ্ট। এখানে বাহারা বাস করে, বাহারা ইহা দর্শন করে বা ইহার বিষয় শ্রবণ করে, অথবা ইহার বিষয় মনে করে বা আন্দোলন করে এবং যে সকল পশু-পক্ষী এখানে বাস করে, তাহারাও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই নগরের মধ্যস্থলে আমি সমস্ত শাস্ত্রকে আশ্রয়রূপে রাখিয়া এবং আপনি লিঙ্গরূপে “একাম্রনাথ” নামে অভিহিত হইয়া বাস করিতেছি। এই কাঞ্চীপুরে বাস করিলে নর সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। কাঞ্চীপুর চারিদিকে পঞ্চযোজন বিস্তৃত। ইহার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে আড়াই কোশ স্থানের মধ্যে আমি সর্বদাই বিরাজমান থাকিব ; এমন কি প্রাণ সময় উহা আমার ত্রিশূলের উপর রাখিব, অতএব ইহার কখনই বিনাশ নাই, ইহা আমারই আকৃতি জানিবে।”

আর্য্যাবর্তের লোকেরা যেমন জীবনের শেষভাগে কাঞ্চীতে গিয়া বাস করে ও কাঞ্চীতে মরিতে পারিলে শিবপ্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে, দাক্ষিণাত্যের লোকেরাও তেমন কাঞ্চীতে বাস করে এবং এখানে মরিলে মুক্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্তি আছে। কাঞ্চীপুরের “একাম্রনাথ-লিঙ্গ” তন্মধ্যে ক্ষিতিমূর্তি। ক্ষিতিমূর্তি বলিয়াই এই লিঙ্গ মূর্তিকার গঠিত ; সুতরাং অজ্ঞাত দেবালয়ের ভাষ্য এখানে জলাভিবেক হয় না।

একাম্রনাথের মন্দির দাক্ষিণাত্যে অতি বিখ্যাত

দেখিতেও অতি সুন্দর ও অতি পুরাতন। এই মন্দির এক সময়ে একবারে যে নির্মিত হইয়াছে তাহা নহে ; ক্রমে ক্রমে ইহা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই মন্দিরের দেওয়াল পরস্পর সরলভাবে নির্মিত নহে বা ঘরগুলিও পরস্পর সম্মুখীন নহে। অনেকে অনুমান করেন, ইহার মূলস্থান চোলরাজারা নির্মাণ করেন ; পরে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরাজ কর্তৃক গোপুর নির্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি পুরাতন আশ্রয়ক আছে। বৃক্ষটির বয়স ৩।৪ শত বৎসর হইবে। এখানকার লোকের বিশ্বাস এই আশ্রয়কটি অনাদি-কালের এবং ইহাই লক্ষ্মীশাক্তরূপী, এই বৃক্ষের চারিটি ডালে মিঠা, কটু, তিক্ত ও অম্ল এই চারি প্রকার আশ্রয় হইয়া থাকে। বাহারা উক্ত বৃক্ষের আশ্রয় খাইয়াছেন, তাহারা এবিষয়ে সাফল্য দিয়া থাকেন। দেব-সেবকেরা বলেন যে, পূর্বে এই আশ্রয়ক হইতে প্রত্যহ একটি করিয়া পাকা আশ্রয় পাওয়া বাইত ও তাহা একাম্রনাথকে ভোগ দেওয়া হইত। অনেকে বলেন, ইহা হইতেই লিঙ্গের নাম ‘একাম্রনাথ’ হইয়াছে। এখন আর প্রত্যহ আশ্রয় পাওয়া যায় না।

কামাক্ষীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থলপুরাণে আছে যে, কোন সময়ে পার্শ্বতীদেবী কৌতুকচ্ছলে মহাদেবের পশ্চাতে গিয়া পশ্চাৎ হইতেই তাহার চক্ষু আবরণ করায়, বিশ্ব-সংসার অন্ধকারময় হইয়া গেল ; কারণ, সূর্য্যচন্দ্রবহ্নিরূপী নয়নজয় ঢাকা পড়িলে আলো হইবে কিসে ? ইহাতে ভগবতীর পাপ হইল এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহাদেবের আদেশে তিনি মর্ত্যলোকে আসিয়া কাঞ্চী-পুরে একাম্রনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থিত কম্পানদী নামক তীর্থে কামাক্ষী দেবীরূপে ছয়মাস তপস্তা করিলে মহাদেব পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করেন। তদবধি কামাক্ষীমূর্তি স্বতন্ত্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ফাল্গুনমাসের পঞ্চদশদিন ব্যাপিয়া একাম্রনাথের বার্ষিক মহোৎসব হয়, উহার দশমদিবসে রাজ্যে কামাক্ষীদেবীর ভোগমূর্তির সহিত একাম্রনাথের ভোগমূর্তিকে একত্র রাখা হয়।

কামাক্ষীদেবীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহারই প্রাঙ্গণে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের সমাধি আছে। এই সমাধির উপর তাহার প্রস্তরময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শিবকাঞ্চীতে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ আছে। এই সকল

• দাক্ষিণাত্যের প্রায় প্রত্যেক বিগ্রহের দুইটি করিয়া মূর্তি থাকে। একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূলমূর্তি, আর একটি উৎসবাবর্তে নগরবাসীর জন্য প্রস্তুত ভোগমূর্তি। এই ভোগমূর্তিই অলঙ্কারহীন সজ্জিত হইয়া থাকে।

লিঙ্গসম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে একান্ত-নাথ একমুষ্টি বালুকা ছড়াইয়াছিলেন। ইহাতে যতগুলি বালুকাণা ভূমিতে পড়ে, তাহার প্রত্যেকটি এক একটি লিঙ্গরূপে পরিণত হয়। এখন সকল লিঙ্গের পূজা হয় কি না সন্দেহ।

একান্তনাথের পূজার জন্ত ১৪০০ শত টাকা আয়ের কয়েকখানি গ্রাম ও নগদ ৮০৫ টাকা কালেক্টরী হইতে বরাদ্দ আছে।

এই মন্দিরে প্রত্যাহ বেদপাঠ ও বেদগান হইয়া থাকে। উৎসবের সময় ভোগমূর্তি রত্নালঙ্কারে শোভিত হইয়া বাহক-ব্রাহ্মণস্বর্গে নীত হয়। পশ্চাতে ব্রাহ্মণেরা বেদগান করিতে করিতে যাইতে থাকেন। ফাস্তনমাসে ইহার রথোৎসব হয়। ঐ সময় বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

এই দেবালয় কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় সৈন্যবাস বা হাঁস-পাতালরূপে ব্যবহৃত হইত। দ্বারের উপর সেই যুদ্ধের একটি গোলার দাগ আজও আছে।

উক্ত শিবমন্দির হইতে ২ ক্রোশ দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী, এখানেই বরদরাজস্বামীর প্রসিদ্ধ মন্দির। স্থলপুরাণে বরদরাজ স্বামীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে— “কোন সময়ে ব্রহ্মা অশ্বমেধযজ্ঞ করেন, কাঞ্চীপুরে যজ্ঞস্থল নিরূপিত হয়। যজ্ঞভূমির উত্তরদ্বার নারায়ণ, পশ্চিম দ্বার বিরিকীপুর, দক্ষিণদ্বার চিল্লিপুত, পূর্বদ্বার মহাবলী-পুর। সরস্বতীদেবী ব্রহ্মার যজ্ঞের কথা শুনে নাই, নারদ ব্রহ্মলোকে গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে না জানাইয়া যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি যজ্ঞস্থল ভাঙ্গাইয়া দিবার উদ্দেশে নদীরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুর সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। বিষ্ণু আসিয়া সরস্বতীর গতি রোধ করিলে অস্ত্রঃসলিলা হইয়া বহিতে লাগিলেন। বিষ্ণু আর কি করেন—উলঙ্গভাবে এদোন্ধোরি নামক স্থানে নদীর মুখে পতিত হইলেন। তখন সরস্বতীদেবী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া আপনাত্মক পূর্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে যথাসময়ে বজ্রীয় অশ্বমাংস আছতি দেওয়া হইল, ভগবান্ বিষ্ণু সেই হতমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে বজ্রীয় অগ্নি হইতে আবিকৃত হইলেন। বিষ্ণুদর্শনে ব্রহ্মার মনঃকান্দা সিদ্ধ হইল। সমাগত ঋষি ও ঋষিকুণ্ঠ বিষ্ণুকে সেই স্থানে থাকিবার জন্ত প্রার্থনা করিলেন। নারায়ণ তাঁহাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কাঞ্চী-পুরে শ্রীবরদরাজস্বামী নামে বিরাজ করিতে লাগিলেন।”

কিংবদন্তি এইরূপ যে, একাদশ শতাব্দীতে কাঞ্চীপুরের

শাসনকর্ত্তা গঙ্গাগোপালরাজ বরদরাজের বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে তিনি অপূজক ছিলেন, বরদরাজের কৃপায় তাহার পুত্রসন্তান হয়। তাই তিনি এক শিবমন্দির তৈরীয়া সেই ইষ্টকে এক বৃহৎ-বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে বরদরাজ স্বামীকে আনাইয়া স্থাপন করিলেন। এই বিষ্ণুমন্দির হইতেই এই স্থান বিষ্ণুকাঞ্চী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুমন্দিরের দেবীমহলের এক স্তম্ভে ১৭৩২ শকের একখানি শিল্পলিপিতে লিখিত আছে, লোলন্তম্মমল্লী নামে কোন ব্যক্তি উদয়নার পলয়ম্ হইতে বরদরাজের মূর্তি বিষ্ণুকাঞ্চীতে আনয়ন করেন। বিষ্ণুমন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণরায়নির্মিত প্রসিদ্ধ শতস্তম্ভমণ্ডপ বিদ্যমান। একখানি পাথর কাটিয়া এই মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছে। ইহার নিকট আরও কএকটি মণ্ডপ আছে, তন্মধ্যে বাহনমণ্ডপ ও কল্যাণমণ্ডপই শ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরের দেবসেবার জন্ত ৩০০০ টাকার আয়ের একখানি গ্রাম এবং মাজাজ গবর্ণমেন্ট হইতে ৯৯৬১ টাকা বরাদ্দ আছে। এই মন্দির অতি সমৃদ্ধিশালী, কেবল ইহার মণিমুক্তাদির মূল্যই লক্ষ টাকার অধিক হইবে। লর্ড ক্লাইব ৩৬৬১ টাকা মূল্যের মক্কাভি নামক একখানি কর্ণাভরণ প্রদান করিয়াছিলেন। বৈশাখমাসে ১০ দিন ব্যাপিয়া ইহার মহোৎসব হইয়া থাকে, এই সময় এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

কাঞ্চীপুরী (জী) নগরবিশেষ। কাঞ্চীপুর।

কাঞ্চীপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ। কাঞ্চীপুর।

কাঞ্জিক (ক্লী) অঞ্জ-গুল-টাপ্-অত ইডম্, অঞ্জিকা; ক্ কুং-সিতা অঞ্জিকা প্রকাশো যজ্ঞ, কোঃ কাদেশঃ। কাঁজি; অগ্নে জল দিয়া পর্যুষিত করিলে সেইজল যখন অগ্নরস হইয়া উঠে, তাহাকেই কাঁজি কহে, আমানী। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—আরনাল, সৌবীর, কুয়াষ, অভিবৃত্ত, অবজিসোম, ধাতাম্, কুঞ্জল, কুয়াস কুয়াষাভিবৃত্ত, কাঞ্চিক, কাঞ্জীক, কাঞ্জিকা, কঞ্জিক, কাজী, ভক্তবারী, ধাতুমূল, ধাতুযোনি, তুয়াষ, গুধাম্, মহারস, তুবেদিক, শুক্ৰ, চূক্র, ধাতুয়, উম্মাহ, রক্ষোয়, কুণ্ডগোলক, সুবীরাম, বীর, অভিবব ও অগ্নগায়ক। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—ভেদক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, স্পর্শশীতল, শ্রম ও ক্লান্তিনাশক, অগ্নিরাগিকারক এবং পিত্ত, ক্রটি, ও বস্ত্তিকারক। রাজনির্ণেয়ের মতে কাঁজি অগ্নে মর্দন করিলে, বায়ু, শোণ, পিত্ত, অর, দাহ, মুচ্ছা, শূল, আত্মান ও বিবন্ধ বিনষ্ট হয়।

কাঞ্জিকবটক (পুং) কটঞ্জিক যোগেন কৃতো বটকঃ, মধ্যলো-

কাজি বড়া। ভাবপ্রকাশে ইহার প্রান্তপ্রাণী এইরূপ
লিখিত আছে—একটি নুতনপাঞ্জ কট্টেলদ্বারা লেপন
করিয়া, নির্মল জলপূর্ণ করিতে হইবে। পরে তাহাতে রাই-
সরিষা, জীরা, লবণ, হিন্দু ও হরিত্রাঁর চূর্ণের সহিত কতকগুলি
বড়া ভিজাইয়া তিনদিন পর্যন্ত পাত্রেয় মুখবন্ধ করিয়া
রাখিবে। তিনদিন পরে ঐ বড়া অন্নাস্বাদ হইলে তাহাকেই
কাজিকবটক বা কাজিবড়া কহে। ইহা কটিকারক,
ষাণ্মাশক, কফকারক এবং শূল, অজীর্ণ ও দাহবিনাশক।
কাজিকা (স্ত্রী) কুংসিতা অজিকা যন্তাঃ, টাপ্। ১ জীবন্তী-
লতা। ২ পলাশীলতা।
কাজী (স্ত্রী) কং জলং অনক্তি, ক-অনজ-অণ্-ভীষ্। ১ মহা-
দ্রোণী বৃক্ষ। ২ কাজি।
কাজীক (স্ত্রী) কাজিক, কাজি।
কাট (দেশজ) কাঠ।
কাট (পুং) কং জলং অট্যতে অজ, ক-অট্-ঘঞ্। ১ কুপ।
২ বিবসমপথ।
কাটন (দেশজ) ১ ছেদন। ২ খনন। ৩ বিদারণ।
কাটনা (দেশজ) ১ হুতা কাটা। ২ হুতা-কাটার যন্ত্র।
কাটনী (দেশজ) যে স্ত্রীণোক হুতা কাটে।
কাটবেশ (পুং) কালিদাস-প্রণীত শকুন্তলা নাটকের একজন
চীতাকার।
কাটব্য (স্ত্রী) কটোভাবঃ, কটু-বাঞ্। ১ কটুতা। ২ কার্কশ।
কাটা (দেশজ) ১ ছেদন করা। ২ ছিন্ন।
কাটাখাল, দক্ষিণ কাছাড় প্রবাহিত ধলেশ্বরী নদীর একটি
শাখা। প্রবাদ এইরূপ বহুকাল পূর্বে একজন কাছাড়ীরাজা
ধলেশ্বর নদী হইতে খাল কাটিয়া বরাকনদীর সহিত মিলিত
করিয়াছিলেন। ইহার সম্মুখস্থানে সেই রাজা একটি বৃহৎ
বাধ প্রস্তুত করাইয়া দেন। এখন বারমাসই ইহাতে জল
থাকে, স্রোত বহে, নৌকা করিয়া বারমাসই পার
হইতে হয়।
কাটা ঘা (দেশজ) সর্পাদির ক্ষতজন্য অথবা ছুরিকাদি দ্বারা
ছেদ জন্য ত্রণ।
কাটান (দেশজ) ১ অতিবাহন করা। ২ জলের পথ করিয়া
দেওয়া। ৩ মজাদির কার্য্যনষ্টকারক অপন্ন মজবিশেষ।
৪ গুণের কিয়দংশ পরিণোদ করা। ৫ অধিক পরিমাণে
বিক্রয় করা।
কাটানী (দেশজ) বৃক্ষাদি ছেদন করাইবার মজুরি।
কাটাম, কাঠাম, কাঠামো (দেশজ) ১ মুখ্য প্রাতিমাদি
নির্মাণের জন্য কাঠ বা বংশাদি নির্মিত আয়তন। ২ আট-

চালাদি বাধিবার জন্য বংশাদির আয়তন। ৩ চূর্ণোৎসবের
পূর্বে বাঙ্গালাদেশে নিয়ম আছে যে, রথের দিন বা সেই
পক্ষের মধ্যে এক শুভদিনে একখণ্ড সরল, নিখুঁত বংশদণ্ড
দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। কুজকারেরা এই বংশদণ্ড
লইয়া গিয়া দেবীদেহের আয়তন বা ঠাঁট বাধিতে আরম্ভ
করে। বাঙ্গালার সকল গৃহস্থেরই কৌলিক রীতি এমত
নহে, তবে অনেকের আছে। এই উৎসর্গীকৃত বংশদণ্ডকেও
“কাটাম” বলে।

কাটার (দেশজ) কর্তারী, কাটারী, দা।

“সুকুঠার কাটার খরধার ছুরী।

বহু তীর তুণীর কোদধারী।” শিবায়ণ।

কাটারী (দেশজ, কর্তারীপক্ষের অপভ্রংশ) ১ দা। ২ কাটারী।

কাটাল, মালদহ জেলার পূর্ব ও উত্তরপূর্বাংশে বিস্তৃত কটক-
ময় জঙ্গলাবৃত ভূভাগ। এই ভূভাগ উত্তরপূর্বে ও দক্ষিণ-
পূর্বে মহানদীর চরভূমি হইতে দিনাজপুরের সীমানা পর্যন্ত
বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রাকৃতিক গঠন বড়ই অদ্ভুত।
এখানে বড় গাছ অথবা বড় বন নাই, কেবল কাটাবন, বোধ
হয়, সেইজন্য এই ভূভাগের নাম ‘কাটাল’ বা ‘কাটাল’
হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই বিস্তৃত
কাটাল ভূভাগের এমন দুর্দশা হয় নাই। পূর্বকালে এখানে
বহুলোকের বাস ছিল, অদ্যাপি পুষ্করিণী ও গৃহাদির ভয়াবশেষ
এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির সাক্ষ্যদান করিতেছে। প্রসিদ্ধ
পাণ্ডুরানগরের ধ্বংসাবশেষ এই কাটাবনের নিবিড় জঙ্গল
মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাই এখন এ অঞ্চলের লোকের
নিকট ‘পেঞ্চরা কাটাল’। এই ভূভাগের মধ্য দিয়া কয়েকটি
খাড়ী ও নালা চলিয়া গিয়াছে। এখানে কেবল অসত্য
লোকের বাস, তাহাদের অনেকেই শীকারী ও মৎস্যজীবী।
সম্প্রতি পেঞ্চরা-কাটালের খানিকটা পরিষ্কার করিয়া কয়েক
ঘর তাঁতাল আশিয়া উপনিবেশ করিয়াছে।

কাটিহারী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Ardisia Catihara, Buch.)

কাটা (দেশজ) ১ হুতা কাঠ। ২ তৃণাদির খণ্ড।

কাটুক (স্ত্রী) কটুক ভাবঃ কটুক-অণ্ (হায়নান্ত মুবাণিভ্যো
অণ্। পা ৫। ১। ১৩০।) কটুরস।

কাটুরা, কাটুরে (দেশজ) ১ কাঠাগার। ২ যাহারা কাঠ
কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে; কাটুরিয়া।

কাটোয়া, বঙ্গের বর্ধমান-জেলার অন্তর্গত ডাক্তারখার পশ্চিম-
ভীরবর্তী একটি নগর বা গঞ্জ। অক্ষা° ২৩° ৩৭' উঃ, দ্রাঘি°
৮৮° ১০' পূঃ।

এই স্থানে চৈতন্যদেব কেশবভাট্টার নিকট লম্বাশয্যে

বীক্ষিত হন। এখনও গোরাকদেবের মন্দির বিদ্যমান রহি-
য়াছে। মুসলমান নবাবদিগের সময়ে কাটোয়া বেশ বর্ধিত
হইয়া উঠিয়াছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্ররাজমন্ত্রী ভাস্কর-
পহ্লু বঙ্গবিজয়কালে এখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া-
ছিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কাসিম-আলীর সহিত এখানে একটি
যুদ্ধ হয়।

এখানকার অধিবাসীরা মধ্যে তাঁতিরাই বর্ধিত। এখানে
পিত্তল কাঁসার ব্যবসা হয়।

কাট্য (ত্রি) কাটে বিষমার্গে কূপে বা ভবঃ, কাট-বৎ।
১ বিষমমার্গজাত। ২ কূপজাত। ৩ (পুং) ক্রূরবিশেষ।

কাটকবুল (দেশজ কাট+আরব্য কবুল) একবারে অস-
ম্মতি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কাটকুট (দেশজ) ১ ইতর লোকেরা বন হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
কাঠ পাতা প্রভৃতি যাহা সংগ্রহ করিয়া আনে। ২ বেতন বদ্ধ
করা। ৩ উত্তরপূর্বের পাওনা হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট
দিবার থাকে। ৪ লিখিত বিষয়ের মধ্যে লেখনীদ্বারা অন্তর্ভুক্ত বা
অসংলগ্ন শব্দাদির সংশোধন।

কাটগড়া, কাঠগড়া (দেশজ) কাঠের বা বাঁশের খুঁটি দ্বারা
বেষ্টিত স্থান। কাটরা, কাঠরা।

কাটছাতা (দেশজ) বেড়ের ছাতা।

কাট কাট (দেশজ) লোকের রোজমুস্তির পরিচায়ক অবস্থা।
“বলিতে না বলিতে তাহারা যেন মাঝ মাঝ, কাট কাট
করিয়া আসিয়া পড়িল।”

কাটচোকরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ; কাঠকুট।

[কাঠকুট দেখ।]

কাটতি (দেশজ) দ্রব্যবিশেষের বিক্রয়বাহুল্য।

কাটপীন্দা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Muscicapa Ganna.)

কাটবগলা (দেশজ) কলকাতার পক্ষিবিশেষ।

কাটরা, কাঠরা (দেশজ) ১ কাটগড়া, কাঠগড়া। ২ বারাগু-
দির প্রান্তভাগে শোভা ও রক্ষাবিধানার্থ কাঠনির্মিত রুতি
(বেড়া) বা রেলিং (Railing)

কাঠ (পুং) কাঠাতে, তদ্ধাতে, কঠ-বৎ। ১ পাষণ। ২ (ত্রি)
কঠম্, কঠ-অণ্। কঠম্বক্ষীয়।

কাঠক (স্ত্রী) কঠানাং ধর্ম্য আন্নায়ঃ সমূহো বা, কঠ-বৎ।
১ কঠশাখাধ্যায়িগণের ধর্ম্য। ২ কঠশাখাধ্যায়িদিগের শাস্ত্র।
৩ কঠশাখাধ্যায়িসমূহ।

কাঠরিয়া, কাঠুরিয়া (দেশজ) বাহারী বনের কাঠ বিক্রয়
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

কাঠশাঠী [ন্] (পুং) কঠশাঠেন শ্রোতব্যঃ অধীয়েত কঠশাঠ-

পিনি (শৌনকাহিত্যস্বল্পসি। পা ৪।৩।১০৬।) কঠশাঠ-
কথিত শাস্ত্রাধ্যায়ী।

কাঠা (দেশজ) ১ প্রস্থে চারি হাত ও দীর্ঘে আশী হাত। ২
ধাত্তাদি মাপ করিবার পাত্রবিশেষ, রেক্। ৩ বাঙ্গালা দেশীয়
কচ্ছপের শ্রেণীভেদ, নদীজ ক্ষুদ্রকার্য কচ্ছপ।

কাঠাকালি (দেশজ) অঙ্কবিশেষ; জমীর পরিমাণ স্থির
করিবার নিয়মাদি।

কাঠাকিয়া (দেশজ) একশত কাঠা পর্যন্ত বিঘা প্রভৃতি
নাম সংযোগ করিয়া গণনা করা।

কাঠাবাড়ী (দেশজ) চারি হাত পরিমাণ ঘটি, ইহা দ্বারা ভূমির
মাপ হয়।

কাঠাম (দেশজ) বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা রচিত আকৃতি, ঠাট।

কাঠাল (দেশজ) কঠিন। (বৃক্ষাদির উন্নতাবস্থা) ?

কাঠি (দেশজ) ১ কাঠের ক্ষুদ্র অংশ। ২ বাদ্য বাজাইবার ক্ষুদ্র ঘটি।

“দামাযায় দিল কাঠি, তোলপাড় কড়ে মাঠি।”

গোবিন্দমঙ্গল ২১০।

কাঠিন (স্ত্রী) কঠিনস্ত্র ভাবঃ, কঠিন-অণ্। ১ দৃঢ়তা, কঠি-
নতা। ২ (পুং) খেজুর।

কাঠিন্য় (স্ত্রী) কঠিনস্ত্র ভাবঃ, কঠিন-যাঞ্। ১ কঠিনতা।

২ নিষ্ঠুরতা। (“কাঠিন্য় পরীক্ষার্থে অঙ্গং কৰ্ম্ম কৃতামপি।”

রাজতরঙ্গিণী ৫৪৪০)

কাঠিন্য়ফল (পুং) কাঠিন্য় ফলে যন্ত, বহুব্রী। কপিথবৃক্ষ,
কদবেল গাছ।

কাঠিয়া রামরাম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Orchis uniflora)

কাঠেরণি (পুং) ঋষিবিশেষ।

কাঠেরণীয় (ত্রি) কাঠেরণেরদম্, কাঠেরণি-ছ। (গহাদিত্যস্।
পা ৪।২।১৩৮।) কাঠেরণি ঋষিসম্বন্ধীয়।

কাঠ (দেশজ) কাঠবৎ কঠিন ও শুষ্ক। যথা—“চামড়াখানি
শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।” ২ আড়ষ্ট, ভীতিবিস্ময়।
যথা—“ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।” ৩ ক্লশ, হ্রস্বল—
“দিন দিন শরীর যেন কাঠ হইয়া যাইতেছে।”

কাঠকাঠ (দেশজ) নীরস। যথা—“এত কাঠ কাঠ গিলিতে
পারিবে কেন ?”

কাঠ-খড়ি (দেশজ) খড়িবিশেষ, ইহা চা খড়ি অপেক্ষা কঠিন।
[খড়ি দেখ।]

কাঠগড়া (দেশজ) বেড়া, সমারোহকার্য্যে লোকসমূহের
শ্রেণী বিভাগ লক্ষ্য স্থানে স্থানে যেরূপে বেড়া দেওয়া হয়।

কাঠগোলাপ (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Rosa Chinensis.)
[গোলাপ দেখ।]

কাঠচাঁদা (দেশজ) মস্তকবিশেষ। [চাঁদা দেখ।]

কাঠচোর (দেশজ) যে কাঠ চুরি করে। পক্ষিবিশেষ, কাঠ-
চোঁকরা (Picus Benghalensis.)

কাঠছাতিয়া (দেশজ) বেঙের ছাঁতি। জলাশয়ের ধারে
অথবা জঙ্গলে বর্ষাকালে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঠজাম (দেশজ) জামবিশেষ। (Eugenia operculata.)
[জম দেখ।]

কাঠজালী (দেশজ) একপ্রকার কড়া লবণ।

কাঠঝেঁকড়ি (দেশজ) একপ্রকার ঝাঁকড়া গাছ।

কাঠটগর (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Tabernaemontana
coronaria.) [টগর দেখ।]

কাঠঠোঁকরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। ইহার চকুদ্বারা কাঠ
বা বৃক্ষমধ্যে গর্ত করিয়া থাকে। [কাঠকুট দেখ।]

কাঠডুমুর (দেশজ) উদ্ভূতবিশেষ। (Ficus oppositifolia.)

কাঠন্যকার (দেশজ) শুষ্ক বমন; বারবার বমনের উদ্বেষ্ট
হইলেও যাহাতে উদরস্থ কোন দ্রব্য উঠিয়া যায় না। অধি-
কাশস্থলেই বায়ুর অধিক্য জন্ম এই রোগের উৎপত্তি
হয়, সেই সকল স্থলে বায়ুর উপশম করাই ইহার চিকিৎসা।

কাঠপিপীড়া (দেশজ) পিপীলিকাবিশেষ, ইহার শুষ্ক কাঠ
ও বৃক্ষাদিতে উৎপন্ন হইয়া তথায় বাস করে। সাধারণ
পিপীলিকা অপেক্ষা ইহাদের দংশনে যন্ত্রণা অধিক হয়।
[পিপীলিকা দেখ।]

কাঠফড়িঙ্গ (দেশজ) পতঙ্গবিশেষ।

কাঠফড়ুরা (দেশজ) কাঠঠোঁকরা। (Picus Benghalensis.)

কাঠমাণ্ডু, (খাটমাণ্ডু) আধীন নেপালরাজ্যের রাজধানী।
বায়মতী ও বিষ্ণুমতীনদীর সম্মিলস্থলে নাগার্জুন-গিরি অব-
স্থিত, এই গিরির পাদদেশ হইতে অর্ধকোশদূরে উপত্য-
কার পশ্চিমাংশে কাঠমাণ্ডুনগর। ইহার প্রাচীন নাম 'মঞ্জু-
পত্তন'। দেশীয় লোকের বিশ্বাস যে পুরাকালে মঞ্জুশ্রী নামক
এক ব্যক্তি এই নগর স্থাপন করেন। রাজধানীর ভূমি চতুরস্র
বা ত্রিকোণ অথবা বৃত্ত অর্ধবৃত্ত একরূপ কোন নিয়মিত
আকারবিশিষ্ট নহে; হিন্দুরা বলে—ইহার আকার দেবীর
খজোর ছায়; আর বৌদ্ধ নেবারীরা বলে—ইহার আকার
মঞ্জুশ্রী নামক নগরস্থাপিতার তলবারীর ছায়, এই কল্পিত
তলবারীর মুঠি নগরের দক্ষিণদিকে বাঘমতী ও বিষ্ণুমতীর
সঙ্গমস্থল এবং নগরের উত্তরদিকে "তিম্মালে" নামক উপকণ্ঠ
স্থান তাহার হৃদয় অগ্রভাগ। মঞ্জুশ্রীর তলবারীর মুঠিতে যেরূপ
একখণ্ড বস্ত্র ছত্রাকারে বেষ্টিত থাকিত, এই তিম্মালে জনপদও
সেইরূপভাবে অবস্থিত।

প্রকৃতপক্ষে কাঠমাণ্ডুনগর প্রায় ৭২০ খৃষ্টাব্দে জগদান-
দেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরটি উত্তর দক্ষিণেই বেশী
দীর্ঘ, প্রায় অর্ধকোশ হইবে। ইহার বর্তমান নাম কাঠ-
মাণ্ডু, এই নাম বড় বেশীদিনের নহে। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা
লচমিনা সিং মাল্ (লক্ষণসিংহ মল্ল ?) নগরমধ্যে সন্ন্যাসী ও
দিগের জন্য একটি কাঠময় বৃহৎ বাটী (মন্দির বা
সামুখগুপ) নির্মাণ করান। এই বাটী এখন বর্তমান আছে
ও ঐ কার্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কাঠমগুপ
হইতেই "কাঠমাণ্ডু" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বে এই
নগর প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল এবং প্রাচীর-গাত্রে মধ্যে মধ্যে
সুন্দর তোরণ ছিল। এখন স্থানে স্থানে প্রাচীরের ভগ্না-
বশেষ মাত্র আছে; কিন্তু অধিকাংশস্থলেই উহার চিহ্নমাত্র
নাই। তোরণগুলির মধ্যে এখনও প্রায় ৩২টি বর্তমান
আছে; কিন্তু কোনটারই কবাট নাই।

কাঠমাণ্ডু সহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩২টি পল্লী বা টোলায় বিভক্ত।
তন্মধ্যে আসমান টোলা, ইজ্জ-চক, কাটমাণ্ডুটোলা,
লখনটোলা ও রাজবাড়ীর নিকটবর্তী স্থান প্রভৃতি পল্লীই
অধিক প্রসিদ্ধ।

নগরের মধ্যভাগে দরবার বা রাজবাটী অবস্থিত। ইহা
দেখিতে তত সূক্ষ্ম নহে—তবে অতি বৃহৎ। ইহার অংশ-
বিশেষ বড় প্রাচীন, ব্রহ্মদেশীয় মন্দিরাদির আকারে নির্মিত,
এই প্রাসাদে যে সকল মোটা মোটা উৎকীর্ণ শিল্প আছে,
তাঁহা দেখিতে বেশ সুন্দর। প্রাসাদের মধ্যে যেটি খাস
দরবার গৃহ, সেটি ২০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছে। এই
দরবার-গৃহ ও সহরের আধুনিক ধনীদিগের গৃহে সাদির
জানালা দরজা আছে। রাজবাটীর আকার কতকটা
চতুরস্র, উত্তরদিকে নগরমুখে উন্মুক্ত। এই দিকে অত্যাচ্চ
'তলিজু' নামক মন্দির অবস্থিত। দক্ষিণদিকে শেবভাগে
মন্ত্রাগৃহ, 'বসন্তপুর' নামক অট্টালিকা ও নূতন দীর্ঘ দরবার
বা সভাগৃহ। পূর্বে উদ্যান ও অশ্বশালা। পশ্চিমে প্রধান
তোরণদ্বার। ইহার সম্মুখে নগরের প্রধান পথ, পথপার্শ্বে
নেবারিদিগের নির্মিত অনেকগুলি হিন্দুমন্দিরাদি আছে।
সভাগৃহের উত্তর-পশ্চিমে "কোট" বা যুদ্ধ বিগ্রহাদির মন্ত্রাগার।
এই গৃহ হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ভীষণ নরহত্যার আদেশ
প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে কোট-লিং, ধুন-
সার প্রভৃতি আইন-আদালত সকল অবস্থিত। রাজবাটীর
সম্মুখভাগে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির আছে।
এই মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অতি উচ্চ ও বহুতল-
বিশিষ্ট। এই সকল মন্দিরের উৎকীর্ণ কারু, চিত্র ও স্বর্ণাদি

বর্ণের গিল্টির কার্য অতি সুন্দর। অনেকগুলির সমস্ত ছাই পিস্তলের বা ভাস্কর গিল্টি করা। মন্দিরগুলির কার্ণিসে অনেকগুলি করিয়া পাঁতলা ঘটা ঝুলিতে থাকে, একটু জোর বাতাসে এই সকল ঘটা ইন্ টুন্ করিয়া বাজিয়া বড় মধুর শব্দ উৎপন্ন করে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে কতকগুলির দ্বারে প্রস্তরের সিংহাদি মূর্তি উভয়দিকে স্থাপিত আছে।

অনেক সর্দার আজ কাল সহরের মধ্যে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া নগর শোভা বাড়াইয়াছেন।

এই নগরে আর একপ্রকার মন্দির দেখা যায়, তাহা শুস্তের উপর গুহ্বল করিয়া নির্মিত। এই শ্রেণীর মন্দিরে বিশেষ কারুকার্য না থাকিলেও দেখিতে বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। পুরোক্ত তলেজু মন্দির দেখিতে ব্রহ্মদেশীয় মন্দিরাদির স্থায়, মন্দির মধ্যে এইটি সর্বাপেক্ষা উচ্চ। কথিত আছে যে, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজা মহেন্দ্র মাল (মহেন্দ্র মল্ল) এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরে কেবল রাজবংশীরেবাই পূজাদি করিয়া থাকেন। অনেকগুলি মন্দিরের সম্মুখে সেই সেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা প্রাচীন রাজগণের প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত আছে। এই সকল মূর্তি প্রায়ই মন্দিরের দিকে হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে উপবিষ্ট এবং ইহাদের মস্তকে রাজসম্মান-সূচক ধাতুনির্মিত সর্পকণা পরিশোভিত; ঐ ফণার উপরে একটি কুন্ড পক্ষী আছে। রাজবাড়ী হইতে একটু দূরে এক মন্দিরে একটি বৃহৎ ঘণ্টা ও অপর দুই মন্দিরে দুইটি বৃহৎ দামালা আছে। এই সমস্ত মন্দিরে নানাবিধ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি আছে।

রাজবাড়ী হইতে ২০০ গজ দূরে অর্ধ-ইুরোপীয় প্রণালীতে নির্মিত “কেটি” নামক অট্টালিকা আছে। যেখানে এই বাটী নির্মিত, সেই স্থানে সারজন্য বাহাদুরের অভ্যাসমূলক ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ নরহত্যা ঘটিয়াছিল। রাজ্যের সমস্ত সম্রাট ও ক্ষমতাশালী লোক ঐ সময়ে বিনষ্ট হয়।

এখানে কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহা একখানি মাত্র প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত। এই সকল ক্ষুদ্র মন্দিরের দেবমূর্তি কয়েক ইঞ্চি মাত্র দীর্ঘ। অনেকগুলি মন্দিরে যোরক, হংস, হাগ ও মহিষাদি বলি হয়।

নগরের পথাদি অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কার। প্রত্যেক পথের ধারে সর্দিয়া আছে, তাহা কখন পরিষ্কার হয় না। নগরের ময়লা জমিতে সার দিবার জন্য কতকটা মঠ হয়। বাড়ী-গুলি প্রায়ই চতুরঙ্গ ও অত্যন্তর চকমিলান; পথের ধার অপ্রশস্ত, মধ্যে বিস্তৃত উঠান।

উত্তর পূর্বের সিংহদ্বার দিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলে দক্ষিণদিকে “রাণীপুথরি” নামে বৃহৎ দীর্ঘিকা। ইহার চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। দাবীর মধ্যস্থলে একটি মন্দির, ইহার পশ্চিম পাড় দিয়া ইষ্টকনির্মিত সেতুদ্বারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের দক্ষিণে একটি বৃহৎ প্রস্তরের হস্তীগুঠে রাজা প্রতাপমাল ও তাঁহার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। এই রাজাই এই মন্দির ও দীর্ঘিকার নির্মাতা। আরও একটু দক্ষিণ হইতে ব্কাফ্লুয়ন (Cape lilac) গাছের সারিস মধ্য দিয়া একটা রাস্তা নগর মধ্যে ‘ঠাণ্ডিখেল’ নামক বৃহৎ কাওয়াজের মাঠে গিয়া মিশিয়াছে। ঐ মাঠে পূর্বের জঙ্গবাহাদুরের তল-বারধারী মূর্তি ৩০ ফিট উচ্চ শুস্তের উপর বসান ছিল, পরে বাঘমতী নদীতীরে একটি প্রাসাদে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই নাঠের পশ্চিমে প্রাচীন সেনাপতি ভীমসেন ঠাপার ‘দারেরা’ নামক ২৫০ ফুট উচ্চ প্রস্তরশস্ত। এই শুস্তের গঠন-প্রণালী অতি সুন্দর। ঐ সেনাপতির আরও একটি বৃহদাকার শস্ত ছিল, তাহা ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এই শস্তটিও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বজ্রাঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুন্দর করিয়া মেরামত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে একটি গোলাকার সিঁড়ি আছে। এই শুস্তে উঠিয়া নগরের শোভা দেখিতে বেশ।

ইহার একটু দক্ষিণে পুরাতন শেলেখানা। মাঠের পূর্বে পুরাতন কামানখানা, এখানে বাকুদ, কামান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আজকাল সহরের দক্ষিণে ৪ মাইল দূরে মুকু নামক নদীতীরে চৌঠবহালের নিকট একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, এখানে কামানাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই গথে পূর্বমুখে ফিরিয়া এক মাইল গেলে ঠাটগটলী নামক স্থান। ঐ স্থানে বাঘমতীতীরে অবস্থিত জঙ্গবাহাদুরের বাটী। এই প্রাসাদের সম্মুখ হইতে বাঘমতীর উপর এক মনোরম সেতু পার হইয়া পত্তন নামক স্থান।

কাঠমাণ্ডুর রেসিডেন্টের বাটী নগরের উত্তরদিকে এক মাইল দূরে। স্থান বেশ। প্রবাদ আছে, এইখানে ভূতাদির উপদ্রব ছিল বলিয়া রেসিডেন্টের বাসের জন্য মনোনীত হয়।

বর্তমান প্রধান মন্ত্রী রণদীপ সিংহ নগরের উত্তরপূর্ব পার্শ্বে, নৈঈন-হিট্টি নামক স্থানে বৃহৎ প্রাসাদে বাস করেন। কাঠমাণ্ডুতে ১২০০০ পদাতিসৈন্য থাকে, ইহাদের প্রাচীন ধরনের ২৫০টি বন্দুক আছে।

কাঠমাণ্ডু কোন বিশেষ ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ নয়।

কাঠবিড়ি (দেশজ) কাঠজকার।

কাঠবিড়াল—ভীষণশ্রেণীর অন্তর্গত ইন্দ্রজাতীর চতুশদ

জন্তু বিশেষ। ক্ষুদ্রজাতীয় পশুদিগের মধ্যে কাঠবিড়ালের শরীর অতি ক্ষুদ্র। ইহাদের সমস্ত দেহ কোমল চিকন লোমে আচ্ছাদিত; চকুর তারা উজ্জ্বল; শরীর অতিশয় পরিচ্ছন্ন; প্রত্যেক পায়ে চারিটি বা পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি আছে। কাঠবিড়াল পশুচাতুর্যের দুই পা পাতিয়া উবু হইয়া বসে এবং লম্বুখের দুই পা দিয়া মুখে আহার তুলিয়া খায়।

কাঠবিড়ালের দন্ত অতিশয় ধারাল ও শক্ত। ইহার দন্ত দ্বারা নারিকেল, গুপারি, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি ফলের শক্ত খোলা কাটিয়া তাহার শাঁস খায়; আত্র, পেয়ারা, গোলাপজাম, খেজুর প্রভৃতি ফল পাকিলে তাহাও খায়। ইহার শীতের প্রভাব বাড়িলে বাসা হইতে বহির্গত হয় না ও তজ্জন্তু গ্রীষ্মকালেই প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। শীত বাড়িলে বাসায় থাকিয়া ইহার সঞ্চিত খাদ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। কাঠবিড়ালী পাট, শণ, নেকড়া, নারিকেল ছোপড়া প্রভৃতি আহরণ করিয়া, বৃক্ষ বা প্রাচীরের গর্ভে বাসা করে। ইহার দেড়মাস গর্ভধারণ করিয়া একবারে ৪৫টি সন্তান প্রসব করে।

এই জন্তুর শরীর অতি লঘু, এজন্তু এক নিমেষে বড় বড় বৃক্ষের শিখরদেশে উঠিতে পারে। ইহার বানরের মত শাখায় শাখায় লাফাইয়া বেড়ায় ও পাখীর মত ডালে বসিয়া বিশ্রাম করে। গাছের উপর বা দেওয়ালের উপর বেড়াইবার সময়, ইহার আপনাদের লোমশ পুচ্ছটিকে মধ্যে মধ্যে খাড়া করিয়া, পাখীর মত চলিবার সুরিধা করিয়া লয়। ইহার বিলক্ষণ চকুর, এক মুহূর্তও অসাবধান থাকে না। পক্ষী দ্বারা উপদ্রুত হইলে, কাঠবিড়াল কখন কখন তাহা-দিগকে তাড়া করে; কিন্তু হিংস্রস্বভাব নহে বলিয়া তাহাদের ধরিতে পারিলেও প্রাণনাশের চেষ্টা পায় না বা পাখীর বাসায় গিয়া ডিম্ব বা শাবকের অনিষ্ট করে না। কাঠখণ্ড অথবা অন্য কোন লঘুজন্তু অবলম্বন করিয়া ইহার নদী, খাল, হ্রদ প্রভৃতি পার হইবার চেষ্টা পায় এবং লাঙ্গুল দিয়া হাল ও পালের কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। যদি অক্ষুণ্ণ বায়ু থাকে, তবেই নির্ঝিল্লি পর পায়ে উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু শ্রোত বা বায়ু প্রবল থাকিলে কাঠবিড়াল আধার সমেত জলে ডুবিয়া মরে। ইহাদের লাঙ্গুলে অধিক লোম হয়। এই লোম সর্বদা ক্ষীত হইয়া থাকে। ইহাদের গাছের লোম শালা, মধ্যে মধ্যে কাল বা পাটলবর্ণের লোমও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঠবিড়াল নানাজাতীয় আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গালায় যে প্রেী অধিক পরিমাণে সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মন্তক হইতে লাঙ্গুলের মূল পর্যন্ত চারিটি কালো সরল ডোরা

টানা থাকে। এই দাগের সন্ধানে বাঙ্গালাদেশে একটি প্রবাদ আছে যে, যখন রাম বানর-সাহায্যে সাগরে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন, তখন কাঠবিড়াল ভগবানের কার্যে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে একবার করিয়া জলে ডুব দিয়া, ভিজাগায়ে সমুদ্রের বালি মাখাইয়া সেতুর উপরে গিয়া, প্রস্তারাদির জোড়ের মুখে মুখে গায়ে বালি ঝাড়িয়া ঝাঁকগুলি ব্লাইতে লাগিল। এই কার্যে অসংখ্য কাঠবিড়াল নিযুক্ত হইল; কাজেই বানরগণের কার্যের বিষম বাধা উপস্থিত হইল। তাহার শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারে না দেখিয়া, হনুমান জুড় হইয়া সমস্ত কাঠবিড়ালগুলিকে তাড়াইয়া রামের নিকট লইয়া গিয়া অভিযোগ করিল। রাম শুনিয়া মেহপরবশ হইয়া ইহাদের গায়ে হাত ব্লাইয়া দেন। তাহাতেই ইহাদের গায়ে ভগবানের কৃপাচিহ্নরূপ তাঁহার অঙ্গুলির দাগ জুটয়া উঠে।

এই প্রবাদ হইতে বাঙ্গালায় একটি জুল্লার উপমাও সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে কাহারও কোন উপকার করিয়া স্বীয় দীনতা প্রকাশ করিয়া বলে—“আমার আর কি সাধ্য যে উপকার করি, তবে কাঠবিড়ালের সাগর-বাঁধা মাত্র।” কেহ কোন বৃহৎ ব্যাপারে দীর্ঘযত্নী হইলে, তাহার কার্য-প্রণালীর নিন্দা করিবার জন্তও বলে—“কি করছ, যেন কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা হচ্ছে, অমন করলে সাতবছরেও শেষ হবে না।”

পৃথিবীর সর্বত্রই কাঠবিড়াল আছে, কেবল অষ্ট্রেলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার স্তম্ভগামী। দেশভেদে কাঠবিড়ালের নাম—

ফরাসী	Ecureuil.
ইতালীয়	Scorjattolo, Schiarro, Schiaratto.
স্পেনীয়	Arda, Ardilla, Esquilo.
পর্্তুগীজ	Ciuro.
জার্মান	Eichhörn, Eichhörnchen.
ওলন্দাজ	Inkhoorn.
সুইস্	Ikron, Graskin.
দেনেমার	Ekorn.
ওয়েল্‌স্	Gwiwair.
বাঙ্গালা	কাঠবিড়াল।
সংস্কৃত	কাঠমার্কার।
হিন্দী	চিখুর বা চিখুরী, গিলহরী।

য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদগণের মতে কাঠবিড়াল “রোডেন-

শিয়া” (Rodentia) বিভাগের অন্তর্গত “সিউরিডি” (Sciuridae) শ্রেণীভুক্ত। যুরোপীয় প্রাণীতত্ত্বশাস্ত্রে সিউরিডি বা কাঠবিড়াল প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা;—সিউরাস (Sciurus), টেরোমিস্ (Pteromys) ও সিউরোপ্টেরাস্ (Sciuropterus), এতদ্ভিন্ন আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে তাহা “আর্কটোমিডি” (Arctomydinae) নামে উল্লিখিত হয়।

১। সিউরাস (Sciurus) শ্রেণীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাঠবিড়াল—

(ক) মালাবারীয় কাঠবিড়াল—(The Malabar Squirrel, Sciurus Malabaricus) ইহাদের কাণ, বাড়, মুখবিবর, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠের উর্দ্ধভাগ পিঙ্গলাভ বাদামীবর্ণের; পৃষ্ঠের নিম্নভাগ, পদচতুষ্টয়ের উপরিভাগ ও পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণের; কপাল ও চক্ষুপার্শ্বস্থ স্থান পিঙ্গল; গলা, বক্ষ ও অন্ত্রাচ্ছন্ন নিম্নাঙ্গ মলিন পীতবর্ণের হইয়া থাকে। কর্ণ ক্ষুদ্র ও গোলাকার ও গাত্রে অধিক লোম হয়। ইহাদের দেহ ১৬।১৮ ইঞ্চি ও পুচ্ছ ২০।২১ ইঞ্চি হইয়া থাকে। নীলগিরির নিম্নদেশ, ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার উপকূলের দক্ষিণাংশে ইহাদের বাস। হিন্দীতে ইহাদিগকে “জঙ্গলী গিলহরী” বলে।

(খ) মধ্যভারতীয় রক্তবর্ণ কাঠবিড়াল—(The Central Indian Red Squirrel, Sciurus maximus) এই জাতীয় কাঠবিড়াল পূর্কোক্ত জাতির ত্রায় আকারবর্ণাদিবিশিষ্ট, কেবল ইহাদের সমুখের পদদ্বয় ও উরুদেশ কৃষ্ণবর্ণ নহে, লাজুল, বক্ষ ও উদরাদিও তত কৃষ্ণবর্ণ নহে। এই জাতি মধ্যভারতে প্রচুর পরিমাণে বাস করে এবং সেখান হইতে কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। পাঁচমুড়ি পাহাড়ে, বস্তারের জঙ্গলে ও গুম্বস্তর জেলাতেও ইহাদিগকে যথেষ্ট দেখা যায়। ইহাদিগকে বাদালায় “কাঠবিড়াল,” হিন্দীতে “কবী,” কোলজাতি—“কোনডেং,” মুন্সেরজেলায় “রাহু” বা “রটুফর,” তৈলকোরা “বেট উদ্ধাতা” ও গোড়াজাতি “পান্-বরুতি” বলে।

(গ) বোম্বাই প্রদেশীয় রক্তবর্ণ কাঠবিড়াল—(The Bombay Red Squirrel, Sciurus Bombayances or Elphinstonei) ইহাদের দেহের উপরিভাগ, পুচ্ছের গোড়ারদিকে অর্দ্ধাংশ, পশ্চাতের পায়ের বহির্ভাগ, সমুখের পায়ের অর্দ্ধাংশ ও কর্ণদ্বয়ের সর্বত্রই এক সমান রক্তাধিক্য-মিশ্রিত পীতভা ও অন্ত্রাচ্ছন্ন অবয়বের বর্ণ গোলাপী। এই দুই বর্ণের সম্মিলনস্থল অতি স্পষ্ট রেখাধারা বিভক্ত; এই স্থলে একবর্ণের লোম অপরবর্ণের সহিত মিশিয়া যায় না। এই

জাতীয় কাঠবিড়ালের কর্ণ কোণাকার ও দেহ লম্বে ২০ ইঞ্চি হয়। মহাবলেশ্বর পর্বতে, মহাজির উত্তরাংশে এবং মালাবার উপকূলের উত্তরাংশে এই জাতীয় কাঠবিড়াল যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

এই তিন শ্রেণীর (ক, খ, গ,) কাঠবিড়ালের স্বভাবাদি একই প্রকার। ইহারা ক্ষুদ্র বৃক্ষের অগ্রভাগে বড় বড় বাসা বাধিয়া থাকে। ইহারা “চুক্-চুক্-চুক্” এইরূপ কতকটা কর্কশশব্দ করে এবং ভূমিতে নামিলে বড় ভীক-স্বভাব প্রকাশ করে, কিন্তু বৃক্ষের উপরে সহস্র উপক্রম হইলেও নিভীকমনে আনন্দে এ ডাল হইতে ও ডালে লাফাইয়া বেড়ায়। ইহারা গোষনানে।

(ঘ) পার্শ্বাত্য কৃষ্ণবর্ণ কাঠবিড়াল—(The black Hill-Squirrel, Sciurus Racruroides) ইহাদের দেহের উপরিভাগ কৃষ্ণাভ, নিম্নভাগ স্নানশ্বেতবর্ণ; জলবা দেশের বহির্ভাগ কৃষ্ণবর্ণ, গালের উপর ত্রিকোণাকার একটি স্নান-ধূসরবর্ণের দাগ এবং কর্ণে স্নান রক্তবর্ণের দাগ আছে। ইহাদের দেহ লম্বে ১৫ ইঞ্চি ও পুচ্ছ ১৬ ইঞ্চি। ইহাদের লোম চিকণ, কিন্তু তেমন চেউখেলানো নহে। হিমালয়ের দক্ষিণ পূর্বে, সিকিম ও নেপালপ্রদেশে এবং আনাম ও ব্রহ্মের পার্শ্বাত্যপ্রদেশে ইহারা যথেষ্ট বাস করে। দাক্ষিণাত্যে এই জাতীয় কাঠবিড়াল অত্যন্ত সংখ্যায় আছে; কিন্তু ইহার সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই বলিয়া ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে তাহাদিগকে “সিউরাস টেনাণ্ডিয়াই” বলে ও মল্লর উপ-দ্বীপের এই শ্রেণীর তুল্য যে শ্রেণী আছে, তাহাকেও “সিউরাস বাইকলার,” অর্থাৎ দ্বিবর্ণ কাঠবিড়াল কহে।

(ঙ) পার্শ্বাত্য ধূসর কাঠবিড়াল—(The grizzled Hill-Squirrel, Sciurus mocrourus) মস্তক, গলদেশ, পুচ্ছের অর্দ্ধাংশ, পদচতুষ্টয়ের বহির্ভাগ স্নান পিঙ্গলাভ কৃষ্ণবর্ণ; উদর পার্শ্বদ্বয়, কক্ষদ্বয় ও লাজুল ধূসরাভ চিকণতাবিশিষ্ট পিঙ্গলবর্ণ; অধরোষ্ঠ, গাল, গলা, উদর ও পদচতুষ্টয়ের অভ্যন্তর-ভাগ পীত বা বসন্তীবর্ণ। শরীরের দৈর্ঘ্য ১২।১৩ ইঞ্চি; লাজুল ১২।১৩ ইঞ্চি। ইহাদের লোম ঈষৎ চেউখেলানো ও কর্কশ, অধিকাংশ লোমই পীতশ্বেতমিশ্রিত চিকণবর্ণ। ত্রিবাঙ্কুর, মহিস্তর ও নীলগিরিতে ইহাদিগকে দেখা যায়। সিংহলে এই জাতীয় একশ্রেণীর কাঠবিড়াল আছে, তাহাদের বর্ণে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে এই জাতীয় একটি শ্রেণী আছে, তাহা ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে “সিউরাস একুপিয়ার্ম্,” “Sciurus Elphippium” নামে খ্যাত।

(চ) লোকরিয়া কাঠবিড়াল (The orange-bellied

Squirrel, *Sciurus lakriah*) ইহাদের গাজের উপরিভাগ হরিভাঙা পিঙ্গল, লোম কমলানুবর্ণ বর্ণ, অধনদেশ পীতাদিক কমলাবর্ণ। লাস্কুল চোপ্টা, প্রশস্ত ও লাস্কুলের লোমের প্রান্তভাগে কৃষ্ণ ও খেতবর্ণের ছুটি ডোরা আছে। দেহের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি, লাস্কুল ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি। ভুটানীরা ইহাকে “কায়ো”, নেপালীরা “কিল্লী” বা “কাল্লি টিঙ্গুঙ্গ” ও নেপালীরা “লোকরিয়া” বলে।

(ছ) খেতাবর্ণ কাঠবিড়াল (*The Hoary-bellied Squirrel, Sciurus lokrioides*) ইহারা পূর্বোক্ত (চ) শ্রেণীর সহিত আকৃতি প্রকৃতিতে একরূপ, কেবল ইহাদের উদরাদির বর্ণ দীর্ঘ রক্তাভবর্ণ। ইহাদের লাস্কুল তত প্রশস্ত নহে বা ইহাদের লাস্কুলে সেরূপ কালা-শাদা ডোরা নাই।

(চ ও ছ) এই দুই শ্রেণীর কাঠবিড়ালে বর্ণগত সামান্য প্রভেদ ভিন্ন আর কোন বিভিন্নতা নাই বলিয়া সিকিমের লোকেরা ইহাদিগকে পৃথক শ্রেণী বলিয়া বিবেচনা করে না। যুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, এই দুইশ্রেণীর মধ্যে প্রথমশ্রেণীই অপেক্ষাকৃত পূর্বের উচ্চতরপ্রদেশে বাস করে। হিমালয়ের পূর্ব দক্ষিণাংশে, নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি স্থলে এই দুইশ্রেণীর গুহই দেখা যায়।

(জ) আসামী কাঠবিড়াল (*The Assam Squirrel, Sciurus Assamensis*) পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর (চ ও ছ) কাঠবিড়ালের অধিকল আকারপ্রকার, কেবল বর্ণগত সামান্য বিভিন্নতা আছে। ইহারা আসাম, আরাকান, ঢাকা, শ্রীহট্ট, তেনাসেরিম প্রভৃতি স্থানে বাস করে। আসাম ও আরাকানের পার্বত্যপ্রদেশে ‘চ’ শ্রেণীর কাঠবিড়ালও আছে, এজন্য অনেকে আসামী কাঠবিড়ালকে ও ‘চ ও ছ’ শ্রেণীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া নির্দেশ করেন। এতদ্ভিন্ন এই তিন শ্রেণী হইতে দীর্ঘ বর্ণগত প্রভেদ ধরিয়া আরও কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। তাহারা খসিয়া পার্বত্য হইতে মলয় উপদ্বীপ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। ইহাদের মধ্যে *Sciurus Tergenens*, *S. chrysonotus*, *S. erythrogaster*, *S. hyperythrus*, *S. erythronus*, *S. phayri*, *S. Blanfordi*, *S. atrodorsalis* প্রধান।

(ঝ) ডোরাদার কাঠবিড়াল (*The common striped Squirrel, Sciurus palmarum*) বাঙ্গালার এই জাতীয় কাঠবিড়ালই যথেষ্ট। দাক্ষিণাত্যেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়, কেবল বাঙ্গালার পূর্বোক্তরাংশে এবং মালাবারের কোন কোন অংশে নাই। এই জাতীয় কাঠবিড়ালকে প্রকৃত

পক্ষে ভারতীয় কাঠবিড়াল বলা যাইতে পারে; কারণ, ভারতের বহির্ভাগে, এমন কি সিংহলে পর্য্যন্ত এই জাতীয় কাঠবিড়াল দেখা যায় না। ইহারা লোকালয়ে, গৃহের আটানে, কড়িবরগার গর্বে, খোলার ঘরের বা কুটারের চালে বাসা করে। শস্তকণা, রুটী ও অন্নাদির কণিকা লইবার জন্য ইহারা নির্ভয়ে ঘরে ঘরে ভ্রমণ করে। ইহারা অতি চতুর ও সতর্ক হইলেও সর্বদা ভূমিতে খাদ্যাঘেষণে ভ্রমণ করে বলিয়া অনেক সময়ে বিপদে পড়ে। মানুষের আমোদ করিবার জন্য ইদৃশকল পাতিয়া ধরে এবং চিলেও ছৌ মারিয়া লইয়া যায়। ইহাদিগকে শৈশব হইতে পুষিলে বেশ পোষ নানে। জিটিনালীতে এই পশু অধিক বিক্রীত হয়। ইহাদের চর্ম্মে যুরোপীয় জীলোকের জুতা ও দস্তানা হয়। ইহারা ৬৭ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ইহাদের লাস্কুলও ৬৭ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। এই শ্রেণীর একবারে ২ হইতে ৪টি পর্য্যন্ত শাবক হয়। ইহাদের স্বর অতি কর্কশ ও কর্ণ-পীড়াকর। ইহারা কখন দলবদ্ধ হইয়া বৃক্ষাদিতে আমোদে ছুটছুটি ও শব্দ করিতে থাকে, তখন দেখিতে বেশ কিছু শব্দের জন্য বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠে। ইহাদের স্বর অনেকটা চড়াইপাখীর ডাকের মত, কিন্তু তদপেক্ষা শব্দগুণ গম্ভীর ও কর্কশ।

ইহাদিগের দেহের উপরিভাগের বর্ণ দীর্ঘ হরিভাঙা ধূসর, মস্তক হইতে পৃচ্ছমূল পর্য্যন্ত পীতভাঙা খেতবর্ণের বা কৃষ্ণবর্ণের ডোরা আছে। দুই পার্শ্বে ঐরূপ আর দুইটি তরলবর্ণের ডোরা আছে। উদরাদি অবয়ব খেতভাঙা, পুচ্ছের প্রত্যেক লোমে প্রথমে একটু লাল তৎপরে একটু কাল, আবার একটু লাল, পরে একটু কাল, এইরূপে চিত্রিত। কর্ণ গোলাকার। ইহারা যখন ভীত বা সতর্ক হইয়া দ্রুত পলায়ন করে, তখন পুচ্ছের লোমাবলী বোতল বা কেরোসীন ল্যাম্পের চিমন-পরিষ্কার করা ত্রণ বা কুঁচির ছায়া ফীত হইয়া উঠে।

ইহাদের পৃষ্ঠের এই ডোরাসম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যে প্রবাদ আছে, তাহা ভিন্নরূপ;—হুম্যানের এক সময় গঙ্গাপার হইবার আবশ্যক হয়, কিন্তু গঙ্গাদেবীকে উল্লঙ্ঘন করিতে হুম্যানের সাহস না হওয়ায়, সকল পশু মিলিয়া নানাবিধ উপায়ে গঙ্গার সেতু বাঁধিয়া দেয়। ঐ সেতুর মধ্যস্থলে একটি ছিট ছিল। কাঠবিড়াল সেই ছিটটি বালুকাধারা বুজাইয়া দেয়। হুম্যান ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহার গাজে হস্তাবমর্ষণ করেন। তদবধি পঞ্চাঙ্গুলির দাগ ইহাদের পৃষ্ঠে চিরকাল রহিয়াছে।

এই শ্রেণীকে হিন্দীতে গিলহরী, বাঙ্গালার কাঠবিড়াল বা লক্ষ্মীবিড়াল, মহারাষ্ট্রেরা খরি, কর্ণাটীরা আলালু, তৈল-কীরা ভোদাতা ও বন্দুরাজি উল্লেখ করে। ইহার আর এক শ্রেণীর ইংরাজী প্রদত্ত নাম *S. pencillatus*.

(এ) জঙ্গলী ডোরাদার কাঠবিড়াল—(*The Jungle-stripped Squirrel, Sciurus tristriatus*) পূর্বোক্ত “ক” শ্রেণীর সহিত ইহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, কেবল তদপেক্ষা অধিক কাল; মুখ, কপাল ও উদরপার্শ্ব রক্তাভ পিঙ্গল; ডোরাগুলি পূর্বোক্তশ্রেণীর ডোরা অপেক্ষা অগ্রশস্ত, পৃষ্ঠের সন্নিবেশ বিস্তৃত নহে। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৭।৮ ইঞ্চি, লাজুল ও ৭।৮ ইঞ্চি হয়। ইহাদের আর পূর্বোক্ত শ্রেণীর তায় কর্ণশ নহে। মেদিনীপুরের জঙ্গল হইতে সিংহল পর্যন্ত এই জাতীয় কাঠবিড়াল দেখা যায়। ইহারা বহুপ্রদেশেই থাকে; কচিং কখন লোকালয়ে আসে বা বাসা করে, আর যদিও আগে, তবে যাহাতে মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্ত সতর্ক হয়।

অনেকে এই দুই শ্রেণীকে পরস্পর সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু স্বরভেদ, শব্দভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলেন, তাহা হইতে পারে না; ইহার দুইটি বিভিন্ন মূলশ্রেণী।

(ট) ত্রিবাঙ্কুরের ডোরাদার কাঠবিড়াল—(*The striped Squirrel, Sciurus Layardi*) “এ” শ্রেণী অপেক্ষাও ইহারা বর্ণগত অধিক কাল, পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে ও উদরপার্শ্বে পীতভাষ কক্ষবর্ণ দাগ থাকে; পুচ্ছের অগ্রভাগ কাল ও মধ্যভাগ পিঙ্গলাভ। এই শ্রেণী ত্রিবাঙ্কুরের পর্বতে ও সিংহলে দেখা যায়।

(ঠ) নীলগিরির ডোরাদার কাঠবিড়াল—(*The Neelghery striped Squirrel, Sciurus sublineatus*) ইহাদের বর্ণ চিকণ বসন্তাভ বর্ণ। ডোরাগুলির মধ্যে ১টি পাতলা ও ১টি গাঢ়বর্ণের ডোরাবিশিষ্ট, ডোরাগুলি অগ্রশস্ত। লোম অতি ঘন ও অতিশয় কোমল। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫।৬ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৬ ইঞ্চি। এই শ্রেণী নীলগিরিপর্বতে, কুর্গপ্রদেশে ও ত্রিবাঙ্কুরে অল্পপরিমাণে দেখা যায়।

এই শ্রেণীর সহিত যবদীপের (*S. insignis* নামক) এক শ্রেণীর অধিকাংশ সাদৃশ্য আছে।

(ড) হিমালয়ের ক্ষুদ্রকায় কাঠবিড়াল। (*The small Himalayan Squirrel, Sciurus Meekellandi*) ইহাদের বর্ণ ম্লান কক্ষাভ চিকণ পিঙ্গল, নিয়ভাগ খেতাভ পিঙ্গল। ইহাদের নাসিকা হইতে গোপের গোড়া পর্যন্ত দুইদিকে

ও ক্ষুদ্র হইতে পাহার উপরাংশ পর্যন্ত দুইদিকে দুটি কাল দাগ আছে ও গলার ঐরূপ দীর্ঘ রক্তাভ একটি দাগ আছে। কাণ ক্ষুদ্র, কাণের অগ্রভাগ কক্ষবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৫ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৪ ইঞ্চি। ক্ষুদ্রকায় কাঠবিড়াল সিকিম, ভুটান ও আসমের পার্বত্যপ্রদেশে এবং খসিয়া পর্বতে দেখা যায়। দার্জিলিঙে ৪।৬ হাজার ফুট উপরেও ইহাদিগকে দেখা যায়, কিন্তু নেপালে বা তাহার পশ্চিমে নাই। জেপচারি ইহাদিগকে—“কল্লিগাঙ্গুদি” বলে।

তেনাসেরিম প্রদেশে এই জাতীয় এক শ্রেণী আছে, তাহাদের বর্ণ ইহাদের অপেক্ষা কিছু গাঢ় (*Sciurus Barbei*)। যবদীপে (*S. plantani*) ও মাণ্ডাই দ্বীপে এই জাতীয় আর একপ্রকার (*S. berdmorei*) দেখা যায়।

(ঢ) দীর্ঘনাস কাঠবিড়াল (*The long-snouted Squirrel, Rhino-sciurus tupooides*) মলয়রাঙ্গো শূকরের তায় দীর্ঘনাসাবিশিষ্ট এক প্রকার কাঠবিড়াল দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন প্রথম অর্থাৎ সিউরাস (*Sciurus*) বিভাগে মধ্য এশিয়ার “ইউরোপীয় কাঠবিড়াল” (*S. Europaeus*) ও আফ্রিকায় (*S. Geosciurus or xerus*) দুই জাতীয় কাঠবিড়াল দেখা যায়।

২। টেরোমিস (*Pteromys*) বিভাগ:—এই বিভাগে যে সকল কাঠবিড়ালকে গণনা করা হয়, তাহার সাধারণতঃ উজ্জয়নশীল “কাঠ-বিড়াল” নামে অভিহিত হয়। ইহাদের পশ্চাতের পায়ে সহিত সম্মুখের পদদ্বয় একত্বও পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া, যখন ইহারা বৃক্ষ হইতে লম্ফ দিয়া বৃক্ষান্তরে পতিত হয়, তখন এই চর্ম্মবয় গোন্ধর গলকষলসদৃশ বিস্তৃত হইয়া অনেকটা বাজুর ডানার কাজ করে। এই জাতীয় কাঠবিড়াল পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় ও মলয় উপদ্বীপে দেখা যায়। ইহাদের পুচ্ছ পোলাকার ও চতুর্দিকে লোমবিশিষ্ট।

২ (ক) পিঙ্গলবর্ণ উজ্জয়নশীল কাঠবিড়াল—(*The brown Flying-squirrel, Pteromys petaurista*) ইহাদের গাত্রবর্ণ মলিন রক্তাভকক্ষবর্ণ এবং খেতাভ চিকণতাবিশিষ্ট। পদদ্বয় ও তৎসংলগ্ন স্থান অপেক্ষাকৃত উজ্জল রক্তবর্ণ; ওষ্ঠাধর, চক্ষুপার্শ্ব, লাজুলের শেষাংশ গাঢ় পিঙ্গল বা কক্ষবর্ণ, কাহারও বা লাজুলের অগ্রভাগ শাদাও হয়। উদরাদি স্থান প্রায় শাদা বা পাতলা ধূসর, ইহাদের পুচ্ছের গলার রক্তবর্ণের অস্বচ্ছ দাগ হয় ও জীবাতির গলার ঐরূপ পীতভ দাগ হয়।

শরীরের দৈর্ঘ্য ২০ ইঞ্চি, পুচ্ছ ২১ ইঞ্চি। বিড়ালীর তায় কাঠবিড়ালীরও ৬টি ডন থাকে, কিন্তু চারিটি

দ্বিতীয় ধর্মধারা নির্গত হয়। দাক্ষিণাত্যের নিবিড় বন জঙ্গলে এই উদ্ভবনশীল কাঠবিড়াল দেখা যায়। ইহার ফল, বৃক্ষের ছাল ও শিকড় প্রভৃতি খায়। ইহাদিগকে শৈশবাবস্থায় ছাগ বা গোছুর দ্বারা প্রতিপালন করিয়া পুষ্টিতে পারা যায়। জন্মের ৩ সপ্তাহ পরে ইহার কোমল ফল খাইতে শিখে। দিনের বেলায় ইহার ঘুমাইতে ভালবাসে; গ্রীষ্মকালে চিত হইয়া চার পা উর্দ্ধে তুলিয়া শুইয়া থাকে, রাত্রিতে আনন্দে চলা-ফেরা করে। ইহার ভূমিতে বা বৃক্ষাদির উপরে চলিতে গেলে লাফাইয়া লাফাইয়া থপ থপ করিয়া চলিতে থাকে। পদদ্বয় চর্মবস্ত্রের সাহায্যে ইহার এক ডাল হইতে অল্প ডালে লাফাইয়া যায়। ছোট বৃক্ষ ১২।১০ ফুট অন্তর হইলেও স্বচ্ছন্দে লাফাইতে পারে। লাফাইবার সময় ইহার একটি বৃক্ষের সর্বাপেক্ষা উচ্চ ডালে উঠিয়া অপর বৃক্ষে নিম্নাভিমুখে কোণাকূর্ণ লাফাইয়া পড়ে, সোজা লাফাইতে পারে না। ইহাদের শব্দ অতি মুছ, প্রায় শুনা যায় না। ইহার রাগিলে কামড়ায় না, আঁচড়াইয়া দেয়। মহারাষ্ট্রের ইহাদিগকে ‘পাক্য’, কোলকাতার ‘ওরাল’ এবং মালাবারীরা ‘প্যারাসাটেন’ বলে।

(খ) স্বেতদার উদ্ভবনশীল কাঠবিড়াল—(The white-bellied flying squirrel, *Pteromys inornatus*) ইহাদিগের দেহের উপরিভাগ চিকণ রক্তাভ পিঙ্গল ও শাদা শাদা বিন্দু বিন্দু দাগবিশিষ্ট, উদ্ভবনচর্ম ও পদবস্ত্রের বহির্ভাগ রক্তবর্ণ ও উদরাদি স্বেতবর্ণ; নাকের চতুর্দিকে একটি ধূসরবর্ণের দাগ আছে; গোঁপ কাল। ইহাদের দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ১৬ ইঞ্চি। এই জাতীয় কাঠবিড়াল উত্তরপশ্চিমে হিমালয় ও কাশ্মীর হইতে কুমাইন পর্যন্ত দেখা যায়। ৬ হাজার ফুটের নিম্ন ভূভাগে ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত ও উর্দ্ধে ১০ হাজার ফুটের উপরে নাই। ইহাকে কাশ্মীরে “কসি-গুগর” (অর্থাৎ উড়ুকইন্দুর) বলে।

(গ) রক্তদার উদ্ভবনশীল কাঠবিড়াল—(The Red-bellied flying squirrel, *Pteromys magnificus*) ইহাদের উপরিভাগ বন্যভাষা পীত, স্বচ্ছ ও অজ্ঞা স্বর্ণ বা রক্তবর্ণ, উদরাদি কমলাবর্ণ বা পীতভাষা চিকণ রক্তবর্ণ; লাজুল খাটো, অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষুর চতুর্দিকে কৃষ্ণবর্ণ রেখা, চিবুকে ত্রিকোণাকার দাগ। কর্ণ রক্তবর্ণ। এই জাতি হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্বভাগে, নেপাল, ভূটান, আসাম ও খমিয়া পর্বতে দৃষ্ট হয়; দাক্ষিণে যথেষ্ট। ইহার দেখিতে অতি সুন্দর, ইহাদিগকে লেপ্চার ‘বিরোম’ বলে।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশের (*P. ciurascens*), মলয়বীপের

(*P. nitidus*), যব্বীপের (*P. elegans*) ও ফিলিপাইন বীপের (*P. Philippensis*) উদ্ভবনশীল কাঠবিড়াল ভারতেও দেখা যায়।

৩। সিউরোপ্টেরাস্ (*Sciuropterus*) বিভাগ—ইহাদের লাজুল দেহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, শরীর কিছু চেপ্টা ও সাধারণতঃ ক্ষুদ্রকার।

(ক) ধূসরমস্তক উদ্ভবনশীল কাঠবিড়াল। (The Grey-headed flying squirrel, *Sciuropterus caniceps*) ইহাদের সমস্ত মস্তক লোহের দ্বারা ধূসরবর্ণ, দেহের উপরিভাগ, উদ্ভবন চর্ম ও লাজুল কৃষ্ণভাষা স্বর্ণবর্ণ। গলা স্বেতভাষা ও উদরাদি অজ্ঞাত অবয়ব কমলাবর্ণের দ্বারা রক্তবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি ও লাজুল ১৬ ইঞ্চি। নেপাল ও সিকিম প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে এই জাতির একপ্রকার শ্রেণী আছে, তাহাকে (*S. Jayardi*) লেপ্চার—“বিরম্ চিহো” বলে।

(খ) ধূসরবর্ণের উদ্ভবনশীল কাঠবিড়াল—(The grey flying squirrel, *Sciuropterus Fimbriatus*) ইহাদের গাত্রবর্ণ মলিন রক্তাভ পিঙ্গল বা বস্ত্র ধরণগোলের মত কৃষ্ণ-মিশ্রিত তরল ধূসরবর্ণ; লোমের মূলভাগ সীসার বর্ণবিশিষ্ট, মধ্যভাগ পিঙ্গল ও অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ; মুখ শাদা, গোঁপ অতি দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ, লাজুল প্রশস্ত, লাজুলের গোড়ার দিকের লোমাবলীর অগ্রভাগ কাল ও লাজুলের অগ্রভাগের লোমাবলী পিঙ্গল বা ধূসর। শরীরের দৈর্ঘ্য ১০।১১ ইঞ্চি, পুচ্ছ ২০ ইঞ্চি।

এই জাতীয় কাঠবিড়াল হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু হইতে কাশ্মীরপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহার আফগানস্থানেও আছে। ইহার আর এক শ্রেণীর নাম *Sc. Baberi*.

(গ) কৃষ্ণ ও স্বেতমিশ্রিত বর্ণের উদ্ভবনশীল কাঠবিড়াল (The Black and white flying squirrel, *Sciuropterus alboniger*) ইহাদের দেহের উপরিভাগের বর্ণ স্বেত রক্তাভ; উদরাদি স্বেত পীতভাষা। অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ পুরোক্ত শ্রেণীর মত। শরীরের দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি, পুচ্ছ ১১।০ ইঞ্চি। ইহার নেপাল ও ভূটানে বাস করে। লেপ্চার ইহাদিগকে “খিম” ও ভোটার “পিয়াম বা পিমু” বলে।

(ঘ) রোমপাদ উদ্ভবনশীল কাঠবিড়াল—(The hairy-footed flying squirrel, *Sciuropterus villosus*) ইহাদের উপরিভাগ উজ্জল লোহ-মরিচার বর্ণবিশিষ্ট ও ঐ রকমের তরল বিন্দু বিন্দু দাগবিশিষ্ট। কর্ণ ক্ষুদ্র, কর্ণের চতুর্দিকে লম্বা লোম আছে; পায়ের অঙ্গুলিতে বড় বড় লোম

হয়। শরীরের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি। সিকিম, ভূটান ও আসামের পার্বত্যপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। দার্জিলিং ইহাদের লোম কিছু বেশী বড় হয়।

(৩) ত্রিবাঙ্কড়ের ক্ষুদ্র উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—
(The small Travancor flying squirrel, Sciuropterus fuscicapillus) ইহাদের বর্ণ গাঢ়-পিঙ্গল, লোমগুলির অগ্রভাগ শীতবর্ণের দাগবিশিষ্ট। উদরাদি রক্তাভ্রমিত, লাসুলের রোমাবলী দেহের বর্ণসদৃশ ও অগ্রভাগ শাদা দাগযুক্ত। গোপ দীর্ঘ ও কাল; লোম দীর্ঘ, চিকণ ও সূক্ষ্ম। শরীরের দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৬ ইঞ্চি। সিংহলে এই জাতীয় কাঠবিড়ালের ইংরাজী নাম Sc. Layardi, পেগু ও তেনাসেরিমের এই জাতীয়ের নাম Sc. Phayrei, আরাকানের এই জাতীয়ের নাম Sc. spadiceus, মালয়ে এই জাতীয় কাঠবিড়ালের তিনটি শ্রেণী আছে, তাহাদের ইংরাজী প্রদত্ত নাম Sc. Sagitta, Sc. Horsefieldii ও Sc. genibarbis.

৪। আর্কটোমিডিনি (Arctomidinae) মরমট (Marmota)। এই জাতীয় পশু আজিও বাঙ্গালার বা হিন্দুস্থানে আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং ইহার বাঙ্গালা বা হিন্দী নাম কি তাহা বলা যায় না। ইহার কাঠবিড়াল জাতীয় কিন্তু স্থলকায় ও ক্ষুদ্র লাসুলবিশিষ্ট। শীতপ্রধান দেশে ইহার থাকে। হিমালয়ের মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। হিমালয়ে ইহাদের দুই শ্রেণী দেখা গিয়াছে। তন্মধ্যে (ক) খেত মরমট (The white Marmot, Arctomys bobac) নামক শ্রেণীকে কাশ্মীরে ‘লুগ’, তিব্বতে ‘কাদিয়া-পিউ’, ভূটানে ‘ভবি’ ও লেপচারা ‘লেহা বা পট-আমিয়াং’ বলে। ইহাদের লাসুল ক্ষুদ্র, চক্ষু ও মস্তক বৃহৎ, জীজাতির ১০। ১২টি শুন ও শরীর দৃঢ়। বর্ণ ধূসর, লোম ঘন। লম্বা ২৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৫৬ ইঞ্চি। ইহার কাশ্মীর হইতে সিকিম পর্যন্ত পার্বত্যপ্রদেশে বাস করে। বৃক্ষাদির শিকড় ও ফলাদি খায় এবং ভূমিতে বাসা করে। ইহার ও প্রকৃত কাঠবিড়ালের মত সম্মুখের দুই পা দিয়া খাদ্য পরিয়া খায়। ইহার একস্থানে কতকগুলি মিলায়া বাস করে এবং গর্তের বাহিরে বসিয়া খেলা করিতে থাকে, কিন্তু সামান্য শব্দেই ভীত হইয়া গর্তের মধ্যে পলাইয়া যায়।

৪ (খ) রক্ত মরমট বা হিমালয়ী মরমট (The Red Marmot, Arctomys Hemachalanus) ইহাদিগকে লেপচারা—‘চিগ’ ও কাশ্মীরে ‘জোণ’ বলে।

কাঠবেণিয়া, বেহারের বগিচক্ষাত্তির এক শ্রেণী। ইহাদের মধ্যে আদিকাগাই বৈষ্ণব। মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দেবদেবী ছাড়া ইহারা

সোখা শঙ্কুনাথ এবং সৎনারায়ণ নামক গ্রাম্যদেবতার পূজা দিয়া থাকে। অপর বণিকের মধ্যে কস্তা ও বর উভয় পক্ষে সপ্তপুরুষের সম্বন্ধ থাকিলেও পিতৃ বর্গেই যেমন বিবাহ হয় না; কাঠবেণিয়ার মধ্যে সেদ্রপ কোন বাধা নাই। ইহার বাস্যকালে কস্তার বিবাহ দেয় এবং এক পত্নী বর্তমানে অপর পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, তবে বিধবা পূর্বপতির কনিষ্ঠ সহোদর অথবা সম্পর্কীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারে না। পত্নীর কোন গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হইলে স্বামী পক্ষায়তের অমুমতি লইয়া পত্নী পরিত্যাগ করিতে পারে। একপ পরিভ্রাতৃ স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হয় না। ইহার শবদাহ করে এবং অশৌচান্তে ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। সামান্য ব্যবসা ও কৃষিকার্য ইহাদের উপজীবিকা।

কাঠবেল (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Jasminum multiflorum.)
কাঠমরঙ্গ (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Tantalus leucocephalus.)
কাঠমল্লিকা (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Jasminum Zambac.)
কাঠমলী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Canthium angustifolium.)
কাঠরা (দেশজ) ১ কাঠির বেড়া দেওয়া স্থান। ২ বারান্দার রেলিং।

কাঠরাঙ্গা (দেশজ) একজাতীয় বড়গাছ (Ehretia levis.) ইহা ভারতবর্ষে ও সিংহলে জন্মে। ইহা হইতে কাঠিন ও বহুদিনস্থায়ী কাঠ পাওয়া যায়।

কাঠশালুক (দেশজ) কন্দবিশেষ।

বঙ্গদেশে স্থান বিশেষে বড় শালুক, হিন্দীতে কমল, পারস্তে নিলোফর, সিন্ধুপ্রদেশে কুনি, তৈলঙ্গে কাকি-কলূবা অল্লিকলং (Nymphaea pubescens)। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও বঙ্গোপে জন্মে। ইহার বড় বড় শাদা ফুল হয়। হিন্দুগণ পবিত্র ভাবিয়া এই ফুলদ্বারা দেবার্চনা করে। প্রাচীন মিসরের অধিবাসীরাও এই ফুল অতি পবিত্র জ্ঞান করিত।

কাঠশিম (দেশজ) শিখীবিশেষ। (Dolichos gladiatus.) [শিম দেখ।]

কাঠশোলা (দেশজ) শোলা। (Aeschynomene paludosa) [শোলা দেখ।]

কাড়ন (দেশজ) অপরের নিকট হইতে বলপূর্বক গ্রহণ। “বেন কেহ কার প্রাণ লয়ে যায় কাড়ি।” রামেশ্বর।

কাড়া (দেশজ) ১ বাদ্যবিশেষ; খুলীর ন্যায় মুক্তিকা-নির্মিত একটি খোলে চর্কের আচ্ছাদন দ্বারা প্রস্তুত। পূর্বকালে রাজাবিগের বহির্দ্বারে এক একটি বৃহৎ কাড়া থাকিত, কোন বিষয় ঘোষণা করিতে হইলে সেই কাড়ায় আঘাত করিয়া

ঘোষণা করা হইত। রাজাদিগের বহির্গমনকালেও সন্ধ্যায়ে এই কাড়ার শব্দ করিতে করিতে যাইত। এখনও অনেক দেবালয়ের চত্বারে কাড়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাহা বাদিত হইয়া থাকে। দেশীয় বাদ্যকরগণ ঐরূপ আকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একরূপ কাড়া গলায় ঝুলাইয়া বাজাইয়া থাকে। ডগর নামক আর একটি বাদ্য ইহার সহিত বাদিত হয়; এজন্য ঐ উভয় বাদ্যের নাম 'ডগর কাড়া।' ২ লুটিত। ৩ শব্দ, ডাক।

"বিজুরি কাড়ার পথ বাসুদেব চলে।" ছঃখ্রীষ্টাম ২৮।

কাড়াকাঠি (দেশজ) তৈলকারদিগের যষ্টিবিশেষ। ঘানী হইতে তৈল প্রস্তুতকালে ইহা দ্বারা বোজগুলি টানিয়া বাহির করা হয়।

কাড়াকাড়ি (দেশজ) পরস্পর বলপূর্বক গ্রহণ।

কাড়াচিয়া (দেশজ) বলপূর্বক গ্রহণ, আক্রমণ।

কাড়ান (দেশজ) ১ অগরের দ্বারা লুণ্ঠন করান। ২ অধিক দিন পর্য্যন্ত নিরন্তর বৃষ্টি হওয়া। ৩ অভীষ্ট দেবতার মন্তকে পুষ্পাদি রাখিয়া, তাহা যতক্ষণ না আগুনাপনি পড়িত হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করা।

কাড়ানকুল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Tantalus Manillensis.)

কাড়াবিকড়ো (দেশজ) বলপূর্বক পরস্পর গ্রহণ।

কাণ (পং) কর্ণতি এক চক্ষুনিম্নলিতি, কর্ণ-ঘণ্ট। ১ কাক। ২ (ত্রি) এক চক্ষুর্নিষ্ট প্রাণী, কাণা। (কাণঃ কাটেক চক্ষুযোঃ। মেদিনী।) ৩ (দেশজ) কর্ণ, শ্রবণ।

কাণকাটা (দেশজ) ১ যে কাণ কাটিয়া দেয়। ২ বাহার কাণ ছিন্ন হইয়াছে।

কাণকুয়া (দেশজ) মৎস্তের কর্ণদেশ।

কাণকোটোরি (দেশজ) কীটবিশেষ, শতপদী, কেধুই। [শতপদী দেখ।]

"কাণকোটোরিতে মোর কাণ হৈল কালা।

কেটোমোর বুড়ি বলে এত বড় আগা।" ভারত—অন্নদামঙ্গল।

কাণখড়কিয়া (দেশজ) ১ কর্ণের মলা। ২ শ্রবণে সতর্ক।

কাণখুঁকি (দেশজ) কাণের মল বাহির করিবার জন্য শলাকাবিশেষ।

কাণচটা (দেশজ) কর্ণশালীর মধ্যদেশে একরূপ বা হয়, তাহাকেই কাণচটা কহে। হৃদয়পোড়া ইহার অত্যাৎকট ঔষধ।

কাণজুলকানি (দেশজ) কর্ণমধ্যে গুন্ন গুন্ন করা।

কাণজুল্পি (দেশজ) চিবুকাদি স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ণমূল হইতে উৎপন্ন লবিত ক্ষুদ্র রাখিয়া দিলে তাহাকেই কাণজুল্পি বা কাণপাটা বহুল।

কাণতড়পা (দেশজ) কর্ণগন্ধারাবিশেষ।

কাণপাকা (দেশজ) কর্ণরোগবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম পুতিকর্ণ। [পুতিকর্ণ দেখ।]

কাণপাটা (দেশজ) ১ কাণজুল্পি। ২ কর্ণের মিল্লহ অংশ।

কাণপাতলা (দেশজ) যে কোন কথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে।

কাণপাল, দেবপাল বংশীয় অল্প বয়স্কর একজন রাজা।

(ভঃ ব্রহ্মবট ২০৪১)

কাণভান্নন (দেশজ) কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া।

কাণভান্নানি (দেশজ) সতর্ক করা, কাণে কাণে বলিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া।

কাণভান্নী (দেশজ) ১ শুণ্ডভাবে কাহারও কাছে কোন কথা প্রকাশ করা। ২ কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া।

কাণভূতি (পং) পিশাচরূপী যক্ষবিশেষ; ইনি মৃতপ্রাণী নামে কুবেরের অঙ্গুর ছিলেন। স্থলশিরা নামক কোন রাজ্যসের সহিত ইহার বন্ধুত্ব থাকার কুবের তাহার সঙ্গ পরিভ্রাণ করিতে বলেন। কিন্তু ইনি বন্ধুত্বের অমুরোধে ঐক্যুর আদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। তাহাতে কুবের অভিশাপ প্রদান করিলে পিশাচ যোনিতে উৎপন্ন হইয়া কাণভূতি নামে কিছুদিন বিক্ষাটবীতে বাস করিয়াছিলেন। পরে দীর্ঘজন্ম নামক ইহার ভ্রাতার চেষ্টায় পুষ্পদন্তের মুখে মহাদেব-কথিত বৃহৎকথা শ্রবণ করিয়া মালাবানের নিকট প্রকাশ করার পিশাচযোনি হইতে মুক্তিলাভ করেন।

(কথাসরিৎসাগর।)

কাণমলা (দেশজ) ১ কর্ণ মর্দন করা। ২ কাণের মলা।

কাণমাগুর (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। [মাগুর দেখ।]

কাণমূতা (দেশজ) কর্ণমূল, কাণের মূলদেশ।

কাণমোচড়া (দেশজ) কাণমোচড়াইয়া দেওয়া, কাণমলা।

কাণলুটি (দেশজ) কাহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে কাণমলা।

কাণা (দেশজ) ১ এক চক্ষুহীন। ২ ফুটা, ছিন্ন। ৩ পাড়া দির কিনরা।

কাণাকানি (দেশজ) ১ গোপনে পরামর্শ করা। ২ নন্দনদীর প্রায় পূর্ণ অবস্থা।

কাণাচি (দেশজ) গৃহের পশ্চাৎভাগ।

কাণাচিয়া (দেশজ) ১ গৃহের পশ্চাৎভাগ।

কাণাড়ি (দেশজ) শুণ্ডভাবে কাণ দেওয়া।

কাণাড়িপাতা (দেশজ) যে অলক্ষ্য থাকিয়া শুণ্ডভাবে কাণ পাতিয়া শ্রবণ করে। ২ কাণ দেওয়া।

কাণাৎ (দেশজ) শিরির বা তাঁবুর পর্দা বা দেওয়ানা।

কাণাদ (ত্রি) কণাদন্ত ইদম্। কণাদ-অণ্। ১ কণাদশ্রীত শাস্ত্র, ইহা বৈশেষিক বা ঔল্‌ক্যদর্শন নামে প্রসিদ্ধ।

[কণাদশব্দ দেখ।]

২ কণাদসম্বন্ধীয়।

কাণা-দামোদর, হুগলীজেলার প্রবাহিত একটি স্রোতস্বতী। পূর্বে ইহাই দামোদর নদীর শাখা ছিল, এখন যেখানে কাণা-নদী দামোদর ছাড়িয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে, এই স্রোতটি তাহারই নিকট হইতে পৃথক হইয়া হুগলী মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্রোতটির নিম্নাংশের নাম কাণসোণা খাল। উহা ঔল্‌ক্যদর্শনের অর্ধকোশ উত্তরে হুগলী নদীতে মিলিত হইয়াছে। কাণানদী, হুগলী জেলার একটি স্রোতস্বতী। পূর্বে ইহাই দামোদরের প্রধান খাল ছিল, এখন কিন্তু একটি ক্ষুদ্র স্রোত মাত্র। বর্ধমানের দক্ষিণে সলিমাবাদের নিকট বর্তমান দামোদর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। পরে দক্ষিণপূর্বাভিমুখে আসিয়া ঘিয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়া কুস্তিনদী নামে নয়াগরহইয়ের নিকট ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। এই স্রোতস্বতীর মধ্যে দামোদরের জল আসিয়া পড়ে।

কাণাশি, মাছ খুগাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত বে দড়ি কাণকুমার মধ্যে দেওয়া হয়।

কাণি (দেশজ) ছিন্নবস্ত্র, নেকড়া।

কাণিপাব্‌দা (দেশজ) একপ্রকার পাব্‌দামাছ। [পাব্‌দা দেখ।]

কাণিমাণ্ডুর (দেশজ) মস্তুরবিশেষ।

কাণুটি (দেশজ) কাণযলা, কাণ মোড়ান।

কাণুক (ত্রি) কণ দীপ্তো, কণ-উক্। ১ কান্ত, কমনীয়। ২ আকৃষ্ট। ৩ পূর্ণ।

কাণুক (পুং) কণতি শব্দায়তে, কণ-উক্। (মুকনিভ্যা-মুকোকণো। উণ্ ৪।৩৯। মৃগধাতু ও কণ্ ধাতুর পরে বধাক্রমে উক ও উক্ প্রত্যয় হয়।) কাক। (কাণুকঃ কাকঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কাণেকাণে (দেশজ) কাণের অতি নিকটে মুখ দিয়া কণোপকথন।

কাণেতালা (দেশজ) উৎকট শব্দ শুনিয়া কাণের যাতনাবিশেষ। ইহাতে শ্রবণশক্তি কিছুকাল রুদ্ধ হয়।

কাণেয় (পুং) কাণায়াঃ অপত্যং পুমান্, কাণা-চক্। ১ এক চক্ষুহীন পুত্র। ২ কাকশাবক।

কাণেয়বিধ (স্ত্রী) কাণেয়ানাং বিষয়ো দেশঃ, কাণেয়-বিধল্ (ভৌরিক্যাদৈত্ব্যু কার্যাদিভ্যো বিধল্ ভক্তলো। পা ৪।২।৫৪) কাণেয়গণের বিষয় বা দেশ।

কাণ্‌গর (পুং) কাণায়াঃ অপত্যং পুমান্, কাণা-চক্ (কুজা-

ভ্যো বা। পা ৪।১।১৩১।) ১ একচক্ষুহীন পুত্র। ২ কাকশাবক।

কাণেলী (স্ত্রী) ১ অবিবাহিতা কস্তা। ২ ব্যভিচারিণী।

কাণেলীমাতঃ [র] (পুং) কাণেলী মাতা যন্ত, বহুব্রী।

১ অবিবাহিতা জীর গর্ভজাত পুত্র। ২ ব্যভিচারিণীর পুত্র।

কাণোড়সাপ (দেশজ) বিষধর সর্পবিশেষ। ইহার গাছের উপর হইতে মরুয়া অথবা পখাদির উপর লাফাইয়া পড়িয়া দংশন করে।

কাণোড়া (দেশজ) বিনয়ী, নম্র, অধীন।

কাণ্টকমর্দনিক (ত্রি) কণ্টকমর্দনেন নিবৃত্তম্, কণ্টক-মর্দন-ঠক্। (নিবৃত্তে হকদুতাদিত্যঃ। পা ৪।৪।১২।) কণ্টকমর্দন দ্বারা সম্পাদিত স্বাস্থ্যাদি।

কাণ্টকার (ত্রি) কণ্টকারন্ত অবয়বো বিকারো বা, কণ্টকার-অণ্ (প্রাণিরজতাদিত্যো হণ্। পা ৪।৩।১৫৪।) ১ কণ্টকারের অবয়ব। ২ কণ্টকারের বিকার।

কাণ্টাল (দেশজ) কাঁটাল।

কাঠা (দেশজ) কলহস্ত্রয়ী স্ত্রীলোক।

কাঠেবিন্ধি (পুং) কঠেবিন্ধন্ত ঋষেঃ অপত্যং পুমান্, কঠে-বিন্ধ-ইঞ্। কঠেবিন্ধ নামক ঋষির পুত্র।

কাণ্ড (পুং, স্ত্রী) কণ্ডি-ড-দীর্ঘচ। ১ দণ্ড। ২ নাল। ৩ বাণ। ৪ শরগাছ। ৫ অশ্ব। ৬ কুংসিত। ৭ কতকগুলি একজাতীয় বস্তুর একত্র সমাবেশ। ৮ পরিচ্ছেদ। ৯ অবসর। ১০ প্রস্তাব। ১১ জল। ১২ স্তম্ভ। ১৩ ভূগাণ্ডির গুচ্ছ। ১৪ গাছের শাঁড়ি। ১৫ গাছের ডাল। ১৬ সমূহ। ১৭ নির্জন স্থান। ১৮ প্লাব। ১৯ গাণ্ডী। ২০ ব্যাপার, ঘটনা। ২১ পক্ষ। ২২ খাণ্ডা-বিশেষ। ২৩ বৃন্ত, বোঁটা। ২৪ (পুং) অকোঠ বৃক্ষ। ২৫ (স্ত্রী) এক সন্ধির নিকট হইতে অস্ত্র সন্ধি পর্য্যন্ত দীর্ঘ এক খণ্ড অস্থি। (‘ভগ্নং সমাসাৎ দ্বিবিধং হতাশ-

কাণ্ডেচ সঙ্কোচ হিতত্র সঙ্কোচ’ মাধব নি’।)

২৬ (ত্রি) কাণ্ডন্ত অবয়বো বিকারো বা, কাণ্ড-অণ্ (বিষাদিভ্যো হণ্। পা ৪।৩।১৩৬।) কাণ্ডের অবয়ব বা বিকার।

কাণ্ডকটুক (পুং) কাণ্ডে স্তম্বে লতায়াঃ ইত্যর্থঃ কটুকঃ, ৭ভৎ। কারবেল, করলা। [কারবেল দেখ।]

কাণ্ডকাণ্ডক (পুং) কাণ্ডন্ত শরবৃক্ষন্ত কাণ্ডনিব কাণ্ডং যন্ত, কাণ্ডকাণ্ড-কপ্। কাশ নামক তৃণবিশেষ।

কাণ্ডকার (স্ত্রী) কাণ্ডং স্বকং ক্রিয়তি, দীর্ঘতয়া উৎক্লিপতি, কাণ্ড-কৃ-অণ্। ১ সুপারি। ২ (পুং) কাণ্ডং বাণং ক্রোতি, কাণ্ড-কৃ-অণ্। বাণনির্মাণকারক।

কাণ্ডকীলক (পুং) কাণ্ডে বন্ধে কীলনিব যন্ত, কাণ্ডকীল-
কপ্। লোধ কাঠ।

কাণ্ডকুকু (পুং) ঋষিবেশব।

কাণ্ডগুণ্ড (পুং) কাণ্ডেন শুভ্রেন গুণ্ডরতি বেষ্টয়তি ভূমিঃ,
কাণ্ড-গুড়ি-অণ্। গুণ্ড নামক তৃণবিশেষ।

কাণ্ডগোচর (পুং) কাণ্ডত বাণত গোচর ইব গোচরো যন্ত,
মধ্যলোপ। নারচ নামক লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

কাণ্ডগ্রহ (পুং) কাণ্ডত বিষয়ত প্রকরণত বা গ্রহঃ
জ্ঞানম্। কাণ্ডজ্ঞান, উপস্থিত প্রকরণের বা বিষয় মাজের
অর্থবোধ।

কাণ্ডগ্রহরহিত (ত্রি) কাণ্ডগ্রহেণ রহিতঃ হীনঃ, ৩তৎ।
কাণ্ডজ্ঞানশূন্য; বাহার কোন বিষয়েই অর্থবোধ হয় না।

কাণ্ডচারী [ন] (পুং) কাণ্ডে তরুশাখায়াং চরতি, কাণ্ড-
চর-ণিনি। বাহার বৃক্ষশাখায় বিচরণ করে। কাকাতৃয়া,
কাঠঠোকা, টিরা প্রভৃতি পক্ষিদিগকে কাণ্ডচারী কহে।

কাণ্ডজ্ঞান (কৌ) কাণ্ডত প্রকরণত বিষয়ত বা জ্ঞানম্, ৩তৎ।
১ বিষয়জ্ঞান। ২ প্রকরণবোধ। ৩ মোটামুটি জ্ঞান।

কাণ্ডগী (কৌ) কাণ্ডেন শুভ্রেন নীরতে হসো, কাণ্ড-নী-কিপ্-
ভীপ্-গত্ব (প্ৰবোধরাদিত্যঃ)। রামদূতী নামক লতাবিশেষ।

কাণ্ডতিল্ক (পুং) কাণ্ডে বন্ধে তিল্কঃ, ৭তৎ। চিরাতা।
[কিরাততিল্ক দেখ।]

কাণ্ডতিল্কক (পুং) কাণ্ডতিল্ক-স্বার্থে কন্। চিরাতা।

কাণ্ডধার (পুং) কাণ্ডঃ ধারয়তি অত্র, কাণ্ড-ধৃ-ণিচ-অচ।
১ দেশবিশেষ। ২ (ত্রি) স অভিজানো হত, কাণ্ডধার-অণ্
(সিদ্ধতক্ষশিলাদিভ্যো হণঞো)। পা ৪।৩।৯৩। তদংশবাসী।

কাণ্ডনীল (পুং) কাণ্ডে বন্ধে নীলঃ, কৌটবস্বাৎ। লোধ।

কাণ্ডপট (পুং) কাণ্ডে কাষ্ঠাদিনির্মিতস্তন্তে স্থিতঃ পটঃ,
মধ্যলোপ। যবানিকা, পদ্ম।

(অপটী কাণ্ডপটঃ ত্র্যং প্রতিনীরা জবজপি। হেম ৩।৩৪৪।)

কাণ্ডপুঞ্জা (কৌ) কাণ্ডত বাণত পুঞ্জ ইব পুঞ্জো যন্তঃ,
মধ্যলোপ। শরপুঞ্জা গাছ।

কাণ্ডপুঞ্জ (কৌ) কাণ্ডাৎ বন্ধঃ ব্যাণ্য পুঞ্জঃ যন্ত, বহুব্রী।
ক্ষুদ্র হৃগন্ধি পুঞ্জবিশেষ, জোণপুঞ্জ।

কাণ্ডপৃষ্ঠ (পুং) কাণ্ডঃ বাণঃ পৃষ্ঠে যন্ত, বহুব্রী। ১ শজ্জাজীব,
ব্যাধ। ২ বৈদ্যাপতি। ৩ (কৌ) কাণ্ডঃ তরুশব্দ ইব বৃক্ষঃ
পৃষ্ঠঃ যন্ত, বহুব্রী। বৃক্ষপৃষ্ঠ বহুঃ, যে বহুর পৃষ্ঠদেশ মোটা।
৪ মহাবীর কর্ণের ধরু।

কাণ্ডবারিণী (কৌ) কাণ্ডান্ সংগ্রামাপত্তিতান্ বাণান্ বারয়তি
অগ্রপাদেব ইতি শেষঃ, কাণ্ড বৃ-গিচ্-ণিনি-ভীপ্। দুর্গা।

(“মহাগজঘটাটোপসংযুগে নরবাজিনাম্।

অগ্রপাদায়তে বাণান্ ভেন সা কাণ্ডবারিণী ॥”

দেবী-পুরাণ ৪৫ অঃ।)

কাণ্ডবীণা (কৌ) কাণ্ড ইব বৃক্ষা বীণা, মধ্যলোপ। ১ কণ্ডোল
নামক বীণাবিশেষ; চণ্ডালবীণা। ২ পরনির্মিত বীণা।

কাণ্ডভগ্ন (কৌ) কাণ্ডে অস্থিধণ্ডে ভগ্নম্, ৭তৎ। হস্তপাদাদি
দীর্ঘ অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়া।

কাণ্ডরুহা (কৌ) কাণ্ডাৎ ছিন্নরুহাৎ রোহতি, কাণ্ড-রুহ-ক
টাপ্। কটুকী। [কটুকা দেখ।]

কাণ্ডর্ষি (পুং) কাণ্ডত বেদবিভাগত ঋষিঃ, যবা কাণ্ডেব
একজাতীয়ক্রিয়াদিসমবায়েষু ঋষি বিচারকঃ। দেবকাণ্ড-
বিশেষের অধ্যাপক মুনিবিশেষ। পূর্বসমীমাংসাসাশ্ত্র প্রণয়ন
দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ডের বিচারক বলিয়া জৈমিনি, উত্তরসমীমাংসারূপ
বেদান্তশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের বিচারক হইয়াছিলেন
বলিয়া বেদব্যাস এবং ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা ভক্তিকাণ্ডের
বিচারক হওয়ায় শাণ্ডিল্য ঋষি ‘কাণ্ডর্ষি’ বলিয়া অভিহিত
হইয়া থাকেন।

কাণ্ডলাব (ত্রি) কাণ্ডঃ লূনাতি, কাণ্ড-লৃ-অণ্ (কর্মণ্যণ্।
পা ৩।২।১।) বৃক্ষবৃক্ষের ছেদনকারক।

কাণ্ডবান্ [ৎ] (পুং) কাণ্ডঃ শুরঃ প্রহরণতয়া অন্ত্যত, কাণ্ড
মতৃপ্-মত্ব বঃ। কাণ্ডীর, তীরন্দাজ; বাহার তীরধরু লইয়া
যুদ্ধাদি করিয়া থাকে।

(ভূগী ধনুর্ভং দাযুকঃ ত্র্যং কাণ্ডীরন্ত কাণ্ডবান্। হেম ৩।৪৩৫)

কাণ্ডসন্ধি (পুং) কাণ্ডস্য বন্ধস্য সন্ধিঃ মেলনস্থানম্, ৩তৎ।
গ্রহি, গাঁট্।

কাণ্ডস্পৃষ্ট (ত্রি) স্পৃষ্টঃ গৃহীতঃ কাণ্ডঃ যেন, নির্ভাস্ত্র্যৎ
পরনিপাতঃ। শজ্জাজীব, শজ্জাব্যবহার দ্বারা বাহার জীবিকা
নির্বাহ করে।

(শজ্জাজীবঃ কাণ্ডস্পৃষ্টো শুরুহা নরকীলকঃ। হেম ৩।৫২২।)

কাণ্ডহীন (কৌ) কাণ্ডেন বন্ধেন হীনম্, ৩তৎ। মুখাবিশেষ;
ভদ্রমুখক।

কাণ্ডানুক্রম (পুং) কাণ্ডস্য অনুক্রমঃ। তৈত্তিরীয়সংহিতার
কাণ্ডসমূহের সূচীপত্র।

কাণ্ডানুক্রমণিকা (কৌ) কাণ্ডস্য অনুক্রমণিকা। তৈত্তি-
রীয়সংহিতার সূচীপত্র।

কাণ্ডানুক্রমণী (কৌ) কাণ্ডস্য অনুক্রমণী অনুক্রমণম্। তৈত্তি-
রীয়সংহিতার সূচীপত্র।

কাণ্ডার (দেশজ) কর্ণধার, মাথি।

“পথে দান সাধো কান নৌকায় কাণ্ডার।” দুঃখীভাষ্য ২৪২।

কাণ্ডারী (দেশজ) কর্ণধার, মাঝি।

“কাণ্ডারী বলেন পানী শুন মোর বাণী।

পার হও একে একে কীণ তরি খানি ॥” গোবিন্দমঙ্গল।

কাণ্ডারোপার্ণ, (স্ত্রী) বাঙ্গাল্যক্রিয়াবিশেষ, দেবমূর্তির চারিদিকে চারিটি তীরকাটি পুতিয়া এই ক্রিয়া করিতে হয়।

কাণ্ডিকা (স্ত্রী) কাণ্ড: শুষ্ক: বাহুল্যে অসামান্য, কাণ্ড-ঠন-টাপ্। ১ লক্ষ্য নামক ধাতুবিশেষ। ২ বালুকা নামক কাঁকড়।

কাণ্ডী [ন] (ত্রি) কাণ্ড: শুষ্ক: প্রাশস্ত্যে অস্ত্যস্ত, কাণ্ড-ইনি। প্রশস্ত শুষ্কযুক্ত।

কাণ্ডী, সিংহলের মধ্যবর্তী কাণ্ডী নামক অধিকার প্রধান নগর। অক্ষা° ৭° ১৭' উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৪৯' পূঃ।

কাণ্ডীর প্রাচীন নাম শ্রীবর্দ্ধনপুর। পূর্বকালে সিংহলী রাজগণ এইখানে রাজত্ব করিতেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ময়দা-মহা-নবেরা নামক স্থানে রাজা বিক্রমরাজ সিংহের সহিত ইংরাজদের এক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে সিংহলের রাজা পরাজিত ও বন্দী হইলে ইংরাজেরা কাণ্ডী অধিকার করেন, সেই অবধি ইংরাজাধিকারে আছে।

এখানে কাণ্ডাজাতির বাস, তাহার পাহাড়ের উপর বাস করে; সকলেই বলবান, স্থলকার ও সাহসী। অধিকাংশ প্রায় বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী, তবে ইংরাজপদার্পণের পর কেহ কেহ খৃষ্টানধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। পূর্বে ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ যণ্ডে প্রচলিত ছিল। ৫৭ ভ্রাতা একজন স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিত, সন্তানেরা উক্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠকেই পিতা সন্মানন করিত। পুত্র অগণ মনোমত বহু স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত, এরূপ প্রায় পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের অনুরাগ হইলেই ঘটিত। স্ত্রী যদি পতি লইয়া আপন পিতৃগৃহে থাকে, তবে অপর ভ্রাতার স্ত্রীর পিতৃসম্পত্তির উপর অধিকার জন্মে, কিন্তু পতিকে তাহার পূর্ব বিষয় আশয় ছাড়িয়া আসিতে হয়। আবার যদি স্ত্রী গিয়া স্বামীর গৃহে বাস করে, তাহা হইলে তাঁহার আর পিতৃসম্পত্তির উপর অধিকার থাকে না, কিন্তু পতির উপর তাহার কর্তৃত্ব চলে। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দ হইতে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কাণ্ডাজাতির কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এখনও স্ত্রী-পুরুষের মত হইলে পরস্পরে বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে পারে। কিন্তু যদি বিবাহভঙ্গের ২ মাস মধ্যে স্ত্রীর পুত্রাদি হয়, তাহা হইলে পূর্বপতি সেই পুত্রকে গ্রহণ ও তাহার তরণপোষণ করিবেন। [সিংহল দেখ।]

কাণ্ডীর (পুং) কাণ্ড: শুষ্ক: অস্ত্যস্ত, কাণ্ড-ঈরন্ (কাণ্ডাণ্ডা-দীরীরটো। পা-৫। ২। ১১১।) ১ অপাঙ্ক গাছ। ২ কাণ্ড-

বেল নামক লতাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাণ্ড-কটুক, নাসাসংবেদন, পটু, অগ্রকাণ্ড, ভোমবল্লী, কারবলী ও মুকাণ্ডিকা। রাজনির্যটকের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, সারক এবং হৃষ্ট ব্রণ, লতাবিক, শুষ্ক, উদর, স্রীহা, শূল ও মন্দায়িনাশক।

কাণ্ডীরা (স্ত্রী) কাণ্ডীর-টাপ্। মঞ্জিষ্ঠা।

কাণ্ডীরী (স্ত্রী) কাণ্ডীর-ভীষ (বিদ্য গৌরাদিত্যচ। পা ৪। ১। ৪১।) মঞ্জিষ্ঠা। [মঞ্জিষ্ঠা দেখ।]

কাণ্ডেস্কু (পুং) কাণ্ডে ইক্ষুরিব। ১ কুলেখাড়া গাছ। [ক্ষুরক দেখ।] ২ কাশতৃণ।

কাণ্ডেরী (স্ত্রী) কাণ্ড: বাণাকারং পুষ্পং জৈর্ভে, প্রায়োতি কাণ্ড-জৈর-অণ-ভীষ্। নাগদন্তী বৃক্ষ। [নাগদন্তী দেখ।]

কাণ্ডেরুহা (স্ত্রী) কাণ্ডে রোহতি, কাণ্ডে-কহ-ক-টাপ্; সপ্তম্যা অলুক্। কটুকী।

কাণ্ডোল (পুং) কণ্ডোল স্বার্থে অণ্। ডোল নামক আধার-বিশেষ, ইহা ধাতু চাউলদি রাখিবার জন্য বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে। [কণ্ডোল দেখ।]

কাণ্ড (পুং) কণ্ড অপর্যায় পুনান্, কণ্ড-অণ্। ১ কণ্ডবিশিষ্ট পুত্র। (ত্রি) কণ্ডসংস্কায়। ৩ কণ্ডবংশীয়দিগের ছাত্র। ৪ বহু-কর্মেদের শাখাবিশেষ। ৫ কণ্ডট সামবিশেষ।

কাণ্ডক (ত্রি) কণ্ডেন দৃষ্টং সাম, কণ্ড-বৃহ্। কণ্ডট সামবিশেষ।

কাণ্ডায়ন (পুং) কণ্ড-অণ্-ফক্। ১ কণ্ডবংশীয় বেদোক্ত প্রাচীন ঋষি। ২ শ্রোত ও গৃহযজ্ঞরচয়িতা ঋষিবিশেষ। ৩ কণ্ডবংশীয় রাজগণ। এক সময়ে এই বংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, মৎস্য ও ভাগবতপুরাণমতে—কণ্ডবংশীয় মহামতি বহুদেব শুকবংশীয় শেষ নৃপতি দেবভূতিকে (দেবভূমিকে) বিনাশ করিয়া রাজ্যপালন করিবেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—

“পাণিবো বহুদেবন্ত বাণাদ্যন্যনিনমঃ নৃপম্।

দেবভূমিং ততো স্তন্ত শুকেশ্ব ভবিতা নৃপঃ ॥

ভবিষ্যতি সমা রাজা নব কাণ্ডায়নস্ত সঃ।

ভূতিমজঃ স্তন্তস্ত চতুর্দশ ভবিষ্যতি ॥

ভবিতা দ্বাদশ সমা তস্যারারায়ণো নৃপঃ।

অশর্দা তৎস্তুতশ্চাপি ভবিষ্যতি সমা দশ ॥

চত্বারঃ শুকভূত্যাতে নৃপাঃ কাণ্ডায়না বিজাঃ।

ভাব্যাঃ প্রণতসানস্তাশ্চত্বারিংশক পঞ্চ চ ॥

তেষাং পর্যায়কালে তু নৃপোহুহুি ভবিষ্যতি।

কাণ্ডায়নমধোক্ত্য অশর্দাণং প্রমজ তম্ ॥”

•

ব্রহ্মাণ্ড, উত্তর ৩৪ অঃ।

মৎস্যপুরাণে ২৭৩ অধ্যায়ে—

“অমাত্যো বহুদেবস্ত প্রসজ্জ্বনীং নৃপঃ ॥ ৩১

দেবভূমি মথোৎসাদ্য শৌলস্ত ভবিতাঃ নৃপঃ ।

ভবিষ্যতি সমা রাজ্যানব কাব্যায়ণো নৃপঃ ॥ ৩২

ভূমিমিত্র সূতন্তস্য চতুর্দশ ভবিষ্যতি ।

নারায়ণঃ সূতন্তস্ত ভবিতাঃ দাদৈশব তু ॥ ৩৩

সুশর্মা তৎসূতস্তাপি ভবিষ্যতি দশৈব তু ।

ইত্যেতে শুভভূতান্ত সূতাঃ কাব্যায়না নৃপাঃ ॥ ৩৪

চত্বারিংশৎ পঞ্চ চৈব ভোক্তব্যস্তীমান বহুধরাম্ ।

এতে প্রণতসামন্তা ভবিষ্যি ধার্মিকাস্চ বে ।

যেষাং পর্যায়কালেভু ভূমিরাক্তান্ গমিষ্যতি ॥” ৩৫

উপরোক্ত ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণের বচনানুসারে জানা বাইতেছে, বহুদেব প্রথমে শুভরাজ দেবভূমির • অমাত্য ছিলেন, পরে আপন প্রভুকে বিনাশ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করায়, তৎপুত্রীয় রাজগণ “শুভভূতা” নামেও প্রসিদ্ধ হন। ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণের মতে কাব্যায়ন রাজগণের সর্বশুদ্ধ রাজত্বকাল ৪৫ বর্ষ; তন্মধ্যে বহুদেব ৯, তৎপুত্র ভূমিমিত্র বা ভূতিমিত্র ১৪, তৎপুত্র নারায়ণ ১২, এবং তৎপুত্র সুশর্মা ১০ বর্ষ মাত্র রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু ত্রীমস্তাগ-বতের মতে, কববংশীয় রাজগণ ৩৪৫ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ছিলেন। যথা,—

“শুভং হৃদ্য দেবভূতিং কবোৎসাত্যস্ত কামিনম্ ।

স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বহুদেবো মহামতিঃ ॥ ১৮

তস্ত পুত্রস্ত ভূমিত্রস্তস্ত নারায়ণঃ সূতঃ ।

কাব্যায়না ইমে ভূমিঃ চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।

শতানি ত্রীনি ভোক্তব্যস্তি বর্ষাণাঞ্চ কলৌ যুগে ॥” ১৯

ভাগবত ১০ স্কঃ ১ অঃ ।

পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ কাব্যায়ন রাজগণের শাসনকাল এইরূপ স্থির করিয়াছেন—

বহুদেব	খৃষ্টপূর্বাব্দ	৭৬	হইতে	৬৭।
ভূমিমিত্র	"	৬৭	"	৫৩।
নারায়ণ	"	৫৩	"	৪১।
সুশর্মা	"	৪১	"	৩১।

(R. Sewall's Dynasties of Southern India, p. 7.)

সুশর্মাকে বিনাশ করিয়া তাহার একজন অঙ্গুল্যাতীয় ভৃত্য রাজ্য অধিকার করেন।†

* ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণমতে ‘দেবভূতি’।

† সেই অঙ্গুল্যাতীয় নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে ‘শিদ্ধক’, মৎস্যপুরাণমতে ‘শিদ্ধক’, বিষ্ণুপুরাণমতে ‘শিদ্ধক’ এবং ভাগবতেরমতে ‘বৃন্দ’।

কাব্যীপুত্র (পুং) কবস্ত অপত্যং পুমান্, কাব্যঃ স্থিরঃ ভীণ্ যলোপঃ কাব্যী; কাব্যঃ পুত্রঃ ৬তৎ। কববংশীয় ঋষিবিশেষ।

কাব্যীয় (ত্রি) কাবস্ত ইদম্, কাব-ই। কববংশীয়গণের সম্বন্ধীয়। কাব্য (পুং) কবস্ত অপত্যং পুমান্, কব-ব-ক্ (গর্গাদিত্যো যত্র। পা ৪। ১। ১০৫।) ১ কবপুত্র। ২ কববংশীয়। ৩ কব-সম্বন্ধীয়।

কাব্যায়ন (পুং) কাব্য-ফক্ (যক্রিক্রোশ্চ। পা ৪। ১। ১০১।) কববংশীয়।

কাব্ (অব্যয়) কু কুৎসিতং অততি অমেন, কু-অভ-কিপ্, কোঃ কাদেশঃ। তিসম্ভার।

(“যম্যৈরর্থ্যামন্তেন শুকঃ সদসি কাংকৃতঃ। ভাগবত ৬। ৭। ১।”)

কাভস্ত্র (স্ত্রী) কু ক্ৰৈবং তদ্রং অস্ত্র, কোঃ কাদেশঃ। কলাপ ব্যাকরণ; শর্ম্মবর্মা ইহার সংকলনকর্তা। বৃহৎকথাসারে এই ব্যাকরণ সংকলনসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—কোন সময়ে কার্ত্তিকের শর্ম্মবর্ম্মার প্রতি অগ্রহ করিয়া দেখা দেন, কুমারের কৃপায় শর্ম্মবর্ম্মার মুখে সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। তখন কার্ত্তিকের ছয় মুখে “সিন্ধো বর্ণসমায়ঃ” এই সূত্র উচ্চারণ করিলেন; শর্ম্মবর্ম্মাও ঐ সূত্র শুনিবামাত্র তাহার পরবর্ত্তী সূত্র উচ্চারণ করিলেন। কার্ত্তিকের তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শর্ম্মবর্ম্মাকে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে আদেশ করেন এবং তাহার ‘কাভস্ত্র’ ও ‘কলাপ’ নাম নির্দেশ করিয়া গিলেন। [কলাপ দেখ।]

কাভস্ত্রপঞ্জিকা (স্ত্রী) ত্রিলোচনদাস কৃত কাভস্ত্রব্যাকরণের টীকা।

কাভস্ত্রপঞ্জী (স্ত্রী) কলাপব্যাকরণের টীকা।

কাভর (পুং) কং জলং আভরতি, ক-আ-ভৃ-অচ্। ১ কাভলা মাছ। ২ (ত্রি) কু কষ্টেন তরতি, কু-তৃ-অচ্-কোঃ কাদেশঃ। ব্যাকুল, অধীর। ৩ ভীত। ৪ বিবশ। ৫ চঞ্চল। ৬ উড়ুপ, ভেলা। ৭ ঋষিবিশেষ।

কাভরতা (স্ত্রী) কাভরস্ত ভাবঃ, কাভর-তন্। ১ ব্যাকুলতা। ২ ভীকতা।

কাভরত্ব (স্ত্রী) কাভরস্ত ভাবঃ, কাভর-ত্ব। ১ ব্যাকুলতা। ২ ভীকতা।

কাভরায়ণ (পুং) কাভরস্ত ঋষেরপত্যং পুমান্, কাভর-ক্ক্। কাভর ঋষির পুত্রাদি।

কাভরোক্তি (স্ত্রী) কাভরস্ত উক্তিঃ ৬তৎ। কাভর ব্যক্তির বাক্য।

কাভর্য্য (স্ত্রী) কাভরস্ত ভাবঃ, কাভর-ব্যাহ্। কাভরতা।

কাত্তল (পুং) কাতর এবং রক্ত লঃ। ১ কাতলা মাছ। ২ ঋষি-বিশেষ।

কাতলায়ন (পুং) কাতলস্ত ঋষে রপত্যং পুমান্। কাতল-কৃৎ। ১ কাতল ঋষির পুত্রাদি। ২ কাতলা মাছের ছান।

কাত্তা (দেশজ) ১ নারিকেলের ছালের দড়ি। ২ কাতারি।

কাতান (দেশজ) ১ দা, কাটারি। ২ কাত করাইয়া দেওয়া।

কাতার (দেশজ) সারি সারি।

কাতারি (দেশজ) ১ ঘট। ২ অস্ত্রবিশেষ, ইহা দ্বারা সোণা রূপা প্রভৃতি ছেদন করা হয়।

কাতারী (দেশজ) অস্ত্রবিশেষ, কাতারি।

কাতি (স্ত্রী) কৈ-কিন্। ১ স্তব। ২ (দেশজ) শাঁক কাটিবার কয়লা।

কাতীয় (ত্রি) কাত্যায়নস্ত ইদম্, কাত্যায়ন-ছ, ফকো বা লুক্। ১ কাত্যায়নসম্বন্ধীয়। ২ (পুং) কাত্যায়নের ছাত্র।

কাতীর (আরব্য) ১ শিক্ষক। ২ লেখক।

কাতু (পুং) কং জলং অতত্তি, সাততোন গচ্ছতি, ক-অত-উন্। কৃপ।

কাতৃণ (স্ত্রী) কু কুংসিতং ক্ষুদ্রং বা তৃণম্, কোঃ কাদেশঃ; কর্মধা। রোহিৎ নামক তৃণবিশেষ।

কাতে (দেশজ) বিপদে, মুকিলে।

কাতেকাতে (দেশজ) পাশে পাশে বক্রভাবে ত্রব্যাদি রাখা।
কাত্রেয় (ত্রি) কত্রেরিদম্, কত্র-ঢকঞ (কত্রাদিত্যো ঢকঞ। পা ৪।২।১৫১) কত্রিসম্বন্ধীয়।

কাথক্য (পুং) কথং খুল্, -কথকঃ-সার্থে-যাঞ। অগ্নিবিশেষ। (নিকট ৮।৫।৬।)

কাত্য (পুং) কতস্ত ঋষে গোত্রাপত্যম্, কত-যঞ (গর্গাদিত্যো যঞ। পা ৪।১।১০৫) কাত্যায়ন ঋষি।

কাত্যায়ন (পুং) কতস্ত গোত্রাপত্যম্, কত-যঞ-ফক্। ১ অতি প্রাচীন ঋষিবিশেষ। যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১৩ ৪২২।), সাম্বায়ন আরণ্যক (৮।১০), আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্র (১২।১০।১৫), রামায়ণ এবং পানিনির অষ্টাধ্যায়ী (৪।১।১৮) মধ্যেও ইহার নাম পাওয়া যায়। ইনি ‘কাত্যায়ন গোত্রপ্রবর্তক’ বলিয়া অহুমিত হয়। [স্বাদে নাগর-খণ্ড ১০৮।১৬ দেখ।]

২ ধর্মশাস্ত্রকারক মুনিবিশেষ। ধর্মগ্রন্থ পাঠে করেকজন কাত্যায়নের পরিচয় পাওয়া যায়;—তন্মধ্যে বিশ্বামিত্রবংশীয়, গোড়িলপুত্র ও সোমদত্তের পুত্র বরহচি-কাত্যায়নই প্রধান। ১ম, বিশ্বামিত্রবংশীয় কাত্যায়ন মুনি “কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র,” “কাত্যায়ন-গৃহসূত্র” ও “প্রতিহারসূত্র” রচনা করেন।

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে কেহ কেহ “কাতীর শ্রৌতসূত্র” বলিয়া নির্দেশ করেন।

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম কণ্ডিকার এই সকল বিষয় লিখিত আছে; যথা—বেদ বেদাঙ্গাধারী সপত্নীক বিজগণের ও রথকারের অগ্নিহোপনাদি কার্যে অধিকার; অঙ্গহীন, স্ত্রীব, পতিত এবং শূদ্রগণের অধিকার; নিবাদ ও সূত্রধরগণের গাবেধুক নামক চক্রতে অধিকার; ব্রতলজ্জন-কারিদিগের গর্দভযজ্ঞ নামক প্রারম্ভিক্তে অধিকার; এই গাবেধুক চক্র ও ব্রতলজ্জনকারিদিগের প্রারম্ভিক্তরূপ গর্দভ-যজ্ঞের লৌকিকায়িতে কর্তব্যতা; গর্দভযজ্ঞে কপালে ঘৃত দান না করিয়া ভূমিতেই ঘৃতদান-বিধি, অগ্নিতে শুদ্ধিকারক হোম না করিয়া জলে করিবার বিধান, কিন্তু অজ্ঞাত আধারাদি অগ্নিতেই কর্তব্য বিধি; গর্দভের শিশুদেহ হইতে গোত্রি প্রদান; যজ্ঞসমূহে, বিহারবিষয়ে, গার্হপত্য, আহবনীয়া ও দক্ষিণায়িতে কর্তব্য বৈদিক কর্ম; আবাস্য অর্থাৎ গৃহসম্বন্ধীয় লৌকিক অগ্নিতে স্মৃতিবিহিত কর্তব্য এবং মাংস-পাক নিষেধ ব্যবস্থা। ২য় কণ্ডিকার—দেবতাগণের উদ্দেশে ত্র্যব্যতাগরূপ যাগ; যাগলক্ষণ; অমাবস্তা ও পৌর্ণমাসাদি শব্দের অর্থবোধক ত্যাগবিশেষ; তাহার প্রাধান্য; ঐ প্রাকরণপঠিত অগ্ন্যধান হইতে ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণা পর্যন্ত কর্মসমূহের অজ্ঞতা; এইরূপ প্রযাজ ও পূর্বাধার প্রভৃতি হোমবিধি; তাহার অঙ্গসমূহ; হোমে দণ্ডায়মান হইয়া বস্টিকার প্রদান; যজ্ঞিত শব্দের অর্থ; উপবিষ্ট হইয়া স্বাহাকার প্রদান; জুহোতি শব্দের অর্থ; সমুদায় কর্মেই ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যবিধি; ক্ষত্রিয়বৈশ্যগণের অবশিষ্ট হবি-ভোজনে নিষেধ অথ পৌরহিত্যে নিষেধ; ফললাভে অভি-লাষী হইলে কাম্যকর্মের অবশ্য কর্তব্যতা; অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের অবশ্য কর্তব্যতা; না করিলে তাহার দোষ-বিধান; দীক্ষিত ব্যক্তির সত্যবাক্য, ভূমিতলে শরন ও ব্রহ্মচর্যাদি নিয়মের অবশ্য কর্তব্যতা; ইচ্ছানুসারে অহুতান না করিয়া, গৃহদাহ ও ধনহানি প্রভৃতি কারণে প্রারম্ভিক্তের অবশ্য কর্তব্যতা; যগাশক্তি নিত্য কর্মসমূহে প্রতিপালন; কাম্যকর্ম সর্বাঙ্গরূপে প্রতিপালন এবং কামনা থাকিলেও যে কোন সময়ে কাম্যকর্মের অহুতান না করিয়া, বধন বৈদিক অঙ্গ সমুদায় সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য হয়, সেই সময়ে করিবার বিধি। ৩য় কণ্ডিকার—ঋক্, যজুঃ, সাম ও গ্রৈষ তেদেচারিপ্রকার মন্ত্র; ঋক্প্রভৃতির লক্ষণ; যজুর যে পরিমিত পদ উচ্চারণ করিলে পদসমূহের আকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়, কর্মকালে সেই পরিমিত বাক্যের প্রয়োগ বিধি; যেখানে পণ্ডিত পদ

সমূহ দ্বারা যজ্ঞ আকাজক্ষাশূন্য হয় না, তথ্যর বখাযোগ্য পদ
অধ্যাহার করিয়া অথবা পূর্ণগঠিত পদ সংযুক্ত করিয়া
আকাজক্ষাশূন্য করিবার বিধান; কথ্যরন্তে মন্ত্রপ্রয়োগ বিধি;
যজ্ঞকেন্দ্রীয় মন্ত্রসমূহ অস্ত্রে শুভিতে না পায় এইরূপ স্বরে এবং
ঋগ্বেদ ও প্রৈষমন্ত্র সকল উচ্চৈঃস্বরে প্রয়োগ করিবার নিয়ম;
বহিঃশব্দের কৃশজাতিমান্ব অর্থ; সাম্বিক ব্রাহ্মণের হোম-
গৃহাদিতে এবং বসুধারা হোম প্রভৃতিতে সংখ্যার কোন বিশেষ
নির্দেশ না থাকায় যে পরিমিতসংখ্যায় কার্য্যাসিদ্ধি হয়, তাহাই
গ্রহণ করিবার বিধি; ইথ্যবদি বন্ধন জন্ত সংনহন ও বিষম
সংখ্যা তৃণমুষ্টির বন্ধনিয়ম; (সংনহনে ভেদ, যথা—১ উত্তরদিকে
বহির্ভাগে অগ্রভাগ স্থাপনপূর্বক বর্ষের ছায় দৃঢ়রূপে বন্ধন
করিয়া, বাহিরে মূলদেশে গ্রহি গোপন করিয়া রাখিবে।
ইত্যাকে প্রাগপ্র-সংনহন কহে।—২ পূর্বদিকে বহির্ভাগে
অগ্রভাগ স্থাপনপূর্বক পূর্বের ছায় বন্ধন করিয়া মূলদেশে
গ্রহি লুক্কায়িত করিলে, তাহাকে উদগগ্র-সংনহন কহে।)
১৮ হাত বা ২১ হাত পলাশকঠধণ্ডের নাম ইথা, কিন্তু
পলাশের অভাবে বইচকঠ, বইচির অভাবে গণিয়ারি,
গণিয়ারি অভাবে বংশ, বংশের অভাবে যজ্ঞভূমুর এবং যজ্ঞ-
ভূমুরের অভাবে পদিককঠ গ্রহণ করিবার বিধি; তিনখানি
ইথ্যকঠ দ্বারা পরিমণিগরিমাণের ব্যবস্থা; অগ্নিসম্বলীপন মন্ত্রের
বৃদ্ধি অনুসারে ইথ্যকঠের বৃদ্ধির নিয়ম থাকিলেও, পিতৃ-
উদ্ভিষ্টকার্য্যে অগ্নিসম্বলীপন-মন্ত্রের হ্রাসসঙ্গে ইথ্যকঠের হ্রাস-
বিধির অভাব; অগ্নিগ্রণয়ন জন্ত পূর্বোক্ত ইথ্যকঠের সংখ্যা
অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ইথ্যের আবশ্যকতা; ইষ্টকপাণ্ড-যজ্ঞে
২৮ হাত পরিমিত পূর্বোক্ত কঠদ্বারা ইথা করিবার বিধি এবং
এই ইথা তিনপ্রকার সংনহন নামক বন্ধনবিশেষ দ্বারা বন্ধন
করিবার প্রণালী; অমাবস্তা ও পৌর্ণমাসীতে বেদকরণ;
সূত্রোক্ত 'অঙ্' শব্দের অভিবিধি ও প্রতিজ্ঞা অর্থ; সর্গবিধ
কন্ডে অমুক্ত থাকিলেও গার্হপত্য অনুসারে আহবনীয় ও
দাক্ষণ্যির উদ্ধারের আবশ্যকতা; কিন্তু জন্ত কার্য্যের জন্ত
তাহাদের উদ্ধার করা হইলে, তাহার পর আর আগন্তুক
জন্ত কার্য্যের জন্ত উদ্ধারের আবশ্যকতা; (যেহেতু সে
কার্য্যের জন্ত তাহাদের উদ্ধার করা হয়, তাহা সমাপ্ত হইলে
ঐ অগ্নি পুনর্বার লৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়, এই জন্তই দর্শ
প্রভৃতি কার্য্যে উক্ত অগ্নিতে অগ্নিহোত্র হোম সম্পাদিত
হয়; কিন্তু ঐ অগ্নি লৌকিক হওয়ায় আর তাহাতে
আহবনাদি কার্য্য হইতে পারে না। যেখানে পৌর্ণমাসাদি
কার্য্যে পৃথক তন্ত্রোক্ত বহুবিধ যজ্ঞের বিধান আছে, তথ্য
প্রতি যজ্ঞেই পৃথক পৃথক অগ্নি উদ্ধার করিয়া সম্পাদন

করিবার নিয়ম; যদিও কঠনির্দিষ্ট ক্রবাণি কোণায়ও অমুক্ত
থাকিলে, সেখানেও তাহার কর্তব্যতা; ক্রব, ফা, ক্রক্, ক্রু
প্রভৃতি হোমসাধন ক্রবের লক্ষণ; যজ্ঞকার্য্যে সকলের
গমনাগমন জন্ত প্রীত ও উৎকর ব্যতীত পথবিধান এবং
উত্তরবেদিকাকার্য্যে চান্দাল ও উৎকরের অন্তরাল পথনিয়ম।
৪র্থ কণ্ডিকায়—বিহিত ক্রবের অভাব হইলে কাম্যকর্ম্মের
আরম্ভ নিষেধ; নিত্যকার্য্যসমূহে প্রধান ক্রবের অভাব হইলেও
প্রতিনিধি ক্রব্য দ্বারা তাহার অনুষ্ঠানবিধি; কাম্যকার্য্যে
সমুদায় অঙ্গ সংগৃহীত হইলে, কার্য্য আরম্ভ করিবার বিধি,
তবে আরম্ভের পর কোন প্রধান ক্রবের অভাব হইলে
প্রতিনিধি ক্রব্য দ্বারা তাহার সমাপন এবং অসমাপ্ত কার্য্যের
তাগ নিষেধ; নিত্যকার্য্য আরম্ভের পূর্বে বা পরে প্রতিনিধি
ক্রবের আয়োজন করায়, কিন্তু কাম্য কার্য্যের অবশ্যকর্তব্যতা
না থাকায় প্রতিনিধি ক্রব্যদ্বারা আরম্ভ করা যায় না, এই-
মাত্র উভয়ের ভেদ কথন এবং জ্যোতিষ্টোম দীক্ষিতগণের
শরীর ধারণার্থ পয়ঃপান প্রভৃতি ক্রতেও প্রতিনিধি বিধান।
এই প্রতিনিধি নিয়মেও আবার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম
নির্দিষ্ট আছে, যে ক্রবের অভাবে তৎসদৃশ জন্ত ক্রবের
প্রতিনিধি কল্পনা করা হয়, দৈবাৎ সেই ক্রব্যও নষ্ট হইলে
তাহার ছায় অন্য প্রতিনিধি না হইয়া প্রধান ক্রব্যজাতীয়
ক্রব্য দ্বারাই প্রতিনিধি কল্পনা করিতে হয়। যেমন ত্রীহি
অভাবে নীবার দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দৈবাৎ সেই নীবার
নষ্ট হইলে, নীবার জাতীয় অন্য ক্রবের কল্পনা না করিয়া
ত্রীহি সদৃশই অন্য ত্রীহি কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ
যেখানে ক্রমত্রীহির অভাব হইলে তাহার প্রতিনিধি শুক্রত্রীহি
হইবে, কিন্তু শুক্র নীবার হইবে না এবং যেখানে পূর্বসংযুক্ত
গাতীর ছদ্মদ্বারা কার্য্যের বিধান আছে, তথ্য ঐরূপ গাতীর
অভাব হইলে জীবৎসংযুক্ত গাতীর ছদ্ম প্রদান করিবে, কিন্তু
পূর্বসংযুক্ত মেধী প্রভৃতির ছদ্ম প্রদান করিলে চলিবে না।
এইরূপ সমুদায় ক্রবেরই প্রতিনিধি বিবেচনা করিয়া লইতে
হইবে। যে কণ্ডিকায় ঋতিপাঠ, মন্ত্রপাঠ এবং অর্থসিদ্ধিক্রমা-
নুসারে পদার্থের অনুষ্ঠানক্রম, যেখানে পাঠক্রম ও অর্থসিদ্ধিক্রম
উভয়ের বিরোধ হইবে, তথ্য পাঠক্রম উপেক্ষা করিয়া
অর্থসিদ্ধিক্রমের গ্রহণ করিতে হইবে এবং যেখানে ঋতিপাঠ
ও মন্ত্রপাঠ উভয়ের বিরোধ হইবে, তথ্য ঋতিপাঠক্রম
গ্রহণ না করিয়া মন্ত্রপাঠক্রমে কার্য্য সম্পাদনবিধি এবং
যেখানে বহু প্রধান ক্রবের একত্র প্রয়োগ বিধান আছে,
তথ্য কোনরূপ ক্রমবিভাগের ব্যবস্থা না করিয়া
সমুদয়ের প্রয়োগ করিবার নিয়ম। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় অবত

হবিঃ * নষ্ট হইলে, অল্প হবিঃ দ্বারা কার্য সম্পাদন, অগ্ন্যাদি দেবতা, মন্ত্র এবং প্রবাজ অমুযাজ + প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহের প্রতিনিধি নিবেদ্য; দৃষ্টার্থ অবধাত প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহের প্রতিনিধি বিধান, নিবিদ্ধ বস্ত্র কোন বিহিত বস্ত্রের সদৃশ হইলেও তাহার প্রতিনিধি নিবেদ্য, ত্যাগ ও বণন প্রভৃতি এবং সংস্কারকর্মে যজমানের প্রতিনিধিত্বের অভাব, কিন্তু পাজগ্রহণ, হবির্দর্শন, অগ্নিহোম, বাহন ও বেদবন্ধনাদি গুণকর্মে যজমানের প্রতিনিধি নিবেদ্য; পত্নী অভাবেও হবির্দর্শন, অগ্নিহোম ও উপাঙ্গন + প্রভৃতি গুণকর্মে প্রতিনিধিকল্পনা; যজমান কর্তৃক সহিত সঙ্কল্পবশতঃ প্রতিনিধিরূপে কল্পিত ব্যক্তিরও দীক্ষাদি যজমানদ্বারা সম্পাদনবিধি; ব্রাহ্মণেরই যজ্ঞাধিকার, ক্ষত্রিয়বৈশ্যের অনধিকার; ব্রাহ্মণ হইলেও এক কল্প ব্রাহ্মণের অধিকার, কিন্তু বিভিন্ন কল্পের নহে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৃহপতিত্বে অধিকার থাকিলেও যজ্ঞে অধিকার নাই এবং সহস্র বৎসর সাধ্য যজ্ঞ মনুস্যসাধ্য, যেহেতু এখানে সহস্র বৎসরের সহস্র দিন যাজ্ঞে লক্ষণাবিধি আছে। ৭ম কণ্ডিকার—যেখানে একটি মাত্র ফলকামনায় একব্যক্তি দ্বারা বহুসংখ্যক প্রধান কার্যের বিধান আছে, সেখানে সমুদায় কার্যের একত্র প্রয়োগ; দেশ, কাল, কল ও কর্মাদি সমান হইলে, প্রধান কার্যসমূহের আশু উপযোগী আচার, প্রবাজ ও আভ্যাতাগ প্রভৃতি পৃথক পৃথক না করিয়া একত্র করিবার নিয়ম; কিন্তু দেশ, কাল বা তত্ত্বভেদ থাকিলে একত্র কর্তব্য নহে, এক দ্রব্যে অনেক কর্মের বিধান থাকিলে, প্রত্যেক ক্রিয়ায় মন্ত্রপাঠ না করিয়া একবার মাত্র করিবার বিধি; কিন্তু হবির্গ্রহণ, কুশচ্ছেদ, কুশস্তরণ ও আভ্যগ্রহণ কার্যে প্রত্যেক বারই মন্ত্রপাঠ করিবার বিধি, আভ্যগ্রহণ কার্যে তিনবার মন্ত্রপাঠ ও অবশিষ্ট বার নৌনী হইতে হয়। দীক্ষিত ব্যক্তির অনেক হৃৎস্পন্দদর্শনে একবারমাত্র মন্ত্রপাঠ বিধি; এক নদীর অনেক প্রবাহ উত্তীর্ণ হইতে হইলে একবার মন্ত্রপাঠ, অনেক বৃষ্টিধারার সংযোগ থাকিলেও বর্ষণকালে একবার মন্ত্রপাঠ; এক সময়ে অনেকগুলি অমঙ্গল দর্শনে একবার মাত্র হৃৎস্পন্দদর্শন, বিশ্রামপূর্বক পুনঃ পুনঃ গমন করিবার সময়ে অমোধ্য দর্শন করিলে একবার মাত্র মন্ত্রপাঠ, এক রাজ্যের মধ্যে বারংবার নিদ্রাদি কালে অমঙ্গল দর্শন করিলে কালভেদে বারংবার মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে, এখানে একবার করিলে চলিবে না, অপ্রধানকালীন অল্প একবার

মাত্র, ইহার প্রতিধান পরিবর্তিত করিতে হয় না। আধানাদি কার্যে সমুদায় পুরুষই কর্তা, কেবল যজমান নহে; তবে দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ প্রভৃতি আত্মকর্মসমূহ ও পুরুষযোনি মন্ত্রসমূহ যজমান দ্বারা লগ্ন করিবেন এবং বণন অভ্যঙ্গনাদি সংস্কারও যজমানেরই, বিশেষ বচন দ্বারা কোন কোন স্থলে এই সংস্কার পুরোহিতেরও হইয়া থাকে; এই সকল কার্যে ব্যতীত অল্প কার্যেরও বিশেষ বিধান থাকিলে তাহা যজমানকেই করিতে হয়। যেমন যজমান বস্ত্রধারী হোম করিবেন, যজমান পাজ সর্কল গ্রহণ করিবেন, তত্ত্বি কার্য পুরোহিত প্রভৃতির। যেমন অধ্বর্যুর আধ্বর্যাব কার্য, হোতার হোত্রকার্য ও উৎগাতার উৎগাত্র কার্য। সমুদায় কার্যই যজ্ঞোপবীতধারীকে করিতে হয়, সেই সমস্ত কার্য পূর্বদিক বা উত্তরদিকস্থ করিয়া সম্পাদন করিবার নিয়ম; পরিস্তরণ ও পণ্যাক্ষাদি কার্য, প্রদক্ষিণ ক্রমে পিত্র্যাকার্য অপসব্য ক্রমে অর্থাৎ দক্ষিণদিক হইতে ক্রমে বাম দিকে কর্ম করিতে হয়, দৈবকার্যে যেখানে পুনরাবৃত্তি করিবার নিয়ম, পৈত্রকার্যে তথায় একবার। পৈত্রকর্মে দক্ষিণদিক গমন্ত, দৈবকর্মে বাহা পূর্বদিকে স্থাপিত করিতে হয় পৈত্রকর্মে সেই সমুদায় দক্ষিণদিকে স্থাপিত করা উচিত, প্রধান দ্রব্য বিনষ্ট হইলে নিকটস্থ উপযোগী অঙ্গসমূহের সহিত তাহার পুনরাবৃত্তি কর্তব্য। ৮ম কণ্ডিকার—বিকল্পাবস্থায় একটি মাত্র দ্রব্য দ্বারা কার্য সম্পাদন করা উচিত। অদৃষ্ট বহু বিষয় বিহিত থাকিলে, সমুদায় গুলিই গ্রহণ করিবে। যজ্ঞকালে মন্ত্রসমূহ একশ্রুতিস্থরে প্রয়োগ করিবে; সংহিতাস্থরে বা ব্রাহ্মণস্থরে প্রয়োগ কর্তব্য নহে। কিন্তু হৃৎস্পন্দ্য, সাম, লগ্ন, মুক ও বাজমান মন্ত্র একশ্রুতিস্থরে প্রয়োগ না করিয়া সংহিতার স্থায় স্থরেই প্রয়োগ করিবে। আধানে বিহিত দক্ষিণাভেদের বিকল্প কর্তব্য, কিন্তু সমুচ্চ নহে। অনেক সাধনকার্যে উবধ্যাদি কার্যের সমুচ্চ করিতে হয়। সর্কলই গার্হপত্য ও আহবনীয় কার্যে প্রদক্ষিণ করিয়া অপসব্য, এবং অপসব্য করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। বিহারের উত্তরদিকে সমুদায় কার্য করিতে হয়; স্তূত্যাং ব্রহ্ম ও যজমানের আসন বিহারের দক্ষিণদিকে কর্তব্য। আসনবর মধ্যে প্রথমতঃ যজমান একখানি আসনে বেদিমধ্যে পদের অগ্রভাগ সংস্থাপন করিয়া উপবেশন করিবেন; তৎপরে ব্রহ্মের উপবেশন কর্তব্য। ব্যক্তিবিশেষের আদেশ না থাকিলে, বহুবিস্তৃত কর্ম অধ্বর্যু সম্পাদন করিবেন; আদেশ থাকিলে—অভ্য করিবেন। হবিঃপাজগ্রহণ সমূহ

* আহতিপ্রদানার্থ গৃহীত হবিক্ত অবশ্য হবিঃ বলে।

+ যজ্ঞবিশেষকে প্রবাজ ও অমুযাজ বলে [প্রবাজ লক্ষ্য দেখ।]

‡ পৌষাদি দ্বারা লেপন।

যেমন পর পর সংগৃহীত হয়, প্রদানকালে সেইরূপ সেই সকল দ্রব্য পূর্বে পূর্বে গ্রহণ কর্তব্য। প্রতাপনাদি অগ্নি-সাধ্য সংস্কার গার্হপত্য অগ্নিতে সম্পাদন করিবে। সমুদায় কার্য্যেই হবিঃপ্রদান গার্হপত্য বা আহবনীয়ে কর্তব্য। সংস্কারশূণ্য দ্রব্যমাত্রই আত্মশব্দের অর্থ বুঝিবে, দ্রব্য শব্দে গব্য দ্রব্য বুঝিতে হইবে। দ্রব্যবিশেষ কথিত না থাকিলে সর্বত্রই দ্রব্য দ্বারা হোম কর্তব্য, কিন্তু বিশেষ দ্রব্যের বিধান থাকিলে সেই সেই দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে। চাণ্ডাল * হইতে বহিঃ পুরীষ গ্রহণ করিবে। পূণক আদেশ না থাকিলে, আহবনৌষ অগ্নিতেই সমদায় যাগ কর্তব্য; কিন্তু আদেশের বিভিন্নতা থাকিলে আদেশানুসারে যাগ করিতে হয়। এতরূপ আদেশ না থাকিলে একবার মাত্র গৃহীত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে, এবং আদেশ থাকিলে আদেশানুসারে করিতে হইবে। ১ম কণ্ডিকার—সকলস্থলেই ত্রীহি বা যব হবিরূপে কল্পিত হয়। উভয়ের বিধানস্থলে বিধানানুসারে কোথায় প্রথমে যব পরে ত্রীহি, এবং কোথায়ও বা প্রথমে ত্রীহি পরে যব প্রদান কর্তব্য। কিন্তু আপস্তম্ব মতে সর্বদাই কেবল ত্রীহি গ্রাহ্য। দ্বিবিধ গ্রহণের বিধান থাকিলে, প্রথমবার পুরোডাশ চকর মধ্যদেশ হইতে বক্রভাবে এক অঙ্গুল পরিমিত গ্রহণ, দ্বিতীয়বার হবির পূঙ্গ ভাগ হইতে একরূপ নিয়মে গ্রহণ করিতে হয়। সমদগ্নি প্রভৃতি প্রের সমূহ তিনবার হবিঃগ্রহণ কর্তব্য। তাহাতে প্রথমবার মধ্যদেশ হইতে, দ্বিতীয়বার পূঙ্গভাগ হইতে, এবং তৃতীয় বার পশ্চাৎভাগ হইতে গ্রহণ করিতে হয়। যেখানে আজ্য-ভাগ, পল্লী সংযাজ, উপাংগুযাজ ও অগ্নিহোজ হোমাদিতে চারিবার গ্রহণের বিধি আছে, তথায় জমদগ্নি প্রভৃতির পাঁচবার গ্রহণ করিতে হয়। দধি ক্ষেত্র ও অবদান ক্ষবদ্বারা অঙ্গুলপূর্ণ পরিমিত গ্রহণ করিতে হয়। পুরোডাশাদি হবির অবদান হইতে প্রথম আজ্য একবার গ্রহণ করিয়া, অঙ্গ হবিঃ গ্রহণ করিবে, এবং শেষবার আবার আজ্য গ্রহণ করিতে হয়। ঋত্বিক্ত্বং হোমে হবিঃগ্রহণ প্রধান অবদান অপেক্ষা একবার কম করিতে হয়। উপস্তার কার্য্য একবার করিবে। উপরি-দেশে অভিধারণ হইবার কর্তব্য। অবদেয় ও অবদান হবির প্রত্যভিধারণ করিতে হয়। এক কপাল পুরোডাশ সর্বস্থানেই আহুতি দিবে। “অগ্নে অমুক্ত্রিহি” এইরূপ বাক্য দ্বারা চতুর্থী বিতক্ত্যন্ত দেবতা পদ দ্বারা অমুবচন করিতে হয়। আশ্রাবণের পর যেখানে মৈত্রাবরূপের অমুবচন করিতে হয়, সেখানেও চতুর্থী বিতক্ত্যন্ত দেবতাপদ প্রয়োগ

করিবে। কিন্তু আশ্রাবণের পর যেখানে মৈত্রাবরূপের অমুবচন করিতে হয় না, সেখানে দ্বিতীয়ান্ত দেবতাপদ প্রয়োগ করিবে। প্রৈষনদ্বিত্বি অমুবচনস্থলে দ্রব্যের উত্তর যজী হয়; কিন্তু দুইটি প্রৈষের সম্বন্ধ থাকিলে যজী হয় না। যেখানে ‘নাম গ্রহণপূর্বক ইহাকে বজনা কর’ এইরূপ প্রয়োগের বিধান থাকে, সেখানে ইহাকে পদের পরিবর্তে সেই সেই নাম প্রয়োগ করিবে। বযট্কারের সহিত আহুতি প্রদানস্থলে বেদীর দক্ষিণভাগে উত্তরপূর্ব বা ঈশানমুখে অবস্থিত হইয়া বযট্কারের পর বা বযট্কারের সহিত আহুতি প্রদান করিবে। ঐ সকল স্থলে দ্রুমমিশ্রিত হবিঃ প্রদান করিতে হয়; তাহার নিয়ম—প্রথমে দ্রুম আহুতি, মধ্যে হবির আহুতি, এবং পরে আবার দ্রুম আহুতি প্রদান করিবে। অথবা দ্রুম ও হবিঃ একত্রই প্রদান করিতে হয়। ১০ম কণ্ডিকার—“আগ্নেয়ো অষ্টকপালো ভবতি” ইত্যাদি স্থলে লট বিভক্তির বিধিনির্ভ বোধক বুঝিতে হইবে। কর্তব্য কর্মের উপকরণ দ্রব্যসমূহ প্রথমে কল্পনা করিয়া কর্মদেশ স্থানে স্থাপিত করিবে। সর্বত্রই উত্তরদিকে লোম ও পূর্বদিকে গ্রীবা বিজ্ঞাসমুক্ত চর্ম্মের আস্তরণ প্রদান করিবে। হবিসমূহ মধ্যে যে সকল দ্রব্য পশ্চাৎ পঠিত আছে; তাহা দেশ কালানুসারে পশ্চাৎই প্রদান করিতে হয়। গ্রহণাদি কার্য্য পূর্বে পঠিত থাকিলে পূর্বে, এবং পরে পঠিত থাকিলে পরে গ্রহণ করিবে। এইরূপ অধিশ্রয়ণাদি কার্য্য পূর্বে পঠিত থাকিলে দক্ষিণদিকে এবং পরে পঠিত থাকিলে উত্তরদিকে স্থাপন করিবে। স্থালী, ক্ষব ও দ্রুম দক্ষিণ হস্তে গৃহীত হইলে, বাম হস্ত দ্বারা বেদের উপগ্রহণ করিবে। কিন্তু উপভূৎ প্রভৃতি দ্বিতীয় দ্রব্যের গ্রহণ বিধি থাকিলে বেদের উপগ্রহণ করিতে হয় না। দ্রুম ব্যতীত অঙ্গ দ্রব্য দ্বারা যাগ করিতে হইলে, ক্ষ্যেনের উপগ্রহণ করিবে। বেদ বজ্রাদি দ্বিতীয় দ্রব্য না থাকিলে কুশদ্বারা উপগ্রহ করিতে হয়। ক্ষক গ্রহণ করিবার সময়, ক্ষক ও জুহু উভয় হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া উপভূতের উপরিদেশে স্থাপন করিবে। এই স্থাপন কালে পরস্পর স্পর্শ জন্ত শব্দ হওয়া উচিত নহে। নিখলিৎ জ্ঞানানুসারে সকল স্থলেই ফলস্বরূপ স্বর্ণ কল্পিত হইয়া থাকে। একটিবাক্য কার্য্যে বেদবিহিত বৈকল্পিক অঙ্গসমূহের মধ্যে অধিকাক অমুক্তিত হইলে ফলও অধিক হয়। এইরূপ বড়মক্ষিপাক অপেক্ষা দ্বাদশ ও চতুর্বিংশতি দক্ষিণাঙ্গের ফল অধিক। যজমানসম্বন্ধী দান, অবারন্ত, বরণ ও ব্রতগ্রামণ গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ দানবিধি, সত্যবাক্য ও অধঃশরণাদি ব্রত বলমানের কর্তব্য, এবং অগ্নি ধর, বেদি, গৃহ প্রভৃতির

* উত্তরযজী প্রভৃতি করণার্থ মটি খুঁড়িয়া গর্ত।

পরিমাণ যজ্ঞমান হস্তাহুসারেই স্থির করিতে হয়। প্রোথিত যুগ, ছিন্ন কুশ, অবহত ব্রীহি, পিষ্ট তণ্ডুল, দোহনকৃত দ্রব, এবং দগ্ধ ইষ্টকাদিতে সেই সেই দ্রব্যে বিহিত কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে হয়। রোদ্র মন্ত্র, রক্ষোদৈবত মন্ত্র অম্বর দৈবত মন্ত্র ও শৈব মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই সেই দেবতা সঙ্কল্পীয় কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক আত্মস্পর্শ ও হস্ত দ্বারা জল স্পর্শ করিবে।

এই সমস্ত সর্স্কার্য্যের উপযোগী বিধান প্রথমাধ্যায়ে কথিত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা, তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, যথা—পৌর্ণমাস-যজ্ঞকাল, ইহাতে অগ্নির অধ্বানন, অধ্বযু্য ও যজ্ঞমানের অধিকার। তাহার বিধানপ্রণালী। দীক্ষা গ্রহণে দীক্ষিত ধর্ম্ম সমুদায়। দিবানৈশথুন ও মাংসপরিবর্জন। শিখা পর্য্যন্ত কেশ পরি-
ত্যাগ। ব্রতকালানুসারে সপত্নীক যজ্ঞমানের মাংস-মাংস-
লবণবর্জিত হবিষ্যাদি হবির সহিত ভোজন বিধি। সত্য
বাক্য প্রয়োগ। রাজিকালে পূর্ব্ববিহিত বিহার স্থানে অগ্নি-
হোত্রহোম গায়কালে ভোজনেচ্ছা হইলে হোমের পর অধিক
রাত্রি না হইতেই নীবার প্রভৃতি বস্তু ওষধির অন্ন ও বস্তু
বৃক্ষের ফল ভোজন করিবে। আহবনীয়া গৃহে বা গার্হপত্য
গৃহে শয্যা ব্যতীত অশয়ন বিধি এবং ব্রহ্মচর্য্য আচরণ
বিধান। (এই নিয়ম সপত্নীক যজ্ঞমানেরই বৃত্তিতে হইবে।)
পৌর্ণমাসে অধ্বাননাদি কার্য্য সমাপন হইলে দুইদিন বা এক-
দিনে কার্য্যভেদের বিধি। (তাহা প্রাতঃকালেই সম্পাদন
করিতে হয়।) ২য় কণ্ডিকায় অগ্নিহোত্রের পর ব্রহ্মবরণ
বিধি, এবং তাহার প্রকার। ৩য় কণ্ডিকায় ব্রহ্মসদন হইতে
আত্মস্পর্শ পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান, প্রকার ও মন্ত্রাদি
কীৰ্ত্তন।

তৃতীয় অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা, তাহাতে হোত্র সদন
হইতে পৌর্ণমাস সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্তব্য কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান
প্রকার ও মন্ত্রাদি বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ১৫টি কণ্ডিকা; তাহার ১ম ২য় ও ৩য়
অধ্যায়ে দর্শযাগের পূর্ব্ব পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রকার
ও মন্ত্রাদি কথন। দ্রব্যাদেবতায়ুক্ত আখ্যাতপ্রত্যয়ান্ত কর্ম্ম
শব্দ ও বেদবোধিত যাগ শব্দের অর্থ। সমুদায় যজ্ঞ ও
অগ্নিবোমীয় পণ্ডিতে দর্শপৌর্ণমাস যাগধর্ম্মের অভিদেশ।
বৈশ্বদেব, বরুণপ্রাণাস, সাকমেধ ও শুনাসীরা নামক চতুঃ
পর্কময় চাতুর্ম্মাস্তের প্রথম বৈশ্বদেব পর্কে দর্শপৌর্ণ ধর্ম্ম-
কথন। অপর তিন পর্কে ত্রিবিধ বহিঃ প্রস্তারাদি ঔপদেশিক

ধর্ম্মবিধান। চাতুর্ম্মাস্ত বরুণপ্রাণাসাদি পর্কত্রয়ে বৈশ্বদেব
পর্কধর্ম্মের বিধান আছে, কিন্তু মাক্ত্যাদিতে ঐরূপ
বিধান নাই। দৌমিক স্নান অপেক্ষা বরুণ প্রাণাসিক
স্নানে ধর্ম্ম হইয়া থাকে। কোণায়্য করিবে এইরূপ সন্দেহ
উপস্থিত হইলে, সেই কার্য্যের জন্ত দৌমিকাদিই গ্রহণ
করিবে। দর্শ ও পৌর্ণমাসে আগ্নেয়াদি ছয়টি প্রধান
যাগ আছে। এক দেবতায়ুক্ত বৈকৃত কর্ম্ম সমুদায়ে
আগ্নেয় ধর্ম্মের বিধান। অনেক দেবতায়ুক্ত কর্ম্মে অগ্নি-
বোমীয় ধর্ম্ম বিধি। দ্রব্য সামাগ্রে ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। দেবতা
শুণের উপাংশু প্রভৃতির সাম্য অবস্থার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি।
দ্রব্য দেবতা উভয়ের সাম্য বিরোধ থাকিলে দ্রব্যের
সমানতায় ধর্ম্ম হয়, কিন্তু দেবতার সামাগ্রে হয় না।
গাভীতে দুগ্ধের ধর্ম্মই হয়, কিন্তু দধি জন্ত হয় না। এজন্ত
চাতুর্ম্মাস্ত প্রভৃতিতে পরিবাসিত শাখা দ্বারা পবিত্র বন্ধনের
পর বৎস দূরীভূত এবং দোহন চতুঃস্থের প্রাপ্তি হয়। পণ্ডিতে
দধি জন্ত ধর্ম্ম না হইয়া দুগ্ধ জন্ত ধর্ম্ম হইয়া থাকে। দ্রব্য-
সমূহে স্থানাপত্তির ধর্ম্ম হয়। প্রাকৃতস্থানযুক্ত দ্রব্যের যে
স্থানীয় ধর্ম্মের সহিত বিরোধ হয়, স্থানপ্রাপ্ত দ্রব্যে সেই
বিরোধ থাকিতে পারে না। যে বিকৃতিতে প্রাকৃত দ্রব্য
দেবতাস্থানে অথ দ্রব্য দেবতাদি বিহিত হয়, সেখানে প্রাকৃত
মন্ত্রের উহ হয় না। বিকৃতিতে বচনবিশেষে প্রাকৃত ধর্ম্ম হয়
না। অর্থলোপ বা প্রয়োজন শোণহেতু প্রাকৃত ধর্ম্ম হয়
না। বিকৃতিতে বিরোধ হেতু প্রাকৃত ধর্ম্মসমূহের প্রবৃত্তি হয়
না। প্রকৃতিতে বাহ্য পরার্থরূপে বিহিত, পরার্থের অপ্রবৃত্তি
জন্ত বিকৃতিতে তাহার অপ্রবৃত্তি হয়। যেখানে পরার্থজাত
দ্রব্য কোণায়্য ও কর্ম্মান্তর সাধন জন্ত বিহিত হইয়াছে, সেখানে
পরের অভাব থাকিলেও পরার্থজাত দ্রব্যের সদ্ভাব হয়।
সমুদায় যজ্ঞেরই সদ্যঃ সময় বিধি। ৪র্থ কণ্ডিকায় প্রজা, পশু,
অন্ন ও যশঃ কামাদির কার্য্য-দাক্ষায়ণ যজ্ঞ, মন্ত্র এবং দর্শ
পৌর্ণমাসের দেব ও দ্রব্যভেদ বর্ণনপূর্ব্বক তাহাদিগের বিধান।
৫ম কণ্ডিকায় উপাংশু শব্দের অর্থ কথন, এবং তাহাতে দ্রব্য
দেবতাদি বর্ণন। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় ব্রীহি ও যব পাককালে
আগ্নেয় নামক কর্ম্ম কর্তব্য। শরৎ বসন্ত প্রভৃতি কাল,
দ্রব্যাদেবতাদির মন্ত্রবিধান ও তাহার প্রকার। দর্শ-
পৌর্ণমাস যজ্ঞের পর আগ্নেয়াদির যথা প্রকৃতি কার্য্য-
বিধি, কিন্তু ঐ যজ্ঞের পূর্ব্ব বিহিত নহে। দর্শপৌর্ণমাসের
উৎসর্গ হইলে অগ্নিহোত্রে আছতি বিধি, এবং আগ্নেয়
বিধান প্রকার। দীক্ষিতের বিশেষ বিধি। সৎসর ও
উপসংবাদি যজ্ঞ আগ্নেয়বিশেষ। সৎসর ও হৃতী প্রকৃ-

তিতে অব্যবিশেষ। জ্যোতিষের বিধান প্রকার। ৭ম কণ্ডিকায় অগ্নি, আধোরকর্ষ, কাল, দেবতা ও মন্ত্রের বিধান প্রকারাদি কথিত আছে। ৮ম, ৯ম ও ১০ম কণ্ডিকায় আধানের অঙ্গ কর্মসমূহের বিধান এবং মন্ত্রাদি কথন। ১১শ কণ্ডিকায় পুনর্বার আধানে ধননাশ প্রভৃতি নিষিদ্ধ কথন। তাহার বিধান প্রকার। ১২শ কণ্ডিকায় কেবল মাত্র অগ্নিহোত্রাদি বাৎসর্যের উপস্থান প্রকার। ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ কণ্ডিকায় অগ্নিহোত্রের কাল, দ্রব্য, দেবতা, বিধান ও মন্ত্রাদি কামনা-ভেদানুসারে অবস্থা ভেদযুক্ত অগ্নিতে হোমের কর্তব্যতা। কামনা-ভেদের হোমে দ্রব্যভেদ বিধি। এইরূপ দ্রব্যসমূহ দ্বারা প্রত্যহ সংবৎসর হোম করিলে, সেই সেই কামনাসিদ্ধি। অগ্নিহোত্র হোমে, এবং সর্ববিধ যজ্ঞে গার্হপত্য আগারের দক্ষিণদ্বার দিয়া প্রবেশবিধি। সর্বাদা যজমানের স্বয়ংই হোম করা উচিত, কার্যাবশতঃ যজমান অশক্ত হইলে যজমাননিযুক্ত অধ্বর্যুও করিতে পারেন। কিন্তু দর্শ ও গোপমাসীতে সর্বাদা স্বয়ং হোম করিবে। প্রবাসে, সূতকাদি অশোচে বিশেষ নিয়ম আছে।

৫ অধ্যায়ে ১৩টি কণ্ডিকা; তাহার মধ্যে ১ম ও ২য় কণ্ডিকায় চাতুর্মাস্ত্র * যজ্ঞান্তর্গত, বৈশ্বদেব বাগের পর্লকাল এবং তাহার দ্রব্য ও দেবতা প্রয়োগাদি বর্ণন। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম কণ্ডিকায় বরণপ্রাধাসের রূপ ও তাহার পর্লকাল, দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র বিধানাদি। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় সাকমেধের রূপ ও তাহার পর্লকাল, দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্রাদি বিধান। ৭ম, কণ্ডিকায় বিহবিকক্রেডিণীয়ে ইষ্টির কালবিধান এবং তদীয় দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। ৮ম, ৯ম কণ্ডিকায় পিত্রেষ্টির কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। ১০ম কণ্ডিকায় ত্রৈয়ম্বক-হোমের কালবিধান, এবং দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি নিয়ম। ১১শ কণ্ডিকায় চাতুর্মাস্ত্র বাগান্তর্গত পর্লবিশেষায়ক ওনাসী-রায়ের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। সূতকাদিতে ও চাতুর্মাস্ত্রের পুনর্বার আরম্ভ। চাতুর্মাস্ত্র ত্রিবিধ, ঐষ্টিক, পাক্ত ও সৌমিক; এই ত্রিবিধ চাতুর্মাস্ত্রের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি। ১২শ, ১৩শ কণ্ডিকায় সিদ্ধবিন্দেষ্টি; তাহার দ্রব্য, দেবতা ও মাত্র বিধান।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১০টি কণ্ডিকায় নিরুদ্র, পশুযজ্ঞবাগ, তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি কথিত আছে।

৭ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা; তাহাতে জ্যোতিষ্টোম

যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান; এবং জ্যোতিষ্টোমের পূর্বাছুষ্ঠের সোমযজ্ঞের দ্রব্য দেবতাগণের বিধান আছে।

৮ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা। তাহার ১ম ও ২য় কণ্ডিকায় আতিথ্যকর্ম, তাহার দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৩য় কণ্ডিকায় ঔগবসথোর কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম কণ্ডিকায়ও ঐরূপ বিধানাদি কথিত আছে।

৯ম অধ্যায়ে ১৪টি কণ্ডিকা। ১ম কণ্ডিকায় সৌত্যকর্ম ও তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা এবং মন্ত্রবিধানাদি। অপর কণ্ডিকাসমূহে প্রাতঃসবনের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি কথিত আছে।

১০ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা। তাহার সমুদায় কণ্ডিকাতেই প্রায় অধ্যায় শেষ পর্যন্ত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও তৃতীয় সন্ধ্যার দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধান। অধ্যায় শেষে জ্যোতিষ্টোম-বাগে সোনোত্তর কর্তব্য অত্যাগ্নিষ্টোম, উক্ধ্য, বোড়শ, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপু'ধাম ও জ্যোতিষ্টোম বাগে সোমোত্তর কর্তব্য সোমের জ্যোতিষ্টোম বিধান এবং তাহাতে অধ্বর্যব বিধান প্রকার।

১১শ অধ্যায়ে ১টি মাত্র কণ্ডিকা; তাহাতে জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গ ব্রহ্মবিধান।

১২শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা; তাহাতে দ্বাদশাহ যজ্ঞের বিধান। একাদশাহ প্রভৃতি যজ্ঞে জ্যোতিষ্টোম ধর্মের অতিদেশ। কেহ বলেন, তাহাতে অগ্নিষ্টোম ধর্মের অতিদেশ কথিত আছে। সত্তরূপ ও অতীনরূপভেদে দ্বাদশাহ দুই প্রকার; এই উভয় রূপের লিঙ্গপ্রদর্শন। যাহার আদ্যন্তে অতিরাত্র, তাহার নাম সত্তর এবং যাহার কেবল অন্তে অতিরাত্র, তাহাকে অতীন কহে। সত্তরবাগে যজমানসহ বোড়শ ঋত্বিকের কর্তৃত্ব থাকায়, সকলেরই যজমানত্ব; সূতরাং সকলেরই ফণপ্রাপ্তির অধিকার থাকায় ঐ কাব্যে দক্ষিণার অভাব। বোড়শ ঋত্বিকে যজমানত্বের অতিদেশ থাকায় সপ্তদশ ব্যক্তিরই দীক্ষাদি যজমান ধর্মনির্দেশ। গৃহপতির অধারমুখ বিধি। যজ্ঞসম্পাদন অঙ্গ পাত্তগ্রহণাদি কার্যে মাত্র একজনেরই কর্তৃত্ব, তৎকর্তৃক সম্পাদিত হইলেই সকলের সম্পাদিত হইয়া থাকে। গার্হপত্য ও আহবনীর অঙ্গপ্রদান। অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত তদীয় দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র, দীক্ষা ও কালবিধানাদি নিরূপিত হইয়াছে।

১৩শ অধ্যায়ে ৪টি কণ্ডিকা। তাহার প্রথম কণ্ডিকায় গবাময়ন যজ্ঞের প্রকার ও তাহাতে দ্বাদশাহ যজ্ঞ ধর্মের

* বৈশ্বদেব, হনাসী, বরণপ্রাধাস ও সাকমেধ এই বাগচতুষ্টয়বরণ চাতুর্মাস্ত্র বাগ। এই বাগচতুষ্টয় কখনও পর্ল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অভিদেশ্য। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কণ্ডিকার বাদশাহ ধর্মের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র বিধানাদি বর্ণিত আছে।

১৪শ অধ্যায়ে ৩টি কণ্ডিকা। তাহাতে জ্যোতিষ্টোম, সংহাভেদ, রাজপের যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র-বিধানাদি কথিত আছে।

১৫শ অধ্যায়ে ১০টি কণ্ডিকা। সমুদায় কণ্ডিকার রাজস্ব-যজ্ঞ, তাহাতে কত্রির জাতির অধিকার, রাজপের যজ্ঞ করিলে আর রাজস্বের অনাবশ্যকতা, এবং রাজস্বের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি বর্ণিত আছে।

১৬শ অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকার পঞ্চাতিশক স্থলবিশেষস্থিত অগ্নিবিধান প্রকার। চন্দ্রমঙ্গলক বিশিষ্টাঙ্গির সোমাস্রতা কথন। তাহাতে ইচ্ছাছুসারে অধিকার। তবে কেবলমাত্র মহাজ্ঞত নামক স্তোত্রলাভ্য সোমযোগে পঞ্চাতিশক স্থলের নিয়ম, অত্রই ইচ্ছাছুসারে বিকল্প। ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ কণ্ডিকায় উখা (যজ্ঞাদি পাত্রবিশেষ) নির্মাণ প্রকার। ৫ম কণ্ডিকায় অগ্নিচয়ন প্রকার এবং তাহাতে দেবতা ও মন্ত্রাদির বিধান। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় পঞ্চ অগ্নি-বিশেষের চয়ন প্রকার। ৭ম কণ্ডিকায় তৎসম্বন্ধীয় প্রারম্ভিত-হোম বিধান। ৮ম কণ্ডিকায় পূর্বোক্ত অগ্নিচয়নের প্রকার ভেদ, এবং তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন।

১৭শ অধ্যায়ে ১২টি কণ্ডিকা। সমুদায় কণ্ডিকায় প্রারম্ভিতান্ত্র্য কর্ত্ত্বের পরবর্ত্তী কর্ত্ত্বের বিধান এবং তাহার ভেদ, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত হইয়াছে।

১৮শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা। তাহাতে শতরুদ্রীয় হোম ; তাহার অঙ্গকর্ম, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকা শেষভাগে অগ্নিচয়নকারী পুরুষের নিয়ম কথিত আছে।

১৯শ অধ্যায়ে ৭টি কণ্ডিকা। তাহাতে সৌজামণিযোগের বিধান, এই যজ্ঞে ধনাতিলাষী ব্রাহ্মণের অধিকার ; সোম যজ্ঞকারী সান্নিক ব্রাহ্মণগণের সোমযজ্ঞের পর ইহার কর্ত্তব্যতা ; সোমোতিপুত অর্থাৎ যাহার মুখ, নাসিকা, কর্ণ, অঙ্গ প্রভৃতি ছিদ্রদ্বারা পীতসোম নিঃসৃত হয় তাহার, এবং সোমবামী অর্থাৎ পীতসোম মুখ দিয়া যে বমন করে তাহারও এই যজ্ঞে অধিকার ; শত্রু কর্ত্ত্বক স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত রাজার পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি জন্ম ইহাতে অধিকার ; পুত্র অভাবে পুত্র পাইবার কামনার বৈশ্বেরও ইহাতে অধিকার ; তারিয়ারে এই যজ্ঞের সম্পাদন বিধি ; এই যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ জুয়া প্রভৃতিপ্রাণী এবং এই যজ্ঞীয় দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত আছে।

২০শ অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা। এই সমস্ত কণ্ডিকার অর্থমেষ

যজ্ঞের বিধান ; ইহাতে অতিমিত্র কত্রির রাজারই একমাত্র অধিকার ; ব্রাহ্মণবৈশ্বের অনধিকার ; তিনরাজে ইহার সম্পাদন নিয়ম ; এই যজ্ঞকালে সমুদায় অতীষ্ট সিদ্ধির কথা এবং যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত আছে।

২১শ অধ্যায়ে ৪টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকার সনমেষযজ্ঞের বিধি ; সর্গজীব হইতে উৎকর্ষকামী পুরুষের অধিকার ; পাঁচ রাজে ইহার সম্পাদন-বিধি ; ইহাতে একবিংশতি দীক্ষা নিয়ম ; ব্রাহ্মণ ও কত্রিরের অধিকার, বৈশ্বের অনধিকার এবং এই যজ্ঞের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান বিহিত আছে। ২য় কণ্ডিকার সর্গবিষয়-অভিলাষী ব্যক্তির সর্গমেষযজ্ঞের বিধান এবং দশ রাজে তাহার সম্পাদন নিয়ম। ৩য় ও ৪র্থ কণ্ডিকায় মনুষ্য, অশ্ব, গো, মেঘ ও ছাগ, এই পঞ্চ পশুর বধবিধি ; প্রোষিত বা মৃত পিতার সন্তানের অতীত হইলে পিতৃমেষযজ্ঞের বিধান এবং তাহার নক্ষত্রাদি কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধান বর্ণিত আছে।

২২শ অধ্যায়ে ১১টি কণ্ডিকা। তাহার প্রথম কণ্ডিকা যজ্ঞকর্ত্ত্বীর আধানাদি পিতৃমেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মবিধি ও সামবেদীয় একাহসাধ্য যাগবিধি কথিত আছে। এই সম্বন্ধীয় কতকগুলি পরিভাষাও এই কণ্ডিকায় লিখিত আছে, যথা— বিভিন্ন সংস্থ কথিত না থাকিলে যজ্ঞ অগ্নিষ্টোমসংস্থ হইয়া থাকে। ধেনুমাত্র দক্ষিণাদেয় ভূনামক একাহ ও জ্যোতিঃ নামক একাহে বিশেষ কোন সংস্থ কথিত না থাকায় এই উভয়ই অগ্নিষ্টোমসংস্থ। গো ও আয়ুঃ নামক একাহ উক্ধ্য-সংস্থ। অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎ অগ্নিষ্টোমসংস্থ। এই অভিজিতে সহস্র গো অথবা শত অশ্ব কিংবা এই সমুদায় দক্ষিণার বিধান। বিশ্বজিতে সহস্র অশ্ব বা যথাসর্ব্ব দক্ষিণা বিহিত আছে। জ্যোষ্ঠ পূজের বিভাগযোগ্য দ্রব্য এবং ভূমি ও দাস ব্যতীত পদার্থকে সর্ব্বস্ব পদার্থ কহে। কেহ বলেন ধারণ-ভ্রমণাদি জন্ম ভূমির, এবং শুক্রবার জন্ম দাসের আবশ্যক থাকায়, এই উভয় দ্রব্য ব্যতীত সুবর্ণাদি অল্প সমুদায় দ্রব্যই সর্ব্বস্ব ; পুরুষমেষ যজ্ঞে গর্ভদাস-দানের বিধান থাকায় এবং ভূমির একদেশ পরিভাগে ধারণের সম্ভাবনা থাকায়, স্বমতেও ঐ উভয় দ্রব্য ব্যতীত অল্প সমুদায়ই সর্ব্বস্ব। কিন্তু অবতৃণ দান বিহিত বৎসচ্ছবি ও দীক্ষার উপযোগী দ্রব্যসমূহ সর্ব্বস্বের মধ্যে পরিগণিত নহে। বস্তুতঃ সহস্র অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দ্রব্যই সর্ব্বস্ব নামে অভিহিত এবং ইহাই দক্ষিণাক্রমে কল্পিত হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে দ্বাদশরাত্রি প্রভৃতি নিয়মের বিস্তারিত আছে। অভিজিৎ সম্পন্ন হইলে বিশ্বজিৎয়ের জন্মটান করিতে হয় অথবা অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎয়ের একত্র সমুদান

কর্তব্য। কিন্তু এক সময়ে উত্তর কার্য্য করিতে হইলে, দেব-
বল-হানের বিশেষনিয়ম আছে যে, তাহাতে বোড়শ ঋষিকের
বাহ্যপ্রাপ্ত অনাত্ম ঋষিক দ্বারা অনাত্ম কার্য্য সম্পাদন
করিতে হয়। তাহাতে বহির্ভূত কর্ম্মসমূহ উত্তরেরই একরূপ;
কেবল অন্তর্ভূত কর্ম্মই উত্তরের বিভিন্নতা আছে। উত্তর
কার্য্য এক সময়ে করিলেও অভিজ্ঞতার এক একটি অঙ্গ
সম্পাদন করিয়া, বিশ্বজ্ঞানের এক একটি অঙ্গ সম্পাদন
করিতে হয়। সর্গজিৎ নামক একাধি মহাব্রত নামক সাম-
ন্তবল্যাদি; এই যজ্ঞে সৎসর দীক্ষা, সপ্তাহে স্নান এবং
তিনটি বা চারটি উপসদ্বিহিত। অর্থাৎ সৎসর দীক্ষার পর
সপ্তমদিবসে স্নান করিবে তাহার পর সপ্তাহ অতীত হইলে
যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহাতে তিনটি বা চারটি উপসদ্বি-
করিতে হইবে। এই যজ্ঞও অগ্নিষ্টোমসংস্থ। এট সমস্ত
বিষয় ১ম কণ্ডিকার কথিত আছে। ২য় কণ্ডিকায় সর্গজিৎ
যজ্ঞের দক্ষিণা ভেদ ও তাহার বিধানাদি; এই যজ্ঞের উক্ত্য
সংস্থতা; কথিত অভিজিৎ প্রভৃতির নামান্তর; যথা—
অভিজিৎ নাম জ্যোতিঃ, বিশ্বজিৎ নাম বিশ্বজ্যোতিঃ
এবং সর্গজিৎ নাম সর্গজ্যোতিঃ; এই সমুদায়ের দক্ষিণা
ভেদ বিধানাদি; চতুর্থ উক্ত্যসংস্থের জিরাঙ্গসম্মিত নাম।
সাদ্যস্তু নামক ছয়টি যজ্ঞের বিধান; উত্তরোত্তর তাহার
প্রদর্শন; যথা—প্রথম সাদ্যস্তু, স্বর্গকাম, পতকাম এবং
ব্রাহ্ম্য-বিশিষ্ট পুরুষদিগের অধিকার; দ্বিতীয় সাদ্যস্তু,
দীর্ঘব্যাবিশিষ্ট এবং প্রাতিষ্ঠা ও অন্নভিলাষিদিগের অধি-
কার; অন্নক্রীড়নামক তৃতীয় সাদ্যস্তু, কর্ম্মহীন ও কর্ম্ম-
নিবৃত্তি প্রার্থিগণের অধিকার; বিশ্বজিৎ শিল্প নামক চতুর্থ
সাদ্যস্তুের দক্ষিণাভেদ, সর্গস্ব প্রতিনিধি দক্ষিণা-বিধান ও
সর্গস্ব প্রতিনিধি জব্যাসমূহের বর্ণন; যথা—ধেহু, সুব, নীর,
ধাত্ত, পলাদি পরিমাণোপযোগী স্বর্ণ ও রৌপ্য, দাস, দাসী,
মিথুন, উপকরণের সহিত মহানল, অশ্বাদি যানারোহণ,
এবংগৃহ শয্যা। অন্তএব সর্গস্ব পদ দ্বারা এই সমস্তই গ্রহণ
কর্তব্য। স্ত্রেন নামক পঞ্চম সাদ্যস্তু বৈরনির্য্যাতন কামের
অধিকার; তাহার দক্ষিণা, অন্নুষ্ঠান, মন্ত্র ও দেবতাদি-
কথন। একত্রিক নামক ষষ্ঠ সাদ্যস্তুের বিধান। দীক্ষা
অপেক্ষা সদ্যাক্রিয়মানতা জন্ম ইহাদের সাদ্যস্তু সংজ্ঞা।
জাত্যস্তোম নামক চতুর্বিধ একাধাগের বিধান। তিন পুরুষ
পর্য্যন্ত পতিত সাবিত্রীকদিগকে ব্রাত্য কহে; এই দোষ
পাত্তির জন্য ইহাদিগের অন্নুষ্ঠান ও লৌকিক অগ্নিতে ইহা-
দিগের হোমবিধি। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাত্যস্তোমে নৃত্যরীত-
কারী ব্রাত্যগণের অধিকার; সুশংসরূপে নিম্নিতব্যক্তির

দ্বিতীয় উক্ত্যসংস্থে অধিকার; তৃতীয়ে কনিষ্ঠের অধিকার;
ইহাতে কনিষ্ঠকে গৃহপতি করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে
হয়; চতুর্থে অন্ন সন্ততি স্থবির জ্যেষ্ঠের অধিকার, অর্থাৎ
ঐরূপ জ্যেষ্ঠকে গৃহপতি করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিতে
হয়। এই সকল কার্য্যের দীক্ষাবিধানাদি এবং ব্রাত্য-
স্তোম-সম্পাদনকারীর ব্যবহার বিধি। পরিশেষে ব্রহ্মবর্চসু,
বীর্ঘ্য, অন্ন ও প্রতীষ্ঠাদি অভিলাবী, এবং স্বীয় পবিত্রতা-প্রার্থী
ব্যক্তির অগ্নিষ্টোমসংস্থ অগ্নিষ্টুৎ নামক একাধাগের কর্তব্যতা।

৫ম কণ্ডিকার অগ্নিষ্টুৎের জব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধা-
নাদি বর্ণন। ত্রিসৃৎস্তোম নামক অগ্নিষ্টোমসংস্থ চতুর্বিধ
যজ্ঞের বিধান; তন্মধ্যে অনিরুক্ত প্রাতঃসবন প্রথম,
তাহার নাম ইপস্বয়জ; স্বর্গাদি অভিলাবী কিংবা গ্রামাদি
অভিলাবীর ইহাতে অধিকার; ইহার জব্য, দেবতা ও মন্ত্র-
বিধানাদি। বৃহস্পতি সর্বল দ্বিতীয়, রাজার সহিত ব্রাহ্মণের
(যে ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মস্থাপকরূপে অঙ্গীকার করেন, সেই ব্রাহ্ম-
ণের) ইহাতে অধিকার। তৃতীয়ের নাম ইবু; ইহা স্ত্রেনের
জব্য করিতে হয়, কিন্তু সদ্য অন্নুষ্ঠান নহে এইমাত্র
প্রভেদ; মৃত্যুকামনা করিয়াই ইহার অন্নুষ্ঠান করিতে হয়।

৬ষ্ঠ কণ্ডিকার সর্গস্ব নামক চতুর্থ একাধি যজ্ঞ;
জীবনাভিলাবী বা মৃত্যুকামনাকারী উত্তরেরই ইহাতে
অধিকার; সিদ্ধান্ত ইহার দক্ষিণা; এই যজ্ঞের জব্য, দেবতা
ও মন্ত্রবিধানাদি। ঋষিক অপোহনীর নামক দ্বিবিধ
যজ্ঞের বিধান; তন্মধ্যে প্রথমের নাম সর্গস্তোম; ঋশি-
হিক ছন্দোময়রূপে উক্ত্যসংস্থ উত্তম দিনঘর পৃথক্
করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋষিক অপোহনীর নামক দ্বিবিধ
যজ্ঞের বিধান, তন্মধ্যে প্রথমের নাম সর্গস্তোম, ঋশি-
হিক ছন্দোময়রূপে উক্ত্যসংস্থ উত্তম দিনঘর পৃথক্ করিয়া
দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋষিক অপোহনীর সম্পাদন করিতে হয়।
ব্রাত্যস্তোম চতুর্বিধ। ছান্দোগ্যে ইহাদিগের বিশেষ বিধি
লিখিত আছে। পরিশেষে ত্রিসৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ,
জিনব ও জয়জিংশ নামক ছয়টি একাধি পৃষ্ঠ্যস্তোম-বিশেষের
বিধান কথিত আছে।

৭ম কণ্ডিকার তাহাদিগের বিধান প্রকার, মন্ত্র ও দেবতা
প্রভৃতির কথন। অগ্ন্যধেয়, পুনরাধেয়, অগ্নিহোজ, স্বর্গ-
পৌর্ণমাস, দক্ষিণ ও অগ্নয়ণ নামক প্রতিকর্মে সোমযুক্ত
ছয়টি যজ্ঞ ও তাহার বিধানাদি কথিত আছে। ৮ম কণ্ডিকার
সপ্তদশ জ্ঞোমক পাঁচটি যজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে গ্রামাভিলাবী
ব্যক্তির উপহব্য নামক অনিষিত যজ্ঞবিধান এবং মিথ্যাভি-
ব্যক্তিগণ ও ঐ যজ্ঞে অধিকারবিধি। তাহার দক্ষিণা

বিধানাদি। দুর্গাভিলাষী ব্যক্তির ক্ষতপেয় এবং তাহার বিধান প্রকার, দেবতা ও মন্ত্রাদির বিষয় কথিত আছে। ৯ম কণ্ডিকায় পশুকাম ও বৈশ্বকাম ব্যক্তির বৈশ্বস্তোম; তাহার বিধানাদি। উক্ধ্যাসংহ ত্রীত্বং নামক যজ্ঞ। ত্রীত্ব-স্তোমে সোমের অভিশেষ থাকিলেও বিশেষ বিধান। তাহাতে সোমভিষ্মত স্বরাজ্য ভ্রষ্টরাজ্য; এবং দীর্ঘ ব্যাধিশাস্তি, গ্রাম, প্রজা ও পশুকামনাকারিদিগের অধিকার এবং তাহার বিধানাদি কথিত আছে। ১০ম কণ্ডিকায় রাজ্যপ্রার্থী ক্ষত্রিয়ের রাট্ নামক যজ্ঞ। তাহার বিধানাদি। এই যজ্ঞের অগ্নিষ্টোমসংহতা। ঋষভের জ্ঞায় এই ঐন্দ্রপরিযজ্ঞের কর্তব্যতা। অন্নাদি প্রার্থী ব্যক্তির বিরাট্ নামক যজ্ঞ; ইহারও ঐন্দ্রপরিযজ্ঞের জ্ঞায় আদ্যন্তে আগ্নেয় পশুসংযুক্ত করিয়া কর্তব্যতা। পুত্রার্থীর উপশদ নামক একাহ। তাহার বিধানাদি। উক্ধ্যাসংহ পুনস্তোম নামক একাহ। তাহাতে প্রতিগ্রহ দোষশাস্তি প্রার্থীর অধিকার। তাহার দক্ষিণাদি। পশুকাম ব্যক্তির চতুষ্ঠোম নামক ও উদ্ভিদ্বলভিন্দ নামক একাহদ্বয়। দর্শপৌর্ণমাসের জ্ঞায় মিলিত এই উভয়ের ফল সাধকতা। ইষুযজ্ঞ তাহার বিধানাদি। উদ্ভিদ্ব যজ্ঞের পর সেই দিন হইতে অর্দ্ধমাস, একমাস, অথবা সপ্তমসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ ইষু যজ্ঞের অহুষ্ঠানবিধি। তাহার বিধানাদি। পূজাভিলাষী ব্যক্তির অপচিতি নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। তাহাতে রাজা বা ত্রিজ্ঞাতির অধিকার। তাহার বিধানাদি। উভয় যজ্ঞের মধ্যে প্রথম যজ্ঞের নাম পক্ষীতি ও দ্বিতীয় যজ্ঞের নাম জ্যোতিঃ। এই উভয় যজ্ঞও সর্বাঙ্কিতের জ্ঞায় দীক্ষা-যুক্ত; ইহাদিগের দক্ষিণাবিধি। ঋষভ ও গোষব নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোমসংহ ঋষভে রাজার অধিকার, এবং তাহার দক্ষিণভেদ বিধি। উক্ধ্যাসংহ গোষবে অযুত গোদক্ষিণা, এবং বৈশ্ব বা অশ্র জ্ঞাতির তাহাতে অধিকার। তাহার বিধানাদি। মরুৎ-স্তোম নামক যজ্ঞবিধি। তাহাতে একত্রিত ভ্রাতৃসমূহ ও বন্ধু সমূহের অধিকার। বৈশ্বস্তোমনির্দিষ্ট দক্ষিণাই ইহার দক্ষিণরূপে নির্দেশ। ঐন্দ্রাণকুলার নামক যজ্ঞবিধি। পুত্রার্থী ও পশুপ্রার্থী ব্যক্তির তাহাতে অধিকার। গোকুল দক্ষিণ। ইহাতে দুই ভ্রাতা বা দুই সখার অধিকার, সমূহের নহে। রাজকর্তব্য, উক্ধ্যাসংহ ইন্দ্রস্তোমের বিধান। পুরোহিত প্রার্থীর ইন্দ্রাণোক্তোম নামক যজ্ঞবিধি। সাযুজ্য অভিলাষী রাজা ও পুরোহিতের ইহাতে অধিকার। উভয়ের একত্র বা পৃথকভাবে অধিকার, এইরূপ অধিকারের ভেদ-বিধি। পশুকাম ব্যক্তির অগ্নিষ্টোমসংহবিধান নামক যজ্ঞ-

দ্বয়ের বিধান। তাহাতে অভিচারকাম বা পশুকামের অধিকার। পশুকাম ব্যক্তির বৎস ও বৃদ্ধকুল বৃহৎগাভী, এবং অভিচারকামের ত্রিশটি গো দক্ষিণাবিধি। অভিচার-কামের সংদশ ও বজ্র নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। হন্বসোম-ভাবে এই উভয় যজ্ঞের কর্তব্যতা। এই উভয়ের মধ্যে বজ্রের ষোড়শিসংহ রূপভেদ কথন। সংদশ দ্বারা রাজার অভিচার করিলে, দেশের নহে এবং বজ্রদ্বারা দেশের অভি-চার করিলে, রাজার নহে; এইরূপ বিধান। মতান্তরে উভয়েরই বিপরীত ভাবে বিধান। অভিচার দ্বারা রাজাদির উপশম বা মারণ সম্পাদন করিয়া জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞদ্বারা আত্মত্বজির বিধান। এইরূপে সামবেদবিহিত একাহ নির্দিষ্ট আছে।

২৩শ অধ্যায়ে ৫টি কণ্ডিকা। তাহার ১ম কণ্ডিকায় অহীন নামক যজ্ঞসমূহের দ্বাদশ উপসদ এবং একমাসে তাহার সমাপনবিধি। সূত্যোপসদের বিশেষ উপদেশ। দীক্ষাভেদ বিধি; যথা সৌত্যাদিন ও উপসদসমূহের দিন গণনা করিয়া দীক্ষানিয়ম হুইরাত্রি হইতে দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত সম্পাদনযোগ্য বাগ অহীন নামে অভিহিত হয়। অস্ত্রের মতে পাঠ হেতু অতিরাজেরও অহীনসংজ্ঞতা। দ্বাদশিতে দশরাত্রাদির প্রবৃত্তিকে গোপ্যা কহে। দ্বাদশদিন কর্তব্য দশরাত্রের দ্বাদশিতে কর্তব্যতা। দ্বিরাত্রি প্রভৃতিতে সহস্র দক্ষিণা; চারিরাত্রি প্রভৃতিতে অধিক দক্ষিণাদানে প্রত্যহ সমভাগে দানবিধি। পরিশেষে অবশিষ্ট সমুদায়ের দান। ত্রয়োদশ অতিরাজের বিধান; যথা—ষোড়শিগ্রহ-রহিত চারিটি প্রথম অতিরাজ। তন্মধ্যে প্রজ্ঞাতিকামের নব সপ্তদশ নামক প্রথম অতিরাজ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবিশিষ্টা জ্যৈষ্ঠ জ্যেষ্ঠপুত্রের কর্তব্য বিষুব নামক দ্বিতীয় অতিরাজ; বাহার ভ্রাতৃব্য আছে তাহার গো নামক তৃতীয় অতিরাজ; স্বর্গকাম বা আরোগ্যকাম ব্যক্তির আয়ুঃ নামক চতুর্থ অতিরাজ। ধনাভিলাষীর জ্যোতিষ্টোম নামক পঞ্চম অতিরাজ। পশুকামের বিশ্বজিৎ নামক ষষ্ঠ অতিরাজ। ব্রহ্মভেজঃ প্রার্থীর ত্রিবিৎ নামক সপ্তম অতিরাজ। বীৰ্য্যকাম ব্যক্তির পঞ্চদশ নামক অষ্টম অতিরাজ। অন্নাদি অভিলাষী ব্যক্তির সপ্তদশ নামক নবম অতিরাজ। প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তির এক-বিংশ নামক দশম অতিরাজ। প্রাপ্ত পুত্র ধন্য হইলে পুনর্বার তাহার প্রাপ্তি অশ্রু আশ্রোধ্যাম নামক একাদশ অতিরাজ। ভ্রাতৃব্যবানের অভিজিৎ নামক দ্বাদশ অতি-রাজ। ঐশ্বর্য্যপ্রার্থীর সর্বাঙ্কোম নামক ত্রয়োদশ অতিরাজ। এইরূপে ত্রয়োদশ প্রকার অতিরাজের বিষয় কথিত আছে।

২য় কণ্ডিকার দুই তৃতীয় তিনটি অহীনবিধি। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অহীনের বোড়শিগ্রহরহিত দুইটি অতিরাজ। তিনটি অহীনের অঙ্গিরস, চৈত্ররথ ও কাপিবন, এই তিনটি নাম কথন। দ্বিতীয় ত্রিরাত্রির উক্ত্য পূর্ণতা-রূপ অন্যের মতভেদ। পাণ্ডিক অগ্নিষ্টোম স্থানে উক্ত্যানির্দেশ। সংহতভেদমাত্রই তাহার ধর্ম। পুণ্যযোগ্য হইয়াও যে পুণ্যহীনের ন্যায় হয়, তাহারই আঙ্গিরসে অধিকার। পূজার্থী ব্যক্তির চৈত্ররথে অধিকার। স্বর্গকাম বা পশুকাম ব্যক্তির কাপিবনে অধিকার। ত্রিহুতীর গর্গ, বৈদ, ছন্দোম, অশ্বব্রহ্ম ও পরাক নামক পাঁচটি অহীনযজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে বৈদ ত্রিরাত্রিসাধ্য এবং ত্রিবৃন্তোমযুক্ত অপর সমুদায় অতিরাজসাধ্য। এই পঞ্চবিধ-যজ্ঞে সংহতভেদ কথন। এই সমুদায়ে রাজ্যকামের অধিকার; তবে অন্তর্ব্রহ্মতে পশুকামের এবং পরাক স্বর্গকামের অধিকার আছে; এইমাত্র ভেদকথন। অত্রিচতুর্বার, জামদগ্ন্য, বশিষ্ঠসংসর্গ ও বিশ্বামিত্র নামক চারিটি চারিদিন-সাধ্য যজ্ঞবিধান। তন্মধ্যে জামদগ্ন্যযজ্ঞে পুটিকাম ব্যক্তির অধিকার; তাহাতে বিংশতি দীক্ষা এবং এই চারিটি যজ্ঞেই পুরোডাশবিধিষ্ট উপসদের বিধান কথিত আছে। ৩য় কণ্ডিকায় তাহার বিধান প্রকারাদি। ৪র্থ কণ্ডিকায় পঞ্চদিনসাধ্য তিনটি অহীন বিধান। তন্মধ্যে প্রথম অহীনের নাম দেবপঞ্চাহ, দ্বিতীয়ের নাম পঞ্চশারদীয়; এই উভয় অহীনের বিধানাদি কথন। তৃতীয় পঞ্চাহের ব্রতবৎ নাম কথন। এই ত্রিবিধ পঞ্চাহ যজ্ঞে জ্যোতির্গৌ, মহাব্রত ও গৌরায় নামক তিনটি একাহ যজ্ঞের বিধি। সর্গজিভের ন্যায় ইহাতে দীক্ষানিয়ম এবং তাহার বিধানাদি নির্দিষ্ট আছে। ৫ম কণ্ডিকায় ছয়দিন-সাধ্য তিনটি অহীনের বিধি। তিনটি অহীনের ঋতু বড়হ, পুষ্টাবল্য ও ত্রিকঙ্ক, এই তিনটি নাম কথন। এই ত্রিবিধ যজ্ঞে স্তোমবিধানাদি। সপ্তাহসাধ্য সাতটি অহীনের বিধান। তন্মধ্যে চারিটির উত্তম মহাব্রত। এই চারিটির মধ্যে তৃতীয়টিতে পশুকামের অধিকার। পঞ্চম অহীনের নাম ইন্দ্রসপ্তাহ; এই পঞ্চম সপ্তাহে দ্বিতীয় একাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টি একাহ এবং সপ্তাহ সমুদায়ের বিধান। ঐ সপ্তাহ সমুদায়ের প্রত্যেক সপ্তাহেই জ্যোতিঃ, গৌঃ, আয়ুঃ, অতিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও সর্গজিৎ এই ছয়টি মহাব্রতের কর্তব্যতা। এইরূপ সমুদায় দিনসাধ্য যজ্ঞেই মহাব্রতের বিধান। উত্তম সর্গস্তোমের বিধান; তাহার শেষ দিনে জ্যোতিঃ, গৌঃ, আয়ুঃ, অতিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও সর্গজিৎ মহাব্রতবিধিষ্ট সর্গস্তোম অতিরাজ। জনক সপ্তরাজ নামক

ষষ্ঠ-সপ্তাহ। তাহার বিধানাদি। উত্তম সপ্তম সপ্তাহে বৃহজ্জ্যোতির সামযুক্ত পুটিক বিধান। এই সমুদায়ের পুষ্টোম সংজ্ঞা। এইরূপে সপ্তসপ্তাহ অহীনের বিধান কথিত আছে। তৎপরে তাহার বিধানাদি। অষ্টমত্যা অহীনে পাণ্ডিক বড়হের পর হইতে মহাব্রত কর্তব্য। নবরাত্রে ত্রিকঙ্ক, জ্যোতিঃ, গৌঃ ও আয়ুঃ নামক মহাব্রতের বিধান। তাহার প্রকারান্তর। তাহার বিধানাদি। চারিটি দশরাত্রে বিধি। প্রতীক্টা-কামনাকারী ব্যক্তির ত্রিকঙ্ক নামক প্রথম দশরাজ; অভিচারকারীর কোলুক্রবিল নামক দ্বিতীয় দশরাজ; পূর্ণশ-রাজ নামক তৃতীয় দশরাজ; পশুকাম ব্যক্তির ছন্দোম নামক চতুর্থ দশরাজ। তাহার বিধানাদি। পৌণ্ডরীক নামক একাদশ রাজ এবং তাহার বিধানাদি কথিত আছে।

২৪শ অধ্যায়ে ৭টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় ষাদশরাজ হইতে এক একদিন বৃদ্ধি করিয়া, চষাশিংশৎ রাত্রি পর্যন্ত যজ্ঞবিধি, তাহাতে যে ক্রমানুসারে যে সকল দিন উপদিষ্ট আছে, সেই সকল দিন সেইরূপই বুদ্ধিতে হইবে। আবাসিক সমূহের অন্ত্যক্রম এবং উপদেশিক সমূহের উপদেশক্রমই গ্রহণ করিতে হয়। উপদিষ্টদিন ব্যতিরিক্ত অন্ত্যদিন সমূহের আবাপক্রম কথন; যথা—যজ্ঞ অপূর্ণ হইলে দশরাজ আবাপ হয়; ইহা যজ্ঞের পরেই হয়, পূর্বে হয় না। পাণ্ডিক অহ ছয়, এবং ছন্দোম অহ চারিটি এই দশরাজ, অথবা পুষ্টা বড়হ তিনটি ছন্দোম ও অবিবাক্য এই সমুদায়ের নাম দশরাজ। এই দশরাজ সমুদায় দিনের অন্তে জানিতে হইবে। দশরাত্রে পর একাহ বিষয়ে প্রকৃতিবিহিত সমুদায়ে মহাব্রত হয়। যজ্ঞ সংখ্যাপূরণ জন্ত দশরাত্রে পর একাহ ব্যতীত মহাব্রত হয়। মহাব্রত ব্যতীত অজ্ঞ কার্যসমূহ আবাপের পর ও দশ-রাত্রে পূর্বে করিতে হয়। যেখানে বড়হ ব্যতীত যজ্ঞ-সংখ্যা পূর্ণ হয় না, তথায় বড়হপূরণের জন্ত অভিপ্লবের ব্যবহার হয়। অভিপ্লবের পূর্বে পঞ্চাহ সমুদায় ও পঞ্চাহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে অমুষ্ঠিত হয়। জাহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে, জাহ বিষয়ে জ্যোতিঃ, গৌঃ ও আয়ুঃ বিধান, এই তিনটিকে ত্রিকঙ্ক কহে। চতুরহব্যতীত যজ্ঞ সংখ্যাপূরণ না হইলে, চতুরহ বিষয়ে জ্যোতিঃ প্রকৃতি তিনটি ও মহাব্রতের অমুষ্ঠান করিয়া পূরণ কর্তব্য। বাহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে, বাহ বিষয়ে গৌঃ ও আয়ুঃ পূরণ হইয়া থাকে। যজ্ঞের আবারম্ভে অতিরাজ কর্তব্য। প্রারণীর ও উদয়নীলের মধ্যে আবাপস্থান করিতে হয়। যে আবাপ করিবার বিধি আছে, তাহার অতিরাজবহন মধ্যে করণের

বিধান। আবাপসমূহের সমবার দ্বারা দেখানে যজ্ঞ পূর্ণ হয়, তহার যে যে অঙ্কঠান অন্ন, তাহাই প্রথমে করিবার বিধি। দুইটি জ্যৈষ্ঠরাত্রি যজ্ঞের বিধি। ইহাতে পৃষ্ঠ্য সম্পাদিত হইলে সর্কস্তোম নামক অতিরাত্রের বিধান; অর্থাৎ সমুদায় যজ্ঞেই দ্বাদশাহ ধর্মের বিধান আছে, জুতরাং ইহাতেও দ্বাদশরাত্রসমূহ সম্পাদন এবং সর্কস্তোম অতিরাত্রের অঙ্কঠান করিবে; তাহা হইলেই জ্যৈষ্ঠরাত্রি রাত্রের পূরণ হইল। ইহার ক্রম যথা—প্রথমদিনে প্রায়ণী অতিরাত্র, দ্বিতীয়দিন হইতে ছয়দিন পর্যন্ত পৃষ্ঠ্যবধূহ, অষ্টমদিনে সর্কস্তোমঅতিরাত্র, নবমদিন হইতে চারিদিন চারিটি ছন্দোমা এবং জ্যৈষ্ঠরাত্রি উদয়নীয় অতিরাত্র। দ্বিতীয় জ্যৈষ্ঠরাত্রি দশরাত্রের পরে মহাত্রত করিতে হয়, এইরূপ ভেদ কথিত আছে। সম্ভাব্য তৃতীয় জ্যৈষ্ঠরাত্রির গবাময়নের ক্রম সম্ভরণপ্রকার। চতুর্দশরাত্রি তিনটি যজ্ঞের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি। তন্মধ্যে শেষ চতুর্দশরাত্রি বিবাহোদকতন্ত্রসংশ্লিষ্টগণের অধিকার। পঞ্চদশরাত্রি চারিটি যজ্ঞের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি এবং সপ্তদশরাত্রি, অষ্টাদশরাত্রি, একোবিংশরাত্রি ও বিংশতিরাত্রি এইরূপ আবাপন পূরণ কথিত আছে। ২য় কণ্ডিকায় ষোড়শরাত্রি প্রভৃতি চারিটিতে আবাপ প্রকার। তন্মধ্যে ষোড়শরাত্রি প্রায়ণীয়ের পর ত্রিকঙ্কর ও দশরাত্রের ব্রত; সপ্তদশরাত্রি প্রায়ণীয়ের পর পঞ্চাহ; অষ্টাদশরাত্রি প্রায়ণীয়ের পর বধূহ; একোবিংশরাত্রি প্রায়ণীয়ের পর বধূহ এবং দশরাত্রের পর ব্রত; এইরূপ আবাপ উক্তির দ্বারা বিধান প্রকার। এক বিংশতিরাত্রি দুইটি অতিরাত্র, তাহাতে আবাপ প্রকার ও তাহার বিধানাদি। অন্নাদিকাম ব্যক্তির দ্বিংশতিরাত্রির বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি। প্রতিষ্ঠাকামের জ্যৈষ্ঠবিংশতিরাত্রিবিধান। প্রজাকাম ও পণ্ডকাম ব্যক্তির চতুর্বিংশতিরাত্রির বিধান; ইহা দ্বিবিধ, তন্মধ্যে প্রথমের বিধানাদি এবং দ্বিতীয়ের সংসদ নাম ও তাহার বিধানাদি কথিত আছে। অন্নাদি কামের পঞ্চবিংশতিরাত্রির বিধি। প্রতিষ্ঠাকামের ষড়্বিংশতিরাত্রির বিধান। ধনকামের সপ্তবিংশতিরাত্রির বিধি। প্রজাকাম ও পণ্ডকামের অষ্টবিংশতিরাত্রি এবং দ্বিংশতিরাত্রির বিধি। এই সমুদায়ের ক্রমশঃ বিধান। একোবিংশরাত্রি, দ্বিংশরাত্রি, একত্রিংশরাত্রি ও দ্বাত্রিংশরাত্রির বিধানাদি, ত্রয়ত্রিংশরাত্রির ত্রিবিধভেদ ও ত্রিবিধানপ্রকার, চতুত্রিংশরাত্রিবিধি চত্বারিংশরাত্রি পর্যন্ত সপ্তযজ্ঞের আবাপক্রমাদ্বারা পূরণ বিধি। তাহার বিশেষ নিয়ম। যজ্ঞ—অন্নাদিকামের চতুত্রিংশরাত্রি, প্রতিষ্ঠা-

কামের ষট্‌ত্রিংশরাত্রি, প্রজাকামের সপ্তত্রিংশরাত্রি, প্রজাকাম ও পণ্ডকামের অষ্টাত্রিংশরাত্রি এবং চত্বারিংশরাত্রি যজ্ঞের বিধান। একোদশরাত্রি, দ্বাত্রিংশরাত্রি সপ্ত যজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে প্রথমের নাম বিধতি, তাহার বিধানাদি। দ্বিতীয়ের নাম সমাতিরাত্রি, তাহার বিধানাদি। তৃতীয়ের নাম অজ্ঞানভ্যজ্ঞনীয়, বিধানাদিগের মধ্যে আপনার খ্যাতি-আকাজীগণের ইহাতে অধিকার এবং ইহার বিধানাদি। চতুর্থের নাম সৎসংসরিত, তাহার বিধানাদি। ৩য় কণ্ডিকায় ইহার সাদৃশ্য জন্ম প্রসঙ্গাধীন পুত্রার্থিগণের কর্তব্য একষট্‌তিরাত্রির বিধান। সবিতার উদ্দেশে পঞ্চম ককুত-বিধি। তাহার বিধানাদি। তাহাতে পুত্রার্থীর অধিকার। ষষ্ঠ ও সপ্তমের সামান্ত্র বিধান। শতরাত্রির বিধানাদি এবং ঐ বিধানে বিকল্পবিবরণ কথিত আছে। ৪র্থ কণ্ডিকায় সৎসংসরিত প্রভৃতি হোমের বিধানাদি। সৎসংসরিত প্রভৃতি যজ্ঞে গবাময়নধর্মের অতিদেশ। আদিত্যগণের অয়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি। আদিত্যগণের অয়নের ক্রম অদিত্যগণের অয়নবিধি। তাহার বিশেষ নিয়ম। দৃতিবাত-বানের অয়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি। কুণ্ডপারিগণের অয়ন নামক যজ্ঞের কালবিধানাদি। ঐ যজ্ঞে স্তুত্যা হানসমূহে সোম ও উপনহন প্রভৃতির বিশেষ বিধি। সর্পসত্র নামক যজ্ঞের ভেদবিধানাদি এবং তাহাতে গবাময়ন ধর্মের অতিদেশ কথিত আছে। ৫ম কণ্ডিকায় তাপশ্চিত নামক যজ্ঞের বিধানাদি; মহাতাপশ্চিত যজ্ঞের বিধানাদি; ক্ষুদ্রক তাপশ্চিত নামক যজ্ঞ ও সহস্রপাণ্যামি যজ্ঞের বিধানাদি; ত্রিসংসরিত যজ্ঞের বিধানাদি; মহাসত্র নামক যজ্ঞের বিধানাদি; দ্বাদশ বৎসরসাধ্য প্রজাপতিসত্র নামক যজ্ঞের বিধানাদি; ষট্‌ত্রিংশ বৎসরসাধ্য শক্ত্যানাময়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি; শত বৎসরসাধ্য সাধ্যানাময়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি; সহস্র বৎসরসাধ্য বিশ্বজ্ঞানাময়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি (গৌণ বৃত্তি অল্পদ্বারে এই যজ্ঞ সহস্র দিনসাধ্য বৃত্তিতে হইবে); সারস্বত যজ্ঞসমূহের বিধানাদি; যাংসত্র নামক যজ্ঞবিধি; শতসংখ্যক প্রথমগতিগী বৎসতরী ও একটি বুঝ সহস্র সংখ্যাপূরণ জন্ম এই যজ্ঞে বনে ত্যাগ করার বিধি; সারস্বতযজ্ঞের দীক্ষাকাল ও দেশাদি বিধান। (যথা—চৈত্র শুক্লপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী বিনশন নামক স্থানে দীক্ষা কর্তব্য। সরস্বতী বিনশন স্থান যথা—সরস্বতী নদী যে নদী প্রবাহিতা আছে, তাহার পূর্ব ও পশ্চিমভাগ মহাব্যগণের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু মধ্যভাগ ভূমি মধ্যে নিম্নরূপ থাকায় কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না; এই স্থানকে সরস্বতীবিনশন

কহে। ইহাতে দীক্ষাবিধানাদির প্রকার।) ৬ষ্ঠ কণ্ডিকার তাহার অঙ্গবিধানাদি। সারস্বতী ও দ্ব্যবতীর সমন্বয়ে তাহার বিধানাদি। প্রকল্পণ নামক সারস্বতীর উৎপত্তি স্থানে অগ্ন্যেকার্য নামক যজ্ঞের বিধি। এই যজ্ঞ কারণ নামক দেশবিশেষে বলমানের অবতৃপ্তানবিধি। যজ্ঞশেষে উদবসনীরের কর্তব্যতা। পৃষ্টশমনীরশূঙ্খ তিনটি সারস্বতযজ্ঞের বিধান। পূর্কোক্ত সহস্র যজ্ঞ পূরণ না হইত গৃহপতির মৃত্যু বা সমুদার গো বিনষ্ট হইলে এই যজ্ঞ সমাপনের বিধি। সহস্রপূরণ হইলেও এই যজ্ঞ সমাপন করিতে হয়। গৃহপতির মৃত্যু হইলে, আয়ুঃনামক অতিরাজ্যজ্ঞ করিয়া এবং জ্যায়মূহ নষ্ট হইলে বিশ্বজিৎ-নামক যজ্ঞ করিয়া সমাপন করিবার বিভিন্ন বিধি। উত্তর ঘটনাতেই জ্যোতিষ্টোম দ্বারা সমাপনরূপ অজ্ঞ মত কথন। এইরূপে প্রথম সারস্বত কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সারস্বত দৃতিবাতবানের অয়নের জ্ঞান কর্তব্য। তাহার বিধানাদি। তাহাতে তিথির ক্ষয়বৃদ্ধিরও বিশেষ বিধান। তুরুরূপক্কের বিশেষ বিধানাদি। তৃতীয় সারস্বতে বিশ্বজিৎ ও অভিজিতের বিধানাদি। তাহাতে ঋত্বিক্ অথবা আচার্য্যের দার্ষভত নামক যজ্ঞ কর্তব্যতা। এই যজ্ঞে এক বৎসরের অজ্ঞ বনমধ্যে গোসকল পরিত্যাগ করিবে; দ্বিতীয় বৎসরে তাহাদিগকে নির্জল স্থানে রক্ষা করিবার বিধি। ঐ বৎসরেই সারস্বতীতরে নৈতক্কা নামক যে সকল প্রাচীন গ্রাম আছে, তাহাতেই অধ্যাপানের আরম্ভবিধি এবং কুরুক্ষেত্রে পরীণৎ নামক স্থলে অম্বারস্ত্র বিধি। তৎপরে তৃতীয় বৎসরে পরীণৎ নামকস্থলেই দর্শপৌর্ণমাসান্ত কার্য্যের কর্তব্যতা। দ্ব্যবতীতীর দিয়া আগমন করিয়া যমুনায় অবতৃত্ত জ্ঞান এবং ঐ স্থানে মন্ত্রপাঠের বিশেষ বিধান কথিত আছে। ৭ম কণ্ডিকায় চৈত্র বা বৈশাখমাসের শুক্লপঞ্চমীতে তুরায়ণ নামক সারস্বতযজ্ঞের কর্তব্যতা। তাহার দীক্ষা বিধানাদি। এই যজ্ঞ এক বৎসরসাধ্য। তাহাতে বর্ষ পর্য্যন্ত কর্তব্যের উপদেশ। দার্ষভতের জ্ঞান অনিয়ত অবতৃপ্ত জ্ঞানবিধি। ভরতবাদশাহ প্রভৃতি বাদশাহ ভেদ কথন। তাহার বিধানাদি এবং উৎসগিসমূহে গবাময়নের বিকল্প বিধান বিহিত আছে।

২৫ অধ্যায়ে ১৪টি কণ্ডিকা। তাহাতে অঙ্গবৈশিষ্ট্য দোষের উপশম অজ্ঞ প্রায়শ্চিত্তবিধান। (প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ যথা—প্রপূর্বক আর ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় করিয়া প্রায় পদ নিশ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ বিধি অতিক্রম অজ্ঞ দোষ; চিত্ত ধাতুর উত্তর ভাবে ক প্রত্যয় করিয়া চিত্তপদ নিশ্পন্ন

হয়, ধাতুসমূহের বহুবিধ অর্থ বিহিত থাকায় তাহার অর্থ সন্ধান, প্রায়ের অর্থাৎ বিধি-অতিক্রম অজ্ঞ দোষের চিত্ত অর্থাৎ সন্ধান, এই বাক্যে পাণিনী ব্যাকরণোক্ত “প্রায়শ্চিত্ত চিত্ত চিত্তরোঃ” এবং “পারস্কর প্রভৃতি” শব্দদ্বারা মধ্যে ‘হৃট্’ আদেশ পূর্বক এই পদ নিশ্পন্ন হইয়াছে। সর্ককার্য্যের অজ্ঞে অথবা নিমিত্তকালে প্রায়শ্চিত্তের কর্তব্যতা।) প্রায়শ্চিত্তবিশেষের আদেশ না থাকিলে, সর্কত্র মহাব্যাহতি হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধি; বিশেষ আদেশ থাকিলে আদেশানুসারেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (যথা—“প্রীতাঃ ক্ষমা অভিমুশেৎ” এই যজুঃশ্রুতিদ্বারা প্রীতিভাতিমর্ষণরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি হইয়াছে বলিয়া ইহাই কর্তব্য।) ঋগ্বেদোক্ত হোত্রিক কর্ত্ত উপঘাত হইলে, গার্হপত্য অগ্নিতে ‘ভূঃ’ সাহা বলিয়া অগ্নিদৈবত হোম করিবে; ইহাতে কর্ত্তার বিশেষ আদেশ না থাকিলে ব্রহ্মেরই করা উচিত। ব্রহ্মবরণের পূর্বে নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মবরণের পূর্বেই ব্যাহতিহোমের অজ্ঞ অপর ব্রহ্মবরণ করিয়া তাহার দ্বারা করাইবে। যে অগ্নি-হোত্রাদিতে ব্রহ্মবরণের বিধি নাই, তাহা স্বয়ং কর্ত্তব্য। কালাহতি দ্বারা সোমে ইহার সমুদয় করিতে হয়। যজুঃ-র্কোক্ত কর্ত্তের উপঘাত হইলে, দক্ষিণাগ্নিতে ‘ভূঃ সাহা’ বলিয়া হোম করিতে হয়, তাহাও পূর্কের জ্ঞান ব্রহ্মেরই কর্ত্তব্য। সোমে আয়ীত্রীয় অগ্নিতে ‘ভূঃ সাহা’ বলিয়া হোম করিতে হয়; এইমাত্র পূর্কের সহিত ইহার বিভিন্নতা। ইহার দেবতা বায়ু। সামবেদবিহিত কর্ত্তের উপঘাত হইলে, আহবনীয় অগ্নিতে ‘সঃ সাহা’ বলিয়া হোম করিবে; ইহার দেবতা সূর্য্য। সর্কবেদোক্ত কর্ত্তের উপঘাত হইলে তিনবার পৃথক্ পৃথক্ ‘ভূভূবঃ সঃ সাহা’ এই বাক্য দ্বারা এবং একবার সমুদায় মিলিত বাক্য দ্বারা এই চারি বার হোম করিতে হয়। “অয়াশ্চায়ে” ইত্যাদি পঞ্চ ঋক্ দ্বারা প্রত্যেক ঋকে আহবনীয় অগ্নিতে পঞ্চ আহতিরূপ সর্কপ্রায়শ্চিত্ত নামক হোম করিবে। স্মৃতিবিহিত অজ্ঞাত কর্ত্তে পৃথক্ ও মিলিত ভাবে চারিটি মহাব্যাহতি হোম করিতে হয়। (যেমন যজ্ঞো-পবীতধারী ব্যক্তি শিখাবদ্ধ করিয়া পবিত্র দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কর্ত্ত করিবে, এই নিয়মস্থলে যজ্ঞোপবীত ধারণাদি স্মৃতি বিহিত কর্ত্ত; ইহার কোনরূপ উপঘাত হইলে ব্যস্ত ও মিলিত চারিটি মহাব্যাহতি হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।) তাহার পর যজুঃর্কোক্ত সর্কপ্রায়শ্চিত্ত নামক পূর্কোক্ত পঞ্চঋক্ বেদীয় আহতিরূপ প্রায়শ্চিত্ত সমুদায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে করিবার বিধি। (কিন্তু ইহাতে সম্প্রদায় ভেদ আছে, যথা—গার্হপত্যে ভূঃ, দক্ষিণাগ্নিতে ভূবঃ, আহবনীয় অগ্নিতে সঃ,

এবং সর্গপ্রাশ্চিত্ত নামক পক্ষ আহতিরূপ প্রাশ্চিত্ত হোমে
ভূত্বঃ স্বঃ। তৎপরে কর্ণবিশেষাঙ্গসারে প্রাশ্চিত্ত বিধান
কথিত আছে। এই অধ্যায়ের ৭ম কণ্ডিকার ৮ম সূত্র
পর্যন্ত এই সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে; তাহার পর
৯ম সূত্র হইতে কর্ণসমাপ্তির পূর্বে বজ্রমানের মৃত্যু
হইলে তখনই কর্ণসমাপ্তি হয়, এইরূপ এক পক্ষ এবং
ঋত্বিক প্রভৃতি অবশিষ্ট ভাগ সমাপ্ত করিবেন এইরূপ অপর
পক্ষ; তাহাতে কর্ণসমাপ্তি পর্যন্ত উত্তর ক্রিয়াবিশেষের
বিধান বিহিত আছে। ৮ম কণ্ডিকায় উপকৃত পশুর
পলায়ন প্রভৃতিতে প্রাশ্চিত্তের ভেদ কথন। তাহার পর
‘অন্ত্যবাগপদ্ধতি। ৯ম কণ্ডিকায় অস্থিসঞ্চয় প্রকারাদি।
১০ম কণ্ডিকায় যজ্ঞবিশেষ করিবার জন্ত উদ্যম করার পর
দৈবাৎ তাহা না করা হইলে, বিশ্বজিৎ নামক অতিরাত্র
যজ্ঞ করিবার বিধি। যজ্ঞাদির জন্ত দীক্ষা করিলে যদি দৈবাৎ
বা কোন সমুদ্র জন্ত সেই দীক্ষা অর্দ্ধকৃত বা স্থানীয় যজ্ঞ সমাপন
করিব না, যদি এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হয়; তাহা হইলে
সোমযুক্ত সাধারণ ধাতু দ্ব্যাদি সর্বস্ব দক্ষিণার সহিত বিশ্ব-
জিৎ নামক অতিরাত্র যজ্ঞ করিবে। অধ্বর্যু প্রভৃতির
দৈবাৎ স্ব স্ব কার্য্য করা না হইলে, অদক্ষিণা-ভাবেই কর্ণ
সমাপন করিয়া, পুনর্বার অজ্ঞকে বরণপূরক যাগ আরম্ভ
করিবার বিধি। তাহাতে দিনভেদের বিশেষ নিয়ম।
দীক্ষিত ব্যক্তির পত্নী যদি রজস্বলা হয়, তাহা হইলে দীক্ষারূপ
শঙ্কুনিধান করিয়া রক্তস্রাব পর্যন্ত বালুকায় অবস্থান করিবে।
মৃত্যু বর্তমান থাকিলে সিকতার উপবেশন করিবে।
প্রাতঃকাল ও সারংকালে বেদীর নিকটে সিকতার উপর
উপবেশন করিবে। চতুর্থ দিবসে গোমূত্রমিশ্রিত জল দ্বারা
স্মৃতিবিহিত জ্ঞান করিয়া, বস্ত্রপরিধানপূর্বক সাম্প্রতিক
কার্য্য করিবে; আরাং উপকারক কার্য্য কর্তব্য নহে।
(দীক্ষণীয় ভূমি উল্লেখন প্রভৃতি কার্য্যকে আরাং উপকারক
কার্য্য কহে।) পত্নী প্রসূতা হইলে দশরাত্রির পর জ্ঞান
করিবে। মতান্তরে গর্ভিণীর দীক্ষা নিষেধ আছে। কিন্তু
“অযজ্ঞিগাঃ গর্ভাঃ” এই শ্রুতি অঙ্গসারে গর্ভবতীরও দীক্ষায়
অধিকার আছে, ইহাই কাভ্যারনের মত। দীক্ষিত ব্যক্তির
হঃস্বপ্রাদি দর্শন প্রভৃতিতে প্রাশ্চিত্তের বিশেষ বিধি।
চমসের পান ও অপান সৰ্ব্বদে প্রাশ্চিত্ত বিধান। সোমের
উপর মেঘবর্ষণ হইলে ভক্ষ্যাতক্ষ্য নিশ্চয়পূর্বক তাহাতে
প্রাশ্চিত্তবিধি। চমস দোষ বিষয়ে এবং জ্রোণকলসের
শোষ-বিষয়ে প্রাশ্চিত্ত বিধান। অত্রিভেদনে হোমভেদ
প্রাশ্চিত্ত। ১১শ কণ্ডিকায় সোমের অপহরণ হইলে অব্যক্ত

রক্তিমাত্ত পুশ্প ও তৃণ সোমকার্য্যে নিধান করিয়া অভিব্য
করিবার বিধি। বহুকালীন খদিরবৃক্ষ লতার ন্যায় অকুরিত
হইলে, তাহাকে শ্রেনকৃত কহে; ঐ শ্রেনকৃত এবং শ্রামা
(সোমসদৃশ পুতিকা নামক লতাবিশেষ), অক্ষণবর্ণ দূর্বা,
অব্যক্ত রক্তিমাত্ত দূর্বা, হরিৎবর্ণ কুশ অথবা অন্তঃ কুশ,
এই সকল দ্রব্যের মধ্যে পূর্ব পূর্ব দ্রব্যের জ্ঞাতব্য হইলে
পর পর দ্রব্য প্রতিনিধান করিয়া অভিব্য করিবার নিয়ম।
তাহাতে গোদানপ্রাশ্চিত্ত করিয়া, উক্ত দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ
সমাপন কর্তব্য। অবভুথের পর পুনর্বার তাহাতে যজ্ঞ-
বিধি। সোম কলসভেদাঙ্গসারে সামপাঠ প্রাশ্চিত্তবিধান।
অভিব্য কর্ণে প্রসূতি পরিমিত সোমরস প্রাপ্ত হইলে জলাদি
দ্বারা তাহা বৃদ্ধি করিয়া কলস পূর্ণ করিয়া জ্রোণকলসের
পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হয়। সোম পরে প্রাপ্ত হইলে যে
কিছু দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আনয়ন করিয়া পুনর্বার
যজ্ঞ করিবার বিধি। তাহাতে গোদান প্রাশ্চিত্ত করিবার
নিয়ম। ১২শ কণ্ডিকায় সোমের আধিক্য হইলে আদ্য
প্রভৃতি সর্বন বিশেষাঙ্গসারে প্রাশ্চিত্তভেদ বিধান। দীক্ষিত
ব্যক্তির রোগ হইলে, জ্রোণকলসে যে গুষ্টিগিপ্লী প্রভৃতি
বপন করা হয়, তন্মধ্যে যে দ্রব্য লইবার ইচ্ছা হয়, তাহাই
লইয়া চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিবেন; কিন্তু তৎপাত্ত
অন্য দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা বিধেয় নহে। তাহার বিধানাদি।
অরযুক্ত ব্যক্তিরও পূর্বোক্ত দেশে অবস্থানকাল পর্যন্ত রোগ-
শাস্তি বিধান; অন্যত্র নহে। প্রাতঃসবনে তাহার মস্ত
বিশেষ দ্বারা অভিষেক প্রকার। সবনের পর দীক্ষিত
ব্যক্তিকে সমুদায় ঋত্বিকগণ স্পর্শ করিবেন; তাহাতে বজ্র-
মানের মস্তভেদ দ্বারা স্পর্শ বিধি। দীক্ষিত ব্যক্তির মৃত্যু
হইলে তাহাকে দাহ করিবার পর তাহার আহ্নসমূহ কৃত্যমুগ
চর্ণে বাধিয়া, মৃত ব্যক্তির পত্নী স্বীয় কর্ণ ও পতিকর্ষ সম্পাদন
করিবেন। পত্নীর মৃত্যু হইলে তাহার নেদেগী ভ্রাতাদিগকে
দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ সমাপন করিতে হইবে; এইরূপ মতান্তর
আছে। কিন্তু কাহারও মতে মৃত্যু হইলেই যজ্ঞেরও সমাপন
হয়। উভয় পক্ষেই তাহাতে প্রাশ্চিত্ত বিধানাদি।
১৩শ কণ্ডিকায়—উপভরণ দিনে বজ্রমানের মৃত্যু হইলে
বিশেষ প্রাশ্চিত্তবিধান। যজ্ঞদীক্ষা মধ্যেই মৃত্যু হইলে,
উক্ত সোমাদি কার্য্য জন্ত দীক্ষিত ব্যক্তির কর্ণফল হয়; কিন্তু
মতান্তরে কথিত আছে—দীক্ষিত ব্যক্তির ভ্রাতা প্রভৃতিরই
প্রকৃত যজ্ঞফল প্রাপ্তি হয়। স্বকীয় অগ্নিতে স্বকীয় দ্রব্য দ্বারা
সামিক নেদেগী পুত্রাদি কর্তৃক সামিতিত্যাগি যজ্ঞ অহুতি
হইলে নেদেগীরই ফলপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞফল

যজমান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে উপদীক্ষী ব্যক্তি নথ্যেছন দিন হইতে ষাট দিন পর্যন্ত সাপ্নাভিক করিবেন। যদি নৈদেজী আহিতাশ্রি না হয়, তাহা হইলে যজকারী ব্যক্তিরই অগ্নিতে কার্য্য করিতে হয়। তাহাতে বৈশ্বানর নির্বাণ নামক প্রারম্ভিত্ত বিধান। ১৪শ কণ্ডিকায়— এক রাজার অধীন যজমানঘর যদি পূর্কত বা নদী প্রভৃতির ব্যবধানশূন্য সমান দেশে যজ করেন, তাহাতে সোমসংসব হয়। আর যদি পরস্পর বিরোধী যজমানঘর ঐরূপ এক স্থানে যজের জন্ত সোমের অভিষব করেন, তাহা হইলে মিলিতভাবে কার্য্য করার জন্য তাহাকে সংসব কহে। তাহাতে সমুদায় কর্ম্মই সত্তর সম্পাদন করা উচিত। তাহার বিধানাদি। দেশকাল ভিন্ন হইলে, পূর্কতাদির ব্যবধান থাকিলে এবং পরস্পর বিরোধী না হইলে তাহা সংসব হয় না; এইরূপ ভেদকথন। সংসববিষয়ে আপনার ন্যায় মৃত্যুকাম্যকারী হোত্রাদি কর্তৃক কর্তব্যকর্ম্ম বিশেষের বিধান। যথা, হোতার মৃত্যুকাম্যকারী হোতা, অধ্বর্য্যুর মৃত্যুপ্রার্থী অধ্বর্য্যু, এবং যজমানের মরণাকাম্যকী যজমান সেই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। এই যজ, রথে করিয়া এক দিনে বাহিতে পারা যায় এইরূপ দেশে এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব থাকিলে অহুষ্ঠিত হয়। পরস্পরের ছেদ না থাকিলে, অথবা উক্ত নিয়ম অপেক্ষা দেশের দূরত্ব হইলে অহুষ্ঠান অসম্ভব। পূর্কোক্ত হোতা প্রভৃতি মধ্যে একজন মাত্র কর্ম্মের অহুষ্ঠান করিলে, অথবা একজনের মৃত্যু হইলে, স্ব স্ব যজ মধ্যবস্তী অধ্বর্য্যু প্রভৃতি অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন; তাহাতে অজ্ঞ বরণ অপেক্ষা করিতে হয় না। সোমাদি দগ্ধ হইলে প্রাতি-নিধি দ্রব্য দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিতে হইবে। পঞ্চ গোদান করিয়া এই যজ সমাপন করিবার বিধি। ষাট দিন রাজির পূর্ক ঐরূপ দোষ হইলে পুনর্কর যজারম্ভ করিবে, এবং পরিশেষে পঞ্চ গোদান দক্ষিণামাত্র প্রারম্ভিত্ত করিবে; এইরূপ মতান্তরের বিধান। ব্রহ্মেরই বিহিত কর্ম্মে অধিকার থাকায়, বিশেষ আদেশ না থাকিলে সমুদায় প্রারম্ভিত্ত হোমেই ব্রহ্মের অধিকার এবং ব্রহ্মশূত্র অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে যজমানেরই অধিকারবিধি কথিত আছে।

২৬শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা। এই সমস্ত কণ্ডিকার প্রবর্ণের উপযোগী মহাবীর সমস্তর কর্ম্ম প্রতিপাদিত আছে। (যথা—মুৎপিণ্ড, বন্ধীকলোষ্ট্র, শূকর কর্তৃক উৎপাতিত মৃত্তিকা, পুতিকা নামক লতাশিশেষ, ও গবেধুক নামক জল-সম্মিলিত মহাতৃণজাত তরু কণবিশেষ; এই সমস্ত দ্রব্য সঞ্চয়পূর্ক তাহা পূর্কদিক বা উত্তরদিকে রাখিয়া, কৃষ্ণ

মৃগচর্ম্ম ও কুদাল উত্তরদিকে রাখিবে।) ঐ সমস্ত গ্রহণ ও নিধানের মন্ত্রকথন। ইহাতে কুন্তকার কর্তৃক ভাঙ্গাদি নির্মাণের উপযোগী এবং অতি চিকণ মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হয়; ঐরূপ মৃত্তিকা কৃষ্ণ মৃগচর্ম্মের উত্তরদিকে রাখিবে। তাহার দক্ষিণদিকে বন্ধীকলোষ্ট্র রাখিতে হইবে। সমস্তকৃষ্ণ ভূভাগের পূর্কদিকে দ্বার ও সাতবার ভূসংস্কার করিয়া তাহার উপর বালুকা আচ্ছাদনপূর্ক, তাহাতে পঞ্চ অরতি অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাত পরিমিত মৃগচর্ম্ম রাখিয়া, তাহার উপর উপকরণ সমূহ রাখিয়া দিবে। উল্লেখন, জলদ্বারা অভিশিক্ত ও সম্ভার-দ্বারা সংসর্গবিষয়ে মন্ত্রসমূহকথন। তাহার পর অধ্বর্য্যু গবেধুক ও ছাগজন্তু পৃথক ভাবে রাখিয়া, বন্ধীকলোষ্ট্রাদির সহিত মুৎপিণ্ড মিশ্রিত করিবে। তৎপরে মহাবীর কর্তব্য (তাহার স্বরূপ যথা—পরিমাণে এক প্রাদেশ, অর্থাৎ অর্দ্ধ হস্ত; মধ্যদেশ উল্খলের ছায় সঙ্কচিত, উপরি-ভাগে তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের পরেই ঐ সঙ্কচিত মেথলা করিতে হয়। মহাবীর নিম্পন্ন হইলে, “মথন্ত শিরঃ” এই মন্ত্র পাঠপূর্ক তাহার স্পর্শবিধি। কাহারও মতে ঐ মন্ত্র দ্বারা তাহার গ্রহণ। এইরূপ অপর দুইটি মহাবীরের বিধান। অভিমর্শনের পর সমুদায়গুলি ভূমিতে নিহত করিবার বিধি। ক্রম্ব মুখের ছায় আকৃতিবিশিষ্ট, রৌহিণ কপাল ও বক্ষ্যমাণ পুরোডাশ কপালের ছায় গোলাকার দোহনপাত্রদ্বয় ভূমিতে স্থাপন করিয়া, অবশিষ্ট মৃত্তিকা প্রারম্ভিত্ত জন্ত নিহত করিবে। “মথায় ঞ্চেতি”, মন্ত্রপাঠপূর্ক গবেধুকসমূহ চূর্ণ করিয়া, অশ্বপূরীষদ্বারা প্রদীপ্ত দক্ষিণাশি দ্বারা “অশ্বন্ত ঞ্চেতি” মন্ত্রপাঠপূর্ক ঐ মৃত্তিকার ধূপদান করিবে। উহার ছায় প্রদাহনাদি বিধি। চতুর্কোণ অংক করিয়া, তাহাতে শ্রুণ অর্থাৎ পাকসাধন কাষ্ঠাদি বিধৃত করিয়া তাহার উপর তিনটি মহাবীর বক্রভাবে রাখিতে হইবে, পরে তাহার উপর পুনর্কর ঐ কাষ্ঠের আচ্ছাদন দিয়া দক্ষিণাশি দ্বারা দগ্ধ করিবে। দগ্ধ হইলে পুনর্কর ঐগুলি ছাগজন্তুদ্বারা শিক্ত করিতে হইবে। ২য় কণ্ডিকায় মহাবীর বিধানের পর প্রবর্ণ্য আচরণের বিধান; গার্হপত্যের পূর্ক প্রাগজলসমূহ বিধৃত করিয়া তাহাতে পাজসমূহের স্থাপনবিধি। প্রোক্ষণী সংকৃত ও উষিত করিয়া ব্রহ্মের অনুজ্ঞা করণ। হোত্রাদি প্রেরণ। গৃহের পূর্কদ্বার দিয়া ছুণা ও ময়ূধ নির্গত করিয়া, গৃহের দক্ষিণদিকে যেখানে বসিয়া হোতা নিখাত ছুণা ও ময়ূধ দেখিতে পার, সেইরূপ স্থলে তাহা নিখাত করিবার বিধি। গার্হপত্য ও আহবনীয়ে উত্তরদিকে ধর নিবাণ। দক্ষিণদিকে তিত্তি লগ্নভাবে উচ্ছিষ্ট

ধর নিবাপের কর্তব্যতা। আহবনীয়ের পূর্নদিকে সন্ধ্যা-
সন্ধ্যা আহরণ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রাচী গ্রহণ। উত্তরদিকে
রাজাসন্ধ্যা ও কৃষ্ণাজিন আন্তরণ করিয়া, তাহাতে মহাবীর
নিধান অথবা তাহা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। অধ্বৰ্য্য বা অস্ত্র
কেহ হুগাদি নিদান করিবে। তৎপরে বিহিত সিকতা
মধ্যে মহাবীর প্রবেশন কথিত আছে। ৩য় কণ্ডিকায়—
প্রস্তোতা প্রেরণ। পত্নীশিরঃ আচ্ছাদন। আজ্যসংস্থার
কালে শরত্বে জালিয়া সিকতা মধ্যে স্থাপন বিধি। ঐ সকল
মুগ্ধ প্রলেবে সংস্থত, যত পূর্ণ মহাবীর নিধান। মহাবীরের
উপরে প্রাদেশধারক মন্ত্রপাঠ। দক্ষিণদিকে যজ্ঞমানের
উত্তানপাণি নিধান। উত্তরদিকে প্রাদেশনিধান। মহাবীরের
চতুর্দিকে ভক্ষণ করিয়া, পরিশ্রপণ বিধি, এবং মহা-
বীরের আচ্ছাদনবিধি কথিত আছে। ৪র্থ কণ্ডিকায়—
আচ্ছাদনকালে প্রস্তোতার প্রেরণ। মহাবীরের চতুর্দিকে
কৃষ্ণাজিন নির্মিত ব্যজন দ্বারা ব্যজন করিবার বিধি।
ব্যজনকালে বাম ও দক্ষিণভাবে তিনবার প্রদক্ষিণ বিধান।
তেজঃ প্রদীপ্ত হইলে তাহাতে শততোলা যতদান করিয়া
মহাবীর সিঞ্চন করিবার বিধি। এই সময়ে প্রতিপ্রস্থাতার
চরুপাক বিধি। পাকশেষে চরুস্থাপন নিয়ম। প্রস্তোতা
প্রেরণ। যজ্ঞমানের সহিত ঋত্বিকগণের পরিক্রমণ। প্রস্তোতা
ব্যতীত অপর পঞ্চ ঋত্বিকের উপস্থানবিধি। ছন্দোগদিগের
প্রস্তোতার সহিত ছয়জনেরই পরিক্রমণবিধি। পত্নীর
শিরআচ্ছাদন খুলিয়া তাহা দ্বারা মহাবীর মোক্ষণবিধি।
পরিশেষে রৌহিণী আহুতির বিষয় কথিত আছে। ৫ম কণ্ডি-
কায়—ধর্মধুক বন্ধনের জন্ত রজু এবং তাহার পদবন্ধন জন্ত
সন্ধান গ্রহণপূর্বক গার্হপত্যে গমন করিয়া, মন্ত্র ও উপাংগ
নাম উচ্চারণপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার তাহার আচ্ছাদন-
বিধি। প্রস্তোতা প্রেরণ। মন্ত্রপাঠানুসারে সমাগত গাভীকে
সেই রজুদ্বারা হুগায় বন্ধন ও সন্ধান দ্বারা তাহার পদ
বন্ধন করিয়া “ধর্মায় নীঘেতি” মন্ত্রপাঠপূর্বক বৎসকে স্তন-
পানে বিরত করিবে। বিহিত মন্ত্রপাঠপূর্বক পিষন নামক
পাত্রবিশেষে তাহার দোহন বিধি। স্তনালস্তন বিধি। এই-
রূপ ময়ূষে ছাগবন্ধন করিয়া প্রতিপ্রস্থাতা তাহাকে দোহন
করিবেন। প্রতিপ্রস্থাতার প্রেরণ বিধি। গাভীর নিকট
হইতে অধ্বৰ্য্যর উত্থান নিয়ম। পরীশাসব্বের গ্রহণ বিধি।
পরীশাসব্বদ্বারা মহাবীর গ্রহণ এবং তাহাকে উৎকলিত
করিয়া পুনর্বার তাহা গ্রহণ করিবার নিয়ম। দুগ্ধরূপ
ধর্মের নিরূপণে উপযমনী স্থাপন। উপযমনী দ্বারা গৃহীত
মহাবীরে ছাগদুগ্ধ সেচন করিয়া নির্দীপিত করিবার এবং

গোধূত অপনয়ন করিবার বিধি। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায়—আহবনীয়ে
গমন করিয়া বাতনাম জপবিধি। উপরমনীতে পতিত দুগ্ধ
বা যুতের সিঞ্চন বিধি। জপের পর প্রস্তোতা প্রেরণ বিধি।
বঘটকারের সহিত মন্ত্রপাঠপূর্বক হোমবিধি। তিনবার
মহাবীর উৎকলন করিবার নিয়ম। বঘটকারবৃত্ত মন্ত্রপাঠ-
পূর্বক পুনর্বার হোমবিধি। হতাংশিষ্ট জব্যের ব্রহ্মাঙ্ক-
মন্ত্রণ। যজ্ঞমান কর্তৃক ধর্মের অমুক্রমণ। অতিতপ্তজন্ত পাত্র
মধ্যে উচ্ছলিত ধর্মলেশসমূহের অমুক্রমণ। অধ্বৰ্য্য নিধান
দিকে গমন করিয়া সিকতা মধ্যে তৎকর্তৃক মহাবীর নিধান
বিধি। নিয়ম ধর্মমধ্যে শকল প্রবেশ করাইয়া, যত
দ্বারা আহুতিদানপূর্বক প্রথম পরিধিতে বিককতশকলসমূহ
নিধান করিবার বিধি। এইরূপ তিনবার আহুতি দিয়া
অবশিষ্ট শকল দক্ষিণদিকে কুণ্ঠমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।
অহত সপ্তম শকল মহাবীরস্থ যতাদি দ্বারা লিপ্ত করিয়া,
প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রদান করিবে। তৎপরে দ্বিতীয় রৌহিণী
হোমবিধি। মধ্যম পরিধিতে নিহিত পঞ্চ বিককত
শকল আহবনীয়ে আহুতি দিবে। উপযমনীস্থ ধর্মাজ্য
অগ্নিহোত্র বিধানানুসারে আহুতি দিয়া সমুদায় ঋত্বিক
প্রভৃতি ভক্ষণ করিবেন। খরে উজ্জিষ্ট যৌত করিয়া উপ-
যমনী নিধান করিতে হইবে। এই সময়ে উপশ্রিত পঞ্চশকল
আহবনীয়ে গ্রহণ করিবে। তৎপরে ধেমুকে তৃণজল দান
বিধি। সমুদায় পাত্রসমূহ আসন্ধ্যা করিবার বিধি। খর,
হুগা, ময়ূষ, কৃষ্ণাজিন, অস্ত্র, উপশর ও আসন্ধ্যার একবার
আসাদন ও প্রোক্ষণবিধি কথিত আছে। ৭ম কণ্ডিকায়—
উপসদের পর প্রবর্গ্য উৎসাদনের প্রকার। অবভূথের জ্বায়
অধ্বৰ্য্য কর্তৃক সামগান জন্ত প্রস্তোতার প্রেরণ। অবভূথের
জ্বায় দেশগতি ও নিধন। সামগানের পর সকলের উৎ-
সাদন দেশে অর্থাৎ মহাবীরাদি পাত্রভাগদেশে গমন বিধি।
সেখানে যজ্ঞ অগ্নিচিহ্নিত হইলে সকলের উত্তর বেদিতে
গমন বিধি। কিন্তু যজ্ঞ অগ্নিচিহ্নিত হইলে পরিষ্যানে
গমন করিতে হয়। সেই উৎসাদন দেশ বা উত্তরবেদি
পরিষেক করিয়া উত্তর কর্যোর কর্তব্যতা। অধ্বৰ্য্য উত্তর
বেদিতে প্রথম মহাবীর এবং পূর্নদিকে অপর দুই মহা-
বীর নিধান করিবেন। সেই স্থানে উপশর্য্য অর্থাৎ মহা-
বীরাদির নির্মাণাবশেষ যুক্তিকা স্থাপন করিতে হইবে।
মহাবীরাদির চতুর্দিকে পরীশাসব্ব নিধান করিবে। নীচে
ও বাহুদেশে রৌহিণী ও হবগী নামক ক্রক্ধর নিধান
করিবে। রৌহিণী হবগীর উত্তরদিকে অস্ত্র, দক্ষিণদিকে
আসন্ধ্যা, এবং অস্ত্রের উত্তরদিকে ধর্ম অর্থাৎ কৃষ্ণাজিন

নির্দিষ্ট ব্যানসমূহে নিধান করিবে। তৎপরে পরিধি, উপযমনী, রজ্জু, সন্ধান, বেদ, পিষন, খুণা, ময়ূধ, রোহিণ, কপাল, তৃষ্টি, ক্রব, মুজ্জকূট, ধর, উচ্ছিষ্টধর প্রভৃতির নিধান বিধি। মুদ্রধারী মহাবীরাদি সপ্তপাত্রেয় গর্তপূরণ বিধি। পত্নীর সহিত সকলের চাচাল মার্জনবিধি। তৎপরে ব্রহ্ম প্রভৃতিকে যাজ্ঞিক ত্রব্যসমূহের প্রদানবিধি। মহাবীর ভক্ষ্য হইলে যথাকালে প্রারম্ভিত করিবার বিধান। ঐ প্রারম্ভিতের প্রকারাদি। প্রবর্গ্য চরণবিধি। তাহাতে পূর্ণা-হুতি হোম প্রকার। সস্ত্রিয়মাণ মহাবীর ভগ্ন হইলে তাহার প্রারম্ভিত নিয়ম। প্রবর্গ্যের অধিকারী নির্দেশ। হস্তশেষ ত্রব্যের ভক্ষণ বিধি। দধিভক্ষের পর চাচাল মার্জনবিধি। প্রবর্গ্যচরণের আদ্যন্তে শাস্তিকাখ্যার পাঠবিধি। এই দুই অধ্যায়ের মধ্যে ১ম অধ্যায় দ্বারপিধানের পর, এবং ২য় অধ্যায় আসন্যায় পাত্রনিধানের পর পাঠ করিতে হয়।

কাত্যায়নসূত্রে এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন—

১ অনন্ত; ২ কর্ক; ৩ কল্যাণোপাধ্যায়; ৪ গঙ্গাধর; ৫ গদাধর; ৬ গর্গ; ৭ পিতৃভূতি; ৮ ভর্তুয়জ; ৯ মহাদেব; ১০ মিশ্রাণিহোত্রী; ১১ ব্রীধর; ১২ হরিহর। যাজ্ঞিকদেব শ্রৌতসূত্রপদ্ধতি এবং পশুনাভ কাত্যায়নসূত্রপদ্ধতি নামে স্বতন্ত্র পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন।

৩, গোভিলপুত্র কাত্যায়ন গৃহ্যসংগ্রহ এবং ছন্দোপনিষিষ্ট বা কর্মপ্রদীপ রচনা করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন এবং স্মৃতিগ্রন্থেতা কাত্যায়ন উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু উভয়ের রচনাপ্রণালী দেখিয়া সন্দেহ বোধ হয় না।

হরিবংশে বিশ্বামিত্রবংশীয় কতির পুত্র কাত্যায়নগণের*

* "বিশ্বামিত্র চ হতা দেবরাতাদয়ঃ সূতাঃ।
বিশ্বাত্মাস্ত্রিম্ লোকেনু তেবাং নামাণি মে শৃণু।
দেবপ্রবাঃ কতিষ্ঠৈব যম্মাং কাত্যায়নাঃ সূতাঃ।
শালাবত্যং হিরণ্যাক্ষো রেণো ভজ্ঞে হধ রেমুমান্।
সাক্তির্গালবৈশ্ব মূললশ্চেতি বিজ্ঞতাঃ।
মধুচ্ছলো জরশ্চৈব দেবলশ্চ তথ্যৈষ্টকঃ।
কচ্ছপো হারিতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্তে হতাঃ।
তেবাং ব্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাজ্ঞানাম্।
পাণিনো বজ্রবৈশ্ব ধ্যানজপ্যাত্তথৈব চ।
দেবলা বেণবৈশ্ব বাজ্রবক্ষ্যামবর্ণাঃ।
ঐমুদ্রা হৃদিকাত্যায়কায়নচুলাঃ।" হরিবংশ ২৭ অধ্যায়ে।

নাম পাওয়া যায়। আবার ঐ বিশ্বামিত্রবংশে বেদশাখাপ্রবর্তক সাক্তি, গালব, মূলল, মধুচ্ছল, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ, হারিত, পাণিন, বজ্র, ধ্যানজপ্য, দেবরাত, শালকায়ন, বাহুল, বেণু, বাজ্রবক্ষ্য, অমবর্ণ, ঐমুদ্র, ভারকায়ন প্রভৃতি আবিস্কৃত হন। তাঁহাদের মধ্যে বাজ্রবক্ষ্য গুরুত্বঃ অর্থাৎ বাজ্রসনরীশাখা প্রচার করেন। শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন ঐ বাজ্রসনরী শাখার অনুবর্তক। এই কারণে বোধ হইতেছে, বিশ্বামিত্রবংশীয় (বাজ্রবক্ষ্যের অনুবর্তী) কাত্যায়ন ঐই কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের রচয়িতা।

স্মৃতিকার কাত্যায়ন গোভিলের পুত্র*। (কাত্যায়নের কর্মপ্রদীপ নামক স্মৃতিগ্রন্থে এই সকল বিষয় আছে;—

যজ্ঞোপবীত; আচমন; মাতৃগণ; আত্মাদয়িক শ্রাদ্ধ; সেই শ্রাদ্ধার্থকৃত্য; পরিবেদনদোষ; তৎপ্রতিপ্রসব; স্মৃতিগ-রেখা; অম্যাদান; অরণিবিধি; অম্যাকার; ক্রবাদি লক্ষণ; সায়ংপ্রাতর্হোমকাল; হোমোতিকর্তব্যতা; স্নানাদিক্রিয়া; সন্ধ্যোপাসনা; তর্পণ; পঞ্চযজ্ঞপ্রকরণ; দক্ষিণাদি পাত্র; আজ্ঞাস্থালাদি; অমাবান্তাশ্রাদ্ধকাল; শ্রাদ্ধভোক্তৃকখন; কহুবিধি; দর্শপোর্ণ্যমাস হোমকালাদি; প্রবাসিদিগের পূর্ক-কৃত্য; দ্বী কর্তব্যকর্ম; দাম্পত্যসমিকর্ষ কৃত্যাদি; প্রেত-কার্য; শোকোপনোদন; পর্ণনরদাহাদি; অশৌচে বর্জন-ত্রবাদি; ষোড়শশ্রাদ্ধাদি; হোমায়বিশেষ; চরু; গো-অশ্ব-যজ্ঞাদিকাল; নরযজ্ঞকাল; অস্বাহার্য্যনাম ও বিধি; অক্ষাতাদি সংজ্ঞা ও নানাবিধ।

গৃহ্যসংগ্রহে ব্রাহ্মণদিগের দশবিধ সংস্কার ও বাস্তকিয়াদি লিখিত হইয়াছে।

৪, কাত্যায়ন বররুচিকেই অনেকে পাণিনিসূত্রের বাস্তিক-কার বলিয়া নির্দেশ করেন। সোমদত্তভট্ট বিরচিত কথাসরিং-সাগরে লিখিত আছে "পুশদত্ত নামক মহাদেবের একজন অনুচর গৌরীকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্যলোকে আসিয়া বৎসরাজধানী কৌশাধীনগরীতে সোমদত্ত নামক ব্রাহ্মণের গুরুরে গৃহ্যগ্রহণ করেন, তিনিই কাত্যায়ন-বররুচি

* "অথাতো গোভিলোক্তানামজ্ঞেবাং চৈব কর্মণাম্।

অপ্পট্টানং বিধিং সমাপ্পশরিত্যা প্রদীপয়ৎ" কর্মপ্রদীপ ১। ১।

এখানে টীকারূপে গোভিলক কাত্যায়নের পিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গৃহ্যসংগ্রহেও এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"পুনরুক্তমতিক্রান্তং বচ সিংহাবলোকিতম্।

গোভিলে যে ন গৃহ্মত্ব ম তে জ্ঞাতস্তি গোভিলম্।

গোভিলাচার্য্যপুত্রস্ত যোহধীতে সংগ্রহে পুমান্।

লক্ষ্যকর্মবসংসৃতঃ পরাং সিদ্ধিমবাধুয়াৎ" গৃহ্যসংগ্রহ ২। ১০৪-১০৫।

নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার জন্মকালে আকাশবাণী হইয়াছিল যে, 'এই বালক ঋতধর হইবে এবং বর্ষপঞ্জিভের নিকট সমস্ত বিদ্যালান্ত করিবে। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে কচি জন্মিবে বলিয়া বররুচি নামে বিখ্যাত হইবে *।' বয়োবৃদ্ধি সহ তিনি অসীমবুদ্ধি ও ধীশক্তিগম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি কোন নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া মাতার নিকট সেই নাটক সমস্ত আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং উপনয়নের পূর্বে ব্যাড়ির মুখে প্রাতিশাখ্য শুনিয়া তাহা সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন অবশেষে বর্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নানাপ্রান্তে পাণ্ডিত্যলাভ করেন, এমন কি তিনি বৈয়াকরণিক তর্কে পাণিনির পরাভূত করিয়াছিলেন। অবশেষে মহাদেবের অমুগ্রহে পাণিনি জয়লাভ করেন। কাত্যায়ন মহাদেবের জ্যোতিষান্তির নিনিত্ত পাণিনি-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তাহা সম্পূর্ণ ও সংশোধিত করেন। পরিশেষে তিনি মগধরাজ যোগেন্দ্রের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন।"

হেমচন্দ্র, মেদিনী ও ত্রিকাংশের অভিধানে কাত্যায়নের একটি নাম বররুচি + লিখিত হইয়াছে।

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতেও বার্তিককার কাত্যায়ন-বররুচি এবং প্রাকৃত-প্রকাশ নামক ব্যাকরণকার বররুচি উভয়ে এক ব্যক্তি। বোধ হয়, তিনি ইণ্ডিয়া হাউসের পুস্তকালয় সর্গাহকুম্বীতে 'অত্র শৌণকাদিগত সংগ্রহীত-বররুচেরহুকুম্বিকা' এই বচন পাঠ করিয়াই উক্তনাম প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক কাত্যায়নবররুচি এবং প্রাকৃত-প্রকাশ নামক প্রাকৃত ব্যাকরণ রচয়িতা উভয়ে এক ব্যক্তি নহেন। প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচি বাসবদত্তা প্রণেতা জুবজুর মাতুল। পুরাবিদগণের মতে, এই বররুচি হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় বর্ষশতাব্দীর লোক। (Hall's Vāsavadattā, preface, p. 6. দেখ)। কিন্তু পাণিনির বার্তিককার তাহার বহু শত বর্ষ পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সোমদেব ব্যাড়ি, পাণিনি ও কাত্যায়ন এই তিনজনকে সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তপূর্বক পাণিনিহুত ও কাত্যায়নের বার্তিক আলোচনা করিলে, উভয় ব্যক্তিকে সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

১ম, পাণিনির সময়ে যে প্রকার শব্দশাস্ত্রের নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক বার্তিক রচনার সময় অপ্রচলিত হইয়া উঠে। যেমন, "অদ্ভুতরাতিভাঃ পঞ্চভাঃ।" পা ৭।১।২৫। অর্থাৎ ডতর ও ডতম প্রত্যয়স্থ এবং অস্ত্র, অস্ত্রতর ও ইতর এই পাঁচটি সর্জনাম শব্দের উত্তর ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার এক বচনে 'অদ্ভু' হইবে। যথা—কতরং, কতমং, ইত্যাদি। তৎপরে পাণিনি আবার বিশেষ বিধি করিলেন— "নেতরাচ্ছন্দসি।" পা ৭।১।২৬॥

অর্থাৎ—বেদে ইতর শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে অদ্ভু হইবে না, 'ইতরদ্' পদের পরিবর্তে "ইতরম্" হইবে।

কাত্যায়ন ঐ বিশেষ বিধির বার্তিকে উক্ত হুজের সংশোধন করিয়া লিখিয়াছেন।

"ইতরাচ্ছন্দসি প্রতিবেদে একতরাং সর্জত্ৰ।" বা०।

এই বার্তিকের পক্ষসমর্থন করিয়া কাশিকাকার লিখিয়াছেন—

"একতরাচ্ছন্দসি ভাষায়াং সর্জত্ৰ প্রতিবেদ ইত্যতে।" অর্থাৎ কি বৈদিক প্রক্রিয়া কি সাধারণ ব্যবহার্য ভাষা সর্জত্ৰই "একতরম্" পদ ব্যবহৃত হইবে।

এতদ্বির ৮।৪।৩৫ হুজের কাত্যায়ন প্রতিবেদ করিয়াছেন।

২য়, পাণিনির সময়ে কোন কোন শব্দ যেরূপ অর্থ-প্রকাশক ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহার অনেক রূপান্তরিত হয়। যেমন—

"আশ্চর্য্যমনিত্যে।" ৬।১।১৪৭। পাণিনি আশ্চর্য্য শব্দের অনিত্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাত্যায়ন— "অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্।" অর্থাৎ আশ্চর্য্য শব্দের অর্থ অদ্ভুত এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ৪।২।১২২, ৭।৩।৬২ প্রভৃতি কয়েক স্থলেও পাণিনি ও কাত্যায়নের অর্থবিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

৩য়, পাণিনির সময়ে অধিকাংশ শব্দ * ও শব্দার্থ যেরূপ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহার অনেক অপ্রচলিত হইয়া যায়। যথা—

* কথিত শব্দগুলির দুই একটি কোন কোন কোবে শব্দনির্ণয়ার্থ উদ্ধৃত হইলেও ভট্টিকাব্য ব্যতীত কোন প্রাচীন লৌকিক কাব্যগ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় না। শব্দপ্রয়োগের নামারূপ দেখাইবার অভ্যাস কেবল ভট্টিকাব্যে উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে।

* "একঋতধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষাদব্যাপ্যতি।

কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে অতিষ্ঠাং প্রাপন্নতি।

নামা বররুচিলোকে বহুদনৈ হি রোচতে।

বহুব্ধ বরং ভবেৎ কিঞ্চিদ্ধিক্যু। বাণপারমং।"

সোমদেববৃত্ত কথাসরিৎসাগর।

† হেমচন্দ্রকৃত অনেবার্ধসংগ্রহ ৩। ১১৬, মেদিনী দ্বায়ে ১৭৫, ত্রিকাংশে ২। ৩। ২৫।

পাণিনিবৃত্ত শব্দ।	অর্থ।
উৎসঙ্গন (১।৩।৩৬)	উর্দ্ধে ক্ষেপণ।
উপসংবাদ (৩।৪।৮)	পণবদ্ধ, শপথকরণ।
উপাভেক্ত অধাভেক্ত (১।৪।৭৩)	বলাধান।
ঋষি (৪।৪।৯৬)	বেদ।
কণেহন (১।৪।৬৬)	শ্রদ্ধা প্রতিঘাত।
নিবচনেক্ত (১।৪।৭৬)	মৌন।
প্রোভাবগান (১।৪।৭২)	ভোজন।
মনোহন (১।৩।৬৬)	শ্রদ্ধা প্রতিঘাত।
স্বকরণ (১।৩।৫৬)	স্বীকার, বিবাহ।
হোত্রা (৫।১।১৩৫)	ঋত্বিক।

উপরোক্ত বৃত্তি ও প্রয়োগানুসারে (কথাসরিংসাগরে উল্লিখিত হইলেও) আমরা পাণিনি ও কাভ্যায়নকে সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কাভ্যায়নের বহু-পূর্বে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এমন কি, বার্তিক আদ্যোপান্ত মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে ইহাই উপলব্ধি হয়, যে পাণিনি ব্যাকরণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, কাভ্যায়নের সময়ে তাহার উপযুক্ত বৃত্তি অথবা বার্তিক অভাবে অনেকই ঐ ব্যাকরণ বৃত্তিতে পারিতেন না, সুতরাং ঐ মহাগ্রন্থ লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। কাভ্যায়ন এই লুপ্তগ্রন্থের উদ্ধারের নিমিত্ত অশেষ পরিশ্রম, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতাপ্রভাবে আপন বার্তিকপাঠ প্রণয়ন করেন। মহাভাষ্যে পতঞ্জলিও লিখিয়াছেন—

“পুরাকল্প এতদাসীৎ। সংস্কারোত্তরকালং ব্রাহ্মণা ব্যাকরণং স্মারীয়ন্তে। তেভ্যন্তত্তৎস্থানকরণনাদাহুঃ প্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিক্যঃ শব্দা উপদিষ্টস্তে, তদন্যত্বেন তথা। বেদমধীভ্য স্বরতা বক্তারো ভবন্তি। বেদায়ো বৈদিক্যঃ শব্দাঃ সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিক্যঃ অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এতৎ বিপ্রতিগম্যবুদ্ধিভ্যো হৃদ্যভূতাঃ সূহৃদৃ ভূহা আচার্য্য ইদং শাস্ত্রমঘাচটে। ইমানি প্রয়োজনান্ত্রাধ্যায়ং ব্যাকরণমিতি।”

মহাভাষ্য ১।১।১ আঙ্কি।

পুরাকালে উপনয়ন হইবার পর ব্রাহ্মণেরা বেদ অধ্যয়ন করিতেন। তাহার তদনুসারে স্বরপ্রক্রিয়া ও বৈদিক শব্দের উপদেশ লাভ করিতেন। কিন্তু এখনকারকালে আর সেক্ষণ নাই। লোকে বেদপাঠ করিয়াই বক্তা হইয়া উঠে এবং কহে যে বেদ হইতে বৈদিক শব্দ এবং লোকব্যবহারে লৌকিক শব্দ জানা যায়, অতএব ব্যাকরণপাঠে আবশ্যক কি? আচার্য্য কাভ্যায়ন এই সকল বিপ্রতিগম্য-বুদ্ধি অধ্যয়নকারীগণের বহু হইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা

দিবার জন্ত (পাণিনির অজুর্ভূত হইয়া) এই বার্তিকশাস্ত্র প্রকাশ করেন।

কোন কোন লেখক বলেন, কাভ্যায়ন বিদ্যেবর্তীবে পাণিনির সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং পাণিনির দোষ দেখাইবার জন্তই তাহার বার্তিক রচিত হইয়াছে। কিন্তু বাহারা সমগ্র বার্তিক ও মহাভাষ্য পাঠ করিয়াছেন, তাহার সকলেই কহিয়া থাকেন, কাভ্যায়ন পাণিনির উদ্ধারকর্তা। বাস্তবিক, নাগোজীভট্ট “বার্তিক” শব্দের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

“বার্তিকমিতি। সূত্রেহমুক্তকৃত্তচ্ছিত্তাকরস্বং বার্তিকমম্।”

পাণিনিহুত্রে যে সকল কথা উক্ত হয় নাই, অথবা একপ অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, সহজে বোধগম্য হয় না, সেই সকল অজুত ও দৃককৃত্ত বিষয়গুলি বাহাতে আলোচিত হইয়াছে, তাহাই বার্তিক।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন পাণিনি-ব্যাকরণ সাধারণের নোদগম্য হইত না, পাণিনির আর্ষসূত্রগুলি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন কি পাণিনির অনেকসূত্রে আর্ষপদ্ধতি ও আর্ষণন্দ রহিয়াছে, বাহা কাভ্যায়নের সময়ের লোকেরা অপ্রচলিত, ভিন্নার্থ অথবা শব্দশাস্ত্রের রীতিবিধি বলিয়া বিশ্বাস করিত। সেই সময়ে কাভ্যায়ন সাধারণকে বুঝাইবার জন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া পাণিনিহুত্রে বার্তিক প্রণয়ন করিলেন। কাভ্যায়ন আপন বার্তিকের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

“সিদ্ধে শব্দার্থসংবন্ধে। লোকতোহর্থগ্রন্থকে শব্দ প্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মো যথা লৌকিকবৈদিক্যু। সমান্যায়-মর্গাবগতো শব্দেন চাপশব্দেন চ শব্দেনবার্থোহতিথেয় ইতি নিয়মঃ।

তত্র জ্ঞানপূর্বকে প্রয়োগে ধর্ম।

ন চোদানীনাচার্য্যঃ সূত্রাণি কৃত্বা নিবর্তয়ন্তি।

বৃত্তিসমবায়ার্থো হুৎবদ্ধকরণার্থশচ বর্ণানামুপদেশঃ।

শাস্ত্রপ্রবৃত্তিকলকো বর্ণানাম্ ক্রমেণ নিবেশো বৃত্তিসমবায়ঃ ॥”

শব্দের সহিত শব্দগত অর্থের সম্বন্ধ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এই লোকপ্রসিদ্ধ অর্থের প্রয়োগ হইলেও শাস্ত্র দ্বারা শব্দের বেদবিহিত ধর্মের নিয়মানুসারে অর্থ নির্ণীত হয়। শব্দ ও অংশশব্দ এই উভয় দ্বারা সমান অর্থবোধই হয়, তথাপি শব্দ দ্বারা অর্থপ্রকাশ করিবে এইরূপ নিয়ম আছে।

জ্ঞানপূর্বক শব্দপ্রয়োগ করিলে ধর্ম হয়। পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যগণ সূত্র রচনা করিয়া তাহাকে নিবর্তিত করেন না। (অর্থাৎ আচার্য্যগণ জ্ঞানপ্রভাবে অথবা

যোগবলে যে সকল সূত্র উদ্ভাবন করেন, তাহা লিখরাখিষ্ট বেদবাক্যের ন্যায় অনর্থক নহে, স্মরণ্য তাহা সাধারণের বোধগম্য না হইলেও তাহাকে শ্রদ্ধা বলা বাইতে পারে না।)

বৃত্তিসমবায়ের নিমিত্ত ও অল্পবদ্ধকরণের নিমিত্ত বর্ণের উপদেশ হইয়াছে। শাস্ত্রে প্রযুক্তির নিমিত্ত একের পর আর একটি বর্ণযোগজনকে বৃত্তিসমবায় কহে।

কাত্যায়নের বার্তিকপাঠ করিলে জানিতে পারা যায়।

(১) তিনি অধিকাংশ স্থানেই পাণিনিহুজের অল্পবর্তী হইয়া কথ্যবিধি অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন। (২) কোন কোন স্থলে নানা তর্কবিতর্ক ও সমালোচনা করিয়া পাণিনিহুজ সংরক্ষণে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন। (৩) কোন কোন স্থলে সূত্র পরিবর্তন করিয়াছেন। (৪) আবার স্থলবিশেষে পাণিনিহুজের দোষ দেখাইয়া তাহার প্রতিবেদ করিয়াছেন এবং (৫) অনেক স্থলে পরিণিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

পতঞ্জলি আপন মহাভাষ্যে বার্তিকপাঠ উদ্ধৃত করিয়া তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

[পাণিনি ও পতঞ্জলি দেখ।]

এই কাত্যায়ন বেদের সর্গাহুক্রমণী ও প্রাতিশাখ্য প্রণয়ন করেন। [প্রাতিশাখ্য ও সর্গাহুক্রমণী দেখ।]

ইনি পতঞ্জলির অনেক পূর্ববর্তী ও পাণিনির পরবর্তী।

৫, একজন বৌদ্ধ আচার্য্য, ইনি অভিধর্ম্মজ্ঞানপ্রস্থাননামক বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা করেন। নেপালী বৌদ্ধগ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি বুকের নির্কাল্পের ৪০০ বর্ষ পরে প্রাদুর্ভূত হন।

৬, জৈনদিগের একজন প্রধান ও প্রাচীন স্থির।

কাত্যায়নবীণা (কৌ) কাত্যায়নের আনিকৃত বীণা, মধ্যলো।। কাত্যায়নসৃষ্ট শততন্ত্রীযুক্ত বীণাবিশেষ।

কাত্যায়নী (কৌ) কাত্যায়ন-ভীপ্। ১ ছর্গা। মহিষাসুর কর্তৃক নিত্য উৎপীড়িত হইয়া, তাহার বিনাশসাধনের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্ব স্ব দেহ হইতে এই মূর্তির সৃষ্টি করেন। মহর্ষি কাত্যায়ন সর্গপ্রথমে ইহার অর্চনা করায় কাত্যায়নী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে ইনি সৃষ্ট হইয়া, শুক্লা শপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন কাত্যায়ন ঋষির পূজাপ্রার্থনের পর দশমীতে মহিষাসুরকে বিনাশ করেন। ২ কথ্য বজ্রপরিধানা শ্রোত্র বরুণা বিধবা। ৩ কাত্যায়নঋষির পত্নী। ৪ বাজবল্ক্যের দ্বিতীয় পত্নী। (‘বাজবল্ক্যস্ত বেতার্য্যো বভূবতুঃ মৈত্রেয়ী কাত্যায়নী চ।’ বৃহৎ সাং উঃ।) ৫ ভৈরবী।

কাত্যায়নীতন্ত্র (কৌ) কাত্যায়ন্যঃ তন্ত্রম্, ৬তম্। কাত্যায়নী পূজার মন্ত্রাদি বিধায়ক শিবপ্রোকৃত তন্ত্রবিশেষ।

কাত্যায়নীপুত্র (পুং) কাত্যায়ন্যঃ পুত্রঃ, ৬তম্। ১ কাষ্ঠিকের। ২ একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য। ইনি বুকের চারিশত বর্ষ পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কাত্যায়নীত্রত (কৌ) কাত্যায়ন্যঃ ব্রতম্, পূজাবিশেষঃ, ৬তম্। কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশ্যে কর্তব্য ব্রতবিশেষ। বৃন্দাবনে গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে প্রাপ্তিকামনার, উদ্যোগে যখননাঙ্গে স্নান করিয়া, বালুকার প্রতিমূর্তি প্রস্তুতপূর্ব্বক ভগবতী কাত্যায়নীর পূজারূপ এই ব্রত আচরণ করিতেন।

কাংলা (দেশজ) একপ্রকার মাছ। সংস্কৃত ভাষায় কাতর, কাতল, বাঙ্গালা ও হিন্দীতে কাংলা, উত্তর-পশ্চিমে কোন কোন স্থানে ‘বোয়ুগা’, বোম্বাই অঞ্চলে ‘টাঙ্করা’, সিন্ধুপ্রদেশে ‘তৈলী’, তৈলঙ্গে ‘বোংচি’ এবং ব্রহ্মে ‘নগা থৈথ’ কহে। ইহার ইংরাজীপ্রদত্ত নাম Cyprinus outla।

এই মাছ এক একটি ছই হাত আড়াই হাত পর্যন্ত বড় হয়, দেহের অপর অংশ অপেক্ষা মুড়া প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি বড়।

এই মাছ ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল ককানদীর দক্ষিণাংশে বড় দেখা যায় না।

বৈদ্যক রাজবল্ক্যের মতে, ইহার মাংসগুণ মধুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক ও বায়ুগিত্তকফকারক।

কাথক (পুং) কথকস্ত অপত্যং পুমান্, কথক-অণ্। ১ কথকের পুত্র। ২ (জি) কথকের বংশীয়। ৩ কথকসম্বন্ধীয়।

কাথক্য (পুং) কথকস্ত গোত্রাপত্যং, কথক-যঞ্ (গর্গাদিত্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) কথক ঋষির বংশীয় পুত্র।

কাথক্যায়ন (পুং) কথকস্ত গোত্রাপত্যম্, কথক-যঞ্-ক্। কথকবংশীয় পুত্র।

কাথকিৎক (কৌ) কথকিৎ-ঠক্ (বিনয়াদিত্যঠক্। পা ৫।৪০৫।) কথকিৎ, কোনও প্রকারে।

কাথি (দেশীয় রাজ্য) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত থানেশ প্রদেশের তলোদা উপবিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র মেহবা রাজ্য। ইহার পরিমাণ প্রায় ৩০০ বর্গ মাইল। তলোদা উপবিভাগের উত্তর পশ্চিমকোণে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি অবস্থিত। সাতপুরা পর্ব্বতের শিখরমালায় এই ক্ষুদ্ররাজ্যটির ভূভাগ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকার বিভক্ত। এদেশের নাথাল জমীগুলিতে কলাই ও ধাতু হয়। বনবিভাগে চকর কাঠ, মহাফুল, মধু ও মোম উৎপন্ন হয়। এক্ষণে এখানে যে রানবংশ রাজত্ব করিতেছেন, তাহার ভীল জাতীর হিন্দু। বর্তমান রাজা বলেন ‘দে, তাহার ভীল জাতিতে ভীল হইলেও রাজপুতওঁরসমস্ত বটে। বর্তমান রাজা নাথাপক, একজন

একদে রাজ্যভার বুটীশরাজের হস্তে আছে। এখানকার রাজারা বংশাবলম্বিত রাজ্য বলিয়া স্বীকৃত হন, কিন্তু নিঃসন্দান হইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহার বুটীশ-রাজকে ১০০ টাকা বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। কাথিয়াবারে দুইটিমাত্র বেশ ভাল রাস্তা আছে, একটি পূর্বদিকে আরকানি পরগণার অন্তর্গত বাড়গাঁওয়ের মধ্যে ও অপরটি দক্ষিণপশ্চিম ইন্দলিনামক গিরিবন্ধের মধ্য দিয়া কুক্রমুণ্ড গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। এই দুইটিপথে গাড়ী ঘোড়া চলিতে পারে।

কাথিক (জি) কথায়া: সাধু; কথাঠক (কাথিদিভাঠক। পা ৪।৪।১০২।) কথারচনা বিষয়ে স্মৃতিপুণ।

কাথিয়াবার (কাঠিয়াবাড়, কাঠিয়াড়)—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাটপ্রদেশের অন্তর্গত একটি উপদ্বীপ। ইহাই প্রাচীন সৌরাষ্ট্ররাজ্য। [সৌরাষ্ট্র দেখ।] ইহা আরব সাগরের তীরবর্তী কচ্ছপ্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। গুজরাট প্রদেশের পশ্চিম উপকূল হইতে ইহা বহির্গত হইয়া পশ্চিমমুখে আরব সাগরে বিস্তৃত হইয়াছে। কচ্ছের দক্ষিণে এই উপদ্বীপ বহির্গত হওয়ার কচ্ছ উপসাগর ও রণ নামক লবণোপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উপদ্বীপটির কর্তৃদেশ অপ্রশস্ত, কিন্তু সাগরের মধ্যস্থলে ইহার মধ্য বা উদরভাগ বিশেষ প্রশস্ত এবং পশ্চিমমুখে ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া “স”কারের নাসিকার ভায় আকারবিশিষ্ট হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে ও পশ্চিমে আরবসাগর, পূর্বে কাথে উপসাগরের কিয়দংশ এবং শুক্লবাহিনী শাবরমতী নদী। এই প্রদেশের ১৩২০ বর্গ মাইল ভূভাগ (রাজস্ব ১০০০০ টাকা), বরদারাজ গাইকোয়াড়ের অধিকৃত ও অবশিষ্টাংশের মধ্যে ১১০০ বর্গ মাইল ভূভাগ (২৬,৬০০০ টাকা রাজস্ব) আন্ধ্রাবাদজেলার অধীন এবং ৭ বর্গ মাইল ভূভাগ (রাজস্ব ৩৮০০০ টাকা) কাথিয়াবারের দক্ষিণদিকস্থিত ডিউ-নামক ক্ষুদ্রদ্বীপস্থ পর্তুগীজদিগের শাসন অধিকৃত, এতদ্বির অবশিষ্টাংশ “কাথিয়াবার পোলিটিক্যাল এজেন্সী” নামক বুটীশ শাসনগতিতির অধিকৃত।

কাথিয়াবার এজেন্সীর শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এই এজেন্সী আপাততঃ চারিটি “প্রান্ত” বা বিভাগে বিভক্ত, ঝালাবার, হালাল, সুরাঠ ও গোহেলবার। পূর্বে কিন্তু এই প্রদেশ দশ “প্রান্ত” নামক উপবিভাগে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে উত্তরদিকে ঝালাবার প্রান্তে ৫০টি ক্ষুদ্ররাজ্য ছিল; ঝালাবারের পশ্চিমে মজ্জুকাছা প্রান্ত (মন্ত্রকান্ত ?), উত্তর পশ্চিমে হালাল (এই প্রান্তে ২৬টি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল); সর্ব-দক্ষিমে বরদার অধীনস্থ ওখমগুদ প্রান্ত; দক্ষিণপশ্চিম উপকূলে বার্দী বা কেঠবার প্রান্ত, দক্ষিণে সুরাঠ প্রান্ত, দক্ষিণপূর্ব

উপকূলে পার্শ্বভা বাত্রিরাবাড় প্রান্ত, মধ্যস্থলে বৃহৎ কাথিয়াবার প্রান্ত, শক্ৰজী (শক্ৰজয়) নদীতীরস্থ উলসারিয়া প্রান্ত, পূর্বে গোহেলবার প্রান্ত, (কাথে উপসাগরের তীরে—গোহেল রাজপুতগণ এই স্থানে রাজত্ব করিত বলিয়া ইহার নাম হয়), এই শেষোক্ত প্রান্তের মধ্যে আন্ধ্রাবাদ বিভাগের গোঁবা বা গোঁগো উপবিভাগ অবস্থিত।

কাথিয়াবারের ভূভাগ বহুদূর ও অল্পক পর্বতমালায় অনির-মিত ভাবে বিচ্ছিন্ন। ঝালাবারের পশ্চিমে ঠাঙ্গা ও মাণ্ডব পর্বত এবং হালালের মধ্যবর্তী কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ পর্বত ব্যতীত উত্তরাংশের অভ্যন্তরস্থ প্রায় সমতল; কিন্তু দক্ষিণাংশে গোঁবার নিকট হইতে ২০ মাইল দূরে বাত্রিরাবাড় ও সুরাঠের উত্তর দিয়া উপকূলের সমান্তরালে “গিরি” নামক পর্বতমালা গিরিনের জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃত। গিরিনের পর্বতমালায় বিপরীত দিকে “ওসন” পর্বত অবস্থিত এবং আরও পশ্চিমে হালাল ও বার্দীর মধ্যে বার্দী পর্বত মালা সুমূল হইতে ঝালাবাও নামক স্থান পর্যন্ত উত্তর দক্ষিণে ২০ মাইল বিস্তৃত। গিরিনের পর্বতমালা কেবল গ্র্যানাইট প্রস্তরপূর্ণ ও অতি প্রসিদ্ধ। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ৩৫০০ ফুট উচ্চ।

কাথিয়াবারের সর্বপ্রধান নদী “ভাদর” (ভদ্রা) মাণ্ডব পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপশ্চিমমুখে ১১৫ মাইল ভূমি বাহিয়া বার্দীর অন্তর্গত নবিবন্দর নামক নগরের নিকট সমুদ্রে মিলিয়াছে। মাণ্ডব পর্বত হইতেই আর একটি “ভাদর” নদী (“শুকা ভাদর” নামে প্রসিদ্ধ) উৎপন্ন হইয়া পূর্বমুখে কাথে উপসাগরে পড়িয়াছে। এতদ্বির অজি, মজ্জু (মন্ত্র ?), ভোগাবা ও শক্ৰজী (শক্ৰজয়) নামে কয়েকটি নদী আছে। শক্ৰজীনদীর উপকূলের শোভা অতি সুন্দর।

কাথিয়াবারে পূর্বে ঞেঠবা, চূড়াসমা, সোলাকী, বালা প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন জাতির প্রভুত্ব ছিল; কিন্তু আজ কাল ঐ সকল জাতির সংখ্যাও হ্রাস হইয়া গিয়াছে এবং ঝালা, জারোজা, প্রমার, কাথি, গোহেল, জাঠ, সুন্দরান ও মার্হাট্টাগণই দেশের মধ্যে জমিদার হইয়া পড়িয়াছে।

কাথিয়াবারের বনবিভাগ অতি প্রয়োজনীয়। দেশীয় রাজগণ যদিও এ সকল প্রদেশে মনোযোগ দেন না, তবুও এ সকল প্রদেশ হইতে তাঁহাদের মন্দ আয় হয় না। বাফানার ও পঞ্চালপ্রদেশে চকর কাঠ উৎপন্ন হয়। ভাউনগর, মতি, গোঁতাল ও মানাবদার প্রদেশে বাবলার আবাদ আছে। নানাজাতীয় তাল, আম ইত্যাদি ভাউনগরে বিশিষ্টরূপে

জন্মে। প্রশস্ত রাস্তা ও অজ্ঞাত প্রধান রাস্তার ধারে ধারে মানীরাপ বৃক্ষাদি রোপিত হইয়া থাকে।

ইতিহাস—কাথিয়াবার প্রদেশই প্রাচীন সুরাষ্ট্রদেশ।

গ্রীক ও রোমীয় প্রাচীন ভৌগোলিকগণ ইহাকে “সুরাষ্ট্রীনী” বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানেরা দেশীয় চলিত কথা অনুসারে “সুরাঠ” বলিত। এখনও ইহার অন্তর্গত দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ একটি বিভাগকে সুরাঠ বলে, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে কচ্ছ প্রদেশ হইতে কাথি জাতি দূরীভূত হইলে, তাহারাই এই প্রদেশের পূর্বাংশ (এখন যে বিভাগের নাম কাথিয়াবার প্রান্ত বলিয়া পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে সেই স্থানে) আসিয়া বাস করে, পরে ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে সৌরাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লয়। শেষে যখন মহারাষ্ট্রদিগের সহিত ইহাদের জানা শুনা হয়, তখন তাহারাই এই প্রদেশ “কাথিয়াবার” (কাথিগণের রাজ্য) এই নাম দেয়। সেই অবধি এই প্রদেশ কাথিয়াবার নামেই চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এতদঞ্চলের হিন্দুরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা আজিও ইহাকে সৌরাষ্ট্র বা সুরাষ্ট্ররাজ্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

অতিপূর্বে সৌরাষ্ট্র ব্রাহ্মণামুগত ক্ষত্রিয়রাজ্য ছিল, পরে বৌদ্ধরাজ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অশোক ২০৫-২২৯ খৃঃ পূঃ অব্দে জুনাগড় ও গিরিনরের মধ্যবর্তী পর্বতে একটি অমুশাসন উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। গ্রীক ইতিহাসবেত্তা ট্রাবো “সারাওটম” নামে যে রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ সুরাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ এবং তাহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় প্রায় ১৯০ হইতে ১৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে শকুনিদীয় নৃপতির আদেশ কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

এই প্রদেশ অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালে সম্ভবতঃ প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত। তৎপরে খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত দেশীয় সাহা উপাধিকারী রাজগণ রাজত্ব করেন। তৎপরে কনোজের গুপ্তরাজগণের অধিকৃত হয়। গুপ্তরাজগণ সেনাপতি বা প্রতিনিধি দ্বারা এদেশ শাসিত করিতেন। অবশেষে এই প্রতিনিধি সেনাপতিরাই স্বাধীন রাজা হন। ইহাদের মধ্যে বলভীনগরের সেনাপতি ভট্টারক সর্কাপেক্ষা বিখ্যাত ও প্রবল ছিলেন। শেষে যখন গুপ্তবংশ রাজ্যচ্যুত হন, তখন বলভীনগরের ভট্টারকবংশ কচ্ছ, লাটদেশ (সুরাঠ, বরোচ, খেদা ও বরদার কতকাংশ) এবং মাণবে প্রভৃৎ স্থান

করেন (৪৮০ খৃষ্টাব্দ)। ভাউনগরের উত্তর-পশ্চিমে ১৮ মাইল দূরে বর্তমান “বালা” নামক স্থানের ধ্বংসাবশিষ্ট নগরীকেই অনেকে বলভীনগর বলিয়া অনুমান করেন। বলভীরাজ দ্বিতীয় জুবসেনের রাজত্বকালে (৬৩২—৬৪০ খৃষ্টাব্দ) হিউয়েন সিয়াং এদেশে আসেন। তিনি যে “কলপি” রাজ্যের ও “সুলাচা” প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বোধ হয় বলভী ও সৌরাষ্ট্র হইবে। তাহার বর্ণনার জানা যায় যে, এদেশের লোক বিদ্যাশুশীলন করিত, তবে সমুদ্রোপকূলবাসী বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যেই ব্যস্ত থাকিত; ইহার অতিশয় ধনী ও অতিথিভক্ত ছিল।

কিসে বলভীরাজ্য ধ্বংস হয় জানা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, দিল্লু হইতে মুসলমানেরাই ইহা আক্রমণ ও ধ্বংস করে। এই সময় (৭৪৬ হইতে ১২৯৭ খৃঃ অব্দ) অনহিলবারের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই সময় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সৌরাষ্ট্র বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং কেউবা জাতি প্রাঞ্চল লাভ করে। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা অনহিলবার অধিকার করে। ইহার কিছু পূর্বে অনহিলবারের সমৃদ্ধিকালে ঝালাজাতি এদেশে আসিয়া বাস করে।

গজনির মাক্কুদ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সোমনাগের মন্দির আক্রমণ করেন। তিনিই প্রথমতঃ (১১৯৪ খৃষ্টাব্দে) অনহিলবার আক্রমণ ও তাহার ধ্বংসের সূত্রপাত করিয়া যান। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। ইনি গুজরাটের মুসলমান রাজগণের আদিপুরুষ। এই মুসলমান বংশ ১৪০৩ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বিশেষ প্রবল হইয়া ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, তৎপরে এই স্থান মোগলসম্রাট আকবরের অধিকৃত হয়। আকবরাদেশের রাজগণ কাথিবারের কতকগুলি সর্দারকে বশীভূত করিয়া বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ মাজ্জোল, বীরাবল, ডিউ, গোগো ও কাঁধে প্রভৃতি বন্দরগুলির উৎকর্ষতা সাধন করেন।

১৫২৮ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজেরা এদেশে প্রবেশ করিতে পায়। পূর্বেই মুসলমান রাজগণের মধ্যে বাহাদুর নামক রাজা হনায়ুন কর্তৃক পরাজিত হইয়া ডিউবীপে পর্তুগীজদিগের আশ্রয় লয়েন। পরে তিনিই পর্তুগীজগণকে কাথিয়াবারের মধ্যে কারখানা করিতে আদেশ দিতে বাধ্য হন। এই কারখানা শেষে চুর্ণে পরিণত হয় ও পর্তুগীজেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিষ্ঠুরভাবে বাহাদুরকে হত্যা করে (১৫৩৬ খৃঃ)।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রেরা গুজরাটে প্রবেশ এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এদেশে দৃঢ়রূপে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তৎপরে প্রায় ৫০ বৎসর কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তযুগে কাথিবারের

মহারাত্রিদিগকে সর্বদাই বাপূত থাকিতে হইয়াছিল। ১৮শ শতাব্দীর পূর্বার্ধে গুইকুমার প্রতি বৎসর পশ্চিম ও উত্তরদিকের সর্দারগণের নিকট হইতে রাজস্ব-আদায়ের জন্য “মুলুক-গিরি” নামে একদল সৈন্য পাঠাইতেন। এই সৈন্যদলের সহিত সর্দারগণের প্রায়ই বিবাদ হইত, আর সেই সূত্রে দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিত। ইংরাজরাজ ইহা দেখিয়া গুইকুমারের সহিত একযোগে রাজস্ব আদায়ের সূচন্যম করিলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াবারের কতকগুলি তালুকদার স্ব স্ব তালুক ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে প্রদান করিয়া আপনারা বুটেশ-রাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এই সকল তালুকদার মহারাত্রিরাজ পেশবারের অধীন ছিলেন না। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে গুইকুমারের সৈন্য ও বুটেশরাজের সৈন্য কাথিয়াবারে প্রবেশ করিয়া তালুকদার ও সর্দারগণের সহিত বন্দোবস্ত করে। স্থির হইল—তালুকদার নিজ নিজ তালুকের খাজনা নির্দিষ্ট হারে দিবেন এবং স্ব স্ব অধিকার মধ্যে শাস্তিরক্ষা করিবেন; গুইকুমার আর মুলুকগিরি সৈন্য পাঠাইবেন না। কর্ণেল ওরাকারের মধ্যস্থতায় (১৮০৭-৮ খৃঃ) সামন্তযুদ্ধ থামিয়া যায়। এই সময় হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার বুটেশরাজের হস্তে পড়িল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে গুইকুমার রাজস্বের নিজাংশ বুটেশরাজের হাতদিয়াই আদায় ও গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াবারের শাসনভার পলিটিক্যাল এজেন্টের হস্তে প্রদত্ত হয়। বোম্বাই গবর্ণমেন্টের অধীনে থাকিয়া এজেন্ট সমস্ত কার্য করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এক জন ইংরাজবিচারকের অধীনে এখানকার রাজকেটনগরে একটি প্রধান নিজামত আদালত স্থাপিত হইয়াছে।

কাথিয়াবারে রীতিমত পুলিশ নাই। প্রত্যেক সর্দার স্ব স্ব অধিকারমধ্যে শাস্তি রক্ষা করিতে বাধ্য।

ভাউনগর হইতে গোণ্ডাল পর্যন্ত যে রেল-লাইন আছে, তাহাই এখানকার প্রধান রেলপথ। এই লাইনে ১৪টি স্টেশন আছে। ধোলা-স্টেশন হইতে একটি শাখা-পথ ধোরাজি পর্যন্ত গিয়াছে, ইহার মধ্যে ১০টি স্টেশন আছে।

কাথিয়াবারে তুলার আবাদ যথেষ্ট। এখান হইতে বৎসরে প্রায় ৩০,০০০,০০০ টাকার তুলা রপ্তানি হয়। এই তুলার কাটতি বোম্বাইয়েই অধিক। এখানে চকর কাঠের ব্যবসাও যথেষ্ট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের মধ্যে ধরদ্র, নবনগর, জুনাগড় ও ভাউনগর (ভবনগর) প্রধান। ভাউনগর রাজ্যে দেশীয় লোক পরিচালিত ৫টি তুলার কল আছে।

কাথিয়াবারের প্রধান উৎপন্ন—তুলা, বাজরা, জোয়ার, ইক্ষু, হরিদ্রা ও নীল। এতদ্বিধ স্বর্ণ ও রৌপ্য, জরি, রেশমী বস্ত্র, সিন্দূর, অগন্ধি তৈল, গোলাপফুলের অগন্ধি, হস্তিদন্ত ও চন্দনের নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এখানকার ঘোড়া অতি উৎকৃষ্ট। মেঘলোমের ব্যবসায় যথেষ্ট আছে।

এদেশে ধাতুপাত্র, শস্ত, চিনি প্রভৃতি আমদানী হয়। বাদী ও হালালের মধ্যে লোহখনি আছে। পুরবন্দররাজ্যে বখরলা নামক স্থানে অনেক লোহের খনি বাহির হইয়াছে, কিন্তু অপরিষ্কৃত লোহপিণ্ড ও গলাইবার উপযুক্ত ইন্ধনের অভাবে এ সকল খনির কার্য হয় না।

বস্ত্র জন্তর মধ্যে গিরিশিখরে সিংহ, চিতাবাঘ, হরিণ, শূকর, হায়েনা, নেকড়ে, শূগল, বনবিড়াল, খেকশিয়ালী, শজার প্রভৃতি প্রধান।

গুজরাটের সিংহ দেখিতে স্রবং পীতভ শ্বেত, ব্যাঘ্রের তুলা দীর্ঘ ও সবল। ইহারা একাদিক্রমে ৩ পুরুষ একত্র বাস করে। আপাততঃ সমস্ত জঙ্গলের মধ্যে প্রায় ১২টি সিংহ আছে মাত্র, আর সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। এই সিংহ কয়েকটি বধ করিতে নিষেধ আছে।

লোকসংখ্যা ২৩৪৩৮৯৯, তন্মধ্যে ১৯৪২৬৫৮ হিন্দু এবং ৩০৩৫৩৭ মুসলমান, দুইটি পরগণা ইহার অন্তর্গত চাঁদা ও অলন্দেমৌ।

[প্রভাস, উজ্জয়ন্ত, গিরিনর, শক্রজয়, সোবাস্ত্র প্রভৃতি শব্দে কাথিয়াবারের পুরাতন তীর্থমাহাত্ম্যাদি দেখ।]

কাদর্থোচা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, কাদার্থোচা।

কাদড়া (দেশজ) কাদা, কদম্ব।

কাদড়াটিয়া (দেশজ) কাদায়ুক্ত স্থান।

কাদম্ব (পুং) কদম্ব সমূহে ভবঃ, কদম্ব-অণ্। ১ কলহংস।

রাজবল্লভের মতে ইহার মাংস গুণ—শীতল, ভেদক, শুক্র-কারক এবং বায়ু, রক্ত ও পিত্তনাশক। ২ কদম্ব-স্বার্থে অণ্। কদম্ব গাছ। ৩ (ত্রি) কদম্বস্বকীয়। ৪ ইক্ষু। ৫ বাণ। (কাদম্বঃ স্ত্র্যং পুমান্ পক্ষিবিশেষে শায়কে হপি চ। মেদিনী) ৬ দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন রাজবংশ। [কদম্ব দেখ।]

কাদম্বক (পুং) কাদম্ব-স্বার্থে কন্। বাণ।

কাদম্বর (স্ত্রী) কাদম্বঃ কদম্বোদ্ভবঃ রসঃ লাতি গৃহাতি, কাদম্ব-লা-ক, লস্ত রঃ। ১ কদম্ব ফুল দ্বারা প্রস্তুত মদ্য-বিশেষ। ২ (পুং, স্ত্রী) দধির সর। ৩ লীধু নামক মদ্যবিশেষ। ৪ ইক্ষুজাত শুড়াদি। (পুং) ৫ বলরাম।

কাদম্বরী (স্ত্রী) কু কৃষ্ণবর্ণঃ নীলবর্ণঃ ইত্যর্থঃ, অধরঃ বস্ত্রং যন্ত, কোঃ কদামেশঃ; কদম্বরো বলরামঃ, তন্ত প্রিয়া, কদম্বর-

অণু-ঈপ্। ১ মদ্য। ২ কোকিলা। ৩ সরস্বতী।
৪ শারিকাপাখী। ৫ বাণভট্ট বিরচিত কথাবিশেষের নারিক, ইনি হংস নামক গজকর্করাজের এবং চন্দ্রকিরণ হইতে উৎপন্ন 'অঙ্গরোক্তুলে জাতা গৌরীর কন্তা। এই নারিকার নামাহু-সারে বাণভট্টশ্রীত সেই কথাগ্রন্থেরও নাম কাদম্বরী হইয়াছে। [বাণভট্ট দেখ।]

কাদম্বরীবীজ (কী) কাদম্বর্যাঃ বীজম্, ৩তৎ। সুরাবীজ। কাদম্বর্যা (পুং) কাদম্বর্যে হিতং, কাদম্বরী-বৎ। কদম্ববৃক্ষ। কাদম্বা (স্ত্রী) কাদম্ব ইব আচরতি, কাদম্ব-কিপ্, অচ-টাপ্। কদম্বপত্নী লতা, সুগন্ধী লতা।

কাদম্বিনী (স্ত্রী) কাদম্বাঃ কলহংসাঃ সন্তি অস্তান্, কাদম্ব-ইনি-ঈব্। মেঘমালা।

কাদর, —ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণার একশ্রেণীর অনার্য্য জাতি। দাক্ষিণাত্যে অনমলর পর্বতে এবং কোইম্বাটুর জেলায় "কাদের" নামে একশ্রেণীর অনার্য্য জাতি বাস করে, অনেকের অনুমানে এই উভয়জাতিই একশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়।

কাদরেরা কৃষি ও মৎস্যধারণ করিয়াই প্রধানতঃ জীবিকানির্ভর করে; অনেকে মজুরীও করিয়া থাকে। কাহারও মতে ইহারা ভূঁইয়া জাতিরই একটি জাতিভ্রষ্ট শ্রেণী মাত্র। ইহাদের মধ্যে ছুইটা শ্রেণী-বিভাগ আছে—কাদর ও নৈয়া। নৈয়া নামক একটি স্বতন্ত্র জাতিও আছে, তাহাদের সহিত কাদরজাতির কোন সংশ্লিষ্ট নাই।

কাদরজাতির মধ্যে অনেক গোত্র আছে। সকল গোত্রে পরস্পর আদান প্রদান হয় না। ইহাদের মধ্যে বাড়ে, বারিক, দর্কে, হাজারি, কম্পতি, কাপড়ি, মন্ডর, মন্ড্রি, মাকি, মন্ডেরা, মরিক, মির্দাহ, নৈয়া, রৌং ও রিখিয়াসন এই কয়টি গোত্র আছে। ইহার মধ্যে বাহাদের বাড়ে গোত্র, তাহার মির্দাহ, কম্পতি ও রৌং গোত্র ভিন্ন অল্প কোন গোত্রে বিবাহ করে না; বারিকগোত্র মন্ডর, মির্দাহ, রৌং ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে না; দর্কে গোত্র মরিক ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে না; কম্পতি গোত্র কেবল বারিক, কাপড়ি, মরিক, দর্কে, মাকি ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে। মরিকগোত্র বারিক, কাপড়ি, মাকি, মন্ডর ও নৈয়া গোত্রে; মির্দাহ গোত্রে দর্কে, মাকি, কম্পতি ও বাড়ে গোত্রে এবং নৈয়া গোত্র কেবল মরিক, হাজারি, নৈয়া, কম্পতি, ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে। ইহারা মাতুলকন্তা বা পিতৃব্যকন্তাকে বিবাহ করে না এবং মাতৃপর্ধ্যায়েও পুরুষ ও পিতৃপর্ধ্যায়েও পুরুষ বান দিয়া বিবাহ করে।

ইহারা বালিকা ও বরহা কন্ডারও বিবাহ দেয়। তবে বালিকাকালে বিবাহ দেওয়াই প্রাপ্ত বয়স গণ্য করে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়। সিন্ধুর-দানই বিবাহের প্রধান কার্য্য। গ্রামের নাপিত ইহাদের পুরোহিতের কার্য্য করে। জ্বর সন্তান না হইলে ইহারা আবার বিবাহ করে। বিধবা সাদাই প্রথাহুসারে নিষিদ্ধ গোত্র ও পুরুষাদি বাদ দিয়া বিবাহ করিতে পারে। জী স্বানীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সাদাই প্রথাহুসারে পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে। সাদাই-বিবাহ বাটীর বাহিরে অস্ত্র-পুরের পশ্চাতে খোলা জাগাগার হয়, আর শুভ বিবাহ বাড়ীর উঠানে হইয়া থাকে।

ইহারা শবদাহ করিয়া তাহার ভস্ম লইয়া মৃত্যুর পরদিবস সমাহিত করে; জরোদর্শদানে মৃতের উদ্দেশে বলি দেয় এবং মৃত্যুর তারিখ হইতে ছমাসের পর আবার ঐরূপ বলি দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বার্ষিক শ্রাদ্ধাদি নাই।

হিন্দু মধ্যে ইহারা অতি নিম্ন শ্রেণীতে গণ্য। ডোম ও হাড়ি ভিন্ন অল্প কোন জাতি ইহাদের জল স্পর্শ করে না। কাদরেরা নিজে ভূঁইয়া ও কাহারের অন্নাদি গ্রহণ করে; কিন্তু তাহার করে না। ইহারা গোমাংস, শূকর-মাংস, মোরগ ও মেঠো ইন্দুর খায়, মদ্যাদিও পান করে। সময়ে সময়ে ইহারা কান্তে ও কুঠারের পূজা করে।

কাদরেরা হিন্দু বটে, কিন্তু অপর অসত্য জাতির ছায়ানানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইহাদের মধ্যে কত ভাংগ লোকে বিশ্বাস করে যে কতকগুলি বিশেষ শক্তিবস্তুর অপদেবতারা তাহা-দিগের চতুর্দিকে অবস্থিতি করে; তন্মধ্যে অনেকেই তাহাদের পূর্বপুরুষের আত্মা। অপর কেহ কেহ বিশ্বাস করে যে ওরূপ অপদেবতা নাই, তবে নদীপর্বতাদি হইতে শক্তি সকল উদ্ভূত হয়, এই সকলের কোন মূর্তি বা প্রতিমা নাই। কোথাও এক টিপি মূর্তিকা বা এক খণ্ড সিন্দূর-লেপিত প্রস্তর খণ্ড মাত্র ভগবানের উদ্দেশে শবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সকল প্রতিষ্ঠিত দেবতার মধ্যে কারু-দানো, হদিরা-দানো, সিমরা-দানো, পাহাড়-দানো, মোহন, ছয়া, লিনু, পরদানো ইত্যাদি প্রধান। ইহাদের মতে এই সকল অপদেবতা যে কিরূপ শক্তিবিশিষ্ট তাহা জানা যায় নাই। কাদরেরা বলে যে, ঐ সকল অপদেবতার পূজার অব-হেলা করিলে দেশে নানা অমঙ্গল ঘটে। পূজাকালে ইহারা শূকরশাবক, ছাগল, পাঁরয়া ও মোরগ বলি দেয়, শতের শীষ ও বৃত্তাদি উৎসর্গ করে। ইহাদের দেবতা যেখানে স্থাপিত থাকেন, সেই কুঞ্জের নাম সর্গা। নাপিতেরাই ইহাদের

পুরোহিত। পুন্ড্রব্য উপাসকেরা ভোজন করে। ইহারা নিজে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় ও পরমেশ্বর, মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে বিশ্বাস করে।

দাক্ষিণাত্যের কাদেবরণ পর্বতবিভাগে বাস করে। তাহার পুণ্ড্রবরণ ও মালয় আরম্ভের জাতির উপর প্রভুত্ব করে। সময়ে সময়ে কামান ও মুদ্রসজ্জাদি বহন করে বটে, কিন্তু কখন দাসাদির কাজ করে না। মুটিয়া বলিলে তাহার আপনাকে অপমানিত বোধ করে। এই জাতি বড় বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও বাধ্য। ইহারা কৃষিক কেশে খোঁপা বাধে; বন হইতে হরিদ্রা, আদা, মধু, মোম, এলাচ, রজন, বড় রিটা, মাজুফল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া চাউল ও তামাকুর সহিত পরিবর্তন করিয়া থাকে। ইহারা বৃট্টাধিকৃত বন হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করে, তাহার জন্ম কিছু কর দেয় না। কোচীনরাঙ্গের অধিকৃত বনভাগ হইতে এলাচসংগ্রহ করিবার জন্ম কেবল বার্ষিক ১০০ টাকা কোচীনরাঙ্গকে রাজস্ব দেয়। ইহারা বনমধ্যে পথপ্রদর্শকের কাৰ্য্য করে, কিন্তু কখন ভারবহন করে না।

কাদিরআলী, একজন মুসলমান পীর। প্রায় ৫২৭ হিজরীতে সিজিহানে জয়গ্রহণ করেন, তৎপরে কুতব উদ্দীনের রাজ্যকালে আজমীঢ়ে আইসেন; এখানে সৈয়দ-হুসেন মেশেদীর কত্মার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১০২৭ হিজরীতে জাঁহাঙ্গীর বাদশাহ তাঁহার গোবের নিকট একটি মন্দির মসজিদ নির্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার স্মরণার্থ নগরেও একটি মসজিদ আছে। মোপ্লা মুসলমানেরা কাদিরআলীকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ১১ই জমাদি-উল-আখীর তাঁহার উৎসব দিন।

কাদলেয় (জি) কদলেন নিবৃত্তন, কদল-ঢক্। কদল-নির্মিত।

কাদা (দেশজ) ১ কর্দম, পাক। ২ বঙ্গদেশে জীলোকদিগের প্রথম ঋতু হইলে একরূপ উৎসব।

কাদাকিচা (দেশজ) কর্দময় স্থান।

কাদাখৈড়ু (দেশজ) বাঙ্গালা দেশে জীলোকদের প্রথম ঋতু হইলে, অজ্ঞাত জীলোক একত্র হইয়া যে খেউড় পাঁচালী প্রভৃতি গান করে, তাহাকেই কাদাখৈড়ু বা কাদাখৈউড় বলে।

কাদাখৈচা (দেশজ) গন্ধবিশেষ।

কাদাচিংক (ক্কা) কদাচিং ভবন্, কদাচিং-কালবাচিৎ ঠক্। কোনও অনির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন।

কাদাচিংকতা (জী) কাদাচিংকত ভাবঃ, কাদাচিংক-তদ্ (ভক্ত ভাবহৃত্যে)। পা ৫।১।১১৯। টীপ। কদাচিং উৎপত্তি।

(“তথাপি তত্ত কাদাচিংকতরা উপচরিতেন কাৰ্য্যচেন কাৰ্য্যত্বমুচ্যতে।” সাহিত্যদং ৩।২৭।)

কাদাটিয়া (দেশজ) কাদামৃত, কর্দময়।

কাদাডিয়া (দেশজ) কর্দমগুণ, কাদামৃত।

কাদান (দেশজ) কাদা করিয়া দেওয়া।

কাদাল (দেশজ) কাদামৃত।

কাদিপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের মুলতানপুর জেলার উপ-বিভাগ। অক্ষা° ২৫° ৫৮' ৩০" হইতে ২৬° ২০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৯' হইতে ৮২° ৪৪' পূঃ। উত্তরসীমা অকবরপুর তহ-সীল, পূর্বে আজমগড় জেলা, দক্ষিণে পতি তহসীল এবং পশ্চিমে মুলতানপুর তহসীল। ভূমিপরিমাণ ৪৩৯ বর্গমাইল। কাদিয়ান, বোর্নিও দ্বীপবাসী অনার্য্য জাতিবিশেষ। এই জাতি এক্ষণে মুলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারাই বোর্নিও দ্বীপের আদিম অধিবাসী। ইহারা সরল ও শান্তি-প্রিয়। ইহাদের জীলোকেরা বেশ সুখী।

কাদিরগঞ্জ, উত্তর-পশ্চিমের এটা জেলার অন্তর্গত একটি পল্লী। এখানে ককরে নির্মিত একটি প্রাচীন চূর্ণের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, এখানকার আরবীভাষায় খোদিত শিরলিপিপাঠে জানা যায়, ঐ স্থানে ১১০৪ হিজরীতে আলমগিরির রাজ্যকালে সুলতান খাঁ দরগা নির্মিত হয়।

কাদিহাটি, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি নগর। সাধারণে কেহিট বলে। অক্ষা° ২২° ৩৯' ১০" উঃ; দ্রাঘি° ৮৮° ২৯' ৪৮" পূঃ। এখানে প্রায় ৫০০০ লোকের বাস। বিদ্যালয়, ডাক-ঘর ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটী আছে।

কাদেব্ (আরব্য) শক্তিশালী, ক্ষমতাবান।

কাদা (দেশজ) কাটারী, দা।

কাদ্রবেয় (পুং) কদ্রোরপত্য পুমান, কদ্র-চক্ (শুভ্রাদি-ভ্যচ। পা ৪।১।১২৩।) কদ্রপুত্র, শেষ, অনন্ত, বাহুকি, তক্ষক, ভূজঙ্গ ও কুলিক এই কয়েকটি কাদ্রবেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(“শেষো হনন্তো বাহুকিচ তক্ষকশ্চ ভূজঙ্গমঃ।

কুর্শ্চ কুলিকশ্চৈক কাদ্রবেদাঃ প্রকীর্তিতাঃ।”

মহাভারত ১।৬৫।৪১।)

কান (হিন্দী) ১ কানাই, কুক। ২ অসত্য বাদ্যকর জাতি-বিশেষ, অনেকটা আচার-ব্যবহারে ডোমজাতির মত। ২ মুসলমান কানারবিশেষ। ইহার লোহাপেটা, ছাতার শিক ও মৎস্ত ধরিবার বড়লী প্রস্তুত করে।

কানক (ক্কা) কনকং কলদবি উগ্রং কলং অন্তত, কনক-অপ্। ১ জয়পালবীজ। রাজবর্মণের মতে ইহার ৩৭,

ভীক্ষ ও উচ্চবীজ্য, সারক ও উৎক্রেদকারক। ২ (ত্রি)
কনকসম্বন্ধীয়, স্বর্ণনির্মিত।

কানকুর (দেশজ) বৃকবিশেষ, কঁকড় (Cucumis
utilissimus.)

কানঙুই (পারজ) নবাবের সময়ে রাজকর্ণচারীদিগের
মধ্যে একপ্রকার উপাধিবিশেষ, কামুনগোই।

কানড়গোড় (পুং) কানড়া ও গোড়রাগসংযোগে উৎপন্ন
রাগবিশেষ।

কানড়নট (পুং) কানড়া ও নটরাগ সংযোগে জাত রাগবিশেষ।
কানড়া, কানাড়া (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। নি সা ঞ্ গ ম প ধি
(মি-খাঁ) এই কয়েকটি ইহার স্বরগ্রাম। রাত্রি ১১ হইতে ১৫
দণ্ড পর্য্যন্ত এই রাগিণী গানের সময়। কানড়া ভিন্ন ভিন্ন রাগ-
রাগিণীর সহিত মিশ্রিত হইয়া ১৮ প্রকার মিশ্রকানড়ার উৎপত্তি
হইয়াছে। যথা—১ দরবারীকানড়া, ২ নায়কীকানড়া, ৩ মুদ্রা-
কানড়া, ৪ কৌশিকীকানড়া, ৫ বাগেশ্বরীকানড়া, ৬ নটকানড়া,
৭ কাফিকানড়া, ৮ কোলাহলকানড়া, ৯ মঙ্গলকানড়া,
১০ শ্রাসকানড়া, ১১ টঙ্ককানড়া, ১২ নাগধ্বনিকানড়া,
১৩ আড়ানা, ১৪ সাহানা, ১৫ স্রষ্টাকানড়া, ১৬ স্রবরাই-
কানড়া, ১৭ হোসেনীকানড়া, ১৮ মিক্রার জয়জয়ন্তী।

কানদ (পুং) ধীসরণের পুত্র।

কানন (স্ত্রী) কং জলং অননং জীবনং অস্ত, বহুব্রী। যথা
কানন্যতি দীপয়তি, কন-গিচ্ লুট্। ১ বন। ২ (কস্ত্র ব্রহ্মণঃ
আননম্।) ব্রহ্মার মুখ। ৩ গৃহ।

(কাননং বিপিনে গেছে পরমেষ্টিমুখে হপি চ। মেদিনী)

কানচন্দ্র, টিকারীর একজন বিখ্যাত রাজা। (দেশাবলী
ঈ ৫৫।২।২)

কাননারি (পুং) কাননাঙ্জাতো হরিং, মধ্যলো। দাবানল।

কাননারি (পুং) কাননস্ত অরিরিব, উপনি। শমীবৃক্ষ; ইহার
মধ্যস্থিত শাখা ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া, সময়ে সময়ে সমগ্র
বনও দগ্ধ করিয়া ফেলে; এজন্য ইহাকে কাননারি কহে।

কাননৌকাঃ [ল্] (পুং) কাননং ওকঃ স্থানমস্ত, বহুব্রী।
বলবাসী।

কানপুর (হিন্দী কান্হপুর—কানাইপুর) উত্তর-পশ্চিম
প্রদেশের একটি জেলা ও নগরের নাম। আলাহাবাদ বিভা-
গের সর্বপশ্চিমাংশে এই জেলা অবস্থিত; ইহার উত্তর-
পূর্বে গঙ্গানদী, পশ্চিমে ফরক্কাবাদ ও এতাবা; দক্ষিণপশ্চিমে
যমুনা ও পূর্বে কতেপুর। এই জেলার সদর কানপুরনগর।

কানপুর জেলা গঙ্গাযমুনার অন্তর্গত অবিখ্যাত দোয়াব
প্রদেশের মধ্যবর্তী। এই জেলায় গঙ্গা ও যমুনা ভিন্ন

আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। সাধারণতঃ ভূমি-
ভাগ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ঢালু। চারটি প্রধান ক্ষুদ্র
নদীতে কানপুর জেলাটি চারিটা প্রধান ভাগে বিভক্ত;—
গঙ্গার উপনদী “জৈনানী” উত্তরদিকে একখণ্ড ত্রিকোণাকার
ভূমিকে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। মধাহ্নে পাণ্ডু ও রিম্প
নদীদ্বয়ে আর দুইটা বিভাগ হইয়াছে ও অবশিষ্ট ভূখণ্ডের
মধ্যে যমুনার উপনদী সেক্সর বর্তমান। এই সকল নদীর
ভাঙ্গন বড় অধিক, বিস্তৃত ও গভীর। কানপুর জেলার
মধ্যে গঙ্গাযমুনায় বর্ষাকালে বড় বড় নৌকাদি যাতায়াত
করিতে পারে; কিন্তু অল্প সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা ব্যতীত
বড় নৌকা চলিতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি গ্রীষ্মকালে
প্রায় শুকাইয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কানপুরের নীচে
পারাপারের জন্ত ভাসা-সেতু ছিল, পরে অবোধা-রোহিলখণ্ড
রেলপথের জন্ত গঙ্গার উপর সেতু নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ঐ
ভাসা-সেতু কার্য্যে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যমুনায়
উপর নৌ-সেতু আছে।

কানপুর জেলার জমী স্বভাবতঃ শুষ্ক, কিন্তু এখন গঙ্গার
খাল হওয়ায় জমী বেশ উর্বরা ও শস্তশালিনী হইয়াছে।
এই খাল শাখা-প্রশাখায় কাটিয়া সমস্ত জেলায় ছড়াইয়া
জল দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এ জেলায় ঋতু-
গুলি ঝিল আছে। পরগণা সিকন্দ্রা নামক স্থানে
সোনউনামে একটি ঝিল আছে, ইহা সিকন্দ্রা পরগণা
হইতে ভোগনিপুর পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ঝিলটি
যমুনা হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। যমুনা এখন
যেখানে যেমন ভাবে যতটা বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, ঐ
ঝিলটিও ঠিক তাহার সমান্তর ভাবে ঐরূপ বাঁকিয়া বাঁকিয়া
বহিয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে ইহাই যমুনা
নদীর প্রাচীন গর্ভ ছিল; কিন্তু আজিও এ সম্বন্ধে কোন
প্রমাণ বা প্রবাদ পাওয়া যায় না; এইরূপ রহস্যবাদ ও
শিবরাজপুর পরগণায় ২৫ মাইল বিস্তৃত একটি স্রোতও ঐরূপ
একটি প্রাচীন নদীগর্ভ বলিয়া বিবেচিত হয়। এ জেলায়
জলল নাই, তবে স্থানে স্থানে পতিত জমী আছে। এই সকল
পতিত জমীতে কিঞ্চিৎ বৃক্ষই অধিক দেখা যায়। এ
জেলায় চিতাবাঘ, নীলগাই (নীলবর্ণ কৃষ্ণসারজাতীয় হরিণ),
শুদ্ধহীন ও শৃঙ্গবিশিষ্ট হরিণ, খেঁকশিয়ালী, শৃগাল, বজ্রশূকর
ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অনেক বন্য জন্তু নাই।

কানপুর জেলায় ২৩৭০ বর্গমাইল ভূমিতে প্রায় লক্ষ
লোকের বাস, তন্মধ্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সকল জাতীয়
হিন্দু, সকল খ্রীষ্টীয় মুসলমান ও য়ুরোপীয় আছে।

গ্রামের সামাজিক বন্ধন অন্তর্বেদীর অস্তিত্ব স্থানের মত। জমিদারেরাই প্রথমে গণ্য, ব্রাহ্মণ বা রাজপুতেরাই প্রধানতঃ জমিদার। তৎপরে এখানকার সাবেক অধিবাসীদিগের বংশধর কৃষকগণ, ইহার জমিদারদিগের জমী বংশানুক্রমে মৌরসী স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে। তৎপরে বেগিয়া দোকানদার ইত্যাদি, তৎপরে উন্নত জমীভোগী প্রজা, তৎপরে নাগিত, কামার, কুমার ইত্যাদি শিল্পীবিগণ।

কানপুর জেলায় চাষাবাসের বিশেষ প্রভেদ নাই, দোয়া-বের অস্তিত্ব স্থলেও যেরূপ প্রাণীভিতে কৃষিকার্য্য হয়, এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এখানে দুই প্রধান ফসল হয়। শরৎকালে যে ফসল হয়, তাহাকে খারিফ ও বসন্ত-কালে যে ফসল হয় তাহাকে রবিকর বল। জৈষ্ঠের প্রথমদিকে খারিফ ফসল বৃনে। এই ফসলে ধান, ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার, তুলা, নীল ইত্যাদি হইবে; ইহার অধিকাংশই আশ্বিনমাসে পরিপক হয়। ধান শীত শীত পাকিলে ভাজেও কাটিয়া থাকে, কিন্তু তুলা ফাল্গুন বাতীত তুলিবার উপযুক্ত হয় না। রবি ফসল আশ্বিনে বৃনে ও চৈত্রবৈশাখে কাটে। এই জেলায় প্রধান খাদ্য গম। এখন এ জেলায় তুলার চাষই প্রধান লাভকর ও বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এফেলায় চাষ করিয়া লোকে একরূপ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে; কিন্তু চামার, কাচ্ছি, কুড়মি প্রভৃতি কৃষকশ্রেণী বড়ই দরিদ্র। এইজন্য কানপুরের দরিদ্রতা অতিগম্ভীর। উত্তরাঞ্চলে জোয়ার ও গম এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাজরা অধিক জন্মে। বিলাছর, রহুলাবাদ ও শিবরাজপুরের দক্ষিণাংশে ধাতু জন্মে। শিবরাজপুরের উত্তরাংশে নীলই প্রধান। এই সকল ক্ষেত্রে গন্ধার খাল, কূপ, পুকুরিণী, জলা, ঝিল ইত্যাদি হইতে জল আনিয়া আবাদ হয়। কানপুরে অনাসৃষ্টির ভয় বেশী, সুতরাং হ্রদিকের ভয়ও যথেষ্ট; এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলেই আবার সে ভয় আরও বেশী। ১৭৭০, ১৭৮৩-৮৪, ১৮০৩-৪ ও ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কানপুরে বড় ভয়ানক হ্রদিক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক, বিস্তর গৌর বাছুর মরিয়া যায়।

কানপুর হইতে শত, তুলা ও নীলবীজের রপ্তানি হয়। এই জেলায় যে নীল হয়, তাহা হইতে কেবল বীজই সংগৃহীত হয় এবং বেহারপ্রদেশে এই বীজই অধিক বিক্রীত হয়। কানপুরনগরে ঘোড়ার সাজ, জুতা, পোট-ম্যাটো ইত্যাদি চামড়ার দ্রব্যাদি যথেষ্ট ও উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয়।

কানপুরে তুলার কলে কাগড় হয়। এখানে তাঁবু প্রস্তুত

হয়। এখানকার পুরাতন কেল্লার গবর্ণমেন্টের চামড়ার কারখানা হইতে সৈন্তগণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গবর্ণমেন্টের ময়দার কলও এইখানে, এই কলে সৈন্তদিগের জুতা ময়দা, ছাতু ইত্যাদি তৈরি হয়। এখানে তেজারতী কারবার অন্ন, বেগিয়া ও রাজপুতেরাই তাহা করিয়া থাকে। রেলপথ, নদী, খাল, পাকা ও কাঁচা রাস্তা প্রভৃতি নানাবিধ পথ যথেষ্ট আছে। অর্থ্যাণ্ডের প্রধান পাকা রাস্তা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড গন্ধার সমান্তরালে এই জেলায় প্রায় ৬৪ মাইল বিস্তৃত।

এখানে একজন কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেট, দুইজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, একজন অ্যাগিষ্টাণ্ট ও দুইজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। এ জেলা হইতে সকল প্রকার রাজস্বের মোট পরিমাণ ৩০২৮৬০ টাকা। পুলিশ, টেনিগ্রাফ, বিদ্যালয় ইত্যাদি সুবিধামত আছে।

কানপুর জেলায় চারিটি প্রধান নগর আছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ৫ হাজারের অধিক লোক বাস করে। প্রধান নগর কানপুরে ১৫১৪৪৪, বিঠুরে ৬৬৮৫, বিলহোরে ৫৫৮৯ ও অকবরপুরে ৫১৩১ জন লোকের বাস।

কানপুর নগর গঙ্গানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। প্রায়গ-সঙ্গম হইতে ১৩০ মাইল উর্দ্ধে এই নগর অবস্থিত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাই চতুর্থ নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৫০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। এখানে সেনানিবাস, আদালত, টেঁশন ইত্যাদি আছে। সেনানিবাস ও আদালত গঙ্গাতীরে। পূর্বাংশে আলোহাবাদ-রোডের উপর পশ্চিমাংশে দেশীয় অস্বারোহী সেনানিবাস ও কাওয়ারের জমী। কাওয়ারের পশ্চিমে যুরোপীয় পদাতি-বারিক ও সেন্টজেন গির্জা, ইহাদের মধ্যে গঙ্গাতীরে মেমোরিয়াল গির্জা (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের স্মরণার্থ নির্মিত হয়)। নগরের উত্তরাংশে সাধারণ কাওয়ারের জমী। ইহার সমুখে গঙ্গাতীরে মেমোরিয়াল উদ্যান। এই উদ্যানে একটি কূপ ছিল। এক্ষণে সেই কূপের উপর একটি স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দিকে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই স্তম্ভের উপরে একটি স্বর্ণবিদ্যাদারীর মূর্তি আছে। স্তম্ভগাত্রে ইংরা-জীতে খোদিত আছে যে “বিঠুরের বিদ্রোহী নানা ধুকুপহের দল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিখে এই স্থানের নিকটে অনেক যুরোপীয়কে বিশেষতঃ যুরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুকে অস্ত্রায়ুধে বধ করিয়া এই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া-ছিল।” এই উদ্যান রক্ষার জন্য গবর্ণমেন্টের বার্ষিক ৫০০০ টাকা খরচ হয়। ঐ বিদ্রোহে বাহাদুর নিহত হয়, এই বাগানের

দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমাংশে তাহাদিগকে সমাহিত করা হইরাছিল।

কানপুর নগর প্রাচীন নহে, এজন্য এখানে দর্শনীয় আটালিকা প্রাসাদ বা মন্দিরাদি নাই।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গারের ও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোয়ার যুদ্ধে জুজাউদৌলা (অযোধ্যার নবাব উজীর) পরাজিত হইলে এই নগর নির্মিত হয়। নবাব বুটশরাজের সহিত সন্ধি করিয়া ফতেগড় ও কানপুরে সৈন্য রাখিতে স্বীকৃত হন।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বর্তমান স্থান নবাবিকৃত স্থানের প্রান্তগামীয়ার সেনানিবাসের জন্য নিরূপিত হওয়ার এই নগরের পত্তন হইল।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা অযোধ্যার নবাবের নিকট ইহার চতুর্দ্বারস্থ স্থান প্রাপ্ত হইলে তখন হইতে ইহা একটি জেলা ও প্রধান নগর বলিয়া গণ্য হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ব্যতীত আর কোন ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে ঘটে নাই।

মুসলমানদিগের অধীনে এই জেলাটি সূবা আলাহাবাদ ও আগ্রার অধীনে অনেকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহাব-উদ্দীন শেরা দোয়াব অধিকার করেন, সেই সঙ্গে ইহাও তাহার অধিকৃত হয়। আরঙ্গজেবের সময় এখানে দুই একটি সামান্য মসজিদ নির্মিত হয়। দোঙ্গল সম্রাটগণের দুর্দশার সময় ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে এই অংশ মহারাষ্ট্রদিগের অধিকৃত হয়। অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধির পর বুটশসেনা প্রথমতঃ বিলগানে (বিছ্রামে) পরে কানপুরে আসিয়া অবস্থান করে।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় কয়েকদিন ধরিয়া সমস্ত জেলার বিদ্রোহানল জলিয়াছিল। মিরাটে বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পরই নানাসাহেবকে কানপুরের ধনাগার রক্ষার ভার দেওয়া হয় এবং জুন মাসের প্রথমে চতুর্দিকে গড়বাই করিয়া সমস্ত যুরোপীয়কে রাখা হয়। ৬ই জুন, এখানকার দেশীয় দ্বিতীয় অখারোহীদল ও দেশীয় প্রথম পদাতিদল বিদ্রোহী হইয়া জেল ভাঙ্গে, ধনাগার লুণ্ঠ করে ও আকিসাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে। তৎপরে বিদ্রোহীগণ দিল্লীঅভিমুখে চলিয়া যায়। এই সময় ৫৩ এবং ৫৪ সংখ্যক সৈন্যদল বিদ্রোহী হয়। নানাসাহেব তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সাহায্যে যুরোপীয়গণের আবাস আক্রমণপূর্বক ও সপ্তাহ অবরোধ করিয়া রাখেন। বেলিগারদ হইতে ইংরাজেরা কেবল সাত শত কি সহস্র জনই হইবে, মৌজে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করেন। বিদ্রোহীদের তিনবার আক্রমণ বুধা হইরাছিল। শেষে ইংরাজগণের অধিকাংশ বিনষ্ট হওয়ার বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে পরাস্ত

করিয়া উন্নতভাবে জীলোক ও শিশু পর্যন্ত নষ্ট করিতে লাগিল। ২৬ জুন, নানাসাহেব হস্তাবশিষ্ট ইংরাজদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিক্রিয়া করিতে লইয়া সকলকে লইয়া কানপুরের নতীচোরার ঘাটে নৌকার তুলিয়া দিলেন। নৌকা আলাহাবাদে তুলিয়া যাইবার পূর্বে তীরস্থ বিদ্রোহী সিপাহীরা গুলি মারিয়া আরোহীদিগকে মারিয়া ফেলিতে লাগিল। দুইখানি নৌকা পলাইতে চেষ্টা করায় সেনারা উভয়তীর হইতে গুলি মারিয়া একখানি ডুগাইয়া দিল। এখান হইতে কয়েক জন লাকাইয়া পড়িয়া শিবরাজপুরে পলাইয়া যায়; সিপাহীরা সেখান হইতেও আবার ৪ জন ব্যতীত সকলকে ধরিয়া আনিয়া মারিয়া ফেলে। নৌকার যত জীলোক ও শিশু ছিল, সকলকে শবাদাকৃতিতে আবদ্ধ রাখা হয়। পরে যখন কানপুরের বহির্দেশে ছাব্বলকের কামানের প্রথম শব্দ শুনা যায়, তখন সিপাহীরা সেই সকল শিশু ও জীলোককে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে। প্রায় ২০০ শত প্রাণ বিনষ্ট হয়। যেখানে এই ব্যাপার ঘটে, সেইখানেই মেমোরিয়াল কুপ ও স্তম্ভ আছে।

১৫ জুলাই ছাব্বলক পাণ্ডুনদীতীরে ও ঔজেরে যুদ্ধ করেন, তৎপর দিন কানপুর অধিকৃত হয়।

২৭ নবেম্বর, গোমালিয়রের বিদ্রোহীদল অযোধ্যায় বিদ্রোহীগণের সহিত মিলিত হইয়া কানপুর আক্রমণপূর্বক নগর অধিকার করে। পরদিন সন্ধ্যাকালে লর্ড ক্লাইভ আসিয়া পুনরায় আক্রমণ করেন ও ৬ই ডিসেম্বর বিদ্রোহীদিগকে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের সমস্ত কামান অধিকার করেন। জেনারল ওয়ালপোল অকবরপুর, রহুলাবাদ ও ডোগাপুর উদ্ধার করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কাল্পি উদ্ধার হইলে কাহুপুরে শান্তি স্থাপিত হয়।

কানলক (সি) কনল-বুঞ্জ। কনল নামক ব্যক্তি নির্মিত। কানাড়া, — দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলবর্তী একটি প্রদেশ। ইহার উত্তরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম জেলা, দক্ষিণে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মালাবার জেলা, পূর্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ধারবার জেলা, মহীশূর-রাজ্য এবং কুর্গ, পশ্চিমে আরব-সাগর ও ভারত মহাসাগর এবং উত্তরপশ্চিম কোণে গোয়া প্রদেশ। এই প্রদেশটি প্রেসিডেন্সী বিভাগের সময় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তরাংশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ও দক্ষিণাংশ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত হইরাছে। উত্তর কানাড়ার প্রধান নগর ও বন্দর করবর। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপকূলবর্তী প্রদেশগুলির দক্ষিণদিগবর্তী, ইহার দক্ষিণে দক্ষিণকানাড়া প্রদেশ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত, ইহার প্রধান নগর মঙ্গলুর (মঙ্গলোর)।

উত্তর কানাকার মধ্যে পশ্চিমঘাট পর্বতের সহ্যাদ্রিখণ্ড উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। এই জেলায় ইহার উচ্চতা ২৫০০ হইতে ৩০০০ ফুট। সহ্যাদ্রির উত্তর পার্শ্বের ভূমির একদিক উচ্চ ও অপর দিক নিম্ন। উচ্চ ভূভাগের নাম বালাঘাট, পরিমাণ প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল। উপকূলভাগে অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর মুখ থাকায় উপকূলরেখা বড় ছিন্ন ভিন্ন। (নদীমুখ প্রশস্ত হইয়া) সমুদ্রখাড়া দেশের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। উপকূলের উত্তরপশ্চিমকোণে করবর অন্তরীপ। সমুদ্রতীরের ভূমি প্রধানতঃ বালুকাময়, মধ্যে মধ্যে পাহাড়ও আছে। পরে নারিকেল-বৃক্ষপূর্ণ জঙ্গল, তৎপরে অশ্রুশস্ত খাতক্ষেত্র। এই নিম্নভূমির বিস্তার কোথাও ১৫ মাইলের অধিক নহে, আবার অনেক স্থলে ৫ মাইলেরও বেশী হয় না। এই ভূভাগের পার্শ্বই প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চ পর্বত। এই পর্বতমালার মধ্যে মধ্যে আবার সহস্র ফুট উচ্চ জঙ্গলবৃত্ত শিখরও আছে। এই সকল শিখরের মধ্যে মধ্যে উত্তম কর্ণিত খাতক্ষেত্র ও উদ্যানশোভিত অট্টালিকা আছে। বালাঘাটের মালভূমি ২৫০০ হইতে ২০০০ ফুট উচ্চ। নদীতীরবর্তী কতক স্থান ভিন্ন এই মালভূমিটি একপ্রকার বনময় পতিত জমী। নদীতীরে সামান্য সামান্য গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শতক্ষেত্র আছে।

সহ্যাদ্রির উত্তর পার্শ্বই নদী আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি পশ্চিমমুখে আরব-সাগরে ও কতকগুলি পূর্বমুখে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পূর্বাংশের নদীর মধ্যে ভূজভদ্রার উপনদী নার্দী উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমাংশের নদীগুলির মধ্যে উত্তরে কালীনদী, মধ্যে গঙ্গাবালী ও তজ্জি এবং দক্ষিণে শিরাবতী প্রসিদ্ধ। শিরাবতীর জলরাশি হোনাবার নগরের ৩৫ মাইল উর্ধ্বে ৪২৫ ফুট উচ্চ পর্বতের উপর হইতে ভীষণবেগে পড়িতেছে। ইহাই বিখ্যাত গারসোপা প্রপাত। পর্বতের অধিকাংশই গ্র্যানাইট পাথর, অনেকের মূলদেশ ল্যাটিরাইট। করবর ও হোনাবার নগরের নিকটে পার্শ্বত্যা প্রদেশ হইতে ল্যাটিরাইট প্রস্তর সংগৃহীত হইয়া গৃহাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। এই প্রদেশের স্থানে স্থানে লৌহখনি আছে। কুম্পতা হইতে ১৮ মাইল ঘন উপত্যকায় চূর্ণপাথর পাওয়া যায়।

উত্তর কানাকার বনবিভাগে সকল প্রকার বৃক্ষই জন্মে, তন্মধ্যে সেগুন, পিরাশাল প্রভৃতিই অধিক। এখানে গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগ হইতে কাঠ কাটান হইয়া থাকে। কৃষকেরা বন হইতে বিনা খরচার আলানি কাঠ, সাঁরের জন্য পাতা ও গৃহনির্মাণের জন্য বাঁশ, খুঁটি ইত্যাদি পায়। পূর্বে

এখানকার কাঠ গুজরাট ও বোম্বাইয়ে লইয়া গিয়া বিক্রীত হইত, এখন করবরে লইয়া গিয়া বিক্রীত হয়।

দক্ষিণকানাকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। এই জেলায় নদী অনেক, সুতরাং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, নানা বৃক্ষাদি পূর্ণ বন, নারিকেল-বাগান প্রভৃতি যথেষ্ট।

এই প্রদেশের উপকূলভাগে উত্তর-দক্ষিণে সমস্ত ভূভাগে (বিস্তারে ৫ হইতে ১৫ মাইল পর্যন্ত) লোকের বাস কিছু ঘন। এই ভূভাগ ল্যাটিরাইট প্রস্তরপূর্ণ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০৭ হইতে ৬০০ ফুট উচ্চ। ইহার পরেই পশ্চিমঘাটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরমালা। জমলাবাদের পর্বত (বেলতজ্জির নিকট) ও গর্দিভকর্ণ পর্বত সর্বাঙ্গেক্ষেপিত। এই প্রদেশে পশ্চিমঘাট ৩০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চ হইয়াছে। পূর্বাংশে ইহাকেই একপ্রকার সীমা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি গিরিনদী আছে, তন্মধ্যে সম্প্রজি, অশুখি, চরমাদি, হাসনগদি বা হাসানগদি, মঞ্জাবাদ ও কলুর প্রভৃতি কর্ণ ও মহিষুরের মধ্যে অবস্থিত। মঙ্গলোর হইতে এই সকল গিরিপথ পর্যন্ত শকটগমনোপযোগী রাস্তা আছে।

দক্ষিণকানাকার কোন নদীই ১০০ মাইলের অধিক বিস্তৃত নহে ও সকলগুলিই পশ্চিমঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে গৌরকালেও অনেকগুলিতে নৌকা গমন করিতে পারে। এই সকল নদীর মধ্যে নেজবতী, গুরপুর, গজোলি, চঞ্জগিরি বা পরশ্বিনী নদীই প্রধান। কারকল নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ও সুন্দর হ্রদ ও কুণ্ডপুরে একটি নির্মল জলের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হ্রদ আছে।

এই জেলায় মৃত্তিকায় অতি সুন্দর স্রব্যাতি নির্মাণ হয়। অনেক বনিক এই মৃত্তিকা হইতে কলে টালি ও ইটকাদি প্রস্তুত করে। এদেশে চীনেমাটির জায় একপ্রকার শ্বেতবর্ণ উজ্জল মন্থণ মৃত্তিকা পাওয়া যায়। মিজার নামক স্থানে স্বর্ণ; সুবর্ণা ও কেম্ফন নামক স্থানে দাড়িম-বীজাকার ক্ষুদ্র পুঙ্কমণি; উদিপি ও উপারদড়ি তালুকের মধ্যে লৌহখনি আছে। লৌহ উত্তোলনের কোন বন্দোবস্ত নাই।

এই জেলায় অধিকাংশ জমীই অধিবাসিগণের অধিকৃত। গবর্ণমেণ্টের অধীনে কেবল পশ্চিমঘাটের নিকটবর্তী বনভূমির কতকাংশ আছে। এই সকল বন হইতে চকর কাঠ, বাঁশ, আলানি কাঠ, এলাচ, বন্য এলাকট, খদির, দাকটিনি (ছাল ও তৈল), গঁদ, রজন ও নানাপ্রকার রং উৎপন্ন হয়। মধু, মোম এবং অজ্ঞাত স্রব্যাতি মলরকুদি বা পার্শ্বতীয় লোকেরা

সংগ্রহ করে। এই জেলা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় দেড় লক্ষ টাকার চন্দনের তৈল প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হয়। মহী-সুত্র হইতে চন্দনকাঠ আসে, তাহার তৈল কেবল দক্ষিণ-কানাড়ায় প্রস্তুত হয়।

এক প্রকার বলিতে গেলে কানাড়া নামে স্বতন্ত্র দেশ নাই। পূর্বে কানাড়া প্রদেশের চতুঃসীমা দেওয়া হইয়াছে, তাহার দক্ষিণের কতকাংশের নাম মলয়ালম্ (মলয়), মধ্যাংশের নাম তুলু ও উত্তরের কতকাংশের নাম কর্ণাট। অনেকে বলেন, কানাড়া কর্ণাটদেশের নামান্তর, কিন্তু তাহা নহে [কর্ণাট দেখ।] দক্ষিণ কানাড়ার উদ্বিগ্ন পরগণার উত্তর পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রাচীন কেরারাজ্যের অন্তর্গত। কথিত আছে, পরশুরামের কল্মষবিনাশের পর পাণ্ডুরাজারা আসিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ১২৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ডুরাজগণ প্রবল ছিলেন, পরে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহা বিজয়-নগররাজের অধিকারভুক্ত হয়। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিজয়-নগররাজের প্রবলপ্রতাপ তালকোটের যুদ্ধে থর্ব্ব হয়, তখন বেদনুরের সর্দার স্বাধীনতালাভ করিয়া বেদনুররাজ্য-স্থাপন করেন এবং কানাড়ার হনর নামক স্থান হইতে নীলেশ্বর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তৎপরে চেরকল-রাজের সহিত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বন্দোবস্তের সময় এই প্রদেশ শক্ররাজ্য কানাড়া নামে উল্লিখিত হইত। কানাড়ার উত্তরাংশ তুলু প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এবং ১৬১১ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কদম্বরাজগণের অধিকৃত ছিল। [কদম্ব দেখ।] তৎপরে ১৭১৪ হইতে ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বল্লালবংশের অধীন হয় [বল্লাল দেখ।] এবং তৎপরে তুলুবেল ইকেরি রাজগণের অধিকৃত ছিল (১৫৬০-১৭৬৩)। এই ইকেরি রাজগণ বিজয়নগররাজ্যধ্বংসের পর প্রাধান্য লাভ করেন। [বিজয়নগর ও তুলু দেখ।] ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দরআলী বেদনুর-অধিকারকালে কানাড়ার মধ্যে মঙ্গলোর বাসবুর অধিকার করিয়া তৎপরে নালগার ও সমস্ত জেলা অধিকার করেন। ছই বৎসর পরে ইংরাজসৈন্য হনর ও মঙ্গলোর সহর উদ্ধার করেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই টিপুহলতান পুনরাধিকার করিলেন। তৎপরে টিপুর সহিত ১৭৮৩-৮৪ যুদ্ধের দক্ষিণ-কানাড়ায় মহাযুদ্ধ ঘটে। অবশেষে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণরূপে ইংরাজাধিকারে আসে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণারাজের সাক্ষ্যগ্রহণের সময় অমর ও অলির-প্রদেশের লোকেরা স্ব স্ব প্রদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিবার প্রার্থনা করায় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরাজ তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। সমগ্র মগনিব জেলা দক্ষিণ-

কানাড়ার পুত্তুর বিভাগের সহিত একত্র করা হয়। ঐ বৎসরেই কল্যাণাপ্পা সুব্রায় নামক একজন সর্দার কর্ণারাজের পুত্তুরে ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। পুত্তুর হইতে মঙ্গলোর পর্য্যন্ত বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়। তৎপরে বিদ্রোহিগণ শাসিত হইলে কানাড়া প্রদেশ ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হইল। দক্ষিণ-কানাড়ার প্রধান নগর মঙ্গলোর, বস্তবাল ও উদ্বিগ্ন। দক্ষিণ-কানাড়ার প্রধানতঃ হিন্দু, পর্তুগীজ, ফিরকী, আরব ও অনার্য্য জাতির বাস। হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক, ইহার সারস্বত ও কোঙ্কণী নামক ছই সমাজে বিভক্ত। বাহারী ব্রাহ্ম জাতি হইতে উদ্ভূত, সেই ব্রাহ্মগণ শিবলী নামে বিখ্যাত।

এ দেশের আরবীয়েরা মাঙ্গিলা নামে বিখ্যাত। অনার্য্য জাতিদের মধ্যে মলয়কুদিরাই প্রধান, ইহার যেক্রপে কৃষিকার্য্য করে তাহাকে 'কুমারী' প্রণালী বলিয়া থাকে।

উত্তর-কানাড়ায় হিন্দুর মধ্যে শুপারি ব্যবসায়ী হারিক ব্রাহ্মণেরাই বিখ্যাত। মুসলমানদিগের মধ্যে নবায়তা (নাবিক)-গণ আরববণিকদিগের প্রতিনিধি বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত, কিন্তু অল্পসংখ্যক আছে। আফ্রিকা হইতে আনীত পর্তুগীজগণের কৃতদাসীদিগের গর্ভজাত মুসলমানেরা সিদি নামে আখ্যাত। ইহাদের আকৃতি এখনও অনেকটা কাফির ন্যায় আছে।

কানাৎ (আরব্য) শিবির, তাঁবু।

কানিষ্ঠিক (ক্কা) কনিষ্ঠিকা ইব, কনিষ্ঠিকা-অণ্ (শকরা-দিভ্যো ২৭। পা ৫। ৩। ১০৭।) কনিষ্ঠিকার ভ্রাতা।

কানিষ্ঠিনেয় (পুং) কনিষ্ঠায়া অপত্যম্ পুমান্, কনিষ্ঠা-চণ্ড ইনঙ্ আদেশশ্চ (কল্যাণাদীনামিনঙ্ চ। পা ৪। ১। ১২৬।) কনিষ্ঠার পুত্র।

কানীত (পুং) কনীতস্ত অপত্যম্ পুমান্। কনীত নামক ঋষির পুত্র, পৃথুশ্রবঃ।

কানীন (পুং) কভায়াঃ জাতঃ, কভা-অণ্ কনীন আদেশশ্চ (কভায়াঃ কনীনচ। পা ৪। ১। ১১৬।) ১ অবিবাহিতা কভার গর্ভজাত পুত্র; ইহার অপর সংস্কৃত নাম 'কভাক-জাত'। এই পুত্র তাহার মাতামহের পুত্রহানীয়ে হইয়া থাকে। ('কানীনঃ কভকাজাতো মাতামহস্তুতো মতঃ।' বাজবল্য।) ২ কর্ণ। ৩ ব্যাসদেব।

(কানীনঃ কভকাজাততনয়ে ব্যাসকর্ণয়োঃ। মেদিনী।)

কানীয়স (জি) কনীয়সঃ ইদম্। কনিষ্ঠ পঞ্চমীয়া।

কানীবুক (দেশজ) বুকবিশেষ। (Salvania cucullata)

কামুড় (দেশজ) বৃকবিশেষ। (Orinum toxicarium)

কানুনগোই (পারস্ত) মুসলমান-রাজত্বকালে বেসকল রাজ-কর্মচারী ভূ-সম্পত্তির বাবতীর জাতব্য বিষয় নবাবের নিকট জানাইতেন, তাহাদিগেরই এই উগাধি ছিল। আইন অকবরীপাঠে জানা যায়, পূর্বে প্রত্যেক সরকারে এক একজন কানুনগোই এবং তাহাদের অধীনে প্রত্যেক মহলে একজন করিয়া পাটোয়ারী নিযুক্ত থাকিতেন।

তৎকালে কোন ভূমির চৌহদ্দী, বিভাগ, বিক্রয় এবং হস্তান্তরকরণ প্রভৃতি ভূ-সম্পত্তিসম্বন্ধীয় কোন কার্য আবশ্যক হইলে প্রথমে কানুনগোইকে জানাইতে হইত অথবা তাহার আদেশ লইয়া কার্য করিতে হইত। ভূমিসম্পত্তীর কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে, কানুনগোই সীমাংসা করিয়া দিতেন।

অকবর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া রাজা টোডর মল্ল ও মুজফর খাঁ দশশালা বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহারা ১৯ জন নূতন কানুনগোই নিযুক্ত করিয়া প্রত্যেক সরকারের কানুনগোইদিগের নিকট হইতে ভূমিসম্পত্তি-সম্বন্ধীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে রাজা টোডর মল্ল যখন জমা বন্দোবস্ত করিতে আইসেন, তখন এখানে কানুনগোইরাই প্রত্যেক ভূমির সীমা, তাহার জমা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জানাইয়া টোডর মল্লের সাহায্য করিয়াছিলেন।

এখনও স্থানবিশেষে এইরূপ কানুনগোই নিযুক্ত আছেন। বঙ্গদেশে পূর্বে যাহারা কানুনগোই কার্য করিতেন, এক্ষণে তাহার বংশধরেরা ঐ কার্যে নিযুক্ত না থাকিলেও অনেকে কানুনগোই বা 'কানুনগো' উপাধি ভোগ করিতেছেন।

কানুন্ (কানন্) পঞ্জাবের কুনাবার উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ৩১° ৪০' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩০' পূঃ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফুট উচ্চে পর্বতের উপর অবস্থিত। এখানে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমঠ আছে, এই মঠে বিস্তর ভোটদেবীর বৌদ্ধগ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। এই স্থান লাথকের প্রধান লামার অধীন।

এখানে "বিভুরাল" নামক কথলের ব্যবসাই অধিক।

কানুক (দেশজ) কাণুক, কাক।

কানুন (পারস্ত) আইন।

কানুনগোই (পারস্ত) কানুনগোই।

কাস্ত (ক্কা) কনতে দীপ্যতে, কন-কর্ত্তর ক্ত। ১ কুছুম। ২ পৌহবিশেষ। ৩ (জি) মনোরম, সুন্দর। (পুং) ৪ শ্রীকৃষ্ণ। ৫ চন্দ্র। ৬ স্বামী। ৭ চন্দ্রকান্ত, স্বর্ষ্যকান্ত ও অরকান্ত মণি। ৮ হিজলগাছ। ৯ বসন্ত ঋতু। ১০ বিষ্ণু। ১১ শিব। ১২ কার্ত্তিকের। ১৩ কামদেব। ১৪ (জি) অভিলষিত।

কাস্ত, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহজহানপুর জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম, শাহজহানপুর সহর হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ দক্ষিণে জলালাবাদের পথের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪৮' ২০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪২' ৪৫" পূঃ।

এই নগরটি অতি প্রাচীন, যখন শাহজহানপুর সহরের পত্তন হয় নাই, তখন ইহার খুব সমৃদ্ধি ছিল, প্রাচীন অট্টালিকা, প্রাচীন দুর্গাদির ধ্বংসাবশিষ্ট ভূপ্ৰভৃতি দৃষ্টে ইহার কতকটা পূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানসহরে পুলিশের থানা, ডাকঘর, সরাই ও কুচ করিবার মাঠ আছে। লোক সংখ্যা ৪৬৮১, তন্মধ্যে ২৭৮৮ হিন্দু। এই প্রাচীন জনপদটি মহাত্মারত্নোক্ত 'কাস্তি' (ভীম ৯।১০) এবং পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি বর্ণিত 'কিণ্ডুরা' বলিয়া অল্পমিত হয়।

কাস্তকড়া (দেশজ) কাস্তগোহ নির্মিত কটা।

কাস্ততা (ক্কা) কাস্তত ভাবঃ, কাস্ত-তল-টাপ্। ১ সৌন্দর্য। ২ স্বামিষ।

কাস্তত্ব (ক্কা) কাস্তত ভাবঃ, কাস্ত-ত্ব (তত্ত্বভাবত্বলো। পা ৫।১।১১১) ১ মনোহারিতা। ২ স্বামিষ।

কাস্তনগর, বাঙ্গালাপ্রদেশের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বীরগঞ্জ থানার অধীন একটি গওগ্রাম, দিনাজপুর সহর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

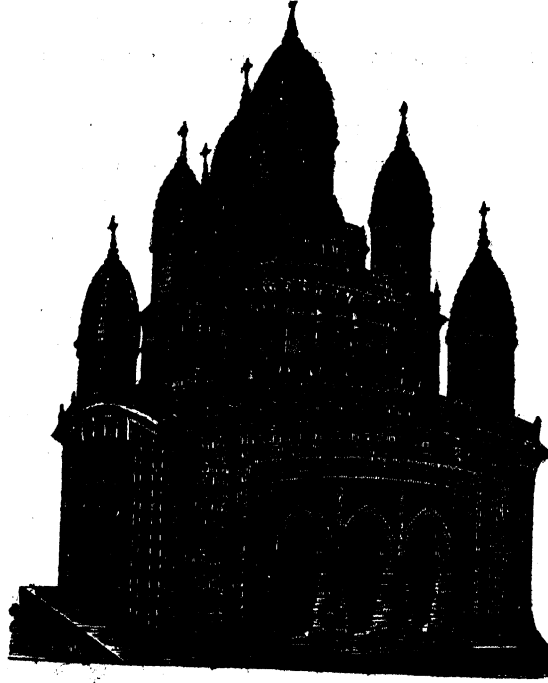
কাস্তনগর এখন যেমন একটি সামান্য পল্লী, পূর্বে এমন ছিল না, এখানকার দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে সহজেই বোধ হয়, একসময়ে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং এখানে বহুলোকের বাস ছিল। এখন যে ভূপাকার দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ নয়নগোচর হয়, অনেকের বিশ্বাস এই দুর্গ এক সময়ে বিরাটরাজ্য ছিল, তিনি ঐ দুর্গ মধ্যে বাস করিতেন, পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসকালে এখানে আগমন করিয়াছিলেন।

কাস্তনগরের চারিদিকে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ গড়িয়া আছে, তাহার নাম উত্তর-গো-গৃহ। প্রবাদ এইরূপ, এখানকার ধাপা নদীর পূর্বতীরে এবং কচাই নদীর উত্তরতীরে বিরাটরাজের গোদান চরিত। এই গোচারণমাঠে এক সময়ে অত্যুচ্চ প্রাকার পরিবেষ্টিত ছিল। এক্ষণে বৃক্ষলতানিতে এই সকল স্থান জঙ্গলাবৃত হওয়ার সেই প্রাচীন প্রাকারের চিহ্ন পর্য্যন্ত বাহির করিবার উপায় নাই*।

* এখানকার অধিবাসীর মধ্যে কিংবদন্তি আছে, দিনাজপুরের অধিকাংশ স্থানই প্রাচীন মৎস্যক্ষেত্র। কিন্তু মহাত্মারত্নাদি পাঠ করিলে কোনরূপে এ অঞ্চলে মৎস্যক্ষেত্রের অবস্থান নির্ণীত হইতে পারে না। মৎস্যক্ষেত্র বা বিরাটরাজ্য উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে। [আর্য্যাবর্তের সামন্তিক এবং বিরাট ও মৎস্য শব্দ দেখ।]

কান্তনগরের কান্তমন্দির ভক্তি প্রসিদ্ধ। এমন সুন্দর ও
বিশিষ্ট মন্দির বঙ্গদেশে আর নাই। রাজা প্রাণনাথ বিদ্যো-
দয় কান্তনগরে বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপন করেন। এই
কান্তবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কান্ত-
মন্দির নির্মিত হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের
নির্মাণ কার্য আরম্ভ এবং অক্টোবর ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে এই মহৎ

কার্য্য সম্পন্ন হয়। রাজা প্রাণনাথ এই মন্দির নির্মাণার্থ
লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই মন্দির অধম
বাকাল্য দেশের স্থপতি ও শিল্পীদের গৌরবপ্রকাশক,
ইংরাজগণের পূর্বে হইতে বঙ্গদেশের ধর্ম শিল্পীগণ স্থাপত্য
ও শিল্পবিদ্যার কতক উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা এই
কান্তমন্দিরের পবিত্র দেবমন্দির দেখিলেই জানা যায়। এটি



কান্তমন্দির।

নবরত্ন মন্দির। মন্দিরের চূড়ার দিক্‌চক্র হইতে পানদেশ
পর্ষদ স্থাপিত, সুচিহ্নিত ও কাককার্য্য-সুশোভিত। এই
মন্দিরে আদৌ পাথরের সন্সর্গ নাই, ভিত্তি হইতে চূড়া
পর্যন্ত সমস্তই ইষ্টকনির্মিত, মন্দিরগায়ে ইষ্টক খোদিত
বহু সংখ্যক দেবদেবীমূর্তি পণ্ডিত হইয়াছে। দেবদেবীর
মূর্তি ব্যতীত; আর হইশত বর্ষ পূর্বে বাকাল্যদেশে রীতি-
পদ্ধতি ও পরিধের বস্ত্রাদি বিস্তার প্রচলিত ছিল, তাহাও
মূর্তি মূর্তির দ্বারা আনিতে পারা যায়। বলিতে কি, এমন
ইষ্টকনির্মিত এবং ইষ্টকখোদিত নিখুঁত কাককার্য্যবিশিষ্ট
মন্দির আর কোথাও নাই।

কান্তনগরের কিছুদূর লক্ষ্য লানক স্থান, এবার আছে,

বিখ্যাত বদিক টান লুণাগর এখানে একটি মাটির চূর্ণ
নির্মাণ করিয়াছিলেন।

কান্তপক্ষী [ন] (পুং) কান্ত কান্তিকেরত পক্ষী, ৬৩৯।

বহা কান্ত: মনোহর: পক্ষো হস্তান্তি, কান্ত-পক্ষ-ইনি। ময়ূর।

কান্তপুষ্প (পুং) কান্তানি মনোরমানি পুষ্পাণ্যত, বহবী।
রক্তকাকুন গাছ।

কান্তলক (পুং) কান্ত লক্যতে আখ্যান্যতে, কান্ত-লক-
যঞার্থে কং। নন্দীবৃক্ষ, তুঙ্গগাছ।

কান্তলোহ (স্ত্রী) কান্ত পৌহপ্রোক্তং কমনীয়ং লোহম্।

১ অরকাত। ২ গৌহবিশেষ; যে গৌহপায়ে জল রাখিয়া,
তাহাতে তৈলবিন্দু নিষ্ক্ষেপ করিলে তৈল ইত্যন্ত; বিকিণ্ড

না হয়, বাহার পক্ষে কিছু আর গন্ধ পরিভাগ করে, নিম্নের কাথও ময়ুর আবাদ হয়, বাহাতে দুই পাক করিলে দুই বাসুনাশির তার জন্মিত। আর এবং যে লৌহপাড়ে ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, তাহাকেই কান্তলৌহ কহে। এই লৌহবারা বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ঔষধে প্রয়োগ করিবার জন্য ইহার জারণ মারণ প্রকৃতি কতকগুলি কার্যের আবশ্যক। [তাহার উপদেশ 'লৌহ' শব্দে দেখ।]

ইহার নিরুখীকরণসম্বন্ধে রসজ্ঞসারসংগ্রহে এইরূপ উপদেশ লিখিত আছে। যথা—“ওজ পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, এই উভয়ের সমপরিমাণ লৌহচূর্ণ, একত্র যুক্ত-কৃত্যক্রীর রসের সহিত ২ প্রহরকাল মর্দন করিয়া, তাম্রার পায়ে এক একটি গোলক করিয়া ঘিতে হইবে। তৎপরে ঐ গোলকগুলি এরূপভাৱে দ্বারা দুই প্রহর কাল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, উষ্ণ হইয়া উঠিবে, তখন সেইগুলি ধাতু রাশির মধ্যে তিনদিন পর্যন্ত রাখিয়া চতুর্থদিনে চূর্ণ করিতে হইবে। এই চূর্ণ কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া, জলে নিঃক্ষেপ করিলে ভাসিয়া উঠিবে।”

কান্তলৌহ (কী) কান্তম্ বনোরমং কৌলম্, কৰ্ম্মণা। কান্তলৌহ। কান্তবাবু, কাসিমবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। জাতিতে তিনি। প্রথমে তিনি নামাজ সুদীর ব্যবসায় করিতেন, একজন অনেক তাঁহাকে “কান্তমুদী” নামে অভিহিত করেন। যখন ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ কাসিমবাজারে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির অধীনে কর্ম করিতেন, সেই সময়ে সিরাজউদ্দৌলা সেখানকার ইংরাজদিগকে ধরিয়া বধ করিবার আদেশ দেন। সেই ষোড়শ সন্ধ্যাকালে কান্তবাবু ওয়ারেন্ হেস্টিংসকে আপন দোকান মধ্যে নিরাপদস্থানে গোপন করিয়া তাঁহার জীবনরক্ষা করেন। হেস্টিংস গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলে কান্তবাবুর মহা উপকার বিস্তৃত হন নাই; তিনি প্রথমতঃ কান্তবাবুকে আপনায় দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে হেস্টিংসের অগ্রগ্রেহে কৃষ্ণকান্ত কোম্পানি বাহাদুরের নিকট গাজপুর ও আলিমগড় জেলার অন্তর্গত “দুহাবেহার” পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র লোকনাথ রাজাবাহাদুর উপাধি লাভ করিলেন। সন ১১২৫ সালে পৌষমাসে কান্তবাবুর মৃত্যু হয়। কান্তবাবু হেস্টিংসের ভান হাত ছিলেন, বড় কিছু কৃষ্ণ হেস্টিংস করিতেন, তাহা এই কান্তবাবু দ্বারাই সম্পন্ন হইত। হেস্টিংসের টাকার প্রয়োজন হইলেও, কান্তবাবু করিয়া আনিয়া দিতেন। দেখানে হেস্টিংস বাইজেন; সঙ্গে সঙ্গে

কান্তবাবু থাকিতেন; এক সময়ে হেস্টিংস কান্তবাবুর লজ কানীর রাজমাস্তকে শাসাইয়া ছিলেন।

কান্তবাবু কলকাতার কাসিমবাজারে। তিনি আপন পুত্রের নামে লবণ ব্যবসায় চালাইতেন। (কান্তবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে Beveridge's The Trial of Nanda Kumar, p. 234-45, 367-401 দেখ।)

ইনিই বর্তমান কাসিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর বামী রাজা কলকাতার পিতামহ।

কান্তা (ত্ৰী) কাম্যতে অসৌ, কম-শিচ্-জ-টাপ্। ১ পত্নী। ২ স্তন্যদী ত্ৰী। ৩ প্রিয়তম। ৪ বড় এলাইচ। ৫ রেণুকা। ৬ নাগরমুখা। ৭ গজা।

(“কুটুহা করণা কান্তা কুর্ম্মযান্না কলাবতী।” কাশীখণ্ড ২৯।৪৩।) কান্তাই, বালাগা এদেশের মুন্সঃকরপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। মুন্সঃকরপুর সহর হইতে ৪ ক্রোশ। এখানে মৌলের ব্যবসা যথেষ্ট। অক্ষা° ২৬°১৫' উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ২০' ৩০" পূঃ। কান্তাজিদ্দৌহ (পুং) কান্তার অজ্যুগা চরণস্পর্শেন দৌহবঃ পুষ্পোদগমো বভ্র, বহত্ৰী। অশোকগাছ।

[অশোক. দেখ।]

কান্তাচরণদৌহ (পুং) কান্তাচরণেন স্ত্রীচরণস্পর্শেন দৌহবঃ পুষ্পোদগমো বভ্র, বহত্ৰী। অশোক।

কান্তারস (কী) অন্ন এব, আরসম্ যথার্থে অণু; কান্তঃ আরসম্, কর্ম্মণা। ১ অন্নভাত, চূষকলৌহ। ২ কান্তলৌহ।

কান্তার (কী) কন্ত দুখত অন্তঃ গচ্ছতি গচ্ছতি, কান্তঃ মনোজঃ গচ্ছতি বা। কান্ত-ও-অণু (কর্ম্মণা)। পা ৩।২।১। ১ কানন, বন। ২ পদ্মবিশেষ। (পুং) ৩ কাকলি আক্। তাব-প্রকাশের মতে ইহার গুণ—তুল্য, সারক, শরীরের দুগ্ধতা, তৃষ্ণ ও স্নেহ বৃদ্ধিকরক। ৪ কোবিদার বৃক্ষ। ৫ বাঁশ। (পুং কী) ৬ মহাবন। ৭ দ্বর্জম পথ। ৮ গর্জা। ৯ হিঙ্গ। ১০ দ্রুতিক।

কান্তারক (পুং) কান্তার-বার্ধে কন্। ইজুনিশের, কাকলি আক্। কান্তারপ (জি) কান্তারঃ গচ্ছতি, কান্তারঃ-পদ-ড। যে বনে গমন করে।

কান্তারপথ (পুং) কান্তারাবৃতঃ গচ্ছা, যথালো। বনমধ্যস্থতী পথ।

কান্তারপথিক (জি) কান্তারপথেন আকৃতম্, কান্তারপথ-ঈঞ। (আকৃতপ্রকরণে বারি-জঙ্গল-স্থল-কান্তার-পূর্ণপদা-দ্রুপসংখ্যানম্। পা ৫।১।৭৭। ব্যক্তি ১।) ১ বনপথ দ্বারা আকৃত। ২ বনপথে গমনকরী।

কান্তারবাসিনী (ত্ৰী) কান্তারে বাসো ২ভ্যভাঃ, কান্তার-বাস-ইনি-ভীহ্। ১ দুর্গা। ২ বনবাসিনী।

কান্তারী (জী) কান্তার-ডীষ (বিদ্‌ গৌরাদিত্য)। পা ৪। ১। ৪১।) ইক্ষুবিশেষ, কান্তি আক।

কান্তি (জী) কন্‌ কন্‌ভাবে জিন্‌। ১ দীপ্তি। ২ শোভা। কান্তির সংস্কৃত পর্যায়—শোভা, ছাতি, দীপ্তি, ছবি, শুভা, ভাষা, ভাঃ ও অভিধা। ৩ জীশোভা।

“রূপযৌবন লালিষং ভোগাদৈরলভ্যম্‌।

শোভা প্রোক্তা সৈব কান্তি মন্থাপাণ্যয়িতা ছাতিঃ ॥”
সাহিত্যদর্পণ ৩।

রূপ ও যৌবনের লালিষ এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা যে সৌন্দর্য্য হয়, তাহার নাম শোভা। এই শোভাই কামচেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে তাহাকে কান্তি কহে।

৪ ইচ্ছা। ৫ কামশক্তিবিশেষ। ৬ হুর্ণ। ৭ গন্ধ। ৮ চক্রেয় কলাবিশেষ। ৯ চক্রেয় জীবিশেষ। ১০ কান্তিকড়া।

কান্তিক (জী) কান্ত্য, কান্তি আখ্যায় কায়তি আস্থয়তে, কান্তি-কৈ-ক। কান্তি বা কান্তদোহ।

কান্তিকর (জি) কান্তিং করোতি, কান্তি-কৃ-খ। কান্তি-বর্দ্ধক জব্যাদি।

কান্তিদ (জী) কান্তিং দ্যতি নান্দয়তি, কান্তি-দো-ক। ১ পিত্ত। [পিত্তদেহ।] ২ (জি) কান্তিং দদাতি, কান্তি-দা-ক। কান্তিদায়ক, শোভাবর্দ্ধক। ৩ সূত।

কান্তিদা (জী) কান্তিদ-টাপ্‌। সোমরাজী।

কান্তিদায়ক (জী) কান্তিং দদাতি, কান্তি-দা-বুল্‌। ১ কালিয়ক নামক গন্ধজব্যবিশেষ। ২ (জি) শোভাদায়ক।

কান্তিনগরী (জী) কাকীনগরী।

কান্তিপুর (জী) ১ নেপালের অন্তর্গত নগরবিশেষ। এখন নেপালের রাজধানীর নাম কাটমান্ডু, পূর্বে এই নগরকে কান্তিপুর বলিত। নেপালীরা জবঃশাবনীপাঠে জানা যায় যে, রাজা লক্ষ্মীনারসিংহ মঙ্গ ৭১৫ নেপালীসম্বতে (১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) গোরক্ষনাথের পূজার্থ একটি বৃহৎ কাঠমণ্ডপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তদনন্তর কান্তিপুর স্থানে কাটমান্ডু নাম হইল। স্বল্পপ্রাণের কুমারিকাথণ্ডে লিখিত আছে—

“নটবকলক্ষা গ্রামাণং কান্তিপুরে প্রাকীর্জিতাঃ ॥” ৩৭ অঃ।

কান্তিপুরে নবলক্ষ গ্রাম আছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, কুমারিকাথণ্ডোক্ত কান্তিপুর নেপালরাজ্যের একটি প্রাচীন নাম অথবা কুমারিকাথণ্ডের অতীতি বলিয়া বোধ হয়। ২ গোমালিয়াররাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। ইহার বর্তমান নাম কাটমান্ডু, অধ্বিন্দনীর তীরে অবস্থিত। প্রভাসখণ্ড মতে এখানে জনপ্রিয় নামক দেবতা দ্বিরাঙ্গ করেন।

কান্তিভূঃ (জি) কান্তিং বিকর্জি, কান্তি-ভূ-কিপ্‌। ১ কান্তি-বিশিষ্ট। ২ (পুং) চক্রে।

কান্তিমতী, কাকীপুরাধিপ চোলরাজ সোমেশ্বরের কস্তা ও পাণ্ডুরাজ উগ্রপাণ্ডোর পটুমহিষী।

কান্তিমান্‌ [৭] (পুং) কান্তিঃ প্রাপ্তোত্তম অত্যন্ত, কান্তি-মহূপ্‌। ১ চক্রে। ২ কামদেব। ৩ (জি) কান্তিমুক্ত।

কান্তিমত্তা (জী) কান্তি মত্তো ভাবঃ, কান্তিমৎ-তল্‌ টাপ্‌। কান্তিবিশিষ্টতা।

কান্তিহর (জি) কান্তিং হরতি নান্দয়তি, কান্তি-হ-খ। কান্তিনাশক।

কান্তুক (জি) বর্ণনদ সমীপস্থ কহ্যাং জাতঃ, কহা-বুক্‌ (বর্ণোবুক্‌। পা ৪। ২। ১০৩।) বর্ণনদের সমীপস্থ কহাজাত।

কান্তুক্য (পুং) কহকত্থ ঋষেঃ গোত্রাপত্যম্‌, কহক-যঞ্‌ (গর্গাদিত্যো যঞ্‌। পা ৪। ১। ১০৫।) কহক ঋষিবংশীয়।

কান্তুক্যয়ন (পুং) কহকত্থ ঋষেঃ গোত্রাপত্যম্‌, কহক-যঞ্‌-কক্‌। কহক ঋষিবংশীয়।

কান্তুক (জি) কহ্যাং জাতঃ, কহা-ঠক্‌ (কহ্যারঠক্‌। পা ৪। ২। ১০২।) কহাজাত।

কান্দ (জি) কন্দ্য ইদম্‌, কন্দ-অণ্‌। ১ কন্দসম্বন্ধীয়। ২ কন্দজাত।

কান্দন (দেশজ) কন্দন, রোদন।

কান্দনী (দেশজ) যে বালিকা বা যে জী অধিক রোদন করে।

কান্দর্প (পুং) কন্দর্পত্ব অপত্যং পুমান্‌, কন্দর্প-অঞ্‌। ১ কন্দর্পের পুত্র, অনিরুদ্ধ। ২ (জি) কন্দর্পসম্বন্ধীয়।

কান্দর্পিক (জী) কন্দর্পার কন্দর্পরুদ্ধয়ে প্রয়োজনমন্ত, কন্দর্প-টক্‌। কাম বৃত্তিকারক জব্য ও নিয়মাদি।

[বাজীকরণ দেখ।]

কান্দব (জী) কন্দৌ সংস্কৃতঃ ভক্ষ্যম্‌, কন্দু-অণ্‌। গিঠকাদি ভোজ্যবস্তু।

কান্দবিক (জি) কান্দবং পণ্যং অন্ত, কান্দব-ঠক্‌ (ভদ্রত পণ্যম্‌। পা ৪। ৪। ৫১।) গিঠকবিক্রেতা, মিঠাইওয়াল।

কান্দা (দেশজ) রোদন করা।

কান্দাবিষ (জী) কান্দবিষ, ছান্দসম্বাৎ দীর্ঘঃ। মূলবিষ, কন্দবিষ।

কান্দাহার, আফগানস্থানের একটি প্রদেশ। হুণ্টর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য গণ্ডিতগণের মতে, কান্দাহার আলেক-সান্দার বা সিকন্দর শব্দের অপভ্রংশ। প্রসিদ্ধ মাকিদনবীর আলেকসান্দার নিজ নামে এখানে একটি নগর পত্তন করেন, তাহার নামানুসারেই এই নগরের নামকরণ হয়। কিন্তু

ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। স্বথেষ্টে (১।১২৬।৭) ও অর্থর্ববেদে (৫।২২।১৪) গন্ধারি নামক জনপদ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩৪), শতপথব্রাহ্মণ (৮।১।৪।১০), ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৬।১৪।১), অর্থর্বপরিশিষ্ট (৫৬) রামায়ণ (৪।৪৩।২৪), মহাভারত, হরিবংশ ও পানিনি শ্রুত্রে গন্ধার বা গান্ধার জনপদের উল্লেখ আছে। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা অমুসায়ে এই জনপদ সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়।

ঋকসংহিতায় লিখিত আছে—

“গর্জাহমস্মি রোমশা গন্ধারীগমিবাবিকা।” ১।১২৬।৭।

আমি গান্ধারদেশীয় সেনার ভ্রায় লোমপূর্ণ ও পূর্ণাবয়ব। এখনও আফগানস্থানে লোমশ-মেঘ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ঋকসংহিতায় গান্ধারদেশীয় কুভানদীর উল্লেখ আছে, আলেক্সান্দার যে সময়ে এ অঞ্চলে আগমন করেন, তৎকালীন গ্রীকগণ ঐ নদীকে ‘কোফেন’ ও ‘কোফেস’ নামে উল্লেখ করিয়াছিলেন, এই নদীর বর্তমান নাম কাবুল।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, আলেক্সান্দারের আসিবার বহু পূর্বে সংস্কৃত শাস্ত্রে বাহা গান্ধাররাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহারই অপভ্রংশ বর্তমান কান্দাহার। কান্দাহার প্রদেশ এখন আর পূর্বকালের ভ্রায় বিস্তীর্ণ না হইলেও চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান, হুয়ান্ ও হিউএন্-সিয়াং প্রভৃতির সময়ে এই জনপদ বর্তমান পেশোবার ও কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [গান্ধার দেখ।]

বর্তমান কান্দাহার প্রদেশ খিলাত-ই-ঘিলজাইর ৫ ক্রোশ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে হাঞ্জারা প্রদেশ, দক্ষিণে বলুচিস্থানের সীমান্ত এবং পশ্চিমে হেলমন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই প্রদেশে শাহমকসুদ, গুলকো, খক্কেজ এবং গাস্তে নামক কএকটি গিরিমালা আছে এবং হেলমন্দ, তর্গক, অরগন্দাব, দোরো, অর্থস্তান ও কদনাই নামে কএকটি নদী প্রবাহিত হইতেছে।

প্রধান নগর—কান্দাহার, ফরা, খেলাত-ই-ঘিলজাই ও মারক। এখানে প্রায় চারিলক্ষ লোকের বাস, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছুরাগীজাতি, পারসী ও ঘিলজাই জাতিও বিস্তর আছে। আয় প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা।

কান্দাহার, আফগানস্থানের অন্তর্গত কান্দাহার প্রদেশের প্রধাননগর। এই নগর ৩১°৩৭' উত্তর অক্ষাংশ ও ৬৫°৩০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, অরগন্দাব ও তর্গকনদীর মধ্যে এবং কাবুলের ৩৮ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।

বর্তমান কান্দাহার নগর বড় বেশীদিনের নির্মিত নহে।

আধুনিক নগর অরগন্দাব নদীর বামদিকে অবস্থিত; কিন্তু একবারে তীরবর্তী নহে; নদী ও নগরের মধ্যে একটি পর্বতশ্রেণী আছে। এই পর্বতমালায় মধ্যে একস্থানে একটি বিচ্ছেদ থাকায় নদীতীরের সহিত নগরের সংযোগ আছে। প্রাচীন কান্দাহার নগর বর্তমান নগরের ৪ মাইল পশ্চিমে চেলজিনাক পর্বতের মূলে অবস্থিত ছিল; ইহার তিনদিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র ও অপরদিকে উচ্চ দূরারোহ পর্বত থাকায় লোকে বিশ্বাস করিত যে নগর অজেয়; কিন্তু মাদির শাহ বহাদুর অবরোধের পর নগর অধিকার করিয়া সে বিশ্বাস দূর করেন। ইহার পর প্রাচীন নগরের দক্ষিণপূর্বে দুই মাইল দূরে চতুর্দিকে পর্বতবনাদিশূন্য পরিষ্কৃত সমতল ভূমির উপর আর একটি নগর নির্মিত হয় ও তাহার নাম নাদিরাবাদ রাখা হয়; কিন্তু আফগানসাহ আবদালী এই নগরটিও ধ্বংস করিয়া, ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান কান্দাহার নগর স্থাপন করেন। প্রাচীন কান্দাহারের বহু বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। এখনও এই ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রাচীনকালাবধি কান্দাহার নগর একটি বিখ্যাত বাণিজ্য-ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। এই নগরে হিরাত, ঘোর, সিন্তান (পারস্ত), কাবুল ও ভারতবর্ষ হইতে পাঁচটি বড় বড় রাস্তা আসিয়াছে। আর এই সকল স্থানের গণ্য এখানকার রাজ্যের আনীত ও বিক্রীত হয়। প্রথমে আলেক্সান্দার, তৎপরে ইহা তাঁহার সেনাপতি সিলিউকসের অধীন হয়। তৎকালীন ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তৎপরে পারস্ত ও সামান্য বংশীয়েরা অধিকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের সময়েরও বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎপরে হিজিরাসনের প্রথনাবস্থায় মুসলমান-ধর্মগণ্যক মুহম্মদের বংশধরেরা এদেশে প্রবেশ করেন। ৮৬৫ খৃঃ, যাকুব-বেন-লিস্ নামক এক ব্যক্তি “সাকোরি” রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া কান্দাহার অধিকার করেন। সামান্য-বংশীয়েরা পুনরায় ইহাদিগের হস্ত হইতে কান্দাহার উদ্ধার করে, পরে গজনবী বংশীয়েরা তাহাদিগকে দ্রুত করেন। তৎপরে ঘোরী-বংশীয়েরা গজনবীদিগকে তাড়াইয়া আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিলেন। তাহাদিগের পর কান্দাহার সেলজুকীদিগের হস্তগত হয়। অবশেষে ১১৫০ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা কান্দাহারে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করে। তৎপরে আবার কয়েক বৎসর পরে গিয়াস-উদ্দীন মুহম্মদ ঘোরীর হস্তগত হয়। ১২১০ খৃষ্টাব্দে খোরিজমের সুলতান আলাউদ্দীন মুহম্মদ এই স্থান অধিকার করেন। ১২২২ খৃষ্টাব্দে তাহার পুত্র জাহাঙ্গীর

খাঁ কর্তৃক দূরীভূত হন, আবার মালেক কুর্ন্তবংশীয়গণ আসিয়া জাহাঙ্গীর খাঁর উত্তরাধিকারীদিগকে তাড়াইয়া দেন। কিছু দিন পরে মালেক-কুর্ন্তর স্থানীয় সর্দারগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া নগর ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। অবশেষে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুর-জঙ্গ সর্দারগণের হস্ত হইতে ইহা অধিকার করেন। তৈমুরবংশীয়গণ ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আপনাদিগের অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে আবু সৈয়দের মৃত্যু হইলে কান্দাহার ও তৎপার্শ্ববর্তী কতিপয় স্থান স্বাধীন হইয়া উঠে। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের মোগলরাজ্যস্থাপিত বাবর শাহবেগ নামক স্বাধীন রাজাকে পরাস্ত করিয়া কান্দাহার ভারতরাজ্যভুক্ত করেন। কিছুপরে পারসিকেরা এই স্থান অধিকার করে। এইরূপ একবার পরাস্ত ও অপর-বার ভারতের অধীনত্ব স্বীকার করিতে করিতে কান্দাহারের রাজলক্ষ্মী কিছুদিন অস্থিরা থাকিয়া অবশেষে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে পারসিকেরা অধিকার করে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ ১০০০০০ সৈন্ত লইয়া ১৮ মাসকাল অবরোধের পর কান্দাহার অধিকার করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শাহজুজা কান্দাহারের বিরুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগত হন। তৎপরে সাদোজাইগণ কান্দাহার অধিকার করিতে চেষ্টা পায়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শাহজুজা আর একবার ইরাজের সাহায্য লইয়া কান্দাহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সিন্দুনদীর তীরবর্তী সৈন্তসাহায্যে ২০ এপ্রেল কান্দাহার অধিকার করেন এবং নগরমধ্যস্থ আকন্দ শাহের সমাধিমন্দিরে ৮ই মে তারিখে রাজপদে অভিষিক্ত হন। তৎপরে তাঁহার সৈন্তদল সমুদয় আফগানস্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত কাবুল ও গজনির দিকে অগ্রসর হইল। সৈন্তের কতকাংশ কান্দাহারে সজার নিকট রহিল। এই সময়ে ছুরাণীর বিদ্রোহী হইয়া সাদোজাই জাতীর অকবর খাঁ ও সফদর-জঙ্গের অধীনে কান্দাহার আক্রমণ করে। অবশেষে ১৮৪৩ সালে নানাবুদ্ধ-বিগ্রহাদির পর সফদর-জঙ্গ নগর অধিকার করিলেন, কিন্তু অতি অন্নদিনের পর কোহন-দিল খাঁ কর্তৃক বিতাড়িত হন। কোহনদিল অতি অত্যাচারী ছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কোহন-দিল খাঁর মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র মুহম্মদ-সাদিক আসিয়া পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও পিতৃত্ব রহিমদিল খাঁর উপর অত্যাচার করার রহিমদিল খাঁ আফগানরাজ দোস্তমুহম্মদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দোস্তমুহম্মদ আসিয়া নগর অধিকার করেন ও নিজ পুত্র গোলাম হায়দরকে শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করিয়া যান। গোলাম হায়দরের পর শের আলী খাঁ প্রথমে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা শেষে আমীর হইয়া কাবুলে ফিরিয়া

গেলেন ও নিজ ভ্রাতা আমীন খাঁকে শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আমীন খাঁ শের আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কাজবাজের যুদ্ধে নিহত হন। আমীনের কনিষ্ঠ মুহম্মদ সরিফ একবার বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষে জ্যেষ্ঠের অধীনত্ব স্বীকার করেন। আজিম খাঁ নামক শেরআলীর বৈপিজের ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে খিলাতি-ই-ঘিলজাই নামক স্থানে শেরআলীকে পরাস্ত করেন। পর বৎসর শেরআলীর পুত্র যাকুব খাঁ পিতৃরাজ্য-উদ্ধার করেন।

এই সময়ে আফগানস্থানের সহিত ইংলণ্ডের মনো-মালিগ্র বটায় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কোয়েটা হইতে সার ডোনাল্ড হুয়ার্ট একদল সৈন্য লইয়া আফগানরাজ্যে প্রবেশ করেন। সৈফ-উদ্দীন নামক সেনাপতি তক্তকুল নামক স্থানে তাঁহাকে বাধা দেন, কিন্তু পরাস্ত হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার ইরাজের অধীন হয়।

শের আলীর মৃত্যুর পর যাকুব খাঁ গণ্ডমক নামক স্থানে ইরাজের সহিত সন্ধি করেন। যুদ্ধাদি মিটিয়া যায়। সন্ধি অগ্রসারে ইরাজদিগকে কান্দাহার ছাড়িয়া পিশিগে ফিরিয়া আসিবার আদেশ হইল, ইতিমধ্যে সার লুই ক্যাম্পাগনারি কাবুলের দরবারে স্বদলে নিহত হন; স্মরণ্য কান্দাহার পুনরায় ইরাজ-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল এবং কান্দাহারের রক্ষার্থ খিলাত-ই-ঘিলজাই নামক স্থান অধিকার করা হইল। ১৮৮০ সালে বোম্বাই হইতে মেজর জেনরল শ্রিমরোজ উপস্থিত হইলে পর সার হুয়ার্ট সৈন্যে ফিরিয়া আসিলেন। সর্দার শের আলী খাঁ ইরাজের অধীনে কান্দাহারের ওয়ালী নিযুক্ত হন। সর্দার মুহম্মদ আয়ুব খাঁ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। ইরাজসেনানী বারো পথিমধ্যে বাধা দেন, কিন্তু স্বদলে একেবারে বিনষ্ট হওয়ার, আয়ুব খাঁ কান্দাহারের পথ মুক্ত পাইয়া অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে আবদর-রহমান খাঁ ইরাজ-গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া নিজে আমীর বলিয়া পরিচিত হন। ইতিপূর্বে সার রবার্টস্ কান্দাহারের উদ্ধারার্থ নূতন সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সার রবার্ট পছন্নিবে বাবা-ওয়ালি কাটাল ও গণ্ডমূল-সাহিবদাদ নামক স্থানে আয়ুবের সহিত ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আয়ুব সমস্ত হারাইলেন। তাঁহার সৈন্ত, শিবির অস্ত্র শস্তাদি, কামান গোলাগুলি বন্দুদ সবই বিপক্ষের হস্তগত হইল। অবশেষে ১৮৮১ সালের এপ্রেল মাসে কান্দাহার-প্রদেশে শান্তিস্থাপন করিয়া সার রবার্ট কোয়েটায় ফিরিয়া

আসিলেন। তৎপরে আমীর আবদুর-রহমান মুহম্মদ হাকিম খাঁ নামক একজন বোড়শবর্ষীয় বালককে সর্দার সমসুদ্দীন খাঁর অধীনে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

আয়ুব খাঁ হিরাটে পলাইয়া রহিলেন। এখানে তিনি জমসিদি জাতির অধিপতি স্বীয় স্বত্ত্বকে বিনষ্ট করিয়া নিজে অধিনেতা হইয়া আমীরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং আডা কুরেজ নামক স্থানে আমীরের সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া কান্দাহার দখল করেন। তৎপরে আমীর নিজে ধীরে ধীরে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া আয়ুবের রসদ ও কামান-গুলি অধিকার করিয়া ফেলিলেন। আয়ুব আবার হিরাটে পলাইলেন, কিন্তু সর্দার আবদুল কুদ্দুস খাঁ হিরাট অধিকার করায় আয়ুব পারস্ত্রাজের শরণাগত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তৎপরে আমীর গোলাম-হায়দর খাঁর অধীনে ৭০০০ শিক্ষিত সৈন্য দিয়া কান্দাহার রক্ষা করিলেন ও ১৮৮২ সালে সর্দার নূর মুহম্মদ খাঁ শাসনকার্যে নিযুক্ত হইলেন।

কান্দাহার নগর দেখিতে আরাকার, ৩০ মাইল বিস্তৃত। চতুর্দিকে গড়খাই, খাদ ২৪ ফুট গভীর। গড়-খাইরের পর রৌদ্রদগ্ধ গুগ্গরপ্রাচীর। ইহাতে ইষ্টক বা প্রস্তর নাই। রৌদ্রে শুকাইয়া পাথরের ভায় জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকে ১৯৬৭ গজ, পূর্বে ১৮১০ গজ, দক্ষিণে ১৩৪৫ গজ ও উত্তরে ১১৬৪ গজ। নগরের ৬টি ফটক। পূর্বে বারহুবাণি ও কাবুলদার, দক্ষিণে শীকারপুরদার, পশ্চিমে হিরাট ও তোপখানাদার, উত্তরে ইন্দগা-দার। ৬টি দ্বার হইতে নগরের মধ্যে ৬টি বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে শীকারপুরদারের রাস্তা ও কাবুলদারের রাস্তার মিলনস্থলে একটি মসজিদ ইহার নাম চাহু'। ইহার গুহ্বরের ব্যাস ৫০ গজ। রাস্তাগুলি ৪০ গজ বিস্তৃত। সহরের উত্তরে কেল্লা, ইহার নিকট তোপখানার মাঠ। এই মাঠের পশ্চিমে আকন্দ শাহ দ্রাবীড়ী কবর। ইহা অতি উচ্চ অট্টালিকা। নগরের প্রত্যেকদ্বার ও প্রত্যেক রাস্তা হইতে ইহার গুহ্বজ দেখা যায়। ইহার চতুর্দিকে আকন্দশাহের বংশধরগণের আরও ক্ষুদ্র ১২টি কবর আছে।

কান্দাহারের বাণিজ্য একপ্রকারে পারস্তবাসীরই এক-চেটরা বলিতে হয়। কান্দাহারের প্রধান উৎপন্ন রেশমের বস্ত্রাদি ও লোমজ গজাবরগাদি (কোট চোগা ইত্যাদি)। লাক্ষার চাষ বহু বিস্তৃত। মেওরাকল প্রচুর। শুকফল এখানকার প্রধান খাদ্য।

কান্দাহারী বেগম, বাদশাহ শাহজহানের প্রথম মহিষী।

ইনি পারস্ত্রাজ ইম্মাইল শাহের (১ম) বংশোদ্ভব সুলতান হোসেন-মির্জা-সকীর কন্যা। সম্রাট অকবর পারস্ত্রাজ শাহ অবাসকে কান্দাহারের শাসনভার প্রদান করিলে, পারস্ত্রাজ এই প্রদেশের শাসনভার সুলতান হোসেন মির্জার হস্তে অর্পণ করেন। হোসেন মির্জার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মুজঃফর হোসেন কান্দাহারের শাসনভার পাইলেন। তিনি ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনজন ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া অকবরের সত্য উপনীত হন। অকবর তাঁহার সন্ধান করিয়া তাঁহাকে পঞ্চহাজারী পদ এবং শতগুলনামক স্থান জারগীর দিলেন। কান্দাহারী বেগম তাঁহার ভগিনী। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে এই হুম্মারী রমলীর সহিত যুবরাজ খুরমের (পরে শাহজহানের) বিবাহ হয়। আগ্রার কান্দাহারী-বাঘ নামক উদ্যানে এই কান্দাহারী বেগমের সমাধি হয়। তাঁহার সমাধিমন্দিরটি অতি সুন্দর, এখন ভরতপুররাজের অধিকৃত।

কান্দি—মুরসিদাবাদ জেলার উপবিভাগ। ইহার পরিমাণ-ফল ৩৮৯ বর্গমাইল। ইহাতে কান্দি, ভরতপুর ও খড়গী নামে ৩টি থানা আছে। এই উপবিভাগের সদরথানা কান্দি, বীরভূম হইতে ময়ূরাক্ষিনদী বেখানে এই জেলার প্রবেশ করিয়াছে, ঠিক সেইখানে ইহা অবস্থিত; এইখানে পাইক-পাড়ার রাজাদিগের আদিবাস। ঐ বংশের আদি-পুরুষ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাগোবিন্দ ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কান্দিতে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন এবং অভ্যাগতগণকে ব্রাহ্মণবাহকের ডাক বসাইয়া হাতে হাতে জগন্নাথ হইতে টাটকা প্রসাদ আনাইয়া খাওয়াইয়া ছিলেন।

কান্দিগুভূত (ত্রি) কাং দিশম্ গচ্ছামি, ইত্যাকুলীভূতঃ; কান্দিশ্-ভূত। ১ পলায়িত। ২ ভীত।

(“ন কথশ্চিৎ ভয়াত্তম্মাৎ নিমুক্তো ব্রাহ্মণস্তদা।

কান্দিগুভূতো জীবিতার্থী প্রজ্ঞাবোত্তরঃ দিশম্।”

ভারত শাস্তি ১৬৯ অঃ।)

কান্দিশীক (ত্রি) ‘কাং দিশম্ যামি’ ইত্যেবং বাদিনো অর্থে ঠক প্রত্যয়েন প্ৰোদারাদিত্বাৎ লিকম্। যদা কদি বৈক্লব্যে ভাবে ইন, কন্দি বৈক্লব্যম্; শীক সেচনে-ভাবে যঞ, শীকঃ অশ্রুপাতঃ; কান্দিশ্ শীকশ্চ তৌ বিদ্যোতে অস্ত, কান্দিশীক-অণ্। ভয় পাইয়া পলায়নকারী।

কান্দু (কাপু বা কাঁড়) বজ ও বেহারনিবাসী মীচ-জাতি-বিশেষ। স্থানবিশেষে এই জাতিকে কাহু, ভরুজা, ভুজা, ভুজারি ও ভুজি বলে। শতকণ্ডনই এই জাতির প্রধান উপজীবিকা ছিল।

কাণ্ডুজাতির মধ্যে কয়েকটী শ্রেণী আছে—

১ মধেসিয়া।	৬ কোরাঙ্ক।
২ মগহিয়া।	৭ ধুরিয়া।
৩ বন্টারিয়া বা ভরভুজা।	৮ রবাণী। (রমণী-বেহারী)
৪ কনোজিয়া।	৯ বজ্জমতিরিয়া।
৫ গোড়।	১০ ঠঠের বা ঠঠেরা।

উক্ত শ্রেণী মধ্যে মধেসিয়া ও বন্টারিয়ারা পুরুষাভুজেনে শতকণ্ডন ও মিষ্টান্নবিক্রয় করিয়া আঁসিতেছে। কেবল মধেসিয়া স্ত্রিয়ারা চাষবাস অথবা অপর কাহারও দাসত্ব করে। কনোজিয়ারা সোরা প্রস্তুত করে, গোড়েরা পাথর ভাঙে, কেহ কেহ জমীদারদিগের অহুচরের কার্য করে, কোরাঙ্ক বা কোঁরাচ শ্রেণী শতকণ্ডন, গৃহে মৃত্তিকা-লেপন, ইষ্টক প্রস্তুত প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকে। কেবল ধুরিয়া ও রবাণীরা পাকীর বেহারার কার্য করে, এই শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে দুই একজন সামান্য মিষ্টান্ন বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

এই জাতির মধ্যে ধুরিয়া ও রবাণীরাই পদমর্যাদায় সর্বাপেক্ষা নিম্ন, এই দুই শ্রেণীর সহিত কাহারের সংস্রব আছে, এমন কি আদানপ্রদানও চলে; কিন্তু অপর শ্রেণীর কাণ্ডুরা কাহারের সহিত কোন সংস্রব রাখে না।

[কাহার দেখ।]

এই জাতিকে বাঙ্গালা দেশের স্থানবিশেষে 'পাঁচপীরীয়া কাঁড়ু' বলে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাঁচপীরী ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের উপাধি সাহা অর্থাৎ সাধু। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে।

	মূল	বা	গোত্র।
মধেসিয়া শ্রেণী	বগিয়াপাপর		কোটা
	বিজয়-বনারস		পচুর
	ধাছুটা		ত্রিবিতিয়া।
	হাতসুখা		

মগহিয়া শ্রেণী	আকান	বাধু	পিলিচ	মেধোস
	আখগাঁও	গাগের	বর্হি	রাখগিরি
	আছুরি	গারোল	বাংকোল	রৌপিয়া
	আরাপ	ছিংনি	বিরেরি	সরাইছাট
	ইচ্বরিয়া	জিয়ারবার	বেরে	সিরা
	উত্তরদাহা	তিসোর	ভারত	সৌরগম্বার
	কাতেবার	তোরিলা	ভাভের	
	কানাপ	দতিয়ান	মনের	
	কানেইল	নেনিজোর	নহলি	
	কারিয়ান	নেপ্রা	মালধিয়া	
	কাসিয়ন্	পরসোতিয়া	মাসোর	
	কোকরস	পালি	মুর্তি	

বন্টারিয়া	{	চৌদিহা।	তিন্দিহা।
কোঁরাচ	{	চাসি	কোরিয়ার
		ডেহরি	মুখা
		হাতিয়াকান্দা	

ইহারা স্বগোত্রে বিবাহ করে না। কেহ কেহ পিতৃ ও মাতৃপার্থ্যারে তিন পুরুষ, কেহ বা সাত পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ দেয়। ইহাদের মধ্যে কস্তার বাগিকাব্যসে বিবাহ দেওয়া প্রশস্ত বলিয়া গণ্য, তবে বয়স্কার বিবাহের অভাব নাই। ইহাদের বিবাহের প্রধান অঙ্গ সিন্দূরদান। 'বিবাহ সময়ে কস্তাকর্তা তিলক দেন এবং বরকর্তাকে অলঙ্কারাদি যৌতুক দিতে হয়। কস্তাকর্তা অতিশয় গরীব হইলে প্রায় বরকর্তার গৃহেই বিবাহ হয়, এরূপ স্থলে কস্তাকর্তা বরকর্তাকে যৎসামান্য (১০ টাকা) দিয়া সন্তুষ্ট করে।

গোড় শ্রেণীর মধ্যে একপ্রকার অপূর্ণ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যে অত্যন্ত দরিদ্র, যাহার কস্তার বিবাহ দিবার কোন উপায় নাই, সে মুক্ত ভরবারীর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেয়। এরূপ স্থলে প্রথমতঃ আত্মীয় কুটুম্বেরা আসিয়া মিলিত হয়, তাহাদের সন্মুখে পুরোহিত আসির অগ্রভাগ দিয়া কন্যার সিতায় সিন্দূর পরাইয়া দেন। তৎপরে সকলে সেই কন্যাকে বিবাহিতা বলিয়া গণ্য করে, সে বতদিন না এক স্বতন্ত্র পতি লাভ করে, ততদিন বিবাহিতা রমণীর ন্যায় পিতৃগৃহে অবস্থান করে। কিছুকাল পরে বর জুটিলে আবার রীতিমত বিবাহ হয়। যদি কোন বয়স্কা বিবাহের পূর্বে পরপুরুষের সংবাস করে, তাহা হইলে পঞ্চায়তের নিকট অখণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পায়। জুড়ো হইলে কাণ্ডুরা পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, পরিত্যক্ত রমণী আবার স্বতন্ত্র পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে।

জীলোক যদি অপর জাতীর পুরুষের সহিত জুট হয়, তাহা হইলে সে জাতিচ্যুত ও সনাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়।

ইহাদের বিধবারা সাগাইপ্রথা অনুসারে বিবাহ করিতে পারে। বিধবা দেবরকে বিবাহ করিতে বাধ্য নয়, তবে কার্যগতিকে এইরূপই প্রায় ঘটে। যদি বিধবা দেবর ব্যতীত অপর কোন পরপুরুষকে বিবাহ করে, আর যদি তাহার পুত্রসন্তানাদি থাকে, তাহা হইলে প্রথম পতির আত্মীয়েরা তাহার পুত্রদিগকে পাইবার অধিকারী, কেবল কন্যাসন্তান মাতার সহিত বাইতে পারে। বিধবা-বিবাহে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে বিধবার সিতায় সাতবার সিন্দূর লেপন করিয়া থাকেন।

কাণ্ডুরা দুইটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। অনেক স্থলে

প্রথম পত্নীর অথবা পক্ষান্তরে অজমতি নইয়া বিবাহ করিতে হয়। কিন্তু পত্নীর জ্যেষ্ঠা সহোদরাকে বিবাহ করিতে পারে না।

ইহাদের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বা বৈষ্ণব। মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যে সকল দেবদেবীর পূজা করেন, ইহারাও তাঁহাদিগকে পূজা করে অথবা মানিয়া চলে; এ ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র দেবতা আছেন। বেহারের কাপুয়া “গোরইয়ার” পূজা করে। পূজা হইবার পূর্বে গৃহের বাহিরে একতাল মাটি এক স্থানে রাখা হয়, দোসাধ (গোরাই ঠাকুরের পুরোহিত) আসিয়া সেই মাটির তালকে দেবতা কল্পনা করিয়া পূজা করে। পূজান্তে দোসাধেরা কাপুদিগের হইয়া শূকরশাবক বলি দেয়। এই বলির মাংস গুরোহিত ও যে পরিবার পূজা দেয়, সেই পরিবারের লোকেরা খায়। ছোট নাগপুরের পাহান নামক পুরোহিতেরা বৈষ্ণবভাবে দেবতার কাব্যাদি করে, দোসাধেরাও সেইরূপ কার্য করে ও সেইরূপ ভাবেই দক্ষিণাদি পাইয়া থাকে। বটরিয়া বা ভরভুজা নামক শ্রেণীরা গোবিন্দ নামে গৃহদেবতার উপাসনা করে এবং জন্মাষ্টমীর দিন খই, কলা, দধি ও মিষ্টান্ন ভোগ দেয় এবং দায়াদ আত্মীয়গণে মিলিয়া প্রসাদ খায়। গোড় শ্রেণীরা বৎসরে একদিন বন্দি-মা নামক দেবীর রৌপ্য-প্রতিমার পূজা করে ও দশহরার দিন বাটালি, হাকুড়ি, টাঙ্গী, প্রভৃতি শিল কাটিবার অস্ত্র ও উপকরণাদি দ্বীত করিয়া স্নাত মাংসিয়া পূজা করে। কোরাঙ্ক শ্রেণীরাও বন্দি-মার পূজা করে, কিন্তু তাহার কাপড়ের প্রতিমা স্থাপন করে। ভাগলপুর ও মুন্সেরের মগহিয়া কাপুয়া কলাগী শাহ (কালানী মহারাজ বা কালানী বাবা) নামক জনৈক দৈবশক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পূজা করে, ইহার নিকট ছাগ, মিষ্টান্ন, অন্ন, নানাবিধ কলাই, গম ও তিলাদি ভাজা উৎসর্গ করে এবং শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে গাঁজা নিবেদন করিয়া দেয়। ভুনা-ওয়ারা কাপুয়া মঙ্গমাসে সরস্বতী পূজা করে, কিন্তু সেই দিন সোখা শিবনাথ নামক দেবতার পূজা দেয়। এই পূজার তাহারাত, সরদা, যবের ছাতু ও অন্যান্য যে সকল দ্রব্য লইয়া ব্যবসা করে, তাহার একটি গাজ পূর্ণ করিয়া ধূনা মিশাইয়া আগুণে আহুতি দেয় এবং গুব্ব ধূম উঠিলে দেবতার প্রীতি হইল বলিয়া বিবেচনা করে। বেহারে আবাচ মাসের প্রতি শুক্রবারে রামঠাকুর, রামধারী, নব বা নারা গোঁসাই নামক দেবতার নিকট ছাগ বলি দেয়। ঢাকার কাপুয়া যদিও ব্রাহ্মণ দিয়া পৌরোহিত্য করায়, তবু

পাঁচশীরের ভজনা করে। অনেকে মুলশমানের রোজার সময় তাহাদের ন্যায় রোজা করে; ইহার কোপীন পরে, দরগার মিষ্টান্নাদি গিরণী দেয় ও মুলশমানি কবচ ধারণ করে। পাঁচ-শীরীর কুস্তকার ও বিশ জাতির ন্যায় নানকশাহী আশড়ার মহান্তরাই ইহাদিগের গুরু হয়। ইহাদের ব্রাহ্মদি ৩১ দিনে হয়। শত্ৰুদি ভাজিয়া ও তালিরা বিক্রয় করাই (ভুনাওয়ারায় ব্যবসাই) ইহাদের জাতিগত মূল ব্যবসা। উত্তরভারতে ইহারা অধিকাংশ কৃষক। গোড়শ্রেণীরা অট্টালিকাদি নির্মাণার্থ প্রস্তরাদি কাটে ও গালিস করে। ইহারাই সিল নোড়া ও শতভাজা জাঁতা প্রস্তুত করে; অনেকে রাজ-মিস্ত্রীর কার্যও করে। অনেকে ধনিগৃহে দাসত্বও করে। এই সকল দাসেরা বেতন বলিয়া অর্থ পায় না, থাকিতে নিকর বাড়ী পায় ও ফসল কাটিবার সময় “মাজান” বলিয়া এক ভাগ পায়। ইহাদের জীলোকেরাও ভাজা ভাজে ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। ঢাকায় ইহারা মিঠাইওয়ারার ব্যবসা করে। চৈহাদিগের নিকট হইতে ইক্ষু, শুড়, প্রভৃতি শুষ্ক মিষ্টাদ্য ব্রাহ্মণে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু শুধু বা জনমিশ্রিত মিষ্টান্ন হিন্দু অস্পৃশ্য।

ইহার কোঁইরি, গোয়ালা, গজোত প্রভৃতি জাতির সতিত একশ্রেণীতে গণ্য। কেহ কেহ বলেন, ইহার নিরশ্রেণীর বেগিয়া জাতিতে গণ্য। ইহার অপরের পাককরা দ্রব্য খায়। গোড়শ্রেণীরা ব্রাহ্মণের অন্নও খায় না।

কান্দুনে (দেশজ) যে বালক অতিরিক্ত রোদন করে।

কান্দুয়া (দেশজ) অতিরিক্ত রোদনকারক।

কান্দুয়াবাঘ (দেশজ) বাঘবিশেষ (Felis jubata.)

কান্দুলি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Commelina nudiflora.)

কান্দু (দেশজ) বৃক্ষ; বাহুর উপরিভাগ।

কান্না (দেশজ) ক্রন্দন, রোদন।

কান্নাকাটি (দেশজ) অত্যন্ত রোদন।

কান্নাকুজ (ক্ৰী) কথ্য: কুজ। বজ্র, কস্তুর-স্বার্থে অপ্।

দেশবিশেষ, ইহার হিন্দী নাম কনোজ। সংস্কৃত পর্যায়, মহোদর, কস্তাকুজ, গাধিপুত্র, কোণ ও কুশল।

[কস্তাকুজ ও কনোজ দেখ।]

কান্নাকুজী (ক্ৰী) কান্নাকুজ-উপ। কান্নাকুজদেশীয় ক্ৰী।

কান্নাজী (ক্ৰী) কান্না অর্থাৎ অস্ত্রম্নি জায়তে, ক-অস্ত্র-অনু-ড টাপ্। নলী নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ।

কাপ (দেশজ) ১ কোড়ককারক।

“কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ।

কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।” (অন্নদামঙ্গল।)

২ ছন্দবেশী, কণ্ঠাচারী। ৩ অবতার, যেমন “কলির কাপ”।

৪ বারের জ্ঞানদানের মধ্যে ইহার কুলজুই, কল্লো একত্রের নাম 'কাপ'।

। ০। উদয়নাচার্য্য ভাট্টা* ছই বিবাহ করেন, তাঁহার প্রথমপুত্রের দ্বার গর্ভে উদগতি, জুপতি, ভবানীপতি, কজ-পতি, চণ্ডীপতি ও রজাণীপতি এই ছয় পুত্র এবং বিজয়নকে পুত্রপতি নামে এক পুত্র জন্মে। প্রবাদ আছে, একদা উদয়নাচার্য্য ভাট্টার প্রথমাগস্ত্রী কবরীতে চম্পকশূণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে ব্যক্তিরূপে গ্ৰহণ করিয়া পরিত্যাগ করেন; তাঁহার ছয় পুত্র নিরপরাধিনী জননীকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ার, তিনি মাতার সহিত ঐ ছয় পুত্রকেও ত্যাগ করেন। তাঁহার উপেক্ষিত পুত্রগণ স্বতন্ত্ররূপে 'করণ' করিতে আরম্ভ করেন। তখন উদয়নাচার্য্যের সমাজবন্ধ লোকগণ বলিতে লাগিলেন, "ইহার সমাজপতি কর্তৃক পরিত্যক্ত অথচ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্ররূপে করণ করিয়া 'কাটের' অর্থাৎ সংঘের জায় কার্য্য করিতেছে, সুতরাং ইহার সকলেই কাট অর্থাৎ সং। এই শব্দ হইতেই কাপ শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বোক্ত কাট-গণই অবশেষে 'কাপ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। উদয়নাচার্য্য সমাজে এই প্রকার কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিয়া বান য়ে, এই কাপগণের সঙ্গে একত্র আহার, বিহার, এক-শয্যা শয়ন অথবা একঘাটে স্নান করিলে, কুলীনের কুলপাত হইবে, এমন কি, কাপনিফিল্প বারি কুলীনের অঙ্গের নিগতি হইলেও তাহার কুল বিনষ্ট হইবে। ইহা দ্বারা কুলীনসমাজে বিবম সঙ্কট উপস্থিত হইল। কাপগণ কালাপাহাড়ের জায় ইত্যন্তঃ বারিনিফিল্প প্রভৃতি উপায় দ্বারা কুলীনগণের

* এই উদয়নাচার্য্য ভাট্টাকে অনেকে জায়ন্তমজলি-প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করেন। হুসঙ্গপরগণার অন্তর্গত পূর্ব-ধলা ও বাগরার সিংগোজী, ধোপাড়হরের রার এবং রামনগর প্রভৃতি স্থানের ভাট্টা-গণ এই উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব। ইহা ব্যতীত রাজশাহী ও পাবনা জেলাতেও ই বংশের অনেক লোক আছেন। পূর্ব ধলার বর্তমান সিংহ বংশ উদয়নাচার্য্য হইতে ২০ পুত্র অবতন। সিংহবাবুরা বলেন, ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাদিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বালিগাটি গ্রাম উদয়নাচার্য্যের জন্মস্থান।

কাহারও বিবাহ, হুসঙ্গের বর্তমান রাজগণ উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব, কিন্তু তাহা নয়। উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব গৌরব্রজ ভাট্টা নামে একজন হুসঙ্গে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার তিন পুত্র জন্মে, চোঁটপুত্রের নাম রাংগোবিল, এই রাংগোবিলের কনিষ্ঠ পুত্র হরিরাম হুসঙ্গের এক রাজকুমারীর পানিগ্রহণ করিয়া মৌতুকব্রহ্ম হুসঙ্গ পরগণার ৮০ আনা কংশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর হরিরাম এবং তাঁহার বংশধরগণ হুসঙ্গের রাজবংশের "সিংহ" উপাধি বেজাপুর্ক গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

[হুসঙ্গ বংশ]

কুলনাশ করিয়া কিছিতে লাগিলেন। কুলীনসমাজ দিন দিন কীপবশ্য নিগতি ও কাপসমাজ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রাজশাহীজেলার অন্তঃপাতি ডাহেরপুর নিবাসী রাজা কংশনারায়ণরায় দেখিলেন যে কাপ সমাজে উদয়নাচার্য্যকৃত কুলিয়ম লবাজে প্রচলিত থাকিলে অল্পদিন মধ্যেই কুলীন নাম বিলুপ্ত হইবে। এই নিমিত্ত তিনি কাপে এক কল্লোদান করিয়া কাপের মধ্যাদা স্থাপন করেন, এবং কাপ ও কুলীনের একত্র ভোজন দিয়া সমাজে এই নিয়ম প্রচলন করেন যে, কাপ ও কুলীনে একত্র শয়ন, উপবেশন, স্নান ও ভোজনাদিতে কুলীনের কুলপাত হইবে না। কেবল কুশবারিসংযুক্ত কার্য্যে অর্থাৎ কন্যা আদান-প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে কুলীনের কুল বিনষ্ট হইবে। তদবধি বারেন্দ্রসমাজে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। বর্তমান সময়ে সমাজে কাপের সংখ্যা অপ্রচুর নয় ও ইহার মধ্যে রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতি লালইর, কানীমপুর ও পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুরের চৌধুরীগণ প্রধান কাপ।

কাপটব (পুং) কাপটোগোপ্রাপত্যম্, কাপটু-অণ্। ১ কাপটু ধর্ম্মবংশীয়। ২ (স্ত্রী) কুংসিতঃ পটুঃ, তত্ত্ব ভাবঃ, কাপটু-ভাবে অণ্। নিম্নিত পটুতা।

কাপটিক (পুং) কপটেন চরতি, কপট-ঠক্। ১ ছাত্র। ২ অন্যের মর্ম্মজ্ঞ। ৩ প্রতারক।

(কাপটিকেহন্যমর্ম্মজ্ঞে ছাত্রে পুংসি শঠে ত্রিষু। মেদিনী।)

কাপট্য (স্ত্রী) কপটস্ত্র ভাবঃ কার্য্যদ্বা, কপট-ব্যঞ্। ১ কপ-টতা, শঠতা। ২ প্রতারণা।

কাপড় (দেশজ) বস্ত্র।

কাপধ (পুং) কুংসিতঃ পছাঃ, কু-পথিন্-অচ কোঃ কাপেশঃ (কাপথ্যকরোঃ। পা ৩। ৩। ১০৪।) ১ কুংসিত পথ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ব্যধ, দুঃখ, বিপদ, কদম্বা, কুপ, অসংপথ ও কুংসিতবস্ত্র। ২ দানববিশেষ। ৩ বেণামূল।

(কাপধঃ কুংসিতপথে উণীরে ক্রীবসিধ্যতে। মেদিনী।)

কাপনগাদি, বাঙ্গালাপ্রদেশের অন্তর্গত সিংহভূম-জেলাস্থ গিরিমালা। ইহার শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৯৮ ফুট উচ্চ। এই গিরিমালা দক্ষিণপূর্বাভিমুখে আসিয়া ময়ূরভজের উত্তর সীমান্ত মেঘাশনি গিরির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গিরির উত্তরে পাথর মধ্যে তামা উৎপন্ন হয়। পূর্বে একমল সাহেব এখান হইতে তামা উন্মীষিত। কিন্তু অধিক ব্যয়-সাধ্য হওয়ার তাহার ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কার্য্যবন্ধ করেন, থাকনা বাবদে দালজুসির রাজা তাঁহাদের বাড়ী কল ও কারখানা দখল করিয়া রাখেন।

কাপা (স্ত্রী) কং স্বঃ আশাতে অনন্না, ক-আপ-বঞ্ টাপ্ ।
বন্ধিগিরের প্রোভাকালীন ভূতিপাঠ ।

("প্রোভার্জেরে জরগেব কাপরাঃ" স্বঃ ১০।৪০।৩।

'প্রোভঃ প্রোভাকন্ত বন্ধিনোবধী কাপা তয়া ।' ভাষ্য)

কাপাটিক (স্ত্রী) কপাটিক এব, কপাটিকা-বার্ধে অণ্ । কুজ
কপাট ।

কাপালি (স্ত্রী) কপালমেব, কপাল-বার্ধে-অণ্ । ১ কুঠরোগ-
বিশেষ । [কপাল দেখ ।]

২ (পুং) কেলেকাঁড়া গাছ ।

কাপালিক (পুং) কপালেন নরকপালেন চরতি, কপাল-
ঠক্ । ১ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ । ২ বামাচারিবিশেষ । ৩ যোগি-
বিশেষ ।

কাপালী [ন] (পুং) কপালং ধার্ম্যধেন অন্ত্যস্ত, কপাল-ইনি ।
১ শিব । ২ বাহুদেবের পুত্রবিশেষ । ৩ বর্ণসঙ্কর জাতি-
বিশেষ । পূর্ববঙ্গের একপ্রকার নিরশ্রেণীর জাতি । কাহারও
মতে, কামারের ঔরসে ও তেলী কছার গর্ভে এই জাতির
উৎপত্তি । আবার কেহ বলেন, তিয়রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে
কপালী বা কাপালীর জন্ম হইয়াছে । কপালীদের বিশ্বাস যে
তাহাদের পূর্বপুরুষেরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে
আসিয়াছে । আবার একটি প্রবাদ আছে—আদিশূরের
সময়ে তাহার পুত্রজাতি বলিয়া পরিচিত ছিল । কাশ্যকুজ
হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কারস্থ আগমন করিলে
আদিশূর কপালীদিগকে অভ্যাগত ব্যক্তিগণের পদধৌত
করিতে আদেশ করেন, কিন্তু কপালীরা তাহার আদেশ
অগ্রাহ্য করিলে, গোড়রাজ তাহাদিগকে সমাজের অতি নিকট
শ্রেণীতে গণ্য করিলেন ।

এই জাতির উবাধি—সিক্কার, মুতবর, নগল, রায়,
হালদার, ভূইয়া, মালা, গাঁঝ ।

গোত্র—শিব ও কাশ্য ।

ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষ শ্রেণীভেদ নাই, তবে
যাহারা কেবল গুণগণি প্রস্তুত করে আর কেবল যাহারা
গুণগণি বিক্রয় করে, এই উভয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ
আছে । যাহারা কেবল বিক্রয় করে, তাহারাই অপর হইতে
শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য । এই উভয়ের মধ্যে বিবাহের আদান
প্রদান হয় না ।

কপালীরা কছার বালিকা বয়সে বিবাহ দেয়; উচ্চশ্রেণীর
হিন্দুর মত ইহারা শাস্ত্রানুসারে কত্তা সম্ভবান করে । কত্তা-
কর্তা বয়ের নিকট পদ লইয়া থাকে ।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ অধিক প্রচলিত নাই, তবে

প্রথম স্ত্রী বক্ষা হইলে দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে ।
বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই । যদি কোন নারী স্ত্রী হয়, তবে
সে নিজ প্রণয়ীকে লাঞ্ছা করিতে পারে না, কিন্তু রক্ষিত
বেস্তার জার তাহার সহিত একত্র বাস করিতে পারে ।
এরূপ স্থলে উভয়ের নিকনীর অথবা সমাজচ্যুত হইতে পারে ।

কপালীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব, অল্পই শাক্ত ।
ইহারা ষড়াননের বদ্ধ ভক্ত । বর্ণব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌর-
হিত্য করে । আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে ইহারা ৩০ দিন অশোচ
গ্রহণের পর ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করে । কাহারও অপঘাতে মৃত্যু
হইলে ৪র্থ দিবসে শ্রাদ্ধ হয় ।

কাপালী পল্লিগ্রামে বাস করে, পাটের চাব দেয় এবং
পাটের তক্ত হইতে 'গুণচট' বয়ন করে । শণ বা তুলার চাব
করিলে ইহাদের জাতি নষ্ট হয় ।

ইহারা তিন প্রকার গুণচটের ব্যবসা করে ঐ তিন
প্রকারের নাম ছালা, ছাট ও তাঁত ।

পূর্বে ইহাদের মধ্যে দুই একজন তালুকদার ও জমীদার
ছিল । কিন্তু এখন ইহাদের সামাজিক অথবা শোচনীয় ।

কাপালী (স্ত্রী) কাপাল-স্ত্রী । বিভক্ত ।

কাপাস (দেশজ, কাপাস শব্দের অগ্রভংশ) বৃক্ষবিশেষ, ইহার
ফল হইতে তুলা উৎপন্ন হয় । [কাপাস দেখ ।]

কাপাসীটেঙ্গরা (দেশজ) সংজ্ঞাবিশেষ । (Pimelodes,
capasi-Tayngra.)

কাপাসীয়াপোকা (দেশজ) কাপাসবৃক্ষজাত কীটবিশেষ ।

কাপিক (পুং) কপিবেব-ঠক্ (অজুলাবিভ্যঠক্ । পা
৫।৩।১০৮।) কপি, বানর ।

কাপিঞ্জল (পুং) কপিঞ্জলশ্চ অশতাম্ পুমান্, কপিঞ্জল-অণ্ ।
কপিঞ্জলের পুত্র ।

কাপিঞ্জলাদি (পুং) কপিঞ্জলান্ তন্মাংসানি অস্তি কপিঞ্জল-
অদ্-অণ্-ইঞ । চাতক ও তিস্তির পক্ষীর মাংসতক্ষক ।

কাপিঞ্জলাদ্য (পুং) কাপিঞ্জলাদেরপত্যং পুমান্, কাপিঞ্জ-
লাদি-ণ্য (কুর্বাদিত্যো গাঃ । পা ৪।১।১৫১।) কাপিঞ্জলা-
দির পুত্র ।

কাপিথ (স্ত্রী) কপিথস্ত বিকারঃ, কপিথ-অণ্ (অজুলাস্তা-
দেশ্ । পা ৪।৩।১৪০।) কপিথ ঘরা নির্মিত বস্ত্র ।

কাপিথক (স্ত্রী) দেশবিশেষ । (বৃহৎসংহিতা) । বর্তমান
উত্তরভারতের সন্ধিশ নামক নগরের চতুঃপার্শ্বস্থ হান ।

[সন্ধিশ বা সাক্ষাতা দেখ ।]

কাপিল (পুং) কপিলেন প্রোভঃ শাস্ত্রং বেত্তি কথীতে বা,
কপিল-অণ্ । ১ সাধ্যশাস্ত্রবেত্তা । ২ (কপিলমধিকৃত্য কৃতো

এছ:) কপিলমুনির মতামতগারে লিখিত উপপুরাণবিশেষ।
৩ পিজলবর্ণ। ৪ (ত্রি) পিজলবর্ণবিশিষ্ট।

কাপিলিক (পুং) কপিলিকার অপর্যায় পুমান্, কপিলিকা-
অণ্। কপিলবর্ণার পুত্র।

কাপিলেয় (পুং) কপিলার অপর্যায় পুমান্, কপিলা-টক্।
কপিলমুনির শিষ্যবিশেষ; ইনি কপিলা নামী কোন ব্রাহ্মণীর
জনপান করায় 'কাপিলেয়' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

(ভারত শাস্তি ২১৮ অঃ।)

কাপিল্য (ত্রি) কপিলেন নিবৃত্তম্, কপিল-ণ্য। কপিল-
নিবৃত্ত।

কাপিবন (ক্লী) হইদিন সাধ্য অহীন বজ্রবিশেষ।

(আদিক্রম চৈত্ররথ কপিবনাঃ। কাত্য। ২৩। ২। ৩।)

কাপিশ (ক্লী) কপিশা নাম্বী, তৎপুংস্ জাতম্, কপিশা-
অণ্। ১ নাম্বীকুল হইতে প্রসূত মদ্য। ২ মদ্যাত্র।

কাপিশায়ন (ক্লী) কাপিশা জাতম্, কাপিশী-ক্ষক্ (কাপিশাঃ
ক্ষক্। পা ৪। ২। ৯৯।) ১ মদ্য। ২ দেবতা। ৩ কাপিশী
জনপদবাসী।

কাপিশী (ক্লী) পাণ্ডিত্য প্রাচীন জনপদবিশেষ। (পা
৪। ২। ৯৯।) চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এই জনপদ
“কি অ-পি-শি” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজকের
সময়েও এই জনপদ ক্ষত্রিয়রাজের অধীন ছিল। তৎকালে
এখানে নিম্ব্রহ্ম, পাণ্ডিত, কাপালিক, দেবোপাসক এবং
বিশ্বর বোধ বাস করিত। সেই সময়ে এই জনপদ ৪০০০
লি (প্রায় ৩৩৩ ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল। (Beal's Buddhist
Record I. 54-58 দেখ।)

প্রাচ্যাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি ‘কপিশা’, গ্রিসি
‘কপিশিন্’ ও সলিনাস ‘কক্ষা’ নামে ইহার উল্লেখ
করিয়াছেন।

কনিংহাম সাহেবের মতে, এই প্রাচীন জনপদটি বর্তমান
কাফিরিস্তান, ঘোরবন্ধ ও পঞ্চশির পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
চীনপরিব্রাজকের বর্ণনার জানা যায়, যে বর্তমান বয়ু (পাণিনি-
কথিত বয়ু) উপত্যকা-প্রদেশ অবধি কাপিশীর ক্ষত্রিয়-
রাজের অধিকারভুক্ত ছিল।

গ্রিসি ‘কপিসা’ নামে ইহার রাজধানীর উল্লেখ করিয়া-
ছেন। ইহার বর্তমান নাম কুসান অথবা ওপিয়ান্।

কাপিশেয় (পুং) কপিশার অপর্যায় পুমান্, কপিশা-টক্।
পিশাচ।

কাপিষ্ঠলী (পুং) কপিষ্ঠলজ ইদম্, কপিষ্ঠল-অণ্। প্রাচীন
জনপদবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় কাপিষ্ঠল নামে উক্ত হই-

রাছে। প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিক এরিয়ান্ বর্ণিত ক্যাথি-
স্থলী। পঞ্চাবের উত্তরে ইরাবতী ও অশিকী নদীর মধ্য-
বর্তী। ২ গোত্রভেদ। (কান্দে নাগর § ১০৮। ২২।)

কাপিষ্ঠলি (পুং) কপিষ্ঠলজ গোত্রাপত্যম্, কপিষ্ঠল-ইঞ্।
কপিষ্ঠল ঋষিবংশীয়।

কাপী (ক্লী) ১ নদীবিশেষ। ২ জীবিশেষ।

কাপু, মাজাজপ্রদেশবাসী একপ্রকার নিম্ব্রজাতি। ইহার
স্থানবিশেষে কাপলু, রেড্ডী বা নায়হু নামে পরিচিত।
নেল্লুর, কদপা, কর্ণুল, ইংরাজের শাসনভুক্ত রাজ্য ও সমস্ত
তৈলঙ্গে এই জাতির বাস। প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যই ইহাদের
উপজীবিকা। তবে কেহ কেহ ব্যবসাদিও করিয়া থাকে।
ইহার চতুর, সাহসী ও কার্য্যক্ষম।

এই জাতি ১০টি শাখায় বিভক্ত। যথা—আয়ে, কানিদে,
চলকুটী, দেহুরি, নেরাকু, গণ্টা, পাকানটী, পেনাকান্তি,
পল্ল, মোটাত্তি, রচু, ঘেরাপ ও রেলামা কাপলু।

কাপুড়ে (দেশজ) কাপড়বিক্রেতা, বস্ত্রব্যবসায়ী।

কাপুরুষ (পুং) কুঃ পুরুষঃ কোঃ কাদেশঃ (বিশ্বা পুরুষে।
পা ৬। ৩। ১০৬।) নিম্নিত পুরুষ।

কাপুরুষতা (ক্লী) কাপুরুষত্ব ভাবঃ কাপুরুষ-তন্। ১ নিম্নিত
পুরুষের কার্য্য। ২ ভীকৃত্য প্রভৃতি।

কাপুরুষত্ব (ক্লী) কাপুরুষত্ব ভাবঃ, কাপুরুষ-ত্ব (তত্ত্ব ভাব-
তলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) ১ নিম্নিত পুরুষের কার্য্য।
ভীকৃত্য প্রভৃতি।

কাপুরুষ্য (ক্লী) কাপুরুষত্ব ভাবঃ, কাপুরুষ-য্যঞ্। কাপুরুষতা।

কাপেয় (ত্রি) কপেভ্যঃ কার্য্যণা, কপি-টক্। ১ কপি-
সম্বন্ধীয়। ২ বানরের কার্য্য।

কাপোত (ক্লী) কপোতানাং সমূহঃ, কপোত-অণ্। ১ পায়-
রার ঝাঁক। ২ (কপোতজ ইদম্) পায়রাসম্বন্ধীয়। ৩
দৌরীরাজন। (পুং) ৪ সাজিমাটী। ৫ কপোতবর্ণ।
৬ কচক। ৭ (ত্রি) কপোতবর্ণবিশিষ্ট।

কাপোতক (ত্রি) কপোতাঃ সন্তি অন্ত্যম্, কপোত-কৃ-কৃচ্চ;
তত্র ভবঃ অণ্, হ্রস্ব লুক্। কপোতবিশিষ্ট দেশজাত।

কাপোতপাক্য (পুং) কপোতানাং পাকঃ ভিষঃ, তত্ত্ব
সমূহঃ, কপোতপাক-ণ্য। পায়রার ডিম সকল।

কাপোতাঙ্গন (ক্লী) কাপোতঃ তৎ অঙ্গনক্বেতি, কর্ম্মণা।
দৌরীরাজন।

কাপোত্টি (ত্রি) কপোতজ ইদম্, কপোত-ইঞ্।
কপোতসম্বন্ধীয়।

কাপ্য (পুং) কপের্গোত্রাপত্যঃ, কপি-যঞ্ (গর্গাদিত্যো

১৫. পা ৪।১।১০৫।) ১ কপি-খবিবংশীয়, আদিরস।
২ বানরবংশীয়। ৩ (ক্লী) পাপ।

কাপ্যকর (পুং) কুসিতং আপ্যং কাপ্যং পাপং কুরোতি,
কাপ্য-কৃ-ট। ১ ব্রহ্মত পাপ য়ে প্রকাশ করিয়া ফেলে।
২ (ত্রি) পাপকারক।

কাপ্যকার (পুং) কাপ্যং কুরোতি কাপ্য-কৃ-অণ্। ১ যে
পাপ করিয়া তাহা প্রকাশ করে। (ত্রি) পাপকারক।

কাপ্যায়নী (স্ত্রী) কপেগৌরাপত্যং, কপি-বঞ-ফক্-ভীষ্।
কপিবংশীয়া।

কাফর (আরব্য) মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে কাফর, কাফির
বা কাফের বলিয়া থাকে।

কাফল (পুং) কুসিতং ফলং যন্ত, কোঃ কাদেশঃ।
কটুকল।

কাফি, কাপি—একপ্রকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ফল। ইহা ভাজিয়া
ভাজিয়া গুড়া করিয়া চাএর জ্বাষ চুড়ের সহিত মিশাইয়া
অনেকে প্রত্যহ পান করে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম,—

বান্দালা	...	কাপি, কাফি, কাবা।
হিন্দী	...	কাওয়া, বন, বুন, কফী, কফি।
গুজরী	...	বুল, কাপি।
বোম্বাই	...	কব, বন, কহা, বুল, কাফি।
দাক্ষিণাত্য	...	বুল, তচেম-কেবে।
মহারাষ্ট্র	...	কাফি, কন, বন্, বুন।
তামিল	...	কাপি-কোটাই, কাপি-কোট্ট, কাপি।
তৈলঙ্গ	...	কাপি-ভিত্তল, কাপি।
কর্ণাট	...	কাফি, বোল-বীজ, কাপি-বীজ।
আরবী	...	বন, কহা, কবা, কুএবা।
পারসী	...	বন, কহা, কহোয়া, তচেম-কেওহে।
ব্রহ্ম	...	কা-পউত, কাফি-সি।
সিংহলী	...	কোপি-অতা, কোপি-কোট্ট।
ইংরাজী	...	কফি (Coffee)
ফরাসী	...	কফি (Café)
জার্মান	...	কফী (Kaffee)
বৈজ্ঞানিক নাম	...	কফিয়া এরাবিকা (Coffea Arabica)

ইহার গাছ ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার বহু-
সংখ্যক শাখা-প্রশাখা হয়, কিন্তু শাখা বড় দীর্ঘ হয় না।
ইহার গাছের ছাল শক্তা গাছের ছালের জ্বর জৈবৎ বৈভবর্ণ।
কমলানবুর আকারের শাদা ফুল হয়। ফুলগুলি ক্ষুদ্র বকুল
ফলের জ্বর হয়, পাকিলে রক্তবর্ণ দেখায়। প্রতি ফলে দুইটি
মাত্র বীজ হয়। এই বীজ ছাড়াইয়া ফল শুকাইয়া বিক্রয়

করে। তৎপরে সেই শুক ফল ভাজিয়া গুড়া করিয়া লইলেই
দোকানের গুড়া কাপি প্রস্তুত হয়।

অনেকে অসুমান করেন যে, ইহার আরবী “কহোয়া” নামে
প্রথমতঃ মদ্য বুঝাইত, এক্ষণে ইহাকে বুঝায়, আবার
কেহ কেহ অসুমান করেন যে, ঐ শব্দটী আবিদিনিয়ার
(আফ্রিকা) অন্তর্গত কাফা প্রদেশের নাম হইতে অপভ্রংশ
হইয়াছে। ইহার হিন্দী নাম “বন” হইতে ইহার গাছ ও ফল
এবং “কহোয়া” নামে গুড়া কাপি বুঝায়।

এই ফলের আদিবাসগ আফ্রিকার অন্তর্গত আবি-
সিনিয়া, সুদান, গিনি এবং মোজাম্বিক প্রদেশের উপকূলে।
এই সকল স্থলে এই গাছ আপনা হইতেই বনমধ্যে জন্মে।
আরবদেশে ইহাদিগকে ওল্পে জন্মিতে দেখা যায় না।
তবে বলা যায় না, আরবের দুর্গম মধ্যপ্রদেশে আছে কি না।

কাপির অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে, তন্মধ্যে ভারত-
বর্ষে ৭ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়।

১। আরবী কাপি—(Coffea Arabica) ভারতের
নালাস্থানে এই কাপির যথেষ্ট চাষ হয়।

২। বান্দালার কাপি—(Coffea Bengalensis) কুম্ভা-
উন হইতে মিশ্রি পর্যন্ত, উত্তর-পশ্চিম ও বান্দালা, আসাম,
ত্রিচুট, চট্টগ্রাম ও টেনাসেরিমপ্রদেশে ইহা জন্মে। ইহার
ফল জৈবৎ আয়তাকার। চট্টগ্রামে ইহাকে “হরীণা” ফল বলে।

৩। সুগন্ধি কাপি—(Coffea fragrans) ত্রিচুট ও
টেনাসেরিমপ্রদেশে পাওয়া যায়। ফল পূর্বেক্ষিত দুই জাতীয়ের
জ্বরই হয়।

৪। আসামী কাপি—(Coffea Jenkinsii) আসামের
খসিয়া পর্বতে ইহা জন্মে। ফল জৈবৎ ডিম্বাকার হয়।

৫। খসিয়া কাপি—(Coffea khasiana) খসিয়া ও
জয়ন্তী পাহাড়ে জন্মে। ফলগুলি ১ ইঞ্চিমান মোটা হয়,
বীজগুলি কোল-কুজা হয়।

৬। ত্রিবাকুড়ের কাপি—(Coffea Travancorensis)
ত্রিবাকুড়ে জন্মে। ফল লম্বা ছোট ও চওড়া বড় হয়।

৭। মালাবারী কাপি—(Coffea Wightiana)
দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে হয়। ইহার ফলের আকার ত্রিবাকু-
ড়ের ফলের মত, কিন্তু একদিকে একটি গভীর টোল
খাইয়া যায়।

প্রথম শ্রেণী ভিন্ন আর সকল শ্রেণীর কাপি জন্ম জন্মে।
দাক্ষিণাত্যের লোকেরাই বেশী কাপি খায় ও সেই দিকেই
ইহার চাষ বেশী হয়। দাক্ষিণাত্যে কাপি এখন এত বেশী
জন্মে যে, বিদেশেও রপ্তানি হয়।

১৫° উত্তর ও ১৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে কাপি বেশ ভাল জন্মে, কিন্তু ৩৬° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্য-প্রদেশেও মাঝারি জন্মে। ভুলার চাষ যেমন জমীতে হয়, ইহার চাষেও সেইরূপ জমী আবশ্যক। ইহার খোপ দেখিতে অতি মনোরম বলিয়া অনেকে ইহা উল্যানে শোভার জন্য রোপণ করে। যেখানে ফারেনহাইটের তাপমানে ৬০° হইতে ৮০° পর্যন্ত উষ্ণতা অনুভূত হয়, সেই স্থানে ইহা জন্মে। যেখানে মাসে একবার বৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু বৎসরে ১৫০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না, সেই প্রদেশে কাপি ভালরূপ জন্মে। ইহার চাষে বড় যত্ন আবশ্যক। অতিশয় মেঘ হইলে বা অতিবেগে বাতাস বহিলে ইহার পক্ষে অন্তত। জোর বাতাসে ইহার ফুল খরিয়া যায়, সুতরাং ফল ধরে না, প্রায় অর্ধেক শত ক্ষতি হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইলে ইহার গাছে ছায়া আবশ্যক। সমুদ্র উপকূলে ইহা বড় ভাল হয় না। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়ার সহিত সমন্বয়পাতে ভারতে যে যে স্থান পড়ে, সেই সকল স্থানে বিশেষতঃ নীলগিরি উপত্যকার কাফি অতি উত্তম হয়।

আবিসিনিয়ার ইহার বহুলকলে “বনু” বা “বউন” বলে। প্রাচীন কালে মিসর ও সিরিয়ায় ঐ নামে চলিত ছিল। সেকালে সিরিয়াবাসীরা ইহার বীজকে কেভে (Cave) বলিত এবং উহাই সিল্ক করিয়া খাইত। আরবী গ্রন্থাদি আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, সেখ সাহাবুদ্দীন খতাবি নামক এক ব্যক্তি আফ্রিকার উপকূলে কাফির ব্যাপার অবগত হইয়া সর্বপ্রথম আদেনবন্দরে একখানি দোকান করে। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়, সুতরাং ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাফি আরবে প্রথম আসে। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা যেমেন, মক্কা, কায়রো, দামাস্কাস, আলোপো ও কনষ্টান্টিনোপলে বিস্তৃত হয়। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলে একটি কাফি-পানাগার সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এই আলোপো সহরেই রণডল্ফ নামক নৈক যুরোপীয়ের নিকট কাফি প্রথম পরিচিত হয়। তৎপরে ক্রমে ইহা ভারতে আনীত হয়, তাহা বলা যায় না। অনেকেই বলেন যে, বাবা বুদান নামে একজন মুসলমান সন্ন্যাসী মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ে ৭টামাত্র বীজ লইয়া মহিল্লরে আসেন। দক্ষিণ ভারতে এই মতটির উপর এক বিশ্বাস যে, ইহার যে সমস্তই অমূল্য, তাহা বোধ হয় না। ১৫৭৬ হইতে ১৬২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লিম দোটেন (Jan Huygen van Linschoten) নামক একজন হলন্দাজ প্রদেশে বেড়াইতে আসিয়া নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে দামাস্কাস

উপকূলের সমস্ত উৎপন্ন ত্রব্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কাফির নাম নাই। ইহার সমসাময়িক লেখকগণের পুস্তকে মিসরীয়গণের বউন বা বনু কলের কাথ খাইবার কথা খাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, লিনসোটেন যে সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে এখানে কাফির কথা শুনে নাই। ডাঃ ওয়ালিচ বিলাতে হাউস অব কমন্সে সাক্ষ্য দিবার সময় বলেন যে, “কলিকাতার কোম্পানীর বাগানে যে কাফি হইত, তাহা ভিন্ন আর কিছু খাই নাই।” তৎপরে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও এই উনবিংশ শতাব্দীর বিবরণ। সিংহলে পূর্বাঙ্গীক দোরাগোর পূর্বে আরবেরা ইহা প্রথম প্রচার করে।

পূর্বভারতীয় দীপশ্রেণীতে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের শেষে গবর্নর ভান হর্ন (Van Hoorne) আরব-বণিকগণের নিকট হইতে বীজসংগ্রহ করিয়া যবদ্বীপে বটেভিয়ানগরে রোপণ করেন। ইহা হইতে যে গাছ হয়, তাহার মধ্যে একটি চারা হলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহা হইতে চারা করিয়া ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে সুরিনাম নামক স্থানে পাঠান হয়। ইহার দশ বৎসর পরে আমষ্টার্ডমের কাপি-বাগান হইতে একটি চারা চতুর্দশ লুইকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, পরে তাহা হইতে চারা লইয়া পশ্চিম ভারতীয় দীপপুঞ্জে রোপণ করা হয়। ইহা হইতে নতুন মহাদ্বীপে কাপির চাষ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমেরিকা ও যুরোপের কাপি-চাষের মূল যবদ্বীপ, কিন্তু এখন আমেরিকার যে পরিমাণে কাপি উৎপন্ন হইতেছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন হয় না। এক ব্রেজিলেই ৫০০০০০০ পাঁচকোটি ত্রিশলক্ষ চারা হইতে যত্ন সহকারে ফল সংগ্রহ হইয়া থাকে। কোষ্টারিকা, গোয়াটিমালা, ভেনেজুইলা, গোয়ানা, পেরু, বলিভিয়া, জামেকা, কিউবা, পোর্টোরিকো, ও অন্যান্য পশ্চিমভারতীয়দ্বীপে, অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে, কুইন্সল্যান্ডে, এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপাবলীর মধ্যে সুমাত্রা, বোর্নিয়ো ও মালয় উপদ্বীপে, শ্রীলঙ্কায়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি প্রাচ্য মধ্যগত দ্বীপবিভাগে এবং ফিজি দ্বীপে ইহার চাষ হইতেছে। ব্রেজিল ও যবদ্বীপের আবাদ যত বিস্তৃত তত আর কোথাও নহে, তৎপরেই ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপের আবাদ উল্লেখ-যোগ্য।

কাফিপানের প্রথা আরবে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, মুসলমান ধর্মযাজকেরা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন; কারণ মসজিদ বা দরগা অপেক্ষা কাফিপানাগারে লোকের আসক্তি চতুর্ভাগ হইয়া পড়িয়াছিল। এই পানাসক্তি কবাইবার জন্য ইহার উপর বিস্তর তদ্ব্যাপিত হয়। গ্রেটব্রিটেনে চাঃএম প্রথম দোকান হইবার পূর্বে (১৬৫৭) কাফি পান্য

গার স্থাপিত হয় (১৬৫২ খৃঃ)। ডি. এডওয়ার্ডস্ নামে একজন তুর্ককের ইংরাজবল্লী কাকিপানে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়েন যে, দেশে আসিবার সময় তাঁহাকে প্যাকোয়া রোসিনামক একজন গ্রীক চাকরকে প্রত্যহ কাকি তৈয়ার করিয়া দিবার জন্য সঙ্গে লইয়া আসেন। ইহার বজুবাকবেরাও ক্রমশঃ কাকিপানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বজুবাকবের নিত্য উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি রোসিকে কর্ণহিলের সেন্টমাইকেলের অ্যালা নামক স্থানে প্রকাশ্যে কাকিপানাগার খুলিয়া দেন। ক্রমশঃ ইহার ব্যবহার বাড়িয়া গেলে পানাগারের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় চার্লস্ (১৬৭৫ খৃঃ) এই সকল পানাগারে লোকের জনতা দেখিয়া ইহার ব্যবহার কমানিতে ও পানাগারের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিতে রাজাদেশ বিধিবদ্ধ করিয়া দেন। ফ্রান্সে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে কাকি ব্যবহার চলিত হয় এবং ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে প্যারীসগরে প্রথম পানাগার স্থাপিত হয়। তৎপরে ক্রমশঃ যুরোপে সর্বত্র ইহার ব্যবহার বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল। অবশেষে ১৮৪৭ সালে চা-এর ব্যবসার ও ব্যবহার অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িলে কাকির আদর কমিয়া যায়। ব্রহ্মদেশে কাকির চাহ হইতেছে, কিন্তু এখনও বিজ্ঞের অভাব আছে। দিন দিন ইহার পানস্পৃহা বাড়িতেছে।

ভারতের দাক্ষিণাত্যে কাকির আবাদ রীতিমত হয়। ১৮৮৩। ৮৪। ৮৫ এই তিন বৎসরে দাক্ষিণাত্যে প্রায় ১৮৬৫০০ একর ভূমিতে ইহার চাষ হইয়াছে; তন্মধ্যে মহিষ্মরে ৮২১০০ একর ভূমিতে ৭,১১,০০০ পাউণ্ড; মাজাজে ৫৫১০০ একর ভূমিতে ১৩,১৬০,০০০ পাউণ্ড; কুর্গে ৪২৩০০ একর ভূমিতে ৯,৩০০,০০০ পাউণ্ড; জিবাঙ্কুড়ে ৪৮০০ একর ভূমিতে ৮২০,০০০ পাউণ্ড ও কোচীনে ২২০০ একর ভূমিতে ৮০০০০ পাউণ্ড কাকি উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতে পূর্বে সর্বপ্রথমে কিরূপে কাকি আসিল, তৎসম্বন্ধে পূর্বে বাবা বৃন্দানের কথা বলা হইয়াছে। মহিষ্মরে ইহার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে দুই শতাব্দী পূর্বে মক্কা হইতে আসিবার সময় তিনি কতকগুলি কল ও ৭টি মাত্র বীজ আনিয়াছিলেন। এখানে তিনি যে পর্রতশিখরে থাকিতেন, আজকাল লোকে তাঁহার নামানুসারে “বাবা বৃন্দানগিরি” বলে। এই শিখরে তাঁহার কুটারপার্শ্বে তিনি সেই ৭টি বীজ হইতে গাঁছ করেন, ক্রমশঃ সেই পর্রতে ইহার অনেক গাছ হয়। তৎপরে ৬০।৭০ বৎসর অতীত হইলে আরও নিকটবর্তী কয়েক স্থানে ইহার আবাদ হয়। শেষে আজ প্রায় ৪০ বৎসর হইল, ইংরাজরাজের এখিকে দৃষ্টি পড়ায়

ইহার রীতিমত আবাদ হইতেছে। যি কানন নামক একজন ইংরাজ সর্বপ্রথমে বাবা-বৃন্দানগিরির দক্ষিণে এক উচ্চ জমীতে ইহার প্রথম আবাদ করেন।

কাকির ব্যবসায়ে ইংরাজাধিকৃত দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা উত্তম সুগন্ধি কাকি বহুপরিমাণে উৎপন্ন হয়। কাকিগাছের পাতা উপযুক্ত নিয়মে প্রস্তুত করিয়া লইলে চাক্ষুপে ব্যবহৃত বা চা-এর সহিত ভেজাল চলিতে পারে। সুমাত্রায় পাড়া নামক স্থানের লোকেরা এই পাতা চা-এর মত করিয়া প্রত্যহ পান করে। চা-এর ছায় ইহারও বেশ হয় প্রাশ্নিনাশক গুণ আছে।

কাকিফলের খোলা হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। এখন এই তৈল বাহির করিবার প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই।

আমেরিকায় কাকির আরও উত্তেজক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে চলিত হয় নাই। সুরাসারের প্রভাবে শরীরে যেরূপ কার্য উৎপাদন করে, ইহাতেও সেইরূপ হয়। কাকি চা অপেক্ষা সারক, ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ করে না; তবে বেশী পরিমাণে খাইলে হয়।

টাইফয়েড জ্বরের ক্রাসী-নোসেনার মধ্যে রোগীকে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর দু-চামচ কাকি খাওয়াইয়া মধ্যে মধ্যে ক্লারেট বা বারগাপ্তি মদ্য সেবন করান হয়; ইহাতে বখেট উপকার দর্শিয়া থাকে। কাকিপানে ক্রাসীনিগের মধ্যে সূত্রহলীতে অশ্মরীরোগের আতিশয্য কমিয়া গিয়াছে। তুর্ককে কাকিপানে বাতের পীড়া নাই বলিলেই হয়। তুর্কবালীরা প্রত্যহ কাকি পান করে, ইহাই তাহাদের প্রিয়তম পানীয়। সবিরাম জ্বরে কুইনাইনের ছায় কাঁচা কাকি খাইতে দেওয়া হয়, কিন্তু ততটা ফল হয় না। ভাজা কাকিতে পচা জীব-শরীর বা বৃক্ষাদির দুর্গন্ধ দূর হয় এবং দূষিত বায়ুর সংক্রামতা নষ্ট করে। মাজাজ ও গজামের হাঁসপাতালে প্রত্যহ কাকির ভাজা শুঁড়া পোড়াইয়া বায়ুর দূষিত অংশ নষ্ট করিয়া থাকে। আরবেরা বলে কাকির কামেচ্ছা-নিবারক গুণ আছে। বাটার প্রাক্ষণে বা খোলা মাঠে কাকি পোড়াইলে হাওয়া বিশুদ্ধ হয়, ইহা অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুমোদিত। ইহাতে আফিমের বিষও নষ্ট হয়।

লাইবিরিয়ার কাকি—(Liberian coffee) আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলে লাইবিরিয়া, অঙ্গোলা, গোলকো, অলটো প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহার বৃক্ষ আরবীয় কাকি-বৃক্ষ অপেক্ষা দৃঢ়; ফল ও পাতা বড়। যখন কাকিগাছের সম্বন্ধে সিংহলে অজ্ঞানজন হয়, সেই সময়ে এই শ্রেণীর কাকি

যুরোপীয়দিগের নিকট প্রথম পরিচিত হয়। এই প্রদেশীয় কাকিতে নাকি পোকা অধিক লাগে না।

কাকির চাষ লিথিয়া বুঝাইবার উপায় নাই; কারণ কাকির চাষ, বা বাগান না দেখিলে তাহা সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে না। আরবীয় কাকিগাছের নানারূপ পীড়া ধরে। আবহাওয়া, জল, চাষবাসের দোষেই অধিকাংশ পীড়া হয়। চাষের সোষে কাকিরে, চায়া মুস্‌ড়াইয়া যায়, পাতায় হরিজাবর্ণের শুড়ার উৎপত্তি ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, পাতা কৌক-ড়াইয়া যায় এবং কাকি-পোকা ও কাকি-মাছি লাগা প্রকৃতি দোষ জন্মে; এতদ্ভিন্ন গজপাল, ইন্দুর, কাঠবিড়াল, শূগাল ইত্যাদিতেও বিস্তর নষ্ট হয়। শূগালের অত্যাচারে যে সকল ফল পড়িয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া অনেকে শূগাল-কাকি নাম দিয়া থাকে।

কাকিখাঁ, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইহার প্রকৃত নাম মুহম্মদ হাশিম। ইনি পারস্তভাষায় মুস্তথবুল লু'াব ইতিহাস প্রণয়ন করেন, এই গ্রন্থে বাবর হইতে দিল্লীর মোগলবাদশাহগণের আত্মপুর্নিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্রাট ফরক-সিয়াদের রাজত্বকালে ইনি নিজামউলমুলক (হায়দরাবাদের প্রথম নিজাম) পদ প্রাপ্ত হন।

কাকিরকোট, সিদ্ধপ্রদেশের অন্তর্গত মেহেরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ একটি উগত্যকা। এখানে বড় বড় কুজিম ধাপ আছে, এই ধাপে গম জন্মে। এই ধাপের মধ্যে মধ্যে প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পড়িয়া আছে। মুসলমানেরা ঐ সকল মূর্তি কাফের (অর্থাৎ বিদুষী) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, বলিয়া ইহার নাম কাকির-কোট রাখিয়াছে।

কাকিরিস্থান—ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমা ও হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যবর্তী একটি প্রদেশকে কাকিরিস্থান বলে। ইহার পশ্চিম সীমা আফগানস্থানের অন্তর্গত আলীসাল নদী এবং পূর্বে কুনার নদীকে সীমা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই স্থানের অধিবাসীকে কাকির ও সিয়াপোশ বলে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন যুরোপীয় এই প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং তৎপূর্বে ইহার বাহা কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তাহার উপর প্রকৃতপক্ষে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। প্রাচীন ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা এই স্থান সম্বন্ধে বাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই পার্শ্ববর্তী মুসলমানগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করা; কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে যে মুসলমানেরা এই প্রদেশে সহজে প্রবেশ করিতে পার না বা করিতে চাহেনা, কারণ কাকির জাতির সহিত ইহাদের চিরশত্রুতা। কোন

কাকির যদি নিজ-জীবনে কোন উপায়ে একটি মুসলমানকে হত্যা করিতে না পারে, তবে সে স্বজাতিতে স্বশ্রেণীতে, স্ববংশে অপদার্থ ও হয়ে হইয়া পড়ে। সুতরাং এক্ষণ সম্বন্ধে বোঝা, সেখানে মুসলমানের নিকট এ প্রদেশের বা এই জাতির বিবরণ ঠিক জানা যাইবে কিরূপে?

এখানে সিয়াপোশ নামে একটি জাতি বাস করে, কেহ কেহ এই সিয়াপোশজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন যে, ইহার পায়ন্তর গবরজাতির স্ত্রী আচারব্যবহারবিশিষ্ট কোন একটি আরবীয় জাতি হইতে উৎপন্ন, কেহ কেহ বলেন যে, ইহার আলেকসান্দারের গ্রীক-সৈন্যের ঔরসোৎপন্ন, আবার কেহ অনুমান করেন যে, মুসলমান-মত প্রচারিত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল অসভ্যজাতিকে পর্তুগীজেরা আসিয়া আনয়ন করিয়াছিল, ইহাদেরই সন্তানসন্ততি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কাকিরগণের ভাষার সহিত কিন্তু আরবী, পারসী বা তুর্কীভাষার বিন্দুমাত্রও মাদৃশ্য নাই; বরং সংস্কৃতের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। এই কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিবেচনা করেন যে, ইহার আরব বা আফগানের মত একবারে একটি স্বতন্ত্র জাতি নহে, ইহার ভারতীয় জাতিরই অন্তর্গত কেবল দেশভেদে যেন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এখানকার যে বিবরণ সংগৃহীত হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে, এদেশে কস্তুর, গধীর, দেল-ছলজ, অরুণ্ড, ইন্তর্গ, অমিসোজ, গজিত, বৈগল নামক কয়েকটি জনপদ আছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডব্লিউ, ম'নোরার নামক ইংরাজই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম এ প্রদেশে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন। তিনি এখানকার লোকসংখ্যা অনুমানে ৬ লক্ষ স্থির করেন। প্রতি গ্রামে ১০০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত লোকের বাস আছে।

ইহাদের দৈনিক আচার ব্যবহার ও আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ বিভিন্নমত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন সিয়াপোশেরা দেখিতে বলিষ্ঠ, দৃঢ়গঠিত, সাহসী কিন্তু স্বভাবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—অলস, বিলাসী ও সর্বদা মদ্যপারী। আফগানস্থানে অনেকগুলি কাকির ধৃত হইয়া বাস করিতেছে, তাহাদের দেখিলে ঐ অনুমান দৃঢ় বলিয়াই বোধ হয়। ইহারিগের মধ্যে যুরোপীয় গঠনের লোকই অধিক, কৃষ্ণাঙ্গ ও বিড়ালাকৃতি আছে। ইহার নাকি আগুন-পিড়ি হইয়া বসিতে পারে না, চৌকির উপরেই বসিতে সুবিধা বোধ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা রূপ-বতী ও বুদ্ধিমতী। ইহাদের বর্ণ রক্তোজ্জ্বল শ্বেত। অধিক

বলেন, ইহারা অতিরিক্ত মন্যপান করে বলিয়া ইহাদের রক্তবর্ণ হইয়াছে। ইহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি কিরূপ পানাহার ভালবাস, তাহারা অমনি উত্তর দেয় “প্রতিদিন এক মসক মদ চাই”—এক মসকে প্রায় পনের সের মদ ধরে।

ম'নেসারের বিবরণ পাঠ করিয়া জানা যায় যে, কাফির-স্থানের লোকেরা সুপুরুষ, সাহসী ও কৃষিজীবী। ইহাদের জীলোকেরা বাগানের কাজ করে। ইহারা নৃত্যগীতে বড় অজ্ঞরত। প্রায় প্রতিপক্ষা নৃত্যগীতাদিতে বাগন করে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে আত্মকলহ বা যুদ্ধবিগ্রহজনিত রক্তপাত হয় না। মুসলমানের সহিত ইহাদের সর্ব-মুকুল সম্বন্ধ দেখা হইলেই যুদ্ধ বাধিয়া যায়, আর জাতিগত বিবাদ ত আছেই। ইংরাজরাজের সহিত ইহাদের কোন বিবাদ নাই। ইহাদের মধ্যে দাশপ্ৰথা ও দাশব্যবসার আছে; কিন্তু শ্রীভই রহিত হইবে বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রায় নাই। জীব্য ব্যক্তিরা দোষে শারীরিক দণ্ড সামান্য হয়; কিন্তু পুরুষকে কতকগুলি গোমেবাদি জরিমানা দিতে হয়। ইহারা শব সিজুকে বদ্ধ করিয়া রাখে। একমাত্র অধিতার দেবতা “ইধু”কে (ইজুকে?) পূজা করে। ইধুর মন্দির আছে, সেই মন্দিরে পরিজ্ঞ প্রস্তরমুষ্টি স্থাপিত, পুরোহিত আসিয়া পূজা করেন। ইহারা তীরথস্থধারী। গোমেবাদি ইহাদের মূল্যবান বস্তু, ইহাই যাহার অধিক থাকে, সেই ধনী। ইহাদের মধ্যে ১৮ জন সর্দার আছে।

এই জাতি পরস্পর লগ্ন করিয়া বহুতাস্থজে বদ্ধ হয়। কোনস্থজে কাহারও সহিত সন্ধিতদের পূর্বে তাহার নিকট একটি তীর বা একছড়া ছুরার মাশা পাঠাইয়া দেয়। ইহারা বড় অতিথি-ভক্ত। যদি কোন অতিথি ইহাদের বাড়ী আসে, তাহা হইলে অন্ন গৃহকর্ত্তা তাহার পরিচর্যা করে এবং যদি অপর কেহ কোন অতিথিকে ভূলাইয়া নিজ বাটীতে লইয়া যায়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বিষম বিবাদ বাধে, এমন কি রক্তারক্তি ঘটয়া থাকে। জীলোকের যথোচ্ছ্রমণে বাধা নাই, অবগুষ্ঠন নাই; কিন্তু পুরুষের সহিত একত্র পান-ভোজন করিতে পার না। প্রতিগ্রামে জীলোকদিগের প্রসবের জন্ত বতঙ্গ বাটী থাকে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া পরে মিটিবার কালে বিবাদীদের মধ্যে একজন অপরের অন্তচূষন করে এবং সেই ব্যক্তি অন্তচূষনকারীর মন্তক চূষন করে। এই-রূপে বিবাদ মিটিয়া যায়। কাফিরেরা নিজ লতান বিক্রয় করে না, কিন্তু কঠে লড়িলে প্রতিবাসীর লতান চুরী করিয়া

বিক্রয় করে। কেহ কেহ বলেন, এই ব্যাপারটা ব্যবসার মধ্যে গণ্য এবং এইজন্য চিজলের সর্দার বিক্রয়ার্থ বালকবালিকার উপর কব আদায় করেন। কোন মুসলমানজাতির বিদ্রোহে ইহারা যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তখন বতদিন পর্য্যন্ত আরোজন ও উপারাদি নির্দ্ধারিত না হয়, ততদিন কোন পুরুষ নিজ বাটীতে আসিতে পার না; দিবারাত্র মন্ত্রণাগৃহে থাকে ও সেইখানেই পানভোজন-শরনাদি করে। যে স্থান আক্রমণ করিতে হইবে, দিনের বেলায় সকলে সেই স্থলে উপনীত হইয়া, দুই তিনজন করিয়া ঝোপেঝোপে লুকাইয়া থাকে ও যেমন নিকট দিয়া মুসলমানেরা যাতায়াত করে, অমনি আক্রমণ করিয়া বিনাশ করে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে একত্র হইয়া স্ব স্ব কার্যবিবরণ প্রকাশ করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে। মুসলমানেরাও ইক্রপে কাফিরস্থানে প্রবেশ করিয়া বালক-বালিকা চুরী করার আনে।

ইহারা জাতীয় ভাঙ্গিয়া গম, যব প্রভৃতির ময়লা করিয়া তাহাতে কটী প্রস্তুত করে। কটী গোহকটাহে সৈকিয়া খায়। ইহারা গৃহ-পালিত পশুমাংসও খাইয়া থাকে। ইহারা এক কোপে গলা কাটিয়া পশুহত্যা করে; যদি দুইকোপ দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহারা সে মাংস অপবিজ্ঞ বোধে পরিভাগ করে এবং বারিজাতির মধ্যে পারিয়া শ্রেণীকে ডাকিয়া দান করে।

ইহারা আত্মর হইতে মদ্য প্রস্তুত করে। আত্মরের বর্ণ-ডেদে মদ্যের দুইপ্রকার বর্ণ হয়। বালকেরা বৎসরের সকল সময় মদ্য খাইতে পার না। মোগলসম্রাট বাবর লিখিয়াছেন যে, কাফিরেরা গলায় মদ্যপূর্ণ “কিং” নামক চামড়ার বোতল লুলাইয়া রাখে। তিনি আরও বলেন যে, ইহারা জলের পরিবর্তে মদ্য পান করে।

কাফির-দিগের সাচায়া না পাইলে ইহাদের দেশে প্রবেশ করিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাফিরস্থান দেখিতে অতি সুন্দরদেশ; নিবিড় বৃক্ষ-মালায় প্রকৃতির রম্য উপবন বলিয়া বোধ হয়; প্রান্তভাগে মহাবন। কাফিরস্থান প্রধানত: তিনটী উপত্যকায় বিভক্ত। এই তিনটী উপত্যকা হইতে এখানকার তিনটি প্রধান জাতির নামকরণ হইয়াছে;—রামগল, বৈগল ও বাসগল। ইহাদের মধ্যে বৈগল-জাতির সর্দাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও ইহাদের উপত্যকাই সর্দাপেক্ষা বৃহৎ। কাফির বা সিয়াপোব ইহাদের জাতীয় নাম মছে, পার্শ্ববর্তী মুসলমানেরা ইহাদিগকে ঐ নামে অভিহিত করে। মুসলমানেরা ইহাদিগকে (মুসলমান ধর্মে অবিবাসী বলিয়া “কাফের”)

কাফির বলে এবং ইহাদের মধ্যে বৈগলেরা কৃষ্ণবর্ণ ছাগ-চর্মের জামা গারে দেয় বলিয়া ও বৈগলের সংখ্যাই অধিক বলিয়া সমুদায় জাতিকে “সিরাপোপ” বা “টর” (কৃষ্ণবর্ণ-পোষাক) বলে। রামগল বা বাসগলেরা ওরূপ চর্মের জামা পরে না, তৎপরিবর্তে স্ততার কাপড়ের জামা পরে। পূর্বোক্ত তিন জাতির ভাষা স্বতন্ত্র।

ইহারা ভূতপ্রভেদাদিতে বিশ্বাস করে এবং ইহজীবনে বাহ্যি কিছু হুং-কঠ পায়, তাহা এই সকল ভূতপ্রভেদাদি হইতেই ঘটে বলিয়া মনে করে। ইহারা যে মদ্য পান করে, তাহা মদ্যপ্রস্তুত-প্রণালীর নিয়মানুসারে পচান বা চৌরান নহে। তাহা বিত্তক টাটকা জ্বাকারস।

ইহাদের মধ্যে পরম্পর যুদ্ধবিগ্রহাদির পর পরাজিত জাতিরজ্রীলোকেরা বন্ধিনী হইলে, আপনাদিগের মধ্যে দাসী-রূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। জ্রীলোকের মধ্যে লজ্জাশীলতা বা ধর্মভাব একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ইহাদের সমাজে তাহা বিশেষ দোষ বলিয়াও গণ্য নহে; কারণ, এক্রূপ দোষে উভয়পক্ষে যেরূপ সামান্য শাস্তি পায়, তাহা পূর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহারা কি ইংরাজ, কি আফগান, কি তুর্ক, কাহারও অধীন নহে, সম্পূর্ণ স্বাধীন। সিদ্ধ ও অক্ষস্নদীর মধ্যে সমস্ত গিরিবন্ধে ইহাদের অক্ষুর প্রতাপ। হিমালয়-পর্বতের শেষ প্রান্ত হইতে অক্ষস্নদীর তীরবর্তী বদকশানের পার্শ্বত্যা-প্রদেশ পর্যন্ত এবং হিন্দুকুশ পর্বতমালায় ইহাদের অধিকার। কাবুল নদীর উৎপত্তিস্থলে যে সকল গিরিবন্ধ আছে, তাহাও ইহাদের অধীনে।

ইহারা দেখিতে সুপুরুষ হইলেও দীর্ঘজন্ম নহে।

ইহাদের মধ্যে অস্বাভাবিক সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি আছে, তন্মধ্যে দারাদুরি নামক জাতি আপনাদিগকে তাজক-মতাবলম্বী এবং অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। লম্পাক (লম্বান্) নামক স্থানের ভাষার সহিত ইহাদের ভাষার ও আফগানদিগের আকারের সহিত ইহাদের আকারের সৌসাদৃশ্য আছে।

সেওয়া (শিব) নামক স্থানের অপরপার্শ্বে চুণ্ডনি নামক একজাতি আছে, ইহারা অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় অধিক। বিত্তক কাফিরেরা ইহাদিগকে “নিবা” অর্থাৎ বর্ণশঙ্কর বলিয়া থাকে; কারণ, ইহারা কাফির ও আফগান উভয় জাতীর কভারই পাণিগ্রহণ করে এবং কাফিরস্থানে নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পার। ইহারা প্রধানতঃ পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া থাকে। কুম্পপর্বতেই ইহাদের অধিক বাস। ইহারা

আফগান অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় ও ইহাদের আকৃতি অপেক্ষাকৃত কোমলতাপূর্ণ। ইহারা মুসলমানধর্মাবলম্বী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে জ্রীলোকের অবরোধপ্রথা নাই।

এই প্রদেশের অরত উপত্যকা ৭০০০ ফুট দীর্ঘ। উচ্চলিক ইমালিক নামক গিরিপথের দৃষ্ট পরমরমণীয়। কুম্প পর্বতের শিখরে একটি ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। কথিত আছে, এই হ্রদের তীরে নোয়ার নৌকার ভগ্নাবশেষ প্রস্তরীভূত হইয়া আছে এবং উহারই নিম্ন-উপত্যকায় লাগেজের (নোয়ার পিঠার) সমাধিস্তম্ভ আছে। [নৌবন্ধন দেখ।]

কাফি—(দেশজ) আফ্রিকার দক্ষিণস্থ ক্যাপ্রিভিয়া নামক স্থানের অধিবাসী; কিন্তু সাধারণতঃ সুদনের দক্ষিণদিগবর্তী সমুদয় আফ্রিকাবাসীই এই নামে পরিচিত। এক্ষণে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষেও কাফি আছে, ইহারা সাধারণতঃ হাবসী নামে পরিচিত। কবে কোন সময়ে, কিরূপে ইহারা এদেশে প্রথম আসে, তাহা স্থির করা যায় না, তবে ইহা অস্বীকৃত হয় যে, যে সময়ে আরবের সহিত ভারতের বহিঃ-কর্ণাটিকা ছিল, সেই সময়েই আরবদিগের মিশ্রণে ইহারা আসিয়া থাকিবে, তৎপরে আফগান, মোগল, তুর্ক প্রভৃতি জাতীয়গণের সঙ্গে অনেকে আসিয়াছে। ইহারা আসিয়া ক্রমশঃ বিশেষ প্রশ্রয় পাইয়া শেষে স্থানবিশেষে রাজ্য পর্য্যন্ত হইয়াছে।

এক্ষণে উত্তরকানাড়ায় দাণ্ডিলিজেলার পার্শ্বত্যা-প্রদেশে কাফির বাসই অধিক। বোম্বাই উপকূলে জাজিরা নামক স্থানে “হাবসী” বা “সিদি” জাতীয় রাজ্য আছে, এই রাজ-বংশ আবিসিনিয় কাফি হইতে উৎপন্ন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই আবিসিনিয় কাফিরা ভারত-উপকূলে জলদস্যুর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নিকটবর্তী সাগরে ঘুরিয়া বেড়াইত। খৃষ্টীয় ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে বিজয়পুরে যে আদিলশাহী বংশ ও নিজামশাহীবংশ রাজত্ব করিতেন, তাহাদের অধীনে কাফিরা পুররক্ষী সৈন্তশ্রেণীতে অনেক নিযুক্ত হইত। সিদ্ধ-প্রদেশে তালপুরের আমীরেরা একদল কাফিসৈন্ত রাখেন। কর্ণাটের নবাবেরাও কাফিরদাস রাখিতেন। কর্ণাটের লাস ও মেক্রান নামক স্থানে কাফির সংখ্যা অনেক এবং আজও নিজামরাজ্যে নিজামের নিয়মিত সৈন্তের মধ্যে কাফি আছে এবং অনিয়মিত সৈন্তের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই কিছু বেশী। বাঙ্গালা দেশেও মুসলমানগণের সঙ্গে কাফিজাতি বিদ্যুত হইয়া পড়ে। সেকালে মুসলমান নবাবগণের অধীনে ইহারা পুররক্ষী সৈন্তরূপে নিযুক্ত থাকিত, লগরামিতে

শান্তিরক্ষক নিযুক্ত হইত। কাকিরা বাঙ্গালারও হাবসী নামে পরিচিত ও এই জাতীয় শান্তিরক্ষকেরা "হাবসী কোতোয়াল" নামে খ্যাত ছিল, হাবসীরমণীরাও নবাব-অন্তঃপুরে দাসী থাকিত। নবাবগণের অহুকরণে তিনু জমীদার ও রাজারাও পুরস্কার কাকি নিযুক্ত করিতেন। ইহারা বড় বিখ্যাসী প্রভুত্ব ও বলিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়, ইহাদের হাতে এই কার্যের ভার দেওয়া চলেত। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র খাঁর কাব্যে বর্ধমানের বর্ণনায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"নদী জিনি গড়খানা, ঘারে হাবসীর থানা

দেখিরা বিকট লাগে শঙ্কা।"*

পূর্বভারতীয় দীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত স্থলেও কাকিজাতির বাস আছে। তাহার উপনিবেশী নহে, সেই সকল স্থানেই তাহাদের আদিম বাসভূমি। আফ্রিকার কাকিজাতির বাসভূমির সহিত সমন্বয়পাতে অবস্থান করে বলিয়া ইহাদের উভয়ের মধ্যে দেশগত পার্থক্য বাতীত, অল্প কোন বিভিন্নতা দেখা যায় না, এইজন্য এই সমস্ত জাতিকেও সাধারণতঃ কাকিজাতির অন্তর্গত করা হয়। টলেমী ইহাদের বিবরণ জানিতেন, তাহা তাঁহার পুস্তক পাঠে জানা যায়। তাঁহার পুস্তকে "অরির খেরসেনেসাস," 'বাবা-ডু ইজিউলি' ও "ইথিওপিস ইথিওপেজি"র বৃত্তান্ত পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহা হুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং নবগিনির পাপুয়াজাতির বিবরণ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ইহারা ই রামায়ণোক্ত রাক্ষসজাতি বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রাচীনকালে যখন ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে মিসরীয় বণিকেরা বাণিজ্য করিতে আসিত, সেই সময়ে আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলের লোকেরা আরব ও আফ্রিকা উভয়স্থান হইতেই এদেশে আসিত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে এইরূপ বাবলা-বাণিজ্য প্রায় তিন হাজার বৎসর চলিয়াছিল। এসময়ে যে, ঐ সকল দেশের লোকেরা কেবল পণ্য লইয়া পোতা-রোহণে এদেশে আসিত আর ক্রয় বিক্রয় করিয়া বন্দর হইতেই চলিয়া বাইত, তাহা নহে; অনেকে বণিকরূপে এদেশে বাস করিয়াছিল। এই সকল স্থায়ী বণিকেরাই সিংহলে "মুরজাতি" ও দাক্ষিণাত্যে "মপ্লা" বা "লববাই"

নামে খ্যাত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যে আর্বাগণের অধিকার বিস্তৃত হইবার পূর্বেই এখানে কাকির বাস হইয়াছে। উক্তমত সমর্থনের জন্য তাঁহার বলেন, দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিবৃন্দের সহিত আর্বা জাতির যতটা পার্থক্য আজও দেখা যায়, ততটা ভারতের আর কোথাও নাই এবং দাক্ষিণাত্যের সকল ভাবাই সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ প্রভেদ। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিগণের মধ্যে কতকাংশের আকৃতিগত সৌন্দর্য্য অধিকাংশ ইরানীয়ের জাত, কতকাংশের সমিতীয়-ইরানীয়ের জাত, কতকাংশের অষ্ট্রেলীয়ের জাত ও কতকগুলি মলয় পাপুয়াজাতির জাত এবং একান্ত নিম্নশ্রেণীর লোকগণের মধ্যে অধিকাংশের আকৃতি আফ্রিকাবাসীর আকারের মত। ইহাদের মতাদৃশ্যে বিজ্ঞা এবং বাটপর্কতের পূর্ব প্রান্তবর্তী অসভ্য-জাতির আকৃতি অনেকটা উত্তর ভারতীয় আর্বা জাতির আকৃতির জাত, কিন্তু বাটপর্কতের পশ্চিমাঞ্চলবাসীর মলয়-উপদ্বীপের জাকুন জাতির জাত। এই জাকুন জাতীয়ের সহিত আফ্রিকাবাসীর অধিক সাদৃশ্য আছে।

পূর্ব-ভারতীয় দীপাবলীতে প্রধানতঃ চারি জাতির বাস। (১) বিত্তম মলয়জাতি, (২) মলয় উপদ্বীপবাসী খর্কাকার কাকি বা সেমাংজাতি, (৩) ফিলিপাইনদ্বীপের কুজাকার কাকি বা এইটা জাতি ও (৪) নবগিনির বৃহৎ-কায় কাকি বা পাপুয়াজাতি; এতদ্বির নবগিনি ও মলয় উপদ্বীপের মধ্যবর্তী কতকগুলিদ্বীপে ইহাদেরই মধ্যবর্তী একজাতীয় লোক দেখা যায়, তাহাদের মলয়-কাকিজাতি বলা যায়। সিলিসিস ও লব্বদ্বীপের পূর্বে যে সকল দ্বীপ আছে, তাহার অধিবাসিবৃন্দ সাধারণতঃ অষ্ট্রেলিয়ারবাসীর জাত। এই পার্থক্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, এশিয়ার দক্ষিণাংশের সহিত পূর্বভারতীয় দীপপুঞ্জের পশ্চিমভাগস্থ দ্বীপগুলি অতি প্রাচীনকালে একত্র সংলগ্ন ছিল এবং কাল-ক্রমে প্রাকৃতিক পরিবর্তনে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।*

আফ্রিকায় যে সকল কাকি বাস করে, অনুমানে তাহা-

* এ অনুমান শুদ্ধ লোকের আকৃতিগত সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করে না। হুমাত্রা, বোর্নিও, যব, বালি প্রভৃতিদ্বীপের পরস্পরের মধ্যবর্তী প্রণালীগুলি ও এশিয়ার প্রধান ভূ-খণ্ডের মধ্যবর্তী প্রণালী কোথাও ১৫০০০ হাতের অধিক গভীর নহে, কিন্তু সিলিসিস দ্বীপের পূর্বাংশের প্রণালী ও সমুদ্রাংশ অনেকস্থলে ৪০০ হাতের অগেণ্ডা গভীর। এতদ্বির এশিয়ার দক্ষিণাংশের উৎপন্ন হইয়া মূল ব্রহ্মাবি, আরণ্য জন্ত ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষাবির সহিত এই সকল দ্বীপের ঐ সমস্ত বিবরের সম্পূর্ণ একা দেখা যায়।

* ভারতচন্দ্র বর্ষিত বিবাহস্থলের ঘটনা অনেক কালনিক, প্রত্যয় বর্ধমান বর্ণনার ভারত নিজের সমকালের বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, নতুবা হুমাত্র বর্ধমানের ভিতর ইংরাজ, ওলন্দাজ, দীনেমার, হাবসী, বোলস পাঠান সৈন্য দেখিতে পাইতেন না।

দের সংখ্যা ২ কোটীর অধিক নহে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে কাক্সেরিয়াবাগী কাক্সি ও হটেটদিগকেও বরা হইয়াছে।

লোহিতসাগরের পূর্বকূলে, নারভোপসাগরের তীরে এবং মলয় উপদ্বীপে কাক্সিজাতীয়ের সংখ্যা মোটের উপর ৫০ লক্ষের অধিক হইবে না; কিন্তু বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপ হইতে পূর্বদিকের দ্বীপাবলীতে যে সকল জাতীয় লোককে সাধারণতঃ কাক্সি বলিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে নুনকল্পে ১২টী আকৃতিগত শ্রেণী-বিভাগ আছে। এই ১২টী শ্রেণীগত পার্থক্য দেখিয়া বোধ হয়;—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ৩০ হাত বা চারি হাত পর্য্যন্ত হয় এবং কতকগুলি সাড়ে চারি হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত শ্রেণীর কথা বলা যাইতেছে।

আন্দামান দ্বীপের মীনকণী কাক্সি—মহুয়া শ্রেণীতে বোধ হয় ইহাদের অপেক্ষা অসভ্য জাতি আর নাই। ইহাদের বাসস্থানের স্থিরতা নাই, পরিধেয় বস্ত্রাদি নাই এবং জীবিকার জন্য যে কোনপ্রকার কার্য্য করিতে হয়, তাহাও ইহারা জানে না। ইহারা লোকের সহিত মিশিতে চাহে, অথচ অনিষ্টপ্রিয়। ইহারা নরমাংস-ভুজ্জ্ব নহে বটে, কিন্তু শূকরমাংস, মৎস্য, শস্ত, ফল ও মূল খাইয়া থাকে। ইহারা অঙ্গলের ফল, মূল, বিল ও পুকুরিণী হইতে মৎস্যাদি ধরিয়া খায়। ইহারা ভীরুত্ব লইয়া বনে বনে পুকুরিণীতে-পুকুরিণীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাঁশের চেয়োড়িতে মাছধরা আকুঁণী প্রস্তুত করে। ইহাদের কাপড় নাই এবং একেবারে উলঙ্গ থাকিতে কিছুমাত্র দ্বিগা ভাবে না। ইহারা ক্ষুদ্রকায়, পনের পোয়ায় অধিক উচ্চ হয় না। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র ও তালু চাপা। ইহারা আপনাদের সর্কাল কাচখণ্ড দ্বারা আঁচড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া শরীরের শোভা সম্পাদন করে। বাহুমূল ও কর্ণমূল হইতে মণিবন্ধ ও কটিদেশ পর্য্যন্ত অঙ্গের চতুর্দিকে গোলাকার আঁচড়ের মাগে ইহাদিগকে অতি বিস্ত্রী ও ভয়ানক দেখায়, কিন্তু তাহাই ইহাদের প্রধান শোভা। ইহারা যখন কোন বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে, তখন ইহারা দক্ষিণ হস্তের তালুব নিরুভাগে ধীরে ধীরে দস্তাঘাত করিয়া বামহস্তে একটি ফুলা চাপড় মারে। সহিসেরা ঘোড়ার গা মলিয়া দিবার সময় যেরূপ ভাবে চুমুজুড়ি দেয়, ইহারা সেইরূপ শব্দ করিয়া চুখন করে। যখন ইহারা পরস্পর কথোপকথন করিতে থাকে, তখন ইহারা একরূপ জড়াইয়া উচ্চারণ করে যে, অপরের বোধ হয় যেন তাহারা কেবল কচ্ছিম্ করিয়াই বৃষ্টি মসোভাব প্রকাশ করিতেছে,

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; উড়িয়াদের মত ইহাদের উচ্চারণ-প্রণালী অতি ক্রত ও অস্পষ্ট। ইহারা নাতিতে ভালভাবে এবং নাচিবার সময় হাত ছুঁই মাথার দিকে তুলিয়া সঙ্গীতের তালে তালে লাকাইয়া লাকাইয়া নাতিতে থাকে এবং নাচিবার সময় কখন মাথা ঘুরায়, কখন সমস্ত শরীর সমুখের দিকে ফুঁকাইয়া দেয়। এইরূপে সঙ্গীত ও নৃত্যের তালে তালে নানারূপ অভিব্যক্তি করিতে থাকে।

সেমাং, বিলা—আন্দামান দ্বীপের পূর্বে মলয় উপদ্বীপের অন্তর্গত কেদা, পেরাক, পাহাঙ্গ ও ত্রিলাহুপ্রদেশে এক জাতীয় কাক্সি বাস করে, তাহাদিগকে মলয়জাতিরা “সেমাং” ও “বিলা” বলে। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ, বেশ পশমের ছায়, গঠনাদি আফ্রিকাবাসীর ছায় খর্ব্বাকার। পূর্ববঙ্গ প্রকৃষের উচ্চতা তিন হাতের অধিক হয় না। ইহাদেরও নিক্টি বাসস্থান বা চাষবাস নাই। ইহাদের অধিকাংশই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বনের উৎপাদ্যাদি সংগ্রহ করে এবং তাহাই মলয়-জাতীয় নিকট ব্যবহার্য্য জব্যাদির সহিত বিনিময় করিয়া থাকে। ইহারা শীকার করে ও শীকারলব্ধ পশুপক্ষী বা তাহাদের চর্ম্ম-পালকাদিও বিনিময় করিয়া খাদ্যাদি সংগ্রহ করে।

ক্রিগান নদীর উপনদী ইজানের তীরবর্তী স্থানে “সেমাং বুকিং” নামক এক শ্রেণী কাক্সির বাস। ইহারা পূর্ববঙ্গের ৩০ হাত হয়। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র, মস্তকের সমুখভাগ কতকটা কোণাকার উচ্চ, পশ্চাভাগ বর্তুলাকার ও মধ্যাংশের অপেক্ষা অগ্রশত। মলয়জাতিদের অপেক্ষা ইহাদের মুখমণ্ডল সাধারণতঃ অগ্রশত, জ্রদেশ উচ্চ, নয়নকোটর অতি গভীর, নাসিকামূল অল্প ও নাসিকা ক্ষুদ্র; নাসিকার অগ্রভাগ হৃদয় ও উন্টান। চক্ষুর পর্দা হরিদ্রাবর্ণ, পদ্ম ঘন, দীর্ঘ ও কোঁকড়া, হৃদদেশ প্রশস্ত, মুখবিবর প্রশস্ত, ঠোঁট মোটা বা ছোট। জ্র, নাসিকার অগ্রভাগ ও খুঁতির উচ্চতা এক-সমান। ইহাদের উদর বৃহৎ কিন্তু শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ইহারা বানরের ছায় উদর কমাতে ও ফুলাইতে পারে। গাত্রচর্ম্ম সাধারণতঃ কোমল ও চিক্ণ।

ত্রিলাহুর সেমাং নামক শ্রেণী কেদাদিগের ছায় জীবৎ তরলবর্ণ; সেমাং-বুকিংদিগের মত মস্তক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নহে। ইহাদের চুল পশমের ছায় নহে, কোঁকড়া কোঁকড়া এবং ঘটোৎকচের ছায় উচ্চ হইয়া থাকে, মাড়োয়ারীদিগের মত খুব ঘন মোটা গোঁপ হয়। মস্তকের গঠন মলয় বা কাক্সি-দিগের মত নহে, অনেকটা পাণ্ডুরদের মত। ইহাদের আর পরিকার, কোমল, কিন্তু অহুমানিক, ইহারা কপালে ও

গালে উড়ি পরে। দক্ষিণ কর্ণ বিধাইয়া বড় ছেঁদা রাখিয়া দেয় এবং সমুখভাগে এক কোণা গোঁগাকার চুল রাখিয়া সমস্ত মস্তক মুগুন করে। পেরাকের নদীকূণবর্তী এই শ্রেণী "সেমাতিংপার" বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা সমুদ্রতীর হইতে পূর্বতের উপর পর্য্যন্ত সকল স্থানেই বাস করে, কিন্তু বুকিতেরা বন ও পার্শ্বস্থ স্থান ভিন্ন জলের উপকূণভাগে বা নদীকূলে বাস না। আর "সকি" শ্রেণীর লোকেরা পার্শ্বভাগে প্রদেশ হইতে নামে না। কেদা ও পেরাকের সেমাংগণের ভাষার দুইটি শব্দের যোগজ শব্দ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বড় কথা বা সমাসবাক্য নাই। যে সকল স্থানে এই সেমাং জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে মলয়জাতির লোক নাই।

পাপুয়া শ্রেণীর কাঞ্চিরা—ফ্লোরিস, গুজব বা হন্দনা, অন্দেনারা, লগয়, লখটা, কুতাব, ওয়ে, ওয়েটার, রড্ডি, সর্কতি, ববর, ভিমর, ভিমরলাউং, লারাট, নব ক্যালিডোনিয়া, নব অয়র্লণ্ড, ওটায়াটা, পলিনেসিয়া, ফিজি, মালকুস, নব-গিনি, পোপো, বাসন্দা, কি দ্বীপ, অঘরনা, সাগবতি প্রভৃতি পূর্বাংশের দ্বীপবলীতে বাস করে। যে সকল দ্বীপে এই জাতীয় কাঞ্চির বাস, মলয়জাতিরা সেই সকল স্থানকে "তানা-পাপুয়া" (পাপুয়া জাতির বাসস্থান) বলে। ইহাদের চুল খুব কৌকড়া বলিয়া ইহাদের নামই "পাপুয়া" হইয়াছে। কারণ মলয়-ভাষায় কৌকড়া চুলকে "পুয়া-পুয়া" বলে; এই পুয়া-পুয়া শব্দ হইতে পাপুয়া শব্দের উৎপত্তি। ইহাদের আকৃতি একবারে অবিকল কাঞ্চির মত; প্রশস্ত নাসিকা, মোটা বড় বড় ঠোঁট, কপাল ও খুঁটি টোপা, রং মেটে-মেটে, অক্ষিগোলকের চতুর্দর্শ শাদা। ইহারা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অজ্ঞাত কাঞ্চিজাতি অপেক্ষা পূর্ণগঠিত ও বলিষ্ঠ; ইহারা উৎসাহী, অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী। এই সকল গুণের জন্ত সেকালে ইহাদিগকে সভ্য দেশে দাসরূপে বেশী বিক্রয় করিত ও লোকে ও আগ্রহসহকারে ক্রয় করিত। ইহাদের মানসিক বৃত্তি মলয়জাতি অপেক্ষা হীন না হইলেও বড় চঞ্চল বলিয়া ইহারা স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে না। মলয়জাতির সহিত বিবাদে এইজন্তই ইহারা পরাজিত হয়।

ইহারা নবগিনি ও তাহার নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতে সমুদ্রোপকূলে বাস করে ও অন্যান্যস্থলে পার্শ্বভাগে অবস্থান করে। অনেকগুলি দ্বীপে ইহাদের সংখ্যা একবারেই হ্রাস হইয়া গিয়াছে। "সিরাম ও গিলোলোদীপে ইহাদিগকে কতিং কখন দেখা যায় মাত্র। অনেকে অনুমান করেন যে, কালে এই শ্রেণী পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে;

কারণ, নীকারপ্রিয় অপেক্ষাকৃত তাত্রবর্ণ জাতীয় লোকেরাই ইহাদিগকেই অধিক বিনাশ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা ভ্রম, কারণ যেখানে যেখানে আজকাল যুরোপীয় সভ্যতা প্রচলিত হইতেছে, সেখানে সেখানে ইহারা পরস্পর দিন দিন মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে শিখিতেছে। সিরাম ও গিলোলোদীপে তাহার আছে, তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অতিশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা কোন সভ্য জাতির সহিত মোটেই মিশে না। অপরিচিত বা ভিন্ন জাতীয় লোক দেখিলে বন-জঙ্গলে পলাইয়া লুকাইয়া থাকে। মাইসলনামক বৃহৎদ্বীপে এই জাতীয় লোক ভিন্ন অন্য কোন জাতির বাস নাই, কেবল উপকূণভাগে এক-প্রকার মিশ্রজাতি বা শঙ্করজাতি আছে, তাহাদেরও আকৃতি-প্রকৃতি অনেকটা ইহাদের মত। পূর্কোল শঙ্করজাতি নাবিকতার বিশেষ পারদর্শী ও যুরোপীয়গণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। মাগেলানদ্বীপে এই জাতীয় লোক দেখা যায়, কিন্তু নিকটবর্তী জেবুদীপে এই জাতীয় একটি লোকও নাই বা কোনকালে ছিল বলিয়াও শুনা যায় না। নবগিনি, কি, অরু, মাইসল, সাগবতি প্রভৃতি দ্বীপে এই জাতীয় লোক বাস করে এবং এই শ্রেণীই ফিজিদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের চুল কড়া ও খুব কৌকড়া। পূর্ববঙ্গগণের মাথায় এইরূপ চুল খুব বড় হইয়া টুপির মত হয়। ইহারা এইরূপ চুলই ভালপাসে। ইহাদের ঐরূপ কৌকড়া দাড়ী আছে, সমস্ত বাহ্যে, পায়ে ও বক্ষেও ঐরূপ লোম অল্প হয়। উচ্চতায় ইহারা মলয়জাতি অপেক্ষা দীর্ঘ, প্রায় যুরোপীয়গণের জায়; পদব্রম দীর্ঘ, কিন্তু ক্ষীণ; বাহ মলয়জাতীয়ের অপেক্ষা দীর্ঘ; মুখমণ্ডল দীর্ঘাকার, কপাল চেষ্টে, জ্র বড়, নাসিকা উচ্চ ও শুকচকুর জায় বক্র; নাসামূল মোটা, নাসাহিড় প্রশস্ত, মুখবিবর বড় ও ঠোঁট মোটা ও বড়। ইহারা কালে কথায় বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চিংকার করিয়া ও উচ্চ হাত করিয়া লাফাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে। ইহারা আপনাদের ঘর, বাড়ী, নৌকা ও চৈলসাদি খুদিয়া চিত্রিত করে। স্ব স্ব শিশু-সন্তানের উপর ইহারা বড় জুঁজ। এই শ্রেণী কখন সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাস করিতে পারিবে না। বোধ হয় যে, কালে যুরোপীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইলে এই বৃদ্ধপ্রিয় জাতি লোপ পাইবে। ইহারা বড় বিশ্বাসী।

বৃহৎকার পাপুয়ারা আকৃতিগত শ্রেষ্ঠ ও বলাদির জন্ত বিখ্যাত। ইহাদের বিস্তৃত-কৃক ও গভীর বক্ষঃস্থল দেখিতে খ্রীতিকর বটে, কাঞ্চিজাতির সাধারণ দোষ পদব্রমের ক্ষীণতা

এ অপূর্ণতা, পাপুয়ামিগের তাহার অভাব নাই। স্বাধীন পাপুয়া-জাতি বড়ই প্রতিহিংসাপরায়ণ ও উদ্ধতস্বভাব। নবগিনির উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ইহাদের বাস আছে, তাহারা স্বদেশে অল্প কোন জাতিকে নিরাপদে বাস করিতে দেয় না এবং একান্ত উতাক্ত করিয়াও তাড়াইতে না পারিলে নিজের স্থান ত্যাগ করিয়া অভ্যন্তর ভাগে পার্শ্বপ্রদেশে চলিয়া যায়। ইহারা উকি পরে না, কিন্তু উরুতে, বকে ও পাহার উপর একপ্রকার প্রলেপ দিয়া চামড়া কুঁচকাইয়া শক্ত শক্ত আব প্রস্তুত করিতে ভালবাসে, সময়ে সময়ে যত্ন করিয়া ইহা এক আঙ্গুল পর্যন্ত উচ্চ করে।

ফোরিস ও নবগিনি দ্বীপ প্রভৃতিতে এই কাক্রিজাতিই সেই সেই দ্বীপের অধিবাসী। নবগিনিতে পাপুয়ারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে পরস্পর যুদ্ধে সর্বদাই লিপ্ত থাকে। এই সকল যুদ্ধে বিপক্ষ পক্ষের মাথা কাটিতে না পারিলে কোন পক্ষই নিরস্ত হয় না। নবগিনির কাফিরা একটা কাঠময়ী প্রতিমার উপাসনা করে। এই দেবতাকে তাহারা “কারবর” বলে। এই প্রতিমা ১৮ ইঞ্চি উচ্চ। প্রত্যেক ঘটনার ইহারা এই দেবতার নিকট জানাইয়া থাকে। ইহাদের বিধবারা স্বামীগৃহে বাস করে। অভ্যন্তর স্থানের কাফি অপেক্ষা নবগিনির পাপুয়ারা অনেকাংশে সভ্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ অতি সামান্য পরিক্রান্তে বাস করে এবং শিকার বা স্বভাবজাত ফলমূলে জীবিকানির্ভর করে। উপকূলভাগের পাপুয়ারা অপেক্ষাকৃত সভ্য; তাহারা উচ্চ খোঁটার উপর গোলার মত বড় বড় কদাকার ঘর বাঁধিয়া বাস করে।

ডোরি দ্বীপে পাপুয়ারা ‘মাইকোর’ নামে খ্যাত। ইহারা দীর্ঘে ৩৯ হাত। জাতিগুণে কৌকড়া চুলগুলিকে জীলোকের জায় বড় করিয়া রাখে। এই চুলের অল্প ইহাদিগকে আরও ভয়ানক দেখায়। ইহাদের পুরুষেরা মাথায় একখানি চিরুণি ঝুলিয়া রাখে, জীলোকেরা রাখে না। ইহাদের দাড়ীর লোম কৌকড়া, কপাল উচ্চ ও অপ্রশস্ত চক্ষুর বড়, বর্ষ কটা বা কালো, নাক খ্যাবড়া ও খাঁধা, ঠোঁট মোটা কিন্তু দাঁতগুলি ঠিক সুন্দর মত। পুরুষেরা বহির্বাসের জায় একপ্রকার ছোট কাপড় পরে, এই কাপড় ‘মার’ নামক গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। ইহাদের জীলোকেরা নীলরঙের সূত্রের বস্ত্র পরিধান করে, তাহা হাঁটুর নীচে নামে না। ইহারা উল্লুস্বাদিতে উকি পরে, এই উকি বেশীদিন থাকে না। উকি পরিহার সময় মাছের কাটা দিয়া, বেখানে উকি পরিতে ইচ্ছা করে, সেইখানে রক্ত বাহির করিয়া ভুবা

মাখাইয়া দেয়। ইহারা সমুদ্রগমনে অতিশয় পারদর্শী, নৌকাচালনে, সমুদ্রগে ও সমুদ্রে ডুব দিয়া সমুদ্রগর্ভে কণাদি করিতে ইহাদের তুল্য নিপুণ লোক নাই বলিলেই চলে। ইহারা যুদ্ধের ভাঁড়ি খুঁদিয়া আপনাদের নৌকা প্রস্তুত করে; ভুট্টা, ধান ইত্যাদি শস্ত খায়, শুকরমাংস পাইলেও খাইয়া থাকে। ইহারা চৌধাযুক্তিকে সর্বাধিক ভুবা ও ঘৃণ্য অপরাধ বলিয়া থাকে। ইহারা লাম্পাট্যাদোবর্জিত এবং একবার-মাত্র বিবাহ করে।

অরুদ্বীপে স্থানে স্থানে পরিষ্কার অলপূর্ণ জলা এবং স্থানে স্থানে দুর্গম জঙ্গল আছে। এখানকার লোকেরা মলয় ও পলিনেসিয়-কাক্রিগণের মধ্যবর্তী জাতি। অষ্ট্রেলীয়-দিগের সহিতই ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি ও ব্যবহারের সাদৃশ্য অধিক। পুরুষেরা উরু বেড়িয়া তুণে বুনা চ্যাটাই বা কাপড় পরে এবং উড়ালি ব্যবহার করে। ইহারা ক্রোধনস্বভাব নহে, কিন্তু গুরুজন বা জীলোক কর্তৃক তিরস্কৃত হইলে হঠাৎ ফুঁক হইয়া উঠে। জীলোকেরা তুণে বুনা চ্যাটাই-এর একখণ্ড সমুখে ও একখণ্ড পশ্চাদিকে ঝুলাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান ও কতকগুলি খৃষ্টান। অরুদ্বীপের ওলন্দাজেরা এখানে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিয়া দেশের প্রায় প্রধান প্রধান লোককে খৃষ্টান করিয়াছে। অরুদ্বীপের পাপুয়ারা নিজ নিজ গৃহ ধাতুকল ও হস্তিদন্ত দ্বারা সজ্জিত করে। হস্তী মরিয়া গেলে ইহারা দন্তসংগ্রহ করে।

কি-দ্বীপের কাফিরা মুসলমান বটে, কিন্তু শুকরমাংস ভক্ষণ করে। ইহাদের জীলোকের মধ্যেও অবরোধ প্রথা নাই। ইহাদের বালকবালিকারা বড় আমোদপ্রিয় এবং পূর্ণবয়স্কেরাও প্রায় সকল বিষয়েই গোলমাল করিয়া থাকে। এই দ্বীপে দুইজাতীর লোকের বাস, তন্মধ্যে পাপুয়ারা নারিকেল তৈল, নৌকা ও কাঠের গামলা প্রস্তুত করে। ইহাদের প্রস্তুত বড় বড় নৌকায় ২০ হইতে ৩০ জন বোঝাই দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ মুদ্রার চলন নাই, সমস্ত বিনিময়ে সম্পন্ন হয়। ইহারা গাছের ছাল বা সূতার কাপড় পরিয়া থাকে। এখানকার অল্পবিধ জাতি বান্দা দ্বীপের মুসলমান, তাহারা তথ্য হইতে তড়িত হইয়া এই দ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহারা সূতার কাপড় পরে। ইহাদিগকে মলয়জাতীর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে এই জাতির স্বতন্ত্রতাবলম্বী পরস্পর সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র মধ্যবর্তী জাতি হইয়া পড়িয়াছে।

সেয়েম দ্বীপ মলকাল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্বাধিক ভুবা। এখানে গিলগালো-দ্বীপের অধিবাসীর সহিত পাপুয়া-

নিগের জাতি নিকট সন্নিবিষ্ট আছে। ইহাদের পুরুষের পূর্ণ গঠন, কিন্তু দেহ কর্কশ এবং জীলোকের আকৃতি মলয়জাতির অপেক্ষা অস্বাভাবিক। এই বোপের অধিবাসী পাণ্ডুরা "আলকারো" নামে খ্যাত। ইহারা মস্তকের বামপার্শ্বে খোঁপা বাঁধে এবং খোঁপার মধ্যস্থলে এক অঙ্গুলি মোটা একটি শুঁজিকাটা রাখে; এই শুঁজিকাটার অগ্রভাগ ও গোড়ার দিকে লাল রং মাখান। ইহারা প্রায় উলক ও অলঙ্কারবর্জিত। কেবল পুরুষেরা ঘাসের বা রূপার বালা, মল, পুঁতির বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলবিশেষের মালা পরে। জীলোকেরা খোঁপা বাঁধে না, কিন্তু ঐ সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করে। ইহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী।

সিলিবিসবীপের কাক্সিরা ব্রহ্মদেশবাসী ও কাক্সিজাতির মধ্যবর্তী শ্রেণী বলিয়া অনুমানিত হয়। ইহারা মলয়জাতির জ্ঞান সত্য এবং 'বুগি' নামে খ্যাত।

ফিলিপাইনবীপে পশ্চিমের জ্ঞান কেশব্রূজ কাক্সির সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। আফ্রিকাবাসীদিগের অপেক্ষা ইহাদের গাভ্রবর্ণ কিছু তরল কৃষ্ণবর্ণ। স্পেনীয়রা ইহাদিগকে "কুজ্জিকায় কাক্সি" বলিয়া থাকে; কারণ, ইহারা তিন হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহাদের জাতিগত নাম "ইটা" বা "আইটা"। এই বীপপুঞ্জের পানাগ, নিগ্রোস, সমর, লেয়টা, মসবেত, বোহল ও জেবু বীপের মধ্যে এই জাতীয় লোক দেখা যায়; অজ্ঞাত বীপে বিস্তৃত 'ইটা' শ্রেণীর কাক্সি নাই। জেবুবীপে একটিও 'ইটা' শ্রেণীর কাক্সি নাই।

গিব্রীপের পাণ্ডুরাদিগের চেন্টা নাক, মোটা ঠোঁট, কোটরগত চক্ষু এবং বাদামী বর্ণ। অনেকে অনুমান করেন যে, নবগিনির পাণ্ডুরা জাতি এবং মলয়জাতির মিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ইহাদের চুল ও পাণ্ডুরাদিগের জ্ঞান নহে।

অস্ট্রেলিয়া, নব ক্যালিডোনিয়া, পিলু প্রভৃতি বীপে যে সকল পাণ্ডুরা কাক্সি দেখা যায়, তাহারা পলিনেসিয়পাণ্ডুরা-কাক্সির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বা মধ্যবর্তী জাতি বলিয়া গণ্য।

ফিজিবীপের পাণ্ডুরাই পাণ্ডুরাশ্রেণী কাক্সির পূর্ণমূর্তি। ইহারা কথাবার্ত্তার নম্র ও ব্যবহারে ভদ্র; কিন্তু নব-গিনি, নব ক্যালিডোনিয়া ও ফিজির পাণ্ডুরা নরমাংসভুক। ফিজিবীপের পাণ্ডুরা আফ্রিকাবাসী হট্টোটদিগের জ্ঞান চূড়াকারে চুল বাঁধে এবং লানদিগের জ্ঞান করোটা অগ্রশত। নবগিনির পাণ্ডুরা ধার্মিকতা, শুকনকনকন ও আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত। প্রায় সকল স্থলেই কাক্সি জীলোকের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রবাই বলিলেই চলে।

কাব, পারস্তোপসাগরকূলবাসী আরবজাতিবিশেষ। উত্তরে শান্তর হইতে রামহরমুজ এবং পূর্বে বেবেহান হইতে হিন্দিয়ান অবধি এই জাতির বাস। ইহাদের রাজধানী মুহমেয়া। এই জাতির বাসভূমির মধ্য দিয়া বহুখাণ্ডাবেষ্টিত তাব নদী প্রবাহিত। এই নদী আরব ভৌগোলিকগণ কর্তৃক দৌরক নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাবেরা কতকগুলি ইংরাজী জাহাজ আক্রমণ করে, সেই স্মৃতি ইহাদের সহিত যুক্ত বাধে। তৎপরে আলীরজা পাশা মুহমেয়া-নগর অধিকার করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে পারস্তযুদ্ধের পর ঐ নগর ভারত গবর্ণমেন্টের অধীন হইয়াছে।

কাবর (পুং) কুংসিতো বহুঃ, কোঃ কাদেশঃ, প্ৰবোধরাদি-
হাং সিদ্ধং। কুংসিত বহু।

কাব্লা খাঁ, একজন বিখ্যাত মোগলসম্রাট। জলীখ খাঁর প্রপৌত্র, তাতাররাজ মলু খাঁর স্রাভা। ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে দ্রাভস্ব প্রাপ্ত হন। ইনিই চীনরাজ্যে যুইনবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে অসংখ্য দলবল সঙ্গে লইয়া চীনরাজ্যে প্রবেশ করেন এবং তাতারদিগকে পরাজয় করিয়া উত্তর-চীন অধিকার করেন। তৎপরে ১২৭৯ খৃঃ, সং-বংশ নির্মূল করিয়া দক্ষিণচীন হস্তগত করেন। এই সময়ে তিনি উত্তরে উত্তরমহাসাগর হইতে দক্ষিণে মালাক্কা-প্রাণালী এবং পূর্বে কোরিয়া হইতে পশ্চিমে এসিয়ামাইনার পর্য্যন্ত সমুদ্র তু-খণ্ডে একাধিপত্য করেন। অপর মোগলসম্রাটদিগের জ্ঞান ইনি অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন না, তাহার প্রশাসন শুণে চীনবাসীমাত্রই তাহার প্রশংসা করিতেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে কাব্লা খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কাবা। ১ জাতিবিশেষ। ইহারা ভারতবর্ষের পশ্চিমে গুজরাটের উত্তরকচ্ছ-উপসাগরের উপকূলে মহারাত্রিরাজ্যে বাস করিত। বোহেটিরাগিরি করিয়া ইহারা জীবিকা উপার্জন করিত। এক্ষণে ইহাদের কথা বড় শুনিতে পাওয়া যায় না।
২ মুসলমানদিগের পরিচ্ছদবিশেষ। ইহা চাপ্‌কালের মত, কেবল বন্ধস্থলে অর্দ্ধাংশ কাটা। তাহার ভিতরে স্বতন্ত্র জামা পরিধান করা যায়। ঐ জামায় বন্ধস্থলে জরির অথবা অল্প কোন প্রকার কাজ করা কাপড় থাকে। কাবার কাটা অংশ দিয়া তাহা দেখা যায়। কাবার ব্যবহার পূর্বে অধিক স্থল, এখন আর বড় দেখা যায় না।

৩ সমচতুর্কোণ আকৃতিতে আরব্য ভাষায় কাবা বলে।

৪ আরবদেশে মকানগরে এক প্রায় সমচতুর্কোণ বাটী আছে। তাহার নাম কাবা। উহা মুসলমানদিগের একটি তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। উহার উত্তর-পশ্চিম হইতে

দক্ষিণপূর্বে দৈর্ঘ্য ২৪ হাত ও প্রস্থ ২০ হাত এবং উচ্চে ২৭ হাত। পূর্বদিকে ইহার দ্বার। দ্বারের নিকট রোপ্যানের উপর একখানি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর আছে। বাজিগণ মন্ডায় পৌছিয়াই হস্তমুখপ্রক্ষালন বা স্নানাদি করিয়া মসজিদে গমন করে। অগ্রে কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর চূষন করিয়া তাহার পর কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। কাবাকে দক্ষিণে রাখিয়া তিনবার ক্রতপদে ও চারিবার ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করিয়া কাবাকে বামে রাখিয়া পরিভ্রমণ শেষ করিতে হয়। কাবার নিকট একখানি প্রস্তরে ইব্রাহিমের পদ চিহ্ন আছে। প্রদক্ষিণের পর বাজিগণ এই প্রস্তরের নিকট গিয়া যজ্ঞপাঠ করে। তাহার পরে কৃষ্ণপ্রস্তরখানিকে পুনরায় চূষন করিয়া চলিয়া আইসে। আরবদেশীয় পরিবারবর্গের মধ্যে প্রথা আছে, যেটাছেলে হইলে জন্মাইবার ৪০ দিন পরে তাহাকে কাবার লইয়া আসে। তথায় আনিয়া তাহার উপর মস্তাদি পাঠ করা হয়। তাহার পর ছেলটাকে বাড়ী আনা হইলে নাপিত আসিয়া ছেলের গওদেশে কুর দিয়া চক্ষের কোণ হইতে মুখের কোণ পর্যন্ত সমান্তরালে তিনটি দাগ কাটিয়া দেয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে কাবা আরবদিগের তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। কথিত আছে, আদমের সময় একখানি প্রস্তরমূর্তি স্বর্গ হইতে পতিত হয়। ক্রমে ইহাতে ৩৬০টি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহম্মদের ধর্মপ্রচারে ইহার গৌরব কতক নষ্ট হয়। ভারতে খলিফ ওমরের বংশীয় কর্ণাটের নবাবগণ এই কাবার উঠিবার জন্য একটি স্বর্ণসোপান প্রদান করেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে কাবার গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাবাইজ—জাতিবিশেষ। পারস্তের পূর্বে ও পশ্চিমে কুর্দ-জাতির বাস। কাবাইজ জাতি এই জাতির অন্তর্গত।

কাবাব (আরব্য) ১ জলীয় দ্রব্যের পরিমাণবিশেষ।

২ পাচিত মাংসবিশেষ। মাংসখণ্ড অগ্নিতে ঝলুগাইয়া কাবাব প্রস্তুত হয়। মুসলমানেরা শোহার শিকে অথবা বংশনির্মিত শিকের মত বাখারিতে খণ্ড খণ্ড মাংসবিন্ধ করিয়া অগ্নির উপরে রাখিয়া দেয়। তাগে উহা সিদ্ধ ও আহারযোগ্য হয়। উহাকে শিক-কাবাব বলে। কখন কখন মাংসখণ্ডের সহিত পলাতু ও আদা দেওয়া হয়। কখন রোপ্যাননির্মিত শিকও ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

কাবাল খেল, কাস্মীরপ্রান্তে বহুর নিকট ওয়াজিরদিগের বাস। উচ্চ মন্ডাই ও যাজিরদিগের মধ্যে কাবার খেল একটি জাতি। ইহাদিগের মধ্যে ও মিরাসি, সেফালী ও পিপালী নামে তিনটি শ্রেণী আছে। ইহাদিগের মধ্যে

৩৫০০ জন বলবান্ যোদ্ধা। ১৮৫০ ও ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহার ভারতের প্রান্তভাগে ইংরাজ-অধিকারে আসিয়া বিংশতিবার লুণ্ঠ তরাজ করে। ইংরাজেরাও ইহাদিগকে কয়েকবার আক্রমণ ও অবরোধ করেন।

কাবুল—আফগানস্থানের একটি জেলা। ইহার উত্তর-পশ্চিমে কোহিবাবা, উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত, উত্তর পূর্বদিকে পঞ্চশির (পঞ্চনদা) নদী, পূর্বদিকে সলিমান পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে হফে-কো ও গজনী এবং পশ্চিমে হাজার-প্রদেশ।

কাবুলের অধিকাংশস্থল পর্বতে পরিপূর্ণ। ইহার অনেক-গুলি উপত্যকা উর্বরা। এই উপত্যকার বড় বড় বৃক্ষ জন্মে, তাহাতে কাড়ি বরগা হয়। কোহিহান ও কুরমে ভাল ভাল কাঠ পাওয়া যায়। কাবুলের নানাহানে মেওয়ার বাগান। কো-দামানে ও হস্তালিফ উপত্যকার বাগান কিছু বেশী। বাগানগুলি দেখিতে অতি মনোরম। লোগার ও ঘোরবন্দ নামক প্রদেশে পত্ভারগের স্থান আছে, এখানে গম্বাদির, আহারও বেশ পাওয়া যায়। গম ও যব এখানে যথেষ্ট জন্মে, কিন্তু উহা দরিদ্র লোকে কেবল ব্যবহার করিয়া থাকে। সম্প্রলোক মাজে মাংস অধিক আহার করেন। গজনী হইতে নানাবিধ শস্ত এ প্রদেশে আমদানী হয়। উত্তর বদাকশন, জলালাবাদ, লাম্বন ও কুনার হইতে চাউল আমদানী হয়। এই জেলাতে স্থানে স্থানে শস্তাদি বেশ জন্মে। বামিয়ান ও হাজার হইতে ঘৃত আমদানী হয়। এখানে দ্রব্যাদি মহার্ঘ্য নহে। গ্রীষ্মের সময় লোকে অধিকাংশই তাড়ুতে থাকে। প্রস্তর ও ইটকনির্মিত বাটীও আছে। বাটীগুলির ছাদ ভারতবর্ষের মত সমতল। গো ও মেঘই এখানকার ধন বলিয়া গণ্য। উত্তরে তুর্কিস্থানের সহিত ও দক্ষিণে ভারতের সহিত বাণিজ্য হয়। তুর্কিস্থানের সহিত অশ্বের বাণিজ্যই অধিক হইয়া থাকে। গ্রামগুলি ছোট বড় নানা প্রকার। এক একটি গ্রামের ১০০। ১৫০ ঘর বসতি। গ্রামের ভিতর মধ্যে মধ্যে ছোট খাট কেজা আছে। জল অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। উপত্যকার মধ্যে প্রায় গোবর গাড়ীই চলে। বহির্বর্ণাজ্যে উষ্ট্র, অশ্ব ও অশ্বতর ব্যবহৃত হয়। তুর্কিস্থানে কয়েক গুহের মাত্রা বাড়িয়াছে, এজন্য দেখানকার বাণিজ্য কিছু কমিয়াছে। ইতিপূর্বে ভারত হইতে কাপড় ও চা বাইত, তাহাও বন্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে গুরু হইত তাহার আরও কমিয়া গিয়াছে।

কাবুলের প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে হাকিম বলে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আদীরসের আলী খাঁর ভ্রাতা সর্দার আব্দুল খাঁ এখানকার হাকিম ছিলেন। কাবুলের আর প্রায় ১৮,০০,০০০ আদার

লক্ষ টাকা। আফগানস্থানের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানকার সৈন্যসংখ্যা কিছু অধিক। এখানকার রাস্তাগুলিও মন্দ নহে। পূর্বে এখানে হিন্দুরাজগণের অধিকার ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। [গাফার দেখ।]

২ উক্ত কাবুলজেলার প্রধাননগর কাবুল। কাবুল ও নগর নামক দুইটা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গঙ্গনী হইতে ৮৮ মাইল, খিলাত-ই-খিলজাই হইতে ২২৯ মাইল, পেশোবার হইতে ১৭৫ মাইল। অক্ষা° ৩৪° ৩০' উঃ ও দ্রাঘি° ৬৯° ১৮' পূঃ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীতে ইহার ১,৪০,০০০ লোক সংখ্যা ছিল। এখানে তাপমানযন্ত্র ৩০° ডিগ্রি নামে ও ১০৫° ডিঃ উঠে।

কো-তাকৎ সা ও কোঃ খোজা সফর নামক দুইটা গিরিশ্রেণী মিলিত হইয়া কোণের নত হইয়াছে, সেই স্থান সমতল। সেইখানেই কাবুলনগর অবস্থিত। ইহার চারিদিক্ বেঠন করিলে দেড় ক্রোশের অধিক হয় না। প্রধান দুর্গ বালা-হিসার নগরের দক্ষিণ পূর্বভাগে অবস্থিত। পূর্বে চারিদিকে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল, এক্ষণে স্থানে স্থানে তাহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। নগরের অধিকাংশ স্থানই বৃক্ষ-বাটিকায় পরিপূর্ণ। বসতি ৫০০০ ঘরের অধিক নহে। নগরের গমনাগমনের ভ্রম পূর্বে ৭টি ফটক ছিল, এক্ষণে লাহরি ও সরদার নামক দুইটি মাত্র ইষ্টকনির্মিত দরজা দেখা যায়। লোকের ঘর বাটী অধিকাংশ কাঁচা ইটের ও কাদার গাথুনি। পূর্বে পাকা গাথুনি হইত, তাহার অনেক প্রমাণ বুঝা যায়। নগরটি কয়েক মহল্লার বিভক্ত, মহল্লাগুলি আবার কুচে বিভক্ত। কুচগুলি প্রাচীর-বেষ্টিত। যুদ্ধবিগ্রহের সময় প্রাচীরগুলি মেরামত হইয়া থাকে। তখন এ গুলি এক একটি দুর্গেরও মত হইয়া উঠে। প্রবেশের জন্য এক একটি ফটক মাত্র থাকে। এইরূপ আশ্রয়ক্ষার ব্যবস্থার নাম কুচবন্দী। ভিতরের রাস্তা-গুলি অত্যন্ত সচ্ছন্দ। নগরে অনেকগুলি বাজার আছে, তন্মধ্যে দুইটি প্রধান। দুইটিই প্রায় সমান্তরালে অবস্থিত। একটির নাম সোর-বাজার, অপরটি দরজা লাহোরির বাজার। নগরের দক্ষিণদিকে সোর-বাজারে চার-ছাতা নামক একটি ইমারত আছে, উহা দেখিতে বড় সুন্দর। বাজারের মধ্যে ঐটী দেখিবার জিনিস; উহার ৪টা বড় বড় খিলান করা গাথুনি। তাহার উপর নানা চিত্র বিচিত্র। আলিমদ্দীন খাঁ এই বাটী নির্মাণ করেন। নগরের বাহিরে বাবর ও তৈমুর শাহের সমাধিস্থান। এছাড়াও দেখিবার জিনিস। কাবুলের শাসনকর্তা খোদ আমীর। পূর্বে বালহিসারই রাজত্ববন

ছিল। এক্ষণে আমীর নগরের মধ্যে অন্যস্থানে বাস করেন। নগরে একটি বিদ্যালয় আছে। বিদেশী বণিক অথবা ব্যবসায়ীগণের থাকিবার জন্য এখানে ১৪। ১৫টা সরাই আছে, এগুলিকে কারবান-সরাইও বলা গিয়া থাকে। সাধারণ লোকের স্থানের জন্য স্নানাগার আছে, সেগুলিকে হাম্মাম বলে। হাম্মামে জল গরম থাকে। গ্রীষ্মের সময় চারিদিক্ হইতে বণিকগণ আসিয়া থাকে। ক্রয় বিক্রয় অধিকাংশই দালালদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। নগরের স্থানে স্থানে কূপ আছে; কিন্তু তাহাদের জল কিছু ভারি। নদীর জল অনেক ভাল।

নগরে আসিবার জন্য কয়েকটি সেতু আছে। তন্মধ্যে পুল-ই-কিস্তি (অর্থাৎ ইষ্টকের পুল) নামক সেতুই প্রধান। কতকগুলি ডোঙ্গা ঘোড়া দিয়া পুল-নওয়া (নৌ-সেতু) নির্মিত হইয়াছে। পাকা সেতু আরও কয়েকটি আছে। অনেক স্থানে নদীতে জলের স্বরতা হেতু সেতুর আবশ্যকতা হয় নাই।

তৈমুরশাহ কাবুলে আফগানস্থানের রাজধানী স্থাপন করেন। সেই অবধি মাজ্জাই-বংশীয় সকল রাজাই কাবুলে থাকিতেন। মাজ্জাইবংশের পতনের পর এই নগর দোস্ত-মুহম্মদের হস্তে আসিল। ইংরাজদিগের আমলে কাবুলে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। [আফগানস্থান দেখ।]

ইংরাজেরা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট সপ্তম্যে শাহ সুজাকে কাবুলে পাঠাইয়া দেন। ইংরাজদিগের সেনাদল দুই বৎসর কাল তথায় অবস্থিত করিল। পরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বর কাবুলের সেনাগণ বিদ্রোহী হইয়া আমীর শাহ সুজাকে খুন করে। দোস্ত মুহম্মদের পুত্র অকবর খাঁ তখন ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। ইংরাজদিগকে কাবুল পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই মর্মে সন্ধি হইবার কথা বার্তা চলিল। সার উইলিয়ম ম্যাকনাতন শাহ সুজার সহিত সন্ধির কথাবার্তা করিতে গেলেন। শাহসুজা সেই সুযোগে ম্যাকনাতনকে পিস্তল দিয়া গুলি করিলেন। ম্যাকনাতন সাহেবের সঙ্গে ট্রেবর, মেকজি ও লয়েন্স সাহেব ছিলেন। খিলজাই সেনাগণ ট্রেবর সাহেবকেও খুন করিল। অপরায়ণ সাহেবগণ আতঙ্ক হইলেন। শেষে স্থির হইল যে, ইংরাজদিগকে টাকা কড়ি সমস্ত দিতে হইবে, কেবল ৬টি কামান লইয়া তাহারা চলিয়া আসিবেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারি, ইংরাজ-সেনা ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৫০০ সেনা ও ১২,০০০ অশ্বচর দারুণ শীতে বরফ ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিলেন। সেই দলের মধ্যে কেবল ডাক্তার ব্রাইডন শশরীরে জালালাবাদে ফিরিয়া আসেন। ১৫ জন বন্দী হইয়াছিল; তাহারাও অবশেষে ফিরিয়া আসে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ইংরাজ-

সেনা লইয়া কাপ্তেন পোলক কাবুলে প্রবেশ করিয়া বালা-
হিসার দখল করেন। ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ইংরাজেরা
নগর দখল করিয়া রহিলেন। মেকনাটন সাহেবের হত্যার
পর তাহার দেহ বাজারে খুলিয়া রাখা গেল। তাহার প্রতি-
শোধের জন্য ইংরাজেরা চার-ছাড়া বাজারটি তোপে
উড়াইয়া দিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গণ্ডামকে যাকুব খাঁর সহিত
ইংরাজগণের যে সন্ধি হয় তাহাতে কাবুলে ইংরাজদিগের
একজন রেসিডেন্ট রাখা স্থির হয়। তদনুসারে সার লুইস
কাবাগনারি রেসিডেন্ট হইয়া কাবুলে গমন করিলেন। তখনও
আফগানগণ আদৌ শান্ত হয় নাই। সেই বৎসর ৩রা সেপ্টেম্বর
তাহারাও সৈন্তে সারলুইস কাবাগনারিকে ছলপূর্বক বিনাশ
করিল। ক্রম উপত্যকার তখন সার ফ্রেডরিক রবার্টস্
ইংরাজসেনা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট
তাহাকে কাবুলে যাইতে অনুমতি করিলেন। রবার্টস্ সৈন্য
অভিযান করিলেন, পথে নানা বাধা বিষয় অতিক্রম করিতে
হইল। ৯ই অক্টোবর তিনি কাবুল অধিকার করিলেন।
ইংরাজসৈন্য কর্তৃক বালাহিসার, কেল্লা ও রাজবাটীর
অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল। আমীর যাকুব খাঁ পদত্যাগ
করিলেন। ইংরাজেরা কাবুল অধিকার করিয়া রহিলেন।
দেশের লোকে মনে করিয়াছিল যে, ইংরাজেরা ফিরিয়া
যাইবে, কিন্তু তাহারা বসিয়া রহিল দেখিয়া সকলেই অসন্তুষ্ট
হইয়া উঠিল। অল্প দিন পরে আফগানদেরা কাবুল ও
বালাহিসার দখল করিল। ২৩এ সেপ্টেম্বর সেরপুরে একটি
যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজদিগেরই জয় হইল। কিন্তু তাহা-
দিগকে সেরপুরেই অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল। ২৩এ
ডিসেম্বর তথায় প্রায় ৫০ হাজার আফগানসেনা আসিয়া
ইংরাজগণকে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হয়। পর দিবস
অধিকতর ইংরাজসেনা আসিয়া জুটিল। কাবুল আবার
ইংরাজের হস্তগত হইল। তাহার পরে তিনমাসকাল আর
কোন গোলযোগ হয় নাই। ২২এ জুলাই আবদর রহমান
কাবুলের আমীর মনোনীত হইলেন। আগষ্ট মাসে ইংরাজ-
সেনাগণ প্রত্যাবর্তন করিলেন। আমীর আবদর রহমানের
শাসনে কতকটা শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৮১ সালে
আয়ুব খাঁ আক্রমণ করিতে আসেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া
হিরাত হইয়া পারস্ত অভিমুখে প্রস্থান করেন। সেই বৎসর
আমীর একবার কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন।
সেই সময় বার্কি ও কোহিস্তানবাসীগণ বিদ্রোহী হয়, কিন্তু
অল্পে অল্পেই গোলযোগ মিটিয়া যায়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কবুলে

মার্ক অধিকার করিয়া আফগানস্থানের সীমার আশ্রয়
উপস্থিত হয়। ইংরাজেরা কবুল ও আফগানস্থানের সীমা স্থির
করিয়া দিবার জন্য ৪০ জন কর্মচারী ও ৪০০ সেনা পাঠাইয়া
দেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড
ডফরিন রাবলপিণ্ডিতে এক দরবার করেন, আমীর তাহাতে
নিমন্ত্রিত হন। মার্চ মাসের শেষে আমীর আবদর রহমান
তথায় আসেন। একপক্ষ কাল থাকিয়া আবার ফিরিয়া যান।

৩ আফগান স্থানের একটি নদী। এই নদীর তীরে
কাবুল নগর। অথর্থে এই নদী কুতা নামে উক্ত হইয়াছে।
[কুতা দেখ।]

কাম (অব্যয়) অনুজ্ঞা।

কাম (ক্রী) কামায় হিতম্, কাম-অণ্। ১ শুক্র। ২ যপেঠ।
৩ বাজ্ঞীয়। ৪ স্বীকারবাধ্য। ৫ অনুমতি। ৬ (পুং)
কাম্যতে অণৌ ঘঞ্। ইচ্ছা। ৭ সঙ্গমেচ্ছা। ৮ ণ্।

(“সন্তানকামায় তপোতি কামং

রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্যা পরাশ্রমী সা।” রঘু।)

৯ মহাদেব। ১০ বিষ্ম। ১১ বলদেব। ১২ কামদেব।

[কামদেব দেখ।] ১৩ ককার অক্ষর। ১৪ তৃফা। এ সম্বন্ধে
ভগবদ্গীতার লিখিত আছে—

“ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্কতযুগ্মজায়তে।

সঙ্গাং সংজারতে কামঃ কামাং ক্রোধোহ'ভজায়তে ॥”(২।৬২।)

প্রথমতঃ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি
উৎপন্ন হয়, পরে সেই বিষয়ে কাম অর্থাৎ তৃষ্ণা জন্মে;
তাহার পর সেই কাম কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ
উৎপন্ন হয়।

এই কাম সম্বন্ধে আরও ভগবদ্গীতার শাস্ত্রভাষ্যে লিখিত
আছে—“যিনি শত্রু হইয়াও সমুদায় প্রাণিবর্গকে স্বর্গে
রাখিতে পারেন, তিনিই কাম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।
এই কামই সমুদায় অনর্থের মূল এবং ইহা যে কোন কারণে
প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া, প্রাণিদিগকে
কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে বিচারহীন করে; সুতরাং তখন
তাহারা পাপাচারী হইয়া উঠে। অতএব দুরাত্মা কাম
যাহাতে চিন্ত হইতে দূরে অবস্থান করে, প্রাণিমায়েদেরই
তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়।”

১৫ চক্রেবংশীর মাল্য রাজপুত্র। তৎপুত্র শঙ্কু।

(সহাস্রিখণ্ড ১। ৩০। ১৫।)

১৬ মহিষুরের একজন শাস্ত্ররাজ। কাদম্বরাজ বিজয়া-
দিত্যদেবের সহিত ইহার তগিনী টেলাদেবীর বিবাহ হয়।
ইনি ১১৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন।

১৭ বুঢ়ীশ ব্রহ্মের থয়েটমরো জেলার একটি বিভাগ। অক্ষা° ১৮° ৪৯' হইতে ১৯° ৫' উঃ, দ্রাঘি° ৯৫° ৪৫' হইতে ৯৫° ১৪' ২০" পূঃ। উত্তরসীমা থয়েৎ ও নেওদুন, পূর্বে ইরাবদী, দক্ষিণে পদৌঙ ও গ্রান্চিম আরাকান-ঘোমা। পরিমাণ ৫৭৫ বর্গমাইল।

পূর্বে এই স্থান ময়ঠুগীর অধীনে ছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই ময়ঠুগীর এলাকায় ১৪২ খানি গ্রাম ছিল। এই বাঙ্গালা দেশে পূর্বেকার ডিহিদারদিগের জায় ময়ঠুগীরাও ক্ষমতামালী ছিলেন, সকল বিষয়েই তাঁহাদের কর্তৃত্ব চলিত বটে, কিন্তু কাহারও জীবনমরণে হাত দিতে পারিতেন না অথবা স্বর্ণ ছদ্ম ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল না।

পূর্বে ব্রহ্মরাজ এই কাম হইতে ৮৫৭০ টাকা কর পাতিতেন। এক্ষণে মোট ৭৪৮৯০ খাজনা আদায় হয়। লোকসংখ্যা ৩৫৩৮৩।

এই বিভাগের প্রধান সহর কাম, ইরাবদী নদীর দক্ষিণ-পার্শ্বে অক্ষা° ১৯° ১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫° ১০' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই নগরের মধ্য দিয়া 'মদে' নামক একটি স্রোত বহিতেছে, কিছু দূরে মতুন নদী প্রবাহিত হইতেছে।

এই নগরে অনেক বৌদ্ধদেবালয় ও আশ্রম আছে। পূর্বে ইহার নাম 'মগাগাম' ছিল, ইহাই বৌদ্ধগ্রন্থে মহাগ্রাম এবং পাম্ভাতা প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি কর্তৃক মা-গ্রাম (Magrama) নামে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মরাজ আলম্পা ইহার 'কাম' নাম প্রদান করেন। লোকসংখ্যা ১৭৯৬।

১৭ রাজপুত্রনার ভরতপুররাজের অধীন কামান-পর-গণার প্রধান সহর। ভরতপুররাজের উত্তরপূর্বে সীমায় অবস্থিত। পূর্বে এই স্থান জয়পুররাজের অধীন ছিল, রাজা কামসেন ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আপন নামে পরিচিত করেন।

এই নগর অতি প্রাচীন। কিংবদন্তি এইরূপ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে কিছুকাল অবস্থিত করেন। বৌদ্ধরাজা-দিগের সময়েও এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অদ্যাপি এখানে বিস্তর বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে শতস্তম্ভ মন্দির দেখিবার জিনিস, এই মন্দিরে বৃদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান সেনাপতি পেরৌ কর্তৃক রণজিত সিংহের অধিকারভুক্ত হয়। এখান হইতে ভরতপুর পর্য্যন্ত ধাতুবন্ধ চলিয়া গিয়াছে।

কামকন্দলা, কামসেন রাজার কন্যা। (কামসেন মধ্য প্রদেশের কামবতী বর্ত্তমান কাম বা কামন্ নগরীতে রাজত্ব করিতেন।) কামকন্দলা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"কামকন্দলা অভিশয় রূপবতী ছিলেন, তাঁহার অল্পম রূপে মুগ্ধ হইয়া মাধবানল নামে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি আনক্ত হন। ঘটনাক্রমে রাজা কামসেন মাধবানলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন রাজ্য হইতে ভাড়াইয়া দেন। মাধবানল বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য যে যাচা চাহিত মাধামত তাহাই তাহাকে অর্পণ করিতেন। মাধবানল বিক্রমের নিকট কামকন্দলার কর প্রার্থনা করিলেন। পরে রাজা বিক্রম কামসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজকুমারী কামকন্দলাকে মাধবানলের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর দম্পতি পুণ্ড্রাবতী নগরীতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। মাধবানল কামকন্দলার নিমিত্ত সুলভ রাজভবন নির্মাণ করাইয়া ছিলেন।" মধ্য-প্রদেশের বিলহরী নামক স্থানে অব্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। (Cunningham's Arch. Sur Ind. IX. p. 37.)

কামকলা (জী) কামস্ত কলা শ্রিয়া, ৬তৎ। ১ কামধেবের গম্বী রতি। ২ চন্দ্রের ষোড়শ কলা।

৩ তন্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ। পুণ্যানন্দ প্রণীত কামকলা-বিলাস নামক তন্ত্র গ্রন্থে ইহার বিষয় বর্ণিত আছে। তন্ত্রশাস্ত্র স্বভাবতই গূহ, সহজে ইহার স্পষ্ট অর্থবোধ হয় না; এইজন্য কামকলাবিদ্যার মূলশ্লোকই উদ্ধৃত করিতে হইল।—

"সকলভূবনোদয়স্থিতিলয়ময়লীলাবিলোকনোচ্ছাস্তঃ।

অন্তর্লীনবিমর্শঃ পাতৃ মচেশঃ প্রকাশমাত্রভূঃ ॥

সী জয়তি শক্তিরাদ্যা নিজগ্রন্থময়নিতানিরূপমাকার।

ভাবিচরচরবীজ শিবরূপবিমর্শনির্মালদর্শে ॥

সুতশিবশক্তিসমাগমবীজাকুররূপিনী পরা শক্তিঃ।

অণুতররূপাহুতরবিমর্শ লিপিলক্ষ্যনিগ্রহা ভাতি ॥

পরশিবরবিকরনিকরে প্রতিকলতি বিমর্শদর্পণে বিশুদ্ধে।

প্রতিরূচিকচিরে কুডো চিত্তময়ে নিবিশতে মহাবিন্দুঃ ॥

চিত্তময়ো হৃৎকায়ঃ স্রব্যাক্তাহার্ষসমরসাকারঃ।

শিবশক্তিঃমধুনপিত্তঃ কবলীকৃতভূবনমণ্ডলো জয়তি ॥

সিতশোণবিন্দুযুগলং বিবিক্তশিবশক্তিসঙ্কটংপ্রগম্।

বাগর্থস্থষ্টিহেতু পরম্পরাহুপ্রাবিষ্টবিস্পষ্টম্ ॥

বিন্দুরহস্যরাশ্মা রবিরেতস্মিধুনসমরসাকারঃ।

কামঃ কমনীয়স্তয়া কলা দহনেন্দুবিশ্রোহৌ বিল্ল ॥

ইতি কামকলাবিদ্যা দেবীচক্রক্রমাঙ্কিকা সেরং।

বিদিতা যেন স মুক্তো ভবতি মহাজিগুরস্বন্দরীরূপঃ ॥

ক্ষুটিতাদকশাখিন্দো ন্যাদব্রহ্মাকুরো রবেহব্যক্তঃ।

তন্মায়ং পণনসদীরণদহনোনকভূমিবর্ণসন্তুতিঃ ॥

অপ বিশদাদপি বিন্দোগর্গনানিলবহ্নিবারিত্ত্বমজনিঃ ।
 এতৎ পঞ্চকবিকৃতির্জগদিনমধাদ্যজাড্যপ্যস্তম্ ॥
 বিন্দুভিত্তয়ঃ যবন্তেদবিহীনং পরস্পরং তৎ ॥
 বিদ্যাঐদেবতরোরপি ন ভেদলেশোস্তি বেদ্যবেদকরোঃ ॥
 বাগণৌ নিত্যযুতো পরস্পরং শক্তিশিবময়াবেতো ।
 সৃষ্টিস্থিতিলয়ভেদৌ ত্রিধা বিতন্তৌ ত্রিবীজরূপেণ ।
 মাতা মানং মেয়ং বিন্দুত্রয়ভিন্নবীজরূপেণ ।
 ধামত্রয়পীঠত্রয়শক্তিত্রয়ভেদভাবিতাক্রাপি চ ॥
 তেযু ক্রমেণ ললিত্রিতয়ং তদ্রূপ মাতৃকাক্রিতয়ম্ ।
 ইথং ত্রিতয়তুরীয়া তুরীয়াপীঠাদিভেদিনৌ বিদ্যাঃ ।
 শাক্ষস্পর্শৌ রূপং রসগন্ধৌ চেতিভূতস্বক্ষণি ॥
 ব্যাপকমাদ্যং ব্যাপ্যং ভূতরসেবং ক্রমেণ পঞ্চদশ ॥
 পঞ্চদশাক্ষররূপা নিত্য্য গৈষা হি ভৌতিকভিমতা ।
 নিত্য্যঃ শব্দাদিগুণপ্রভেদভিন্না শুভানয়া ব্যাপ্তাঃ ॥
 নিত্য্যস্তিথ্যাকারান্তিথয়ঃ শিবশক্তিসমরসাকার্য্যঃ ।
 দিবসনিশামপ্যন্তাঃ ত্রিবর্ণান্তেপি তদ্ব্যয়ীকৃপাঃ ॥
 অব্যঞ্জনবিন্দুত্রয়সমষ্টিভেদৈবিতাবিতাকারা ।
 ষট্‌ত্রিংশৎ তৎস্বাত্মা তৎস্বাতীতা চ কেবলা বিদ্যা ॥
 বিদ্যাপি তাদৃগাত্মা স্বাত্মা সা ত্রিপুরসুন্দরী দেবী ।
 বিদ্যাবেদ্যাত্মকয়োরত্যন্তভেদমানন্ত্যার্থ্যাঃ ॥
 যা সান্তরোহরূপা পরা মহেশী ত্রিভাবিতা সৈব ।
 স্পষ্টা পশুস্ত্যাদিজিনাতৃকাত্মা চ চক্রতাং যাতা ॥
 চক্রস্তাপি মহেশা ন ভেদলেশো বিভাব্যতে বিবৃষ্টৈঃ ।
 অনয়োঃ স্বাক্ষাকারা পটৈব সা স্থূলসূক্ষ্ময়োঃ চ ভিদা ॥
 মধ্যং চক্রস্ত ত্র্যং পরাময়ং বিন্দুত্বমেবেদম্ ।
 উচ্চুনং তচ্চ যদা ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং চক্রম্ ॥
 এতৎ পশুস্ত্যাদিজিতয়নিদানং ত্রিবীজরূপঞ্চ ।
 বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী চাধিকা অহস্তরাসম্ভূতাঃ স্ত্রীঃ ॥
 ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শাস্তাশ্চৈত্যা শুথোত্তরাবয়বাঃ ।
 ব্যাস্ত্যব্যস্ততদর্শয়মিদমেকাদশাঙ্গপশুস্তী ॥
 এবং কামকলায়া ত্রিবিদুত্ববরূপবর্ণময়ী ।
 সেয়ং ত্রিকোণরূপং যাতাত্রিগুণবরূপিনী মাতা ॥
 একা পরা তদত্বা বামাদিষটিমাতৃস্ফট্যাত্মা ।
 তেন স্ত্রীয়া জাতা মাতা সা মধ্যমাভিধানাভ্যাম্ ॥
 বিবিধা হি মধ্যমা সা স্বক্ষস্থলাকৃতি হিতা স্বাত্মা ।
 নবনাদময়ী স্থলা নববর্ণাত্মা চ ভূতলিপ্যাকৃপা ॥
 আদ্যা কারণমত্ৰা কার্য্যং অনয়োর্ব্যস্তভূতো হেতোঃ ।
 সৈবেয়ং নহি ভেদভাবাত্মাং হেতু হেতুমদভীষ্টম্ ॥
 শ ব স প বর্ণ ময়ং তদ্বক্ষ্যকোণং মধ্যকোণবিস্তারম্ ।

নবকোণং মধ্যং চেত্যশ্বিন্শিচক্ৰীপদীপিতে দশকে ॥
 তচ্ছায়াবিস্তারমিদং দশারচক্রময়ানা বিততম্ ।
 ক চ ট ত বর্ণ চতুর্দশবিগুনবিস্পষ্টকোণবিস্তারম্ ॥
 এতচ্চক্রচতুর্দশপ্রভাসমেতৎ দশার-পরিণামঃ ।
 হাদিস্বরনবক চতুর্দশবর্ণময়ং চতুর্দশারমিদম্ ॥
 পরয়া পশুস্ত্যাপি চ মধ্যময়া স্থূলবর্ণরূপিন্যা ।
 এতাভিরেকপঞ্চাশদক্ষরাত্মা চ বৈধরীজাতা ॥
 কাদিভিন্নষ্টভিক্রপচিতমষ্টনলাজ্ঞঞ্চ বৈধরৈব গৈঃ ।
 স্বরগণসমুদিতমেতদ্ব্যাহদলাস্তোরহঞ্চ সঞ্চিন্ত্যম্ ॥
 বিন্দুত্রয়ময়তজন্ত্রিতয়বিকারাস্চ তানি বৃত্তানি ।
 ভূবিস্বত্রয়মেতৎ পশুস্ত্যাদি জিমাভূবিশ্রান্তিঃ ॥
 ক্রমণং পদবিক্ষেপঃ ক্রমেদয়ন্তেন কথ্যতেবেধা ।
 আবরণং গুরুপংক্তিষয়মিদম্বাণদাঙ্গুলপ্রসরম্ ॥
 সেয়ং পরা মহেশী চক্রাকারেণ পরিণমেত তদা ।
 তদেহাবয়বানাং পরিণতিরাবর্ণদেবতাঃ সর্বাঃ ॥
 আসীনা বিন্দুময়ে চক্রে সা ত্রিপুরসুন্দরী দেবী ।
 কামেশ্বরাক্ষনিলয়া কলয়া চন্দ্রস্ত কলিতোত্তংসা ॥
 পাশাক্ষশেখুচাপপ্রশ্ননশরপঞ্চাধিকিতবকরা ।
 বালারূপারূপাঙ্গী শশিভাস্করশালোচনত্রিতয়া ॥
 তন্মিথুনং গুণভেদাদান্তে বিন্দুত্রয়াঙ্কে ত্র্যশ্রে ।
 কামেশীমিত্রেশপ্রমুগদম্বয়য়ায়না বিততম্ ॥
 বক্ষ্যকোণনিবাসিত্বো যাত্তাঃ সক্ষ্যাকৃণাবশিতাদ্যাঃ ।
 পূর্য্যষ্টকমেবেদং চক্রতনোঃ সখিদায়েনো দেব্যাঃ ॥
 তদ্বিস্ববৃত্তয়স্তাঃ সর্গজাদিষরূপমাংগরাঃ ।
 অহর্দশারনিলয়া ললন্তি শরদিদুসুন্দরাকারাঃ ॥
 তদাহংপংক্তিকোণে যোগিতঃ সর্গসিদ্ধিদাঃ পূর্বাঃ ।
 দেবী বীকর্ষেজ্জিহবিস্বয়ময়া বিশ্বদেবভূবাদ্যাঃ ॥
 ভুবনারচক্রভবনা দেবীমুচ্চকরণবিবরণক্ষুরণাঃ ॥
 সক্ষ্যাসবর্ণবসনাঃ সঞ্চিন্ত্যাঃ সন্মদ্রায়যোগিতঃ ॥
 অব্যক্তমহদংকৃতিতমাত্রাঃ স্বীকৃতাদানাকারাঃ ।
 হিরদচ্ছদনসরোজে জয়ন্তি গুপ্ততরযোগিনীসংজ্ঞাঃ ॥
 ভূতানীশ্রয়দশকং মনস্চ দেব্যা বিকারযোড়শকম্ ।
 কামাক্ষিগাণাদিষরূপতঃ ষোড়শারমধ্যান্তে ॥
 সুত্রাঙ্গিগুণসহ সখিমধ্যাঃ সমুচ্ছিতাঃ সর্বাঃ ।
 আদিমহীর্গহবাসা ভায়া বালার্ককান্তিভিঃ সদৃশাঃ ॥
 আধারনবকমত্মা নবচক্রেণ পরিণতং বেন ।
 নবনাদশক্তরোপি চ সুত্রাকারেণ পরিণতাশ্চক্রে ॥
 অস্তাঙ্গগাদিসপ্তকমাকারশ্চৈবমষ্টকং স্পষ্টং ।
 ব্রাহ্ম্যাদিমাতৃরূপং মধ্যমভূবিস্বমেতদধ্যান্তে ॥

অগ্নিমানিত্ত্বতো হস্তাঃ স্বীকৃতকমনীরকামিনীরূপাঃ ।

বিদ্যাস্তরকলভূতা শুণভাবেনাত্যক্তনিকেষতনগাঃ ॥

পরমানন্দাভূতবঃ পরমশুদ্ধনিকিশেষবিষায়া ।

স পুনঃ ক্রমেণ ভিন্নঃ কামেশত্বং যযৌ বিমর্শাংশাৎ ॥

আসীনঃ ত্রীপীঠঃ কৃতযুগকালে শুকঃ শিবো বিদ্যাম্ ।

তত্বে দদৌ স্ব শক্ত্যে কামেশত্ব্যে বিমর্শরূপিত্যে ॥

সাপ্যেব মিত্রসংজ্ঞান্ স্থানেশান্ জ্যেষ্ঠমধ্যবালাখ্যান্ ।

চিৎপ্রাণবিষয়ভূতাংস্তেতাযুগাদিকারণত্রিগুণান্ ॥

বীজত্রিতয়াধিপতীন্ পরীক্ষ্য বিদ্যাং প্রকাশয়ামাস ।

এতৈরোষদ্বিত্তয়ানুগৃহীতুঃ শুকক্রমো বিহিতঃ ॥”

ভাবার্থ—আদিষ্টিকারণ শিব ও শক্তি দুইটি বিন্দু-
স্বরূপ, এই দুইটি বিন্দুমধ্যে শিবরূপ বিন্দুটি ঋতবর্ণ, এবং
শক্তিরূপ বিন্দুটি রক্তবর্ণ। শিববিন্দুর সহিত যখন শক্তি-
বিন্দু সংযুক্ত হয়, সেই সময়ে এই উভয় বিন্দুর সংযোগকে
কাম কহে। বিন্দু দুইটির নাম কলা ও নাদ। এই শিব-
শক্তি বিন্দু হইতেই ছত্রিশ অক্ষর, সমুদায় ভাষা, এবং
পঞ্চভূতাদি বাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। অকার অক্ষরে শিব
এবং হ্কার অক্ষরে শক্তি বুঝায়; এইজন্য শিববিন্দু, শক্তি-
বিন্দু ও নাদ, এইতিনের সংমিশ্রণে ‘অহং’কারের উৎপত্তি
হইয়া থাকে। ইহাকেই কামকলাবিদ্যা কহে এবং ঐ
শক্তিই ত্রিপুরাসুন্দরী নামে অভিহিত হয়। পূর্কোক্ত
বিন্দু তিনটি একটি ত্রিকোণচক্রের মধ্যস্থিত; অতরাং
ত্রিপুরাসুন্দরী সেই চক্রমধ্যে অবস্থান করেন এবং তাহার
কোণসমূহে সিদ্ধিপ্রদা যোগিনীগণের অধিষ্ঠান। এই
ত্রিপুরাসুন্দরীর বালারূপের ছায় অরূপবর্ণ, মস্তকে চক্রকলা,
চক্র, সূর্য্য ও অগ্নি তাঁহার চক্ষুর; পাশ, অঙ্কুশ, ইক্ষু,
ধনুঃ ও পঞ্চশর তাঁহার হস্তে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়ে
অবাক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্ত্রাভ্র, এই গুপ্ততর যোগিনী-
সমূহ; এবং মধ্যে পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বোড়শ বিকার
অবস্থিত আছে।

এই কামকলা-বিদ্যা অবগত হইতে পারিলে ত্রিপুরা-
সুন্দরীও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু শুকর উপদেশ ব্যতীত
কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা ইহাতে কখনই জ্ঞানলাভ হয় না।
ইহার ৩৬ মূলতত্ত্ব যথা—

১ শিব, ২ শক্তি, ৩ সদাশিব, ৪ ঈশ্বর, ৫ শুদ্ধবিদ্যা,
৬ মায়, ৭ কলা, ৮ বিদ্যা, ৯ রাগ, ১০ কাল, ১১ নিয়তি,
১২ পুরুষ, ১৩ প্রকৃতি, ১৪ অহঙ্কার, ১৫ বুদ্ধি, ১৬ মনঃ,
১৭ শ্রোত্র, ১৮ শ্রব, ১৯ নেত্র, ২০ জিহ্বা, ২১ জ্ঞান, ২২ পাদ,
২৩ পানি, ২৪ পায়ু, ২৫ উপশ্ব, ২৬ শব্দ, ২৭ স্পর্শ, ২৮ রূপ,

৩০ রস, ৩১ গন্ধ, ৩২ আকাশ, ৩৩ বায়ু, ৩৪ তেজঃ ৩৫ অপ,
৩৬ পৃথিবী।

কামকলাবিলাস. (পুং) কামকলার্যঃ বিলাসঃ সমাক্
বিবরণং যত্র, বহত্রী। তন্ত্র শাস্ত্রবিশেষঃ; ইহাতে কামকলা-
বিদ্যার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে; পুণ্যামন্য ইহার
প্রণেতা এবং নটনানন্দ নাম ইহার টাকাকার।

[কামকলা দেখ।]

কামকান্তি (ত্রি) কৈ শব্দে ক্তিন্, কান্তিঃ শব্দঃ; কামপর্য
কান্তিঃ শব্দো যত্র, বহত্রী। কামশব্দযুক্ত।

কামকাম্ (ত্রি) কামং কাময়তে, কাম কম-গিচ্-অণ্।
অভীষ্টপ্রার্থী, অভিলষিত বস্তু যে প্রার্থনা করে।

কামকামী [ন্] (ত্রি) কামং কাময়তে, কম-গিচ্-গিনি।
অভীষ্টপ্রার্থী।

কামকার (ত্রি) কামং করোতি, কাম-কৃ-অণ্। ১ কাম্য-
কার্যের নিষ্পাদক। ২ (পুং) ফলাভিসন্ধি।

কামকূট (পুং) কাম এব কূটং প্রধানং যত্র, বহত্রী। ১
বেঙ্গাপ্রিয়, লম্পট। ২ বেঙ্গাগণের বিভ্রম। ৩ কামরাজনামক
ত্রীবিদ্যার মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্র তিন প্রকার। যথা তন্ত্রে,—
১ম কামকূট,—

“বিয়চ্ছন্ততঃ পশ্চাৎ কলৌ নকুলি বহু চ।

মায়াম্বরেণ সংযুক্তং নাদবিন্দুকলান্বিতম্।

প্রথমং কামরাজত্ব কূটং পরম দুর্লভম্ ॥” (হংকলত্রীম্।)

২য় কামকূট,—

“বিয়বিষ্ফুযুতঃ কামো হংসঃ শব্দন্ততঃ পরম্।

মহামায় ততঃ পশ্চাৎ স্বপ্নাব্যতীতি কথ্যতে ॥” (হংকলত্রীম্।)

৩য় কামকূট,—

“মদনং শিববীজঞ্চ বায়ুবীজং ততঃ পরম্।

ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চাৎ মহামায়ং সমুদ্বরেণ ॥” (হংকলত্রীম্।)

কামকূৎ (ত্রি) কামেন করোতি, কাম-কৃ-কিপ্। ১ যথেষ্ট-
কারক। ২ (কামং করোতি) অভীষ্টলম্পাদক। ৩ (পুং) বিষ্ণু।

(“কামহা কামকৃতং কান্তঃ কামঃ কামপ্রদঃ প্রভূঃ ॥” বিষ্ণুসহং।)

কামকেলি (ত্রি) কামে তক্ষেত্বকরতো কেলির্গত বহত্রী।

১ লম্পট। ২ (পুং) কামনিমিত্তা কেলিঃ, মধ্যলো। ৩ অরত।

(সংঘেষং সম্প্রয়োগঃ সন্তোগশ্চ রহোরতিঃ।)

গ্রাম্যধর্মো নিধুবনং কামকেলিঃ পশুক্রিয়া ॥

হেমচন্দ্র ৩। ২০১।)

কামকৌড়া (স্ত্রী) কামেন কৌড়া, ৩তৎ। ১ কামহেতুক
কৌড়া, অরত। ২ পঞ্চদশাক্ষরি ছন্দোবিশেষ।

“মাঃ পঞ্চ সূর্য্যভাং সা কামকৌড়া সংজ্ঞা জ্যোতীঃ”

পাঁচটি ম গণ অর্থাৎ ১৫টি বর্ণই শুদ্ধ হইলে তাহাকে

'কামক্রীড়া' হুদ্য: কহে। (বৃত্তর' টী।)

কামধত্তাগাদলা (জী) কামং কমনীরং খত্তামিব দলং পজ্ঞং
বভাঃ, বহত্রী। স্বর্ণকেন্তকী কুলের গাছ।

কামগ (জি) কামেন বাহত্ত ইচ্ছয়া যথেষ্টং দেশং গচ্ছতি,
কাম-গম-ড। ১ ইচ্ছানুসারে দেশবিশেষে গমনকারক যানাদি।
২ যথেষ্ট-জীগামী লম্পট। ৩ (পুং) কন্দর্প।

কামগতি (জি) কামং যথেষ্টং গতি যন্ত, বহত্রী। ১ ইচ্ছানু-
সারে যে সকল যানাদি গমন করে। ২ যথেষ্টদেশে গমন
কারক ব্যক্তি। ৩ যথেষ্ট জীগামী লম্পট।

কামগম (জি) কামং যথেষ্টং গচ্ছতি, কাম-গম-অচ্।
১ কামচারী। ২ যথেষ্টভাবে জীগমনকারক।

কামগা (জী) কামেন অমুরাগেণ গচ্ছতি, কাম-গম-ড-টাণ্।
যথেষ্ট-পুরুষগামিনী জী, কুলটা।

(“পাবন্ত্যাম্রিতা ত্যোনা: তর্জয়া কামগাদিকা:।

সুবাণা আম্রত্যাগিত্তো নাশোচৌদকভাজনা:।” বাজবল্য)।

কামগামী [ন] (জি) কামং যথেষ্টং যোনিবিচারং অকুঠৈব
ইত্যর্থ: গচ্ছতি, কাম-গম-গিনি। ১ বাহারা যোনিবিচার
না করিয়াই যথেষ্টভাবে জীগমন করে। ২ কামচারী।

কামগিরি (পুং) কামপ্রধানো গিরিঃ, মধ্যলোং। ১ কাম-
রূপের একটি পাহাড়। (কালিকাপুরাণ।) ২ দাক্ষিণাত্যের
একটি পর্বত।

“কামগিরিঃ সমারভ্য হারিকান্তং মহেশ্বরী।” শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।

কামগুণ (পুং) কামকৃতো গুণঃ, মধ্যলোং। ১ অমুরাগ। ২
বিষয়। ৩ ভোগ।

(অথ কামগুণো রাগে বিবরাতোগরোরশি। মেদিনী।)

কামঙ্গামী [ন] (জি) কামং যথেষ্টং গচ্ছতি, কাম-গম-
গিনি। ১ ইচ্ছানুসারে গমনকারী। ২ যথেষ্ট জীগামী। ইহার
অপর সংস্কৃত নাম অমুকামীন।

(কামকাম্যমুকামীন:। হেম ৩। ১৫২।)

কামচর (জি) কামেন চরতি, কাম-চর-ট। খেচ্চারী;
ইচ্ছানুসারে সকল স্থানেই বাহারা বিচরণ করে।

(“তাং নারদঃ কামচরঃ কমাচিং।” কুয়ার।)

কামচরণ (জী) কামং যথেষ্টং চরণং বিচরণং কর্মধা।
যথেষ্টভাবে বিচরণ।

কামচরন্ত (জী) কামচরন্ত ভাবঃ কামচর-ব (তন্ত ভাব-
ভলৌ। পা ৫। ১। ১১১।) কামচরের কার্য, যথেষ্টভাবে
বিচরণ।

কামচার (জি) কামেন খেচ্ছয়া চরতি, কাম-চর-অচ্। ১

যথেষ্টভাবে বিচরণকারক। ২ (কামং যথেষ্টং চরতি,
কাম-চর-গিচ্-অচ্।) যে যথেষ্টভাবে গৌর প্রভৃতি পতঙ্গিগকে
চরাইয়া থাকে।

কামচারী [ন] (জি) কামেন খেচ্ছয়া চরতি, কাম-চর-
গিনি। ১ কামুক। ২ যথেষ্টচারী। ৩ চড়ুই পাখী।
৪ (পুং) গরুড়।

কামজ (জি) কামাৎ জারতে, কাম-জন-ড। ১ অভিনাবজাত
ব্যসনাদি। মহাসংহিতার মতে কামজব্যসন ১০ প্রকার।
যথা,—

“মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।

ভৌর্য্যজিকং বৃথাট্যাচ কামজো দশকো গণঃ।”

মৃগয়া, দ্র্যাক্রীড়া, দিবা-নিদ্রা, পরনিদ্রা, জীপন্তোগ,
মদ্যপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথা পর্যটন; এই দশটি
কামজ ব্যসন। ইহার মধ্যে মদ্যপান, দ্র্যাক্রীড়া, জীপন্তোগ
ও মৃগয়া; এই চারটি উত্তরোত্তর অধিক কষ্টদায়ক।
কামজ ব্যসনে আসক্ত হইলে ধর্ম ও অর্থলাভ হইতে বঞ্চিত
হইতে হয়, এজন্য সর্বদা ইহার পরিত্যাগ করা উচিত।
২ কামজাত। ৩ (পুং) কামদেবের পুত্রাদি।

কামজঙ্ঘর (পুং) কামজঙ্গমৌ জরন্তেতি, কর্মধা। জর-
বিশেষ, কামরিপুর আধিক্য হইলে এই জর উৎপন্ন হয়।
বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহার লক্ষণ,—

“কামজে চিত্তবিভ্রংসস্তজ্জ্বালন্তমভোজনম্।”

কামজজ্বরে মনের বিকলতা, ভ্রান্তা, আলস্ত ও ভোজন-
শক্তির নাশ হইয়া থাকে। (মাধব নিং।) আশ্বাসবাক্য,
অতীষ্ট বস্তুর লাভ, বাস্তব উপশমকারক কার্য এবং যে কোন
উপায়ে কষ্ট থাকিতে পারিলে এই জর নিবারিত হয়। ক্রোধের
দ্বারাও এই জরের উপশম হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ।)

কামজনি (পুং) কামন্ত জনিরূপন্তি: অস্মাৎ, বহত্রী। ১
কোকিল। ২ (জি) মৃগন্ধি মালাচন্দন প্রভৃতি বস্ত্র।

কামজান (পুং) কামং জনরতি, কাম-জন-গিচ্-অচ্ নিপা-
তনাং ন ব্রহ্মঃ। অথবা কামজং কন্দর্পভাবং আনরতি,
কামজ-আ-নী-ড। ১ কোকিল।

কামজিৎ (পুং) কামং জরতি, কাম-জি-কিপ্। ১ মহাদেব।
২ কাঙ্ক্ষিকের। ৩ জিনদেব।

কামঠ (জি) কামঠ ইদম্, কামঠ-অণ্। ১ কচ্ছপস্বকীর।
২ কামঠলু স্বকীর।

কামঠক (পুং) সর্পবিশেষ, ধৃতরাষ্ট্রনামক নাগবংশে ইহার
জন্ম এবং জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে ইহার বিনাশ হইয়াছিল।
(মহাভারত আদিং।)

কামড় (দেশজ) দংশন, দস্তাবাত।

কামড়া-কামড়ি (দেশজ) পরস্পরে দস্তাবাত করা।

কামড়ান (দেশজ) দংশন করা।

কামণ্ডলব (ত্রি) কমণ্ডলোর্ভাবঃ কর্ণধা, কমণ্ডলু-অণ্।

(হারনাস্ত্রুবাদিত্যোহণ্। পা ৫।১।১০০।) ১ কমণ্ডলু
সম্বন্ধীয়। ২ কমণ্ডলুর কার্য।

কামণ্ডলেয় (ত্রি) কমণ্ডলোরিৎ, কমণ্ডলু-উবর্ণত লোপঃ

(ঢে লোপোহক্ৰ্ণাঃ। পা ৬।৪।১৪৭।) চত্ৰ এয়।

(আয়রেন্দ্রানীরিঃ ফ ট খ ছ ষাং প্রত্যয়ানীনাম্। পা ৭।১২।)

কমণ্ডলুসম্বন্ধীয়।

কামতরু (পুং) কামং যথেক্ষং জাতরুঃ, মধ্যলো°। বৃক্ষ-
বিশেষ, বন্দাক। [বন্দাক দেখ।]

কামতা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটি
গ্রাম। চিত্রকূট পর্বতের নিকট অবস্থিত। কামদগিরি
হইতে ইহার নাম কামতা হইয়াছে।

কামতাপুর (কমতাপুর) বিহারের অন্তর্গত একটি ধ্বংসাবশিষ্ট
প্রাচীন নগর। কামরূপ রাজা নীলধ্বজ ইহার স্থাপয়িতা। এই
নগর কামরূপের কামপীঠের মধ্যে অবস্থিত। যখন কামরূপ-
রাজ্য পশ্চিমে করতোয়ানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তখন এই
নগরী এক সময়ে সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল; তখন ইহার
শোভা সমৃদ্ধি বৈরাগ্য ছিল, এখন তাহার চিহ্ন মাত্র আছে,
নতুবা বলিতে গেলে, এখন ইহা একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম
অপেক্ষাও হীনাবস্থায় পড়িয়াছে। ভগ্নাবশেষের মধ্যে
দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, সরোবর, উদ্যান, দেবালয় ইত্যাদি সকল
বিষয়েরই ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার পশ্চিমে লালবাজার
নামে এখন একটি ক্ষুদ্র সहर আছে। ব্রূরোপীয়েরা সাধারণতঃ
সেই লালবাজার নামেই ইহাকে অভিহিত করেন।

পূর্বে কামতাপুর ধরলানদীর পশ্চিমতটে অবস্থিত ছিল;
কিন্তু এক্ষণে ধরলা প্রাচীন খাদ পরিভ্রাণ করিয়া অনেকটা
পূর্বে সরিয়া যাওয়ার, ইহা ধরলা হইতে অনেকদূরে পড়িয়া
আছে। ধরলার প্রাচীন গভীর বিস্তৃতখাদ এখনও কামতা-
পুরের পূর্বে পড়িয়া আছে, এখনও ভরাট হইয়া উঠে
নাই; সেই খাদ দেখিয়া বোধ হয় যে পূর্বে ধরলা এখনকার
অপেক্ষা অনেকটা বিস্তৃত ও প্রবল নদী ছিল। কামতা-
পুরের মধ্য দিয়াও একটি ক্ষুদ্র নদী আজিও প্রবাহিত
আছে; ইহার নাম “শিকীমারী” * (“শুকী বা সিংহমারী”)।
এই ক্ষুদ্র নদীতে প্রাচীন নগরটা হইতাবে বিভক্ত, পূর্বের

* অনেক বলেন, শুকী (সিঙি) মৎস্য হইতে ইহার নাম শুকীমারী
এবং অনেক বলেন, ইহার নাম “সিংহ” হইতে সিংহমারী হইয়াছে।

খণ্ড অপেক্ষা পশ্চিমখণ্ড ক্ষুদ্র। যেখান দিয়া শিকীমারী নগরে
প্রবেশ করিয়াছে বা যেখান দিয়া নগর হইতে বাহির হই-
য়াছে সেই দুই স্থানের অনেকাংশ ইহার একটানা ধর যোতে
বিনষ্ট হইয়াছে।

নগরটি অনেকটা আয়তাকার, পরিধি প্রায় ১৯ মাইল।
ভগ্নাশ্ম পূর্বদিকেই ৫ মাইল ধরলার প্রাচীন খাদ উত্তর-
পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্বকোণাভিমুখে অবস্থিত। নগরটি
অপর তিনদিকে খাদ ও দুর্গের বৃহৎ প্রাকার-পরিবেষ্টিত।
খাদ দুইটি, একটি নগর পরিখা অপরটি নগরের অভ্যন্তরে
দুর্গ-পরিখা। এই দুর্গ পরিখার মাটি তুলিয়া বোধ হয় দুর্গের
মুরচা নির্মিত হয়, আর নগর পরিখার মাটিই বোধ হয়
পরিখার বহির্দেশে ফেলিয়া ঢালু ভেড়ী বাধা হয়। এই
ভেড়ী ও দুর্গের মুরচা এখন অধিকাংশস্থলেই ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে। নগর-পরিখা ও দুর্গের মুরচা উচ্চ কারণে অতি
বৃহৎ ও বিস্তৃত হইয়াছিল। নগর পরিখার পরই ইহার তিন
দিকে নগররক্ষার্থ মুরচা আছে, পূর্বে ধরলানদীর দিকে
এই মুরচা নাই। দুর্গ পরিখার বিস্তার এখন সকল স্থলে
সমান নাই। এখন ইহার তীরে চাব বাস হইতেছে
বলিয়াই ক্ষেত্রে জল-সংগ্রহের জন্ত এই দুর্গ পরিখা
কাটিয়া নানাস্থানে মাঠের সহিত কতকটা মিলাইয়া
লইয়াছে। দুর্গের মুরচাগুলির (এখন যে অবস্থায় আছে
তাহাতোও) তলভাগ প্রায় ১৩০ ফুট বিস্তৃত ও উচ্চ
২০।৩০ ফুট হইবে; কিন্তু দেখিলেই বোধ হয় যে এগুলি
আরও উচ্চ ছিল, কিন্তু কালক্রমে শিখরদেশের স্তম্ভিকা
ধুইয়া গোড়ায় পড়িয়া তলদেশের বিস্তৃতি কিছু বাড়াইয়া
দিয়াছে; কিন্তু পূর্বের আরতন কত বড় ছিল, তাহা
জানিবার উপায় নাই। মুরচাগুলি আগাগোড়া মাটির, বাহি-
রের দিকেও যে ইষ্টকের আবরণ ছিল, তাহা বেশ বুঝা
যায়। নগর পরিখার বিস্তার এখনও ৫৫০ ফুট, কিন্তু গভী-
রতা যে কতটা ছিল, তাহা এখন ঠিক অনুমান করা যায়
না, কারণ এখন অনেকটা ভরাট হইয়া উঠিয়াছে, তবে
বাহিরের ভেড়ী দেখিয়া বোধ হয় যে গভীরতাও বড় সামান্য
ছিল না। এই নগরের তিনটি তোরণ এখনও বর্তমান, এবং
শিকীমারীর পশ্চিমস্থলে একটি তোরণ ছিল বলিয়া অনুমান
করা যায়, এবং সম্ভবতঃ এই তোরণের নিকট মূলমন্দিরের
তাঁহু পড়িয়াছিল। এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে
অজ্ঞাত তোরণের নিকট যেমন পরিখা নাই ও দুর্গ-মুরচার
বাহিরে এবং মধ্যে যেমন অজ্ঞাত রক্ষণোপযোগী ব্যবস্থা
দেখা যায় এই স্থানেও সেইরূপ আছে। এতদ্বিত্য এখানে

যে একটি তোরণ ছিল, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, এই স্থান হইতে একটি পুরাতন প্রশস্ত রাস্তা বরাবর উত্তরমুখে নগর মধ্যে কোবাগার নামক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে ঈষৎ বাঁকিয়া দক্ষিণমুখে ঘোড়া-বাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর আরও নানাবিধ সাধারণ কার্যের চিহ্ন দেখা যায়। এই রাস্তা নগরবহির্দেশে দৌদল-দৌদীর তীর দিয়া ঘোড়াবাট অতিমুখে গিয়াছে; নগর হইতে দৌদী পর্য্যন্ত রাস্তা প্রায় ৩ মাইল, ইহারও উত্তরপার্শ্বে কয়েকটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। এদেশের লোকেরা নগর হইতে দৌদল-দৌদী পর্য্যন্ত পথিপার্শ্বস্থ ভগ্ন অট্টালিকাগুলিসম্বন্ধে বলে যে, এগুলি মোগলদিগের নির্মিত; কিন্তু তাহা তাহাদিগের ভ্রম বলিয়াই বোধ হয়। ইহার মধ্যে একটি ইষ্টক-স্তূপের উপর দুইটি ও আর একটি ইষ্টক-স্তূপের উপর চারিটি গ্রানাইট পাথরের অসম্পূর্ণ ও সৌষ্ঠবশূন্য স্তম্ভ আছে। হিন্দু রাজাদিগের সময় এখানে বিস্তারিত অট্টালিকা ছিল, অবরোধকালে মুসলমানেরা এই সকল অট্টালিকা অধিকার করিয়া বাস করিয়াছিল এবং এ সকলের হৃদ্রাশ ও তাহাদিগের হস্তেই হইয়াছে। যেখানে একটি তোরণ ছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে, তাহার ও শিল্পীমারী নদীর দুই মাইল পশ্চিমে একটি ভগ্নপ্রাঙ্গণ তোরণ আছে; এই তোরণে প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভাদি ছিল বলিয়া ইহার নাম “শিলাঘার”, এই সকল স্তম্ভ-প্রস্তর সৌষ্ঠবশূন্য ও কোনরূপ কারুকার্যবিশিষ্ট নহে। শিলাঘারের দুই মাইল পশ্চিমে আর একটি তোরণ আছে, ইহার নাম “বাঘঘার” এই তোরণের শিরোদেশে একটি ব্যাঙ্গ-মূর্তি ছিল। নগরের উত্তরাংশে ধরলানদীর প্রাচীন খাদের মুখ হইতে পশ্চিমে প্রায় এক মাইল দূরে “হোকোঘার” নামক তোরণ। কামরূপ জেলায় যে সকল অগভ্য জাতির নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে “হোকো” কোন অগভ্য জাতি হইবে। এজন্য বোধ হয় যে “হোকো” নামক কোন অগভ্য ব্যক্তির নামানুসারে এই তোরণটির নাম হইয়া থাকিবে। এই সকল তোরণগুলিই ইষ্টকনির্মিত এবং ইহাদের নিকটে নানাবিধ রক্ষণগোপ্যগী উপায় ছিল, এখনও সে সকলের ভগ্নাবশেষ আছে। হোকোঘারের বহির্দেশে রাস্তার বামপার্শ্বে ও শিল্পীমারীর পূর্বে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ আছে, ইহা প্রায় ১ বর্গ মাইল জমীর উপর গঠিত। এই দুর্গ “পাত্রেয় গড়” নামে প্রসিদ্ধ। এই দুর্গে পাত্র অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী বাস করিতেন। ইহার গঠনপ্রণালী ও ব্যবস্থাদি নগরদুর্গের ভায় তত উৎকৃষ্ট নহে; কিন্তু তাহা হইলেও ইহা এরূপভাবে নির্মিত যে, মগরদুর্গ হইতেই ইহার রক্ষাকার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে।

এই দুর্গের আরও উত্তরে একটি ক্ষেত্রের মধ্যে রাজার স্নানাগার ছিল। ইহার চারিদিকে এখন তামাকুর চাষ হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রের এক স্থানকে আজিও “শীতলবাস” বলে, কিন্তু এখানে কোনরূপ অট্টালিকার চিহ্নও নাই। এইখানে একটি পাথরের গামলার ভায় পাত্র আছে, তাহা গ্রানাইট প্রস্তর হইতে খুঁদিয়া প্রস্তুত করা। ইহার কাণা ৬ ইঞ্চি মোটা এবং মুখের বিস্তার ৬ ফুট ও গভীরতা ৩ ফুট। ইহার অভ্যন্তরে একটি পাথরের ধাপের ভায় আছে, বোধ হয় তাহা দিয়া ইহার মধ্যে অবতরণ করিতে হইত। পাথরের বাহিরে ঐরূপ উঠিবার কোন উপায় না থাকায় অনুমান হয় যে, ঐ পাথর ভূমিতে পোতা ছিল ও উহার কিণারা স্নানভূমির মেঝের সহিত সমপৃষ্ঠ ছিল। এই স্নানাগারের ক্ষেত্র দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্নানাগার ও শীতলবাস একটি স্থানের ছায়াশীতল মনোরম উদ্যান মধ্যে ছিল, কালক্রমে উদ্যানের বৃক্ষাদি বিনষ্ট হইয়াছে বা কৃষিকার্য্যের জন্য সেই সকল বৃক্ষাদি কাটিয়া ফেলিয়া সমগ্র ভূ-ভাগ আবাদ করা হইয়াছে।

নগরমধ্যে প্রধান স্থান দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ। ইহা প্রায় নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার চতুর্দিকে ৬০ ফুট বিস্তার একটি পরিধা আছে। দুর্গ পূর্বপশ্চিমে ১৮৬০ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ১৮৮০ ফুট বিস্তৃত। পরিধার বহির্দেশে দুর্গ-মুরচা ও পরিধার অভ্যন্তরে ইষ্টকপ্রাচীর। উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে পরিধার তীর হইতেই এই প্রাচীর গাঁথা এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রাচীরের কোলে প্রশস্ত ঢালু পোতা। দুর্গ-মুরচার বাহিরে দক্ষিণপূর্বে কোণে কতকগুলি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও একটি বৃহৎ জলা আছে। অপর তিনদিকে এই দুর্গের মধ্য-বিস্তারে প্রায় ২০০ গজ জমী মাটির মুরচার বেষ্টিত। এই বেষ্টিত স্থানটি তিনভাগে বিভক্ত; সম্ভবতঃ এই স্থানে রাজাসংস্র ছিল। ইহার বাহিরে কয়েকটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, কিন্তু নিকটে কোন অট্টালিকার চিহ্ন নাই। দুর্গাভ্যন্তরে ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে উত্তরাংশে বৃহৎ স্তূপ পড়িয়া আছে, ইহা উচ্চে ৩০ ফুট, শিখরদেশ ৩৬০ ফুট বিস্তৃত এবং চতুষ্কোণাকার। এই স্তূপের দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটি ক্ষুদ্র অথচ গভীর পুষ্করিণী আছে এবং সেই জন্ত স্তূপের ঐ অংশ এখনও নষ্ট হয় নাই। ইহার চতুর্দিকে ইষ্টকের আবরক ছিল, কিন্তু এক্ষণে ঐ পুষ্করিণীর তীর ভিন্ন আর কোনদিকে নাই। ইহার নিকটে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, এগুলি দেখিলেই বোধ হয় যে দুর্গের এই অংশ রক্ষা করিবার জন্যই এই পুষ্করিণীগুলি উৎখাত হইয়াছিল ও সেই মৃত্তিকা রাশি-তেই ঐ স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপের অভ্যন্তর

ইটকগঠিত নহে, কেবল বালি ও মৃত্তিকাপূর্ণ। এই স্থানের উপর উত্তর ও দক্ষিণভাগে দুইটি ইটকদিয়া বাধান ১০ ফুট প্রশস্ত কূপ আছে; কূপ দুইটির তলদেশ পর্য্যন্ত বাধান। স্থানের উপর পূর্ব-পশ্চিমে দুইটি স্থান আছে, দেখিলেই সহজে বুঝা যায় যে, সেখানে পূর্বে আটালিকা ছিল। পূর্বদিকে এই ঢিপির উপর একটি ক্ষুদ্র চতুর্ভুজাকার বেদীর ভাঙ্গা স্থান আছে। অনেকেই অনুমান করেন যে, এখানে কমতেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির ছিল। এ অনুমান অনেকটা সত্য। এই বেদীর পশ্চিমে আর একটি ভগ্নাবশেষ আছে, লোকে বলে সেখানে রাজবাড়ী ছিল। কিন্তু তাহা অসম্ভব; সেক্ষণ ক্ষুদ্র স্থানে রাজবাড়ী হইতে পারে না; ইহা বোধ হয় দেবীর উৎসবমঞ্চ ছিল। নীলকুটির জন্ত এই স্থান হইতে যে ইটক সংগৃহীত হয়, তাহা নাকি অতি সুগঠিত; কিন্তু এখানে যে সকল ইটক আজিও ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, তাহা ভারতবর্ষের সাধারণ ইটকের ভাঙ্গা। ঢিপির দক্ষিণ-দিকে মধ্যস্থল হইতে একটি ইটকপ্রাচীর দুর্গপ্রাচীর পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এই প্রাচীরের পূর্বদিকে কতকগুলি ইটককূপ আছে। সম্ভবতঃ এই সকল স্থানে দরবার ও রাজকার্য্য হইত। এই দিকে ঢিপির পূর্বগায়ে তাহারই সমান দীর্ঘ একটি দীঘী আছে। কথিত আছে যে, এই দীঘীতে রাজার করেকটা কুস্তীর পুষ্টিয়া রাখিতেন। এই দীঘীর উত্তর-পূর্বকোণে আর একটি ক্ষুদ্র ঢিপি আছে, ঐ ঢিপির চতুর্দিকে এই দীঘী হইতে একটি খাল কাটিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া আছে। এই ক্ষুদ্র ঢিপিতেও অনেক ইট পড়িয়া আছে দেখিয়া অনুমান হয় যে, এখানে একটি দেব-মন্দির ছিল। কুমারদীঘীর ঠিক পূর্বে আর একটি ঢিপি আছে, লোকে বলে এই ঢিপির উপর শেলেখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। বড়ঢিপির পশ্চিম-দক্ষিণে ও মধ্যপ্রাচীরের পশ্চিমে যে খণ্ড তাহা প্রাচীরের পূর্বের খণ্ড অপেক্ষা ছোট। এখানে বোধ হয় রাজার বাড়ী ছিল। ইহারই ঠিক উত্তরে অন্তঃপুর, এই অন্তঃপুরের পূর্বদ্বারে বড়ঢিপি, পশ্চিমদিকে মাটির মুরচা, দক্ষিণ ও উত্তরে ইটের প্রাচীর। ইহার মধ্যস্থলে একটি কূপ আছে, অনুমান হয় এই কূপটি অন্তঃপুরই কোন দেবালয় ছিল। এই স্থানের নিকট দুইটা পুকুরিণী আছে, সম্ভবতঃ এই দুইটা জীলোকদিগের ব্যবহারার্থ পাথর দিয়া বাধান ছিল। বড় ঢিপির দক্ষিণ-পশ্চিমকোণের পুকুরিণী-তীরে আর একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। অন্তঃপুরের নিকটই এই দুই পুকুরিণীতে ও পূর্বেক বড়ঢিপির উপরে, যে স্থানে কমতেশ্বরীর মন্দির ছিল বলিয়া অনুমান করা

হইয়াছে, সে স্থানেও পতঙ্গাদির ভয়ংকর সকল পাওয়া যায়। একস্থানে ৮ ফুট লম্বা ১৮ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ধূসরবর্ণের প্রাচী-ইট পাথরের স্তম্ভের একটি খণ্ড পড়িয়া আছে, ইহার অগ্রভাগ আট-পলা ও মূলদেশ চতুর্ভুজ। লোকে বলে ইহা স্তম্ভাংশ নহে, নীলাধর নামক নৃপতির অরোগোলকের একখণ্ডমাত্র। প্রবাদ আছে যে, এই দুর্গ বিশ্বকর্মার নির্মিত ও লঙ্কায় বহির্দেশের মুরচা নগরাধিপাত্রী কমতেশ্বরী দেবী নিজে নির্মাণ করেন। পূর্বদিকে ধরলার তীরে কমতেশ্বরী নির্মিত মুরচা নাই। কথিত আছে, ইহার নির্মাণের সময় রাজাকে দেবীর আদেশে একাদিক্রমে চারিদিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু তিনদিন কাটিয়া গেলে, রাজা আর ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারায় চতুর্থ দিনে আহার করেন; এই সময় দেবীও তিন দিকের মুরচা শেষ করিয়াছিলেন মাত্র, কাজেই অপরদিকের মুরচা গাণা হইল না। ধরলার তীর হইতে বাঘদার পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ আছে। রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের এক মাইল দূরে শিঙ্গীমারী নদীর বর্তমান খাদ। ইহার নিকটে আর একটি ক্ষুদ্র খাদ আছে, তাহার উপর বাঘদারের সম্মুখে কিছু দূরে একটি ইটকের বিলানবিশিষ্ট সেতু আছে। এই সেতুর উপর দিয়াই পূর্বেক ধরলা-বাঘদারের রাস্তা। বাঘদারের নিকটে একটি প্রান্তরময় স্থানকে লোকে গৌরীপট বলে। ইহার শিবলিঙ্গাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই বৃহদাকার শিবলিঙ্গের উপর মন্দির ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র আছে। ইহার নিকটে একটা পুকুরিণী, পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ৩০০, ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তারে ২০০ ফুট। ইহার দুইদিকে দুইটি ঘাট আছে। ইহার নিকটে কতকগুলি উৎকীর্ণ মূর্তিবিশিষ্ট বৃহদাকার প্রস্তর আছে, তাহার একখানিতে একটি অর্দ্ধনাগিনীমূর্তি ও একখানিতে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী মূর্তি খোদা আছে।

আদাম বুরুজীপাঠে জানা যায়—খৃষ্টীয় ১৪শ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে কামরূপে নীলধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ আছে;—বগুড়া জেলার এক ব্রাহ্মণের একজন গো-রক্ষক ছিল। এই গো-রক্ষক বড় দুট, পরের অনিষ্ট করিতে ভালবাসিত। সে প্রতিদিন অপরের ক্ষেজে গো-পাল ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিস্তা বাইত। প্রতিদিন এইরূপে শত্ৰুহানি দেখিয়া সকলে ব্রাহ্মণকে তাহার ভৃত্যের দুর্ভাব্যবহারের কথা জানাইল। ব্রাহ্মণ একদিন নিজে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত মাঠে গিয়া দেখিলেন যে, তাহার গো-রক্ষক এক গাছতলায় শুইয়া নিস্তা বাইতেছে ও একটি সর্প ফণাবিন্ধ্যার করিয়া তাহার সুখের

রৌজ নির্ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ সর্প দেখিয়া ভীত হইলেন এবং ক্রতপদে পলাইতে উদ্যোগ করিলেন, এমন সময় সর্প লোকসমাগম বুঝিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ তখন তাহাকে জাগাইতে গিয়া দেখিলেন যে, তাহার পদতলে অর্ধদণপয়, ত্রিশূল ও উর্দ্ধরেখা প্রভৃতি রাজলক্ষণ আছে। এই সকল দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া তাহার নিজা ভাড়াইয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে কোন-রূপ নীচকর্ম করিতে নিষেধ করিলেন। অবশেষে একদিন ব্রাহ্মণ তাহাকে ডাকিয়া, প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, সে যদি কোন দিন রাজা হয়, তবে সে তাহাকে মন্ত্রী করিবে। কালক্রমে কামরূপরাজ ধর্মপালের তদানীন্তন বংশধর দুর্জয় হওয়ার এই গো-পালক তাহাকে বিনষ্ট করিয়া অরং নীলধ্বজ নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হইল এবং স্বরাজ্যকে “ব্রাহ্মণরাজ্য” নাম দিয়া প্রতিপালক ব্রাহ্মণকে মন্ত্রী করিল। আর একটি প্রবাদ আছে যে, কোন স্থানে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একটি দাসী ছিল, তাহারই গর্ভে এক পুত্রপুত্রান হয়। ব্রাহ্মণ তাহাকে গো-রক্ষায় নিযুক্ত করেন। কালক্রমে পূর্ণোক্তরূপে সেই গো-রক্ষক নীলধ্বজ হয়। আর একটি প্রবাদ আছে যে, এই গো-রক্ষক অমর (অসত্য ভাতীয়) ছিল। বাহা হউক, রাজা নীলধ্বজ মিথিলা হইতে ব্রাহ্মণ ও কারহ আনাইয়া কামরূপে স্থাপন করেন এবং “কামতাপুর” * নামে একটি নগর পত্তন করেন। তিনিই সেই নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া “কমতেশ্বর” উপাধি গ্রহণপূর্বক আপনাকে “মহাজ্ঞ” বলিয়া প্রচারিত করেন।

এই নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ, তৎপরে তৎপুত্র নীলাধর রাজা হন। এই নীলাধর বোড়াবাটের গড় ও অনেক কীর্তি স্থাপন করেন। একদা নীলাধররাজের মন্ত্রীপুত্র রাজরায়ীর প্রতি আসক্ত হওয়ার রাজা তাহাকে বধ করিয়া, তাহার মাংস রাখাইয়া মন্ত্রীকে খাইতে দিলেন। মন্ত্রীর খাওয়া হইলে, রাজা তাহাকে তাহার পুত্রহুও দেখাইয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলে, মন্ত্রী লবুপাশে গুরুদণ্ড দেখিয়া পতিত রাজসংসর্গ পরিত্যাগপূর্বক গঙ্গানানদ্বলে কামরূপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, মন্ত্রী গঙ্গানান করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য গোড়েশ্বর হলেন শাহ নবাবের সিকট

* নীলধ্বজ সম্ভবতঃ ১২৫০-৩০ শকালে কামতাপুর পত্তন করেন; কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কামতাপুর নামে একটি ক্ষুদ্র নগর পূর্ব হইতেই ছিল, নীলধ্বজ সেই নগরের বিস্তার বাড়াইয়া ও দুর্গাদি নির্মাণ করাইয়া রাজধানী করেন মাত্র। ১২২০/৩০ শকেও এই নগরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

সাধায়া চাহিলেন। নবাব রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়া বহু দৈর্ঘ্য সহ কামরূপ বাজা করিলেন। ষোড়শ বছর চলিল, কমতেশ্বর পরাজিত হইলেন না। কাজেই নবাব নগরব্যব-
 রোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবরোধ ১২ বৎসর পর্যন্ত রহিল। মুসলমানেরা এই দীর্ঘকালের মধ্যে নগরের বহি-
 র্ভাগে অনেক কীর্তি বিনষ্ট করিয়া, আপনাদিগের থাকিবার
 মত অট্টালিকাদি ও পুষ্করিনী পর্যন্ত নির্মাণ করাইয়া লইল,
 অবশেষে তাহারা কৌশল অবলম্বন করিল। রাজ্যকে
 সংবাদ দেওয়া হইল যে, মুসলমানেরা অবরোধ উঠাইয়া
 চলিয়া বাইবে, কিন্তু বাইবার পূর্বে মুসলমান-রক্ষীগণ
 রাণীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। নীলাধর প্রজ্ঞাবে সম্মত
 হইলেন, কিন্তু মুসলমানেরা দোলায় জীলোক না পাঠাইয়া
 সশস্ত্র যোদ্ধা পাঠাইল। তাহারা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া
 নগর অধিকার করিল ও রাজ্যকে বন্দী করিল। কেহ
 বলেন, বন্দী রাজা গোড়েশ্বর প্রেরিত হন, আর কেহ বলেন,
 তিনি নিহত হন; আবার কেহ বলেন, যে রাজা প্রাণ লইয়া
 পলাইয়া যান। বাহা হউক নগর মুসলমানের অধিকৃত হয়।
 ১৪২০ শকে কামতাপুরে মুসলমানের জয় পতাকা উড়ে।
 ৪০০শ বৎসর পূর্বে যে নগর এককালে মুসলমানের দ্বাদশ-
 বার্ষিক অবরোধ অনার্যসে সহ্য করিয়াছিল; আজ সে নগর
 ভয়ভূমি মাজে পরিণত! কালধর্ম বিচিত্র বটে!

“গুরুজন কথা চরিত্র” নামক আসামীর গদ্যগ্রন্থে লিখিত
 আছে, কামতাপুরে দুর্লভনারায়ণ নামে একজন রাজা
 ছিলেন। তাহার সহিত গোড়েশ্বর ধর্মনারায়ণের এক ভীষণ
 যুদ্ধ হয়। এই দুর্লভনারায়ণকে কেহ কেহ কামরূপের
 রাজা ধর্মপালবংশীয় ও কেহ বা “জিতারি” বংশীয় বলিয়া
 উল্লেখ করেন। বাহা হউক, যুদ্ধে অনেক লোক বিনষ্ট হয়।
 পরে রাজিতে উত্তর রাজা স্বপ্ন দেখিয়া, পরদিনে সখ্যতা-স্থাপন
 করিয়া সন্ধি করিলেন।

তৎপরে গোড়েশ্বর কামরূপের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া রাজা
 দুর্লভনারায়ণকে সাতজন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কারহ প্রদান
 করিলেন। এই চৌদ্দজনের মধ্যে প্রধান ১২ জনকে রাজা
 দুর্লভনারায়ণ ‘বারহুঁরা’ আখ্যা দেন [কামরূপ দেখ]।
 এই বারহুঁরারা সম্ভবতঃ গোড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন।
 বাহা হউক, দুর্লভনারায়ণ ইহাদের সাহায্যে ডোটারাজের
 বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কালক্রমে কামরূপের মধ্যে
 কৌতুকাতির সংখ্যা ও প্রভাব বর্ধিত হওয়ার রাজা দুর্লভ-
 নারায়ণ কিছু ক্রীড়াই হইয়া পড়েন। এই সময় আদি
 কৃষ্ণাঙ্গের মুহূর্ত্ত হওয়ার তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

কিছুদিন পরে কোচবিগের মধ্যে হাজো নামে একজন সর্দার প্রধানত্ব লাভ করেন। এই ব্যক্তি ক্রমে নিজ অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে ঘোড়াঘাট ভিন্ন প্রায় সমস্ত আসাম প্রদেশ অধিকার করেন। ইহার হীরা ও জীরা নামে দুইটা কস্তী ভিন্ন অন্য কোন সন্ধান ছিল না। এই দুই কস্তার অবিবাহিতাব্যহার অতি অল্পদিনের অগ্রশব্দে দুইটি সন্ধান হয়। জীরার সন্ধানের নাম শিশু ও হীরার সন্ধানের নাম বিজু। হাজোরাজ কুমারীকস্তার পুত্র হইল দেখিয়া মহা ভাবিত হইলেন। এই সময় দৈববাণী হইল যে, এই দুই পুত্র দেবদেব মহাদেবের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে হরিয়া নামক একজন মেচ জাতীয় সর্দারের সহিত হীরার বিবাহ হইরাছিল, কিন্তু সন্ধানটি তাহার ঔরসজাত মছে। বাহা হউক এই দুই সন্ধান শেষে বিশেষ পরাক্রমী হইয়া “বিখসিংহ” এবং “শিব-সিংহ” নাম গ্রহণ করিয়া, আপনাদিগকে শিববংশীয় ও স্বশ্রেণীর লোকদিগকে ‘রাজবংশীয়’ বলিয়া প্রচার করিল। ক্রমে বিখসিংহ নানাদেশ জয় করিয়া (বুদ্ধজীমতে ১৪২০। ৩০ শকের মধ্যে) কামতাপুর অধিকার করিয়া রাজা হন এবং খ্রীষ্ট হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ জানাইরা তাহাদিগকে “কাম-রূপী ব্রাহ্মণ” আখ্যা দিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করেন। ইনি বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যের সময় লুপ্তপ্রায় কামাখ্যাপিঠের উদ্ধার সাধন করেন।

কামতাপুর কত দিনের?—বুদ্ধজীমতে রাজা নীলধ্বজ কামতাপুরের স্থাপিতা নহে, সংস্কারকর্তা ও রাজধানীকর্তা মাত্র। গ্রন্থানুসারে রাজা নীলধ্বজ ১২৫০।৬০ শকে (১৩২৮। ৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ গ্রন্থানুসারে ১৪২০ শকে (১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) হসেনশাহ কামতাপুর অধিকার করেন। ১২ বৎসর অবসরোত্তর পর নগর অধিকৃত হয়, সুতরাং ১৪০৮ শকে (১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) হসেনশাহ প্রথম নগর আক্রমণ করেন। এ সময়ে নীলধ্বজের পৌত্র নীলাধর কামতাপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং নীলধ্বজের সমুদ্র হইতে নীলাধরের রাজ্য-কাল সমাপ্তির মধ্যে প্রায় ১৬০। ১৫০ বৎসর অতীত হইয়া ছিল ও নীলধ্বজবংশীয় রাজারা প্রত্যেকে দু্যাবধিক ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। পূর্ব-ভারতের ইতিহাস-লেখক মিঃ মন্সগোমারি মার্টিন সাহেব এ সম্বন্ধে যে সকল কালসংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার মিল নাই। তিনি বলেন, হসেনশাহ ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪১৮ শকে) রাজ্য-রোহণ করেন এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্তী পৌত্ররাজ

নগরতশাহ ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৪৫ শকে) রাজ্যারোহণ করেন; সুতরাং হসেনশাহের রাজত্বকাল ২৭ বৎসর। এই ২৭ বৎসর হইতে নগরারোহণের ১২ বৎসর (মিঃ মার্টিন ইহা বীকার করেন না, তিনি ইহাকে অতিশয়োক্তি বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন, এবং তিনি নিজেও অবসরোপ-কালের কোন সংখ্যা দেন নাই) কাল বাদ দিলে ১৫ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। আবার বিখসিংহের কামতাপুর অধিকারকাল বুদ্ধজীমতে ১৪২০ ও ১৪৩০ শকের (১৪৯৮ ও ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে) মধ্যে। মিঃ মার্টিন বিখসিংহের কামতাপুর অধিকারসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। পূর্বোক্ত কালসংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় যে, হসেনশাহ বীর রাজ্যারোহণের কাল (মার্টিনের মতে ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ বা ১৪১৮ শক) হইতে প্রায় ৬০ বৎসর পরে (বুদ্ধজীমতে ১৪০৮ শকে বা ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) কামতাপুর আক্রমণ করেন; কিন্তু তাহার রাজত্বকালের পরিমাণ (মার্টিন মতে) কেবল ২৭ বৎসর মাত্র। আর বুদ্ধজীমতে কামতাপুরের আক্রমণকাল ১৪০৮ শক বা ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, কিন্তু মার্টিন মতে ঐ সময় (১৪৯৬+১৫) ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দ বা ১৪৪৩ শক বা তাহার দু-পাঁচবৎসর পূর্বে; কারণ, বুদ্ধজীমতে বিখসিংহের কামতাপুর অধিকার কাল বিবেচনা করিলে, বুঝা যায় যে, কিছু দিন কামতাপুরে মূলসমানের অধিকার ছিল।

কামতাপুর নামের কারণ—বুদ্ধজী মতে নীলধ্বজ ইহার স্থাপিতা নহেন, কিন্তু তাহা কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াও ইহার প্রাচীন নাম বর্তমান থাকে, কারণ, বুদ্ধজী-পাঠে ১২২০ শকেও কামতাপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার মূল-স্থাপিতার নাম বুদ্ধজীমতে নাই। এই নগরে কামতেশ্বরী নামে শিল্পীমারীর তীরবর্তী গোলাইনিমারী নামক স্থানে এক দেবী আছেন। অনেকে মনে করেন, এই দেবীর নামানুসারে নগরের নামকরণ হইয়াছে। কামতাপুরের দুর্গে ভগ্নাবশেষের বিবরণ হলে এই কামতেশ্বরীদেবীর উল্লেখ করা গিয়াছে। দুর্গের উত্তরাংশের বৃহৎ ভূপে ইহার প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এই দেবী সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। “প্রাগুজ্যোতিপুরাধিপতি ভগ্ন-দত্ত শিববরে একটি কবচ পাইয়াছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে ভগদত্ত নিহত হইলে, এই কবচ হস্তিনাতেই ছিল। শেষে পূর্বোক্ত নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ একদিন স্বপ্ন দেখিয়া, স্বপ্ননির্দিষ্ট উপায়ে এই কবচ আহরণ করিয়া, দুর্গমধ্যে মন্দির নির্মাণপূর্বক তাহাতে স্থাপন করেন। স্বপ্নেই এই কবচের পূজাপদ্ধতি ও অধিষ্ঠাত্রীদেবীর মূর্তি

অবগত হন এবং তদনুসারে দেবীপ্রতিমা গড়াইয়া তন্মধ্যে কবচটি রক্ষা করেন। ইহার নিকট পূর্বে বলি হইত। অবশেষে মুসলমান হন্তে দেবী-প্রতিমা বিনষ্ট হইলে কবচটি একটি পুষ্করিণী মধ্যে অর্পিত হয়। তৎপরে বিশ্বসিংহ-বংশীয় বিহারের চতুর্থ রাজা প্রাণনারায়ণের অধিকারকালে তুনা নামে একজন ধীরর বেখানে শিকারী নদী নগরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নিকটে একটি পুষ্করিণীতে মন্ত ধরিবার জন্য জাল ফেলে; কিন্তু সে জাল এত ভার বোধ হইল যে, কিছুতেই উঠাইতে পারিল না, অবশেষে রাজার নিকট সংবাদ দিল। রাজা প্রাণনারায়ণ কবচের ব্যাপার জানিতেন ও সেজন্য উৎসুকও ছিলেন; এক্ষণে এই সংবাদে উল্লাসিত হইয়া, ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হস্তায়ে-হণে একজন ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া জলে ডুব দিয়া জাল মধ্যে কবচ পাইলেন এবং হস্তস্থিত একটি রেশমী খালিতে পুরিয়া হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করাইয়া, হস্তকে ইচ্ছামত ঘাইতে দিলেন। হস্তী শিকারীর ভীরদিয়া চলিতে লাগিল; অবশেষে বেখানে ঐ নদী প্রাচীন নগর-সীমানা পরিভ্রাম্য করিয়াছে, তাহারই নিকটে গোঁসাইনী মারী নামক স্থানে দণ্ডায়মান হইল, আর কিছুতেই নড়িল না। ব্রাহ্মণেরা স্থির করিলেন যে, দেবীর এই স্থান হইতে বাই-বার ইচ্ছা নাই। রাজা কাজেই এইখানে মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিলেন এবং প্রথমতঃ বিশ্বসিংহের আনীত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে একজনকে পূজক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু দেবী স্বপ্নে মৈথিলী ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে পূজক নিযুক্ত করিতে আদেশ দিলেন; কারণ, তাঁহারাই পূর্বে দেবীর পূজা করিতেন। তাহারই হইল। এইরূপে যে মৈথিলী পূজক নিযুক্ত হইলেন, কিছু দিন অতীত হইলে তিনি একদিন রাজাকে বলিলেন যে, দেব্যাদেশে তাঁহাকে প্রত্যহ রাজে দেবীমন্দিরে চক্ষু বঁধিয়া ঘাইতে হয় ও সেখানে তিনি ভাবলা বাজাইতে থাকেন এবং দেবী একটি মন্দিরী সুবস্ত্রীয় বেশে উলঙ্গ হইয়া তালে তালে নৃত্য করেন, কিন্তু দেবীর নিষেধে তিনি কখন সে রূপ দেখেন নাই। তুমি রাজার কোতূহল জন্মিল, সেই রাজে মন্দিরে গিয়া দরজার কাটল দিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেবী অন্তর্ধামিনী; তিনি জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নৃত্য বন্ধ করিলেন এবং এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, অভঃপর যদি বর্তমান নারায়ণবংশীয় কোন রাজা কোন দিন কি দিবসে কি রাজে মন্দিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই অবধি আজও ভবংশীরেরা কেহ মন্দিরের সীমানা

প্রবেশ করেন না। কিন্তু সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই মন্দির আজও বর্তমান। ইহা ইষ্টকে নির্মিত; গঠন-প্রণালী মুসলমানী ধরণে। মন্দিরের চতুর্দিকে গুলো-দ্যান। এই মন্দিরের প্রতিমা নূতন, নির্মিত প্রতিমা-গর্ভে সেই কবচ আছে। মন্দির মধ্যে একখানি প্রস্তরকলকে বাহুদেব-মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। কথিত আছে, এই প্রস্তর খণ্ড প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে পাওয়া যায়। শুনা যায়, অর্থ পাইলে পূজকেরা নাকি যাত্রীদিগকে প্রতিমা গর্ভ হইতে সেই কবচ দেখাইয়া থাকে; কিন্তু ইহা অতি গোপনে করিয়া থাকে।

কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখন কৃষ্ণকায় ভালুকের আবাস হইয়াছে।

আইন আকবরীতেও কামতাপুরের উল্লেখ আছে।

মার্টিন সাহেব মালদহ হইতে একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পান, তাহাতে বঙ্গদেশের বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, নসরত শাহের অব্যব-হিত পূর্ববর্তী হুসেনশাহ কামতাপুরের হরণনারায়ণকে বিনাশ করিয়া তদ্রাজ্য অয় করেন। হরণনারায়ণ সদা লক্ষ্মীমান্রাজের পোজ ও মালিকান্রাজের পুত্র।

কামতাল (পুং) কামং তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তি, কাম-তল-নিচ-অণ্। কোকিল।

কামতি, মধ্য প্রদেশের নাগপুর জেলার একটি প্রধান নগর। এখানে সেনানিবাস আছে। অক্ষা° ২১°৩৩'৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°১৪'৩০" পূঃ। নাগপুর সহর হইতে উত্তর পূর্বে ৪৫ ক্রোশ। লোকসংখ্যা ৫০,৯৮৭। এখানে দেশী ও বিলাতী কাগড় এবং লবণ পশাদির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। শস্তের ব্যবসা প্রায় মারবারী মহাজনের হস্তগত। কার্খার ব্যবসাও বেশ চলে। এখানে বংশীলাল আবীরচাঁদের নির্মিত একটি মন্দির বাঁধান পুষ্করিণী এবং তৎ সংলগ্ন একটি মন্দির, ও একটি বাগান আছে। কনহান নদীর উপর সেতু আছে, তাহার উপর দিয়া নাগপুর ও ছত্রিশগড়ের রেল গাড়ী চলে। রেলের একটি ষ্টেশনও হইয়াছে। ঔষধালয়, বিদ্যালয় ও অভিধিগণের জন্য ধর্মশালা আছে। এখানে ৪৬০টি কুপ দেখিতে পাওয়া যায়।

কামতিধি (স্ত্রী) কামত পূজার্থে প্রস্তুতা তিথি; মধ্যলোচ্য জ্যোতিষী; এই তিথিতে কামদেবের পূজা করিতে হয়।

কামতাপুর। মধ্যপ্রদেশের ভাভার জেলার তিরোয়া বিভাগের জমিদারী লাট। পরিমাপ ২৭১ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা ৭৮,৮১৬, উচ্চতা ৩০,৮৯১ জন পুরুষ ও ৩৯২২৯ জন

জী। ইহাতে ১২৩৪টি গ্রাম আছে, ১৩৫১১ ঘর লোকের বাস। গ্রাম পথ বৎসরের উপর হইল, নাগপুরের রাজার অধীন একটি কুনবি বৎসরের জমিদারী ছিল। কিন্তু রাজার দিগকে বিজ্ঞাপিতকরণের লক্ষ টকা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া লোদীবাংশীর একজনকে দেওয়া হয়। তাহার টাকা দিয়া ভোগ করিতেছেন। এই নামে এই জমিদারীতে কামতা নামে একটি গ্রামও আছে। উহা অক্ষা° ২১°৩১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২১' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৬১২। অধিবাসীরা চাষ বাস করে। কামতার সর্দার বা জমিদার এইখানে থাকেন। তাহার বাটীর চারিদিকে প্রাচীর ও গড় দ্বারা বেষ্টিত।

কামদ (জি) কামঃ অভিলাষঃ দদাতি, কাম-দা-ক। ১ কামদাতা। ২ অতীষ্টপ্রদ। ৩ (পুং) কামঃ দ্যতি বসৌন্দর্য্যেণ অবধগুরতি, উর্জয়ন্তব্যং নাপরতি বা, কাম-দ্যো-ক। কান্তিকের।

কামদগিরি, চিত্রকূটের অপর নাম। [চিত্রকূট, দেখ।]

কামদমিনী (জী) কামত্ব নমঃ উপশমঃ অন্ত্যভাঃ, কাম-দম-ইনি। যে নারী কাম রিপু বশীভূত করিয়াছে।

কামদর্শন (জি) কামঃ মনোজ্ঞঃ দর্শনং বস্ত, বহুব্রী। মনো-রম দর্শন, সুন্দর।

কামদা (জী) কামঃ অতীষ্টঃ দদাতি, কাম-দা-ক-টাণ্। কামধেহু।

(কামদা কামধেনোদ্রী কামদাতরি বাচ্যবৎ। মেদিনী)

কামদুহ (জি) কামঃ দোহি, কাম-দুহ-ক-হত্বাৎ। অতীষ্ট সম্পাদক, বাহার কাছে যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিয়া, লাভ করা যায়।

কামদুঘা (জী) কামঃ দোহি, কাম-দুহ-ক-টাণ্। কামধেহু। [কামধেহু দেখ।]

কামদুহ্ (জি) কামঃ দোহি, কাম-দুহ-কিণ্। অতীষ্টপ্রদ।

কামদূতিকা (জী) কামত্ব দূতিকা ইব উদীপকত্বাৎ। নাগদত্তী।

কামদূতী (জী) কামত্ব দূতীবা, উপনিং। পাকুল গাছ।

কামদেব (পুং) কাম এব দেবঃ। কন্দর্প। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—মদন, সম্মথ, মার, প্রেয়ার, মীনকেতন, কন্দর্প, দর্পক, অনল, পঞ্চশর, অর, পঞ্চরারি, মনসিঙ্গ, কুল্লমেয়ু, অনন্তল, পুষ্পধরা, রতিপতি, মকরধ্বজ, আয়তু, ব্রহ্মহ ও বিশ্বকেকু। শাস্ত্রকারগণ কামের পঞ্চাশ প্রকার ভেদ বলিয়া থাকেন—১ কাম, ২ কামদ, ৩ কামত, ৪ কাম্ভিমান, ৫ কামগ, ৬ কামচর, ৭ কামী, ৮ কামুক, ৯ কামবর্জন, ১০ রাম, ১১

রম, ১২ রমণ, ১৩ রতিনাথ, ১৪ রতিপ্রিয়, ১৫ রাজিনাথ,

১৬ রমাকান্ত, ১৭ রমবর্ষি, ১৮ নিশাচর, ১৯ নন্দক, ২০ নন্দন, ২১ নন্দী, ২২ নন্দরিতা, ২৩ পঞ্চবাণ, ২৪ রতিনথ, ২৫ পুষ্পধরা, ২৬ মহাবল্লভ, ২৭ ভ্রামণ, ২৮ ভ্রমণ, ২৯ ভ্রমবাণ, ৩০ ভ্রম, ৩১ ভ্রাত, ৩২ ভ্রাতক, ৩৩ ভ্রত, ৩৪ ভ্রাতচর, ৩৫ ভ্রমাবহ, ৩৬ মোহন, ৩৭ মোহক, ৩৮ মোহ, ৩৯ মোহ-বর্জন, ৪০ মদন, ৪১ সম্মথ, ৪২ মাতক, ৪৩ কুল্লমারক, ৪৪ গারন, ৪৫ গীতিক, ৪৬ নর্তক, ৪৭ খেলক, ৪৮ উল্লভোন্মতক, ৪৯ বিলান ও ৫০ লোভবর্জন।

অরদীপিকাগ্রহে এই কয়েকটি কন্দর্পের স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে,—

“পাদে শুলকে তথোরো চ ভগে নাভৌ কুচে হৃদি।

ককে কঠেচ ওঠেচ গণ্ডে নেদে শ্রভাবপি ॥

ললাটে শীর্ষকেশে কামদানং তিথিক্রমাৎ।

নকে পুংসাং জিরা বামে শুক্রককে বিপর্যায়ঃ ॥

পাদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিপদি বিতীরায় শুক্রককে।

উরুদেশে তৃতীরায় চতুর্থায় ভগদেশতঃ ॥

নাভিহানে চ পঞ্চম্যায় বর্তীভ কুচমণ্ডলে।

সপ্তম্যায় হৃদয়েচৈব অষ্টম্যায় ককদেশতঃ ॥

নবম্যায় কঠদেশে চ দশম্যায় চোঠদেশতঃ।

একাদশ্যায় গণ্ডদেশে দ্বাদশ্যায় নরনে ভবা ॥

ত্র্যবশেচ জয়োদশ্যায় চতুর্দশ্যায় ললাটকে।

পৌর্ণমাস্যায় শিখায়াক জাভব্যাক ইতি ক্রমাৎ ॥”

“পদবর, শুক্রবর, উরুবর, ভগ, নাভি, কুচবর, হৃদয়, কক, কঠ, ওঠ, গণ্ড, চকু, কর্ণ, ললাট, মস্তক ও কেশ; তিথি অঙ্গুষ্ঠায় ইহার এক একটি স্থানে কামদেবের অধিষ্ঠান হয়। শুক্রপকে পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গ ও জীর বাহ অঙ্গ; এবং শুক্রপকে পুরুষের বাম অঙ্গ, ও জীর দক্ষিণ অঙ্গ; এইরূপে উক্তস্থান সনুহের বিপর্যায় বাটরা থাকে। প্রতিপদু তিথিতে পদাঙ্গুষ্ঠে, বিতীরায় শুক্রকে, তৃতীরায় উরুদেশে, চতুর্থীতে ভগ-দেশে, পঞ্চমীতে নাভিদেশে, বজীতে কুচমণ্ডলে, সপ্তমীতে হৃদয়ে, অষ্টমীতে ককদেশে, নবমীতে কঠে, দশমীতে ওঠ-দেশে, একাদশীতে গণ্ডদেশে, দ্বাদশীতে চক্কে, জয়োদশীতে কর্ণে, চতুর্দশীতে ললাটে ও পুর্ণিমায় মস্তকে, কামদেবের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে।

কামদেবের ধোবনুর্ধ্বি এইরূপ—

“কামদেবস্ত কণ্ঠব্যঃ পঞ্চপদ্মবিভূষণঃ।

চাপবাণকরচৈব বদ্যাকৃতিভোগোদনঃ ॥

রতিঃ প্রীতি তথাশক্তি তর্ক্যাট্টকতাতথোচ্ছল্যঃ ॥

চতুস্তম্ভ কণ্ঠব্যঃ পদ্যো রূপমনোহরঃ ॥

চত্বারশ্চকরাভ্যন্তর্য কার্য্য। ত্র্যম্বকো নোমহাঃ ।

কেতুশ্চ মকরঃ কার্য্যঃ পঞ্চবাণমুখো মহান ॥”

(হেমাদ্রিভূত বিষ্ণুধর্মোত্তর।)

“শম্ভু, পদ্ম, ধনুঃ ও বাণধারী, মদজন্তু জীবৎ কুণ্ঠিত চক্ষুঃ, মকর কেতু, পঞ্চবাণ, এবং রতি, প্রীতি, শক্তি ও উজ্জ্বল নারী চারিটি স্ত্রী বিশিষ্ট।”

অথেষে কামের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে;—

“কামো জন্তে প্রথমো নৈনম দেবা আপুঃ।”

সর্ব প্রথমে মনোর উপর কামের আবির্ভাব হওয়ার তাহা হইতেই সর্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল।

(খৃষ্ ১০।১২৯।৪।)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—“ব্রহ্মা যে সময়ে দক্ষ প্রভৃতি মানস পুত্রগণ সৃষ্টি করেন, সেই সময়ে সক্ষা নারী একটি রূপবতী কস্তুরও উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই মনোরম কস্তা দর্শনে ‘ইনি জগতের কোন্ কার্য্য করিবেন’, এই-রূপ চিন্তা ব্রহ্মহৃদয়ে উপস্থিত হওয়ার পরম রমণীয় সৃষ্টি কামদেবের জন্ম হইয়াছিল। ব্রহ্মা তাঁহাকে জগতের নর নারীসমূহকে মুগ্ধ করিতে আদেশ করিয়া ফুলধনু ও ফুলশর প্রদান করেন। কাম সেই ফুল বাণ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে কি না পরীক্ষার জন্য সমীপস্থ ব্রহ্মা, দক্ষাদি ঋষি ও সক্ষাকে ঐ বাণাঘাত করেন, তাহাতে সকলেই কামপীড়িত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে মহাদেব তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার কস্তাপ্রতি কামতাব দর্শনে তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই উপহাসে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া স্বীয় কামবেগ নিরোধ করিলেন, এবং কামদেবের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ‘তুই হর কোপানলে দগ্ধ হইবি’ বলিয়া অভিশাপ দিলেন। কামদেব অকারণে এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট অশ্রুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। তখন ব্রহ্মাও কামদেবের তাদৃশ অপরাধ না দেখিয়া ‘পুনর্বার শরীরপ্রাপ্ত হইবে’ বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং দক্ষদেহজাত রতি নারী স্তন্যময়ী রমণীকে তাঁহার পত্নীষে নিয়োজিত করিলেন। (কাং পু ১ অঃ।)

এদিকে সক্ষা পিতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে অভিশাপ করিতেছেন ভাবিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং সেই স্থগিত দেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য তপস্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্তার প্রীতি হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সক্ষা প্রথমতঃ অজ্ঞ কোন বর প্রার্থনা না করিয়া কেবল এই চাহিলেন যে, “প্রাণিগণ উৎপত্তি মাত্রই যেন সকাম না হয়।” ভগবান্ তাঁহার এই

প্রার্থনামুসায়ে শৈশব, কৈশর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই চারিভাগে বরক্রম বিভক্ত করিয়া, তাহার তৃতীয়ভাগ অর্থাৎ যৌবনই কামোৎপত্তির কালরূপে নির্দেশ করিলেন এবং কৈশরের শেষ সময় ও তাহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিলেন। (কাং পু ১৯ অঃ।) এই জন্যই প্রাণিদিগের উৎপত্তি মাত্রই কামতাব প্রকাশিত হয় না।

দেবগণ তারকাসুরের উৎপীড়নে, যে সময়ে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ইজ্ঞের আদেশে শিবদ্ব্যন ভজ করিতে যাওয়ার কামদেবকে কিছুদিন অলম্বন হইতে হইয়াছিল। শিব পুরাণে ইহার আধ্যাত্মিক এইরূপ বর্ণিত আছে—“মহাদেবী সতী দক্ষবজ্রে দেহ পরিত্যাগ করিলে পর, মহাদেব কঠোর জিতেস্ত্রিতা অবলম্বনপূর্ব্বক মহা-যোগে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তারকাসুর দেব-সমূহের প্রতি নিতান্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করায়, দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহার বধসাধনের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইজ্ঞাদি দেবগণ স্বয়ং কোন উপায় নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, ব্রহ্মার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, ‘মহাদেব-বর্ষা ঋতুতে তারকাসুরের নিধন হইবে না; মহেশ্বরী সতী হিমালয়গৃহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া, মহাদেবের স্তম্ভস্বরাজ্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে রহিয়াছেন, এই সময়ে মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে পার্শ্বভীতিতে অস্তিত্বাধী করিতে পারিলে, মহাদেব ঔরসে মহাবীর কুমার জন্মগ্রহণ করিয়া, তারকাসুরের নিধন সাধন করিবেন।’ দেবগণ সেই পরামর্শ অনুসায়ে কামদেবকে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে নিযুক্ত করিলেন। আজ্ঞা মাত্রই কামদেব রতি ও বসন্তসহ সদর্পে মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে উপস্থিত হইলেন এবং ফুলধনুতে ফুলবাণ বোজন করিয়া মহাদেব উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেব কন্দর্পবাণে আহত হইয়াই সন্ধোদে কন্দর্পের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে মহাদেবের ললাট দেশ হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া কন্দর্পমূর্ত্তি একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।” পরজন্মে ইনিই ত্রীকূটপুত্র প্রচ্যায়রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হরিবংশে ইহার জন্ম-বিবরণ এইরূপ বর্ণিত আছে—ত্রীকূট ঔরসে কক্ষিণী গর্ভে প্রচ্যায়ের জন্ম হয়। জন্মের পর সপ্তমরাজে শব্দাসুর মার্য্য-বলে ইহাকে স্তম্ভিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া আনিয়া, স্বীয় পত্নী মার্য্যবতীকে দান করেন। মার্য্যবতীর সন্তানাদি না থাকায়, এই শিশুটি প্রাপ্ত হইয়াই অত্যন্ত আত্মাদিত হইলেন। পরে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিশেষরূপে লক্ষ্য

করিয়া, মারাবতী বৃত্তিতে পারিলেন যে, এই শিশুই তাঁহার প্রিয়তম স্বামী কন্দর্প। হরকোপানলে দক্ষ হওয়ার পর দেবগণ এইরূপেই তাঁহার পুনর্জন্ম পতি প্রাপ্তির বিষয় বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার স্মরণ হইল। সুতরাং তিনি স্বাভাবিক শিশুর প্রতিপালন করিতে না পারিয়া স্বামী হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং রসারনাদি প্রয়োগ দ্বারা স্বহস্তেই তাঁহাকে সঞ্চর্চিত করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রহ্লাদও তখন বৈষ্ণবদ্বারের দ্বারা শব্দরাস্যকে নিহত করিয়া পত্নীসহ পিতৃগৃহে আগমন করিলেন। মারাবতী বাহিরে শব্দরাস্যের পত্নীরূপে পরিচিতা থাকিলেও বস্তুতঃ তিনি তাঁহার পত্নী ছিলেন না; কন্দর্প পত্নী রতি পুনর্জন্ম পতি প্রাপ্তি কামনার, দেবগণের আদেশে এইরূপ মারাবল দ্বারা শব্দরাস্যের পত্নীরূপে অবস্থান করিতে ছিলেন। (হরিবং ১৬৩ অঃ।)

মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে কাম ধর্মপুত্র বলিয়া লিখিত আছে—

“শ্রদ্ধা কামঃ চলা দর্পঃ নিয়মঃ ধৃতিরাজস্বজ।
সন্তোষঞ্চ তথা ভূটিলোভঃ পুষ্টিরহস্যতঃ ॥
মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ।
বোধঃ বুদ্ধি স্তথা লজ্জা বিনয়ঃ বপুঃস্বয়ম্ ॥
ব্যবসায়ঃ প্রজ্ঞাভ্যেবৈ কেমঃ শান্তিরহস্যতঃ।
সুখং সিদ্ধির্ঘণঃ কীর্তিরিত্যেতে ধর্মস্বনবঃ ॥”

ত্রয়োদশ ধর্মপত্নী মধ্যে শ্রদ্ধা কাম নামক পুত্র, চলা দর্প, ধৃতি নিয়ম, ভূটি সন্তোষ, পুষ্টি লোভ, মেধা শ্রুত, ক্রিয়া দণ্ড, নয় ও বিনয়, বুদ্ধি বোধ, লজ্জা বিনয়, বপু ব্যবসায়, শান্তি কেম, সিদ্ধি সুখ, এবং কীর্তি যশঃ নামক পুত্র প্রসব করেন; ইহারা সকলেই ধর্মপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(হরিবং ৭ম ২৬-২৮।)

ভাগবতের মতে কাম ব্রহ্মপুত্র—

“হৃদিকামো ক্রোধো ক্রোধো লোভশচাধোরধচ্ছদাৎ।

ব্রহ্মের হৃদয়ে কাম, ক্রোধে ক্রোধ ও অধরোষ্ঠ হইতে লোভের উৎপত্তি হইয়াছে।

ভাগবতেরই অন্তর্ভুক্ত আবার কাম সত্ত্বের পুত্র বলিয়া লিখিত আছে—

“সত্ত্বরাস্ত সত্ত্বঃ কামঃ সত্ত্বরজঃ স্তুতঃ।”

ব্রহ্মসত্তা সত্ত্বরাস্ত সত্ত্বঃ এই সত্ত্ব হইতে কামের উৎপত্তি হইয়াছে। (ভাগ ৩।৩। ১০।)

বজ্রসূক্তেও কামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কামই দাতা ও গৃহীতা বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।

“কোদাং কন্না অদাং কামোদাং কানারাদাং।

কামোদাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কানৈভতে ॥”

কে দান করিয়াছে, কাহাকে দান করিয়াছে, এইরূপ প্রশ্ন হইলে, তাহার এইরূপ উত্তর দেওয়া হয় যে: কাম দান করিয়াছে এবং কামকেই দান করিয়াছে; যেহেতু কামই দাতা এবং কামই প্রতিগৃহীতা। অতএব হে কাম এই দ্রব্য তোমারই। (যজুঃ ৭।৪৮।)

২ গোপকপুরীর একজন কামদ্বারাজ। ইহার মহাবীর নাম কেতলাদেবী। ইনি একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন, বাহু বলে মলয়, কোকণ ও সহ্যাদ্রি জয় করিয়াছিলেন। শিরলিপি অনুসারে ইনি ১১৮১ খৃঃ হইতে ১২০৪ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৩ ভট্টনারায়ণ পুত্র। [ভট্টনারায়ণ দেখ।] ৪ পরমেশ্বর। ৫ মহাদেব। ৬ কবিরিশেষ। ৭ রাজবিশেষ, ইহার রাজধানী জয়ন্তীপুর। “রায়বগাওবীর” প্রণেতা কবিরাজ নামক কবির প্রতিপালক। ৮ প্রারম্ভিকপদ্ধতি নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণেতা।

৯ “সংকৃত্য মুক্তাবলী”-প্রণেতা রঘুনাথের প্রতিপালক।

১০ “চতুর্ভুজচিন্তামণি”-প্রণেতা হেমাদির পিতা, ইহার পিতার নাম বাহুদেব, পিতামহের নাম বামন।

১১ জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্বিৎ।

১২ “কর্মপ্রদীপিকা” “পারদ্বারপদ্ধতি” “পারদ্বারগৃহপরিশিষ্টপদ্ধতি” প্রভৃতির গ্রন্থকার। ইহার পিতার নাম গোপাল। কামদেব কবিরাজ, ৮৩৭র প্রাচীন টীকাকার।

কামদেবদূত (কী) বৈদ্যাশাস্ত্রোক্ত বৃত্তবিশেষ।

অখণ্ডাকা ১২০ সের, গোক্ষুর ৬০ সের; শতমূলী, ভূমি-কুম্ভাণ্ড, শালপাণী, বেড়োলা, গুলঞ্চ, অশ্বখের শূলা, পদ্মবীজ, পূর্ণবা, গান্তারীফল ও মাষবীজ প্রত্যেক ১০ সের; এই সকল দ্রব্য ৩৬৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, ১৪ সের জল থাকিতে ঐ জল ছাকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ কাথের সহিত কিস্মিস, পদ্মকাঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, তেজপত্র, নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলভূঁদি, অনন্তমূল, শ্রামলিতা এবং জীবনীরাগণোক্ত অখণ্ডাকা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, বংশ-লোচন, খেতবেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে, কাকোলা, কীর-কাকোলা, যুগানী ও বাবানী; ইহাদিগের প্রত্যেকের পরিমাণ ২ তোলা, মিস্রি ৮ তোলা, এবং পুঁড়ী ইক্ষুর রস ১৬ সের; একত্র যথার্থিতা পাক করিয়া এই বৃত্ত প্রস্তুত করিতে হয়। এই বৃত্ত ব্যবহার করিলে রক্তপিণ্ড, কণ্ঠ, কামলা, বাতরক্ত হৃদীমক, পাণ্ডু, বিবর্ণতা, শরৎকাল, মূত্র-কৃত্ত, বকোদাহ ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়। (চন্দ্রসংহত।)

কামদেব সীমাংসকরীকিত "প্রারম্ভিক পদ্ধতি" প্রণেতা। কামদোহী [ব] (জি) কামঃ দোহি, কাম-দুহ-মিনি। লক্কাটপ্রদ, বাহা কিছু প্রার্থনা করিলেই দাহার, নিকট পাওয়া যায়।

কামধর (পুং) কাম ইতি সংজ্ঞাং ধরতি, ধারয়তি বা, কাম-ধ-অচ্। কামরূপদেবীর স্বতন্ত্ররূপ নামক পর্কতস্থিত সরো-বরনামেব। কালিকাপুরাণে এই সরোবর একটি তীর্থ বলিয়া বর্ণিত আছে। এখানে বথাবিধি জান ও এই জল পান করিলে, সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শিব-লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। (কালিকা পুঃ ৮১ অঃ।)

কামধেনু, ১ শব্দপ্রণীত একখানি প্রাচীন স্ততিগ্রন্থ। বাচ-স্পতি মিশ্রের "বৈতনির্ণয়" গ্রন্থে ও চণ্ডেশ্বর, বর্দ্ধমান, রঘু-সঙ্কন, কলকাত্ত প্রভৃতির গ্রন্থে এবং স্তত্যর্থগারে ইহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ তত্ত্ববিশেষ।

৩ কাব্যকামধেনু নামক বৃহৎ অলঙ্কার গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার।

৪ একখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ। ত্রিবিধকামনি কামধেনু নামে প্রসিদ্ধ।

৫ মূর্ত্ততিতামনিগ্রন্থের সিকাবিশেষ।

৬ অনন্তপ্রণীত একখানি গণিত গ্রন্থের টীকার নাম কামধেনু।

কামধেনু (স্ত্রী) কাম প্রতিপাদিকা ধেনুঃ, মধ্যলোঃ। ১ গাভীবিশেষ, এই গাভীর নিকট ইচ্ছানুসারে কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে, তাহা পাওয়া যায়।

অগ্নিপুরাণে এই কামধেনু দান মহাপুণ্য কার্য্য বলিয়া বর্ণিত আছে। দান বিধিও তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে বথা—"কার্ত্তিকমাসের শুক্ল একাদশীতে উপবাস করিয়া, ৪ দিন পর্য্যন্ত লক্ষ্মীসহ নারায়ণের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে পঞ্চমদিনে প্রাতঃকালে দান করিয়া, শুক্লবস্ত্র, শুক্লমাণ্য ও শুক্ল অলংকরণ ধারণ করিবে। দান ভূমি সুগন্ধ, তিলগ্রন্থ ও স্বর্ণাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া, সবৎসা কামধেনু তথায় আনয়ন করিতে হইবে। এই ধেনুর শূন্য ও পুরসমূহ স্বর্ণ দ্বারা আবরিত করিয়া, সমস্তগায়ে একখানি শুক্লবস্ত্র আচ্ছাদন দিবে। অনন্তর বথাবিধি মন্ত্রাদি দ্বারা গাভীর পূজা করিয়া, নারায়ণোদ্দেশে গাভী দান করিতে হইবে।"

২ দানের অস্ত্র স্বর্ণনির্মিত ধেনুবিশেষ।

দানসাগরে স্বর্ণনির্মিত কামধেনুর দানবিধি লিখিত

আছে। "শাক্ত অঙ্গুসারে ৩ পনের অধিক হইতে সহস্রপল পর্য্যন্ত স্বর্ণদ্বারা সবৎসা কামধেনু প্রস্তুত করিয়া, রত্নদ্বারা বিভূষিত করিতে হয়। সহস্রপল স্বর্ণ উপরোক্তবিধি, পাঁচ-শত পল মধ্যমবিধি, এবং আড়াইশত পল অধরবিধি; নিত্যন্ত অসমর্থের জন্য তিনপলের অধিক স্বর্ণেরও বিধান আছে। তুল্যপুরুষ কথিত সময় মধ্যে কোন দিন দানকাল নির্দিষ্ট করিয়া, তাহার পূর্বদিন শুক্ল, পুরোহিত, বজ্রদান ও জাপক চারিজনই হবিষ্যতোজনাদি করিয়া, নিবেদন ও সঙ্কর করিয়া রাখিবেন। অপরদিনে বজ্রদান গোবিন্দাদির আরাধনা, মধুপূর্ব দান ও ব্রাহ্মণদিগের অন্নমতি গ্রহণ করিবেন। শুক্ল, পুরোহিত ও জাপককে এইদিন উপবাস করিতে হইবে। তৎপরদিনে অগ্নিহোমাদি কার্য্য সমাপন পূর্বক, পুরোহিত প্রধানবেদীর মধ্যস্থলে লিখিত চক্রের উপর কৃষ্ণ সুগন্ধ ও শুভগ্রন্থ বসাক্রমে স্থাপন করিয়া, তাহার উপর কোবের বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত সবৎসা ধেনু স্থাপন করিবেন। ধেনুর পার্শ্বদেশে আটটি পূর্বকৃত, অষ্টাদশ প্রকার ধাতু, নানাবিধ ফল, রত্ন, ইক্ষুগু, কাংস-পাত্র, পট্টবস্ত্র, তাম্রনির্মিত দোহনপাত্র, প্রদীপ, আভরণ ও পাণ্ডকাষর এবং ধেনুর সমুখভাগে মধুরাদি ও রস, হরিদ্রা, পুষ্পাদি বিবিধ পূজাজব্য, জীরা, ধনে ও শর্করা স্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর মঙ্গলগীত বাদ্য ও স্ততিপাঠ সহকারে বজ্রকুণ্ডের সমীপস্থ চারিটি কুণ্ডের জলদ্বারা বজ্র-দানকে দান করাইতে হইবে। দানান্তে বজ্রদান শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া, শুক্লমাণ্য ও বিবিধ অলঙ্কারধারণপূর্বক কুণ্ডস্থে পুষ্পাজলি গ্রহণ করিয়া কামধেনুকে প্রবেশিত পূজা করিবেন এবং ঐ ধেনু শুক্লকে প্রদান করি-বেন। পরিশেষে শুক্ল, পুরোহিত ও জাপককে দক্ষিণাদান, এবং অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে অর্থদান করিয়া দান ব্রত সমা-পন করিবেন। ৩ স্বর্ণধেনু সুরভির দৌহিত্রী ধেনুবিশেষ। কালিকাপুরাণে ইহার উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—"ঋগ্বেদে সমুদ্রের আদিগ্রন্থি সুরভি দক্ষের কন্যা ছিলেন; প্রজাপতি কস্তপ ঔরসে তাঁহার গর্ভে রোহিণীর জন্ম হয়; এই রোহিণীই তপোমিথি শ্রুতেন সীমক বহুর ঔরসে সর্বলক্ষণসম্পন্ন কামধেনু প্রসব করিয়াছিলেন। ইহার বর্ণ খেত, চতুর্ভুজ ইহার চতুর্ভুজ স্বরূপ, এবং চারিটি পদ দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিববাহন রূপ এই কামধেনু গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিল। যৌবনে কামধেনুর লাগণাত্মী অধিকতর বুদ্ধি পাওয়ার কোন কাঙ্ক্ষাভাব তাঁহাকে দেখিয়া কামাতুর হইয়া উঠে

এবং নিজেও বুঝে মূর্তিধারণ করিয়া, তাঁহার সহিত সজ্জ হইয়া। এই সময়েই একটা বিশালকার বুঝ উপস্থিত হইয়া, নিজের তপস্তাবলে মহাদেবের বাহনস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন।

(কালিকা পু. ৯১ অঃ।)

৪ কামধেনু কুলজাতা নন্দিনী বা শবলা নামী বশিষ্ঠের ধেনুবিশেষ। এই ধেনুর জন্মই বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের তরুণ বিবাহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই বিবাহের ফলেই বিশ্বামিত্র কত্রিগর্ভাভ হইয়াও অন্ধর্বি হইবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে—কোন সময়ে রাজা বিশ্বামিত্র বহু সৈন্ত ও অমাত্য পরিবার প্রভৃতির সহিত বশিষ্ঠ ঋষির নিকট আতিথ্য গ্রহণ করেন; বশিষ্ঠ ঐ কামধেনু হইতে যে সকল উত্তমোত্তম প্রচুর জব্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের সৎকার করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র রাজা হইলেও ঐ সকল জব্যাদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কামধেনু হইতে এইরূপ অসাধারণ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পাওয়া যায় দেখিয়া, শতসংখ্যে দুঃখবতী গাভীর বিনিময়ে তিনি ঐ ধেনুটি বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করেন; বশিষ্ঠ তাহাতে একেবারে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র কোনমতেই সেই গাভীর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন হরণ করিবার জন্ত সৈন্তাদিগকে আদেশ করিলেন। সৈন্তগণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, “বশিষ্ঠ কেন আমার ত্যাগ করিলেন” ভাবিয়া নন্দিনী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্রীম বসে বহুসৈন্ত বিনষ্ট করিয়া, বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি কি আমার পরিত্যাগ করিয়াছেন? নতুবা বিশ্বামিত্রের সৈন্তগণ আমার লইয়া যায় কেন?’ বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, ‘না, আমি তোমার পরিত্যাগ করি নাই এবং কখন করিবও না। অতএব তুমি শত শত মহাবীর সৈন্ত সৃষ্টি করিয়া, বিশ্বামিত্রকে পরাজিত কর।’ বশিষ্ঠের আজ্ঞামাফেই নন্দিনী যোনিদেশ হইতে যবন, পুরীষ হইতে শক, এবং রোমকূপ হইতে স্নেহ, হারীত ও কিরাত সৈন্তের সৃষ্টি করিয়া, বিশ্বামিত্রের সমুদায় সৈন্তের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ তাহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, (এককালে শতগুণেই) বশিষ্ঠের প্রতি ধাবিত হইলেন। বশিষ্ঠ সক্রোধে একটীমাত্র হস্তার দ্বারা ঐ তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

এই অপমানের পর হইতেই বিশ্বামিত্র রাজশক্তি অপেক্ষা তপস্তাশক্তি অধিক ভাবিয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক

কঠোর তপস্তার নিমুক্ত হইলেন এবং সেই তপস্তার ফলেই তিনি অন্ধর্বি নামে কামতালী হইয়া, অন্ধর্বি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (রামা. আ. ৫১ অঃ।)

৫ বোপদেব প্রণীত ধাতুপাঠ নামক পুস্তকের ব্যাখ্যা পুস্তকবিশেষ।

কামধেনুতন্ত্র (কৌ) কামধেনুরি বর্জ্যভিষ্টপ্রদং তন্ত্রম্, মধ্যলো। শিবপ্রোক্ত তন্ত্রবিশেষ।

কামধেনু, রামাৎ অথবা নিমাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণববিশেষ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মী ভিক্স। কামধেনু নামে ভিক্ষায় ব্যবহার করায় ইহাদের কামধেনী নাম হইয়াছে। কামধেনুতন্ত্রটী একগাছি বাঁক। ঐ বাঁকের দুই দিকে দুইগাছি শিকা থাকে, একদিকের শিকার গাভীর আকার, অপরদিকের শিকার হস্তমানের মূর্তি; কামধেনীর দুইবেলা এই বস্ত্রটির পূজা ও আরতি করে।

কামধেনুরী ঐ বস্ত্রটি কাঁধে করিয়া ভিক্ষার বাহির হয়, কাহারও দ্বারস্থ হয় না “ধনুস্ধারী রাম” “ধনুস্ধারী রাম” কেবল এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, গৃহীরা ঐ নাম শুনিয়া ইচ্ছাছাপারে ঐ কামধেনু পাঠে ভিক্ষা প্রদান করে।

কামধ্বংসী [ন] (পুং) কামং কন্দর্পং ধ্বংসয়তি কাম-ধ্বংস্ নিচ্ গিনি। শিব।

কাম্বন (ত্রি) কামরতি কাম-গিৎ যচ্। ১ কামুক।

(কামুকঃ কামিতা কত্রো হনুকঃ কামরতি হমিকঃ।

কামনঃ কমনো হতীকঃ। হেম ৩। ৮৮।)

২ (ভাবে যচ-কৌ) অভিলাষ, ইচ্ছা।

কামনা (কৌ) কামন-টাপ্। ইচ্ছা।

কামনাশক (পুং) কামং কন্দর্পং নাশয়তি, কাম নশ্-গিচ্ ধূল্। ১ মহাদেব। ২ (ত্রি) কামনাশক ঐষাদি।

কামনীয়ক (কৌ) কামনীয়ত্বাৎ, কামনীয়-বৃদ্ধ্। রমণীয়তা।

কামন্দকি (পুং) কামন্দকত্বাৎ অত্যন্ত পুমান্, কামন্দক ইঞ্। জনৈক নীতিশাস্ত্র প্রণেতা।

ঐ গ্রন্থ কামন্দকীর নীতিশাস্ত্র নামে খ্যাত এবং ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাও মহাত্মারতের দ্বারা প্রাচীনকালে রচিত হয়। অতিপূর্ব্বকালে এই নীতিশাস্ত্রখানি বালি প্রভৃতি দ্বীপে নীত হয় ও দেখানে মহাত্মারতের দ্বারা কবিতাব্যয় অনুবাদিত হয়। কোন সময়ে ইহা দ্বাবীপে যায় তাহা নিরূপিত হয় নাই; কেহ কেহ অনুমান করেন, মহাত্মারত যে সময় ঐ দ্বীপে বার ভ্রমণকালেই ইহা গিয়া থাকিবে। [মহাত্মারত দেখ।]

এই নীতিসারের চারিখানি টীকা পাওয়া যায়, একখানির কাম—উপাখ্যায়-নিরপেক্ষ, অপরগুলির মধ্যে একখানি অস্বাভাবিক কৃত, একখানি অস্বাভাবিক কৃত ও অপরখানি বরদারাক কৃত।

কামন্দকীয় (কৌ) কামন্দক্যেরিয়ম্, কামন্দীক-হ (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২।১১৪।) কামন্দকি প্রণীত নীতিশাস্ত্রবিশেষ।

কামন্ধমী [ন্] (পুং) কামং যথেষ্টং ধমতি, কাম দ্বা-ধিনি, বাহুল্যং ধমাদেশঃ, নিপাতনাত্ মুমি সাধুঃ। কান্তকর, কান্দারি।

কামপতি (কৌ) কামঃ পতির্ঘণ্টাঃ, বিকরত্বাৎ ন ভীষ্। ১ রতি। ২ (পুং) চন্দ্রবংশীয় পৃথ্বংশধর একজন রাজপুত্র, ইনি পুণ্ড্রিট্য বাণ করিয়াছিলেন। (মহাভিঃ খ ১।৩০।২১)

কামপত্নী (কৌ) কামত পত্নী, ৩তং। রতি।

কামপাগলা (দেশজ) লম্পট।

কামপাল (পুং) কামান্ পালয়তি, কাম-পাল-অণ্। ১ বল-দেব। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

(“কামহা কামপালশ্চ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ।” বিষ্ণুসং।) ৩ মহাদেব। ৪ চন্দ্রবংশীয় ইন্দুমণ্ডন রাজপুত্র, তৎপুত্র সলিল (মহাভিঃ ১।৩০।২১।) ৫ একবীরা দেবীভক্ত গোতম কুলজ জয়পালবংশীয় একজন রাজা, তৎপুত্র হেম। (১।৩১।১৬-১৭) ৬ কুমারিকান্তক চরণক কুলজ দলরাজপুত্র, তৎপুত্র সুদর্শন। (১।৩১।৪৭)।

কামপীঠ (পুং, কৌ) কুশাদির উপরিভাগে বদ্ধস্থান, কুপের পাড়।

কামপীড়িত (জি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া পীড়িতঃ, ৩তং। সঙ্গমেচ্ছুক।

কামপূর (জি) কামং অতীষ্টং পূরয়তি, কাম-পূর-নিচ্ অণ্। ১ অতীষ্টপ্রদ। ২ পরমেশ্বর।

কামপ্র (জি) কামং পিপর্তি, কাম-পৃ-ক। অতীষ্টপ্রদ।

কামপ্রদ (পুং) কামং কামজরতিভেদঃ প্রদদতি, কাম-প্র-দা-ক। ১ রতিবদ্ধবিশেষ।

“যৌ পাদৌ বন্ধনংলম্বৌ কিশ্টালিঙ্গং ভগে তথা।

কাময়েৎ কামুকঃ প্রীত্যা বন্ধঃ কামপ্রদো হিসঃ॥”

(স্বরসীপিকা)।

২ কামানাং সর্গ পুরুষার্থাণাং প্রেমঃ, ৩তং। বিষ্ণু। ৩ (জি) অতীষ্টপ্রদ বাক্যি।

কামপ্রবেদন (কৌ) কামত অভিল্যাত্ত প্রবেদনম্ আবিকরণম্, ৩তং। অভিল্যাবপ্রকাশ। সংস্কৃত ভাষায় এই অর্থে ‘কচ্চিৎ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(কচ্চিৎ কামপ্রবেদনে। অমরঃ।)

কামপ্রস্থ (পুং) কামং যথেষ্টং প্রস্থঃ। ইচ্ছাস্থগারে-বে কোন প্রস্থ।

কামপ্রস্থ (পুং, কৌ) কামত কামগিরেঃ প্রস্থঃ, ৩তং। অজ্ঞ আদিবর্ণ উদাত্তঃ (মালানীনাঙ্ক। পা ৬।২।৮৮।) ১ কাম-গিরির সাহুদেশ। ২ (পুং) নগরবিশেষ।

কামপ্রস্থীয় (জি) কামপ্রস্থে ভবঃ, কামপ্রস্থ-হ। কামগিরির সাহুদেশজাত।

কামপ্রি (জি) কামং পিপর্তি, কাম-পৃ-কি। অতীষ্ট-পূরক।

কামফল (পুং) কামং যথেষ্টং ফলমত্, বহুব্রী। মহারাজাশ্র বৃন্দ।

কামবদ্ধ (জি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া বদ্ধঃ, ৩তং। কন্দর্প পীড়ায় আবদ্ধ।

কামভক্ষ্য (জি) কামং যথেষ্টং ভক্ষ্যং যত্, বহুব্রী। ভোজন নষদে কোনরূপ বিচার না করিয়া, সকলপ্রকার বস্তুই বে ভোজন করে।

কামভাক্ [জ্] (জি) কামং যথেষ্টং ভজতে, কাম-ভজ্-বিণ্। ১ যথেষ্ট ভোগকারক। ২ কামভোগকারক।

কামভোগ (পুং) কামত কামজরতেভোগঃ, ৩তং। ১ সন্তোগ। ২ যথেষ্ট ভোগ।

কামমু (অব্যয়) কন্-গিঙ-অম্। ১ অমুমতি। ২ যথেষ্ট। ৩ অধিক। ৪ অহুয়া। ৫ অকামানুমতি। ৬ স্বচ্ছন্দ। ৭ অনিষ্ট আগমনে স্বীকার। ৮ অমুগমন।

কামমঞ্জরী (কৌ) দণ্ডিপ্রণীত দশকুমার চরিতের নারিকাবিশেষ।

কামময় (জি) কামত বিকারঃ, কাম-ময়ট্। (ময়ড্ বৈভবো ভীষায়া সতকাচ্ছাদনরোঃ। পা ৪।৩।১৪৩।) কামবিকার। কামমর্দন (পুং) কামং কন্দর্পঃ মর্দয়তি, নাশয়তি, কাম-মৃদ-ল্য। মহাদেব।

কামমহ (পুং) কামত মহ উৎসবো যত্র, বহুব্রী। কামদেব উদ্দেশে উৎসবের দিন, চৈত্রীপূর্ণিমা এই উৎসবের নির্দিষ্ট সময়।

কামমালী [ন্] (পুং) গণেশ।

কামমুদ্রা (কৌ) কামপ্রায়েচ্ছা মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।]

কামমুচ (জি) কামেন মুচঃ, ৩তং। কামপীড়ার হিতাহিত-বিবেচনাপুত্র।

কামমুত (জি) কামেন মুতঃ মুচ্ছিতঃ, কাম-মব-ক-হান্ধগত্বাৎ ইট্ অভাবঃ, উট্। ১ কামমুচ্ছিত। ২ অত্যন্ত কামপীড়িত।

কামমোহিত (জি) কামেন কামজরত্যা মোহিতঃ, ৩তং।

১ কামপীড়ার হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। ২ সুরতাসক।

(“মা নিবাদ প্রীতিষ্ঠাং স্বয়মঃ শাখতীঃ সমাঃ।

বং ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমববীঃ কামমোহিতম্।” রামায়ণ।)

* কামরূমান (জি) কাম-গিঙ-মানচ। কামুক।
 কাময়ান (জি) কাম-গিঙ-শানচ-মুগভাব (আগমশাস্ত্রত অনিতাষাৎ)। কামুক।
 কাময়িত্তা [তু] (জি) কাময়তে; কাম-গিঙ-তুচ। কামুক।
 কামরাস (পুং) কাম: কামজরতাদিরেব রসঃ। পুরতাদি।
 ("নৃপনন্দন কামরসে রসিরা,
 পরিধান ধৃতি পড়িছে বসিরা।" বিদ্যাহুন্দর।)
 কামরাসিক (জি) কামে কামজরতাদৌ রসিক: স্ত্রিণিপুং।
 ৭তৎ। স্ত্রতাদি বিষয়ে স্ত্রিণিপুং।
 কামরাজা (দেশজ) অক্ষফলবিশেষ। [কর্মরজ দেখ।]
 কামরাজ, ১ কালিকাত্ত কোত্তিত্ত মুনিকুলোত্তব শ্রীধররাজ
 পুত্র, তৎপুত্র মাতুল। (সহস্রি ১৩১১৭।) ২ কৈবল্য-
 দীপিকা প্রণেতা হোমজির প্রতিপালক। ৩ গোপালচন্দ্র
 প্রণেতা জীবরাজের পিতামহ। ইহার পুত্র ও জীবরাজের
 পিতার নাম ব্রজরাজ এবং ইহার পিতার নাম শ্রামরাজ।
 কামরাজ দীক্ষিত, কাব্যোদ্যুৎকাশ, শৃঙ্গারকলিকাব্য
 প্রভৃতি প্রণেতা।
 কামরিপু (পুং) শরীরস্থ ছররিপু মধ্যে প্রথম রিপু, অভিলাষ
 ও জীমন্তোগাদি ইহার কার্য।
 কামরূপ (জিং) কামঃ মনোজ্ঞঃ রূপং যন্ত, বহুব্রী। ১
 মনোজ্ঞ রূপবিশিষ্ট। ২ ইচ্ছাহুসারে বিবিধ রূপধারী।
 ("কামরূপঃ কামগর্ভঃ কামবীৰ্য্যো বিহঙ্গমঃ।"
 মহাভারত গরুড় স্ততি।)
 কামরূপ, বর্তমান আমাম প্রদেশের একটি বিস্তৃত জেলা।
 এই জেলার উত্তর সীমা ভূটান, পূর্বে দরঙ্গ ও নগাঁ
 জেলা, দক্ষিণে খাসি গিরিমালা এবং পশ্চিমে গোয়ালপাড়া
 জেলা। অক্ষা° ২৫° ৪৪' হইতে ২৬° ৫০' উঃ এবং দ্রাঘি°
 ৯০° ৪০' হইতে ৯২° ১২' পূঃ মধ্যে, ব্রহ্মপুত্রের উভয়পারে
 অবস্থিত। পরিমাণ ৩৮৫৭° ৬ বর্গমাইল। ইহার প্রধান
 সহর ও সদর গোহাটী।
 কামরূপ জেলার প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত অতি মনোহর। এই
 স্থান অতিশয় উর্বর। ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী ভূমি নাবাগ,
 বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়; এখানে ধাতু ও সরিষা অপৰ্য্যাপ্ত
 উৎপন্ন হয়, শর, খাগড়া, বাঁশ প্রভৃতি স্বভাবতই বিস্তর জন্মে।
 ব্রহ্মপুত্রের তীর ছাড়িয়া উত্তরে ভূটান ও দক্ষিণে খাসি পাহাড়
 পর্য্যন্ত জমি ক্রমশঃই উচ্চ ও সমতল। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে এই
 জেলার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, এক একটি
 দুই হাজার হইতে তিন হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। ঐ সকল
 পাহাড়ের পার্শ্বদেশে চাকরসাহেবদিগের চা-বাগান।

ব্রহ্মপুত্রই এখানকার প্রধান নদী। বিস্তরনদী ও উপনদী
 এই জেলার ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উত্তর-
 দিক্ হইতে মানস, চাউলধোরা, বরনদী ও দক্ষিণদিক্ হইতে
 কুলদী নদী আসিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।
 এই নদের মধ্যে চড়া পড়িয়া কত ক্ষুদ্র দ্বীপ উদ্ভিতহে,
 আবার ডুবিতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

এখানকার পাহাড় হইতে যে সকল ক্ষুদ্র নদী উদ্ভি-
 রাছে, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্যে প্রায় জল থাকে না, কিন্তু
 অন্তঃসলিলা বহে।

এখানে নালা বা কৃত্রিম খাত নাই, তবে শত রকার
 জন্ত মধ্যে মধ্যে সামান্য বাঁধ আছে।

এই ভূভাগের প্রায় ১৩০ বর্গমাইল বনজঙ্গল, এই বন
 হইতেও গবর্ণমেণ্টের বখেট আর হইরা থাকে। তন্মধ্যে
 কুলদীনদীতীরস্থ বনবিভাগই প্রধান। যে যে বন হইতে
 খাজনা আদায় হয়, তন্মধ্যে বড়বার, দিমরুয়া, পস্তান,
 ময়রাপুর ও বরাঠৈ নামক বনই উল্লেখযোগ্য।

বনে শাল, শিশু, তুঁদ, হুম, নাহর প্রভৃতি বৃক্ষ বখেট
 জন্মে। তাহাতে বেশ মূল্যবান কড়ি, বরগা ও তক্তা
 প্রস্তুত হয়। লালুক, কাছারী, গারো, মিকির ও খাসি
 প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাই বন হইতে লাক্ষা, মোম, তক্ত,
 গঁদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।
 উত্তরাঞ্চলে ভূটান পাহাড়ের নিকট বিস্তৃত গোচারণ মাঠ
 আছে। এখানে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মে*।

জীবজন্তু—হস্তী, গণ্ডার, নানাজাতীর বাঘ, মহিষ,
 হরিণ, বন্যশুকর, নানাপ্রকার সর্প এবং নানাপ্রকার পক্ষী

* এখানকার বোগিনীতন্ত্রে এই সকল বৃক্ষাদির উল্লেখ আছে। যথা—

"ইন্দ্রবীৰ্য্যমিধানি বদরামলকানি চ।
 ধর্ম্মং পদসকৈব তথা তালকলানি চ।
 দাড়িমং কদলীকৈব
 লক্ষুচং মধুকং বৃজং তথা পুণ্ডলানি চ।
 বস্ত কলং বিশালকং তস্য শাকং প্রেরাহকন্।
 বাস্ত কস্য চ শাককং পালকস্য সম শ্রিরে।
 বিলম্বানি শ্রিরাগাতান্ তথা চ ভিত্তিকলম্।
 কুম্বাণং পার্শ্বতীকং তথা চারণসত্তবম্।
 কদলং বীজপুংকং রামকং পৌত্রকত্তবম্।
 সোমবাণ্ডং বৃহদ্বাণ্ডং রক্তশালিকমেব চ।
 রামবাণ্ডং বটিকং দেববরতকত্তবম্।
 চণকং কোত্রবটিকং
 কারকং বৃক্ষকীরকং বর্ষকং মার্কটিকত্তবম্।

দেশী বার। এখানে মন্ত্র নানা প্রকার, তন্মধ্যে কই, চিতল ও গিঠিয়া নামক মন্ত্রই অধিক *।

পুৰাতন্য—কামরূপ অতি প্রাচীন জনপদ; মহাত্মারতের সময় এই স্থান ক্রিয়াতপতি ভগদত্তের অধীন ছিল এবং পরন্তরামের লৌহিত্যতীর্থে বলিয়া পরিগণিত হইত।

পুরাণ ও তন্ত্রে এই কামরূপ মহা পীঠস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

“কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা তত্র তিষ্ঠতি।” গরুড় পু. ৮৯। ১৬।

রাধাতন্ত্রে ২০ পটলে লিখিত আছে—

“কামরূপং মহেশাণি ব্রহ্মণো মুখ মূঢ়্যতে।”

হে ভগবতি! এই কামরূপ ব্রহ্মার মুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হৃদয়পুরাণের প্রভাসখণ্ডের (৭৯ অধ্যায়) মতে, এই স্থানে শুভর লিঙ্গ আছে।

নীলতন্ত্র ও বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে, এই মহাতীর্থে যোগিনীরা সর্কদা বিরাজ করিতেছেন।

এখন যেমন কামরূপ বলিলে কামরূপ জেলাকে বুঝায়, পূর্বকালে কামরূপের ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত আয়তন ছিল। কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে—

“কামরূপে চ গ্রামাণাং নবলক্ষাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।” ৩৭ অঃ ৥

বর্তমান আসাম, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং রঙ্গপুর প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত ছিল। যোগিনীতন্ত্রে প্রাচীন কামরূপের চতুঃসীমা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—

“করতোয়াঃ সমাপ্রিত্যা যাবদিকরবাসিনী।

উত্তরন্তাঃ কঞ্জগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিমে ॥

তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্শুনদী পূর্বন্তাঃ গিরিকন্যকে।

দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্ত লাক্ষারঃ সঙ্গমাবধি ॥

* যোগিনীতন্ত্রের মতে—

“পশ্চিন্ধাঃ অবক্যামি বনানাম্ গ্রামবাসিনাম্।

যেন বাহ্যপবোধ্যানি গব্যং দেবি পরোবৃত্তম্।

মার্গং মাংসাং তথা ছাগং শালিনং শালকৃত্য।

মাছিং বর্জয়েদ্যাসং ক্ষীরং দধিযুক্ততঃ।

পক্ষিপাক প্রবক্ষ্যামি যে এষোজ্যো মমগ্রিরে।

হারিতক ময়ূরক নারকঃ বর্জকৃত্য।

কপিলশৈলচর্যশচ কাককুজটকৌ শিরঃ।

বন্যকুজটকৈব শরাসিচ কপোতকঃ।

বিদ্যুৎ কুলকশৈব রক্তপুচ্ছচ টিষ্ঠিতঃ।

কুকমংস্যাননৈচব পত্রীণাক বিশিযাতে।

চিহ্নমংসাং রোহিতক মহাশয়ক রাজীবন্।”

যোগিনীত. ২। ৮ পটল।

কামরূপ ইতিথ্যাতঃ সর্কশাস্ত্রেয়ু নিশ্চিতঃ ॥ * ॥”

“ত্রিংশৎ যোজনবিভাগং দীর্ঘেন শতযোজনম্।

কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্।

ঈশানে চৈব কেদারো বায়বাণ্যং গজশাসনঃ।

দক্ষিণে সঙ্গমে দেবী লাক্ষারঃ ব্রহ্মরেতসঃ ॥

ত্রিকোণমেব জানীহি সুরাসুরনমস্কৃতম্।”

করতোয়া হইতে দিকরবাসিনী পর্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত ইহার উত্তরসীমার কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়ানদী, পূর্বসীমায় তীর্থশ্রেষ্ঠ দিক্শুনদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ ও লাক্ষা নদীর সঙ্গমস্থল। এইরূপ সীমানির্দেশ সমুদায় শাস্ত্রেরই অনুমোদিত।

এই সুরাসুরপূজিত কামরূপ ত্রিকোণাকার; ইহার দৈর্ঘ্য একশত যোজন এবং বিস্তার ৩০ ত্রিশ যোজন। কামরূপের ঈশানকোণে কেদার, বায়ুকোণে গজশাসন এবং দক্ষিণে ব্রহ্মরেতা ও লাক্ষার সঙ্গমস্থল।

কালিকাপুরাণেও লিখিত আছে।—

“করতোয়া সত্যগঙ্গা পূর্বভাগাবধিশ্রিতা।

যাবল্ললিতকাত্যাক্তি তাবদংশং পুরং তদা ॥”

কালিকাপুরাণ ৩৮। ১২১ অঃ

করতোয়া নামক সত্যগঙ্গা হইতে পূর্বদিকে ললিতকাত্যাক্তি পর্যন্ত এই পুর বিস্তৃত। (ললিতকাত্যাক্তি দিকরবাসিনীর নিকট।)

কামরূপ ব্রহ্মার মতেও—ইহার উত্তরসীমা কঞ্জগিরি বা ভুটানের পার্শ্বভাগে প্রদেশ, পূর্বে মহাচীন বা চীনসাম্রাজ্য, দক্ষিণে লাক্ষা নদী (এই নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে পৃথক্ হইয়া বঙ্গদেশের সীমারূপে প্রবাহিত) ও পশ্চিমে করতোয়া নদী*।

যোগিনীতন্ত্রের মতে, এই বিস্তৃত কামরূপ রাজ্য নব যোনি পীঠে বিভক্ত। যথা—

“উপবীথিচ বীথিচ উপপীঠক পীঠকম্।

সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদন্তরম্ ॥

* রঙ্গপুরের লোকদিগের বিশ্বাস দেবীগণের নিম্নভাগে প্রাচীন তিলা (জিপ্রোতা) নদীতে পাথরাজ নামে যে একটি ক্ষুদ্র নদী মিলিত হইয়াছে, উহাই করতোয়া নদীর প্রাচীন খাত এবং কামরূপের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। (Martin's Eastern India Vol. III. p. 361-62.)

[করতোয়া দেখ।]

এদিকে বর্তমান আসাম প্রদেশের পূর্বপ্রান্তে সদিয়ার নিকট কামরূপপুত্র নামে একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহাও কামরূপের পূর্বসীমাপরিচায়ক বলিতে হইবে। (Journey from upper Assam towards Hookhoom &c. by W. Griffith; See Selection of papers regarding the Hill Tracts between Assam and Burma, p. 125.)

বিজুপীঠঃ মহাদেবী রত্নপীঠঃ তদন্তরম্ ।

নবযোনিরিত্থিত্যাতা চতুর্দিক্ সমন্ততঃ ।*

এতদ্ব্যতীত যোগিনীতন্ত্রপাঠে আর কতকগুলি পীঠের নাম পাওয়া যায়* । যথা—নৌমারপীঠ, শ্রীপীঠ, রত্নপীঠ, ও কামপীঠ ইত্যাদি ।

* কামরূপে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীঠ ও উপপীঠ আছে, যথা—

উড্ডীয়ানসা বেবেশি প্রাভুর্ভাবঃ কৃতে যুগে ।

পূর্ণশৈলস্যা সমুত্তিস্তেতাযুগ্মংভবৎ ।

দ্বাপরে জালশৈলস্যা কামাখাসা কলৌ যুগে ।

যোরস্যা কলিপাপস্যা বিনাশায় মহেশ্বরী ।

প্রতিবর্ষে তব পীঠমুপপীঠঃ যুগং যুগম্ ।

ত্রয়ং ত্রয়ং মহাক্ষেত্রং পুণ্যারণ্যং ত্রয়ং ত্রয়ম্ ।

প্রতি পীঠে মহাদেবঃ প্রতি পীঠে চতুর্ভুজঃ ।

প্রতি পীঠে দ্বিতীয়া গঙ্গা পার্বতী প্রতিপীঠকে ।

প্রতি পীঠং প্রতিক্ষেত্রং পুণ্যারণ্যতঃ পীঠকে ।

কলৌ গৃহাৎ স্বদূরেচ তীর্থবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ।

কিন্তু তীর্থানি বৈ সন্নি ভাবনাসিক্চি রিষাচে ।

প্রতি পীঠে পৃথগধর্ম আচারস্ত পৃথক্ পৃথক্ ।

দেশে দেশে কলাচারো মহন্তবানি হেতুভিঃ ।

পৃথক্ পূজা পৃথক্ মন্ত্রো মন্তোচ তীরপীঠকম্ ।

ভ্রমপীঠঃ দাক্ষিণাত্যে মদ্যদেশস্য পার্বতী ।

জালরত্ন পাশ্চাত্যে পূর্ণপীঠস্ত পূর্বতঃ ।

ঐশাখ্যং পূর্বভাগেচ কামরূপঃ বিজানীহি ।

জালরত্ন বারবো কোলাপুরস্ত উত্তরে ।

ঈশানে চৈব বিহারঃ মহেন্দ্র উত্তরে কিয়ৎ ।

ঐহটমপি পূর্বে চ উপপীঠানাংখ্যো শূণ্ ।

নোকাখানেন বেবেশি অষ্টবস্ত্রি যোজ্যনৈঃ ।

প্রস্তারে ওড়পীঠস্ত আয়ামেতি গুণং ভবেৎ ।

শকটাকারকং পীঠং চতুর্ভুজং সপীঠকম্ ।

চতুর্দ্বারসমামুক্তং বায়ুবিষ্মেন চিহ্নিতম্ ।

তীর্থকোটিষয়মুতং সিজুভয়কপীঠকম্ ।

যত্র সোমেশ্বরঃ লিঙ্গমাদিপীঠং তথাপরম্ ।

কামধেনুশ্চ যত্রৈব যত্র চক্রেখরো হরঃ ।

ক্ষেত্রং বিরজসংজ্ঞকং একান্তং তদনন্তরম্ ।

ভাস্বরস্ত মহাক্ষেত্রং যত্র মাতঙ্গলক্ষরঃ ।

কুশল্লী মহাপুণ্যং দত্তকস্যা বনস্তথা ।

সুমন্তস্ত তথারণ্যং শিবযুগল পর্বতঃ ।

পশ্চিমে ধেনুকারণ্যে উত্তরে তু পরিশিরঃ ।

দক্ষিণে চন্দ্রপাশাচ ওড়পীঠং বরাননৈ ।

ত্রিংশদ্বোজনবিত্তীর্ণমার্যানে শতবোজনম্ ।

যত্র কামেশ্বরী দেবী যোনিরূপাধরুণিপী ।

ভূগোলপীঠকং নাম যত্র বৈ গোলোকেশ্বরঃ ।

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সমস্ত উত্তরাংশের নাম নৌমার ।
যোগিনীতন্ত্র এইরূপ চতুর্দশীয়া নির্দিষ্ট আছে—

“পূর্বে সর্বনদীঃ বাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে ।

দক্ষিণে মন্দৈশলশ্চ উত্তরে বিহগাচলঃ ।

প্রস্তারে চৈব ব্যাগাঙ্কঃ বোজনানাক পঞ্চকম্ ।

অযুতজয়ক জিত্রোতঃ পঞ্চোত্তবং তথা নশ ।

ধর্মপীঠং মহাপীঠং যত্র কামেশ্বরো হরঃ ।

অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রং হংসপ্রপত্তনস্তথা ।

ত্রয়যুগল যত্রৈব যত্র খেতবটঃ রিতঃ ।

কৃষ্ণক্ষেত্রস্ত তত্রৈব যত্র মায়াবনা নদী ।

অযোধারণ্যকং পুণ্যং ধর্মারণ্যং তথা পরম্ ।

কচাক্ষকং মহারণ্যং যত্র পাতাললক্ষরঃ ।

গওকীচ নদী পূর্বে বিজুপুশ্চ পশ্চিমে ।

দক্ষিণে বুযভং লিঙ্গং উত্তরে কদলীবনম্ ।

এতদ্রূপাতমঃ পীঠং চাপাকারঃ মনোরমে ।

অনাহতং তথা পদ্মং রক্তবর্ণং বিভাবরং ।

একাদশ শতাব্দীয়াং যোজনানানং তথা নব ।

অনীতাত্তো চ প্রস্তারে ত্রিকোণং পীঠমুত্তমম্ ।

প্রবরং পীঠকং তত্র পীঠকালোকমেবচ ।

নীতায়ান্ত মহাক্ষেত্রং অগস্ত্যাস্রমং তথা ।

হরস্য পরমং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজয়মিদং প্রিয়ে ।

মাধবাষণ্যকং ক্ষেত্রং হরসারণ্যকং তথা ।

অরণ্যকৈব ভর্গস্য এতদারণ্যকং ত্রয়ম্ ।

উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্রক দক্ষিণে সাগরাবধি ।

পূর্বতোষয়কুটক পশ্চিমে শ্রীপর্বতঃ সিয়ে ।

এতদ্রূপাতমং পীঠং পুণ্যার্থং নাম নামতঃ ।

পাদ্যং পাদান্তরং বাবদ্রুখ্য হস্তধরান্তরম্ ।

শিবরাত্তো চ পদমঃ সৌরমাসেন মাসকম্ ।

কামরূপং বিজানীয়াৎ বটকোণাত্রপ্রগর্ভকম্ ।

তৎপুণ্যং তৎসমং বেখং নববাহুঃ ত্রিমণ্ডলম্ ।

গর্ভতৈর্দর্শ্যভিবৃক্তং বেদিমধ্যং প্রক্ষীপ্তিতম্ ।

মধ্যপীঠং মহাপীঠং যত্র কামেশ্বরো ভবেৎ ।

তত্র পীঠে হি দেবেশি যত্র চম্পাবতী নদী ।

কচ্ছাত্রমং মহাক্ষেত্রং যত্র রত্নগদধরম্ ।

একাক্ষকং পরং ক্ষেত্রং যত্র নাগালক্ষণম্ ।

সানসং ক্ষেত্রকৈব যত্র বিবেশরো হরঃ ।

নাটকারণকৈব চম্পারণ্যকস্তথা ।

পিচ্ছিলা বা দক্ষিণতো গৌতমস্যা মহাবনম্ ।”

যোগিনীতন্ত্র ২১১ পটল ।

হে দেবেশ্বরী ! ত্রোতাগুণের পূর্ববর্তী সত্যযুগে উড্ডয়নশীল পূর্ণশৈলের প্রাভুর্ভাব হইরাছিল, তৎপরে দ্বাপরযুগে জালশৈল এবং কলিযুগে কলি পাগবিনাশের জন্য কামাখ্যা পর্বতের আবির্ভাব হইরাছে । হে মহেশ্বরী ! প্রত্যেক বর্ষেই তোমার পীঠ, উপপীঠ, তিন তিনটি মহাক্ষেত্র ও তিন

অষ্টকোণক সোমারং যত্র দিক্‌রবাসিনী ।
তস্মিন্ বসতি সা দেবী জ্ঞানং ধ্যানান্তবোধিণি বা ॥
তেহপি দেব্যঃ প্রসাদেন স্থিতিং গচ্ছন্তি নাতথা ।
অখোদয়ো নবং পীঠং সোমারাত্যাং তু কথ্যতে ॥
বসত্যজরং প্রত্যক্ষং যত্র দিক্‌রবাসিনী ।
দিক্‌রত্বে চ বারব্যে নীলপীঠং স্তূর্ণভম্ ॥

তিনটি মহারণ্য বিরাজিত আছে এবং ঐ প্রত্যেক পীঠেই মহাদেব, চতুস্তম্ভ বিষ্ণু, গঙ্গা ও পার্বতীর আধিষ্ঠান। প্রত্যেক পীঠ ও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক একটি পুণ্যারণ্য অবস্থিত।

কলিকালে গৃহের দূরবর্তী দেশমাজেই তীর্থযাত্রী হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে ভাবনাসিদ্ধি হয়, তাহাই তীর্থ বলিয়া অভিহিত। প্রত্যেক পীঠে ধর্ম ও আচার পৃথক পৃথক। দেশভেদানুসারে কলাচারও পৃথক। এজন্য প্রত্যেক পীঠের পূজা ও মন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে। হে পার্বতি! মর্ত্য ভূমিতে তীরপীঠ, দাক্ষিণাত্য দেশে ভদ্রপীঠ, পান্ধাত্য দেশে জালন্ধর, পূর্বদিকে পূর্ণপীঠ।

ঈশানে ও পূর্বভাগে কামরূপ। ইহার বায়ুকোণে জালন্ধর, উত্তরে কোলুপুর, মহেশ্বরের কিঞ্চিৎ উত্তরে ঈশানদিকে বিহার এবং পূর্বে জীহট। হে দেবেশ্বর! অতঃপর উপপীঠের বিবরণ শ্রবণ কর—ওড়পীঠ ৬৮ যোজন বিস্তৃত। শঙ্কটাকার পীঠ চতুষ্কোণ, চারিটি ষারগুণ্ড এবং বারমুখ চিহ্নিত। সিক্ততরু পীঠে দুই কোটি তীর্থ আছে এবং এই স্থানে সোমেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত আছে। বিরজ নামক ক্ষেত্র ও একান্ত্র-ক্ষেত্রে কামধেনু ও চক্রেবর শিবের অবস্থান। ভাস্কর নামক মহাক্ষেত্রে মাতঙ্গ নামক মহাদেব, পবিত্র কুশলী, দন্তকবন ও হুমন্তবন। এই ক্ষেত্রের পূর্বদিকে শিবগুপ, পশ্চিমে ধেনুকার্য্য, উত্তরে গয়াশিরঃ এবং দক্ষিণে চন্দ্রভাগা ও ওড়পীঠ। হে বরদানে! ইহার দৈর্ঘ্য ১২০ যোজন এবং বিস্তার ১৮ যোজন। এই পীঠস্থলেও মহাদেবের ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রের এবং সাধবারণ্য, মহাদেবের অরণ্য ও ভগ্নের অরণ্য এই অরণ্যত্রয় বর্তমান আছে। এই পীঠের উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্র, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্বে উদয়কূট এবং পশ্চিমে জীপার্কত। ইহারই মধ্যবর্তী পীঠের নাম পুণ্যপীঠ। কামরূপের মধ্যস্থলে ঘটকোণ, নবম্বাহ ও ত্রিমণ্ডলযুক্ত পবিত্রতম এক বেদী আছে এবং এখানে দশটি পর্বত অবস্থিত রহিয়াছে। মধ্যপীঠ নামক মহাপীঠস্থলে কামেশ্বর নামক মহাদেব এবং চম্পাবতী নদী। কস্তাজম নামক মহাক্ষেত্রে কস্ত্রদেবের পদময়। একান্ত্রক্ষেত্রে দাণ্ডাকন্দর। মানসক্ষেত্রে বিবেশ্বর, নাটকার্য্য ও চম্পকার্য্য। গৌতমের দক্ষিণ ভাগে পিঞ্জলা ও মহাবল।

যত্র কামেশ্বরীদেবী যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী ।
পারিজাতং মহাক্ষেত্রং যত্রাদিত্যন্ত শঙ্করঃ ॥
কোষেরম্ভ পুত্রং ক্ষেত্রং তথা চামরকটকম্ ।
আরণ্যমাশ্বিনদৈব গৌতমারণ্যকং শিবম্ ॥
পূর্বে স্বর্ণনদী (বর্তমান সুরগঙ্গী) পশ্চিমে করতোয়া, দক্ষিণে মন্দশৈল এবং উত্তরে বিহগাচল এই চতুঃসীমার মধ্যে সোমার।

অষ্টকোণ সোমার ও দিক্‌রবাসিনীস্থলে মহাদেবী অবস্থান করেন এবং ঐ সকল স্থলে দেবীর অমুগ্রহে পীঠাদিও অনস্থিত আছে। অতঃপর নয়টি পীঠের বিবরণ কথিত হইতেছে। দিক্‌রবাসিনীতে অজয় নামক প্রত্যক্ষ পীঠ এবং দিক্‌রের বায়ুকোণে স্তূর্ণভ নীলপীঠ, এই স্থানে যোনি-মুদ্রারূপিণী কামেশ্বরীদেবীর অবস্থান। আদিত্যশঙ্করের অবস্থিত স্থলের নাম মহাক্ষেত্র পারিজাত এবং অপরায়ণ পীঠের নাম কোষেরপুর, অমরকটক, আরণ্য, আশ্বিন, গৌতমারণ্য ও শিবনাথের অরণ্য।

সোমারের অংশবিশেষের নাম সোমারপীঠ, আসামের উত্তর-পূর্বভাগে অবস্থিত, যোগিনীতন্ত্রে ইহার চতুঃসীমা এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

“অরণ্যং শিবনাথস্ত শৃণু পীঠাবধিশ্রিয়ৈ ।
পূর্বে সৌরশিলারণ্যং পশ্চিমে স্বর্ণদী শুভা ॥
দক্ষিণে ব্রহ্মযুগন্ত উত্তরে মানসং সরঃ ।
এতন্মধ্যগতং পীঠং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥
সোমারাত্যাং মহাপীঠং ঘটকোণস্ত ত্রিমলম্ ।
সহস্রযোজনব্যামং হরতাত্রাক্ষ পঞ্চমম্ ॥”

যোগিনীতন্ত্রে ২।১।

হে প্রিয়ে! এই শিবনাথের অরণ্যের চতুঃসীমা নির্দ্ধারণ শ্রবণ কর। পূর্বদিকে সৌরশিলারণ্য, পশ্চিমে স্বর্ণদী, দক্ষিণে ব্রহ্মযুগ ও উত্তরে মানস সরোবর। ইহারই মধ্যস্থলে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ ঘটকোণ ও ত্রিমণ্ডল সোমার নামক মহাপীঠ। এই পীঠের পরিমাণ সহস্রযোজন ব্যাম, পঞ্চন হরতাত্র নামেও এই পীঠ অভিহিত হয়।

আসাম ব্রজের মতে ভৈরবী হইতে দিক্‌রাই নদী পর্য্যন্ত সোমার পীঠ।

ঐপীঠের চতুঃসীমা এইরূপ,—

“বারাহী প্রথমং পীঠং বিতীরং কোলপীঠকম্ ।
কুমারক্ষেত্রং প্রথমং বিতীরং নন্দানন্দম্ ॥
তৃতীয়ং শাখতীক্ষেত্রং মাতঙ্গং প্রথমং বনম্ ।
সিদ্ধারণ্যং বিতীরং তৃতীয়ং বিপুলং বনম্ ॥

কোটি কোটিযুগং লিঙ্গং কোটি কোটি গণেশযুগম্ ।
পঞ্চতীর্থং ভবেৎ পূৰ্বে পশ্চিমে ধনদা নদী ॥
পত্রাখ্যা দক্ষিণে চৈব উত্তরে কুরুবকাবনম্ ।
এতন্নধ্যগতং দেবী ত্রীপীঠং নাম নামতঃ ॥”

যোগিনীতন্ত্র ২।১ পটল ।

প্রথম পীঠের নাম বারাহী, দ্বিতীয় কোলপীঠ। প্রথম ক্ষেত্রের নাম কুমারক্ষেত্র, দ্বিতীয়ের নাম নন্দন এবং তৃতীয়ের নাম শান্তীক্ষেত্র। প্রথম বনের নাম মাতঙ্গ, দ্বিতীয়ের নাম সিদ্ধারণ্য, তৃতীয়ের নাম বিপুলবন; এই বন কোটি কোটি লিঙ্গযুক্ত এবং কোটি কোটি গণাধিষ্ঠিত। পূৰ্ব্বদিকায় পঞ্চতীর্থ, পশ্চিমে ধনদা নদী, দক্ষিণে পত্রা ও উত্তরে কুরুবকা বন, ইহারই মধ্যস্থলে ত্রীপীঠ অবস্থিত।

রত্নপীঠের বর্তমান নাম কোচবিহার। সম্ভবতঃ কন্যেশ্বরী-দেবী এই স্থানে অধিষ্ঠান করিতেন বলিয়া ইহা রত্নপীঠ নামে অভিহিত হইত। আসাম ব্রহ্মর মতে স্বৰ্গকোষী নদী হইতে রূপিকা নদী পর্য্যন্ত রত্নপীঠ। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

“রত্নপীঠে তু বড়ঃস্তং লোহিত্যা চৈব উত্তরে ॥”

কামপীঠ।—আসাম ব্রহ্মর মতে করতোয়া ও স্বৰ্গকোষী নদীর মধ্যবর্তী স্থান কামপীঠ। কিন্তু যোগিনীতন্ত্রে কামপীঠের অপর নাম যোনিপীঠ উক্ত আছে। যোনিপীঠের বর্তমান নাম কামাখ্যা, কামগিরির উপর অবস্থিত বলিয়া কামপীঠ নাম হইয়া থাকিবে। যথা—

“যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা ॥”

তন্ত্রচূড়ামণি—পীঠমালা ।

[কামাখ্যা দেখ ।] এই কামাখ্যার কিছু দূরে যোগিনী-তন্ত্রোক্ত উগ্রপীঠ ও ব্রহ্মপীঠ। যথা—

“ব্রহ্মমুখাশ্রয়ঃ পীঠং উগ্রতারিধিদৈবতম্ ।

তৎ পীঠং বিবিধং প্রোক্তং গুপ্তং ব্যক্তং মহেশ্বরী ॥

মনোভবগুহাবলৌ দেবীশিখরমুরতম্ ।

তন্মহোগ্রমিতি খ্যাতং পীঠং পরমং হ্রলভম্ ॥

লিঙ্গিকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী ।

নিবসেত্তত্র যা কালী ঘোরদৈত্যবিনাশিনী ॥”

যোগিনীতন্ত্রে ১।১১ ।

ব্রহ্মজিতে স্বৰ্গপীঠ নামক একটি পীঠের উল্লেখ আছে, কিন্তু কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে এই স্বৰ্গপীঠের উল্লেখ নাই। কালিদাসের রঘুবংশে ইহাই “হেমপীঠ” নামে উক্ত হইয়াছে।

“তমীশঃ কামরূপাণামত্যাগভলবিজয়ম্ ।

ভেজে ভিন্নকটৈর্নগৈরস্তাহুপকরোষ ধৈঃ ॥ ৮৩

কামরূপেশ্বরস্ত হেমপীঠাধিদেবতাম্ ।

রত্নপুষ্পোপহারেণ ছাগামানার্ক পাদয়োঃ ॥” ৮৪

রঘু ৪র্থ সর্গ ।

তখন কামরূপেশ্বর অস্ত্র ভূপালগণের আক্রমণে লক্ষপ্রতিষ্ঠাভিন্নগুপ্ত হস্তিসকল লইয়া ইন্দ্রবিজয়ী রঘুর শরণাপন্ন হইলেন এবং সেই সুবর্ণপীঠের অধিদেবতা স্বরূপ তাঁহার চরণকমলে রত্নরূপ পুষ্পোপহার প্রদান করিলেন।

আসাম ব্রহ্মর মতে রূপিকা বা রূপহী নদী হইতে ভৈরবী বা ভয়লী নদী পর্য্যন্ত স্বৰ্গপীঠ।

নামকরণ।—কালিকাপুরাণের মতে, কামদেব মহা-দেবের জ্যোদানলে তন্মীভূত হইবার পর, এই স্থানেই মহা-দেবের রূপার স্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার নাম কামরূপ। [কালিকাপুরাণ ৫১ অঃ দেখ।] পূৰ্বে ব্রহ্মা এই স্থানে থাকিয়া নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই জন্ত ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষ্য হয়।

“অত্রৈবহি স্থিতো ব্রহ্মা প্রতিনক্ষত্রং সসর্জহ ।

ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা ॥”

কালিকাপু ৩৭ অঃ ।

তীর্থবিবরণ।—পূৰ্বেই বলা হইয়াছে কামরূপ অতি প্রাচীন তীর্থ। কালিকাপুরাণে এসম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

“পূৰ্ব্বকালে মহাপীঠ কামরূপের নদীতে স্নান, তাহার জলপান এবং তথাকার দেবতা পূজা করিয়া অনেক লোকই স্বর্গে যাইতে লাগিল এবং কেহ বা নির্লিপ্ত মুক্তি ও কেহ বা শিবত্ব প্রাপ্ত হইল। পার্শ্বভীভয়ে যমরাজ ঐ সকল লোক মধ্যে কাহাকেও স্বর্গগমনে নিষেধ করিতে বা নিজ ভবনে লইয়া যাইতে পারিলেন না। প্রথমতঃ অনেকবার তিনি যমদূত পাঠাইয়া দেখিলেন, শিবদূতেরা যমদূতদিগকে তাহাদের নিকট যাইতে দেয় না। সুতরাং যমরাজের কর্তব্যকার্য্য একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি বিধাতার নিকটে গিয়া বলিলেন যে, হে বিধাতা! মহাভাগ কামরূপে স্নান, তথাকার জলপান ও দেবপূজাদি করিয়া, মৃত্যুর পর সকলেই কামাখ্যাদেশীর বা শিবের পার্শ্বচর হইতেছে। আমার সেখানে অধিকার না থাকায়, তাহাদিগকে কোনক্রমেই বাধা দিতে পারি না, কাজেই আমার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, এখন এসম্বন্ধে কোন উচিত উপায় অবলম্বন করিবার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। পিতামহ ব্রহ্মা যমের এই সকল কথা শুনিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া দিগ্বিদিকট যাইলেন এবং যমের পূৰ্ব্বোক্ত কথাগুলি অবিকল

তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণুও এই সকল কথা শুনিয়া তাহাদের উত্তরকে স্নেহে লইয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাদেব পরম সমাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন বিষ্ণু তাহাকে বলিতে লাগিলেন, 'এই কামরূপ সমুদায় দেবতা, সকল তীর্থ ও সকল ক্ষেত্র দ্বারা পরিবৃত্ত হওয়ার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই, সুতরাং এই পীঠে মুক্ত হইলে সকলেরই স্বর্গলাভ বা আপনাদের পার্শ্বচর্য লাভ হইতেছে। এই সকল লোকদিগের উপর যমরাজের কোনই অধিকার নাই; যমের ত্বর বাতীত এই পীঠের নিয়মও বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে যমের অধিকার পূর্বস্বং অক্ষুর থাকে, তাহার কোন উপায় করিতে হইতেছে।'

মহাদেব বিষ্ণুবাক্য পালন করিতে সীকৃত হইয়া তাহা-দিগকে বিদায় দিলেন। পরে অগণসহ কামরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামরূপে আসিয়াই তিনি দেবী উগ্র-তারাকে ও অগণকে বলিলেন, 'সব্বর এই কামরূপ হইতে লোক সকল দূর করিয়া দাও।'

শিব-আজ্ঞামাত্রই মহাদেবী উগ্রতারার ও গণসমূহ সমুদায় লোক নিতাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহারা কাম-রূপস্থ সম্ভ্রান্ত সমুদায় লোক দূরীভূত করিয়া^৬ বশিষ্ঠকে ডাড়াইবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে বশিষ্ঠ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উগ্রতারাকে অভিশাপ দিলেন, 'হে বামে! আমি মুনি, তথাপি তুমি যে আমার ডাড়াইবার চেষ্টা করিতেছ, এইজন্য তুমি মাতৃগণসহ বাস অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ ভাবে পুজিত হইবে। তোমার প্রমথগণ মদমত্ত চিত্তে স্নেহের জ্বালায় যুরিয়া বেড়াইতেছে, এজন্য তাহারা স্নেহরূপে এই কামরূপে বাস করিবে। আমি শম দম গুণবিশিষ্ট, বেদপারগ ও তপো-নিরত মুনি, তথাপি মহাদেবও যে আমার স্নেহের জ্বালায় বিবেচনাশূন্য হইয়া ডাড়াইতে বাগিয়াছেন, তজ্জন্ত তুমিও স্নেহের জ্বালায় ভগ্ন ও অস্থি ধারণ করিয়া এই কামরূপে অবস্থিত করিবে। আর এই কামরূপক্ষেত্র অদ্যাবধি স্নেহপরিবৃত্ত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব বিষ্ণু এখানে না আসিবেন, ততদিন ইহা এই ভাবেই থাকিবে। কামরূপের মাহাত্ম্যপ্রকাশক তন্ত্র সকল বিরল হইয়া বাউক। তবে যে সকল পণ্ডিত বিরল প্রচার কামরূপতন্ত্র অবগত হইতে পারিবেন, তাহারা যথাকালে সম্পূর্ণ ফলও প্রাপ্ত হইবেন।'

বশিষ্ঠ এই অভিশাপ দিয়া অন্তর্হিত হইয়ামাত্রই কাম-রূপপীঠের প্রমথগণ স্নেহ হইয়া উঠিল, উগ্রতারার বামা

হইলেন, মহাদেব স্নেহমত্ত হইলেন, কামরূপমাহাত্ম্য-প্রকাশক তন্ত্র সকল বিরলপ্রচার হইল; সুতরাং কলকাল মধ্যে কামরূপ বেদমন্ত্রহীন ও চতুর্দশপুঞ্জ হইয়া উঠিল।

তৎপরে কামরূপপীঠে বিষ্ণুর আগমন হইল, তাহাতে কামরূপ শাপমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইলেও দেবতা ও মনুষ্যাগণ পূর্বের জ্ঞান তাহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিলেন না। এই সময়ে ব্রহ্মা সমুদায় কুণ্ড ও নদী গোপন করিবার জন্য শাশ্বতপত্নী অমোঘ্যার গর্ভে একটি জলময় পুঞ্জ উৎপাদন করিলেন, সেই পুঞ্জকে পরশুরাম দ্বারা অব্যাহতভাবে অবতারিত করিয়া, সমুদায় কামরূপ জলমগ্নিত করিলেন; সুতরাং অজ্ঞান্য তীর্থসমূহ গুপ্ত হইয়া গেল।

যাহারা অজ্ঞ কোন তীর্থের বিষয় অবগত না হইয়া, কেবল ব্রহ্মপুঞ্জেরই অস্তিত্ব জানিয়া তাহাতে স্নান করেন, তাহাদিগের কেবলমাত্র ব্রহ্মপুঞ্জে স্নান জন্ম ফলপ্রাপ্তি হয়। আর যাহারা এই ব্রহ্মপুঞ্জে সমুদায় তীর্থেরই গুপ্তভাব অবগত আছেন, ব্রহ্মপুঞ্জে স্নান করিলেই তাহাদের সমুদায় তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়।' (কালিকা পুঃ ৮১ অঃ।)

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয় যে এক সময়ে কামরূপে বিস্তার তীর্থ ছিল। বাস্তবিক এখনও কামরূপের নানাহান পর্য্যটন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কামরূপের অনেক তীর্থ, অনেক পবিত্র স্থান ব্রহ্মপুঞ্জ গর্ভে অবস্থিত রহিয়াছে। যেন ব্রহ্মপুঞ্জ কামরূপের প্রাচীন গৌরবের স্নেহে স্নেহে হিন্দুদিগের প্রাচীন কীৰ্ত্তি সকল গ্রাস করিয়াছে! যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

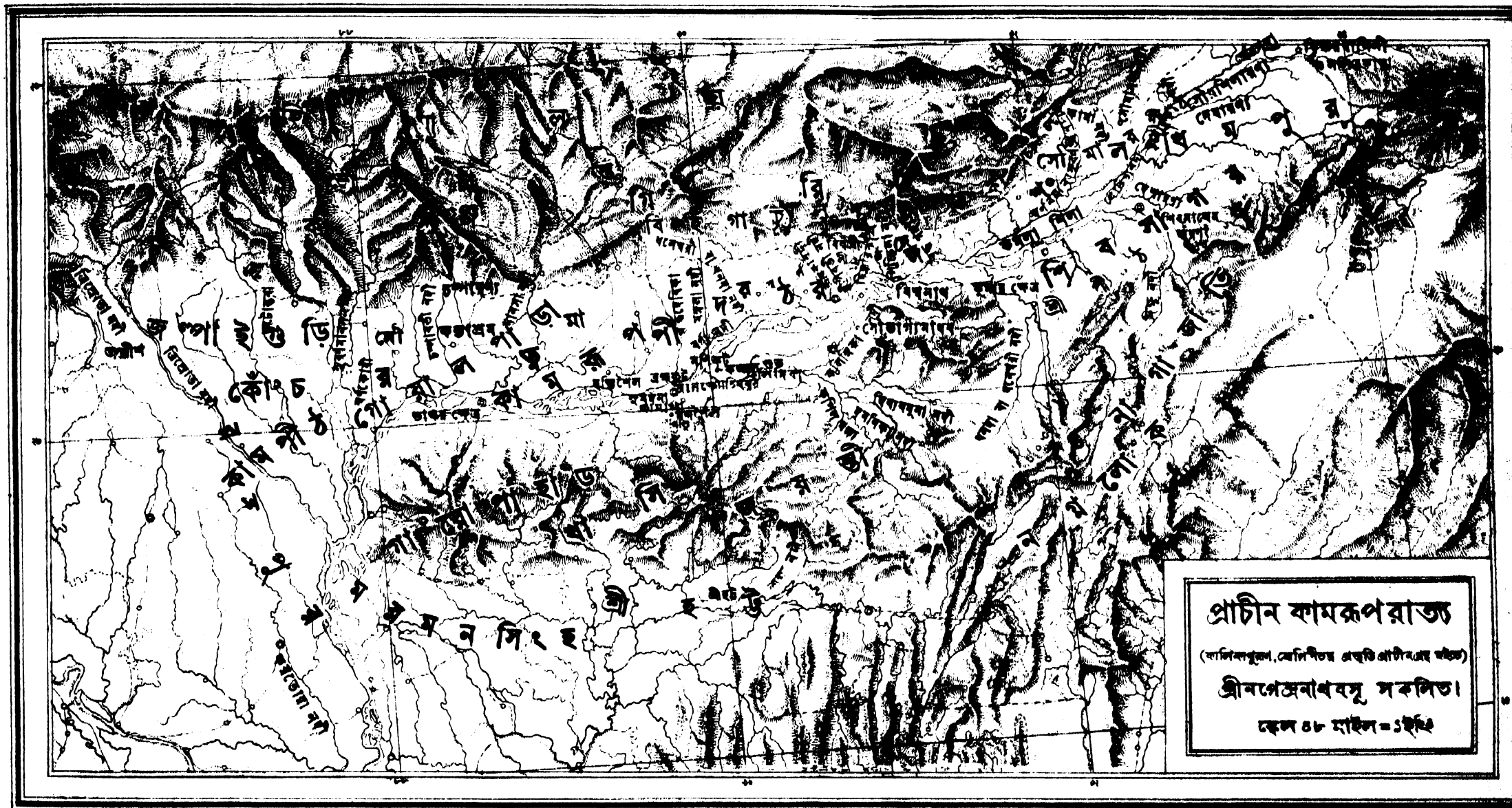
"দেবীক্ষেত্রঃ কামরূপঃ বিদ্যাতেহন্তঃ ন তৎসমম্।

অজ্ঞান পিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে ॥"

কামরূপ দেবীক্ষেত্র, এমন স্থান আর নাই। অজ্ঞান দেবীর দর্শনলাভ সুকঠিন, কিন্তু কামরূপের ঘরে ঘরে দেবী বিরাজ করিতেছেন।

যোগিনী তন্ত্রপাঠেও কামরূপ তীর্থের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।—মহাপীঠ কামরূপ আতি শুভতীর্থ, এখানে মহাদেব পার্শ্বতীর সহিত নিত্যই অবস্থান করেন। এই পীঠে শতমদী ও কোটি লিঙ্গ অবস্থিত আছে। বায়ুকুটের শেষ সীমায় ধরুহৃত পরিমিত বায়ুরূপী চন্ডের অবস্থান। বায়ুগিরির পূর্বদিকে চতুর্ভূত শৈল, মধ্যভাগে গোদন্ত ও

* বর্তমান আমাদের উত্তরপূর্ব প্রান্তবাসীগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে, পরশুরাম আপন কুঠার দ্বারা যে স্থান হইতে ব্রহ্মপুঞ্জের অবতরণ করেন, অদ্যাপি সেই স্থানের নাম 'ববিকুঠার'; ইহা একটি পবিত্র তীর্থ, নদীর উত্তরপূর্বে ব্রহ্মপুঞ্জের নিকট অবস্থিত।



প্ৰাচীন কামৰূপৰাজ্য

(কালিন্দ্যপুৰাণ, মেদিনীতৰ প্ৰকৃতিপ্ৰাচীৰদ্বাৰা সীমিত)

শ্ৰীমৎপ্ৰজ্ঞাপাৰ্বতী সন্নিহিত।

কেৱল ৪৮ মাইল = ১৫৫ কিলোমিটাৰ

কেৱল জেলাস্তলিৰ বৰ্তমানৰ নামেৰে দেখা দিয়া হৈছে।

Printed at the Indian Art Cottage, Calcutta.

চন্দ্রশৈলের মধ্যস্থলে ইন্দ্রশৈলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ও চন্দ্রশৈলের কিঞ্চিৎ উত্তরে চন্দ্রকূট নামক সরোবর। এই সরোবরের দক্ষিণদিক্‌ভাগে চারি ধনু পরিমিত মানসতীর্থ। মানসের দক্ষিণদিকে ২৮ ধনু পরিমিত অমৃততীর্থ। তাহার দক্ষিণভাগে দশ ধনু পরিমিত বর্ণমোচন নামক সরোবর। অমৃতকৃত পর্কতের দক্ষিণ ও অগ্নিকোণে অমৃতক্রান্তা নামক সরোবর। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব সর্বদাই আশ্রয় করেন। চন্দ্রশৈল হইতে যে নির্ঝর পতিত হয়, তাহাকে জাহ্নবী এবং ইন্দ্রশৈল হইতে নিঃসৃত নিষ্করকে সরস্বতী কহে; বর্ষাকালে এত অমৃতক্রান্ততীর্থে ঐ উত্তর নির্ঝরের সঙ্গম হওয়ার, ইহা প্রয়াগতীর্থের তুল্য বলিয়া অভিহিত।

এই সকল তীর্থে দান, দান ও পূজাদি কার্য্য করিলে বিবিধ পুণ্যকণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ অমৃতক্রান্ত তীর্থ প্রয়াগতীর্থের তুল্য বলিয়া এখানে মন্তক মুণ্ডনাদি কার্য্যেরও বিধান আছে, তাহাতে ইহলোকে যাবতীয় দুখ সম্বোগ ও পরলোকে সর্বলাভ হয়।" (যোগিনী তঃ ২। ৩য় পং।)

"অমৃততীর্থের কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে আট ধনু পরিমিত স্থানে সিদ্ধকূট। এই তীর্থের পশ্চিমে মক্ষর নিকটে চৌষটি ধনু পরিমিত স্থানে ব্রহ্মসরঃতীর্থ। ইন্দ্রকূটের উত্তরে আশি ধনু পরিমিত রামক্ষেত্র, এখানেও একটি কূট আছে। রামতীর্থের নব ধনু দূরবর্তী পূর্বদিক্‌ভাগে সীতা-তীর্থ। সীতাতীর্থের দক্ষিণে দশ ধনু পরিমিত বিজয়তীর্থ; এখানে বিজয় নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত। ইহারই নিকটে যোগতীর্থ। তাহার যোগেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। তাহার নিকটে ২২ ধনু পরিমিত মুক্তিীর্থ। মুক্তিীর্থের অতিদূরে বৃদ্ধকূট, ইহার ১৫ হস্ত। ইন্দ্রশৈলের দক্ষিণে বার ধনু পরিমিত সূর্য্যতীর্থ; এখানে সূর্য্যদেব অশুভ মুক্তিঃ অবস্থান করেন। রামক্ষেত্র মধ্যে দুইটি হর্গকূপ ও একটি ব্রহ্মকূপ আছে। ইন্দ্রকূটে মণিমাথ নামক মহাদেব অবস্থিত আছেন। লোমতীর্থের শেষদিক্‌তে পাঁচ ধনু পরিমিত মণিতীর্থ। চন্দ্রশৈলের উত্তরে চৌষটি ধনু পরিমিত যে পর্কত অবস্থিত আছে, সেখানকার জলাশয়ের নাম গয়াকূট এবং তীরকুমির নাম ক্ষেত্র। পুষ্কো লোহিত্য ও উত্তরে ব্রহ্মযোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ২২ ধনু পরিমিত স্থানের নাম গয়াতীর্থ বা গয়াতীর্থ।

এই সমুদায় তীর্থে দান, দান, পূজা, প্রদক্ষিণ এবং গয়াতীর্থে প্রাজ্ঞাদি কার্য্য করিলে অক্ষর পুণ্য লাভ হয়।"

(যোগিনী তঃ ২। ৪র্থ পং।)

মোমশৈলের উপানদিকে মণিশৈল, মণিশৈলের কিঞ্চিৎ

পূর্বাংশে উপানদিকোণে সাত ধনু দূরে বারাগনী নামক কূট, এই কূটের দৈর্ঘ্য ২২ ধনু। তাহার দক্ষিণদিকে পাঁচ ধনু দূরে ২২ ধনু পরিমিত মণিকর্ণিকা নামক কূট। মণিশৈলের উপানদিকে মঙ্গলানামক নদী। দক্ষিণদিকে কামেশ্বরী, পশ্চিমে হরগ্রীব, উত্তরদিকে কমললিঙ্গ, এবং পূর্বদিকে বিরজা; এই চতুঃসীমার মধ্যস্থলে তিন ক্রোশ পরিমিত স্থানের নাম মণিশিঠ। মানশৈলের বায়ুকোণে বরাহ পর্কত। তাহার পূর্বদক্ষিণভাগে সরস্বা-রূপ-সরোবর। ইহার বায়ুকোণে আট ধনু দূরে বৈদ্যরাক তীর্থ এবং দৈর্ঘ্যে একশত ধনু পরিমিত প্রোতাসতীর্থ। প্রোতাস-তীর্থের বায়ুকোণে বিষ্ণুরূপ। নাটকালের পূর্বভাগে বাতক নামক পর্কত এবং অগ্নিকোণে হর্য্যচল; এই স্থানকে শিবের অমর্গ্যও নামক তীর্থ কহে। হর্য্যচলের পূর্ব ও উপানদিক্‌ভাগে ভদ্রাচল। ইহার উত্তরদিকে উর্দ্ধশী নামক তীর্থ। উর্দ্ধশীতীর্থের পূর্বদিকে সূর্য্যতীর্থ। তাহার পাঁচ ধনু দূরবর্তী পূর্বদিকে কামাধাসরোবর। মনমতীর্থের দক্ষিণদিকে গঙ্গাসরোবর তীর্থ। গঙ্গাতীর্থের আট ধনু দূরবর্তী দক্ষিণদিকে আগন্ত্যতীর্থ। এই আগন্ত্য তীর্থের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অগ্নিকোণে একশ ধনু পরিমিত স্থানে বাসব নামক তীর্থ। ইহার পশ্চিমদিকে অনতিদূরবর্তী সাত ধনু পরিমিত স্থানে রক্ততীর্থ। তাহার ত্রিশ ধনু দূরবর্তী পশ্চিমদিকে কম্পীগকূট। এই কূটের বায়ুকোণে আট ধনু পরিমিত স্থানে পিতৃতীর্থ। পূর্বাংশে চন্দ্রশৈলের অগ্নিকোণে আট ধনু দূরে শিখাচমোচন তীর্থ; এখানে কম্পীকুমার নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন। ভদ্রকূটের বায়ুকোণে কপালমোচন তীর্থ; এখানে কপালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। কপালমোচনের পাঁচ ধনু দূরবর্তী উত্তরদিকে কপালতীর্থ। এই স্থানে বৃষধ্বজ নামক শিবলিঙ্গের অবস্থান। এই শিবলিঙ্গের পশ্চিমভাগে ২২ ধনু পরিমিত মাতলক্ষেত্র। মক্ষর পর্কতের উপানদিকে ১৬ ধনু পরিমিত চক্রতীর্থ। চক্রতীর্থের পশ্চিমে নন্দন পর্কত, ইহার পরিমাণ ৩২ ধনু। এখানে বৃদ্ধকুমারী কনার্দ্দিনদেব অবস্থিত আছেন। মক্ষরশৈলের উত্তরাংশ উপানদিকোণে বিরজাতীর্থ। চন্দ্রশৈলের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে শৌভলিঙ্গ। চক্রতীর্থের অগ্নিকোণে দুই ধনু পরিমিত স্থানে শৌভলিঙ্গতীর্থ। ইহারই নিকটে তুক্রাচাধ্য-স্থাপিত তুক্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছে।

এই সকল তীর্থে দান, দান, পূজা, প্রদক্ষিণ এবং স্থান বিশেষে প্রাজ্ঞাদি করিলে বিশেষ পুণ্য লাভ হয়।"

(যোগিনী তঃ ২। ৫ম পং।)

লোহিত্য হইতে বক্ষিপদিকে গমন করিয়া, তাহার বাহু-
কোণে কোলপৰ্জত। কোলপৰ্জতের পশ্চিমদিকে পাণ্ডু-
নাথ। তাহার বাহু-কোণে ব্রহ্মকৃত্যনামক বাহন বহু
বিভূত সরোবর। এই সরোবরের অনতিদূরে বক্ষিপদিকে
বাহবর কৃৎ পৰ্ব্বত বিভূত বিষ্ণুকৃত্য। বিষ্ণুকৃত্যের
পশ্চিমাংশে নৈঋতকোণে একাবন বহু পরিমিত শিবকৃত্য।
ইহারই নিকটবর্তী স্থানে পাণ্ডুনৈল। পাণ্ডুনৈলের পাঁচ বহু
দূরবর্তী নৈঋতকোণে অশ্বখচিত্রিত মৰ্জকেন্দ্র এবং ঐ
নৈলের পাঁচ বহু দূরবর্তী পূর্বদিকে বজ্রাকৃতি শিলা, এই
শিলা লক্ষ্মীনাথে অতিবিত্ত হয়। তাহার অনতিদূরে বক্ষিপ-
দিকে আটবহু পরিমিত কোলকেন্দ্র। এইখানে অশ্বখ-
মূলে বিষ্ণুর পাদ্যন মূর্তি বিদ্যাজিত আছে। ব্রহ্মকৃত্যের
নিকটে ঐকৃত্য নামক দুই বহু পরিমিত সরোবর। তাহার
পূর্বদিকে বাইন বহু দূরবর্তী স্থানে কনকল নামক তীর্থ।
তাহার বক্ষিপদিশ্চাপে মনোহর পৰ্ব্বতের উপর চারি বহু
পরিমিত চন্দ্রকেশব মূর্তি বিদ্যাজিত আছে। এই মূর্তির
পূর্বদিকে সাত বহু পরিমিত পুষ্করতীর্থ। পুষ্করের নৈঋত-
দিকে কিকিৎ বামভাগে ২৮ বহু পরিমিত বহরিকাপ্রসবতীর্থ;
এইখানে বিভাগক নামক শিবলিঙ্গ বিভাজ্য করিতেছেন।
পুষ্করের পূর্বভাগে কুমার নামক সরোবর, এখানে কাম
নামক মহাদেব আছেন। পূর্বোক্ত চন্দ্রকেশবের নামানু-
সারে ৬২ বহু পরিমিত স্থানে একটি বন আছে, তাহা
চন্দ্রক-বন নামে প্রসিদ্ধ। নীলকূটের পূর্বদিকে তুর্গ-
কূপের তিন বহু দূরে আশ্রাতকেশব নামক মহাদেব আছেন।
আশ্রাতকেশবের বক্ষিপদিকে আটবহু দূরবর্তী স্থানে তুর্গবর্ণ
গজাকার গগনেশ মূর্তি। তাহার পূর্বদিকে এক বহু দূরে
ত্রিবিক্রম মূর্তি। এই মূর্তির এক বহু দূরবর্তী স্থানে ৪০
হস্ত পরিমিত সৌভাগ্যসরোবর; ইহা কামাখ্যাদেবীর
কৌড়াসরোবর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই উপনদিকে
লোহিত্য সরোবর, অরিকৃত্য ও বামল-সরোবর। সৌভাগ্য
সরোবরের পাঁচ ৪৩ দূরবর্তী নৈঋতদিকে গজাসরঃ। ইহার
উপরিভাগে অনন্তকৃত্য। এই কৃত্যের পূর্বদিকে এবং
তুর্গশিলার পশ্চিমদিকে বরাহতীর্থ। ইহার অধিকোণে
কবল নামক শিবমূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন। অনন্তকৃত্যের
পশ্চিমদিকে অসি নামক নদী। তাহার পশ্চিমে বজ্রা নদী।
এই সকল তীর্থ শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত, এখানে
বহাবিধানে পূজাদি কার্য করিলে অনন্ত পুণ্য লাভ হয়।"

(গোবিন্দী তং ২।৬ পং।)

দামদতীর্থ নামক মহানদীর উত্তরদিকে দুই বহু দূরবর্তী

স্থানে প্রোক্তশিলা। বাহুবোবের আঠার বহু দূরবর্তী
পশ্চিমদিকে পক্ষকোণ উত্তরতীর্থ। কোট্টিনিকের বক্ষিপে
চতুর্ভাগ শিবমূর্তির নাম বক্ষিপ দামল। কামনাগের সাত-
বহু দূরবর্তী পশ্চিমদিকে বীর্ষবর্তী দেবী। কামেশ্বরের
উত্তরদিকে বামল বহু দূরবর্তী স্থানে কাম-সরোবর। কবল
বোবের বক্ষিপদিকে আট বহু দূরবর্তীস্থানে কোট্টিনিকী দেবী।
লোকচকু দেবীর দুই বহু দূরবর্তী স্থানে তিনটী খাড়া
আছে, তাহার মধ্য খাড়া সরস্বতী, বক্ষিপ খাড়া বজ্রা,
এবং উত্তর খাড়া বহুনা। ত্রিখারার সমন্বয়ে আকাশ-
গঙ্গা। তাহার উত্তরদিকে অনতিদূরে তুর্গবর্ণ বাহুবোব মূর্তি;
কামেশ্বরের পশ্চাত্তাগে শিবেশ্বর মূর্তি; তাহার নিকটবর্তী
স্থানে জয়াক্রম; বিভ্যাচলের নিকটবর্তী স্থানে বিভোবর্তী-
শিলা। তাহার পূর্ব-উত্তরদিকে পত বহু দূরে আকাশগঙ্গার
চিহ্ন রহিয়াছে। ইহার বক্ষিপভাগে প্রতীকিত শিলা,
এই শিলা ললিতাকান্তা নামে বিখ্যাত; এইখানে লক্ষ্মীপী
অশ্বখ এবং তাহার মূলদেশে কৃষ্ণাকৃতি শিলা আছে।
ইহার অনতিদূরে ব্যালতীর্থ ও ব্যালেশ্বরদেব ব্যালতীর্থের
বিংশতি বহু দূরবর্তী পূর্বদিকে হস্তিতপসী দেবীমূর্তি।
ইহারই পূর্বদিকে অনতিদূরে নব বহু পরিমিত কৃৎনেশ্বর-
মূর্তি। তাহার বাহু-কোণে অগত্যাপ্রমে গদ্যবহুমূর্তি।
গদ্যবহের অনতিদূর উচ্চল হেতুশিলার নাম তরুণ।
তাহার পশ্চিমদিকে সর্গাপন মূর্তি। সর্গাপনের নিকটবর্তী
স্থানেই গোবন্দপৰ্জতবিত্ত পোবিন্দ মূর্তি। তাহার পূর্ব-
দিকে নব বহু পরিমিত তুর্গবর্ণ শিলার নাম শরণেশী।
উচ্চ শিবাচলে প্রকটী নারী মহাদেবী। বিভ্যাচলের
উত্তরদিকে নব বহু দূরবর্তী স্থানে মহালক্ষ্মী। ঐপৰ্জতে
ঐকৃত্য নামক তীর্থ। সৌভাগ্যপ্রমে গুণকলক নামক শিব
মূর্তি এবং এই স্থানেই হংসতীর্থ নামক সরোবর আছে।
পাক্কট পৰ্ব্বত হইতে যে খাড়া নিঃসৃত হয়, তাহার নাম
সম্পদা নদী। শিব ও বিষ্ণুমূর্তির মধ্যবর্তী স্থান হইতে যে
খাড়া নির্গত হইয়াছে, তাহার নাম মহানদী। নিতম্ব ও
ধন এই উত্তরের মধ্যবর্তী খারার নাম বজ্রা। বিবস্ত্রী
পৰ্ব্বতের সীমান্ধে হইতে নিঃসৃত খারার নাম সরস্বতী।
মতল পৰ্ব্বতেরও খারার নাম নন্দা। কামকৃত্যের খারার
নাম কামগঙ্গা। কামাখ্যার খারার নাম গঙ্গা। লক্ষ্মীকৃত্যের
খারার নাম মধুপ্রবা। কামেশ্বরের খারার নাম জ্বাশ্রমী।
পদ্মশৈলের খারার নাম গঙ্গা। নীলকূটের খারার নাম
উর্জনী। ব্যালকূটের খারার নাম হুতজা। পক্ষশৈলের
খারার নাম চক্ৰভাগা। দোদকূটেরও খারার নাম

উল্লিখিত। যমুনেশ্বরের বারান নাম বৈষ্ণবী এবং ভক্তী-
শের বারান নাম গোদাবরী। মধ্যবর্তী মধ্যে রামহ্রদ
নামক ভীৰ্ণ। তাহার ত্রিণ খহু দূরবর্তী উত্তরদিকে কোটি-
শিল। এই শিলের সমুদ্রভাগে ব্রহ্মবান।

বরাহ ও কামের মধ্যবর্তীস্থানে অগুনতবন্ধের ও অগুন-
তব নামক আট খহু পরিমিত সরোবর, তাহার উত্তর
ভায়ে তত্ত্বকাল পৰ্বত; এই পৰ্বতে পৌত্রবিন্দা ও শোণ
চাৰ্ণিপলা। তাহার পাঁচ খহু দূরবর্তীস্থানে অববীধী
নামক ক্ষেত্র। অগুনতবন্ধের পূর্বদিকে নয় খহু দূরে সাত খহু
বিশ্বত বায়ানসীকৃত। তাহার পূর্বদিকে পাঁচ খহু
দীর্ঘ মার্জিতের হ্রদ। হ্রদের উত্তরভায়ে মার্জিতেশ্বর শিব।
গোকর্ণের অনতিদূরে ব্রহ্মসর: নামক কৃত। তাহার
পশ্চিমদিকে শৈলভঙ্গী বরাহদেব। গোকর্ণের উপনদিকে
তিন খহু দূরবর্তী স্থানে মদন পৰ্বত, তথায় কেদার নামক
মহাদেব মূর্তি বিরাজিত আছেন। কেদারের পশ্চিমদিকে
ব্রহ্মবটবৃক্ষ। কেদারের উত্তরদিকে তিন খহু দূরবর্তী
শোণক নগরে কমলাক্ষ মহাদেব। ব্রহ্মবট নামক কম-
লাক্ষের তিন খহু দূরবর্তী পশ্চিমদিকে ছত্রকের পৰ্বত।
ব্রহ্মবটই মধ্যদেশে মন্মথ নামক উন্নত গিরি। ছত্রকের
পূর্বদিকে মহুতপু নামক বিষ্ণুমূর্তি। এই পৰ্বতের উত্তর-
দিকে ১০ খহু দূরে কপিলাশ্রম, তথায় কপিলেশ্বর দেবতা
আছেন। কপিলাশ্রমের পূর্বদিকে ১১ খহু দূরে শিখাচ-
মেচন ভীৰ্ণ; এখানে কালভৈরব দেবতা আছেন। বায়ে
বহুদেবের উপনদিকে ১০ খহু দূরে কৃত্তিবাসেশ্বর। মদন
পৰ্বতের উপনদিকে তিন খহু দূরে বাণেশ্বর, সপ্তশালা-
ভৈরব ও বৎসভৈরব। বাণেশ্বরের বায়ুকোণে গজতলিল।
তাহার পশ্চিমদিকে বিষ্ণুমন্দির। মলিকুটের উত্তরদিকে
বলভা নদী। মলিকুটের পূর্বদিকে অনতিদূরে বিষ্ণু-
মুখবর্তী।

যথা বিদ্যানে এই সকল ভীৰ্ণে জান, মান, পূজা, প্রে-
ক্ষণাদি কায্য করিলে অক্ষর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে।”

(যোগিনী ত ২। ৭-৮ প ১।)

কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রপাঠে কামরূপের প্রাচীন
ভূত্বাধের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

পৰ্বত। কালিকাপুরাণের মতে এই কয়েকটি—

- (১) চন্দ্রবিধ; (২) হ্রদ; (৩) নীল; (৪) কৃতি-
বাসা; (৫) হুতীহ; (৬) বিজ্রাট; (৭) শুভাচল (৮);
ধবল; (৯) গজমাদন; (১০) গোপ্রোভ; (১১) মলিকুট;
(১২) মদন; (১৩) দর্পণ; (১৪) রোহণ; (১৫) অগ্নি-

মান; (১৬) কংসকর; (১৭) বায়ুকুট; (১৮) পূর্ণাশৈল
(১৯) চন্দ্রকুট; (২০) আনন্দ বা তন্মাতল; (২১) মন্ত-
ক্ষয়; (২২) কাম; (২৩) সুকাতক; (২৪) রক্তকুট;
(২৫) পাণ্ডনাথ; (২৬) চিত্রবহ; (২৭) ব্রহ্মগিরি; (২৮)
কর্ণট; (২৯) বরাহ; (৩০) অর্বাঙ্ক; (৩১) কঙ্কল;
(৩২) দূর্জয়গিরি; (৩৩) কোতক; (৩৪) সন্ধ্যাচল;
(৩৫) ভগবান্; (৩৬) শূলাট; (৩৭) নাটক; (৩৮)
হেম; (৩৯) ভক্তকাশ; (৪০) মন্মথ। এতদ্বিন্ন যোগিনী-
তন্ত্রে (৪১) মল্লশৈল; (৪২) বিহগাচল; (৪৩) স্পর্শা-
চল; (৪৪) ব্রহ্মপুণ; (৪৫) বিজ্রাচল; (৪৬) মান শৈল;
(৪৭) শিবযুগ; (৪৮) ইন্দ্রশৈল; (৪৯) শ্রীশৈল; (৫০)
মতল; (৫১) হাঙ্গাচল; (৫২) কোলপৰ্বত; (৫৩) হস্তি-
কর্ণ; (৫৪) বিকর্ণক (৫৫) অমাতল; (৫৬) ছামত;
(৫৭) কনক; (৫৮) নীললোহিত; (৫৯) গজদ্বর্জ; (৬০)
শিখাচ; (৬১) আদিত্য; (৬২) ভরাতক; (৬৩) ধনদ;
(৬৪) মহীত্র; (৬৫) জনক; (৬৬) নল; (৬৭) মণ্ডল;
(৬৮) বস; (৬৯) গোবিন্দ; (৭০) বিষ্ণুশ্রী; (৭১)
ভৌল; (৭২) ছত্রক; (৭৩) পরিগাভ; (৭৪) পূর্ণশৈল
ইত্যাদি।

নদী। কালিকাপুরাণে এই কয়েকটির নাম পাওয়া যায়।—

- (১) সুবর্ণমানস; (২) জটোত্তবা; (৩) ত্রিভোতা;
(৪) সিতপতা; (৫) নবভোতা; (৬) যোগদা; (৭)
(৮) মহানদী; (৯) বহুরোকা; (১০) করভোতা; (১১)
ব্রহ্মপ্রদা; (১২) চন্দ্রিকা; (১৩) কেদিকা; (১৪) পতা-
নন্দা; (১৫) সুমহনা; (১৬) ভৈরবগঙ্গা; (১৭) দেব-
গঙ্গা; (১৮) তত্ত্বা; (১৯) পুনর্ভ; (২০) মানসা; (২১)
ভৈরবী; (২২) বর্ণাশা; (২৩) কুসুমমালিনী; (২৪)
কীরোদা; (২৫) নীলা; (২৬) শিখাচণ্ডী বা চিত্রিকা;
(২৭) সিদ্ধজিহ্বোতা; (২৮) বুদ্ধদেবিকা; (২৯) ভট্টা-
রিকা; (৩০) দিকরিকা; (৩১) বর্ণবহা; (৩২) সুবর্ণশ্রী;
(৩৩) কামা; (৩৪) সোমাসনা; (৩৫) বুঝোদিকা;
(৩৬) শ্বেতগঙ্গা; (৩৭) কনধলা; (৩৮) সীতা; (৩৯)
(৪০) সুমহলা; (৪১) শাখতী; (৪২) কলিকিকা; (৪৩)
দুগ্ধমান; (৪৪) কপিলাগঙ্গিকা; (৪৫) দমনিকা; (৪৬)
বুদ্ধা; (৪৭) কাশা; (৪৮) ললিতা; (৪৯) সন্ধ্যা; (৫০)
দীপবতী; (৫১) অগদনদ।

এতদ্বিন্ন যোগিনীতন্ত্রে এককয়েকটি নদীর নাম পাওয়া যায়—

- (৫২) চন্দ্রাবতী; (৫৩) মানদ; (৫৪) পিজ্জিলা;
(৫৫) বর্ণদী; (৫৬) হীরিকা; (৫৭) ধনদা; (৫৮)

गङ्गावा; (६३) यववा; (७०) यवना; (७१) कनिजा; (७२)
यववडी; (७३) वादरी; ७४ विष्णु देवादि। (क)

(ক) জুর্কানবিন, জটোস্ত্রা ও জিমোস্ত্রা এই তিনটি নদীই জল-পাইকিঃভেলার অধাধিত। জুর্কানবিনের বর্তমান নাম জুর্কোশ্টি, চলিত কথায় সোণকাণী কহে; এই নদী জটোস্ত্রার পশ্চিম হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। জটোস্ত্রা—এই নদী জটান পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জটোকা নামে জলপাইকিঃ ভেলা ও কুতবিহার রাজ্যের মধ্য বিতা ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। জিমোস্ত্রার বর্তমান নাম তিকা, উহার প্রাচীনবর্ত অবশ্য পরিবর্তন হইলেও, এক্ষণে সিকিহের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাইকিঃ ও ব্রহ্মপুত্রে ভেলার মধ্য বিতা ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। এই নদীর অবস্থিহূরে কচিকক্সের মধ্য জলপাইকিঃ মগর হইতে প্রায় বেলুচোন পুরী প্রাচীন মায়ক পুণাশিষ্ট। কামিকাপুরাণে লিখিত আছে—

‘उत्तम कायकलाल साहसाः विभूषावहः ।

आह्लादवाजिबमकुलः कल्लोपायाः वाचस्पतिः ।"

কামরূপের বারুকোণে অধায়েন জল্লাশ দায়ক আপনার অনুল জিত
 দেবিভাছিয়েন ।

*ବ୍ରହ୍ମଦାତାହେତୁଃ ବିକୃତକୃତମସ୍ମିତ୍ ।

ତତ୍ପୁରସକ୍ତ ହୁ ଯତ୍ରେଽପୁରାତେଦେବସ୍ତୁତମ୍ ।

अथ भूतार्कः शिरोऽऽसीनः प्रशास्यः ।

এতদ্ভাষ্যে নবো বাতি পদ্যভাসকঃ প্রতি ।"

कानिकायुः ११ अः ।

এই জাতীয় ব্যাক মহাবেশ বরাহ-ভরহত কৃষ্ণকুলা বেতবর্ন,
ইহাকে ভৎসুভবের পূজা করিবে। যিনি জাতীয় বিবর্ত সম্বন্ধ অবগত হন,
তিনি নিশ্চয়াকৈ ধরন করেন।

কালিকাপুরাণের মতে, নন্দী মহাদেবের আরামদা করিবা এই-
 বামে সপত্নীয়ে দ্বাপনতা গ্রীষ্ম হইয়াছিলেম।

এই জাতিপন্থের নথির মধ্যে জরুরের নামক একজন রাজা নির্ণয় করেন। মুসলমানেরা সেই প্রাচীর নথির জন্ম করে। তৎপরে কুচবিহাররাজ আশনারায়ণ (খ্রীঃ ২০০-৬৬ হইল) বর্তমান নথির নির্মাণ করাইয়া যেন। এখন এই নথিরের সেই পূর্বে দৌষ্টবনাই, এখন ইহার ভগ্নাবস্থা, কবে ভূসিমাং হইবে। পূর্বে এখানে বিহার জীবদ্বাজীর সমাধয় হইত, কিন্তু এখন সে কাল গিয়াছে।

এই জরাজীর্ণের অনতিদূরে ভলহানসীর উপরে প্রাচীন পুণ-
নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এক সময়ে এখানে পুণ্ড্রবাহুর
রাজত্ব, দুর্গপরিধাৰি ছিল, এখনও তাহার বিলম্বন পড়িয়া আছে।
এই প্রাচীন স্থান প্রত্নতাত্ত্বিকদের যেখানে যোগ্য হইবে।

ইহাঃ নিকট করেকটি কুত কুত নদী আছে, সেইগুলি কালিকা
পুরাণোক্ত সিংগড়া ও নবভোজা বলিয়া অনুমিত হয়।

ভাষার কিছুরে পাটময় নবক ছাদে পাটের দ্বীপের এলিফ
অবির। কেহ কেহ এই পাটের দ্বীপকেই কালিকাপুরাণোক্ত শিবের
দ্বীপের অর্থবাৎ করেন।

ইতিহাস।—বহীষক নামক একজন দানব কানকপের
অতি প্রাচীন রাজা বলিয়া আশা-বৃক্ষভেদে বিখ্যাত
আছে। এই দানব কে, কেমন করিয়াই বা কানকপ ইহার
দামাদাখীনে আইনে জাহার কোম বিশেষ বিবরণ নাই।
বহীষকের পয় তরুণের চারিজন রাজা কানকপ দামদ
করেন।

ସଦୀରକ୍ଷ୍ୟ ସାମବେଶ ମଧ୍ୟ ମହାକାହ୍ନର କାୟକ୍ରମେଷ୍ଟ ହାଜିମବେ
 ଶ୍ରୀଚିନ୍ତାମଣି ବସୁ । ମହାକାହ୍ନର ବିଶେଷ ବିବରଣ ଏବଂ ଦ୍ଵିତମେଷ୍ଟ

ভৈরবী—এই বীর্য বর্ধক নাম ভক্তি। অত্যাভ্যাস যেন হইতে
উৎপন্ন হইত। ব্রহ্মপুত্র পতিত হইত।

বর্ণনা—বর্তমান কামতলুকের উপর হইতে বোম্বাইদেশের নিকট
কামতলুকে মিলিত হইতাহে ।

ବୁଦ୍ଧାବସିତା—କାୟତ୍ତମ ଶେଷାର ଶ୍ରୀମାଦିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧାବସିତା ।

বিকটিকা—বর্তমান নামে বিকটাই। এই নদী অকানাহাত্য হইতে
 উৎপন্ন হইয়া বরকজেলার যথা চিত্রা ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইতাত্বে।

কবিবরা বা হুগলি নদী—বর্তমান নাম হুগলি নদী বা বোবলি নদী :
এই নদী অধিবপুর জেলায় প্রবাহিত হইয়া ঢাকাতে পতিত হইয়াছে :

কাব্য—কবিমণ্ডিত জেলার বর্ধমান কাব্যাবলী, ইত্যাদি প্রকাশিত
বিপিনচন্দ্রে ।

ମୋହନନା—ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ମିଳି, ଜାଣିବନ୍ତୁ ଯେମାନେ ମହାବିତ ।

ବେତକା-ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିବର ନିକଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ସାହି, ଇହାହ
 ନିକଟ ବିଜୟସାହିସିବିବେଦୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଚିବ :

বিবাহবନ୍ଧা—একদেবে কେবল বନ୍ଧুনা নামে প্রসিদ্ধ। এই মহী নাপা
পাহাড় হইতে উৎপন্ন।

দর্শনিক—পূর্বোক্ত সমুদায়েরই পূর্বে প্রবাহিত । এখন বিমান।
 বায়ু প্রসিদ্ধ ।

কলিত্তিকা—এতখানি ছেলের কলহ মণী, হৃদয়গুণে পণ্ডিত হইয়াছে।

কণিজবন্ধিত। বা কণিজা—একদণ্ড কণিজি নামে অভিহিত। অৱন্তী-
নাহাঙ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গদেশে পতিত হইতাত্বে।

ବୁଦ୍ଧଧର୍ମା—ବହୁଳ ଭେଦାର ବୁଦ୍ଧଧର୍ମ ନାହିଁ ।

ଶିଳ୍ପବତୀ—ହସକ ଶେଖାସି ଶିଳ୍ପବତୀ ଘରୀ ।

বিশ্ববন্দী—বর্তমান যাব বিশ্ব : বিশ্ববন্দীদের বিকট ক্রন্দন শুনে মিলিত
হইতাহে । বোম্বিনীকৃতের সঙ্গে এই নবীই জাতীয় কান্ডনের পূজনীয় ।

চন্দ্রাবতী—বোম্বাইশাসক জেলায় প্রবাহিত বহুমান উপানদী নদী,
ইহার ত্রিভুজাশেখ নাম দখাবয় ।

যাযা—যোড়গাড়া কোলা যাযা নহী।

শিক্ষা—বরদা জেলার শিক্ষা বর্গী, বিজ্ঞানের বিকট প্রচণ্ডে
পড়িত হইয়াছে।

হীরিকা বধী—বর্তমান যাম হিজিক, শিবসাবর জেলার প্রবাসিত
 হইয়া লখিমপুর জেলার মধ্য দিয়া ব্রজপুরে পতিত হইয়াছে।

धनदा—वर्द्धमान धनवती वा धनविधि धाने वाक, वावावावाक हरेक
 केनन हरेक सकलने विनिक हरेवाह । हरेई विविधन पावन
 नीह ।

বা যখন তগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক কামরূপের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, কামিকাপুরাণের ৩৮নং হইতে ৪০নং অধ্যায়ে তাহা সমাক্রমে বিবৃত আছে। নরকাসুরের কীর্তি অদ্যাপি কামরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। * নরকাসুর এবং কামাখ্যা সম্পর্কে এইরূপ একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে বলা—

নরকাসুর কোন এক সময়সীমায় আত্মরিক মর্মে উন্নত হইয়া তগবতী কামাখ্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। তখন তগবতী কামাখ্যার মন্দিরাদি নির্মিত হয় নাই। অতি সামান্তভাবে অরণ্যের ভিতরেই পীঠস্থান ছিল মাত্র। নরকের প্রস্তাব শুনিয়া তগবতী কহিলেন, যদি তিনি এক মন্দির তিতর তাঁহার মন্দির, রাজ্য, পুত্রাদি ইত্যাদি সমস্ত নির্মাণ করিয়া দিতে পারেন তবে তগবতী তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। নরক তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্মাণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সাহায্যে মন্দিরশেখরের পূর্বেই প্রায় সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিলেন। তগবতী দেখিলেন মহা বিপদ, এখন তাঁহাকে অসুরের ভাষা হইতে চাইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া একটি মায়াকর্পী কুণ্ডল সৃষ্টি করেন এবং নরকের কার্যশেখরের অবাবিহিত পূর্বেই তৎকর্তৃক প্রাতঃকালীন কুণ্ডলধ্বনি করাইতে আরম্ভ করিলেন। কুণ্ডলধ্বনি হইলেই তগবতী নরককে কহিলেন, কার্যশেখরের পূর্বেই কুণ্ডলধ্বনি হইয়াছে— রাজ্য প্রভাত চাইল, আমি তোমাকে বরণ করিতে প্রস্তুত নহি। তগবতী বাক্যে নরক ক্রোধাক্রমে চাইয়া সেই কুণ্ডলের অন্তঃসরণ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। যে স্থানে নরকাসুর এই কুণ্ডলকে বধ করেন অদ্যাপি “কুরুরাটচাকি” নামে সেই স্থান প্রসিদ্ধ। নরকাসুর কর্তৃক এই সময়েই প্রথমতঃ তগবতীর কামাখ্যার মন্দির নির্মিত হয়।

রামায়ণের সময় কামরূপের (প্রাগ্জ্যোতিষপুরের) শাসন-কর্তা নরকাসুর ছিলেন। সীতা অযোধ্যায়ের নিমিত্ত সুগ্রীব কর্তৃক বানরগণ নানা বিগম্ভে প্রেরিত হইলে কামরূপেও একজন বানর প্রেরিত হয়। বানররাজ সুগ্রীব সেই সময় কামরূপের এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন—

“বোজানানি চতুঃবৈবরাহো নাম পৰ্বতঃ।

সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে ॥ ৩০

তত্র প্রাগ্জ্যোতিষঃ নাম জাতরূপময়ঃ পুরম্।

তদ্বিন্ বলতি হৃষ্টাঙ্গা নরকো নাম দানবঃ ॥ ৩১

কিঙ্কিকাণ্ড ৪২ সর্গ।

বর্তমান গৌহাট্টে নরকের রাজধানী ছিল। এই

* এই গৌহাট্টের প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর।

“প্রাগ্জ্যোতিষপুরঃ খ্যাতঃ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলঃ”

গৌহাট্টের পশ্চিম দক্ষিণপার্শ্বে নীলাচলের নিকট নরকাসুর পর্বত নামে একটি কৃত্রিম পাহাড় আছে।

নরকাসুরের পর তৎপুত্র তগমন্ত তগবান্ ঐক্য কর্তৃক কামরূপের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্বদিকে চীনদেশ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত তগমন্ত স্বীয় শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাত্ম্যের সত্যপক্ষে অর্জুনদিগ্বিজয়ে তগমন্তের বিষয় এইরূপে লিখিত আছে—

“স কিরাটৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্জ্যোতিষোত্তমঃ।

অন্যৈশ্চ বহুভির্বোধৈঃ সাগরাস্তপবাসিভিঃ ॥”

তিনি কিরাত, চীন এবং সমুদ্রতীরবর্তী রাজত্ব কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ও তগমন্ত চীন এবং কিরাতসেনা দিয়া চর্যোধনকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেককালে এই কিরাতদিগকে রেজু এবং স্থানবিশেষে কামরূপেশ্বরকে “রেজুনামাধীপঃ” এবং কামরূপের অন্তর্গত এই কিরাত-দেশগুলিকে রেজুদেশ বলা গিয়াছে। প্রকৃত কামরূপদেশেরও প্রথমবিশেষে রেজুদেশ নাম দেখা যায়। তাহার কারণ কামরূপ ভীর্ণবিবরণের প্রারম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে।

বোদিনীতন্ত্রে কামরূপের রাজবিবরণ সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে—

“কুমতেঃ পুরভূপত রাজান্যাপো বলা তবেৎ।

তদ্দিনাং পরমেশানি ব্রহ্মশাপঃ প্রবর্ততে ॥

ততোহতীৰ ছরাতারো কামরূপে ভবিষ্যতি।

সদাশুদ্ধঃ মহামারো সদাশূর্য্যন্তমো চ ॥

দেবদানবগন্ধর্বাঃ সদা পীড়াপরাধরাঃ।

কুপূৰ্ণকুলটাচক্রেগতে শাকে দিবানিশম্ ॥

সৌম্যৈশ্চ কুবাটৈশ্চ যবনৈশ্চ সুললম্।

ভবিষ্যতি কামপুটে বহুসৈন্তসমাকুলম্ ॥

ততো রণে চ সৌম্যঃ জিহ্বা যবন-ঈলিতম্।

বর্ষমেবাকরোদ্ভাজ্যং মকারাদিমহীপতিঃ ॥

তৎসহায়ঃ সমাসাদা কুবাচঃ স্বীয়রাজ্যভাক্।

বর্ষান্তে যবনঃ হিহ্বা সৌম্যারো রাজানারকঃ ॥

কুমারীচক্রেগালেগতে শাকে মহেশ্বরী।

কামরূপে মণেঃ পৃষ্ঠসংযোগঃ সম্ভবিষ্যতি ॥

কামরূপে তথা রাজ্যং ছাদশাখং মহেশ্বরী।

কুবাচসংগতো ভূত্বা যবনন্ত করিষ্যতি ॥

বঠবর্ণপক্ষমাদিত্যতঃ শরীরমিচ্ছতি।

শাসিতব্যং কামরূপং সৌম্যৈশ্চ কুবাটৈকঃ ॥

যবনন্ত কুবাচশ্চ সৌম্যশ্চ তথা মণঃ।

কামরূপাধিপো দেবি শাপমন্ডোন চাভকঃ ॥
 এবমেব বহুবিধং বক্যো লক্ষণমীশ্বরী ।
 ক্রিয়তে সংকারকরং প্রত্যক্ষং পরমেশ্বরী ॥
 বশিষ্ঠস্ত তপস্তাদাবয়িঃ শাম্যতি কামিনি ।
 ভবিষ্যন্তি চ তরবঃ শালাখ্য পর্ত্তোপরি ॥
 স্বর্গদ্বারে শিলাপাতে চৈকে বেপুরসন্নিধৌ ।
 কামাখ্যায় মঠে ভগ্নে উর্কশ্চা সদৃশকমঃ ॥
 ব্রহ্মপুত্রস্ত দেবেশি হৃদধারী তু তস্ত চ ।
 ষোড়শাব্দে গতে শাকে ভূমহীরিপুচলুকে ॥
 বিগতো ভবিতা ন্যূনঃ সৌমারকামপৃষ্ঠয়ো ।
 যথাসং তত্র সংপূজ্য উত্তরাকালকোষমোঃ ॥
 গমিষ্যন্তি চ রাজানঃ সর্কে যুদ্ধবিশারদাঃ ।
 কুবাচৈর্ববনৈশ্চাজৈবহসৈন্তসমাকুলৈঃ ॥
 জিত্বিন্নৈঃ স্যেৎ সমাকীর্ণং মহাযুদ্ধং ভবিষ্যতি ।
 অশ্বমুণ্ডৈর্নরমুণ্ডৈর্গজমুণ্ডৈর্বিষেষতঃ ॥
 লোহিত্যো রক্তপূর্ণশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 তদৈব পরমা মায়্য যোগিনীগণবন্দিতা ॥
 কামাখ্যা বর্ণকশ্যমা বলিহস্তা হসনুখী ।
 লোলজিহ্বা মুণ্ডমালা দিগন্তা পরমাস্তিতা ॥
 পর্ত্তোগ্রঃ সমাপ্রিত্য রক্তপানং করিষ্যতি ।
 ততঃ কুবাচো যবনঃ হিষ্টা সৌম্যবিনাশিতঃ ॥
 করতোয়ানদীং যাবৎ করিষ্যতি মহত্ৰণম্ ।
 দশাহং তত্র সংস্থায় যান্তস্তি পুনরালয়ম্ ॥
 ততো বিপ্রো নৃপো ভূষা কামরূপনিবাসিনঃ ।
 করিষ্যতি জনান্ দেবী জপপুজাদিতং পরান্ ॥
 এবং বর্ষত্রয়ং রাজ্যং কৃষা দত্তী দ্বিজো নৃপঃ ।
 ভবিষ্যতি মহামায়ে যোনিমণ্ডলসন্নিধৌ ॥
 ততো দ্বাদশদলে নাভিঃ কল্লতে পূর্কভূমিপঃ ।
 ঐশানীমাগতঃ কামানেকচ্ছত্রং করিষ্যতি ॥
 তদ্রাজ্যং সকলং দেবি ধর্ম্মেণ পালয়িষ্যতি ।
 তৎপত্নী শ্রামবর্ণা ত্রাৎ সদারাদিতপা ধর্ম্মতী ॥
 সবিতং তনয়ং সাধ্বী রাজানং রাজপুত্রকম্ ।
 তজ্জন্মদিবসাদেবি যাবৎ শ্রাদ্ধাদশং দিনম্ ॥
 তাবৎ স্পর্শাচলে স্পর্শমণিরিবির্ভবিষ্যতি ।
 তেনৈব ধনিনঃ সর্কে কামরূপনিবাসিনঃ ।
 ভবিষ্যন্তি তদৈব ত্রাৎ বশিষ্ঠশাপমোচনম্ ॥”

যোগিনীতন্ত্রে ১।১২ পটল।

কোন সময়ে কামরূপরাজ (নরক) মল্লবুদ্ধি হওয়ার সেই সময়ে তাঁহার রাজ্যনাশ হইবে এবং তদবধি কামরূপে ব্রহ্ম-

শাপ হওয়ার নিয়ত দ্রব্যবহার ও যুদ্ধাদি ঘটনা হইবে। এবং দেবদানব গন্ধর্ভ প্রভৃতিও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিবেন।

১৩১১ শকে (?) সৌমার, কুবাচ ও যবনগণের বিপুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। এই যুদ্ধে মকারাদি কুবাচ নৃপতি জয়লাভ করিয়া এক বৎসর রাজ্যশাসন করিবেন। তৎপরে ১৩১৯ শকে (?) সৌমার কামরূপ অধিকার করিয়া বারবৎসর রাজ্য-পালন করিবেন। এইরূপে শাপকালমধ্যে তথায় যবন* কুবাচ, সৌমার + ও প্রভৃতি রাজগণ কামরূপের শাসনকর্ত্তা

* যোগিনীতন্ত্রে যবন ও প্রবল্যতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

“কৌরবযুদ্ধে শাবপুত্র বাহ্লীকগণ নিহত হইলে, তাহাদের বংশ একে-বারে লোপ হইল। এই সময়ে কীর্ণিনারী কোনও বাহ্লীকরমণী কাশীধামের স্তুতিমণ্ডপে অবস্থান করিয়া বিবেচনের তপস্তা করিতে থাকে। বলিপুত্র বাগাহর তখন মহাকালরূপে কাশীর দ্বার রক্ষা করিত; এই মহাকাল কীর্ণির সৌন্দর্য্যদর্শনে কামমুগ্ধ হইয়া তাহাকে সঙ্গত হয়। তাহা হইতেই মহাকুশনামক মহাবলশালী এক পুত্র উৎপন্ন হইল। পরে মহাদেব তাহাকে শাশুরাজ্য কামরূপ দান করিয়া ‘দ্রব’ অর্থাৎ ‘বাও’ এই বাক্যে স্তুতিমণ্ডপ হইতে বিদায় দেন। এই জন্তই তাহার দ্রব নামে অভিহিত হইয়াছে।

ত্রৈত্যযুগে বাহনামক এক বর্ষপারায়ণ রাজা ছিলেন, তিনি সপ্তদ্বীপস্থ সমুদ্রায় পিতৃপুত্র পরাজিত করিয়া সমগ্র পৃথিবী মধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কাণ্ডা জন্ত তাঁহার মনে অহঙ্কার উপস্থিত হইল এবং সেই অপরোধে তাঁহার রাজ্যলক্ষীও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে হৈহয় ও তালজল্য নামক রাজত্বয় তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করে। বাহ সপরিবারে যেনে পলায়ন করিয়া কিছুদিন মধ্যেই যুত্মুখে পতিত হইলেন। ক্রমে তৎপুত্র সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃপুত্র হৈহয় ও তালজল্যকে আক্রমণ করিলেন, তাহার পরাজিত হইয়া বশিষ্ঠ ঋষির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। সগরও বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘আমি এই পিতৃপুত্রদ্বয়ের শিরশ্ছেদ করিব বলিয়া এতিজ্ঞা করিয়াছি; এনিকে আপনি আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে নিধন করিতে নিবেদ্য করিতেছেন। উভয় কাণ্ডাই আমার পালনীয়, হুতরাং কি কর্তব্য বলিয়া দিন।’ বশিষ্ঠ বলিলেন—‘শাস্ত্রে শিরশ্ছেদ ও শিরো-মুণ্ডন একরূপ বলিয়াই নির্দিষ্ট আছে, অতএব তুমি ইহাদিগের শিরো-মুণ্ডন করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেই উভয়দিক্ রক্ষা হইবে।’ সগর বশিষ্ঠ বাক্যামুসারে তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন তাহার হৃদয় সূন্য নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার উপদেশামুসারে তপস্তা করিতে লাগিল। কিন্তু এই সময়ে তাহার নিত্যন্ত স্নেহাচার হওয়ার তদবধি যবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তথাপি তাহার তপোবলে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া কলিযুগে রাজ্য প্রাপ্তির বরলাভ করিয়াছিল। (যোগিনীতন্ত্র) ১৩ পঃ)

+ কোন সময়ে ইন্দ্র কৌশলীর সহিত নৃত্যরীতি বর্ণন করিতেছিলেন, তৎকালে সর্ভকীদিগের মধ্যে কাঞ্চী নামী অপসারী হাব ভাব বর্ণন

হইবেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি লক্ষণাদি সজ্জাতিত হইবে।—বশিষ্ঠঋষির তপোদাবানল শাস্ত হইলে পর্বতের উপর শালবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। এই সময়ে শিলাপাত জন্ম কামাখ্যা মঠ ভগ্ন হইয়া যাইবে এবং উর্কশীর সহিত ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম হওয়ায় তাহার জলধারা হ্রস্ব হইয়া যাইবে। এই ঘটনার পর ষোলবৎসর অতীত হইলে ১৬১১ শকে (৭) সৌমার ও কাম-পীঠে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, ৬ মাস এখানে যুদ্ধের পর ঐ সমস্ত যোদ্ধাগণ উত্তরাকালকোষে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিবেন। এই যুদ্ধে কুব্জাচ, যবন ও চান্দ্র এই ত্রিবিধ য়েচ্ছ-সৈন্যমধ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য ও অশ্বগজাদি বিনষ্ট হওয়ায় যুদ্ধস্থল রক্তপ্লাবিত হইয়া উঠিবে। দিগদ্বারী মুণ্ডমালা-বিভূষিতা শ্রামবর্ণা কামাখ্যাদেবী সহস্রমুখে লোলজিহ্বা বিস্তারপূর্বক ঘোগীনিগণের সহিত পর্ত্তশিখরে আরোহণ করিয়া রণশোণিত পান করিবেন। কুব্জাচ (কোচ) এই যুদ্ধ জয়লাভ করিয়া তথায় দশদিন বাস করিয়াই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে। ইহার পর কামরূপদেশে ব্রাহ্মণ রাজা হইবেন। রাজ্যমধ্যে প্রজাদিগকে তিনি পূজা ও জপ-প্রভৃতি কার্যে আসক্ত করিয়া তুলিবেন। এইরূপে তিনি তিন বৎসর রাজ্যশাসনের পর যোনিমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাসস্থান নিশ্চয় করিয়া ক্রমে ক্রমে একচ্ছত্রী রাজা হইয়া উঠিবেন। এই রাজার পত্নী শ্রামবর্ণা হইবে, ইহার উভয়ে সর্পদা পার্শ্বতীর আরাধনা করিবেন এবং যথাকালে সবিভ নামক একটি পুত্র লাভ করিবেন। এই পুত্রের জন্মদিন হইতে বারদিন পর্য্যন্ত স্পর্শাচল পর্ত্ত হইতে স্পর্শমণির আবির্ভাব হইবে, তজ্জন্ম কামরূপবাসিগণ সকলেই ধনী হইয়া উঠিবেন। এই সময়েই বশিষ্ঠ ঋষির অভিষাগ মোচন হইয়া যাইবে।

কামরূপের কোন কোন প্রাচীন ব্রহ্মজীতে ভগদত্তের পর পাঁচজননের নাম পাওয়া যায়—ধর্মপাল, রত্নপাল, কামপাল, পৃথ্বীপাল ও যুবাহ। ইহার কে কোথায়, কবে, কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। এই পাঁচজন

কৌশাজীর মন বিচলিত হওয়ায়, তাহাকে মাননী হইবার আশ্রয় দেন। কাজী যথা সময় কোরব বধু হইলেন, ভগ্নগরে বৃক্ষক্ষেত্রে লত লত কোরবরমণী যখন প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তিনি সেই সময়ে চন্দ্রচূড় পর্ত্তের অতি উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। এইখানে তাহার ঋতু হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত কামপীড়িত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে সেই পথ দিয়া ইন্দ্র গমন করিতে করিতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া সজ্ঞাপন করেন। তাহাতে অরিন্দম নামক পাণ্ডাচারী একপুত্র হইয়াছিল; তথাপি ইন্দ্রের অমুগ্রহে সেই পুত্র কামরূপের রাজা হইয়াছিলেন। এই অরিন্দমের বংশধরগণই সৌমার নামে প্রসিদ্ধ।

(যোগিনীতন্ত্র ২।১০।)

রাজা কোন বংশীয়, তাহাও জানা যায় না, তবে ভগদত্তের পরই এই পাঁচজননের নাম একাদিক্রমে পাওয়া যায় বলিয়া, আধুনিক ব্রহ্ম-লেখকেরা অতুমান করেন যে, ইহার ভগদত্ত-বংশসম্ভূত হইলেও হইতে পারেন। যাহা হউক, শেষে এই বংশ লোপ পায়। ইহার পর কামরূপ একপ্রকার অরাজক হইয়া পড়ে এবং নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়।

এখানকার লাকাকার আরম্ভসময়ে কামরূপে দেবেশ্বর নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার রাজধানী-কোথায় ছিল, জানা যায় না। ইনিই বৌদ্ধধর্মের প্রবলতার মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা বাড়াইতে চেষ্টা পান। ইনি কামাখ্যাদেবীর পূজার ও মন্দিরের উদ্ধারসাধনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহার পর কে কতদিন কোথায় রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না।*

ইহার কিছুদিন পরে ব্রহ্মপুত্রবংশীয় ব্রাহ্মণরাজবংশের রাজত্বকাল। এই বংশের উৎপত্তিসম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। কোন ব্রাহ্মণের এক যুবতীকন্যা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যায়। ব্রহ্মপুত্র যুবতীর রূপ দেখিয়া মোহিত হন এবং তাহাকে দর্শন দিয়া স্বীয় মনোভিলাষ জানাইলে যুবতী সখতা হন বা যাহাই হউক এই যুবতীর গর্ভে একটি সন্তান জন্মে। এই পুত্রটি শেষে কামরূপে রাজা হন। এই রাজার নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না। মিঃ রবিন্সন্ করতোয়ার গর্ভজাত এক রাজার কথা লিখিয়াছেন। বোধ হয় এই ব্রহ্মপুত্রের সন্তানকেই তিনি করতোয়ার সন্তান বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ফলে প্রবাদের বা কল্পনার মূলে যাহাই থাকুক, কামরূপে যে কোন ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিয়াছিল, ইহা নিশ্চয়।

৫৫১ শকে চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং ভারতে আসেন এবং ৫৬০-৬১ শকে তিনি কামরূপে আসিয়াছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে কামরূপকে “কিয়া-মো-লু-পো” বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার কামরূপের বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি ব্রহ্মপুত্রের তীর দিয়া কামরূপের রাজধানীতে (গোহাটীতে) উপস্থিত হন। এখন গোহাটী যেমন ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অবস্থিত, তখনও সেইরূপ ছিল। তখন নারায়ণ-দেববংশীয় বর্দ্ধ-উপাধিধারী কদ্রিয়রাজকুমার ভাস্করবর্ম্ম† নামে রাজা

* পূর্বে যে নরকের প্রতি শিবশাপের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে বোধ হয়, এই দেবেশ্বর বুড়িই লাক-জন্মের প্রারম্ভ সময়ের প্রথম শূদ্ররাজা ইনি ধীর বা কৈবর্ত্তজাতীয় ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

† হিউএন সিয়াং ইহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (Beal's Buddhist Record, Vol. II. p. 96)। কিন্তু বর্ম্ম উপাধি কদ্রিয়-পরিচায়ক।

ছিলেন। এই রাজা হিন্দু হইলেও বৌদ্ধধর্মী ছিলেন না, বৌদ্ধদিগকে বৃত্তি দিতেন। ইনি কুমাররাজ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ৫৬৫ শকে শালম্বাবিহারে শিলাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া কাঞ্চকুজে গিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কাঞ্চকুজরাজ ইহাকে বখোচিত সম্মান দেখাইয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বসিতে আসন দিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকের সময় কামরূপে শতাধিক হিন্দুদেবদেবীর মন্দির ছিল। বৌদ্ধমন্দির বা সত্যারাম একটিমাত্র ছিল না। কামরূপের অধিবাসীরা অধিকাংশ হিন্দু ছিল। এই সময়ে কামরূপ রাজধানীর পরিধি ২০ ক্রোশ বা ৩ ক্রোশ ও দেশের পরিধি প্রায় ৮৫০ ক্রোশ (১০০০০ লি) ছিল। এ সময় সমস্ত কামরূপরাজ্য একমাত্র রাজা কুমার-ভাস্কর-বর্মার অধীন ছিল। ইহার অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ ছিল। তৎপরে দশকুমারচরিতে কামরূপরাজ কলিন্দবর্মার নাম পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবত ভাস্করবর্মার বংশীয় হইবেন। এই বংশের প্রাধিকৃত্য হ্রাস হইলে পুরোক্ত সামন্তরাজেরা প্রবল হইয়া উঠে।

আসামের বর্তমান দরঙ্গ জেলায় নাগশঙ্করনামে এক শিবালয় আছে। নাগাক্ষনামে কোন রাজা এই মন্দির নির্মাণ ও ইহাতে শিবস্থাপনা করেন। * নাগশঙ্কর দেবালয়ের পার্শ্বে প্রতাপপুর বা প্রতাপগড়ে ইহার রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কেহ কেহ অস্বীকার করেন, ৩০০ শকে নাগাক্ষ রাজা ছিলেন। রাজা নাগাক্ষের পর তৎস্থানীয় আর কয়জন রাজা হইয়া গেলে, তাঁহার বংশলোপ হয়। নাগাক্ষবংশ কামরূপে সর্বশুদ্ধ ৪০০ শত বৎসর রাজত্ব করেন। দরঙ্গ জেলায় এই রাজবংশের বাস ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে আড়িমাও নামক একজন রাজা ছিলেন। প্রবাদ আছে, প্রতাপপুরের কোন রাণীর গর্ভে ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে এই নরপতির জন্ম। ইহার আকৃতি আড়িমাছের মত ছিল বলিয়া “আড়িমাও” নাম হয়। প্রবাদ যাহাই হউক, আড়িমাও কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে প্রবল হইয়া উঠেন। ইনি নাগাক্ষবংশধরদের কিছু পুর্বে কাছাড়, জয়ন্তী ও প্রতাপগড়ের অধিকারভুক্ত অনেক স্থল অধিকার করেন। গোহাটী হইতে নগাঁও পর্যন্ত ইহার অধিকার বিস্তৃত হয়। আড়িমাওর জোড়ালবলহ নামে এক পুত্র ছিল। কাছাড়রাজের সহিত সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহাদি

হইত বলিয়া এই জোড়ালবলহ একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। নগাঁওর শহরীপারগণায় আজিও একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে, লোকে ইহাকেই “জোড়াল-বলহর গড়” বলে। কাছাড়রাজ যুদ্ধ পরাস্ত হইলে জোড়ালবলহর সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। এই রাজকুমারী পিতৃকুলের হিতেচ্ছায় বড়বয়স করিয়া উভয় রাজ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। কপিলীনদীতীরে এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জোড়ালবলহ পরাস্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া কিলিঙ্গ নদীতে পড়িয়া প্রাণরক্ষা করেন। নদী হইতে উঠিয়া পলাইবার সময় জোড়ালবলহ কোথায় মারা পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। এদিকে কাছাড়ীরা তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। এই সকল ঘটনার কাল নির্ণয় করা যায় না।

কামরূপের ডিমরুয়ার রাজা পুরোক্ত আড়িমাও রাজার কোন সন্তানের বংশজাত বলিয়া পরিচয় দেন। আজিও ডিমরুয়ার রাজবংশ (পূর্বপুরুষের সন্মম রক্ষার্থ অথবা এক গোত্র বা বংশোৎপন্ন বলিয়া) আড়িমাছ খান না। নাগাক্ষবংশ ধ্বংস হইলে উত্তরভাগে ছুটিয়া নামক এক অসত্য জাতি প্রবল হইয়া উঠে। ইহাদের রাজা মহাদেবের ভাগ্যারী কুবেরের সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু আধুনিক আসাম ব্রজা-লেখকেরা বলেন যে, ব্রহ্মপুত্রবংশীয় কোন শেষ বংশধরের ভাগ্যারী প্রবল হইয়া এই জাতিকে বশীভূত করিয়া প্রাধিকৃত্য লাভ করেন। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রবংশ লোপ হইলে ইহারাই রাজা হয়। তৎপরে যখন আহোমজাতি কামরূপরাজ্য অধিকার করে, তখন ইহার তাড়িত হইয়া অনেকেই দরঙ্গ জেলায় উঠিয়া গিয়া ছুটিয়ারাজ্য স্থাপন করিল। এখানে ইহার আপনাদের মধ্যে একজনকে রাজা করিয়া সমুদয় উত্তর-খণ্ড অধিকার করে। ইহাদের পরাক্রম হ্রাস হইলে কেবল পুর্কের কিঞ্চিদংশমাত্র ইহাদের অধিকারে থাকে এবং অবশিষ্টাংশ আহোমরাজ্যভুক্ত হয়। এই বিবরণ হইতে উত্তর অঞ্চলের কিছু প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়।

কামরূপ জেলার দক্ষিণাংশে জিতারিনামে একজন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী রাজা ছিলেন। ইনি পশ্চিমপ্রদেশের লোক। ইহারই সময়ে গোহাটী (গুয়াহাটী) হইতে চিরদিনের জন্ত রাজধানী উঠাইয়া লওয়া হয়। জিতারি ভাটীনামক স্থান হইতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ভাটীতে রাজধানী হইল। কবে ইহা হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইহার পরে জন্মেখর নামে একজন রাজা হন। এখন যেখানে জন্মেখর নামক দেবমন্দির আছে, সেইখানে ইহার রাজধানী ছিল। জলপাইগুড়ির জরীশপীঠে ইনিই জন্মেখর নামক দেবালয়

* নাগাক্ষ নাগশঙ্কর নামেও বিখ্যাত। ইনি কয়তোয়া নদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

নিৰ্মাণ করেন ও শিবপূজা প্রচার করেন। কামরূপের এই খণ্ডকে আসামীরা বড়হেড়ীদেশ বলে। অল্প একখানি বুরঞ্জীমতে জিতারি ৬২ বৎসর, তৎপুত্র হুবলি ১০৫ বৎসর, তৎপরে পদ্মনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ, মহেন্দ্রনারায়ণ, গজেন্দ্রনারায়ণ, রামনারায়ণ, জয়নারায়ণ, শুভনারায়ণ ও রামচন্দ্র ইহারা প্রত্যেকে ১০৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব করেন। রামচন্দ্রের সময়ে এই বংশ লোপ পায়। এই বংশ কবে রাজত্ব করিয়াছিল, তাহা কিছুতেই জানিবার উপায় নাই এবং বুরঞ্জীতে যেরূপ বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে বিশ্বাস করাও কিছু কঠিন। এই অঞ্চলে পুখু নামে একজন রাজা ছিলেন। রঙ্গপুর অঞ্চলে ইহার এবং ইহার বংশের অন্ত্যস্ত ভূপতিগণের অনেক কীৰ্ত্তি আছে (ক)।

ইহাদের পর কামরূপে ধৰ্ম্মপাল (খ) নামক একজন

(ক) পুখুরাজের সময় রাজ্যের সীমা বহুদূর বিস্তৃত ছিল এবং ইনি বহুদিন পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি দেবংশজাত বলিয়া বিখ্যাত। এবাদ আছে, ইনি রাজা হইবার পূর্বে রাজা মধ্যে কীচকনামক অসভ্যজাতির উৎপাত হয়। তৎকালীন রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে না পারায় পুখু একদিন কোন পুত্রবিশিষ্টে আশ্রয় দেন। পরে তিনি উট্টিয়া আসিবার সময় তাহার সহিত অসংখ্য সমস্ত সৈন্ত উট্টিয়া আসিল এবং কীচকদিগকে দমন করিয়া নগর অধিকার করিল ও পুখুকে রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিল। এই কীচকজাতীয় লোক উত্তরভারতে এখনও দেখা যায়। ইহারা বহু পশুচারণ ও ভাগ্যগণনা করিয়া জীবিকার্জন করে।

(খ) ধৰ্ম্মপাল নামক একজন গোড়াধরের পুত্রকে অবলম্বন করিয়া ঘনরামের “ঐধর্মমঙ্গল” কাব্য লিখিত। ঐধর্মমঙ্গলে এই ধৰ্ম্মপালের পুত্র গোড়াধর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ঐধর্মমঙ্গল হইতে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। ইহার সময়ে কামরূপরাজ গোড়ের অধীন ছিলেন। গোড়েশ্বর ধৰ্ম্মপালের পুত্রের সমসাময়িক কামরূপের রাজার নাম কপূরধল। কপূরধল গোড়ের অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ধৰ্ম্মপাল ইহাকে দমন করিবার জন্য মন্ত্রী মহামদকে পাঁচলক সৈন্যসহ পাঠাইয়া দিলেন। ষাশদিন পরে মন্ত্রী ব্রহ্মপুত্রের তীরে উপনীত হইল। শত্রু দেখিয়া যেন ব্রহ্মপুত্রের জল কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল (বোধ হয় বর্ধাকাল) অতঃপর মন্ত্রী পার হইতে না পারিয়া এ পারেই রহিলেন। ব্রহ্মপুত্রের অপর পার তখন কামরূপরাজের সীমা। কিছুদিন পরে মন্ত্রীমহামদ সৈন্ত উঠাইয়া লইয়া চলিয়া আসিলেন, কিছু করিতে পারিলেন না, কারণ ব্রহ্মপুত্র কমিল না। অজয়নদীর তীরবর্তী ঢেকুর বা ত্রিধীগড়ের পূর্বা-রাজা ও ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন রায় এই ধৰ্ম্মপালপুত্রের শালীপতি; ইহার পুত্র লাউসেন ইনি ধৰ্ম্মপালপুত্রের নিকট ময়নাগড়ের রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তৎপরে মন্ত্রীর অত্যাচারে গোড়রাজো দুর্দশা আরম্ভ হয়। কিছুদিন পরে ধৰ্ম্মপালপুত্র মন্ত্রীর দোষ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে কর্ণ

রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গদেশের পালবংশের সহিত এই ধৰ্ম্মপাল রাজার কোন সম্পর্ক ছিল বা ইনি বঙ্গদেশের পালবংশেরই কোন একজন রাজা। আসাম-বুরঞ্জী অধিবর্ণে জানা যায়, এই সময় ছুটীয়া নামে এক পরাক্রান্ত জাতি আসামের পূর্বভাগে রাজত্ব করিত। ইহাদের

হইতে অপহৃত করেন। মন্ত্রী গোপনে বড়বস্ত্র করিয়া কামরূপরাজকে গোড় আক্রমণের জন্য পত্র লিখিলেন। কামরূপের এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন না, সৈন্ত সজ্জিত হইতে লাগিল। গোড়েশ্বর সংবাদ পাইলেন এবং মহামদের ক্ষমতায় মোহিত হইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আবার তাহাকে বশদে প্রেরিত করিলেন। পরে মহামদের মন্ত্রণার লাউসেন কামরূপরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। লাউসেন উপস্থিত হইলে ব্রহ্মপুত্র বাড়িল, কিন্তু দেবকুণার নদী পার হইলেন এবং যুদ্ধে কপূরধলকে পরাস্ত করিলেন। ঐধর্মমঙ্গলের এই উপাখ্যান কতদূর সত্য তাহা অনুমান করার ঠিক করিবার উপায় নাই; কিন্তু মি: মার্টিন বলেন যে, বঙ্গেশ্বর ধৰ্ম্মপাল পালবংশীয় বঙ্গরাজ্যগণের অন্ততম। ইহার মার্কিচন্দ্র নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। মার্কিচন্দ্রের অজয়নসে মৃত্যু হয়। মার্কিচন্দ্রের পত্নীর নাম ময়নাবতী। স্বামীর মৃত্যুর পর ময়নাবতী স্বীয় শিশু গোপীচন্দ্রকে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে বঙ্গসিংহাসনে বসাইবার জন্য বড়বস্ত্র করিয়া রাজা ধৰ্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। তিস্তার তীরে যুদ্ধ হয়। ধৰ্ম্মপাল পরাজয়ের উপক্রম দেখিয়া পলায়ন করিলেন। শিশু গোপীচন্দ্র সিংহাসনে বসিলেন। ইহার রাজকাৰ্য্য ময়নাবতী নিজেই দেখিতে লাগিলেন আর রাজা স্বয়ং একশত পত্নী লইয়া বিশ্রামে উন্নত হইলেন। কিছুদিন পরে ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিলে তিনি রাজকাৰ্য্য দেখিতে প্রসন্নী হইলেন; কিন্তু ময়নাবতী হরিপ (বা হাড়ীসিদ্ধ) নামক একজন গোপীকে দিয়া তাহার সে বাসনা ফিরাইয়া দিলেন। গোপীচন্দ্র হরিপের উপদেশে বিষমবাসনা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। কামরূপের ঘনী নামক নীচশ্রেণীর লোকেরা আজিও “শিবেরপীঠ” নামে একপ্রকার গান করে, তাহাতেই এই গোপীচন্দ্রের বিষম-বিরাগ ও তাহার শতস্ত্রীর খেবোজি অতি সরল প্রামাণ্যে রচিত। ইহা গান করিতে দুইদিন লাগে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে গোপীচন্দ্র কামরূপে রাজা ছিলেন। রাজা গোপীচন্দ্রের পর তাহার পুত্র ভবচন্দ্র বা হরচন্দ্র রাজা হন। ইহার এক মন্ত্রী ছিলেন, তাহার নাম গবচন্দ্র। নিৰ্ব্বিক্রিতর জন্য হরচন্দ্র রাজা ও তাহার গবচন্দ্র মন্ত্রী অতি বিখ্যাত। হরচন্দ্রের রাজত্বকালে নিয়ম হয় যে, রাজ্যে লোকে কাজকর্ম করিবে ও দিবসে নিরা যাইবে। এইরূপ দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন করার মত আরও অনেক ঘটনার কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে “ঠাকুরমার গল্প” হইয়াছে। এই রাজা মূৰ্খ ও নিকোষ হইলেও অজান্তশত্রু ছিলেন, ইহার সময়ে রাজ্য লম্বুদিসম্পন্ন ও প্রজাবল ধন প্রাণ লইয়া নির্ভর ভাবে বাস করিত। ইহার পরেও এই পালবংশীয় আর একজন রাজা হন, তৎপরে নীলকলন নামে একব্যক্তি পালবংশ ধ্বংস করিয়া কামরূপের সিংহাসন লাভ করেন।

এই ধৰ্ম্মপাল ও ভবচন্দ্রেরা কতদিন বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু মি: মার্টিন

রাজাদেরও উপাধি 'পাল'। এখন এই ধর্মপাল ছুটীরাদেরই কোন রাজা কি বলীয় পালবংশেরই কেহ তাহার নির্ণয় করা কঠিন। ধর্মপাল রাজা কামরূপে ১০৯৭ শকে রাজত্ব করেন। ইনি বর্তমান সুরাহাটার নিকটবর্তী শোয়ালকুছি গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণকে নিজের জমী দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে খোদিত তাম্রফলকে ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ধর্মপালের পত্নী বনমালার ভগিনী ময়নাবতীর পরাক্রমের বিষয় অন্য্যাপি রঙ্গপুর অঞ্চলের গ্রাম্য-সঙ্গীতে গীত হইয়া থাকে। ধর্মপালের পর মাণিকচন্দ্র, মাণিকচন্দ্রের পর গোপীচন্দ্র, গোপীচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন। এই সময়ে রঙ্গপুর কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আসামের কোন ব্রজীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালবংশীয় ১৭ জন রাজার নাম পাওয়া যায়;—জয়ন্ত, চক্রপাল, ভূমিপাল,

তাহা বিশ্বাস করেন নাই। বাঙ্গালার বৌদ্ধপালরাজ্যের মধ্যে এক ধর্মপালের নাম পাওয়া যায়, ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের প্রস্তুত একখানি তাম্রলিপি ও মুদ্রের হইতে প্রাপ্ত দেবপালের প্রস্তুত আর একখানি তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, স্থপতিবুদ্ধের মতাবলম্বী গোপাল (দিনাজপুরের বৃদ্ধাল ত্ত্বের লিপি অনুসারে লোকপাল ও আইন অকবরী মতে ভূপাল) পালবংশের আদিরাজা এবং ইহারই পুত্রের নাম ধর্মপাল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মিঃ জেমস্‌ প্রিন্সেপ প্রভৃতির বিচারে স্থির হইয়াছে যে এই ধর্মপাল ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। ইতিহাসে পালবংশীয় রাজগণ যে প্রায়ই উড়িষ্যা, আসাম (কামরূপ), ত্রিপুরা, কান্তকূজ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউএন সিয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে দিনাজপুরের মধ্যে পালবংশীয় রাজগণের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের বিষয় অবগত হওয়া যায়। স্থিৎ সাহেবের মতে করতোয়াতীরবর্তী গোবিন্দগঞ্জের নিকট বর্দ্ধনকুটি নামক স্থানই ঐ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। হিউএন সিয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্দ্ধনকুটির ৭০ মাইল উত্তরে একটি দুর্গের বিষয় অবগত হওয়া যায় এবং ইহা ধর্মপালের নির্মিত বলিয়া এতদ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে অনুমান করিয়াও বলা হকিষ্ট যে, এই বৌদ্ধ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ধর্মপালই কামরূপের ধর্মপাল কি না? রঙ্গপুরের অন্তর্গত ডিমলা-ধানার ২১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এই ধর্মপালের নগর "ধর্মপুরের" ভগ্নাবশেষ আজিও আছে।

কামরূপরাজ ধর্মপালের মাণিকচন্দ্র নামে যে ভ্রাতার কথা উক্ত হইল, তাঁহার সম্বন্ধে রঙ্গপুরে একটি উপাখ্যান চলিত আছে। উপাখ্যান হইতে ঐতিহাসিক কথার মধ্যে জানা যায় যে, মাণিকচন্দ্রের পত্নীর নাম ময়নাবতী। তিনি হরিণ নামক কোন এক বোণীর নিকট দীক্ষিত হন। এই বোণী সামান্তত: "হাড়ীসিদ্ধ" নামে বিখ্যাত। ইহার কৃপায় মাণিকচন্দ্রের পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্রের সহিত হরিশ্চন্দ্র রাজার কথা অন্তরা ও পছন্দের বিবাহ হয়। এই বিবাহে গোপীচন্দ্র ১০০ দানী বৌদ্ধ পান। অবশেষে মনে নির্বেণ উপস্থিত হওয়াতে হাড়ীসিদ্ধের উপদেশে সন্ন্যাসী হন।

দক্ষপাল, মধুপাল, ইন্দ্রপাল, সিংহপাল, কৃষ্ণপাল, ভূপাল, গজপাল, মাধবপাল ও লক্ষ্মীপাল। এই লক্ষ্মীপাল ৭৭ বৎসর ও অবশিষ্ট কয়জন প্রত্যেকে ১০৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব করেন। লক্ষ্মীপালের পর সুরাহা নামে একজন রাজা হন, তিনি একা ১০৫ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া প্রকাশ আছে; কিন্তু ইহাদের এতদীর্ঘকাল রাজত্বের কথা বিশ্বাস হয় না। আর একখানি প্রাচীন ব্রজীতে ধর্মপাল, রত্নপাল, সোমপাল, প্রতাপসিংহ, আভিমত, হিন্দ্রা ও রত্নসিংহ নামে ক্ষয়ক-জন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহারা যে কতদিন রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না, আর একখানি ব্রজীতে দেখা যায় যে কামরূপের লৌহিতাপুরে মীনাঙ্ক রাজা ৫০ বৎসর, গজাঙ্করাজা ৫০ বৎসর, শৃকবাঙ্করাজা ৪০ বৎসর, যুগাঙ্করাজা ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন, ইহাদের পর কিছুয়া নামে একজন রাজা হন। এই রাজার রাজত্বকালেই মসলন্দগাজি নামে একজন মুসলমান নবাব লৌহিতাপুর জয় করিয়া ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই লৌহিতাপুর কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বর্তমান কামরূপ জেলায় বৈদরগড় নামে একস্থানে এই কিছুয়া রাজা একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে এই বৈদরগড়ই লৌহিতাপুর হইতে পারে।

ধর্মপালের বংশ উচ্ছেদের পর কামরূপ কিছুদিন অরাজক হয়। কামরূপের চতুর্দিকবর্তী কোচ, মেছ, কাছারী, ভোট ইত্যাদি পার্শ্বতাজাতিগণ কামরূপ বিধবস্ত করিয়া ফেলে। ইহার কয়েক বৎসরের পর কামতাপুরের রাজবংশের আধিপত্য হয়। [এই বংশের আদিপুরুষ নীলধ্বজ কীরূপে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তদ্বিবরণ "কামতাপুর" শব্দে দেখ।] নীলধ্বজের পর তৎপুত্র চক্রধ্বজ কামরূপে রাজা হন। ইনিই কমতেশ্বরীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা ও ভগদত্তের কবচ-উদ্ধার করেন। চক্রধ্বজের পর তৎপুত্র নীলাশ্বর রাজা হন। ইহার সময়ে বাঙ্গালার নবাব আলা-উদ্দীন হুসেনশাহ কামরূপ আক্রমণ করেন। আধুনিক ব্রজীমতে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কামরূপে মুসলমান অধিকার হয়। মুসলমানেরা ১২ বৎসরকাল নগর অবরোধ করিয়া বসিয়াছিল, সুতরাং বলিতে হইবে ১৪৮৬ * খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা সর্বপ্রথম এদেশ আক্রমণ করে।

* ব্রজীর মতে খৃষ্টীয় ১৪৮৬ অব্দে হুসেনশাহ কামরূপ আক্রমণ করেন, কিন্তু রাজত্বক মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, হুসেনশাহ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে হাবসি নবাবদ্বিককে পরাজিত করিয়া স্বাধীনভাবে বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৪২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পূর্বে কামতাপুরের বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে

নীলধরবংশীয় চন্দন ও মদন নামে দুই রাজপুত্র কামতাপুর হইতে কিছু দূরে স্বতন্ত্র এক নগর স্থাপন করিয়া অতি অস্বাস্থ্যমাত্র স্থানে কিছুদিন রাজত্ব করেন।

গুরুজন-কথা-চরিত্র নামক আলামীর ভাষায় লিখিত এক খানি পদ্যগ্রন্থে কামতাপুরে ছল্লভনারায়ণ নামে একজন পরাক্রান্ত রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। এই ছল্লভ কোন বংশের রাজা, তাহা জানা যায় না; কেহ বলে পালবংশীয়, কেহ বলে জিতারিবংশীয়। এই ছল্লভনারায়ণ গোড়েশ্বর ধর্মনারায়ণ নামক রাজার সহিত রাজ্যভোভে মহা যুদ্ধ করেন। কয়েক দিন বোর যুদ্ধ উভয় পক্ষের অনেক লোক মরিল। রাত্রে উভয়েই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন উভয়ে সখ্যতা স্থাপন করিলেন এবং গোড়েশ্বর দেশের অবস্থা শুনিয়া সাত জন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থ প্রদান করিয়া গেলেন। রাজা ছল্লভনারায়ণ এই চৌদজননের মধ্যে প্রধান ১২ জনকে “বারভূয়া” আখ্যা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ সাতজনদের নাম—কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর (রমাবর), লোহার (লহর), বয়ন, ধরম (ধর্ম) ও মথুরা। কায়স্থ সাত জনের নাম—হরি, ত্রীহরি, ত্রীপতি, ত্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর। ইহাদের সকলের মধ্যে চণ্ডীবর সর্বাঙ্গোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ছিলেন। রাজা ছল্লভনারায়ণ তাঁহাকে “শিরোমণি ভূয়া” উপাধি দেন। এই চণ্ডীবর শিরোমণি দেবীর পূজক হন। ইহার ভক্তি দেখিয়া লোকে ইহাকে ‘দেবীদাস’ বলিত। কায়স্থ হইয়া চণ্ডীবর দেবীপূজক ছিলেন। ঐ চৌদজন বুদ্ধকালে গোড়েশ্বরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়া আসাম বুরঞ্জীলেখকেরা বিবেচনা করেন যে, ইহারা গোড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন।

রাজা ছল্লভনারায়ণের রাজত্বকালে কোচ জাতির প্রভাব অল্পে অল্পে বাড়িতেছিল। রাজাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেইজন্ত এই সকল ভূয়াগণের সাহায্য পাইবার আশায়, তাহাদিগকে নিজ রাজ্যে ভূসম্পত্তাদি দিয়া রাখিলেন; কিন্তু ভূয়া রাজার কোনও উপকারে মন দিলেন না, শেষে কয়জনেই জী-পুত্র-পরিবার আনিবার উদ্দেশে স্বদেশে চলিয়া গেলেন। রাজা ধর্মনারায়ণ * তাঁহাদিগকে

যে, মিঃ মার্টিন হুসেনশাহের কামরূপ আক্রমণকাল প্রায় ১৪২৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বুরঞ্জীমতের সহিত ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের এই মত-পার্থক্য দূর হওয়া একরূপ অসম্ভব।

* গোড়েশ্বর রাজা ধর্মনারায়ণ যে কে, তাহা ব্রিহৎ ভাষা যায় না। এ সময়ে গোড়েশ্বর মুসলমান রাজত্ব, হতরাং বোধ হয়, ধর্মনারায়ণ গোড়েশ্বর নিকটবর্তী কোন ক্ষুদ্র রায়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন, তিনি মুসলমান স্বাধীনতা মানিতেন না। শেষে তিনিই সৈন্তসংগ্রহ করিয়া গোড়েশ্বর পরিচয়ে কামরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কিরিতে দেখিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডীবর শিরোমণি প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে কালী হইতে এক দিঘিজরী পণ্ডিত গোড়েশ্বর উপস্থিত হইয়া সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া স্বদেশে কিরিতেছিলেন, এমন সময় রাজার মনে চণ্ডীবরের কথা স্মরণ হইল। রাজা অমনি চণ্ডীবরকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। শেষে চণ্ডীবরের সহিত বিচারে দিঘিজরী পণ্ডিত পরাস্ত হইলেন। রাজাও সন্তুষ্ট হইয়া চণ্ডীবর প্রভৃতিকে ধনরত্নাদি পুরস্কার ও যান-বাহনাদি দিয়া কামরূপে পাঠাইয়া দিলেন। পশ্চিমধ্যে পাইমাগুরী নামক স্থানে ইহাদের নৌকা থামিল। এইখান হইতে বাউসী পরগণার ব্রহ্মপুত্রের একটা শাখা আছে। রাজা গন্ধর্ভরায় চৌধুরী ঐ শাখাটীতে কিছুতেই বাধ দিতে পারেন নাই। শেষে চণ্ডীবরের পরামর্শে অনেক চেষ্টার পর বাধা হইল, জলের স্রোত বন্ধ হইল। রাজা চণ্ডীবরকে আশীর্বাদ করিলেন। কিছুদিনের পর চণ্ডীবরের এক পুত্র হইল, ইহার নাম রাজধর রাখিলেন। ভূয়াগা গন্ধর্ভরায়ের যত্নে সেইখানেই রহিয়া গেলেন। এই সময় অগ্রহায়ণ মাসে ভূটীয়া বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজা গন্ধর্ভরায় পলাইয়া দক্ষিণপারে চলিয়া গেলেন। অত্যাচার লোকের সঙ্গে শিশু রাজধর ভূটীয়াদের হস্তগত হইল। চণ্ডীবর শুনিয়া, ভূটীয়াদিগকে পরাস্ত করিয়া সকলকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। ভোটানরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ভরায়কে অমুযোগ করিয়া পাঠাইলেন। গন্ধর্ভরায় ভীত হইয়া বলিলেন, আমি কখনও ভোটানরাজের বিদ্রোহী নহি। ভূয়াগা এই কথায় বিরক্ত হইয়া বাউসী ত্যাগ করিয়া কাজলীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শেষে কিছুদিন সোমাই তলুকগুড়িতে থাকিয়া শেষে শিমুলতলার গিয়া রহিলেন। ভোটানরাজ গন্ধর্ভরায়ের নিকট স্রাস্ত হইয়া ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। তিনদিন যুদ্ধের পর ভোটানরাজ হারিয়া পলায়ন করিলেন। এই সময় চণ্ডীবরের মৃত্যু হয়। রাজধর শিরোমণি ভূয়া হইলেন। এই রাজধরই শঙ্করদেবের পিতামহ। কোন আধুনিক বুরঞ্জীকার অনুমান করেন, চণ্ডীবরাদি আদি ভূয়াগণ ১২২০ শকে এ দেশে আসেন এবং রাজধর ১২৫০/৬০ শকে শিরোমণি ভূয়া হন। * পূর্ববঙ্গে প্রায় তখন সকল স্থানেই বারভূয়া উপাধিধারী জমিদার বা ক্ষুদ্র রাজা ছিল। কাহারও কাহারও মতে চন্দ্রবীপের ভূয়া (পূর্ববঙ্গের বারভূয়াগণের মধ্যে

* ইহার মতে কামতাপুরের সংস্কৃত রাজা নীলধর ১২৫০/৬০ শকের লোক, হতরাং রাজধরের সমসাময়িক। ছল্লভনারায়ণ এই হিসাবে নীলধরের পূর্ববর্তী।

একতম) কেশারমায়ের (চান্দার কেশার রায় নামে বিখ্যাত) বংশে এই কামরূপাগত চণ্ডীবর শিরোমণি ভূমীর জন্ম হয়। (৭) অল্প ভূমিগণের বংশবিবরণ আর কিছু জানা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুচবেহার রাজবংশের মূল-পুরুষ শিববংশীয় বিশ্বসিংহ কর্তৃক এই অরাজকতা দূরীকৃত হয়। কোচবংশসম্বৃত হাজো নামক এক ব্যক্তির হীরা এবং জীরা নামী দুটি পরমামূল্যবান কণ্ঠা ছিল। কামরূপ যে সময় অরাজক হয়, তখন এই কোচেরা নিকটবর্তী অগ্ৰাছ ইতর জাতিদিগকে বশীভূত করিয়া একটু পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। পরাক্রমে কোচদের ভিতর হাজো অগ্রণী ছিলেন। এরা জনপ্রবাদ আছে যে, মহাদেবের ঔরসে [কামতাপুর দেখে] হীরার গর্ভে শিশু বা শিবসিংহ এবং জীরার গর্ভে বিত্ত বা বিশ্বসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। * খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিশ্বসিংহ কুচবেহারে রাজত্ব করেন। বিশ্বসিংহ মুসলমান কর্তৃক বিধ্বস্ত কামতাপুর রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। আধুনিক ব্রজীমতে বিশ্বসিংহ ১৪২০-৩০ শকের (১৪৯৮-১৫০৮ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কামরূপ অধিকার করেন। ইহার পূর্বে কামরূপে কিছুদিন মুসলমান রাজত্ব ছিল। হুসেনশাহের পুত্র এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন; কিন্তু সে সময়ে কামরূপে কোঁচদিগের বড়ই উৎপাত, সুতরাং হুসেনশাহের পুত্র নসরত-শাহ কামরূপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিশ্বসিংহ এই সুযোগে অবশিষ্ট মুসলমানগণকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। ইনি অতি পরাক্রমসহকারে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্বকালেই লুপ্ত কামাখ্যা-পীঠের উদ্ধারসাধন এবং কামাখ্যার অন্তর্বর্তী অনেক পীঠ-স্থান আবিষ্কৃত হয়। বিশ্বসিংহ প্রকৃতপক্ষে কোচবেহারের রাজা হইলেও কামরূপ এই সময় ইহার শাসনাধীন হয় এবং কামরূপের সীমা কুচবেহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিশ্বসিংহের সময় উজনিখণ্ড আহোমেরা আক্রমণ করে। বিশ্বসিংহ সৈন্ত পাঠাইয়া আক্রমণ নিবারণ করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্তদল সে স্থান পরিত্যাগ করিলেই আবার তাহারা উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং বিশ্বসিংহ বাধ্য হইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করেন। এই সময়ে রাজলুগড় কামরূপ ও বেহাররাজ্যের পূর্ণসীমারূপে নিরূপিত হয়।

বিশ্বসিংহ ডিমকরা বেলতলা, রাণী, লুকিবগাই, পাতান,

বকো, বনগাঁ, মৈরামপুর, ভোলগাঁ, ছয়গাঁ, বড়নগর, দরঙ্গ, করাইবাড়ী, আটায়বাড়ী, কমতাবাড়ী, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল ক্ষমতাপালী বিখ্যাত লোক ছিল, তাহাদের সকলকেই বশীভূত করিয়াছিলেন ৮ মুর্গা, কাপাস, তামা, রাস, সীসা, রূপা, সোণা, লোহা, কাচ, মাটী, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের উপর কর-নির্ধারণ করিয়া রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করেন। ইহারই সময় ভোটারেরা সর্ষদাই উপদ্রব করিতে থাকে। তখন ভোটারে দেববর্মী রাজা ছিলেন। বিশ্বসিংহ ইহার সহিত সন্ধি করেন। রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে শান্তিরক্ষার জন্য উজীর, লক্ষর, ভূয়ী, বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধি দিয়া শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করেন।

বিশ্বসিংহের ১৮টি সন্তান ছিল। নরনারায়ণ তন্মধ্যে সর্ষদ্যোত ছিলেন, তিনিই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহারই ঠিক পরবর্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিলারায় বা গুরুধ্বজ রাজ্যের দেওয়ান বা সেনাপতি হন। নরনারায়ণ শঙ্করদেবের * ভ্রাতা রামরায়ের কণ্ঠা কমলপ্রদা আপীকে বিবাহ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, গুরুধ্বজই বিবাহ করেন। যাহা হউক যেখানে এই বিবাহ হয়, সেই স্থান আজিও “রামরায়ের কুঠি” বলিয়া কথিত হয়। জেলা গোয়ালপাড়ার ঘুলা পরগণায় এই স্থান আছে ও সেইখানে মেলা হয়। কমলনারায়ণ নামে আর একজন কুমার ভোটার ও আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপাড়ে একটা বাধা বাধেন। এই বাধের নাম “গোসাই কমলের আলি।” লখিমপুর হইতে জলপাইগুড়ির মধ্যে অনেক স্থলে এই আলির চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। এই সময়ে সজন বা সজনগ্রামে পণ্ডিত রামণী ভূয়ী নামে একজন রাজা ছিলেন। এই ব্যক্তি তলে তলে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু শেষে ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়।

আসাম ব্রজী এবং অগ্ৰাছ ইতিহাসমতে জানা যায়, বিশ্বসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরনারায়ণ এবং তৎকনিষ্ঠ গুরুধ্বজ বা চিলারায়। কিন্তু রামসরস্বতী পণ্ডিত-প্রণীত গ্রন্থে জানা যায়—

“বিশ্বসিংহ পুত্র, শশীসিংহ নাম,

তেজ অভিনব বর ॥

তাহান কণ্ঠাত, ঔরস রহিল,

তেহৌ প্রাণ তেজিলন্ত।

* আসামী ভাষায় লিখিত রামসরস্বতী পণ্ডিতের গ্রন্থবিশেষে জানিতে পারা যায়, হরিশান নামক কোন একজন লোকের ঔরসে হীরার গর্ভে বিত্ত বা বিশ্বসিংহের জন্ম হয়। রামসরস্বতী মহারাজ নরনারায়ণের লভাপতি ছিলেন।

* এই শঙ্করদেব গৌরানন্দদেবের শিষ্য। ইনি বাজালী, কামরূপে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। বাজালার বেমন গৌরানন্দদেব, কামরূপে তেমনই ইনি বিকুর অবতার বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন। ইহার বিবরণ পক্ষে প্রাপ্ত হইবে।

পরম শোভন,
রূপ বিতোপন,
পাছে পুত্র জন্মিলন্ত ॥
অপুত্রক রাজা,
পুত্র নাহি কয়,
নাতি ভৈলা অনুপাম।
পরম মহন্তে,
পণ্ডিত সকলে,
নারায়ণ দিলা নাম ॥”

অর্থাৎ বিশ্বসিংহের শশীসিংহ নামে একটি পুত্র ছিল। শশীসিংহ অল্পবয়সে লোকান্তরপ্রাপ্ত হন। তাঁহার কন্তার গর্ভে (কাহার ওরসে ঠিক নাই) অপুত্রক বিশ্বসিংহ রাজার পরম সুন্দর রূপবান একটি দৌহিত্রের জন্ম হয়। পণ্ডিতেরা তাহার নাম নারায়ণ রাখেন।

এই নরনারায়ণ এবং ইহার ভ্রাতা গুরুধ্বজের (চিলা-রায়ের) নাম কামরূপে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। মহারাজ নরনারায়ণ বিশেষ বলশালী ছিলেন। ইনি কামরূপকে বিদেশীর হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিয়া, ইহার অনেক উন্নতিসাধন করেন। মহারাজ নরনারায়ণের অজ্ঞ একটি নাম মল্লদেব বা মল্লনারায়ণ। ইহার সময়েই পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক অধুনা আসামে প্রচলিত সংস্কৃত রত্নমালা-ব্যাকরণ রচিত হয়*। বথা—

“শ্রীমল্লদেবজ্ঞ গুণৈকসিক্কোর্মহীর্মহেন্দ্রস্ত যথা নিদেশম্।
মদ্রাং প্রয়োগোত্তমরত্নমালা বিতজ্ঞতে শ্রীপুরুষোত্তমেন ॥”
রত্নমালা।

হিন্দুধর্মবিদ্যেবী বিখ্যাত কালাপাহাড়† ১৫৬৪ বা ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে ভগবতী কামাখ্যা-দেবীর মন্দির ভগ্ন করিতে আইসে। কুচবেহারে তখন মহারাজ নরনারায়ণ রাজা ছিলেন। কালাপাহাড়ের পরাক্রমে সঙ্গত হইয়া তিনি তাহার সহিত সন্ধি করেন। কালাপাহাড় ভগবতীর মন্দির ভগ্ন এবং পীঠস্থানবর্তী সুন্দর সুন্দর অজ্ঞাত প্রতিমূর্তিগুলি গদাঘাতে বিকৃত করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে মহারাজ তাঁহার ভ্রাতার সহিত ভগবতীর মন্দিরাদির পুনঃসংস্কার করেন। অতি কমেও বার বৎসরে এই জীর্ণ সংস্কার কার্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কামাখ্যা-মন্দিরের বর্তমান (চলন্ত) মূর্তি (যাহা সাধারণতঃ নাড়াচাড়া করা যায়) মহারাজ নরনারায়ণ কর্তৃক নির্মিত। বর্তমান কামাখ্যা-মন্দিরের বহির্ভাগেই মহারাজ নরনারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা গুরুধ্বজের প্রস্তরখোদিত সুন্দর প্রতিমূর্তি দুইটি অদ্যাপি বর্তমান আছে।

* আধুনিক ব্রজীমতে ১৫০০ শকে রত্নমালা রচিত হয়।

† কামরূপ অঞ্চলে কালাপাহাড় ‘পোরাহঠার,’ ‘পোরাহুঠার,’ ‘কালাপুঠান’ বা কালধ্বন নামে বিখ্যাত।

মহারাজ নরনারায়ণ এবং গুরুধ্বজ মহামায়ার একান্ত ভক্ত ছিলেন, এবং ভগবতীও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অহুগ্রহ করিতেন। মহারাজ কুচবেহার হইতে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভগবতীর পূজাদি নির্বাহ করিতেন। কেন্দুকলাই নামক কামাখ্যার একজন পূজারী ব্রাহ্মণ এবং মহারাজ নরনারায়ণ ও গুরুধ্বজের লব্ধে কামরূপে অদ্যাপি এইরূপ জনপ্রবাদের প্রচলন আছে।—কেন্দুকলাই পূজারীঠাকুর সন্ধ্যার সময় যখন ঘণ্টা বাজাইয়া ভগবতীর আরতি করিতেন, তখন ভগবতী কেন্দুকলাইয়ের আরতিতে মুগ্ধ হইয়া, তাহার ঘণ্টাবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেন। মহারাজ নরনারায়ণ ইহা জানিতে পারিয়া ভগবতীর চৈতন্তমূর্তি দর্শন-মানসে কেন্দুকলাই ঠাকুরকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুরমহাশয় বলিলেন, যে সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার ঘণ্টাধ্বনি শুনা যায়, তখন নাটমন্দিরের “কুজ্জাক জলা” (রক্ত বিশেষের মধ্য দিয়া) মন্দিরের ভিতরে চাহিলেই, মহারাজ ভগবতীর চৈতন্তমূর্তি দেখিতে পাইবেন। এই পরামর্শ মত মহারাজ একদিন সন্ধ্যার সময় নাটমন্দিরের “কুজ্জাক জলা” দিয়া ভগবতীকে দেখেন। দৈবাৎ ভগবতী মহারাজের এই কার্য জানিতে পারিয়া কেন্দুকলাইঠাকুরের শিরশ্ছেদ করেন। (“কেন্দুকলাইর মুরছিয়ার দরে মুর ছিঞ্জিম”—আসামে সেই সময় হইতে এই একটি দৃষ্টান্তই চলিয়া আসিয়াছে। অর্থ—‘কেন্দুকলাইর যেরূপে মস্তক ছিন্ন হইয়াছিল, সেইরূপে তোমারও মস্তক ছিন্ন করিব।’) এবং ভগবতী মহারাজ নরনারায়ণকে শাপ দেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কি তাঁহার বংশের কেহই কামাখ্যা-দর্শন দূরে থাক, কামাখ্যা-মন্দিরের দিকে দেখিলেও তাঁহাদের শিরশ্ছেদ হইবে। এই শাপের ভয়ে আজিও কুচবেহার, বিজনী, দরঙ্গ ইত্যাদি শিববংশী রাজপরিবারের কেহই কামাখ্যা-মন্দিরের দিকে প্রাণান্তেও দৃষ্টিপাত করেন না। কোন কার্যবশতঃ কামাখ্যার দিকে যাইতে হইলেও কাপড় দিয়া সেই দিকটি অবরোধ করিয়া চলেন।

বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় রাজ্য, তাঁহার ছইপুত্র নরনারায়ণ ও গুরুধ্বজের মধ্যে বিভক্ত হয়। নরনারায়ণ স্বর্ণকোবী নদীর পশ্চিমতীরস্থ সমস্ত রাজ্য ও গুরুধ্বজ উহার পূর্বতীরস্থ অবশিষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হন। গুরুধ্বজের অংশেই ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরস্থ ভূভাগ পড়ে, সুতরাং কামরূপও গুরুধ্বজের অধিকারে পড়ে।

গুরুধ্বজের পর তাঁহার পুত্র রঘুদেবনারায়ণ রাজা হন। তাঁহার পর তাঁহার ছই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিত।

কনিষ্ঠের নাম অজ্ঞাত। এই কনিষ্ঠ পুত্র জায়গীর স্বরূপে দরঙ্গ প্রদেশ প্রাপ্ত হন; ইহার বংশধরেরা আজিও আসামরাজ্যগণের অধীনে ঐ প্রদেশ অধিকার করিতেছেন। পরীক্ষিৎ সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া গদাধর নদীতীরস্থ গিলাকাড় নামক স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। (এখানে গিলাগাছের মহাবন ছিল।) এখানে রাজপ্রাসাদের ভ্রমাবশেষ আজিও দেখা যায়। এই স্থানে তিনি ১৮টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করান এবং তাহা হইতে প্রাসাদের নাম “আঠারোকোটা” হয়। ইহার সভায় নিত্য ৭০০ শত বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন এবং ঐ নগরেই তাঁহাদের আবাস ছিল। ইহার সময়েই ঢাকার মুসলমান-শাসনকর্ত্তা মোগলসম্রাটের প্রতিনিধিষে ইহার নিকট রাজস্ব চাহিয়া পাঠান ও আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। পরীক্ষিৎ কিছু ভীত হইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া আগ্রার সম্রাটের নিকট গমন করেন। সেখানে দরবারে সাদরে গৃহীত হন। ঢাকার নবাবের উপর আদেশ হইল যে, পরীক্ষিৎ যে পরিমাণ মুদ্রা রাজস্ব দিতে সক্ষম হইবেন, নবাব তাহাই লইতে বাধ্য হইবেন, কোন বিরুদ্ধি করিবেন না। রাজা কিরিয়া আসিয়া সয়ল মনে, নবাবের নিকট একবারে ২ কোটি টাকা দিতে প্রতিক্ষত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রী এই বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে মুসলমানের অসঙ্গত অর্থ লোভের কথা জানাইলে, তিনি মহাভীত হইয়া পড়িলেন; শেষে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, আর একবার সম্রাটদরবারে গিয়া এই ভ্রম সংশোধন করিয়া আসিবেন। এবার মন্ত্রী সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে পাটনার (কাহারও মতে রাজমহলে) রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হইল। এই সুযোগে ঢাকার নবাবসৈন্য প্রতিক্ষত অর্থের অছিলায় রাজ্য অধিকার করিল। পরীক্ষিতের মন্ত্রী সম্রাটদরবারে অনেক কষ্টে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করায় সম্রাট তাঁহাকে কানুনগোপদে নিযুক্ত করিয়া পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন। এই সময় এই রাজ্য চারিটি সরকারে বিভক্ত হয়—ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে উত্তরকূল বা টেকরি সরকার, দক্ষিণে দক্ষিণকূল সরকার, পশ্চিমে বাক্সালভূমি সরকার ও গুৱাহাটী লইয়া কামরূপ সরকার। পরীক্ষিতের ভ্রাতৃরাজ্য দরঙ্গ তাঁহারই রহিল এবং পরীক্ষিতের পুত্র চন্দ্রনারায়ণ একটি বিচ্ছিন্ন জমিদারী পাইলেন, এই জমিদারী আজিও তঞ্চলীগণের আছে। প্রাচীন মন্ত্রীও (নূতন কানুনগো) নিজের জন্ত অনেকটা জমিদারী প্রাপ্ত হই-

লেন। এই ঘটনা প্রায় ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে। একজন মুসলমান কোজদার নিযুক্ত হইয়া রাজ্যমাটি নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে যখন রাজা মানসিংহ বাক্সালা বেহারের নবাব হন, তখন এদেশের বিশেষ উন্নতি হয়। অরঙ্গজেবের সময়ে, মীরজুম্মা যখন বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া আসাম জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তৎপরে কামরূপরাজ্যের এই অংশ হইতে সরকার কামরূপ ও সরকার উত্তরকূল ও দক্ষিণকূলের কিয়দংশ আসাম রাজ্যগণের অধিকৃত হয়। এই ঘটনার ৭৩ বৎসর পরে রাজ্যমাটির কোজদারী উঠাইয়া ঘোড়াঘাটে স্থাপিত হয়।

মীরজুম্মার আক্রমণের পর আসাম রাজ্যগণ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া নামে মাত্র রাজ্যমাটির কোজদারের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজস্ব করিতে লাগিলেন।

নরনারায়ণ ও গুরুধ্বজ এই উভয়ের মধ্যে রাজ্যবিভাগের কথা বাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা গুরুধ্বজের জীবিতকালে হয় নাই। গুরুধ্বজের মৃত্যুর পর নরনারায়ণ অপুত্রক থাকায়, গুরুধ্বজের পুত্র রঘুদেব নারায়ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; কিন্তু পোষ্যপুত্রগ্রহণের কিয়দিন পরে তাঁহার একটি পুত্র হয়। রঘুদেব এই ঘটনায় ভবিষ্যতে রাজ্য-প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া তলে তলে বিজ্রোহচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে নরনারায়ণ সেই বিষয় জানিতে পারিলে, রঘুদেব পলাইয়া গিয়া পূর্বাঞ্চলের শত্রুগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদিগের সৈন্য লইয়া জ্যোতীতাতের রাজ্য আক্রমণার্থ আসিয়া পহুছিলেন। নরনারায়ণও স্ব-রাজ্য রক্ষার্থ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। স্বর্ণকোষী নদীর পূর্বপারে রঘুদেব ও পশ্চিমপারে নরনারায়ণের ছাউনি হইল। নরনারায়ণ স্বয়ং অম্বারোহী সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। রঘুদেব ভীত হইয়া সসৈন্যে পলাইয়া গেলেন। নরনারায়ণ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “হায়! আমি রাজ্য দিবার জন্তই আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাভো হইল না; অতএব এই নদীই উভয়ের রাজ্যসীমা হউক।” আধুনিক আসাম ব্রহ্মীমতে এই ঘটনা ১৫০৩ শকে ঘটে। রঘুদেবের রাজ্যের সীমা পশ্চিমে স্বর্ণকোষী ও পূর্বে দিকুরাই আর নরনারায়ণের রাজ্যের সীমা পূর্বে স্বর্ণকোষী ও পশ্চিমে করতোয়া। রঘুদেব গোয়ালপাড়া জেলার জোয়ারপরগণার মধ্যে আধুনিক গৌরীপুরনগরের ১০ মাইল দূরে গদাধর নদীর তীরে নগর স্থাপন করিলেন।

গুরুধ্বজ যখন জীবিত ছিলেন, তখন কামাখ্যার মন্দির পুনর্নির্মিত হয়। মন্দির সমাপ্ত হইতে ১০ বৎসর লাগে।

একজন হিন্দুস্বামী ইহা নির্মাণ করে। মন্দিরের পূর্বদ্বারের সম্মুখে পুরোক্ত কেন্দ্রলাই নামক পুরোহিতের ছিন্নমুণ্ড প্রতিমূর্তি আছে। গুরুধ্বজের জীবিতকালে, নরনারায়ণ একবার শনিগ্রস্ত হন। জ্যোতিষীরা গণিয়া এই কথা জানাইলে, নরনারায়ণ গুরুধ্বজকে রাজ্যে প্রতিনিধি রাখিয়া নিজে তীর্থযাত্রা করেন। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি ফিরিয়া আসেন। এই ভ্রমণের সময় আসামরাজ্যের খেত হস্তীর উপর তাঁহার লোভ হয়। গুরুধ্বজ এই বিবরণ শুনিয়া ভ্রাতার ভৃগুর জন্ত আসামরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া হস্তী কাড়িয়া আনিলেন। অনেকে বলেন, এই ঘটনা হইতেই তাঁহার নাম “গুরুধ্বজ” হয়।

আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৫০৬ শকে নরনারায়ণের মৃত্যু হয়। ইহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হইলেন। স্বর্গকোষী হইতে মহানন্দা পর্য্যন্ত, এবং সরকার ঘোড়াঘাট ও ভোটারের দক্ষিণস্থ পার্বত্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ইহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিমোত্তর হইতে দক্ষিণ-পূর্বে এই রাজ্য ৯০ মাইল দীর্ঘ ও পূর্বোত্তর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬০ মাইল বিস্তৃত। উত্তর-পশ্চিমে ককটা সীমান্তপ্রদেশ শিবসিংহের (পূর্বোক্ত হীরা ও জীরার মধ্যে জীরার পুত্র শিবসিংহের) সন্তানগণকে প্রদান করা হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের এই রাজ্যকে পূর্ব হইতেই “বিহার” বলিত। শিব হীরা ও জীরার সহিত বিহার করিতেন বলিয়াই এই স্থানের ঐ নাম হয়; কিন্তু মগধদেশের বর্তমান নাম বিহার (পাটনা) প্রদেশ হইতে এই বিহারের স্বতন্ত্রতা বুঝিবার জন্ত ইহাকে “কোচবিহার” বলে।

আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণ অকবরের বশ্ততা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে রাজ্যসীমা উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে বোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহুত ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র; পরিমাণফল দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ শত ক্রোশ। ইহার ৪০০০ অশ্বারোহীসৈন্য, ২ লক্ষ পদাতি, ৭০০ শত হস্তী ও ১০০০ জাহাজ ছিল।—আইন-অকবরীতে আরও জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণের পিতার নাম গুরুগোস্বামী। গুরুগোস্বামী রাজা ছিলেন না, ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালগোস্বামী রাজা ছিলেন; বিবাহ না করার তাঁহার পুত্রাদি হয় নাই। বালগোসাই অতি সুবিজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র পাটকুমারকে রাজ্যাধিকারী নির্ণয় করেন। গুরুগোস্বামী আর এক বিবাহ করিলেন, সেই গর্ভে লক্ষ্মীনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। পাটকুমার বিদ্রোহী হইলেন। এই সময় মানসিংহ বাঙ্গালার নবাব। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের নিকট সন্ত্রাস্টের পরিচিত হইবার প্রার্থনা করেন;

কিন্তু মানসিংহ তাহা উপেক্ষা করেন। মানসিংহ ইহার এক কস্তার পাণিগ্রহণ করেন। বালগোসাই ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে একবার বাঙ্গালার নবাবের অধীনতা স্বীকার করিয়া দরবারে ৫৪টি হস্তীসহ বিস্তর উপঢৌকন দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

তাজক-ই-জাহাঙ্গিরী পাঠে জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণ ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের রাজসভায় ৫০০ খান মোহর নজর পাঠাইয়াছিলেন।

পাদশাহনামা পাঠে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরের সময়ে পরীক্ষিতনারায়ণ কোচহাজো প্রদেশে, ও লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারে রাজত্ব করিতেন। পাদশাহনামা বলেন, লক্ষ্মীনারায়ণ পরীক্ষিতের পিতামহের সহোদর। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৮ম বৎসরে হুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে দরবারে অভিযোগ করেন যে, তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেখ আলাউদ্দীন ফতেপুরী-ইসলাম খাঁ তখন বাঙ্গালার নবাব। তিনি মকরাম খাঁকে কোচহাজো জয় করিতে পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মুসলমান পক্ষে যোগ দেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরীক্ষিত আত্মসমর্পণ করেন। ইহার ভ্রাতা বলদেব আসামরাজ স্বর্গদেবের আশ্রয় লয়েন। তৎপরে পরীক্ষিত সন্ত্রাস্টের আদেশানুসারে দিল্লীতে প্রেরিত হন ও মকরাম খাঁ হাজোর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

বলদেব আসামরাজের সহায়তায় হাজো উদ্ধারার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন। আসামরাজ তাঁহাকে স্বীয় অধীনতা স্বীকার করাইয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মকরাম খাঁ এই সময়ে শাসনকর্তৃত্ব হইতে অপস্থত হওয়ায় আর একজন নূতন শাসনকর্তার আগমনের অবসরে সুযোগ পাইয়া বলদেব দরঙ্গ অধিকার করিলেন। এই সময় এদেশে বাঙ্গালার নবাবের পক্ষ হইতে হাজোপ্রদেশে হাতী-খেদা রক্ষা করিবার জন্ত পাইকেরা জয়গীর লইয়া বাস করিত। কাশিম খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব, তখন তিনি অনেকদিন হাতীর আমদানী না পাইয়া হাতী-খেদার সর্দারদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ দেন। সর্দারেরা উপস্থিত হইলে নবাব তাহাদিগকে বন্দী করেন, তন্মধ্যে সন্তোষ লঙ্কর ও জয়রাম লঙ্কর নামক দুইজন সর্দার পলাইয়া গিয়া আসামরাজ স্বর্গদেবের আশ্রয় লয়। তৎপরে যখন ইসলাম খাঁ নবাব হন, তখন পাণ্ডুর অত্যাচারী থানাদার শজ্জিৎ বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে হাজোর শাসনকর্তা আবদাসসেলানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গোপনে পরামর্শ দেন।

বলদেব কোচ ও আসামী সৈন্ত লইয়া বুদ্ধ করিতে উপস্থিত হন। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ, এই সংবাদ পাইয়া কয়েকজন মনসবদারের সহিত ১০০০ অখারোহী, ১০০০ বন্ধুকধারী, ও ১০ খানি জাব নামক নৌকা, ২০০ কোশা* নৌকা ও বহুসংখ্যক জলবা বা জলবাহ নামক নৌকা পাঠাইয়া দেন। ঐশাট ও পাণ্ডুর নিকট মহাবুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষে হতাহত হয়, কিন্তু বুদ্ধ শেষ হইল না। তৎপরে ইসলাম খাঁ আবার বিশৃঙ্খল সৈন্ত পাঠাইলেন, কিন্তু ইতি মধ্যে পাইকেরা বলদেবের পক্ষ গ্রহণ করার মুসলমান সেনার রসদ বন্ধ হইয়া যায়। ইসলাম খাঁ সংবাদ পাইয়া রসদ পাঠাইলেন। রসদ পৌছিতে বিলম্ব হইল। এই অবসরে বলদেব সসৈন্তে ঐশাট ও পাণ্ডু ত্যাগ করিয়া হাজোর অভিমুখে গমন করিলেন, এবং রাজ্য অবরোধ করিয়া রসদ প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করিলেন। আবদাসসেলাম খাঁর ভ্রাতার সহিত (ইনিই প্রধান সেনাপতি হইয়া, ঢাকা হইতে আসিয়া ছিলেন) বিপক্ষ শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব করিতে গমন করেন। কিন্তু তিনি সদলে বন্দী হইয়া আসামে প্রেরিত হন। তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ জৈন-উল-আবদীন বলপূর্বক শত্রুশিবির হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফল হইয়া সদলে নিহত হন। ইহার পর নীরজৈন-উদ্দীন আলী সেনাপতি হইলেন। মুহম্মদমান ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলের রাজা চন্দ্রনারায়ণকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্রনারায়ণ ভীত হইয়া দক্ষিণকূলে পরগণা সোলমারীতে পলাইয়া গেলেন। সোলমারীর জমীদার চন্দ্রনারায়ণের ভয়ে মুসলমানের সহিত যোগ দিলেন। মুসলমানসেনা তৎপরে শুষ্কশত্রু শত্রুজিতের অল্পসন্ধানে ধুবড়িতে উপস্থিত হইল।

এই শত্রুজিৎ রায় ভূষণার জমীদার (রাজা) মুহম্মদরায়ের পুত্র। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়, যখন সেখ আলাউদ্দীন বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি এই মুহম্মদরায়ের অধীনে একদল সৈন্ত পাঠাইয়া একবার হাজো প্রদেশ অধিকার করেন। মুহম্মদরায় বুদ্ধে জরী হইয়া পাণ্ডু ও গোহাটীর খানাদার নিযুক্ত হন। এই সুযোগে আসামীদিগের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়, এবং নিজে ভূষণার জমীদার বলিয়া আসাম ও কামরূপপ্রদেশের

অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করেন। সেখ আলাউদ্দীনের পর যে সকল নবাব হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহাকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য অনেকবার আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু ইনি কোনবারই উপস্থিত হন নাই বা নিয়মিত গোলকাস পাঠান নাই। নবাব ইসলাম খাঁ বুঝিলেন যে, মুহম্মদরায় কোমকালেই দরবারে আসিবে নো, এজন্য তাঁহার পুত্র শত্রুজিৎকে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। শত্রুজিৎ আসিলেন, দরবারে রীতিমত নবাবের বন্দুতা জানাইলেন। নবাব এই সময় হাজোর বিরুদ্ধে প্রথম সৈন্ত প্রেরণ করিতেছিলেন। শত্রুজিৎকেও সেই সৈন্তদলের সহিত প্রেরণ করিলেন; কিন্তু শত্রুজিৎ আসামরাজ ও রাজা বলদেবের সহিত বন্ধুতা রাখিয়া গোপনে গোপনে তাহাদিগকে গৃহ সংবাদ দিতে লাগিলেন এবং অন্ত্যস্ত জমীদারগণকে তাহাদের সহিত যোগ দিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বাহা হউক, নবাব-সৈন্ত ধুবড়িতে পহুঁছিয়াই শত্রুজিৎকে বন্দী করিল, এবং জাহাঙ্গীর-নগরে পাঠাইয়া দিল। সেখানে বিচারে শত্রুজিতের প্রাণদণ্ড হইল।

আবদাসসেলাম বিনষ্ট হইলে, কোচ ও আসামীসেনা ১২০০০ পদাতি ও বহুসংখ্যক কোশা নৌকা লইয়া বনাশ নদী দিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে যোগীঘোপা (যোগীগুহা) নামক পর্বতে উপস্থিত হইল। এই পর্বতের নিম্নে ব্রহ্মপুত্র-বিনাশ-সঙ্কম। আসামীরা যোগীঘোপার একটি স্রুত চূর্ণ নির্মাণ করিয়া, নবাবসৈন্তের প্রতীকা করিতে লাগিল। যোগীঘোপার চূর্ণের ঠিক সম্মুখে ব্রহ্মপুত্রের অপরপারে হীরাপুর নামক স্থানেও ঐরূপ আর একটি চূর্ণ নির্মিত হইল। যোগীঘোপার চূর্ণে ৩০০ ও অবশিষ্ট ২০০০ সৈন্ত হীরাপুরের চূর্ণে রহিল। নবাবসৈন্ত ধুবড়ি ত্যাগ করিয়া খাপুর নদী দিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইল, এবং বন জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা করিয়া যোগীঘোপার দিকে অগ্রসর হইল। নবাবসৈন্তের প্রধান সেনাপতি জৈন-উদ্দীন-আলী ও আরা ইয়ার নামক সেনানীর অধীনে ৩০০০ পাখরী বন্ধুকধারী সৈন্ত পাঠাইয়া দিলেন। ক্রমে পশ্চিমধ্যে উভয়দল সম্মুখীন হইল। আসামীরা প্রথম আক্রমণে ৬ কোশ হটিয়া গেল। পরদিন নবাবসৈন্ত যোগীঘোপার চূর্ণ আক্রমণ করিল। আবার ঠিক এই সময় জমান খাঁ দক্ষিণকূলের চন্দ্রনারায়ণকে ধ্বংস করিয়া সসৈন্তে আসিয়া মিলিত হইলেন, কাজেই বলদেব নুতন ও বর্ধিত সৈন্তদলের বেগ সহ করিতে না পারিয়া, সসৈন্ত চূর্ণ ত্যাগ করিয়া চলিয়া

* এই সকল বৃহৎকার নৌকা তখন জলবুদ্ধে বুদ্ধ পোতের নামে খ্যাত হইত। কোশা নৌকার একটি মাত্র খাঁকে, ইহাতে অধিক সংখ্যক দাঁড় থাকিত। এই নৌকার সাহায্যে বড় বড় বৃহৎ নৌকা (যাহা বৃহৎকার বলিয়া দাঁড়ে বাহিয়া লইয়া বাইতে পারিত না তাহাই) টানিয়া লইয়া বাইত।

গেলেন। হুর্গ অধিকার করিয়া নবাবসৈন্ত চন্দনকোট বাজা করিল। পশ্চিমধ্যে বৃহনগরের জমীদার উত্তমনারায়ণের নিকট হইতে এক পত্রবাহক আসিয়া এক পত্র দিল যে, বলদেব বৃহৎসৈন্তদল লইয়া বৃহনগর আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু উত্তমনারায়ণ তাহাকে বাধা দিতে না পারিয়া খোন্ডাঘাটে নবাবসৈন্তের সহিত মিলিত হইবার আশায় সেইখানে গিয়াছেন। মুহম্মদ জমান খাঁ কতক সৈন্ত লইয়া বলদেবের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ বৃহনগর অভিমুখে বাজা করিলেন, পথে উত্তমনারায়ণ মিলিলেন। নবাবসৈন্তের অবশিষ্ট চন্দনকোটে গেল। জমান খাঁ পোমারী নদী পার হইয়া বলদেবের একটি ক্ষুদ্র হুর্গ অধিকার করিয়া অগ্রসর হইলেন। বলদেব দেখিলেন, জমান খাঁ প্রায় আসিয়া পড়িয়াছেন, অমনি বৃহনগর ত্যাগ করিয়া ছত্ৰী নামক স্থানে গমন করিলেন, এবং সেখানে পর্তুগের ধারে ধারে কয়েকটি হুর্গ করিয়া রাখিলেন। জমান খাঁও কাজেই ফিরিয়া বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে স্বকাবার স্থাপন করিলেন, এবং বর্ষা অতীত হইলে বলদেবকে আক্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। বলদেব ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরের দেড়কোশ দূরে কালাপানি নদীতীরস্থ বিপক্ষের রক্ষিদল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পাণ্ডু ও শ্রীঘাট হইতে এই সময়, তাঁহারও নৃতন সৈন্ত আসিয়া পহুছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে রাজিতে আক্রমণ করিয়া নবাবসৈন্তকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বর্ষা কাটিল, আসামরাজের জামাতা আসিয়া বলদেবের সহিত যোগ দিলেন। তৎপরে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ৩১এ আগষ্ট রাত্রে বলদেব বিপক্ষদিগের দুইটি ক্ষুদ্র হুর্গ অধিকার করিলেন, কিন্তু পরদিন প্রাতে জমান খাঁ হঠাৎ কতকগুলি সৈন্ত লইয়া বলদেবকে আক্রমণ করিলেন, এবং কতকাংশ তাঁহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়া, অবশিষ্ট কতকাংশ লইয়া বলদেবের রক্ষিত স্থান সকল আক্রমণ করিলেন। সে সকল স্থানে তখন তাদৃশ সৈন্ত ছিল না, কাজেই একে একে বিপক্ষের হস্তে পতিত হইল। অনেক সেনাপতি মরিল, বহুসৈন্ত ক্ষয় হইল; বন্দুক, কামান, অস্ত্র শস্ত্র অনেক গেল, কিন্তু বলদেব সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন না দেখিয়া নবাবসৈন্ত সেইদিনই রাত্রে বিষ্ণুপুর জঙ্গলে পলাইয়া গেল। তৎপরে নবেম্বর মাসে চন্দনকোট হইতে নৃতন সৈন্ত আসিয়া, তিনদিক্ হইতে বলদেবকে আক্রমণ করিল। তখনও বলদেবের বা আসামরাজের সৈন্ত আসিয়া পড়ে নাই, কাজেই বিপক্ষের ভীষণ আক্রমণে বলদেবের অন্তঃস্থ সৈন্ত দাঁড়াইতে পারিল না, দীর্ঘই রণে ভঙ্গ

দিয়া পলাইল। বলদেব নিজে দরজা খোলার করিলেন। আসামরাজের জামাতা বন্দী হইলেন। হতাবশিষ্ট সৈন্তদল শ্রীঘাট ও পাণ্ডুর নিকে পলাইল। এইখানে আসামরাজ সৈন্তে রসদাদি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। নবাবসৈন্ত এইবার ইহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। অক্ষর পাহাড়ী, শ্রীঘাট ও পাণ্ডুতে ভীষণ যুদ্ধ হইল, আসামরাজ পরাস্ত হইয়া বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কোচহাজো প্রদেশ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। আসামপ্রান্তে কলজনদী ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে কাজলী হুর্গ মুসলমানের অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হইল। এদিকে একদল সৈন্ত দরজে গিয়া বলদেবকে তাড়া করিল। বলদেব অবশেষে আসামে প্রবেশ করিয়া শিজি নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। শেব দশার দুইটি পুত্রের সহিত এইখানেই স্বর্গলাভ করেন। এই যুদ্ধেই কামরূপ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের অধীন হইল।

উপরিউক্ত ঘটনা পাদশাহনামা হইতে গৃহীত কিন্তু বুরঞ্জী বা মি: মার্টিনের গ্রন্থে বলদেবের নাম পাওয়া যায় না; পরীক্ষিৎ নারায়ণের চন্দ্রনারায়ণ * নামে পুত্রের কথাও কোন গ্রন্থে নাই।

নরনারায়ণের পর যে সকল রাজা কুচবিহারের রাজা হন, তাঁহাদের বিষয় কুচবিহারের ইতিহাসে লিখিত হইবে। [কুচবিহার দেখ।]

আসাম বুরঞ্জী হইতে জানা যায় যে—গুরুধ্বজের পুত্র রঘুদেব রাজা হইয়া নগর সংস্কার ও হরগ্রীব-মাধবের মন্দির নির্মাণ করেন। ইহার পিতা আসামের আহম রাজগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শাসনে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ইনি তাহা পারেন নাই, ইনি স্বর্গনারায়ণ প্রতাপসিংহ নামক আসামের আহমরাজকে মঙ্গলদই নামক নিজ কন্যা প্রদান করিয়া নিরাপদে রাজত্ব করেন। আধুনিক বুরঞ্জী মতে ১৫১৫ শকে রঘুদেব রাজা হইয়াছিলেন। রঘুদেব গদাধরতীরে যে নগর নির্মাণ করেন, তাহার চলিত নাম গিলাঝাড় বা গিলাবিজর (এই স্থানে গিলাগাছের বন যথেষ্ট ছিল।)

রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিৎনারায়ণের যে স্ত্রী দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে কাছনুংগো হইয়া আসেন, তাঁহার নাম কবীজ বড়ুয়া। রাঙ্গামাটির বর্তমান জমীদারেরা এই কবীজ বড়ুয়ার বংশধর।

পাটনার পরীক্ষিতের স্ত্রী হইলে, তাঁহার রাজা

* পাদশাহনামা নামক পারসী ইতিহাসের মতে, রাজা চন্দ্রনারায়ণ পরীক্ষিতের পুত্র।

মুসলমানের হস্তগত হইল কটে, কিন্তু মানহানদীর পশ্চিম হইতে স্বৰ্ণকোবী নদীর পূৰ্ব পর্য্যন্ত এদেশে উহার পুত্র বিজিতনারায়ণের অধীনে রহিল। ইনি মুসলমানের অধীনে কয়দ রাজা হইলেন। মানহানদীর পূৰ্ব হইতে দিকরাই পর্য্যন্ত এদেশে পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলিতনারায়ণও ঐরূপ কয়দ রাজা হইলেন। বিজীর রাজারা এই বিজিতনারায়ণের ও দরঙ্গের রাজারা এই বলিতনারায়ণের সন্তান। সম্ভবতঃ বিজিতনারায়ণই বিজলীনগর স্থাপন করেন। ইহার মুসলমান মবাবকে প্রথমে অর্থ দিয়া কর দিতেন, তৎপরে কয়দরূপে হাতী দিকার নিরব হই, শেষে জাবার ইংরাজ অধীনে অর্থ দিকার নিয়ম পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে।

এই মুসলমান অধিকারে কামরূপের সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গেল। দেশের আচার ব্যবহার, ভূমির বন্দোবস্ত, রাজ্যপ্রণালী বাঙ্গালাদেশের তায় হইল।

বলিতনারায়ণ যে ভাগে রাজা হইলেন, কামতাপুরের রাজবংশ ধ্বংস হইলে, সেই স্থান এতদিন একপ্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে চণ্ডীবাদি বাঙ্গালী ভূরাগণ এদেশ কতকটা সুশাসিত করেন, কিন্তু তাহাও অধিকদিন রহিল না। মুসলমানেরা রাজ্য জয় করিয়া লুণ্ঠপাট করিত, স্তত্রাং তাহাদের সময়ে দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়া দূরে থাক, আরও অশান্তি বাড়িয়া উঠিল। তোট ও কাছাড়বাসীরা উভয় প্রান্তে মহা উপদ্রব করিত। যাহা হউক, বলিতনারায়ণ দরঙ্গনগরে রাজধানী করিয়া দেশ শাসনে মনোযোগী হইলেন, কিন্তু আসামরাজ্যের উপদ্রব কমিল না। পরে উহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হইলে আসামরাজ্যের সহিত উহার মিত্রতা হয় *। স্বর্গনারায়ণ নূতন পত্নীর নামে নগর স্থাপন ও একটা নদীর নামকরণ করেন। বলিতনারায়ণের ধর্ম্মশীলতায় ও সদ্যবহারে খ্রীত হইয়া স্বর্গনারায়ণ ইহাকে ধর্ম্মনারায়ণ উপাধি দিলেন ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা গজনারায়ণকে বেলতলার রাজা করিলেন। বেলতলার রাজারা এই গজনারায়ণের বংশধর। আধুনিক ব্রজীমতে ১৬৩৪ শকে বলিতনারায়ণ স্বর্গলাভ ও তৎপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন।

* পূর্বে উক্ত হইয়াছে, পরীক্ষিতনারায়ণ আসামরাজ্যের আক্রমণ হইতে অগাধতি পাইবার জন্য স্বর্গনারায়ণকে মঙ্গলদ্বীপ দ্বারা কন্যা প্রদান করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পরীক্ষিতনারায়ণের রাজত্বকালেই বলিতনারায়ণ এ দেশে শাসন করিতেন, পরে ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তিনি বাধীন হন এবং মুসলমান শাসনকর্তার নিকট হইতে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লনেন।

মহেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মদিগকে অনেক নিকর ভূমি দান করেন। তিনি ১৯ বৎসরকাল নিরাপদে শান্তিতে রাজত্ব করিয়া ১৬৪৩ শকে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তৎপুত্র চন্দ্রনারায়ণ রাজা হন। চন্দ্রনারায়ণের রাজ্যকাল ১৭ বৎসর, তৎপরে তৎপুত্র স্বর্ঘ্যনারায়ণ রাজা হন। ইহার সময় আধুনিক ব্রজীমতে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে মঙ্গুর খাঁ নামক একজন মুসলমান সেনাপতি এই দেশ আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে স্বর্ঘ্যনারায়ণ বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। পথ হইতে স্বর্ঘ্যনারায়ণ কোনমতে পলাইয়া আসিলেন, কিন্তু লজ্জার কোনমতে আর সিংহাসনে বসিলেন না। যে সময়ে স্বর্ঘ্যনারায়ণ বন্দী হন, তখন তাঁহার ভ্রাতা ইন্দ্রনারায়ণ পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক। মন্ত্রীরা মিলিত হইয়া তাঁহাকেই রাজা করিলেন, কিন্তু মন্ত্রীগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হওয়ার আসামের আহোমরাজ কামরূপ পর্য্যন্ত অধিকার করেন; কিন্তু বলিতনারায়ণের বংশ একেবারে উচ্ছেদ না হওয়ার তৎপরেই দরঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। তৎপরে ইন্দ্রনারায়ণের পর আদিত্যনারায়ণ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ইহার সময়ে রাজ্যের উত্তরসীমা গৌসাই কমলের আলি, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র, পূর্বে ধনশিরা ও পশ্চিমে বড় নদী নিরূপিত হয়। ইহারই মধ্যে কিয়দংশ ভাগ করিয়া লইয়া আদিত্যের ভ্রাতা মধুনারায়ণ রাজা হন। আদিত্যের মৃত্যু হইলে ধ্বজনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন। ইহার সময়ে দরঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে আহোমের অধীন হয়। স্বর্ঘ্যনারায়ণের ধীরনারায়ণ নামে এক পুত্র ছিলেন (১৭৪৪—আধুনিক ব্রজী), তিনি ধ্বজনারায়ণকে বিনাশ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করেন, কিন্তু তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া ভিক্ষুরা অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। তৎপরে মহেন্দ্রনারায়ণ বিশেষ পরাক্রমী হওয়ার চুই ভ্রাতার একজন রাজা হইলেন। দরঙ্গের প্রথমে ও তৎপরে মহেন্দ্রের মৃত্যু হয়। দরঙ্গের পুত্র হংসনারায়ণ রাজা হন। ইহার কিছুদিন পূর্বে কয়েক দিনের জন্য ধীরনারায়ণের পুত্র কীর্তিনারায়ণ রাজা হন। তৎপরে (১৭৮৯ সনে) কীর্তিনারায়ণের পুত্র রাজা হয়। ইহার সময় দরঙ্গ রাজদিগের পরাক্রম একবারে খর্ব্ব হয়।

বলিতনারায়ণের সময় হইতে ইন্দ্রনারায়ণের সময় পর্য্যন্ত ইচ্ছাই কামরূপ শাসন করিতেন। মধ্যে মধ্যে মুসলমান আক্রমণেও এই কংশেরই প্রাধান্য ছিল। ইন্দ্রনারায়ণের সময়ে কামরূপে আহোম অধিকার হয়, কিন্তু ধ্বজনারায়ণের সময়েই কামরূপের স্বাধীনতা কিছুটা হয়। তৎপরে

কীর্তিনারায়ণের পুত্রের সময় হইতে দরদরাক্ষর নাম লোপ হয়।

বিজ্ঞানীর রাজকপের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মহারাজ বিক্রমসিংহের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ নরনারায়ণ ভূপ করতোয়া ও বিহারের মধ্যে এবং কনিষ্ঠ গুরুধ্বজ ভূপ বিহার হইতে দিক্রাই পর্যন্ত স্থানে রাজা হন। গুরুধ্বজের পুত্র রঘুদেবনারায়ণ। রঘুদেবের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিনারায়ণ বিজ্ঞানীর, মধ্যম বলিতনারায়ণ দরঙ্গের এবং কনিষ্ঠ গজনারায়ণ বেলতলার রাজা হন। পরীক্ষিনারায়ণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট খেলাৎ প্রাপ্ত হন এবং দেশে ফিরিবার সময় পথে রাজমহলে স্বর্গলাভ করেন। ইহার সঙ্গে যে মহতী বা দেওয়ান ছিলেন, তিনি কামরূপের কাছনগো হন। পরীক্ষিতের চন্দ্রনারায়ণ নামক এক পুত্র ছিল। তাঁহারই কংশে বিজ্ঞানীর রাজকপের উৎপত্তি।

কামরূপে মুসলমান অধিকার।—বক্তিরায়ের সহযোগী মিনহাজ-উদ্দীন তবকৎ-ই-নাসিরি নামে যে ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে, “লক্ষণাবতী অধিকারের কয়েক বৎসর পরে (সম্ভবতঃ ৬০১ হিজরায়) বক্তিরায় তিব্বত ও তুর্কিস্থান জয় করিবার জন্য অগ্রসর হন। তিব্বত ও লক্ষণাবতীর মধ্যবর্তী ভূভাগে তখন কোঁচ, মেছ ও তিহাঙ্গ (বর্তমান থাক) নামক তিনটি প্রধান জাতির বাস ছিল। কোঁচ ও মেছজাতির একজন সর্দার (তবকৎ-ই-নাসিরিতে এই সর্দারের নাম মেছজাতির “আলী” লিখিত আছে) বক্তিরায়ের হস্তে পরাজিত হন ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ইনিই পঞ্চদশক হইয়া বক্তিরায়কে সসৈন্তে বর্ধন-কোটের পথ দিয়া বাঘমতী নদীতীরে লইয়া যান। এই-খান হইতে তিনি দশদিনে পার্বত্য প্রদেশে ২০টিরও অধিক খিলানবিশিষ্ট একটি প্রান্তরসেতুর নিকট উপস্থিত হন। এই সেতুটিকে রক্ষা করিবার জন্য বক্তিরায় একদল সৈন্ত রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। এই সেতু পার হইলে কামরূপের রায় একজন বিশ্বাসী লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, ‘এই সময়ে তিব্বত আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, বরং এখন ফিরিয়া গিয়া আরও সৈন্তসংগ্রহ করা উচিত। তৎপরে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আগামী বৎসরে আমিও আমার সৈন্তদল লইয়া বাহাতে ঐ দেশ জয় হয়, তাহা করিব।’ বক্তিরায় কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। তৎপরে তাঁহার ১৬শ দিনে তিব্বতে উপস্থিত হন। সেখান্দে বুদ্ধাঙ্গির পয় তাঁহার সৈন্তদলকে দি গোলমাল হওয়ার তিনি ফিরিতে বাধ্য হইলেন। যে পথ

দিয়া ফিরিলেন তাহা কামরূপের ও জিহতের মধ্যে ত্রিশটি গিরিবন্ধের একতর। তৎপরে ১৫ দিন অনাহারে অবিশ্রান্ত চলিয়া তাঁহার পুরোঁক সেতুর নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার দুইটি খিলান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে সৈন্তদল সেতুরক্ষার নিযুক্ত ছিল, তাহাদের দুইজন নারকের মধ্যে মনোবিবাদ ঘটায় তাহারা আসল কার্যে অবহেলা করিয়া চলিয়া বাওয়ার, কামরূপের হিন্দুরা ঐ সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। পারের উপায় না থাকায় বক্তিরায় সসৈন্তে একটি দেবকলিতে আশ্রয় লয়েন এবং তেলা বাধিয়া পার হইবার জন্য কাঠাদি সংগ্রহে চেষ্টা পান। কামরূপের রায় এ সংবাদ পাইয়া সসৈন্তে আসিয়া মন্দিরের চতুর্দিকে তীক্ষ্ণবৃষ্ণ বংশ লগু পুঁতিয়া ও তাহাতে বাখারি বিনাইয়া মুসলমান সৈন্তের নির্বাণপথ রোধ করিতে প্রয়াস পান। বক্তিরায় সমুহ বিপদ দেখিয়া একদিক্ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া একেবারে নদীতীরে উপনীত হন। কামরূপসৈন্ত পশ্চাদ্ধসরণ করিল। প্রত্যেকেই তখন প্রাণভয়ে ঘোড়া সমেত নদীতে পড়িয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া প্রায় সকলে ডুবিয়া গেল, কেবল বক্তিরায় ও আর কয়েক জন মাত্র অপরপারে প্রাণটুকু মাজ লইয়া অতিকষ্টে উত্তীর্ণ হইলেন। পুরোঁক কোঁচসর্দার আলী আসিয়া ইহাদিগকে লইয়া দিনাজপুরের দেবকোটে পহুঁচাইয়া দেন।” বাঙ্গালার আসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকার ২০ খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠার ড্যান্টন সাহেবের অঙ্কিত সিল-হাকো নামক সেতুর বর্ণনা আছে—এই সেতু পশ্চিম কামরূপে গোহাটী পহুঁচিবার একটি প্রাচীন উচ্চ রাস্তার মধ্যে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এই সেতু দিয়াই বক্তিরায় খিলজী (মতান্তরে বক্তিরায়ের পুত্র মুহম্মদ খিলজী) তাতার-অখারোহী লইয়া গোহাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন; কারণ ইহা গোহাটীর উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তের পর্বতমালায় অতি নিকটে অবস্থিত। এই পর্বতের উপরে এখনও নগর প্রবেশপথের এবং পথরক্ষণোপযোগী বহির্দুর্গের গুণাবশেষাদি দেখা যায়; কিন্তু এই সিলহাকোর সেতু যে বক্তিরায় খিলজীর তিব্বতপথের বৃহৎ প্রস্তরসেতু নহে, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তৎপরে গোড়ের নবাব মুলতান ময়মুদ্দীন (১২১১-১৭ খৃষ্টাব্দ) এই দেশ জয় করিতে আসেন। কামরূপ হইতে নদীয়া নামক স্থান পর্যন্ত তিনি জয় করেন এবং কর আদায় করেন, কিন্তু নদীয়ার পুরদিকে আসিয়া

তিনি পরাজিত হন। ১২৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সেনাপতি মল্লিক জয়বক কামরূপ আক্রমণ করিতে আসেন এবং এ প্রদেশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন; কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। বর্ষায় দেশময় জল বাড়িয়া উঠায় তাঁহার যথেষ্ট সৈন্তহানি ঘটে। শেষে তিনি মহা হ্রবহায় পড়িয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপরে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের নবাব তুগল খাঁ স্বয়ং কামরূপ জয় করিতে আসেন। তিনি কামরূপরাজের হস্তে বন্দী ও নিহত হন। এ সময় কামরূপে কে রাজা ছিলেন তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কামরূপ জেলার “বৈদরগড়” নামে একটি গড় আছে। প্রবাদ আছে, ১২০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একজন মুসলমান সেনাপতি কামরূপ আক্রমণ করিতে আসে, তাহার হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য ফেলুয়া (বৈদরগড়-স্থাপিত) কথ্য পুর্বে লিখিত হইয়াছে) নামক রাজা এই গড় নির্মাণ করেন। ইহার পর কিছুদিন মুসলমানেরা আর এদেশে আসে নাই। একেবারে রাজা নীলাধরের সময় গৌড়ের নবাব হোসেন শাহ (১৪৯৪—১৫০৬ খৃষ্টাব্দ) ১২ বৎসর অবরোধের পর কামরূপ অধিকার করেন। হোসেন শাহ কামতাপুর জয় করিয়া স্বীয় পুত্র নসরৎ শাহকে প্রতিনিধি রাখিয়া বাঙ্গালার প্রত্যাবর্তন করেন। নসরৎ শাহ কোচবিহারের রাজবংশের আদিপুরুষ, বিশ্বসিংহের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপরে যখন কামরূপের সোমার খণ্ডে (বর্তমান আসাম) চুহুয়ুজ বা স্বর্গনারায়ণ রাজা (১৪৯৭-১৫০৯ খৃষ্টাব্দ) তখন তুরবক নামে একজন পাঠান সেনাপতি কামরূপের অন্তর্গত উজাইদেশ আক্রমণ করে। আসামের অন্তর্গত কলিয়াবর নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তুরবক জয়লাভ করেন; কিন্তু স্বর্গনারায়ণের প্রধান মন্ত্রী কনচঙ্গ তুরবকের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কনতোয়ার অপর পারে তাড়াইয়া দিয়া আসেন। * তৎপরে বিশ্বসিংহের

পুত্র নরনারায়ণের সময়ে কালাপাহাড় কামরূপে গৌড়াটী পর্যন্ত আসিয়া অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়া বার। পরীক্ষিতনারায়ণের যুদ্ধের পর ঢাকার নবাব কামরূপের অন্তর্গত হাজো প্রদেশ (পরীক্ষিতের রাজ্য) অধিকার করেন। মুসলমান সেনাপতি মকরম খাঁ রাজ্যমাটিতে থাকিয়া এপ্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। তৎপরে বড়দেনীলগরী নামে একজন রাজ্যমাটিতে আগমন করেন। তৎপরে সৈয়দ আবাবকর নামক একজন আসাম জয় করিতে আসে। তেজপুরের নিকট তরলীতে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে আবাবকর মারা পড়ে। এই সময় কামরূপের অধিকাংশ আহোম-রাজগণের অধিকৃত, কতকাংশ রাজ্যমাটির মুসলমান শাসনকর্তার অধিকৃত ও কতকাংশ দরজরাজের অধীন ছিল। কিয়দিবস পরে মির্জাবাদ নামে একজন রাজ্যমাটির শাসনকর্তা আহম্মরাজগণের হস্ত হইতে গৌড়াটী কাড়িয়া লইবার যত্ন করেন; কিন্তু তাহা ঘটনা উঠে নাই। শেষে তৎপরবর্তী বাবারাম বেগ তাহাতে কৃতকার্য হন। তৎপরে একে একে মির্জা রমণা খাঁ, আবদুল ইসলাম (আবদুলসলাম?) শাহ, ইসলাম খাঁ, সেখ বয়রাম খাঁ, সেখ সমন্তি খাঁ, মকছুম ইসলাম খাঁ ও মহিউদ্দীন রাজ্যমাটির শাসনকর্তা হন। ইতিমধ্যে মোমাইতামুলী বড় বড়ুয়া নামক একজন আসামী সেনাপতি একবার অত্যন্তদিনের জন্য গৌড়াটী উদ্ধার করেন; কিন্তু আবার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে মির্জা জৈনউল-আবদীন, ইম্পুজ খাঁ, নবাব মুকুলা, আনোয়ার খাঁ, মির্জা হোসেন খাঁ, জারিমিঞা, সৈয়দহোসেন, সৈয়দ কুতুব, নাথুয়া, প্রভৃতি কয়েকজনে মোট ২৬ বৎসরকাল কামরূপ শাসন করেন। এই সকল শাসনকর্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হাজোতে, কেহ কেহ রাজ্যমাটিতে, কেহ বা গৌড়াটীতে থাকিতেন। শেষে এই সময় সমস্ত কামরূপ জেলাই একপ্রকার মুসলমানের অধীনে ছিল। বিজনীরাজ ও গোয়ালপাড়া জেলা মুসলমানের অধীনে ছিল; কেবল দরজরাজ স্বাধীন ছিলেন বটে, কিন্তু মুসলমানের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে জয়ধ্বজ সিংহ বা চুতামুলা রত্নপুরে আহম্ম-সিংহাসনে রাজা হন। ইহার একজন সেনাপতি গৌড়াটী অধিকার করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মীরজুমলা কুচবিহার জয় করিতে আসেন। গৌড়াটীর পূর্বে উজাই গড়গাঁও পর্যন্ত মীরজুমলার অধিকার হয়। তৎপরে মীরজুমলা স্বয়ং গৌড়িত

* ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধের একস্থলে ও কামতাপুরের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে যে, নসরৎশাহের হস্ত হইতে বিশ্বসিংহ কামতাপুর বা কামরূপ রাজ্য উদ্ধার করেন আর এস্থলে দেখা বাইতেছে যে, আহোমরাজ স্বর্গনারায়ণের বড়ী কনচঙ্গ কনতোয়া পর্যন্ত তুরবকের অনুসরণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তুরবক নামক কোন পাঠান সেনাপতির কামরূপ জয়ের কথা ভারতবর্ষের বা বাঙ্গালার অপর কোন ইতিহাসে দেখা যায় না। এই বিষয়ে পর্যালোচনা করিলে দেখা হয় যে তুরবকের কামরূপ আক্রমণের কথা প্রবাদ মাত্র;

কারণ, বিশ্বসিংহ কুচবিহারে ও কামতাপুরে বর্তমান থাকিতে তুরবকের অনুসরণে কনচঙ্গ কেহ আসিবে?

ও তাঁহার সৈন্ত মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা হওয়ার রাজা জয়-
ধ্বজ নিঃশেষে সহিত সন্ধি করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।
মাজুম খাঁ অধিকৃত এদেশে শাসনকর্তা রহিলেন।
তৎপরে মসিদ খাঁ, ঈসরাদ পিত্রোজ খাঁ এদেশের শাসন-
কর্তা হন। আহমরাজ চক্রধ্বজ সিংহের নিকট রাজস্ব
আদায়ের জন্য দূত আসিলে তিনি তাহাকে অপমান
করিয়া তাড়াইয়া দেন এবং গোহাটী পর্যন্ত স্থান অধিকার
করেন। দিল্লীর ফক্ক হইয়া ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রাম-
সিংহকে প্রেরণ করেন। রাম সিংহ আসিয়া গোহাটী অধি-
কার করিয়া উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হইলে এই সময়
কামরূপের সীমান্ত স্থানে বড়ফুকন উপাধিধারী একজন
শাসনকর্তা থাকিতেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণনারায়ণ এই
পদের সৃষ্টি করেন। ইনি সীমান্ত স্থানে থাকিয়া আহম
রাজ্যে বিদেশীয় আক্রমণ নিবারণ করিতেন। রাজা চক্র-
ধ্বজের সময় তিনি বড়ফুকন ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত
মোমাইতামূলী ফুকনের পুত্র, নাম লাহিত। লাহিত বড়-
ফুকন রাজা রাম সিংহকে গর্ভিত বচনে কহিয়া পাঠাইলেন
যে, মীরজুমলা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে রণে পরাস্ত হইয়া আহমরাজের
সহিত সন্ধি করিয়া গিয়াছেন। আহমরাজ এখন দিল্লীর
সম্রাটের অধীনস্থ নহেন এবং তাহাকে রাজস্ব দিতেও
প্রস্তুত নহেন। লাহিত বড়ফুকনের সদর্পবাক্য শ্রবণ
করিয়া মুসলমান সেনারা যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কাম-
রূপে এই ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের সেনার সহিত কামরূপ
শাসনকর্তা লাহিত বড়ফুকনের সারাঘাট নামক স্থানে ঘোর-
তর সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে মুসলমানসৈন্ত পরাস্ত
হইয়া পলায়ন করে এবং আহমসৈন্তেরা মানহা নদী
পর্যন্ত উহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। এই মানহা নদী এই
সময় হইতে আহমরাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া নির্ধারিত হয়
এবং আহমরাজ নদীতীরে হাদীরাত নামক স্থানে একদল
সৈন্ত রাখিয়া দিলেন। ১৬০১ শকে অর্থাৎ ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে
দিল্লী হইতে আবার সৈন্ত আসিলে তখনকার গোহাটীর
আহম-শাসনকর্তা ভীতস্থ্যতাৎব শোলা বড়ফুকন কলিয়া-
বর পর্যন্ত দেশ মুসলমানহস্তে দিয়া সন্ধি করিলেন।
তৎপরে ১৬০৪ শকে সন্ধিক বড়ফুকন নিরুপদ্রবে গোহাটী
উদ্ধার করিলেন। তৎপর বৎসর মজুর খাঁ নামক একজন
নবাব যুদ্ধে আসিলে গোহাটীর নিকট গুজ্রেশ্বরের ইটখোলার
এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাস্ত হইয়া
রাকামাটী, হাজো, গোহাটী এমন কি কামরূপের সীমা
ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হয়। কামরূপ সম্পূর্ণরূপে আহম-

রাজের অধিকারভুক্ত হইল। তৎপরে দিল্লীর বাহাদুরশাহ
হীনশ্রুত এবং বাঙ্গালার ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ
প্রভৃতি স্বদূর যুরোপবাসী বিভিন্ন লোকের উপদ্রব হুঁচি
হওয়ার তথাকার নবাবেয়াও কামরূপের বিষয় কিছুই
ভাবিতে সময় বা অবকাশ পান নাই, সুতরাং আহমরাজেরা
নিরুপদ্রবে কামরূপ ভোগ করিতে লাগিলেন। শোলা বড়-
ফুকন যে সন্ধিপত্র লিখিয়া দেন, সেই পত্রে কামরূপরাজ্যের
নাম লিখিত ছিল। সেই সন্ধিপত্র আহমরাজ অগ্রাহ্য
করিলে কামরূপরাজ্যের নাম লোপ পায় এবং আসামের
অন্তর্গত প্রদেশ বলিয়া কীর্তিত হইতে থাকে।

কামরূপে আহম বা ইন্দ্রবংশের অধিকার।—নিজ আসাম
দেশের রাজা আহম নামে কথিত। অনেকেই অজ্ঞান
করেন যে, তাঁহার শান-বংশীর লোক; ইহার আসামের
পূর্ববর্তী পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দী
কীর প্রারম্ভে ব্রহ্ম ও শ্রামদেশ হইতে সৌমারগীর্থে রাজত্ব
করিতে আসেন। আসামের রাজ্য স্থাপনের পর এই দেশে
তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ নাই বলিয়া অসম নামে অভিহিত
হন। কালক্রমে স স্থানে হ হইয়া অহম বা আহম নাম হয়।
তাঁহাদিগের নাম অজ্ঞানরা এই দেশের নাম অসম হইয়া এখন
আসামে পরিণত হইয়াছে। পূর্বকালে তাঁহারা অহিন্দু
ও চোমদেও নামক দেবতার উপাসক ছিলেন। এই দেশে
রাজত্ব স্থাপনের কিছুকালের পর তাঁহারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ
ও আপনাদিগকে স্বর্গের রাজা ইন্ড্রের বংশোদ্ভব বলিয়া
বিখ্যাত করেন। যোগিনীভক্তে ইহার ইন্দ্রবংশোদ্ভব 'সৌমার'
নামে অভিহিত, তাহা ইতিপূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

শকাব্দ ১১৫১, ইং ১২২৯ খৃষ্টাব্দে চুকাফা নামক একজন
প্রভাপশালী লোক সসৈন্তে পূর্বদিক হইতে আসিয়া আদিম
নিবাসী ছুটিয়া ও বরাহী জাতিকে পরাজয়পূর্বক আসামের
পূর্বভাগে রাজ্যস্থাপন করেন। ইহার পরে ইহার পুত্রাদি
ক্রমে ১২ জন রাজা হন। তাঁহাদিগের নাম চুতেওফা,
চুবিন্কা, চুখাম্কা, চুখাংকা, চুতুকা, তাওখামপি, চুতাংকা,
চুজাংকা, চুফ্কা, চুচেন্কা, চুহেন্কা ও চুপিফ্কা। ইহার
আপনাপন রাজ্যবিস্তার ও তজ্জন্ত কোন কোন আদিমনিবাসী
জাতির সহিত যুদ্ধ ব্যতীত লিখিবার যোগ্য কোন কার্য
করেন নাই। পরে ১৪১৯ শকে চুহংমুং রাজা হইয়া হিন্দুধর্ম
গ্রহণ করেন ও স্বর্ণনারায়ণ নামে খ্যাত হন। ইনিও কোন
কীর্তি রাখিয়া যান নাই। ইহার পরে ইহার পুত্র ও
পৌত্র রাজা হন। ইহারও লিখিবার যোগ্য কোন কার্য
করেন নাই। তৎপরে ১৫৩০ শকে চুচেংকা রাজা হইয়া

হিন্দুতে বুদ্ধি স্বর্গনারায়ণ বা প্রতাপ সিংহ নামে অঙ্কিত হন। ইনিই এদেশে চূর্ণোৎসব এবং স্বর্ণ ও দ্রৌপ্যমুক্তা প্রচলিত করেন। ইহার রাজত্বকালে, ১৫৪৯ শকে, কামরূপের শাসনকর্তা সৈয়দ বাবাকর আসাম আক্রমণ করার যুদ্ধ হয়, তাহাতে সৈয়দ নিহত হন ও গোহাটী আসামরাজ্যের হস্তগত হয়। ইনি বিস্তর পথ-ঘাটাদি প্রস্তুত করিয়া আসামের উন্নতি সাধন করেন। দেবমন্দির ও ব্রাহ্মণের প্রতিশালনার্থ ভূমিদান করিবার প্রথা ইহারই রাজত্বকালে প্রবর্তিত হয়। ইহার মৃত্যুর পর ইহার জ্যেষ্ঠ, তৎপর কর্ণিষ্ঠ পুত্র সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু তাঁহার উর্ভরেই অত্যন্ত উপদ্রবী ছিলেন, তজ্জন্ত মন্ত্রিগণ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। ইহার পর চুতাম্ফা বা জয়ধ্বজ সিংহ রাজা হন। ইনি একজন পরাক্রমী রাজা ছিলেন ও আসামের বহু উন্নতি সাধন করেন। ১৫৭৭ শকে নীরজুম্ফা ও মজুম খাঁ এই দুইজন মুসলমান সৈন্যদ্বারা আসাম আক্রমণ করেন। আসামরাজ পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইহার মরণান্তর চুপংফা বা চক্রধ্বজ সিংহ রাজা হন। ইনি সন্ধির নিয়ম অনুসারে অরঙ্গজেব বাদশাহের প্রাণ্য কর দানে ক্রেট ও বাদশাহের দূতকে অবমাননা করার বাদশাহের আজ্ঞামুসারে রাজা রাম সিংহ আসাম আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন, তাহাতে কামরূপ পুনরায় আসামরাজ্যের হস্তগত হয়। আসামের রাজধানী উপর আসামে ছিল, সেখান হইতে দূরস্থ কামরূপের শাসন-কার্য্য সূচাঙ্করূপে নির্বাহ হওয়া সুকঠিন, তাই রাজা গোহাটীতে একজন বড়ফুকন অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তাঁহার দেবপদর বরচরা বা মন্ত্রণাগারের চিহ্ন অদ্যাপি আছে। ইহার পর তাঁহার ভ্রাতা চুনাংফা বা উদয়াদিত্য রাজা হন, ও তাঁহার মরণান্তে তদ্রাতা চুন্ম্ফা বা রামধ্বজ সিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। ইহার পরে যে চারিজন রাজা হন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম বা হিন্দু-নাম গ্রহণ করেন নাই। ইহাদিগের শেষ রাজা চুতৈফা ১৬০১ শকে কামরূপপ্রদেশ মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার মরণান্তর চুলিক্কা বা লরারাজা রাজা প্রাপ্ত হন। মন্ত্রিগণ ইহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া চাম্‌গুরীয়বংশীয় চুপাংফা বা গদাধর সিংহকে অভিষেক করেন। ইনি হিন্দু ছিলেন না, হিন্দু ও হিন্দুধর্ম উভয়কেই ঈশ্বা করিতেন, ব্রাহ্মণদিগের উপর তাঁহার বিজাতীয় বিবেক ছিল ও ব্রাহ্মণদিগের অনেকেই নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলবান ও বৃহৎকার পুরুষ ছিলেন। মদ্যমাংস বিনা থাকিতে পারিতেন না; তেঁকে ও গো-মাংস তাঁহার প্রিয়

খাদ্য ছিল। তিনি বলিতেন যে, হিন্দু-ধর্মই আহল বংশের পতনের কারণ হইবে। তিনি হিন্দু-ধর্ম মানিতেন না, কাজেই কোন হিন্দু-দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাই; কিন্তু গোহাটীর নিকট ব্রহ্মপুত্রমধ্যস্থিত ভদ্রাচল-পর্যন্তে উমানন্দ-শিবের মন্দির তাঁহারই রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অদ্যাপি আছে। তাঁহার রাজত্বকালে ১৬০৫ শকে পুনরায় মুসলমানেরা আসাম আক্রমণ করে, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কামরূপ-প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় ও আসামরাজ পুনর্বার গোহাটীতে কামরূপের রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক একজন বড়-ফুকন প্রেরণ করেন। তাঁহার মরণান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চুপংফা বা রুদ্রনাথ সিংহ রাজা হন। ইহার পিতা যেমন হিন্দু ও হিন্দু-ধর্মবিষেই ছিলেন, ইনি তেমনই হিন্দু-ধর্ম-পরায়ণ ও ব্রাহ্মণভক্ত হইলেন। ইনি অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমি-দান ও দেবমন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শিব-সাগরের অন্তর্গত নামডাং নদীর উপর যে বৃহৎ ও সুদৃঢ় প্রস্তরময় সেতু বিদ্যমান আছে ও যাহার উপর অনেক হস্তী, অশ্ব ও লোক গমনাগমন করিতেছে, তাহা ইহারই আদেশ-মুসারে নির্মিত। তত্ত্বিন্ন ইহার স্থাপিত অনেক দেবমন্দিরও বর্তমান আছে। ইনিই বাঙ্গালা দেশ হইতে গায়ক ও বাদ্য-কর আনাইয়া এদেশে বাঙ্গালা গান-বাদ্যের প্রচলন করেন। ইনি গঙ্গানদীকে নিজ দেশান্তর্গত করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গ-দেশ আক্রমণার্থ সসৈন্তে যুদ্ধযাত্রাপূর্ব্বক গোহাটীতে উপস্থিত হন, কিন্তু দুর্দৈববশতঃ উক্ত স্থানে রোগাক্রান্ত হইয়া কালের করাল কবলে নিপতিত হওয়ার তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। তৎপুত্র শিবনাথ সিংহ বা চুতন্থা তাঁহার সিংহাসনাধিকার-প্রাপ্ত হন। আসামদেশে যে সমস্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, গীরো-ত্তর বা অন্ত প্রকার নিকর ভূমি আছে, তাহার অধিকাংশ ইহারই প্রদত্ত। ইহার পটুমহিরা ফুলেশ্বরী বা প্রমথেশ্বরীর আদেশামুসারে গৌরীসাগর নামক বৃহৎ পুষ্করিণী নির্মিত হইয়া তাহার পারে এক শিবমন্দির স্থাপিত হয়। ইহার মৃত্যু হওয়াতে মহারাজা ইহার ভগিনী দ্রৌপদী বা অম্বিকাকে বিবাহ করিয়া পটুমহিরা অভিষেক করেন। ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠার আদেশে শিবসাগর জিলার মিথুনদীর উত্তরপারে কিছুদূর একশত পুরা (চারিশত বিঘা) ভূমিতে শিবসাগর নামক এক পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার তীরে শিব, চূর্ণা ও বিষ্ণুর তিনটি বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার জন্য অনেক ভূমি দান করেন। উক্ত মন্দিরত্রয় ও পুষ্করিণী বর্তমান আছে এবং ঐ পুষ্করিণীর নামামুসারে ঐ প্রদেশের নাম শিবসাগর হইয়াছে ও তাহার

পারেই এখনকার সমুদায় রাজ-কার্য্যালয় ও ইংরাজ রাজ-কর্মচারীদের নিবাস-গৃহ স্থাপিত হইরাছে। রাজা শিবনাথ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা প্রমত্তসিংহ বা চুচেন্কা সিংহাসনাধিকার করেন। শিবসাগর জিলার অন্তর্গত দিখুনদীর দক্ষিণপারে যে রংঘর (রঙ্গশালা) নামক বিতল অট্টালিকা বিদ্যমান আছে, তাহা ইহার নির্মিত। তিনি হস্তী, ব্যাঘ্র ও মহিষ প্রভৃতি পশুদিগের যুদ্ধসন্দর্শনার্থ ঐ রংঘর নির্মাণ করেন। ইহার ভ্রাতা চুরক্ষা বা রাজেশ্বর সিংহ ইহার পর-সিংহাসনাধিষ্ঠ হন, ও তদানীন্তন রাজপ্রাসাদের পরি-বর্তে শিবসাগরের দিখুনদীর উত্তরপারে “গরগাও” নামক বৃহৎ ও ত্রিতল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কিয়ৎ-কাল তথায় বাস করণান্তর অসম্ভব হইয়া উক্ত নদীর অপর পারে পূর্বোক্ত রংঘরের নিকট অতি বৃহৎ ও সপ্ততল একটি রাজবাটা নির্মাণ করাইয়া রংপুরনামে অভিহিত করেন। তমিকটে যে শিবসাগরের ন্যায় বৃহৎ “জয়সাগর” নামক পুরু-রিণী আছে, তাহা ইহারই প্রতিষ্ঠিত ও তীরস্থ শিবমন্দিরও ইনিই স্থাপন করেন। তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অপরাপর শিব-মন্দিরের মধ্যে দেবগ্রাম নামক স্থানের বৃহৎ মন্দির অদ্যাপি বর্তমান আছে। ইহার মৃত্যুর পর ইহার ভ্রাতা চত্তেওফা বা লক্ষ্মীনাথ সিংহ অভিষিক্ত হন। ইনিও কতিপয় দেব-মন্দির স্থাপিত করেন, তন্মধ্যে কামরূপের অন্তর্গত মণিপর্কতে অশ্বক্রান্তের দেবালয় প্রধান। ইহার মরণান্তে ইহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র গৌরীনাথ সিংহ বা চুহিতপংফা সিংহাসনাধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা দিক্রগড়ের নিকটস্থ হিন্দুধর্মে দীক্ষিত মটক, মোয়ামরীয়া বা মরণ নামক এক আদিমনিবাসী জাতির বিদ্রোহিতা। ইহারাই দুইবার বিদ্রোহী হয়, প্রথমবার রাজা তাহাদিগকে দমন করেন; কিন্তু দ্বিতীয়বার তাহাদিগের দমনে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন ও কলিকাতায় দূত প্রেরণপূর্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহাতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশানুসারে কাপ্তান ওয়ালস ও লেফটেনেন্ট মেগ্রে-গর কতকগুলি দেশীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আসামে আগমন করিয়া বিদ্রোহ-দমনপূর্বক দেশে শান্তি স্থাপন করেন। রাজা পলায়ন করিলে পর মটকেরা অতীব নিষ্ঠুরভাবে অসংখ্য নিরাশ্রয় প্রজার প্রাণনাশ করে, তজ্জন্ত মরণ নামে অভিহিত হয়। বিদ্রোহ-শান্তির পর গৌরীনাথ রংপুর-নগর পরিত্যাগপূর্বক শিবসাগরের অন্তর্গত বোড়হাট নামক স্থানে নগর স্থাপন করেন ও ঐ স্থানেই কালপ্রাপ্ত পতিত হন। তৎপরে কামরূপীয়া বংশের কমলেশ্বর সিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হন।

বলা কর্তব্য যে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইয়া অবধি আহম-রাজগণ, অপরাপর আহমদিগের দ্বারা আপন লতানদিগকে হিন্দু-নাম প্রদান করিতেন; পরে ঐ লতানদিগের মধ্যে বিনি রাজা হইতেন, তিনি অভিষেকের সময় আহম-বাজ্রাহুধারী কোন এক কার্য্য করিয়া আহম নাম গ্রহণ করিতেন; কিন্তু উক্ত কার্য্য অতীব ব্যয়সাধ্য হেতু কমলেশ্বর সিংহ তাহা করিতে পারিলেন না, ও তজ্জন্য তিনি কোন আহম নাম প্রাপ্ত হইলেন না। ইহার পর কোন রাজা উক্ত কার্য্য করেন নাই ও আহম নাম প্রাপ্ত হন নাই। ইনি পশ্চিমাঞ্চল হইতে অনেকগুলি লোক আনাইয়া সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত ও পাথরী বন্দুক প্রচলিত করেন। তাঁহার পর-লোক প্রাপ্তির পর তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহ রাজা হন। ইহার রাজত্বকালে মন্নিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, গোহাটীস্থ রাজ-প্রতিনিধি বড়কুকন ব্রহ্ম-রাজ্যে গিয়া কতক সৈন্তসমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তন করেন ও রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষদিগকে দমনপূর্বক রাজাকে স্বায়ত্ত করিয়া নিজে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন ও ব্রহ্ম-দেশীয় সৈন্তদিগকে বিদায় দেন।

তাহাদিগের স্বদেশ যাত্রার পর বড়কুকনের কোন কোন বিপক্ষ কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া রাজ-মাতা গোপনে তাঁহার শিরশ্ছেদ করান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিপক্ষ প্রধান রাজমন্ত্রী রুচিনাথ বুচা গোসাঁই অপরাপর প্রধান রাজপুরুষ-দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুরন্দর সিংহকে অভিষেক করেন। ইহার পর ব্রহ্ম-দেশীয় সৈন্ত আসাম আক্রমণ করে, তাহাতে যুদ্ধ পরাস্ত হইয়া পুরন্দর সিংহ পলায়ন করিলে পর, ব্রহ্মদেশীয়েরা চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজ্যপ্রদানপূর্বক প্রত্যন করে। অনন্তর ব্রহ্মদেশীয় রাজা, রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের নিকট বন্ধুভাবে কতকগুলি সৈন্তসমভিব্যাহারে একজন দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু মন্নিগণ তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পথরোধ করায়, তাহার অপরামিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। আসামীদিগের সৈন্তগণ যুদ্ধ পরাস্ত হইলে রাজা পলায়ন করিলেন। তৎপর ব্রহ্মদেশ হইতে অধিক সৈন্ত আসিয়া আসামবাসীদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন ও তাহাদিগের ধন-প্রাণ হরণ করে। বহু কষ্টের পর আসামের সৌভাগ্যোদয় হওয়ার ইংরাজ গবর্ণমেন্ট চর্দান্ত ও নিদারুণ ব্রহ্মবাসীদিগকে দুরীকৃত করিয়া আসাম অধিকার করিলেন। তাহাতে আসামে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারিতে আসামের

দুঃখশরীরী শেখ হইরা প্রজাগণ অসহ্য যাতনা হইতে উদ্ধার
পায় এবং ৬০০ শত বৎসর রাজ্য-ভোগ করিয়া আহমবংশ
সিংহাসনচ্যুত হয়।

আহমবংশীয় রাজগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাম	ভোগ-সংখ্যা।
১। চুকা	১২২৯—১২৬৮ খৃষ্টাব্দে
২। তৎপুত্র চুতেওকা	১২৬৮—১২৮১
৩। " চুভিন্কা	১২৮১—১২৯৩
৪। " চুখাংকা	১২৯৩—১৩৩২
৫। " চুখাংকা	১৩৩২—১৩৬৪
৬। তদ্ব্রাতা চুতুকা	১৩৬৪—১৩৭৬
অরাজক	১৩৭৬—১৩৮০
৭। তাওখামখি চুতুকার ব্রাতা	১৩৮০—১৩৮৯
অরাজক	১৩৮৯—১৩৯৮
৮। চুভাংকা, তাও- খামখির পুত্র	১৩৯৮—১৪০৭
৯। তৎপুত্র চুখাংকা	১৪০৭—১৪২২
১০। " চুকা	১৪২২—১৪৩৯
১১। " চুচেন্কা	১৪৩৯—১৪৮৮
১২। " চুহেন্কা	১৪৮৮—১৪৯৩
১৩। " চুপিন্কা	১৪৯৩—১৪৯৭
১৪। " চুহুং বা স্বর্গনারায়ণ	১৪৯৭—১৫৩৯
১৫। " চুসেন্কা বা গরগরা রাজা	১৫৩৯—১৫৫২
১৬। " চুখাম্কা বা খোরা রাজা	১৫৫২—১৬১১
১৭। " চুচেংকা বা বুদ্ধিস্বর্গনারায়ণ বা প্রতাপাদিত্য	১৬১১—১৬৪৯
১৮। " চুরম্কা বা ভগা রাজা	১৬৪৯—১৬৫২
১৯। " চুতিংকা বা নরনারায়ণ	১৬৫২—১৬৫৪
২০। " চুতাম্কা বা জয়ধ্বজ সিংহ ভগনিরা রাজা	১৬৫৪—১৬৬৩
২১। " চারিদীরা- বংশের চুপংমুং বা চক্রধ্বজ	১৬৬৩—১৬৭০
২২। তদ্ব্রাতা চুতুংকা বা উদয়াদিত্য	১৬৭০—১৬৭২

২৩। তদ্ব্রাতা চুকা	১৬৭২—১৬৭৪
রামধ্বজ	
২৪। চামুগুরীয়া বংশের চুহুং রাজা	১৬৭৪—১৬৭৪ (১ মাস ১৫ দিন)
২৫। তুংখুদীয়া বংশের গোবর রাজা	১৬৭৪—১৬৭৪ (২০ দিন)
২৬। দিহিদীয়া বংশের চুজিন্কা	১৬৭৪—১৬৭৭
২৭। তুংখুদীয়া বংশের চুতেকা	১৬৭৭—১৬৭৯
২৮। চামুগুরীয়া বংশের চুলিক্কা বা লরা রাজা	১৬৭৯—১৬৮১
২৯। চামুগুরীয়া বংশের গদাপানি বা গদাধর সিংহ বা চুপাংকা	১৬৮১—১৬৯৫
৩০। তৎপুত্র লাই বা চুখাংকা বা রুদ্রসিংহ	১৬৯৫—১৭১৪
৩১। চুতন্কা বা শিবসিংহ	১৭১৪—১৭৪৪
৩২। তদ্ব্রাতা চুনেন্কা বা প্রমত্তসিংহ	১৭৪৪—১৭৫১
৩৩। " চুরম্কা বা রাজে- শ্বর সিংহ	১৭৫১—১৭৬৯
৩৪। " চুচেংকা বা লক্ষীসিংহ	১৭৬৯—১৭৮০
৩৫। তৎপুত্র চুহিতপংকা বা গোবীনাথ সিংহ	১৭৮০—১৭৯৫
৩৬। নামরূপীয়া বংশের কমলেশ্বর সিংহ	১৭৯৫—১৮১০
৩৭। তদ্ব্রাতা চক্রকান্ত সিংহ	১৮১০—১৮১৭
৩৮। " পুরন্দরসিংহ	১৮১৭—১৮১৮
পুনঃ চক্রকান্ত সিংহ	১৮১৮—১৮২১
৩৯। তুংখুদীয়া বংশের যোগেশ্বর সিংহ	১৮২১—১৮২৪

আহমজাতির এখন অতীব দৈন্তাবস্থা। তাহারা

নিজধর্মের সঙ্গে ভাবাপত্তি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে হিন্দু
হইয়াছে। উপরে যে সব দেবমন্দির ও রাজপ্রাসাদের বিবরণ
লিখা গিয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই বর্তমান আছে; কিন্তু অবস্থা
অতি মন্দ। তাহার অধিকাংশ শিবসাগর জিলার আছে,
তেজপুর ও নওগাঁয়ে কিছু কম। কামরূপ জেলার আসাম-
রাজদিগের স্থাপিত অনেক দেবমন্দির দেখা যায়। কিন্তু
কামাখ্যার মন্দির আসামরাজদিগের নির্মিত নয়। যখন
কামরূপ কুচবেহারের অন্তর্গত ছিল, তখন ঐ দেশের রাজা
নরনারায়ণ তাহা নির্মাণ করান। আসামরাজরা তাহার
জীর্ণ সংস্কার করেন মাত্র। [কামাখ্যা দেখ।]

আসামরাজ্যদিগের রাজধানী শিবসাগর জেলায় ছিল, এই জন্ত অপর কোন স্থানে রাজভবন নাই।

এই সময় হইতে কামরূপের কোন উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা পাওয়া যায় না। কেবল খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কামরূপে হরদত্ত ও বীরদত্ত নামক দুই ভাই আহমরাজ্যদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব অবলম্বন করে। হরদত্তের পদ্মকুমারী নামে একটি পরমরূপবতী কন্যা ছিল। প্রধানতঃ এই পদ্মকুমারীই হরদত্ত-বীরদত্ত-দ্রোহের প্রধান কারণ। আহমরাজ্যপ্রতিনিধি কলীয়া ভোমোরা বড়হুকনের সঙ্গে হরদত্ত-বীরদত্তের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হরদত্ত পরাস্ত হয় এবং কলীয়া ভোমোরা বড়হুকনের সেনাপতি কুমেদান নামক কোন লোক পদ্মকুমারীকে হস্তগত করে। প্রবাদ আছে পদ্মকুমারীর হস্তে এবং পদে পদ্যের চিহ্ন ছিল। এই পদ্মচিহ্নই তাঁহার পদ্মকুমারী নামের মূল কারণ। অদ্যাপি কামরূপে হরদত্ত-দ্রোহ এবং পদ্মকুমারীর বিবরণ গ্রাম্যসঙ্গীতে গীত হইয়া থাকে। সাধারণের অবগতির জন্ত একটি গীতের নমুনা দেওয়া গেল।—

“হরদত্তের জিরী, পদ্মকুমারী, ধনরাত নেখালি ভাত।

“কুমেদান বঙালে হাত ও ধরি নিলে পদ্ম বিচারি গাত” ॥

অর্থ—হরদত্তের কন্যা পদ্মকুমারী ধনরাত গ্রামে ভোমার অন্ন-জল জুটিল না। কুমেদান বাকাল ভোমাকে হাতে ধরিয়া লইয়াই অমনি ভোমার গায়ে পদ্ম দেখিতে লাগিল।

কামরূপে ইংরাজাধিকার—রাজা রুদ্রসিংহ স্বর্গদেব নদীরার রুদ্ররাম ঞায়বাগীশ নামক একজন ভট্টাচার্যের নিকট দীক্ষিত হন। ভট্টাচার্যের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলিয়া আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে দেবীর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি করিত। রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহও সপরিবারে ইহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। শিবসিংহ স্বর্গদেব সপরিবারে ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপাশ্রয় দেবীমন্ড্রে দীক্ষিত হন। এক সময়ে শিবসিংহের ছত্রভঙ্গ দোষ ঘটে। জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা ও মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া শিবসিংহের প্রেমরাপত্রী রাণী ফুলেশ্বরীকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজকাৰ্য্য সম্পাদন করিতে থাকে। এইরূপে শিবসিংহের দীর্ঘরাজত্বের মধ্যে তাঁহার চারিটা মহিষী ফুলেশ্বরী, প্রেমেশ্বরী, দ্রোণলী বা অধিকা ও অনাদেশী বা সর্কেশ্বরী একে একে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ফুলেশ্বরী স্বীয় অভিভূতদেবীপুত্র প্রতি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন। এক বৎসর দুর্গোৎসবের সময় তিনি মোরামরীয়ার মহন্ত ও

অভ্যন্তরস্থানের কয়েকজন মহন্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া তৎপবিত্র প্রসাদিত সিন্দূর, রক্তচন্দন ও বলির রক্তাদি লইয়া তাঁহাদিগকে ফৌটা দিয়া লালিত করেন। অপর অপেক্ষা মোরামরীয়ার মহন্তের প্রাণে এই ব্যবহারে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি শিষ্য সকলকে বলিলেন, বে ইহার প্রতিশোধ লওয়া আবশ্যক ও তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। কালক্রমে ইহাও সিদ্ধ হইল। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রাজেশ্বরসিংহ রাজা হইলেন। ইহার শেষদশায় মোরামরীয়ার মহন্ত শিষ্যগণকে একত্র করিয়া শিবসিংহ রাজার পত্নীকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমুদয় শিষ্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিষ্যেরাও গুরুর অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তৎপরে লক্ষীসিংহ রাজা হইলেন। রাজা রুদ্রসিংহের শেষবয়সে লক্ষীসিংহের অন্ন হয় এবং তাঁহার সহিত ইহার আত্মত্যাগত সোমাদৃত্র না থাকায় রাজা রুদ্রসিংহ ইহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এই জন্ত রাজ্যের অভ্যন্তর প্রধান লোকেরাও ইহাকে তাবৎ আদর করিত না, এমন কি রাজাদিগের কুলগুরু পরম্ভীয়া গোসাই ইহাকে দীক্ষিত করিতে অসম্মত হইলেন। লক্ষীসিংহ স্বীয় বিদ্যাগুরু রমানন্দ ভট্টাচার্য নামক একজন অধ্যাপককে দীক্ষিত করিলেন। বাল্যকালে ইহারই নিকট ইনি শিবপূজা শিখিয়াছিলেন এবং এক্ষণে শিবমন্ড্রে দীক্ষিত হইলেন। রাজগুরু হইয়া রমানন্দ অনেক বৃত্তি পাইলেন এবং পহ-মরিয়া গোসাই নামে আখ্যাত হইলেন। ইহার এইরূপ পদ-মর্যাদায় অগ্ৰাণ্ত মহন্ত মহা চটিয়া গেলেন, বিশেষতঃ মোরামরীয়ার মহন্ত গরিত বচনে রাজার প্রতি কটু কথা প্রয়োগ করায় তিনি রাজার বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িলেন। সেই বৎসরেই আশ্বিনমাসে স্বর্গদেব নৌকার ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। সঙ্গে স্বতন্ত্র নৌকার বড়বড়ুয়া ছিলেন। মোরামরীয়ার মহন্ত এই সময় সাক্ষাৎ করিয়া ক্রমা প্রার্থনা করেন; কিন্তু বড়বড়ুয়া মহন্তকে যথেষ্ট বিজ্ঞপ্ত করেন। মহন্ত ইহাতে অভিযয় অপমানিত বোধ করিলেন। তাঁহার মনে পূর্ণ অপমান ও দ্বিগুণ জলিয়া উঠিল। তিনি শিষ্যদিগকে ডাকাইয়া তলে তলে তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিলেন। রুদ্রসিংহ স্বর্গদেবের ভাঙিত একজন রাজবংশীয়কে দলপতি হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। নাহরখোরা ও রাঘবরাণ দুই ব্যক্তি সেনাপতি হইল। বাহারা এই ক্রোড়ে যোগ দিল তাহারা না, টানন, ধন, কাঁড়, বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইল। প্রায় সহস্রাকার লোক অগ্রহারণের প্রবনেই

রত্নপুরের নিকে বাজা করিল। লোকে প্রবাদ রটাইল যে, মহত অজ্ঞার করিয়া লক্ষীসিংহকে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে এই যুদ্ধবাজা করিয়াছেন।

মোহাম্মদীরার লোকের এই উল্লেখ দেখিয়া ভূপাই বড় গোসাঁই, বুড়া গোসাঁই, কীর্তিচন্দ্র বড়বড়ুয়া প্রভৃতি মন্দিরাও পরামর্শ করিয়া একদল সৈন্ত পাঠাইলেন। যুদ্ধে রাজসৈন্তেরা পরাজিত হইল। মোহাম্মদীয়া সৈন্তদল নগর অধিকার করিয়া রাজা, সেনাপতি ও বড়বড়ুয়া প্রভৃতি মন্দিগণকে বন্দী করিল। রাজাকে জয়সাগরের নিকট বন্দী করিয়া রাখিল এবং বড় গোসাঁই, বুড়া গোসাঁই, প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোককে বধ করিল। কীর্তিচন্দ্রকে শালে চড়াইয়া দিল ও তাঁহার পুত্রগণকে মারিয়া ফেলিল। ধোরামরাণপুত্র রমাকান্ত রাজা হইলেন। অগ্রহায়ণে এই ঘটনা ঘটিল, কিন্তু চৈত্রমাসে লক্ষীসিংহের পক্ষ হইতে কুঁই, গঁরা, ঘনশ্রাম প্রভৃতি কয়েকজন লোক বড়বড়ুয়া করিয়া রমাকান্তের দাসত্ব স্বীকার করিল, ইহাদের কৌশলে রমাকান্ত, মোহাম্মদীয়া সেনাপতি প্রভৃতি কয়েকজনে প্রাণ হারাইলেন। তৎপরে লক্ষীসিংহ রাজা হইলেন। লক্ষীসিংহ ঘনশ্রামকে বড় গোসাঁইপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লক্ষীসিংহের পর কোকনাথ গোসাঁইদেব গৌরীনাথসিংহ নামে রাজা হইলেন। ইনি রাজ্যমধ্যস্থ সমস্ত মোহাম্মদীয়ার লোককে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহার সকলে মড়বড়ুয়া করিয়া ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ২রা বৈশাখ অগ্নি দিয়া শিকারীঘর নামক প্রাসাদ পোড়াইয়া দিল। রুদ্রেশ্বর বড়পাত্র ডাক্তারীয়া (প্রধান সেনাপতি) এই কার্যে বাধা দিতে না পারিয়া গোহাটী পলাইয়া গেলেন। বুড়া গোসাঁই মোহাম্মদীয়াদিগকে ধরিয়া আনিয়া দোষী নির্দোষ বিবেচনা না করিয়া সকলকেই বধ করিলেন। ইহারা একে বিদ্রোহী, তাহার উপর এই অবিচার হইল, সুতরাং তাহারা একবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। ইহারা গুরুবাক্য ও গুরুকার্যকে সাক্ষ্য জৈশ্বরের আদেশ ও কার্য বলিয়া মানিত। সুতরাং তাহারা এই বিদ্রোহকে ধর্মবিদ্রোহ বলিয়া গণ্য করিয়া তলে তলে মোহাম্মদীয়ার মহন্তের প্রত্যেক শিষ্যের নিকট সংবাদ পাঠাইল এবং সকলেই যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

ইতিমধ্যে ঘনশ্রামের মৃত্যু হইল। তাঁহার স্মরণ্য পুত্র পূর্ণানন্দ বুড়া গোসাঁই হইলেন। পূর্ণানন্দ বিদ্রোহ ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, সামান্য শাস্তি দিয়া সাবধান করিয়া দিলেই ইহারা থামিতে পারে। এই ভাবিয়া কয়েকজন মোহাম্মদীয়াকে ধরিয়া বৃহৎ শাস্তি দিয়া কঠিন আদেশ করিয়া

ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে বল কিন্তু উঠা করিল। বিদ্রোহীরা রাজাকে হুর্দল ভাবিয়া পূর্ণ উৎসাহে দশহাজার সৈন্ত সংগ্রহ করিল। একদল নগর্যভিমুখে বাজা করিল। বুড়া গোসাঁই ইহাদিগকে বাধা দিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন। রাজ্যমধ্যে হলহুল পড়িয়া গেল; প্রজারা হতাশ হইয়া পড়িল। রাজা নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তারীয়া নগরের চৌদিকে গড়বন্দী করিয়া নগর মধ্যেই রহিলেন। এই গড়কে 'বিবুধিগড়' বলে। জয়সাগরের নিকট শেষে এক বিষম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও রাজকীয় সৈন্য পরাস্ত হয়। তরতসিংহ নামে বিপক্ষের একজন সেনাপতি রাজা হইল। রাজা গৌরীনাথের ইচ্ছা ছিল, কাছাড় ও জরজীরাজের সাহায্য লইয়া এই বিদ্রোহ দমন করিবেন, কিন্তু তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, স্বদেশরক্ষার্থ যত সৈন্য আবশ্যক তাহার অধিক সৈন্য আমাদের নাই। গৌরীনাথ বিদ্রোহীদের ভরে গোহাটীতে পলাইয়া গেলেন। এখানে তিনি বড়ফুকনের সহিত পরামর্শ করিয়া কতকগুলি সৈন্যসংগ্রহপূর্বক বুড়া গোসাঁইয়ের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন, পথে বিদ্রোহীদের বাধা দিয়া ইহাদিগকে বিনষ্ট করিল।

এই সময় গোয়ালপাড়ার রস নামে একজন ইংরাজ লবণের ব্যবসা করিতেন। গৌরীনাথ নিরুপায় হইয়া সাহেবকে বিশেষরূপে পুরস্কার দিবার আশা দিয়া তাঁহার দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সাহেব ৭০০ বরকন্দাজ দিলেন। এই বরকন্দাজসৈন্ত নওগায়ের বিদ্রোহীদের গড়কাছাড় দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইবার সময় ষোড়হাটের নিকট শত্রুহস্তে সকলেই বিনষ্ট হইল। কিছুদিন পরে মণিপুররাজ ৫০০ অশ্বারোহী ও ৪০০০ হাজার পদাতি লইয়া গৌরীনাথের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এই সৈন্তদলও যুদ্ধে পরাস্ত হইল, প্রায় ১৫০০ সৈন্য মৃত্যুমুখে পড়ায় মণিপুরী সৈন্ত স্বদেশে চলিয়া গেল। বিপদ একলা আসে না। ওদিকে দরঙ্গরাজ বিষ্ণুনারায়ণের ভ্রাতা কৃষ্ণনারায়ণ ভ্রাতাকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন ও গৌরীনাথের দুর্দশা দেখিয়া হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী ও ককীর হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া কামরূপ আক্রমণ করিতে আসিলেন। আহমগণকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে দেখিয়া কামরূপের লোকেরা বড় ভুগা করিতে আরম্ভ করে, এমন কি গোহাটী নগরের মধ্যে তাহাদের বাস উঠাইয়া দিল। এই যুদ্ধে তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কৃষ্ণনারায়ণের পক্ষ হইল। গৌরীনাথ সিংহ চারিদিকে বিপদ দেখিয়া গোহাটীর

বিকা বহুমুখ্য, বহুদাম খণ্ড ও ময়ূর বিতাক্ত রাজা বিষ্ণুনারায়ণকে বৃতীশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। গোয়ামপাড়ার ইংরাজ-বণিক রস সাহেব কলুনি বজেট কোম্পানির নামে চিঠি দিলেন। এই সময় কলিকাতার লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনেরল। তিনি রাজা গৌরীনাথের আবেদনপত্র পাইয়াও প্রথমতঃ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন; কারণ আত্মবিচ্ছেদে এক পক্ষকে সাহায্য করা অপর রাজার পক্ষে রাজনীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু শেষে দেখিলেন যে রাজা কৃষ্ণনারায়ণ হিন্দুস্থানী সৈন্ত লইয়া কামরূপ লও ভণ্ড করিতেছেন; এই হিন্দুস্থানীরা বৃতীশ প্রজা। সুতরাং তাহাদের দমন করা তাঁহার কর্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া তিনি ১৭২২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ওয়েল্‌স সাহেবকে সঙ্গেতে পাঠাইয়া দিলেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স এদেশে পৌঁছিয়াই হিন্দুস্থানীদিগকে দমন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

এদিকে ভরতসিংহ রাজা হইয়া নিষ্ঠুরভাবে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। সৈন্তদিগের প্রতি আদেশ ছিল যে, তাহারা যেক্ষণে হউক আহমপ্রজার ধনহরণ ও প্রাণ বিনাশ করিবে। রসসাহেবের বরকন্দাজ ও মণিপুরীসৈন্ত পরাস্ত হওয়ায় ভরতসিংহ ভাবিলেন রাজ্য নিকটক হইল। তিনি গোহাটীর নিকটস্থ কতকটা স্থান অধিকার করিলেন। রাজা গৌরীনাথ এই সংবাদ পাইয়া কিছু সৈন্ত লইয়া সেই দিকে যাত্রা করিলেন। এদিকে কাপ্তেন ওয়েল্‌স সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন এবং রাজার মুখে দেশের অবস্থা অবগত হইয়া ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ২৯এ নবেম্বর তারিখে গোহাটা প্রদেশ উদ্ধার করিলেন। মোয়ামরীয়া দল ছিন্ন ভিন্ন হইল। গৌরীনাথ গোহাটীতে রহিলেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স ৬ই ডিসেম্বর নৌহিত্তোর উত্তরকূলে গমন করিলেন। মোয়ামরীয়াগণের পরাজয় শুনিয়া কৃষ্ণনারায়ণের সৈন্তও পলাইল। কৃষ্ণনারায়ণ স্বয়ং বন্দী হইলেন। কৃষ্ণনারায়ণ বলিলেন, আমি গৌরীনাথের বিপক্ষ নহি, মোয়ামরীয়া-বিদ্রোহ নিবারণ করা আমারও উদ্দেশ্য, গৌরীনাথ তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমার বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যাহা হউক, কাপ্তেন ওয়েল্‌স থাকিয়া গৌরীনাথ ও কৃষ্ণনারায়ণের মধ্যে এইরূপ সন্ধি করিয়া দিলেন যে, কৃষ্ণনারায়ণ দরঙ্গ ছুটিয়া ও চাই-ছায়েবর মাহুৰ দিবার পরিবর্তে ৫৫০০০ টাকা ও ভোটারাজ্যে ব্যবসায় করিবার জন্য মাহুৰ হিসাবে ৩০০০ টাকা দিবেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স গোহাটীতে থাকিয়া জানিতে পারিলেন যে, গৌরীনাথের বুদ্ধি বিব্রেক্ততা বড় নাই, রাজ্য-নিকটক হইলেও

তাঁহা যারা রাজ্য স্থাপিত হওয়া বড় যত্নেহ। তিনি এই যত্নে কলিকাতার পত্র বিধিধেন, “আমি বাহাতে রাজ্যের সুবন্দোবস্ত হয় তাহা করিয়া বাইতে চাই। আমার বোধ হয় যে রাজার অন্তর আচরণেই কৃষ্ণনারায়ণ প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়াছে” ইত্যাদি।

কাঃ ওয়েল্‌স ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে প্রধান নগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। গৌরীনাথ সঙ্গে গেলেন। যে দিন নগরের নিকট পৌঁছিলেন, সেই দিন নগরের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ১২ জন সিপাহী, একজন জমাদার, একজন নায়ক ও একজন হাবিলদার নগরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা গৌরীনাথ ব্যাপার দেখিয়া বিব্রত হইলেন। পাঁচ হাজার মোয়ামরীয়ার সহিত এই মুষ্টিমেয় সৈন্তের যুদ্ধ হইবে ভাবিয়া তিনি জয়াশা ত্যাগ করিলেন। ওদিকে মোয়ামরীয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল এই কয়টা সিপাহী মারিতে পারিলেই বৃষ্টি তাহাদের জয় হয়। ফলে সিপাহীরা বীরভাবে গুলি চালাইতে লাগিল। যথেষ্ট মোয়ামরীয়া মরিল। এই কয়জন সিপাহী শত্রুপক্ষ প্রায় নিঃশেষ করিলে, শেষে আর কয়েকজন বৃতীশসৈন্ত গিয়া নগর অধিকার করিল। তৎপরদিন বুড়া গোঁসাই ডাঙ্গরীয়া গৌরীনাথকে নগর মধ্যে লইয়া গেলেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের চৈত্রমাসে কাপ্তেন ওয়েল্‌স নগর প্রবেশ করিলেন।

গৌরীনাথ পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন। কাপ্তেন সাহেব বুড়া গোঁসাই ডাঙ্গরীয়া প্রভৃতি প্রধান কর্মচারীকে অনেক উপদেশ দিলেন এবং গবর্ণর জেনেরলের উপদেশ বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, দেশে স্থানাসন স্থির রাখিবার জন্য কিছু বৃতীশসৈন্ত এদেশে থাকিবে ও কামরূপের উৎপন্ন হইতে এই সৈন্তদলের খরচ চলিবে।

ওদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বদেশে গেলেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শোর গবর্ণর হইয়া কাপ্তেনকে কিরিয়া বাইতে আদেশ করিলেন।

তৎপরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন চক্রকান্তসিংহ স্বর্গদেবকে বন্দী করিয়া পুরন্দরসিংহ রাজা হন, সেই সময় বড়হুকনের লোক গিয়া ব্রহ্মদেশের অধীশ্বর আলু মজি বা কিওয়া মজিকে জানাইলে তিনি সাহায্যার্থ ৩০,০০০ সৈন্ত পাঠাইলেন। ব্রহ্মসেনাপতি রাজ্যে প্রবেশ করিলে পর পশ্চিমধ্যে পুরন্দর সিংহ সৈন্ত পাঠাইয়া বাধা দিলেন। যুদ্ধে পুরন্দরসিংহের সৈন্ত পরাস্ত হইল। পুরন্দর ভীত হইয়া গোহাটা পলাইয়া গেলেন। ব্রহ্মসেনাপতি চক্রকান্তকে রাজা করিয়া পুরন্দরকে ধরিবার জন্য সৈন্ত পাঠাইলেন। পুরন্দরের পক্ষে

বড়কুকন বুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তিনিও পরাস্ত হইবার পুরস্কার পলায়ন করিয়া তিলমণিরিতে গিয়া রহিলেন। ব্রহ্মসেনাপতি চন্দ্রকান্তের স্বার্থ ২০০০ সৈন্ত রাখিয়া স্বদেশে গেলেন। পুরস্কার নিরুপায় হইয়া কলিকাতায় গিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রীটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট এই বলিয়া এক আবেদন করিলেন যে যদি ব্রীটিশ গবর্ণমেন্ট সৈন্ত দিয়া তাঁহার রাজ্য উদ্ধার করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি ভক্ত সৈন্তব্যয় দিতে ও অবশেষে ব্রীটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে করদ রাজ্য হইতে প্রস্তত আছেন। ব্রীটিশ গবর্ণমেন্ট কিন্তু পত্র গ্রাহ করিলেন না।

এই সময় কুচবিহার প্রদেশে মিঃ স্কট কমিশনার ছিলেন। তিনি প্রতি পত্র ব্রীটিশ গবর্ণমেন্টকে দেশের অবস্থা জানাই-তেন। এক্ষিকে ব্রহ্মসেনা রীতিমত দেশে ছড়াইয়া পড়িল। চন্দ্রকান্তকে নামমাত্র রাজ্য রাখিয়া ব্রহ্মসেনাপতিরা রাজ্যের সর্বস্বয় কর্তা হইয়া উঠিল। চন্দ্রকান্তও শেষে ব্রহ্ম হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসেনাপতি মিজিমাহা দেশের অবস্থা দেখিতে আসিলেন। জরপুরের নিকট একটি নুতন গড় নির্মিত হইতেছে দেখিয়া তিনি কৌশলে সেখানকার বড়কুকনকে মারিয়া ফেলিলেন। চন্দ্রকান্ত ইহাতে ভীত হইয়া ভাবিলেন যে, ব্রহ্মসেনাপতি এবার শত্রুরূপে রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিবেচনায় তিনি বুড়া গোসাঁইকে নগরস্বার্থ রাখিয়া মিজে গৌহাটী পলাইলেন। মিজিমাহা পৌছিয়া চন্দ্রকান্তকে অভয় দিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভরসা করিতে না পারায় নগরস্বার্থী সৈন্তের সহিত ব্রহ্মসেনাপতির যুদ্ধ হইল। বুড়া গোসাঁই পরাস্ত হইলেন। চন্দ্রকান্ত বোড়হাটের দিকে পলায়ন করিলেন।

মিজিমাহা যোগেশ্বর নামক একজন কুমারকে সাক্ষী গোপালের মত রাজ্য করিয়া নিজে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এ সময় রাজ্যে প্রায় দশহাজার ব্রহ্মসেনা উপস্থিত ছিল। দয়দরাজও এই সময় ব্রহ্মের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তৎপরে দেশদ্বয় ব্রহ্মসেনাপতির সহিত চন্দ্রকান্ত ও পুরস্কারের নামাহানে যুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মসেনাপতি ব্রীটিশ গবর্ণমেন্টকে পত্র লিখিলেন যে, এ সময়ে যেন তাঁহার কোন আশাশীলতার পক্ষ গ্রহণ না করেন। ব্রীটিশ গবর্ণমেন্ট এ আবেদন গ্রাহ করিলেন না, অথচ কাহাঁকেও সাহায্য করিলেন না।

এই সময় গারো প্রভৃতি পার্বত্যজাতিকে সন্ততা শিকা

নিবার ভক্ত ও ভাবানের দেশে ব্রীটিশ অধিকার বিস্তার করিবার জন্য, ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১০ আইন জারী হয়। (কুচবিহারের কমিশনার ভট্টসাহেব এই আইনের কার্য করিবার জন্য উত্তরাঞ্চলের এজেন্ট হন।) এই সময়ই রতপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গোয়ালপাড়া এক স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া গণ্য হয়। আসামে এই সময় ব্রহ্মাধিকার থাকার গোয়ালপাড়ায় একদল ইংরাজসৈন্ত রহিল; লেকটন্যান্ট ডেবিডসন সাহেব এই সৈন্তদলের নায়ক ছিলেন। মিঃ ডেবিডসন ও মিঃ স্কট আসামীদিগকে বড় স্বেচ্ছ করিতেন।

ওদিকে মহগড়ের যুদ্ধে চন্দ্রকান্ত সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া গোয়ালপাড়ায় আসিয়া ইংরাজের আশ্রয় লইলেন। লেকটন্যান্ট ডেবিডসনকে ত্বর দেখাইয়া ব্রহ্মসেনাপতি এক পত্র লিখিলেন যে, ব্রহ্মরাজের ইচ্ছা যে কোম্পানীর সহিত মিত্রতা থাকে এবং ব্রহ্মসেনা যেন কোন মতে ইংরাজসীমা অতিক্রম না করে। কিন্তু চন্দ্রকান্ত ইংরাজ অধিকারে আশ্রয় লইয়াছে, অতএব তাহাকে ধরিবার আদেশ দেওয়া আবশ্যক। মিঃ ডেবিডসন মিঃ স্কটকে এই পত্র পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ স্কট আবার সে পত্র গবর্ণরজেনারেলকে পাঠাইলেন। গবর্ণরজেনারেল ঢাকার ইংরাজ সেনাপতির উপর আদেশ দিলেন যে, আবশ্যক মত মিঃ স্কট যেন তাঁহার নিকট সৈন্ত প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মসেনা যদি ইংরাজ সীমায় প্রবেশ করে, তবে তাহাদিগকে বলে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কাছাড়রাজ গোবিন্দচন্দ্র গবর্ণমেন্টে এক আবেদন করেন যে মণিপুরসীমা ব্রহ্মসৈন্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মণিপুর হইতে চৌরজিৎসিংহ, মারজিৎসিংহ ও পন্ডীরসিংহ নামে তিনজন রাজকুমার ব্রহ্মের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কাছাড়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপরে যখন গোবিন্দচন্দ্র গৃহবিবাদে রাজ্যচ্যুত হন, তখন এই তিন ভ্রাতার মধ্যে কাছাড় সিংহাসন লইয়া মহা হলধুল পড়িয়া গেল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চৌরজিৎসিংহ ব্রীটিশ গবর্ণমেন্টকে এক পত্র লিখিলেন, শীঘ্রই ব্রহ্মরাজ এ অঞ্চল আক্রমণ করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব কাছাড়রাজ ইংরাজহস্তে অর্পণ করিতে চাই। ব্রীটিশ গবর্ণমেন্ট এ প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। মারজিৎসিংহ পূর্বে হইতে ব্রহ্মের সাহায্যে মণিপুর অধিকার করিয়া তথায় ব্রহ্মের করদ রাজ্য হইরাছিলেন।

ব্রীটিশ গবর্ণমেন্ট কাছাড়প্রবেশ হতে লইলে মহাবাদ পাইলেন যে ব্রহ্মরাজ আসাম হইতে কাছাড় অধিকারের উদ্যোগে আছে। মিঃ স্কট কাছাড়ের সহিত ব্রীটিশ গবর্ণ-

মেণ্টের সম্বন্ধ জানাইয়া, তৎপ্রদেশ আক্রমণ করিতে নিবারণ করিয়া ব্রহ্মসেনাপতিকে এক পত্র লিখিলেন।

আসাম ও কাছাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র জয়ন্তীরাজ্য। ব্রহ্মসেনাপতি এই দেশের রাজ্যকে তম দেখাইয়া বশীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু জয়ন্তীরাজ বশ্ততা স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মসেনাপতিও কাছাড়ের ইংরাজসেনার ভয়ে হঠাৎ এ রাজ্য আক্রমণ করিতে পারিলেন না।

তৎপরে ব্রহ্মসেনা একবারে আসাম ও মণিপুর এই দুই দিক দিয়া আক্রমণ করিবার ইচ্ছার জয়ন্তী ও কাছাড়ের প্রান্তে এবং ত্রিহট্টের সীমার উপস্থিত হইল। ইংরাজাধিকৃত আরাকান ব্রহ্মেরাজ করিয়া লইল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাহার চট্টগ্রামের নিকটবর্তী সাহাপুর নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপও অধিকার করিল। লর্ড আমহার্স্ট তখন গবর্নর জেনেরল। তিনি দেখিলেন, ব্রহ্মাধিকার বাঙ্গালার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, আর স্থির হইয়া থাকিলে বাঙ্গালার সীমান্ত প্রদেশে মগেরা অভ্যুত্থান করিবে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের সহিত যুদ্ধ করাই স্থির হইল, গবর্নর জেনেরল ঢাকা হইতে ব্রিগেডিয়ার মেকমরিনকে গোদালপাড়া বাইতে আদেশ দিলেন ও লেকটেন্যান্ট ডেভিডসনকে আসাম মধ্যে প্রবেশ করিবার অমুমতি দিলেন। মিঃ ফট সমস্ত বন্দোবস্তের ভার পাইলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মেকমরিন বিনা যুদ্ধে গোহাটি অধিকার করিলেন। ব্রহ্মেরা ইংরাজ আগমন ও নিয়মিত সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। তৎপরে ব্রিগেডিয়ার মেকমরিন, কাপ্তেন হর্সবারা, লেকটেন্যান্ট রিচার্ডসন, কর্ণেল রিচার্ডস প্রভৃতির সহিত কলিয়ার, নগণী, রহা, মরাংখ প্রভৃতি স্থানে কয়েকবার যুদ্ধে ব্রহ্মসেনা পরাস্ত হইল। যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ারের মৃত্যু হওয়ার কর্ণেল রিচার্ডস প্রধান সেনাপতি হন। শেষে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যে মাসে আসামপ্রদেশ বৃত্তাশীর্ণ হইল বলিয়া প্রচারিত হয়। তৎপরে ঘোড়াহাট, জয়ন্তী, কাছাড়, গৌরীসাগর প্রভৃতি স্থানে শান্তিরকার্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ব্রহ্মের অধীনস্থ শ্রামসুকন ও বগলীসুকন ৭০০ সেনার সহিত আত্মসমর্পণ করিলেন। যোগেশ্বর সিংহ বোণিখোপায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন। তৎসঙ্গীয়ে বৃত্তাশ গবর্ন-মেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া রহিল।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ২৪এ কেক্সারীতে মণ্ডাবু সহরে ইংরাজ ও ব্রহ্ম এক সন্ধি হয়। তদনুসারে আরাকান, মার্ভাবান, তেমা-সরীম ও আসাম ইংরাজেরা প্রাপ্ত হন। ফট সাহেব এই নবজিত রাজ্যের কমিশনার হইলেন, কিন্তু তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গবর্নর জেনেরলগণের এজেন্ট ও কমিশনার, কুচবিহার,

রঙ্গপুর, মণিপুর ও কাছাড়ের কমিশনার এবং ত্রিহট্টের-রাজ ছিলেন। সুতরাং একজন সোফের হস্তে একজন কার্যের সুবিধা না হওয়ার, সমগ্র পূর্বভারত নিয় ও প্রেষ্ঠ খণ্ডে বিভক্ত হইল। এই খণ্ডখণ্ডের উত্তরসীমা উরুগি নদী ও দক্ষিণ সীমা ধনশিরি নদী। সিমির বা প্রেষ্ঠ খণ্ডে মিঃ ফট ও জুমির বা নিয় খণ্ডে কর্ণেল রিচার্ডস কমিশনার হইলেন; কিন্তু ফট সাহেবই প্রধান কর্তৃক পাইলেন। গোহাটি আসামের রাজধানী হইল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে অতীবর মাসে কর্ণেল রিচার্ডসের পর কর্ণেল কুপার কমিশনার হন। প্রেষ্ঠ বিভাগে ফট সাহেব একা কার্য চালাইতে না পারিয়া কাপ্তেন এডাম হোরাইটকে সহকারীতে গ্রহণ করেন। ফট হইতে আসাম প্রদেশের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চিত্রাপুত্রীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর টি, সি, রবার্টসন প্রধান কমিশনার হন।

উত্তর খণ্ডে পুরন্দর সিংহ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তিনি বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা কর দিতে অঙ্গীকার করিলেন। বিশ্বনাথ নামক স্থানে একজন পলিটিকাল এজেন্ট রহিলেন। ১৮৩২/৩৩ খৃষ্টাব্দে নরজ, কামরূপ ও নগণী এই তিন জেলায় বিভক্ত হইয়া কামরূপ প্রদেশে একজন স্বতন্ত্র কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসহ একজন প্রধান সহকারী কমিশনার (Chief Assistant Commissioner) হইলেন। রবার্টসনের পর ১৮৩৪ অব্দে জেফ্রি সাহেব কমিশনার হন। ইদ্রিই জিলা ও মোজার সীমাভিভাগ ঠিক করেন। ১৮৩৫ অব্দে এই প্রদেশ বোর্ড অব রেভিনিউয়ের অধীন হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তী-রাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধি করিয়া অধীনতা স্বীকার করেন, কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজাকে মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি দিয়া জয়ন্তীপ্রদেশ কোম্পানির খাস দখলে আনা হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পুরন্দর সিংহ নিয়মিত কর দিতে না পারায় তাঁহাকে রাজচ্যুত করিয়া তৎপ্রদেশ শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর এই দুই জেলায় বিভক্ত করা হয়। চন্দ্রকান্ত সিংহ গোহাটিতে ৫০০ টাকার বৃত্তি পাইতেছিলেন; কিন্তু এই বৎসর তিনি পরলোক গমন করেন। পুরন্দর সিংহকেও বোড়হাটে রাখিয়া বৃত্তি দিবার কথা হয়; কিন্তু গর্ভিত পুরন্দর বৃত্তি গ্রহণ করিলেন না। এইখানে চুকাফার বংশের হস্ত হইতে আসামের ছত্র-দণ্ড অপসৃত হয় ও আসাম বা প্রাচীন কামরূপরাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজাধিকৃত হয়।

ইহার কিছুদিন পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে একজন কমিশনারের হস্তে শাসন ও বিচারভার থাকার কার্যের সুবন্দনা না হওয়ার একজন সহকারী নিযুক্ত হইলেন। এই সহকারী

নিযুক্ত হওয়ার একটি পদ জুডিশিয়াল কমিশনার ও অপরটি ডেপুটি কমিশনার নামে কথিত হইল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইন্কমট্যাক্স প্রচলিত হইলে ফুলগুড়ির লোকেরা কেপিয়া উঠে। আসিস্ট্যান্ট কমিশনার লেকটুনাট সিদ্ধার গোলমাল থামাইতে গিয়া নিহত হন। শেষে অনেক কৌশলে গোলমাল থামিলে দোষীরা উচিতমত শাস্তি পায়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কমিশনার জেফ্রি হপকিন্সন অবসর লইলে কাণ্ডেন হপকিন্সন সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গোহাটীতে জেফ্রি হপকিন্সন মৃত্যু হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে খাসি ও জয়ন্তী পর্বতে ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৬৪ অব্দে ভূটানযুদ্ধ বাধে। ইংরাজেরা জয়ী হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সিকোলা নামক স্থানে সন্ধি হইল। এই সন্ধি অনুসারে ভূটানের দক্ষিণে কয়েক স্থান ইংরাজের অধিকৃত হইল। গারো ও নাগাদিগের কয়েকজন সর্দার অধীনতা স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তার করিবার জন্য এই সকল প্রদেশ দুই জেলায় বিভক্ত হইল। ১৮৬৬ অব্দে গারো পর্বতে তুরা ও নাগা পর্বতে সামাণ্ডিং রাজধানী হইল। এই বৎসর কুচবিহার ও গোয়ালপাড়া আসামের কমিশনারের হস্ত হইতে স্বতন্ত্র হইল। ১৮৭১ অব্দে লেকটুনাট গবর্নর সার জর্জ ক্যাথল এদেশ পরিদর্শন করিতে আসিয়া এদেশীয় বিচারালয়ে ও বিদ্যালয়ে আসামীভাষা ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদান করিয়া যান।

১৮৭৪ অব্দে কর্ণেল হপকিন্সন অবসর লইলে, আসাম দেশ বাঙ্গালার লেকটুনাট গবর্নরের হস্ত হইতে পৃথক হইয়া একজন প্রধান কমিশনারের হস্তে অর্পিত হইল। কর্ণেল কিটিং প্রথম চিফ কমিশনার হন। চিফ কমিশনার হইলে শিলং নগর রাজধানী হইল এবং গোয়ালপাড়া ও গারোপর্বত আবার আসামের অন্তর্ভুক্ত হইল। তৎপরে কাছাড় ও ত্রিহট বঙ্গপ্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আসামের চিফ কমিশনারের অধীন হইল।

এই বৎসরে আসিস্ট্যান্ট কমিশনার লেকটুনাট হলকম্ব নাগাপর্বত জয়ীপ করিতে আরম্ভ করেন। নীলগাঁয়ে উপস্থিত হইলে কয়েকজন নাগা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁহার শিবিরে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বধ করে। হলকম্ব প্রভৃতি ১১ জন লোকের মধ্যে সেইদিন ৮ জন লোক মারা পড়ে। ৫ জন আহত হয়। কিরদিবস পরে সেই নাগারা উপযুক্ত শাস্তি পায়। কর্ণেল কিটিং এর পর সার ষ্টুয়ার্ট বেলী (বাঙ্গালার ভূতপূর্ব ছোটলাট) এবং তাঁহার পর মিঃ এলিয়ট (১৮৯২ রাজ্যলার বর্তমান ছোট লাট) আসামের চিফ কমিশনার হন।

সার এলিয়টের পরে ওয়ার্ড, কিজপাট্রিক, ওয়েটল্যাণ্ড এবং তৎপরে কুইটন্ সাহেব আসামের চিফ কমিশনার হন, তিনি মণিপুরে নিহত হইলে ওয়ার্ড সাহেব চিফ কমিশনার হইলেন।

ইংরাজরাজত্ব আসামের কয়েকটি ঘটনা—

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে এদেশে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ অব্দে কুচবিহারের কমিশনার রবার্টসন বিচারসংক্রান্ত কতকগুলি দেশীয় ব্যবহারসিদ্ধ নিয়ম বাধিয়া দেন। এই নিয়মাদি “আসাম কায়দাবন্দী” নামে খ্যাত। ১৮৩৮ অব্দে এদেশে একদল খৃষ্টান মিশনারি প্রবেশ করেন। ইহারা প্রথমে জয়পুর পরে শিবসাগরে গির্জা করেন। ১৮৪৬ অব্দে তাহারাই আসামীভাষায় “অরুণোদয়” নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪৩ অব্দে দাসত্বপ্রথা রহিত করিবার আইন প্রচলিত হয়। ঐ বৎসরেই প্রসিদ্ধ আসাম ‘চা’ কোম্পানি গঠিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথমে অহিকেশের চাষ হয়, শেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গবর্নমেন্ট হইতে সাধারণের পক্ষে উহার চাষ উঠাইয়া দেওয়া হয়।

কামরূপের লোকসম্প্রদায়।—এখানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সতলোং ব্রাহ্মণেরা সর্বশ্রেষ্ঠ। এদেশে বঙ্গালী কোলীজ-প্রথা নাই। মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। দৈব-জ্ঞেরা এদেশে বিশেষ সম্মানের পাত্র।

এখানে ব্রাহ্মণকায়স্থেরা নিজ হস্তে হলাকর্ষণ করে না। কার্য়স্থগণের মধ্যে ভূঁয়্যর ছয় ঘর বিশেষ বিখ্যাত।

কলিতা—কৃষিপ্রধান জাতি। ইহারা জাত্যাংশে শ্রেষ্ঠ, তবে কেবল হলবাহনদোষে পতিত।

কেওট—ইহারা আদিম জাতি। ইহারাও কৃষক। কেওটেরা কৈবর্তের (মৎস্তজীবী) অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন কোচ, মেছ, লালুং, নট, নাপিত, পটয়া, কুমার, গুঁড়ী, ধোপা, শালৈ (গুঁড়ীবিশেষ), ডোম প্রভৃতি কয়েকটি জাতি আছে।

ধর্মপ্রভাব।—প্রথমে হিন্দুধর্ম পরে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। শঙ্করাচার্য যখন সমগ্র ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব নষ্ট করেন, তখন কামরূপেও তাঁহার সংহারের প্রভাব বিদ্যুত হয়। দেবেশ্বর নামক শূদ্ররাজই ইহার মূল। বৌদ্ধধর্ম অল্প প্রদেশে যত শীঘ্র দূর হইয়াছিল, এখানে তত শীঘ্র হয় নাই; খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতেও এখানে তাহার প্রাবল্য ছিল। অদ্যাপি হাজোর হরগ্রীবের মূর্তি বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। যোগিনীতন্ত্রেও এখানকার বুদ্ধমূর্তির কথা লিখিত আছে। তৎপরে শঙ্করদেব ও মাধবদেব নামে দুই ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন।

বারভূঁয়াগণের মধ্যে চণ্ডীবর শিরোমণির বংশে কুম্ভবর শিরোমণি ভূঁয়ার এক পুত্র জন্মে। ইহার নাম শঙ্কর ভূঁয়াশিরোমণি বা শ্রীশঙ্করদেব। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নানা তীর্থাদি দর্শন করিয়া কন্দলী নামক এক ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সংস্কৃত শিখিয়া ভাগবত হইতে “কীর্ত্তন দশম” নামক পুস্তক অমূল্যবাদ ও সঙ্কলন করেন। (কাহারও মতে ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যের শিষ্য স্বীকার করেন।) শঙ্কর বৈষ্ণব হইয়া স্বদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইনি দেশীয় ভাষায় বৈষ্ণবধর্মের নানাবিধ গ্রন্থ ও সঙ্গীত রচনা করিয়া ধর্মপ্রচারের সুবিধা ও ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেন। ইহা হইতেই কামরূপে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অভিনয়াদি (যাত্রাদি) প্রচলিত হয়। বাধুকা নামক স্থানের দীর্ঘলগিরির পুত্র মাধব শঙ্করের শিষ্য হইয়া গুরুকে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

আহমেরা ইহারই উপদেশে বৈষ্ণব হয়; কিন্তু তৎপূর্বে তাহারা বৈষ্ণবধর্মের প্রচারে বিরক্ত হইয়া শঙ্করদেবের জামাতা হরিকে অতি সামান্য অপরাধে বধ করে এবং মাধবদেবকে বন্দী করে। শঙ্কর এই সূত্রে আহম অধিকার পরিত্যাগ করিয়া পাটবাউসী নামক স্থানে বাস করেন ও মাধব কোন উপায়ে মুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। শাক্ত ও অনাচারী ব্রাহ্মণেরা কয়েকবার রাজা নরনারায়ণের কাছে ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। দিন দিন দলে দলে লোক বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিল। তৎপরে রাজার আস্থা হওয়ায় কুচবিহারেও এই ধর্ম প্রচারিত হয়। ১৪৯০ শকে শঙ্করদেব স্বর্গলাভ করেন। ইনি কামরূপ অঞ্চলে আজিও চৈতন্যদেবের শ্রায় অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

শঙ্করের পর মাধবদেব তাঁহার ধর্মকে জাগাইয়া রাখেন। মাধবদেব “মহাপুরুষ গুরু” নামে বিখ্যাত। ইহার মতে পূজাদির আবশ্যক নাই, একমাত্র হরিনামকীর্ত্তনেই সকল কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। এই জন্ত সর্বত্র সঙ্গীর্জন করিবার জন্ত সত্র বা ধর্মালয় আছে। এই সকল সত্রে অধিকারী ও মহন্তেরা বাস করেন। এই সকল সত্বে মাধবদেব প্রতিষ্ঠিত বড়পেটার সত্রেই প্রধান। মহন্তেরা বাল্যলার গুরু ব্যবসায়ী গোস্বামীগণের শ্রায় শিষ্যগণের প্রদত্ত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করেন। শিষ্যেরা এইরূপে অর্থ না দিলে সমাজচ্যুত হয়। মাধবের পর কয়েক জন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইয়া ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহারা মাধবের ধর্ম হইতে কিছু ভিন্নভাবে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন বলিয়া তাঁহাদের মতকে “বামুনীয়া”

ও মাধবের মতকে “মহাপুরুষীয়া” ধর্ম বলে। মহাপুরুষীয়ার মধ্যেও “ঠাকুরীয়া” নামে একশাখা আছে। মাধবাধি শঙ্কর শিষ্যগণ অনেকানেক গ্রন্থ ও সঙ্গীতাদি রচনা করেন। বৈষ্ণবেরা পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি ততটা আস্থামান নয়। বৈষ্ণব ব্যতীত এখানে তান্ত্রিকমতও প্রচলিত আছে। অরীতিয়া বা পূর্ণসেবা নামে আজকাল একটি মত গোপনে এদেশে চলিতেছে। এই সম্প্রদায়ীরা জাতিভেদ মানে না। ইহারা সকল জাতীর লোক একত্র মদ্যমাংসাদি পানাহার করে। এই সম্প্রদায়ের উপাসনার ভক্তিমাতা নামে একটা জীৱ প্রয়োজন হয়। এই জীৱই সকলের পূজ্য। পূর্ণসেবা-চারীরা বলে, তাহাদের এই ধর্ম শঙ্করদেবের প্রচারিত ধর্মের পূর্ণমত। ইহা তান্ত্রিক বামাচারী ও বৈষ্ণব মতের মিশ্রণে উৎপন্ন।

এখানকার মুসলমানেরা ছদ্ম মতাবলম্বী। গ্রাম্য মুসলমানেরা বিবহরি প্রভৃতি হিন্দুদেবতার পূজা করে। হাজো নামক স্থানে “পোয়া মন্ডা” নামে একটি মুসলমানদিগের তীর্থ স্থান আছে। বৌদ্ধাচারী লোক আর এখন নাই।

আজকাল নানাদর্শের লোকই আসামে আছে।

সামাজিক প্রথা।—ব্রাহ্মণাদিবর্গের মধ্যে কস্তার কুমারী-কালে বরকে আহ্বান করিয়া বিবাহ দিবার নিয়ম আছে। অল্প জাতির মধ্যে নাই। শূদ্রাদি জাতিতে রক্তস্বেলা হইবার পর কস্তার বিবাহ হয়। ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই, অল্প জাতিতে আছে। গুরুব্রতবিবাহের শ্রায় একপ্রকার বিবাহ এখানে শূদ্রাদির মধ্যে প্রচলিত আছে। কোন প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা তাহার পিতামাতার বা অভিভাবকের সম্মতি লইয়া স্বীয় সমাজের কোন লোকের সহিত আহারাদি ও সহবাস করিতে পারে। এই গর্তের সন্তানাদি বিবাহিতার গর্ভজাত সন্তানের শ্রায় পিতামাতার ধনাধিকারী ও সমাজে গণ্য হয়। কোন কোন স্থলে একরূপ দম্পতীকে সধবারা ধাতুর্জী দিয়া আশীর্বাদ করে—ইহাকে “অগ চাউল দিয়া” বলে। এক প্রকার স্বয়ম্বরপ্রথাও এইদেশে প্রচলিত আছে। কোন পুরুষ বা জী ইচ্ছাছলানে কোন জী বা পুরুষের গৃহে স্বামীজীৱপে বাস করে। এই সকল ব্যবহারে ইহাদের সমাজে কোন দোষ হয় না। হিন্দুধর্ম মতে যাহাদের বিবাহ হয়, তাহাদের মধ্যে স্বামীত্যাগ করিয়া পত্যস্তরগ্রহণ করিবার প্রথা নাই; কিন্তু পূর্বোক্ত অল্প সকল প্রথাছলানে তাহা আছে। ইহাদের মতে শরীরগুচি করিবার জন্যই বিবাহ আবশ্যক, এজন্য বিবাহসম্বন্ধে ইহাদের তাদৃশ দৃঢ় নিয়ম নাই। কোন

কোন স্থলে বিবাহার অহি তদ্বির জন্য কোন পুস্তক, মিলা-খণ্ড বা কদলীকুলের সহিত বিবাহ হয়। কোথায় অপর এক পুস্তকের সহিত এইরূপ অহিতদ্বির বিবাহ হয়, সেবে তাহাকে কিছু দক্ষিণাদি দিয়া বিদায় করিয়া বেওয়া হয় এবং জী পুরুষান্তর গ্রহণ করে, ইহাকে 'এড়া বিয়া' বলে।

ইহাদের মধ্যে আগন্তুককে আসন দান করিবার নিয়ম নাই। সকলেই ভ্রমণ করিবার সময়ে নিজ নিজ আসন, তারার রতনপাও ও ঘটা সঙ্গে লইয়া যায়।

ইহারা ধর্ম্মাভ্যাসে পণ্ডপণ্ডী ও মন্ত্র আহার করে। অপরের এমন কি জাতির অরণ্য গ্রহণ করে না। কোন কোন স্থলে গ্রামে এক একটা জীলোক থাকে, তাহার হস্তের রতন সকলেই ধার। উৎসবাদিতে তাহাকেই রীতিতে হয়। অন্য স্থলে বোকা চাউল ও কোমল চাউল নামে দুই প্রকার চাউল জলে ভিজাইয়া দধি, গুড়, কদলী প্রভৃতি মাখিয়া সাধারণতঃ ইহারা নিমজ্ঞগাদিতে আহার করে। ইহারা বড় পাণ ধার।

চৈত্র, আশ্বিন ও পৌষের সংক্রান্তি ইহাদের মধ্যে প্রধান উৎসবের দিন। এই তিন পর্কের নাম বিহ। এই পর্কে ইহারা পিতাকে প্রণাম ও আত্মীয় কুটুম্বাদির সহিত সাক্ষাৎ করে ও মহাড়ম্বরে পানভোজনাদি হয়। চৈত্রের বিহতে সাতদিন কোন প্রকাশ্য স্থলে জীপুরুষে মিলিয়া নৃত্যগীত করে। এই নৃত্যগীতে অশ্রাব্য অবাচ্য অশ্লীল গীত ও অজ্ঞতঙ্গী প্রদর্শিত হয়। চুর্গোৎসব, হোলী, অম্বা-ইন্দী ও শঙ্করমাধবের মৃত্যু হি ভিষি সাধারণ পর্ক বলিয়া গণ্য।

বেহলা ও নবীন্দর।—কামরূপ জেলার দক্ষিণপ্রান্তে কোন স্থানে একটি প্রস্তরনির্মিত গৃহ আছে। প্রবাদ আছে, এই গৃহ চাঁদ সপ্তদাগরের নির্মিত নবীন্দরের "লোহার বাসরঘর"। বেহলার কোশলে ও নেতা ধোপানীর কুপার কিল্পে নবীন্দর পুনর্জীবিত হয়, সে গল্প অনেকেই জানে। খুবড়ীর নিকট "নেতাধোপানীর ঘাট" নামে একটি ঘাট আজিও আছে। আজকাল তাহার ভগ্নাবস্থা। চাঁদ সপ্তদাগর একজন বিখ্যাত বণিক ছিলেন।

তেজপুরের নিকট আরও কয়েকটা প্রস্তরগৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রবাদ—এইগুলি বাগরাজের কন্যা উষার প্রাসাদ। নওগাঁর চাঁপানলা পর্বতে কতকগুলি প্রস্তরপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে—প্রবাদ যে এগুলি মহাভারতোক্ত হংসধ্বজের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। ডিমাপুরে একরূপ ভগ্নাবশেষগুলি মহাভারতোক্ত হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া খ্যাত। গোয়ালপাড়ার হাবড়াঘাট পরগণার

"শ্রীহৃদ্যপাহাড়" নামে এক পর্বত আছে, এখানে একটি গোলাকার কুহং প্রস্তরখণ্ডের উপর যতির দাগের মত কতকগুলি রেখা আছে। কেহ কেহ অজ্ঞান করেন যে এককালে এখানে একটি স্থানমন্দির ছিল।

এক সময়ে এই কাঙুর বা কামরূপদেশ ইন্দ্রজালবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার অনেক জীলোকেই ইন্দ্রজাল শিখা করিত। কিন্তু এখন ইংরাজী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কামরূপের সেই প্রাচীন বিদ্যা বিলুপ্ত।

[প্রাচীন কামরূপ বা বর্তমান আসামরাজ্যের অন্যান্য জাতব্য বিবরণ সম্বন্ধে Hunter's Statistical Account of Assam, 2 Vols ; Dalton's Ethnology of Bengal ; M'cosh's Topography of Assam ; Robinson's Assam ; M. Martin's Eastern India, Vol. III ; Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLI., XLII, প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য।]

কামরূপধর (ত্রি) কামং যথেষ্টং রূপং ধরতি ধারয়তি বা, কাম-রূপ-ধ-অচ্। ইচ্ছাভাসারে বিবিধরূপধারক।

কামরূপপতি (পুং) 'শায়দাতিলক' নামক তন্ত্রের টীকাকার। কামরূপপিণী (স্ত্রী) কামং মনোজ্ঞং রূপং অন্ত্যতাঃ, কাম-রূপ-ইনি-স্ত্রীপ্। ১ অম্বগন্ধা গাছ। ২ সুল্লরী জী। ৩ কামং যথেষ্টং রূপং ধার্যম্ভেন অন্ত্যতাঃ। যে জী ইচ্ছামত বিবিধ-রূপ ধারণ করিতে পারে।

কামরূপী [ন] (পুং) কামং কমলীং রূপং অন্ত্যতি, কাম-রূপ-ইনি। ১ বিদ্যাদর। ২ জাহক জন্ত। ৩ (ত্রি) কামং যথেষ্টং রূপং ধার্যম্ভেন অন্ত্যত। ইচ্ছাভাসারে বিবিধরূপধারী। ("সর্বমাণ্ড বিচেতব্যং হরিত্তিঃ কামরূপিত্তিঃ।" রামায়ণ।)

কামরেখা (স্ত্রী) কামানাং কামব্যাপারাগাং রেখা চিহ্নং লক্ষণং বা যত্র, বহুব্রী। বস্ত্রা।

কামল (পুং) কম-পিচ্-কলচ্। ১ রোগবিশেষ, কামলা। ২ বসন্তকাল। ৩ মরুভূমি। ৪ (ত্রি) কামুক।

(কামলো রোগভেদে বা নানামরুবসন্তরোঃ।

কামুকে বাচালিলা ২৫। মেদিনী।)

কামলকীরক (ত্রি) কমলকীরকত ইদম্, কমল-কীরক-অণ্ (প্রহোত্তরপদপল্যাদিকোপধাণ্। পা ৪। ২। ১১০।) কমলকীরক নামক কীটসম্বন্ধীয়।

কামলতা (স্ত্রী) কামত লতা ইব, উপমি। ১ উপম্, শিন্ন। ২ লতাবিশেষ (Ipomoea Quamolit).

কামলা (স্ত্রী) কামল-স্ত্রীপ্। রোগবিশেষ (A form of Jaundice). পাণ্ডুরোগ অতিক্রান্ত হইলে অথবা পাণ্ডুরোগ সত্ত্বে পিত্তকর বস্ত্র আহারাদি করিলে, বিকৃত পিত্ত সেই রোগীর

রক্ত মাংস হৃদিত করিয়া কামলারোগ উৎপাদন করে। প্রথম হইতেও কামলারোগ হইয়া থাকে। এই রোগে চক্ষু, স্বক, নখ ও মুখদেশ হরিদ্রাবর্ণ; মলমূত্র রক্ত বা পীতবর্ণ; সর্গসরীর সোণাবর্ণের মত বর্ণবিশিষ্ট; ইন্দ্রিয় সকল শক্তিহীন এবং দাহ, অজীর্ণ, দুর্বলতা, অবসন্নতা ও অরুচি হইয়া থাকে। এইরোগ বিবিধ, কোষ্ঠাশ্রয়ী ও শাখাশ্রয়ী। আমাশয়াদি আত্যন্তরিক কোষ্ঠ-সমূহে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কোষ্ঠকামলা বা কুস্ত-কামলা কহে এবং হস্তপাদমিহানে কামলা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে শাখাহিত কামলা বলে। কুস্তকামলা অধিকদিন অবস্থিত হইলেই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। এই কুস্তকামলা রোগ থাকিতে বমন, অরুচি, উৎক্লেষ, জ্বর, ক্লান্তি, শ্বাস, কাস ও মলভেদ উপস্থিত হইলে, সে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। উভয়বিধ কামলাতেই যদি মলমূত্র রক্ত ও পীতবর্ণ, অথবা মল, মূত্র ও বমন রক্তযুক্ত, শরীর শোথবিশিষ্ট, অব-সন্ন এবং দাহ, অরুচি, পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা, মোহ ও বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে রোগীও অল্পদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহার চিকিৎসা এইরূপ—ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা বা নিমের কাথ মধুর সহিত পান করিবে।

দ্রোণফুলগাছের পাতার রস চক্ষে অঞ্জন দিবে।

গুলঞ্চের পাতা বাটিয়া তক্তের সহিত ভক্ষণ করিবে।

আমলকী, লৌহচূর্ণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রাচূর্ণ যুত, মধু এবং চিনির সহিত লেহন করিবে।

কুস্তকামলাতেও এই সকল ঔষধ উপযোগী, বিশেষতঃ এইরোগে এই সকল ঔষধ উপকারী।—গোমূত্রের সহিত শিলাজতু সেবন করিবে।

বহেড়াকাষ্ঠ দ্বারা মধুর দধি করিয়া, তাহা গোমূত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে; এইরূপ আটবার পোড়াইয়া ও গোমূত্রে নিক্ষেপ করিয়া, ইহার চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে। (ভাবপ্রকাশ।)

গরুড়পুরাণোক্ত এই রোগের ঔষধ।—মরিচ ও তিলফুল একত্র পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কামলা নিবারিত হয়। হৃৎকের সহিত অপাংগমূল ও গোক্ষুরমূল পান করিলে কামলাদি রোগ নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা মুখরোগও নিবারিত হইয়া থাকে।

কামলায়ন (পুং) কমলজ অপত্যঃ পুমান্, কমল-অঙ্কক। কমলপত্র উপকোসল নামক মুনিবিশেষ। (হাস্যোপা-
টপ। ৪। ১০। ৭)

কামলাক্ষী (স্ত্রী) কামঃ বধেঃ স্যতি আকর্ষতি, কাম-লা-
ক, কামলে অক্ষিণী বভাঃ, কামলাক্ষি-বহ-স্ত্রী। আকর্ষণ-
কারক দেবীমূর্তিবিশেষ।

(“অনামারক্তমিশ্রেণ কামলাক্ষীমহুং অপেং।” তত্ত্বসা।)

কামলিকা (স্ত্রী) কামুদান।

কামলী [ন্] (ত্রি) কামলো রোগবিশেষো হস্ত্যাক্তি, কামল-
গিনি। কামলারোগপীড়িত। (পুং) কমলেন বৈশম্পায়নস্ত
অন্তেষানিবিশেষেণ প্রোক্তঃ অধীরতে, কমল-গিনি (কলাপি-
বৈশম্পায়নান্তেবাসিত্যশ্চ। পা ৪। ৩। ১০৪।) বৈশম্পায়ন-
শিষ্যপ্রণীতশাস্ত্রাধ্যায়ী।

কামলেখা (স্ত্রী) কামানাং কামব্যাপারাদাং লেখা চিহ্নঃ
লক্ষণং যজ, বহস্ত্রী। বস্ত্রা।

কামলোল (ত্রি) কামেন কল্পপক্ষিঃ। বোলঃ চকলঃ,
৩তং। কামলীড়ার আকুল।

কামবতী (স্ত্রী) কামঃ কমলীয়তা অন্ত্যাত্মা, কাম-মতৃপ-মত বঃ
স্ত্রীপ্। ১ দারুহরিদ্রা। ২ (কামঃ কল্পভাবঃ অন্ত্যাত্মাঃ)
মৈথুনের অভিলাষযুক্তা।

(“ভাগঃ কামবতীনাং হি স্ত্রীণাং সত্ত্বিবিগহিতঃ।”

ভারত আদি ২৭। ৫।)

কামবর (ত্রি) কামাদপি সৌন্দর্যেণ বরঃ প্রেষ্ঠঃ। অতি-
সুন্দর, অতিরূপবান।

কামবল্লভ (পুং) কামঃ কমলীয়তা, অস্ত্যএব বল্লভঃ প্রিয়ঃ,
কর্মণা। যদা কামস্ত কল্পর্ত বরভঃ, ৬তং। ১ আম। আমের
মূল কল্পের বিশেষ প্রিয়বস্ত, ২ বল্লভ কল্পপুঙ্খার সময়
আত্মমূল্যের নিত্য প্রয়োজন। ২ বল্লভ।

কামবল্লভা (স্ত্রী) কামস্ত কল্পর্ত বরভা প্রিয়া। ১ রতি।
২ জ্যোৎস্না।

কামবশ (ত্রি) কামস্ত বশঃ বসীভূতঃ, ৬তং। কামরপূর
বসীভূত।

কামবশ্য (ত্রি) কামস্ত বশ্তঃ বশতামাপন্নঃ, কাম-বশ-বাক্।
কল্পপীড়ার বসীভূত।

কামবাণ (পুং) কামস্ত কল্পর্ত বাণঃ শরঃ, ৬তং। কল্পের
বাণ, ইহা ফুলময়, এবং সংখ্যার পাঁচটি।

“অরবিন্দমশোকক শিরীষং হৃতমুংপলম্।

পট্টকতানি প্রকীর্ত্তে পঞ্চবাণস্ত সারকাঃ॥”

পদ্ম, অশোক, শিরীষ, আত্ম ও উৎপল, এই পাঁচটি
ফুল কল্পের পঞ্চবাণ।

কল্পবানের পাঁচপ্রকার কর্ম্মদ্বারা অস্ত পাঁচটি নাম
আছে,—

“সমোহনোন্মাদনো ঠ শোষণভাপনভবা।

ভক্তনচেতি কামত লকবাণাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥”

সমোহন, উন্মাদন, শোষণ, ভাপন ও ভক্তন এই

পাঁচটি কামবাণের নাম।

কামবান্ [৭] (পুং) কামঃ অজ্ঞপ্তি, কাম-মতুস-মত বঃ।

১ অভিলাষবৃত্তঃ। ২ মৈথুনেচ্ছাবৃত্তঃ।

কামবাদ (পুং) কামঃ বধেচ্ছং যানঃ। যথেষ্টপ্রবাদ;

লোকসমূহ আপন আপন ইচ্ছানুসারে অকারণ বে সকল কথা উত্থাপন করে।

কামবানী [ন্] (ত্রি) কামঃ বধেচ্ছং বসতি, কাম-বস-ণিনি।

১ ইচ্ছামত নানাভাবে যে অস্থির ভাবে বাস করে।

কামবিক্ত (ত্রি) কামবাণেন বিক্কঃ, ওতং। কন্দর্পবাণবিক্ত,

মৈথুনেচ্ছার আকুল।

কামবিহস্তা [ত্] (পুং) কামত কন্দর্পত বিশেষণ হস্তা

নাশয়িতা, কাম-বি-হস্ত-তৃচ্। ১ মহাদেব। ২ (ত্রি) কামরিপু-
জরকারী।

কামবীৰ্য্য (ত্রি) কামঃ পর্য্যাপ্তং বীৰ্য্যং বত, বহত্ৰী। ১

অপরিমিতবীৰ্য্যশালী। ২ (স্ত্রী) কামত বীৰ্য্যম্ ওতং।
কন্দর্পের শক্তি।

কামবৃক্ষ (পুং) কামঃ বধেচ্ছং (বীজাদানপেক্ষেন) জাতো

বৃক্ষঃ, মধ্যলোৎ। বন্যাক, পরগাছা।

কামবৃত্ত (ত্রি) কামঃ বধেচ্ছং মিরমুখং বৃত্তমত, বহত্ৰী।

বধেচ্ছাচারী।

(“ইন্দ্রিয়ৈঃ কামবৃত্তৈঃ স্ক্রিত্তসে প্রাকৃতো যথা।”

হায়র ৪। ১১। ২৭।)

কামবৃত্তি (স্ত্রী) কামেন বেচ্ছার বৃত্তিঃ, ওতং। ১ বেচ্ছা-

চার। ২ (ওতং) কামরিপুর কার্য। ৩ (ত্রি) কামতো-
বৃত্তিরত বহত্ৰী। বধেচ্ছাচারবৃত্ত।

কামবুদ্ধি (পুং) কামত বুদ্ধিৰ্ব্যমাং, বহত্ৰী। ১ ওদ্রবিশেষ।

কর্ণাটদেশে ইহাকে কামজ কহে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সরবুদ্ধিসংজ্ঞ, মনোজবুদ্ধি,
মদনায়ুঃ, কন্দর্পজীব, জিতেজিরাঙ্ক, কামৈকজীব ও জীব-

সংজ্ঞ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার বীজের গুণ—মধুরসঃ,
বল, ক্রুটি, কামশক্তি ও ইন্দ্রিয়ের বলবৃদ্ধিকারক।

২ (ওতং) কামরিপুর বুদ্ধি।

কামবৃত্তা (স্ত্রী) কামঃ কমনীয়ং বৃত্তং বত্যাঃ, বহত্ৰী।

পাকুল গাছ।

কামশক্তি (স্ত্রী) কামত শক্তির্মিরিকাতেনঃ, ওতং। কাম-

দেবের পরীবেশ। রাঘবতই এই কামশক্তির পঞ্চাশ

প্রকার বিভাগ করিয়াছেন। যথা—১ রতি, ২ ক্রীতি,

৩ কামিনী, ৪ মেগিনী, ৫ কমলপ্রিয়া, ৬ বিদ্যামিনী, ৭ কম-

লজা, ৮ ভ্রামলা, ৯ গুচিমিতা, ১০ বিমিতাকী, ১১ বিশা-

লাকী, ১২ দেগিহানা, ১৩ দিগম্বরা, ১৪ বারা, ১৫ কুজা,

১৬ ধরা, ১৭ নিত্যা, ১৮ কল্যাণী, ১৯ মেগিনী, ২০ ললোচনা,

২১ জলাবধা, ২২ বিমর্দিনী, ২৩ কমলপ্রিয়া, ২৪ একাকী,

২৫ জয়ধী, ২৬ মলিনী, ২৭ জটিল, ২৮ পাণিনী, ২৯ শিবা,

৩০ বৃদ্ধা, ৩১ রসা, ৩২ ভ্রমা, ৩৩ চাকলোলা, ৩৪ চকলা,

৩৫ দীর্ঘজিহ্বা, ৩৬ রতিপ্রিয়া, ৩৭ লোলাকী, ৩৮ কুঙ্গিনী,

৩৯ পাটলা, ৪০ মাদিনী, ৪১ মালা, ৪২ হংসিনী, ৪৩ বিকতো-

মুখী, ৪৪ মলিনী, ৪৫ রত্নিনী, ৪৬ কান্তি, ৪৭ কলকটী,

৪৮ কুকেদরা, ৪৯ মেঘভাঙ্গা, ৫০ রুবোম্বাভা।

ধ্যানমত্রে কামশক্তি এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

“শক্তয়ঃ কুহুমনিভাঃ সর্গাতরগভূতিভাঃ।

নীলোৎপলকরা ধোয়া ত্রিলোক্যাকর্ষণকমাঃ ॥”

কুহুমের জ্যায় বর্ণশালিনী, সর্গাদে অলঙ্কারযুক্তা, হস্তে

নীলোৎপলধারিণী এবং ত্রিলোক্যাকর্ষণে শক্তিসম্পন্ন।

কামশর (পুং) ১ কন্দর্পবাণ। কামত কন্দর্পত শর ইব,

কামোদীপকস্থাৎ। ২ আম।

কামশাস্ত্র (স্ত্রী) কামত স্বর্গাদেঃ প্রতিপাদকং শাস্ত্রং,

মধ্যলোৎ। ১ অতীষ্ট সম্পাদক শাস্ত্র।

(“অর্থশাস্ত্রমিহং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।

কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ক্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥”

মহাভারত আদি ১। ৪।

২ রতিশাস্ত্র। [রতিশাস্ত্র দেখ।]

কামসখ (পুং) কামত যথা, কাম-সখি-ট্ (রাজাহঃসখি-

ভাট্টে। পা ৫। ৪। ১১।) ১ বসন্তকাল। ২ আমগাছ।

কামমৃত (পুং) কামত মৃতঃ পুত্রঃ, ওতং। কন্দর্পপুত্র,

অনিরুদ্ধ।

কামসু (ত্রি) কামঃ অতীষ্টঃ হতে, কাম-সু-ক্টিপ্। ১

অতীষ্ট-প্রদ। ২ (পুং) ক্রীড়ক। ৩ (স্ত্রী) কামঃ প্রোহরঃ

হতে। কল্পিণী।

কামসূত্র (স্ত্রী) কামত তথ্যাপারত প্রতাপাদকং হৃদয়ম্,

মধ্যলোৎ। বাৎসর্য্যনপ্রণীত কামব্যাপার-বোধক শাস্ত্রবিশেষ।

কামসেন (পুং) কামবতীর রাজকিষকঃ। [কামকল্যা দেখ।]

কামস্ততি (স্ত্রী) কামত স্ততিঃ, ওতং। প্রতিপ্রাশস্তির

ভক্ত কামদেবের ভক্তিরূপ স্ততিবিশেষ; এই মন্ত্র প্রতিপূহী-

তাকে পাঠ করিতে হইবে যখন যখন—“কামোহং ১ কামা

অদাং ১ কামোহদাং কামারাদাং কামোহঃ দ্ব্যস্ত্র কামঃ প্রতী-

স্বীজ কামৈততে।" (ভদ্রকল্প: ৭।৩৮।) বৃতিশাস্ত্রেও
এতিগ্রহমোশান্তির জন্ত এই মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা আছে।

"এতিগ্রহজদোষত শান্তো কামজন্তি পঠেৎ।" (বৃতি।)
কামহা [ন] (পুং) কামং কন্যায় হতবান্, কাম-হন-কিপ্।
১ মহাদেব। ২ বিষ্ণু।

(“কামহা কামকং কামী।” বিষ্ণু সহস্র নাম।)

কামহেতুক (মি) কাম: হেতুর্ভূত, কামহেতু-কন্। ১ কাম-
রিপুজন্ত। ২ অভিলাষজন্ত।

কামহোগলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Typha augustifolia)
কামাই (পারস্য) ১ নিরমিতকার্যে বাদ দেওয়া। ২
অস্থপস্থিতি।

কামাক (পুং) কুমারিকাত্ত চন্দ্রকনুনিফুলজাত শৃঙ্গার-
রাজপুত্র, তৎপুত্র পারিজাত। (সহাস্রিখণ্ড ১।৩১।৪৫)

কামাক্ষী (স্ত্রী) কামং রমণীয়ং অক্ষি যন্তাঃ, কাম-অক্ষি-যচ্-
স্ত্রী। ১ দেবীমূর্তিবিশেষ। ২ তত্ত্বোক্ত বীজবিশেষ।

কামাখ্যা (স্ত্রী) কামরতে ভক্তানাং কামং পুররতীতি কামা,
আখ্যা যন্তাঃ। ১ দেবীবিশেষ।

কালিকাপুরাণে ইহার এই নামসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত
আছে,—“ভগবানুবাচ—

কামার্মমাগতা যন্মাম্মা সার্ব্জং মহাগিরৌ।

কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা ॥

কামদা কামিনী কামা কান্তা কামান্দদারিনী।

কামান্দদারিনী যন্মাং কামাখ্যা তেন চোচ্যতে ॥”

ভগবান্ বলিতেছেন, এই মহাদেবী অভিলাষপুরণের
জন্ত আমার সহিত নীলকূটে আগমন করায়, ‘কামাখ্যা’ নাম
প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা,
কামান্দদারিনী ও কামান্দদারিনী হওয়ার, ‘কামাখ্যা’ নামে
বিখ্যাত হইয়াছেন।

২ পীঠস্থানবিশেষ, কামাখ্যাদেবীই এই স্থানের অধিষ্ঠাতৃ-
দেবতা। কালিকাপুরাণে এই পীঠস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত
আছে—“দক্ষবজ্রে সতী প্রাণত্যাগ করার পর মহাদেব
ঐহার সেই বৃত্তসেহ বন্ধে লইয়া বহুদিন পর্যন্ত ইতস্ততঃ
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই সেহ হইতে স্থানে
স্থানে অক্ষরবিশেষ পণ্ডিত হওয়ার, সেই সকল স্থানে এক
একটি পবিত্র পীঠ হইতে লাগিল। পরিশেষে কুজিকা নামক
পীঠস্থানঃ দেবীর বোনিমগুল পতিত হইল; এই সময়ে মহা-
মারা বোপনিজাও মহাদেবে লীন হইয়া বাওয়ার, তিনি অতি
উচ্চ পর্বত রূপ ধারণ করিয়া পাভলঃ প্রবেশ করিলেন।
তাহা দেখিয়া ব্রহ্ম পর্বতরূপে ঐহাকে ধারণ করিলেন এবং

বিষ্ণুও পর্বতরূপে পৃথিবী আক্রমণ করিয়া ঐহার নিকট
উপস্থিত হইলেন। এই পর্বতজর যত্নশত বোনিম উন্নত,
কিন্তু দেবীর আক্রমণে ঐহারা অধোগত হইয়া ক্রোশপরি-
মিত উচ্চ রহিলেন। ইহারিগের মধ্যে পূর্বদিকের পর্বত
ব্রহ্মশৈল, ঐহার নাম ‘শেত’; সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ
পশ্চিমদিকের পর্বত বাতাহনামক-বিষ্ণুশৈল এবং উত্তরের মধ্য-
দেশস্থিত ত্রিকোণ উদ্বলাকৃতি শৈলের নাম নীল, ইনিই
মহাদেবের রূপান্তর। ইহা ব্যতীত ঐশানদিকের দীপ্তিশালী
পর্বতরূপী কুর্কের নাম ‘মণিকর্ণ’। বায়ুকোণস্থিত পর্বতের
নাম ‘মণিপর্বত’, এই পর্বত ত্রীকূলের অতি প্রিয়স্থান
নৈল’তকোণস্থ পর্বতের নাম ‘গড়মানন’; ইহা মহাদেবের
প্রিয়স্থান। ব্রহ্মশক্তিধার পূর্বভাগস্থিত পর্বতও মহা-
দেবের রূপান্তর এবং ইহার নাম ‘তমচল’।

এইরূপে পবিত্র নীলকূট পর্বতস্থ কুজিকাপীঠে দেবী মহে-
শ্বরী মহাদেবের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐহার
সেই বোনিমগুল পতিত হইয়াই প্রস্তর হইয়াছিল, তাহাই
কামাখ্যা দেবী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মর্ত্যগণ এই শিলা
স্পর্শ করিলে দেবত্ব এবং দেবগণ ইহার স্পর্শে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন। এইস্থানের মাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত, ইহাতে
লৌহ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা তত্ত্ব হইয়া যায়।

এই বোনিমগুলের পরিমাণ দীর্ঘে ২১ অঙ্গুলি এবং
প্রস্থে এক বিততি (২ হাত) এবং উহা সিন্দুর ও কুচুমানি
লেপিত। দেবী মহামারা এই স্থানে প্রত্যহ পঞ্চ
কামিনী মূর্তিতে অরস্থান করেন; সেই পঞ্চমূর্তির নাম—
কামাখ্যা, ত্রিপুয়া, কামেশ্বরী, সারদা ও মহোৎসাহ।
দেবীর চতুর্দিকে অষ্টবোগিনী অবস্থান করিতেছেন, ঐহা-
দিগের নাম—ভৃগুকামা, ত্রীকামা, বিদ্যাবাসিনী, কটীশ্বরী,
ধনহা, পাদমুগী, দীর্ঘেশ্বরী ও একটা। অপরাপর তীর্থ-
সমূহও এখানে অল্পরূপে অবস্থিত আছে, বিষ্ণু ইহার তীরে
কমল নামে অবস্থান করেন। দেবীঅঙ্গে লক্ষী লগিতা
নামে এবং সরস্বতী মাতঙ্গী নামে অবস্থিত আছেন। দেবীর
প্রিয়পুত্র গণদেব পর্বতের পূর্বভাগে হারদেশে সিদ্ধ নামে
বাস করিতেছেন। কমলক ও কমলতা, তিষ্ঠিতী ও
অপরাজিতারূপে এই স্থানে অবস্থিত। বরাহমূর্তিধর হরি
পাণ্ডুনাথনামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন; তিনি যেখানে
মধু ও কৈটভস্কর বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে
ব্রহ্ম ব্রহ্মকুণ্ড নির্মাণ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট
গদা ও কামাগণীদেবীর বোনিমগুলকূলা কুণ্ডরূপে অবস্থিত
আছে। ইহারই নিকটে ইজ ও অজ্ঞাত দেবগণ মহাদেবের

সন্ততিস্বত্ব অমৃতপূর্ণ অমৃতকুণ্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার নিকট কামেশ্বর নামক মহাপুণ্যতীর্থ কামকুণ্ড। সিদ্ধকুণ্ড ও কামকুণ্ডের মধ্যভাগে কেশারনাথক ক্ষেত্র, ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪ ব্যাম, ইহার অপর নাম হারাহজ। ঐশ্বরকুণ্ডের মধ্যদেশে কামেশ্বরপর্যন্তে সংলগ্ন শৈলপুত্রীর নাম 'কামাখ্যা'। কামেশ্বর ও কামাখ্যার মধ্যদেশে কাল-রাজি। পীঠস্থানে দীর্ঘেশ্বরী, সীমাভাগে প্রচণ্ডিকা, এবং কামাখ্যাশ্রমের প্রান্তদেশে কুম্ভাণ্ডী নামক যোগিনী অবস্থান করে। দক্ষিণপীঠে কামেশ্বরের অধোন্নামক শিখরকে পরমার্থিগণ ভৈরব নামে অভিহিত করেন। এই ভৈরবের নিকটে চামুণ্ডাভৈরবীর অবস্থান। কামেশ্বর ও ভৈরবের মধ্যবর্তী স্থানে সুরাপনা দেবী। সদ্যোজাত নামক শিখরদেশে আত্মাতকেশ্বর। এই স্থানে যোগরূপিণী দুর্গানারী নারিকা এবং এই স্থানে অশক পত্রবিশিষ্ট লতাবেষ্টিত যে আত্মাতক বৃক্ষ আছে, তাহাই কল্ললতা-বেষ্টিত কল্লবৃক্ষ। এই আত্মাতক বৃক্ষের নিকট স্বয়ং গঙ্গা সিদ্ধগঙ্গা নামে অবস্থিত আছেন। ইহার সমীপে আত্মাতকক্ষেত্রনামে পুষ্করক্ষেত্র। ঈশানদিকে তৎপুরুষ নামক শিখরের উপরিভাগে ভুবনেশ্বর-দেবের পীঠ। ইহার নিকটে কামধেনু নামে সুরভির শিলা মূর্তি আছে। মধ্যদেশে কোটিলিঙ্গ নামক মহাভৈরব মূর্তি, ইহা পাঁচ মূর্তি দ্বারা পাঁচভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মপর্যন্তের উর্দ্ধদেশে ভুবনেশ্বরীর নামে মহাগৌরীর শিলামূর্তি আছে। যেখানে ব্রহ্মা পর্যন্তরূপে পর্যন্তরূপী মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইখানে অপরাজিতা নামক কল্ললতা অবস্থিত। কামধেনুর নিকটে অগ্নিকোণে যোনিরূপা কামাখ্যার পীঠ। এইখানে বিদ্যাবাসিনী নামে চণ্ডেশ্বরী, বনবাসিনী নামে স্বন্দামাতা, এবং কাত্যারনী নামে পাদদুর্গাযোগিনীর অবস্থান। এই সকল যোগিনীগণ নীলশৈলের নৈঋতদিকে অবস্থিত। পশ্চিমদ্বারে হুম্মানপীঠে পাবাগরূপী নন্দীর অবস্থান।" (কালিকা পুরাণ ৬১ অঃ।)

দেবীপীঠারও এইস্থান সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উক্ত আছে। বিশেষতঃ তাহাতে লিখিত আছে,—

"দেবী কামাখ্যা প্রতিমাসে এই স্থানে রজস্বলা হইয়া থাকেন।" [যোগিনীতন্ত্র ২।৬ পটল ও কামরূপ শব্দ ত্রুটি।]

কামাখ্যার কুমারীপূজা ভগবতীপূজার একটি অঙ্গ-বিশেষ। কামাখ্যার অনেক ব্রাহ্মণকুমারীর পূজাপ্রহণ একটি ব্যবসায় বস্তু। পূজা হটক বা মাই হটক, কামাখ্যাধর্মের জন্ত বাদী গমন করিলেই কুমারীরা

তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিবে এবং দক্ষিণা চাহিবে। ন্যূনাধিক ৩০০ কুমারী সর্বদা কামাখ্যার থাকে। অনেক সময় কুমারীরা স্বামীদিগকে দক্ষিণায় নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন।

কামাখ্যার তিতর ন্যূনাধিক ৫২টি তীর্থস্থান অদ্যাপি বর্তমান আছে, কিন্তু হুংখের বিবর অনেকগুলি দুর্গম অরণ্যে সমাবৃত। এই সমস্ত তীর্থের মধ্যে ভগবতী ভুবনেশ্বরীর এবং দশমহাবিদ্যার পীঠস্থানই সমধিক প্রসিদ্ধ।

কামাখ্যার পূজাদি নির্বাহের জন্ত আহমরাজারা অনেক পাইক (ভূতা) এবং নিকর জমী দান করিয়াছেন। অদ্যাপি পাইকেরা কার্যবিশেষে ভগবতী-সেবার খাটিয়া থাকে এবং নিকর জমী ইংরাজ গবর্ণমেন্টেও পূর্বনিয়মে ভগবতীপূজার জন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রায় সকল দেবালয়েই পাইক ও নিকর জমী আছে। তন্মধ্যে কামাখ্যা, কেশার ও মাধবের সর্বাপেক্ষা অধিক।

কামাখ্যা (পুং) কামঃ অগ্নিরিব, উপমি। ১ কামরূপ অগ্নি। ২ কামরিপুঞ্জ বস্তুগণ।

কামাখ্যিসঙ্গীপন (স্ত্রী) সঙ্গীপ্যতে অনেন ইতি সঙ্গীপনং, কামাখ্যীনাং সঙ্গীপনম্, ৬তৎ। কামোদীপক ঔষধবিশেষ। ইহা একরূপ মোদক, ভৈরবায়রসাবলীতে ইহার পাকপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে। দধা—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অঙ্গ ২ তোলা, ববকার, সাজীকার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শট্টা, বমানী, বনযমানী, কীটহারী ও তালীশপত্র, একত্র ৪ তোলা; জীরা, তেজপত্র, দাকচিনি, বড় এলাইচ, ছোটএলাইচ, লবঙ্গ ও জারকল, এক সঙ্গে ৬ তোলা; বীজ-তাড়ক, শুট, পিপুল ও মরিচ, একত্র ৮ তোলা; ধনে, ঘটমধু, কেশর, প্রত্যেকে ২ তোলা; শতাবরী, ভূমিকুম্ভাণ্ড, গজপিঙ্গলী, বেড়োলা, আলকুশিবীজ, গোন্ধুরবীজ এবং বীজ ও পত্রযুক্ত ইন্দ্রযব, প্রত্যেক সমান্যংশ। সর্ব সমষ্টির সমান্যংশ চিনি। পাকশেষে হুত, মধু ও কর্পূর ২ তোলা প্রক্ষেপ দিতে হয়।

[মোদকক্ষেপে পাকনিয়ম দেখ।]

কামাক্ষুশ (পুং) কামে কামোদীপনে অক্লুশ ইব। ১ নখ। (কামাক্ষুশো মহারাজঃ করজ্ঞা নখরো নখঃ।

করশুকো ভূজাকণ্ঠঃ পুনর্ভব-পুনর্মর্ষো ॥ হেম ৩।২৫৮।)

২ (কামত অক্লুশ ইব) উপদ্র, পুংচিহ্ন। ৩ (স্ত্রি) কাম-শান্তিকারক।

কামাক্ষ (পুং) কামঃ কামোদীপকঃ অক্লুশ ইব, হুত, বহরী। আশপাহ।

কামাচিশিঙ্গী (শেঙ্গ) বৎসবিশেষ। (Silurus pungen-
tissimus.)

কামাতুর (জি) কামেন আতুর: ৩৩৭। কামপীড়িত।

কামাত্তজ (পুং) কামত আত্মজ: পুং, ৩৩৭। কল্পপের
পুত্র, অনিরুদ্ধ।

কামাত্ততা (জী) কামপ্রধান: আত্মা বত, তত্ভাভা, কামাত্তন-
তন্ (তত্ভাভবতুলো। পা ৪।১।১১১।) ১ অহুরাগ-
প্রধানচিত্ততা। ২ কামাত্তনচিত্ততা।

(“কামাত্তন ন প্রপত্তা ন চৈবেহাত্মকামতা।” বহু।২।২।)

কামাত্তা [ন] (পুং) কামপ্রধান: আত্মা বত, বহুব্রী।
১ অহুরাগী। ২ কামবশীভূত। ৩ কামময়। ৪ কলাভিলাষী।

কামাধিকার (পুং) কামত অধিকার: ৩৩৭। কামরিপুর
অধিকার।

কামাধিষ্ঠান (জী) কামত অধিষ্ঠান: স্থান, ৩৩৭। কামের
অধিষ্ঠান স্থান অর্থ্যাৎ মন।

কামাধিষ্ঠিত (ত্রি) কামেন অধিষ্ঠিতম্, ৩৩৭। ১ কল্প
কর্ষক অধিকৃত ইন্দ্রিয়াদি। ২ (ভাবে ক্ত) কামাধিষ্ঠান।

কামান (পারত) আগের অন্তবিশেষ, তোপ। (Cannon)
(“ঘন ঘন ভুরু কামান টানে।

জর জর করে কটাক বাণে।” ভারত—বিদ্যাসুন্দর।)

যুদ্ধকালে দুর্গাদি অধিকার করিবার সময় অগ্নি সাহায্যে
বুহদাকার অগ্নিময় ধাতুগোলক নিক্ষেপ করিয়া দুর্গাদি
ভাঙ্গিবার যন্ত্রবিশেষ। “কামান” শব্দের অর্থ নিক্ষেপক যন্ত্র।

অগ্ন্যস্ত্রের মধ্যে কামান সর্বাঙ্গেকা প্রধান। অধুনা
দুর্যোগীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতি ও বহুল
ব্যবহার হইতেছে। ইহা সাধারণতঃ লৌহ, পিত্তল, ব্রোঞ্জ
প্রভৃতি ধাতুতে নির্মিত। ইহা নানাবিধ আকারে হইয়া
থাকে। আকারানুসারে, ব্যবহারানুসারে ও গঠনানুসারে
কামান তিন প্রকার দেখা যায়। আকারানুসারেও আবার
হাউইটজার, গান্, মর্টার প্রভৃতি প্রভেদ আছে; ব্যবহার-
ানুসারে যুদ্ধস্থলব্যবহার্য্য, পর্তব্যবহার্য্য, সমুদ্রোপকূল-
ব্যবহার্য্য, দুর্গাক্রমণার্থ ব্যবহার্য্য ইত্যাদি এবং গঠনানুসারে
সরলছিদ্র ও পঁচাল গুল্লরযুক্ত (rifled & spirally
grooved) কামান দেখা যায়।

গান্—সর্বাঙ্গেকা বুহদাকার ও ভারী কামানকে ইংরাজী
ভাষায় গান্ বলে। এই ভারী কামানের মধ্যে আমেরি-
কায় ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌ রাষ্ট্রে যুদ্ধের সময় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে
কর্ণেল বসকোর্ড “কলব্রিড” নামে একপ্রকার কামান
(গান্) প্রস্তুত করেন, তাহাতে হাউইটজার, মর্টার ও গান্

এই ত্রিবিধ কামানেরই কার্য্য চলে। ঐ রাষ্ট্রের নৌসেনার
অধ্যক্ষ আর একপ্রকার বুহদাকার “কলব্রিড” প্রস্তুত করেন,
তাহা প্রস্তুতকর্তার নামে “ডাফ্‌গ্রেণ গান্” নামে পরিচিত।
ফরাসীসেনাপতি পেইকুহান্ আর একপ্রকার “কলব্রিড”
প্রস্তুত করেন, ইহা “পেইকুহান্ গান্” নামে খ্যাত। আর, পি,
প্যারট নামে একজন ইংরাজ যুদ্ধস্থলে ব্যবহারোপযোগী এক
প্রকার পঁচাল গুল্লরযুক্ত কামানের সৃষ্টি করেন, তাহা
“প্যারট গান্” নামে বিখ্যাত। এই কামান হইতে অশেফাকৃত
দীর্ঘাকৃতির গুলি নিক্ষেপ হয়। মি: হুইটওয়ার্থ নামক আর
একজন ইংরাজ একপ্রকার কামান প্রস্তুত করেন, তাহার
চোলা সাধারণতঃ যে পরিমাণে দীর্ঘ হয়, তদনুসারে দীর্ঘ ও
গুল্লর বটকোণ। আর একপ্রকার কামান আছে, তাহার
প্রস্তুতকর্তা সারজর্জ্‌ অস্ট্রিন্; এই কামান তাহার নামেই
বিখ্যাত।

হাউইটজার—এই ভারী কামানের চোলা ছোট, কিন্তু
গুল্লর এত বৃহৎ যে হাত দিয়াই গোলাটা বখানাহানে বসাইয়া
দেওয়া যায়। ইহাতে বারুদ খুব অল্প লাগে।

মর্টার—ইহা সৈন্য ভাষায় হাঁড়ীকামান নামে বিখ্যাত।
ইহা দেখিতে ঠিক চাঁকির গড়ের মত।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে কামান-বন্দুকাদি দুর্যোগীয়-
গণ হইতেই এদেশে প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা নহে।
বৈদিক আর্ঘ্যগণের সময় হইতেই কামানের ন্যায় অগ্ন্যস্ত্র
ভারতে ব্যবহৃত হইত। বেদের হুর্দী নামে একপ্রকার অস্ত্রের
বিবরণ পাওয়া যায়। তৎকালে অস্ত্রেরা দেবতাদিগের
সহিত যুদ্ধ করিবার সময় ইহা ব্যবহার করিত। অনেক
বৈদিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক অভিধান
গ্রন্থে “হুর্দী” অর্থে লৌহপ্রতিমা লিখিত হয়, কিন্তু বৈদিক
গ্রন্থে লৌহ-স্থূণা (চোলা) বা স্থূণাকারযন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত।
কৃষ্ণ বজ্রকূর্মে (১।৫।৭।৬।) হুর্দী শব্দ আছে। ভট্ট-
ভাষ্যর এই শব্দের বৈকল্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে
স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেকালে অস্ত্রেরা একপ্রকার বন্দুক
ব্যবহার করিত। সে বন্দুক আধুনিক বন্দুকের মত নহে।
যে মত্রে হুর্দী শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার সাধারণত্যা ও
ব্যাখ্যাদি হইতে জানা যায় যে—“এই হুর্দী—লৌহময়ী
স্থূণা, বাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র, তদ্বাধ্য প্রক্ষালিত হস্তাশন—
যাহা বহির্গত হয়, তাহাও অলঙ্কৃত, এই ঋক্ মন্ত্রটাও সেই
লৌহময়ী অলঙ্কৃত স্থূণার মত জানিবে। অস্ত্রগণের মধ্যে
যাহারা হুর্দীভাষা যুদ্ধ করে, এক আঘাতে শত শত বিনাশ
করে—দেবতারও তেমনি তাহাদিগকে মারিবার ক্ষমতা

শতরী বজ্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ঋক্ষয় সেই শতরী বজ্রের বা স্থরীর তুল্য। যে বজ্রমান (বজ্রকর্তা) এই ঋক্ষারা সমিধাধীন (অগ্নিতে আহুতি দান) করেন, তিনিও এই শতরী অর্থাৎ শত শক্রনাশক বজ্র বা স্থরী উদ্ধৃত করিয়া শক্রর প্রতি ঋক্ষ বা মন্ত্ররূপ প্রহার করিতে সমর্থ হন।” *

অথর্ববেদে (১।১৬।২৪) একস্থলে একটা উদাহরণ আছে তাহাতে সীসক দিয়া শত্রু-বিনাশের কথা আছে।†

একশ্রেণী লৌহনির্মিত ছুপা বা চোলা, তন্মধ্যে স্থবির বা রক্ত, তাহা হইতে প্রচ্ছলিত পদার্থ বাহির হইয়া এককালে শত শত্রু বিনাশ করে; আবার সীসক দ্বারাই শত্রু বিনষ্ট হয়; স্ততরাং বন্ধুক বা কামানেরই ভ্রায় যে একপ্রকার বজ্র ছিল, তন্নিয় আর কি অসম্ভব করা যাইতে পারে?

বৈদিককাল ছাড়িয়া দিয়া পৌরাণিককালে হিন্দুদিগের যুদ্ধোত্তরের বিবর আলোচনা করিলে দেখা যায়, এইকালে বৈদিক স্থরী “নলিকা,” “নালিক” বা “নাল” নাম প্রাপ্ত হইয়া বহুল উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং বহুল ব্যবহারও হইত। বৈশম্পায়নপ্রণীত নীতিপ্রকাশিকা, গুক্রাচার্যের নীতিশাস্ত্র, শাক্যধরের ধর্মুর্কদে ও বীরচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে এই অস্ত্রের স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় এবং বিশ্বামিত্রের ধর্মুর্কদেও ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মহাভারত ও রামায়ণে এই অস্ত্রের উল্লেখ আছে। মহাভারতে ইহার

* “এবা বৈ স্থরী কর্ণকাব্যতোত্তরা হ ন বৈ দেবা অহরাণাং শত-তর্হাংসুংহতি যদেত্তরা সমিধমাদধানো বজ্রমেবৈতচ্ছতরীঃ বজ্রমানো জাতুবার প্রহরতি।” তৈত্তিরীয়সংহিতা—১।৫।১।৬।

তাবা—“অলতী লৌহময়ী যুগা স্থরী। গৌরাগির্হাং গীর্হ। কর্ণকাব্যতী অন্তঃস্থবিরবতী অন্তঃস্থলতী চেত্যর্থঃ। সাংহিতকং গীর্হবন্। তৎসদৃশা বপিত্যর্থঃ। দেবা এত্তরা অহরাণাং মধ্যে শততর্হাং এক প্রহারেণ শতত হন্তুন্। তুংহতি ব্রহ্মি স। তুং হিংসামান্ যৌধামিকঃ। তন্মান্দেত্তরা ওচা সমিধমাদধানো বজ্রমানঃ বজ্রং ইন্দ্রাণুধমসুধমেব এতৎ শতরী পুরোক্তাং স্থরী জাতুবার শত্রবে প্রহিণোতি।”

যাযা—“অলতী লৌহময়ী যুগা স্থরী। সা চ কর্ণকাব্যতী ছিত্রবতী। অতএব অলতীত্যাঃ। তৎসদৃশমবন্। একেন প্রহারেণ শতসাধ্যাকান্ নাহরতঃ পুরা শততর্হাঃ। অহরাণাং মধ্যে তাদৃশান্ (স্থরী) বোজুন্। এতন্না ওচা দেবা হিংসতি। অনরা সমিধাদধানে শতরীমেদাং ওচা বজ্রং কৃৎষা বৈরিণঃ হস্তং প্রহরতি।”

† “সীসারাগ্রাহ বরুণঃ সীসারাগ্নিরূপাবতি।

সীসং ন ইন্দ্রঃ প্রোহজ্ঞং তদগ্ন বাতুচাতম্।

যদি নো গাং হংসি বদ্যং যদি পুরুষম্।

জং দ্বা সীসেন বিদ্যাসো বধ্যা নোহেনো অবীরহাঃ”

অথর্ববেদে ১।১৬।২৪।

বহুল ব্যবহারের কথাই আছে। রামায়ণে রাবণের বিবিধর বর্ণনস্থলে লিখিত আছে যে, পূর্বকালে ইহা অস্ত্রের রাব-হার করিত। নলিকাত্তের ব্যবহার ও আকারাদি সবকিছু পুরোক্ত গ্রন্থাদিতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা নিয়ে লিখিত হইল।

বৈশম্পায়নের নীতিপ্রকাশিকার আছে,—

“নলিকা ঋক্ষদেহা তাত্ তব্বী মধ্যমক্।

মর্ম্মচ্ছেদকরী শীলা দ্রোণচাপশরৈরিণী॥”

নলিকাত্তের কারা ঠিক শোভা ও বক, ইহার মধ্যে চোকার ভ্রায় খোল আছে, বর্ণ কাল এবং ইচ্ছা হইতে দ্রোণচাপের শরের ভ্রায় বহির্গত হইয়া শত্রুর মর্ম্মচ্ছেদ করে।

ইহার প্রয়োগদির ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলেও ইহাকে বন্ধুক ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। যথা—

“গ্রহণং দ্বাপনকৈব স্যত্যক্কেতি গতিভ্রমঃ।

তামাপ্রিতং বিমিশ্রা তু জেতাসদান্ রিপূন্ যুধি॥”

প্রথমে গ্রহণ, তৎপরে দ্বাপন (প্রচ্ছলিত করণ) তৎপরে স্যত্য (অর্থাৎ বিদ্ধকরণ) এই ত্রিবিধ ক্রিয়া নলিকার আশ্রিত, ইহা জানিলে আসন্নশত্রুকেও যুদ্ধে জয় করা যায়।

গুক্রনীতিতে নলিকাত্তের যে বর্ণনা প্রয়োগ ও তাহার উপযুক্ত সামগ্রী ইত্যাদির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে, অস্ত্র বিবিধ, একপ্রকার ময়ূপত করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়, অপরপ্রকার নালসাহায্যে নিক্ষেপ করিতে হয়। যেখানে মাস্তিক অস্ত্র নাই সেখানে নলিকাত্ত ধারণ করা উচিত। নালিকাত্ত ছই প্রকার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বা লঘু। লঘু নালিকের আকার এইরূপ পঞ্চবিভক্তি (২৫ হাত) পরিমাণ একটি (লৌহনির্মিত) নল বা নাল তাহার মূলের দিকে আড়ভাবে একটি ছিদ্র, মূল হইতে উর্দ্ধ পর্যন্ত অন্তঃস্থবির (গর্ত), মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দু (মাছী), যন্ত্রের আঘাত পাইবামাত্র অগ্নি নির্গত হইতে পারে, এরূপ অন্তর-খণ্ডযুক্ত, * সেই স্থানে অগ্নিচূর্ণের (বারুদের) আধার স্বরূপ একটা কর্ণ, উত্তমকার্তের উপাঙ্গ ও বৃহৎ অর্থাৎ ধরিবার মুঠ—এই প্রকার নালিকাত্তের মধ্যগর্তের (যেখানে বারুদ পূরিতে হয় সেই গর্তের) পরিমাণ মধ্যমাকুলী পরি-

* ইংরাজী রাফেট (পাখুরী বন্ধুক) নামক বন্ধুকে চকরকী পাখর লাগান থাকে। ইংরাজীতে রাফেট বন্ধুকের বর্ণনা এইরূপ আছে—Musket is a species of fire-arm carried by the infantry or main body of an army, and originally fixed by means of a match, for which a flint-lock was substituted.

মিত অর্থাৎ মধ্যমাজুলী প্রবেশ করিতে পারে—এরূপ গর্ভ, তাহার জোড়ে অমিচূর্ণ সন্নিবেশিত করণের দৃঢ় শলাকা-বিশিষ্ট—এইরূপ লঘুনালিক কেবল পদাতি সৈন্ত ও অশ্ব-রোহী সৈন্তেরাই ব্যবহার করিবেন। গুরুনীতির ৪র্থ অধ্যায়ের সপ্তম প্রকরণে এবিষয়ে যে কয়েকটি শ্লোক আছে তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

“অস্ত্রস্ত বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মাস্ত্রিকং তথা ।

“যদা তু মাস্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ ॥

নালিকং বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ ।

তীর্থ্যগৃহীতমূলং নাগং পঞ্চবিতস্তিকম্ ॥

মূল্যপ্রায়োপক্যেদেতিতিলবিন্দুযুতং সদা ।

বস্ত্রাঘাতামিহ্নং প্রাবচূর্ণধ্বং কর্ণমূলকম্ ॥

সুকার্ঠোপাদবৃক্ষং মধ্যমাজুলিলাস্তরম্ ।

স্বাস্তেহমিচূর্ণসন্ধ্যাতুলশলাকালংযুতং দৃঢ়ম্ ।

লঘুনালিকমণ্যেতৎ প্রার্থ্যং পত্তিসাদিশিঃ ॥”

তৎপরে বৃহন্নালিকের বর্ণনা এইরূপ আছে,—

“যথা যথা তু স্বক্কারং যথা স্থলবিলাস্তরম্ ।

যথা দীর্ঘং বৃহদগোলং দূরভেদী তথা তথা ॥

মূলকীলত্রমাল্লক্যসমসন্ধানমাজি যৎ ।

বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তৎ কাঠবৃক্ষবিবর্জিতম্ ।

প্রবাহং শকটাদৈশ্চ স্নযুক্তং বিজয়প্রদম্ ॥”

উক্ত লঘুনালিকের স্বক্ যত কঠিন হইবে, উহার আর-তন যত বড় হইবে, উহার গর্ভ যত স্থূল (ফাঁদাল) হইবে, উহার গোলা যত বড় হইবে, উহা ততই দূরভেদী হইবে। এইরূপ বৃহদাকার নালিকের মূলদেশে কীলক এবং কাঠ-বৃক্ষ অর্থাৎ কাঠনির্মিত ধরিবার মুট নাই। উহা শকটাদি দ্বারা বাহিত হয়। উহা উপযুক্তরূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে জয় হয়। ইহারই নাম বৃহন্নালিক।

ইহা হইতে বৃহন্নালিক যে আধুনিক কামান ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তৎপরে ইহার পরিচালনাদির বিবরণ পর্যালোচনা করিলে উহা যে এক প্রকার কামানই তৎপক্ষে আর কোন সন্দেহই হয় না। যথা—

“নালিক্যং শোধয়েদাদৌ দদ্যৎ তত্রামিচূর্ণকম্ ।

নিবেশয়েতু দণ্ডেন নালমূলে যথাদৃঢ়ম্ ॥

ততঃ স্রগোলকং দদ্যৎ ততঃ কর্ণেহমিচূর্ণকম্ ।

কর্ণচূর্ণাধিধানেন গোলাং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ ॥”

প্রথমে নালিকার শোধন (পরিষ্কার) করিবে। পরে তাহাতে অমিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ দিবে। অনন্তর দণ্ডদ্বারা

সেই বারুদ দৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত করিবে, পরে তাহাতে গোলা দিবে। অভ্যন্তর কর্ণস্থানে অমিচূর্ণ স্থাপন করিয়া তাহাতে বস্ত্রপ্রস্তরাদি সংযোগপূর্বক তদ্ব্যবস্থায় গুলিকে লক্ষ্যস্থানে নিক্ষেপ করিবে।

তৎপরে গুরুচার্য্য অমিচূর্ণ ও গুলিগোলা প্রস্তুত করিবার নিয়মও বলিয়াছেন। অমিচূর্ণ যে আধুনিক বারুদ ভিন্ন আর কিছু নহে, তাহা তাহার উপকরণ দেখিলেই বুঝা যায়। [বারুদ দেখ ।]

গোলাগুলি প্রস্তুত সম্বন্ধেও গুরুচার্য্য এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

“গোলো লৌহময়ো গর্ভাটিকঃ কেবলোহপি বা ।

লীলস্ত লঘুনালার্থে হস্তধাতুতবোহপি বা ॥

লৌহসারময়ং বাপি নালান্ত্রং হস্তধাতুজম্ ।

মিত্যসম্বার্কজনস্বচ্ছ মস্ত্রপাতিভিন্নায়তম্ ॥”

বৃহন্নালিকের গর্ভ (নিরেট) লৌহ খোলা প্রস্তুত করিবে, আবার শূণ্ণগর্ভও (কাঁপা) করিবে। কাঁপাগোলার ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি পূর্ণ করিতে পারা যায়। লঘুনালিকের ক্ষুদ্র নালহিঙ্গের উপযুক্ত লীলকের বা অস্ত্রধাতুনির্মিত গুলিকা প্রস্তুত করিবে। নালান্ত্রগুলি লৌহসারদ্বারা বা অস্ত্র কোন কঠিন ধাতুদ্বারা নির্মাণ করা আবশ্যিক।

গুরুচার্য্যের গ্রন্থের বিবরণে এই পর্য্যন্ত জানা যায়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে প্রাচীন হিন্দুগণেরও কামানের জায় কোন অস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বীরচিন্তামণিগ্রন্থে বৃহন্নালিক-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—

“নালিকা লঘবো বাণা নলবয়্রণ নোমিতাঃ ।

তে তুচ্ছদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু সংমতাঃ ॥”

লঘুনালিকবাণ অর্থাৎ ক্ষুদ্রনালিকাত্র সকল নলবয়্র দ্বারা নিক্ষেপ্ত হয়। এ অস্ত্র উচ্চ ও দূরলক্ষ্যের এবং দুর্গ-যুদ্ধে উপযুক্ত।

মহাভারতের স্থানে স্থানে এই নালিকাত্র নানাবিধ নামে কথিত হইয়াছে। হিরণ্যপুরাণ-ধ্বংস-বর্ণনস্থলে নালিকাত্রের নাম স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। আদিপর্বে একস্থানে (২৫। ২২৫ শ্লোকে) ইহা “অয়ঃকণপ”-নামে কথিত হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐশ্বক্যের ব্যাখ্যায় নালিক শব্দের পর্যায় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন— “অয়ঃকণান্ লৌহগুলিকাঃ শিবতীতি তৎ তথাবিধং লৌহ-ময়ং বস্ত্রং যেন আঘেদৌবধবলেন গর্ভমবৃত্তলৌহগুলিকাঃ ক্লিপ্যন্তে ।”—

একালের হাঁড়ীকামান (মর্টার) * যে ধরনের কামান, পূর্বকালে সেই একালের “তুলাগুড়া” নামে একপ্রকার যন্ত্রের কথা পাওয়া যায়। সুবিধীর নিকট অর্জুন খীর স্বর্গগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে বলিলেন, “মহারাজ! অতঃপর যাতলি সেই অমৃত জৈত্রয় লইয়া আমার নিকট আসিলেন। সে রথ অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, বহু, বাহু-উৎপাদনকারী নির্ঘাত বা অলঙ্কারপিণ্ডযুক্ত এবং মহামেঘের ভ্রার ভীমানারী চক্রযুক্ত তুলাগুড়া প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ছিল।” টীকাকার নীলকণ্ঠ এই ‘তুলাগুড়া’ শব্দের ব্যাখ্যার সিঁথিরাছেন—“তুলাগুড়া ভাণ্ডগোলকা: ভাণ্ডানি আধেরদ্রব্যবলেন গোলনিকৈপপাত্রাণি। বাহুকেটা: বেগবশাং বাহু জনরভ্যা:। সনির্ঘাতা:—অশনিধ্বনিযুক্তা মহামেঘবনাঞ্চ ॥” তুলাগুড়া—আধেরদ্রব্যের বলে গোলা নিক্ষেপ করিবার ভাণ্ডাকার পাত্র; ইহা হইতে গোলা-বহির্গমনের বেগে বাহুর প্রাবল্য হয় এবং যন্ত্রের বা বোর মেঘের গভীর গর্জনের ভ্রার শব্দ হয় এবং তাহাতে ঢাকা আছে; হুতরাং এরূপ বর্ণনার তুলাগুড়াকে সশকট হাঁড়ী-কামানের ভ্রার আধেরদ্রব্য ভিন্ন আর কি বলিয়া অনুমান করা যায়।†

* Mortar—a short piece of ordnance used for throwing bombs, carcasses, shells, &c., at high angles of elevation as 45°, and even higher—so named from its resemblance in shape to the untenail (a wide-mouthed vessel in form of an inverted bell), in which substances are pounded or bruised with a pestle.

† বিখ্যাতের গ্রন্থবল্লভের সঙ্কলিত মহাশর “অগ্ন্যস্ত্র” শব্দে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাশনিক প্রহবোধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, “সংকৃতপক্ষে লোক সাজাইয়া কোন কথা লিখিতে পারিলে যদি তাহা প্রামাণিক হয়, তবে আর্ঘ্যের হাতপড়া কামানবন্ধুর বেশ ভাল প্রমাণ আছে। গুরুত্বপূর্ণ পড়িলে জানা যায়”—কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবিক এরূপ অগ্রা-শনিক প্রহবোধে। ইহা অতি প্রাচীন; কারণ, সভা, বন ও উল্লেখ্য-পর্বের বিদ্রব্যাকৃতলি পাঠে জানা যায় যে, তিনি কুরোভূঃ এই গ্রহের বা গুরুচার্য্যগ্রন্থে নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণ-ধরণ আমরা হুইচারিট হল উদ্ধৃত করিতেছি:—

“অশিষ্টে নিগ্রহো বিভাং বিভাং শিষ্টে পালনম্।

এবং শুক্রোঃ বীজীমানাপং তরতর্ভত্।”

“উপন্যাসকঃ যে গায়ে প্রোক্তাঃ সারবীণ পুরা।

“অপিতোপন্যাসা গীতঃ স্রজতঃ পুরাতনঃ।”

“শাস্ত্রো চোপন্যাসা প্রোক্তাঃ শাস্ত্রং শাস্ত্রম্।”

“ইতোভাঃ শাস্ত্রঃ প্রোক্তাঃ।” “কাব্যো নীতিঃ শাস্ত্রম্।”

এই সকল হলে শুক্রের বাক্য, শুক্রগাথা, শুক্রগীত, শুক্রপ্রোক্ত শাস্ত্র,

মহাশব্দিতার একটি বিবি পাওয়া যায়,—

“ন কুট্টোরাধৈবৈভাং বুধ্যানো রূপে হিনুন্।

ন কণিষ্ঠীর্নাপি দিষ্টেদীর্নামিচ্ছিতভেদজৈঃ ॥”

যুদ্ধকালে কুটীজ অর্থাৎ কাঠের আবরণাদি নেওড়া গুণ্ডাজ, বড়িশাকার কলকবিশিষ্ট বাণ, বিবলিগু বা অগ্নিঅগ্নিত অস্ত্রাদি দ্বারা শত্রু হনন করিবে না। এইবিধি হইতে বুঝা যাইতেছে যে পূর্বকালে অগ্ন্যস্ত্রের উপর হিন্দু-সিগের স্থাপা ছিল, সহজে তাহার প্রাকল অস্ত্র ব্যবহার করিতেন না; আর সেইজন্যই নালিকাত্তের বিশেষ উন্নতি বা ধনুঃ তরবারীর ভ্রার বহল পরিমাণে ব্যবহার হইত না।

অনেকে পৌরাণিক “শতরী” নামক অস্ত্রকে কামান বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু বর্ণনাদি দেখিলে ইহাকে ঠিক কামান বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, প্রত্নরনিকৈ-পক কাঠময় যন্ত্রের নাম শতরী ছিল। মহাতারতের টীকা-কার নীলকণ্ঠ উভয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু রামায়-ণের টীকাকার রামানুজ ইহাকে কণ্টকমরী বৃহৎ মূল্যের বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের নীতিপ্রকাশিকার ৫ম অধ্যায়ে আছে—

“শতরী কণ্টকযুক্তা কালারসমরী হৃতা।

মূল্যরাভা চতুর্হস্তা বর্জুলাং সক্ষপা হৃতা ॥

গদাবল্লভবতোবা ময়েতি কথিতা ভূবি ॥”

কণ্টকবিশিষ্ট, সোহসারনির্ঘাত, মূল্যের সদৃশ, হুতৃত বর্জুলের নাম শতরী; ইহা ধরিবার নিমিত্ত হুত আছে, প্রমাণ ৪ হাত। গদাযুদ্ধের বদন অর্থাৎ প্রয়োগকালীন

কাণ্ডের (গুকের) নীতি—গুরুত্বপূর্ণের পরিচায়ক বলিয়া আমাধের বিবাস।

কেহ কেহ সাহচর্য্য অর্ধ ধরিয়া বলেন, নলিকাত্ত ঠিক বন্দুক বা কামানের ভ্রার অস্ত্র নহে, প্রত্যুত ইহা মলবারা নিক্ষেপ্য বাণাদিত্ত ভ্রার অস্ত্র। কারণ—

“কুর কুরপ্রানালিকবৎসদভাবিসদকঃ।” জ্যোৎসর্গ ৩০।১৭।

‘নালিকা নলিকরা কেপ্যা’ (নীলকণ্ঠ।)

কুর, কুরপ্রানালিক, বৎসবল্লভ অহিসিকি ইত্যাদি নলিকাবার্য্য বাহা হুত্বিতে হয়, তাহাই নালিক। অস্ত্রাত্ত কলকাত্তের সাহচর্য্যেহু নালিকও একটি কলকাত্ত, ইহাই অনুমান হয়; কিন্তু এ অনুমানও হুত্ব-সমত নহে। নীলকণ্ঠ টীকার বাহা সিঁথিরাছেন (নলিকাবার্য্য কেপ্যা) তাহাতেও কোন সন্দেহ হয় নাই; কারণ, এই গ্রন্থের সোভ্যের বলা হইয়াছে যে নালিকা, নালিক ও নাল এই তিন শব্দই একার্থসম্বন্ধ। ইহার প্রমাণবরণ নীতিপ্রকাশিকা হইতে উদ্ধৃত লোকভাষা পর্য্যায়-চন্দা করিলে পাঠে বুঝা যাইবে।

আকালন যেরূপ ইহারও সেইরূপ। বৈশম্পায়নের এই বর্ণনায় “শতরী” মূল্যের ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, কিন্তু মূল্যের ভিন্ন অস্ত্রে এককালে শত পুরুষের হনন হইবে কিরূপে? এজন্য বোধ হয় এই নামে কোনপ্রকার অস্ত্রও ছিল; কারণ, মহাভারতে আছে—

“মূল্যমৈঃ কূটপাশৈশ্চ শূলোন্মূলপৰ্জ্বিতৈঃ।

শতরীতিশ্চ দীপ্তাভির্দৈওরপি স্ত্রমাকর্শনৈঃ॥”

এখানে “দীপ্ত শতরী” এই পদ হইতে শতরীর অগ্নিবিশিষ্টতা বুঝা যায়। এতদ্বিধ অস্ত্রই হলেও তৎপোষক বর্ণনা পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠও সেই সেই স্থলে ইহাকে কামানের ন্যায় কোন আগ্নেয় অস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহা হউক “শতরী” কামান হউক বা না হউক কামান-বন্দুকের জ্ঞান অধ্যাত্ম যে পূর্বকালে ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

পূর্বে দুর্গাদি রক্ষার জন্য কামানের জ্ঞান অধ্যাত্রাদির ব্যবহার হইত। যখন পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব মণিপুত্রে প্রবেশ করে, অশ্বমেধপর্বে সেইস্থলে মণিপুত্রের বর্ণনায় আছে যে, “নগর-বাহিরে শকটের উপর আগ্নেয় অস্ত্রাদি স্তরজিত রহিয়াছে এবং সেনারা সর্ষদা তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।”

প্রাচীনকালে যে, কামানাদির জ্ঞান একপ্রকার অস্ত্র হিন্দুদিগের ছিল, তাহা উপরে বলা হইল; কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান ঐতিহাসিককালের প্রথমাবস্থায় ভারতে সেরূপ কোন অস্ত্রাদি ছিল না; কারণ ভুবনেশ্বর বা সাক্ষিনামক স্থানে যুদ্ধাদির যে সকল খোদিত প্রস্তরের ছবি দেখা যায়, তাহার কোনটিতেই কোনরূপ অস্ত্রাশ্বের ব্যবহার বা প্রতিকৃতি দেখা যায় না। ইহা হইতেই ওরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ, ১০০৮ খৃষ্টাব্দে গজ-নীর মাক্কুদ যখন পঞ্চনদের অধীশ্বর আনন্দপালের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন, তখন আনন্দপালের হস্তী হঠাৎ ভীষণ শব্দ ও প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া পলায়ন করে। কিরিত্তার এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। কিরিত্তার এই স্থলে স্পষ্ট “তোপ” (কামান) ও “তুফাজ্” (পাখুরী বন্দুক) এই দুইটি শব্দ আছে। কেহ কেহ বলেন, সকল কিরিত্তার পাঠ সমান নহে, কোন কোন লিপিতে নাকি ঐ দুই শব্দের পরিবর্তে “নফাৎ” (naptha) ও “খদাজ্” (arrow) আছে। মিঃ ম্যাকলগান শেখোক্ত প্রকারের শব্দবিশিষ্ট লিপির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, এই স্থলে যে শব্দের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা তোপের (কামানের) শব্দ নহে, গ্রীকাকি বা নাপথার সাহায্যে যে সকল প্রজ্জ-

লিত বস্তু নিক্ষিপ্ত হইরাছিল, তাহারই কাটিবার শব্দ; কিন্তু ডাউ, ইলিরাট প্রভৃতি মহাক্ষার পুর্কের পাঠই গ্রাহ্য করিরা “তোপ” শব্দে কামান লিখিরা গিয়াছেন। “কিতাব-ই বমিনি” নামক আর একখানি মূল্যমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, গজনীর সৈন্য মধ্যে আতস-দিদা-বান নামে এক-প্রকার বন্দুকের জ্ঞান অস্ত্রাশ্বের (fire-eyed rockets) ব্যবহার ছিল। ইংরাজেরা এ পুস্তকের এই পাঠটিতে বিশ্বাস করেন না।

গজনীর সৈন্যে বন্দুকাদির ব্যবহার ছিল বলিয়া ভারতেও যে ছিল, ইহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে চাঁদকবির গ্রন্থে “মল-গোলা” নামক একপ্রকার অস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। এই অস্ত্রের বিবরণ চাঁদকবির গ্রন্থ হইতে অস্পষ্টরূপে বাহা জানা যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, আগ্নেয় ত্রব্যের সাহায্যে মলাকার বস্তু হইতে গোলা নিক্ষিপ্ত হইত। এতদ্বিধ তাঁহার কাব্যে বৃন্দাকার কামানের জ্ঞান অস্ত্রের বর্ণনাও পাওয়া যায়। ইংরাজেরা কিন্তু এই সকল অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন।

তৎপরে মোগলসম্রাট বাবর ভারতবর্ষে ইহা ব্যবহার করেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি কান্ডহুজের নিকট গজাভীরে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিজ লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রথমদিন তাঁহার সেনাপতি ওস্তাদ আলীকুলী ৮ বার, দ্বিতীয়দিন ১৬ বার ও ৩য় ৪র্থ দিনও ঐ নিয়মে তোপ দাগিয়াছিলেন। বাবর যে কামানটির সাহায্যে জয়লাভ করেন, তাহার নাম রাখিয়াছিলেন “দেগ গাজী”। বাবরের জীবনচরিতপাঠে জানা যায় যে, তাঁহার একটি বৃহৎ কামান পূর্বোক্ত যুদ্ধস্থলে প্রথম তোপ দাগিবার সময় ফাটিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বহুসংখ্যক কামান ছিল। বাবরের “দেগ-গাজী” নামক কামান পিত্তলে নিষ্প্রতি হইরাছিল। সেমশাহের সময় ভারতবর্ষে পিত্তলের কামান প্রস্তুত হইত। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে রাইসিন দুর্গ অধিকার করিবার সময় সেমশাহ আদেশ করেন যে, যেখানে যত পিত্তল সংগ্রহ করিতে পার, সমস্ত কেল্লায় পাঠাইয়া দিবে ও উহাতে “দেখা” (mortar হাড়ীকামান) প্রস্তুত করিবে। মির্জা কামরান হুমায়ূনের সভা হইতে পলাইবার সময় কতকগুলি কামান লইয়া যান, কিন্তু উল্ট-সংগ্রহ করিতে না পারিয়া প্রতি কামান লইয়া যাইবার জন্য বহুসংখ্যক লোক নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

বাবরের পূর্বে (১৫শ শতাব্দীর প্রথমে) ব্রহ্মদেশে পেঙ-রাজ প্রোমিনগর অধিকার করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু সাহস

করিয়া নগরের নিকট উপস্থিত হইতে পারেন নাই ; কারণ, নগরটি কামান বন্দুকে সুরক্ষিত ছিল। এই ঘটনা ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে। * এই সময় নিকোলো কন্টি নামক একজন যুরোপীয় ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে, ভারতে তখন ব্যালিষ্টি ও বোম্বার্ডের দ্বারা বস্ত্র ব্যবহার করিত।

১২৯০ খৃষ্টাব্দে আলালুদীন খিলজি “মদ্রিবিহা” নামক এক প্রকার আগ্নেয়বস্ত্র রণধর্য হর্গজয়ের সময় ব্যবহার করেন। আলালুদীন ও উহা বরফল হর্গজয়ের সময় ব্যবহার করেন। তাহার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, “এই হর্গপ্রাচীর এতদূর দৃঢ় যে, মদ্রিবিহা হইতে গোলা বাহির হইয়া হর্গের প্রাচীরে লাগিল ; কিন্তু প্রাচীর ভাঙিল না, গোলাই টিকিয়াইয়া আসিল।” তারিখী-কিরোজশাহীতে ইহার বিবরণ আছে। ইহা মাত্রিক নামে বিখ্যাত।

বাবরের সময়ের কামানগুলিকে সাধারণতঃ “কিরিজি” বলিত। পাণিপথের ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধবর্ণনায় ঐ নাম পাওয়া যায়। তৎপরে জাহাঙ্গীরের সময় এ দেশে যুরোপীয় কামানাদি আসিতে আরম্ভ হয়।

যুরোপে সর্বপ্রথম গ্রীকেরা আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষা করে। গ্রিকের ইতিহাসে জানা যায় যে, ট্রয়যুদ্ধের সময় ব্যাটারিং রাম নামক হর্গ-বিনাশক আগ্নেয় অস্ত্র প্রস্তুত হয় ; কিন্তু হোমরের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। ইহার পূর্বে প্রস্তর-নিষ্ক্ষেপক ও অগ্নিমুখ বাণাদি নিষ্ক্ষেপক বস্ত্র ব্যতীত অস্ত্র কোন আগ্নেয় বস্ত্র ছিল না। বাইবেলে ইজিকিয়েলের গ্রন্থে (IV. 2 XXI. 22 Ez-ekiel) এই যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইজিকিয়েল ৫৯০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। তৎপরে ৪২৯ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে পিলোপনিসিয়ান যুদ্ধে এই যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তৎপরে মধ্যকালে ইহার সামান্যমাত্র ব্যবহার ছিল।

ইহার পর ফিলীপ্পীয়া ব্যালিষ্টি ও ক্যাটাপুল্টা নামক প্রস্তরক্ষেপক এবং বাণক্ষেপক অস্ত্রাদি আবিষ্কার করে। কর্ণেল চেসনি স্বীয় “অগ্ন্যস্ত্রের বিবরণ” নামক গ্রন্থে বলেন, ১২০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বারুদ আবিষ্কৃত হয়। ঐ গ্রন্থেই আবার ১১৩১ খৃষ্টাব্দে মুরগণ কর্তৃক সাল্যামোনিকা নামক কালিবার (calibre) বন্দুক প্রস্তুত হয় বলিয়া লিখিত আছে।

ইংলণ্ডে তৃতীয় এডওয়ার্ডের সৈন্যদলে প্রথম কামান ব্যবহারের কথা জানা যায়। ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে স্কটিশদের বিরুদ্ধে উহা প্রথম ব্যবহৃত হয়।

কোয়ার্ক নামক একব্যক্তি ১৪শ শতাব্দীতে প্রথম কামান

উদ্ভাবন করেন। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে বন্দুক প্রচলিত হয়। পরে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া বর্তমান নশার উপস্থিত হইয়াছে। [বন্দুক ও বারুদ দেখ।]

পূর্বে পূর্বে ভারতে যে সকল কামান প্রস্তুত হইত, তাহাদের আকার প্রায়ই অতি বৃহৎ ; তন্মধ্যে বিজাপুরের কামানটাই উল্লেখ যোগ্য। ক্রমি খাঁ বা হুসেন খাঁ নামক কনট্যাক্টিনোপলবাসী একজন ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দের আন্ধ্রদেশগরে ইহা ঢালিয়া তৈয়ারি করে। যে স্থানে উহা ঢালাই হয়, তাহার চিহ্ন ১৮৩৯ সালেও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। কামানটি প্রস্তুত হইলে হস্তী ও বড় বড় গরু দ্বারা টানিয়া উহাকে বিজাপুরে লইয়া যাওয়া হয়। আন্ধ্রদেশগরে যখন নিজাম সা তৈয়ারী বংশীয়গণ রাজত্ব করেন ; ক্রমি খাঁ তখন মীর আতশ ছিলেন। গোলান্দাজিদের নারককে মীর আতশ বলে। এই কামানটি দীর্ঘে ১৫ ফিট ও ইহার মুখের পরিসর ২ ফিট ৪ ইঞ্চি হইবে। বিজাপুরে গড়ের বুরুজের উপর ইহা স্থাপিত আছে। তদ্রূপ হিন্দুগণ ইহার উপর সিঙ্গুর দিয়া পূজা করে। উপরি বুরুজ নামক বুরুজের উপর ৩০ ফিট লম্বা একটা কামান আছে। গাওঠলপড় পর্বতের উপর ২৭ ফিট দীর্ঘ আর এক কামান আছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যুরের প্রাচীরেও একটা ২১ ফিট লম্বা কামান ছিল।

আক্‌বর শাহের সময়ে এক একটি কামানে ১২ মণ ওজনের গোলা ছোড়া হইত। একটি কামান এক স্থান হইতে অস্ত্র স্থানে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইলে কতকগুলি হস্তী ও সহস্র সহস্র গো-মহিষাদি দ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। কামান সকল তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য দারোগা ও কেরাগী নিযুক্ত থাকিত। আক্‌বর শাহ নিজে একপ্রকার কামান তৈয়ারি করেন ; কোথাও যাইতে হইলে তাহা খুলিয়া ছোট করিয়া লইয়া যাইতে পারা যাইত। তিনি আরও একপ্রকার কোশল উদ্ভাবন করেন যে, তাহা দ্বারা একবারমাত্র অগ্নিপ্রদান করিলে, এক সময়ে ১৭টি কামান একত্র ছোড়া যাইত। তিনিই গজনাল নামক আর একপ্রকার কামান প্রস্তুত করেন, উহা এক একটি হাতী অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে। তাহারই প্রস্তুত আর এক প্রকারের নরনাল নামক ছোট কামান এক এক জন মনুষ্যে লইয়া যাইতে পারিত।

পূর্বে এই অধম বঙ্গদেশে বাঙ্গালীরাও কামান ব্যবহার করিত। চন্দ্রবীণের রাজা বলবীর কল্কর্ণনারায়ণের বৃহৎ পিত্তলের কামানই বঙ্গের প্রাচীন নিদর্শন।

কামান (দেশজ) গোপ, দাড়ি, চুল, নখ প্রভৃতি কাটিয়া ফেলা।

কামানিল (পুং) কার এবং অনলঃ, কামঃ অনল ইব বা।

১ কামরূপ অগ্নি। ২ কামজ্ঞ অগ্নির দ্বারা বাতনা।

কামানশন (ক্লী) কামঃ অনশনঃ যত্র, বহত্রী। ১ ইচ্ছাপূর্বক অনাহারে তপতাবিশেষ। ২ রাগদ্বৈষাদিরহিত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ভোগ।

কামানী (দেশজ) ১ কামানের মজুরি বা বেতন। ২ উপার্জন।

কামান্ন (পুং) কামেন কামোদীপনেন অক্ষয়তি জ্ঞানশূন্তং করোতি, কাম-অন্ধ-নিচ-অচ। ১ কোকিল। ২ (ত্রি, কামেন অন্ধঃ) কামবেগজ্ঞ হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত।

কামান্না (ক্লী) কামঃ যথেষ্টঃ অক্ষয়তি, কাম-অন্ধ-গিচ-অচ টাপ্। ১ কতুরী। ২ (কামেন অন্ধা) কামবেগজ্ঞ হিতাহিতজ্ঞানশূন্তা ক্লী।

কামানী [ন্] (ত্রি) ১ ইচ্ছাভোগী। ২ ইচ্ছামাত্র আহাৰ-লাভকর্তা।

কামাভিকাম (ত্রি) কামস্ত অভিকামো যন্ত, বহত্রী। কাম-ভোগেচ্ছ, কামভোগে অভিলাষী।

কামায়ুধ (ক্লী) কামস্ত আয়ুধমিব। ১ আমের মুকুল। ২ (তৎ অস্ত্রাভি, কামায়ুধ-অচ।) আমগাছ। ৩ কন্দর্পবাণ।

কামায়ু [ন্] (পুং) কামঃ যথেষ্টঃ আয়ুর্ভূত, বহত্রী। গরুড়। (পাক্ষিবানী কাশ্যপি: স্বর্ণকাঃ-

স্তাক্ষ্যঃ কামায়ুর্গরুদ্বান স্বেদাৎ ৭। হেম ২। ১৪৫।)

কামার (দেশজ) কর্ণকার নামক জাতিবিশেষ। পশ্চিমে লোহার নামে খ্যাত।

পশ্চিমবঙ্গ, বেহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে লোহার জাতি কেবল লোহার গঠন করিয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশের কামারগণ প্রধানতঃ লোহার গঠনই গড়িয়া থাকে বটে, কিন্তু অন্ত্যাত ধাতু হইতেও দ্রব্যাদি গড়িতে ইহাদের বিশেষ আপত্তি নাই। কথিত আছে, বিশ্বকর্মার ঔরসে ও শূদ্রাণীর গর্ভে কামার উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে—

“বিশ্বকর্মা চ শূদ্রায়াং বীৰ্য্যাদানং চকার সঃ।

ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিরকারিণঃ ॥ ১২ ॥

মালাকার-কর্ণকার-শখকার-সুবিলকাঃ।” ইত্যাদি।

ব্রহ্মবৈবর্ত ১০ম অধ্যায়।

বিশ্বকর্মা শূদ্রাণীতে বীৰ্য্যাদান করেন, তাহাতে ৯ শিরীর উৎপত্তি, মালাকার, কর্ণকার বা কামার, শখকার বা শাঁখারী ইত্যাদি। [বিশ্বকর্মা কিরূপে শূদ্রাণীতে আসক্ত হন, তাহাবরণ কাঁসারি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পরপরামোক্ত জাতিমালা মতে—

“ভ্রুবায়্যাং কুন্তকারাং কর্ণকং লোহকারকঃ।”

কুমার হইতে ঔড়িকভার গর্ভে লোহকার কামার জাতির উৎপত্তি।

মেদিনীপুর অঞ্চলে এবাদ আছে যে, লোহাঙ্গর নামক এক অঙ্গুর তপঃপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়া দেবভাগ্যের সহিত যুদ্ধে অয়লাভ করে। যুদ্ধে পরাভ হইয়া ইন্দ্রদেব অবশেষে শিবের আশ্রয় লইলেন। লোহাঙ্গর অমর, তাহাকে বধ করা সহজ নহে, একজন মহাদেব এক নতুন মানবের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নতুন নতুন অস্ত্র দান করিলেন। শিবের ডমক হইতে তাহার হাতুড়ি হইল। একটি মৃতদেহের মস্তকের খুলি হইতে তুন্দুল হইল, সর্প হইতে হাপর নির্মিত হইল। এই সকল অস্ত্র লইয়া কামার লোহাঙ্গরের সহিত যুদ্ধে প্রেরিত হইল। কামারকে দেখিয়া লোহাঙ্গর হস্ত করিল, আর বলিল, “তোমার সহিত আবার যুদ্ধ কি করিব।” কামার লোহাঙ্গরকে বলিলেন, “আচ্ছা তুমি কিরূপ অমর আমি তাহা দেখিব, তুমি আমার এই তুন্দুলে প্রবেশ কর, আর আমি জীতা চালাইব।” লোহাঙ্গর তাহাতেই সম্মত হইল। অবশেষে সেই অঙ্গুর হাপরে প্রবেশ করিল। কামার পূর্ণবলপ্রয়োগ করিয়া তাইতে লাগিলেন। অগ্নির বিধম উত্তাপ হইল। লোহাঙ্গর তাহাতে ঘোর লালবর্ণ ও অগ্নির হইয়া গিয়া লোহ হইয়া গেল। তাহাকে পিটিয়া আট প্রকার লোহ প্রস্তুত হইল। সেই আটপ্রকার লোহ হইতে আট প্রকার কামার হইল। যথা ১ম লোহার-কামার, ২য় পিত্তল-কামার, ৩য় কাঁসারি, ৪র্থ স্বর্ণকামার বা সেকরা, ৫ম ঘটরা কামার (ইহার লক্ষ্মীপুজার জন্য ধাতুনির্মিত পেচক ও কাজললতা ইত্যাদি গড়িয়া থাকে); ৬ষ্ঠ চাঁদকামার (ইহার পিত্তলের দর্পণ গড়ে); ৭ম ধোকড়া; ৮ম তামরা। শেষোক্ত দুইপ্রকার কামার মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমভাগে জঙ্গল-মহলে বাস করে।

ঢাকা অঞ্চলে অনেক কামার আছে। কথিত আছে যে, মুসলমান রাজত্বের সময় উত্তরপশ্চিম হইতে তাহারা আনীত হয়। আইন-অকবরীতে উক্ত হইয়াছে যে, বজ্রহা সরকারপ্রদেপে একটি লোহের খনি ছিল। পূর্বে যে স্থানকে বজ্রহাসরকার বলিত আধুনিক ঢাকা তাহারই অন্তর্গত। তথায় লালবর্ণ প্রস্তরবিশিষ্ট বৃত্তিকা হইতে লোহ বাহির করা হইত। তথসকার কামারগণ লোহা বাহির করিবার প্রক্রিয়া জানিত। সেজন্য তাহাদিগকে জারগীর দান করা হইত। ঐ জারগীরকে আহকার বলিত।

এখনকার কামারেরা মাটি হইতে লৌহ বাহির করিবার প্রক্রিয়া জানে না। এখন বাহারী লৌহের কৰ্ম করে, তাহার কলিকাতা হইতে ঢালা লৌহের বাট কিনিয়া আনিয়া তবে গঠন করে। বাক্সালদেশের পশ্চিমবঙ্গাগে ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের লোহার ও অল্পর নামক জাতিগণ মাটি হইতে লৌহ গলাইয়া বাহির করিয়া থাকে। কামারদিগের মধ্যে অনেকেই লেকরার কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু এখনও অর্দ্ধাংশের উপর লোহার কার্যেই নিরুক্ত। গ্রামস্থ কামার একটি লাঙ্গলের কাল তৈয়ার করিয়া দিলে ৪ আড়ি (প্রায় ১ মণ) ধান পাইয়া থাকে। দেবতার স্থানে বলিদানকার্য কামারদিগকেই করিতে হয়। ঢাকা অঞ্চলে কাঁসারি বড় অধিক নাই। এছত্ত কাঁসার দ্রব্যাদি তথায় কামারেরাই গড়িয়া থাকে। সেখানে তাহার ভিন ভাগ ভায়া ও চারিভাগ নতু দিয়া কাঁসা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঘাটা ঘটা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। গোলাম-কারহ নামক এক প্রকার নিষ্কট জাতি আছে, উহারাই প্রায় ঐ সকল দ্রব্যাদি গড়িয়া থাকে। কামারদিগের অনেকে আবার চায়ের কৰ্মও করে। কেহ কেহ অর্থশালী হইয়া তালুক মুলুক করিয়াছে। তবে অধিকাংশই মৌরসী প্রজা। ইহাদের অধিকাংশই অধিক লেখাপড়া শিখে না। কতকগুলি মাত্র ইংরাজী শিখিয়া গবর্ণমেন্টের চাকরি করিতেছে; কেহ বা ওকালতীও করিতেছে, তবে অনেকেই একটু আদটু লিখিতে পড়িতে বা হিসাবপত্র রাখিতে পারে।

কামারগণের মধ্যে বৈষ্ণব কিছু অধিক, তবে শাক্তও অল্প নহে। সকলেই বিষ্ণুকৰ্ম্মকে ভক্তি করে ও ভাস্কর্য্যের শেখরিনে বস্ত্রাদি দিয়া বিষ্ণুকৰ্ম্মার পূজা দেয়। পূজার দিন কেহ কোন কার্য করে না।

কামারগণের জল শুদ্ধ, ইহার নবশাখ মধ্যে পরিগণিত। বঙ্গদেশে কামার কস্তার বিবাহ ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। বরকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। স্ত্রতরাং অবস্থামতে সময় সময় বরকে অধিক বয়সেও বিবাহ করিতে হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে অনেক কস্তার কুমারী-বয়সে বিবাহ হয় না। তবে উহা দ্ব্য বলিয়া তাহাদের জ্ঞান আছে। মেদিনীপুর অঞ্চলে কস্তার বিবাহ অল্প বয়সেই হয় বটে, কিন্তু কস্তা বরহা না হইলে স্বামী-সহবাস করে না। এই প্রদেশে বিবাহের পূর্বে কস্তাকে কাপড় ও মসলাদি পাঠান হইয়া থাকে। ইহাকে “কাপড় পরানো” বলিয়া থাকে। কাপড় পরান হইয়া গেলে কস্তা যদি অপরাপায়ে অর্পিত হয়, তবে

পিতাকে জাতিহৃত বা এক ঘরে হইতে হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে মগহিয়া কামারদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিত আছে। সিংহভূম ও পাঁড়তাল পরগণার বিবাহ-বিচ্ছেদেরও মিরব আছে। এরূপ স্থলে একটি পক্ষীয় বসে। তাহাদের সমক্ষে একটি অখণ্ড শালপত্র ছইখণ্ডে বিভক্ত করা হয়। এরূপে বিবাহভঙ্গ হইলে পর সেই স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

বিহার অঞ্চলে কস্তার বিবাহের সময় ১২ বৎসর ও পাত্রেয় ১৫ বৎসর পর্যন্ত, কিন্তু বর কস্তা অশেপল জাতভিতে দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে বাসকাটা প্রথা চলিয়া থাকে। বিবাহের পরদিবস বর ও কস্তাকে সঙ্গে লইয়া অপর স্ত্রীলোকেরা গান করিতে করিতে বাতীর বাহিরে আইসে। বরের হস্তে তখন একটি ধূরপা মেওয়া হয়। ধূরপা লইয়া বর এক মুঠা বাস কাটিয়া দেয়। তখন কোন রমণী একগাছি ছড়ি লইয়া কিছু দূরে প্রোথিত করিয়া আইসে। তখন বর ও তাহার শ্রালক ছইজনে দৌড়িয়া গিয়া কে অগ্রে ছড়ি গাছটা তুলিয়া লইতে পারে, তাহার জন্ত চেষ্টা করে। দলের মধ্যে বরের পক্ষীর লোক থাকে; তাহার শ্রালকের পথ আশুলিয়া বিলম্ব করাইয়া দেয়, স্ত্রতরাং বরেরই জয় হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধা হইলে অথবা হুচিকিৎস-রোগগ্রস্ত হইলেই স্বামী আবার বিবাহ করিতে পারে, নতুবা নহে।

বঙ্গের ২৪ পরগণা অঞ্চলে কামারগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী ও আনরপুরী। ইহাদের পরস্পর আদানপ্রদান নাই। উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণ-রাঢ়ীর মধ্যে কুলীন ও মৌলিক আছে। পূর্ববঙ্গের কামারদিগের ভূষণাপতি, ঢাকাই ও পশ্চিমে এই তিন শ্রেণী আছে। ভূষণাপতিদিগের মধ্যে নলদিপতি, চৌদসমাজ ও পঞ্চসমাজ নামক বিভাগ মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলে।

মুন্সিদাবাদ অঞ্চলে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, ঢাকাওয়াল ও খোটা এই চারি শ্রেণীর কামার দেখা যায়। ঢাকাওয়াল ঢাকা হইতে ও খোটা পশ্চিম হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। পাবনা অঞ্চলে রাঢ়ী কামারের দল সমাজ ও ও বারেন্দ্র কামারের পঞ্চসমাজ চলিত। নোরাখালি অঞ্চলে বতিকৰ্ম্মকার ও শিখকৰ্ম্মকার এই দুই শ্রেণী আছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান নাই। বৰ্ত্তমান অঞ্চলে বেলাসী, মাহুদপুরিয়া ও কামলা কামার এই তিন শ্রেণী আছে। মাহুদপুরিয়া ও কামলা কামার এই তিন শ্রেণী আছে। মাহুদপুরিয়া ও কামলা কামার এই তিন শ্রেণী আছে। মাহুদপুরিয়া ও কামলা কামার এই তিন শ্রেণী আছে।

হুমানই, বেগালই ও শম্ভুই এই কয় প্রণী আছে। সিংহ-
কুম ও বেহার অঞ্চলে প্রণীবিভাগ বড় দেখা যায় না।

বঙ্গদেশে কামারদিগের গোত্র আছে। সিংহভূম ও
সাঁওতাল পরগণার বর আছে। মাতৃকুলে ৫ পুরুষ ও
পিতৃকুলে ৭ পুরুষ তফাৎ থাকিলে এক গোত্রে বিবাহ হই-
বার বিশেষ আপত্তি নাই। বেহার ও ছোট নাগপুর
অঞ্চলে তাহা হয় না। বিহার অঞ্চলে কামারদিগের ১৭
প্রকার গোত্র আছে। যথা—বাথুয়েট, দরহুরিয়া, গরবেড়িয়া,
গোধনপুরা, হরদুরিয়া, হসনপুরিয়া, জাবালপুরিয়া, জরদইত,
জসিয়ায়, কলইত, কতোসিয়া, মরতুরিয়া, পোখরমিয়া,
রতবরিয়া, সাগি, শোনপুরিয়া, সোখিবার।

বঙ্গদেশে ৫ প্রকার গোত্র চলিত আছে যথা—

অলম্যান, ভরহাজ, কাঙ্গপ, মোফালা ও শাওল্য।
সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণার ১০ প্রকার গোত্র চলিত
আছে। যথা—আলমখাষি, বাঘখাষি, বাঘুনিয়া, কছুচা,
খুজিরিয়া, মজরি, নাগ, নেজিয়া, পোতা ও পুরলিয়া।

বঙ্গদেশে কামারদিগের অরি, দাস, দে, তেওয়ারী এই
কয়েকটি পদবী প্রচলিত।

বেহার অঞ্চলে ইহাদিগকে লোহার বলে। বেহারে
কলগা, মিল্লি, ঠাকুর ও রাউত এই কয়েকটি পদবী দেখিতে
পাওয়া যায়।

সিংহভূম অঞ্চলে কামারদিগকে বিক্ষিনী বলে। জঙ্গল-
মহলে ধোকড়া ও তামরাজাতীর কামারেরা কুচুট ভক্ষণ
করে। একজু ভাল ব্রাহ্মণ তাহাদের কোন কার্য
করেন না। তাহাদের ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র। কোন কোন
কামারস্ত্রীলোকেরা নাকে নখ পরে না। কথিত আছে,
পরিবেশনের সময় পরিবেশনপাত্রের নাকের নখ খুলিয়া
পড়ে। সেই অবধি নখ পরা উঠিয়া যায়। বঙ্গদেশে কামারের
সংখ্যা ৪০,৯,৯৫৫ জন হইবে।

কামার আর লোহার প্রায় একই জাতি বলিতে পারা
যায়। বেহার, ছোট নাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গে লোহারদিগের
বাস। বেহার অঞ্চলে লোহারগণ ছুতারের কার্য্য ও করিয়া
থাকে। অনেকে আবার কৃষিকার্য্যেও নিযুক্ত থাকে।
সাঁওতাল পরগণার পুরুষেরা কৃষিকার্য্যের জন্ত মাঠে যায়,
আর স্ত্রীলোকেরা লোহার কর্ম্ম করে। পশ্চিমবঙ্গে বাহার
লোহার কর্ম্ম করে, তাহার বরং কৃষিকর্ম্ম করে, কিন্তু কখন
ছুতারের কাজ করে না। বেহারে লোহারগণ কৈরী ও
কুড়ম্বদিগের সহিত এক প্রণী মধ্যে গণ্য; তাহাদের জল
তৃষ্ণ। কিন্তু বঙ্গের পশ্চিমপ্রদেশে তাহাদের জল অস্পৃশ্য।

ভবার উহার বাউরী ও বাশির সহিত সমশ্রেণী। লোহার-
দিগের মিল্লী, রাউত ও ঠাকুর এই তিনপ্রকার পদবী
আছে। বেহারে লোহারদিগের কনৌজিয়া, কোকাস, নখ-
ইরা, কামারকরা, মাহর বা মাহদিরা, মাথুরিয়া ও কাথিরা
এই কয় প্রণী আছে। এ সকলের মধ্যে কনৌজিয়া সক-
লের উচ্চ বলিয়া গণ্য। ইহার বে সে লোকের কতাকে
বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের ত্রিশটি গোত্র আছে।
যথা—অশেষ মেয়াম, উধমতিয়া, কমতরিয়া, কনতিয়া,
কাঙ্গপ, কঠার, কথোতিয়া, কিশোরিয়া, কুরুর কুশার, কুলখরি
মল্লিক, গঙ্গভির, চৌলাহা, দমদরিয়া, চকনিয়া, পাহলমপুরী,
পাঁড়ে, বাসবরিয়া, বেগসরিয়া, বর্মান, বিন্‌করী, হুমিচর,
ভাকুর, রানে, সত্রি, সামিল ঠাকুর, সংগ্রী ঠাকুর, সরবৎ,
সোনমন, সুপাহা ও সাগখবি। কনৌজিয়ারা বলে তাহার
বিখ্যামিজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহার ঠাহার পুজাও
করিয়া থাকে। কোকাসপ্রণী সম্ভবতঃ বরহি হইতে
স্বতন্ত্র প্রণী।

বরহিগণ ছুতারের কর্ম্ম করে। তাহারদিগের মধ্যে বাহার
লোহার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই হয়ত কোকাস
হইয়া থাকিবে। কনৌজিয়া ও মাথুরিয়াগণ সম্ভবতঃ কনৌজ
ও মথুরাপ্রদেশ হইতে আসিয়া থাকিবে। মাহদিরাগণের
জল ওদ্ধ। ইহার উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়াছে।
কামিয়াগণ নেপাল হইতে আসিয়াছে। তাহাদের জল ওদ্ধ
নহে। তাহাদের অনেকেই মুসলমান হইয়াছে।

সাঁওতাল পরগণার লোহারদিগের বীরভূমিয়া, গোবিন্দ-
পুরিয়া, শরগরহিয়া এই কয়েকটি প্রণী আছে। বীরভূমিয়া-
গণ বীরভূম হইতে, গোবিন্দপুরিয়াগণ মানভূমের উত্তর
গোবিন্দপুর হইতে, শরগরহিয়াগণ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত
শরগরহিয়া পরগণা হইতে আসিয়াছে। লোহারডাকার
লোহারদিগের মনখাল তুরলা, মুণ্ডলোহার, সদলোহার,
শিঙটবংশী লোহারিয়া, লহনডিয়া ও মানভূমে লোহার মানবি,
দণ্ডমানবি ও বাশি লোহার এই কয়েকটি প্রণী আছে।
এতদ্ব্যতীত বাঁকুড়া জেলার অঙ্গরিয়া, গোবরা, খেতিয়া,
পানসিলি নামক প্রণী আছে।

ছোট নাগপুরের লোহারদিগের মধ্যেও অনেকগুলি প্রণী
আছে। যথা—ইন্দ্রয়ার, উদয়ার, কচুয়া, কৈখোয়ার,
কৈসলে, কমল, কন্দ, কনৌজিয়া, করহর, করকোশ, করকুব,
কোয়া, করকেতা, কিসনত, কোহিরা কল, কুহয়ার,
গৈস্তোয়ার, গোলবার, গঙ্গ, চৌরিয়া, চুঙ্গার, জলবার,
তপোর, তির্কি, দৈমতা, হুমডিয়া, ধান, নাগ, পাড়,

পুরতি, ফুটকা, বাশ, বান, বশো, বাশ, বরোহা, বেলওয়ার, বেশড়া, বুকর, তেজরাজ, কুতকুমার, বোজা, মেলওয়ার, মজইরা, মঘনিয়া, মহিলি, মহিলিমুণ্ডা, মজু, মুজিয়ার, রেখা, কণ্ডা, ললিহার, লুমরিয়াসন, সাক, সাকলওয়ার, সৌর, সেমানোহিজিয়ার, সোনারোমে, সোনবেধরী, সনমাঝিরা, সোনটিকি, সুইয়া, হর্দি, হস্তর, হস্তি ও হেমরম।

কামিয়ারগণ ব্যতীত বেহারের লোহারগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। মৈথিল ব্রাহ্মণগণই তাহাদের কর্মদি করিয়া থাকে। ছোট নারপুর ও বজের পশ্চিম অংশের লোহারগণ হিন্দু। তাহারা ললিগোরই, বরক ঠাকুর, ফুলে গৌসাই, তাহু, ডরভা, মনসা ও মোহনগিরিপ্রভৃতির পূজা করে। আবার, অগ্রহারণ ও মাঘ মাসে সোমবার ও মঙ্গলবারে মোহনগিরির পূজা হইয়া থাকে। পূজার ছাগবলি হয়। সকলে প্রসাদ আহার করে। বাকুড়া ও সাঁওতাল পরগণার লোহারদিগের স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ আছে। লোহারভাঁকার পাহান, মতি ওঝা বা সোখাগণ পূজাদি সম্পন্ন করে। সমলোহারগণের বিবাহে গ্রামস্থনাপিতগণ পুরোহিতের কর্ম করে।

পশ্চিমবঙ্গে ও ছোটনাগপুরে লোহারদিগের বিবাহে পণ লাগে। পুরুষেরা যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে। নীচ জাতিদিগের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদও হইয়া থাকে। বিবাহ অন্ন বরসে হয়, অধিক বরসেও হইয়া থাকে। কিন্তু বেহার অঞ্চলে অন্ন বরসে বিবাহ দেওয়াই প্রথা। পণও আছে। বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তানাদি না হইলে পুরুষেরা আবার বিবাহ করিতে পারে। কনৌজিয়াদিগের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের নিয়ম নাই। অস্ত্রাবর্ণে পক্ষান্তরে মত লইয়া স্ত্রী বা স্বামী-ত্যাগের নিয়ম আছে। বিধবাবিবাহ নীচ-শ্রেণীতে কোথাও কোথাও প্রচলিত, কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীতে আদৌ নাই। বজ ও বেহারে লোহারের সংখ্যা ২,৬২,৩৫৭ জন হইবে।

নেপালের কামারদিগকে কামি বা কামিয়া বলে। সম্ভবতঃ ইহারা ভারত হইতেই নেপালে গিয়া থাকিবে। এক্ষণে বজের স্থানে স্থানে ইহাদিগকে দেখা যায়। দার্জিলিংএ ইহাদের সংখ্যা ৩৭২৩ জন, চম্পারণে ১০৭ জন, ভাগলপুরে ৯ জন, ছোটনাগপুরের করদরাজ্যে ৫৮ জন আছে। কামিগণ হিন্দুধর্মাবলম্বী। তাহারা কালীপূজা করে, বিশ্বকর্মা-কে আপনাদিগের ঈষ্টদেবতা বলিয়া জানে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী মধ্যে কুর্গাই, অনাঙ্গা, খোসাই, দারমত্তা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা প্রচলিত। কুর্গাইকে প্রায় সকলেই ভক্তি করে। ইহাদের ৩৮টি ঘর। এই ৩৮ ঘর বৎসরে হুইবার করিয়া কুর্গাইএর পূজা দেয়। এই পূজার ছাগ, মেহ,

ফুটুট প্রভৃতির বলিদান হয়। আর প্রতি পূর্ণিমায় সিন ধূপ ও ধূনা দেওয়া হয়। গমাইলি, শাপখর ও বরদাল শ্রেণীর কামিগণ খোসাইএর পূজার শ্রুত বলি দেয়। ইহাদের মধ্যে গজদের ও ধরকা-বাঁহু শ্রেণীর কামিগণ অনাঙ্গা ও দারমত্তা দেবতার উপাসনা করে ও খেত ফুটুট বলি দেয়।

কামিদিগের পূজাদির জন্ত ব্রাহ্মণ নাই। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি একটু অবিকথার্থ্যরস্ক হয়, সেই খুঁশাদি সম্পন্ন করে। কামিরা গো-মাংস ভক্ষণ করে না; কিন্তু শূকর-মাংস ও কুকুট-মাংস ইহাদের খাদ্য, অন্যপানেও ইহাদের বিলক্ষণ আসক্তি।

মৃত্যু হইলে ইহাদের শবদাহের নিয়ম ঠিক নাই। দেহ কখন দগ্ধ হয়, কখন বা নদীতে তাসাইয়া দেওয়া হয়, কখন বা গোর দেওয়া হয়। দগ্ধদেহের অঙ্গার লইয়া গঙ্গাজলে অর্পণ করিবার প্রথাও আছে। সংস্কার হইয়া গেলে, মৃতের আত্মীয়বর্গ মাথা মুড়াইয়া দাড়ি, গোপ, ভুরু পর্যন্ত কামাইয়া কেলে। তাহার পর একখানি ধুতি মাত্র পরিধান করিয়া মস্তকে একখণ্ড শাদা কাপড় বাধিয়া রাখে ও এক সন্ধ্যা আহার করে। আহারে মাংস, লবণ বা স্নাত কিছুই থাকে না। কখনো শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করে না বা অধিক কথাও কহে না। একাদশ দিবসে আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। বহুবিধ আহারেরও আয়োজন হয়। আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে সকল প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া একখানি পাতা সাজান হয়। একজন আত্মীয় সেই পাতা ও নিজের আহারীয় সামগ্রী লইয়া একটু অন্তরে বনের তিতর যায়। তথায় সেই সাজান পাতাখানি ভূমিতে রাখিয়া নিজে দাঁড়াইয়া দেখে; যখন কোন কীট পতঙ্গ অথবা মাছি হউক আসিয়া সেই পাতে বসে, তখন সেই আত্মীয় একখানি প্রস্তর সেই পাতে চাপা দিয়া নিজের জন্ত যে আহারীয় লইয়া আসে, তাহাই আহার করিতে বসে, তাহার পর বাটীতে প্রত্যগমন করিয়া নিমন্ত্রিত জাতি কুটুমকে বলে যে মৃতের প্রোক্তা আসিয়া আহার করিয়া গিয়াছেন। তখন বাটীতে ভোজন আরম্ভ হয়। যাহার অপঘাতে মৃত্যু হয়, বা যাহার সন্তানাদি না হয় তাহার একপ জাঁকাদি হয় না।

কামিরা নিজবংশীয়দের অথবা মাতুলবংশীয়দের বিবাহ করিতে পারে না। কতারা বরহা হইলে তবে বিবাহিতা হয়। বিবাহের পূর্বে বরকন্ডার ধরম্পরে কখন কখন

দেখাওনা হওয়াও প্রচলিত আছে। অধিক মাথা-
মারি নিষিদ্ধ। বিবাহ রাজিকালে সম্পন্ন হয়। একটি
মুক্তিকার পায়ে অগ্নি থাকে। তাহার একদিকে বর ও অপর
দিকে কন্ডাকে দাঁড়াইতে হয়। তাহার পর উভয়ে সেই
অগ্নিকে দক্ষিণে রাখিয়া ৭ বার প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণের
পর কন্ডার হস্ত বরের হস্তে স্থাপিত করা হয়। কন্ডার
শিখা মাত্র তখন করেকটি কুশ, বিষপত্র, তাম্র ও তুলসী
তাহার উপর রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর বর
কন্ডারসীমন্তে সিন্দূর দিয়া গলায় একছড়া মালা (পটী)
পরাইয়া দিলে বিবাহের ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়।

পুরুষ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু বড়
কাহাকেও দুইটার অধিক বিবাহ করিতে দেখা যায় না।
বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহে পূর্বস্বামীর
জ্যেষ্ঠভ্রাতাসম্পর্কীয় কাহারও সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। বিধবা-
বিবাহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না। মন্ত্রাদিও উচ্চারিত হয় না।
বর কন্ডারসীমন্তে সিন্দূর দিয়া গ্রীবাদেশে মালা পরাইয়া
দিলেই বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। তাহার পর উভয়পক্ষে
আত্মীয়গণের ভোজন হইলে বিবাহোৎসব সমাপ্ত হয়।

বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মও আছে। পাংড়ো নামক
একপ্রকার ফল সিংকো নামক একখণ্ড কাঠ দিয়া বিধও
করিলেই বিবাহ-ভঙ্গ হয়। পাহাড় অঞ্চলে এই ক্রিয়ার নাম
সিংকো-পাংড়ো। ইহাতে পুরুষদেরই অধিকার আছে, তবে
স্বামী যদি জীৱ প্রতি অভ্যাস করে, তবে জীও স্বামীকে
পরিভ্যাগ করিতে পারে। তাহার পর জী যদি অপর
কাহাকেও বিবাহ করে, তবে পূর্ব স্বামী বিবাহের সময়
যে পণের টাকা দিয়াছিলেন, নূতন স্বামীকে তাহা দিতে
হয়। বিবাহবিচ্ছিন্ন-পত্নীগণের বিবাহ বিধবাবিবাহের স্থায়
সম্পন্ন হয়। কামিদিগের অপেক্ষা যদি কোন উচ্চজাতীয়
লোক কোন কামি-রমণীকে উপপত্নী করে আর সে জন্ত যদি
তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাহা হইলে কামিগণ
পঞ্চায়তের মত লইয়া তাহাকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া লয়।

কামিদিগের ৩৮ ঘরের নাম, যথা—কেৱালা, কতিচি-
ওরে, ধরকাবায়ু, খাতি, গজমের, গদাইলি, গদাল, গহৎ-
রাজ, বতানি, ঘরতিঘোরে, ঘামদোতলে, জারকামি, তিরুয়া,
থাপালী, দরনাল, দিয়ালী, ছধরাজ, ছরাল, দেবপাঠী, পর্কত,
পোখরেল, পোটেল, বরাইলি, মল্লরাতি, রসাইলি, রহপাল,
রায়দান, রিজাল, রুজাল, লাকাদে, লোকাজি লোহাণ্ডণ,
লোহার, লাপকোটী, লানখর, সিকাওরে, সিকিওড়ি,
সেজুসুয়াল।

পঞ্চাব ও ভারতের উত্তর পশ্চিমপ্রান্তে কাঁয়ারভার ককর
ভাবে অবস্থান করে। অন্ত কোন জাতির সহিত আদান
প্রদান নাই। এ প্রদেশে কোথাও কোথাও লোহারদিগকে
কৃষিকার্য করিতে দেখা যায়। বেরার ও মধ্যপ্রদেশে ইহার
ছুতারের কার্যও করিয়া থাকে; বেশপক্ষা প্রদেশে বাহার
বাস করে তাহাদিগকে “খাতী” কহে। খাতী লোহারগণ
বেরার ও মধ্যপ্রদেশের লোহারগণের সহিত আদান
প্রদান করে না। বোম্বাইপ্রদেশে মরাঠিলোহার, কুন্ডলী
লোহার প্রভৃতি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। এদেশের
লোহারগণ লাকলের কাল ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে।
কাঠিবাড় প্রদেশে লোহারগণের বাস স্থান নাই। তাহার
আদমী হইতে ওয়াগড়, ও উমিরার ইয়া কাঠিবাড় বান্ধ,
আবার ঐরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আদমীতে আসে। তাহার
সাধারণের কাজকর্ম করিয়া বেড়ায়। ইহার হিন্দু, তবে
মুসলমানের রামদাপীরকেও ভক্তি করে। ইহাদের পুরুষের
বিবাহে পণ লাগে। ওজরাটেও লোহার আছে। রাজপুত-
নার ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বুদ্ধির লোহারগণ
খনিজপদার্থ গলাইয়া লোহা বাহির করে।

কাঁয়ারণ্য (রী) কামং শোতনং অরণ্যং কর্মধা। ১ মনো-
হর বন। ২ কন্দর্পবন।

কাঁয়ারশাল (দেশজ) কর্মকারগণ যেখানে লোহ পোড়ায়।

কাঁয়ারশাল (দেশজ) কর্মকারের দোকান।

কাঁয়ারি (পুং) কামন্ত অরি: শক্রঃ, ৬তৎ। ১ মহাদেব।

২ বিটমাক্ষিক নামক ধাতুবিশেষ।

(“তাপ্যো নদীজ: কামারিত্তারারিক্ৰিটমাক্ষিকঃ”। হেমচ। ১২১।)

কামার্ত্ত (ত্রি) কামেন ঋত: পীড়িতঃ, ৩তৎ। কামপীড়িত।

(“কামার্ত্তা হি প্রকৃতিরূপণাশ্চেতনাচেতনেনু”। মেঘ দূ. ৫।)

কামার্ত্তী [ন] (ত্রি) কামং অর্থয়তে প্রার্থয়তে, কাম-অর্থ
পিচ-গিনি। ১ কামপ্রার্থী। ২ অতীষ্টপ্রার্থী।

কামালিকা (স্ত্রী) কামং অলতি ভুবরতি, কাম-অল-গুল
টাপ্-অত ইষম্। মদ্য।

কামালু (পুং) কামং যথেষ্টং অলতি পুশ্ববিকাশেন পর্য্য-
প্রোতি, কাম-অল্-উণ্। ১ রক্তকাকমগাছ। ২ (ত্রি)
অত্যন্ত কামুক।

কামাবচর (ত্রি) কামং যথেষ্টং অবচরতি, কাম-অব-চর-অচ্।
যেচ্ছাচারী।

কামাবতার (পুং) কামন্ত অবতারঃ, ৩তৎ। কামদেবের
অবতার, প্রহ্লাদ; শ্রীকৃষ্ণের কল্লীপার্শ্বে প্রহ্লাদ অবতীর্ণ
হইয়াছিলেন।

কামাবশারিত্তা (জী) কামেন বেচ্ছা অবশারতি, বচিতে
পদার্থীন্ নিশ্চিনোতি, কাম-অব-শী-নিচ-গিনি; তত্ত ভাবঃ
তল। সত্যসঙ্করতা।

কামাবসার (পুং) কামেন বেচ্ছা অবসারঃ বচিতে পদা-
র্থানাং হিরীকরণম্। ইচ্ছামত স্বীয়চিতে পদার্থসমূহের
নিষ্কর করা।

কামাবসারিত্তা (জী) কামাবসারিনঃ সত্যসঙ্করকারিণো
ভাবঃ, কামাবসারিন-তল। সত্যসঙ্করতা, অগ্নিমানি অষ্ট ঐশ্বৰ্য্যের
মধ্যে ইহাও একটি যোগিগণের ঐশ্বৰ্য্য বলিয়া পরিগণিত।

(“অগ্নিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রোকাম্যঃ গরিমা তথা।

ঐশিষ্যক বশিষ্যক তথা কামাবসারিত্তা ॥”)

কামাবসারিত্ত্ব (জী) কামাবসারিনো ভাবঃ, কামাব-সারিন্
ব (তত্তভাববতলো। পা ৪।১।১১৯।) সত্যসঙ্করতা।

কামাবসারী [ন] (জি) কামান্ বেচ্ছা অবসারিত্ত্বং
লীলমন্ত, কাম-অব-সো-গিচ-গিনি। সত্যসঙ্কর, ইচ্ছাহসারে
যিনি পদার্থ-সমূহের নিষ্কর করিতে পারেন।

কামাশন (জী) কামঃ যথেষ্টং পর্যাপ্তং বা অশনং ভোজনম্,
কৰ্ধধাং। ১ ইচ্ছামত ভোজন। ২ পর্যাপ্ত ভোজন।

কামাশ্রম (পুং) কামঃ রমণীয়ঃ আশ্রমঃ কৰ্ধধা। রমণীয়
আশ্রম।

কামাশ্রমপদ (জী) কামঃ মনোজ্ঞঃ আশ্রমপদম্, কৰ্ধধা।
রমণীয় আশ্রমস্থান।

কামাসক্ত (জি) কামেন আসক্তঃ, ৩তৎ। ১ কামরিপুর
বলীভূত। ২ অভিলাষমাত্রের বলীভূত।

কামাসক্তি (জী) কামে আসক্তি পিঙ্গা, ৭তৎ। কামরিপু-
জ্ঞত কার্য্যমায়ে ইচ্ছা।

কামাসন (জী) কামমত্ততি ক্ষিপতি অনেন, কাম-অস-স্মৃট্।
রুদ্রযামলকথিত আসনবিশেষ। গুরুভাসন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি
ভূমিতে স্পর্শ করাইলেই কামাসন হয়। [গুরুভাসন দেখ।]
(“অথ কামাসনং বক্ষ্যে কামমর্দনহেতুনা।

গুরুভাসনমাকৃত্য কনিষ্ঠাং স্পৃশেদুভবি ॥” রুদ্রযামল।)

কামি (পুং) কাময়তে কম-গিঙ-ইণ্। ১ কামুক। ২ (জী)
কন্দর্পপত্নী, রতি।

(কামি নী কামুকে রত্যাং জী। মেদিনী।)

কামিক (পুং) কামঃ অস্তান্তি, কাম-ঈন্। ১ কারণ্ডব পক্ষী।
কামেন নিবৃত্তম্, কাম-ঈঞ্। ২ কামজন্তু কার্য্যাদি। ৩

(কামাধিকারেণ কৃতো গ্রহঃ) হোমাত্রি-প্রণীত গ্রহবিশেষ।

কামিকী (জী) কামিক-ঈপ্। ১ কারণ্ডবপক্ষী। ২
কামনাভক্ত কার্য্যাদি।

(“তত্ত ইষ্টং চকারবিত্তং বৈ পুত্রকামিকীম্।”

বহাভারত অহুশান।)

কামিজ (আরব্য) জামাবিশেষ।

কামিত (জি) কম-গিচ-ক্ত। ১ অভিলষিত। ২ প্রার্থিত।

কামিতা (জী) কামো হত্যত, কাম-ইনি; তত্ত ভাবঃ তল।
১ কামুকতা। ২ অভিলাষ।

কামিনী (জী) কামঃ অতিশয়েন অন্ত্যতাঃ, কাম-ইনি-ঈপ্।

১ অতিশয়কামযুক্তা জী। ২ জীমাত্র। ৩ হুম্বু জী।

৪ তীক জী। ৫ বন্দা, পরগাছা। ৬ দারুহরিত্তা। ৭ মদ্য।

৮ কামদেবের শক্তিবিশেষ।

কামিনীপ (পুং) কামিতাঃ কামিনী-প্রিয়াজনস্ত ঈশঃ সাধকঃ,
৬তৎ। শক্তিনাগাছ। ইহাভারা একরূপ অল্পন প্রস্তুত হয়,
তাহাই পূর্বকালে কামিনীগণ চক্ষে ব্যবহার করিতেন।

কামী [ন] (পুং) অতিশয়েন কাময়তে, কম-গিঙ-গিনি।

১ কামুক। ২ চক্রবাক। ২ পায়রা। ৩ চড়ুই। ৪ চন্দ্র।

৫ শব্দ-নামক ঔষধবিশেষ। ৬ সারসপক্ষী। ৭ বিষ্ণু।

(“কামদেবঃ কামপালঃ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ।”

মহাভারত ১৩।১৪৯ অঃ।)

কামীন (পুং) কামঃ অহুগচ্ছতি, কাম-খ (প্ৰবোধরাদিষাৎ
সাধু।) ১ রামস্থপারি। ২ কামদেবের অহুগত। ৩ কাম-
রিপুর বলীভূত, কামুক।

কামীল (পুং) কামঃ অহুগচ্ছতি, কাম-খ (প্ৰবোধরাদিষাৎ
সাধুঃ।) ১ রামস্থপারি। ২ কামদেব বা কামরিপুর অহুগত।

কামুক (জি) কাময়তে, কম-উকঞ্ (লঘ-পত-পদ-স্মৃ-
বৃ-হন-কম-গম ভূত উকঞ্। পা ৩।২।২৫৪।) ১
কামী; ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কমিতা, অমুক, কল্প, কাম-
য়িতা, অতীক, কমন, কামন, অতিক। (পুং) ২ অশোক
গাছ। ৩ চড়াই পাখী। ৪ অতিমুক্তক লতা।

(“কামুকঃ কমলেশোক-পাদপে চাতিমুক্তকে।” মেদিনী।)

কামুককান্তা (জী) কামুকানাং কান্তা প্রিয়া, ৬তৎ। অতি-
মুক্তলতা, মাধবীলতা।

কামুকতা (জী) কামুকত ভাবঃ, কামুক-তল। অত্যন্ত
কামযুক্তের কার্য্যাদি।

কামুকত্ব (জী) কামুকত ভাবঃ, কামুকত্ব। অত্যন্ত কাম-
পীড়িতের কার্য্যাদি।

কামুকা (জী) কম-উকঞ্-টাপ্। ১ ইচ্ছাবতী। ২ ভোগা-
ভিলাষবিশিষ্টা। ৩ রমণেচ্ছাযুক্তা।

কামুকায়ন (পুং) কামুকত্ব অপত্যম্ পুমান্, কামুক-কচ্
(নড়াদিত্যঃ কচ্। পা ৪।১।১১৯।) কামুকের পুত্র।

কামুকী (জী) কামুক-ভীষ (জানপদকুণ্ডগোপেতি। পা ৪। ১। ৪২।) মৈথুনোচ্ছাবিশিষ্ট। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কুশভক্তী।

কামেশ্বর (পুং) কামানং কেশ্বরঃ ৩৩৭। পরমেশ্বর।

কামেশ্বরী (জী) কামানং ভোগবিষয়াণাং প্রদায়িন্ধেন কেশ্বরী, ৩৩৭। ১ ভৈরবী বিশেষ। ২ কামাখ্যার পঞ্চমূর্তি-মধ্যে মূর্তি বিশেষ।

(“কামাখ্যা ত্রিপুরা চৈব তথা কামেশ্বরী শিবা।

সারদাহং মহোৎসাহা কামরূপশুভৈবুতা ॥”

কালি পুং ৬১ অঃ।)

কালিকাপুরাণোক্ত ধ্যানপাঠে কামেশ্বরীমূর্তির এইরূপ বর্ণনা জানিতে পারা যায়। যথা—“কৃষ্ণবর্ণ, স্তম্ভাকৃষ্ণকেশ, ছয়মুখ, দ্বাদশহস্ত, অষ্টাদশচক্ষু, প্রত্যেক মন্তকেই অর্ধচন্দ্র, বক্ষোদেশে মণিমুক্তাদিনির্মিত-মালা, দক্ষিণহস্ত-সমূহে পুস্তক, সিন্ধুহস্ত, পঞ্চবাণ, খড়্গ, শক্তি ও শূল। বামহস্তসমূহে অক্ষমালা, মহাপদ্ম, কোদণ্ড, অভয়, চর্ম্ম ও পিনাক। জ্ঞান, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য, এই ছয়দিকে ছয়মুখ অবস্থিত; মুখ সকল যথাক্রমে গুরু, রক্ত, পীত, হরিত, কৃষ্ণ ও বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। এই মুখ সকল পৃথক পৃথক দেবীর মুখ বলিয়া কীর্তিত—গুরুমুখ মাহেশ্বরীর, রক্ত কামাখ্যার, পীত ত্রিপুরার, হরিত সারদার, কৃষ্ণ কামেশ্বরীর এবং বিচিত্র চণ্ডদেবীর। প্রতি মন্তকেই কেশ সংযত। পরিধান বিচিত্রবস্ত্র অথবা ব্যাঘ্রচর্ম্ম। সিংহের উপরে খেতশব, তাহার উপরে রক্তপদ্ম, তাহার উপরে এই দেবী উপবিষ্ট। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসিদ্ধির জন্ত এইরূপ কামেশ্বরী মূর্তি ধ্যান করিবে।”

(কালিকা পুং ৬৩ অঃ।)

কামোদ (পুং) রাগিণী বিশেষ; বেলাবলী ও গোড়ের সংযোগে ইহার উৎপত্তি হয়। ইহাতে ধ নি স ঙ্গ গ ম প এই কয়েকটি স্বরগ্রাম আছে। ধৈবত ইহার বাদী, এবং পঞ্চম সঙ্গী। করুণ ও হাঙ্গরদের সময় ইহা গান করিতে হয়। প্রথম অর্ধপ্রহর এই রাগিণী গাহিবার সময়।

কামোদক (ক্লী) কামেন স্বেচ্ছয়া দত্তং উদকম্, মধ্যলোং। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে ইচ্ছাহুসারে যে জল প্রদত্ত হয়। চূড়া-করণের পর মৃত্যু হইলে, তাহারই উদকক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহার পূর্বে বাহাদিগের মৃত্যু ঘটে, তাহাদের উদকক্রিয়ার বিধি নাই, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশে কামোদক প্রদান করা যায়। (লোগাকি।)

কামোদকল্যাণঃ (পুং) কামোদ ও কল্যাণমিশ্রিত রাগিণী।

কামোদীমট (পুং) কামোদ ও মটমিশ্রিত রাগ।

কামোদা (জী) কুৎসিতো মোদো বভাঃ, বহবী। রাগিণী-বিশেষ।

কামোদী (জী) কুৎসাই ও কুটমোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ। স ঙ্গ গ ম প ধ ০ এই কয়েকটি ইহার স্বরগ্রাম।

কাম্পিল (পুং) কাম্পিলঃ নদীবিশেষঃ, তত্ত্ব অদূরে ভবঃ, কাম্পিল-অণ্। কাম্পিলা নামক দেশবিশেষ। হরিবংশে এই দেশ পাঞ্চালের দক্ষিণাংশ বলিয়া বর্ণিত আছে।

কাম্পিলা (পুং) কাম্পিলে জাতঃ, কাম্পিল-বাণ্। ১ শুভা-রোচনী নামক স্নগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। ২ (কাম্পিলায় অদূরে ভবঃ, কাম্পিলা-ণ্য) জনপদবিশেষ, বর্তমান নাম কাম্পিল। [কাম্পিল দেখ।]

“মাকন্দীমথ গন্ধারাতীরে জনপদামৃতম্।

সৌহৃদ্যবাৎসর্য্যে নীনমনাঃ কাম্পিলায় পুরোত্তমম্ ॥”

৩ লতাবিশেষ।

[মহাভারত ১। ১০৯।

কাম্পিলায়ক (ত্রি) কাম্পিলো জাতঃ, কাম্পিলা-বুজ্। (পা ৪। ২। ১২১।) ১ কাম্পিলাদেশজাত। ২ (পুং) কমলা-গুড়ী নামক স্নগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

কাম্পিল (পুং) কাম্পিল-অণ্, (নিপাতনাৎ সাধুঃ) কমলা-গুড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাম্পিল, কাম্পীল, কাম্পিল ও কাম্পিলা।

কাম্পিলক (ক্লী) কাম্পিল-স্বার্থে-কন্। কমলাগুড়ী।

(“চূর্ণং কাম্পিলকং বাপি তৎপীতং গুটিকাকৃতম্।” সূত্রতঃ।)

কাম্পিলক (ক্লী) কাম্পিলক-টাপ্। কমলাগুড়ী।

কাম্পীল (পুং) কাম্পিল-অণ্ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ কমলা-গুড়ী। ২ কাম্পিলানগর। ৩ পলাশগাছ।

কাম্পীলক (পুং) কাম্পীল-স্বার্থে কন্। ১ কমলাগুড়ী। ২ কাম্পিলানগর। ৩ পলাশগাছ।

কাম্পীলবাসী [ন] (পুং) কাম্পীলে কাম্পিলাদেশে বাসো হস্তান্তি, কাম্পীল-বাস-ইনি। কাম্পিলাদেশবাসী।

কাম্পল (পুং) কাম্পলেন আবৃতঃ, কাম্পল-অণ্। কাম্পলদ্বারা আবৃত রথ।

(অথ কাম্পলবান্ধন্য স্তৈস্তৈঃ পরিবৃত্তে রথে। হেম ৩। ৪১৮।)

কাম্পলিক (পুং) বৈদ্যাশাস্ত্রোক্ত ভূবিশেষ; দধির মাত ও অন্নদ্রব্যের সহিত যুগপৎভুক্তির ভূব প্রস্তুত করিলে, তাহাকেই কাম্পলিক ভূব কহে। ইহা বেশ কটিকারক।

(“দধিমদ্রসিক্তং ভূবঃ কাম্পলিকঃ কৃতঃ।” সূত্রতঃ।)

কাম্পলিক (পুং) কন্য়ঃ শম্ভং ভূষণেন শিষ্টমতঃ, কাম্পলিক্। শম্ভকার, শাঁধারী।

কান্দুকা (জী) কুশিতং অথ বজাঃ, কু-অধু-কপ্তাণ, কো:
কাদেশঃ। অধগুতা।

কাষে, ইহার দেশীয় নাম খন্ডাং। খন্ড বা ত্তজজীর্ণনামে
মহাদেবের একটি তীর্থ আছে, তাহা হইতেই খন্ডাং নাম
হইয়াছে। এই রাজ্য গুজরাটের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। অক্ষা
২২° ৯' ও ২২° ৪১' উঃ, দ্রাঘি ৭২° ২০' ও ৭৩° ৫' পূঃ। পূর্বে
বরদা রাজ্যের অন্তর্গত বড়সার ও পিতলাদ প্রদেশ, দক্ষিণে
কাষে উপসাগর; পশ্চিমে শাবরমতী নদীর পরই আন্ধ্রাবাদের
সীমা। কাষের সীমার মধ্যে ইংরাজঅধিকৃত কয়েকখানি ও
বরদার গুইকুমারের অধিকৃত কয়েকখানি গ্রাম আছে। এই
প্রদেশের পূর্বদিকে মহী ও পশ্চিমে শাবরমতী নদী আছে।
ছুইটী নদীতেই জোরারভাটা খেলে বলিয়া ইহাদের জলও
কতক দূর অবধি লোনা। কাষের ভূমি সমতল। মধ্যে মধ্যে
খনন করিলে, অন্নমিনেই উহার জল লোনা হইয়া যায়।
সেই জল সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, নহিলে গায়ে
কোড়া হইয়া থাকে। কাষের ভূমি সমতল। মধ্যে মধ্যে
আম, তেঁতুল, নিম, বট প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে পাওয়া
যায়। ভূমিপরিমাণ ৩৫০ বর্গ মাইল। ইহাতে ২টি নগর ও
৮৩টি গ্রাম আছে। ইহাতে ৭০,৭০৮ হিন্দু, ১২৪১৭ জন
মুসলমান ও ২৯৪৯ জন জৈন ও পারসী প্রভৃতি অপরাপর
জাতি আছে। এ দেশে গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী এই দুই
ভাষাই প্রচলিত।

কথিত আছে যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে পারস্ত-
দেশ হইতে পারসিক জাতি কয়েকখানি জাহাজে করিয়া
আসিতেছিল, ঝড়ে উহাদের অনেকগুলি জলমগ্ন হইলে,
তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি জাহাজ অতিকষ্টে সাজেম-
প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাজেমপ্রদেশ জুরাটের
৩৫ ক্রোশ দক্ষিণ। পারসিকেরা সাজেমপ্রদেশে অবতরণ
করিবার জন্য রাজার অনুমতি চাহিল। রাজা বলিলেন, যদি
তাহারা গুজরাটী ভাষার কথা কহিতে শিক্ষা করেন ও
গোমাংস ভক্ষণ না করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে
আসিবার অনুমতি দিতে পারেন। তদনুসারে পারসীরা অনেক
দিন তথায় অবস্থান করিল। তাহারা তথা হইতে উপকূলে
বাণিজ্য করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা চারিদিকে
বিস্তৃত হইয়া কাষেতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাষে
স্থানটি তাহাদের বড় ভাল লাগিল। সুতরাং পারসিকগণ
দলে দলে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশই
বাড়িতে লাগিল। শেষে সেখানকার অধিরাসিগণ অপেক্ষা
পারসীদিগের সংখ্যাই অধিক হওয়ায় তাহারাই কর্তৃত্ব করিতে

আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে হিন্দুগণ তাহাদিগকে ক্রম
পন্নাত করিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। বৃহৎ অনেক
পারসী নিহত হইল। ১২৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশটি কাম্বজগণের
অধিকারে আইসে। সেই সময় হইতে কাষের ক্রমিক উন্নতি
হইতে লাগিল। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানেরা এ দেশ
অধিকার করে, তখন কাষে ভারতের একটি সবৃক্ষিমানী
নগর বলিয়া পরিগণিত ছিল। মুসলমানদিগের আসলে
ইহা গুজরাটের অন্তর্গত হয়। পঞ্চদশশতাব্দীতে ইহার
আবার সবৃদ্ধি হইয়াছিল। বোড়শ শতাব্দীতে এই প্রদেশ
বাণিজ্যের প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। মহারাষ্ট্রগণ
যখন রাজ্য বিস্তার করেন, তখন মুসলমানগণ প্রাণপণে
আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করেন। বেসিনের সন্ধির পর
কাষে ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এখন ইংরাজের
অধীনে জনৈক মুসলমান নবাবের হস্তে ইহার শাসনভার
দেওয়া আছে। এই মুসলমান ইংরাজরাজের নিকট হইতে
সনন্দ লইয়া রাজ্য করিতেছেন। এখনকার বন্দোবস্ত অনু-
সারে রাজ্যভার ইহাদের বংশাবলির হস্তেই থাকিবে। ইংরাজ
গবর্ণমেন্টকে অবশ্য কর দিতে হইবে।

এখানে ৩০টি বিদ্যালয় আছে। অহিকেন, গম, চাউল,
ভুলা, তামাক ও নীল এখানে বর্ষেই জন্মে। নীলগাই, বন-
বরাহ, হরিণ এ প্রদেশে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কাষে
উপসাগরে বর্ষাব্যতীত অল্পসময় ভালরূপ জল থাকে না
বলিয়া [কাষে উপসাগর দেখ] বাণিজ্যে তত সুবিধা নাই।
মহী ও শাবরমতী এই উপসাগরে পড়ে, কিন্তু উহাদের প্রবাহ
সকল সময় একপথে যায় না। এজন্য নদীমুখে যে বড় বড়
জাহাজ আসিবে, তাহারও সুবিধা নাই; তথাপি বাণিজ্য
একপ্রকার মন্দ চলে না। সতরঞ্চ, গালিচা, লবণ, নীল,
খোদিবার প্রস্তর প্রভৃতি এখানে প্রস্তুত হয়। এ প্রদেশে
ভাল রাস্তা বড় একটা নাই। গোন্ধুর গাড়ী, উঠ, গোন্ধুর প্রভৃতি
দ্বারা মালপত্র চলাচল হয়।

কাষে বা খান্ডাং। কাষে রাজ্যের প্রধান নগর। ইহা মহী-
নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা ২২° ১৮' ৩০" উঃ ও দ্রাঘি
৭২° ৪০' পূঃ। জনসংখ্যা ৩৬,০০৭; তন্মধ্যে ২৫,৩১৪ জন
হিন্দু, ৮০৩৮ জন মুসলমান, ২৫২৫ জন জৈন, ৮ জন খৃষ্টান,
১১৯ জন পারসী। নগর অতি প্রাচীন। খন্ডাং বা ত্তজ
নামক মহাদেবের তীর্থ হইতে এই নাম হইয়াছে।
পূর্বে এই নগরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। অলক্ষ্যে
বন্দুকের গুলি চালাইবার জন্য প্রাচীরের ভিতর গর্ত থাকিত।
আবার পাড়ের উপর কারানও সম্বদ্ধ থাকিত। একসে

সে সকলের ভগ্নাবশেষমাত্র লক্ষিত হয়। কথিত আছে, জায়নামাক্য এইখানে জয়গ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি প্রাচীন জাতিদের পাণ্ডুরাজের দোষাকার্য্যে রোমনস্বাট অগস্ত্যের নিকট প্রেরিত হন ও এখেল নগরে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া জাহাতেই বেষ্টিতক্রমে দগ্ধ হন। প্রবাদ যে, প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যও নাকি এইখানে জয়গ্রহণ করেন। ১২৯৩ খৃঃ অব্দে মার্কো পোলো নামক ভিনিসের পরিব্রাজক এই নগর দেখিয়া ইহাকে ভারতের একটি প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যস্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। তাহার বিবরণে কাঞ্চের নামে ইহার উল্লেখ আছে। বাস্তবিকই কাঞ্চ নগর ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যের স্থান ছিল; কিন্তু উপসাগরের জল কমিয়া যাওয়ার, সে সমৃদ্ধি এখন নাই। [কাঞ্চ উপসাগর দেখ।]

এখানে জৈনদিগের প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। সেই সকল মন্দিরের স্তম্ভগুলি লইয়া ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ জমামন্দির নির্মাণ করেন। কাঞ্চের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে লাল, সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের অকীক পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মুসলমান নবাব এখানে রাজত্ব করেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে কর দিয়া থাকেন।

কাঞ্চ উপসাগর।—ইহার পশ্চিমে গুজরাট ও পূর্বদিকে ভারতবর্ষ। সমুদ্রের মোহানায় ইহার পরিসর দেড়কোশ মাত্র। কিন্তু মুখ হইতে উত্তরে কাঞ্চপ্রদেশ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ কোশ হইবে। পূর্বদিক হইতে নর্মদা ও তাপ্তী, উত্তর হইতে শাখরমতী ও মহী এবং পশ্চিমে কাটিবাড়প্রদেশ হইতেও দুইটা নদী আসিয়া এই উপসাগরে পতিত হইয়াছে। উপসাগরের মুখে পশ্চিমদিকে পৰ্ব্বতগুজদিগের অধিকৃত দিউ নামক দ্বীপ ও পূর্বদিকে সুরাটনগর অবস্থিত। সুরাট, কাঞ্চ প্রভৃতি বন্দর ইহার উপকূলে অবস্থিত। তথাপি ইহাতে বাণিজ্যের একটি বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। দুই শত বৎসরের অধিক কাল হইতে ইহার জল ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। এই জন্য ভাটার সময় ইহাতে প্রায় জল থাকে না। আর জোয়ারের সময় বিষম স্রোতের বেগ হয়। কাঞ্চের নিকট প্রায় ৮ কোশ দূর পর্য্যন্ত ভাটার সময় কিছুই জল থাকে না। সে সময় পার হইতে হইতে যদি জোয়ার আসিয়া পড়ে, তবে জীবনের আশা ছাড়িতে হয়। জোয়ারের বেগে জাহাজ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। যে সকল নৌকা বা জাহাজ এক জোয়ারে আসে, পুনরায় জোয়ার না হইলে তাহারা আর বাইতে পারে না।

কাঞ্চোজ (পুং) কঞ্চোজদেশে ভবঃ, কঞ্চোজ-অণ্। ১ কঞ্চোজ

দেশভাষা বোজা। ২ (ত্রি) কঞ্চোজদেশীয় বস্তু। ৩ দোম বক। ৪ পুরাণ বৃক। ৫ বনকুল্য রেখাজাতিবিশেষ; সগর ইহারিগকে মতকমুক্তি করিয়া নির্দাসিত করিয়াছিলেন। (হরিবংশ)

কাঞ্চোজক (স্ত্রী) কঞ্চোজে ভবঃ, কঞ্চোজ-বৃঞ্। (মহাভাষ্য তৎস্বরোবৃঞ্। পা ৪।২।১৩৪।) ১ কঞ্চোজদেশবাসিনী হস্তাদি।

কাঞ্চোজী (স্ত্রী) ১ মাষপর্ণী, মাষাণী। ২ পাপগড়ি ধরের। ৩ কুঁচ। ৪ হাকুচ।

কাঞ্চোজী (স্ত্রী) কাঞ্চোজ-ভীপ্। ১ মাষপর্ণী। ২ পাপগড়ি ধরের। ৩ কুঁচ। ৪ হাকুচ।

কাম্য (ত্রি) কাম্যতে, কম-গিচ্-বৎ। ১ কমনীয়। ২ স্তম্ভর। ৩ কামনায়ুক্ত (ব্যক্তি)। ৪ কর্তব্যাকর্ম্।

(“বৎ কিঞ্চিৎ কলমুদিত্ত বজ্রদানজপাদিকম্।

ক্রিয়তে কারিকং যত তৎকাম্যং পরিকীর্তিতম্॥”

মুগ্ধং রা' টা'।)

৫ ভোগ্য। ৬ বাহনীর। ৭ (স্ত্রী) অভীষ্ট কর্ম্।

কাম্যক (স্ত্রী) ১ বনবিশেষ। ২ সরোবরবিশেষ।

কাম্যকবন (স্ত্রী) বনবিশেষ, ইহা সরস্বতী নদী তীরে অবস্থিত ছিল; পাণ্ডবগণ বহদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

কাম্যকর্ম্ম [ন্] (স্ত্রী) কাম্যক তৎ কর্ম্ চেতি, কর্ম্মধা।

স্বর্গাদিঅভীষ্টকামনার কর্তব্য কর্ম্মবিশেষ, জ্যোতিষ্টোমাদি।

কাম্যতা (স্ত্রী) কাম্যত্ব ভাবঃ, কাম্য-তল্। ১ কমনী-রতা। ২ ভোগ্যতা। ৩ বাহনীরতা।

কাম্যদান (স্ত্রী) কাম্যক তৎ দানকেতি, কর্ম্মধা। ১ জীৱন্ত

প্রভৃতি কমনীর বস্তুর দান। ২ পুত্র, ঐশ্বর্য্য, জয় প্রভৃতি

প্রাপ্তিকামনার যে দান করা হয়।

(“অপত্যবিজরৈশ্বর্য্য-স্বর্গার্থং বৎ প্রদীয়তে।

দানং তৎ কাম্যমাখ্যাতং ঋষিতি ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥” গরুড়পু'।)

কাম্যফল (স্ত্রী) কাম্যত্ব ফলং, ভতৎ। কাম্যকর্ম্মের বাহ-

নীর ফল।

কাম্যমরণ (স্ত্রী) কাম্যং বাহনীরং মরণং, কর্ম্মধা। বাহনীর

মৃত্যু, মুক্তি।

কাম্যব্রত (স্ত্রী) কাম্যং কাম্যকলপ্রদং ব্রতম্, মধ্যলো'।

অভীষ্টকলপ্রদ ব্রত।

কাম্য (স্ত্রী) কম-গিচ্-ভাবে-কাম্-টাপ্। ১ প্রিয়ব্রতের

পত্নী। [প্রিয়ব্রত দেখ] ২ কামনা।

(“অষ্টৈভ্যস্তব্রতরানি আপোমূলং কলং পয়ঃ।

হবির্ভ্রাণকাম্যাত কুর্য্যেচননৌষধম্॥” প্রাঃ তঃ বোধায়ন।)

কাম্যোত্তীর্ণ্য (পুং) কাব্যঃ বাহনীর অভিপ্রায়ঃ, কর্মমা।
বাহনীর অভিপ্রায়।

কাম্যোপাসনা (স্ত্রী) কাম্যো কামনাসিকীকৃত্য উপাসনা,
৩তং। কামনাসিকির অভিপ্রায়ে যে উপাসনা করা হয়।

কায় (স্ত্রী) কু কুংসিতঃ জীবৎ বা অন্ন, কোঃ কামেশঃ।
১ কুংসিত অন্নরস। ২ জীবৎ অন্নরস। ৩ (ত্রি) কুংসিত
বা জীবৎ অন্নরসযুক্ত।

কায় (স্ত্রী) কঃ প্রজাপতির্দেবতা অস্ত, ক-অণ-ইদামেশচ
(কত্থেৎ। পা ৪। ২। ২৫।) আদেবৃদ্ধিঃ। ১ প্রজাপত্যতীর্থ;
কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অধোভাগের নাম প্রজাপত্য তীর্থ।

(“অঙ্গুষ্ঠমূলত তলে ব্রাহ্মণ তীর্থং প্রচক্রেতে।

কায়মন্ত্রমূলে হঃপ্র দৈবং পিত্র্যং তরোয়ধঃ।” মনু ২।৫৮।)
২ মন্ত্রব্যতীর্থ। (পুং) ৩ ব্রহ্মতীর্থ। ৪ (কারতি প্রকাশতে
অচ্) মূর্তি, শরীর। [শরীর দেখে।] ৫ সমূহ। ৬ লক্ষ্য। ৭
বভাব। ৮ প্রজাপত্য-বিবাহ। ৯ মূলধন। ১০ বৃহৎ। ১১ ব্রহ্ম।

কায়কারণকর্তৃত্ব (স্ত্রী) কায়শ্চ শরীরশ্চ কারণে উৎপত্তি-
কারণে কর্তৃত্ব। শরীরোৎপত্তিকারক কারণস্থিতিবিষয়ে কর্তৃত্ব।

কায়ক্লেশ (পুং) কায়শ্চ ক্লেশঃ, ৬তং। শারীরিক পরিশ্রম।
কায়ক্লেশে (দেশজ) শারীরিকপরিশ্রমদ্বারা কষ্ট স্বীকার
করিয়া কোনরূপে।

কায়ক্কন (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Silurus asotus Buch.)

কায়চিকিৎসা (স্ত্রী) কায়শ্চ চিকিৎসা, ৬তং। আয়ুর্কেন্দোক্ত
অষ্টাঙ্গ চিকিৎসার মধ্যে অঙ্গবিশেষ; শরীরব্যাপী জ্বর,
উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

(“কায়চিকিৎসা নাম সর্গাঙ্গ-সংস্থতানাং ব্যাধীনাং
অরাতিসার-রক্তপিত্ত-শোথোন্মাদাপস্মার-কুষ্ঠাদীনাং পু-
শমনার্থম্।” সুশ্রুত সূত্রস্থান ১ অঃ।)

কায়ছাল (দেশজ) কটফল গাছের ছাল। ইহার নখ
শিরোরোগের উপকারক।

কায়ড়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Muscicapa Kangdhara)
কায়দা (আরব্য) ১ নিয়ম। ২ চতুরতা।

কায়ফল (দেশজ) কটফল।

কায়বন্ধন (স্ত্রী) কায়ং বধাতি, কায়-বন্ধ-লু। চেতনাবিধিত
গুরুশোণিতের সংযোগবিশেষ।

কায়মনোবাক্য (ত্রি) কায়ঃ মনঃ বাক্যঞ্চ যজ্ঞ, বহুব্রী।
শরীর মন ও বাক্যের সহিত একান্ত আগ্রহে বাহ্য সম্পাদন
করা হয়।

কায়মান (স্ত্রী) কায়শ্চ মানমিব মানমন্ত, মধ্যলো। তৃণ-
কূটর, পর্ণকূটর।

কায়রূপসংযম (পুং) পাতঞ্জলকথিত কানবিশেষ, রূপ
সংযমবিশেষ।

কায়বলন (স্ত্রী) কায়ো বলন্তে আচ্ছাদ্যতে অনেন, কায়-
বল-লুট। স্বচ, কর্ম।

কায়ব্য (পুং) মহাত্মারতোক্ত দহ্মরাজবিশেষ। ইহার
জন্মবিবরণাদি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, “কোন
নিবাসীগর্ভে কত্রিয়গুণসে কায়ব্যের জন্ম হয়; কায়ব্য
দহ্মাদশাধিপতি হইয়াও সর্বদা ধর্মকর্মে আসক্ত থাকি-
তেন। অহুচরদিগের প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল, ‘তোমরা
ব্রাহ্মণ, তপস্বী, ভীক, শিশু, স্ত্রী ও বৃদ্ধে পরাধূর্ন ব্যক্তিকে
কখন নষ্ট করিও না।’ নিজেও তিনি সর্বদা বনবাসী,
তপস্বী ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিতেন, এবং যুগাদি হনন
করিয়া তাঁহাদিগকে পর্যাপ্তরূপে আহার করাইতেন।
এইরূপ দহ্ম্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও তিনি দিক্শিলাভে সমর্থ
হইয়াছিলেন।” (মহাত্মার শাস্তি ১৩৫ অঃ।)

কায়ব্যূহ (পুং) কায়ো শরীরে ব্যূহঃ বাতাদীনাং যুগাদীনাং
সপ্তধাতুনাঞ্চ ব্যূহনম্, ৭তং। ১ শরীরস্থ বাত পিত্ত স্নেহা
এবং ষড়্ প্রভৃতি সপ্তধাতুর বিস্তার। বাহ্যদিক্ হইতে
আরম্ভ করিলে, প্রথমে ষড়্, তৎপরে রক্ত, এইরূপ যথাক্রমে
মাংস, নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও গুত্র। বাত, পিত্ত ও স্নেহা
শরীরের অভ্যন্তরে পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থিত।

সুশ্রুতে এই দোষত্রয়ের অবিকৃতঅবস্থায় স্থাননির্দেশ
এইরূপ লিখিত আছে—“নিতম্ব ও গুরুদেশ বায়ুর স্থান;
নিতম্ব ও গুরুদেশের উপরিভাগে এবং নাভির নিম্নভাগে
পকাশয় অবস্থিত, এই পকাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্তী
স্থান পিত্তের আশ্রয়। আমাশয় স্নেহস্থান। সংক্ষেপতঃ
প্রাধাত্যাহ্বাসারে এই তিনটি স্থান তিন দোষের বলিয়া
কথিত হইল।” (সুশ্রুত সূত্র ২১ অঃ।)

[প্রত্যেক দোষই পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহা
ভিন্ন যে সকল স্থানে অবস্থিত আছে, তাহা বায়ু, কফ ও
পিত্ত শব্দে দেখ।] ২ কর্মভোগজন্ত বোগিগণকরিত-
কায়সমূহ। বোগিগণ কর্মভোগের জন্ত কায়ব্যূহ রচনা করেন।
পাতঞ্জলহুত্রে আছে, “নাতিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্” নাতিচক্র
সংযম করিয়া বোগিগণ কায়ব্যূহ জানিতে পারেন। শাণ্ডিল্য-
হুত্রে আছে, “সব্রহ্মদেব তচ্ছ্রুতঃ।” বোগিগণ এক সময়ে
বহুবিধ ফলভোগের জন্ত যে সকল শরীর নির্মাণ করেন,
তাহাতে চিত্তেরও অস্থিরতা হয়।

কায়সম্পদ (স্ত্রী) কায়শ্চ সম্পদ, ৬তং। রূপ, লাবণ্য, বল
ও সুগঠন প্রভৃতি শরীর সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত।

কায়স্থ (পুং) কায়স্থ সর্বভূতদেহেবু তিষ্ঠতি কায়-স্থ-ক।
১ অন্তর্ভাবী, পরমেশ্বর।

“কায়স্থোহপি ন কায়স্থঃ কায়স্থোহপি ন জায়তে।

কায়স্থোহপি ন ভূতানঃ কায়স্থোহপি ন বধ্যতে ॥”

উত্তরগীতা ১।২৮।

‘কায়স্থোহপিতি কিঞ্চ দেহাধ্যাসবশাৎ প্রতীয়মান-ইহ
ভোক্তৃবাদিকং আশ্রমো নান্তি ইত্যাহ কায়স্থ ইতি দেহীজীবঃ
কায়স্থোহপি শরীরাদ্যাসবানপি ন কায়স্থঃ শরীরনিমিত্তক-
বন্ধনরহিত ইত্যর্থঃ। কায়স্থো জন্মানিমচ্ছরীরস্থোপি
ন জায়তে, কায়স্থোহপি কলহহেতুভূতদেহস্থো ন বধ্যতে।’

গৌড়পাদ্যচাৰ্য্যকৃত স্তোত্রাবলী টীকা।

২ জাতিবিশেষ। এই কায়স্থজাতির উৎপত্তি ও প্রকৃতবর্ণ
নির্ণয়সম্বন্ধে বহুদিন হইতে মতভেদ ও বাদাম্বাদ চলিয়া
আসিতেছে। এই জাতিকে কেহ শূদ্র, কেহ অন্ত্যজ, কেহ
ক্ষত্রিয়, কেহ ব্রহ্মক্ষত্রিয়, কেহবা স্বতন্ত্র পঞ্চমবর্ণ বলিয়া অভিমত
প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, যখন বহুদিন হইতে এই
জাতির প্রকৃত বর্ণতত্ত্ব জানিবার জন্ত সকলেই অভিলাষী, তখন
নিরপেক্ষভাবে এই জাতির মূলতত্ত্বসম্বন্ধে প্রবৃত্ত হওয়া
উচিত। প্রাচীনস্মৃতি, পুরাণ, কাব্য, নাটক প্রভৃতি বিস্তর
সংস্কৃতগ্রন্থে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন দেখা
যাউক সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থে কায়স্থজাতি কিরূপভাবে
অভিহিত হইয়াছে।

স্মৃতির মত।—সর্বপ্রথম বিষ্ণুসংহিতাতে কায়স্থ শব্দের
এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।—“অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজ-
সাক্ষিকং সন্যাসিকং সন্যাসিকং। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থ-
কৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নং রাজসাক্ষিকম্।” (বিষ্ণু সং. ৭।২)

উক্ত বচনের স্মৃতিবিস্তৃতিতে নন্দপণ্ডিত লিখিয়াছেন,
“রাজোদিকরণং রাজসভা তস্তাং তেন রাজাভিযুক্তো যঃ
কায়স্থঃ তেন কৃতং তস্তাং সভায়াং বোধ্যক্ষঃ প্রাড়্ বিবাক-
স্তম্ব করচিহ্নেন যুক্তং তদ্রাজসাক্ষিকম্। রাজা মুদ্রাকর-
ণেন সাক্ষী যস্মিন্ তৎরাজসাক্ষিকম্।”

অর্থাৎ রাজসভায় রাজকর্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত
এবং প্রাড়্ বিবাকের করচিহ্নিত অথবা রাজমুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত
যে লেখ্য তাহাই রাজসাক্ষিক। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

“চাটতন্ত্ররহবৃত্ত মহাসাহসিকানিভিঃ।

পীড্যমানাঃ প্রজারক্ষণে কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥” যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩৫।

‘কায়স্থে: রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ।’ শুলপাণিকৃত টীকা।

কায়স্থ = রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী। মিতাক্ষরায়
কায়স্থের এইরূপ অর্থ আছে ;—

“কায়স্থঃ পণকা লেখকাস্তি তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো
রক্ষণে তেবাং রাজবল্লভতরাজিতমারাবিভাক্ত হুর্ণিবারহাৎ ॥”

কায়স্থ অর্থ্যং পণক ও লেখক। তাহাদিগের দ্বারা
উৎপীড়িত প্রজাদিগকে রাজা বিশেষতঃ রক্ষা করিবেন।
কারণ তাহারা (কায়স্থেরা) রাজার অতি প্রিয়পাত্র হওয়ার,
অতিমারাবী ও দুর্ব্ব।

বৃহৎ পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে—

“গুচীন প্রজাংশ ধর্মজ্ঞান বিপ্রান্ মুদ্রাকরাসিতান্।

লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্ব হিতৈষণাঃ ॥”

বৃহৎপরাশর ১০।১০।

গুচি, বিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ ও মুদ্রাকরাসিত ব্রাহ্মণকে এবং সন্-
দের গুডাকাজ্ঞী লেখক কায়স্থকে [ইত্যাদি]

উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে
কায়স্থগণ পূর্বকালে হিন্দুরাজদিগের সমর রাজকর্মচারী
রাজলেখকরূপে অভিহিত ছিলেন।

ধর্মশাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণসম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা উল্লেখ
না থাকিলেও তাহাদিগের আচার ব্যবহার দ্বারা বর্ণ-
নির্ণীত হইতে পারে। প্রথমতঃ যাহারা কায়স্থকে শূদ্র
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কথা স্বীকার করিয়া
দেখা উচিত যে কায়স্থ জাতি ধর্মশাস্ত্র অনুসারে প্রকৃত
প্রস্তাবে শূদ্র জাতি কি না ?

মহু প্রভৃতি সকল ধর্মশাস্ত্রেই শূদ্রজাতির বিজাতিগুণ্য
ও শিরকার্য্যই একমাত্র উপজীবিকা বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।
এমন কি স্মৃতিশাস্ত্রমতে শূদ্রকে স্পর্শ করাও দোষাবহ। যথা—

“তস্মাত্তানি ন শূদ্রায় স্পৃষ্টব্যানি যুধিষ্ঠির।

সর্বং তচ্ছূদ্রসংস্পৃষ্টং ন পবিত্রং ন সংশয়ঃ ॥

লোকে ত্রীণ্যপবিদ্রাণি পঞ্চামেধানি ভারত।

খা শূদ্রশ্চ স্বপাকশ্চেত্যপবিদ্রাণি পাণ্ডব ॥”

বৃহৎগৌতম ২১।১৯-২০।

হে যুধিষ্ঠির ! শূদ্রগণকে স্পর্শ করা উচিত নহে। কায়স্থ
এই সকল শূদ্র কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে অপবিত্র হইবে, তাহাতে
সন্দেহ নাই। হে পাণ্ডব ! কুকুর, শূদ্র ও স্বপাক এই তিন
অপবিত্র।

রাজসভায় বসিয়া শূদ্রের লেখাপড়ার কথা কোন স্মৃতি
বা পুরাণে পাওয়া যায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কায়-
স্থেরা রাজসভায় বসিয়া লেখকের কার্য্য করিত, সুতরাং
স্মৃতি মানিলে রাজসভায় নিযুক্ত কায়স্থগণ কোন ক্রমে
শূদ্র হইতে পারেন না। বিশেষতঃ রাজসভায় নিযুক্ত লেখক-
গণ রাজার অষ্টাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যথা—

“রাজা নৃপকৃৎসনঃ সত্যঃ শাস্ত্রং গণকলেখকো ।

হিরণ্যময়িকদকমষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ ॥”

নারায়ণসংহিতা ১।১৫।

প্রাড়াবিবাক, সত্যগণ, শাস্ত্র, গণক, লেখক, হুবর্ণ, অগ্নি ও জল এই আটটি রাজার অঙ্গ। উক্ত শ্লোকের টাকার কল্যাণভট্ট লেখকের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

“ভাবোত্তরক্রিয়াজয়পত্রাদিলেখনোপযোগী”।

ব্যবহারমাতৃকার একস্থলে লিখিত আছে—

“লিখিতং লক্ষণজ্ঞেন মুক্তিষ্ঠ্যৈকবন্ধনাম্।

অর্থতো গ্রহতশ্চৈব মন্তব্যমব্যুচিতাং ॥” ৪।১০৬।

কায়স্থকে যদি রাজসভাহ লেখক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এই জাতি যে শূদ্র নয়, তাহা স্থির।

মিতাক্ষরার কায়স্থের অপর অর্থ রাজার প্রিয়পাত্র গণক লিখিত হইয়াছে। ব্যাস রাজসভাহ গণকের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

“ত্রিষন্ধ জ্যোতির্বাতিজ্ঞঃ ক্ষুটপ্রত্যয়কারকম্।

ঐতাব্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েমৃণঃ ॥”

বৈজয়ন্তীযুক্ত ব্যাসবচন।

রাজা ত্রিষন্ধ জ্যোতির্কিৎ, ক্ষুটপ্রত্যয়কারী এবং বেদ-বিদ্বৎ এরূপ গণককে নিযুক্ত করিবেন।

মহাভারতের সময়েও উক্ত গণক ও লেখকেরাই রাজার আয় ব্যয় পরিদর্শন করিত। যথা—

“কচ্চিচ্চায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্বে গণকলেখকৌ।

অমুতিষ্ঠতি পূর্বাঙ্কে নিত্যমায়ব্যয়ং তব ॥”

সভাপর্ক ৪র্থঃ।

হে রাজন! আয়ব্যয়বিষয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখক, পূর্বাঙ্কে আপনার আয় ব্যয় পরিদর্শন করিয়া থাকে।

একণে যদি মিতাক্ষরার প্রমাণানুসারে কায়স্থকে গণক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও কায়স্থকে শূদ্র-জাতি বলা যাইতে পারে না। গণক বেদে অধিকারী, শূদ্রের কোনকালে বেদে অধিকার নাই।

এখন স্থির হইল, কায়স্থ শূদ্র নয়, কিন্তু বিজ্ঞাতির অন্তর্গত। —

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

“লেখকঃ প্রাড়াবিবাক সত্যশ্চৈবানুপূর্বশঃ।

নৃপে পত্ততি তৎকার্য্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহৃতঃ ॥”

যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহার ৬৮ শ্লোকে মিতাক্ষরা।

রাজা তাহাদের কার্য দেখেন বলিয়া লেখক, প্রাড়া-বিবাক ও সত্যগণ রাজসাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

উপরোক্ত শ্লোকদ্বারা জানা যাইতেছে যে পূর্বকালে ধর্ম্মাধিকরণে লেখকেরাও রাজসাক্ষী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত রাজসাক্ষীর এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

“তপথিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।

ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবত্তো ধনাবিতাঃ ॥

দ্রাবরাসা সাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ শ্রোতৃমার্জিতক্রিয়াপরাঃ ॥”

যাজ্ঞবল্ক্য ২।৬৮।

শূদ্রজাতি ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত হইতে পারিত না। মহর্ষি কাত্যায়নের মতে—

“ব্রাহ্মণো বজ্র ন তাত্ত্ব কত্রিরং ভজ্র যোজয়েৎ।

বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজং শূদ্রং যয়েন বর্জয়েৎ ॥”

মিতাক্ষরা, কেশববৈজয়ন্তী (৬জঃ) ও কুল্লুকধৃত কাত্যায়নবচন।

যেখানে ব্রাহ্মণ নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অভাবে কত্রির অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ বৈশ্য নিযুক্ত করিবেন, শূদ্র কখন নিযুক্ত করিবেন না। (১)

উপরোক্ত প্রমাণদ্বারাও রাজসভার নিযুক্ত কায়স্থ কখন শূদ্র হইতে পারে না।

মহাসংহিতার ৮ম অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের তাৎপ্যে মেধাতিথিও কায়স্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

“রাজাগ্রহরশাসনাঙ্গেককায়স্থ-হস্ত-লিখিতাঃ প্রমাণী ভবন্তি।” অর্থাৎ

রাজদত্ত ত্রকোত্তর-ভূম্যাদির শাসন বাহা এক কায়স্থের হস্ত লিখিত, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

বাস্তবিক, অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে কায়স্থগণ পূর্বকালে হিন্দুরাজদিগের সময়ে মহাসাক্ষিবিগ্রহিকের কার্য্য করিতেন। পূর্বকালে রাজা শাসনদ্বারা যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণাদিকে দান করিতেন, সেই শাসনপত্রে মহাসাক্ষি-বিগ্রহিকের নাম প্রকাশ থাকিত। এতদসম্বন্ধে মিতাক্ষরায় এই বচনটী উদ্ধৃত দেখা যায়।—

(১) মহাসংহিতার লিখিত আছে—

“বস্ত্র পূজ্যত্ব কৃত্বতে রাজো ধর্ম্মবিবেচনম্।

তত্ত সীমতি তদ্রাষ্ট্রং পত্রে ধৌরিব পশ্বতঃ।

বরাষ্ট্রঃ শূদ্রভূমিঃ নাতিকাকাত্তমখিগম্।

বিনম্রভ্যাও তৎকৃত্বৎস্ব হৃদিকব্যাবিধিতম্ ॥”

মহাসংহিতা ৮।২১-২২ শ্লোঃ।

যে রাজার রাজ্যে শূদ্র ধর্ম্ম বিচার করে, সে রাজার রাজ্য পত্রে নিম্ন পোষ ভায় শীঘ্রই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। যে রাষ্ট্র শূদ্রভূমি, নাতিকাকাত্ত, বিনম্রভূমি, হৃদিক ও ব্যাবিধিত সেই রাজ্য আও বিনষ্ট হয়।

“সন্ধিবিগ্রহকারীত্ব ভবেদ্যন্তত লেখকঃ।

স্বয়ং রাজা সমাদিষ্টঃ স লিখেব্রাজশাসনম্ ॥”

আচার্য্যাদ্যায় ৩১৯ শ্লোকঃ।

সন্ধিবিগ্রহকারী লেখক নৃপতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিবেন।

ইতিপূর্বে মেধাতিথির উক্তি দ্বারা জানা গিয়াছে যে কায়স্থেরাই রাজশাসন লিখিত, এখন মিতাক্ষরাদৃত বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে সেই লেখকই সন্ধিবিগ্রহকারী বা সন্ধিবিগ্রহিক। এখন দেখা যাউক, সন্ধিবিগ্রহিক কাহাকে বলে—

“সন্ধিবিগ্রহিকঃ কার্য্যঃ বাড়্‌গুণ্যাদি বিশারদঃ।”

অগ্নিপুরাণ ২২০।৩।

সন্ধিবিগ্রহিক বাড়্‌গুণ্যাদি বিশারদ হইবে। ঐ বাড়্‌গুণ কি কি? মনুসংহিতার মতে—

“সন্ধিঞ্চ বিগ্রহকৈব যানমাসনমেব চ।

দ্বৈধীভাবঃ সংশ্রয়ঞ্চ বড়্‌গুণাংস্চিস্তয়েৎ সদা ॥”

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, বৈধ ও আশ্রয় এই ছয় গুণ রাজার সতত স্থিরভাবে চিন্তা করা উচিত।

সন্ধিবিগ্রহাদি উক্ত ছয় গুণ যে ব্যক্তি ভালরূপে অবগত আছেন এবং তদনুসারে যে কার্য্য করিতে পারদর্শী, তাহাকেই সন্ধিবিগ্রহিক বলা যায়। (২)

মনুর মতে রাজা বা স্থপণ্ডিত মন্ত্রী ঐ বাড়্‌গুণ বিশারদ হইবেন। কিন্তু সন্ধিবিগ্রহিক একটি স্বতন্ত্র উচ্চ সচিবের পদ, মন্ত্রী ও সেনাপতির পরই গণনা করা যাইতে পারে। যতদূর দেখা হইয়াছে, তাহাতে বলা যাইতে পারে ক্ষত্রিয়েরই এই পদে অধিকার। মহর্ষি হারীত নির্দেশ করিয়াছেন—

“রাজ্যস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজ্ঞাধর্ম্মেণ পালয়ন্।

কুর্যাদধ্যয়নং সম্যগ্ যজ্ঞেদ্ব্যজ্ঞান্ যথাবিধি ॥

নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।

দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা ॥

(২) পাদ্যাত্তা ও এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সন্ধিবিগ্রহিকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। “It is a noticeable fact that the sanchi-grahī or Minister of war and peace, and the Secretary, were always Kayasthas, or men of the writer-caste. This not only occurs in the Kataka plates; but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India.”

Indian Antiquary Vol. V. p. 57.

“নহাসন্ধিবিগ্রহিক—A great officer for making treaties and declaring war. This officer or his subordinate is deputed at the end of the grant to give effect to it.”

Journal Asiatic Society of Bengal, 1875, Pt. I. p. I.

“Secretary for foreign affairs.”—

Lawney's Kathasarit Sagara, Vol. p. 383.

ধর্ম্মেণ বজ্রম্ কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জনম্।

উত্তমঃ গতিম্যাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োহশ্যেবমাচরন্ ॥”

হারীতস্মৃতি ২ অঃ ॥

ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থ হইলেও ধর্ম্মানুসারে প্রজ্ঞাপালন, সম্যক অধ্যয়ন এবং যথাবিধি বজ্র করিবেন। নীতিশাস্ত্রোক্ত অর্থে পটু ও সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ হইবেন এবং দেব-ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও পিতৃকার্য্যে রত থাকিবেন। ধর্ম্মানুসারে বজন ও অধর্ম্ম পরিবর্জন করিবেন। ক্ষত্রিয় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়া উত্তম গতি লাভ করেন।

মহু বলিয়াছেন—

“তৈঃ সার্কং চিস্তয়েন্নিত্যং সামাশ্রং সন্ধিবিগ্রহম্।”

মনুসংহিতা ৭।৫৬।

‘তৈ বৃদ্ধিসচিবৈর্মুখ্যৈশ্চাধিকারিভিঃ সহ সামাশ্রং যদ্রাতিরহস্তং তচ্চিস্তয়েৎ সন্ধিবিগ্রহং কিং সন্ধিঃ সম্প্রতি যুক্তো অথ বিগ্রহঃ?। উভয়ত্র গুণদোষান্ বিচারয়েৎ।’

ইতি মেধাতিথিতাষ্য।

রাজা সন্ধিবিগ্রহাদি ঐ সকল বুদ্ধিমান সচিববর্গের সহিত সদযুক্তি ও সংপরামর্শ করিবেন।

এখানে মহুর উক্তিভেদেও জানা যাইতেছে বুদ্ধিমান সচিব ও রাজাই সন্ধিবিগ্রহনির্ণয়ে অধিকারী। এখন দেখা আবশ্যক যে সকল সচিব সন্ধিবিগ্রহাদিতে অধিকারী তাহাদের কিরূপ গুণ থাকা উচিত।

“মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লক্ষলক্ষান্ কুলোদগতান্।

সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্য্যোঁত পরীক্ষিতান্ ॥”

মহু ৭।৫৪।

প্রতিষ্ঠালাভকারী, বেদানিধিধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী, স্বয়ং শূর ও বুদ্ধিবিদ্যার নিপুণ এবং সংকুলোদ্ভব এইরূপ গুণী সাত বা আটজন মন্ত্রী প্রত্যেক রাজার থাকা আবশ্যক।

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

“এবং মন্ত্রিণঃ পূর্ব্বং কৃত্বা তৈঃ সার্কং রাজ্যে সন্ধিবিগ্রহাদি-লক্ষণং কার্য্যকিস্তয়েৎ। সমতৈর্ব্যাস্তৈস্ত অনন্তরং তেভ্যামভি-প্রায়ঃ জ্ঞাত্বা সকলশাস্ত্রার্থবিচারকুশলেন ব্রাহ্মণেন পুরোহিতেন সহ কার্য্যং বিচিন্ত্য ততঃ স্বয়ং বুদ্ধা কার্য্যং চিস্তয়েৎ।”

(মিতাক্ষরা আচার্য্যাদ্যায় ৩১১ শ্লোকে)

মিতাক্ষরার উক্ত বচনদ্বারা বোধ হইতেছে যে, রাজা যে ৭।৮ জন সচিবের সহিত সন্ধিবিগ্রহাদিচিন্তা করিতে, তাহার ব্রাহ্মণ নহেন, কারণ ব্রাহ্মণের সহিত তৎপরে কি কি পরামর্শ করিবেন, তাহাও নির্দিষ্ট হইয়াছে।

[বাক্যবাক্য ১ অঃ। ৩১২ শ্লোকঃ] ইতিপূর্বে হারীতের বচন

যারা সন্ধিবিগ্রহাদি কজিরের বর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হই-
য়াছে। এক্ষণে সন্ধিবিগ্রহকারী কায়স্থ স্মৃতির মতে কজির
জির অপর কোন্ বর্ণ হইতে পারেন ? (৩)

(৩) ১, এখনকার স্মৃতি বাসসংহিতার লিখিত আছে—

“বর্জকী নাগিতো গোপ আশাপ: কৃতকার:।” ১০

বশিষ্ঠরাত্তকারহনালাকারকুইখিন:।

বরটো বৈষ্ণবভালদাসবপচকোলকা:। ১১।

এতেহস্তাভা: সমাখ্যাতা বে চাত্তে চ পদাননা:।

এবাং সত্যবর্ণাং দানং তর্জন্যবর্জকীকণ্ঠ” ১২। ১ অ:।

বর্জকী, নাগিত, গোপ, আশাপ, কৃতকার, বশি, ক্রিয়াক, কায়স্থ,
নালাকার, কুইখি, বরট, মেঘ, চণ্ডাল, দাস, বপচ, কোলজাতি এবং
যাহারা গোমাস ভক্ষণ করে, ইহঁদের সকলেই অন্ত্যজ। এই সকল অন্ত্যজ
জাতির সহিত আলাপ করিলে দান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলেই
দূর্য্য দর্শন করিতে হয়।

উপরোক্ত বচন দ্বারা অনেক কায়স্থ জাতিকে অন্ত্যজ মনে করিতে
পারেন, কিন্তু কায়স্থ যে অন্ত্যজ অথবা পুত্র ময়, তাহা অপরাপর স্মৃতি
দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষত: ১৬৫৬ সম্বতে লিখিত এবং
১৪০১ শকে লিখিত দুইখানি বাসসংহিতার প্রাচীন হস্তলিপিতে

“বর্জকী নাগিতো গোপ আশাপ: কৃতকার:।

বশিষ্ঠরাত্তকারহনালাকার কুইখিন:।”

এই স্নোকেট এককালে নাই, ইহাতে অস্মৃতিত হয় যে এই স্নোকেট
প্রকৃষ্ট ও আধুনিক সময়ে লিখিত।

বাসসংহিতার মতে—

“রজকর্ত্তকাকার নটো বরুড় এবং চ।

কৈবর্ত্তমেঘভিন্নাশ্চ সঙ্কটে চান্ডালা: শূতা:।” বস সং ৫৪ স্নো:।

ধোম, চামার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেঘ ও ভিন্ন এই সপ্তজাতি অন্ত্যজ।

আপত্ত্ব বলিয়াছেন—

“অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্বশ্চ বেদমি।

সম্যগ্ জ্ঞাতা তু কালেন দিভা: কুর্ন্তুসুগ্রহম্। ১

চান্দ্রায়ণং পরাকো বা বিভাজীনাং বিশোধনম্।” ৩৪ অ:।

অন্ত্যজ জাতি অজ্ঞাতভাবে কোন দিভাতির গৃহে বাস করিলে
সেই দিভাতি সম্যক্রূপ জানিয়া তাহাকে অসুগ্রহ করিবেন এবং ব্রহ্ম
চান্দ্রায়ণ ও পরাকরত দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

যদি কায়স্থগণ একত্ব ঐরূপ অস্মৃতিত জাতি হইত, তাহা হইলে
প্রাচীন হিন্দুস্বায়গণ কখনও তাহাদিগকে রাজসভায় স্থান দিতেন না।

বাসসংহিতায় যে বচনটি প্রকৃষ্ট বলা হইল, তাহার সম্বন্ধে সাস-
সংহিতার অন্ত বচন উদ্ধৃত করা বাইতে পারে। বধা—

“নাগিতাষ্মিসিদ্ধার্থসিরিণো বাসগোপকা:।

শূত্ৰাশামপানীবাড ভূতানং দেব দুহতি।” ৩ অ:, ৫০ স্নো:।

নাগিত, কুলমিত্র, অর্জুনী, দাস ও গোপ পুত্র হইলেও ইহাদিগের
অজ্ঞাতজন করিলে দোষ হয় না। (ময়, বাজবল্য ও পরাশরস্মৃতিতেও
এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে।)

যে বাস নাগিত ও গোপের অজ্ঞাতজন দোষাবহ নহে, বলিতেছেন,

সেই বাস কখনই নাগিত ও গোপকে অন্ত্যজ অস্মৃতিত জাতি বলিয়া
উল্লেখ করেন নাই।

অতএব এখনকার স্মৃতিত বাসোক্ত স্নোকেট যে প্রকৃষ্ট তৎপক্ষে
সন্দেহ নাই।

যাহারাজাধিরাজ কোতদারকপুত্র বেশবদারকপ্রোৎসাহিত বারানসী-
বাসী বর্জাধিকারিঈরামপতিভানুজ নন্দপতিত-বিরচিত “বৈজয়ন্তী”
নামী বিকৃতিবিবৃতি মধ্যে বাসের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও
কায়স্থের উল্লেখ আছে—

“বহুত কালসম্পন্নং দানং কায়স্থেং হিরম্।

দানবংশাশ্রয়তী চ বেশপ্রায়দুশাপতন।

ত্রাণাণাং তথা চাত্তাভ্যভ্যিকৃতানি।

কুইখিনোহং কায়স্থাদ হুতবৈদ্যবহুতান।” (বৈজয়ন্তী ৬ অ:)।

উপরোক্ত বাস বচনে কায়স্থ অন্ত্যজ বা নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া অভিহিত
হয় নাই।

২, ঔপনসর্গশাস্ত্র নামে একখানি স্মৃতি গ্রন্থ আছে (এখানি
উপনাস্মৃতি নয়), এই গ্রন্থে কায়স্থস্বককে একটি বচন আছে—

“কায়স্থ ইতি জীবন্তু বিতরজ ইত্যন্তত:।

কাব্যাক্রোশ্য বস্যাং ক্রোধাং হৃৎতেরথকৃতনম্।

আখ্যাকরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্তিত:।”

ঔপনসর্গশাস্ত্র ৩৪-৩৫ স্নোকে।

উক্ত স্নোকেদ্বারাও কায়স্থজাতির বর্ণ সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে
পারা যায় না।

৩, কোন কোন গ্রন্থকার এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“পত্না ন তোরং কনকং ন ধাতু-

শৃণং ন দর্ভ: পশবো ন পাব:।

প্রজাপতে: কায়স্থনৃত্যবাজ

কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূত্ৰা:।”

এই বচনটি কেহ বসস্মৃতির, কেহ মহাকালসংহিতার আবার কেহ
ভবদেবভট্ট পুত্র হারীভের বচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা
উক্ত কোন পুস্তকে এই বচনটির নির্বণন পাইলাম না, সুতরাং কাহারও
বকপোলকল্পিত বলিয়াই বোধ হয়।

৪, শব্দকল্পত্রয়ের দ্বিতীয় ও বাগরাকর-সংস্করণে আপত্ত্বশাখা
হইতে এই বচন কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

“বাহোশ্চ কজিরা জাতা: কায়স্থ জগতীতলে।

চিহ্নগুণ্ড: হিভ: বর্ণে বিচিহ্নো বাগমণ্ডলে।

চৈত্রয়বহুতন্ত বশবী কুলদীপক:।

কবিবংশে সসুভূতো গোতমো নাম সন্তন:।

তত পিণ্যো মহাপ্রাজ: চিহ্নকুটচিহ্নাধিপ:।”

উক্ত প্রমাণগুলি আপত্ত্বশাখা অথবা আপত্ত্বশাস্ত্রোক্ত, আপত্ত্ব-
শূত্ৰোক্ত, আপত্ত্বশূত্ৰোক্ত, আপত্ত্ববাসংহিতা, আপত্ত্বব্রহ্মোক্ত,
আপত্ত্ববস্মৃতি: ১ এতদ্বির বিবেকর ভট্টবিরচিত আপত্ত্ববস্মৃতি, পঞ্চভট্ট
বিরচিত আপত্ত্বব্রহ্মোক্ত, দ্ব্যবস্মৃতিত আপত্ত্ববস্মৃতি:গ্রন্থ, লক্ষ
আপত্ত্ব একুতি গ্রন্থে পাওয়া গেল না, এই কয়েকটি স্নোকেটের মৌলিকত্ব
সম্বন্ধে সন্দেহ হইল।

পুরাণের সত্য। এখন দেখা যাউক, পুরাণে কায়স্থ জাতি কিরূপভাবে অভিহিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে দেখা যায়—

“ততোহভিধায়ন্তস্তত্ত্বজজিরে মানসাঃ প্রজাঃ।

তচ্ছরীর-সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।

ক্ষেত্রজাঃ সমবর্তন্ত গাত্রেভ্যন্তস্ত ধীমতঃ ॥”

সৃষ্টিখণ্ড ৩।১৪৯ শ্লোকঃ।

অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যান আরম্ভ করিলে মানসপ্রজাগণ উৎপন্ন হইল; পরে তাহার গাত্র হইতে শরীরোৎপন্ন কায়স্থ ও করণজাতির সহিত ক্ষেত্রজগণ উৎপন্ন হইলেন।

উক্ত শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে কায়স্থজাতি করণের সহিত ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বোধ হয় সেইজন্য কায়স্থ নামে বিখ্যাত।

অনেকের বিশ্বাস কায়স্থ ও করণ এক জাতি। কিন্তু প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রসমূহে কায়স্থ ও করণ এই উভয়জাতির উল্লেখ থাকিলেও কোন সংহিতায় কায়স্থ ও করণ এক জাতি বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। কায়স্থ ও করণ দুইটা স্বতন্ত্র জাতি। উপসংহারে করণজাতির প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে—

“কায়স্থেনোদরহেন মাতুর্মাসং ন খাদিতম্।

তত্র নাস্তি রূপা তস্ত দস্তাতবেন কেবলম্।

স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কায়স্থস্ত ব্রহ্মেশ্বর।

নরেশু মধ্যে তে ধূর্তাঃ রূপাহীনা মহীতলে ॥

হুময়ঃ সুরধারাভঃ তেবাঞ্চ নাস্তি সাদরম্।

শতেষু সজ্জনঃ সোহপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ ॥”

জন্মখণ্ড ৮৫।১৩০-১৩২ শ্লোকঃ।

কায়স্থজাতি অতি নির্দয়, গর্ভবাসকালে কেবল দস্ত না থাকায় ঐ জাতি জননীর মাংস ভোজন করে না। ব্রহ্মেশ্বর! মনুষ্যের মধ্যে স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক ও কায়স্থজাতির তুল্য ধূর্ত ও দয়াহীন জগতে আর নাই। তাহাদের হুময় সুরধার সদৃশ, তাহাদের সমাদর নাই। কায়স্থজাতি শত ব্যক্তির মধ্যে একজন সাধু হইতে পারে, কিন্তু স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক ঐ দুই জাতির মধ্যে কেহই সজ্জন হইতে পারে না।

অগ্নিপু্রাণে এই বচনটা পাওয়া যায়—

“সুভগা বিটভীতেব রাজবল্লভতরুরৈঃ।

তক্ষ্যমানাঃ প্রজা রক্ষাঃ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥

রক্ষিতা তদুদেভ্যস্ত রাজো ভবন্তি সা প্রজা ॥”

অগ্নিপু্রাণ ২২৩।১২।

রাজবল্লভ ও তরুরগণ, বিশেষতঃ কায়স্থগণ প্রজাপিতৃনে প্রবৃত্ত হইলে বিটভীতা সুভগার ভার প্রজা রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য ও পরম ধর্ম।

ব্রহ্মবৈবর্ত ও অগ্নিপু্রাণের বচন দ্বারা বোধ হইতেছে যে পূর্বকালে কায়স্থেরা অতিশয় প্রজাপিতৃক, ধূর্ত ও নির্দয় ছিল, সেইজন্য তাহাদের হস্ত হইতে প্রজাপিতৃকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্বে স্থতিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থেরা রাজসভার লেখক এবং সন্ধিবিগ্রহের কার্য করিত। পূর্বকালে কায়স্থের হস্ত হইতেই ব্রাহ্মণমিকে ব্রহ্মোত্তরাদি ভূমিদান, সীমানির্দেশ, ছাড় প্রভৃতি শাসনপত্র লিখিত হইত এবং তাহার উপস্থিত থাকিয়া ঐ সকল ভূম্যাদির দানকার্য্যাদি সমাধা করিত। এই গুরুতর তাহাদের হস্তে থাকায় তাহারা সুবিধামত যে যেমন লোক, তাহার নিকট তদনুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে কাতর হইত না। অনেক সময়ে অভায়-রূপে অর্থ সংগ্রহ করিত এবং সেইজন্য বোধ হয় অনেকেই অবধা উৎপীড়িত হইত। কায়স্থেরা রাজার অতি প্রিয়পাত্র ছিল বলিয়া তাহাদের কোন অনিষ্টচরণ করিতে কোন জাতি সাহসী হইত না, সুতরাং তাহাদের ঐ সকল অভ্যাচার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই রাজার প্রতি ধর্মশাস্ত্রের আদেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের হস্তে রাজ্যের গুরু-ভার থাকায় তাহাদের উপর রাজার বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আদেশ করা হইয়াছে। কারণ তাহাদের উপর রাজার বিশেষ দৃষ্টিপাত না থাকিলে, তাহারা আপন ইচ্ছানুসারে শাসনপত্র দ্বারা একজনের ভূমি অপরকে দান করিয়া তাহাকে সর্বস্বান্ত, পিতৃপিতামহগত জন্মান্বিত হইতে নির্বাসিত ইত্যাদিরূপ নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এবং তাহাতে রাজ্যেরও ঘোর অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কায়স্থ জাতির প্রতি কটাক্ষ করিবার পরই লিখিত হইয়াছে—

“সীমাপহারী দুষ্টশ্চ ভূমিচোরশ্চ হিংসকঃ।

ভূমিদানাপহারী চ কালহৃত্যঃ ব্রহ্মহত্যবৃন্দ ॥” জন্মখণ্ড ৮৫।১৩৪।

সীমাপহারণকারী, দুষ্ট, ভূমিচোর, হিংসাকারী এবং যে ভূমিদান অপহরণ করে, সে নিশ্চয়ই কালহৃত্য নরকে গমন করে।

এ জন্যই মনু বিধি করিয়াছেন—

“কুটশাসনকর্তৃংশ্চ * প্রকৃতীনাঞ্চ দূরকান্।

ব্রীবালাব্রাহ্মণাংশ্চ হস্তাশ্চিট্টলেনিনস্তথা ॥

* কুটশাসন্য কর্তব্যে যেষব রাজাশ্চিট্ট তদানন্তরভিধি।

অমাত্যঃ প্রোড়বিবাকো বা বৎসুহ্যঃ কার্যমন্তথা।

তৎ স্বয়ং বৃপতিঃ কুৰ্য্যাৎ তান্ সহস্রকং দণ্ডয়েৎ ॥”

মহাসংহিতা ২। ২৩৪।

মিথ্যারাজ্যাকাপত্রলেখক, প্রকৃতিবর্গের ভেদকারী, স্ত্রী-বালক ও ব্রাহ্মণহত্যা এবং শত্রুসেবীকে রাজ্য বধ করিবেন। অমাত্য অথবা প্রোড়বিবাক যদি কোন অর্থী প্রত্যর্থীর অভিযোগ অবশ্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে রাজা স্বয়ং ঐ অভিযোগের পুনর্নির্ধারণ করিবেন এবং অভিযোগ বিচারকারী-দণ্ডকে সহস্রগুণ দণ্ড করিবেন।

বাস্তবিক সন্ধিবিগ্রহকারী কায়স্থগণ সকলেই যে উক্ত প্রকার অত্যাচারী ছিল, তাহা নয়। ব্রহ্মবৈবর্তের ‘শতেনু সজ্জনঃ সোধপি কায়স্থঃ’ এই বচন দ্বারা উক্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে। মিতাক্ষরার মতে, কায়স্থেরা রাজার অতি প্রিয়পাত্র, অতি মারাত্মক ও অতি দুর্ব্বল। অতি প্রিয়পাত্র বলিয়া রাজকর্মচারী কায়স্থের উপর রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। তাই বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্য কায়স্থশব্দ উল্লেখের পরই বলিয়াছেন—

“যে রাষ্ট্রাধিকৃত্য স্তেবাং চারৈর্জ্ঞান্য বিচেষ্টিতম্।

সাধুন্ সম্পালয়েজ্ঞান্য বিপরীতাংস্ত বাতয়েৎ ॥”

যাজ্ঞবল্ক্য ১। ৩৩৮।

রাজা যাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ জানিয়া যাহারা সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে সম্মানিত এবং যাহারা অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন।

কমলাকরভট্ট শূদ্রবর্ণভবে পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ড হইতে এই কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্তাত্ত সর্গকায়স্থিনির্গতঃ।

দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রং মনীপাত্রঞ্চ লেখনীম্ ॥

চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতে ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।

• প্রাণিনাং সদস্যং কর্ম্ম-লেখ্যায় স নিরুপিতঃ।

ব্রহ্মণ্যতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাধ্যোর্ম্মজুর্জু স বৈ।

ভোজনাত্ত সঙ্গা তন্মাদাহতিদীর্ঘায়তে যিষ্টৈঃ।

ব্রহ্মকায়োক্তবো বস্মাৎ কায়স্থো জাতিকৃত্যতে।

নানাগোত্রাশ্চ তৎসংস্তাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ ॥” (৪)

ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্ন হইলে ব্রহ্মার সর্বকায় হইতে এক

জন্মের পুরুষ বাহির হইলেন, তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত, প্রাণিগণের সদস্যকর্ম্ম নিষিদ্ধ করিবার জন্য তিনি ধর্ম্ম-রাজের নিকট নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা দেবদ্বি মধ্যে সেই ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানী পুরুষকে সমস্তভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা ভোজনকালে ঐ পুরুষকে আহতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি কায়স্থ জাতি * নামে বিখ্যাত হইলেন। তাহার বংশসমুহ কায়স্থগণ নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন। (৫)

ভাল মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত অথবা প্রকৃত কি না? তৎপক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ রহিল। কমলাকরভট্ট-বিরচিত নির্ণয়সিদ্ধিপাঠে জানা যায়, তিনি ১৬১২ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। হুতরাং অনুন আড়াইশত বর্ষের পূর্বে তাহারই রচিত শূদ্রবর্ণভবে, উক্ত যোকগুলি উদ্ধৃত হইরাছে। অন্তএব যোকগুলির মৌলিকত্ব সন্দেহ তিনিই দারী।

* ব্রহ্মাণ্ডের তারানাম বাচস্পতির বাচস্পত্য অভিধানে—

“ব্রহ্মকায়োক্তবো বস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে।” এইরূপ পাঠ আছে, উক্ত বচন অনুসারে কেহ কেহ কায়স্থকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চমবর্ণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বাচস্পত্যের এই পাঠ সঙ্গত নয়, এহলে কমলাকরের পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ চতুর্ভূষণের অন্তরিক্ত পঞ্চমবর্ণ নাই।—

“ব্রাহ্মণঃ ক্রিয়ামোহৈবজ্ঞানমো বর্ণা বিজাতয়ঃ।

চতুর্ধ একজাতিস্ত শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।” মনু ১০। ৪১।

ব্রাহ্মণ, ক্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ বিজাতি এবং সংস্কারবিহীন শূদ্র একজাতি, এই চারিবর্ণ, এতদ্ব্যতীত পঞ্চমবর্ণ নাই।—হুতরাং কায়স্থকে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলা বাইতে পারে না।

(৫) “চিত্রগুপ্ত কথা” নামে তিনখানি হস্তলিপি আমাদের হস্তগত হইরাছে, ঐ তিনখানি হস্তলিপির প্রথম আরম্ভ ২ যোক ব্যতীত আর আর সকল যোক ঐক্য আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ তিন পুথির বর্ণনীর বিষয় এক এবং যোক যোক মিল হইলেও প্রথম হস্তলিপির শেষে “ইতি ভবিষ্যত্তরপুরাণে চিত্রগুপ্তকথা,” দ্বিতীয় হস্তলিপিতে “ইতি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চিত্রগুপ্তকথা,” এবং তৃতীয় হস্তলিপির সমাপ্তি পুণ্ডিকার “ইতি বিষ্ণুখণ্ডান্তরে চিত্রগুপ্তকথা সমাপ্তা” এইরূপ লিখিত আছে। বিষ্ণুখণ্ডান্তর ও পদ্মপুরাণে-উত্তরখণ্ড-নামধের যে দুইখানি হস্তলিপি আছে, তাহার আরম্ভ যোক এই—

অম্বধ্বনি উবাচ।

নুনে কথং ধর্ম্মজ কাচস্থানাক সত্ববন্।

কায়স্থানাং কুতো জন্ম তেবাং কথং হব্রত ॥ ১ ॥

এতৎ সর্গসনাসেন ধর্ম্মজোসি যসো যম ॥

ভবিষ্যত্তর আখ্যাত হস্তলিপির আরম্ভ যোক এই—

সূত উবাচ।

যদ্যজ্ঞেয়ং সুবিষয়ং তথন্য বিদ্যাশ্রয়শিব্।

উপপন্ন্য সন্মোহায়ঃ পঞ্চজ্ঞেয়েং সুবিষ্টিয়ঃ ॥

রাজ্যকৃত্যেতি পত্রকঃ রাজাধিকৃতলেখকলিখিতম্ভি। শাসনং রাজ্যাদেশ সম্বাদশাসনং তৎ কুটং কুর্ভতি পালয়তি।” ইতি মেঘাতিথি।

(৪) উক্ত যোকগুলি ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের ৪ খানি হস্তলিপিতে পাওয়া গেল না। উক্ত যোক-

স্থিতির উবাচ ।

কেন পুণ্যবর্তনৈব বানেন তপসা মুন ।

বর্ণা বাতি মহাত্মানন্তরে কথং হতত ।

এখম মোক দুইটি ব্যতীত অপর মোকগুলি বাচন্যতা অভিধান এবং শব্দকল্পত্রয়ের দ্বিতীয় ও নাগরাকরসংকরণে ভবিষ্যদ্বাণীর বচন বলিয়া প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইরাছে । কিন্তু হুঃখের বিষয়, পাণ্ডোক্তরথও, ভবিষ্য, ভবিষ্যোত্তর ও বিষ্ণুধর্মোত্তর এই চারিবিধিরই বিভিন্ন স্থানের ঠাণ্ডাখানি মূল হস্তলিপি দেখা হইল, কিন্তু কোন মূল গ্রন্থে উক্ত চিত্রগুপ্ত কথা ও ইহার মোকগুলির নিদর্শন পাওয়া গেল না । আজকাল যেমন রাধাক্ষর, কালহরীমাহাত্ম্য, শ্রীরামমাহাত্ম্য প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থ ব্রাহ্মণ-পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও সেগুলি মূল ব্রাহ্মণ মহাপুরাণের অন্তর্গত নয় । [বিষকোষ কাব্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রাহ্মণপুরাণের মুখবন্ধে মন্তব্য দেখ ।] সেইরূপ উক্ত “চিত্রগুপ্তকথা” বিভিন্ন পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত হইলেও উহা যে মূল পুরাণ রচিত হইবার বহুকাল পরে লিখিত এবং মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত নয়, তাহা স্থির । দারদীরপুরাণের পূর্বভাগে পয়, ভবিষ্য ও বিষ্ণুধর্মোত্তরবর্ণিত বিষয়ের অনুক্রমিকা দেওয়া হইরাছে, তাহাতেও ঐ সকল পুরাণ মধ্যে যে চিত্রগুপ্ত ব্রতকথা আছে, এখন কোন কথা লিখিত হয় নাই । হতরঃ এরূপ হস্তলিপির উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন কায়স্থ জাতির প্রকৃতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না । কেবল বাহারি চিত্রগুপ্তব্রত করিয়া থাকেন এবং করিতে অভিলাষী, তাহাদের-কৌতুহল নিবারণার্থ “চিত্রগুপ্ত কথা” অনুবাদসহ উপরোক্ত মোকব্বরের পর হইতে উদ্ধৃত হইল ।

দত্তাশ্রয়ের উবাচ ।

দ্রিকালজঃ মহাপ্রাজঃ পুলাভ্যঃ মুনিপুত্রবৎ ।
উপসঙ্গম্য পশ্চচ্ছ ভীষ্মঃ শত্রুভৃত্যধরঃ ।
চতুর্দশমি বর্ণানামাজমাণাং তেষাম চ ।
সম্ভবঃ সঙ্করাঙ্গীনাং প্রভো বিস্তরতো ময়া ।
কায়স্থ ইতি যে লোকে ব্যাতাশ্চ মহামুনে ।
ভূম এব মহাবাহো । শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।
বৈকুণ্ঠা দানশীলাশ্চ দেবপিতৃপরায়ণাঃ ।
হৃদয়ঃ সর্গশাস্ত্রেণ কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ ।
গোষ্ঠীকো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণাণাং বিশেষতঃ ।
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথঞ্চ মহামুনে ।
এতস্মৈ সংশয়ঃ বিপ্রা । বক্ত, সর্বতত্ত্বমেবতঃ ।
ইতি পুটো মুনি গ্রাহ গাজের শূন্য তত্ত্বতঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ ।

শুণু গাজের বক্যামি তেবামপি চ কারণম্ ।
ন প্রভং বৎ ভরা পূর্কং তস্মৈ কথয়তঃ শূণু ।
বেনেন্দে সকলং বিধং স্বাবরঃ জগদং তথা ।
উৎপাদ্য পালাতে ভূমো নিধনার প্রকল্পাতে ।
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্ম লোকপিতামহঃ ।
বখামুহরং শূরা বিধং কথয়ামি তব প্রভো ।

মুখতো ব্রাহ্মণো জাতো বাহত্যো কত্রিসত্বা ।

উল্লভ্যাক তথা বৈভতঃ পত্যাং শূত্রঃ সমুভবঃ ।

বিচক্লুঃ বটপদার্থীংক সন্নবদসরীংহপান্ ।

এককালেহস্তরং সর্কং চত্ৰংকোপ্রহংতথা ।

এং বহুবিধানেন বিকলংপাধ্য ভায়তঃ ।।

উবাচ তং হতং জেঠং কতপং চাতিভেজমন্ ।

এবহেন চিরঃ পুত্র জগৎ পালয় দরতঃ ।

ইত্যাজাপ্য হতং জেঠং কবিনত্ববহুভুতঃ ।

ততস্ত ব্রহ্মণ্য তেন বৎকৃতং তরিতোষ মে ।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষতানি চ ।

ন সমাধিং সমাধার হিতোহনুৎ কলমাননে ।

হিতে সমাধৌ সকলং বহুভুতং তবদামি তে ।

ভজরীরাগদ্বাবাহঃ ভাষঃ কলমোচনঃ ।

কথুপ্রীণো গৃহিণাঃ পূর্ণভ্রমিতাননঃ ।

লেখনীছেদনীহস্তো সনীভাজনমঃভুতঃ ।

নিঃসৃত্য দর্পনে তদৌ ব্রাহ্মণোহব্যক্তজগদঃ ।

উত্তমঃ স্থিতিচাক্ষো ধ্যানভিত্তিলোচনঃ ।

ভাজ্যঃ সমাধিং পাদেয়ঃ । তং দর্শনং পিতামহঃ ।

অধোদ্বিতরীক্যাপ পূর্ণকাক্রতঃ হিতভঃ ।

পগচ্ছ কো ভবানগ্রৈ তিষ্ঠতে পুরুষোত্তমঃ ।

ইতিপুটো হব্রবীভীম ব্রাহ্মণঃ কলমোচনম্ ।

পুরুষ উবাচ ।

উৎপন্নো বিধিনা নাথ বজ্রহীরার সংশয়ঃ ।

নামধেয়ং হি মে ভাত । বক্ত, সর্বতত্ত্বঃ পরম্ ।

বখোচিতক বৎকার্যং তৎ বৎ সামদুশাসয়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য ভাতো ব্রহ্মা পুরুষঃ বশরীরজম্ ।

একম্বা প্রভূবাচেনমাননিতমতিঃ পুনঃ ।

ধিরদাবার মেধাবী ধ্যানহত্মপি হৃদয়ঃ ।

প্রকোবাচ ।

মজ্জরীরাং সমুভূত জগদং কায়স্থসংজকঃ ।

চিত্রগুপ্তোতি নামা বৈ ব্যাতো ভূবি ভবিষ্যসি ।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুত্রঃ সদা ।

স্থিতিভবতু তে বৎস । মহাজ্ঞাঃ প্রাপ্য নিশ্চলান্ ।

কত্রবর্ণোচিতোদ্বর্গঃ পালনীকো বখাবিধিঃ ।

প্রজাঃ পুরুষ ভোঃ পুত্র ভূবি ভায়সমাবিভঃ ।

তমৈ বখা বয়ং ব্রহ্ম ভবৈবাকরপরীতঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ ।

চিত্রগুপ্তাধরং ভাতাঃ শূন্যান্ কথয়ামি বৈ ।

গৌড়াধ্যা শূন্যাক্ষর ভট্টনাগরসেনকাঃ ।

অধিষ্ঠানাঃ শ্রীবাত্ম্যো লোকসেনান্তবৈবচ ।

ভূশলাঃ সর্গশাস্ত্রেণ অবর্তাদ্যা মহাবিপ ।

পূজান্ বৈ হ্যাপরাহাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে ।
 ধর্মধর্মবিবেকজ্ঞানিহুগুপ্তো মহামতিঃ ।
 ভূবন্তান্ বোধয়ামাস সর্বনাথনুভবন্ ।
 পূজনং দেবতান্যক পিতৃনাং বজ্রনাথনু ।
 বর্ণনাং ব্রাহ্মণান্যক সর্বহাতিবিশেষনন্ ।
 প্রজাতাঃ কন্যাসামান্য ধর্মধর্মবিশোচনন্ ।
 কর্তব্যং হি প্রবক্ষ্যে ন পুত্রাঃ ! কর্তব্য কাব্যম্ ।
 বা সান্না প্রকৃতিঃ শক্তিশক্তি চতুশ্চক্ৰিণী ।
 ততাত্ত পূজনং কার্যং সর্বনিজিপ্রদায়কম্ ।
 ধর্মধর্মিকারসামান্য বতোবজ্রজুগলঃ সন ।
 ভবতিঃ সা সবা পূজ্যা দ্বিষ্টাষ্ট্রৈশ্চ হুয়াতিভিঃ ।
 ভবতাং সিদ্ধিমা নিভায় পূজনং সাত্ত চণ্ডিকা ।
 তথাচোক্তা হুয়াপেরা বানপেরা বিজাতিভিঃ ।
 বৈকবঃ ধর্মমাজিত্য মহাবাক্য প্রতিপালয় ।
 কর্তব্যং হি প্রবক্ষ্যে ন লোকজরহিতায় বৈ ।
 অমূল্যমা হুতানেষং চিত্রগুপ্তো দিগং যযৌ ।
 ধর্মরাজভাধিকারী চিত্রগুপ্তো বজ্রবহ ।
 এবং ভীষ ! সনুং পরাঃ কারতা যে প্রকীর্তিতাঃ ।
 যে প্রোক্তান্তে সন্যাসাতাঃ সংখ্যকঃ শূন্য ভৎসরন্ ।
 অহং তে কথরিব্যারি বিচিত্রং পরমাত্মকম্ ।
 প্রত্যং চিত্রগুপ্ত সনুতু তং বধা পুনঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ ।

সৌদাসো নাম রাজাত্মং সমন্তে ক্রতিমত্তলে ।
 সন্যাসাপরতঃ সৌহৃদ্য ধর্মধর্মঃ নবিনতি ।
 স বধা ধর্মসামান্য লেভে পুণ্যকলঃ শূন্য ।
 সর্বপাপো দুর্নচারঃ সর্বধর্মবিবর্জিতঃ ।
 রাজনীতিগতং ধর্মং ন জানাতি কথকন ।
 অদেবে বাদয়ামাস ডিগিমং স নরাধিপঃ ।
 ন দাতব্যং ন বষ্টব্যং দৈবং পিত্র্যং কদাচন ।
 আতিথ্যভগপকর্ষণি ভগঃ সাধননুভবন্ ।
 ন কর্তব্যং নৈবঃ কপি সন্যাসঃ স মহীতলে ।
 এবমাজাতবীজোক্তে দৈবপিত্রেয়কর্ষণি ।
 পরিভ্রাজ্য স্বকং দেশং ততো দেশান্তরং যযৌ ।
 যে কেচিৎসতিঃ চক্রেদর্শেন্দ্র ব্রাহ্মণধর্মঃ ।
 নৈববজ্রঃ প্রকৃষ্মতে দৈবং পিত্র্যং কদাচন ।
 ততঃ প্রভৃতি গালয় । ন বজ্রহবনং কচিং ।
 ন কোহপি কুরুতে ভীষ ! পুণ্যং তত্র সিংহিষিতম্ ।
 অত্রহীন্ ব্রাহ্মণানিভাঃ কত্রং ধর্মবিষয়কঃ ।
 অহো ধর্মভূতাঃ প্রোক্ত শূন্য কর্ণবিপাকজন্ম ।
 কাসেনান্তেন গালয় সৌদাসে বিচরন্ মহীন্ ।
 কান্তিকৈ গুরুপাকৈচ বিতীরা চোভমা তিথিঃ ।
 ততঃ কার্যক কার্যৈশ্চচিত্রগুপ্ত পূজনন্ ।
 মহতা ভক্তিভাবেন ধূপদীপাঘ্যামকৃতম্ ।
 দৈবযোগাভিধারাতঃ সৌদাসঃ পর্যটনমহীন্ ।

বুই । পশ্চাদ্ কতেকং পূজনং ক্রিয়তে কতে ।
 তে উহু চিত্রগুপ্ত পূজাকর্ষ ভক্তঃ শূন্য ।

রাজোবাচ ।

অহবেব করিবারি চিত্রগুপ্ত পূজনন্ ।
 ততশ্চ বিধিবৎ নানং কৃচ্ছা চৈব নরাধিপঃ ।
 প্রজাতুল্যশরীরেন বুই । ৫ পূজনং ততঃ ।
 কৃচ্ছাতু পূজনং তত্র চিত্রগুপ্ত ভক্তিভঃ ।
 গত পাপোহতবৎ সন্যাসঃ সৌদাসো হসৌ মহীপতিঃ ।
 চিত্রগুপ্তপ্রজাবেন গতো লোকঃ হুয়ালয়ন্ ।
 ইদং বিচিত্রং সাহস্রাং চিত্রগুপ্তপ্রজাবলন্ ।
 কথিতং শূপশার্দ্দুল । কিমন্তং প্রোক্তমিচ্ছামি ।
 ইত্যাকর্ণ্য ততো ভীষঃ প্রভৃৎচ শুন্য ভক্তঃ ।
 বিধিমা কেন তত্রাপি পূজাকার্য্য মহামুদে ।
 কোমন্ত্রঃ কোবিষিক্ত্র সর্বং তব্বং যে প্রোক্তা ।
 বাসাসাম্য মুনিশ্রেষ্ঠ । সৌদাসঃ ধর্মগণ্ডবান্ ।

পুলস্ত্য উবাচ ।

চিত্রগুপ্ত পূজারা বিধানং কথয়ামাস ।
 নৈবেদ্যৈর্ভূতপৈক্য বধাকালোভবৈঃ কলৈঃ ।
 গজপুলোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ হুগতিভিঃ ।
 নান্যপ্রকারৈঃ নৈবেদ্যৈঃ পটবস্ত্রৈঃ হুশোভনৈঃ ।
 ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গৈশ্চ পটহৈশ্চৈব ডিতিভিঃ ।
 চিত্রগুপ্ত পূজারাঃ প্রজাতুল্যসমবিতঃ ।
 নবভূজং সমাকীর পানীরপরিপূরিতম্ ।
 শর্করাপূরিতং কৃচ্ছা পাত্রং ততোপরি ভুতং ।
 পূজাকালে প্রবক্ষ্যে ন দাতব্যক বিজয়নে ।
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র কারহানপি সন্ত্রবিন্ ।
 মসীভাজনসংযুক্তঃ সন্যাস চরসি ভূতলে ।
 লেখনীচ্ছদনীহুতচিত্রগুপ্ত নমো হস্ততে ।
 চিত্রগুপ্ত সমস্ততাং নমন্তে ধর্মধর্মপিতা ।
 তেবাং তং পালকো নিত্যং সন্যাসঃ প্রবক্ষ্যে ।
 মন্ত্রোপানেন রাজেন্দ্র চিত্রগুপ্ত পূজনন্ ।
 এবং সংপূজ্য বিধিবৎ সৌদাসো ভক্তিভাবতঃ ।
 অচিরং পাপসংমুক্তো রাজা কৃচ্ছা হুতো শূন্যঃ ।
 নীতোহসৌ বনমূলৈশ্চ বনলোকং ভ্রামকম্ ।
 চিত্রগুপ্তপূজা পূজ্যধর্মরাজো হপি ভারতঃ ।

ধর্মরাজ উবাচ ।

সৌদাসোহসৌ দুর্নচারঃ পাপকর্মসহারতঃ ।
 বানি কানি চ পাপানি রাজাসৌ কৃতবান্ ভূবি ।
 পুটোহসৌ বনরাজেন ধর্মধর্মবিশারদঃ ।
 ধর্মরাজঃ ততঃ প্রাহ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ।
 বিপাকং ধর্মজং জ্ঞাত্বা তং প্রহস্যাত্রবীচতঃ ।

চিত্রগুপ্ত উবাচ ।

জানৈবহং পাপকর্মসৌ রাজারং বিবিতঃ ধীবা ।
 স্বং প্রসাদ্যবহং সৌদে । পূজ্যো হসি ব্রহ্মাতলে ।

হুয়া দত্তঃ বরঃ মানঃ ভক্তভেদঃ সদাশ্রিতঃ ।
ইতি জ্ঞাত্বা বদাম্যত্র রাজা পাণোহতি মে মতিঃ ।
পুজাং চকার রাজা হেনৌ দৃষ্টে । পুজাং সামকীদ্র ।
অতঃপরে হেনি হে দেব । বাহু বিকৃপঃ বৃণঃ ।
বসোভাষাপিতো রাজা ঐকবঃ পদমাণ্ডবান্ ।
মে চাত্তে পুজয়িত্বা চিত্তগুপ্তঃ মহীতলে ।
কায়স্থঃ পাণিনিষ্ঠা যাততি পরমাং পতিম্ ।
তস্যাং বসপি গাজের । পুজাঃ কুত্র বিধানতঃ ।

দত্তাজের উবাচ ।

মুনের্বচনমাকর্ণ্য তীম্র প্রভতমানসঃ ।
চকার পুজনং তত্র চিত্তগুপ্তস্ত তৎপরঃ ।
কার্ষিকি গুরুপক্ষেতু মিতীয়ারাক ভারত ।
বসক চিত্তগুপ্তক বসপুত্ৰাং পুজয়েৎ ।
অতো বসমিতীয়েতি সংজ্ঞা লোকে বহুব্ধ ।
ভেনৈব ভগিনীহস্তে ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।
নিত্যং বশতমারুৎ সংসর্গকামাধিসিদ্ধিম্ ।
হানানি হাপয়েদ্যন্ত ভগিনী চ বিশেষতঃ ।
কালে তত্র চ সাংপুজা চিত্তগুপ্তক লেখকম্ ।
চিত্তৈক চিত্তপুষ্টিপাক রক্তচন্দনমিশ্রিতঃ ।
নৈবেদ্যঃ দীয়েত তৈম্র মোদকং গুড়মিশ্রিতম্ ।

ভীমোক্ত প্রার্থনা যথা—

উৎপত্তৌ এলয়ে চৈব ভ্যাগে দানে কৃতাকৃতৈঃ ।
লেখকঃ সদা শ্রীমাংসিত্তিগুপ্তনমোহস্ততে ।
শ্রীয়া সহস্রমুংগর সমুদ্রমনোভব ।
চিত্তগুপ্ত মহাবাহো ! মদাং বরদো ভব ।
চিত্তগুপ্ত সন্তোঃ ভীমার চ বরং দদৌ ।
সংপ্রসাদায়মহাবাহো যুতান্তে ন ভবিষ্যতি ।
স্মরিত্বা বদা যুতং তদা যুতার্জবিষ্যতি ।
ইতি তমৈ বরঃ দত্তা চিত্তগুপ্তো দিবঃ বরো ।
অনেন বিধিনা যন্ত চিত্তগুপ্তস্য পুজনম্ ।
করিষ্যতি মহাবুদ্ধে তস্য পুণ্যফলং শৃণু ।
ইতৈব বিবিধান্ ভোগান্ ভুজ্য সর্বাণ্য মনোরথান্ ।
অকরং বিকুলোকক নরো বাতি ন সংশয়ঃ ।
চিত্তগুপ্তক্যাং দিবাং কারহোংপতিসংজ্ঞকাম্ ।
ভক্তিযুক্তেন মনসা বে শৃণুতি নরোত্তমাঃ ।
কীর্ষায়ুযো ভবিষ্যতি সর্ববাণ্যবিবিক্তিতাঃ ।
সর্গে বিকৃপদং বাতি বজ্র যাত্তি তপোধানাঃ ।

দত্তাজের কহিলেন—সর্বপাশ্রয়ি মহাহুত্ব তীম্র ত্রিভালজ মহা-
প্রাজ ধর্মিষ্ঠে পুলভ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ব্রহ্ম ! আমি
ব্রাহ্মণ্যি চাত্তুর্যের উৎপত্তি ও জ্ঞান চতুষ্টয় এবং সত্ত্বজাতিগণের
উৎপত্তির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইরাছি । হে মুনে । লোক মধ্যে
কারহবিষয়ের উৎপত্তির কথা বিশেষ বিখ্যাত । তাহার বিকৃতভিগরা-
দ্বয়, হানানি, পিত্তবীজগার্য, সর্গপাশ্রে দ্বপতি, কাব্যাকার্য ও

বসনবর্ণের বিশেষতা ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক । হে মহাপ্রাজ । এ
একশ নৃভণালভূত কারহবিষয়ের উৎপত্তির বিষয় জিজ্ঞাসিত্রপে তুমিতে
ইচ্ছা করি । অতঃপূর্বক আমার নশ্বর হুয় করিরা সন্তোষ বিধান
করন ।” মুনিষ্ঠে পুলভ্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইরা উত্তর করিলেন—
হে গাজের ! ইতিপূর্বে বাহা তোমার ক্রতিবোচন হয় নাই ; আমি
সেই কারহবিষয়ের উৎপত্তির কারণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।—হে
তীম্র ! বিধি এই স্বায়রজলমাত্রক বিশ্বাসের দৃষ্টি করিরা প্রতিপালন
এবং এলয়কালে সংহার করেন, সেই অব্যক্ত পুরুষ পিতামহ ব্রহ্ম এই
জগতের বেরণ দৃষ্টি বিধান করিরাছেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর ।
হে ভায়র ! ব্রাহ্মর মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহ হইতে কায়স্থ, উক হইতে
বৈজ্ঞ এবং চরণ হইতে পুত্র এবং বেজহাঙ্গুরক বিশব, চতুষ্পদ, দ্বিপদ,
কীট, দ্ব্যকম, সন্ন্যাসাদি প্রাণিবর্গ এবং চত্র হুবা ব্রহ্মকায়াদি এবং-
কালে দৃষ্টি করিলেন । তিনি এই প্রকার বহুবিধানে বিশ্বাসের দৃষ্টি
করিরা অতি তেজস্বী আপন জ্যোতিপুত্র কতপকে আহ্বান করিরা
বলিলেন, হে পুত্র ! অতি বয়পূর্বক এই জগৎ প্রতিপালন কর । ব্রহ্ম
এই প্রকার দৃষ্টি বিধান করিরা ভদ্রনস্তর বাহা করিরাছিলেন, তাহা
শ্রবণ করন । শান্তবানস মহারা কমলানন দৃষ্টিবিধানান্তর হির-
চিত্তে ইঞ্জিরপকে সংঘত করিরা ১১০০০ বৎসর সমাধি হইলেন ।
তিনি এইরূপ সমাধি অবলম্বন করিলে বাহা হইরাছিল তাহাও বলি-
তেছি শ্রবণ কর । তদনন্তর অব্যক্তজগা সেই ব্রাহ্মর কার হইতে
জামবর্গ, পদ্মলোচন, কৃষ্ণবীণ, গুণিদিরা, পরমহম্বর এক পুরুষ উৎপন্ন
হইরা, লেখনী, ছেদনী ও মসীপাণ্ড হতে তৎসমুদে দারমায় হইলেন ।
হে গাজের ! পিতামহ ব্রহ্ম সমাধিত্ত করিরা সমুদ্রবিত্ত ধ্যানপন্নায়
দ্রুবিচিত্র-গঠন উত্তম পুরুষকে বর্ণন করিলে, সেই পুরুষ পরমভক্তি-
সহকারে ব্রাহ্মর আশ্রয়নন্তক নিরীকণ করিরা কহিলেন, হে ভাত !
আমার নাম কি এবং আমার উপযুক্ত কার্যে আমাকে নিয়োজিত
করন । ভগবান্ ব্রহ্ম বকারসমুদ্র পুরুষের হৃদয়রাক্য শ্রবণ করিরা
আমলিত চিত্তে কহিলেন, হে বৎস ! আমি হিরচিত্ত হইরা জন্মর
সমাধি হইলে তুমি আমার কার হইতে উৎপন্ন হইরাছ । এ নিমিত্ত
তুমি সংসারে কারহ নামে খ্যাত হইলে আর তোমার দান চিত্তগুপ্ত
হইল । ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারার্থ ধর্ম্মরাজের সত্তার তোমার দান নিরূপিত
হইল । তুমি তথায় অবস্থিত হইরা কত্রবর্ণাদির বর্ণ প্রতিপালন এবং
পৃথিবীতে ভারসমবিত্ত প্রজা দৃষ্টি কর । ব্রহ্ম এই বর দান করিরা
তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন । হে কৃপণবিশিষ্ট ! অতঃপরে চিত্ত-
গুপ্তের বংশকীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করন । ভট্ট, নাপর, সেনক,
গৌড়, শ্রীযুক্তবা, বাহু, অহিষ্ঠান, শৈকলেন এবং অর্ঘ্য চিত্তগুপ্তের
এই উত্তম করেক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, মহারতি চিত্তগুপ্ত
এই সকল বিচারকম পুত্রপক্ষে বর্ণন করিরা অভ্যাশ্রয় চিত্তে
পৃথিবীমণ্ডলে স্থাপন করিরা তাহাবিপক্ষে সর্বসিদ্ধিপ্রদ উপবেশ
করিলেন । হে পুত্রবর্গ ! তোমরা বর্ণ কামনা করিরা সর্ববা
যোজনা, ব্রাহ্মণবিষয়ের পালন, অতিথি সেবা এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারপূর্বক
প্রজাপঞ্জর করপ্রণ করিয়ে এবং ভোগ্যাদিদের কর্তব্য বে বয়পূর্বক
পুত্রোৎপাদন করিরা বর্ণ কামনা করিয়ে ।

মহাপুরুষেরা বে মহাবীর্য প্রভাবে দিগ্ধি লাভ হইরা বর্ষ

বজ্রাশ্বতরী হ'ল, তোরগাও সর্বদা সেই রক্তহেমবর্ণী তরী
 দ্ব্যনুধারায় হইয়া কল পুষ্প পুষ্পাশি নানা উপচার-কল্পবাসে
 পূজা করিলে। তাহা হইলে তিনি তোরগাশিরে প্রতি পূজ্যতরী ও
 সর্বসিদ্ধিপ্রদা হইবেন। আর বিজাতির অপেরা যে হুয়া ভাষ্য
 চিত্তিপূজ্যার্থ তোরগাশিরে পের হইল। কিন্তু তোরগা
 লোকের হিতের নিষিদ্ধ বৈকল্যের আশ্রয়পূর্বক আমার আজ্ঞা
 প্রতিপালন করিবে। চিত্রগুপ্তের পূজ্যবিশেষ এইরূপ উপদেশ প্রদান-
 পূর্বক কর্তৃক গমন করিয়া বর্ষাকালের সতী হইলেন। হে ভীষ্ম! আপনি
 যে আমাকে কারুহৃদয়ের উপাখ্যান কিস্তাসা করিয়াছিলেন, তাহার
 এইরূপে উপহার হইয়াছেন। এক্ষণে চিত্রগুপ্তের বাহ্যিক প্রবণ করুন।

পুলস্ত্য বলিলেন—“এই পৃথিবীমণ্ডলে সৌদাস নামে এক রাজা
 সর্বদা পাণকর্ণের রত থাকার বর্ষাবধি কিছুই বিচার করিতেন না।
 কিন্তু তিনি যে কারণে হিরণ্য লাভ করিয়াছিলেন তৎপূর্ণাঙ্গ প্রবণ
 করুন। ঐ সৌদাস রাজা অত্যন্ত হুয়াচার, সর্বপ্রকার পাণকর্ণের রত,
 ও সর্ববর্ষবিবর্জিত ছিলেন। রাজনীতি কিছুমান জ্ঞাত ছিলেন না
 এবং অভিযিন্সা প্রভৃতি কোন উত্তম কর্ম সাধন করিতেন না।
 তিনি বিজাতিবিশেষে ঘেঁষ পিতৃকর্ম ও বজ্রাশি কিছুই করিতে দিতেন
 না। অতঃপর কিংকাল অভিযাহিত করিয়া বিশেষজ্ঞমণে গমন
 করিলেন। পৃথিবীমণ্ডলে ব্রাহ্মণদিগে যে কেহ বসতি করিতেন, তাহার
 কেহই বজ্রহনাদি কর্ম করিতে পারিতেন না। হে ভীষ্ম! তিনি
 কখন কোন পুণ্যকর্ম করেন নাই। সেই বিদুষক রাজা ব্রাহ্মণদিগের
 কর গ্রহণ করিতেন। হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! তাহার কর্মকল প্রবণ
 করুন। পাণাঙ্গা সৌদাস কোন সময়ে পৃথিবী পর্যটন করিতে
 করিতে দেখিলেন যে, কাশ্মীরমাসে গুপ্তপক্ষে উত্তমা দ্বিতীয়া
 তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা কর্তব্য বলিয়া কারুহেরা তত্ত্বভাবে ধূপ-
 কীপাদি নানা উপচারে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতেছে। সৌদাস
 রাজা তথায় গমন করিলেন এবং তাঁহারের পূজা দেখিয়া পরম
 সন্তোষে তত্ত্বভাবে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করার তৎপরাং নিপাণ
 হইলেন। বখাকালে যত্ন হইলে চিত্রগুপ্তের প্রভাবে তিনি বিমূলোকে
 গমন করিলেন। অতএব চিত্রগুপ্তের বিচিত্র প্রভাব ও বাহ্যিক তোরগা
 কহিলাম। হে নৃপশাঙ্গ! এক্ষণে আর কি প্রবণ করিতে ইচ্ছা
 করেন।’

ভীষ্ম মুনিবরের এই সকল কথা প্রবণ করিয়া বলিলেন, হে মহামুনে!
 কোন্ বিধানে ও কোন্ সময়ে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতে
 হয়, তাহা আমাকে বলুন? বাহার পূজা করিয়া সৌদাস রাজা
 হিরণ্য লাভ করিয়াছিলেন? পুলস্ত্য বলিলেন, চিত্রগুপ্তের পূজার
 বিধি কহিতেছি, প্রবণ করুন। গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-কীপাদি উপহার দ্বারা
 যত্ন সহিত অর্ঘ্য ও তত্ত্ববুদ্ধ হইয়া চিত্রগুপ্তের পূজা করিবেন।
 জলপূরিত নুতন কলসোপরি সর্বদাপূর্ণ পান রাখিয়া পূজাতে
 বিজাতিবিশেষে দান করিবেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ ও কারুহবিশেষে
 তোজস করািবেন।

“হে চিত্রগুপ্ত! তুমি সতীপাত লেখনী ও হেমবর্ণী হতে পুত্র প্রদান করিয়া
 পৃথিবীমণ্ডলে সর্বদা প্রবণ করিতেছ, তোমাকে বনমহার। হে চিত্রগুপ্ত!
 তোমাকে বনমহার। তুমি সর্বদা বর্ষাবধি, জেনারেল বনমহার।

জলপূর্ণাঙ্গ রেখুকামাহোম (৬) কবিতা জাতির উৎ-
 পত্তি সম্বন্ধে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে—

তুমি লোক সকলের দিত্যপালক, তুমি আমাকে বনমহার। বনমহার, তোমাকে
 বনমহার করি।” মহারাজ সৌদাস তত্ত্ব ও অর্ঘ্যবুদ্ধিতে এইরূপ বনমহার
 চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করার অচিরাৎ সর্বপাণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।
 রাজ্যতোষণে যত্ন হইলে বনমহার তাহাকে ভরদ্বাজ বনমহারে আনয়ন
 করিল। তাহাকে দেখিয়া বর্ষাকাল চিত্রগুপ্তকে এইরূপ কহিয়া-
 ছিলেন। “এই হুয়াচার সৌদাস রাজা সর্বদা পাণকর্ণের রত থাকিয়া
 নিরন্তর সংসারমধ্যে নানাবিধ পাণচরণ করিয়াছেন।” বর্ষাকাল এই-
 রূপ কহিলে, বর্ষাবধিবার্ষিক বনমহাতি চিত্রগুপ্ত সৌদাসের কর্মকলিত
 বিপাক জ্ঞাত হইয়া হাতপূর্বক বর্ষাকালকে বলিলেন—

“এই সৌদাস রাজা সর্বদা পাণকর্ণের রত ছিলেন, তাহা আমি জ্ঞাত
 আছি। হে হুয়াপুত্র! তোমার প্রসাদে তোমা কর্তৃক শ্রেষ্ঠ হান
 প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে আমি পূজ্য হইয়াছি। সৌদাস রাজা
 পাণকর্ণ করিয়াছে বটে, কিন্তু হে দেব! এই পৃথিবীমণ্ডলে একদা
 আমার পূজা দেখিয়া এই রাজা তত্ত্বভাবে আমার পূজা করিয়াছিলেন,
 সেই হেতু আমি তুমি হইয়া বিমূঢ় প্রাপ্ত্য বর প্রদান করিয়াছি।
 এই কথা শুনিয়া বর্ষাকাল বিমূঢ় প্রাপ্তির অনুমতি করিলেন।
 অতএব পৃথিবীতে যে কারুহেরা চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন,
 তাহার সর্বপাণমুক্ত হইয়া পরমগণ লাভ করিবেন। অতএব হে ভীষ্ম!
 তুমিও বিধিপূর্বক তাহার পূজা কর।

মহারাজের কহিলেন, পুলস্ত্যের এই কথা প্রবণ করিয়া ভীষ্ম মহা-
 পর তত্ত্বভাবে কাশ্মীরমাসে গুপ্তপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে বনমহার,
 চিত্রগুপ্ত ও বনমহার সকলের পূজা করিলেন। এই নিমিত্ত এই তিথির
 নাম বনমহারী হইল। এই দিনে রক্তচন্দনমিশ্রিত চিত্র বিচিত্র পুষ্প
 ও নৈবেদ্যাদি এবং গুপ্তমিশ্রিত মোহকদ্বারা চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে।
 ভদ্রাদি হস্তপ্রস্তুত অর্ঘ্যাদি ও গুপ্ত পানতোজন করিলে বুদ্ধি, যশঃ,
 আয়ুর্ভুক্তি এবং সর্ব কাশনা সিদ্ধ হয়। জ্ঞাতা ভোজনান্তে ঘের জ্বাদি
 ভদ্রাদি দিবেন। মন্ত্র—“উৎপত্তি, প্রলয়, তোগে, দানে ও পাণপুণ্যে
 তুমি লেখক ও শ্রীমান, হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে বনমহার করি,
 তুমি সমুদ্রবহনে লক্ষীর সহিত উপহার হইয়াছ। হে মহাবাহো!
 চিত্রগুপ্ত অর্ঘ্য আমাকে বর প্রদান করুন।”

চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিলেন। হে মহা-
 বাহো! ভীষ্ম! আমার প্রসাদে তোমার যত্ন হইবে না। তুমি বনম
 ইচ্ছা করিবে, তখন তোমার যত্ন হইবে। চিত্রগুপ্তদেব ভীষ্মকে এই
 বর প্রদান করিয়া বর্ষে গমন করিলেন। এই প্রকারে বাহার পৃথি-
 বীতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাহার ইচ্ছালোকে নানাবিধ বন-
 মহার তোগ করিয়া পরলোকে অমর বর্ষ তোগ করিবেন। অতএব
 এই কারুহোপপত্তি প্রকারে যে কেহ কারুহ চিত্রগুপ্তের কথা তত্ত্ব-
 ভাবে প্রবণ করিবেন, তাহার সর্বদা হইতে মুক্ত হইয়া বর্ষাবধি
 হইবে এবং বনমহারে বিমূঢ়োক্ত-গমন করিবেন।

(৬) কলসাকরতট ও তাহার পূজ্যকর্তৃত্ব এই উপাখ্যান উল্লেখ
 করিয়াছেন।

এবং হৃদয়স্থানঃ রামঃ সন্ধ্যা নিশিতান্ শরান্ ।
 এক এব যবৌ হস্তঃ সর্গানেবাতুরান্ নৃগান্ ॥
 কেচিং গহনমাপ্রিত্য কেচিং পাতালমাবিশন্ ।
 সগৰ্ভা চক্সেনন্ত ভার্যা দালভ্যাপ্রমং যবৌ ॥
 ততো রামঃ সমাবাতো দালভ্যাপ্রমমুত্তমম্ ।
 পূজিতো মুনিরা সদ্যঃ পাদ্যার্থ্যাচমনাদিভিঃ ॥
 ননৌ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ ।
 রামস্ত বাচরামাস হৃদিস্থং স্বং মনোরথম্ ॥
 বাচরামাস রামাক্ত কামং দালভ্যো মহামুনি ।
 ততস্তৌ পরমপ্ৰীতৌ ভোজনং চক্সমুদম্ ॥
 ভোজনানন্তরং দালভ্যঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি ।
 যস্য প্রার্থিতং দেব তৎ স্বং শংসিতু মর্হসি ॥
 রাম উবাচ ।—তবাপ্রমে মহাভাগ সগৰ্ভা ত্রী সমাগতা ।
 চক্সেনন্ত রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়ন্ত মহাম্বনঃ ॥
 তস্মৈ স্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসরং ভাং মহামুনে ।
 ততো দালভ্যঃ প্রভূবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥
 দালভ্যউবাচ ।—ক্ষিয়ং গৰ্ভমমুং বাগং তস্মৈ স্বং দাতুমর্হসি ।
 ততো রামোহব্রবীদালভ্যং যদধর্মমহাগতঃ ॥
 ক্ষত্রিয়ান্তকরশচাহং তৎ স্বং বাচিতবানসি ।
 প্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গৰ্ভ উত্তমঃ ॥
 তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা ।
 এবং রামো মহাবাহু হিহা তং গৰ্ভমুত্তমম্ ॥
 নির্জগামাপ্রমাৎ তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ ।
 কায়স্থ এব উৎপন্নঃ ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়ান্ততঃ ॥
 রামাক্সয়া স দালভ্যান ক্ষত্রধর্মাহিহুততঃ ।
 কায়স্থধর্মো দত্তোহস্মৈ চিত্রগুপ্তস্ত যঃ স্মৃতঃ ॥
 তদগোত্রজ্ঞান্ কায়স্থাঃ দালভ্যগোত্রান্ততোহভবন্ ।
 দালভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ ॥
 সদাচারপরানিতাং রতা হরিহরার্চনৈ ।
 দেববিপ্রপিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ ॥”

ভূগুপ্ত এইরূপ কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনকে নিহত করিয়া
 অস্ত্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজগণকে নিধন করিতে নিশিতশর হস্তে
 একাকী গমন করিলেন। ক্ষত্রিয় রাজগণ ভয়ে কেহ নিবিড়
 অরণ্যে পলায়ন করিলেন। কেহ বা পাতাল মধ্যে প্রবেশ
 করিলেন। গৰ্ভবতী চক্সেনের ভার্যা দালভ্য মুনির আশ্রমে
 গিয়া আশ্রয় লইলেন। অনন্তর পরশুরাম দালভ্য ঋষির
 আশ্রমে গমন করিলে মহর্ষি দালভ্য পাদ্যার্থ্যাদি দ্বারা
 তাঁহার পূজা করিলেন এবং মধ্যাহ্নে সমায়পূরক
 ভোজ্যাদি সংগ্রহ করিলেন। রাম ও দালভ্য ঋষি

পরস্পর পরস্পরের নিকটে বাজ্ঞা করিয়া উভয়ে ভোজন
 করিলেন। অনন্তর মহর্ষি দালভ্য ভার্গবকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন—‘হে দেব! আপনার বাহা অতীপিত তাহা
 নিবেদন করুন।’ রাম কহিলেন, ‘হে মহাভাগ! ক্ষত্রিয়
 চক্সেনের গৰ্ভবতী ভার্যা আপনার আশ্রমে আসিয়াছে,
 আপনি তাহাকে দান করুন, আমি বিনাশ করিব,
 এই আমার অভিলাষ।’ দালভ্য কহিলেন, ‘হে রাম! আপ-
 নার অতীষ্ট দান করিতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন;
 আমি সেই গৰ্ভস্থিত বালককে বাজ্ঞা করিতেছি।’ রাম
 কহিলেন, ‘হে মহর্ষে! আমি যাহার জন্ত আপনার আশ্রমে
 আসিয়াছি, আপনি তাহাই প্রার্থনা করিলেন, আমি
 ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী। বাহা হউক, যেহেতু আপনি কার-
 স্থিত গৰ্ভের প্রার্থনা করিয়াছেন, সেজন্ত এই গৰ্ভস্থিত শিশু
 কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।’ অনন্তর ক্ষত্রিয়ান্তকারী মহা-
 বাহু ভার্গব গৰ্ভিণী চিত্রসেনের ভার্যাকে ত্যাগ করিয়া
 দালভ্যের আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই কায়স্থ
 ক্ষত্রিয়ার গৰ্ভে ও ক্ষত্রিয়ের গুণে উৎপন্ন হইয়াছে, রামের
 আজ্ঞায় সেই কায়স্থ ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চিত্র-
 গুপ্তের ধর্ম অবলম্বন করিল। তদগোত্রজ্ঞান কায়স্থগণ
 দালভ্যগোত্র নামে পরিচিত হইয়া দালভ্যের উপদেশানুসারে
 ধর্মিষ্ঠ, সত্যবাদী, সদাচারপর, হরিহর অর্চনার রত, দেব,
 বিজ্ঞ, পিতৃ ও অতিথিদিগের পূজক হইল।”

চিত্রগুপ্তের বৃত্তি কি? মানবের পাপপুণ্যলেননই
 তাঁহার বৃত্তি। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শিবরাত্রি সংবাদে
 ১০২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

“রাম উবাচ।

চিত্রগুপ্তেন লিখিতা লগাটে বা লিপিদৃঢ়া।

তয়া লিপ্যাতু নিরতং নরকং কথমন্তথা ॥”

উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে, চিত্রগুপ্তই রাজবের
 লগাটে ভাবী শুভাশুভ ফল লিখিয়া রাখেন।

[চিত্রগুপ্ত দেখ।]

বাহা হউক, চিত্রগুপ্তের বৃত্তি বলিতে গেলে লেখকবৃত্তি
 বৃত্তিতে হইবে। যদি উক্ত উপাখ্যান প্রকৃত ঘটনা থাকে,
 তাহা হইলে ক্ষত্রিয়স্তান যে কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়া
 লেখকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কতকটা বিশ্বাস
 করিতে হয়। ধর্মশাস্ত্রপাঠে জানা গিয়াছে, লেখনবৃত্তিই
 কায়স্থজাতির উপজীবিকা ছিল, অতএব লেখন বৃত্তিই
 কায়স্থকে এবং কায়স্থ বৃত্তিই লেখনবৃত্তিধারীকে বুঝাইত।
 প্রকটবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—

“বিত্তৈকশিপিকর্তা চ ভব্যহাচর্যমঃ হরেণ ।

ভয়ঃকুণ্ডে বর্ষণতঃ স্থিতা স্বর্গবসিগচ্চবেণ ॥”

ঐক্যকল্পকথ ১৫। ১২৩ ॥

যে ব্রাহ্মণ শিপিবৃত্তি অবলম্বন করে এবং যে অন্ন-দাতার ধন হরণ করে, তাহাকে একশতবর্ষ অন্ধকারনয়ক কুণ্ডে বাস করিয়া স্বর্গবসি হইয়া কল্পগ্রহণ করিতে হয়।

উক্ত শ্রোত্রীয় হারা বোধ হইতেছে যে পৌরাণিকসময়ে ব্রাহ্মণদিগের লেখকবৃত্তি নিবেদ ছিল।

যৎপুত্রাণে লেখকের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

“লেখকঃ কথিতো রাজঃ সর্বাধিকরণেণ বৈ ।

ঈর্ষোপেতান্ হ্রস্পূর্ণান্ সমস্ত্রেণিগিতান্ সমান্ ॥

আন্তরান্ বৈ লিখেন্দবন্ত লেখকঃ স বরঃ সূতঃ ।

উপারবাক্যকুশলঃ সর্গশাস্ত্রবিশারদঃ ॥

বহুবর্ষক্য চান্নেন লেখকঃ স্তান্নপোত্তম ॥”

মাৎস্ত্রে ১১৫। ২৫-২৮ ।

সকল দেশের বর্ণমালার অভিজ্ঞ, সর্গশাস্ত্রবিৎ লেখকই রাজার ধর্ম্মাধিকরণের উপযুক্ত। যিনি সমান মাত্রার সমান ছত্রে গোটা গোটা লিখিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। হে নুপোত্তম! যিনি উপারবাক্যকুশল, সর্গশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যিনি অন্নকথার বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তাহাকেই লেখক বলা যায়।

গরুড়পুরাণের মতে—

“মেধাবী বাকপটুঃ শ্রোক্তঃ সত্যবানী জিতেজ্জিয়ঃ ।

সর্গশাস্ত্রসমালোকী হ্বেষ সাধুঃ স লেখকঃ ॥”

গারুড় ১১২। ৭ ।

মেধাবী, বাক্যকুশল, বিদ্বান্, সত্যবানী, জিতেজ্জিয় এবং সর্গশাস্ত্র সাহায্য দেখা আছে, সেই সাধুই লেখক।

রেণুকামাহাভ্যে ‘কল্পধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত’ এইরূপ থাকায় কেহ কেহ কার্য্যকে কল্পধর্ম্ম দ্রষ্ট, সূত্ররূপে পতিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পতিতের সর্গশাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্মাধিকরণে অধিকার আছে, এরূপ কথা কোথাও পাওয়া যায় না। অতএব যদি রেণুকামাহাভ্যাকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ‘কল্পধর্ম্মবহিষ্কৃত’ অর্থাৎ ‘মুদ্রকার্য্যে বিরত’ এইরূপ অর্থ করিতে হয়। কারণ স্বধর্ম্ম-ত্যাগীর সর্গশাস্ত্রে অধিকার নাই, কিন্তু রাজসভায় লেখক বা কার্য্যের সর্গশাস্ত্রে অধিকার নির্দিষ্ট আছে।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

“চিত্রভূতপুংসঃ কল্পবোজনামাষ বিংলতিঃ ।

কার্য্যভ্যন্তর পতন্তি পাশপুণ্যানি সর্গশঃ ॥” উক্তকথ ১১। ২।

ভাষ্য বিংলতি বোজন শিখক চিত্রভূতপুংসঃ, সেখানে কার্য্যভ্যন্তর পতন্তি পাশপুণ্যানি বিলম্ব করিয়া থাকেন।

উক্ত শ্লোক হারা বোধ হইতেছে যে কার্য্যভ্যন্তর কেবল লেখক তাহা নয়, ধর্ম্মাধিকরণে তাহাদের ভাগ্যমন্ড বিচার করিবারও কর্ম্মতা ছিল। বৃত্তি ও পুরাণের সময় পুত্রের লেখকবৃত্তি অথবা ধর্ম্মাধিকরণে বিচার করিবার কর্ম্মতা ছিল না। সূত্ররূপে পুরাণমতে কার্য্যেরা পুত্র নয়, তাহা স্থির।

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে এই বিবরণ পাওয়া যায়—

“বিচিত্রো জগত্যাং হেতুর্ভগবান্চ সদাভ্রমঃ ।

তদ্ব্যবসায়ি বৈচিত্র্যঃ জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ ॥

চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞোত্তরাত্মবাবি ।

ধর্ম্মরাজ্য সচিবৌ সৃষ্টাবস্যাতু বেধনা ॥

অসত্যং দণ্ডনেত্যারৌ নৃপনীতিবিত্তকণৌ ।

যথার্থবাসিনৌ তাত্যাং শাস্তিকর্ম্মণি তাবুজৌ ॥

কার্য্যসংজ্ঞাধ্যাতৌ সর্গকার্য্যপূর্ণিনৌ ।

লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপারায়ণৌ ॥

অগ্নিন্ সংসারজলধৌ বড়বিধাঃ কার্য্যবর্জিনঃ ।

তদ্ব্যবসায়বিজ্ঞান্য কার্য্যস্বমিহৈতরোঃ ॥

ধর্ম্মরাজ্য সাচিব্যাং কুর্ততোঃ শাস্তিকর্ম্মণি ।

হরেন্দ্রগ্রহাদাসন্ তরোশ্চিত্রবিচিত্রয়োঃ ॥

একবিশতিভেদেন আভ্যাং কার্য্যস্বজাতয়ঃ ।

সদৃষ্টঃ স ততস্তাত্যাং পৃষ্ঠঃ স্বাভ্যবিত্তেষ্টিতম্ ॥

অসত্যং কেচ সংসার্য্যঃ কিং বর্ণজা বয়ং প্রভৌ ।

তৎ সর্গং কথমস্যাং ভবৎ-সেবাপরায়ণৌ ॥

ইতি শ্রদ্ধা তরোবাক্যমহুমোদ্য পিতামহঃ ।

উক্তঃ সোত্তরমুংকৃষ্টমুবাচ প্রহমসি ব ॥

ব্রহ্মা উবাচ ।

অত্র বর্ণাশ্রম উৎকৃষ্টো ব্রাহ্মণঃ সর্গসম্বতঃ ।

তত্বেবরজত্যাং বাবাং কত্রিয়ঃ পরিরক্ষকঃ ॥

বিজ্ঞানজীবিতোপারী ব্যবহারনরাধিতঃ ।

বৈজ্ঞানবর্ণভূতীয়ঃ স্তাধর্গমিতর-সেবকঃ ॥

চতুর্থঃ শূত্রবর্ণঃ স্তাধর্গমিতরসেবকঃ ।

অনেকব্যবহারহাঃ কত্রিয়াঃ সন্তি তত্রৈব ॥

তেষামুত্তমত্যাং বাবাং কার্য্যোচ্চকরজীবকঃ ।

তবজৌ কল্পবর্ণৌ বিজ্ঞানজৌ মহামনৌ ॥

কৃতোপারীভিনৌ তাত্যাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ ।

পূর্ণপুণ্যবোধোৎকর্ষাং সাধ্যসাধনতাবিনৌ ॥

এবমাস্থ্যায় ভগবান্ সর্গাস্ত্রপারায়িত্বা ।

অভ্যর্গে তরোরবহিত্যঃ প্রত্যকস্বজিত ॥

হত উবাচ ।

একবিংশতিসংখ্যাকাঃ পংক্তয়স্তৎ পৃথক্ মতাঃ ।
 আদ্যাবেব হি তদ্ব্যর্থঃ স্বধর্মকৃতনিশ্চয়ঃ ॥
 এতাবৎস্ব চ তাবৎস্ব কথ্যতে চ মহাধিপ ।
 মিথোন তক্তিসম্বন্ধসিদ্ধয়েতুকলৌ যুগে ।
 ইমে স্বীয়া ইতিজ্ঞানমন্তথা নহি সিধ্যতি ।
 অতঃ পৃথক্ তয়া বর্ণাঃ কৃতা ঐকৈকবিংশতিঃ ॥
 হৃদ্যধ্বজঃ স্থিতৌ কৃতা গুণজাতিবিচক্ষণঃ ।
 প্রথমঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্থাননামবান্ ॥
 চিত্রদেবস্ত সঙ্করাৎ পূমান্ স্বয়মজায়ত ।
 স হৃদ্যধ্বজ ইত্যাখ্যামবাপ প্রাক্তনপ্রিয়া ॥
 হৃদ্যধ্বজাকৃতি প্রোক্তং চিত্রং তত্ প্রবর্ততে ।
 দেহে যন্মন্ততো জ্ঞেয়ঃ হৃদ্যধ্বজ উদারধীঃ ॥
 অহো তেজস্বিনং বেত্তি নাপ্রয়াৎ স কুটম্বিনম্ ।
 কুলেষ্টদৈবতং যেবাং শ্রীমানাদিত্য এবচ ॥
 এবং বিজ্ঞায় কায়স্থো ভবৎ সন্ততি সাত্ত্বিকঃ ।
 কুলেষ্টদৈবতাত্মানং স্বামহং পরিপূজয়ে ॥
 এবং স্তুতিমন্তেরাসীন্তত্ বিশ্বস্তরোদয়ঃ ।
 বিবস্বান্ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ প্রত্যক্ষঃ করুণানিধিঃ ॥
 বয়ং বরয় ভদ্র স্বং মন্তঃ সন্তোষবারিধেঃ ।
 কিমিচ্ছসি স্তুতিং কুর্কন ইত্যাহ গগনস্থিতঃ ॥
 বিদেহি তারকমাং স্বমেবৈকং সকলার্থদম্ ।
 ত্বন্মাম বসতিস্থানং দেহিমে বিশ্বলোচন ॥
 এবমাত্মাবিতঃ স্বর্ঘ্যো বরমেবহি দিৎসতে ।
 এবমস্থিতি স্রবাক্তং বভাষে ভগবানিদম্ ॥
 হৃদ্যধ্বজস্ত তষ্টেব নিবাসায় ভুবঃ স্থলে ।
 কল্পয়ামাস হৃদ্যাত্মাং পুরীং পরমশোভনাম্ ॥
 হৃদ্যধ্বজাদ্ দ্বিজম্যানো দ্বিতীয়া ইহ ভারতে ।
 ভবিষ্যন্তি নিজঃ কশ্ম কুর্কানাঃ শাস্ত্রদর্শিতম্ ॥
 আশ্রমং প্রথমং তেচ অনতিক্রমা বৈদিকং ।
 যুক্তিমাঙ্গাদ্য বিহিনা গার্হস্থ্যমবলম্বয়ন ।
 তত্রাপি ষট্ স্বকর্ম্মাণি চক্ষুঃ কেবলয়া ধিয়া ।
 বাণপ্রস্থা ভবেযুশ্চ ততঃ সন্ন্যাসসেবিনঃ ॥
 চতুর্থপ্রমযোগ্যেযু শাম্যামাদধুরুন্মতাঃ ।
 সর্বত্রবিষয়াসক্তি রহিতাঃ শিবহেতবে ॥
 সদা সদাচারপরীঃ পরপ্রাণিহিতেরতাঃ ।
 বাজীয়াং বৃত্তিমাঙ্গাদ্য গার্হপত্যাদি সেবকাঃ ॥
 দ্বিতীরস্ত স বিজ্ঞেয়স্কল্পহাস উদারধীঃ ।
 চিত্রগুণ্যাকোজাতি যথা হৃদ্যধ্বজোহভবৎ ॥

স একদা মুখ্যপুমান্ সখীনাং স্থিতিহেতবে ।
 সন্ততোচ বিত্তকায়ে বিত্তয়ে সমচিত্তবৎ ॥
 কুলেষ্টদৈবতা বস্ত চক্রমাঃ সমজায়ত ।
 তন্মাদেনং সমারাক্ষ্মন্তবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥
 এবং স চ বিনিশ্চিত্য চক্রমসমুপাসিতুম্ ।
 যবৌ স্তমেকনিশ্চয়ং স্তপস্কল্লেশিণিশোভিতম্ ॥
 স্ত্যতানদৈবং সন্ততো রাজা সর্বদ্বিজম্যানাম্ ।
 ওষধীনামধিপতি র্জহাস স্তববীকণৈঃ ॥
 আবিরাণীং সমকোহনৌ চক্রমা যুগলাহনঃ ।
 রূপানিধির্বাচেনং মধুরং পূর্ববৎসলঃ ॥
 বয়ং বরয়ত কিপ্রং মন্তোমনসি নিশ্চিতম্ ।
 স্ত্রদ্ধাপি স্তুভগং পুণ্যং বরয়ামাস সধরম্ ॥
 নদাসি যদি দেবেশ বাহিতং মে দদম্বতৎ ।
 মদীয়বংশবর্গ্যস্ত বাসস্থানমন্তমম্ ॥
 উপাসনায় ভো স্বামিন্ মন্তে চ সততং স্থিতাঃ ।
 তন্মাদ্ যাচেতু মে নাথ ভবতা দেয়মর্থবৎ ॥
 এবমাত্মাবিতঃ শ্রীত্যা গ্রহর্ষা পুনরপ্যুত ।
 মনঃ সংকল্পিতং সর্ব মেতাবস্তে ভবিষ্যতি ॥
 ভবদ্বক্তিবশাক্ষাতো হাসোহয়ং তদ্বদানপি ।
 চক্রহাসাভিধানেন সর্বকায়স্থমণ্ডলে ॥
 গওলেখঃ স্তুতেজস্বী চক্রবন্ মুখশোভিতঃ ।
 মাহিষতীসমীপস্ত চক্রহাসগিরীশ্বরঃ ॥
 অতুলস্থিতিমং সাক্ষাৎ পুরং নিম্নায় শোভনম্ ।
 চক্রহাসাভিধাং লেভে কারহৃজাতিলক্ষণম্ ॥
 ভবতস্তত্র পুরুষাঃ সন্তষ্টগুণমূর্তয়ঃ ।
 যথা বৈ লেখনং সর্কে লভিষ্যন্তে চ তে নিজম্ ॥
 এবাং লেখনধর্ম্মোহস্ত ক্ষত্রবর্ণাভূষর্শিনাম্ ।
 শ্রীমতাং মুখ্য পুরুষে স্বয়ি সন্মানদায়িনাম্ ॥
 ভগবদ্ভক্তিচিত্তানাং সর্বজীবহিতাত্মনাম্ ।
 তরষাজপ্রসাদেন সদাচারস্বধর্ম্মিনাম্ ॥
 বেদাত্মাসনবৃত্তীনাং শ্রোতমার্গীভূষায়িনাম্ ।
 চিত্রগুণ্যস্ত পুণ্যেন সর্ববাপারবর্জিনাম্ ॥
 ইতি দষ্টা বয়ং তস্মৈ তজ্জৈবাস্তরধীয়ত ।
 চক্রহাসস্তদাদেশং চক্রে স বিধিপূর্বকম্ ॥
 তত্র স্থিতিমন্তস্তত্ বহুধা বংশতস্ততিঃ ।
 পুত্র পুত্রজ পুত্রাদি নপুং নপুং জনপুং জৈঃ ॥
 চক্রহাসস্ত বংশীয়াঃ কৃত্তবজোপবাতিনঃ ।
 স্ত্রহৎ সযদ্বিতদ্বর্গ বিভট্টবৈদ্যাপৃতা মহী ॥
 তৃতীয়াঃ হরিচক্রাঙ্কিতচক্রদেহচতুর্থকঃ ।

পঞ্চদশবিদ্যাসোপি রবিরত্ন তৎপরঃ ॥
সপ্তমো রবিবীরঃ তাদষ্টমো রবিপূজকঃ ।
গভীরো নবসংখ্যাকো দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ ॥
একাদশো মর্যাদ্যাতো বনভঃ পরমার্থধীঃ ।
উদারহাসোবিজ্ঞয়ো রবির্দশনসংখ্যকঃ ॥
মধুমানন্তংপরন্ত বিংশদৈবতসংখ্যকঃ ।
তটঃ স্তম্ভটঃ সর্গজ্ঞো ধীমান্ পঞ্চদশোহপরঃ ॥
ত্রীগৌরঃ বোদ্ধশতমো রাজধানা তত্তঃপরম্ ।
অষ্টাদশম আনন্দঃ সংগ্রনৈকোনবিংশতিঃ ॥
বিংশাসঃ পঞ্চতন্ত্র একবিংশতমঃ সুরঃ ।
এতেষামহুগন্তারো বিংশবিংশতিতাপুনঃ ॥

এই জগতের আদিকারণ ভগবান বিষ্ণু বাহা হইতে ব্রহ্ম উৎপন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি চিত্র ও বিচিত্র নামক দুইজনকে সৃষ্টি করিলেন। তাহার উভয়ে ধর্মরাজের মন্ত্রী, অঙ্গদ্বিগের দণ্ডাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, শাস্তিকর্ম্মহাপক এবং কায়স্থ নামে পরিচিত। তাহার সর্বপ্রকার কায়স্থের আদিপুরুষ এবং লেখনকার্যে নিপুণতা হেতু মূখ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের কায়বর্তী ছত্রপ্রকারের বিশেষ জ্ঞান আছে বলিয়া তাহারাই এই সংসারে কায়স্থ নামে পরিচিত এবং ধর্মরাজের মন্ত্রী হইয়াছেন। তাহাদের দ্বারা এক বিংশতি কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার উভয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আমরা কোনবর্ণ ও কি প্রকার সংস্কারসম্পন্ন হইব ? অল্পগ্রহপূর্ব্বক বলুন, আমরা আপনার সেবক।’ ব্রহ্মা কহিলেন, ‘ব্রাহ্মণ সকল বর্ণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞান-বিশিষ্ট কর্ম্মোপজীবী ব্যবহার্যবিত্ত ক্ষত্রিয় দ্বিতীয়বর্ণ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সেবক বৈশ্য তৃতীয়বর্ণ। শূদ্র চতুর্থবর্ণ। পৃথিবীতে ব্যবহারোপজীবী অনেক ক্ষত্রিয় আছে, অক্ষরোপজীবী কায়স্থ তাহাদের অন্তর্গত। তোমরা ক্ষত্রিয়, দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত, তোমাদের উপনয়ন হইয়া থাকে, তোমাদের বেদে অধিকার আছে।’ এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। সূত কহিলেন, কায়স্থ জাতি একবিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত। পূর্ব্বকরে তাহাদের যে ধর্ম তাহাই স্বধর্ম বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। হে মহাধিপ। কুলগত ধর্ম্মে ভক্তি না থাকিলে কলিযুগে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। এই আমার ধর্ম্ম ইত্যাকার জ্ঞান না থাকিলে কোন প্রকার সিদ্ধি হয় না। এই একবিংশতি শ্রেণীর ধর্ম্ম পৃথক্-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম সূর্য্যধ্বজ। চিত্রদেবের সংকল্পানুসারে এক পুরুষ উৎপন্ন হন, তাহার শরীরে সূর্য্যধ্বজের চিত্র থাকায় তিনি সূর্য্যধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ

হইলেন। তিনি প্রথমে গৃহাশ্রম না করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিতেল। সূর্য্য তাঁহার কুলদেবতা। “আপনার পত্নি কায়স্থ কুলদেবতারূপে আপনাকে পূজা করিতেছে” এইরূপ শুবে সন্তুষ্ট সূর্য্যদেব প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, ‘আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি অতীষ্টবর প্রার্থনা কর।’ সূর্য্যধ্বজ কহিলেন, ‘হে বিশ্বলোচন! আপনার নামে আমাকে একটি বসতিস্থান প্রদান করুন।’ তৎক্ষণাৎ বলিয়া সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যধ্বজের নিবাস জন্ত ভূতলে ‘সূর্য্য নামক একটা পুরী’ কল্পিত হইল। সূর্য্যধ্বজ হইতে ভারতে দ্বিতীয় বিজ হইল, তাহার শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। তাহার সদাচারসম্পন্ন, সর্বপ্রাণিহিতকারী এবং যজ্ঞীয়বৃত্তিঅবলম্বী। দ্বিতীয় চন্দ্রহাস। যেমন সূর্য্যধ্বজ চিত্রগুপ্তের জাতি, তদ্রূপ চন্দ্রহাসও তাঁহার জাতি। তাহার কুলদেবতা চন্দ্র। তিনি সূর্য্যধ্বজের গমনপূর্ব্বক চন্দ্রের স্তব করিলেন। চন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া হস্তপূর্ব্বক অভিমত বর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, আমার বংশীয়গণের বাসের জন্ত একটা উত্তম স্থান দান করুন। প্রীত হইয়া চন্দ্র পুনর্বার কহিলেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তোমার বাক্যে আমি হাসিয়াছি, এজন্য তুমি চন্দ্রহাস নামে কায়স্থমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইলে। মাহিষতীর সমীপস্থ চন্দ্রহাস নামক গিরির অধীশ্বর হইবে। তোমার বংশধরগণ চন্দ্রহাস নামক পুরীতে বাস করিবে, তাহার ভগবদ্বক্তা, সর্বজীবহিতকারী, মহর্ষি ভরদ্বাজের প্রসাদে সদাচারসম্পন্ন, চিত্রগুপ্তের পুণ্য শ্রোতস্মার্তানুযায়ী সর্বব্যাপারসম্পন্ন হইয়া আদিপুরুষরূপে তোমাকে সম্মান করিবে। এইরূপ বর দান করিয়া চন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। চন্দ্রহাস তাহার আদেশ বিধিপূর্ব্বক পালন করিলেন। ক্রমে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে তাঁহার বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার বংশধরগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন। তৃতীয় হরচন্দ্রাদি। চতুর্থ চন্দ্রদেহ। পঞ্চম রবিদাস। ষষ্ঠ রবিরত্ন। সপ্তম রবিবীর। অষ্টম রবিপূজক। নবম গভীর। দশম প্রভু। একাদশ বনভ। দ্বাদশ উদারহাস রবি। ত্রয়োদশ মধুমান। চতুর্দশ তট। পঞ্চদশ স্তম্ভট। বোদ্ধশ ত্রীগৌর। সপ্তদশ রাজধানা। অষ্টাদশ আনন্দ। উনবিংশ সন্নম। বিংশ বিংশাস। একবিংশ পঞ্চতন্ত্র। এই এক বিংশ কায়স্থের প্রত্যেকে আবার বিংশ বিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।”

* সৌরপুরাণে কায়স্থ জাতি সূর্য্যদেবের বাক্যবিশেষে উক্ত হইয়াছে। ইতি—

তত্ত্ব।—কারহজাতিতথ্যনির্ণায়ক কোন কোন গ্রন্থে তত্ত্ব হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বলা বাইতে পারে যে সর্বত্র শুধু ৪৬ খানি তত্ত্ব দেখা হইয়াছে, উহার কোন খানিতে কারহের কথা উল্লিখিত হয় নাই। (১)

“কারহা লব্ধকর্ণা দিত্যঃ রাজাপসেবকাঃ।

নক্ষত্রাভিধিবক্তারো তিব্দ্ শাঙ্কোপজীবিনঃ।

যাখিনকাব্যাকর্তারো গায়কান্তব গোত্রিনঃ।

“বীজাতিরিক্তদেহান্তে আছে বর্ণাঃ প্রযুক্তঃ।” সৌরপুরাণ ২০ অঃ।

এই পুরাণে বলাচাৰ্যের প্রসঙ্গে তাঁহাকে যজুৰ্ভাষা পুত্র বলা হইয়াছে। সন্মত্যাৰ্ঘ্য ১১১১ পৃঃ অঙ্কে লক্ষ্যগ্রহণ করেন। অতএব তাঁহার অনেক পরে আধুনিক সময়ে এই উপপুরাণখানি রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই লক্ষ্য এই গ্রন্থোক্ত বচন প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

(১) কারহজাতি লইয়া বাহায়া বহনিন হইতে বায়ামুদান এবং লপকে ও বিপকে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে এই কয়েকটি অমূলক বচন দেখিতে পাওয়া যায়—

“বিরাটকারজো বংশঃ কারহ ইতি বিজ্ঞতঃ।

আৰ্য্যাজ্ঞানঃ একশাস্তু আৰ্য্যাবৰ্ত্তঃ প্রসূতঃ।

অয়ং তু নবনস্তেবাঃ বীপসাপারসংযুতঃ।

বোদমানাঃ সহশ্রত্ব বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাঃ।

সেক্ততন্ত্রে ১১৯ পটল।”

উক্ত বচন দ্বারা কেহ কেহ কারহজাতিকে বেদের আৰ্য্যাজ্ঞান-প্রকাশক বিরাটকারসমূহ বংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু মূল সেক্ততন্ত্রের কোন স্থলে এরূপ অঙ্গদন্ত উক্তি নাই, উহা যে আধুনিক হাতগড়া শ্লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত শ্লোকচরিতা বোধ হয় কোনকালে সেক্ততন্ত্র দেখেন নাই, যেহিলা “১১৯ পটলে” লিখিতেন না। সেক্ততন্ত্রে পটলের পরিবর্তে সর্বত্রই “একাশ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আবার কেহ বিজ্ঞানতন্ত্রের দোহাই দিয়া এই বচন রচনা করিয়াছেন—

“ব্রহ্মোবাচ।

নান্যং চিত্তগুণোহসি মম কায়াসভূতঃ।

তন্মাৎ কারহ বিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি।

কারহঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণো নতু শূত্রঃ কদাচন।

অতো ভবেতঃ সংস্কারা পৰ্ভাশাসাদিকা দশ। বিজ্ঞানতন্ত্র।”

সেক্ততন্ত্রের উক্ত শ্লোকের স্তায় বিজ্ঞানতন্ত্রনামধেয় শ্লোকগুলিও এখনকার হাতগড়া বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞানতন্ত্র, বিজ্ঞানললিততন্ত্র বিজ্ঞানভৈরবতন্ত্র এবং শিখ্যাসীমন্তিত বিজ্ঞানভৈরবোদ্যোতসংগ্রহ প্রভৃতি “বিজ্ঞান” নামধেয় তন্ত্রগ্রন্থে এই শ্লোকগুলির নিদর্শন নাই।

এতদ্বির কোন কোন গ্রন্থে অঙ্গিপুত্রাণির জাতিমালা, বৃহদ্রুক্ষপুরাণ, যোমসংহিতা ইত্যাদি কয়েকখানি অপ্রামাণিক গ্রন্থ হইতে কারহজাতি-পরিপোষক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, এই ভুলি যে দ্বিতীয় আধুনিক সময়ে রচিত অথবা কোন কোন মহাপুত্র বঙ্গপোষকরিত, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করাই বিশুদ্ধমোক্ষ। তবে রাজা রাধাকান্তদেব বিরচিত শব-

প্রাচীন কাব্যনাটকাদি।—প্রাচীন মুচ্ছকটিক নাটকে কারহের উল্লেখ আছে—

“ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠীকারহানিধিরিত্তোবিকরনিকঃ।”

(নবমাক্ষে)

এখানে আধিকরনিক প্রধান বিচারপতি এবং শ্রেষ্ঠী ও কারহ তাঁহার সহকারী (Assessor) রূপে অভিহিত হইয়াছে। বিচারস্থলে শ্রেষ্ঠী ও কারহের যুগ হইতে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার কেহ কেহ কারহকে শূত্রজাতি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। কেবল প্রাকৃতভাষার ব্যবহার দেখিয়া শ্রেষ্ঠী ও কারহকে শূত্রবলা যুক্তিবৃত্ত নহে। রাজকালক, ব্রাহ্মণপুত্র প্রভৃতি যাহারা প্রাকৃতভাষার কথা কহিয়াছেন সকলেই তবে কি শূত্র? ভাষার ব্যবহার দেখিয়া মুচ্ছকটিক হইতে জাতিনির্ণয় করা বাইতে পারে না। বরং কার্য্য প্রণালী দেখিয়া কে কিম্বদন্তী লোক, কতকটা জানা বাইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে শূত্রজাতির ধর্ম্মাধিকরণে বিচার করিবার অধিকার নাই। কিন্তু মুচ্ছকটিকে কারহ কেবল লেখক নর, বিচারেরও সহায়তা করিতেছে। স্তত্ররায় স্মৃতি মানিলে মুচ্ছকটিকোক্ত বিচারকের সহকারী কারহ যে শূত্র নর, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। (২)

বঙ্গভ্রমোদ্ধৃত আচারনির্ণয়তন্ত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিয়া থাকি যায় না।

আচারনির্ণয়তন্ত্রের রচনাপ্রণালী ও বিবরণাদি বদোবোধপূর্ব্বক পাঠ করিলে উহা যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায়। রাজা যে হস্তলিপি দেখিয়া শব্দকল্পদ্রম উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই হস্তলিপিখানি এখনও তাঁহার বাটিতে আছে, উহাতে সর্বত্রও প্রায় ৭০ শ্লোক আছে এবং উহার লিপি দেখিলে শতাধিকবর্ষের অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ তন্ত্রসার, মহাসিদ্ধিসারস্বত, আগমভট্টবিলাস, বারাহীকৃত ও ব্রহ্মবাসনতন্ত্র প্রায় ৫০। ৬০ খানি বিভিন্ন তন্ত্রের উল্লেখ আছে, উক্ত কোন গ্রন্থে আচারনির্ণয়তন্ত্রের উল্লেখ নাই। আচারনির্ণয়তন্ত্র যদি প্রাচীন তন্ত্র হইত, তাহা হইলে অবশ্য কোন মহাত্ম্যে অথবা সংগ্রহগ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত, কিন্তু কোথাও উল্লেখ নাই। স্তত্ররায় এই আচারনির্ণয়তন্ত্রোক্ত বিবরণ প্রাচীন বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা বাইতে পারে না। এই লক্ষ্য আচারনির্ণয়তন্ত্রের বিবরণ দ্বাঢ়িরা বাইতে হইল।

(২) অধ্যাপক উইলসন মুচ্ছকটিকের ইংরাজী অনুবাদে যে স্থানে কারহ ও শ্রেষ্ঠীর প্রসঙ্গ আছে, তাহার টিপনীতে কারহকে Mixed caste অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মত সমস্ত বলিয়া বোধ হইল না। সেখানি বদেন, “তন্মাৎ বর্ণসঙ্করো রাজা পরিবর্ত্তনীয়ঃ।” (মহু ১০। ৬১ ভাষ্য) রাজা বর্ণসঙ্করকে পরিবর্ত্তাণ করিলেন। স্তত্ররায় হিন্দুধর্ম্ম কল্লক ধর্ম্মাধিকরণে নিম্নত্ব কারহ বর্ণসঙ্কর হইতে পারে না।

মুদ্রারাক্ষসনাটকে অনেকস্থলে কায়স্থের উল্লেখ আছে, চন্দ্রশূপ্তের সময়েও কায়স্থেরা রাজসংসারে লেখকের কার্য করিত, এই নাটকে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে কায়স্থ শকটদাস একজন পাত্র, তিনি মহা-মন্ত্রী রাক্ষসের একজন বয়স্ক ও বন্ধু। রাক্ষস চন্দ্র-শূপ্তের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য ঐ শকটদাসকে নিযুক্ত করেন। সূচতুর চাপক্য তাহা জানিতে পারেন। তিনি শকটদাসের হস্তে নামরহিত একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন, সেই পত্র বলেই ভবিষ্যতে নন্দবংশের শেষ রাজ-মন্ত্রী চারণক্যের হস্তগত হইল। শকটদাস কায়স্থ, রাক্ষসের পার্শ্বে, আসনে বসিয়া বরাবর সংস্কৃত ভাষার কথা কহিয়াছেন। রাক্ষস বিত্তময়ী ব্রাহ্মণ পুরুষসকলের নন্দবংশের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি শূদ্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অণুচি জ্ঞান করিতেন। [Wilson's 'Theatre of the Hindus', Vol II. p. 248 ও মুদ্রারাক্ষস ৭ মাধ্য দেখ।] রাক্ষসের কথার ও শকটদাসের ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তৎকালেও কায়স্থেরা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত না। যদি শকটদাস শূদ্র হইত, তাহা হইলে বিত্তময়ী ব্রাহ্মণসন্তান প্রাজ্ঞরাক্ষস কখনই শকটদাসের পার্শ্বে বসিয়া বস্তুভাবে কথাবার্তা কহিতেন না এবং শকটদাস নীচ জাতি হইলে কখনই রাক্ষসের পার্শ্বে বসিয়া নিজা যাইতে সাহসী হইত না। (মুদ্রারাক্ষস ৪র্থ অঙ্ক)।

উক্ত নাটকের প্রথমদিকে চাপক্য শকটদাসকে উল্লেখ করিয়া একস্থানে বলিতেছেন, “কায়স্থ ইতি লঘী মাত্রা। তথাপি ন বুদ্ধঃ প্রাকৃতমপি রিপুমবজ্ঞাতুঃ।” এখানে ‘লঘী মাত্রা’ দেখিয়া কেহ কেহ কায়স্থ শকটদাসকে অতি সামান্য জাতি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এখানে তলাইয়া দেখা উচিত, যে কায়স্থ শকটদাসকে সামান্যভাবে সম্বোধন করিতেছে? চাপক্য। এখানে চারণক্যের সহিত শকটদাসের রাজনৈতিক সম্বন্ধ, জাতিগত কোন সম্বন্ধ উক্ত হয় নাই। কুট রাজনীতিতে যখন মহামন্ত্রী রাক্ষসও চারণক্যের নিকট পরাজিত, তখন তাহার নিকট শকটদাসও সামান্য! সামান্য হইলেও চাপক্য উপেক্ষা করেন নাই। অতএব চারণক্যের উক্তি কায়স্থ শকটদাসের নীচজাতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে না।

শ্রীহর্ষের উত্তরনৈবধচরিতে (দময়ন্তীর স্বয়ম্বরসভায়) চিত্রগুপ্তকে কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইরাছে—

“দুগ্গোচরোহৃদয চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈশ্বৰ্য্য এতদীশঃ।

উর্দ্ধপত্র মলীদ একো মসেদধোপরি পত্রমন্তঃ।” ১৪ সর্গ।

অনন্তর চিত্রগুপ্ত চন্দ্র গৌচর হইলেন, ইনি কায়স্থ এবং

উত্তম গুণবৃত্ত। এই পুরুষ আপনাদি রূপ গোপন করিয়া-ছেন। ইনি কপালরূপ পত্রের উপর মলী প্রদান করেন অর্থাৎ মহুঘোর ওভাত্ত গণনা করিয়া তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া দেন এবং রূপে মলীর উন্নয়ন করিয়া দিয়াছেন।

১০৫০ খৃষ্টাব্দে কাম্বীরদেশীয় বিখ্যাত কবি ব্যাসদাস ক্ষেমেজ তাঁহার সময়মাতৃকার কায়স্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

“দানেন নশ্রতি বগিন্ধনশ্রতি সত্যেন সর্কথা বেষ্টা।

নশ্রতি বিনয়েন গুরুনশ্রতি কৃপয়া চ কায়স্থঃ॥”

সময়মাতৃকা ৪। ৭০।

ব্যবসারী দান করিলে, বেষ্টা সভ্যবাদিনী হইলে, গুরু বিনয়ী হইলে এবং কায়স্থ দয়াপরবশ হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। [সময়মাতৃকা ৫। ৬০ দেখ।]

১১০১ খৃষ্টাব্দে কাম্বীররাজ হর্ষদেবের মৃত্যু হয়, তাঁহার জননী রাণী হর্ষাবতীকে সান্থনা করিবার নিমিত্ত সোমসেব সংস্কৃত ভাষার কথাসরিৎসাগর রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়—

“কায়স্থো হি করোত্যেকো ব্যাপারঃ ব্রহ্মরূপয়োঃ।

লিখত্যাংপুংসয়তি চ ক্ষণাধিঃ করহিতম্॥”

কথাসরিৎসাগর ৭২। ৩২৩।

কায়স্থ (চিত্রগুপ্ত) এককই ব্রহ্মা ও ব্রহ্মের কার্য করেন। তিনি লিখিতে পারেন, আবার ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত বিশ্ব-লোপ করিতে পারেন, সকলই তাঁহার করহিত।

কথাসরিৎসাগরের ৪২ তরঙ্গ পাঠে জানা যায় যে, রাজার যাহা কিছু লেখাপড়ার কার্য, সকলই কায়স্থের উপর অর্পিত ছিল। কায়স্থ রাজার হইয়া নাম পর্যন্ত সহি করিতে পারিত। রাজা কায়স্থকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। রাজ্যের ওভাত্ত অসংখ্য লোকের ইষ্টানিষ্ট এই কায়স্থের হস্তে অর্পিত ছিল। এই জন্যই রাজনিযুক্ত কায়স্থকে সকলেই রাজবল্লভ, অতি মায়াবী ও ছদ্মবিদ্যার বলিয়া মনে করিত। এমন কি সেই সন্ধিবিগ্রহ কায়স্থ যদি অতিশয় কুটবুদ্ধি ও অত্যাচারী হইতেন, তাহা হইলে মনে করিলে অপর লোক দ্বারা রাজপুত্রকে পর্যন্ত বিনাশ করিতে পারিত, এই তরঙ্গে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।

একদা উপরোক্ত নাটক ও কাব্যাদির প্রমাণ যদি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কায়স্থেরা যে শূদ্র নয়, তাহা স্থির। রাজসংসারে রাজার সহিত বিশেষ সংপ্রব থাকার এবং রাজার সেক্রেটারী প্রভৃতি উচ্চপদ ভোগ করার উক্ত কায়স্থকে কি কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হয় না?

সংস্কৃত ইতিহাস।—প্রাচীন কার্যকাণ্ডের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন শিলালিপির অধ্যয়ন করা উচিত, অথবা বিষয়জনসমাজে অপরাপর প্রমাণ অপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপির প্রমাণই মূখ্য বলিয়া আনৃত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাউক, প্রাচীন ইতিহাস, শিলালিপিক ও তাম্রশাসনাদিতে কার্যকরী রূপে ভাবে অভিহিত হইয়াছে। কলহণ-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের একখানি প্রাচীন ইতিহাস। এই গ্রন্থে কার্যের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

“প্রদেশাদেকতো রূঢ়া বদা বৃত্তিচ শাস্ত্রিণাম্।

অত্রোত্রোহাসবদৈঃ কার্যহাঃ সংহতা বদি ॥

কর্মহানানি বীকন্তে স্রাপাঃ কার্যহবদ্যাদা।

তদা নিঃসংশয়ঃ জ্ঞেয়ঃ প্রজ্ঞাভাগ্যবিপর্যয়ঃ ॥”

রাজতরঙ্গিণীর হস্তলিপি ৪। ৪৮-৪৯।

“কিং দিগ্জয়াদিভিঃ ক্রেষৈঃ স্বদেশাদমজ্যতাং ধনম্।

ইত্যর্থ্যমানঃ কার্যহৈঃ স্বমণ্ডলমদগুণং ॥

কাশ্মীরকাণামুৎপন্নঃ নিজ্ঞাভাবাবধায়কম্।

কার্যহবত্ প্রেক্ষিতং ততঃ প্রভৃতি ভূতৃত্যম্ ॥”

৪। ৬১৬, ১৮ (মুদ্রিত ৬২ পৃষ্ঠা)।

“বন্ধকগ্রামকার্যহমাসমুভ্যাদিসংগ্রহৈঃ।

অষ্টৈশ্চ বিবিধার্যসৈর্য্যাদ্গ্রাম্যান্ স নির্ধান ॥” ৫। ১৭৩।

“তথা কার্যহভোজ্যভূজ্ঞাতা তৎপ্রত্যবেক্ষমা।” ৫। ১৭৯।

“কার্যহপ্রেরণাদেতৈর্দেবেনাদ্যাবধিত্তিভৈঃ।

আর্য্যসৈঃ স্বাসশেষৈব প্রাণবৃত্তিঃ শরীরিণাম্ ॥” ৫। ১৮২।

“উত্থাপ্য পাপকার্যহাস্তেন ভূয়োহপি দণ্ডিতঃ ॥” ৫। ৪৪২।

“কার্যহা রুদ্রপালাপ্তাঃ প্রজানাং পীড়নং ব্যধুঃ ॥” ৭। ১৪৯।

“কার্যহচ হতাবিলাসমহিমা রুদ্রে নৃপং পাতয়ন্

স্বস্তাসন্নপরাভবন্ত কুরুতে ভূয়ঃ সমুত্তমম্ ॥” ৭। ১১৭২।

“নিপীড়্যলোকং কার্যহৈর্মহাদণ্ডব্যবহর্য্য ॥” ৭। ১২৩৮।

“যেন সম্প্রতি শ্লোকং কার্যহৈর্জর্জনং কৃতম্।

যন্তে বিহচিকানুলসংগ্রাসেভ্যঃ কিলেতরে।

সন্ত্যক্তকারিণো বিধং প্রজা রোগানিরাগিনঃ ॥

পিতরং কর্কটো হস্তি মাতরং হস্তি পুত্রিকা।

হস্তি সর্পস্ত কার্যহঃ কৃত্যঃ প্রাপ্তসম্ভবঃ ॥

শৃণান্ সমর্ষ্য ক্ষুরতা যেনৈবোৎপাঠ্যতে শতঃ।

বেতাল ইব কার্যহস্তমেবাহস্তি হেলরা ॥

বিবরুক্ষো নিরোগী চ যদেবাসিত্য বর্জতে।

চিহ্নং করেতি তন্তৈব স্থানতানতিগম্যতাম্ ॥” ৮। ৮৭-৯১।

“কুর্য্যদিত্য কলহান্ ধীমতির্ব্রহ্মমত্তম্ ॥” ৮। ১১৩।

“নির্গবককা বেস্তাঃ কার্যহোহপি করোবদিত্য।

শূরগণেশোপকীর্তিবিধিভিঃ সবিদ্যাবিধোঃ ॥” ৮। ১৩১।

উক্ত শ্লোক কর্তার তাহার এইরূপ—কার্যহ অতিশয় হৃদ্যন্ত, কুটিল ও প্রজাপীড়ক। বিশেষতঃ তাহার পরস্পর মিলিত হইলে, কাশ্মীররাজ্যে অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা। রাজা অনেক সময় কার্যহের উপদেশে প্রজাদিগের নিকট হইতে অবধা কর আহার করিতেন। কার্যহের ভাবাবধানে রাজকোশ থাকিত, কোন কোন কার্যহ রাজকোশপুত্র করিয়া রাজাকে অবধি বিপদে কেলিত। যে কার্যহ প্রজাপীড়ক ও যে রাজার ঐরূপ অর্থ অপহরণ করিত, সে যে অতিশয় ক্রুর, কৃত্য ও পাশাপাশী তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ কার্যহকে বিবরুক্ষ ও বেতালের সহিত তুল্যজ্ঞান করা হইয়াছে। কলহণের অতিপ্রায় এইরূপ যে কার্যহ প্রায় কুটিল, নির্দয় ও প্রজাপীড়ক হইয়া থাকে, অতএব রাজা যেন তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন না করেন।

কলহণ যে কেবল কার্যহের উপরই কটাক করিয়াছেন, এমন নহে, অনেক স্থলে মন্ত্রিগণের উপরও কটাক করিতে বিচলিত হন নাই।

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কলহণপণ্ডিত কার্যহের প্রতি কেন এরূপ কটাক করিয়াছেন? কার্যহ কি এমন লোক ছিল যে রাজা, রাজপুরুষ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া প্রজাপীড়ন করিত? কাশ্মীররাজ্যে কি সৈন্তসামন্ত ছিল না? প্রজাগণ কি এমনই নির্জীব যে কার্যহের উৎপীড়ন সহ করিত, অথচ তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিত না?—যেন কার্যহ শব্দের উপরই কোন গুঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে!

এখানে যদি কার্যহকে রাজসভায় লেখক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও বিষম গোল। প্রজাপীড়ন ও রাজার রাজকোশ নিঃশেষ করা কি সামান্য লেখকের কর্ম? কার্যহ যদি পরস্বাপহারক দম্ভা হইত, তাহা হইলে অবশ্যই কেহ তাহাদের বিপক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করিত, রাজাও তাহার বিচার করিতেন। কিন্তু সমস্ত রাজতরঙ্গিণী অহুসন্ধান করিলাম, কে, কোথাও কার্যহকে দম্ভা বলা হয় নাই! মিতাকরার কার্যহ অতি মারাত্মক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে? তবে কি কার্যহ মারাত্মক? রাজতরঙ্গিণীতে কোথাও মারাত্মক বলা হয় নাই। শূলপাণি নীপকলিকা নারী রাজবন্ধ্যাকার কার্যহকে রাজসভ্যপ্রভৃৎ প্রজাবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে সাহস, বীরী প্রভৃতির সহিত কার্যহের উল্লেখ আছে। বলা—

“একদা মদ্রিগামভদ্রিকারহসৈনিকাঃ ।

পার্থঃ ভদ্রাজামাগত্য নিশান্নাং পর্যবেষ্টয়ন ॥” ৪।৪২৪।

“पार्थिवकाशनायकमन्त्रिकारहृत्तन्त्रिणाम् ।

তদীত্য। জোহব্বতীনাং জোহাষেতমদ্রুত ॥” ৬। ১৩২।

“हं कारहकुट्टधिक, सुसचिवप्रासाद पकाननी

नीतायुक्तनदेवनिर्वृत्तिस्थितिः। प्रसीः वाः क्रियाम् ॥” ८११०

উপরোক্ত শ্লোক দুইটা দ্বারা বোধ হইতেছে, যে কলহ-পণ্ডিত কারহ নামে কারহজাতীর কোন উচ্চপদস্থ রাজকৰ্মচারীর উল্লেখ করিয়াছেন। সেই উচ্চপদ মন্ত্রীর পরই বলিয়া বোধ হয়। সেই পদের নাম কি ? কলহ তাহা স্পষ্ট লেখেন নাই। কলহের পূর্ববর্তী কাশ্মীররাজপণ্ডিত সোমদেব ভট্ট * কথাসরিৎসাগরে “সকিবিগ্রহকারহ” নাম কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছেন—

“सर्वविग्रहकारहेनाहतेनार्थसकटैः ।

উপাংগু কাব্যালঙ্কার। ব্যসুজল্লেক্ষহারকম্ ॥”

कथासरित्सागर ४२ । २१ ।

কথাসংসাগরের ইংরাজী অনুবাদক ঐ সচিবগ্ৰহ-
কায়স্থের অর্থ Secretary for foreign affairs অর্থাৎ
'পররাষ্ট্রসচিব' লিখিয়াছেন।

ধর্মশাস্ত্রে উহারাই “সন্ধিবিশ্রহলেশক” বলিয়াও স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে; প্রমাণস্বরূপ কএকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

“রাজা তু স্বয়মুদ্ভিষ্টঃ সন্ধিবিশ্রহলেককঃ ।

তাহ্মপটে পটে বাপি ত্রিবিধেদ্রাজশাসনম ॥”

ব্যবহারার্থ্যারে ৮৭ শ্লোকে বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্যাসবচন ।

রাজকর্তৃক স্বয়ং আদিষ্ট হইয়া সন্ধিবিগ্রহলেখক তাম্র-
কলকে অথবা পটে রাজশাসন লিখিবেন।

“दातुःपालयितुः स्वर्गं हर्षन्नरकमेव च ।

যষ্টিবর্ষসহস্রাণি দানোচ্ছেদফলং লিখেৎ ॥

জ্ঞাতম্ময়েতি লিখিতং সন্ধিবিগ্রহলেখকৈঃ ।”

ঐ ব্রহ্মস্পত্তি বচন ।

“सुनिपा नृपशक्तोक्तु सम्पूर्णविद्यवाङ्मयम् ।

शासनं राजदण्डं च सत्त्विविग्रहनेतकैः ॥”

संग्रहकार ।

শ্রীমদেব "কারহু কুটলেখক" (৩২। ১১১) অর্থাৎ কুটলেখক কারহু একগুণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বোধ হয়, কলশব্দ কেবল একগুণ সাধিবিশিষ্টক কুটলেখকেরই সিদ্ধ। করিয়াছেন। কুটলেখক বা কুটণাসমকর্ষ। যে রাজ্যের কিংগণ অনতি মটাইতে পারে, তাহা ইতি-পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

যেথাতিথি যেমন কেবল কার্য বসিলা 'সন্ধিবিগ্রহ
লেখকের' উল্লেখ করিয়াছেন, কল্যাণ বোধ হয় সেইরূপ
'কার্য' নামে সন্ধিবিগ্রহকারকেরই উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা
প্রজ্ঞান সহিত সন্ধিবিগ্রহলেখক বা সান্ধিবিগ্রহিকের বৈরুপ
সম্বন্ধ, তাহা ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে।

কল্লহ দুই এক স্থানে সাক্ষিবিগ্রহিকের উল্লেখ করিয়াছেন
এবং রাজসংসার হইতে যে তাহার নানা উপায়ে বহু অর্থ
উপার্জন করিত, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন—

“ভূত্বাপি ভূত্যাঃ কৃতিনো বিভূতিং কেহপি লেভিরে ।

সাক্ষিবিব্রাহিকসমুহ রক্ষোনাং বিভূতিভাক ।

তন্মিন কালেহপি যশ্চক্রে ব্রহ্মস্বামিসুরান্দম ॥” ৪ । ৭১০ ।

যিনি প্রকৃত রাজনীতি অহুসারে কার্য করিতেন, কলহণ তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। তবে কান্দীরের অদৃষ্ট এমনই মন্দ, অধিকাংশ হুদেই দেখা যায় যে রাজগণ প্রায় কায়স্থের অর্থাৎ সাক্ষিবিগ্রহিকের উপদেশ মত প্রজার স্বার্থরূপ শোণিত শোষণ করিতেছেন ; সুতরাং রাজকোষ পূর্ণ করিতে গিয়া কায়স্থ যে সাধারণের বিরাগভাজন হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি ? সেই জন্তই কান্দীরের প্রসিদ্ধ কবি ব্যাসদাস দ্ব্যেমেন্দ্র “নশ্রুতি কুপরা চ কায়স্থঃ” এইরূপ উক্তি দ্বারা সাক্ষিবিগ্রহ-কায়স্থকে নির্দয়রূপে প্রতাপ করিয়াছেন। বাস্তবিক সাক্ষিবিগ্রহকায়স্থকে স্বার্থসাধনের জন্ত নির্দয় হইতে হইরাছিল। [সাক্ষিবিগ্রহিক দেখ।]

[সাক্ষিবিগ্রহিক দেখ ।]

এই সাক্ষিবিশিষ্টগণ * অনেক সময়ে সেনাপতি হইয়া
যুদ্ধযাত্রা করিতেন; অনেক সময় রাজদূত হইয়া রাজার
ইউসিজির অল্প বিভিন্ন দেশের রাজসভায় যাইতেন।

(রাজতরঙ্গিণী ৪। ৫০৩ দেখ।)

কায়স্থ সকলেই যে নির্দয় ও দুঃস্বাদী ছিলেন, তাহা নয়, কেহ কেহ রাজাকে রক্ষা করিবার জন্ত আপনার জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন। কলহণ লিখিয়াছেন,—

“তৎপৃষ্ঠে স্বঃ কিপন মেহঃ গ্রহাঋজ্জরীকৃতঃ ।

শুদারনামা কারন্তো নির্দ্রোহো বারিতোহরিতিঃ ॥” ৮ । ৩২২ ।

শ্রদ্ধার নামক একজন কায়স্থ, তিনি বিদ্রোহী হন নাই, রাজার পৃষ্ঠপোষক করিবার জন্য আপনি খুঁকিয়া পড়েন, কিন্তু শত্রুগণ কর্তৃক নিবারণিত হইয়া গুলতরুরূপে আহত হন।

প্রজাতিগের দারুণ অভাবের সময় কার্যকর অর্থদ্বারা তাহাদের অভাবমোচনে যথেষ্ট চেষ্টা পাইরাছেন, তাহারাও কথা কলহণ লিখিয়াছেন—

* রাক্তনরক্তিশীতে ব্রাহ্মণ সাক্ষিবিশিষ্টকৈরও উল্লেখ আছে।

“প্রশস্তকল্পতান্ত্রে তদ্রোহিতনয়ঃ পরম্।

কায়স্থকনকো নাম স্নায়ামকৃত সম্পদম্ ॥

নানাদিগন্তরাযাতো হুর্ভিকপতিতো জনঃ।

যেনাবিছিন্নব্রহ্মেণ শান্তব্যাপদ্যধীযত ॥” ৮। ৫৭২-৭৩।

প্রশস্তকল্পসের মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতৃপুত্র কায়স্থ কনক তাহার ধনসম্পত্তির প্রকৃত ব্যবহার করিলেন। তিনি নানা স্থান হইতে আগত হুর্ভিকপীড়িত ব্যক্তিবর্গের সর্বদা হুঃখমোচন করিতে লাগিলেন।

সন্ধিবিগ্রহীর পদ ভিন্ন কায়স্থ কায়স্থগণ অপরাপর উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও কলহণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখানে কেবল ৪ জনের নাম উদ্ধৃত হইল—

১। রুদ্র (কায়স্থ) কায়স্থরাজ সূসলের গজাধিকারী (কোষাধ্যক্ষ) ছিলেন, ইনি কায়স্থরাজের জন্ত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। যথা—

“কায়স্থেনাপি রুদ্রেণ লক্ষ্য গজাধিকারিতাম্।

স্বামিপ্রসাদঃ শাকল্যং নিস্ত্রে ত্যক্ত্য ততঃ রণে ॥” ৮। ৪৭৫।

২। নাগবট্ট (কায়স্থ)—ইনি একজন সেনাপতি ও বীর ছিলেন।—

“তত্র কায়স্থপুত্রোহপি স্বামস্থানীকনায়কঃ।

সংরক্তঃ নাগবট্টাখ্যসমেহে তস্ত চিরং যুধি ॥” ৮। ৬৭১।

৩। গোরক (কায়স্থ)—ইনি সর্বাধিকার (Lord Chancellor) পদ প্রাপ্ত হন। ইহার উপর কায়স্থের রক্ষাতার অর্পিত হয়।

“অথ রাজা নিবাতাদান্ সহীলাদীন মহত্তমান্।

সর্বাধিকারে বিমধে কায়স্থং গোরকভিধম্ ॥” ৮। ৫৬২।

“শমিতে পূর্বকায়স্থ-বর্ণে তেন ততঃ ক্রমাৎ।

নীতঃ সর্বাধিকারিষ্যং সোহস্তামেব স্থিতিং ব্যাধাৎ ॥” ৮। ৫৬৪।

“রাষ্ট্রগুণৈঃ স্বয়ং রাজা স্থাপিতঃ স স্বমণ্ডলে ॥” ৮। ৬৩৩।

৪। তিলকসিংহ—পূর্বোক্ত গোরকের ভ্রাতা। ইনি দ্বারপতি ও কম্পনেশ্বর নামে বিখ্যাত ছিলেন।

“অগ্রগাম্যভবন্তস্ত তিলকঃ কম্পনাপতিঃ ॥” ৮। ৬২৯।

এখন স্পষ্টই জানা যাইতেছে কায়স্থকায়স্থগণ রাজসংসারে সন্ধিবিগ্রহী, সেনাপতি, পতি বা সামন্ত, সর্বাধিকার প্রভৃতি সকল উচ্চপদেই নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ সকল প্রেষ্ঠপদ ক্ষত্রিয়-বর্ণেরই প্রধানতঃ অধিকার, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং রাজতরঙ্গিনীকে প্রকৃত হিন্দু ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া কে না স্বীকার করিবে?

কায়স্থের সর্বোচ্চ রাজপদ অবধি কায়স্থের ভাগ্যে বটনা ছিল।

রাজতরঙ্গিনী পাঠে জানা যায়—অখবোধ-কায়স্থবংশীয় ১৬ জন রাজা কায়স্থের রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে প্রথম হর্গত-বর্ধন*। গৌনকায়স্থীয় শেবরাজা বালাদিত্যের কন্যা অনঙ্গ-লেখার সহিত হর্গতবর্ধনের বিবাহ হয়। বালাদিত্য জামাতার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রজাদিত্য নাম রাখেন। (১)

কায়স্থ হর্গতবর্ধন ৫২০ শকে কায়স্থের রাজত্ব আরোহণ করেন। ইনি বিশোককোটগিরিহ চন্দ্রগ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন এবং শ্রীনগরে হর্গতবর্ধারী নামক হ্রদে হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ৩৬ বর্ষ রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন।

তৎপুত্র হর্গতক (৫৫৬ শকে) রাজা হন। ইনি মাতামহবংশীয় রাজাদিগের দ্বারা “আদিত্য” উপাধি লইয়া প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। ইনি নিজ নামে প্রতাপপুর নামক স্থল নগর স্থাপন করেন। ৫০ বর্ষ রাজত্বের পর ইহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রাপীড় (অপর নাম বজ্রা-দিত্য) ৬০৬ শকে রাজ্যভিষিক্ত হন। ইনি অতিশয় ধার্মিক ছিলেন এবং অনেক সৎকর্ম করিয়া যান। সামান্য লোকেও ইহাকে “কাকুৎস্থ্যং পার্শ্বিৎ পৃথুং” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহার সম্বোধন তারাপীড় একজন আভিচারিক ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্রবলে ইহার জীবননাশ করেন। (রাজ্যকাল ৮ বর্ষ ৮ মাস)।

তৎপরে প্রতাপাদিত্যের মধ্যম তারাপীড় (৬১৫ শকে)

* সোসাইটির মুদ্রিত রাজতরঙ্গিনীতে ‘অখবোধকায়স্থ’ লিখিত আছে। [এই মুদ্রিত রাজতরঙ্গিনীর ৩৯ পৃঃ দেখ।] কিন্তু রাজতরঙ্গিনীর প্রাচীন হস্তলিপিতে ‘অখবোধকায়স্থ’ পাঠ আছে।

(১) “যেহুং হুগপতামাত্রং কৃষা জামাতরং নৃপঃ।

অখবোধোবকায়স্থকে হর্গতবর্ধনম্।

মাতুঃ কর্কোটনাগেন হুদাতারঃ সমীরুবা।

রাজ্যারৈব হি সজ্জাতা রাজা নাজ্যারি তেন সা।

অতুং সর্বস্ত চক্খ্যাঃ লভু হর্গতবর্ধনঃ।

প্রজয়া বোতমানঃ তং প্রজাদিত্য ইতি এবাম্।” ৩। ১৮৮-১৯০।

কলহণ কায়স্থ হর্গতবর্ধনকে কর্কোটনাগের উরসজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে এই কর্কোটনাগ কতপগড়ী কল্পের পুত্র, (বিষ্ণুপুরাণে ১। ২১। ২২) একটি ভয়ঙ্কর সর্প। সর্পের উরসে মাসুকের জন্ম কখনই সম্ভবপর নহে। এখানে রাজা বজ্রালঙ্কেশকে বাড়াইবার জন্ত ব্রহ্মপুত্রস্বরের পুত্র বলিয়া যেমন প্রবাদ আছে, কলহণের পূর্ববর্তী কবিশ্রম কায়স্থপ্রথম হর্গতবর্ধনকে বাড়াইবার জন্তই বোধ হয় কর্কোটনাগের পুত্র লিখিয়া কবিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, কলহণ তাহারই অনুবর্তী হইয়াছেন।

কানিংহামকে সম্মিলিত করিলেন। ইনি অতিশয় ক্রুর ও কোপনকৃত্যব ছিলেন, ৪ বর্ষ ২৪ দিন রাজত্বভোগের পর প্রাণত্যাগ করিলেন।

তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ললিতাদিত্য (৬১৯ শকে) সিংহাসন লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন; পূর্বে কান্যকুব্জ ও গৌড়দেশ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও কর্ণাট, পশ্চিমে কাবোজ এবং উত্তরে কুশাঘর, দমন ও ব্রীহদ্রাজ্য প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। ইনি কানিংহাম-রাজ্যে সর্বপ্রথম এই কয়েকটি কর্ণহান স্থাপন করেন—মহা-প্রতীহারপীড়, মহাসন্ধিবিগ্রহ, মহাশালা, মহাভাণ্ডাগার ও মহাসাধনভাগ (২) (রাজতর ৪। ১৪৩-৪৪ শ্লোক)

ইনি ৩৬ বর্ষ ৭ মাস ১১ দিন রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রজাহিতৈষী ও দাতা কুবলয়-পীড় (৬৫৫ শকে) রাজা হন। ইনি ১ বর্ষ ১৫ দিন রাজত্ব করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তৎপরে ইহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হুইকৃত্যব বজ্রাদিত্য রাজা হইলেন। তিনি ৭ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন।

বজ্রাদিত্যের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথিব্যাপীড় (৪ বর্ষ ১ মাস), তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সংগ্রামাপীড় (৭ দিন) রাজ্যশাসন করেন। সংগ্রামাপীড়ের পর বজ্রাদিত্যের পুত্র জয়পীড় বা জয়াদিত্য (৬৬৭ শকে) সিংহাসনা-রোহণ করেন। ইহার ছাত্র প্রবল পরাক্রান্ত বিদ্যোৎসাহী দিগ্বিজয়ী মহাবীর কানিংহামের আর জয়প্রাপ্ত করেন নাই।

ইহার সত্যর কীর্ত্তনামী, উত্তমভট্ট, দামোদর, বামন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিরাজ করিতেন। ইনি নিজ মন্ত্রী বামনের সাহায্যে পাণিনিমুদ্রের ‘কানিকা’ নামীয় রচনা করেন। গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ৬৯৮ শকে ইনি পরলোক গমন করেন।

তৎপুত্র ললিতাপীড় ১২ বর্ষ, সংগ্রামাপীড় ৭ বর্ষ, বৃহস্পতি ১৮ বর্ষ, অজিতাপীড় ৪৪ বর্ষ, অনঙ্গাপীড় ৩ বর্ষ ও শেষে উৎপলাপীড় রাজা হন।

কানিংহাম চূর্ণভবর্কনের বংশ ২৬০ বর্ষ ৫ মাস ২০ দিন কানিংহামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের একটি বংশাবলী দেওয়া গেল।

(২) রাজতরঙ্গিনীর ইংরাজী অনুবাদক ঐ পাঁচটি প্রথম রাজকীর্ত্তনের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—(১) The Great Constabulary, (২) The Military Department, (৩) The Great Stable-department, (৪) The Treasury, (৫) The Supreme Executive office.

কানিংহামের কানিংহাম রাজবংশ।

১ চূর্ণভবর্কন।

২ চূর্ণভবর্কন বা প্রতাপাদিত্য

৩ চক্রাপীড়

৫ ললিতাদিত্য

৪ তারাপীড়

৬ কুবলয়পীড়

৭ বজ্রাদিত্য বা ললিতাদিত্য (২য়)

৮ পৃথিব্যাপীড়

৯ সংগ্রামাপীড়

১০ জয়পীড়

জিতুবনাপীড়

১১ ললিতাপীড়

১২ সংগ্রামাপীড়

১৩ বৃহস্পতি

১৫ অনঙ্গাপীড়

১৪ অজিতাপীড়

১৬ উৎপলাপীড়

(রাজতরঙ্গিনী ৩য় ও ৪র্থ তরঙ্গ দেখ।)

সংস্কৃত শিল্পালিপিপাঠেও কানিংহামের সংবাদ পাওয়া যায়।—গোরাগিরররাজ ভুবনপালদেব শিলাফলকে আপ-নার পরিচয় দিয়াছেন—

“কানিংহামবংশিগণনাশ্রয়প্রাপ্ত।”

উপরোক্ত রাজতরঙ্গিনী, শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা কানিংহামজাতিকে কানিংহামই অন্ততম শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।*

সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে কানিংহাম সম্বন্ধে যতদূর জানা যাইতে পারে, একে একে সমুদয় উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে দেখা যাউক প্রাচীন শিলালিপি দ্বারা কানিংহামজাতির আর কি পরিচয় পাওয়া যায়।

শিলালিপি।—শিবগুপ্তের পিতা মহাভবগুপ্তের তাম্র-শাসনে * সর্বপ্রথম মহাসন্ধিবিগ্রহিক কানিংহামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

* কেবল যে সংস্কৃত গ্রন্থে কানিংহামের উল্লেখ আছে, তাহা নয়, এমন কি হিমালয়ের ভূখানাবৃত আন্দ্রোহ প্রদেশের গ্রন্থও কানিংহাম ছিলেন, প্রতিপন্ন হইয়াছে। Atkinson's Gorakhpur, p. 412.

† এই তাম্রশাসনখানি কাহারও মতে ৩২ (৩৩) দশক, কালীরও মতে ৩১ (৩২) সম্বতে প্রস্তুত হয়। Indian Antiquary, Vol. V. p. 51; Proc. As. Soc. Bengal, 1882, p. 12.

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মতে ৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা উক্ত পাদনমত ৩৯০ অব্দ ৩৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রমাণিত হয়।

“লিখিতশিখাং ত্রিকলী তাম্রশাসনং মহাসাক্ষিবিগ্রহী রাণক
জিন্নমদত্ত প্রবিওক কার্য শ্রীম X কিল প্রিয়তরাদিত্য

সুতেনেতি ॥”

প্রণীতঃ কোশিলেশ্রেণ প্রতিবোধ্য মহত্তমঃ।

আনন্ত পুণ্ডরীকাক্ষশাসনং তাম্রনির্মিতম্ ॥

উৎকীর্ণিতং মাধবেন ॥”

কেবল যে প্রিয়তরাদিত্যপুত্র কার্যপ্রবর মদত্ত সাক্ষি-
বিগ্রহীকোর পদলাভ করিয়াছিলেন, এমন নহে। গুপ্তরাজ-
গণের সময়ে মদত্ত ব্যতীত দত্তউপাধিধারী কার্যগণ
পুরুষাঙ্কুরে মহাসাক্ষিবিগ্রহের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন,
গুপ্তরাজগণের তাম্রশাসন ও শিলাফলক দ্বারা প্রতিপন্ন
হইয়াছে। নিম্নে তাহাদিগের একটা তালিকা দেওয়া হইল—

গুপ্তরাজের নাম	সাক্ষিবিগ্রহীকোর নাম	গুপ্তকাল
দেবাচ্য	বক্র (অমাত্য) ?	
প্রভঞ্জন	ঐ নরদত্ত পুত্র	
দামোদর	ঐ রবিদত্ত (ভোগিক) ?	
হস্তিন	ঐ সূর্য্যদত্ত	১৫৬
ঐ	ঐ-পুত্র বিভূদত্ত	১২১
জয়নাথ	ঐ-বদন্তপুত্র গুণকীর্তি	১৭৪
ঐ	ফল্লদত্তপৌত্র গল্প	১৭৭
সর্বনাথ	ফল্লদত্তপৌত্র মনোরথ	১৯৩, ১৯৭
ঐ	মনোরথপুত্র নাথদত্ত	২১৪

গুপ্তরাজগণ ব্যতীত অপরাপর নানাস্থানের হিন্দুরাজগণ
কার্যদ্বিগকে মহাসাক্ষিবিগ্রহীকোর কার্যে নিযুক্ত করিতেন,
তাহার বিস্তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

কালিঙ্গরাধিপ কীর্তিবর্ষদেবের শিলাফলকে ‘কার্য’কে
মহাত্মা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কোঙ্কণাধিপ অপরা-
দিত্যের শাসনপত্রে জানা যায়, তাহার প্রধান মন্ত্রী কার্য
ছিলেন। এতদ্বির শিলালিপি ও তাম্রশাসনে কার্যরাজ-
গণের কথাও খোদিত হইয়াছে।

শিলালিপির উপর বিশ্বাস করিলে অবশ্যই স্বীকার
করিতে হয়, যে পূর্বকালে রাজসংসারভুক্ত কার্য রাজা, সাক্ষি-
বিগ্রহী ও মন্ত্রী প্রভৃতি কখনই শূদ্র অথবা বর্ণসত্তর ছিলেন
না; তাহারা যে সকল কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয়ের
কার্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

নব্যমুখতিপ্রভৃতি।—আধুনিকমুখতিপ্রভৃতির রঘুনন্দন
বসিও কার্য শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু
বহুবোবাদি উপাধিধারী বঙ্গীয় কার্যদ্বিগকে উল্লেখ করিয়া
লিখিয়াছেন— :

“সঙ্ক্ৰান্তাং তু নামকরণে বহুবোবাদিরূপশব্দভি-
নামক বোধ্যম্।” (উদাহরণ)

রঘুনন্দনের মতে কলিতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আছে,
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি নাই। এই নিষিদ্ধই বোধ হয় তিনি
অপর শূদ্র হইতে একটু উচ্চ করিবার জন্য বহুবোবাদি
কার্যকে “সঙ্ক্ৰ” নামে অভিহিত করিয়াছেন (১)। কিন্তু
দেখা উচিত, ধর্মশাস্ত্রে সঙ্ক্ৰের উৎপত্তি কিরূপ নির্দিষ্ট
হইয়াছে।—

“শূদ্রাদেব তু শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।

বিজ্ঞগুণবণশরঃ পাকবজ্ঞগণায়িতঃ ॥

সঙ্ক্ৰঃ তং বিজানীরাৎসঙ্ক্ৰততোহজ্ঞা।

ঔশনসধর্মশাস্ত্রে ৪৯-৫০ শ্লোক।

শূদ্র হইতে শূদ্রার গর্ভে জাত যে শূদ্র, তাহাকেই সঙ্ক্ৰ
বলা যায়, সে বিজ্ঞগুণবা ও পাকবজ্ঞ অবলম্বন করিবে।
এতদ্বির অপরে অসঙ্ক্ৰ।

ঔশনসধর্মশাস্ত্রে প্রকৃত শূদ্রকেই সঙ্ক্ৰ বলা হইয়াছে।
সুতরাং রঘুনন্দনের মতে বহু বোবাদি কার্যই প্রকৃত শূদ্র,
আর সকলেই অসঙ্ক্ৰ।

রঘুনন্দন বঙ্গীয় কার্যকে কেন “প্রকৃত শূদ্র” বলিয়া গ্রহণ
করিয়াছেন, তাহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ লেখেন নাই।
ইতিপূর্বে স্মৃতি প্রভৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কার্য
শূদ্র নয় এবং কোন কালে শূদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন না।
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, বিজ্ঞাতির অন্তর্গত কার্যগণ
বঙ্গদেশে সাবিত্রীপ্রান্ত হইয়া ভ্রাতৃত্বাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু,
কোন ধর্মশাস্ত্রে ভ্রাতা ও শূদ্র একজাতি বলিয়া নির্দিষ্ট হয়
নাই। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রমতে, ভ্রাতা বা নির্দিষ্ট কার্য
কোনক্রমে ‘শূদ্র হইতে শূদ্রা গর্ভজাত প্রকৃত শূদ্র’ বা “সঙ্ক্ৰ”
হইতে পারে না।

এ স্থলে কেহ যদি বলেন যে, রঘুনন্দন দেশাচার বা

(১) রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, সাড়ে তিন বর্ষ পূর্বে
বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বোধ হয়, তৎপূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণ
দেখিয়া কার্যকে ‘সঙ্ক্ৰ’ বলিয়া উল্লেখ করেন। ধর্মশাস্ত্র এইরূপ
লিখিয়াছেন—

“সঙ্ক্ৰত মণীষদেবঃ কার্যক জীবৎসজঃ।”

এখানে মণীষদেবের অর্থ চিত্রভণ্ড। চিত্রভণ্ডদেব সঙ্ক্ৰ ছিলেন,
ধর্মশাস্ত্র পুরাণাদি কোন গ্রন্থে এরূপ কথা লিখিত হয় নাই। বিশেষতঃ
পুরাণে চিত্রভণ্ডের ঐশ্বর্য্যবর্জিত অধিকার থাকার তাহাকে কখনই
শূদ্র বলা যায় না। সুতরাং ধর্মশাস্ত্র মত অসঙ্গত বলিয়া প্রমা-
ণ্য করিতে হইল।

শিষ্টাচার দেখিয়া কায়স্থজাতিকে “সঙ্কুচ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র মতে—

“স্বতের্বেকবিব্রোথে তু পরিভ্যাগো বখা ভবেৎ।

তদেব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবোধে পরিভাজেৎ ॥”

(সংস্কার প্রকরণে) প্রয়োগপারিজাত ৫৯ শ্লোঃ।

বেদের সহিত বিরোধ হইলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে লৌকিক বাক্য (অর্থাৎ দেশাচারকে) অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

“লোকে প্রেভ্য বা বিহিতো ধর্মঃ। তদন্যতে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্।” বশিষ্ঠস্মৃতি ১ম অধ্যায়।

কি লৌকিক কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম অবলম্বনীয়, শাস্ত্রের বিধি না পাইলে শিষ্টাচারই প্রমাণ।

সুতরাং যখন স্মৃতিদ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে, কায়স্থ জাতি যিহাতির অন্তর্গত, তখন শিষ্টাচার বা দেশাচার অবলম্বন করিয়া কায়স্থকে শূত্র বলা যাইতে পারে না। স্মৃতির বিরোধ হওয়ার এক্ষণ হানে দেশাচারকেও অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

আর এক কথা। হয়ত কেহ বলিতে পারেন, ১ মাস অশৌচ গ্রহণই বঙ্গীয় কায়স্থের শূত্র-পরিচায়ক। যদিও ধর্মশাস্ত্রে শূত্রেরই ১ মাস অশৌচ বিধিবদ্ধ হইয়াছে বটে, (২) কিন্তু স্মৃতির মত একটু তলাইয়া বুঝিলে অস্বাভাবিক হয়, যে ব্রহ্মপুত্র বাক্তি তাহারই তদনুরূপ অশৌচ নিরূপিত হইয়াছে। যেমন রাজার ১ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন বা ১৫ দিন; সান্নিধ্য ও বেদপারগ ব্রাহ্মণের ১ দিন, কেবল বেদপারগ ব্রাহ্মণের ৩ দিন এবং বেদবিহীন, জন্মকর্মপরিশ্রষ্ট ও সঙ্কোপাসনাবর্জিত এক্ষণ ব্রাহ্মণের ১০ দিন, বৈশ্যের ১৫ বা ২০ দিন। বঙ্গীয় কায়স্থেরা অল্পশ্রমীত হওয়াতেই বোধ হয় ১ মাস অশৌচ ধারণ করিতেছেন *।

(২) “একাহাঙ্ক দ্ব্যতে বিশ্রো বোহগ্নিবেনসমবিতঃ।

আহাং কেবলবেদজ্ঞ বিহীনো দশভিক্ষিতঃ।

জন্মকর্মপরিশ্রষ্টঃ সঙ্কোপাসনাবর্জিতঃ।

নামধারকবিপ্রতঃ দশাং সূতকং ভবেৎ ॥” পরাম্পর ৩।৫-৬।

“দশাং ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াণাং জিপককম্।

বিশ্রাজ্ঞাঃ তু বৈভাষাঃ শূত্রাণাং দশবেদবিঃ” দেবদ।

“ব্রাহ্মণো বশরাজেণ পঞ্চবশরাজেণ ক্ষত্রিয়ঃ।

বৈভো বিশ্রাজ্ঞাজেণ শূত্রো দাসেন শুদ্ধতিঃ” বশিষ্ঠ।

“রাজো মাহাত্ম্যিকো হানে সত্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥” মনু ৫।১০।

* কেহ-কেহ ব্রহ্মসংস্কৃত পুরাণ হইতে এই ঘটনটি উদ্ধৃত করেন,—

“উপবীতক্ষত্রিয়তঃ সান্নিধ্যম্ শুদ্ধতিঃ।

দাসেনাস্ত্রপবীতকঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধ্যতে তথা ॥”

এখনও পণ্ডিতমহাশয়ের উপবীতধারী কায়স্থেরা ১২ দিন, বেহারে উপবীতধারী কায়স্থেরা কোথাও ১০ দিন কোথাও কোথাও ১৬ দিন, কিন্তু ঐ সকল হানে বাহারা উপবীতবর্জিত তাহারা ১ মাস অশৌচ গ্রহণ করেন।

অতএব বঙ্গদেশের কায়স্থগণ ১ মাস অশৌচ ধারণ করিতেছে বলিয়া জাহাঙ্গিরকে শূত্র বলা যায় না। এমন কি চণ্ডাল ডোম প্রভৃতি অনেক নিকৃষ্ট জাতিমধ্যে ১০ দিন অশৌচকাল দেখিয়া সেই সকল জাতিকে কিছুতেই উচ্চ জাতি বলা যাইতে পারে না। মহাক্ষারতেও লিখিত আছে, যে পাণ্ডবেরা আত্মীয়গণের মৃত্যুর পর ১ মাস অশৌচ অবস্থায় ছিলেন;—

“কৃতোদগতে স্তম্ভমাং সর্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।

শৌচং নির্বর্তয়িত্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাং ॥”

শান্তিপর্ব ১।১০২।

রঘুনন্দনের পর তাঁহার মতপরিপোষক কমলাকর (৩) কায়স্থজাতির উপপত্তি লইয়া বিবম গোলযোগ করিয়াছেন। তদ্বিরচিত শূত্রধর্মতত্ত্বে তিনি প্রথমে স্বল্পপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

“কায়স্থ এষ উপপন্নঃ ক্ষত্রিগ্যাং ক্ষত্রিয়ান্ততঃ।”

এই কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উপপন্ন। আবার তৎপরেই নিজমত সমর্থন করিবার জন্ত লিখিতেছেন—

“মাহিষ্যবনিতাস্ত্রহু বৈদেহাঙ্কঃ প্রহর্যতে।

স কায়স্থ ইতি প্রোক্ত স্তত্র কর্ম বিধীয়তে ॥

ক্ষত্রাবৈশ্যভায়াং মাহিষ্যা বৈশ্যাদ্বি প্রজ্ঞো বৈদেহঃ।

নীপানাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ ॥

গণকঙ্কং বিচিহ্নকং বীজপাট্যপ্রভেদতঃ।

অধমঃ শূত্রজাতিভ্যাঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ।

চাতুর্ব্যগত সেবাং হি লিপিলেখনসাধনম্।

ব্যবসায়শিল্পকর্ম তজ্জীবন মুদাক্ততম্ ॥

শিখাং যজ্ঞোপবীতকং বস্ত্রমারক্তমস্তসা।

স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জয়েৎ ॥”

অর্থাৎ—বৈদেহের ঔরসে মাহিষ্যপত্নীর গর্ভে কায়স্থের উপপত্তি হইয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যগর্ভে মাহিষ্যা এবং বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদেহের জন্ম। সুতরাং কায়স্থ অতি নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর। কায়স্থের কর্ম এইরূপ বিধি আছে, নীপদেশজাত লেখন, গণনা, শিল্প, বীজাদি প্রভেদ করণ ও বপন, চাতুর্ব্যগের সেবা এবং লিপিলেখন ইত্যাদি পঞ্চসংস্কারই অধম শূত্র (কায়স্থ) জাতির জীবনোপায়।

(৩) কমলাকর (১৬১২ খ্রীঃ) নির্ণয়লিঙ্গগ্রন্থে রঘুনন্দনের মত সমর্থন করিয়াছেন।

এইরূপ কার্যসিগের শিক্ষা, বক্তৃতা ও রক্তবস্ত্র ধারণ এবং দেবতাসম্পর্শন নিষেধ।

কমলাকর প্রথমে কার্য ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়া গর্ভ-জাত বলিয়া আবার কেন তিনি কার্যকে বৈদেহের ঔরসে ও মাহিবাক্তার গর্ভজাত অতি নীচ বর্ণসত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করিলেন? ডেকারা কার্য, গোলাম কার্য নামে কেবল মাত্র কার্য নামধারী কতকগুলি নীচজাতি এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে এই সকল নীচজাতির অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে অবশ্যই কোনস্থিতিতে উল্লেখ থাকিত। মুসলমানসিগের বন্ধে আগমনের পরে ঐ সকল নীচজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়। কমলাকর আড়াই শতবর্ষ পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি কি ঐ সকল কার্যনামধারী নিকৃষ্ট জাতিরই উল্লেখ করিয়াছেন? তাহাও ঠিক জানা গেল না। তাহা হইলে কেন তিনি প্রথমে ক্ষত্রিয়পুত্র কার্যের উল্লেখ করিয়াই, তৎপরে এই নীচ বর্ণসত্ত্বের উল্লেখ করিলেন? বোধ হয়, প্রথম কার্য হইতে দ্বিতীয় বর্ণসত্ত্বসিগকে প্রভেদ করিবার জন্তই লিখিয়া থাকিবেন।

কিন্তু এখনকার ডেকরাকার্য ও গোলাম-কার্যের বৃত্তি আলোচনা করিলে, এই বর্ণসত্ত্ব জাতি যে কোন কালে লেখক ও গণকের বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ভর করিয়াছে, এমন বোধ হয় না। অতএব বোধ হইতেছে, কমলাকর রত্নপুরাণের বচন উপেক্ষা করিয়া নিজ মত সমর্থন করিবার জন্ত কার্যজাতির অভিনব উৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। কোন ধর্মশাস্ত্রে অথবা প্রাচীন স্মৃতি সংগ্রহে বৈদেহ ও মাহিয়া হইতে কার্যের উৎপত্তির কথা লিখিত হয় নাই। স্তত্রাং কমলাকরের শেবোক্ত মত অশাস্ত্রীয় ও অভিনব বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে কার্য বর্ণসত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই। (৪)

(৪) শতাব্দিক বর্ষের প্রাচীন “রত্নবামলে শিবরায়বসংবাদে জাতি নামানির্ঘর” নামে একখানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, ঐ জাতিমালায় কার্য সত্ত্বকে এইরূপ লিখিত আছে—

“ব্রহ্মণো বানসাঃপুত্রাঃ নারকাঃ সংপ্রকীর্তিতাঃ।

রাজকর্মসমাসুতা নারকে সংহিতাঃ সদা।

ভেম কার্যজাতিস্ত ব্রহ্মণ চোপকল্পিতা।

ভক্ত চাংশৈব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ +-+-+ সংহিতাঃ।

চিত্রাক্ষরচিত্রসেনচিত্রগুপ্তভার্গব।

চিত্রাক্ষর মাহুর্বা বৈ দক্ষা নাপকত্তরা।

মেঘাতিথি (১০।১৩১) বালকভাট লিখিয়াছেন, “ভবান-বর্ণসত্ত্বো রাজা পরিবর্জকীয়ঃ।”

রাজা বর্ণসত্ত্বকে পরিত্যাগ করিবেন। যদি কার্য প্রকৃতই বর্ণসত্ত্ব হইত, তাহা হইলে কখনই রাজসভার স্থান পাইত না। ইতিপূর্বে প্রাচীন স্মৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কার্য বিজাতি। এক্ষণে তাহারই অস্বার্থী হইরা নব্যস্মৃতির মত উদ্ধৃত হইতেছে। বিজমিত্র লিখিয়াছেন,—

“কার্যকখনমুখেন বৃহস্পতিঃ।

‘নৃপোহধিকৃত সভ্যাস্ত স্মৃতিগণকলেখকৌ।

হেমাধ্যবুখপুরুষাঃ সাধনানানি বৈ দশ॥”

‘গণকো গণেরার্থ লিখেন্নারক লেখকঃ।’

সর্বরঞ্জকঃ সভাতারোপি ব্যাসেনোক্তঃ।

‘অর্থিপ্রার্থিনৌ সভ্যলেখকঃ প্রেক্ষকাত্রঃ।

ধর্মবাক্যে রঞ্জয়তি সভাতারয়িতামিবাং॥”

‘কটুলেখরিসুজীত শঙ্কলাক্ষণিকঃ শুচিঃ।

কট্টাক্ষরং জিতক্রোধমলুং সভ্যবাসিনঃ॥”

* শ্রুতাদায়নসম্পন্ন মিচ্ছুকৈর্গণকো বিজাতিস্তৎসাহ-চর্য্যলেখকোহপি বিজাতিঃ।”

বীরমিজোদরে ব্যবহার্য্যাদ্যার।

কার্য কখনপ্রস্তাবে বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজা তদ্বিত্ত পুরুষ, সভা, স্মৃতি, গণক, লেখক, স্তবর্ণ, অগ্নি, জল ও রাজকীয় পুরুষ এ দশটী সাধনের অঙ্গ। গণক অর্থ গণনা করিবে, লেখক স্মারসঙ্গত লিখিবে।

সর্বরঞ্জক সভাতার ব্যাস কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। প্রেক্ষকাত্র লেখক ধর্মবাক্য দ্বারা অর্থী প্রার্থী ও সভ্যগণকে সন্তুষ্ট করার সভাতাররূপে অভিহিত হইয়াছে।

রাজা স্পষ্টাক্ষর শঙ্কলাক্ষণ, শুচি, জিতক্রোধ, অদুহ, সভাবাদী এরূপ লেখককে নিযুক্ত করিবে।

“শ্রুতাদায়নসম্পন্ন” ইহার দ্বারা গণক বিজাতি বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎসহচরহেতু লেখকও বিজাতি বলিয়া প্রতিপাদিত হইল।

প্রবেশিতঃ হরজেণ নাপলোকাং × × ।

চিত্রসেনস্ত বর্ণাধৈ ব্রহ্মণা প্রেরিতঃ বরম্ ।

গচ্ছ রাজম্ পুথিব্যাক রাজ্যে কুত বিধানতঃ ।

চিত্রগুপ্তো নারসেন স্তব্যাং তু সতর্পিভাঃ ।”

উক্ত বচন দ্বারা কার্যজাতি ব্রহ্মণ বালসত্ত্বা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মূল রত্নবামলভরে উপরোক্ত সৌকণ্ডলির নিদর্শন না পাওয়ায়, উক্ত জাতিমালায় সৌলিক সত্ত্বকে সন্তেহ রহিল।

* [৫৯৩ পৃষ্ঠার কার্য সত্ত্ব বৈদ্যরাজীকৃত ব্যাস বচন দেখ।]

নব্যশাস্ত্রকার মিশ্রমিশ্রকৃত বিবরণে, পদাদিত্য বিরচিত ইতিহাসমণি প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে। অজএব লেখক বা কারস্থ বে বিজ্ঞান, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ইতিহাস ও তালশাসন দ্বারা কারস্থজাতির কত্রিগণ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বর্তমান কারস্থজাতির অবস্থা।—উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ।

উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে প্রধানতঃ ১০ শ্রেণী কারস্থের বাস। যথা—মাথুর, ভটনাগর, সাকসেনা, শ্রীবাস্তব, অষষ্ঠ, স্বর্ধ্যাক্ষ, বাব্বীক, অহিষ্ঠানা, নিগম। এ ছাড়া গোড়কারস্থ নামক এক স্বতন্ত্র শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, এই শ্রেণী গোড়দেশে হইতে গিয়া দিল্লীতে উপনিবেশ করে।

মাথুর কারস্থ অপর শ্রেণীর সহিত বিবাহে দানগ্রহণ করে। কিন্তু, শ্রীবাস্তব প্রভৃতি শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত আদান প্রদান করে না। তাহারা স্বশ্রেণী মধ্যে ভিন্ন গোত্রে মাতৃপক্ষে পাঁচ ও পিতৃপক্ষে ৭ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ দেয়।

পশ্চিমাক্ষলের কারস্থেরা যথাকালে বজ্রহস্ত ধারণ করে। তাহাদের মধ্যে যে আচারভ্রষ্ট ও অধ্যাত্মভোজী হয়, তাহার বজ্রোপবীত কাড়িয়া লওয়া হয়। প্রকৃত, ইহারা ব্রহ্মহত্যের অবমাননা করে না। ইহারা অনেকেই আপনাদিগকে দেবীপুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়।

শ্রীবাস্তব—এই শ্রেণী শ্রীনগর হইতে অযোধ্যায় আসিয়া ছিল, এক্ষণে কান্ধী, আলহাবাদ, মির্জাপুর, গোরক্ষপুর প্রভৃতি নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভটনাগর—এই শ্রেণী মুজাফরনগরেই অধিকাংশ বাস করে, অজ্ঞানস্থানে অন্নসংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায়।

সাকসেনা—এই শ্রেণী এতাবা জেলার অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কনৌজরাজ জয়চাঁদের বৃত্ত্যর পর সমরসিংহের অধীনে এতাবায় আসিয়া বাস করে। ইহাদের আদিপুরুষ পুরুষদাস ও নির্মলদাস সমরসিংহের নিকট কয়েকখানি গ্রাম জায়গীর ও চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের বংশধরেরা সমরসিংহের সময় হইতে ইংরাজ আমল পর্যন্ত এতাবার কানুনগোইপদ পুরুষাবৃত্ত্যক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে। (১)

এতাবার সাকসেন-কারস্থবংশে প্রসিদ্ধ বীর রাজা নবলরায়ের জন্ম। ইনি করুণাবাদের বঙ্গসনবাবের উজীর ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইনি অনেক স্থানে যুদ্ধ করিয়া যেরূপ বীর্য দেখাইয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। (২)

এখানকার ভাটেরা এখনও রাজা নবলরায়ের বীরপাণা গাহিয়া থাকেন।

স্বর্ধ্যাক্ষ—এই শ্রেণীর আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের ভায়, ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। দিল্লীতে এই শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। (৩)

মিরাতের কারস্থেরা প্রায় অধিকাংশই জমিদার। এখান এইরূপ যে, ইহারা ই মুসলমানদিগের আমলে সর্বপ্রথম পারভতাবা শিক্ষা করেন (৪)।

কুলজেষ্ট—কতেপুর জেলার অধিকাংশের বাস। হাতগাঁ হইতে এখানে আসিয়াছে। ইহারা অধিকাংশই জমিদার।

অষষ্ঠ—এই শ্রেণী পশ্চিমাক্ষলের নানাহানে বাস করে। ইহাদের আচারব্যবহার ব্রাহ্মণের ভায়। পূর্বে এই শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসকের কার্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তাহাদের আদিপুরুষ সর্বপ্রথম অষষ্ঠ দেশ হইতে আগমন করেন। কেহ কেহ চিকিৎসাবৃত্তিতেও যুগ্ম করেন।

পশ্চিমে উনাই নামে এক অর্ধকারস্থ আছে। চিত্রগুপ্তের ঔরসে কোন বেড়াগর্ভে এই জাতির জন্ম। কোন কারস্থ এই উনাই জাতির হস্তে আহার করে না। উনাইরা বাঙ্গালার গোলামকারস্থের ভায় কারস্থজাতির দাসত্ব ও সামান্ত ব্যবসা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে।

পশ্চিমাক্ষলের কারস্থগণ যখনরাজত্বকালে অনেকেই আচারভ্রষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায় সকলই কত্রিগণ বলিয়া পরিচয় দেয়।

পঞ্জাব।—কেবল ডেরাইয়াইল থা ব্যতীত পঞ্জাবের সর্বত্রই কারস্থজাতি ছড়িয়া পড়িয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার উত্তর পশ্চিমাক্ষলের অপরাপর কারস্থের ভায়।

মধ্যপ্রদেশ।—এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা মালব-কারস্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসপাঠে জানা যায়, মুসলমান রাজাদিগের আগমনকালে এখানকার ব্রাহ্মণগণ দেশ ছাড়িয়া যান। এই সময় মুসলমানেরা কারস্থদিগকে পারভতাবার পারদর্শী বুঝিয়া নানাহানের কানুনগোইপদ প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে জাতভিমান বা কুলংকার নাই, ইহাদের মধ্যে সকলেই লেখাপড়া জানে। ইহারা বলে, যে “অন্ধরের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কারস্থের সৃষ্টি, বিধাতা লেখাপড়ার জন্মই কারস্থকে পাঠাইয়াছেন।”

(৩) Sherring's Tribes and Castes, Vol. I. p. 310.

(৪) Plowden's Census of the North Western Provinces, p. 14.

(১) Hume's Memorandum on the Castes of Etawa, p. 87.

(২) Journ. As. Soc. Bengal, Vol. XLVIII, pt. I. p. 50-66.

এইরূপ অতি লামান্ত কায়স্থও কাহারও পরিচারককর্তে নিযুক্ত হন না। দাসত্ব ইহাদের মধ্যে অতি হেয় বলিয়া গণ্য *। ইহারা সকলেই উপবীত ধারণ করেন।

বোঁধাই।—এখানকার কায়স্থেরা আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মক্ষত্রিয়, প্রভু, পত্তনীপ্রভু ও বান্দীক কায়স্থ এই চারি প্রধান শ্রেণী আছে। এতদ্বিধ উপকায়স্থ ও প্রভা নামে অতি নিকৃষ্ট জাতি আছে, তাহারা কায়স্থগণত্ব বলিয়া পরিচয় দেয়।

কায়স্থ বা প্রভু—ইহারা সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। গুণাতে চক্রেসেনী প্রভুর বাস, তাহারা ক্ষত্রিয় চক্রেসেন রাজার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহারা ক্ষত্রিয়ের ছায় যজন, যাজন ও দানে অধিকারী এবং ব্রাহ্মণের ছায় বেদোক্ত হোমকর্মাদি নির্বাহ করেন (১)।

উপকায়স্থ—কায়স্থ (প্রভু) এবং কায়স্থবিধবার গর্ভে জন্ম। ইহারা অতি নীচজাতি বলিয়া গণ্য। কোন কায়স্থ ইহাদের হস্তে আহারাদি গ্রহণ করেন না অথবা কোন সংস্রব রাখেন না।

প্রভা—ক্ষত্রিয়ভ্রাতা ও ক্ষত্রিয় ভগিনীগর্ভে উৎপত্তি। ইহারা বঙ্গদেশের গোলামকায়স্থের ছায় কায়স্থসমাজের বহির্ভূত এবং শূদ্র অপেক্ষা নীচ জাতি বলিয়া গণ্য।

শুজরাট।—পত্তনের কায়স্থ বা প্রভুগণ আপনাদিগকে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহারা যথাকালে যজ্ঞহুত্র ধারণ করেন এবং যজন, যাজন ও দান প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করিয়া থাকেন (২)।

কচ্ছপ্রদেশের কায়স্থগণ যজ্ঞহুত্র ধারণ করেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পুরোহিত, লেখক ও শস্ত্রজীবী (সিপাহী) (৩)।

রাজপুতানা।—এখানকার কায়স্থেরা প্রধানতঃ রাজধানী বলিয়া পরিচয় দেন। বুলিতে মাধ্ব ও ভটনাগর কায়স্থেরও বাস আছে। মাড়বারে কায়স্থদিগকে পাঞ্চলী বা পাঞ্চলী ঠাকুর কহে। রাজপুতানার কায়স্থদিগের তিনটি

শাখা—১ আভরী, ২ রাসমর ও ৩ কেশুরী। এখানকার সকলেই প্রায় বজ্রহুত্র ধারণ করেন, তবে যে লম্বাঘা তোজনাদি করে, তাহার বজ্রহুত্র থাকিলে কাড়িয়া লওয়া হয়। এখানকার কায়স্থেরাও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন (৪)।

মাজাজ।—বোঁধাইপ্রদেশের ছায় এখানেও কায়স্থপ্রভু, উপকায়স্থ ও প্রভা এই তিনটি বিভাগ আছে। তাহাদের আচার ব্যবহার বোঁধাই প্রদেশের কায়স্থের ছায়।

কুন্তকোণম্ প্রভৃতি স্থানে কায়স্থেরা মঠাধ্যক্ষ হইয়া আছেন (৫)। তাহারা “কায়স্থ” নামে পরিচিত *।

বেহার।—বেহার প্রদেশে যে সকল কায়স্থ বাস করেন, তাহারা সাধারণতঃ লাল-কায়স্থ নামে বিখ্যাত। ইহারা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের প্রকৃত বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং বাল্মীকির কায়স্থগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে সম্মানার্থে জান করেন। ইহাদের মধ্যে এবাদ আছে যে, সত্যযুগে যখন সকল দেবতা বজ্র করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন যম ব্রহ্মাকে বলিলেন, পিতামহ! ইচ্ছাদি সকলেই দিকপাল অথচ তাহারা বজ্রাদি করিতে সময় পাইতেছেন, কিন্তু আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে আমি আমার কার্যভার মুহূর্ত্তের অজ্ঞ ও ত্যাগ করিতে পারিব না, আপনি আমার বজ্র করিবার উপায় করিয়া দিন। ব্রহ্মা যমের এই প্রার্থনামুসারে নিজ কারা হইতে চিত্রগুপ্তকে হুটি করিয়া বলিলেন, এই মহাভাগ তোমাকে সাহায্য করিয়া তোমার

(৪) Rajputana Gazetteer.

(৫) Wilson's Mackenzie-Collections, p. 615.

* বাক্ষিণাত্যের জাতিতত্ত্ব লেখকগণ লিখিয়াছেন, “Insinuation from Brahmanical hatred, the Kayasthas or Prabhus, being great rivals of the Brahmins in the matter of office-employment.” Wilson's Castes, Vol. I. p. 66.

ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থজাতির আচার ব্যবহার পর্যালোচনা করিয়া কোন কোন পাঞ্চাভ্য জাতিবিধ লিখিয়াছেন—“Somehow there has sprung up this special write class, which among Hindus has not only rivalled the Brahmins, but in Hindustan may be said to have almost wholly ousted them from secular literate work, and under our Government is rapidly ousting the Mahomedans also. Very sharp and clever these *Kaits* certainly are.” Campbell's Ethnology of India, p. 118.

গুজরার আশ্রমসমায় বিবরণে কায়স্থের ক্ষত্রিয় পরিচয় দেয়া হইয়াছে—“It is not irrelevant, however, to state here, that the whole of the third class, that of the *writers*, have a distinct strain *Kshatriya* blood, not only in this Presidency, but in the Upper India, where they are stronger in number as well as in influence.”

Census Report of British India, Vol. III, p. XCIX.

* ম্যাকোম সাহেব তাহার মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসে কায়স্থ লম্বাঘা লিখিয়াছেন—“This useful and intelligent tribe.....are never to be seen in a state of mendicancy or even menial employ, they describe their feeling on this point, that it would be a sin to use in mean offices hands which God has expressly made for the noble purpose of writing.” Malcolm's Central India, Vol. II. p. 168.

(১) Arthur Steele's Law and Custom of Hindu Castes, p. 94.

(২) Sherring's Tribes and Castes, Vol. II. p. 182.

(৩) Indian Antiquary, Vol. V. p. 171.

করেন অবলম্বন করিয়া দিবেন; ইনিই সকলের কর্মীকর্তার বর্ণনা করিবেন ও ভদ্রত্ববাহিনী কর্তৃক বর্ণনাকারি ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

বেহারী কায়স্থের মধ্যে বাদশখা শাখা আছে। এই বাদশ শাখার আদিপুরুষেরা চিত্রগুপ্তের বংশধর। চিত্রগুপ্ত নোপবীত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লালাকায়স্থেরা আভি ও উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাদের বাদশখা শাখা এই—অহিষ্ঠানা, অর্ঘট, বাসীক, ভটনাগর, গৌড়, কুলশ্রেষ্ঠ, মাধুর, নিগম, সকসেনা, শ্রীবাস্তব, হর্ষাক্ষজ ও করণ। এই বাদশ শাখা মধ্যে অহিষ্ঠানাশাখার আদিবাস জোনপুরে। পাটনা ও ত্রিহত-অঞ্চলে অর্ঘট শাখার লোকই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বাসীকশাখার আদিবাস হান গুজরাট। অর্ঘট, শ্রীবাস্তব ও করণেরা এক হকার তামাক খাইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করে না। করণ ও অর্ঘটেরা ব্রাহ্মণপ্রভৃত অন্নাদি এক পংক্তিতে আহার করিতে পারে।

নিগম শাখার লোক বেহারে বড় একটা দেখা যায় না। হর্ষাক্ষজ শাখার লোকেরা হর্ষ্যকে অধিদেবতা বলিয়া গণ্য করে। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে বিক্রম-মিত্যের সত্য নর্তকী কাম্বল্লার গর্ভে মাধবনন্দনামক ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানই এই শাখার আদিপুরুষ। মাধুর, সকসেনা, শ্রীবাস্তব ও ভটনাগর শাখার লোকেরা চিত্রগুপ্তের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়। মাধুর শাখা মথুরা হইতে, সকসেনা শাখা কুরুবাদের অন্তর্গত ধ্বংসাবশিষ্ট সাত্তান-নগর হইতে, শ্রীবাস্তবশাখা শ্রীনগর হইতে ও ভটনাগর শাখা ভাটনৈর হইতে আসিয়াছে বলিয়া অল্পমিত। গৌড়শাখা গৌড়দেশ হইতে সমাজবদ্ধ হন। এখানকার গৌড় কায়স্থের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালার সেনরাজগণ এই গৌড়-কায়স্থশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। শ্রীবাস্তবশাখার দুইটা শ্রেণীবিভাগ আছে—থরে ও হুসরে। থরে শ্রেণীর লোকেরা অজ্ঞাত শ্রীবাস্তবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা আপনাদিগকে “পাঁড়ে” বলিয়া পরিচয় দেয়। থরে ও হুসরে এই দুই শ্রেণীতে পানাহার আদান প্রদান চলে না। সকসেনা শাখাতেও এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আছে। মাধুর, ভটনাগর ও সকসেনা শাখার লোকেরা পরস্পর পরস্পরের অস্বভাব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। গৌড় ও ভটনাগরশাখার কায়স্থ-দিগের বেহারে বাস সম্বন্ধে একটি কৌতূহলজনক ঘটনার কথা শুনা যায়।—যখন মুসলমানেরা বেহার আক্রমণ করে,

সেই সময়ে ভটনাগরেরা এখন বেহারে আসেন। এক্ষণে আসিয়া তাহারা দেখিল যে, গৌড়ীয় শাখা তৎপূর্বকই আসিয়া বসবাস ও প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তাহারা গৌড়ীয়-দিগের সহিত একত্র পানাহার করিতে সমর্থ হইয়া তাহাদের সমাজে চলিত হইয়া বাস করিবার প্রার্থনা করিল। গৌড়-কায়স্থেরা স্বীকৃত হইল, কিন্তু গৌড়ীয়েরা কেহই ভটনাগর বাটতে অন্নাদি গ্রহণ করিল না। কিছুদিন পরে যখন ভটনাগরদিগের গৌড়দরবারে কিছু প্রভুত্ব অধিষ্ঠিত, তখন তাহারা কোশলে গৌড়ীয়দিগকে বাধ্য করাইয়া আপনাদিগের অন্নাদি গ্রহণ করাইতে লাগিল। গৌড়ীয়েরা তখন নিরুপার হইয়া দিল্লীতে মুসলমান বাদশাহ বলবনের নিকট আবেদন করিবার জন্ত পলাইয়া গেল। ইতিমধ্যে বলবনের মৃত্যু হওয়ার ভটনাগরেরা চেষ্টা করিয়া তাহার উত্তরাধিকারীকে স্বপক্ষে আনিয়া তাঁহা দ্বারা কতকগুলি গৌড়ীয়কে কারাবদ্ধ ও আপনাদিগের অন্নাদি গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিল। গৌড়ীয়েরা তখন নিরুপার হইয়া বদাউনের ব্রাহ্মণগণের শরণাগত হইল। কতকগুলি ব্রাহ্মণ এই সময় ইহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া চালাইয়া লইল এবং আপনাদিগকে তাহাদিগের সহিত পানাহার করিতে লাগিল। অবশেষে এই ব্রাহ্মণেরাও জাতিভ্রষ্ট হইল এবং গৌড়ীয় কায়স্থের পুরোহিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে এই পুরোহিতগণের মধ্যস্থতায় গৌড়ীয় ও ভটনাগরদিগের মধ্যে মিল হইয়া গেল, পানাহার চলিতে লাগিল। বিবাহাদির জন্ত তাহারা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইল—এই শ্রেণীর নাম হইল শামালী বা উত্তর গৌড়ীয় শাখা।

পূর্বোক্ত বাদশ শাখার লালাকায়স্থ তিন আরও কয়েক প্রকার নীচ কায়স্থ আছে, কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, অপর জাতীয়েরা বা পূর্বোক্ত বাদশ শাখার কায়স্থেরা তাহাদিগকে কায়স্থ বলিতে চাহে না। সারণ জেলার সেওয়ান নগরে কতকগুলি দরজী ও কতকগুলি টীকাদারও আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু ইহাদিগের সহিত লালাকায়স্থের কোন সংশ্লিষ্ট নাই। অনেকে অহমান করেন যে, ইহারা বস্ত্রতই কায়স্থ, তবে নীচ কর্মগ্রহণ করার সমাজচ্যুত হইয়া কালে একেবারে ভিন্নশ্রেণী বলিয়া গণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এখনও বেহারপ্রদেশে যে সকল লালাকায়স্থ বংশাচ্যুতের গ্রামের পাটোয়ারী কর্তৃক করিয়া আনিতেছে, অনেকে তাহাদের থরেও আদান প্রদান করিতে চাহে না। পাটোয়ারী, কাছনগোই, অম্বোড়ী, পাকি বা বকী উপাধিধারী কায়স্থেরা

শত শত ধনী বা সংকল্পশালী হইলেও সামাজিক মর্যাদার দ্বারা বলিয়া বিবেচিত হয়।

বেহারী কায়স্থেরা বিবাহাদিতে কুল বাহিয়া থাকে, গোত্র বাহিব্যবহার নিয়ম ভূত বলিয়া বোধ হয় না। প্রবাস্তব-নিগেয় মধ্যে এই কয়টি কুল প্রধান—চুড়ামনপুরের অখৌড়ী, অমৌকার পাড়ে, ডিহিরাকোটের পাড়ে; মিঠাবেলের তেও-হারী; মোরারের বক্সী, মার, ঠাকুর; বতাহার মিশ্র; হর-প্রাসের সিংহ; পটরের তেওহারী; পরশরাম ঠাকুর ও সাহনীর সাহনীরাম। ইহারা বিবাহকালে কেবল স্বকুল বাহিয়া বিবাহ করে।

বিহারী কায়স্থেরা অতিশয় কস্তার বিবাহ দিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু পাণ্ডের অভাবে প্রায় নির্জন কায়স্থের কস্তা ১৮।১৯ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকে। অনার্তবা কস্তার বিবাহ হইলে যে পর্যন্ত সে সজোশন না করে, ততদিন সে পিতৃগৃহেই অবস্থান করে, পরে কস্তার বয়স বিবেচনার এক, তিন, পাঁচ ও সাত বৎসর পরে দ্বিরাগমন করাইয়া তাহাকে স্বগৃহগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সার্তবা কস্তার বিবাহ হইলে বিবাহের সঙ্গেই দ্বিরাগমন বা বিবাহের একবৎসর পরে দ্বিরাগমন হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ বা বিবাহোচ্ছেদ নাই।

বেহারী কায়স্থদের মধ্যেও বঙ্গালীদিগের ভ্রায় কস্তার সংখ্যা অধিক হইয়াছে বলিয়া বরপক্ষে যৌতুকাদির লোভ বাড়িয়াছে। সুপাত্র অধবেণ কয়িবার জন্ত কস্তাপক্ষ হইতে পুরোহিত ও নাপিত নিযুক্ত হয়। উভয়পক্ষের কোণী দেখিয়া বিবাহের কথাবার্তা হ্রি হয়। কোণীর ফলাফল মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া হ্রি হইলে যৌতুকাদির কথা হইতে থাকে। এই যৌতুককে তিলক, জাহেজ, দান, পণ ইত্যাদি বলে। বঙ্গালীর ভ্রায় অনেক ভদ্রলোককে কস্তাদারে তিলক ও জাহেজ দিয়া সর্বস্বান্ত হইতে হয়। সময়ে সময়ে পুরোহিতের ও নাপিতের পূজা করিতে পারিলে কাণা, ধোঁড়া, কণা বালিকারও উভয় দ্বারে বিবাহ হইয়া থাকে।

ইহাদের বিবাহে অনেক ব্যাপার আছে—প্রথমতঃ সন্তান-প্রাপ্তি। কথাবার্তা হ্রি হইয়া গেলে শুভদিনে কস্তাপক্ষের পুরোহিত ও নাপিত বরের বাড়ীতে গমন করে। বরের পিতা শুভক্লে আশীর স্বজনে পরিবৃত হইয়া কস্তাপক্ষের পুরোহিতের সন্মুখে একখানি ধালার কতক-গুলি শুপারি, হলুদ ও টাকা রাখেন। পুরোহিত তাহা হইতে যৌতুকের পরিমাণ অনুসারে শতকরা ১১ টাকা

হিসাবে নিজের-হস্তিগা উঠাইয়া লয়। কোন-কোন কুলে কস্তাপক্ষীরেই এই টাকা দিয়া থাকে। ইহাকেই সন্তান-প্রাপ্তি, বরদেখা বা বরহেঁকা বলে। বরহেঁকা অর্থে দাক্ষ-দান, এ দেশে যেমন পাকা দেখা।

তৎপরে তিলকদান অর্থাৎ যৌতুকের টাকার মধ্যে কতকাংশ এই সময়ে দিতে হয়। যে দিন ইহা দেওয়া হইবে, সেইদিন কস্তার আশীর ও কেরকজন ব্রাহ্মণ একত্র ৭ জন বরের বাড়ীতে গমন করে। বরের অন্তঃপুরের উঠানে ইহাদের বসিবার স্থান হয়। এই স্থানে বিহু, প্রজাপতি ইত্যাদি দেবতার পূজা হয়। তৎপরে সেইখানে কস্তাপক্ষীরে বরের কপালে ঘণ্ডি ও নাসিকার তিলক দিয়া যৌতুকের টাকার কতকাংশ (বাহা এই সময় দিবার কথাবার্তা হ্রি থাকে তাহা) প্রদান করে। টাকা যে সমস্তই নগদ দিতে হয়, তাহা নহে; বাসন ও স্বত্রাদি বা গহনাদিও দেওয়া হয়। পরে তিলকের সময় ঘণ্ডি টাকা নগদ না দেওয়া হয়, তবে কুটুমিতার মহা গোলমাল থাকিয়া যায়। তৎপরে তিলকদানের পর কস্তাপক্ষীরে বরপক্ষীয়-গণের সহিত একত্র জলপান (পাকী খাওয়া অর্থাৎ দুটি মিঠাই ইত্যাদি) ভোজন করে। তিলকদানের পূর্বে কস্তাপক্ষীরে পুরোহিতের কথা দূরে থাক, নাপিত পর্যন্ত বরের বাড়ীর জল অবধি পান করে না।

সে দিবস কস্তাপক্ষীরে বর গৃহেই বাস করে। পরদিন প্রাতঃকালে কস্তাপক্ষীরদিগকে বরকর্তা সাধ্যমত বস্ত্রাদি দান করেন। এই সময় কস্তাপক্ষের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ লম্বহ্রি করেন। লম্বহ্রি হইলে পুরোহিত তাহা একখানি পত্রে লিখিয়া বরকর্তাকে প্রদান করেন। ইহার নামই লম্বপত্রী।

তৎপরে কুলপ্রথা অনুসারে বিবাহের তিন, পাঁচ বা আট দিন পূর্বে “তিনমল্লা” পাঁচমল্লা” বা “আটমল্লা” উৎসব হয়। এই উৎসবের দিন কস্তার বাড়ীতেই স্ত্রীলোকেরা সজ্জিত হইয়া কস্তাকে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের বহির্ভাগস্থ কোন মাঠ হইতে মাটি আনিতে যায়। নদীতীর বা পুকুরিগীতীরে স্ত্রীলোকেরা প্রাপ্ত। স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া গাহিতে গাহিতে নদীতীরে পুকুরিগীতীরে উপ-স্থিত হইয়া কস্তাকে সামান্যরূপে দান করাইয়া দেব এবং গাহিতে গাহিতে নানাবিধ স্ত্রী-আচারের সহিত মাটি খুঁড়িয়া লইয়া আসে। আসিবার সময়ও গাহিতে থাকে। মাটি আনিয়া অন্তঃপুরের উঠানের মাধ্যমে সেই মাটিতে বেদী করে। এই বেদীর উপর গৃহদেবতা ও পূর্বপুরুষদের পূজা

৩ আশ্বিনাষি হ্র। বরের বাড়ীতেও এইরূপ হইয়া থাকে। তৎপরে এক শুভদিনে বা শুভক্ষেপে কস্তার বাটীতে অস্তঃপুরের উঠানে কয়টা নুড়ন অথবা বংশে মণ্ডপ প্রস্তুত হয়। এই মণ্ডপের মধ্যে বেদীর উপর তীর্থকলপূর্ণ কল স্থাপন করিয়া থাকে। এই ষ্টে পুরোহিত কুলদেবতা ও পূর্ব পুরুষগণের পূজা করেন। বরের বাড়ীতে তীর্থকল স্থাপিত ও পূজাদি হয়, কিন্তু মণ্ডপ হয় না, এই তীর্থকলসের নিকট একটা লালল রাখা হয়।

তৎপরে হর্দিকাদান বা গাত্রহরিদ্রা। শুভদিনে শুভক্ষেপে বরের গায়ে হরিদ্রা দিয়া উদ্বৃত্ত হরিদ্রা কস্তার বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কস্তা তাহার অর্ধেকটুকু সেইদিন মাথে, অবশিষ্টটুকু রাখিয়া দেয়। বরের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইলে তাহার গাত্রহরিদ্রা হয় না। তৎপরে বিবাহের দিনও প্রাতঃকাল পর্যন্ত কস্তার গায়ে প্রত্যহ সেই অবশিষ্ট হরিদ্রার একটু একটু মাখাইয়া দান করান হইয়া থাকে।

তৎপরে মাতৃকাপূজা। বোড়শমাতৃকা পূজাই ইহার প্রধান অঙ্গ। তৎপরে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি কার্য সম্পন্ন হয়।

তৎপরে বিবাহের দিন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হয়। বর বিবাহ করিতে যাত্রা করিবার পূর্বে মধ্যাহ্নে অস্তঃপুরে গমন করে। এখানে জীলোকেরা আবার তৈলহরিদ্রা মাখাইয়া দান করাইয়া দেয়। তৎপরে কতকগুলি অবিবাহিত বালকের সহিত একত্র বসিয়া শেষ (আয়ুর্ক্যার) অবিবাহিতাঙ্গ ভোজন করে। তৎপরে যাত্রার অব্যবহিতপূর্বে পোষাকাদি পরিয়া বর আসিয়া মাতৃক্রোড়ে উপবেশন করিয়া এক পাখ জলপান করে। পরে বরের মাতা পুত্রের পানাবশিষ্ট জলটুকু পান করেন। তৎপরে বরকে লইয়া বরযাত্রীগণ কস্তার বাটীতে উপস্থিত হয়।

বর উপস্থিত হইলে কস্তাকর্তা বরকে দ্বারের নিকট কতকগুলি মুদ্রা নজর দিয়া অভ্যর্থনা করেন। নজরের নাম দ্বার-পূজা। তৎপরে বর ও বরযাত্রীরা সভার আনীত হন। এই সভাকে জনবাস বলে।

বর ও বরযাত্রীরা জনবাসে উপস্থিত হইলে অস্তঃপুরে কস্তার নথাদি কর্তন করিয়া আলতা পরাইয়া দেয় এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে নক্স দিয়া একবিন্দু রক্তপাত করাইয়া আলতায় শুবিয়া রাখিয়া দেয়, ইহার নাম অশৌচ-পরিচালন।

তৎপরে বর-নিমন্ত্রণ বা ধূক্ষ ক।—কস্তাপক্ষীরের কয়েকজন লোক ও কয়েকটা ব্রাহ্মণ, সবৎ জলপানীয় দ্রব্য ও তাহাঙ্ক লইয়া জনবাসে উপস্থিত হইয়া বরযাত্রীদিগকে গ্রহণ করিতে

অনুরোধ করে এবং বরকে আবার অর্ধ-উপহার দেওয়া হয়। এই অর্ধের পরিমাণ লইয়া অনেক সময়ে মহাবিশব ঘটে।

তৎপরে কস্তানির্গমন—বরযাত্রীরা ধূক্ষ গ্রহণ করিলে কস্তাকে বংশমণ্ডপে তীর্থকলসের নিকট বসাইয়া কস্তার পিতা তৎপার্ষে উপবেশন করেন। বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা গুরুতর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় এই সময়ে কস্তাকে দিবার লজ্জা যে সমস্ত জলকার ও বস্ত্রাদি আনা হইয়াছে, তাহা লইয়া সেই স্থানে গিয়া কস্তাকে দিয়া আসেন। কস্তা প্রণাম করিয়া সেগুলি গ্রহণ করে। তৎপরে কস্তাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া সেই সকল বেশভূষা পরাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে বরকে সেই স্থলে লইয়া আসে।

তৎপরে শাস্ত্রোক্ত বিধান মতে, পান্য, অর্ঘ্য ও মধুগুর্ক, (পিণ্ডা-কুশাসন, পরাজলি, হস্তার্থ্য) দেওয়া হইয়া থাকে। পরে কস্তাকে আনিয়া বরের দক্ষিণে বসাইয়া অগ্নিস্থাপন, গোত্রান্তর গ্রহিবন্ধন, সস্ত্রদান, বস্ত্রবন্ধন (বর কস্তার পিতৃদত্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্ববস্ত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে), হোম, শেধ লাক্ষাহতি (লাঙরা মেরাচন) করিয়া বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়।

তৎপরে বাটনা বাটিবার শিলের উপর দাঁড়াইয়া কস্তা সপ্তপদী-গমন করিয়া থাকে। মণ্ডল কয়টা উত্তীর্ণ হইলে বর শিলখানি উঠাইয়া রাখে। তৎপর সিন্দূর দান (স্বমঙ্গলীকরণ) হইয়া থাকে। বর স্বহস্তে কস্তার কপালে সিন্দূর দিয়া থাকে।

তৎপরে কস্তার পিতা বরকে কন্যাদানের দক্ষিণা দান করেন ও বর কুদাম্বর পাঠ করিয়া স্বপুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করে।

তৎপরে অশৌচকরণ। অশৌচ পরিচালনের সময় কন্যার কনিষ্ঠাঙ্গুলির রক্ত-শোষিত আলতাটুকু লইয়া জীলোকেরা বরের গলদেশ স্পর্শ করে ও বরের আনীত আর একখানি শুক আলতা কন্যার গলদেশে স্পর্শ করাইয়া উভয় খণ্ড লাল-হুতা দিয়া উভয়ের মণিবন্ধে দেওয়া হয়। জীলোকের বিবাস যে ইহাতে দাম্পত্য-প্রীতি বর্ধিত হয়।

তৎপরে উভয়ে পীঠ পরিবর্তন করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞার বন্ধ হয়। তৎপরে পুরোহিত শাস্ত্রানুসারে উভয়কে গৃহস্থ বলিয়া বুঝাইয়া গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম ওনাইয়া দেন। তাহার পর ব্রাহ্মণবর্গ ও উপস্থিত সকলেই ধানমুর্কা দিয়া কন্যাকে আশীর্বাদ করেন।

আশীর্বাদ হইয়া গেলে পুরুষেরা বরকন্যাকে মণ্ডপে রাখিয়া চলিয়া যায় ও জীলোকেরা আদ্রিয়া "চুখ" করিয়া

বাক্য। বরকন্যার পক্ষ হইতে, বহু প্রভৃতি জগৎ
বাদ্যুপী সহিয়া অজুগাধার স্পর্শ করার নাম চূষন। বাক্যলা-
দেশে ইহাকে বরণ বলে। তৎপরে বরকন্যা 'ধবর'গৃহে
(বাসরগৃহে) নীত হয়। এখানে জীলোকেরা নানাবিধ
জী-আচার করিয়া বরের সহিত সারারাত্রি আগিয়া হাত
পরিহাসাদি করে। প্রত্যুষে বর জনবাসে ফিরিয়া আসে।
তৎপরে বরবাজীদিগকে জল খাওয়ান হয়। এই সকল
আয়োজনে প্রায় বিশ্রাম হয়। এই সময় বরকে
জাহেজ বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বিবাহের রাতে বরবাজীদিগকে
জলপানাদি করান হয়। তৎপরে বাজার সময় উত্তরপক্ষের
আত্মীয়েরা বর ও কন্যাকে অর্থ ও অলঙ্কারাদি যৌতুক দেয়,
ইহার নাম মদোয়া বা মুখদেখি। তৎপরে সকলে জনবাসে
আসিয়া বাজার আয়োজন করিতে থাকে। পাটনায় অঞ্চলে
ঐ দিন বরকন্যা বরণগৃহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু শাহাবাদ অঞ্চলে
তাহা হয় না, বর একাকী আসে। বিবাহের চতুর্থ দিনে
চৌথারী নামে একটা প্রথা সম্পাদিত হয়। ইহা বাক্যলা
দেশের "রাঙাস্তা খোলা বা অষ্টমঙ্গলার জায়।" পাটনায়
বরের বাটীতে বরকন্যা একজু চৌথারী করে, আর শাহাবাদে
তাহারা স্ব স্ব বাটীতে একা একা করে। পাটনায় চৌথারী
হইয়া গেলে কত্ৰা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসে। দ্বিরাগমন না
হইলে কন্যা স্বামিগৃহে বাস করে না। দ্বিরাগমনে বধু
স্বগুরুবাটী আসিয়া নখাদিচ্ছেদন করিয়া স্বগুরু-পরিবারের
অন্তর্নিবিষ্ট হয়। দ্বিরাগমনের সময় বর স্বগুরুগৃহে গেলে
উঠানে তীর্থকলস স্থাপিত হয়, (মণ্ডপ হয় না), গৃহদেবতার
পূজা হয়, কন্যার নখাদিচ্ছেদন ও আলতা পরান এবং চূষনাদি
পূর্ববৎ হয়। তৎপরে কন্যার পিতা কন্যাকে বস্ত্রাদি,
অলঙ্কার, বিছানা, খাট ও বরকে যৌতুকাদি দান করেন।
বর বিবাহের পর বাড়ী আসিয়া গৃহদেবতা, গ্রামদেবতা ও
সমস্ত হিন্দুদেবতাকে প্রণাম করিয়া পূজাদি দিয়া থাকে।

পশ্চিমাঞ্চলের কার্যস্বগণের বিবাহের অল্পটান এই বেহারী
কার্যের মত, তবে দেশভেদে আচারাদির কিছু প্রভেদ আছে।
বেহারী কার্যের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, কবীরপন্থী,
নানকশাহী প্রভৃতি আছে। শাক্তের সংখ্যাই অধিক। দ্রা-
ঘিভীয়ার দিন ইহারা চিত্রগুপ্তের পূজা করে। ত্রীপঞ্চমীর
দিন দোয়ারত কলম পূজা হয়।

অজ্যোতিষ্কার ইহাদের অশোচ গ্রহণপ্রথা বিবিধ।
কতকগুলি লোকে ১৩ দিন ও কতকগুলি লোকে একমাস
অশোচ গ্রহণ করেন। কেহ কেহ আবার বোল দিন মাত্র
গ্রহণ করে। তাহার তের দিন অশোচ লর তাহারা "তেরা"

ও তাহার এক মাস লর তাহার "মাসী" নামক অনিষ্ট-
মৃত্যুর এক বৎসর পরে সপিত্তকরণ বা "বড়কি" হার
হয়। পতীর মৃত্যু হইলে ভিনবান পরে বড়কি জাহ হয়।

বকে কার্য।—প্রাচীন ঘটককারিকার মতে, প্রথমে
পঞ্চ কার্য কোলাকশেণ * হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণের সহিত
গোড়রাজ আদিশূরের সভার আগমন করেন।

প্রথমে দেখিতে হইবে কোন সময়ে কি উদ্দেশে তাহার
গোড়ে আসিয়াছিলেন ?

সময় নিরূপণ।—বাচস্পতিমিশ্রের মতে ২৫৪ শকে (১),
ভট্টগ্রহ মতে ২২৪ শকে (২), কিতীশবংশাবলীর মতে
২২২ শকে (৩), কার্যকৌত্তভরচরিতার মতে ৩৮০ বাঙ্গাল
সনে (৮১৪ শকে), দত্তবংশমালার মতে ৮০৪ শকে (৪) এক
৮ রাজেন্দ্রলালের মতে ২৬৪ খ্রষ্টাব্দে অর্থাৎ ৮৮৬ শকে (৫)
পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কার্য গোড়ে আগমন করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ-
ভাগে আদিশূরের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন (৬)।

উপরে যে কয়েক মত উদ্ধৃত হইল, সবই পরস্পর
অনৈক্য। এক্ষণে তাহার মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ
করা যায় ?

রাষ্ট্রীয় ও বঙ্গজ ঘটককারিকার মতে, মহারাজ বল্লালসেন
কাণ্ডকুজ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও কার্যস্বগণের উত্তরপুরুষ-
দিগকে কৌলীন্যমর্যাদা প্রদান করেন। এখন দেখিতে
হইবে, বল্লালসেন কোন সময়ে জীবিত ছিলেন এবং তাহার
সময়ে কাণ্ডকুজাগত ব্যক্তিবর্গের কয় পুরুষ গত হইরাছিল ?

* শব্দস্বাবলীর মতে, কাণ্ডকুজের নামান্তর। তাহুল মানির নামক
গারজ ইতিহাসে এই বান "কোল" নামে উক্ত হইয়াছে।

(১) "বেদবাণীকশাকে তু গোড়ে বিশ্রা সমাগতাঃ।
কিতীশতিথিমেধা চ বীতরাগঃ স্থাদিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাঃ আগতা গোড়মণ্ডলে।
আরাভাঃ পঞ্চব্রাহ্মণ কাণ্ডকুজপ্রবেশতঃ।"
বাচস্পতি মিশ্রকৃত সুলভান।

(২) "পঞ্চ ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পঞ্চাং বদা।
অকে অকে বামাগতি বেদমুক্তা তদা।
কতাপত তুল্য অকে গুরুপূর্ণ দিশে।
সহর পহর কোলাক ভেজিরে গোড়ে অবশিষ্টের এসে।"
ভট্টগ্রহ।

(৩) "নবদেবতাদিকনবদনীপকাবে প্রাপ্তপঞ্জিকাবাদে বিশেষ্যসান।"
কিতীশবংশাবলীচরিতম্ ২ পৃষ্ঠা।

(৪) "কাণ্ডকুজাভাবানঃ কতারাঃ গুরুবোভনঃ।
গোড়ে সমাগতঃ শাক্তে মবেদাইনভাকবে।" দত্তবংশমালা।

(৫) Indo Aryans, Vol. II, p. 269, (৬) "সেনসামন্ত" ১৭ পৃষ্ঠা।

মহারাজ বজালসেনকে জীবনের দেবদেবতার সমন্বয় করিয়া করেন। এই বৃহৎ গ্রন্থ ১৩২১ শকে (১১৩৯ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হয়। সম্ভবতঃ তাঁহার ৫০ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১১১২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আদিপুরের সবার-নিরূপণ লব্ধে মৈত্রয় মত ভেদ রহি-
রাছে, বজালসেন-সম্বন্ধে সেরূপ মত ভেদ লক্ষিত হইতেছে
না। বজালসেন নিজেই দানসাগরে সবার নিরূপণ করিয়াছেন।
(কারিখগণের কোলীন্ডমর্থ্যাদিপ্রাণিকালনিরূপণ উপলক্ষে
সেনরাজগণেরও সময় নিরূপিত হইবে।)

রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের ঘটককারিকা পাঠে জানা যায়—
কান্তকুলজাগত দক্ষের ৮ম উত্তর পুরুষ অরবিন্দ, ছান্ডের ২ম
উত্তরপুরুষ গোবর্দ্ধন, বেদগর্ভের ৮ম উত্তরপুরুষ শিও পাণ্ডুলি,
ভট্টনারায়ণের ১০ম উত্তর পুরুষ মহেশ্বর ও শ্রীহর্ষের ১৪শ
উত্তর পুরুষ উৎসাহ বজালসেনের সমকালীন।

বারেজ কুলজীর মতে—ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঁহির
১৩শ উত্তর পুরুষ জয়সাগর ও মণিলাগর, বীতরাগের পুত্র
অবেশের ৮ম উত্তর পুরুষ ভবদেব ও স্বর্গদেব, হুধানিধির পুত্র
গোভমের ১৫শ উত্তর পুরুষ পরাশর ও ভাস্কর এবং সৌভরির
পুত্র পরাশরের ৮ম পুরুষ গুণার্ঘ্য ও অনিরুদ্ধ বজাল কর্তৃক
'কুলীন' আখ্যা প্রাপ্ত হন। [কুলীন দেখ।]

উক্ত উভয়স্থানের কুলজী অস্থানে আদিপুরের রাজসভায়
বে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, বজালসেনের সময় তাঁহা-
দেরই অধস্তন ৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ পর্যন্ত গত হইরাছিল।*
এতদ্বারা বোধ হইতেছে, বজালসেনের বহুকাল পূর্বে আদিপুর
রাজত্ব করিতেন। অতএব অতাবপক্ষে যদি আদিপুর হইতে
বজাল ১১১২ পুরুষ অন্তর এইরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া যায়,
তাহা হইলেও আদিপুর বজাল হইতে প্রায় তিনশত সত্তর
বর্ষেরও + অধিক পূর্বতন হইয়া পড়েন। তাহা হইলে
আদিপুর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক হইতেছেন। ‡

৮ রাজেন্দ্রলালের মতে আদিপুরের অপর নাম বীরসেন,
ইনি সেনরাজগণের আদিপুরুষ। আবার কাহারও মতে,
কনোজাধিপতি “বৎসরাজ ৭০২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ
করেন। বৎসরাজ গোড়ের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নরপতিকে
উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্তে তাহার সেনাপতি জনৈক হিন্দুকে

সৌকর্য্য সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনিই
আদিপুর।”

আদিপুর লব্ধে যে দুইটি মত উদ্ভূত হইল, তাহার
কোনটাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। বিজয়সেনের
শিলালিপিতে তাঁহার “পূর্বপুরুষ বীরসেন “দাক্ষিণাত্য-
কৌশিল্য” অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের রাজা বা দাক্ষিণাত্যবংশীয়
রাজা বলিয়া আখ্যাত হইরাছেন। এই বীরসেন গোড়ের কোন
সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন কি না, তৎপক্ষেই বোধ সন্দেহ!
অতঃপর বীরসেনকে নিঃসন্দেহে আদিপুর বলা বাইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ কেবল অস্থান দ্বারা আদিপুরকে বৎসরাজের
সেনাপতি বলিয়া গ্রহণ করা বুদ্ধিসঙ্গত নয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে আদিপুর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক।
এই সময়ে দেবশক্তির পুত্র বৎসরাজ (৭০০ খৃষ্টাব্দে) কনোজের
সিংহাসনারোহণ করেন। [কনোজ শব্দ ৮০ পৃঃ দেখ।] এখন
দেখা যাউক, ঐ সময়ে অথবা তৎপূর্বে গোড়দেশে কে কে রাজত্ব
করিতেছিলেন? কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—

“মণ্ডলেব নরেন্দ্রাণাং পরোদানামিবার্য্যাম।

গোড়রাজাশ্রয়ঃ শুণ্ডঃ জয়ভাধ্যেন ভূভূজা ॥

প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড বর্দ্ধনম্।

তন্মিন্ সৌর্য্যজয়ম্যভিঃ শ্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ ॥

লাভং স ত্রুষ্টুমবিশং কার্ত্তিকৈরনিকৈতনম্।”

রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪১৫-৪১৭।

(কাশ্মীররাজ জয়গীড় সৈন্তগণকে গঙ্গাভীরে বিদায়
করিয়া রাজিকালে একাকী) গোড়রাজ্যে উপস্থিত হইলেন।
জয়ন্তনামক গোড়রাজ্যের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া
শুণ্ডভাবে ক্রমে ক্রমে পৌণ্ড বর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন।
পুরস্বসিবর্গের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শনে তিনি
অতিশয় প্রীত হইলেন। জয়গীড় এখানে কার্ত্তিকৈরদেবের
মন্দিরে নৃত্যদর্শনমানসে প্রবেশ করেন।

ইতিপূর্বে কাশ্মীরের প্রাচীন কারিখরাজবংশ বর্ণনা
কালে লিখিত হইয়াছে, যে কারিখরাজ জয়গীড় ৬৬৭ শক
(৭৪৫ খৃঃ অঃ) হইতে ৬৯৮ শক (৭৭৬ খৃঃ অঃ) পর্যন্ত
কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে কোন সময়ে তিনি
পৌণ্ড বর্দ্ধননগরে আসিয়াছিলেন। অতএব স্বীকার করা
বাইতে পারে যে, গোড়রাজ জয়ন্ত ৭৪৫ হইতে ৭৭৬ খৃষ্টাব্দের
মধ্যে কোন সময়ে পৌণ্ড বর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, “জয়গীড় কার্ত্তিকৈর-
মন্দিরে কনোজাবাসী দেবদত্তবীর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন।

* এক্ষণে কোথাও কোথাও সেই পঞ্চরাজগণের অধস্তন ৩৮০৭।
পুরুষ বৃষ্ট হয়।

† বর্তমান ঐতিহাসিকগণ ৩ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করেন।

‡ “সেনরাজগণ” রচয়িতার মতই এখানে সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল।

কমলা জয়সিংহের অসামান্য রূপমায়ারীন্দ্রনে তাঁহাকে কোন রাজবংশীয় ভাবিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসেন। সেই সময়ে পৌণ্ড্রবর্ধনে সিংহের উৎপাত হয়। জয়সিংহ স্বকীয় কুলবলপ্রভাবে সেই সিংহকে বিনাশ করেন। সিংহকে মারিতে গিয়া ঘটনাক্রমে তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ুর পড়িয়া যায়। কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া গোড়রাজ জয়ন্তের নিকট উপস্থিত করে। তাহাতে সকলে জানিতে পারিল যে, কায়সীরপতি জয়সিংহ পৌণ্ড্রবর্ধনে আসিয়াছেন। সকলেই নাম শুনিয়া কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়ন্ত কহিলেন, ‘তিনিরাহি কায়সীরাজ কল্লট নাম গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে বেশ ভ্রমণ করিতেছেন, অতএব আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তাঁহাকে অহুসন্ধান কর।’ তিনি চর দ্বারা অবগত হইলেন যে জয়সিংহ কমলার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর গোড়রাজ, অমাত্য ও রাজপরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া জয়সিংহকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং বহুদৈর্ঘ্যে তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীকে সম্ভ্রদান করিলেন। এই সময় গোড়দেশ কেবল জয়ন্তের অধিকারভুক্ত ছিল না। জয়সিংহ পাঁচজন গোড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া স্বস্তর জয়ন্তকে রাজচক্রবর্তী করিলেন (১)।” (রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ তরঙ্গ)।

রাজতরঙ্গিণীর উক্ত বিবরণপাঠে বোধ হইতেছে, প্রথমে জয়ন্ত একজন সামান্ত রাজা ছিলেন, পরে জামাতার সাহায্যে সমস্ত গোড়দেশের অধীশ্বর হইলেন।

এদেশের প্রাচীন কুলাচার্যদিগের মতে, রাজা আদিশুর বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়া সর্বপ্রথম রাজচক্রবর্তী হন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ৬৬৭ শক হইতে ৬৯৮ শক মধ্যে) ঐ সময়ে জয়ন্ত গোড়ের রাজা এবং তিনিই সর্বপ্রথম সমস্ত গোড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যদি ব্রাহ্মণবংশাবলী ও রাজতরঙ্গিণীর বিবরণ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আদিশুর ও জয়ন্তরাজকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। বোধ হয়, জয়ন্তরাজ সর্বপ্রথম সমস্ত গোড়দেশের অধীশ্বর হইয়া ‘আদিশুর’ উপাধি গ্রহণ করেন।

আর এক কথা—যে পৌণ্ড্রবর্ধনে জয়ন্ত রাজত করিয়াছিলেন, শিলালিপিপাঠে জানা যায়—সেই পৌণ্ড্রবর্ধনে

সেনরাজসমভ ৬ রাজত করিতে। অতএব যখন হইতাহে জয়ন্ত বা আদিশুরের সময়ে পক্ষ ব্রাহ্মণ ও পক্ষ কায়স্থ সর্বপ্রথম এই পৌণ্ড্রবর্ধনে আসিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ বঙ্গদেশের সময়ে ‘কুলীন’ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে বে বে স্থানে গিয়া বাল করেন, তিনি সেই স্থানের নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কোন কোন ঘটককারিকায় লিখিত আছে—

“মহারাজ আদিশুর পুত্রোত্তমজয় করিবার জন্ত কাঞ্চকুলপতি বীরসিংহের নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। ধর্মশাস্ত্রমতে, তৎকালে কেহ বন্ধুত্বে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন কারণে আসিলে পণ্ডিত হইত। এই ভয়ে কোন ব্রাহ্মণ গোড়ে আসিতে চাহিলেন না। কাজেই কনোজরাজ ও আদিশুরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। দূত কিরিয়া আসিলে তাহার মুখে নিজ নিম্নাবস্থা শুনিয়া আদিশুর কনোজরাজের বিরুদ্ধে সেনাপতি বীরবাহকে পাঠাইলেন। উত্তরনলে যুদ্ধ হইল। গোড়সেনাপতি নিহত হইলেন, কাজেই প্রথমবার গোড়রাজের পরাজয় হইল। তিনি আবার হেড়ম্বাধিপত্যকে যুদ্ধ করিবার জন্ত আদেশ করিলেন। হেড়ম্বরাজ অভিশর চতুর। তিনি শুনিলেন, কাঞ্চকুলরাজ গোবিন্দ্রের প্রীতিপালক ও মহামোক্ষা, কুটযুদ্ধ ভিন্ন তাঁহাকে পরাজয় করা সহজ নহে। তখন তিনি বন্ধুদেশীয় হীন ও অস্পৃহ সপ্তশত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া গোবাহনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কাঞ্চকুলরাজের সেনাপতিগণ গোবিন্দ্রবর্ধের আশঙ্কার রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিলেন। কনোজরাজ এই অতৃতপূর্ব সংবাদ পাইয়া বাধ্য হইয়া গোড়েশ্বরের সহিত সন্ধি করিলেন এবং যথাকালে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহিত ৫ জন কায়স্থ গোড়ের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। যে ৭০০ লোক ব্রাহ্মণ সাজিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, আদিশুরের অগ্রগৃহে তাহারা ‘সপ্তশতী ব্রাহ্মণ’ নামে পরিচিত হইল।”

রাজতরঙ্গিণীতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, কায়সীরাজ জয়দিত্য স্বস্তরকে গোড়দেশের অধীশ্বর করিয়া রাজ্যী কল্যাণদেবী ও কমলাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রেরণ করেন। পশ্চিমদিকে তিনি কাঞ্চকুলরাজকে পরাস্ত করিয়া কনোজের রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন (২)।

(১) “কল্যাণদেবীসম্ভব কল্যাণভিবিবিনা।

রাজলক্ষ্য ব্যপান্তরা ইব সোহজিগ্রহণ করম্।

ব্যবধিমাপি জামগ্রী তত্র শক্তি প্রকাশয়ম্।

পঞ্চদোড়াদিশান জিহা বস্তর তদধীশ্বরম্।

রাজতরঙ্গিণী ৪ ১৬৬৫।

* দিমাজপুর হইতে সংগৃহীত লক্ষণেশ্বরের তাম্রশাসন দেখ।

(Jour. As. Soc. Bengal, 1875, pt. I. p. 12.)

† ক্রবাসলক্ষিত কায়স্থকারিক। প্রকৃতি লেখ।

(২) “গতশেষে প্রকৃত্যন্ত সৈভঃ সখ্যদয়ঃ বিভঃ।

বিভঃসখ্যদেভো দেবদর্শনোভ্যন্তরায়বো।

দাসিক হইতে আঁঠু রাইট্‌টাপি গোবিন্দরাজ-প্রভু
১৩০ শকাব্দের তাম্রশাসনপাঠে জানা যায়—যে তাঁহার
পিতা গৌররাজ বংশরাজকে জয় করিয়াছিলেন, ঐ বংশ-
রাজ গোড়রাজ্য জয় করিয়া ধনমত্ত হইয়াছিলেন।
(Journ. Roy. As. Soc. Vol. V. p. 850)

উপরোক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে, প্রথমে বংশরাজ
গোড়রাজকে হুঁড়ে পরাজয় করেন। পরে সেই ধনমত্ত
বংশরাজও যে গোড়রাজ জয়ন্তের সন্তানস্বর্গ্য তাঁহার
জামাতা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব করিয়া
গইলে যোবের হয় না।

ঘটককারিকাতেও লিখিত হইয়াছে, যে গোড়সেনাপতি
প্রথমে কান্তকূজরাজের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, পরে
অতঃপর এক ব্যক্তি গিয়া ছলে বলে একরূপ কনোজের অতুল
প্রভাবকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময়
হইতে বঙ্গদেশে গোড় ও কনোজরাজের যুদ্ধের কথা পরম্পরার
প্রবাদরূপে চলিয়া আসিতেছিল, তৎপরে আধুনিক কুলাচাৰ্য-
গণ * সেই প্রবাদ এবং ব্রাহ্মণকার্যের গোড়ের আগমন উপলক্ষ
করিয়া এক প্রকার নৃতন কথার অবতারণা করিলেন;
একশ্রেণে তাহাই কারিকাপ্রব্ধে দেখিতে পাওয়া যায়।

কলহণ ১০৭০ শকে রাজতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন। তাঁহার
লিখিত বিবরণ যে অধিক প্রামাণিক, তাহা এখানে উল্লেখ
করা বাহুল্য। অতএব এদেশের ব্রাহ্মণবংশাবলী যদি ঠিক
হয়, তাহা হইলে জয়ন্তরাজই (১) যে আদিপুত্র উপাধি

নিরূপণ প্রাপ্ত হইতেন; স প্রব্ধে তদ্বর্ণিত।

অগ্রে জয়ন্তরাজ হুঁড়ু পদাভ্যন্তর হইয়াছেন।

সিংহাসনং দ্বিতীয়াদৌ কান্তকূজমহীভূমঃ।”

রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪৭৬-৪৭৭।

* দেবীর ব্রাহ্মণদিগের বেলবন্ধন উপলক্ষে ব্রাহ্মণবংশাবলী সংগ্রহ
করেন, তিনি চৈতন্তের সমসাময়িক। তাঁহার পূর্ববর্তী কোন কুলা-
চাৰ্যের লিখিত কারিকা পাওয়া যায় না। সুতরাং দেবীর তৎপরে-
বর্তী কুলাচাৰ্যগণকে আধুনিক বলিতে হইবে।

(১) আইন-ই-অকবরীতে, বঙ্গদেশের কারুহরাজবংশাবলী মধ্যে
জয়ন্তের নাম পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ মতে জয়ন্তরাজ আদিপুত্রের
পূর্ববর্তী। [H. L. Jarrett's Ain I Akbari, Vol. II. p. 145
দেখ]

আইন অকবরীতে এক রাজার নাম দুই ভিন্ন বার অতঃপর উল্লেখও
দেখা যায়। যেমন পালবংশীয় প্রথমরাজা কুপাল এবং চতুর্থ রাজা
কুপতিপাল দুই জন ভিন্ন রাজা বলিয়া লিখিত হইলেও শিলালিপি
অনুসারে একজন রাজা বলিয়াই বোধ হয় এবং কুপাল বা কুপতি-
পালের নামান্তর কেবল বোপাল ও সোৎপাল জানা গিয়াছে।

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিক সম্ভব। আদিপুত্ররাজ
জয়ন্তকে কারুহরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ
তাঁহার কস্তার সহিত কারুহরাজ জয়ন্তের বিবাহ হওয়ার

(Indo Aryans, Vol. II, p. 362; Centenary Review of the
As Soc. Bengal, p. 208-9; Journ. As Soc. Bengal, 1878, pt.
I. p. 190.) সেইরূপ আদিপুত্র জয়ন্তের পরবর্তী বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও
একরাজা বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব হয় না। চন্দ্রবংশের রাজপণ্ডিত
প্রবাসদ্বিগ্ন লিখিয়াছেন—

“চন্দ্রবংশের জাতঃ কারুহা হুঁড়ুনাথকঃ।

অতঃপর বংশে চ আদিপুত্রা নৃপেশ্বরঃ।

অনন্তরাজকঃ বর্ষং দ্বারদ্বাং নৃপবিশ্বতঃ।.....

জিহ্বা চ বৌদ্ধরাজানঃ তথা পৌড়াবিপাদ্ বলাদ্।”

চন্দ্রবংশের বংশে অবশ্যনামা কারুহ জন্মগ্রহণ করেন। সেই
বংশজাত মহারাজ আদিপুত্র দারদ্রবংশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন
করেন। তিনি বৌদ্ধরাজগণ ও পৌড়াবিপ প্রভৃতিকে জয় করিয়াছিলেন।
উক্ত ঘটন অনুসারে আদিপুত্রের জন্মস্থান (কান্দীরের উত্তরবর্তিত)
দারদ্রবংশ (বর্তমান হার্মিন্দাবাদ)।

শিবরাজপুরের একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের তলে কাঞ্চোজবংশজাত
গোড়পতির উল্লেখ আছে। যথা—

“হুর্দারিবিব্রজখিনীপ্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরঃ

সানন্দঃ বিবি বস্ত্র মার্গপত্তপ্রাসব্রহ্মে পীরতে।

কাঞ্চোজবংশজেন গোড়পতিনা তেনেন্দ্রমৌলেশ্বরম্

প্রাসাদো নিরমারি হুঁড়ুরবটবর্ষেণ ভূত্বয়ঃ।”

ঐ কাঞ্চোজবংশজাত গোড়পতিকে কেহ কেহ আদিপুত্র অথবা তাঁহার
উত্তর পুত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (নবভারত ১২৯৬, ৪৪ পৃঃ)।
প্রাচীন কাঞ্চোজরাজ্য কান্দীরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।
[কাঞ্চোজ ও আর্ধ্যাবর্ত দেখ।]

দারদ্র ও কাঞ্চোজ উভয়েই পরম্পর পার্শ্ববর্তী জনপদ।

“কাঞ্চোজা তরদাদৈব বর্ধরাজঃ অঙ্গলৌকিকাঃ।”

* ব্রহ্মপুত্রপুত্র ১। ৪৬। ১১৮; বার্কডের ৫৭। ৩৮।

কোন কোন আধুনিক ঘটককারিকার আদিপুত্রকে বৈষ্ণবরাজ
বলা হইয়াছে। বোধ হয় আধুনিক কুলাচাৰ্যগণ অবশ্য নাম
শুনিয়াই বৈষ্ণা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বালালাদেশ ছাড়া
কোথাও বৈষ্ণবনামে কোন স্বতন্ত্রজাতি নাই। বৈষ্ণবে * শাক্যবংশী
ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসা করিয়া থাকেন, উত্তরপশ্চিমদেশে কারুহ ও
ব্রাহ্মণের মধ্যেই চিকিৎসক দৃষ্ট হয় এবং মহারাষ্ট্রেও কারুহের বৈষ্ণা
উপাধি গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। সুতরাং কেবল অবশ্য
নাম শুনিয়া আদিপুত্রকে বৈষ্ণবরাজ বলা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

বিহুপুরাণে—অবশ্য নামক একটি জনপদের উল্লেখ আছে—

“গৌরীয়াঃ সৈন্যধা হুণাঃ শাখাঃ শাক্যলম্বিনঃ।

নবভারতাতথাবর্তা পায়সীকায়নতথা।” বিহুপুঃ ২। ৩। ১৭।

উক্ত শোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে অবশ্যদেশে বর্তমান পঞ্চাব ও
পাঞ্জাবের মধ্যে ছিল। (ইহারই নিকট কাঞ্চোজ ও দারদ্ররাজ্য ছিল।)

আইন অববরীর কথাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।

ঐ আদিশূরের সময়ে অর্থাৎ ৭৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও ষষ্ঠ কায়স্থ গোড়দেশে আগমন করেন। ঐ পঞ্চকায়স্থের নাম সৌকালীন গোত্রজ মকরন্দ ঘোষ, পৌত্তমগোত্রজ দশরথ বহু, বিশ্বামিত্র গোত্রজ কালিদাস মিত্র,* কাশ্যগোত্রজ বিরাতগুহ এবং মৌলগল্য-গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত।

বঙ্গীয় ও দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ঘটককারিকার মতে—“ঐ পাঁচজন কায়স্থ শূত্র। তাহারা পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত দাসরূপে গোড়ে আগমন করে। আদিশূর প্রথমে ব্রাহ্মণদিগের যথোচিত সম্মান করিয়া শেষে কায়স্থগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘আপনাদিগের আগমনে আমার জন্ম সফল হইল, আমার ভবন পবিত্র হইল। হে শূত্রপুত্রবগণ! আপনারা ব্রাহ্মণদিগের

সহিত কি জন্ত আগমন করিয়াছেন?’ ইত্যাদি ভাব ভূতি বারা আদিশূর কায়স্থগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। (১২)।

প্রথম চারিজন আপনাদিগকে বিপ্রদাস বলিয়া পরিচয় দিলেন। শেষে ‘নিবিলশাস্ত্রবিখ্যারদ’ পুরুষোত্তম দত্ত কহিলেন, সকলকে রক্ষা করিবার জন্ত এখানে আসিয়াছি (১৩)।

রাজা প্রথমে চারিজনকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং দত্ত বিনয়হীন হওয়ার তাঁহাকে নিরুল করিলেন।”

কায়স্থকে শূত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইল, আবার সেই শূত্রগণকে দেখিয়া আদিশূর কৃতার্থব্রত হইলেন, তাঁহাদের স্তব জুতি করিলেন। একি চমৎকার! পূর্বকালে যে শূত্রজাতির রাজসভার অধিকার ছিল না, পবিত্রচেতা অর্ধগণ যে শূত্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচিজ্ঞান করিতেন, প্রবল পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্তী যজ্ঞাভিলাষী আদিশূর সেই শূত্রকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন! অতি অসম্ভব! ৪ জন কায়স্থ বিপ্রদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল বলিয়াই কি ঘটকেরা তাঁহাদিগকে শূত্রমধ্যে গণ্য করিয়াছেন?

ঐবানন্দ মিশ্র ৫ জন কায়স্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।—

১—“এই প্রভাবসম্পন্ন মকরন্দ……ইনি সৌকালীন গোত্রসম্ভূত ও শৈব, ইহার গোত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবপূজ্য কালিকা। ইনি ভট্টনারায়ণের শিষ্য, মহাতান্ত্রিকদিগের অগ্রগণ্য, সূর্য্যাক্ষজের বংশধর এবং বীরাগ্রগণ্য।

পাণিনি মতে—অবশ্য শব্দ ক্ষত্রিয় ও জনপদবাচী (পা ৪।১।১৭১।) পশ্চিমের অবশ্য কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ অবশ্যদেশ হইতে আসিয়াছেন। ঐরূপ জীবাস্তবেরা কান্দীরের সীমগর হইতে আসিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

ঐবানন্দমিশ্রের কারিকার আদিশূর দরদদেশীয় অবশ্য-কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দিনাজপুরের শিলালিপিতে কাঞ্চোলবংশীয় গোড়পতির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; আবার কাঞ্চোল, দরদ ও অবশ্য পরস্পর নিকটবর্তী দেশ হইতেছে। বিশেষতঃ অবশ্যকাঞ্চোলদিগের নিকটবাসী কান্দীররাজ কায়স্থপ্রবর জয়গীড় গোড়রাজ জয়ন্তের কন্যা কলাগাদেশীকে বিবাহ করেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা জয়ন্ত বা আদিশূরকে অবশ্যকায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিলে যুক্তিবদ্ধ হয় না। রাজহরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, যে জয়গীড় পৌত্রবর্দ্ধনে আসিয়াছেন শুনিয়া সকলই শঙ্কিত হইয়াছিল, কেবল গোড়রাজ জয়ন্ত জানিতেন যে কান্দীররাজ জয়গীড় ছদ্মবেশে করট দামগ্রহণপূর্বক দেশ ভ্রমণ করিতেছেন। কেহই জানিতে পারিল না, অবশ্য গোড়রাজ জানিতে পারিলেন। ইহার কারণ কি? এতদ্বারা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে যে কান্দীরের সহিত পূর্ব হইতে কোন রূপ সংস্রব ছিল অথবা (ঐবানন্দের কথা যদি অল্পমাত্র সত্য হয় তাহা হইলে) তিনি কান্দীরের নিকট কোন বান হইতে আসিয়া পৌত্রবর্দ্ধনে প্রথম রাজা হন। এ সকলই অনুমান! বোধ হয়, কায়স্থ আদিশূর নিজে কায়স্থ বলিয়াই কনোজাগত কায়স্থকে বিশেষ সম্মান করেন এবং ব্রাহ্মণের পরই পদবর্ধাণা প্রদান করিয়াছিলেন।

কুলাচাৰ্য্যাক্ষর বিরচিত কুলপঞ্জিকার আদিশূরকে “ক্ষত্রিয়বংশসং” বলা হইয়াছে।

* ঘোষ, বহু, মিত্র এই তিনটি আদিশূরপ্রদত্ত উপাধি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু বহু, মৎস্ত, ব্রজাও, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে শুদ্ধবংশীয় রাজাধিগণের মধ্যে উক্ত উপাধি দৃষ্ট হয়।

(১২) “অন্য মে সকলং জন্ম জীবিতক দুজীবিতম্।

পুত্রক ভবনং জাতং বুদ্ধ্যাকং গমনং বতঃ।

এবঞ্চ ক্রিয়তে ত্রোত্রং পৃষ্ট্যন্তং শূত্রপদকং।

বুদ্ধ্যাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থং বা দ্বিজৈঃ সহঃ।

তৎসংসর্গং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্রুত ভোঃ শূত্রপূজবাঃ।”

বঙ্গীয় কুলাচাৰ্য্যাকারিকা।

“কে ব্রহ্ম নাম কিবা কথয়ত কৃতিনঃ খাগতাঃ কপি দেশাং।

কোলাক্যং পঞ্চ শূত্রা বচমপি শূত্রে কিংবা কুহুরাণাম্।

ধন্তা ব্রহ্মঃ পৃথিব্যাঃ পরিচয়মলিঙ্গং ত্রুত ভো বিপ্রভক্তাঃ।

জ্যোতীর্বিপ্রবধ্যাঃ সকলপরিচয়ং ভূতপুত্রস্তি চৈবাম্।”

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কুলাচাৰ্য্যাকারিকা।

(১৩) “মৌলগল্যাগোত্রজো দত্ত পুরুষোত্তমঃসংজ্ঞকঃ।

এতেবাং রক্ষণার্থং আগতোহস্মি তবালয়ে।”

বঙ্গীয় ঘটককারিকা।

“অহং পুরুষোত্তমঃ কুলভূষণঃপ্রণয়ঃ কৃতী,

হৃদয়কুলসম্ভবো নিবিলশাস্ত্রবিদ্যুতমঃ।

বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজমরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো,

চকার শূত্রেঃ স তং বিনয়হীনকো নিরুলম্।”

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ঘটককারিকা।

২...এই বংশধর...চন্দ্রের স্বরূপ চেনিয়াআর বংশোদ্ভব, গৌতমগোত্রজ, নন্দের শিষ্য, মহাত্মা, জীবীর, নির্মল চরিত্র, মতিমান, মহাত্মিক এবং মহাবীরগিরেও অগ্রগণ্য।

৩...ইনি অমিকুলোদ্ভব গুহের বংশধর, ইহার নাম বিরাট, ইনি স্তূতাপন, মহাবীর ও কান্তপগোত্রীয়, জীহবের শিষ্য, কালিকাতক, ব্রাহ্মণপ্রতিপালক, ধার্মিকাগ্রগণ্য। তট বধন গুহ শব উচ্চারণ করিলেন, তখন ভূপতির সভাগণ হস্ত করিয়াছিলেন।

৪...এই সত্বগুণবিশিষ্ট কালিদাস...মিত্রবংশে প্রকাশ-
মান। ইনি চন্দ্রবংশোদ্ভব, বৈষ্ণবগ্রগণ্য, রথিশ্রেষ্ঠ, ছান-
ডের শিষ্য, বিখ্যাতগোত্রীয়, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ। ইহার
কুলদেবী আত্মা প্রকৃতি।

৫...এই পুরুষোত্তম...অগ্নিদত্তের কুলোদ্ভব...ইনি সৈক-
সেনার বংশধর, মহাশৈব, সমস্ত রথিগণের অধিপতি,
মৌলগ্যগোত্রীয়, শত্রুবিং ও শাস্ত্রজ্ঞ, মহাবীর ও বলবান।
মহাদেব ইহার কুলদেবতা। (১৪)

(১৪) "হুতুতানিত্যধর এষ কৃতী কিত্তিদেবদাম্বুজানুরতিঃ।
মকরজ ইতি প্রতিভাতি যতি বিজ্ঞান্যকুলোদ্ভবতটপতিঃ।
স চ বোমকুলানুরক্তাভ্যুতঃ প্রথিতেন্দ্রিয়ঃ সুরলোকবশঃ।
সততং হৃদযী হমতিত হৃদীঃ শরদ্বিনুপনোহুধিকুলবশাঃ।
স সৌকানীনগোত্রজঃ শৈব এষ
তদগোত্রে দেবতা কালিকা দেবপুত্রা।
ঐতটপতিঃ মহাত্মিকাগ্রা হৃদ্যক্ষজধরঃ ইহাপি শূরাগ্রগণাঃ।
বহুবাধিপত্যকবর্ণিতো বহুভূলা বহুংশোদ্ভবাঃ।
বহুবাধিভিত্তা গুণার্ণবৈঃ নিরতঃ তেজস্বিনো ভবন্ত নঃ।
দশরথো বিদিতো অগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশশিখাঃ জরিনাং বশসা জরী বিজয়তে বৈষ্ণবকুলসাগরে।
স চ চৈকাকুলানুরক্তসৌমসঃ গৌতমগোত্রজঃ ঐ।
দক্ষশিখো মহাজ্ঞা জ্ঞানী ধার্মিকো মতি নির্মলাস্য।
মহাত্মিকো বীরবর্ষাগ্রগণ্যভিমানী
অরমদ্বিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্।
কুলানুরক্তো মধুরভো বিবিধগুণাপুঞ্জাধিতঃ
বিরাটপুরুষঃ সমঃ বিরাটভিধানো পরীমান্।
স্তূতাপনো মহাবাহুঃ কান্তপগোত্রসভবঃ।
স জীহবশিষ্যঃ কালিকারাক্ত ভক্তঃ
সদা বিজাগিপালকো ধার্মিকাগ্রগণ্যঃ
নিশমা ভট্টেন গুহঃ প্রভাবিতঃ
নৃপালসভ্যৈরতি হস্তমাজিতঃ।
বশবিনাং বংশধরঃ সদা হি সর্বসামরঃ
প্রমত্তপদ্বানরঃ শরৎস্থানগুবদ্ববণঃ
প্রভাপ্রভাপনোৎপত্তদ্বিবাণিবোবিদ্যালিকো
বিভাতি মিত্রবংশসিদ্ধকালিকাবাসচন্দ্রকঃ।

এবানক কায়স্থদিগকে শূত্রের পরিকর্ত্তে প্রাধান্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে প্রথম চারিজন চারিজনব্রাহ্মণের শিষ্য।

এবানক প্রায় দুইশত বর্ষের পূর্বে বর্তমান ছিলেন, বলজ ও দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ঘটককারিকা সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে লিখিত। সুতরাং তিনখানি গ্রন্থই আধুনিক হইতেছে। যখন পরস্পর তিনখানি অনৈক্য, তখন কোনখানির উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না। তবে মূল কথা, সেই পাঁচজন কায়স্থ যে পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে হৃদ্যক্ষজ, সকসেনা, অষ্ট প্রভৃতি কায়স্থ বিদ্যমান, এরূপ হলে, এবানক যে মকরনকে হৃদ্যক্ষজ, পুরুষোত্তমকে সৈকসেনকায়স্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অসম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ হৃদ্যক্ষজ, সৈকসেন প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলীয় কায়স্থগণ অন্যাপি বজ্রহুত ও সংস্কার-সম্পন্ন হওয়ায় তাহারা যেমন ক্ষত্রিয়ের অন্ততম শাখা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন * ; ঐ পঞ্চকায়স্থ সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের অন্ততম শাখা বলিয়াই মহারাজ আদিশূরের নিকট সমাদর-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শূত্র হইলে এমন আদৃত হইতেন না। যে কায়স্থ যে ব্রাহ্মণের শিষ্য, তিনি তাহারই দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ হলে 'দাস' শব্দ শূত্রবাচী নহে +। কায়স্থ চিরকালই ব্রাহ্মণের তক্ত। "দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ অতিথীনাঞ্চ সেবকঃ" ধর্মশাস্ত্রে এইরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম নির্দিষ্ট আছে। অতএব কায়স্থ ভক্তিতাবে 'ব্রাহ্মণদাস' বলিয়া পরিচয় দিলে তাঁহার উন্নত স্বভাব ব্যতীত নিকৃষ্টজাতিত্ব প্রকাশ পায় না।

এবানকমিশ্র লিখিয়াছেন—

"গজান্বনরযানেষু প্রাধানা অভিসংস্থিতাঃ।

স চ বৈষ্ণবপ্রধানঃ রথিনাং বরোহরহ্।
হান্দকৃত শিখ্যো বিখ্যাতগোত্রশাস্ত্রজঃ জ্ঞানীঃ স্বধীরশ্চ প্রাজ্ঞঃ।
আত্মপ্রকৃতিত্ব কুলদেবী তক্ত।
অরক পুরুষোত্তমঃ অগ্নিগুপ্ত কুলোদ্ভবঃ।
হুতবংশধীপকঃ সর্ববিদ্যাবিহারকঃ।
মহাকৃতিঃ মহামানী চ কুলভূষণগণ্যকঃ।
স আগত বজ্রবেশে সর্কেবাং রক্ষণার চ।
স চ সৈকসেনাদধরো শৈববরঃ রথিনাঞ্চ রথী স মৌলগ্যগোত্রঃ।
শত্রুজঃ শাস্ত্রজঃ ভাহরশ্চ বলী পিপাকপাণিঃ কুলদেবতা চ।"

ব্রাহ্মকারিকা।

* Census Report of British India, for 1881, Vol. III. p. XCIX.

+ ব্রাহ্মণও নিজ গুরুর নিকট তাঁহার দাসস্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিতে অভিমান করেন না।

গোবান্দ্যারোহিণো বিপ্রাঃ পণ্ডিতবেশনমযিতাঃ।

খলুচন্দ্রাদিত্যবৃত্তাঃ পুত্রদারাদিত্যিঃ সহ ॥”

প্রধানগণ (কায়স্থগণ) গজ, অশ্ব ও শিবিকার এবং ব্রাহ্মণগণ পুত্রদারাদিত্য খলুচন্দ্রাদিত্য-পরিবৃত্ত হইয়া বীরবেশে আসিয়াছিলেন। (১৫)

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কায়স্থেরা কিসের জন্ত বঙ্গদেশে আসিয়া ছিলেন? কোন কোন কারিকায় লিখিত আছে, কায়স্থগণ আশিশুরের যজ্ঞ দেখিতে আসিয়া-ছিলেন। মিত্রকারিকার মতে, বীরসিংহ এই পাঁচজন প্রধানকে (কায়স্থকে) পাঠাইয়া ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, কায়স্থগণ যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্ত আসিয়াছিলেন, কারণ শাস্ত্রেই আছে—

“নাব্রহ্ম ক্ষত্রমুপ্যোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্জতে।

ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুদ্য বর্জতে ॥” মনু ৯। ৩২২।

‘ব্রাহ্মণরহিতক্ষত্রিয়ো বৃদ্ধিঃ ন যাতি শাস্তিকপৌষ্টিক-ব্যবহারেক্ষণাদিধর্মবিরহাৎ। এবং ক্ষত্রিয়রহিতোহপি ব্রাহ্মণো ন বর্জতে রক্ষাং বিনা যাগাদিকর্মান্নাপ্ততেঃ।” কুল্লুক।

ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণও কখন বৃদ্ধিলাভ করেন না। কারণ ব্রাহ্মণ না থাকিলে শাস্তিক, পৌষ্টিক ও দণ্ডনীতি প্রভৃতি ধর্মের অভাব হয় এবং ক্ষত্রিয় না থাকিলে রক্ষা বিনা যাগ-যজ্ঞাদি কার্য সুসম্পন্ন হয় না। তবে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব একত্র মিলিত হইলেই ইহঁদের উভয় লোকেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণের সহিত যে কায়স্থ আসিয়াছিল, ইহা ধর্মশাস্ত্র-প্রণোদিত।

প্রাচীন ইতিহাস অথবা প্রাচীন কারিকা অভাবে কেবল আধুনিক (ছই তিন শতবর্ষের) কুলাচাৰ্য্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যে কেবল যজ্ঞোদ্দেশে এখানে আসিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা যায় না। যদি যজ্ঞই করিতে আসিবেন, তবে পুত্রদারাদি সঙ্গে আনিবার প্রয়োজন কি? এবং বীরবেশে আসিবারই বা কারণ কি? বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের গোড়াগমন সম্বন্ধে কোন রাজকীয় গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য কি?

‘গুরুজনকথাচরিত্র’ ও প্রাচীন আসাম বুরঞ্জীপাঠে জানা যায়, যে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে (বর্তমান কোচবিহারের অন্তর্গত) কামতাপুর নামক স্থানে চূর্ণভনারায়ণ নামে এক-

জন রাজা ছিলেন। [কামতাপুর দেখ।] গৌড়েশ্বর তাঁহার সহিত বহুতাহাপন করিয়া তাঁহার রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্ত ৭ জন ব্রাহ্মণ ও ৭ জন কায়স্থকে কামরূপে পাঠাইয়া দেন, এই ৭ জন ব্রাহ্মণের নাম—কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর, লোহার, বরান, ধর্ম ও মধুর এবং ৭ জন কায়স্থের নাম—হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর। কামরূপরাজ তাঁহাদের ‘বারভূঁয়া’ উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থ চণ্ডীবর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বীরত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি “শিরোমণি-ভূঁয়া” উপাধিলাভ করেন। তিনি দেবীপূজক ছিলেন এবং “দেবীদাস” বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেন।

আসামবুরঞ্জী লেখকেরা অনুমান করেন, যে তাঁহার গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন *।

দেবীপূজক চণ্ডীবরের বীরগাথা কামরূপের ঘরে ঘরে প্রসিদ্ধ। তিনি ছইবার ভোটনরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া-ছিলেন। চণ্ডীবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজধর ১২৫০ শকে শিরোমণি ভূঁয়া হন। বিখ্যাত শঙ্করদেব এই রাজধরের পৌত্র। বড়ো যেমন বৈষ্ণবেরা চৈতন্ত দেবের পূজা করেন, কামরূপেও বৈষ্ণবগণ সেইরূপ শঙ্করদেবকে ততোধিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই শঙ্করদেবই সর্বপ্রথম আসামী ভাষায় বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচার করেন। বাঙ্গালার যেমন গৌরান্দেব, কামরূপে তেমন শঙ্করদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্তিত হন।

কোচবিহারাধিপ নরনারায়ণের সভায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ অবস্থান করিতেন †। অনেকেই তাঁহাকে ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন ‡। বোধ হয় রাজা চূর্ণভনারায়ণের সময়ে যে ৭ জন ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের কাহারও উত্তর-পুরুষ হইবেন।

কামরূপে যে কারণে ব্রাহ্মণকায়স্থ গিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। আমাদের বোধ হয়, কামরূপের স্থায় ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ গৌড়ের সুশৃঙ্খলা-স্থাপনের নিমিত্ত এবং রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্ত রাজনৈতিক কর্মচারী (Political Officer)-রূপে কনোজরাজ অথবা

* শুণাভিরাম বড়ুয়ার আসামবুরঞ্জী ৫৬ পৃষ্ঠা। [বিষকোষে কামরূপ পৃষ্ঠা ৫২৩ পৃষ্ঠা দেখ।]

† বিষকোষ ও ভাগ ৫২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ Sir Rája Saurindra Mohan Tagore's Kavirashya, Preface.

(১৫) “গোবান্দ্যনগতাঃ বিপ্রাঃ অশ্বে বোবাদিকল্পয়ঃ।

পদে যজ্ঞঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ নরবালে ভবঃ স্থপীঃ।”

দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ঘটককারিকা।

জরাজীর্ণ কর্তৃক গোড়ের রাজসভার প্রেরিত হইয়াছিলেন। গোড়ে সমাগত আদি ব্রাহ্মণদিগের উত্তরপুরুষ ধর্ম্মাধিকারী হলান্দ, মন্ত্রী পণ্ডিত, কারুহপ্রবর সাক্ষিবিশিষ্ট মারায়ণ দত্ত প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালী মনোযোগপূর্ব্বক পর্যালোচনা করিলে, উত্থাপিত যুক্তি অনেকটা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ঘটককারিকামতে, পঞ্চ কারুহের আগমনের পর আদি-শূরের সময়ে তাঁহাদের দার পুত্রাদি এবং নাগ, নাথ ও দাস এই তিন জন কারুহ (দারাদিসহ) আসিয়াছিলেন।

সেনরাজগণ।—ইতিপূর্বে আদিশূরের সময় নিরুপণ এসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ বল্লালসেনদেব ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর প্রণয়ন করেন। কিন্তু ৮ রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি পুরাবিদগণ সময়প্রকাশের ভ্রমাত্মক পাঠের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে “১০৯১ শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচিত হয় (১)” এবং তদনুসারে তাঁহারা ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালের অভিষেককাল অবধারণ করিয়াছেন (২)।

দানসাগরে লিখিত আছে—

“অত্র সংসারাদি-সময়-বিশেষ-পরিণামেন দানসাগরস্ত নির্মাণ-কালতৈব সংসারমুদ্রাপ্রতিপাদনার লিখ্যতে।

নিখিলচক্রতিলকশ্রীমদ্ বল্লালসেনেন পূর্বে।

শশি-নব-দশ-মিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ ॥

রবিশগণাঃ শরশিষ্টা যে ভূতা দানসাগরস্তাত।

ক্রমশোহত্র সংপরাধানুদ্যাতা বৎসরাঃ পঞ্চ।

তদেবমেকনবতাদিকবর্ষসহস্রারহমিতি শাকে।

সংসারঃ পতন্তি বিষণ্ণদারস্তা চ।

সংসারপরিবৎসরইদাবৎসরউৎসরঃ ॥”

(দানসাগর হস্তলিপি ২২০ পত্র-১ পৃঃ)

চক্রবর্তী রাজাদিগের প্রের্ত শ্রীমদ্বল্লালসেন কর্তৃক ১০৯১ শকবর্ষে দানসাগর রচিত হয়। রবিশগণকে ৫ দিরা ভাগ করিলে ষাট অবশিষ্ট থাকিলে, তাহাতেই সংসারাদি বর্ষ জ্ঞান হইবে; সুতরাং এই নিয়মানুসারে দানসাগরের রচনা সময়ে ‘সংসার’ নামক বর্ষ লাভ হইবে অর্থাৎ যে সময়ে দানসাগর রচিত হইয়াছিল, সেই বৎসর ‘সংসার’ বর্ষ হইয়াছিল।

(১) “নিখিল চক্রতিলকশ্রীমদ্বল্লালসেনদেবেন পূর্বে নবশশিধর্ম্মমিতে শকাবে দানসাগরো রচিতঃ।” ৮ রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বৃত্ত সময়প্রকাশ। কিন্তু আমরা যে সময়প্রকাশ দেখিয়াছি, তাহাতে “পূর্বে শশিনব-দশমিতে শকাবে” এইরূপ একত পাঠ আছে।

(২) তাঁহাদের মতে, “আবুলফজলের মতানুসারে বল্লালের রাজ্যারম্ভ ১০৬৬ খৃঃ অব্দ।” কিন্তু আবুলফজল আইন-জুব্বারী কোথায় বল্লাল-সেনের সময় নিরূপণ করেন নাই। তাঁহার মতে, গোড়দুর্গদ্বাপতিজা বরাদ ৫০ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। (See H. S. Jarrett's Ain i Akbari, Vol. II, p. 146.)

পূর্ব্বোক্ত চুক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। “যথা—‘অত্র সংসারাদিসময়বিশেষপরিণামেন দানসাগরস্ত নির্মাণকালতৈব সংসারমুদ্রাপ্রতিপাদনার লিখ্যতে’—

(তেন) রবিশগণাঃ—১০৪১ শকে

১০৫৬৮৪২৭০, ইহাকে ৫ দিরা ভাগ করিলে অবশিষ্ট “০” শূন্য থাকে। ইহাতে সংসার নামক বর্ষই হইবে কারণ অতীত বিবরণই অবশিষ্ট থাকিবে।

দানসাগরের উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, ঐ গ্রন্থ বল্লালসেন কর্তৃক ১০৯১ শকে রচিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে বল্লালসেনদেব নিজে যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন তাহাই মুখ্য ও সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য এবং অপরাপর প্রমাণ কল্পিত বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত।

দেবীসর, বাচস্পতি, ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণের মতে, বল্লালসেন অষ্টকুলজাত মিত্রসেনের পুত্র। আবার কেহ আদিশূরের পুত্র, কেহ বিশ্বক্সেনের পুত্র, কেহ শুক-সেনের পুত্র, কেহ ব্রহ্মপুত্রনদের পুত্র, আবার কেহ তাঁহাকে জারজ বৈদ্যরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* যে বাহাই বলুন, এই আধুনিক কুলাচার্য্যকারিকাসমূহ অথবা একদেবী অভিনব জনপ্রবাদ এককালে অগ্রাহ্য করাই কর্তব্য। এরূপ স্থলে সেনরাজগণের সাময়িক গ্রন্থ, শিলালিপি ও তাঁহাদের প্রদত্ত শাসনপত্রের উপরই একমাত্র বিশ্বাস করিতে হইবে।

দানসাগরে বল্লাল বিজয়সেনের পুত্র ও হেমন্তসেনের পৌত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন (৩) এবং প্রায় শতাব্দিকবার “নিঃশঙ্কদর গোড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লালসেনদেব” এই নামে আখ্যাত হইয়াছেন (৪)।

* বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট হইতে প্রকাশিত রিসলিমাংহেব-রচিত “বঙ্গ ও বেহারের জাতিতত্ত্ব” গ্রন্থে বল্লাল প্রভৃতি সেনারাজগণকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। (See H. H. Rishley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, p. 47) কিন্তু সেনরাজগণ যথ্য তাত্ত্বশাসনে ‘চন্দ্রবংশীয়’ ব্রহ্ম-কজির বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং রিসলিমাংহেবের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। (Journ. As. Soc. Bengal, 1866, pt. p. I. 143-154 দেখ।)

(৩) “হেমন্তঃ পরিগৃহিৎকল্পসঃ সর্গস্য নৈনর্গিষ্টক-

কল্যাতঃ বর্ণগৈরুদ্যান্তমহিবা হেমন্তসেনোহমনি।

তদনু বিজয়সেনো আশ্রয়ানীঘরেপ্রো

দিশিবিদিশি তজ্জন্তে বদ্য বীরবৃজস্ব ১...

দৈত্যোত্তাপভূতানকাদম্বজনঃ সর্কোত্তরঃ স্মৃতাভ্যঃ

শ্রীবল্লালমুপ্ততো হস্তনি শুণাবিভাবসৌভেবরঃ ॥”

দানসাগর (পৃষ্ঠা ১)।

(৪) তৎপুত্র লক্ষণসেনবৈভব লক্ষণপুত্র কেশবসেনবৈভব ও যথ্য প্রদত্ত তাত্ত্বশাসনে ‘শঙ্করগোড়েশ্বর’ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

কাজিরবংশসম্বৃত ছিলেন। আইন অকুবরী মতে, বল্লালসেন ৫০ বর্ষ রাজত্ব করেন। দানসাগরের উপসংহারপাঠে বোধ হয়, বল্লাল শেখারসার সংসারান্ত্রম হইতে দূরে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব দানসাগরের রচনাকালই যদি তাঁহার রাজত্বকালের শেষ অবধি হয়। লওয়া যায়, তাহা হইলে আইন-অকুবরীর মতে (১০৯১ হইতে ৫০ বাদে) ১০৪১ শকে (১১১৯ খৃঃ) তাঁহার অভিষেক হয় এবং ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেব পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ তাঁহার রচিত ব্রাহ্মণসংস্করণে পরিচয় দিয়াছেন—“শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবনুপতি তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনারম্ভে মন্ত্রী পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার প্রদান করেন।” (ব্রাহ্মণ-সংস্করণ ১।১২২)।

লক্ষ্মণসেনের প্রিয়পাত্র বটুদাস মহাসামন্তের পুত্র মহা-মাণ্ডলিক শ্রীধরদাস তথ্যচিত্রিত হস্তিকর্ণামৃতের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

“শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতাপেতদশশতে শরদাম্।

শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনকিত্তিপত্র রসকবিশিষ্টে * ॥

সবিতুর্গত্যা ফাক্তনবিশেষ্য পুরার্থহেতাবকুতুকাৎ।

শ্রীধরদাসেনদং হস্তিকর্ণামৃতং চক্রে ॥”

হস্তিকর্ণামৃত ৫ম প্রবাহ।

১১২৭ শকে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনরাজের ৩৭ বর্ষে ফাক্তনবিশেষ্যের বিংশতি দিবসে শ্রীধরদাস হস্তিকর্ণামৃত রচনা করেন।

ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেনদেব ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করেন। হস্তিকর্ণামৃতপাঠে জানা বাইতেছে, যে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের ৩৭ বর্ষ রাজত্ব চলিতেছে।

হলায়ুধের ব্রাহ্মণসংস্করণের অনুবর্তী হইলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, রাজা লক্ষ্মণসেন বহুদিন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন, যে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বখতিয়ার লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ অধিকার করেন। (৯) তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস

* ৮ রাজেন্দ্রলাল সঙ্কটিকর্ণামৃতের যে হস্তলিপি দেখিয়াছেন, তাহাতে “শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনকিত্তিপত্র রসকবিশিষ্টে” এইরূপ পাঠ আছে।

Notices of Sanskrit Mus. Vol. III. p. 14.

(৯) তবকাৎ-ই-নাসিরির ইংরাজী অনুবাদক মেজর রেভার্ট সাহেবের মতে, বখতিয়ার ৫০০ হিজরী অর্থাৎ ১১০৪ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করেন (Raverty's Tabakat-i-Nāsiri, p. 550a). বুকম্যান সাহেবের

লেখক মিন্‌হাজুদ্দীন লিখিয়াছেন, “বখতিয়ারের সমস্ত সৈন্য আসিয়া পৌছিল, (নদীরা) নগরের চারিপার্শ্ব অবিকৃত হইল;—রায় লখ্মণিয়া সকনাট (সমুদ্র ?) ও বঙ্গভিমুখে পলায়ন করেন। তথার অতি অল্পকালই রাজত্ব করিয়াছিলেন।” (১০)

মতে ১২০০ খৃষ্টাব্দে (Blochmann's Contribution to the Geography and History of Bengal, in J. A. S. B. 1873, pt. I. p. 211). উইলফোর্ড সাহেবের মতে ১২০৭ খৃষ্টাব্দে (Asiatic Researches, Vol. IV. p. 203) এবং টমাস সাহেবের মতে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত ঘটনা হইয়াছে। (Thomas, Initial Coinage of Bengal). শেবোক্ত মত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল।

(১০) Raverty's Tabakat-i-Nāsiri, p. 558. মিন্‌হাজের মতে—রায় লখ্মণিয়া ৮০ বর্ষ রাজত্ব করেন এবং তাঁহার সুদীর্ঘ রাজ্যকাল সম্বন্ধে তিনি এক অস্বুত গল্প লিখিয়াছেন, তাহা এই—‘লখ্মণিয়া যখন মাতৃ-গর্ভে, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিলেন যে, এখন সম্ভাব্য ভূমিষ্ট হইলে নিত্যন্ত হতভাগ্য হইবে, আর দুই বর্ষটা পরে যদি সম্ভাব্য জন্মে, তাহা হইলে তিনি ৮০ বর্ষ জীবিত থাকিয়া রাজত্ব ধারণ করিবেন। এই কথা শুনিয়া রাজমাতা আদেশ করিলেন—‘বতকণ না শুভলগ্ন হয়, ততক্ষণ আমার পা দুইটি উপরদিকে বাধিয়া থুলাইয়া রাখ।’ আদেশ প্রতিপালিত হইল। তাহার দুই বর্ষটা পরে রায় লখ্মণিয়া ভূমিষ্ট হইলেন। রাজমাতা সেই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। অমাত্যবর্গ শিশু লখ্মণিয়াকে রাজা করিলেন।”

(Tabakat-i-Nāsiri, p. 555.)

মিন্‌হাজ, এই গল্পট বখতিয়ার কর্তৃক নদীরা বিজয়ের প্রায় ৫৫ বৎসর পরে একজন মুসলমানের নিকট লক্ষ্মণাবতী (গোড়) নগরে জ্ঞাপন করেন। এরূপ হলে এই উপাখ্যানটি কতদূর সত্য?—সম্ভবতঃ আনুগোবি বলিয়া বোধ হয়।

৮ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন পুরাবিদ ঐ লখ্মণিয়াকে ‘লক্ষ্মণের’ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে, বখতিয়ারের সম-সাময়িক রায় লক্ষ্মণেরের অপর নাম অশোকসেন (চন্দ্র), তিনি লক্ষ্মণ-সেনের পৌত্র। (Mitra's Indo-Aryans, Vol. II. p. 251.)

আবার কেহ লিখিয়াছেন, “বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনদেবের ৫৩ বৎসর অন্তে অর্থাৎ ১০৮১ শকাব্দে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) আমরা অশোকচন্দ্র দেবকে গোড়ের রাজ্যসনে দেখিতে পাই।... অশোকচন্দ্রের পর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন।” (সেনরাজগণ ৬৮ পৃঃ)

উপরোক্ত উভয় মতই সমীচীন বোধ হইল না। ১ম, লখ্মণিয়া হইতে লাক্ষ্মণের শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে না। লাক্ষ্মণের পরিবর্তে পশ্চিমাকলেসহমল, লহমণিয়া ও লখ্মণিয়া নাম সচরাচর চলিত। মিন্‌হাজ পশ্চিমাকলের লোক। তিনি ‘লখ্মণিয়া’ শব্দে লক্ষ্মণসেনেরই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২য়, বুদ্ধগম্ভাহ বোদ্ধমণির হইতে অশোকচন্দ্রদেবের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি গোড়ের বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

তৎকালে নদীরা হইতে লক্ষণাবতী পর্যন্ত তুখণ্ড মুসলমানের করালকবলে পতিত হইরাছিল বটে, কিন্তু মিন্‌হাজুদ্দীন ঐ ঘটনার ৫৫ বর্ষ পরে লিখিয়াছেন, “অদ্যাপি বঙ্গে লক্ষ্মণিয়ার বংশধরগণ (স্বাধীন ভাবে) রাজত্ব করিতেছেন।” (১১)

বাস্তবিক লক্ষণসেনের পর তৎপুত্র মাধবসেন কিছুকাল পূর্ববঙ্গে ও সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আইন-অকবরীর মতে, ইনি ১০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেশবসেনকে রাজ্যভার দিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তীর্থযাত্রায় অতিবাহিত করেন। তিনি বালককাল হইতেই দেবী সরস্বতীর প্রসাদে কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন (১২)। সম্ভবতঃ তিনি কেদারনাথে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অদ্যাপি হিমালয়ের তুষারাবৃত কুমায়ূনের আলমোরা-নগরের অনতিদূরবর্তী ‘যোগেশ্বর’ মন্দির-গাত্রে শিলালিপি দ্বারা মাধবসেনের কীর্তি বিঘোষিত হইতেছে (১৩)। কেবল মাধবসেনই যে হিমালয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন, এমন নহে, তাঁহার সহিত স্নেহপ্রাপীড়িত ব্রাহ্মণগণও গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণবংশীয় কুদ্রশর্মার নাম কেদারভূমির বালেশ্বরমন্দিরমধ্যস্থ তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ রহিয়াছে (১৪)।

লক্ষণসেনের কনিষ্ঠ পুত্র কেশবসেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনে তিনি ‘শঙ্করগোড়েশ্বর’ নামে আপনার ও পূর্বপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি স্বাধীনভাবে অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তিনি কোন হানের রাজা ছিলেন অথবা সেনরাজগণ সহিত কোন সংশ্রব ছিল কি না, শিলালিপি পাঠে কিছুমাত্র জানা যায় না। ঐ শিলালিপির শেষে “ইতি শ্রীমল্লগঙ্গসেনদেবগঙ্গানামতীতরাজ্যে” এই মাত্র বোধিত থাকার কেবল অনুমান দ্বারা তাঁহাকে লক্ষণসেনবংশীয় বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ অশোকচন্দ্রের শিলালিপির অন্তে যে সময় লিখিত হইরাছে; তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট। ইত্যাদি কারণে ঐ শিলালিপি দ্বারা কোন ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করবার উপায় নাই। হতরাং অশোকচন্দ্রকে সেনবংশীয় গোড়েশ্বর অথবা তাঁহার অপর নাম ‘লক্ষ্মণেশ্বর’ বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

৩য়, দ্বিতীয় লক্ষণসেনের প্রমাণাত্মক। প্রথমতঃ যখন দেখা যাইতেছে, বঙ্গালপুত্র লক্ষণসেন ১১২৭ শকে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং ঐ সময়ে বখতিয়ার দ্বারা আক্রমণ করেন। তখন দ্বিতীয় লক্ষণসেনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত।

(১১) Raverty's Tabakat-i-Nâsiri, p. 558.

(১২) মহাভারতকালীন পুত্রকীর্ত্তি-ভাষ্যে পরিচয় দিয়াছেন।

(১৩) E. Atkinson's Himalayan District, p. 492.

(১৪) ১১৪৪ শকে কামরূপের কব্জক এই তাম্রশাসন প্রস্তুত হয়।

তাম্রশাসনে কুদ্রশর্মার পূর্বপুরুষ ভট্টনারায়ণকে ‘বল্লভ ব্রাহ্মণ’ বলা হইরাছে। (See E. Atkinson's Kamaon, p. 516.)

কেশবসেনের পর আর সেনবংশীয় রাজগণের নাম আত্মশাসনে অথবা তৎসাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

আইন-অকবরীর মতে, কেশবসেনের পর লবাসেন বা সুরসেন (১৮ বর্ষ), তৎপরে রাজা সোজা বা নারায়ণ (৩ বর্ষ) রাজত্ব করেন। মিন্‌হাজের তবকাৎ-ই-নাসিরিপাঠে জানা যায় যে, ১২৬০ খৃষ্টাব্দেও সেনবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন (১৫)।

এখানে কায়স্থকুলবিধাতা বঙ্গালের বংশাবলী ও তাঁহাদের অভিষেককালপ্রদর্শনার্থ একটি তালিকা দেওয়া হইল *।

বিজয়সেন

বঙ্গালসেন (১১১৯ খৃঃ অঃ)

লক্ষণসেন (১১৬৯ খৃঃ অঃ)

মাধবসেন (১২০৬ খৃঃ অঃ) কেশবসেন (১২১৬ খৃঃ অঃ)

(৭) সুরসেন (১২৩১ খৃঃ অঃ)

(৭) নারায়ণ (১২৪৯ খৃঃ অঃ)

বঙ্গালকৃত শ্রেণীবিভাগ।—বঙ্গালসেনের সময়ে কায়স্থগণ বঙ্গ, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে বঙ্গে মকরন্দখোববংশীয় চতুর্ভূজ, দশরথবল্লভবংশীয় লক্ষণ ও পুষ্পবল্লভ, বিরাটগুহের উত্তরপুরুষ দশরথগুহ ও কালিদাস মিত্রের উত্তরপুরুষ তারাপতি মিত্রকে বঙ্গালসেন মুখ্য কুলীন বলিয়া নির্বাচন করেন।

তৎকালে দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত (১৬), নাগবংশীয় দশরথ নাগ, নাথবংশীয় মহানন্দ নাথ এই তিন জন “মহালা” হইলেন।

দাসবংশীয় চন্দ্রশেখর দাস, সেনবংশজাত গঙ্গাধর সেন, করবংশীয় দামোদর কর, দামবংশীয় উষাপতি, পালিত বংশীয় জন, চন্দ্রবংশোদ্ভব নারায়ণ, পালবংশীয় আবপাল, রাহাবংশীয় কুম্ভরাহা, ভদ্রবংশীয় সিংহবীর ভদ্র, ধরবংশীয় ব্যাসধর, নন্দীবংশীয় প্রভাকর নন্দী, দেববংশীয় কেশবদেব, কুণ্ডবংশীয় অধিপতি কুণ্ড, সোমবংশীয় বংশধরসোম, সিংহবংশীয়

(১৫) Journ. As. Soc. Bengal, Vol. XLII. pt. I. p. 312.

* বঙ্গদেশের কায়স্থজাতির সহিত সেনরাজগণের বিশেষ সংশ্রব ছিল। বঙ্গীয় কায়স্থের পূর্বতত্ত্ব জানিতে হইলে এখন সেনরাজগণের সময় নিরূপণ করা উচিত বোধে সেনরাজগণের প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করিয়া লিখিত হইল।

(১৬) ইনি মহারাজ লক্ষণসেনের মহাসামন্তিপ্রাপ্ত ছিলেন। লক্ষণসেনের তাম্রশাসনে ইঁহার নাম কীর্ত্তিত হইরাছে। করিমপুর অফিস ইঁহার বংশীয়গণ “অর্জুনকুল” বলিয়া পরিচিত। তাঁহার্য্য সৌপল্যগোত্রজ। দক্ষিণরাঢ়ে ভরবাংসোদ্ভাবিত বংশধরের বাস। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককাকিয়ার ঐ ভরবাংসোদ্ভাবিত বংশধরকে পুরুষোত্তমের বংশধর বলিয়া নির্দেশ হইরাছে।

রত্নাকরসিংহ, রক্ষিতবংশীয় নারায়ণরক্ষিত, অজয়বংশীয় বেদগর্ভ, বিষ্ণুবংশীয় দৈত্যারি বিষ্ণু, আদ্যবংশীয় জিলোচন আদ্য, নন্দবংশীয় উষাপতি নন্দন এই ২০ জন বজ্রালসেন কর্তৃক “মহাপাণ্ডু” নামে আখ্যাত হইলেন (১৭)।

দক্ষিণরাষ্ট্রীয়।—ঘোষবংশীয় প্রভাকর ও নিশাপতি, বহুবংশীয় শুক্তি ও মুক্তি, মিত্রবংশীয় ধুই ও শুই, এই ছয়জন প্রকৃত মুখ্য পদাভিষিক্ত হইয়া রাজসভায় বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। [কুলীন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বজ্রাল ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন কারিকদিগকে যেরূপ মেল-বন্ধ করিয়া যান, কয়েক পুরুষ পরে তাহার বিশৃঙ্খলা ঘটয়াছিল। সেই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য রাজা দম্বজমর্দন রায় বজ্রাল-নির্দারিত প্রধার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া কারিকদিগকে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

বরগুরুত তারিখ-ই-কিরোজশাহী নামক পারস্য ইতিহাস পাঠে জানা যায়—এই দম্বজরায় সুবর্ণগ্রামে একজন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সুলতান বলবন্ যৎকালে বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মুঘিযুদ্দীন তুঘলকে দমন করিবার জন্য সসৈন্তে জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিযুগে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে (১২৮০ খৃঃ) দম্বজরায় সত্রাটিকে বধেষ্ঠ সাহায্য করিয়া-ছিলেন। ইনি তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ জলযোদ্ধা (১৮) ছিলেন। এই দম্বজরায় অবশেষে উক্ত্যক্ত হইয়া চন্দ্রবীপে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন এবং “সমাজপতি” উপাধি গ্রহণ করিয়া এইরূপ কৌলীন্য মর্যাদা স্থাপন করেন।

(১৭) “বহুবংশে মুখো বো নান্না লক্ষণপুংগো।

বোষে চ সমাখ্যাততুতু জমহাকৃতঃ।

গুহে দশরথৈকব মিত্রে তারাপতিস্তথা।

দন্তে নারায়ণৈকব এতে চ বজ্রাঃ সূতাঃ।

নাগে দশরথৈকব মহানন্দক নাথকে।

চন্দ্রশেখরদাসন্ত সেকৈগজাধরস্তথা।

দামোদরকরঃ খ্যাতো দামন্তু ষাপতিস্তথা।

পালিতে জনসংজা স্যাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ।

পালে আধঃ সমাখ্যাতো রাহাংশে চ কৃষ্ণকঃ।

ভদ্রে দ্বিপথরথৈকব ধরে তু ব্যাসসংজকঃ।

প্রভাকরন্ত নন্দী স্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ।

অধিপতিরিতি খ্যাতঃ কুণ্ডবংশে একীর্ষিতঃ।

সোমে বংশধরথৈকব সিংহে রত্নাকরস্তথা।

নারায়ণঃ সমাখ্যাতো রক্ষিতে চ তথা পরে।

বেদগর্ভাভুয়ৈকব দৈত্যারিবিষ্ণু সংজকঃ।

আদ্যো জিলোচনঃ খ্যাতো নন্দসে চ উপাতিঃ।

দিগ্ভিষ্টা বজ্রা এতে বজ্রালেন মহাধন।”

বেদবীর।

(১৮) Tarikh-i-Firoz Shahi in The History of India as told by its own Historian, by H. M. Elliot, Vol. III. p. 116.

কুলীন।—ঘোষ, বহু, মিত্র *, শুই।

মধ্যা।—মৌক্যল্যাগোত্রীয় দন্ত, নাগ, নাথ ও দাস।

মহাপাণ্ড।—সেন, সিংহ, দেব, রাহা।

(নিয়)-মহাপাণ্ড।—ভর, দাস, পালিত, চন্দ্র, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, কুল, বিষ্ণু, আদ্য, নন্দন।

অচলা।—হোড়, স্বর, ধরনী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, শাল, ভগ্ন, বিলু, শুই, বল, শর্মা, বর্মা, ভূমিক, ছই, রত্ন, শুড়, আদিত্য, পীল, খিল, শুণ্ড, চাক্রি, বহু, শাক্রি, হেস, ‘সুমহু, গণ্ড, রাণা, রাহত, দাহক, দান, গণ, অপ, মান, ধাম, ক্ষেম, তোষক, বৈ, ঘর, দেব, ভূত, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সজ্জ, ক্ষমা, আশ, বর্ধন, হেম, বন্ধ, অজ, কীর্ষি, শীল, ধনু, গুণ, বশ, মনন, দাড়িক, চাকি, শ্রাম, পুঞ্জি, গণ্ড, নাদক, বোই, হোম, চাশক, ঢোল, দূত ইত্যাদি। মতা-স্তরে ৬৪ ঘর কারিক অচলা।

দম্বজরায়ের পর চন্দ্রবীপের বহুবংশীয় রাজগণ বরাবর ‘সমাজপতি’ ছিলেন। গুহবংশীয় রাজা প্রতাপাদিত্য ‘সমাজপতি’ হইবার জন্য চন্দ্রবীপপতি রায়চন্দ্রকে কস্তারান করিয়া বিবাহের রাজ্যে তাঁহাকে মারিবার জন্য বড় যত্ন করেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

চন্দ্রবীপের কারিকরাজগণের রাজত্বকালে বজ্রকায়স্থগণ প্রধানতঃ চারিসমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যথা—চন্দ্র-বীপ (শিরস্থান), যশোর (বাহুবংশ), বিক্রমপুর (উরুধর), কতেয়াবাদ (পাদম্বর)।

রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক যশোরসমাজ, বারভূঁয়ার অন্ততম চাঁদরায় ও কেদাররায় কর্তৃক বিক্রমপুরসমাজ এবং সুবিখ্যাত বীর মুকুলরায় কর্তৃক ভূষণ বা কতেয়া-বাদ সমাজ স্থাপিত হয়। এতদ্বির বাজু (ঢাকা ও ময়মন-সিংহ) সমাজ ছিল, এই সমাজ অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরি-পরিচিত হয়। [চন্দ্রবীপ, যশোর ও কুলীন শব্দ দেখ।]

রাষ্ট্রীয়।—রাষ্ট্রীয় কারিকেরা দুইভাগে বিভক্ত, দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও উত্তররাষ্ট্রীয়।

দক্ষিণরাষ্ট্রীয়—কুলাচাৰ্য্য কারিকামতে কৌলীন্যমর্যাদা প্রাপ্তির পর মকরন্দঘোষের উত্তরপুরুষ শুক্তি বাগাঙা সমাজে ও শুই টেকাসমাজে শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হন। তদ্বির বংশজগণের কয়েকটি সমাজ স্থাপিত হয়। যথা—

বংশজঘোষদিগের আমড়েঘর, দীর্খাল, করাতি, শেরাখালা, খনিয়া ও শাঁকরাণি।

* বজ্র মিত্র পুত্রহীন হওয়ার বহুকপুরুষ গ্রহণ করেন, তদনুযায়ী বহু মিত্রবংশের মূল বটে হইয়াছে।

বংশজ ব্রহ্মদিগের—নিমার্কা, শান্দুলী, চিত্রপুর, দীর্ঘাদ, গেরহরি ও পঞ্চমূলী।

বংশজমিথ্যদিগের—দাবড়াহুপি, চাঁদড়া, নীতিয়া, চাক-লাই, কুমারহাট ও কালিয়া।

উক্ত সমাজ গঠিত হইবার কয়েক শতবর্ষ পরে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এমন কি মুখ্যকুলীন কুলভঙ্গ করিয়া মৌলিকের কন্ডার সহিত কোষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে লাগিলেন (১)। পুনরায় হুনিয়ম স্থাপনের জন্ত দ্বিতীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে কুলতান হুসেনশাহের রাজস্বমন্ত্রী গোপীনাথ বসু (উপাধি পুরন্দর, ধী) একজাহ্নী করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ পুনর্বার নূতন ভাবে সংস্কার করেন। যথা—

কুলীন।—বোব, বসু, মিহ্র।

সিদ্ধমৌলিক।—দেব, দত্ত, কর পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ * এই আট ঘর।

সাধ্যমৌলিক।—ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র, গণ, ভজ, ভদ্র, নাগ, মন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিত্য, পাল, নাথ, বিদিত, ধনু, বাণ, গুণ, স্বর, তেজ, শক্তি, সাম, ধর, আইচ, অর্ণব, আশ, দানা, খিল, পীল, শীল, শান, রাজ, রাহুত, রাণা, শূর, কীর্তি, বল, বর্দ্ধন, অক্ষর, নন্দী, বিন্দু, বর্ম্মা, শর্ম্মা, হুই, গুই, গণ্ড, দাম, নাদ, লোধ, গুত, বই, গুপ্ত, বেদ, যশ, ভুই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই, ধরগী, হোড়, মান, হেশ, দণ্ডী, ক্ষোম, গুহ, ক্ষেম, খাম, ক্ষেম, খঞ্জ, বসু এই ৭২ ঘর।

উত্তররাঢ়ীয়।—পুরন্দর ধী কর্তৃক মেল বন্ধ হইবার পূর্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কয়েক ঘর উত্তররাঢ়ে গিয়া বাস করেন, তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় নামে প্রসিদ্ধ হন।

জেম্মাকান্দী, পাঁচধুবি, বাগডাঙ্গা, যজ্ঞান, ছাতনে-কান্দী প্রভৃতি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের সমাজ। সম্ভবতঃ রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

(১) তাঁহারা প্রথম কুলভঙ্গ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আদমরা বাঙ্গালার আদিকবি শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা মালাধরবহর (উপাধি গুণরাজ ধী) নাম গ্রাপ্ত হই, ইনি মুখ্য কুলীন হইলেও দত্তের কন্ডার সহিত আপনাতঃ কোষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেন। উজীর পুরন্দর ধী ইঁহাদের আত্মীয় ছিলেন।

* পুরন্দর ধীর সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে গুহবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, এই জন্ত বোব বহর তাঁহারা কুলীনমধ্যে পরিগণিত হন নাই। এইরূপ তৎকালে মৌল্যগোত্রজ দত্তের অভাবে তদ্রথাকোত্রীয় দত্ত 'সিদ্ধমৌলিক' আখ্যা গ্রাপ্ত হন।

উত্তররাঢ়ীয় কুলীন।—বোব, সিংহ।

সম্মৌলিক।—দাস, দত্ত, মিহ্র।

সামান্তমৌলিক।—দাস, বোব, কর, সিংহ।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের উক্ত ৯ ঘর মধ্যে দাস (১) ও কর (১) উভয়ে অর্দ্ধ ঘর মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে সাত ঘর গণিত হয়।

বারেন্দ্র।—বঙ্গালসেনের বহু পরে ভৃগুনন্দী, নরদাস ও মুরারি চাকী বারেন্দ্রসমাজের পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া সিদ্ধসাধ্যভাবে নূতনসমাজ স্থাপন করেন। তদনুসারে বারেন্দ্র কায়স্থেরা এইরূপে বিভক্ত হন।

সিদ্ধ বা কুলীন।—নন্দী, দাস, চাকী।

সাধ্য বা মৌলিক।—দত্ত, দেব, নাগ, সিংহ।

হেজ বা নিকুঠে—দাম, ধর, গুণ, কর। প্রথম সাত ঘরই শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা পরস্পর সাতঘরের মধ্যে পাইলে আর হেজ বা নিকুঠের সহিত আদান প্রদান করিতে চান না।

উক্ত সাতঘর যে যেখানে গিয়া বাস করেন, সেই স্থান বা সমাজের নামে পরিচিত হন। যথা—

দাসবংশ—বাঁকি, বগুড়া, হরিপুর, গুধির, নাগরা, ময়দানদীঘি, চৌপাকিয়া, পাবনা, মালঞ্চ, কেচুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঘরগ্রাম, মাণিকদিহি।

নন্দী—পোতাজিয়া, চিপুলিয়া, চণ্ডিপুর, সাধুখালি, দিলপসার, রহিমপুর, মুনিন্দহ, বেথুড়িয়া, করঞ্জ।

চাকী—চক্রবাস্ত, মৌরট, বাজুরস, সরিষা, সেকেন্দ্রপুর, নলমুড়া, গোবিন্দপুর, অষ্টমনিষা, মেদবাড়ী, মুরহর, দুর্লভপুর, ঢাকচৈর, রামদীঘা, দিলপসার, হেমরাজপুর, বাগুটিয়া, সিমুলিয়া, হেলঞ্চ, পানানগর, কুমারী, রঘুনাথপুর।

নাগ—শৌলকুপা, সরগ্রাম, রামনগর, কাঁটাপুকুর, পাথরাইল, মালঞ্চ, সিদ্ধা, গাঁড়াদহ, নন্দনকাঁদি, কতেউল্লাপুর, বুড়কা, শতইকাঁদি, গড়বড়া, উরদিঘরি, মেদবাড়ী, ডাঙ্গাপাড়া, আতালিয়া, সিমুলিয়া।

সিংহ—করতাজা, চৌয়া, উধুনিয়া।

দেব—কানগোণা, কাকদহ, হিড়িমদিয়া, চিহলিয়া, তাড়ওয়াস।

দত্ত—বটগ্রামী, কাউরাড়ি, রাধানগর, রূপাট, সেখুপুর।

বারেন্দ্র কায়স্থেরা বলেন, উক্ত সাতঘর ও সমাজ ভিন্ন অপর যে কায়স্থ বারেন্দ্রকূলে বাস করে, তাঁহারা বারেন্দ্রসমাজভুক্ত নহে।

গোত্র ও প্রবর।—বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও প্রবর প্রচলিত। যথা—

উপাধি	বোহ	এবর
বহ	গৌতম	গৌতম, অলার, আলিরস, বার্হপতা, নৈত্রব।
বোহ *	সৌকালীন	সৌকালীন, আলিরস, বার্হপতা, আমবরা, নৈত্রব।
ভহ †	কাতপ	কাতপ, অলার, নৈত্রব।
বিজ	বিধামিত্র	বিধামিত্র, মরীচি, কোশিক।
নত	মৌলপলা	উর্কা, চ্যবন, ভার্গব, আমবরা, আগুংবং।
	শাভিলা	শাভিলা, অনিত, বেবল।
	ভরবাজ	ভরবাজ, আলিরস, বার্হপতা।
	কুকাজের	কুকাজের, আলিরস, আমবরা।
	পরামর	পরামর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাতপ	(কাতপখোত্রের এবর)
	আলম্যান	আলম্যান, শাভারন, শাকটারন।
নগ	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, শাকুতি।
	মৌপারন	মৌপারন, চ্যবন, ভার্গব, আমবরা, আগুংবং।
	বৃতকোশিক	হুশিক, কোশিক, বৃতকোশিক।
নাথ	বৃতকুশিক	বৃতকোশিক, কোশিক, বজুল।
	সৌকালীন	(পূর্বে বাহা বলা হইরাছে)
সেন	কাতপ	"
	আলম্যান	"
	কাতপ	"
	ধবজরি	ধবজরি, অলার, নৈত্রব, আলিরস, বার্হপতা।
সিংহ	বাহকি	অকোতা, অনন্ত, বাহকি।
	ভরবাজ	(পূর্বে বাহা বলা হইরাছে)
	শাভিলা	"
	বৃতকোশিক	"
দাস	গৌতম	"
	বাংত	উর্কা, চ্যবন, ভার্গব, আমবরা, আগুংবং।
	সাবর্ণ	"
	আজের	আজের, শাতাতপ, শখ।
কর	কাতপ	(পূর্বে বলা হইরাছে)
	আলম্যান	"
	মৌলপলা	"
	গৌতম	"
দাম	বৃতকোশিক	"
	আমবরা	আমবরা, উর্কা, বশিষ্ঠ।
	কাতপ	(পূর্বে বলা হইরাছে)
	আলম্যান	"
দাম	গৌতম	"
	মৌলপলা	"
পালিত	শাভিলা	"
	ভরবাজ	"
চন্দ্র	ভরবাজ	"
	মৌলপলা	"

* বহুদেশে শাভিলা ও বাংতগৌতমী বোহ আছে, তাহার কৌলীভ-
মর্দায়া পাঈ নাই।

† ককীস ও ককিগৌতমী শুহেরা বাহাভরে ককিহ।

গাল	কাতপ	(পূর্বে বলা হইরাছে)
মণী	শাভিলা	"
	ভরবাজ	"
দেব	কাতপ	"
	আলম্যান	"
	পরামর	পরামর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাতপ	(পূর্বে বলা হইরাছে)
কুণ্ড	শাভিলা	"
	বাংত	"
	ভরবাজ	"
	আলম্যান	"
সোম	বশিষ্ঠ	"
	গৌতম	"
রাহা	মৌলপলা	"
	কাতপ	"
ভহ	গৌতম	"
	কাতপ	"
রক্ষিত	শাভিলা	"
	চন্দ্রবহি	চন্দ্রবহি, পরামর, দেবল।
অকুর	ভরবাজ	(পূর্বে বলা হইরাছে)
	আলম্যান	"
বিষ্ণু	কাতপ	"
	ভরবাজ	"
আড্য	ব্যাঙ্গপাদ	সাকুতি
	ভরবাজ	(পূর্বে বলা হইরাছে)
আল্য	শাভিলা	"
	গৌতম	"
নন্দন	মৌলপলা	"
	কাতপ	"
হোড়	গৌতম	"
	মৌলপলা	"
রাণী	হালতা	"
	কাতপ	"
ভগ্ন	হংসল	হংসল, বাসল, বেবল।
	আলম্যান	(পূর্বে বলা হইরাছে)
বল	আলম্যান	"
চাকী	গৌতম	"
রাহত	আলম্যান	"
আবিত্য	ঐ	"
গুণ্ড	ঐ	"
রত্ন	কাতপ	"

পরিচয়।—পূর্বেই বলা হইয়াছে কান্যকুজাগত কায়স্থ-গণের উত্তরপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের জার করিয়াছেন। কায়স্থ বটে কিন্তু আচারভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে সংস্কারবর্জিত হইয়াছে। কতদিন হইতে তাঁহারা প্রথম সাবিত্রীভ্রষ্ট হইলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ সেনরাজগণ অবসর হইলে মুসলমানদিগের আগমনে এবং মুসলমান নবাবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে গিয়া সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়াছেন। মিশ্রকারিকার মতে, কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উপবীত ও গায়ত্রী-শূভ হন। ক্রমে বেদোক্ত ক্রিয়াভাবে তাঁহারা বৃহলক্ষ প্রাপ্ত ও পরিশেষে আগমোক্ত বিধানে দীক্ষাগ্রহণ ও পবিত্রতা লাভ করিয়া বিশ্রুত হইলেন। তাঁহারা তাত্ত্বিক ও তন্ত্র-দক্ষ। কিন্তু ঐতিহাসিকানুসারে শূদ্রধর্মী বলিয়া খ্যাত (১)।

ঐবানন্দের প্রসঙ্গ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ ঐতিহ্যের মতে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে আর ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ক্রিয়াহীন হইলেও আধ্যাত্মবিদের বৃহলক্ষ প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। তবে যদি তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তৎপরে তাত্ত্বিকী দীক্ষা দ্বারা অবশ্যই শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোন ঐতিহ্যেই তাত্ত্বিককে শূদ্রধর্মী * বলা হয় নাই।

বোধ হয়, আধ্যাত্ম ব্রহ্মজ্ঞানী কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে ত্রাত্যতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ নিকিত হন এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবে তাঁহারা ত্রাত্যস্তোম দ্বারা সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তবে তাত্ত্বিকী দীক্ষা দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন এই মাত্র। মহুর মতে, যথাসময়ে উপনীত না হইলে ত্রাত্য হয় এবং সে ত্রাত্যস্তোম করিলে পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে। আপস্তম্ব ও মিতাক্ষরার মতে বহুদিন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের

(১) "গৃহীত্যাধ্যাত্মিক জ্ঞানঃ কায়স্থঃ বিশ্রামনাঃ।

তত্যানুস্তম্য বজ্রমন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ।

ক্রিয়াহীনান্য তে সর্বেষাং বৃহলক্ষঃ ক্রমাদ্ভগতঃ।

ভক্তো কালে গতে চাপি আশ্রমাদীক্ষিতো ভবনঃ।

দ্বিষ্যজ্ঞানঃ যতো দধ্যাৎ চুর্বাৎ পাণস্য সংকরম্।

তন্মাদীক্ষেতি না শ্রোত্বে নুনিভিত্ত্ববেদিত্তিঃ।

আগমোক্তবিধানেন পূতাঃ কায়স্থসভবাঃ।

তন্মাত্রে বিশ্রুতকণ্ড বিশ্রুতকণ্ডাভবনঃ।

তাত্ত্বিকান্তে সমাখ্যাতাত্ত্বিকানপি পারগাঃ।

তথাহি শূদ্রধর্মীতে খ্যাতান্ ঐতিহাসিকান্।" মিশ্রকারিকা।

* শূদ্র বলিলেও কায়স্থজাতিবলোপের আশঙ্কা নাই। যেমন, হোণি-চাণ্যকে কায়স্থধর্মী বুলিলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের লোপ হয় না।

অভাবে অহুগনীত থাকিলেও ত্রাত্যস্তোম প্রারচিত্ত দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন হইতে পারে (২)। [ত্রাত্য দেখ।]

বাহা হউক বহুদিন অহুগনীত থাকিলেও কন্যাজাগত কায়স্থের উত্তরপুরুষগণ যে কায়স্থেরই অন্ততম শাখা, তাহা বথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে (৩)।

[বঙ্গীয় কায়স্থগণের বিবাহপদ্ধতি কুলীন ও ব্রাহ্মণ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালাপ্রদেশে কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ১৪,৫১,৮০০।

পশ্চিমাঞ্চলে উনাই ও দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের জার বঙ্গে ডেকর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্থের বংশসম্ভূত বলিয়া বলিয়া পরিচয় দেয়। মিশ্রকারিকার মতে—

কায়স্থের ঔরসে শূদ্রাঙ্গীর গর্ভে যাহারা জন্মিয়াছে; তাহারা ডেকর নামে খ্যাত।

ডেকর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্থের দাসত্ব ও সামান্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

এতদ্ভিন্ন অনেক নিকটজাতি ধনগৌরবে আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত কুলীন বা সম্মৌলিক বলিয়া সমাজে চলিত হইতে পারে না। শুদ্ধাচারী কুলীন ও সম্মৌলিকেরা তাহাদিগকে ঘৃণা করেন।

বঙ্গের শুদ্ধাচারী কায়স্থগণ স্বজাতি ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না। [বঙ্গকায়স্থ সম্বন্ধে অপরোপকথ্য কুলীন, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শব্দে দ্রষ্টব্য।]

উড়িষ্যা।—উড়িষ্যায় একপ্রকার কায়স্থ আছে, তাহারা করণকায়স্থ নামে পরিচিত। অনেকে 'করণকায়স্থ' নাম উনিয়াই কায়স্থকে বৈজ্ঞানিক ঔরসে শূদ্রাগর্ভজ করণ বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দরসাকর সাধারণের এই সম্বন্ধে নিরাকরণ করিয়াছেন—

"করণং সাধনে গাজে পুমান্ শূদ্রাণিষ্ঠো ভূতে।

যুদ্ধে কায়স্থভেদেহপি জ্ঞেয়ং করণমস্ত্রিয়াম্ ॥"

করণ (কুলী) অর্থ—১ সাধন। ২ গাজ। (পুং) ৩ বৈজ্ঞ হইতে শূদ্রার গর্ভোৎপন্ন পুত্র *। (পুং কুলী) ৪ যুদ্ধ। ৫ কায়স্থভেদ।

(২) 'বাচস্পত্য' রচয়িতা ঐশ্বাম্বর্য তারানাম বাচস্পতি প্রভৃতিও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

(৩) বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান স্মার্তপণ্ডিতগণের মতে, কন্যাজাগত কায়স্থ-বঙ্গীয় কুলীন ও মৌলিকগণ কায়স্থগণসম্ভূত, এতদ্ভিন্ন অপর কায়স্থ সম্বন্ধে

* মহাত্ম্যরতে রাজা হুতরাষ্ট্রের ঔরসে বৈশ্যপণ্ডীগর্ভজ যুগ্মকৃত করণ বল্য হইয়াছে।

বৈশ্ব ও শূদ্রাজাত করণ ও করণকার্য যে স্বতন্ত্র জাতি তাহা স্পষ্টই প্রতীপন্ন হইতেছে।

করণের 'কায়স্থডেম' এইরূপ অর্থ থাকায় করণ বলিলে কায়স্থ জাতিমাত্রকে বুঝায় না। বাস্তবিক কায়স্থের অন্তর্গত করণশ্রেণী অপর সকল কায়স্থ অপেক্ষা নিকট বলিয়া গণ্য। বেহারের প্রধান কায়স্থেরা (দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের জায়) করণকার্যকে স্বতন্ত্রভাবে গণ্য করেন। পদ্মপুরাণে এই করণ ও কায়স্থজাতি স্বতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। মিশ্র-কারিকায় লিখিত আছে—

“ব্রাত্যামাং কায়স্থজাতিঃ করণাশ্চ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।”

ব্রাত্যনারী ও কায়স্থ হইতে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহারাই করণ (২)। এই হেতু করণেরা 'সঙ্কর' বলিয়া গণ্য (৩)। উড়িষ্যায় ইহাদের প্রধানতঃ দুইটা বিভাগ আছে। শুদ্ধকরণ ও সৃষ্টিকরণ (উড়িয়া সৃষ্টিকরণ)। শুদ্ধকরণেরা মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থের জায় আপনাদিগকে বাক্সালী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারাই বলে যে, তাহারাই বাক্সাল দেশেরই কায়স্থ, বক্সালসেনের সময় কোলীভূপ্রথা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ার দেশবহিষ্কৃত হয় এবং উড়িষ্যায় আসিয়া বাস করে। সৃষ্টিকরণেরা শুদ্ধকরণ ও নবশাখ-জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া অস্বীকৃত হয়। ইহারাই শুদ্ধ-করণদিগের ভৃত্যাদির কার্য্য করিয়া থাকে। শুদ্ধকরণ-দিগের মধ্যে যে সমস্ত জারজ সন্তান সমাজ হইতে দূরীভূত হয়, শুনা যায় যে সৃষ্টিকরণেরা তাহাদিগকে অশ্রেণীভূত করিয়া লয়। এই উভয় শ্রেণীতে আদান প্রদান নাই বা শুদ্ধকরণেরা ইহাদের প্রস্তুত কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। অনেকস্থলে অন্যান্য শুদ্ধজাতির লোকও করণজাতি মধ্যে গৃহীত হয়। এইরূপে অনেক ধনী ধণ্ডাইত করণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাদের অনেকেরই দাসীগর্ভে সন্তান হয়, এই সন্তানেরা করণ বলিয়া গণ্য হয় বটে; কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারী হয় না।

আর একজাতীয় করণ আছে, তাহারাই নৌলীকরণ অর্থাৎ উপবীতধারী করণ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের উপবীত সঙ্কে একটি রহস্য আছে—এক সময় কোন একজন উড়িষ্যার রাজা পথে ভ্রমণ করিবার সময়ে পথপার্শ্বে দুইটি সন্ধ্যোজাত বালক পতিত দেখিতে পাইলেন। বালক দুটি

যমজ বলিয়া বোধ হইল। রাজা দুইজনকে আনিয়া একটি, একজন ধোপানীকে ও অপরটি, একজন হাড়িনীকে দাস-পালন করিতে দিলেন। বালক দুইটি বড় হইলে রাজার নিকট আনীত হইল। রাজা তাহাদিগের জাতি স্থির করিবার জন্য নানা উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন মীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক তাহাদিগকে লইয়া স্ব স্ব সম্বানের অনিষ্ট করিতে স্বীকৃত না হওয়ার, রাজা দ্বয়ং রাগিয়া বলিলেন, তবে, ইহারাই হয় ব্রাহ্মণ না হয় করণ হউক। তৎপরে দুজ্ঞাও আর কিছু মীমাংসা না করায়, তাহারাই ব্রাহ্মণের জায় উপবীতও লইল এবং করণকায়স্থ বলিয়া গণ্য হইল। ইহাদেরই বংশীয়েরা 'নৌলীকরণ' নামে খ্যাত। ইহারাই উপবীত লইবার সময় একটি ফোঁতুকজনক কার্য্য করে। একটি বেলকাষ্ঠের দণ্ড উঠানে পুঁতিয়া তাহার উপর সোনার টোপর ও অজ্ঞাত সোনার ভূষণ পরাইয়া দেয় এবং চেলির কাপড় ও অজ্ঞাত দ্রব্যাদি রাখে। একপার্শ্বে একজন সখবা ধোপানী ও অপরপার্শ্বে একজন সখবা হাড়িনী দাঁড়াইয়া থাকে। বালক উপবীত ধারণ করিয়া আসিয়া এই দণ্ডমূলে প্রণাম করে। ইহারাই বলে যে বেলদণ্ডকে প্রণাম করিতেছি, কিন্তু ভাবে বোধ হয় যে আদিবংশপিতার ধাত্রী-দ্বয়কেই প্রকারান্তরে প্রণামাদি করে। নৌলীকরণেরা শুদ্ধ-করণদিগের সহিত আদান প্রদান করে। কিন্তু সৃষ্টিকরণদিগের সহিত কোন কার্য্য করে না।

করণকায়স্থের মধ্যে এই কয় গোত্র আছে—আত্রেয়, ভরদ্বাজ, কস্তশস, কাশ্যপ, মুশল, নাগান, পরাশর, শম্ব। ইহাদের ৪ সমাজ—খরা, পুরা, চৈয়া ও কুলীনা।

ইহারাই শৈশবেই কন্যার বিবাহ দেয়; কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বা অর্থের অনাটনে ১৮।১৯ বৎসরেও কন্যার বিবাহ হয়। করণেরা মেদিনীপুরের কায়স্থগণের ন্যায় কন্যার রজোদর্শনের পূর্বে যাহাতে সে স্বামী সহবাস করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে।

হিন্দুপ্রথার বহির্ভূত নিয়মে অর্থাৎ নিবসে ইহাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর চতুর্থদিনে ইহারাই পিতৃপুরুষ-গণের উদ্দেশে পিষ্টকাদি উৎসর্গ করে।

ইহারাই বৈষ্ণব। উৎকল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরহিত্য করে। ইহারাই দশরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করে। একাদশদিনে আদ্যপ্রাক হুয়। মিতাকরা মতে শঙ্কর-বাজপেয়ীর বিবৃতি অনুসারে ইহাদের সকল কার্য্য হয়।

উড়িষ্যার করণকায়স্থ, ব্রাহ্মণের পরই আসন পায়। ইহারাই নবশাখ ব্যতীত অন্য জাতির জন্য গ্রহণ করে না।

(২) কিন্তু চিত্রকুণ্ডলেশ্বর ও চন্দ্রসেনবংশীয় কায়স্থগণ একত্ব করিয়া। তাহারাই মিশ্রজাতি বলে, তাহাদের বিবরণ দেখ।

(৩) মন্ত্র, করণ নামক ব্রাত্য কবিরের উল্লেখ করিয়াছেন।

কারক (স্ত্রী) কার্য তিষ্ঠতি অনরা, কার-হ-ক। ১ হরীতকী। ২ অঙ্গুরী। ৩ কাকৌলী। ৪ বড় ও ছোট এলাইচ। ৫ তুলসী। ৬ কারহরীজাতি।

কার্যৈর্হা (স্ত্রী) কার্যতৈর্হাৎ, ৬৩৭। ১ রসায়ন ঔষধাদি দ্বারা শরীরের বিরতা। ২ দীর্ঘকাল শরীরের অবস্থিতি। কার্য (দেশজ) কার, শরীর।

কার্যাকাশলক্ষণসংঘম (পুং) পাটঞ্জলহৃত্তোক্ত সংঘম-লক্ষণম্। ইহার লক্ষণ যথা,—“কার্যাকাশনোঃ সম্বন্ধসংঘমাৎ লঘুতুলসবর্ণভেদাশাশনম্।”

কার্যাগ্নি (পুং) কার্যহিতোঃগ্নিঃ, মথালোঃ। শরীরস্থ অগ্নি-বিশেষ, পাচকারি, পিত্ত।

কার্যিক (ত্রি) কাদেন নিশ্পাদিতঃ নির্বৃত্তো বা, কার-ঢক্। ১ শরীর দ্বারা নিশ্পাদিত। ২ শরীর দ্বারা উৎপন্ন। ২ শরীর-সম্বন্ধীয়।

কার্যিকা (স্ত্রী) কাদেন কার্যিকব্যাপারেণ নির্বৃত্তা; কার-ঢক্। ১ পৌর বলম্ প্রভৃতির কার্যিক পরিশ্রম দ্বারা যে বৃদ্ধি নিশ্পাদিত হয়।

“দোষবাহকপুংস্তা কারিকা সমুদাহিতা ॥” ব্যাস।

২ মূলধনের হানি না হয় এইরূপে প্রতিবৎসর যে লাভ হইয়া থাকে।

কার্যিণী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Mimosa rubicandia)

কার (পুং) কৃ-ঘঞ্। ১ বধ। ২ নিশ্চয়। ৩ (কং হুং) ধ্বজি অনেন, ক-ঞ-ঘঞ্) স্বামী। ৪ তুষারপর্বত। ৫ কোন কর্ম-পদ পূর্বে থাকিলে কর্তা অর্থ বুঝায়, যেমন স্বর্ণকার, কর্ম-কার ইত্যাদি। ৬ ক্রিয়া। ৭ অক্ষরের পরে সংযোগ করিলে কেবলমাত্র সেই অক্ষর-টি-ই বুঝাইয়া থাকে, যেমন আকার, ককার ইত্যাদি “বর্ণস্বরূপে কারতকারো” ইতি ব্যাকরণ। ৮ পুজার উপকরণ, বলি।

কারক (স্ত্রী) ক্রিয়াতিরথিতঃ, ভাব্যমভে কয়োতি ক্রিয়াঃ নির্বর্ততি, কৃ-কর্তৃণি গুল্। ১ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অথবা ক্রিয়ানিষাদক। বৈরাগ্যকরণভূষণমতে ক্রিয়াজনক শক্তিবিশিষ্টমাত্রই কারকপদবাচ্য। যদিও দ্রব্যাদির ঐ শক্তি থাকা অসম্ভব, তথাপি শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ স্বীকার করিয়া, দ্রব্যাদিতেও কারকব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। কারক শব্দের ক্রিয়ানিষাদক অর্থ করিলে সকল কারকই কর্তৃকারক হইয়া পড়ে, কিন্তু ব্যাপারভেদানুসারে তাহার করণাদি ভেদ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। বঙ্গব্যাস ইহার ভেদ এইরূপ লিখিত আছে,—“কর্তৃঃ কার-কাত্ত্বপ্রবর্তনব্যাপারঃ; করণত্বঃ ক্রিয়াক্রিয়ানিবাহিত-

ব্যাপারঃ; ক্রিয়াক্রিয়ানিবাহিতত্বকরণব্যাপারত্ব কর্তৃঃ; কর্তৃ-কর্তৃস্ববাহিতক্রিয়াধারণব্যাপারো অধিকরণত্বঃ; প্রেরণাহ-মতাদি ব্যাপারঃ সম্প্রদানত্বঃ; অবধিতাধোনিধনব্যাপারো অপাদানলোভিঃ।” অতঃ কারকের প্রবর্তনকারীর নাম কর্তৃ-কারক; ক্রিয়ানিষাদন বিষয়ে অতি নিকটবর্তী কারকের নাম করণ; ক্রিয়ার উদ্ভিষ্ট ব্যাপারবিশিষ্টের নাম কর্তৃ; কর্তৃকর্ম ব্যতীত অপর ক্রিয়া ধারণশীল কারকের (ক্রিয়ার আধার) নাম অধিকরণ; প্রেরণ অহুমতি প্রভৃতি ব্যাপারবিশিষ্টের নাম সম্প্রদান এবং অবধিতাধোনিধনবিশিষ্টের নাম অপাদান।

কারক ছয় প্রকার,—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। পাণিনি মতে কর্তৃকারকের লক্ষণ, “যত্নঃ কর্তা।” পা ১।৪।৫৪। ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য অবস্থার বিবক্ষিত কারকের নাম কর্তা। কর্তা উক্ত হইলে তাহাতে প্রথমা এবং অমুক্ত হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা তির অত্ভজ প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—“প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্র প্রথমা।” পা ২।৩।৪৬। প্রাতিপদিক অর্থমাত্র, লিঙ্গমাত্র, পরিমাণমাত্র ও সংখ্যামাত্র প্রথমা বিভক্তি হয়। “সম্বোধনে চ।” পা ২।৩।৪৭। অত্ভকে যে শব্দ দ্বারা নিজের সম্বোধন করা হয়, তাহার নাম সম্বোধন; তাহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়। “কর্তৃকরণনো-হুতীরা।” পা ২।৩।১৮। অমুক্ত কর্তৃকারক ও করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্মলক্ষণ যথা,—“কর্তৃলীলিততমঃ কর্ম।” পা ১।৪।৪২। কর্তা ক্রিয়াদ্বারা যে ঐপিত্ততম পদার্থ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার নাম কর্ম। “তথ্যবৃত্তং চানীপিত্তম্।” পা ১।৪।৫০। ক্রিয়া দ্বারা ঐপিত্ত পদার্থের জ্ঞান কোন অনীপিত্ত পদার্থ নিশ্চয় হইলেও তাহার কর্মসংজ্ঞা হয়। “অকথিতং চ।” পা ১।৪।৫১। অপাদানাদি দ্বারা অবিবক্ষিত কারকেরও কর্মসংজ্ঞা হয়। “গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মণামধিকর্তা সপৌ।” পা ১।৪।৫২। গতি বুদ্ধি ও প্রত্যবসান অর্থে অগিভক্ত-কালের কর্তা শিভকালে কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। “ছকোরজ তরঙ্গাম্।” পা ১।৪।৫৩। হ ও কৃ ভাষুর অগিভক্তকালের কর্তা শিভকালে বিকরে কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। “অধিশীল-হাসাৎ কর্ম।” পা ১।৪।৫৬। অধি পূর্বক ই, হা ও আস ভাষুর যোগে অধিকরণের কর্মসংজ্ঞা হয়। “অভিনিবিশ্চ।” পা ১।৪।৫৭। অভি ও নী পূর্বক বিশ ভাষুর যোগে অধিকরণের কর্ম সংজ্ঞা হয়। কোন কোন স্থলে ইহার ব্যাচ্যারসম্বন্ধে ইহা বিবক্ষিত বিশি বসিয়া স্বীকৃত আছে।

বধা,—“পাণে অভিনিবেশঃ।” “উপাধ্বাৎ বসঃ।” পা ১। ৪। ৪৮। উপ, অহু, অধি ও আওপূর্বক বসধাতুর কর সংজ্ঞা হয়। “ক্ৰুৎক্ৰোহরূপস্ফটরোঃ কর্ণঃ।” পা ১। ৪। ৩৮। উপসর্গবিশিষ্ট ক্ৰুৎ ও ক্ৰহ ধাতুর প্রয়োগে বাহার প্রতি ক্রোধ, তাহার কর্ণ সংজ্ঞা হয়।

কর্ণ তিন প্রকার, নির্কৃত, বিকার্য ও প্রাপ্য। কর্ণ-কারক উক্ত হইলে তাহাতে প্রথমা এবং অহুক্ত কর্ণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; “কর্ণবি দ্বিতীয়া।” পা ২। ৩। ২। অহুক্ত কর্ণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা তিন অস্ত্রান্ত স্থলেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। বধা,—“অস্ত্রান্তরেণ যুক্তঃ।” পা ২। ৩। ৪। অস্ত্রা ও অস্ত্রেণ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। “কর্ণপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া।” পা ২। ৩। ৮। কর্ণ ও প্রবচনীয় সংজ্ঞাবিশিষ্ট শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। [প্রবচনীয় দেখ।] “কালান্বনোরভ্যন্তস্যযোগে।” পা ২। ৩। ৫। কালবাচক ও অন্তরবাচক শব্দের সহিত গুণ, ক্রিয়া ও জব্যের নিরন্তর সম্বন্ধ বুঝাইলে, তাহাতে দ্বিতীয়া হয়।

করণের লক্ষণ বধা,—“সাধকতমং করণম্।” পা ১। ৪। ৪২। ক্রিয়ানিদ্ধি বিষয়ে বাহা প্রধান উপকারক, তাহারই করণ সংজ্ঞা হয়। “দিবঃ কর্ণ চ।” পা ১। ৪। ৪৩। দিব ধাতুর সাধক কারকের কর্ণ ও করণ উভয় সংজ্ঞা হয়। “কর্তৃকরণয়োঃ তৃতীয়া।” পা ২। ৩। ১৮। অহুক্ত কর্তৃকারক ও করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা তিন অস্ত্রস্থলে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। বধা,—“অপবর্ণে তৃতীয়া।” পা ২। ৩। ৬। কলপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় কাল ও অন্তরবাচক শব্দের নিরন্তর সম্বন্ধ হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। “সহযুক্তঃ প্রথানে।” পা ২। ৩। ১১। সহায় শব্দের যোগে অপ্রধান পদার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। সহায় শব্দের বিবক্ষা থাকিলেও তাহাতে তৃতীয়া হইয়া থাকে। সহায় শব্দ বধা,—“সহ, সাহাং, সার্বং, সমং।” “বেনাকবিকারঃ।” পা ২। ৩। ২০। যে বিকৃত অঙ্গের দ্বারা শরীরীর বিকার লক্ষিত হয়, সেই অঙ্গবিশেষে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। “ইখতুলক্ষণে।” পা ২। ৩। ২১। যে চিহ্ন দ্বারা কোন রূপান্তর লক্ষিত হয়, তাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। “সংজ্ঞা হস্ততরঙ্গাং কর্ণশি।” পা ২। ৩। ২২। সংপূর্বক জ্ঞা ধাতুর যোগে বিকরে কর্ণে তৃতীয়া হয়। “হেতো।” পা ২। ৩। ২৩। কলসাধনযোগ্যপদার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

সম্প্রদান লক্ষণ বধা,—“কর্ণণা বমতিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্।” পা ১। ৪। ৩২। বাহার উদ্দেশে দান কার্য সম্পাদিত হয়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। “কৃত্যধীনাঃ প্রীয়মাণাঃ।” পা ১। ৪। ৩০। কৃতি অর্থবোধক ধাতুর

প্রয়োগে প্রীয়মান অর্থ বাহার প্রতি তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। “রাধকৃৎ দ্ব্যপাং জীপ্তমানঃ।” পা ১। ৪। ৩১। রাধকৃৎ হা ও শপ ধাতুর প্রয়োগে সেই সেই অর্থ অহুক্তব্যবহারের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। “ধারেকৃতমণঃ।” পা ১। ৪। ৩৩। শিক্তত্বধাতুর প্রয়োগে উত্তমণের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। “শূহেরীশ্লিতঃ।” পা ১। ৪। ৩৬। শূহ ধাতুর প্রয়োগে অতীষ্ট পদার্থের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। “ক্ৰুৎক্ৰোহরূপস্ফটরোঃ কর্ণঃ প্রতি কোপঃ।” পা ১। ৪। ৩৭। ক্রোধ, অপকার, জেধা, ও অহুয়া অর্থ প্রয়োগে বাহার প্রতি ক্রোধ, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। কিন্তু উপসর্গবিশিষ্ট হইলে তাহার কর্ণ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। “রাধীকোর্বত বিপ্রঃ।” পা ১। ৪। ৩৯। রাধ ও ঈক ধাতুর প্রয়োগে বাহার সম্বন্ধে শুভাশুভ প্রশ্ন করা হয়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। “প্রত্যাত্ত্যাং ক্রবঃ পূর্বত কর্তা।” পা ১। ৪। ৪০। প্রতি ও আঙ্ পূর্বক ক্র ধাতুর প্রয়োগে পূর্ববর্তী প্রবর্তনব্যাপারের যে কর্তা, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। “অহুপ্রতিগুণশ্চ।” পা ১। ৪। ৪১। অহু ও প্রতি পূর্বক গৃ ধাতুর প্রয়োগে প্রবর্তন-ব্যাপারের কর্তার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। “পরিক্রমণে সম্প্রদানমন্ততর-তাম্।” পা ১। ৪। ৪৪। বাহা দ্বারা নিরন্তরকালের জন্ত অবিকার সাধিত হয়, বিকরে তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। “চতুর্থী সম্প্রদানে।” পা ২। ৩। ১৩। সম্প্রদান অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। অস্ত্রান্ত স্থলে চতুর্থী বিভক্তির বিধান বধা,—“ক্রিয়ার্থোপপদন্ত চ কর্ণশি স্থানিনঃ।” পা ২। ৩। ১৪। ক্রিয়াবাচক উপপদবিশিষ্ট অপ্রযুক্ত তুমনর্থে কর্ণে চতুর্থী হয়। “তুমর্থাক্ত ভাববচনাৎ।” পা ২। ৩। ১৫। তুমর্থ প্রয়োগে ও ভাববচনার্থে বিহিত প্রত্যয়ের প্রয়োগে চতুর্থী হয়। “নমঃ স্বত্তি স্বাহা স্বধাঃ ববট্টযোগাক্ত।” পা ২। ৩। ১৬। নমঃ, স্বত্তি, স্বাহা, স্বধা, অলং ও ববট্ট শব্দের যোগে চতুর্থী হয়। “মন্তকর্ণণ্যাদয়ে বিতর্ভা হপ্রাণিষু।” পা ২। ৩। ১৭। মন ধাতুর অনাদর অর্থ গম্যমানে প্রাণিব্যতীত অস্ত্র কর্ণ-পদে বিকরে চতুর্থী বিভক্তি হয়; বিকরণকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। “গত্যর্থকর্ণশি দ্বিতীয়া-চতুর্থী চেষ্টানামন-ধনি।” পা ২। ৩। ১২। গত্যাধ ধাতুর কারকত্ব ব্যাপার অর্থে অধতির কর্ণস্থলে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হয়। ইহা তিন তাদর্থা অর্থে, কৃপ ধাতুর অর্থে, সম্প্রদান অর্থে, উৎ-পাতের দ্বারা জ্ঞাপিত বিষয়ে এবং হিতশব্দের যোগে চতুর্থী হইয়া থাকে।

অপ্রদান লক্ষণ বধা,—“কলদশীয়েংপারাবম্।”

আপা ১।৪।২৪। বিদেব বিবরে অববীভূত কারকের
অপাদান সংজ্ঞা হয়। “ভীকর্মানাং তরহেতুঃ।” পা ১।৪।২৫।
ভরার্ভ-ত রক্ষার্থ ধাতুর প্রয়োগে তরহেতুর অপাদানসংজ্ঞা
হয়। “পরাজেরলোভঃ।” পা ১।৪।২৬। পরা পূর্বক জি
ধাতুর প্রয়োগে অসহ অর্থের অপাদান সংজ্ঞা হয়। “বারণা-
র্ধানাধীশিত্যঃ।” পা ১।৪।২৭। বারণার্থ ধাতুর প্রয়োগে
কৈশিত বিবদের অপাদানসংজ্ঞা হয়। “অন্তর্ধো বেনা-
দর্শনমিচ্ছতি।” পা ১।৪।২৮। ব্যবধান সম্বন্ধে বৎকর্তৃক
স্বীয় অদর্শন ইচ্ছা করা বার, তাহার অপাদান সংজ্ঞা হয়।
“আখ্যাতোপযোগে।” পা ১।৪।২৯। যথারীতি অধারন অর্থে
বে বক্তা তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। “জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ।”
পা ১।৪।৩০। জন ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের
অপাদান সংজ্ঞা হয়। “ভুবঃ প্রভবঃ।” পা ১।৪।৩১। প্র পূর্বক
ভূ ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের অপাদান সংজ্ঞা হয়।
“অপাদানে পঞ্চমী।” পা ২।৩।২৮। অপাদানকারকে পঞ্চমী
বিত্তিক্তি হয়। এতদ্ব্যতীত অস্ত্রস্থলেও পঞ্চমী বিত্তিক্তি হইয়া
থাকে। যথা,—“অস্ত্রারাদিতরন্তে দিক্ শব্দাকৃতরপদাভাহি
যুক্তে।” পা ২।৩।২৯। অস্ত্র, আরাং, ইতর, ঞতে, দিক্-
শব্দ, অকৃতর শব্দ, আচ্ ও আহি এই সকল শব্দযোগে
পঞ্চমী হয়। “পঞ্চম্যপাঞ্ পরিত্তিঃ।” পা ২।৩।৩০।
অপ, আঙ্ ও পরি শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়।
“প্রতিনিধিপ্রতিদানে চ যন্মাং।” ২।৩।৩১। প্রতিনিধি
ও প্রতিদান অর্থে প্রতি শব্দের প্রয়োগে পঞ্চমী বিত্তিক্তি হয়।
“অকর্তৃর্থাণে পঞ্চমী।” পা ২।৩।৩২। কর্তৃশূন্য ঞৎ হেতু-
স্বরূপ হইলে তাহাতে পঞ্চমী হয়। “বিভাবা ঞ্ণেৎ দ্বিরাশ্।”
পা ২।৩।৩৩। অস্ত্রীলিঙ্গ ঞ্ণবাচক শব্দ হেতুস্বরূপ হইলে
তাহাতে বিকল্পে পঞ্চমী হয়। “পৃথগ্বিনা নানাভিত্তিতীয়ানা-
তরস্তাশ্।” পা ২।৩।৩৪। পৃথক্, বিনা ও নানা শব্দের
যোগে তৃতীয়া, দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিত্তিক্তি হয়। “করণে চ
তোকানকৃচ্ছ কতিপরস্তাস্ববচনস্ত।” পা ২।৩।৩৫।
অস্ত্রব্যবচী তোক, অন্ন, কৃচ্ছ ও কতিপর শব্দের উত্তর
করণে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিত্তিক্তি হয়। “দূরাভিকার্তেভ্যো
দ্বিতীয়া চ।” পা ২।৩।৩৬। দূর ও সমীপার্থ শব্দের উত্তর
দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিত্তিক্তি হয়। “পঞ্চমী বিত্তিক্তো।” পা
২।৩।৩৭। বাহা হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তাহাতে
পঞ্চমী বিত্তিক্তি হয়।

অধিকরণ লক্ষণ যথা,—“আধারোঅধিকরণশ্।” পা
১।৪।৪৫। ক্রিয়ার আধারস্বরূপ কর্তৃকর্ত্তের বে আধার,
তাহার অধিকরণ সংজ্ঞা হয়। ইহাতে সপ্তমী বিত্তিক্তি

হইয়া থাকে। “দপ্তম্যধিকরণে চ।” পা ২।৩।৩৮।
অধিকরণে এবং দূর ও নিকটার্থ শব্দের যোগে সপ্তমী
বিত্তিক্তি হয়। “বস্ত চ ভাবেন ভাবলক্ষণশ্।” পা ২।৩।৩৯।
বাহার ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়াস্তর লক্ষিত হয়, তাহাতে
সপ্তমী হয়। “বস্তি চানামরে।” পা ২।৩।৪০। অনাদর
অর্থে বস্তি ও সপ্তমী বিত্তিক্তি হয়। “স্বামীশ্বরবিপতি-
দারাদসাক্ষিপ্রতিভূপ্রহৃতৈশ্চ।” পা ২।৩।৪১। স্বামী,
ঈশ্বর, অধিপতি, দারাদ, সাক্ষী, প্রতিভূ ও প্রহৃত শব্দের
যোগে বস্তি ও সপ্তমী বিত্তিক্তি হয়। “আয়ুক্তকুশলাভ্যাং
চাসেবাদ্যশ্।” পা ২।৩।৪২। আয়ুক্ত ও কুশলশব্দের যোগে
তাদর্থ্য অর্থে বস্তি ও সপ্তমী বিত্তিক্তি হয়। “বস্তচ নির্ধারণশ্।”
পা ২।৩।৪৩। জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদ্বারা এক-
দেশ মাত্র বাহা হইতে পৃথক্ করা হয়, তাহাতে সপ্তমী
বিত্তিক্তি হয়। “সাধুনিপুণাত্যামচায়াং সপ্তম্যপ্রভেঃ।” পা
২।৩।৪৪। সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগে পূজা অর্থে সপ্তমী
বিত্তিক্তি হয়; কিন্তু প্রতিশব্দের প্রয়োগে হয় না। “প্রসি-
তোংলুকাভ্যাং তৃতীয়া চ।” পা ২।৩।৪৫। প্রসিত ও
উৎলুক শব্দযোগে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিত্তিক্তি হয়।
“নক্ষত্রে চ লুপি।” পা ২।৩।৪৬। লুপ্ত নক্ষত্র শব্দে অধি-
করণার্থে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিত্তিক্তি হয়। “সপ্তমীপঞ্চম্যো
কারকমধ্যে।” পা ২।৩।৪৭। শক্তিশব্দের মধ্যবর্তী বে
কালবাচক ও অক্ষবাচক শব্দ, তাহাতে পঞ্চমী ও সপ্তমী
বিত্তিক্তি হয়। “বন্দ্যাদধিকং বস্ত চেষ্বরবচনং তত্র সপ্তমী।”
পা ২।৩।৪৮। বাহা হইতে অধিক, অথবা বাহার ঈশ্বর,
তাহাতে সপ্তমী বিত্তিক্তি হয়। ইহা ভিন্ন সাধু বা অসাধু
শব্দের প্রয়োগে এবং কর্মপদযোগে নিমিত্তবাচক শব্দেও
সপ্তমী বিত্তিক্তি হইয়া থাকে। যথা,—

“চর্মগি দীপিনং হস্তি দন্তরোহস্তি কুঞ্জরশ্।

কেশেযু চমরীং হস্তি সীমি পুণ্যলকো হতঃ ॥”

এই সকল কারকগণের মধ্যে উত্তরের প্রাপ্তি সম্ভাবনা
থাকিলে সেখানে পরবর্তী কারকই হইয়া থাকে। যথা—

“অপাদান-সম্পাদান-করণাধারকর্ণগাম্।

কর্তৃশ্চোভয়সম্প্রাপ্তৌ পরমেব প্রবর্ততে ॥”

সম্বন্ধের কারকতা নাই, এজন্য তাহা কারক মধ্যে
পরিগণিত নহে। সম্বন্ধ অর্থে এবং কারক ব্যতীত অন্য অর্থ
ব্রূালেই বস্তি বিত্তিক্তি হয়। “বস্তিশেবে।” পা ২।৩।৫০।
কারক ও প্রাপ্তিপদিক অর্থ ব্যতিরিক্ত, স্বকীয় স্বামিতাবাদি
সম্বন্ধের নার শেব, তাহাতে বস্তি বিত্তিক্তি হয়। পূর্বোক্ত
কারক বিত্তিক্তিসমূহের দ্বারা অর্থবিশেষেও বস্তি বিত্তিক্তির

বিধান আছে। বলা,—"বলি হেতুপ্ররোগে।" পা ২।৩।২৩।
 হেতুশব্দের প্ররোগে হেতুবাচক ও হেতুশব্দ উভয়দ্বয়েই বলি
 বিভক্তি হয়। "সর্বনারায়ণীয়া চ।" পা ২।৩।২৭। হেতু-
 শব্দপ্ররোগে সর্বনার শব্দ ও হেতুশব্দে বলি বিভক্তি হয়।
 "বল্যতসর্পপ্রত্যয়েন।" পা ২।৩।৩০। অতঃস্থ অর্থে
 কপ্রত্যয়ান্ত শব্দের বোমে বলি বিভক্তি হয়। "এনপা
 বিতীয়া।" পা ২।৩।৩১। এনপ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের
 বোমে বিতীয়া ও বলি হয়। "দুরান্তিকার্থেঃ বল্যততরতান্।"
 পা ২।৩।৩৪। দুর ও সর্বাধার শব্দের বোমে বলি ও পক্ষমী
 বিভক্তি হয়। "জোহবিন্দিত করণে।" পা ২।৩।৪১।
 অজানার্থ জা ধাতুর করণ বিবকার বলি হয়। "অধীমর্ধ-
 মরেশাং কর্ণি।" পা ২।৩।৪২। মরশাং শব্দের বোমে,
 এবং দর ও ঈশ ধাতুর প্ররোগে কর্মবিবকার বলি হয়।
 "কৃষ্ণঃ প্রতি বয়ে।" পা ২।৩।৪৩। কৃ ধাতুর গুণান্তরা-
 ধান অর্থে কর্মবিবকার বলি হয়। "কৃষ্ণার্থানাং ভাববচনানা-
 মজরৈঃ।" পা ২।৩।৪৪। ভাবকর্ত্তাবিশিষ্ট অরতির
 রোগার্থ ধাতুর প্ররোগে কর্মবিবকার বলি হয়। "আশিবি
 নাথঃ।" পা ২।৩।৪৫। আশির্কানার্থ নাথ ধাতুর
 প্ররোগে কর্মবিবকার বলি হয়। "জানি-নি-প্র-হণ-নাট-ক্রাথ-
 পিবাং হিংসারাম্।" পা ২।৩।৪৬। হিংসার্থ জাস, নি-প্র-
 হণ, নাট, ক্রাথ ও পিব ধাতুর প্ররোগে কর্মবিবকার বলি
 হয়। "ব্যবহরণোঃ সমর্থয়োঃ।" পা ২।৩।৪৭। বি ও অব
 পূর্বক হু এবং পণ ধাতুর প্ররোগে কর্মবিবকার বলি হয়।
 "মিবতলত্বত্ব।" পা ২।৩।৪৮। দ্যুতার্থ বা ক্রয়বিক্রয়
 ব্যবহারার্থ দিব ধাতুর প্ররোগে কর্মবিবকার বলি হয়।
 "বিভাকোপসর্গে।" পা ২।৩।৪৯। উপসর্গযুক্ত হইলে
 দিব ধাতুর কর্ম বিবকার বিকরে বলি হয়। "প্রোবা-
 ক্রবোহবিদ্যোদেবতা সম্ভ্রমানে।" পা ২।৩।৫১। লোট
 বিভক্তির মধ্যমপুরুষের একবচনান্ত ইব ও জা ধাতুর
 দেবতা সম্ভ্রমানে অর্থে হবিৎ শব্দ কর্ম হইলে তাহাতে
 বলি হয়। "কৃষোর্থপ্ররোগে কালোহিকরণে।" পা ২।৩।৫৪।
 'কৃষা' এই অর্থপ্ররোগে কালবাচক অধিকরণে বলি হয়।
 "কর্ত্তকর্মণোঃ কৃতি।" পা ১।৩।৬৫। কৃৎপ্রত্যয়ের
 বোমে কর্ত্তা ও কর্মে বলি হয়। "উত্তরপ্রাপ্তৌ কর্মণি।
 পা ২।৩।৬৬। কর্ত্তা কর্ম উভয়ের বলি প্রাপ্তির সম্ভাবনা
 হইলে কর্মেই বলি হইবে। "কৃত্ত চ বর্ত্তমানি।" পা ২।৩।৬৭।
 বর্ত্তমানার্থ কৃত্ত প্রত্যয়ের বোমে বলি হয়। "অধিকরণকাচি-
 নশ।" পা ২।৩।৬৮। অধিকরণবাচক কৃত্ত প্রত্যয়ের বোমে
 বলি হয়। "ন দোকাব্যনিষ্ঠাধর্মত্বান্।" পা ২।৩।৭০।

প, উ, উক, অকর, লিট, বদর্শ ও কৃৎ প্রত্যয়প্ররোগে
 বলি হয় না। "অকেনোর্বিত্তদাধর্ম্যয়োঃ।" পা ২।৩।৭০।
 তবিদ্যং অর্থে অক, তবিদ্যং অর্থে আধর্ম্য এবং ইন
 প্রত্যয়ের বোমে বলি হয় না। "কৃত্তান্য কর্ত্তরি বা।"
 পা ২।৩।৭১। কৃৎ প্রত্যয়ের বোমে কর্ত্তার বিকরে
 বলি হয়। "তুল্যার্থধর্মত্বলোপমাত্যাং তৃতীয়াভ্যন্তরতান্।"
 পা ২।৩।৭২। তুল্য ও উপমা শব্দ ব্যতীত অন্ত তুল্যার্থ
 শব্দের বোমে বিকরে তৃতীয়া ও বলি হয়। তুল্য ও উপমা
 শব্দ প্ররোগে নিজ বলি হয়। "চতুর্থী চাশিধ্যায়-মত-ভ্র-
 কুল-স্থার্থহিতৈঃ।" পা ২।৩।৭৩। আশির্কান, আদ্য,
 মত, ভ্র, কুল ও স্থার্থ শব্দের বোমে, এবং হিত শব্দের
 বোমে বিকরে চতুর্থী ও বলি হয়।

বলি বিভক্তি সধক মাত্র বুঝাইরা দেয়। ধাতুর্থে সহিত
 কোনরূপে সঙ্গত না হওয়ার সধকের কারকতা নাই। যেহেতু
 কারকের প্রধান লক্ষণ,—

"ক্রিয়াপ্রকারীভূতো হর্থঃ কারকম্।"

ক্রিয়ার সহিত কর্ত্তকর্ম্মাদিভেদাদ্বারা যাহাদের কোন-
 রূপ সধক আছে, তাহাদিগকেই কারক কহে। ২ বর্ষশিলা-
 জাত জল। ৩ (ক্রি) কর্ত্তা।

কারকদীপক (ক্ৰী) কারকেণ দীপকম্। দীপক অলঙ্কারের
 ভেদবিশেষ। [দীপক দেখ।]

কারকবাদ (পুং) স্বত্বপ্রাপ্ত কারকমল্লকীয় গ্রহবিশেষ।
 কারকবান্ [৭] (ক্রি) কারকোহন্তাত্ত, কারক-মতুপ
 মত বঃ। ১ কারকবিশিষ্ট। ২ কর্ত্তৃত্ব।

কারকবিশিষ্ট (ক্ৰী) কারকশক্তিবোধিকা বিভক্তি, মধ্যলো।
 কর্ম্মাদিকারকবোধক দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি।

[কারক দেখ।]

কারকর (ক্রি) কারং করোতি, কার-কৃ-ট। ক্রিয়াকারক,
 ভূতা প্রভৃতি।

কারকুক্ষীয় (পুং) কারকুক্ষি-হ। ১ শাবদেশ। ২ (তত্ত্বতবঃ
 অণ-তত্ত্ব লুক) তদেববাসী ব্যক্তি; এই অর্থে নিত্য বহুবচ-
 নান্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়।

(শাবান্ত কারকুক্ষীয়ঃ। হেম ৪। ২৩।)

কারজ (ক্রি) কারাৎ ক্রিয়াজো জারতে, কার-জ-ন-ড। ১
 ক্রিয়াজাত। ২ (করজাৎ তবঃ, করজত ইবন্ বা, করজ-
 অণ) নথজাত। ৩ নথসম্বন্ধী।

কারকল—বাক্য প্রেসিডেন্সি দক্ষিণ কান্দ্যার অন্তর্গত
 উল্লিপি তালুকের একটি নগর। অক্ষা° ২৩°১২'৪০" উঃ ও
 দ্রাঘিঃ ৭৪°১২'৪০" পূঃ মধ্যে। লোকসংখ্যা ৩০০২, তল্লক্ষে

সমুদয়কার্য কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং কার্য সমুদয় অজ্ঞান দ্বারা পরমত্বকে কল্পিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেমন অজ্ঞান দ্বারা রজুতে সর্প করণ করা হয়, সেইরূপ ত্রুটিও অজ্ঞান দ্বারা কার্যসমূহের করণ করা হইয়া থাকে। রজুবিবরক জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিরুত্তি হইলে যেমন কল্পিত সর্প বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ত্রুটিজ্ঞান দ্বারা তদীয় অজ্ঞানের নিরুত্তি হইলে সমুদয় জগৎপ্রাপক বিনষ্ট হইয়া থাকে। ত্রুটি জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান বলিয়াই বৈদান্তিকগণ তাহাকে জগতের উপাদান (সমবায়ী) বলিয়া থাকেন।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মিক প্রকৃতিই মূল কারণ। ইহাতেও বৈদান্তিকেরা বলেন যে চেতনের সাহায্য না থাকিলে অচেতন প্রকৃতি হইতে কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সাংখ্যবাদীর প্রকৃতি-কারণবাদ ভ্রমমূলক বলিয়া অস্বীকৃত হয়।

নৈমারিকগণ পারিমাণুল্যকে (অণুপরিমাণ) কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহারা এই কথা বলেন যে, পরিমাণমাত্রই স্বসমান জাতীর উৎকৃষ্ট পরিমাণের কারণ অর্থাৎ যে পরিমাণ হইতে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় সেই উৎপন্ন পরিমাণ কারণীভূত পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। যেমন তত্ত্বপরিমাণ-সমুৎপন্ন বস্তুপরিমাণ তত্ত্বপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে। যদি অণুপরিমাণকে কোনও পরিমাণের কারণ স্বীকার করা হয়, তাহা-হইলে অণুপরিমাণ জন্য উৎপন্ন পরিমাণ অপেক্ষাও ছোট হইতে পারে। যেমন মহৎ পরিমাণ জন্য পরিমাণকারণীভূত পরিমাণ অপেক্ষা মহত্তর, সেইরূপ অণুপরিমাণ জন্য পরিমাণও অণুতর হইতে পারে।

সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে কারণ দুই প্রকার, জৈব-রেজা, কাল, অদৃষ্ট, উদ্যোগ এবং প্রাগভাব এই কয়টি সাধারণ অর্থাৎ সমুদয় কার্যেরই কারণ হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাদিগকে সাধারণ কারণ বলা যায়। আর বাহ্যার বিশেষ (এক এক) কার্যের কারণ, তাহাদিগকে অসাধারণ কারণ বলা যায়, যেমন আত্মবুদ্ধির প্রতি আত্মবীজ, এই আত্মবীজ কেবল আত্মবুদ্ধিরই উৎপত্তির কারণ, কণ্টকিবুদ্ধির নহে, সুতরাং উক্ত বীজ উক্ত বুদ্ধির অসাধারণ কারণ হইল।

ভাস্করাচার্যের মতে, ২ সাধন। ৩ (করণমেব, করণ-বার্ধে অণু)-কর্ম। ৪ করণ। ৫ (কৃ বধে-বার্ধে পিচ মূর্চ্চ।) বধ। ৬ আদি, মূল। ৭ প্রমাণ। ৮ ইন্দ্রিয়। ৯ পরীক্ষা। ১০ হেতু। ১১ উদ্দেশ্য। ১২ (কারণ-অভ্যুত্তি, কারণ-অচ্ছ-উত্তরবিশেষ।

১৩ ভাস্করকণ অজ্ঞানদ্বারা পূর্ণাবি করিত বৈ-সমাপান করেন, তাহার নামও কারণ।

(পুং) ১৪ কারণ। ১৫ বাহ্যবিশেষ। ১৬ গান্ধারবিশেষ। ১৭ বিজ্ঞ। ১৮ শিব।

কারণক (স্ত্রী) কারণমের, কারণ-বার্ধে কনু। কারণ। কারণকারণ (স্ত্রী) কারণত কারণম, ৩তং। ১ কারণের কারণ; ইহাও একটা পাঁচ প্রকার অন্যথানিচের অন্তর্নিবিষ্ট। যেমন পুত্রের জন্মবিষয়ে তাহার পিতামহ। পুত্রের জন্মের কারণ পিতা, পিতার কারণ পিতামহ; সুতরাং পিতামহ কারণের কারণ হইলেও, পুত্রের প্রতি অন্তর্ধানিক। ২ পরমেধর। ৩ প্রয়োজক। (“কারণকারণত অকারণকারণেপি প্রয়োজকঃ অন্তোব।” নৈয়াঃ।)

কারণগুণত (স্ত্রী) কারণঃ গুণত প্রাপ্তোত্তি, কারণ-গম-ক। কারণনিষ্ঠ, কারণহ।

কারণগুণ (পুং) কারণত গুণঃ, ৩তং। উপাদান-কারণের গুণ। ইহাই কার্যগুণের উৎপাদক। (“কারণগুণাঃ কার্যগুণমারভতে।” ভাস্কর।)

কারণগুণই কার্যগুণের আরম্ভ করে। যেমন রূপ কারণের গুণ রূপ প্রভৃতি বর্ণ বস্তুর কারণেরও গুণ রূপাদি বর্ণ উৎপাদন করে।

কারণগুণপূর্বকত্ব (স্ত্রী) কারণগুণঃ পূর্বে যত তত ভাবঃ-ত। কারণের গুণবিশিষ্টতা।

কারণগুণোৎপন্নগুণত্ব (স্ত্রী) কারণগুণেন উৎপন্নো যো গুণঃ তত ভাবঃ-ত। কারণ গুণ দ্বারা যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, তাহার ধর্ম। ভাস্করাচার্য ইহার এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ আছে। যথা,—“বাস্তবসমবায়িমাত্রসমবেত-সজাতীয়গুণজন্তুত্তিঃ পৃথক্-সংখ্যাভ্যতিরিক্ত ভাবনা বৃত্তান্তা চ বা জাতিভাদৃশজাতিসত্ত্বো সত্যপাকজন্ম।”

কারণগুণোত্তব (পুং) কারণগুণেন উদ্ভবো যত বহুব্রী। উপাদান-কারণের গুণ হইতে উৎপন্ন গুণবিশেষ।

কারণগুণোদ্ভবগুণ (পুং) কারণগুণোদ্ভবকাসৌ গুণশ্চেতি, কর্মধা। কারণগুণজাত গুণ। ভাষ্যপরিচ্ছেদে এই কয়েকটা কারণ গুণোদ্ভবগুণ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। যথা—রূপ, রস, গন্ধ, অপাকজ স্পর্শ, ত্রবতা, মেহ, বেগ, গুরুত্ব, একত্ব, পৃথক্, পরিমাণ ও হিতাহাগক সংহার।

কারণজ্ঞান (স্ত্রী) কারণরূপ জন্ম। ত্রুটিও হইল কারণ-রূপ জন্ম। তদগত ত্রুটিও হইল পূর্বে কেবল জন্ম-মাত্রেরই হইল করেন, পরে তাহাতে বীজনিকেশপূর্বক ত্রুটিও হইল করিয়া থাকেন।

কারণভা (জী) কারণত ভাব; কারণ-তল। কারণেধর্ষ, হেতুভ।

কারণহ (জী) কারণত ভাব; কারণ-ব (তত ভাবতত্তল)। পা ২।১।১১১। কারণের ধর্ষ, হেতুভ। (“কারণং ভবেত্তত।” ভাবা প।)

কারণদুর্বা (দেশজ) তৃণবিশেষ (Poa karundubi, Buch)

কারণধ্বংস (পুং) কারণত ধ্বংস: ৬৩৭। কারণের নাশ। সমবারী ও অসমবারী কারণের ধ্বংস হইলে কার্যেরও ধ্বংস হয়, কিন্তু নিমিত্ত কারণের ধ্বংসে কার্যধ্বংস হয় না।

কারণধ্বংসক (ত্রি) কারণ ধ্বংসতে নাশয়তি কারণ-ধ্বংস-কুল। কারণধ্বংসকারক।

কারণধ্বংসী [ন] (ত্রি) কারণ ধ্বংসতে নাশয়তি, কারণ-ধ্বংস-গিনি। কারণনাশক।

কারণনাশ (পুং) কারণত নাশ: ৬৩৭। কারণের বিনাশ।

কারণনাশক (ত্রি) নাশয়তি, কারণ-নশ-গিচ্-কুল কারণত নাশক:। যাহা দ্বারা কারণের নাশ হয়।

কারণফল (দেশজ) ফলবিশেষ। (Amyris heptaphylla)

কারণভূত (ত্রি) কারণ ভূতে যেন, কারণ-ভূ-কুল। কারণ-বরূপ।

কারণমালা (জী) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত অর্থালঙ্কারবিশেষ।

“পরং পরং প্রতি যদা পূর্বপূর্বস্য হেতুভ।

তদা কারণমালা ত্রাং।” সাহিত্যদর্পণ।

যেখানে পূর্ব পূর্ব বাক্য, তাহার পরপরবর্তী বাক্যের হেতু হয়, তাহাকে কারণমালা অলঙ্কার কহে। যেমন,—

“শ্রুতং কৃতধিরাং সন্ধাং জায়তে বিনয়ঃ শ্রুতাত্।

লোকান্তরাগো বিনয়ঃ কিং লোকান্তরাগতঃ॥”

পশ্চিমতগণের সংসর্গে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হয়, শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বিনয়গুণ জন্মে, বিনয় হইতে লোকান্তরাগ এবং তাহা হইতে কি না হইতে পারে? এখানে শাস্ত্রজ্ঞান, বিনয় ও লোকান্তরাগ যথাক্রমে তাহার পর পর বাক্যের কারণ হওয়ার কারণমালা-অলঙ্কার হইল।

কারণবাদী [ন] (পুং) কারণ বদতি, কারণ-বদ-গিনি। বাহ্যায়ী সকল বিষয়েই কারণ স্বীকার করেন।

কারণবারি (জী) কারণবরণ বারি, মধ্যলো। ব্রহ্মাণ্ড-স্থিতির কারণবরণ একার্ণব জল।

কারণশরীর (জী) কারণ অবিন্যা সৈব শরীরম্, কর্মধা। ব্রহ্মস্থিকালে অহঙ্কারাদিশরীরোৎপাদকপদার্থের সংহার-মায়ে অবশিষ্ট যে জীবগত অজ্ঞান, বোধাত্মক তাহাকেই

কারণশরীর কহে। ইহার সংস্কৃত পদ্যায়, আদ্যকর-কোব ও স্মৃতি।

কারণা (জী) কারণতি হিংসতি, ক-শিচ্-হু (গানত্রয়ো হু। পা ৩।৩।১০।) টীপ। ১ যাতনা। ২ অত্যন্তবেদনা। ৩ নরকবর্ণনা।

কারণাভাব (পুং) কারণত অভাব: ৬৩৭। কারণের অভাব, কারণ না থাকা।

কারণিক (ত্রি) করণৈঃ কারণৈর্বা চরতি, করণ বা কারণ-ঠক্ (চরতি। পা ৪।৪।৮।) ১ পরীক্ষক। (কারণিক: পরীক্ষক:। হেম ৩।১৪৩।) ২ (করণত ইদম্, করণ-ঠক্, ঐঠি বা) করণসম্বন্ধী।

কারণোত্তর (জী) কারণেন উত্তরম্, ৬৩৭। বিচারস্থলে বাদিকথিত বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহার অতিকূল কারণ দেখাইয়া যে উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহারই নাম কারণোত্তর। ইহার সংস্কৃত নামান্তর ‘প্রত্যাবরুদ্ধন।’ এই কারণোত্তর তিনপ্রকার, বলবৎ, তুল্যবল ও দুর্বল। বলবৎ যথা,—‘আমি তোমার নিকট একশত টাকা কর্জ লইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা পরিশোধ করিয়াছি।’ তুল্যবল যথা,—বাদী বলিল, আমি পুরুষাত্মকমে এই জমী ভোগ দখল করিতেছি, অতএব ইহা আমার। প্রতিবাদীও তাহার উত্তরে ঐ কথাই বলিল। দুর্বল যথা,—আমি এই জমী পুরুষাত্মকমে ভোগ করিতেছি, অতএব ইহা আমার। বাদীর এই বাক্যের পর প্রতিবাদী যদি উত্তর করে, আমি দশ বৎসর হইতে এই জমী ভোগ করিতেছি, সুতরাং ইহা আমারই; তাহা হইলে এই উত্তর দুর্বল হইল।’ (ব্যবহারতম্।)

কারণট (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কারণ্ডব (পুং) রম-ড, রঙ:; কু জৈবং রঙ: কারণ্ড: কো: কাদেশ:; কারণ্ডং বাতি, অথবা করণ্ডত ইদম্ কারণ্ডং, তদা-কারণ বাতি। কারণ্ড-বা-ক (আতোহুপসর্গে ক:। পা ৩।২।৩।) হংসবিশেষ, ধড়হাঁস।

(“কারণবাননবিষষ্টতবীচিমালা:

কাদম্বারসকুলাকুলভীরদেশা:।” ঋতু সং ৮।)

কারণুববতী (জী) কারণুব: হংসবিশেষ: অস্তি অভ্যাস, কারণুব-মতৃপ্ মতৃ বঃ-ভীপ্। নদীবিশেষ।

কারণুব্যূহ (পুং) ১ বৌদ্ধবিশেষ। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রবিশেষ।

কারণম (পুং) করনমত্ অপত্যম্, করনম-অণ্-ক-১ করনম-রাজের পুত্র, অবীক্ষিত। ২ করনমত্ গোত্রাপত্যম্। কর-নমের পৌত্র মন্ত। ৩ (জী) নারীভীর্বা বিশেষ। মহাভারতে এই ভীর্ষের উপপত্তি কথা লিখিত আছে,—অর্জুনের ভীর্ষ

ক্রম সময়ে তপস্বিনী তাহাকে অসত্যতীর্থ, নৌতর, পোলেম, কারকম ও তারহাজতীর্থ নামক পঞ্চতীর্থ বর্ণন করাইলেন। অর্জুন সেই সকল তীর্থ জনশ্রুত দেখিয়া ঐ-সিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাহার বলিলেন, এই পঞ্চতীর্থে জলজন্তুর অত্যন্ত তর, এতদ্ব্যতীত ইহাতে অবতরণ করে না। অর্জুন এই বাক্য শ্রবণের পর একটি তীর্থে অবতীর্ণ হইলেন, তৎক্ষণাৎ জলজন্তু তাহার পাশদেশ ধারণ করিল। অর্জুন তাহাতে ভীত না হইয়া বলপ্রয়োগে কুস্তীরূপে তাঁরে উত্তোলন করিলেন। সেই কুস্তীর ভীরে উদ্ভিত হইয়াই স্থলরী নারীমূর্তি ধারণ করিল। অর্জুন তাহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি? কেন এইরূপ কুস্তীরমূর্তিতে জল মধ্যে বাস করিতেছিলে। নারী তাহার উত্তরে বলিতে লাগিল,—মহাশয়! আমি, অঙ্গরা; এক সময়ে আমি আমার চারিটি সখীর সহিত ইন্দ্রাণ্ডরে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে এক রূপবান্ ব্রাহ্মণযুবককে তপস্তা করিতে দেখিয়া, আমরা তাহার তপস্তাভঙ্গের জন্য নৃত্যগীত করিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের অতিশাশ দিলেন,—তোমরা জলজন্তু হইয়া চিরকাল জলে বিচরণ কর। আমরা এই অভিশাপ শুনিয়া কান্দিতে কান্দিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায়, বলিয়া দিলেন, যে সময়ে তোমরা কুস্তীররূপে কোন পুরুষকে ধারণ করিবে, তখনই তোমরা শাপমুক্ত হইয়া পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তোমরা যে বঙ্গল জলাশয়ে জলজন্তুরূপে অবস্থিত থাকিবে, সেই জলাশয় নারীতীর্থ নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে। ব্রাহ্মণের এই বাক্যে কথঞ্চিৎ আশঙ্ক হইয়া চিন্তা করিতেছিলাম। আমরা কুস্তীররূপ ধারণ করিয়া এমন কোন জলাশয়ে অবস্থান করিব, যেখানে অন্নদিন মধ্যেই আমাদের মুক্তিকারক পুরুষের বর্ণন পাইতে পারিব। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া এই পাঁচটি স্থান আমাদের নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন অন্নদিন মধ্যেই অর্জুন এখানে উপস্থিত হইয়া আমাদের মুক্ত করিবেন। সেই আশায় এই এক একটা জলাশয় মধ্যে আমরা এক এক জন অবস্থান করিতেছিলাম। মহাশয়ের অন্তর্গত আমি যেমন মুক্তিলাভ করিয়াছি, এইরূপ আমার সখী চারিটাকেও অল্পেই পূর্বরূপ মুক্ত করিয়া উপকৃত করুন। অর্জুন তদনুসারে ক্রমে ক্রমে অপর চারি তীর্থ হইতেও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (ভারত আদি ২১৭ অঃ।)

কারকমী [ন] (পুং) কর এব কার: জং ধনতি, কারমা-

হা (পুং) কারমা-হা-বা-পা-হা (১) কামায়া। ২ বে-কা-হা-পা-হা-বা-হা।

(কারকমী কাংতকারে খাত্বানরতেংপি চ। বেদিকা।)

কারপাচয (পুং) দেশবিশেষ, এই দেশ যখনামীর সিকটবর্তী।

কারভু (জি) করভু ইদম্, করভ-অন্। ১ হস্তিণাবক-সম্বন্ধীয়। ২ উষ্ট্রসম্বন্ধীয় হৃদয়াদি। হৃদয়ে ইহার গুণ এইরূপ লিখিত: আহে,—উষ্ট্রহৃৎ রক্ত, উকবীর্ষ্য, কিকিৎ লবণ ও বাহুরস, লবু এবং শোথ, গুদ, উদর, অর্শঃ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বিষরোগনাশক। উষ্ট্রবহি—ইবং কারয়স, গুদ, ভেদকারক, পাকে কটুরস এবং বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও উদরযোগে হিতকারক। উষ্ট্রযত,—পাকে কটুরস, অধি-লীপক এবং কক, বায়ু, কুষ্ঠ, গুদ, উদর, শোথ, ক্রিমি ও বিষরোগনাশক। উষ্ট্রমূত্র—শোথ, কুষ্ঠ, উদর, উন্নাদ, বায়ু, ক্রিমি এবং অর্শোনাশক।

(“শোককুষ্ঠোদরোন্মাদমাকৃতক্রিমিনাশনম্।

অর্শোয়ং কারভং মূত্রং মাধুযন্ত বিবাপহম্।”

হৃদয়ে নং: ৪৫ অঃ।)

কারভু (জী) কর এব কার: তত ভূঃ, ৬তং। রাজা যে সকল স্থানের কর গ্রহণ করেন।

কারমিহিকা (জী) কারং জলসম্বন্ধং মেহতি, কার-মিহ-ক-বার্ধে কন্-টাপ্-অত ইদম্। যদা কারভু তুবানশৈলন্ত মিহিকা নীহার ইব, উপমি-। কর্পর।

কারভা (জী) কু ভবং রভা ইব, কামেশঃ। প্রিয়ভূত্বক।

কারয়িতব্য (জি) কৃ-ণিচ্ তব্য। করাইবার উপযুক্ত।

কারয়িতা [ভ] (পুং) কারয়তি, কৃ-ণিচ্ ভূচ্। অপর দ্বারা যে কার্য করাইয়া লয়।

কারয়িত্ব (জি) কৃ-ণিচ্ ইচ্ছ। কারয়িতা।

কারব (পুং) কা ইতি রবো যন্ত কুংসিতো রবো যন্ত বা বহতী। কাক।

কারবল্লী (জী) কারা ইতন্ততো বিক্লিষ্টা বলী যতঃ, বহতী।

১ করেলা। ২ কাণ্ডবেল নামক লতাবিশেষ।

কারবার (পায়ত) ব্যবসার।

কারবার বা কারবান্ড,—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর-কানাড়ার প্রধাননগর। অক্ষা° ১৪°৫০' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪°১৪' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৩৭৬১। কারবার একটি বন্দর। এই বন্দরের সম্মুখে উপসাগরে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেগুলিকে কস্তুর-দ্বীপবলী বলে। ইহার মধ্যে একটীর নাম দেবগড়।

দেশের একটা আলোকস্থ আছে। সমুদ্র হইতে ১৫০ হুট উচ্চ তাহার অধিশিখা প্রকাশিত হয়। সেই আলোক ১২ কোশ দূর হইতে দেখা যায়। বিপরীত দিক দিয়া এটি আলোক দেখিবার সুবিধে পায়ে যে অতীর বন্ধ আছে। তদুপরে সেই দিকে লাহাজ পরিচালিত করে।

কারবারের উপকূল হইতে ২৫ কোশ দক্ষিণপশ্চিমে সমুদ্রগর্ভে অগ্নিবীপ নামে একটা ছোট দ্বীপ আছে। তাহাতে পর্দুগীজদিগের উপনিবেশ আছে। অতি অল্পদিন হইল এই নগর স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বে এখানে দীঘলগণের বাস ছিল মাত্র। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কানাড়ার উত্তর অঞ্চল বন্দন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত করা হইল, তখন হইতেই ইহার উন্নতি আরম্ভ। এখন ৯টা গ্রাম কারবার সিউনিশিপারিসীটার অধীন।

পুরাতন কারবার নতুন কারবারের দেড় কোশ পূর্বে কালীনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পূর্বে এখানে বাগিচার বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য এবং এই স্থান বিজয়পুরের অন্তর্গত ছিল। কারবারের দেশাই অর্থাৎ খাজনার তদ্বাবধায়ক বিজয়পুররাজের একজন প্রধান কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজদিগের কোর্টেন কোম্পানি বাণিজ্য আরম্ভ করেন। তাঁহারা হবলী অঞ্চল প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাজার তাঁতি নিযুক্ত করিয়া ভাল ভাল মসলিন কাপড় তৈয়ার করাইয়া রপ্তানি করিতেন। এলাচি, দারুচিনি, শুট ও দল্দি নামক নীল রঙ্গের বস্ত্র এখান হইতে রপ্তানি হইত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবজী তথাকার ইংরাজ বণিকের নিকট হইতে ১১২০০ টাকা শুক আদার করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে কারবারের কোর্টের ইংরাজদিগের কুঠি আক্রমণ করেন। পরবৎসর নগর দগ্ধ করিয়া দেন, কিন্তু ইংরাজগণের কারখানার কোন ক্ষতি করেন নাই। বরং ইংরাজ-অধিবাসিগণের প্রতি বড়ই করিরাছিলেন। তাহার পর শিবজী কোন অত্যাচার করেন নাই বটে, কিন্তু স্থানীয় প্রভুদিগের অত্যাচারে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আপনাদিগের কুঠি উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে তাঁহারা আবার কুঠি স্থাপন করিয়া কার্য আরম্ভ করিলেন। দুই বৎসর পরে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে এক বিবদ কাণ্ড ঘটে। বিলাতী জাহাজের বিলাতী নাবিক হিন্দুর গোক চুরি করে। এই কার্য হিন্দুদিগের অসহ্য হইল। ইংরাজদিগের কুঠি উঠাইয়া দিবার জন্য হিন্দুদিগের চেষ্টা হইল। সমুদ্রপ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজদিগের কারবারে যে তাঁতের কারবার ছিল তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য ওলন্দাজেরা বিশেষ

চেষ্টা করে, কিন্তু কতকটা হইতে পারেন নাই। এই সময় ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে, মহারাষ্ট্ররাজ কারবারে আসিয়া দুইপাট করিয়া ইহার বিশেষ অনিষ্ট করে। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নগরের পুরাতন দুর্গ ভূসিলাং করিয়া সাতাধিপতি নদাশিবগড় নামক একটা দুর্গ নির্মাণ করিয়া ইংরাজদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। অসহ্য হওয়ায় ১৭২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আপনাদিগের কুঠি তুলিয়া লইলেন। তাহারা তখনও সাতা-রাজের তোবাশমে ক্রীত করে নাই। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আবার আসিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে পর্দুগীজগণ রণতরী লইয়া আসিয়া নদাশিবগড় দখল করিয়া লইলেন। তাহার পর পর্দুগীজগণ কারবারের রাণিজ্য প্রায় এক চেষ্টা করিয়া লইলেন। সুতরাং ইংরাজেরা কারবার উঠাইয়া দিলেন।

কারবারী, মধ্যভারতে মালবের অন্তর্গত যেহাল নামে যে রাজ্য আছে তাহার দুই জন রাজা। কিন্তু দুই রাজাই নিজ নিজ রাজ্যভার এক মন্ত্রী উপর দিয়া রাখিয়াছেন। সেই মন্ত্রীকে কারবারী বলে। দুই রাজার কার্য তিনি এককই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

কারবারী (জী) ক হিংসারং স্বার্থে-শিচ্-কিপ, কারং অবতি, কার-অব-অণ্ডী, ১ ঘোঁরী, ২ কুজলটা, ৩ ময়ুরশিখা। ৪ কুজলীয়া, ৫ হিজুগজী, ৬ ছোট করেলা, ৭ করেলা মাত্র। ৮ জীজাতি কাক।

কারবারীর (জি) করবীরেয় নির্ভুতঃ, করবীর-চঞ, সখা-মিছাং (বৃহৎকর্তৃজিলসেনিরচক্রিভাদি। পা ৪। ২। ৮০।) ১ করবীর হইতে উৎপন্ন। ২ করবীরনবদীয়া।

কারবেল্ল (স্ট্রী) কারণে বাতগমনে বেদতি চলতি, কার-বেল্ল-অচ্। ১ করেলা। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কঠিল। তাব-প্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, ভেদক, লঘু, তিক্তরস, বাতকর নহে, এবং অন্ন, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমিরোগনাশক। ২ (পুং) ছোট করেলা। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কঠিলক, জুশবী, জুশবী, কণ্ডুর, কাণ্ডকটুক, লুকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, কঠিল, নাসাসম্মেদ ও পটু। রাজবল্লভের মতে ইহার পুষ্ণগুণ—ধারক ও রক্তপিত্তরোগে হিতকারক। কল গুণ—কঠিকর এবং তৃষ্ণ, কক ও পিত্তনাশক।

[উচ্চ ও করেলা দেখ।]

কারবেল্লক (পুং) কারবের এত-বারে কন্। করেলা। এই শব্দ কোন কোন স্থলে ক্রীতশিল্পও দেখিতে পাওয়া যায়।

("ভবৎ করোঁটকং প্রোক্তং কারবেল্লকমেব চ")

হৃদয় পুত্র ৪৬ কঃ।)

কারবেলিকা (জী) কারবেলিকা পত ইবদ্। কুত্ব
করেনা, উছে।

কারবেলী (জী) কারবেল-অমার্বে জী। হোটি করেলা, উছে।

কারব্য (জি) [বৈ] কার(গারক) নব্বীর অববিশেষের
মত্বিশেষ।

কারসাজি (দেশজ) ১ ছল, কপটব্যবহার। ২ প্রতারণা।

কারসীয় (দেশজ) বৃক্‌বিশেষ (Grewia hispida, B&h.)

কারস্কর (পুং) কারঃ বহঃ করোতি, কু-ট (হেতুভাষ্য-
হ্রস্বোম্যে। পা ৩।২। ২০।) বৃক্‌বিশেষ। ইহার সংস্কৃত
পর্ধ্যায়—কিন্মাক, বিবভিনু, করক্রম, রম্যকল, কুপীলু ও
কালকুট। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিত্ত,
রস, উষ্ণবীৰ্য এবং ফুট, বায়ু, রক্ত, কফ, কক, অর্শঃ ও
ব্রণনাশক।

কারস্করাটিকা (জী) কারস্কর ইব অটতি, কারস্কর-অই-পুল
টাপ-অত ইবদ্। কর্ণজলোকা, কেন্দুই।

কারা, উত্তর পশ্চিমবঙ্গে আলাহাবাদ নগরের ২০ ক্রোশ
উত্তরপশ্চিমে সিরাদু নামক তহশীলের একটি নগর।
গঙ্গার দক্ষিণদিকে অক্ষা ২৫°৪১'৫৫" উঃ ও দ্রাঘি ৮১°২৪'২১"
পূঃ মধ্যস্থিত। লোকসংখ্যা ৫০৮০। উত্তরপশ্চিমে ৯টী প্রধান
তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে কারা একটি, এখানে কালেশ্বরের
মন্দির আছে, সেইজন্য ইহার একটি নাম কালনগর।
পুরাতন ভারতবর্ষে কালখল বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে।
ইহার আর একটি নাম কর্কোটক নগর। কথিত আছে,
বিষ্ণুজ্যেষ্ঠ ঋষিভক্ত হইয়া সতীদেবীর করের একটি অংশ এখানে
পতিত হয়। মুসলমান পরিব্রাজক ইবন বাতুতার গ্রন্থে এই
তীর্থের কথা লিখিত হইয়াছে। আবাহমানের কুরুপক্ষের
তিথিতে প্রায় লক্ষাধিক লোক এই নগরে আসিয়া গঙ্গা-
স্নান করে।

এখানে একটি অতি পুরাতন দুর্গ আছে। উহা ঠিক
গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখন তাহার ভগ্নরূপ। দুর্গটি
দৈর্ঘ্যে ৩ প্রহর প্রায় ৬০০ হস্ত ও ৪৫০ হস্ত হইবে। সর্ব
১০২৫ (খৃঃ ১০৫৫) অব্দে রাজা ধর্মোপালের সময়ে কতক-
গুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। হুতরাং দুর্গটি যে আরও কত
দিনের পুরাতন তাহার ঠিক নির্দেশ করা হইসক। কেহ
কেহ বলেন, কদোজরাজ জরাজ উহা নির্মাণ করেন।

দুর্গের নিরতানের বাজারঘাটে একটি মন্দির দেখিতে
পাওয়া যায়। উহার চারিদিকে চতুর্ভা (বা বালান)
আছে। সেই বালাসে দুর্গীর মতকৃৎ একটি মূর্তি পড়িয়া
আছে। একস্থানে একটি শিবলিঙ্গ ও হানাতের নব্বীর

মূর্তি রহিয়াছে। বোধ হয় বসন্তেরই এই মন্দিরকে এই মশা
করিয়া থাকিবে। ঘাটের নিকটেই একটি স্থান আছে,
তাহার চারিদিকে তত্তাকতি গাছ। লোকে ইহাকে দ্বিনার
বলিয়া থাকে।

মুসলমানদিগের অনেক কীর্তিও এখানে দেখিতে
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বাজা-কারকের গোরহান, কবল
গোরহান, জামি মসজিদ, সেখ মুলভানের রোজা, সাখুব
আমার গোরহান, এইগুলি প্রধান। নিকটে দাননগরে
একটি মসজিদ ও ছইটী গোরহান, কটদারি নামক
প্রাচীরে কৃতব আলমের রোজা, ইসমাইলপুরে কবির হোস-
নের রোজা, সাহজাদপুরে আমাদান বীর মসজিদগুলিও
দেখিবার জিনিস।

পূর্বে এই নগর বহু সূক্ষ্মশালী ও অনেক বিদ্বত ছিল।
গঙ্গার পশ্চিমদিকে এক ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্ধক্রোশ বিস্তৃত।
পুরাতন নগরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।
পূর্বে এই স্থান এই প্রদেশের প্রধাননগর ছিল। সম্রাট
আকবারসহ আলাহাবাদে প্রধান নগর উঠাইয়া লইয়া
বাওয়ার ইহার সূক্ষ্ম নষ্ট হইল।

কারা বা কোরা নগর মুসলমান আমলেও অনেকগুলি
ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম প্রসিদ্ধ। অযোধ্যার নবাব আসফ-
উদ্দৌলা কারার ভাল ভাল বাটীগুলি তাকিয়া লইয়া গিয়া
লক্ষোনগরে নিজের ইমারত নির্মাণ করেন।

কারানগরে উত্তম কবল প্রস্তুত হয়। এখানে নানাবিধ
শস্ত্রাদি উৎপন্ন হয়। কাগজও উত্তম প্রস্তুত হয়। অযোধ্যা
ও কতেপুরের সহিত কাপড়, কাগজ ও শস্তের ব্যবসা চলে।
কারা (জী) কীর্যতে কিপাতে দগাহো বতাম্ কু-অঙ-গুণঃ
(বহুশোভিত গুণঃ। ৭।৪।১৬।) গুণে দীর্ঘকক্ষ নিপা-
তনাৎ। ১ কারাগার। ইহার সংস্কৃত পর্ধ্যায়—বন্ধনালয়,
বদানক। ২ দ্বী। ৩ বীণার অধঃস্থিত বক্রকাঠ বা লাউ।
৪ সুবর্ণকারিকা। ৫ বন্ধন। ৭ গীড়া। ৮ শব।

কারাকুবেট (দেশজ) বৃক্‌বিশেষ (Calamus latifolius)
কারাগার (জী) কারা এব আগারং, কারার বন্ধনার বা
আগারম্। বন্ধনগৃহ।

কারাওপ্ত (জি) কারার বন্ধনাগারে গুণঃ রক্তঃ, ৭তৎ।
কারাক, করেদী। (চায়ঃ কারাওপ্তৌ। হেম ৩। ৪৭০।)
কারাগৃহ (জী) কারা এব গৃহম্, কারার বন্ধনার বা গৃহম্।
কারাগার।

কারাগোলা।—বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত পুর্বিরাঙ্গোলায় একটি
গ্রাম। গঙ্গার উত্তর তীরে অক্ষা ২৪°২৩' উঃ, দ্রাঘি

করাগোলা পুণ্যক্ষেত্র অবস্থিত। যখন উত্তরবঙ্গের রেল
হয় নাই, তখন স্নেহক-কারাগোলা দ্বারা দার্জিলিং-বাইত।
এখনও নাহবেগল, হইতে একখানি ট্রামার কারাগোলা গজ-
রাত করে। তবে সম্প্রতি কারাগোলার নিকটে চড়া
পড়িয়া হাওয়ার বর্ষাকাল ব্যতীত ট্রামার সকল সময়ে
টিক কারাগোলার বাইতে পারে না—তথা হইতে ১ ক্রোশ
দূরে আরোহিণকে নামাইয়া দেয়। এখানে একটা প্রকাণ্ড
মেলা হয়। পূর্বে এই মেলা ভাগলপুরের অন্তর্গত পীর-
শৈলি নামক স্থানে হইত। তাহার পর কিছুকাল পুর্নিয়াতে
বসিত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ মেলা কারাগোলার হইতে
আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে হারতাল মহারাজের এক খণ্ড
বালুকাময় ভূমি পড়িয়া আছে। তাহাই মেলার স্থান। মেলা
১০ দিন থাকে। তখন বহুসংখ্যক দোকান পাট বসে।
দেবী, বিলাতী, রেসমী, পসমী ও কার্পাসের নানাবিধ বস্ত্র,
লৌহময় লাঙ্গলের কাল হইতে গালায় খেলনা অবধি
সকল প্রকার প্রয়োজন-সামগ্রীই এখানে বিক্রয়ের লব্ধ
আসিয়া থাকে। নেপালীরা নানাপ্রকার ছুরি, তোড়ালে,
কুকরি, বেত, চামর, লাকা ও টাই ঘোড়া লইয়া আসে।
প্রায় ৩০।৪০ সহস্রলোক এই মেলার সমবেত হয়।

কারাঙ্গ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Gratiola amara)

কারাধুনী (জী) কারায়া: শব্দত আধুনী উৎপাদিকা, ৬তম।
শব্দ উৎপাদক শব্দ প্রভৃতি।

কারাপথ (পুং) দেশবিশেষ; লক্ষণপুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু
এই দেশের শাসনকর্তা ছিলেন।

(“অঙ্গদ চন্দ্রকেতুঃ লক্ষণো ২প্যায়সম্ভবম্।

শাসনাং রঘুনাথঃ চন্দ্রে কারাপথেশ্বরৌ।” রঘু ১৫।৩০।)

কারাপাল (পুং) কারাং কারাগারং পালয়তি রক্ষতি, কারা-
পাল অহ্। কারাগার-রক্ষক।

কারাত্ত (জী) কারায়ৈ বন্ধনার তু: স্থানম্। বন্ধনস্থান।

কারায়িকা (জী) কং জলং আরাতি বিচরণস্থানম্বেন
গৃহাতি, ক-আ-রা-গূল-টাণ্-ইষক্। বলাকা, বক।

কারাবর (পুং) চর্যকার জাতিবিশেষ; নিবাদ জাতির গুরুসে
এবং বৈদেহী জাতি জীরগর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

(“কারাবরো নিবাদাত্ত চর্যকারঃ প্রসূতঃ।” ময় ১০।৩৬)

কারাবাস (পুং) কারায়াং বাস: ৭তম। কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়া
থাকা।

কারাবেশ্ব [ন্] (জী) কারা এব কারায়ৈ বা বেষ্ম গৃহম্।
কারাগার।

কারাঙ্গ (পুং) ১ করাঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ। ২ করাঙ্গদেশ্য। মহা-

ভারতে, করাঙ্গীক-কারাঙ্গ উক্ত হইয়াছে। করাঙ্গীক-মান
করাঙ্গ। [করাঙ্গ দেখ।]

কারি (জী) ক্রিতে অসৌ, ক-ইঞ্। (ত্রি) কারায়ানপরি-
প্রয়োয়িঞ্ চ। পা ৩।৩।১১। ১ ক্রি। (বি) কয়েতি,
ক-ইঞ্। (কৃঞ্) উদীচাৎ কাকম্। উৎ ৪।১২৮। ১। শিষ্টী, বে-
শিরকার্য করে।

(কারি: ক্রিয়াং ক্রিয়ায়াং তাৎপার্যমিত্য শিষ্টিনি। যেদ্রিণী।)

কারিক (জী) কারি-স্বার্থ কন্। ক্রি। কার্য।

কারিকর (বি) কারিঃ ক্রিয়াং শিরকর ইতি স্বার্থ-করোতি
কারি-ক-ই। শিরকারক, বে-শিরকার্য করিতে পারে।

কারিকরী (জী) কারিকর-জীপ্। শিরকারিণী।

কারিকা (জী) কয়েতীতি স্বার্থে বা কৃ-পু-ল্-টীপ্ অত ইষক্।

১ নটজী, অভিনেত্রী। ২ ক্রি। ৩ বিবরণ। ৪ শ্লোক। ৫

শিল্প। ৬ বাতনা। ৭ বৃদ্ধি, স্থল। ৮ কষ্টকারী। ৯ রহ-স্বার্থ-

বোধক অন্ন অক্ষর বিশিষ্ট কবিতা। ১০ কর্তা। ১১ বর্জ্য।

কারিকাল, তামিল ভাষার ইহাকে ‘কারিখান’—অর্থাৎ

মৎস্তের খাল বলে। করমণ্ডল উপকূলে এই প্রদেশ।

ইহার উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণে তাম্রোয়ারা ও পূর্বে কোমপ-

নাগর। এই প্রদেশটীতে ১১০ টা গ্রাম আছে—মোকলংখা

২১৪৮৭। কাবেরী নদীর পাঁচটা মুখ এই স্থান দ্বারা সাগরে

পড়িয়াছে। ইহার প্রধান নগরের নামও কারিকাল।

নগর অক্ষা: ১০° ৫৫' ১০" উ: দ্রাঘি ৭৯° ৫২' ২০"

উ: মধ্যে সমুদ্র হইতে প্রায় তিনপোয়া পথ দূরে অব-

স্থিত। সিংহলদ্বীপের সহিত কারিকালের বারমাস চাঁউলের

বাণিজ্য হয়। এতব্যতীত আশ্রামান দ্বীপের সহিত ও ক্রান্তের

সহিত বাণিজ্য চলে। এখান হইতে নানান্থানে ভারতীয়-কুলি

চালান হয়। কারিকাল বলরে একটা আলোকস্থল আছে।

উহা সমুদ্র হইতে ২২ হস্ত উর্দ্ধে স্থাপিত।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা কারিকালে আসিয়া একটা

দুর্গ নির্মাণ করেন। অন্নকাল পরেই, রাজার সহিত

ফরাসীদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই

এপ্রেল তাম্রোয়ারাজ সসৈন্তে কারিকাল আক্রমণ করেন।

কিন্তু ১৭৪৯ খৃ: অগ্রে ২১ ডিসেম্বর তারিখে তাম্রোয়ারাধিপতি

কারিকাল ও তৎসংলগ্ন ৮১ টা গ্রাম ফরাসীদিগকে দান

করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনা কারিকাল অবরোধ

করেন। ফরাসীরা সশস্ত্র অনবরত লড়াই করিয়া শেষ ৫ই

এপ্রেল তারিখে ইংরাজবহুত আত্মত্যাগ করেন। তাহার

পর আর তিরসকার কারিকাল ইংরাজবহুত আত্মত্যাগ

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি, এই স্থান একেবারে ফরাসী-

সিপকে পেতরা হয়। এক্ষণে ইহা করানী অবিকারে আছে। ভারতে করানীদিগের প্রধান হান পুঁচিয়ারী; পুঁচিয়ারী গবর্ণরের কর্তৃত্বাধীনে কারিকালের শাসনকার্য নিৰ্বাহিত হয়। এখানেও করানীদিগের সাধারণতঃ এক প্রভুত্ব। মিউনিসিপালের কোলিল ব্যতীত এখানে আর একটা সভা আছে, তাহাকে লোকাল-কোলিল বলে। তাহাতে নগরস্থ মিউনিসিপালিটির অবিকার ব্যতীত অপর কিছরের আলোচনা হয়। এতব্যতীত আর একটা সভা আছে, তাহার নাম কান্সাই জেনেরাল (Consul General) পুঁচিয়ারীতে ইহার অবিকেশন হয়। ইহাতে ভারতের এতোক করানী অবিকৃত হান হইতে এতিনিবি প্রেরিত হয়। এতিনিবিশপ অবত প্রজাপণের নিৰ্বাচিত। ইহা ব্যতীত ফ্রান্সের সেনেট সভার ও ডিপুটি সভার এক এক জন করিয়া ভারতের এতিনিবি থাকেন। সেই এতিনিবি এখানকার প্রজাপণ-কর্তৃক নিৰ্বাচিত হয়। এখানে বন বিভাগে, পুঁচিবিভাগে ও শান্তিরক্ষার বিভাগে এক এক জন করিয়া (Chief) কর্তা আছে। সকলের উপর শাসনকর্তা। ইনিই স্থানীয় বড় সাহেব। ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেন্টের এখানে একজন ইংরাজ-এতিনিবি আছে।

কারিকুরি (দেশজ) শিল্পকার্যে যে সকল নিপুণতা দেখান হয়।

কারিকুর (পারত) কারিকর, শিল্পকারক।

কারিকুরী (পারত) কারিকুরি, নিপুণতা।

কারিকী (স্ত্রী) করোতি, কু-পিনি-স্ত্রী। ১ বে শব্দের পরে থাকে তৎকার্যের নিষাদিরিত্তী, যে স্ত্রী তৎকার্যাদি নিষাদন করে।

কারিত (জি) ক-পিচ্-কর্মণি ক। অস্ত কর্তৃক বাহা সম্পাদিত হইরাছে।

(“বিহুঃ শরীরগ্রহণমহবীশান এবচ।

কারিতান্তে মতোহত্বাং কঃ ভোতুং শক্তিমান্ তবৎ ॥”

মার্ক ৮১। ৬৪।)

কারিতা (স্ত্রী) কারিত-টাপ্। অবিক হ্র। ইহার সংকৃত পঠ্য—কারিকা ও কারিতা বৃদ্ধি।

“কপিকেন তু বা হৃদয়বিকা সস্ত্রীকীৰ্ত্তিতা।

আপৎকালকৃত্য নিত্যং বাতব্যা সা তু কারিতা ॥”

কীৰ্য্যক্তি আপদকালে অবিক হ্রদ দিব্য অঙ্গীকার করিলে, তাহা নিরতই দিতে হয়; এই নিরতের নাম কারিতা। (বিবাং সেতু।)

কারিকাকোসা (দেশজ) মৎতবিশেষ। (A species of Tetradon.)

কারী (ব্) (পুং) করোতি, ক-পিনি। কোন পুঁচক করে থাকিলে তৎকর্তার কারক বা কর্তা বৃত্ত।

কারী (স্ত্রী) কপাতি হিনতি কটকৈকিবি শেবা, ক-ই-ক-স্ত্রী। হৃকবিশেষ; কটকারী ও কাকবৃত্তকারী নামে ইহা দুই প্রকার। ইহার সংকৃত পঠ্য—কারিকা, কার্য্য, পিরিকা ও কট-পজিকা। রাজসিধ্যন্তের মতে ইহার ত্ত্ব—ককার ও মবুর মল, পিত্তনাশক, অগ্নিবর্ধক, বলবোধক, কটিকারক, কটশোষকারক এবং শুক।

কারীর (স্ত্রী) করীরত অবরবা, করীর-অঙ্ (পলাশাদিত্যো’ বা। পা ৪। ৩। ১৪১।) ১ বাঁশের কাণ্ড। ২ বাঁশের তন্ত।

কারীরী (স্ত্রী) কং জলং বজ্জতি, ক-ক-বিচ্; কারং সমল-যেবা ইবরতি, কার-ই-অ-স্ত্রী। বৃষ্টিজন্য কর্তব্য বজ্জবিশেষ।

কারীৰ্য্য (স্ত্রী) করীরত অবরবা, করীর-অঙ্। কারীর, বংশকাণ্ড বা বংশতন্ত।

কারীষ (স্ত্রী) করীবাণাং সমূহঃ, করীব-অঙ্। করীবনমূহ, ঘৃষ্টের রাশি।

কারীষগন্ধি (জি) কারীষত্বের গন্ধো বস্ত, ইচ্ছ। ওক্ষ গোময়ের গন্ধবৃত্ত।

কারীষি (পুং) ১ ব্যক্তিবিশেষ। ২ বংশবিশেষ।

কারু (পুং) করোতি, ক-উণ্ (কুবাপাজিবি যদিলাধাপ্তভা উণ্। উণ্ ১। ১।) ১ বিধকর্ম্ম। ২ (তাবে উণ্) শিল্প।

৩ (জি) কারক। ৪ শিল্পী। ৫ হৃপকারাদি, পাচক প্রভৃতি। (“ধাত্তেহটমঃ বিশাং ওহং বিংশং কার্যাপণাবয়ম্।

কর্মোপকরণাঃ শূদ্রাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা ॥” মনু ১০। ১২০।)

‘কারবঃ হৃপকারাদয়ঃ’ ভূম্। ৬ কর্ম্ম।

কারুক (জি) কার-স্বার্থে কন্। শিল্পী।

(“কারুকারং প্রজাং হস্তি বলং নির্ণেজকত চ।

গণারং গণিকারঞ্চ লোকৈস্তাঃ পরিকৃত্ততি ॥”

মনু ৪। ১২২।)

কারুচৌর (পুং) কারুণা শিল্পেন চৌররতি, কার-চুর-অঙ্। সন্ধিচৌর, বাহারি পিন কাটিয়া চুরি করে।

কারুজ (পুং) কং জলং আকজতি, ক-আ-ক-ক। ১ করত। ২ কেন। ৩ বন্দীক। ৪ নাগকেশর। ৫ গিরিমাটি। ৬ (কারতো

জারতে, কার-জন-ড) শিরিনির্ধিত্তিজ। ৭ শরীরে আপনা হইতেই ডিলের ভায় কাল কাল যে চিক জড়ে।

[তিলকালক শেবা।]

কারুণিক (জি) করুণায়াং শীলমত, করুণা-তৎ। দয়ালু।

কারুণ্ডিকা (স্ত্রী) কারুণ্ডী-স্বার্থে কন্-টাপ্-বৃষত্। জলোকা, জৌক।

কারকী (স্ত্রী) ককিলা ইবং বা ককী দুইইবা ইবং কোঃ
কাসেণঃ। জলোকা, জৌক।

কারকী (স্ত্রী) ককবত ভাষ্য, ককণা-এব বা, ককণা-ব্যঞ্।
ককণা, ককা; স্বাধ্বরিভ্যাগপূর্বক পরজ্ঞাপনবারণের ইচ্ছা।

(“মুনে: পিতৃসহায়ত কারকণা-স্বয্যারত।” রাজা ১।২।১৫।)

কারক (পুং) ককবত রাজা, ককব-অণ্। ১ ককবদেশের
অধিপতি, নতবজ্। ২ ককবোহভিজন এবাম্, ককব-অণ্।
পুরুষাক্রমে ককবদেশবাসী। এই অর্থে নিত্য বহুবচনান্ত
হইয়া থাকে। ৩ মন্থর পুত্র।

কারকক (ত্রি) কারক-বার্ধে কন্। ১ ককবদেশবাসী। ২ (পুং)
ককবদেশের রাজা।

নাম কামিংহামের মতে বর্তমান শাহাবাজেলাই প্রাচীন
ককবদেশ।

কারক (পুং) ককবত রাজা, ককব-অণ্। ১ ককবদেশের
রাজা। ২ ককবদেশবাসী। ৩ জাতিভেদ। ত্রাত্যবৈশ্ত
হইতে সর্বাণী ত্রীতে উৎপন্ন।

“বৈশ্তাৎ তু জারতে ত্রাত্যাৎ স্বধাচার্য্য এব চ।

কারকবচ বিজয়া চ মৈত্রঃ সাক্ষত এব চ।” মন্থ ১০।২৩।

কারক্য (পুং) ককবত রাজা, ককব-ব্যঞ্। ১ নতবজ্। ২
(স্ত্রী) সেত্রমল।

কারেণব (ত্রি) করেণোরিসন্, করেণু-অণ্। হস্তিসম্বন্ধীয়।
করেণুর হৃদ্যাদিশুণ্ণ যথা—হস্তিহৃদ্য—ঈবং কথারযুক্ত মধুর
রস, বলকারক ও শুক্লশাক। হৃদিশুণ্ণ—কথারযুক্ত মধুররস
ও মলবদ্ধকারক। দ্ব্যতশুণ্ণ—মলমুত্ররোধক, তিক্তরস,
অমিকর, লঘু এবং কফ, কূষ্ঠ, বিষরোগ ও ক্রিমিনাশক।
মূত্রশুণ্ণ—ঈবং তিক্তমুত্রলবণরস, ভেদক, বায়ুনাশক, পিত্তবর্ধক
ও তীক্ষ্ণ। ইহা কিলাসিরোপে উপকারী।

কারেণুপালি (পুং) করেণুপালত অপত্যম্, করেণুপাল-ইঞ্।
হস্তিপালকের পুত্র।

কারেলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Cleome pentaphylla.)

কারোন্তর (পুং) কারেণ সুরাগালনেন উত্তমঃ। সুরাস
সুগ্রহাধাণ।

কারোন্তর (পুং) কারেণ সুরাগালনক্রিয়য়া উত্তরতি, কার-
উৎ-কৃ-অর। সুরামত্ত, মদের মাত। ২ কৃপ। ৩ বংশাদি-
নির্মিত পাত্রবিশেষ, চালনী।

কার্টেলব (স্ত্রী) ককটুনাং মিষাসোহজ, ককটু-অঞ্।
(৩রঞ্। পা ৪।২।১১।) ককটুপক্ষীর মিষাসহল।

কার্প (ত্রি) ককবত ইবন্, ককব-অঞ্। ১ ককব পক্ষি-
সম্বন্ধীয়। ২ ককিষসম্বন্ধীয়। ৩ দেহস্থ বায়ুবিশেষসম্বন্ধীয়।

কার্প (ত্রি) ককবত ইবন্, ককব-অঞ্। ১ ককব পক্ষি-
(বিষাদিত্যোহণ্। পা ৪।২।১১।) ককটু-বিশেষ।

২ ককটু-অবয়ব।

কার্পালিলয় (ত্রি) ককলাসত ইবন্, ককলাস-অঞ্ (ওলাদি-
ত্যচ। পা ৪।১।১২০।) ককলাসসম্বন্ধীয়।

কার্পাকর (ত্রি) ককবাকোরিসন্, ককবাকু-অণ্। কুট্ট-
সম্বন্ধীয়।

কার্পা (স্ত্রী) ককবত ভাষ্য, ককণ-ব্যঞ্। ১ ককণতা।

(“কার্পতং গমিতেহপি চেতমি তন্ম রোমানকমানবতে।”

২ কটিনতা। ৩ নির্দয়তা।

[অমর শাঃ-২৪।]

কার্প (পুং) ব্যক্তিবিশেষ।

কার্পকায়নি (পুং) কার্পকত অপত্যম্ পুমান্, ককব
কিঞ, কুগাগবত (যাকিরাঙ্গীলাং কুক্ চ। পা ৪।১।১৪৮।)
কার্পের পুত্র।

কার্পি (পুং) ককব-কিঞা বিকল্পবিধানাং ইঞ্। কার্প-
বের পুত্র।

কার্পারী [ব্] (ত্রি) [বৈ] নিজের আধারকর।

(“বন্দ্যুত মনন্তে হস্ত কিং বা কার্পারিণো হস্তরীং।”

কার্পারিণ ইতি যজ্ঞী যজ্ঞীরাধা হ্রাস্বী, তেন অস্বধারকং
কিমুক্তবান্ ইত্যর্থঃ।)।

কার্পীক (ত্রি) ককঃ ওরো হঃ স ইব, কক্ ঈকক্। খেত-
অবতুল্য।

কার্পেটিক (স্ত্রী) নগরবিশেষ। বর্তমান নাম কারা।

কার্পরা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Curcuma Zerumbet)

[কর্কর দেখ।]

কার্ণ (পুং) কর্ণত অপত্যম্ পুমান্ কর্ণ-অণ্। ১ কর্ণের পুত্র,
বৃকেতু। ২ (ত্রি) কর্ণেজিরসম্বন্ধী।

কার্ণগ্রাহিক (পুং) কর্ণগ্রাহত অপত্যম্ পুমান্, কর্ণগ্রাহ-ঈক্
(ইবত্যানিভ্যচ। পা ৪।১।১৪৬।) নাবিকপুত্র, মাঝির
ছেলে।

কার্ণহিত্রক (ত্রি) কর্ণহিত্রত ইবন্, কর্ণহিত্র-অণ্-বার্ধে কন্।
কর্ণহিত্রসম্বন্ধীয়।

কার্ণবেষ্টকিক (ত্রি) কর্ণবেষ্টকাত্যম্ সম্পাদি, কর্ণালকা-
রাত্যাং অবস্তাং শোভতে ইত্যর্থঃ। কর্ণবেষ্টক-ঈঞ্ (সম্পা-
দিনি। পা ৪।১।১৯।) কর্ণবেষ্টস অলঙ্কার দ্বারা যে
শোভা পায়।

কার্ণজবস (স্ত্রী) [বৈ] সায়ভেদ।

কার্পটিক (পুং) কর্ণটিঃ অজিহনো হস্ত, কর্ণটি-অণ্-বার্ধে কন্।
১ কর্ণটিমেশবাসী। ২ (ত্রি) কর্ণটিমেশসম্বন্ধীয়।

কার্পটভাৰা (জি) কার্পটভাৰা কার্পটভাৰাভাৰা ভাৰা,
৬৩২। কার্পটভাৰাভাৰাভাৰা ভাৰা।

কার্পায়ানি (জি) কৰ্ণে নিবৃত্ত, কৰ্ণ-কিঞ্ (বৃহৎ কৰ্ণ-কি-
সেনিয়চক্ধ্যককিকিত্যাদি। পা ৪। ২। ৬০।) কৰ্ণ
ভাৰা নিশাশিত।

কাৰ্ণি (জি) কৰ্ণ-কিঞ্ বিধানত বিকল্পাং ইঞ্। ১। কৰ্ণ
ভাৰা নিশাশিত। ২ কৰ্ণস্বকীয়।

কার্ণিক (জি) কৰ্ণত ইন্দ, কৰ্ণ-কিঞ্। কৰ্ণস্বকীয়।

কার্ণিশ (নেশজ) হাণ্ডের উপরে চতুর্দিকে যে অন্ন বিবৃত্ত হান
বাহিরদিকে প্রস্তুত করা হয়।

কার্ত্ত (জি) কৃত: কৃতপ্রত্যয়ত ব্যাখ্যানো গ্রহঃ, কৃত-অণ্।
১। কৃতপ্রত্যয়ের ব্যাখ্যাগ্রহবিষেব। ২ (কৃতত ইন্দ) কৃতস্বকীয়। (ক্ৰী) ৩ (কৃতমেব, বার্ষে অণ্) সত্যুগ।

(“কিং কারণং কার্ত্তব্যুগে প্রদানঃ।” ভারত আ: ৯০ আ:।)
৪ (পুং) ধৰ্ম্মনেত্ৰের পুত্র।

কার্ত্তকৌজপাদি (পুং) পাদিনি ব্যাকরণোক্ত গণবিশেষ,
যশসামাসবৃত্ত এই সকল শব্দের পূৰ্ণপদে প্রকৃতিস্বর হয়
(কার্ত্তকৌজপাদিরূপ। ৬। ২। ৩৭।) গণ যথা—“কার্ত্তকৌ
জপৌ, সাবর্ণিমাধুকৈরৌ, অবন্ত্যশ্বকা: পৈলস্তাপর্ণেরা:,
কশিতাপর্ণেরা:, শৈতিকাকপাকালেরা:, কটুকবাহুলেরা:,
শাকলগুনকা:, শাকলশপকা: শপকবাহবাহ:, আর্জাভিমৌলগলা:,
কুন্তিল্লরাষ্ট্রা:, চিত্তিল্লরাষ্ট্রা:, তওবতঙা:, অবিমন্তকামবিহা:,
বাজ্রবশালহারানা:, বাজ্রবদানচ্যুতা:, কঠকালপা:, কঠকৌ-
থুমা:, কোমুমলোকাকা:, ক্রীকুমারম, তৌমপৈল্লাদা:,
বৎসজরত:, সৌক্ৰপার্থবা:, জরামুহু, বাজ্যাহুবাক্যে।”

কার্ত্তবশ (ক্ৰী) [বৈ] নামভেদ।

কার্ত্তব্যুগ (পুং) কৃতমেব কার্ত্ত, কার্ত্তচালৌ যুগন্তেতি,
কৰ্ম্মধা। সত্যুগ।

কার্ত্তবীৰ্য্য (পুং) কৃতবীৰ্য্যত অপত্যম্ পুমান্। কৃতবীৰ্য্য-অণ্।
১ চক্রবর্তী কৃতবীৰ্য্য রাজার পুত্র। ইহার নামান্তর—হৈহয়,
রোহঃসহস্রভৃৎ ও অর্জুন। মাহিমতীপুরী কার্ত্তবীৰ্য্যের
রাজধানী ছিল। ইনি দত্তাজেয়ের যোগিবলে যুদ্ধ সময়ে সহস্র
হস্ত প্রাপ্তির বর প্রাপ্ত হইয়া তুচ্ছলো সনাপরা পৃথিবী
অধিকার করিয়াছিলেন। লঙ্কাপতি রাবণ সিংহাসন কালে
ইহারই নিষ্ঠুর পরাজিত হইয়া নিগড়বদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে
তাহার পিতামহ পুলস্ত্যমুনি আসিয়া মুক্ত করিয়া যেন। জয়-
দায়িত্ব আশ্রয় হইতে সবৎসা দেখে অগহরণ করিয়া, জয়দায়িত্ব
পরন্তরায় হস্তে কার্ত্তবীৰ্য্যের হস্ত হইয়াছিল। (ভারত-সং-
১৬২-অঃ।) ২ কৈলয়াবর্ত্তকার্ত্তবীৰ্য্য, ইহার অপত্য নাম মুহু।

কার্ত্তবীৰ্য্য (পুং) কার্ত্তবীৰ্য্যোদেবের সিন্ধবংশীয়,
মহাশো। কার্ত্তবীৰ্য্যের উদ্দেশে প্রেরিত হইল। এই নীপ
প্রদানের বিধি যথা উক্তাদেবতত্ত্ব—কোন তরু হান
গোবরগণিত করিয়া, তাহার মধ্যস্থলে বিন্দুত্ব দ্বিকোণ-
মণ্ডল করিতে হইবে। মণ্ডলের বহির্দিকে কুহুম ও মণ্ডলম
মিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা দ্বিকোণ এবং মণ্ডলের মধ্যদেশে কুহুম
লিখিতে হইবে। মন্ত্রের উপর স্বতপূর্ণ প্রদীপ স্থাপন করিয়া
এই মন্ত্র দ্বারা সঙ্গর করিবে—

“কার্ত্তবীৰ্য্য মহাবাহো তত্ত্বানামাত্মরপ্রদ।

গৃহাণ নীপং মনস্তং কল্যাণং কুক্ষ সর্বদা॥

অনেন নীপদানেন কার্ত্তবীৰ্য্যত প্রীরতাং॥”

তত্বেকল কামনার নীপদান কালে একটি প্রদীপ পশ্চিমমুখে
স্থাপন করিবে; অভিচার কার্যে তিনটি প্রদীপ দক্ষিণ, উত্তর
ও পশ্চিমমুখে স্থাপন করিবে এবং নষ্ট বস্ত্র প্রাপ্তিকামনার নীপ
দান করিলে, পাঁচটি হইতে ততোধিক বিষমসংখ্যক প্রদীপ
স্থাপন করিবে। চতুর্বর্ণ কল পাইবার জন্য একশত নীপ দিতে
হয় এবং মারণকার্যে এক সহস্র বা দশ সহস্র নীপ দান বিধেয়।
রৌপ্য, তাম্র, কাংস্ত, লৌহ, মৃত্তিকা, গম, মাষ ও মুগ চূর্ণ
দ্বারা নীপপাত্র নির্মাণ করিতে হয়। স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিলে
কার্য্যসিদ্ধি, রৌপ্যদ্বারা জগৎ বশীভূত, তাম্রদ্বারা শত্রুর নাশ,
কাংস্ত দ্বারা হিংসা কার্য্য সম্পাদিত হয়, মারণ কার্যে লৌহ-
দ্বারা, উচাটনে মৃত্তিকা দ্বারা, যুদ্ধে জয়কামনার গোধূম চূর্ণদ্বারা,
শত্রুমুখস্তম্ভনের জন্য মাষকলার দ্বারা, সন্ধিকার্যে নদীর উত্তর
কূলের মৃত্তিকা দ্বারা, অথবা অন্ত বস্তুর অভাব হইলে সকল
কার্য্যেই কেবল তাম্র দ্বারা নীপপাত্র নির্মাণ করিতে হয়।
এই নীপে কার্য্যদ্বারায় এক, তিন, পাঁচ বা সাতটি
সলিতা অন্নকার্য্যে অন্ন এবং মহৎ কার্য্যে অধিক সংখ্যক
দেওয়াই বিধি। গুরু, পীত, রক্ত, কুহুম, কুহুমাত বর্ণ, কৃষ্ণ ও
বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট সলিতা কার্য্যবিশেষ ব্যবহার করিতে হয়।
অতাবে কেবল গুরু হুয় দ্বারা সলিতা করিলেই চলে।

কার্ত্তবীৰ্য্যের উদ্দেশে এইরূপ নীপদান বিধি দেখিয়া স্বতঃই
সন্দেহ হইতে পারে কার্ত্তবীৰ্য্য এরূপ উপাত্ত কেন? কার্ত্তবীৰ্য্য
দত্তাজেয় হইতে যোগ লাভ করিয়া, অথবা চক্রবর্ত্তারূপে
জয় গ্রহণ করিয়াই এইরূপ উপাসনার যোগ্য হইরাছিলেন।
তাহার ধ্যানমধ্যে চক্রবর্ত্তারূপের উল্লেখ আছে যথা—

“উদ্যৎসুৰ্য্যসহস্রকান্তিরখিলকৌশলৈবৈবন্ধিতো

হস্তনাং শতশক্কেন চ কল্যাপানিসুতোরতা

কর্ত্তে হাটকমালসা পরিবৃত্তচক্রবর্ত্তরো হয়ো

পার্বাৎ কল্যাপানিসুতোরতা—কার্ত্তবীৰ্য্য।”

আমিতক ধার্মিকবঙ্গের কর্তব্য
অসম্ভব প্রভাতে অরুণ প্রভিনঃপ্রভিনে অকলীততি

করিবে। সন্নিহিত দ্বাদশকীয়া শাস্ত্রানুযায়ী, তদানি এই দিবস সর্বত্র বর্ষের শুভাশুভ বিজ্ঞান জ্ঞত কীড়া করা একান্ত আবশ্যিক। এই কীড়ার বাহ্যিক অঙ্গলাভ হয় সংবৎসর তাহারই শুভ হয় এবং বাহ্যিক পরাজয় হয় সংবৎসর তাহার শুভ হয়। কেবল কীড়া কেন এই দিবস—

“যো যো বাহুশভায়েন তিষ্ঠত্যন্তঃ সুবিস্তর।

হবদৈশ্চায়াং তেন তত বর্ষং প্রযাতি হি।”

যে ব্যক্তি যে ভাবে অর্থাৎ আকর্ষণ বা অহর্ষণে কাল-ব্যাপন করিবেন, সংবৎসর তাহার সেইরূপ ভাবে অতিবাহিত হয়। অতএব বাহাতে এই দিবস মনোমুখে অতিবাহিত করিতে পারা যায়, তাহা বলায় সকলেরই মতেই থাকা আবশ্যিক।

অনন্তর দ্বিতীয়া তিথিতে অর্থাৎ দ্বাদশকীয়ার দিবস দীর্ঘজীবন কামনার ভগিনীহস্তে ভোজন করা বিধেয়। এই দিবস সকলকেই স্ব স্ব ভগিনীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সন্মান করা এবং ভগিনীহস্তে সাদরে ও আনন্দপূর্বক ভোজন করা একান্ত আবশ্যিক। উক্ত দিবস বসরাজ, চিত্রগুপ্ত, যমদূতগণ ও যমদার পূজা করিয়া ভোজনকালে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্বক গণ্ডু ব্রহ্মণ করিয়া ভোজন করিবে। কনিষ্ঠ ভগিনী হইলে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে। কথা—

“ব্রাহ্মত্বব্রাহ্মত্বাং হুঙ্কৃত্ত্ব ভক্তমিতং শুভং।

শ্রীতরে বসরাজত যমদার। বিশেষতঃ ॥”

যদি ভগিনী কোটা হন তবে “ব্রাহ্মত্বব্রাহ্মত্বাং” এই বলিয়া গণ্ডু ব্রহ্মণ করিবে।

এতদ্ব্যতীত কার্তিকমাসে গুরুপক্ষে নবমীতিথিতে সোমবারে জ্যৈষ্ঠাষ্মকের উৎপত্তি হয় বলিয়া এই দিবস অতিশয় পুণ্যাহ বলিয়া কীর্তিত। কার্তিকমাসের গুরুপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পঞ্চতিথিকে বকপক্ষ বলিয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে এই সকল তিথিতে বকেরাও মন্ত্র তপস্ব করে না, অতএব বকপক্ষকে কাহারও মাংসাদি ভোজন বিধেয় নহে। এতদ্ব্যতীত ভূতচতুর্দশীর পর অমাবস্যার কালীপূজা, তরুণবরীতে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং সংক্রান্তির দিবস কার্তিকপূজা হইয়া থাকে। পূজা পদ্ধতি নানাবিধ বলিয়া এখানে তাহার কোনও উল্লেখ করা হইল না।

কৌষ্ঠগ্রন্থীমতে এই মাসে বিসি জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি বৃক্ষশাস্ত্রবিদ্যায়, ব্যবসায়গু, নানাবিধ পিঙ্গলজ্যোতিষ, সুবর্ণ এবং অশ্বিনয় সুন্দরাকৃতি হইয়া থাকেন।

পঞ্চমপুরাণমতে—এই মাসে বিষ্ণুকে তুমসীদাস কর্তব্য; ইহা দ্বারা অমৃত, গৌরীমের কল পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র

মতে—সেবহুত; অর্থাৎ তাহা শুভকর। ব্রহ্মবিদ্যায় বিদ্যমান করিবে; ইহাতে অমর কল লাভ হয়। ব্রহ্মপুত্র মতে—

এই মাসে হবিষ্যভোজন করিলে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হয়। হবিষ্য জন্ম কথা—অধির হৈমন্তিকরাত, মূল, তিল, ধন, কলাই, কুম্ভার, দীবারবাতি, বাতক (কোতা) ও হেলেকা-শাক, কালশাক, মূল, সৈন্ধব ও সামুদ্রলবণ, গবাদি, গবাদিত, বাহা হইতে বাধন কুলিরা লব বাই একশ হুঙ্ক; কাঁটাল, আম, হরীতকী, ডেঁকুল, ঝীরা, মাছাদিনে, পিঙ্গুল, কলা, লবঙ্গীকল, আনলকী, ইকু, শুভ, অষ্টলক্ষ জন্ম দ্বারা হবিষ্যের ব্যবস্থা। নারদীয় পুরাণ মতে—মন্ত্র, কুর্বা ও অমৃত সকল জন্তর বাসাই কার্তিকমাসে ভোজন করা নিষিদ্ধ; মেঘে তাহাতে চণ্ডালভূজ্য হইতে হয়। মহাভারতেও সর্বমাংস পরিত্যাগের বিধান আছে। ব্রহ্মপুরাণ মতে—ওল, পটোল, কবচ, বেগুন এক কাংশ্যশাস্ত্রে ভোজনও নিষিদ্ধ। এই মাসে উখান একাদশী, এইমাসে হরি শয্যা ত্যাগ করেন। মন্ত্রবিদ্যাকে যশান্নিবে উপবাস করিয়া শ্রীহরির অর্চনা করিতে হয়। পুরাণে কার্তিকমাসে এই সকল প্রতিপালন করিলে পুণ্যলাভ হয় বলিয়া বর্ণিত আছে এবং প্রতিপালন না করিলেও মরকাদি বিবিধ বাতনার কথা তাহাতে উল্লিখিত আছে। ২ বর্ষবিশেষ; কৃত্তিকা বা রোহিণী নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হইলে, তাহাকে কার্তিক বর্ষ কহে। (মঙ্গলমতঃ)। ৩ (কৃত্তিকানাম্ অগত্যম্) কার্তিকের।

(“দৃষ্ট। তন্ কৃত্তিকাঃ সর্বা ভবিষ্যলয়ানসাঃ।

কার্তিকঃ কথ্যমানঃ সর্বত্র ব্রহ্মভেজসা ॥” ব্রহ্মবৈবর্ত।

৪ চরকাদি চিকিৎসাশাস্ত্রের কঠিন সংগ্রহকার। ৫ বোম্বাই-প্রদেশের কসাই জাতিবিশেষ। ইহার হিন্দু অশুভ।

কার্তিকমহিমা। [ন] (পুং) কার্তিকত মহিমা মাহাত্ম্য, ৩৩৭। ১ কার্তিকমাসের মাহাত্ম্য। ২ কার্তিকেরদেবের মাহাত্ম্য। কার্তিকব্রত (স্ত্রী) কার্তিকে কর্তব্যব্রত, মধ্যলো। প্রাতঃ-দানাদি কার্তিকমাসে কর্তব্য নিয়ম। [কার্তিক লেখ।]

কার্তিকশালি (পুং) কার্তিকে পরিপক: শালি: মধ্যলো। যে সকল ধাত কার্তিকমাসে পাকে তাহার নাম কার্তিকশালি।

কার্তিকনিজ্জাত (পুং) বৃক্ষবোধ্যাকরণের একজন চীফকার। কার্তিকিক (পুং) কার্তিকী পৌরোহিত্যে অগ্নি মাসে, কার্তিক-

উৎ (বিভাঃ) কার্তিকীপ্রবাকার্তিকীচৈত্রীজঃ। পা ৩। ২। ২৩। ১ কার্তিক মাস। ২ কার্তিকী দ্বিত পক্ষ। ৩ কার্তিক-

নাক বর্ষবিশেষ। কার্তিকী (স্ত্রী) কার্তিকত ইন্দ্র, কার্তিক-অপ্-স্ত্রীঃ ১০ বেশ-

স্বর্গকামেশ্বর। ২ নবগমিকার জয়ন্তীর সেবীরিণেশ্বর। ৩ কৃত্তিকা-
নন্দারূপ পুনিয়া।

কার্তিকেশ্বর (পুং) কৃত্তিকানামপত্যন্ পাল্যতেন ইতি শ্বেবঃ ;
কৃত্তিকা-চক্ (জ্যৈষ্ঠ্যোচই। জ্য। ৪। ২। ১০।) শিবপুত্র ;
পার্বতীরহ শিবের কেলি সময়ে তাঁহার বীৰ্য্য ভূমিতে পতিত
হয়, কুনি তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, অগ্নি আবার শর-
বনে নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে কৃত্তিকাগণ গ্রহণ করিয়া
প্রতিপালন করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত।)

কল্পবিশেষে ইনি পুনরুদার অগ্নিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। সেই সময়ে অগ্নিবীৰ্য্যে ও গঙ্গাগর্ভে ইহার জন্ম
হইয়াছিল, তৎপরে কৃত্তিকাগণ ইহার প্রতিপালন করেন।
কৃত্তিকাগণের স্তনপানকালে ইহার ছয়মুখ উৎপন্ন হইয়া-
ছিল এবং তাহাদের প্রতিপালিত বলিয়াই কার্তিকেশ্বর
নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। (রামায়ণ।)

উভয় জন্মেরই একরূপ কারণ জানিতে পারা যায়।
হৃদাঙ্ক তারকাস্থরের উৎপীড়নে দেবগণ নিত্য ব্যতিব্যস্ত
হইয়া বহুচেষ্টায়ও তাহাকে নিধন করিতে পারিলেন না।
তখন ব্রহ্মার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করার, ব্রহ্মা তাঁহা-
দিগকে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে বলেন। তদনুসারে
তাঁহার কল্প সাহায্যে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিলে,
কল্পবর্ষণবিদ্ধ মহাদেব পার্শ্বস্থ পার্বতীর প্রতি সাত্তিলাব দৃষ্টি
নিক্ষেপ করেন, তাহা হইতে প্রথম কার্তিকেশ্বর জন্ম গ্রহণ
করিয়া দেবগণের সেনাপতিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তারকাস্থর
নিধন করেন। অপর কল্পেও ঐরূপ তারকাস্থরের উৎপীড়নে
ব্রহ্মা দেবগণকে অগ্নির আরাধনা করিতে বলেন ; তদনুসারে
তাঁহার অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিলেন। অগ্নি শুকরূপ ধারণ
করিয়া অতি গোপনে মহাদেব সমীপে উপস্থিত হইলে,
তিনি তাহা জানিতে পারিয়া স্তম্ভত বিস্ময় অস্ত্র ফুট
হইয়া খলিত বীৰ্য্য অগ্নির উপরই নিক্ষেপ করিলেন।
অগ্নি রক্তভেজ ধারণে অসমর্থ হইয়া গঙ্গার নিক্ষেপ করি-
লেন। তাহা হইতে কার্তিকেশ্বর দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ
করিয়াছিলেন। ইহার নামান্তর—মহাসেন, শরজয়া,
বজ্রানন, পার্বতীনন্দন, ভঙ্গ, সেনানী, অগ্নিতু, ওহ, বাহ-
লেন, তারকজিৎ, বিশাখ, শিখিবাহন, বাস্মাতুর, শক্তিধর,
কুমার, ক্রোধানর, আগের, বীণকীর্ত্তি, অনঘের, ময়ূর-
কেশব, ধর্ম্মাঙ্গা, ভূতেশ, মহাবীর্জন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত,
সত্যবাক, ভূবেন্দ্র, শিও, গীত, তুতি, চণ্ড, বীণবর্ণ, চতান-
ন, অমোঘ, অজয়, রোজ, প্রিয়, চক্রানন, বীণশক্তি,
প্রোভাতা, তর্কজ, কুটমোহন, বজ্রপ্রিয়, পবিজ, মাতৃবৎসল,

কভাহত, বিভক্ত, বাগের, দেবভীষত, প্রভু, নেতা, ঈশগণের,
হৃহতর, হৃহত, বলিত, বাস্মাতুরপ্রিয়, বজ্রানী, ব্রহ্মচারী,
শূর, শরবনোত্তর, বিশাখিপ্রিয়, প্রিয়ক, মাক, মাদী,
হামণলোভন, দেবসেনাপ্রিয়, বাহুদেবপ্রিয়, দেবসেনাপতি,
বালচর্য্য, ভক্তবাক্সমজ, মহাবাহ, ময়ূরজ, শিখিনজ, পাবকা-
য়জ, রক্তময়, বটুশিরা ও হিঙিজাতক।

কার্তিকেশ্বরের ধ্যান কথা—

“কার্তিকেশ্বর মহাতাপ ময়ূরোপরি সংস্থিতম্।

তপ্তকাকনবর্ণাত শক্তিহন্ত বরপ্রদম্॥

যিত্ত্বজ শক্তহস্তার নানালঙ্কারভূষিতম্।

প্রসন্নবদনং দেবং সর্বসেনাসমাবৃতম্॥”

মহাতাপ কার্তিকেশ্বর ময়ূরের উপর অবস্থিত, তপ্তবর্ণের
জ্ঞায় বর্ণবিশিষ্ট, শক্তিহন্ত, বরদাতা, যিত্ত্বজ, শক্তনালন,
নানালঙ্কারভূষিত, প্রসন্নমুখ এবং সমুদার সেনাপরিবৃত।

(কার্তিকপূজাপদ্ধতি।)

অনেকের বিশ্বাস যে কার্তিকেশ্বর বিবাহ হয় নাই, তিনি
চিরকাল অবিবাহিত অবস্থায় আছেন। কিন্তু তাহা ভ্রম
মাত্র। ইহার পত্নী দেবসেনা, এই দেবসেনাকেই আমরা
বজ্রদেবী বলিয়া থাকি। বোধ হয়, কার্তিকেশ্বরের বজ্র পত্নী
বলিয়াই অনেক হিন্দু পুত্রকামনার কার্তিকেশ্বরভ্রত করিয়া
থাকেন। দেবসেনার অস্ত্র ও বাহনাদি কার্তিকেশ্বর সমান।
মার্কণ্ডেয়পুরাণে বর্ণিত আছে—

“কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরোপরি সংস্থিতা।

বোদ্ধমভ্যাববৌ তজ্জ অধিকা ওহরুপীগী॥”

কুমারশক্তি কার্তিকেশ্বরসদৃশ সৃষ্টিধারণ ও শক্তিগ্রহণ
করিয়া ময়ূরবাহনোপরি আরোহণপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত
যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন।

কার্তিকেশ্বরপুর, উত্তর-পশ্চিমাংশে কুমারউন জেলার মধ্যে
দানপুর পরগণার হুজুর নামক তহসীলের অন্তর্গত নগর।
এখন এ স্থানের নাম বৈদ্যানাথ বা বৈজনাথ। ইহা অক্ষা-
২৯° ৫৪' ২৪" উ ও দ্রাঘি ৭৯° ৩২' ২৮" পূঃ মধ্যে অবস্থিত।
এখানে রাঙ্কলা নামক একটা পুরাতন দুর্গ আছে। তাহার
মধ্যে এক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। আরও কয়েকটা
পুরাতন মন্দির পড়িয়া আছে, তাহাতে কোন মূর্ত্তি নাই। সে-
গুলিতে এখন শতাব্দী রাখা হয়। চীনপরিভ্রাজক হিউএন্-
সিয়াংএর বর্ণনার জানা যায়, খ্রীস্ট শতাব্দীতে এখানে
বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। মন্দিরের দেওয়ালের একস্থানে
বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। একস্থানীয়
আরও অনেক মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। উত্তরপালদেবের

বোধিত ২ বৎসর অন্তর লিপি এখানে আছে। তাহার উপর ক্রমান্বয়ে কল পড়িয়া তাহার অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে। এখানে ১১২৪ শকে ইঙ্গদেবের আদত একশত তালিলিপি অব্যাপি আছে। পুরাতন মন্দিরগুলির একটিকে এক বিহ্বলি আছে। তাহার দিগে ১৪২১ শক ও একটা গণেশের মূর্তির দিগে ১১২৫১২৪৪ শকও দেখা আছে।

কার্তিকেশ্বরপ্রসূ (জী) কার্তিকেশ্বর প্রভৃতে বা, কার্তিকেশ্বর-প্র-কৃষ্ণ। হুগা, পার্শ্বকী। বহিঃ পার্শ্বকীতে শিববীৰ্য পতিত। হইবার কালে দেবগণ বিয় উৎপাদন করায়, তাহা ভূমিতে পতিত এবং তথা হইতে শরবনে পতিত হইয়া কার্তিকেশ্বরের জন্ম হইয়াছিল, তথাপি বীৰ্য্যপতন বিষয়ে পার্শ্বকীই মূলকারণ, এতদ্বা তাহা কার্তিকেশ্বরপ্রসূ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

কার্তিকোৎসব (পু) কার্তিকায় কার্তিকীপৌর্ণমাস্য ভবঃ উৎসবঃ। কার্তিকী পূর্ণিমা।

কাক্র্য (পুং) কর্তৃরপত্যম্, কর্তৃণ্য (কুর্বাদিত্যো প্যঃ। পা ৪।১।১৫১।) কর্তার পুত্র।

কাৎপ্স (স্ত্রী) কৃৎসত ভাবঃ, কৃৎস-অণ্। ১ সমুদার। ২ সম্পূর্ণতা। কাৎস্র্য (স্ত্রী) কৃৎসত ভাবঃ, কৃৎস-বাঞ্। ১ সাকল্য, সমুদার। ২ সম্পূর্ণতা।

কাৎস্রোয় (অব্যয়) সমুদাররূপে, বিশেষরূপে।

কার্দম (ত্রি) কর্দমেন রক্তম্, কর্দম-অণ্। (শকলকর্দমাভ্য-মুপসংখ্যানং ইত্যত্র অগণীতি বৃত্তিকারঃ। পা ৪।২।২ বাঃ) কর্দম দ্বারা বে বস্ত্র রক্ত করা হয়; কাঁদার ছোপান কাপড়।

কার্দমিক (ত্রি) কর্দমেন রক্তম্, কর্দম-ঠক্ (শকলকর্দমাভ্য-মুপসংখ্যানম্। পা ৪।২।২ বাঃ) কাঁদার ছোপান কাপড়।

কাপটি (পুং) কর্ণটিব আকারো হত্যতি, কর্ণটি অণ্। ১ জড়, জো। ২ কার্যপ্রার্থী, উদ্দেশ্য। (কাপটি জড় কার্যপ্রার্থীঃ। মেদিনী।)

৩ (কর্ণটি এবং-বর্ধে অণ্) কীর্ণিত্ব ষণ্ড, নেকড়া।

কাপটিগুণ্ডিকা (স্ত্রী) কাপটিংন ষণ্ডবয়শ্চ ওণ্ডা, ওণ্ডং, কাপটিওণ্ডা-বর্ধে কন্-টাপ্ অত ইষদ্। ১ বেটু। ২ মূল।

কাপটিক (পুং) কাপটিং অন্ততয়া যেন্তি, কর্ণটেন চরতি বা কর্ণটি-ঠক্। ১ মর্দবেদী। ২ ভীষণবাক্যসেবক।

“সারং ত ভৈব বহিঃ সঙ্কটবতোত্তমেন।

সমাক্ষং কর্ণটিকঃ সোহমরশাশ্রিতঃ সঃ” কথায়কি না।

কাপট্য (স্ত্রী) কপপত ভাবঃ, কপপ-বাঞ্। ১ কপপতা। ২ বীণতা।

কার্পাস (স্ত্রী) [ইং] হুগা।

কার্পাস (পুং স্ত্রী) কর্পাস এবং, বার্ধক্যক্। ১ কপকপ গাছ। ইংল্যান্ডে ইহার পত্রাধি দ্বারা পশুদিগে নিয়ন্ত্রিত হয়। টিকিৎসাক্রম বধা-ভুগংশর মাজই রোগকে কাপাস পাতার রস দ্বারা ভোজ্য পান করাইবে এবং কত জন জনদ্বারা পরিচাল্য করিয়া এই পাতার রস তাহাতে মর্দন করিবে। এই সময়ে শরীরের যে কোন স্থান ফুলিয়া উঠিবে, সেই স্থানে এই পাতার রস মাখাইরা দিবে।

কার্পাস বা তুলা—হুগা কেশবৎ, অথচ মনম ওজ পদার্থ। ইহা কার্পাস নামক বৃক্ষের ফুলের মধ্যে থাকে। কার্পাস-বৃক্ষ এদেশে অনেক আছে। এই আভীরবৃক্ষ পৃথিবীর উচ্চ এদেশেই প্রায় দেখা যায়। ইংরাজী উদ্ভিদবিদগণ এই গাছ Malvaceae শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। ইহার ইং-রাজী বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium। কার্পাসের কয়েক প্রকার তেদ আছে। যথা—

১, Gossypium arboreum—বাঁকালায় ইহার নাম দেব-কার্পাস, হুরমা; গাঁওভালীরা বৃদি কাসকম্, ভোগকাসকম্; বৃন্দেলখণ্ডে বোগালি ও হুরমা; উত্তরগুজিতে মছরা, রদিয়া ও হুরমা; পঞ্জাবে কাপাস; মহাভারতে মছরা, দেব; বোম্বাইয়ে দেব কাপাস; মহারাষ্ট্রে দেও কাপাস, মহীছরে দেওকাপাস, তামিলভাষার সেমপাকথি; তৈলঙ্গীভাষার পটি ও ব্রহ্মদেশে হুওয়া বলে।

২, Gossypium herbaceum—ইহাকে বাঁকালা ভাষায় কাপাস বা তুলা; সংস্কৃত কার্পাসী, কার্পাস; হিন্দিতে কই বা কপাস; পঞ্জাবে কই; সিন্ধুদেশে বোম; বোম্বাইয়ে কাপাস, কই; গুজরাটে ক, কাপাস; দাক্ষিণাত্যে কপাস; তামিলভাষার বনপরতি বা পার্শ্বকি; তৈলঙ্গীভাষায় পাউতি, এছদি, পরতি বা পরিতি; ব্রহ্মদেশে ওরা বা বা; আরবীতে কতান্ বা উহুল ও পারসীতে গব নামে প্রচলিত।

৩, এদেশে আর একপ্রকার তুলা আছে, তাহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium barbadense; এদেশে মার্কিন তুলা বলে।

কার্পাস বৃক্ষগুলি অগ্নিকারিত হুগা। পত্রগুলি করাকার বা হস্তের মত, যেম তিনটি পত্র একত্র সংলগ্ন হইয়া গঠিত। মধ্যের অংশটা অগ্নিকারিত বড়। ডাল হইতে বহুতর কুঁড়ি নির্গত হইয়া হরিজাফেরে ফুল হয়। কুঁড়ি ফুলিয়া তাহার ভিতর হইতে তুলা বাহির হয়। কুঁড়িগুলি পুতা দিয়া প্রাক্ত থাকে। ফুলিবার সময় ঢাকা অংশ প্রসারিত হইয়া যায়। বৃক্ষ-মতর ফুলত হইয়া থাকে। ফুল ফুলিয়া

তুল্য সংগ্রহ করিতে হয়। নতুন রোজ ও লিপিরে তাহা
কই হইয়া যায়। কর্পাসের পাকড়ার মধ্যে বীজ থাকে।
তুল্য তিতর হইতে বীজগুলি বতর করিয়া লইতে হয়।

হানিজেনে কার্পাস বীজবপনের সময় নির্দিষ্ট আছে।
সচরাচর আখিন ও কার্তিক মাসই বপনের উত্তম সময়।
হাই গোবর বা সোরা অথবা এই তিন একত্র করিয়া জলে
গুলিয়া তাহাতে বীজগুলি ডিকাইয়া রাখিতে হয়। একদিন
রাখিয়া বীজগুলি লইয়া খানিকক্ষণ রোজে শুকনাইয়া লইতে
হয়। অধিক শুক করাও নিবিদ্ধ। তাহার পর ভালরূপ
করিত জমিতে ১ হাত বা ১১ হাত অন্তর ৪।৫ অঙ্গুলি
পরিমাণ গর্ত করিয়া ৩।৪ টা করিয়া বীজ রোপণ করিয়া
আদা মাটি চাপা দিতে হয়। অন্নদিন পরেই চারা
বাহির হইবে। চারাগুলির মধ্যে বেগুলি উৎকৃষ্ট,
সেগুলির মধ্যে ২টা মাত্র সেইখানে রাখিয়া অপরগুলি
লইয়া হানাতরে প্রোথিত করিবে। গাছ বাহির
হইলে আগাছা নষ্ট করিতে হয়। কর্পাসের বীজ বড়
কেলিবার নয়। ইহার খইলে উত্তম সার প্রস্তুত হয়।
কোন জমিতে উপযুক্ত ২০ বৎসর কর্পাস জন্মিলে, তাহার
পর তাহাতে আর ভালরূপ জন্মে না। কিন্তু কর্পাসবীজের
খইল দিলে জমির উর্বরতা শক্তি কতকটা থাকিয়া যায়।
সকল প্রকার খইলই কর্পাসের জমিতে সাররূপে দেওয়া
হয়। খইল ভালরূপ চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত শুক মুস্তিকা
সমান ভাগে মিশাইয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে, তাহার
পর উহা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য। সচরাচর প্রতি
বিঘার অর্দ্ধ মণ বা একমণ তুলা হয়। কিন্তু বিশেষ যত্ন
করিলে এক বিঘার ৬/৮ মণ কর্পাস পাওয়া যাইতে
পারে। এক বিঘা চাষের এইরূপ খরচা ধরা যাইতে পারে।
বথা—চাষ ১/০, আলিবাধা ৮/০, বপন ৮/১০, জলসেচন
৮/০, নালা ৮/০, নিড়ান ২৮/০, গাছ পাতলা করিয়া দেওয়া
৮/০, কর্পাসসংগ্রহ ৮/০, সার ও ভূমির কর ২৮/১০, সমুদারে
৮।০। কিন্তু সকল ভূমিতেই সমান পরিমাণে তুলা জন্মেনা,
সকল জমিতে খরচও সমান নহে।

বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত স্থানে কোন সময় বৃক্ষ রোপণ করা
হয় আর কোন সময় তুলা সংগ্রহ করা হয়, তাহার তালিকা
দেওয়া যাইতেছে—

	বপনের সময়।	তুলিবার সময়।
কটক	{ জ্যৈষ্ঠ কার্তিক	আখিন চৈত্র
চট্টগ্রাম	{ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ	অগ্রহায়ণ পৌষ

বারভাঙ্গা	{ কার্তিক জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	চৈত্র, বৈশাখ
মানভূম	{ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় অগ্রহায়ণ, পৌষ	অগ্রহায়ণ, পৌষ চৈত্র, বৈশাখ
মেদিনীপুর	{ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় কার্তিক	আখিন চৈত্র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
লোহারডাঙ্গা	{ কার্তিক আষাঢ়	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ অগ্রহায়ণ, পৌষ
সারণ	{ আষাঢ় মাঘ	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ভাদ্র, আখিন

বঙ্গদেশের মধ্যে কটক, চট্টগ্রাম, বারভাঙ্গা, মেদিনীপুর,
মানভূম, লোহারডাঙ্গা, সারণ, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি
স্থানেই অধিক পরিমাণে কর্পাস জন্মিয়া থাকে। পটনা অঞ্চলে
খালি থাকি রক্তের একপ্রকার কর্পাস জন্মে। সাঁওতালগণ
ইহাকে খড়ুয়া কাপাস বলে। তাহারা শ্বেতবর্ণের কর্পাসকে
হালুয়া-কাপাস বলিয়া থাকে। সারণ ভাগখা, ভোচরি,
কতুয়া, কোকতা প্রভৃতি নামীর তিস রক্তের তুলা জন্মে।
গয়া অঞ্চলে ব্রাইসা বা বকীর, রাটী, ভোচার এই তিন
প্রকার দেখা যায়। বারভাঙ্গা অঞ্চলের কোকটা, তৈরা ও
ভাগলা এই তিনপ্রকার কর্পাসের নাম প্রচলিত। কটক
অঞ্চলে আচুয়া ও হলদিয়া এই দুইপ্রকার প্রসিদ্ধ।

ভারতে কর্পাসের কাটতি পূর্বে বিলক্ষণ ছিল। এক্ষণে
উৎপন্নের অধিকাংশই রপ্তানি হইয়া যায়। রপ্তানি কর্পাসের
অনেক নামভেদ দৃষ্ট হয়। নিয়ে কয়েকটীর সংক্ষেপে বিবরণ
দেওয়া গেল। ইংরাজ মহাজনের হাত দিয়া রপ্তানি হয়
বলিয়া অনেকগুলি ইংরাজী নাম হইয়াছে। যথা—

ধল্লেরা—বরদা, কচ্ছ ও কাঠিবাড়প্রদেশ হইতে রপ্তানি
হয়। ইহার ভাওনগর, মউরা, বাদবাহির, বীরুমাণী, বেরাবল,
কচ্ছ এই কয়েক প্রকার ভেদ আছে।

বাঙ্গাল—বাঙ্গালা, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম, রাজপুতানা ও
মধ্যভারতে অধিকাংশ জন্মে।

অমরা বা অমরাবতী—ইহার আবার প্রকার ভেদ আছে।

খানেশ—খানেশ হইতে আনীত।

ওমরা—বেবার প্রদেশে জন্মে।

বিলাতী খানেশ—অমরাবতী প্রভৃতি স্থান হইতে
আসিয়া থাকে।

ওয়েটারনল—মাদ্রাজ, নিজামরাজ্য ও পশ্চিম ভারত।

বারবার—বারবার, বিজয়পুর ও দক্ষিণমহারাজ্য হইতে
আসিলে।

সুবভা—বিজয়পুর, বেলগাম, কোলাপুর ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে জন্মে।

বরোট—বরগা, বরোট ও সুরাট প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত।

কোকনম—বর্ণ লাগ, মাস্তোজের অন্তর্গত কুকা বেলায়, নেমোরে ও পোদাবরী প্রদেশে জন্মে।

জিনবরী—জিনবরী, কোমেরাকুর, তাকোর প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া ছুঁউকুড়ি হইতে রপ্তানি হয়।

হিঙ্গনবাট—মধ্যপ্রদেশে জন্মে ও বোম্বাই হইতে রপ্তানি হয় সিঙ্—সিঙ্দেশজাত।

আসাম—আসামজাত।

কার্পাসের অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপাদন করিবার রীতি ও প্রণালী লক্ষিত হয়।

কার্পাসের আঁশ বড় লম্বা হইবে, বড় ঘূট হইবে, আর বড় পরিষ্কার হইবে, ততই উৎকৃষ্ট বলিয়া পণ্য।

কার্পাসের ইতিহাস।—ভারতবাসী কতকাল হইতে তুলার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বেলেও ইহার বিবরণ আছে—

“মুখো ন শিলা ব্যদন্তি মাধ্যঃ

স্তোতাং তে শতক্রতো বিভং মে অন্ত রোদনী।”

ঋকসংহিতা ১। ১০৫। ৮।

মুখিক যেমন সূত্র কাটরা নষ্ট করে, সেইরূপ হে শতক্রতো! আবি তোমার স্তোতা, হুঃখ আমাকে সেইরূপ নশ্বন করিতেছে।

সায়ণ ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে তত্ত্ববাসের সূত্রগুলিতে ভাতের মাড় দেওয়া থাকে, বলিয়া ইন্দুরেরা খাইতে ভাল বাসে। সূত্ররা ইহা স্বচ্ছন্দে অতুমান করা বাইতে পারে যে তৎকালে কার্পাস হইতে বস্ত্রবস্ত্রের প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। [বন দেখে।]

সূতার মাড় দিয়া সূতাকে কঠিন করিবার ব্যবস্থাও তখন প্রচলিত ছিল। এরূপ না হইলে মুখিকের তাহার উপর এত সোত হইবে কেন? (আখ্যায়নশ্রোতসূত্র ৯। ৪ ও লাক্ষ্যায়নশ্রোতসূত্র ২। ৬। ১ প্রভৃতি বৈদিক সূত্রে কার্পাস শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।) কার্পাসের ব্যবহারের কথা মহাসংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

“কার্পাসমুপবীতং ভাষিপ্রভোঃ কুতং জিহ্বং।” যজু ২। ৪৪।

ব্রাহ্মণের উপবীতসূত্র কার্পাসের সূতা হইতেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যিক। এই জড়ই বোঁধ হয় মন্দির ও মন্দির নিকট কার্পাস বৃক্ষ দেখা যায়।

“ন কার্পাসাং ন তুল্যং দীর্ঘবায়ু জিহ্বাবিন্।” যজু ১০। ৪৪।

যজুর মতে—তুলার বীজ, তুল এই সকল জীবের উপর আরোহণ করিবে না।

“কার্পাসীকীটোপাণাং শিশুকৈশবকত চ।

পক্ষিগজোবরীনাং রজ্জ্বাটৈব জাহং পরাঃ।” যজু ১১। ১৩৯।

বাজবল্যসংহিতায় এইরূপ বিধি আছে—

“শতে দশপলং বুদ্ধির্যোশে কার্পাসসৌজিকং।

যশ্যে পক্ষপলাং সূত্রে যশ্যে তু জিপলাং যজ্ঞা ॥” যজু ১১। ১৪২।

উর্ধ্বসূত্র ও হল কার্পাস সূতার শতকরা মাড় দিয়া ১০ পল বুদ্ধি করিবে, মাকারি কাপড় ৫ পল ও সূত্র হইলে ৩ পল দিবে।

“তত্ত্ববাসো দশপলং দদ্যাদেক পলাধিকম্।

অতো হস্তথা বর্তমানো দাপ্যো বাদশকং দদম্ ॥” যজু ৮। ৩৯৭।

তত্ত্ববাস কাপড় বুনিবার জন্য গৃহস্থের নিকট হইতে ১০ পল সূতা কইলে, মাড় দিবার নিমিত্ত গৃহস্থকে ১১ পল সূতা দিতে হইবে। যদি ইহার নূন দেয়, তবে (রাজকর্তৃক) দাদশ পল দণ্ড হইবে।

ভারতে বহুকাল হইতে কার্পাসের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও পাশ্চাত্যদেশে তাদৃশ ব্যবহার ছিল না। ভারত হইতেই পশ্চিমে ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া ক্রমে ব্যবহৃত হয়, তাহা বেশ বুঝা যায়।

সম্ভবতঃ আরবী “কতান” শব্দ হইতেই যুরোপের ইতালীয়গণ “কতোন”, ফরাসিরা “কোতান”, ইংরাজেরা “কটন” শব্দ পাইয়া থাকিবেক। কিন্তু পারসী “কুরপাশ” শব্দ সংস্কৃত কার্পাসের অপভ্রংশ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গ্রীক “করপসন” শব্দে পাট বুঝায়। গ্রীক-ভৌগোলিক হিরোদোটাস্ ভারতের কার্পাসবিষয়ে নিজ পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন; “তৎকার বস্ত্রবস্ত্রের ফল হইতে একপ্রকার পশম বাহির হয়, সৌন্দর্য্যে উহা মেঘের লোম হইতেও উৎকৃষ্ট—ভারতবাসী উহা হইতে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে।” থিসফ্রাটিস্ নামক আর এক জন ভৌগোলিক কার্পাসের বৃক্ষ দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। আলেকজান্ডারের নৌসেনার অধ্যক্ষ নিরাকাস্ ভারতবাসীর পরিধেয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, “উহার গাছের পশমের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা পরিধান করে। তাহাতে পানের মধ্যদেশ পর্যন্ত আবৃত থাকে। তাহার উপর বহুদেশে এক-খানি চামর আর মস্তকে একটা উকীল, ইহাই তাহাদের সমস্ত পোষাক।” ছই নহে বৎসর অতীত হইয়া গেল, ভারতবাসীর এখনও এই পরিধেয়। এখন শতাব্দীতে এরিয়ান নামক

একজন গ্রীকব্রহ্মচারী আরব উপসাগর হইতে ভারতবর্ষে বরোচ নগরে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজ পুত্রকে লিখিয়াছেন, আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে লোহিত সাগরের উপকূলে অছিন নামক স্থানে কার্পাস লইয়া গিয়া ব্যবসার করিতেন। ক্রমে তথা হইতে ভারতের পাতিয়াক, অরিরক ও বারিগাঙ্গা (আধুনিক বরোচ) নগরের সহিত বাণিজ্য স্থাপিত হয়। বরোচ হইতে তথার কার্পাসবস্ত্র রপ্তানি হইত। পূর্বে ভারতে মল্লিয়া (আধুনিক মসলিপতন) নামক স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইত। তাহা হইতেই মসলিন শব্দ হইয়াছে। ঢাকার মসলিন তখনও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। গঙ্গার কূলে যে সকল বস্ত্র হইত, গ্রীকগণ তাহাকে গাভিত্তিকি বলিত। চারিদিকেই ভারতের কার্পাসবস্ত্রের আদর দেখা যাইত। ক্রমশঃ আরব হইতে পূর্বদিকে পারস্যে ও পশ্চিমদিকে গ্রীস ও রোমে কার্পাসবস্ত্রের রপ্তানি হইতে লাগিল। তুলা যে কি পদার্থ, তখন সেদিকে কেহ লক্ষ্য করিল না। বস্ত্র পাইয়াই তুষ্ট। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তুলার চাষের দিকেও লক্ষ্য পড়িল। তুলার চাষ ক্রমে ক্রমে ভারত হইতে পারস্য, পারস্য হইতে আরব, আরব হইতে মিসর, মিসর হইতে আফ্রিকার মধ্যভাগ ও পশ্চিমভাগে বিস্তৃত হইতে লাগিল। পারস্য হইতে তুরকে ও তথা হইতে যুরোপের দক্ষিণ বিভাগে কার্পাস বস্ত্রের চাষ চলিত হইল। যুরোপীয়গণ কার্পাসজাত তুলা হইতে লেপ বাসিস, কেহ বা কাগজ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

চীনের সহিত ভারতের বহুকাল হইতে বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু চীনে তখনও কার্পাসবস্ত্রের চাষের কোন চেষ্টা হয় নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুটী নামক সম্রাট একখানি কার্পাসবস্ত্রের পরিচ্ছদ উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। তিনি উহার বড়ই আদর করিতেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীনের লোকে গুলিল যে একপ্রকার বৃক্ষ হইতে কার্পাস জন্মে, ঐ বৃক্ষ বড় শোভাময়, একজ্ঞ চীনেরা বাগানে কার্পাস বৃক্ষ রাখিতে লাগিল। কিন্তু কেহই রীতিমত চাষ করে নাই। এই জাতি রক্ষণশীল, সহসা কোনপ্রকার পরিবর্তন করিতে বা নূতন সামগ্রী গ্রহণ করিতে চাহে না। সুতরাং চীনে তুলার অনেককাল আদর হইল না। ক্রমে সেখানেও উহার চাষ বাড়িতে লাগিল। এখন চীনেরা কার্পাসের আদর বুঝিয়াছেন। কি ছোট কি বড়, চীনেরা সকলেই কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করেন। কার্পাস ভারত হইতে আসিয়া, যুরোপ ও আফ্রিকার গিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু

আমেরিকাজেও কার্পাসবস্ত্র দেখা যায়। কখনো কখনো আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন তথার কার্পাসের ব্যবহার দেখিয়াছেন। কিন্তু ভারত হইতে উহা আমেরিকায় গিয়াছে, কি আমেরিকায় স্বভাবত জন্মে; কি আমেরিকায় লোকে আপনাদি উহার গুণ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? সম্ভবতঃ শেবোক্ত অলুমানই গ্রাহ্য হইতে পারে।

মুসলমানগণের অভ্যুত্থান সময়ে তাঁহারাও কার্পাসের ব্যবহারপ্রণালী সম্বন্ধে চারিদিকে জ্ঞান বিস্তার করেন। সেই জ্ঞান ইতালী ও স্পেনে বিস্তৃত হইল। ক্রমে ওলন্দাজেরা স্বয়ং কার্পাস হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের লোকে তাহা দেখিয়া ঐ সকল ব্যবহার আদর করিতে শিক্ষা করেন ও ওলন্দাজদিগের অঙ্ককরণে কার্পাসের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড তুরক হইতে কার্পাস সংগ্রহ করিতে লাগিল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার অধুমতি পাইলেন। ভারত হইতে অস্ত্রান্ত্র ব্যবহার সহিত ইংলণ্ডে কার্পাস ও কার্পাসনির্মিত বস্ত্রের আমদানী হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে কার্পাসবস্ত্র আসিত বলিয়া এই বস্ত্রের নাম কেলিকো হইল। কার্পাসনির্মিত বস্ত্রের উপর ছাপ দেওয়া হইলে, তাহাকে কেলিকো প্রিন্টিং বলিত।

কার্পাস ছিট বস্ত্রের বিলাতে তখন বড়ই সমাদর। সমাদর এত বাড়িল, যে বিলাতের লোকে ইংলণ্ডের পশমের বস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া কার্পাস বস্ত্রই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল।

বিলাতের অল্প লোকে পশম ও তুলার প্রভেদ জানিত না; তাহাদের নিকট সকলই পশম। সুতরাং তাহারা বলিতে লাগিল যে কোথা হইতে গাছের উপর কি একপ্রকার পশম হয়, তাহা লইয়া আমাদের দেশের পশম নষ্ট করিল। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পশমব্যবসায়ীগণ দেশের লোকের নিকট চুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য একখানি পুস্তক বাহির করিল। পুস্তকের নাম "The ancient Trades decayed and repaired again"। অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল; চারিদিকে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে লাগিল। গবর্ণমেন্ট আর হ্রি থাকিতে পারিলেন না। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে একটা আইন হইল; আইনের আদেশে নিজের গার্হস্থ্য প্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ নিজের শোবাকের জন্য বা গৃহস্থিত জব্যাদির জন্য কাপাস ছিট বস্ত্র ক্রয় করিলে জেজার বা

বিক্রেতার ২০০ পাউণ্ড বা দুই হাজার টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু কার্পাসের উপর লোকের এমনি ঝোক যে পোপনে উহার ব্যবহার চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডেই ভারতীয় বস্ত্রের উপর ছাপ দিয়া হিট ও ভারতের হিট উভয়ে মিলিয়া পশমের আদর ক্রমশঃই হ্রাস করিতে থাকিল। এদিকে বাতির সলিডার জন্ত কার্পাসের মত সামগ্রী আর নাই। ইহা সাধারণের প্রয়োজন, সুতরাং অন্ততঃ ইহার জন্তও কার্পাসের প্রয়োজন। আইন ইহা নিবারণ করিতে চাহেন না। ভারতীয় কার্পাস যে দেশীয় পশমের অনিষ্ট সাধন করিবে, এ সম্বন্ধে পার্লামেন্টে অনেক তর্ক হয়। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ তারিখে পার্লামেন্টে ঘোরন্তর তর্ক বিতর্ক হয়। তাহাতে স্থির হয় যে বৎসর বৎসর এক কার্পাসের হিসাবে ৮ লক্ষ করিয়া টাকা বিলাত হইতে বাহিরে বাইতেছে। এরূপ অর্থনাশ জাতীয় স্বার্থের বিশেষ অনিষ্টকর। ইতিহাসের সেই কথা এখন ভারতে প্রতিকলিত। মনসাংহেব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি ১৬২১ খৃষ্টাব্দে হিসাব করিয়া দেখেন যে, বৎসর ৫০,০০০ খণ্ড করিয়া কার্পাসবস্ত্র বিলাতে আমদানী হয়। এক খণ্ড ক্রয় করিয়া জাহাজে আনিতে খরচ পড়ে ৩০ টাকা, আর বিলাতে উহা বিক্রয় হয় ১০০ টাকার। সুতরাং লাভ যথেষ্ট। কোম্পানি এতলাভ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। আমদানী যত অধিক হইতে লাগিল, লাভের ভাগও তত বাড়িতে থাকিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডিকো সাংহেব ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালিক “Weekly Review” নামক পত্রে লিখিলেন যে, “ভারতের সহিত এই বাণিজ্যে পশমের কারবার অর্ধেক নষ্ট হইল, ইংলণ্ডের অধিবাসীর অর্দ্ধাংশ শস্যের মত অন্নহীন হইয়া গেল।”

১৭২০ খৃষ্টাব্দে আবার একটা আইন হইল, তাহাতে কি ইংলণ্ড, কি স্কটলণ্ড, কি আয়ারলণ্ড কোথাও কোন ব্যক্তি কোনপ্রকার কার্পাসবস্ত্র সঙ্গে পরিধান করিতে পারিবেন না, করিলে ৫০০ টাকা জরিমানা হইবে। আবার বিধানার বাসিলে জানালার পর্দাতে অথবা অন্ত কোন প্রকার কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না, করিলে ২০০ টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু আইন হইলে কি হয়, ইংলণ্ডের মহিলাগণের কার্পাসের দিকে নজর পড়িয়াছিল। বেশভূষার আইন তাহাদের হস্তে। পুরুষের আইন কি করিবে। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পুরুষজাতিকে আইনের কঠোরতা হ্রাস করিতে হইল। পরে আইন হইল যে, কার্পাস বস্ত্রের টানা বসি (স্লিনেন) পাঠের সূতা বহন, তাহা হইলে

ইংলণ্ডে কেবল ইচ্ছা করিলে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন। তাহার পর ৩৫ বৎসর মধ্যে ওয়াট আর্করাইট প্রভৃতি সাংহেব নানাবিধ কলের সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে বহুবিধ অলংকৃত ও নতুন প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হইল। কল কারখানার বস্ত্রবরনের জন্ত তখন কার্পাস-তুলার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ভারতের লক্ষ্যমণ্ডলের সূত্রপাত হইল। ভারত হইতে কার্পাসবস্ত্রের পরিবর্তে কার্পাস-তুলা ইংলণ্ডে নীত হইল। কল কারখানার অনেক তুলার প্রয়োজন। ভারতের তুলার উপর আবার আমেরিকার তুলাও তথায় বাইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মার্কিনতুলা আমদানী চলিল। ইতিপূর্বে আমেরিকার তুলা ইংলণ্ডে আসিত না। ক্রমে মার্কিনতুলা অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডে আমদানী হইতে লাগিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইচ্ছা, ভারত হইতে অধিক পরিমাণে তুলা যায়। কিন্তু মার্কিনতুলা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। সেইজন্য আদর বেশী। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা ভারতের গবর্নরজেনেরলকে ভারত হইতে উৎকৃষ্ট তুলা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্ত পত্র লিখিলেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, ইংলণ্ডের বাজারে মার্কিন তুলার সহিত ভারতীয় তুলার বিলম্ব প্রতিনিবৃত্তা চলিয়াছিল। এই বন্দে কখন ভারতের, কখন বা আমেরিকার জয়লাভ হইয়াছে। আমেরিকার লম্বা আঁশযুক্ত তুলার আদর, আর ভারতের ছোট আঁশযুক্ত তুলার অনাদর ক্রমশঃই অধিক হইতে লাগিল। তাহার উপর ভারতের তুলার অধিক ভেজাল দেওয়ার অনাদর আরও বাড়িল। কিন্তু ইংরাজেরা এদেশে আমেরিকার মত তুলা প্রস্তুত করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখানকার কৃষি ও পুস্পসমিতির সভ্যগণ ও অস্ত্রাঙ্গ অনেকে এই উদ্দেশ্যে বিশেষ চেষ্টা করিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকট আখড়া নামক স্থানে ৫০০ বিঘা জমি লইয়া কার্পাসের চাষ করা হইল। তিন বৎসর পরে দেখা গেল, কোন বিশেষ ফল হয় নাই। এজন্য উহা পরিত্যক্ত হইল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে বীজ ও নূতন নূতন লাঙ্গল লইয়া মনজন পারদর্শী লোক ভারতে আনীত হইল; তন্মধ্যে তিন জন বোম্বাই, তিন জন মাদ্রাজ, আর চারি জন বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল। অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু শেষে কোন স্থায়ী ফল দাঁড়িল না। শেষে মার্কিন কার্পাসের বীজ এদেশের কৃষকগণকে স্বেচ্ছায় হইল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুদ্ধ হইলে তাহাতে তথাকার

তুলার আমদানী বন্ধ হয়। ইংরাজেরা ভারতে বাহাতে আমেরিকার মত তুলা জন্মে, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতের তুলাও খুব কাটতি হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনকোটি টাকার কার্পাস মাত্র বাইত। কিন্তু ১৮৬৬ অব্দে ৩৭ কোটি টাকার তুলা রপ্তানি হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকার বিসমার্ক মিটিয়া গেল, অমনি রপ্তানি কমিয়া গেল, সে বৎসর ৮ কোটি টাকারও কম মাল রপ্তানি হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইপ্রদেশে একজন ও মধ্যপ্রদেশে একজন কটন কমিসনের নিযুক্ত হইলেন। ঐ বর্ষে বোম্বাইয়ে তুলার ভেজাল নিবারণের জন্ত আইন হইল। শেষে বিদেশীর বীজ ছাড়িয়া দিয়া ধনু দ্বারা দেশীয় কার্পাসের উন্নতির চেষ্টা চলিতে লাগিল। সে চেষ্টা কতকটা ফলবতী হইয়াছে। এখনও বিলাতে ভারতের তুলার যথেষ্ট আদর আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে যে দেশ হইতে যে পরিমাণ তুলার গাঁইট গিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া গেল। আমেরিকা ১৬,৬৪,০১০, ভারত ১০,৬৩,৫৪০, ব্রজিল ৪,০২,৭৬০, মিসর ২,১২,২২০, ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ বীপগুজ ১,১২,১০০ গাঁইট। ভারতের তুলার সের করা ১৮০ এগার আনা মূল্য পড়িয়াছে।

ভারতের তুলার আদর ইংলণ্ডে কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক আছে। ইংলণ্ড ছাড়া যুরোপের অন্যান্য দেশেও ভারতের কার্পাস রপ্তানি হইয়া থাকে। গত ১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ১৭ লক্ষ, ইটালিতে ৭ লক্ষ, অস্ট্রিয়ায় ৭ লক্ষ, বেলজিয়মে ৮ লক্ষ, ফ্রান্সে ৫ লক্ষ, চীনে ১ লক্ষ, জার্মানিতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার, রুসিয়ায় দেড় লক্ষ হন্দর কার্পাস তুলা রপ্তানি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড হইতে যুরোপের অন্যান্য দেশে উহা নীত হইতেছে। চীনে সর্বত্রই তুলা জন্মে, তথাপি ভারতের কার্পাসে চীনের প্রয়োজন।

কার্পাস রপ্তানি করিবার জন্ত তুলার গাঁইট প্রস্তুত করিতে হয়। আমদানী রপ্তানি কার্যে জাহাজের সুবিধা অসুবিধা দেখিতে হয়। জাহাজের খোলে অন্ন স্থানের ভিতর বাহাতে অধিক মাল পাঠাইবার স্থানের সমাবেশ করিতে পারা যায়, তাহার জন্য নিয়ত চেষ্টা হইয়া থাকে। জাহাজের স্থান অল্পসারে ভাড়া নির্ণীত হয়। মহাজনদিগকে স্থানের ভাড়া দিতে হয়, সুতরাং অন্ন স্থানে যত অধিক মাল সম্ভব, তাহা পুরিবার চেষ্টা হয়। সেই উদ্দেশ্যে তুলার গাঁইট যত ছোট করিতে পারা যায়, তাহার বিশেষ চেষ্টা হইয়া থাকে।

তুলার পরিমাণ অনুসারে গাঁইট ছোট বড় হয়। জাহাজের

জন্ত তুলার গাঁইট আরও ছোট করিতে হয়। এইজন্য এদেশে বিলাতী বাণীর কল প্রস্তুত হইয়াছে। এই কলের সাধ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে ২৪২০টি ঐরূপ কলের সংখ্যা ছিল।

ভারতের তুলা ইংলণ্ডে যায়। তাহাতে ইংলণ্ডের বহুতর কলে সে দেশের প্রয়োজন সাধিত হইতে লাগিল। কলের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইংলণ্ড দেশের প্রয়োজনের অধিক কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইল। ইংলণ্ডের বস্ত্র যুরোপের অন্যান্য দেশে বাইতে লাগিল। শেষে কলের বস্ত্রাদি ভারতেও প্রেরিত হইল। ভারতেও তাহার কাটতি হইল। ক্রমে মান্চেস্টারের কলে ভারতের লোকের পরিধের বস্ত্রের অঙ্গুরণ হইতে লাগিল। তাহা ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রেরিত হইল।—সামান্য লোকে স্বল্প মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে ভারতের তাঁতি-কুলের ব্যবসায় ক্রমশঃ লোপ পাইবার অবসার দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসায়াজেই প্রতিবন্ধিতা আছে। বিলাতে মজুরির মূল্য অধিক, ভারতে কম। ভারত হইতে বিলাতে তুলা লইয়া গিয়া তথায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা আবার ভারতে আনিতেও ধরচ আছে। ভারতেই বস্ত্র বুনিবার কল প্রস্তুত করিলে এ সকল ব্যয় নিবারণ হইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডের লোক আসিয়া এদেশে কল করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে দেখা গেল যে ইংলণ্ড হইতে কল আনা হইতে আর তাহা বসাইতে প্রথমতঃ ইংলণ্ডের কল অপেক্ষা ভারতের কলে অনেক অধিক ধরচ হয়। কিন্তু তাহার পর আর সকলই সুবিধা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে একটা সমিতি গঠিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল বসিল। সেই অবধি ইংরাজ ব্যবসায়িগণ ক্রমশঃ কলের সংখ্যা বাড়াইতেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ইতিমধ্যে ২৩টা ও বোম্বাইসহরে ৫২টা, ইন্দোরে ১টা, জব্বলপুরে ১টা, হিন্দনবাটে ১টা, নাগপুরে ১টা, বৃন্দেনবার ১টা, আরদাবাদে ১টা, হরদ্রাবাদে ১টা, কলবর্গায় ১টা, কানপুরে ৪টা, আগরায় ১টা, কলিকাতার নিকট ৭টা, মাদ্রাজে ৪টা, বেঙ্গালিতে ১টা, কলিকাতে ১টা, কোয়েম্বাতুরে ১টা, তুঁতকুড়িতে ১টা, ত্রিনবল্লীতে ১টা, ত্রিবা-বুরে ১টা, বাঙ্গালোরে ২টা, পুঁন্ডিচরীতে ১টা। এই ১০৮টির মধ্যে ৫০টাতে মৃত ও কাপড় উত্তরই প্রস্তুত হয়। ৩৮টাতে শুদ্ধ মৃত আর ৫টাতে শুদ্ধ কাপড় বোন হয়। এই সমস্ত কলে ২২,১৫৬টা শুদ্ধ এবং ২,৬৬৯,২২২ টাকু আছে। এইগুলিতে বৎসর ৪০ লক্ষ মণ তুলা লাগে; ৪০,৬৬৭ জন

পূর্ব, ১৮, ৩১ জন জীলোক, ১৫, ৩০ টি তুলা ও ৩৩০০ জনক-
বালিকা নিযুক্ত আছে।

কাপাস পরিষ্কারকরণ।—কাপাস গুচ্ছ হইতে তুলা পৃথক
করিয়া তাহা পরিষ্কার করা হয়। তুলায় মধ্যে মধ্যে
অনেক বীজ জড়ান থাকে, তাহা বতন করা আবশ্যক।
এইজন্য একটা সমতল প্রস্তরখণ্ড বা সমতল স্থানে তুলাগুলি
বিছাইয়া তাহার উপর একটা এক হস্ত দীর্ঘ লোহ দণ্ড
রাখিয়া তাহার উপর বীজাইরা পা দিয়া মাড়া হয়।
তাহাতে বীজগুলি নিরে পড়ে আর পরিষ্কৃত তুলা উপরে
থাকিয়া যায়। তুলা হইতে বীজ বতন করিবার জন্য আর
একপ্রকার কল দেখা যায়। তাহাকে খাউই বলে।
উহা আক্কাড়া কলের মত ছইটী লোহ বা কাঠ নির্মিত
গোলাকার দণ্ড নবানবী এরূপ সংলগ্ন যে ঘুরাইলে ছইটীই
গায়ে গায়ে লাগিয়া ঘুরিতে থাকে। এই ছইটীর মধ্যে একহস্তে
অপরিষ্কৃত তুলা খাওয়াইতে হয়, আর অপর হস্তে কল
ঘুরাইতে হয়। এইরূপ করিলে একমিকে বীজগুলি পড়িয়া
যায়, অপরমিকে পরিষ্কৃত তুলা বাহির হয়। কোন কোন
স্থানে ইহাকে চরকাও, কোথাও বা বেলনা বলে।
আমেরিকায় এই উদ্দেশ্যে স-জিন নামক একপ্রকার কলও
গঠিত হইয়াছে। এদেশে তুলা পরিষ্কার করিবার এক-
প্রকার যন্ত্র আছে, তাহাকে মুছটি বলে। বাহার উহা দিয়া
তুলা পরিষ্কার করে, তাহানিগকে মুছরি বলে। হিন্দুস্থানে
উহার ‘পিঙ্গারী’ নামে অভিহিত। বেরার প্রদেশে ঐ কাঠ
খণ্ডটার নাম কামান্। কামানে একটা তাঁত বেশ টান ভাবে
বাঁধা। মুছরি সমুখে তুলারানি রাখিয়া বামহস্তে কামানটী
ধরিয়া মুছরির তাঁতটী তুলার মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে দস্তর
নামক একটা দণ্ড দ্বারা তাঁতের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত
করে, তাহাতে তাঁতলগ্নের তুলা পরিষ্কৃত হইতে থাকে।

কাপাসবস্ত্র।—পূর্বে বঙ্গদেশে পরিষ্কৃত তুলা লইয়া
হস্ত দ্বারা তাহার আঁশগুলি বতন করা হইত। একাধা
প্রায় জীলোকেরাই করিত। তুলা পিঁজা হইলে চরকা দ্বারা
সূতা কাটা হইত। পূর্বে বঙ্গের গৃহস্থমাত্রেই ঘরে এক একটা
চরকা থাকিত। গৃহস্থরমণীরা গৃহস্থালীর কর্ম সমিিয়া অবসর-
কালে চরকার বলিয়া সূতা কাটিতেন। সূতা নদীতে শুটান
থাকিত। ভিন্ন ভিন্ন রকমের সূতার ভিন্ন ভিন্ন নদী থাকিত,
বস্ত্রবস্ত্র তত্ত্বাবধাতিয় কার্য ছিল। তত্ত্বাবধান গৃহস্থের
স্ত্রী হইতে নদী ক্রয় করিয়া লইয়া বাইত। তত্ত্বাবধানরক্ষণ
খইয়ের সন্ত দিয়া তাহাকে সুদৃঢ় করিত, এরূপ সুদৃঢ় করার
নাম পাট করা। তত্ত্বাবধান ঐ পাটকরা সূতা তাঁতত জড়াইয়া

বস্ত্রবস্ত্র করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। পূর্বেতত্ত্বাবধান
সকল নোকের পরিবেশ এইরূপে প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশে
হানে হানে কলর কলর কাপাসবস্ত্র হইত ও তাহা কলার
বিশেষী দলিকরণ লইয়া গিয়া ঘনোপার্জন করিতেন। চাকার
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এরূপ সূত্র বস্ত্র আর
কোথাও হইত না। নিরে করেফটীর নাম দেওয়া হাইতেছে।

১। মলমল—অব্রোরান, তানজের, মলমল—সর্বাপেক্ষা
উৎকৃষ্ট। সাবনাম, খামা, খুনা, সরকার আলি, গলাবন্দ ও
ভেরিলম এই কয়েক প্রকার বিত্তীয় শ্রেণীর। বাকতা—বধা,
হানাম, ভিমটা, সান, জলগালা ও গলাবন্দ এইগুলি তৃতীয়
শ্রেণীর বলিয়া গণ্য।

২। দোরিয়া—ভোরাকাটা, মসলিন্ (মিহিবজ), রাজ-
কোট, ডাকান, পানশাহীদার, কুড়িদার, কাপজাহি, কলাপাত।

৩। চারখানা—ছিট মসলিন্ ছয়প্রকার; বধা—নন্দনমাহী,
আনারদানা, কবুতারখোপ, সাকুতা, বাছাশার ও কুড়িদার।

৪। জামদানী—সাহেবেরা ইহাকে নয়ানসুখ বলিতেন।
সাধারণত এগুলি বুড়িদার হইত; বধা—সাবর্ণবুটী, ছাওয়াল,
হবলিজাল, মেল, তেরহা।

এতদ্ব্যতীত ঢাকাই ধুতি, উড়ানি ও শাটী চিরপ্রসিদ্ধ।

কাপাসের কত সূত্র সূতা প্রস্তুত হইতে পারে আর
সেই সূতার কত সৌখীন বস্ত্রবস্ত্র করা যাইতে পারে
তাহা এই ঢাকাই তত্ত্বাবধান সূত্ররূপ দেখাইয়া গিয়াছে ও
এখনও দেখাইতেছে, এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে।
মুসলমান বাদশাহগণের আমলে এই সকল বস্ত্রের যে বিশেষ
আদর ছিল, তাহা উপরোক্ত নামগুলি দেখিলেই বুঝা যায়।
কথিত আছে, আরবজেরের এক কহা এই ঢাকাই কাপড়
পরিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলে পিতা তাহাকে
আবরহীনা বলিয়া ভৎসনা করেন। উত্তরে কন্যা বলি-
লেন, “ভবু আমি সাতপুরু কাপড় পরিয়াছি।” নবাব
আলিবর্দীখান সময়ে এক তাঁতি একখানি ধোয়া কাপড়
ঘাসের উপর শুকাইতে দেয়। তাহার গোকটী ঘাস খাইতে
আসিয়া দেখানে যে কাপড় শুকাইতেছে, তাহা বুঝিতে
না পারিয়া তাহার উপর ঘাস খাইতে গিয়া কাপড় গুচ্ছ
খাইয়া ফেলে। মিহির (সুন্নতদার) পরিচর অধিক আর কি
হইবে। এই সকল সূত্রবস্ত্র প্রস্তুত করিতে অনেক সময়
লাগে। ২০ হস্ত দীর্ঘ ও দুই হস্ত প্রস্থ এরূপ সূত্র বস্ত্র বুঝিতে
৫৬ মাস লাগে। তাহাও প্রায়ের সময় বুনিবার যো নাই।
বর্ধাকালেই এরূপ কাপাসবস্ত্র বুনিবার উত্তম সময়। উহার
মূল্য ৩০০০, ৪০০০ টাকা হয়।

জীলোক এই সকল স্থান হস্ত কাটিত, তাহার অনেকই বস্ত্র। এই একজন এখনও আছে। এখন ঐ সকল বস্ত্রের আস্তো, আদর নাই; আর যে কখন হইবে তাহার আশাও নাই। এখন বিলাতী কলের কাপড়ে বেশ তরিতা গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে দেশের লোক এখনও দেশী কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিতেছেন, তাই এখনও বঙ্গদেশে ঢাকা, ফরাসডাকা, সিমলা, শান্তিপুর, কলমি, বরাহনগর, কৈকালী, শ্রীরামপুর, মাতখিরা, চন্দ্রকোণা, নবানল, দোগাহি, পাবনা প্রভৃতি স্থানে দেশী ধুতি, উড়ানি ও শাটী বোনা হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলও হইতে হুতা আসে। পূর্বে এদেশে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত। এখন কেবল তুলা রপ্তানি হয়। স্তত্রাং যাহারা বস্ত্র বুনিত, তাহার অনেক অরহীন বা অন্ত্র ব্যবসার-আশ্রিত। বঙ্গদেশের ধুতি, উড়ানি, শাটী ব্যতীত কার্পাসের অন্যান্য ব্রাদি এখনও প্রস্তুত হয়, যথা দরি বা সতরঞ্জী, একহুতি মলমল, চারখানা, শুশি ও লুদি। দারভাঙ্গা অঞ্চলে কোল্টী নামক একজাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বর্তমান অঞ্চলে মশারির থান, রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে কোটা, মাগনা, নিমজা, লুদি, চারখানা নামক বহুবিধ ছিট, ডোরাকাটা বস্ত্র, মশারির থান প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আসাম প্রদেশে এখনও দেশী কার্পাস হইতে দেশী বস্ত্র তৈয়ার হয়। জীলোকেরাই হুতা কাটে ও বস্ত্র বরন করে। তবে এখানেও বিলাতী বস্ত্রের আদর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ইহাদের বর কাপড়, খিনিয়া কাপড়, পরিখিয়া কাপড়, গামছারিহা ও মেখলা নামক বস্ত্রগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তুত হয়। মণিপুরে পটস, তামিয়েন, খিনডইলী ও সৌন্দনামীর বস্ত্রগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তুত। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সেকেন্দ্রাবাদ ও বুলন্দসহরে উত্তম মসলিন্ (মিহি কাপড়) তৈয়ার হয়। উহার পাড় স্বর্ণহুত্রে বোনা হয়। পাগড়িতেই উহার অধিক ব্যবহার। সেকেন্দ্রাবাদের দোপাট্টাও অতি সুন্দর। আজিমগড়ে একপ্রকার মসলিন্ হয়, নেপালে তাহার কাটুতি অধিক। অযোধ্যার সরবতি, মলমল, আধি ও ভারদম্ব নামক স্থান বস্ত্র প্রসিদ্ধ। রায় বেরিলি জেলার জৈ নামক স্থানে, কাশীতে ও ফরজাবাদের তাণ্ডা নামক স্থানে অতি চমৎকার স্থান মসলিন্ প্রস্তুত হয়। কিন্তু অযোধ্যার অধঃপতন হইতে সে সকল কারুকার্যেরও অধঃপতন হইয়াছে। রায়পুরের কার্পাসনির্মিত খেস সেদিন কলিকাতার প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুন্দরবাদ, প্রভাসগড়, কানপুর, বলিডপুর, শাহাপুর, মিউলি, আলি-

নগর, মজির অন্তর্গত নাই, আজিমগড়ের অন্তর্গত নাই, শাহারনপুর, দিরাট ও আগ্রা অঞ্চলে মান্যবিধ কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। উহাদের অনেকগুলি এখনও বিদেশে রপ্তানি হয়। এতব্যতীত পারহা, গাজি ও হুতিবোড়া নামক কার্পাস বস্ত্র উত্তর-পশ্চিমের আর সকল স্থানেই প্রস্তুত হয়। দেশের নামান্ত্র লোকেরা অধিকাংশই এই বস্ত্র ব্যবহার করে।

পঞ্জাব প্রদেশে পূর্বে একপ্রকার মসলিন্ হইতে সুন্দর পাগড়ি প্রস্তুত হইত। সে কাপড় এখন আর দেখা যায় না। হসিয়ারপুর, সিরসা, জালকর, লুধিয়ানা, সাপুর, গুরুদাসপুর ও পাতিয়ালা এখনও পাগড়ির কাপড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু উহা আর পূর্বের মত উৎকৃষ্ট নহে। রোহতকে তাজেব নামক একপ্রকার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট মসলিন্ দেখা যায়। জালকরে বাটী নামক মাকিনের মত পুরু কাপড় হয়। ইহার উপর একপ্রকার কারুকার্য আছে। বুলবুল পক্ষীর চক্কে আদর্শ করিয়া উহা বোনা হয় বলিয়া ইহাকে “বুলবুল চসম” বলে। এখন এই শিল্প লোপ পাইতেছে। এখন কেবল খেস, লুদি ও শুশি নামক মিহি ও দোহুতি, গাড়াহা ও গাজি নামক মোটা কাপড় দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতনাতেও শেবোক্ত চারি প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। গোরালিয়রের অন্তর্গত চান্দেবির নামক স্থানে যে মসলিন্ তৈয়ার হয়, তাহা উৎকৃষ্ট। ইন্দোরে যাহা হয়, তাহাও বড় মন্দ নহে। দেবাস রাজ্যের অন্তর্গত সারঙ্গপুরে ধুতি, শাটী ও পাগড়ি প্রস্তুত হয়।

মধ্যপ্রদেশে নাগপুর, ভাণ্ডারা ও চান্দা জেলার এখনও কার্পাসের স্থান হুতা প্রস্তুত হয় ও তাহাতে বস্ত্র তৈয়ার হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, চান্দা প্রদেশে একটা প্রদর্শনী হয়, তাহাতে হস্তনির্মিত (কলের নহে) হুতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ হুতা এত স্থান যে উহার অর্ধসের মাত্র ৫৮ ক্রোশ দীর্ঘ। নাগপুরে তুলার কল হওয়াতে ঐ শিল্পের অনেক গৌরব গিয়াছে। কিন্তু কলের হুতা, এখনও তত উৎকৃষ্ট হয় নাই। এইজন্য গৌরব একেবারে যায় নাই। দেশী বস্ত্র অধিক দিন স্থায়ী হয় বলিয়া সেখানকার দরিদ্র লোকে বিলাতী অপেক্ষা দেশী বস্ত্রেরই অধিক আদর করে। হোসলাবাদে দেশী বস্ত্রের ব্যবসা বরং বাড়িতেছে।

দাক্ষিণাত্যের হারজাবাদ অঞ্চলে রাইচুর প্রদেশে থাকিরদের মোটা কাপড় ও নন্দের প্রদেশে মিহি মসলিন্ তৈয়ার হয়। যাত্রাজ প্রেসিডেন্সিতে আরনি নামক স্থানের মিহি মসলিন্ অতি উৎকৃষ্ট।

বোম্বাই প্রদেশে বিলাতী কাপড়ের বিলম্ব আদর হইলেও

এখনও এসে এসে সেই বোঁটা কার্পাসবস্ত্র রক্তকর হইতে দেখা যায়। নানান্দ লোক যেটা যেটা শাড়ী ও পাগড়ির বিশেষ আদর করে।

অনেক স্থানে কার্পাসের হুতার সহিত জেকর বা পশমের হুতা মিশ্রিত করিয়া রক্ত রক্ত কাপড় তৈয়ার হয়। কোথাও কোথাও কার্পাসবস্ত্রে ফেলমের পাড় দেওয়া হয়। কোথাও ফেলমের ফুল, জরির ফুল ছুঁতে তোলা, কোথাও বা বোনা হয়। উহার নানাপ্রকার নাম আছে। বধা—কারচোপ, কাল্যাবর্ষ, কারচিকন বা চিকন, কামদানী ও জামদানী। জামদানীর আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। বধা—করেলা, তোড়ারার, বুট্টার, তেরচা, জলবার, পারহাওয়ার ইত্যাদি।

কার্পাসবস্ত্রের উপর ফুলকাটা নানাবিধ বস্ত্র কলিকাতার নিকট প্রস্তুত হয়, সেই সকল বস্ত্র কলিকাতার নিকট হাবড়ার হাটেই অধিক বিক্রীত হইয়া থাকে।

কার্পাসনির্মিত বস্ত্রের উপর বিবিধ রং করা হয় ও তাহার উপর নানা প্রকার ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে।

কার্পাসবস্ত্র প্রথম কলিকাতা হইতে গইয়া ঘাইত বলিয়া ইংরাজেরা তাহার কেলিকো (Calico) নাম দিয়াছিলেন। রং করার নাম কেলিকো-ডাইং (Calico-dying) আর ছাপ দিয়া ছিট প্রস্তুত করার নাম (Calico printing) কেলিকোপ্রিন্টিং। কার্পাসবস্ত্রে রং করা বস্ত্রদেশে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিমের লোক কলিকাতার আসিয়া কাপড় রক্ত করা ও কাপড়ে ছাপ দেওয়ার ব্যবসা খুলিয়াছে। কোন কোন কাপড়ের উপর সোনারলির ছাপও দেওয়া হইয়া থাকে। ছাপ দিয়া নানাবিধ ছিট তৈয়ার হয়। ছিটের কাপড়ে রেজাই, লেপের খোল, তোবক, পাশলপোষ, জামিন, সামিয়ানা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। রং করা কাপড়ের মধ্যে লালু অতি উৎকৃষ্ট। ছোপান কাপড়ের মধ্যে চুহুরি নামক কাপড় অধিক দেখা যায়।

এ দেশে রক্তকরাই কার্পাসবস্ত্র ধোলাই করিয়া থাকে। বকীর রক্তকমিগের মধ্যে ঢাকা, ফদাসডাঙ্গা ও শান্তিপুরের রক্তকর্ণ কার্পাসবস্ত্র অতি রক্তের ধোলাই করিতে পারে। কিন্তু বস্ত্রদেশে ধোলাইকারী রক্তকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া রক্তক আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে।

সিদ্দান্তী কলের প্রভাবে দেশস্থ কার্পাসসিঁরি ক্রমশঃ লোপ হইতেছে। এখনও বাকী আছে কয়েক জায়গা থাকিবে না একরূপ লুপ্ত হইয়াছে। গুরুর কার্পাস

বস্ত্র দেশের প্রায়শঃ লাদির উৎকৃষ্ট হইয়া বিদেশে বিক্রীত হইত। এখন সেকম দিরাহে। এখন শিলী আরহীন।

ভাবপ্রকাশ রক্ত—কার্পাসবস্ত্রের ভণ্ড—লালু, ইক উক-বীরা, মনুসল ও বাহুল্যপদ। কার্পাসের পাড়া—বাহুল্যপদ, রক্তকারক ও মনুসল। "ইহার কল—পিডিকা, আনাহ ও পুত্রাবনাশক। বীজ—তমহুদরক, তরুদক, সিড, কককারক ও গুদ।

২ (জি) কার্পাস বিকারঃ অবরবো বা, কার্পাসী-অণু (বিষাদিত্যো ২৭। পা ৪। ৩। ১৩৬।) কার্পাসজাত বস্ত্রাদি। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাল ও বাদর।

(রক্তঃ বস্ত্রমকার্পাসনাবিকং মূহ চাজিনম্।" ভারত ২। ৫। ১২৪) কার্পাসিক (পুং, স্ত্রী) কার্পাস-স্বার্থক ক্। কাপাল গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কার্পাস, কার্পাসী, তুণ্ডকেরী ও সন্ধ্যাতা।

কার্পাসক্ষেত্রে (স্ত্রী) কার্পাসবস্ত্রনির্মিতা যেষুঃ, মধ্যলোঃ। দানের জন্ত কার্পাসাদিনির্মিতা যেষুঃ। বরাহপুরাণোক্ত ইহার আনবিধি বধা—"বিবুসংক্রান্তদিনে, যুগজয়দিনে, গ্রহশীড়া, চংসপদর্শন ও অরিউদর্শনাদি অমঙ্গল ঘটিলে, পবিত্র ক্ষেত্রে অথবা বিষ্ণু গোচারগৃহে গোময় দ্বারা দানস্থান লেপন করিয়া তাহার উপরে কুশ তিল বিস্তারিত করিতে হইবে, তৎপরে তাহার মধ্যস্থলে যেরূপ ছাপন করিয়া বস্ত্র, মালা, অমূল্যপদ, নৈবেদ্য ও ধূপদীপাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর কুশহতে দানমন্ত্র পাঠ করিয়া, প্রজ্ঞা-মহাকারে তাহা দ্বিজাতিকে প্রদান করিতে হইবে। এই কার্পাসক্ষেত্রে ৪ তার বস্ত্র দ্বারা নির্মিত হইলে উত্তম, ২ তার দ্বারা নির্মিত হইলে মধ্যম এবং ১ তার দ্বারা নির্মিত হইলে অধম বলিয়া গণ্য। এই পরিমাণের চতুর্থাংশ দ্বারা বৎস প্রস্তুত করিতে হয়। এই যেরূপ দস্তসকল নানাবিধ ফল দ্বারা, ফুরসমূহ রৌপ্য দ্বারা এবং মূদ স্বর্ণদ্বারা নির্মাণ করিবে, তাহার গর্ভস্থল বিবিধ রত্নপূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপ যথাবিধি যেরূপান করিলে অন্তিম ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়।"

কার্পাসনাসিকা (স্ত্রী) কার্পাসত নাসিকা ইব, উপনি। তর্ক-টোকা।

কার্পাসপর্বত (পুং) কার্পাসবস্ত্রনির্মিতঃ পর্বতঃ, মধ্যলোঃ। দানের নিমিত্ত কার্পাসবস্ত্রনির্মিতঃ পর্বতঃ। ব্রহ্মাণ্ড উপন্যাসে ইহার দাক্ষিণ্যনামি এইরূপ বিবৃত আছে—"সেবাসর-প্রকৃতি পরিক্রমণের কিরদণে গোময়লিপি করিয়া তাহাতে কুশ ও তিল বিস্তারিত করিবে, তৎপরে তাহার মধ্যদেশে কার্পাস-বস্ত্রনির্মিত পর্বত স্থাপন করিয়া, যথাবিধি পূজাযজ্ঞানান্তে কুশহতে দানমন্ত্রপাঠপূর্বক দ্বিজাতিকে দান করিতে হইবে।

কর্ণাচার্য্যিনি নিম্নোক্ত ভাষা হইলে উক্ত, সপ্ত ভাষা
শব্দ্য এবং পঞ্চভাষা অর্থবলিগা পণ্য। ইহাতে বিবিধ
প্রভৃতি দ্বান্যকার ওষধি ও রস পরিষিষ্ট করিতে
হয়। কার্ণাসপ্তভাষ্যে চারিটুকু অংশিধর, বিবিধ রস এবং
বান্যপ্রকার তক্ষকভোজ্যবৃক্ষ চারিটি কুলাচল স্থাপন করিয়া
দান করাই বিধি। এইরূপ দান করিলে স্বীয়বংশ উদ্ধার হয়।”

কার্ণাসমৌত্রিক (ত্রি) কর্ণাসমৌত্রিক নির্কৃত্ত, কর্ণাসমৌত্রিক
ঐচ্ছ, বিপদবৃদ্ধিঃ। কার্ণাসের হস্তনির্মিত বস্ত্রাদি।

কার্ণাসান্ধি (স্ত্রী) কার্ণাসান্ধি অস্থি, ওষুৎ। কার্ণাস-
বীজ। ভাবপ্রকাশোক্ত ইহার গুণ—তনুদ্রববর্জক, গুত্র-
কারক, মিষ্ট, কককারক ও গুরু।

কার্ণাসিক (ত্রি) কার্ণাসাজাত, কার্ণাস-ঐচ্ছ। কাপাস
দ্বারা নির্মিত।

কার্ণাসিকা (স্ত্রী) কার্ণাসী-স্বার্থে কন্-টাপ্, পূর্বস্তম্ভঃ।
কাপাসের গাছ, কার্ণাসী।

কার্ণাসী (স্ত্রী) কার্ণাস-জাতিদ্বাং স্ত্রীন্। কাপাস গাছ।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বদরা, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রাতা, সারিগী,
চব্যা, তুলা, গুড়, তুণ্ডিকেরিকা, মল্লদত্তবা, পিচু ও বামর।
[গুণাদি কার্ণাস শব্দে দেখ।]

কার্ণা (ত্রি) কর্ণস্থ শীলং অস্ত, হস্তাদিভাং গঃ। নিপাতদ্বাং
সাম্ভুঃ (কার্ণতাত্ত্বিন্যোঃ) পা ৬। ৪। ১৭২। ১ কলের আকাঙ্ক্ষা
না করিয়া যে কর্ম করে। ২ কর্মশীল।

কার্ণাণ (স্ত্রী) কর্মএব, কর্ম-স্বার্থে অণ্ (তদ্ব্যুৎপাদ্য কর্মণ্যে
২ণ্। পা ৫। ৪। ৩৬। ১) মূলকর্ম, ওষধাদির মূল দ্বারা যে
জ্ঞান, উচাটন, মারণ, বলীকরণ প্রভৃতি কার্য করা হয়,
তাহাকেই কার্ণাণ কহে। ২ মন্ত্রতন্ত্রাদি যোগ। ৩ (ত্রি)
কর্মসাধ্যাধেন অন্ত্যস্ত, কর্মন্-অণ্। কর্মদক।

(কার্ণাণং মন্ত্রতন্ত্রাদিযোগেন কর্মঠেপি চ। মেদিনী।)

কার্ণাণেয়ক (পুং স্ত্রী) জনপদবিশেষ।

কার্ণার (পুং) কর্মারএব, কর্মার-স্বার্থে অণ্। ১ কর্মকার,
কামার। ২ (কর্মারত অপত্যম্) কর্মকারের পুত্র।

কার্ণারক (ত্রি) কর্মারেণ কৃতম্, কর্মার-বৃঞ্ (কুলালা-
নিভ্যো বৃঞ্। পা ৪। ৩। ১১৮।) কর্মকারকৃত কার্য, কর্ম-
কার দ্বারা প্রস্তুত করিয়াছে।

কার্ণার্য্য (পুং) কর্মারত অপত্যম্, কর্মার-ব্যঞ্। ১ কর্ম-
কারের পুত্র। ২ (ত্রি) কর্মারত ইদম্। কর্মকারসম্বন্ধীয়।

কার্ণার্য্যারিণি (পুং) কর্মারত অপত্যম্, কর্মার-ব্যঞ্।
(কৌশল্যকার্ণার্য্যাত্মক। পা ৪। ১। ১৫৫।) নিপাতদ্বাং
কার্ণার্য্যাদেশঃ। কর্মকারপুত্র।

কার্ণিক (ত্রি) কর্মার্য্য চিত্তকরণ দিব্যত্ব, কর্মকর্তৃ-নিমিত্ত
বস্ত্র; যে বস্ত্রে নানাবর্ণের স্থল দ্বারা চিত্রবস্ত্রকারি চিত্রে
চিত্রিত করা হয়, (চিত্রাকরা)

(“কার্ণিকে যৌবরজে চ জিৎস্বভানকরো রজঃ।”

বাক্যব্যাস ২। ১৮৩।)

কার্ণিক্য (স্ত্রী) কর্মিকত্ব ভাবঃ কার্মিক-মক্ (পত্যত্বপূরো-
হিতাদিত্যো বক্। পা ৫। ১। ১২৮) কর্মশীলতা, পরিভ্রম।

কার্মুক (স্ত্রী) কর্মণ্যে প্রভবতি, কর্মক-উকঞ্ (কর্মণ উকঞ্।
পা ৫। ১। ১০৩। ১) ধ্বংস। (পুং) ২ কার্মুকং ধ্বংস সাধ্য-
য়েন অন্ত্যস্ত, কার্মুক-অচ্। বাণ। ৩ (ত্রি) কার্মুক-
(কার্মুকং ধ্বংসি তাদ্রা বেণৌ কর্মকমে ২ভবৎ। মেদিনী।)
৪ বেতখদির। ৫ হিজল। ৬ মহানিষ। ৭ বেব প্রকৃতির
মধ্যে নবমর্যাপি।

(“কার্মুকত পরিত্যজ্য ধ্বংস সংক্রমতে রবিঃ।

প্রভাতে চার্করাজে চ দানং কুর্বাৎ পরেহহনি॥”

কালমাধবদত্ত ভবিষ্যৎ।)

৮ (ত্রি) কুমুকত্ব ইদম্, কুমুক-অণ্। খেতখদিরসম্বন্ধীয়।

৯ তুলা ধুনিবার বস্ত্র, আচড়া।

কার্মুকভূৎ (ত্রি) কার্মুকং বিতর্জি, কার্মুক-ভূ-কিপ্। ধ্বংসকারী।

কার্মুকাসন (স্ত্রী) আসনবিশেষ। “পর্যাসন করিয়া, দক্ষিণ
হস্ত দ্বারা বামপদের অঙ্গুলিধর এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণপদের
অঙ্গুলিধর ধারণ করিলে কার্মুকাসন হয়।” (কল্পবায়ল)

কার্মুকী [ন] (পুং) কার্মুকং অস্ত্যস্তি, কার্মুক-ইনি।
ধ্বংসকারী।

কার্য্য (স্ত্রী) ক্রিয়তে বৎ তৎ, কৃ-ণ্যৎ (বহুলোপ্যৎ। পা ৩।
১। ১২৪।) ততো বৃদ্ধিঃ। ১ কাজ; দ্বারা লক্ষ্য করিয়া কর্তা
প্রবর্তিত হয়। ২ কর্তব্য, করিবার উপকৃত। ৩ হেতু। ৪
প্রয়োজন। ৫ গুণাদি বিবাদ।

(“নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যত পুরুষঃ।” মনু ৮। ৪৩।
‘কার্য্যং গুণাদিবিবাদম্।’ কুমুকঃ।)

৬ অপূর্ণ। ৭ উদ্দেশ্য। ৮ ব্যাকরণগোক্ত আদেশ প্রত্যয়।

৯ আরোগ্য। ১০ (ভাবে প্যৎ) কর্ম, ব্যাপার। ১১ দ্রোণিব-
শাস্ত্রোক্ত জয় লভ্য হইতে দশমহালের নাম।

(“কার্য্যাদীশঃ স্বগৃহে বৃণ্ডককবিত্তিঃ সংযুতো বীজিতো বা।”
ভাটক।)

১২ আগতাবের প্রতিযোগী উৎপত্তিবিধি, জন্ম; দ্বা—
বস্ত্র প্রকৃতি। [কর্ম দেখে।]

কার্য্যকর (ত্রি) কার্য্যং কল্পেতি, কার্য্য-কৃট। যে কার্য্য
নির্বাহ করে।

কার্যকর্তা [হ] (পুং) কার্য্য করোতি, কার্য্য-ক-পুং । কার্য্যকারক ।

কার্য্যকারক (ত্রি) কার্য্য করোতি, কার্য্য-ক-পুং । কার্য্যকর । কার্য্যকারণ (স্ত্রী) কার্য্যক কারণক যনোঃ সমাহারঃ । মিলিত কার্য্য ও কারণ ।

কার্য্যকারণতা (স্ত্রী) কার্য্যকারণয়োর্ভাবঃ, কার্য্যকারণ-তন্ । কার্য্য ও কারণ উভয়ের পরস্পরাসংক্রমিক ধর্ম্ম । যেমন ঘট ও দণ্ড উভয়ের ধর্ম্ম—ঘট দণ্ডের কার্য্য এবং দণ্ড ঘটের কারণ । সুতরাং ঘট ও দণ্ডে পরস্পরের কার্য্যকারণতা-ধর্ম্ম অবস্থিত আছে ।

কার্য্যকারণভাব (পুং) কার্য্যক কারণক তয়োর্ভাবঃ, ৬৩৭ । কার্য্যকারণতা ।

কার্য্যকারী [ন] (পুং) কার্য্য করোতি, কার্য্য-ক-পিনি । কার্য্যকারক ।

কার্য্যকাল (পুং) কার্য্যার্থাৎ উপযুক্তঃ কালঃ, মধ্যলোঃ । কার্য্যের উপযুক্ত সময় ।

কার্য্যকুশল (ত্রি) কার্য্যে কুশলঃ দক্ষঃ, ৭৩৭ । কার্য্যদক্ষ, যে উত্তমরূপে কার্য্য সম্পাদন করে ।

কার্য্যকর্ম্ম (ত্রি) কার্য্যে ক্রমঃ সমর্থঃ, ৭৩৭ । কার্য্যসম্পাদনে ক্রমভাজক ।

কার্য্যগুরুতা (স্ত্রী) কার্য্যার্থাৎ গুরুতা গৌরবম্, ৬৩৭ । কার্য্যের গুরুত্ব, কার্য্যের নিত্যত্ব আবশ্যকতা ।

কার্য্যগৌরব (স্ত্রী) কার্য্যার্থাৎ গৌরবম্, ৬৩৭ । কার্য্যগুরুতা ।

কার্য্যচিন্তক (ত্রি) কার্য্য চিন্তয়তি, কার্য্য-চিন্তি-পুং । কর্তব্য বিষয়ে চিন্তাকারক ।

কার্য্যচিন্তা (স্ত্রী) কার্য্যত কার্য্যে বা চিন্তা, ৬ বা ৭৩৭ । ১ কার্য্যের চিন্তা । ২ কর্তব্য বিষয়ে চিন্তা ।

কার্য্যচ্যুত (ত্রি) কার্য্যৎ চ্যুতঃ ভ্রষ্টঃ, ৫৩৭ । কার্য্যভ্রষ্ট, নির্দিষ্ট কার্য্য হইতে যে পরিত্যক্ত হয় ।

কার্য্যত্ব (স্ত্রী) কার্য্যত্ব ভাবঃ, কার্য্য-ত্ব (তত্ত্ব ভাবত্বভোগ্যে) । পা ৫।১।১১১ । কর্তব্যতা ।

কার্য্যদর্শক (ত্রি) কার্য্যার্থাৎ দর্শকঃ, ৬৩৭ । ১ কার্য্যের তত্ত্বাবধারণক । ২ কার্য্যের পরীক্ষক ।

কার্য্যদর্শন (স্ত্রী) কার্য্যার্থাৎ দর্শনম্, ৬৩৭ । ১ কার্য্যের তত্ত্বাবধান । ২ কার্য্যপরীক্ষা ।

কার্য্যদর্শী [ন] (ত্রি) কার্য্য পশতি, ইদং সম্যক্ কৃতং ইদমসম্যগিতি বিবেচয়তি, কার্য্য-দৃশ-পিনি । কার্য্যদর্শক, কাল ভাগরূপে লক্ষ্য হইতেছে কিনা যে ব্যক্তি তাহা দেখে ; তত্ত্বাবধারণক ।

কার্য্যদেব (পুং) কার্য্যে কর্তব্যনিশানিমে দেবো অনিচ্ছা, ৭৩৭ । ১ কার্য্য করিতে অনিচ্ছা । ২ আলস্য ।

কার্য্যনির্ণয় (পুং) কার্য্যত্ব নির্ণয়ঃ স্থিরীকরণম্, ৬৩৭ । নিশ্চয়রূপে কার্য্য স্থির করা ।

কার্য্যনির্বাহক (ত্রি) কার্য্য নির্বাহয়তি সম্পাদয়তি, কার্য্য-নির্ব-বহ-পুং । যে কার্য্য নির্বাহ করে, কার্য্যসম্পাদক ।

কার্য্যনিষ্পত্তি (স্ত্রী) কার্য্যত্ব নিষ্পত্তিঃ সমাধানম্, ৬৩৭ । কার্য্যসমাধা, কাণ্ডশেষ হওয়া ।

কার্য্যপটু (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যকরণে পটুঃ নিপুণঃ, ৭৩৭ । কার্য্যকুশল, যে অতি নিপুণতার সহিত কার্য্য করে ।

কার্য্যপুট (পুং) কার্য্যার্থে কর্তব্যে ন পুটতি স্ফিতি কারি-পুট-ক । ১ ক্ষপক, বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিশেষ । ২ উন্নত । ২ অনর্থকারক ।

(কার্য্যপুটঃ ক্ষপণোন্মত্তানর্থকরেষু চ । মেদিনী)

কার্য্যপ্রদেব (পুং) কার্য্য প্রদেষ্টি অনেন, কার্য্য-প্র-দেব-করণে ঘঞ । ১ আলস্য । ২ কার্য্যে অত্যন্ত অনিচ্ছা ।

কার্য্যপাত্র (স্ত্রী) কার্য্যে উপযোগিপাত্রম্, মধ্যলোঃ । কার্য্যে আবশ্যক পাত্র ।

কার্য্যপ্রেষা (ত্রি) কার্য্যে প্রেষাঃ, ৭৩৭ । ১ কার্য্যসম্পাদন জন্য নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত । ২ দূত ।

কার্য্যভাজন (স্ত্রী) কার্য্যে উপযোগি ভাজনম্, মধ্যলোঃ । কার্য্যে উপযোগী ।

কার্য্যভ্রষ্ট (ত্রি) কার্য্যৎ ভ্রষ্টঃ, ৫৩৭ । কার্য্যচ্যুত, যাহার আর কার্য্য করিবার অধিকার নাই ।

কার্য্যবত্তা (স্ত্রী) কার্য্যবত্তো ভাবঃ, কার্য্যবৎ-তন্ (তত্ত্ব ভাব-ত্বভোগ্যে) । পা ৫।১।১১১ । কার্য্যবিশিষ্টতা, কার্য্যবানের ধর্ম্ম ।

কার্য্যবত্ত্ব (স্ত্রী) কার্য্যবত্তো ভাবঃ, কার্য্যবৎ-ত্ব । (তত্ত্ব ভাবত্বভোগ্যে) । পা ৫।১।১১১ । কার্য্যবত্তা ।

কার্য্যবশ (পুং) কার্য্যত্ব বশঃ বশতা । ১ কার্য্যের অধ্যবসায় । ২ (ত্রি) কার্য্যের বশীভূত, কার্য্যনির্বাহজন্য আবশ্যক ।

কার্য্যবস্ত (স্ত্রী) কার্য্যার্থঃ বস্ত, মধ্যলোঃ । কার্য্য নিষ্পাদন জন্য আবশ্যক দ্রব্য ।

কার্য্যবান্ [৭] (পুং) কার্য্যমভ্যাসিত, কার্য্য-মভূপ্ মভ বঃ । কার্য্যবিশিষ্ট, কার্য্যে আবশ্যক ।

কার্য্যবিপত্তি (স্ত্রী) কার্য্যে বিপত্তিঃ, ৭৩৭ । কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে যে সকল বিপদ উপস্থিত হয় ।

কার্য্যশক্তি (ত্রি) কার্য্যঃ শক্তি ইত্যাহ, কার্য্য-শ-ক্-ঠক্ (তবাহেতি মা শক্তাদিত্য উপসংধানম্ । পা ৪।৪।১ । বা ১ ।) 'কার্য্যঃ শক্তিঃ' এইরূপ বাক্যবাহী নৈরাসিকবিশেষ ; ইহার শব্দের অনিত্যতা স্বীকার জন্য এইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

কার্যার্থে (পুং) কার্যতঃ শেষঃ, ৬৩৭। ১ কার্যে কার্যে নিমিত্তিঃ ২ কার্যের অবশিষ্ট অংশ।

কার্যাসম্পাদক (পুং) কার্যে কার্যতঃ নিমিত্তিবিশেষে সন্নিহিতঃ, ১৩৭। কার্য নিমিত্তিবিকল্প অনিচ্ছকতা।

কার্যাসম্পাদন (পুং) ভারমতে চতুর্নিবেশতিজাতির অন্তর্গত জাতি-বিশেষ। লক্ষণ বহা—

“প্রবর্তককার্যাসম্পাদকঃ কার্যাসম্পাদকঃ” (ভারতঃ ৫।১।৩৭।)

প্রবর্তনসম্পাদনীর বস্ত্র অনেক বলিয়া কার্যাসম্পাদন নামক কার্যাবিশেষে জাতি হয়। যেমন “শব্দোহনিত্যঃ প্রবর্তনসম্পাদনীর বস্ত্র ইত্যাদি।” মীমাংসাকগণ শব্দকে নিত্য স্বীকার করেন; যেহেতু তাঁহাদের মতে শব্দের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু কোন বস্তুতে আঘাত লাগিলে সেই আঘাত দ্বারা শব্দের প্রকাশ হয় মাত্র। কিন্তু নৈমারিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—শব্দ অনিত্য এবং তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনিত্যতা সত্ত্বেও তাঁহারা “শব্দোহনিত্যঃ প্রবর্তনসম্পাদনীর বস্ত্র” এই পুরোক্ত অমুমান বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। মীমাংসাকগণ এই অমুমান বাক্যে এইরূপ আপত্তি করেন, যে—‘এই অমুমান দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু প্রবর্তনসম্পাদনীর বস্ত্র অনেক; অর্থাৎ নিত্য ও অন্ত বস্তু বস্ত্রই প্রবর্তন দ্বারা আত্মলাভ করে। যদিও নিত্য বস্ত্র সর্বদা একভাবে অবস্থিত, তথাপি প্রবর্তন দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইতে পারে; যেমন বস্ত্রপূর্ণক বস্ত্র উঠাইয়া কেলিলে বস্ত্র দ্বারা অনিত্যতা সিদ্ধি হির হইতে পারে না। এই দোষকেই তাঁহারা “কার্যাসম্পাদন” বা “কার্যাবিশেষ” জাতি বলেন।

কার্যাসম্পাদন অতীত জাতিসমূহ দোষদাতার স্বপক্ষ কতি-কারক বলিয়া, “অসম্পাদক” ও “ব্যবহার্যক” উভয়নামে অভি-হিত হয়। [জাতি দেখ।]

কার্যাসাধক (জি) কার্যে সাধরতি, কার্য-সাধ-পিচ্-পুন্। বাহা দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয়, কার্যাসম্পাদক।

কার্যাসাধন (স্ত্রী) কার্যতঃ সাধনম্ নিম্পাদনম্, ৬৩৭। কার্য-সিদ্ধি, কার্য-নিম্পত্তি।

কার্যাসিদ্ধি (স্ত্রী) কার্যতঃ সিদ্ধিঃ, ৬৩৭। ১ কর্তব্য কর্মের নিম্পত্তি। ২ অতীতসিদ্ধি।

(“বিত্তঃ ব্রহ্মসি কার্যাসিদ্ধিরতুলা শব্দে হত্যাশে ভরম্।” তিথিতত্ত্ব।)

ও ভোমতিবোক্ত সহমবিশেষ।

কার্যাসম্পাদন (স্ত্রী) কার্যতঃ হানম্, ৬৩৭। ১ কার্য নিম্পাদন করিবার স্থান। ২ চাকুরী স্থান।

কার্যাবলি (স্ত্রী) ক্রিয়াক্ষণ-টাপ্। কার্যাবলি।

কার্যাবলিবিচার (পুং) কার্যক অকার্যক ভেদো বিচারঃ, ৬৩৭। ইহা কর্তব্য ইহা অকর্তব্য এইরূপ বিচার।

কার্যাবলি (জি) কার্যে কার্যকরণে প্রকৃতঃ সন্নিহিতঃ, ১৩৭। কার্য করিতে অপারগ।

কার্যাবলি (পুং) কার্যতঃ অবিশিষ্টঃ, ৬৩৭। ১ কার্যাবলি। ২ জ্যোতিষোক্ত কার্যহানের অধীশ্বর, অর্থাৎ লক্ষ্মীদেব হইতে লক্ষ্মীদেবের অবিশিষ্ট।

কার্যাবলি (পুং) কার্যতঃ অবিশিষ্টঃ অবিশিষ্টঃ, ৬৩৭। কার্যাবলি।

কার্যাবলি (পুং) কার্যতঃ অধ্যক্ষঃ, ৬৩৭। বাহ্যে তদ্ব্য-ধানে কার্য নিম্পন্ন হয়।

কার্যাবলি (পুং) কার্যতঃ অধ্যক্ষঃ, ৬৩৭। কার্যের অবশ্য কর্তব্যতা অন্ত বস্তু।

কার্যাবলি (পুং) কার্যতঃ অন্তঃ, ৬৩৭। কার্যের শেষ। কার্যাবলি (স্ত্রী) অন্তঃ কার্যে, মনুষ্যবাসকাদিবৎ সমাসঃ। অন্ত কার্য, এককার্য হইতে অপর কার্য।

কার্যাবলি (জি) কার্যেণ কর্তব্যম্ অবিশিষ্টঃ বৃত্তঃ, ৬৩৭। ১ কার্যাবলি। ২ কার্যাবলি পদের প্রতিপাদ্য অর্থবিশিষ্ট।

কার্যাবলি (পুং) কার্যতঃ আরম্ভঃ, ৬৩৭। কার্যের প্রথম আরম্ভ।

কার্যাবলিসিদ্ধি (স্ত্রী) কার্যার্থতঃ কার্যপ্রয়োজনতঃ সিদ্ধিঃ ৬৩৭। উদ্দেশ্যসিদ্ধি।

(“বলতঃ বামিনশ্চৈব বিত্তিঃ কার্যাবলিসিদ্ধয়ে।

বিবিশ্বঃ কীর্ত্যতে বৈধঃ বাত্-গুণ্যগুণবৈবিত্তিঃ।”)

মহু ৭। ১৬৭।)

কার্যাবলি [ন] (জি) কার্যতঃ অর্থী প্রার্থী, ৬৩৭। ১ কার্য করিবার জন্য প্রার্থনাকারী। ২ উমেদার, চাকুরী-প্রার্থী।

কার্যাবলি (জি) কার্য-বল্। কার্যাবলি।

কার্যাবলি [ন] (পুং) কার্যে অন্তঃ, কার্য-ইনি। ১ কার্যাবলি। ২ কার্যপ্রার্থী, উমেদার। ৩ ব্যাকরণোক্ত আদেশস্থান।

কার্যাবলি (পুং) কার্যাবলিঃ ক্রীঃ তদ্ব্যবহারেণ সম্পাদকঃ, ৬৩৭। কার্যাবলি।

কার্যাবলি (স্ত্রী) কার্যাবলিঃ ক্রীঃ ৬৩৭। ভারমতে হয় প্রকার সত্ত্বতির অন্তর্গত সত্ত্বতিবিশেষ, এককার্যাবলিহীনতা অর্থাৎ কার্যের সমানতা।

কার্যাবলি (জি) কার্যে কার্যাসম্পাদনে উৎসাহঃ, ১৩৭। কার্যনির্বাহে ব্যগ্র।

কার্যাবলি (পুং) কার্যে উদ্যমঃ চেষ্টা, ১৩৭। কার্য সম্পাদনে চেষ্টা।

কার্যোদ্ধৃত্ত (জি) কার্যের উদ্ভব উদ্ভবস্থানঃ ৭৩৭।
কার্যোদ্ধবস্থানঃ উদ্ভবস্থানঃ ৭৩৭।

কার্যোদ্ধবস্থানঃ (পূঃ) কার্যের উদ্ভবস্থানঃ ৭৩৭। কার্য-
আরম্ভের চেতা।

কার্যোদ্ধবস্থানঃ (পূঃ) কার্যের উদ্ভবস্থানঃ ৭৩৭। কার্য-
সম্পূর্ণরূপে কার্যমিহি।

কালি—একটি পর্বতের ওহা। অক্ষাঃ ১৮° ৪৫' ২০" ও
দ্রাঘিঃ ৭৩° ৩১' ১৬" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পূর্বা হইতে
বোরাই বহিবার পথে অর্ধেক দূরে আসিয়া দক্ষিণভাগে
সমুদ্রের নিকে অন্নদূর গমন করিলেই পর্বতের উপত্যকার
কালিওহা দেখা যায়। সমুদ্রতটপর্বত হইতে কালিপাহাড়
বর্তর জাবে অবস্থিত। ইহা লানোলি টেসনের অতি নিকট।

এই ওহার একটি সুন্দর মন্দির খোদিত আছে। পর্বতের
পর্বতের তিতর খোদিত মানাহানে মানাহানে মন্দির
আছে। কিন্তু গঠন বৈচিত্র্যে কাশির ভীর কোমলীই মনে।
সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধধর্মের নির্মিত। নির্মিত উপালনা করিবার
জন্ত বৌদ্ধধর্ম পর্বতের ওহার তিতর এই চৈত্র্য নির্মাণ
করেন। ইহার গঠনপ্রণালী কতকটা এখনকার সিদ্ধান্ত মত।
ওহার মুখের গোড়ার সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের দুইদিকে দুইটি
প্রস্তরের স্তম্ভ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখন একটি
মাত্র দেখা যায়। অপর স্তম্ভের স্থানে একটি ছোট প্রস্তর-
মন্দির নির্মিত হইয়াছে অথবা একটি স্তম্ভই বরাবর ছিল
তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। স্তম্ভটি গোলাকার,
তদুপরি ৩২টি পল দৃষ্ট হয়। উহা ভূমি হইতে সমতাবে উঠে



কালি।

উদ্ভবস্থানে। স্তম্ভের উপরিভাগে কাশিস। কাশিসের উপর
চারিদিকে চারিটি সিংহমূর্তি খোদিত। কেহ কেহ অনুমান
করেন যে এই মূর্তিগুলি একটি চক্রধারণ করিত। সিংহদ্বার
পার হইয়াই আর একটি দ্বার। উহার বিস্তার আর ৩৫ হস্ত
হইবে। ইহার দুই পাশে দুইটি স্তম্ভ, দুইদিকই অষ্টভোজ বা
অষ্টপলবিশিষ্ট। স্তম্ভ দুইটি সাদা সিংহ, নিয়ে বা উপরিভাগে

কোন কারুকার্য দ্বারা সাজান নহে। তবে উপরিভাগে দুই
স্তম্ভে দুইখানি প্রস্তর প্রস্তরকলক আছে। তাহার পর আবার
খানিক উঠে একটি কাশিস। তাহা হইতে চারিটি স্তম্ভাভূতি
কতকদূর নাথিরা আসিয়াছে। তাহার পর আর একটি প্রস্তর
হইলেই মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্ত তিনটি দ্বার আছে। এই
দ্বার করে কলি উদ্ভব, কোমলপ কশাট নাই। তিনটি দ্বারই

কার্ষিক (পূ.) কর্ষ-বার্ষে ঠক্। ১ কার্ষাপণ। ২ (কর্ষ: শীল
মত, কর্ষ-ঠক্) কৃষক। ৩ (কর্ষত অরন্) শাস্ত্রীর পণের
চতুর্থাংশ। ৪ (কর্ষ: পরিমাণমত) কর্ষপরিমিত মূল্য বার
যে বস্তু ক্রয় করা হইয়াছে।

कारिबद (३) [३] प्र. सं. का. नं. १०, ११, १२

काठे (जी) इंडियन सोसायटी, इंडियन सोसायटी, इंडियन सोसायटी

प्रा.सं.३.१२२१) प्रदेस, हरिद्वार-भाग

कार्क ने वि. इकाई देना, १९५५। - इकाई देना।

२. इकाईनामनामिका । ३. (इकाई) की संख्या । इकाईनाम

बदला, कथित !

काक'विनि (२) इकाविनि काक'विनि, इकाविनि-३।

१) इकादशसूत्रिण भूष । २) निरुक्तविशेष । ३) दार्शनिक विज्ञान

[illegible]

नाम हरे हरे । ४ सर्वत्र प्रसिद्धिप्राप्तम् । श्रीगणेशाय नमः ।

হেঁসাজি, বাঁধবাজি, কবুতর প্রভৃতি স্বাদু পণ্ডিতগণ

काक विनिर्गतं यत् उहं तं कश्चिदाह्न ।

কাকি দিন (৭২) ককর কাকর গোয়াপতায়, কক-কক (নভা)

विद्या ऋषिः श्रीगुरुदेवः ॥ १ ॥

२. समिति, समिति

SECRET

1964-1965

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100-443888-100

मासिक (२०) वर्ष (२०) वर्ष (२०) वर्ष

[१००]

बालक (श्री) कृष्ण काव्य, कृष्ण-राज्य (वर्तमानिक काव्य)

[illegible]

कोष [३] (जी) कबडि नम, हय-राज विद्या नारायण

पुनः [२५] १ पुनः २ (काला नमि) कर्म ।

काशी (जी) काशी कर्करा नालि नालि, काशी-का-का-का

100

कायदा (२) कायदा विभाग कायदा विभाग

কৃষ্ণের আশ্রয় ।

कार्या (गुं) कव-क-वार्थे यान् । नागगाहः ।

